লাঙল ও গণবাণী



লাঙল ও গণবাণী

লাঙল ও গণবাণী

সম্পাদনা

মুহম্মদ নূরুল হুদা

নজরুল ইন্সটিটিউট

লাঙল ও গণবাণী
সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ / মে ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪২০ / জুন ২০১৩

প্রকাশক
নজরুল ইন্সটিটিউট
কবিভবন
বাড়ি-৩৩০-বি, রোড ২৮ (পুরাতন)
ভাষাসৈনিক বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী সড়ক
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৯

প্রচ্ছদশিল্পী
রবি সরদার

মুদ্রাকর
অনুপম প্রিন্টার্স
৫ শ্রীশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য
পাঁচশত টাকা মাত্র

LANGOL O GANAVANI. Edited by Mohammad Nurul Huda, Published by Nazrul Institute, Kabi Bhaban, House 330-B, Road 28 (Old), Dhanmondi Residential Area, Dhaka-1209, Bangladesh.

Price
Taka 500.00 / US $ 25.00

ISBN 984-555-260-9

নজরুল জন্মশতবর্ষে
কবির অমর স্মৃতির
প্রতি
উৎসর্গীকৃত

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

নজরুলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বুধবার ১লা পৌষ, ১৩৩২, ইং ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫'।

আর নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে 'লাঙল' পত্রিকা-সমগ্র প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ / মে ২০০১ সালে।

মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত 'লাঙল' সমগ্রতে সম্পাদক উল্লেখ করেছেন, 'লাঙল-এর সবগুলো সংখ্যা পাওয়া গেলেও কিছু পৃষ্ঠা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি'।

যেহেতু আজ পর্যন্ত তা উদ্ধার করা যায়নি, তাই পূর্ববর্তী মুদ্রণই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

২.

নজরুলের 'গণবাণী' শিরোনামের সঙ্গে বন্ধনীতে (... 'লাঙল' একীভূত হয়েছে) বাক্যটি প্রমাণ করে পত্রিকার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে কোনো ভিন্নতা বা পার্থক্য আনা হয়নি। 'লাঙল' যেমন কৃষক তথা অতি সাধারণ মানুষের কথা বলে, তেমনি 'গণবাণী'ও যে জনগণের জয়গাথা পরিবেশন করে তা ধ্রুব সত্য। নজরুলের এই অমর অবদান পাঠকের মনন সমৃদ্ধ করবে; এ-আশাবাদ প্রকাশ করছি।

রশীদ হায়দার
নির্বাহী পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

প্রথম মুদ্রণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি মনীষার এক মহত্তম বিকাশ, বাঙালি সৃষ্টিশীলতার এক তুঙ্গীয় নিদর্শন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রায় সর্বাঞ্চলে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। নজরুল তার বহুমাত্রিক প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে যুক্ত করেছেন আপন-মাত্রা।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিরক্ষা, তাঁর জীবন, সাহিত্য-সঙ্গীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, রচনাবলী সংগ্রহ, প্রকাশনা ও প্রচার নজরুল ইন্সটিটিউট কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

নজরুল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট নজরুল জন্মশতবর্ষ গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করেছে। শতবর্ষ গ্রন্থমালায় নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ে নানাকৌণিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে 'নজরুলের লাঙল' প্রকাশিত হলো। 'লাঙল'-এর সবগুলো সংখ্যা পাওয়া গেলেও কিছু পৃষ্ঠা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সংগ্রহ করা সম্ভব হলে পরবর্তী সংস্করণে এ-সব পৃষ্ঠা সংযোজন করা হবে। আশা করা যায়, নজরুল গবেষণায় এ-গ্রন্থটি আকর-গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাধ্যমত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। এ-জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

যাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের এ-গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ড. রফিকুল ইসলাম
সভাপতি
নজরুল ইন্সটিটিউট ট্রাস্টি বোর্ড, ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা



'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের স্বাক্ষর সম্বলিত ছবি

লাঙল

লাঙল



প্রধান পরিচালক

নজরুল ইস্‌লাম

সম্পাদক—শ্রী

মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নগদ মূল্য এক আনা

বার্ষিক ৩।০ টাকা

লাঙলে

কি কি থাকিবে ?

১। বিদ্রোহী কবি, নজরুল ইসলামের কবিতা

২। ম্যাক্সিম গর্কীর জগৎবিখ্যাত রোমাঞ্চকর উপন্যাস "মা"র ধারাবাহিক অনুবাদ।

৩। কাল মার্কসের জীবনী

৪। প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচনা

৫। গণ-আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা ও সংকলন।

৬। প্রতি সংখ্যায় একখানি করিয়া ছবি।

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র

প্রথম খণ্ড } বুধবার ১লা পৌষ, ১৩৩২, ইং ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫ { বিশেষ সংখ্যা

এই সংখ্যায় লাঙলের সর্ব্ব প্রধান সম্পদ

কবি নজরুল ইস্‌লামের কবিতা

সাম্যবাদী



লাঙল

প্রধান পরিচালক
নজরুল ইসলাম

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র]

সম্পাদক—
শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড } বুধবার, ১লা পৌষ, ১৩৩২ { বিশেষ সংখ্যা

"লাঙল"

—:০:—

যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালী মাথায় ক'রে মাটি বিক্রী করে, সেই দানব শহর কলিকাতায় "লাঙল" চালাবার দুঃসাহস যারা করে, তাদের সকলেই নিশ্চিত পাগল মনে করছেন। কিন্তু এই পাষাণ শহরেই আমরা "লাঙল" নিয়ে বেরুলাম। এই পাষাণের বুক চিরে আমরা সোনা ফলাতে চাই। ব্রহ্মপুত্র স্রোত হিমালয়ে আটকে গেলে হলধর লাঙলের আঘাতে পাহাড় চিরে সেই স্রোতকে ধরায় নামিয়ে ছিলেন। সেই জল কত প্রান্তর শ্যামল ক'রে কত তৃষিত কণ্ঠের পিপাসা মিটিয়ে বাংলা দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। "লাঙলবন্ধ" আজ বাংলার তীর্থ। মহাত্মাগণের আন্দোলন আজ নেতাদের পাষাণ-পারি-পার্শ্বিককে আটকে গেছে—তাই আজ আবার হলধরের ডাক পড়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনে শহরের সৃষ্টি হ'য়ে পল্লীমুখী বাংলার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে। শাসন এবং শোষণের সহায়তার যন্ত্রস্বরূপে ভদ্র-সম্প্রদায় আত্মবিক্রয় ক'রে শহরে উঠে এসেছেন। গ্রামের আনন্দ উৎসব রোগ-শোকের চাপে লুপ্ত হয়ে গেছে। শহরের বেকার বাঙালী আজ বুঝছে গ্রাম ছেড়ে এসে তার কি নিরুপায় অবস্থাই হয়েছে। জমিদার আর গ্রামের সকল কর্মের প্রাণস্বরূপে উপস্থিত নন—তিনি শহরে এসে বাস ক'রে মদ-মাংস মেয়েমানুষ-মোটর-মামলা এই পঞ্চ-মকারের সাধনায় নিযুক্ত আছেন। নায়েব গোমস্তার অত্যাচারে প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত। মহাজনের হাতে জমির শস্য চ'লে যাচ্ছে। গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটছে—কলকারখানায় কতক ঢুকে নিজেদের সর্ব্বনাশ করছে—আর কতক নানা হীন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করছে। দেশে চুরি, ডাকাতি ও বলাৎকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

যেমন তিন আনা সের এবং মাছ কেন দেড় টাকা সের হয় তাই লোকে জিজ্ঞাসা করে। যে ক্ষেতের মালিক বা মাছ ধরে তার অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে—জমিদার মহাজন, দালালের পেটেই লাভের বার আনা যাচ্ছে। কাজেই ক্রেতাকে দাম এত বেশী দিতে হচ্ছে।

জমিতে চাষীর স্বত্ব নাই। যত্নের অভাবে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়েছে। উৎপন্নে প্রজার লাভের পূর্ণ অংশ নাই। আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি। কাউন্সিলে এবং খবরের কাগজে স্বরাজের জন্য চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছি। আবার বলছি স্বরাজ পেলে এই সমস্ত সমস্যা আপনিই দূর হবে!

এই "স্বরাজ"টা এখন হলে পাবে কে? যারা পাবে তারা নিজের হাতে যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা এখনই আছে, তা সকলকে দিচ্ছে কি? আমরা স্বরাজের মামলা আর এটর্ণি দিয়ে করতে চাই না—এবার নিজেদেরই বুঝতে হবে। মথুরার লীলা ঢের দেখেছি—আমাদের দেবতা যিনি তাঁকে বৃন্দাবনের শ্যামল মাঠে ফিরিয়ে আনতে চলেছি, তিনি রাখাল-গণের সখা তিনি গোধন চরাতে ভালবাসেন। তিনি বেণু বাজিয়ে সকলকে পাগল করেন! যদি সেই দেবতার আবাহনে কেউ বাধা দেন, তবে আমাদের হলধর ঠাকুর তাঁকে রাখবেন না—লাঙলের আঘাতে তাকে মরতেই হবে।

"লাঙল" চালিয়ে যিনি সীতাকে লাভ করেছিলেন, সেই জনক আমাদের গুরু। যিনি producer (জনক) তিনিই ঋষি। তিনিই সমাজের শ্রেষ্ঠ। আজ নব-জনকের নূতন দর্শনে আমাদের জ্ঞানলাভ করতে হবে। Destributor হিসাবে জনকয়েক ভদ্রলোকের স্থান সমাজে আছে। ডাক্তারী, শিক্ষকতা প্রভৃতির দ্বারা সমাজের সেবা করার জন্য লোকেরও প্রয়োজন। কবি, চিত্রকর, শিল্পী হিসাবেও তাঁদের স্থান আছে। কিন্তু পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার ব্যবসাটা লোপ পাওয়া দরকার। শরীরের মধ্যভাগ বেশী স্ফীত হয়ে গেলে শরীরটা অচল হয়ে পড়বে। দু'বার পেট শরীর অপেক্ষা বড় হ'লে তার মেদের মাংস খেলে দু'বারই উপকার।

হিন্দুর বর্ণ-বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিযোগিতাকে এড়িয়ে শ্রমবিভাগ-নীতি মেনে পুরুষানুক্রম একই চর্চ্চা করে সমাজের ক্রমোন্নতি এই পদ্ধতির মূলে ছিল। এখন কিন্তু তালগাছহীন তালপুকুর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই বর্ণ-বিভাগ।

ব্রাহ্মণ পাদরির রাজত্ব গিয়েছে। গুরু-পুরোহিত, মোল্লা, পোপ নির্বংশ-প্রায়। ক্ষাত্র-সম্রাট ও সাম্রাজ্য সব লোপে পড়েছে। রাজা আছেন নামে মাত্র। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এখন বৈশ্যের রাজত্ব। এবার শূদ্রের পালা। এবার সমাজের প্রয়োজনে শূদ্র নয়—শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সমস্যা সব লাঙলের ফালে মুখে লোপ পাবে। তাই আমরা লাঙলের আগমন সংবাদ জানালাম। লাঙল নবযুগের নব দেবতা। জয় লাঙলের জয়—জয় লাঙলের দেবতার জয়!!

"যাহারা বর্ত্তমানে বাঙ্গালার চার কোটী ষাট লক্ষের মধ্যে চার কোটী, যাহারা দেশের প্রাণ রক্ত, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটী কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে, যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্ব্ব প্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালার ধর্ম্মকে অটুট রাখিয়াছে, যাহারা আজিও শুদ্ধ চিত্তে সরল প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্য বাঙ্গালী আজিও বাঙ্গালী, যাহারা মাটী ও বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহাদের আমরা বিলাতী শিক্ষা মোহে আইন-আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজনা ন্যায্য ভাবে কি অন্যায্য ভাবে বাড়াইয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গালীর একবারে রক্ত মাংস প্রাণ, তাহারা বড় না আমরা বড়? কোন্ সাহসে কি অহংকারে, তাহাদের জলস্পর্শ করি না? কাছে আসিলে ঘৃণিত কুকুরের-মত তাড়াইয়া দিই? এত অহঙ্কার কিসের? দাম্ভিকতা কেন? ঐ যে বাঙ্গালার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গালার মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবাবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গালার কুটীরে বাঙ্গলায় গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, তারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ!!"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সাম্যবাদী

[নজ্‌রুল ইসলাম]

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুস্‌লিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?—পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্ব্বাক-চেলা? ব'লে যাও, বল আরো!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও যত সখ,—
কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফুটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে' দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম্ম সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জ্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।

* * *

ঈশ্বর

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে?
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চুড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মাণিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠোনা, শাস্ত্রবিদের ক'রোনাক বীর, ভয়,—
তাহারা খোদার খোদ্ "প্রাইভেট সেক্রেটারী" ত নয়!
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি!
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কুলে—
রত্নাকরের খবর তা ব'লে পুছোনা ওদেরে ভু'লে।
উহারা রত্ন-বেণে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে!
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে।

* * *

মানুষ

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম্ম জাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি—
'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হোলো!'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়!—
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিক সাত দিন!'
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মাণিক জ্বলে!
ভুখারী ফুকারী কয়,
ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!
মসজিদে কাল শির্‌নী আছিল,—অঢেল গোস্ত রুটী
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি।
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন্
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাতদিন!
তেরিয়াঁ হইয়া হাঁকিল মোল্লা—"ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?"
ভুখারী কহিল "না বাবা!" মোল্লা হাঁকিল—'তাহলে শালা,
সোজা পথ দেখ!" গোস্ত-রুটী নিয়া মস্‌জিদে দিল তালা!

'লাঙল'

ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে—
আশীটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা'বলে বন্ধ করনি প্রভু!
তব মস্‌জিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!
কোথা চেঙ্গিস্, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা র'বে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!
হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!
মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কা'রা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!
ও'মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল!—মূর্খ'রা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ;—গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!
আদম দাউদ ঈশা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর,—বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরি এঁরা পিতাপিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরি রক্ত কম-বেশী ক'রে প্রতি ধমনীতে রাজে!
আমরা তাঁদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরি মতন দেহ,
কে জানে কখন্ মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।
হেস না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি কে'জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।
হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ঈশা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি কে পায় কাহার দিশা?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়ত উহারি বুকে ভগবান্, জাগিছেন দিবারাতি!
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান্ উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!
হয়ত ইহারি ঔরসে ভাই ইহারই কুটীর বাসে
জন্মিছে কেহ—জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে!
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখেনি,—হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে!

ওকে? চণ্ডাল? চম্‌কাও কেন? নহে ও ঘৃণ্যজীব!
ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল কা'ল হ'তে পারে মহাযোগী-সম্রাট,
তুমি কা'ল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী-পাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে কর হেলা, ও হেলা কাহারে বাজে!
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
চাষা ব'লে কর ঘৃণা!
দে'খো চাষারূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না!
যত নবি ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল
তারাই আনিল অমর বাণী—যা আছে র'বে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিণী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।
সে মার রহিল জমা—
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা!
বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ দুচোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোন্ খানে!
তোমারি কামনা রাণী
যুগে যুগে, পশু, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি।

পাপ

সাম্যের গান গাই!—
যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
এ পাপ-মুলুকে পাপ করেনিক কে আছে পুরুষ নারী?
আমরা ত ছার;—পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী!
তেত্রিশ কোটী দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল,
দেবতার পাপ-পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর দল!
আদম হইতে শুরু ক'রে এই নজরুল তক্ সবে
কমবেশী ক'রে পাপের ছুরীতে পুণ্য করেছে জবেহ্।
বিশ্ব পাপস্থান
অর্দ্ধেক এর ভগবান, আর অর্দ্ধেক শয়তান!
ধর্ম্মান্ধরা শোনো,
অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো!
পাপের পঙ্কে পুণ্য-পদ্ম, ফুলে ফুলে হেথা পাপ!
সুন্দর এই ধরা-ভরা শুধু বঞ্চনা অভিশাপ।
এদের এড়াতে না পারিয়া যত অবতার আদি কেহ
পুণ্যে দিলেন আত্মা ও প্রাণ, পাপেরে দিলেন দেহ।
বন্ধু, কহিনি মিছে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হ'তে ধ'রে ক্রমে নেমে এস নীচে—
মানুষের কথা ছেড়ে দাও যত ধ্যানী মুনি ঋষি যোগী
আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী!

এ দুনিয়া পাপশালা,
ধর্ম্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা।
হেথা সবে সম পাপী,
আপন পাপের বাট্‌খারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি।
জবাবদিহির কেন এত ঘটা যদি দেবতাই হও,
টুপি প'রে টিকি রেখে সদা বল যেন তুমি পাপী নও!
পাপী নও যদি কেন এ ভড়ং ট্রেড্‌মার্কার ধুম?
পুলিশী পোষাক পরিয়া হয়েছ পাপের আসামী গুম্!
বন্ধু, একটা মজার গল্প শোনো,
একদা অপাপ ফেরেশ্‌তা সব স্বর্গ-সভায় কোনো
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়মে দুষি—
দিন রাত নাই এত পূজা করি এত ক'রে তাঁরে তুষি'
তবু তিনি যেন খুশী নন্—তাঁর যত স্নেহ দয়া ঝরে
পাপ-আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ জাতিরই পরে!
শুনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে কন,—
মলিন ধূলার সন্তান ওরা বড় দুর্ব্বল মন,
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা—নয়নে, অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দ্রহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দে'খে ম'রে আছে মার!
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান্,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ।
দেবদূত সব বলে, প্রভু, মোরা দেখিব কেমন ধরা,
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু-জরা!'
কহিলেন বিভু—'তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন
যাক্ পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণীর প্রলোভন!'
"হারুত" "মারুত" ফেরেশ্‌তাদের গৌরব রবি-শশী
ধরার ধূলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি।—
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল-দীঘিতে সাতশ' হয়েছে এক আকাশের চাঁদ!
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী!
দুদিনে আতশী ফেরেশ্‌তা-প্রাণ ভিজিল মাটীর রসে,
শফরী-চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরী ঝলকি, গাগরী ছলকি নাগরী "জোহরা" যায়—
স্বর্গের দূত মজিল সেরূপে বিকাইল রাঙা পায়!
অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি
মাটীর সোরাহী মস্তানা হ'ল আঙুরী-খুনে তিতি!
কোথা ভেসে গেল সংযম-বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভ'রে পিয়ে মাটীর মদিরা ওষ্ঠ-পুষ্প-পুটে।
বেহেশ্‌তে সব ফেরেশ্‌তাদের বিধাতা কহেন হাসি—
'হারুত মারুতে কি করেছে দেখ ধরণী সর্ব্বনাশী!'
নয়না এখানে যাদু জানে সখা এক আঁখি-ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়।
সুন্দর বসুমতী
চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয়—কাম রতি!

* * *

চোর ডাকাত

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে?
চারিদিকে বাজে ডাকাতী ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে!
চোর ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্ম্মরাজ?
জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ?
বিচারক! তব ধর্ম্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়!
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট-রক্ত-ইঁটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছে খল কল্‌ও'লা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল!
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়ি কল-ওয়ালা
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পুরিছে স্বর্ণ-জ্বালা!
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফুলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ ক'রে জমিদার চড়ে জুড়ি!
পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নীচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী, গাহে যক্ষের জয়!
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।
পালাবার পথ নাই
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে চোরে এরা মাস্তুত ভাই, ঠগে ও ঠগে স্যাঙাৎ।
কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু, কে বলে করিছ চুরী?
চুরী করিয়াছ টাকা ঘটি বাটী, হৃদয়ে হাননি ছুরী!
ইহাদের মত অমানুষ নহ, হ'তে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর।

* * *

বারাঙ্গনা

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?
হয় ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতাসম সতী মায়ে।
না-ই হ'লে সতী তবু ত তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি।
আমাদেরই মত খ্যাতি যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে!—

স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হ'ল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়—
তাঁদেরি পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যাঁয়!
মুনি হ'ল শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার—মহাপ্রেমিক সে যিশু!—
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-কালিয়-দহে।
শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকেনাক' কোনো গ্লানি!
পাপ করিয়াছ বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হ'তে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন্ গোঁড়া পাড়ে গালি?
তাহাদেরে আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি—
দেবতা গো জিজ্ঞাসি—
দেড়শত কোটী সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—
কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎ-সতী?
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুড়ে জ'ন্মে মরে?
সেরেফ্ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা! তবুও গর্ব্ব কত!
শুন ধর্ম্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।

* * *

মিথ্যাবাদী

মিথ্যা বলেছ বলিয়া তোমায় কে দিল মনস্তাপ?
সত্যের তরে মিথ্যা যে বলে স্পর্শে না তারে পাপ।
গোটা সত্যটা শুধু ত সত্য কথা বলাতেই নাই,
মিথ্যা কয়েও সত্যনিষ্ঠ হতে পারি আমরাই।
সত্যবাক্ সে বড় কিছু নয়, ক'জন সত্যবান্?
সত্যবাদীরা ক'জন দিয়াছে সত্যের তরে প্রাণ?
অন্তরে যারা যত বেশী ভীরু, যত বেশী দুর্ব্বল,
নীতিবিদ্ তারা তত বেশী কয়ে সত্য-কথন ছল।
সত্যকামেরও নমস্য যারা সত্যনিষ্ঠ বীর—
সত্যের তরে হাসিতে হাসিতে যারা দিল নিজ শির!
হয়ত তাহারা অনেক মিথ্যা বলেছে জীবন ভ'রে
তবু তারা বীর—তারা দিল প্রাণ সত্য-রক্ষা তরে।
সত্য লইয়া করিছে ওজন কে উনি মুদীর মত?
মনে মনে ভাবে কি কাষই করিনু আমি সে বিজ্ঞ কত।
বলি ওহে বাপু সত্য-ব্যাপারী, সত্য কি চা'ল ডা'ল?
কোথা কয় রতি সত্য কমিল, তাই নিয়ে দেবে গা'ল।
সত্য মুদীর তথ্য:—
অমুক বীরের জীবনে কমেছে দু' দু' একটুকু সত্য!
ওকে আসে বাবা? সত্যেরে তবু এরা মাপে, ওগে গণে।
দশটী কথায় বাঁধিল সত্য, হেসে মরি মনে মনে!
বাটখারা আর রসি নিয়ে এল সত্যের পিসী মাসী,
মাপিয়া মাপিয়া ভরিল বস্তা, গুণে গুণে বাঁধে থাসী!
বন্ধু, শুনো না কূট তর্কের যত হাতী ঘোড়া উট,
সত্যনিষ্ঠা থাকে যদি প্রাণে, বেপরোয়া বল ঝুট!

* * *

নারী

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্দ্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয়-জ্ঞান?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।
অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু গন্ধ সুনির্ম্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে—নারী যোগায়েছে মধু।
শস্যক্ষেত্র উর্ব্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটী মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।
স্বর্ণ রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হয়েছে অলঙ্কার।

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সীঁথির সিন্দুর লেখা নাই তার পাশে!
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রাণী,
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।
পুরুষ হৃদয়-হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাঁদের যশ ধরেনাক অমর মহামানব
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।
লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।
নারী সে শিখা'ল শিশু-পুরুষেরে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরা'ল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে ক'রে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ।
তিনি নর-অবতার :—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার!
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্দ্ধনারীশ্বর
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর!
সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে প্রবল পুরুষে করিল, নারীরে অবলা দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!
শোনো মর্ত্ত্যের জীব!
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।...
স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী,
করিল তোমায় বন্দিনী, বল কোন্ সে অত্যাচারী?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!
যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ!!
ধরার দুলালী মেয়ে!
ফিরনা ত আর গিরিদরীবনে পাখী-সনে গান গেয়ে।
কখন্ আসিল "প্লুটো"-যমরাজা নিশীথ-পাখায় উ'ড়ে,
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে।
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হ'তে আছ মরি
মরণের পুরে; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী।
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুঁড়ি'!
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি!
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও-পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে!
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে-হাতে কূট বিষ দিতে হবে!
সেদিন সুদূর নয়—
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

* * *

রাজা-প্রজা

সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সম-বেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।
এ প্রশ্ন অতি সোজা
এক ধরণীর সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?
অদ্ভুত দর্শন—
এই সোজাকথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন্!
প্রজা হয় শুধু রাজ-বিদ্রোহী, কিন্তু কাহারে কহি,
অন্যায় ক'রে কেন হয়নাক রাজাও প্রজাদ্রোহী!
প্রজারা সৃজন করেছে রাজায়, রাজা ত সৃজেনি প্রজা,
কৃতঘ্ন রাজা তাই কি প্রজায় ধ'রে করে দিল খোজা?
বন্ধু হাসিছ চু'টে,
আপনার ঘরে হয়ে আছি সব গোলাম নফর মুটে!
আপনার পুরুষত্ব অস্ত্রে সঁপিয়া কি পেনু দাম?
আগলাতে রাজা-রাজ্য-হেরেম হয়েছি খোজা গোলাম!
এ ব্যথা কাহারে কই,
যার ঘর তার ঘর নয় আর নেপো' মারে এসে দই!
যাদের লইয়া রাজা, রাজ্যে নাই তাহাদেরই দাবী,
রাজা দেবতার অনন্ত ভোগ, আমরা খেতেছি খাবী!
এ নিয়ে নালিশ কার কাছে করি, জয় রাজা জি কি জয়!
আমাদের হয় সুবিচার, নাই রাজারই বিচারালয়!
গুরু গুরু বাজে যুদ্ধ-ডঙ্কা, দলে দলে ছুটে ছেলে,
হেসে বুক চিরে কলসী কলসী তাজা খুন দিল ঢেলে।
কলিজা-ছিদ্রে দীর্ঘশ্বাস ফুঁ দিয়া বাজায় শাঁখ,
ঘরে ঘরে উঠে ক্রন্দন-উলু, চালে চালে ডাকে কাক;

প্রস্তুত হ'ল পথ

বাজা, শাঁখ বাজা, ওই দেখা যায় জয়-লক্ষ্মীর রথ!
মাগো কাঁদ্ তোরা, আদুরী বোনেরা ধুলায় লুটায়ে পড়্,
সিঁথায় সিঁদুর নাই দিলি বধূ, চল্ খেয়ে গেছে ঝড়।
ফেরেনি ছেলেরা? ফেরেনি ভাইরা? ফেরেনিক পতি? ওরে
দুঃখ কি? ওরা স্থান পেয়েছে যে জয়-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে।
আজিকে রাজ্যময়,
শোকের তুফান ছাপাইয়া ওঠে—জয় রাজা কি কি জয়!
বাজারে ডঙ্কা বাজা!
এতদিন পরে কেল্লা ছাড়িয়া বাহির হয়েছে রাজা!
নিহত আহত বীরেরে মাড়ায়ে ছুটেছে রাজার রথ,
যুদ্ধ-ফেরত ধন্য পন্থ পালা পালা ছাড় পথ!
বন্ধু এমনি হয়—
জনগণ হ'ল যুদ্ধে বিজয়ী, রাজার গাহিল জয়!...
প্রজারা যোগায় খোরাক পোষাক, কি বিচার বলিহারি,
প্রজার কর্ম্মচারী নন তাঁরা রাজার কর্ম্মচারী!
মোদেরি বেতন-ভোগী চাকরেরে সালাম করিব মোরা,
ওরে 'পাব্লিক সারভেন্ট'দেরে আয় দেখে যাবি তোরা!
কালের চরকা ঘোর্,
দেড়শত কোটী মানুষের ঘাড়ে—দেড়শত কোটী চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়—
সমবেত রাজকণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয়!

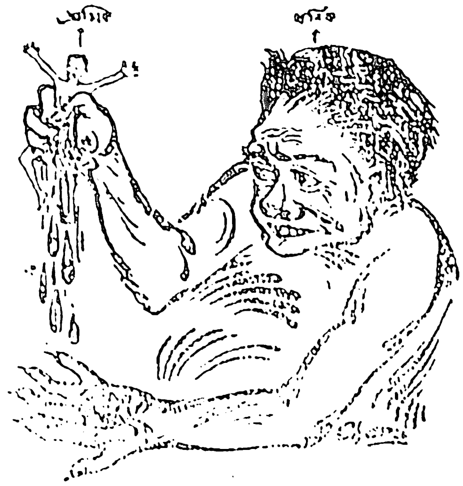
* * *

সাম্য

গাহি সাম্যের গান—
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে মুখে মুখে তাজা প্রাণ।
বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র ধনী,
হেথা পায়নাক কেহ ক্ষুদ ঘাঁটা কেহ দুধ-সর-ননী।
অশ্ব-চরণে মোটর-চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ,
ঘৃণা জাগেনাক সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা-দেহ।
সাম্যবাদী-স্থান
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান।
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গির্জ্জা-ঘর,
নাইকো পাইক-বরকন্দাজ নাই পুলিশের ডর।
এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশ্ত্, এখানে বিচ্ছেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছি ভাই ভাই।
নেইক এখানে ধর্ম্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।
হেথা স্রষ্টার ভজনা-আলয় এই দেহ এই মন,
হেথা মানুষের বেদনায় তাঁর দুখের সিংহাসন।
সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে-নামে যে-কেহ ডাকে,
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মা'কে!
পাজামা প্যান্ট ধুতি নিয়া হেথা হয়নাক ঘুষাঘুষি
ধূলায় মলিন দুখের পোষাকে এখানে সকলে খুসী।

কুলি-মজুর

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্ব্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে!
বেতন দিয়াছ?—চুপ্ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্!
রাজ-পথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলত এ সব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লিখা।
তুমি জাননাক কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূ'লি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হা'ল রবে তাহাদেরি বশে!
তারি পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধুলি!
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত্ত পীড়িতের মাখি খুন,
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!
আজ ডাক শুনি জাম-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,
রং-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও!
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য্য তারারা পড়ুক ঝ'রে!
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি,
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশী।
এক জনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা!
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা—সকলের অপমান!
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্দ্ধে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান!



পেট-পোরা তার রাক্ষসী ক্ষুধা
ধনিক্ সে নির্ম্মম ;
দীনের রক্ত নিঙাড়িয়া করে
উদর ভূধর-সম ।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়

উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী

গঠন-প্রণালী

১। নাম—ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়—এই দলের নাম হইবে।

২। উদ্দেশ্য—নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।

৩। উপায়—নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি-প্রয়োগ উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হইবে।

৪। সভ্যপদ—ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির যে কোন সভ্য এই দলের উদ্দেশ্য, গঠন-প্রণালী এবং কার্য্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন তিনিই কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির মত হইলে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সভ্য হইতে পারিবেন। শ্রমিক এবং চাষীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণের কথা যতদিন স্বরাজ্যদলের কার্য্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, ততদিন এই দলের সভ্যগণের স্বরাজ্যদলের সভ্য হওয়ায় বাধা নাই।

৫। চাঁদা—এই দলের প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক এক টাকা চাঁদা দিবেন। শ্রমিক ও কৃষক হইলে বার্ষিক এক আনা চাঁদা লাগিবে। প্রয়োজন স্থলে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতি চাঁদা না লইতেও পারেন।

৬। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েৎ—কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েৎ কমবেশী পনের জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। দলের সৃষ্টি-কর্ত্তাগণ তাঁহাদের প্রথম সভায় তিন বৎসরের জন্য ইহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিবেন। পঞ্চায়েতগণ নিম্নলিখিত বিভাগগুলির এক বা ততোধিক বিভাগের ভার লইবেন এবং তদ্বিষয়ে চরম ক্ষমতা পাইবেন।

(১) প্রচার (২) অর্থ (৩) দল গঠন (৪) শ্রমিক (৫) চাষী (৬) ব্যবস্থাপক সভা।

পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট থাকিবে। সমান সমান স্থলে যে ব্যক্তি সভাপতির কাজ করিবেন, তিনি কাষ্টিং ভোট দিতে পারিবেন। তিন জন সভ্য থাকিলেই পঞ্চায়েতের কার্য্য চলিতে পারিবে।

৭। প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ—কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের দ্বারা নিযুক্ত পাঁচ হইতে নয়জন সভ্য লইয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে।

৮। প্রাদেশিক পরিষৎ—প্রাদেশিক পঞ্চায়েতের দ্বারা প্রথম অবস্থায় এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত প্রত্যেক জেলায় জন্য

এক বা একাধিক প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক পরিষৎ গঠিত হইবে।

৯। জেলার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা করিবেন। এই সকল পরিষৎ গঠিত হইলে প্রাদেশিক পরিষৎ, প্রাদেশিক পঞ্চায়েৎ এবং কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতে সভ্য নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১০। উপরোক্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েৎ করিবেন। এবং সে বিষয়ে তাঁহাদের মতই চরম বলবান হইবে।

কর্ম্মনীতি ও সংকল্প

যেহেতু বিদেশী আমলা-তন্ত্রের সৃষ্ট এবং সেই আমলা-তন্ত্রের শাসন প্রণালীর স্থিতির উপর যাহাদের চরম অস্তিত্ব নির্ভর করে, সমাজের সেই শ্রেণীর স্কুল কলেজ, আইন-আদালত ও কাউন্সিল বর্জ্জনের দাবী করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের অসফলতার অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানে বোঝা যাইতেছে।

যেহেতু ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের বাধা-প্রদান-নীতি চেষ্টা দ্বারা আমলা-তন্ত্রকে ভারতের জাতীয় দাবীর পরিপূরণে ইচ্ছুক করান যায় নাই, এবং সমস্ত ব্যবস্থা-পরিষদগুলি স্বরাজ্যদলের সভ্যগণের দ্বারা অধিকৃত হইলেও ভবিষ্যতে ঐ নীতির সফলতার আশা দেখা যাইতেছে না।

যেহেতু ভারতের স্বাধীনতা-সমরের সেনানীগণের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে আবদ্ধ হওয়া বিষয়ে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের একযোগে তীব্র প্রতিবাদ আমলা-তন্ত্রের মনোভাবের কোনও পরিবর্ত্তন সাধনে সমর্থ হয় নাই।

যেহেতু অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র ধারা যাহাতে সাক্ষাৎ প্রতিরোধ ক্রিয়ার সর্ব্বজনীন প্রয়োগ দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট ও খাজনা বন্ধের দ্বারা হইতে পারিত এবং তদ্দ্বারা শাসন-যন্ত্র ও শোষণ-যন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লওয়া হইত, সেই ধারার প্রয়োগ বিষয়ে ভারতের সমস্ত অগ্রগামী রাজনৈতিক দলই বিরোধী বা নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন।

যেহেতু দেখা গিয়াছে যে গলাবাজি অথবা আদান-নীতিতে অনিচ্ছুক আমলা-তন্ত্রের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা অতীতে কেবলই বিফল হইয়াছে; আমলা-তন্ত্রের নিকট খোসামুদি দ্বারা ভারতবর্ষের লোকের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি আনয়ন সম্ভব নয়, কিম্বা সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ স্বদেশীয়গণের সাহায্যেই নিয়ন্ত্রীকৃত জনসাধারণের স্বাধীনতা গুপ্ত হত্যার সাহায্যে আসিতে পারে না; বোমা এবং পিস্তলের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের চলমান শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

যেহেতু ভারতীয় স্বরাজের যে কর্ম্ম সংকল্পের ভিতর ভূমি-স্বত্বের বিষয়ে কথা নাই এবং যেহেতু কোনও কৃষিজীবী জাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং শ্রেষ্ঠ অধিকার সেই—যাহাতে সে নিজের জমির নিজে স্বত্বাধিকারী হয়; এবং ভূমির স্বত্বে স্বাধীনতা না থাকিলে অন্য সমস্ত অধিকার ভোগে সুখ হয় না; এবং উপরোক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমিবহ ক্রীতদাসদের আইন-সঙ্গত নামান্তর মাত্র।

যেহেতু প্রতিযোগিতা আধুনিক সভ্যতার কলঙ্ক, এবং ভারতীয় জীবন প্রকৃত সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার স্থলে যতদিন না সহযোগিতা ও পরস্পর সেবার ইচ্ছা প্রবর্তিত না হয়।

যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যেমন বলিয়াছেন যে শিক্ষিত স্বার্থত্যাগী ভদ্র যুবক, শ্রমিক ও কৃষকের সংযোগ না হইলে ভারতের মুক্তি আসিবে না।

অতএব ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ-সম্প্রদায় এই ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারতের জাতীয় দাবী পূরণের এখনও একমাত্র অবশিষ্ট উপায় এই যে, দেশের শতকরা আশি জন যাহারা—সেই শ্রমিক ও কৃষিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং তাহাদিগের জন্মগত অধিকার লাভে সাহায্য করা, যাহাতে তাহারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়া নিজের সমবায় এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে। এবং এতদর্থে উপরোক্ত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায় নিম্নলিখিত কর্ম্ম সংকল্পের অবতারণা করিতেছেন।

(১) এই দল শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থের জন্য যুঝিবেন। (ভদ্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে কোনও ব্যক্তি নিজের হাত-পা বা মাথা খাটাইয়া নিজের জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাকেই শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হইবে)।

(২) জাতীয় কার্য্যে নিযুক্ত অন্যান্য দলের সহিত এই দল যতটা সম্ভব সহযোগিতা করিবেন।

(৩) শ্রমিক ও কৃষকগণের নিম্নলিখিত দাবীগুলির জন্য অন্যান্য দাবী ছাড়াও যাহারা যুঝিবেন, ব্যবস্থাপক সভার এমন সমস্ত প্রতিনিধির নির্ব্বাচনে এই দল সাহায্য করিবেন এবং ব্যবস্থা সভায় তাঁহারা এই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ক) ব্যবস্থা পরিষদে এই দলের প্রতিনিধিগণ নিজেদের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(খ) সম্ভব হইলে প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিবেন।

(i) যতদিন না শ্রমিক ও কৃষকগণের অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া শাসন-প্রণালী পরিবর্তিত না হয়, ততদিন টাকা মঞ্জুরি বজেটে না দেওয়া।

(ii) আমলা-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে এমন সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী হওয়া।

(iii) জাতীয় জীবনের শক্তির বৃদ্ধির অনুকূল এবং সে কারণে আমলা-তন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির প্রতিকূল এমন সমস্ত প্রস্তাব আইনের প্রবর্ত্তন করা ও সমর্থন করা।

(গ) ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত সম্মতি বিনা গবর্মেন্টের অধীনে কোনও প্রতিনিধি কোনও চাকরী গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চরম দাবী

১। আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎ সংক্রান্ত কর্মীগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তি রূপে পরিচালিত হইবে।

২। ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্ত-শাসন-বিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের উপর বর্ত্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্রে ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।

এখনকার দাবী

১। শ্রমিক

(ক) জীবন-যাত্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মজুরির একটা নিম্নতম হার আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া।

(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের পক্ষে সপ্তাহে সাড়ে পাঁচদিন খাটুনি চরম বলিয়া আইন করা; নারী এবং অল্প বয়স্ক ছেলে-পিলের জন্য বিশেষ সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা।

(গ) শ্রমিকগণের আবাস, কাজের সর্ত্ত, চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে যতকগুলি দাবী মালিকগণকে আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া পূরণ করানো।

(ঘ) অসুখ, বিসুখ, দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন।

(ঙ) সমস্ত বড় কলকারখানার লাভের ভাগে শ্রমিকগণকে অধিকারী করা।

(চ) মালিকগণের খরচায় শ্রমজীবীগণের বাধ্যতা মূলক শিক্ষা।

(ছ) কলকারখানার নিকট হইতে বেশ্যালয়, নেশার দোকান উঠাইয়া দেওয়া।

(জ) শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

(ঝ) শ্রমিক-সঙ্ঘ-গুলিকে আইনত মানিয়া লওয়া এবং শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্য ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করা।

১। কৃষক

(ক) ভূমি-কর সম্বন্ধে একটা উর্দ্ধতম হার বাঁধিয়া দেওয়া এবং বাকি খাজনার সুদ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হারের সহিত সমান নির্দ্ধারণ করা;

(খ) (i) জমিতে কায়েমী স্বত্ব (ii) উচ্ছেদ নিরোধ (iii) অন্যায় এবং বে-আইনি খাজে আদায় বন্ধ (v) স্বেচ্ছায় বিনা সেলামিতে হস্তান্তর করার অধিকার (v) গাছ কাটা, কূয়ো খোঁড়া, পুকুর কাটা, পাকা বাড়ী করার বিনা সেলামিতে অধিকার।

(গ) জল-করে মাছ ধরিবার নির্দ্ধারিত সর্ত্ত।

(ঘ) মহাজনের সুদের চরম হার নির্দ্ধারণ;

(ঙ) কো-অপারেটিভ কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা কৃষককে ঋণদান এবং মহাজন ও লোভী ব্যবসাদারগণের হাত হইতে কৃষককে উদ্ধার।

(চ) চাষের জন্য যন্ত্রপাতি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মারফৎ কৃষকের নিকট বিক্রয় অথবা ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া। মূল্য অথবা ভাড়ার টাকা কিস্তীবন্দী হিসাবে অল্প অল্প করিয়া লওয়ার বন্দোবস্ত।

(ছ) পাটের চাষের কৃষকের উপযুক্ত লাভের বন্দোবস্ত।

এই দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন:—

নজরুল ইসলাম, ৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

খবরদারী

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের সিলেক্ট কমিটি থেকে প্রজাপক্ষের প্রতিনিধিদের নাম বাদ দিবার জন্য স্বরাজ্যদল যখন গবর্ণমেন্টের সঙ্গে একযোগে ভোট দেন, তখন মাননীয় ডোনাল্ড সাহেব হাসতে হাসতে একজন স্বরাজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—Is this the beginning of Responsive Co-operation? অর্থাৎ এ কি সেই মহাযানের গৌরচন্দ্রিকা, যাতে গাওয়া হবে—

"তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী?"

° ° °

স্বরাজ্য-দলের হেমন্ত বাবু প্রভৃতি কয়েক জন গবর্ণমেন্টের সঙ্গে ভোট না দিয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। দলপতি সেনগুপ্ত সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—গবর্ণমেন্টই স্বরাজীদের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

অর্থাৎ বেড়ালে ইঁদুর ধরে নি, ইঁদুরই বেড়ালকে ইঁদুর-ধরতে বাধ্য করিয়েছে। হায় দেশবন্ধু! তুমি এ অসাধ্যসাধন করতে পার নি!

° ° °

মন্ত্রীত্ব যদি কারো মারা যায় তবে মন্ত্রীর বেতনও মারা যায়, আর মন্ত্রীর বেতন যদি মারা পড়ে তবে মন্ত্রীর উত্তমর্ণের আশাতেও ছাই পড়ার সম্ভাবনা—এটা অর্থনীতি ও ন্যায়শাস্ত্র দু'য়েতেই পরিষ্কার লেখা আছে।

উত্তমর্ণের আশা ত আর অপূর্ণ থাকতে পারে না, তাই সে আশায় 'সেঁজে ধরে' মন্ত্রীর মাইনে রইল,—সুতরাং মরা মন্ত্রী আবার বেঁচে উঠলো—

অয়োহস্তু মিনিষ্টারাণাং যেষাং পক্ষে স্বরাজিষ্টাঃ।

° ° °

বাজারে রেজায় গুজব—ভাইসরয়ের 'ডিনারে' নবাবের মহারাজাকে রাজ-প্রতিনিধি নাকি খুব অভিনন্দিত করেছেন। কারণ প্রজাস্বত্ব আইন সম্পর্কে মহারাজা স্বরাজ্যদলকে দু'বার গবর্ণমেন্টের সঙ্গে ভোট দেবার সুব্যবস্থা করেছিলেন!

আমরা আশা করি, আগামী ..... জাতুয়ারীর উপাধি তালিকায় 'রায় বাহাদুরের' গাদায় মহারাজের নামটি দেখতে পাব।

° ° °

তা যেন হ'ল, কিন্তু এই অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়া-স্বরূপ মহারাজার প্রিয়বন্ধু স্বরাজ্যদলের কাউন্সিল-সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের অভিনন্দন কি ভাইসরয় করবেন না?

এজন্য একটি 'স্বরাজ্য-ই-হিন্দ' কবচ ব্যবস্থা করলে গুরুর যোগাডাকে পুরস্কৃত করা হয় আর সে কবচ অঙ্গে ধারণ করলে শত্রুপক্ষের আক্রমণও ব্যর্থ হ'তে পারে।

° ° °

মনিব ও কর্ম্মচারী

বিদেশী কোম্পানীর নির্ম্মম ব্যবহার

—:o:—

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 'মনিব ও কর্ম্মচারী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিতেছেন।—

আই, জি, এস, এন, এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর শিপিং বিভাগে এ দেশীয় কর্ম্মচারিগণ হৃদয়হীন প্রভুদের কবলে পড়িয়া পেটের দায়ে যে কঠোর মূল্য প্রদান করিতেছে, দেশের এ জাগরণের দিনে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এই শুভ-সংগ্রামের দিনে দেশবাসী তথা দেশী-বিদেশী সমস্ত প্রভু-সম্প্রদায়কে তাহা জানাইতে চাই।

১। এই কর্ম্মচারীদিগকে সাধারণত প্রতিদিন ১২।১৩ ঘণ্টা এমন কি ঊর্দ্ধ ১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু লোককে দেখাইবার জন্য ছাপান কাগজ পত্রে লেখা রহিয়াছে—"কাহাকেও তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত—এই আট ঘণ্টার বেশী সময় কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে না।"

দৈনিক নির্দ্দিষ্ট ৮ ঘণ্টা সময়ের অতিরিক্ত কার্য্যের জন্য অবশ্য কোম্পানী কর্ম্মচারীদের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়া থাকেন; এবং শান্ত ছেলের মত প্রভুর ব্যবসায়ের জোয়াল বহিয়া ক্লান্ত দেহে অনুরক্ত ভৃত্য যেদিন শেষ-ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িবে, সেদিন বোধ হয় একখানা খুব বড় প্রশংসাপত্রও দিবার ভরসা দিয়া থাকেন।

বিকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দৈনিক বেতনের এক চতুর্থাংশ; আর ৬টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত দৈনিক বেতনের এক অর্দ্ধেক ব্যবস্থা আছে।

২। সম্প্রতি সেপ্টেম্বর মাস হইতে কোম্পানির কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্ম্মচারীদেরও শ্রম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কাহাকেও রাত্রি ২টার পূর্ব্বে ছুটী দেওয়া হয় না।

মনিবকে নির্দ্দয় বলা যাইতে পারে না, কারণ বেশী কাজের সময় হইতে ৬টা—৯টার জন্য দিনের অর্দ্ধবেতন এবং ৬টা—১টার জন্য পূর্ণ বেতন মঞ্জুর করিয়াছেন,—যাহাতে ভৃত্যের কষ্টের অনুভূতি লঘু হয়।

৩। বর্ত্তমানে ঐ বেতনে সমস্ত রাত্রি অর্থাৎ ৬টা হইতে ভোর ৫।৬টা পর্য্যন্ত কাজ করাইয়া লইতেছে। বলা বাহুল্য ইহা সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কাজের পর অতিরিক্ত কাজ। সোজা ভাষায় কর্ম্মচারীদের ৮ ঘণ্টার স্থানে ২৪ ঘণ্টার ১৯।২০ ঘণ্টাকাল কাজ করিতে হয়; অবশিষ্ট সুদীর্ঘ ৪।৫ ঘণ্টা সময় যান, আহার, বিশ্রাম, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-পালন, নিদ্রা এবং অন্যান্য কাজের জন্য পাওয়া যায়। মহাবীর নেপোলিয়ান, শুনিতে পাই—অবসর অভাবে নিজের অশ্বপৃষ্ঠেই ঘুমের কাজ সারিয়া লইতেন। আই, জি, এস, এন, এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর এ-দেশীয় কেরানিগণও বোধ হয় অতঃপর কাজ করিতে করিতে কলমের গোড়ায় মাথা ঠেকাইয়া একটু ঘুমাইয়া লইবেন এবং অন্যান্য আবশ্যক কাজগুলি সারিবার জন্য অনুরূপ সহজ উপায় বাহির করিয়া লইবেন।

কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহার সামর্থ আছে বা বেতনাতিরিক্ত উপার্জ্জনের লোভে কেহ এরূপ কঠোর পরিশ্রমে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হইলে তাঁহার কথা না বলিলাম, কিন্তু আমরা জানি, উঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এই অমানুষিক নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য করা হয়।

দেশে অনেক কোম্পানী, কল-কারখানা বা অন্য ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্ম্মচারীকে নানারূপ অসুবিধা মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু বক্ষ্যমান এই আই, জি, এস, এন, এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর মত এমনটি বড় একটা শুনা যায় না। দেশে 'পশু-ক্লেশ নিবারণী' প্রতিষ্ঠান রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর হতভাগ্য কর্ম্মচারী-কুলের এমন অভাবনীয় ক্লেশ কাহারো হৃদয়ে রেখাপাত করে না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরিয়া হাতের কাছে যাহা ঘটিতেছে তাহা জানিবার আমাদের অবসর নাই। শ্রদ্ধেয় জনষ্টনের মত বিদেশী আসিয়া ২।৪ দিনেই আমাদের লজ্জা এবং অপৌরষের গ্লানির সন্ধান লইয়া তাই ত আমাদের ধিক্কৃত করিয়া যান।

এ বিষয়ে উপযুক্ত অনুসন্ধান এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থার আশায় আমরা দেশের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ব্যাপারে লিপ্ত মহানুভবগণের তথা কোম্পানীর ডাইরেক্টর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

---

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড্ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

লাঙল



উপ প্রধান পরিচালক

নজরুল ইসলাম

সম্পাদক—

মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নগদ মূল্য এক আনা

বার্ষিক ৩ টাকা

'লাঙলে'

কি কি থাকিবে?

১। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতা

২। ম্যাক্সিম গর্কীর জগৎবিখ্যাত যোমাঞ্চকর উপন্যাস "মা"র ধারাবাহিক অনুবাদ

৩। কার্ল মার্কসের জীবনী

৪। প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচনা

৫। গণ-আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা ও সঙ্কলন।

৬। প্রতি সংখ্যায় একখানি করিয়া ছবি।

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

প্রথম খণ্ড } বুধবার ৮ই পৌষ, ১৩৩২, ইং ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৫ { দ্বিতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

কবি নজরুল ইসলামের

কৃষাণের গান



লাঙল

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | বুধবার, ৮ই পৌষ, ১৩৩২ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মাটীর মোহ

(শ্রীগিরিজাকান্ত মুখোপাধ্যায়)

—:০:—

মানুষের এই বড় সভ্যতা যাকে আশ্রয় ক'রে, যার কাঁধে ভর ক'রে আজ এমন বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে সেই আসল বস্তুকেই আমরা এতদিন তুচ্ছ করেছি। জ্ঞান, মনীষা এ সব ত ছিলই কিন্তু সর্বোপরি ছিল আদিম মানুষের এই মাটীর মোহ,—ভূমির ক্ষেত্র।

মাটীর জন্যই তার সমাজের বেষ্টনী হ'য়েছে। মাটীর প্রেমেই তার রাজনীতির ভিত্তি, তার জাতি-বোধের পটভূমি অঙ্কিত হ'য়েছে। Geographical limit, natural boundary, এগুলোই অনেকগুলো মানুষকে একত্র হবার প্রেরণা দেয় নাই। তার পায়ের তলার যে দেশের পরশ, হাস্যোজ্জ্বল প্রেয়সীর যে আলিঙ্গন—তাই তাকে ধরণীর সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়েছে। ধরিত্রীর কণ্ঠে যে ঐক্যের আহ্বান, মিলনের গীতি, তারই মাঝে জাতির বেদ, জাতীয়তার নান্দীপাঠ লুকিয়ে ছিল। আদিম মানুষ political advantage-এর জন্য জাতি-গঠন করে নাই। তার পায়ের নীচে যে নির্বাক জগৎ, শুধু একত্র হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উন্মুখ হ'য়ে ছিল, জাতি-স্রষ্টাদের কাছে তা স্পষ্ট হ'য়েছিল। মাটীর নিশ্চলতার মধ্যে ঐক্যের বাণী তাঁরা শু'নেছিলেন। আমরা তাই আজ এই অত্যন্ত সভ্যতার যুগেও সেই tradition মেনেই চলছি। আমাদের আগে যারা গেছেন তাঁরাও শুধু এই রকম একটা ভাবের দ্বারা চালিত হ'য়েই মানুষের ইতিহাস রচনা ক'রে গেছেন।

বাইরের কোনো শিক্ষার প্রভাব যাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে নাই, জাতীয়তা বুঝবার inspiration তারা এই মাটীর মধ্যেই পেয়েছে। মাটীর সম্পর্কই তাদের স্বজাতি, স্বগোত্রকে চিনিয়ে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের জাতি-গঠন সম্পূর্ণ করতে হলে ও অগণিত

সন্তানের কানে এই মাটীর গানের মন্ত্র দিতে হবে। যাদের বিচার-বুদ্ধি কোন একটা abstract আদর্শ গ্রহণের উপযোগী হয় নি, তাদের ক্ষুদ্র মন খুব সহজে নাগাল পায় এমন একটা সম্পর্কের ভিতর দিয়ে বড় একটা মন্ত্রে দীক্ষিত হবে।

আমাদের দেশের চাষী, মজুর, কুলি—এরা যদি ভারতবর্ষের নব জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে একাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'লাঙল' ভারতের প্রাচীন কৃষক, মজুরের বাহন ও বাহক ত বটেই, তা ছাড়া আজ ভারতবর্ষের নিরন্ন দরিদ্রের দুঃখের গান সে-ই জুগিয়ে দিবে—এবং সেই সঙ্গে তার চিন্তার অন্ন, প্রাণের খোরাক ও উৎপন্ন করবে।

কৃষাণের গান

[নজরুল ইস্‌লাম]

—:·:—

ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর্ কসে লাঙল।
(আমরা) মরতে আছি—ভাল ক'রেই মরব এবার চল ॥

(মোদের) সত্য ত্রেতা দ্বাপর জুড়ে ছিল না ভাই ক্লেশ,
(এই) দস্যু-যুগের লুঠ্‌তরাজে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
লক্ষ হাতে টান্‌ছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ
মা'র কাঁদনে লোনা হ'ল সাত সাগরের জল ॥

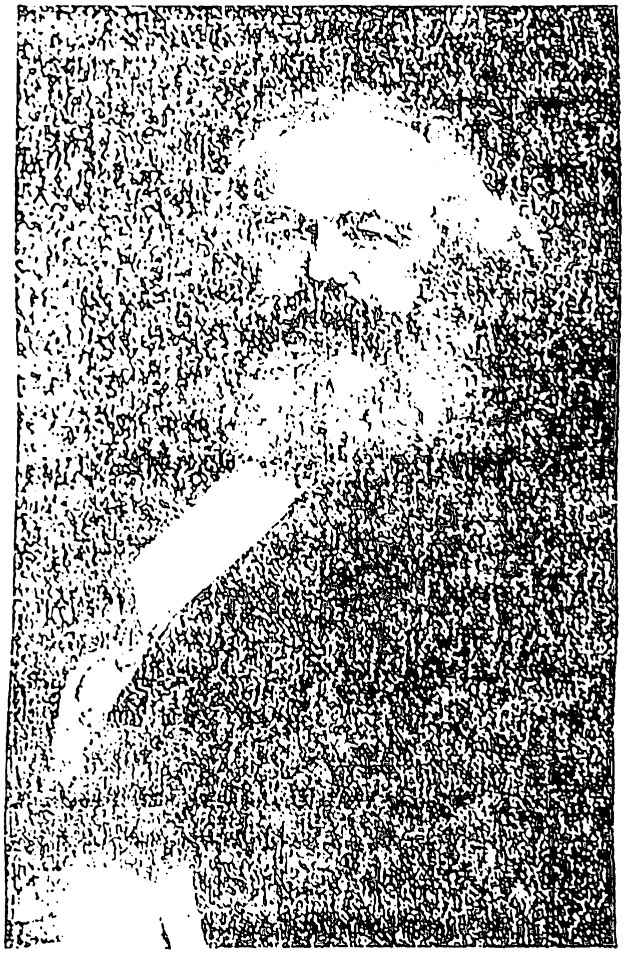
আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
গলায় গলায় গান ছিল ভাই গোলায় গোলায় ধান,
কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?
মোদের রক্ত জল হ'য়ে আজ ভর্‌ছেছে বোতল ॥

চার্‌দিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত কাড়্‌ছে থালার ভাত
বুকের কাছে মর্‌ছে খোকা, নাইক আমার হাত-
সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেল্‌ছে খেলা খল ॥

আমরা মাটীর খাঁটি ছেলে দুর্ব্বাদল-শ্যাম
মোদের মাঝেই লুকিয়ে আছেন রাবণ-অরি রাম
হালের ফালে শস্য উঠে সীতা তাঁরি নাম
হর্‌ছে রাবণ সেই সীতারে—সেই মাঠের ফসল ॥

লোভ-রাবণের দশ মুণ্ড দশ দিক্ হ'তে চায়
দশরথের ঘর আজি তাই দশ দিকেতে ছায়,
দশদিকে আজ ঘনশ্যাম রামকে দেখা যায়
দশদিকে তার ডঙ্কা বাজে দশদিকে মাদল ॥

জাগ্ রে কৃষাণ সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়
ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়
বল্ সবে ভাই, বল্ কৃষাণের বল্ লাঙলের জয়,
দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল ॥



[কার্ল মার্কস্]

কার্ল মার্কস্

[শ্রীদেবব্রত বসু ।]

—ঃ০ঃ—

(১)

ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার দিকে চাইলে বোঝা যায় যে এই ইতিহাসের পৃথিবী অথবা এই পৃথিবীর ইতিহাস—সে যুগ-প্রবর্ত্তনকারী কতকগুলি মানবের ইতিহাস। এই সমস্ত মানব জন্মগ্রহণ করেছে—ধরণীর অন্তর্গূঢ় বাসনার তীব্রতা থেকে—ধরণীর বিকাশের প্রয়োজন থেকে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে পৃথিবীর লোক এই নিদারুণ নবাগতদের সহ্য করতে পারে নি—; এই নব-সূর্য্য আলোকে তাদের দৃষ্টিশক্তি অন্ধ হয়েছে—তারা প্রাণপণে চেয়েছে—সূর্য্যকে নিভাতে। ঘরের কোণের স্তিমিত প্রদীপের শিখাকে ফুঁ দিয়ে নিভান যায়—কিন্তু আকাশের সূর্য্যকে কে নিভাবে ?

রাজনীতি বা দর্শনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এমনি সব মহাপুরুষ এসেছেন যাঁদের মত সমস্ত জগতের নিভৃততম কোণেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত জগৎ প্রতিবাদ ও ঘৃণার মধ্য দিয়ে আপনাদের অজ্ঞাতসারে যাদের প্রতিবাদ করেছে তাদেরই গ্রহণ করেছে। যিশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তখনই খৃষ্টধর্ম্মের জন্ম হয়; সক্রেটীস্ যখন বিষপাত্র অধরে গ্রহণ করেন তখনই বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করে। যে কলসী ছুঁড়ে জগাই মাধাই চৈতন্যকে আঘাত করে, সেইভাঙ্গা কলসীর প্রেরণাতেই তারা নবধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রত্যেক মত ও নীতি জন্মগ্রহণ করে সমসাময়িক জগতের বস্তুগত জীবনের ধারা ও গতির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে। কালের প্রবাহে হয়ত যে মত আজ মানব আঁকড়ে ধরে, শত বর্ষ পরে তাতে মানবের আর আস্থা থাকে না ; কারণ মানব প্রতি মুহূর্ত্তে আদর্শের দিকে এগিয়ে চলেছে—বর্ত্তমানের অভাব অভিযোগকে অতিক্রম করে এক বৃহত্তর সত্তার দিকে। তা'বলে এই সমস্ত মত

ও নীতিকে অসার ভাবা যায় না; দেহকে ভঙ্গুর জেনে যেমন দেহকে অস্বীকার করা যায় না। তাই জগতের বৃহত্তর আত্মিক কল্যাণের জন্যই এই সমস্ত মত ও নীতির একান্ত প্রয়োজন। মানবের অন্তরের কল্পনায় যে ভূ-স্বর্গের পরিকল্পনা লুকিয়ে আছে—তা কোন দিন মানবের দৃষ্টির সীমায় আসবে কি না, জানি না, তবে একথা ঠিক এই সমস্ত মত ও নীতির সোপান বয়েই সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী এই রকম একটী ভয়ানক মতবাদের জন্ম দেখে। সেই মত প্রবল প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে ও বিচারের সবলতায় আজ সমস্ত জগতের পুরাতন ভিত্তির গোড়ায় ঘা দিয়েছে গতানুগতিক জগৎ আজ যেন বহুবর্ষের নিদ্রার পর আবার জেগে এগিয়ে চলেছে। তাণ্ডবের ভাবে পুরাতন সব ভেঙ্গে চলেছে। জগৎ নিজেকে নূতন করে গড়ছে।

কার্ল মার্কস্ এই নূতন মতের সৃষ্টিকর্তা। বর্ত্তমান জগতের প্রচলিত ধারায় মানব মানবকে অস্বীকার করে চলেছে। মানব মানবকে যন্ত্রের তুল্য করেছে। মানব স্বজাতির রক্তে স্নান করে বৃহৎ হতে চাইছে। বহুকে বঞ্চিত করে কয়েকটী বৃহৎ হয়ে চলেছে। এই ধারা এমনি চলতে পারে না। শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন এই নির্য্যাতিত বহু মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে জীবধর্ম্ম অনুসারে আপনাদের রক্ষা করবার শেষ অস্ত্র স্বরূপ বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। এবং তখনকার অনিবার্য্য শক্তি-ক্ষয়কে রোধ করতে হলে এখন থেকে প্রতিকার করা উচিৎ। অপহৃত মানবকে তার গৌরব ফিরিয়ে দিতে হবে। যে মানুষ শ্রম করে, যে মানুষ অহোরাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সেও জগতের ইতিহাস সৃষ্টি করে। অথচ সে সৃষ্টির সঙ্গে তার কোন সুন্দর যোগ নেই। সে যেন নিষ্ঠুর গর্ভবেদনার পর সন্তান প্রসব করল, কিন্তু সে অপরের পোষ্যপুত্র হবে বলে। এ অন্যায় প্রথা নষ্ট করতে হবে। শ্রমিকের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। যে সৃষ্টি করে, আর যে ভোগ করে, প্রত্যেকেই একই নিয়মের অধীনে থেকে আপনাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টি ও ভোগের অধিকারী হবে। মোটামুটী এই প্রেরণাই এই নূতন মতের সৃষ্টি করে। এবং মার্কসের এই নীতি অবলম্বন করেই বোলশেভিকবাদের জন্ম হয়। কার্ল মার্কস বোলশেভিকদের নীতি-গুরু—লেনিন দীক্ষাদাতা।

মার্কসের এই নীতি প্রচারিত হবার পর আজ প্রায় একশো বছর চলে গেছে। এই একশো বছর ধরে জগতের সহস্রকোণ থেকে সহস্র ভাবে মার্কস-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবাদের মধ্যে অনেক সময় সুন্দর তর্কপদ্ধতি বা বিচার ও অনুশীলনের অভাব ছিল বা আছে সে কথা কেউ বলতে পারবে না কিন্তু তবুও এত প্রতিবাদ সত্বে মার্কস্-নীতি আজ জগতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে কারণ সেই সমস্ত প্রতিবাদের অন্তরালে সৃষ্টিকরী প্রাণশক্তি নেই।

একজন ফরাসী শিল্পী রোমে থাকতেন। সেখানে তাঁর কোন বন্ধু গেলেই তিনি শিল্পজগতে বিখ্যাত মার্কাস্ অরেলিয়াসের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি দেখাতে নিয়ে যেতেন। সকলেই সেই অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তির প্রশংসা করত। কিন্তু তিনি বলতেন, "সে দেখো ঘোড়াটা ঠিক আঁকা হয়নি। আসল ঘোড়া ঠিক এরকম নয়।" বন্ধুদের অনুরোধে শিল্পী একটা পর্দার বিজ্ঞান সঙ্গত নিখুঁত ঘোড়ার প্রতিচ্ছবি এঁকে আপনিই একদিনই বিচারের জন্য সেই প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে যান। অনেকক্ষণ দেখার পর অবশেষে বলেন, Et pourtant cette-bete ca est vioante, et la mienne est morte!"

"তবুও ঐ জন্তুটা সজীব আমারটা মৃত।" ঠিক ঐ এক কথাই মার্কস্ ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সম্বন্ধে খাটে।

(২)

১৮১৮ সালে ৫ই মে ট্রাভে নগরে কার্ল হেনরিচ্ মার্কস্ জন্ম-গ্রহণ করেন। কার্লের পিতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত য়িহুদী বংশীয় এবং তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল ছিলেন। কার্লের জননীও ছিলেন হলাণ্ডবাসী য়িহুদী রমণী।

১৮২৪ সালে কার্লের পিতা সপরিবারে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং প্রুশিয়ার একজন অত্যন্ত অনুরক্ত খৃষ্টান প্রজা হন। কার্লের পিতা এই রকম বেশী জার্ম্মান হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি একবার কার্লকে নেপোলিয়ানের পতনে ও জার্ম্মাণীর পুনরুত্থানের জন্য একটা কবিতা লিখতে বলেন। অবশ্য সে কবিতা কার্ল লেখেননি। কিন্তু কার্লের বরাবরই এই য়িহুদী জাতির প্রতি ঘৃণা ছিল।

সেইখানকার স্কুলেই কার্লের কৈশোর পাঠ শেষ হয়। এই স্কুলে পড়বার সময় কাল একজন উচ্চপদস্থ জার্ম্মাণের সঙ্গে পরিচিত হন। এবং প্রত্যহ তাঁর বাড়ী যান। এই জার্ম্মান রাজকর্ম্মচারী কার্লের শিক্ষার জন্য অনেকখানি দায়ী। মার্কস্ তাঁহাকে আপনার পিতার মত শ্রদ্ধা করেন। এবং পরে এর বিদুষী, সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

স্কুল পরিত্যাগের পর কার্ল বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য যান এবং সেখান থেকে ১৮৩৬ সালে তিনি বার্লীন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

বার্লিনে মার্কস দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। আমাদের অনেকেই হয়ত জানতাম না যে কার্ল মার্কস্ তার জীবনের আরম্ভে ছিলেন একজন সাহিত্যিক, একজন কবি। এই সময় দর্শনের আলোচনা তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে বসে থাকে। সারারাত ধরে দর্শনের আলোচনায় ও আত্ম-সন্দেহে ও ন্যায়-বিচারে কেটে যেত। এই তীক্ষ্ণধী যুবক জগতের সমস্ত দর্শনের মূলে কি আছে তা আপনার মন দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এবং অচিরে এই মনন-শক্তির জোরেই প্রচলিত অর্থ নীতির মূল হতে আরম্ভ করে তার শেষ পর্য্যন্ত আপনার সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে এক নূতনতর সাম্যবাদের জন্ম দেন।

এই সময়ে তাঁর মনের অবস্থা কি রকম ছিল এই নিয়ে কাল তাঁর পিতাকে একখানি চিঠি লেখেন। সে চিঠিখানি অপূর্ব্ব। "জীবনে এমন সময় আসে, যখন বেশ বোঝা যায়—যে একটা যুগ চলে গেল, আর একটা সামনে শুরু হল।... ...জীবনের এই

সাহকরে মানবের মন কাব্যময় হয়ে ওঠে। কারণ প্রত্যেক মস্তিষ্কের এই যে পরিবর্তন এ যেন অতীতের সমাধির ওপর স্তব রচনা আর সেই একই সঙ্গে নবাগত এক নূতনের নান্দীপাঠ...... আমার কাছে জীবন মনে হয় আমার এই দেহ ও মনকে নিয়ে ছুটে উঠতে চাইছে—চারিদিকে—কাব্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, বাস্তব জীবনে,......"

এই চিঠিতে বোঝা যায় যে সে সময় কার্ল কবিতা ও দর্শন নিয়ে ভাবনায় ব্যস্ত ছিলেন। কবিতা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সহচর।

এই সময় তাঁর জীবনে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক Hegelএর ছাপ পড়ে। এবং তাঁর পরবর্তী সমস্ত লেখায় সঙ্গে Hegelএর প্রভাব বর্তমান আছে। Hege! যে পদ্ধতি অনুসারে দর্শন শাস্ত্র লিখেছিলেন পরে সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করে কার্ল তাঁর বিখ্যাত "Capital" লেখেন। সেই পদ্ধতিকে dialectic method বলে। একটা বিষয় এনে তার অসারতা প্রশ্ন ও উত্তরের ছলে প্রতিবাদ ও খণ্ডনের মধ্য দিয়ে শেষ করে দিয়ে আবার নূতন মত অগ্রসর হওয়া—এই dialectic methodএর রূপ। এই dialectic method কার্লের সমস্ত লেখায় বিশেষত্ব।

১৮০৮ খ্রীঃ অঃ কার্লের পিতার মৃত্যুর পর কার্ল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজের জন্য চেষ্টা করেন। এই সময়ে একটা দার্শনিক তত্ত্ব লেখার জন্য তিনি Doctor of philosophy উপাধি পান। কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী পান নি। কারণ যে সমস্ত লোকের চিন্তার ধারা ছিল স্বাধীন ও নবীনতা প্রয়াসী বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন তাঁদের স্থান হওয়া দুষ্কর ছিল।

অধ্যাপকের কাজ না পাওয়ায় অবশেষে কার্ল দলভুক্ত হয়ে হেগেলপন্থীদের প্রচলিত মত খণ্ডনের জন্য সমালোচনা আরম্ভ করেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে এই দল হতে Rheinische Zeitung নামে একখানি পত্রিকা বার হয়। এবং কার্ল এই পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেন। এবং কয়েক মাস পরেই এই কাগজের তিনিই সম্পাদক হন।

এই কাগজ সম্পাদনের সময়ই তাঁর চিন্তার ধারা দর্শন ও সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে অর্থনীতি ও রাজনীতির দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় ফরাসী ও জার্মান সাম্যবাদীদের এক মিলিত সভা হয়। এবং সেই সভায় দেখা গিয়াছিল যে, সত্যকার অর্থনীতি শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতি ও গণ্য জার্মানীতে রাজকীয় দপ্তরের আড়ালে লুকিয়ে আছে। মার্কসের মন রাজনীতি ও অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হল। এবং এই নূতন বিষয় পাঠের জন্য তিনি পত্রিকার সম্পাদনের পদ ত্যাগ করেন। এবং এইখান থেকে মার্কসের নূতন জীবন আরম্ভ হয়। এই জীবনেরই পরিণত ফল—মার্কসের নূতন সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম, যা আজ সমস্ত জগতের চিন্তাধারাকে বদলে দিয়েছে।

১৮৪৩ খৃঃ অঃ মে মাসে তিনি এক পত্রে লেখেন, "এই যে শোষণনীতি ও বাণিজ্যপ্রথা মনুষ্যত্বকে শুধু শোষণ করে নিচ্ছে সংকলনের বিপুল লোভে একদিন শীঘ্রই সমাজের ভিতর থেকে এর ভিতরে যুদ্ধ ঘোষণা হবে। এবং এই দুর্নীতির প্রসার প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিরোধও করতে পারছে না, উপশমও আনতে পারছে না।"

উপরি উক্ত চিঠিতে মার্কস্-নীতির বীজ অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই সময় ১৮৪৩ খৃঃ অঃ মার্কস্ সস্ত্রীক প্যারিসে আসেন এবং Franco-German Year Bookএর সম্পাদক হন। এই সম্পাদন কার্যের সূত্রে মার্কসের সহিত মার্কসের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ও জ্ঞানী সহচর এঙ্গেলসের পরিচয় হয়। অনেকে বলেন এঙ্গেলসের সঙ্গে এই মৈত্রী-বন্ধন না হলে হয়ত মার্কসের কথা জগৎ তেমনভাবে পেত না। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস্‌ই মার্কসের বিখ্যাত পুস্তক "Capital"এর প্রকাশ ও সম্পাদন ভার নেন। তার পরের কয়েক বছরের মধ্যেই কবি ও দার্শনিক মার্কস্ রাজনীতির মূল প্রবর্তনকারী মার্কস রূপে পরিণত হন। এইখানে আর একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক সমাজবাদীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনিও মার্কসের মতন জগতে এক নূতন রাজনীতির মন্ত্রপ্রচারে ও তাহার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর নাম Proudhon। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে Property is robbery— ব্যক্তির সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের অপর নাম দস্যুতা। মার্কসের বিপ্লবপন্থায় অনেকখানি অনুপ্রেরণা ছিল ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে। সেই সময় ইংলণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সে সাম্যবাদী সাহিত্যের প্রচুর প্রসার ও বৃদ্ধি লাভ ঘটে। ১৮৪২ খৃঃ ইংলণ্ডে প্রথম সর্ব্ব বৃহৎ ধর্মঘটের সূচনা হয়। এই সময় বিজ্ঞান-জগতের শ্রীবৃদ্ধির ফলে চারিদিকে রেল, টেলিগ্রাফ, কল, কারখানা ও ঠিক তাহাদেরি পদাঙ্ক অনুসরণ করে' সমষ্টিগত মানবের দুঃখ, দারিদ্র্য বেড়ে চলে। চারিদিকে একটা অশান্ত বাণী যেন বহুস্বরে বিকৃত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর মানবের এই বহুধা বিভক্ত অশান্তির মূর্ত বিগ্রহ হইয়া মার্কস্ নীতি জন্মগ্রহণ করে।

এই সময় মার্কস্ কলের মজুরদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁদের সঙ্গে বাস করে তাদের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাতে থাকেন। এই রকম করে ক্রমশঃ শ্রমজীবি সঙ্ঘ মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করে। এবং ইউরোপের প্রত্যেক বড় বড় নগরে শ্রমজীবি-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ প্রথম লণ্ডনে কম্যুনিষ্টদের কংগ্রেস বসে। সেই কংগ্রেসেই মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ একটা কার্য্য-পদ্ধতির বিবরণ দেন। তাহাই মার্কস্‌নীতির ভিত্তি। তাহার নামই বিখ্যাত Communist Manifesto. এই কার্য্য-পদ্ধতিতে ছিল প্রথম, সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের অন্যায় শ্রেণীভাগের কথা, মূলধন-ওয়ালা ও শ্রমিকের অধিকার; দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং শ্রমজীবি-বিপ্লবের কথা; তৃতীয়—কম্যুনিষ্টদের বিপ্লব-ঘোষণা; চতুর্থ,—অন্য সব সাম্যবাদী মতের খণ্ডন।

১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ জার্ম্মাণীতে বিদ্রোহ ঘোষণা হয়। এই সময় মার্কস্ বেলজিয়াম হতে নির্ব্বাসিত হয়ে প্যারিসে আসেন এবং প্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন করবার জন্য জার্ম্মাণীতে আসেন। এখানে আবার এঙ্গেলস্ ও মার্কস তাঁদের পুরাতন কাগজ Rheinische Zetung বার করেন এবং মার্কসই তাঁর সম্পাদক হন। এই কাগজ চালাবার জন্য মার্কস্ সর্ব্বস্বান্ত হন। গভর্ণমেণ্টের তাড়নায় কাগজ চালান অসম্ভব হয়ে ওঠে। আপনার স্থাবর অস্থাবর যা কিছু ছিল সব বেচে ঋণ পরিশোধ করে মার্কস প্যারিসে আসেন। প্যারিস্ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে অবশেষে লণ্ডনে আসেন লণ্ডনেই তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়। লণ্ডনে অতিবাহিত অবশিষ্ট জীবন অধিকাংশই নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। এই দারিদ্র্যে মার্কসের একটী প্রধান অবলম্বন ছিল—সে তাঁর স্ত্রী, সুন্দরী ও বিদুষী বারনেস্ ভন্ ওয়েষ্টফ্যালেনের অপূর্ব্ব প্রেম ও সাহচর্য্য। এই সময় মার্কসের দারিদ্র্য এত দূর বেড়ে গিয়েছিল যে সত্য সত্যই তাঁকে লেখবার কাগজের জন্য আপনার সর্ব্বশেষ জামাটী বাঁধা দিতে হয়েছিল। এই অধম দারিদ্র্যের মধ্যে লক্ষপতির কন্যা সহাস্যমুখে বলেছিলেন যে মার্কসকে বিবাহ করে সুখী হয়েছি। নির্ব্বাসনে, নির্য্যাতনে, সকল সময়ে এই অপূর্ব্ব বিদুষী রমণী মার্কসের পাশে থেকে মার্কসকে নিত্য নব জীবনের অন্তপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মুখে সর্ব্বদাই একটা স্নিগ্ধ গম্ভীর সৌন্দর্য্য খেলা করত। মার্কসের শত্রু ও মিত্র সবাই এই রমণীকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করত। মার্কস ওয়েষ্টফ্যালেনের এই অপূর্ব্ব প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। লেনিনেরও জীবনে এমনি একটী রমণীর প্রেম-সাহচর্য্য দারুণ দুর্যোগের মধ্যে অপূর্ব্ব সহন-শক্তি দিয়েছিল। মার্কস সমস্ত লেখা স্ত্রীকে প্রথম পড়িয়ে তাঁর মতামত নিয়ে ছাপাতেন।

এই লণ্ডনবাস কালেই দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে মার্কস "Capital"এর প্রথম অংশ লেখেন; আমরা যেমন গীতাকে শ্রদ্ধা করি, কম্যুনিষ্টরা তেমনি "Capital"কে শ্রদ্ধা করে। জীবনের শেষ বয়সে তিনি রুষের কৃষকের সামাজিক অবস্থা জানবার জন্য রুষভাষা শেখেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সত্যজ্ঞান-স্পৃহা তাঁকে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অবশেষে ১৮৮৩ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাসে মার্কস লণ্ডনে দেহত্যাগ করেন।

বিংশ শতাব্দীর জগতের রসায়ন-আগারে এই সমস্ত মতের পরীক্ষা চলেছে। বর্ত্তমান মানব তার বেশী কিছু বলতে পারে না। ট্রটস্কী তাঁর বিখ্যাত লেনিনের জীবনীর উপসংহারে লিখছেন, *"এক শতাব্দীর পর, এমন দিন আসবে যখন ইংলণ্ডে ট্রাফালগার স্কোয়ারে দুটী বিশাল মর্ম্মর মূর্ত্তি উঠবে—একটী মার্কসের আর একটী লেনিনের"।* অনাগত যুগের দেবতাই জানেন অনাগত কালের গর্ভে কি আছে।

প্রজাস্বত্ব আইন

[শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সেনের—"বাঙলার কৃষকের কথা" হইতে সঙ্কলিত]

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার সুজা খাঁ বাংলার ভূমি-রাজস্ব এক কোটি সাত লক্ষ থেকে এক কোটি এক ত্রিশ লক্ষ টাকা করেন। এর পরে মুর্শিদ কুলি খাঁর সময়ে একবার বৃদ্ধি হয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীন আবার রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। রাজস্বের পরিমাণ হ'ল বিয়াল্লিশ লক্ষের উপর। মীর কাসেমের সময় হয় শেষ বৃদ্ধি। তখন বর্দ্ধিত রাজস্বের পরিমাণ হয় দুই কোটী ছাপান্ন লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এক শত বৎসরের মধ্যে রাজস্ব হয় দ্বিগুণ। ইহা ছাড়া নবাবের কর্ম্মচারিগণ উপরি "আবওয়াব" আদায় করতেন। এই সকল আবওয়াব ক্রমশ আসলঃ খাজনায় যোগ হ'ত এবং তার উপর আবার আবওয়াব ব'সত। শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গিয়ে শস্য নষ্ট করবে না, এই অনুগ্রহের জন্যও ক্ষেতের মালিককে কিছু দিতে হ'ত।

প্রজা যখন এই সকল আবওয়াবের গুরুভারে প্রপীড়িত এবং নবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত, তখন কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি পেলেন।

তখন দিল্লীতে শাহ আলম সম্রাট। মুর্শিদাবাদে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নজমুদ্দৌলা। কোম্পানি বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা সম্রাটকে এবং তিপান্ন লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা নজমুদ্দৌলাকে দেবার অঙ্গীকার ক'রে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি পেলেন। সম্রাট তখন বিপদসাগরে নিমজ্জমান, কাজেই কোম্পানির কর্ম্মচারীর সঙ্গে আর বেশী কথাবার্ত্তার আবশ্যক হ'ল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল কথাবার্ত্তা স্থির হ'য়ে গেল যে, একজন মুসলমান লেখক বলেন, সেই সময়ের মধ্যে একটা গাধা-বিক্রীর কথাও শেষ হয় না।

নবাব নজমুদ্দৌলার মৃত্যুর পর যখন সৈফউদ্দৌলা সুবাদার হ'লেন, কোম্পানি নবাবের স্বার্থ, পদমর্য্যাদা, মান সম্ভ্রম এবং দেশরক্ষার ভার নিলেন এবং সৈফউদ্দৌলার বৃত্তি তিপান্ন লক্ষ হ'তে একচল্লিশ লক্ষে দাঁড়াল। সৈফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর মোবারকউদ্দৌলা যখন সুবাদার হ'লেন, তখন কোম্পানি তাঁর বৃত্তি আরো দশলক্ষ টাকা কমিয়ে নিলেন।

এই সময়ে বাংলাদেশের রাজস্ব প্রায় তিন কোটি টাকা। সম্রাট এবং নবাবকে দিয়ে এবং নিজেদের খরচপত্র বাদে কোম্পানির দু'কোটি টাকা লাভ থাকতই। এই লাভের বিনিময়ে কোম্পানি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, স-কৌন্সিল গবর্ণর নবাবকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারিতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন, তাঁরা যে নিজেই তাঁর স্থান অধিকার ক'রে শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করবেন এমন কোন কথা ছিল না।

দেওয়ানি নেবার ছ'মাস পরেই ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল

প্রথম মুর্শিদাবাদে কোম্পানির পুণ্যাহ হ'ল। বিলেতে কোর্ট-অব-ডিরেক্টারদের কাছে রিপোর্ট গেল, সে বৎসর এক কোটি এক চল্লিশ লক্ষ টাকা আদায় হবে। ভারত-সোনার গাছ নাড়া দিয়ে কেমন ফল পাওয়া যাবে তার এই নমুনা দেখে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ অংশীদারদের শতকরা ১২॥০ টাকা লাভ দেবেন ব'লে ঘোষণা করলেন।

এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ল। তাঁরা কোম্পানির কাছে কিছু কর চাইলেন। পার্লামেণ্ট-এ আইন পাশ হ'ল। কোম্পানিকে চল্লিশ লক্ষ টাকা কর দিতে হবে। অবশ্য এই অতিরিক্ত টাকাটাও বাংলার কৃষকের কাছ থেকে আদায় করবার চেষ্টা করা হ'ল।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টির জন্য ভাল ফসল হ'ল না। তার ফলে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্নকষ্ট হ'ল। কিন্তু কোম্পানি খাজনা আদায়ে বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রকাশ করলেন না। ঐ বৎসরই উত্তর বাংলায় অনাবৃষ্টি ও দক্ষিণ বাংলায় অতিবৃষ্টি হয়।

ফলে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। লোকে গাছের পাতা, মৃতের মাংস খায় এবং সন্তান বিক্রী করে। প্রায় ছ'আনা রকম লোক মারা যায়। কিন্তু কোম্পানির লোকের খাজনা আদায়ের ত্রুটি ছিল না। যেখানে কোন প্রজার ঘরে কিছু শস্য ছিল, কোম্পানির ইংরেজ কর্ম্মচারীরা তা বলপূর্ব্বক অল্পমূল্যে কিনে নিয়ে অধিক মূল্যে বিক্রী করে কিছু লাভ করতে ছাড়েন নি।

এই দুর্ভিক্ষের বৎসরটা বাংলা ১১৭৬ সাল। সেই জন্য এই সালের নাম অনুসারে এটা "ছেয়াত্তুরে মন্বন্তর" ব'লে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

নবাবী আমলের আরম্ভে সুবাদারী ফরমানে দিল্লীর সম্রাট বাংলা দেশকে "জেন্নেৎউল বিলেত" অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য ব'লে বর্ণনা করেছিলেন। আর সেই—নবাবি আমলের শেষে সেই বাংলার এই শোচনীয় পরিণাম।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির শাসনের উপর বিলেতের রাজ-সরকারের দৃষ্টি পড়ল। এর ফলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর-জেনারেল হ'য়ে বাংলায় আসেন। রাজস্ব-সংগ্রহ প্রণালীর সংস্কার আরম্ভ হ'ল। প্রথমেই কালেক্টার ও তাঁর সহকারীদের বেতন বৃদ্ধি ক'রে দেওয়া হ'ল। ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার যত কিছু হয়েছে, সকলগুলিরই এই বেতন বৃদ্ধিরূপ স্বস্তিবচন দ্বারা সূত্রপাত।

প্রথম প্রস্তাব হ'ল পাঁচ বৎসরের জন্য ঠিকা দ্বারা খাজনা আদায় করা হ'বে। একজন কলেকটার একজন দেশীয় দেওয়ানের সহকারিতায় এই কার্য্য সম্পাদন করবেন। সে সময়ে জমিদার নামে অভিহিত, যাঁরা রাজস্ব আদায় ক'রে দিতেন, সকল স্থলে তাঁদিগকে কর্ম্মচ্যুত ক'রে তাঁদের স্থানে অন্যলোক নিযুক্ত করা হয় নি, কোন কোন স্থানে হয়েছিল। ঠিকার প্রস্তাবে নূতন-পুরাতন সকলের কাছে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা চাওয়া হ'ল। যারা সেই কোম্পানি-নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতে স্বীকার করলেন তাঁরাই নূতন ঠিকাদার (revenue farmer) হলেন। আর যাঁরা অস্বীকার করলেন তাঁদিগকে সরিয়ে দিয়ে সেইস্থানে অন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হ'ল।

প্রজা নবাব-সরকারে যে কর দিয়ে আসছে তার অতিরিক্ত আর কিছু না নেওয়া হয়, তার জন্য যথারীতি আদেশ প্রচার করা হ'ল। পুরাণো আবওয়াব করের সামিল হইল, নূতন আবওয়াব আদায় বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ঠিকাদারি চলল না। ঠিকার টাকার পরিমাণ জমিদারির আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্দ্ধারিত করা হয় নি। অনেক স্থলে নিলামের ডাকাডাকির মধ্যে রাজস্বের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়েছিল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পাঁচশালা বন্দোবস্তের মধ্যে ঠিকাদার বা জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধটা স্থির হ'ল না। কাজেও এর অনেক ত্রুটি দেখা যেতে লাগল। নূতন বন্দোবস্তের জন্য বিলেতে লিখে জবাব না পেয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাৎসরিক বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

এর মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধে আরও তথ্য অনুসন্ধান করবার জন্য হেষ্টিংস এক কমিশন নিযুক্ত করলেন। এই কমিশনের রিপোর্টের ফলে প্রাদেশিক রেভেনিউ কমিটিগুলি উঠে গেল। তার পরিবর্ত্তে মেট্রোপলিটান রেভেনিউ কমিটি নিযুক্ত হ'ল। এঁরা রিপোর্ট করলেন, জমিদারদের সঙ্গে সুবন্দোবস্ত ক'রে তাঁদের হাতে জমি দেওয়াই কোম্পানির সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও নিরাপদ এবং রায়তের পক্ষে ও দেশের পক্ষেও মঙ্গলজনক। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট এক আইন পাশ করেন। তা দ্বারা আদেশ করা হ'ল, হিন্দুরাজত্বের ও মুসলমান রাজত্বের সময়ে জমিদার, তালুকদার ও জায়গিরদারের যে সকল স্বত্ব ও অধিকার ছিল এবং তাঁরা কি পরিমাণে খাজনা দিতে বাধ্য ছিলেন, তার একটা অনুসন্ধান হোক। আরও আদেশ হ'ল যে, যাদের স্বত্বাধিকার লোপ করা হয়েছে তাদের তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে কিনা তা'ও দেখা হোক। কোর্ট-অব-ডিরেক্টার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন, জমিদারদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করা হোক। কিন্তু অন্য সকল লোকের স্বত্বাধিকারও যেন রক্ষা করা হয়।

রাজস্ব সম্বন্ধে তাঁদের এই অভিপ্রায় হ'ল যে পুরাতন বন্দোবস্ত এবং তদনুসারে প্রকৃত পক্ষে যে রাজস্ব আদায় হয়েছে তাকেই ভিত্তি ক'রে একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হোক। তাঁরা মনে করেছিলেন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ পর্য্যন্ত যত অনুসন্ধান হয়েছে তা থেকে জমিদারিগুলির রাজস্বদানের সামর্থ্য জানা গিয়েছে। সেইজন্য এবার দশ বৎসরের বন্দোবস্ত করা হোক। এই সকল আদেশ ও উপদেশ নিয়ে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে লর্ড কর্ণ-ওয়ালিস ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস পৌঁছেই প্রস্তাবিত দশশালা বন্দোবস্তের নিয়মাদি প্রণয়ন করতে আরম্ভ করলেন। নিয়মাদি প্রস্তুত হ'লে তা সংহিতা ক'রে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশন ৮ ব'লে প্রচারিত হ'ল এবং এরই উপর ভিত্তি ক'রে দশশালা বন্দোবস্ত স্থাপিত হ'ল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রথম থেকেই এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু জন শোর প্রভৃতি মন্ত্রীরা বিরোধী হন। কর্ণওয়ালিস এ সম্বন্ধে পুরাতন রীতির কোনও অনুসন্ধান করলেন না। কোম্পানির ডিরেক্টাররা অনুসন্ধান করতে নিষেধ ক'রেছিলেন।

খবরদারি

গরুর মেলায় শ্বেতাঙ্গের লাথি

একদিন কোনও জায়গায় প্রশ্ন হ'য়েছিল সাহেবদের বড় একটা ম্যালেরিয়া হ'তে দেখা যায় না কেন? তার উত্তরে একজন অকালপক্ক ছোক্‌রা ব'লে উঠ্‌লো—"কারণ শ্বেতাঙ্গের পীলে কৃষ্ণাঙ্গের চাইতে ঢের বেশী শক্ত;—যদিও তোমরা তার পরখ্ করবার সুযোগ আজ পর্য্যন্ত পাও নি, কিন্তু আমি সেটা ঠিকই জানি।"

সম্প্রতি রংপুর জেলার ফুলছরি গ্রাম থেকে এই রকমের একটি সংবাদ সহযোগী "বসুমতী" ছেপেছেন। ব্যাপারটা হ'য়েছিল এই যে,—ফুলছরিতে প্রতি পৌষ মাসে একটি করে' মেলা বসে। মেলায় গরু মোষ ইত্যাদি বিক্রী হয়। ফুলেশ্বর নামে একজন ২০।২২ বছরের গোয়ালা সেই মেলায় গিয়েছিল গরু বিক্রী করতে। গত ১০ই ডিসেম্বর ফুলেশ্বর গোয়ালা নিকটবর্ত্তী নদীর ঘাটে জলপান করতে যায়। সেই ঘাটে এক শ্বেতাঙ্গের ফ্লাট বাঁধা ছিল। সাহেব কালা-আদ্‌মীর এই অসভ্য ব্যবহার দেখে চটে' কাঁই হ'য়ে ফুলেশ্বরের উপর চড়াও হ'য়ে বেচারীকে বুটের আঘাত করতে থাকে। ক্রমশঃ লোক সমাগমের সম্ভাবনা দেখে বুদ্ধিমান শ্বেতাঙ্গ তার ফ্লাটে ফিরে যায়। ঠাকুর ষ্টেটের ম্যানেজার মহাশয় ঘটনা শুনে' স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে নিয়ে ঘটনা স্থলে হাজির হন। ডাক্তার বাবু ফুলেশ্বরকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে গাইবাঁধা মহকুমার সদর হাঁসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সহযোগী "বসুমতী" এর উপর একটু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"অভিযোগ ভীষণ, কাজেই এ সংবাদে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আশা করি সত্বর এ বিষয়ের সত্যাসত্য প্রকাশ পাইবে।"

এ জাতীয় অভিযোগ ত'তা আমাদের দেশে "বারোমেসে" হ'য়ে উঠেছে, কাজেই অবিশ্বাস করবার কি আছে? আর অভিযোগই বা এমন "ভীষণ" কিসের? শ্বেতাঙ্গের লাথিতে কালা-আদ্‌মীর প্লীহা কাটা? আদালতে সে অভিযোগের ভীষণত্ব যে কত, সহযোগীর তা নিশ্চয়ই অগোচর নাই। বড়জোর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। তবে সংবাদ দাতার পত্রে যে জনসমাগমের কথা লিখিত হয়েছে সেইটুকু অবিশ্বাস্য মনে হয়। বোধ হয়, সে গরুর মেলায় মানুষ ছিল না।

আমরা বলি—প্লীহা-না-ফাটানোর জন্য জমিদারের তরফ থেকে সাহেবকে একটি 'ডিনার' দেওয়া হোক, আর যাঁদের সম্মুখে সাহেব খোস মেজাজে বাতাস খেতে খেতে ফ্লাটে ফিরে গিয়ে স্বচ্ছন্দ চিত্তে বিরাজ করছিলেন—সেই ফুলছরির জনগণগুলো চাঁদা তুলে সাহেবের জুতোর 'হাফ-সোল' দেবার ব্যবস্থা করে দিন নতুবা সাহেবকে যে একটু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

০ ০ ০

মিঃ জনষ্টনের ভারতীয় অভিজ্ঞতা

বোম্বাই শহরে মিঃ জনষ্টন একজন খবরের কাগজের প্রতিনিধির কাছে ভারতের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—"ভারতীয় শ্রমিকরা মনুষ্যবাসের অযোগ্য স্থানে চরবান্দা দিয়ে কাল কাটায়; তারা না পায় শিক্ষা; না পায় স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধা। [illegible] শ্রমিকদের কর্ত্তব্য এদের ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন ও জীবন-যাত্রা উন্নত করবার জন্য সাহায্য করা। শ্রমিকদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য যথাসম্ভব সত্বর একটী দল গঠন করা দরকার।"

মিঃ জনষ্টন আরও বলেছেন—"খুব কম স্বরাজী নেতাকেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য যত্নবান দেখলাম। শ্রমিকদের প্রতি যে তাঁদের কোন সহানুভূতি আছে, এমন কোন কিছু বোঝা গেল না।"

মিঃ জনষ্টনের বুদ্ধির প্রশংসা করতে আমরা বাধ্য কেননা স্বরাজীদের সহানুভূতি যে কা'দের উপর সেটা তিনি প্রকাশ্য সভায় বলেন নি।

০ ০ ০

"কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদে মৃগ লয়ে ক্রোড়ে।"

বাঁকুড়ার চাউলের কলের মালিক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চৌধুরীকে চাউলের কলের লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে সেখানকার মিউনিসিপাল কমিশনারদের মধ্যে একটু মজা হ'য়েছে। সে মজা নিমচাঁদের "মজা" নয়, কেননা তার মধ্যে "মানে" আছে।

স্বরাজ্যদলভুক্ত চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান—এই চেয়ারম্যান-মিথুন লাইসেন্স দেওয়ায় দারুণ আপত্তি তোলা সত্ত্বেও কমিশনারেরা লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। কেশব বাবু অতঃপর বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একখানা দরখাস্ত করে' জানিয়েছেন যে, স্বরাজ্যদলের চাঁদার খাতায় তিনি একটি আঁচড়ও কাটেন নি বলে' চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান মহাশয়েরা তাঁকে ফ্যাসাদে ফেলেছিল।

মল্লযুদ্ধে প্রতিযোগী চিৎ হ'য়ে পড়ে গেলে তাকে আর আক্রমণ করা রণনীতির সভ্যতা-বহির্ভূত। কেশব বাবুর এটা জানা উচিত ছিল।

০ ০ ০

মধ্য প্রদেশে আত্মাকর্ষণ

মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার গত শারদীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও মহাশয়ের উপস্থাপিত ও সভার গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে মিউনিসিপালিটী ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিলের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সিলেক্ট কমিটি বসেছিল। উক্ত কমিটীর প্রদত্ত মত পাঠ করতে স্বরাজ্যদল ও সরকার পক্ষ উভয়েই রাজি হ'য়েছেন। লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচনে অনায়াসী ম্যাজিষ্ট্রেটদের দাঁড়াবার যে ধারা আছে তা তুলে' দেবার

এত যত্নাদায়ক সরকারের গোতায় হাওয়া দিয়েছেন আর কারা-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্ব্বাচনে দাঁড়াবার যে বাধা আছে তা তুলে দেবার জন্য সরকার পক্ষ স্বরাজ্যদলকে "অহং গৃহ্নামি" বলেছেন।

এরূপ দিলে আমাদের বিশেষ বলবার কিছুই নেই। তবে ভাবনা হয়, এই রকম "কোর্টশিপ" হ'তে হ'তে কবে বা কোন্ অবৈধ "রাজযোটক" ঘটে' যায়।

ভ্রূণহত্যা

গত সংখ্যায় "লাঙলে" আমরা হেমন্ত বাবুর Young Bengal পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। পুস্তকখানি মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভস্থ ছিল, কিন্তু কোন অপ্রকাশ্য কারণে গর্ভেই ইহলীলা সংবরণ করেছে।

আশা করি, কারণটি আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করবেন না। অগত্যা আমরা নিজেরাই কারণটি সাধারণের কাছে বল্‌বো ;— [illegible] সামাজিকতায় বাধে।

অক্ষর-শিল্পীর কৃতিত্ব—

১৫৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল মহাশয় সেদিন আমাদের কার্য্যালয়ে একটি ফ্রেমে বাঁধান "দৈনিক বসুমতীর" একটি বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা এনেছিলেন। আমরা প্রথমতঃ পুরাতন বসুমতীর একটি বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা এরূপ যত্ন সহকারে বাঁধিয়ে রাখবার প্রয়োজনীয়তা কি থাকতে পারে তা ঠাহর করে' উঠ্‌তে পারিনি। পরে অশ্বিনী বাবু বললেন—এটি আগাগোড়া হাতের লেখা। দিনাজপুর জেলার অধিবাসী মিঃ পি, সি দাসগুপ্ত এম, এস সি মহাশয় এটি নিজে মাত্র ৪০ ঘণ্ট সময়ে লিখেছেন।

আমাদের মনে হয়, হাতের লেখায় এরূপ কৃতিত্ব আজ পর্য্যন্ত কেউ দেখাতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। যাঁরা ওটি দেখ্‌তে চান যেন উক্ত ঠিকানায় অশ্বিনী বাবুর ছবির দোকানে গিয়ে দেখে আসেন। জিনিষটি শুধু দেখবার নয়,—দেখে স্তম্ভিত হবার মত।

খড়কুটো

—ঃ০ঃ—

গতবার আমরা ৫ হাজার "লাঙল" ছেপেছিলাম—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত কাগজ ফুরিয়ে যাওয়াতে কলিকাতায় অনেকে কাগজ পান নি এবং মফস্বলে একবারেই কাগজ পাঠানো হয় নি। ঐ সংখ্যার প্রধান সম্পদ কবি নজরুলের "সাম্যবাদী" গ্রাহকগণের অনুরোধে পুস্তিকাকারে বের করা হ'ল, দাম করা হয়েছে দুই আনা।

কংগ্রেস উপলক্ষে "লাঙল" এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে। আগামী ৭ই জানুয়ারী কবি নজরুলের আর একটি অপূর্ব্ব কবিতা নিয়ে "লাঙল" আবার বেরুবে।

[illegible] নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলন হ'তে প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে একটি মতামত প্রকাশ হওয়া দরকার। সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন বগুড়ায় হয়েছিল। দ্বিতীয় অধিবেশন নদীয়ায় হবার কথা আছে। আগামী ১লা। ২রা ফাল্গুন শনিবার ও রবিবার (১৩।১৪ই ফেব্রুয়ারী) নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরি ষ্টেশন হতে ৩ মাইল দূরে বীরপুরের প্রজারা এই সম্মিলনের অধিবেশনকে সাদরে আহ্বান করবেন ব'লে জানিয়েছেন। আশা করি কাউন্সিলের সদস্যগণ ও অন্যান্য প্রজাহিতৈষীগণ অবশ্য অবশ্য উপস্থিত হবেন।

[illegible] বীরভূম জেলা প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশনের কথা আছে। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সভাপতি পদে প্রস্তাবিত হয়েছে।

কবি নজরুল ইসলাম এখন অসুস্থ। তাঁর শরীরটা একটু সারলেই তিনি কাউন্সিলের স্বরাজদলের সম্পাদক শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকারের সহযোগে প্রজা আন্দোলন উপলক্ষে মফস্বলে ঘুরবেন। যাঁরা তাঁদের চান, অনুগ্রহ করে এখনই পত্র দিবেন।

জানুয়ারী মাস হতে কলিকাতার পার্কে পার্কে প্রজা-আন্দোলন সম্বন্ধে প্রতি রবিবারে সভা হবে। বিখ্যাত বক্তাগণ বক্তৃতা করবেন এবং কাজি নজরুল ও মণিবাবুর গান সকল সভাতেই হবে।

প্রজার দুর্দ্দশা ও তার প্রতিকারের উপায় দেখাবার জন্য আমাদের আপিস হতে কতকগুলি ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি তৈরি করানো হচ্ছে। এইগুলি শেষ হ'লেই লাঙলের কর্ম্মসচিব শামসুদ্দীন হুসেন সাহেব ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে মফস্বলের ডাকে বেরোবেন।

শোনা যাচ্ছে, নতুন বড় লাটের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হবে। তথাস্তু শীঘ্রং।

বাজারে গুজব রায় বাহাদুর অবিনাশ বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে "সার" উপাধির জন্য লাট সাহেব সুপারিশ করেছেন। লাটের কৃতজ্ঞতা আছে!

শ্রমিক ও প্রজা স্বরাজ দলের সাহায্যার্থ আগামী ৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এলবার্ট হলে একটি Veriety Entertainment হবে। বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জগতের নানা ভাষায় গান গাওয়া হবে। কলিকাতার খ্যাতনামা কয়েকজন বিখ্যাত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁদের সঙ্গীত কলা কৌশল প্রদর্শন করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

প্রত্যেক ইস্কুলে কলেজে ও আপিসে টিকিট বিক্রীর জন্য লোক চাই। সাহায্যকারীগণ অনুগ্রহ করে "লাঙল" আপিসে এসে দেখা করবেন।

° ° °

বঙ্গীয় লাট কাউন্সিল আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী বসবে। প্রজাস্বত্ব আইনের খসড়া সেই সভায় সিলেক্ট কমিটি পেশ করবেন।

মা

[ম্যাক্সিম গর্কী]

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

ভূমিকা

গর্কীর সাহিত্য দুঃখের সংহিতা। নির্য্যাতিত মানবতার মহাভারত। ধরণীর বিবর্ত্তনের বেগে বিভিন্ন জাতি বিভিন্নভাবে এই দুঃখের ও নির্য্যাতনের সংস্পর্শে আসে। যুগে যুগে ব্যথিত বোধি-সত্ত্ব চলেছে তার বোধিদ্রুম মূলের সন্ধানে যেখানে সুজাতা পরমান্ন নিয়ে আছে তার বোধি-সত্ত্বের জন্য। ম্যাক্সিম গর্কী এই বোধিসত্ত্বগণের অন্যতম। গর্কী মানে তিক্ত। জীবনের নিষ্করুণ অভিজ্ঞতার জন্য তিনি এই নাম গ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম Alexi Maximich Peskov—আলেক্সি পেশকভ্। ১৮৬৮ খ্রীঃ অঃ Nizni Novgorod-এ গর্কী জন্মগ্রহণ করেন।' পিতা র‍্যাপরের কাজ করতেন আর তাঁর মা ছিলেন একজন সাধারণ কৃষক-রমণী। গর্কীর জীবন নিদারুণ দুঃখ ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁর জীবনের কাহিনী তিনি তাঁর চারখানি বইএতে লিপিবদ্ধ করেছেন—(১) My Childhood, আমার শৈশব; (২) In the World পৃথিবীর পথে; (৩) Fragments from my diary ডায়েরীর কিয়দংশ; (৪) Reminiscenses of My Youth (My University Days) যৌবনের স্মৃতি। গর্কীর সাহিত্য নির্য্যাতিত মানবতার সাহিত্য। তিনি সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে কাদামাটি সমেত স্বর্ণ আবিষ্কার করেছেন। রুশিয়ার সমাজপরিত্যক্ত নিম্ন অ-শিক্ষিত মানুষের দলের মধ্যে বন্দী হয়ে যে ছিন্ন মলিন বাসে অপহৃত-মানব-দেবতা মূক হয়েছিল—গর্কী সেই দেবতাকে জাগিয়েছেন, মানবতাকে জাগিয়েছেন। মানবতার যে মহৎ ও বৃহৎ অংশ চিরদিন আপনার বিশাল সংক্ষুব্ধ জীবনকে প্রকাশ করতে পারে না—যে সমস্ত বিশাল শক্তি ও বিপুল চিন্তার [illegible] শিক্ষা ও সহানুভূতির অভাবে সমাজের অপব্যয় ও ক্ষতিতে পরিণত হয়—গর্কী তাদের প্রতিনিধি।' যেখানে, যে-কোন দেশে মানব মানবকে অস্বীকার করে শুধু তার প্রয়োজনের সামগ্রী করে চালাচ্ছে যায়—পৃথিবীর যে কোন নিভৃত কোণে যে কোন জাতির মানব দিনান্তে নিরন্নে রাত্রি কাটায়, যে কোন মানব মানব হতে পারল না অন্যের অত্যাচারে, সে তার অন্তরের সাথী ভাবে চিরন্তন স্থান পাবে গর্কীর সাহিত্যে। বঞ্চিত মানবতার প্রতি এত বড় সত্যকারের দরদ জগতের সাহিত্যে বিরল।

"Mother" একদিক দিয়ে জগতের নির্য্যাতিত মানবতার গদ্য কাব্য—আর একদিক দিয়ে তদানীন্তন রুশিয়ার প্রকৃত ইতিহাস। এ ইতিহাসের নায়ক নায়িকাগণ সামান্য কুলী, মজুর, কৃষাণ, আর তারা যারা বাণী নিয়ে এল সারা দেহ ভরে কিন্তু ক্ষুধার অন্ন জোটাতে বাণী যাদের নিল চিরমৌনী করে। এক শতাব্দী ধরে এই ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে। এ শতাব্দীর ইতিহাস। সহস্র সহস্র লোক একই বছরের মধ্যে একই পথ বেয়ে সুদূর সাইবেরিয়ায় চিরজীবনের মত নির্ব্বাসিত হয়েছে—সহস্র লোক একই ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে—একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে। জননীর বিশুষ্ক বক্ষে ক্ষীরধারা আসুক আমাদের আত্মাহুতিতে আসুক—অনাগত কোটী মানব যেন আর ক্ষুধার আর নির্য্যাতনের তাড়নায় না মরে—জননীকে যেন তারা রাক্ষসীর প্রেতমূর্ত্তিতে না দেখে—এই ছিল সেই উদ্দেশ্য। গর্কার নারী জাতির প্রতি একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধা আমরা পরিস্ফুট দেখি তাঁর সমস্ত লেখার ও চিন্তার মধ্যে— বিশেষতঃ "মা"র পরিকল্পনায়। গর্কী বলেন (মনে হয় কোন মধুচ্ছন্দা আর্য্যঋষি বলছেন)—

"জননী গো, এই মৃত্যু-ভরা বিশ্বে তুমি মা অনন্ত প্রাণপ্রস্রবিনী। এই ধরণীর বিশাল প্রান্তরে একদিকে কোথাও মৃত্যু যখন এই ধরণীর কোন শিশুকে নিয়ে যায় অপহরণ করে—আর এক প্রান্তে কোথায় নিভৃত ছায়ায় মাগো তুমি তোমার মৃত্যু-জয়ী অমর-শক্তির বলে তোমার মধ্য দিয়ে আবার ফিরিয়ে আন, তাকে। তুমি মাগো জীবনের রাজপথ। মৃত্যুর তুমি মা অনন্ত শত্রু। তোমার স্নেহে ও প্রেরণায় জগৎ দোলে।" নারীর জননী-মূর্ত্তিতে এই অসীম প্রাচ্য-সুলভ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস "মা"র পরিকল্পনায় ফুটে আছে।

(১)

প্রতিদিন প্রভাতে কারখানার বাঁশী বাজিয়া ওঠে; একটা তন্দ্রিত-কর্কশ দীর্ঘ শব্দ শ্রমজীবিদের আবাসের উপরের ধূম্র-ধূসর পাণ্ডুর আকাশকে ছাইয়া ফেলে। বাষ্পযন্ত্র-দানবের এই আহ্বানে দ্রুত-দ্রুতবে অসংখ্য নর-নারী ধূসর গৃহগুলি হইতে পথে দলে দলে বাহির হয়। বিবর্ণ বিষণ্ণ-মুখে সন্ত্রস্ত জন্তুর মত তাহারা আগাইয়া চলে,—অনিদ্রায়, অল্পনিদ্রায় দেহ কাঠ হইয়া থাকে। শীত-প্রভাতের ম্লান-আলোকে কর্দমাক্ত পথে অসংখ্য পরিম্লান রক্তহীন মানবের অর্থহীন দৃষ্টি লইয়া সঙ্কীর্ণ খোয়ার পথ বাহিয়া তাহারা চলে যেখানে তাহাদের জন্য হিম-স্নেহে অপেক্ষায় রহিয়াছে দীর্ঘ প্রস্তরের সিঁড়িগুলি। তাহাদের পায়ের তলায় কাদায় চলার শব্দ হয়—মনে হয় যেন কাহারও বাস্ত দশায় অভিনয়ের শব্দ। তন্দ্রাচ্ছন্ন গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দ ওঠে; ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট, আক্রোশের ও গালাগালের শব্দ আকাশ ছাইয়া ফেলে। আর এই শব্দকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য গভীর বধির গতি-রোলে যন্ত্রের পীড়িত আর্তনাদ তাহাদের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতে থাকে। নির্দয় অনিবার্য্যতায় ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কারখানার চিমনীগুলি গ্রামের উপরে দীর্ঘ সদম্ভ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন আবার সূর্য্য অস্ত যায়, অস্ত সূর্য্যের ক্লিষ্ট রক্ত-আলো যখন বাতায়নে বাতায়নে আসিয়া পড়ে, তখন আবার কারখানা হইতে দাহ-অন্তে ভস্মের মত অসংখ্য নর-নারী পথে আসিয়া দলে দলে পড়ে। অন্ধকারে-ভরা মুখ, ধোঁয়ার দাগ, গায়ে লেগে কল-চালনের তেলের তীব্র গন্ধ, গোধূলির ঈষৎ-আলোকে ক্ষুধার্ত্ত দাঁতগুলির রক্তহীন শ্বেত আভা জ্বলে। ফিরিবার সময় কিন্তু তাহাদের ভাষা একটু যেন সতেজ হয়—একটু আনন্দের আভাস থাকে। একটা দিনের দীর্ঘ শ্রমের অবসান ত' হইল রাতে আহার আছে, তাহার সঙ্গে আছে বিশ্রাম।

মানবগুলির জীবন হইতে যন্ত্রদানব নিঃশব্দে দিবসকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। মাংসপেশী ও শিরা উপশিরা হইতে যতদূর যা পায় তা তাহার আহারের জন্য মানবের তেজ ও রস চুষিয়া লইয়াছে। মানবের জীবন হইতে দিবসের রৌদ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; একটাও রবির কর জীবনের সঙ্গে গাঁথা হইল না। আপনার অগোচরে মানব মৃত্যুর গহ্বরের দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহার শ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে কিন্তু কিসের আনন্দ দোলে, তাহার সম্মুখে পূতি-গন্ধময় ভাঁটিখানার আনন্দ-আসর খোলা। সে আনন্দে তাহা গ্রহণ ও ভোগ করে।

ছুটির দিনে তাহারা বেলা দশটা পর্য্যন্ত ঘুমায়। তারপর শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির লোকেরা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গির্জ্জার উপাসনার জন্য যায়। যাইবার সময় ছোকরাদের ধর্ম্মে অশ্রদ্ধার বিষয়ে তীব্র মন্তব্য হয়। গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রুষ-জাতির মোহন-ভোগ "পিরগ" খায়। তারপর আবার ঘুমাইতে যায়—সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। বহুবর্ষের উৎপীড়িত অবসাদ ক্ষুধাকে কখন নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাই আহার ও ক্ষুধার জন্য তাহারা জাগিয়া উঠিয়া আকুল ও তীব্রভাবে মদ্যপান করে। উদরের অসহায় তন্ত্রীগুলি "ভোড্‌কার" তীব্র জ্বলন্ত বিষজ্বালায় জ্বলিয়া উঠে।

তারপর তাহারা অলস পথে এমনি ঘুরিতে বাহির হয়। কেউ কেউ কাদায় ব্যবহারের জন্য "ওভার-সু" পরে—যদিও পথ শুক্‌না থাকে; কেউ বা ছাতি মাথায় দিয়া চলে—যদিও পরিষ্কার আকাশে তখন শুধু ম্লান সূর্য্যের আলো নিভিয়া আসিতে থাকে। প্রত্যেকেরই যে জুতা ও ছাতা আছে তাহা নয় কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে বাসনা আছে যে, সে তাহার প্রতিবেশীর অপেক্ষা অধিকতর শোভন হইবে।

পথে দেখাশোনা হইলে তাহারা কারখানা আর তাহাদের যন্ত্রপাতির কথাই বলাবলি করে; ফোরম্যানকে নিয়ে বেশ একটু দুষ্কথা অসাক্ষাতে বলা-কওয়া চলে; তাহাদের চিন্তার সীমানা কারখানা ও যন্ত্রপাতিকে ছাড়াইয়া যায় না। কখনও কদাচিৎ অস্পষ্ট ইঙ্গিতে কোনও ব্যর্থ সম্ভাবনার চিন্তা কাহারও কাহারও মনে ঝিলিক মারিয়া ওঠে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সব তাহাদের একটানা বৈচিত্র্যহীন ভাষা ও ভাবে ডুবিয়া যায়। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা নিয়মিত ভাবে তাহাদের স্ত্রীদের উপর কব্‌জীর জোর পরীক্ষা করে। ছোকরারা ভাঁটিখানায় স্ফূর্ত্তি জমায়, কাহারও বাড়ীতেই হয় ত আড্ডা বসে, বাজনা বাজে, সৌন্দর্য্যের নাম-গন্ধ-শূন্য অশ্লীল গান পুরাদমে চলে, নাচ হয়, শ-কার ব-কারের সঙ্গে ভরা ভোড্‌কার ভাঁড় অনবরত খালি হইতে থাকে।

ক্লান্তিতে ও শ্রমে অবসন্ন তাহারা অবিরাম পান করিয়া চলে। প্রত্যেক চুমুকের সঙ্গে অন্তরে একটা গূঢ় ব্যাধিগ্রস্ত চাঞ্চল্য জাগে। সে চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিতে চায়। সামান্য কারণে তাহারা বন্ধুদের সামান্যতর কথায় ছল ধরিয়া বিষম ঝগড়ার সৃষ্টি করে। অন্তরের পিঞ্জরে আবদ্ধ এই আশাময় চাঞ্চল্য মূর্ত্তি ও মুক্তি চায়। কলহ ঘন হইয়া উঠে; মত্ত পশুর মত তাহারা আপনাদের মধ্যে কলহ করে—কামড়া-কামড়ি করে—রক্তা রক্তি হয়—কচিৎ কখনও হত্যাও হয়।

স্নায়ু ও পেশীতে বদ্ধমূল শ্রান্তিহীন ক্লান্তির মত তাহাদের দেহে ও মনে হিংসার বীজ ছড়াইয়া আছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা বাড়িয়া চলে। অন্তরের এই দুরারোগ্য ব্যাধি লইয়াই তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-কুটিল ছায়ার মত এই ব্যাধি তাহাদের ঘিরিয়া থাকিয়া নিত্য নব অবস্থ বীভৎসতা ও পাশবিকতায় প্রণোদিত করে।

ছুটির দিনে ছোকরারা যখন বাড়ী ফিরে তখন গভীর রাত। ছিন্ন বসন, মলিন, ধূলি-জীর্ণ, মুখে আঘাতের চিহ্ন; অমুককে বেশ দুটো ঘুষি মারা হইয়াছে—কেহ চীৎকার করিয়া গর্ব্ব ভরে তাহাই শুধু বলিয়া চলে; কেহ বা কোনও বন্ধুকে যে বিষম অপমান করিয়া আসিতে পারিয়াছে তাহার পুনরুক্তিতে একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভে মগ্ন থাকে। কেহ বা রুদ্র অগ্নিমূর্ত্তি, কেহ বা অপমানিত হইয়া অশ্রুকুল। মাতাল, বীভৎস, শোচনীয় ভাবের অসহায় মানবের দল। কখনও ছোকরাদের মা বাবা তাহাদের মাতাল অবস্থায় রাস্তা বা সরাইখানা হইতে অচৈতন্য অবস্থায়

তুলিয়া আনে, গালাগাল দিয়া বকে, মদ্যরসে ভরা স্পঞ্জের দেহে তাহাদের দুপাই আঘাত করে; আবার তাহাদিগকে ধরিয়া কোনও রকমে বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়া হয়, কারণ আবার প্রভাত হইতে না হইতে ত' বাতাস কাঁপাইয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিবে।

মাতলামি ও এই ভাঁটিখানার জীবন যে বুড়োদের কাছে অন্যায় লাগিত তাহা নয়, তবুও তাহারা এই প্রহার ও গালাগালি করিত। কারণ তাহাদেরও যখন যৌবন ছিল তাহারাও এমনি উন্মত্ত হইয়াছে, কলহ করিয়াছে, আবার তাহাদেরও এমনি তাহাদের মা বাবা রাস্তা হইতে তুলিয়া আনিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়াছে। জীবন চিরকাল ধরিয়া এমনি বহিয়া চলিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর এমনি করিয়া অনির্দিষ্ট ভাবে এক ঘেয়েমীর সুরে পাকে-ভরা জীবনের আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। এবং একটা অতি পুরাতন দৃঢ় নিয়মের ও অভ্যাসের দাস হইয়া তাহারা প্রতিদিন একই কাজ অবিরত দিবারাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া করিয়া চলিয়াছে। জীবনের এই *ধারাকে পরিবর্তিত করে, এমন সময় ও ইচ্ছা তাহাদের নাই।*

বহুদিন বাদে একবার হয় ত কোনও নবাগত গ্রামে আসে। নবাগত বলিয়াই সে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজের খাতিরে সে যে সমস্ত জায়গায় গিয়াছে সেখানকার গল্প করিয়া প্রথম প্রথম সে অনেকের মধ্যে একটা আবছায়া কৌতুহলের সৃষ্টি করে। কিছুকাল পরেই আবার এইটুকু এই নূতনত্ব পুরাতন হইয়া আসে এবং এই নবাগত ও তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কৌতুহল আবার হারাইয়া যায়। এই সমস্ত গল্প শুনিয়া তাহারা বুঝিয়াছিল যে, সকল দেশেই যাহারা এই কাজ করে তাহাদের জীবন সমান বৈচিত্র্যহীন। তাহাই যদি হয় তবে ইহা লইয়া আলোচনা করিয়া তাহাদের কি লাভ!

কচিৎ কখনও গ্রামে এমন কোনও নূতনতর নবাগত আসে যার কথা একবারে নূতন লাগে। তাহারা ইহার সহিত তর্ক করে না, প্রতিবাদও করে না, নবাগত যাহা কিছু অদ্ভুদ্ বলিয়া যায়, চরম অবিশ্বাসে তাহারা তাহাই চুপ করিয়া শোনে। ইহার কথায় কখনও হয় ত কাহারও অন্তরে একটি অন্ধ চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে, কাহারও বা অন্তরে একটা এলোমেলো প্রীতি জাগে, কাহারও অন্তরে একটা অজানা সম্ভাবনার ক্ষীণ ছায়ার আভাস দোলে। কিন্তু এই নিতান্ত উত্তাক্তকারী অপ্রয়োজনীয় ক্ষণিক উত্তেজনার হাত হইতে সনাতন অবসাদে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা আবার অধিকতর মাত্রায় পান করে।

এই নবাগতের চারিদিকে একটা অস্বাভাবিক কিছু তাহারা লক্ষ্য করে বলিয়াই একটু বেশী দিন ধরিয়া তাহার স্মৃতি উহাদের মনে থাকে এবং এই যে লোকটা যেটেই তাহাদের মত নয় সেই জন্য একটা গূঢ় সন্দেহাকুল ভয় তাহাদের মনে থাকিয়া যায়। তাহাদের ভয় হয় যে, হয় ত এই লোকটা তাহাদের জীবনে এমন একটা কিছু ঘটাইয়া তুলিতে পারে যাহাতে তাহাদের জীবনের এই অন্ধকারবাহিনীর সনাতনী ধারা রুদ্ধ বা ব্যাহত হইবে। অন্ধকার অথবা কুটীল যাই হ'ক এ জীবনের ধারা তাহাদের সুপরিচিত। তাহাদের মনে একটা ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, জীবনের মাত্র একটা নিয়ম আছে এবং সে নিয়ম নিয়ত তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অন্য কোনও উন্নতির আশায় গভীর নিরাশ হইয়া তাহারা যে কোনও পরিবর্তনকে ভয় করিত; ভাবিত—পরিবর্তন মানে জীবনের বোঝা বাড়ান।

এবং সেই জন্য বস্তীর লোকেরা যাহারা জীবন সম্বন্ধে নূতন কথা বলিত তাহাদের নীরবে এড়াইয়া চলিত। হঠাৎ তাহারা হয় ত কয়েকজন মিলিয়া একবারে অদৃশ্য হইয়া যাইত; যাহারা পড়িয়া থাকিত তাহারা কারখানার কাজ করিয়া চলিত এবং গাঁয়ের একটানা জীবন ভাল না লাগিলে—একলা থাকিত।

এমনি জীবন যাপন করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে একজন শ্রমজীবি পৃথিবী হইতে অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিত।

—ক্রমশঃ—

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

বাৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলমে ইঞ্চি (১"×২¼")	॥০
প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলমে (১২"×২¼)	৫৷০
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৬৲
মলাট—১ম পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলমে ইঞ্চি	১৲
অর্দ্ধ কলম	৫৷০
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৬৲
" ২য় পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলমে ইঞ্চি	৷৵০
" প্রতি কলমে	৭৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	২০৷০
" ৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য	
" ৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	৸০
প্রতি কলম	৮৷০
" সমগ্র পৃষ্ঠা	২৫৲

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলমে ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵০।

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পাঁচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সি দেওয়া হইবে না; ও প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ হিসাব সহ বিক্রয়লব্ধ অমার টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় ও মণিঅর্ডার কমিশন লাঙল অফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যায় শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেন্টগণকে শতকরা পচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

৬। নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

পত্রিকার মূল্য—

বাৎসরিক	৩৲ টাকা,	ভিঃ পিঃ	৩৷০
ষাণ্মাসিক	১৷৵০	"	১৸৵০
প্রতিসংখ্যা	এক আনা		

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র

৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ছেলে-মেয়েদের হাসিমুখ দেখ্‌তে চাইলে
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চমৎকার গল্পের বই

নীল পাখী

চাই-ই।

দাম মাত্র আট আনা।

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ফরওয়ার্ড, অমৃতবাজার, বিজলী, আত্মশক্তি, আনন্দবাজার, বসুমতী, স্বরাজ, বেঙ্গলী, প্রভৃতি মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্রে উচ্চ প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান—গুপ্ত ব্রাদার্স
১৬নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

"লাঙল" বুক এজেন্সি

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

[নব যুগের নবীন মন্ত্রের নবীন ছন্দের নব পুস্তকালয়]

কাজি নজরুল ইসলামের

নূতন কবিতার বই :—

ক্রন্দন নীরত ভারত মাতার বিবর্ণ-রঞ্জিত অতুলনীয় প্রচ্ছদ পট, ৺দেশবন্ধুর সর্বাঙ্গ সুন্দর ফটো ও কবির নিজের ফটোসহ

চিত্তনামা—১৲

পাঠক ইহারই মধ্যে কবির অমর কবিতা "ইন্দ্র পতন" ও "সান্ত্বনা" পাইবেন। অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

ছায়ানট—১৷০

(কবির সুন্দর ছবিসহ সুন্দর বাঁধাই)

অগ্নিবীণা—১৷০

(৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত, এবং কবির বর্তমান ফটোসহ)

রিক্তের বেদন (গল্প কাব্য)—১৷০

ব্যথার দান (২য় সংস্করণ) ঐ—১৷০

(সৈনিকবেশী ফটোসহ)

দোলন চাঁপা—১৷০

(যাহার পূজারিণী কবিতাখানি চিরপূজ্য)

রাজবন্দীর জবানবন্দী—৵০

ইহা পাঠে পাঠক কবির নির্ভীকতার যথার্থ পরিচয় পাইবেন

কবির তিনখানা পুস্তক যন্ত্রস্থ :—

ঝিঙেফুল
বাঁধন হারা
ফণী মনসা

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী প্রণীত

বোলশেভিকবাদ

(সচিত্র)

বোলশেভিক রুশিয়া সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ নানা চিত্র-সম্বলিত পুস্তক মূল্য মাত্র ৷০ আনা।

চিত্তকথা

(সচিত্র)

চিত্তকথা চিত্তরঞ্জনের নিজেরই মুখের কথা—মহাপুরুষের চরিত্রের সকল দিক ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

নরনারী

(যন্ত্রস্থ)

মারী ষ্টোপস্‌, হ্যাভলক এলিস্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের গবেষণা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত।

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড্ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



প্রধান পরিচালক

কাজী নজরুল ইসলাম

সম্পাদক—

মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নগদ মূল্য এক আনা

বার্ষিক ৩ টাকা

লাঙলে :

কি কি থাকিবে ?

১। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতা।

২। ম্যাক্সিম গর্কীর জগৎবিখ্যাত উপন্যাস "মা"র ধারাবাহিক অনুবাদ

৩। যুগ প্রবর্ত্তক মনীষিগণের জীবনী

৪। প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচনা।

৫। গণ-আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা ও সংকলন।

৬। প্রতি সংখ্যায় একখানি রঙিন ছবি।

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

প্রথম খণ্ড } বৃহস্পতিবার ২২শে পৌষ, ১৩৩২, ইং ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৬ { তৃতীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায়

কবি নজরুল ইসলামের

সব্যসাচী

"লাঙলের" পুস্তক-বিভাগ

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হেমন্ত বাবুর বই

১। বন্দীর ডায়েরী

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে নেতাগণের কারাগারে গমন, তাহাদের জীবন যাত্রা ও ভলেন্টিয়ার আন্দোলনের ইতিহাস যদি উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক ভাষায় জানিতে চান তবে ১৲ টাকা দিয়া বইখানি কিনুন।

২। Intellectual Laws of Language (Thesis for the P. R. S. Published by the Calcutta University. Price R. 1/-)

৩। স্বাধীনতার সপ্তসূর্য্য

(সান-ইয়াত-সেন, জগলুল, ডি ভেলেরা, লেনিন প্রভৃতির জীবনী) ৷৷০ আনা।

৪। বিপ্লবের পঞ্চঋষি

(কার্ল মার্কস, রুশো, ম্যাটসিনি, বাকুনিন, টলষ্টয়ের জীবন কথা ও উপদেশ) ।০ আনা

৫। ছায়াবাজী (গল্পের বই)

(সমাজের অন্ধকার দিকের ছবি—প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতির দ্বারা প্রশংসিত) ৷৷০ আনা।

৬। উল্টোকথা	৷৷০ আনা।
৭। স্পষ্টকথা	।/০ আনা।
৮। যুগশঙ্খ	৶০ আনা।

৯। ভাষাতত্ত্ব ও বাংলাভাষার ইতিহাস

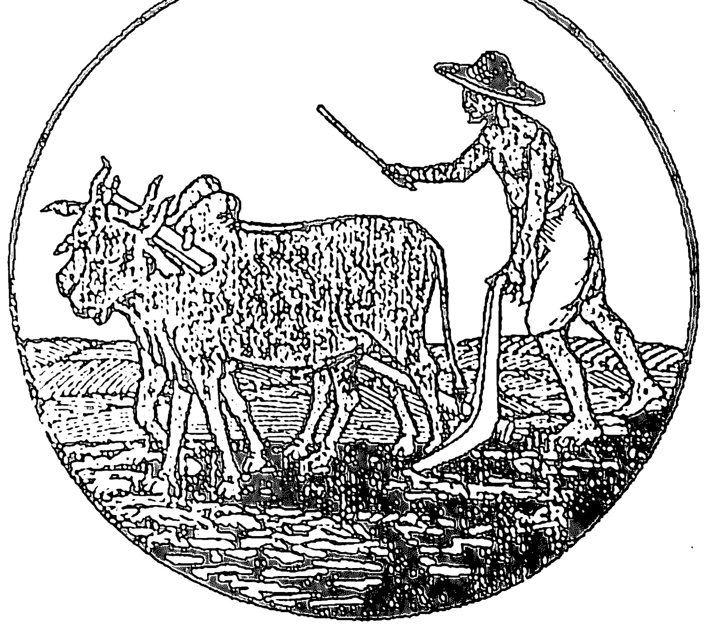
(বাংলাভাষায় একমাত্র বৈজ্ঞানিক ভাবে লিখিত পুস্তক) মূল্য ২৲ টাকা।

নূতন বই

সুলেখিকা মিসেস্ আর এস হোসেন প্রণীত

পদ্মরাগ—(উপন্যাস) মূল্য	১৷৷০
অভিচুর্ন—১ম খণ্ড মূল্য	১৲
অভিচুর্ন—২য় খণ্ড মূল্য	২৲

প্রাপ্তিস্থান—মিসেস আর, এস, হোসেন
৮৬এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।



লাঙল

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৩২ | তৃতীয় সংখ্যা

সব্যসাচী

[নজরুল ইসলাম]

—ঃ০ঃ—

ওরে ভয় নাই আর দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী !
গৌরীশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী ।
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে "আমি আসিয়াছি!"
নব যৌবন জলতরঙ্গে নাচেরে প্রাচীন প্রাচী ।

[২]

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে
গাণ্ডীব ধনু বাজিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য
সাজে রথাশ্ব হাঁকিছে সৈন্য
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে ।

[৩]

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্ম্মতি কুরুসেনা,
দুর্য্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা!
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভদানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা!
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবেনা এই উৎপীড়নের দেনা!

[৪]

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে কাল তারা পদানত।
আজি সম্রাট কালি সে বন্দী,
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী।
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত।

[৫]

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কা'ল তারে বলে পিতা,
চির-বন্দিনী হ'তেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা।
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা।
লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা
জ্বলিবে তাঁহারি আঁখির সুমুখে কা'ল রাবণের চিতা।

[৬]

যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হন শ্রীভগবান্ যে তাঁহারই রথ-সারথি!
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্গাতা
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা সতী
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি।

[৭]

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী
জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়োনা আর শান্তির বাণী শুনি
অনেক দধীচি হাড় দিল তাই
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুনি।।
জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি

[৮]

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এস নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি।
পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী
এইবার তুমি এস মহাবলী,
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি
আর, সত্য সেবিয়া দেখিতে পারিনা সত্যের প্রাণহানি।

[৯]

মশা মেরে ঐ গরজে কামান—'বিপ্লব মারিয়াছি!'
আমাদের ডানহাতে হাতকড়া, বামহাতে মারি মাছি।
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি।
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যাহোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি!

তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে', চাষার কুটীর ভেদ করে', জেলে মালো, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

পোলিটিকাল তুবড়ি বাজি

—:০:—

ভারতের বড়দিনের ছুটীতে All India Political Tubri Competition হয়ে গেল। জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য ৩০টি অধিবেশন বসেছিল। নিখিল ভারতীয় প্রেত-তত্ত্ব সভা হ'তে আরম্ভ ক'রে সোভিয়েট রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে। ঐ অধিবেশনের মধ্যে দুঃখের বিষয় শ্রমিক ও কৃষকের কথা কেউ কেউ তুলেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী লাঙলের জয়গান করেছেন।

"The immemorial twin symbol of the plough and the spinning wheel as the central text of the teaching that shall liberate our unhappy country from the crushing misery and terror of hunger, ignorance and disease"। লাঙল এবং চরকাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের পল্লী-সংগঠনের আয়োজন করতে হবে—লাঙলের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-স্বত্বের কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং ভূমি-স্বত্বের সঙ্গে ভারতীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠার এত নিকট সম্বন্ধ যে সে সমস্যার সমাধান না হ'লে স্বরাজ আসতেই পারে না, তাই প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার সময় নেতারা কি করেন, তা দেখবার জন্য উৎসুক আছি। যাঁরা বলেন স্বরাজ হ'লে ও সব ঠিক হবে—তাঁরা গোড়াতেই ভুল করেন।

শ্রমজীবীদের কনফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুত শিঙ্গারভেলু ঠিকই বলেছেন যে শ্রমিক ও কৃষকের সাহায্য ব্যতীত যে কংগ্রেস বলহীন এবং সে কংগ্রেসের দ্বারা স্বরাজ আসতে পারে না, তা গত পাঁচ বৎসর আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। কেবল ১৯২১ সালে যখন সর্ব-ঐশ্বর্য্যত্যাগী রাজ-দুলাল মহাত্মাকে কাঁধে নিয়ে জনতা বিক্রমে অভিযান করে ছিল, তখন লর্ড রেডিং বলে-ছিলেন "Let us sit as equals, forgiving and forgetting the past, in a round table conference to devise a constitution for India"। তখন সমানে সমানে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা ছিল। আর এখন এসেম্ব্লির সামান্য প্রস্তাবের জবাব দিতেও গবর্মেন্ট প্রয়োজন বোধ করে না।

পণ্ডিত মতিলাল ভয় দেখিয়েছেন ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্বরাজ না দিলে স্বরাজীরা ব্যবস্থাপক সভা ত্যাগ করে সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় হ'তে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত তোলপাড় করবেন। তবে কাউন্সিলের সিটগুলি যাতে শূন্য না হয়, কিম্বা ফাঁকতালে আমলাতন্ত্র দখল করে না নেয়, সে জন্য সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হবেন। সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স শেষ অস্ত্র হবে—কিন্তু সেটা যখন ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না—তখন দেশকে তার জন্যে তৈরি করতে হবে। মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি direct action আর বর্ত্তমান কংগ্রেস-নীতির ভিত্তি constitutionalism—বিরোধ এইখানে, বিরোধ মতিলাল জয়াকর কেলকারে নয়। প্রথম জাতীয় নীতির মূলে দেশের জনসাধারণের সাহায্য চাই, দ্বিতীয় নীতির মূলে শুধু বুর্জ্জোয়া ভদ্রসম্প্রদায়ের হাত। যে শক্তি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য সঞ্চিত হয়েছিল—মহাত্মা বারদোলিতে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আজ আভ্যন্তরিক বিবাদ-বিসম্বাদে সেই শক্তির অপ-প্রয়োগ হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-প্রজা, নো-চেঞ্জার, প্রো-চেঞ্জার এই সমস্ত দলাদলির মূলে ঐ একই কারণ। সতীদেহ টুকরো টুকরো হয়ে আজ ভারতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রুদ্রের এ রোষ কবে থামবে, জানি না।

কৃষক ও শ্রমিককে সংঘবদ্ধ না করে তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে জনগণকে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়। পণ্ডিত মতিলালের মতলব দেশের লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে ফিরে ইলেকসনে আবার দলবেঁধে কাউন্সিলে প্রবেশ করা? কিন্তু অতঃপর? মহাত্মার এক বৎসরের স্বরাজের ধাক্কা এখনও আমরা সামলাতে পারিনি আর চমক লাগানোর প্রয়োজন কি? পণ্ডিতজীর রেজোলিউশন প'ড়ে আমাদের মনে হয় সেই লোকটার জলে ডোবার কথা। সে সংসার-জ্বালায় জ্বলে পুড়ে বিরক্ত হয়ে জলে ডুবে মরবে বলে ঠিক করল। কিন্তু ঘাটে যাওয়ার আগে গামছা খান ও তেল চাইল। তেলমাখা ও গামছার কথা যে না ভুলেছে, সে যে জলে ডুবে মরবে না এটা বেশ বোঝা যায়।

শুধু পোলিটিকাল তুবড়ি বাজিতে কি হবে? কাগজে আমরা লিখতে পারি দেশ কানপুরের দিকে চেয়ে আছে great speech, momentous session কিন্তু এ সবই অভিনয়ের শেষরাত্রির বিজ্ঞাপনের মত। দেশের জনসাধারণের মাথা কচ্ছপের মত শরীরের ভিতর ঢুকে গেছে। এখন সেই মাথা বের করতে দেহটাকে কাটতে গেলে চলবে না। জলে ছেড়ে দিলেই সে আবার স্বচ্ছন্দভাব ধারণ করবে। প্রতিদিনের যে অভাবে সে এমন হয়ে পড়েছে, জনসাধারণকে সেই অভাবের প্রতিকারের মধ্য দিয়ে আবার সজাগ করতে হবে—সে কঠিন সাধনার তারিখ নাই, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৩ বা ফেব্রুয়ারির শেষ ১৯২৬ এর ভিতর তাকে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না।

বৎসরান্তে কাণপুরে আমাদের পোলিটিক্যাল চড়ক পূজা শেষ হল। ফিরে এসে দুই একজন বাদে নেতারা ওকালতি, ডাক্তারি, ব্যারিষ্টারি এবং অন্যান্য ব্যবসায় মন দিবেন এবং যিনি বড় দয়ালু সপ্তাহান্তে হয়তো এক একবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন। কই দেশবন্ধুর মত সেই সর্ব্বত্যাগী স্বদেশপ্রেম, কই সেই আশা—আজ রাজনীতি ক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবাজি, সঞ্চিত ধনের গাদায়

রূপে, অথবা পাবলিক ফণ্ডের অপহরণে, অথবা প্রজার রক্ত শোষণ ক'রে যে নিশ্চিন্ত আছে, আজ তারই নেতাগিরির দিন। যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে দেশের সেবা করে সে নিশ্চয়ই উপায়হীন, কিম্বা গবমেণ্টের টাকা খায়! স্বরাজসাধনার শক্তিবলে আস্তে প্রতিষ্ঠান-সমূহ আজ লোভীর মধুচক্রে পরিণত, পোলিটিক্যাল মোহন্তের দল রাজনীতির পুণ্য তীর্থে যথেচ্ছাচারে দীপ্তিমান। নন্দীভৃঙ্গীর দল তাদের শিঙা বাজিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে শিবাদলের কোলাহলে শ্মশান দেশ মুখরিত। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি আর ত্যাগ-সুরধুনীকে মর্ত্যে নিয়ে আসছে না—শ্মশান-কুকুরদের কাড়াকাড়ি-খিঁচিতে আজ্ব যোগশোকে মুহ্যমান নিস্তব্ধ দেশকে প্রাণবান ব'লে প্রতিভাত করছে।

আজ এই শবসাধনায় তরুণ বাংলার ডাক পড়েছে—এস ভাই, তোমাদের মরণজয়ী পণ আর একবার শক্তি-পীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক। নেতাদের স্তোকবাক্যে ভুলো না—তোমাদের কাঁধে চড়ে যারা নিজেদের উঁচু দেখান, সিন্ধুবাদের নাবিকের সেই বোঝা ফেলে দাও। তুবড়িবাজি দেখে দূর হ'তে আকাশের দিকে চেয়ে থেকো না—তোমার দুর্গম অমানিশার পথে ও আলো কেবল চোখে ধাঁধা লাগায়। একটা পিতল বা তোমার আদর্শে তুমি জড় হয়ে দাঁড়িও না···ওর চেয়ে ঢের বড়শক্তি তোমার অন্তরে লুকিয়ে হয়ে আছে, তুমি নবযুগের রামের মত সেই শক্তিকে পাষাণী অহল্যার ন্যায় প্রাণের স্পর্শে মুক্তিদান কর। গণ আন্দোলনের চলমান শক্তি এই নিরস্ত্রীকৃত প্রাণহীনের দেশে বিপ্লবের বন্যা এনে দিক যুগান্তরের সঞ্চিত জঞ্জাল সব ভেসে যাক।

"জড় জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া হল বেহুঁশ
তথাপি পড়ে না পাগলশিবের মাথার ফুল।
বল সন্ন্যাসী মুখ ফুটে বল,
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিল জল?
রক্ত নয়ন ডুবিছে তপন না পেয়ে কূল।
দিন যায়, কেন পড়ে না শিবের মাথার ফুল।

লেনিন ও সোভিয়েট রুষিয়া

[শ্রীদেবব্রত বসু]

—:০:—

এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া প্রথমেই মনে আসিতেছে সমস্ত মানুষের একটী বিষম রহস্যময় ত্রুটীর কথা—সে ভূতের ভয়। এই ভূতের ভয় এক হাস্যকর রহস্যময় মনস্তত্ত্বের জিনিষ। ভূত আছে কি না আছে আমরা হয়ত অনেকেই জানি না; কিন্তু আমাদের প্রায় সকলের মনেই সেই শিশুকাল থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এই অজ্ঞাত সত্বার ভয় আমাদের পিছু পিছু চলিয়াছে। যে সাহসী বীরপুরুষটিদের বেলায় হয়ত দু'দশটা লোককে বেশ দু'ঘা দিয়া অথম করিয়া দিতে পারে, নিশীথকালে তেপান্তরের মাঠের পথে ঘূর্ণী হাওয়ায় তার রক্ত জল হইয়া ওঠে; সে দেখে আলেয়ার আলো; ভয়ে সেও চারিদিকে ভয়-মরীচিকা দেখে। তখন তেপান্তরের মাঝে শুকনো বাজ-পড়া তালগাছটাকে মনে হয়—সেই অশরীরীর ছায়া—; বাতাসে গায়ের স্পর্শ লাগে—নাকি সুরে বীভৎস শব্দ উঠে চারিদিক থেকে। সাহসী পুরুষ আতঙ্কে ঘন ঘন রাম নাম জপিতে জপিতে ছুটেন। ফিরিয়া আসিয়া ওঝা দেখাইয়া স্নান হইলে সকলকে সাবধান করেন। ভয় বাতাসের সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

আজ সমগ্র য়ুরোপের দিকে চাহিলে শুধু মনে হয় সেই সব কথা। এক অজানা আতঙ্ক ও ভয় প্রত্যেক জাতিকে ঘিরিয়া আছে। সেই ভয়ের চোখে তাহারা চারিদিকে এক বিষম ভয়-মরীচিকার সৃষ্টি করিয়াছে। এশিয়া ও য়ুরোপের মাঝখানে এক বিশাল তেপান্তরের মাঠের দেশ পড়িয়া রহিয়াছে। আজ সমগ্র জগৎ তাহারই আশঙ্কায় দল-বদ্ধ হইয়া রাম-নাম জপিতে বসিয়াছে। এই সমস্ত জাতিদের ভয় এতদূর পাইয়া বসিয়াছে যে এখন ভূতের আর প্রয়োজন নাই। কারণ এ কথা সকলেই জানেন যে অনেক সময় ভূত না থাকিলেও ভয় থাকিয়া যায় এবং অবশেষে এই ভয় এত বড় হইয়া আসে বা থাকে যে ভূতেরও প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু মজার বিষয় হইতেছে যে এই সমস্ত ভূতে-পাওয়া জাতি এরা আবার অন্য জাতির কাছে ঠিক এমনি ভূত সাজিয়া ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে গেছে এবং যায়। "Theories and Practice of Bolshevism"-এ মনীষি বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন,······ "যদিও আমি যুদ্ধ ও বিপ্লবের বিরোধী কিন্তু ইহাও সত্য যে জার্ম্মেনী, রুষিয়া ও ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তির অপব্যবহার করিয়া আমরা আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিতেছি। এবং আজ আমাদের মধ্যে যাহারা বোলশেভিকদের ক্ষমতার অপব্যবহার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি, তাহারাই অন্যত্র সেই সব অত্যাচারের পুনরভিনয় করিয়া গৌণতঃ জগতে বোলশেভিকবাদ প্রচারের সহায়তা করিতেছি।"

H. G. Wells তাঁর জগৎবিখ্যাত ইতিহাসে বোলশেভিক-বাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই সমস্ত জাতির মিলিত বাধার ফলেই রুষিয়াতে বোলশেভিকবাদ দৃঢ়তর হইয়াছিল। জারের দুর্দ্ধর্ষ ও অমানুষ রাজত্বের সময় য়ুরোপ ও উত্তর আমেরিকা সহিষ্ণু হইয়া ছিলেন, কিন্তু এই মার্কসপন্থীদের সময় তাঁহারা যতপ্রকারে পারিয়াছেন তাঁহাদের সমস্ত শক্তি দিয়া বোলশেভিকদের বাধা দিয়াছেন। সমস্ত খবরের কাগজে বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে যে

মিথ্যা-ঘটনা-সৃষ্টি ও প্রচারের অভিযান হইয়াছিল জগতের ইতিহাসে এ রকম অঘন্য আর কিছু ঘটে নাই।"

একবার লেনিনকে কোনও লোক জিজ্ঞাসা করে যে বোলশেভিকবাদ জগতে এ রকম বাধা পাইলে তাহার সমূলে বিনষ্ট হইতে ত বেশী দেরী লাগিবে না। লেনিন তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তারের (সেই সব জাতিদের) বলবেন তারা যেন তাদের দেশের চারিদিকে চীনের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখে। যেন, তাদের তো গুপ্তবিভাগ আছে, জলপথে শত্রুকে বাধা দেবার জন্য অসংখ্য রণতরী আছে। তারা তো ইচ্ছা করলেই বোলশেভিকদের ধরে ফাঁসি দিতে পারে। কিন্তু বিপ্লব যে বাইরের প্রচারকের মুখ দিয়ে আসে না। সে থাকে দেশের ভিতরে মানুষের মনে। আজ দেশে দেশে মানুষের মনে সেই বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। রুষিয়াকে কুড়ি বৎসর সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে রাখ কিন্তু ইংলণ্ডে তা বলে শ্রমিক আন্দোলনকে থামাতে পারবে না।"

লেনিনের জীবন আজ ইতিহাস। বোলশেভিকবাদ সম্বন্ধে অনেক জাত অনেক জাতির চলে গেছে। অনেক জাতি লেনিনের প্রশংসা পর্য্যন্ত করে ফেলেছে। বোলশেভিকবাদ ভাল কি মন্দ, প্রচার হওয়া উচিত কি অনুচিত, সে আমার বিষয় নয়। এখানে আমি শুধু তার জন্মদাতার জীবন ও তার স্বরূপের ঈষৎ আলোচনা করিব।

(২)

যে লোকটী আজ সমস্ত জগতের চিন্তার ধারার একটী নূতন বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—সেই অসামান্য ধীশক্তিশালী ব্যক্তিটীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জগৎ খুব কম কথাই জানে। আজ দেশে দেশে স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে, যে সব মহাপুরুষগণ আপনার জীবন দিয়া ভবিষ্যৎ জগতের ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন, তাহাদের জীবনের গূঢ় উৎসগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইতেছে, আজিকার মানব শুধু দেখিতে পাইতেছে তাঁহাদের বিকৃতরূপ, স্বার্থপর, রাজনৈতিকের চতুর লেখনীর মিথ্যামূর্ত্তি, কিন্তু সময়ের যবনিকা অন্তরালে সেই সমস্ত মহা-জীবন ভবিষ্যৎ জগতের মূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতেছে এবং যখন এই সাময়িক দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘর্ষ লুপ্ত হইয়া যাইবে—তখন জগতে প্রেরণার ও শক্তির জন্য কালের যবনিকা বার বার উত্তোলন করিয়া এই সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনার দিকেই চাহিতে হইবে। এবং হয়ত এখনকার মিথ্যা-অভিযানের ফলে তাঁহাদের জীবনের অনেক কিছু প্রয়োজনীয় ঘটনা জগৎ ভুলিয়া যাইবে—এবং ভবিষ্যৎ জগতের ইতিহাসকার ব্যর্থ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে এই সমস্ত মিথ্যা-অভিযানের শিরে শত অভিশাপ বর্ষণ করিবে।

আজ বোলশেভিকদের সহিত সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতির স্বার্থের দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। তাই এই সমস্ত জাতি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সত্যকে বিকৃত করিয়া রাক্ষসের ভয়াবহ মূর্ত্তি দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু সেই সমস্ত জাতি ভুলিয়া যান যে এই জোড়া অসম্ভব—সত্যকে এই রকমে বিকৃত করা যায় না। তার অন্তরে এত বড় একটী সঞ্জীবনী শক্তি আছে—তার অক্ষয় অমৃত সঞ্চিত আছে—তাই সে একদিন সহস্র বিকৃতির মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দীপ্তিমান্ হইয়া ওঠে। এবং তার জ্যোতিঃ তখন আরও প্রখর হইয়া ওঠে এবং যে মিথ্যা-অন্ধকার তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল সে যে সন্দেহাতীতভাবে ঘৃণ্যতর হয়।

আজিকার জগতের অনেক কথাই হয়ত কালিকার জগৎ ভুলিয়া যাইবে। জগতের এই বিপুল জাগরণীর কথা—যা সহস্র বর্ষ পরে একবার সাধিত হয়—সমস্ত মানবতার এই বন্ধন-মোচনের জীবন-গীতি—এই মানব-চেষ্টার মহাসঙ্গীত—জগতের তন্ত্রীতে ধরা যদি না পড়ে—দুর্ভাগ্যের কথা। মানব জাগিতেছে; দেশে দেশে, বিভিন্ন পথ দিয়া, বিভিন্ন মত নিয়া, আপনার রক্ত-অস্থি দিয়া—মানব জাগিতেছে। ধ্যানযোগে দধীচি আপনার অস্থি বিশ্বের মঙ্গলের জন্য দান করিতেছে। আজিকার দেশে দেশে বিভিন্ন দিকে যে মহা-জাগরণী চলিয়াছে আমি তাহার মূলে সেই আদি যুগের একই কল্যাণ-প্রেরণা দেখিতে পাই। ধরণী বিকশিত হইতে চাহিতেছে সহস্রদলে। ধরণী চায় আকাশের স্বচ্ছনীল সাগরে তার পরিপূর্ণ বিকাশের রূপ দেখিতে। তাই দিকে দিকে এই প্রচেষ্টা।

লেনিনকে জগতের কাছে ভয়াবহ মিথ্যায় অঙ্কিত করা হইয়াছিল এবং যে কোন স্থিরধী ব্যক্তি সেই সমস্ত মিথ্যা চিত্রগুলি যদি একত্রে দেখেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে প্রত্যেক মিথ্যাটী অপর কোনও মিথ্যার প্রতিবাদ এবং আসলে এ যে সব কল্পিত চিত্র তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কোনও কাগজে সকাল বেলা দেখা গেল যে লেনিন সাইবেরিয়াতে কোনও রকমে শত্রুর গুপ্ত আঘাতের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, অন্য কোনও কাগজে প্রচার হইল লেনিন মস্কোর জেলে বন্দী হইয়া আছেন। আর একটী কাগজ প্রকাশ করিল লেনিন গুপ্তচর সাজিয়া স্পেনে চলিয়া গিয়াছেন। এখনও যন্ত্র-বিজ্ঞান এত দূর সক্ষম হয় নাই যে একজন লোককে একই দিনে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সাইবেরিয়া হইতে মস্কোর জেল হয়ে তাকে আবার স্পেনের মাটীতে পৌছে দেবে। লেনিনের শত্রুরা লেনিনকে ভেবেছিলেন সর্ব্বময়।

ঈশ্বরের যতগুলি গুণ আমরা সাধারণত দিয়া থাকি লেনিনের শত্রুগণ শত্রুতার ছলে লেনিনকে সেই সমস্ত গুণগুলি দিয়ে বিভূষিত করেছিলেন। ভবিষ্যতে যদি কোনও লোক খবরের কাগজের খবরের উপর নির্ভর করিয়া লেনিনের জীবনী লিখিতে বসেন তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, লেনিন ঈশ্বরের মতই সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তিশালী সর্ব্বজ্ঞ ও অমর।

এই সমস্ত দেশে ছবি আঁকিয়া প্রচার করা হইয়াছিল লেনিন নর-রাক্ষস, হয়ত কোনও প্রকারে আফ্রিকার গভীরতম জঙ্গল হইতে রুষিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে, হয়ত এখনও নর-রাক্ষসের বংশ সভ্যতা লুপ্ত করিতে পারে নাই। লেনিনের অস্তুর বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। একটী ছবির একদিকে দেখান হইতেছে যে রুষবাসীরা ক্ষুধায় অস্থি-জীর্ণ দেহে মৃত কুকুরের মাংস ভোজন করিতে যাইতেছে—অপর দিকে তাহাদের নেতা লেনিন Kremlin এর

বিরাট প্রাসাদে উচ্চসিংহাসনে আসীন—সম্মুখে শত প্রকারের ফলের ও খাদ্যের সম্ভার—এবং সমস্ত খাদ্যগুলির বিল হইয়াছে ২০০০ রুবেল। অথচ রুশিয়ার কোথায় কোন গ্রামে কোন্ কৃষক অনাহারে দিন কাটাইতেছে ভাবিয়া এই লোকটী অনাহারেই দিন কাটাইয়াছে। Kremlin এর বিরাট রাজপ্রাসাদে সামান্যতম প্রকোষ্ঠে কাঠাসনে বসিয়া লেনিন যে রাজ-ভোগ খাইতেন সমস্ত রুষবাসীর সাধনা ছিল যে, সে রাজ-ভোগ তাহারাও দৈনন্দিন খায়। আমরা গান্ধীকে দেখিয়াছি জনতার কল্যাণের জন্য প্রায়োপবেশন করিতে—রুশিয়া লেনিনকে দেখিয়াছে নির্যাতিত মানবতার জন্যও একজন সামান্যতম দরিদ্র শ্রমজীবির মত জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে। আত্ম-বোধন ও আত্ম-ত্যাগে গান্ধী ও লেনিন সমতুল্য সমস্ত জগতের আদর্শ।

(৩)

লেনিনের আসল নাম Vladimir Ilyich Ulianov ভ্লাডিমির ইলিইচ্ উলিয়ানফ্। তিনি Nicolai Lenin এই নাম পরে গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খৃঃ অঃ ১০ই এপ্রিল রুশিয়ার পল্লী ভোল্‌গা নদীর ধারে সিমবার্স প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

কেহ কেহ তাঁহাকে কৃষাণ বংশ উদ্ভূত বলেছেন, কেহ কেহ বলেছেন তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। এ দুই-ই সত্য।

য়ুরোপের অনেকদেশে, এবং বিশেষতঃ রুশিয়ায় যে কোনও লোক সমাজের যে কোনও স্তর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি আপনার শক্তি ও প্রতিভার বলে কোনও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন তাহা হইলে তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত পদবাচ্য করা হয়। লেনিনের পিতা যদিও কৃষাণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বীয় প্রতিভার বলে Couincllor of State হইয়াছিলেন। সুতরাং লেনিন কৃষাণবংশ উদ্ভূত ও সত্য এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় এ কথাও সত্য। লেনিনের মার নাম মেরিয়া এলেক আণ্ড্রভনা।

লেনিনের পিতা প্রথমে স্কুলে মাষ্টারী করিতেন। এবং ক্রমশঃ আপনার প্রতিভায় ও অসামান্য জ্ঞান-পিপাসার ফলে উন্নতি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে লেনিনের পরিবারের মধ্যে জ্ঞান-পিপাসার ও শিক্ষার একটা গভীর সম্বন্ধ ছিল, এবং লেনিন যে ভবিষ্যতে একজন গভীর পণ্ডিত হইতে পারিয়াছিলেন সে এই বাল্যকালে তাঁর পিতার শিক্ষার জন্য। লেনিনরা ছিলেন তিন ভাই ও দুই বোন।

লেনিনের পিতার শিল্প ও জ্ঞানচর্চ্চার বিষয়ে একটা গভীর অনুরাগ ছিল এবং সেই জন্যই তাঁহাদের আবাসগৃহটী একরকম বিশ্ব-বিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে সর্ব্বদাই সঙ্গীত, সাহিত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা পূর্ণমাত্রায় চলিত। এই আব-হাওয়ার মধ্যে লালিতপালিত হইবার দরুণ লেনিনের অন্তরে একটা সরল ও গভীর সত্য জ্ঞান-স্পৃহা জন্মে যাহা ভবিষ্যৎ জীবনে বহু দুস্তর বিপদ ও আপদের সময়ও তাঁহাকে হাসিতে সাহস দিয়াছিল। এবং এই আব-হাওয়ার মধ্যে থাকায় দরুণ সমস্ত পরিবারের মধ্যে একটা গভীর সুন্দর সম্বন্ধবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল—যাহার অভাব আজ বাঙ্গলায় সদগৃহে অনুভূত হইতেছে।

এই সমস্ত পিতৃগণ শিক্ষার গুণে সমস্ত বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠে। তাহাদের অন্তঃকরণ উদার হয় এবং এই জ্ঞানস্পৃহা ও উদারতার ফলেই লেনিন এবং লেনিনের অন্যান্য ভ্রাতারা আপনাদের জীবনের বাহিরে অন্য সমস্ত লোকেদের জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়া চাহিতে বাল্যকাল হইতেই শিখিয়াছিলেন।

কৈশোর অবস্থাতেই লেনিন এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাদের নিজেদের জীবনের স্বচ্ছন্দগতি ও সুখের পরিপূর্ণতার বাহিরে অসংখ্য লোকের নিদারুণ দারিদ্র্য জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেখানে দেখিতেন অসম্ভব রকম অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে; তাহার উপর দিয়া জারের কঠোর শাসন তাহাদিগকে নিষ্পেষিত ভাবে পিষিয়া চলিয়াছে। সমবেদনায় কিশোরদের হৃদয় ভরিয়া আসিত। ক্রমশঃ সমবেদনা অর্ন্তনিহিত ভাবে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আপনাদের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবন, এই সকল ব্যক্তির বন্ধনের দিকে চাহিয়া শৃঙ্খলের মত মায়া দেখে যায়। তাহাদের সমস্ত জ্ঞানের স্পৃহা বাড়িতে লাগিল—এই সমগ্র মানবকে জানিবার ও বুঝিবার স্পৃহাও তদনুরূপ বাড়িয়া চলিল; এবং তাহাদের মধ্য হইতে একে একে সকলে এই নির্য্যাতিত অন্ধ মানবের মনকে মুক্তি দিবার মহান উদ্দেশ্যে আত্ম-নিয়োগ করেন।

১৮৮৬ খৃঃ অঃ ২০শে মে একটী নিদারুণ ঘটনা গভীর ভাবে লেনিনের চরিত্রে ছাপ রাখিয়া যায়। ঐ দিন তাঁহার ভ্রাতা আলেকজাণ্ডারকে রাজদ্রোহ অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনা হইতে লেনিনের আসল জীবনের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। লেনিন ও তাঁহার ভ্রাতার মধ্যে একটা গভীর বন্ধন ছিল এবং যখন সেই বন্ধন ঐ প্রকারে ছিন্ন হয় লেনিন পরিপূর্ণ মাত্রায় সজাগ হইয়া উঠেন।

আলেকজাণ্ডার ছিলেন একজন অসামান্য প্রতিভাশালী যুবক—যাহাদের অনেককে স্বপ্ন-বিলাসী বলা হয়—সঙ্গীত ও সাহিত্য তাঁহার জীবনের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি ও তাঁহার ভগ্নী আনা St. Petersburg এ কলেজে একসঙ্গে পড়িতে যান। সেইখানে তিনি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হন; এবং সেই সময় তিনি কার্ল মার্কসের লেখা নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। লেনিন ও কিছুকাল পরে এই কার্ল মার্কসের লেখায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার নূতন জীবন আরম্ভ করেন। এই সময়ে রুশিয়ায় জারের অত্যাচার চরম সীমায় উঠিতে থাকে। বাহিরে যত অত্যাচার, অনাচার ঘটে, যুবক আলেকজাণ্ডার ততই বিদ্রোহীদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে তিনি বিদ্রোহীদের দলে যোগ দান করেন এবং পুলিশে খবর পাইয়া তাহাদের দলের পনেরো জনকে ধরে।

বিচারের সময় আলেকজাণ্ডার কোনও উকিলের সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন এই কাজ সব আমি করিয়াছি তাহাতে যদি দোষ হয় আমি তাহার দণ্ড গ্রহণ করিব। এই সময় লেনিনের মাতা সন্তানের মৃত্যু সংবাদে উনি হইয়া তথায় যান কিন্তু এই বীর যুবক রুশিয়ার কল্যাণের দিকে চাহিয়া মাতাকে শান্ত হইতে বলেন এবং সহাস্য মুখে তার কিশোর ভ্রাতাকে দেখাইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়।

এই ঘটনা সেই কিশোর ভ্রাতাটীর অন্তরে গভীর রকম আঘাত দেয়। লেনিন সেইদিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন অন্তরে বিশ্বাস ও শক্তি কি জিনিষ যাহার জন্য মৃত্যুও অতি-তুচ্ছ হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)



তোমরা কাটো মাথায় টেরী
মোদের রক্তে নেয়ে উঠে,
তোমরা চড় জুড়িগাড়ী
মোদের সকল লুটেপুটে,
আমরা চষি তোমার জমি
আমরা জোগাই তোমায় ভাত,
আমরাই আজ খালি পেটে
ভাবছি দিয়ে মাথায় হাত।

মা

[ম্যাক্সিম্ গর্কী]

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

——ঃ০ঃ——

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৩)

ঠিক এমনি জীবন যাপন করিয়াছিল মাইকেল ভ্লাসব। তার বিষণ্ণ মুখে সর্ব্বদাই একটা অবিশ্বাসের হাসি দেখা যাইত; ঘন ভ্রূর আড়াল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখ দুইটা সর্ব্বদাই সন্দেহের দৃষ্টিতে লোকদিগকে চাহিত।

কারখানার মধ্যে সে ছিল কিন্তু সব চেয়ে ওস্তাদ কারিকর এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সে ছিল সব চেয়ে বলিষ্ঠ পুরুষ। কিন্তু কারখানার কর্ত্তা বা ফোরম্যানের সঙ্গে সে মোটেই শিষ্ট বা ভদ্র ব্যবহার কোন দিনও করে নাই; তাই তার রোজগারও ছিল কম। প্রত্যেক ছুটির দিনে সে কাহাকে না হয় কাহাকে জখম করিত। সুতরাং গ্রামের লোকেরা ভালবাসার কথা দূরে থাক সকলে তাহাকে ভয় করিত।

তাহাকেও জখম করিবার বহুবার অবশ্য চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহার কিছুই করিতে পারে নাই। ভ্লাসব যখন টের পাইত যে তাহাকে মারিবার উদ্যোগ চলিয়াছে, সে তখনই সেখানে গম্ভীরভাবে পা দুটী শক্ত করিয়া হাতের কাছে পাথর কিংবা লোহার দাণ্ডা যাহা কিছু পাইত তাহা লইয়া গম্ভীরভাবে আক্রমণের অপেক্ষায় দাঁড়াইত। চোখের কোন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গলায় তাহার চুলে ভরিয়া গিয়াছিল। হাতদুখানি হইতে সুতোর মতন লোম ঝুলিত। সেই বীভৎস মূর্ত্তিকে সবাই ভয় করিত। লোকে কিন্তু তাহার চোখ দুটীকে সকলের চেয়ে বেশী ভয় করিত। সেই ক্ষুদ্র গহ্বর-স্পর্শী চোখ দুটীর দৃষ্টি যেন গরম লোহার শিকের মত সকলকে বিঁধিত। তাহার চোখের সামনাসামনি পড়িলে লোকে ভয় পাইত যেন কোনও হিংস্র পশুর সম্মুখে তাহারা পড়িয়াছে; একটা আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি, ভয়াতীত, এখনি যেন নির্ম্মমভাবে সব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে এমনি একটা ভয়াল ইচ্ছা তাহার চোখে জ্বলিয়া উঠিত।

সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে দাঁত কড়মড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিত,—

"দূর হও সব, আস্তাকুঁড়ের পোকা"!

সে প্রায়ই অল্প কথা বলিত এবং আস্তাকুঁড়ের পোকা এ গালাগাল সে নির্ব্বিচারে সব সময়েই সকলকে দিত। এই নামে সে কারখানার মালিকদের ডাকিত, এই নামে সে পুলিশকে এবং তাহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিত।

এক দিন রাসব ইচ্ছা করিয়া তাহার চোদ্দ বছরের ছেলে পাভেলের চুলের মুঠী ধরিয়া তাহাকে তুলিতে গিয়াছিল। কিন্তু এবার পাভেল একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলিয়া লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়া কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে।

"খবরদার, আর আমাকে ছোঁবেনা তুমি!"

"কি". বলিয়া রাসব গর্জ্জিয়া উঠিল।

"আমি পড়ে পড়ে রোজ এমনি মার খাব?" বলিয়া পাভেল তাহার কুঁচকালো চোখদুটো দীর্ঘ করিয়া হাতের হাতুড়িটা রাগে দু'একবার শূণ্যে ঘুরাইল।

রাসব তাহার দিকে চাহিয়া লোমশ হাত দুইটী পিছনে করিয়া একটু হাসিয়া বলিল;

"ঠিক্! ঠিক্!"

তারপর একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হায় রে আস্তাকুড়ের পোকা!"

এই ঘটনার খানিকক্ষণ পরেই সে তার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "আমার কাছে আর পয়সা কড়ি চাইবি না। বুঝলি? এবার থেকে তোর ছেলেই তোকে খাওয়াবে। বুঝলি?"

"আর তুমি সব মদ খেয়ে ওড়াবে?"

"তোর তাতে কি রে, আস্তাকুঁড়ের পোকা!"

সেইদিন হইতে তিন বৎসর কাল যত দিন সে বাঁচিয়াছিল এক দিন ও আর সে তার পুত্রের সঙ্গে দেখা শোনা করে নাই বা একদিনের জন্যও কোনও কথা বলে নাই।

রাসবের একটা কুকুর ছিল; সে তারই মত বৃহৎকায় আর রোমশ। প্রতিদিন প্রভাতে সে রাসবের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার দরজা পর্য্যন্ত যাইত এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানেই সে রাসবের জন্য অপেক্ষা করিত।

ছুটীর দিনে রাসব তাড়িখানায় খানায় টহল দিয়া ফিরিত। সে চলিত খুব ধীরে ধীরে, এবং পথে সে প্রত্যেকের মুখের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিত—যেন সে কাহাকে খুঁজিতেছে। কুকুরটী তাহার পিছনে পিছনে সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিত। মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া সে কুকুরটীকে লইয়া খাইতে বসিত। তাহার পাত হইতেই তাহাকে খাওয়াইত; কোনও দিন এই কুকুরটীকে সে বকে নাই, কোনও দিন মারে নাই, কোনও দিন গায়ে হাত চাপড়াইয়া আদরও করে নাই। আহার-অন্তে সে জিনিসগুলি যেন স্ত্রীর দেরী সহিতে না পারিয়াই আপনি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। সামনে হুইস্কির একটী বোতল বাহির করিয়া রাখিত এবং দেয়ালে ঠেসান দিয়া বিভৎস সুরে হাঁ করিয়া সে গান গাহিয়া যাইত। গানের বিকৃত স্বর তাহার চারিদিকে যেন যন্ত্রণার জাল বুনিত। মনে হইত স্বর ও সুর গুলি যেন তাহার বৃহৎ দাড়িতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া যাইতেছে, যেন সেই সব বিকৃত স্বরের খোঁচায় তাহার দাঁতের ফাঁক হইতে রুটীর টুকরো সব ঝরাইয়া পড়িতেছে। সে মাঝে মাঝে দাড়ি পরিষ্কার করিয়া আবার গান গাহিয়া চলিত। সে গান গাহিত—সে গানের কোনও ভাষা নাই—কোনও অর্থ নাই। তাহার গানের সুর স্মরণ করাইয়া দিত শীত-রাত্রের উদাস প্রান্তরে নিশীথে শৃগালের রোদন। যতক্ষণ বোতলে মদ থাকিত সে এমনি গান গাহিয়া চলিত। বোতল শেষ হইলে সে আপনি অবশ হইয়া বেঞ্চ হইতে গড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইত। সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িত—যতক্ষণ না প্রথম প্রত্যূষে আবার কলের বাঁশী বাজিয়া উঠিত। কুকুরটীও তাহার পাশে সারারাত শুইয়া থাকিত।

যখন সে মরিল, সে বিষম বেদনায়। মসীকাল বর্ণ হইয়া ক্রমান্বয় পাঁচদিন ধরিয়া সে বিছানায় যন্ত্রনায় এ পাশ ও পাশ করিয়াছে, চোখ যন্ত্রণায় বুজিয়া গিয়াছিল; দাঁত দিয়া কোনও রকমে তাহার স্ত্রীকে বলিত, "আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল—মেরে ফেল শিগ্‌গির"—

স্ত্রী ডাক্তার আনিল। ডাক্তার আসিয়া পুলটিসের বন্দোবস্ত করিল কিন্তু বলিল হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া অস্ত্র করিতে হইবে নতুবা বাঁচিবে না।

রাসব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দূর হও আস্তাকুড়ের পোকা, আমি একলা এখানেই মরব—যাও!"

ডাক্তার চলিয়া যাইলে স্ত্রী কাছে আসিয়া অশ্রুসিক্ত স্বরে অনুনয় করিয়া অস্ত্র করাইবার কথা বলিল। রাসব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল;

"খবরদার। আমি যদি বাঁচি সে তোরই খারাপ হবে!"

সে সকালেই মারা গেল; সকালে তখন সবে কলের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে; লোকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার কবরে তাহার মৃতদেহের সৎকারের জন্য গিয়াছিল তাহার স্ত্রী, তাহার পুত্র, তাহার কুকুরটী, একটী বুড়ো মাতাল একজন চোর আর পাড়ার কতকগুলি ভিখিরী। তাহার স্ত্রী নীরবে কাঁদিতেছিল। পাভেল একবিন্দুও অশ্রু ফেলে নাই। পথে গাঁয়ের লোক এই খবর শুনিয়া দেখা শোনা হইলেই বলাবলি করে—"যাক্ মাগীটা বাঁচলো!"

মাটীর ভিতরে কবরে দেহটীকে রাখিয়া যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে কুকুরটী সেইখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল এবং সেই টাট্‌কা মাটীর উপর বসিয়া সে কবরের গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

নাগরিক

(শেক্ষপীয়রের ভাবাবলম্বনে)

[শ্রীইন্দ্রজিৎ শর্ম্মা]

—:০:—

আমি মহানগরী কলিকাতার নাগরিক। এই মহানগরীর সর্ব্বত্রই আমার অবাধগতি। আমি নিম্নতম নাগরিকদের গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ আদালত, থিয়েটার, চায়ের দোকান, রেষ্টুরেন্ট, সংবাদপত্রের সম্পাদকের অফিসে, কেরাণীমহলে, 'রাজ-নৈতিক' দলের আড্ডায় যেখানেই যাই, আমি একই কথা বলি— কী একঘেয়ে! কী অসহ্য অশান্তি! সকলেই সমস্বরে আমার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলে "সত্যই ভীষণ একঘেয়ে জীবন, কী অশান্তি"।

দিনরাত এইভাবেই চলিয়াছে। রাত্রে যখন বাড়ী ফিরিয়া আমি ক্লান্ত দেহখানি বিশ্রামের আশায় শয্যায় লুটাইয়া দি— দুই চোখে না জানি কত বিনিদ্র রজনী চলিয়া যায়। মনে ঐ একই কথা জাগে—কেন এ অশান্তি! কেন এই একঘেয়ে জীবন! বেদনাভরে বুকখানি যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন জগদ্দল পাথর বুকে চাপ আছে বলিয়া মনে হয়। সপ্তাহ খানেক আগে— একটি বাড়ীতে যাই সেখানে একজন ভদ্রলোককে আমার এই অশান্তির কথা বলি সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটি তা শুনে বলেন "এক কাজ করুন টেলীফোনের তারটি নিয়ে প্রথম যে Lamp post পাবেন তাতে ঝুলে পড়ুন। এ ছাড়া আপনার আর কিছু ব্যবস্থা হতে পারেনা"।

রাত্রে যখন আমার এই একঘেয়ে জীবনের বেদনাভরে বিভোর অসহায় ভাবে বিছানায় এপাশ ওপাশ করি তখন মাঝে মাঝে মনে হয় আমার বেদনার কারণ বোধ হয় জানিয়াছি।

প্রথমতঃ, আমি কিছু জানিনা। আমি এককালে কিছু হয়ত শিখিয়াছিলাম কিম্বা আমার বিদ্যা কোন কাজে লাগাতে পারি নাই, এখন আমার সব সময়ই মনে হয় যেন আমি সর্ব্বদাই কলম্বাস যেন কোন অজানা আমেরিকার সন্ধানে ঘুরিতেছি, কিন্তু কূল আর নাই :

দ্বিতীয়তঃ আমি এই কলিকাতায় আছি কিন্তু কলিকাতা নাম কি করিয়া হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। মজলিসে, বন্ধু বান্ধবদের সহিত বিশ্রম্ভালাপে সহরের আয় ব্যয় সম্বন্ধে লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু সহরের কটা ড্রেন, কটা রাস্তা আছে কতই বা এর লোক সংখ্যা, জন্মেই বা কত, মরছেই বা কত ; এ সহরের নাগরিকেরা মরে আর কত, ব্যবসা বাণিজ্যের হাল চাল কি—এ সম্বন্ধে আমি কোন খবর রাখিনা।

আমি দশজনের কাছে খুব বড় গলায় ইউরোপের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিয়া চীন জাপানের সাথে বাণিজ্য করার কথা বলি, কিন্তু চীন জাপান বা প্রাচ্য দেশগুলির বাণিজ্য সম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলিও জানিনা।

আমি সকাল বিকাল চায়ের দোকানে আড্ডা দি, সহরের থিয়েটারগুলিতে নূতন বই খুলিলেই একখানি দেখাও আমি বাদ দিনা। কিন্তু "চিত্রকুমার সভা" দেখিতে গিয়া ড্রপসিন উঠার পরই মনে পড়ে, তাইতো রবীন্দ্রনাথের কোন বইতো আমি পড়িনেই কিম্বা পড়িলেও ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি নিজেও লেখক—মাঝে মাঝে থিয়েটারের জন্য বইও লিখি যখন দেখি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ আমার বই চালাচ্ছে না তখনি মনে পড়ে তাইতো ডি, এল রায় গিরিশ বাবু না হয় অমৃত বাবু এই রকম বই অনেক আগেই লিখে গেছেন।

আমার সামনে যখন লোকে সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি বা থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করে আমি তার কিছুই বুঝিনা— কিন্তু যখন ঐ সব বিষয়ে কেহ আমার মত চায় তখন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া "এটাভাল" "ওটা মন্দ" "এরূপ হওয়া উচিত নহে" এই মত স্বচ্ছন্দে প্রচার করি।

আমি ওকালতী ব্যবসা করি,…নিয়মিতভাবে আমি আদালতে ধর্ণা দি…মামলায় হারিয়া গেলে হাকিমের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষ দি, আর যদি কচিৎ কদাচিৎ মামলা জিতি তবে স্যার রাসবিহারী অপেক্ষাও নিজকে অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া জাহির করি।

সত্য কথা বলিতে গেলে আমি কিছুই জানিনা কিন্তু চলতি ফ্যাসানের অনুকরণে দশ আনা ছ আনা চুল ছাঁটি রোজ কামাই, ভাল ভাল পোষাকে দেহ ঢাকি ; মেঝের গালিচা পাতিয়া সোফা টেবিলে ঘর সাজাই অথচ আমার সিঁড়ি দিয়ে উঠিতে পানের পিক, শোবার ঘরে ঝুল কালি আর চাকর ব্যাটার পরণে হাঁটুর উপর ওঠা ছেঁড়া ধুতি।

যখন নিজের একঘেয়েমী অসহ্য হইয়া উঠে মহানগরীর কর্ম্ম কোলাহল নিঝুম মধ্যাহ্নে নিজের ঘরে আরাম কেদারায় বসিয়া নিজের অবস্থাআলোচনা করিতে গিয়া উঁকি মারিয়া পাশের ছাদে এলায়িতকুন্তলা রমণীর দিকে কটাক্ষ হানি বা কোন বাটির জানালার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে সুবৃহৎ পালক্ষ্যানের রাস্তা বা ভিড়-খানার হল্লা চীৎকার, নিদাঘ নিশীথে রাস্তার ফুটপাথের উপর নিদ্রিত অর্দ্ধ উলঙ্গ ভিক্ষুকের দল কিছুতেই আমার কলা জ্ঞানের হ্রাস করিতে পারে না।

মহানগরীতে যখন Art Exhibition হয় আমি নিয়মিতভাবে তথায় হাজিরা দি—কি দেশী কি বিদেশী সব চিত্রের উপরই সমালোচনা করি—কারও নাক লম্বা আঙ্গুল সরু বলি—কারও চ্যাবড়া মুখের প্রশংসা করি আর নগ্ন নারী-মূর্ত্তির চিত্র দেখিয়া উল্লাসে আত্মহারা হইয়া যাই।

সময় সময় আমি মহানগরীর জনপ্রবাহ ও জীবন-যাত্রার বৈচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করি।

আসলে আমি কিছুই দেখিনা যত খোলার ঘর বস্তি ঘুরিয়া বেড়াই তাহাদের দুঃখের জীবনের করুণ দৃশ্য আমার চোখে পড়ে না—চোখে পড়ে কোথায় কোন যুবতী ধোপানী তাহার বৃদ্ধ পতির সহিত বচসা করিতেছে বা বড় জোর কোন তরুণী মেথরাণীর ঝাঁটা হাতে লীলায়িত যৌবনের পতিভঙ্গি।

আমার এই অসহ্য একঘেয়ে জীবনের কারণ খুঁজিতে গেলে মনে হয় আমি নিজেকে সকলের অপেক্ষা চতুর ও খুব বড় ভাবি। আমি কাহারও ভাল দেখিতে পারিনা—যদি শুনি কেহ কোন কাজে সফলকাম হইয়াছে বা যশোলাভ করিয়াছে—অমি আমার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার সুতীক্ষ্ণ কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হয়।

আমি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া তাহার কুৎসা রটনা করিয়া তবে ছাড়ি। যদি দেখি কোন গ্রন্থকারের কোন বই বিক্রী হইতেছে—আমি বলিয়া বেড়াই যে সে খবরের কাগজের সম্পাদকদের নিয়মিত ভোজ দেয়। কোন থিয়েটারে কোন বই চলিলে বলিয়া বেড়াই ঐ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ নিয়মিত-ভাবে কাগজের সম্পাদক ও সমালোচকদের পাস দেয়।

আর যখন কুৎসার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইনা তখন বলি ঐ লোকটা দুশ্চরিত্র না হয় তো গুপ্তচর।

সময় সময় আমার লেখা প্রকাশ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগি। কোন সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতে দেরী করিলে তার বাড়ি দুবেলা ধর্ণা দিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলি ও মুখে সভতা সম্বন্ধে লম্বাচৌড়া বক্তৃতা দি।

আমি কখনও কখনও নেতা সাজিয়া দেশ বিদেশে বেড়াই। খুব হাততালি ও ভোজ পাই অথচ দেশের প্রকৃত অভাব অভিযোগে মীমাংসার কোন ধার ধারি না। যখনই লোকের অন্নাভাব বা দুঃখ কষ্টের কথা উঠে অমি অম্লান চিত্তে বলি বিদেশী গভর্ণমেন্ট থাকিতে এ সবের কোন সমাধান হইবার নয়।

এক কথায় যাহাতে আমার স্বার্থ নাই এমন কাজ আমি কখনও করি না। যত পাবলিক কাজে আমি লিপ্ত এই আশায় যাহাতে Public funds এ হাত বসাইতে পারি। তাহা না পারিলে অন্যকে চোর বলি।

এইভাবে আমার দিন যায়। ঈর্ষ্যার জ্বালা বাড়িয়াই চলে ঈর্ষার আগুনে ছারখার হইয়া পুড়িয়া মরি—আমার অক্ষমতা আমার অশিষ্টতা আমার নজরে পড়ে না—নিজেকে সবজান্তা ও বড় বলিয়া বলিয়া ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে—আর কেবলি ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে প্রশ্ন করি তাইতো—কী অসহ্য যন্ত্রণা—কী ভীষণ একঘেয়ে জীবন!

আমি ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা বা বসন্তের মতই ভীষণ সংক্রামক—আমি চেষ্টা করিলে সব কিছুই করিতেপারিতাম কিন্তু ভেতরের এই মানুষটি অহর্নিশি ঈর্ষ্যার পুড়িয়া আমাকে কিছু করিতে দেয় না।

এই ঈর্ষ্যার আগুনে দিনরাত পোড়ার চাইতে সত্য সত্যই নিমতলার চিতার আগুন বোধ হয় অনেকটা আমার জ্বালা জুড়াইতে পারে। আমি কেবল সেই আশাতেই দিন গুণছি।

যখন রাত্রে ঘুম হয় না—সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির কথাই কানে বাজে "টেলিফোনের তার নিয়ে রাস্তার প্রথম ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলে পড়ুন।"

খবরদারি

—০—

আগু-পিছু

ভারতীয় সাম্যবাদী দলের কাণপুরে যে কনফারেন্স হয়ে ছিল, তাতে কংগ্রেস বা খিলাফতের কর্ত্তারা কেউ উপস্থিত ছিলেন না—কেবল তরুণের দল ছিলেন। কংগ্রেসের জোর না থাকলে এই কনফারেন্সে যোগ দেওয়া বোধ হয় একটু শক্ত। কেননা, এখানে "মিয়াঁ" ছিল না—ছিল কৌৎকা।

অহিংস গুণ্ডামী

আজমীরের নির্য্যাতিত দেশকর্ম্মী শ্রীযুত অর্জ্জুনলাল শেঠী যথানিয়ম প্রায় চারিশত প্রতিনিধি কংগ্রেসে এনেছিলেন—কিন্তু তাঁদের নির্বাচন কোনও নিয়মের দোষে নাকচ হ'য়ে গেছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ দিয়ে সকলকে প্রবেশের অনুমতি দেন। কিন্তু প্রবেশকালে অহিংস অসহযোগের লাঠিয়ালদের আঘাতে শ্রীযুত শেঠি, মৌলানা হসরত মোহানি, এমন কি বেগম মোহানি পর্য্যন্ত জখম হয়েছেন, অনেক প্রতিনিধিও লাঠি খেয়েছেন। প্রত্যাগমবাদী দলের লোক ব'লেই নাকি এঁদের এই শোচনীয় দশা। কিন্তু আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

মহাবীরের সম্বর্দ্ধনা

কংগ্রেসের সময় শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার এম, এল, সি, প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গীয় কানপুর মেমোরিয়াল উদ্যানে সাহেবের বিনা অনুমতিতে ঢুকে তালাচাবি বন্ধ হয়েছিলেন। ঐ উদ্যানে ভারতীয়দিগকে বিনা পাশে যেতে দেওয়া হয় না। তাই নলিনীবাবু প্রভৃতি ঢুকে গিয়ে চৌকিদারের খাতায় লিখে দিয়ে এসেছেন তাঁরা ইচ্ছে করেই ভারতীয়ের অসম্মান দূর করার জন্যে বাগানে ঢুকেছেন। আমরা বীরবৃন্দকে পৈতৃক প্রাণ নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসার জন্যে অভিনন্দন করি।

মহাত্মার ভোট

সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের বিরুদ্ধে মাহাত্মা সর্ব্বাগ্রে হাসতে হাসতে ভোট দিয়েছেন—ব্যাপারটা হাসিরই বটে!

অ-রাম বা অ-রাবণ হবে খরা আজ।

শ্রীযুত জে-এম-সেন গুপ্ত কিন্তু ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আইন অমান্য ঘোষণা করবেন ব'লে ভয় দেখিয়েছেন—ততদিনের মধ্যে আমাদের একটা "হিল্লে" হ'য়ে যাবেই।

পাদপূরণঃ—

শ্রীযুত জয়াকর, কেলকর, মুন্জে প্রভৃতি স্বরাজদলের ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি পদে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু ভয় কি? রাও বাহাদুর চিৎলে, শ্রীযুত পৃথ্বীশরায়, হাজি ইসমাইল চৌধুরী স্বরাজ-দলে এসেছেন। আমরা সানন্দে এঁদের সম্বর্দ্ধনা করছি।—

"নাকের বদলে নরুণ পেলাম তাক্ ডুমাডুম্।"

প্রজাস্বত্ব আইন

প্রজার কথা

(২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

[শ্রীযুক্ত ভবানী সেনের "বাঙলার কৃষকের কথা" হইতে]

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কোর্ট অব ডিরেক্টর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত দিলেন। আদেশ পেয়ে কর্ণওয়ালিস্ ২২শে মার্চ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী ব'লে ঘোষণা করলেন। ঘোষণার মর্ম এই যে, যে সকল জমিদার, তালুকদার ও অন্যবিধ ভূম্যধিকারীর সহিত জমা বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে, ঐ বন্দোবস্ত মেয়াদ (১০ বৎসর) পূর্ণ হ'লেও তাঁদের সেই জমার জোর পরিবর্ত্তন করা হবে না। তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীরা ঐ জমা অনুসারেই চিরকাল তাঁদের জমিদারি ভোগ করবেন।

Sir Henry Summer Maine বলেন—"A province, like Bengal Proper, where the village system had fallen to pieces of itself, was the proper field for the creation of a peasant proprietary; but Lord Cornwallis turned it into a country of great estates, and was compelled to take his landlords from the tax-gatherers of his worthless predecessors. The political valuelessness of the proprietary thus created, its failure to obtain any wholesome influence over the peasantry, and its oppression of all inferior holders led not only to distrust of the economical principles implied in its establishment, but to a sort of reluctance to believe in the existence of any naturally privileged class in the provinces subsequently acquired." (Village Communities in the East and West, p 154.)

নবাবী আমলের ঠিকাদার রাজস্ব আদায় ক'রে হিসাব সহ ট্রেজারিতে দাখিল করতেন; আর পারিশ্রমিক স্বরূপ শতকরা দশ টাকা অতিরিক্ত কমিশন পেতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এরা এখন পেয়ে থাকেন শতকরা ৩০০৲ টাকা।

প্রজার দেয় খাজনা নির্দ্ধারিত ক'রে দেবার জন্য ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ কিছুই করা হয়নি। হেষ্টিংস ও শোরের মতে আগে প্রজার অধিকার ও প্রজার দেয় খাজনা অনুসন্ধিত ও নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়ে তারপর জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্তের জমা দাবী নির্দ্দিষ্ট করা ও রাজস্ব বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা উচিত ছিল। কোর্ট অব-ডিরেক্টর কিন্তু এ সকল কথা অগ্রাহ্য ক'রে কর্ণওয়ালিসের মত গ্রহণ করলেন। আর জমির উপর প্রজাদের অধিকার চিরকালের জন্য অবধারিত ক'রে না দিয়ে ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতামাত্র রেখে নিশ্চিন্ত হলেন, যদি প্রজার হিতের জন্য এরূপ আবশ্যক হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই সকল ত্রুটি থেকে যাওয়াতে জমিদার ও প্রজার মধ্যে সীমানা, স্বত্ব, অধিকার, খাজনা প্রভৃতি নিয়ে যে বিবাদের স্রোত প্রবাহিত হ'ল, তা'তে দেশ ডুবে গেল। বাংলার বহু বনিয়াদি জমিদার যুগ-যুগান্তরব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব ও অরাজকতা সহ্য ক'রে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, কিন্তু এই আইনের অত্যাচারে অনেকে উৎসন্ন হ'য়ে গেল। জমিদারকে যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর জমিদারির খাজনা দিতে হ'ত, প্রজাকে তার জমির খাজনা তেমনি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে বাধ্য করবার কোনও আইন ছিল না। জমিদারের নিকট থেকে বাকী খাজনা আদায়ের জন্য সাবেক-দস্তুর বেত-চাবুক ব্যবহার করা ছাড়া জমিদারকে পাঠশালার ছেলেদের মত পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, গ্রীষ্মকালে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা, শীতকালে গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে ঠাণ্ডা জল দেওয়া হত।

এই শাসনগুলি কোম্পানি দেওয়ানি নেবার কিছু পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে জমিদারকে ধ'রে এনে কয়েদ করা এবং সম্পত্তি ক্রোক করা আরম্ভ করলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩ রেগুলেশন দ্বারা জমিদারকে কয়েদ করবার প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। খাজনা বাকী পড়লে জমিদারি নিলামে বিক্রীর ব্যবস্থা হ'ল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২২ বৎসর মাত্র পরে (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) বাংলার ভূ-সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধেক বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল। এই বাকী খাজনার জন্য দায়ী জমিদারদের মধ্যে নদীয়া, রাজসাহী, বিষ্ণুপুর ও কাশীজোড়ার রাজের নাম উল্লেখযোগ্য। সুচতুর বর্দ্ধমানাধিপতি জমিদারি পত্তনিদারের সহিত বন্দোবস্ত করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল জমিদার জমিদারির ও জমিদারিভুক্ত কৃষকের উন্নতি করবেন। বর্দ্ধমানের রাজা তা না ক'রে নিজের সম্পূর্ণ লাভ রেখে অন্যকে জমিদারির লাভের অংশ যথাসম্ভব দিয়ে দিলেন। কাজেই কোম্পানি তাঁর এই আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'লেন। কিন্তু কোম্পানির অসন্তোষ সত্ত্বেও দেখা গেল নিলাম বিক্রী আইনের কবল থেকে জমিদারি রক্ষা করবার এই একমাত্র উপায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ২৭ বৎসর পরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এইরূপ জমিদারি হস্তান্তর করাকে আইনসঙ্গত ক'রে নেওয়া হ'ল। এর ফলে অনেক বড় জমিদার প্রজার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হ'য়ে কেবল পত্তনিদারের বৃত্তিভোগী হয়ে পড়লেন।

ওদিকে পত্তনিদারেরা আবার দর-পত্তনিদার দর-পত্তনিদারেরা আবার সে-পত্তনিদার নিযুক্ত করলেন। সকলেই অবশ্য কিছু লাভ করতে লাগলেন। জমিদার ও কৃষকের মধ্যে কখন কখন বার জন পত্তনিদার থাকত। নিজের লাভ ছাড়া প্রজার অবস্থায় এদের কোনও স্বার্থ নেই। তাঁদের শোষণে গ্রাম শুষ্ক ও নীরস হয়েছে এবং প্রজার দারিদ্র্য এত বেড়েছে। কেবল মাত্র প্রাণধারণের জন্য যা আবশ্যক তাও থাকে না। তথাপি প্রজার রক্তশোষক এই ব্যবস্থা কোম্পানি বাহাদুর বৈধ করে দিলেন।

খড়কুটো

—ঃ০ঃ—

প্রথম সংখ্যার ৫ হাজারের মত "লাঙল" দ্বিতীয় সপ্তাহে বেরুতে না বেরুতে সমস্ত বিক্রী হ'য়ে যাওয়ায়, গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয্যে আমরা দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করি। কিন্তু তাতেও না কুলোনোতে মফঃস্বলের অনেক জায়গায় কাগজ পাঠান হয়নি। আশা করি বর্ত্তমান সংখ্যা হ'তে নিয়মিত ভাবে সর্ব্বত্র কাগজ পাঠাতে পারবো।

* * *

গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে রংপুর জেলার গাইবাঁধা গ্রামে প্রজাবর্গের এক সভা হয়ে গেছে। প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং ঐ আইনের জন্য গঠিত সিলেক্ট কমিটিতে জমিদার-প্রাধান্য-হওয়া বিষয়ে গবর্ণমেন্ট ও স্বরাজ্যদল দায়ী ব'লে প্রতিবাদ করা হয়।

* * *

গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ময়মনসিং জেলার নগরপুর থানার এলাকায় মাইনজানি গ্রামে কৃষকগণের এক বিরাট সভা হ'য়ে গেছে। সিরাজগঞ্জের মৌলবী ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রজাস্বত্ব আইনের সিলেক্ট কমিটি গঠনে জমিদার সংখ্যা অধিক হওয়ায় ঐ সভা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কৃষকগণ যাতে বিনা নজরে গাছকাটা, দালান ইমারত করা, পুকুর ইঁদারা কাটা ইত্যাদি অধিকার পায় তার দাবী করেন। পাত্তনাদারের ডিক্রীতে যাতে জমি ক্রোক না পড়ে বা বিক্রী না হয়, সুদের হার শতকরা ৯ টাকার অধিক যাতে না হয়, শতকরা ২৲ টাকা সেলামিতে যাতে হস্তান্তরের অধিকার হয় এবং বর্গাজমি সম্বন্ধে স্থানীয় প্রথানুযায়ী নিয়ম প্রচলিত থাকে, সে সম্বন্ধে মন্তব্য পাশ হয়।

* * *

আগামী ১৭।১৮ই জানুয়ারী ময়মনসিংহ সহরে জিলা কৃষক ও শ্রমিক কনফারেন্স বসবে। এজন্য হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণকে নিয়ে অভ্যর্থনা গঠিত হয়েছে। সহস্র সহস্র প্রতিনিধি সভায় যোগদান করবেন ব'লে জানিয়েছেন। কাজি নজরুল ইসলাম সাহেব ও শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কাজি সাহেব সুস্থ থাকলে হেমন্ত বাবুর সঙ্গে নিশ্চয়ই উপস্থিত হবেন।

* * *

প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন নদীয়ায় না হ'য়ে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে হওয়ার আয়োজন হচ্ছে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকেই অধিবেশন হবে। ১০ই ফেব্রুয়ারী কাউন্সিল বসবে—আশা করি তার আগেই নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনী প্রজার দাবী সকলকে জানিয়ে দেবেন।

* * *

গত ২০শে ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৪টার সময় ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরের অন্তর্গত মেষ্টা বাজার সংলগ্ন মাঠে প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার জন্য একটি রায়ত সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল। যাতে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব আইনরূপে পাশ হয়, তার জন্য সাধারণের পক্ষ থেকে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়।

* * *

(১) প্রজার দখলী স্বত্ববিশিষ্ট জোতগুলি হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজাকে দেওয়া হোক, আর জমিদারের পত্তনী নজরের প্রথা তুলে' দেওয়া হোক।

(২) দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজাকে দেওয়া হোক।

(৩) নিজের দখলী জমীতে পুকুর ও দালান দেওয়ার অধিকার প্রজাকে দেওয়া হোক।

(৪) প্রজার দখলী জোতের উপর জমিদারের জমাবৃদ্ধির অধিকার রহিত করা হোক।

(৫) জমিদারের নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত অতিরিক্ত খরচ আদায়ের প্রথা রহিত করা হোক।

* * *

২১শে ডিসেম্বর বগুড়ার এডোয়ার্ড পার্কে বগুড়া-জেলা-প্রজা-সম্মিলনীর একটি অধিবেশন হয়েছিল। সেখানে ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইনের সিলেক্ট কমিটিকে প্রজাদের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য কতকগুলো প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'য়েছে।

কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জ্জন্স অব কলিকাতা

১২৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আনন্দচক, কলিকাতা।

ইহাই একমাত্র হোমিওপ্যাথিক কলেজ যাহাতে মফঃস্বলের ছাত্রগণকে পত্রযোগে হোমিওপ্যাথি, ইউনিপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি ও বায়োকেমিক শিক্ষা দিয়া পরীক্ষা গ্রহণান্তর অতিসামান্য খরচে এইচ, এল, এম্, এস ; এইচ, এম বি ; এইচ, এম, ডি, ডিপ্লোমা, এম্, সি, পি, এস ; এম্, সি, পি, এস ; ডি, ডি, এস এবং ডি, ডি, ও, এস সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়।

উপাধি পরীক্ষা

উপরোক্ত কলেজ হইতে বর্ত্তমান ফাল্গুন মাসের ২৭শে তারিখে বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। স্থানীয় ও মফঃস্বলের পরীক্ষার্থীকে অন্ততঃ পরীক্ষার ৭ দিন পূর্ব্বে কলেজের ছাপান আবেদন পত্রে দরখাস্ত করিতে হইবে। এক আনার টিকিটসহ সেক্রেটারীকে পত্র লিখিলে নিয়মাবলী ও আবেদন পত্র পাঠান হইবে।

ম্যাডিকাল ডাইরেক্টরী

উক্ত ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার জন্য সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কবিরাজ এবং হেকিম প্রভৃতি চিকিৎসকগণের নাম, উপাধি ও ঠিকানা জানা আবশ্যক। চিকিৎসকগণ দয়া করিয়া কলেজের সেক্রেটারীর নিকট লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

কর্ম্মখালি

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র মাসিক ৫০৲ বেতন ও ২৫৲ ট্রাভেলিং এলাউন্সে কার্য্যদক্ষ ক্যানভাসিং এজেণ্ট আবশ্যক। ভাধীকুশলতার প্রমাণ পাইলে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হইবে। এক আনার টিকিট সহ আবেদন করুন। ঘোষ দত্ত এণ্ড সন্স, ১২৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আনন্দচক, কলিকাতা। কর্ম্মখালী—প্রতি গ্রামে২ জন করিয়া লিখাপড়া জানা ১০০ লোকের নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে ১০০ ইনভেলাপ এবং ১০০০ পাঠালে নগদ ২৲ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ড্রাম /৫ ও /১০ দেবদত্ত হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী, ১২৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আনন্দচক, কলিকাতা।

বেনবিশ এণ্ড কোং

৯৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট।

আমাদের এখানে ফুটবল, ব্যাটবল, হকি এবং যাবতীয় আউটডোর এবং ইন্‌ডোর খেলার জিনিষ ও ডাম্বেল, প্রভৃতি যাবতীয় ব্যায়ামের সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৫ নং বল— ৫৲ টাকা হইতে ১৭৷৹ টাকা
৪ নং ,, — ৪৷৹ টাকা হইতে ১১৷৹ টাকা
৩ নং ,, — ৩৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা
২ নং ,, — ২৲ টাকা হইতে ২৸৹ টাকা
১ নং ,, — ১৷৹ টাকা হইতে ২৲ টাকা

ফুটবল ও ব্যাডমিণ্টন



সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট ফুটবল সরবরাহ আমাদের বিশেষত্ব। মাদ্রাসা, উচ্চ প্রাইমারী, নিম্ন প্রাইমারী প্রভৃতি স্কুলের এবং অন্যান্য যাবতীয় অর্ডার বিশেষ সতর্কতার সহিত ভিঃ পিঃ করিয়া থাকি। প্রেরিত জিনিষ অপছন্দ হইলে ফেরৎ লইব। ফুটবল (ব্লাডার সহ) খোকন ১নং ১৸৹, ২নং ২৷৹ ও ২৸৹, ৩নং ৩৷৹ ও ৩৸৹, ৪নং ৪৷৹ ; প্র্যাকটিস্ ৫নং ৫৷৹ ; জুনিয়ার ম্যাচ ৫নং ৬৷৹ ; বাঙ্গালী পল্টন ৪নং ৫৷৹ ; ৫নং ৭৷৹ ; গোবর ৪নং ৩৲, ৫নং ৯৲ ; শিল্ডউইনার ৪নং ৮৲, ৫নং ১০৷৹। ব্লাডার—১নং ৸৵৹, ২নং ১৶৹, ৩নং ১৷৵৹, ৪নং ১৷৹ ৫নং ১৸৹। ইনফ্লাটার ১৷৹, ১৷৹, ২৲, ২৷৹, ও ৩৷৹ ; ব্যাডমিণ্টন সেট (৪টা ব্যাট, ১টা জাল, ৩টি সাটল কক্, রুল বুকসহ) ৬৸৹, ৮৷৹, ১০৷৹, ও তদুর্দ্ধ।

মোহনতোষ ব্রাদার্স
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, আলবার্ট বিল্ডিংস, কলিকাতা।

বাহির হইল! বাহির হইল!

নজরুল ইসলামের

—ছায়ানট—

মূল্য—পাঁচসিকা মাত্র

কবির অন্যান্য পুস্তক : সাম্যবাদী—৶৹ ; রাজবন্দীর জবানবন্দী (যন্ত্রস্থ)

বিবেকানন্দের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের
৺ কাশীধামে বিবেকানন্দ
মূল্য—বার আনা

হেমন্তকুমার সরকারের
বন্দীর ডায়েরী—১৲ ; বিপ্লবের পঞ্চঋষি—৷৹ ; ছায়াবাজী—৷৹ ; উল্টো-কথা—৷৹ ; পাঁচকথা—৷৵৹ ; যুগধর্ম—৵৹ ;

স্বামী বিবেকানন্দের
—স্বদেশ-মন্ত্র—
মূল্য চারি আনা ;

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

বাৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	৷৵০
প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম	৬৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১১৷০
মলাট—১ম পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷০
অর্দ্ধ কলম	৭৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৷০
" ২য় পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৲
" প্রতি কলম	৮৷০
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৬৲
" ৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য	
" ৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১।০
প্রতি কলম	১১৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	২১৷০

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵০।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পঁচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সী দেওয়া হইবে না; ও প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ হিসাব সহ বিক্রয়লব্ধ জমার টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় ও মনিঅর্ডার কমিশন লাঙল অফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যায় শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেণ্টগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

৬। নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

পত্রিকার মূল্য—

বাৎসরিক	৩৲ টাকা,	ভিঃ পিঃ	৩৷০
ষাণ্মাসিক	১৷৵০	"	১৸৵০
প্রতিসংখ্যা	এক আনা		

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র

৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড্ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্রধান পরিচালক
নজরুল ইসলাম

সম্পাদক—
মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নগদ মূল্য এক আনা
বার্ষিক ৩৲ টাকা



লাঙলে

কি কি থাকবে?

১। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতা

২। ম্যাক্সিম গর্কীর জগৎবিখ্যাত রোমাঞ্চকর উপন্যাস "মা"র ধারাবাহিক অনুবাদ

৩। যুগ প্রবর্ত্তক মনীষিগণের জীবনী

৪। প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচনা

৫। গণ-আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা ও সংকলন।

৬। প্রতি সংখ্যায় একখানি করিয়া ছবি।

শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

প্রথম খণ্ড { বৃহস্পতিবার, ৩০শে পৌষ, ১৩৩২, ইং ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৬ { চতুর্থ সংখ্যা

আগামী বারে

জনৈক কারারুদ্ধ আদর্শ দেশ ভক্তের পুণ্য-চরিত্র চিত্রনে লাঙলের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে।

কাফি সাহেবের বিশেষ অসুস্থতার জন্য এলবার্টহলে "ভ্যারাইটি এনটারটেন্মেন্ট" আপাতত স্থগিত রাখিতে হইল। যাঁহারা টিকিট কিনিয়াছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বিক্রেতাগণের নিকট জমা দিলেই টাকা ফেরৎ পাইবেন।

চান, তাঁদের লোভ অপরাজেয়। নিজেদের দেশের ধন-সম্পত্তিতে তাঁদের পেট ভরছে না। তাই, তাঁরা ভারতবর্ষে ও অন্যান্য উপনিবেশে দোকান খুলে বসেছেন। ঠিক্ এ অবস্থা ফ্রান্সের, এ অবস্থা আমেরিকার। ফ্রান্স, আর আমেরিকাকে যে গণতন্ত্র বলা হয় সেটা শুধু মনকে চোখ-ঠারা মাত্র। আসলে এ দু'টো সর্বদেশের ধনিক্-তন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাক্, ইংল্যাণ্ডের ধনিক্ সমাজের কথা বলছিলুম। আমরা অবুঝ আর নাবালগ বলে আমাদের উপকারের জন্যে তাঁরা আমাদের অভিভাবক হতে আসেন নি। আমাদের এ দেশ তাঁদের কারবারের বাজার। সকল মহাজনেরই বণিজ-বিক্রীর সুবিধার জন্য স্থানীয় দালালের প্রয়োজন হয়ে থাকে, ইংল্যাণ্ডের ধনিক্ সমাজেরও বহু ভারতীয় দালাল রয়েছেন। তাঁরা নানারূপে নানা আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। জমিন কোথায় রয়েছে তা জানা না থাকলেও তাঁরা জমিনের মালিক, কোনো প্রকারে পণ্যদ্রব্য স্পর্শ না করেও তাঁরা মহাজন অর্থাৎ লাভের মালিক, পণ্যদ্রব্য তৈয়ার না করেও তাঁরা পণ্যদ্রব্যের মালিক, আর কল-কারখানাতে তাঁরা যতই কম পরিশ্রম করেন ততই বেশী মাইনের মালিক। কাজেই ধনিক্-তন্ত্রের দ্বারা সাধারণভাবে ভারতের যতই অহিত হোক না কেন, তাঁদের নিজেদের হিত যথেষ্ট হচ্ছে, আর এই আত্ম-হিতের জন্যে তাঁরা ধনিক্ তন্ত্রেরও হিতাকাঙ্ক্ষী।

এই যে রীতি-নীতি চলেছে এর জন্যে যাঁরা সকল দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তাঁরা ভারতের জনসাধারণ—ভারতের কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। কৃষকগণের দ্বারা সর্ব্ববিধ খাদ্যোপাদান উৎপাদিত হচ্ছে বটে, কিন্তু সে খাদ্যোপাদান তাঁদের ভোগে যা এসে থাকে, তা না আসারই মত। শ্রমিকদিগের অবস্থাও তদ্রূপ। কারখানাতে তাঁরা খেটে মারা যান, পেট ভরে কিন্তু যথোপযোগী খাদ্য পান না। ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে ভারতের লোক দিনকে দিন রুগ্ন, পঙ্গু ও স্বল্পায়ু হয়ে পড়ছেন, ভারত ধ্বংসের পথে চলেছে।

আমরা দেখেছি কুকুর বিড়ালকে তাড়া করে নিয়ে যায়, বিড়াল ত প্রথমে প্রাণপণে ছুটে ছুটে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে যখন উঠে না, তখন ফিরে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ করে কুকুরকে। এও দেখেছি সেই আক্রমণের চোট কুকুর প্রায় সহ্য করতে পারে না। কিন্তু, এদেশের কৃষক, এদেশের শ্রমিক দিনের দিন স্বার্থান্বেষী লোকেদের দ্বারা বিলুণ্ঠিত হচ্ছেন, অথচ একটি প্রতিবাদের শব্দ তাঁদের মুখ থেকে বেরুচ্ছে না। এঁদের জীবনে যোগের সাথে কোথাও দেখা শোনা নেই, কেবল বিয়োগ আর বিয়োগ, বিয়োগের একটানা রেখাটি যেন কোথায় কোন অসীমের পানে বেড়েই চলেছে। ভারতের এ দুরবস্থার সাথে জগতের আর কোন দেশের অবস্থার তুলনা হয় না। অন্য-অন্য দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকেরাও যা পাওয়া উচিত তা সবটা পান না, কিন্তু না পাওয়ার জন্যে অসন্তোষ তাঁরা সর্ব্বদাই প্রকাশ করে থাকেন। সেই জন্যে তাঁদের জীবন সকল দিক দিয়ে আমাদের দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকদের চেয়ে উন্নত।

ভারতবর্ষ একটি অভিশপ্ত দেশ, নিরবচ্ছিন্ন অভিশাপ এর সকল দিককে ঘিরে রেখেছে। এদেশে প্রাচীনকালে বড় বড় ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা নাকি বলে গিয়েছেন জীবনটা নিছক মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁদের মতে জীবনে বিয়োগের অঙ্কটা যতই বাড়ানো যায় ততই নাকি পুণ্যের কাজ করা হয়, আর যোগের অঙ্ক বাড়ালে হয় পাপ, এমন বড় পাপ যে তার কোনো কালে ক্ষমা নেই। পরে এলেন মুসলমানেরা। তাঁরাও নিয়ে এলেন গোটা কতক ফিওলজী অর্থাৎ ব্যবস্থা শাস্ত্রের কেতাব। কাজেই ব্যবস্থা-দাতা অর্থাৎ মোল্লার সংখ্যা এদেশে খুব বেড়ে গেল। এই মোল্লারা শিখাচ্ছেন, পৃথিবীর জীবনটা কিছুই নয়। কোনো রকম করে দুনিয়ায় এ দু'দিনের জীবনটা দুঃখ কষ্টে কাটালেই হ'ল, তারপরে, পরকালে অনন্ত স্বর্গে অনন্ত জীবন, আর অনন্ত সুখ। মোটের উপর, কপট সাধু-সন্ন্যাসী-গুরু-পুরোহিত ও মোল্লা-মৌলবী-ফকিরগণ ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হ'তে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বিলোপ-সাধন করে দিয়েছেন। এঁদের ফাঁদে পড়ে ভারতের কৃষাণ ও শ্রমিকগণ বাঁচার লোভে হাতে-পাওয়া জিনিষটা খুইয়ে বসে আছে। শ্রেণী হিসাবে এই কপট সাধু-সন্ন্যাসী ও মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এঁরা শ্রম-বিমুখ লোক, আপনাদের ষোল আনা ভোগের জন্যে জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগের বাণী প্রচার করে থাকেন। এঁদের পেশা হচ্ছে কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিরীহ চাষী-মজুরদিগকে লুঠ করা। কাজেই, শ্রেণী হিসাবে এঁরাও ধনিক্-তন্ত্রের খুব বড় সহায়ক।

ভারতের প্রাণশক্তি হচ্ছে ভারতের চাষী আর মজুরগণ। এঁদের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জনের কম নয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা এঁদের চাওয়া-না-চাওয়ার উপরে নির্ভর করছে। এঁরা আপনাদের পাওনা ষোল আনা বুঝে নিতে বদ্ধপরিকর না হলে ভারতের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন কিছুতেই সাধিত হতে পারে না। কিন্তু এঁদের জীবনে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই যদি না জন্মে তবে কিসের জন্যে এরা পাওয়ার দাবী জগতের সম্মুখে পেশ করতে যাবেন? ভারতের নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ ক্ষেত্রে সমবেত হতে হবে। চাষী আর মজুরদের মধ্যে জীবনের বাণী প্রচার করা আর তাঁদের সত্যকারের জীবনের সন্ধান দেওয়াই নবীন শিক্ষিত সমাজের একমাত্র কাজ। চাষী আর মজুরদের বলতে হবে, তোমরা অজানা ভবিষ্যতের লাভের আশায় বর্ত্তমানের শ্রমলব্ধ ধন পরের পায়ে বিলিয়ে দিয়ে বসে আছ, কিন্তু জান না তোমরা, বিয়োগের ভিতর দিয়ে লাভ কখনো হতে পারে না। লাভের জন্যে যে যোগ চাই-ই চাই। তাদের বোঝাতে হবে, তাদের শ্রমের ধনে তাদের ভোগের অধিকার ষোল আনি রয়েছে, সে অধিকার ত্যাগ করে তারা পৌরুষের পরিচয় না দিয়ে কাপুরুষতার পরিচয়ই দিচ্ছে, মনুষ্যত্ব হতে তারা বহু দূরে সরে পড়েছে। এক কথায়, জীবনে খাওয়া-পরার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যতদিন না আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রাণে জাগবে ততদিন আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন

কিছুতেই হবে না। পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনের সৃষ্টি না হলে পরিবর্ত্তন কেনই বা হবে ?

কপট সাধু-সন্ন্যাসী ও মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতির দুষ্ট আওতা হতে তাদের কৃষক ও শ্রমিকজীবনকে সম্পূর্ণ মুক্ত না করতে পারলে আমাদের উদ্ধারের আশা একেবারেই নেই। যে অবস্থায় আমাদের শুধু যে মানুষের ঘৃণিত জীবন বহন করতে হবে, তা নয়, আমাদের জীবন দিনকে দিন যেমন অসহায় হচ্ছে, তাতে আমরা ধরাবক্ষ হতে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাব।

লেনিন ও সোভিয়েট-রুষিয়া

[শ্রীদেবব্রত বসু]

—ঃ০ঃ—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

লেনিন সিমবার্স্ক বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করিতেন। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন খিওডর কেরেনেস্কী। তাঁহার পুত্র কেরেনেস্কী ছিল লেনিনের সহপাঠী। এই বৃদ্ধ স্কুল-মাষ্টার কোনও দিন হয়ত গভীরতম স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে একদিন তাঁহার পুত্র এই কেরেনেস্কী সমস্ত রুষিয়ার পরিচালক হইয়া উঠিবে এবং এই কিশোর ছাত্র একদিন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করিয়া রুষিয়াকে নবজন্ম দিবে। বাল্যে এই দুই ব্যক্তি দৈব ক্রমে একই বিদ্যালয়ে একই শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিমবার্স্কে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি রাজধানীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য যান। কিন্তু বিপ্লবীর ভ্রাতা বলিয়া সেখানে তাঁহার প্রবেশাধিকার ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে তিনি কাজান বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান রুষিয়ার আর একজন শ্রেষ্ঠতর পুরুষ এমনি পড়িতে আসিয়াছিলেন, সে ম্যাক্সিম্ গর্কী। দুজনেরই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কাল অত্যল্প পরিমিত।

বিদ্যালয়ে সাম্যবাদ প্রচার করা এবং ছাত্রদের বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ লেনিন এই বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। তাহাতে তিনি আইন-অধ্যয়ন করেন এবং পরে অতি-অল্প দিনের জন্য মাত্র উকিল হইয়াছিলেন এবং মাত্র এ।টী কেস চালাইয়াছিলেন।

১৮৯০ সালে ওকালতি পরিত্যাগ করিবার পর লেনিন নেভার ধারে সমস্ত সহরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেণ্ট-পিটার্সবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের সময় লেনিন কার্ল মার্কসের লেখার সহিত পরিচিত হন। মার্কসের বাণী লেনিনের অন্তরকে স্পর্শ করিল এবং লেনিন সেইদিন হইতে মার্কসকে একপ্রকার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। তখন রুষিয়ার নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মার্কসের বাণী গুপ্তভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এবং শ্রমজীবিরা তখন সবেমাত্র আপনাদের অবস্থার শোচনীয়তা উপলব্ধি করিতেছিল। তখন লেনিন মার্কস্-পন্থার উপর একটী প্রবন্ধ লেখেন। এবং প্রবন্ধটী এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সবল ও সতেজ হইয়াছিল যে রুশিয়ার সাম্যবাদ প্রচারের অনেক Plekhanov সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এই যুবক একদিন জারের পক্ষে ভয়ানক বিপদজনক হইয়া উঠিবে।" এবং শীঘ্রই সে কথা সত্য হইয়াছিল এবং পনেরো বৎসর পরে এই লেনিনই Plekhanovর হাত হইতে Social-Democratic দলের নেতৃত্বের ভারগ্রহণ করেন এবং Leninএর ব্যক্তিত্বে Plekhanov অদৃশ্য হইয়া যায়।

কিন্তু এই পুস্তিকা অবিলম্বে গভর্ণমেণ্ট নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত করেন। এবং নরমপন্থী পপুলিষ্ট দলের মধ্যে তখন এই নবাগত ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে সাবধান সাবধান রব পড়িয়া যায়। গভর্ণমেণ্টও লেনিনের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

শ্রমজীবিদের উন্নতিকল্পে তিনি এক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সঙ্ঘ যাহাতে ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হয় তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবিদের উন্নতির যে তীব্র বাসনা তাঁহার অন্তরে লুপ্ত ছিল তাহাকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আলেকজাণ্ডারের মত কিন্তু তিনি প্রথমেই বিদ্রোহী-দের দলে মিশেন নাই তিনি প্রথমত চাহিয়াছিলেন শ্রমজীবিদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষা দিয়া—বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে একটা জ্ঞান সংযোগ করিয়া তাহাদিগকে আপনা হইতে বুঝিতে দেওয়া তাহারা কি ভয়ানক দুরবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু জারের শাসনে সে বিদ্রোহী হউক বা কোন রকমে লোকের অজ্ঞতার গতি অন্য দিকে প্রবর্ত্তনকারী শান্ত-ব্যক্তি হউক—সে সাম্রাজ্যের শত্রু। তাই ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ২৯ জানুয়ারী রাজ-আজ্ঞায় দণ্ডিত হয়ে লেনিন পূর্ব্ব সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হন।

লেনিন সাইবেরিয়াতে একা যান নাই। তাঁর পক্ষে শত সহস্র রুষ যুবক মৃত্যুহীন অচপল অন্তঃকরণে দীর্ঘ অনাচার ক্লান্ত এই সাইবেরিয়ার পথ বাহিয়া নির্ব্বাসনে চলিয়াছিল ; সাইবেরিয়ার এই বন্দীশালা রুষিয়ায় মুক্তির প্রেরণা আনিয়াছিল এবং এই সাইবেরিয়ার জনহীন নিষ্করুণ প্রকৃতির মধ্যে দেশমাতার সুসন্তান-রুষিয়ার সন্তানের জীবনকে মর্ম্মে মর্ম্মে দেখিতে পাইতেন তাই বন্দীশালা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের অন্তরে মুক্তির কামনাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছিল।

সাইবেরিয়ার এই নির্বাসনে লেনিন ক্ষুব্ধ হন নাই। স্থির-ভাবে চিন্তা করিবার ও অধ্যয়ন করিবার এই তো উপযুক্ত অবসর। তাই সেই নির্বাসনে তিনি গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তায় ব্যাপৃত হন। Suspenskoy গ্রামে বসিয়া তিনি প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন, এই সময় তিনি "Ilyich" "Ilin" "Tylin" "Lenin" নাম ব্যবহার করেন।

নির্বাসন শেষ হইলে পর রুষ গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে আদেশ করা হয় যে তিনি আর রুষিয়ার কোন বড় সহরে, কিম্বা যেখানে কলকারখানা আছে এবং যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে এমন স্থানে বাস করিতে পারিবেন না। এই সময় লেনিন য়ুরোপ পরিভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময় তিনি Iskra স্ফুলিঙ্গ নামে সাম্যবাদীদের একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। স্বদেশ হইতে নির্বাসিত সমস্ত রুষ সাম্যবাদী তাঁহার দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

এই নির্বাসিতদের দলের মধ্যে থাকিয়া এবং তাহাদের পরিচালনার ভার লইয়া লেনিন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অসামান্য কর্মপ্রতিভা ও পরিচালনক্ষমতা আয়ত্ত করিতেছিলেন। এই কাগজে শ্রমজীবিদের সভাকারের অভাব অভিযোগ ও অবস্থার বিষয় বিবরণ সংগ্রহ করা এবং শ্রমজীবিসঙ্ঘ প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় অনেক তরুণ যুবক লেনিনের সহিত যোগদান করেন এবং এই সমস্ত যুবকের সাহায্যে লেনিন রুষিয়ার অভ্যন্তরে আপনার মত প্রচার করাইতে লাগিলেন।

এই সময় লেনিনের পশ্চাতে পুলিশের লোক তাঁহার গন্ধ শুঁকিয়া অনবরত তাঁহার পিছু লইয়া তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি সমস্ত পুলিশের হাত এড়াইয়া মিউনিচ, পারিস, লণ্ডন, জেনেভা প্রভৃতি য়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরগুলি বিশেষ-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন।

এই সময় একটী নারী সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া লেনিনের এই সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করেন। সে নারী লেনিনের স্ত্রী। তাঁর নাম Nadezhda Krupskaya লেনিনের সমস্ত বিপদ ও আপদের সঙ্গে এই নারী আপনার প্রেম-গভীর শক্তি ও মাধুর্য্য ছড়াইয়া দিয়া লেনিনের কার্য্যকে অনেকখানি সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন এই নির্ব্বাসিত রুষ-সাম্যবাদী দলের সেক্রেটারী। এই দলের জন্য অনবরত পরিশ্রম করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন এই নির্ব্বাসিত রুষ-সাম্যবাদী দলের একাকী তিনি কাজ করিতেন—যে সমস্ত গুপ্তপত্র রুষিয়া হইতে আসিত—তিনি তাহার পাঠোদ্ধার করিতেন। এই সমস্ত পত্র অদৃশ্য কালী দিয়া লেখা থাকিত।

রুষ বিপ্লবীদের প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ দুটী বিভিন্ন দল ছিল। একদলের নাম ছিল Social Democrats, আর একদল ছিল Social Revolutionists শেষোক্ত দলের লোকেদের টেরারিষ্ট (Terrorists) বলা হয়। তাহারা যুদ্ধ-বিপ্লবে আগা-গোড়া গুপ্তহত্যায় বিশ্বাস করিত এবং সেই ভাবেই কাজ করিয়া চলিয়াছিল। এবং এই দলের লোকেরা সুবিধা পাইলেই গোপন হত্যা করিত। লেনিন এই গোপন-হত্যার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তিনি Social Democrats দলের প্রধান নেতা ছিলেন। ইহারা গোপনে শ্রমজীবিদের শিক্ষা ও বিপ্লব-বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া একটা বৃহৎ জন-বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিলেন। এই আয়োজনের ফলে রুষিয়ায় ১৯০৫ সালে স্থানে স্থানে জন-বিপ্লব হয় কিন্তু অবশেষে মস্কোতে এই বিপ্লবীরা পরাস্ত হয়। এবং তাহার ফলে এই দলের বহুলোক নিহত ও নির্ব্বাসিত হন। লেনিন ও জিনোভিভ্, এই বিপ্লবে কোনও রকমে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া যান।

এই সময় Social Democrats বাদানুবাদের ফলে দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বোলশেভিজম্ এই ভয়ানক কথাটী এই সময়েই জন্মগ্রহণ করে। যে দলের লোকেদের সংখ্যা বেশী হইল তাহাদের নাম হইল বোলশেভিক; কারণ রুষ ভাষার bolse কথার মানে বেশী। আর যাদের দলে লোক সংখ্যা কম রহিল তাঁরা হইলেন menshevists—মেনশেভিষ্টস্ (mensh মানে অল্প; বোলশেভিকগণ কম্যুনিষ্টবাদের চরমপন্থা অবলম্বন করিতে চান; অল্পদল তাহা আপোষ করিতে। কিছুকাল ধরিয়া লেনিনকে শুধু এই মেনশেভিষ্টদের বিরুদ্ধেই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

এই সমস্ত সময় তিনি গোপনে নির্ব্বাসিত অবস্থায় য়ুরোপের সমস্ত প্রধান নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বাহির হইতে রুষিয়ায় বিপ্লবের আয়োজন চালাইতেছিলেন। প্যারিসের বিখ্যাত গ্রন্থালয়ে Nationale Bibliothequeএ কিম্বা লণ্ডনের বৃটিশ মিউ-জিয়ামে এই নির্ব্বাসিত রুষ তখন দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যয়ন করিয়া চলিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের গ্রন্থাগারগুলিই লেনিনের শিক্ষার জন্য কতকটা দায়ী।

রুষিয়ায় এই নব-জাগরণের কথা বুঝিতে হইলে যে-রুষিয়ার ভগ্ন-সৌধের উপর এই নব-রুষিয়া উঠিল, তাহার বিষয় জানা চাই।

বর্ত্তমান জগতে এশিয়া ও য়ুরোপের মধ্যবর্ত্তী এই তুষারের ও তেপান্তরের দেশ এক বিচিত্র স্থান অধিকার করিয়াছে। মনে হয় বর্ত্তমান য়ুরোপের সমস্ত গতির মূলে আছে—রুষিয়া ও ১৯১৪ সালের যুদ্ধ। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের বিষয় এবং য়ুরোপে ও সমস্ত বিশ্বে তাহার প্রভাবের কথা এখানে না বলিলেও চলে। এখানে রুষিয়ার বিগত এক শতাব্দীর ইতিহাসের ঈষৎ আলোচনাই আমাদের প্রয়োজন।

য়ুরোপে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ও নব-নব আবিষ্কারের ফলে বিগত চনাই আমাদের প্রয়োজন।

য়ুরোপে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ও নব-নব আবিষ্কারের ফলে বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বিপুল রুষিয়া সে উঠা-পড়ায় সাড়া দেয় নাই।

য়ুরোপে যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, রুষিয়ায় তখন রাজাকে তাহারা সত্য সত্যই দেবতা ভাবিত। সাধারণ রুষের অন্তরে পশ্চিমের শিক্ষা-দীক্ষা অপেক্ষা প্রাচ্যের বৈশিষ্ট প্রচুর পরিমাণে ছিল ও আছে। ধর্ম্মের ও অন্তরের বিশ্বাসের গভীরতায় এবং জীবনের প্রতি একটী বিশেষ দৃষ্টি লইয়া দেখা ও ভাবা—রুষজীবনের বিশেষত্ব। যখন বোলশেভিক-বিপ্লবের সময়ও তাঁহার বংশধর-দিগকে হত্যা করা হয় তখন সেই খবর রুষিয়ায় অনেক সাধারণ

লোক বিশ্বাস করিতে পারে নাই। যদিও জারের দ্বারা তাহারা অসংখ্য রকমে নির্য্যাতিত হইয়াছিল তথাপি তাহাদের অন্তরে জার এই নামটার সঙ্গে একটা রহস্যময় ধর্ম্মভাব জড়াইয়াছিল। তাই অনেক কৃষাণ খবর শুনিয়া বলিয়াছিল, "জার নিশ্চয়ই কোন রকমে পালিয়ে কোথাও গুপ্তভাবে আছে—আবার একদিন ফিরে আসবে।" অবশ্য এ ভাব শীঘ্রই তিরোহিত হয়।

রুষিয়ার এই বিপ্লব বুঝিতে হইলে রুষিয়ার বিগত একটা শতাব্দীর ইতিহাস জানিতে হয়। এবং সমগ্র রুষ-সাহিত্যই সেই ইতিহাস। পুস্কিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সেরগেনভ ও ব্লক পর্য্যন্ত বহু মহাপুরুষ রক্ত দিয়া সেই সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যদি বলা যায় যে রুষ-সাহিত্যে অক্ষরের ব্যবহার হয় নাই, পরিবর্ত্তে জীবন ব্যবহার হইয়াছিল; যদি বলা যায় রুষ-সাহিত্যে কালীর প্রয়োজন হয় নাই—শহীদের তাজা রক্ত ছিল; এক কথায় বোধ হয় তাহা হইলে রুষ-সাহিত্যের ও রুষিয়ার স্বরূপ বোঝা যাইতে পারে।

রুষিয়ার সাহিত্য বা ইতিহাসের দিকে চাহিলে দুটী বিভিন্ন দেশের ছবি দেখা যায়। একটী কৃষক ও নির্য্যাতিত মানবের রুষিয়া; আর একটী জার ও তাঁহার অনুগৃহীত ধনী ও ধর্ম্মধ্বজীদের রুষিয়া। একটী দেশ নির্য্যাতনে, শিক্ষার অভাবে, দারিদ্র্যে ও দুর্ভিক্ষে নিয়ত পশুভাবাপন্ন হইয়া চলিয়াছে; অপর দেশটী ধর্ম্মকে সামনে রাখিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া পাপে নিত্য ডুবিয়া চলিয়াছে। একটী দেশ অনাহারে মরিতে বসিয়াছিল; অপরটা তখন অতি-আহারে মুমূর্ষু হইয়া উঠিয়াছিল। দেশে যে কেহ দেশের দুঃখে ও বেদনায় কথা কহিয়াছে তাহাকেই মৃত্যুকে বরণ করিতে হইয়াছে। কত শত সহস্র প্রাণের নির্ভীক প্রকাশ আত্মহুতিতে রুষিয়ার নবজন্ম হয়। একটী বালককে অন্যায় দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল দেশের মঙ্গলের জন্য। পৃথিবীর অন্তরে একটা চিরন্তন সজীবতার ও প্রাণধারার স্রোত নীরবে দৃশ্য জগতের অন্তরালে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই অজ্ঞাত ইঙ্গিতে পৃথিবীতে যখন যে কোনও স্বর্ণলঙ্কার রাবণ আসিয়া আপনার শক্তির উন্মাদনায় সীতার জ্ঞান-অঙ্গে হাত দিয়াছে—সেইখানেই তাহার মৃত্যুবাণ হাতে লইয়া দাশরথি আসিয়াছে। ঐশ্বর্য্যের ও শক্তির গর্ব্ব-ভরা স্বর্ণ-লঙ্কায় পাবক আজ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

রুষিয়ায় লেনিন বা অন্য কেহই বোলশেভিসম আনেন নাই। যদি কেহ তাহা সত্য সত্যই থাকে ত সে জার ও তাঁদের শাসন-পদ্ধতি। বোলশেভিসম্ লেনিন বা ট্রটস্কীর নিয়মে বাঁধা পদ্ধতির নাম নয়। বোলশেভিসম মানে এমন একটা অবস্থা যখন মানুষ তার শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া বুঝিতে পারে যে, হয় তাহাকে এই মুহূর্ত্তেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতে হইবে, নতুবা শেষ সহায় স্বরূপ একবার দুঃখের আক্রমণ আত্মরক্ষার যথাযথ অনুযায়ী করিতেই হইবে। রুষিয়ার সাধারণ মানুষের মনে সেই ভাব এত ঘন হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহাকে পরিচালনা করিবার জন্যই শুধু লেনিন, ট্রটস্কীর মত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)



শক্তি আছে সাহস আছে নাইকো জ্ঞান-দৃষ্টি ভাই,—
অজ্ঞানের অন্ধকারে পথ-হারা আজ পান্থ তাই।

মা

[ম্যাক্সিম্ গর্কী]

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ।

—০ঃ৯ঃ০—

ঠিক দুই সপ্তাহের পর একদিন রবিবারে পাভেল পুরা মাত্রায় মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিল। কোনও রকমে হামাগুড়ি দিয়া আর দৌড়ে যাইয়া সে ঘরের কোণে টেবিলের কাছে গিয়া বসিল। ঠিক যেমন করিয়া তাহার বাবা রাত্রে মাতাল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া টেবিল চাপড়াইয়া খাবার চাহিত, ঠিক সেই রকম করিয়া পাভেল ডাকিল,

খাবার দাও!"

মা ধীরে পুত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন; ধীরে পাশে বসিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মাথাটী স্নেহে বুকে রাখিলেন। মার কাঁধে হাত পড়িতেই প্যাভেল জোরে ধাক্কা দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,

"যাওনা শিগ্‌গির!"

কোনও রকমে ধাক্কা সামলাইয়া বিষন্ন স্নেহে মা বলিয়া উঠিল—"পাজি ছেলে,.. ...

পাভেল কোনও রকমে জিভে ছড়াইয়া বলিল, দাও তো ঐ পাইপটা—আমি তামাক খাব।

জীবনে এই প্রথম পাভেল মাতাল হইয়াছে। তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাহার মন তখনও বেশ সজাগ। তাহার মনে হইতেছিল কে যেন মাথায় ঘা দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মাতাল? মাতাল হয়েছ?"

মার স্নেহে সে আরও ব্যস্ত হইয়া ওঠে, মার চোখে বিষাদের ছায়া তার মনে ব্যথা আনে। কান্নায় তার বুক ভরিয়া আসে কিন্তু সে তাহা থামাইবার চেষ্টায় আরও বেশী মাতালের মত করিতে থাকে।

তার কোঁকড়ান চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে চুপি চুপি মা বলেন,

"এ তুই কেন করলি রে!"

ক্রমশঃ পাভেলের শরীর আরও দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মা তাহার মাথায় ভিজে গামছা দিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সে যেন একটু সুস্থ হইল। কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে তাহার মনে হইতেছিল যে সমস্ত দুলিতেছে। চোখের পাতা দুটো ভারী হইয়া আসিতেছে; মুখে একটা বিশ্রী টক স্বাদ উঠিতেছে; সে স্থির-চোখে একবার মার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। মনে মনে সে ভাবে,—

"বোধ হয় আমার এখন ওসব করবার বয়স নয়! আর সবাই ত খায়, কই, কিছুই তো হয় না—আমি কেন এত অবশ হলাম।"

ঘরের এক কোণ থেকে মা শান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,

"এখন থেকে যদি মদ খেতে আরম্ভ করিস, তাহলে তুই যে আমাকে খেতে দিবি—তা বুঝেছি!"

পাভেল চোখ বেশ ভাল করিয়া বুজিয়া, উত্তর দিল,

"কেন? প্রত্যেকেই ত মদ খায়!"

পাভেল তো ঠিকই বলিয়াছে। মা খুব ভাল রকমই জানিত যে এই তাড়িখানার বাইরে এমন কোনও স্থান নাই যেখানে এই সমস্ত মানুষগুলা একটু আনন্দ পাইতে পারে। হুইস্কীর আস্বাদ ছাড়া এমন কোনও রস নাই যাহা তাহাদের অন্তরে তৃপ্তি দিতে পারে। তবুও মা উত্তর দিল;

"খাক্—তা বলে তুই খাবি? তোর বাবা তোদের দুজনেরই জন্যে খেয়ে গেছে: আর আমার কপালে যথেষ্ট জ্বালা রেখে গেছে। মার দিকে ফিরে চা;—হয়ত তাহলে খেতে পারবি না?"

মার শান্ত স্নেহগভীর কথায় পাভেলের মনে পড়িল যতদিন তার বাবা জীবিত ছিলেন, মার অস্তিত্বের কথাই যেন কেহই জানিতে পারিত না। এক কোণে মা সর্ব্বদাই নীরবে যেন অপেক্ষায় থাকিতেন কখন প্রহার আর গালাগাল আরম্ভ হইবে। ইদানীং বাবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ যাতে না হয় তার জন্য পাভেল বাড়ীতে খুবই অল্প সময় থাকিত। তাই সে মার সঙ্গ থেকে যেন খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

একটু ঠাণ্ডা হইয়া পাভেল মার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দেখিল মার দীর্ঘ দেহ কুঁজোর মত হইয়া আসিতেছে। মার সবল দেহ আজ বহুবর্ষের পরিশ্রমে আর প্রহারে ভাঙিয়া গিয়াছে। ঘরের একোণ থেকে ও কোণ চলা-ফেরা করিবার সময় এত সন্তর্পণে মা চলা-ফেরা করিতেন যে মনে হইত তিনি যেন সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছেন বুঝিবা কিছু ভাঙিয়া ফেলিবেন তাঁর স্বামী যেখানে মুখের দুইটী চোখ চঞ্চল বিষাদে যেন অহর্নিশি জ্বলিতেছে। গ্রামের প্রায় সমস্ত রমণীর চোখে সেই একই দৃষ্টি। কুঞ্চিত ধূসর কেশগুচ্ছগুলি সারা মাথা ভরিয়া ছিল, মনে হইত সেগুলি যেন কাহারও বজ্রমুষ্টির ছাপ—এখনও রহিয়া গিয়াছে।

মার গণ্ড বহিয়া তখন অশ্রু পড়িতেছিল।

"আঃ, দাঁড়াও, কেঁদনা, মা,...আমায় একটু জল দাও......

"দাঁড়া, বরফ-জল এনে দিচ্ছি।"

ফিরিয়া আসিয়া দেখেন পাভেল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পুত্রের

উপর নিঃশব্দে ঝুঁকিয়া তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। হাতের পেয়ালা কাঁপিয়া উঠিয়া, বরফ পড়িয়া গেল। ধীরে পেয়ালাটী টেবিলে রাখিয়া ঘরের এক কোণে যে দেবমূর্ত্তি ছিল তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া নীরবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বাহিরে তখন অন্ধকারে নষ্ট-জীবনের নিশীথ-উন্মাদনার শব্দ উঠিতেছে। শরতের মায়াময় নিশীথ-অন্ধকারে তখন কোথায় একটা সেতারের ভাঙ্গা শব্দ আসিতেছে; কেহবা উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া গান গাহিতেছে; কেহবা অশ্লীল গালাগাল অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে, নিশীথের অন্ধকারকে ঘন করিয়া তখন বাহিরে নানাকণ্ঠে তিক্ত-অভিশাপের শ্রান্তবাণী উঠিতেছিল।

(৪)

ভ্লাসবদের জীবন এক রকম একটানা গতিতে চলিয়াছিল কিন্তু গ্রামের অন্য সব ঘরের চেয়ে এ বাড়ীর জীবন ছিল চের শান্ত এবং বিশেষ বিভিন্ন।

পাভেল আর সকলের মতই জীবন যাপন করিতেছিল। তার বয়সের অন্য সব ছেলেরা যা করে সেও তাই করিল। একটা বাজনা, জামা, কাপড় নেকটাই একটা ছড়ি, ওভারসু সেও কিনিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় সে পার্টিতে যাইত এবং সেখানে নাচিতেও শিখিয়াছিল। ছুটীর দিনে রাত্রে মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিত। এবং মদ খাওয়ার জন্য বিশেষ যন্ত্রণাও পাইত। সকালে যখন উঠিত তখন সমস্ত শরীর ফ্যাকাসে ও ভারী হইয়া থাকিত, মাথা ঘুরিয়া উঠিত, এবং বুকের ভিতর জ্বলিতে থাকিত।

একবার মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হাঁরে, কেমন ছিলি কালকে?"

সে বিরক্ত হইয়া ব্যস্তভাবে উত্তর দিয়াছিল,

"কি ভীষণ, যেন কবরের মধ্যে শুয়ে আছি! কলের মতন মানুষগুলো চলা-ফেরা করে চলেছে। আর ভাল লাগে না, এবারে একটা ছিপ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ব না হয় একটা বন্দুক কিনব।

কারখানায় সে কিন্তু খুব মনোযোগের সঙ্গেই কাজ করিত; কখনও ফাঁকি কিংবা জরিমানা দেয় নাই। সে সর্ব্বদাই একটু গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং তার মার মত দুটী বিশাল নীল চোখে সে চারিদিকে একটা অতৃপ্তিতে চাহিয়া থাকিত। সে ছিপ কিংবা বন্দুক কিছুই কেনে নি ঠিক কিন্তু বাঁধা-পথ হইতে সে কখন সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমশঃ পার্টিতে যাওয়া-আসা তাহার কমিয়া আসিতে লাগিল এবং ছুটীর দিনে সে অন্য কোথায় যাইত বটে কিন্তু রাত্রে মাতাল হইয়া আর ফিরিত না। মা নীরবে গভীর ভাবে ছেলের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি দেখিতেন তাঁর পুত্রের পাণ্ডুর মুখখানি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে,—চোখের দৃষ্টি যেন ক্রমশঃ গভীর হইতেছে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে সে এমনভাবে প্রায়ই ঠোঁট চাপিয়া রাখিত যে তাহার মুখে একটা গম্ভীর চিন্তার ছায়া আপনি ভাসিয়া বেড়াইত। মনে হইত সে যেন পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে কিংবা তাহার দেহে কোথাও কোন গভীর ক্ষত অনবরত জ্বলিতেছে। প্রথম প্রথম বন্ধুরা বাড়ীতেই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহাকে পাওয়া যাইত না, সুতরাং তাহারা ক্রমশঃ তাহার সঙ্গ এক রকম পরিত্যাগই করিল।

পাভেলকে কারখানার অন্য সব কারিকরদের থেকে আলাদা হইতে দেখিয়া মার মনে যেমন একটা তৃপ্তি হইতেছিল তেমনি যখন তিনি দেখিলেন পাভেল এক মনে অবিচলিত ভাবে জীবনের বাঁধা পথ ছাড়িয়া কোথায় এক অনির্দ্দিষ্ট জীবনের গূঢ় পথে চলিয়াছে—দক্ষিণে, বামে কোনও দিকেই ভ্রুক্ষেপ নাই, মার অন্তরে তখন কেমন একটা আশঙ্কা দোলা দিয়া উঠিতে থাকে।

সে ক্রমশঃ বাড়ীতে বই আনিতে লাগিল। প্রথম প্রথম সে আড়ালে পড়িতে চেষ্টা করিত; এবং কোনও বই পড়া শেষ হইলে লুকাইয়া রাখিয়া দিত। মাঝে মাঝে সে বই দেখিয়া কি লিখিত এবং সেগুলিও লুকাইয়া রাখিত।

একবার মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পাভ্লুসা, তোর কি হয়েছে? বল্না আমায়?"

সে উত্তর দিয়াছিল, "বেশ ভালই আছি, মা?"

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই লাত রোগা আর ফ্যাকাসে হয়েছিস্ কেন?"

পাভেল কোনও উত্তর দেয় নাই।

ক্রমশঃ মাতা পুত্রে কথাবার্ত্তা খুবই কম হইত এবং দেখাশুনাও বেশী হইত না। সকালবেলা সে চুপি-চুপি চা খাইয়া কাজে চলিয়া যাইত; দুপুরবেলা যখন সে আহারের জন্য বাড়ী ফিরিত তখনও খাবার সময়ে দু'একটা বাজে কথা ছাড়া বেশী কথা বলিত না। সন্ধ্যা বেলায় আবার কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে গা হাত পা ধুইয়া নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া আপনার বই লইয়া বসিত এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িত। ছুটীর দিনে সে ভোর না হইতেই বাহির হইয়া যাইত, ফিরিত গভীর রাত্রে। মা জানিত যে ছেলে শহরে থিয়েটারে যায়। মা ক্রমশঃ লক্ষ্য করেন যে যত দিন যায় পাভেল তত কম কথা বলে; আর তাহার কথায় আগেকার মত রূঢ়, কর্কশ ভাব যেন আর নাই; তার ভাষা যেন কোমল হইয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে সে এমন দু একটী কথা বলে যার মানে মা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ছেলের কথাবার্ত্তায় ও হাবভাবে এই রকম সহসা এক অপূর্ব্ব কোমল সরলতায় মার মন চঞ্চল হইয়া ওঠে; মার মনে সহস্র ব্যাকুল প্রশ্ন জাগে।

(ক্রমশঃ)

খবরদারী

—:০:—

পরলোকে জগদিন্দ্রনাথ

গত ২১শে পৌষ মঙ্গলবার নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় পরলোকে গমন করেছেন। জগদিন্দ্রনাথের বিয়োগে বাংলার যে ক্ষতি হয়েছে, তা'র সহসা পূরণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সরকার বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টিতে এ দেশের একাংশের মৃত্তিকা বৎসরে বৎসরে যথেষ্ট উর্ব্বরা হ'য়ে থাকে, এবং রাজা-মহারাজা প্রভৃতি অফলা উদ্ভিদ্‌ও যথেষ্ট গজায়। তা'দের মধ্যে থেকেও আমরা জগদিন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম, এই আমাদের সৌভাগ্য। জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন গুণী, জ্ঞানী, রসজ্ঞ, কলাবিদ্‌। তিনি যে এত জনপ্রিয় হ'য়েছিলেন, তার কারণ তিনি দেশের আর-পাঁচজনের মতই নিজেকে বাঙালী বলে' ভাবতেন। অন্যের চেয়ে মাথা উঁচু করে' নিজেকে বড় করে' দেখাবার প্রহসন সৃষ্টি করার তাঁর কোনও দিন প্রয়োজন হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে আমরা গিয়ে দেখেছি, তিনি যে মহারাজা তা' ভাববারও অবসর দিতেন না। হয়তো মহারাজা ভেবেই কেউ তাঁর সঙ্গে ভয়ে ও সঙ্কোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছে কিন্তু মানুষ দেখে সসম্মানে শির অবনত করে' ফিরে এসেছে। এই প্রসঙ্গে জগদিন্দ্রনাথের একটি দিনের কথা বলবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারছি না। তাঁর একজন অনুরক্ত ভক্তের সঙ্গে গেলাম, তাঁর বাড়ীতে। ভক্তটি তাঁর একটি শিশু কন্যা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জগদিন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে' কন্যাটিকে বললেন—"দেখছিস্‌, উনি মহারাজা—প্রণাম কর্‌।" জগদিন্দ্রনাথ তাই শুনে হাসতে হাসতে কন্যার পিতাকে বললেন—"ওহে একটা সম্বন্ধ ঠিক করে' আমার পরিচয় দাও,—ও এখন মা-বাবা-কাকা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত; 'মহারাজা' শুনে হয়তো ভাবছে, এ একটা নতুন রকমের জন্তুবিশেষ।"

জগদিন্দ্রনাথের গুণের কথা বাঙলাকে নতুন করে' শোনাবার আর প্রয়োজন নাই। তাঁর প্রতিভা বাংলার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় দীপ্তিমান্‌ হয়ে আছে। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর যোগ্য উত্তরাধিকারী জগদিন্দ্রনাথের অভাব-মোচনের জন্য আমরা বাংলার অভিজাত শ্রেণীর প্রত্যেককেই শোকার্ত্তচিত্তে আহ্বান করছি। এ আহ্বান যদি আমাদের অরণ্যে রোদন হয় তাহ'লেও আমরা বিস্মিত হব না।

* * *

চীন সরকারের মৌতাত

হংকং থেকে দু'শ মাইল দূরে প্রাটাস পাহাড়ের উপর একটি আলোক-গৃহ নির্ম্মাণ করবার জন্য চীন সরকার সেখানে ১১০ জন শ্রমিক পাঠান। কিন্তু হতভাগ্য শ্রমিকদের জন্য যথোপযুক্ত খাদ্য বা তাদের সঙ্গে কোন একজন চিকিৎসক ঔষধাদি দিতে কর্তৃপক্ষের হুঁস হয় নি। একখানি রাজস্ব-সংগ্রহকারী জাহাজ ঐ অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময় কতকগুলো সাদা হাড় দেখতে পেয়ে হতভাগ্য শ্রমিকদের কঙ্কাল ও মরণোন্মুখ কয়েকজনকে উদ্ধার করে। প্রকাশ যে, জুন এবং নবেম্বরের মধ্যে উক্ত ১১০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৬৩ জন অনাহার ও অনাহারজনিত ব্যাধিতে মারা যায়। অবশিষ্ট ৪৭ জন ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করছিল। উদ্ধারের পর আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হ'য়েছে।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, হতভাগ্যদের দুরবস্থার কথা কর্তৃপক্ষের একেবারে অবিদিত ছিল না। তবুও চীন সরকার আফিমের মৌতাতে এদিকে নজর দিতে পারে নি। দেশের শ্রমিকদের গায়ে এ তাত নিশ্চয়ই লাগবে, আর তাতে সরকারের মৌতাতও ছুটবে।

* * *

"কথার ব্যবসায়"—

সহযোগী "বঙ্গবাসী" কানপুর কংগ্রেস প্রসঙ্গে লিখেছেন—

২৩শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বর নাগাদ টেলিগ্রাম-যোগেই কানপুর হইতে নানাস্থানের সংবাদপত্রসমূহে দুই লক্ষ তেষট্টি হাজার শব্দ প্রেরিত হইয়াছে। এক ২৬শে তারিখেই অর্থাৎ কংগ্রেস খুলিবার প্রথম দিনেই ষাট হাজার কথা দিকে দিকে চালান হইয়াছে। আচ্ছা—এইবার যদি জিজ্ঞাসা করি,—এই প্রায় পৌনে তিন লক্ষ কথা চালানের ফলে দেশে কয়হাজার নিরন্নের ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়াছে,—কয় হাজার পিপাসিতের তৃষ্ণার জলের সংস্থান হইয়াছে,—কয় স্থানে কয়টা কাজের মত কাজ আরম্ভ হইয়াছে;—তাহা হইলে কি আমাদের এই জিজ্ঞাসা অন্যায় এবং অসঙ্গত হইবে? একজন পাগল পথে পথে একটা নেকড়ার পুঁটলি বারংবার খুলিয়া এবং বাঁধিয়া কেবলই চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইত,—"এই যে দেখছ ভাই,—এর ভিতরে কিছু নাই—কেবল পরদায় পরদায় দেখতে পাবে ছেঁড়া নেকড়ার কাঁই।" এদেশের এই কংগ্রেস-কনফারেন্সগুলা কি কেবল "ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলি?" আসল কাজের আশা কিছু আছে কি?

* * *

ছিদ্র কোথায়?

কানপুরে স্বরাজ্যদলের সভায় আগামী বৎসরের কার্য্যপদ্ধতি মনোমত না হওয়ায় পুনার মিঃ বি, জি, লোহাকরে এম, এল, এ মহাশয় ও বেরারের অনেক সভ্য ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য দলের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন।

কেলকর জয়াকর হ'তে হ'তে লোহাকর পর্য্যন্ত সমস্ত ...র ক্রমশঃ বেরিয়ে যাচ্ছে। এ দামোদরের বাঁধের ফুটো কোথায় এখনো দেখ, নইলে নিজেরা তো মজ্‌ছই, দেশকেও মজাবে।

খড়কুটো

—:০:—

কবি নজরুল ইস্‌লাম পীড়িত অবস্থায় কৃষ্ণনগরে আছেন তাঁর ঠিকানা—নজরুল ইস্‌লাম—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

* * *

মিঃ এন্‌, এম, যোশীর সভাপতিত্বে এম, এণ্ড, এস্‌, এম্‌রেলওয়ের কর্ম্মচারী সম্মিলনের অধিবেশন মাদ্রাজে আরম্ভ হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর মিঃ যোশী তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। দেশের সর্ব্বত্র শ্রমিক সমিতি গঠন এবং এই সমিতিগুলোর উন্নতির জন্যে অর্থ-সংগ্রহের আবশ্যকতার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন।

* * *

মাদ্রাজের শ্রমিকদলের এক সভায় মেজর গ্রেহাম পোল বলেছেন,—বিলাতের ফেবিয়ান সমিতির নিয়ম প্রণালী অনুযায়ী ভারতীয় ফেবিয়ান সোসাইটি নাম দিয়ে সাম্যবাদ প্রচারের জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হোক। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের লেবরপার্টির কর্ম্মপন্থানুযায়ী ভারতীয় শ্রমিক দলের কর্ম্মপন্থা গঠন করবার জন্য ভারতের বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে এক মিলনভূমিতে এনে দাঁড় করাবার জন্য এই সমিতি নিজ শক্তি নিয়োজিত করবে।

* * *

খিদিরপুর ডকের ইলেক্‌ট্রিক ইনজিনিয়ার মিঃ বাইনের ভৃত্য লাকটুয়া তার স্ত্রী ও আট বছরের মেয়েকে নিয়ে গত রবিবারে ঘরে শুয়েছিল। সকাল বেলায় দ্বার ভেঙে তার ঘরে ঢুকে দেখা গেল তারা স্বামী-স্ত্রীতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে' আছে আর কন্যাটির মৃত্যু হয়েছে। শীতের জন্য তারা ঘরে আগুন জেলে, শুয়েছিল, বিষাক্ত তাপে হতভাগ্যদের এই শোচনীয় পরিণাম হয়েছে।

* * *

১৯ই পৌষ টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আকালু গ্রামে রায়-তদের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়েছে। সভাপতি ছিলেন—মৌলবী খোন্দকার আবদুল মন্নান সাহেব। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিলের বিশেষ প্রয়োজনীয় ধারাগুলি মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব সর্ব্বসাধারণকে বুঝিয়ে দেন।

* * *

২৩শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহ—নিকরাইল স্কুল প্রাঙ্গনে একটি প্রজাসভার অধিবেশন হয়। সভাপতি হয়েছিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলবী রাজিবউদ্দীন তরফদার সাহেব। সভায় প্রায় দু'হাজার প্রজা সমবেত হয়েছিলেন।

* * *

২৭শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাশিল মধ্য-ইংরাজী স্কুল প্রাঙ্গনে এক বিরাট প্রজাসভার অধিবেশন হয়। সভায় হিন্দু-মুসলমান প্রায় পাঁচহাজার প্রজা উপস্থিত হয়েছিলেন। অনেকগুলি প্রজাহিতকর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়েছে।

—:থ:—

বীরভূম প্রজা-সম্মিলন

কীর্ণাহারের অধিবেশন

—•—

গত ২৫শে পৌষ শনিবার বেলা ৩টার সময় বীরভূম কীর্ণাহারে এক প্রজা সম্মিলন অধিবেশন হয়। বীরভূম কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মণিলাল বোস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা ও তাহাদের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে নানা আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

(১) যেহেতু গবর্ণমেণ্ট প্রজা স্বত্ব আইনের সংশোধনের নিমিত্ত যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা প্রজা সাধারণের দিক হইতে সন্তোষজনক নহে। অতএব এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ বিশেষতঃ সিলেক্ট কমিটীর সভ্যগণ যেন এই পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর না করেন।

(২) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ কৃষকগণের স্বার্থের অহিতকর কোন আইন বিশেষতঃ প্রজা স্বত্ব সম্বন্ধীয় আইন মঞ্জুর না হওয়াই শ্রেয়ঃ।

(৩) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, কৃষকগণকে জমিতে কায়েমী স্বত্বক্রমে নিম্নলিখিত অধিকার দিতে হইবে।

(ক) স্বেচ্ছায় বিনা সালামিতে জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার।

(খ) বিনা সালামিতে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করা, পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিবার এবং গাছ কাটার অধিকার।

(৪) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, জমিদারগণ হস্তান্তরিত জমি উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

(৫) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, জমির খাজানা সম্বন্ধে একটা ঊর্দ্ধতম হার থাকিবে, এবং সেই হার জমিদার কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রদত্ত হারের দেড় গুণ অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত নয়।

(৬) বাকী খাজনার উপর ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের সুদের হারের সমান হইবে এবং বাকী খাজানার দায়ে গোলা আদি সম্পত্তি নীলাম না হইয়া কেবল বাকী খাজানা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) জমীর খাজানা ছাড়া জমিদার কিংবা উঁহাদের আমলা কর্ত্তৃক যে কোন আবওয়াব, ভেট ও বাজে আদায় যেন বে-আইনী ও পুলিশ চালানী অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়।—

(৮) প্রস্তাব করা হইতেছে যে, জমিদারের স্বার্থ রক্ষা ও তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া প্রজাসভা স্থাপন করা হউক।

(৯) যাহাতে প্রজাদের স্বার্থহানি না হয় তজ্জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, প্রজা পক্ষীয় লোক প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা চাই।

(১০) বর্ত্তমানে এতদঞ্চলে জমি মাপ ও জরিপ হইতেছে, তাহাতে কোন কোন সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী প্রজাদের উপর অত্যাচার ও রূঢ় ব্যবহার করিতেছে শোনা যায়। যাহাতে তাঁহারা ঐরূপ ব্যবহার না করেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে এবং সেটেলমেণ্ট অফিসার মহোদয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে।

——

হাওড়া জেলা প্রজা সম্মিলন

—:০:—

এই সম্মিলন প্রস্তাব করেন যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন নিম্নলিখিত সর্ত্তসহ পরিবর্ত্তিত হউক :—

(১) জমীদারের বাজে আদায় আইন-সঙ্গত নহে বলিয়া বন্ধ করা।

(২) দখলিস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কর্ত্তৃক বৃক্ষকর্ত্তন, ইঁদারা ও পুকুর খনন ইটক নির্ম্মাণ ও পাকাবাড়ী করিবার অধিকারলাভ ও উত্তরাধিকার সূত্রে সমূহ স্বত্বলাভের ক্ষমতা প্রদান।

(৩) নাম খারিজের সময় 'খারিজানা' হার আইনের দ্বারা [illegible]

(৩) নাম খারিজের সময় 'খারিজানা' হার আইনের দ্বারা নায় সাময়িক বৃদ্ধি রহিত করণ।

(৫) জমীদার কর্ত্তৃক উপযুক্ত পরিমাণ নিষ্কর গোচর জমীর ব্যবস্থা।

(৬) আবশ্যক হইলে কাছারিতে না গিয়া রেণ্ট মনিঅর্ডার দ্বারা খাজনা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন।

(৭) মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর মত কোনও কোম্পানীর সহিত গভর্ণমেণ্টের মহাল ইজারা না দেওয়ার ব্যবস্থা।

(৮) সাক্ষাৎভাবে কৃষকদের সহিত গবর্ণমেণ্টের জমীবিলির ব্যবস্থা।

(৯) সাক্ষাৎভাবে প্রজাদিগের সহিত জলকর বিলির ব্যবস্থা।

(১০) মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ।

(১১) কোনরূপ 'নজরানা' না দিয়া প্রজাকে জমীর আংশিক বা সমূহ হস্তান্তর দান 'ক্রিয়াদি' করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান।

(১২) বাকী খাজনার জন্য জমিদার শতকরা অনধিক বার্ষিক ৬৲ ছয় টাকা হারে সুদ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(১৩) জমিদারের 'কুৎ' প্রথার দ্বারা বাৎসরিক খাজনা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা বন্ধ করা এবং [illegible]

(১৩) জমিদারের 'কুৎ' প্রথার দ্বারা বাৎসরিক খাজনা নির্দ্দেশ করা।

(১৪) প্রতি পনের বৎসর অন্তর করবৃদ্ধির রহিত করা।

(১৫) জমিদার বাঁধ খরচা আদায় সম্পর্কে উপযুক্ত বাঁধ প্রস্তুত না করিলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে ঐরূপ বাঁধ করিবার ক্ষমতা প্রদান এবং জমিদারের নিকট হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের খরচা আদায়ের ক্ষমতা প্রদান; এবং জমিদার বাঁধ খরচা বাবদ যাহাতে অতিরিক্ত আদায় করিতে না পারে তাহা আইনের দ্বারা বন্ধ করা।

(১৬) কোরফা প্রজাকে নিম্নলিখিত স্বত্ব প্রদান করা :— (ক) বার বৎসর পরে জোৎস্বত্ব অর্জ্জন। (খ) কোরফাস্বত্ব দান বিক্রয়াদির দ্বারা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা; (গ) উত্তরাধিকার সূত্রে কোরফা স্বত্বলাভের ক্ষমতা। (ঙ) যাহাতে উচ্ছেদ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

ভারতীয় প্রথম কম্যুনিষ্ট কনফারেন্স

কানপুর

[ভারতীয় কম্যুনিষ্ট্ পার্টির গঠন নীতি]

—:০:—

যেহেতু দেশীয় ও বৈদেশিক ধনিকগণের দ্বারা এবং ভারতীয় জমীদারগণের শোষণ-বৃত্তির দ্বারা ভারতবর্ষের শ্রমিক ও কৃষকগণ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারিতেছে না, যেহেতু ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় দলসমূহে বুর্জ্জুয়া (অভিজাত)-দেরই সমধিক প্রভুত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে আর এই প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকগণের উন্নতির পরিপন্থী, সেই হেতু ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের এই সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছে যে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মুক্তির জন্য একটি দল গঠিত হউক। এই দল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (Communist Party of India) নামে অভিহিত হইবে। এই দলের চরম উদ্দেশ্য হইবে ভারতে কৃষক ও শ্রমিকগণের সাধারণ তন্ত্র (স্বরাজ) প্রতিষ্ঠিত করা।—ভূমি, খনি, গৃহ, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে ইত্যাদি যে সমস্ত

জন-সম্পদের উপর জন-সাধারণের অধিকার স্থাপিত হওয়া উচিত সেই সমস্ত সম্পদকে সর্ব্বাধিকারভুক্ত ও সর্ব্বনাগরিকের আয়ত্ত করিয়া ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মানুষের মত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করার ব্যবস্থা করা কম্যুনিষ্ট পার্টির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য হইবে।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনে সাফল্য লাভের জন্য এই পার্টিকে সহরে ও মফস্বলে শ্রমিক ও কৃষকসঙ্ঘ গঠিত করিতে হইবে, ডিষ্ট্রীক্ট ও তালুক বোর্ড মুনিসিপালিটি ব্যবস্থাপক সভা সমূহে লোক প্রেরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ অন্যান্য উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এখন যে সকল রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ রহিয়াছে এই পার্টি তাহাদের সমবায়ে বা তাহাদিগকে বাদ দিয়া কাজ করিবে।

এই পার্টির একটি কেন্দ্র কার্য্যালয় থাকিবে, কার্য্যালয়ের কাজ চালানর জন্য বর্ত্তমানে এক বা দুইজন সেক্রেটারী থাকিবেন।

সম্মিলনের সভাপতি আগামী বর্ষে অন্য সম্মিলন হওয়া পর্য্যন্ত এই পার্টির সভাপতি থাকিবেন।

কেবলমাত্র কম্যুনিষ্টগণই এই পার্টির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে পার্টির উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে।

কোনো সাম্প্রদায়িক সভা বা সংগঠনের সভ্য এই পার্টির সভ্য হইতে পারিবেন না।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস বা সম্মিলনের অধিবেশন বৎসরে একবার করিয়া ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হইবে।

এতদ্ব্যতীত রুস ও চীনবাসিগণের স্বাধীনতার সমরের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সম্মিলন এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডে যে সকল কম্যুনিষ্ট সম্প্রতি কারারুদ্ধ হইয়াছেন, সম্মিলন তাঁহাদিগকে সমবেদনা জানাইতেছেন এবং ইংল্যাণ্ডের সরকারের এরূপ ব্যবহারের প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। বৃটিশ পার্লামেন্টের কম্যুনিষ্ট ও ভারতীয় সভ্য মিঃ সাকলাৎওয়ালাকে যে আমেরিকাতে যাইতে দেওয়া হয় নাই তৎপ্রতিও সম্মিলন বিরক্তি প্রদর্শন করিয়াছে।

নিম্নলিখিত ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের কারাবরণেও সম্মিলন সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে :—

(১) মোহাম্মদ আকবর খান (১০ বৎসর, এখনো কারাগারে)
(২) গওহর রহমান (২ বৎসর, পূরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
(৩) মির্জা আকবর শাহ্ (২ বৎসর, পূরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
(৪) সৈয়দ মোহম্মদ হাবীব (১ বৎসর, পূরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
(৫) আবদুল মজীদ (১ বৎসর, পূরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
(৬) রফিক আহ্মদ, (১ বৎসর, পূরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
(৭) ফিরোজ দীন (১ বৎসর, পূরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
(৮) মোহাম্মদ সুলতান (১বৎসর, পূরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
(৯) শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে (৪ বৎসর, এখনো কারাগারে)
(১০) মোহম্মদ শওকৎ উস্মানী (৪ বৎসর, এখনও কারাগারে)
(১১) নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত (৪ বৎসর, পাকস্থলীতে সাংঘাতিক ক্ষত হওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে)
(১২) মুজফ্ফর আহ্মদ, (৪ বৎসর, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে)
(১৩) মোহম্মদ শফীক (৩ বৎসর, এখনো কারাগারে)

বগুড়া জেলা প্রজা কন্‌ফারেন্স

বিগত ১২ই পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বগুড়া জেলা প্রজা কন্‌ফারেন্সের ৩য় বার্ষিক অধিবেশন বগুড়া টাউনস্থ এডোয়ার্ড পার্কে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় জেলায় বিভিন্ন স্থানের প্রায় তিন হাজার হিন্দু মুসলমান প্রজা প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিল। বাদানুবাদের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

১ম প্রস্তাব—বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক সংশোধন পাণ্ডুলিপি ৩রা ডিসেম্বরের কাউন্সিল সভায় সিলেক্ট কমিটীর হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিল প্রজাদের স্বার্থের প্রতিকূলে প্রস্তুত হওয়ায় এবং সিলেক্ট কমিটীতে প্রজা পক্ষের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি না থাকায় এই সভা বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। দুর্ব্বল প্রজার ন্যায্য স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার প্রতিনিধিগণ জমিদারদের অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার কল্পে শক্তি প্রয়োগ করিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে। অতএব এই সভা ব্যবস্থাপক সভা ও সিলেক্ট কমিটীর মেম্বরগণকে অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন প্রজার ন্যায় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাজ করেন।

২য় প্রস্তাব—এই সংশোধন বিলের উপর প্রজাগণের সকল প্রকার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে অতএব এই সভা আশা করেন যে, কাউন্সিল সভায় প্রত্যেক মেম্বর যেন প্রজা পক্ষে ভোট প্রদান করেন।

৩য় প্রস্তাব—দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী জোত ও তাহার স্বত্ব সর্ব্বপ্রকারে হস্তান্তর যোগ্য হইবে। ঐরূপ হস্তান্তর হইলে জমিদার কোন হেতুতেই হস্তান্তরিত জোত খাসে লইতে বা স্বয়ং খরিদের দাবী করিতে পারিবেন না।

৪র্থ প্রস্তাব—স্বভাবত বংশধর কিংবা মৃত বংশধরের বংশধরগণের অনুকূলে হস্তান্তর কালে জমিদার কোনই নজর পাইবেন না। তদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকার হস্তান্তর কালে এবং

বাকী খাজনার বাকী পড়া নীলাম বা উক্ত অন্যান্য নীলামে ডিক্রীদার কিংবা নীলাম খরিদ্দার নীলামী জমির ষোল আনা জমির সালিয়ানা খাজানার চতুর্গুণ টাকা জমিদার নজর বাবদ পাইবেন।

৫ম প্রস্তাব—দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী জোতের রায়ত, বৃক্ষ রোপণ, ছেদন, বৃক্ষ, ফল ও উৎপন্ন উপভোগ করিবার পূর্ণ অধিকার পাইবেন। তজ্জন্য জমিদার কোন ক্ষেত্রেই মূল্যাংশের দাবী করিতে পারিবেন না।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—খাজানা আইনের ৩০ (সি) ধারা মতে জমিদার নিজ ব্যয়ে রায়তী জোতের উন্নতি বিধান করিলে এবং তাহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে জমিদার সঙ্গত মত জমা বৃদ্ধি পাইবেন। তদ্ব্যতীত অন্য কোন হেতুতেই জমা বৃদ্ধির দাবী করিতে পারিবেন না।

৭ম প্রস্তাব—রায়তী প্রজা, বা দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট কোর্ফা প্রজা (অধীন রায়ত) তাহার বাস্তু ভিটাতে কাঁচা ও পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ও তাহার দখলী জমিতে পানীয় জলের কৃষিকার্য্যের বা অন্যান্য ব্যবহারের যে কোন উদ্দেশ্যে পাকা ইন্দারা ও পুকুর দিতে পারিবে। তজ্জন্য জমিদার কোন নজর পাইবেন না।

৮ম প্রস্তাব—প্রজার খাজানা দেয় হউক বা না হউক প্রজা তাহার বাকী খাজানা বা অগ্রিম খাজানা আদালতে আমানত করিতে বা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে পারিবেন, খাজানা আইনের ৬১ ধারা এই মর্ম্মে সংশোধন করা হয়।

৯ম প্রস্তাব—জমিদার খাজানা আইনের ১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারা মত সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা করিয়া তাহা না চালাইয়া পুনরায় দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিলে ও প্রজা ৫০ (২) ধারার Presumption এর দাবী করিতে পারিবে। এবং খাজানা আইনের ১১৫ ধারা তুলিয়া দেওয়া হউক।

১০ম প্রস্তাব—খাইখালাসী বন্দোবস্ত ফলে খাইখালাসী দাতা যে কোন সময়ের জন্য ঐ বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। নয় বৎসর ম্যাদের কোন সীমা-নির্দ্দেশ থাকিবে না।

১১শ প্রস্তাব—যদি কোন রায়ত এক জমায় হউক ১০০ শত বিঘার অনধিক রায়তী জোত না থাকে তবে তাহার অধীনস্থ অধীন রায়ত বাস্তু জমি ব্যতীত অন্য কোন জমির বাবদ দখলী স্বত্ব পাইবে না।

১২শ প্রস্তাব—খাজানা বাকী মোকদ্দমার বাকী করের জোতের স্বত্বাধিকারী সমুদয় প্রজাকে পক্ষ না করিয়া জমিদার বাকী খাজানার মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

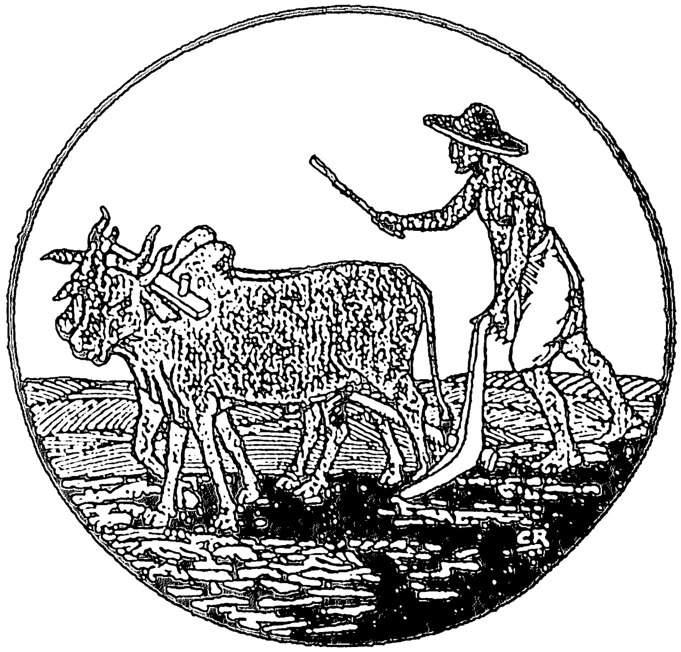
১৩শ প্রস্তাব—বর্ত্তমান খাজানা আইনের ৩ ধারার ২য় দফার Repeal করিয়া এবং সংশোধন আইনের ৩ ধারার ৩ দফা উঠাইয়া দিয়া Municipalityর অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলিতেও খাজানা আইন প্রয়োগ করা হউক।

১৪শ প্রস্তাব—এই সভায় প্রস্তাবগুলি বাংলার কাউন্সিল সভায় এবং সিলেক্ট কমিটীর প্রত্যেক সদস্যের নিকট লিখিত আকারে পাঠান হউক।

১৫শ প্রস্তাব—এই সভা প্রস্তাব করেন যে বাংলা দেশের প্রজাগণ প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় ও পল্লী সমূহে প্রজা সমিতি গঠন করিয়া প্রজাগণের মতামত কাউন্সিল সভায় সদস্য ও সিলেক্ট কমিটীর মেম্বরগণের নিকট পাঠাইয়া দেন।

———

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড্ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



লাঙল

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | বৃহস্পতিবার, ৭ই মাঘ, ১৩৩২ | পঞ্চম সংখ্যা

জন্মোৎসবে

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

—ঃ০ঃ—

শৃঙ্খলিতা জননীর স্নেহ-স্নিগ্ধ কোলে
শুভ শঙ্খ-রোলে
প্রথম যে দিন
হে নবীন,
এসেছিলে তুমি
সেদিন তোমার জন্মভূমি
এ কথা ভাবেনি কল্পনায়,
এক দিন বজ্রাগ্নি-প্রভায়,

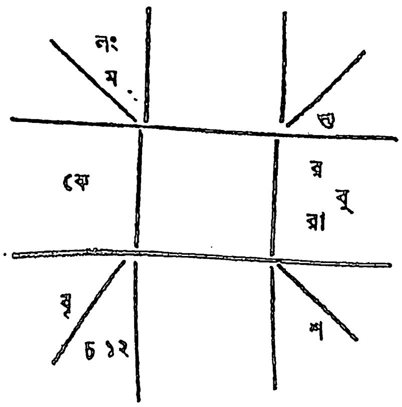
এই বালারুণ
লয়ে তার তেজ-দীপ্ত জীবন তরুণ,
উজ্জ্বল করিয়া দিবে এ দেশের পাণ্ডুর আকাশ
দূর করি অন্ধকার বিষাক্ত বাতাস
দানিবে নির্জ্জীব মনে নূতন পরাণ,
নব যৌবনের গান
কোন্ দীপকের সুরে উচ্চকণ্ঠে গাহি,
আনিবে সে বাহি
জননীর মুক্তির আশ্বাস।
হে উদার তরুণ তাপস, তোমার বিশ্বাস,
সুগভীর আত্ম-নির্ভরতা
যে বারতা
দিয়াছে আনিয়া সুপ্তিময় যৌবনের কানে,
জাগাইয়া অচেতন প্রাণে
জীবনের বিদ্যুৎ-স্পন্দন,
বন্ধ করিয়াছ আজ ভিক্ষুকের নিষ্ফল ক্রন্দন;
সর্ব্ব স্বার্থ করি পরিহার,
স্বদেশের স্বাধীনতা ব্রত করি সার
জীবনে তোমার,
পূজিয়া তন্ময় চিত্তে জন্মদা শ্যামার
কারাগার করেছ বরণ,
তুচ্ছ করি সর্ব্ব বাধা বিপদ মরণ
চেয়েছিলে মায়ের সম্মান;
জননীর ক্রোড় হ'তে সবলে বিচ্যুত হে সুযোগ্য দেশের সন্তান
তোমার দৃষ্টান্ত ধরি
তব পথ অনুসরি
আজও যারা চ'লেছে নির্ভয়ে,
মুক্তি ক্রয়ে
মূল্য দিতে অমূল্য জীবন
বজ্রদৃঢ় পণ;
হে গরিষ্ঠ নব বন্ধু
বীর-প্রসূ
জননীর হে নবীন শাস্তনু-নন্দন,
তোমার এ জন্মদিনে আজ
কিশোর রাজ্যের ওগো নির্ব্বাসিত বীর যুবরাজ,
তাহাদের সকলের ভালে
পরাইয়া জয়-টিকা বক্ষচিরি শোণিতের লালে
তোমারে করিব সম্মানিত
হে দেশ-বন্দিত।



দেশভক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

—:❁:—

সুভাষচন্দ্রের রাশিচক্র



জন্মক্ষণ

শকাব্দা ১৮১৮। সন ১৩০৩

ইংরেজী ১৮৯৭। ২৩শে জানুয়ারী।

১১ই মাঘ শনিবার আন্দাজ ১২।১৫ মিনিট, দং ১৩।৩৭।৩০

কন্যারাশি—

উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র—

নরগণ—

বৈশ্যবর্ণ—

শুভেচ্ছা

আগামী ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করবেন। তিনি শীঘ্র কারামুক্ত হ'য়ে এসে সহায়হীন শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্তিপথে অভিযানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করুন এবং সফলকাম হয়ে শত বর্ষ পরমায়ু লাভ করুন, তাঁর ত্রিংশ জন্মদিনে আমাদের এই শুভেচ্ছা।

বাল্যকথা

সুভাষচন্দ্রের পিতা-মাতা-ভাই-বোন সকলেই অশেষ গুণের আধার। এরূপ আকরেই মণিরত্নের জন্ম সম্ভব। সুভাষচন্দ্রের পিতামাতা এখনও বর্ত্তমান। সন ১৩০৩, ১১ই মাঘ তারিখে সুভাষ কটকে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কটকের ইউরোপীয় স্কুলে সুভাষ শিক্ষারম্ভ করেন। তারপর ইংরেজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। তাঁর মত মেধাবী এবং শক্তিশালী ছাত্র বিদ্যালয়ের গৌরবস্বরূপ ছিলেন। সেকেণ্ড-ক্লাসে পড়ার সময় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস মহাশয় প্রধান শিক্ষক হ'য়ে আসেন। বেণীবাবুর আদর্শ দেবচরিত্র সুভাষকে মুগ্ধ করে। এই বেণীবাবু বদলি হইয়া অন্যত্র গেলে তাঁরই চেষ্টায় তাঁর একটি ছাত্রের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় ঘটে এবং উভয়ে গভীর সৌহৃদ্যে বদ্ধ হ'ন। এই সময় হ'তে সুভাষের চরিত্রের অদ্ভুত বিকাশ আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বে সুভাষ রামকৃষ্ণকথামৃত প'ড়তেন, ধ্যান-ধারণা অভ্যাস করতেন এবং ধর্ম্মপ্রাণা মাতৃদেবীর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু এখন যেন তাঁর মনের সব বাঁধ ভেঙ্গে গেল। পরীক্ষার পড়ায় আর মন বসে না—পীড়িতের সেবা, দরিদ্রের দুঃখমোচন ইত্যাদি কর্ম্মেই সুভাষচন্দ্রের সময় কাটতে লাগল। তবুও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন এবং ইংরেজী এত ভাল করেছিলেন যে, পরীক্ষক স্বীকার করেছিলেন—তিনিও ওরূপ পারতেন না।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দেই সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত, গণিত ও লজিক নিয়ে আই-এ-ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ন। এই সময়ে ডাঃ সুরেশ বাঁড়ুয্যে মহাশয় এবং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মেডিকেল মেসে একটি দল করেছিলেন। এই দলে অনেক ভাল ভাল ছেলে ছিল। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিবাহ না ক'রে দেশের সেবা ক'রে ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করা। সুরেশবাবু অভয় আশ্রমের সভাপতিরূপে এখন সেই আদর্শ কাজে পরিণত করেছেন। বন্ধুর সহিত সুভাষচন্দ্র এই দলে যোগ দেন। পরে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি আরও অনেকে আসেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বন্ধুর সঙ্গে হরিদ্বার গিয়ে গুরুর সন্ধানে হিমালয় যান। দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া, প্রভৃতি স্থানে এই উপলক্ষে ঘুরে ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে ফিরে আসেন। আগ্রাতে প্রেমানন্দ বাবাজী ব'লে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়। ইনি গ্রাজুয়েট এবং বড় ভদ্রলোক। গৃহস্থাশ্রমীদের মত থাকতেন ব'লে তাঁর সঙ্গে বনিবনাও হ'ল না। বৃন্দাবনে এসে কুসুম সরোবরে ৺রাজর্ষি বনমালী রায় সুভাষচন্দ্রের ও তাঁর বন্ধুর জন্য বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠের বন্দোবস্ত করেন। পরে সাধু রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী কিন্তু তাঁদের মনীষা, ধীশক্তি এবং মানসিকতা দেখে কাশীতে গিয়ে জ্ঞানমার্গের চর্চ্চা করতে উপদেশ দেন। বারাণসীতে তাঁরা কিছুদিন রামকৃষ্ণ মিশনের ৺ব্রহ্মানন্দ স্বামী ওরফে রাখাল মহারাজের নিকট থাকেন। তিনি বলেন বাপ-মাকে না ব'লে পালিয়ে এসেছ—বাড়ী ফিরে যাও।

তাই কাশী থেকে রওনা হয়ে সুভাষচন্দ্র বন্ধুর সঙ্গে বোধ-গয়া আসেন। বোধ-গয়ায় কিছুদিন থেকে মোহন্ত মহারাজের বিলাসিতার বহর দেখে সন্ন্যাসধর্ম্মের দুরবস্থা দেখে বাড়ী ফেরাই সঙ্গত মনে করেন।

নানা অনিয়মে অত্যাচারে, সুভাষের শরীর খারাপ হয়ে গেছল। অবিলম্বে টাইফয়েড জ্বরে সুভাষচন্দ্র বহুদিন শয্যাগত থাকেন। পূজার সময় কার্সিয়ং-এ চেঞ্জে গিয়ে শরীরটা একটু ভাল হয় এবং ১৯১৫ অব্দেই তিনি ২১৪ দিন প'ড়ে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন—প্রথম শ্রেণীর উপর দিকেই তাঁর নাম ছিল।

আই-এ-পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজেই তিনি দর্শনে অনার নিয়ে পড়তে থাকেন এবং নিজের চরিত্র ও কার্য্যকারিতা গুণে ছাত্রগণের নেতার স্থান অধিকার করেন।

এই সময়ে অধ্যাপক ওটেন একটি ছেলেকে গাল দেওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে গোলযোগ হয় এবং কলেজে ধর্ম্মঘট করা ও ওটেন সাহেবকে মারার অপরাধে সুভাষচন্দ্র "রাষ্টিকেট্" হ'ন। তাঁর সহকর্ম্মী শ্রীযুত অনঙ্গমোহন দাম অন্তরীণ হ'ন—সুভাষচন্দ্র কটকে প্রায় তন্দ্রাবস্থায় প্রায় দু'বছর থাকেন। তারপর স্যার আশুতোষের চেষ্টায় পুনরায় পড়বার অনুমতি পেয়ে স্কটিশচার্চ কলেজে আবার বি-এ-তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে দর্শনে অনার নিয়ে ভর্ত্তি হ'ন। এই সময়ে তিনি ইউনিভার্সিটি সৈন্যদলে যোগদান করেন। বি-এ পরীক্ষায় দর্শনে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তারপর ১৯১৯ অব্দে ইউনিভার্সিটি Experimental Psychology—এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। এবং মাস দুইয়ের মধ্যেই পিতার প্রস্তাব মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আই-সি-এস-পড়তে বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ভেবেছিলেন, যে অল্প সময় ছিল তার মধ্যে আই-সি-এস-পাশ করতে পারবেন না এবং কেম্ব্রিজের ডিগ্রী নিয়ে এসে শিক্ষাদানব্রত গ্রহণ ক'রে জীবন কাটাবেন। পাশ ক'রে তিনি তাঁর বন্ধুকে চিঠি লেখেন—"তুমি শু'নে দুঃখিত হবে যে, আমি আই-সি-এস পাশ করে ফেলেছি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেছি। এখন উপায় কি?"

পূর্ব্ব হ'তেই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কথা ছিল, যদি পাশ করতে পারেন তাহ'লে I-C-S ছেড়ে দিয়ে একবার চাকরী রোগগ্রস্ত বাঙালীদের সামনে একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করতে হবে। আই-সি-এস এ তিনি ইংরেজী রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২১ অব্দের মে মাসে কেম্ব্রিজের বি-এ ডিগ্রী নিয়ে আই সি-এস ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনের কাজে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তরূপে

যোগ দেন। আই-সি-এস-ছাড়ার আগে দেশবন্ধুকে তিনি পত্র দিয়ে কি কাজ পাবেন, জানতে চেয়েছিলেন। দেশবন্ধু ন্যাশনাল কলেজ ও কংগ্রেসের ভার তাঁকে দেবেন ব'লে পত্র লিখেছিলেন। সেক্রেটারি অব্ ষ্টেটের অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস-পদত্যাগ করেন। এই ঘটনায় বিলাতের অনেকে আই-সি-এস না হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সুভাষচন্দ্রের অনুবর্ত্তী শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় ব্যারিষ্টারি না ক'রে দেশবন্ধুর দলে যোগ দেন।

ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষপদে থাকার সময় ভলাণ্টিয়ার আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলনের নেতাপদে বরিত হ'ন। ১৯২১ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ১৭ (বি) ধারায় দেশবন্ধুর সঙ্গে গ্রেপ্তার হ'ন এবং প্রায় তিনমাস হাজতে থাকার পর ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। দণ্ডাদেশ শুনে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—"Have I robbed a fowl!—"আমি কি মুর্গীচোর যে এত কম দণ্ড হ'ল!"

সুভাষচন্দ্র জেলে থাকতে দেশবন্ধুর রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত থাকতেন। জেল থেকে খালাস পেয়ে কিছুদিন পরে তিনি উত্তরবঙ্গ বন্যাপ্লাবন রিলিফ্ কমিটির ভার নিয়ে অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতা প্রদর্শন করেন।

উত্তরবঙ্গ হ'তে ফিরে সুভাষচন্দ্র দৈনিক "বাংলার কথা" চালাচ্ছিলেন। ১৯২২ অব্দের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর সহকারীরূপে যান। সেখানে স্বরাজ্য দল সৃষ্টি হয় এবং সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর প্রধান সহকারীরূপে এই দলের বাংলা দেশে সাফল্য সম্পাদন করেন। "ফরওয়ার্ড" পত্র পরিচালন ও কাউন্সিল নির্ব্বাচন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র অদ্ভুত পরিশ্রম করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদে নির্ব্বাচিত হন। তিনি নিজে কাউন্সিলে দাঁড়ান নি—কারণ বাইরে কাজ যথেষ্ট ছিল, আবার ভোটারের তালিকায় তাঁর নামও ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মপন্থা

১৯২০ অব্দে সুভাষচন্দ্র Young Bengal Party নামে একটি দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। সেই দলের অনুষ্ঠান পত্র হতে দেখা যায় সুভাষচন্দ্র ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ লাভই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন। ধর্ম্ম এবং সমাজ এবং মতামত বিষয়ে তিনি সকলের যথাসম্ভব স্বাধীনতা চেয়েছিলেন; শ্রমিক এবং কৃষকগণের স্বার্থের সহিত এই দলের একীকরণ তাঁর ঈপ্সিত ছিল।

শ্রমিকগণকে যাতে অতিরিক্ত খাটতে না হয়, বেতনের একটা নিম্নতম হার থাকে, অসুখের সময় বেতন না কাটা যায়, বৃদ্ধকালে পেন্সন, দুর্ঘটনা স্থলে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি পায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা এই দলের অভিপ্রেত ছিল।

কৃষকগণকে অন্ততঃ নিম্নলিখিত অধিকার দেওয়া সুভাষচন্দ্রের মত ছিল।

(১) অন্যায় এবং বাজে আদায় বন্ধ করা।

(২) সুদের একটা চরম হার নির্দ্ধারণ।

(৩) গাছ কাটা, ইঁদারা পুকুর কাটা এবং পাকান ইমারত করার অবাধ অধিকার।

(৪) হস্তান্তরের অবাধ ক্ষমতা।

(৪) কৃষকের ভূমিতে স্বত্বলাভ।

১৯২৪ অব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হ'ন—কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদে বরিত হন'। তিন হাজারের স্থলে সুভাষচন্দ্র দেড় হাজার টাকা বেতনে কার্য্যে ব্রতী হন। যে অল্প কয়েক মাস তিনি কাজ করেছিলেন, তাতে সকলেরই তিনি প্রশংসার পাত্র হতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের এতটা সইল না—সুভাষচন্দ্র ১৯২৪ অব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে বিনা বিচারে বন্দী হ'লেন। আলিপুর জেলে থাকতে তিনি কিছুদিন কর্পোরেশনের কাজ চালাতেন, কিন্তু কর্ত্তারা তাঁকে বহরমপুরে চালান দিলেন এবং কিছুদিন পরে সেখান থেকে একবারে ব্রহ্মদেশে মন্দালয় জেলে পাঠালেন।

মন্দালয়ে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে—রাত্রে ঘুম হয় না—পিঠে বেদনা—অজীর্ণ রোগ এবং ওজন প্রায় দশ সের কমে গেছে। দেশের জন্য সুভাষচন্দ্রের তিলে তিলে মৃত্যু কি দেশবাসীকে এখনও সজাগ করবে না?

বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ, অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর।

—রবীন্দ্রনাথ।

সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী

(জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত)

—:০:—

(১) সন্ন্যাস হ'তে ফিরে বাড়ী ঢুকিবার পর।

৩৮।২ এলগিন রোড,
কলিকাতা।
১৯.৮।১৪

ট্রাম হইতে নামিয়া বুক টান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম।—মামা, ও একটি পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়। তাঁহারা একটু আশ্চর্য্য হইলেন। ভিতরে পিষা মহাশয়, দাদা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল। মার কাছে খবর গেল। অর্দ্ধেক পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা। প্রণাম করিলাম—তিনি থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে এইমাত্র বলিলেন, "আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম।" বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি ত প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি শুইয়া পড়িলেন আমি ধীরে ধীরে পায় হাত বুলাইতে লাগিলাম।

তার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া দুই জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলাম, সমস্ত frankly বলিলাম। কেবল বলিলেন, একখানা চিঠি দাও নাই কেন?

নানা স্থানে টেলিগ্রাম ও খোঁজ করা হইয়াছিল। মা পাগল-প্রায় হওয়াতে অগত্যা মামা চলিলেন আমার অনুসন্ধানে—বৈদ্যনাথ ও দেওঘরে পাহাড়ে সব খোঁজ করিয়া একখানি পত্র দিয়াছেন—আজ পৌঁছিয়াছে—তাহার মর্ম্ম শুনিয়াছি। স্বামী বালানন্দের কাছে গিয়াছেন। আর একজন ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, "যদি উপযুক্ত না হইয়া গিয়া থাকে, তবে ধাক্কা খাইয়া ফিরিবে, না হয় ফেরাইবার চেষ্টা বৃথা। বেলুড়ে খোঁজ করা হইয়াছিল—হরিদ্বার রামকৃষ্ণ মিশনে তার করা হইয়াছিল। হাওড়ার একজন গণৎকারের কাছে যাওয়া হইয়াছিল—তিনি বলেন, ফিরিয়া আসিবে ১৯।২০ দিনের ভিতর, ভাল আছে, একলা নাই, উত্তর পশ্চিমে "ব" দিয়া কোন স্থানে আছে, তখন বোধ হয় আমরা বারাণসীতে। তিনি আরও বলেন contrary influenceএর জন্য সে সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না—সংসারী হইবে। তাঁর মাথায় লাঠি! তিনি কচুপোড়া খাবেন!

দুপুরে ফের বাবার সঙ্গে অনেক কথা হয়। নানামত লইয়া সন্ন্যাসী দর্শন সম্বন্ধে এবং ভ্রমণের সম্বন্ধে। বলিলাম কাহাকেও পছন্দ হইল না। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার আদর্শটা বলিলাম। সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি বুঝাইতে চাহিলেন (১) সংসারে থেকে ধর্ম্ম হয় কি না (২) ত্যাগের জন্য preparation দরকার (৩) কর্ত্তব্য ত্যাগটা কি ঠিক? আমি বলিলাম—(১) সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয়, কারণ সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয় (২) সংসারের উপর ত্যাগটা অনেকটা নির্ভর করে, সকলের পক্ষে বেশী দূর যাওয়া প্রয়োজন না হইতে পারে (৩) কর্ত্তব্যটা relative, higher call এলে lower calls ভেসে যায়—জ্ঞান এলে কর্ম্মনাশ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্বৈত জ্ঞান "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা"—একটা theory কি না—বলিলাম, যতক্ষণ মুখে বলছি, ততক্ষণ theory, কিন্তু realise করিলে সত্য এবং realise করা যায়। যাঁহারা এ কথা বলে গেছেন তাঁরা realise করেছিলেন এবং বলে গেছেন আমরাও realise করতে পারি। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কা'রা করেছিলেন এবং প্রমাণ কি?" বলিলাম—"ঋষিরা করেছিলেন, প্রমাণ—"বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তং" ইত্যাদি। আমি বলিলাম—বিবেকানন্দের আদর্শ হচ্ছে আমার আদর্শ। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা যখন তোমার higher call আসিবে, তখন আমরা দেখিব।"

Next time চলিয়া গেলে বাবা বোধ হয় আর ফিরাইবার চেষ্টা ও সংকল্প পরিত্যাগ করিবেন, মা বলেন—"আমার ও যদি যায়, আমি আর থাকিব না।" তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা সফল হইবে না বলিয়া বোধ হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব reasonable। যাহা হউক আসাতে ভাল হইয়াছে এখন দেখিতেছি। ইতি

শ্রীসুভাষ

জীবনের মিশন

৩৮।২, এলগিন রোড, কলিকাতা।
৩১।৮।১৫

আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন, যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে—তারই জন্য আমার শরীর ধারণ—and I am not to drift in the current of popular opinion—লোকে ভালমন্দ বলিবে জগতের এটা রীতি—but my sublime self-consciousness consists in this that I am not affected by them. যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্ত্তন অর্থাৎ দুঃখ, নৈরাশ্য প্রভৃতি আসে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য, সম্মুখে পর্ব্বত আসছে কি কূপ আসছে—তার সে জ্ঞান থাকে না—সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য misson-এর দিকে, আদর্শের দিকে—তার ও-সব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। I must move about with the proud self-consciousness of one imbued with *an idea*.

যাক, আমি এখন বুঝিতেছি—যে, মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিস চাই—

(1) embodiment of the past

(2) product of the present

(3) prophet of the future

(1) I must assimilate all the past history in fact all the past civilisation of the world.

(2) I must study myself—study the world around me—both India and abroad and for this foreign travels are necessary.

(3) I must be the prophet of the future—I must discover the laws of progress—the tendency cf both the civilisations and therefore to settle the the future goal and progress of mankind. The Philosophy of life with also help me in this.

This ideal must be realised through a nation—begin with India.

Is not this a grand idea? But it is so difficult to realise an Idea. But what of that, we shall shake hands in the common march.

The more we lift our eyes heavenwards the more we shall forget all that was bitter in the past. The future will dawn upon us in all its glory.

সুভাষ

---

(৩) ভারতের নবজাগরণ

৩৮।২, এলগিন রোড্,

কলিকাতা।

১।২।১৬

জীবন নদীতে বিপরীত স্রোত অনবরত বহিতেছে। একস্রোত অন্ধকারের দিকে টানিয়া লয়, এবং অপর স্রোতটি ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই দুইয়ের সঙ্গে সংগ্রামই জীবনের পুরুষকার।

ভারত এখন নবজীবনে পদার্পণ করিতেছে। তমোময়ী অমা-

আগামী বারে
সুভাষচন্দ্রের
বিলাতের পত্র
বাহির হইবে।

নিশার অবসানে আবার ঊষার আলোক ভারতের গগন রঞ্জিত করিতেছে। তাহা কোন্ ভারতীয় যুবক এখন না দেখিতেছে বা অনুভব করিতেছে। ধন্য আমরা যে এই শুভ সময়ে জন্মিয়াছি এবং বর্তমান "অশ্বমেধ যজ্ঞ" সম্পাদন নিমিত্ত কাঠাহরণের সুযোগ পাইয়াছি।

একবার অতৃপ্ত নৈরাশ্য ত্যাগ করিয়া নয়ন মেলিয়া দেখ পূর্ব্ব-গগনে কি সুন্দর নবরাগের শোভা। চারিদিকে ভবিষ্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ উচ্চৈঃ শঙ্খ নিনাদ করিয়া সেই আলোকময় ভবিষ্যতের আবাহন করিতেছে। তুমি কি ইহাতে যোগদান করিয়া প্রাণের সঙ্গীত ঢালিয়া দিবে না? ইতি

শ্রীসুভাষ

---

(৪) "আবার তোরা মানুষ হ"

৩৮।২, এলগিন রোড,

কলিকাতা

৮।২।১৬

"আবার তোরা মানুষ হ"—কবির এই কথাগুলি আমার বড়ই ভাল লাগে, কারণ কথাগুলি বড় ভাবপূর্ণ। তোমাকে, আমাকে, রাম, যদু, হরি, শ্যামকেই নিয়েই তো ভারত। আমরা যদি মানুষ হ'তে পারি তো ভারত জাগিবে। ভারতের কঙ্কালময় দেহের মধ্যে এখনও প্রাণ ধক্ ধক্ করিতেছে—ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরগণ বারংবার তাহাই বলিতেছেন। অতএব ভাবনা কিসের? এত অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য, পরশ্রী-কাতরতা, পরস্পর ঈর্ষা, অসূয়া, কাপুরুষতা প্রভৃতি সত্ত্বেও ভারতের জন্য প্রাণের মধ্যে আশা হয়—কেন হয় তা বলিতে পারি না।

"Know Thyself" নিজেকে চিনিয়া নিজের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। তুমি যে শক্তির অধিকারী, তাহার বিকাশ কর।

নবীন উৎসাহে তোমার হৃদয় ভরিয়া যাক—নবীন আশা তোমার কল্পনাকে অধিকার করুক—যৌবনের আনন্দ ও শক্তি শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হউক—সূর্য্য কিরণে প্রস্ফুটমান পদ্মের মত তোমার অন্তর জীবনের বিকাশ হউক। জীবনের পূর্ণতা অনুভব করিয়া ধন্য হও, ইহাই আমার বিনীত আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা।

ইতি

শ্রীসুভাষ

---

(৫) সৈনিক জীবনের আনন্দ

৩৮।২, এলগিন রোড,

কলিকাতা,

৩০।৪।১৮

গত শুক্রবার আমরা সকলে ক্যাম্প হইতে বাড়ী ফিরিয়াছি। Capt Gray আগামী মাস হইতে General I, D, F, এর ভার লইবেন।

আমাদের Experienceটা মোটের উপর খুব pleasant

এবং যাহা শিখিয়াছি, তাহার দ্বারা সকলেই যে কিছু উপকার পাইয়াছি তার কোন সন্দেহ নাই। তবে তিন মাসের training এর effect তত lasting হ'তে পারে না এবং কোন জিনিষের লাভালাভ পাত্রাপাত্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

আমাদের Experience এর ভিতর romance বিশেষ কিছু নাই, সেইজন্য কলিকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে monotonous বোধ হইত। কিন্তু বেলঘরিয়ায় থাকিতে যখন ঝড় বৃষ্টিতে তাঁবু সব ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত continual firing চলিয়াছিল, তখন কতকটা field-service এর মত বোধ হইয়াছিল। তারপর পাইখানা পরিষ্কার করা, দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে পানীয় আহরণ করা, রাত্রিতে "শান্ত্রী" পাহারা দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি night operationগুলি জীবনটাকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তারপর বেলঘরিয়ায় থাকিতে যে shooting competition হইয়াছিল তাহাতে British Instructorরা তোমাদের কাছে পরাস্ত হইয়াছিল। শেষ কয়দিন camp life এত pleasant বোধ হইয়াছিল যে তার প্রতি বেশ একটু মায়া জন্মিয়াছিল এবং camp ছাড়িতে সত্যিই কষ্ট সকলেরই হইয়াছিল।

তুমি আমার উন্নতি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছ—উন্নতি আমার কিছু হয় নাই—শেষ পর্য্যন্ত আমি private ছিলাম। তাহার একটা কারণ এই যে Capt. Gray আদেশে N. C. O. দের Stripe কেড়ে নেওয়া হয় এবং nomination এর পরিবর্ত্তে by vote একটা fresh election হয়। সে সময়ে আমি বসন্ত হ'য়ে absent ছিলাম সুতরাং সমস্ত posts filled up হ'য়ে যায়।

ইতি

শ্রীসুভাষ

---

(৬) বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে

আমি একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। কাল বাড়ী থেকে একটা offer পেয়েছি—বিলাত যাত্রার জন্য। আমাকে এখনই বিলাত যাত্রা করিতে হইবে—বিলাতে পৌঁছিয়া এখন কোনও ভাল ইউনিভারসিটিতে স্থান পাওয়ার আশা নাই। সকলের ইচ্ছা আমি কয়েক মাস পড়িয়া Civil Service পরীক্ষায় appear হই। আমি ভাবিয়া দেখিলাম Civil Service পরীক্ষায় পাশ করিবার আশা নাই। সকলের মত যে আমি পরীক্ষায় ফেল হইলে আগামী অক্টোবরে কেম্ব্রিজে বা লণ্ডনে প্রবিষ্ট হইব। আমার নিজের primary উদ্দেশ্য বিলাতের University Degree লাভ করা—কারণ তাহা না হইলে Education lineএ সুবিধা করিতে পারিব না। যদি আমি এখন বলি যে Civil Service পড়িতে যাইব না—তাহা হইলে এখনকার মত (এবং চিরকালের মত) বিলাতযাত্রা প্রস্তাব তোলা থাকিবে। ভবিষ্যতে আর ঘটিয়া উঠিবে কি না জানি না। এরূপ অবস্থায় আমার কি এ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত? তবে একটা গুরুতর মুস্কিল এই—যদি Civil Service পরীক্ষায় পাশ হইয়া যাই! তাহা হইলে আমি উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইব। বাবা কলিকাতা আসিয়াছিলেন কালই প্রস্তাবটা তোলেন এবং কালকের মধ্যে একটা মত দিতে হইতেছে। বাবা কালই কটক চলিয়া গেছেন, আমি বিলাত যাইতে স্বীকৃত হইয়াছি। তবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ঠিক বুঝিতেছি না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। তুমি যদি শীঘ্র একবার কলিকাতায় আসিতে পার ত বড় ভাল হয়। শুনিলাম তুমি ৪ঠা আসিবে, কিন্তু তাহাতে বড় বিলম্ব হয়। ইতি

---

(৭) মানসিক অবস্থা

৩।৯ ১৯

এ কয়দিন মানসিক তুফানের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। অনেক সংগ্রামের পর যাত্রা করিবার বিষয়ে মত দিয়াছিলাম—তবুও মনকে আশ্বস্ত করিতে পারি নাই যে আমার বিবেচনা ঠিক হইয়াছে। যাহা হউক তোমার পত্র পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। ভয়ানক ব্যস্ত থাকায় কাল পত্র দিতে পারি নাই। আমি ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কলিকাতা হইতে জাহাজে রওনা হইতেছি—যদি অবশ্য এর মধ্যে সমস্ত জোগাড় এবং বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারি।

লেখাপড়া সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিবার দরকার আছে। যাহা হউক তুমি এখানে আসিলে সে সব ঠিক হইবে। ইতি—

শ্রীসুভাষ

দেশবন্ধু সম্বন্ধে

সুভাষচন্দ্রের চিঠি*

—:0:—

Mandalay Central Jail,
12-8-25

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

"মাসিক বসুমতীতে" আপনার "স্মৃতিকথা" তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি, দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

* সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত। কার্ত্তিক সংখ্যার "বঙ্গবাণী" হইতে উদ্ধৃত।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হাল্কা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকেদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করিতে হয়।"—এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তাঁর অনুগত কর্ম্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সব চেয়ে ভাল লাগল "একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মাঝে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আর আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার জায়গাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না।" বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? ওরা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে, তা' হ'লে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয় "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ।" আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে?

আর একটা কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে। ......"আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।" প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও পারতেন না। আর তিনিও মতনির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্যচরিত্র বিচার করতে দেখি নি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সব চেয়ে বেশী ঝগড়া। নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকিবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যত বড় বন্যা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো—মার (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায়—"রাগ করিবার, অভিমান করিবার যায়গাও আজ আমাদের ঘুচিয়া গেছে।"

আপনি এক যায়গায় লিখেছেন "লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সে দিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলকাতায় ফিরি—তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্দ্ধসত্যে বাঙ্গলায় সব খবরকাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তৃতাটাও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় না। তখন স্বরাজ্য-ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব বেশী প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়টী প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ব্বগৌরব ফিরে এল—বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না! কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ভাণ্ডারে অর্থ-সঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবরকাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা' বাহিরের লোক জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্ম্মভার—এই দুইয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে তাঁর স্বদেশ-সেবা-ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রীঃ ধরপাকড়ের সময়ে তিনি স্থিরসংকল্প করেছিলেন যে একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এরকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্ন স্তরেরই বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন তাই আমরা বলেছিনুম যে, তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্ত্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না! অনেকক্ষণ ধরে তর্কবিতর্ক চলে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারি নি। শেষে তিনি বলেন—"এটা আমার আদেশ; তোমাদের মত যা'ই হোক না কেন—আমার আদেশ পালন করতে হবে।" তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার বা দাবী নাই, সেইজন্য তাঁকে তিনি পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগ্‌দত্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কিনা—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হল। তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা—কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত না। কারণ একেই তিনি অসুস্থ তারপর আবার বাগ্‌দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষ সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব্বপ্রথমে তোমরা যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও উর্ম্মিলা দেবী যাবেন—এবং তাঁর ডাক যে মুহূর্ত্তে আসবে—তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে—তার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁর সাধনা শুধু নিজকে নিয়ে নয়—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে।

আমার মনে হয় যে মহাপুরুষদের মহত্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের "বসুমতীতে" আমি দেশবন্ধুর সহকর্মী ও অনুগত কর্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের—এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হল তা' বলতে পারিনা। * * * দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্মীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারিনা যে দেশবন্ধুর অকাল দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা এবং তাঁর অনুচরবর্গ কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা' হ'লে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হ'ত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বকল্‌মা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা—শুধু আমার কেন এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতিকথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না—অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। এখানে দুঃখে কষ্টে স্মৃতিতে ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গায়ে আঘাত ক'রে যে ব্যথা বোধ হয়—সে ব্যথার মধ্যেও যে কোনও সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে যে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয় বন্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ একটা শান্তি একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের চঞ্চলতা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দারিদ্র—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাংলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় বোধ হয় [illegible] কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছিলেন—

"সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাংলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাংলার মাটী, বাংলার জল—বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

কেন এ পত্র লিখে ফেল্লুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব একথা আগে কখনও মনে আসে নি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসাতে লিপিবদ্ধ করলুম। আর যখন লিখেই ফেলেছি—এখন পাঠিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয়—দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখিনা। যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

C-O D. I. G., I. B, C. I. D.
13 Elysium *Row.*
Calcutta.

ইতি—
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

নজ্‌রুল ইস্‌লামের পত্র

—ঃ০ঃ—

আমার প্রিয় ময়মনসিংহের প্রজা ও শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ!

আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, আপনাদের এই নব জাগরিত প্রাণের স্পর্শে নিজেকে পবিত্র করিয়া লইব, ধন্য হইব। কিন্তু দৈব প্রতিকূল হওয়ায় আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমার শরীর আজও রীতিমত দুর্ব্বল, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার মত শক্তি আমার একেবারেই নাই। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা সকলে ক্ষমা করিবেন। এই ময়মনসিংহ আমার কাছে নূতন নহে। এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আমি অশেষ ঋণী। আমার বাল্যকালের অনেকগুলি দিন ইহারই বুকে কাটিয়া গিয়াছে। এইখানে থাকিয়া আমি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছি। আজও আমার মনে সেই সব প্রিয় স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। বড় আশা করিয়াছিলাম, আমার সেই কৈশোর-চেনা ভূমির পবিত্র মাটী মাথায় লইয়া ধন্য হইব, উদার-হৃদয় ময়মনসিংহ জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে আমার লৌহ-প্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব, কিন্তু তাহা হইল না,—দুরদৃষ্ট আমার। যদি সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ দিন দেন, আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আপনাদের গফরগাঁওয়ের নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ও আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব। আপনারাই দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ। মাটির মায়ায় আপনাদেরই হৃদয় কাণায় কাণায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই। রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া—দিন নাই রাত নাই—সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই ত এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয় সন্তানের মত লালন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন, ও করিবেন,—আপনাদের মাঠের এক কোদাল মাটী লইলে আপনারা আততায়ীর হয় শির লেন কিংবা তাকে শির দেন,—এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটী, এত বুকের খুনে উর্ব্বর যে শস্যশ্যামল মাঠ,—আপনারা আমার কৃষাণ ভাইয়া ছাড়া তাহার অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষায় আকাশ ভরিয়া বাদল নামে, তাদের বুকের স্নেহ ধারার মতই মাঠ ঘাট পানিতে বন্যায় সয়লাব হইয়া যায়, আমার এই কৃষাণ ভাইদের আদরে সোহাগে মাঠঘাট ফুলে ফলে ফসলে শ্যাম সবুজ হইয়া উঠে,—আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় কাঁচা ধান সোনার রঙে রাঙিয়া উঠে,—এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর, মাঠে ইহার প্রতি ধ্বনি শুনিতে পাইবে,—এ মাঠ চাষার এ মাটী চাষার, এর ফুল ফল কৃষক-বধুর।

আর আমার শ্রমিক ভাইয়া, যাহারা আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়া হুজুরদের অট্টালিকা লালে লাল করিয়া তুলিতেছে, যাহাদের অস্থি মজ্জা ছাঁচে ঢালিয়া রৌপ্যমুদ্রা তৈরী হইতেছে, যাহাদের চোখের জল সাগরে পড়িয়া মুক্তামাণিক ফলাইতেছে,—তাহারা আজ অবহেলিত, নিষ্পেষিত, বুভুক্ষু। তাহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ক্ষুধায় পেট পুরিয়া আহার পায় না, পরণে বস্ত্র নাই।

হায় রে স্বার্থ! হায় রে লোভী দানব-প্রকৃতির মানব! আজ কৃষাণের দুঃখে শ্রমিকের কাৎরাণীতে আল্লার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। দিন আসিয়াছে, বহু যন্ত্রণা পাইয়াছ ভাই—এইবার তাহার প্রতীকারের ফেরেশ্‌তা দেবতা আসিতেছেন। তোমাদের লাঙল, তোমাদের শাবল তাঁহার অস্ত্র, তোমাদের কুটীর তাঁহার গৃহ! তোমাদের ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাঁহার পতাকা, তোমরাই তাঁহার পিতা মাতা। আমি আপনাদের মাঝে সেই অনাগত মহাপুরুষের শুভ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাদের নব জাগরণকে সালাম করিয়া নির্নিমিষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি, ঐ বুঝি নব দিনমণির উদয় হইল। ইতি।

দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে বল কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার,
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন।

—রবীন্দ্রনাথ

কমিউনিজম ও বলশেভিজম।

সাম্যবাদী সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ

——:০:——

কাণপুর, ২৫শে ডিসেম্বর কংগ্রেস মণ্ডপের সন্নিকটে নির্ম্মিত আর একটী বিশেষ মণ্ডপে সন্ধ্যায় ভারতীয় সাম্যবাদী সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এই সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মৌলানা আজাদ সোভানি, শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনলাল শেঠী, সত্যভক্ত, বেগম মোহানী এবং মৌলবী মুজঃফর আহম্মদ। মৌলবী মুজঃফর আহম্মদ বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে ইনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সমবেত সভ্যবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া মৌলানা হসরত মোহানী সাম্যবাদী সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—সর্ব্বপ্রকার বৈধ উপায়ে স্বরাজ অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করাই আমাদের অভিপ্রায়। অতঃপর আমরা দেখিব, যাহাতে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্রের আকার ধারণ করে।

সভাপতির অভিভাষণ

মাদ্রাজের মিঃ সিঙ্গারভেলু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—কমিউনিজমের অর্থ বিশ্বজগতের সহিত সহযোগিতা এবং ভারতীয় কমিউনিজম মোটেই বলশেভিজম নহে। আমরা বণিক সম্প্রদায়ের একাধিপত্য নাশ করিতে চাই। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জনসাধারণের জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সাম্যবাদ কি?

মৌলানা হসরৎ মোহানীর বক্তৃতা

সাম্যবাদী সম্মেলনে কোন নামজাদা কংগ্রেস বা খিলাফৎ নেতা উপস্থিত হন নাই। যাঁহারা এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই অল্প বয়স্ক যুবক। মৌলানা হসরৎ মোহানী তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, সাম্যবাদ কৃষকের ও শ্রমিকের আন্দোলন। ভারতবাসীগণ সাধারণভাবে এই আন্দোলনের কার্য্যপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সমর্থন করেন, কিন্তু বুঝিবার ত্রুটিতে দুর্ব্বল প্রকৃতি বিশিষ্ট কতিপয় লোক সাম্যবাদের নামেই আতঙ্কিত হন। স্বার্থান্বেষী বণিক ও বিরুদ্ধবাদী অপরাপর ব্যক্তির কারসাজিতেই কাহারও কাহারও মনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে; কেহ কেহ মনে করিতেছেন সাম্যবাদ রক্তপাত দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি করতঃ কার্য্যোদ্ধারের পক্ষপাতী। এইরূপ ধারণার এক কারণ হইতে পারে যে আমরা সময় ও অবস্থার উপযোগী এবং আবশ্যক বোধে অহিংসা গ্রহণ করিয়াছি এবং মহাত্মা চিরদিন এই একই নীতি ধরিয়া থাকেন, তাহাও আমরা চাহি না। কেহ কেহ আবার এতটা ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁহারা মনে করেন, সাম্যবাদীদের মতে 'তুমি' 'আমি' এক, তোমার জিনিষই আমার জিনিষ, আমার জিনিষেও তোমার সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে আমরা যাবতীয় সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত ও প্রাইভেট এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে ঘড়ি, ছাতা, বাসনপত্র, বিছানা, পোষাক-পরিচ্ছদ, গৃহ প্রভৃতি ব্যক্তিগত বা নিজস্ব সম্পত্তি, আর জায়গা-জমি, কলকারখানা প্রভৃতি প্রাইভেট সম্পত্তি। কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদীদের বিধি ব্যবস্থাগুলি কেবল প্রাইভেট সম্পত্তির প্রতি প্রযোজ্য হইবে; নিজস্ব সম্পত্তির পক্ষে ঐ সকল খাটিবে না। বিস্তৃতভাবে বলিবার সময়াভাব; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আমাদের নীতিতে বণিকের বা প্রাইভেট সম্পত্তির কোন স্থান নাই। সাধারণের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে সাম্যবাদকে এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—জলবায়ুর ন্যায় ভূমি ভগবানের দান এবং সেই জন্য সাধারণের সম্পত্তি, জমির কাহারও স্বত্ব স্বামিত্ব বর্ত্তিতে পারে না। মনুষ্য কেবলমাত্র নিজের উপর সুবিধার জন্যই ইহা ব্যবহার করিতে পারে। যাহাতে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়, সেজন্য বা স্বীয় স্বাধীনতা ও আমাদের জন্য মানব জমি কাযে লাগাইবে। প্রত্যেক পল্লীর লোকজন গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে নিজেদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারে; ইহাই আমাদের কার্য্য—সোভিয়েট শাসন-নীতি। আমাদের নীতির যে অংশের সহিত সোভিয়েট নীতির মিল আছে, তাহা আলোচনার পর কনফারেন্সে গৃহীত হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে—সদুপায়ে স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের আকার দেওয়া এবং তাহাতে সাম্যবাদের নিয়মগুলি কার্য্যে পরিণত করা। স্বরাজ লাভ হইবার পূর্ব্বে কৃষক ও শ্রমিকদিগের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সহিত একযোগে কার্য্য করা; যেন স্বরাজ স্থাপিত হওয়া মাত্র সাম্যবাদ নীতি অনুসারে কাজ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে সাম্যবাদ নীতি প্রচার করিয়া জনমত গঠন করা। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি একেবারে ষোল আনা ভারতীয় এবং বর্ত্তমান সময়ে দলের কার্য্য ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। বিদেশীয় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ও দলসমূহের সহিত আমাদের সহানুভূতি ও মানসিক ঐক্য ও নৈকট্য থাকিবে। আমরা একই পথের পথিক; তাঁহাদের হইতে কোন অংশে ছোট নহি। আমরা তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া কোন সাহায্য করি না বা তাঁহারাও টাকা পয়সা দ্বারা আমাদের সহায়তা করিতেছেন না।

সাম্যবাদ ও ধর্ম্ম।

দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া অনেকে বলেন, সাম্যবাদ ধর্ম্মের

নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ধর্ম্মবিষয়ে আমরা যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতা সমর্থন করিয়া থাকি। যে কেহ আমাদের নীতিতে বিশ্বাসবান হইবে, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক বা খৃষ্টান হউক বা বৌদ্ধ হউক, কোন ধর্ম্ম তাহার থাক্ বা না থাক আমরা তাহাকেই আমাদের দলে গ্রহণ করিব। অর্থাৎ আমরা সকল ধর্ম্মকেই স্বীকার করি এবং কোন ধর্ম না থাকাটাকেও অর্থাৎ নাস্তিকতাকেও একটি ধর্ম্ম মনে করি। কোন কোন মুসলমান নেতা এই অমূলক অপবাদ দিতেছেন যে, সাম্যবাদ ইস্লামের শত্রু। প্রকৃত পক্ষে ইহা আদৌ সত্য নহে, বরং সাম্যবাদের চেয়ে ইস্লামই ধনিকতন্ত্রের অধিকতর বিরোধী এবং যে পর্য্যন্ত একটি প্রাণীও অভুক্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ধনিকদের ব্যবসায়ে অর্থসঞ্চয় করিবার কোন অধিকার নাই, এই জন্যই 'জাকত' এর, বাধ্যবাধকতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। নমাজের পরই কোরাণে জাকতের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম খলিফা যাহারা 'জাকত, দিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরিশ্রম বিনা শুধু মূলধনের উপর সুদ গ্রহণ অন্যায়, এইজন্যই মুসলমানদের পক্ষে সুদ খাওয়া নিষেধ। কুসীদজীবি বিনা পরিশ্রমে টাকা ধার দেওয়া সুদ খায়। এই জন্যই ইস্লামধর্ম্ম সুদ গ্রহণকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। সাম্যবাদও এই সুদগ্রহণ ব্যাপারটাকে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন

—০:০:০—

সকলেই জানেন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কানপুরে ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের প্রথম সম্মিলন হয়েছিল। স্থির হয়েছে বোম্বেতে কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি কেন্দ্র কার্য্যালয়, আর কানপুর, কলিকাতা, লাহোর ও মান্দ্রাজে পৃথক পৃথক শাখা কার্য্যালয় স্থাপন হবে। বাংলা দেশ হতে প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র রাধামোহন গোকুলজী উপস্থিত ছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলুম বটে, কিন্তু, আমি গিয়েছিলুম আলমোড়া হতে। কলিকাতায় কার্য্যালয় স্থাপন করা ও বাংলা দেশে পার্টি গঠন করার ভার আমার ওপরে দেওয়া হয়েছে। আমার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। সংযুক্ত প্রদেশের কারাগারে ক্ষয়রোগে ভুগে ভুগে যখন মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছিলুম তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট আমায় মুক্তি দিয়েছেন। তারপরে কূর্ম্মাচলের আলমোড়াতে ৩ মাস থেকে যদিও চলা-ফেরার শক্তি কতকটা ফিরিয়ে পেয়েছি, তথাপি এই ঘৃণিত ব্যাধি হতে একেবারে মুক্ত হতে এখনো পারিনি এবং আর কখনো পারব কিনা তাও জানিনে। এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ত নয়ই, পরন্তু, সম্ভবপরও হয়তো হয়ে উঠবেনা। তবে, আমার একার অভাবে বাংলা দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির গঠন স্থগিত থাকা কিছুতেই উচিত হবেনা। বাংলায় যাঁরা কম্যুনিষ্ট আছেন তাঁরা সমবেত হয়ে পার্টি গঠন করুন, এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি। কম্যুনিষ্ট হতে বলা এদেশের আইন অনুসারে অপরাধ নয়। বাংলা দেশের কম্যুনিষ্টগণ পার্টি গঠন সম্বন্ধে কতদূর কি করতে রাজি আছেন তা আমায় জানালে আমি বড় বাধিত হব।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

—:০:—

পুস্তক-সমালোচনা

—০—

"বাংলার কৃষিক্ষেত্র কথা" শ্রীহৃষীকেশ সেন প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, পৃঃ ১৩৮ প্রাপ্তি স্থান:—

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, চন্দননগর।

বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর তথ্যপূর্ণ উপাদেয় পুস্তক লিখে সেন মহাশয় সমস্ত জাতির ধন্যবাদভাজন হ'য়েছেন। যাঁরা দেশের সম্বন্ধে একটু ভাবেন, তাঁদের সকলেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। জাতির সকল সমস্যার অন্তরালে কোন্ মহাসমস্যা রয়েছে, তা এই পুস্তকখানা পড়লেই হৃদয়ঙ্গম হবে। আমরা কিছু অংশ "লাঙলে" পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করেছি। গ্রন্থকারের এ বিষয়ে জ্ঞান ও পরিশ্রমের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হ'তে হয়। প্রজাশক্তির এই নব জাগরণের দিনে এবং প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন কালে পুস্তকখানি প্রত্যেকের হাতে থাকা উচিত।

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

সাম্বৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যার প্রতি কলম ইঞ্চি		৸৹
	প্রতি সংখ্যার প্রতি কলম	৭৲
”	সমগ্র পৃষ্ঠা	১৩৷৹
মলাটে— ১ম পাতা প্রতি সংখ্যার প্রতি কলম ইঞ্চি		১৷৹
	অর্দ্ধ কলম	৭৲
	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৷৹
” ২য় পাতা প্রতি সংখ্যার প্রতি কলম ইঞ্চি		১৲
”	প্রতি কলম	৯৷৹
”	সমগ্র পৃষ্ঠা	১৮৷৹
” ৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য		
” ৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যার প্রতি কলম ইঞ্চি		১।৹
	প্রতি কলম	১১৲
”	সমগ্র পৃষ্ঠা	২১৷৹

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যার প্রতি কলম ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵৹।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পঁচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সী দেওয়া হইবে না; ও প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ হিসাব সহ বিক্রয়লব্ধ জমার টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় ও মণিঅর্ডার কমিশন লাঙল অফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যার শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেন্টগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

৬। নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

পত্রিকার মূল্য—

বাৎসরিক	৩৲ টাকা,	ভিঃ পিঃ	৩৷৹
ষাণ্মাসিক	১৷৵৹	”	১৸৵৹
প্রতিসংখ্যা	এক আনা		

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র

৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

বাহির হইয়াছে। বাহির হইয়াছে।

ইউরোপের দর্পহারী মহাবীর গাজী আবদুল করিম—৷৵৹

ইহাতে বীরেন্দ্র-কুল-কেশরী গাজী আব্দুল করিমের অলোক সামান্য জীবন কথা ও রীফের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। সচিত্র মূল্য ৷৵৹ আনা। সংবাদপত্র কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মোস্তাফা কামালপাশা—।৵৹

এসিয়ার গৌরব মহাবীর গাজী মোস্তাফা কামালপাশার চিত্তাকর্ষক জীবনী। মূল্য সচিত্র ।৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—লাঙলবুক এজেন্সী
৩৭ নং হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

"লাঙল" বুক এজেন্সী

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

[নব যুগের নবীন মন্ত্রের নবীন পন্থের নব পুস্তকালয়]

কাজি নজরুল ইসলামের

নূতন কবিতার বই :—

ক্রন্দন নীরত ভারত মাতার শির্ষ-রঞ্জিত অনুপম প্রচ্ছদ-পট, ৺দেশবন্ধুর মর্ম্মার সুন্দর ফটো ও কবির নিজের ফটোসহ

চিত্তনামা—১৲

পাঠক ইহারই মধ্যে কবির অমর কবিতা "ইন্দ্র পতন" ও "সান্ত্বনা" পাইবেন। অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

ছায়ানট—১।৹

(কবির সুন্দর ছবিসহ সুন্দর বাঁধাই)

অগ্নিবীণা—১।৹

৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত, এবং কবির বর্ত্তমান ফটোসহ)

রিক্তের বেদন (গল্প কাব্য)—১৷৹

ব্যথার দান (২য় সংস্করণ) ঐ—১৷৹

(সৈনিকবেশী ফটোসহ)

দোলন চাঁপা—১।৹

(যাহার পূজারিণী কবিতাখানি চিরপূজ্য)

রাজবন্দীর জবানবন্দী—/৹

ইহা পাঠে পাঠক কবির নির্ভীকতার যথার্থ পরিচয় পাইবেন

কবির তিনখানা পুস্তক যন্ত্রস্থ :—

ঝিঙেফুল

বাঁধন হারা

ফণী মনসা

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী প্রণীত

বোলশেভিকবাদ

(সচিত্র)

বোলশেভিক রুশিয়া সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ নানা চিত্র-সম্বলিত পুস্তক মূল্য মাত্র ৷৹ আনা।

চিন্তকথা

(সচিত্র)

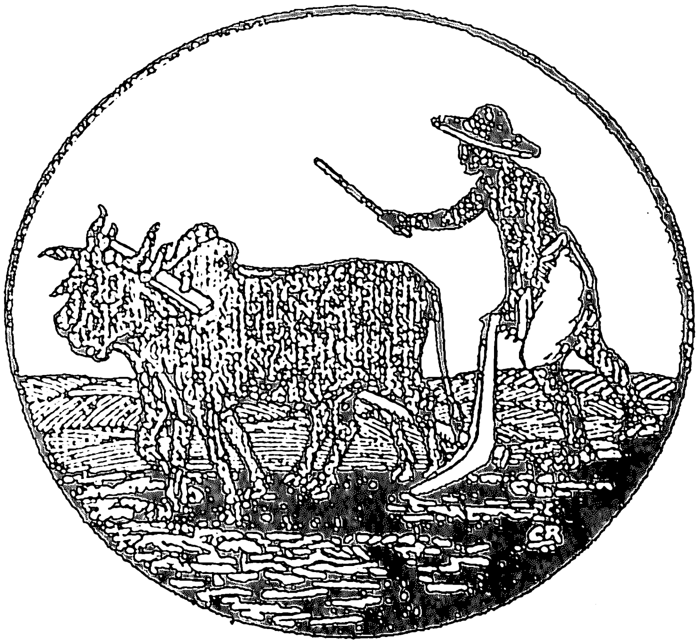
চিন্তকথা চিত্তরঞ্জনের নিজেরই মুখের কথা—মহাপুরুষের চরিত্রের সকল দিক ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

নরনারী

(যন্ত্রস্থ)

মারী ষ্টোপ্‌স, হ্যাভলক এলিস প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের গবেষণা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক-শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।



লাঙল

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।
—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | বৃহস্পতিবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৩২ | ষষ্ঠ সংখ্যা

গাড়োয়ানের গল্প

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

—:৪:—

তুমি যখন কথা ঠাকুর, শোন— কেন শেষে
ভিটে ছেড়ে গাড়ী চালাই এসে তোমার দেশে।
গঙ্গাপারে মুখুয্যেদের মস্ত জমীদারী,—
পা'ক্ পেয়াদা,—জ্ঞান বোধ হয়,— মহাল শাসন ভারি।
বাবা আমার ছিরু সেখ মোড়ল ছিল গাঁয়ে,
নিইছিল ধার বিশখানেক ধান অজন্মার দায়ে।
পরের বছর দুনো হারে ফিরিয়ে দেবে গোলায়,—
এমন সময় ধরলে তাঁকে ম্যালোয়ারির পালায়!

ডাক্তার দিলে দু'তিন রংএর দামী ওষুধ গাঁটি.—
—ছাখ, ধলা কেঁদে বুঝি—বাপকে দিলাম মাটি।
আমি তখন ছেলে মানুষ, উঠ্‌তি জোয়ান মোটে,
দুখান লাঙল রেখে দিলাম হিম্মতেরি চোটে।
মাঠের থেকে খেটে খুটে ফিরে দুপুর রোদে,
শুন্‌লাম মোষ খুলে নিলে জমিদারের লোকে।
ঘেন্না হ'ল মনে, গেলাম খাওয়া দাওয়া ভুলে,
তুচ্ছ দুটো ধানের তরে মোষ নিয়ে যায় খুলে ?
বেরিয়ে প'লাম লাঠিগাছি বগলদাবা কোরে,
চ'লে গেলাম বাবুর বাড়ী সিধে রাস্তা ধ'রে।
কাছ্‌রি বাড়ীর উঠানেতে বাঁধা আছে 'কটা';
লাঠির ঘায়ে পিঠ হ'য়েচে এমন গোটা গোটা।
ঠাকুর, তোমায় বলব কি আর, চোখে এল জল,
দড়া খুলে বল্‌লাম 'কটা' চ'বাপ ঘরে চল।
লাঠিগাছটি বাগিয়ে ধ'রে আসচি পিছু পিছু,
কর্ত্তাবাবু দেখলেন কিন্তু বললেন নাক কিছু।
'হাদে, কেলের রকম দেখছ।' তার পরত ঠাকুর।
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছি রাত্রি বোধ হয় দুকুর,—
জন আষ্টেক পাইক আমার হঠাৎ নিলে ধরে,
সাররাত্রি রাখ্‌ল একটা ঘরে কয়েদ ক'রে।
ভাবলাম আমি—এবার দেখি করলে অপমান,
গায়ে যদি হাত তোলে ত রাখব না এ জান।
সকাল বেলা নিয়ে গেল কর্ত্তাবাবুর আগে,
বল্‌লাম আমি সেলাম করে, ফুলচি তখন রাগে,—
ব্রহ্মস্ব খেইচি যখন, শুধ্‌ব বাপের ঋণ,
আজকে আমায় ভালয় ভালয় ছাড়তে হুকুম দিন।
আমার গায়ে হাত তুল্‌তে দেবেন যদি হুকম,
আপনি আমি দুটো খুন আর চারটে হবে জখম।
কর্ত্তাবাবু বললেন—ওকে ধরলে কেন ছাই,
মোষ জোড়াটা বেচে দিলেই টাকা যখন পাই।
মোষ জোড়াটি বেচতে হল জমিদারের দোরে,
ক্রমে গেল জমিজমা কোথায় কেমন কোরে!
ঘরে শেষে লাগল আগুন, পূব্‌জন্মের ফল—
দাদাঠাকুর! ঘুমিয়ে গেছ ? 'চ বাপ ধলা চল'।

সুভাষচন্দ্রের বিলাতের পত্রাবলী

—:০:—

বিলাত পৌঁছিবার পর

Fitz William Hall.
Cambridge.
12/11/19

যাহাদিগের নিকট হইতে পত্র আশা করিতে পারি নাই, তাহারা পত্র দিয়াছে—অথচ তোমার নিকট হইতে কোন পত্র পাইলাম না। যাহা হউক, আশা করি ভবিষ্যতে পত্র দিবে।

শেষ পত্রে তোমাকে লিখেছিলাম যে আমি Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছি, এবং সেখানে আসিয়াছি। অনেক বন্ধুর সাহায্যে—কতকটা বি-এর result-এর দরুণ এবং কতকটা I. D. F. Service এর দরুণ স্থান পাইতে সমর্থ হইয়াছি। থাকিবার স্থানের অভাব হইলেও সৌভাগ্যবশতঃ বাসস্থানও পাইয়াছি।

আমার মতলব আগামী বৎসরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি—১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos এর পরীক্ষা দেওয়া। এখানকার Degree আমাকে লইতে হইবেই—তাহা ভবিষ্যতে আমার বিশেষ কাজে লাগিবে।

এখানে ভারতবাসীদের একটা সমিতি আছে—নাম "Indian Majlis"—সাপ্তাহিক অধিবেশন হয় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেও বক্তারা আসেন। Mrs. Sarojini Naidu একবার বক্তৃতা করিয়াছেন—"Kingdom of youth" সম্বন্ধে। পরবার W. W. Pearson বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমার আসিবার পূর্ব্বে তিলক মহারাজ এখানে আসিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস থেকে [illegible] কিছু পারে নাই। এখানকার ভারতবাসীদের [illegible] বড় ভাল এবং [illegible]।

[illegible] আরম্ভ করিয়াছিল। [illegible] যাহা হউক, এখনকার [illegible] উদাসীনভাবে [illegible]। এখানকার activity দেখে প্রাণে বড় আনন্দ হয়। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে সমস্ত [illegible] প্রাণ আছে—এবং সব কাজে method আছে। আমার সব চেয়ে বেশী ভাল হয় যখন দেখি যে সাদা চাকরেরা আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা সাফ করিতেছে।

এখানকার ছাত্রদের একটা status আছে এবং Professor-দের ব্যবহারও অন্য রকম। মানুষের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার এখানে দেখতে পাওয়া যায়। [illegible] ভিখারী দেখিতে পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে অনেক দোষ আছে—কিন্তু অনেক বিষয়ে এদের গুণ দেখে মাথা নত হয়।

ইতি
শ্রীসুভাষ

দেশসেবা ও স্বাস্থ্য—

Cambridge
19/1/20

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। আমার মনে হয় তুমি এক সঙ্গে বড় বেশী কাজ হাতে নিয়েছ। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষ যে যাহারা কোন কাজ করে না—তাহারা কিছুই করে না—আর যাহারা করে তাহারা বড় বেশী করিতে চেষ্টা করে এবং এক দিনের ভিতরে সব কাজ করিতে গিয়া শরীর এবং মন হারাইয়া বসে। মানুষ যদি কোন স্থায়ী কাজ করিতে বাসনা করে তাহা হইলে তাহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—২।১ বৎসরে তাহা সম্ভব নয়। অতএব তোমার যদি কোন বাসনা থাকে দেশের জন্য কোন স্থায়ী কাজ করিতে—তবে তোমার এরূপ ভাবে কাজ করা উচিত, যাহাতে বহু বৎসর ধরিয়া কাজ করিবার শক্তি থাকিবে! অবশ্য কোন্ দিন কাহার মরবার ডাক আসিবে—কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু তা ব'লে আগে থেকে গলায় ছুরী দিয়ে কোন লাভ নাই বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে শরীর নষ্ট করে কোনও লাভ নাই।

এদেশের "[illegible]" ভাবের কতগুলি গুণ আছে, যার জন্য এরা এত বড় হ'তে পেরেছে। প্রথমতঃ—এরা ঘড়ির মত ঠিক সময় মত কাজ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—এদের একটা robust optimism আছে—আমরা জীবনের দুঃখের বিষয় বেশী ভাবি, এরা জীবনের সুখের এবং আমোদের বিষয় বেশী ভাবে। তারপর এদের strong common sense আছে এবং নিজের জাতীয় স্বার্থ খুব ভাল বোঝে। এখন মোটের উপর দাঁড়িয়েছে আমাদের জলবায়ুর দোষ—আমাদের দেশের হাওয়াটা বদলাতে হবে!

তোমার পত্রের অধিকাংশ স্থান [illegible] অধিকার করেছে—ঐ [illegible]। "[illegible]।" এখন [illegible] দেশের পক্ষে মোটেই মঙ্গলকর নহে। তোমার একটু [illegible] দরকার।—তোমার motto এখন হওয়া উচিত—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"।

শরীরের যত্ন না করা একটা অপরাধ—সে অপরাধ শুধু নিজের কাছে নয়—পাঁচ জনের কাছে এবং সর্ব্বোপরি দেশের কাছে। আমাদের দেশের যুবকদের শারীরিক সামর্থ্য যদি এরূপ থাকে যেরূপ এখন আছে তাহা হইলে বলিতে হবে যে, তাহাদের আদর্শের ভিতরে একটা গলদ বা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। প্রত্যেকে মনে করবে তোমার শরীর তোমার নয়, তুমি trustee মাত্র!

এখনও বুঝিতে পার নাই আমি [illegible] হয়েছি কি না

আমি আত্মপ্রতারণা ক'রে নিজেকে বুঝাতে চাইনা যে Civil Serviceএর জন্য পড়াটা ভাল। চিরকাল ঐ কাজটাকে ঘৃণা করতাম—এখনও বোধ হয় করি—এ অবস্থায় Civil Service এর জন্য চেষ্টা করা আমার দুর্ব্বলতার নিদর্শন অথবা কোন দূরবর্ত্তী মঙ্গলের সূচক তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোনও hasty opinion না form করেন।

অনেক ঘটনার শেষে এসে না পৌঁছালে তার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আমার সম্বন্ধেও কি তা হতে পারে না?

ইতি
শ্রীসুভাষ

ভারতীয় রমণী—

Cambridge
2. 3. 20.

অনেক দিন হইল তোমার কোন পত্র পাই নাই বা তোমাকে পত্র দিই নাই। যখন সময় কম থাকে, তখন শুধু তাদেরই লেখা যায়, যাদের দুলাইনে লেখা যেতে পারে।

সেদিন "ভারতীয় মজলিসের" বাৎসরিক ভোজ হইয়া গেল। Mr. Horniman আমাদের অতিথি (guest) হয়ে এসে ছিলেন; এখানকার বিদেশীয় বন্ধুগণও কেহ কেহ এসে ছিলেন। লণ্ডন থেকে কয়েক জন ভারতীয় মহিলাও এসে ছিলেন। মিসেস্ নাগ গত রবিবারে মজলিসের সভায় Rights of the Indian mother সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

বাস্তবিক কবে আবার ভারত-রমণীবৃন্দ—সমাজের শিক্ষাদাত্রী রূপে আসন গ্রহণ করিবেন? না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগিবে না। যেদিন Ms. Sarojini Naidu এখানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন—সেদিন আনন্দে বুক দশহাত ফুলে উঠেছিল, সেদিন দেখিলাম ভারত রমণীর আজও এমন শিক্ষা, দীক্ষা, গুণ, চরিত্র আছে যে পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আত্ম-পরিচয় দিতে পারেন।

লণ্ডনে 'ভারত মিত্রের' [illegible] মিঃ হিউ [illegible] moderate in politics কিন্তু [illegible] extremist—আনন্দে বুক ভরে গেল। বিশেষ করে extremist. এ সব দেখে মনে হয় যে, যে দেশে রমণীর আদর্শ এত উচ্চ, সে দেশের উন্নতি না হ'য়ে পারে না। এ দেশে যে সকল ভারত-মহিলারা আসেন, আমার বিশ্বাস ওঁদের প্রাণে গভীর স্বদেশ-প্রেমের উদ্রেক হয়—কারণ মাতৃ হৃদয় বড় কোমল ও বড় গভীর।

জগদীশবাবু F. R. S. হয়েছেন শুনছি। তাঁহাকে labour leaderরা বলেছিলেন—"the country which can tolerate Amritsar massacres deserves it." Horniman বাস্তবিক ভারতের বন্ধু। তিনি তাঁর "land of adoption"-এ ফিরিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত। Passage পাচ্ছেন না।

কোন্ দিকে ভেসে যাচ্ছি জানি না। কোন্ তীরে গিয়ে উঠবো তাও জানি না। তবে বিশ্বাস করি তোমাদের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ না হারাইলে পথভ্রষ্ট হইব না।

ইতি
শ্রীসুভাষ

I. C. S. সন্ন্যাসী

Cambridge
23-3 20

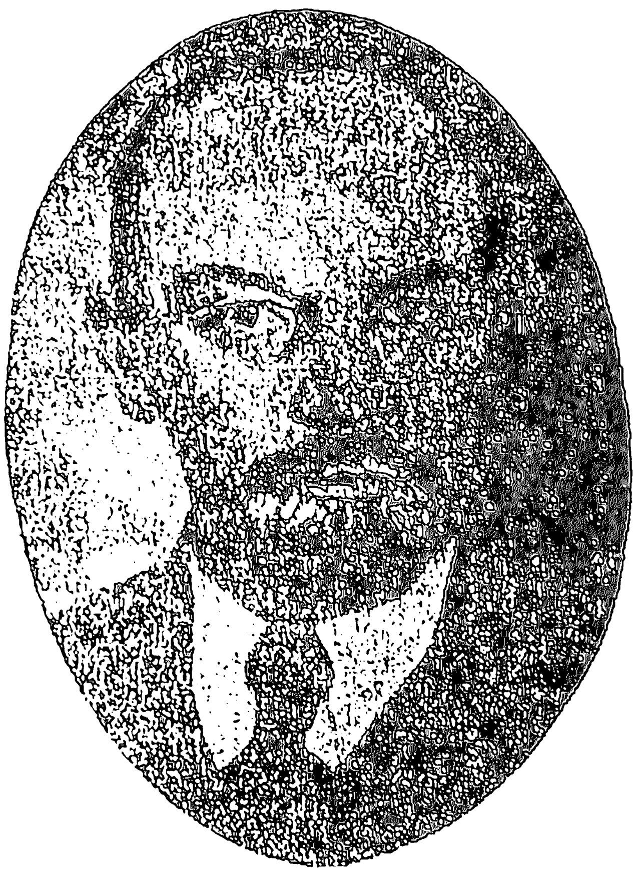
তোমার দীর্ঘপত্রে অনেক সত্য কথা আছে। তবে দু'একটা বিষয়ে ঠিক বল নাই। আমাকে সন্ন্যাসী বললে আমি এখনও চটি না! আমি এখন সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য হতে পারি কিন্তু সন্ন্যাসী বললে আমি এখনও পূর্ব্বের মত গৌরব অনুভব করি।

তোমার পত্রে মোটের উপরে সবই অনুমোদন করি উত্তর দিতে গেলে প্রকাণ্ড উত্তর হয়ে যায়। তুমি যখন আসছ, তখন সাক্ষাতে সব কথা এবং বুঝাপড়া হইবে। এখন থাক।

ইতি
শ্রীসুভাষ

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে!
সবারে না যদি ডাক,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ' চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

—রবীন্দ্রনাথ।



লেনিন ও সোভিয়েট রুষিয়া

[শ্রীদেবব্রত বসু]

—०:::०—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪)

রুষিয়ার নবজন্মদাতা এই সমস্ত আদর্শবাদী Slavগণ নিদারুণ এবং নিষ্করুণ বাস্তবের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম থেকে অন্তরে এক স্বপ্ন জুগিয়ে রেখেছিলেন। লেনিন, ট্রট্স্কী প্রভৃতি বোলশেভিক নেতাগণ এক দিকে যেমন ঘোরতর কর্ম্মপটু লোক ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন সেই রকম আদর্শবাদী।

এই সমস্ত আদর্শবাদীরা সেইজন্যে অন্তর দিয়ে চেয়েছিল—মুক্তি, রুষিয়ার মুক্তি, নষ্ট-মানবতার মুক্তি।

এই মুক্তির স্বপ্ন তাদের কারাগার থেকে কারাগারে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে; এই আদর্শের স্বপ্নে তারা দলে দলে বহ্নিমুখী পতঙ্গের মত অম্লান অন্তরে আত্মাহুতি দিয়েছে; সাইবেরিয়ার নিষ্করুণ চির তুষারে অসংখ্য যৌবন বার্দ্ধক্যে মলিন হয়ে মরে গিয়েছে, দেশে দেশান্তরে ফাঁসীর রজ্জুতে প্রাণ দিয়েছে।

তারা চেয়েছিল যে রুষিয়াকে সেখানে মুক্ত, স্বাধীন হতে হবেই। জারের দুর্দ্ধর্ষ পুলিশ আর মিথ্যা সম্মানের লাঞ্ছনা থেকে, ছোট ও বড়র মিথ্যা পার্থক্য থেকে, মিথ্যা ধর্ম্মের মোহ থেকে, সত্য জীবনে মুক্ত হতে হবে।

জাতিত্বের নাম জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে মানবত্ব জন্মগ্রহণ করুক। জাতির অন্ধ কারাগার থেকে পৃথিবী মুক্ত হোক।

শাসক দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী লুপ্ত হয়ে যাক। অর্থপিশাচের ব্যবসা, মূলধন, তার সুদ, তার অসংখ্য ভণ্ড নিয়মকানুন, মানুষকে ঠকিয়ে নেবার সব প্রকারের যন্ত্রতন্ত্র লুপ্ত হয়ে যাক।

যে গির্জ্জায়, যে মন্দিরে শুধু দেবতাকে রেখে মানুষকে বলি দেবার নিত্য নিয়মিত আয়োজন চলে; যে গির্জ্জা শুধু জারের পুলিশের স্থান অধিকার করে সাধারণ মানুষকে মিথ্যা ভয়ের তাড়নায় নিয়ত মাথা হেঁট করেই চলতে বাধ্য করায়; যে দেবতার নামে যে মন্দির, তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন কিন্তু সে মন্দিরের পুরোহিত যে কষ্টে ক্রুশ ঝুলিয়েই নিশ্চিন্ত। লুপ্ত হয়ে যাক সে মন্দির, সে গির্জ্জা; লুপ্ত হয়ে যাক সে পুরোহিত।

নূতন মানুষ আসুক; যারা সকল রকমের শ্রমকে শ্রদ্ধা করে;

প্রদেশ যারা নিজ নিজ দেশকে স্বীকার করে; যারা অপরের ক্ষতি দৃষ্টি চায় না, সমস্ত মানুষের মঙ্গলের দিকে চেয়ে শ্রম করে, আসুক সেই নূতন জাতিদের দল।

আমার আনন্দ যেন অন্ধ হয়ে অপরের আনন্দকে দলে না চলে প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে আমার সুবিধা অসুবিধা জড়ান; অন্তরে যেন জাগ্রত থাকে এই ধারণা। শিশুকে সর্ব্বরকমে এবং সর্ব্বসময়ে সব চেয়ে বেশী যত্ন আর সুবিধা দিতেই হবে; কারণ ভবিষ্যৎ জগতের তারাই তো উত্তরাধিকারী। যে অসমর্থ, যে জরাজীর্ণ, সে যেন নিঃসহায় না থাকে।

প্রত্যেক সমর্থ পুরুষ ও নারীকে শ্রম করতেই হবে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে ক্রমশঃ মানুষের দৈহিক শ্রমের মাত্রা হ্রাস হবে; বিজ্ঞান ধনিকের ধন উৎপাদনের যন্ত্র নয়—বিজ্ঞান সকলের, সর্ব্ব মানবের দূরতম প্রদেশের সামান্য কৃষাণও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসবে।

প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষিত হতে হবে। প্রত্যেক মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ও সুবিধা দিতে—হবে। সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত প্রতিমানবের মনে ও দেহে বিকশিত হক। কষিয়ায় মানব তন্ত্র প্রচারিত হক'।

এই স্বপ্ন ছিল এই সমস্ত ঘোরতর আদর্শবাদী অগ্নিপুরুষ লোকেদের মনে।

(৫)

এখন দেখা যাক, বাইরের জগতে এই আদর্শ কি রকমে ফুটে উঠেছিল। ১৯০৫ সালে রুষিয়ায় যে জন বিপ্লব হয় তার ফলে কিছু সময়ের জন্য জারের রাজত্ব একটু বেসামাল বোধ হয়েছিল বটে কিন্তু ১৯০৭ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড থেকে মধ্যস্থিতায় রুষিয়ার জার ইংলণ্ডের নিকট হতে বহু পরিমাণ অর্থ ঋণ স্বরূপ পান। এবং এই সময়েই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে Triple Entente অর্থাৎ এই তিন জাতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ঋণ-লব্ধ অর্থে রুষিয়ার জারের প্রতিপত্তি আবার নব-ভাস্বর হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় যে অমানুষ অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড রুষিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। সাধারণের হত্যার এই জঘন্য কাজে হাত পাকা এক বিষম সৈন্য সৃষ্টি হয়। তার নাম The hundreds. গ্রামকে গ্রাম তারা কবর করে দিয়ে চলে গেছে। সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন ছিল এই সময়ে সব চেয়ে কম শাস্তি। ১৯০৯ থেকে কিছু কালের জন্য জারের রাজত্ব নির্বিঘ্নভাবে চলতে থাকে।

১৯১৪ সালে য়ুরোপের রণাঙ্গনে যুদ্ধের [illegible] বেজে ওঠে। [illegible] তখন য়ুরোপের সমস্ত জাতি সর্ব্ব, হুঁস, নাকি না পুঁছি [illegible] মহাযুদ্ধে নেমে পড়ল।

তখন লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত। সেইখান থেকেই তিনি শ্রমজীবিদের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন যে এই যুদ্ধ কোনও রকমে সাহায্য করা মহাপাপ। এ অভিজাত সম্প্রদায়ের অধিক উচ্চাভিলাষ প্রসূত বিলাস।

জারের রুষিয়া এই যুদ্ধে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যোগদান করে। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে রুষিয়ায় বিপ্লবের পথ অনেকখানি সোজা হয়ে আসে। যুদ্ধের ফলে বাইরের আমদানী প্রায় এক রকম বন্ধ হয়ে যায়; ১৯১৫ সাল নাগাদ রুষিয়ার যুদ্ধের রসদ এক রকম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়; সৈন্যদের অনাহারে যুদ্ধ করতে হয়েছে, এমনি কি কামান বন্দুক সকলের জোটে নি; এমনি করে নানা সৈন্যের মধ্যে নিদারুণ অসন্তোষ প্রবেশ করে। এরি মধ্যে যুদ্ধের সময় বড় বড় ব্যবসাদারেরা নানারূপ সর্ব্বশোষণ করতে থাকেন, এই যুদ্ধ তাঁদের যা সারা 'বছর সুবিধা করে দেয়; এবং তাঁরা সে সুবিধা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত ব্যাপারে রাজসিংহাসনে রাসপুটিন নামে একজন মহাধূর্ত ধর্ম্মযাজককে হাতে রাখে। এই রাসপুটিন দলের নামে ব্যক্তিগতের রাজত্ব পুরোদমে চালিয়ে চলেছিল। রাসপুটিনই ছিল এক রকম জারের রাজত্বের শাসক; রাণীর উপর তার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ১৯১৬ সালে ২৯শে ডিসেম্বর এই রাসপুটিনকে পেট্রোগ্রাডে এক ভোজে হত্যা করা হয়। এই সময় লর্ড মিলনার রুষিয়ায় এসে বিপ্লবের কোনও সম্ভাবনা নাই বলেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাগমনের পরেই রাসপুটিনের হত্যা হয়; এবং চারিদিকের অবস্থা বিপ্লবমুখী হয়ে উঠতে থাকায় দরুণ জার সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। ১৯১৭ সালে মার্চ্চ মাসে পেট্রোগ্রাড (বর্ত্তমান লেনিনগ্রাড) সহরে শ্রমজীবিরা প্রকাশ্য বিপ্লব ঘোষণা করে। যে সমস্ত সৈন্যদের বিপ্লবীদের দমনের জন্য পাঠান হয়; তারাও শেষে বিপ্লবীদের সহিত যোগদান করে। মার্চ্চ মাসের এই বিপ্লবের ফলেই রুষিয়ায় সর্বপ্রথম জারের একাধিপত্যের শেষ হয়ে রিপাব্লিকেট রুষিয়ার নবজন্ম লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

শতেক শতাব্দী ধরে' নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোমারে সবার সমান।
—রবীন্দ্রনাথ।

কোথায় প্রতিকার ?

[মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ]

—:০:—

বালির ওপরে পাকা ইমারত তৈয়ার হতে পারে না, একথা সবাই জানেন, কিন্তু, তথাপি আজ ক'বছর থেকে ভারতবর্ষে এখানকার সে চেষ্টাই হয়েছিল। অদ্ভুত, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কোনো কাজ করতে গেলে যা হয়ে থাকে, ভারতের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটেছে।— লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের দিন থেকে ভারতে যে একটা রাষ্ট্রীয় পাকা ইমারত গড়ে উঠেছিল, সেইটে আজ ভেঙে পড়তে বসেছে— শুধু যে ভেঙে পড়তে বসেছে তা নয়, প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাকে ভেঙে পড়তেই হবে। ভারতের জাতীয় মহাসমিতি (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) ভারতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রতিপত্তিশালী সভা। এক ফুৎকারে যেমনি তাসের ঘর উড়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে আজ জাতীয় মহাসমিতি উড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। হয়তো গেলে অনেকটা [illegible]। কিন্তু, কেন এমন হল ?

ধর্মের ভেদ বুদ্ধির ভিত্তির ওপরে জগতে কোনোদিন কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমরা কোনো দিন শুনিনি। কিন্তু ভারতে হিন্দুতে আর মুসলমানে মিলে যে একটা সংহতি গড়বার চেষ্টা হয়েছিল, কিংবা, আজো পর্যন্ত চলেছে, তাতে এই ধর্মের ভেদ-বুদ্ধির একটা প্রণোদন সব সময়েই ছিল এবং আজো আছে। লক্ষ্ণৌর কংগ্রেসে হিন্দু আর মুসলমান সংযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু যে চুক্তির ওপরে হয়েছিল সেটা ধর্মের ভেদ-বুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সকলেই জানেন, মুসলমানদিগকে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিশেষ অধিকার দেওয়ার কথা লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেই স্বীকৃত হয়। গান্ধীজীর নন-কো অপারেশন আন্দোলনও আগাগোড়া ধর্ম সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে পরিপূর্ণ ছিল। এই আন্দোলনে আসমুদ্র-হিমাচল সারা ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু, হিন্দু আর মুসলমান কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন নি। হিন্দুরা কখনো মনে করতে পারেন নি যে খিলাফৎ আন্দোলনে তাঁরা যোগদান না করলে মুসলমানেরা তাঁদের সাথে মিলে কাজ করবেন, আবার অনেক মুসলমান ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে শুধু এই জন্যে এসেছিলেন,—যেহেতু হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলেন। বাদ্য আর খাদ্যের একটা হাস্যাস্পদ প্রশ্ন ছিল নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। গরু নাকি হিন্দুর দেবতা, সেজন্যে মুসলমানদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা কখনো গরু খেয়োনা।' মসজিদে, মসজিদে মুসলমানরা 'নামাজ' পড়ে থাকেন। সেই নামাজের নাকি ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটে হিন্দুরা তার সম্মুখ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গেলে। বড় বড় শহরে ট্রামের ঘর্ ঘর্ ধ্বনিতে নামাজের ব্যাঘাত হয় না, মোটরের ভোঁ ভোঁ'তেও কোনো ব্যাঘাত হয় না, এমন কি মোহররমের বাদ্য যত দুন্দুভি ভাবেই বাজুক না কেন তাতেও নামাজে এতটুকুও ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না,—হয় কেবল হিন্দুর বাদ্য-ধ্বনিতে। মুশকিল এই যে এই বাদ্য বাজানো আর সঙ্কীর্তন করা হিন্দুর আবার ধর্মকর্ম। গরু খাওয়ার বিরুদ্ধে দু' শ্রেণীর হিন্দু দুই দিক থেকে আপত্তি করে থাকেন। এক শ্রেণীর হিন্দু বলেন এবং বিশ্বাসও করেন যে গরু তাঁদের দেবতা। আর এক শ্রেণীর হিন্দুর মনে যে দেবতা এ কুসংস্কারটি বদ্ধমূল হয়ে আছে, কিন্তু, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এমন হাস্যাস্পদ কথাটি তাঁরা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারেন না। তাই, তাঁরা আপত্তিটি তুলে থাকেন ঠিক অন্য ভাবে। তাঁরা বলেন, নানাদিক থেকে মানুষের সেবার জন্যে গরু একটি বিশেষ আবশ্যক বস্তু। খেয়ে খেয়ে গরুর সংখ্যা কমিয়ে দিলে একদিন গো-বংশ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু, খাদ্য হিসেবে গরুকে খেলে যে মানুষের একটা সেবা তাতেও হয়ে থাকে, এটা তাঁরা বুঝতে চাবেন না। আসলে গরু যে এদেশে কমছে কিংবা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সেটা মানুষের খাওয়ার জন্যে নয়। গরুর চেয়ে মুরগী ও হংসের প্রাণ প্রতিদিন অনেক বেশী বধ হচ্ছে। কিন্তু, তবুও মুরগী আর হাঁসের বংশ ভারত হতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের লোকে কত ভাবে, কত জিনিষ তৈয়েরী করে প্রতিদিন গো-মাংস খাচ্ছেন তার ইয়ত্তা করাই কঠিন। অথচ এ দু'টো দেশ দুধে ভেসে যাচ্ছে। এত বেশী দুধ এই দুই দেশে পাওয়া যায় যে, লোকেরা তা খেয়ে ফুরোতে পারেন না, তাই, দেশে দেশে চালান পাঠিয়ে থাকেন জমিয়ে এবং আরো অনেক উপায়ে। আমাদের দেশে গরুর যে অবনতি হচ্ছে, কিংবা গরু যে কমে যাচ্ছে তার কারণ খুঁজে বার করা উচিৎ তা'টা খুব আমরা করছিনা।

এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক ব্যাপারগুলো এড়িয়ে যাওয়া চলে না বলে ওঠে বড় প্রশ্ন, আর এ প্রশ্নগুলোর সমাধান না হলে হিন্দু ও আর মুসলমানে নাকি মিলন কিছুতেই হতে পারেই না। চিত্তরঞ্জন "স্বরাজ দল", গঠন করলেন। মুসলমানকে তাঁর দলে চাই, তাই, তিনি এক চুক্তি পত্র তৈয়ার করলেন, তাতে বিধি-বদ্ধ করলেন মুসলমানদের বিশেষ নির্বাচনাধিকার বিশেষভাবে দেওয়া হবে, আফিস আদালতে চাকুরীও দেওয়া হবে ঠিক সেই ভাবে। আমি জানি ধর্মের স্বাভাবিক গুণ আমাদের দেশের লোকদের এমনি অন্ধ করে রেখে দিয়েছে যে তারা অন্য ধর্মাবলম্বীকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে পারে না। এ অন্ধতা হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে সমান ভাবেই আছে। তবে, আফিস-আদালত আদিতে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী বলে চাকুরী প্রভৃতির দিক থেকে মুসলমানেরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু, এই সমস্ত ভেদ-বুদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্ণৌ থেকে আরম্ভ করে 'স্বরাজ দল' গঠন পর্যন্ত যা কিছু হয়ে গেছে, তার কোনোটাতেই হতে পারে না।√ সাম্প্রদায়িক সম্মিলনের জন্যে যা যা করা হয়েছে সে সমস্তই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ততর করে দিয়েছে। ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণে আকাশ যেরূপভাব ধারণ করে থাকে, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ঠিক সেইরূপ ভাবই ধারণ করে আছে। হিন্দু-মহাসভা, হিন্দু-সংগঠন, শুদ্ধি-আন্দোলন, খিলাফৎ, তবলীগ, তনজীম ও মুসলিম লীগ প্রভৃতিতে মিলে এমন একটি সর্বনেশে ব্যাপার ঘটিয়ে তোলার বন্দোবস্ত করে তুলেছে যে তাতে ভারতের সমস্ত আশা আকাঙ্খা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

লালা লাজপৎ রায় নাকি একজন 'সোশালিস্ট'। সোশালিস্টরা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে আপনাদিগকে কিছুতেই প্রলিপ্ত করতে পারেন না। আমার বেশ মনে পড়ছে আমেরিকা হতে ফিরে এসে 'লালাজী' ঘোষণা করেছিলেন যে, কোনো ধর্মে তাঁর আস্থা নেই। অথচ আজ সেই লালাজী হিন্দু মহাসভা আর সংগঠনের একজন মস্ত বড় চাঁই। লালাজী যতই ব্যাখ্যান করুন, আর যতই কৈফিয়ৎ দিন না কেন, তাঁর হিন্দু মহাসভা আর সংগঠন ভারতের কোনো হিতসাধন করতে পারবে না। পরন্তু, সর্বনাশ-সাধন যথেষ্টই করবে। ডাক্তার সৈফুদ্দিন কিচলু জেল হতে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটানোর জন্যে তিনি তাঁর জীবন পর্যন্ত বলিদান করতে প্রস্তুত আছেন। এহেন ডাক্তার কিচলু আজ "তনজীম" আন্দোলনের প্রধান পাণ্ডা। হিন্দু-মুসলিম বিবাদ মিটানোর কি মহান্ চেষ্টাই আজ তিনি করছেন!

চারদিক থেকে এই যে অমঙ্গল ঘনিয়ে এসেছে, এর প্রতিকার কোথায়? কি করে ভারতবর্ষ আজ আপনাকে এই সকল অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাতে পারে?

জগতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই মনে করেন তাঁর ধর্মটি বিশেষ ভাবে সত্য,—প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই মনে করেন ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছানুসারে তাঁর ধর্মটি সৃষ্ট হয়েছে। অথচ একটি ধর্মের বিধি-নিষেধের সাথে আর একটি [illegible] কিছুতেই মিল খাচ্ছে না। গরু নামক জন্তু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতির খাদ্য, এবং হিন্দুর দেবতা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা পরস্পরের প্রতি ধর্মের দিক থেকে এমনি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকেন যে, তা দেখে মনে হয়, ধর্মের সৃষ্টি মানুষের জন্য হয় নি, পরন্তু মানুষের সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের জন্য। অথচ ধর্মাবলম্বী লোকের মুখেই একটি সাধারণ কথা আমরা শুনে থাকি। তাঁরা বলেন, মানুষ নামক জীবটি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও উন্নততম সৃষ্টি। আবার, এই মানুষকে খুন করাই নাকি ঈশ্বরের অভিপ্রেত ধর্ম। ধর্মের মৌলিক ভিত্তি কি, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। তবে, আজকের দিনে ভারতবর্ষ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাতে এখনো ভারতের জনসাধারণ, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়, অবহিত না হন [illegible] সকল আশা-আকাঙ্খার অবসান এখানেই হয়ে যাবে। দেশের জনসাধারণ চারদিক থেকে বিভ্রান্ত হয়ে [illegible] ধর্মান্ধ হয়ে উঠেছে। আজ তাদের যে শক্তিটা [illegible] অন্নাভাবের কারণ অনুসন্ধানে ব্যয়িত হতে পারত, সেই শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে ধর্মের গোঁড়ামীর জন্যে। দেশের রাষ্ট্রীয় [illegible] গুলো সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির সমর্থক হয়ে উঠেছে, নিরীহ [illegible] শ্রমিক ও কৃষকদিগকে স্বার্থপর লোকেরা ধর্মের নামে নাচাচ্ছে।

একটিমাত্র জিনিষ,—কম্যুনিজম্—আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে। কম্যুনিষ্টরা মনুষ্যত্বকে বড় বলে মানে, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্রয় তারা একেবারেই দেয় না। তারা ধনিকদের লোভ-লোলুপতার অবসান করে দিতে চায়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করে, সর্ব সম্পদ ও উৎপাদিত যাবতীয় সামগ্রী রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করে কম্যুনিষ্টরা জগতে স্থায়ি-শান্তি আনয়ন করবে।

ময়মনসিংহ জেলা কৃষক শ্রমিক সম্মিলন

—০:০:০—

গত ১৭।১৮ই জানুয়ারি তারিখে ময়মনসিংহ শহরে এক বিরাট কৃষক শ্রমিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, এম এল সি ও মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় যোগদান করেন। বঙ্গ ও আসাম প্রদেশী মৎস্যজীবী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বিশ্বাস ও [illegible] গঠনের বন্ধু শ্রীযুক্ত জনার্দন নিয়োগী মহাশয়ও সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। কিশোরগঞ্জের মৌলবী খাঁ আবদুল হামিদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মণিবাবু কাজি নজরুল ইসলামের কয়েকটি গান করিলে, কাজি সাহেবের পত্র ও কবিতা হেমন্ত বাবু পাঠ করেন এবং তৎপরে সকলের অনুরোধে প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে হেমন্ত বাবু প্রাঞ্জল ভাবে একটি বক্তৃতা করিয়া সকলকে প্রীত করেন, দুই দিন ধরিয়া মহা উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য চলে। সম্পাদক ফয়েজুদ্দিন হোসেন ও ছাত্রগণ সম্মিলনের সফলতার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন। জেলার প্রত্যেক [illegible] হইতে একটি সমিতি গঠন ও কার্য্য-পথ স্থিরীকৃত হয়।

কনফারেন্সে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে যে, (১) রেজেষ্ট্রী অফিসে

এক টাকা ক[illegible] হইবে, (২) খাজনা বাকী পড়িলে তজ্জন্য সুদ দিবার ক্ষমতা তুলিয়া দিতে হইবে, (৩) জমিদার ও মহাজনে নিজেরা চাষবাস না করিলে খামার জমী রাখিতে পারিবেন না, (৪) লোক্যাল বোর্ডের সভা ও যে কোন প্রকারের চাঁদাদাতাকে ক[illegible] সভ্য হইবার অধিকার দিতে হইবে ইত্যাদি। আগামী বৎসর জামালপুরে এই কৃষক শ্রমিক সম্মিলনের পরবর্তী অধিবেশন হইবার কথা হইয়াছে।

নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলন

২য় অধিবেশন

কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

—:০:—

নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ১৯২২ অব্দের ৭ই-৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বগুড়া সহরে হয়। ঐ সম্মিলনে সমগ্র বঙ্গের জন্য একটি স্থায়ী প্রজা সংঘ ও নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের গঠন প্রণালী ও নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের গত ফরিদপুর অধিবেশনের সময় বগুড়া প্রজা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সান্যাল মহাশয়ের নেতৃত্বে উক্ত কমিটি নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। বগুড়াতেই স্থির হয় নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন নদীয়াতে হইবে। তদনুসারে মৌলবী শামসুদ্দিন আহম্মদকে সভাপতি ও শ্রী[illegible]কে সম্পাদক করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য জেলার প্রজাসমিতিসমূহ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে, বঙ্গীয় লাট কাউন্সিলের ফেব্রুয়ারি মাসের অধিবেশনের পূর্ব্বেই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে প্রজাগণের মতামত স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এজন্য আগামী ৬ই ৭ই ফেব্রুয়ারি বাং ২৩শে-২৪শে মাঘ কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন স্থির হইয়াছে। বাংলা দেশের প্রত্যেক মহকুমা হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন। প্রতিনিধিগণের ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ২৲ টাকা করিয়া 'ফি' ধার্য্য করা হইয়াছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণও স্থানীয় প্রজাসমিতির প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া চাই। অন্যান্য জেলার প্রজাসমিতিসমূহ অবিলম্বে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের নাম ধাম সম্মিলনীর অধিবেশনের অন্ততঃ ৩দিন পূর্ব্বে যেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠান—অন্যথা অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের আহারাদি বা বাসস্থানের জন্য দায়ী হইবেন না। প্রতিনিধিগণ সঙ্গে বিছানাপত্র মশারি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্র লইয়া আসিবেন। কলিকাতা এবং মফস্বলের বহু নেতা সম্মিলনীতে যোগদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। সঠিক সময় ও স্থান পরে জানানো হইবে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রধান হইবে :—

(১) কৃষক শ্রমিক দল গঠন
(২) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন
(৩) কাউন্সিল নির্ব্বাচন

কৃষ্ণনগর
২৫।১।২৬

ইতি—
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার
সম্পাদক, অভ্যর্থনাসমিতি

খবরদারী

—:০:—

পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ

বাংলার গৌরব, মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শান্তিনিকেতনে তাঁর মানবলীলা সংবরণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিচয় নূতন করে কাউকে দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তাঁর সাহিত্যিক ব্যুৎপত্তি, তাঁর কবি প্রাণের স্বতঃউচ্ছ্বসিত ধারা, তাঁর রাজনৈতিক মতামতের নির্ভীক আলোচনায় তিনি প্রত্যেক বাঙালীর মনে অমর হ'য়ে থাকবেন। যারা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মেশবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর সহজ সরল সরস হৃদয়ের কাছে চিরদিন বন্দীর মত আবদ্ধ ছিলেন। আজ তাঁর মৃত্যুতে শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ নন্ সমগ্র দেশবাসী জ্যেষ্ঠের অভাবে শোকাচ্ছন্ন। মৃত্যুকালে তাঁর প্রায় নব্বই বৎসর বয়স হ'য়েছিল।

০ ০ ০

"মুসাবাত"

সাম্যবাদ প্রচারের জন্য "মুসাবাত" (Equality) নামে একখানি উর্দ্দু সাপ্তাহিক আমাদের আফিস থেকে বেরুবার আয়োজন হচ্ছে।

০ ০ ০

মহাত্মাজীর পীড়া

আমেদাবাদের ২০শে জানুয়ারীর তারে প্রকাশ—"মহাত্মা গান্ধী দু'দিন যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাগত। ২৪শে জানুয়ারী জ্বরের তাপ ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে ছিল, আজ ১০৩।"

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মহাত্মাজী সত্বর নিরাময় হোন।

০ ০ ০

চাঁদা দিয়ে হিসেব চাওয়া!

জনৈক সম্ভ্রান্ত পত্র-প্রেরক আমাদের জিজ্ঞাসা করে' পাঠিয়েছেন যে, "মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব তিলক স্বরাজ ফণ্ডের দরুণ ২৩, ৫২৭/৫ পাই, মহাত্মাজীর ফাণ্ডের দরুণ ৮৬৫।০/০ আনা এবং কানপুর মসজিদ ফণ্ডের দরুণ ১১১৪।০ একুনে ৩৩,৩৩১।৶৬ পাই চাঁদা "আল হিলাল" পত্রিকায় প্রাপ্তিস্বীকার করেছিলেন—সাধারণের প্রদত্ত সে টাকার হিসাব আজও দেওয়া হ'ল না! আশা করি অবিলম্বে মৌলানা সাহেব হিসাবের কথা সাধারণকে জানিয়ে সকলের সন্দেহ দূর করবেন।"

পত্র-প্রেরক মহাশয়ের পত্রখানির সুরে যেন কেমন-একটু শ্লেষ আছে, যা থেকে তিনি শেষ পর্য্যন্ত "সন্দেহ দূর করবেন" লিখে ফেলেছেন। অবশ্য মৌলানা সাহেব নিশ্চয়ই তা অবগত নন কেননা আমরা তাঁর সংভাবের প্রতি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমরা চোখে দেখি চাঁদা আদায় বেওয়ারিশ পদার্থটি যখন যার কাছে থাকে তার, ফুটবলের মতো লেওয়া ও দেওয়ার মধ্যেই তার সার্থকতা। ও বস্তুগুলো ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়ে' নাজেহাল হওয়াই এর স্বধর্ম। এ বলে—শুধু দেখে যাও আমোদ পাবে, হিসেব চেয়েছ কি বেকুব বনেছ।

০ ০ ০

কম্যুনিষ্ট ও স্বরাজ্য দল

মিঃ সাকলাৎওয়ালা কম্যুনিষ্ট দলের সেক্রেটারী মিঃ মজাফ্ফর আহমদ একখানি চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, "স্বরাজ্য দল ও কম্যুনিষ্ট দলের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার জন্য কেউ কেউ বৃথা চেষ্টা করছেন আর স্বরাজ্য দলও কম্যুনিষ্ট দলের আদর্শ ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। কিন্তু আমরা আশা করি যে, স্বরাজ্য দলের নেতারা শীঘ্রই বুঝতে পারবেন যে, কম্যুনিষ্ট দলের আদর্শ ছাড়া ভারতে কখনও স্বরাজ লাভ হ'তে পারে না।"

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মনোমালিন্য যেমন খুবই স্বাভাবিক,—কোনও বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতা বা মনোমালিন্যও স্বাভাবিক; তবে যেখানে চরম উদ্দেশ্য উভয়েরই এক, সেখানে বিভিন্ন দলের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হওয়াটা কারোরই পক্ষে শুভকর নয়। এ বিবেচনা বোধ হয় সকলেরই আছে। তবু এরূপ হয় কেন? হয়, সেই দলের ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে যখন ঘা লাগে তখনই, আর সেইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দলে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে থাকে, তবে তো কথাই নাই।

খড়কুটো

—:০:—

গত ২৮শে জানুয়ারী ঢাকার কয়েকটি গ্রামে প্রায় [illegible] হাজার ধীবর একত্র হ'য়ে 'বঙ্গীয় মৎস্য সংরক্ষণ' বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, পাবনা থেকে অনেক ধীবর সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল। [illegible] সাহাপুরের শ্রীযুক্ত শরৎচরণ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় একবাক্যে প্রস্তাব সমর্থিত হয় যে, অবিলম্বে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। ব্যবস্থাপক সভায় ধীবরদের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে, ধীবরদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। সভায় মাছ বৈধ্য এবং [illegible] মৎস্য সংরক্ষণ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় ও শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকারের বিলের সমর্থন করা হয়। শীঘ্রই মাদারীপুর অথবা অন্য কোথাও বঙ্গ আসাম ধীবর কনফারেন্সের অধিবেশন হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

০ ০ ০

গত শনিবার হাওড়ার [illegible] একটি খোড়ার দুর্ঘটনা হ'য়ে গেছে। ঐ দিন ট্রেন পরিষ্কার [illegible] শ্রমজীবি মাটীর নীচে প্রবেশ করে। অনেক ঘণ্টা নিরুদ্ধ হ'য়ে গেলেও তারা আর বাহির হ'তে না পেরে সকলের মনে [illegible] উদ্রেক হয়। এ [illegible] ১ [illegible] ব্যাপার জানবার জন্য আর একটি কুলীকে [illegible] নামানো হয়। সে [illegible] সময় পাশাপাশি পড়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। উপরের লোকেরা [illegible] খবর গোলযোগ আরম্ভ করায় অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হয়। খবর পেয়ে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ, ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় এবং ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি সেখানে সমবেত হন। ক্রমশঃ পুলিশের লোকও উপস্থিত হয়। অনেক চেষ্টার পর কুলীদের উপরে উঠানো হয়; কিন্তু দেখা গেল সাত জন হতভাগ্যেরই [illegible] প্রাণবায়ু নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।

০ ০ ০

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার মধ্যে [illegible] নিম্নে প্রকাশিত হইয়াছে:—

	মোট সংখ্যা	[illegible] সংখ্যা
(১) [illegible]	১৫৩৮৩৮	৩০৭
(২) [illegible]	৬৮৯৯০২	১৩৬৯
(৩) [illegible]	৫৮৫৩৩	৩১০
(৪) [illegible]	১১০৯০	৫১৫

ইহা হইতেই বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশের মত অন্যান্য প্রদেশে অস্পৃশ্যদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়. ইহাদের দুঃখের কারণ—

দারিদ্র্য;

অশিক্ষা;

ঋণ;

মাদকদ্রব্য সেবন।

অজ্ঞতাহেতু তাহারা আপনাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে না, কাজেই তাহারা ঋণগ্রস্ত হয়। অশিক্ষার জন্য তাহারা অস্পৃশ্য হইল। দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহারা মাদকদ্রব্য সেবনে আপনাদের দুরবস্থা ভুলিতে চেষ্টা করে; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক অবনতির পথ প্রশস্ত হয়। দৈনিক বসুমতী

মা

[মাক্সিম গর্কী]

অনুবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একদিন প্যাভেল একটা ছবি আনিয়া দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিল তিনটী লোক ধীরে দৃঢ়পদে অবিচলিতভাবে চলিয়াছে, এই ছিল ছবির বিষয়।

প্যাভেল মাকে ডাকিয়া আনিয়া বুঝাইয়া বলিল, "দেখছ মা ঐ যিশু, মৃত্যুর সমাধি থেকে আবার নব-জীবনে জাগ্রত হয়েছেন।"

ছবিটী মার বড় ভাল লাগে কিন্তু তিনি বিস্মিত হইলেন, যে যিশুকে এত শ্রদ্ধা করে আর ভালবাসে, সে কই তো গির্জ্জায় যায় না একদিন।

ক্রমশঃ দেয়ালে আরও ছবি দেখা দিল; বইএর থাক ক্রমশঃ ভরিয়া আসিল; চারিখানি দেয়ালে ঘেরা বাসাটুকু ক্রমশঃ একখানি সুন্দর ঘর হইয়া উঠিল।

সে আর মাকে তুমি না বলিয়া আপনি বলিত, মা বলিয়া না ডাকিয়া তাঁহাকে মা জননী বলিয়া ডাকিত। কিন্তু কখনও কখন আবার সহসা সেই ছোট একটী অতি পরিচিত আদর আপনি আসিয়া পড়িত; সে বলিত, "মাগো, রাগ করিস্ না, যদি আজ ফিরতে খুব রাত হয়।"

মার মনে প্যাভেলের কথা শুনিয়া কেমন যেন ভরসা হইত।

কিন্তু যতদিন যায় মার মনের আশঙ্কা তত বাড়ে। প্রতিদিন যেন প্যাভেল আরও আলাদা হইয়া চলিয়াছে—প্রতিদিন সে যেন আরও রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল। মার মন অশান্ত হইয়া উঠে, মা ভাবেন, "সবাই দেখি মানুষের মতন, এ যেন সন্ন্যাসী। কথা নেই, বার্ত্তা নাই, গম্ভীর! এই কি ওর বয়স ও-সবের।" কখনও কখন আবার মার মনে হইত হয়ত বা ছেলে শহরে কোন মেয়েকে ভাল বাসিয়াছে—তাই এই পরিবর্ত্তন।

কিন্তু মা জানিতেন যে ভালবাসিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন আছে; প্যাভেল তো সবই মার কাছে দিয়া দেয়।

এই রকমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়; মাসের পর মাস। এমনি করিয়া কখন অজ্ঞাতে নীরবে চিন্তা আর মৌন আশঙ্কায় ভরা জীবনের দুইটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

একদিন প্যাভেল খাওয়া দাওয়ার পর জানলা দরজা বন্ধ করিয়া এক কোণে প্রদীপের আলোয় পড়িতে বসিয়াছিল, মা টেবিল পরিষ্কার করিয়া চুপি চুপি ছেলের মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্যাভেল মুখ তুলিয়া মার দিকে চাহিল।

মা ত্রস্ত হইয়া বলিল, "কিছু না বাছা, তুই পড়্!" কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমি জানতে চাই, সারাক্ষণ তুই ও-সব কি পড়িস্!"

প্যাভেল বইখানি সরাইয়া রাখিয়া মাকে বসিতে বলিল। আশঙ্কায় ও কৎকণ্ঠায় ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বসিলেন।

প্যাভেল মার দিকে না চাহিয়া গম্ভীর দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল, "এই সমস্ত বইএর প্রচার শাসন-কর্ত্তারা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের বাজেয়াপ্ত করে প্রচার বন্ধ করা হয়েছে কারণ তাতে এই আমাদের, মুটে মজুর কুলীদের জীবনের রূঢ় সত্য লেখা আছে। এই সমস্ত বই এখন গোপনে ছাপা হয়। আজ আমাকে তারা যদি এই বই পড়তে দেখে আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে কেন না আমি সত্যকে জানতে চেয়েছি এই অপরাধ।"

হঠাৎ মার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। বিস্ফারিত নয়নে তিনি আপনার পুত্রের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি যেন তাঁহার আপনার পুত্রকে সম্মুখে দেখিতেছেন না। তাহার বদলে কে এক অপরিচিত রহস্যময় যুবক যেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আরও যেন কোমল, গভীর ও উদার। যুবক প্যাভেল মা'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিল।

উদ্বেলিত হৃদয়ে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কেন এমন করিস বাছা? প্যাভেল মাথা তুলিয়া মা'র দিকে চাহিয়া ধীরে কোমল স্বরে উত্তর দিল, আমি সত্যকে জানতে চাই, মা।

তাহার কোমল কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার চোখে দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র কোন্ এক রহস্যময় ভীষণ দেবতার প্রস্তর-বেদীতে আপনাকে আত্মাহুতি দিয়াছে। জীবনের সমস্ত কিছু মা এক নিষ্ঠুর ভবিতব্যতার দোহাই দিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে এই নিষ্ঠুর ভবিতব্যতাকে স্বীকার করিয়া সইতে তিনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার মুখে কোনও কথা ফুটিয়া উঠিতে পারিল না, শুধু নীরবে অশ্রুজলে অন্তরের ব্যথা ও যন্ত্রণাকে মানিয়া লইলেন।

প্যাভেল মা'র কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'কেঁদো না মা'।

মার মনে হইল, প্যাভেল যেন চিরকালের মত চলিয়া যাইবে, তাই বিদায় লইতে আসিয়াছে।

প্যাভেল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিয়া চলিল, মনে কর মা, তুমি কি জীবন যাপন ক'রে এসেছো। আজ তোমার জীবনের চল্লিশটি বছর চ'লে গেছে, কোন দিন বলতে পার, এক মুহূর্ত্তের জন্য তুমি সত্যিকারের

জীবন যাপন করেছো? বাবা তোমাকে নিয়ত মারতেন, আমার মনে হয়, তাঁর জীবনের সমস্ত নিকৃষ্ট অপদ্রব্য দৈন্য তিনি তোমার জীবনে এই রকম করে সার্থক করতেন। এই দৈন্যের চাপ তাঁকে অবশ করে, চালিয়ে নিয়ে চলেছিল। তিনি নিজেই জানতেন না, কোথা থেকে এ চাপ আসত। ত্রিশটি বছর তিনি কারখানায় কাটিয়েছেন; কারখানার ঘর যখন মাত্র দুটি ছিল, তখন কাজে ঢোকেন আর আজ সেখানে সাত সাতটা বাড়ী নিয়ে কারখানা উঠেছে। কল বেড়ে চলেছে, আর কলের জন্য রক্ত দিয়ে মানুষ নিয়ত মরছে!

এতক্ষণ মা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া পুত্রের কথা শুনিতেছিলেন। প্যাভেলের চোখে একটা সুন্দর জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে সে মা'র দিকে ঝুঁকিয়া তাঁহার সামনা সামনি দাঁড়াইয়া মা'র চোখের দিকে চাহিল। দেখিল, মা'র চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। জীবনে যে সত্য সে উপলব্ধি করিয়াছে। ধীরে ধীরে আজ সে মাকে তাহার সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

"জীবনে কোন্ আনন্দ তুমি পেয়েছো? তোমার সমস্ত অতীত জুড়ে কি পড়ে আছে?"

পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মা'র মনে যেমন এক নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। মা আপনিই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল কে যেন তাঁহার ব্যথাতুর অন্তরে স্নেহ-প্রলেপ বুলাইয়া দিতেছে। এক বিষণ্ণ আনন্দে মা'র মন ভরিয়া উঠিল। জীবনে এই প্রথম তিনি এই সুকোমল স্পর্শ পাইলেন। এই স্পর্শে তাঁহার অন্তরের সুপ্ত আবছায়া বহুচিন্তা যেন সজাগ হইয়া উঠিল। দূর যৌবনের যত সব বিদ্রোহী বিক্ষত চিন্তার মৃত কঙ্কাল তাঁহার অন্তরে আবার যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল।

ইহার পূর্ব্বে বহুবার মা প্রতিবাসিনীদের সহিত জীবন সম্বন্ধে বহু আলোচনাই করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ব্যতীত সকলেই শুধু নানারকম প্রতিবাদই করিত, কেহ কোন দিন বলে নাই, কেন জীবন এত দুর্বিষহ ও নিষ্ঠুর। আজ তাঁহার আপনার পুত্র তাঁহার জীবন সম্বন্ধে যে কথা শুনাইল, মনে হইল এই সমস্ত কথা আর প্যাভেলের ঐ মুখ চোখ, সমস্ত দেহ যেন তাঁহার মনকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। পুত্রের দিকে চাহিয়া মা'র মন গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল। ছেলেরা ত মা'র দিকে ফিরিয়া চায় না, মা সে কথা খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু আজ প্যাভেল তাঁহার নারী-জীবনের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিল সমস্তই তাঁহার অতি পরিচিত, তাই প্যাভেলের এই সমস্ত কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া মা'র মন সায় দিয়া উঠিল। এবং তাঁহার অন্তঃকরণ প্রতি মুহূর্ত্তে এক নূতন অজ্ঞাত প্রেরণায় দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে তুই কি করতে চাস?"

"আমরা নিজেরা শিখবো, পরকে শেখাবো। এই সমস্ত কারখানার লোকদের শেখাতে হবে, তাদের ভাবতে দিতে হবে, জীবন তাদের কাছে কেন এত নিষ্ঠুর।"

প্যাভেলের কথা শুনিয়া মা'র মনে যদিও একবার ইচ্ছা গিয়াছিল বলিতেন যে, লোকে তোকে মানবে কেন? তারা হয়ত তোকে মেরেও ফেলতে পারে।

কিন্তু প্যাভেলের এই সমস্ত কথা শুনিতে মা'র এত আনন্দ ও গর্ব্ব লাগিতেছিল যে, তাঁহার আর কিছু বলা হইল না।

প্যাভেল মা'র দিকে চাহিয়া দেখিল মুখে একটি সুন্দর কোমল হাসি, চোখে স্নেহদৃষ্টি, সমস্ত দেহে একটি সলাজ কৌতুহল। মা'র দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল যে, সে মাকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে অজ্ঞাতে বাধ্য করিয়াছে। আপনার কথার শক্তিতে যৌবনোচিত এক গর্ব্বে তাহার আপনার উপর বিশ্বাস সহসা যেন বাড়িয়া উঠিল। এই সব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সে অনবরত বলিয়া চলিল। তাহার মুখে কখনো তাহার অজ্ঞাতে হাসি অথবা তিক্ত বিরাগের রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার কথায় এক নিদারুণ ঘৃণা প্রকাশ পাইতেছিল। মা সেই সমস্ত কর্কশ শব্দে সহসা সজাগ হইয়া উঠিয়া ভীত কণ্ঠে বলিলেন, তাই নাকি?

প্যাভেল উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিল, নিশ্চয়ই! জগতে যারা মানুষের মঙ্গল কামনা করে আর তারই জন্যে সত্য কথা বলে সত্যের মহিমা প্রচার করে, তাদেরই বন্য পশুর মত জগতের এককোণ থেকে আর এককোণে, কারাগার থেকে কারাগারে চালিয়ে নিয়ে ফিরেছে তারা এমন মানুষ—জীবনের শত্রু, সমস্ত সত্যের এরা শত্রু। আমি এই সমস্ত সত্যদর্শী মানুষদের নিজের চোখে দেখেছি। জগতে তারা শ্রেষ্ঠ।"

এই সমস্ত লোকেদের কথায় মা'র মন এক অজানা আতঙ্কে ভরিয়া আসিত, তাঁহার ইচ্ছা যাইত জিজ্ঞাসা করিতে যে, এ সব কি সত্যই! কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। আজ তাঁহার আপনার পুত্রকে এই সমস্ত ভয়াবহ কথা ভাবিতে ও বলিতে শিখাইয়াছে, তাহাদের জীবন-কাহিনী তিনি শুধু নির্ব্বাক হইয়া শুনিয়াই চলিয়াছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে অবশেষে মা বলিয়া উঠিলেন, তা যাই হোক, ভোর হবে এল যে! একটু ঘুমিয়ে নে, কাল ত আবার কাজ আছে।

প্যাভেল ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, তা যাচ্ছি মা, কিন্তু বল, তুমি বুঝেছ?

মা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, বুঝেছি। কিন্তু তাঁহার চোখ দিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, বুঝেছি কিন্তু এ পথে যে মৃত্যু!

প্যাভেল ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, একবার দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, মাগো, আমি যা করি, আমি যেখানে যাই, আজ সমস্তই তোমাকে বললাম। যদি আমায় তুমি সত্যই ভালবাস, তবে কোন রকমে আমাকে বাধা দিও না।

মা রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন, ওরে আমার সোনা মানিক, তোর এ সব কথা না জানা আমার যে ঢের ভাল ছিল।

প্যাভেল ধ'রে থাকে মা'র হাত দুখানি আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল।

মা তেমনি রুদ্ধ-কণ্ঠে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, না, আমি বাধা দেবো না। শুধু এই চাই, সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিস।

কিন্তু কি থেকে সাবধানে থাকিতে হইবে, হঠাৎ তাহা মনে না আসায় মা বলিয়া উঠিলেন, কি ভয়ানক রোগা হয়ে গেছিস!

তিনি প্যাভেলের দিকে এক নূতন স্নেহের তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া চাহিলেন। মনে হইতেছিল, তাঁহার দৃষ্টি যেন পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। যে রকম তুই চাস, সেই রকমই তোর জীবন হোক, আমি কেন বাধা দেবো তোকে। একটা জিনিষ শুধু মনে রাখিস যে, লোকেদের সঙ্গে যখন কথা বলবি, খুব সাবধানে বলিস। মানুষের সম্বন্ধে সব সময়ই সজাগ থাকিস, কেন না তারা লোকে লোককে ঘৃণা করে। হিংসা আর লোভে তাদের জীবন; অপরের অনিষ্টে তাদের আনন্দ, শুধু মজা দেখবার জন্যে তারা মানুষকে যে কোন নির্য্যাতন দিতে পারে। যখন তুই তাদের দোষ দেখিয়ে তাদের উন্নত হতে বলবি, তখনই তারা তোকে ঘৃণা করবে, হয়ত তখনই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।"

প্যাভেল দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মা'র এই সমস্ত বিষাদ-মাখা কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, জানি মা, জানি; মানুষ কি খুব কিন্তু যে দিন জানলাম যে, জগতে আরো একটা বড় সত্য আছে, সেদিন এই সমস্ত ভয়ঙ্কর মানুষগুলো আমার কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমি জানি না, কেমন করে এ পরিবর্ত্তন হ'ল। ছেলেবেলা থেকেই মানুষকে রীতিমত ভয় করতাম। তারপর যত বড় হতে লাগলাম, মানুষকে ঘৃণা করতে শিখলাম। কারুর নীচতা দেখে রাগ হ'ত বা কেন—জানি না এমনি; কিন্তু আজ আমি এই সমস্ত মানুষদের অন্য চোখে দেখি। আজ আমার মানুষ দেখে চোখে জল ভ'রে আসে শুধু, কেন আসে তাও জানি না ঠিক। যেদিন থেকে বুঝেছি, এই মানুষেরই মধ্যে আছে আমার সত্য, সেই দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে, এই অধঃপতন বা নীচতার জন্য এরাই শুধু দায়ী নয়।

প্যাভেল হঠাৎ থামিয়া গেল, সে যেন তাহার আপনার মধ্যে কাহার কথা শুনিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে স্থির শান্তকণ্ঠে সে বলিল, সত্য, তার জীবন এই রকমই।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, কল্যাণ হোক তোর কিন্তু এ কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন!

—ক্রমশঃ

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

বাৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি		৸৹
	প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম	৭৲
	" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৩৷৹
মলাট—১ম পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি		১৷৹
	অর্দ্ধ কলম	৭৲
	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৷৹
" ২য় পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি		১৲
	" প্রতি কলম	৯৷৹
	" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৮৷৷৹
" ৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য		
" ৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি		১।০
	প্রতি কলম	১১৲
	" সমগ্র পৃষ্ঠা	২১৷৷৹

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵৹।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পঁচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সী দেওয়া হইবে না; ও প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ-হিসাব মত বিক্রয়লব্ধ অর্থের টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় ও মণিঅর্ডার কমিশন লাঙল অফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যায় শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেন্টগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

৬। নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

পত্রিকার মূল্য—

বাৎসরিক	৩৲ টাকা,	ভিঃ পিঃ	৩।৹
ষাণ্মাসিক	১৷৷৵৹	"	১৸৵৹
প্রতিসংখ্যা	এক আনা		

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র

৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

বাহির হইয়াছে। বাহির হইয়াছে।

ইউরোপের দর্পহারী মহাবীর গাজী আবদুল করিম—৷৷৵৹

ইহাতে রিফ-কুর্দ্দিস্থানের গাজী আবদুল করিমের অলোক সামান্য জীবন কথা ও রিফের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। সচিত্র মূল্য ৷৷৵৹ আনা। সংবাদপত্র কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মোস্তাফা কামালপাশা—।৵৹

এসিয়ার গৌরব মহাবীর গাজী মোস্তাফা কামালপাশার চিত্তাকর্ষক জীবনী। মূল্য মাত্র ।৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—লাঙলবুক এজেন্সী
৩৭ নং হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

"লাঙল" বুক এজেন্সী

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

[নবযুগের নবীন মন্ত্রের নবীন ছন্দের নব পুস্তক সমূহ

কাজি নজরুল ইসলামের

নূতন কবিতার বই ঃ—

ক্রন্দন নীরতা ভারত মাতার ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত অনুপম প্রচ্ছদ পট, ৺দেশবন্ধুর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ফটো ও কবির নিজের ফটোসহ

চিত্তনামা—১৲

পাঠক ইহারই মধ্যে কবির অমর কবিতা "ইন্দ্র পতন" ও "সান্ত্বনা" পাইবেন। অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

ছায়ানট—১।০

(কবির সুন্দর ছবিসহ সুন্দর বাঁধাই)

অগ্নিবীণা—১।০

৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত, এবং কবির বর্ত্তমান ফটোসহ)

বিষের বাঁশী (গদ্য কাব্য)—১৷৷৹

ব্যথার দান (২য় সংস্করণ) ঐ—১৷৷৹

(সৈনিকবেশী ফটোসহ)

দোলন চাঁপা—১।০

([illegible])

রাজবন্দীর জবানবন্দী—/০

ইহা পাঠে পাঠক কবির নির্ভীকতার যথার্থ পরিচয় পাইবেন

কবির তিনখানা পুস্তক যন্ত্রস্থ ঃ—

ঝিঙেফুল

বাঁধন হারা

ফণী মনসা

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী প্রণীত

বোলশেভিকবাদ

(সচিত্র)

বোলশেভিক রুশিয়া সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ নানা চিত্র-সম্বলিত পুস্তক মূল্য মাত্র ৷৷৹ আনা।

চিত্তকথা

(সচিত্র)

চিত্তকথা চিত্তরঞ্জনের নিজের মুখের কথা—মহাপুরুষের চরিত্রের সকল দিক ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

নরনারী

(যন্ত্রস্থ)

মারী ষ্টোপস্, হ্যাভলক এলিস্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের গবেষণা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত।

---

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড, হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীমাণভূষণ মুখোপাধ্যায়।



লাঙল

[শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড	বৃহস্পতিবার, ২১শে মাঘ, ১৩৩২	৭ম সংখ্যা

অশ্বিনীকুমার

[নজরুল ইসলাম]

—ঃ০ঃ—

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, "চল্ আগে চল্",—
"চল্ আগে চল্" গাহে ঘুম-জাগা পাখী,
কুয়াশা-মশারি ঠেলি জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা; আজি এই সাথে,
এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিনু বীর প্রাতঃস্মরণীয়!
স্বর্গ হ'তে এ স্মরণ প্রীতি-অর্ঘ্য নিও,
নিও নিও সপ্তকোটি বাঙালীর তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব।

আজো তারা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে দেব। আজো পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষ্যা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি—নিরস্ত্রের পুঁজি।
মন্দভাষ গাঢ়মসী দিব্য অস্ত্র তার।
দুই সপ্তকোটিধৃত খর তরবার.
সে শুধু কেতাবী কথা, আজো সে স্বপন!
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ণ
উদ্গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হ'ল ভূমি।
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি।

কে করিবে নমস্কার। হায়, যুক্তকর
মুক্ত নাহি হ'ল আজো। বন্ধন-জর্জ্জর
এ কর পারেনা দেব ছুঁইতে ললাট।
কে করিবে নমস্কার?

কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান। রসনা অসাড়,
কথা আছে বাণী নাই, ছন্দে নাচে হাড়।
ভাষা আছে আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতিরে নবমন্ত্রদান।
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের অকাল
করিয়াছে হেয় তারে। লেখনী ও কালি
যত না সৃজিছে কাব্য—ততোধিক গালি।
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ প'ড়ে সে অবশ।
গর্দ্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে।
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার। জুলুম জিঞ্জির
মাংস কে'টে ব'সে আছে হাড়ে খায় চিড়
আর্ত্ত প্রতিধ্বনি তার। কোথা প্রতীকার।
যারা আছে—তারা কিছু না ক'রে নাচার।

নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি,
তাও নাহি পারি দেব। আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী। যাইব কোথায়।
আমার চরণ নহে মম বশে হায়।
একঘর ছাড়ি আর-ঘর যেতে নারি,
মর্দ্দজাতি হয়ে আছে পর্দ্দা-ঘেরা নারী।

এ লাঞ্ছনা, এ পীড়ন, এ আত্ম-কলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ—
তব বরে দূর হোক ! এ জাতির পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্ব্বাদ ঝরে !
যে-আত্মচেতনা-বলে যে-আত্মবিশ্বাসে
যে-আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উ'ঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে !
স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আছ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর শক্তি তব ! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি !
দিলে ধর্ম্ম, দিলে কর্ম্ম, দিলে ধ্যান জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিলনা ; দিয়ে বলিদান
আত্মারে জননী-পদে, হাঁকিলে, "মাভৈঃ !"
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই !
ওরে জড় ওঠ, ভোরা !" জাগিল না কেউ,
তোমায় লইয়া গেল পারাপারী ঢেউ !

অগ্রে তুমি জেগে ছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি দিবা ধরি
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি
বেলা শেষে জাগিয়াছে ! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার !
পশ্চাতে "অতীত" টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের বর্ত্তমান অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ ভবিষ্যৎ,
যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ !

হে প্রেমিক, তব প্রেম বরিষায় দেশে
এল ঢল বীর-ভূমি বরিশাল ভেসে !
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে উষর বঙ্গ তব কাছে হায় !
পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমায়,
অসুর নিধনে কবে আসিবে আবার !

মা

[ম্যাক্সিম গর্কি]

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

——:০:——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার তাহারা নীরবে দিন কাটাইতে লাগিল, দূরে হইলেও একে অন্য হইতে যেন কত নিকটে। সপ্তাহের মাঝখানে একদিন, সেদিন ছুটী ছিল, বাহিরে যাওয়ার জন্য তৈয়ার হইতে হইতে সে তাহার মাকে বলিল:

"শনিবারে এখানে কয়েকজন লোকের আসবার কথা আছে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথাকার লোক?"

"কতক লোক আসবে আমাদের গাঁ থেকে, আর অপর সব আসবে শহর থেকে।"

"শহর থেকে?" মাথা নাড়িয়া মা এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং পরক্ষণেই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্যাভেল্ রোষ সহকারে চেঁচাইয়া বলিল, "মা! একি হচ্ছে? কেন তুমি এমন করছ?"

সম্মুখদিকের বস্ত্রাবরণ দ্বারা চেহেরাকে শুকাইয়া লইয়া শান্তভাবে তিনি বলিলেন:

"আমি জানিনে কেন আমি কাঁদছিলুম, কিন্তু আমার বড় কান্না পাচ্ছে।"

ঘরের এক কিনারা হইতে আর এক কিনারা পর্য্যন্ত সে কয়েকবার পায়চারি করিল। তাহার পরে মায়ের সামনে থামিয়া বলিল:

"তুমি কি ভয় পেয়েছ?"

মা স্বীকার করিলেন, "আমি ভয় পেয়েছি। ঐ যে শহরের লোকেরা আসছে—কে তাদের চেনে?"

মায়ের মুখখানা দেখার জন্যে সে নত হইল এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলিল যার কিন্তু মনে হইল সে যেন তাহার বাপেরই মত রাগ করিয়া বলিয়েছে:

"এই যে ভয়—এটাই হচ্ছে আমাদের সকলের ধ্বংসের মূল কারণ। যারা আমাদের দাবিয়ে রাখ্‌ছে, আমাদের ভীরুতা তাদের সুবিধে করে দিচ্ছে এবং তার দ্বারা তারা আমাদের ক্রমশঃ অধিকতর ভীতু করে তুলেছে। মনে রেখো, যতদিন লোকেরা ভীরু থাকবে, বিলের জলে আগাছাগুলো পড়ে পড়ে যেমন করে পচতে থাকে, ঠিক তেমনি করে তারাও ততদিন পচতে থাকবে। আমাদের সাহসী হতেই হবে। এই হচ্ছে সময়!

মায়ের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "তুমি যাই বলনা কেন, যেমন করে হোক, তারা আমার বাড়ীতে একত্র হবেই হবে।"

অনুনয় ও বিষণ্ণভাবে মা বলিলেন, "আমার উপরে রাগ করোনা! ভয় না পেয়ে আমি কি করে থাক্‌তে পারি? আমার সারাটি জীবন যে ভয়ের ভিতর দিয়েই কেটে গিয়েছে!"

নম্রভাবে পুত্র উত্তর করিল—"আমায় ক্ষমা কর। কিন্তু, আমি যে, এ ছাড়া অন্য কিছু করতেই পারিনে। এই বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

তিন দিন যাবৎ মায়ের হৃদয় কাঁপিতেছিল। যতবার তাঁহার মনে পড়িতেছিল যে তাঁহার ঘরে অচেনা লোকেরা সব আসিবে ততবারই তিনি ভয়ে সারা হইয়া যাইতেছিলেন। আপনার মধ্যে তিনি ঐ সমস্ত লোকের একটা ছবি কল্পনাই করিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু এইটুকু তাঁহার মনে হইতেছিল যে তাহারা ভয়ানক লোক। তাঁহার পুত্র যে পথে চলিয়াছিল তাহারাই তাহাকে সে পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

শনিবারের রাত্রে প্যাভেল কারখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রক্ষালনের কাজ সমাধা করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিল, এবং ঘরের বাহিরে যাইতে যাইতে মায়ের দিকে না তাকাইয়া তাঁহাকে বলিল:

"যখন তারা আসবে, তাদের বলবে যে আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি। তাদের একটুকু বসতে দিও এবং ভয় পেয়োনা। আর সব মানুষের মত তারাও মানুষ।

প্রায় মূর্চ্ছিতাবস্থায় মা আপনার আসনে বসিয়া পড়িলেন।

পুত্র ধীরভাবে মায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল। সে বলিল: "হয়তো তুমি আর কোথাও চলে গেলে ভাল হবে।"

এরূপ ধারণাতে মা আপনাকে অপমানিত মনে করিলেন এবং মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া দিলেন। তার পরে তিনি বলিলেন,—"না, সে একই কথা। কেনই বা যাব?"

নবেম্বর মাস শেষ হইয়া আসিয়াছিল। দিনের বেলায় জমাট মাটির উপরে শুষ্ক ও সুন্দর তুষারপাত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র যখন চলিয়া যাইতেছিল তখন তাহার পায়ের নীচে পড়িয়া যে জানালার বাহিরে তুষারের কড়্ কড়্ শব্দ হইতেছিল তাহা তিনি শুনিতে পাইলেন। জানালার আয়নাগুলির উপরে ঘন অন্ধকারের আবরণ দৃঢ়রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন কোনো একটা প্রতিকূল বস্তুর অনুসন্ধান করিতেছে। বেঞ্চের উপর শরীরের ভর দিয়া মা বসিলেন এবং দ্বারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে হইল কাহারা যেন সঙ্গোপনে ও সাবধানে নত হইয়া এবং চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্ধকারে তাহার

ঘরের আশে পাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন অদ্ভুত তাহাদের পোষাক, তেমনি তাহারা নীরব। কোনো একজন লোক আগে থেকেই দেওয়ালে হাতড়াইয়া ঘরের দিকে আসিতেছিল।

একটি বাঁশী আওয়াজ শুনা গেল। তারের যন্ত্রের বিষাদ-মাখা সুমধুর ধ্বনির মত আওয়াজটি চারিদিক ছাইয়া ফেলিল এবং অন্ধকার নির্জ্জনতায় গানের সুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল, যেন কোনো কিছুর খোঁজ করিতেছে। ধ্বনিটি আরও নিকটে শুনা গেল। হঠাৎ জানালার তলায় আসিয়া বন্ধ হইয়া গেল, এমন মনে হইল যেন ইহা দেওয়ালের লাকড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। এবার অলিন্দে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। মা চমকাইয়া উঠিলেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে জোর করিয়া চাওয়ার ও ভয়ের নিদর্শন ছিল।

দরওয়াজা খুলিয়া গেল। প্রথমে ঘরের ভিতরে লম্বা চুলওয়ালা একটি হ্যাট প্রবেশ করিল। তাহার পরে একখানা নোওয়ান, পাতলা শরীর নিজেকে সোজা করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, এবং একটুকু ভাবিয়া ডানহাত খানা তুলিল :—

লোকটি নিম্ন ও চাপা স্বরে বলিল—"নমস্কার"। সে কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিতেছিল।

মা নীরবে মাথা নত করিলেন।

"প্যাভেল কি এখনো বাড়ী আসে নি?" ক্রমশঃ

বাংলার প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বিধি

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

—০:০—

(১)

১৮৮৫ সালে এই বিধি প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। তার পর এর অনেক ত্রুটি দেখা গিয়েছে এবং অনেক সংশোধন হয়েছে। এখনও অনেক ত্রুটি আছে এবং সেই জন্ত গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেছেন যে আবার একবার আইনটার সংশোধন করবেন। মহারাজ সৌনীশচন্দ্র রায়, কৃষিমন্ত্রী, এই কাজের ভার নিয়েছেন।

রোগ যেখানে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী, সেখানে অঙ্গবিশেষে বাহ্য প্রলেপ দিয়ে আরোগ্য লাভের চেষ্টাও যেমন, প্রস্তাবিত সংশোধক বিধি দিয়ে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনকে নির্দ্দোষ করবার চেষ্টাও তেমনি। জমি সম্বন্ধীয় যত আইন পূর্ব্বে পূর্ব্বে হয়ে গিয়েছে এবং এখন হচ্ছে, তাতে জমিদারকে জমির মালিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাঁর ভূ-স্বামিত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ; তাতে যদি কেউ আপত্তি করে তা বাতিল ও নামঞ্জুর। এ ব্যবস্থার কারণ খুঁজতেও বেশী দূর যেতে হবে না। তখনকার (এবং এখনকার বললেও বড় বেশী অত্যুক্তি হবে না) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের প্রায় সকলেই ছিলেন ভূ-স্বামী; আর ছিলেন ইংরেজ, যাঁদের পূর্ব্ব পুরুষ এই অলঙ্ঘনীয় জমিদারী-স্বত্ব-বেদের বেদব্যাস। তাঁরা চেয়েছিলেন বিলাতী ভূ-স্বামীদের একটা ভারতবর্ষীয় সংস্করণ করতে। তাঁরাই বপন করেছিলেন সেই দুষ্ট বীজ যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল সংসারে একমাত্র অচল অপরিবর্ত্তনীয় বিধি-বৃক্ষ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যার ফল এই বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আমি স্থানান্তরে (১) বলেছি। এখানে আর তার পুনরুক্তি করব না। সংক্ষেপে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, যে দিল্লীশ্বর এই বন্দোবস্ত ইংরেজ কোম্পানিকে চিরকালের জন্য (for ever and ever) দিয়েছিলেন সে দিল্লীশ্বরও নাই, সে কোম্পানিও নাই। কিন্তু বন্দোবস্তটা চিরস্থায়ী কি না সেই জন্ত সেটা অবশ্য আছে এবং আশঙ্কা হয়, থাকবে। আর, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই উত্তরাধিকারসূত্রে তাকে পেয়েছেন সে বন্দোবস্তে প্রজা পক্ষভুক্ত ছিল না। সুতরাং পরবর্ত্তী বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের সময়ও তার কথা শোনা হয় নি।

(১) বাঙলার কৃষকের কথা। রাধেশ্বর দে, চন্দননগর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কিন্তু বাঙলার প্রজার এখন চোখ ফুটেছে। প্রজা এখন বুঝেছে তার স্বত্বাধিকার কি আছে এবং কি হওয়া উচিত। আর, তথা-কথিত জমিদারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি রকম আছে এবং কি রকম হওয়া উচিত তাও সে বুঝেছে। সে আর এমন কূপমণ্ডূক নাই। এখন সে পৃথিবীর চারিদিকে চেয়ে দেখছে অন্য দেশের প্রজা তাদের স্বাভাবিক স্বত্ব এবং অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক প্রজাসংঘে সম্মিলিত হয়ে কত প্রকার চেষ্টা করছে এবং এ দেশের প্রজাকে সেই সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করছে, সেই আন্তর্জ্জাতিক প্রজাসঙ্ঘে (Praesidium of Krestintern) ৩৯টি দেশের দেশের কৃষক প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হয়েছেন। সকল দেশের কৃষকের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি—রাজনৈতিক, আর্থিক, শিক্ষা বিষয়ক—সাধন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এই নিঃস্বার্থ হিত-কামনার মধ্যে দুর্ভাগা ভারত প্রজাও স্থান লাভ করেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তাঁর পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে লিখেছেন—

"Bowing our head in sorrow over the loss of your leader, we pledge, on behalf of the organised peasantry throughout the world, our support in every way, to the measures undertaken by you for the attainment of your ultimate goal.

We are convinced that the joint efforts of your party and of the world's peasantry whose spokesman is the Krestintern, will bring about the realization of these task for which your never-to-be-forgotten leader has fought so devotedly throughout the whole of his lifetime.

The Praesidium of Krestintern requests the Central Committee of the Swarajyist Party to tender to the larger masses of Indian peasants the ardent fraternal greetings and the appeal to join the ranks of your party under the banner of Krestintern, for the fight for a better future for the Indian people in alliance with the toilers throughout the world."

এর মর্ম্মার্থ এই যে আপনাদের নেতার মৃত্যুতে আমরা শোকে মস্তক অবনত করে পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় কৃষকসংঘের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার করছি যে আপনারা আপনাদের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করছেন আমরা তা সর্ব্বোতোভাবে সমর্থন করব। আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে আপনাদের চেষ্টার সঙ্গে ক্রেষ্টিনটার্ণ প্রমুখ পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় কৃষকসংঘের চেষ্টা সম্মিলিত হলে আপনাদের চিরস্মরণীয় নেতা যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিলেন সে উদ্দেশ্য সফল হবে। আমাদের ক্রেষ্টিনটার্ণ (আন্তর্জ্জাতিক কৃষকসংঘ) আপনাদের স্বরাজ্যদলের কেন্দ্রীয় সমিতিকে অনুরোধ করছেন যে তাঁরা যেন ভারতীয় কৃষক সাধারণকে আমাদের ভ্রাতৃভাবের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন এবং অনুরোধ করেন পৃথিবীর শ্রমজীবীসংঘে সম্মিলিত হয়ে ভারত বাসীর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যেন তাঁরা সচেষ্ট হন।" বাঙলার কৃষকও বলছেন সেই "সংঘং শরণং গচ্ছামি"।

Praesidium Krestintern (Peasants International)—এর এই পত্রে স্বাক্ষর করেছেন—Bombal (Poland), Otto Ryddle (Czekoslovakia), Marius Vazeilles, Renand Jeon (France), Corov (Bulgaria), Richard Buergi (Germany) Orlov (Ussb), Gero (Sweeden), Liang (Norway), Alonso (Spain) Odinets (Ukraine), Hudaikulov (Urbekiston, Central Asia), Ussulio Galvan (Mexico), Knutson (Americ) Kain Haiashi (Japan), Tem (Esthonia), Grieco (Italy) Tohan (China), Nodelai Quack (Indonasia), Guido Migioli (Representative of Catholic Popular Party, Italy.

(২)

আন্তর্জ্জাতিক কৃষি সংঘের এই পত্রে কোন ইংরেজ কৃষিকর্ম্মীর স্বাক্ষর নাই। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমজীবী দলের মেম্বার্স ক্যাম্বেল (Campbell) ষ্টীভন (Stephen) কেলি (Kelley), ল্যান্সবেরি (Lansbury) পারসেল (Purcell) সাক্লাৎওয়ালা (Saklatvala), স্কার (Scurr) থার্টল (Thurtle) ওয়ালহেড (Wallhead) এ, জে, কুক (A. J. Cook) এবং ফেনার ব্রকওয়ে (Fenner Brookway) প্রভৃতি সদস্যগণ স্বাক্ষরিত যে বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তাঁরা এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক আলোচনা করে বলেছেন—

"The illiteracy, poverty and misery of the masses in India surpass all belief. The peasants are left without political rights and any form of education and medical assistance. By this action of the British Government, things are tending towards an explosion in India. ○ ○ ○

It is urgntly necessary that ○ ○ ○ ○

(3) Immediate step should be taken for the granting of full right for the development of peasant and industrial labor organizations and the promction of measures for imroving the condition of the workers and peasants."

অর্থাৎ এ দেশের জনসাধারণ এত দারিদ্র্য-দুঃখ পীড়িত, এত বর্ণজ্ঞানহীন যে ভারতবর্ষের বাইরের লোক তা সহজে বিশ্বাস করতে পারে না! এ দেশে কৃষকের কোন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাই। শিক্ষার ও চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ দেশটাকে বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখন দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির জন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। তাতে আর বিলম্ব করলে চলবে না। তাদের ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অধিকারগুলি শীঘ্রই পূর্ণ মাত্রায় তাদের দিতে হবে।

এই ত ইংরেজ শ্রমজীবীদের কথা। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ প্রমুখ ইংরেজ উদারনৈতিক দলও এই সময়ে তাঁদের দেশের চাষের জমিকে জাতীয় সম্পত্তি করে দিয়ে ইংলণ্ডের কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেছেন। এ দেশের ও কৃষির হিতের জন্য তাঁদের কৃষিমন্ত্রীকে এ দেশের শাসনকর্ত্তা করে পাঠাচ্ছেন।

বাঙলার কৃষকের সঙ্গে এ সকলের সাক্ষাত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও অবস্থাগুলি পারিপার্শ্বিক ভাবে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন সংশোধনে সহায়তা করবে। বাঙলার কৃষক এই সুযোগে জমির উপর কেবল তার স্বত্ব নয়, তার স্বামিত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করুক। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বা ভারত গবর্ণমেণ্টের কথার উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে না থেকে ব্যবস্থাপক সভার ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হয়ে, অনুগ্রহের উপর নয়, ন্যায় ধর্ম্মের উপর, নির্ভর করে দাবী করুক আগে জমিদারের স্বত্বের বিচার হোক। যদি জমিদার জগতে তাঁর স্বত্ব সাব্যস্ত করতে পারেন, তখন প্রজার স্বত্বের সংশোধন হবে। সংশোধন ত অনেকবার হয়েছে, এবারকার সংশোধনটা যেন আমূল হয়। বিষবৃক্ষের মূলটি বজায় রেখে দু' একটা ডাল পালা কেটে ছেঁটে দিলে ফল বিষময়ই থাকবে।

(৩)

কিন্তু প্রস্তাবিত সংশোধন আইনের যে খসড়াটা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়েছে; তাতে আমূল সংশোধনের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। বরং পাওয়া যায় জমিদারের কতক-গুলি অধিকার এবং ততোধিক অনধিকার। আরও শক্ত করে দেবার চেষ্টা। প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় যে শতধাবিভক্ত প্রজার সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করবার জন্য সহস্রধাবিভক্ত জমি-দারের যাতে সুবিধা হয় তারই চেষ্টা। স্রোত-জমার স্বত্বাধিকারের অনেক ভাগ হয়ে গিয়েছে। জমিদারের বংশবৃদ্ধির জন্য চটকল্ড মাংসের মত জমিদারীরও অংসখ্য অংশ হয়ে গিয়েছে। সেই জন্য প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করা বা প্রজার সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করা কিছু কঠিন হয়ে পড়েছে সেইটাকে সহজ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অংশীদার জমিদারেরা এখন প্রত্যেকে নিজের নিজের খাজনা আদায় বা মামলা মোকদ্দমা না করে, একজন সাধারণ ম্যানেজার বা গোমস্তার দ্বারা এই কাষ করাতে পারেন। কিন্তু প্রজার বেলায় প্রজার অংশীদারেরা সকলে মিলে বা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকে সমস্ত খাজনার জন্য দায়ী হবে। এটা যে কেবল জমি-দারের সুবিধার জন্য, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু স্রোতজমার এই ভাগে এবং ভাগের ভাগে আর একটা যে মহা অনিষ্ট হচ্চে প্রস্তাবিত সংশোধনে তার কোন নাম গন্ধ নাই। দেশের উত্তরাধিকার আইনের গুণে প্রজাবৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যেক কৃষকের অংশের জমির পরিমাণ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আজ এক কৃষকের ৩০ বিঘা জমি আছে, কাল তার মৃত্যুর পর তার তিন ছেলের প্রত্যেকের ভাগে পড়বে ১০ বিঘা মাত্র। তাদের ছেলের ভাগে ৩।৪ বিঘা, তারপর আরও কম। কিন্তু বংশবৃদ্ধিটা অবাধ নয়, ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি যমদূতগুলি এতে কিছু বিঘ্ন জন্মায়। সুতরাং জমির ভাগ যত বাড়তে পারত তত বাড়ে নি। গত সেন্সাসে দেখা গিয়েছে যে বাঙলার কৃষকের জমির পরিমাণ গড়ে ৩।০ বিঘা মাত্র। এই জমিটুকু থেকে একটি গৃহস্থের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। এ দেশের কৃষকের দারিদ্র্যের এটা একটা প্রধান কারণ। কিন্তু গ্রামের অনাবাদী বা অন্তবিধ উদ্বৃত্ত জমিতে যদি কৃষককে চাষের অধিকার দেওয়া যায়, তা হ'লে এই অভাবটা দূর হতে পারে। কিন্তু জমিদার জমির মালিক উপযুক্ত মূল্য এবং প্রণামী না পেলে তিনি সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দেবেন না; বর্ত্তমান সময়ে এমন কোন বিধি ব্যবস্থা নাই যা দ্বারা উপযুক্ত মূল্য এবং প্রণামী দিয়েও জমিদারকে জমি দিতে বাধ্য করা যায়। এর ফলে অনেক সামান্য কৃষক তার জমিটুকুর উপর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নির্ভর করতে না পেরে কল-কারখানায় কুলীর কাষ করতে যেতে বাধ্য হয়। প্রস্তাবিত আইনে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যে গ্রামের অনাবাদী জমি আবশ্যক অনুসারে প্রজার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। একটি কৃষক গৃহস্থের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে পরিমাণ জমির আবশ্যক তা গ্রাম্য পঞ্চায়তের দ্বারা বা অন্য উপায়ে নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে, জমি-দারকে সেই পরিমাণ জমি দিতে বাধ্য করতে হবে।

বাস্তু জমি এবং গো-চর জমি সম্বন্ধেও এই কথা। প্রজার সন্তান সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তার বাসস্থান ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হচ্ছে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল কৃষক ও কৃষক-পরিবারের স্বাস্থ্য-হানি। জমিদারের কাছে একখানি ঘর করিবার জন্য একটু জমি চাইলেই তিনি মূল্য চান এবং সে মূল্যটা এত বেশী যে সকলে তা দিয়ে উঠতে পারে না। প্রজার নিজের যে জমি আছে তাতেও প্রণামী না দিলে জমিদার নতুন ঘর করতে দেন না, বাগান পুকুরের ত কথাই নাই। এ সকলের যথোচিত প্রতীকার করতে হলে জমিদারীর মূল নীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। মূল নীতিটা হওয়া উচিত এই যে, গ্রামের জমি হবে গ্রামের সম্পত্তি, জমিদারের বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। এবং তা বিভক্ত হবে সমান ভাবে প্রজার মধ্যে; জমিদার আসলে যা' তাই হবেন অর্থাৎ খাজনা আদায়ের ঠিকাদার মাত্র (revenuer farmer)

(ক্রমশঃ)



মোটা ভাকিয়ায় দিয়ে ঠেস,
আমরা স্বাধীন করি দেশ,

* * *

আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি
কিন্তু কাজের বেলায় সব ঢুঁ ঢুঁs,

—দ্বিজেন্দ্রলাল

লেনিন ও সোভিয়েট রুষিয়া

[শ্রীদেবব্রত বসু]

—:o:—

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

লেনিন ছাড়া আর যাঁহারা এই বিপ্লবের পশ্চাতে শক্তি যোগাইতেছিলেন তাঁহাদের ঈষৎ বিবরণ এখানে দেওয়া প্রয়োজন। কেননা এই অভ্যুত্থান তাঁহাদের সমবেত শক্তি ও সাধনারই ফল।

কম্যুনিষ্টগণ জয়ী হইয়া প্রথমতঃ সর্ব্বরকমে চেষ্টা করিয়াছিলেন Dictatorship of the Working Classes শ্রম-জীবিদের শাসনমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিতে এবং ধনিক-তন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিতে। এই কার্য্যে তাঁহারা যে পন্থা অনুসরণ করেন মোটামুটী তাহা এই,

(১) সমস্ত রকম জমির উপর কোনও ব্যক্তিগত দাবী থাকিবে না।

(২) ব্যক্তিগত ব্যবসায় তিরোহিত হইবে।

(৩) জমির ধনাগমের সমস্ত বিষয়—যথা, খনি, কারখানা, রেল, ইত্যাদি সমস্ত ষ্টেটের অধীন হইবে। এবং এই সমস্ত বিষয় যতদূর সম্ভব শ্রমিক-সঙ্ঘ দ্বারাই পরিচালিত হইবে।

(৪) প্রচলিত নিয়ম কানুন, আইন আদালতের পরিবর্ত্তে "People's Court" পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এবং এই পঞ্চায়েতের সভ্য শ্রমিক হইবেন এবং শ্রমিকদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইবেন।

(৫) কার্য্যকরী ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে থাকিবে—; বুর্জ্জোয়াদের ভোটের কোনও অধিকার থাকিবে না; শ্রমিকদের হাতেই সামরিক শক্তি থাকিবে।

(৬) কার্য্যক্ষম প্রত্যেক নরনারীকে শ্রম করিতেই হইবে এবং ষ্টেট প্রত্যেক নরনারীর সুখ সুবিধার জন্য দায়ী।

কিন্তু কম্যুনিজমের নিয়মকানুন, আইনসভা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁহারা প্রত্যেকেই professional class এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাঁহাদের জীবনের অভিজ্ঞতা শ্রমিকদের অন্তরকে পুরা মাত্রায় আপনার করিয়া লইয়াছিল।

এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে প্রথমেই লেনিনের নাম আসে। কম্যুনিষ্টরা যদিও ব্যক্তিপূজা মানেন না তথাপি আজ লেনিন কম্যুনিষ্টগণের মধ্যে যে শ্রদ্ধা ও পূজার স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহার গভীরতা ও ব্যাপকতা অননুমেয়। কার্ল মার্কস এবং লেনিন আজ সমস্ত জগতের সাম্যবাদীদের সমান শ্রদ্ধার পাত্র।

লেনিনের চরিত্র এই শ্রদ্ধার আপনি আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে লেনিনের তীক্ষ্ণ মনীষা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি তাঁহার সহযোগী সমস্ত নেতাদের স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিল। লেনিন নূতন রুষিয়ার নব নব বিপদের সময় আপনার অসাধারণ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সাহায্যে এই বিষম শতধা-বিক্ষিপ্ত সমাজকে নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত করিয়া চলিয়াছিলেন। এবং এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, সে তাঁহার প্রভূত শিক্ষার অর্জ্জিত সম্পত্তি, কোনও অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া নয়। বহুবার তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সহিত বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু প্রায়ই দেখা যাইত লেনিনের কথাই অবশেষে সঠিক হয়।

নভেম্বর বিপ্লবের পূর্ব্বে জেনোভিভ্ এবং কেমেনফ্ দুইজনেই বিপ্লবের বিষয়ে বিশেষ হতাশ হইয়া বলেন যে, এ সময় বিপ্লব ঘটাইলে পরাজয় নিশ্চয়। লেনিন বলেন, পরাজয় অসম্ভব। জয়ী হইয়া নূতন নূতন ভয়াবহ বিপদের সম্মুখে অধিকাংশ বোলশেভিক নেতা হতাশ হইয়াছিলেন। লেনিন একা বলেন, Every day will bring us new strength—প্রতিদিনই আমরা নূতন বল পাব। বহু শত্রুর বিরুদ্ধে অসম্ভব গোলমালের মধ্যে সোভিয়েট রুষিয়া পুরা-মাত্রায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়।

জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি বিষয়ে ট্রট্স্কী ও লেনিনের মধ্যে বিষম গণ্ডগোল বাধে। ট্রট্স্কী ডিপ্লোমাসীর সাহায্যে সন্ধিকে এড়াইয়া চলিতেছিলেন। লেনিন বলেন, সন্ধি করা এখন একান্ত প্রয়োজন। সন্ধির প্রস্তাব যতই খারাপ হ'ক, এখনই তাহা গ্রহণ করা হ'ক; তা না হইলে শীঘ্রই আমাদের এর চেয়ে বেশী খারাপ প্রস্তাবে সন্ধি করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এবং সত্য সত্যই সোভিয়েট রুষিয়াকে শীঘ্রই পরাজিত অবস্থায় Brest-Litovsk এ জার্ম্মাণীর ভিক্তকর প্রস্তাবে সই করিতে হইয়াছিল। Brest-Litovsk এর সন্ধির বিষয় পরে বলিব।

এখানে লেনিনের বিষয় কিছুক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দিয়ে অন্য নেতাদের ঈষৎ পরিচয় দিব।

লেনিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহ-কর্ম্মী ট্রট্স্কী (১)। রুষিয়ার বিখ্যাত বিখ্যাত Red Army র প্রতিষ্ঠাতা এই অদ্ভুতকর্ম্মা মনীষি বোলশেভিক-অভ্যুত্থানের মেরুদণ্ড। সামান্য কৃষক ও যুদ্ধ-বিস্তায় সম্পূর্ণ অশিক্ষিত শ্রমিকদের মাত্র এই কয় বৎসরের শিক্ষায় ট্রট্স্কী এমন এক সুশিক্ষিত সৈন্যমণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, যা বহুবার য়ুরোপের মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লেনিন ও ট্রট্স্কী দুইজন বহুবিষয়ে অনেক ভিন্ন তবুও তাঁহারা কম্যুনিজম এর দুইটি বিশাল ভিত্তি। অনেকেরই ধারণা যে লেনিন ও ট্রট্স্কীর মধ্যে কোনও হীন ঈর্ষার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু সে সম্পূর্ণ মিথ্যা। বহুবার এই দুইজনের মধ্যে বিষম মতদ্বৈধ হইয়াছে কিন্তু সে শুধু

(১) রুষিয়ার অন্যতম নেতা ট্রট্স্কীর বিশদ্ জীবনী আমাদের [প্রবন্ধে নিবদ্ধ হইয়াছে।

আপনাদের উদ্দেশ্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই; ব্যক্তির স্বার্থের অপেক্ষা সমষ্টির বা যে সাধনার জন্য তাঁহারা নামিয়াছিলেন তাহার কল্যাণই তাঁহাদের মনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল; তাই মতদ্বৈধ থাকিলেও লেনিন লেনিন ছিলেন, ট্রট্‌স্কী ট্রট্‌স্কীই আছেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশের নেতাগণের যে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা স্বদেশ-প্রীতির ঠিক উল্টা জিনিষ মাত্র।

ট্রট্‌স্কী একজন বিখ্যাত বক্তা ও সাহিত্যিক। কেমন করিয়া ক্ষুধিত জনতাকে উন্মত্তভাব প্রণোদিত করিতে হয় ট্রট্‌স্কী তাহা ভাল রকমই জানেন। অনেকে বলেন বর্ত্তমান জগতের মধ্যে ট্রট্‌স্কী একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা। ট্রট্‌স্কী বর্ত্তমান রুষিয়ার রাজনীতি সমাজনীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক বই লিখিয়াছেন বর্ত্তমান রুষ-সাহিত্য বুঝিতে হইলে ট্রট্‌স্কীর Literature and Revolution নামক অপূর্ব্ব পুস্তক পড়িতেই হইবে।

চিচেরিণ (Chicherin) বোলশেভিক রুষিয়ার Foreign Minister. বহুবার য়ুরোপ এই পাকা ডিপ্লোমাটের হাতে ঠকিয়াছে। জেনোয়াতে চিচেরিণ সিল্ক হাট মাথায় একবারে ইটালীর রাজার অতিথি হইয়া যখন ওঠেন, সমস্ত খবরের কাগজ-ওয়ালা তখন ব্যস্ত হইয়া চিচেরিণ সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। ফলে সমস্ত বিখ্যাত রাজনৈতিকগণের পরিবর্ত্তে চিচেরিণের নামই সব চেয়ে বেশী প্রচারিত হয়। চিচেরিণ য়ুরোপের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিপ্লোমাট। জারের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া চিচেরিণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লন এবং বোলশেভিকদের সহিত যোগদান করেন। এই বিষম শক্তিশালী রাজনৈতিক অন্তরে একান্ত উদার। প্রত্যেক প্রহরীর বাড়ীর সমস্ত খবর—চিচেরিণের বেশ জানা আছে। একবার একদিন সকাল বেলায় ঝাড়ুদার ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া দেখে চিচেরিণ বাইরে এক গাছের তলায় শুইয়া আছেন, ঘরে কয়েক জন অর্দ্ধনগ্ন ভিখারী ঘুমাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনী

২য় অধিবেশন, কৃষ্ণনগর।

কার্য্যতালিকা

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, শনিবার

(১) বেলা ১১টার ট্রেণে সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল মহাশয়ের কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে আগমন।

(২) বেলা ৩টায় সম্মিলনীর কার্য্যারম্ভ, কৃষ্ণনগর টাউন হল।

(ক) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলবী সামসুদ্দিন আহম্মদের বক্তৃতা।

(খ) সভাপতি ডাঃ সেন গুপ্ত মহাশয়ের অভিভাষণ।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬, রবিবার

(৩) সকালে ৭½টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর টাউনহলে বিষয় নির্দ্ধারণ সমিতির অধিবেশন।

(৪) বেলা ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর টাউনহলে সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশন।

(৫) সন্ধ্যা ৬টায় সাধারণ সভা। বক্তা :—কাজি নজরুল ইস্‌লাম, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি, শ্রীযুত অতুল গুপ্ত (এডভোকেট্) শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (এড-ভোকেট্) মৌঃ কুতবুদ্দিন আহম্মদ, মৌঃ আহম্মদ আলি ইত্যাদি।

কৃষ্ণনগর।
৩১শে জানুয়ারী
১৯২৬ } শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।
অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক।

খড়কুটো

—০::::০—

সরকারের হুকুম—মিঃ হর্ণিম্যান এক মাসের মধ্যে বোম্বাই ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না। কাজেই তাঁর দিল্লী যাওয়া মার্চ্চ মাসের আগে আর হ'য়ে উঠ্‌বে না।

* * *

গত ১লা ফেব্রুয়ারী ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় রাজসাহী জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। জেলের গেটে অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্রমণ্ডলী তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীযুত সুদর্শন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত সুরেন্দ্র মৈত্রও উপস্থিত ছিলেন। একখানি সুসজ্জিত মোটর গাড়ীতে ক'রে তাঁকে সমস্ত সহরটি পরিক্রমণ করানো হ'য়েছিল। "রায় সাহেব" উপাধি-গ্রস্ত কুঞ্জমোহন বাবুও শোভাযাত্রার পশ্চাদ্ধাবন ক'রেছিলেন। ডাঃ গুহ রায় এখন সুরেন বাবুর বাড়ীতে আছেন।

* * *

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় যাচ্ছেন। ঢাকা সহরে কবি-সম্বর্দ্ধনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন হচ্ছে। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের এক বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে, কবি সেখানে পৌঁছলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তাঁকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হবে।

* * *

মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় আগামী অধিবেশনে ঠাকুর ছেদিলাল কাথরিতে দেশবন্ধু দাশের কনিষ্ঠা কন্যার প্রতি পুলিশের অশিষ্ট ব্যবহারের বিষয়ে প্রশ্ন করবেন।

* * *

"আকালী" কাগজে প্রকাশ, অমৃতসরে এই মর্ম্মে এক গুজব রটেছে যে, শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী ও আকালীদলের

নেতাদের শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে। প্রকাশ—ইতিমধ্যেই সর্দ্দার মঙ্গল সিং, সর্দ্দার অমর সিং, সর্দ্দার যশোবন্ত সিং ও আনী সীতার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী হ'য়েছে।

০ ০ ০

চট্টগ্রামের "দৈনিক জ্যোতিঃ" কাগজে প্রকাশ—স্থানীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও অসহযোগী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ ঘোষকে ইতঃপূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল। সেখানে তিনি রাজবন্দীভাবে অবস্থান করছিলেন। সম্প্রতি তাঁর প্রতি দেড় মাস সশ্রম কারা-বাসের হুকুম হয়েছে। প্রকাশ—তাঁকে টিপসই দিতে বলায় তিনি তাতে সম্মত হন নি আর তাঁর ফটো তুলতে যাওয়ায় তিনি তাতেও গররাজী হ'য়েছিলেন।

খবরদারী

—০:০—

মেকি শোক প্রকাশ

হাওড়ায় ড্রেনের মধ্যে কার্ব্বলিক এসিড্ গ্যাসের জন্য মিউনিসি-প্যালিটির যে সাত জন কুলীর শোচনীয় মৃত্যু হ'য়েছে সে সংবাদ "লাঙলের" পাঠকবৃন্দ গত বারে পেয়েছেন। গত ২৯শে জানুয়ারী শুক্রবার মিউনিসিপ্যালিটির একটি সভাধিবেশন হয়। সেই সভায় কুলীদের জন্য শোক প্রকাশ, প্রস্তাব-উত্থাপন, অনুমোদন ও সমর্থন এবং সভা-স্থগিত প্রভৃতি হাল-ফ্যাসানী পোষাকী কান্না কাঁদা হ'য়েছে। তা' ছাড়া এ বার্ত্তাও প্রচারিত হয়েছে যে, মিউনিসি-প্যালিটি কুলীদের সৎকারের জন্য ৫৫৲ টাকা ইতঃপূর্ব্বে খয়রাৎ করেছেন এবং অতঃপর তাদের শ্রাদ্ধের জন্য নগদ ৪৫৲ টাকা খরচ করবেন।

মোটের উপর সাতটি কুলীর মৃত্যুর জন্য মিউনিসিপ্যালিটি ১০০৲ টাকা হক-না-হক খরচ করে' ভালই করলেন। ইহলোকে তাদের অনাথা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়ালেও, তাদের ভবনদী খেয়ার কড়িটারও ব্যবস্থা যে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তারা করেছেন; তাতে আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি।

০ ০ ০

সাবধান! সাবধান!!

চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" খবর দিচ্ছেন—চন্দনপুরার একটি আস্তা-বল থেকে একটি চোর ঘোড়া চুরি করে' নিয়ে পালাচ্ছিল। মাঝ পথে ঘোড়াটি চোরের ঘাড় কামড়ে ধরে' বেচারীকে আস্তাবলে হিঁচড়ে টেনে এনে হ্রেষারবে মুনিবকে ডাকতে আরম্ভ করে। রব শুনে লোকজন এসে চোর পাকড়াও করে। চোর এখন হাজতে।

আমাদের স্বরাজ আসবার আগে সাধারণের-দেওয়া-চাঁদায় ফেলোজার-ফাণ্ডের ক্যাশরক্ষগুলোকে এই ঘোড়ার কাছে কিছু দিন শিক্ষানবীশীর জন্য পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

০ ০ ০

রাজবন্দী-সংবাদ

(১) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০শে জানুয়ারী হতে ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁর নিজের বাড়ীতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রয়েছেন।

(২) মেদিনীপুর জেলার বেজরী নামক স্থান হতে চিকিৎসার জন্যে শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র চৌধুরীকে আবার আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনয়ন করা হয়েছে।

(৩) ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনের বন্দী ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম বি কে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হতে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করা হয়েছে। তিনি পিঠের পীড়াতে ভুগছেন।

(৪) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁর আটক থাকার জায়গায় গিয়েছেন।

(৫) শ্রীযুক্ত অংশুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতার অসুস্থতা হেতু এক মাসের জন্যে ৬১, মাসারা লেনে বাস করার অনুমতি পেয়েছেন।

(৬) নদীয়া জেলার শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় কদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে গেরেফ্‌তার হয়ে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনীত হয়েছেন।

(৭) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে তাঁদের ময়মনসিংহের বাড়ীতে ১৫ দিন বাসের অনুমতি পেয়েছেন। তাঁর পিতা খুব বেশী অসুস্থ।

(৮) শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিয়ে দেবার জন্যে এক সপ্তাহ বাড়ী গিয়ে থাকার অনুমতি পেয়েছেন।

(৯) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বাগচী মুক্তি পেয়েছেন।

(১০) শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরীকে তাঁর বাড়ীতে আটক রাখা হয়েছে।

০ ০ ০

"সাম্যবাদী"

কানপুর হতে প্রকাশিত নূতন হিন্দী পাক্ষিক পত্র "সাম্যবাদী"র দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা পেয়েছি। সত্য ভক্ত সাহেব এ কাগজের সম্পাদক। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে সাম্যবাদী বেরিয়েছে:—

(১) কৃষকদের প্রতি অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করা,

(২) শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা,

(৩) তথাকথিত অচ্ছুত জাতিদিগকে মনুষ্যত্বের অধিকার দেওয়া,

(৪) স্ত্রীজাতিকে সামাজিক দাসত্ব হতে মুক্ত করা,

(৫) দেশ বিদেশের "কম্যুনিজম" ও "বলশেভিজম" আন্দোলনের সত্য সংবাদ প্রদান করা,

(৬) সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে কম্যুনিজম বা সমূহবাদের শিক্ষার প্রচার করা।

"সাম্যবাদী"র বার্ষিক মূল্য দুই টাকা এবং ত্রৈমাসিক মূল্য এক টাকা। আমরা এই নবীন সহযোগী "সাম্যবাদী"কে আমাদের হৃদয়ের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

০ ০ ০

উসমানীর স্বাস্থ্য

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার অন্যতম আসামী মোহম্মদ শওকৎ উসমানী সম্প্রতি দেরাদুন ডিষ্ট্রীক্ট জেলে রয়েছেন। তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে সংযুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুত ঠাকুর মনজীৎ সিং রাঠোর দেরাদুন জেলে উসমানীকে দেখে এসে যুক্ত প্রদেশের সংবাদ পত্র সমূহে যে বিবরণ ছেপেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে উসমানীর অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। জেলের হাসপাতালে উসমানী পেটের ব্যথায় ভুগ্‌ছেন। কর্ত্তৃপক্ষ এখনো ব্যারাম নিরূপণ করতে পারছেন না, তবে ক্ষয়রোগ (Tuberculsis) এর প্রথম আক্রমণ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। দেরাদুন থেকে কোনো ভদ্রলোক উসমানীর বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে এক পত্র লিখেছেন। তাতে জানা গিয়েছে যে ঠাকুর সাহেবের জেল পরিদর্শন করার পরে উসমানীর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। একমাত্র দুধের ওপরে উসমানী জীবন ধারণ করছেন। গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ উসমানীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করে দেরাদুন জেলের সুপারিন্টেণ্ডের নামে এক জওয়াবী তার পাঠিয়েছিলেন। ২৮শে তারিখে তিনি এই বলে জওয়াব দিয়েছেন যে "উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই।"

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দেরাদুন থেকে যে পত্র পেয়েছেন তার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু, ঠাকুর মনজীৎ সিং সাহেবের বিবরণে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এখনো রোগ নিরূপণই করা হয় নি। তবুও নাকি উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই। ক'বছর পূর্ব্বে উসমানীর ক্ষয়রোগ আরো একবার হয়েছিল, কিন্তু, সে সময়ে চিকিৎসা ও হাওয়া বদলাবার উত্তম ব্যবস্থা হওয়ায় রোগ সেরে গিয়েছিল। যাঁরা একটুকু ভাল খাওয়া-পরায় অভ্যস্ত যুক্ত প্রদেশের জেলে তাঁদের ক্ষয়রোগ না হওয়াই আশ্চর্য্যের কথা। যুক্তপ্রদেশের জেলের ন্যায় এমন অপকৃষ্ট খাওয়া ও পোষাক ভারতের আর কোনো প্রদেশের কারাগারে দেওয়া হয়না। সকলেই জানেন, কানপুর ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় উসমানী, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এই চারিজনের ৪ বছর করে সশ্রম কারাবাসের হুকুম হয়েছিল। ক্ষয়রোগাক্রান্ত হওয়ায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বিগত সেপ্টেম্বর মাসে মুক্ত হয়েছেন। পাকস্থলীর ক্ষতের জন্যে দু'বার অপারেশন্ করেও যখন কোন ফল হয় না তখন মর মর অবস্থায় নলিনীভূষণ দাস গুপ্তকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে। উসমানী যদি এখন মুক্তি পান তবে হয়তো কিছু দিন বাঁচতে পারবেন। তা-না হলে তাঁর জীবনের কোন আশা নেই। জানিনে, ভারত গবর্ণমেন্ট উসমানীর মুক্তি সম্বন্ধে কি বিবেচনা করছেন।

কানপুর জেলে বিচারের জন্যে যেদিন উসমানী এসেছিলেন সেদিন তাঁর ওজন ছিল ১২১ পাউণ্ড। সে ওজন আজ কমে কমে ৯০ পাউণ্ডে নেমেছে। উসমানীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার কোন কারণ আছে কিনা দেশের লোক তার বিচার করুন।

কার্ল মার্কসের শিক্ষা

[কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ]

—:o:—

ভারত বীর-পূজার দেশ। বীর যা প্রচার করে যান, তাতে ভারতীয়দের মন এতটুকুও আলোড়িত হয়না, তাঁরা দেখেন শুধু বীরের জীবনটিকে। একটা লোকের মধ্যে সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশী কিছু দেখতে পেলেই ভারতবর্ষের লোকেরা তখনি দেবতা জ্ঞানে তাঁর পূজো শুরু করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না। ভারতবাসীদের মনোবৃত্তির সঙ্গে এই জিনিসটি এমনি মিশে গিয়েছে যে, পর্ব্বত, নদী ও বৃক্ষের ন্যায় জিনিসগুলিও তাঁদের পূজোর নৈবেদ্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে না। আদিম যুগের রীতিনীতির বহু নিদর্শন আজো অসভ্য জাতির ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু তা হ'তে বুঝ্‌তে পারা যায় না যে নর-পূজা আদিম যুগেও এ দেশে ছিল। নর-পূজা যে আমরা এদেশে আর্য্য অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। রাক্ষসরা আর ঋষিরা এদেরই মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং পাপ ও পুণ্যের দেবতা রূপে পূজিত হয়েছেন। এশিক্ষা এদেশের প্রজ্ঞাবান লোকেরাই প্রচার করেছিলেন। এই জিনিসটিকে জনসাধারণের মনের ভিতর স্থায়িভাবে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে, তাঁরা এর সঙ্গে অনেকগুলি নিগূঢ় ও বোধাতীত শিল্প জুড়ে দিয়েছেন। ফলে, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, পূর্ণ শরীরী মানুষ ত দূরের কথা, মানুষের শরীরের এমন কোনো অংশ নেই, যার পূজো আজকের দিনে না হচ্ছে। নিগূঢ় অর্থে ঋষি বা পয়গম্বর বল্‌তে যা বুঝায় কার্ল মার্ক্স্‌কে আমি তারি আবরণে আচ্ছাদিত করতে চাইনে। কার্ল মার্কস সমাজ-বিজ্ঞানের একজন বড় দরের ভাবুক। জনসাধারণের মধ্যে তিনি একটা গতি-শক্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শিক্ষা কতলোকের মনের খোরাক জুগিয়েছে, কতলোকের হৃদয়ে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে সুন্দর আর কি কাজ হতে পারে? ১৮১৮ সনের ৫ই মে তারিখে জার্ম্মানির ট্রেভিস নামক স্থানে কার্লমার্ক্স জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, যাঁরা তাঁর লেখা পড়েছেন কিংবা পড়েননি—সকলেরই জানা তিনি সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু আদর্শ ও বহুভাব রেখে গিয়েছেন। তাঁর এই আদর্শ ও ভাব আজকের দিনে সমস্ত জগতে নিত্য চিন্তনীয় বিষয়ে পরিণত

হয়েছে। তার ফলে, আজ আমরা মূলধন ও ধনিক-প্রথা, উৎপাদনের উপায়, শ্রেণি-সংগ্রাম, সংস্কার এবং সর্বোপরি সবহারাদের (Proletarian) বিপ্লব ও সোশেলিজম (সমূহবাদ) প্রভৃতির বিষয় শুনতে পাচ্ছি।

কার্লমার্ক্সকে বোঝার জন্যে সর্ব্বপ্রথমে হেগেলকে বোঝা একান্ত আবশ্যক। হেগেল বিশদরূপে ব্যাখ্যাত এক নূতন তর্ক বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছেন। এই তর্ক-বিজ্ঞানের ভিত্তি বিবর্তনের বিশ্বজনীন ক্রমিক-গতির ওপরে বিন্যস্ত রয়েছে, হেগেলের লজিক্ বা তর্ক বিজ্ঞান "ডায়েলেক্টিক্" (dialectic) রূপে রচিত হয়েছে। ডায়েলিক্টিক পদের দ্বারা প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতরা প্রশ্ন ও উত্তরের (discourse and re-joinder) কলাকেই বুঝতেন। তর্কের এইরূপ প্রথার দ্বারা বিরোধী ভাবের (contradiction and antithesis) নিবৃত্তি করা হয়। এর আরো বেশী সংজ্ঞা প্রদান করতে হলে এই বলতে হবে যে, বিরোধী জড় পদার্থাবলী ও তার বিশ্লেষণের গতানুগতিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিশ্বের বস্তু ও জীব-জগতে যে রূপান্তর উপস্থিত হয় তারি ধারণা করা। সামাজিক বিবর্তনের ধারণা মার্ক্স হেগেলের নিকট হতে পেয়েছেন। হেগেলের মতে প্রকৃতি ও ইতিহাস বিবর্তনের ক্রমিক গতির সাথে বিজড়িত রয়েছে। তাঁর মতে এই বিবর্তনের কাজ পরিচালিত হয় আইডিয়া (Idea) অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা। মার্ক্স কিন্তু হেগেলের এ কথা মানেন না। তিনি বলেন, ইকনমিক্ ফোর্স অর্থাৎ অর্থনৈতিক শক্তিই হচ্ছে যাবতীয় সামাজিক বিবর্তনের মূল কারণ। সমাজের গড়া, ভাঙা এবং পুনরায় গড়া—এই ভাবে এক স্তর হতে আর এক স্তরে যাওয়া —এ সবই ইকনমিক ফোর্সের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। সমাজের প্রত্যেক স্তরই তার নিজের মধ্যে একটা ভাঙার কারণ সৃষ্টি করছে এবং প্রত্যেক ভাঙার পরে একটা নবীন ও উচ্চতর স্তরের সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো কিছুর মধ্যে একটা গতির সৃষ্টি বরাবর বিরোধের দ্বারাই হয়ে থাকে। পৃথিবীটা চিরকালই যদি একটা অগ্নি ও বাষ্পময় পিণ্ড থেকে যেত এবং তার বিরোধের দ্বারা শীতল ও ঘনীভূত না হত, তা হলে আজকের দিনে তাতে জীবের বাস কিছুতেই সম্ভবপর হতনা। ষ্টেট্ অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট যদি চিরকালই যথেচ্ছাচারী থাকত এবং তার বিরোধী মত মধ্য শ্রেণীর স্বতন্ত্রতার সৃষ্টি না হত, তা হলে ষ্টেটে জীবন ভয়ানক একঘেয়ে হয়ে যেত এবং কোনো প্রকারের জ্ঞান-বর্দ্ধন পৃথিবীতে সম্ভবপর হত না। ধনিক-দলের প্রতিপক্ষ সব-হারারা না থাকলে দুনিয়াটা একটা শৈল্পিক দাসত্বতন্ত্রে পরিণত হত। যত প্রকারের শক্তি আছে সমস্তই বিরুদ্ধভাব থেকে সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি ও মানবতার যত প্রকার অবদান আমরা পেয়েছি, এ সবই সম্ভবপর হ'য়েছে বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা। একমাত্র বিরুদ্ধভাবই যখন আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তখনি চিন্তা ও বস্তুরাজ্যে উচ্চগ্রামের দিকে বিবর্তন আরম্ভ হয়। মার্কস্ অস্তিত্বকায়ের বিরুদ্ধভাবকে নিয়ে আলোচনা করেছেন,—বিবর্তনের গতানুগতিকতার ভিতর দিয়ে যে বিরুদ্ধভাব আপনা হতে আত্মপ্রকাশ করে থাকে ঠিক সেই বিরুদ্ধভাব নিয়ে। জিনিস মাত্রেরই এক একটা বিরুদ্ধ জিনিসও আছে। যেমন—সত্তার প্রতিপক্ষ হচ্ছে অসত্তা, শৈত্যের প্রতিপক্ষ উষ্ণতা, আলোর প্রতিপক্ষ অন্ধকার, মোলায়েমের প্রতিপক্ষ কর্কশতা, আনন্দের প্রতিপক্ষ ব্যথা, উল্লাসের প্রতিপক্ষ সন্তাপ, সম্পদের প্রতিপক্ষ দারিদ্র্য, মূলধনের প্রতিপক্ষ শ্রমিক, জীবনের প্রতিপক্ষ মৃত্যু, পুণ্যের প্রতিপক্ষ পাপ এবং ভাববাদ (Idealism) এর প্রতিপক্ষ জড়বাদ (Materialism) ইত্যাদি। হেগেল বলেন, প্রকৃতিঃ প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ শক্তি আছে। এই বিরুদ্ধ শক্তির নিয়ত প্রকাশ ও পার্থক্যের ভিতর দিয়ে বস্তুবস্তু ও জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই নিয়ত নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার দ্বারাই জগতে বৃহত্তর অস্তিত্বের সম্ভাবনা হয়ে থাকে। মার্ক্সের সিদ্ধান্ত বোঝার জন্যে হেগেলের এই কথাটাকে বোঝা একান্তই প্রয়োজন।

এতক্ষণে, ডায়েলেক্টিক প্রণালীর দু'টো কথা—অস্তিত্ব ও নস্তর সাথে আমাদের যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গেছে। চিন্তা ও বস্তুরাজ্যের বর্দ্ধন প্রণালীর প্রথম দু'টো স্তরের কথাও আমরা বলেছি। কিন্তু এ প্রণালীও সম্পূর্ণ নয়, এখনো এর একটা তৃতীয় স্তরের প্রয়োজন আছে। হেগেল এ'কে নস্তর নষ্ট নামে অভিহিত করেছেন। নস্তর অবিরাম প্রক্রিয়ার একটা নূতন বস্তু বা প্রাণীর অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কথাটাকে স্পষ্ট করে বোঝবার জন্যে একটি ডিমের দৃষ্টান্ত দেওয়া হোক। ডিমটি একটি বাস্তব বস্তু। এর ভিতরে একটি জীবাণু আছে। এই জীবাণু ক্রমশঃ ডিমের ভিতরের জিনিসটি খেয়ে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। এই যে নষ্ট, ইহা কিন্তু মোটেই ধ্বংস নয়, পক্ষান্তরে এতদ্বারা জীবাণুটি একটি প্রাণীতে পরিণত হয়। নস্তর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই মুরগীর বাচ্চাটি ডিমের খোলসটি ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে হেগেলের নস্তর নষ্ট এবং এতদ্দ্বারা শরীরতঃ এমন একটি জিনিসের উদ্ভব হয়েছে যা ডিমের চেয়েও বড়। ডায়েলেক্টীকের প্রক্রিয়া যে সব সময়ে কোনো নিয়মানুযায়ী ঠিক ধাপের পর ধাপ চলে তা নয়, অনেক সময় মাঝের ধাপগুলোর না নিয়েও একেবারে সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌছয়। জল ক্রমশঃ শক্ত না হয়ে হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে প্রথমে মণ্ডাকার ধারণ করবে এবং তার পরে হবে শক্ত বরফ,—এমনটা হয় না। এই জিনিসটের চর্চ্চা মার্কস্ অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত করেছেন। সমাজ কি করে সোশলিজম এর অবস্থায় বিবর্তিত হবে, এতদ্বারা তারি নিয়ম মার্কস্ তৈয়ার করেছেন। মার্কস এর প্রাথমিক গ্রন্থ "পবিত্র পরিবার" (The Holy Family, 1844) এবং "দর্শনের দারিদ্র্য" (The Poverty of Philosophy, 1847) এমন সময়ে লিখা হয়েছিল যখন তিনি ইতিহাসের বাস্তব ধারণা (The Materialistic Conception of History) গঠন করালেন। এর পরে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "ক্যাপিটাল" প্রণয়ন করেছেন। একখানি গ্রন্থেই বিষয়গুলোর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে মার্কস্ হেগেলের "ডায়েলেকটিক" এর সহায়তা নিয়েছেন।

সব-হারা আর মালদার (Proletarjat and Riches)

এ দুটো হচ্ছে পরস্পর বিরোধী (antithesis) আবার এ দু'এতে মিলে একটা সম্পূর্ণ জিনিস হয়ে থাকে। জগতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকায় মালদার ও সব-হারা এতদুভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মালদার আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখতে যেমন বাধ্য ঠিক তেমনি বাধ্য তার বিরুদ্ধ শক্তি সব হারার অস্তিত্বও বজায় রাখতে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারটা হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্বের দিক (Positive side)। পক্ষান্তরে সবহারারা সবহারা হওয়া হেতু আপনাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করতে যেমন বাধ্য, ঠিক তেমনি বাধ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের ধ্বংস করতে। কেননা, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব আছে বলেই তারা সব-হারা হয়েছে। এটা হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষের দিক। এই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সম্পত্তির মালিকরা হচ্ছে রক্ষণশীল আর সব-হারারা ধ্বংসকারী। মালিকরা চায় বিরুদ্ধ শক্তিটাকে বজায় রাখতে আর সব-হারারা চায় সেটাকে ধ্বংস করতে। জাতীয় ও ইকনমিক্ অর্থাৎ অর্থ নৈতিক আন্দোলনের দিক থেকে বিচার করে দেখতে পাওয়া যায় যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ত আপনা হতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু জেনে শুনে নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে যে ধ্বংসের ক্রিয়া চলেছে সেটা সম্পত্তির মালিকের অনিচ্ছাতেই চলেছে। একটা সব হারা দলের সৃষ্টি না করতে পারলে সম্পত্তির মালিক হওয়া যায় না অথচ বঞ্চিত করে মালিক হওয়াটাই হচ্ছে নিজের বিরুদ্ধে একটা ধ্বংস-শক্তির সৃষ্টি করা। মার্ক্স বলছেন :—

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি সব-হারা-দলকে সৃষ্টি করে নিজের জন্যে যে একটা ধ্বংসের কারণ সৃষ্টি করে রেখেছে তার কাজ সব-হারা দলই সম্পন্ন করছে। ঠিক এরূপভাবে বেতনভোগী শ্রমিকরা অপরের জন্য ধন সম্পদ ও তার দরুণ নিজেদের দণ্ডের সৃষ্টি করে নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে। যদি সব-হারাদল জয়যুক্ত হয়, তবে তারাই কিছু সমাজের অনন্যসাপেক্ষ দিক্ হবে না। কেননা নিজেদের ও তাদের বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্মূল করেই তবে জয়যুক্ত হবে। এই ভাবে সব-হারাদল এবং তাদের অবচ্ছিন্ন বিরুদ্ধ-শক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি দু-ই বিলোপ হয়ে যাবে।

(ইংরেজী হতে অনুবাদিত)

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

বাৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	৸৹
প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম	৭৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৩।৹
মলাট—১ম পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷৹
অর্দ্ধ কলম	৭৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৷৹
" ২য় পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৲
" প্রতি কলম	৯৷৹
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৮৷৹
" ৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য	
" ৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১।৹
প্রতি কলম	১১৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	২১৷৹

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵৹।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পঁচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সী দেওয়া হইবে না; ও প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ হিসাব সহ বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় ও মনিঅর্ডার কমিশন লাঙল অফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যায় শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেন্টগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

৬। নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

পত্রিকার মূল্য—

বাৎসরিক	৩৲ টাকা,	ভিঃ পিঃ	৩।৹
ষান্মাসিক	১৸৵৹	"	১৸৵৹
প্রতিসংখ্যা	এক আনা		

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র

৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

বাহির হইয়াছে। বাহির হইয়াছে।

ইউরোপের দর্পহারী মহাবীর গাজী আবদুল করিম—৷৵৹

ইহাতে বীরেন্দ্র-কুল-কেশরী গাজী আবদুল করিমের অলোক সামান্য জীবন কথা ও রীফের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। সচিত্র মূল্য ৷৵৹ আনা। সংবাদপত্র কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মোস্তাফা কামালপাশা—।৵৹

এসিয়ার গৌরব মহাবীর গাজী মোস্তাফা কামালপাশার চিত্তাকর্ষক জীবনী। মূল্য সচিত্র ।৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—লাঙলবুক এজেন্সী

৩৭ নং হ্যারিসনরোড, কলিকাতা।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

"লাঙল" বুক এজেন্সী

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

[নব যুগের নবীন মন্ত্রের নবীন ঋত্বিক নব পুরোহিত শ্রী]

কাজি নজরুল ইসলামের

নূতন কবিতার বই ঃ—

ক্রন্দন নীরব ভারত মাতার স্বির্গভিত অনুপমার প্রচ্ছদ-পট, ৺দেশবন্ধুর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ফটো ও কবির নিজের ফটোসহ

চিত্তনামা—১৲

পাঠক ইহারই মধ্যে কবির অমর কবিতা "ইন্দ্র পতন" ও "সান্ত্বনা" পাইবেন। অল্প পরিচয় অনাবশ্যক।

ছায়ানট—১।৹

(কবির সুন্দর ছবিসহ সুন্দর বাঁধাই)

অগ্নিবীণা—১।৹

৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত, এবং কবির বর্ত্তমান ফটোসহ

রিক্তের বেদন (গদ্য কাব্য)—১৷৹

ব্যথার দান (২য় সংস্করণ) ঐ—১৷৹

(সৈনিকবেশী ফটোসহ)

দোলন চাঁপা—১।৹

(যাহার পূজারিণী কবিতাখানি চিরপূজ্য)

রাজবন্দীর জবানবন্দী—৵৹

ইহা পাঠে পাঠক কবির নির্ভীকতার যথার্থ পরিচয় পাইবেন

কবির তিনখানা পুস্তক যন্ত্রস্থ ঃ—

ঝিঙেফুল

বাঁধন হারা

ফণী মনসা

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী প্রণীত

বোলশেভিকবাদ

(সচিত্র)

বোলশেভিক রুশিয়া সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ নানা চিত্র-সম্বলিত পুস্তক মূল্য মাত্র ৷৹ আনা।

চিত্তকথা

(সচিত্র)

চিত্তকথা চিত্তরঞ্জনের নিজেরই মুখের কথা—মহাপুরুষের জীবনের সকল দিক ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

নরনারী

(যন্ত্রস্থ)

মারী ষ্টোপস্, হাভলক এলিস্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের গবেষণা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত।

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড্ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

Reg. No. C 1389.



প্রধান পরিচালক
নজরুল ইসলাম

নগদ মূল্য এক আনা

বার্ষিক মূল্য
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
বিদেশে ৬ শিলিং

লাঙলে

কি কি থাকবে?

১। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতা
২। ম্যাক্সিম গর্কীর জগৎবিখ্যাত রোমাঞ্চকর উপন্যাস "মা"র ধারাবাহিক অনুবাদ
৩। যুগ প্রবর্ত্তক মনীষিগণের জীবনী
৪। প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচন
৫। গণ-আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচন ও সংকলন।
৬। প্রতি সংখ্যায় একখানি করিয়া ছবি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

প্রথম খণ্ড } বৃহস্পতিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৩২, ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ { অষ্টম সংখ্যা

এই সংখ্যায়
ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের
সভাপতির অভিভাষণ



লাঙল

[বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | বৃহস্পতিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৩২ | ৮ম সংখ্যা

সভাপতির অভিভাষণ*

[সভাপতি—ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল]

——:•:——

বঙ্গীয় প্রজা-সম্মিলনী আমাকে তাঁহাদের সভাপতি পদে বরণ করিয়া যে সম্মান করিয়াছেন সেইজন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার শক্তি ক্ষুদ্র, তাঁহাদের সম্যক্ হিতচেষ্টা আমার অদৃষ্টে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু আমার ক্ষীণ লেখনীর শক্তি আমি যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি। আমার সেই অকিঞ্চিৎকর চেষ্টায় এই আশাতীত পুরস্কার আমাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

আপনাদের এই প্রচেষ্টা আপাততঃ ক্ষুদ্র। বাঙ্গলার অন্নদাতা কৃষক সম্প্রদায় সমবেত হইয়া যে বৃহৎ ও মহাশক্তি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে—তার তুলনায় আজকার আয়োজন নিতান্ত সামান্য, কিন্তু ইহার ভিতর একটা বৃহৎ অভ্যুদয়ের বীজ নিহিত আছে, কেননা এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ একটা প্রকাণ্ড সত্য। প্রত্যেক মানুষের মনুষ্যত্বের একটা অনিবার্য্য দাবী আছে এবং সেই দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাই তাহার প্রাণ। এ সম্মিলন বাঙ্গলার পরিভূত অবনত কৃষক সম্প্রদায়ের সেই চরম দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা। এ চেষ্টা যে অবিলম্বে সাফল্য মণ্ডিত হইবেই, এ আশা আমি করি না কেননা জগতের ইতিহাসে কোনও সত্যই কোনও দিন অব্যাহত সরল পথে

* নিখিল বঙ্গীয় প্রজা-সম্মিলনী, দ্বিতীয় অধিবেশন, কৃষ্ণনগর—৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই, অনেক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া অনেক নিষ্ফলতা ও নিপীড়ন সহ্য করিয়া অগ্নি-পরীক্ষায় শুদ্ধ হইয়া সত্য চিরদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ যে তাহার প্রতিষ্ঠার পথেও রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন আসিবেই, বহুবার নিষ্ফলতার কঠিন পরীক্ষা হয়তো উত্তীর্ণ হইতে হইবেই, কিন্তু যে ক্ষুদ্র বীজের প্রথম অঙ্কুর আজ এই সভায় দেখা দিয়াছে তার পরিণতি যে বিশাল বটবৃক্ষ তাহা আজ আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই, কেননা আমি প্রজা বা কৃষক নই। কিন্তু তবু আমি আপনাদের পর নই, কেননা আমি বাঙ্গালী, আমি ভারতবাসী—দেশের মঙ্গলকামী। যে কেহ ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া দেশের মঙ্গলের ব্যাপক আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে সেই জানে যে জাতির মঙ্গলের অচ্ছেদ্য অপরিহার্য্য অঙ্গ কৃষকের অভ্যুদয়। বাঙ্গালীর জাতি বা ভারতবাসীর জাতি শুধু মুষ্টিমেয় ভদ্রলোক লইয়া নয়—এ জাতি কুটীরবাসী দরিদ্র কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমিকের জাতি, তাহাদের প্রাণে জাতির প্রাণ, তাহাদের শক্তিতে জাতির শক্তি, তাহাদের সমৃদ্ধিতে জাতির সমৃদ্ধি। আমরা এ অধঃপতিত জাতির দুঃখ ও দুর্দ্দশা যদি প্রাণের ভিতর অনুভব করি এবং ইহার অভ্যুত্থান যদি কামনা করি, তবে আমাদের সমগ্র চেষ্টা ও আয়োজন নিয়োগ করিতে হইবে কৃষক ও শ্রমিকের অভ্যুদয়কল্পে। যদি বাঙ্গলার কৃষক দরিদ্র, উপবাসী, ধনীজনের নির্ম্মম পাশা খেলার ঘুঁটি না হইয়া মানুষ হইয়া উঠে, প্রত্যেকে যদি উন্নতি লাভ করে ও শক্তি ও স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, প্রত্যেক কৃষকের অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যদি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত অশক্তি ও ত্রুটি পরিত্যাগ করিয়া যদি প্রত্যেকে আপন শক্তির প্রতি আস্থাবান ও পরস্পরের সহযোগে শক্তিমান হইয়া উঠে, তবে জগতে এমন কোনও শক্তি নাই যে এ জাতিকে অবনত অবজ্ঞাত করিয়া রাখিতে পারিবে। আর যতদিন বাঙ্গলার কৃষক তাহাদের বর্ত্তমান অসহায় থাকিবে, ততদিন মুষ্টিমেয় অ-শ্রমিক ভদ্রসম্প্রদায়ের কোনও চেষ্টাই জাতিকে উন্নত করিয়া সমগ্র জগতের বরণীয় করিয়া তুলিতে পারিবে না, সুতরাং কৃষক ও শ্রমিকের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে আমি জাতীয় অভ্যুদয় চেষ্টার একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একান্ত অপরিহার্য্য আয়োজন বলিয়া মনে করি।

এটা হয়তো একটা দুর্ভাগ্য যে কৃষক ও শ্রমিকের আত্ম-প্রতিষ্ঠার এ চেষ্টা করিতে হইতেছে একটা প্রকাণ্ড বিরোধের ভিতর দিয়া। সমাজের বহু যুগের অবিবেচনার ফলে এমন কতকগুলি স্বার্থ গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা কৃষকের আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরোধী। সেই সব স্বার্থ তাহাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত শক্তি লইয়া আজ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং কৃষকের আত্ম-প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে আজ কেবল আত্মদর্শনের উদাত্ত স্বর বাজিয়া উঠিতেছে না, উঠিয়াছে সংগ্রামের ভেরী-নিনাদ। এটা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এ দুর্ভাগ্য যে মানুষের নিত্য সহচর, বিধাতার অভিসম্পাত বল, আশীর্বাদ বল, তাঁহার বিধান এই যে—বিরোধের ভিতর দিয়াই সমন্বয় লাভ করিতে হইবে, সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে হইবেই—শান্তি ও সিদ্ধির দিকে। মানুষের এই সাধারণ অদৃষ্ট যে আমাদের পথে দাঁড়াইয়াছে ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিছু নাই।

কিন্তু একটা কথা উঠিয়াছে যে, যখন আমরা বিদেশী গভর্ণমেন্টের সঙ্গে স্বরাজ্যলাভের একটা বিরাট সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছি তখন আমাদের যথাসাধ্য সমবেত হইয়া কার্য্য করা উচিত। আমাদের ভিতর যে বিরোধ আছে তাহাকে কোনও মতে মাথা তুলিতে না দিয়া, এই বৃহৎ সংগ্রামে যথাসাধ্য একমত হইয়া চেষ্টা করা উচিত। অতএব বাঙ্গালার প্রজা দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে অবিচার সহিয়া আসিয়াছে, ভূম্যধিকারীর সঙ্গে তাহার যে নিদারুণ সত্য বিরোধ আছে তাহাকে আপাততঃ ধামা-চাপা দিতে হইবে।

স্বরাজ আমাদের সকলের চির-আকাঙ্ক্ষিত। ভারতবাসী বলিয়া যে পরিচয় দেয়, ভারতের নামে যাহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আছে তার মনে স্বরাজ্য লাভের জন্য একটা তীব্র অদম্য আকাঙ্ক্ষা সতত জাগ্রত থাকিবেই; যদি কাহারও এক বিন্দু আত্মসম্মান-বোধ থাকে তবে সে পরাধীনতার দুরন্ত অপমান এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিবে না। যদি আমরা এক দিনের তরেও ভুলিয়া যাই যে আমরা বিদেশী জাতির অধীন তবে আমরা মানুষ নামের অযোগ্য হইব। শিশু যুবক বৃদ্ধ কোনও পুরুষ ও নারী যেন এক মুহূর্ত্তের তরেও ভুলিয়া না যান যে আমাদের প্রত্যেকের উপর একটা ঋণের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছে। এ ঋণ আমাদের পিতৃ-পুরুষের কাছে, আমাদের জন্মভূমির কাছে আর আমাদের অপমানিত আত্মার কাছে—আর এ ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় স্বরাজ্য-লাভ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের এই নিদারুণ সত্য ধ্যান করিতে হইবে, আমাদের সকল চেষ্টা সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে এই স্বরাজ্যলাভের জন্য—স্বরাজ্য-প্রাপ্তির পথ সহজ করিবার জন্য।

কিন্তু স্বরাজ্য লাভ হইবে কি উপায়ে? এখন বোধ হয় কাহারও মনে এ বৃথা সংস্কারের কণামাত্র অবশিষ্ট নাই যে ইংলণ্ড একদিন আপনার ঔদার্য্যবশে সহসা এই আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ্য অহেতুক-দান কিংবা আমাদের কোনও কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ দিয়া ফেলিবেন, স্বরাজ্য যদি আমাদের পাইতে হয় তবে তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে, যদি প্রতিগ্রহ দ্বারা স্বরাজ্য লাভ করিতে হয় তবে সে অবসর তখনই আসিবে যখন ইংলণ্ড অনুভব করিবেন যে এদেশকে আর পরাধীন করিয়া রাখা অসম্ভব, অথবা ইহা অধীন করিয়া রাখিয়া তাঁহাদের কোনও লাভ নাই।

কি উপায়ে আমরা স্বরাজ্য লাভ করিব? যদি আমরা কথার মোহে ভুলিয়া সত্যকে অস্বীকার না করিতে চাই, তবে এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে স্বরাজ্যলাভের একমাত্র নিশ্চিত ও অভ্রান্ত উপায় সমগ্র জাতির কণা কণা শক্তি আহরণ করিয়া এমন একটা সংহতির সৃষ্টি করা যাহার সম্মুখে জগতের যে কোনো শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। সে শক্তি ভারতের মাঠে-ঘাটে

ছড়ান রহিয়াছে, তাহাকে কুড়াইয়া লইতে হইবে, তাহাকে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। সে শক্তি ছড়ান রহিয়াছে ভারতের কোটী কোটী অবজ্ঞাত শ্রমিক ও কৃষকের ভিতর। তাহাদের রোগ-জীর্ণ, ক্ষুধাতুর, দীনমলিন দেহের ভিতর অসীম শক্তি প্রসুপ্ত রহিয়াছে—তাহাকে জাগাইতে হইবে। তাহাদের ভিতর মনুষ্যত্ব যদি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তাহাদের অন্তরাত্মা যদি জাগ্রত হইয়া মাথা খাড়া করিয়া বলে আমি আছি, তবে তাহাদের সেই বিচ্ছিন্ন শক্তি-কণার সমবায়ে যে মহাশক্তি হুঙ্কার করিয়া উঠিবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে, জগতে এমন কোনো শক্তি আছে? সেই শক্তিকে জাগ্রত ও সংহত করাই স্বরাজলাভের একমাত্র পথ। সে পথ সহজ নয়—অনায়াস-লভ্য নয়, যাদুকরের লাঠি বা মন্ত্রের ফলে তাহা এক মুহূর্তে আয়ত্ত হইয়া আমাদিগকে অবাক করিয়া দিবে না; দীর্ঘ সে পথ, অক্লান্ত চরণে দীর্ঘ দিন হয় ত সে পথে চলিতে হইবে, বলিতে পারিব না কবে আমরা পৌঁছিতে পারিব আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে—কিন্তু একথা স্থির যে এ পথ অভ্রান্ত সুনির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত—আর নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

দেশের যে বিরাট আত্মা অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত এ দরিদ্র ভারতবাসীর ভিতর সুপ্ত আছে, তাহাকে জাগ্রত ও পরিপুষ্ট না করিয়া যদি আমরা স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন দেখি তবে স্বপ্নই দেখিতে থাকিব, স্বাধীনতা লাভ করিব না। ইহা অসম্ভব নয় যে তাহা সত্বেও ভারতের কোনো অজ্ঞাত কন্দরে আগ্নেয়গিরির মত কোন বিরাট শক্তি সহসা জাগ্রত হইয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থা চুরমার করিতে পারে—ইংরেজকে হয়ত ভারত হইতে তাড়াইতে পারে—হয়ত আমাদের দেশবাসীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ইহা সহজে কল্পনীয় না হইলেও অসম্ভব নয়—কিন্তু তবু তাহাতে স্বরাজ্য লাভ হইবে না, স্বাধীনতা আমরা পাইব না, যদি সেই শক্তির পশ্চাতে একটা সমৃদ্ধ শক্তিমান গণশক্তি দাঁড়াইয়া না থাকে।

সুতরাং কৃষক ও শ্রমিকসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা, ইহা স্বরাজ্যলাভের পরিপন্থী নয়, এই চেষ্টার চরম সফলতাই স্বরাজলাভের একমাত্র সুনিশ্চিত ও সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা। ইহাকে চাপা দিয়া আপাতত একটা লোক-দেখান একতার সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহারা মনে করেন যে এ চেষ্টা দমন করিয়া, ভগবানকে ফাঁকি দিয়া রাতারাতি স্বরাজ্যলাভ করিবেন, তাঁহারা চক্ষু মেলিয়াও স্বপ্ন দেখিতেছেন। জাতীয় অভ্যুদয় শুধু স্বপ্ন দেখিয়া লাভ করা যাইবে না। কঠোর সত্যকে অস্বীকার করিয়া কেবল ফাঁকির জোরে ভাগ্যদেবীর ভাণ্ডারে ডাকাইতি করা যাইবে না।

বিরোধ বস্তুটা কোন আকারেই বাঞ্ছনীয় নয়, এবং আমাদের জাতির বর্ত্তমান অবস্থায় বিরোধ-নিবারণ যতদূর সম্ভব তাহা করা উচিত, সে বিষয়ে একবিন্দু সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শান্তির অজুহাতে সত্যের গলা টিপিয়া মারা আমি সমর্থন করিতে পারি না। মানুষের মনুষ্যত্বের দাবী অস্বীকার করাই যদি শান্তিলাভের একমাত্র উপায় হয় তবে সে শান্তি চাইতে আমরা পারি না। যাঁরা বলেন যে শান্তির খাতিরে আপাতত প্রজার এই সহজ অধিকারের দাবী অস্বীকার করা প্রয়োজন, তাঁহাদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে এমন অসত্য ও অন্যায় ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত যে শান্তি তাহার কোন মূল্যই নাই।

কিন্তু শান্তিলাভের আর একটা উপায় আছে। সে উপায় অত্যন্ত সহজ—তাহাতে কারও ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ হইবে না, তাহাতে শুধু ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিরোধ অনায়াসে নিরাকৃত হইয়া পরিপূর্ণ শান্তি ও একতা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে যদি ভূস্বামীসম্প্রদায় তাঁহাদের কেবলমাত্র চিরাগত প্রথার উপর ন্যায় ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার বিরোধী দাবী পরিত্যাগ করিয়া প্রজার সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন, তাহা হইলে বিরোধের আর অবসর থাকে না। বহুদিন তাঁহারা তাঁহাদের আধিপত্য উপভোগ করিয়াছেন, বহুদিন এই বিশিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থে নিষ্পেষিত প্রজার মনুষ্যত্ব পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে—সে অতীতের জন্য আমরা ক্ষোভ করিব না, তখনকার ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব খতাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে যাইব না, হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়া তাঁহাদিগকে ভাই বলিয়া, বন্ধু বলিয়া, নেতা বলিয়া অভিনন্দন করিয়া লইব যদি শুধু তাঁরা ভবিষ্যতের জন্য প্রজার মনুষ্যত্বের অধিকার স্বীকার করিতে অগ্রসর হন।

এটা খুব শক্ত কথা নয়। প্রজার দাবীটা খুব ভয়ানক নয়। তাহারা চায় যে জমীর স্বত্ব তাহারই থাকিবে যে আবাদ করিবে—অন্য কেহ কোন কারণে তাহার উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না। এ দাবী এত সহজ ও স্বাভাবিক যে যদি আমাদের দেশের ভূমি এতদিনকার একটা জটিল বিধি-নিগড়ে বাঁধা না পড়িত, তবে আজ কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারিত না। কিন্তু চিরাগত বিধানের ফলে এই ভূমির উপর এতগুলি ভিন্ন স্বত্ব জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে যে এই সহজ স্বত্বটা স্বীকার করিতে গেলে অনেকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত স্বার্থ ও অধিকারে আঘাত পড়ে। যাহাদের সে স্বার্থ ও অধিকার আছে তাঁহারা যদি আপোষে তার একটা বড় অংশ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন, দেশবাসী জনসাধারণের সাধারণ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার কল্যাণে যদি তাঁহাদের খণ্ডস্বার্থ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন তবে এ সমস্যার অতি সহজ অবিরোধ সমাধান হয়, বাঙ্গলার ভূমিঘটিত জটিল বিধি অনায়াসে সরল হইয়া আসে। এ ব্যাপারে বিরোধ নিরাকরণের এ সহজ এবং সত্য ও ধর্ম্মসঙ্গত পন্থা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে দোষ কি?

আমি স্বীকার করি যে ভূস্বামী সম্প্রদায়ের পক্ষে এই ত্যাগ খুব ছোট জিনিষ নয়, এত বড় ত্যাগ স্বীকার করিবার মত ঔদার্য্য ও দেশ-প্রীতি যে সহসা এ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিবে এ আশাও আমি করি না। কিন্তু এমনি একটা প্রকাণ্ড ত্যাগ যে জাতির সম্ভব তাহারাই জগতে একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। ইংলণ্ড শুধু বাহুবলে মহত্ত্ব অর্জ্জন করে নাই, স্বাধীনতা লাভ ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের অজস্র ত্যাগ-স্বীকারের ফলে তাহারা এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। বিদেশে বিজাতীয় কাফ্রি দাসগণের স্বাধীনতা দানের জন্য ইংলণ্ডকে যে পরিমাণে ত্যাগ-

স্বীকার করিতে হইয়াছিল শুধু সেইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিলেই বাঙ্গলার ভূস্বামীগণ জাতির প্রতিষ্ঠার পথ অবাধ ও সরল করিয়া দিতে পারেন। জাপান বর্ত্তমান যুগে যে অশেষ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়া সমস্ত বিশ্বজগৎকে তাক লাগাইয়া দিয়াছে তাহার মূলে সামুরাইগণের অপূর্ব্ব ত্যাগ রহিয়াছে। এমনি ত্যাগের উপর জাতির মঙ্গলের কাছে স্বার্থ-বলিদানের উপর জাতীয় চরিত্র ও গৌরবের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বাঙ্গলার ভূস্বামী যদি এমনি একটা প্রকাণ্ড ত্যাগ করিয়া কুটীর-বাসী বিরাট জাতির প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সহজ করিয়া দেন তবে তাহাতে যে চরিত্র-গৌরব সূচিত হইবে তাহার সম্মুখে জগতের কোন বাধা দাঁড়াইতে পারিবে না। যাহারা এত বড় ত্যাগ করিতে পারে, তাহারা অঙ্গুলি-হেলনে পৃথিবী শাসন করিতে পারিবে। ইংরেজ কোন ছার সমগ্র জগতের মিলিত শক্তি, তাহাদিগকে দীর্ঘ দিন পদানত করিয়া রাখিতে পারিবে না। স্বরাজ্য কোন্ ছার, বিশ্বরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইবে না।

বিরোধ আমাদের আকাঙ্ক্ষিত নয়—প্রজার আত্মপ্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠা, ইহাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সে লক্ষ্যটা এত বৃহৎ এত মহান যে, তাহা লাভের জন্য যে কোনও ত্যাগ স্বীকারে আমরা পরাঙ্মুখ হইব না। বিরোধ যদি আসে, জাতীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিপন্থী ক্ষুদ্র স্বার্থ যদি আমাদের এই সহজ দাবীপথে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় তবে তাহার সে বিরোধ স্বীকার করিয়া সে বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না। বিধিসঙ্গত সকল উপায়ে আমরা আমাদের সহজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইব—ভয়ে পিছু হটিব না, স্তোভবাক্যে বিচলিত হইব না, লোভে আমাদের ব্রত ত্যাগ করিব না।

কিন্তু, একথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার যে বিরোধকে আগ বাড়াইয়া আমরা ডাকিয়া আনিব না। বরং যদি আপোষে একটা মীমাংসা সম্ভব হয় তবে তাহা দ্বারা আমাদের দাবী ষোল আনা স্বীকার করা না হইলেও তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইব—যদি আমাদের মূল দাবী তাহাতে স্বীকার করা হয়। যাহা মৌলিক ও একান্ত অপরিহার্য্য তাহা আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে আমরা আপোষ করিতে প্রস্তুত।

আমাদের দাবীর মূল কথা এই যে জমিতে সম্পূর্ণ স্বত্ব তারই যে তাহা আবাদ করে বা তাহাতে বাস করে। প্রজার এ দাবী স্বীকার না করিলে যে দেশে কৃষির সম্যক্ উন্নতি সম্ভব নয় তাহা আমি দেখাইবার চেষ্টা করিব। কাজেই এ দাবী আমরা ছাড়িতে পারি না, কেননা, ইহার উপর সমগ্র জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। কিন্তু, আজই এ অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রজার হস্তগত হইবে, এবং এতদিনকার ব্যবহারে যে সব অধিকার সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কলমের এক খোঁচায় উড়াইয়া দিতে হইবে তাহা আমরা বলিতে চাহিনা। যদি আপোষ নিষ্পত্তি করিতে হয় তবে আমরা জমিদারের এতদিনকার অধিকার, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায় হউক এই পরিমাণে স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা খাজনার অধিকারি হইয়া থাকুন এবং তাঁহাদের সে অধিকার যদি লোপ করিতে হয় তবে তার জন্য তাঁরা উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণ গ্রহণ করুন। এমন ব্যবস্থা যদি হয়, জমীদারের অধিকার যদি কেবলমাত্র নির্দ্ধারিত খাজনা পাওয়ার অধিকার মাত্র হয় তবে তাহাতে ভূমিতে প্রজার পূর্ণাধিকার স্বীকার হইবে, সুতরাং এ ব্যবস্থা আপোষে মানিয়া লইতে আমাদের কোন আপত্তি হইবার কথা নয়।

আমরা অপেক্ষা করিতে সম্মত আছি, জমিদারের পরম্পরাগত যে স্বত্ব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই মূলকথা, যে ভূমিতে প্রজার সম্পূর্ণ স্বত্ব স্বীকার করা হইবে এ বিষয়ে আমরা আমাদের দাবী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই।

এটা কেবল একটা খামখেয়ালীর কথা নয়, কেবল একটা ঘোঁট পাকাইয়া গায়ের জোরে অন্যায় লাভ করিবার চেষ্টা নয়, এ অধিকার স্বীকার না করিলে কৃষির সম্যক্ উন্নতি সম্ভব হইবে না, দেশের সমৃদ্ধি সাধিত হইবে না।

এতদিন আমাদের দেশের ভূমি সম্বন্ধীয় বিধি কেবলমাত্র স্বত্ব ও অধিকারের নৈয়ায়িক বিশ্লেষণের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। জমিদারের একটা স্বত্ব আছে, প্রজার একটা স্বত্ব আছে, এই উভয় স্বত্বকে নিত্য পদার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহা হইতে কেবল যুক্তির জোরে পরস্পরের সম্বন্ধ ও অধিকার নিয়মিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে যে ভূমিঘটিত আইনের কত চুলচেরা তর্ক হইয়াছে, কত জটিল ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমাদের আইন-আদালত-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই জানেন।

কিন্তু এসব বিচারে একটা কথা মোটে হিসাব করা হয় নাই, যেটা এ বিচারের গোড়ার কথা—সে কথা দেশের মঙ্গলামঙ্গলের কথা, কৃষির সৌকর্য্যবিধানের ব্যবস্থার কথা। The Great Rent Case হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আদালত কোনও দিন এ হিসাব করেন নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের খাজনার আইনের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভা এ বিচার উঠান নাই। ভাবিয়াছিলাম যে বুঝিবা ভারতগবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত নূতন রয়েল কমিশন এ কথাটা আলোচনা করিয়া গোড়ার কথাটা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিচারের ভার তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই।

ভূমির সম্বন্ধে সকল ব্যবস্থার মূল কথা এই যে ভূমির অধিকার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে কৃষি সমৃদ্ধ হয়, জমী হইতে যতটা সম্পদ পাওয়া সম্ভব তাহা আদায় হইয়া সমস্ত দেশবাসীর সমৃদ্ধি বাড়িতে পারে। মানব সমাজের আদি যুগ হইতে সমাজ এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা করিয়াছে—নানা দেশে নানা ভাবে ইহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সকল দেশের সকল যুগের অভিজ্ঞতার ফল এই যে ব্যবস্থায় কৃষক সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশালী না হয়, এবং যাহাতে সে ভূমিতে

পূর্ণ স্বত্ববান না হয় সে ব্যবস্থায় ভূমির প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন হয় না। আমাদের দেশে ইংরেজী ১৭৯৩ সালে যে, যে ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে ভূমির এই স্বত্ব প্রজাকে দেওয়া হয় নাই। এবং দুর্বল নিঃসহায় প্রজার উপর জমীদার ও মহাজনের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ পরিচালনের ফলে প্রজা হীনবল ও দরিদ্র হইয়া রহিয়াছে।

এ অবস্থায় কৃষির কোনও বিশেষ উন্নতির আশা করা বৃথা। গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের কৃষিবিভাগের অধীনে কৃষির উন্নতিকল্পে নানা রকম ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা করিয়াছেন, তার মধ্যে একমাত্র ভাল বীজ বিতরণ ছাড়া অন্য কোনও উপায়েই কৃষির বিশেষ উন্নতির কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। তার কারণ উন্নত প্রণালীর আবাদ ব্যয়সাধ্য, দরিদ্র কৃষকের পক্ষে তাহা করা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া যে সব সামান্য সামান্য প্রক্রিয়ায় কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহাও বর্ত্তমান অবস্থায় অসাধ্য। বাঙ্গলার কৃষকের জমী নানা খণ্ডে বিভক্ত। পরস্পরের ভিতর পাশাপাশি এগুলি বদল করিয়া যদি জমীগুলি এক খাপে আনা যায় তবে আবাদের অনেক সুবিধা করা যায়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে বর্ত্তমান বিধি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে জমীদারের সম্মতির প্রয়োজন, এবং যেখানে একাধিক জমীদার আছেন সেখানে সকলের সম্মতি আবশ্যক। এই সম্মতি আদায় করা যে কত কঠিন ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তা ছাড়া বাঁধ দিয়া বা জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে জমীর উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রায় স্থলেই তাহা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, কেননা, জমীর মালিক যাঁরা তাঁদের স্বার্থ ইহাতে খুব বেশী নাই এবং প্রজার প্রায়ই শক্তি নাই। তা ছাড়া যদি প্রজা কোনও উন্নতি-সাধন করে তবে তার ফলের কতখানি অংশ যে জমিদার গ্রহণ করিতে পারিবেন; সেটা দীর্ঘকালব্যাপী অনিশ্চিত-ফল মামলায় নির্দ্ধারিত হইবে।

জমীর আবাদের উন্নতির পথে এমনি নানারকমের বিরাট এইসব বাধা থাকা কোনক্রমেই উচিত নয়। এই সব বাধা দূর করিবার একমাত্র উপায় ভূমিতে প্রজার সম্পূর্ণ স্বত্ব স্বীকার। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সত্যটা সহজে বুঝা যাইবে। বাঙ্গলাদেশে এগুলি বদল করিয়া জমী এক চাপে আনিবার চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই বলিলেই হয়, হইবার পথে বিঘ্ন অনেক আছে। কিন্তু পাঞ্জাবে যেখানে ভূমির মালিক প্রজা সেখানে গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই জমীর এইরূপ একীকরণ (consolidation) অনায়াসে সম্ভব হইবে।

একথা অবশ্য ঠিক যে প্রজাকে ভূমির মালিক করিয়া দিলেই কৃষি-সমস্যার একেবারে সমাধান হইয়া যাইবে না। ইহা ছাড়াও অনেক কাজ করিতে হইবে। এক কথায় প্রজাকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। প্রজার হাতে যদি টাকা না থাকে, তবে কিসের উন্নতি সে করিবে, কি করিয়া? বাঙ্গলার প্রজার হাতে টাকা নাই। অধিকাংশ স্থলে সে ঋণগ্রস্ত। তার এ অবস্থা দূর করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রজা ঋণগ্রস্ত হয় কেন? ইহার অনেক কারণ আছে। একটা কারণ অবশ্য এই যে, প্রজা যে জমিটুকু আবাদ করে তার উপস্বত্ব হইতে তাহার সংসার চলে না। এই সব লোকসানী জোত (uneconomic Holdings) দূর করিতে না পারিলে প্রজার ঋণভার কমিবে না। আর একটা কারণ এই যে, প্রজা আবাদ করিয়া যে ফসল উৎপন্ন করে তার একটা অতিরিক্ত অংশ তাহাকে খাজনাস্বরূপে দিতে হয়। যাহাকে Economic Rent বলে—ভূমিতে জমীদার স্বত্ব স্বীকার করিলে যাহা ভূমির অধিকারী অর্থনীতির নিয়মানুসারে পাইতে পারে—তাহা অপেক্ষা অধিক খাজনা যদি প্রজার কাছে লওয়া হয় তবে ভূমির আবাদ হইতে প্রজার যথেষ্ট লাভ হয় না; অনেক স্থলে খাজনা এই Economic Rentএর চেয়ে বেশী।

যাঁরা কেবল বাহির হইতে ব্যাপারটা দেখেন তাঁরা অনেক সময়ে বলেন প্রজার অমিতব্যয়িতাই তার ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণ। প্রজারা হিসাব করিয়া খরচ করিলে যেখানে চালাইতে পারে, বেহিসেবী হইলে সেখানে তার ঋণগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। এমন প্রজা না আছে তা বলি না। বর্ত্তমান অবস্থা যদি চরম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে প্রজারা একটু হিসাব করিয়া চলিলে এত ঋণগ্রস্ত না হইতে পারে। আমাদের প্রজাদের মধ্যে কেউ কিছু রাজার হালে চলে না। যাহাকে আমরা বে-হিসাবী খরচ বলি, তাহা করিয়াও প্রজার জীবনে আরাম ও স্বচ্ছন্দতার পরিমাণ খুব বেশী নয়। এই অতিরিক্ত খরচা না করিলে প্রজারা ইহাপেক্ষাও দীনাবস্থায়, আরও কিছু আরাম ও স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া হয়ত ঋণভার কমাইতে পারে। কিন্তু প্রজাকে যে চিরদিন এমন দীন-হীন, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য-বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইবেই এমন কোনও কথা নাই। আমরা লম্ব-শার্ট-পটাবৃত হইয়া গরীব চাষীর গায়ে একটা গেঞ্জী দেখিলে তাদের বেহিসাবি বাবুয়ানীর সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রজা যদি এ উত্তর দেয় যে আমরা তোমাদের সম্পূর্ণ সম্পদ উৎপন্ন করি, আমরা তোমাদের চেয়ে আরাম বা স্বচ্ছন্দতায় হীন কেন, তবে সে কথার জবাব নাই।

প্রজার ঋণভার নিবারণ করিয়া তাহার হাতে টাকা জমাইতে হইবে। এ বিষয়ে কো-অপারেটিব সোসাইটিগুলির কাজ বিশেষ প্রশংসনীয়, এবং এই সব সোসাইটির প্রসার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার দ্বারাই প্রজার বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর হইবে না। এ অবস্থা নির্ম্মূল করিতে গেলে করিতে হইবে সমস্ত ভূমির পুনর্ব্যবস্থা, যাহাতে প্রত্যেক প্রজা যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি আবাদ করিতে পায় এবং তার সমস্ত ব্যয় বাদেই তাহার হাতে যথেষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। এরূপ ব্যবস্থা তখনি সম্ভব হইতে পারিবে যখন প্রজা হইবে জমীর মালিক। যতদিন জমীর মালিক থাকিবেন জমীদার ও লক্ষকোটি মধ্যস্বত্বভোগী, ততদিন এমন ব্যবস্থা গঠনের স্বপ্নও আমাদের পক্ষে বাতুলতা হইবে।

কৃষির উন্নতি ঘটিত যে কোনও সমস্যা আমরা গোড়া পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখি না কেন, দেখিতে পাইব, যে সে সমস্যা সমাধানের অপরিহার্য্য প্রথম পদ বাঙ্গলার ভূমিঘটিত বিধির আমূল পরিবর্ত্তন।

যে সব পরিবর্তন প্রয়োজন তাহার কোনটিই সম্ভব হইবে না যে পর্যন্ত ভূমিতে প্রজার অবিভক্ত স্বত্ব স্বীকার করা না হইবে। বাঙ্গলার কৃষির যদি উন্নতি করিতে হয়, বাঙ্গালার কৃষককে যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণাধিকারী করিতে হয়, বাঙ্গালী জাতির সম্পদ যদি বাড়াইতে হয় তবে ভূমিতে কৃষকের পূর্ণাধিকার স্বীকার সর্বাগ্রে করিতে হইবে।

আমরা যাহা চাই তাহা একটা আমূল সংস্কার—বাঙ্গলার ভূমিস্বত্ববিধির আদ্যোপান্ত ওলট পালট করিয়া একটা সহজ বিধান সৃজন যার ফলে কৃষির অভ্যুদয় ও কৃষকের কল্যাণ সাধিত হইবে। কোনও রকম তালি জোড়া দিয়া এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। ১৭৯৩ সালে যে বিধি প্রণীত হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল ভুল।—তার পর ১৮৫৯ সন হইতে আরম্ভ করিয়া সে ভুলের একটি সংশোধন চলিয়াছে, তালির উপর তালি দিয়া স্বভাবের নিয়মবিরুদ্ধ অন্যায় ও অকল্যাণকর বিধিকে কোনও রকমে দাঁড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। আজ গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে আরও কতকগুলি নূতন ত্রুটির উপর, তাই সেই হাজার তালি-মারা জীর্ণ পঙ্গু বিধির উপর আবার তালি মারিবার চেষ্টা হইতেছে নূতন প্রজাস্বত্ব বিধির সংস্কারক বিধির দ্বারা।

নিতান্ত চোখের উপর যে সব ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে আমাদের গবর্ণমেন্ট বরাবর হালফিল শুধু সেইটুকুর সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। চারিদিক দিয়া যে ইমারত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহার এক দিক সামলাইতে গিয়া আর এক দিক ভাঙ্গিয়া পড়ে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে স্থলে মেরামতের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়ে। বাঙ্গলার ভূমিস্বত্ববিষয়ক আইনেও ভাঙ্গিয়া গড়ার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এবারেও প্রস্তাব হইয়াছে কেবল তালি জোড়ার।

বাঙ্গলার প্রজা বর্তমান অবস্থায় যে যে জায়গায় অন্যায় সব চেয়ে বেশী অনুভব করিয়াছে, শুধু সেই সেই জায়গায় বর্তমান বিধিসংস্কারের আয়োজন হইয়াছে। ফলে কয়েকটি এমন প্রস্তাব হইয়াছে যাহাতে আশু অসুবিধা ও অন্যায়ের কতকটা প্রতিকার হইবে। কিন্তু ভাঙ্গা ঘর একদিকে ঠেলা দিতে গিয়া গবর্ণমেন্টকে আর এক দিক সামলাইতে হইয়াছে খুঁটাগাড়ি করিয়া। তাই এই বিধিতে এমন একটা গোলমেলে কাণ্ড করা হইতেছে যাহাতে বাঙ্গলার প্রজাস্বত্ববিষয়ক বিধি আরও বহুপরিমাণে জটিল হইয়া পড়িবে। যথা, প্রজার হস্তান্তরের অধিকার না থাকায় সমস্ত প্রজা অসুবিধা বোধ করিতেছে। সুতরাং প্রজার ভূমি হস্তান্তর করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু এই সামান্য অধিকারটুকু দিতে গিয়া অপর দিকে জমীদারের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে শতকরা ২৫৲ টাকা সেলামী—আর একটী অধিকার যাহাতে ইতিমধ্যেই জমীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে—বিক্রীত জমী খরিদ করিয়া লইবার অধিকার। কিন্তু তাতেও চলে না; কথা উঠিল, যদি ষোল আনা মালিক এক হইয়া খরিদ করিতে না চায়, তবে কি হইবে? সুতরাং প্রস্তাব হইয়াছে যে ইচ্ছা করিলে আংশিক মালিকও খরিদ করিতে পারিবেন। সুতরাং আর কোনও লেঠা রহিল না। প্রজার পক্ষে মালিক ব্যতীত আর কাহারও কাছে জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। এবং মালিক জমী কিনিয়া লইয়া পুনরায় বন্দোবস্ত করিবার সময় যথেচ্ছা নজর লইয়া বন্দোবস্ত করিবেন।

শতকরা ২৫৲ টাকা সেলামী অনেকস্থলে অতিরিক্ত, অনেক জমীদারই এখন ইহা পান না। কিন্তু এ ব্যবস্থাতেও এখন উঁহাদের মন উঠিবে না। ধর—রাম ও শ্যাম উভয়েই রহিমের জমী কিনিতে চায়, রাম জমীদারকে হাত করিয়াছে, শ্যাম পারে নাই। রাম বলিয়াছে যে শতকরা ২৫৲ টাকা হারে জমীদার যে সেলামী পাইবে সে তার দ্বিগুণ দিবে। Pre-emptionএর অধিকার না থাকিলে রাম এ টাকাটি রহিমকে দিতে চাহিত—কিন্তু যেখানে জমীদারের হাতে কলকাঠি, সেখানে সে বুদ্ধিমানের মত টাকাটা জমীদারকে দিতে চাহিবে। জমীদার বলিবেন, আমি জমী কিনিব। শ্যাম কাজেই পিছাইয়া যাইবে, কেন না, সে যে কালে জমী পাইবে না সেকালে কেন ইহা লইয়া হাঙ্গামা করিতে যাইবে? রামশ্যামের ভিতর ডাকাডাকিতে রহিম যে দামে জমী বেচিতে পারিত, তার চেয়ে অনেক অল্পমূল্যে তাকে বেচিতে হইবে জমীদারের কাছে—এবং জমীদার সেই জমী পত্তন করিয়া অতিরিক্ত নজর পাইবেন।

গভর্ণমেন্ট অনেক বৎসর ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে প্রজার জমী বিক্রয় করিবার অধিকার থাকা উচিত। এই সরল সত্যটা আবিষ্কার করিয়া তাঁরা সরলভাবে স্বীকার করিতে পারিলেন না, তাঁরা জমীদারের মুখ রাখিতে গিয়া ইহার সঙ্গে এমন একটা লেজুড় জুড়িয়া দিলেন যাহাতে প্রজার হস্তান্তরের অধিকারের সুবিধাটা স্বপ্ন হইয়া মিলিয়া গেল। অবশ্য ইহা তাঁহাদের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু ফল ইহাই হইবে। এই তালি জোড়ার প্রক্রিয়ার ফলে এতদিন ধরিয়া এইরূপ জুড়ি জুড়ি অপ্রত্যাশিত ফল ফলিয়াছে, আর যতদিন পর্যন্ত গভর্ণমেন্ট এ বদভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আমূল সংস্কার করিতে মনঃস্থির করিতে না পারিবেন, ততদিন পর্যন্ত এমনি হইতে থাকিবে।

প্রজার পক্ষে গভর্ণমেন্টের কাছে আমাদের এই দাবী যে ভূমিস্বত্বসম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া ভূমিতে প্রজার পূর্ণ স্বত্ব স্বীকার করুন। যতদিন পর্যন্ত তাহা স্বীকৃত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা এ আন্দোলন ছাড়িব না। এ জন্য আমাদেরই উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। জমীদারের লোকসান আমরা করাইতে চাই না, যাঁহারা বর্তমান বিধির উপর আস্থা রাখিয়া জমীদারী বা মধ্যস্বত্ব খরিদ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁদের খাজনা পাইতে থাকুন, কিম্বা খাজনার মূল্যস্বরূপ ক্ষতিপূরণ নিন, কিন্তু তাহা ছাড়া তাঁদের ভূমির উপর অন্য কোনও স্বত্ব বা অধিকার যেন না থাকে ইহাই আমরা চাই।

প্রজার জমির উপর যে গাছ আছে, হয় তো প্রজা নিজেই তাহা জন্মাইয়াছে—কিম্বা তাহা আপনি গজাইয়াছে। সে গাছ যদি নিতান্তই আগাছা হয়, যদি ঝড়ে পড়িয়া যায়, কিম্বা কাটা

।।—হবে তাহা জমীদারের, ইহাই আজকার বিধি। এ বিষয়ে ঠাঁরা যে অন্যায় তাহা গভর্ণমেণ্ট অনুভব করিয়াছেন। এবং বদান্যবশ হইয়া প্রজাকে আগাছার উপর সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু ফলের গাছ বা কাঠের গাছ হইলে তাহাতেও জমীদারের শতকরা ২৫৲ টাকা হারে অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

আইন ব্যবসায়ীগণ এ ব্যবস্থায় নাচিয়া উঠিবার কথা। কেননা ইহাতে প্রজার বাড়ীতে একটি গাছ কাটা গেলে মামলায় নানারকম প্রশ্ন উঠিবে—সে গাছ আগাছা না মূল্যবান বৃক্ষ? তার মূল্য কত? তার কতকটা প্রজা চুরী করিয়াছে কিনা? ইত্যাদি। সুখের চেয়ে যদি স্বস্তি ভাল হয় তবে অনেক প্রজা বলিবেন যে অধিকারের এই স্বল্পটুকু দিয়া ভাগাভাগির ব্যাপারে এত লেঠার সৃষ্টি করার চেয়ে বুঝি বা গাছে অধিকার না থাকাই ভাল ছিল।

এইরূপে প্রস্তাবিত বিধিতে যেখানে প্রজার ন্যায্য অধিকার স্বীকারের দিকে এক পা অগ্রসর হওয়া হইয়াছে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে জোর পিছটানে সরকার দশ পা পিছাইয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে গভর্ণমেণ্ট এ বিধি প্রণয়ন করিতে ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থার গোড়ার কথার দিকে দৃষ্টি করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত পুনর্গঠনের আয়োজন না করিয়া আপনাদিগকে চিরাগত বিধি ও অধিকারের প্রাচীরে আবদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন। উপস্থিত আপদের আশু নিরাকরণের চেষ্টা মাত্র করিয়াছেন রোগের মূলোচ্ছেদের কোনও চেষ্টাই করেন নাই।

সুতরাং এ প্রস্তাবিত বিধি আমার মনঃপূত নয় তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা চাই আমূল-সংস্কার, তালি-জোড়ায় আমাদের মন উঠিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া আমি একথা বলিতে চাই না যে, ইহা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রজার পক্ষে অহিতকর এবং প্রজার স্বত্বের বিরোধী যে সব বিধান ইহাতে আছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের প্রাণপণ করিয়া লড়িতে হইবে এবং তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইব না। কিন্তু ইহাতে প্রজার স্বত্ব যতটুকু স্বীকার করা হইয়াছে, প্রজাকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে আমরা তাহাতে তৃপ্ত না হইলেও তাহা প্রত্যাখ্যান করিব না। এ বিধান পরিত্যক্ত হউক ইহা আমরা চাই না, ইহার যথাসম্ভব সংস্কার করিয়া প্রজাস্বত্বের যতদূর সম্ভব অনুকূল করিয়া লইতে হইবে, ইহাই আমার পরামর্শ। যেটুকু অধিকার প্রজা ইহাতে পাইবে, তাহাকে চরম বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। যে পর্য্যন্ত প্রজার পূর্ণাধিকার স্বীকৃত না হয়, ভূমি-ঘটিত ব্যবস্থার আমূলসংস্কার না হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিব—এক দিনের তরে বিরত হইব না। কিন্তু আপাততঃ যেটুকু পাইব, তাহা পরিত্যাগ করিব না।

প্রজার এ সংহত দাবীর উত্তরে বাঙ্গলার জমীদার সম্প্রদায়ের যুক্তি মাত্র একটী। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রজার মঙ্গল হইতেছে কিম্বা ইহা জাতীয় সমৃদ্ধির অনুকূল এমন কথা তাঁরা বলিতে পারিবেন না। তাঁদের দাঁড়াইবার একমাত্র স্থান তাঁদের চিরাগত অধিকার। তাঁরা বলেন যে ১৭৯৩ সালের এক চুক্তির দ্বারা গভর্ণমেণ্ট তাঁদের যে স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন আজ তাকে তাঁরা বদলাইতে পারেন না। আমি বহুস্থানে বলিয়াছি যে এ যুক্তির মূলে অনেক ভুল আছে। ১৭৯৩ সালের চুক্তিতে জমীদারের যে অধিকার ও যে দায়িত্ব আছে, এখনও তাঁরা সেই অধিকার দাবী করিতেছেন কিন্তু তাঁদের দায়িত্ব ঝরিয়া পড়িয়াছে—সুতরাং সে চুক্তি Failure of consideration হেতুতে নষ্ট হইতে পারে। তা ছাড়া আর একটা কথা এই যে চুক্তির বাধ্যবাধকতা খাটে কেবল তাদেরই ভিতর যারা সে চুক্তিতে পক্ষ ছিলেন। বাঙ্গলার প্রজা তাহাতে পক্ষ ছিল না। বাঙ্গলার প্রজার চিরাগত স্বত্ব এবং স্বভাব-দত্ত অধিকার যদি সে চুক্তির দ্বারা নষ্টই হইয়া থাকে, তবে তাহাতে প্রজা তো বাধ্য নয়। , অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন শক্তিহীন বাঙ্গালী প্রজাকে না ডাকিয়া তাদের চিরাগত অধিকার এবং অর্থনীতির অনুমোদিত অধিকারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া গভর্ণমেণ্ট জমীদারের সঙ্গে যদি কোনও মীড বা পারসীকদের আইনের মত কোনও অপরিবর্ত্তনীয় চুক্তি করিয়া থাকেন তাহাতে সে গভর্ণমেণ্ট বা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা বাধ্য থাকেন থাকুন, প্রজা তাহাতে বাধ্য নয়, বাধ্য থাকিবে না। অশক্ত প্রজাকে যে অন্যায় মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে সমবেত প্রজাশক্তি আজ সকল চেষ্টা নিযুক্ত করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে—ইহার চুক্তির দোহাই খাটিবে না।

আজ আমরা পরাজিত হইতে পারি দীর্ঘকালের অধিকার-পুষ্ট যে শক্তি প্রজার বুকের উপর বসিয়া আছে তাহা আমাদের চেষ্টা আজ প্রতিহত করিতে পারে, কিন্তু পরাজয়ে আমরা দমিয়া যাইব না। কেননা আজ বাঙ্গলার প্রজা যতই পদানত, পরাহত হউক—প্রজার শক্তি ত ক্ষুদ্র নয়। বাঙ্গলার কৃষক শ্রমিকের ভিতর যে প্রচণ্ড শক্তি, ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা আজ হয়তো লাঞ্ছিত হইতে পারে, কিন্তু চিরদিন হইবে না। যত পরাজয় যত লাঞ্ছনা তাহাদের হইবে ততই তাদের ভিতরকার সে সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইবে, তার বিচ্ছিন্ন কণাগুলি সংহত হইয়া উঠিবে। যখন সেদিন আসিবে—যে দিন বাঙ্গলার প্রজা আপনার শক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও জ্ঞানবান হইয়া উঠিবে, তখন অভিজাত্য বা অধিকারের এই ক্ষুদ্র দম্ভ চূর্ণ হইয়া যাইবে, সে সমবেত শক্তির প্রচণ্ড স্রোতোবেগের সম্মুখে চিরাগত অধিকারের এই তুচ্ছ আস্ফালন কুটার মত ভাসিয়া যাইবে। আমরা কেন হতাশ্বাস হইব? আমরা যে শক্তিমান—সমগ্র জাতির—বৃহৎ শক্তি যে আমাদের এ চেষ্টার পশ্চাতে আছে।

কোন লক্ষ্য লাভের জন্য আমরা আমাদের এই শক্তির উদ্বোধন করিতেছি? কি উপায়ে সে লক্ষ্য লাভ হইবে? আজ নবজাগরণের দিনে আপনাদিগকে আমি এই কথা নিবিড়ভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

লক্ষ্য আমাদের ছোট নয়—সে বাঙ্গলার প্রজাশক্তি শ্রমিক-শক্তির পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা, তাদের মনুষ্যত্বের অধিকার-লাভ তাদের প্রত্যেকের জীবনের সার্থকতা-লাভ, বিরোধ আমরা চাই না, কোনও জাতি বা শ্রেণীর কোনও ক্ষতি বা অনিষ্ট আমাদের

লক্ষ্য নয়—কারও মঙ্গলের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব নাই। আমরা চাই সকল স্বার্থের সমন্বয় দেশবাসী সকল জাতির, সকল শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সমান সুযোগ, চাষীরা মানুষ হইয়া মনুষ্যত্বের গর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে দেশবাসী আর সকলকে প্রভু বলিয়া নয়—ভাই বলিয়া প্রীতি সম্ভাষণ করিবে, সকল দেশবাসীর সঙ্গে হাতে হাত দিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে, ভারতের স্বরাজ্য লাভ করিতে অগ্রসর হইবে, ইহাই আমাদের লক্ষ্য, ইহাই আমাদের অভিপ্রায়।

কি উপায়ে আমরা এ লক্ষ্য লাভ করিব। অন্যায় আমরা আশ্রয় করিব না অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিব না, ভগবানের পায় মতি রাখিয়া ধর্ম্মপথে আমরা অগ্রসর হইব, অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে বাহুবলের প্রয়োজন হয় তবে তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইব না, কিন্তু পাশব শক্তি দিয়া ধর্ম্মের অধিকারকেও কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিব না। যুদ্ধ করিয়া সুযোগ লাভ পশু ধর্ম্ম। মানব যতদিন পশু থাকিবে ততদিন হয়তো ইহা তার ধর্ম্ম থাকিবে কিন্তু মানবের যে চিরমঙ্গল তাহা তাহার পশুত্বের ধর্ম্ম নয় সে তার দেবত্বের অংশ, তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে যে শক্তি দিয়া তাহা পশুবল নয়।

আমাদের উদ্দেশ্য লাভের দুটী পন্থা আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট—সেই দুই পথই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে। প্রজার অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য আইনের যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা করিতে হইবে ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা। প্রজার মঙ্গলের জন্য যে অনুষ্ঠান গভর্ণমেণ্টের দ্বারা করা প্রয়োজন, তাহাও করাইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার প্রজা প্রতিনিধিদের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বা আইনকর্ত্তাদের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহা ছাড়াও অনেক কাজ আমাদের নিজেদের করিবার আছে। বাঙ্গলার প্রজা-শক্তিকে এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেহইবে এই সব কাজ করিবার জন্য।

বাঙ্গলার প্রজা বর্ত্তমানকালে যে নিদারুণ দুরবস্থায় পড়িয়া আছে তার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—তার দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে, তার স্বাস্থ্যহীনতা দূর করিতে হইবে—আর দূর করিতে হইবে তার অজ্ঞান।

বাঙ্গলার প্রজার দারিদ্র্য কোনও দিনই দূর হইবে না, চিরদিন সে দীনহীন ঋণভার পীড়িত হইয়া পড়িয়া থাকিবে যদি বর্ত্তমান ভূমিব্যবস্থা ও বিলির পুনর্ব্বন্দোবস্ত করা না হইবে। কিন্তু তা' ছাড়া আরও কতকগুলি কাজের দরকার আছে :

প্রথম কথা প্রজার ঋণভার দূর করিতে হইবে। এই একটা প্রধান সমস্যা। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়টা ঠিক উপযুক্তরূপ ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয় নাই। এ যাবৎ কেবলমাত্র দুইটি উপায়ে প্রজার ঋণভারের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ কমাইবার চেষ্টা হইয়াছে। Interest Act দ্বারা সুদের মাত্রা কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটীর দ্বারা অতি অপ্রচুর পরিমাণে কতকটা সস্তায় টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। Interest Actএ বাস্তবিক কোনও উপকার হয় নাই এবং হইতে পারে না। কো-অপারেটিভ সোসাইটি কেবল সেই প্রজাকেই কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিবে যে ঋণজালে একেবারে জড়িত হইয়া ডুবিয়া পড়ে নাই। কিন্তু এমন লোক আছে মহাজনের কাছে যার চুলের ডগাটি পর্য্যন্ত বাঁধা আছে। তাহাদের কোনও উপায় ইহাতে হয় না।

প্রজার ঋণ-সমস্যা সমাধান করিতে গেলে প্রথম দরকার প্রজার হোল্ডিংএর পুনর্ব্যবস্থা ও তার উপর খাজনার ভার লাঘব করিয়া তার হাতে নিতান্ত আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু টাকা দেওয়া। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। তা ছাড়া উপস্থিত ঋণের ভারটা যদি তাদের উপর চাপিয়াই থাকে তবে তাদের উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। এ ঋণ যদি একেবারে পরিশোধ করিয়া তাদের পক্ষে নূতন করিয়া আরম্ভ করা সম্ভব হইত তবে কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রভৃতির দ্বারা অনেক সহায়তা হইত। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। সুতরাং আমার মনে হয় যে ঋণগ্রস্ত প্রজার মুক্তির পক্ষে অন্ততঃ একটা দীর্ঘদিনের moratorium বা সাময়িক ঋণমুক্তি দেওয়াই একমাত্র উপায়।

এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায়টা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি, আশা করি আপনারা ইহা বিবেচনা করিবেন। মনে করুন কুড়িটি প্রজা এমন আছে যাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও দেনা না থাকিলে তারা একরকম চালাইয়া কিছু টাকা হাতে করিতে পারে কিন্তু তাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে পুরাতন দেনা, তাহার সুদ যোগাইয়া আর তার কিছু অবশিষ্ট থাকে না, কাজেই তার আরও দেনা করিয়া সংসার চালাইতে হয়। ইহাদের ভিতর কো-অপারেটিভ সোসাইটি করিয়া ইহাদের কোনও বিশেষ উপকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি ইহারা কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করিয়া একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পায় তবে দশ বছরের মধ্যে হয় তো অবস্থাটা গুছাইয়া লইতে পারে। এই নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর তাহাদের দেওয়া যায় যদি আইন করিয়া এমন বিধান করা যায় যে দেনাদারেরা বিশিষ্ট নিয়মে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করিলে তাহাদের পূর্ব্বপাওনাদারদের দাবী ধরুণ পাঁচ বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে, ঐ সময়ের মধ্যে তাহারা টাকা আদায় করিবার জন্য কোনও মামলা বা ডিক্রীজারী করিতে পারিবে না। এরূপ ব্যবস্থা হইলে ইহাদের সমিতি, ইহাদের নিকট হইতে ক্রমে টাকা লইয়া একটি sinking fund সৃষ্টি করিয়া এই অবসরের অন্তে টাকাটা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে পারিবে। এই moratorium বা অবসরের সময়ে দেনার উপর আদালতের ডিক্রীর হারে, অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে সুদ চলিবে।

এ প্রস্তাব এমন কিছু ভয়ানক নূতন বা বিপ্লবজনক নয়। ইনসলভেন্সী আইনের ফলে অনেক সময় পাওনাদারকে এমনি বাধ্য হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, কোর্ট অব ওয়ার্ডস জমীদারের সম্পত্তি লইয়া পাওনাদারদিগকে এমনি করিয়া বসাইয়া রাখেন, যুদ্ধের সময় ব্যাঙ্কগুলিকে রক্ষা করিবার সময় এমন moratorium দেওয়া হয়। যে নীতিতে ঋণগ্রস্তকে ধনীকে এই উপায় উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করা হয় আমি কেবল সেই নীতি

অনুসরণ করিয়া প্রজাকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে বসিতেছি। এমনি একটা উপায় না করিলে বাঙ্গলার প্রজার ঋণভার কমান অসম্ভব।

এই সঙ্গে আর একটা কথা আসিয়া পড়ে সেটা প্রজার ধনবৃদ্ধির উপায়। প্রজার হাতে টাকা নেই, অথচ প্রজা বৎসরের অনেক সময় কর্ম্মের অভাবে বসিয়া থাকে। সেই সময় অনেকে নানা প্রকার ছোট খাট কাজ করিয়া কিঞ্চিৎ রোজগার করে— আরও অনেক করিতে পারে যদি কাজ করিবার অবসর পায়। কিন্তু কি কাজ তারা করিবে?

সে কালে গ্রামে গ্রামে অনেক কুটীর-শিল্প ছিল, কৃষিজাত অনেক শিল্প ছিল, তা ছাড়া দেশের কাপড়, হাতিয়ার, খেলার সামগ্রী প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা দেশের কৃষক ও শ্রমজীবিরাই খাটিয়া তৈয়ার করিত। আজ সেদিন নাই। বড় বড় কারখানার চাপে, বিদেশী বৃহৎ প্রতিযোগিতার পেষণে এবং চলাচল ও মাল সরবরাহের সুযোগ বৃদ্ধির এই সব শিল্প লোপ পাইয়াছে। এখন ক্ষেতের সরিষা লইয়া কলু তেল করে না, তেল সরবরাহ হয় কলিকাতায় কল হইতে, দড়ি বা চট গ্রামে তৈয়ার হয় না আসে বিলাত হইতে কিম্বা কলিকাতার কল হইতে। কাজেই অনেকটা লাভজনক কাজের অবসর প্রজার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। ফলে প্রজার জমীর দখল ছাড়া অন্য উপায়ে আয়ের অনেকটা অবসর চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রজা আরও দরিদ্র ও অসহায় হইয়া পড়িতেছে;

এ ব্যাপারটার উপর কিছুদিন হইল দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এই কথা দেশের সকল লোকের মনের ভিতর প্রবলভাবে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। তিনি এ সমস্যা সমাধানের যে উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই যে প্রত্যেক গৃহস্থ সূতা কাটিবে, গ্রামের তাঁতে কাপড় বোনা হইবে, আমরা কেহ সেই কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় পরিব না।

এই নীতি অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশে অনেক চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে এবং খাদিপ্রতিষ্টান ও অন্যান্য সমিতির উদ্যোগে এ পথে অনেক কাজ করা হইয়াছে এবং কতক পরিমাণে নিরন্নের অন্ন-সংস্থানের উপায় হইয়াছে।

আমি স্বয়ং এ বিষয়ে দীর্ঘকাল বিচার করিয়া এবং এই নীতির মন্ত্রদ্রষ্টাদের সহিত আলোচনা করিয়াও ইহার চরম উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ইহাতে যে নিরন্নের অন্নসংস্থান হইবে ও হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই, এই উপায়ে যে গরীব চাষী তার অবসর কালের একটা লাভজনক কাজ পাইতেছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিবেচনায় এ উপকার স্থায়ী হইবার পথে গুরুতর অন্তরায় আছে, এবং দেশের সমবেত সম্পদ ইহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মতামত আমি বেশী করিয়া আলোচনা করিতে চাই না। দেশের একটা গুরুতর সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করিবার জন্য যে প্রকাণ্ড চেষ্টা হইতেছে, নিজে তার পরিবর্ত্তে তার চেয়ে ভাল কিছু না করিয়া কেবল তাহা নষ্ট করিবার জন্য কোনও কথা বলিতে চাই না। এ পথে যদি সফলতা লাভ হয় তবে আমি আনন্দিত হইব, এবং এ প্রণালীর সফলতায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের সফলতা আমি কামনা করি।

কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সূতাকাটাই একমাত্র অবলম্বনীয় গৃহশিল্প নয়। এখনও, বর্ত্তমান ব্যবস্থার ভিতরেও, এই অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী বহু লাভজনক কুটীর শিল্পের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ বিষয়ে বঙ্গদেশের Industries Department কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে বাঙ্গলার বহু স্থানে বহু কুটীর শিল্প এখনও জীবিত আছে, এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা ইহাদের উন্নতির চেষ্টা করিলে এ সব শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। আমি নিজে ঢাকা জেলার শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টা ও আয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে অনেকগুলি বেশ লাভজনক কুটীর-শিল্প চালান যাইতে পারে। অনেক স্থলে অনেকগুলি লাভজনক কুটীর-শিল্প অদূরদর্শী মহাজনের লোভের চাপে মারা যাইতেছে; সেগুলি শ্রমজীবি-সমবায়ের ব্যবস্থা করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। অনেক নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠাও করা যাইতে পারে।

এ সব অনেক অনুসন্ধানসাপেক্ষ—কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে কোনও গুরুতর অনুসন্ধান বা চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। Bengal Home Industries Association যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাঁহারা এই কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের Industries Depart-ment এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কতকটা করিয়াছেন, কিন্তু ঠিক যে রকম অনুসন্ধান দরকার তাহা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটী যদি গ্রামে গ্রামে যাইয়া এ বিষয়ের প্রত্যেক স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থা আলোচনা করিয়া এবং স্থল বিশেষে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া অনুসন্ধান করেন তবে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। কি প্রণালীতে কাজ করিতে হইবে তাহা Industrial Commission এর রিপোর্টে মোটামুটি প্রকাশিত হইয়াছে—কিন্তু কোন স্থানে কি উপায়ে কি বিশিষ্ট কাজ করিতে হইবে—প্রস্তাবিত মূলসূত্রগুলির কি বিশিষ্ট প্রয়োগ আবশ্যক তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আশা করি এমনি একটা দীর্ঘকাল স্থায়ী কমিশন নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিবেন, যাঁরা কেবল কেতাবী [illegible] করিবেন না, একটা দীর্ঘকালব্যাপী প্রোগ্রাম নির্দ্ধারণ করি[illegible] কাজের সূত্রপাত করিয়া তাহা অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিবেন।

কিন্তু বাঙ্গলার প্রজার, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের প্রজার সম্পদ বাড়াইবার কথা মনে করিলে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে যে কথা, সে পাট। পাট আমাদের কৃষিজীবির একটা প্রকাণ্ড সম্পদ। অনেক টাকা ইহাতে দেশে আসে। চাষী ইহা আবাদ করিয়া অনেক লাভ পায়। কিন্তু পাটের দ্বারা দেশে যে সম্পদ [illegible] তার খুব মোটা অংশ যায় মহাজন ও স্তরে স্তরে বিস্তৃত মধ্যবর্ত্তীদের হাতে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে পাটের ব্যবসা আর ব্যবসা নাই, ইহা হইয়াছে একটা প্রকাণ্ড জুয়াখেলা। চাষীর এ খেলা খেলিবার সঙ্গতি বা শক্তি নাই, তাই যারা ইহা খেলিতে পারে তারা পাটের টাকা দু'হাতে লুটিয়া লইতেছে। চাষীর সম্পদ লইয়া তাহারা ছিনিমিনি খেলিতেছে। কেবলমাত্র পাটে দেশে যে সম্পদ হয় তাহা যদি উৎপাদক কৃষিজীবিদের মধ্যে ন্যায়মতে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় তবে অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গের শ্রমজীবি রীতিমত সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারিবে।

ইহা মোটেই অসম্ভব নয়—বরং অত্যন্ত সহজ। যারা পাট উৎপাদন করে তারা যদি কেবল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমস্ত পাট লইয়া বাজারে দাঁড়ায়, তবে সমস্ত পৃথিবী তাদের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে, তাদের হাতে টাকা গুঁজিয়া দিবার পথ পাইবে না। পাটের সকল সম্পদ বিতরণ হইবে কৃষিজীবিদের মধ্যে। এমনি একটী প্রকাণ্ড সমবায় গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে।

এজন্য প্রথমে দরকার প্রতি গ্রামে এক বা ততোধিক কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন। এই সোসাইটি মেম্বরদের প্রত্যেকের পাট লইয়া বেচিবে। কেবলমাত্র এইটুকু করিলেই ফড়িয়ার লাভটুকু তাহারা কাড়িয়া লইতে পারিবে। তারপর যদি এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি ক্রমশঃ একটা বৃহৎ সমবায় গড়িয়া তুলিয়া সেই সমবায় or Federationএর হাতে বাঙ্গলার সমস্ত পাট আনিয়া ফেলিতে পারে, তবে আর পাটের দর Dundee হইতে নির্দ্ধারিত হইবে না, নির্দ্ধারিত হইবে কলিকাতায়, এই বৃহৎ উৎপাদক সমিতির দ্বারা। যদি এই বৃহৎ পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কার্য্যারম্ভ করি এবং গ্রামে গ্রামে সমবায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারি তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাটের ব্যবসায় জুয়ারীদের টাকা চাষীর ঘরে আসিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে। বিলাতে সামান্য Rochdale Pioneers হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেশময় কো অপারেটিভ সমিতি ছাইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সমবায় যে Co-operative wholesale গঠিত হইয়াছে তাহা বিলাতের একটী সব চেয়ে বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র। আমরা যদি উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারি তবে দশ বিশ বছরের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড Federation তেমনি আপনি আপনি গাড়য়া উঠিবে। গভর্ণমেন্ট Co-operative Department এ বিষয়ে সামান্য কিছু কাজ করিয়াছেন তাহাতে সাফল্যের যথেষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে। এখন চাই বাঙ্গলার কৃষিজীবিদের একট প্রকাণ্ড চেষ্টা।

বাঙ্গলার কৃষিজীবির কথা ভাবিতে গেলে আর একটা সমস্যার কথা মনে উঠে সে তাদের স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্টের অনেক কিছু করিবার আছে। জেলা বোর্ডের কাছে অনেক কাজ আমাদের পাওনা—সে সব আদায় করিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অনেক করিবার আছে। গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য প্রতি গ্রামে হয় Village Union কিম্বা কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের অবিলম্বে সর্ব্বাগ্রে দরকার কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। কৃষকের বর্ত্তমান [illegible] সব চেয়ে বেশী দাবী তাদের অজ্ঞান। সে অজ্ঞান দূর করিতে হইবে, প্রত্যেক কৃষক যাহাতে অন্ততঃ একটুকু লেখাপড়া শিখিতে পারে যাহাতে বই বা কাগজ পড়িয়া তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে পারে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। একথা বহুদিন হইতে আলোচনা হইয়াছে, ইতিমধ্যে বাজেটের বহু কোটি টাকা নানারকম শৌখীন কাজে খরচ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কৃষিজীবির এই প্রাথমিক দাবী এপর্য্যন্ত পূর্ণ করিবার কোনও আয়োজন হয় নাই। এতদিনে এক প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে যাহাতে এই অভাব হয়তো দূর হইতে পারিবে। আপনাদিগকে গভর্ণমেন্টের এ নূতন প্রস্তাব বিশিষ্টভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি:

এ প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনটী আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। প্রস্তাবে একটি নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার কথা হইয়াছে—আপত্তি হইয়াছে যে এ ট্যাক্স দেওয়া উচিত নয়। বর্ত্তমানকালে প্রাথমিক শিক্ষার ভার আছে ডিষ্ট্রিক বোর্ডের হাতে, তাহা প্রস্তাবিত বিধানে জেলা শিক্ষা সমিতির হাতে দিবার কথা হইয়াছে প্রস্তাবিত শিক্ষা সমিতির গঠন সম্বন্ধে।

প্রথমে ট্যাক্সের কথা আলোচনা করিব। সর্ব্বাগ্রে আমি আপনাদের এই কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি যে অবিলম্বে সমস্ত দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার হওয়া প্রজার হিতার্থে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ কাজ করিতে বৎসরে প্রায় দুই কোটী টাকার প্রয়োজন। বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের মোট আয় প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা। গভর্ণমেন্টের ব্যয় বাহুল্য আছে, তাহা সঙ্কোচ করিয়া ইহা হইতে দুই কোটি টাকা পরিমাণ কষ্টেসৃষ্টে বাহির করা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে দুট কথা স্মরণ রাখিবেন। প্রথমতঃ এ ব্যয়সঙ্কোচ আমাদের শত চেষ্টা সত্বেও শীঘ্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেন্টের কোনও কোন দিকে ব্যয় বাহুল্য যতই থাকুক, অনেক দিকে তাঁদের অনেক টাকা খরচ করা দরকার যাহা তাঁহারা করেন না। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বৎসরে দুই চার কোটি টাকা খরচ করিতে পারিলে তবে কতকটা কাজ হইতে পারে। সুতরাং ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া দুই কোটি টাকা উঠাইয়া তারপর, প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করা হইবে, আমাদের ইহাই যদি পণ হয় তবে সে ব্যবস্থা কোন দিনই হইবে না। আর সাড়ে দশ কোটি টাকা রাজস্বের ভিতর যে বহু ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াও ঠিক এত টাকা পাওয়া যাইবে কি না তাহা বিশেষ সন্দেহের কথা।

সুতরাং একটা ট্যাক্স করিয়া টাকা না উঠাইলে প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বব্যাপী করা অসম্ভব। সে ট্যাক্স যদি কোথাও বসাইতে হয় তবে বাঙ্গলা দেশে তাহা জমীর উপর বসান উচিত। ইহার কারণ, আমি সংক্ষেপে বলিব। ভারতের অন্যান্য দেশে গভর্ণমেন্ট প্রতি একর ভূমি হইতে গড়ে ১৷৹ হইতে ১৷৷৵৹ আনা পর্য্যন্ত রাজস্ব পান। বাঙ্গলা দেশের ভূমি হইতে গভর্ণমেন্ট পান প্রতি একরে মাত্র ৷৵৹ আনা। অথবা বাঙ্গলা দেশের ভূমির লাভ অন্যান্য

প্রদেশের চেয়ে বেশী। সুতরাং ভূমির উপস্বত্বের উপর আরও অধিক কর-স্থাপনের যথেষ্ট অবসর আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ সত্যটা যে আমরা সাদা চোখে দেখিতে পাই না তার কারণ এই যে, বাঙ্গলার ভূমির উপর কর-ভার এক স্থির করার যে অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে সেটা জমিদার ও বহু মধ্যস্বত্ববানদের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে।

ভূমির উপর কর-নির্দ্ধারণের অবসর থাকিলেও আমার বিবেচনায় অতিরিক্ত কর যাহা ধার্য্য হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে আসা উচিৎ জমিদার ও মধ্যস্বত্ববানের উপস্বত্ব হইতে সেটেলমেন্ট ও পাবলিক ওয়ার্কস সেসের মত তাহা প্রজা ও মধ্যস্বত্ববানের মধ্যে সমান ভাগাভাগি হওয়া উচিত নয়। ইহার একটা কারণ এই যে মধ্যস্বত্ববানদের এ করের অংশ প্রজার কাছে আদায় করিবার অধিকার দিলেও অনেক স্থলে তাহার ষোল আনাই গিয়া পড়িবে প্রজার উপর। তা' ছাড়া, যদিও বঙ্গদেশে ভূমি হইতে সরকারী রাজস্ব আদায় হয় অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক কম, তবু প্রজা বাঙ্গলার অন্য প্রদেশের প্রজার চেয়ে কম দেয় না। অন্যান্য যে প্রদেশে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত আছে সেখানেও গভর্ণমেন্ট রায়তের কাছে প্রতি একরে ১৸৵০ আনার বেশী কোথাও পান না, অথচ বাঙ্গলা দেশের প্রজা খাজনা দেয়, গড়ে প্রতি একরে ৩৲ টাকা করিয়া। সুতরাং রায়তের উপর কর-ভার এখানে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। কেবল জমীদার ও মধ্যস্বত্ববান, সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনও হিত চেষ্টা না করিয়াও তার মধ্যে গড়ে প্রতি একরে ২।৶০ পরিমাণ আত্মসাৎ করেন। সুতরাং এ নূতন কর তার ষোল আনা পড়া উচিৎ মধ্যস্বত্ববানের এই অনর্জ্জিত লাভের উপর। বাঙ্গলার ভূমি-করের মধ্যে বৎসরে ১৩ কোটি টাকা যায় জমীদার ও মধ্যস্বত্ববানের ঘরে। শিক্ষার জন্য ট্যাক্স করিয়া যে সাময়িক এক কোটি টাকা তুলিবার আয়োজন হইতেছে তাহা অনায়াসে এই ১৩ কোটি টাকার মধ্য হইতে তোলা যাইতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই প্রস্তাবিত করের অর্দ্ধাংশ রায়তের নিকট আদায় করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। রায়তের নিকট জমিদার যে খাজনা আদায় করেন তাহা অতিরিক্ত—আর জমীদারের এ অনর্জ্জিত লাভের পরিমাণ দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। স্বীকার করি যে ১৩ কোটি টাকা হইতে এক কোটি টাকা রাজস্ব দিতে গেলে জমীদার ও মধ্যস্বত্ববানদের গায় লাগিবে, কিন্তু তাঁরা কথায় কথায় গভর্ণমেণ্টকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বলেন, কথায় কথায় চাষীর অমিতব্যয়িতার বক্তৃতা করেন, তাঁরা নিজেরাও হয়তো অনায়াসে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া এই এক কোটি টাকা দিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতে পারেন। বাঙ্গলার রায়ত অমিতব্যয়ী এ কথা আমি স্বীকার করি না। তারা মদ খায় না, রেশমের জামা পরে না, মোটর গাড়ীতে চড়ে না। কিন্তু বাঙ্গলার জমীদার মধ্যস্বত্ববানেরা যে অমিতব্যয়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রস্তাবিত বিধির অন্যান্য যে ব্যবস্থা আছে, তার যথেষ্ট সংশোধনের অবসর আছে। সে বিষয় আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। সে সব বিষয়ে সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু আমার বিবেচনায় মোটের উপর চাষীদিগের পক্ষ হইতে এই ব্যবস্থা আমাদের অভিনন্দন করিয়া লওয়া উচিত। দরিদ্রের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই যে চেষ্টা হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে ইহার তুল্য ব্যাপক ও যথেষ্ট আয়োজন কখনও করা হয় নাই।

মাত্র কয়েকটি বিষয় আমি আলোচনা করিলাম। এইরূপ আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। প্রজার মঙ্গলের জন্য একটা বিরাট একনিষ্ঠ চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছে। একদিকে সে চেষ্টা করিতে হইবে গভর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, অপর দিকে সে চেষ্টা আমাদের নিজেদের কার্য্যের দ্বারা করিতে হইবে। আর ঘুমাইবার অবসর নাই, আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকার যত কমই হউক, গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়া বা না করাইয়া কাজ করাইবার অনেকটা ক্ষমতা ইহার আছে। আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে এ ক্ষমতা প্রজার স্বার্থের প্রতিকূলে না হইয়া তাদের স্বার্থের অনুকূলে নিয়োজিত হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার যাহা গঠন তাহাতে ধনী ও জমীদারের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। কিন্তু তবু আমাদের যেটুকু প্রভাব-বিস্তারের অবসর আছে তাহা আমাদের প্রযুক্ত করিবার সকল চেষ্টা করা আবশ্যক। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের কাল নিকট হইয়া আসিয়াছে। এ অবসর যেন আমরা হেলায় না হারাই। বাঙ্গলার প্রজাগণ যদি স্থির করিতে পারে যে তাদের অনুকূল সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে, তবে আগামী ব্যবস্থাপক সভার আমলে বাঙ্গলার প্রজার স্বার্থ বহু পরিমাণে অগ্রসর হইয়া যাইবে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অবিলম্বে বিপুল চেষ্টা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করিতে হইবে আমাদের নিজের চেষ্টায় যাহা সম্ভব তাহা একান্ত ভাবে অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত অনুশীলন।

বাঙ্গলার কৃষক, বঙ্গমাতার অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত সন্তান—অন্নদাতা ধনদাতা তোমরা এ দেশের। তোমার শ্রমে ধনী হইয়া বঙ্গবাসী অভিজাত সম্প্রদায় তোমাদের কি চিরদিন লাঞ্ছিত পদানত করিয়া রাখিবে? চিরদিন তোমাদের বিধিদত্ত অধিকার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, কাড়িয়া রাখিবে তোমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভের অধিকার? ভাঙ্গিবে না কি তোমাদের এ ঘুমঘোর? জাগিয়া উঠিবে না তোমরা? দাসত্ব পরিহার করিয়া তোমাদের অন্তরে প্রসুপ্ত বিচ্ছিন্ন যে বিরাট শক্তি আছে, তাহা তোমাদের প্রতি শিরার ভিতর জাগ্রত করিয়া তুলিবে না? আপনার শক্তি অন্তরে অনুভব করিয়া মাথা খাড়া করিয়া বলিবে না তোমরা যে আমরা মানুষ—মনুষ্যত্বের সকল অধিকার চাই—আমাদের জন্মাধিকার চাই? দীন, পরাধীন হইয়া আমরা থাকিব না, ক্ষুধিত পিপাসিত অজ্ঞান তিমিরাবৃত হইয়া আমরা রহিব না। বঙ্গমাতার সন্তান আমরা মাতৃস্তন্যে যে অফুরাণ অমৃতের ধারা বহিতেছে তার সমান অংশ আমরা চাই। ভগবান আমাদেরকে মনুষ্যত্বের যে বিজয়টীকা দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা সার্থক করিতে চাই।

শ্রমিক আমরা, শ্রমের পুরস্কার আমরা লইব, প্রাচীন সংস্কারের দোহাই মানিব না, চিরাগত অধিকারের খাতিরে অন্যায়ে আর মাথা নোয়াইব না। আমাদের জন্মাধিকারের ক্ষুদ্র কণা প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ধন্য হইব না।

মাথা তুলিয়া বাঙ্গলার কৃষক যেদিন তাদের এই সকল দাবী জোর করিয়া বলিতে পারিবে—সেদিন জগৎপিতা তাহাদের মস্তকে অকৃপণ হইয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন, বঙ্গমাতা দুই হাতে তাহাদিগকে সৌভাগ্য বিতরণ করিবেন।

সেদিন আসিবে—তার আগমনবার্ত্তার প্রথম নিঃশ্বাসে আজ আমরা বাঙ্গলার সেই বৃহৎ শক্তির অগ্রদূত, তার প্রেরণা আমাদের অন্তরে অনুভব করিতেছি, তার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া চলিয়াছি। তাই আমরা নির্ভয়—পরাজয়ে আমরা অকুণ্ঠিত, প্রতিজ্ঞায় আমরা অটল। বাঙ্গলার কৃষককে তার জন্মাধিকারের স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে আমরা কৃতসঙ্কল্প। পরাজিত আমরা হইবনা, কোনও লাঞ্ছনায় আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিতে পারিবে না। ক্ষান্ত হইব না আমরা যাবৎ আমাদের লক্ষ্য লাভ না হয়, দরিদ্রের ভগবান আমাদের এই প্রতিজ্ঞা সাফল্যে মণ্ডিত করুন।



চীন-রাষ্ট্র-গুরু ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেন।

চীনের নবজন্ম।

(শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এস, সি ও শ্রীসুরেশ বিশ্বাস. বি, এ)

গোড়ার কথা

এসিয়ার দুইটী প্রাচীন দেশ চীন ও ভারত; এক একটীকে এক একটি মহাদেশ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, অর্দ্ধ মহাদেশ ত বটেই। এই দুইটি দেশ যেমনি প্রাচীন তেমনি এদের মধ্যে সামঞ্জস্যও খুব বেশী। উভয়ের অতীত গৌরবময়, গ্রীক্ যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, রোমের নাম যখন কেহ শোনে নাই, তখন এই দুইটী দেশের ধর্ম্ম, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কলা-কৌশল, আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান, কৃষি এবং অন্যান্য শিল্প—তসর রেশম ইত্যাদি সত্য জগত সমক্ষে গর্ব্ব করিবার মত ছিল। মোহেঞ্জো তখন মোহ ঘুমাচ্ছন্ন, সোলোমনের মন্দির তখন নির্ম্মিত হয় নাই।

উভয় দেশেই বৃহৎ আয়তন, বহু লোকসংখ্যা, জাতি ও বর্ণ-বৈষম্য ভৌগোলিক আকৃতি প্রভৃতি সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণও দুইটী দেশের উপর বারবার দৌরাত্ম্য করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া জাতির পর জাতি, একের পর আর এই উভয় দেশকে অধিকার-ভুক্ত করিয়াছে; সম্প্রতি চীন মাঞ্চু জাতির পরাধীনতা-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে। অদৃষ্টের পরিহাসে আজও ভারত "সাম্রাজ্যবাদ" (Imprialsm)-পঙ্কে জড়িত; বিদেশী আমলাতন্ত্রের পদনিষ্পেষণে আর্ত্তনাদ করিতেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দুইটি দেশ এই ফলভোগ করিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি তাহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইল। এই এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হইল বিশেষ করিয়া তাহাই বুঝিবার জন্য চীনের নবজন্মের ইতিহাস ও তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মবীর ডাঃ সান্‌ইয়েৎসেনের কাহিনী প্রত্যেক দেশভক্তেরই জানা দরকার। এ স্থলে এ কথাও উল্লেখ করিয়া রাখা ভাল যে ডাঃ সান-ইয়েৎসেন যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই নীতি ভারতবর্ষের পক্ষেও প্রযুজ্য কিনা তাহাও আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে "যুক্ত এসিয়ার" কথা উঠিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বকবি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন যে এসিয়ার বাণী জগতকে শুনাইতে হইবে। এই জন্যই আজ এসিয়ার মধ্যস্থিত একটি দেশ কি করিয়া চির পরাধীনতা পাশ হেলায় উন্মোচন করিল, কোন অগ্নিমন্ত্রের শক্তি বলে বলীয়ান হইয়া অসাধ্য সাধন করিল তাহার কাহিনী আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ এই চিরপরাধীন ভারতবাসীর। যুরোপ আমেরিকার স্বাধীনতার কাহিনী মাট্‌সীনি লেনিন ওয়াসিংটনের বিবরণ জানিবার পূর্ব্বে চিরসঙ্গী চীনের স্বাধীনতার ইতিহাস-পাঠের মূল্য ভারতবাসীর পক্ষে অনেক বেশী।

য়ুরোপ আমেরিকা ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, অথচ চীন ও ভারতের অবস্থা চিরকালই একরূপ ছিল।

বাল্য ও যৌবন

নব্য চীন-স্রষ্টা চীন-স্বাধীনতার মহাঋত্বিক ডাঃ সান্‌ইয়েৎসান ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'ক্যানটাপ' ও 'ম্যাকাও'র মধ্যবর্ত্তী কোয়াংটাং প্রদেশের অন্তর্গত একটি দূর পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হংকং হইতে এই গ্রামটী ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী, উহা পর্ত্তুগীজ অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার পিতৃদেব খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রচারক ছিলেন। ঐ মিশনের একটী ইংরেজ মহিলার নিকট বাল্যে ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া তরুণ সান্ ইংরাজীতে বেশ দক্ষ হইয়া উঠেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি ক্যান্টনের অ্যাংলো আমেরিকান মিশন হাসপাতালের সংস্রবে আসেন। তখন ডাঃ কার ঐ হাসপাতালের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার বেশ নামযশ ছিল। তরুণ সানের ডাক্তারী ও অস্ত্র-বিদ্যা খুব ভাল লাগিত। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হংকংএ ডাক্তারী পড়িতে আসেন। তখন ঐ কলেজটি সবে মাত্র খোলা হইয়াছে,—বর্ত্তমানে তাহা হংকং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পড়িয়া তিনি ডাক্তারী ও অস্ত্র পরিচালনা করিবার ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। তিনিই ঐ কলেজের সর্ব্ব প্রথম গ্রাজুয়েট, ইহার অত্যল্প কাল মধ্যেই ম্যাকোয়াতে সানা ডাক্তারী করিতে সুরু করেন।

সংগ্রাম

ম্যাকিয়োতে সান সর্ব্বপ্রথম "তরুণ চীন সঙ্ঘের" কথা শুনিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাকে ম্যাকিয়া ছাড়িয়া যাইতে হইল। পর্ত্তুগীজদের আইন অনুসারে পর্ত্তুগীজ ডিপ্লোমাধারী ছাড়া অন্য কেহ আইনতঃ সেখানে ডাক্তারী করিতে পারিত না। এই নিয়মানুসারে তাঁহাকে ক্যানটেনে যাইতে হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সানইয়েৎসান ক্যানটেনে একটি দলে যোগদান করেন—তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল মঞ্চু গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন বা উচ্ছেদ-সাধন। প্রায় ১৮ জন শক্তিশালী কর্ম্মী সেই দলে ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মঞ্চু গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস-রূপ মহাকাব্য সাধিত হয়। এই বিপ্লবমূলক ভাবসংক্রমণের কিছুকাল পরেই ১৮ জনের মধ্যে ১৭ জনের শিরশ্ছেদ করা হয়। একমাত্র ডাঃ সান্‌ইয়েৎসান চীনে বিপ্লববাদ প্রচার করিবার জন্য অবশিষ্ট রহিলেন। ১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মঞ্চু-সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হয় এবং সানইয়েৎ সানের উদ্দেশ্য ও জীবনব্যাপী সাধনা সফল হয়।

ক্যান্টোনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এইরূপ চেষ্টা চলিতেছিল যাহাতে সান ও তাঁহার সহযোগী কর্ম্মীগণ নগর ও বারুদখানা দখল করিতে পারে কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সান্ ব্যতীত তাঁহার সমস্ত উৎসাহী কর্ম্মীবৃন্দের শিরশ্ছেদ করা হইল। একা সান্ প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। হংকংএ ডাঃ ক্যাণ্টলী নাম একজন ইংরেজ ডাক্তারের গৃহে আসিয়া আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার কয়েক দিন পরেই হনলুলুতে যাইয়া আশ্রয় লন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে সানইয়েৎসান লণ্ডনে আসেন এবং তথায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়; তাঁহাকে দশ দিনের জন্য চীনদূতাবাসে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তখনকার ইংলণ্ডের প্রীমিয়ার লর্ড সেলিসবারী মধ্যস্থ হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। [এই কৌতুকাবহ ঘটনাটি Arrowssmith এর লেখা ঘটনাটি Kidnapped in London পুস্তকে যথাযথভাবে বিবৃত হইয়াছে। সেখান হইতে মুক্ত হইয়া সান কিছুদিনের জন্য ডাঃ ক্যানটেলের বাড়ীতে ছিলেন; তাহার পরেই আবার দূর প্রাচ্য তাহাকে আহ্বান করে।

বিপদ কিম্বা বিফলতা কিছুই তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন-পথের অন্তরায় হইতে পারিত না। সেইজন্য এইভাবে কোনমতে পলাইয়া বাঁচা, এই যে জীবনে সর্ব্বপ্রথম ধাক্কা ইহাও তাঁহার সাধন-পথের অন্তরায় হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত মন্ত্রস্তোর বলপ্রদান করিল।

জাপানে তিনি একটি আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির করেন। এবং তাহার পর নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন। তিনি চীনের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন। ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেণ্টস্ মালয় উপদ্বীপ, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ এবং যেখানে যেখানে চীনেরা উন্নতি স্থাপন করিয়াছে সেইখানে সেইখানে সেইখানে যাইয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন এবং এবং যাহাতে তাহারা অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারে সেইজন্য যথারূপ শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য দিকে দিকে নব নব ভাববাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রচার কার্য্য

তিনি অহিংসা বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। অহিংসাদ্বারা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। যাহাতে শান্তি-প্রণোদিত বৈধ উপায় অবলম্বনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারই প্রকৃষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে জনসাধারণের সম্পূর্ণ উদাসীন সেই উদাসীনতারূপ শত্রুকে তিনি নিষ্পেষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের অভাব অভিযোগ সহস্রবিধ কিন্তু সর্ব্বপ্রধান অভাব প্রকাশ করিবার অযথা ভীতি। যাহাতে চীনদেশবাসী দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করিতে পারে সেই নিমিত্ত তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যথাশক্তি চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ছদ্মবেশে পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। চীন সাগরে প্রবাহিত সুবৃহৎ ওয়াংসিকিয়া নদীর মুখ হইতে তিব্বতের সীমান্তে জেবু পর্য্যন্ত পল্লীতে পল্লীতে নব যুগের বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পালনদের তীরে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য লোক সমাগম হয় তিনি নানাস্থানে



চীন-রাষ্ট্র-গুরু ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেন।

চীনের নবজন্ম।

(শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এস, সি ও শ্রীসুরেশ বিশ্বাস. বি, এ)

গোড়ার কথা

এসিয়ার দুইটী প্রচীন দেশ চীন ও ভারত; এক একটীকে এক একটি মহাদেশ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, অর্দ্ধ মহাদেশ ত বটেই। এই দুইটি দেশ যেমনি প্রাচীন তেমনি এদের মধ্যে সামঞ্জস্যও খুব বেশী। উভয়ের অতীত গৌরবময়, গ্রীক্ যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, রোমের নাম যখন কেহ শোনে নাই, তখন এই দুইটী দেশের ধর্ম্ম, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কলা-কৌশল, আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান, কৃষি এবং অন্যান্য শিল্প—ভদ্র সমাজ ইত্যাদি সব, জগত সমক্ষে গর্ব্ব করিবার মত ছিল। মোশেস তখন মোহ-সুপ্ত ছিল, সোলোমনের মন্দির তখন নির্ম্মিত হয় নাই।

উভয় দেশেই বৃহৎ আয়তন, বহু লোকসংখ্যা, জাতি ও বর্ণ-বৈষম্য ভৌগোলিক আকৃতি প্রভৃতি সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণও দুইটী দেশের উপর বারবার দৌরাত্ম্য করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া জাতির পর জাতি, একের পর আর এই উভয় দেশকে অধিকার-ভুক্ত করিয়াছে; সম্প্রতি চীন মাঞ্চু জাতির পরাধীনতা-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছে, কিন্তু ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে। অদৃষ্টের পরিহাসে আজও ভারত "সাম্রাজ্যবাদ" (Imprialsm)-পঙ্কে জড়িত; বিদেশী আমলাতন্ত্রের পদনিষ্পেষণে আর্ত্তনাদ করিতেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দুইটি দেশ এই ফলভোগ করিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি তাহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইল। এই এক সমস্যায় পৃথক ফল কেন হইল বিশেষ করিয়া তাহাই বুঝিবার জন্য চীনের নবজন্মের ইতিহাস ও তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মবীর ডাঃ সান্-ইয়াৎসেনের কাহিনী প্রত্যেক দেশভক্তেরই জানা দরকার। এস্থলে এ কথাও উল্লেখ করিয়া রাখা ভাল যে ডাঃ সান-ইয়েৎসেন যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই নীতি ভারতবর্ষের পক্ষেও প্রযুজ্য কি না তাহাও আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে "যুক্ত এসিয়ার" কথা উঠিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বকবি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন যে এসিয়ার বাণী জগতকে শুনাইতে হইবে। এই জন্যই আজ এসিয়ার মধ্যস্থিত একটি দেশ কি করিয়া চির পরাধীনতা পাশ হেলায় উন্মোচন করিল, কোন অপরাজেয় শক্তি বলে বলীয়ান হইয়া অসাধ্য সাধন করিল তাহার কাহিনী আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ এই চিরপরাধীন ভারতবাসীর। য়ুরোপ আমেরিকার স্বাধীনতার কাহিনী ম্যাটসীনি লেনিন ওয়াসিংটনের বিবরণ জানিবার পূর্ব্বে চিরসঙ্গী চীনের স্বাধীনতার ইতিহাস-পাঠের মূল্য ভারতবাসীর পক্ষে অনেক বেশী।

য়ুরোপ আমেরিকা ভিন্ন ভিন্ন আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, অপিচ চীন ও ভারতের অবস্থা চিরকালই একরূপ ছিল।

বাল্য ও যৌবন

নয়া চীন-স্রষ্টা চীন-জাতীয়তার মহাকবি ডাঃ সান্‌ইয়েৎসান ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'ক্যানটাপ' ও 'ম্যাকাও'র মধ্যবর্তী কোয়াংটাং প্রদেশের অন্তর্গত একটি দূর পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হংকং হইতে এই গ্রামটী ৩০ মাইল দূরবর্তী, উহা পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার পিতৃদেব খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রচারক ছিলেন। ঐ মিশনের একটী ইংরেজ-মহিলার নিকট বাল্যে ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া তরুণ সান্‌ ইংরাজীতে বেশ দক্ষ হইয়া উঠেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি ক্যান্টনের অ্যাংলো আমেরিকান মিশন হাসপাতালের সংস্রবে আসেন। তখন ডাঃ কার ঐ হাসপাতালের কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁহার বেশ নামযশ ছিল। তরুণ সানের ডাক্তারী ও অস্ত্র-বিদ্যা খুব ভাল লাগিত। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হংকংএ ডাক্তারী পড়িতে আসেন। তখন ঐ কলেজটি সবে মাত্র খোলা হইয়াছে,—বর্তমানে তাহা হংকং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পড়িয়া তিনি ডাক্তারী ও অস্ত্র পরিচালনা করিবার ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। তিনিই ঐ কলেজের সর্ব প্রথম গ্রাজুয়েট, ইহার অত্যল্প কাল মধ্যেই ম্যাকোয়াতে সানা ডাক্তারী করিতে সুরু করেন।

সংগ্রাম

ম্যাকিয়েতে সান সর্বপ্রথম "তরুণ চীন সঙ্ঘের" কথা শুনিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাকে ম্যাকিয়া ছাড়িয়া যাইতে হইল। পর্তুগীজদের আইন অনুসারে পর্তুগীজ ডিপ্লোমাধারী ছাড়া অন্য কেহ আইনতঃ সেখানে ডাক্তারী করিতে পারিত না। এই নিয়মানুসারে তাঁহাকে ক্যানটেনে যাইতে হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সানইয়েৎসান ক্যানটেনে একটি দলে যোগদান করেন—তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল মঞ্চু গভর্ণমেন্টের পরিবর্তন বা উচ্ছেদ-সাধন। প্রায় ১৮ জন শক্তিশালী কর্মী সেই দলে ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মঞ্চু গভর্ণমেন্ট ধ্বংস-রূপ মহাকার্য সাধিত হয়। এই বিপ্লবমূলক ভাবসংক্রমণের কিছুকাল পরেই ১৮ জনের মধ্যে ১৭ জনের শিরশ্ছেদ করা হয়। একমাত্র ডাঃ সান্‌ইয়েৎসান চীনে বিপ্লববাদ প্রচার করিবার জন্য অবশিষ্ট রহিলেন। ১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মঞ্চু-সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হয় এবং সানইয়েৎ সানের উদ্দেশ্য ও জীবনব্যাপী সাধনা সফল হয়।

ক্যান্টোনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এইরূপ চেষ্টা চলিতেছিল যাহাতে সান ও তাঁহার সহযোগী কর্মীগণ নগর ও বারুদখানা দখল করিতে পারে কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সান্‌ ব্যতীত তাঁহার সমস্ত উৎসাহী কর্মীবৃন্দের শিরশ্ছেদ করা হইল। একা সান্‌ প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। হংকংএ ডাঃ ক্যান্টনী নাম একজন ইংরেজ ডাক্তারের গৃহে আসিয়া আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার কয়েক দিন পরেই হনলুলুতে যাইয়া আশ্রয় লন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে সানইয়েৎসান লণ্ডনে আসেন এবং তথায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়; তাঁহাকে দশ দিনের জন্য চীনদূতাবাসে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তখনকার ইংলণ্ডের প্রাইমমিনিষ্টার লর্ড সেলিসবারী মধ্যস্থ হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। [এই কৌতুকাবহ ঘটনাটি Arrowssmith এর লেখা ঘটনাটি Kidnapped in London পুস্তকে যথাযথভাবে বিবৃত হইয়াছে। সেখান হইতে মুক্ত হইয়া সান কিছুদিনের জন্য ডাঃ ক্যানটেলের বাড়ীতে ছিলেন; তাহার পরেই আবার দূর প্রাচ্য তাহাকে আহ্বান করে।

বিপদ কিম্বা বিফলতা কিছুই তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন-পথের অন্তরায় হইতে পারিত না। সেইজন্য এইভাবে কোনমতে পলাইয়া বাঁচা, এই যে জীবনে সমপ্রথম ধাক্কা ইহারা তাঁহার সাধন-পথের অন্তরায় হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত মত্তহস্তীর বলপ্রদান করিল।

জাপানে তিনি একটি আশ্রয় খুঁজিয়া বাহির করেন। এবং তাহার পর নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন। তিনি চীনের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন। ষ্ট্রেট্‌স্‌ সেটেলমেণ্ট্‌স্‌ মালয় উপদ্বীপ, য়ুনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ এবং যেখানে যেখানে চীনেরা উন্নতি স্থাপন করিয়াছে সেইখানে সেইখানে সেইখানে যাইয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন এবং এবং যাহাতে তাহারা অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারে সেইজন্য যথারূপ শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য দিকে দিকে নব নব ভাববাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রচার কার্য্য

তিনি অহিংসা বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। অহিংসাদ্বারা রাজনৈতিক পরিবর্তনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। যাহাতে শান্তি-প্রণোদিত বৈধ উপায় অবলম্বনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারই প্রকৃষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে জনসাধারণের সম্পূর্ণ উদাসীন সেই উদাসীনতারূপ শত্রুকে তিনি নিষ্পেষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের অভাব অভিযোগ সহস্রবিধ কিন্তু সর্বপ্রধান অভাব প্রকাশ করিবার অযথা ভীতি। যাহাতে চীনদেশবাসী দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করিতে পারে সেই নিমিত্ত তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যথাশক্তি চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ছদ্মবেশে পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। চীন সাগরে প্রবাহিত সুবৃহৎ ওয়াংসিকিয়া নদীর মুখ হইতে তিব্বতের সীমান্তে জেবু পর্য্যন্ত পল্লীতে পল্লীতে নব যুগের বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাল নদের তীরে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য লোক সমাগম হয় তিনি নানাস্থানে

কার্য্যকরী শক্তি সম্পন্ন কেন্দ্র সংস্থাপন করেন—এবং সমগ্র কোয়াংসীতে অসংখ্য কার্য্যদক্ষ উৎসাহী অনুচরবৃন্দ সংগ্রহ করিলেন। মালয় উপদ্বীপ ও ষ্টেট সেটেলমেণ্টে যাইয়া শুধু প্রবাসী নহে তাঁহাদের প্রভুদের পর্য্যন্ত তাহার অনুগত করিয়া তুলিলেন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পেনাং ও সিঙ্গাপুরে ধনী বণিকের প্রভূত অর্থ দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন।

য়ুরোপীয় লেখকগণ তাঁহাকে যেমন একজন জনপ্রিয় বক্তা হিসাবে বড় বলেন তিনি শুধু তাহাই ছিলেন না। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে একজন প্রসিদ্ধ এই লেখক একটি বক্তৃতার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি ডাঃ সানইৎসানকে সেই বক্তৃতাটি দিতে শুনিয়াছিলেন।......

দীর্ঘ তিনঘণ্টাব্যাপী তিনি স্থির গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করিলেন। কোন সময়ের জন্য উপস্থিত হইয়া হৃদয়গ্রাহী আবেদন লইয়া বেশী চীৎকার করিলেন না, একবারও সিদ্ধান্তগুলি অকাট্য প্রমাণ করিবার জন্য হস্তোত্তলন করিলেন না। সাদাসিদে ভাবে ধর্ম্মোপদেশের মত বলিয়া চলিলেন তাঁহার শ্রোতৃবর্গও করতালি প্রদান করিয়া সম্মতি প্রদান করিল না; অথচ অসম্মতিরও কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। যেন একটি মন্ত্রমুগ্ধ পরিষৎ যুগ যুগ ধরিয়া বঞ্চিত, অনাস্বাদিত রসধারাসিক্ত সুপূর্ব্ব মহিমাময় বাণী—চিরদিনের দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচনের বাণী—তাহারা স্থির হইয়া শুনিল।...এ দাসত্বের সহিত মধ্যযুগের পশ্চিম য়ুরোপের পরাধীনতার তুলনা করিলে মনে হয় যে তাহা স্বাধীনতার নামান্তর মাত্র। [Dr. Canthine's Book—Sun Yet Sun and the Awakening of China.

বারবার পলায়ন

পূর্ব্ববর্ত্তি প্রথম পলায়ন ম্যাকাওতে প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়া ক্যানটোনে আসিবার পরেই সংঘটিত হয়। তাহার দ্বিতীয়বার পলায়ন আরও বিপদজনক। বহু দিনযাবৎ স্বাটেউ সহরে বিপ্লব কার্য্য পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হইয়াছিল সান ইৎসেসান স্বাটেউতে যাইয়া স্থানীয় বিপ্লববাদীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহারা তাঁহাকে ক্যানটোন অবরোধ করিতে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়। বন্দুক, পিস্তল গোলাবারুদ এবং এমন কি ডিনামাইট পর্য্যন্ত সম্ভব এবং অসম্ভব নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইল। লোক সংগ্রহের নিমিত্ত একজন কর্ম্মীকে হংকংএ পাঠান হইল সে সেখান হইতে লোক সংগ্রহ ও অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিবে।

ইতিমধ্যে স্বাটোতে যে এইরূপ দল সৃষ্টি হইয়াছে এ খবর কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়। সেইজন্য হংকংএ এই মর্ম্মে তার পাঠান হইল যে সৈন্যাদি প্রেরণা বন্ধ করিয়া দেও। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সৈন্যাধ্যক্ষ টেলিগ্রামটি পাইয়া ভুল অর্থ করেন। তিনি ৪০০ শত সৈন্য এবং পিস্তল-ভরা অনেকগুলি ব্যারেল ক্যানটোনে পাঠাইয়া দেন। ফলে এই হইল যে ক্যানটোনে পৌছিয়া তাহারা দলশুদ্ধ ধরা পড়ে। সেইজন্য ক্যানটোনের মধ্য সংস্কার সমিতি (Central Reform Committee) সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র [illegible] হইয়া যায়, [illegible] কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা হইল—সদস্য [illegible] এবং সহর হইতে কর্ম্মিগণ পলাইয়া বাঁচিল।

সান্‌-ইয়াৎ-সান তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে [illegible] এবং রাত্রিবেলা নগরের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া নগরের [illegible] খালের পার ধরিয়া বরাবর চলিতে আরম্ভ করিলেন। [illegible] খালের ভিতর দিয়া ছোট নৌকা [illegible] এবং যখন সৈন্যগণ [illegible] অন্বেষণ করিতে নৌকায় আসিতেছিল তখন [illegible] খালের [illegible] দিয়া চলিয়া অবশেষে ম্যাকাওতে পৌঁছিলেন। কিন্তু [illegible] সেস্থান ও বিপদজনক মনে করিয়া হংকং যাত্রা করিলেন। [illegible] হইতে হনলুলু এবং সেখান হইতে আমেরিকার পথে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।......

অনিবার্য্য মৃত্যুর হস্ত হইতেও তিনি অনেকবার রক্ষা পাইয়াছেন।

তিনি যখন চীনের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিয়া নৌকায় নৌকায় বেড়াইতেন। সেবার নানকিংএ তিনি এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন—একদিন তিনি বসিয়া আছেন এমন সময় একজন লোক তাঁহার কামরার ভিতর ঢুকিয়া বলিল যে তাঁহাকে [illegible] করিবে। সান তাহার সহিত শান্তভাবে আলাপ করিতে আরম্ভ করিতে আরম্ভ করেন—এবং তাঁহার বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সে এতই অভিভূত হইয়া পড়ে যে সানের চরণ তলে পড়িয়া সে লোকটি নিজকৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা করে।...

এই সানের স্বরূপমূর্ত্তি—চীন রাষ্ট্রীয় জগতে তিনি বাস্তবিকই সূর্য্য সদৃশ।

তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব—চুম্বকের মত অন্যকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিত। প্রতিকার্য্যে তাঁহার স্বচ্ছ সাধু উদ্দেশ্য, নিস্বার্থ স্বাদেশিকতার মধ্যে এমনি যাদু ছিল যে বিপক্ষীয়েরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত, গুপ্তহত্যাকারীর অস্ত্র বন্ধুর রক্ষাবর্ম্মে পরিণত হইত—বিশ্বাসঘাতক পরম বিশ্বাসী ভৃত্য হইয়া পড়িত।

যখন তিনি ক্যানটোনে ছিলেন, তখন আর একবার তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। সরকারী একদল সৈন্য তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য তাঁহার গৃহে একদিন অপরাহ্নে প্রবেশ করে। সান্‌ তাহাদের সান্নিধ্য জানিতে পারিয়া টেবিল হইতে "কনফুসিয়ানিজমের" একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া চীনের কনফুসিয়াস সন্ন্যাসীর মত উচ্চৈস্বরে পড়িতে আরম্ভ করেন। যাহারা বন্দী করিতে আসিয়াছিল তাঁহারা মনোযোগ করিয়া শুনিতে লাগিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সে স্থান ত্যাগ করিল। এই স্থানেও তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিই পরিলক্ষিত হয়। যে সকল সামরিক সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী করিতে আসিয়াছিল তাহারাই এই অসাধারণ মানুষটির আকর্ষণী শক্তি বলে বন্দী হইয়া গেল।

ম্যাকাওতে তরুণ চীনসঙ্ঘে যোগদানের পর হইতে জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সান ইয়াৎ সান ১৮৯৭ খৃঃ

হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপী জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে এইরূপে মৃত্যুর নিঃশ্বাস অনুভব করিয়াছেন।

একাধিক বার ভাড়া করা গুপ্ত ঘাতকেরা তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে; মাঞ্চু সরকারের তীব্র ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন কুকুর স্বভাবের গুপ্তচরগণ তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় প্রায় প্রতি দেশে অনুসরণ করিয়াছে। সরকার হইতে তাঁহার মস্তকের জন্য একটা মোটা রকমের পুরস্কার ঘোষণা করাও হইয়াছিল।......

মৃত্যুর পরপারে আজ তিনি সমস্ত প্রচেষ্টার বহুদূরে বাস করিতেছেন।

তাঁহার শক্তির গুপ্ত রহস্য।

এই স্থানে আপনা হইতেই প্রশ্ন উদিত হয় যে দারিদ্র, সহায়হীন, অপরিচিত একক সান-ইয়েৎ সান কি করিয়া অগণিত নিদ্রিত চীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাঁহাকে তাহারা কেন সম্মান দেখাইত, কেন তাঁহাকে চীনের সর্ব্ব প্রথম গণতন্ত্রের সভাপতি বলিয়া অভিহিত করা হয়?

উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা খুব বেশী শক্ত নয়। আর্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত, দুঃখার্ত্তদের সহিত একত্র জীবন যাপন, বিশেষ করিয়া তাহাদেরই একজন ছিলেন বলিয়া, জাতীয় জীবনের প্রতিস্পন্দন তাঁহার বুকে ধ্বনিত হইত এবং এই জন্যই মরণের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধ্বংশকেই আহ্বান করিয়া আনিতে তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ জগতের যে কোন অংশে তাঁহার জীবন নিরাপদ ছিল না, তিনি জীবনের প্রাতদিন এবং সত্য বলিতে কি প্রতি মুহূর্ত্ত মাঞ্চুগভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের চিন্তা করিয়াছেন এবং কি করিয়া চীনের অভাব-অভিযোগ-অনুযায়ী গণতন্ত্র সংস্থাপন করিতে পারেন তাহাই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ছিল। তিনি পদব্রজে চীনের অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং দূর অজ্ঞাত পল্লীতে প্রবেশ করিয়া জনবল সংগ্রহ করিয়াছেন। ছদ্মবেশে বিপ্লবকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমগ্র চীনকে বিপ্লবী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি প্রায় প্রতি সহরে সহকর্ম্মী প্রেরণ করেন। চীনের অগণিত জনবল সংগ্রহ করিয়া তিনি জগতের সমগ্র দেশে যেখানে যেখানে তাঁহার স্বদেশবাসী চীনেরা বাস করে সেই সমস্ত স্থানেই কর্ম্মী পাঠান। এইরূপে জাপান হনলুলু, আমেরিকা, মালয় উপদ্বীপ, ষ্ট্রেট্‌ সেটেলমেণ্ট সর্ব্বত্র তাঁহার দূত প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি অনেকবার য়ুরোপে গিয়াছেন—গোলাবারুদ ক্রয় করিয়া সরকারের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখেই তাহা প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি প্রায় প্রত্যেক য়ুরোপীয় রাজদূতাবাসে যাইয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন—এবং যখন চীন মুক্তি সংগ্রামে নিযুক্ত হইবে তখন যেন তাহারা নপুংসকবৃত্তি অবলম্বন করেন—প্রত্যেক রাজদূতকে এই মন্ত্রে জপাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

[মূল প্রবন্ধ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪এর Forword এ ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল ইহা তাহারই অনুবাদ।]......

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

বাৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	৸৹
প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম	৭৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৩৷৹
মলাট—১ম পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷৹
অর্দ্ধ কলম	৭৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৷৹
" ২য় পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৲
" প্রতি কলম	৯৷৹
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৮৷৹
" ৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য	
" ৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷৹
প্রতি কলম	১১৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	২১৷৹

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵৹।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পাঁচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সী দেওয়া হইবে না; ও প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ হিসাব সহ বিক্রয়লব্ধ জমার টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় ও মণিঅর্ডার কমিশন লাঙল আফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যায় শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেন্টগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

৬। নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

পত্রিকার মূল্য—

বাৎসরিক	৩৲ টাকা,	ভিঃ পিঃ	৩৷৹
ষাণ্মাসিক	১৸৵৹	"	১৸৵৹
প্রতিসংখ্যা	এক আনা		

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র

৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে বার্ষিক ৩ টাকা,
ভিঃ পিঃ ৩৷৹
" " ষাণ্মাসিক ১৸৵৹ আনা
ভিঃ, পি, ১৸৵ "
বিদেশে বার্ষিক মূল্য ৬ শিলিং

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র :—
৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

Reg. No. C 1389.



প্রধান পরিচালক
নজরুল ইসলাম

নগদ মূল্য এক আনা
বার্ষিক মূল্য
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
বিদেশে ৬ শিলিং

সম্পাদক
শ্রীমণিভূষণ
মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

প্রথম খণ্ড } বৃহস্পতিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২, ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ { নবম সংখ্যা

এই সংখ্যায়
নজরুল ইসলামের
শ্রমিকদের গান



লাঙল

[বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | বৃহস্পতিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২ | ৯ম সংখ্যা

শ্রমিকের গান

[নজরুল ইসলাম]

—:•:—

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল্।
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
পাহাড় ট'লে তুষার গ'লে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে।
মোরা সিন্ধু ম'থে এনে সুধা
পাইনা ক্ষুধায় বিন্দু জল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলিরে।
আজ মানব-কুলের কালি মেখে
আমরা কালো কুলির দল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

আমরা পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে খনি
আনি ফণীর মাথার মণি
তাই পেয়ে সব শনি হল ধনী রে।
এবার ফণি-মনসার নাগ-নাগিনী
আয়রে গর্জ্জে মার ছোবল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

যত শ্রমিক শু'ষে নিঙ্‌ড়ে প্রজা
রাজা উজির মার্‌ছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দল্‌বি রে আয় মজুর দল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই মোদের বলে হ'তেছে পার,
হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার,
সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে।
তবু মোরাই জনম চল্‌ছি ঠেলে
ক্লেশ-পাথারের সাঁতার জল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল

আজ ছ'মাসের পথ ছ'দিনে যায়
কামান গোলা রাজার সিপাই
মোদের শ্রমে মোদেরি সে কৃপায় রে।
ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে উড়ে
ঐ ভুঁড়োদের উড়োকল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই দালান বাড়ী আমরা গড়ে
রইনু জনম ধূলায় পড়ে,
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে!
আমরা চিনির বলদ চিনিনে স্বাদ
চিনি বওয়াই সার কেবল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্‌দিকে জ্বেলে রে!
এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাটা
ময়লা কুলির সেই অনল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি
আমরা যু'টে কল্-খালাসি।
ডুব্‌লে তরী মোরাই তুল্‌তে আসিরে।
আমরা বলির মতন দান করে সব
পেলাম শেষে পাতাল-তল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকেরে!
আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জ্জাবে তাই দল-মাদল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল

ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয়রে ধ্বংস-সাথী।
ধর হাথিয়ার, সামনে প্রলয় রাতিরে।
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার নায়ে চড়বি চল্।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

কৃষ্ণনগর
২০শে মাঘ, ১৩৩২

লেনিন ও সোভিয়েট রুষিয়া

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীদেবব্রত বসু।]

—:•:—

র‍্যাট্রাণ্ড রাসেলের কথায় বলতে গেলে, "প্রকৃত সমাজতন্ত্র আন্তর্জাতিক। লেনিন কেবলমাত্র রুশিয়ার হিতের জন্য বিপ্লবে যোগ দেন নাই—তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য জগতের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চালাইতেছেন...রুশ সমাজতন্ত্রীদের ইহাই বদ্ধমূল ধারণা।"

তাই এই বোলশেভিকসঙ্ঘ শুধু রুশিয়ার মধ্যে আপনাদের আবদ্ধ করে রাখতে চায় নি। তারা চেয়েছিল সমস্ত জগতের মধ্যে এই নূতন বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে পড়ুক।' "রুশিয়ার এই অন্তর্বিপ্লব প্রশমিত করতে হয়ত লেনিনের খুব অল্প সময়ই লাগত" এইচ্, জি; ওয়েলস্ বলেন, "তারা যদি জগতের কাছ থেকে বাধা না পেত হয়ত সত্যই পরীক্ষা করে সমস্ত মানবের পক্ষে একটা হিতকর জিনিসের সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু তারা জগতের অন্য সমস্ত জাতির কাছে যে রকম ভয়ানক ঘৃণা ও আক্রমণ পেয়েছে জগতের ইতিহাসে তাহা বিরল।"

১৯১৮ সালে জুলাই মাসে জার এবং তাঁর বংশকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ওয়েলস্ বলেন "এই হত্যার জন্য বোলশেভিক শাসন মণ্ডলীকে দোষদেবার মত কোন প্রমাণ নেই। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে চার জন গ্রাণ্ডডিউক—জারের পিতৃব্যগণকে লেনিনের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশ কমিশনার ফাঁসি দেন।"

তার পরের পাঁচ বৎসর কাল ধরে এই সঙ্ঘকে ভাঙ্গার সহস্র রকম দৈব ও মানুষিক চেষ্টা সত্ত্বেও বোলশেভিকবাদ টিকে আছে।

১৯২১ সালের কাছাকাছি জগতের অনেক জাতির বোলশেভিক ভীতি ক্রমে ক্রমে বাহ্যতঃ কমে আসতে থাকে। কিন্তু সেই বছরে রুশিয়ায় যে ভয়ানক দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটে তার মধ্য দিয়ে বোলশেভিকবাদ যে বেঁচে উঠেছে—তাতে জগতে এই প্রমাণ হয়েছে যে তাদের নেতাদের অসীম ক্ষমতা ও মস্তিষ্ক বল আছে। এবং তাতে আর একটা জিনিস ও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে সব জাতি মানবের মঙ্গলের জন্য বিশ্বহিত-মণ্ডলী খুলেই আছেন তাঁরা মানবকে পণ্যদ্রব্যের চেয়েও অন্তরে বেশী শ্রদ্ধা করে না। ১৯২১ সালে অকস্মাৎ রুশিয়াতে ভয়ানক অনাবৃষ্টি ঘটে। এবং তার ফলে শস্য একদম জন্মায়নি। মানবের ইতিহাসে এত বড় দুর্ভিক্ষ খুব কম দেখা গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। অসংখ্য জনসঙ্ঘ, সমস্ত গ্রাম, নগর, রুদ্ধদ্বারে মৃত্যুর অপেক্ষায় স্থির হয়ে থেকে অবশেষে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। মানুষ খড় খেয়েছে, কাদা খেয়েছে, মানুষ আপনার সমজাতির মৃতদেহ মাটীথেকে তুলে তার মাংস খেয়েছে। জনশূন্য প্রান্তর শুধু অসংখ্য মৃতের স্তূপ নিয়ে মূক হয়ে পড়ে থাকে। কত কয়েক শত মাইল দূরে, কয়েক দিনের পথের শেষে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, হাঙ্গারী ও রুমানীয়াতে শস্য সব উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছিল, সেখানে ব্যবসায়ীদের সঞ্চয়াগারে লভ্যাংশ বেশী পরিমাণে ফিরে আসছিল—আর এ ধারে লক্ষ লক্ষ মানব এক মুষ্টি অন্নের জন্য মানবের মৃত দেহ খেতে চলেছিল। ওয়েলস বলেন, "যে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট একদিন এই ভূতপূর্ব্ব মিত্রের জন্য অন্যায় যুদ্ধের খরচ স্বরূপ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়নি সেই বৃটেন আজ এই সময়ে একটা অন্ন দিয়াও সাহায্য না করিয়া আপনাদের নাম সমস্ত জগতের কাছে কলঙ্কিত করে।" এই সময় উত্তর মেরুর আবিষ্কর্ত্তা বিখ্যাত ডাঃ নান্‌সেন একটা সাহায্য সমিতি করেন। এবং আমরা জানি ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহুলোক এই সাহায্য সমিতিতে যোগদান করেন। মহাপ্রাণ আনাতোল-ফ্রান্স তাঁর নোবেল প্রাইজ লব্ধ সমস্ত অর্থ এই দুর্ভিক্ষে দেন।

কিন্তু বোলশেভিকবাদ ইহার মধ্য দিয়েও বেঁচে রইল। এই বিপদের মধ্য থেকে এমনি করে একটা এত বড় সঙ্ঘকে বাঁচিয়ে রাখা যে কত বড় শক্তির প্রয়োজন তা বলা নিষ্প্রয়োজন। অবশেষে ১৯২২ সালে জেনোয়াতে ইউরোপের আর্থিক উন্নতির পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য যে সর্ব্বজাতীয় সভা বসে তাতে বোলশেভিক প্রতিনিধিরও স্থান হয়েছিল।

এইখানে যে শক্তিশালী মহাপুরুষ এই মহাবিপ্লব সৃষ্ট ও প্রচার করেন তাঁর বিষয় ঈষৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। কিছুকাল আগে যে মহাপুরুষকে নর রাক্ষসরূপে চিত্রিত করা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল, সেই নর-রাক্ষসের ব্যক্তিগত চরিত্র তথা কথিত বহু দেবতারও উর্দ্ধে। রুশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ম্যাক্সিম গর্কী যদিও লেনিনের সহিত এক মত নন তবুও তিনি লেনিনের চরিত্রের যে অপূর্ব্ব শক্তির ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় জগতের কাছে দিয়েছেন তা প্রশংসার্হ।

লেনিন সদাপ্রফুল্ল, নিতান্ত দৃঢ়চেতা পুরুষ এবং মানব চরিত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। জনশক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। অনেকে জানেন তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতের শত্রু কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়। আপনার আদর্শের জন্য তিনি স্থির অবিচলিত চিত্তে যে অসম্ভব রকমে নির্য্যাতন সহ্য করেছেন বর্ত্তমান যুগে তাহা বিরল। জীবনের এই দুঃখ কষ্ট তাঁর মতে মানুষের বিকাশের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁর বক্তৃতা তেজপূর্ণ, সুন্দর, তাঁর সাহিত্য রসপূর্ণ এবং কখনও কখনও গোপন শ্লেষাত্মক। প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষু যেমন করে আপনাকে সঙ্ঘের নিকট দান করতেন লেনিন

তেমনি আপনার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ আপনার আদর্শের সম্মুখে ধরে দিয়েছিলেন। লণ্ডনের Herald পত্রিকার সম্পাদক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহাতে আছে—'Kremlin এর বিরাট প্রাসাদগুলির একটীতে একটা সাধারণ গৃহে লেনিনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। কোনও ভৃত্যদ্বারা আমার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় নাই। প্রাসাদের বহির্দ্বারগুলি সশস্ত্র প্রহরী পরিরক্ষিত বটে, কিন্তু তাঁহার বাসগৃহগুলি সম্পূর্ণ অরক্ষিত। প্রাসাদের কোন স্থলেই আড়ম্বরের কোন চিহ্ন দেখিলাম না।......আমার সহিত যেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইল সেদিন তিনি সবেমাত্র অসুখ হইতে উঠিয়াছেন, কিন্তু তবুও তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও অদম্য উৎসাহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার কথাবার্ত্তায় কোনও দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, কঠিন ও অপ্রীতিকর প্রশ্নগুলির খুব স্পষ্ট ও সত্য উত্তর দিতে তাঁহাকে একটুও ভাবিতে হয় না। এরূপ স্থলে অন্য দেশের মন্ত্রীসভার কোনও মন্ত্রী হয়ত তাঁহাদের নানা প্রকার অসুবিধা উল্লেখ করিতেন এবং পাছে প্রশ্নের ভুল জবাব দিয়া বসেন এই ভয়ে একদল কর্ম্মচারীকে হাতের কাছে রাখিতেন। কিন্তু লেনিন একাকী সমস্তই করেন। কারণ তিনি রাজনৈতিক চাল জানেন না। যেরূপ স্থির ভাবে তিনি মন্ত্রীসভায় যান ঠিক সেইরূপ ধীরতার সহিত ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে পারা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। তিনি যে রুশিয়ার যথেচ্ছাচারী প্রভু তাহা নহে। রুশিয়ার সর্ব্ববিধ প্রেরণা তাঁহার নিকট হইতে আসে।"

লেনিনের মৃত্যুর পর জগতের সমস্ত অংশ হতে এই মহাপুরুষকে স্বীকার করা হয়েছিল। রাক্ষস মরে গিয়ে তবে দেবতা হল। একদিন পিটার রুশিয়াকে নবজন্ম দেন এবং তাঁর নামে রুশের রাজধানীর নাম পেট্রোগার্ড করা হয়। লেনিনের মৃত্যুর পর রুশিয়া তার নব মুক্তিদাতার নামে রাজধানীর নাম বদলাইয়া লেনিনগার্ড করেছে।

বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে লেনিনের যে ছবি দিয়েছেন তাতে লেনিনের চরিত্রের অনেক দিক বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। লেনিনের ঘরখানি অতি সাধারণ; একবারে বাহুল্য-বর্জ্জিত। ঘরখানিতে বড় বড় দুইটী লিখিবার জন্য, চতুঃপার্শ্বের দেওয়ালে ম্যাপ টাঙ্গান, দুইটী বইয়ের আলমারী এবং দর্শকের জন্য একখানি আরাম কেদারা, তা ছাড়া আস্ত কাঠের দুইখানি চেয়ার। বিলাসের স্পৃহা তো দূরের কথা, তাঁহার নিজের সুবিধার দিকে পর্য্যন্ত দৃকপাত নাই। তিনি অতি সরল প্রকৃতির বন্ধুবৎসল ও মিষ্টভাষী; তিনি কে বলিয়া না দিলে তাঁহাকে চিনিবার যো নাই। আমার জীবনে আত্মম্ভরিতা বর্জ্জিত এরূপ লোক দুটী আর দেখি নাই। তিনি মুখোমুখী হইয়া একচোখ বন্ধ করিয়া দর্শকের সহিত আলাপ করেন; তাহাতে অন্য চোখের অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়। তিনি খুব উচ্চ হাস্য করেন, প্রথমে এই হাসি বন্ধুর হাসি বলিয়া মনে হয় কিন্তু কিছুকাল পরে এই হাসির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার হাসি অতি ভয়ানক। কঠোর বাস্তব সত্য উপলব্ধি করিলে মিথ্যা অনাচারের প্রতি যে অবজ্ঞা আসে, ইহা সেই অবজ্ঞার হাসি। তিনি তাঁহার হৃৎপিণ্ড দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে যেন জগতের যত অত্যাচার অনাচার উপলব্ধি করিয়াছেন।...আমার মতে তিনি আদর্শবাদী ও অত্যন্ত গোঁড়া সমাজতন্ত্রী।"

লেনিন বিপ্লবধর্ম্মী। কিন্তু লেনিনের এই বিপ্লবকে অনেকে ভুল বোঝেন। অনেকের ধারণা লেনিন রক্তপিপাসু তৈমুরের মত হিংস্র ও রক্তলোভী। অন্ততঃ এই রকমভাবে লেনিনকে প্রচার করা হয়েছিল। ১৯২১ সালে লেনিন যখন রুশিয়ার বিপ্লবকে বদলে নিরুপদ্রব পন্থায় গড়ে তোলবার পথ ধরেন তখন তাঁর দলের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছিল। তখন তিনি আপনার কার্য্যপ্রণালী বোঝাবার জন্য একটী প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন অনেক বিপ্লবী বিপ্লব ও সংস্কারের সীমানা কোথায় জানেন না। সত্যিকারের বিপ্লবীদের আসল বিপদই হচ্ছে যে তারা জানে না বিপ্লব কতটুকু করা উচিত, কোথায় থামা উচিত এবং কখন থামা উচিত। অধিকাংশ বিদ্রোহীই বিদ্রোহের নামেই এমন উন্মত্ত হয়ে উঠে যে তারা অন্যায়ভাবে বিদ্রোহকে স্বর্গে তুলে ধরে। এতে করে তারা সত্যকার বুদ্ধি হারায় এবং কখন বিপ্লব বন্ধ করে সংস্কার আরম্ভ করতে হবে তা ভুলে যায়। এরূপ অবস্থায় তারা ভাবে যে শুধু বিপ্লবই জগতের দুঃখ দূর করবার চরম পন্থা। এই সব ধারণা মূর্খতা মাত্র এবং এই মূর্খতার পরিণাম পরাজয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "রুশ কম্যুনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রীরা কেবল নিজের দলের লোককেই প্রকৃত জন-সাধারণ বলিয়া মনে করে, তাহারা ভূ-সম্পত্তি ও বিষয়াধিকারকেই জগতের যত অনিষ্টের মূল বলিয়া বিবেচনা করে। রুশ সমাজতন্ত্রী তাহার এই মত সম্বন্ধে আপনাকে এতই অভ্রান্ত মনে করে যে তাহার আপন মত রক্ষার জন্য অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য কোনরূপ অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না। এজন্য সে নিজেও বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করে। রুশ সমাজতন্ত্রী রোজ ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করে এবং শনিবারের ছুটিটা লইতে পর্য্যন্ত নারাজ। সে সর্ব্ব প্রকার বিপজ্জনক ও কঠিন কাজ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এমন কি পূতিগন্ধময় বিষাক্ত নর-সবদেহ স্তূপ সরাইয়া মহামারী হইতে দেশকে বাঁচাইতেও কখন কুণ্ঠা বোধ করে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রুশ সমাজ তন্ত্রীর করতলগত হইলেও সে নিজে কঠোর সংযমে জীবন যাপন করে। সে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাজ করে না। তাহার সমস্ত উদ্যম ও চেষ্টা জগতে নব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে প্রাণপণে নিয়োগ করিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে সে নিজেকে এতখানি কঠোরতার মধ্যে রাখিয়াছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই সে অন্যের প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছে।

"বোলশেভিক মতে সামাজিক তন্ত্রের দুটী মূল নিয়ম হচ্ছে—শ্রম সকলকেই করতে হবে এবং আর একটী ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু নেই, সমস্ত সমাজের অধিকারভুক্ত। ব্যক্তিগত সম্পদকে বলশেভিকগণ পাপ ও অন্যায় বিবেচনা করে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য মিটিয়ে, সমস্ত অর্থ অপরের সুখ ও

দুঃখের দিকে না চেয়ে, শুধু নিতে যদি সঞ্চয় করতে থাকে তবে সে সমাজ শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বোলশেভিকগণের মতে সমস্ত সম্পত্তি থাকবে সমাজের আয়ত্তে—এবং এই সম্পত্তি বিলি হবে ব্যক্তির প্রয়োজন ও শ্রমের যোগ্যতা অনুসারে।

মিঃ ওয়েলস্ রুশিয়াতে যখন যান তখন তিনি রাশিয়ার ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখে রুশিয়া সম্বন্ধে তাঁর শঙ্কা লেনিনকে জানান। লেনিন তার উত্তরে বলেন, "অনুগ্রহ করে দশ বছর পরে এসে সোভিয়েট রুশিয়া দেখে যাবেন।"

আজ প্রায় দশ বৎসর হতে চলল। অনেক জ্ঞান-প্রিয় পুরুষ আজ সোভিয়েট রুশিয়ায় গিয়ে তার আসল মূর্ত্তি দেখে এসে যে বিবরণ সব প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হয় লেনিনের ভবিষ্যবাণী ব্যর্থ হয় নি। এখানে সেই বিবরণ থেকে বর্ত্তমান সোভিয়েট রুশিয়ার একটা মূর্ত্তি দেব।

Paul Vaillant-Coulturier নামে একজন ফরাসী সমাজতন্ত্রী গত বৎসর মস্কো শহরে রুশিয়ার সোভিয়েট শাসনের প্রতিষ্ঠার আসল রূপ দেখিতে যান। তিনি বলেন, যখন মস্কো শহরে ঢুকলুম মস্কোকে আর যেন চিনতে পারা যায় না। চার বৎসর আগে যেখানে দেখে গেছি একটা শ্মশান-ভূমি, নষ্ট নগরীর কঙ্কাল, আজ সেখানে দেখি এক নূতন নগর,—বিরাট ও বিশাল। ষ্টেশনে গাড়ী ঢুকতেই একটা ব্যস্ত নবজাগ্রত জীবনের অসংখ্য বিভিন্ন শব্দ সম্মিলিত হয়ে কানে বাজতে লাগল। ষ্টেশনের সামনের স্কোয়ারে অসংখ্য গাড়ী, ট্রলি, মোটর-বাস, ট্রাম মোটর, মুটে, মজুর, অসংখ্য মানবের ভিড়। সামনের রাস্তার উপরে লাল পতাকা উড়ছে। চারিদিকে আঙুরের গুচ্ছের মত মানুষের দল।....

"রাস্তায় নবজাগ্রত জাতীয় স্পন্দনের অনুকূল নামে ষ্টেট অনুশাসিত সমস্ত দোকান—"National Store," "National Syndicate," "National Bank," "National Trust" ইত্যাদি......

সোভিয়েট রুশিয়ায় আভ্যন্তরিন জীবনে গত যুগের ধনশালীদের মধ্যে যারা অধিকাংশ সময়ই ঘরে কাটান—তারা আপনাদের এই আত্ম-বৃত নির্ব্বাসনে নিন্দা, আর কুৎসা প্রচারে দিন কাটান। তাঁরা কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন না—এ তাঁদের গর্ব্ব। এখন আর তাঁরা বোলশেভিকদের প্রথা ও মানুষে হাবভাবের কথা নিয়ে আলোচনা বড় একটা করেন না। কারণ সেটা অনেক পুরাণো হ'য়ে গেছে। এখন ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকেই তাঁদের নজর বেশী। এই সমস্ত লোক তাঁদের জীবনের চারিদিকে অসংখ্য বিলাস ও মিথ্যার সম্ভার ছড়িয়ে রেখে যখন ধর্ম্মের ও সত্যের ও নিষ্ঠার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন তখন শুনতে বেশ লাগে। অমুক কম্যুনিষ্টদলের সেই মেয়েটা? সে দিন কি ভয়ানক অনাচার না করলে সে? "অমুক কম্যুনিষ্টদলের মেয়েরা, বারো বছরে মা হয় সব, জানেন?" অমুক লোকটার তিনটী স্ত্রী আছে—জানেন? একজন থাকে ক্রেমলিনে, একজন থাকে Moscowতে, আর একজন থাকে লেনিনগ্রেডে।

"রুশিয়ার পুরাতন মানুষের দল মরে চলে গেছে। তাদের চিতার আগুনের মধ্য দিয়ে আর একদল মানুষ জন্মাচ্ছে। এই নূতন মানুষ সবে মাত্র জন্মবেদনা অঙ্গে নিয়ে জাগছে—তার জীবনের ও নীতির কোন স্পষ্টধারা সে এখনও গড়ে তুলতে পারে নি। এখন এই নবজাত শিশুকে অনেকখানি পথ হাঁটতে হবে। তবে সে এই নূতনের আদর্শের মন্ত্রকে স্পষ্টাক্ষরে দেখতে পাবে। প্রেমের ভিত্তিতে যে সংসার, সমন্বয়ের ভিত্তিতে যে সমাজ, শ্রমের ব্যয়ে যে পূর্ণ জীবিকা, তাকে স্পষ্ট মূর্ত্তি দিতে হলে জীবনের অনেকখানিই চাই—

রুশিয়ার এই বিপ্লব সত্যই নৈতিক রাজ্যের অনেকখানি ওলোট পালট করে দিয়েছে; কিন্তু সে ভালই করেছে। সে ধর্ম্ম থেকে ভণ্ডামিকে পৃথক করে দিয়েছে। যখন মানুষের এতদিনের মিথ্যাসংস্কারের আবরণ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন মানুষ আপনার নগ্নতাকে স্পষ্ট দেখতে পেল এবং এই বিপ্লব তাদের শিখিয়েছিল যে এ নগ্নতার লজ্জার কিছু নেই।—

আজ সোভিয়েট রুশিয়ায় নারী আর পুরুষের সম্পত্তি নয়—সে তার সামাজিক জীবনে সহধর্ম্মিণী, সাথী। নারীর জাগরণের যে আন্দোলন বহুকাল হতেই রুশিয়াতে আলোচিত হয়ে আসছিল সোভিয়েট শাসনে তা পরিপূর্ণ মূর্ত্তি গ্রহণ করেছে। বিবাহে নারীর সম্মতি একান্ত প্রয়োজন এবং সে বিষয়ে নারীর স্বাধীন-ইচ্ছা আছে। বিবাহ ও বিবাহবন্ধনচ্ছেদ সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক বহু ক্রিয়াকলাপ ও বাদ দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েট রুশিয়ায় প্রত্যেক সংসারের প্রধান কর্ত্তব্য—নির্দ্ধারিত হয়েছে যে শিশুর যত্ন একান্ত এবং প্রথম দ্রষ্টব্য। শ্রমজীবি মেয়েদের মধ্যে গর্ভবতীরা পূর্ণ সময়ের আগে দু'মাস ছুটী পায় এবং ছুটিতে পুরা মাইনে দেওয়া হয়। যে সমস্ত শিশুরা জগতে মাতার বা পিতার পরিচয় না নিয়ে আসে—তাদের আর অন্যসমস্ত শিশুদের মধ্যে কোনও সামাজিক পার্থক্য নেই। পোষ্যপুত্র নেওয়া আইনত বারণ, কারণ সমস্ত শিশুই ষ্টেটের সন্তান। সাধারণ শ্রমজীবিরা সোভিয়েট শাসনে আগেকার থেকে ঢের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। এবং তাদের সাংসারিক জীবনও ঢের সংযত। বস্তুনিষ্ট দলের চেষ্টা যে তাদের সভ্যের মধ্যে অন্যায় ও দুর্নীতি খুব সংযত হয়। পথে, ঘাটে, সর্ব্বত্র, অসংখ্য স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশুর দল দেখা যায়। এই শিশু-উন্নতির উপর সোভিয়েট রুশিয়া অত্যন্ত যত্নবান্।"

গতবৎসর ইংলণ্ড থেকে Labour Women এর প্রতিনিধিগণ রুশিয়াতে যান। তাঁরা তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন। সেই ভ্রমণে তাঁরা রুশিয়ার অভ্যন্তরে বহুস্থানে যান। অনেক স্থলে তাঁরা কোন বড় বড় স্থলে প্রবেশাধিকার পেয়ে শ্রমজীবীদের প্রশ্ন করেছেন—জারের শাসনের সময় তাদের অবস্থা ভাল ছিল না এখন? তাতে তারা উত্তর দেয়, যে জারের শাসন ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে তুলনাই হয় না। তারা যে শুধু তাদের মুক্তির সুখ আস্বাদ করেছে তা নয়—কার্য্যতঃও তারা যথেষ্ট সুখী। এখন আর তাদের সারা

ঘণ্টা ধরে কাজ করতে হয় না। এবং তারা এখন গ্রীষ্মকালে কিছুকাল ছুটী পায় এবং ছুটীতে পূরা মাহিনাও পায়।

রুশিয়ার বিপ্লবের আগে সাধারণ কৃষকদের অবস্থা ভারতবর্ষের সাধারণ কৃষকদের অপেক্ষা যথেষ্ট খারাব ছিল। অনেক জমি এমনি পড়ে থাকত এবং যে সব জমী চষা হত তাতে শস্যও সে রকম বেশী উৎপন্ন হত না। এবং যা কিছু শস্য উৎপন্ন হত তার প্রধানাংশই যেত জমিদারদের ঘরে কারণ এই সমস্ত শস্যোৎপাদিকা ভূমিগুলির মালিক ছিল এই জমিদারেরাই। কৃষাণরা ছিল তাদের কৃতদাস মাত্র। আগে রুশিয়ার এই সমস্ত জমী গ্রাম্য "মীর" অর্থাৎ পঞ্চায়েতের অধীনে ছিল। কিন্তু মূলধনওয়ালাদের ক্রমঃ আক্রমণের ফলে এই পঞ্চায়েতী জমী বিভাগ প্রথা তিরোহিত হয়ে যায় এবং তার জায়গায় জমিদারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত কৃষকদের অর্থাভাবও ছিল প্রচুর, সুতরাং আমাদের দেশে মত সেখানেও চাষী ধার করতে বাধ্য হত এবং ধার পেত তারা এই সমস্ত জমীদারদেরই কাছে, কিন্তু ভয়ানক বেশী সুদে। চাষারা আপনাদের অজ্ঞতার দরুণ সস্তাদরে আপনাদের উৎপন্ন সমস্ত জিনিস ব্যবসায়ীদের হাতে দিত কিন্তু আপনার প্রয়োজনের জন্য যে সমস্ত জিনিষ তাকে কিনতে হত তার দাম ছিল ঢের বেশী। এই সমস্ত চাষাদের সঙ্গে আমাদের চাষাদের কৃষাণ-জীবনের অনেক মিল আছে। বোলশেভিকগণ শাসনভার হাতে নিয়ে গ্রামের সংস্কারের দিকে পুরো মাত্রায় নজর দিল। গ্রামে অসংখ্য লোক বসবাস করে আছে অসম্ভব দারিদ্র্যের মধ্যে। বোলশেভিকগণ সমস্ত জমী রাজ্যের অধীনে আনে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীনে এই সমস্ত জমী কৃষাণদের মধ্যে বিলি হয়। তার পর এই সুদখোরের ব্যবসা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং গ্রামে কো-ওপারেটীভ সোসাইটী খুলে অতি অল্প সুদে কৃষাণদের সাহায্য করা হয়। ১৯২৪ সালে Consumers co-operative এর সংখ্যা ছিল ২২৫০০, agricultural co-operative এর সংখ্যা ছিল ৪১০০০, এবং এই উভয়ের মেম্বর ছিল ১০ এবং ৩০ লক্ষ। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি যাতে বাড়ে এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বীজ ও কর্ষণযন্ত্রের উন্নতিসাধন করে শস্যের চেষ্টা বহু পরিমাণে সফল হয়েছে। রুশিয়া শীত প্রধান দেশ এবং বছরের মধ্যে ছ'মাস বরফে সমস্ত দেশ ঢাকা থাকে। এই সময়ে চাষারা জমি চষা অসম্ভব বলে অলসভাবে বসে দিন কাটাত। এর প্রতিকারের জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট গ্রামে গৃহ-শিল্পের প্রচার ও ব্যবস্থা করে। এই ছ'মাস কৃষাণরা অলস হয়ে বসে না থেকে, ছুতোরের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, এবং আরো অন্যান্য কাজ করে। এদের কাজের সাহায্য করবার জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে গ্রামে গ্রামে। গ্রাম সংস্কারের সময় সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট শিক্ষার দিকটাও ভোলেন নি। গ্রামে গ্রামে ব্যায়ামের জন্য ব্যায়ামাগার খোলা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে ছেলে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। এবং প্রত্যেক গ্রামে একটা করিয়া পাঠাগার আছে যেখানে সমস্ত রকম কাগজ, পত্র আসে। এবং মাঝে মাঝে গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে লোক এসে স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে নগরের সহিত একটা চিন্তার বন্ধনীর সৃষ্টি করবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এই সমস্ত দেখে বোঝা যায় যে উন্নতি সেইখানেই দ্রুতবেগে চলে যেখানে যে উন্নতি বিধান করবে এবং যে সে উন্নতি গ্রহণ করবে দুজনের মধ্যে একটা ঐকান্তিকতার ও বিশ্বাসের যোগসূত্র আছে।

বাংলার খেয়ালী আকাশের তলায় জীর্ণ পল্লীবটের মত বাংলার জীর্ণ পল্লী-বাংলার দীর্ণ প্রাণ পড়ে রয়েছে। জাতির অগ্রগমনের পথে সে এক বিরাট প্রশ্নের মত পড়ে আছে। যে প্রশ্নের সমাধান না করলে হয়ত জাতীয় উন্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা একদিন সহসা ধূলি-মলিন হয়ে পড়বে।

নিখিল-বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলন

২য় অধিবেশন—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৬।৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬

—:০:—

প্রস্তাব সমূহ

১। কৃষক ও শ্রমিকগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণের জন্য এই সম্মিলনী নিম্নলিখিতভাবে কৃষক ও শ্রমিকদল গঠনের প্রস্তাব করিতেছেন :—

প্রস্তাবক—ফয়েজুদ্দীন হোসেন
(ময়মনসিংহ)

সমর্থক—ব্রজনাথ দাস
(বগুড়া)

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল

উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী

গঠন প্রণালী

১। **নাম**—বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল।

২। **উদ্দেশ্য**—নারী-পুরুষ—নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।

৩। **উপায়**—নিরস্ত্র গণআন্দোলনের সমবেত শক্তি-প্রয়োগ উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হইবে।

৪। **সভ্যপদ**—আঠার বৎসর বয়স্ক যে কোনও নারী-পুরুষ এই দলের উদ্দেশ্য, গঠন-প্রণালী এবং কার্য্য-পদ্ধতি অনুমোদন করেন তিনিই কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পঞ্চায়েতের মত হইলে সভ্য হইতে পারিবেন। শ্রমিক এবং চাষীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণের কথা যতদিন কংগ্রেস, স্বরাজ্যদল বা অপর কোনও দলের কার্য্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, ততদিন এই দলের সভ্যগণের সেই সমস্ত দলের সভ্য হওয়ায় বাধা নাই।

৫। **চাঁদা**—এই দলের প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক একটাকা চাঁদা দিবেন। শ্রমিক ও কৃষক হইলে বার্ষিক একআনা চাঁদা লাগিবে। প্রয়োজন স্থলে পঞ্চায়েৎ চাঁদা না লইতেও পারেন।

৬। **কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পঞ্চায়েৎ** (Central Working Committee)—এই পঞ্চায়েৎ কম-বেশী পনের জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। পঞ্চায়েৎগণ নিম্নলিখিত বিভাগ গুলির এক বা ততোধিক বিভাগের ভার লইবেন।

(১) প্রচার (২) অর্থ ব্যবস্থা (৩) দলগঠন (৪) শ্রমিক (৫) কৃষক (৬) ব্যবস্থাপক সভা।

৭। **কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি** (Executive Committee) দলের একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি থাকিবে। এই কমিটি দলের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবে। কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের ভার ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির হাতে থাকিবে।

৮। **সাধারণ পরিষদ** (General Council)—বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে। এই পরিষৎ প্রথম বার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্তৃক মনোনীত এবং পরে বার্ষিক অধিবেশনে প্রত্যেক জেলা হইতে নির্ব্বাচিত হইবে।

৯। জেলার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা করিবেন।

১০। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের কার্য্যাধিকার সমগ্র বঙ্গদেশে, আসাম প্রদেশের বাঙলাভাষী জেলা সমূহে এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মানভূম ও সিংহভূম নামক বাঙলাভাষী জেলাদ্বয়ে থাকিবে।

১১। উপরি উক্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে তাহা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি করিবে।

কর্ম্মনীতি ও সংকল্প

যেহেতু বিদেশী ধনিক্-তন্ত্রের সৃষ্ট এবং সেই ধনিক-তন্ত্রের শাসন প্রণালীর স্থিতির উপর যাহাদের চরম অস্তিত্ব নির্ভর করে, সমাজের সেই শ্রেণীর দ্বারা স্কুল, কলেজ, আইন-আদালত ও কাউন্সিল বর্জ্জনের দাবী করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের অসফলতার অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানে বোঝা যাইতেছে ;

যেহেতু ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ-সমূহের বাধা-প্রদান-নীতি চেষ্টা দ্বারা ধনিক-তন্ত্রকে ভারতের জাতীয় দাবীর পরিপূরণে ইচ্ছুক করা যায় নাই, এবং সমস্ত ব্যবস্থা-পরিষদগুলি স্বরাজ্যদলের সভ্যগণের দ্বারা অধিকৃত হইলেও ভবিষ্যতে ঐ নীতির সফলতার আশা দেখা যাইতেছে না ;

যেহেতু ভারতের স্বাধীনতা-সময়ের সেনানীগণের যথেচ্ছ গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে আবদ্ধ হওয়া বিষয়ে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের একযোগে তীব্র প্রতিবাদ ধনিক-তন্ত্রের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয় নাই ;

যেহেতু অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র ধারা যাহাতে সাক্ষাৎ প্রতিরোধ ক্রিয়ার সার্ব্বজনীন প্রয়োগ দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট ও খাজনা বন্ধের দ্বারা হইতে পারিত এবং উদ্ধাধিকারী শাসনযন্ত্র হইতে হাত সরাইয়া লওয়া হইত, সেই ধারার প্রয়োগ বিষয়ে ভারতের সমস্ত অগ্রগামী রাজনৈতিক দলই বিরোধী বা নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন ;

যেহেতু দেখা গিয়াছে যে দলাবাজি অথবা ত্রাস-নীতিতে অনিচ্ছুক ধনিক-তন্ত্রের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা অতীতে কেবলই বিফল হইয়াছে; আমলা-তন্ত্রের নিকট খোশামুদী দ্বারা ভারতবর্ষের লোকের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি আনয়ন সম্ভব নয়, কিম্বা সংঘ্র বন্ধনে আবদ্ধ স্বদেশীয়গণের সাহায্যেই নিরন্নীকৃত জনসাধারণের স্বাধীনতা গুপ্ত হত্যার সাহায্যে আসিতে পারে না; বোমা এবং পিস্তলের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের চলমান শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই নিরন্ন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে;

যেহেতু ভারতীয় স্বরাজের যে কর্ম্ম-সংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয় কথা নাই এবং যেহেতু কোনও কৃষিজীবী জাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম এবং শ্রেষ্ঠ অধিকার তাহাই—যাহাতে সে নিজের জমির নিজে স্বত্বাধিকারী হয়; এবং, ভূমির স্বত্বে স্বাধীনতা না থাকিলে অন্য সমস্ত অধিকার ভোগে সুখ হয় না; এবং উপরিস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমিস্বত্ব ক্রীতদাসত্বের আইন-সঙ্গত নামান্তর মাত্র;

যেহেতু প্রতিযোগিতা আধুনিক সভ্যতার কলঙ্ক, এবং ভারতীয় জীবন প্রকৃত সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার স্থলে যতদিন না সহযোগিতা ও পরস্পর সেবার ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত না হয়;

যেহেতু শ্রেণীগত স্বার্থত্যাগী যুবক, শ্রমিক ও কৃষকের সংযোগ না হইলে ভারতের মুক্তি আসিবে না;

অতএব বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল এই ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারতের জাতীয় দাবী পূরণের এখনও একমাত্র অবশিষ্ট উপায় এই যে, দেশের শতকরা আশী জনেরও অধিক যাহারা—সেই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং তাহাদিগের জন্মগত অধিকার লাভে সাহায্য করা, যাহাতে তাহারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়া নিজের ক্ষমতায় এবং নিজেদের স্বার্থ ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে; এবং এতদর্থে উপরোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল নিম্নলিখিত কর্ম্ম সংকল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

(১) এই দল শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থের জন্য যুঝিবেন। এবং বাংলার শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ গঠন করিবেন।

(২) জাতীয় কার্য্যে নিযুক্ত অন্যান্য দলের সহিত এই দল যতটা সম্ভব সহযোগিতা করিবেন।

(৩) শ্রমিক ও কৃষকগণের নিম্নলিখিত ও অন্যান্য দাবী গুলির জন্য যাহারা যুঝিবেন, ব্যবস্থাপক সভায় এমন সমস্ত প্রতিনিধির নির্ব্বাচনে এই দল সাহায্য করিবেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারা এই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ক) ব্যবস্থা পরিষদে এই দলের প্রতিনিধিগণ নিজেদের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(খ) সম্ভব হইলে প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিবেন:—

(১) যতদিন না শ্রমিক ও কৃষকগণের মানুষের প্রাপ্য প্রাথমিক অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত না হয় ততদিন বজেটে টাকা মঞ্জুরী না দেওয়া।

(২) ধনিক-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর এবং ধনিক ভূস্বামীর শ্রমিক ও কৃষকের উপর শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে এমন সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী হওয়া।

(৩) জাতীয় জীবনের বিশেষতঃ কৃষক শ্রমিকদের শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল এবং সে কারণে ধনিক-তন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির প্রতিকূল এমন সমস্ত প্রস্তাব ও আইনের প্রবর্ত্তন করা ও সমর্থন করা।

(গ) দলের সভ্যগণের সম্মিলিত সম্মতি বিনা গবর্মেণ্টের অধীনে কোনও প্রতিনিধি কোনও চাকরী গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চরম দাবী

১। শ্রমিক ও কৃষকগণের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা—অর্থাৎ

(২) আধুনিক কল-কারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে ও ষ্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎ সংক্রান্ত কর্ম্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

(২) ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব পূরণক্ষম (self contained) স্বায়ত্ত-শাসন-বিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের (village community) উপর বর্ত্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্র সর্ব্বশ্রেণীর হাতে থাকিবে।

উপস্থিত দাবী

১। শ্রমিক

(ক) জীবন-যাত্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মজুরীর একটা নিম্নতম হার আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া।

(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের পক্ষে সপ্তাহে সাড়ে পাঁচদিন খাটুনি চরম বলিয়া আইন করা, নারী এবং অল্প বয়স্ক ছেলেপিলের জন্য বিশেষ সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা।

(গ) শ্রমিকগণের আবাস, কাজের সর্ত্ত, চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি দাবী মালিকগণকে আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া পূরণ করানো।

(ঘ) অসুস্থ অবস্থা, দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন।

(ঙ) সমস্ত বড় কলকারখানায় লাভের ভাগে শ্রমিকগণকে অধিকারী করা।

(চ) মালিকগণের খরচায় শ্রমজীবীগণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

(ছ) কলকারখানার নিকট হইতে বেশ্যালয়, নেশার দোকান উঠাইয়া দেওয়া।

(জ) শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

(ঝ) শ্রমিক-সঙ্ঘ-গুলিকে আইনতঃ মানিয়া লওয়া এবং শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্য ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করা।

(ঙ) শ্রমশিল্পীদের মধ্যে যৌথ সমবায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের উন্নতি বিধান করা।

২। কৃষক

(ক) প্রজার করের বিষয়ে স্থায়িত্ব বিধান এবং বাকী খাজনার সুদ ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের সুদের হারের সহিত সমান নির্দ্ধারণ করা।

(খ) চাষের জমীতে চাষীর অবিভক্ত স্বামিত্ব স্থাপন করা।

(গ) জমিতে কায়েমী স্বত্ব (১) উচ্ছেদ নিরোধ (২) অন্যায় এবং বে-আইনি বাজে আদায় বন্ধ (৩) স্বেচ্ছায় বিনা সেলামিতে হস্তান্তর করার অধিকার (৪) গাছ কাটা, কুয়ো খোঁড়া, পুকুর কাটা, পাকা বাড়ী করার বিনা সেলামিতে অধিকার।

(ঘ) জলকরে মাছ ধরিবার নির্দ্ধারিত সর্ত্ত।

(ঙ) মহাজনের সুদের চরম হার শতকরা ১২ টাকার অনধিক স্থির করা।

(চ) কো-অপারেটিভ কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা কৃষককে ঋণদান এবং মহাজন ও লোভী ব্যবসাদারগণের হাত হইতে কৃষককে উদ্ধার।

(ছ) চাষের জন্য যন্ত্রপাতি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মারফৎ কৃষকের নিকট বিক্রয় অথবা ব্যবহারে জন্য ভাড়া দেওয়া। মূল্য অথবা ভাড়ার টাকা কিস্তী হিসাবে অল্প অল্প করিয়া লওয়ার বন্দোবস্ত।

(জ) পাটের এবং অন্যান্য ফসলের সমবায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত লাভের বন্দোবস্ত করা।

২। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক বৎসরের জন্য উপরোক্ত দলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হউক:—(প্রয়োজন হইলে সভ্যগণ ইহার অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন)।

সভাপতি:—ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল (কলিকাতা)

সহকারী সভাপতি:—মৌলবী কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ (কলিকাতা)

রজীবুদ্দীন তরফদার এম, এল, সি (বগুড়া)

শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত (এডভোকেট) (কলিকাতা)

সম্পাদক:—শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার এম, এ, এম, এল, সি (নদীয়া)

সহযোগী সম্পাদক:—মোঃ শামসুদ্দীন হুসেন (বীরভূম)

কার্য্যকরী সভ্য:—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)

কাজী নজরুল ইসলাম (বর্দ্ধমান)
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (নোয়াখালী)
কয়েজুদ্দীন হুসেন (ময়মনসিংহ)
শামসুদ্দীন আহমদ (নদীয়া)
আফতাব হোসেন জোয়ার্দার (,,)
আফসরুদ্দীন আহ্‌মদ (,,)
আজিজুর রহমান (জামালপুর)
শা আবদুল হামীদ (কিশোরগঞ্জ)
মহিউদ্দীন আহ্‌মদ (টাঙ্গাইল)
মকবুল হোসেন (নওগাঁ)
সৈয়দ জাহিদুলহক চৌধুরী (ত্রিপুরা)
মুহম্মদ ফজলুল করীম মল্লিক (ঢাকা)
ব্রজনাথ দাস (বগুড়া)
রমণীমোহন বিশ্বাস (বরিশাল)
মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (২৪ পরগণা)

প্রস্তাবক—শামসুদ্দীন আহ্‌মদ (নদীয়া)
সমর্থক—রজীবুদ্দীন তরফদার (বগুড়া)

৩। নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনীর পূর্ব্ব বৎসরের নিযুক্ত কমিটির প্রস্তাবিত নিয়মাবলী বিবেচনা জন্য গ্রহণ করা হউক এবং এতৎ সম্বন্ধে ভার কৃষক ও শ্রমিকদলের কার্য্যকরী সমিতির উপর অর্পিত হউক।

প্রস্তাবক—বিজয়কান্ত রায় চৌধুরী (নদীয়া)
সমর্থক—আফতাব হোসেন জোয়ার্দার (নদীয়া)

৪। কবি নজরুল ইসলাম পরিচালিত—"লাঙল" পত্রিকাকে কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্ররূপে আপাতত গ্রহণ করা হউক এবং শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার সম্পাদিত নদীয়ার "জাগরণ" পত্রিকা ও মৌলবী রজীবুদ্দীন তরফদার প্রতিষ্ঠিত বগুড়ার "প্রজাবাহিনী" নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনীর মুখপত্ররূপে গণ্য হউক।

প্রস্তাবক—সৈয়দ জাহিদুল হক (ত্রিপুরা)
সমর্থক—আফতাব হোসেন জোয়ার্দার (নদীয়া)

৫। নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনীর ২য় অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতাটি "লাঙল" অফিস হইতে পুস্তিকাকারে বাহির করিয়া বাঙলার সর্ব্বত্র প্রচারিত করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌলবী মকবুল হোসেন (নওগাঁ)
সমর্থক—আকবর হোসন (বগুড়া)

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন

৬। এই সভা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে এবারকার কাউন্সিলের আলোচ্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত প্রজার সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ মূলক এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সমর্থনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

(১) প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে রায়তগণকে তাঁহাদের রায়তী জোতের উপর উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষাদি কর্ত্তন দান বিক্রয় ইত্যাদি করিবার অবাধ অধিকার প্রদান করা হউক এবং তাহাতে জমিদারের কোন প্রকার প্রাপ্য রহিত করা হউক।

(২) প্রজাগণকে তাহাদের রায়তী জোতে পুকুর ও কূপ খনন, পাকা ইমারতাদি ও ইষ্টক নির্ম্মাণ করিবার অধিকার প্রদান করা হউক।

(৩) রায়তী জোত অবাধ হস্তান্তর করিবার অধিকার প্রজাকে দেওয়া হউক ও হস্তান্তরিত জোতের বা জোতের অংশের দাখিল খারিজ জন্য মধ্য সত্বের (Permanent Tenure) হস্তান্তরের যে ফি ধার্য্য আছে সেই হারে জমিদারের অবগতি ফি (Landlord's fee) ধার্য্য করা হউক এবং জমিদারকে Right of Preemption (ক্রয়ের পূর্ব্বাধিকার) না দেওয়া হউক।

(৪) ওদারীশী সত্বে সত্ববান হইলে নাম খারিজ করিতে মালিককে কোনরূপ ফি দেওয়ার প্রস্তাব প্রস্তাবিত প্রজাসত্ব আইন হইতে রহিত করিয়া দেওয়া হউক।

(৫) কোন জোতের একাধিক অংশীদার থাকিলে অংশীদারগণ যাহার যাহার জমা বিনা নজরে পৃথক করিয়া লইতে পারিবেন উহাই আইনে বিধিবদ্ধ করিয়া লওয়া হউক।

(৬) রায়তী জোতের প্রতি পনর বৎসর পর পর জমা বৃদ্ধি করিবার যে বিধান আছে তাহা এবং খাদ্য শস্যের মূল্যের বৃদ্ধি অনুযায়ী ও অন্যান্য কারণে জমা বৃদ্ধির যে বিধান আছে তাহা রহিত করিয়া দেওয়া হউক।

(৭) বাকী খাজনার মোকদ্দমার ক্ষতিপূরণের হার শতকরা ৬৲ ছয় টাকার অনধিক ধার্য্য করা হউক।

(৮) কর্জ্জ টাকার সুদের হার যেন শতকরা বার্ষিক ১২৲ বার টাকার বেশী আদালতে ডিগ্রি না হয় ও যাহার ষোল বিঘার অনধিক জমি আছে বাকি খাজনার দায়ে বা ধানের দায়ে বা ঋণের দায়ে তাহার জমি নিলাম না হইয়া জমির উপসত্বের দ্বারা উক্ত বাকী খাজনা বা ঋণ পরিশোধ হইবে।

(৯) সুদ ব্যবসায়ী ও জমিদারগণের নিজের হাল না থাকিলে তাহারা খামার জমি রাখিতে পারিবেন না এবং খামারের খাজনা ব্যতীত কোন ফসল পাইবেন না।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত।

(১০) যে সকল প্রজা রায়তী স্বত্বে জমী পত্তন লইয়াছে কিন্তু খাজনার বাবত উৎপন্ন শস্যের একাংশ প্রদান করে তাহাদের ঐ খাজনা টাকায় রূপান্তরিত করিবার অধিকার প্রচলিত আইনেই বিধিবদ্ধ আছে। কিন্তু যাহারা কোনও প্রজাই স্বত্বে জমী বন্দোবস্ত না লইয়া শ্রমিকরূপে বর্গাস্বত্বে জমী চাষাবাদ করে তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর বর্গাদারকে প্রজা স্বীকার করিয়া দেয় খাজনা টাকায় রূপান্তরিত করিবার অধিকার গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন কমিটি প্রস্তাব করিলেও প্রস্তাবিত আইনে এইরূপ বিধির কোনও বিধান নাই। বর্গাদারগণের কিরূপ স্বত্ব হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে দেশের মধ্যে বর্ত্তমানে নানারূপ ভিন্নমত থাকায় এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্যকরী সমিতি এ বিষয়ের অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাদের অনুসন্ধানের ফল ও মতামত নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর আগামী অধিবেশনের পূর্ব্বে জ্ঞাপন করেন।

প্রস্তাবক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (রংপুর)
সমর্থক শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার (নদীয়া)

(১১) যে সকল কোর্ফা প্রজা প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে একাদিক্রমে বার বৎসর কোর্ফা সত্বে কোন জমি দখল করিবে তাহাদের ঐ জমিতে দখলি সত্ব জন্মিবে এবং যে সকল কোর্ফা প্রজা ১৯২৫ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে একাদিক্রমে বার বৎসর কোর্ফা সত্বে জমি দখল করিয়াছে ঐ সকল জমিতে তাহাদের দখলি সত্ব স্বীকৃত হইবে।

প্রস্তাবক শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত (রংপুর)
সমর্থক বাহাদুর আলী বিশ্বাস (নদীয়া)

(১২) জিলা ময়মন সিংহ ও রংপুরের অন্তর্গত পরগণা পাতিলা দহের অস্থায়ী মধ্যস্বত্ব জোতগুলি স্থায়ী মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট বলিয়া আইনে গণ্য করা হউক এবং খাজনা বৃদ্ধির অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হউক।

প্রস্তাবক আজিজর রহমান (ময়মনসিংহ)
সমর্থক মুজিবর রহমান (ময়মনসিংহ)

(১৩) হাট সমূহে যথেচ্ছা তোলা উঠানো প্রথা বন্ধ করা হউক।

(১৪) জমিদারের বা তাহার কর্ম্মচারীর দ্বারা বাজে আদায় পুলিশ চালান অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হউক।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও
সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত।

(১৫) এই সম্মিলনী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নদীয়া জেলার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবিত "বেঙ্গল ফিসারী বিল ১৯২৬" সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করিতেছেন এবং যাহাতে ঐ বিল আইনে পরিণত হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে একান্তে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীব্রজনাথ দাস, (বগুড়া),
সমর্থক—কাজীনজরুল ইসলাম, (বর্দ্ধমান),
(সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত)

(১৬) যেহেতু মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত গরীব এবং যেহেতু তাহাদের একবেলাও মাছ না ধরিলে তাহাদের অন্নসংস্থানের অন্য কোনও ব্যবস্থা নাই বলিয়া এই সম্মিলনী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ত্রিপুরা জেলার প্রতিনিধি মৌ সৈয়দ এমদাদুল হক সাহেবের প্রস্তাবিত "মৎস্যের পোনা সংরক্ষণ আইন" মূলক বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাস মৎস্যধরা বন্ধরাখা সম্বন্ধীয় বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে যাহাতে ঐরূপ সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টকর বে-আইনি আইন বিধিবদ্ধ না হয় তাহার জন্যে যেন সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া দরিদ্র প্রজাসাধারণের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হন।

প্রস্তাবক—শ্রীব্রজনাথ দাস, (বগুড়া)
সমর্থক—কাজী নজরুল ইসলাম, (বর্দ্ধমান),
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)

(১৭) এই সম্মিলনী ফরিদপুর জেলাবাসী মৎস্যজীবী ভ্রাতাদিগের

দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন এবং ফরিদপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর ও অন্যান্য মেম্বরদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাহারা যেন দয়া করিয়া অনতিবিলম্বে মৎস্যজীবীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কাঠা, ভেসাল, আওর, বাধা কোনা প্রভৃতির সাহায্যে মৎস্যধরিবার নিষেধাজ্ঞামূলক বিধির প্রত্যাহার করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেন ফতেপুর হইতে মাদারিপুর পর্য্যন্ত কুমার নদীর সন্নিহিত খাল সমূহে কবাট না দেন।

প্রস্তাবক—শ্রীরমণীমোহন বিশ্বাস, (বরিশাল)
সমর্থক—কাজী নজরুল ইসলাম, (বর্দ্ধমান),
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)

(১৮) এই সম্মিলনী চূর্ণী, হাউলিয়া, ইছামতী, ভাগিরথী, খড়িয়া, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, কুমার প্রভৃতি নদীতে কোমর, জাল, পোলা, বাঙ্কাল, খাটা, বাঁশজাল প্রভৃতির অজুহাতে মৎস্যজীবিদিগকে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি গবর্ণমেন্টের পূর্ত্তবিভাগের ও সে বিভাগের কর্ম্মচারীদের অযৌক্তিক অত্যাচার ও অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন এবং উহার সম্যক প্রতিকার করিয়া অনতিবিলম্বে মৎস্যজীবিদিগকে রক্ষা করিতে গবর্ণমেন্টকে একান্ত অনুরোধ করিতেছেন;

প্রস্তাবক—শ্রীব্রজনাথ দাস, (বগুড়া)
সমর্থক—কাজি নজরুল ইসলাম, (বর্দ্ধমান)
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)

(১৯) বর্ত্তমান প্রস্তাবিত প্রজাসত্ব আইনের সিলেক্ট কমিটিতে [illegible] প্রজাহিতৈষী মেম্বরকে নেওয়ার যে সংশোধনী প্রস্তাব কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে স্বরাজ্য-দলের ও অন্যান্য দলের যে সকল প্রতিনিধি গবর্ণমেন্টের সহিত একযোগে ভোট দেওয়ায় এবং তজ্জন্য ঐ প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় এই সম্মিলনী তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীরমণীমোহন বিশ্বাস (বরিশাল)
সমর্থক—মহিউদ্দিন আহাম্মদ (টাঙ্গাইল)

(২০) প্রজাদের এই দাবী অনুসারে প্রস্তাবিত আইন সংশোধিত না হইলে এই সম্মিলনী বাঙ্গলার প্রজাবর্গকে অনুরোধ করিতেছেন যে ভবিষ্যতে প্রজাসত্ব আইন সংশোধন করার জন্য যেন তাহারা এই সম্মিলনীতে গঠিত বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের দ্বারা মনোনীত কাউন্সিলের পদ প্রার্থীগণকে ভোট দেন।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রম
গৃহীত।

(২১) উপরিউক্ত সমস্ত প্রস্তাব কাউন্সিলে উপস্থাপিত করিবার জন্য এই সম্মিলনী মৌলবী রজিবউদ্দিন তরফদার, মৌলবী কাদের বক্স, মৌলভী আফতাব হোসেন জোয়ার্দ্দার ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মহাশয়কে ক্ষমতা দিতেছেন।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রম
গৃহীত।

৭। বঙ্গদেশের প্রজাগণ রোডসেস হিসাবে বহু টাকা প্রতি বৎসর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিতেছেন। এই রোড সেস সেটেলমেন্ট জরিপের কল্যাণে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। প্রজাগণ ইতিপূর্ব্বে রাস্তাঘাট কূপ ইন্দারা প্রভৃতিতে যে পরিমাণ সুবিধা পাইতেছিলেন বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে অতিরিক্ত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, অতএব এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ডের পারের ঘাট সমূহে কোন প্রকার পারাপারের পয়সা না লাগে তজ্জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

প্রস্তাবক—মোহাম্মদ মকবুল হোসেন
নওগাঁ (রাজসাহী)
সমর্থক—মৌঃ গাজিয়ুর রহমান।
(জামালপুর)

৮। লোকাল বোর্ডের মেম্বর হইতে হইলে বাৎসরিক এক হাজার টাকা আয় দেখাইতে হয় ইহা উঠাইয়া দিয়া ভোটার মাত্রকেই মেম্বর হইবার অধিকার দেওয়া হউক এবং যিনি খাজনা বা চৌকিদারী বা মিউনিসিপালিটিক ট্যাক্স দেন এরূপ ব্যক্তি মাত্রকেই যেন ইউনিয়ন বোর্ড লোকাল বোর্ড ও কাউন্সিলের ভোটার শ্রেণী ভুক্ত করা হয়।

প্রস্তাবক—মুজিবর রহমান খাঁ ফুলপুরী
(ময়মন সিংহ)
সমর্থক—মহিউদ্দিন আহমদ (টাঙ্গাইল)

৯। প্রায় প্রত্যেক বৎসরই ২৫।৩০ কোটি টাকার পাট বঙ্গদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের থলে চট প্রভৃতি তৈয়ারী যোগাইতেছে এবং তদ্দ্বারা বিদেশী বণিকগণ প্রচুর লাভবান হইতেছেন অথচ বঙ্গদেশের কৃষকগণের দুরবস্থার সীমা নাই উহার প্রতিকার কল্পে এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে কৃষকগণ যাহাতে ছালা চট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইতে পারেন তজ্জন্য গ্রামে গ্রামে প্রতি গৃহস্থ বাড়ীতে যাহাতে ছালা চট প্রস্তুত হইতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও
সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১০। এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন মোকররী বা রায়তী জমা বিক্রয় কালীন রেজেষ্টী আফিসে প্রজাপ্রদত্ত সমস্ত বাজেয়াপ্ত (Lapsed) Landlord feeর টাকা যে যে ইউনিয়ন হইতে যত পরিমাণে জমা হয় সেই সেই ইউনিয়ন বোর্ডকে সেই পরিমাণ টাকা গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি বা শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী
জিয়ারখী (নদীয়া)
সমর্থক—শ্রীনিশিকান্ত পাত্র (নদীয়া)

১১। বাঙলায় বিভিন্ন স্থানে প্রতিবৎসর কারণে অকারণে অসংখ্য মেলার আয়োজন হইয়া থাকে ঐ সমস্ত মেলায় বেশ্যা ও জুয়ার,—ও মদ্যপানের কবলে পড়িয়া দরিদ্র অশিক্ষিত জন সাধারণ ধর্ম্ম-অর্থ স্বাস্থ্য দৈনন্দিনই অজ্ঞাতরে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। জুয়াখেলা

যে আইনি তথাপি তাহার পসার ঐ মেলা সমূহে রীতিমত ধুমধামের সহিত চলিয়া আসিতেছে। এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে, গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া মেলায় মদের দোকান, বেশ্যা ও জুয়ার আমদানি বন্ধ করিয়া দেন।

প্রস্তাবক—মোহাম্মদ মকবুল হোসেন
নওগাঁ (রাজসাহী)
সমর্থক—মহিউদ্দিন আহমদ
(টাঙ্গাইল)

১২। বঙ্গদেশের হাট বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর মাপের পাথর (Weights) বর্ত্তমান থাকায় অনেক সময়েই বহু দোকানদার নিরক্ষর অজ্ঞ কৃষকগণ হইতে দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয়ের সময় তাহাদিগকে হিসাবের ফের ফারে ঠকাইয়া থাকে, উহার নিবারণ কল্পে এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে যাহাতে গবর্ণমেন্ট মাপের একটী পাথর নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রচলন করেন (Standard weight), তার ব্যবস্থা জন্য কাউন্সিলে একটী আইন প্রস্তুত করেন এবং কৃষকগণও ৮০ তোলার পাথর দ্বারাই সব জিনিষের খরিদ বিক্রয়ের পক্ষপাতী হইয়া উহাই প্রচলন জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়েন।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও
সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১৩। জমিদার ও তালুকদারগণের অধীনে অনেক লোক বেতনের পরিবর্ত্তে চাকরাণ জমী ভোগ করে কিন্তু ঐ সকল লোক অনিবার্য্য কারণে চাকরী করিতে অক্ষম হইলে কি নাবালক ও স্ত্রীলোক ওয়ারীশ রাখিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইলে ঐ চাকরাণ ভূমি খাস করা হয় তখন ঐ চাকরাণ গৃহীতার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের কোন উপায় থাকে না। এই জন্য এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে চাকরাণ ভূমিতে চাকরাণ গৃহীতার দখলি স্বত্ব বর্ত্তিবার ও ঐ চাকরাণ ভূমি গ্রাম নিরিখে খাজনা দিয়া প্রজা স্বরূপে ভোগ করার বিধান করা হউক।

প্রস্তাবক—কয়েজুদ্দীন হোসেন
(ময়মনসিংহ)
সমর্থক—মুজিবর রহমান (ময়মনসিংহ)

১৪। বাঙ্গলার কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে ঋণভার হইতে মুক্তি দিবার জন্য বিশিষ্ট নিয়মে সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক যাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান ঋণের জন্য কয়েক বৎসরের জন্য পাওনাদারেরা কোনওরূপ নালিশ বা ডিক্রীজারী করিতে না পারে। আইন দ্বারা এইরূপ সমবায় সমিতি গঠন করিয়া প্রজাদিগকে এই সাময়িক ঋণ মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত
ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত

১৫। কৃষির উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য যে রয়াল কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে তাঁহাদিগকে দেশের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা ও জমী বিলির বিধান বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। বাঙ্গলার ভূমি ব্যবস্থার আদ্যোপান্ত সংস্কার ব্যতীত বঙ্গদেশে কৃষির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য এই সম্মিলনীর মতে উক্ত রয়াল কমিশনকে অন্ততঃ বঙ্গদেশে এবিষয়ে অনুসন্ধান করিবার অধিকার দেওয়া কিংবা একটি স্বতন্ত্র কমিশন স্থাপন করিয়া এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত
ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে

১৬। বাঙ্গলার শ্রমজিবী ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বর্ত্তমান কুটীর শিল্পগুলির স্থায়ী উন্নতি বিধান প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং কার্য্য করিবার জন্য একটী স্থায়ী কমিশন নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই কমিশন নানা স্থানে কুটীর শিল্পের বিস্তারিত অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার অসুবিধার প্রতিবিধান এবং তাহার সুযোগ সৃষ্টির উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন এবং নিরূপিত প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবেন।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত
ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত

১৭। প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বব্যাপী ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে তাহার দ্বারা জমীদার ও প্রজার নিকট নূতন কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সম্মিলনী অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক করিবার পক্ষপাতী এবং এজন্য জমীদার ও মধ্যস্বত্বগণের নিকট নূতন কর আদায় করা সমর্থন করেন। কিন্তু এইকর সম্পূর্ণরূপে জমীদার এবং মধ্যস্বত্ববানদিগের নিকট আদায় হওয়া উচিত। প্রজাদিগের নিকট এই করের কোনও অংশ আদায় হওয়ার বিরুদ্ধে এই সম্মিলনী তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

১৮। বাঙ্গলার কৃষকের উৎপন্ন সম্পদ পাট ও অন্যান্য ফসল লইয়া নানা শ্রেণীর দালাল ফড়িয়া মহাজন প্রভৃতি ধনবান হইতেছেন, অথচ উৎপাদকেরা তাহাতে লাভবান হইতেছেন না। এই ব্যবস্থা দূর করিয়া প্রজাকে এই পাট ও অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের বিক্রয় হইতে সম্যক লাভের ব্যবস্থার জন্য সর্ব্বত্র সমবায় বা Co operative society প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশের উৎপন্ন বস্তু একটা দেশব্যাপী বিরাট Federation বা সমবায়ের দ্বারা কলকারখানাওয়ালাদের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয় দেশের সর্ব্বত্র অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন।

সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত
ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত—

খড়কুটো

—:০:—

পরলোকে কাজিম আলী

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর চট্টগ্রামের মৌলবী কাজিম আলী সাহেব ১২ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০টার সময় দিল্লীতে পরলোক দিল্লীতে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। তাঁর বয়স বোধ হয় আশির উপরে উঠেছিল, কিন্তু যুবকেরই মত তাঁর উৎসাহ ছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় যে ক'জন মুসলমান তার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিলেন মৌলবী কাজিম আলীর নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। চট্টগ্রাম হাইস্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এই স্কুলকে চট্টগ্রামের জন-সাধারণে কাজিম আলী হাইস্কুল নামে অভিহিত করে থাকে। মৌলবী কাজিম আলীও চট্টগ্রামে কাজিম আলী মাষ্টার নামে সুবিখ্যাত। যখন মুসলমানেরা কংগ্রেসের নামে ১০ হাত দূরে সরে দাঁড়াত, কাজিম আলী তখনো কংগ্রেস-কর্ম্মী ছিলেন।

• • •

নাবিক সভা

গত রবিবারে সিমেন্স ইউনিয়নের (নাবিক সঙ্ঘের) এক অধিবেশন ইকবালপুর লেনে হয়েছিল। মিঃ এ আহ্‌মদ, ব্যারিষ্টার সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেক্রেটারী মিঃ দাউদ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নাবিকদের বেকার থাকা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করবার জন্যে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তারি অনুমোদন তিনি সভার কাছ থেকে করিয়ে নিলেন। তার পরে নাবিক প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ দাউদের এবং তার পরামর্শদাতা হিসাবে মিঃ মুজাম্মিল আলী ও মিঃ মোগলজানের জেনেভা লেবর কনফারেন্সে পাঠানোর প্রস্তাবও গৃহীত হয়। ব্যারিষ্টার মিঃ এ, আহ্‌মদ নাবিকদিগকে সংহত হতে উপদেশ দিয়েছেন।

• • •

নজরুল ইস্‌লাম

কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেব কৃষ্ণনগরেই থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে চিঠি-পত্র তাঁকে পোঃ কৃষ্ণনগর জিলা নদীয়া ঠিকানাতেই লিখতে হবে। "লাঙল"—আফিসের ঠিকানায় তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখলে সে পত্র সময় মত তিনি পাবেন না।

• • •

কালের ডাকে পারস্য

তেহ্‌রানের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের তারের খবরে জানা গিয়েছে যে পারস্যের মজ্‌লিস্ রেলওয়ে বিল পাস করেছেন। রেলপথ তৈয়ার ও জরীপের কাজের জন্য মজ্‌লিস আপাততঃ ৬০ হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করেছেন। রেলের রাস্তা তৈয়ারের এমন-ভাবে ব্যবস্থা হচ্ছে যাতে রুসের পথ ছাড়াও পারস্যের পণ্য দ্রব্যের যাতায়াতের ব্যবস্থা হতে পারে। তেহ্‌রান হতে বু-সহর পর্য্যন্ত এবং এন্জিলি হতে ইরাক সীমান্ত পর্য্যন্ত আকাশ-যান চালাবার জন্যে মজলিস্ জার্ম্মাণি জঙ্কার্স কোম্পানীকে পাঁচ বছরের জন্যে অনুমতি দিয়েছেন। এ ব্যবস্থায় ইউরোপীয় ও অন্যদীয় আকাশ পথের সাথে পারস্যের যোগ সাধন হয়ে যাবে।

• • •

ভরা গাঙে জল

হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী সরস্বতী নদীর বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তন করে আবার তাতে জলধারা প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করবার জন্য গবর্মেণ্ট ৭০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। পূর্ত্ত বিভাগের উপদেশানুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। জামালপুরের নিকটবর্ত্তী স্লুইচ্-গেট খুলে দিলে দামোদর নদী হতে কনো নদী দিয়া সরস্বতী নদীতে জল প্রবাহিত হবে। আশা করা যাচ্ছে আগামী জুন মাসের ভিতরে একাজ সমাধা হবে।

• • •

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম বৈঠক আগামী ২১শে মার্চ্চ তারিখে পূর্ব্বাহ্ন ৮টা ৩ মিনিটের সময় দলের আফিস ৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলকাতায় বসবে।

শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার

সম্পাদক।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল।

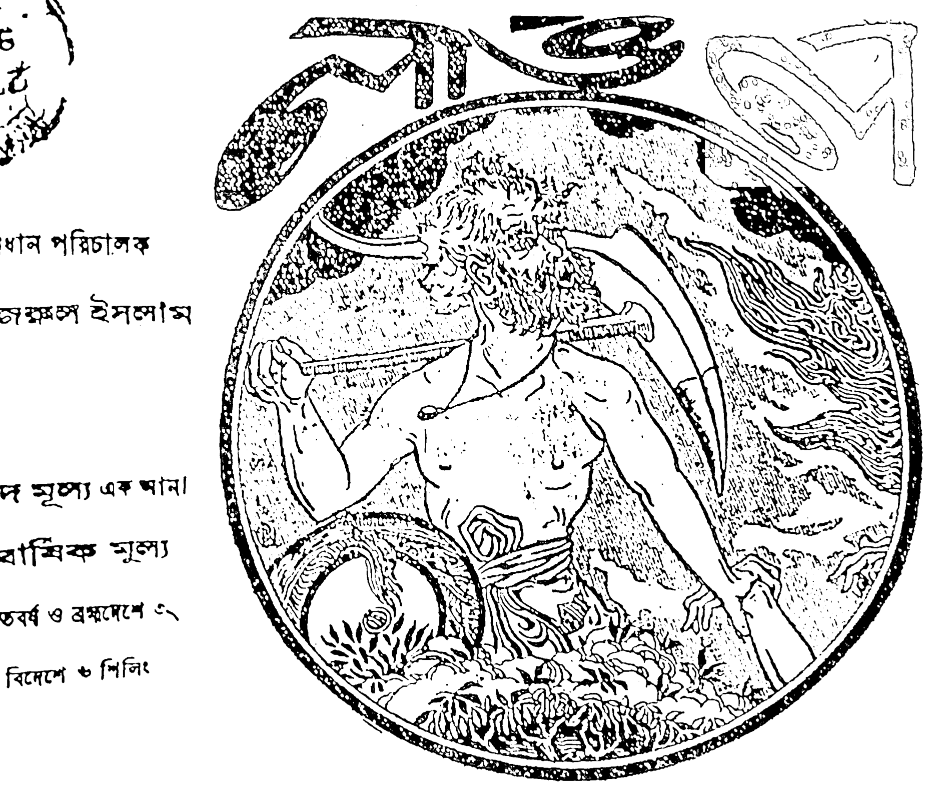
• • •

রাজ-বন্দীর সংবাদ

১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এম-এ সম্প্রতি বর্ম্মার ইনসিন্‌সিন সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী রয়েছেন তাঁর মা ও আত্মীয়রা গত অক্টোবর মাস থেকে তাঁর কোনো পত্রাদি পান নি। এ জন্যে তাঁরা খুব উৎকণ্ঠার সহিত দিন কাটাচ্ছেন। অধ্যাপক ঘোষ কি অসুস্থতার জন্যে চিঠি লিখতে পারছেন না, কিংবা চিঠি লেখা হতে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে—একথা তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা বুঝতে পারছেন না বলে তাঁদের অধীরতা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। হুগ্‌লী বিদ্যামন্দির ভবনের শ্রীযুক্ত গৌরহরি সোম গত অক্টোবর মাসের ১৪ই তারিখে অধ্যাপক ঘোষের কাছ থেকে শেষপত্র পেয়েছেন। তাতে লিখেছিলেন, তিনি ভয়ানক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, বহুমূত্র প্রভৃতিতে ভুগছেন। ইণ্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিশের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল সোম মহাশয়ের পত্রোত্তর তাঁকে জানিয়েছেন যে অধ্যাপক ঘোষ ভাল আছেন। কিন্তু, ভালই যদি রয়েছেন তবে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের লিখ্‌ছেন না কেন? একথার উত্তর কে দেবে?

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড, হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

Reg. No. C[illegible]



প্রধান পরিচালক

নজরুল ইসলাম

নগদ মূল্য এক আনা

বার্ষিক মূল্য

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲

বিদেশে ৬ শিলিং

সম্পাদক

শ্রীমণিভূষণ

মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

প্রথম খণ্ড } বৃহস্পতিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩২, ইং ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ { দশম সংখ্যা

এই সংখ্যায়

চীনের নবজন্ম



লাঙল

[বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | বৃহস্পতিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩২ | ১০ম সংখ্যা

সোশ্যালিজম কাকে বলে?

[ম্যাক্স বিয়ার]

—ঃ০ঃ—

সকল দিক থেকে দেখ্‌লে সোশ্যালিজম বল্‌তে এমন কতকগুলি মত ও নৈতিক অনুশাসনের সমষ্টিকে বোঝায় যদ্দারা সমাজের পুনর্গঠনের প্রণালী সমূহ সূচিত ও প্রণোদিত হয়ে থাকে। এই পুনর্গঠনের ভিত্তি, উৎপাদনের বাস্তব উপায় সমূহে সর্ব্বসাধারণের অধিকার এবং মানুষ আর মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন হওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গণতন্ত্র (Democracy) বল্‌তে যদি জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণেরই দ্বারা, জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সমূহের পরিচালনা বোঝায়, তা হ'লে সোশ্যালিজমের ব্যাখ্যান হবে, জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণেরই দ্বারা, জনসাধারণের উৎপাদনের উপায় সমূহের নিয়ন্ত্রণ।

চীনের নবজন্ম।

অষ্টম সংখ্যক "লাঙল" এ প্রকাশিত হবার পরে

শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এস্, সি
শ্রীসুরেশ বিশ্বাস, বি, এ

——:০:——

২

চীনের আত্ম-অভিব্যক্তির সাধনা

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যখনই কোন জাতি দুর্ব্বল, অধঃপতিত অথবা অবনমিত অবস্থা হইতে তাহার যুগ-যুগ-সঞ্চিত ঔদাস্য, দুর্ব্বলতা ও পরাধীনতা এক মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে তখনই সে উন্নতির যশোগিরি শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছে। সংগ্রামের মৃত্যু-প্রাণীস্রোত তাহাদিগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সংগ্রাম অর্থ শুধু যুদ্ধ নয়, সংগ্রাম অর্থ পরিবর্ত্তন, মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য পরিবর্ত্তন। সংগ্রাম অর্থ নবজন্ম; সংগ্রাম অর্থ বিবর্ত্তন; সর্ব্বোপরি সংগ্রাম, কোন দেশের বা জাতির জীবন স্বরূপ। সংগ্রামবিহীন কোন জীবন নাই—শারীরিক জীবন থাকিতে পারে, কিন্তু জীবন বলিতে যাহা বুঝায় সে-জীবন সংগ্রাম ব্যতীত পরিলক্ষিত হয় না। এই জন্যই চীনের নবজন্মের ইতিহাস জানিতে হইলে এই 'সংগ্রামের' ইতিহাস জানিতে হইবে।

প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে চীন, বিপ্লবের প্রধান তিনটি প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে সে তিনটিই দুরতিক্রম্য।

চীন অতি বিশাল ও বিশৃঙ্খলাময় ছিল। প্রথম প্রতিবন্ধক এইটি। দ্বিতীয়তঃ, চীনবাসিগণ অক্ষরজ্ঞান শূন্য, অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন; শেষতঃ, শাসন-তন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রতিপদে দেশবাসিগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-সঞ্চয়ে বাধা প্রদান করিতেছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, আপাতঃ দৃষ্টিতে দুরতিক্রম্য এই তিনটি প্রতিবন্ধক কি করিয়া চীন অতিক্রম করিয়াছে।

চীনের উপর মাঞ্চু আধিপত্যের প্রথম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে সংস্কারের জন্য আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত কোন মূর্ত্তি লইয়া তাহা গড়িয়া উঠে নাই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন 'তরুণ চীনসঙ্ঘ' (Young China-Party) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই এই আন্দোলন একটি স্বতন্ত্র রূপ পায়। সানইয়েৎসান্ এই সঙ্ঘে যোগদান করিলেন এবং শীঘ্রই এইদলের একটি প্রধান কর্ম্মী হইয়া উঠিলেন। শান্তি এবং শৃঙ্খলার সহিত কোনো অধিকার পাওয়া যায় কিনা, সহকর্মীদের সহিত তাহারই প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। তৎকালে চীন দুর্বিত্ত-শাসন পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছিল। তাহারই সহিত সহযোগে কোনো সুদৃঢ় ব্যবস্থা সঙ্গত পদ্ধতিতে দেশটি শাসিত হইতে পারে কিনা তাহার চেষ্টা চলিল। আবেদন-নিবেদন প্রেরণ করা হইল; ফলে এই হইল যে, মাঞ্চু সরকার হুকুমজারী করিলেন যে, ঐরূপ আন্দোলন বিদ্রোহমূলক, এবং যাহারা উক্তদলে কাজ করিতেছে তাহাদিগকে অবিলম্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বিদ্রোহের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করা হউক।

'অহিংসানীতি' ব্যর্থ হইল। হিংসামূলক নীতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে রাজনৈতিক সংস্কার অসম্ভব দেখিয়া, তাহারা জনবল ও অর্থবল সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। মঞ্চু সরকারকে উচিত শিক্ষা দেওয়াও যে তাহাদের অভিসন্ধি ছিলনা এমন নহে।

জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধের পর একদল সৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে 'ক্যান্‌টোনে' অবস্থান করিতেছিল। সংস্কার প্রয়াসীরা তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া 'ক্যান্‌টোন'-দখল করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। যন্ত্রপাতি, গোলাগুলি, বন্দুক পিস্তল এমন কি ডিনামাইট্ পর্য্যন্ত নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইল। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহারপর হইতেই নানাস্থানে সশস্ত্র-সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে।

সংস্কার প্রয়াসীদের সৈন্যসমূহ কোয়ান্‌সি এবং কোয়ান্‌টাঙ প্রদেশসমূহে বিস্তৃত হইয়া ক্যান্‌টোন অবরোধ করিল; তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রশালা দখল করা। প্রথমে তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্যান্‌টোন্ দখল করিতে যাইবার পূর্ব্বক্ষণে তাহাদের গোলাবারুদ কম পড়ে এবং এমনি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীনের মহাবিপ্লবের যুদ্ধ। হ্যান্‌কাউয়ের উপরে উইনচাঙে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়; এবং তাহারই ফলে মঞ্চুসরকারের সমস্ত ক্ষমতা শেষ হয়, প্রজাতন্ত্র সংস্থাপিত হয়। যাহারা নিয়মিত রূপে মঞ্চুসরকারের অধীনে কাজ করিতেছিল তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার চেষ্টার ফলে এই যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়।

এইস্থানে এই ঘটনাটি বিশদরূপে বিবৃত করা যাইতেছে। য়ুরোপের আদর্শে শিক্ষিত ও সংগঠিত চীন সৈন্য ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহারা 'ইউয়ানসিকাই' নামক উপযুক্ত সেনানায়কাধীন অস্ত্রশস্ত্র ও ক্রীড়াকৌশল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই বুৎপত্তিলাভ করিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত সৈন্যের সংখ্যা

১৩০,০০০ তে পৌছিল। যদি এই সমস্ত বৈদেশিক সমর প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষিত সৈন্যগণ মঞ্চুসরকারের উপর সন্তুষ্ট থাকিত, তবে বিপ্লবীদের সাধের স্বপ্ন কখনই সফল হইতে পারিত না।

সান্-ইয়েৎ সানের সংস্কারের পরিকল্পনা সেনাবিভাগীয় উচ্চতম কর্মচারী হইতে অধস্তন কর্মচারিগণেরও কলুষিত মন বিশুদ্ধ করিয়াছিল। ১৯১১ সালের জানুয়ারীমাসে সমস্ত সৈন্যগণের চারিভাগের তিনভাগ বিপ্লববাদীদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। প্রবল পরাক্রান্ত মঞ্চু গভর্ণমেন্ট এই রাজদ্রোহী সৈন্যগণের আচরণ বুঝিতে পারিয়া যে সকল সৈন্যদলকে সন্দেহ করিতেছিল তাহাদিগকেই অস্ত্রশস্ত্রহীন করিয়া দলভ্রষ্ট করিয়া দিতেছিল। নানকিন্ ও অন্যান্য স্থানে এইরূপে পল্টনদিগকে দলভ্রষ্ট ও অস্ত্রশস্ত্রহীন করিয়া দিল; হন্‌কাউয়ে এবং উচাংএও দুইদল পল্টনকে অস্ত্রহীন করিয়া দিতে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় দল অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিপ্লবের জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার পূর্ব্বেই বিপ্লব আরম্ভ হয়। সান ইয়েৎ সান তখন আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে।

তিনি একচোটে চীন অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি প্রথম নিউইয়র্কে গেলেন, এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে জেনারেল হোমার লি ছিলেন। তিনি সানইয়েতের ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার কার্য্য প্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া সংস্কারপ্রয়াসীদের সৈন্য সংগ্রহে সাহায্য করে সঙ্গ লন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর সান্ লণ্ডন হইতে প্যারীতে গমন করেন। প্যারীতে কিছু দিন থাকিয়া তিনি সিঙ্গাপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে অবতরণ করিলে তাঁহার দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। তাহার পর, তিনি হং কং এ গমন করেন, এবং সেখান হইতে সাংঘাই!—এখানেও তাঁহাকে বিপুল সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করা হয়। নানকিংএ প্রাদেশিক সংস্কৃত (reformed) গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাহাদের প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য অনুরোধ করে। তিনি প্রথমে আপত্তি করেন; অবশেষে পরে তিনি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। সানইয়েৎ সানের তৎপরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ সকলেই জ্ঞাত আছেন;—বর্ত্তমান 'রিপাবলিকান গভর্ণমেণ্ট' দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া যেরূপভাবে সানইয়েৎ সেনের পরিচালিত এবং নির্দ্দিষ্ট পথে সর্ব্বসাধারণের কার্য্য প্রণালীর বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে তাহারা সমগ্র সভ্য জগতের প্রশংসা ও অভিনন্দনের পাত্র হইয়াছেন।

নব্যচীনের ক্রম-বিকাশ

(ক) দেশান্তরে চীনাছাত্রদের শিক্ষা

নব্যচীনের ক্রম বিকাশের ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ বিস্ময়োদ্দীপক সংবাদ যে, কি অনন্য সাধারণ নিষ্ঠা, যত্ন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চীনগণতন্ত্রের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী সানইয়েৎসান্ চীনে সংস্কার আন্দোলন চালাইতেছিলেন এবং ইহার ভিত্তি উপযুক্ত পরিমাণে দৃঢ় করিতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ১৫ বৎসর পূর্ব্বেই চীনের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে সংস্কারক সম্প্রদায় অর্থ সাহায্যে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ ক্যাবিনেটে উচ্চস্থান দখল করিতে পারে এবং সরকারের [illegible] বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ উচ্চ স্থানে নিয়োজিত হইতে পারে সেই [illegible] কয়েকশত ছাত্রকে য়ুরোপ ও আমেরিকায় নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা [illegible] প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিল। মঞ্চু সরকারের [illegible] কালেই তাহারা ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপক সভা ইত্যাদিতে সদস্য হই[illegible] পারিবে এই নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে শিক্ষা পাইতেছিল। সান্[illegible] আরও বিশেষ সুবিধা করিলেন। যাহারা মঞ্চু-সরকার কর্ত্তৃক [illegible] নব প্রণালীতে বিদেশে শিক্ষা পাইতেছিল তাহাদের দ্বারাও [illegible] চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণকালে [illegible] তিনি এই সমস্ত ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সকলকে [illegible] অলৌকিক ক্ষমতাবলে স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ই[illegible] বর্ত্তমান চীনের প্রতিনিধি। ইঁহারা 'সেকেলে'—বিখ্যাত [illegible] পরিবার সমূহের বংশধর, সমগ্র বিদ্বৎজনসমাজে উজ্জ্বল রত্ন সদৃশ।

(খ) নূতন জাতীয় জীবনে চীনা মহিলাদের স্থান

পুরাতন চীন হইতে নূতন-চীনের পরিবর্ত্তন সম্প্রতি এই [illegible] বৎসরের মধ্যে সাধিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের একটি [illegible] লক্ষ্য করিবার জিনিস উদ্বোধিত জাতীয় জীবনে মহিলা[illegible] স্থান।

রাজকীয় পরিবারের বিধবা রাজ্ঞপত্নী ব্যতীত এ পর্য্যন্ত [illegible] চীন মহিলারা রাজনীতিতে যোগদান করেন নাই। চীনমহিলা[illegible] লিখিতে পড়িতে জানিতেন না বলিয়াই বিশ্বাস। বহু [illegible] ব্যাপী ইহাই প্রথা—ইহাই চলিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে চীন মহিলারা রাজনীতি ক্ষেত্রে উচ্চস্থান [illegible] সক্ষম। বহু চীন মহিলা বিপ্লববাদীদের সাহায্য করিয়া[illegible] ......অনেকে নিজেদের স্বাধীনতা ও জীবন্‌পর্য্যন্ত [illegible] করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।...অনেকে সৈন্যদের পোষাক [illegible] পরিয়া সৈন্যদের সহিত এক যোগে যুদ্ধ করিয়াছেন [illegible] সম্বন্ধে ডাঃ সান্‌ইয়েৎ সানের মত এই যে তাঁহারা পুরুষদের সমান রাজনৈতিক সুখ-সুবিধা ভোগ করিবেন। এই [illegible] এ-ঘটনা মোটেই আশ্চার্য্য জনক নয় যে, শিক্ষামন্ত্রী[illegible] একজন স্ত্রী, এবং আর একজন পুরুষ। মহিলা এবং [illegible] ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা পরিষদের সভাপতি পদে নিযুক্ত [illegible]

(গ) চীন মহিলাদের বিদ্যালয়গত শিক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে প্রধানতঃ খৃষ্টান মিশনারীদের [illegible] চীন [illegible] লেখাপড়া শিখিতেছে। কোন কোন স্থানে [illegible] পড়িতেছে। কেহ কেহ বা উচ্চবিদ্যা লাভ করিবার [illegible] পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে ও করিতেছে। তাহাদের [illegible] চ্যাংএর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি [illegible] ভাগিনেয়ী। এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা [illegible] তিনি চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। চীন সংস্কার [illegible] তাঁহার দান কম নহে।

(ঘ) চীন মহিলাদের পাদবন্ধন অভ্যাস পরিহার

চীন বিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে মহিলাগণ যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে পদবন্ধন করিত তাহার ক্রম-পরিবর্তন ও পরিহার। এই অভ্যাস সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ কেহ বলেন এইরূপ করার কারণ এই যে মেয়েরা তাহা হইলে তাহাদের স্বামীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিম্বা গৃহ ছাড়িয়া পলাইতে পারিবে না। অন্য কেহ কেহ বলেন যে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য এইরূপ পদবন্ধন প্রয়োজন। পদদ্বয় ছোট হইলে মেয়েরা দোদুল-দোলায় না দুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এবং সেইজন্য তাহাদের ঠিক দোদুল্যমান স্বর্ণ-কমলের ন্যায় দেখাইবে। পুরুষগণ এই বিশ্রী অভ্যাস পরিত্যাগের পক্ষপাতী কিন্তু মহিলারা কিছুতেই এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না। এবং বিশেষ করিয়া এই মহিলাদের জন্যই ছোট শিশুসন্তানের পদবন্ধনরূপ নিষ্ঠুর কু-প্রথা এখনও যায় নাই। সান্‌ইয়াৎসান প্রথমেই আইন করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন।

চীনের নবজন্মের ইতিহাসে আরও একটি কৌতুক জনক কু-অভ্যাস পরিত্যাগের কাহিনী বলা প্রয়োজন। নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে চীনবাসিগণ তাহাদের লম্বা শিখা বর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমান চীন শিখা রাখার বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—তাহারা য়ুরোপীয় কায়দায়, (তাহারা জার্ম্মানীর কায়দাই বেশী পসন্দ করে) চুল আঁচড়ায়। য়ুরোপীয় পোষাক পরিহিত সানইয়াৎসানের ছবিতে আমরা দেখিতে পাই বিলাতী কায়দায় চুল আঁচড়ানো।

(ঙ) অহিফেন সেবন বর্জ্জন

মানবের সংগ্রামেতিহাসে এমনি করিয়া চীনের একে একে সমস্ত কু-অভ্যাস পরিত্যাগ বাস্তবিকই শিক্ষাপ্রদ। বর্ত্তমান য়ুরোপের যেরূপ মদ্য ও চা তৃষ্ণা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বস্তু, অহিফেন সেবনও ঠিক চীনাদের নিকট সেইরূপ জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল।

চীন সরকার হুকুম জারী করিলেন যে দশ বৎসরের মধ্যে অহিফেন সেবন বন্ধ করিতে হইবে। চীন ব্যতীত সর্ব্বত্রই এইরূপ আদেশ হাস্যকর বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে বাস্তবিকই চীন সরকার অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টায় ছিল। অহিফেন সেবন লক্ষ লক্ষ নরনারীকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহা ছাড়া আর একটী কারণে কার্য্যটী অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছিল। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য প্রজাদের নিকট অহিফেন ব্যবসায় জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। অহিফেন সেবন বন্ধ হইলে তাহাদের নিকট হইতে সরকারী খাজনাও বন্ধ হইয়া গেল। সরকার এই সমস্ত প্রজাদের খাজনা রদ করিয়া দিলেন, যাহারা সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ভিতর অহিফেন সেবন করিত তাহাদিগকে বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। অহিফেন-গর্ত্ত-সমূহ বন্ধ করিয়া ফেলা হইল এবং অহিফেন-সেবীরা জন সাধারণের নিকট রহস্যের পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। নানা প্রদেশে অহিফেন সেবনরূপ নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইল, এবং নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গকারিগণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত। এই প্রকার দমন মূলক পদ্ধতি ও চীন সরকারের কার্য্য প্রণালীগুণে অহিফেন সেবন বন্ধ হইয়া গেল। অতীতের চীন দুর্ব্বল ও অধঃপতিত থাকিতে পারে, কিন্তু জাগ্রত গৌরবময় বর্ত্তমান-চীন তাহা নহে। অহিফেন সেবন ছাড়িয়া অচেতন অবস্থা হইতে সে চৈতন্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে!

(চ) যুদ্ধ বিদ্যার পুনরুত্থান

চীন যে পুরাতন হইতে নূতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে তাহা আমরা এই যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ে আলোচনা করিয়া সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। মঞ্চু সরকারের অধীন চীনারা সৈন্যদিগকে ঘৃণা করিত। তাহারা জ্ঞান ও বিদ্যার পূজা করিত—জীবন সংগ্রামে তাহা কার্য্যকরী হউক আর নাই হউক। পুরাতন সাহিত্য অধ্যয়ন করিত 'ক্লাসিক' কাব্য মুখস্ত করিত; কিন্তু যে যোদ্ধা দেশের সম্মান রক্ষার্থ স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইত না তাহাদিগকে চীনের লোকগণ জানোয়ার অথবা সামাজিক শয়তান বলিয়া ডাকিত। কিন্তু বিপ্লব সমস্ত কিছুরই পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। বর্ত্তমান চীন আর যোদ্ধাকে ঘৃণা করে না, কিম্বা সাহস-বীর্য্যের অসম্মান প্রদর্শন করে না। সানইয়াৎসান প্রাদেশিক চীনগণতন্ত্রের সভাপতি হইবার পরদিনই স্বয়ং চীনসৈন্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। চীন সাধারণ তন্ত্রী সরকারের সর্ব্ব প্রথম না হউক, অতি প্রথমেই দলবদ্ধ চীনসৈন্য সংগঠনের আদেশ প্রদান করেন। চীন বড় দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াই এ শিক্ষা পাইয়াছে যে স্বীয় সন্তানগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে না পারিলে কোন জাতিই বৃহৎ জগৎ সভার সম্মানের দাবী করিতে পারে না। গত বিংশ বৎসরের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তির নিকট হইতেও অপমানের উপর অপমানের বোঝা চীনের মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে। কোরিয়ার উপর চীন সাম্রাজ্যের আধিপত্য লইয়া যে ঘটনা সংঘটিত হয় তাহাই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাপানের সহিত যুদ্ধে চীন স্বাধীনতার উপর এমনি বজ্র নির্ঘোষিত হইয়াছিল যে সে তাহার সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষের স্বাধীনতার জন্য য়ুরোপীয় ক্ষমতা সমূহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার চেয়েও অপমানের বিষয় এই যে দুইজন জার্ম্মান মিশনারীর হত্যার জন্য চীনের কিয়দংশ "কিয়োচাও" দণ্ডস্বরূপ তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। ইহার পরেই প্রসিদ্ধ Boxer Risjng সম্মিলিত শক্তি অত্যাচারের প্রতিশোধ কল্পে পেকিং লুণ্ঠন, শহর লুট এবং মহিলাদিগকে অপমান করে। নিরপেক্ষ চীনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়ায় রুশ জাপানের যুদ্ধ হয়। ইহাতেও চীনের অপমানের একশেষ। এই সমস্ত ব্যাপারেই চীনের সর্ব্বসাধারণের ভিতর একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এযাবৎকাল একটি বিশালকায় জন্তুর মত চীন চির উদাসীন ছিল, কিছুতেই চেতনা প্রেরণা হইত না। এতদিন চীন উঠিয়া পড়িয়া সৈন্যসংগ্রহে মন দেয় নাই। বর্ত্তমানের চীনদেশবাসিগণ তাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে বুঝিতেছে যে তাঁহাদের পিতা, প্রপিতামহদের প্রাচীন সভ্যতা এবং প্রিয় বিদ্যোৎসাহীদের মার্জ্জিত কর্ষণা (culture) বৈদেশিক শত্রুর

খনের অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে না। প্রাচীন ও নবীন চীনের মূলগত পার্থক্য এই যে নবচীন রণনীতিতে শক্তিসম্পন্ন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, প্রাচীন সৈন্যদিগকে ঘৃণা করিত। সাধারণ তন্ত্রের সৈন্যগণকে ইতিমধ্যেই ইংরেজী ও আমেরিকার সামরিক যুদ্ধকৌশলী কর্মচারিগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। সাধারণতন্ত্রের সরকারের নিকট সর্বাপেক্ষা আধুনিক দ্রুত অগ্নিনিক্ষেপকারী বন্দুক পাঠান হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা বর্তমানের সাধারণ সামরিক সজ্ববদ্ধতা উৎকৃষ্টতর। চীন সাধারণতন্ত্র বৃহদাকারে সামরিক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে; এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে সমস্ত কর্মচারি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে তাহাদের দ্বারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রতিই তাহার বর্তমানে ঝোঁক বেশী। বর্তমানে প্রশ্ন হইতেছে যে সুদূর প্রাচ্যের শক্তির সমতা (Balance of Power) রাখিবার নিমিত্ত চীনের এই নবাগত সামরিক শক্তি কি প্রভাব বিস্তার করিবে? চীনের উপর কতদিন এই পীতাতঙ্ক (yellow peril) রাখিবার নিমিত্ত পরিশেষে কি য়ুরোপ ফিরিয়া যাওইবার ইস্তাফা জারী করিবে? হয় তো শেষে তাহাই দাঁড়াইবে, কিন্তু বর্তমানে সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে চীনসৈন্যগণ সুদূরব্যাপী ফল প্রসব করিবে।

(ছ) শিল্পকলার জাগরণ

চীনের খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা ও প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। কিন্তু এ পর্যন্ত এই দুটি শ্রেষ্ঠ শিল্পের জাগরণের জন্য কোন বিশাল আয়োজনে কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। সম্প্রতি সরকারও সাহায্য করিতেছে এবং কার্য্যও বৃহৎ ব্যাপার ধারণ করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই শিল্পের জাগরণই চীনকে দারিদ্র্যের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। চীন দেশটি আয়তনে বৃহৎ—উৎপন্ন দ্রব্য বা খনিজ পদার্থ না পাওয়া গেলে সর্বাপেক্ষা ভাল সময়েও কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করা হয়। একবার বৃষ্টির অভাব হইলেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু অনিবার্য্য। বাহিরের লোকেরাও এই শিল্পকলার জাগরণের সুফল ভোগ করিতেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বণিকগণ চীনকে অভাবনীয়রূপে লাভজনক বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ তন্ত্র সংস্থাপনের পর চীন বাস্তবপক্ষে বাণিজ্যের নব বিবর্তনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থনীতি গত পরিবর্তনও লোক সংখ্যার বিপুলতা হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে সাধিত হইয়াছে।

(জ) বাণিজ্যে পরিবর্তন।

(ঝ) অর্থনীতিতে পরিবর্তন।

(ঞ) চীনের নূতন জীবন।

নব নব আবিষ্কারের ফলে খাদ্যদ্রব্য বিলাসব্যসনের দ্রব্য চীনে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বনিয়াদীঘরের লোকেরা এবং ধনীরাই যে সে সুখ সুবিধা উপভোগ করিতেছে এমন নহে। ইহাতে সাধারণের সুখ সুবিধাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্বের মত চীনারা আর মোমবাতী অথবা মেটে প্রদীপ জ্বালায় না। তাহারা আমেরিকার আলো কিনিয়া প্রায়ান্ধকার ঘর সমূহের দুর্দ্দশা দূর করিয়াছে। ক্যান্টোনের সরু রাস্তা গুলি, রাস্তার দুই পার্শ্বের গৃহগুলি জার্মান বাতির আলোক উদ্ভাসিত। মাটীর পরিবর্তে লালটালী দিয়া গৃহ নির্মিত হইতেছে। চীনের সে দিন আর নাই। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আর নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় না। তাহারা আজকাল জামা কাপড় পরে। চীনের পল্লীতে পল্লীতে আজকাল লক্ষ লক্ষ সিঙ্গার সুইং মেসিন চলিতেছে। এক কথায় বর্তমান চীন পূর্ণমাত্রায় সভ্য হইয়া উঠিয়াছে।

(ট) তুলা ও ময়দার কল

চীনের বিভিন্ন স্থানে তুলা ও ময়দার কল স্থাপিত হইয়াছে।

(ঠ) রেশমের কারবার

দেশের সর্বত্র আধুনিক প্রণালীতে রেশমের ব্যবসায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, দেশজ লৌহের কারবার এবং বিলেতী কল কব্জা বসানো "মেসিন সপ" সমুদ্র তীরে নদীর কূল এবং রেলের ধারে স্থাপিত হইয়াছে।

(ড) রেলওয়ে স্থাপন

শিল্প বাণিজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য রেলওয়ে স্থাপন অতি আবশ্যক। চীন "গবর্ণমেন্টের ইম্পিরিয়েল রেলওয়ে" "সাংঘাই নানকিং" রেলওয়ে এবং অন্যান্য অনেক রেলওয়ে স্থাপিত হইয়াছে। সরকারও যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। চীন রেলওয়ে স্যানটোনএর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের জন্য "হুনান" হইতে খাদ্য শস্য আনিতেছে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গমনকারী জাহাজের সন্নিকটে কয়লা, লৌহ, চীন মৃত্তিকা এবং চীন শিল্প হইতে উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করিতেছে।

(ঢ) সাহিত্যিক জাগরণ

সাহিত্যিক জাগরণও চীনের নব-জন্মের ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। চীন বিশ্বজন সমাজে দুইটি কর্ষণের (culture) ধারা প্রবাহিত হইতেছে। একটি ধারা চীনের নিজস্ব, প্রাচীন সাহিত্য এবং প্রাচীন সভ্যতার ধারা, একদল তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চায়। অপর একটি ধারা চীন দেশবাসীদিগকে প্রতীচ্য এবং সমস্ত সভ্যদেশ সমূহ হইতে সাহিত্যিক ধারণা এবং কর্ষণার আদর্শ গ্রহণ এবং তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছে। এই শেষোক্ত কর্ষণার ধারাই চীনের নব্য সম্প্রদায়কে বিচলিত করিয়াছে এবং সম্প্রতি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চীনের আহ্বানের মূলসূত্র ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে।

বৈদেশিক উৎপীড়ন

বর্তমান সময়ে চীন কোন শক্তি বিশেষ বা সম্মিলিত শক্তির দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে বলিয়া মনে হয়। বৈদেশিকেরা মাংসলোলুপ শকুনীর ন্যায় চীনের শরীরের অংশ লইবার প্রত্যাশায় দ্বারে সমাসীন। চীন পুনরায় আত্ম-কলহে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ বাণিজ্য শুল্কের স্বাধীনতা হ্রাস; জাতীয় অর্থবলের শোচনীয় অবস্থা, চীনের অনিচ্ছাকৃত বৈদেশিকগণের হস্তে আংশিক ক্ষমতা অর্পণ এবং এই সমস্তের ফল স্বরূপ চীনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া।

বৈদেশিক শক্তি সমূহ চীনের দ্বারদেশে অলস ভাবে বসিয়া নাই। তাহারা নির্লজ্জভাবে চীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে; জটিল কূটনীতির ধাঁধাময় পথে বিচরণ করিতেছে। চীনের নদীতে ও সাগরে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিয়া বাস্তবিক পক্ষে চীন-রাষ্ট্র শক্তির অপমান করিতেছে। ম্যাক্সিকোতেও এই সে দিন ঠিক এইরূপই একটি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিশৃঙ্খলার সময় একজন ইংরেজ মহিলাকে পর্য্যন্ত হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ, ফরাসী অথবা আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের রাজশক্তি সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নাই। ইহার কারণ এই যে "ম্যাক্সিকো" শেতাঙ্গ মানুষগণের বাসস্থান আমেরিকার অন্তর্গত একটি প্রদেশ;—এবং আমেরিকা শুধু আমেরিকা বাসীদের জন্য তথায় এই "মনরোবাদ" (Monroe Doctrine) প্রচলিত আছে।

এসিয়ার বিভিন্ন দেশ সমূহের মিলন
(Asiatic Federation)

প্রশ্ন হইতেছে কি করিয়া ইহার প্রতীকার বিধান করা যায়। Asiatic Federationই একমাত্র উপায়। এসিয়াদেশবাসী আমরা কি চিরকাল য়ুরোপ ও আমেরিকার চিরদাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকিব? প্রাণ জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর দিতেছে—না। গত রুশ-জাপানের যুদ্ধে সে এই বাক্যকে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছে। সমগ্র এসিয়ার মিলন প্রয়াসী হইয়া সেই অগ্রগামী হইয়াছে। চীনও যোগদান করিয়াছে। ভারতও পিছনে পড়িয়া নাই। এই শুভ মুহূর্ত্তে এসিয়ার ভ্রাতৃবৃন্দের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য সেও সময় এসিয়া সম্মিলনে একত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে যে ভারতের পূর্ণ সহানুভূতি এবং সহযোগিতা আছে, এই বাণী মৃত পুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কম্বুকণ্ঠে সর্ব্বপ্রথম ঘোষিত করেন। ভারতের উপাদানেবতা সদৃশ, ভারত রাজনীতি ক্ষেত্রে নববুদ্ধ অবতার স্বরূপ এই পুরুষ দেহত্যাগ করিয়াছেন। সমগ্র এসিয়া সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার দূরদর্শীতা বলে উপলব্ধি করেন এবং ভারতীয় স্বরাজ্য দলের কার্য্যপ্রণালীর তালিকা ভুক্ত করিয়া এই নববাণী তিনিই তাঁহার দেশবাসীগণকে সর্ব্বপ্রথম শোনান। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

[মূল প্রবন্ধ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সালের Forward এ ইংরেজীতে প্রবন্ধ হয়। বিনানুমতিতে কেহ প্রবন্ধ হইতে কোন অংশ বা সমগ্র প্রবন্ধ ছাপাইতে পারিবেন না। সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

Asiatic Federationএর কথা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে তাঁর সম্পাদিত বোম্বে হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক Socialist পত্রিকায় ঘোষণা করেছিলেন। স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করেছেন এর পরে।

সম্পাদক, "লাঙল"

খড়কুটো

—:•:—

মান্দালয় জেলের রাজবন্দীরা প্রায়োপবেশন করেছেন। দুর্গাপূজা আর সরস্বতীপূজায় কিছু টাকা খরচ হয়েছিল, এমন কি গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী সাপেক্ষ ভাবে সে টাকা জেলের ট্রেজারী হতে দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখন তা দিতে অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, জেলের টাকা জেলকে ফেরৎ দিতে হবে। এছাড়া কাপড় ও পুস্তকাদি অন্যান্য জিনিসও তাঁরা যথা প্রয়োজন পান নি। এ সমস্ত কারণে তাঁরা প্রায়োপবেশন করেছেন।

* * *

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার রাত্রি ১১টার সময় হতে ৩টা পর্য্যন্ত গোয়েন্দা পুলিশের লোকেরা ৩৭।১, বেনিয়াপুকুর রোডের বাড়ীখানা তালাসি করেছিল। কোনো আপত্তি জনক জিনিস পাওয়া যায়নি। তবে শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ মহকুমার শ্রীযুত রাজেন্দ্র দাস ওরফে যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তকে পুলিশের লোকেরা গেরেফ্‌তার করে নিয়ে গেছে। প্রকাশ, শ্রীযুত রাজেন্দ্র দাস মানিকতলার বোমার মোকদ্দমার পলাতক আসামী। বেনিয়াপুকুরের এই বাড়ীতে মোহাম্মদ ইসমাইল নামক যাদবপুর টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের একটি ছাত্র থাকে। এ ছাত্রটির বাড়ীও করিমগঞ্জ মহকুমায়। শ্রীযুত রাজেন্দ্র দাস ইহারই অতিথি রূপে ক'দিন থেকে এ বাড়ীতে বাস করছিল।

* * *

গার্ডেনরীচের অনতি দূরে বদরতলার ইষ্টনিয়ন সাউথ জুট মিলের বয়ন বিভাগের ৬ শত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। ফলে, মিলের সকল শ্রমিকই বেকার বসে আছে। ঠিকা কাজের বন্দোবস্ত শ্রমিকদের মনঃপুত না হওয়াই ধর্ম্মঘটের কারণ।

* * *

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্যদলের সভ্য মৌলবী সম্সুল হক সাহেব ল'কলেজে আইন পড়ছেন এবং মৌলবী আমানত খান সাহেব আইনের পরীক্ষা দিয়েছেন।

* * *

পত্রান্তরে প্রকাশ, স্যর্ আবদুল রহীম একটি মুসলমান দল গড়বার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি স্বয়ং এ দলের প্রধান পাণ্ডা হবেন, আর মৌলবী এ-কে ফজলুল হক সাহেব হবেন সহকারী পাণ্ডা।

শচীন সান্যালের উপর আবার অর্ডিন্যান্স !

—:•:—

সকলেই জানেন, বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শ্রীযুত শচীন্দ্র নাথ সান্যাল ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। এ মোকদ্দমার পূর্ব্বে তিনি ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে রাজবন্দী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে তিনি "রিভোলিউশনারী" (বিপ্লববাদী) নামক একখানা পুস্তিকা বাঁকুড়ার বিভিন্ন ব্যক্তির নিকটে প্রেরণ করেছিলেন। যাঁদের নিকটে পাঠানো হয়েছিল তাঁদের সকলই সরকারী চাকুরে। প্যাকেটের উপরে যে ঠিকানা লেখা হয়েছিল তাহাই নাকি সান্যাল মহাশয়ের সাজা পাওয়ার একমাত্র কারণ। এ বিচারের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল হয়েছে। বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ ও ডুবালের আদালতে এই আপীলের শুনানি হয়ে গেছে। রায় এখনো মুলতবী রয়েছে।

শ্রীযুত শচীন্দ্র নাথ সান্যালের বিরুদ্ধে সম্প্রতি আর এক ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমাও চলেছে। লক্ষ্ণৌতে বর্ত্তমানে যে কাকোরী ট্রেণ ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা চলছে তিনি তাতেও অভিযুক্ত হয়ে লক্ষ্ণৌ নীত হয়েছেন।

"সম্প্রতি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা তার যোগে জানাইয়াছেন যে, উক্ত শচীন সান্যালকে কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলায় আসামীরূপে সেখানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং সেখানে তাঁহাকে সাধারণ বন্দীর মত রাখা হইয়াছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী আসামী শচীন্দ্র সান্যাল আদালতকে জানান যে, ঐ দিবস বঙ্গীয় সরকার বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স আইন অনুসারে তাঁহার উপর এক পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

"আসামীর বক্তব্য শুনিয়া আদালত হইতে এই মন্তব্য পাশ হয় যে, বাংলা সরকার এইরূপে অর্ডিন্যান্স আইন জারি করিয়া এক অভিনব কাজ করিয়াছেন। যাহা হউক যতদিন শচীন সান্যাল কাকোরী মামলায় বিচারাধীন আসামীরূপে অবস্থান করিবে, ততদিন বঙ্গীয় সরকারের ঐ আদেশ কার্য্যকারী হইবে না। আদালতের ঐ আদেশ শুনিয়া শচীন সান্যাল মর্ম্মস্পর্শী ভাবে গদগদ কণ্ঠে বলেন :—"আমি রাজবন্দীরূপে এখানে আনীত হই না। এখানে আমার উপর অর্ডিন্যান্স জারি করিবার বাংলা সরকারের কোনও অধিকার নাই। এই আদেশ জারি সম্পর্কীয় কাগজপত্রও এখানে আমার নিকট আসে নাই। আমি এখন নিরাশ্রয়। এখন আমি আদালতের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আমি আদালতের মারফতে সরকার ও দেশবাসীর নিকট নিবেদন জানাইতেছি।"

"উক্ত আদেশ জারির কারণ সম্বন্ধে উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রথমে শচীন সান্যালকে অর্ডিন্যান্স আইন মতই গ্রেপ্তার করা হয়। সে জন্য শচীন বাবুর স্ত্রী মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া ভাতা সরকারের নিকট হইতে পাইতেন। কিন্তু বাঁকুড়ার মামলায় শচীন বাবুর দুই বৎসরের জেল হইলে সরকার শচীন বাবুর স্ত্রীর ভাতা বন্ধ করেন। উহার পর হইতে এযাবৎকাল শচীন বাবুকে সাধারণ বন্দীর মতই ব্যবহার করা হইতেছে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় নাকি শচীন বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রধানতঃ ঐ "রিভোলিউশনরী" পুস্তিকা প্রকাশ সম্পর্কে। কলিকাতা হাইকোর্টে বাঁকুড়া মামলায় আপীলের শুনানী হইয়া গিয়াছে। রায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সম্ভবতঃ আপীলে শচীন বাবুর জয় হইবে। আর ঐ আপীলে জয় হইলে কাকোরি মামলাতেও শচীন বাবুর বিরুদ্ধে তেমন সুবিধাজনক হইবে না বলিয়া প্রকাশ। যদি উক্ত দুই মামলাতেই শচীন বাবু অব্যাহতি পান তবুও তিনি অর্ডিন্যান্স আইনমত বন্দী থাকিবেন, এই উদ্দেশ্যেই এই অর্ডিন্যান্স জারি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অপূর্ব্ব এ ব্যবহার।" (নায়ক)

বাঙ্‌লার প্রজাস্বত্ববিষয়ক বিধি

শ্রীহৃষীকেশ সেন

—:১:—

(৪)

জমিদারের ভূম্যধিকারিত্ব সম্বন্ধে যে গবর্ণমেন্টেরও সন্দেহ আছে, সম্প্রতি তার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। গত বুধবারে (২০শে জানুয়ারী, ১৯২৬) লর্ড রেডিং ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধনে বলেছেন যে এদেশের কৃষির উন্নতি করবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয়েছে। এই কমিশন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারিত্ব, প্রজাস্বত্ব এবং রাজস্ব নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে প্রণালী এখন চলছে, তারও সবিশেষ অনুসন্ধান করবেন। লর্ড রেডিং এর কথায় "It will be within the scope of the commission's duties to examine the existing system of land revenue • • •"। এর মধ্যে বাঙলা দেশে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করার কথাই নেই; লর্ড কর্ণওয়ালিস সেটা অনন্ত কালের জন্য

নির্দ্ধারিত করে দিয়ে গিয়েছেন। আর বাঙলার জমিদারেরা তাঁর প্রসাদাৎ প্রজার কাছ থেকে যা আদায় করছেন তার তিন ভাগ সচ্ছন্দে নিজে নিচ্ছেন এবং এক ভাগ গবর্ণমেণ্টকে দিচ্ছেন। অপর ৩টি দিয়ে—ভূম্যধিকারিত্ব এবং প্রজাস্বত্ব। জমিদার ধরে' নিয়েছেন যে তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই ফল। কিন্তু তাঁদের কাছে যা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, প্রজার কাছে তা ধর্ম্মতঃ মিথ্যা। গবর্ণমেণ্ট সেইজন্য রয়াল কমিশনের দ্বারা জমিদারের ভূম্যধিকারিত্বটা স্থির করিয়ে নিতে চান। এই সুযোগে প্রজাসমিতি যেখানে যত আছে, তাদের কর্ত্তব্য একটা দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করে দেশের লোককে এবং কমিশনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে জমির প্রকৃত অধিকারী প্রজা, জমিদার নয়। রয়াল কমিশনের মেম্বরেরা অবশ্য জানেন যে ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই ভূম্যধিকারিত্ব প্রজাকে দেবার জন্য কত চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে। জমিদার এর প্রতিবাদে একটি কথা বলতে পারেন যে, ভূম্যধিকারিত্ব তাঁর ন্যস্ত অধিকার (vested right). তাঁর এই ভ্রমটা প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করে দিতে হবে। তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তিনি খাজনা আদায়ের কমিশন এজেণ্ট মাত্র, জমির মালিক নন। রাজস্বসম্বন্ধেও, তিনি যদি এখনও না মেনে থাকেন ত তাঁকে জানতে হবে যে তথাকথিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যখন দেওয়া হয় তখন কথা ছিল প্রজার কাছে খাজনা-স্বরূপ যা আদায় করবেন জমিদার তাঁর পারিশ্রমিক স্বরূপ তার উপর কমিশন পাবেন শতকরা দশ টাকা মাত্র, এখনকার মত শতকরা তিনশ' টাকা নয়। নবাবী আমলে যাঁরা জমিদার ছিলেন তাঁরা আদায়-করা খাজনার হিসেব দিতেন এবং শতকরা দশ টাকার অনধিক পারিশ্রমিক পেতেন।

এইখানে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট লর্ড কর্ণওয়ালিসের সত্য পালন করতে যে খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তা' বলে বোধ হয় না। বাঙলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইবার পরেই তার দোষগুলি বেশ দেখা যেতে লাগল। গবর্ণমেণ্ট তখন অন্যান্য প্রদেশে আর এ বন্দোবস্ত চালালেন না। অন্য অন্য প্রদেশে সাময়িক বন্দোবস্ত হতে লাগল। সময়ে সময়ে প্রায়ই ত্রিশ বৎসর অন্তর, গবর্ণমেণ্ট জমিদারদের সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত করেন। তাতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বেড়েই যায়। বাঙলায় রাজস্ব বাড়তে পায় না। সেইজন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভেঙে সাময়িক বন্দোবস্ত চালাতে পারলে গবর্ণমেণ্টের লাভই হয়। কিন্তু প্রজার তাতে কিছু লাভ নেই। সাময়িক বন্দোবস্তে তার খাজনার হার কমবে না, স্থায়ীও হবে না। জমিতে তার স্বত্ব-স্বামিত্বও জন্মাবে না। সেইজন্য প্রজা চায় যে কর্ণওয়ালিসী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে এমন একটা বন্দোবস্ত হ'ক যাতে প্রজার স্বত্ব-স্বামিত্ব চিরস্থায়ী হয়। এবং আসল রাজা ও আসল প্রজার মধ্যে জমিদাররূপী কোন কৃত্রিম রাজা না থাকে। জমিতে তার স্বত্ব-স্বামিত্ব স্থায়ী না হলে প্রজা কখন তার জমির উন্নতি করবেনা। কৃষির উন্নতিও হবে না। একথা এখন পৃথিবীর সর্ব্বদেশে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেইজন্য সর্ব্বদেশেই এখন প্রজাকে জমির স্বত্বস্বামিত্ব দেবার চেষ্টা হচ্ছে। অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাক কারণ, ইংলণ্ডই আমাদের শাসনকর্ত্তাদের নজীর। সেই নজীরের বলেই ইংলণ্ডের আসল Land Lord'-এর মত এদেশে নকল ভূম্যধিকারী'র (Imitation Land-Lord) সৃষ্টি হয়েছে। এখন আবার সেই নজীরের বলেই এই নকল ভূম্যধিকারীর ভূম্যধিকারিত্বের স্থানে প্রজার ভূম্যধিকারিত্ব হ'ক।

কিন্তু ইংলণ্ড আমাদের শাসন কর্ত্তাদের আদর্শ হলেও, সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে সকল বিষয়ে সে আদর্শ অনুসারে কার্য্য করা তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। যেমন সেখানকার ভূম্যধিকারীরা জমির সকল রকম উন্নতি করে দেন, কিন্তু এ দেশের জমিদারেরা সে সকল কিছুই করেন না; করতে বাধ্যও নন; যখন ইংলণ্ডের আদর্শ সুবিধাজনক হয় না তখন এ দেশের প্রচলিত আচারের (customs) দোহাই দেওয়া হয়। জমির খাজনা নির্দ্ধারণ করতে বা খাজনা বৃদ্ধি করতে হলে দেশের আচার অনুসারে তা' করতে হয়। কিন্তু এই আচার আবার প্রাচীন হিন্দু আচার হলে' সুবিধা হয় না। হিন্দু আচার অনুসারে রাজস্ব হওয়া উচিত জমির উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ। জমিতে যা উৎপন্ন হবে, রাজস্বটা তার একটা অংশ হবে, এর চেয়ে রাজস্ব-নির্দ্ধারণের আর উৎকৃষ্টতর উপায় কি হতে পারে? এতে আপত্তি হতে পারে এই যে উৎপন্ন দ্রব্যের একটা অংশ রাজস্ব স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা এবং সংগ্রহ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য। উত্তরে বলা যেতে পারে যে আয়কর নির্দ্ধারণ করতে প্রতি বৎসর প্রত্যেক কর দাতার আয় নির্দ্ধারণ করা হচ্ছে। বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারণ করতেও প্রতিবারে পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা হচ্ছে; কেবল কৃষিজাত দ্রব্যেরই পরিমাণ ও দ্রব্য মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব? ব্যয় সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে এখন রাজস্বের একটি টাকা রাজকোষে পৌঁছে দিতে প্রজাকে আর তিন টাকা দিতে হয়। যদি আয় করের মত প্রতি বৎসর জমির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে, তার একটা অংশ রাজস্বরূপে সংগ্রহ করা হয় তা' হলে তার চেয়ে নিশ্চয়ই ব্যয় অনেক কম হবে। এখন ব্যয়টা হচ্ছে জমিদারের ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, পাইক প্রভৃতি কতকগুলি বুভুক্ষু দায়িত্বশূন্য জমিদারের কর্ম্মচারীর জন্য, আর জমিদারের অযথা সাধ্যের জন্য; তখন হবে কতকগুলি দায়িত্ব-বিশিষ্ট রাজ কর্ম্মচারীর জন্য।

প্রজার আর একটা লাভ হবে এই যে এখন যেমন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে অজন্মা হলেও জমিদারের খাজনাটি পূর্ণমাত্রায় দিতে হয়, তখন আর তা হবে না। যেমন জন্মাবে তেমনি দেবে, না জন্মালে দিতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা প্রজার আয় এবং আয়করের মতই এর নির্দ্ধারণ ও আদায় হবে। এখন যে আয়ের উপর কর দিতে হয়, অবস্থা অনুসারে তার পরিমাণ অবশ্য কমিয়ে দিতে হবে।

(৫)

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিলের প্রধান কথা প্রজার স্বত্ব

স্বত্ব হস্তান্তরিত করবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করা। কোন কোন প্রজাবন্ধু বলেন যে প্রজাকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হ'ক যার দ্বারা প্রজা নিজের দখলী জমি ইচ্ছেমত বিক্রয়, দান, বন্ধক, স্বত্ব-ত্যাগ প্রভৃতির দ্বারা হস্তান্তরিত করতে পারে। তাঁদের মতে এই ক্ষমতা না থাকলে প্রজার স্বত্বাধিকার অপূর্ণ থাকে। নিজস্ব সম্পত্তিকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করবার স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তিই যে সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় তা' বলা যায় না। সকল সম্পত্তিই, বিশেষতঃ ভূ-সম্পত্তি, দেশের, জাতির, সমাজের সম্পত্তি হওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয়; কারণ, সম্পত্তি এক জনের অধিকারগত হলেই আর একজন তা' থেকে বঞ্চিত হবে। স্বাধীনতা সম্বন্ধেও ঐ কথা, তারও ইচ্ছেমত ব্যবহার অন্যের অনিষ্টজনক হতে পারে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেয়ে এখন জাতীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতারই বেশী আবশ্যক। গণের হিতের জন্য জনের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। জমির স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত করা সম্বন্ধেও এই মূল সূত্র মনে রাখতে হবে। তার পর এ সম্বন্ধে দেশের চির প্রচলিত প্রথাও দেখতে হবে। সেকালে কৃষক যে তার জমি হস্তান্তরিত করতে পারত তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, কারণ, তখনকার মূলনীতি ছিল, যে জমি চাষ করবে জমি তারই অর্থাৎ কৃষক জমির চাষ করবারই অধিকারী, জমির অন্য কোন ব্যবহার করবার তার অধিকার নেই। চাষের জমিতে অন্য কোন অধিকার থাকাও যুক্তিযুক্ত বলে বোধ হয় না।

এ কালেও সে প্রথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একাল বলতে অবশ্য বুঝতে হবে ব্রিটিশ-শাসন আরম্ভের পর। ১৭৮৯ সালের জুন মাসে Shore যে মিনিট লেখেন তাতে তিনি বলেন দীর্ঘ কাল দখল করার জন্য জমিতে রায়তের দখলী স্বত্ব জন্মাত এবং তার জন্য রায়তকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যেতে পারত না, কিন্তু তা বলে রায়ত সে জমি বিক্রী করতে বা বন্ধক দিতে পারত না। ফীল্ড (Mr. Justice Field) এ সম্বন্ধে বলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আরম্ভের পূর্ব্বেও জমি হস্তান্তরিত হতে পারত না, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হবার সময়েও রায়তী জমি হস্তান্তরিত হত না। সার রিচার্ড গার্থও ঐ কথা বলেন। যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের এবং জমিদারীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং যা জমিদার বেদবাক্যবৎ অলঙ্ঘনীয় মনে করেন, তা'ও প্রজার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেনি। তার পর ১৮৫৯ সালের ১০ আইন সম্বন্ধে ক্যাম্বেল (Mr, Justice Campbell) তাঁর ১৭৬৪ সালের ১লা জুনের মিনিটে বলেন জমিজমা হস্তান্তরিত করা সম্বন্ধে এই আইনেও প্রজাকে কোন নূতন ক্ষমতা দেওয়া হল না, প্রজা পূর্ব্বেই জমিজমা হস্তান্তরিত করতে পারত না, এখনও পারলে না। তার পর ১৮৮৫ সালের ৮ আইন বা বর্ত্তমান আইন। ব্যবস্থাপক সভায় যখন এই আইন সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয় তখন শ্রীযুক্ত আমীর আলী প্রস্তাব করেছিলেন যে বাঙলার কৃষক তার অস্থাবর স্থাবর সম্পত্তি যেমন হস্তান্তরিত করতে পারে, জমিজমাও তেমনি হস্তান্তরিত করতে পারবে এই মর্ম্মের একটা ধারা ঐ আইনে সন্নিবেশিত করা হ'ক। তার উত্তরে লর্ড রিপন বলেন যে সারজন গোর স্পষ্ট করে বলেছেন যে দখলী স্বত্বের অর্থ এ নয় যে দখলী স্বত্ববান্ রায়ত তার জমিজমা হস্তান্তরিত করতে পারে—"that the occupancy right does not include the right of sale or transfer." বাঙলা দেশের আদালত সকলও এই অর্থই গ্রহণ করেছে। লর্ড রিপণের এই কথার পর শ্রীযুক্ত আমীর আলী তাঁর সংশোধন প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে দখলী স্বত্ব প্রজা হস্তান্তরিত করতে পারে কিনা এ কথাটা নূতন নয়। যে আইনের সংশোধন বিল আজ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত, সেই আইনেরই বাদানুবাদের সময়ে একথা উঠেছিল এবং যথোচিত তর্ক-বিতর্কের পর প্রত্যাহৃত হয়েছিল। আবার সে কথা উঠে কেন? এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে ১৮৮৪ সালে ৪৩০০০ দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জমিজমা রেজিষ্টরী দলিলের দ্বারা হস্তান্তরিত হয়েছিল। ১৯১৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ২,৫০,০০০ দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। আরও বলা হচ্ছে যে লোক সংখ্যা যেমন বাড়ছে এবং তার জন্য জমির চাহিদাও তেমন বাড়ছে, তাতে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এই রকম জমিজমা আরও হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং হবে। এ ছাড়া অনেক সময় এমন ঘটে যে জমি হস্তান্তরিত হবার পূর্ব্বে জমিদার সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেন না। যার হাতে জমি যায় সে যে সব সময় জমিদারের মনের মত প্রজা হয় তা' অবশ্যই নয়। আবার জমিদার যদি এইরূপ অবাঞ্ছনীয় প্রজা না চান ত তার জন্য অনেক মামলা মোকদ্দমা করতে হয়। এই সকল বিষয় হাইকোর্ট ১৯১২ সালে গবর্ণমেন্টের গোচরে আনেন। হাইকোর্ট বলেন যে জমিদারকে না জানিয়ে বা তাঁর বিনা অনুমতিতে কোন জমাজমি বিক্রী হলেই সে বিক্রী অসিদ্ধ হবে, কি জমিদারের ইচ্ছা অনুসারে তা অসিদ্ধ হবে, এ বিষয়ে বর্ত্তমান আইনে কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা নেই। এই সকল কারণে প্রস্তাবিত সংশোধন বিলে ব্যবস্থা করা হচ্ছে যে দখলী স্বত্ব এখন যেমন খরিদ বিক্রী হচ্ছে তেমনি হ'ক, কিন্তু জমিদারের স্বার্থের যেন কোন ব্যাঘাত না হয়। এই জমিদারের স্বার্থ রক্ষাটাই প্রস্তাবিত আইনের অস্থিমজ্জা। প্রজার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি অতি অল্পই। এ ক্ষেত্রে জমিদারের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রস্তাবিত হয়েছে যে জমিজমা হস্তান্তরিত করবার সময় জমিদারের দক্ষিণা (landlord's fee) ছাড়া তাঁকে দিতে হবে এমন একটা অধিকার যার দ্বারা তিনি, যার হাতে সম্পত্তিটা যাচ্ছে তাকে অবাঞ্ছনীয় মনে করলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শতকরা দশ টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা নিজের হস্তগত করতে পারেন। এটা ত গেল সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে যাবার পরের কথা। কিন্তু জমিদার যদি ইচ্ছা করেন ত হস্তান্তরিত হবার সময় তাঁরই পূর্ব্বাধিকার থাকবে অর্থাৎ তিনি নিজে নিতে ইচ্ছা করলে আর কেউ তা পাবে না—এমন অধিকারও তাঁকে দেবার প্রস্তাব আছে। যদি তিনি নিজে না নেন, তবে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্যের চতুর্থাংশ তাঁকে দিতে হবে। এর মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে এই যে জমিদার যাকে অবাঞ্ছনীয় মনে করবেন তাকে সম্পত্তি নিতে দেবেন না। অর্থাৎ প্রজার দখলীস্বত্ব হস্তান্তরিত করবার ক্ষমতা জমিদারের মর্জ্জির উপর নির্ভর করবে। আর, দখলীস্বত্ব ত থাকবেই না, মেয়াদী পাট্টায় জমি নিতে হবে,

জমিদারকে চোখ দিতে হবে এবং জমিদার ও তাঁর আমলাকে "খুশী" করতে হবে ; এর প্রকৃত উত্তর হচ্ছে এই যে জমিদার যদি অবাঞ্ছনীয় প্রজা চাই না বলবার অধিকার পেতে পারেন ত প্রজা কেন অবাঞ্ছনীয় জমিদার চাই না বলবার অধিকার পাবে না ? জমিদারেরা যে সকলেই পরম বাঞ্ছনীয় পুরুষ এ কথা বোধ করি তাঁদের পরম মিত্রও বলতে ইতস্ততঃ করবেন। কিন্তু কথাটা হচ্ছে জমিদারের স্বার্থরক্ষার জন্য, প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য নয়। এ সম্বন্ধে কৃষক সম্প্রদায়ের হিতের জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এ অধিকার জমিদারকে না দিলে মহাজন কৃষকের দেনার দায়ে তার জমিজমা বিক্রী করিয়ে খরিদ করে নেবে, আর উচ্চ হারের খাজনায়, অতি-উচ্চ সেলামী নিয়ে মেয়াদী পাট্টায় পুনরায় সেই জমি বিলি করবেন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চাচ্ছেন যে জমিদার স্বয়ং খরিদ করলে এ সকল অন্যায় আচরণ হতে পারবে না। বাকী খাজনার দায়ে বা অন্য কোন কারণে দখলীস্বত্ব বিক্রি হলে, যদি জমিদারকে সেই স্বত্ব বিশিষ্ট জমি খরিদ করবার পূর্ব্বাধিকার দেবার বা অন্য কেউ সেই স্বত্ব খরিদ করলে জমিদারকে সেই স্বত্ববিশিষ্ট জমিজমা সেই খরিদদারের কাছ থেকে পুনরায় ফিরিয়ে নেবার অধিকার দেবার ব্যবস্থা যদি নিতান্তই করতে হয় তা' হলে সেই সঙ্গে এ ব্যবস্থাও করতে হবে যে জমিদার গ্যারাণ্টি দেবেন যে তিনি স্বয়ং সেরূপ কাষ করবেন না। আর, অবাঞ্ছনীয় প্রজা কাকে বলে তার একটা সংজ্ঞা করে দিতে হবে। কে বাঞ্ছনীয় আর কে অবাঞ্ছনীয়, তার বিচারের ভার জমিদারের বিবেচনার উপর দেওয়া হলে সে ব্যবস্থা অতি নির্দয় হবে তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ সমস্ত কথা উঠছে কেবল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার জন্য। যাদের জমিজমাতে দখলীস্বত্ব জন্মায় নি এবং কখন জন্মাতে পারবে না; তাদের সম্বন্ধে কোন কথাই নেই, যদিও তারাও যথারীতি জমিতে চাষ আবাদ করে' থাকে এবং জমিদারকে খাজনাও যথারীতি দিয়ে থাকে। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা এবং অ-দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা, এ দু'য়ের মধ্যে প্রভেদটা এই যে প্রথমোক্ত প্রজার স্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে তার পুত্র পৌত্রাদির প্রাপ্য, এবং নিয়মিত খাজনা দিলে তাকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। একথাগুলি শুনতে মন্দ নয়। কিন্তু কার্য্যতঃ যা' হয় তা' দেখলে দখলীস্বত্বের মোহ আর বেশী দিন লোককে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে অজন্মা হলে, পারিবারিক আপদ বিপদ ঘটলে, পুত্রকন্যার বিবাহাদিতে বা পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য প্রজা যখন সময়মত খাজনা দিতে পারে না তখন বর্ত্তমান আইন অনুসারে তার জমিজমা সব বিক্রী হয়ে যায়। দখলীস্বত্ব অ-দখলীস্বত্ব সব সমান হয়ে যায়। পূর্ব্বে যে বলেছি ১৯১০ সালে দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জমিজমা হস্তান্তরিত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই বোধ হয় এইরূপেই হয়েছে। তার পরে আরও ১২ বৎসর গিয়েছে। এর মধ্যে আরও কত প্রজা যে দখলীস্বত্ব হারিয়েছে তার সংখ্যা নেই। ব্যবস্থাপক সভার কোন প্রজাহিতৈষী সদস্য গবর্ণমেণ্টকে প্রশ্ন করে' এ বিষয়ের তথ্য জানতে পারেন। সে যা' হ'ক, এটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে প্রস্তাবিত আইন অনুসারে হস্তান্তরকরণ কার্য্য চললে পরে এ দেশে আর প্রজার দখলীস্বত্ব নামক পদার্থটি থাকবে না।

এই ত গেল প্রজার স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে। জমিদারের স্বত্বাধিকারটা কিরূপ তা'ত একবার দেখা যাক। এর সবিস্তর ইতিহাস আমি স্থানান্তরে বলেছি (১)। এখানে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে ১৭৯৩ সালের ১ রেগুলেশনই তাঁদের সৃষ্টিকর্ত্তা। এর পূর্ব্বে তাঁদের অস্তিত্ব ছিল না। ঐ সালের ২ রেগুলেশনের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিতে জমিদারের স্বামিত্ব ছিল না, যেটুকু অধিকার ছিল তার বলে তিনি, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না নিয়ে, জমি হস্তান্তরিত করতে পারতেন না, বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতেও পারতেন না :—"the property in the soil was never before formally declared to be vested in the landholders nor were they allowed to transfer such rights as they did possess, or raise any money upon the credit of their tenures without the previous sanction of Government."—Preamble to Regulation II of 1793. ১৭৯৩ সালের ১ রেগুলেশনের ৬ ও ৭ ধারা দ্বারা জমিদার ভূম্যধিকারিত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু সে ভূম্যধিকারিত্বের অর্থ এ নয় যে জমির যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ, ঐ রেগুলেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গবর্ণর জেনারেল যে তাঁর যথাযোগ্য জমিদার ভূম্যধিকারিত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু সে ভূম্যধি- জমিদারেরা তার পূর্ব্ববর্ত্তী দশশালা বন্দোবস্তের সময় যে রাজস্ব দিতেন সেই রাজস্বই চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হল। আর কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ঘোষণাটা এই—The Governor General in Council accordingly declares to the Zamindars, independent Talukdars and other actual proprietors of land, with or on behalf of whom a settlement has been completed that at the expiration of the term of the settlement (ten years) no alteration will be made in the assessment which they have respectively engaged to pay but that they and their heirs and lawful successors will be allowed to hold their estates at such assessments for ever." এই শর্ত্তে বন্দোবস্ত দিয়ে গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করেছিলেন জমিদার এর অপব্যবহার করবেন এবং সেইজন্য ঐ রেগুলেশনেরই ৮ ধারায় ব্যবস্থা করলেন যে যখনই আবশ্যক মনে করবেন সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল রায়তের হিতের জন্য এবং রক্ষার জন্য যথোচিত আইন-কানুন করতে পারবেন। এই ক্ষমতার বলেই ১৮৭৯ সালে তখনকার গবর্ণর জেনারেল Rent Law Commission.

---

(১) বাঙলার কৃষকের কথা। রামেশ্বর দে কর্ত্তৃক চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

নিযুক্ত করেছিলেন। বর্তমান খাজনা আইন (১৮৮৫ সালের ৮ আইন) তারই ফল।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব্বে প্রজার জমিজমা হস্তান্তরিত করবার ক্ষমতা ছিল না, জমিদারের সে ক্ষমতা ছিল কিনা সন্দেহ। এই সন্দেহ দূর করে' জমিদার এখন চান জমিতে তাঁর অপ্রতিহত স্বামিত্ব বজায় রাখা হ'ক। কিন্তু প্রজারই হ'ক, আর জমিদারেরই হ'ক, কোন ব্যক্তিরই জমিতে স্বামিত্ব রেখে তাকে ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি হতে দিলে দেশের মঙ্গল হয় না। জমি নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেই, এদেশের হিন্দু-মুসলমানের উত্তরাধিকার বিধির এবং প্রজাস্বত্ব বিধির প্রভাবে জমিদার ও প্রজা দু'পক্ষেই অশেষ ভাগাভাগি হয়েছে এবং হবে। জমিজমা সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমারও অন্ত নেই। আর, পূর্ব্বেই বলেছি, তার ফলে আজ বাঙলার কৃষকের জমির পরিমাণ গড়ে ৬॥ বিঘা মাত্র যাতে তার উদরান্নেরও সংস্থান হয় না। এ সমস্তারি একমাত্র সমাধান ভূ-সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তি করা। ইউরোপের সর্ব্বত্র, ইংলণ্ডেও, আজ সমস্ত চাষের জমিকে জাতীয় সম্পত্তি করবার চেষ্টা হচ্ছে। এ দেশেও সে চেষ্টা করবার এই সময়। আবশ্যক হলে কৃষিসম্বন্ধীয় রয়্যাল কমিশন যত দিন না তাঁদের এই বিষয়কে অনুসন্ধান শেষ করেন তত দিন প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিলের আলোচনা স্থগিত থাকতে পারে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

—:•:—

স্বরাজ্যদলের মেম্বর মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন তার জন্যে তাঁকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে পারলুম না। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন কোনো দিন কোনো জাতির জন্যে মঙ্গল আনতে পারবে না। মৌলবী সাহেবের মতে হিন্দু আর মুসলমানে ঐক্য স্থাপিত হলে, তবেই দেশে স্বরাজ আসবে, আর এ দু'জাতির মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাসের ভাবটা দূর করতে না পারলে স্বরাজ কখনো পাওয়া যাবে না। এই যে একের প্রতি অন্যের অবিশ্বাস, এর যে প্রতিকারের তিনি ব্যবস্থা করেছেন, তা হচ্ছে সংখ্যার অনুপাতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন। মৌলবী সাহেবের সাজিকটা কিন্তু মোটেই বোঝা গেল না। বিশ্বাস নেই বলেই ত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কথা ওঠে। যদি একের প্রতি অন্যের বিশ্বাসই রইল তবে ত, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কোনো প্রয়োজনই থাকছে না।: অবিশ্বাসের দ্বারা যে অবিশ্বাস দূর হতে পারে এমন কথা আমি কোনো দিন শুনিনি। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব রয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। সে কারণ দূর না করতে পারলে ঐক্য কখনো স্থাপিত হতে পারে না। এই অর্থ-নৈতিক কারণ নানাদিক্ থেকে নানাভাবে সমাজে কাজ করছে। অনুসন্ধান করে এর মূলে আঘাত না করলে কখনো এ বিদ্বেষের ভাব তিরোহিত হবে না। সমাজে কতকগুলি পরগাছা—অশ্রমিক শ্রেণীর লোক আছে। তারাই সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি করছে, কেননা, এই বৈষম্যের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভর করছে। এই পরগাছা গুলোর আওতা হতে সমাজকে মুক্ত করতে না পারলে সমাজের কোনো মঙ্গলই সাধিত হবে না, পরন্ত অমঙ্গল বেড়ে যাবে।

ম—আ

—০—

মৌলবী আবদুল গফুরের প্রস্তাব উপলক্ষ করে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাউন্সিল গৃহে খুব একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হয়ে গেছে। সার আবদুর রহীম এ প্রস্তাবের একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট তাই জানতে চাইলেন এতে কোনো মেম্বরের আপত্তি আছে কিনা। এক সঙ্গে অনেক মেম্বরই আপত্তি জানালেন। আপত্তির কারণ হচ্ছে, সার আবদুর রহীমের সংশোধক প্রস্তাবটি ঠিক্ কায়দা অনুসারে পেশ করা হয়নি। বহু মেম্বরের আপত্তি সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট সংশোধক প্রস্তাবটি উপস্থিত করার অনুমতি দিলেন। এই নিয়ে তাঁর সাথে মৌলবী মুহম্মদ নূরুল হক চৌধুরীর বচসা হয়। ফলে প্রেসিডেন্ট সে দিনের জন্যে চৌধুরী সাহেবকে বের হয়ে যেতে বলেন। প্রেসিডেন্টের এই অন্যায় কাজে অন্যান্য মেম্বররা তাঁদের অসন্তোষ ও আপত্তি জানালে তিনি যথাক্রমে ডাক্তার কুমুদ শঙ্কর রায়, মিঃ জে,এম, সেনগুপ্ত, মিঃ এ,সি, ব্যানার্জ্জি ও ডাঃ জে,এম দাস গুপ্তকে সে দিনকার জন্যে কাউন্সিল গৃহ হতে বের হয়ে যাবার হুকুম দেন। অতঃপর প্রেসিডেন্টের যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করে স্বরাজ্য দলের ও ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট দলের সমস্ত মেম্বর বের হয়ে গিয়েছেন।

• • • •

প্রেসিডেন্ট কুমার শিব শেখরেশ্বর রায় যেমন ভাবটি দেখিয়েছেন তাতে এই বোঝা যাচ্ছে যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যেন তিনিই একমাত্র অধিপতি, এখানে তিনি যা খুসী তা করতে পারেন, তাঁর কথার ওপরে কাহারো কিছু বলবার অধিকার নেই। তাহিরপুরের রাজ-বাড়ীটি যেমন কুমার সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাকেও তিনি ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মনে করে নিয়েছেন, অন্ততঃ তাঁর সে দিনকার ব্যবহার থেকে আমরা এ ছাড়া অন্য কিছু ধারণা করতে পারিনি। কোনো সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করবার জন্যে এক সপ্তাহের বিজ্ঞাপন দিতে হয়। সার আবদুর রহীম তা দেন নি,

আর তিনি বলেছেন না দেওয়ার অংশে তিনি দায়ী৷ কেননা প্রস্তাবের প্রতিলিপি তিনি সবে আগেকার দিনে পেয়েছেন। কুমার সাহেবের আফিস যে এজন্যে দায়ী তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। অসময়ে সংশোধক প্রস্তাব পেশ করলেও সে প্রস্তাব কাউন্সিলে পেশ করতে দেওয়ার অধিকার কুমার সাহেবের আছে। কিন্তু, তিনি যখন জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে বহুসংখ্যক মেম্বরেরই তাতে মত নেই, তখনো কি সংশোধক প্রস্তাব পেশ করতে দেওয়ার অধিকার তাঁর ছিল? আর যদি তিনি আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন যে তাঁর ক্ষমতার তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করবেন, তবে মেম্বরদের মত চাওয়ার কোনো প্রয়োজনইত তাঁর ছিল না।

ম—আ

ডাণ্ডি হতে নির্ব্বাচিত বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ জনষ্টোন ও ডাণ্ডি এণ্ড ডিষ্ট্রীক্ট ইউনিয়ন অফ্ জুট এণ্ড ফ্ল্যাক্স ওয়ার্কার্স্ এর সেক্রেটারী মিঃ সাইম বাংলা দেশের পাটের কল সমূহের শ্রমিকদের অবস্থা পরিদর্শন করবার জন্যে এসেছিলেন। তাঁরা দেশে ফিরে যেয়ে তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। লাভ-লোলুপতার যতগুলি অনুষ্ঠান ভারতবর্ষে আছে তার কোনটিরই সহিত বাংলা দেশের পাটের কলগুলির তুলনা হয়না। পাটের কল গুলির মত কোনো কল-কারখানা এত বেশী লভ্যাংশ বাঁটতে পারেনি। এ সত্ত্বেও পাটের কলের শ্রমিকদের অবস্থা একান্তই শোচনীয়। মিঃ জনষ্টোন্ ও মিঃ সাইম এ শোচনীয় অবস্থা দেখে শুধু যে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন তা নয়, মর্ম্মাহতও হয়েছেন। ১৯১৫ হতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত ১০ বছরের মধ্যে এক একটী শ্রমিকের মাথা পিছু কলের মালিকেরা পনের হাজার টাকা লাভ করেছেন। অথচ মানুষের মত জীবন যাপন করবার কোনো সংস্থানই শ্রমিকদের হাতে নেই। ভারবাহী পশুর মত এরা কেবলি খেটে খেটে মরছে। এরা সংহত নয়, আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন নয়। কাজেই, কলের তথাকথিত মালিকেরা নিরুদ্বেগের সহিত এদের লুঠছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের এদিকে নজর একেবারেই নেই। চিন্তার বাজারে তাঁরা দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন, চরখা আর খদ্দরের দ্বারা দেশোদ্ধারের উন্মত্ততা তাঁদেরকে পেয়ে বসেছে।

• • •

পৃথিবীর যেখানে যত পাটের প্রয়োজন হয় সমস্তেরই উৎপাদক বাংলা দেশের কৃষকগণ। যত পাট উৎপন্ন হয়ে থাকে তার তিন ভাগের দু'ভাগ বাংলা দেশের পাটের কল সমূহে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হুগলী নদীর দু' কেনারায় ৭৯টি পাটের কল রয়েছে। তিন লক্ষ শ্রমিক এ সমস্ত কলে কাজ করছে। ১৯১৫ সন হতে ১০ বছরের হিসাব খতিয়ে দেখা গিয়েছে যে প্রতিবৎসরে কলের মালিকেরা একশ টাকা মূলধনের উপরে গড়ে ৯০ টাকা লাভ বণ্টন করেছেন। অর্থাৎ একশ' টাকা দিয়ে দশ বছরে তাঁরা ৯০০ টাকা লাভ তুলে নিয়েছেন। মিলগুলোর জমি, বাড়ী ও মেশিন আদির দামত ধরাই হয়নি। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এই ৭৯টি পাটের কলের প্রকৃত মালিক কে?

ম-আ

শ্রেণি-সংগ্রাম

(মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)

শ্রেণি-সংগ্রামের নাম শুনেই অনেকে আঁৎকে উঠেন। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, অরাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, মানবতার প্রেমিক ও নিরপেক্ষ বাদী—প্রত্যেকেই এ জিনিসটিকে খারাব ভাবে গ্রহণ করে থাকেন, এবং এর জন্যে তাঁরা দায়ী করেন সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদিগকে। তাঁদের অভিযোগ এই হচ্ছে যে সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা কেবল মাত্র শ্রমিক ও কৃষকদেরই পক্ষাবলম্বন করছেন, এবং ইহার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা কেবল বেড়েই যাচ্ছে। আর এক দল লোক আছেন যাঁরা কার্লমার্ক্স হতে আরম্ভ করে লেনিন পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই সমান ভাবে ভক্তি করে থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এদেশে শ্রেণি-সংগ্রাম জিনিসটিকে প্রশ্রয় দিতে তাঁরা একেবারেই রাজীনন। শ্রেণি-সংগ্রামের দ্বারা ভারতবাসীর মধ্যেই পরস্পর সংঘাত বেধে যাবে, এই আশঙ্কা তাঁরা করেন। ভারতবর্ষ বিদেশীর পদানত হয়ে আছে। যতদিন না এ বিদেশীদের বিদেয় করে দেওয়া যায় ততদিন ঘরের বিরোধ তাঁরা ঘটাতে চান না। দেশীয় জমীদার দেশীয় কৃষকদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেন, আর দেশীয় ধনিকেরা দেশীয় শ্রমিকদের রক্ত শুষে খান, এসব কথা তাঁরা জানেন ও মানেন। তাঁদের মতে এসবই আমাদের সয়ে নিতে হবে যতদিন না ইংরেজরা আমাদের দেশথেকে চলে যায়।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম—স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টদের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। সমাজের অসম গঠনের জন্য এ যুদ্ধ আপনা হতেই বেধে বসে আছে। সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টদের একটি প্রাণীও যদি আজকের দিনে বেঁচে না থাকে তবুও শ্রেণীর সংগ্রাম সমাজ হতে কিছুতেই মিটবে না।

সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে বলেই শ্রেণীসংগ্রাম হচ্ছে। আমরা জমিদার, মহাজন, ধনিক, ব্যবসায়ী, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের কথা বলে থাক। এমন কোন মূর্খ আছে যে সমাজের সকল লোককে এসব নামে ডাকতে পারে? আমরা

শ্রমিক, কারিগর, কৃষক ও সম্পত্তি বিহীন লোকের কথাও সদা-সর্ব্বদা বলে থাকি। তাদের কে আমরা জমীদার ও ধনিক প্রভৃতি নামে কি কখনো ডাকতে পারি? তারপর, শ্রমিক ও কৃষক প্রভৃতির স্বার্থ যে ধনিক ও জমীদার প্রভৃতির স্বার্থের সাথে এক হতে পারে না একথা যে কোনো বোকা লোকও বুঝতে পারে। সোজাভাবে বোঝাবার জন্যে উপরে আমরা যতগুলি বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেছি সে সমস্তকে দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে: যেমন ধনিক ও কর্ম্মিশ্রেণী।

কর্ম্মী বা শ্রমিক আমরা কোন্ শ্রেণীর লোককে বলব? কর্ম্মী শ্রেণীর লোকের আয়ের উপায় হচ্ছে তার মেহনত বিক্রী করা। যে ঘরে সে বাস করে সে ঘর খানার মালিক সে নিজে হতে পারে, যে জমিতে সে ঘর রয়েছে সে জমির মালিকও সে হতে পারে। কিংবা এ ছাড়া আরো দু'এক বিঘা জমি জিরাত বা দু'চারটে গরু বাছুরও তার থাকলেও থাকতে পারে। এ সমস্তের মালিক হওয়াতে তাকে কিছুতেই ধনিক শ্রেণীতে গণ্য করা যেতে পারে না। যদি তার আয়ের বেশীর ভাগই সে দিন মজুরী বা চাকুরীর মাইনের দ্বারা পায় তবেই সে শ্রমিক। শ্রমিকের অস্তিত্বটা বজায় থাকে তার বাহুর বা মস্তিষ্কের শক্তির বিক্রয়ের দ্বারা আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকও শ্রমিকের শ্রেণীতে এসে পড়েছে। তার উৎপন্ন দ্রব্য এমনি ভাবে বিলুণ্ঠিত হয় যে তাকে ক্ষেতের মজুর ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

নিজের আয়ের জন্যে যে অন্যের পরিশ্রম কিনে নেয় তাকেই ধনিক বলা হয়। যেখানে বেচা-কেনার কারবার হয়, সেখানে দরাদরিও হয়ে থাকে। ধনিক চায় যথা সম্ভব সস্তায় শ্রমিকদের পরিশ্রম কিনে নিতে, আর শ্রমিকরা চায় যতটা সম্ভব তাদের পরিশ্রমের মূল্য ধনিকদের কাছে থেকে আদায় করে নিতে। পরস্পরের এই যে দ্বন্দ্ব, এ দ্বন্দ্বকে সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টরা শ্রেণি সংগ্রাম নামে অভিহিত করে থাকে।

এই শ্রেণি-সংগ্রামের জন্য আমাদের তথা কথিত দেশ-প্রেমিকরা সোশ্যালিষ্ট আর কম্যুনিষ্টদিগকে দোষ দিচ্ছেন। এ হচ্ছে ঠিক হাওয়া ঘরের অধ্যক্ষকে ঝড় হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে দোষ দেওয়ার মত। সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট শ্রেণি-সংগ্রামের জন্য মোটেই দায়ী নন। শ্রেণি-সংগ্রাম যে সমাজে অবিরত চলেছে এটুকুর প্রতি তাঁরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন মাত্র। শ্রেণি-সংগ্রাম জিনিসটাকে তাঁরাও যে পছন্দ করেন তা নয়। কিন্তু তাঁরা এও কখনো বিশ্বাস করেন না যে সিংহ আর মেষ এক জায়গায় বসবাস করতে পারে; অবশ্য সিংহ যদি নিরামিষ ভোজী হয়ে যায় সে আলাদা কথা।

সমাজের পরান্নভোজী ধনিকগণই শ্রেণি-সংগ্রামের জন্য দায়ী। তারা উৎপাদন কারীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে বলেই শ্রেণি-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছে। এসংগ্রাম তারা মেটাতেও পারে না। যে কারণটা এই সামাজিক সংঘাতের ভিত্তি, সেই কারণটার উপরে, অর্থাৎ উৎপন্ন কারীদিগকে তাদের শ্রমলব্ধ ধন হতে বঞ্চিত করার উপরেই ধনিকগণের জীবন নির্ভর করছে। শ্রেণি-সংগ্রামের পরি-সমাপ্তি ঘটাবে এই বঞ্চিত শ্রমিকগণ। এই করে তারা সমাজ হতে ধনিকগণের অস্তিত্ব যে শুধু মিটিয়ে দেবে তা নয়, তাদের নিজেদের অস্তিত্বও আর থাকবে না। মানুষ সভ্যতার এমন এক স্তরে এসে হাজির হবে যেখানে সকলেই কাজ করবে, আর সকলেই তার ফলও ভোগ করবে।

---

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড্ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

Reg. No. C 1389.



প্রধান পরিচালক
নজরুল ইসলাম

সম্পাদক
শ্রীমণিভূষণ
মুখোপাধ্যায়

নগদ মূল্য এক আনা
বার্ষিক মূল্য
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৫৲
বিদেশে ৮ শিলিং

LANGAL

A weekly organ of The Bengal Peasants and workers Party

office: 37, Harrison Road, Calcutta.

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

প্রথম খণ্ড } বৃহস্পতিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৩২, ইং ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯২৬ { একাদশ সংখ্যা

এই সংখ্যায় আছে---

চাষার ব্যারিষ্টার



লাঙল

[বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস— ১৩৩২

প্রথম খণ্ড	বৃহস্পতিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৯২৬	একাদশ সংখ্যা

চাষার ব্যারিষ্টার

(শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত)

—০:*:০—

বার বার তিনবার
বুঝেছে বাবুরা চাষা ছাড়া এবে হবে না দেশোদ্ধার।
শোনরে শ্রমিক শোন ভাই চাষা,
ভুঁড়োর ভুঁড়িতে যত ভালবাসা
ঢালিবে বিলাবে তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।
তোদের দুঃখে হায়!
পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
কোরো নাক ভাই, হীন আশঙ্কা,—
এবার নয়নে ঘষেনি লঙ্কা;
ত্রিসত্য করি বলিছে—'চাষীরে, হৃদয় তোদেরই চায়।'

ওরে চির পরাধীন।
তোরা না জানিস্—ওরা জানে তোর কি কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি প'ড়ে পেয়েছে প্রমাণ,—
তোরাই দেশের তের-আনা প্রাণ ;
বৎসরে হায়, বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন।
তোরাই যে ভাই দেশ,
তোদের দৈন্য জন্য মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।
মহার্ঘ্য হ'লে বেগুণ পালঙ্,
যদিও বাবুরা চ'টে হ'ন টঙ্,
তবু তোরই সেবা দেশেরই যে সেবা মনে মনে বুঝে বেশ।
ওরে নাবালক চাষা।
ভুঁড়োরা তোদের ভাঙাবে নিদ্রা, মূকমুখে দিবে ভাষা।
রচিতে শ্রমিক-দুখের ফর্দ্দ
বাবুরা ছুটিছে লিলুয়া খড়দ'
গড়িয়া আইন ভাঙি বে-আইন জাগাইবে নব-আশা।
ওরে, ওঠ্ ওঠ্ জেগে ;—
তরুণ অরুণ আলোকে জানাও অজানা ব্যথায় লেগে।
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল
পাঁচনে খেদায়ে বলদের দল,
প্রভাতের মাঠে কল কোলাহলে দল বেঁধে চল বেগে।
জুড়ে দে লাঙল ক'ষে,
ফালের আগায় যত উঁচু নীচু সমভূম কর্ চ'ষে।
মাথা উঁচু ক'রে আছে ঢ্যালাগুলো,
মইএর চাপানে ক'রে দেরে ধুলো।
কাটার বংশ কর্‌রে ধ্বংস জোএ জোএ বিদে ঘ'ষে।
ফসল হবেই হবে।
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল খুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস্ যাকে,
টেনে তুলে বলে রুয়ে দিবি পাঁকে
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।
সেই দুর্য্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
স'রে পড়ে যদি হেসোনাক, দাদা।
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে রেখো—ওই ওরা চাষা নয়—চাষার ব্যারিষ্টার ?

মা

মার্কসিম্ গর্কী—

[অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আবার তাহারা দুইজনে কাছাকাছি থাকিয়াও যেন অতি দূরে দূরে নীরবে বাস করিতে লাগিল। সপ্তাহের মাঝামাঝি এক ছুটীর দিনে বাহিরে যাইবার সময় প্যাভেল মাকে ডাকিয়া বলিল,

"দেখ, শনিবারে এখানে আমার কাছে কয়েকজন লোক আসবেন।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারা?"

"কতক লোক আসবেন গাঁ থেকে—আর কয়েকজন আসবেন শহর থেকে।"

"সহর থেকে!" এই কথা কয়টী বলিবাই মা নিরুদ্ধ আবেগে কাঁদিয়া উঠিলেন।

প্যাভেল ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "একি? এ সব কি, মা?"

আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া মা ধীরে উত্তর দিলেন,

কেন, তা জানি না, কিন্তু আমার মন যে এমনি অধীর হয়ে উঠছে।"

প্যাভেল মার কথা শুনিয়া ঘরের এ কোণ হইতে ও কোণ পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিল। তার পর সহসা মার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভয় পাচ্ছ মা?"

মা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "সত্যই আমার কেমন ভয় করছে? সহরের তারা—কে জানে তারা কেমন লোক?"

মার মুখের দিকে স্পষ্টভাবে চাহিবার জন্য পাভেল একটু নত হইয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,

"এই ভয়ই আমাদের সকলের ধ্বংসের মূল। আর এই ভয়ের প্রশ্রয় নিয়ে যারা আমাদের দাবিয়ে রাখে তারা নিত্য নিয়ত আমাদের এমনি ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে চলেছে। মনে রেখো মা, জাতির অন্তরে যত দিন পর্য্যন্ত এই ভয় থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত সে জাতি ঐ বিলের পচা জলে আগাছার মত পচে পচে মরবে। ভয়-হারা হবার সময় এসেছে আজ—; এই ত সময়—"

তার পর মার মুখের দিক হইতে মুখ তুলিয়া সে বলিল,

"সে যাই হ'ক, তারা এখানে আসছে, নিশ্চয়ই।"

বিষণ্ণ সুরে মা বলিয়া উঠিলেন,—রাগ করিস্ না রে—ভয় নে পেয়ে কি করে থাকতে পারি বল; সারাটা জীবন যে এই ভয়ের মধ্যে কাটিয়ে এসেছি।"

পাভেল আরও শান্ত সুরে উত্তর দিল—ক্ষমা করিস্ মা-জননী আমারও ঐ বলা ছাড়া আর উপায় নেই।"

তার পর প্রায় তিন দিন ধরিয়া তাঁহার হৃদয় আতঙ্কে অহরহ কাঁপিয়া উঠিত। যখনি ভাবিতেন যে সেই সব রহস্যময় আগন্তুকরা আসিতেছে—এইখানে, এই ঘরেই—তখনই ভয়ে তিনি সারা হইয়া যাইতেন। কল্পনায় তাহাদের মূর্ত্তি তিনি চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিন্তু তাহারা যে সব ভয়ানক লোক সে বিষয় তাঁহার কোনও সন্দেহ ছিল না। আজ তাঁহার পুত্র যে ভয়ানক পথে চলিয়াছে তাহারাই নিশ্চয় তাহার পথ প্রদর্শক।

শনিবারের রাত্রে কারখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাভেল হাতমুখ ধুইয়া পোষাক বদলাইয়া বাহিরে যাইবার সময় মাকে ডাকিয়া বলিল,

"তারা যখন আসবে, তাদের বলবে যে আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি। তাদের বসতে বলো আর তুমি ভয় পেয়োনা মিছা-মিছি। আর সব মানুষের মত তারাও মানুষ।"

প্রায় মূর্চ্ছিত অবস্থায় মা বসিয়া পড়িলেন। পুত্র ধীরভাবে মার দিকে চাহিয়া বলিল,

"এখানে না থাকলেই তোমার পক্ষে বোধ হয় ভাল হয়!"

পাভেলের মুখে এই রকম কথা শুনিয়া মা ব্যথিত হইয়া অসম্মতি জানাইলেন। তার পর তিনি বলিলেন,

"না, সে একই কথা, কেনই বা যাব।"

তখন নভেম্বর মাস শেষ হইয়া আসিতেছিল। দিনের বেলায় শীতার্ত্ত মাটীর বুকে শুষ্ক শুভ্র বরফ পড়িয়াছে। পাভেল অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জানালার বাহির হইতে মার কানে সেই শব্দ আসিয়া লাগিতেছিল। জানালা আয়নার উপর এক রাশ জমাট অন্ধকার যেন গুঁড়ি পাতিয়া বসিয়াছে। বেঞ্চের উপর ভর দিয়া দরজার দিকে চাহিয়া মা বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার মনে হইল কাহারা যেন সংগোপনে অত্যন্ত সাবধানে অন্ধকারের মধ্যে ঘরের পাশে পাশে ঘুরিতেছে। অদ্ভুত তাহাদের সাজ, তেমনি অদ্ভুত তাহাদের মুখের ভাব। কে যেন এরি মধ্যে দেওয়াল হাতড়াইয়া ঘরের মধ্যে আসিতেছে।

সহসা কোথা হইতে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র মূর্চ্ছনার মত সেই সকরুণ সুর অন্ধকারের কাননে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাহাকে খুঁজিতেছিল। বাঁশীর সুর যেন ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে। সহসা সে সুর দেয়ালে প্রহত হইয়া যেন তাহারই কাষ্ঠ গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল। বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। মা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দরজা খুলিয়া গেল। প্রথমে ঘরের মধ্যে একটী বৃহৎ টুপি-ওয়ালা মাথা ঢুকিল; তার পরে আসিল একটী কৃশ-তনু যুবক।

যুবকটী চাপা স্বরে ডান হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মা নীরবে মাথা নত করিয়া রহিলেন।

"পাভেল কি এখনও বাড়ী আসে নি?"

নবাগত যুবকটী সন্তর্পণে কোমের জামাটী খুলিয়া রাখিয়া টুপি দিয়া পায়ের বরফ ঝাড়িয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে টুপিটা ঘরের একটী কোণে রাখিয়া দিল; সে আপন মনে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। আপনার পদ-চিহ্ন গুলি এক মনে নিরীক্ষণ করিতেছিল। ক্রমশঃ টেবিলটার কাছে আগাইয়া আসিয়া পদার্থটার নিরেট অস্তিত্বের কথা যেন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একবার টেবিলটা পরীক্ষা করিল। অবশেষে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া তাহার উপরই বসিয়া পড়িয়া হাই তুলিতে লাগিল। এই নবাগত যুবকটার মাথাখানি ছিল একেবারে গোল, মাথার চুল খুব ছোট করে কাটা। মুখখানিতে ক্ষুরের স্পর্শ সদ্যই পড়িয়াছে; কেবল একটী সূক্ষ্ম রেখার মত গোঁপে এখনও অস্ত্রচিহ্ন পড়ে নাই।

বহুক্ষণ ধরিয়া সমস্ত ঘরখানি তাহার দুইটী বৃহৎ উদ্গত চক্ষু দিয়া পরীক্ষা করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,

"এ কি আপনাদের আপনার বাড়ী, না ভাড়া দেন?"

মা ঠিক তাহার পিছনে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা ভাড়াটে।"

বাড়ীটা তত ভাল নয় ত"

মা অস্ত মনস্কভাবে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর—সে আসছে এখুনি—',

"তাতে কি হয়েছে? আমি তো অপেক্ষা করেই আছি!"

মার মাঝে মাঝে মনে ভয়ানক ইচ্ছা হইতেছিল যে একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, কে সে, কোথা থেকেই বা এসেছে, আর তাঁর ছেলের সঙ্গেই বা কত দিনের ভাব। কিন্তু হঠাৎ নবাগত যুবকটী তাহার সমস্ত দেহটা বেশ একটু দোলাইয়া মার দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া আপনিই জিজ্ঞাসা করিল,

"মা, আপনার কপালে ওগর্ত্তটা কি করে হলো?"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অর্দ্ধ করুণার ও চোখে একটা স্পষ্ট হাসির আভাস ছিল। মা কিন্তু এই প্রশ্নে হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

দুই ঠোঁট বেশ জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিলেন, "তাতে তোমার কি?"

ঠিক সেই রকম মাথা দুলাইয়া যুবক বলিল, "দেখুন, রাগ করবেন না। আমি আপনাকে কেন ও কথা জিজ্ঞাসা করলাম, জানেন? যে মা আমাকে পালন করেছিল তারও মাথায় ঐ রকম একদিন ভীষণ আঘাত লেগেছিল। কে তাঁর মাথায় ঐ রকম দাগ করেছিল, জানেন? তারই আপনার মানুষটী একদিন জুতো সেলায়ের যন্ত্রটা দিয়ে মাথায় মারে; অবশ্য বুঝতেই পারছেন যে লোকটা একজন মুচী। আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সেই মা আমায় মানুষ করে—; তারপর পথে একদিন মাতাল অবস্থায় সেই লোকটার সঙ্গে মার দেখা হয়। তারা বিয়ে করে। সেই লোকটা মাকে মারত—দেখে আমার সমস্ত দেহ জ্বলে উঠত...

মা রাগিয়াছিলেন বটে কিন্তু এই যুবকের সরল ব্যবহারে একবারে জল হইয়া গেলেন। তারপর তাঁহার হঠাৎ মনে হইল যে যদি পাভেল শোনে যে তিনি এইরকম কড়া কথা বলিয়াছেন তাহা হইলে সে দুঃখিত হইবে। আপনাকে যেন দোষী মনে করিয়া মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'না, আমি তো রাগ করিনি, তবে দেখ, যে রকম হঠাৎ তুমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করলে,—হ্যাঁ, তিনি আজ স্বর্গে গেছেন—ভগবান্ তাঁর অশেষ মঙ্গল করুন। তিনিই আমার কপালে এই দাগ করে দিয়েছিলেন। তুমি কি তাতার বংশীয়? *

যুবক গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "না, এখনও তাতার হইনি।"

মা তাহার কথার ভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমি ও কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কেন না তোমার ভাষা আমাদের রুষ ভাষা থেকে একটু আলাদা দেখছি বলে।"

যুবক হাসিয়া উত্তর দিল, আমি রুষীয়দের চেয়ে ঢের ভাল! আমি একজন লিটল রুষ।

"কতদিন হল তুমি এখানে এসেছ?"

"আমি প্রায় একমাস সহরে ছিলাম। তারপর প্রায় একমাস হল এই আপনাদের কারখানায় এসেছি। সেখানে আপনার ছেলে আর দু' একজন ভাল লোক দেখতে পেলাম। এখানে হয়ত এখন কিছুদিন থাকব।"

ক্রমশঃ লোকটীকে মার ভাল লাগিতে লাগিল এবং পুত্রের প্রশংসায় আনন্দিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু চা করে দি, কেমন?"

"আরে আমি একা একা খাব! না, না, তারা সব আসুক, একসঙ্গে খাওয়া যাবে।"

আবার এই নূতন লোকদের আসার কথায় মার মন ভয়ে দুলিয়া উঠিল।

মনে মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "তারা যদি সব এই লোকটার মতনই হয়!"

(ক্রমশঃ।

* প্রবাদ আছে তাতারগণ ভয়ানক নিষ্ঠুর।

হিন্দু-মুসলমান

(শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের দেশের যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেই হিন্দু মুসলমানের যথার্থ মিলনের সমস্যার সমাধান করিতে গিয়ে খেলাফৎ নামক একটি অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, যে পদার্থটির যথার্থ স্বরূপ অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রতীয়মান না হইলেও আজ খুবই স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমরা গভীরভাবে কোন কিছুই অনুভব করিতে চাই না, কোন কিছুই সবদিক হইতে তলাইয়া বুঝিতে চাই না। আমরা মনে করি যে শুধু বায়ুর পরিবর্ত্তনের দ্বারাই মরা গাছের শুকনো ডালে আমরা ফুল ফোটাবো। এটুকু ভেবে দেখিনা যে প্রকৃতির নিয়মেও শুধু বসন্তের বাতাস ফুলফোটানোর জন্য দায়ী নয়, যে মৃত্তিকা আপনার রস সিঞ্চনে অগোচরে বীজটিকে পরিপুষ্ট করে তোলে তারও ফুলফোটানোর কাজে দাবিও কম নয়। বাইরের হাওয়ার কি সাধ্য ছিলো ফুল ফোটাতে যদি মৃত্তিকা তাকে সাহায্য না করত।

আমরাও দেশের যে কোন সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া সেই ভুলটাই বারে বারে করছি। গভীরভাবে সমস্যার কেন্দ্রে পৌঁছতে এতটুকু চেষ্টা করিতেছি না, সমস্যার অতি দৃষ্টিগোচর অংশটুকু মেরামৎ করিয়া আশ্বস্ত হইয়া ভাবিতেছি যে ইহার দ্বারা বোধ হয় যে আমূল সংস্কার অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল তাহার আর প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু তার ফলে দাঁড়ায় এই, যে ভিত্তি আরো শিথিল হয়ে পড়ে এবং যে দুরবস্থা একদিন সামলানো যেতে পারতো তার আর প্রতিরোধ করবার কোনই উপায় থাকে না।

এতদিন ধরে যারা একই দেশে, একই গাঁয়ের মাঠের ফসল খেয়ে, একই গাঁয়ের নদীর জল পান করে পাশাপাশি মানুষ হয়ে উঠলো তারা কেন ভাইয়ের মত মিশে যেতে পারলো না, একথাটি তলিয়ে বোঝবার দিন কি আজও আসেনি? মহাত্মাজী খিলাফৎ এর সৃষ্টি করে ভেবেছিলেন, যে মুসলমান যখন দেখবে যে তাঁর ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য হিন্দু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন এতদিনের বিরোধ ভুলে উভয় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবে। ফলে দাঁড়ালো কি না Pan-Islam বলে যে দৈত্য বৃহৎ মানবের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে উৎপাত করবার সম্ভাবনা দেখাচ্ছিলো তাকে আরো পরিপুষ্ট করে তোলা হোল। ভারতবর্ষের অন্নে, ভারতবর্ষের জল-বাতাসে শতশত বৎসর ধরে যারা পুষ্ট, তারা দেশের চেয়েও বেশী আপনার মনে করলে আঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টকে, আর গর্ব্ব করে বলতে এতটুকু লজ্জা পেলে না যে আমি আগে মুসলমান তার পরে ভারতবাসী। এই Extra territorial জাতীয়তার মূলে জল সিঞ্চন করেছেন মহাত্মা গান্ধী। মৌঃ শৌকত আলী আর তাঁর বুদ্ধিহীন ভ্রাতা মোহম্মদ আলী এই সুযোগে জাতীয়তায় অহিফেন এই বিষ দেশের মুসলমান জন-সাধারণের মধ্যে ছড়িয়েছেন। আজকের পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের যে কটি-বিভীষিকা আমাদের কাণ মলে বশ্যতা স্বীকার করাচ্ছে তাদের কোনটিরই থাকার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। এ সম্বন্ধে অনেকেই আমার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন তা আমি জানি কিন্তু সে তর্কের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে পৃথিবীর বর্ত্তমান যে কোন একটি ধর্ম্ম মতে যারা আস্থা-সম্পন্ন তাঁরা কি স্বীকার করবেন না যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত একেবারেই ব্যক্তিগত জিনিষ। সকলে মিলে একসঙ্গে ধর্ম্মমতের কুচকাওয়াজ করবো এটা দেখতে বিশেষ শোভন হয় না। মত যখনই মতের উদ্দেশ্যের চেয়ে বড় হোয়ে ওঠে তখনই প্রলয়ের সূচনা করে, আর ধর্ম্মমতের মত প্রলয় বাধাতে আর কোন মতে পারে? রাষ্ট্রকে যখন মানুষ তার ধর্ম্মমতের চশমার ভিতর দিয়ে দেখে, তখন দেখে নয় মুসলমান রাজ্য, নয় হিন্দু রাজ্য। তখনই পুরোহিত, পাণ্ডার, আর মোল্লার আর মৌলানাদের বিষম উপদ্রবের সূত্রপাত ঘটে। তখনই ভারতবর্ষের মুসলমানরা তুর্কী আর পারস্যের মুসলমানদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে গিয়ে কতশত অলীক সম্বন্ধের রচনা করে, তখনই দেশের হিন্দু, হিন্দু সভা, হিন্দু জ্ঞানের সাহায্যে হিন্দু রাজ্য পত্তনের চেষ্টায় তাদের সঙ্গে সহস্র বৎসর আগেকার সম্বন্ধ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হোয়ে উঠে। একেবারে পাশে যে তার সঙ্গের সত্যসম্বন্ধটিকে নির্ণয় করবার সময় পায় না। তখনই সুরু হয় তাঞ্জিম আর সংগঠন, দুই দলের ধর্ম্ম ষণ্ডদের পরস্পরকে অবিশ্রাম শৃঙ্গাঘাত। সবই সেই ধর্ম্মমতের চশমার ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রের স্বরূপ দর্শনের ভ্রান্তি থেকে উৎপন্ন।

রাষ্ট্রকে ধর্ম্মতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র করতে গিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংলণ্ডে ও ইয়োরোপে বিপ্লব ও রক্তপাত ঘটেছে। আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড রাষ্ট্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের এই বিভাগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। ইংলণ্ডের রাজনীতির যাঁরা কোন খোঁজ রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে এখনো লর্ড চান্সেলারের পদ একজন রোমান ক্যাথলিক কিছুতেই অধিকার করিতে পারেন না। পুরোহিত তন্ত্র ও রাষ্ট্র যখন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিলো আর যখন প্রোটেষ্টান্টরা মালিক হলো, তখন রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে এই চালটি তারা চেলে রেখেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই আইন এখনো ইংলণ্ডে বলবৎ থাকতে পেরেছে।

ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখি যে আজকের দিনে আমরা সেই ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করতে চলেছি। অথচ আশ্চর্য্য এই যে নবীন চীনের হোমাগ্নি যিনি প্রজ্বলিত করে গেছেন সেই মহান্ আত্মা ডাঃ সানইয়াৎ সেন ছিলেন খৃষ্টান, মিশরের জাগরণের অগ্রদূত দেশবন্ধু জগলুল পাশা খৃষ্টান এবং ইংলণ্ডে বহুলোক আছেন যাঁরা মুসলমান কিন্তু কেহই তো দেশের কল্যাণের চেয়েও ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতকে উচ্চে স্থান দেন নি। ইংলণ্ডে ও তুর্কীতে

যুক্ত হইলে এমন তো কখনো সম্ভব হয় না যে সব ইংরাজ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁরা তুর্কীর হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। ভারতবর্ষেই বা কেন ইহা সম্ভব হয় যে ভারতবর্ষের মুসলমান তুর্কী ও আফগানিস্থানের সঙ্গে যোগ দিয়া ভারতবর্ষকে লাঞ্ছিত করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।

ভারতবর্ষের হিন্দুর রক্ত ভারতবর্ষের মুসলমানের ধমনীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত। অথচ কেন তবে এই সম্প্রদায়িক বিরোধের কোন ক্রমেই শেষ হইতেছে না? কেন দেখি যে আমাদের দেশে কেহ যখন মুসলমান হয় তখন আপনার নাম পর্য্যন্ত বদলাইয়া ফেলে। অন্য কোন দেশে তো তাহা ঘটে না? ওদের দেশে মিঃ স্মিথ তো এরফান আলীতে পরিণত হয় না অথচ আমাদের দেশের গুরুচরণ মল্লিক বদলাইয়া খাঁতে পরিণত হন। ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাম পরিবর্ত্তনের মত এই হাস্যকর অভিনয় আমাদের দেশেই ঘটে। এত বৃহৎ সমস্যা, এই মিলনের সমস্যা কিন্তু দুটি সহজ সত্যের উপর নির্ভর করে। একটি হচ্ছে যে কথাটি এতক্ষণ ধরে বলেছি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্ম্মমতের যে কোন স্থান নেই এবং ধর্ম্মমত যে নেহাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় (প্রচলিত অফিসিয়াল ধর্ম্মগুলিকে যখন আপাততঃ ওঠানো সম্ভব নয় তখন এই পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই) তাহা দেশের জনসাধারণকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং এই বুঝাইয়া দিবার ভার তাদেরই নেওয়া ভালো যারা প্রচলিত সব কটি ধর্ম্মমতের অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছে। পল্লীতে পল্লীতে তারা দেশের সত্যরূপের বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিবে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত তারাই তাদের এই বার্ত্তার প্রসারের মধ্য দিয়া করিবে।

এই সমস্যা সমাধানের আর একটি উপায় হচ্ছে ইকনমিক সমস্যার সমাধান। এই অন্ন বস্ত্রের সমস্যাই আমাদের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। যত দিন দেশ রাষ্ট্রের দিক হইতে সাধারণ সম্বাদ স্বীকার না করিতেছে, যতদিন পরশ্রম-উৎপন্নভোগী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সমাজ হইতে বিলুপ্ত না, হইতেছে ততদিন এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত সংঘাত চলিতেছে; ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষের এই উপরি-উক্ত কারণ ব্যতিরেকেও আরো দুএকটি কারণ আছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থা তার মধ্যে অন্যতম।

ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা কম হওয়ায় মুসলমানেরা ভাবিতেছেন যে হিন্দুরা দেশকে মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিতেছে সবটাই আপনাদের ভাগে টানিয়া লইতেছেন, আর তাঁদের ভাগে পড়িতেছে শুধু হলাহল। এই অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সুযোগে বিদেশী স্বেচ্ছাচারতন্ত্র এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আরো বাড়াইয়া দিতেছে। মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করিয়া, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ইত্যাদি কল কৌশলের দ্বারা বিরোধকে চিরস্থায়ী করিতে প্রাণপণ করিতেছে। আরো মুস্কিল হইয়াছে এই যে এখানে আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ধর্ম্মমত আসিয়া এই বিরোধের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। একে তারা সংখ্যায় কম, তাতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া হিন্দুরা তাদের উপর অবিচার করিতেছে এই বিশ্বাস প্রায় অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে বর্ত্তমান। মৌলবী আর মৌলানাদের কৃপায় দেশের সাধারণ নিরক্ষর মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষী হইতে দেরী হয় নাই। হিন্দু মুসলমানদের সমস্যা লইয়া পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের সহিত একদিন আলোচনা করিতেছিলাম। আমার মনে আছে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁর মতে দেশে প্রতি গ্রামে গ্রামে যদি এমন কয়েকটি সমবায়ের পত্তন করা যায় যাতে হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকার থাকে তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলিয়া তাঁর বিশ্বাস। যেমন একটি গ্রামে যদি এমন একটি কৃষি সমবায় স্থাপন করা হয় যাহা বীজও চাষের উপযোগী আধুনিক যন্ত্র আনিয়া গাঁয়ের সমস্ত কৃষকদের সাহায্য করে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, তাহা হইলে সকলেই সেই সমবায়কে আপনার বলিয়া মনে করিবে এবং কোন সম্প্রদায়ই সেই সমবায়কে ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইবে না। ইহার মূলেও সেই ইকনমিক সমস্যার সমাধানের কথা।

এই সেই দিন ঢাকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে প্রাচুর্য্যের অভাবে এই দ্বন্দ্ব হইয়াছে, প্রাচুর্য্য ফিরাইয়া আনিতে পারিলে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিবে। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য। প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন স্বীকার করি কিন্তু শুধু প্রাচুর উৎপন্নের উপর নির্ভর করিলে তো চলিবে না আধুনিক যুগের ধনীশাসিত রাষ্ট্রে ধন প্রচুর ভাবে উৎপন্ন হইয়া তাঁদের গৃহেই আশ্রয় লয়, প্রচুর উৎপন্ন হইয়াও যে সকলের অভাব মিটিতেছে না তার কারণ প্রাচুর্য্যের অভাব নয়, তার কারণ এই প্রাচুর্য্যের যথাযথভাবে বন্টনের অভাব। এই যথাযথ বন্টন কিছুতেই সম্ভব নয় যতদিন না সাধারণসম্বাদ রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লয় ও পর-শ্রম উৎপন্নভোগী সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করা হয়। আজকের দিনের পৃথিবীর সমস্যাই হচ্ছে এই উৎপাদন ও বন্টনের সমস্যা, আর এই সমস্যার সমাধানের উপর হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

সোশ্যালিজম

[আর, নেক্‌ট]

গোড়ায় যে মানুষ ছিল সে ছিল প্রাকৃতিক মানুষ। সে তার খাদ্য আর আশ্রয় প্রকৃতির কাছ থেকে গ্রহণ করত এবং যে আকারে প্রকৃতি তাকে দিতেন ঠিক্ সেই আকারেরই এ দু'টো জিনিসকে সে ব্যবহার করত। এর পরে দয়াশীলা প্রকৃতি জননী তাকে মন দিলেন, কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা অসচ্ছল ছিল বলে খুব কম করেই দিলেন।

মন থেকে আর্ট বা কলার সৃষ্টি হল। মানুষ তার খাদ্য আর আশ্রয়ের উন্নতি করতে লাগ্‌ল। সে তার খাদ্য পাকাতে লাগ্‌ল এবং রকমেও তা বাড়িয়ে দিল। প্রকৃতির তৈয়ার করা আশ্রয় গ্রহণ না করে সে নিজেই আশ্রয় তৈয়ার করে নিল। এবার সে আপনাকে সভ্য করে নিতে আরম্ভ করেছে।

কর্ম্মশীল মন যে প্রকৃতিকে মানুষের সেবায় প্রণোদিত করে, তাকেই সভ্যতা বলা হয়, আর আর্ট হচ্ছে সভ্যতার মাপকাটি।

তার মনের অভিজ্ঞতা আরো বাড়লো। সে এমন সব উপায় খুঁজে বের করল যাতে সমষ্টিকে বঞ্চিত করে অল্প কয়েক জন আর্টের উন্নতি করতে পারে। দাসত্ব, ক্ষেতের গোলামী ও ধনিক্‌বাদ—এসবই হচ্ছে অর্দ্ধসভ্য লোকদের অনুসৃত প্রণালী যার দ্বারা অল্পসংখ্যক লোকের বিলাসের উপকরণ অধিক সংখ্যক লোককে যোগাতে হয়।

অর্দ্ধ সভ্যাবস্থার উর্দ্ধতম স্তরে মানুষের মনের উন্নয়নকেই ধনিক্‌বাদ নামে অভিহিত করা হয়। সোশ্যালিজম (সমূহবাদ) হচ্ছে মানুষের উন্নত মন। এ অবস্থায় আর্ট সমস্ত সমাজের সুবিধার জিনিসে পরিণত হয়। শোষণ বৃত্তির সেখানে পরিসমাপ্তি হয়, আর সভ্যতারও আরম্ভ হয় সেখানেই।

সোশ্যালিষ্ট (সমূহবাদী) সেই মানুষকে বলা হয়, যে কালের গতিতে সাড়া দিয়ে মানুষকে সভ্যতার জন্যে গড়িয়ে নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যে মানুষের মন এখনো অর্দ্ধ প্রাকৃতিক অবস্থায় রয়েছে এবং যে সোশ্যালিষ্টের বাণী বুঝতে অপারগ—তাকেই সোশ্যালিষ্টের বিরুদ্ধবাদী বলা হয়।

সোশ্যালিষ্টের বিরুদ্ধবাদীর জন্যও আশা আছে। কালের দৃষ্টি তার উপর পড়েছে। ভবিষ্যতে এমন সময় আসচে যখন সে খুব একজন উৎসাহী সোশ্যালিষ্ট হয়ে যাবে—সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের ভিতর সেই হবে তখন রক্ষণশীল। সময়কে বড় কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কাল যে ধনিক প্রতিযোগিতার নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, সমবায়ের নামে বিষম অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিল, আজ সে তার মূলধনকে অপরের সাথে সমপাতিতে সম্মিলিত এবং কেন্দ্রীভূত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এই মূলধন যে সামাজিক ধনে রূপান্তরিত হবে সে শুধু সময় সাপেক্ষ।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বি-এস-সি ১৯২৪ সালে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে গেরেফ্‌তার হয়ে প্রথমে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দী ছিলেন এবং পরে তাঁকে কিছুকাল থেকে বর্দ্ধমান জেলার আউশ গ্রামে আটক রাখা হয়েছিল। আমরা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে গত শুক্রবারে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মুক্তির দিনে অতুল বাবু আমাদের হৃদয়ের অভি-নন্দন গ্রহণ করুন।

উপেন্দ্রনাথের মুক্তি

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বর্ত্তমান সময় তাঁর কলকাতার বাড়ীতে আটক রয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ দু এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে মুক্তি প্রদান করবেন। এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে নাকি এতটুকুও সন্দেহ নেই। প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি হওয়ার জন্যে তাঁর নাম অনেক জায়গা হতে প্রস্তাব করা হয়েছে। তাঁর ছাড়া পাওয়ার কথা যখন সম্প্রতি নিশ্চিতরূপে উঠেছে, তখন দেশ বাসীর উচিত এবার বার সম্মান তাঁকেই দেওয়া। উপেন্দ্রনাথের যোগ্যতাও ত্যাগের কথা কাহাকেও নূতন করে বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

"ভারত কি চায় ?"

(আফতাব আলী)

সে প্রায় বছর খানেকের কথা, তখন আমি আমেরিকায় ছিলাম। একদিন আমার অনৈক বন্ধু, আমায় কথা প্রসঙ্গে একটা মস্ত বড় প্রশ্ন করে বসলেন, "ভারত কি চায় ?" আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমার বন্ধুকে একটা উত্তর দিতে পারতেম, কিন্তু দিইনি, কারণ আমার চাওয়া আর ভারতের চাওয়া হয়ত এক নাও হ'তে পারে ! কিন্তু সেই প্রশ্নটা প্রায়ই আমার চিন্তার পথ-রোধ করে দাঁড়ায় একটা উত্তরের দাবী করে। আজ আমি সেই বন্ধুকে বহুদূরে ছেড়ে এসেছি, হাজার হাজার মাইলের রাস্তা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, কিন্তু তাঁর প্রশ্নটি আমার অতি নিকটে রয়েছে, "ভারত কি চায় ?"

আজ আমি সে প্রশ্নের উত্তর দেবো। কিন্তু আমার বন্ধুকে নয়, আমার দেশকে। জানিনে আমার 'চাওয়া' সকলের 'চাওয়ার' অনুরূপ হ'বে কি না। কিন্তু না হ'লেও একজন ভারতবাসী হিসেবে, আমি মনে করি, আমার 'চাওয়া' ব্যক্তিগত হ'লেও সকলের কাছে তা ব্যক্ত করবার অধিকার অন্ততঃ আমার আছে। আমি আশা করি, কোন বন্ধু এ ক্ষেত্রে আমায় ভুল বুঝবেন না। আমার 'চাওয়াকে' যে সকলের 'চাওয়া' করে নিতে হ'বে তা নয়, কিন্তু দেখতে হ'বে আমাদের কোন 'চাওয়াটা' সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন 'চাওয়াটা' আমাদের সকলের মঙ্গল সাধন করবে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের কল্যাণের জন্য কোন ভারতবাসীই তাঁর ব্যক্তিগত 'চাওয়ার' উপরে জেদ করে কোন কাজ করবেন না। অনেকে তাঁহাদের দেশকে যতটুকু ভালবাসেন, তাঁহাদের স্ব স্ব 'চাওয়াকে' তার চেয়েও বেশী ভালবাসেন। এবং ভাল মন্দের বিচার করে নিজেদের 'চাওয়ার' জেদ ত্যাগ করতে তাঁরা মোটেই প্রস্তুত নন। তাঁহাদের দেখা উচিত এ রকম ব্যক্তিগত জেদ ও 'চাওয়া' যে কত জাতির কত সর্ব্বনাশ করেছে, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

আজ ভারতে 'স্বরাজের' কথা উঠেছে। এই 'স্বরাজ' জগতের জন সাধারণ অর্থাৎ কৃষক শ্রমিকগণের কতটুকু উপকার এবং বর্ত্তমান অবস্থার কতটুকু পরিবর্ত্তন করবে, তা'ই ভাল করে দেখবার বিষয়। আজকে আমাদের উপরে একটা বিদেশী শাসন-যন্ত্র আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই আমরা এর পরিবর্ত্তে আমাদের 'শাসন-যন্ত্র' চাই। বেশ কথা। কিন্তু 'আমরা' বা 'আমাদের' বলতে কাহাদেরে বুঝায় ? ভারতের শতকরা ৯৫ জন নর-নারীই হচ্ছে কৃষক ও শ্রমিক দলভুক্ত।

সুতরাং ভারতের 'শাসন-যন্ত্র' ভারতের কৃষক শ্রমিকদের ইচ্ছানুসারেই প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে। তাই আমার জিজ্ঞাস্য এই যে 'স্বরাজ' হবে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু হবে কাদের জন্যে ? দুনিয়ার প্রারম্ভ থেকে যে মানুষ, মানুষের উপর অত্যাচার অবিচার করছে, ধর্ম্ম, সমাজ, আইন কানুন ইত্যাদির দোহাই দিয়ে যে মানুষ মানুষকে হত্যা ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে আসছে তার ইতিহাস থেকে আমরা কি শিক্ষা পাচ্ছি ? সমগ্র মানুষের উপরে জন কতক মানুষের স্বার্থ-গড়া শাসন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই এই সমস্ত অবিচার ও অত্যাচারের একমাত্র হেতু। এই যে চারিদিকে অশান্তির দাবানল ধূ ধূ করে জলছে, অত্যাচারিত নিপীড়িত দুর্বল নিরীহ মানুষের জগতব্যাপী হাহাকার উঠেছে, মানুষের শাসন যন্ত্রের উপরে কতকগুলো স্বার্থবাদী মানুষের মানুষের একচেটে অধিকারই তাহার একমাত্র কারণ। জগত যদি কোন দিন মানুষ মাত্রের জন্যই নিরাপদ স্থান হয়, প্রত্যেক মানুষ যদি কোন দিন তার জন্মগত দাবী পায়, শান্তি বলে একটা জিনিস যদি জগতে কোন দিন আসে, সে দিনের আকাশ বাতাস, সে দিনের চন্দ্র সূর্য্য তারা দেখতে পাবে মানুষ জাতির শাসন যন্ত্রের উপর কয়েকটা অত্যাচারী নরাধমের কোন শক্তি বা অধিকার আর নেই। আরও দেখবে ঐ দলিত মথিত কৃষক আর লাঞ্ছিত লুণ্ঠিত শ্রমিকই মনুষ্যত্বের মহা সত্যের ভিত্তিতে দুনিয়ার আইন কানুন বা শাসন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে।

পূর্ব্বেই বলেছি ঐ 'স্বরাজ' আমাদের কতটুকু উপকার করবে তা ভাল করে দেখতে হবে। দুঃখের বিষয় স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পাণ্ডা সাহেবরা আজ পর্য্যন্তও 'স্বরাজের' প্রকৃত চিত্র দেশের সম্মুখে খুলে ধরেন নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশকে প্রকৃত সুখ শান্তি দিতে পারে না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ ফ্রান্স মার্কিণ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ঐ দেশ গুলোর শাসন-যন্ত্রও গণ-তন্ত্র নামে কথিত হয়। কিন্তু তাহাতে সাধারণ লোকের অর্থাৎ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না। কারণ শাসন যন্ত্র গুলি উভয় দেশের ধনীদের দ্বারাই চালিত হচ্ছে। ঐ ফ্রান্স বা মার্কিণের মত যদি আমাদের 'স্বরাজ' কতক গুলো ধনী এবং ব্যবসায় স্বার্থ জড়িত নর-নারীর জন্য "Capital Protection Republic" বা 'ধনরক্ষণশীল' গণতন্ত্রে পরিণত হতে চায়, তবে আমি মুক্তকণ্ঠে ঐ "ধনরক্ষণশীল' স্বরাজ প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ ত করবই, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব বিরোধ করতেও ছাড়ব না।

ভাই কৃষক ও শ্রমিক, আমরা মানুষ, কিন্তু মানুষের গর্ব্ব প্রকার স্বাভাবিক দাবী ও অধিকার আমরা কোনো দিন পাচ্ছিনে। আজ আমরা মানুষের পবিত্র জন্মাধিকার-বঞ্চিত ভারতের অভিশপ্ত কৃষক ও শ্রমিক একটা মহা ধ্বংস পথের অতি নিকট পথিক হ'য়ে এসেছি, হাজার হাজার বৎসরের অত্যাচার আর অবিচার আজ আমাদেরকে মরণ দ্বারের অতি নিকটে নিয়ে এসেছে। আমরাও যে মানুষ সে কথা আজ আমরা ভুলে যেতে বসেছি। সমাজের কতকগুলো স্বার্থপর লোকের ভোগ লালসার উপকরণ যোগাবার জন্যই যেন আমাদের জন্ম, সব জিনিসের উৎপন্নকারী আমরা অথচ আমরাই খেতে পরতে পাইনে।

কৃষক ও শ্রমিকরা এ পৃথিবীতে কেবল আপনাদের বুকের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে অশ্রমিকদের ভোগের উপকরণ যোগাতে আসেনি। নিজেদের দাবী দাওয়া তাদেরকে এবার বুঝে নিতে হবে, অশ্রমিক পরগাছা গুলোর ভার তারা আর বইতে পারবে না। একই রাত্রিতে দুটো মানুষ জন্ম নিয়েছে। একটি রাজার রাজপ্রসাদে বা ধনীর বিলাস নিকেতনে, আর একটি গরীব চাষা বা শ্রমিকের পর্ণ কুটিরে। এ সুযোগের মাহাত্ম্যে একজন পাবে রাজার রাজ্য সামগ্রী বা ধনীর ধন দৌলত—দাসদাসী ও অহর্নিশ বিলাস ব্যসন—আর একজন পাবে রাতদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি, অভাবের তীব্র কঠোর তাড়না। যে গরীব চাষী বা শ্রমিকদের ঘরে জন্ম নিয়ে সব কিছু উৎপন্ন করছে বলেই কি তার কোন স্থান বা অধিকার নেই?

মানুষ আমরা, আমরা আমাদের কর্মের জন্য দায়ী হতে পারি, কিন্তু জন্মের জন্য ত দায়ী নই। যখন আমরাও এ দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছি—তখন আমরাও এ দুনিয়ার ফল-ফুল-ধন-দৌলত ইত্যাদি উপভোগ করার সমান অধিকারী। মানুষের জন্যই দুনিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দুনিয়াটা কারুর পৈতৃক সম্পত্তি হতে পারে না, উহাতে প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার, সমান দাবী আছে। মানুষের ঐ জন্মগত অধিকার বা দাবীকে ন্যায়ত অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করবার অধিকার কারো নেই। প্রত্যেক মানুষের ঐ জন্মগত অধিকার বা Birth Right কে স্বীকার করার নামই মানবতা। মার্কিন বাসীরা, তাদের সুবিখ্যাত স্বাধীনতার ইস্তাহারে অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায় এই মহাসত্যের ঘোষণা করেছেন—

"We hold these truths to be self evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creater with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the persuit of happiness—"

অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি সকল মানুষই সমান এবং সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকেই কতকগুলো অপরিবর্তনীয় দাবী বা অধিকার দিয়েছেন, মানুষের জীবন স্বাধীনতা ও সুখশান্তির উপকরণ তাদের অন্তর্গত।

মানুষের সমস্ত ও তার জন্মগত দাবী বা অধিকারকে স্বীকার করতে প্রত্যেক মানুষই ধর্মত ও ন্যায়ত বাধ্য। উহার অন্যথায় সৃষ্টি ও মহামানবতার চরম বিদ্রোহীতা করা, প্রকৃতির বিধানে সর্বথা দণ্ডনীয়।

এখন জিজ্ঞাসা করি আমাদের জন্মগত অধিকার বা দাবীগুলো কোথায়? কেন আজ ভারতের শতকরা ৯৫ জন নরনারী অতি শোচনীয়রূপে একটা মহা ধ্বংসের পথে চলেছে? সুখ-শান্তির উপকরণ ত দূরের কথা, রাত দিন খেটে খেটেও চারটে পেটের ভাত পায় না। হায়রে মানুষের পরিণাম!

সুমেরু হতে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যাদের দেশ, ধন-ধান্য পুষ্পে ভরা-ভারতের যারা অধিকারী তারা আজ পেটভরে চারটে খেতেও পায় না। কেন? ভারত কি আর সেই "সুজলা সুফলা" ভারত নয়? ভারতের সেই উৎপাদিকা শক্তি কি আর নেই? ধরিত্রীর কৃষির জনক কি তার সেই মহা কৃষিবিদ্যা ভুলে গিয়েছে? যায় নি। কিন্তু তার পেটে ভাত নেই, শরীরে বল নেই—নির্দয় ডাকাতের কবলে পড়ে সে সর্বস্বান্ত। হায় কৃষক! ভারতের গৌরব, ভারতের উৎপন্নকারী তুমি, তোমার এই নিদারুণ অবস্থা! কিন্তু ভয় কি কৃষক! যে লাঙল দিয়ে তুমি যুগে যুগে কোটি কোটি নরনারীকে অন্নদান করে অকাল মৃত্যুর নির্দয় কবল থেকে বাঁচিয়ে এসেছ এখনো তোমার সেই লাঙল তোমারি হাতে রয়েছে! লাঙল তোমাকে কাঙাল সেজে ভিক্ষা চাইতে শিক্ষা দেয় না। অবাধ্য মাটির বুক চিরে ভেঙে চুরমার করে না দিলে শস্য জন্মায় না, তেমনি তোমাদের উপরে যে যুগ যুগ ধরে অত্যাচার আর অবিচার হচ্ছে তার মূলে আঘাত না করলে পৃথিবীতে শান্তির ফসল ফলবে না, তোমরাও মনুষ্যত্বের দাবী দাওয়া পৃথিবীর কাছ থেকে বুঝে নিতে পারবে না, দুর্বলের হাহাকার পৃথিবী হতে ঘুচবে না। তোমার লাঙল তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছে তোমার প্রাপ্য বুঝে নিতে। এস ভাই কৃষক, এস ভাই শ্রমিক, আমরা সকলে মিলে আজ আমাদের জন্মগত অধিকারের দাবী করি। আমরা শুধু তপ্ত নিশ্বাস আর চোখের জল ফেলতে দুনিয়াতে আসিনি। আমরাও অন্নবস্ত্র চাই, সুখ-শান্তি চাই। আর মনে রেখো ভারতের কল্যাণের অকল্যাণের জন্য আমরাই সর্বতোভাবে দায়ী। কালকে যারা আসবে তারা যেন আমাদের নামে দায়িত্ব হীনতা ও কর্তব্যে অবহেলার ভীষণ অভিযোগ না আনতে পারে।

ভারত আজ—অত্যাচারী দস্যু ডাকাত ও স্বার্থান্ধ মানুষের নির্দয় কবল থেকে মুক্ত হয়ে সকল মানুষের জন্য একটা নিরাপদ সুখময় স্থানে পরিণত হোক্, ভারতের ধ্বংসোন্মুখ কৃষক ও শ্রমিক তাদের প্রাপ্য অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া নিতে বদ্ধপরিকর হোক, এবং ভারতের প্রকৃত মালিক, ভারতের কৃষক-শ্রমিক-শক্তির উপরে ভারতের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। মানুষ মাত্রকেই সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দিতে হবে। ভারতের কৃষক ও শ্রমিক! আমি তোমাদেরই একজন! আমি বেশ বুঝতে পারছি, শাসনতন্ত্র আমাদের হাতে না আসা পর্যন্ত আমাদের দুঃখ কষ্ট ও দুর্দশার অবসান হবে না। আমাদের দাবী পূর্ণ হওয়ার উপরে আমাদের সকলেরই সুখ শান্তি এমন কি মরা বাঁচা পর্যন্তও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে।

বাঙলার প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বিধি

(শ্রীহৃষীকেশ সেন)

(৬)

তার পর প্রজার নিজের জমিতে গাছ কাটবার অধিকারের কথা। সকলেই জানেন যে, যে গাছ অর্জাবে সেই গাছ কাটতে পারবে এই স্বাভাবিক নিয়মই এ দেশে চিরকাল চলে আসছিল। হঠাৎ জমিদারেরা ইংরেজ ল্যাণ্ডলর্ডদের অনুকরণে প্রজার সে ক্ষমতা লোপ পাইয়ে দিলেন। প্রজার গাছ কাটবার ক্ষমতা নেই এ তত্ত্বটা একেবারে বিলেত থেকে আমদানী করা, এ দেশে কখন ছিল না। ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের অর্থাৎ বর্তমান প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের, ২৩ ধারায় বিহিত হলে যে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জমিতে প্রজা গাছ কাটতে পারবে না। কিন্তু সেটা যদি দেশাচারের অনুমোদিত হয় তা' হলে পারবে। দেশাচার কিন্তু প্রমাণ করা কঠিন। সেই জন্য গাছ কাটা নিয়ে অনেক বিপদ বিসংবাদ হতে লাগল। এই বিবাদ বিসংবাদ নিবারণের জন্য প্রস্তাবিত বিলে আর একটা ধারা যোগ করা হচ্ছে। সে ধারাটা (বিলের ১৯ ধারা) এই যে, যে জমিতে প্রজার দখলীস্বত্ব জন্মেছে প্রজা তার উপর গাছ অর্জাতে পারবে। এ পর্যান্ত ধারাটি অতি উদার কিন্তু—একটা খুব বড় কিন্তু আছে—যদি গাছটা মূল্যবান্ হয়, তা হলে জমিদারকে গাছটার দামের চতুর্থাংশ দিতে হবে। মূল্যবান্ গাছের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। কিন্তু, বলে' দেওয়া হয়েছে যে আম, জাম, কাঁটাল, তাল এবং যার কাঠের মূল্য আছে এ রকম গাছ মূল্যবান্ গাছের মধ্যে গণ্য হবে। কমিটির এক সদস্য বাবলা কাঠে গোরুর গাড়ী তৈরী হয় বলে বাবলা-গাছকেও মূল্যবান্ গাছের তালিকার মধ্যে ফেলতে যান। অপর এক সদস্য না কি প্রস্তাব করবেন ভেরাণ্ডা গাছকেও ঐ তালিকায় স্থান দেওয়া হক, কেন না, কোন কোন দেশে "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"। কলা গাছ কাটলে থোড়ের দিকি অংশটাও যেন জমিদারের বাড়ীতে পৌঁছয় তারও ব্যবস্থা বোধ করি, হবে। এ সম্বন্ধে বর্তমান ব্যবস্থা, আগেই বলেছি, দেশাচারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু দেশাচারটা নিঃসন্দেহ নয় বলে' এখন জমিদার প্রজার পাট্টা-কবুলিয়তে লিখিয়ে নেন যে গাছ "রোপন" করবার অধিকার আছে, কিন্তু "ছেদন" করবার অধিকার নেই। এর ফল হয়েছে এই যে বাঙলা দেশে ফলের বাগান করা একবারে উঠে গিয়েছে। যাদের পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন যে পল্লীগ্রামে জমিদারের দু'একটা বাগান ছাড়া বাগানই নেই। গাছে যদি প্রজার সম্পূর্ণ অধিকার থাকত তা হ'লে প্রজা ফলের বাগান করে তার শীর্ণশীর্ণ ক্ষুদ্র আয়কে একটু বাড়িয়ে কথঞ্চিৎ দারিদ্র্য নিবারণ করতে পারত। এই ব্যবস্থা আর কিছু দিন চললে দেশমাতৃকাকে আর "সুফলাং" বলে' বন্দনা করা চলবে না।

তার পর প্রজার বাড়ী করা ও পুকুর-কাটা। বর্তমান আইনের ৭৬ ধারায় চাষের জমির উন্নতি করবার জন্য প্রজাকে বাড়ীঘর করবার ও পুকুর কূয়ো প্রভৃতি জলাশয় করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর ১৮২ ধারায় বিহিত হয়েছে যে, যে-প্রজা চাষী নয় তার বসত বাড়ী এবং বসতবাড়ীর সংলগ্ন জমির স্বত্বাদি দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে স্থির করা হবে। কিন্তু "বসতবাটী" বা "বাস্তু ভিটার" কোন সংজ্ঞা বর্তমান আইনে নেই। প্রস্তাবিত বিলের ৯ ক ধারা দ্বারা সেই ভ্রম সংশোধন করা হচ্ছে। এতে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা দ্বারা বুঝতে হবে যে, রায়ত বা দর রায়তের চাষের জমির সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য যে ঘর বাড়ী আবশ্যক এবং সেই ঘর ঘরবাড়ীর জন্য যে জমি আবশ্যক তাই বসতবাড়ী (home-stead) অর্থাৎ কৃষকের বাস করবার জন্য এবং কৃষিজাত শস্যাদি রাখবার জন্য যে ঘর বাড়ীর এবং জমির আবশ্যক তাই। কিন্তু দোকান নয় অর্থাৎ কৃষিজাত জিনিসপত্র বিক্রী করবার ঘর বা স্থান নয়। এখন এই ১৮২ ধারা পরিবর্তন করে যে বিধি হচ্ছে (বিলের ১১০ ধারা) তাতে বসত বাড়ীর জন্য আর স্বতন্ত্র বিধি ব্যবস্থা থাকছে না। চাষের জমির সম্বন্ধেও যে ব্যবস্থা, বসত বাড়ীর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তির বসত বাড়ী বা অন্য কোন বাড়ী থাকে অথচ রায়তী বা দর-রায়তী জমি না থাকে, তা' হলে সে ব্যক্তি পরে জমি পেয়ে তাতে রায়তী-বা-দর রায়তী স্বত্ব পেলেও তার বসত বাড়ীতে কোন স্বত্ব বা অধিকার পাবে না। বিলের এই ধারাগুলি আইনে পরিণত হলে প্রজার আর বাড়ী ঘর থাকবে না। দখলী স্বত্ব, অ-দখলী স্বত্ব সব রকম রায়তী স্বত্বই বাকী খাজনার দায়ে বা অন্য কোন কারণে বিক্রী হয়ে গেলে জমিদার পূর্বাধিকারের দাবীতে সেই বাড়ী ঘর নিজের অধিকারভুক্ত করে নিয়ে প্রজাকে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন, যেমন কলকারখানার মালিকেরা তাদের কলকারখানার মজুরদের কাজ থেকে বরখাস্ত করে তাদের, ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন এন, ডব্লু (N, W.) রেলের শ্রমজীবীরা ধর্মঘট করে কাজ ছেড়ে দেয় তখন সেই রেলের কর্তৃপক্ষীয়েরা শ্রমজীবীদের নির্যাতন করে কর্মে যোগ দিতে বাধ্য করবার জন্য অন্য উপায়ের মধ্যে ঘর থেকে তাড়িয়ে-দেওয়া উপায়টা যথেচ্ছ অবলম্বন করেছিলেন। ইংলণ্ডেও গত বৎসর ধর্মঘটের সময় এই জন্য অনেক দাঙ্গাহাঙ্গাম হয়ে গিয়েছে।

পুকুর বা কূয়োর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন বিধি নেই। বাড়ী করবারও যে ব্যবস্থা পুকুর বা কূয়ো করবারও সেই ব্যবস্থা। বর্তমান ব্যবস্থায় পুকুর কূয়ো চাষের জমির উন্নতির জন্য হওয়া চাই। পানীয় জলের জন্য, মাছের জন্য, বাগানের জন্য বা ধর্মার্থে প্রতিষ্ঠার জন্য কেউ পুকুর বা কূয়ো করতে চাইলে তা' পারবে না। বর্তমান আইনে বা প্রস্তাবিত বিলে এমন কোন বিধি নাই যে এই সকল কাজের জন্য কোন জলাশয় করতে যাইলে জমিদার তাকে জমি দিতে বাধ্য। তা' ছাড়া পুকুর এবং কূয়োর উপর প্রজার স্বত্বটা

তার জমিজমা এবং বাড়ীর উপর যে স্বত্ব তারই মত হবে অর্থাৎ তার কোন স্থায়িত্বই থাকবে না। এ অবস্থায় পুকুর ও কুয়ো কাটবার অধিকারের কোন মূল্যই নেই।

এ সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। এই সকল বিধিব্যবস্থা হচ্ছে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বা দর-রায়তের জন্ম। কিন্তু দখলী স্বত্ব যাদের নাই বা কখন হবে না, বা যাদের এখনও আছে কিন্তু বেশী দিন আর থাকবে না, তাদের জন্ম কোন বিধি-ব্যবস্থা নেই। আগেই বলেছি এই সকল অন্যায় অবিচারের মূল হচ্ছে জমিদারের তথা-কথিত ভূম্যধিকারিত্ব। **সেই ভূম্যধিকারিত্বের উচ্ছেদ সাধন করতে না পারলে প্রজার মঙ্গল নেই। দেশের ভূসম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি হওয়াই এর একমাত্র প্রতীকার।**

ভূ-সম্পত্তিটা যদি জাতীয় সম্পত্তি হয়ে যায় তা' হলে প্রজার কি লাভ হবে? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয়। সংক্ষেপে এর উত্তর এই—একটা গ্রামে যত জমি আছে, সেই সমস্ত জমি প্রথমে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। প্রথম, বাস্তু জমি, দ্বিতীয়, গোচর জমি; তৃতীয়, চাষের জমি। গোচর জমি সর্ব্বসাধারণের থাকবে, সকলেই তাতে গোরুবাছুর চরাবে। প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর জমি গ্রামের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। একটি কৃষক-গৃহস্থের যে পরিমাণ জমি হলে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় সেই পরিমাণ জমি প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত কৃষককে দেওয়া হবে—এই শর্ত্তে যে, কৃষক সে জমি নিজে নিজ পরিজনের দ্বারা চাষ করবে। বেতন ভোগী ভৃত্য নিয়ে বা মজুর দিয়ে বা ভাগে দিয়ে চাষ করতে পারবে না। জমি অনাবাদী বা পতিত রাখতেও পারবে না। দান-বিক্রী-বন্ধক দিয়ে হস্তান্তরিত করতেও পারবে না। বেতন ভোগী ভৃত্য বা দিন মজুর দিয়ে চাষ করান প্রথায় জমি বিহীন দিন মজুরের সৃষ্টি হয় এবং সেই মজুরদের অন্যের দেওয়া মজুরীর উপর জীবিকার জন্ম নির্ভর করতে হয়। ক্রমে এক একটি কৃষক এক একটি ক্ষুদ্র নীলকর বা চা-কর হয়ে ওঠে এবং ধনিক-শ্রমিকের মধ্যে যত বিবাদ বিসংবাদ আছে সবই ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়। কিন্তু বেতন ভোগী ভৃত্য বা দিনমজুর না রাখতে পারলেও, পাঁচজন কৃষকে মিলে যৌথ চাষ করতে পারবে। এইরূপ জমিতে উত্তরাধিকারিত্বও থাকবে না কারণ, উত্তরাধিকারিত্ব থাকলেই জমির ভাগের ভাগ তস্য ভাগ অবশ্যম্ভাবী। উত্তরাধিকারিত্বের আবশ্যকও থাকবে না, কারণ, বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই প্রত্যেক কৃষক-সন্তান গ্রামের জমির এক অংশ পাবে। এ অংশ আবার কোথা থেকে আসবে এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যেমন একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হবে তেমনি আর একজনের তিরোভাবও ত হবে। সেন্সাসে দেখা যায় বাঙলায় কৃষকের মৃত্যুর চেয়ে জন্ম তত বেশী নয়, এবং অনাবাদী পতিত জমির পরিমাণও কম নয়। আর, প্রতি দশ বৎসর অন্তর সেন্সাস অনুসারে লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি দেখে জমির পুনর্বিভাগ করাও কঠিন হবে না। বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে যিনি জমিদার আছেন তারও এতে বিশেষ ক্ষতি হবে না কারণ, খাজনার সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ, তিনি যথারীতি খাজনা পাবেন। তাঁর কর সংগ্রাহকত্ব অক্ষুন্নই থাকবে, কেবল থাকবে না তাঁর ভূম্যধিকারিত্ব যার বলে তিনি সেলামী নিয়ে, চৌথ নিয়ে, জমিদারী দক্ষিণা (lanalord's fee) নিয়ে, পূর্ব্বাধিকারের দাবীতে আরও কত কি নিয়ে উধোর জমি বুধোকে দিয়ে অসাধু উপায়ে আয় বৃদ্ধির ক্ষমতা। জমির ভাগ এবং জমি সম্বন্ধীয় বিবাদ-মীমাংসার ভার থাকবে গ্রাম্য পঞ্চায়তের উপর।

বিবিধ প্রসঙ্গ

যাক্। ইরাকের আর কোন কোন ভয় নেই। ইরাক্ বাসীরা এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারেন। সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আরো পনের বৎসরের জন্ম ইরাকের দুর্ব্বিষহ ভার বহন করতে রাজী হয়েছেন। পার্লামেণ্টে সেদিন অধিবেশন হয়ে স্থির হয়ে গেছে যে ইংলণ্ড পৃথিবীর শান্তি রক্ষার্থে ও ইরাক্ বাসদের তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়ে দেবার জন্তে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এই বোঝা আপনার স্কন্ধে নিলেন। শ্রমিক দলপতি মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কি আস্পর্দ্ধা। তিনি কিনা ইঙ্গিত করতে ছাড়েন নি অতদূরে যে ইরাকের তেলের গন্ধ ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের নাকে এসে পৌঁচেছে, আর তারি লোভে এই ভার বহন।

কি আস্পর্দ্ধা। আমরা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কথার তীব্র প্রতিবাদ করছি। ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, আয়ার্লণ্ড প্রভৃতি জায়গায় ইংলণ্ডের পরার্থ পরতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তের পর এ কথা কোন ক্রমেই বলা চলে না।

বাজারে গুজব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের মেয়র পদের অবসর গ্রহণের পর শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী সেই পদ অলঙ্কৃত করিবেন। তাঁর যোগত্যা সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? বিলাতে যাইয়া তিনি শ্রমিক-দলপতিদের নিকট বলিয়া আসিয়াছেন যে তিনি ও তাঁর দল ভারতের শ্রমিকদিগের উন্নতির জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই সত্য কথা বলার জন্ম তাঁকে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র করা কলিকাতাবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। নৈহাটিতে তাঁর জমীতে চটকলের মজুরদের আবাসস্থান যারা দেখেন নাই তাঁরা দয়া করিয়া দেখিয়া আসিবেন আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। তবে তাঁকে মেয়র করিলে লক্ষ্মীর পদ্মের দু একটি পাঁপড়ি স্বরাজ্য দলের মণিব্যাগের মধ্যে ঝরিয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভবনা আছে। স্বরাজ দলের আয়ু যে তাহা হইলে কিছুকাল বাড়িবে তাহা নিঃসন্দেহ।

স-স-ঠ

* আমাদের একটি বিশেষ বন্ধু একবার একজন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করিতে যান। দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার পর হইতে তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত কাউকে স্পর্শ করিতে দিতেন না, বলিতেন যে হস্তে তিনি রাজপুরুষের সঙ্গে কর মর্দন করিয়াছেন সেই হস্ত কি সকলকে স্পর্শ করিতে দিতে পারেন? সেদিন কাউন্সিলে ঘটনার পর এই কথাটাই বারে বারে মনে পড়িতেছিল। ঘন ঘন লাটভবনে যাতায়াত করিয়া ও লাটসাহেবের সঙ্গে মোলায়েম স্বরে কথা কহিয়া কুমার বাহাদুর বোধ হয় সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে মোলায়েম সংযত ভাষা শুধু লাটসাহেবের সহিত বলিবেন, অন্যদের সহিত তার বিপরীত ব্যবহারই সঙ্গত। আমরা বলি যে ঠিক কথা। লাটের সহিত বাধ্য হইয়া ভদ্র ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া কি সকলের সঙ্গে ভদ্র হওয়া যায়?

স-ন-ঠ

খড় কুটো

হালিসহরে বঙ্কুমচাঁদ জুট মিলে ধর্ম্মঘটের অবসান হয়েছে। বর্ব্বর শ্বেতাঙ্গের একটি শ্রমিকের উপর অত্যাচারের ফলে এই ধর্ম্মঘটের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বিনা সর্ত্তে শ্রমিকেরা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কুলির সর্দ্দারেরা শ্বেতাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে একজোট হইয়া ধর্ম্মঘটকারীদের বিধ্বস্ত করিয়াছে। বালি জুটমিলের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। তাহারা খাটুনির সময় কমাবার জন্য ও বোনাসের বৃদ্ধির জন্যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। একই কারণে সেখানকার ধর্ম্মঘটও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যতদিন না শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে ততদিন সঙ্ঘবদ্ধ বণিকদের আক্রমণ হইতে তাদের রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

রাগবীর ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের তারের খবরে জানা গিয়েছে যে ওয়ার উইকের কাউন্টেস সেদিন তাঁর ইসেক্সের কাউন্টী হাউসখানা শ্রমিক আন্দোলনের সহায়তার জন্যে দান করেছেন। এবাড়ী খানার বেড়ার ভিতরে ১০০ একর জমি আছে। শ্রমিক আন্দোলনের সহিত শ্রীমতী ওয়ার উইক কাউন্টেসের অনেক কালের যোগ রয়েছে।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সার রাধা গোপাল আচার্য্যের জায়গায় ইংল্যাণ্ডে ভারত সচিবের কাউন্সিলার নিযুক্ত হয়েছেন।

বাঙলা দেশের গবর্ণর লর্ড লিটন কয়েক মাসের জন্যে ছুটিতে যাচ্ছেন। তাঁর জায়গায় বর্ত্তমান হোম মেম্বর সার হিউ ষ্টিফেন্সন গবর্ণর হবেন।

---

* বিলাতের লেবর পার্টি কম্যুনিষ্ট দিগকে তাঁদের দলভুক্ত করবেন না বলে স্থির করায় কয়েকটি শ্রমিক সঙ্ঘ লেবর পার্টি হতে আপনা দিগকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। এই সঙ্ঘগুলি লেবর পার্টির ভীরুতা সহ্য করতে পারেনি।

কলিকাতার হাইকোর্ট শ্রীযু শচীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসের আপীলের রায় প্রকাশ করেছেন। বাঁকুড়ার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে যে সাজা দিয়েছেন সে সাজাই বহাল থেকে গেল।

বৌবাজারের জমিদার শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র মণ্ডল তাঁর একজন প্রজাকে চার ঘণ্টা আটক রেখে তার কাছ থেকে ৬৮৩ টাকার একখানা হাতচিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। প্রজাটি আলীপুরের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জমিদার মশায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছিল। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এ মোকদ্দমার বিচার হয়ে গেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট জমিদারের ২০০ টাকা জরিমানা করেছেন। টাকাটা আদায় না হলে জমিদার মশায়কে দু'মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

আগামী ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল তারিখে বীরভূম জেলার সদর ষ্টেশন সিউরীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন হবে।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য স্থগিত রাখার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল মান্দালয় জেলের বাঙ্গালী রাজবন্দীদিগের অনশন ব্রত নেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা। ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারী শ্রীযুত সেনগুপ্তকে জানিয়েছেন যে সভার সভাপতি কুমার শিব শেখরেশ্বর রায় কিছুতেই এ প্রস্তাব তুলতে দিবেন না। তাঁর মতে সাধারণের দিক থেকে এ প্রস্তাবের কোনো বিশেষত্ব নেই। তা-ছাড়া আরো বলেছেন যে এ ব্যাপারের সহিত বাঙলা সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। বর্ম্মার গবর্ণমেণ্টই এ ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করতে পারেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি কিন্তু ঠিক এ প্রস্তাবই ভারতীয় ব্যবস্থাপক তুলতে অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্রীযুত তুলসী চরণ গোস্বামী এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন। অধিকাংশ সভ্যের মতে সেখানে গোস্বামী মশায়ের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে।

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

বাৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	৸৹
প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম	৭৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৩৷৹
মলাট—১ম পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷৹
অর্দ্ধ কলম	৭৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩৷৹
" ২য় পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৲
" প্রতি কলম	৯৷৹
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৮৷৹
" ৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য	
" ৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷৹
প্রতি কলম	১১৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	২১৷৹

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵৹।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সী দেওয়া হইবে না; ও প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতি মাসের শেষ হিসাব সহ বিক্রয়লব্ধ জমার টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় এজেন্টগণকে দিতে হইবে কিন্তু মণিঅর্ডার কমিশন কাগজ অফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যায় শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেন্টগণকে শতকরা পচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

পত্রিকার মূল্য—

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে বার্ষিক ৩ টাকা,

ভিঃ পিঃ ৩৷৹

" " ষান্মাসিক ১৷৵৹ আনা

ভিঃ, পি, ১৸৵ "

বিদেশে বার্ষিক মূল্য ৬ শিলিং

নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র :—

৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মোস্তাফা-কামালপাশা ।৵৹

গাজী আব্দুল করীম ৷৵৹

প্রাপ্তিস্থান—লাঙল বুক এজেন্সী

৩৭ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

"লাঙল" বুক এজেন্সী

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

[নব যুগের নবীন মন্ত্রের নবীন তন্ত্রের নব পুস্তকালয়]

নজরুল ইসলামের

নূতন কবিতার বই সাম্যবাদী	৵৹
ছায়ানট	১।৹
রাজবন্দীর জবানবন্দী	৵৹

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী প্রণীত

বোলশেভিকবাদ

(সচিত্র)

বোলশেভিক রুশিয়া সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ নানা চিত্র সম্বলিত পুস্তক মূল্য মাত্র ৷৹ আনা।

চিত্তকথা

(সচিত্র)

চিত্তকথা চিত্তরঞ্জনের নিজেরই মনের কথা—মহাপুরুষের চরিত্রের সকল দিক ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

নরনারী

(যন্ত্রস্থ)

মারী ষ্টোপ্‌স্‌, হ্যাভলক এলিস্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের গবেষণা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত।

শ্রমিক-সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিষয়ক যাবতীয় পুস্তক সরবরাহ করার জন্যে—

লেবার বুক এজেন্সী

শীঘ্রই খোলা হবে।

FOR ALL SORTS OF BOOKS
ON
Social Science and Labour Politics
Please ask
The Labour Publishing Company Ltd
38, Great Ormond Street, London W. C.

প্রিণ্টিং মেশিন আবশ্যক

পুরাতন, অথচ কার্য্যোপযোগী একটি ডবল ডিমাই বা ডবল ক্রাউন প্রিণ্টিং মেশিন এবং হাফ ক্রাউন সাইজ ট্রেডল মেশিন আবশ্যক।

ম্যানেজার, "লাঙল"
৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বসন্ত-উৎসব! বসন্ত-উৎসব!!

(বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের সাহায্যের জন্য)

যাঁরা সঙ্গীত ও নৃত্যানুরাগী তাঁদের
এ সুযোগ হারানো কিছুতেই
উচিত নয়।

বিখ্যাত গায়ক ও গায়িকাগণের
অপূর্ব্ব সমাবেশ।

নৃত্যকুশলা

একজন ইউরোপীয় মহিলা আমাদের সাগ্রহ
অনুরোধে পাশ্চাত্যের ক্লাসিক নৃত্য
প্রদর্শন করতে সম্মত হয়েছেন।

২২শে ফাল্গুন শনিবার (৬ই মার্চ্চ, ১৯২৬)
সন্ধ্যা ৬টার সময় কলেজ স্কোয়ার

* এলবার্ট হলে *

এ উৎসব সম্পন্ন হবে।

টিকিট পাওয়ার ঠিকানা

১। লাঙল কার্য্যালয়—৩৭, হ্যারিসন রোড,—কলিকাতা।

২। দি বুক কোম্পানী—৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার,—কলিকাতা।

৩। দি ক্যালকাটা সেল্‌-হাউস্‌—৬৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

উৎসবের দিনে এলবার্ট্ হলের দ্বারেও টিকিট পাওয়া যাবে।

প্রবেশিকা—তিন টাকা, দুই টাকা ও একটাকা

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট—মেট্‌কাফ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোড্ হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক ও সম্পাদক শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

Reg. No. C 1389.

লাঙল

প্রধান পরিচালক
নজরুল ইসলাম
সম্পাদক—
শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
নগদ মূল্য এক আনা
বার্ষিকমূল্য—
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩
বিদেশে ৬ শিলিং

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের
সাপ্তাহিক মুখপত্র।

LANGAL

A Weekly organ
of
The Beugal
Peasants and Workers,
Party
37, Harrison Road, Calcutta.

প্রথম খণ্ড বৃহস্পতিবার, ৪ঠা চৈত্র ১৩৩২, ইং ১৮ই মার্চ্চ (১৯২৬) দ্বাদশ সংখ্যা

(১২১-৬)

এই সংখ্যায় আছে
কার্ল-মার্কসের পত্র

লাঙল

[বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৩২ | দ্বাদশ সংখ্যা

জেলেদের গান*

[নজরুল ইস্‌লাম]

আমরা নীচে প'ড়ে রইব না আর
শোন্‌রে ও ভাই জেলে'
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে।
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠ্‌ল সবাই রে
ঐ মুটে মজুর হেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥

আজ সবার গায়ে লাগ্‌ছে ব্যথা
সবাই আজি কইছে কথা রে,
আমরা এমনি মরা কইনে কিছু
মড়ার লাথি খেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥

আমরা মেঘের ডাকে জেগে উ'ঠে
পান্সিতে পাল তুলি।
আমরা ঝড়-তুফানে সাগর-দোলার
নাগর-দোলায় দুলি।
ও ভাই আকাশ মোদের ছত্র ধরে
বাতাস মোদের বাতাস করে রে।
আমরা সলিল অনিল নীল গগনে
বেড়াই পরাণ মেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥

* মাদারীপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত।

ভাইরে মোদের ঠাঁই দিলনা
আপন মাটির মায়ে,
তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়
ঝড়ের মুখে নায়ে।
ওভাই নিত্য নূতন হুকুম জারি
করছে তাই সব অত্যাচারী রে,
তারা বাঘের মতন ছোঁ মেরে খায়
আমরা মৎস্য পেলে।
এবার উঠ্‌বে রে সব ঠেলে॥

আমরা তল করেছি কতই সে ভাই
অথই নদীর জল,
ভাই হাজার ক'রেও ঐ হুজুরদের
পাইনে মনের তল।
আমরা অতল জলের তলা থেকে
রোহিত মৃগেল আনি ছেঁকে রে
এবার দৈত্য দানব ধরব রে ভাই
ডাঙাতে জাল ফেলে।
এবার উঠ্‌বে রে সব ঠেলে॥

আমরা পাথার-জলে ডুব-সাঁতার দিই
ম'রেও নাহি মরি,
আমরা হাঙর কুমীর তিমির সাথে
নিত্য বসত করি।
ওভাই জলের কুমীর জয় ক'রে কি
কুমীর হ'ল ঘরের ঢেঁকি রে,
ওভাই মানুষ হ'তে কুমীর ভাল
খায়না কাছে পেলে।
এবার উঠ্‌বে রে সব ঠেলে॥

ওভাই আমরা জলে জাল ফেলে রই,
হোথা ডাঙার পরে
আম জাল ফেলেছে জালিম যত
জমিদারের চরে।
ওভাই ডাঙার বাঘ ঐ মানুষ-দেশে!
ছেলে মেয়ে ফেলে এসে রে
আমরা বুকের আগুন নিবাই রে ভাই
নয়ান-সলিল ঢেলে।
এবার উঠ্‌বে রে সব ঠেলে॥

ওরে　　সপ্ত লক্ষ শির মোদের ভাই
　　　　চৌদ্দ লক্ষ বাহু,
ওরে　　গ্রাস করেছে তাদের ভাই আজ
　　　　চৌদ্দ জনা রাহু।
যে　　চৌদ্দ লক্ষ হাত দিয়ে ভাই
　　　　সাগর ম'পে দাঁড় টেনে যাই রে।
সেই　　দাঁড় নিয়ে আজ দাঁড়া দেখি
　　　　মায়ের সাত লাখ ছেলে।
　　　　এবার উঠ্ বরে সব ঠেলে॥

ওভাই　　আমরা জলের-জল দেবতা
　　　　বরুণ মোদের মিতা,
মোদের　　মৎস্যগন্ধার ছেলে ব্যাসদেব
　　　　গাইল ভারত-গীতা।
আমরা　　দাঁড়ের ঘায়ে পায়ের তলে
　　　　জলতরঙ্গ বাজাই জলে রে।
আমরা　　জলের মতন জল কেটে যাই,
　　　　কাটব দানব পেলে।
এবার　　উঠ্ব রে সব ঠেলে॥

আমরা　　খেপ্লা জালে মাছ ধরি ভাই
　　　　একূলা নদীর তীরে,
এবার　　এক সাথে ভাই সাত লাখ জেলে
　　　　ধর্ বেড়াজাল ঘিরে।
ঐ　　চৌদ্দ লক্ষ দাঁড়-কাঁধে ভাই
　　　　মল্লভূমির মল্ল-বীর আয় রে,
ঐ　　আঁশ-বঁটীতে মাছ কাটি ভাই
　　　　কাটব অসুর এলে।
এবার　　উঠ্ বরে সব ঠেলে॥

কৃষ্ণনগর
২৪শে, ফাল্গুন, ১৩৩২।

কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলন

(মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)

চাষী আর মজুরের সংখ্যা ভারতবর্ষে কত বেশী একথা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষে সত্যিকারের গণ-আন্দোলন যা, তা হচ্ছে এই চাষী আর মজুরের আন্দোলন। ভারতের এ বিশাল গণ-শক্তিকে বাদ দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার সমরে আমরা কোনো দিন জয়ী হতে পারব না। সকল প্রকারের জাতীয় আন্দোলন তার প্রেরণা হয়তো মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে, কিন্তু তার শক্তি জুগিয়েছে কৃষক ও শ্রমিক-সম্প্রদায়। কিন্তু, বড় দুঃখ যে, এই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় বরাবর কৃষক ও শ্রমিকদিগকে অবহেলা করে এসেছেন। তাদের মঙ্গলের জন্যে যে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি কোনো দিন কিছু বলে নি, এমন কথা আমরা কখনো বলতে পারব না। কংগ্রেসের নেতারা চাষী আর মজুরদের জন্যে মায়া কান্না অনেক কেঁদেছেন। কিন্তু ধন ও বিত্তশালী লোকদের সহিত উৎপন্নকারী-দের সংঘর্ষ যখনি বেধেছে তখনি কংগ্রেসের নেতারা ধনী ও বিত্তশালী লোকদেরই পক্ষাবলম্বন করেছেন। চৌরি-চৌরা ও মালাবারের কৃষকদের বিদ্রোহের কথা সকলেই জানেন, আর মহাত্মা গান্ধী যে এ দু' ব্যাপারকেই খুব বেশীরূপ নিন্দা করেছেন তাও কাহারো অজানা নেই। কংগ্রেস বলতে সে যুগে মহাত্মা গান্ধীকেই বোঝাত, কারণ, তখন তাঁর কথার ওপরে কথা বলার শক্তি কংগ্রেসের কোনো লোকেরই ছিল না। আমরা জানি, বিদ্রোহ করতে যেয়ে চৌরি-চৌরা ও মালাবারের কৃষকরা অনেক অন্যায় কাজও করেছে, তবে যে কারণে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল সে কারণটিত মোটেই মিথ্যা নয়। সত্যপ্রিয় মহাত্মা গান্ধী কিন্তু এখানে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করেন নি, কেননা, মিথ্যার পক্ষে ছিল বিত্তশালী সম্প্রদায়। এসব ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনের বাংলা দেশের প্রজাসত্ত্ববিষয়ক বিধি পর্য্যন্ত সব কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সেই একই ভঙ্গী,—বিত্তশালী লোকদের পক্ষাবলম্বন।

দেশের স্বাধীনতা সত্যিকার ভাবে যাঁরা চান তাঁদেরকে এমন কাজ করতে হবে যাতে সেই পথে আমরা একান্তভাবে এগুতে পারি। স্বাধীনতা সমরের পতাকা বহন করার কোনো অধিকার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের নেই। শ্রমিক-দিগকেই এই মুক্তির পতাকা বহন করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। এযুগে শ্রমিক ও অ-শ্রমিকের সংগ্রামই প্রকৃত মুক্তি-সংগ্রাম। এদেশের শ্রমিক তাদের আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন নয়,—তারা অজ্ঞান ও নিরক্ষর। যুগের পর যুগ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে তাদের এই দশা ঘটেছে। কিন্তু তবুও শ্রমিকদের সংজ্ঞা বদ্ধ হওয়ার লক্ষণ আজ চারিদিকে পরিদৃষ্ট হচ্ছে, আর এ লক্ষণ অতি শুভ লক্ষণ। আজকের দিনে আমাদের জাতীয় মুক্তিকামী বন্ধুগণের একমাত্র কাজ হচ্ছে শ্রমিকগণের এ চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ফলবতী করে তোলা। আমাদের সমাজ আজ যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে, তাতে তার গতি রোধ করার শক্তি কাহারো নেই। ভারতের কৃষক ও ভারতের শ্রমিকের উত্থান হবেই হবে। নানা ভাবের লোক, নানাদিক থেকে আজ শ্রমিক ও কৃষকদিগকে সংহত করবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে, কিন্তু এঁদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থাপেক্ষা নিজেদের স্বার্থই খুব বেশী রকম কামনা করে থাকে। এদের অনেকেই জমিদার ও ধনিকের প্রসাদ-ভোজী। শ্রমিক সংগঠনের নাম দিয়ে শ্রমিকদিগকে দাবিয়ে রাখাই এদের কাজ। আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণ অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলে আপনাদের মধ্য হতে লোক দাঁড় করাতে পারছে না। এ সুযোগ পেয়েই তথা কথিত স্বার্থপর শ্রমিক-নেতৃগণ শ্রমিকদের মধ্যে স্থান করে নিতে পেরেছে। কিন্তু, তাদের এ নষ্টামী আর কিছুতেই করতে দেওয়া উচিত নয়।

দেখে শুনে মনে হয়, স্বাধীনতা সমরের জন্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, একথা আমাদের অধিকাংশ স্বাধীনতাকামী বন্ধুরা বুঝতে পারেন না। শ্রমিক সংগঠনের নামে তাঁরা বড় ভয় পান, মনে করেন, তাতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হবে। এমন ধারণা সত্য সত্যই তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সমাজের উচ্চাসনের লোকদের প্রতি তাঁদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণই তাঁদের এত বেশী ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু এই ভয়ের জন্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। সংগঠনের কারণ সমাজে বর্ত্তমান রয়েছে। সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সংগঠন হবেই হবে। বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার সাহসই হচ্ছে প্রতিকারের একমাত্র উপায়। আমরা এড়িয়ে চললেও যে এ জিনিসটে ধামা-চাপা পড়বে তার কোনো কারণ নেই।

জাতীয় মুক্তি, পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা একান্তই চাই। এই মুক্তির জন্যে যে কোনো প্রকারে জাতীয় শক্তিকে সংহত ও পরিচালিত করা যে একান্তই প্রয়োজন, একথাও আমরা মানি। কিন্তু একটা কাল্পনিক সংহতি নষ্ট হবে ভেবে আমরা যদি সমাজের চির বর্দ্ধমান ইকনমিক ফোর্স (অর্থনীতির শক্তি) কে অবজ্ঞার চোখে দেখি তাহলে কখনো কি স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় শক্তির পরিচালনা সম্ভবপর হবে? জাতীয় আন্দোলনে লিপ্ত সকল শ্রেণীর লোকই চান যে ভারতে বিদেশী-শাসনের

অবসান হোক্। কেননা, পর-শাসন তাদের সকল উন্নতির পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এ চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বরাজ্যদল, স্বতন্ত্রদল, মডারেটদল প্রভৃতি কত দলই না রয়েছে। এ সকল দলের লোকেরা সকলেই শিক্ষিত। কাজেই, আমরা সহজেই ধারণা করতে পারি যে তাঁরা বোঝেন-শোনেনও বেশ্। তা-সত্ত্বেও দলাদলি হয় কেন? প্রত্যেক দলের বিভিন্ন বাস্তব স্বার্থই কি এ দলাদলির প্রকৃত কারণ নয়? আশ্চর্য্য এই যে, তবুও আমরা চাই সমাজের দু'টো বিশিষ্ট শ্রেণী—শোষণকারী ও শোষিত এক হয়ে কাজ করুক, যদিও একাজের দ্বারা কেবলমাত্র শোষণকারীর দলই লাভবান হবে! আমাদের অতি দেশভক্তেরা বলেন, "আমাদের এ পুণ্য-পবিত্রতার দেশ। এদেশে তোমরা কিছুতেই শ্রেণীগত স্বার্থের কথা তুলোনা। কেননা, আধ্যাত্মিকভাবে সকল শ্রেণীর সমতা আমরা মেনে থাকি।" একটা খুব বড় বিচার্য্য ও চিন্তনীয় বিষয়কে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা শুধু এ নয়, এ হচ্ছে সমাজের নিম্ন-স্তরের লোকগুলোর এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো। কিন্তু, এতে অবস্থার পরিবর্ত্তন কিছুতেই হবে না। কেউ স্বীকার করুন আর না-ই করুন, বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব সমাজে বর্ত্তমান রয়েছে, আর এই বিভিন্ন শ্রেণীর উন্নতি অনুসারেই আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পন্থা নিরূপিত হয়ে থাকে। এ যদি না হত তা হলে আজ কংগ্রেস আন্দোলনের বাহিরে শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টি কিছুতেই হতনা। বিভিন্নস্থানের শ্রমিক-ধর্ম্মঘট ও কৃষক-বিদ্রোহ হতে এ আন্দোলনের সত্তা আজ আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারছি। ধর্ম্মঘট আর বিদ্রোহের দ্বারা তারা তাদের দাবীদাওয়া বুঝে নিতে চায়। এর জন্যে কৃষক ও শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হবে, তাদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নেয় তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের দাবী যতদিন না পূর্ণ হবে, যতদিন বিদেশী শোষণ-শাসনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন আমাদের শ্রমিক ও কৃষকগণই আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম চালাবে। কিন্তু, তাদিগকে জাগাবার জন্যে, সচেতন করার জন্যে, তাদের সংহত শক্তির পরিচালনার জন্যে, তাদের উপস্থিত শ্রেণীগত স্বার্থটা মেনে নিতেই হবে। কৃষক ও শ্রমিকের সংগঠন ভারতের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের সংগঠন। তাদের শ্রেণী সংগ্রামকে যাঁরা ভুল বুঝেন তাঁরা কিছুই বোঝেন না।

সমাজের অধিকাংশ লোক অল্পাংশ লোকের দ্বারা বিলুণ্ঠিত হচ্ছে! এরূপ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিলে আমাদের জাতীয় শক্তি সমূহের সংহতির স্বপ্ন কোনো দিনও সফল হবেনা। শ্রমিকদের ভিতরে বিদ্রোহ মাথা তুলে উঠেছে। আজকের দিনে বাজে ঐক্যের দোহাই দেওয়া আর চলবেনা। শ্রমিকদের জাগরণ অবশ্য অশ্রমিক লোকেরা খুব ভাল চোখে দেখেনা, যেহেতু এতে তাদের স্বার্থের হানি যথেষ্ট হবে। এখন তারা পরের পরিশ্রমের কড়ি খুব আমোদ করে উপভোগ করছে, শ্রমিকরা জেগে উঠলে তা আর সম্ভব পর হয়ে উঠবে না।

শ্রমিক আন্দোলন এমন সব লোকের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হওয়া কিছুতেই উচিত নয়, যারা স্বার্থের খাতিরে আন্দোলনকে ভুলপথে পরিচালিত করতে চায়। দেশকে যাঁরা সত্য সত্যই স্বাধীন করতে চান, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে তাঁদের সকল শক্তি নিয়োজিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের একটি চিত্র

(কার্ল মার্‌কস্)

[১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণ স্বত্ববাদের প্রবর্ত্তক কার্ল মারকস্ নিউইয়র্কের ডেলী ট্রিবিউন পত্রিকায় ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে দুটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এতদিন বাদে মস্কোতে সেই দুখানি চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। মস্কোর একটি পত্রিকা থেকে জার্ম্মানীর একটি পত্রিকায় অনুবাদ বের হয়। বিলাতের শ্রমিকদলের মুখপত্র 'লেবার মান্থলী' তার অনুবাদ প্রকাশ করেন। লাঙলের পাঠকদের জন্যে আজ আমরা তার একখানা চিঠি অনুবাদ করে দিলাম। অন্য চিঠিখানার অনুবাদ আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে।]

ভারতবর্ষকে ইতালীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যেমন হিমালয়কে আল্‌প্সের সঙ্গে, বঙ্গদেশের সমতল ভূমিকে লম্বার্ডির সঙ্গে, দাক্ষিণাত্যকে এপিনাইনের সঙ্গে আর সিংহলকে সিসিলির সঙ্গে। এই কারণে ভারতবর্ষে ইতালির মত এত বিভিন্ন রকমের ফসল উৎপন্ন হয়, আর এর রাজনৈতিক জীবনও ইতালির মত এত জটিল।

ইতালী যেমন বহুবার বিজেতার তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষও তেমনি যখন মোগল কিম্বা ইংরাজের শাসনাধীন ছিলনা তখন বহু সংখ্যক পরস্পর বিরোধী রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। সামাজিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দুস্থানকে প্রাচ্যের আয়ার্লণ্ড বলতে হয়। একই

দেশে ইতালী ও আয়ারল্যণ্ডের জীবন যাত্রা প্রণালীর মত পরস্পর বিরোধী দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জীবন ধারার অদ্ভুত মিশ্রন, একদিকে কদর্য্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা, অন্যদিকে আত্মনিগ্রহের কঠোর বিধির মত দুটি ভিন্ন জগতের বস্তুর সংযোগ ভারতবর্ষের ধর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমান।

এই ধর্ম্মে একদিকে ভোগসুখের অত্যধিক ব্যাভিচার, অন্যদিকে নিষ্কামতা লাভ করবার জন্য কঠোর আত্ম-নিগ্রহ, এক দিকে লিঙ্গ আর জগন্নাথের পূজা, অন্য দিকে সাধু আর নাচওয়ালীর অস্তিত্ব পাশাপাশি ভাবে বর্ত্তমান দেখা যায়।

অতীত কালে ভারতবর্ষের একটি সত্যযুগ ছিলো এই কল্পনা যাঁরা মনে পোষণ করেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। তাই বলে আমার কথার সমর্থনের জন্যে সার চার্লস উডের মত আমি তুলি খাঁর নজির দেখাবার কোনই সঙ্গত কারণ দেখছি না। একবার আওরঙ্গজেবের সময়, কিম্বা মোগলেরা যখন উত্তরে আর পোর্ত্তুগীজেরা যখন দাক্ষিণে দেখা দিলো, সেই সময়টা কিম্বা দাক্ষিণাত্যে মুসলমান বিজয়ের সময়, কিম্বা দাক্ষিণাত্য যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিলো, সেই সময়ের কথা যে কেউ ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

আরো অতীত কালে ভারতবর্ষের অবস্থা কি রকম ছিলো, কোন সময় থেকে তার দুঃখ দারিদ্র্যের সুত্রপাত ঘটেছে তা জানবার জন্য কেউ যদি উৎসুক হন তাহলে খৃষ্টানদের মতে যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে তারও আগেকার যুগে ব্রাহ্মণেরা যে সব পুরাণের সৃষ্টি করেছেন তার থেকেই তার সম্যক্ পরিচয় পাবেন।

কিন্তু ইংরেজ আসবার আগে যত কিছু বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, বিদেশীদের অভিযান ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বয়ে গেছে সবই তার বাইরের জীবনের প্রান্তটুকু স্পর্শ করে গেছে মাত্র। ইংরেজ কিন্তু ভারতীয় সামাজিক জীবনের সমস্ত অবগুণ্ঠনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। আজপর্য্যন্ত সেই পুরাতন সামাজিক জীবনের নবজীবন লাভের কোনই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। প্রাচীন সামাজিক জীবনের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, অথচ কোন নতুন জীবনের স্পর্শ পায়নি, জাতির পক্ষে এই যে করুণ অবস্থা, তা ভারতবর্ষের বর্তমান দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করছে এবং এই কারণেই ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে পূর্ব্বকালের ভারতবর্ষের অবস্থার কোন সাদৃশ্য নেই।

কোন প্রাচীন কাল থেকে এশিয়া মহাদেশে রাজ শাসনযন্ত্রের মাত্র তিনটি বিভাগ ছিলো; প্রথম, কর আদায়ের বিভাগ অর্থাৎ দেশের মধ্যে থেকে দেশকে লুণ্ঠনের ব্যবস্থা; দ্বিতীয়, যুদ্ধের বিভাগ অর্থাৎ দেশের বাইরে লুণ্ঠনের আয়োজন, আর তৃতীয় সাধারণের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করার বিভাগ। আবহাওয়ার গুণে আর বিভিন্ন শ্রেণীর মাটি এক দেশে বর্ত্তমান থাকায় প্রধানতঃ মরুভূমি, সাহারা থেকে শুরু করে আরবা, পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় খাল ও কূপ খননের দ্বারা কৃষিকার্য্য করা প্রাচ্যের কৃষিকার্য্যের মূল কথা। ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, ইরাক্ আর পারস্যে নদীর স্রোতের সুযোগ গ্রহণ করে জমিকে উর্ব্বর করা হত, আর কৃষির সুবিধের জন্য যে সব খাল খনন করা হয়েছে সে গুলিতে অধিক পরিমাণে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হত। খুব বুঝে সুঝে জল ব্যবহারের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা থাকায় পাশ্চাত্যে ইটালী আর ফ্লানডার্সে ভূমি-সত্বাধিকারীরা স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে বাধ্য হোয়েছিল। প্রাচ্যভূখণ্ডে সভ্যতার বিস্তার অত্যন্ত অল্প, আর ভূমি খুবই বিস্তৃত হওয়ায় স্বতঃপ্রবৃত্ত সঙ্ঘস্থাপন অসম্ভব হোয়েছিল। সেই জন্যে প্রাচ্য রাষ্ট্র আপনার ক্ষমতা জারি করতে বাধ্য হোয়েছিল, এবং সেই একই কারণে, এসিয়াতে দেশ-শাসন-যন্ত্রের মধ্যে ইকনমিক সমস্যার সমাধান খুব সহজ ভাবে আপনার স্থান পেয়েছিল,—যেমন খাল কাটা, চাষের জন্যে যেখানে জল সরবরাহের প্রয়োজন সেখানে জলের বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি জন-হিতকর কার্য্য সমূহ।

এই কৃত্রিম উপায়ে জমিকে উর্ব্বরা করার ব্যবস্থা প্রাচ্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে। জল সরবরাহের ও জল নিষ্কাষণের সম্যক্ ব্যবস্থার অভাবে যে সব জায়গায় পূর্ব্বে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হোত সে গুলি এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পামিরা পেট্রাওইমেনের ধ্বংসের ইতিহাস, ইজিপ্ট, পারস্য ও ভারতবর্ষের এক একটি প্রদেশের আমূল ধ্বংসের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি যুদ্ধেরফলে যে সমস্ত দেশ জনশূন্য হোয়ে পড়েছে, আর ভবিষ্যতে সেই দেশে শত শত বৎসর ধরে সভ্যতা বিস্তারের পথ বন্ধ হোয়ে গেছে, তার কারণও রাষ্ট্রের হাতে দেশের ইকনমিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার ভার থাকায় ঘটেছে।

ইংরাজ ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন শাসকদের কাছ থেকে কর আদায়ের ভার ও যুদ্ধ বিভাগের ভার নিজেদের হাতে উঠিয়ে নিয়েছেন; কিন্তু জনহিতকর কার্য্যে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন। সেই জন্যই ভারতবর্ষে কৃষির এই অবনতি দেখতে পাই; কারণ, এখানে কৃষিকার্য্য বিলাতের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার নিয়ম-অনুসারে হওয়া সম্ভব নয়। এসিয়াতে কিন্তু আমরা একটি জিনিস দেখতে খুব অভ্যস্থ হয়েছি, সেটি হচ্ছে একটি গভর্ণমেণ্টের শাসনে কৃষিকার্য্যের অবনতি, আর একটির হাতে তার উন্নতি। ইউরোপে যেমন ভালো কি মন্দ প্রাকৃতিক অবস্থার উপর দেশের চাষের অবস্থা নির্ভর করে, ভারতবর্ষে তেমনি গভর্ণমেণ্ট ভালো কি মন্দ হওয়ার উপরে ফসলের প্রাচুর্য্য কিম্বা অল্পতা নির্ভর করে। গভর্ণমেণ্টের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা, আর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের এই হৃদয়হীন ঔদাসীন্য ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের ধ্বংস সাধন করতে পারতেন, যদি না এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটতো যা, এসিয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের।

অতীতের ভারতবর্ষে যত কিছু রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটুক না কেন, তার সামাজিক জীবন স্মরণাতীত কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্য্যন্ত একই প্রকার ছিলো। লক্ষ লক্ষ

তন্তুবায়কে যা নিয়মিত ব্যাপৃত রাখতো, সেই চরকা আর তাঁত ভারতীয় সমাজের ইন্ডাস্ট্রিয়াল জীবনের মূল ছিলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপ মূল্যবান ধাতুর বিনিময়ে ভারতবর্ষের অপূর্ব সূক্ষ্মবস্ত্র আমদানী করতো। এই মূল্যবান ধাতু ভারতবর্ষের স্বর্ণকারের প্রভূত সুবিধা করে দিলো। স্বর্ণকার-শ্রেণী ভারতের সামাজিক জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। কারণ, গয়না পরার সখ ভারতবর্ষে এত বেশী যে অতি গরীবও কানে হাতে, গলায় সোনার গয়না পরে। মেয়েরা আর ছেলেরা প্রায়ই খুব ভারী ভারী সোনার গয়না পরে আর সেখানে প্রায় প্রত্যেক কুটীরে সোনার কিম্বা রূপোর বিগ্রহ-মূর্ত্তি দেখা যায়।

ইংরেজ ভারতে এসে তাঁত আর চরকার সর্ব্বনাশ করলো। ইংরেজ ইউরোপের বাজার থেকে ভারতজাত বস্ত্রাক নির্ব্বাসিত করলো। তারপরে ভারতবর্ষে বিদেশী সুতা চালান করে, এমন কি তুলোর জন্মভূমি এই ভারতে বিদেশ থেকে তুলো আমদানী করে ভারতবর্ষের বাজার দখল করলো। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৭ সালের ভিতর ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে সূতোর আমদানী শতকরা এক থেকে শতকরা পাঁচ হাজার ২'শ পর্য্যন্ত বেড়ে গেলো। ১৮২৪ সালে ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে প্রেরিত বস্ত্রের আমদানী দশ লক্ষ গজের বেশী ছিলো না। ১৮৪৭ সালে ভারতে এই বস্ত্রের আমদানী ছ'শো চল্লিশ লক্ষ গজের চেয়েও বেশী হোল। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার জনসংখ্যা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে বিশ হাজারে এসে দাঁড়ালো। বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত এই সব সহরের ধ্বংসপ্রাপ্তির ইতিহাস ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের শোচনীয় দুর্দ্দশার শেষ কথা নয়। ইংলণ্ডের বাষ্পবল আর বিজ্ঞানবল, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কৃষির সঙ্গে কুটিরশিল্পের যে যোগ ছিলো তা একেবারে নির্ম্মূল করলো।

একদিকে হিন্দুরা প্রাচ্যের অন্য সব জাতের মত কৃষি ও ব্যবসায়ের সমস্ত বন্দোবস্ত গভর্মেণ্টের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলো, অন্যদিকে এই কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা পারিবারিক সাজ্যর দ্বারা সমস্ত দেশময় ব্যাপৃত ছিলো—এই দুই ঘটনা বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে একটি বিশেষ সামাজিক বিধির প্রবর্ত্তন করেছে—সেই তথাকথিত পল্লীসমাজ বিধি। এই পল্লীসমাজবিধি প্রত্যেক কেন্দ্রকে স্বতন্ত্র জীবন দিয়েছিলো। বিলাতে কমন্স সভায় ভারত-বর্ষের গ্রামকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রাম বলতে দেশময় ব্যাপৃত ছিলো—এই দুই ঘটনা বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে একটি বিশেষ সামাজিক বিধির প্রবর্ত্তন করেছে—সেই তথাকথিত পল্লীসমাজ বিধি। এই পল্লীসমাজবিধি প্রত্যেক নজর রাখে, বিবাদ মেটায়, শান্তি রক্ষা করে আর খাজনা ... করে, একজন লোক আছে যে গ্রামের চাষ সংক্রান্ত সমস্ত খবর রাখে। গ্রামের একজন চৌকিদার আছে, আর শস্য রক্ষা করা ও শস্য মাপ করার জন্যও লোক আছে। গ্রামের সীমানা রক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য একজন লোক আছে, জলের বন্দোবস্তের জন্য একজন আছে। একজন ব্রাহ্মণ আছে যে গ্রামের পূজার সব বন্দোবস্ত করে তার আছেন গ্রামের পণ্ডিত মশায়, আর ঐ ধরনের আরও দু' চারজন লোক। এই অতি সরল গ্রাম্য শাসনের বিধি যুগ-যুগান্তর থেকে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান। এই বিধি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সমস্তকে পরাস্ত করে এসেছে। গ্রামের সীমানা শত শতাব্দী আগে ইতিহাসের উষাকালে যা ছিলো আজও প্রায় সে-ই আছে। কত রাজা এলো গেলো, কত রাজত্ব উঠলো পড়লো, কিন্তু গ্রাম আপনার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

এই ছাঁচে ঢালা সামাজিক বিধি এখন প্রায় ভেঙে এসেছে, কিন্তু সেই ভাঙনের জন্য ইংরাজের পাশবিক কর আদায় প্রথা কিম্বা ইংরাজের পশুপ্রকৃতি সৈন্যেরা ততটা দায়ী নয়, যতটা ইংরাজের ষ্টীম এঞ্জিন আর ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য প্রথা দায়ী। এই গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন প্রধানতঃ চরকা, তাঁত আর কৃষি উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করতো, এই কুটির শিল্প তাদের আত্মনির্ভরশীল করতো।

ইংরাজের ভারত অধিকার চরকাকে লাঙ্কাশায়ারে চালান করলো, আর তাঁতকে বাংলা দেশে নির্ব্বাসিত করলো, এবং এর দ্বারা সেই অর্দ্ধ সভ্য গ্রামের গোষ্ঠিবদ্ধ জীবনকে নষ্ট করলো। নষ্ট করলো বলছি, কেন না এই উপরি উক্ত ঘটনাতে গ্রামের ইকনমিক জীবনের ভিত্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে ইংরেজ এই প্রকারে এসিয়ার ইতিহাসের সব চেয়ে বৃহৎ সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটালো।

এই সব অসংখ্য নিরলস শান্তি প্রিয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ায় তাদের কষ্টের একশেষ হয়েছে। গোষ্ঠীর সমষ্টি জীবন হইতে প্রত্যেকে ব্যক্তি খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পত্তি ও কৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই সব প্রত্যেক ঘটনাই দুঃখের বিষয়, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎ-সত্বেও এটা ভুললে চলবেনা যে গ্রামের এই গোষ্ঠিজীবন বাইরে থেকে যতই নিরীহ মনে হোক না কেন, প্রাচ্যের সব রকম অত্যা-চারের মূল হচ্ছে এই গোষ্ঠিজীবন। এই গোষ্ঠিজীবন মানুষের মনকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে সব রকমের কুসংস্কার আর অন্ধ প্রথার দাস করে রেখেছে, তাকে সমস্ত মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে, সমস্ত সৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এদের বর্ব্বর আত্মপ্রীতি যেন আমাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে না যায়। এরা একটুকরো ভূঁম আঁকড়ে পড়ে থেকে একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যের ধ্বংসলীলা অবিচলিত ভাবে দেখেছে, অবর্ণনীয় যত রকমের যুদ্ধক্ষেত্রে, সহরের পর সহরের সমস্ত লোককে নির্দ্দয় ভাবে সমস্ত মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে, সমস্ত সৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এদের বর্ব্বর আত্মপ্রীতি যেন আমাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে না যায়। এরা একটুকরো ভূঁম আঁকড়ে পড়ে থেকে একটা হাতে মার খেয়েছে। এটা ভুললেও চলবে না যে এই অচল, নিষ্ক্রিয় জড় জীবন যাত্রা প্রণালী বাহ্যত অদ্ভুত ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এই জীবনযাত্রা প্রণালী হিন্দুস্থানে হত্যাকেও ধর্ম্মের দিক হইতে স্বীকার করেছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠি বর্ণগত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। তাকে বহির্জগতের ঘটনার অধিপতি না করে দাস করে রেখেছে।

এটা সত্য যে অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরাজ ভারতবর্ষে এই সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত করে, আর খুব নির্ব্বোধের মত সেই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হয়, কিন্তু, সেটা এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই, যে এসিয়াতে সামাজিক বিপ্লব সাধিত না হলে পৃথিবীর মানবের পক্ষে তার চরম উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হবে কি না? যদি তা সম্ভব না হয় তা-হলে ইংরাজ ভারতে যত অন্যায়ই করে থাকুক না কেন, এই সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে আপনার অজানিতে সে ইতিহাসের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

কৈফিয়ৎ

প্রেস পরিবর্ত্তন করা হেতু গত সপ্তাহে "লাঙল" বের হয়নি। অপ্রত্যাশিতরূপে আমাদিগকে হঠাৎ প্রেস বদলাতে হয়েছে। পাঠকগণ দয়া করে আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ম্যানেজার, লাঙল

স্বরাজ্যদল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরাজ্যদল বললে আমরা ব্যারিষ্টার আর ধনিক-বণিকের দল বুঝি। সেই স্বরাজ্যদল আগামী নির্ব্বাচনের জন্যে এখন থেকেই পাঁয়তারা কসতে সুরু করেছেন। কাউন্সিলে গিয়ে গবর্ণমেণ্টকে পদে পদে বাধা দিয়ে দেশের স্বাধীনতার পাকা রাস্তা রাতারাতি বানিয়ে নেবো এই ফাঁপা ফাঁকির কথায় দেশের জনসাধারণকে ভুলিয়ে গত নির্ব্বাচনের সময় তাঁরা আপনাদের নির্ব্বাচিত হবার পথ প্রশস্ত করেন। স্বরাজ্যদল গঠনের সময় এই গুজব দেখানো হয়েছিলো যে গবর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত কতকগুলি জীব কাউন্সিলে গিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করছে, তাদের দূর করা দরকার, আর সব জায়গাতেই গবর্ণমেণ্টকে বাধা দেওয়া উচিত। দু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দেশের লোক দেখল শুধু টাউনহলের দোতলার ঘরে বসে কতকগুলি লোক মান অভিমানের পালা একটানা চলিয়ে যাচ্ছে। জাতিকে শক্তিমান করতে হলে যে কর্ম্মপদ্ধতির দরকার সে সবের ধার দিয়েও স্বরাজ্যদল গেলেন না। কলে কৌশলে নানারকম ঘৃণ্য উপায়ে স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে কয়েকবার ভোটে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু তাতে দেশের স্বাধীনতার পথ কি এক হাতও এগিয়েছে?

গত দুই বৎসর স্বরাজ্যদলের কাজের তালিকা যদি কেউ জানতে চান তো আমাদের কাছে পাবেন। কাউন্সিলে হাত পা নেড়ে কোন রকমে বক্তৃতা সেরে নিয়েই কাউন্সিলগৃহের নীচের তলায় গিয়ে ফূর্ত্তি করে চা ও কেক উদরস্থ করে মোটর চেপে বাড়ী গিয়েই শুয়ে পড়া, স্বরাজ্যদলের দুবৎসরের কাজের নমুনা। দেশের জন্যে এর চেয়ে বেশী পরিশ্রম আর কি করে করা যায়? নতুন নির্ব্বাচনের সময় যেমন না ঘনিয়ে এসেছে অমনি দেশের জনমতকে বন্দী করবার জন্যে একটা নতুন ফন্দি বের করেছেন, এতদিন বাদে তাঁরা হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে গবর্ণমেণ্ট জনমত অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা দেশের মহামান্য প্রতিনিধির দল কাউন্সিল ঘরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চীৎকার করে গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করলেন, গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই তাঁদের আবদার রাখলে না। সেইজন্যে তাঁরা গবর্ণমেণ্ট জনমত অগ্রাহ্য করায় সকলে একযোগে কাউন্সিল বর্জ্জন করেছেন। কংগ্রেসও নাকি তাঁদের আদেশ করেছে কাউন্সিল ছাড়তে। তাঁরা আবার কংগ্রেসভক্ত হোয়ে উঠলেন কবে থেকে? দেশবন্ধু আর পণ্ডিত মতিলালতো বারে বারেই হুমকি দিয়েছেন যে কংগ্রেস যদি তাঁদের কথা না শোনে তাহলে তাঁরা কংগ্রেস বর্জ্জন করবেন। স্বতন্ত্রভাবে স্বরাজ্যদল নিয়ে কাজ চালাবেন।

মহাত্মাজীকে বিদ্রূপ করা, তাঁর মতবাদকে তুচ্ছ করা স্বরাজ্যদলের কর্ম্মপদ্ধতিতে অন্যতম স্থান অধিকার করে আসছিলো। আজ হঠাৎ পণ্ডিত মতিলাল মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আহমদাবাদে ছুটলেন, আর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাউন্সিল বর্জ্জন করছেন এই কথা চারদিকে প্রচার করলেন।

যাঁদের দৌলতে তাঁরা কাউন্সিলে যেতে পেরেছিলেন, নির্ব্বাচনের পরমুহূর্ত্তেই তাদের একেবারে ভুলে গেলেন। নির্ব্বাচনের আগে যাদের কাছে গলবস্ত্র হয়ে তাদের দাস ইত্যাদি অতি-ঘৃণিত স্তুতিবাক্যে অসন্দিগ্ধ জনসাধারণকে বঞ্চনা করেছিলেন, নির্ব্বাচনের পরমুহূর্ত্তেই তাদের কথা বিস্মৃত হতে এঁদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিলম্ব হয়নি। আজ যেই নির্ব্বাচনের সময় ঘনিয়ে এসেছে অমনি দেশের জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে স্বরাজ্যদলের মহানেতার দল কাগজে কাগজে চিঠি ছাপাতে সুরু করেছেন। এত জঘন্য কপটাচরণ যে দলের, সেই দল করবে দেশ-উদ্ধার, দেশের উন্নতিসাধন! হায়রে দেশ উদ্ধার!!

মা

ম্যাক্‌সিম্‌ গর্কী

অনুবাদক শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আবার বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। দরজা খুলিয়া মা বাহিরে যাইতে রান্নাঘরের পথে নবাগতের সহিত দেখা। নবাগত একজন সামান্য কৃষাণ যুবতী—অত্যন্ত অল্প বয়স, পরিধানে ছিন্ন মলিন সামান্য পোষাক। মেয়েটীর ভারী মাথায় এক মাথা কালো চুল। একটু হাসিয়া মেয়েটী ঘরে ঢুকিয়া বলিল,

"আমার কি আসতে দেরী হল না কি ?"

লিট্‌ল্‌ রুষ বলিল, "না, দেরী হবে কেন ; তা, তুমি হেঁটে এলে বুঝি ?"

"নিশ্চয়ই ! আপনি বুঝি পাভেলের মা ! আমার নাম নাটাশা বুঝলেন ?

"হাঁ, মা, আমি পাভেলের মা।"

"যাক্‌, আমাদের সব পরিচয় হয়ে গেল।"

মা একটু শান্তিতে নিশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, এই তো পরিচয় হয়ে গেল।"

লিট্‌ল্‌ রুষ মেয়েটীর ওভার কোটের বোতাম খুলিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল,

"বাইরে খুব ঠাণ্ডা, না ?"

"বাইরে খোলা মাঠের মাঝে—ওঃ কি ভয়ানক ঠাণ্ডা আর বা [illegible]স, ওরে বাপ্‌রে—

মেয়েটীর গলায় স্বর ছিল সুন্দর মিষ্টি, তাহার মুখখানি ছোট্ট আর হাসি হাসি, শরীরখানি বেশ সুঠোল আর কর্ম্মপটু।

মেয়েটী বলিল, "বাস্তবিক, কি ভয়ানক ঠাণ্ডা—আমি তো একেবারে বরফ হয়ে গেছি—"

মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আদর মাখান স্বরে বলিল, "বাছারে, দাঁড়াও মা, আগুন জেলে দিচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পরেই রান্নাঘর হইতে মা বলিলেন, "আগুন হয়ে যাবে এখনিই—"

মার কেমন আজ মনে হইতেছিল যে তিনি এই মেয়েটীকে যেন বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই জানেন, যেন এই মেয়েটিকে তিনি উদার করুণ স্নেহে বহুবর্ষ ধরিয়া ভাল বাসিয়া আসিতেছেন। মেয়েটীর নীল চোখের দিকে চাহিয়া মার মন আনন্দিত হইয়া উঠিতেছিল। আগুন জ্বালাইতে জ্বালাইতে মা ঘরের দিকে কান রাখিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "এত বিষণ্ণ হয়ে বসে আছ কেন ?"

যুবকটি উত্তর দিল, "পাভেলের মার চোখের দিকে চেয়ে আমার মার কথা মনে পড়ছে—হয়ত আমার মারও ছিল ঐ রকম দুটী সুন্দর স্নেহ গভীর চোখ—; জান, আমি মনে মনে অহরহ ভাবি যে মা আমার বেঁচে আছেন—

তুমিই তো বলেছিলে যে তিনি মারা গিয়েছেন—

যে মা আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিল, তিনি মারা গেছেন। আজ আমার মনে হচ্ছে আমার গর্ভ-ধারিণীর কথা। আজ হয়ত রাজধানীর পথে পথে আমার মা ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে আর মদ খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"ওসব অলক্ষুণে কথা ভাব কেন, ভাই ?"

"তা জানিনা। মাতাল অবস্থায় হয়ত রোজ পুলিশের হাতে হাতে মার খেয়ে জীবন বাঁচিয়ে চলেছে।"

রান্নাঘর হইতে মা সমস্ত শুনিতে পাইতেছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাঁর মাতৃ-অন্তর কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "হায় রে অভাগা !

মেয়েটী যুবককে ভৎর্সনার স্বরে তাড়াতাড়ি কি সব বলিতে লাগিল।

যুবক উদাস কণ্ঠে উত্তর দিল, "বন্ধু, এখনও তোমার বয়স অল্প, সংসারের সব কিছু জানতে তোমার এখনও অনেক সময় লাগবে। ছেলেকে মানুষ করা কত শক্ত জানি, কিন্তু একটা মানুষকে ভাল করা আরও শক্ত।"

আবার দরজা খুলিয়া আর একজন নবাগত দেখা দিল। নিকোলো গ্রামের পুরাতন চোর দানিয়েলের ছেলে। দানিয়েল-কে লোকে ঘৃণা করিত, কেও গ্রামের কোন লোকের সঙ্গে কথা বলিত না। মা নিকোলেকে দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলেন।

বিস্মিত হইয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি ? এখানে ?"

মার কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে মার দিকে ধূসর চোখে একবার চাহিল, তারপর হাত দিয়া দাগে-ভরা মুখ খানা মুছিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"পাভেল বাড়ী আছে ?"

"না।"

ঘরের মধ্যে চাহিয়া নিকোলে বলিয়া উঠিল,

"এই যে, নমস্কার বন্ধু !"

নাটাশাকে আগাইয়া আসিয়া তাহাকে সাদরে ঘরের মধ্যে লইয়া যাইতে দেখিয়া মা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন,

"ওমা, এও ঐ দলে ! কি আশ্চর্য্য !"

ইহার পরে আরো দুইজন আসিল। তাহাদের বয়স এত অল্প যে তাহাদের এখনও বালক বলা যায়। তাহাদের মধ্যে

একজনকে মা চিনিতেন। সে কলের এক কুলীর ছেলে। নাম ইয়াকুব। আর একজনকে মা চিনিতেন না বটে, তবে ভয়ানক যে নয় সে বিষয়ে মা চেহারা দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া ছিলেন।

অবশেষে কলের দুইজন কারিকরের সঙ্গে পাভেলও আসিয়া উপস্থিত হইল।

রান্না ঘরে আসিয়া আগুন জ্বালা দেখিয়া পাভেলের ভারী আনন্দ হইল। সে বলিল, "বাঃ, তুমি তো বেশ আগে থাকতেই এ সব গুছিয়ে রেখেছ মা।"

এই সমস্ত সমাগত লোকদিগের দিকে চাহিয়া মার হঠাৎ মনে হইল যে তিনি ছেলের কাছে বড়ই বেশী ভয় দেখাইয়াছিলেন।

মা চুপি চুপি একটু হাসিয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল,

"এদেরই সব লোকে অরাজক বিদ্রোহী বলে?"

পাভেল বলিল, "এদেরই।"

মা একবার সকলের দিকে চাহিয়া করুণার্দ্র স্বরে বলিলেন,

"শিশু। এরা যে সব শিশু।"

তারপর তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। রান্নাঘর হইতে গরম জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন সমাগত সকলে গোল হইয়া টেবিলের চারিদিকে বসিয়াছে। আর একটু দূরে এক কোণে একটা বাতির আলোর সামনে নাটাশা কি একখানা বই হাতে করিয়া বসিয়া আছে।

নাটাশা বলিতেছিল, "লোকে কেন যে এই দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকে, তা জানতে হলে—"

লিটল রুষ বলিয়া উঠিল, "আর তারা এত দুঃখের মাঝে কেনই বা এত নীচ হয়—"

"মনে রাখা দরকার যে তারা জীবন আরম্ভ করে কিসের মধ্যে থেকে—"

মা চা করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এই দেখ, আমি বলি কি—"

তারা সবাই মার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল।

পাভেল জিজ্ঞাসা করিল, 'কি মা?"

মা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তিনি হঠাৎ এই রকম কথা বলায় লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

"না আমি, ও নিজের মনে কথা বলছিলাম।"

নাটাশা আর পাভেল হাসিয়া উঠিল কিন্তু লিটল্ রুষ স্নিগ্ধ চক্ষুতে মার দিকে চাহিয়া বলিল, "ভারি, সুন্দর চা হয়েছে, মা।"

নাটাশা চা খাওয়া শেষ করিয়া কপাল হইতে চুলগুলি টানিয়া লইয়া একটী বই লইয়া পড়িতে লাগিল। পাছে কোনও রকমে শব্দ হইয়া পড়ার ব্যাঘাত হয় ভাবিয়া মা অতি সন্তর্পণে চা ঢালিতে ঢালিতে একান্ত মনে তিনি পড়া শুনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আদিম অসভ্য মানব যারা একদিন পাহাড়ে পাহাড়ে বন্য পশু শিকার করিয়া বেড়াইয়া আর গুহায় দিন কাটাইত তাহাদের জীবনের সরল কাহিনী চলৎচিত্রের ছবির মত ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া চলিতেছিল। মার কাছে এই সমস্ত কথা ঠাকুরমার গল্পের মত লাগিতেছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে ঔৎসুক্যভরে পুত্রের দিকে চাহিয়া যেন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে এই সমস্ত অসভ্য আদিম মানুষের জীবনের গল্পে বিদ্রোহের কি আছে? কিছুক্ষণ পরে তিনি গল্পের ধারা হারাইয়া ফেলিলেন এবং তখন গল্প শোনা বাদ দিয়া তিনি সমাগত সকলের দিকে একদৃষ্টে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আগুনের তাতে ঘর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তাপ মার যেন আজ কেমন নূতন লাগিতেছিল। মার মন ক্ষণে ক্ষণে অকারণ আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া এবং নাটাশার সুন্দর সুর ভরা মৃদু মৃদু কথা শুনিয়া মার মনে আজ তাঁহার যৌবন দিনের জনতাকীর্ণ দিনগুলির কথা মনে হইতে-ছিল। সেদিনের স্মৃতির ছবির দিকে চাহিয়া মা দেখিলেন যে তাঁহার যৌবনে তাঁহার চারিদিকে যাহারা বসিয়া গল্প করিত তাহারা এরূপ ছিল না; তাহাদের মুখ মদের তীব্র গন্ধে ভরা থাকিত তাহারা যে রসিকতা করিত তাহার স্মৃতিতে মার লজ্জা করিতেছিল। অতীত যৌবনের স্মৃতিতে যতই তাঁর মন ভরিয়া আসিতেছিল ততই তাঁহার মনে তাঁহার নিজের জন্য কি এক দুঃখময় করুণ সমবেদনা দীর্ণ অন্তঃস্থল মথিয়া উঠিতেছিল।

মার চোখের সম্মুখে মার বিবাহের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে একটা পার্টিতে তিনি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। একটা অন্ধকার ঘুপীর মধ্যে সে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া গম্ভীর কর্কশ স্বরে বলিয়াছিল,

"বল, আমার বিয়ে করবে?"

সে আলিঙ্গনের যন্ত্রণায় মার চোখ দিয়া জল আসিয়াছিল। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন—সে আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত হইতে।

সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "থামো—বলছি—উত্তর দেবে না—আচ্ছা—"

দম্ আটকে আসার মত হইয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় তিনি নীরব হইয়াছিলেন।

"আর ঢঙ করতে হবে না, ... ; তোমাদের সব বুঝি। খুশী হয়েছে তা বল না, বাবা।"

তখন হঠাৎ কে যেন সেই দিকে আসিতেছিল। সে ছাড়িয়া দিয়া বলিল,

"আচ্ছা—তা হলে রবিবার দিন ঘটককে পাঠাব।"

এবং সে তাহাই করিয়াছিল।

আজ সেই সব কথা স্মরণ করিয়া মার মন ব্যথায় ফুলিয়া উঠিতেছিল। তিনি আপনার অজ্ঞাতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভূম্যধিকারিত্বের বিলোপ

The Tenure of Agricultural Land.
By C. S. Orwin and W. R. Peel.
Cambridge University Press, 1925.
$7\frac{1}{2} \times 5$ pp 75. 8s. 6d.

ভূ-সংস্কার নিয়ে আলোচনা করবার আগে আমাদের ভূসম্পত্তির অর্থ-নীতির দিকটা আর কৃষি-বাণিজ্যের কতগুলি বিশেষত্ব মনে রাখতে হবে। প্রত্যেক দেশেই জমিজমা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক। কৃষির উপর প্রত্যেক দেশেরই আহার্য্য সরবরাহ নির্ভর করে। এবং এই জন্যই প্রত্যেক দেশের সামাজিক অর্থ-নীতির দিক দিয়া কৃষি একটা মস্ত ব্যাপার। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমীজমার মূল্যও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। একথাগুলো যদিও গোড়ার কথা, তবু ও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভূ-স্বত্বের এই সব বিশেষত্বের জন্যই কতকগুলি সিদ্ধান্তে আমরা আপনা থেকে পৌছতে পারি। প্রত্যেক দেশেই জমি জমা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বলে এবং ভূ-সম্পত্তি জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ বলে উহা একটা ব্যক্তি বিশেষের বা একটি শ্রেণী বিশেষের হলে চলবে না। ভূমির একাধিপত্য মানে কোন জাতির জীবনে একাধিপত্য করা, এই জন্য ভূমির উপর জন কয়েক বা শ্রেণী বিশেষের একাধিপত্য ভয়ানক বিপজ্জনক। ইহা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যায়। সমগ্র জাতীয় স্বার্থের জন্য প্রত্যেক জাতিকে মুক্ত হতে হবে—এই মুক্তির পথে বাধা দিচ্ছে ভূ-সম্পত্তির উপর একাধিপত্য, কোথাও বা স্বল্পলোকের, কোথাও বা শ্রেণী বিশেষের। তা ছাড়া সভ্যতা জাতীয় সম্পত্তি। সমগ্র জাতি তার ফল ভোগ করবে। কোন দেশের ভূ-সম্পত্তির মূল্য যদি বৃদ্ধি হয়, সে শুধু সভ্যতা বৃদ্ধির জন্যই হচ্ছে। সভ্যতা তো জন কয়েকের বা শ্রেণী বিশেষের চেষ্টা প্রসূত নয়। তাহ'লে সমগ্র জাতি কেন তার সুফল ভোগ করে না?

আমরা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেম সে সমস্তই ভূম্যাধিকারিত্বের বিরুদ্ধে। উপরি উল্লিখিত পুস্তক খানিতে এই সমস্ত কথা নিয়েই আলোচনা করা হ'য়েছে। যারা ভূমিস্বত্ব নিয়ে আন্দোলন করেছেন, কিম্বা এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাঁরা, এ বইখানি পড়ে দেখবেন।

পুস্তক-লেখকদ্বয় অক্সফোর্ডের কৃষি অনুসন্ধান সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট; ভূস্বামীদের প্রতি এঁদের বিদ্বিষ্ট হওয়ার রাজনৈতিক কোন কারণ নেই। ধীর গম্ভীর ভাবে তাঁরা কোথায় রোগ তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করে দেখিয়েছেন এবং একমাত্র প্রতীকার নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন,—দেশের ভূ-সম্পত্তি জাতীয় ভূ-সম্পত্তি-ভূক্ত করে নেওয়া।

ভূম্যধিকারিত্বের দিন যে চলে গেছে সেকথা সকল উন্নতশীল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ই এবং প্রত্যেক ভূ-সংস্কার প্রয়াসীরাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। বর্ত্তমানে ভূম্যধিকারিত্ব চলবে কি চলবে না, সে প্রশ্ন নয়, এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি করে একে অপসারিত করা যায়? মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে ভূম্যধিকারিত্বের অবলোপসাধনে দুইটি জিনিস দরকার। প্রথম, দেশের ভূ সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিভুক্ত করে নেওয়া, এবং দ্বিতীয়তঃ পুনর্বিভাগ। বাজেয়াপ্ত করে, স্বেচ্ছায় যারা বিক্রয় করবে তাদের কাছ থেকে কিনে, অথবা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সম্পত্তি অধিকার ভূক্ত করে এই তিন উপায়ে সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিভূক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম উপায় অনেকেই পছন্দ করেন না; দ্বিতীয় উপায়ও বর্ত্তমানের ভূ-সংস্কার প্রয়াসীরা ভাল মনে করেন না; এতে করে কোনকিছু সুশৃঙ্খলামত হবে না, তাছাড়া সময়ও বেশী লাগবে। ভূ-সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিভূক্ত করে নেওয়ার পক্ষপাতী যাঁরা তাঁরা তৃতীয় উপায়ই শ্রেয়ঃস্কর মনে করেন।

ভূ-সম্পত্তির পুনর্বিভাগ সম্বন্ধেও গ্রন্থকারদ্বয় নানামত উদ্ধৃত করে বিশদ ভাবে সমস্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। কৃষি-তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়ি করছেন এবং যাঁরা কৃষকদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রয়াসী তাঁরা এই পুস্তকখানি পড়ে বিশেষ উপকৃত হবেন। আমরা সকলকে এই পুস্তকখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি ("সার্ভেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া" হতে সঙ্কলিত)"

সু-বি

খড়কুটো

রয়টার খবর দিচ্ছে যে শ্রমিকদলপতি মিঃ ল্যান্সবেরীর সভাপতিত্বে বিলেতে সেদিন একটি সাধারণ সভা হোয়ে গেছে। মিঃ ল্যান্সবেরী সেই সভায় ... সমবেত সমস্ত জনমণ্ডলীকে দিয়ে ... প্রতিজ্ঞার এই কথা উচ্চারণ করিয়েছেন যে দেশে ধর্ম্মঘট হোলে সৈন্যেরা ধর্ম্মঘটকারীদের উপর গুলি বর্ষণ করবে না। তাদের ধর্ম্মঘটকারীদের উপর আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

মিঃ ল্যান্সবেরীকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রমিক,-বণিক সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা সমস্ত দেশের কর্ম্মীদের আদর্শ হওয়া উচিত।

বজবজলার ইউনিয়ন জুট মিলে আজ প্রায় একমাসের উপর ধর্ম্মঘট চল্‌ছিলো। সম্প্রতি ধর্ম্মঘটকারীরা বিনা সর্ত্তে কাজে যোগদান করেছে। তাদের নিজেদের কোন সঙ্ঘ না থাকায় এই ধর্ম্মঘট সফল হয়নি।

যে দু'কারণে তারা ধর্ম্মঘট করেছিলো সে দু'কারণ আজও বর্ত্তমান। অত্যাচারী বণিক অর্থবলে তাদের নিষ্পেষণ করছে আর সেই অত্যাচার দিনের পর দিন সহ্য করে চলেছে, এই হতভাগ্য নির্জ্জাতিতের দল। কবে তারা বুঝবে হবে যে তাদেরই মজ্জির উপর কলের প্রস্তুর অসহ্য প্রভুত্ব নির্ভর করেছে? তাদের চেতন করে দিতে গেলে যে কর্ম্মী প্রয়োজন, সে কর্ম্মী কই?

শ্রীযুত অংশুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫ সনের বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে রাজবন্দী। তাঁকে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছিল। তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করার জন্যে তিনি একমাস তাঁর ৯১ নং মালাঙ্গা লেনের বাড়ীতে থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে আরো দু'মাস কাল স্বগৃহে আটক থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বৃটেনের ১৯২৫।২৬ সনের কারাগারের রিপোর্ট বের হয়েছে। বর্ত্তমানে কয়েদীর সংখ্যা ১১৬১৯ জন। আগের বছরে এর চেয়ে ২৫৯১ জন কয়েদী বেশী ছিল। এদের জন্যে ১,০৩,৪০০ পাউণ্ড ব্যয় করা হবে। নূতন ব্যবস্থায় পোষাকের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং গীত, বাদ্য ও বক্তৃতাদির দ্বারা কয়েদীদের চিত্তবিনোদনও করা হচ্ছে। কয়েদীদের আপোশে মেলা-মেশারও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থায় খুব সুফল ফলেছে।

গত সোমবারে পাঞ্জাবের জেল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

খবরদারি

দিনাজপুর

প্রজা-কন্‌ফারেন্স

গত ৯ই মার্চ্চ তারিখে দিনাজপুরের চেহেলগাজি নামক স্থানে এক বিরাট প্রজাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। দিনাজপুরের বিখ্যাত জন-নায়ক আনোয়ারী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রায় চার হাজার লোকের সমাগম হয়। শ্রীযুত হেমন্ত কুমার সরকার মহাশয় নিমন্ত্রিত হ'য়ে সভার কাজে যোগদান করেন এবং একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা প্রজা আন্দোলনের মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এল, সি, মৌলবী কাদের বখ্‌শ এম, এল, সি, ও জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুত নিশীথ নাথ কুণ্ডু, ও মোহাম্মদ হবিবর রহমান সাহেব সভার কার্য্য সুপরিচালনা করিয়াছিলেন। ১০ই তারিখেও সভা খুব উৎসাহের সঙ্গে চলেছিল।

নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয়

মৎস্যজীবী সম্মিলনী

গত ১১ই ও ১২ই মার্চ্চ তারিখে ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর সহরে মৎস্যজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হয়। ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় সভাপতি শ্রীযুত হেমন্ত কুমার সরকার মহাশয় ষ্টীমার যোগে আসেন। তাঁর সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম শ্রীযুত বসন্ত কুমার মজুমদার, ও শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার ছিলেন। ষ্টীমার ঘাটে অভ্যর্থনার জন্য প্রায় ৫ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনীতে বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৫ শত প্রতিনিধি এসেছিলেন। সভায় শ্রোতার সংখ্যা ৫ হাজারের উপরে হয়েছিল। সভাপতি হেমন্ত বাবুর বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং মৌলিক ধরণের হয়েছিল। কাজী সাহেবের গানে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় ও সম্পাদক শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র মল্ল বর্ম্মণ মহাশয়ের বক্তৃতাও হৃদয় গ্রাহী হয়েছিল। মৎস্যজীবিগণের হিতকারক নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ... এমদাদুল হকের মৎস্যের পোনা সংরক্ষণ আইনের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। হেমন্ত বাবুর "বেঙ্গল ফিসারিস্ বিল্" এর সম্পূর্ণ সমর্থন করা হয়। আগামী সংখ্যায় সম্মিলনীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

চাঁদ মিঞার দান

ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার চাঁদমিঞা সাহেব অসহযোগ, আন্দোলনে জেলে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর জমিদারির প্রভূত আয় নানা সৎকার্য্যে ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু সব চেয়ে সুখের কথা এই যে তিনি প্রজাগণকে গাছ কাটা, পুকুর কাটা, ইমারত তৈয়ার করা ইত্যাদি অধিকার দিয়েছেন। বাংলার অন্যান্য জমিদারেরা যদি চাঁদ মিঞার আদর্শ অনুসরণ করিতেন, তাহলে দেশে প্রজা জমিদারে বিরোধ বাধিত না, বা কউন্সিলে গিয়ে গবর্মেণ্টের কাছ থেকে আইন পাশ করাতে হত না। জাপানের জমিদার সামুরাইগণ যেমন দেশের হিতার্থে নিজেদের সমস্ত অধিকার জাতির হাতে দিয়েছিলেন—আমাদের দেশের জমিদারগণের নিকট প্রজারা কি সে ত্যাগ আশা করতে পারে না? এই ত্যাগ সম্ভব না হ'লে শ্রেণী-সংগ্রাম (class war) যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা সকলে বুঝেছেন কি?

কংগ্রেস ইলেকসন বোর্ড

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, আবুলকালাম আজাদ ও মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত মহোদয়কে নিয়ে কাউন্সিলের প্রার্থী নির্ব্বাচনের জন্য একটি বোর্ড করেছিলেন। কিন্তু পরের এক সভায় এই বোর্ডকে Co-opt করার অর্থাৎ অতিরিক্ত সভ্যগ্রহণের অধিকার প্রদান করা হয়। তিনজনে ১৯ জনকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত ক'রে নিয়েছেন। জগতের কোথাও বোর্ডের সভ্যদের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভ্য গ্রহণ দেখা যায় নি। আমাদের স্বরাজ গবর্মেণ্ট নতুন পথ দেখালেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় "শয়তানি" গবর্মেণ্ট প্রজাগণকে কাউন্সিলে অধিকাংশ সংখ্যা দিলেও, স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের বোর্ডে প্রজার প্রতিনিধি কেহ স্থান পায় নি—যাদের টাকা আছে অথবা শিং নাড়তে পারে এরূপ সমস্ত লোককেই নেওয়া হয়েছে। এমন কি কাউন্সিলে অবিশ্বাসী নো চেঞ্জার সভ্য ও নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস আফিসে বসে অসহযোগকারীগণের প্রতিনিধিও আছেন। আগামী নির্ব্বাচনে এঁদের উপর কি দেশসুদ্ধ সকলে ভক্তিমান হয়ে লুটিয়ে পড়ে ভোট দেবেন?

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

বাৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	৸০
প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম	৭৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৩॥০
মলাট—১ম পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷০
অর্দ্ধ কলম	৭৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩॥০
" ২য় পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৲
" প্রতি কলম	৯॥০
" সমগ্র পৃষ্ঠা	১৮৷০
৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য	
৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷০
প্রতি কলম	১১৲
সমগ্র পৃষ্ঠা	২১॥০

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵০।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পঁচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সী দেওয়া হইবে না; এবং প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতিমাসের শেষ হিসাব সহ বিক্রয়লব্ধ জমার টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় এজেন্টকে দিতে হইবে কিন্তু মণিঅর্ডার কমিশন লাঙল অফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যার শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেন্টগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

পত্রিকার মূল্য—

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে বার্ষিক ৩৲ টাকা,

ভিঃ পিঃ ৩৷০ "

ষাণ্মাষিক ১॥৵০ আনা

ভিঃ পি, তে ১৸৵০ আনা

বিদেশে বার্ষিক মূল্য ৬ শিলিং

নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

লাঙ্গলের কর্ম্মকেন্দ্র—

৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মোস্তাফা কামালপাশা	৷৵০
কাজী আব্দুল করিম	৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—লাঙল বুক এজেন্সী

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ নং কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট কলিকাতা

(নবযুগের নবীন মন্ত্র নবশক্তির বিপ্লব পুরোহিত)

কাজী নজরুল ইসলামের

নূতন কবিতার বই :—

ক্রন্দন নিরত ভারত মাতার শিল্পী কল্পিত অপূর্ব্ব প্রচ্ছদ পট, ৺দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ফটো ও কবির নিজের ফটোসহ—

চিত্তনামা ১৲

পাঠক ইহার মধ্যে কবির অমর কবিতা "ইন্দ্র পতন" ও সান্ত্বনা" পাইবেন। অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

কাজীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ফটোসহ

পূবের হাওয়া ১৷০

প্রেমের উচ্ছ্বাসময় সুন্দর কবিতাগুলি পাঠক এই পুস্তকেই পাইবেন।"

৩য় সংস্করণ সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত এবং

কবির বর্ত্তমান ফটোসহ

অগ্নিবীণা ১৷০

ইহার "বিদ্রোহী" কবিতা কাব্য-জগতে অতুলনীয়, বঙ্গভাষার নূতন সম্পদ।

সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত, ২য় সংস্করণ

অতি উত্তম সিল্ক কাপড়ে বাঁধাই

কবির যুদ্ধে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত

পরের সুন্দর ফটোসহ

যুদ্ধস্থানে বসিয়া লেখা—গদ্য কাব্য

উপহারের শ্রেষ্ঠ "উপন্যাস –"

রিক্তের বেদন ১॥০

দোলন চাঁপা ১৷০

(ইহার "পূজারিণী" কবিতা-রাজ্যে চির পূজ্য)

বাহির হইল বাহির হইল

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত সুন্দর প্রচ্ছদ পটসহ

ঝিঙেফুল ৸০

ছোট ছেলেমেয়ের হাতে দিবার এমন কবিতার বই পূর্ব্বে বাঙলা ভাষায় বাহির হইয়াছে বলে মনে হয় না।

লাঙলের "সাম্যবাদী" পুস্তকাকারে বাহির হইল।

সাম্যবাদী	৵০
রাজবন্দীর জবানবন্দী	৵০

(কবি কত নির্ভীক ইহাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাবেন)

বাঁধন-হারা	(যন্ত্রস্থ
ফণী মনসা	(যন্ত্রস্থ)

কলিকাতা ৩৭, হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত এবং ২৬।১।১এ, হ্যারিসন রোড, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড প্রেসে মুদ্রিত।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীমণি ভূষণ মুখোপাধ্যায়।

Reg. No. C 1389.

লাঙল

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

LANGAL

Weekly Organ of the Bengal Peasants, and Workers, Party.

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচন

জাগো জাগো বলরাম,
ধরো তব মরুভাঙা হল।
বল দাও ফল দাও
স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল।

প্রথম খণ্ড । বৃহস্পতিবার, ১১ই চৈত্র ১৩৩২, ইং ২৫শে মার্চ্চ ১৯২৬ । ১৩শ সংখ্যা

প্রধান পরিচালক—নজরুল ইসলাম
সম্পাদক—শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস

নগদ মূল্য এক আনা ... ... বার্ষিক মূল্য—
বিদেশে ৬ শিলিং, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲

লাঙল

[বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১১ই চৈত্র, ১৩৩২ | ত্রয়োদশ সংখ্যা

মৎস্য-জীবীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

[মাদারীপুরে গত ২৭শে ও ২৮শে ফাল্গুন তারিখে যে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্য-জীবী সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়েছিল তাহার সভাপতির অভিভাষণ।]

উপরি উপরি তিনবার নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনের সভাপতি পদে আমাকে বরণ করিয়া আপনারা যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইয়াছেন, আমি তাহার প্রতিদানে কিছুই করিতে পারি নাই। তবুও আপনাদের এই সম্মানের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সামান্য আরম্ভ হইতে আপনাদের অনুষ্ঠান এত অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে আশার কারণ যথেষ্ট আছে। তবে গাছ বড় হইলেই তাহাতে ঝড় বেশী লাগে, তাই আজ বিপদের দিন সম্মুখে আসিতেছে। নানা প্রলোভন, প্রবঞ্চনা, নিরাশা, এইবার চারিদিক হইতে আপনাদের ঘিরিয়া আসিবে—কিন্তু পাকা মাঝির মত হাল ধরিয়া এই ঝড়-তুফানের মধ্য দিয়া আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হইবে।

আপনারা মনে করিবেন না কর্ত্তাদের হাতে পায়ে ধরিয়া বা কাঁদাকাটি করিয়া কার্য্য উদ্ধার হইবে। নিজের পায়ের উপর নিজেকে দাঁড়াইতে হইবে। বাহির হইতে বহুবেশে কত শত্রু আসিয়া কাজ পণ্ড করিবে, আবার ভিতর হইতে নিজের দলের লোক প্রলোভনের বশে শত্রুর করতলগত হইবে। এই সমস্ত বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া আপনাদিগকে ধীরে ধীরে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

আজ এখানে মৎস্য জীবীদের উপর অত্যাচার কাল ওখানে অত্যাচার—ফরিদপুর জেলা বোর্ডের হুকুম, গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের জুলুম, পুলিশের দৌরাত্ম্য, জমিদারের অত্যাচার এ সমস্তের একটা একটা করিয়া প্রতিকার করার চেষ্টা ভুল। এই সমস্ত অত্যাচারের মূলে রহিয়াছে আপনাদের অত্যাচার সহিবার অসীম ক্ষমতা। যে অন্যায় করে সে যেমন দোষী, অন্যায় যে সহে—সেও তাহার চেয়ে কম দোষী নয়।

নধর ছাগ-শিশু যখন ব্রহ্মার কাছে নালিশ করিতে গিয়াছিল, তখন ব্রহ্মা নিজেই বলিয়াছিলেন যে তোমার চেহারাখানি দেখিলে আমারই যে খাইতে ইচ্ছা হয়। তেমনি নিরীহ মৎস্যজীবীকে দেখিলে মৎস্য ভোজী বাঙালী সকল সম্প্রদায়ের লোভ জাগিয়া উঠে। এই অত্যাচারের একমাত্র প্রতিকার বাঙলার ও আসামের সাত লক্ষ মৎস্যজীবী একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া সমস্বরে ঘোষণা করা—"আমরা আর এতটুকু অত্যাচার সহ্য করিব না।" এই সংঘের বিরোধী যে মৎস্যজীবী হইবে,

সেই আপনাদের প্রথম শত্রু। কঠোর সামাজিক শাসনে প্রথম তাহাকে ঠিক করাই আপনাদের প্রধান কাজ। ঘর সামাল্ হইলে তখন পরের সঙ্গে যুদ্ধ। প্রথম দেশীয় ধনিকগণের সহিত এবং তারপর বিদেশীয় শাসনতন্ত্রের অত্যাচারের সহিত লড়িতে হইবে।

এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিবেন যে ফড়িয়া, দালাল, নিকারী হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারের বরকন্দাজ, পাইক পিয়াদা, নায়েব গোমস্তা সকলেই মৎস্যজীবীর শত্রু। বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, ঝড় তুফানে নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া, কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা সহিয়া আপনারা বাঙালী জাতির জন্য যে খাদ্য আহরণ করেন, সে পরিশ্রম ও দুঃখের মূল্য স্বরূপ আপনারা পান অত্যাচার, অনাহার এবং চিরজীবনব্যাপী ঋণভার।

সমাজের যে খাদ্য আহরণ করে, দুবেলা পেট ভরিয়া খাইবার ব্যবস্থা তাহারই নাই। স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, জাতীয় আন্দোলন, বিশ্বমানবতা এ সমস্ত বড় বড় কথা। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা যদি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া দুই বেলা খাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠায় না হয়, তবে সে স্বরাজ আমরা চাই না। নেতারা বলিবেন স্বরাজ নাই বলিয়াই তো দেশের জনসাধারণের এই দুর্দশা, কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে স্বরাজ আন্দোলনের অনেক নেতার হাতে জনসাধারণকে যে অধিকার দেওয়ার অধিকার আছে, তাঁহারা সে সমস্ত অধিকার এখনই দিতে প্রস্তুত আছেন কি? যদি স্বরাজ মানে এই হয় যে এক দল বিদেশী শাসক ও শোষকের বদলে দেশী লোক হইবে, তবে সে স্বরাজ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে জন্য জনসাধারণকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে না থাকিলেই আমার উপর জমার জমিদার ব্যক্তি নেতা যে অত্যাচার করেন, রাজ্য হাতে পড়িলে তিনি যে আমাদের হাতে মাথা কাটিবেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ক্ষমতা লাভের জন্য যে আন্দোলন তাহা হইতে জনসাধারণ আজ সরিয়া পড়িয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের বিফলতা এই জন্য।

কিন্তু সাধারণে যদি এইটুকু বুঝিতে পারে যে দৈনিক যে অত্যাচারের যন্ত্রণায় তাহারা তিলে তিলে মরিতেছে, সেই অত্যাচারের প্রতিকার স্বরাজ আন্দোলনে হইবে এবং সেই আন্দোলনের যাঁহারা নেতা তাঁহারা তাঁহাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে এখনই সে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে রাজি আছেন—অমনি জনসাধারণ সে আন্দোলনে যোগ দিয়া এমন শক্তির সৃষ্টি করিবে যে তাহার সম্মুখে বিদেশী শাসনতন্ত্রের সমস্ত অত্যাচার ভাসিয়া যাইবে।

দুঃখের বিষয় বর্তমান, স্বরাজ আন্দোলনের সকল নেতার কাছে মৎস্যজীবীগণ সে ব্যবহার পায় নাই। দেশবন্ধুর অনুরোধ ও মহাত্মার শুভ ইচ্ছা সত্ত্বেও যেখানে কাজ হয় নাই—সেখানে স্বার্থের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। কেহ কেহ বলিবেন ইহাতে দেশের একতা নষ্ট হইবে। দেশের একতা মানে এই নয় যে দেশের অত্যাচারীর সহিত আপোষ। জাতীয় একতা সৃষ্টির জন্য এই অত্যাচারীর ধ্বংসই জাতীয় শক্তি পরিপুষ্টির একমাত্র উপায়। এই নির্মম নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার বলেই জাতীয় আন্দোলনের জন্মদাতা সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় মহাসমিতি হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। আজ আমাদিগকে সেই শ্রেণীগত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। একদিকে সমগ্র জাতির মঙ্গলকারীর দল, আর এক দিকে শাসন ও শোষণ যন্ত্রের চালক ও সহায়তাকারীর দল।

এই বিরোধেই স্বরাজের ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা। আপনারা সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হউন। এ জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া প্রথম দরকার—অর্থ সংগ্রহ করা দ্বিতীয় কার্য্য। মামলা-মোকদ্দমা করিয়া এবং ঘুঁষঘাষ দিয়া আপনারা কত সহস্র সহস্র টাকার অপব্যয় করিয়াছেন। হাজার হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাতে চাঁদা আদায়কারীর অবস্থা ভাল হইয়াছে—আপনারা যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন। আজ পর্য্যন্ত কি চাই যে কথাটাই সমগ্র ভাবে বলা হয় নাই। সভাসমিতি করিয়া, বক্তৃতা করিয়া এবং তাহাতে লম্বা লম্বা প্রস্তাব পাশ করিয়া আপনাদের অবস্থা ফিরিবে না। নিজের দুরবস্থার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে দেশব্যাপী সপ্তাহকাল মাছধরা বন্ধ রাখিয়া হরতাল ঘোষণা করিতে হইবে।

জেলা বোর্ড, সেচ বিভাগ, পুলিশ বিভাগের অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য শান্তভাবে জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য বাঙলার আমাদের সমস্ত মৎস্যজীবীকে বৎসরে অন্তত এক দিনের মাছের দাম সমিতির হাতে দিতে হইবে। কাগজে পত্রে আন্দোলন করিতে হইবে—জেলায় জেলায় সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। লাট কাউন্সিলে মৎস্যজীবীর পক্ষ সমর্থক প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে। যেখানে এই সমস্ত বে-আইনি আইন তৈয়ার হয়, সেইখানে আগে লোক রাখা দরকার। বর্তমান বর্ষে সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখিলাম মৎস্য ধরিতে দিয়া সরকারের বৎসরে হাজার টাকা মাত্র আয় আছে। বাংলা দেশে যত জলা আছে, তাহাতে ত লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে, তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন। এই সমস্ত টাকাই মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে যায়। মৎস্যজীবীর দু'বেলা দু মুঠোও জোটে না।

পৃথিবীর কোন দেশে স্রোতস্বতী বৃহৎ নদীতে মাছ

ধরিতে হইলে কাহাকেও খাজনা দিতে হয় না। বাংলা দেশেও গবর্ণমেণ্ট একবার সেই নিয়ম চালাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন—কিন্তু জমিদারের বাধায় তাহা হইতে পারে নাই। একবারে বিনা খাজনায় না হউক, একটা ন্যায্য নির্দ্ধারিত খাজনায় মাছ ধরার বন্দোবস্ত থাকিলেও মৎস্য জীবীরা বাঁচে। জমির জন্য খাজনার আইন আছে। কিন্তু জলার জন্য এপর্য্যন্ত আইন হইল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কতকগুলি জলা তৌজির শামিল হইয়া অতি অল্প খাজনায় বিলি হইয়া ছিল। সেই সকল তৌজির খাজনা বাড়িল না কিন্তু জলার খাজনা শতগুণ বাড়িয়া চলিয়াছে। সে বাড়ার ঠিক ঠিকানা বা সীমানাও নাই। যে জমিদার জোর করিয়া কোনও জলা দখল করিতেছে—সেই খাজনার হার নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। মৎস্য-জীবীর উপর নানা অত্যাচার, তাহার উপর মৎস্যের দিন দিন মূল্য বৃদ্ধি ইহার ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অন্যায় নিবারণের জন্য আমি একটি আইন প্রণয়নের জন্য লাটকাউন্সিলে মঞ্জুরি চাহিয়াছি। এই আইন এখন বড়লাট ও বাংলার লাটের বিবেচনাধীন আছে। এই আইনে আমি চাই যে স্রোতস্বতী বড় বড় নদী সমূহে গবর্ণমেণ্ট মাছধরার জন্য যে সমস্ত বিলি বন্দোবস্ত করিয়াছেন মেয়াদ গত হইলে ঐ সমস্ত নদীতে যে কেহ বিনা খাজনায় অবাধে মাছ ধরিতে পারিবে। অন্য সমস্ত জলাতে কেবল-মাত্র মৎস্যজীবী বা মৎস্যজীবীগণের সমবায় সমিতি বন্দোবস্ত পাইতে পারিবেন। তিনবৎসরের কমে এই বন্দোবস্ত হইবে না। যে সকল জলা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেখানেও উপরোক্ত ভাবে বন্দোবস্ত হইবে। এই সমস্ত ব্যক্তিগত জলার মৎস্যজীবিগণ কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়া ন্যায্য প্রচলিত হারে খাজনা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারিবেন।

১২ বৎসর একাদিক্রমে জলার মাছ ধরিলে মাছধরার স্থায়ী স্বত্ব জন্মিবে এবং খাজনা বাকী না থাকিলে ঐ স্বত্ব যাইবেনা। জমিদার বা ইজারাদারের নির্দ্ধারিত লোককে মাছ বিক্রয় করিতে হইবে এইরূপ চুক্তি বে-আইনি বলিয়া গণ্য হইবে। সরকারী, পলাতকা, যোগান, মীনকুৎ, রাকৃ, ঈশ্বরবৃত্তি, পার্ব্বণী, তহরী, খঁটাগাড়ী এবং অন্যান্য নামে আদায় বে-আইনি বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ কিছু অন্যায় আদায় করিলে মৎস্যজীবিগণ ৩ মাসের মধ্যে নালিশ করিয়া ঐ মূল্য ফিরিয়া পাইবেন। বাকী খাজনার উপর বৎসরে টাকায় এক আনা সুদ আদালত হইতে ডিগ্রী দেওয়া হইবে।

গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট হইতেই এই আইনের সমর্থক অনেক কথা পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আইন বর্ত্তমান কাউন্সিলে উপস্থিত করিলে যে পাশ হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। কারণ স্বরাজ্য এবং অন্যান্য দলে জমিদারের সংখ্যাই অধিক। বাঙলার স্বরাজ্যদলের বর্ত্তমান সম্পাদক স্বয়ং গোয়ালন্দ জলার মালিক। আপনাদের জন্য এই আইন উপস্থিত করিতে গিয়া আমাকে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের খাস মন্ত্রী খাজনা বিভাগের কর্ত্তা নদীয়ার মহারাজা বাহাদুর একজন জলার মালিক। এরূপ স্থলে বর্ত্তমান কাউন্সিলে কিছু হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে তাই বলিয়া নিরাশ হইলে চলিবে না। ১৮৮৫ অব্দের খাজনার আইন যাহা ১৪ বৎসরেও প্রজার মনের মত হইয়া সংশোধন হইল না। আর জলার জন্য এখনও আইনই হইল না—তা আবার মৎস্যজীবীর মনের মত হওয়া তো পরের কথা। আমার কথা এই যে আগামী পূজার পর কাউন্সিলে আবার নূতন নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনে যদি বাঙলার ও আসামের সাত লক্ষ মৎস্যজীবি এই কথা বলে যে সমস্ত বিশ্বাসযোগ্য, সমিতির অনুমোদিত প্রতিনিধি কাউন্সিলে দাঁড়াই-বেন তাহাদিগকে ভোট দিব ও সহানুভূতিসম্পন্ন অন্যান্য প্রার্থীগণের ভোট সংগ্রহ করিয়া দিব এবং এক দিনের ধরা সমস্ত মাছের দাম দিয়া এই সকল প্রতিনিধির নির্ব্বাচনে সাহায্য করিব—তাহা হইলে আগামী বৎসরে এই আইন পাশের সুবিধা হইতে পারে। আপনারা এই কাজের জন্য প্রস্তুত আছেন কি? এই কাজ করিতে হইলে আপনাদের পক্ষীয় লোককে কাউন্সিলে দাঁড় করাইতে হইবে এবং স্বরাজ দল বা অন্যান্য দলের যে সমস্ত প্রতিনিধি পদপ্রার্থী হইবেন, তাঁহারা যাহাতে এই আইনের সমর্থন করেন তজ্জন্য আমাদের সমিতির পক্ষ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। আপনাদের পক্ষীয় লোক বহু সংখ্যায় কাউন্সিলে গেলে সেচ বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, কেনাল এক্ট ডিঃ বোর্ড বাই-ল, জমিদারের জুলুম, শা সাহেবের আইন এই সকলের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় হইতে পারে। আর বরাবর আন্দোলন চালাইবার জন্য সমিতিকে স্থায়ী করিতে হইবে। আর্থিক উন্নতির জন্য সমবায় সমিতি সমূহ সর্ব্বত্র স্থাপন করিতে হইবে।

গত ৩ বৎসর আপনাদের সহিত কাজ করিয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচনা হইয়াছে, আপনাদের সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলাম। এখন ইহাকে কাজে পরিণত করা না করা আপনাদের হাত। আপনারা সর্ব্বদা এই কথা মনে রাখিবেন যে আপনাদের উদ্ধার আমরা বা আর কেহ করিবে না। নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে। তাই নিবেদন, আমাকে অবসর প্রদান করুন এবং আগামী বৎসরের জন্য নিজেদের মধ্য হইতে কাহাকেও সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া ও তাঁহাকে কাউন্সিলে পাঠাইয়া নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন। আপনাদের সে চেষ্টা নিশ্চয়ই

ফলবতী হইবে। আজ জগৎ জুড়িয়া জাগরণ আসিয়াছে, নিদ্রিত-নারায়ণ চক্ষু মেলিয়াছেন মায়ের নাম করিয়া এই সুযোগে জাতীয় সাধনায় নিজের স্থান গ্রহণ করুন।

আপনাদের সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। লেখাপড়া না শিখিলে যে আপনাদের উন্নতি হইবে না এইরূপ ধারণায় অনেকে ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ধনোৎপাদক শ্রেণী সমূহের মধ্যে সমাজের পরগাছা শ্রেণীভুক্ত হইবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ চলিত কথায় ভদ্রলোক হইবার সাধ সকলের জাগিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে যাহারা অলস শ্রেণীভুক্ত হইবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ চলিত কথায় ভদ্রলোক হইবার সাধ সকলের জাগিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে যাহারা অলস শ্রেণীভুক্ত নয়, তাহারাই ছোট লোক। যিনি যত বড় অলস, পরান্নভোজী ও অক্ষম তিনিই তত সম্মানের অধিকারী। যিনি গাড়ীতে চড়েন তিনি বড় লোক, যিনি মানুষের কাঁধে পাল্কীতে চড়েন তিনি আরও বড় লোক, যাঁহার জুতার ফিতা খুলিতে বা জামা গায়ে দিতে লোকের সাহায্য দরকার হয়; তিনি বড় বড় লোক—যাহার বিশাল দেহখানি বহিয়া লইতে ১০ হাজার টাকার মোটরগাড়ী দরকার, তিনি আরও বড় লোক। এই বড় লোক ও ভদ্রলোকের ধারণা প্রথমে উল্টাইয়া ফেলিতে হইবে।

সমাজের যাহারা শ্রম করিয়া ধন উৎপাদন করে এবং সমাজকে খোরাক যোগায় তাহারাই জনক (producer), তাহারাই ঋষি—তাহারাই আমাদের রাজা। আর তাহাদের প্রয়োজনে যাহারা সমাজে খাটিবে তাহাদেরও অবশ্য খোরাক-পোষাক ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী আছে। কিন্তু একজনের বিলাসের বাতি জ্বালিবার জন্য যদি লক্ষ লোকের ঘর অন্ধকার হয়, তবে সে বিলাসের বাতি নিবাইতে হইবে। এই জন্যই একজন পাশ্চাত্য ভাবুক (Proudhon) বলিয়াছেন Property is a crime—সম্পত্তি সকল মানুষের পক্ষে অপরাধ। আমাদের সমাজও চিরদিন এই কথা মানিয়া চলিয়াছে। এইজন্য উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি ত্যাগ হইবার রীতি আছে—বিবাহে; শ্রাদ্ধে এবং অন্যান্য পুণ্য কার্য্যে ব্যয়ের এত বড়াকড়ি বন্দোবস্ত রহিয়াছে। জাতীয় ধনের উৎপাদন ও বণ্টন সমান ভাবে না হইয়া একজনের হাতে পড়িলেই অন্য দশ জনে বঞ্চিত হইবেই। কিন্তু বুদ্ধির কসরতের জন্য একজন অপরের চেয়ে সঞ্চয় করিবেই—এই জন্যই সমাজে ধনের পুনঃ সঞ্চালনের জন্য এত ব্যবস্থা।

রক্ত যেমন ফুসফুস্ হইতে শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া না পড়িলে মানুষ বাঁচে না, তেমনি উৎপন্ন ধন সমাজের সকল শ্রেণীতে ছড়াইতে না পারিলে সমাজ বাঁচে না। আজ সমাজ শরীরের নানা অঙ্গ অলসতার জন্য বাত না দিয়াছে এবং কোনও অঙ্গ বিশেষ স্ফীত আবার অন্য অঙ্গ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। পাকে বহিতে হইবে, হাতকে খাটিতে হইবে—তাহারা আর শ্রমের আতিশয্যে ও খাদ্যের অনটনে শুষ্ক প্রায়—পুত্র-শ্রমিক মৃতপ্রায়। কিন্তু দেহের ভুঁড়ি ক্রমশঃ প্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ দেহ বেশী দিন চলিতে পারে না। জমিদার মহাজন ভুঁড়ি আর সামলাইতে পারিতেছে না। তাই আজ চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দিবার জন্য শরীরের স্থানে স্থানে চিরিতে হইবে। সমাজকে আবার ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। সমাজের ধনোৎপাদক শ্রেণীর পাওনা হইতে অন্যান্য শ্রেণীর মাপ ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি কেহই ধন উৎপাদন করে না—সকলেই প্রজার ঘাড়ে চাপিয়া খায়। প্রজার কাজ করিয়া দিলে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক দিতে প্রজা বাধ্য—কিন্তু যেখানে সাধারণের আয় গড়ে বৎসরে বিশ টাকার অধিক নয়—সে দেশে একজনের হাতে একদিনে বিশ টাকা যেন কোনও ক্রমেই আসিতে না পারে—বা সম্প্রদায় বিশেষ জাতীয় ধনের মালিক হইয়া না বসিতে পারে, সে আইন বিশেষভাবে দরকার। অবৈজ্ঞানিক ধনভাগী সম্প্রদায়ে আপনাদের জাতির কেহ নাই বলিয়া লেখাপড়া শিখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। হিন্দু মুসলমানের তথাকথিত বিবাদ; ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের বিবাদ এবং বাংলায় ভদ্র-ইতর সম্প্রদায়ের যে সংঘর্ষ ইহার মূলে রহিয়াছে শ্রম ত্যাগ করিয়া সমাজের কোনও কোনও লোকের অবৈজ্ঞানিক ধনভাগী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া সম্পত্তি পাইবার ইচ্ছা।

এই পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের জাতি নাই, ধর্ম নাই—চোর, ভিখারী বা বেশ্যাদলে নিজের জাতির কতকগুলি থাকিলে তাহা লইয়া যেমন মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, তেমনি নিজের জাতির কয়জন উকিল, মোক্তার, হাকিম হইল তাহার জন্য ধনোৎপাদক কোনও শ্রেণীরই ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। মুসলমান হাকিম যেমন জেল দেয়, বাকি খাজনার ডিক্রী দেয়, নমঃশূদ্র উকিল যেমন 'দা' নেয়, তাহাতে অন্য জাতি হইলেও সাধারণের কিছুই যায় আসেনা তবে নিজের জাতির হাকিমের দেওয়া জেল খাটিতে যদি কাহারও বেশী সুখ বোধ হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর কেহ ইংরেজী লেখা পড়া শিখিলে তিনিও আর এক জাতি হইয়া যান তিনিও 'বাবু' হইয়া যান এবং উকিল হইলে তিনি তখন তাঁহার পূর্ব্বজাতীয় ডাক্তারের বা উকিলের বা চাকুরিয়ার সহিত বিবাহাদি দেন, তখন চাষা, জেলে তাঁহারই নিকটে সমানই পর হইয়া যায়।

তবে নিজের জাতীয় ব্যবসায় উন্নতির জন্য জ্ঞান আহরণ

করিতে হইবে। কাগজে কলমে আঁচড় পাড়িতে পারিলেই বা দুইটা ইংরেজী বুলি গাড়িতে পারিলেই বা জামাজুতো পরিলেই যে জ্ঞানী হইবেন এমন আদর্শ আমাদের দেশে পূর্ব্বে কখনও ছিল না। মাছ ধরবার ভিতর যে কৌশল, শিক্ষা, জ্ঞান, সহিষ্ণুতা ও চরিত্রগুণ দরকার একজন গ্র্যাজুয়েটের তাহা নাই। অথচ অক্ষর পরিচয় নাই বলিয়া জেলিয়া ঘৃণ্য ও ছোটজাত। সমাজকে খাওয়াইয়া সে অস্পৃশ্য, আর সমাজের ঘাড়ে চড়িয়া যিনি খাইতে মজবুত তিনি মাননীয়।

বুদ্ধিজীবী কতক লোকের সমাজে স্থান আছে বটে, ইহারাই বর্ত্তমানে ভদ্রলোক নামে পরিচিত। কিন্তু সমাজ শরীরে মস্তক স্থানীয় হইবার জন্য আর অন্য সমস্ত অঙ্গও ফেলিয়া উঠিয়াছে: ফলে দাঁড়াইয়াছে বেকার সমস্যা। জাতি ব্যবসা ও ভূমি হইতে চ্যুত হইয়া এই সকল প্রাণী সমাজের আইবুড়ো মেয়ের মত বাপের অন্ন ধ্বংস করিতেছে।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত এখন বলিতে হইতেছে, আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভদ্রগণকে অনুসরণ করিয়া উচ্ছন্ন যাইবার প্রবৃত্তি অনেকের জাগিয়াছে। তাহারা যেমন করিয়া চাকরী করে; তাহারা যেমন করিয়া মেয়েদের পর্দ্দানশীন রাখিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করে, তাহারা যেমন বিধবা বিবাহ না দিয়া সমাজে পাপের বন্যা বহায় আপনারাও ঠিক সেই পথে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। মেয়েদের পথে ঘাটে চলা বন্ধ রাখিয়া আপনারা সদাচারের প্রতিষ্ঠা করিতে চান, কিন্তু নিজে ভদ্র সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া এই কথা আমি অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে পর্দ্দার আড়ালে যে পাপ স্রোত বহিয়া যায়, আপনাদের অস্পৃশ্য সমাজে তার চেয়ে ঢের কম পাপের অনুষ্ঠান হয়।

অস্পৃশ্যতার জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই। পর্দ্দার আড়ালে যাইয়া নিভৃতে পাপ আচরণ শিক্ষার জন্য চেষ্টার আবশ্যক নাই।

আমাদের গ্রামেও সমাজে অস্পৃশ্যতা ছিল কিন্তু সে কেবল আচারের অঙ্গ স্বরূপে। আপনারা বলিবেন কুকুর বেড়ালের চেয়ে আমাদের ঘৃণা করা হয়। বাস্তবিক আচারের ভিতর ঘৃণার কিছুই নাই। আমার বিধবা মা আমার হাতের জল খান না তাই বলিয়া তিনি যে আমায় ভালবাসেন না এ কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে হৃদয়ের যোগ-তন্ত্রী আজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আপনারা হয়তো চাহিবেন সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্তগণ আপনাদের জলগ্রহণ করুন, কিন্তু আপনাদের নীচে হিন্দু সমাজের যেসমস্ত শ্রেণী আছে তাহাদের জল গ্রহণ করিতে আপনারা প্রস্তুত আছেন কি? এ বিষয়ে দেখি মেথর বা চামারদের সহিত জল চল করিতে কেহই রাজি নহেন। আগে সমাজে জল চল ছিল না কিন্তু আপদে, বিপদে ক্রিয়াকর্ম্মে, সুখে দুঃখে উচ্চশ্রেণীর লোক আত্মীয় অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিত।

আজ সভার হাততালির মধ্যে হয় তো আপনাদের হাতে জল খাইতে পারি কিম্বা ব্রজনাথ দাস মহাশয়কে ব্রজবাবু বলিয়া নমস্কার করিয়া সম্মান দেখাইতে পারি। কিন্তু আমার গ্রামের নমঃশূদ্র বারিক খুড়োর সঙ্গে পুরুষানুক্রমে যে ভালবাসা ছিল—ব্রজবাবুকে তাহার একটুও দিতে পারি না। ব্রজবাবুকে যে সম্মান দিই, তাহা মৎস্যজীবীর জাতি বলিয়া নয়—তাঁহাকে সম্মান দিই—তিনি স্বশ্রেণীর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া আমার জাতির মত উকিল মোক্তার হইয়া পরদাসত্বজীবী হইয়াছেন বলিয়া। এই সম্মানের ভিতর আপনাদের সমস্ত জাতির প্রতি আমাদের অসম্মান লুকাইয়া রহিয়াছে।

ভদ্র সমাজে বিধবা বিবাহ নেই বলিয়া ইতরেতর সমাজেও সেই নীতি চালাইতে সকলে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু একটা কথা বলিলে ভুলিয়া যান যে তাঁহারা সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া পণ দিয়া মেয়েকে পার করিতে হয় আর ইতরেতর সমাজে চল্লিশ বৎসর ... আইবুড়ো থাকিয়া অতি কষ্টে কিছু টাকা জমাইয়া একটি আট বছরের মেয়েকে কিনিয়া আনিতে হয়। এই যৌন সম্বন্ধে অস্বাভাবিকতাই হিন্দু সমাজের ধ্বংসের মূলে অগ্রসর হওয়ার প্রধান কারণ। ভদ্রলোক এক শতের মধ্যে ১৯ জন মাত্র—বাকী ৮১ জনের দুরবস্থার জন্যই আমাদের এত অবনতি। বাংলাদেশে নারী-হরণের মূলে এই কারণ নিহিত রহিয়াছে—হিন্দুদের মধ্যে বারবনিতার সংখ্যাধিক্যের কারণও ইহাই। বিধবা-বিবাহ প্রচলনই এই রোগ দূর করিবার প্রথম ও প্রধান উপায়। এ বিষয়ে আপনারা কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

Rank is but a guinea's stamp—a man is man for all that—" যা মর্যাদার ছাপ টাকার উপরে ছাপের ন্যায়—মানুষকে তাহাতে ছোট বড় করিতে পারে না। রূপায় যতই খাদ থাকুক না কেন—উপরে এক টাকা লেখা থাকিলেই দশ আনা রূপার মূল্য এক টাকা বলিয়া চলে। কিন্তু আগুনে ফেলিলে তাহাতে দশ আনার বেশী দাম বাহির হয় না। জীবনের পরীক্ষার আগুনে মানুষ চেনা যায়। ভগবানের উপরে নির্ভরশীল, পরিশ্রমী, সরলপ্রাণ আপনাদের চেয়ে বড়মানুষ ভদ্রলোক আর কে আছে? "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণু" না "তৃণের চেয়ে ছোট, তরুর মত সহিষ্ণু" মহাপ্রভুর সেই বাণী জীবনে সাধনা করিয়া আপনারা সত্যকার ছোটলোক হইয়াছেন। পদ্মার ঝড়ের পর আপনাদের সংকীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া ও আপনাদের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া যে ভোজনানন্দ পাইয়াছিলাম—তাহাতেই আমি আপনাদের দাস হইয়া আছি। সেই জন্যই লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে

আমি জাতিতে জেলে কি না—তখন জেলে বলিয়া পরিচয় দিতেই আমার বুকখানি ফুলিয়া উঠে। সে দিন খবরের কাগজে দেখিলাম বিলাতের Royal Humane Society জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসক কার্য্যের জন্য একজন মৎস্যজীবীকে স্বর্ণপদক দিয়াছেন; এত বড় সম্মান যে জাতি পাইয়াছে, সে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সম্মানের চেয়ে কোনও অংশে হীন হইতে পারে না। নিজের মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়া জীবনের কাজে অগ্রসর হউন—ব্রাহ্মণও আপনাকে নমস্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। সেই মনুষ্যত্ব লাভের জন্য আজ বৃদ্ধ শিশুর মত নতুন— [illegible] সমিতিকে আশ্রয় করিলাম। দেবতার নিকট প্রার্থনা করুন:—

"আমাদের গতি যেন এক হয়,
আমাদের বাণী যেন এক হয়,
আমাদের মন যেন এক হয়,
আমাদের সমিতি যেন সকলের হয়।

"বন্দে মাতরম্।

কারাগার সম্বন্ধে দেশের ঔদাসীন্য

মুজফ্ফর আহ্মদ

অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হতে হাজার হাজার লোক কারা-বরণ করে কারাগার সমূহের ভিতরের ব্যাপার অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। আশা করা গিয়েছিল তাঁদের কল্যাণে জেলগুলোর অনেক সংস্কার হবে, কিন্তু দেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ তার কিছুই হয়নি। রাজ-নৈতিক কয়েদীর সুখ-সুবিধার বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা কখনো কখনো হয়ে থাকে বটে, কিন্তু সাধারণ কয়েদীদের সম্বন্ধে দেশ একেবারেই নীরব। সকল রাজনৈতিক কয়েদীর প্রতিও দেশের যে অনুগ্রহ-দৃষ্টি পতিত হয় একথাও আমরা ঠিক বলতে পারিনা। এক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছি কেবল তেলা মাথার জন্যই তেলের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। মান্দালয় জেলের অনশন-ব্রতের সহিত আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের অনশন-ব্রতের তুলনা করে দেখলে পাঠকগণ আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা অতি অল্প, এত অল্প যে কোনো গণনার মধ্যেই নেওয়া যেতে পারেনা। সাধারণ কয়েদীদের নিয়েই জেলের অস্তিত্ব, জেল সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে এদেরি কথা বলতে হয়।

১৯১৯ সনের পর হতে জেল কমিটির কল্যাণে জেল সমূহের সামান্য সংস্কার হয়েছে বটে, তবে সে সংস্কার আজ পর্য্যন্তও কয়েদীদের মনুষ্যত্ব মেনে নেয়নি। সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব পর নহে। একটি মাত্র জিনিস নিয়েই আজ আমরা শুধু আলোচনা করব। লৌহ জেল সমূহে একটা বিশিষ্ট জিনিস। লৌহ-কপাটের ভিতরে কয়েদীরা বন্ধ হয়ে থাকে। লোহার বেড়ী দরকার হলে তা-দিগকে পরানো হয়, লোহার বাসনে তাদিগকে খেতে দেওয়া হয়। এমন কি খাদ্য-দ্রব্য যে হাঁড়িতে পাকানো হয় তাহাও লোহারি দ্বারা তৈয়েরী করা হয়। যত ঘৃণিত কাজই করে কয়েদীরা কারাবরণ করুকনা কেন, তারাও যে মানুষ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের মত অধিকারও তাহাদের নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। লোহার পাত্রে পাকানো খাবার কষ উঠে বিস্বাদ হয়ে যায়। তার পরে, সেই খাবার লোহার থালাতে খেতে যেয়ে আরো ভয়ানক খারাব হয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে কয়েদী-দের এ বিশ্রী খাদ্যও খেতে হয়। কিন্তু, কেন এমন ব্যবহার কয়েদীদের প্রতি করা হয়? জেলের ব্যবহৃত অধিকাংশ জিনিসপত্রই কয়েদীগণ তৈয়ের করে থাকে। ভাল বাসন ভাল হাঁড়ি তারা তৈয়ের করে নিতে পারে। ভাল বলতে আমরা অন্য কোনো ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত পাত্রাদি মনে করেছি। লৌহ পাত্রে না পাকিয়ে কলাই করা তাম্র পাত্রে পাকালে খাবারটা আর বিস্বাদ হয়না। লৌহ পাত্রটিও যেমন কয়েদীরাই প্রস্তুত করেছে, তাম্র পাত্রও তেমনি তাদেরি দ্বারা প্রস্তুত হতে পারে। খাওয়ার জন্যে থালা গুলো পিত্তল কিংবা এলুমিনিয়ামের দ্বারা প্রস্তুত কয়েদীরাই করতে পারে। এমন অবস্থাতেও অবৈজ্ঞানিক লৌহ পাত্রাদি খাবার জিনিসের জন্য ব্যবহার করতে দিয়ে দেশের হাজার হাজার লোকের স্বাস্থ্যের সর্ব্বনাশ করা হচ্ছে, অথচ দেশ সে সম্বন্ধে একটি কথাও কইছেনা। এদেশের জেল সমূহে ইউরোপীয় কয়েদীদিগকে ইনামেল করা বাসন ও পেয়ালা দেওয়া হয়, আর তাদের খাদ্য

পাকও হয়ে থাকে কশাই করা আমার দেখে। জেলের বাহিরে ইউরোপীয় কয়েদীরা যেমন লোহার বাসনে খেতে অভ্যস্ত নয়, তেমনি ভারতীয় কয়েদীরাও নয়, তা যতই দরিদ্র তারা হোক্‌না কেন। এসত্বেও যে ভারতীয় কয়েদীদিগকে লোহার বাসন-কোসন দেওয়া হয় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের মানবত্বার অবমাননা করা। প্রথম জেলে গিয়েই এ লোহার বাসনাদির কল্যাণে প্রায় শতকরা আশি জন কয়েদী পেটের পীড়াতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, অথচ জেল খানার ডাক্তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তাতে মন এতটুকুও বিচলিত হয় না। এই ডাক্তাররাও তাঁদের চিকিৎসকের ধর্ম্ম বর্জ্জিত হয়ে জেলে ঢোকেন। দেখে শুনে যে অবস্থায় যে ব্যবস্থা তাঁরা কোনো কয়েদীর জন্য করতে পারেন ঠিক্‌ সে অবস্থায় সে ব্যবস্থা তাঁরা কোন বাইরের লোকের জন্যে করতে পারেন না।

নানা প্রকারের লোক নানা কারণে জেলে গিয়ে থাকে। অনেকে অপরাধ করেও যায়, আবার অনেক নিরপরাধকেও পাকে চক্রে পড়ে জেলে যেতে হচ্ছে। অপরাধ রাতদিন দেশে কত লোকেই না করছে, সকলে কিছু ধরা পড়েনা। ধরা যারা পড়েনি তারা আর দশ জনের সঙ্গে দিব্য ভাল মানুষের মত চলে যাচ্ছে। তাদের কে কোনো কথা বলার শক্তি কাহারো নেই। অথচ যারা জেলে গিয়েছে তাদেরই প্রতি যত প্রকারের অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এমনটি আর হতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আমি অপরাধ করেছি বলে তুমি আমাকে আমার প্রিয়তম বস্তু স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করেছ, কিন্তু আমার কাছ থেকে আমার মনুষ্যত্ব কেড়ে নেবার কি অধিকার রয়েছে তোমার?

জেলে যারা যায় তারা মানুষ, আমাদের দেশের লোক, পরম আত্মীয়। তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এতগুলো লোককে এই যে পশুত্বে অবনমিত করা হচ্ছে, —এতে দেশের খুব বেশী ক্ষতি হচ্ছে। এতদিন আমরা জেলের দিকে তাকিয়ে দেখিনি, না দেখে পাপ করেছি। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনি আমাদের করা চাই।

ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষ

——:•:——

(কার্লমার্ক্‌স্‌)

(২)

[গত সপ্তাহের "লাঙল" এ আমরা মার্কসের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রথম পত্র প্রকাশ করেছি। এ সপ্তাহে তাঁর দ্বিতীয় পত্র প্রকাশিত হলো। বলা বাহুল্য মার্কস এ পত্রখানাও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দেই লিখেছিলেন।]

প্রশ্ন উঠেছে যে ভারতবর্ষে ইংরেজের আধিপত্য কি করে সম্ভব হোল? মোগলদের সুদূর বিস্তৃত আধিপত্য মোগলদের শাসন কর্ত্তাদের হাতে পড়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হোয়েছিলো। এই শাসকদের ক্ষমতা আবার মারাঠাদের হাতে পড়ে বিনষ্ট হয়। আফ্‌গানেরা আবার সেই মারাঠাদের প্রভুত্বের অবসান ঘটায়। তারপরে যখন এই বিভিন্নদলের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ চলছিলো ইংরেজ ভারতে প্রবেশ করে এই সমস্ত দলকেই বশীভূত করতে সক্ষম হয়।

যে দেশে শুধু যে মুসলমান হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তা নয়, যে দেশে প্রত্যেক জাত প্রত্যেক জাতের বিরুদ্ধে, প্রত্যেক বর্ণ প্রত্যেক বর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে, যেখানে সমাজের অখণ্ড শান্তির সম্ভব হোয়েছে পরস্পর প্রতি ঈর্ষা ও পরস্পরের মধ্যে কোন রকম যোগাযুগ না থাকায় সে দেশ যে বারবার স্বাধীনতা হারাবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যদি কোন জ্ঞানই না থাকতো তাহলেও ভারতের অর্থে ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ যে ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখতে পেরেছে সেই কি আমাদের কথার যৌক্তিকতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নয়? সেই সময়ে বলেছি যে ভারতবর্ষের অবস্থায় তার পক্ষে বারে বারে পরাধীনতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না, আবার ইতিহাসে হচ্ছে তার বারম্বার ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরাধীনতা স্বীকারের ইতিহাস। ভারতবর্ষের কোন প্রকৃত ইতিহাস নেই, অন্ততঃ আছে বলে জানা নেই।

আমরা যাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে থাকি সেটা হচ্ছে একের পর এক ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বিদেশীদের অভিযানে যে ঝড় বয়ে গেছে তার ইতিহাস। এই বিদেশীরা ভারতবর্ষের অপরিবর্ত্তনশীল জড় সমাজের সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজের ভারতবর্ষ অধিকার করবার

কোন ন্যায্য দাবী ছিলো কি না সেটা এস্থলে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে এই ইংরেজের বদলে, তুর্কি পারস্য কিম্বা রুশ ভারত অধিকার করুক এইটে আমরা সমিচীন মনে করি কিনা।

ভারতবর্ষে ইংরেজের দুটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে; একটি হচ্ছে ধ্বংস মূলক কার্য্য। একটি হচ্ছে এশিয়ার সামাজিক জীবনের মূল নষ্ট করা, আর একটি হচ্ছে পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবনকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

আরব, তুর্কী, তাতার, মোগল একের পর এক ভারতবর্ষ অধিকার করেছে কিন্তু তারা যে এত শীঘ্র ভারতের লোকের সঙ্গে মিলে যেতে পেরেছে তার কারণ হচ্ছে এই যে ইতিহাসের একটা শাশ্বত নিয়ম অনুসারে বর্ব্বর শাসকেরা বরাবরই তাদের সভ্য প্রজাদের কাছে পরাভব স্বীকার করেছে। ইংরেজই প্রথম বিদেশী ভারতবর্ষে এলো, যাদের সভ্যতা হিন্দুসভ্যতার চেয়ে অনেক উচুদরের আর সেই কারণেই তারা হিন্দু সভ্যতার প্রভাবকে সম্পূর্ণ পরাহত করতে পেরেছিলো।

ইংরেজ ভারতীয় সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করলো ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে যা কিছু মহৎ যা কিছু সুন্দর ছিলো তাকে বিনষ্ট করে আর দেশের শিল্পকে নষ্ট করে। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস ধ্বংসের ইতিহাসের নামান্তর বলা যেতে পারে। সেই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে থেকে এখনো পর্য্যন্ত নবজীবনের কোন সূচনা দেখা যাচ্ছে না।

মোগলের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য ছিলো তার চেয়েও অনেক বেশী ঐক্য ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে, আর এই ঐক্যই ভারতবর্ষের নবজীবন লাভের প্রথম সূচনা। ইংরেজের তরবারি ভারতবর্ষকে যে ঐক্য স্বীকার করতে বাধ্য করেছে ইংরেজের টেলিগ্রাফ প্রণালী সেই ঐক্য বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করবে, ইংরেজ সৈনিক দ্বারা শিক্ষিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভারতের মুক্তির পথ সুগম করবে আর ভবিষ্যৎ ভারতকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবে। এই প্রথম মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা এশিয়ার জীবনে প্রবেশ অধিকার লাভ করেছে, আর এশিয়ার জীবনের সংস্কারের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করবে। জমিদারী আর রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত মূলতঃ যতই খারাব হোক না কেন ব্যক্তি বিশেষ জমীতে উপস্বত্ব স্বত্বে এশিয়ার জীবনে যে একটা অভাব ছিলো তার পূরণ করেছে। কলিকাতাবাসী ভারতবর্ষীয়দের ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট খুব সন্দিগ্ধ চিত্তে অনিচ্ছার সঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছেন বটে কিন্তু তবুও তাঁদের মধ্যে একদল দেশশাসন করবার উপযুক্ত ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁরা য়ুরোপের বিজ্ঞান শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত। বাষ্প বল ভারতবর্ষে ও য়ুরোপের মধ্যে খুব সহজ বার্ত্তাবিনিময়ের পথ উদ্ঘাটন করেছে। এই বাষ্পযান ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব্ব সাগরের সমস্ত বন্দরের যোগাযোগ স্থাপন করেছে আর ভারতবর্ষের জীবনের সমস্ত নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তার মূলে যে হেতু বর্ত্তমান সেই সমস্ত পৃথিবী থেকে যোগ বিচ্যুত ভারতবর্ষের জীবনকে নষ্ট করেছে। সে দিন আসতে বেশী দেরি নেই যে দিন রেল আর ষ্টীমারের কল্যাণে ভারতবর্ষ থেকে বিলেত আট দিনেই পৌঁছন সম্ভব হবে।

ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায় ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করেন নি বললে সত্যের অপলাপ হবে। ইংলণ্ডের ধনী সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে জয় করতে আর ইংলণ্ডের বণিকদল ভারতকে লুণ্ঠন করতে চেয়েছিলো। আজ কিন্তু সে দিনের বদল হয়েছে। বণিক সম্প্রদায় বুঝতে পেরেছে যে ভারতবর্ষকে উৎপাদক দেশ করে তোলায় তাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধের কারণ হয়েছে, আর সেই কারণেই ভারতবর্ষে কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, দেশের মধ্যে যানবাহন প্রচলনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তারা প্রথম ভারতবর্ষকে অসংখ্য রেলপথ দিয়ে বিভক্ত করতে চান—আর তাঁরা তা করবেনও। এর ফল কিন্তু কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন আনবে। সকলেরই জানা আছে যে ভারতবর্ষের উৎপাদিকা শক্তি দেশজাত নানা রকমের দ্রব্যের বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় একেবারে নির্জ্জীব হোয়ে আছে। উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহের বন্দোবস্তের অভাবে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য থাকা সত্বেও সামাজিক জীবনে দারিদ্র্যের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে যেমন ভয়াবহ আকারে বর্ত্তমান পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরকম দেখা যায় না। ১৮৩৮ খৃঃ বিলেতে House of Commons এর একটি অধিবেশনে দেখানো হয়েছিলো যে খান্দেশে ধান যখন তিন টাকা মণ দরে বিক্রী হচ্ছিলো পুনাতে সেই সময়েই ধানের দাম ১৪ টাকা পর্য্যন্ত চড়েছে, মাল সরবরাহ করবার কোন বন্দোবস্ত না থাকায়। মেঠো রাস্তা দিয়ে মাল পাঠানোর অসুবিধে থাকায় পুনায় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরেছে।

রেলের বন্দোবস্ত সামরিক ব্যয় হ্রাস করবে। কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ামের সৈন্যনায়ক কাপ্তেন ওয়ারেন বিলাতে কমন্স সভার একটি বিশেষ অধিবেশনে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা উঠিয়ে দেওয়া গেল।

"এখন একটা খবর আনতে যতদিন এমন কি যত সপ্তাহ সময় লাগে, সেই খবরটা তত ঘণ্টার মধ্যে আনবার ব্যবস্থা করা দরকার। সংবাদ, সৈন্য ও রসদ যে যথাসম্ভব কম সময়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার তা বলাই বাহুল্য। এতে এখনকার চেয়ে দূরতর ও স্বাস্থ্য কর স্থানে সৈনিকগণকে পাঠানো যেতে পারে, আর এ ব্যবস্থা করলে অসুস্থতার দরুণ যে অনেক প্রাণনাশ ঘটে তা নিবারণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ঘাটিতে

যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য এখন জমিয়ে রাখতে হয় তা কম করা যেতে পারে; এতদ্ব্যতীত আবহাওয়ার দোষে যে খাবার জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায় তা আর হবে না। সৈনিকদিগকে সহজে স্থানান্তরিত করিবার সুবিধে অনুসারে তাদের সংখ্যাও কমানো যেতে পারে।"

আমরা জানি যে পঞ্চায়েতী শাসন আর পল্লী-সঙ্ঘগুলির অর্থ-নৈতিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ সে গুলির মন্দের দিকটা—গ্রামগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন অবস্থা —এখনো বিদ্যমান রয়েছে। গ্রামগুলোর বিচ্ছিন্ন অবস্থার মানেই হচ্ছে ভারতে রাস্তা ঘাটের অভাব; রাস্তাঘাটের অভাবই আবার গ্রামগুলোকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এখন যেহেতু বৃটিশ কর্তৃক এই জড়তা ও গ্রামগুলোর গণ্ডীর বেড়া নষ্ট হয়ে গেছে,—রেলওয়ে ব্যবসায়ের ও চলাচলের আবশ্যকতা সৃষ্টি করবে।

আমি জানি, বৃটিশ ধনিকরা কেবলমাত্র তাদের কারখানার জন্যে অল্পমূল্যে তূলো ও অন্যান্য কাঁচা মাল পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে রেলওয়ে বিস্তার করতে চায়। কিন্তু, কয়লা এবং লৌহ সম্পদে সম্পন্ন কোনো দেশে যদি একবার যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করা হয়, তা হলে সে দেশকে নিজেই ওসব জিনিস উৎপাদনে বাধা দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। ভারতের ন্যায় বিরাট বিশাল ভূখণ্ডে রেলওয়ে প্রণালী রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, যদি না এরূপ রেলওয়ের উপস্থিত আবশ্যক জিনিসপাতি গুলোর নির্মাণের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়। এর ফলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে এমন সব জিনিস তৈয়েরী হতে লাগবে যাহার সঙ্গে রেলওয়ে সংক্রান্ত শিল্পের সাক্ষাৎ কোনো সংস্রব থাকবে না। এরূপে ভারতের রেলওয়ে প্রণালী প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত হয়ে পড়বে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষরা নিজেরাই বলছেন যে কলকব্জার জ্ঞানলাভ করার জন্যে শ্রমের যে প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, ভারতবাসীরা তা অনায়াসে করতে পারবে। কাজেই আমি যা বলেছি তা না হয়েই পারে না। কলিকাতা টাকশালে অনেক বছর থেকে বাষ্পীয় শক্তিতে পরিচালিত যন্ত্রাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই টাকশালের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণের ক্ষমতা ও কর্ম-নৈপুণ্য হতে একথার বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। হরিদ্বারের কয়লা খনির স্থান সমূহে ও অন্যত্র ভারতীয়দের দ্বারা বাষ্পচালিত যন্ত্রাদির ব্যবহার হতেও একথা প্রমাণিত হচ্ছে। মিঃ ক্যাম্বেল বলেন যে সাধারণ লোকের মধ্যে অনন্যসাধারণ বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় তিনি পেয়েছেন। রেলের প্রসারের সুযোগে বর্তমান বাণিজ্য প্রথা দেশময় বিস্তৃত হোয়ে পড়ে জাতিভেদকে ধ্বংস করবে। এই জাতি ভেদ প্রথাই ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত সৃজনশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছে।

কিন্তু এই পরশ্রম-উৎপন্ন ভোগী (Bourgeois) ইংরাজ সম্প্রদায় যে পরিবর্তনই ঘটান না কেন তাঁরা না পারবেন জনসাধারণের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করতে, না পারবেন তাদের মুক্তির পথ সুগম করতে, কারণ তাদের জীবনের মূলগত পরিবর্তন তো শুধু উৎপন্নের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে না, সেই উৎপন্ন দ্রব্য যারা উৎপাদন করে তাদের মধ্যে কি ভাবে তাহা বণ্টন হয় তার উপর নির্ভর করে। এই পরশ্রম-উৎপন্ন-ভোগী দলের কাজ হচ্ছে এই পরিবর্তন আনবার জন্যে পথ প্রস্তুত করা। কিন্তু এই পরশ্রম উৎপন্ন ভোগীর দল কি কখনো এর চেয়ে বেশী কিছু করেছে?

যতদিন পর্যন্ত না ইংলণ্ডের শ্রমিক দল ইংলণ্ডের এই—পরশ্রম-উৎপন্ন ভোগী (Bourgeois) সম্প্রদায়কে অপসারিত করে রাজ্য শাসন যন্ত্রের চালনা নিজেদের হাতে নিচ্ছে যতদিন পর্যন্ত না ভারতবাসীরা ইংরেজের অধীনতা থেকে আপনাদের মুক্ত করতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত ইংরেজ তাদের জন্য যে সব সুবিধের বন্দোবস্ত করেছে তা পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করা সম্ভব হবে না। যাই হোক, এই অপূর্ব দেশ, অল্পদিনের মধ্যেই হোক কিম্বা খুব সুদূর ভবিষ্যতে হোক একটা মহৎ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে। এই দেশের লোকের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রিন্স সালটিকোফ বলেছেন যে এরা ইটালীয়ানদের মতই সরল ও সুন্দর।

স্বদেশের বাইরে উপনিবেশ গুলিতে এই পরশ্রম উৎপন্ন ভোগী সম্প্রদায়ের সৃষ্ট সভ্যতার কপটতা আর বর্বরতা যথার্থরূপে ধরা পড়ে। দেশে এই সভ্যতা ভদ্রতার আবরণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এই পর-শ্রম উৎপন্ন ভোগী সম্প্রদায়ই সম্পত্তির মূলগত ভাবটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাঙলা, বোম্বাই আর মাদ্রাজে জমীসংক্রান্ত ব্যাপারে সংস্কারের নামে যে সব অত্যাচার সঞ্চিত হয়েছে কোন্ দেশের বিপ্লববাদীর দল এত ভীষণ অত্যাচার করেছে? সেই পাকা দস্যু লর্ড ক্লাইভের নিজের স্বীকার উক্তি থেকে কি প্রমাণ হয় না যে ভারতবর্ষে এই পর-শ্রম-উৎপন্ন ভোগী দল সাধারণ উপায়ে যখন লোভ মেটানো সম্ভব হোল না তখন লোভ মেটাতে কি অমানুষিক পীড়নই না করেছে। ইংলণ্ডে থাকতে যারা জাতীয় ঋণ স্বীকার করার নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে লম্বা চওড়া কথা বলেছে ভারতবর্ষে তারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সামন্ত নৃপতিদের যে সব টাকা জমা ছিলো সব আত্মসাৎ করতে এতটুকুও দ্বিধা করেনি। ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ধর্মরক্ষার ওজরে যারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো তারাই না ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারে পুনঃ পুনঃ বাধা দিয়েছে!

উড়িষ্যা আর বাঙলাদেশের মন্দিরে প্রতিবৎসরে যে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয় তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্যে জগন্নাথের মন্দিরে হত্যা আর গণিকাবৃত্তি

বজায় রেখে এই পর-শ্রম-উৎপন্নভোগী সম্প্রদায় রীতিমত ব্যবসা চালিয়েছে।

ইয়ুরোপের মতই বৃহৎ এই ভারতবর্ষে ইংরেজের বাণিজ্য-প্রথা যে সর্ব্বনাশ সাধিত করেছে তা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি ভয়ঙ্কর। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে এই বাণিজ্য প্রথা বর্ত্তমান কালের উৎপাদন প্রণালীর ফল মাত্র। এই উৎপাদন প্রণালীর মূলে ধনিক-তন্ত্রের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচার লুক্কায়িত আছে। সভ্যবদ্ধতার উপরেই এই ধনিক-তন্ত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্ভর করে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ধনিক-তন্ত্র যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে তা বর্ত্তমান সভ্যজগতে প্রত্যেক সহরে যে অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত তার থেকেই প্রতীয়মান হবে।

ইতিহাসের এই পর শ্রম-উৎপন্ন ভোগীদের দূর পৃথিবীতে নবযুগের প্রতিষ্ঠা করতে যাহারা করবে—এক দিকে তারা পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রে গ্রথিত করবে অন্যদিকে উৎপাদন শক্তির আর প্রকৃতির শক্তির উপরে মানুষের ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটাবে।

মা

(ম্যাক্সিম্ গর্কী)

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঘরের মধ্যে সহসা একজন বিরক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমরা জানতে চাই না মানুষ কেমন করে জীবন কাটাত, আমরা জানতে চাই কেমন করে তাদের জীবন কাটান উচিত"

তাহাকে সায় দিয়া আর একজন বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই—। তাইত চাই!"

তাহাকে প্রতিবাদ করিয়া আর একজন বলিয়া উঠিল, "ভুল! তা কি হয়? আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয়—পেছনে কি পড়ে রইল—সবই জানতে হবে!"

তাহাকেও সমর্থন করিয়া আর একজন যুবক বলিয়া উঠিল, "সত্যিই তো।"

ক্রমে ভয়ানক তর্ক সুরু হইয়া গেল। শুষ্ক বনের মধ্যে তপ্ত অগ্নি শিখার মত কথা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। মা বিস্মিত-নয়নে চাহিয়া তাহারা কেন যে চীৎকার করিতেছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। মা দেখিলেন যে তাহাদের সকলের মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতির স্পন্দন দুলিতেছে, কিন্তু কেহই রাগিয়া উঠিতেছে না, অথবা কোনও অভদ্র কথাও উচ্চারণ করিতেছে না।

মা বহুক্ষণ ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে নারীত্বকে সম্মান করিবার জন্যই তাহারা নিজেদের এমনি সংযত রাখিয়াছে। নাটাশার তরুণ গম্ভীর মুখখানি মার বড় ভাল লাগিতেছিল। মা লক্ষ্য করিতেছিলেন যে নাটাশা এই সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক যুবকদের দিকে এমন এক গৌরবে চাহিয়া রহিয়াছে যেন সে নিজে বয়সে এদের চেয়ে ঢের বড়।

সহসা নাটাশা বলিয়া উঠিল, "শোন ভাই!"

নাটাশার কথা শুনিয়া সকলেই চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নাটাশা বলিল, "এইখানে আজ যাঁরা বলছেন যে আমাদের সমস্ত কিছুই জানা উচিত তাঁরা ঠিকই বলছেন। জ্ঞানের মশালের আলোক আমরা হাতে নিয়ে দাঁড়াবো, তবে তো যারা চিরান্ধকারে আছে তারা আমাদের দেখতে পাবে, চিনতে পারবে। যত সব প্রশ্ন উঠবে তার যথাযথ উত্তর দিতে আমাদের ক্ষমতা থাকা চাই। জীবনের সমস্ত সত্য সমস্ত মিথ্যা সব কিছু আমাদের জানা চাই।"

নাটাশার কথা শেষ না হইতেই পাভেল তাহার কথার সূত্র লইয়া বলিয়া উঠিল।

"শুধু দিনের পর দিন কেমন করে এই উদর ভরাবো—এই শুধু আমাদের কামনা?"

আপনার কথার উত্তরে পাভেল আপনি বলিয়া উঠিল, "না—কখনই নয়। আমরা চাই মানুষ হতে। আজ যারা আমাদের ঘাড়ের ওপর বসে, পাছে আমরা সব দেখে ফেলি ভেবে আমাদের চোখে ঠুলি বেঁধে রেখেছে, তাদের আমরা প্রমাণ করে দিতে চাই যে আমরা তাদের ভারবাহী পশু নই—আমরা পৃথিবীতে শুধু ঘাস আর জল খেয়ে পেট ভরাতে আসিনি—আমরাও তাদের মতন মানুষ। আমরা আমাদের শত্রুদের দেখাবো যে আমাদের ওপরে যে বিষম দাস-জীবনের ভার তারা স্বেচ্ছায় চাপিয়েছে আমরা আমাদের অন্তরের গৌরবে সে ভার সত্বেও অন্তরে ও মস্তিষ্কে তাদেরই সমান—আর হৃদয়ের দিক দিয়ে? আমরা তাদের ঢের ওপরে।

মা পাভেলের কথা শুনিতেছিলেন। পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া মার অন্তর গৌরবে ভরিয়া উঠিতেছিল। কি সুন্দর সে কথাগুলি!

লিট্‌ল্‌রুষ বলিয়া উঠিল, "জগতে যাঁদের পেট ভরা তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়—কিন্তু সত্যিকারের মানুষ তারি কম। এই এধারের গলিত জীবন আর ঐ ওধারের অদূর ভবিষ্যতের প্রাণময় সুন্দরতর জীবনের মাঝে আমরা চাই এক নতুন সেতু বন্ধন করতে। এই আমাদের জীবনের ব্রত;—এ ব্রত আমাদের উদ্‌যাপন করতেই হবে, বন্ধু।"

ঘরের মধ্যে প্রথমে যে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল যে আমরা জানতে চাই না জীবন কেমন ছিল, সে একটু উদাস হইয়াই বলিল, "যখন রণাঙ্গনে নামবার সময় আসে—তখন কি আঙুল নাচানোর জন্যে বসে থাকা যায়?"

লিট্‌ল্‌ রুষ হাসিয়া উত্তর দিল, "যুদ্ধে নামবার আগেই আমাদের পিঠ সব ভাঙবে—ভয় কি!"

বাহিরে তখন নিশীথ রাত্রি। তাহারা এইবার দল ভাঙিয়া সব ফিরিবার জন্য উঠিল।

নাটাশা লিট্‌ল্‌ রুষের দিকে চাহিয়া বলিল, "বন্ধু, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে পার?"

লিট্‌ল্‌ রুষ উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই। নাটাশা চলিয়া যাইবার সময় যখন রান্নাঘরে গিয়া পায়ে মোজা পরিতেছিল, তখন মা গিয়া বলিলেন, "আহা রে, এ সময়ে কি অত পাতলা মোজায় শীত আটকায় রে? আমি একটা রেশমের মোজা তোকে বুনে দেবো, কেমন?"

"না-মা রেশমে পায়ে লাগে।"

"না লাগে আমি এমনি করে করে দেবো।"

"তুমি কত সুন্দর না-মা?"

যাইবার সময় নাটাশা মার হাত দুইখানি অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল। লিট্‌ল্‌ রুষ মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া চলিল।

সকলে চলিয়া গেলে মা আপনার পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বন্ধুদের পথের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

পাভেল মার দিকে চাহিয়া বলিল, "সন্ধ্যেটা বেশ কাটল্‌। কিন্তু রাত হয়েছে এখন তুমি শুতে যাও—মা!"

"আমি তো যাচ্ছি তুইও শুবি চল্‌"।

জিনিসপত্তর সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে মার মন আনন্দের আবেগে ভরিয়া উঠিতেছিল।

মা পাভেলকে ডাকিয়া বলিল, "সভা বেশ সুন্দর হল না? কি সুন্দর লোক এরা সব! লিট্‌ল্‌ রুষ ভারী উদার ছেলে। আর সেই মেয়েটী, কি চমৎকার দেখতে আর কি সুন্দর তার কথাবার্ত্তা! ও মেয়েটী কে রে?"

পাভেল ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে করিতে বলিল, "একজন শিক্ষক!"

"আহা—তাইতো ঐ রকম ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়চোপড় ওর! এই শীতে গেল—নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগবে—! আচ্ছা ওর কি আপনার কেউ লোক নেই?"

"ওর আপনার লোক! তারা আছে বৈকি। তারা থাকে মস্কো শহরে। তুমি জান মা যে ওর বাবা একজন বেশ বড় লোক? রীতিমত ব্যবসা আর সম্পত্তি আছে। ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে বলে তার বাবা তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে। একদিন সে বিলাস আর [illegible] মাঝখানে লালিত-পালিত হয়েছিল—আজ সে এ-রাত্রিতে চার মাইল পথ অনাবৃত অঙ্গেই চলেছে!"

নাটাশার কথা শুনিয়া মা চমকাইয়া উঠিলেন। "সে কি, এ রাত্রেই শহরে যাবে?"

"হাঁ।"

"ভয় করে না?"

পাভেল হাসিয়া উত্তর দিল, "না।"

"কেনই বা সে এত রাত্রে গেল? সে তো এইখানে থাকতে পারতো! আমার কাছে শুতো!"

"তা হয় না, মা! আমি চাই না যে কাল সকালে কেউ দেখে যে সে আমার এখানে ছিল! সেও তা চায় না!"

মার সহসা আগেকার সব ভয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—এতে অন্যায় কি আছে! [illegible], এর মধ্যে তো কেউ কিছু অন্যায় করছে না!"

পাভেল গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমরা যা করছি বা যা করব—তাতে অন্যায় কিছুই নেই। কিন্তু তবুও আমাদের জন্য কারাগারের লৌহ-কপাট খোলা রয়েছে—এ কথা জেনে রাখা ভাল!"

মার হাত কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত-কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই ভগবান্‌—কারাগারে যেন না যেতে হয়!"

পাভেল ধীর স্থির কণ্ঠে বলিল, "মা! তোমার কাছে মিথ্যা বলে কোনও লাভ নেই! কারাগারে আমাদের যেতেই হবে! সে যাই হ'ক—এখন শোও গে, যাও—আমি চল্লুম শুতে!"

সেই নির্জ্জন ঘরে একাকী মা বিহ্বলভাবে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিরে নিশীথ রাত্রি নির্ম্মম উদাসীনতার অন্ধকার বিছাইয়া চলিয়াছে। নিদ্রিত গৃহের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বরফ দুর্দ্দান্ত বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

মার মন নিশীথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "হে ভগবান—দয়া করো!"

মার মনে যতই ভয় আসিয়া জমে—চোখ ততই জলে ভরিয়া উঠিতে থাকে। মার চোখের সামনে জোনাকী আলোর মত ভয়ের ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বাহিরে মা চাহিয়া দেখিতেছিলেন—এক সুদূর বিস্তীর্ণ নির্জ্জন তুহীনের পৃথিবী। সেই নির্জ্জন পৃথিবীর উপর বায়ু তুহীনের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক রিক্ত হিম-শীতল সুরে বাঁশী বাজাইয়া চলিয়াছে। আর সেই তুহীনের উপর দিয়া হেলিয়া দুলিয়া অন্ধকারে একাকী একটী মেয়ে চলিয়াছে। বাতাসে তাঁহার সামান্য অঙ্গ আবরণ উড়িয়া যাইতেছে, তার চলার পথে বরফ আসিয়া পড়িতেছে, মুখে চোখে বরফের তীব্র কশাঘাত লাগিতেছে। পথ চলা তার ভার হইয়া উঠিতেছে। বরফে যে পা ডুবিয়া যায়। শীতে আর ভয়ে সে কুঁকড়িয়া পড়িয়াছে—যেন সে ঝড়ের দিনের একটী নিঃসহায় তৃণ-শিশু, তার বাঁ দিকে গভীর অরণ্যের প্রাচীর সেই প্রাচীরের ওপারের শাল-বন হইতে জন্তুদের আর্ত্ত হাহাকারের ধ্বনি আসিতেছে। দূরে তাহার চোখের সামনে নগরের স্তিমিত দীপ আপ্সা হইয়া জ্বলিতেছে।

এক অজানা ভয়ে মার সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আকাশের দিকে চাহিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "দয়া করো, হে ভগবান্।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

সার আবদুর রহীম সেদিন কলকাতায় "জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ" এর সম্মিলনে বলেছেন, বাংলা ভাষা যদি শিক্ষার বাহন হয় তা হলে বাঙালী মুসলমানের সর্ব্বনাশ হবে। চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করে তিনি বাঙালী মুসলমানের স্বনিয়োজিত নেতা হয়েছেন এবং যত সব অশোভন ও অবৈজ্ঞানিক জিনিসের ব্যবস্থা তিনি বাঙালী মুসলমানের জন্য করতে আরম্ভ করেছেন। সার আবদুর রহীম নিজে সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জরিত হয়ে আছেন। সে বিষ তিনি বাঙালার সকল মুসলমানকে পান করাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মাতৃভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় সকল প্রকারের উচ্চ শিক্ষা লাভ করা যে একমাত্র বিজ্ঞান সম্মত উপায় তাঁর মত উচ্চ শিক্ষিত লোক একথা খুব ভাল করেই জানেন। তা সত্বেও তিনি যে এরূপ অদ্ভুত কথা বলেছেন তার মানে এই যে তিনি মুসলমানদের জন্য কানা গরুর পৃথক বাথান সৃষ্টি করতে চান। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বড় সুখের বিষয়, বাংলা দেশের আলেমগণ সার আবদুর রহীমের অবৈজ্ঞানিক অভিমতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বাংলা দেশের মুসলমানগণ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শিখুন। তা না করে যদি তাঁরা সার আবদুর রহীমের মত লোকের কথায় আপনাদের পরিচালিত করেন, তাতে তাঁদের ধ্বংস অনিবার্য্য। সার আবদুর রহীম বাংলা দেশের তথা ভারতের মুসলমানদিগকে জগতের চোখে খাটো করতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন। পার্ক ষ্ট্রীটের মুসলমানদের সভার কথা সকলে জানেন। যেহেতু কেবলমাত্র হিন্দুগণ অর্ডিন্যান্স অনুসারে ধৃত হয়েছেন সেই হেতু কতিপয় সংকীর্ণমনা মুসলমান, মুসলমান সমাজের দ্বারা অর্ডিন্যান্স আইনের অনুমোদন করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তাতে তাঁরা সফলকাম হননি। এ সভার পশ্চাতেও সার আবদুর রহীমের অদৃশ্য হস্ত কাজ করছিল। মৌলভী আবদুর রউফ সাহেব অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে বলতে যেয়েও সার আবদুর রহীমের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কিছুই বলেন নি। সার আবদুর রহীম মৌলভী সাহিবকে বলেছিলেন যে মুসলমানরা অর্ডিন্যান্স আইনের অনুমোদন করলে সরকারী দফতরে শতকরা ৫০টী চাকুরী পাবেন। বাংলার শিক্ষিত সমাজ কি এইরূপ নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা হতে আপনাদিগকে বাঁচাতে চান না? তাঁদের উচিত আপনাদিগকে সার আবদুর রহীমের ন্যায় লোকের দুষ্ট আওতা হতে বহু দূরে সরিয়ে রাখা। তা না হলে তাঁরা সমগ্র সমাজের জন্যে যে কলঙ্ক অর্জ্জন করবেন সে বোঝা চিরকালের জন্যে তাঁদের ভবিষ্যদ্ বংশধরগণের মস্তক জগতের সম্মুখে অবনমিত করে রাখবে।

ম-আ

সার আবদুর রহীম মুসলমানদিগকে বাংলার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করতে বলেছেন। "জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ"এর সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আপনার অভিভাষণ তিনি উর্দ্দুতেই পাঠ করেছেন। শুনেছি, এই অভিভাষণটি তিনি নিজে উর্দ্দু ভাষায় তৈয়ার করতে পারেন নি. ইংরেজী ভাষায় লিখে কোনো বিহারী ভদ্রলোকের দ্বারা উর্দ্দুতে তর্জ্জমা করিয়ে নিয়েছিলেন। তার ওপরে, অভিভাষণখানা ভাল মত পাঠও করতে পারেন নি। কতিপয় উর্দ্দুভাষী ভদ্রলোক আমাদের জানিয়েছেন যে সার আবদুর রহীম যখন অভিভাষণ খানা পাঠ করছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন কোনো ইংরেজ উর্দ্দু পড়ছেন। সার আবদুর রহীম বাঙালী হয়েও আজীবন উর্দ্দুতে কথা-বার্ত্তা বলে আসছেন। নিজেকে তিনি উর্দ্দুভাষী বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। এ সত্বেও তিনি তাঁর অভিভাষণ খানা নিয়ে এক হাস্যাস্পদ অভিনয় করেছেন। নিজের শোচনীয় দুরবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেও তিনি বাঙালী মুসলমানদিগকে উর্দ্দুভাষা গ্রহণ করতে বলেছেন এবং তা বলতে এতটুকুও লজ্জা বোধ করেননি। যাঁরা অনুসন্ধানপ্রিয় লোক তাঁরা একটিবার অনুসন্ধান করে দেখুন কি ভাবের দ্বারা সার আবদুর রহীম প্রবুদ্ধ হয়ে এ বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন!

ম-আ

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—এই সম্মিলনী মৎস্যজীবীদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাহারা যেন তাঁহাদের ধৃত মৎস্য যদৃচ্ছা স্বাধীন মত বিক্রয় করেন এবং জমিদার কর্তৃক নিযুক্ত একচেটিয়া ফরিয়াদের নিকট বিক্রয় না করেন ও ঐরূপ জমিদারদের সহিত কোন প্রকার শর্ত্তেই আবদ্ধ না হন।

প্রস্তাবক—শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মল্লবর্ম্মন (ফরিদপুর)

সমর্থক—শ্রীবিহারী লাল বিশ্বাস (ফরিদপুর)

৭ম প্রস্তাব—এই সম্মিলনী মৎস্যজীবীদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে যদি শেষ পর্য্যন্ত কোন জমিদারের সহিত ন্যায় সঙ্গত ও সম্মান জনক মিটমাট না হয় তাহা হইলে সকলেই যেন তাহার সেই জলকরের সর্ব্ব প্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

প্রস্তাবক—শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সরকার (ত্রিপুরা)

সমর্থক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র সরকার (পাবনা)

৮ম প্রস্তাব—এই সম্মিলনী সমগ্র বাঙ্গালা ও আসামের মৎস্যজীবী মাত্রকেই এই অনুরোধ করিতেছেন যে আগামী কাউন্সিল নির্ব্বাচনের সময় নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সমিতির কার্য্যকরী সমিতির দ্বারা অননুমোদিত সভ্যকে যেন কেহই ভোট না দেন বা কোন প্রকারের সাহায্য না করেন।

প্রস্তাবক—শ্রীহীরালাল বিশ্বাস (খুলনা)

সমর্থক—শ্রীঋষিপদ হালদার (নদীয়া)

৯ম প্রস্তাব—এই সম্মিলনী এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার এম, এ,এম, এল্ সি, মহাশয়কে মৎস্যজীবীদের দুঃখ ও দুর্দ্দশার কথা জন সাধারণের অবগতির জন্য ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং জমিদারদের নিকট উপস্থাপিত করিবার ক্ষমতা দিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীদীননাথ মল্লবর্ম্মন তালুকদার (ময়মনসিংহ)

সমর্থক—শ্রীঘনশ্যাম সরকার (ময়মনসিংহ)

১০ম প্রস্তাব—এই সম্মিলনী গবর্ণমেন্টকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে গবর্ণমেন্ট যেন হাটে বা বাজারে তোলা উঠাইবার প্রথা রহিত করিয়া দেন।

প্রস্তাবক—শ্রীরামচন্দ্র মল্লবর্ম্মণ কবিরাজ (বরিশাল)

সমর্থক—শ্রীরাজকৃষ্ণ বিশ্বাস (নদীয়া)

১১শ প্রস্তাব—এই সম্মিলনী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নদীয়া জেলার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবিত "বেঙ্গল ফিশারীজ বিল ১৯২৮ (The Bengal Fisheriel Bill, 1928) সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছেন এবং যাহাতে ঐ বিল আইনে পরিণত হয় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে একান্তে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীঅভয়চরণ হালদার (পাবনা)

সমর্থক—শ্রীব্রজনাথ দাস (বগুড়া)

১২শ প্রস্তাব—যেহেতু মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত গরীব এবং যেহেতু তাহাদের একবেলাও মাছ না ধরিলে তাহাদের অন্ন সংস্থানের অন্য কোনও ব্যবস্থা নাই বলিয়া এই সম্মিলনী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ত্রিপুরা জেলার প্রতিনিধি শাহ্ সৈয়দ ইমদাদুল হক সাহেবের প্রস্তাবিত "মৎস্যের পোনা সংরক্ষণ বিল" (Bengal Fish Fry Preservation Bill, 1924) অর্থাৎ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাস মৎস্য ধরা বন্ধ রাখা সম্বন্ধীয় বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে যাহাতে ঐরূপ সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টকর বে-আইনি আইন বিধিবদ্ধ না হয় তাহার জন্য যেন সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দরিদ্র প্রজা সাধারণের চির কৃতজ্ঞতা ভাজন হন।

প্রস্তাবক—শ্রীব্রজনাথ দাস (বগুড়া)

সমর্থক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র সরকার (ত্রিপুরা)

অনুমোদক—শ্রীচণ্ডীচরণ সরকার (ত্রিপুরা)

১৩শ প্রস্তাব,—এই সম্মিলনী ফরিদপুর জেলাবাসী মৎস্যজীবী ভ্রাতাদিগের দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন এবং ফরিদপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর ও অন্যান্য মেম্বর দিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অনতিবিলম্বে মৎস্যজীবীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কাঠা, ভোসাল, আওর,কোন প্রভৃতির সাহায্যে মৎস্য ধরিবার নিষেধাজ্ঞামূলক বিধির প্রত্যাহার করেন এবং গবর্ণমেন্ট যেন ফতেপুর হইতে মাদারীপুর পর্য্যন্ত কুমার নদীর সন্নিহিত খাল সমূহে কবাট না দেন।

প্রস্তাবক—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মল্লবর্ম্মণ (ফরিদপুর)

সমর্থক—শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মল্লবর্ম্মণ (ফরিদপুর)

১৪শ প্রস্তাব—(ক) এই সম্মিলনী মৎস্যজীবীদিগের প্রতি চাঁদপুরের পুলিশের অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন এবং মৎস্যজীবীদিগকে এই সব অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য এই বিষয় গভর্ণমেণ্টের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মল্লবর্মণ
(ফরিদপুর)

সমর্থক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র মল্লবর্মণ
(ফরিদপুর)

(খ) এই সম্মিলনী চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার মৎস্যজীবীদের চাষবাস বিষয়ে বনবিভাগের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মল্ল বর্মণ
(ফরিদপুর)

সমর্থক—শ্রীনিবারণচন্দ্র মল্ল বর্মণ
(ফরিদপুর)

১৫শ প্রস্তাব:—নিখিল-বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনীর জন্য ও নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সমিতির জন্য নিয়মাবলী প্রণয়নার্থে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্ল বর্মণ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ মল্ল বর্মণ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়কে লইয়া একটী অস্থায়ী কমিটি গঠিত করা হইল এবং তিনজন উপস্থিত হইলেই এই কমিটির কার্য্য চলিতে পারিবে।

প্রস্তাবক—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী
(২৪ পরগণা)

সমর্থক—শ্রীতুষ্টচরণ বাউল
(যশোহর)

১৬শ প্রস্তাব:—এই সম্মিলনী নিখিল-ভারতীয় জাতীয় মহাসভাকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে মৎস্যজীবী সভার পক্ষ হইতে একজন মৎস্যজীবী প্রতিনিধিকে ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীব্রজনাথ দাস
(বগুড়া)

সমর্থক—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মল্ল বর্মণ
(ফরিদপুর)

১৭শ প্রস্তাব—এই সম্মিলনী মৎস্যজীবী মাত্রকেই এই অনুরোধ করিতেছেন যে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সমিতির কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দিবসে তাহারা তাহাদের একদিনের ধৃত মৎস্যের মূল্য নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবি সমিতির তহবিলে দান করেন।

প্রস্তাবক—শ্রীদ্বারকানাথ মল্লবর্ম্মণ, (ময়মনসিংহ)
সমর্থক—শ্রীরেবতীকুমার মল্লবর্মণ (ঢাকা)

১৮শ প্রস্তাব—নিখিল বঙ্গীয় আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনীর পরবর্ত্তী অধিবেশন ত্রিপুরা জেলায় হওয়া স্থিরীকৃত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীগোবিন্দচরণ সরকার (ত্রিপুরা)

১৯শ প্রস্তাব—পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্য্যকরী সমিতি পুনর্গঠিত হইল। যে সমস্ত জেলার প্রতিনিধি লওয়া হয় নাই সেই সমস্ত জেলার প্রতিনিধি লওয়ার ভার ইহাদের প্রতি অর্পণ করা হইল।

(সভাপতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)

(১) সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার,
এম, এ, এম এল, সি
পোঃ কৃষ্ণনগর জেলা নদীয়া।

(২) সহকারী সভাপতি—শ্রীব্রজনাথ দাস,
মোক্তার, বগুড়া।

(৩) সম্পাদক—শ্রীরমণী মোহন বিশ্বাস
পোঃ এবং সাং সাধুপুর।
জেলা বরিশাল।

সহযোগী সম্পাদক:—

(৪) শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র মল্লবর্ম্মণ
পোঃ মাদারীপুর
সাং কাসিমাবাদ
জেলা ফরিদপুর

(৫) শ্রীঅভয় চরণ হালদার
পোঃ ও সাং সুজানগর
জেলা পাবনা।

কার্য্যকরী সভা:—

(৬) শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র মল্লবর্ম্মণ তালুকদার
পোঃ মাদারীপুর
সাং আমিরাবাদ
জেলা ফরিদপুর

(৭) শ্রীবিপিন বিহারী বিশ্বাস
শ্রীযুক্ত বনমালী সরকারের গদী
পোঃ গোয়ালন্দ।
ঘিসঘাট, জেলা ফরিদপুর।

(৮) শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র মল্লবর্ম্মণ
সাং সোনার গাঁ, পোঃ বৈদ্যের বাজার,
জেলা ঢাকা।

(৯) শ্রীশশিভূষণ দাস ডাক্তার
সাং টোকমদান বাজার
পোঃ উলুসাড়া, জেলা ঢাকা।

(১০) শ্রীরাইমোহন মল্লবর্ম্মণ
সাঃ কাউনিয়া। পোঃ ও জেলা বরিশাল।

(১১) শ্রীহরিচরণ মল্লবর্ম্মণ মৃধা
সাং সোনাপুর, পোঃ কাউখালী, জেলা বরিশাল

(১২) শ্রীদীন নাথ মল্লবর্ম্মণঃ তালুকদার
পোঃ নান্দাইল, সাং আচার গাঁও,
জেলা ময়মনসিংহ।

(১৩) শ্রীদ্বারকানাথ মল্লবর্ম্মণ
(ময়মনসিংহ)

(১৪) শ্রীদশরথ দাস ডাক্তার
পোঃ সরিসাবাড়ী
জিলা ময়মন সিংহ

(১৫) শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সরকার
পোঃ ভবের চর
সাং পোড়াচক বাউসিয়া
জিলা ত্রিপুরা

(১৬) শ্রীভদ্র দালাল
সাং গঙ্গাপ্রসাদ
পোঃ দাউদ কান্দি
জিলা ত্রিপুরা

(১৭) শ্রীবিহারী লাল সরকার
পোঃ সাং সাতবাড়িয়া
জিং পাবনা

(১৮) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সরকার
শ্রীযুক্ত জলধর হালদার মহাশয়ের বাড়ীতে।
সাং নলগোলা
পোঃ পুরান ভারেঙ্গা
জিং পাবনা।

(১৯) মুনশী হেকমত উল্লা সরকার

(২০) মুনশী তুফান উদ্দীন মণ্ডল
সাং মহিষাবাদ
পোঃ মাদলা জিং বগুড়া

(২১) শ্রীদুর্গাদাস সরকার
সাং বকুর বাড়ী
পোঃ স রিয়া কান্দি
জিং বগুড়া

(২২) শ্রীমুকুন্দ কুমার হালদার
নবাবগঞ্জ মালদহ

(২৩) শ্রীঘনশ্যাম সরকার
সাং পোঃ লতুটী, জিং রংপুর

(২৪) শ্রীতারিণী কান্ত সরকার
সাঃ পূর্ব্বতলা, পোঃ গাইবান্ধা, জিং রংপুর

(২৫) শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র হালদার
পোঃ জঙ্গিপুর, জিং মুর্শিদাবাদ

(২৬) শ্রীনলিনীকান্ত হালদার
সাং কুচেমোড়া, পোঃ শিবনারায়ণ পুর, জিং নদীয়া

(২৭) শ্রীরাজকৃষ্ণ বিশ্বাস
সাং চাঁদুরিয়া, পোঃ সিমুরালি, জিং নদীয়া

(২৮) শ্রীঋষিপদ হালদার
পোঃ নিশ্চিন্ত পুর, সাং সুবল পুর, জিং নদীয়া

(২৯) শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী
পোঃ আড়িয়াদহ, সাং দক্ষিণেশ্বর, জিঃ ২৪ পরগণা

(৩০) শ্রীহীরালাল বিশ্বাস
পোঃ বেলফুলিয়া, সাং গোলপুর, জেলা খুলনা।

(৩১) শ্রীকানাইলাল মল্লবর্ম্মণ
পোঃ বাগেরহাট, সাং মুন্সীগঞ্জ, জেলা খুলনা।

(৩২) শ্রীকৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস
(যশোহর)

(৩৩) শ্রীপাঁচু গোপাল হালদার
পোঃ সমুদ্রগড়, সাং কালুইডাঙ্গা, জেলা বর্দ্ধমান।

(৩৪) শ্রীবিহারীলাল হালদার
সাং নোয়াপাড়া, পোঃ মাজিদিয়া, জেলা বর্দ্ধমান।

(৩৫) শ্রীহরিপদ মণ্ডল
সাং বড় কোবলা, পোঃ সমুদ্রগড়, জেলা বর্দ্ধমান।

কৃষক ও শ্রমিক সভা।

গত ১০শে ফাল্গুন ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত টাউনহলে গোপালনগর নিবাসী মোহাম্মদ হায়াতুল্লাহ নামক একজন খাটি কৃষকের সভা পতিত্বে অত্র জিলা কৃষক ও শ্রমিকদিগের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় স্বরাজ্যদলের অন্যতম নেতা বাবু নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ও খাদি প্রতিষ্ঠানের ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সভা বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিল। এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া টাউন হল সর্ব্বদা জনতা পূর্ণ ছিল। জিলার বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। খুব কম সংখ্যক সহরের লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল।

সভাপতি সাহেবের মুখে তাঁহার উপর ১৫ বৎসর যাবত জমিদারের নির্ম্মম অত্যাচারের কাহিনী বড়ই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

নির্ম্মল বাবু প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে তাঁহার ও স্বরাজ্যদলের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে নজর সেলামী ও right of pre-emption এর

বিরোধী। তাঁহার উদারতা পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া সভার সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

১। ভারতীয় কৃষি ও কৃষকদের উন্নতি বিধান-কল্পে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা তদন্ত করার জন্য বিলাত হইতে যে রয়েল কমিশন আসিতেছেন, তাঁহারা যাহাতে সব জমিনে আসিয়া গ্রামবাসী কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা ভাল মতে তদন্ত করতঃ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তজ্জন্য এই সভা অনুরোধ জানাইতেছে।

২। এই সভা বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলকে অনুরোধ করিতেছে যে, প্রজাস্বত্ব সংশোধক প্রস্তাব যদি প্রজার অনুকূলে পাশ না হয়, অথবা স্থগিত রাখা হয়, তবে তাহার প্রতিবাদের জন্য উপরোক্ত দল যেন সমস্ত বঙ্গব্যাপী এক দিবস শান্তিপূর্ণ হরতালের ব্যবস্থা করেন।

৩। আগামী লোকেল বোর্ড ইলেক্শনে পল্লীবাসী কৃষক ও শ্রমিকগণ ভোটদানে নিজেদের মধ্য হইতে উপযুক্ত স্বাধীনচেতা, নিরপেক্ষ লোকদিগকে যাহাতে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠায় তজ্জন্য এই সভা অনুরোধ করিতেছে।

৪। যেহেতু অত্র জিলার জমিদারগণ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উহা রদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং ঐ সংশোধন দ্বারা প্রজাগণের সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে বলিয়া এক আজগবি মতের প্রচার করিয়া স্থানে স্থানে কতক সরলমনা প্রজাদিগের দ্বারা নানা কাগজে দস্তখত করাইয়া দরখাস্তরূপে গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এই কৃষক ও শ্রমিক সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ঐরূপ কোন দরখাস্ত কাউন্সিলে অথবা গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত হইলে, ঐ দরখাস্ত সম্বন্ধে ভালরূপ তদন্ত না করিয়া যেন গ্রহণ না করেন।

খুচরো

খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক সাহেব গত শনিবার দিন গত রাত্রে কলিকাতায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমেডিয়েট বোর্ড অফ একজামিনেশনের সেক্রেটারী ছিলেন। এটুকুই শুধু তাঁর পরিচয় নয়,—তিনি খুব উদার ও শিক্ষাভিজ্ঞ লোক ও ছিলেন। কোন অন্ধ সংস্কারের বালাই তাঁর ছিল না। খোশামদ করে খানবাহাদুর উপাধিও তিনি কিনেন নি।

পারলামেণ্টের কমন্স সভায় শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ বার্টন এই বলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট যতটা সম্ভব রাজবন্দীদের নামে মোকদ্দমা করবার চেষ্টা করবেন কিনা। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী এ সংবাদে নিশ্চয়ই পরম আনন্দিত হবেন।

দুর্দ্দান্ত জমিদারের দারুণ অত্যাচার———রামপুর হাট বাঢ়-দীপিকায় জনৈক পত্র প্রেরক লিখেছেন—

"মল্লারপুর মোকামের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত মহাত্ম ভগবান দাস থানা রামপুরহাট সামীল মারগ্রাম মৌজার দর-পত্তনীদার। তিনি তাঁহার প্রজাদের অনেকেরই অকারণ জরিমানা আদায় করিতেছেন ও তাঁহাদের উপর নানারূপ অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নাদি করিতেছেন। এইরূপ মর্ম্মে শ্রীমান শ্রীযুক্ত রামপুরহাটের সবডিভিসানাল অফিসার বাহাদুরের আদালতে উক্ত মারগ্রাম গ্রাম নিবাসী বিভূতি-ভূষণ মণ্ডল দিগর "দুর্দ্দান্ত জমিদারের দারুণ অত্যাচার।" উল্লেখে একটি নালিশ করিয়াছে। উক্ত দরখাস্ত সম্বন্ধে তদন্ত জন্য রামপুরহাট থানার সেনামপ্যাক্ত দারোগা বাবু রাধাবিনোদ সরকার মহাশয়ের উপর ভার হইয়াছে। দেখা যাউক খুঁটি দাঁড়ায় কোথায়?"

কানপুরের "প্রতাপ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার ইন্দোর রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ ছিল। ইন্দোরের মহারাজা তাঁর গদী ত্যাগ করার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন। আরো দশটি দেশীয় রাজ্যে প্রতাপ প্রবেশ করতে পায় না।

দারা নামক জাহাজ মরিসস্ দ্বীপ হতে ৪০ জন ভারতীয় শ্রমজীবী নিয়ে ১৪ই মার্চ্চ তারিখে বোম্বেতে পৌঁছেছে। এরা আগের থেকে কাজ করতে মরিসসে গিয়েছিল। চুক্তির সময় অতীত হয়ে গেছে বলে দেশে ফিরে এসেছে। মাত্র কুড়িটি করে টাকা এই শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছে।

গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ইংল্যাণ্ডের ডন্‌ক্যাষ্টারের অন্ত-র্গত নিউথর্ণ কয়লার খনির মধ্যে একটা স্তম্ভ দৃঢ় করতে যেয়ে ৬ জন মজুর এক শ' গজ নীচে পড়ে যেয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।

আগামী ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র তারিখে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা নামক স্থানে কৃষক ও শ্রমিক কনফারেন্স হবে। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এ কনফারেন্সে সকলের যোগদান করা আবশ্যক। খোন্দকার গাজী মাহমুদ সরকার অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটরী মনোনীত হয়েছেন।

৬। হজরত শাহ্ জালাল।
মৌলবী আবদুল মালেক চৌধুরী প্রণীত।
৭। সচিত্র আরব জাতির ইতিহাস।
৮। সচিত্র আজমীর ভ্রমণ।

লাঙল

বিজ্ঞাপনের হার

বাৎসরিক চুক্তিতে—

সাধারণ পৃষ্ঠা—প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	৸৹
প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম	৭৲
সমগ্র পৃষ্ঠা	১৩॥৹
মলাট—১ম পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷৹
অৰ্দ্ধ কলম	৭৲
অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৩॥৹
,, ২য় পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৲
,, " প্রতি কলম	৯॥৹
,, সমগ্র পৃষ্ঠা	১৮॥৹
,, ৩য় পাতা ২য় পাতার তুল্য	
,, ৪র্থ পাতা প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চি	১৷৹
প্রতি কলম	১১৲
" সমগ্র পৃষ্ঠা	২১॥৹

বিনা চুক্তিতে প্রতি সংখ্যায় প্রতি কলম ইঞ্চির জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৵৹।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

১। ন্যূনকল্পে পঁচিশখানি পত্রিকা না লইলে এজেন্সী দেওয়া হইবে না; এবং প্রতি ২৫খানি পত্রিকার জন্য পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

২। প্রতিমাসের শেষ হিসাব সহ বিক্রয়লব্ধ জমার টাকা না পাঠাইলে নূতন কাগজ পাঠান হইবে না।

৩। পত্রিকা পাঠাইবার ব্যয় এবং এজেন্টগণ কর্ত্তৃক বিক্রয়লব্ধ টাকামণি অর্ডার করিবার কমিশন লাঙল আফিস হইতে দেওয়া হইবে।

৪। প্রতি সংখ্যার শতকরা দশখানি হিসাবে অবিক্রীত পত্রিকা ফেরত লওয়া হইবে।

৫। এজেন্টগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

পত্রিকার মূল্য—

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে বার্ষিক ৩৲ টাকা,
ভিঃ পিঃ ৩৷৹ "
ষাণ্মাষিক ১॥৵৹ আনা
ভিঃ পি, তে ১৸৵৹ আনা
বিদেশে বার্ষিক মূল্য ৬ শিলিং
নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র—

৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মোস্তাফা কামালপাশা। ।৵৹
গাজী আব্দল করিম ।৵৹
প্রাপ্তিস্থান—লাঙল বুক এজেন্সী
৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রজাবাহিনী

বাঙ্গলার জমিদার নিপীড়িত প্রজা বৃন্দের মুক্তির বার্ত্তা লইয়া বগুড়ার প্রজাহিতৈষী এম. এল. সি মৌলবী রজিব উদ্দীন তরফদার সাহেবের পরিচালনাধীনে সাপ্তাহিক প্রজাবাহিনী বাহির হইতেছে। ইহাতে থাকিবে শুধু প্রজার স্বার্থ জমিদারের অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার মূলক পন্থা, দেশের হা-হা-কার নিবারণ ও হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপায়। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৹ দুই টাকা চারি আনা।

ম্যানেজার—
প্রজাবাহিনী
বগুড়া।

বিনোদিনী শিল্প-মন্দির

২০২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনোদিনী বালা; হস্তিদন্তের বালার উপর গিনি স্বর্ণের লতামোড়া; মূল্য প্রমাণ ২১ টাকা, ছোট ১৫ টাকা।

আমাদের এখানে নাম লেখা সেফটি পিন ও হস্তি দন্তের অন্যান্য জিনিস তৈয়ারী ও সুলভে বিক্রয় হয়। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। পাইকারগণকে বিশেষ কমিশন দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী—
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গৃহ সাজাবার আসবাব ও পুরাতন টাইপ রাইটার ইত্যাদি যদি আপনি সুলভ মূল্যে পেতে চান তা-হলে দয়া করে একটিবার

ক্যালকাটা সেল-হাউসে

আসবেন

ঠিকানা:—৬৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস ও আবেগময়ী ভাষায় বাঙ্গালার অভিনব নাটক

কাদম্বরী বাহির হইয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন প্রণীত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী—
১০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BOOKS TO READ :

1. **ORGANISED LABOUR :** An Introduction to Trade Unionism 1924 By G. D. H. Cole, cloth 6s.
2. **SINCE LENIN DIED :** By Max Eastman, cloth 4s.
3. **LABOUR IN POLITICS :** By Keith Hutchison, paper 1s. 6d.
4. **THE PRESS :** The Labour Research Dapartment, 1s.
5. **ENGLISH AGRICULTURAL LABOUR,** 1300—1925 By Montague and T. R. Fordham, paper 1s.
6. **INDIA'S AWAKENING :** By Wilfred Wellock, paper 1s. 6d.
7. **THE LABOUR INTERNATIONAL HANDBOOK :** The Labour Research Department cloth 6s.
8. **ECONOMIC IMPERIALISM.** By Leonard Woolf, paper 2s. 6d.
9. **THE FOUNDATIONS OF IMPERIALIST POLICY,** By M. Pavlovitch, cloth 3s. 6d.

TO BE HAD OF

THE LABOUR PUBLISHING COMPANY LIMITED,
38, Great Ormond Street,
London, W. C. 1.

স্বরাজ ফ্যাক্টরী

অফিস ও প্রদর্শনী
২১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
শাখা—১৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

চামড়ার সুটকেস, ডাক্তারের বাক্স, মেসিনে তৈরী করা টীন বাক্স ও ষ্টেভ্ রং করা ক্যাশ বাক্স প্রভৃতি মজবুত ও সুন্দর গঠনে, নির্মিত ও বিক্রয় হয়ে থাকে। ১৯২২-২৩ সনের নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনীতে সোনার মেডেল পাওয়া গিয়েছে।

আনন্দ সংবাদ [illegible]

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible]

নূতন কবিতার বই :—

[illegible]

চিত্রনামা ১৲

[illegible]

পূবের হাওয়া ১।০

[illegible]

অগ্নিবীণা ১।০

[illegible]

কবির সুন্দর ফটোসহ

[illegible]

উপহারের শ্রেষ্ঠ "উপন্যাস—"

রিক্তের বেদন ১॥০

দোলন চাঁপা ১।০

(ইহার "পূজারিণী" কবিতা-মাত্র চির পূজ্য)

বাহির হইল বাহির হইল

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত সুন্দর প্রচ্ছদ পটসহ

ঝিঙেফুল ৸০

ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার এমন কবিতার বই পূর্ব্বে বাঙলা ভাষায় বাহির হইয়াছে বলে মনে হয় না।

লাঙলের "সাম্যবাদী" পুস্তকাকারে বাহির হইল।

সাম্যবাদী ৵০

[illegible] ৵০

(কবি কত নির্ভীক ইহাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাবেন)

বাঁধন-হারা (যন্ত্রস্থ)

[illegible] (যন্ত্রস্থ)

কলিকাতা ৩৭, হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত এবং ২৩।১।১এ, হ্যারিসন রোড, ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং লিমিটেড প্রেসে মুদ্রিত। মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস।

লাঙল

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

LANGAL

Weekly Organ of the Bengal Peasants' and Workers' Party.

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচন

জাগো জাগো বলরাম,
ধরো তব মরুভাঙা হল।
বল দাও ফল দাও,
স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল।

প্রথম খণ্ড — বৃহস্পতিবার, ২৫শে চৈত্র ১৩৩২, ৮ই এপ্রিল ১৯২৬ — ১৪শ সংখ্যা

প্রধান পরিচালক—কাজী নজরুল ইসলাম

সম্পাদক—শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস

নগদ মূল্য এক আনা ... ... বার্ষিক মূল্য—বিদেশে ৬ শিলিং, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩্।

লাঙল

[বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৩৩২ | চতুর্দ্দশ সংখ্যা

খোলা চিঠি

(মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)

দেশের জন্যে তোমার অনুরাগ। দুঃস্থ নিপীড়িত মানবতার জন্যে তোমার অনুভূতি, তোমায় কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, চারিদিকে তুমি কেবল ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছ। খদ্দর আর চরকার প্রচার থেকে আরম্ভ করে কাউন্সিলের ভোট সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত—সকল কাজের জন্যই তুমি সমানভাবে খাটছ, কোনোটাতেই তোমার এতটুকু বিতৃষ্ণা জন্মায় না। কংগ্রেস, খিলাফৎ-কমিটি, জমিয়তে উলামা ও হিন্দু-মহাসভা—সব ক'টি অনুষ্ঠানেরই তুমি কর্ম্মী। তার ওপরে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা ও দুর্ভিক্ষ এ সমস্তকে তাড়াবার জন্যেও তোমার চেষ্টার নিবৃত্তি মোটেই নেই। গত চার পাঁচ বছর থেকে এসমস্ত কাজের জন্যে তোমায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে নিজের চোখে দেখেছি এবং তার বিষয়ে অপরের মুখেও শুনেছি। আমি ভেবে ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, কি করে তুমি এত খাটছ। অসহযোগ আর খিলাফৎ আন্দোলনে কত নেতা আর উপনেতা রাজা হয়ে গেল, তুমি কিন্তু কোনো দিন ব্যক্তিগত ভাবে লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখলে না;—তুমি নির্লোভ। পাঁচ বছর পূর্ব্বে তোমায় যে অবস্থায় দেখেছিলুম তার চেয়ে আজ তুমি ঢের ঢের বেশী গরীব।

কিন্তু বন্ধু, বড় দুঃখের সহিত আমায় বলতে হচ্ছে, তুমি ঠিক পথে চলনি। কাজের প্রেরণা তোমার ভিতরে এসেছে, তাই তুমি কেবলি কাজ করে যাচ্ছ, এতটুকুও ভেবে দেখ্‌ছনা যে কিসে কি হতে পারে। চিন্তা করাত তুমি ছেড়েই দিয়েছ, মুশ্‌কিল এই যে হিসাব করেও কাজ তুমি করতে চাওনা। প্রকৃতি-দত্ত শক্তিকে এমনি ভাবে তুমি পদ দলিত করে যাচ্ছ যে তা-দেখে বাস্তবিকই আমার বড় দুঃখ হয়, তোমার ওপরে খানিকটা দয়াও যে হয় না, তা নয়। বীরের পূজা আমাদের ভারতবর্ষের সকল সর্ব্বনাশের মূল হয়ে পড়েছে। এই বীর পূজাই তোমার ন্যায় উদ্যম-শীল যুবকের সকল শক্তি জল করে দিচ্ছে। নেতা-উপনেতাদের ব্যক্তিত্বের মোহ তোমায় এমনি ভাবে পেয়ে বসেছে যে তুমি কখনো তাঁদের কর্ম্ম-পদ্ধতিটি সমালোচকের চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে না, অথচ দেখার শক্তি তোমার ছিল। এ দুরবস্থা যে তোমার একার শুধু হয়েছে তা নয়, তোমার মত দেশের শত শত যুবক এমনি ভাবে মোহাবিষ্ট হয়ে ঘুরপাক খেয়ে মরছে।

ভারতের মত হতভাগ্য দেশ পৃথিবীর আর কোথায় কি আছে? এ দেশের জন সাধারণের ন্যায় পৃথিবীর আর কোন্ দেশের লোক এমন হীনজীবন যাপন করছে? জীবন ধারণ করার জন্যে মানুষের যা খাওয়া-পরার দরকার তা এদেশের জনসাধারণ কোনো দিনও পায় না। ফলে তাদের জীবনীশক্তি একেবারেই ক্ষয়ে গেছে। এই কারণে আমাদের দেশের লোক বেশী দিন বাঁচতে পায় না, আর যে কয়দিন বেঁচে থাকে, মরার মতই বেঁচে থাকে। এমনি ভাবে

জাতের ধ্বংসের পথ যখন পরিষ্কার হয়ে চলেছে তখন গান্ধী দেখা দিলেন রঙ্গমঞ্চে, কর্ম্মক্ষেত্রে নয়। তিনি জনসাধারণের নিকট তাদের একজন হয়ে এলেন না, তিনি এলেন মহাত্মা হয়ে। তাঁর বাণীকে হিসাব কিতাবের কথা বলে লোকে ধরে নিলে না, মহাত্মার বাণী বলেই গ্রহণ করে নিলে। ফলে আজকের দিনে অবস্থা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ। এদেশের লোকত খেতে পরতেই পায় না, তিনি এসে উপদেশ দিলেন এ খাওয়া-পরা আরো কমাতে। খেতে না পেয়ে যে দেশের লোক শিরদাঁড়া সোজা করে পথ চলতে পারে না সে দেশের লোকের জন্যে কত নিষ্ঠুর যে এ বিধান তা একটিবার ভেবে দেখ দেখি! আত্মনিগ্রহই কি মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য? মানুষের জীবন এমনি কি অবহেলার বস্তু?

ইকনমিক ফোর্স বা অর্থনীতিক শক্তি নামক একটি জিনিস যে সমাজে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে তোমাদের মহাত্মা গান্ধী তার প্রতি খুব বেশী অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন এবং আজো করছেন। কিন্তু বাস্তব জিনিস যা তাকে যদি আমি এড়িয়ে চলি তাতে কি তার সত্তা বিলোপ পেয়ে যাবে? অভাবের পীড়নে দেশের জন সাধারণের অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছে,মহাত্মা গান্ধী তা তাঁর প্রাণে অনুভব করেছেন এবং তারি জন্যে তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন ভোগের মাত্রা কমাতে। পৃথিবীর আর আর দেশের তুলনায় এদেশের লোকের ভোগকে ভোগ বলেই গণ্য করা যায় না। মানুষের শরীরকে সবল ও সতেজ রাখার জন্যে কমপক্ষে যে যে বস্তু খাওয়া উচিত এদেশের লোক তা কোনো দিনও খেতে পায় না। আর সকল দেশের লোকের চেয়ে আমরা যে দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু ইহাই তার একমাত্র কারণ। দেশের উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী বণ্টিত না হয়ে লুণ্ঠিত হচ্ছে, উৎপন্ন জিনিস উৎপাদকের ভোগে আসছেনা, আর এরি জন্যে দেশময় হাহাকার উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর মতে জনসাধারণ যদি খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে উপোস করতে থাকে তবেই দেশে আর কোনো হাহাকার থাকবে না, শান্তি স্থাপিত হবে। কোনো যুগে কোনো দেশে জাতের জন্যে এমন ধ্বংসের ব্যবস্থা কেউ করেছেন বলে আমি কখনো শুনিনি। দেশের উৎপাদিকা শক্তি আজো পর্য্যন্ত এতবেশী কমে যায় নি যার জন্যে দেশের লোককে অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাতে হবে। অথচ সত্য সত্যই তা করতে হচ্ছে। কেন এমন হয়? সামান্য অনুসন্ধান করলেই আমরা এর প্রকৃত কারণটা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। জিনিসত এখনো ঢের উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু যথাযথরূপে তার বণ্টন হচ্ছে না। উৎপন্ন জিনিস সকলের মধ্যে যথাযথরূপে বণ্টিত হলে কোনো দুঃখই আর থাকেনা, বস্তুতঃ ভোগের মাত্রা কমিয়ে কমিয়ে জনসাধারণকে খাদ্যের নামে যা তা খেয়ে দিন কাটাতে হয় না। শোষণের ব্যবস্থা দেশে আছে, লুণ্ঠনের ব্যবস্থাও আছে, নেই কেবল বণ্টনের ব্যবস্থা। মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্ম ভাবাপন্ন হৃদয়ে এ নিপীড়িত বিলুণ্ঠিত মানবতার দুঃখে একটুকুও বিদ্রোহ কখনো জাগেনি। তিনি জীবনের সন্ধান দেশকে দিতে পারেন নি, মরণের সন্ধানই শুধু দিয়েছেন।

চরকা ও খদ্দর কোনো অর্থ-নীতিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। গান্ধী বলেন বছরে ৬০ কোটি টাকার কাপড় বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে আমদানী হয়ে থাকে। এই ৬০ কোটি টাকার কাপড়ের চালান বন্ধ হয়ে গেলে দেশে আপনা হতে স্বরাজ এসে যাবে। একথা সত্য যে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের জন্যে তাদেরি ইচ্ছার দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত হয় না। এও সত্য যে এদেশের কাঁচা মাল খুব সস্তায় কিনে নিয়ে তার জায়গায় ইংল্যাণ্ডের পাকা মাল এদেশে চালাবার জন্যে ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন ধনিক এদেশকে শাসন করছে। ৬০ কোটি টাকার কাপড়ের চালান আসা বন্ধ হয়ে গেলে ইংল্যাণ্ডের ধনিকদের ক্ষতি যে যথেষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে তারা এদেশ আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কিছুতেই পালিয়ে যাবে না। তুলোই একমাত্র কাঁচা মাল নয়, যা ভারতবর্ষ হতে ইংল্যাণ্ডে চালান গিয়ে থাকে, আর কাপড়ও একমাত্র পাকা মাল নয় যা ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ড হতে আমদানী হয়ে থাকে। আরো নানান্ রকমের কাঁচা মাল যেমন এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে রফ্তানী হয়ে থাকে, তেমনি আরো বহু প্রকারের পাকা মালও এদেশে আমদানী হয়ে থাকে। কাজেই কাপড়ের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলেও ইংল্যাণ্ডের বণিক্ প্রভুরা কিছুতেই এদেশ ছেড়ে যাবেন না। গান্ধী যে বলেন খদ্দরের দ্বারা স্বরাজ হবে তার পেছনে খামখেয়াল ছাড়া কোনো প্রকারের বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।

প্রত্যেক পরিবার চরকায় সুতো কাটবে, আর হাতের তাঁতে কাপড় বুনবে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। লাভ-লোলুপতা সমাজে অব্যাহত ভাবে বর্ত্তমান রয়েছে, আর রয়েছে বলেই এত বক্তৃতা ও আন্দোলন সত্ত্বেও গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী খদ্দরের প্রচলন দেশে হয় নি। আজ পর্য্যন্ত খদ্দরের প্রচলন যতটা হয়েছে তা ব্যবসায়ের অর্থাৎ শোষণ ও লুণ্ঠনের দিক থেকেই হয়েছে। ব্যবসায় চালিয়ে দশজনকে শোষণ করে এক জনের বড় হওয়ার প্রথা যতদিন না রাষ্ট্র অবৈধ বলে নিরূপণ করছে ততদিন কিছুতেই শোষণ-বৃত্তির সমাপ্তি হবেনা।

শালীনতা (decency) আর বিলাসিতা এক জিনিস নয়। যেদিন থেকে মানুষ আর্টের সৃষ্টি করে প্রকৃতিকে মানুষ করেছে সেদিন থেকে সে আপনাকে সভ্য বলেও

ঘোষণা করেছে। শালীনতার প্রতিও মানুষ সেদিন থেকেই আকৃষ্ট হয়েছে। এ আকর্ষণই মানুষকে মানবেতর প্রাণীর ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। প্রকৃতি যে অবস্থায় মানুষকে ভূমিষ্ট করেন, কোনো শিল্প-কলার সৃষ্টি না করে মানুষ যদি সে অবস্থাতেই থাকত তা হলে মানুষের চেহেরা আজ ঠিক অন্যরূপ হত। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় শীতাতপ হতে বাঁচার জন্যে মানুষের গায়েও লম্বা লম্বা লোম হত, আর আত্ম রক্ষার জন্য শিং বা নখরাদিও হয় তো মানুষের গজাত। বুদ্ধি-কৌশলে শিল্পকলার সৃষ্টি করেছে বলে, আর শালীনতার প্রতি, সৌন্দর্য্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি মানুষের মধ্যে জন্মেছে বলে, তাকে আজ আমরা যে সুন্দর রূপে দেখতে পাচ্ছি সেরূপে সে পৌঁছুতে পেরেছে। শালীনতার প্রতি আকর্ষণই হচ্ছে সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের লক্ষণ, আর এর প্রতি বিরাগ হচ্ছে সেই আদিম অসভ্যতার দিকে ফিরিয়ে যাওয়া। শালীনতার অপব্যবহারের নামই বিলাসিতা। বিশ্বের আর আর দেশের, তুলনায় বিলাসী হওয়াত দূরের কথা, শালীনও ভারতের জন-সাধারণ অদ্যাবধি হতে পারেনি। এ সত্বেও মহাত্মা গান্ধী ভারতের জনসাধারণকে সেকেলে কর্কশ বস্ত্র পরিধানে উদ্বুদ্ধ করতে চান। কল মানুষের হাতে গড়া আর্ট। এই কলের তৈয়েরী কাপড় দেখতে সুন্দর হলে, মোলায়েম হলে, আমি কেন তা পড়তে যাবনা, আর কেনই বা আমি কর্কশ খদ্দরের কাপড় পড়তে যাব? কল কিছু খারাব জিনিস নয়, কলের স্বামিত্ব ব্যক্তিগত হওয়াই খারাব। সভ্য মানবের উচিত কলকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, ধ্বংস করা নয়। শ্রমিকের দুর্গতি দেখে মহাত্মা গান্ধী কলের ধ্বংস সাধন করতে চান! কিন্তু কল শ্রমিকদিগকে দুর্গতির পথে টেনে আনেনি, কলের তথাকথিত মালিকরাই এনেছে।

শালীনতার প্রতি, সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে বলে, খাওয়া-পরার একটা আকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে বলেই মানুষ পাওয়ার উদ্দেশ্যে সকল বাধা ঠেলে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। এই চলার পথে মানুষের মনুষ্যত্ব নব নব রূপে বিকশিত হয়। তোমার গুরু মহাত্মা গান্ধী এহেন চলার পথে বাধা প্রদান করে ভারতের মহাক্ষতি সাধন করেছেন। খাওয়া আর পরা এ দুটোর প্রতিই তিনি ভারতের জন সাধারণের বোধশক্তিকে পঙ্গু করে দিতে চেষ্টা করেছেন; খাওয়া-পরা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে পারলেই তাকে মুক্তির পথে পরিচালিত করা হয়। খাওয়া-পরার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের দেশের জন সাধারণের হৃদয়ে জাগানোই হচ্ছে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ। যতদিন মানুষ তার খাওয়া-পরার আকাঙ্ক্ষা টাকে তীব্র ভাবে অনুভব না করবে ততদিন সে তার অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে কিছুতেই অগ্রসর হবেনা, তা সে অবস্থা যতই হীন হোক্ না কেন। মহাত্মা গান্ধী এখানেই বাধ সেধেছেন। তিনি দেশের জন-সাধারণকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন না করে অচেতন করতেই প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। আজকের দিনে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্ব্বপ্রধান কাজ হচ্ছে দেশকে মহাত্মা গান্ধীর সকল প্রকার প্রভাব হতে মুক্ত করা।

পারবে কি বন্ধু তা করতে?

ময়মনসিংহ কৃষক ও শ্রমিক-দল

—:•:—

আগামী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যাঁহারা কৃষক ও শ্রমিক-দলের মনোনীত হইয়া ময়মনসিংহ জিলা হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে চান তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ৭ই বৈশাখের মধ্যে নিজেদের নাম নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

গবর্ণমেন্ট ও জমিদারদিগের সহিত যাঁহার স্বার্থ জড়িত তাঁহার নাম পাঠানো নিষ্প্রয়োজন। ৭ই চৈত্র ১৩৩২

ফয়েজুদ্দীন হোসেন,

সম্পাদক, কৃষক ও শ্রমিক-দল, মসজিদ লেন;

ময়মনসিংহ

কমন ওয়েলথ অফ্ ইণ্ডিয়া বিল ও কমরেড সাক্‌লাৎওয়ালা

—ঃ০ঃ—

"ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় অনৈক প্রতিনিধি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কম্যুনিষ্ট ও ভারতীয় সদস্য কমরেড সাকলাৎওয়ালার সহিত দেখা করেছিলেন। তিনি বল্‌ছেন :—

"আমি মিঃ সাক্‌লাৎওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—'আপনি কমন ওয়েলথ অফ্ ইণ্ডিয়া বিল' এর একজন সমর্থক, লণ্ডন টাইমসের দেওয়া এ খবর সত্য কি? আমার একথা শুনে তিনি খুব জোর দিয়ে বল্লেন যে তিনি কিছুতেই তা হতে পারেন না। তিনি বল্লেন, 'আমি ধূর্ত্ততা পূর্ণ শোষণবাদের (Imperialism) ধূর্ত্ত কর্ম্মীদের বিরুদ্ধ দলের লোক। তার ওপরে, মিসেস্ বেসাণ্টের ধূর্ত্ততার প্রতি আমি কখনো বিশ্বাসবান হইনি।

জাতি হিসেবে ভারতবাসী চিরকাল বৃটিশের অধীন হয়ে থাকুক; এ স্বীকারোক্তিটা তিনি (মিসেস্ বেসাণ্ট) ভারতবাসীদের মুখ থেকে বের করে নিতে চান। সত্য প্রিয় বৃটিশ নর-নারীগণ যেমন কোনো শর্ত্তেই তাঁদের স্বাধীনতা ও দেশকে অন্য জাতির নিকট বন্ধক রাখতে পারেন না, ঠিক্ তেমনি আমিও ভারতবাসী হিসেবে আমার দেশ ও দেশের জনসাধারণ অপর কোনো জাতির বশ্যতা ও অভিভাবকত্ব মেনে চলুক, এমন কথা কখনো মেনে নিতে পারিনে।'

• • • •

"তার পরে তিনি বল্লেন, ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকাতে সে সব দেশের লোক যেমন মুক্ত, ভারতমাতার সন্তানগণেরও তেমনি মুক্ত হওয়ার উপরে ভারতের সহিত্যকারের উন্নতি নির্ভর করছে, আর আমি আশা করি এ কথাটি প্রত্যেক সৎসাহসী ভারতবাসী খুলে বলতে এখন আর দ্বিধা বোধ করবেন না। আমি আরো আশা করছি যে ভারতবর্ষ তার রাজনীতি হতে এখন "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন" প্রভৃতি বাজে কথাগুলো বাদ দিয়ে চলবে। ভারতের সাথে বৃটেনের কোনো রক্তের বন্ধন নেই। কাজেই, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার সাথে ভারতের তুলনা করতে যাওয়াই ভুল। স্বাধীন আমাদের হতেই হবে এবং আন্তর্জ্জাতিক কর্ম্মীশ্রেণীর সম্মতির ভিত্তির উপরে স্বাধীন ভারতকে জগতের সকল জাতির সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ হতে হবে।

পুস্তক-পরিচয়

—ঃ০ঃ—

সত্যের সন্ধান। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল ইনষ্টিটিউসন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রভৃতি বড় বড় পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য।

...চিরকুমার যোগেশবাবু সত্যের সন্ধান করিতে করিতে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। সংসারের সুখদুঃখ, বাধা-বিপত্তি, শত ঝড়ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে আপন অন্তরের জ্ঞান-দীপ খানি জ্বালাইয়া ক্ষ্যাপার মত সত্যরূপ পরশমণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এমনটি একালে দুর্লভ।......কখনও বা 'ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সাহায্য' লইতেছেন; কখনও বা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মনীষিগণের মতামত লইয়া বিচার করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরের 'কঃ পন্থাঃ' প্রশ্নোত্তরে—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" ভাবিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, 'মহাজন কে? ইহার মীমাংসা হইবে কি? মহাজনের ভিতরও তো মতবিরোধ দেখিতে পাই।' "Nietzche-র মতে দয়ামায়া মনের দুর্ব্বলতা. Religion is for the weak. দুর্ব্বলের জন্য। 'হরি হরি'।"

শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া শান্তিরূপ সুধা উঠিল না; হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল না।

অবশেষে বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবার আদর্শের মধ্যে গ্রন্থকার সত্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

"আমি যেন লক্ষবার জন্মগ্রহণ করি, আর লক্ষবার যেন দরিদ্ররূপী, দুষ্টরূপী, দুঃখীরূপী নরনারায়ণের সেবা করিতে পারি; ইহাই আমার সাধনার ভিত্তি, আমি ভক্তি মুক্তির অপেক্ষা করি না। আমি লক্ষ নরকে যাব, বসন্তের ন্যায় লোকের হিত আচরণ করিতে করিতে।"

তাই 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' ইহার মধ্যে বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

সত্যের সন্ধান এইরূপ কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থকারের গভীর দার্শনিক জ্ঞান ও প্রকাশভঙ্গিমা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। পুস্তকখানি সকলেরই চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

সু—বি

সর্ব্বহারা

[নজরুল ইস্‌লাম]

(১)

ব্যথার সাঁতার-পানি-ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস্
সেই চরে তোর ঘর?
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইসারা
হাট তুলে দে সর্ব্বহারা,
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা
ঝরছে মাথার পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাক্‌ছে মাটী
দুলিয়ে তরু-কর।

(২)

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
কাঁদ্‌ছে উতরোল
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
সাগর-মায়ের কোল।
নায়ের মাঝি! নায়ের মাঝি!
পাল তু'লে তুই দে রে আজি।
তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী
তরঙ্গে খায় দোল।
নায়ের মাঝি! আর কেন ভাই?
মায়ার নোঙর তোল!

(৩)

ভাঙন-ভরা আঙনে তোর
যায় রে বেলা যায়।
মাঝি রে! দেখ কুরঙ্গী তোর
কূলের পানে চায়।
যায় চলে ঐ সাথের সাথী,
ঘনায় গহন শাঙন-রাতি,
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি
ঘুমুস্‌নে আর হায়।
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায়?

(৪)

হীরা মাণিক চাস্‌নিক তুই
চাস্‌নি ত সাত ক্রোর,
একটী ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র—
ভরা অভাব তোর,
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা
একটি ছিন্ন মাদুর ভরা,
একটী প্রদীপ-আলো-করা
একটু কুটীর-দোর।
আস্‌ল মৃত্যু আস্‌ল জরা,
আস্‌ল সিঁদেল-চোর।

(৫)

মাঝিরে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটীর বুকে চল্।
শক্ত মাটীর ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চল্‌বি ফিরি
দল্‌বি পাহাড় কানন গিরি।
হাঁকছে বাদল, ঘিরি ঘিরি,
নাচ্‌ছে সিন্ধুজল।
চল্‌রে জলের যাত্রী এবার
মাটীর বুকে চল্!!

যুগ-সন্ধি

(শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

স্বীকার করতেই হবে যে কংগ্রেসের সূত্রপাত থেকে আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেস যাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে এসেছে তারা হচ্ছে ধনিক, বণিক আর মধ্যবিত্তসম্প্রদায়। গত চল্লিশ বৎসর ধরে জাতির নামে কংগ্রেস যতকিছু দাবী করেছে, সবই এই ধনিক বণিক আর মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের জন্যে, আর যে সব অন্যায়ের প্রতীকার প্রার্থনা করেছে, সেও ঐ উপরি উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রেণীগত স্বার্থকে বিদেশী শাসনতন্ত্রের ক্রমিক সম্প্রসারণের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টায়। চল্লিশবৎসর ধরে কংগ্রেস এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র শ্রেণীগত স্বার্থকে রক্ষার প্রয়াস করে এসেছে, জাতীয় দাবী বলতে কংগ্রেস থেকে বৎসরের পর বৎসর ধরে ইংরেজের কাছে যা কিছু দাবী করা হয়েছে তাও দেশের এই মুষ্টিমেয় পরশ্রম-উৎপন্নভোগী সম্প্রদায়ের (bourgeois) স্বার্থ-রক্ষার্থেই করা হয়েছে। তার কারণ যে, কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাঁরা এতদিন ধরে করে এসেছেন মহাত্মাজী ছাড়া তাঁদের মধ্যে কেহই আপনাদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। মহাত্মাজীকে যখন কংগ্রেসের হাল ধরতে দেখলুম তখন আশা হোয়েছিল যে তাঁর ভারতবর্ষের ধারণা, অন্যান্য নেতাদের দেশ সম্বন্ধে যে খণ্ড ধারণা ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত হবে, আর সেই কারণেই তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতালাভের আন্দোলন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের মূলে যে ইকনমিক সমস্যার সমাধানের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান আছে তারও সংশোধন আনবে, অন্ততঃ সংশোধন করবার চেষ্টা করবে, এই আশা আমরা মনে পোষণ করেছিলুম। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে জনগণমন দুলে উঠেছিলো, কিন্তু ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে গণমনের এই প্রথম উদ্বেলকে শুধু ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের দোহাই দিয়ে এক কথায় নিষ্পত্তি করে দেবার মত অত সহজ নয়। বহুদিন থেকে অত্যাচার-জর্জ্জরিত এই কৃষক ও শ্রমিকের দল সহ্যের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁচেছিলো, গভর্ণমেণ্ট, জমীদার থেকে সুরু করে গ্রামের চৌকীদার পর্য্যন্ত সকলের হাতে মার খেয়ে আসা এদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। ব্যথা অনুভব করে অথচ তার প্রতীকার করবার উপায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভারতের এই কৃষক ও শ্রমিকদল নিষ্পন্দ জড়ের মত পড়েছিলো। সেই জন্যেই ভারতবর্ষের জন-সাধারণ থেকে যোগবিযুক্ত স্বাধীনতাকামী সব দলের কথাই ইংরেজ উপেক্ষা করতে সাহস করেছে। এই অচেতন নির্য্যাতিতদের কানে খবর পৌঁচেছিলো যে তাদের অন্নবস্ত্রের জন্যে, তাদের অত্যাচারের প্রতীকারের জন্যে কে একজন চাম্পারণে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, আফ্রিকা মহাদেশে কারাবরণ করেছেন, সমস্ত অপমান হাসিমুখে দিনের পর দিন বহন করেছেন। অত্যাচারী দানবকে শাসন করতে বজ্রপাণির আবির্ভাবের বার্ত্তা তারা দুস্থ অবস্থায়ও পেয়েছিলো। তাই মহাত্মাজীর ডাক বিরাট ভারতের নিদ্রিত গণদেবতাকে যেমন করে বিচলিত করে তুলেছিলো তেমনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহুযুগ কোন সম্ভব হয় নি। তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলতে কোন আধ্যাত্মিক মুক্তির স্বপ্ন দেখে নি, ইংরেজের হাত থেকে শাসন-যন্ত্র কার হাতে যাবে সে কথা ভেবে দেখবার সামর্থ্য তার ছিল না। তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলতে বুঝেছিলো করভার থেকে মুক্তি, মহাজনের কবল থেকে মুক্তি, জমীদারের পেয়াদার তাড়ন থেকে মুক্তি। তাদের ছুটি-বেলায় অন্নের থালায় যে শকুনির দৃষ্টি পড়েছিলো তার থেকে নিষ্কৃতি। মহাত্মাজীকে তারা এত শীঘ্র অবতার করে তুলেছিলো তার কারণ তাদের বিশ্বাস হোয়েছিলো যে তিনি তাদের প্রাত্যহিক উপবাসের হাত থেকে বাঁচাবেন। এই পেটের দায় আমাদের দেশে বহুবার বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক সুষমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। তাই বলে কেউ যেন না মনে করেন যে আমি মহাত্মাজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধাসম্পন্ন নই। আমি শুধু গণমনের উপর আধিপত্যের দিক থেকে গণ-মন-তুলাদণ্ডেই মহাত্মাজীর কার্য্যপদ্ধতির আলোচনা করছি। যাই হোক্ দেশের সেদিনের অবস্থার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন যে ভারতবর্ষের কৃষক সেদিন কি অধীর ভাবেই না খাজনা বন্ধ করে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলো। সেদিনের হরতালের সাফল্য তাদের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হবে এই বিশ্বাসের উপর একান্তভাবে নির্ভর করেছিলো। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে জাতির ইকনমিক জীবনের যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে সেটা উপলব্ধি করে মহাত্মাজী যদি এই কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করতেন তারা যে যথার্থ কত শক্তিমান, অত্যাচারীকে দণ্ড দেবার সহজ পন্থা যে তাদের হাতেই আছে, সেটা যদি বুঝিয়ে দিতেন তাহলে সমস্ত অত্যাচার ও অনাচারের মূলে পৌঁছতেন আর স্বাধীনতালাভের পরেও যে সাধারণ-স্বত্ববাদ দেশকে

একদিন না একদিন স্বীকার করতেই হবে তারও পথ প্রশস্ত করতেন। বর্ত্তমানের সীমানা ছাড়িয়ে যার দৃষ্টি বহুদূরে ভবিষ্যৎএ জাতির ও দেশের সমগ্ররূপের ধারণা করতে পারে তাকেই আমরা ধ্যানী বলি। মহাত্মাজীর মধ্যে সেই ধ্যানীর দৃষ্টির আভাস পেয়ে সমস্ত জাতি আশান্বিত হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু খুব শীঘ্র সেই দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা সকলের চোখে পড়লো। বর্ত্তমানে ফললাভের আশায় তিনি স্বেচ্ছায় আপনার দৃষ্টির প্রসারকে খর্ব্ব করেছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে যার ফল বিষময় হয়ে উঠেছে সেই খেলাফৎকে তিনি দুধ-কলা দিয়ে বর্দ্ধিত করেছেন। মুসলমানদের সহানুভূতি লাভের আশায়, খেলাফৎএর মূল কথাই যে ভারতবর্ষের ঐক্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, সেটা তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেলো কি করে, ভাবলে আশ্চর্য্য হোতে হয়। অথচ এই খেলাফৎ যাদের ঘরোয়া কথার সামিল সেই নব্যতুর্কী সম্প্রদায় আঙ্গোরার তীর থেকে খেলাফৎকে যে উপায়ে বহিষ্কৃত করেছে তার সঙ্গে তুলনা করলে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বহিষ্করণের তুলনাও উপমা হিসেবে হার মানে। আমাদের দেশের মৌলানারা আঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টের কাছে তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে উত্তর পেয়েছিলেন সেটা এমন কি আমাদের এই গুরু গম্ভীর দেশেও হাসির তুফান এনেছিলো।

জমীদার আর তালুকদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেই সময় দেশময় কৃষক সম্প্রদায় সভাসমিতি করে যে আন্দোলন সৃষ্টি করে তুলছিলো মহাত্মাজী স্বরাজ আন্দোলনে ধনিক বণিকের সহায়তা লাভের ইচ্ছায় তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন। এখানেও তাঁর দৃষ্টি বর্ত্তমানের সাফল্যলাভের সীমার কাছে পরাহত হয়েছিলো। অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশে তালুকদারের ভীষণ অত্যাচারের ফলে কৃষকেরা স্থানে স্থানে কৃষাণ সভা স্থাপন করেছিলো। যখন ইকনমিক শক্তি চারিদিকে অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করে এনেছিলো, সমস্ত দেশ যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, পরিবর্ত্তনের মোহানার মুখে সেই সময় সেই মহাশক্তির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী। ইতিহাসে এত বড় দুর্ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কৃষক ও শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা যে তিনি জানতেন না তা নয়, তিনি আমাদের সকলের চেয়েও তাদের অবস্থা ঢের বেশী জানতেন, তাদের উপর যে তাঁর দরদের অভাব ছিলো তাও নয়, তাদেরই জন্যে তিনি সর্ব্বত্যাগী কৌপীনধারী। অভাব হয়েছিলো দূরদৃষ্টির। তিনি স্বরাজ সংগ্রামে ধনিক বণিকের সহানুভূতি কামনা করেছিলেন সেই জন্যেই বারদৌলিতে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সিদ্ধান্তে জমীদারদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে তাদের আইনত যে অধীকার আছে তার উপরে হস্তক্ষেপ করা হবে না। কৃষক প্রজাদের তিরস্কার করে বলা হয়েছে যে জমী দারের খাজনা বন্ধ করা কংগ্রেসের নিয়মবিরুদ্ধ, আর দেশের প্রকৃত কল্যাণের বিরোধী। কংগ্রেসের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পেলো। গণশক্তি এই হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়ে সরে দাঁড়ালো, কংগ্রেস আগেকার মত আবার শক্তিহীন হয়ে পড়লো। যাদের স্বার্থ দেশের সেই তথাকথিত শান্তি শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে, যাদের আরামের সমস্ত ব্যবস্থা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর করুণার উপর নির্ভর করে আছে, তারা পরিবর্ত্তন বিরোধী হবে না তো হবে কারা?

বিদেশী শাসনতন্ত্র তাদের অক্ষমতার খবর বেশ ভালো করেই রাখে, তাদের আরামের উত্তরোত্তর সুব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের সুবোধ করে তুলতে গভর্মেণ্টকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। একদিকে হোল মুষ্টিমেয় এইদল যাদের আরামের ব্যবস্থা বিদেশী গভর্মেণ্ট নিত্য যোগান দিচ্ছে ও দেবে, অন্যদিকে অগণিত উপবাস কাতর উৎপাদক অথচ সব-হারা কৃষক ও শ্রমিকের দল। বিদেশী শাসনতন্ত্র কখনো কোন বিজিত দেশের জন সাধারণের জীবন যাত্রা প্রণালীকে সহজ ও রম্য করে দিয়েছে, কোন দেশের কোন যুগের ইতিহাসে তার নজির নেই। ইংরেজ ভারতবর্ষের জন সাধারনের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করে দেবে এ হাস্যকর ধারণা কারও মনে থাকা উচিত নয়। কিন্তু যাঁরা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষে থাকবেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা দাবী করি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সমগ্ররূপের পরিকল্পনা। নেতাদের এই খণ্ড ধারণার ফলে বারে বারে সব আন্দোলন বিফল হয়েছে। আজ যাঁরা সত্যসত্যই দেশের কল্যান কামনা করেন তাঁদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ যে আইডিয়েলকে যেন কোন লাভের আশায় কিম্বা আশঙ্কার ভয়ে তাঁরা ক্ষুণ্ণ করে না ফেলেন। আপোসের ফলে সেই সময়ের মত বিপদকে সরিয়ে রাখতে পারা গেলেও ভবিষ্যৎএ সে যে আবার রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দেয় সে কথা ভুললে চলবে না।

মা

(ম্যাক্‌সিম্‌ গর্কী)

অনুবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দিনের পর দিন সপ্তাহেরপর সপ্তাহ কালের সূত্রে মালার মত গাঁথা হইয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক শনিবারে পাভেলের বাড়ীতে পাভেলের বন্ধুদের আড্ডা জমিত। প্রতিদিন তারা যেন তাহাদের সংস্পর্শে জীবনকে নব নব পথে উন্নত করিয়া লইয়া চলিতেছিল। এ চলার শেষ কিন্তু এখন ও তাহাদের দৃষ্টির আড়ালে রহিয়াছে।

নূতন লোকও আসিত। ছোট্ট ঘরখানি ক্রমশঃ ভরিয়া আসিল। শনিবার রাত্রে নাটাশা তেমনি শ্রান্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অন্তরের আনন্দে দুঃখ ও বেদনাকে ভাসাইয়া দিয়া উপস্থিত হইত।

মোজা তৈরী করিয়া মা নিজে নাটাশার পায়ে পরাইয়া দিয়াছিলেন। নাটাশা প্রথমে আনন্দে হাসিয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া চুপি চুপি মাকে বলে, "আমার একজন ধাই মা ছিল। সে ঠিক আপনার মত ভালবাসত। কি আশ্চর্য্য! কুলী মজুররা এত কঠোর আর অযত্ন জীবনের মধ্যে দিন কাটায় কিন্তু তবুও তাদের অন্তর ওদের চেয়ে কতদূর উদার আর সরল। মা উত্তর দিয়াছিলেন, "আচ্ছাই মেয়ে যা হক্, তুই মা, নিজের বাপ মা, সংসার ছেড়ে—"

এর বেশী কিছু মা বলিতে পারেন নাই।

নাটাশা বলিয়াছিল,

"সংসার ছেড়ে এসেছি? তাতে কি হয়েছে। ওতে কি যাচ্ছে। আমার বাবা,তিনি ত একজন পুরো মাতাল; আর আমার ভাই সেও তাই। বড় বোনটীর কথা মনে পড়লে চোখে সত্যই জল আসে—অভাগীর বিয়ে হল এক বড়লোকের সঙ্গে —বয়সে ঠাকুরদাদা,বদমায়েসের রাজা। কিন্তু প্রাণে লাগে শুধু একজনের জন্যে। সে আমার মা। তোমারই মত মা-একজন উদার সরল প্রাণী—নির্য্যাতিত ভীত মূষিকের মত শুধু তিনি আমাদের সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি বাড়ীর সকলকেই ভয় করে চলেন। মাঝে মাঝে আমার মা-জননীকে দেখতে ইচ্ছে যায়!"

বিষাদে মা বলিয়াছিলেন, "বাছা রে!"

মার বিষণ্ণ কণ্ঠ কাণে আসিতেই নাটাশা বলিয়া উঠিয়াছিল, না, না, দুঃখ কিসের! মাঝে মাঝে আমার যা আনন্দ হয়। যদি তুমি জানতে মা কি ভয়ানক আনন্দে আমরা সব মিলেছি। একদিন তুমিও এই আনন্দের স্বাদ পাবে মা!"

এই অজানা আনন্দের কথায় মার মন দুলিয়া উঠিত। পরক্ষণেই কিন্তু বলিতেন,—

"আমার কি আর বয়স আছে? আমি যে সকল কাজের বার।"

পাভেল আজকাল ঢের বেশী কথাবার্ত্তা বা আলোচনা করে। ক্রমশঃ সে আগেকার চেয়ে জোরে কথা বার্ত্তা কয়। এবং প্রতিদিনই সে যেন রোগা হইয়া চলিয়াছিল। মার মনে হইত যে যখন সে নাটাশার সঙ্গে কথা বলিত শুধু তখনই তাহার চোখ দুটী কেমন মৃদু হইয়া আসিত কথা গুলি কোমল লাগে, সমস্ত দেহ যেন আভায় সুন্দর সুষমায় ভরিয়া উঠে।

মা মনে মনে হাসিয়া বলিতেন—ভগবান্ করুন মেয়েটীকে যেন আমার বৌ করে পাই!"

মাঝে মাঝে নাটাশা ছাড়া আর একজন লোক শহর থেকে আসিত। লোকটার চোখে চসমা, দাড়ি গোঁপ বেশ চক্ চক্ করিত এবং কথাবার্ত্তাও বেশ মোলায়েম সুরে বলিত। তাহাকে দেখিয়া গ্রামের লোকেরা ভাবিত যেন সে কোন্ অসম্ভব দূর দেশের অধিবাসী। ভদ্রলোকটী রসাল ভাবে জীবনের সাধারণ সমস্ত ব্যাপারের কথা লইয়া আলোচনা করিতেন। এবং জীবনের প্রতিদিনের এই সমস্ত ঘটনায় তিনি দেখাইতেন জোয়াচুরী, অজ্ঞতা ও দাসত্ব কেমন ভাবে জড়াইয়া থাকিয়া সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত ও নির্য্যাতিত করিয়া চলিয়াছে।

মার মনে হইত যে এই লোকটী যেন এক অতি দূর দেশ হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। সে যে দেশ হইতে আসিয়াছে সেখানে জীবনে এত গোলমাল আর জ্বালা যন্ত্রনা নাই তাই এখানকার সব কিছু তাহার কাছে কেমন বেখাপ্পা লাগিতেছে। তাহার মন এই সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনাকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। তাই সে যেন আপনার মত করিয়া এখানকার এই জীবন ধারাকে বদলাইয়া লইয়া যায়।

শহর হইতে আরও অনেক লোক আসিত। তাহাদের মধ্যে শাশাঙ্কা বলিয়া একটী মেয়ে আসিত। মা প্রথমে তাহাকেই বলিতে শুনিলেন যে—আমরা সাম্যবাদীর দল।

মা জানিতেন যে এই সাম্যবাদী-দলই জারকে হত্যা করিয়াছিল। সে সব ঘটনা ঘটে মার যৌবন কালে।

মা তখন শুনিয়াছিলেন যে জার প্রজাদের স্বাধীন করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া জমিদারেরা নাকি ভয়ানক রাগিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে যতদিন পর্য্যন্ত জারকে হত্যা না করা হইবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা চুল কাটিবে না। তাহারাই ও ছিল সাম্যবাদীর দল। হঠাৎ আবার তাহার ছেলে এতদিন পরে আপনাদের সাম্যবাদী কেন বলে ভাবিয়া মা কোনই কূল পাইতেছিলেন না।

দল ভাঙ্গিয়া গেলে পর মা পাভেলকে ডাকিয়া বলিলেন 'পাভেল, তুই কি সাম্যবাদী দলের লোক?"

প্যাভেল, দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল "হাঁ, কিন্তু এপ্রশ্ন কেন?

"সত্যিই তবে? তারা যে জারের শত্রু! তারা যে একজন জারকে হত্যাও করেছিল!"

মার কথাবার্তা শুনিয়া পাভেল ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে করিতে হাসিয়া বলিল, আমরা হয়ত তা না করতে পারি।"

তাহার পর পাভেল বহুক্ষণ ধরিয়া মাকে বুঝাইতে লাগিল। কথাবার্ত্তার শেষে মা ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন যে তাহার পুত্র কখনই কোনও অন্যায় কাজ করিবে না, করিতে পারে না।

এধারে ক্রমশঃ তাহাদের দল রীতিমত বাড়িয়া চলিয়াছিল। এবং তাহারা এখন সপ্তাহে দুইবার করিয়া মিলিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে তাহারা গানটান করিত; কিন্তু আজকাল যে সমস্ত গান গাহিত মার কাছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন লাগিত। এই সমস্ত গানের সুর কেমন এক বিষাদে আচ্ছন্ন। মন্দিরে স্তোত্র পাঠের মত তাহারা ধীরে সমবেত কণ্ঠে সংযতভাবে এই সমস্ত গান গাহিত। গাহিতে গাহিতে তাহাদের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

অন্তরের আড়াল হইতে কোন্ এক নিরুদ্ধ শক্তি গানের সুরকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিত।

দলের মধ্য হইতে একজন বলিয়াছিল, "এখন আমাদের এই সমস্ত গান সকলের সামনে রাস্তায় বেরিয়ে গাওয়া উচিত।

মাঝে মাঝে আবার তাহাদের মধ্যে আনন্দের উদ্দামতা দেখিয়া মা অবাক্ হইয়া যাইতেন। মা এই উদ্দাম আনন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। অন্য দেশের শ্রমিকদের কাহিনী খবরের কাগজে পড়িয়া তাহারা উদ্দাম আনন্দে মাতিয়া উঠিত। চোখে তাহাদের উল্লাস-নাচিত, শিশুর মত আনন্দে উন্মত্তের মত তাহারা হাস্যে ও নৃত্যে ঘরখানিকে ভরিয়া তুলিত।

আপনার আনন্দে আপনি উন্মত্ত হইয়া কেহ বলিয়া উঠিত, "ফরাসী দেশের হে বন্ধুরা, সাবাস্!"

কখনও আবার কেহ চীৎকার করিয়া উঠিত—

"ইটালীর হে শ্রমিক বন্ধুরা, অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।"

ধরণীর অতি দূরতম দেশের সেই সব অজানা লোকেদের কাছে তাহাদের এই মর্ম্মবাণী যেন ভাষার আর দূরত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়া পৌছিল—যেন সেই দূর দেশবাসীরা আনন্দে এই বার্ত্তাকে অন্তরে গ্রহণ করিল—এই বিশ্বাসে তাহাদের এক অপরূপ তেজে মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

লিট্‌ল্ রুষ আনন্দ উজ্জ্বল নয়নে দাঁড়াইয়া বলিত "বন্ধু! তাদের লিখে পাঠাও, দেশে দেশান্তরে আজ যারা আমাদের মত গহন পথে চলেছে—তারা জানুক যে এই দূর রুষিয়ার অন্তরে তাদের সাথী আছে—তাদের জয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হবার বন্ধুরা আছে।"

স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহারা আনন্দে দূর জার্ম্মাণ, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইডেন, জগতের সমস্ত শ্রমিকদের কথা বলিতে লাগিল—যেন তাহারা সব তাহাদের অন্তরের অন্তরতম আত্মীয়—; যদিও তাহাদের সহিত কোনও সাক্ষাৎ মিলন নাই, তবুও আজ তাহাদের আনন্দে ইহারা আনন্দিত—তাহাদের বেদনায় ইহারা ক্ষুব্ধ।

সেই ক্ষুদ্র ঘরে শ্রমিক মানবের এক বিশ্বজনীন আত্মীয়তার প্রবাহ দুলিয়া উঠিল। এই বিশ্বজনীনতা যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠিল। এই রূপের তেজে, এর আনন্দে, এর জয় গৌরবভরা যৌবনে, এর আশায় মার মনও দুলিয়া উঠিল।

লিট্‌ল্ রুষকে ডাকিয়া মা বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য তোমরা—সবার আনন্দে তোমরা আনন্দ পাও—সবার দুঃখে তোমরা বেদনা পাও!"

লিট্‌ল্ রুষ বলিয়া উঠিল, "সবার জন্যে, মা, সবার জন্যে! এই আমাদের পৃথিবী! যে মানব রক্ত দিয়ে এই পৃথিবী গড়ে তুলেছে—এ পৃথিবী সেই শ্রমিক মানবের। আমাদের কাছে আর কোনও জাতি নেই, কোনও দেশ নেই। আমাদের কাছে আছে শুধু বন্ধু আর শত্রু। পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক আমাদের বন্ধু, আর সমস্ত বিলাসী ধনী আর রক্তচক্ষু শাসনকর্ত্তারা আমাদের শত্রু। যেদিন দেখবে আমরা কত,—আর আমাদের অন্তরে যে আগুন জ্বলে সে কত তীব্র তখন তোমার মত মা সবার অন্তরে এক মধুর অবকাশের সুর বেজে উঠবে! আমরা সবাই একই জননীর সন্তান! কে সে জননী? নিখিল-ভরা যে সমস্ত মানব আজ দেহপাত করে চলেছে—তাদের মিলন-মন্ত্রই আমাদের জননী! এই মন্ত্র প্রতিদিন তেজময় হয়ে উঠবে—এই মন্ত্র সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান্ হবে। কল্যাণের গগনে এই নব সূর্য্য! সে যেই হ'ক, সে যে দেশেই থাকুক, এই সাম্যের মন্ত্রের যে উপাসক—সে যুগ যুগ ধরে আমাদের সবার মন্ত্র-বন্ধু।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

—:•:—

১১ই চৈত্র বৃহস্পতিবার স্বরাজ্যদলের উদ্যোগে মির্জ্জাপুর পার্কে একটি কৌতুক নাট্য অভিনয় করা হয়েছে। দৈনিক কাগজের খবর থেকে যতটুকু অবগত হওয়া যায় তাতে দেখা গেলো যে চার পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়েছিলো। বিনা খরচায় এমন 'ফলষ্টাফীয়' অভিনয় দেখতে কার না ইচ্ছে করে? একজনের পর একজন অভিনেতা উঠে ভাষার শ্রাদ্ধ করে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন যে দেশের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে তাঁরা ত্রুটি করেন নি, তবে যে সফলতা লাভ করতে পারেন নি তার কারণ তাঁরা সংখ্যায় কমে গেছেন। এবারে দল ভারী করে গিয়ে গবর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে দেবেন মজাটা। সরকার যদি তাতেও ভয় পেয়ে সুরসুরিয়ে স্বরাজ্যদলের পায়ের তলায় স্বরাজ গুটিয়ে না রাখেন তাহলে ১৯২৭ সালে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে। মৌঃ শওকৎ আলী এই অসম্ভব গরমের দিনে বিকেল বেলা বক্তৃতা দিতে গিয়ে দৈববাণী করে বসেছেন। তাঁর মতে যদি আমরা এইভাবে কার্য্য করতে পারি তাহলে ১৯২৮ সালে ভারত স্বাধীন হোয়েছে নিশ্চয়ই দেখতে পাবো'। 'এই ভাবে কার্য্য করা' বলতে তিনি বোঝেন স্বরাজ্যদল এই দু তিন বৎসর যে রকম কাজের নমুনা দিয়েছেন সেই রকম ভাবের কাজ করা। আমরা দেশের জনসাধারণকে আর একবৎসর (স্বরাজ্য দলপতি সেনগুপ্ত মহাশয়ের হিসেব মত) নয়, জোর দু বৎসর (মৌলানা শওকত আলীর ভবিষ্যৎবাণীর কথামত) অপেক্ষা করতে বলি। তার মধ্যে তাঁরা স্বাধীনতালাভ করবেন সন্দেহ নেই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সুরসিক লোকটিও এঁদের রসিকতার কাছে হার মানেন।

স-ন-ঠ

—•—

আনন্দবাজারে প্রকাশ বরিশালের শরৎবাবু উপোস করে মান্দালয়ের বন্দীদের মুক্তির পথ সুগম করছেন। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর শরৎবাবুর উপবাসের খবর পেয়ে বরিশাল গিয়ে হাজির। সেখানে একটি জনসভায় তিনি শরৎবাবুর উপবাসের আধ্যাত্মিক দিক বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। শরৎবাবুও উত্তেজিত হোয়ে দু চার কথা বলে ফেলেন। তারপর কিছু অর্থ সংগ্রহের পর বন্দে মাতরম চীৎকার করে সভা ভঙ্গ হয়। শরৎ বাবু উপোস ভঙ্গ করেছেন কিনা জানি না, তবে তাঁকে আমরা খৃষ্টের সেই অমূল্য উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। খৃষ্ট বলেছেন যে উপবাসের দিন, মুখ খুব ভালো করে ধুয়ে মাথায় তেল দেবে, কেউ যেন জানতে না পারে যে তুমি উপবাস করেছো। উপবাসের দ্বারা রাজনৈতিক ফললাভ কোন রকমেই সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি না, তবে ব্যক্তিগতভাবে অন্যের দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি থেকে যে উপবাস সুরু হয় সে উপবাসও তার সমস্ত মাহাত্ম্য হারায় এই রকম সকলকে জানিয়ে করার ফলে।

স-ন-ঠ

—•—

লর্ড রেডিং দেশে ফিরে যাবার আগে গদগদ ভাষে তাঁর বিদায় বাণী দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সভায় ২৫শে মার্চ্চ তারিখে করেছেন। তাঁকে নাকি আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতের কল্যাণকামী ভৃত্যরূপে। মনে তাঁকে আমাদের রাখতেই হবে জানি—দেশের রাজা মহারাজাদের কল্যাণে তাঁর মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থানে স্থানে শোভা পাবে তাও জানি, তবে যতটুকু বাধ্য হোয়ে রাখতে হবে তার বেশী যেন তিনি আশা না করেন। অর্ডিনান্সের যিনি প্রবর্ত্তক, বাঙলার বুক থেকে শত কর্ম্মীবৃন্দকে যিনি বিচ্ছিন্ন করে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেছেন, তিনি ভারতবর্ষের সেবক নয় তো সেবক কে?

স-ন-ঠ

—•—

বাঙলা দেশের নানাস্থানে কৃষকেরা সমবেত হয়ে, জমিদারেরা তাদের উপর যে নির্য্যাতন করে এসেছে আর আজও করছে, তার প্রতীকারের চেষ্টা করছে। তারা বলছে যে, বুকের রক্ত ঢেলে দিনের পর দিন তার সম্বন্ধে সস্নেহ আশঙ্কা মনে পোষণ করে যে জমীকে তারা উর্ব্বর করে তোলে, তাতে ফসল ফলায়, সেই জমীতে তাদের উপস্বত্ব জমীদার স্বীকার না করায় যখন তখন তাদের উচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা আছে, আর জমীদারেরা প্রকৃতপক্ষে তাদের উচ্ছেদ করে থাকেও। তারা চায় এই যে বার বৎসর ধরে যে জমী তারা চাষ করে এসেছে তাতে তাদের স্বত্ব জন্মাবে, জমীদার ইচ্ছে করলেই তাদের জমী বেশী খাজনার লোভে হরণ করতে পারবে না। তারা আরো

চায় যে গাছের জমার গাছ ইচ্ছামত কাটবার অধিকার তাদের থাকবে।

বাঙলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই কৃষক আন্দোলন মাথা তুলে উঠেছে। জমীদারেরাও শঙ্কিত হোয়ে উঠেছে। ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধিত বিলের শর্ত অনুযায়ী প্রজার অধিকার অনেক বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা আছে। ময়মনসিংহকে বাঙলার জমীদারদের আড্ডা বল্লেও চলে। সেই ময়মনসিংহের নানাস্থানে জমীদারেরা সভা করে এই প্রজাস্বত্ব সংশোধক বিলের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের চীৎকারের মূল কথা এই, তাঁদের ন্যায্য অধিকারে হাত দেওয়া হচ্ছে ন্যায্য অধিকার তাঁরা কাকে বলেন জানাতে পারি কি? অনেককাল থেকে তাঁরা নিঃস্ব প্রজা শোষণ করে এসেছেন বলেই কি এটা ন্যায্য হবে না কি? লুণ্ঠন ও শোষণের শেষ একদিন হবেই হবে, এটা যেন তাঁরা সুনিশ্চিত মনে রাখেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত দেশ ভক্ত ও মানবহিতৈষী, তাঁদের আমরা আহ্বান করি অন্যায় দাবী ত্যাগ করে শতাব্দীর সঞ্চিত অন্যায়ের পাপ থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করতে।

স-ন-ঠ

—•—

এসোসিয়েটেড প্রেস খবর দিচ্ছেন যে সিংহল গভর্ণমেণ্টের শ্রমিক বিভাগের পরিচালকের সঙ্গে ভারত-গভর্ণমেণ্টের শ্রমিক বিভাগের কর্ত্তার অনেক আলোচনা হোয়ে গেছে। একটা চুক্তিও নাকি হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় শ্রমিক দের নাকি অনেক সুবিধে হবে আশা করা যাচ্ছে। যদি কোন সুবিধে হয় তাহলে মন্দের ভালো বলতে হবে। এই গভর্ণমেণ্টের হাতে আমাদের যে কোন, সত্যিকার উপকার হোতে পারে তা আমরা ভুলেও মনে করতে পারিনে।

স-ন ঠ

—•—

বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন

১৯২৫ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভাটপাড়ায় এই সমিতি স্থাপিত হয়েছে। ইহার উদ্দেশ্য :—

(১) বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত চট কল সমূহের কর্ম্মচারীদের মধ্যে সদ্ভাব এবং একতার বৃদ্ধিকরা ও তাহাদের আর্থিক এবং নৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য সর্ব্ব প্রকার আবশ্যক সাহায্য করা।

২। বর্ত্তমানে নির্দ্দিষ্ট কারখানা পরিচালনার সময় এবং কার্য্যের গুরুত্বের পরিমাণ হ্রাস করিয়া কর্ম্মীদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির অনুকূল কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা।

৩। কারখানা হইতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায় স্বরূপ "ঘুষ" প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা।

৪। ধনী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক কারখানার পণ্যোৎপাদনকারী শ্রমিকগণকে বর্ত্তমানের যদৃচ্ছাক্রমে বেতন দেওয়ার কুব্যবস্থা রদ্ করিয়া শ্রমিকগণের পক্ষে মনুষ্যোপযোগী জীবন ধারণের অনুকূল ন্যায্য এবং সঙ্গত পরিমাণ বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

৫। সমিতির কোনও সভ্য কারখানা হইতে অন্যায় ভাবে কর্ম্মচ্যুত হইলে তাঁহাকে সুবিধামত কোনও কার্য্য সংগ্রহ করিয়া দেওয়া বা জীবিকার্জ্জনের জন্য সম্ভবপর অন্য কোন উপায় করিয়া দেওয়া।

৬। কারখানায় সম্পূর্ণ এক বৎসর কার্য্য করার পর প্রত্যেক কর্ম্মচারী যাহাতে সাধারণ নিয়মানুসারে প্রত্যেক বৎসরে পূর্ণ বেতনের সহিত অনূ্যন এক মাস কাল ছুটি পাইতে পারেন তাহার উপায় করা।

৭। অসুখ বিসুখের সময় আবশ্যকীয় ছুটির জন্য যে কোন রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ দাখিল করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মচারী যাহাতে প্রথম এক মাস পূর্ণ বেতনে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাস অর্দ্ধেক বেতনে ও পরবর্ত্তীকাল বিনা বেতনে হইলেও আবশ্যকীয় ছুটি পাইতে পারেন তাহার উপায় করা।

৮। উপযুক্ত সময়ে অবসর লইয়া প্রত্যেক কর্ম্মচারী যাহাতে কোম্পানীর নিকট হইতে 'পেন্সন্' বা "ভাতা" লাভ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা।

৯। কর্ম্মচারিগণের বসবাসের জন্য কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বর্ত্তমানের সংকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর "ধাওড়া' বা "লাইন ঘর" গুলি যাহাতে যথার্থ স্বাস্থ্যকর আবাসে পরিণত হয় ও কর্ম্মচারিগণ কোনও প্রকার ভাড়া বা খাজানা না দিয়া তথায় থাকিতে পান তাহার উপায় করা।

১০। সমিতির সভ্যগণকে অথবা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণকে বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দান করিবার উদ্দেশ্যে কারখানার সন্নিকটে আবশ্যক মত "দিবা" অথবা "নৈশ" বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনও বিদ্যালয় থাকিলে তাহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করা।

১১। অত্যধিক মাত্রায় সুদখোর মহাজনদের কবল

হইতে রক্ষা করিয়া সমিতির সভ্যগণকে যাহাতে অল্পমাত্র সুদে আবশ্যকীয় অর্থ ঋণ দিতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে "কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটী" প্রতিষ্ঠা করা।

১২। উক্ত "কো অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটী" ব্যতীত সমিতির সভ্যগণ যাহাতে তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহ বাজার দর অপেক্ষা সুলভে পান সেই উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় "ষ্টোর বা সমবায় ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করা।

১৩। নারী শ্রমিকগণ যাহাতে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় সন্তান প্রসবের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্ব হইতে পরবর্ত্তী দুই মাস পর্য্যন্ত মোট চারি মাস কাল পূর্ণ বেতনের সহিত ছুটী পাইবার অধিকারী হন তাহার উপায় করা।

১৪। সমস্ত কারণে সমিতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণকে আইন আদালত সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করা।

১৫। শ্রমিকদিগের সাহায্যের জন্য কোম্পানীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় যাহাতে কারখানার কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া না হইয়া বিনামূল্যে উহা শ্রমিকসাধারণের যথার্থ ব্যবহারে ও উপকারে আইসে তাহার উপায় করা।

১৬। কারখানার মধ্যে নারী ও পুরুষ কর্ম্মচারিগণ যাহাতে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে ও পৃথকভাবে কার্য্য করিবার সুবিধা পান তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।

১৭। মিউনিসিপ্যালিটী, লোক্যাল্বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং ব্যবস্থা পরিষদে শ্রমজীবিগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

১৮। শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের লোক যাহাতে বেকার না থাকে বা পানদোষ এবং জুয়া খেলা প্রভৃতি অমিতাচারে দিন দিন তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া না পড়ে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা।

১৯। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক সমিতির সহিত সহযোগ ও সদ্ভাব স্থাপন করা এবং ভারতীয় শ্রমিক মহাসভার অনুবর্ত্তী থাকিয়া তাহার শক্তিবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক সহায়তা করা।

২০। উল্লিখিত বিষয় সমূহে সাফল্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ভাবে প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা করা।"

আমরা এ সমিতির সর্ব্বাঙ্গীন শুভ কামনা করছি। সুখের বিষয় সমিতি ইতোমধ্যে অনেক কাজ করতে সমর্থ হয়েছে।

কলিকাতায় দাঙ্গা

—:০:—

গত শুক্রবার হতে ধর্ম্ম কলিকাতা শহরে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেছে, অর্থাৎ হিন্দু আর মুসলমানে মারামারি রক্তারক্তি খুবই হচ্ছে। হ্যারিসন রোডের কোনো মস্জিদে মুসলমানেরা যখন তাদের খোদার নামে নামাজ পড়ছিল তখন আর্য্য সমাজের একদল লোক সেই পথ দিয়ে তাদের খোদার নামে বাজা ও শাঁখ বাজিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানরা আর্য্যসমাজ ওয়ালাদের বাজা ও শাঁখ বাজিয়ে যেতে বারণ করে, কেননা, তাতে তাদের উপাসনার ব্যাঘাত হয়, আর আর্য্য-সমাজভুক্ত হিন্দুরা বাজা থামাতে অস্বীকার করে, কেননা, তাতেও তাদের ধর্ম্মের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই নিয়েই নাকি সর্ব্ব প্রথমে মারামারির সূত্রপাত ঘটে। তার পরে আজ (শনিবার) পর্য্যন্তও গোলমাল চল্ছে। মুসলমান হিন্দুকে মারছে আর হিন্দু মারছে মুসলমানকে। সশস্ত্র-পুলিশ, সার্জ্জেন্ট পুলিশ এবং মোটরযান বিহারী গোরা পুলিশ অফিসার সবই ঘটনাস্থলে রয়েছে। "গ্রেগোষ্ট" নামক আর্ম্মারড্কার্ থানাও জাকারিয়া ষ্ট্রীট্ ও সেন্ট্রাল এভেনিউ নামক রাস্তায় ঘোরা-ফেরা করছে। এতে কিন্তু গোলমাল একটুকুও থামছেনা। যা কিছু ঘট্‌ছে পুলিশের চোখের সামনেই ঘট্‌ছে। দাঙ্গায় যাঁরা লিপ্ত রয়েছে, তাদের কেউই বাঙালী নয়, আরো দেখা গেলো যে হাঙ্গামাকারী হিন্দু-মুসলমান যথাসাধ্য বাঙালীদের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার করছেনা।

সকলেই বলছে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। এ ঈশ্বর যে সকলেরই সৃজন কর্ত্তা এ কথাও ধর্ম্মবিশ্বাসী মাত্রেই মেনে নিচ্ছে। আশ্চর্য্য এই যে তারা এ ঈশ্বরেরই নামে মানুষকে হত্যা করছে, ভাবছে এতেই তাদের ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ঈশ্বর যদি সত্যই থাকেন, তা-হলে কি হিন্দু, কি মুসলমান কাহারো আচরিত ধর্ম্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত ধর্ম্ম নহে।

সোমবার, ২২শে চৈত্র

আজ সকালে বিশেষ গোলমালের লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছেনা। কাল কলিকাতা সহরের বিশিষ্ট স্থান সমূহে চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে। একসঙ্গে ৫ জন লোক দাঁড়িয়ে জটলা পাকালেই পুলিশ তাদের গেরেফ্তার করবে। কাল পর্য্যন্ত সহরের অবস্থা খুবই খারাব ছিল। মারধোর-লুট-তরাজ খুবই হয়েছে। হিন্দু মুসলমানকে মেরেছে আর মুসলমান মেরেছে হিন্দুকে। যে পাড়ায় মুসলমানের জোর বেশী সে পাড়ায় হিন্দুর দোকান পাট বেশী লুট হয়েছে। আবার যে পাড়ায় হিন্দুর প্রভাব বেশী সে পাড়ায় মুসলমানের দোকান-পাট লুট হয়েছে বেশী। জাকারিয়া ষ্ট্রীট ও রাজাবাজার অঞ্চলে হিন্দুরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর জোড়াসাঁকো ও চিৎপুর অঞ্চলে মুসলমানদেরই ক্ষতি হয়েছে বেশী। এবারকার দাঙ্গার একটা বৈশিষ্ট্য এই হয়েছে যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের মন্দির ও মসজিদ আদি কোথাও ধ্বংস করেছে এবং কোথাও বা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। জাকারিয়া ষ্ট্রীটে যে মন্দিরটি ছিল সেটি মুসলমানেরা নষ্ট করে দিয়েছে। আরো অন্যান্য অনেক মন্দির তারা আক্রমণ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। হিন্দুরা কয়েকটি মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। হাওড়া পুলের নিকট বর্ত্তী জুম্মাশার দরগা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট অঞ্চলেও একটি দরগা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটি বিশেষ ভাবে অ-বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে মন্দির আক্রমন হবে এ কথা শুনে কলেজের বাঙালী ছেলেরা লাঠি—সোটা নিয়ে বের হয়েছিলেন।

তালতলা থানার সন্নিহিত স্থানগুলো মুসলমান প্রধান। এ থানার হিন্দু কনেষ্টবলরা ওখানকার একটি মুসলমান হোটেল ও তৎসংলগ্ন একটি মুসলমান মেসের বাড়ী লুট করেছে। নব-নির্ম্মিত ইস্লামীয়া কলেজের বাড়ীর সম্মুখস্থ কয়েকখানা মুসলমান কাপড়ের দোকানও লুট হয়েছে। থানায় কনেষ্টবলদের ঘরে তালাস করে লুটের মাল পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, প্রায় ১৭ জন কনেষ্টবল গত কল্য গেরেফ্তার হয়েছে। লুটের কাপড় কিছু কিছু ধুকুরিয়া বাগানের বেশ্যাদের বাড়ীতেও পাওয়া গিয়েছে।

হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় বহু মুসলমান নারী শ্রীযুত নলিনী নাথ শেঠের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেখান হতে তা দিগকে পুলিশের সাহায্য নিয়ে অন্য নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীযুত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাড়ীতেও প্রায় ৫০ জন মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল। এজন্য অ-বাঙালী হিন্দুগণ ঠাকুর বাড়ী ঘেরাও করেছিল। তারা বলছিল যে মুসলমানদের তাদের হাতে ছেড়ে না দিলে তারা ঠাকুর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে। পুলিশের নিকটে ফোন করাতে কনেষ্টবল ও গোরা পল্টন যখন আসে তখন এ সকল লোক পালিয়ে যায়। আশ্রিত মুসলমানদিগকে পুলিশের হেফাজতে লালবাজার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাকারীয়া ষ্ট্রীটেও অনেক মুসলমান মাড়োয়ারী দিগকে স্থানান্তরিত হওয়ার কাজে সাহায্য করেছে।

সোস্যালিজম্ কাহাকে বলে ?

—:০:—

(শ্রীসুরেশ বিশ্বাস সঙ্কলিত)

বর্ত্তমান জগতে সোস্যালিজম হচ্ছে মানব স্বাধীনতার আশার বাণী। (ডাঃ মরিয়ন ফিলিপস)।

• • •

মানবীয় ক্রমোন্নতির ফল হচ্ছে সোস্যালিজম; এতে নরনারী বেঁচে থাক্বার যাদুবিদ্যা আয়ত্ত ক'রে মুক্ত মানবতার সম্মিলিত পূর্ণ জীবনে প্রবেশ কর্ত্তে সক্ষম হয়েছে (পাম্ দত্ত)।

• • •

ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত সংঘবদ্ধতা যাহা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে—

১। শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত—

২। সমাজের উপকার সাধনের নিমিত্ত—

৩। কৃতকর্ম্মের যথোচিত ন্যায্য পুরস্কার প্রাপ্তির নিমিত্ত—

৪। যখন কার্য্য করা অসম্ভব তখন সমাজের নিকট হ'তে সাহায্য, উপকার এবং আশ্রয় প্রাপ্তির নিমিত্ত—

সমভাবে সুযোগ প্রদান করে তাহাই সোস্যালিজম। (মিসেস্ ডেসপার্ড)

• • •

জনসাধারণের নিমিত্ত, জনসাধারণের দ্বারা জনসাধারণের ব্যবসাবাণিজ্যের উপর আধিপত্যই সোস্যালিজম। (ইউয়ার)

• • •

বিশ্বের মানববৃন্দের যুগযুগান্তের দাবী হচ্ছে তাদের স্বভাবলব্ধ জাতীয় দ্রব্য সমূহ গ্রহণ এবং তার উপর আধিপত্য বিস্তার ;—ইহারই আধুনিক নাম সোস্যালিজম।
(গভন ডাফি, এম, পি)।

* * *

সোস্যালিজম ব্যক্তিগত এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম সোপান। (পোষ্টগেট)।

* * *

সোস্যালিজম অর্থ পৃথিবীতে সামাজিক সুবিচার।
(অজ্ঞাত)।

* * *

সাধারণের ইষ্টের জন্য সকলের সমবেত চেষ্টাই হচ্ছে সোস্যালিজম।
(অজ্ঞাত)

* * *

সাধারণের সুখ সুবিধার জন্য মিলিত অনুষ্ঠানই হচ্ছে সোস্যালিজম
(অজ্ঞাত)

* * *

পারিবারিক ভাবে ভাবিত পারিবারিক আদর্শে সংস্থাপিত শাসনতন্ত্রই সোস্যালিজম। (অজ্ঞাত)

* * *

খড়কুটো

—:০:—

পোনা সংরক্ষণ বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শাহ সৈয়দ ইমদাদুল হক মাছের পোনা সংরক্ষণের জন্যে ব্যবস্থাপক সভায় যে বিল উপস্থাপিত করেছেন তা কলকাতা মৎস্য ব্যবসায়ী সঙ্ঘের মতে দরিদ্র ধীবরদের ও জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ অপকারী। সে জন্যে তাঁরা উক্ত শাহ্ সাহেবের বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। মৎস্য জীবী-সঙ্ঘ শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত বিলের পূর্ণ সমর্থন করেছেন।

লোক্যাল বোর্ড নির্ব্বাচন

হুগলী জেলার আকনা, পোলবা, রাজহাট ও দোগাছা ইউনিয়নের পল্লী সমূহের তরফ থেকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র এম-বি লোক্যাল বোর্ডের সভ্যপদ প্রার্থী হয়েছেন। হুগলীর কংগ্রেস কমিটি ডাক্তার মিত্রকে মনোনীত করেছেন। নানারূপ লোকহিতকর কার্য্যে তিনি সর্ব্বদা অংশ নিয়ে থাকেন। তাঁকে নির্ব্বাচন করলে তিনি যে উপরি উক্ত পল্লী সমূহের জন্যে অনেক কিছু করতে পারবেন তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই।

প্রেস কর্ম্মচারী সম্মিলন

বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের ১১ই ও ১২ই তারিখে কলিকাতা টাউন হলে সমগ্র ভারতীয় প্রেস কর্ম্মচারী সম্মিলনের অধিবেশন হবে। শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ গোস্বামী সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। সমগ্র ভারতের প্রেস কর্ম্মচারিগণের সাধারণ অভাব-অভিযোগ ও তার প্রতিকারের বিষয়ে সম্মিলনে আলোচনা হবে। শ্রীযুক্ত মৃনালকান্তি বসু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। শ্রীযুত কেশরীলাল ঘোষ ও শ্রীযুত সঞ্জীব চৌধুরী হয়েছেন সংযোগী সম্পাদক।

শ্রীহট্ট বঙ্গভুক্ত

জোড়হাটের তারের খবরে জানা গিয়েছে যে ভারত সচিব শ্রীহট্টের বঙ্গ ভুক্তির প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন। এতে আসাম প্রদেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা তাই ভেবে আসামের লোকেরা কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। জোড়হাটের উকীলরা সভা করে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পাস করেছেন যে ভারত গবর্ণমেন্ট যেন আসামকে গবর্ণর শাসিত প্রদেশের মর্য্যাদা হতে বঞ্চিত না করেন

মুক্তাগাছা কৃষক ও শ্রমিক সম্মিলন

বিগত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ্চ তারিখে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থানার অধীন ঘুগা গ্রামে কৃষক ও শ্রমিক সম্মিলন বসেছিল। বহুলোক সম্মিলনে যোগদান করেছিলেন। চারিদিকে খুব একটা উৎসাহের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। শাহ্ আবদুল হামীদ সাহেব

সভাপতির আসন গ্রহন করেছিলেন। প্রস্তাবের সংশোধিত বিলটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তার পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয় —

শীঘ্রই সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক্। এতদ্দ্বারা গবর্ণমেন্টকে জানান যাচ্ছে যে জমীদারদের দ্বারা যে সকল জন সভার অধিবেশন হচ্ছে সে সমুদায়কে যেন রায়ত, কৃষক ও শ্রমিকের সাধারণ সভা বলে ভুল করা না হয়। কৃষি রয়েল কমিশনের সদস্যরা যেন মফস্বলে যাবতীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করেন কৃষক দিগকে অনুরোধ করা হয় যে প্রত্যেক নির্ব্বাচনেই তাঁরা যেন কেবলমাত্র কৃষক কিংবা কৃষকের শুভাকাঙ্ক্ষী দিগকে ভোট প্রদান করেন। প্রত্যেক জেলায়, প্রতি থানা ও ইউনিয়নে কৃষক ও শ্রমিকগণ আপনাদের সঙ্ঘ গঠন করুন। মুক্তাগাছা থানায় একটা শক্তিশালী কৃষকও শ্রমিকদল গঠিত-হোক্ এবং প্রথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করা হোক্।

রায়ত নেতাকে জখম

রঙ্গপুর, ৩০শে মার্চ্চ

বাবু ঠাকুরপ্রসাদ রায় একজন ব্যবসায়ী এবং রঙ্গপুর জেলা বোর্ডের সদস্য। গত ২০শে মার্চ্চ রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বদরগঞ্জ রেল ষ্টেশনের বাহিরে কতকগুলি লোক লাঠির দ্বারা তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করে। বাবু ঠাকুরপ্রসাদ রায়ত দলের একজন নেতা। তারযোগে এই খবর পেয়ে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে সরজমিন তদন্ত করেন। তিনি ৮ জন লোককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯ এবং ২৫ ধারা মত অভিযোগে গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা জারী করেছেন। এই লোকগুলি স্থানীয় জমিদারদের অধীনে চাকুরী করে।

স্বগৃহে অন্তরীণ

বরিশাল, ২৯শে মার্চ্চ

এই জেলার নথুল্লাবাদের শ্রীযুত হিমাংশুকুমার রায় স্বগৃহে অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি পালাজ্বরে আক্রান্ত হওয়াতে চিকিৎসার জন্যে তাঁকে জেল হাস-পাতালে আনয়ন করা হয়েছিল। গতপরশ্ব আবার তাঁকে তাঁর বাড়ীতে অন্তরীণ স্বরূপেই প্রেরণ করা হয়েছে

রাজবন্দীর আত্মহত্যা

আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দী শ্রীযুত অম্বিকাচরণ ধান কেরোসিন তেল কাপড়ে মাখিয়ে এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করে আত্মহত্যা করেছেন।

কলিকাতা ৩১, হ্যারিসন রোড হতে প্রকাশিত এবং ২৮।১ ১এ, হ্যারিসন রোড, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড প্রেসে মুদ্রিত।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস।

Reg. No. C 1389.

লাঙল

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

LANGAL

Weekly Organ of the Bengal Peasants' and Workers' Party.

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচন

জাগো জাগো বলরাম
ধরো তব মরুভাঙা হল।
বল দাও ফল দাও,
স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল।

প্রথম খণ্ড | বৃহস্পতিবার, ২রা বৈশাখ ১৩৩৩, ১৫ই এপ্রিল ১৯২৬ | ১৫শ সংখ্যা

প্রধান পরিচালক—নজরুল ইসলাম

সম্পাদক—শ্রীমণিভূষণ বিশ্বাস

নগদ মূল্য এক আনা ... ... বার্ষিক মূল্য—
বিদেশে ৬ শিলিং, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲



লাঙল

[বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দলের মুখপত্র]

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

প্রথম খণ্ড { কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২রা বৈশাখ, ১৩৩৩ } পঞ্চদশ সংখ্যা

ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র

(মুজফ্ফর আহ্মদ)

একদিন এমন ছিল যখন পৃথিবীর এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের কোনো খবরই রাখত না—রাখার কোনো উপায়ও ছিল না। আজ কাল রেলওয়ে যোগে যে রাস্তা আমরা একদিনে অনায়াসে অতিক্রম করে যাচ্ছি, এক সময়ে পায়ে সে পথ এক মাসেও চলা কঠিন হয়ে উঠত, পশুর পিঠে চেপে বেড়ালে সামান্য ক'দিন কম হয়ত লাগত। মহাসমুদ্রেরও যে কূল আছে সেটা সেকালের লোকের ধারণাতেও আসত না, অথচ আজ কাল কলের জাহাজ আমাদিগকে চোখ খুলে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সমুদ্রও অপার নয়। দিন দিন চিন্তা প্রসারতা যতই বাড়ছে মানুষের সাথে মানুষের যোগের পন্থাও ততই সংক্ষিপ্ত ও সহজ হয়ে উঠছে।

ইউরোপ হতে জাহাজে চেপে ভারতে আসতে হলে আগে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসতে হত, তার পরে সুয়েজ খাল কাটিয়ে লোহিত সাগরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের যোগ সাধন করে দেওয়াতে সে পথ আজ কত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে! কালে পারস্যের ভিতর দিয়ে ভারতের সাথে যখন ইউরোপের রেলওয়ে সংযোগ হয়ে যাবে তখন এ পথ আরো অনেক বেশী সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। ইংল্যাণ্ডের কমাণ্ডার বার্নি মহাশয় স্থির করেছেন যে মাত্র তিন দিনে তিনি আকাশযান যোগে ইংল্যাণ্ড হতে ভারতে এসে পৌঁছুবেন, শুধু শুধু নয়, ডাক ও যাত্রী নিয়ে।

আজকের দিনে কেউ যে কূপমণ্ডূক হয়ে নিজের ঘরে বসে থাকবে তার কোনো উপায় নেই। আমি যতই আট ঘাট বন্ধ করে দিয়ে নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে পড়ে থাকি না কেন, বাহিরের আলো, বাহিরের বাতাস আমার গায়ে লাগবেই।

কোনো একটা জাতি যে নিজেদের বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার নিয়ে পৃথিবীর এক কোণে পড়ে থাকবে সেদিন আর এখন নেই। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও আচারাবলম্বী লোকের সংস্রবে না এসে আজকের দিনে তারা এক পাও চলতে পারেনা। এক সময়ে এই ভারতবর্ষে হিন্দু ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস ছিল না, আর আজ ইস্লাম্ খৃষ্টীয় বৌদ্ধ, শিখ ও জোরাস্ত্রিয়ান প্রভৃতি কত ধর্ম্মমতেরই প্রচার এই দেশে হয়েছে! বাংলা দেশে ভাষা একটি— বাংলা, আর ধর্ম্ম চারটি—হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইস্লাম।

নানা দলের লোক নানা ধর্ম্মমতের অনুসরণ করে থাকে একথা যেমন সত্য, নানা ধর্ম্মমতাবলম্বী লোকেরা যে সকলেই মানুষ একথাও ঠিক তেম্নি সত্য। কোনো একটা দেশের জন সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মমতের দ্বারা নানারূপ পার্থক্য থাকলেও একটা সাধারণ ক্ষেত্রে তাদেরকে একত্র হতে হয়, না হলে তারা বাঁচতে পারে না কিছুতেই। এই যে সাধারণ মিলনের ক্ষেত্র, এ ক্ষেত্রের নাম রাষ্ট্র, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান যে যা-ই হোক্ না কেন এখানে সকলের স্বার্থ অভিন্ন। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমাদের যে মিলন হবে সেটা হবে ঠিক্ মানুষের সাথে মানুষের মিলন, হিন্দু-মুসলমান—বৌদ্ধ-খৃষ্টানের মিলন নয়। ধর্ম্মের স্বার্থ আর রাষ্ট্রের স্বার্থের সংযোগ ঘটিয়ে মিলনের বনিয়াদ গড়ে তুললে সে বনিয়াদ কিছুতেই খাড়া হয়ে থাকতে পারে না, আজ না হয় কাল সেটা ভেঙে পড়বেই পড়বে।

ধর্ম্ম আর রাষ্ট্রকে একই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা বরাবর চলে এসেছে বলে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র শক্তি আজো মূর্ত্ত হয়ে উঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র হতে

আরম্ভ করে অরবিন্দ, গান্ধী, আবুল কালাম ও মোহাম্মদ আলী প্রত্যেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই ভুল করেছেন। একটা অভিনব জাতীয় জাগরণের ভাব ভারতবাসীর প্রাণে জাগিয়ে দিয়েছেন বলে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে ভারতবর্ষ ঋণী. কিন্তু. তবুও নিতান্ত দুঃখের সহিত বলতে হবে যে তাঁর মিশন এ দেশে কৃতকার্য্য হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন, অথচ সমদৃষ্টিতে সকলকে দেখতে পারেন নি। তাঁর সাধনা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই নিয়ে যে, সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, পরন্তু, অহিন্দুর প্রতি তা হতে হিন্দুর প্রাণে একটা বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতে দেশের ও দশের কম ক্ষতি সাধন হয়নি। ফলে এই হয়েছে যে বঙ্কিমের ন্যায় এত বড় একটা শক্তিসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে এ দেশের জন সাধারণ যা পেতে পারত তাঁর একটা ভুলের জন্যে তার শতাংশের একাংশও তারা পায়নি।

অরবিন্দের শিষ্যরা লেখায় ও মুখে তাঁকে যে ভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা সমস্বার্থ ও ঐক্যের ভাব আনতে চান, কিন্তু তার জন্যে যে উপায় তিনি অবলম্বন করতে চাইছেন সেটা বড় শক্ত ব্যাপার। আধ্যাত্মিকতার দ্বারা এ দেশের সকল লোককে একসূত্রে বেঁধে তিনি তাদের মধ্যে একটা বিরাট শক্তির উদ্বোধন করতে চান, কিন্তু সত্যই কি তাতে শক্তির উদ্বোধন হবে? একথা ভাবতেও আমার প্রাণ আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে। বাস্তবিক ভারতবর্ষের সকল লোকই যদি একদিন আধ্যাত্মিক ভাবে তন্ময় হয়ে পড়ে তা হলে কি দুর্দ্দশাই তাদের হবে, আর কি অশক্তই না তারা হয়ে পড়বে! তেমন দিন যদি আসে তা হলে এই আত্মভোলা জাত কোন্ দিন হয়ত বা একেবারে লোপাট হয়ে যাবে। সমস্ত লোকই যদি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে তা হলে কোনো বন্ধনই যে থাকবেনা তাদের, আর বন্ধন না থাকলে কি ধরে লোক বেঁচে থাকবে? প্রাচীন হিন্দু মুনি-ঋষিরা এদেশে যে মায়াবাদের প্রচার করে গেছেন তাতে গোটা জাতটাই পঙ্গু হয়ে গেছে। কে জানে ক'হাজার বছর গত হয়ে গেছে, অথচ আজো কথায় কথায় লোকে মুনি-ঋষিদের দোহাই দিচ্ছে, কাল যে কত এগিয়ে গেছে সেদিকে কারো এতটুকুও লক্ষ্য নেই। সে ছিল এক যুগ যখন বাহিরের সাথে ভারতের কোনো যোগ ছিলনা, আর আজ বাহিরের সংস্রব ছেড়ে দিয়ে ভারতের এক পা চলারও কি উপায় আছে? শুধু ভারতের কেন, কোনো দেশেরই যে নেই। মুনি-ঋষিদের সময়ে ভারতে লোকের সংখ্যা ছিল কম, খাবারের ছিল প্রাচুর্য্য, তার উপরে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও অন্যান্য মহামারীর প্রকোপ এক প্রকার ছিলনা বললেও অত্যুক্তি হয়না। অনেক লোক বেকার বসে বসে কল্পনার ঘোড়া যতটা সম্ভব শূন্য মার্গে হাঁকিয়ে গেছেন, খাবারের ভাবনা তাঁদেরকে ভাবতে হয়নি। কেবল কথার জাল আকাশে বুনে গেলে অবসর সময়ে চিত্তের বিনোদন হতে পারে, আনন্দও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু এ নিয়ে বাস্তব জীবনে ঘরকন্না করা চলেনা। আত্ম-হারা ভারত একথা বুঝতে না পেরে যে জন-সাধারণের সাথে আকাশ কুসুমের যোগ সাধন করতে গিয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে। ভারতের জীবনের সকল দিক আজ যে কেবল গোলামীতে দিয়ে রেখেছে তার জন্যে ভারতের দর্শন দায়ী, তা সে দর্শন যত উঁচুদরেরই হোক না কেন। প্রকৃতি ভারত বাসীকে প্রচুর শক্তি দিয়েছিল, ইচ্ছা করলেই পৃথিবীকে তারা অনেক নূতন অবদান দিতে পারত, কিন্তু পেছনের টানে আর কত কত যুগ ধরে না পারল তারা দুনিয়াকে নূতন কিছু দিতে না পারল দুনিয়ার কাছ থেকে বিশেষ কিছু নিতে। কেউ যে পেছনের দিকে তাকাবেই না এমন কথাও বলা হচ্ছেনা, তা তাকাবে অবশ্যই, কিন্তু দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখতে হবে সম্মুখের দিকে, চলতেও হবে সম্মুখেরইদিকে তা না হলে যে মরণ। দিন কাল সময় বুঝে যারা কাজ করে, সময়ের তালে যারা সাড়া দিয়ে এগিয়ে চলে তাদেরকে কেউ ধরে রাখতে পারেনা, আর যারা পেছনের টানে পড়ে থাকে তাদেরকে বসে বসে কেবল কাঁদতেই হয়, যেমন আমাদের অবস্থা এখন হয়েছে। অরবিন্দের শিষ্যরা আমায় ক্ষমা করবেন, তাঁদের দেখানো ভোরকরে আমি যা বুঝতে পেরেছি সেও সেই পশ্চাদ্গমনের বাঁধাপথই বটে. সম্মুখে চলার জন্যে জঙ্গল আর পাহাড় কেটে নূতন রাস্তা তৈয়েরী করা ত নয়। তাঁরা অরবিন্দের বাণী বলে যা প্রচার করছেন তাতে কেউ যে কখনো সাড়া দেবেনা বা দেয়নি এমন কথা আমি বলছিনে, সাড়া অনেকে হয়তো দিয়েছে অনেকে হয়তো দেবে এর পরে, তবে একথাও আমি জোর করে বলতে পারি যে দিন দিন খাওয়া পরার সমস্যা এদেশে যেমন সঙ্গীন হয়ে উঠছে তাতে দেশের জন সাধারণ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঘেঁসবেনা আর কিছুতেই। তারা এখন পেটে চায় বস্তুর সন্ধান, যে বস্তু পেটে পড়লে পেটের জ্বালা নিবারণ হয় সেই বস্তুর। এই যে প্রশ্ন এটা শুধু যে ভারতেরই প্রশ্ন তা নয়, সমস্ত বিশ্ব আজ বিব্রত হয়ে উঠেছে এই প্রশ্ন নিয়ে।

মহাত্মা গান্ধী যে আন্দোলনের নেতৃত্বে বরিত হয়েছিলেন সেই আন্দোলনে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, এত বড় চাঞ্চল্যের লক্ষণ ভারতে বোধ হয় আর কখনো প্রকাশ পায়নি। ব্যামোর না চিনে ঔষধ প্রয়োগ করাতে আজ এতবড় অসহযোগ আন্দোলনটা ও মরে ভূত হয়ে গেছে। আজো যাঁরা বলছেন অসহযোগ আন্দোলন বেঁচে আছে তাঁদের অবস্থা হয়েছে ঠিক সেই মায়ের মত যার কোলের বাছা কোলেই মরে গেছে, অথচ এমনি স্নেহের বন্ধন আর নাড়ীর টান যে তার প্রাণ তাকে কিছুতেই সেকথা স্বীকার করতে দিতে চায়না। প্রতিবেশিনীরা যখন তাকে বলছে 'ওগো, ও হতভাগিনি, আর কেন মড়া ছেলে কোলে করে বসে আছিস, রাখ ওকে মাটিতে নামিয়ে, তখনো সে বলছে—'না গো না, বাছা আমার মরেনি, কেবল ভিমি ধরে গেছে' যদিও সে বুঝতে পেরেছে যে তার সাত রাজার ধন মাণিক আর বেঁচে নেই। গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত কাগজ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও স্বীকার করেছে যে দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেসের পরে অসহযোগ আন্দোলন আর সশরীরে বেঁচে নাই; যদিও তার আত্মা কখনো মরবে

পারে না। আমরা মানুষ, রক্ত মাংসের শরীরের মধ্যেই আমাদের গড়ন। সেই শরীর ধ্বংস হলেই আমরা মনে করি যে মানুষটিও গেল। কারণ অশরীরী আত্মার সাথে আমাদের বোঝা-পড়া করা চলে না। যাক, এখন কথা হচ্ছে যে অসহযোগ আন্দোলন মিলিয়ে গেল কিসের জন্য? একটা বিরাট স্তূপের উপরে কোনো একটা জিনিস দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাই কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেল। কেউ একথা ভেবে দেখছেন না যে ভারতবর্ষে কোন একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোক শুধু বাস করেনা, নানা ধর্মমতের লোক এদেশে রয়েছে, আবার নানা ধর্মের নানা বিধান, নানা আচার,—এদেশে ধর্মশক্তি আর রাষ্ট্রশক্তি কি করে এক হয়ে কাজ করবে? এযুগে যে ধর্মশক্তি আর রাষ্ট্রশক্তি একত্রে মিলে কাজ করলে সে আর কিছুতেই হতে পারে না। ভারতবর্ষে যে সমস্ত লোক এক ধর্মমতাবলম্বী হয়ে যাবে এ সম্ভাবনা নেই। জানিনা, শতাব্দী পরেও এমন ব্যাপার যদি সম্ভবপর হয়ে উঠবে কি না, আর যদি হয়েও উঠে তাতেই বা কি? যে দিন কাল এসে পড়েছে, কঠিন প্রশ্ন দিন দিন যেমন জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠেছে তাতে সেই শুভদিনের আশায় বসে থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার যে আমরা একদিনও ফেলে রাখতে পারিনে। ভারতবর্ষের সব লোক যদি কেবল হিন্দু, বা কেবল মুসলমানও হয়ে যায় তা হলেও রাষ্ট্রের কোন আনা সমাধান হতে পারেনা। সে অবস্থাতেও বাইরেকার রাষ্ট্রের সংযোগে এসে পড়লে, আর একটা মত আসতেই হবে, আবার একটা না একটা ধর্মসংক্রান্ত বিরোধ বেধেই উঠবে।

কোন কাজ করার আগে তার ভিতর বাহির ভাল করে তলিয়ে দেখতে হয়, তা না দেখলে কাজত হয় না, পরন্তু অকাজটা খুব বেড়ে ওঠে। দেখা করে পর্য্যবেক্ষণ না করাতে নন্-কো অপারেশন যে শুধু ফেল হয়ে গেল তা' নয়, তার উল্টো প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে হিন্দু মুসলমানে খানিকটা বিরোধও ঘনিয়ে উঠেছে, যদিও তা তেমন মারাত্মক নয়। গান্ধীজী ও তাঁর প্রধান প্রধান সহকর্মীরা যদি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সাথে ধর্ম্মের খিচুড়ি না পাকাতেন তা'হলে আজ মালিকানা রাজপুতগণের তথাকথিত শুদ্ধি ব্যাপার নিয়ে সমস্ত ভারতময় মুসলমান মহলে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হত না। মালিকানা রাজপুতেরা যদি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী আবার হিন্দু হয়ে যায় তা'হলে মুসলমান সমাজের পক্ষ হতে হিন্দুদের অভিযুক্ত করার কোনো কারণই যে থাকতে পারে না। মুসলমানেরা কেন তাদের এতকাল ভাল মুসলমান করে গড়ে তোলেনি? মালিকানা রাজপুতেরা মুসলমান কিন্তু আজ হয়নি। যে মৌলবী সাহিবেরা আজ বড় বড় পাগড়ী মাথায় বেঁধে 'ফৎওয়া' জারী করে বেড়াচ্ছেন তাঁরা এতকাল ছিলেন কোথায়? হিন্দু যদি চায় যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক্ তাতে মুসলমানের আপত্তি করার কি আছে? মুসলমানেরা কি এমনটা চায় না যে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক্? এখন হিন্দুরা যেমন মালিকানাদের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াচ্ছে, মুসলমানেরাও ঠিক্ তেমনি মুসলমান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তাদের মধ্যে প্রচার করে বেড়াতে পারে। এ'ত নিশ্চয়ই সোজা কথা। এর মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন যে প্রতিহত হচ্ছে সে কি কর্তাদের অদূরদর্শিতার ফলে নয়?

গান্ধীজী বললেন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের প্রধান কারণ হচ্ছে মুসলমানের গরু খাওয়া। অমনি হাকীম আজমল খান প্রমুখ মুসলমানগণ মুসলিম লীগে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন যে হিন্দু মুসলমান সম্মিলনের খাতিরে মুসলমানদের গরু খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। প্রস্তাবই শুধু পাস হল বটে, গরু খাওয়া মুসলমান ছেড়ে দিলে না। গরু খাওয়া তাদের কত যুগ যুগের অভ্যাস, যদি তারা সহজে ছেড়ে দিতে পারে? ঠিক [illegible] অন্যায়ের দিক থেকে এক শ্রেণীর হিন্দু গরুকে দেবতা বলে মনে করে থাকে। যেমনি মুসলমানেরাও গরু খাওয়া বৈধ বলে মনে করে থাকে, শুধু তা নয়, গরু বলিদান করা পরম পুণ্যের কাজ বলেও তাদের কাছে বিবেচিত হয়। হিন্দুরা একটা অর্থনৈতিক দাবীও এখানে তুলছে, বলছে গরু মানুষের নিত্য প্রয়োজনে লাগে, মানুষ তার দুধ খেয়ে বাঁচে, সুতরাং গো-বধ করা কিছুতেই উচিত না। মুসলমানেরা বলছে—মহিষও ঠিক মানুষের মত উপকারী আছে, তোমরা মহিষ বধ কর কেন, আর তাকে দেবতা বলেই বা মাননা কেন? এই নাম করে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে তর্কাতর্কি হয়ে বিরোধ বেড়ে উঠে রাষ্ট্রের বাহিরেকার কথা নিয়ে। একজন মনে করে গরু আমার দেবতা, আর একজন মনে করে গরু আমার খাদ্য। এমন বিরোধী প্রশ্ন নিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যোগ সাধন করতে চান তাঁরা কি বুদ্ধিমান? গরু খেলে কিছু গরুর সংখ্যা কমে যায় না। যত গরু জন্মায় সব গরু বাঁচিয়ে রাখলে মানুষ তাকে জায়গা দেবে কোথায়? ভদ্রবাবুরাও কেবলমাত্র দুধের গরুই ভার বহন করেন, অন্য অকেজো গরু টেনে বেড়াতে হয় চাষাদের। তারা যদি দু'চারটে করে না [illegible] না হলে অতগুলোকে জায়গা দেবে কোথা থেকে? এইত গেল এক কথা। তারপরে, উদ্ভিদই বল, আর প্রাণীই বল—সমস্ত জিনিসেরই একটা চাষ করার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে গরুর সংখ্যা যদি হ্রাস পেয়ে থাকে সে মানুষের খাওয়ার জন্য নহে, যথোপযুক্ত চাষের অভাবে। আর দুধের পরিমাণ যে কমে গেছে সে কেবলমাত্র গরুর সংখ্যা কমে গেছে বলে নয়, গরুর দুধ দেবার শক্তিও অনেক কমে গেছে বলে। অনুপাতে ইউরোপের শতাংশের একাংশ গরুও এদেশের লোক খায় না। অথচ দুধ আর মাখনে ইউরোপের বাজার ভেসে যাচ্ছে, আর আমরা ঔষুধের অনুপান খেতেও পাচ্ছিনে। কেন এমন হয়? আমরা যথোপযুক্ত গরুর চাষ করিনে বলে নয় কি? [illegible] এরা একটা জিনিসকে না দেখেন সত্যকার দৃষ্টি দিয়ে, আর না ভাবেন কিসে কি পরিণতি হতে পারে?

গয়া কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসে চিত্তরঞ্জন বললেন—"মুসলমান যদি গরু খাওয়া ছেড়ে দেয়, আর হিন্দু যদি মুসলমানের মসজিদের পাশ দিয়ে বাদ্য না বাজিয়ে যায় তা হলে এদের মধ্যে সংঘর্ষ আর হবে না।" মসজিদ মুসলমানের উপাসনার জায়গা, সেখানে গিয়ে তারা আল্লার

মহরমের উদ্দেশ্যে মাথা খুঁড়িয়ে দেয়। এটা তাদের পরম ধর্ম কর্ম। রাস্তায় বাদ্য বাজিয়ে হরি সঙ্কীর্ত্তন করা হিন্দুরও তেমনি ধর্ম-কর্ম। হিন্দুরা যখন মসজিদের ভিতরে বসে মুসলমানকে নামাজ পড়তে বারণ করে না, তখন মুসলমান কেন তাকে শঙ্খ কাঁসর ও বাদ্য বাজিয়ে মসজিদের বাহির দিয়ে যেতে বারণ করবে? মসজিদের পাশ দিয়ে ঘর্ ঘর্ শব্দে ট্রাম ট্রেণ চলে যায়, ঘোড়ারগাড়ী, মোটরলরী চলে যায়, সে সমস্তকে বাধা না দিয়ে হিন্দুর হরি সঙ্কীর্ত্তনকে বাধা দেওয়া কেন? ইসলাম উদারতার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এমন অন্যায় দাবীতে উদারতার কি কোনো নাম গন্ধও আছে? এই যে দাবী করা হচ্ছে তোমরা অ-মুসলমানরা আমাদের মসজিদের পাশ দিয়ে শঙ্খ কাঁসর বাজিয়ে যেওনা এটা নিতান্তই জেদের কথা, ধর্মের কথা নয়। মোহররমের সময় ধর্মের নামে যে কতকগুলি অপকর্ম্ম করা হয় সেই অপকর্মের বাদ্য কলকাতার দেখেছি মন্দির মসজিদ কোনো জায়গাতেই থামেনা। সেদিন কেন মুসলমানেরা বারণ করে না? উপাসনার ব্যাঘাত হয় কি শুধু হিন্দুর বাজানো বাদ্যে? নিতান্ত জেদের বশে গায়ের জোরে এসব করা হচ্ছে। হিন্দুরা যেমন জোর করে বলছে গরু খেওনা, তেমনি তার জওয়াবে মুসলমানরাও জোর করে বলছে তোমরা আমাদের মসজিদের পাশ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে যেওনা। আসলে গরুও হিন্দুর দেবতা নয়, আর মসজিদের পাশ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গেলে কোনো সত্যকার মুসলমানের উপাসনারও হানি হয় না। অথচ এই পোড়া দেশে এই বাজে কথা গুলিই হলো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মুখ্য প্রশ্ন! কে জানে এ এ বুদ্ধি বিকার আরো কতকাল এদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে?

("দেশেরবাণী" হতে পুনর্মুদ্রিত)

নৈহাটী গৌরীপুর জুট মিলে নৃশংস কাণ্ড

শোভাক্ষের আঘাতের চোটে শ্রমিকের প্রাণ নাশ

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সহযোগী সম্পাদক মৌলবী শামসুদ্দীন হুসেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিবরণ।

গত ৭ই এপ্রিল বুধবার বেলা আন্দাজ ৮ ঘটিকার সময় নৈহাটী গৌরীপুর জুট (পুরাণ) মিলের অনৈক তাঁতি—যোগ নারায়ণ (তাঁতি নম্বর ৩৩৭) তার মায়ের অসুখের খবর পেয়ে—উইভিং মাষ্টার মিঃ স্পেন্সের কাছে বাড়ী যাবার জন্য ছুটী চাইতে যায়। সাহেব ছুটী দিতে চায় না। যোগ নারায়ণের ছুটীর জন্য কাকুতি মিনতি আরম্ভ করে এতে সাহেব পুঙ্গবের রাগ হয় এবং সে রাগে যোগ নারায়ণের গালে এক চড় মারে। চড় খেয়ে বেচারা যোগ নারায়ণ মাটীতে পড়ে যায় আর সাহেব তাকে পদাঘাত করতে থাকে। কয়েক লাথি দিয়া সাহেব অন্যান্য তাঁতিদের কাজ দেখতে যায়—। যোগনারায়ণ লাথি খেয়ে সেখানে পড়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে—সিংহাসন পাণ্ডে বলে আর এক জন তাঁতি জল খেতে সে দিকে এলে যোগনারায়ণ তাকে ইশারা করে ডাকে এবং তাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিতে বলে। যোগনারায়ণকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে সিংহাসন আপন কাজে ফিরে যায়। তার পর বেলা ১১টার সময় ছুটী হলে যখন সব তাঁতিরা ফিরে বাসায় যায় তখন তারা দেখে যে যোগনারায়ণ মরে পড়ে আছে।

যখন যোগনারায়ণ ছুটী চাইতে যায় সে সময় গোপাল লাল নামক আর এক জন তাঁতি (নং ৩১৪) ছুটী চাইতে সাহেবের কাছে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য সাহেব তাকেও ছুটী দেয় নাই। যখন স্পেন্স সাহেব যোগ নারায়ণের গালে চড় মারে তখন সে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। যোগ নারায়ণ পড়ে গেলে যখন স্পেন্স তাকে পদাঘাত করতে থাকে তখন ভয়ে গোপাল লাল পালিয়ে যায়—শিওপূজন সিংহ, কমলা সিংহ, মুখলাল পেয়ালা, প্রয়াগ প্রভৃতি কয়েকজন তাঁতি যোগনারায়ণকে চড় ও লাথি খেতে দেখে। সাহেবের ভয়ে তারা—কাকেও কিছু বলতে পারে নাই। মৃত যোগনারায়ণের বয়স ছিল ২৫।৩০ তার বাড়ী—বালিয়া জেলা, দেশে তার বাপ মা ভাই বোন আছে—তার বিয়ে হয় নাই। ডাক্তারেরা তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলেছে—আঘাত পেয়ে তার মাথার হাড় ভেঙ্গে যায় তাতে তার মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ স্পেন্সকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা মতে চালান দেয়—সে এখন জামীনে খালাস আছে। ১০।৪।২৬।

একটা কিছু কর

—:০:—

[মিসেস্ এম, রহমান]

কথিত আছে, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জন্মদিনে জনৈক অজ্ঞাত নামা পাদরী জ্যোতির্ব্বিদ গির্জ্জায় আগুন লাগান অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছিল—"জ্যোতিষ গণনা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি, নবপ্রসূত রাজকুমার জগৎ বিখ্যাত বীর হইবেন। এই বীরকুল চূড়ামণির নামের সহিত স্মরণীয় হইবার আশায় গির্জ্জা ধ্বংস করিয়াছি।

উক্ত ঘটনার পর বহু শতাব্দী অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে কিন্তু মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাই আজ বাঙালী রহীম সাহেব বাঙলা ভাষার মূলোচ্ছেদ বা মাতৃহত্যা কর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশ সমূহে যাহা সম্ভবপর হয় নাই, হইবার নহে, বাঙলায় তাহার সূচনা তাঁহার অভিশাপে।

শিক্ষার যূপকাষ্ঠে বাঙালী না হয় মাতৃভাষা বলি দেবে কিন্তু মা বোনরা কোন ভাষায় পুত্র ভ্রাতাদের সহিত বাক্যালাপ করিবে, উর্দ্দু ফার্সীতে? তাহা হইলে পুরুষদের ভাষা পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভে নারীদের জন্য প্রতি গ্রামে উচ্চ স্কুলের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যকীয়, অন্ততঃ কুমারীদিগকে ইরাণী, ইস্পাহানী গড়িয়া তুলিবার জন্য।

কোন মহিলা মজলিসে খদ্দরধারিণী মোসলেম মহিলাগণকে লেডী রহীম ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন যথা, "স্বরাজ স্বরাজ করকে শির পটকতা হায়, ইসলামকে ওয়াস্তে ক্যা কিয়া?" অতএব আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস "ইসলামকে ওয়াস্তে" রহীম সাহেব সরকারের একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বরী হইতে কাঠমোল্লায় প্রমোশন লইয়াছেন।

অদূরদর্শী গোঁড়া মৌলবীরা "ইংরাজী পড়া হারাম" ফতওয়া (বিধান) দিয়া, ভারতীয় মুসলমানদিগকে উন্নতির পথে পাঁচ শত বৎসর পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। ইহা উত্তমরূপে জানা সত্ত্বেও রহীম সাহেব তাহাদিগকে সহস্র বৎসর পিছু হটাইয়া দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। হাতে কাজ বা কর্ম্মশক্তি থাকিলে পূর্ব্বোক্ত পাদরী পুঙ্গবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন না।

রহীম সাহেব জ্ঞানতঃ জাতির কল্যাণার্থ এমন কোন কাজ করেন নাই যাহা, "ইসলামকে ওয়াস্তে" বলিয়া বৃদ্ধ বয়সে শান্তি পাইতে পারেন। এমন কি উলামা কনফারেন্সে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াও জাতীয় পরিচ্ছেদে সজ্জিত বা আলেমগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। অথচ একটা কিছু না করিলেও দশে নামোচ্চারণ করে না। বাঙলা অভিশপ্ত, বাঙালী অধঃপতিত সুতরাং বাঙলা ভাষায়ই শনির দৃষ্টি পড়িল॥

ধর্ম্ম রক্ষায় হিন্দু-মুসলমান

—:০:—

(শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কলকাতার বুকে গতপূর্ব্ব শুক্রবার বেলা তিনটের সময় ধর্ম্ম তার সমস্ত কপট আবরণ সরিয়ে ফেলে যে মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেয়েছে তার বীভৎসতা মনকে পীড়া দেয়। সব দেশেই ধর্ম্ম যান্ত্রিক প্রাণহীন আচারের পুজোর নামান্তর হোয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষে যে দুটি প্রধান ধর্ম্মমত প্রচলিত তাদের মত এমন আচার-বদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবীতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বৈর্য্য-বীর্য্য-করুণা বিবর্জ্জিত এই ধর্ম্মমত দুটি একদিকে ফোঁটা কেটে ঘণ্টা নেড়ে অন্যদিকে দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ে নৈতিক জীবনের সমস্ত দায় থেকে মুক্তি লাভ করবার অতি সহজ উপায় নির্দ্ধারিত করে রেখেছে। মসজিদে যারা ভগবানের উপাসনায় রত ছিলো তাদের এইটুকু সংযম সাধনা ছিলো না যে বাদ্যধ্বনি সহ্য করতে পারে। তাই ভগবানের আরাধনা শেষ করে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে তাদের এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় নি। মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই ধর্ম্মসাধনা ভগবানকে পুজো করার নামে মানুষকে ঘৃণা করে এসেছে। হিন্দু তার নিজের শ্রেণীর মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে যন্ত্রবদ্ধ করেছে। তারফলে কোন একটি বিশেষদল সমাজের সমস্ত সুবিধে নির্ব্বাচারে ভোগদখল করে এসেছে বিশাল একটি জনসঙ্ঘকে যুগযুগান্তর ধরে নিপীড়িত করে। হিন্দুদের এই জাতিভেদ প্রথা, বর্ণগতস্বার্থ তাদের প্রত্যেক বর্ণকে প্রত্যেক বর্ণ থেকে এতদূর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে যে এই বর্ণ কয়টিকে এক একটি স্বতন্ত্রজাতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মের নামে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর বর্ণগুলির উপর যে অত্যাচার করে এসেছে, আর আজও দক্ষিণে করছে, তার নৃশংসতা সকলের জানা আছে। পা দিয়ে ইট তৈরী করে মানুষ যে মন্দির আর মসজিদ বানালো তার মধ্যে সে ভগবানকে বন্দী করে ফেলেছে ভেবে আরাম বোধ করেছে। ভেবেছে যে এই চতুঃষ্কোন আয়তনের মধ্যেই ভগবান বিশেষভাবে বদ্ধ হোয়েছেন তাদের বিশিষ্ট দলের সুবিধার জন্যে। এই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অন্ধতার মধ্যে আমাদের দেশের দুটি বিরাট সম্প্রদায় বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে। এই অন্ধতাকে যারা সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্ফুলিঙ্গে প্রজ্জ্বলিত করে দিচ্ছে তাদিগকে দেশের শত্রু বললে সব বলা হয় না, তারা সর্ব্বকালের মানুষের শত্রু। তারা মানুষকে দলের মানুষ, বিশিষ্ট পরিবারের মানুষ, কোন বিশিষ্ট দেশের মানুষ হিসেবে দেখে। সত্য তাদের কাছে নয় তাদের ব্যক্তিগত, নয় পারিবারিক, নয় সাম্প্রদায়িক লাভ লোকসানের হিসেব, তার বেশী আর কিছুই নয়। এই তকৃমা আর উর্দ্দিপরা ধর্ম্মগুলোর অত্যাচারে মানুষ যে কত শত যুগ ধরে মনুষ্যত্বকে অবমানিত করে আসছে তা বলা যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেক ছত্রে তার হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের মুখে হিন্দু নৃপতিদের হাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিগ্রহ; আবার বৌদ্ধ নৃপতির হাতে হিন্দু মতাবলম্বীদের শাস্তি, এই রকম বারে বারে সাময়িক ভাবে রাজশক্তির কৃপালাভে সমর্থ এক ধর্ম্মের পাণ্ডাদের হাতে অন্য ধর্ম্মের লাঞ্ছনা ঘটেছে। অন্য দেশে যে এই ধর্ম্ম মতের বিরোধের দৃষ্টান্ত নেই তাও নয়। এই নিয়ে ইউরোপে ও ইংলণ্ডে অনেক বৎসর ধরে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপের একটি সুবিধে ছিলো যে তাদের বিরোধ এক মূল ধর্ম্মের দুটি শাখা ধর্ম্মের মধ্যে আর ভারতবর্ষে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির দুটি ধর্ম্ম মতের মধ্যে। কিন্তু সব স্বীকার করেও তো এটা মানতেই হবে

যে সব মতামতের চেয়েও নিছক মানুষ অনেক বড়, মত তারই সৃষ্টি, মানুষ মতের সৃষ্টি নয়! তবে কেন এত বিরোধ? কেন দেখি শুধু নানা রঙের মতবাদের আবরণে পরস্পরকে আবৃত করে মানুষ নিজেকে নিজে মেরে চলেছে। সেদিন শনিবারে এই হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ্ব যখন ক্রমশঃই ভীষণ রূপ ধারণ করছিলো তখন আমরা লাঙল আফিসে বসেছিলুম। পথে গোলমাল শুনে বের হয়ে দেখি যে একদল কলেজের ছাত্র লাঠি হাতে দলবদ্ধ ভাবে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের দিকে চলেছেন। 'কালী মাই কি জয়' চীৎকারে তাঁরা সমস্ত পথ মুখরিত করে চলছিলেন। আমরা তাঁদের অনুরোধ করেছিলুম যে হিন্দুমুসলমানের বিরোধের অবসানের ইচ্ছা যদি তাঁরা মনে পোষণ করেন তা হলে এই চীৎকারের দ্বারা বিরোধকে আরো ঘনীভূত করা ছাড়া অন্য কোন ফল হবে না। ভারতের প্রকৃত কল্যাণ কখনো কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বনে তাঁরা সাধিত করতে পারবেন না। কিন্তু সেদিন আমাদের কথা উপেক্ষিত হয়েছিলো সাম্প্রদায়িক সুরাপানে মত্ত তরুণ বাহিনীর কাছে। একমাত্র যাঁদের দ্বারা এই বিরোধের অবসান করা সম্ভব তাঁরা ভবিষ্যৎ ভারতের সমগ্র মূর্ত্তির ধ্যানে অসমর্থ হয়ে বর্ত্তমানের শত প্রকারে খণ্ডিত ভারতের অসত্য কুৎসিত বিভীষিকার কাছে মাথা অবনত করলেন এর চেয়ে দুঃখের আর কি হোতে পারে? উভয় পক্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অসংযমের ফলে এই বিরোধের আয়ুবৃদ্ধি হোয়েছে। শিক্ষিত ছাত্র নিরীহ পথিককে মোটর হইতে বলপূর্ব্বক নামাইয়া নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে। নিজের মনের মধ্যে এক অলীক শত্রুর ছায়ামূর্ত্তি কল্পনা করে এঁরা উত্তরোত্তর রেগে উঠ্ছেন। তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে শান্ত মনে দেশের এই দুর্দ্দিনে অসাম্প্রদায়িকভাবে এই সমস্যার সমাধানে তৎপর হউন। যে ভারতবর্ষীয় লোকের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরাতে' কল্পনা করেছেন সেই বর্ণ-সংস্কারমুক্ত, সাম্প্রদায়িক-সংস্কারমুক্ত, ধর্ম্মান্তের অবিনীত ঔদ্ধত্যমুক্ত বিরাট মনুষ্যত্বের সূচনার জন্যে তাঁদের প্রস্তুত হতেই হবে।

বিবাদ

(মুজফ্ফর আহ্মদ)

মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা আর বিদ্বেষ যতটা ঘৃণিতরূপে প্রকাশ পেতে পারে, মানুষের প্রতি কোনো হিংস্র জন্তুর হিংসা ততটা বিশ্রী ভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব পর নয়। এ কয়দিন কলিকাতায় হিন্দু আর মুসলমানের বিবাদ যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে উঠেছে তা-থেকে আমরা একথাটির সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি। হ্যারিসন রোডের এক মসজিদে মুসলমানরা নামাজ পড়তে যখন সমবেত হয়েছিল তখন সেই পথ দিয়ে বাজনা আর শাঁখ বাজিয়ে যাচ্ছিল আর্য্য-সমাজ ভুক্ত হিন্দুরা। মুসলমান বল্লে, আমি এখানে আল্লার উপাসনা করতে এসেছি, তুমি তোমার বাদ্যধ্বনির দ্বারা আমার উপাসনার ব্যাঘাত করো না। আর্য্য-সমাজী হিন্দু বল্লে, আমি বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছি আমার ভগবানের সন্তুষ্টির জন্যে, তুমি আমায় কিছুতেই বাধা দিতে পার না, বিশেষতঃ, আমি যখন তোমার মসজিদের হাতার ভিতরে ঢুকিনি। মুসলমান বল্লে মসজিদের হাতায় ঢোকো আর না ঢোকো, বাজনা তোমায় বাজাতে দেবনা। হিন্দু বল্লে, আমি বাজাবই। এই ভাবে ঝগড়া শুরু হলো। দু-পক্ষেরই মুখে ধর্ম্মের অবমাননার কথা।

সাধারণতঃ কলিকাতার গির্জ্জা, গোরস্থান ও মসজিদের পাশ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাবার নিয়ম নেই। কিন্তু, যে নিয়ম কোনো যুক্তি তর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় সে নিয়ম মানুষ চিরকাল কি মেনে চলতে পারে? একটা জেদ ও আবদারের সম্মান বরাবর রক্ষা হবে এমন আশা করা কিছুতেই উচিত নয়। কোনো জিনিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা-না-করা মানুষের হৃদয়ের ভক্তির উপরে নির্ভর করে থাকে। জোর করে কাহারো নিকট হতে সম্মান আদায় করা যায় না, আর করলে তাহার ফল একদিন না একদিন বিষময় হবেই হবে।

মসজিদের পাশ দিয়ে হিন্দুরা বাজনা বাজিয়ে যাবেনা কেন? তোমরা মুসলমানরা মসজিদে সমবেত হয়ে নামাজ পড়াটাকে যেমন ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলে মনে কর হিন্দুরাও ঠিক তেমনি মনে করে রাস্তায় তাদের সংকীর্ত্তন করাটাকে। আর্য্য সমাজভুক্ত হিন্দুরা সেদিন যে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল সেটাও তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মই ছিল। মুসলমানের মসজিদের পাশ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে গেলে তাদের উপাসনার ব্যাঘাত হয়, এটা একেবারেই জেদের কথা। ট্রাম মোটর ও অন্যান্য যান-বাহনের বিশ্রী ঘর্ ঘর্ শব্দে যদি নামাজের ক্ষতি না হয় তা হলে বাদ্যের মধুর ধ্বনিতেই শুধু কি যত সর্ব্বনাশ হয়ে যায়? এমন উৎকট উপাসনার বিধান মুসলমানের কোনো শাস্ত্রে নেই। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা শুনে ঠাট্টা করবে কিংবা অসুবিধে বোধ করবে, এজন্যে দিনের বেলাতে আওয়াজ করে নমাজ পড়ার হুকুম পর্য্যন্ত নেই। এ অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের রাস্তায় বাজনা বাজিয়ে যেতে হিন্দুকে নিষেধ করার কোনো অধিকার মুসলমানের নেই। মোহর্রমের সময় মুসলমানরাও বাজনা বাজিয়ে যায়। সে সময় তারা কোথাও বাজনা থামানো উচিত মনে করেনা। সেদিন তাদের আপনাদের বেলাতে কোনো আপত্তি ওঠেনা কেন?

এইরূপ অন্যায় আব্দারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেশময় বিস্তৃত হয়ে আমাদের জাতীয় মুক্তির পথকে দিনের পর দিন দুর্গম করে তুলছে। হিন্দুর দিক থেকেও এ শ্রেণীর জেদ কম দেখানো হয় না। গরু মুসলমানের চিরকেলে খাদ্য। এই পশুটি হিন্দুর নাকি দেবতা, আশ্চর্য্য এইযে সুশিক্ষিত হিন্দুও মুখে এমন অদ্ভুত কথা স্বীকার করছেন, মনে মানুন আর না মানুন। অনেকে আবার একটুকু ঘুরিয়ে বলছেন যে গরুর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, অথচ গরু একটা প্রয়োজনীয় গৃহ পালিত পশু, কাজেই গরু

খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গেছে বলে রুটি খাওয়া কমিয়ে দেওয়ার বা বন্ধ করে দেওয়ার উপদেশ যা এও হচ্ছে ঠিক তাই। যাক, একটা পশু কিছু মানুষের দেবতা হতে পারেনা, আর যদি হয়, তা-হলে বুঝতে হবে যে মানুষ এখনো আদিম অসভ্যতার যুগ পেরিয়ে আসতে পারেনি।

এই প্রকারের জিনিসগুলো নিয়ে, যার মূলে কোনো সত্য নিহিত নেই, আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত হয়ে থাকে। এবারেও তাই হয়েছে। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর রক্তারক্তির মূলে একটা ইকনমিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে এবং খুব প্রবল ভাবেই রয়েছে। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারের আবরণের ভিতরে এই কারণটাই বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটিকে ব্যাপক করে তুলেছে। লুটের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা যদি এর পেছনে না থাকত তা-হলে কখনো ব্যাপার এত গুরুতর হতনা। সমাজে ইকনমিক সমস্যা দিনকে দিন যত জটিলতর হচ্ছে, এই লুট-পাটের কারণও ততই আপনা হতে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হচ্ছে। সমাজের আমূল সংশোধন না হলে এই লুটপাটের মূল সমাজ হতে কিছুতেই উৎপাটিত হবেনা। সমাজের নিম্নস্তরে খাওয়া-পরার অবস্থা যতই দিনকে দিন শোচনীয় হবে ততই লুটপাট করা বাড়তে থাকবে। সমাজের বৃহত্তর শক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক শক্তি, এ শক্তিকে আহত করার শক্তি কাহারো নেই। ঐ অর্থ-নৈতিক শক্তি চিরকাল সমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোকে ভেঙে এসেছে, আজো ভাঙছে এবং ভবিষ্যতেও ভাঙতে থাকবে যতদিন না সমাজে একটা সাম্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

সমাজের উচ্চস্তর নিম্নস্তরকে বরাবর লুণ্ঠন করে আসছে। আজকের দিনে কলিকাতা সহরে হিন্দু-মুসলিম বিবাদের সূত্র ধরে যে লুণ্ঠন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে ইহা সে লুণ্ঠনেরই প্রতিক্রিয়া। এতে ক্ষোভের একমাত্র মর্ম্মান্তিক কারণ এই হচ্ছে যে ব্যাপারটা একটা ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক রঙে রঞ্জিত হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এ লুটতরাজকে বন্ধ করে দেওয়ার শক্তি আমাদের শিক্ষিত সমাজের নেই, কিন্তু, এর সত্যিকার স্বরূপ সকলের চোখের সামনে উদ্ঘাটন করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের হাতে ছিল। সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার তাঁরা করেন নি, না করে কর্ত্তব্য-হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রকারের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটপাট আরো বহুবার বহু জায়গায় হয়েছে, কিন্তু, মন্দির ও মসজিদ আক্রান্ত পর্য্যন্ত কখনো পৌঁছয়নি। এবারে যে তা হলো তার জন্যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় দায়ী, বিশেষ করে খবরের কাগজওয়ালারা। যত প্রকারের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উপাদান এঁরাই সংগ্রহ করে থাকেন। একটা সত্যদৃষ্টি, একটা অনুসন্ধানের ইচ্ছা আমাদের দেশের কাগজ ওয়ালাদের একেবারেই নেই। প্রত্যেক ঘটনার উপরে একটা সাম্প্রদায়িক রঙ ফলানোর ইচ্ছে এদের এত বেশী যে তাতেই দেশের সমূহ সর্ব্বনাশ হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনোরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলেই মুসলমান খবরের কাগজ ওয়ালা বলেন, সমস্ত দোষ হিন্দুর, হিন্দু কাগজ ওয়ালা বলেন সমস্ত দোষ মুসলমানের। এই করে এই শ্রেণীর ব্যাপারের সত্যিকারের চেহেরা তাঁরা কিছুতেই দেশের জনসাধারণকে দেখতে দেননা। অনেক লোকের মুখে অনেক বড় বড় কথা শুনতে পাওয়া যায়, তাঁরা কথায় সত্য আর মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কিছুই মানেন না। কিন্তু, বর্ত্তমান ঘটনার ন্যায় ব্যাপার উপলক্ষে তাঁদের মনের সঙ্কীর্ণতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। সে দিন একজন মুসলমান বন্ধু এসে চুপি চুপি আমায় বল্লেন—তুমি হিন্দুর সাথে মেলামেশা খুবই করছ বটে, কিন্তু, হিন্দুর সাথে মুসলমানের মিলন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। জিজ্ঞাসা করলুম কেন? বললেন, ছুম্মাশার দরগা হিন্দুদের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার পরেও কি তাদের সাথে মিলন হওয়া সম্ভব? আমি, বললুম, তোমার মুসলমানরা তার আগেকার দিনে হিন্দুর শিবমন্দির ভাঙতে গেল কেন? তার প্রতিক্রিয়াতে যদি তোমার দরগা ভাঙতে গেয়ে থাকে তাতে এমন কি অন্যায় করা হয়েছে? এর উত্তরে বন্ধু বললেন, মন্দির ভাঙার পূর্ব্বে হিন্দুরা মুসলমানদের কোন এক মসজিদে ঢুকেছিল, তারি জন্যেই মন্দির ভাঙা হলো। আমার একজন হিন্দু বন্ধুকে এতকাল খুবই উদার বলে জানতুম। তিনি পড়াশুনা অনেক করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও মতের তিনি খুব ভক্ত। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় সমূহবাদী (Socialist) না হলেও সেই দিকে তাঁর মনের প্রবণতা খুবই বেশী। সেই বন্ধু সেদিন বল্লেন, মুসলমানরা মার খাচ্ছে খুবই ভাল হচ্ছে! মুসলমানকে মেরে, শক্তির পরিচয় দিয়ে তিনি তাদের বশ্যতা স্বীকার করাবেন, অন্য কোনোরূপে ঘটনাকে পরিচালিত করতে তিনি একেবারেই রাজী নন। ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও বিদ্বেষ সমাজে তাঁর মতে বর্ত্তমান আছে ও থাকবে। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু যুবকেরা লাঠি হাতে মন্দির রক্ষা করতে যেয়ে রাস্তার নির্দ্দোষ মুসলমানকে গাড়ী হতে টেনে নিয়ে যে অপমান করেছে তাতে তিনি এতটুকুও ক্ষুব্ধ হননি। আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলুম শিক্ষিত মুসলমান যুবকেরাও যদি রাস্তায় হিন্দুকে অপমান করতে থাকে তা হলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াবে তা তিনি একবারও ভেবে দেখেছেন কিনা। একথার কোনো জওয়াব বন্ধু দেননি। এরূপ মনোভাবের লোক হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই বর্ত্তমান আছে। স্যার আবদুর রহীমের ন্যায় লোক, যাঁরা প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের সৃষ্টি করতে চান, সমাজের ততটা অনিষ্ট সাধন করতে পারেনা, যতটা পারে উপরি উক্ত শ্রেণীর লোকেরা। এই শ্রেণীর লোকের প্রভাবের দ্বারা আমাদের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় যেন কোনো প্রকারে প্রভাবান্বিত না হতে পারে সে চেষ্টা করা সকলেরই একান্ত উচিত।

এমন এক সময় ছিল যখন এই ভারতবর্ষে হিন্দু ছাড়া অন্য কোনো জাতি ছিল না। এখন এদেশে নানা ধর্ম্মাবলম্বীর সমাবেশ হয়েছে। হিন্দু আর মুসলমান এদেশের সর্ব্ব প্রধান দুটি সম্প্রদায়। ভবিষ্যতের কোনো এক দিন যে কেবল মাত্র হিন্দু কিংবা কেবল মাত্র মুসলমান এদেশের অধিবাসী হবে সে ভরসা একেবারেই নেই। এযুগে নিজের ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ হয়ে থাকার উপায়ও নেই। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলের সংস্রবে সকলকে আসতেই হবে। ঐ

অবস্থায়ও যে দেশে ধর্মের নামে বিরোধ বিসম্বাদ ঘটে তার চেয়ে ঘৃণিত ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই জিনিসটিকে ভাল করে তলিয়ে বুঝতে চায় না। যদি বোঝবার চেষ্টা তারা করত তা হলে মানুষের হাতে গড়া ইট কাঠের মন্দির আর মসজিদের জন্যে মানুষের রক্তে কলিকাতার রাজ পথ রঞ্জিত হত না। মানুষ বড় না ধর্ম বড়, এ কথাটা মানুষ কিছুতেই বুঝতে চায় না। তাই যদি বুঝত, তা-হলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে এই দেশ জ্বলে পুড়ে ছাই হত না। যেহেতু আমি মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি সেই হেতু আমি হিন্দুকে ঘৃণা করব, আর শুধু এই কারণেই হিন্দু ঘৃণা করবে আমাকে—এই যদি ধর্ম হয় তা-হলে সেই ধর্ম কি কখনো মহাধর্ম হতে পারে? বড় দুঃখের বিষয় যে, ধর্ম আজকের দিনে পৃথিবীতে ঠিক এই রূপেই দাঁড়িয়েছে। ঘৃণার নাম, বিদ্বেষের নাম হচ্ছে ধর্ম, সেই ধর্মই নাকি আবার আমাদের মানতে হবে, এমনি শোচনীয় দুর্গতি হয়েছে আমাদের দেশের!

স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা আর নরকের ভীতি মানুষের মনের ভিতর জাগিয়ে দিয়ে স্বার্থপর মানুষ বিশ্বমানবের কি সর্বনাশই না সাধন করেছে! ধর্মের নেশা পান করিয়ে যত সহজে জন-সাধারণকে শোষণ করা যায় এমন আর কিছুতেই পারা যায় না। ধনিকরাও জন-সাধারণকে শোষণ করছে বটে, কিন্তু তার জন্যে তাদেরকে অনেক ভাবতে হয়, অনেক মাথা খাটাতে হয়। আর ধর্মের নামে যারা শোষণ করে তাদেরকে অত শত ভাবতে হয় না। কোনো যুগে কতকগুলি লোক এই ধর্ম নামক অহিফেনের সৃষ্টি করে গেছে যার দৌলতে আজ হাজার হাজার লোক দুধ মজা উড়োচ্ছে, এতটুকুও তাদের খাটতে হচ্ছেনা। সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ এদেরই সৃষ্টি। এত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে জগৎ যাচ্ছে, কত নব নব সত্যের আস্বাদ মানুষ পাচ্ছে, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে সত্য জিনিসটে আমাদের দেশের মানুষ কি কখনো উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেনা? চিরকালই কি আঁধারে হাত পা ছুঁড়ে মরবে?

আমাদের দেশের লোক কত লেখাপড়া শিখছে, কত বড় বড় কথা আওড়াচ্ছে, কিন্তু যখনি ধর্মাচরণের কথা ওঠে তখনি তার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে। যত অযৌক্তিক, যত অবৈজ্ঞানিক সে জিনিসটে হোক্‌না কেন, সেখানে সে একটি কথাও বলতে রাজি হয় না, অন্ধের মত সবগুই নির্বিবাদে মেনে নেয়। জগতের ইতিহাসে এমন দুর্দশা আর কোনো দেশে হয়েছে কিনা জানিনে। নিজের হাতে মন্দির তৈরি করে, নিজের হাতে গড়া পাথরের মূর্তি তাতে প্রতিষ্ঠিত করে অন্ধ মানুষ বলছে আমি ভগবানের প্রতিষ্ঠা করলেম, নিজের হাতে মসজিদ-বাড়ী তৈয়েরী করে মানুষ বলছে আমি খোদার ঘর বাঁধলুম। তারপরে, এই মন্দির আর মসজিদের একখানা ইট, কাঠ এমন কি একখানা বাঁশের বাকির জন্যে সহস্র মানবের জীবন-বলিদান মানুষ অনায়াসে দিচ্ছে। এই খোদার ঘর গুলোকে খোদার সৃষ্ট সকল মানুষের স্পর্শ করবার অধিকার পর্যন্ত নেই।

সেদিন একখানা দৈনিক কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছেপেছিল যে খাকড়েরা মুসলমানের আক্রমণ হতে এক-খানা মন্দির রক্ষা করেছিল। বড় অক্ষরের শিরোনাম পড়তে আমার লজ্জা বোধ হয়েছিল, কিন্তু, সেই কাগজের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সম্পাদক সেই শিরোনাম দিতে এতটুকুও লজ্জা বোধ করেননি। যে খাকড় মন্দির রক্ষা করেছে সেই খাকড়ের স্পর্শত দূরের কথা, ছায়া মাড়ালেও মন্দির অপবিত্র হয়ে যায়! আর কতকাল ধর্মের নামে এমন ঘৃণার অভিনয় চলবে, কে জানে?

হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাংলার বাহিরে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার ভিতরে যদি কখনো হত তাহাও অবাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এবারেও অবাঙালীর ভিতরেই ঝগড়া প্রথমে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাগজগুলো যে ভাবে জিনিসটিকে নিয়েছে তাতে এ সংক্রামক ব্যাধিতে বাংলা দেশও অচিরে আক্রান্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, কতকটা আক্রান্ত এখনি হয়ে গেছে। এমন সাংঘাতিক ব্যাপার যখন ঘটছে তখন কাগজওয়ালাদের উচিত ছিল খুব অবহিত হয়ে যথার্থ বিবরণ প্রকাশ করা। লোক-মুখে শুনে, কোনো প্রকারের অনুসন্ধান না করে তাঁরা যা-তা ছেপেছেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, বাংলা দৈনিকের দেওয়া অনেক সংবাদই মিথ্যা। অনেক সংবাদ এমন আছে যা দিলে ভাল হত, কিন্তু, কাগজ ওয়ালারা তা দেন নি। জানিনে, প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে আমাদের কাগজ ওয়ালারা কি লাভ করছেন? বাইরের দিক থেকে তাঁদের কাগজ বেশী বিক্রী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিনে। একটা জাতির, একটা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা এমন ছিনি মিনি খেলছেন তাঁদেরকে কি বলা যায়?

আমরা বাঙালীরা বিদ্যার অহংকার অনেক করে থাকি, কিন্তু মন যদি আমরা বড় করতে না পারলুম তা হলে আমাদের অমন বিদ্যার কোনো সার্থকতা থাকে কি? নানা প্রকারের সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী আমাদিগকে এড়াতেই হবে। সকল সম্প্রদায়ের যুবকদের নিকটে আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন সামান্য ব্যাপারে বিচলিত না হয়ে পড়েন। সঙ্কীর্ণতার ভিতর দিয়ে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁদের মনে রাখা উচিত মন্দির আর মসজিদ মানুষের চেয়ে কিছুতেই বড় নয়।

আজকের দিনে যে সব সাম্প্রদায়িক অনর্থপাত ঘটছে, সে সব কখনো ঘটতনা যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় বাজে কথা গুলো'র উপরে বিশেষ জোর না দিতেন। দেশের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলো ধর্মের বাজে জিনিস গুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যত অনর্থের সৃষ্টি করেছে। যে সব জিনিসের কিছু মাত্র মূল্য নেই, যেমন গো হত্যা ও মসজিদের পাশে বাদ্য বাজানো, সে গুলোকে নানা দিক থেকে নানা ভাবে চোখের সামনে ধরে দিয়ে দেশের যে ক্ষতি করা হয়েছে তার জন্যে আমাদিগকে বহুকাল ভুগতে হবে। তার ওপরে, গত ক'বছরে খিলাফৎ কমিটি, জমিয়তে উলামা, হিন্দু সংগঠন, তনজীম, তবলীগ ও শুদ্ধি প্রভৃতি আন্দোলন সাম্প্রদায়িক বিরোধের পথ প্রশস্ত করে তুলেছে। এই অনুষ্ঠান গুলো দেশে অনেক অমঙ্গল ডেকে এনেছে, ভবিষ্যতে আরো আনবে।

হিন্দু-মুসলিম সম্মিলন দেশের জাতীয় মুক্তির খাতিরে, মানবতার হিতের জন্যে একান্তই হওয়া চাই। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামীর ভিতর দিয়ে তা হবেনা। হিন্দু আর মুসলমানকে এমন একটা সাধারণ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হবে যেখানে ধর্মের গোঁড়ামীর এতটুকু গন্ধও নেই। সেই ক্ষেত্র হচ্ছে ইকনমিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র। ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে 'ক্ষুধার জোরে সুধার জগৎ জয়' করতে হবে।

ধর্ম্ম বিভীষিকা।

কলকাতার প্রায় সমস্তটা জুড়েই ধর্ম্মের একটানা স্রোত এ কয়েকদিন থেকেই বইচে। ঘরে বসে ধর্ম্মের কাঁদুনিতে কান ঝালাপালা হচ্ছে, আর বাইরে তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে ধর্ম্মের নামে অন্ততঃ দুশো বার বাহবা জানাতে হচ্ছে। এই মারপিট, খুন ও পৈশাচিক নৃত্যের মধ্যে ভগবান যে নিশ্চয়ই আছেন এ কথা আজ জোর করেই বলতে হবে, কেননা, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু ধর্ম্মপ্রাণ শিক্ষিত লোকের অভিমত এই যে রক্তারক্তি করেই হিন্দু-মুসলমানকে তাদের ধর্ম্ম রক্ষা করতে হবে কিন্তু আমাদের পাপটা এত বেশী করে খাতায় জমা হয়ে আছে যে খুনাখুনির ভিতরে ভগবানের অস্তিত্বকে আমরা কোনদিনই বুঝে উঠতে পারিনি। হয়ত সে শুভমুহূর্ত্ত খুব শীগ্‌গীরই আসচে যেদিন একটু পুণ্যের ফলে দেখতে পাব যে মন্দিরের উপর মা-কালী খাঁড়া হাতে করে আর মসজিদের উপর খোদা প্রকাণ্ড ছোরা নিয়ে লম্বা লম্বা হাত বের করে উভয়ে উভয়ের রক্তপাত করছেন।

এখন কথা হচ্ছে ধর্ম্মকে উপলক্ষ করে এই যে একটা বিভীষিকা জাগিয়ে তোলা হয়েচে এর জন্য দায়িত্বের ভার কোন্ সম্প্রদায়ের ঘাড়ে ওজন করে কতটুকু চাপিয়ে দেওয়া উচিৎ তাই নিয়ে এখন জটলা করবার সময় নেই, কিম্বা Statistics কষে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করে দুচারবার 'আহা' করলেই যে যথেষ্ট কাজ হয়ে গেল তা আমাদের মনে হয় না। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে যে গুণ্ডামীকে সম্পূর্ণরূপে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে সেটা যাতে অতি সত্বর নিরাকৃত হতে পারে তার জন্য একান্তভাবে দাঁড়ানই বর্ত্তমানে প্রধান কাজ এবং এজন্য এমন কতকগুলো লোকের প্রয়োজন যাঁরা সব কিছুকেই সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে ভাবতে শিখেছেন। আমরা জানি এরূপ লোক হিন্দু-মুসলমান দুই শ্রেণীর ভিতর অনেক আছে এবং তাদের পক্ষে কাজ করবার এই প্রকৃষ্ট সময়। অন্যায়কারী হিন্দু কি মুসলমান তা নিয়ে ভাবতে বসলে তাঁদের চলবে না, তাঁরা শুধু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অন্যায় দমন করেই যাবেন। হয়ত ভারতের মহারাজা কিংবা তার আবদার রহমের মতানু-সেবীগণ হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বেন, কিন্তু স্বার্থানুসন্ধিৎসুদের কথায় ভুলবার দিন যে আর নেই। সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে তো হিন্দুমুসলমান বীরদের ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদানের কাহিনী দেখে দেখে নিজেদেরই সময় সময় বীর সেজে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়. কিন্তু তার সত্যিকারের ফল যে কি আছে সেটাইযে মগজে ঢুকতে চায় না। মোহাম্মদী প্রভৃতি কাগজের, "জাগো মুসলমান" আহ্বানে সত্যিই রণসজ্জার যথেষ্ট আয়োজন আছে স্বীকার করি আর বসুমতী প্রভৃতি কাগজের "নানাসাহেবী কাণ্ডের" ভিতর ইতিহাসপাঠের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু তাঁদের বুদ্ধিমত্তাকে যথেষ্টই প্রশংসা করা যেত যদি তাঁরা দেশের মঙ্গল ভেবে কিছু করতেন। ধর্ম্মজ্ঞানটাই যে তাঁদের বুদ্ধিকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে এটাই বলতে হবে, নইলে হিন্দু-মুসলমান একই দেশবাসী দুইটি শ্রেণীর একটিকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

কয়েকটি বন্ধু সেদিন বলছিলেন যে মন্দির মসজিদ দুই চুরমার করে দিলে হিন্দু মুসলমান মিলন সমস্যার সমাধান হওয়া অনেকটা সম্ভব। আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। যেগুলি চুরমার হয়ে গেছে তার উপরে বসে চোখের জল ফেলে আর পাপ বৃদ্ধি করবার দরকার নেই। যেগুলি বাকী আছে তার জন্য হিন্দু মুসলমানদের ভিতর এমন কয়েকটি কালাপাহাড়ের প্রয়োজন যারা নিষ্ঠুর হস্তে মন্দির মসজিদ সব ধ্বংস করেই চলবে। ধর্ম্মের উন্মত্ততা, গোঁড়ামী দিয়ে দুদলের বিরুদ্ধভাবকে বাঁচিয়ে রাখা আর যে বেশীদিন চলতে পারেনা।

এই হত্যার বিভীষিকার মধ্যেও আমরা জানি নিজেদের জীবন এবং মেয়েদের সম্মানকে তুচ্ছকরে অনেক হিন্দু মুসলমানদের তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন এবং অনেক মুসলমান হিন্দুদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। যে মন নিয়ে উভয়ে উভয়কে বুকে স্থান দিয়েছেন আমরা শুধু সেই মনটাকেই চাই। মানুষ মানুষকে শুধু মানুষ বলে জানুক, দেশের মঙ্গল দেশবাসীদের একজনকে অপরের একান্ত আপনার করে রাখুক। সম্প্রদায়ের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, ধর্ম্মের বিষ আর বিভীষিকায় সৃষ্টি করবে না হিন্দু-মুসলমানের মিলন সেই খানেই সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে স্থায়ী জিনিস হবে।

বৃটিশ সোস্যালিষ্ট দল ও ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের অভিমত :—

ভারতবর্ষকে স্বাতন্ত্র শাসনের সামান্য অধিকার টুকু পর্য্যন্ত ও দেওয়া হয় নাই। বৃটিশ পার্লামেণ্ট এখনও ভারতের শাসন কার্য্যের জন্য দায়ী আছে। বড়লাট এবং তাঁর পারিষদগণ সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁরা বিলেতে অবস্থিত ভারত সচিবের আদেশ মত সব কাজ করে থাকেন।

ভারতের বড় বড় ব্যবস্থাপক সভা দুটির অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সভা এবং ব্যবস্থা পরিষদের ক্ষমতা ও প্রতিনিধিত্ব নিতান্ত সংকীর্ণ। রাষ্ট্রীয় সভায় সরকারী সদস্যের সংখ্যাই অধিক এবং ব্যবস্থা পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সভ্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন। রাষ্ট্রীয় সভা ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত মঞ্জুরী সমূহ নাকচ করবার অধিকার রাখেন আর ব্যবস্থা পরিষদে যে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় সে গুলি চালাবার ক্ষমতা আছে বড় লাটের। যাঁদের বিষয় সম্পত্তি আছে তাঁরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন। প্রায় ২৫ কোটী লোকের মধ্যে অনধিক ৩০ হাজার লোক রাষ্ট্রীয় সভার ভোটার আর ব্যবস্থা পরিষদের ভোটারের সংখ্যা ১০ লক্ষের ও কম।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহের ভোটারের সংখ্যা লোক সংখ্যার শতকরা তিনজন মাত্র। এই সব সভাগুলির আইন ও শৃঙ্খলা, রাজস্ব, আবকারী, বন ও সেচ বিভাগের উপরে কোন ক্ষমতা নাই অথচ এই সব বিভাগের জন্য দেশের বেশী টাকা খরচ হয়। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বর্ত্তমান থাকায় দেশের একতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সিভিল সার্ভিস এবং ফৌজদারী বিচার কার্য্য বৃটিশদের কর্ত্তৃত্বাধীনে, আছে। সমর বিভাগও বৃটিশ প্রভুত্বের অধীন অথচ ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় ভারতের অর্থ থেকে। বক্তৃতা দিবার, সংবাদ পত্রে লিখিবার, সভা সমিতি করবার অধিকার এমন কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকেও জনসাধারনকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

ভারতে কেবল মাত্র শতকরা ৭.২ জন লোক পড়তে পারে। সমাজ সংস্কার করতে গেলে সরকার তাতে বাধা দেয়। লোকদের স্বাস্থ্যোন্নতি করবার যে সব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাহা নিতান্ত অপ্রচুর। কিন্তু জলে স্থলে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালই করা হয়েছে।

আফ্রিদীগণকে ও ব্রহ্মদেশের লোকদিগকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের অধীনে আনা হয়েছে। যদিও কোনও কোনও দেশীয় রাজ্যে শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বেশ উন্নতি হয়েছে কিন্তু তাদের দু'একটা ছাড়া অন্য সবগুলির মধ্যে প্রতিনিধিমূলক কোনও প্রতিষ্ঠান নাই বল্লেও হয়।

প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রেলীয়া ও নিউ জীলাণ্ডে ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ আর কানাডা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং গুয়ানা ছাড়া অন্য সব বৃটিশ উপনিবেশে তারা বর্ণ দোষে মানুষের সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে।

জাতি সঙ্ঘে যে সব ভারতীয় প্রতিনিধি যান তাঁরা ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত না হয়ে বড়লাট বাহাদুরের অনুমোদনে ভারত সচিব কর্ত্তৃক মনোনীত হন।

আমরা (Independent Labour Party) ভারতবাসীর স্বায়ত্বশাসনের এবং স্বরাজলাভের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করি। ভারতবাসী যদি ইচ্ছা করে বৃটিশ সাম্রাজ্য মুক্ত হ'তে চায় তা'হলে সেটা করবে তবে সাম্য ও স্বাধীনতার উপর স্থাপন করে। "ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনের" বিধান মত ১৯২৯ সালে উহা সংস্কার করবার কথা কিন্তু আমরা (শ্রমিক দল) এই সংস্কার এখনই করতে চাই। বৃটিশ সরকার জানিয়ে দিব যে তাঁরা বাহিরের সব শাসন বন্ধ করতে রাজী আছেন। তাঁদিগকে অত্যাচার মূলক সব আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সব রাজনীতিক অপরাধীকে নির্দ্দোষ বলে ঘোষণা করতে হবে ও ভারতের বাহির হ'তে ভারতীয় সৈন্য সমূহ উঠিয়ে আনতে হবে এবং ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করতে হবে। তাঁরা তাঁদের অধীন দেশ সমূহ হ'তে ভারতবাসীদের সব অসুবিধা দূর করে দেন এবং অন্যান্য দেশে যাতে ভারতবাসীরা সেই দেশের লোকদের সহিত সমান অধিকার পায় তজ্জন্য তাঁদিগকে চেষ্টা করতে হবে আর জাতি সঙ্ঘে যে ভারতীয় প্রতিনিধি পাঠান হয় তাঁর নির্ব্বাচন ভার ব্যবস্থা পরিষদের হাতে দিতে হবে।

সর্ব্বান্তঃকরণে ভারতবাসীর দাবী সমর্থন করলেও আমরা (শ্রমিক দল) এটা স্বীকার করি যে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যাঁরা এই দাবী উত্থাপিত করেছেন তাঁরা মধ্য বিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায়ের লোক এবং যে পর্য্যন্ত না শ্রমিকগণ ভোটাধিকার পায় আর নিজেরা নিজেদের দলগঠন করে ততদিন তাদের রাজনীতিক, মুক্তির কোনও আশা নাই। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহ কর্ত্তৃক বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইনগুলি পাশ হওয়া চাই, তাহলে শ্রমিকগণ ও দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারবে।

বর্ত্তমান অবস্থা

দরিদ্রতা—ভারতের দারিদ্র্য নিতান্ত ভয়াবহ। হাণ্টার সাহেবের মতে ৪ কোটি লোক সারা জীবন দৈনিক এক বেলার বেশী খেতে পায় না। স্যার চার্লস ইলিয়ট সাহেবের মতে ৭ কোটি লোক জীবনে কোনও দিন পেটপুরে খেতে পায় না। (ভারত বাসীর দৈনিক আয় গড়ে কেও বলে ৴১৫ তিনপয়সা কেও বলে ৴১৬ ছয় পয়সা) মৃত্যুর হার

হাজার করা ৩১ এত বেশী পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ভারতবাসীরা ২৩।০ বৎসর বাঁচে এদিকে বিলাতের লোকের আয়ু ৫৩।৪০ বছর। শিশু মৃত্যুর হার হাজার করা বোম্বাইয়ে ৫১২ কলিকাতায় ৩৮৬ আর ইংলণ্ডে মাত্র ২০৬।

কৃষি—ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এখানকার শতকরা ১০।১ জন লোক সহরে বাস করে। যদিও দেশের অধীর নামীক গভর্ণমেণ্ট কিন্তু জমিদারেরা প্রজার কাছ থেকে থেকে অত্যধিক খাজনা আদায় করে (বাঙলাদেশে সরকার যে খাজনা পায় জমিদারেরা পায় তার ৪গুণ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রায়ত এবং ভূমি হীন লোকের সংখ্যা ৪ কোটি। দারিদ্র্য দেশের সর্ব্বত্র। কৃষকগণ মহাজনের ঋণে বাঁধা। ভূমিগুলির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে উচিত ব্যবস্থা করা চাই। কৃষকদিগকে জমীর স্থায়ী স্বত্ব দিয়ে মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারী উঠিয়ে দেওয়া দরকার। জমীগুলি সব জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা আবশ্যক। কৃষি ও সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ধার দিবার জন্য, শস্য ও খাদ্যাদি দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন ও ঘুরে ঘুরে কৃষিশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষকগণকে লাভজনক কৃষিকার্য্য হাতে কলমে শিক্ষাদিবার সুবিধা দিতে হবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সাহায্যে সকলে একযোগে চাষ করা যেখানে হয়।

কৃষিকার্য্যের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য যে কমিশন হবার কথা হয়েছে তাদিগকে প্রজাস্বত্বের মূল কথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে বলতে হবে। ইহাদিগকে সকলেরই স্বার্থ বিশেষ করে কৃষক ও রায়তদের স্বার্থ দেখতে হবে।

শিল্প—শ্রমিকদের অবস্থা ও কৃষকদের মত শোচনীয়। বোম্বাইয়ের লেবার অফিস থেকে যে তদন্ত হয়েছিল তাতে জানা যায় যে, যে শ্রমিকদের পরিবারে ৪০২ জন লোক তারা সপ্তাহে বেতন পায় ১৭ ১ শিলিঙ (অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের অবস্থা বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের অপেক্ষা খারাপ) শতকরা ৯৭ শ্রমিক পরিবার সবে একটি মাত্র ঘরে বাস করে। পক্ষান্তরে প্রচুর লাভ পাচ্ছে কলওয়ালাগণ। গত দশ বছরে পাট কল সমূহে গড়ে লাভ দেওয়া হয়েছিল শতকরা ৯০ টাকা করে আর ১৯২০ সালে কাপড়ের কল সমূহে লাভ দেওয়া হয় শতকরা ১২০ টাকা। চা বাগানে শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সেখানে তারা যে ব্যবহার পায় তাহা নিতান্ত অমানুষিক। তাদের সপ্তাহে মাহিনা পুরুষদের জন্য ৩।৪ শিলিঙ মেয়েদের জন্য ১ হতে ৩ শিলিঙ। বহুলোক একত্র বসবাস করায় তাদের নৈতিক অবস্থার চরম দুর্দ্দশা হয়েছে।

শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার হয় তার নিবারণ করবার আইনে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। কারণে অকারণে শ্রমিকদের নিকট হতে যে জরিমানা আদায় করা হয় তার প্রতিবিধানের উপায় নাই তাহা ছাড়া অসুখ বিসুখ বেকার অবস্থা বৃদ্ধাবস্থা ও গর্ভাবস্থা প্রভৃতির জন্য আইনে কোনও বিশেষ বিধান নাই। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে প্রসূতিদের খাটাবার সম্বন্ধে ও কোনও প্রতি বিধান নাই।

শিক্ষাভাব, চাঁদা দিতে অক্ষমতা স্থানান্তরে গমনাগমন প্রভৃতি কারণে শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করা কঠিন হয় তথাপি বোম্বাই মাদ্রাজ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করবার খুব চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। বিশ লক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে এখন আড়াই লক্ষ শ্রমিকসঙ্ঘ বদ্ধ হয়েছে।

এখন কি চাই—কার্য্যের সময় নিরূপণ, বেতন নির্দ্ধারণ, শিশু শ্রমিক ও মেয়েদের কাজ সম্বন্ধে এখন যে সামান্য ব্যবস্থা আছে তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কল পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং বেকার অবস্থা বৃদ্ধাবস্থা অসুখ বিসুখ ও গর্ভাবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে। শ্রমিকদের থাকবার ব্যবস্থাও ভাল করতে হবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি এবং ধনিকতন্ত্রের হাত হ'তে তাদের উদ্ধার হবার উপায় শ্রমিকদের শিক্ষা ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভর করছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করে বৃটিশ শ্রমিকদলের উচিত যথা সম্ভব ভারতীয় শ্রমিকদিগকে সাহায্য করা। জগতের শ্রমিকদিগকে এক সূত্রে গাঁথবার কথা ছেড়ে দিলেও উন্নত দেশ সমূহের শ্রমিকদের অবস্থা ঠিক রাখবার জন্য অন্ততঃ ইহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতীয় শ্রমিকগণকে অর্থ সাহায্য করা দরকার কিন্তু এর চেয়ে বেশী দরকার উহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। যাতে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে ইন্টার ন্যাশন্যাল ফেডারেশন অব ট্রেড য়ুনিয়নের যোগাযোগ হয় আর যাতে যাঁরা শ্রমিকদের জন্য রাজনৈতিকদল করতে চান তাঁদের সঙ্গে লেবার পার্টির এবং সোস্যালিষ্ট ইন্টার ন্যাশনালের যোগাযোগ হয় তার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। তবে চায় ইন্টার ন্যাশনালদের উচিত ভারতবর্ষ ও [illegible] থেকে ট্রেড য়ুনিয়নিজম ও রাজনৈতিক শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে একটা লেবার কলেজ স্থাপন করা যেতে পারে কিনা তার বিবেচনা করা।

বৃটিশ শ্রমিকদল এই সব প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করেছেন: শ্রমিকদলের এবং ট্রেড য়ুনিয়নের বড় অফিসের সঙ্গে ভারতে শ্রমিকদের বড় বড় অফিস সমূহের সরাসরি যোগাযোগ হওয়া চাই। বৃটিশ শ্রমিকদিগকে ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। বৃটিশশ্রমিক প্রতিনিধিগণ সময়ে সময়ে ভারত ভ্রমণে আসবেন এবং ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে উহাদিগকে শ্রমিক গঠন প্রণালী সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দিবেন। ভারতে লেবার কলেজ করবার পূর্ব্বে ভারতের কর্মীদের বিলাতের কলেজে এনে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলে হয়। একজন পাকা বৃটিশ ট্রেড য়ুনিয়ন ওয়ালাকে ভারতে পাঠিয়ে পরামর্শ দেওয়ানো হয়।

স্বতন্ত্র শ্রমিকদল ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যথা সম্ভব যোগ রাখবে এবং এর সভায় এই সব প্রস্তাব ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসে, লেবার পার্টিতে এবং ইন্টার ন্যাশনালে পেশ করবে। (শাহ)

নির্য্যাতন, বিপ্লব, ও তাহার প্রতিক্রিয়া

(শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীসুরেশ বিশ্বাস)

নির্য্যাতন, বিপ্লব দাবানল জ্বালাইয়া তোলে, আবার বিপ্লব হইতেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পতন। একের পর আর—এমনি করিয়া অগ্নিচক্র ঘুরিতেছে। ইতিহাসে ইহার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত মিলিবে। ফরাসীর ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে বুর্ব্বন রাজতন্ত্রের অত্যাচারের ফলেই ফরাসীবিপ্লব সংঘটিত হয়, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ—একটি বিরাট পতন। ফরাসীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গে এ পতনতার চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল। বিপ্লবের পরে 'জ্যাকোবিনদের' অত্যাচার ও ইতর সাধারণের আধিপত্যই আমাদের উপরের মন্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। বৈচিত্র্যময় ফরাসীবিপ্লবে মানবপ্রকৃতির জঘন্য বৃত্তি ও মানবচরিত্রের উদারভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। শত শত শতাব্দীর নিষ্পেষিত মানবগণ অত্যাচারের রুদ্রমূর্ত্তি ও প্রতিহিংসার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঁড়াইল। বহুদিনের অন্যায়ের প্রতিবিধানও করা হইল, সুবিধামূলক ক্ষমতা লোপ পাইল। দুর্ব্বল দাস, সবল দুর্ব্বল, ধনী দরিদ্র এবং দরিদ্র ধনী হইয়া উঠিল। ... ... মাদ'ম্ রোলা সাধারণ রন্ধনশালা ও বহির্ব্বাটীর বদলে টুইলারী রাজপ্রাসাদ পাইলেন, আর ম্যারী আন্টয়নেট টুইলারী-রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া একজন বৈদেশিকের বহির্ব্বাটীতে আশ্রয় লইলেন। ... হত্যার বিভৎস উৎসব, মৃত্যু ও ধ্বংশের উপদেবতাদের তাণ্ডবনৃত্য চলিল। রমণীর স্বভাব সুলভ কোমলতা রক্তলোলুপ নিষ্ঠুরতায় পরিনত হইল। কার্ডিনিয়াসের ন্যায় রমণীকূলের পরিবর্ত্তে লেডীম্যাকবেতদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিপ্লবোন্মত্ত জনবাহিনীর অগ্রে অগ্রে রণরঙ্গিনী প্রমদাকুল চলিল। যাহাদের সহিত এক সপ্তাহ, একপক্ষ অথবা বড়জোর একমাস আগেও চা কিম্বা মদ্য পানের সময় ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছে সেই সমস্ত লোকদের কণ্ঠবিকৃত ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ দর্শনে প্রতিবেশীনীরা পৈশাচিক বিজয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অগণিত গিলোটিনে-কাটা নরমুণ্ড হইতে উষ্ণরক্তধারা রাইন দানিউবের স্রোতের মত বাহির হইয়া আসিল। ... মনে হয় আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতে প্রকৃতি যেরূপ তাণ্ডবলীলা করে ফরাসীর সিত্রালপাইন সমিতিও যেন সেইরূপ তাণ্ডবলীলায় মাতিয়াছিল। ... পর্ব্বত গাত্র হইতে আকস্মিক তুষারপাত, গহ্বর সঞ্জাত তুষার ক্ষেত্র," পার্ব্বত্য ঝটিকা, পার্ব্বত্য বিস্ফোরক 'জুরার' বীরদস্তু ও 'মণ্টব্লাঙ্কের' তাহাতে সাড়া প্রদান সমস্তই সিন ও লয়ার নদীসৈকতে, প্যারীনগরীর রাজপথে এবং 'লাভেনডির' কুঞ্জে কুঞ্জে প্রমূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছিল। ক্রমেই এই তাণ্ডবলীলা বাড়িয়া উঠিয়া প্রলয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ... ... অস্থানগরীর তুষারমণ্ডিত স্বর্ণচূড়া, 'সান্সোচার' পরিবা-বেষ্টিত কেল্লাসমূহ, ইতালীর সুরম্য নগরাবলী, বল্টিক সাগরোপকূলস্থ রাজ্যগুলি বিপ্লবের অপ্রতিহত ঘূর্ণাবায়ুর প্রচণ্ডবেগের সম্মুখে, নতশির হইয়া পড়িল,—এবং দেখিতে দেখিতে সমগ্র ইয়োরোপ ঘনমেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ইহারি ফলে দীর্ঘবর্ষের রক্তপাতের পর, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সূর্য্য সহসা প্রচণ্ড কিরণমালা বিস্তার করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।...প্রাচীন রাষ্ট্র প্রণালী বিধ্বংস হইয়া এক নূতন পদ্ধতি গড়িয়া উঠিল। বহুর উপর স্বল্পের আধিপত্য লোপ পাইল। জনসাধারণের অধিকারের উপর শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল। সংবাদপত্র সমূহ উচ্চসম্মানের স্থান অধিকার করিল। বর্ব্বরতা-মূলক নীতিসমূহ বিধিবদ্ধ আইনের পুঁথি হইতে মুছিয়া ফেলা হইল। সমাজ-ও ধর্ম্মতন্ত্রের সংস্কার সাধিত হইল। স্বর্ণোপকূলের দাসশ্রেণীর নিম্ন ও সেন্‌ডমিঙ্গোর ইক্ষুক্ষেত্রে একটি অপরিচিত জাতি সর্ব্বান্তকরণে ১৭ ৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহকে আশীর্ব্বাদ করিল।

বহুবর্ষ ধরিয়া রক্তপাত এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর তাহার যে প্রতিঘাত শুধু তাহারই ফলে এই সমস্ত অসম্ভব সম্ভব এবং স্বাধীন ও পূর্ণ বিকাশিত জাতীয় জীবন-পদ্ম বিকশিত হইয়াছিল।

রুষিয়া ও জার্ম্মাণীর ইদানীন্তন বিপ্লব সমূহেও দেখা গিয়াছে যে বিপ্লবের পরিণাম পতন বা অবনতি। "রেড্ রাসিয়া" জারের নির্য্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে; এবং সেই নির্য্যাতনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব। উক্ত পুস্তক খানিতে এই পংক্তি-টি সুন্দর ব্যঞ্জনা পূর্ণ,—"রুষিয়া ব্রিটনকে তাহার রক্তাক্তহস্ত প্রসারিত করিয়া দিল এবং ব্রিটন তাহা সাদরে চুম্বন করিয়া যথোচিত সাহায্য প্রদান করিতে লাগিল।"

জারের অত্যাচার ও তাহার ফলে দেশে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল পোষ্টগেট ও ম্যাকমন হইতে যে অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহাতে কতকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।.....

"অর্থনীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে রুশিয়া কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক কৃষি সম্প্রদায়ের উপরে এক একজন ব্যারণ আধিপত্য বিস্তার করিত এবং অভাগাদের যথা সর্ব্বস্ব শোষণ করিত। দারিদ্র্যের প্রকোপে এবং জারের প্রতিনিধির কঠোর নিষ্পেষণে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নৈতিক ও মানসিক ভাবের আদান প্রদান বিষয়ে পরস্পর হইতে বিছিন্ন ছিল। এইরূপে কঠোরনীতি অবলম্বন করিয়া আমলাতন্ত্রের শাসন ও দৌরাত্ম্য চলিত। জারের শাসনাধীনে; কেবল মাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ই উচ্চরাজকর্ম্মের অধিকারী ছিল। ... ... শহরবাসীরা খাদ্যের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। কৃষকশ্রেণী.

অন্তরে অন্তরে স্বাধীনতার অভাব অনুভব করিতে লাগিল, এবং সমস্ত শ্রমিক ও কৃষিজীবি সম্প্রদায় শান্তির আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ...বিপ্লবের মূল কারণ এইগুলি।" (New Russia পৃষ্ঠা ১১, ১২।)

আধুনিক জার্ম্মাণ ও রুশ বিপ্লব যদিও অনেকটা সাম্য-ভাবের উপর প্রোতিষ্ঠিত ছিল, তবুও উহা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে নানাবিষয়ে উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিপ্লবের জন্যই দেশে দুর্ভিক্ষ ও অনটন আসিল এবং তাহাতে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইল এবং শিল্পকলা ও ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদির সমূহ ক্ষতি হইল। ...ভলগা নদীর কূলে 'কাজন' হইতে ভাল্‌গাস্থুরের অষ্ট্রাখান্ ও কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৮০০ শত মাইল এবং প্রস্থে ৫০০ শত মাইল ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। সে কি অসহ্য যন্ত্রণা কীট পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরিতে লাগিল। ক্ষুধার্ত্ত মাতা রাক্ষসীর ন্যায় নিজ সন্তানের অঙ্গ হইতে মাংস খাইতে লাগিল; ক্ষুধার-এমনি তাড়না, দুর্ভিক্ষ এমনি ভীষণ!

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে রুশিয়ার আর্থিক ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধীয় যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত লেখা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইবে।—

"তিন বৎসর মহাযুদ্ধে যোগদানের পর রুশিয়াকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে পুনরায় তিন বৎসর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে সোভিয়েট সরকারকে একটি নিঃশেষিত জাতির উপর রাজত্ব করিতে হইয়াছে। নবেম্বরের বিপ্লবের পরে সোভিয়েট সরকারের উপর যখন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা আসিল তখন বাণিজ্যশালা, রেলওয়ে, কিম্বা ফ্যাক্টরী একটিও তাহাদের করতলে আসিল না।—সমস্তগুলিই আংশিক ভগ্ন, অথবা একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে। ... রুশিয়ার সোভিয়েট সরকারকে পুনরায় অর্থনীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছুরই নূতন করিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইয়াছিল।" (New Russia.)

'রেডটেরার' জন সাধারণের ভিতর বিশৃঙ্খলা ও ভীতির ভাব সঞ্চার করিল। প্রমন্ত্রীসম্প্রদায়ের বিপ্লব ও স্বেচ্ছাচার মূলক নেতৃত্ব ঐ ভাবকে আরও জাগাইয়া তুলিল।' রেড্‌টেরার' ফরাসী জ্যাকোবিন-ভীতি অথবা হাজারীর হার্থ ভীতির ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইল। "ব্রেষ্ট 'লিটভস্ক" সন্ধির অব্যবহিত পরেই জর্ম্মাণ রাজদূত মস্কো নগরীতে উত্তেজিত সোস্যাল বিপ্লবপন্থীদের-দ্বারা নিহত হইলে এবং রাইট সোস্যাল বিপ্লবপন্থীরা সোভিয়েট কমিশনারদের আক্রমণ করার পরেই ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল। বলশেভিক বিপ্লববাদীদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সর্ব্বস্থানে অত্যাচার চালাইবার হুকুম জারী করিয়া 'অতিরিক্ত কমিশন' ও সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশোধ লইলেন। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলিল। বিরুদ্ধপক্ষ বিপ্লবান্দোলন ব্যর্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। সোভিয়েট সরকারও সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া পাশবিক আক্রমণ আরম্ভ করিল।

নির্য্যাতন, বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য সমূহ ভারতবর্ষ—বিশেষ করিয়া বাংলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নির্য্যাতনের আমলের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান বাংলা চলিয়াছে। ইম্পিরিয়েলিজম মদে মত্ত হইয়া আমলাতন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছেন যে নির্য্যাতনদ্বারা বিপ্লবকে দমান যায় না। রাওলেট কমিটির বিবরণে আমরা যে নির্য্যাতন মূলক আইনের উল্লেখ দেখি এবং বর্ত্তমানে অর্ডিনেন্স এবং 'তিন' আইন চালাইয়া আমলাতন্ত্র যে চণ্ডলীলায় অভিনয় করিতেছেন তাহাতে ভারতের জাতীয়জীবনের এই অস্বাস্থ্যকর বিপ্লব ব্যাধির উপশম হইবে না। প্রত্যুত তাহা ঐ ব্যাধিকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে। ইহাতে হয় ত অশান্তি এবং অসন্তোষের বীজকে অঙ্কুরোপিত করিয়া অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবে, এবং কালে তাহাই বিপ্লবরূপ বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে।......

শান্তি ও বৈধনীতির পক্ষপাতী সিন্‌ফিনেরা অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ফলে প্রকাশ্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া গুপ্ত সমিতি চালাইতে আরম্ভ করে; এবং তাহারই ফল আয়র্লণ্ডে প্রসিদ্ধ "ইষ্টার বিদ্রোহ" ও যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে। জন-সাধারণের মধ্যে যে বিপ্লবমূলক ভাবস্রোত বহিয়া যাইতেছিল তাহা 'ব্লাক'-'টান' কিম্বা 'কারফু হুকুম'ও থামাইতে পারে নাই 'সিন্‌ফিনের জন্মকথা' নামক পুস্তকে নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া সিন্‌ফিন আন্দোলনের বিকাশের একটি জলন্ত বর্ণনা আছে।

এ সম্বন্ধে ম্যাকসুইনি (Terence Mac Swiney) বলেন, "১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ড ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়াও বিপ্লবের ব্যর্থ আন্দোলন চালাইয়া যেন সম্পূর্ণরূপে হীনবল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ত্রিংশ বৎসর পরে এমন একটি বিদ্রোহ সৃষ্টি হইল যে তাহাতে আয়র্ল্যাণ্ডস্থ বৃটিশশক্তির মূলভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। (Principles of Freedon)

New Russia পুস্তকে Postgate এবং Jackson বলেন, "জারের নির্য্যাতনের তাড়নায় নগরস্থ শ্রমিকেরা পশ্চিমইউরোপের ট্রেড্-ইউনিয়নের পরিবর্ত্তে কারখানা-সম্মিলনীর একটি বিস্তৃত গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে। তাহাদের প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে সহরে সহরে ও জিলায় সমিতি গঠন করিত। জারের নির্য্যাতনের জন্য ধনিক, বণিক ও মধ্যবিত্তেরা প্রকাশ্যভাবে সঙ্ঘ পরিচালনা করিতে পারিতনা।"

সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে যদি ঐ দুষ্ট ব্যাধি দূর করিতে হয় তবে বিপ্লবের মূলীভূত কারণ সমূহ দূর করিতে হইবে। পরিবর্ত্ত অর্থই কোন কার্য্যের অভ্যন্তরস্থ গলদ্ দূর করা। (Forwardএ ৭-১২-২৪ তারিখে মূল প্রবন্ধ প্রথম লেখকের নামে ইংরেজীতে প্রথম প্রকাশিত হয়)।

একজন শ্রমিকের

বৎসরে খাদ্যের পরিমাণ

(পাউণ্ডের হিসাবে)

এক পাউণ্ড-প্রায় আধসের

খাদ্যদ্রব্য	যুক্তরাজ্য	জাপান	ভারতবর্ষ
মাংস	১৪০	২১'৫	*
মৎস্য	২১	৫০'৫	*
ডিম	৩০	২'১	*
ডাল	২৮	৩১'৪	১১৪
ভাত রুটি	৩৫০	৩০১'৪	৪৫৬'৪
শাক সব্জি	৫২০	৪৫৯'৪	১৪'১
চিনি	৬৩	১৭'১	*
ফল	২০০	২৯'৭	*
অন্যান্য	৩৩	*	২২'৮
দুধ	৫০০	২০২	*
মোট—	১৭৭৫	৯০৫	৭৪১'৪

* এত অল্প যে গণনার মধ্যে আসে না।

ভারতবাসীর খাদ্যের পরিমাণ আমেরিকা বাসীর খাদ্যের অর্দ্ধেকের চেয়েও কম তাতে আবার পুষ্টিকর খাদ্য মাছ মাংস ডিম দুধ ভারতবাসীর ভাগ্যে জোটে না। সে খেতে পায় কেবল ভাত রুটি ও শাক-সব্জি এতে তার জীবনী শক্তি কমবে না কেন কেন? তার সে বাঁচে ২৩। বৎসর আর একজন ইংরেজের আয়ু ৫৩॥ বৎসর। শাহ

বিবিধ প্রসঙ্গ

মিঃ আবদুর রশীদ একজন ইউরোপীয় মুসলমান। তিনি ডাক্তার আর, আহমদ প্রতিষ্ঠিত ডেন্টাল কলেজের সেক্রেটারীর পদ করছিলেন। ১৯২৪ সনে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে আর সকলের সাথে মিঃ রশীদকেও গেরেফতার করা হয়। সেই হতে তিনি কারাগারে পচতেছেন। সকলেই জানেন, রাজনৈতিক কারণে অর্ডিন্যান্স অনুসারে দেশের মুক্তিকামী কতিপয় সন্তানদের নজরবন্দীর অবস্থায় কারাগারে ও কারাগারের বাহিরে রাখা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারিয়েছেন, সকল দুঃখ ভোগ করছেন। কিন্তু একজন বিদেশীয়কে কেন যে ভারতের অভিশপ্ত নজরবন্দী জীবনের দণ্ড দেওয়া হচ্ছে তা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে। তাঁর দ্বারা যদি এদেশের বৃটিশ শাসন যন্ত্রের বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাঁকে ভারতগবর্ণমেণ্ট যখন ইচ্ছে, দেশ থেকে বিদেয় করে দিতে পারেন। একজন বিদেশীকে কেবল মাত্র সন্দেহের বশে ভারতের জেলে জেলে পচানোর কিছু কি সার্থকতা আছে? মিঃ রশীদ বর্ত্তমানে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে রয়েছেন। তাঁর সাথে নাকি কাহাকেও দেখা-সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়না। তাঁর বেলায় গবর্ণমেন্টের নিজের গড়া নিয়ম-কানুনের কোনো মূল্যও নেই। ভারতের কারাগারে সাধারণ ভারতীয় কয়েদী ও ইউরোপীয় কয়েদীর জীবনযাত্রার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে। বাংলাদেশের কারাগারে একজন দেশীয় কয়েদীর খাওয়ার জন্যে যত অর্থ ব্যয় করা হয় তার তিন গুণ অর্থ ব্যয় করা হয় একজন ইউরোপীয় কয়েদীর জন্যে। অথচ রাজবন্দী হওয়া সত্ত্বেও মিঃ রশীদের বেলায় ব্যবস্থা অন্যরূপ করা হয়েছে। তাঁর খাওয়ার জন্যে যা বরাদ্দ হয়েছে তা তাঁর অভ্যস্ত জীবনের পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। এ অসহায় বিদেশী যাতে এ অপ্রত্যাশিত দুর্ভোগের হাত হতে নিস্তার পেয়ে তাঁর স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন, সে চেষ্টা আমাদের করা একান্ত উচিত।

ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে আর একদল প্রতিক্রিয়াকারী বাড়লো। এদল ভারতীয় জাতীয় দল নামে অভিহিত হবে। একথা বলাই বাহুল্য যে পরান্ন ভোজী সম্প্রদায়ই এদল পুষ্ট করবেন এবং এ দলের লোকেরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পরিপন্থী হবেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন নামক অশ্বডিম্বের জন্য এই দল কান্নাকাটি করবেন। ভারতে কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভারত হয়তো পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে, নতুবা ইংরেজের অধীন হয়ে থাকবে। ইংল্যাণ্ডের লোকের সাথে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার লোকদের সাথে একটা রক্তের সম্বন্ধ আছে। সেই জন্যে তারা ইংরেজদের সমকক্ষ হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আমাদের সাথে ইংরেজের কোনো রক্তের সম্বন্ধ নেই, অর্থাৎ আমরা ইংল্যাণ্ড হতে এদেশে এসে আমাদের উপনিবেশ স্থাপন করিনি। তাই আমরা ইংরেজের সমকক্ষ হতে পারব কেবলমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারা। সেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করাই আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই নূতন দল যে পূর্ণ স্বাধীনতার পরিপন্থী হবেন তার একমাত্র কারণ তাঁরা পরান্নভোজী সম্প্রদায়। জনসাধারণের মতের উপরে পূর্ণ স্বাধীনতা স্থাপিত হলে তাঁদের শোষণবৃত্তি আর কিছুতেই চলবে না। তবুও এ দলের একটা তারিফ করতে হয়,—কি তাঁরা যা চান তা তাঁরা পরিষ্কার করেই বলেছেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি কিংবা ভারতীয় স্বরাজ্য দল আজো সাহস করে বলতে পারলেন না কি তাঁরা চান।

গত ২৩ শে চৈত্র মঙ্গলবার টাঙ্গাইলে কৃষক শ্রমিকদের এক সভা হয়েছিল। সেই সভাকে পণ্ড কোরবার জন্য নাকি এক দল লোক বলে বেড়াচ্ছিলেন যে ওটা হিন্দুদের সভা ওখানে যেও না আবার আর একদল লোক বলে বেড়াচ্ছিলেন যে ওটা মুসলমানদের সভা ওখানে যেওনা এমনি যতই তারা বলাবলি কোরছিল লোকে ততই তাদের কথায় অবিশ্বাস কোরেছিল। এত গোলমাল সত্ত্বেও সভায় চারি পাঁচশত কৃষক শ্রমিক উপস্থিত হয়েছিল। কৃষক শ্রমিকদলের সর্ব্বজন হিতকর উদ্দেশ্যের বিষয় জানতে পেরে জন সাধারন আহ্লাদিত হয়েছিল। কৃষক শ্রমিকেরা বর্ণগত ভেদবুদ্ধি মানে না। তারা সম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে নিজেদের সর্ব্বনাশ করতে চায় না। ধনিক বনিক শোষন কারীদের হাত থেকে তারা বাঁচতে চায়। একারণে তারা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গণ্ডির বাহিরে। ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হয়ে গেছে সেদিনকার টাঙ্গাইলের সভায় সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গীরণকারী গায়ে মানে না আপনি মোড়ল গুণ্ডারা এতেও কি সাবধান হবেন না। যদি না হন তবে তাদের গতি "হাতে দিয়ে তেলের থারি সে জন কোথায় গেলিরে আমি কার মেসো রে" র মত হবে। ধনিক বণিক শোষনকারীরা যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন তারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কৃষক শ্রমিক মাত্রেরই শত্রু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতীয় জাতীয় দল

গত ৩রা ৪ঠা এপ্রিল বোম্বাই শহরে নিবারণ দল, জাতীয় দল, স্বতন্ত্র দল হোমরুলার দল প্রতিনিধিমূলক সহযোগীদের দল ও অন্যান্য দলের নেতারা মিলিত হইয়া, সকল প্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারে এক যোগে কার্য্য করিবার জন্য ভারতীয় জাতীয় দল নামে একদল গঠন করেন। গত ১০ই এপ্রিল বাঙলায় ঐ দলের এক শাখা স্থাপন করা হইয়াছে। নবগঠিত জাতীয় দলের উদ্দেশ্য হইতেছে বর্ত্তমান বিশিষ্ট ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া স্বরাজ, বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের অনুরূপ দায়িত্ব মূলক পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন লাভ এবং ইহার কার্য্য প্রণালী হইবে।

(১) সার্ব্বজনীন আইন অমান্য ও টাকা দেওয়া বন্ধ করা ছাড়া অন্যান্য সর্ব্ববিধ আইনানুযায়ী ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে এই রাষ্ট্রীয় দল যোগদান করিবে।

(২) আইন সভা সমূহে সময় মত এইরূপ সহযোগ বা অসহযোগ যাহা আবশ্যক, সেই নীতিই অবলম্বন করিবে।

(৩) এই দল রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে অনুরূপ যে কোন দল বা রাজনৈতিক সমিতির সহিত সহযোগিতা করিবে।

(৪) ভারত সরকারের আইন সমূহ সন্তোষজনক এবং অনুপযুক্ত মনে করা সত্বেও এই দল যথাসম্ভব ঐ আইন কাজে লাগাইবে। সরকারী চাকুরী গ্রহণ প্রভৃতিও দেশের লোকের স্বার্থরক্ষার্থ ও স্বার্থবৃদ্ধিকল্পে এই দল করিতে পারিবে।

(৫) এই দল ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান, অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন প্রভৃতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

(৬) এই দল বিভিন্ন দলের মধ্যে মিলন সংঘটনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

২১ বৎসর বয়স্ক লেখাপড়া জানা যে কোন লোক এই দলের নীতি মানিয়া চলিতে সম্মত হইবেন, তাঁহাকেই এই দলের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

বলশেভিক ষড়যন্ত্রের অভিযুক্ত

(কানপুরের "প্রতাপ" হতে অনুবাদিত)।

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় মুজফ্ফর আহ্‌মদ, নলিনী, শওকৎ উসমানী ও ডাঙ্গের চার বছরের সশ্রম কারাবাসের হুকুম হয়েছিল। তাঁদের অপরাধ এই ছিল যে তাঁরা দেশের সম্বন্ধে আওয়াজ তুলছিলেন,—তাঁরা বলেছিলেন ধনী-নির্ধন একই প্রকার সুখে জীবন কাটাবে। তাঁদের মধ্যে একজন অভিযুক্ত ও এ প্রদেশের অধিবাসী নন। এই জন্যে জল-বায়ু অনুকূল না হওয়ায় জেলে তাঁরা পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। নলিনী আর মুজফ্ফর আহ্‌মদের অবস্থা খুবই খারাব হয়েছিল। সরকার কলঙ্ক থেকে বাঁচবার জন্যে তাঁদের দু'জনকে ছেড়ে দিয়েছেন। অবশিষ্ট দু'জন অভিযুক্ত আর কাল জেলে খুব খারাব অবস্থায় আছেন। শওকত উসমানীর শরীরেত মাংস বলতে কোনো জিনিস নেই,—কেবল মাত্র অস্থি পঞ্জরই অবশিষ্ট রয়েছে। অন্যতম সজ্জন ডাঙ্গেকে সীতাপুর জেলে রাখা হয়েছে। তাঁরও অবস্থা শোচনীয়। এঁদের দু'জনাকে কাহারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়না। কানপুর মজদুর সভার শ্রীযুত রমজান আলী এঁদের দু'জনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে কয়েকবার জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু, তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি কানপুর মজদুর সভার বার্ষিক অধিবেশনে এক প্রস্তাব পাস করে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যে এ বীরদ্বয়কে ছেড়ে দেওয়া হোক্। এ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টকে পাঠানো হয়েছে। সরকারের উচিত নলিনী আর মুজফ্ফর আহ্‌মদের ন্যায় এ দু'জন কয়েদীকেও ছেড়ে দেওয়া। ঈশ্বর না করুন, যদি এ সজ্জনদ্বয় জেলে মরে যান, তাহলে সরকারের নামে যে কলঙ্কের ছাপ পড়বে তা আর কখনো মিটবেনা। আমাদের এসেম্বলী ও প্রাদেশিক আইন সভার মেম্বরদিগকেও অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁরা রোগ শয্যায় শায়িত এই দু'জন অভিযুক্তকে ছাড়াবার যথাশক্তি চেষ্টা করুন।

কৈলাশ বিহারী মিশ্র
সহায়ক মন্ত্রী, মজদুরসভা,
কানপুর।

খড়কুটো

গত ২৩শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে বগুড়া জিলার চন্দন বাইশা নামক স্থানে বিদ্যালয় গৃহে সাহেবের পোনা সংরক্ষণ আইনের প্রতিবাদকল্পে এক মহতী অধিবেশন হইয়াছিল। ধীবর জাতীয় বহু সংখ্যক লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিখিল বঙ্গ আসাম ধীবর সমিতির সেক্রেটারী বরিশাল বাজাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রমণী মোহন বিশ্বাস এবং বগুড়ানিবাসী ব্রজনাথ দাস বর্ম্মণ ও রমেশচন্দ্র বর্ম্মণ আমন্ত্রিত হইয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীগয়ানাথ দাস, ভুবন সরকার, যুধিষ্ঠির সরকার, কালীচরণ সরকার, সহদেব মল্ল বর্ম্মণ, নগেন্দ্রনাথ দাস, জগন্নাথ সরকার, ক্ষুদিরাম হাওলাদার, রাধাকান্ত সরকার, মেহেরউল্লা দফাদার এবং কাবুল দফাদার প্রভৃতি সকলেই সভার সাফল্য সম্পাদনার্থে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সভায় সাহেব পোনা সংরক্ষণ আইনের তীব্র প্রতিবাদ এবং বেঙ্গল ফিসারি আইনের সমর্থন হইয়াছিল। ধীবর জাতির ভিতর প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারসূচক প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে।

গত ২১শে চৈত্র রবিবার ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলের আদাবাড়ীতে আলো মাঠে মৎস্যজীবিদের এক সভা বসেছিল। তাতে আমাদের কৃষক শ্রমিক দলের বগুড়ার শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস মোক্তার ও বরিশালের শ্রীযুক্ত রমণী মোহন বিশ্বাস এবং বগুড়ার মৎস্যজীবি উকিল শ্রীযুক্ত অনন্তচন্দ্র দাস মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হলেম যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জনকয়েক তথাকথিত লোক ভদ্রতার খোলস নিয়ে অভিমানী হয়ে সভায় আসতে আপত্তি করেছিলেন। তারা বলেছিলেন যে তাদের মত উচ্চ জাতীয়গণ মৎস্যজীবীদের সভায় গেলে তাদের সম্মানের লাঘব হবে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আপত্তির গোড়ায় ছিল টাকা। তারা টাকা পাইলেই নাকি তাঁদের সম্মানের হানি হত না। যা হোক শেষ চেষ্টায় মৎস্যজীবিরা বেঁকে দাঁড়ানর ফলে বিনা টাকাতেই আপত্তিকারীরা সভায় এসেছিলেন। সভায় সবচেয়ে সুন্দর বক্তব্য হয়েছিল যে বঙ্গ-আসাম ক্ষত্রিয় সমাজে বাল্য বিধবা বিবাহ প্রচলন ও সামাজিক বাধ্যতা মূলক অবৈতনিক শিক্ষা। শাহ সাহেবের মৎস্যের পোনা সংরক্ষণ বিলের প্রতিবাদ ও হেমন্ত বাবুর ফিসারী বিলের সমর্থন করা হয়েছিল।

যুদ্ধার্থে যে সকল রেল লাইন পশ্চিম ভারতে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে ২৭৪৯:০০১৬৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

স্বরাজ্যদল আগামী নবেম্বরে আবার দল পুষ্ট হইয়া কাউন্সিলে ঢুকিবেন কিন্তু আবার এই অবস্থায় [illegible] কাউন্সিলে যাইয়া হইবে কি? ভোটের জোরে তাঁহারা বাধা দিবেন আর ভোটের জোরে লাট সাহেব কাজ চালাইবেন। সুতরাং তাহাতে ফল খুব সুবিধাজনক হবে না তার চেয়ে তাঁরা যদি পল্লীগঠন কার্য্যে সত্যই একটু মন দিয়ে লাগেন তো দেশের সত্যকার মঙ্গল হয় ঢের বেশী। কারণ আজকাল ‘দল’ বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা এই স্বরাজ্য দলেই দেখা যায়। এদের মধ্যে অনেকেরই কাজ করিবার মত শক্তি আছে, অভাব শুধু প্রবৃত্তির। (নবযুগ)

১৮১৮ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন অনুসারে নিম্নলিখিত ১৭ জন বাঙ্গালী যুবকগণ ধৃত হইয়া আবদ্ধ আছেন।

	কবে ধৃত হইয়াছেন	কতদিন বন্দী
নাম	২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৩	২॥০ বৎসর
মনোমোহন ভট্টাচার্য্য	″	″
সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	″	″
যদুগোপাল মুখার্জ্জি	″	″
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	″	″
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	″	″
মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত	″	″
ভূপতি মজুমদার	″	″
অমৃতলাল সরকার	″	″
রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	″	″
সাবিত্রীপ্রসাদ বানার্জ্জি	২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩	″
জীবনলাল চাটার্জ্জি	৫ই অক্টোবর ১৯২৩	২ বৎসর ৭ মাস
সতীশ চক্রবর্ত্তী	২৩ জানুয়ারী ১৯২২	২ বৎসর ১০ মাস
অমরেন্দ্র গুহ	২৫ জানুয়ারী ১৯২৪	″
কিরণচন্দ্র মুখার্জ্জি	″	″
পূর্ণচন্দ্র দাস	৮ই মার্চ্চ ১৯২৪	২ বৎসর
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী	৯ই মার্চ্চ ১৯২৪	″
প্রতুল গাঙ্গুলী	২২ আগষ্ট ১৯২৪	১ বৎসর ৩॥০ মাস

লাঙলের মূল্য—

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে বার্ষিক ৩৲ টাকা,

ভিঃ পিঃ ৩।০ "

বাণ্মাষিক ১॥৵০ আনা

ভিঃ পি, তে ১৸৵০ আনা

বিদেশে বার্ষিক মূল্য ৬ শিলিং

নমুনার জন্য একখানা ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়।

লাঙলের কর্ম্মকেন্দ্র—

৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা ৩৭, হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত এবং ২৬।১।১, হ্যারিসন রোড, ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড প্রেসে মুদ্রিত।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস।

গণবাণী

গণবাণী

লাঙল ও গণবাণী একীভূত হইয়াছে

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

(WITH WHICH IS INCORPORATED "LANGAL")

Weekly Organ in Bengali of the

BENGAL PEASANTS' AND WORKERS' PARTY

CALCUTTA.

[illegible] বর্ষ, [illegible] সংখ্যা, [illegible]বার, ১২ই আগষ্ট, ১৯২৯, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৬ । [illegible]

—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার—তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।—

—রবীন্দ্রনাথ—

সম্পাদক—[illegible] মোহাম্মদ [illegible]

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা।
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে ৩।
[illegible]

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম বর্ষ] কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১২ই আগষ্ট, ১৯২৬, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৩ [১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

"গণ-বাণী হাতে নিয়ে গণের সেবার জন্যে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলুম। ব্যষ্টির জন্যে, আভিজাত্যের জন্যে, শ্রেণীর জন্যে, আমাদের অভ্যুদয় হয়নি, আমরা এসেছি শ্রমক্লিষ্ট, দালিত-মাথিত-নির্য্যাতিত জন-সাধারণের বাণী বহন করার জন্যে। সকল কিছু উৎপাদন করেও যাদের ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয় না, অবিরত দেহের ও মস্তিষ্কের পরিশ্রম করেও যারা অনশনে-অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে তাদেরই কথা আমাদের বলবার বিষয় হবে। পরাশ্রিত, পরান্নভোজীদের শোষণেব পর শোষণে যারা সর্ব্বহারা হয়ে পড়্ছে বা পড়েছে আজ আমরা তাদের পতাকা উত্তোলন করব। অন্ধ সামাজিকতা যা'দিগকে পিষ্ট ও বিপথে চালিত করে রেখেছে, সত্যের আলোক দেখিয়ে তা'দিগকে আমরা পথে টেনে নিয়ে আস্ব। পেছনের টানে আমরা আর পড়ে রইব না, সম্মুখে দিকে আমরা চল্ব। আমরা চাই ভারতবর্ষ পর-শাসন-কবল হতে পূর্ণ বিমুক্ত হোক, কিন্তু, সে বিমুক্তির ভিত্তি ভারতের জন সাধারণের মতের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে—বিশিষ্ট শ্রেণীসমূহের মতের উপরে নয়। জয় গণ-ভারতের জয়।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল "গণ-বাণী"র প্রকাশ ভার গ্রহণ করেছেন। এই দলের পূর্ব্ব-প্রকাশিত "লাঙল" "গণ-বাণী"র সহিত একীভূত হয়ে গেছে। "লাঙল' এর গ্রাহক যাঁরা হয়েছিলেন "গণ-বাণী তাঁরা পাবেন। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের নিজের ছাপাখানা ছিলনা ব'লে "লাঙল" প্রকাশে অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছিল, অপরের ছাপাখানা হতে কিছুতেই ঠিক সময়ে কাগজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে বিগত ১৫ই এপ্রিলের পর থেকে কাগজ বন্ধ করে দিতে হয়। আমাদের সম্মুখে এই যে সব চেয়ে বড় অসুবিধে ছিল তা দূর করবার জন্যে দলের অন্যতম সদস্য ও সম্পাদক মৌলবী কুতবুদ্দীন আহ্মদ সাহেব নিজে একটী ছাপাখানা করেছেন। তাঁরি ছাপাখানা হতে "গণ-বাণী" ছাপা হয়ে বের হলো। পেছনে ছাপাখানা যখন রইল তখন সকলের সহানুভূতি পেলে কাগজ স্থায়ী হবে এ আশা আমরা করতে পারি।

কলিকাতায় দাঙ্গা
শ্রমিকের প্রতি নিবেদন

(শ্রীনরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল)

[গত এপ্রিল মাসে কলিকাতার দাঙ্গার সময় শ্রীযুত নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল এ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক-দল" এর পক্ষ হতে পুস্তিকার আকারে এটিকে ছেপে বাঁটার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। "লাঙল" হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাতেও প্রবন্ধটি তখন ছাপাতে পারা যায়নি। কলিকাতার দাঙ্গা বাইরে মিটে গেছে বটে, কিন্তু, লোকের অন্তরের দাঙ্গা আজো মেটেনি। সেই জন্যে এখনো ডাক্তার সেনগুপ্তের এ প্রবন্ধ ছাপানোর আবশ্যকতা আছে।

সম্পাদক, গণ-বাণী]

একমাস কাল কলিকাতায় যে ভীষণকাণ্ড চলিতেছে তাহা স্মরণ করিতে দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়, লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়, ঘৃণায় অন্তর ভরিয়া উঠে।

অনেক লোকের ইহাতে প্রাণ গিয়াছে, অনেকে গুরুতর আঘাত পাইয়াছে, বহুগৃহে হাহাকার উঠিয়াছে, অন্নাভাবে অনেকে মরিতে বসিয়াছে। এ সবই দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা এই যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এমনি একটা দাঙ্গা কলিকাতা সহরে সম্ভব হইয়াছে। ধর্মের নামে ধূয়া তুলিয়া হত্যাকারী তার শোণিত-পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছে, বীরত্বের মিথ্যা গৌরব লইয়া হিংস্র মানুষ তার হিংসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

শান্তমনে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে এ ঝগড়ার তলায় যাহা আছে তাহা অতি তুচ্ছ কথা। একটা খড়ের কুটার আগুন যাহা হেলায় আঙ্গুলে টিপিয়া নিভান যাইতে পারিত তাহাকে ফুঁ দিয়া খড়ের গাদায় ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে আর তার ফলে যে ভীষণ আগুন জলিয়াছে তার সামনে সব শান্তির চেষ্টা লাঞ্ছিত হইতেছে।

আত্মীয়ের মধ্যে ঝগড়া খড়ের গাদার আগুন—এ আগুন সহজে জ্বালান যায়, কিন্তু নিভান বড় কঠিন। বাঙ্গালা দেশে ও কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের জীবন নিবিড় ভাবে জড়িত, হিন্দু ছাড়া মুসলমানের চলে না, মুসলমান ছাড়া হিন্দুর চলে না। তাদের ভিতর ঝগড়া তাই ঠিক ভাই ভাইয়ের ঝগড়ার মতই মিটান কঠিন। হিংসায় হিংসার সৃষ্টি করে, একজন ইটটি মারিলে তার উত্তরে পাটকেলটি ছুটিয়া আসে—তাহার আবার সুদ শুদ্ধ প্রতিদান হয়। এমনি বিরোধ বাড়িয়া যায়। হিন্দু যদি একজন মুসলমানকে মারে, মুসলমান তার উত্তরে হয়তো দুইটি হিন্দুকে মারিবে, আর এই যে হিন্দুর উপর আঘাত তার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হইবে সেই হিন্দু যে প্রথম আঘাত করিয়াছে। তেমনি মুসলমান যদি হিন্দুকে মারে তার প্রতিহিংসায় যে মুসলমানের প্রাণ যায় তার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী মুসলমান।

সুতরাং আজ যে সব হিন্দু অকালে শ্মশান যাত্রা করিয়াছেন, তাঁদের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ দায়িত্ব মুসলমানের হইলেও, হিন্দুর দায়িত্ব তার চেয়ে কম নয়। আর যে মুসলমান আজ দাঙ্গার ফলে কবরে গিয়াছেন তাঁর মৃত্যুর জন্য তেমনি মুসলমানের সমান দায়িত্ব।

হিন্দু মুসলমান সকলের পক্ষেই আজ এই কথা স্মরণ করা আবশ্যক। এই কথা যদি আজ তাঁরা স্মরণ করেন তবে তাঁহাদের কেহই আজ জয়ের গৌরবে উল্লসিত হইবেন না, সকলে তাঁদের অপরাধ স্মরণ করিয়া হিন্দু মুসলমানের ভগবানের নিকট নত মস্তকে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন।

কে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করিল, কোন পক্ষ ইহার জন্য বেশী অপরাধী সে কথা লইয়া আলোচনায় কোনও লাভ নাই। এ রকম বিরোধ যেখানে হয় সেখানে প্রত্যেক পক্ষই আপনার দোষ সম্বন্ধে অন্ধ এবং গুণ সম্বন্ধে সজাগ হন। কাজেই এ আলোচনায় কেবল বিরোধের বৃদ্ধি হয়। যাঁরা শান্তির কামনা করেন তাঁদের এ আলোচনা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত।

কোন পক্ষ জয়ী, কে পরাজিত, কি লাঞ্ছিত, কে গৌরবান্বিত সে আলোচনা ইহার চেয়েও বেশী দোষের কথা। যেই জয়ী হউক তার জয়ের গৌরবেই লজ্জিত হইবার প্রয়োজন আছে। আর যদি একপক্ষ পরাজিত হইয়া থাকে, তবে তার পরাজয়ের কথা তাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই বিরোধকে আরও জাগাইয়া তুলিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শান্তি যদি পাইতে হয় তবে এসব আলোচনা নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, উভয় পক্ষের স্মরণ করিতে হইবে শুধু এই কথা যে উভয় পক্ষ এক অতি জঘন্য হত্যাকার্য্যে অত্যন্ত লজ্জাকর এক আত্ম কলহে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কিন্তু ভবিষ্যতে যদি বিরোধ নিবারণ করিতে হয় তবে এ বিরোধের যে গুলি মূল কথা আলোচনা করা দরকার।

ধর্ম্মের জন্য যদি এ বিরোধ হইত তবে দেখিতাম উভয় পক্ষের যোদ্ধা পরম বিশ্বাসী ধার্ম্মিক। কিন্তু লড়িয়াছে কাহারা? সব চেয়ে যারা এ দাঙ্গায় বেশী অগ্রবর্ত্তী সেই গুণ্ডাদের কয়জনের মধ্যে ধর্ম্মের ছায়া মাত্র আছে? অন্য যারা লড়িয়াছে তাদেরই বা কয়জন বুকে হাত দিয়া বলিতে পারে যে তাদের ধর্ম্মের বিশ্বাস খুব বেশী। যে হিন্দু দেবদ্বেষী বলিয়া মুসলমানের মাথায় লাঠি মারিতে গিয়াছে, তাদের মধ্যে অনেকেই দুই বেলা হিন্দু ধর্ম্মের সকল অনুশাসন পদদলিত করিতেছে। যে মোসলমানকে নমাজের সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সে-ই ধর্ম্মের নামে হিন্দুকে হিংসা করিতে ছুটিয়াছে।

আর ধর্ম্মের নাম করিয়া ইহারা একটা তুচ্ছ তর্কের জন্য পদে পদে হিন্দু মুসলমানের উভয় ধর্ম্মের গোড়ার কথা, তার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ আদেশ পদে পদে লঙ্ঘন করিয়াছে। নিরপরাধ পথিকের উপর সহসা আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করা হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্ম্মের চক্ষে যে একটা হীন পাপাচার এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ আছে কি?

যাঁরা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা, আর্ত্তরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষার জন্য লড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবার কিছু নাই। তারা বীর ও ধার্ম্মিক বলিয়া সকলের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যে কেহ ধর্ম্মের বা স্বধর্ম্মীর লাঞ্ছনার প্রতিহিংসার জন্য বিরুদ্ধ ধর্ম্মী বা

তার ধর্ম্মানুষ্ঠানকে লাঞ্ছনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁদের সে গৌরবে অধিকার নাই। তাঁরা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন এ দাবীও করিতে পারেন না।

ধর্ম্মের রক্ষার জন্য এ দাঙ্গা হয় নাই, ধর্ম্মের নাম লইয়া যুগে যুগে নানা পাপ অনুষ্ঠান হইয়াছে। এ দাঙ্গা তারই মধ্যে একটি। ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়ের ধর্ম্ম লাঞ্ছিত হইয়াছে, ধর্ম্মের কোনও উপকার হয় নাই। পাশব নৃশংসতা ও অন্ধকার-অজ্ঞতা কেবল ধর্ম্মের একটা খোলস লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছে মাত্র।

হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মের সার কথা এই যে ধর্ম্ম আমাদের অন্তরের গোপন সম্পদ। বাহিরের লাঞ্ছনায় ইহা লাঞ্ছিত হয় না, কেবল অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে ইহা রক্ষিত হয় না। এই সত্য যে আয়ত্ত করিয়াছে, তার কাছে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঢাক বাজাইবার অধিকার এবং মসজিদের কাছে ঢাক বাজাইতে না দেওয়ার অধিকার লইয়া বাদানুবাদ হাস্যাস্পদ, তা লইয়া মাথা ফাটা ফাটি ধর্ম্মের একটা নিদারুণ উপহাস বলিয়া মনে হইবে।

ইহা যে সম্ভব হইয়াছে তার কারণ এই যে হিন্দু বা মুসলমান কেহ আজ ধর্ম্ম চান না, চান ধর্ম্মের জাঁক, সম্প্রদায়ের গৌরব, দলের শক্তি! তাই ঋষি উপদেষ্টার আসন লইয়াছে আজ অজ্ঞ ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক, আর ইমামের স্থানে বসিয়াছে নিরক্ষর মোল্লা। আর স্বার্থান্বেষী, হিংস্র, প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন গুণ্ডার দল উভয় সমাজকে কানে ধরিয়া বাঁদর নাচ করাইতেছে।

এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইবে। ধর্ম্মকে জীবনের ভিতর সত্য করিয়া তুলিতে হইবে, উদার সত্য ধর্ম্মের উপদেশে অন্ধের চক্ষে আলো ফুটাইতে হইবে, অন্তরে হিংস্র দানবের স্থলে বিশ্ব দেবতার আসন পাতিতে হইবে।

সত্য-ধর্ম্ম কি তাহা যখন সকলে জানিবে তখন গুণ্ডার সেনাপতিত্বে হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম লইয়া দাঙ্গা করিতে অগ্রসর হইবে না। প্রত্যেকে আপনার অন্তরের ভিতর সত্য ধর্ম্মের সেবা করিয়া চরিতার্থ হইবে, ধর্ম্মমতের বিরোধ লইয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে মাথা কাটা ফাটি করিতে যাইবে না।

সুতরাং এ বিরোধ নির্ম্মূল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই শিক্ষা। ধর্ম্মের শিক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু সুধু তাই হইলেই চলিবে না, চারিদিক দিয়া লোকের চোখ ফুটাইতে হইবে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার মূল কারণ শিখাইতে হইবে শত্রু মিত্র চিনিতে শিখাইতে হইবে। আর সমাজের যে অপব্যবস্থায় এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড সম্ভব হইতেছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

কেন এ দাঙ্গা সম্ভব হইয়াছে?

গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিলে কয়েকটি বিষয় চোখে পড়ে, সে গুলি নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

কলিকাতায় বহু গুণ্ডা আছে, তারা বিনা কারণে লোকের প্রাণ লইতে দ্বিধা করে না। তাহারাই এ দাঙ্গা সংঘটন করিয়াছে।

এ কথা সত্য, কিন্তু কেন এত গুণ্ডা আছে? কি জন্য গুণ্ডামী সম্ভব হইয়াছে?

তা ছাড়া, ইহা যদি কেবল মাত্র গুণ্ডাদের কাজ হইত তবে দুই দিনেই তাদের শক্তি, ও সামর্থ্য নিঃশেষ হইয়া যাইত। কে ইহাদের এই কাজ বাঁচাইয়া রাখিল? কিসের জন্য রাখিল? কেমন করিয়া রাখিল?

এঝগড়াটা কাদের? কাহারা উৎসাহ দিল?
আর ইহাতে মরিল কাহারা?
এ সব কথা ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন আছে।

যদি উভয় পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ধনী সম্প্রদায় না থাকিত তবে গুণ্ডার লড়াই দুই দিনে শেষ হইয়া যাইত।

ধনী যাঁরা লড়িয়াছেন তাঁরা নিজ নিজ প্রাসাদের বেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া হুকুম দিয়াছেন। মরিয়াছে অন্ততঃ বার আনা রকমে কেবল গরীব। আর আজ দাঙ্গার ফলে অনাহারে মরিতে বসিয়াছে তাহারাই যারা গরীব, যাদের দৈনিক পরিশ্রম করিয়া ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করিতে হয়।

সামান্য কারণে বা বিনা কারণে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সহসা লড়াই করিতে যায় তারাই সংসারে যাদের বাঁধন কম, সমাজের শৃঙ্খলায় যাদের স্বার্থ সামান্য। সম্পন্ন গৃহস্থ গুরুতর আপদ উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষার্থ লড়াই করিতে লাগিতে পারেন—কিন্তু যে কোনও একটা তুচ্ছ ওজুহাতে লাঠি হাতে করিয়া বাহির হন না। কথায় বলে নেংটার বাটপাড়ের ভয় নাই। প্রথম ঝোঁকে যারা লড়াই করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল তারা এই নেংটার দল। যারা দোকান লুটিতে গিয়াছিল তারা বুভুক্ষিত হিংস্রের দল, যাদের ধরা পড়িলে লোকসান হইবার কিছু নাই এবং যাদের নিজের ঘরে লুটিবার মত জিনিস নাই।

যে ক্ষুদ্র দুই দলের ভিতর প্রথম ঝগড়া বাধিয়া ছিল, তাহাদের কেহই এ দাঙ্গা একদিনের বেশী চালাইতে পারিত না। কিন্তু তাদের কাজে দুই দলে এমন সব লোক ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন যাঁরা ধনের বলে, প্রতিপত্তির বলে বলীয়ান। যদি তাঁহাদের নিজেদের লড়িয়া নিজেদের মনের আক্রোশ নিবারণ করিতে হইত, তবে সে লড়াই কখনও হইত না। কেন না, তাঁদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি যতই প্রবল হউক তাঁরা তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য আপনাদের মূল্যবান প্রাণ হাতে করিয়া আসিতেন না। কিন্তু টাকার জোরে লোক মিলিল। ভাড়াটিয়া গুণ্ডা জুটিল, আশাতীত পুরস্কারের লোভে দরিদ্র শ্রমজীবী পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল—যতই দিন যাইতে লাগিল, শ্রমজীবীর রোজগারের পথ যখন বন্ধ হইতে চলিল তখন তারা দলে দলে আসিয়া দাঙ্গায় যোগ দিল।

এমন একদল লোক যদি না থাকিত যারা টাকার জন্য জান দিতে বা নিতে সমান প্রস্তুত, অভাবে যাদের মনুষ্যত্ব পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, অজ্ঞানে যারা অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, তবে হিংসোন্মুখ ধনীর দল তাদের টাকার কাঁড়ি লইয়া বৃথাই বসিয়া থাকিতেন, রাগে তাঁরা যতই ফুলুন, দাঙ্গা হইত না।

কালকার সমাজে সর্ব্বত্র যাহা হইতেছে এখানেও তাই হইয়াছে, শ্রমিক ও দরিদ্রের শক্তির অপব্যবহার করিয়া ধনী তাঁদের নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। তাদের ধ্বংশলীলার জন্য দায়ী এই ধনীর দল।

আর ইহার ফল ভোগ করিতেছে কে? কত লোক প্রাণ দিয়াছে কত লোককে জেলে যাইতে হইবে বা ফাঁসী কাঠে ঝুলিতে হইবে কে জানে? যাহারা যাইবে তাহারা সামান্য অর্থের জন্য এসব অনায়াসে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহারা ফাঁসী যাইবে, কয়েদ হইবে, যে ধনী তাহাদিগের শক্তির ব্যবহার করিয়া এ ঘোর অনিষ্ট সংঘটন করিয়াছেন তাঁহাদের অতিরিক্ত অর্থের সামান্য ক্ষতি বই কেশাগ্রও ছোঁয়া যাইবে না।

কলিকাতায় ইহারা যে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছে তার ফল ভোগ করিতেছে কাহারা। সামান্য বেতনে যারা কোনও মতে দিন গুজরান করে তাহারা কেহ বা প্রাণভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছে, কেহ বা এখানে বসিয়া একদিকে কাজের অভাব অপর দিকে প্রাণের ভয় লইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। কবে যে আবার কাজ জুটিবে তাহার স্থিরতা নাই, কবে যে তাদের উপবাস ভাঙ্গিবে অভাগ্যেরা তাহাও জানে না।

কোটি কোটি টাকার লোকসান হইবে এই অরাজকতায়। ধনীর যে ক্ষতি তাহার তাহা সহিবার শক্তি আছে, গরীবের ক্ষতি অনশন। কলিকাতায় খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়িয়া গিয়াছে ধনীর যাহাতে সামান্য ক্ষতি গরীবের সেখানে অনাহার।

দাঙ্গা মিটিয়া গেলে ধনী তাহার প্রাসাদ হইতে নামিয়া আসিয়া মোটরে হাওয়া খাইতে ছুটিবেন। শ্রমিক হয়তো পড়িয়া থাকিবে, অনাহারে ক্লিষ্ট ব্যাধিতে পীড়িত, নির্ম্মম প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সে ভুগিয়া মরিবে।

ধনীর পক্ষে এ ধ্বংসলীলা একটা সৌখীন খেলা হয় তো বা রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা দাবার চাল। কিন্তু শ্রমিক ও দরিদ্রের পক্ষে ইহা মৃত্যু।

গরীব ও শ্রমজীবী একথা এতদিনও বুঝিতে পারে নাই। তারা কি এখন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছে না যে এ বিরাট দাঙ্গা একটা ধনীর পাশা খেলা, গরীব সুধু এ খেলার ঘুঁটি। ধনীর খেয়াল, তার হিংসাবৃত্তি, হয় তো বা তার সৌখীন ধর্ম্মোন্মাদের পরিতৃপ্তির জন্য, তারা কি আবার তাদের জীবন বিপন্ন করিতে যাইবে? তাদের অন্নের ক্ষুদ্র গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া ছুটিবে। কিসের জন্য? ইহাতে তাদের কোনও স্বার্থ নাই, কোনও পুরস্কার নাই। পুরস্কারের ভাগী ধনী, তিরস্কারের ভাগী হইবে সুধু তাহারাই।

চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ ভাই শ্রমিক। অন্ধের মত ধনীর হাত ধরিয়া খানায় পড়িয়া মরিও না। ভেড়ার পালের মত ধনীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া কসাইয়ের ছুরীর মুখে গলা বাড়াইয়া দিওনা। আপনার স্বার্থ আপনারা বুঝিতে শেখ, আপনারা মিলিয়া আপন বুদ্ধিতে কাজ করিতে আরম্ভ কর। যারা তোমাদের শ্রমের উপার্জ্জনে পেট মোটা করিয়া তোমাদিগকে আধপেটা খাওয়াইয়া রাখিয়াছে তারা যে তোমাদের বন্ধু নয় সে কথা বুঝিতে শেখ। আর তোমাদের খণ্ড শক্তি সমবেত করিয়া নিযুক্ত কর, ধনীর খেয়াল মিটাইতে নয়, নিজের উন্নতি করিতে, ধনীর অন্যায় লাভ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আপনার বাঁচিবরে অধিকার প্রতিষ্টিত করিতে। মানুষের মত বাঁচিবার জন্য প্রাণ পণ কর, সত্য জানিবার ও বুঝিবার শক্তি অর্জ্জন কর, ধনীর হাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া এমনি করিয়া মরণের পথে চলিও না। হিন্দু হও মুসলমান হও, তোমাদের সবার এক স্বার্থ এক অধিকার—সেই অধিকার হইতে তোমাদিগকে যাহারা বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের ধোকায় ভুলিয়া আপনা আপনি মারামারি করিয়া তাহাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করিওনা, নিজের মরণ ডাকিয়া আনিওনা।

খোলা চিঠি

শিক্ষিত তরুণ মুসলিমগণের

বরাবরে—

বন্ধুগণ,

আমার প্রাণের কথাগুলো নিবেদন করব বলে আজ এই চিঠিখানা আপনাদিগকে লিখ্‌ছি। আপনাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই আমায় চেনেন, কিন্তু, যে বিষয় নিয়ে আমি আজ আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছি, তার জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে চেনা শোনা থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। বর্ত্তমান সময় আমাদের দেশের উপর দিয়ে একটা প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছে এবং সেই ঝড়ের দ্বারা দেশময় একটা সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দেশে ও সমাজে এমন সব কারণ বর্ত্তমান রয়েছে যার জন্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি না হয়েই পারে না, তবে এই বিক্ষোভটাকে যে সাম্প্রদায়িক রং এ রঞ্জিত করা হয়েছে, সেটা শুধু এ দেশের পক্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষে একটা মর্ম্মান্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের একটা দুর্নাম রয়েছে যে যুগ-সমস্যা সম্বন্ধে আপনারা কখনো স্বাধীন ভাবে কোনো চিন্তা করতে চান না। আপনাদের এই বদনাম আছে বলেই বিশেষভাবে আপনাদিগকেই সম্বোধন করে এ চিঠিখানা লিখ্‌তে আমি বাধ্য হয়েছি। আপনারা শিক্ষালাভ করেছেন এবং আজো করছেন। মানুষ যদি স্বাধীন চিন্তা না ক'রে, নিজের ধীশক্তির দ্বারা কোনো বিষয়কে আয়ত্ত না ক'রে, কেবলমাত্র গতানুগতিকতার স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দেয় তবে তার সে শিক্ষা-দীক্ষার কিছুই কি মূল্য আছে? আপনারা প্রত্যেক বিষয়কে যুক্তি ও বিবেচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ করুন, আপনাদিগকে এ বিনীত অনুরোধ আমি সর্ব্বপ্রথমেই জানিয়ে রাখ্‌ছি।

স্বার্থপর লোকেরা, শোষণবাদের হীন ভৃত্যরা, আজ ভারতবর্ষকে দুর্দ্দশার পথে যতটা সম্ভব টেনে নিয়ে এসেছে। আপনারা তরুণের দল সর্ব্ব বিষয়ে অবহিত হয়ে এই দুষ্ট সম্প্রদায়ের ঘৃণিত নষ্টামী হতে দেশকে, মানবতাকে রক্ষা করুন। আজকের দিনে পৃথিবীর বুকে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক স্থায়ীভাবে বাস না করে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান এবং আরো কত সম্প্রদায়ের লোক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাস করে আসছে। ইস্‌লাম ধর্ম্ম ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে বটে, কিন্তু, মুসলমান যা এসেছে তার সংখ্যা অতি নগণ্য। এই ভারতবর্ষেরই লোক ইস্‌লামকে আলিঙ্গন করেছে। এই দেশের অধিকাংশ মুসলমানই এই দেশের হিন্দু কিংবা বৌদ্ধের বংশধর। যে সকল মুসলমানের পূর্ব্ব পুরুষ বাইরে থেকে এদেশে এসেছিল তারাও নিজেদের শরীরে খাঁটি বৈদেশিক রক্ত আছে বলে দাবী করতে পারেনা, কেননা, তাদের বিয়ের কনে বিদেশ হতে আমদানী করা হয়নি। ভারতের হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ যেমন ভারতের অধিবাসী এবং ভারতেরই অন্ন-জলে মানুষ, ভারতের মুসলমানেরাও ঠিক্ তাই। ভারতের একটা অতি প্রাচীন সভ্যতা ছিল। বিশ্বের দরবারে এই সভ্যতার খুব একটা বড় জায়গাও আছে, আর এ সভ্যতাটি হিন্দুর শুধু এক চেটিয়া সম্পত্তি নয়, এটা ভারতের

মুসলমানেরও সম্পত্তি। ভারতের প্রাচীন হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ সভ্যতাকে যে মুসলমানরা আপনাদের বলিয়া মানিয়া নিতে চায়না এটাযে তাদের পক্ষে নিতান্তই মূর্খতা সে কথা মেনে নিতেই হবে। গ্রীস যখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল তখন গ্রীসের অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু, তাই বলে পৌত্তলিকতা বিদ্বেষী খৃষ্টান-গ্রীস তাদের পূর্ব্ব সভ্যতাকে কখনো অস্বীকার করেনি এবং চিরকাল তার জন্যে মহান্ গৌরব অনুভব করে এসেছে। চীনের মুসলমানেরা আজো চীনের সভ্যতাকে তাদের নিজস্ব সভ্যতা বলে খুব গৌরব অনুভব করছে। সে যুগের মুসলমানরাও নানা দেশের নানা জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে রত্ন আহরণ করে নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল। এইদিক দিয়ে তারা যদি বর্ত্তমান ভারতের মুসলমান-দের ন্যায় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করে রাখত তা হলে বিশ্ব সভ্যতার রত্নাগারে তারা কোনো অবদানই দিতে পারত না। মুস্লিম সভ্যতার ভাণ্ডারে প্রাচীন ভারতেরও দান নিতান্ত অল্প নহে।

মুসলমানরা এদেশে তাদের সৃষ্ট সভ্যতার ক্ষীণতম বর্ত্তিকা মাত্র নিয়ে এসেছিল। তথাপি, ভারতীয় শিল্প, কলা ও সঙ্গীতে মুসলমানের দান খুব বেশী। এ শিল্প, কলা ও সঙ্গীত জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেরই প্রাণের জিনিস। এই অব-দান গুলো হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দ্বারা নব নব রূপে শোভিত হচ্ছে। আজকের দিনে হিন্দু কিংবা মুসলমান কেহই বলতে পারে না যে এটা মাত্র আমারই জিনিস।

বড় দুঃখ যে সত্য দৃষ্টির অভাবে আমরা অনেক জিনিসেরই সত্যরূপ ধরতে পারিনে এবং তার জন্যে নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি করে বসি। হিন্দু মুসলমান উভই স্রষ্টার এবং একইমাত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকে। উভয়েই ধর্ম্ম মেনে থাকে এই স্রষ্টারই সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে। আবার হিন্দু মুসলমান এ ধর্ম্মেরই রক্ষার জন্যে পরস্পর পরস্পরের গলাও কেটে থাকে। জানিনে, স্রষ্টার এ কিরূপ ধর্ম্ম, আর কি আনন্দ পান তিনি এতে! আমার শিক্ষিত তরুণ মুস্লিম বন্ধুগণ, আপনারা এ সমস্ত ব্যাপার গুলোকে তলিয়ে বুঝুন এবং বুঝে এর প্রতিকার করুন। একই দেশের লোক, একই সভ্যতার অধিকারী, এবং একই অন্ন-জলে লালিত পালিত হয়ে কেন উভয়ের মধ্যে এ বৈষম্যের সৃষ্টি হল? কেন মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে? আপনারা শিক্ষিত লোক, বুকে হাত দিয়ে কখনো একথা বলতে পারবেন না যে ধর্ম্মের জন্যে এসব হচ্ছে। মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গেলে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা হয় কিংবা অপকর্ম্ম করা হয় এমন কথা কোনো শিক্ষিত লোক মেনে নিতে পারে না, আর যদি কোনো শিক্ষিত লোক একে সত্য বলে মেনেও নেয় তা-হলে বলতে হবে, কাণাকড়ির শিক্ষাও তিনি পাননি। হিন্দুরা অনেক সময় মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে যায়নি। তাতে তাদের ধর্ম্মের কোন হানি হয়নি। আবার অনেক সময় হিন্দু মুসলমান উভয়েই মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গিয়েছে। তাতে মসজিদের বা নমাজের এতটুকুও ক্ষতি হয়নি। মিঃ আবদুল করীম গজনবী বাজা বাজানোর বিরুদ্ধ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁর পুত্রের সহিত খান বাহাদুর আবদুল মোমেনের কন্যার বিবাহ বর্দ্ধমান জিলার মাহতা গ্রামে হয়ে গেছে। গজনবী সাহেব কলকাতা শহর থেকে ব্যাণ্ডপার্টী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। মোমেন সাহেবের বাড়ীর মসজিদের সম্মুখে এই ব্যাণ্ডপার্টি প্রাণ খুলে বাদ্য বাজিয়েছিল। তখন কিন্তু মসজিদেরও অবমাননা হয়নি, আর নমাজেরও কোনো ক্ষতি হয়নি! এক মাড়োয়ারী আজীবন পল্টনে গোমাংস সরবারহ করে একবার গো-হত্যা করার জন্যে নরহত্যার (মুসলমান হত্যার) ব্যবস্থা করেছিল। এমনি ভাবে ধর্ম্ম নিয়ে যারা ছিনি-মিনি খেলে তারাই হয়ে ওঠে ধর্ম্মধ্বজ।

সমাজে আর্থিক অসন্তোষটা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলিম-বিরোধ এই অসন্তোষেরই ফল। ইহা সমাজে নানা দিক থেকে নানা ভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। শোষকের প্রতি শোষিতের একটা স্বাভাবিক বীতরাগ আছে, যতদিন না সমাজ দেহ হতে শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হচ্ছে ততদিন এ বীতরাগও যাচ্ছে না কিছুতেই। পরাশ্রিত, পরান্নভোজী ধনিক্ সম্প্রদায় যতই শোষণ ক্রিয়াদ্বারা দেশের জনসাধারণকে সর্ব্বহারা করে তুলছে ততই তাদের প্রতি জন সাধারণের একটা আক্রোশ আপনা হতেই বেড়ে উঠ্ছে। অত্যাচারী ধনিকের দল জন-সাধারণের এই আক্রোশ হতে নিজেদেরকে বাঁচাতে চায়, এবং এই বাঁচারই জন্যে তারা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষের ন্যায় ধর্ম্মক্লিষ্ট দেশে ধনিকদের পক্ষে এর চেয়ে বাড়া সদুপায় আর কি হতে পারে?

বাংলা দেশে সরকারী আঁফিস আদালতে হিন্দু চাকুরের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ হিন্দুরা আগেই ইংরাজী লেখাপড়া শিখে আফিস আদালত গুলো দখল করে নিয়েছে। এখনো হিন্দু বড় চাকুরেরা আপন আপন আফিস গুলোর ছোট ছোট পদগুলো তাদের আত্মীয় স্বজন, কমপক্ষে স্বধর্ম্মাবলম্বীদের দিয়ে পূরণ করে নিচ্ছে। মুসলমান হলেও তাই করত, এবং এখনো যে কোথাও কোথাও না করছে তা নয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানের আজকাল খুবই ঝোঁক চেপেছে। সুশিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ দলে দলে চাকুরীর উমেদারীতে ঘুরে ঘুরে চাকুরী জোটাতে পারছে না। তাদের প্রতি অনেক জায়গায় অবিচারও হচ্ছে, অর্থাৎ যোগ্যতর মুসলমানকে না নিয়ে অযোগ্য হিন্দুকে হিন্দু অফিসারের কারসাজিতে চাকুরীতে নেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছদের অন্তরালে এখানেও সেই অর্থ-নীতিক সমস্যা! আমি আগেই বলেছি হিন্দু যা করছে, মুসলমানও বাগে পেলে ঠিক্ তাই করছে। কিন্তু, কে তলিয়ে বুঝতে যায় এসব কথা? ভাত কাপড়ের ব্যবস্থায় অপারগ শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ হিন্দুর প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাবাপন্ন হয়ে উঠ্ছে তাদের প্রতি অবিচারের জন্যে। শোষণবাদের দালালেরা এই বিদ্বেষ যাতে দিন দিন বাড়তে থাকে একান্ত ভাবে তারি চেষ্টা করছে। আমার তরুণ বন্ধুগণ, আপনারা দালালের জালে ধরা পড়েছেন। মনে করেছেন আপনাদের অভিযোগের প্রতিকার এই দালালদের দ্বারা হবে। কিন্তু, একটুকু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে তা একেবারেই সম্ভবপর নহে। সরকারী চাকুরীর দ্বারা আপনাদের ভাতকাপড়ের প্রশ্নের সমাধান হবে না। আপনাদের তথাকথিত নেতৃগণ শতকরা যে কয়টি চাকুরী চাইছেন তার সব ক'টিও যদি একই দিনে আপনাদের দেওয়া হয় তবুও আপনাদের অধিকাংশ লোক বেকার থেকে যাবে। বন্ধুগণ, যে পথে বেকার সমস্যার মীমাংসা আপনারা করতে চাইছেন সে পথে তার মীমাংসা কস্মিন কালেও

হবে না। আপনারা হিসাব-পত্র মিলিয়ে, আঁক কষে দেখুন আমার কথা সত্য কি না। আর্থিক অসন্তোষ সমাজে কেন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তার মূল কারণ আপনারা অনুসন্ধান করে বের করুন এবং সেখানেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। কোনো সম্প্রদায় বিশেষের উপরে অভিমান করে, বিদ্বিষ্ট ভাবাপন্ন হয়ে, কখনো এ সমস্যার সমাধান হবে না।

পরাশ্রিত ও শোষণকারিগণের হাত হতে আপনারা যদি স্বত-সর্ব্বস্ব উৎপাদকদিগকে রক্ষা করে উৎপাদিত সামগ্রীর যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবেই সকল প্রশ্নের সমাধান হবে, নতুবা নয়। এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্যে সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষের পূর্ণ জাতীয় মুক্তি লাভ করা একান্তই আবশ্যক। আপনারা তারি জন্যে বদ্ধ পরিকর হউন।

সবচেয়ে দুঃখকর দারিদ্র্য হচ্ছে মনের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যের হাত হতে আপনারা নিজেদেরকে রক্ষা করুন। নিম্নস্তরে অবস্থান করলে সব জিনিসকেই উচ্চ-নীচ বলে বোধ হয়, কিন্তু, উপরের ধাপে উঠলেই সবই হয়ে যায় সমান। আপনারা মানবতার উচ্চধাপে আরোহণ করে আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষাকে সার্থক করে তুলুন।

মনুষ মাত্রকেই যদি স্রষ্টার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলে মেনে নিতে হয় তা হলে হিন্দুকে হিন্দু হওয়ার জন্যে ঘৃণা করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। মুসলমানকেও ঘৃণা করার তাদৃশ কোনো অধিকার হিন্দুর নেই। অথচ আজকের দিনে এই ঘৃণা করাটাকেই ধর্ম্ম বলে মনে নেওয়া হয়। আরো মজা এই যে ঘৃণার ভিতর দিয়েই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ হবে এ কথা হিন্দু-মুসলমান মোল্লা-পুরোহিতরা অবলীলাক্রমে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এইরূপ প্রচার করার উপরেই সমাজের এই পরাশ্রিত জীবগুলোর জীবন-মরণ নির্ভর করছে। কতকগুলো বাইরেকার ব্যবধান সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য বাড়োনোতেই এদের সমূহ লাভ। আপনারা এদের হাত থেকে জন-সাধারণকে রক্ষা করুন। সমাজকে, মানবতাকে, কত নীচে যে এরা অবনমিত করে রেখেচে একবারও কি আপনারা সে দিকে চেয়ে দেখবেন না? নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের কথা আপনাদের বেশ মনে আছে। সে আন্দেলোনের সময় অনেক বড় বড় মোল্লারাই "ফতোয়া" জারি করেছিল যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত কোনোরূপ সম্বন্ধ রাখাই মহাপাপ। সেই মোল্লারাই আজকের দিনে আবার "ফতোয়া' জারি করছে যে হিন্দুর সাথে সদ্ভাব রাখা অন্যায়। শুধু তা নয়, তারা এও বলছে যে বিদেশী শোষণ-তন্ত্র এদেশে মুসলমানদের মঙ্গলের জন্যেই রয়েছে। এই শ্রেণীর মোল্লাগুলোর 'ফতোয়া' র কোনো কি মূল্য আছে? এরা মানুষকে বলে দুনিয়া অসার, অথচ এ দুনিয়ার সারটুকু নিঃশেষে পান করার জন্যে এরা করতে না পরে এমন কোন কাজ নেই। এ ভাড়াটে মোল্লাদের কথায় আপনারাও যদি বিপথে চালিত হন তাহলে আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষা সবই বিফলে যাবে। মুসলমান হোক, হিন্দু হোক, অত্যাচারী সর্ব্বত্রই অত্যাচারী। অত্যাচার করার বেলা সে কখনো হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য করে না। ক'বছর পূর্ব্বে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে হিজরাৎ আন্দোলন হয়েছিল, এ কথা আপনারা জানেন। সে সময়ে ২৫ হাজার মুসলমান আফগানিস্থানে চলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত যুবকও ছিল। যে ব্যবহার পাবে আশা করে আফগানিস্থানে ভারতীয় মুসলমানরা গিয়েছিল, সে ব্যবহার তারা সেখানে পায়নি। ফলে, তাদের অনেকেই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময়ে আফগানিস্থানের বাহিরে তুর্কমান মুসলমানদের হাতে তারা নানারূপে নির্য্যাতিত হয়েছিল, এমনকি, তাদের স্কন্ধ-বিলম্বিত 'কোর-আন এর দ্বারা তুর্কমানরা ফুটবল পর্য্যন্ত খেলেছিল। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তারা মুসলমানের প্রতি এমন ঘৃণিত ব্যবহার করেছিল সে কথা বলা নিরাপদ নয়। তবে এতটুকু আপনারা মেনে রাখুন যে এ ব্যাপারে পেছনে টাকারই খেলা ছিল। স্বার্থে স্বার্থে যেখানে সংঘাত বাধে সেখানে কাহারো মুসলমান অ মুসলমান জ্ঞান থাকে না।

ইউরোপের শোষণবাদীরা 'প্যান্ ইস্‌লামীজম্' নামকএকটা কথার সৃষ্টি করেছে। এ জিনিসটি এদেশে অনেক অ-মুসলমানের মাথা বিকৃত করে দিয়েছে, অনেক মুসলমানেরও যে মাথা কিছু কিছু বিকৃত হয়নি এমন কথা বলা কঠিন। এ তথা কথিত 'প্যান্ ইস্‌লামীজম' এর পূর্ণ ইতিহাস এখানে দেওয়ার জায়গা নেই। পারস্যের একজন প্রখ্যাত নামা নির্ব্বাসিত মুসলমান—জামালুদ্দীনের নাম এ আন্দোলনের সহিত সংসৃষ্ট রয়েছে। জামালুদ্দীনের আন্দোলন সত্যকার ভাবে মুস্‌লিম আন্দোলন ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ইউরোপের কবল হতে এসিয়াকে বাঁচাতে। এসিয়ার অত্যাচারী রাজার অবিচারের হাত হতে নির্য্যাতিত প্রজামণ্ডলীকে উদ্ধার করাও তাঁর আন্দোলোনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইস্‌লামের 'শরিয়ৎ, (থিওলজী)এর সহিত জামালুদ্দীনের আন্দোলনের এতটুকুও যোগ ছিল না, বিশ্বের মুসলমানদিগকে সঙ্ঘ-বদ্ধ করার স্বপ্নও তিনি কখনো দেখেন নি। মিসরে যখন জামালুদ্দীন তাঁর সঙ্ঘের কার্য্যালয় স্থাপন করেছিলেন তখন য়ূহুদী, খ্রীষ্টান, ও মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক তাতে যোগদান করেছিল। পারস্যের অত্যাচারী নৃপতি নাসের-উদ্দীন ও তুরস্কের দ্বিতীয় আবদুল হামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জামালুদ্দীন তুমুল আন্দোলন করেছিলেন। যদি কেবলমাত্র মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করার আন্দোলন তাঁর হত, তা-হলে তাতে অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোকেদের যোগদান করার কিছু মাত্র কারণ ছিল না। এ হেন জামালুদ্দীনকে বিষ-প্রয়োগে যিনি হত্যা করেছিলেন তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মুসলমান—তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ খান্। আশ্চর্য্য এই যে এই আবদুল হামীদ নাম আবার প্যান্ইস্‌লামিক্ আন্দোলনের সহায়করূপেও উল্লিখিত হয়ে থাকেন। আমি জানি অনেক মুসলমান যুবক এ সব বিষয় না জেনে না শুনে বিশ্ব-মুসলিম সঙ্ঘ স্থাপনের স্বপ্ন দেখে থাকেন। তাঁদের বোঝা উচিত বিশ্বটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নয়—খুব একটা বড় জিনিস। বিশ্বের ব্যাপারটা মুসলিম-খ্রীষ্টান বা হিন্দু-জনীন কখনো হবে না, হতে পারে না। বিশ্ব-মানব যে দিন তাদের মানবতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে সে দিন বিশ্ব-মানব-সঙ্ঘ স্থাপিত হবে,—বিশ্ব-মুসলিম-সঙ্ঘ কিংবা বিশ্ব-খৃষ্টান-সঙ্ঘ নয়।

আমার পত্রখানা সুদীর্ঘ হয়ে পড়ছে, হয়তো আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে, কাজেই আর বেশী আমি বাড়াব না। সাম্প্রদায়িকতা মানবতার চেয়ে কিছুতেই বড় নয়। এমন কাজ আপনারা করবেননা যাতে মানবতার নামে কলঙ্ক লেপিত হতে পারে। যে মানুষ অপর দশজন মানুষকে শোষণ করে, তাদের

মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়,—হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক,—সে ঘৃণার পাত্র। তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে দাঁড়াতে হবে। শতকরা ৯৮জনের পক্ষ আমরা অবলম্বন করব, দু'জনের নয়। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আমাদের গৌরবের বস্তু। কিন্তু, প্রাচীন বৈদিক ভারতে ফিরে যেতে আমি আপনাদের ডাক্‌ছিনে। অনাগত মহা-ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মুখে পড়ে রয়েছে। তারি আবরণ উন্মোচন করার জন্যে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি।

দেশের কাজে, নির্য্যাতিতের কাজে, মানুষের কাজে আপনারা পশ্চাদ্‌পদ—আপনাদের এ কলঙ্ক বিমোচন করুন। আপনাদের চিন্তার ধারাকে কেবল মাত্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতরে অবরুদ্ধ রেখে গলা টিপে মারবেন না, এ হচ্ছে আপনাদের নিকটে আমার শেষ অনুরোধ।

আপনাদের প্রীতির ভিখারী—
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

অনাগত যুগের ব্রাত্য

(শ্রীসৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর)

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রায়ই যে অভিযোগ শুনতে পাই সেটি হচ্ছে এই যে শাসক সম্প্রদায়ের কোন লোকের সঙ্গে যদি শাসিত সম্প্রদায়ের কোন লোকের বিবাদ হয় তা হলে ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়ের তুলাদণ্ডে শাসিতের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজের বিচারের বিরুদ্ধে দেশের লোক আস্থাহীন। যে কারণে তারা আস্থাহীন সেটি হচ্ছে এই যে অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে যে ইংরাজ রাজপুরুষ বিচারকের যতটা নিরপেক্ষ থাকা উচিত আপনার সম্প্রদায় যেখানে অভিযুক্ত সেখানে সেই নিরপেক্ষতা রাখেন না। কিন্তু শুধু ইংরেজকে দোষ দিলে হবে কেন? আমরা নিজেরা কি জোর গলায় বলতে পারি যে আমাদের মন এই হীন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর থেকে একটুও মুক্ত! নিজেকে পরিবারের দিক থেকে দেখে, কোন বিশেষ সমাজভুক্ত লোকের দিক থেকে দেখে, সম্প্রদায়ের দিক থেকে দেখে আমরা কি পদে পদে মনুষ্যত্বের অবমাননা করি না? এই সে দিন একমাস ধরে যে ঘৃণিত দানবীয় বিভৎসতা এই সহরের বুকে সংঘটিত হল তার সম্বন্ধে যে কাগজে যত কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে সব গুলিতেই সেই এক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। হিন্দু কাগজ হিন্দুকে এই বিভৎসতার সমস্ত দোষ, সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দিয়ে সমস্ত পাপের বোঝা চাপিয়েছে মুসলমানের ঘাড়ে, মুসলমান কাগজও পাল্টা জবাব দিয়েছে হিন্দুকে সব অন্যায়ের জন্যে খোদার কাছে দায়ী করে। মাসের পর মাস ধরে আগেকার কালের কবির লড়াইয়ের নিতান্ত আধুনিক অভিনয়ে কলকাতার সমস্ত সংবাদ পত্র মনোনিয়োগ করেছে। আরো কতদিন এই পাঁচালী চলবে কে জানে?

বিচার কর্‌বার যোগ্যতা যে দাবী করে তাকে নিরাসক্ত থাকতেই হবে ব্যক্তিগত, দলগত, সম্প্রদায়গত আসক্তি থেকে। যে সূত্রপাত থেকে নিজেকে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বলে দেখে সে বিচার করতে যায় কোন সাহসে? তার কাছে বিচার হচ্ছে তার নিজের সম্প্রদায়ের লাভ ক্ষতির হিসেব করে নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে অন্যের উপর যতটুকু সুবিচার করা সম্ভব তার ব্যবস্থা করা। সেদিনের হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের সময় উভয় সম্প্রদায়ের বেশীভাগ লোক এই অত্যন্ত ছোটদরের মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের যে অত্যাচার ও বীভৎসতার প্রতিবাদ তাঁরা বক্তৃতায় ও কাগজে শত সহস্রবার করেছেন সেই একই অত্যাচার কিম্বা তার চেয়ে বেশী অত্যাচার যখন তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা সাধিত হয়েছে তখন তাঁরা প্রতিবাদ করার ন্যায়সঙ্গতা অনুভব করেন নি। অন্যায়কে তাঁরা শুধু অন্যায় বলে ঘৃণা করতে পারেন নি, বর্ব্বরতা তাঁদের কাছে শুধু বর্ব্বরতা হিসাবে হেয় বলে মনে হয় নি। কাফেরকে হত্যা করে মুসলমান গাজী হবার জন্য ব্যস্ত হোল, যবনকে হত্যা করে হিন্দু গোদানের পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় লুব্ধ হোল। হত্যাও পুণ্য হোয়ে দাঁড়ালো সাম্প্রদায়িক ওকালতির প্রভাবে। ক্লীব যাঁরা তাদের পরিচয় দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে, তাদের যত কিছু গৌরব যত কিছু মহত্বের বড়াই সব ঐ সম্প্রদায় বিশেষের লোক বলে, মনুষ্যত্বের পরিচয়ে-পরিচয় দেবার কোন পথই তারা রাখেনি। বারে বারে ভারতবর্ষে একদল গণ্ডী-ভাঙা বিদ্রোহীর দল এসেছে। তারা নব জীবনের বেদনা বহন করে এসেছে গণ্ডীর শাসনে উপদ্রুত মানুষকে মুক্তি দেবে বলে। অতীতের ভারতবর্ষে তারাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়েছে। সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা যখন সত্যের সহজ প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে করে দাঁড়িয়েছে তখন নির্ম্মম আঘাতে সেই তমকে খণ্ডিত করে সত্যকে অবগুণ্ঠন মুক্ত করেছে এই বিদ্রোহী বীরের দল। সব মানুষই তাদের কাছে পরম কামনার বস্তু বলে প্রতীয়মান হয়েছে, সাম্প্রদায়িক মোহের কুয়াসার সাধ্য হয় নি তাদের সত্য দৃষ্টির সামনে মানুষকে বিকৃত করে দেখাতে। যুগে যুগে বারে বারে অচলায়তনের আয়তনটিকে নাড়া দেবার আয়োজন হয়েছে কিন্তু নাড়া দিলে আয়তনের তো বিশেষ কিছু হয় না বড় জোর দু একটা আলো ঢোকবার পথ উন্মুক্ত হতে পারে। আবার অবসর সময়ে আগাছা জন্মে সেই আলো আসবার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। বুদ্ধদেব বিদ্রোহ করেছেন, চৈতন্যদেব বিদ্রোহ করেছেন, গুরু নানকও বিদ্রোহ বহন করে এসেছেন। আলোর পথের যাত্রী তাঁরা তাঁদের উদ্ভাসিত চেতনার কাছে মানুষের বিশ্বরূপ স্বপ্রকাশ হোয়েছিলো। কিন্তু শাশ্বত সত্যের সন্ধান পেয়েও ব্যবহারিক জীবনের অপরিহার্য্য সীমাবদ্ধতার কাছে তাকে ক্ষুণ্ণ করার ফলে বারে বারে বিদ্রোহ বিফল হয়েছে।

ভারতবর্ষে আবার তাই ব্রাত্য আসবার সময় হয়েছে। যত রকমের বন্ধন আছে সব বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন এই নির্ভীক বীরের দল। ঘরে বাইরে অজস্র নিন্দা ও উপহাস তাঁদের উপর বর্ষিত হবে কিন্তু তাঁদের পথ প্রত্যহের জীবনের সোজা পথ নয়। সত্যের পথ চিরকালই এমনি লাঞ্ছনার পথ।

হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ার একমাত্র সুফল হয়েছে এই যে আমাদের দেশে যে সব নেতা এতদিন লোক ঠকিয়ে

আসছিলেন তাঁরা আর ঢাকা থাকতে পারেন নি। উত্তেজনার মুখে তাঁরা যে সব অপূর্ব্ব উক্তি করেছেন সেগুলিকে তাঁদের সাময়িক উত্তেজনার দোহাই দিয়ে বাদ দেবার উপায় নেই। অত্যন্ত খেলো রকমের মেকী বীরত্বের অভিনয় এঁরা করেছেন। আমাদের দেশের যাত্রার প্রধান অঙ্গই হচ্ছে তরোল গদা হাতে দুই মহাবীরের আবির্ভাব, কিছুক্ষণ রোমাঞ্চকর বীরত্বের পরিচয় দিয়ে অন্তর্ধান।. যাত্রার অভিনয় যে জীবনের প্রত্যেক কাজে করা চলে না এ রসবোধও আমাদের নেতাদের নেই।

মৌলানা শওকত আলীর সুবিপুল আয়তনের মধ্যে কিছু রস কষ আছে বলে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনিও দেখছি শেষে যোগদিয়েছেন এই কাপুরুষদের দলে। মরা সব সময়েই খুব শক্ত বলে তো মনে হয় না।' আর যারাই কোন দুঃসাহসিকতা করে মরে তারাই যে যথার্থ বীর তাও মনে হয় না। যে সব গুণ্ডার দল পথে ঘাটে লোকের উপর অত্যাচার করে জীবিকা উপার্জ্জন করে, তারা অন্যের জীবন যত সহজে নিতে পারে তত সহজে নিজের জীবন দিতে না পারলেও তারা নিজেদের জীবন সম্বন্ধেও যথেষ্ট মরিয়া। কিন্তু এই কারণে তো তাদের বীর বলতে পারিনে। তাদের পশু বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। আজ কাল সব রকমের গুণ্ডামীকে বীরত্বের নামে চালিয়ে দেবার একটা প্রয়াস বিশেষ করে চোখে পড়ছে। এই গুণ্ডামির ভিতরে যে কত বড় কাপুরুষতা লুকিয়ে আছে তা বলে শেষ করা যায় না। অসহায় শিশু, বালক, নারী গুণ্ডাদের হাতে নির্য্যাতিত হয়েছে। ধর্ম্মের জন্যে প্রাণ দিতে পারার অত্যন্ত সহজ অভ্যাস সম্বন্ধে যারা বুক ফুলিয়ে গর্ব্ব করেছে, মসজিদের সামনে গান বাজনা বন্ধ করে দেবার সৃষ্টিছাড়া আব্দার রাখতে গিয়া যারা নৃশংসতা করতে পশ্চাৎপদ নয় তাদের যদি প্রশ্ন করি যে দাঙ্গার সময় যখন গোরা সৈনিক মসজিদের সামনে বসে মদ খেয়ে উচ্চৈস্বরে গান গেয়েছে, শিস দিয়েছে তখন তাদের বীরত্ব ছিল কোথায়? এর জবাব তারা কি দেবে? ধর্ম্মরক্ষাও যে শাদা কালোর বিচার করে চলে দেখতে পাচ্ছি।

কলেজ স্কোয়ার ওয়াই, এম, সি, এ, এর সামনে কতকগুলি গোরা পাহারা রাখা হোয়েছিল। একটি বৃদ্ধা মজুর স্ত্রীলোক কাজ করে ফিরে আসবার সময় অপরাধের মধ্যে সেই পশু প্রকৃতি গোরাদের নিষিদ্ধ সীমার মধ্যে ভুলক্রমে চলে যায়। ফলে তারা সেই অসহায় রমণীকে পথের উপর ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এত বড় কাপুরুষতা দাঁড়িয়ে দেখেছে যারা তাদের যখন জিজ্ঞেস করলুম যে এর প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা তারা করেনি কেন; উত্তরে শুনলুম যে শান্তি রাখতে গেলে এরকম অনেক সময়েই দরকার হোয়ে পড়ে। আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না যে তাঁরা যা বলেছিলেন সেটি তাঁদের মনের কথা। আসল কথা তাঁদের ভীরুতা ও অক্ষমতাকে ঢাকা দেবার জন্যে তাঁদের কথার জালবোনা ছাড়া উপায় ছিল না। এই অসহায় স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার যদি কোন হিন্দু বা মুসলমান করতো: তা হলে পরস্পর বিরুদ্ধ সম্প্রদায় দুটি বীরত্বের, মনুষ্যত্বের নিদর্শন দেখাতে আশ্চর্য্যরকম তৎপরতা দেখাতেন, সন্দেহ নেই।

অত্যাচারীর বল অনুমান করে নিয়ে যারা বীর সাজবে কিনা স্থির করে, তাদের মনুষ্যত্ব যে কি সুনিশ্চিত প্রবল তা কি আর বলতে হবে? বহুদিন থেকে তো শত প্রকার অত্যাচার এই দুর্ভাগ্য দেশের পৌরুষকে লাঞ্ছিত করে আসছে, সেই অত্যাচার ও অপমানের শেষ করবার চেষ্টা করার কথা তো দূরে থাক সেই অপমানের বেদনা এদের হৃদয়কে এত টুকুও বিক্ষুব্ধ করে না। এরা সেই বৃহৎ অপমান সম্বন্ধে একেবারে অচেতন।

সেই বৃহৎ অপমান সম্বন্ধে এত অচেতন বলেই তারা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত দলাদলিকে এত স্ফীত করে তোলে আত্মাভিমানের চরিতার্থতার জন্যে। বৃহৎ এর ক্ষেত্রে যে শক্তি মুক্তি পায় না, বাহিরের চাপে ও নিজের মজ্জাগত ভয়ের ফলে, সেই শক্তির যত আস্ফালন যত দর্প দুর্ব্বলের প্রতি। আফিসে বড় বাবুর কাছে পাদুকা প্রহার খেয়ে এসে বাড়ীতে স্ত্রীর উপর ঝাল ঝাড়ার ইতিহাস আমাদের দেশে বিরল নয়।

পশুবল ও বাহুবলে যে সত্যিকার কোন সম্বন্ধ নেই সে কথা উপলব্ধি করবার সময় এসেছে।

পশুবলের জাত আছে, সম্প্রদায় আছে, ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার আছে, সেখানে ম্লেচ্ছ আছে, কাফের আছে, টিকি আছে দাড়ি আছে। সেখানে মানুষকে এক ধাঁচের পশু প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পর্য্যায় ভুক্ত করা হয়। টিকি সেখানে টিকির দোষ দেখেও দেখে না, দাড়ী সেখানে দাড়ীর অপরাধ অপরাধ বলেই গণ্য করে না। সেখানে টিকিতে দাড়িতে বিরোধ, ধুতিতে আর ইজেরেতে ঝগড়া।

বাহুবলের কাছে শুধু এক বিভাগ আছে।

নির্য্যাতনকারী শাদা কি কালো, ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, হিন্দু কি মুসলমান তার কূট তর্ক সেখানে নেই। নির্য্যাতিত শাদা কি কালো, হিন্দু না মুসলমান সে ওকালতী তর্ক সেখানে নেই, সেখানে আছে শুধু একদিকে মুষ্টিমেয় নির্য্যাতনকারীর দল অন্যদিকে অসংখ্য নির্য্যাতিতের দল, একদিকে অসংখ্য অত্যাচারীর দল অন্যদিকে পেষনক্লিষ্ট উপদ্রুত অগণিত হতভাগ্যের দল। এর বেশী বিভাগ করবার প্রয়োজন মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিরোধকারী সত্যকার বাহুবলের নেই।

এই অসাম্প্রদায়িক বিরাট মনুষ্যত্বের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী বহন করে আনবে যারা তাদেরই প্রতীক্ষা করে আছে ভবিষ্যতের ভারত। বর্ত্তমান ভারতের মহাকবি ধ্যাননেত্রে তারি পরিকল্পনা করেছেন। আভিজাত্যের গর্ব্ব নেই, জাতের বড়াই নেই, এমন মানুষের সৃষ্টি এ হতভাগ্য দেশে যতদিন না হচ্ছে ততদিন অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ এর ললাটে লেখা আছে সন্দেহ নাই।

এরাই অনাগত যুগের ব্রাত্য, এরা একদিকে যেমন করুণ কোমল অন্যদিকে তেমনি রুদ্র কঠোর। সুন্দরকে, সত্যকে এরা স্থান পাত্র হিসাবে গ্রহণ করে না। কুৎসিৎকে এরা কোন স্থান মাহাত্ম্যের জলুসে মুগ্ধ হয়ে স্বীকার করে না। আজকের এই বিরোধের দিনে এই সত্যব্রতী বিগতভী অসাম্প্রদায়িক মানুষের অভ্যুদয় কামনা করি।

রুসে যে আভ্যন্তরীন বিদ্রোহের কথা রটিত হয়েছিল তা সর্ব্বৈব মিথ্যা। রয়টার এখবর মস্কোর অর্দ্ধ সরকারী সংবাদপত্র সমূহ হতে জানতে পেয়েচেন। রুসের ভালো যারা চায়না তারাই এসমস্ত মিথ্যা সংবাদ রটনা করেচে। এও এক প্রকারের প্রচার কার্য্য। রুসকে নিয়ে ইউরোপের শোষণবাদ আচ্ছা মুশকিলেই পড়েচে।

কার্লমার্ক্সের শিক্ষা

(কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ)

(১)

[কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা সম্বন্ধে লেখক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখ্‌বেন বলে সঙ্কল্প করেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি ৭ম সংখ্যক "লাঙল" এ বিগত ৪টা ফেব্রুয়ারী তারিখে ছাপা হয়েছিল। নানা কারণে তার পরে এ সম্বন্ধে আর কোন লেখা ছাপা হতে পারেনি। এতকাল পরে এর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছাপালে প্রতিপাদ্য বিষয়টি পাঠকগণের পক্ষে নিতান্তই খাপছাড়া বোধ হবে। সেইজন্যে প্রথম প্রবন্ধটি একাগজে পুনর্মুদ্রিন হল। সম্পাদক, গণ-বাণী।]

ভারত বীর-পূজার দেশ। বীর যা প্রচার করে যান, তাতে ভারতীয়দের মন এতটুকুও আলোড়িত হয় না, তাঁরা দেখেন শুধু বীরের জীবনটিকে। একটা লোকের মধ্যে সাধারণ দশজনার চেয়ে বেশী কিছু দেখতে পেলেই ভারতবর্ষের লোকেরা তখনি দেবতা জ্ঞানে তাঁর পূজো শুরু করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না। ভারতবাসীদের মনোবৃত্তির সঙ্গে এই জিনিসটি এমনি মিশে গিয়েছে যে, পর্ব্বত, নদী ও বৃক্ষের ন্যায় জিনিসগুলিও তাঁদের পূজোর নৈবেদ্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে না। আদিম যুগের রীতিনীতির বহু নিদর্শন আজো অসভ্য জাতির ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু তা হ'তে বুঝ্‌তে পারা যায় না যে নর-পূজা আদিম যুগেও এদেশে ছিল। নর-পূজা যে আমরা এদেশে আর্য্য অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। রাক্ষসরা আর ঋষিরা তাঁদেরই মধ্যে জন্মগ্রহণ করে পাপ ও পুণ্যের দেবতা রূপে পূজিত হয়েছেন। এশিক্ষা এদেশের প্রজ্ঞাবান লোকেরাই প্রচার করেছিলেন। এই জিনিসটিকে জনসাধারণের মনের ভিতর স্থায়ি ভাবে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে, তাঁরা এর সঙ্গে অনেকগুলি নিগূঢ় ও বোধাতীত বিষয় জুড়ে দিয়েছেন। ফলে, অবস্থা এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পূর্ণ শরীরী মানুষ ত দূরের কথা, মানুষের শরীরের এমন কোনো অংশ নেই, যার পূজো আজকের দিনে না হচ্ছে। নিগূঢ় অর্থে ঋষি বা পয়গম্বর বলতে যা বুঝায় কার্লমার্ক্সকে আমি তারি আবরণে আচ্ছাদিত কর্‌তে চাইনে। কার্লমার্কস সমাজ-বিজ্ঞানের একজন বড় দরের ভাবুক। জনসাধারণের মধ্যে তিনি একটা গতি-শক্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শিক্ষা কতলোকের মনের খোরাক জুগিয়েছে, কত লোকের হৃদয়ে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে সুন্দর আর কি কাজ হতে পারে? ১৮১৮ সনের ৫ই মে তারিখে জর্ম্মানির ট্রেভিস নামক স্থানে কার্লমার্কস জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, যাঁরা তাঁর লেখা পড়েছেন কিংবা পড়েননি সকলেরই জন্যে তিনি সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু আদর্শ ও বহুভাব রেখে গিয়েছেন। তাঁর এই আদর্শ ও ভাব আজকের দিনে সমস্ত জগতে নিত্য চিন্তনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তার ফলে, আজ আমরা মূলধন ও ধনিক-প্রথা, উৎপাদনের উপায়, শ্রেণী-সংগ্রাম, সংস্কার এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বহারাদের বিপ্লব ও সোশেলিজম (সমূহবাদ) প্রভৃতির বিষয় শুন্‌তে পাচ্ছি।

কার্লমার্কসকে বোঝার জন্য সর্ব্বপ্রথমে হেগেলকে বোঝা একান্ত আবশ্যক। হেগেল বিশদরূপে ব্যাখাত এক নূতন তর্ক বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছেন। এই তর্ক-বিজ্ঞানের ভিত্তি বিবর্ত্তনের বিশ্ব-জনীন ক্রমিক-গতির ওপরে বিন্যস্ত রয়েছে,। হেগেলের লজিক্ বা তর্ক বিজ্ঞান "ডায়েলেক্টিক্" রূপে রচিত হয়েছে। ডায়েলিক্টিক পদের দ্বারা প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতরা প্রশ্ন ও উত্তরের কলাকেই বুঝতেন। তর্কের এইরূপ প্রথার দ্বারা বিরোধী ভাবের নিবৃত্তি করা হয়। এর আরো বেশী সংজ্ঞা প্রদান করতে হলে এই বলতে হবে যে, বিরোধী রূঢ় পদার্থাবলী ও তার বিশ্লেষণের গতানুগতিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিশ্বের বস্তু ও জীব-জগতে যে রূপান্তর উপস্থিত হয় তারি ধারণা করা। সামাজিক বিবর্ত্তনের ধারণা মার্কস হেগেলের নিকট হতে পেয়েছেন। হেগেলের মতে প্রকৃতি ও ইতিহাস বিবর্ত্তনের ক্রমিক গতির সাথে বিজড়িত রয়েছে। তাঁর মতে এই বিবর্ত্তনের কাজ পরিচালিত হয় আইডিয়া অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা। মার্কস কিন্তু হেগেলের এ কথা মানেন না। তিনি বলেন, ইকনমিক্ ফোর্স অর্থাৎ অর্থ নীতিক শক্তি হচ্ছে যাবতীয় সামাজিক বিবর্ত্তনের মূল্য কারণ। সমাজের গড়া, ভাঙা এবং পুনরায় গড়া এই ভাবে এক স্তর হতে আর এক স্তরে যাওয়া—এ সবই ইকনমিক্ ফোর্সের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। সমাজের প্রত্যেক স্তরই তার নিজের মধ্যে একটা ভাঙার কারণ সৃষ্টি করছে এবং প্রত্যেক ভাঙার পরে একটা নবীন উচ্চতর স্তরের সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো কিছুর মধ্যে একটা গতির সৃষ্টি বরাবর বিরোধের দ্বারাই হয়ে থাকে। পৃথিবীটা চিরকালই যদি একটা অগ্নি ও বাষ্পময় পিণ্ড থেকে যেত এবং তার বিরোধের দ্বারা শীতল ও ঘনীভূত না হত, তা হলে আজকের দিনে তাতে জীবের বাস কিছুতেই সম্ভবপর হতনা। ষ্টেট্ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যদি চিরকালই যথেচ্ছাচারী থাকত এবং তার বিরোধী-মত মধ্য শ্রেণীর স্বতন্ত্রতার সৃষ্টি না হত, তা হলে ষ্টেটে জীবন ভয়ানক একঘেয়ে হয়ে যেত এবং কোনো প্রকারের জ্ঞান-কর্ষণ পৃথিবীতে সম্ভবপর হত না। ধনিকগণের প্রতিপক্ষ সর্ব্বহারারা না থাক্‌লে দুনিয়াটা একটা শৈল্পিক সামন্ততন্ত্রে পরিণত হত। যত প্রকারের শক্তি আছে সমস্তই বিরুদ্ধভাব থেকে সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি ও মানবতার যত প্রকার অবদান আমরা পেয়েছি, এ সবই সম্ভবপর হয়েছে বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা। একমাত্র বিরুদ্ধভাবই যখন আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তখনি চিন্তা ও বস্তুরাজ্যে উচ্চগ্রামের দিকে বিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। মার্কস সত্যিকারের বিরুদ্ধভাবকে নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিবর্ত্তনের গতানুগতিকতার ভিতর দিয়ে যে বিরুদ্ধভাব আপনা হতে আত্ম-প্রকাশ করে থাকে ঠিক্ সেই বিরুদ্ধভাব নিয়ে! জিনিস মাত্রেরই এক একটা বিরুদ্ধ জিনিসও আছে। যেমন সত্তার প্রতিপক্ষ হচ্ছে অ-সত্তা, শৈত্যের প্রতিপক্ষ উষ্ণতা, আলোর প্রতিপক্ষ অন্ধকার, মোলায়েমের প্রতিপক্ষ কর্কশতা, আনন্দের প্রতিপক্ষ ব্যথা, উল্লাসের প্রতিপক্ষ সন্তাপ, সম্পদের প্রতিপক্ষ দারিদ্র্য

দারিদ্র, মূলধনের প্রতিপক্ষ শ্রমিক, জীবনের প্রতিপক্ষ মৃত্যু, পুণ্যের প্রতিপক্ষ পাপ এবং ভাববাদ এর প্রতিপক্ষ জড়বাদ ইত্যাদি। হেগেল বলেন, প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ শক্তি আছে। এই বিরুদ্ধ শক্তির নিয়ত প্রকাশ ও পার্থক্যের ভিতর দিয়ে বহুমত ও জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই নিয়ত নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার দ্বারাই জগতে বৃহত্তর অস্তিত্বের সম্ভাবনা হয়ে থাকে। মার্কসের সিদ্ধান্ত বোঝার জন্যে হেগেলের এই কথাটাকে বোঝা একান্তই প্রয়োজন।

এতক্ষণে, ডায়েলেক্‌টিক প্রণালীর দুটো কথা অস্তিত্ব ও নষ্টর সাথে আমাদের যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গেছে। চিন্তা ও বস্তু রাজ্যের বর্জ্জন প্রণালীর প্রথম দু'টো স্তরের কথাও আমরা বলেছি। কিন্তু এ প্রণালীও সম্পূর্ণ নয়, এখনো এর একটা তৃতীয় স্তরের প্রয়োজন আছে। হেগেল এ'কে নষ্টর নষ্ট নামে অভিহিত করেছেন। নষ্টর অবিরাম প্রক্রিয়ায় একটা নূতন বস্তু বা প্রাণীর অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কথাটাকে ভাল করে বোঝবার জন্যে একটি ডিমের দৃষ্টান্ত দেওয়া হোক। ডিমটি একটি বাস্তব বস্তু। এর ভিতরে একটি জীবাণু আছে। এই জীবাণু ক্রমশঃ ডিমের ভিতরের জিনিসটি খেয়ে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। এই যে নষ্ট, ইহা কিন্তু মোটেই ধ্বংস নয়, পক্ষান্তরে এতদ্বারা জীবাণুটি একটি প্রাণীতে পরিণত হয়। নষ্টর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যেতেই মুরগীর বাচ্ছাটি ডিমের খোলসটি ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে হেগেলের নষ্টর নষ্ট এবং এতদ্বারা শরীরতঃ এমন একটি জিনিসের উদ্ভব হয়েছে যা ডিমের চেয়েও বড়। ডায়েলেক্‌টীকের প্রক্রিয়া যে সব সময়ে কোনো নিয়মানুযায়ী ঠিক ধাপের পর ধাপ চলে তা নয়, অনেক সময় মাঝের ধাপ গুলোর সাহায্য না নিয়েও একেবারে সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। জল ক্রমশঃ শক্ত না হয়ে হঠাৎ শক্ত হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে প্রথমে মণ্ডাকার ধারণ করবে এবং তার পরে হবে শক্ত বরফ, এমনটা হয় না। এই জিনিসটের চর্চ্চা মার্কস অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত করেছেন। সমাজ কি করে সোশেলিজম এর অবস্থায় বিবর্ত্তিত হবে, এতদ্বারা তারি নিয়ম ম্যার্কস্ তৈয়ার করেছেন। মার্কস্ এর প্রাথমিক গ্রন্থ "পবিত্র পরিবার" এবং "দর্শনেয় দারিদ্র্য" এমন সময়ে লিখা হয়েছিল যখন তিনি ইতিহাসের বাস্তব ধারণা নিজের মনে গঠন করেছিলেন। এর পরে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "ক্যাপিটাল" প্রণয়ন করেছেন। এ ক'খানি গ্রন্থেই বিষয়গুলোর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে মার্কস্ হেগেলের "ডায়েলেক্‌টিক" এর সহায়তা নিয়েছেন।

সর্ব্বহারা আর ধনী এ দুটো হচ্ছে পরস্পর বিরোধী আবার এ দু'এতে মিলেই একটা সম্পূর্ণ জিনিস হয়ে থাকে। জগতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকায় ধনী ও সর্ব্বহারা এতদুভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ধনী আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখতে যেমন বাধ্য, ঠিক তেমনি বাধ্য তার বিরুদ্ধ শক্তি সর্ব্বহারার অস্তিত্বও বজায় রাখতে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারটা হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্বের দিক পক্ষান্তরে সর্ব্বহারারা সর্ব্বহারা হওয়া হেতুই আপনাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করতে যেমন বাধ্য, ঠিক তেমনি বাধ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদেরও ধ্বংস করতে। কেননা, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব আছে বলেই তারা সর্ব্বহারা হয়েছে। এটা হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির নষ্টের দিক। এই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সম্পত্তির মলিকরা হচ্ছে রক্ষণশীল আর সর্ব্বহারা ধ্বংসকারী। মালিকরা চায় বিরুদ্ধ শক্তিটাকে বজায় রাখতে আর সর্ব্বহারারা চায় সেটাকে ধ্বংস করতে। জাতীয় ও ইকনমিক্ অর্থাৎ অর্থ নীতিক আন্দোলনের দিক থেকে বিচার করে দেখতে পাওয়া যায় যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার নিয়ত আপনা হতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু, জেনে শুনে নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে যে ধ্বংসের ক্রিয়া চলেছে সেটা সম্পত্তির মালিকের অনিচ্ছাতেই চলেছে। একটা সর্ব্বহারা দলের সৃষ্টি না করতে পারলে সম্পত্তির মলিক হওয়া যায় না, অথচ, বঞ্চিত করে মালিক হওয়াটাই হচ্ছে নিজের বিরুদ্ধে একটা ধ্বংস শক্তির সৃষ্টি করা। মার্কস্ বলছেন :—

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি সর্ব্বহারা-দলকে সৃষ্টি করে নিজের জন্যে যে একটা ধ্বংসের কারণ সৃষ্টি করে রেখেছে তার কাজ সর্ব্বহারা দলই সম্পন্ন করছে। ঠিক এরূপভাবে বেতনভোগী শ্রমিকরা অপরের জন্য ধন সম্পদ ও তার দরুণ নিজেরে দণ্ডের সৃষ্টি করে নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে। যদি সর্ব্বহারাদল জয়যুক্ত হয়, তবে তারাই কিছু সমাজের অনন্যসাপেক্ষ দিক্ হবে না। কেননা নিজেদের ও তাদের বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্ম্মূল করে তবেই তারা জয়যুক্ত হবে। এই ভাবে সর্ব্বহারাদল এবং তাদের অবচ্ছিন্ন বিরুদ্ধশক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি দু-ই বিলোপ হয়ে যাবে।"

(ইংরেজী হতে অনুবাদিত)

কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো
(কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিশ এঙ্গেলস)

[১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক সাধারণ সত্ত্ববাদের অন্যতম জন্মদাতা কার্ল মার্কস ও তাঁর বন্ধু ফ্রেডেরিশ এন্‌জেলস্ এই প্রবন্ধ পুস্তক আকারেপ্রকাশিত করেন।

বহু শত শতাব্দী ধরে মানব সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ চলে আসছে ও এই শ্রেণীবিভাগ থাকার জন্যে আদিম কাল থেকে সামাজিক জীবনে যে অবিশ্রান্ত শ্রেণিগত সংঘাত চলে আসছে তার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে আছে। সাধারণ সত্ত্ববাদীরা সমাজের এই শ্রেণীবিভাগকে কি চক্ষে দেখেন ও ভবিষৎএর সমাজ গঠন সম্বন্ধে তাঁদের আদর্শই বা কি তার সম্যক আলোচনা এই প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। এই প্রবন্ধে সাধারণ সত্ত্ববাদের মূল তত্ত্বের হদিস পাওয়া যাবে বলে অনুবাদকের বিশ্বাস]

পর-শ্রম-ভোগী সম্প্রদায়
ও
আত্ম-শক্তি-উৎপন্ন-বঞ্চিত সম্প্রদায়

আজ পর্য্যন্ত সব সমাজের ইতিহাস আলোচনা করে আমরা দেখিতে পাই যে সে ইতিহাস হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ইতিহাস।

স্বাধিকার প্রাপ্ত লোক আর ক্রীতদাস, অভিজাত সম্প্রদায় আর সাধারণ লোক, গিল্ডিদলভুক্ত লোক আর সাধারণ মজুর, এক কথায় অত্যাচারী দল আর নির্য্যাতিতের দল প্রতিনিয়ত পরস্পরের বিরোধ করে আছে। তাদের সেই বিরুদ্ধতা কখনো গোপনে কখনো বা প্রকাশ্যে চল্‌ছে আর প্রত্যেক বারেই সেই

বিরোধের অবসান ঘটছে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে অথবা সেই দুই বিরুদ্ধ দলের ধ্বংসের অবসানে।

ইতিহাসের সেই প্রথম যুগের কথা আলোচনা করে আমরা সর্ব্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত সমাজের জটিল বিভাগ দেখতে পাই। কত শত বিভিন্ন স্তরে সমাজ বিভক্ত। প্রাচীন রোমে, সমাজ, অভিজাত সম্প্রদায়, সাধারণ লোক, ক্রীতদাস আর নাইট, এই কটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত ছিলো। মধ্যে যুগের সমাজ জায়গীরদার আর তাদের প্রজা, গিল্ডদলভুক্ত লোক, সাধারণ মজুর ও দাস সম্প্রদায়, এই কয় দলের সৃষ্টি করেছিলো। এই সব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি আবার বহু দলে বিভক্ত ছিলো।

অতীতের জায়গীরদার সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত আধুনিক যুগের পর-শ্রম-উৎপন্ন-ভোগী সম্প্রদায় এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের নিরাকরণ করে নি। তারা কেবল পুরাতন সাম্প্রদায়িক বিভাগের স্থানে নতুন সম্প্রদায়িক বিভাগ, অত্যাচারের নব নব প্রণালী ও পুরাতন বিরোধের স্থানে বিরোধের নবরূপের সৃষ্টি করেছে।

আমাদের এই যুগ, এই পর-শ্রম-উৎপন্ন ভোগীর যুগের একটি বিশিষ্টতা আছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের জটিলতাকে ইহা অনেকাংশে দূর করেছে। সমাজ দিনের পর দিন পরস্পর বিরোধী দুটি সম্প্রাদায়ের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সেই দুটি দল পর-শ্রম-উৎপন্ন-ভোগী সম্প্রদায় আর আত্ম-শক্তি-উৎপন্ন-বঞ্চিত সম্প্রদায় পরস্পরকে বিরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

মধ্য যুগের দাস সম্প্রদায় থেকে পরবর্ত্তী যুগের আদিম নগর গুলির প্রথম স্বাধীন নাগরিক এর সৃষ্টি হয়। এই নাগরিকদল থেকে পর-শ্রম-উৎপন্ন ভোগী সম্প্রদায়ের সূত্রপাত ঘটে।

আমেরিকার আবিষ্কার, উত্তমাশা অন্তরীপের আবিষ্কার, জাগরণশীল পর-শ্রম-উৎপন্ন-ভোগী সম্প্রদায়কে নূতন পথ দেখিয়ে আরো লুব্ধ করে তুললো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর চীন দেশে ব্যবসার পথ প্রশস্ত হওয়ায়, আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে ব্যবসার সূত্রপাত ঘটায় ও ব্যবসার দ্রব্যসম্ভাবের বৃদ্ধি ও দ্রব্য বিনিময়ের জন্যে অর্থের বৃদ্ধি হওয়ায়, ব্যবসা ও ব্যবসার জন্যে প্রয়োজনীয় নৌবহর সৃষ্টি এমন একটা প্রেরণা-লাভ করেছিলো যা' পূর্ব্বে কখনো দেখা যায় নি। এই উৎসাহ পতনোন্মুখ জায়গীদার সমাজে পরিবর্ত্তন আনিতে উৎসুক বিপ্লব-পন্থীদলকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে গঠিত হতে সাহায্য করে।

ব্যবসার সেই সামন্ত প্রণালীর যুগে ব্যবসার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের উৎপামন বিশেষ বিশেষ সঙ্ঘের এক চেটিয়া অধিকারে ছিল। আজ ব্যবসার প্রসারের দিনে তা আর সম্ভব হল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গিল্ডদলভুক্ত লোকেদের কোন ঠেসা করল। প্রত্যেক গিল্ড ভিন্ন ভিন্ন রকমের দ্রব্য উৎপন্ন করায় আগে শুধু গিল্ড গুলোর মধ্যে শ্রম-বিভাগ ছিলো এখন একই কারখানার মধ্যে শ্রম-বিভাগ এসে পূর্ব্বের শ্রম-বিভাগের স্থান অধিকার করল।

এদিকে ব্যবসার সম্প্রসারণের সঙ্গে ব্যবসাজাত দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে গেল। তখন আর পূর্ব্বতন প্রণালীতে উৎপাদন করিয়া সকলের অভাব মেটানো সম্ভব হল না। তখন বাষ্প ও কল কারখানা বাণিজ্যে নবযুগের সূচনা করল। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অল্পপরিমাণে উৎপাদন প্রণালীর স্থানে বর্ত্তমান যুগের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনক্ষম নতুন প্রণালী অধিকার করল। আগের যুগের ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্থান আধুনিক যুগের ব্যবসায়ী লক্ষ পতিরা অধিকার করল। এই লক্ষ পতিরাই বর্ত্তমান কালের পর-শ্রম-উৎপন্ন ভোগীর দল।

বর্ত্তমান কালের উৎপাদন প্রণালী বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের স্থাপনা করেছে। এ্যামেরিকার আবিষ্কার এই পথ আরো প্রশস্ত করেছে। এ্যামেরিকার বাজার, বাণিজ্য, বাণিজ্য বহর নির্ম্মান ও স্থলপথে বার্ত্তাবিনিময় স্থাপনে প্রভূত সাহায্য করেছে। এই সব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পর-শ্রম-উৎপন্ন ভোগী সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি হোল, তাদের মূলধন বেড়ে গেল এবং মধ্য যুগ থেকে যে সব শ্রেণী বিভাগ চলে আসছিলো তাদের সকলকে এরা কোণঠেঁসা করল।

আমরা তাহলে বেশ বুঝতে পারচি যে এই পর-শ্রম-উৎপন্ন-ভোগী সম্প্রদায় কেমন করে উৎপাদন ও বিনিময়ের অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠচে, আর এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতারও বৃদ্ধি হয়েচে। ফিউডাল আভিজাত্যের হাতে নির্য্যাতিত এই পর-শ্রম-উৎপন্ন ভোগী সম্প্রদায় মধ্যযুগে স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত আত্মশক্তির দ্বারা সুরক্ষিত স্বাধীন-নগর রাজ্য স্থাপন করেছিল (যেমন উদাহরণ স্বরূপ ইটালী ও জার্ম্মানীর সাধারণ তান্ত্রিক সহরগুলোর কথা কিম্বা ফ্রান্সের রাজ-শাসিত কর-দায়ী এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে) এরাই পরে বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপন্নের যুগে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্যে বা রাজার অল্প ক্ষমতাবান ভূস্বামীদের পক্ষাবলম্বন করেচে। বড় বড় রাজ-শাসিত রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন এই পর-শ্রম-উৎপন্ন ভোগী সম্প্রদায় বর্ত্তমান যুগের বাণিজ্য প্রথার প্রচলনের সঙ্গেও বর্ত্তমান কলের বিশ্বব্যাপী বস্তুবিনিময়ের সুযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান কালের প্রতিনিধি মূলক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হয়েচে। বর্ত্তমান কলের রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্র এই পর-শ্রম-উৎপন্ন-ভোগী সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করবার জন্যে নির্ব্বাচিত একটি কমিটি মাত্র।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে এই পর-শ্রম-উৎপন্ন-ভোগী সম্প্রদায় মহান বিপ্লব সাধিত করেচে।

যেখানে ক্ষমতা পেয়েচে সেখানেই এরা অভিজাত সম্প্রদায়ের ও ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা শাসিত গোষ্ঠী জীবনের বিলোপ সাধন করেচে। তোমাদের চেয়ে আমরা স্বভাবতই অধিক ক্ষমতাবান, মোহের এই রঙীন সূত্র যা দিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় অপরাপর মানুষকে বেঁধে রেখেছিল সেই সূত্রটি এরা ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। নগদ মূল্যে ক্রয় করার মত শুধু স্বার্থের সম্পর্ক ব্যতীত মানুষের সঙ্গে—মানুষের সম্পর্কের আর কোন উপায় এরা রাখল না। এই পর-শ্রম-উৎপন্ন-ভোগী সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত সমাজে মানুষ আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার অত্যন্ত ব্যস্ততায় ধর্ম্মজীবনের উচ্ছ্বাস ও বীরত্বের ও ভাবপ্রবণতার মূলে কুঠারঘাত করচে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মূল্যকে এরা বিনিময়ের বস্তু করে তুলেচে, অসংখ্য অপরাজেয়র পরিবর্ত্তে অবাধ বাণিজ্যের হৃদয়হীন স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেচে। এক কথায় বলতে গেলে যে লুণ্ঠন এতদিন ধর্ম্মের ও রাজনীতির মুখোস পরে হচ্ছিল সেই লুণ্ঠনের পরিবর্ত্তে তারা আরো নির্ম্মম হৃদয়হীন সোজাসুজি লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করল।

যাকিছু কাজকে লোকে এতদিন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এসেচে সেই সব কাজকেই এই পর-শ্রম-উৎপন্ন-ভোগী সম্প্রদায় মহত্ত্ব বর্জ্জিত করেচে। এরা চিকিৎসক, আইনজীবী, পুরোহিত, কবি ও বৈজ্ঞানিক সকলকেই বেতনভোগী দাসে পরিণত করেচে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

লীগের সেক্রেটারীর পত্র

কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের উপরে আমাদের ভক্তি নেই, আবার সে অনুষ্ঠান যদি রাষ্ট্রনৈতিক হয় তাকে আমরা সাংঘাতিক বলে মনে করি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বাংলা দেশের মুসলমানগণের একটি রাষ্ট্রনৈতিক অনুষ্ঠান। মসজিদের সম্মুখে বাজা বাজানো সম্বন্ধে এ লীগের নির্ব্বাচিত সেক্রেটারী মৌলবী কুতুবুদ্দীন আহমদ সাহেবের একখানা পত্র সংবাদ পত্র সমূহে কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো গভীর ভিতরে থেকে সত্য কথা বলা কখনো নিরাপদ নয়। তাই মৌলবী কুতুবুদ্দীন সাহেব বাদ্য সম্বন্ধে সত্য কথা বলে কয়েকখানা খবরের কাগজের নীচ আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেন নি। আমাদের ইংরেজী সহযোগী "মুসলমান" যদিও নীচভাবে তাঁকে আক্রমণ করেন নি তথাপি তাঁর এরূপ পত্র লিখার এবং সে পত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশ করার অধিকার সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন। লীগের কাউন্সিলের (কার্য্যকারী সমিতির) এক সভায় মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজানো সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিগণের মত সংগ্রহের জন্য সেক্রেটারী অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। এই মত সংগ্রহটা সংবাদপত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে করা একেবারেই সম্ভবপর নহে। কেবল মাত্র লীগের মেম্বরগণের মত যদি সেক্রেটারীকে গ্রহণ করতে বলা হত তা-হলে তিনি মেম্বরদের পত্র লিখে তা করতে পারতেন। কিন্তু, যখন মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিগণের মত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তখন সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই তাঁর হাতে ছিলনা। তার পরে, তাঁর নিজের মত প্রকাশের কথা। মুসলমান সমাজের তিনিও যখন একজন প্রতিনিধি তখন নিজের মত প্রকাশ করেও তিনি কিছুমাত্র অন্যায় কাজ করেননি। তাঁর পত্রখানা পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি যেমন অপরের মতামত জানতে চেয়েছেন তেমনি তাঁর নিজের মতামতও ব্যক্ত করেছেন। সহযোগী "মুসলমান" এর আপত্তিতে উদারতার অভাব দেখতে পেয়ে আমরা দুঃখিত হয়েছি। সত্যকে ঢেকে রেখে তাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাল করতে চান, কিন্তু জগতের চোখে যে এর জন্যে তাঁরা খেলো হয়ে যাচ্ছেন সে দিকে এতটুকুও নজর দিচ্ছেন না। কেবলমাত্র জেদের জন্যে সত্যের অবমাননা করে মানুষ কখনো জগতে বড় হতে পারেনা।

সাম্প্রদায়িকতা

ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকতাতে সমস্ত দেশ বিশ্রীরূপে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। দেশশুদ্ধ লোকের মাথা একেবারেই খারাব হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতা ব্যতীত আজ যেন আমাদের আর চিন্তা করার অন্য কোনো বস্তু নেই। ব্যাপার এমন গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের একখানা কাগজও সত্য কথা প্রকাশ করছেনা। মুসলমান পরিচালিত কাগজে ছাপা হচ্ছে হিন্দু-গ্লানি আর হিন্দু চালিত কাগজে মুসলমানের কুৎসা। এই সাম্প্রদায়িক কবির লড়াইয়ে কাগজের বিক্রী অনেক বেড়ে গেছে এবং সেই বাড়াটাকেই কাগজ ওয়ালারা চরম ও পরম কাম্য বলে মনে করে নিয়েছে। কিন্তু এই পথই কি আমাদের পথ? যে জিনিসটাকে উপলক্ষ্য করে বিক্ষোভের সৃষ্টি হলো সেটা যে বিক্ষোভের সত্যিকার কারণ নয় একথা অনেক শিক্ষিত লোকই মেনে নিচ্ছেন, অথচ মেনে নিয়েও আবার তাতেই আপনাদের জড়িত করছেন। বড় দুর্ভাগা আমাদের এই দেশ। এই দেশে ধর্ম্মের নামে যা চলে এমন কোনো জিনিসই নেই, তা সে জিনিস যতই খারাব হোক্‌না কেন? ভবিষ্যতে যে বিবাদটা দেশের শোষক ও শোষিতের মধ্যে খুব বেশীরূপে প্রকট হয়ে উঠত তারি গতি আজ শোষক সম্প্রদায় অন্য দিকে চালিয়ে দিয়েছে, আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বার্থপর লোকগুলো এই শোষক শ্রেণীর নিকট আত্ম-বিক্রয় করে দেশকে চরম নিগ্রহের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আজ রূপোর চাকতি তাঁদের নিকটে বড় হয়ে উঠেছে, দেশের এবং মানুষের কল্যাণের চেয়ে! ধনার জালে যারা ধরা পড়েছে পড়ুক, আমরা আমাদের দেশগত প্রাণ তরুণের দলকে সাবধান করে দিচ্ছি, তাঁরা যেন এই ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকতার স্রোতে ভেসে না যান। তাঁরা জেনে রাখুন জাতির কল্যাণ কখনো ঘৃণিত সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভিতর দিয়ে সাধিত হয়নি এবং আজো হবেনা। অতীতের অনেক অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে, স্বার্থপর লোকেদের স্তোক বাক্যে অনেক ভুল তাঁরা করেছেন,—এবারে আবারো যদি তাঁরা সেই ভুলেরই পথ ধরে চলেন তবে সেটা দেশের পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক হবে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কয়েক দিন পূর্ব্বে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য—ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন নামে একটী নূতন সঙ্ঘ গঠন করে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করা। সাম্প্রদায়িকতা নিতান্ত ঘৃণিত জিনিস, এ'কে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। পণ্ডিতজী ও মৌলানা সাহেব দু'মাস পূর্ব্বে এ বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন। তারি ফলে ইতোমধ্যে অনেকেই এ নূতন দলে যোগদান করেছেন। নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলনের সময় নেতৃগণ ধর্ম্মোত্তেজনার দ্বারা জনসাধারণকে তথাকথিত স্বরাজ লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার পরিণাম এই হয়েছে যে আজকের দিনে জাতীয়তার সহিত সাম্প্রদায়িকতার তুমুল সংগ্রাম বেধে গেছে। এতকাল যে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করা হয়েছিল ন্যাশন্যাল ইউনিয়নের উদ্যোক্তাগণ তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন এবং আগেভাগে বলে দিয়েছেন যে এনূতন সঙ্ঘতে সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্ম্মোন্মত্ততার প্রবেশ একেবারেই নিষেধ। এতটুকুও যে তাঁরা ঠেকে শিখেছেন তা আশার কথা বটে।

এতকাল পরে তাঁরা এও বুঝেছেন যে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা জাতীয়ত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই নষ্ট হওয়া মানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌছে যাওয়া। কিন্তু, তাঁদের এ সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি। সাম্প্রদায়িকত্ব আর জাতীয়ত্বের বিরোধে কেবল মাত্র জাতীয়ত্ব ধ্বংস হবে না, সাম্প্রদায়িকত্বও তাতে ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং এই ধ্বংসের ভগ্নস্তূপ হতে যে বস্তু আত্ম প্রকাশ করবে তা আন্তর্জাতীয়তা। এই

আন্তর্জাতীয়তাই ভারতবর্ষকে মঙ্গলের পথে টেনে নিয়ে যাবে। আমাদের এ কথার সত্যতা মৌলানা ও পণ্ডিতজী আজ না হয় কাল বুঝতে পারবেন।

তারপরে তাঁরা লিখেছেন দেশের সব শ্রেণীর লোকেরাই সম্প্রীতির সহিত বাস করতে না চাইলেও শান্তির সহিত বাস করতে চায়। কৃষক, কারখানার শ্রমিক ও ধণিক, সম্প্রদায় সমূহ শান্তির জন্য আরব্ধ যে কোনো অনুষ্ঠানকে বরণ করে নিবে। কিন্তু, ধনীলোকের শান্তি আর কৃষক ও শ্রমিকের শন্তি কি একই প্রকারের? মাহ্মুদাবাদের মহারাজা স্যার মোহাম্মদ আলী মোহম্মদ খান, স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং চাষী করীমুদ্দীন ও শ্রমিক রামপ্রসাদ একই মনোভাব নিয়ে কি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিয়নে যোগদান করতে পারবেন? কৃষক ও শ্রমিকের অশান্তিতেই ধনিকের শান্তি বৰ্দ্ধিত হয়ে থাকে। আবার ধনিকের বিলোপ সাধন করে নিজেদের অবস্থার সমন্বয় সাধন করাতেই কৃষক ও শ্রমিকের অর্থাৎ জন সাধারণের মধ্যে শান্তি বিরাজিত হবে। শ্রেণীর সাথে জন সাধারণের সংগ্রামকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মাথা থাকলে মাথাব্যথাও থাকবে। পণ্ডিতজীও মৌলানা আভিজাত্য ও ধনীকের মায়া পাশ কাটিয়ে সর্ব্বসাধারণের সহিত মিশুন। তাতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে—অন্য উপায়ে নয়।

শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী

নোয়াখালীর "দেশ-বাণী" পত্রিকার সম্পাদক আমাদের বন্ধু শ্রীযুত ক্ষীতিশ চন্দ্র রায় চৌধুরী আজ কয়েক দিন হলো দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারা ও ১৫৩এ ধারা অনুসারে গেরেফতার হয়ে ২৫০ টাকার জামিনে মুক্ত হয়েছেন। বাংলা দেশের আর সকল কাগজওয়ালাদের ন্যায় ক্ষিতীশ চন্দ্র তাঁর কাগজকে ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কলঙ্কিত করেন নি। তবুও তাঁকে যে এ সাম্প্রদায়িকতার যুগে অভিযুক্ত হতে হলো, এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। তিনি "মনুষ্যত্বের দায়" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ "দেশ-বাণী" তে লিখেছিলেন। তারি জন্যে তাঁর নামে এ অভিযোগ আনা হয়েছে। আত্মপক্ষ ভালো মতে সমর্থন করে ক্ষিতীশ বাবু মুক্ত হউন, একান্ত মনে এ কামনা আমরা করছি।

মিঃ সত্যভক্তের পেটেণ্ট 'দাওয়া'

আমাদের কানপুরের বন্ধু মিঃ সত্যভক্ত এক পেটেণ্ট 'দাওয়া'র আবিষ্কার করেছেন। এই 'দাওয়া'র তিনি নাম রেখেছেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কম্যুনিষ্ট পার্টি। মিঃ সত্যভক্তের মৌলিকত্বের প্রশংসা না করে থাকতে পারা যায় না। এতকাল আমরা জেনেছিলুম কম্যুনিজম জিনিসটা একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। আমাদের কোনো দোষ নেই, কার্ল মার্কস হতে আরম্ভ করে লেনিন পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই আমাদের এইরূপ বুঝিয়েছিলেন। মিঃ সত্যভক্ত যখন এ বিষয়ে গবেষণা করতেছেন তখন ইণ্ডিয়ান হিন্দু কম্যুনিষ্ট পার্টি বা ইণ্ডিয়ান মুস্লিম কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করুন না কেন। আজ কালকার বাজারে এ দু'টো জিনিস খুব জোরে বিকোবে। এ বিষয়ে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও স্যর আবদুর রহীমের নিকট হতে অনেক সাহায্য তিনি পেতে পারেন। তাইকি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও মৌলানা হাসন নিজামীও তাঁকে অনেক সাহায্য করতে পারেন।

কৃষক ও শ্রমিক

বেশী বেতন ও কম খাটুনি—ইংল্যাণ্ডের রংরেজ ও ধোপার কারখানার শ্রমিকগণের সম্মিলিত সঙ্ঘ নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে পূর্ণ বয়স্ক লোকদের জন্যে প্রতি সপ্তাহে ৪ পাউণ্ড (বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের ৫২ টাকার কিছু বেশী) বেতন দাবী করেছে। যে কোনো নারী বা পুরুষের বয়স আঠার বছর পূর্ণ হলে তাকে পূর্ণ বয়স্ক বলে ধরে নেওয়া হবে। বেতন সহ তারা বছরে ১২ দিনের ছুটীর দাবী করেছে, আর তাদের সপ্তাহ হবে ৪৮ ঘণ্টায়। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের সাথে তুলনা করলে ভারতের শ্রমিকদের স্থান কোথায়? দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবকগণের দৃষ্টি একবার কি এদিকে পড়বেনা?

দু'লক্ষ নাবিক বেকার—অধ্যাপক গিল্‌ক্রাইষ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মিলনে যোগদান করতে জেনেভা গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন ভারতবর্ষে দু'লক্ষ সমুদ্রগামী নাবিক বেকার বসে আছে। তাই যদি হয় তবে ভারতীয় শিপিং আফিসে নাবিক সংগ্রহ করার জন্যে দালাল কেন রয়েছে এ কথার উত্তর কেউ দিতে পারেন কি? রাম, শ্যাম, যদু সকলেই আপনাদিগকে শ্রমিক নেতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁরা ভারতীয় নাবিকদিগকে দালালদের কবল হতে মুক্ত করার জন্যে কি চেষ্টা করেছেন একবার জানতে পারি কি?

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল

দেশের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের যোগ যদি দেশের জন-সাধারণের জীবনের সাথে না থাকে তবে সে অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশের কোনো মঙ্গল সাধিত হতে পারেনা। আজ পর্য্যন্ত ভারতে যত এ শ্রেণীর অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার কোনোটিই শ্রেণীর সীমা ডিঙিয়ে জন-সাধারণের মধ্যে আপনার জায়গা করে নিতে পারেনি। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসকেও যদি আমরা শ্রেণীগত অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করি তা-হলে কেহ বোধ হয় আমাদের উপরে দোষারোপ করতে পারবেন না। দেশের প্রাণ শক্তি কৃষক ও শ্রমিকের জন্যে চল্লিশ বছরের জীবনে কংগ্রেস কিছুই করেনি। **বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল** দেশের উৎপাদক সম্প্রদায়কে তাদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যে এবং তাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্যে গঠিত হয়েছে। ভারতের জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে না পারলে আমাদের জাতীয় মুক্তির কোনো আশা নেই। আমরা জাতীয় মুক্তিকামী শিক্ষিত যুবকগণকে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলে যোগদান করার জন্যে আহ্বান করছি। তাঁরা এই দলে যোগদান করে দেশের জন-সাধারণকে প্রকৃত জীবনের সন্ধান প্রদান করুন।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ৯ই আগষ্ট অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলারের পদে আসীন হয়েচেন। তাঁর এ পদ সম্পূর্ণ অবৈতনিক। তিনি বলেচেন, বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি বাড়ী ভাড়া পর্য্যন্ত পাবেন না।

কম্যুনিষ্ট নির্য্যাতন

হাঙ্গেরীর শ্রমিক ও কম্যুনিষ্ট গণের প্রতি অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। পুলিশ শ্রমিক জনতার উপরে নির্দ্দয়ভাবে গুলিও চালাচ্ছে। শোষণবাদের ইচ্ছে ও আপদগুলোর নাম পর্য্যন্ত দেশ থেকে মিটিয়ে দেওয়া। কিন্তু, এই করে, যে শোষণবাদ আপন হাতে আপন মৃত্যুবান তৈয়েরী করছে—তা' বুঝেও বুঝতে চাইছে না। হাঙ্গেরীর শ্রমিক ও কম্যুনিষ্ট বন্ধুগণ, আমাদের প্রাণের অভিনন্দন নিও। যে দুঃখকে তোমরা বরণ করে নিয়েছ আজ না হয় কাল ঘৃণিত শোষণবাদের ভিত্তি তাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সমাজ ভেঙে চুরে নূতন ভাবে গড়ে উঠবেই। কোনো শোষণবাদ তার সমানে দাঁড়াতে পারবে না।

নূতন শাহ্ ও পারস্যের কৃষক—পারস্যের সিংহাসন কাজার বংশের হাত থেকে পহ্লুবী বংশের হাতে আসাতে পারস্যের জন-সাধারণের বিশেষ করে কৃষকদের কোনো সুবিধা হয়নি। রেজাখান নিজে যে ভূসম্পত্তির অধিকারী তার মূল্য ৩ কোটি রুবল। ব্যবসায়ী শ্রেণীর সহিত তাঁর খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে, সমস্ত সর্দ্দারদের সহিতও তাঁর চলাচলি খুব বেশী। কাজেই রেজাখাঁর অভ্যুদয়ে পারস্যের উৎপাদক সম্প্রদায়ের এতটুকুও সুবিধে হয়নি।

শ্রমিক নেতার তিরোধান—ডেনমার্কের স্মিথ্ ও ইঞ্জিনিয়ার সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট জে, এইচ হান্সেন বিগত ৮ই জুলাই তারিখে ফুস্ফুসের রোগে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স ৫৯ বৎসর হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। আমরা ডেন্মার্কের শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহকে তাঁদের সাহসী নেতার অকাল তিরোধানের জন্য গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

টিটাগড় কাগজের কলের কর্ম্মীসঙ্ঘ—টিটাগড় কাগজের কলের শ্রমিকগণ সম্প্রতি তাদের এক সঙ্ঘ গঠন করেছে। এ সঙ্ঘের নাম হয়েছে "টিটাগড় পেপার মিল্স ওয়ার্কারস ইউনিয়ন"। শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই সঙ্ঘের সভাপতি ও শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

গোদের উপর বিস্ফোটক

ভারতের কারখানা আইন অনুসারে মালিকরা শ্রমিকদের নিকট হতে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ আদায় করে নিতে পারেন। ভারতবর্ষের ন্যায় গরম দেশে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ করলে কোনো মানুষেরই জীবনীশক্তি থাকেনা। ঠাণ্ডা দেশের শ্রমিকেরাই সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের জন্য আন্দোলন করছে, ভারতবর্ষেত তার চেয়েও কম হওয়া উচিত। কিন্তু, আশ্চর্য্য এই যে কারখানা আইনের নির্দ্দিষ্ট ৬০ ঘণ্টার কাজেও কারখানার মালিকেরা সন্তুষ্ট হতে না পেরে অনেক জায়গায় শ্রমিকদের আরো বেশী খাটিয়ে নিচ্ছে। রোগী মরুক্ আর বাঁচুক, মোল্লার তাতে কি এসে গেল, সে তার হালুয়া রুটি পেলেই হল। বিগত ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কারস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী বঙ্গদেশের কারখানা সমূহের চিফ্ ইন্স্পেক্টরকে পত্র লিখে জানান যে নদীয়া জুট মিলের শ্রমিকদিগের দ্বারা ছুটীর দিনেও কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করতে চাইলে এসোসিয়েশন যথেষ্ট প্রমাণ দিতে রাজী আছেন। ইন্স্পেক্টর সেক্রেটারীর পত্রখানা নদীয়া জুট মিলের ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দেন। ম্যানেজার জানালেন যে সেক্রেটারীর অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা, তিনি কখনো ছুটীর দিনে কাজ করিয়ে নেননি। চিফ্ ইন্স্পেক্টর ম্যানেজারের পত্রখানা অবগতির জন্যে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কারস এসোসিয়েশনে পাঠিয়ে দিলেন। এসোসিয়েশনের তরফ থেকে আবারো চিফ্ ইন্স্পেক্টরকে লিখে পাঠানো হলো যে ম্যানেজারের কথা মিথ্যা। তাঁরা আরো জানালেন যে এর পরেও ম্যানেজার ৬০ ঘণ্টার বেশী কাজ করিয়ে নিয়েছেন এবং "ডাণ্ডি এণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট ইউওনিয়ন অফ্ জুট এণ্ড ফ্ল্যাক্স ওয়ার্কারস" এর সেক্রেটারী মিঃ সাইমকে তারা তা দেখিয়েছেন। এ পত্র পাওয়ার পরে চিফ্ ইন্স্পেক্টর অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে সত্যই নদীয়া মিলের ম্যানেজার সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার বেশী কাজ করিয়ে নিচ্ছিল। তিনি এজন্যে ম্যানেজারকে আদালতে অভিযুক্ত করেন এবং তাতে ম্যানেজারের ৫০০ টাকা জরিমানা হয়।

সম্প্রতি নদীয়া মিলের ম্যানেজারের আবারো ১৫০০ টাকা জরিমানা হয়েছে। শ্রমিকদের অতিরিক্ত খাটিয়ে মিল ওয়ালারা এত বেশী লাভ করেন যে সামান্য জরিমানা দিতে তাঁদের মোটেই বাধেনা।

টিটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানীর ম্যানেজারও শ্রমিকদের অতিরিক্ত খাটিয়ে নিচ্ছিলেন এবং তার জন্যে তাদের কোনো মজুরীও দিচ্ছিলেন না। বেঙ্গল জুট ওয়ার্কারস এসোসিয়েশন এরূপ কাজ হতে বিরত থাকতে অনুরোধ করে এক পত্র ম্যানেজারকে লিখেন। ম্যানেজার তার কোনো জওয়াব দেওয়াও দরকার মনে করেননি। কাজেই বাধ্য হয়ে ব্যাপারটি কারখানা সমূহের চিফ্ ইন্স্পেক্টরের গোচরীভূত করা হয়। চিফ্ ইন্স্পেক্টর সেদিন বেঙ্গল জুট ওয়ার্কারস এসোসিয়েশনকে জানিয়েছেন যে পেপার মিলের ম্যানেজারের ৩০০ টাকা জরিমানা হয়েছে।

একেত কারখানা আইন অনুসারে কাজ করতেই শ্রমিকদের পক্ষে প্রাণান্তকর ব্যাপার হয়ে উঠে। তার উপরে আরো অতিরিক্ত খাটতে হলে কি দুর্দ্দশাই না তাদের হয়! এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় শ্রমিকদিগকে সর্ব্বত্র সঙ্ঘ-বদ্ধ করে তোলা। কিন্তু, এ কাজের জন্যে কর্ম্মী কই? বাংলার যুবকেরা ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকতার স্রোতে ভেসে যাবেন, না, এদিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন?

বিজয়ী

শ্রীজীবনানন্দ দাস গুপ্ত

নহি আমি উঞ্ছবৃত্তি, উদাসী ভিক্ষুক ;
দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা মাগি বেড়ায় না মন।
মোর তাই নাই শঙ্কা, নাই নিষ্পেষণ,
নম্র নহে শির মোর,—নত নহে বুক ;
বিজয়ী সৈনিক আমি, আমার কার্ম্মুক
করিতেছে অহরহ অসত্য খণ্ডন ;
টঙ্কারে টঙ্কারে ভরি' ধরার অঙ্গন
ছুটিতেছে চিত্ত মোর উৎসাহী, উৎসুক।
কোথায় চকিত ভীত যাত্রিকের দল?
নির্জ্জিতা বসুধা কোথা? নিপীড়িত জীব!
কোথা হিংসা, অত্যাচার, অসুরের বল!
কোথা সিংহাসন জুড়ে জেগে আছে ক্লীব!
আছি আমি সব্যসাচী,—দৃপ্ত, অচঞ্চল,
হস্তে মোর অনিদ্রিত উদ্যত গাণ্ডীব।

খড়কুটো।

মুক্রী আহ্মদ নামক একজন মোপলা কবর খনন ক'রে তার দিন চালাত। গত মোপলা বিদ্রোহের সময় সে তাতে নেতৃত্ব করেছিল। গত দু'বছর সে পালিয়ে বেড়িয়েছিল। এক মাস পূর্ব্বে ধরা পড়ে বিচারার্থ আদালতে আনীত হয়। মাদ্রাজের দায়রা জজের নিকটে খুন আর জখমের জন্য তার বিচার হয়েছে। জজ তার ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন।

বিমান-বিহারী কব্হাম ৫ই আগষ্ট তারিখে অষ্ট্রেলিয়াতে অবতরণ করেছেন। বিগত ৩০শে জুন তারিখে তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। জনৈক আরবের রাইফলের গুলিতে তাঁহার সঙ্গী ইলিয়ট পথে মারা যান। এ ছাড়া আর কোনো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেনি।

লাহোর হতে উর্দ্দু ভাষায় "স্বরাজ" নামক একখানা উচ্চ-শ্রেণীর দৈনিক পত্র শীঘ্রই বাহির হবে। ডাক্তার সত্যপাল সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করবেন। "স্বরাজ" কংগ্রেসের নীতি অনুসারে পরিচালিত হবে।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও নাগপুরের ডাক্তার মুঞ্জের উপরে কলিকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে এই বলে নোটিস জারী করেছিলেন যে তাঁরা দু'মাস কলিকাতায় আসতে পাবেন না। উভয়েই এ আদেশ অমান্য করে কলিকাতায় এসে কয়েক ঘণ্টা বাস করে আবার চলে গিয়েছেন। তখন তাঁদের গেরেফ্তার করা হয়নি। কারণ, ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করার জন্যে দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনতে হয়। এ অভিযোগ আনয়নের জন্যে প্রথম অভিযুক্তের জানা থাকা চাই যে তার উপরে ১৪৪ ধারার নোটিস জারি হয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ, আদেশ অমান্য করা চাই এবং এও প্রমাণ করতে হবে যে এ আদেশ অমান্যর দ্বারা ক্ষতি হয়েছে বা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যা হোক্, "ষ্টেট্সম্যান" খবর পেয়েছেন যে পণ্ডিত মালব্য ও ডাক্তার মুঞ্জের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারা অনুসারে সমন বের হয়েছে। এঁদের দু'জনই সাম্প্রদায়িক নেতা। এ ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে বাংলাদেশে তাঁদের প্রসার-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে।

জ্ঞান-চর্চ্চার দিক থেকে বিদেশের সাথে ভাব-বিনিময় করার জন্যে রুসে একটা সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এই সমিতির নাম "সোসাইটি অফ্ কালচারেল রিলেশন উইথ ফরেন্ কান্‌ট্রিজ"। ১৯২৬ সনের প্রথম চারি মাসে সমিতি ৬০১৩২টি পুস্তকের আদান প্রদান করেছেন। এ পুস্তক বিনিময় জগতের ৫০টি দেশের সহিত করা হয়েছে।

সমিতি যে সকল তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন তদ্বারা অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে। সমিতি বিদেশে অনেক মৌলিক প্রবন্ধও পাঠিয়েছেন। ১৯২৬ সনের প্রথম পাঁচ মাসে তারা ৩২৫টি মৌলিক প্রবন্ধ বিদেশে প্রেরণ করেছেন। এগুলির অধিকাংশই সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকা সহরে খুব জাকজমকের সহিত মিছিল বের হয়ে থাকে এবং এ মিছিলের সাথে বাদ্যাদিও থাকে। এবারে সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ গান-বাদ্য সহ মিছিল মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা সম্বন্ধে মীমাংসা করার জন্যে ৮ই আগষ্ট তারিখে হিন্দু ও মুসলমানগণের এক সভা আহ্বান করেছিলেন। হিন্দুরা বলেন চিরকাল সবাদ্য জন্মাষ্টমীর মিছিল মস্‌জিদ অতিক্রম করে গিয়েছে। কয়েকজন মুসলমান একথা অস্বীকার করেন। কিন্তু, ঢাকার নওয়াব বলেন, মিছিল যে বাদ্যসহ বরাবর মস্‌জিদ অতিক্রম করেছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবুও তিনি হিন্দুদের নিকট প্রার্থনা করেছেন যে তাঁরা মুসলমান জনসাধারণের বর্ত্তমান মনো-ভাবের প্রতি লক্ষ্য করে এবারে কিছু বিবেচনা করুন। পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আজিজুল হক চৌধুরী বলেন যে বাদ্যসহ জন্মাষ্টমীর মিছিল বহুবার তিনি নিজেই পরিচালিত করেছেন। সুতরাং, প্রথার সম্বন্ধে কোনো কথাই উঠতে পারেনা। তিনি মুসলমান নেতৃগণের নিকটে প্রার্থনা করেছেন যে তাঁরা ব্যাপারটি মুসলমান জনসাধারণকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দিন যে যাতে কোনো প্রকারের গোলমাল না হতে পারে। হিন্দু নেতৃগণ নওয়াব সাহেবকে নিবেদন করেন যে তিনি হিন্দুদের মনোভাবের প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। অবশেষে আর আর বছরে মিছিল যেমন বের হচ্ছিল তেমন বের হওয়াই স্থিরীকৃত হয়। নওয়াব সাহেব আশা করেন যে সবই ভালয় ভালয় মিটে যাবে।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বর্ত্তমানে টিকিট সংগ্রহের যে কায়দা অবলম্বন করেছেন হুগলী রেলওয়ে যাত্রিগণ তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। অনভিজ্ঞ যুবকদিগকে টিকেট কলেক্টর নিযুক্ত করার বিরুদ্ধেও তাঁরা ঘোর প্রতিবাদ করেছেন। নূতন টিকেট কলেক্টর-গণ যাত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে পারেনা। কাজেই, তাদের সাথে সংঘর্ষ বাধে, যেমন ব্যাণ্ডেল ও চন্দন নগরে বেধেছিল।

কলিকাতা মেডিক্যাল এণ্ড রিচার্ সোসাইটি অর্থের জন্য আবেদন করতে যেয়ে বলেছেন যে বাংলাদেশে প্রতি ঘণ্টায় যক্ষ্মারোগে ১২জন করে অর্থাৎ বছরে প্রায় ১লক্ষ লোক মরছে। সোসাইটি আরো বলেছেন—প্রত্যেক ১০ জনের মধ্যে একজন লোকের যক্ষ্মারোগ আছে। হায়! বঙ্গদেশ!!

আলীপুরে আর একটা স্পেশাল ট্রিবিউনাল বসেছে। এবারের আসামী শ্যামাপদ রায় নামক একটি ১৯।২০ বৎসর বয়সের যুবক। শ্যামাপদ সবে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পুলিশের খানা তল্লাশিতে শ্যামাপদর বাড়ীতে বিস্ফোরক পদার্থ, রিভলবার ও বোমার ছাঁচ পাওয়া গিয়েছে। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে বলেছে ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি এ সমস্ত জিনিস তাকে রাখতে দিয়েছিল।

আলিপুর জেলার হত্যার মোকদ্দমা।

হাইকোর্টের আপীলের রায়।

বেঙ্গল পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে নিহত হয়েছিলেন। এর জন্যে দক্ষিণেশ্বর বোমার মোকদ্দামায় সাজাপ্রাপ্ত ১০ জন আসামীর আলীপুরের স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিচার হয়। সে বিচারে—

১। অনন্ত হরি মিত্র।

২। বীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও

৩। প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী।

মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং—

১। ধ্রুবেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২। নিখিল বন্ধু বন্দোপাধ্যায়

৩। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৪। অনন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী

৫। হরি নারায়ণ চন্দ

৬। রাখাল চন্দ্র দে ও

৭। সুধাংশু শেখর চৌধুরী

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁদের সকলেই [illegible] প্রতি দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন। স্পেশাল ট্রাইবিউনালও হাইকোর্টের নিকট মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদন চেয়েছিল। বিচারপতি র‍্যানকেন্ ও মুখোপাধ্যায় এ আপীলের বিচার করে রায় দিয়াছেন। তাঁরা—

১। বীরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায়

২। হরিনারায়ণ চন্দ

৩। নিখিল বন্ধু বন্দোপাধ্যায়

৪। সুধাংশু শেখর চৌধুরী ও

৫। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কে বেকসুর খালাস দিয়েছেন,

১। অনন্ত হরি মিত্রের প্রাণদণ্ড বহাল রেখেছেন,

আসামী

১। ধ্রুবেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২। রাখাল চন্দ্র দে ও

৩। অনন্ত কুমার চক্রবর্ত্তীর আপীল বিচার পতিদ্বয় অগ্রাহ্য করেছেন,

১। প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী

সম্বন্ধে বিচারপতি র‍্যানকেন ও মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় তাঁহার মোকদ্দমা চিফ্ জাষ্টিসের নিকটে মীমাংসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিবেদন

ইংল্যাণ্ডের কয়লার খনির শ্রমিকগণের পক্ষ হ'তে ভারতের জনসাধারণের নিকট নিম্নলিখিতরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে :—

"কম বেতনে বেশী সময় খাটার বিরুদ্ধে আমরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছি তারি জন্যে আমরা আমাদের ভারতের বন্ধুগণের নিকটে সাহায্য-ভিক্ষা করছি। চৌদ্দ সপ্তাহ যাবৎ আমরা গবর্ণমেণ্ট ও কয়লার খনির মালিকদের সহিত যুঝেছি। আমাদের নারীদের ও সন্তানদের অনশনে রেখে তারা আমাদের পরাজিত করার চেষ্টা করছে। আপনাদের সামান্য সাহায্যও উভয় দেশের শ্রমীকদের সংহতিকে সুদৃঢ় করবে।

সুবিচারের জন্য আমরা আমাদের সংগ্রাম চালাতে থাকব, এবং আমরা শুধু আমাদের জন্যে নয়, সমস্ত শ্রমিকের জন্য খাওয়া-পরার সুব্যবস্থায় সফল কাম হব। ইংল্যাণ্ডে বেশী সময় খাট্তে অস্বীকার ক'রে ভারতের শ্রমিকদের জন্যও আমাদের যুদ্ধ করা হচ্ছে। যা কিছু আপনারা পারেন পঠিয়ে দিয়ে—আমাদের বিজয়ের জন্যে আমাদের শিশুদের বাঁচানোর জন্যে—সাহায্য করুন।"

শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার গাঙ্গুলী

শ্রীযুক্ত জলধর সেন [illegible]

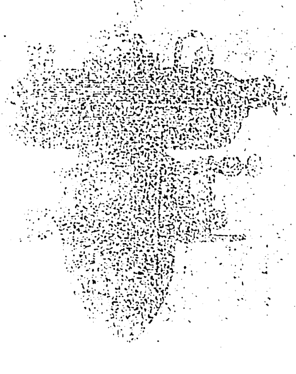
শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible]



[illegible] সম্পূর্ণ নূতন [illegible]

[illegible] ১৯০০ [illegible]

[illegible]

[illegible]

নাকুন ও প্রকাশক

[illegible] রোড, কলিকাতা

[illegible]

Do You Want to Know Anything About Socialism?

The following illuminating booklets by learned scholars and students of the subject will give you all informations you want about [illegible]

The Coming of Socialism	0	6	[illegible]
[illegible] Machine	0	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] Tree Ever	0	[illegible]	[illegible]
[illegible] to the Young	0	4	[illegible]
[illegible]	0	4	[illegible]
[illegible]	[illegible]	6	0
Manifesto of the Communist Party	0	[illegible]	[illegible]
[illegible] of Socialism	0	6	0
The Principles of Socialism	0	[illegible]	0
Scientific Socialism	0	4	0
Wages, Labour and Capital	0	4	0
Women [illegible]	0	4	0
The Rights [illegible]	0	4	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Social Revolution [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

…VANI

…CORPORATED LANGAL

…ly Organ in Bengal of the

…ANTS AND WORKERS' PARTY

… ROAD, CALCUTTA

[illegible]

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম বর্ষ]কলিকাতা, মঙ্গলবার, ১২ই অক্টোবর ১৯২৬, ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৩[৯মসংখ্যা

রাজদ্রোহ

রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা রাজাকে ভারত সাম্রাজ্য হতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে আমাদের দেশের লোকেরা নিগ্রহ নিতান্ত কম ভোগ করেনি। জেলের ঘানি ঘুরানো থেকে আরম্ভ করে ফাঁসির কাঠে ঝোলা পর্য্যন্ত সবই তাদের ভাগে ঘটেছে। তারপরে ভারতের বাহিরে যাঁরা নির্ব্বাসিত হয়ে আছেন তাঁদেরও সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু এ রাজদ্রোহ জিনিসটি কি? ভারতবর্ষে কোন রাজা নেই। গ্রেটব্রিটেনের যিনি রাজা তিনিই আমাদের ভারতবর্ষের সম্রাট। বিদ্রোহ, যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা ষড়যন্ত্র ইত্যাদি যা কিছু করার কথা বলা হয়েছে সবই সেই সমুদ্র পারের রাজা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে।

গ্রেটব্রিটেনের রাজা ও ভারতের সম্রাট ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসন করেন না। তাঁর নামে ভারতবর্ষ শাসিত হয় মাত্র। তিনি ভাল লোক কি মন্দ লোক সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমাদের মনে উঠে না, কেননা, তাঁর সাথে আমাদের কোন দেন-লেন নেই। গ্রেটব্রিটেনে হাউস্ অব কমন্স নামক একটা সভা আছে। এ সভার সভ্যগণ ভোটে নির্ব্বাচিত হন এবং এরি বিশিষ্ট সভ্যগণ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। হাউস্ অব কমন্স গ্রেটব্রিটেনের বিন্যস্ত স্বার্থ বিশিষ্ট লোকেরই দ্বারা অধিকৃত হয়ে থাকে। কাজেই হাউস্ অব কমন্স যে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন তা এই বিন্যস্ত স্বার্থ-বিশিষ্ট লোকদের মুখ চেয়েই করেন। নামে হাউস অব কমন্স জন-সাধারণের সভা হলেও সত্যকার ভাবে উহার উপরে অসীম ক্ষমতা রয়েছে ইংল্যাণ্ডের ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের। এঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হলেও সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের এঁরাই মালিক। এঁদের ব্যবসায়ের নূতন নূতন বাজার সৃষ্টি করার জন্যেই এঁরা এঁদের শাসন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত করেছেন। ব্যবসায়ের দ্বারা এই যে বিভিন্ন দেশকে শোষণ করা হয় ইহারি নাম বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্ বা শোষণ-বাদ। এ শোষণেরই খাতিরে আমরাও বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পদানত হয়ে আছি। আমাদের শাসন ও শোষণ এ দু'এর একটিরও জন্যে ইংল্যাণ্ডের রাজা কিংবা জন সাধারণ এতটুকুও দায়ী নহেন।

বিপ্লব ও বিদ্রোহের প্রচেষ্টা এদেশে যা কিছু হয়েছিল সবই হয়েছিল এই বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমেরই বিরুদ্ধে, গ্রেটবৃটেনের রাজা ও ভারতের সম্রাটের বিরুদ্ধে নয়। এদেশের স্বার্থের হানি গ্রেটবৃটেনের রাজা ও ভারতের সম্রাটের দ্বারা হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত যাদের দ্বারা স্বার্থের হানি ঘটে তাদেরি বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে, অপরের বিরুদ্ধে নয়। একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজা আজ কাল আর জগতের কোন দেশেও নেই। ফিউডালিজম্ বা সামন্ত তন্ত্রের সহিত যখন রাজ-তন্ত্রের সংঘর্ষ বেধেছিল তখনি সে যথেচ্ছাচারী রাজার অস্তিত্ব ধরা পৃষ্ঠ হতে বিলোপ হয়ে গেছে। রাজতন্ত্র বা সামন্ত-তন্ত্রের জায়গায় এখন স্থাপিত হয়েছে কিয়জ্জন-তন্ত্র। আমাদের সংগ্রাম চলেছে এ কিয়জ্জন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে। কাজেই রাজদ্রোহ নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব একেবারেই নেই। ভারতবর্ষ ভারত-সম্রাটের নামে শাসিত হয়, কিন্তু, ভারত-সম্রাটের জন্য শাসিত হয় না। ভারতবর্ষ গ্রেটবৃটেনের জন-সাধারণের জন্যও শাসিত হয় না। ভারতবর্ষ শাসিত ও শোষিত হয় গ্রেটবৃটেনের ধনিক-বণিক সম্প্রদায়ের জন্যে। এই যে শোষণের জন্যে শাসন-প্রথা, এ প্রথারই বিরুদ্ধে আমাদের যত অভিযোগ, এরি আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলার কথা আমরা জানি। ঠিক বিদেশী শোষণবাদ বা ইম্পিরিয়েলিজমও তাঁদের শোষণের সুবিধ

ও স্থায়িত্বের জন্যে যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশেও করেছেন। ঁরা আমাদের দেশেও এমন কতকগুলি শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন যাঁদের দ্বারা তাঁদের শোষণের যথেষ্ট সুবিধে হয়েছে। এ শ্রেণীগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখা হচ্ছে ঠিক যেন ঘুষ দিয়ে কতকগুলো লোককে আপনাদের দলে টেনে আনা। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা জমিদারদের নাম করব। এ জমিদারী প্রথা বর্ত্তমান আছে বলে ষ্টেট বা রাষ্ট্রকে রাজস্বের দিক থেকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। তবুও যে এ প্রথা স্থিরতর রাখা হচ্ছে তা কিসের জন্যে? ভূমি হতে যে শস্যোৎপাদন করে থাকে সে'ত বরাবর ষ্টেটের তহবিলেই তার দেয় রাজস্বের টাকা জমা করে দিতে পারে। অশ্রমিক মধ্যস্বত্ব ভোগকারীদের মাঝখানে রেখে দেওয়ার কিছু কি প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন যে নেই একথা খুবই সত্য, কিন্তু, বিনা প্রয়োজনে এ জমিদার শ্রেণীর লোকেরা যে রয়েছে একথাও ঠিক তেমনি সত্য। এ কি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ব্যবস্থা নয়? এমন আরও বহু প্রথা আছে। আর সবগুলো আছেও ঠিক এই একই কারণে।

এ সকল বিষয়ে রাষ্ট্র একেবারেই নির্লিপ্ত। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আর না করা একই কথা। আমাদের ঝগড়া-কলহ ও সংগ্রাম সবই হচ্ছে বৃটিশ শোষণবাদ ও ভারতীয় শোষকশ্রেণীর সহিত। আমাদের এ সংগ্রামকে শোষকদ্রোহ বলা যেতে পারে, রাজদ্রোহ ইহা একেবারেই নয়। আমার দেহের রক্ত যে শোষণ করে খাবে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার আমার থাকবে। ভারতবর্ষ সর্ব্ববিধ শোষণের হাত হতে মুক্ত হবে. ভারতের সকল কাজ ভারতেরই জন-সাধারণের হাতে পরিচালিত হবে।

———

মা

[ম্যাক্সিম্ গর্কী]

অনুবাদক—শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৮ম পরিচ্ছেদ

ভ্লাসব পরিবারের ক্ষুদ্র মেটে রঙের বাড়ীটা ক্রমেই গ্রামবাসিদের দৃষ্টি বেশী করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। শুধু যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ও অকারণ শত্রুতা বাড়ীটিকে ঘিরিয়া ফিরিত তাহা নহে; গ্রামবাসিদের অহেতুক কৌতূহলেরও সীমা ছিলনা। প্রায়ই কেহ না কেহ আসিয়া পাভেলকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, ভাই, তুমি ত' এখানে বইটই পড়ছ, আইনকানুনও তোমার জানা আছে, এটার অর্থ কি বলত,—"

এই বলিয়া সে পাভেলকে পুলিশের অবিচার কিম্বা কলকারখানার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। যদি ব্যাপারটা জটিল মনে হয় পাভেল কোন শহরে উকিলবন্ধুকে নোট্ করিয়া পাঠাইয়া দেয়, আর যদি সহজসাধ্য হয় তাহাহইলে নিজেই বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করে।

ক্রমেই সকলেই এই যুবকটিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। কী অদ্ভুত এই লোকটি, যে যুবক, অথচ কি গম্ভীর, সে যে কোন বিষয়েই বলুক না কেন, খুব সহজ ভাবে বলে, অথচ যাহা বলে তাহা জোরের সঙ্গেই বলে। সে হাসে না বলিলেও চলে,— প্রত্যেক জিনিষটিই সে লক্ষ করে, এবং এমনি মনোযোগের সহিত সব কিছুই শোনে যে মনে হয় প্রত্যেক বস্তুই সে তলাইয়া দেখিতেছে, সকল মানুষকে একত্রে বাঁধিবার যে অজানা অচেনা সূত্রটি রহিয়াছে, সে যেন তাহারই সন্ধান পাইয়াছে এমন মনে হইত।

ভ্লাসোভা দেখিলেন তাঁহার পুত্র বড় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ছেলের কার্য্য কলাপ বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন, এবং যখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন, শিশু-সুলভ আনন্দে তাঁহার মন নাচিয়া উঠিত।

বিশেষ করিয়া "কাদা-ভরা পেনি" গল্পটি বাহিরে বাহির হইবার পর পাভেলের সম্বন্ধে লোকের ধারণা আরও বদলাইয়া গেল। সবাই তাহাকে বেশ সমীহ করিয়া চলে।

কারখানার ঠিক পিছনেই একটা বিস্তৃত পচা জলা ভূমি, নানা তরো বেতরো আগাছাতে সেটি ভরা ছিল। গ্রীষ্মকালে হলুদ, সবুজ নানা রঙের ময়লা পচিয়া সেটি একটি নরককুণ্ড বিশেষ হইয়া থাকে; রাজ্যের মশা সেখানে জন্মে, এবং সারা গ্রামময় জ্বরের বীজ ছড়াইয়া বেড়ায়। জলাভূমিটি ঐ কারখানাওয়ালাদের। নূতন ম্যানেজার আসিয়া ভাবিল, 'যা হোক্, এ থেকে কিছু লাভ করে নেওয়া যাক্।' এই ভাবিয়া সে ঠিক করিল যে ড্রেনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ভাগ্য ক্রমে সেখানে সেবার প্রচুর জ্বালানী কাঠের ব্যবস্থা হইল। ম্যানেজার শ্রমিকদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে ড্রেন করিয়া দিলে স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির এবং সকলের অবস্থারই পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদের আয়ের প্রত্যেক রুবলের মধ্যে এক কোপেক্ এই জলাভূমিতে ড্রেন করিবার জন্য দিতে হইবে। শ্রমিকগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। অফিসের কেরাণী বাবুদের এই নূতন ট্যাক্স দিতে হইবে না দেখিয়া তাহারা চাঁদা দিতে অস্বীকার করিয়া বসিল।

যে শনিবারে ম্যানেজার এই নূতন টেক্সের আদেশ জারী করে সেদিন পাভেল অসুস্থ হইয়া বাড়ী পড়িয়া ছিল। সে কাজ করিতে যায় নাই, সেই জন্যই ইহার কিছুই সে জানিত না। তাহার পরের দিন দলবল সঙ্গে করিয়া বুড়ো সর্দ্দার গালাইকর সিজোভ্, লম্বা মতন দুরন্ত-আকৃতি, তালাচাবি প্রস্তুত কারক

মাখোটিন্ আসিয়া পাভেলকে ম্যানেজারের কথা খুলিয়া বলিল।

"আমাদের বুড়োদের মধ্যে অনেকেই" প্রশান্ত স্বরে সিজোভ্ বলিতে আরম্ভ করিল, "এ সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখেছি, আমাদের সঙ্গীরা তোমার কাছে আমাদের পাঠিয়েছে, আমাদের মধ্যে তুমিই একটু জানো শোনো। মশার বিরুদ্ধে লড়্‌বার জন্য গরীবদের কানাকড়ি নিয়ে টানাটানি কেন বল দেখি, ম্যানেজার এ কোন্ আইনের বলে করছে, একবার আইন টাইন খুলে দেখত'!"

ক্ষুদ্র চক্ষু দুটিতে ঈষদ্দীপ্তি ফুটাইয়া মাখোটিন্ কহিল,

"এই জুলোচোরগুলি তিন বছর আগে স্নানাগার তৈরী ক'রবার জন্য টাকা তুলেছে, আর মশায়, সেকি কম টাকা ;— নগদ তিন হাজার আটশ' রুবেল। কৈ সে টাকাইবা কোথায়, আর সে স্নানাগারইবা আজ কৈ ?"

পাভেল তাহাদিগকে টাকার অপব্যবহারিতা, উপরিওয়ালাদের এতে কি লাভ, সমস্ত বুঝাইয়া বলিলে তাহারা সঙ্গীদের বিষণ্ণ চিত্তে প্রস্থান করিল।

মা তাহাদিগকে দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"দেখছিস্ পাশা, বুড়ো বুড়ো লোকগুলি পর্যন্ত তোর পরামর্শ নিতে আসে।"

পাভেল কোন উত্তর দিল না, হঠাৎ কি কাজ মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যস্ত হইয়া সে টেবিলে বসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল, কয়েক মিনিট পরে সে মাকে বলিল,

মাগো, শীগ্‌গীর করে এই লেখাটা শহরে নিয়ে যাও ত'।"

মা বলিলেন,

"ভয়ের কিছু আছে নাকি এতে ?"

"হাঁ, আমাদের একটা কাগজ বেরুচ্ছে। এই "কাদা-ভরা পেনি" গল্পটি এর পরের ইস্যুতে যাওয়া নিতান্ত দরকার।"

"এক্ষুনি যাচ্ছি," এই বলিয়া মা তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

জীবনে এই তাহার ছেলে তাঁহাকে কোন কাজের ভার দিয়াছে, ইহা ভাবিতেও মার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। খোলাখুলিভাবে তাহার পুত্র তাহাকে সমস্ত জানাইয়াছে, তাহা ছাড়া পুত্রের কার্যে সে সহায়তা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন পুলক হিন্দোলে নাচিতে লাগিল।

মা বলিলেন, "ব্যাপারটা আমি বুঝেছি, পাশা, এও একরকম ডাকাতি। এ নামটা কি ?......ইয়েগোর আইভানোভিচ ?

সহাস্যে পাভেল কহিল,

"হাঁ, মা,"

শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া অপরাহ্নে মাতা বাড়ী ফিরিলেন, আত্মপ্রসাদে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল।

মা পাভেলকে কহিলেন,

"শাশেঙ্কার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে তোমায় নমস্কার ও ভালবাসা জানিয়েছে। আর এই ইয়েগোর আইভানোভিচ কি সোজা মানুষ ; এমন আমুদে, কথায় কথায় হাসিয়ে মারে।

মৃদুস্বরে পাভেল উত্তর করিল,

"ওদের যে তোমার পছন্দ হয়েছে এতে ভারি খুসি হয়েছি মা।"

"কি সোজা মানুষ ওরা, পাশা ; মানুষ যদি সরল হয়ত' কত ভাল লাগে। লোকে কিন্তু সবাই মান্য করে চলে।"

সোমবারেও পাভেল কাজে যাইতে পারিল না, তাহার মাথা কামড়াইতেছিল। দ্বিপ্রহরের আহার তখনো হয় নাই, এমন সময় ফেড্‌ওয়া মেজিন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া উত্তেজিত ভাবে উপস্থিত হইল ; ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সে অত্যন্ত উৎসাহান্বিতভাবে বলিতে লাগিল,

"শীঘ্র এস, সমস্ত কারখানা আজ জেগে উঠেছে। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সিজোভ্ আর মাখোটিন্ বল্‌লে যে, তুমি সব চেয়ে ভালকরে জিনিষটা বুঝিয়ে বলতে পারো ; ওঃ সে যে কি হৈ-চৈ কাণ্ড!"

পাভেল নীরবে কাপড় জামা পরিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

"একদল মেয়েরাও একত্রিত হয়েছে, তারাও সবাই মিলে চীৎকার সুরু ক'রে দিয়েছে।"

মা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,

"আমি ও যাব তা' হলে। তোর আজ শরীর ভাল নেই পাভেল,—আর ওরা সব কী কাণ্ড আরম্ভ করে দিলে ? আমি যাচ্ছি কিন্তু!"

পাভেল সংক্ষেপে কহিল, "চলো।"

তাহারা নিঃশব্দে দ্রুত গতিতে রাস্তা অতিক্রম করিতে লাগিল। মাতা উত্তেজনায় দ্রুতপাদক্ষেপে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কী যে একটা বিরাট কাণ্ড ঘটিতেছে তাহা তিনি মনে মনে অনুভব করিবার চেষ্টা করিলেন। কারখানার দ্বারদেশে একদল মেয়েরা একত্রিত হইয়া সমস্বরে তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল। তিন জনে যখন প্রাঙ্গনের মধ্যে কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের আশেপাশে সকলেই উত্তেজিত, চীৎকার কোলাহলের অন্ত নাই। মা দেখিলেন সকলেই কামারশালার দেয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে। সেখানে সিজোভ্, মাখোটিন, ভালোভ্, এবং অন্যান্য পাঁচ ছয় জন মাতব্বর রকমের কামলা লাল ইটের উঠানের উপর একরাশ পুরাণো লোহা পড়িয়াছিল তাহার উপর দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কি বলিতেছে।

কে যেন একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,

"ব্লাসব এসেছে"

"ব্লাসব ? তাকে এইখানে,—এইখানে নিয়ে এস!"

পাভেলকে ধরিয়া সকলে সামনে ঠেলিয়া দিল। মা শুধু একা সেখানে পড়িয়া রহিলেন।

চারিদিক হইতে সকলে মিলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,

"চুপ্—চুপ্!"

নিকটে কোথা হইতে যেন রাইবিনের গলা ভাসিয়া আসিতেছিল,

"আমরা সকলে একত্রে মিলিত হয়েছি, এর একটা মস্ত প্রয়োজন আছে। কোপেকের জন্য মোটেই নয়, আমরা ন্যায্য বিচারের জন্য সকলে সম্মিলিত হয়েছি। আমাদের কাছে কোপেকের আদরই সব চেয়ে বেশী নয় ; অন্যান্য কোপেকের চাইতে আমাদের গুলো বেশী গোল নয়! কিন্তু কথা হচ্ছে কি, এর মূল্য আমাদের কাছে ঢের বেশী—ম্যানেজারের রুবেলের চেয়ে এ দামী,—আমাদের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিয়ে এ কোপেকগুলো তৈরী! নিপীড়িত মানবতার বক্ষ নিংড়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত সংগ্রহ করে এ গুলো প্রস্তুত করা হয়েছে..............."

কথাগুলি অগ্নি শিখার মত জনতার মন ঝল্‌সাইয়া দিয়া গেল; উত্তেজিত জনগণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,

"ঠিক্ ঠিক্, রাইবিন ঠিক বলেছে।

কেহ বলিল, "চুপ্ চুপ্।"

কেহ বা বলিয়া উঠিল,

"স্লাসোভ এয়েছে, স্লাসোভ এয়েছে"

কলের বিকট শব্দ, ইঞ্জিনের খ্যাচ্ খ্যাচ্, চামড়ার বেল্টের পত্‌পত্ শব্দ সমস্ত ছাপাইয়া লোকদের কোলাহল ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। সে কী বিরাট হট্টগোল! সকল দিকেই লোকজন চেঁচামেচি করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কখনও বা তাহারা তর্ক করে, তাহাদের কথা শুনিয়া অপর লোক উত্তেজিত হইয়া ওঠে। তাহাদের রুদ্ধ-বক্ষদ্বারের এতদিনের পুঞ্জীভূত আবেগ ও উত্তেজনা আজ যেন জাগিয়া উঠিয়াছে, নির্গম পথ খুঁজিয়া মরিতেছে, তাই আজ তাহাদের অজস্র অনর্গল বাঁধন হারা বাক্যস্রোতে থামায় কার সাধ্য?.........এ যেন একটি প্রকাণ্ড বিহঙ্গমের মত বিস্তীর্ণ পাখা ছাড়াইয়া দিয়া শূন্য-মার্গে উড়িয়া চলিয়াছে, থাবাতে সে মানুষ ধরিয়া টানিয়া লইয়াছে; একে ওর ঘাড়ে ফেলিয়া যেন আঘাত করিতেছে। উন্মত্ত জনসঙ্ঘ ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত। এক রাশ ধূলি ময়লা জনতাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেকের মুখই আগুনের মত রাঙা, কপোল হইতে বিন্দু বিন্দু স্বেদ-বারি নির্গত হইতেছে। কৃষ্ণ, কৰ্ম্ম পাংশু মুখমণ্ডল হইতে চক্ষু জল্-জল্ করিয়া জ্বলিতেছে। দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

যেখানে সিজোভ্ ও মাখোটিন্ দাঁড়াইয়া ছিল পাভেল আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল,

"ভাই সব!—"

মা দেখিলেন প্যাভেলের মুখ বিবর্ণ, তাহার ঠোঁট কাঁপিতেছে। মা নিজের অজ্ঞাতসারে ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন, কে যেন প্রশ্ন করিল,

"কোথায় যাচ্ছ, বুড়ি?"

তিনি ক্রুদ্ধ জনমণ্ডলীর প্রশ্ন শুনিয়াও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহাকে সকলে মারিতে লাগিল, কিন্তু মা কনুই দিয়া, ঘাড় দিয়া ঠেলিয়া, যা করিয়া পারুক রাস্তা করিয়া লইবেনই। এইরূপে আস্তে আস্তে মা তাঁহার পুত্রের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মনের মধ্যে সঙ্কল্প রহিয়াছে সে তাহার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইবেন। পাভেল যখন কথা কহিতেছিল, লড়াই করিবার তীব্র আনন্দে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল; তাহার প্রত্যেক কথাগুলি কী অর্থ ব্যঞ্জক ও গুরু-গম্ভীর। মনে হইতেছিল অন্তরের নিগূঢ় কামনা ও বিশ্বাসের তীব্র উন্মাদনায় তাহার অবরুদ্ধ অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাহার সমস্ত সত্তা যেন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পাভেল পুনরায় কহিয়া উঠিল,

"ভাই সব,"

কথাগুলির উপর সমগ্র শক্তি ও প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিয়া বলিতে লাগিল,

"আমরাই গির্জ্জা গড়ি, আমরাই কারখানা তৈরী করি, লোহার চেনও আমাদের হাতের তৈরী, আর রূপার টাকাও আমাদের প্রস্তত। আমরা খেল্‌না বানাই, কামানও গড়ি। জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্ব রকমের আমোদ আহ্লাদের আমরাই রসদ্ জোগাই, এই জীবন্ত জাগ্রত শক্তিই সমগ্র জগতের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিচ্ছে।"

রাইবিন চীৎকার করিয়া উঠিল,

"চুপ্ চুপ্, শোনো, শোনো।"

"সর্ব্বত্র সব সময়েই আমরা কর্ম্ম যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে, কিন্তু জীবন যুদ্ধে সকলের পিছনে আমাদের স্থান। আমাদের জন্য কে ভাবে? আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কে আছে? আমাদের মানুষ বলে মনে করে এমন কি কেহ আছে? কেউ নেই।"

জনতা প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল,

"কেউ নেই।"

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পাভেল আরও সোজা পরিষ্কার করিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল। আস্তে আস্তে জনতা তাহাকে ঘিরিয়া একটি বিশাল জন সমুদ্রের সৃষ্টি করিল। হাজার হাজার মাথা দেখা যাইতে লাগিল। উৎসুক-ব্যগ্র দৃষ্টিতে সকলে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, তাহারা একাগ্র চিত্তে নিঃশব্দে যেন তাহার কথা গিলিতে লাগিল।

"আমরা যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভাই ভাই বলে মনে না কর্ত্তে পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত এর চেয়ে উন্নত জীবন আমরা আশা করতে পারি না। আমাদেয় এক আশা—যেন এক পরিবারের কয়েকজন বন্ধুরমত থাকি, একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা, আমরা যেন আমাদের মঙ্গলের জন্য সকলে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করতে পারি।"

কে একজন মায়ের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিয়া উঠিল,

"হাঁ, হাঁ হয়েছে যে যার নিজের চরকায় তেল দাও গে।"

"বাধা দিও না! "চুপ্ চুপ্।" দুই স্থান হইতে এইরূপ চীৎকার শোনা গেল। ঝুলের ন্যায় কালো মুখগুলি রুষ্ট সন্দেহে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; অন্যান্য অসংখ্য চক্ষু পাভেলের দিকে অচপল-চিন্তিত বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

কেহ কেহ বলিল,

"সাম্যবাদী হ'লে কি হবে, লোকটি বোকা নয়।"

মার ঘাড়ের উপর মৃদু আঘাত করিয়া লম্বা শুস্ক মজুরটী বলিল;

"আমি বল্‌ছি, লোকটা খুব সাহসের সঙ্গে কথা কইতে পারে কিন্তু!"

"বন্ধুগণ, এইবার আমাদের সময় এসেছে, আমাদের পরিশ্রমের উৎপন্ন থেকে যে লোভীরা সমস্ত কিছু কেড়ে লয়, সেই শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমাদের এ কথা প্রত্যেকের ভালকরে বলা প্রয়োজন যে, আমরা নিজেরা ছাড়া আমাদের সাহায্য কর্ত্তে আর কেউ নেই। আমাদের আইন হবে সকলের জন্য একজন, এবং একজনের জন্য সকলে। এ ছাড়া শত্রু দমনের আর কোন উপাই নেই।"

মাখোটিন চীৎকার করিয়া বলিল,

"বন্ধুগণ, সে যা ব'লছে, শোনো। সত্যবাণী শ্রবণ করো।"

এই বলিয়া সে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া শূন্যে মুষ্টি উত্তোলন করিল।

পাভেল কহিল,

"এই মুহূর্ত্তে আমরা ম্যানেজারকে এখানে ডেকে এনে সব কথা.

তাকে জিজ্ঞাসা ক'রব।"

ঘূর্ণীবাত্যার মত জনতা ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিল। সমস্বরে অনেকে চীৎকার করিয়া উঠিল,

"ম্যানেজার, ম্যানেজার, সে কোথায়, তাকে ডাকো, তাকে সব বুঝিয়ে দিতে বলো"

"তার কাছে ডেলিগেট পাঠাও, তাকে এখানে নিয়ে এস।"

"না না, তা ক'রোনা, তার কোনো দরকার নেই"।

মাতা জনতা ঠেলিয়া তাহার পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পুত্র-গর্ব্বে তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিতেছিল। তাঁহারই পুত্র আজ বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী শ্রমিকদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছে, সকলে তাহারি মুখ চাহিয়া আছে, তাহার কথা শুনিতেছে, এ গর্ব্ব মাতা কোথায় রাখিবেন? সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা তাহার পুত্র অন্যের মত রাগে নাই, কি সুন্দর সহজ সরল ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিতেছে। লৌহের উপর শিলাবৃষ্টির মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা চীৎকারধ্বনি ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত,-অযাচিত প্রতিজ্ঞা শোনা গেল। উচ্চস্থান হইতে পাভেল সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল; তাহার বিস্ফারিত নয়নদ্বয় জনতার ভিতর কি যেন অ-পাওয়া জিনিস খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

"যা শত্রু পরে পরে"

(নজরুল ইসলাম)

রাজ্যে যাদের সূর্য্য অস্ত যায়না কখনো, শুনিস্—হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর—মরিবেনা কভু মৃত্যু ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়!
চেয়ে দেখ্ ঐ ধূম্র চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য্য তাদের গ্রাসিল প্রায়!
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রীক প্যারী—সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য্য!—দেখবি আয়।

(২)

অর্দ্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ-রজ্জু পাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস—
তাদের সে লোভ-বহ্নি শিখ
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস!
যে আগুনে তারা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরি সর্ব্বনাশ!
আপনার গলে আপন ফাঁস!

(৩)

এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধ্‌বে বল্?
আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল,
ওঝা ডেকে আর বল্ কি ফল।
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শগুন,
রে ভারতবাসী চল্‌রে চল্!
এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই ব'সে কি রবি কেবল?
আসে ঘনঘটা ঝড় বাদল।

(৪)

ঘর সামলে·নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন !
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবেনা, সুযোগ পলালে মেলা কঠিন !
ধর্ম্ম কলহ রাখ্ দুদিন !
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া
গণ্ডূষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবেনা ফিরে এই সুদিন !
বদনা গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন !

[৫]

ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি ক'রে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস্,
শত্রু যখন যায় পরে পরে—নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস্ !
ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব বিষ।
কলহ করার পাইবি সময়,
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয় !
হাতে হাত রাখ্, ফেল হাথিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা-বিষ
নব ভারতের এই আশিস্ !

(৬)

নারদ নারদ ! জুতো উল্টে দে ! ঝগড়েটে ফল খুঁজিয়া আন্
নখে নখ বাজা ! এক চোখ দেখা ! ঢুকাটি বাজিয়ে লাগাও গান
শত্রুর ঘরে ঢুকেছে বান !
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ টেনে আন্ আনরে তাজিয়া,
পূজা দেরে তোরা, দেরে কোরবান
শত্রুর গোরে গলাগলি কর আবার হিন্দু-মুসলমান !
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান !

"শক্তি" (বর্দ্ধমান)

পাটের কারবার

(শ্রীহৃষীকেশ সেন)

(৩)

শ্রমিকসংঘ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আর নূতন করে' বোঝাবার আবশ্যক নাই। আগে যে কারখানা সম্বন্ধীয় আইন কানুনের কথা বলেছি, তার ফলে এই হয় যে শ্রমিক যদি সুস্থ শরীরে বেঁচে থেকে নিয়মিত কাজ করতে পারে তা' হলে সে একটা মজুরি পায়। সে মজুরিটা এত বেশী নয় যে তা' থেকে অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করা যায়। অথচ রোগ আছে, বার্দ্ধক্য আছে, মৃত্যু আছে। আরও আছে সামান্য কারণে বা বিনা কারণে চাকরী যাওয়া। পূজা-পার্ব্বণ, উৎসব, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপও আছে। এ সকলের জন্যই আর্থিক সাহায্যের আবশ্যক। শ্রমিকসংঘ সুসংগঠিত হলে এই সাহায্য রাষ্ট্র শক্তির কাছ থেকে আদায় করতে পারে। ইউরোপের এবং আমেরিকার শ্রমিকসংঘ অনেক আন্দোলন করে' রাষ্ট্র শক্তির কাছ থেকে এই সকল সাহায্য পাবার অধিকার লাভ করেছে। এখন শ্রমিকদের কর্ম্ম-হীনতা বীমা (Unemployment Insurance), বার্দ্ধক্য বৃত্তি (old age pension) হয়েছে। রোগের জন্য কাজ করতে অশক্ত হ'লে চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি সবের জন্যই বীমা আছে। এখন অন্যায় করে' কেউ কাউকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারেনা। এখানে সামান্য কারণে বা বিনা কারণে শ্রমিককে

কাজ থেকে "জবাব" দেওয়া অনেক সময়েই ঘটে' থাকে। তার জন্য ধর্ম্মঘটও অনেক সময়ে হয়েছে। কিন্তু সুসংগঠিত স্থায়ী শ্রমিক সংঘের অভাবে একজন শ্রমিকের কর্ম্ম গেলে তার জায়গায় আর একজন লোক সহজেই পাওয়া যায় এবং কর্ম্ম কর্ত্তারা তাকেই নেন। ফলে, ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে যায়। শ্রমিকসংঘ বাঙলা দেশে এখনও নিতান্ত শৈশব অবস্থায় আছে। ১৯২১ সালে শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও অশান্তি দেখা গিয়েছিল, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত হয়—Committee on Industrial Unrest in Bengal. তাঁরা বলেন সুসংগঠিত শ্রমিকসংঘ বাঙলায় নাই বললেই হয়। কোন কোন ব্যবসায়ে ছোট ছোট সংঘ আছে বটে, কিন্তু বাঙলার প্রধান ব্যবসায় পাটের কারবারে শ্রমিকসংঘ বেশী নাই। কমিটি বলেন এর কারণ দুটি—একটি এই যে, পাটের কলে যারা কাজ করে তারা নানা স্থানের, নানা জাতের লোক; অপরটি এই যে কিছু দিন পূর্ব্বে পাটের কলের শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য যে দাবী করেছিল, কর্ম্ম কর্ত্তাদের দ্বারা সে দাবী গ্রাহ্য করাতে তাদের বিশেষ কোন কষ্ট পেতে হয়নি। দেশের লোককে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের যে মত, শ্রমিকদেরকে সংঘ সংগঠনের অধিকার দেওয়া এবং তার দ্বারা তাদের সর্ব্ববিষয়ক স্বার্থ রক্ষা এবং উন্নতি করা সম্বন্ধেও সেই মত—এখনও সময় হয়নি। সেই জন্য যখন ট্রেড ইউনিয়ন আইনের প্রথম প্রস্তাব হয়, তখন মূল ধনীরা এবং তাঁদের পক্ষ-সমর্থন কারীরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, গবর্ণমেণ্টও তাঁদেরই পক্ষেই ছিলেন। তার পর যখন লোকমত নিতান্তই প্রবল হয়ে উঠল, শ্রমিকদের মূক মুখে কথা ফুটল, তারা ন্যায্য অধিকার দাবী করলে, না পেয়ে ধর্ম্মঘট করলে, ধর্ম্মঘট যখন দেশব্যাপী হয়ে উঠল, তখন গবর্ণমেণ্ট তাদের কথা শুনতে রাজী হলেন। অনেক বাদ-বিসংবাদের পর যদি বা একটা আইন পাশ হল ত' সেটাকে আজ● কাজে প্রয়োগ করা হলনা।

ইংলণ্ডেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত হবার পূর্ব্বে শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। ইংলণ্ডের লোকও তখন প্রধানতঃ কৃষি-কর্ম্মীই ছিল, কৃষিকর্ম্মের মজুরি করত। সেখানে এদেশের মত কৃষক নাই। কৃষকের নিজের জমি নাই। একজন বড় ধনী কৃষক বড় জোত নিয়ে মজুর দিয়ে চাষ করে। ইংলণ্ডে যখন প্রথম কল-কারখানা আরম্ভ হল, তখন এই কৃষিমজুর থেকেই কারখানার মজুর নেওয়া হল, গ্রাম শূন্য হয়ে শহর গড়ে' উঠল। জমিজমাহীন মজুরদের আর গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক থাকল না। তারা কৃষিকর্ম্ম ভুলে গেল; কারখানার মজুরিই তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হল। সমাজ বিভাগে এই শ্রমিকেরা একটা শ্রেণী হয়ে উঠল। কারখানা আইন এবং ট্রেড ইউনিয়ন হয়ে এই শ্রেণী এখন খুব প্রবল। এখন তারা মূল ধনীদের এবং গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করছে।

কেবল যে ইংলণ্ডেই এই শ্রমিকশ্রেণী খুব প্রবল হয়েছে, তা' নয়। সমস্ত ইউরোপে এবং আমেরিকাতেও এরা খুব প্রবল এবং প্রত্যেক দেশের স্বতন্ত্র শ্রমিক সংঘগুলি আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকসংঘে সম্মিলিত হয়ে আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। এরা যে এখন কত শক্তিশালী তা' এবারকার বিলেতের কয়লার খনির ধর্ম্মঘটে বেশ করে' বুঝিয়ে দিয়েছে। খনির মালিকদের জেদ তারা কম মজুরি দেবে আর কাজের সময় বাড়িয়ে দেবে। আর শ্রমিকদের জেদ তারা তাদের মজুরির একটি পয়সা কম নেবেনা, কাজও দৈনিক সাত ঘণ্টার উপর এক মিনিটও করবেনা—"Not a penny off their wages and not a minute to the day." ফল হয়েছে, কয়লা আর খনি থেকে উঠছেনা, শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে' কাজ বন্ধ করে' দিয়েছে, লোক সাধারণের কয়লার অভাবে অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। কল-কারখানারও অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে। শ্রমিকদেরও অবশ্য খুব কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাদের ট্রেড ইউনিয়ন তাদের কষ্ট মোচনের যথোচিত চেষ্টা করছে। আর শ্রমিক সংঘের আন্তর্জ্জাতিকতার প্রভাবে অন্য দেশের ট্রেড ইউনিয়নও যথেষ্ট সাহায্য করেছে। রুশিয়ার শ্রমিকসংঘ অনেক সাহায্য করেছে, আমাদের দেশের শ্রমিক সংঘও যথাসাধ্য সাহায্য করেছে।

এদেশে এখনও ইউরোপের মত একটা শ্রমিকশ্রেণী পাকা রকমের স্থায়ী ভাবে গড়ে ওঠেনি। এখনও কল-কারখানায় যারা কাজ করে তাদের কারখানার মজুরিই একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নয়। এখনও তাদের পল্লীগ্রামের বাড়ী আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, একটু জমিও আছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যারা বাড়ীতে থাকে তারা সেই জমিটুকু চাষ করে। যারা কারখানায় কাজ করে তারা জমির খাজনাটা সেখান থেকে পাঠিয়ে দেয়, চাষের সময়ও বীজ কেনা বা অন্যান্য যা' খরচের আবশ্যক তা' দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে। ফলে, ইউরোপের কলের মালিকদের মত এখানকার কলের মালিকেরা শ্রমিকদেরকে বিশেষ জব্দ করতে পারেনা। ধর্ম্মঘট উপস্থিত হলে শ্রমিকেরা প্রথমে কারখানা-ওয়ালাদের সঙ্গে যথাসাধ্য লড়াই করে. পরে আবশ্যক হলেই আপনার পল্লীভূমিতে ফিরে যায়। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন এ সম্বন্ধে বলেন, কলকাতা এবং বোম্বাই-এর কারখানার শ্রমিকেরা স্থায়ীভাবে কারখানায় থাকেনা। কিছুকাল কাজ করে গ্রামে ফিরে যায়। যে অবস্থায় তারা কারখানায় বাস করে এবং কাজ করে, তার পরিবর্ত্তন না হলে এই শ্রমিকেরা কারখানার কাজে নিপুণতা লাভ করে' একটা স্থায়ী কারুকর শ্রেণীতে পরিণত হতে পারেনা (Report of the Indian Industrial Commission p. 15). শ্রীমতী জি, এম, ব্রাউটন, এম, এ, ও, বি, ই, বলেন, একটি সুপরিচালিত কাপড়ের কলের কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁকে বলেছিলেন যে শ্রমিকেরা কারখানাটাকে একটা বন্দীশালা বলে মনে করে। সেই জন্য যে তারা স্থির হয়ে কাজ করেনা, তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁকে আরও বলেছিলেন যে প্রতি দেড় বৎসর অন্তর তাঁর সমস্ত শ্রমিকের দল বদলে যায়। কারখানায় বৃদ্ধ পুরুষ বৃদ্ধা নারী প্রায় দেখতে পাওয়া যায়না। শ্রমিকদের এই অস্থায়ীভাব, আর তার উপর তাদের ভিন্ন ভিন্ন দেশ এবং ভাষা তাদের ঐক্যবন্ধনের প্রধান অন্তরায়। তাদেরকে নিয়ে কোন সভাসমিতি করা কঠিন। কিন্তু এসকল বাধা সত্ত্বেও তাদের কথা ফুটছে। তারা এখন সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে (Labor in Indian Industries u.p. 18-19.) তারা এখন বুঝেছে যে সংঘবদ্ধ না হতে পারলে তাদের কাজও ভাল হবেনা, তাদের প্রতি তাদের প্রভুদের ব্যবহারও ভাল হবেনা, তাদের দুরবস্থাও ঘুচবেনা।

শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা ক্রমশঃ সফল হচ্ছে। এখন আহমদাবাদে ন' টি ইউনিয়ন আছে। তাদের সদস্যসংখ্যা

১৯,৭৮৫। ইউনিয়নগুলি এক একটি কারখানার নয়, এক একটি ব্যবসায়ের। অর্থাৎ সকল কারখানার একব্যবসায়ীরা মিলে এক একটি ইউনিয়ন সংগঠিত করেছে। শ্রীমতী অনসূয়া সারাভাই এই সকল সংঘের অধিনেত্রী। বোম্বাই-এও ন'টি ইউনিয়ন আছে। তাদের সদস্যসংখ্যা ২৪,৫০০। সমুদ্রগামী নাবিকদেরও একটা ইউনিয়ন আছে। তাদের সদস্যসংখ্যা ১০,০০০। কিন্তু বাঙলা এ বিষয়ে অনেক পেছিয়ে আছে। বাঙলার ট্রেড ইউনিয়ন নাই বললেও হয় (Labor in Indian Industries p. 190.) এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকসংঙ্ঘকে আবার সম্মিলিত করে' একটা সর্ব্বভারতীয় শ্রমিকসংঙ্ঘ-সম্মেলন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও আরম্ভ হয়েছে। বঙ্গদেশেও একটা বঙ্গীয় শ্রমিকসম্মেলন (Bengal Labor Federation) আছে।

এখন শ্রমিকদের এবং শ্রমিকহিতৈষীদের কর্ত্তব্য শ্রমিকসংঙ্ঘগুলিকে সুসংগঠিত করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আইন-অনুসারে রেজিষ্টরী করে নেওয়া। বাঙলার প্রধান কারবার পাট নিয়ে। বোম্বাই-এর যেমন তুলো আর কাপড়, বাঙলার তেমনি পাট আর চট। এই পাট আর চটের কলে ১৯১১ সালে ছিল ৩,৬২,৩৬৯ জন লোক। আর ১৯২১ সালে হয়েছিল ৪,৯৩,০৯৯ জন লোক। এই সুবৃহৎ কারবারটি সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের দ্বারা অধিকৃত এবং পরিচালিত। সম্প্রতি দু'টি কল মাড়ওয়ারি মহাজনেরা করেছেন। বাঙালীদের একটিও নাই। ইউরোপীয় কলকারখানার উক্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা তাঁদের নিজের দেশে হ'লে শ্রমিকদলের ভিতরেই আসতেন। কিন্তু এদেশে তাঁরা ধনীর দলে। "ইতর" শ্রমিকদলে যোগ দিলে তাঁদের বিজেতৃজাতীয়ত্বর হানি হয়। "ইতর" শ্রমিকদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। হিন্দুদের মধ্যে কৈবর্ত্ত ও মুচিই বেশী। এরা প্রধাণতঃ কল চালানর কাজই করে, চট-বোনার কাজেও অনেকে নিযুক্ত। এই সকল নিপুণ কারিকরদের এক চতুর্থাংশ মাত্র বাঙলাদেশে জন্মেছে। এই চতুর্থাংশের জন্মস্থান বাঙলাদেশ হলেও এদের অধিকাংশই বাঙালী নয়। সাধারণ অনিপুণ শ্রমিকদের সংখ্যা ১,৫৫,৬৩৩। স্ত্রীলোক ৩৫,৬৭০। চৌদ্দ বছরের নীচের বালকের সংখ্যা ১৯,১৯৫, বালিকার সংখ্যা ২,৩১১। এর মধ্যে বাঙালী নাই বললেই হয়। বাঙালীর সংখ্যা অল্প হবার কারণ এই যে কারখানায় কাজ করতে গিয়ে যেরূপ দুরবস্থায় বাস করতে হয়, বাঙালী শ্রমিক তাতে রাজী হয় না। আর একটি কারণ এই যে পাটের কলে মজুরি করার চেয়ে পাটের চাষ করা বেশী লাভজনক। ব্রাউটন বলেন এখন বাঙলার কারখানায় শ্রমিক আসে বাঙলার বাইরের অন্য অন্য প্রদেশ থেকে। আগে কিন্তু তা' ছিল না। বাঙলার কারখানায় বাঙালী শ্রমিকই কাজ করত। যেখানে কাজের আনুষঙ্গিক অবস্থা ভাল, বাসের অবস্থা ভাল সেখানে এখনও বাঙালী শ্রমিককে বিদেশী শ্রমিক স্থানচ্যুত করতে পারে নি। শ্রমিকসংঙ্ঘের প্রথম কাজ হওয়া উচিত শ্রমিকদের কাজের আনুষঙ্গিক অবস্থা এবং বাসের ব্যবস্থার উন্নতি করা। তা'হলেই আবার অনেক বাঙালী এই কাজে নিযুক্ত হবে। ব্রাউটন বলেন It has been Contended that industrial development in Bengal will not add very much to the material prosperity of the Bengal Labour. For the reasons stated above I think that this view is fallacious. There is also little doubt in my mind that industry in Bengal will be much benefited by the increasing number of Bengalees who will seek industrial occupation. Not only will they bring intelligence to the work, but their higher standard of living will induce them to work hard to earn wages sufficient to maintain that high standard." (Labour in Indian Industries pp 74-75) অর্থাৎ বাঙালী শ্রমশিল্পের কাজে যোগ দিলে তাদের কর্ম্মকুশল বুদ্ধির প্রভাবে ব্যবসায়েরও উন্নতি হবে, শ্রমিকেরও অবস্থার উন্নতি হবে।

রিক্ত

[কাজী নজরুল ইস্‌লামের শ্রীহট্টে আগমন উপলক্ষে শ্রীহট্টবাসী কৃষকদের পক্ষ থেকে দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী কর্ত্তৃক লিখিত]

তুমি এলে আমার দেশে দিব উপহার
বন্ধু কি আছে আমার ?

এ ধানের ক্ষেতে বান ডেকেছে
মান করেছে বউ
ঐ রাগের বশে ছোঁয়না ওরা
পিপড়া ভরা মউ।
ঐ ঘর খানি আজ ঝাঁট দিল না
আবর্জ্জনায় ভরা,
ঐ কাঠলেড়ালী আম খেয়েছে
কেউ দিল না সাড়া।
ঐ শরীর খানি কেমন কেমন
জরা জরা ভাব,
ঐ বছর তিনেক হয়ে গেল
গাই হলো না গাভ।
ঐ একটির উপর আরটি আসে
দুঃখ নিরবধি,
ঐ জমীদারের খাজনা বাকী
কেমন করে শুধি ?
ঐ টাকা পাঁচেক হাতে ছিল,
হারিয়ে গেল কোথা।
ঐ এমনি করে নিত্য নতুন
ঠিক থাকে কি মাথা ?
ঐ টাকা পাঁচেক হারিয়ে আবার
দিলেন পাঁচেক আনা,
ঐ গণক বেটা গুণিয়ে নিলে
কেউ দিল না মানা।

ঐ রাত হলে আর ঘুম আসে না,
মাথা ভরে ঘাম,
ঐ ভোর হলেও উঠ্‌তে নারি
ভেবে পরিণাম।
ঐ বোল টাকা কর্জ্জ করে
কিনেছিলেম গাই,
আজ সতের টাকা সুদ হয়েছে,
এখন কোথা যাই?
ঐ ছেলেটিও মরে গেল
শূন্য করে কোল,
ঐ মন চলে না, পা চলে না,
কথায় কথায় ভুল।
ঐ রুক্ষ হল রুগ্ন দেহ
পক্ক হল কেশ,
আর ম্যালেরিয়ায় ভরে গেছে,
আমার জন্ম দেশ।
ঐ সাত সমুদ্র পার হয়েরে
বণিক হল রাজা,
ঐ পায়ের চোটে প্লীহা ফাটে,
কথায় কথায় সাজা।
ঐ বুকে বসে সিংহ মামা,
রক্ত করে পান,
ঐ শূন্য করে দিল মোদের
দৈন্য দেহ খান।
কিবা ছিল কি হইল
সোনার বঙ্গদেশ,
আছে কি তার চিহ্ন এখন
আছে কি তার লেশ!
কেন এসে দাসের দেশে
কি দেখিতে তুমি,
হায়! ম্যালেরিয়ায় ভরে গেছে,
আমার জন্ম ভূমি।
সেদিন কি আর আছে এখন
ধানে ভরা মাঠ,
মুখে ভরা মধুর হাসি,
লোকে ভরা হাট।
দ্বারে দ্বারে গরু বাঁধা,
ঘরে ঘরে দুধ,
আজ গরু বাছুর শেষ হয়েছে
শোধ করিতে সুদ।
ঐ গোলা ভরা ধান কি আছে
গলা ভরা গান,
ঐ ক্ষীণ দেহ পড়ে আছে,
আছে কি আর প্রাণ?
কি দেখিবে শ্মশান ভূমে,
মানুষ ত আর নাই,
মানুষ সকল পুড়ে গেছে,
পড়ে আছে ছাই।

মাটির ডাক্

(জসীম উদ্দীন)

বিদ্বান্
(চোখে চশ্‌মা ও হাতে অনেকগুলি বই)

চাকুরী মেলা ভার, আমাদের চাকুরী মেলা ভার.
এম-এ, বি-এ খেতাব পেয়ে কেতাব বওয়া সার।
মনিব বাড়ীর গোলাম হতে সেলাম ঠুকে হায়
মিছেই কপাল ঘা করেছি কেউ ফিরে না চায়।
ছেলে মেয়েয় পায় না খেতে জল আসে যে চোখে
পথের ধূলো গায়ে মাথায় সেই বেদনার শোকে।
দেশ ছেড়ে আজ পালিয়ে যাব যেথায় যায় দুই আঁখি.
বুকের ব্যথা পথের গায়ে চোখের ধারায় আঁকি।
(ছেড়ে এই) শহরখানা পাঁজর পেশা ব্যথার হাহাকার
চাকুরী মেলা ভার আমাদের চাকুরী মেলা ভার।

একদল রাখাল, তাঁতী, বণিক ও চাষা।

[এদের মুখগুলি গ্রামের সহজ সুন্দর সারল্যে ভরা। রাখাল-দের কারও হাতে বাঁশের বাঁশী, কেউ একরাশ সর্ষে ও কলমী ফুল হাতে করে আছে। কেউ শামুকের মালা গেঁথে গায়ে পরেছে। কারও কানে রঙ বেরঙের পাখীর পালক, কেউ কাঁধে একগুচ্ছ সোনালী ধান ঝুলিয়ে রেখেছে। এরা যেন শস্য ক্ষেত্রের রঙীন্ দেবশিশু। চাষার হাতে কাস্তে ও হুঁকো, আর এক হাতে আগুনের পাত্র, মাথার মাথা'ল। তাঁতী লোকটী সাদাসিদে ধরণের। হাতে একরাশ রঙীন্ গামছা, বণিকের মাথায় পশরা হাতে পুঁতির মালা, কাঁচের চুড়ী ইত্যাদি। খুব করুণ-স্বরে সেই বিদ্বানকে ডাকল।]

কোথা যাস্ আয় ফিরে ও সোনার বরণ ছেলে
কাঁজল ঘন গাঁয়ের পাশে আসন দিছি মেলে।
আমরা চাষী, কুমোর, তাঁতী, অধম মোরা অতি
মূর্খ যে তাই চোখ থাকিতে নাইক চোখের জ্যোতি।
মোদের ব্যথা কেউ শোনে না, কেউ চাহে না ফিরে,
সব দুনিয়ার অত্যাচার এই লুটায় মোদের শিরে।
একলা মোরা ডুকরে কাঁদি, একলা মুছি আঁখি,
বুনো গাঁয়ের গায়ে গায়ে সেই ব্যথারে আঁকি।
মোদের পানে বারেক ও ভাই চাও না নয়ন্ মেলে
কাঁজল ঘন গাঁয়ের পাশে আসন দিছি ফেলে।

রাখাল

চল চল মোদের সাথে উজান তলীর মাঠে,
মায়ের দেওয়া চিড়ে মুড়ী হর্ষে বেঁধে গাঁঠে।
কল্‌মী ফুলের মালা গাঁথি দিব তোমার হাতে,
দুধ-বাছুরে পরিয়ে দিও নাচ্‌বো তাহার সাথে।
গাম্‌ছা খানি পাতিয়ে দেব বটের শীতল ছায়ে,
কুসুম ফুলের নুপূর গড়ি জড়িয়ে দেব পায়ে।
বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে তোমায় পাড়িয়ে দিব ঘুম,

উছে ফুলের বুকের ভাষা গণ্ডে দেব চুম্।
গাছের শাখা ভেঙে তোমায় বাতাস দিব গায়ে,
মুঠি মুঠি বুনো ফুল ছড়িয়ে দেব পায়ে।
(মোদের) মাঠের খেলা রঙীন হবে তোমায় সাথে পেলে,

সকলে

কাঁজল-ঘন গাঁয়ের পাশে আসন দিছি মেলে।

তাঁতী

সুতোর পরে সুতো দিয়ে বুনিয়ে তুলি শাড়ী,
সাত রঙা তার পাড়ের নেশায় গানের মায়া ছাড়ি।
হর্ষ তারি তাঁতের সুরে কাঁপায় সারা গাঁ,
রাত দুপুরেও কাজ যে মোদের কখন থামে না।
নিখিল ধরার লাজের বসন যোগাই মোরা তাঁতী,
সেই গরব আজ রাখ্‌তে পারি ফুল্‌ছে বুকের ছাতি।
মোদের বাড়ী যাও যদি ভাই বসতে দেব পীড়ে,
হাতের বোনা গামছা খানি বাঁধিয়ে দেব শিরে।
নানান্ দেশের শুন্‌বো খবর তোমায় বাড়ী পেলে,

সকলে

কাঁজল-ঘন গাঁয়ের পাশে আসন দিছি মেলে।

বণিক

পশরা মোর মাথায় নিয়ে নানান্ গাঁয়ে ফিরি,
বউ-ঝিরা সব ঘোম্‌টা খুলে আমায় দাঁড়ায় ঘিরি।
গাঁ ভ'রে মোর হাজার মা-বোন্ ছড়িয়ে আছে তারা,
আমায় দেখে লজ্জাতে তাই পালিয়ে না হয় হারা।
(বেচে) কাচের চুড়ী পুঁতীর মালা পান সুপারী সিন্দুর,
ছেলেমিয়ে জাগিয়ে তুলি যত গেঁয়ো বধুর।
আমার সাথে তাইতে তাদের কেবল ছেলে খেলা,
গরীব বলি তবুও কেহ করে নাক হেলা।
সিদুঁর দিয়ে চাল মেঙে লই, পুঁতির মালায় ধান,
টাকা কড়ির ধার ধারিনে নাইক কোন মান।
তোমরা বল ঠকাই তাদের? তাইবা যদি করি
মার কাছে কি ছেলের এদোষ এতই রাখে ধরি?
গাঁয়ের মাঝে নাম কিনেছি, রটে মাঠে দিঠে,
বউ-ঝিরা কয় গরানাথের বচন বড় মিঠে।
এই গাঁয়ে ভাই বসত কর হেথায় বাঁধো ঘর,
পশরা মোর নামিয়ে যাব তোমার উঠান পর।
আদর দিয়ে ভুলিয়ে যাব তোমাদের সব ছেলে,

সকলে

কাঁজল-ঘন গাঁয়ের পাশে আসন দিছি মেলে।

চাষা

আমি চাষী মাঠের হাসি ফোটাই তরুণ ধানে,
ক্ষেতের ধূলো ধুন-চুলা-চুল সবুজ হাওয়ার পানে।
নিড়িয়ে নিয়ে ধানের গোড়া পিছন ফিরে চাই,
বুকের দরদ পেয়ে তারা কেমন দেখায় ভাই।
পাটের ক্ষেতে বাছন দিতে গানের মায়া ঢালি
সবুজ ঢেউএ হরষ আমার দোদোল দোলে খালি।
ছয় ঋতুতে মাঠটী মোরা ছয় রঙে সব সাজাই,
তারি সাথে রঙীন্ হয়ে বিশ্বটারে হাসাই।
সারা মাঠে কিন্তু মোদের তারি অহঙ্কার
রাত ঘুমানো বসত বাটি করেনি গুলজার।
ঘরের সোনা ছড়িয়ে দিয়ে চষা মাঠের বুকে
নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকি রাতখানি তাই সুখে।
গাছের পাতা দোদুল দোলে ঘুমঘুমি দেয় চোখে,
প্রথম মোরগ ডাক্ দিয়ে দেয় স্বর্ণ-উষার লোকে।
মাঠটি সমান ঢালু হেথায়, আকাশ সীমাহারা,
সূর্য্য হেথায় সমান জ্বলে, সমান বাদল ধারা।
উঁচু নীচু জানিনে তাই সবায় বুকে ডাকি,
আমার বাড়ী যাও যদি ভাই আদর করে রাখি।
তোমায় মোরা করবো যতন বুকের স্নেহ ঢেলে,

সকলে

কাঁজল-ঘন গাঁয়ের পাশে আসন দিছি মেলে।

বিদ্বান্

(তাঁতী, চাষী ও রাখাল ছেলেদের খুব কাছে যেয়ে
আদর করে গাইবে।)

আয়রে তাঁতী, কামার, কুমার, গাঁয়ের রাখাল, চাষী,
তোদের বুকে বক্ষ দিয়ে চোখের জলে ভাসি।
বাংলা মায়ের সবুজ বুকে ছড়িয়ে আছিস্ তোরা,
লক্ষ্মীদেবীর আঁচল যেমন হীরে মাণিক ভরা।
নীল আকাশে তোরাই যেন ঝুনকি তারার রাশি
ছড়িয়ে দিছিস্ আঁধার রেতে আপন কাজের হাসি।
তোদের সাথে ফিরিবো মাঠে চরিয়ে সুঠাম ধেনু
সাঁঝ সোহাগী অলস হাওয়ায় বাজিয়ে বাঁশের বেনু।

(সকলে মিলে তাকে ঘিরে ফেল্‌লে, রাখালেরা কেউ তার কোলে উঠে বসলো। তারপর, গান গাইতে গাইতে গাঁয়ের পথে চলে গেল।)

কোথা যাস আয় ফিরে ও সোনার বরণ ছেলে,
কাঁজল ঘন গাঁয়ের পথে আসন দিছি মেলে।

পত্র

"গণ-বাণী"র মাননীয় সম্পাদকদ্বয়!

আমি আপনাদের সম্পাদিত "গণবাণী" নিয়মিত ভাবে প'ড়ে থাকি এবং উহাতে যে সকল মতামত প্রকাশিত হয়, সে গুলির নিরপেক্ষতা দেখে যারপর নাই আহ্লাদিত হই। "গণবাণী"র ন্যায় উদার মতাবলম্বী সপ্তাহিকের সংখ্যা যে দেশে খুবই কম, তা' স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। ইহার ভাব ও ভাষা সুমার্জ্জিত, সুরুচি সঙ্গত। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে "গণবাণী"র বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক গণবাণীর ৮ম সংখ্যায় 'সাম্প্রদায়িকতার পরিণাম' প্রবন্ধটি আমার খুবই ভাল লেগেছে, কথাগুলি বেশ গুছিয়ে ঠিক্ ঠিক্ বলা হয়েছে। তবে হিন্দুদিগের সভাসমিতি ও নেতৃবর্গের সম্বন্ধে যা' যা' বলা গেছে, সে সম্বন্ধে আমার দু' একটা কথা বলবার আছে। তা আপনাদের জানাবার জন্যই আমার এই লেখা। আজ চল্লিশ বৎসরের ভারতবর্ষের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ

ক'রে আমার মনে ধারণা জন্মেছে যে, হিন্দু নেতৃগণ যদি বিপথ-গামী হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে সেজন্য মুসলমান নেতৃবর্গই বহুলাংশে দায়ী। যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেশে অপর কোনও প্রতিষ্ঠানের এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না, বা হিন্দু মুসলমান ঘটিত কোনও গুরুতর প্রশ্নও উপস্থিত হয় নাই, কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িক হিসাবে গঠিত হইয়াছিল না। যাহারা ভারতের অধিবাসী বলিয়া মনে করিবে, পরস্পর অভিন্ন স্বার্থ বলিয়া বুঝিবে, তাহারা সকলেই কংগ্রেসে মিলিতে পারিবে, ইহাই ছিল কংগ্রেসের গোড়ার কথা। তথাপি মুসলমান নেতৃগণ মনে প্রাণে কংগ্রেসে যোগ না দিয়া, পৃথকভাবে নিজেদের নানা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুল্লেন। সাম্প্রদায়িক ভাবের সূত্রপাত হইল। দু'চার জন উদারচেতা মুসলমান কংগ্রেসে এলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বসম্প্রদায়কে আয়ত্ত করতে পার্লেন না। হিন্দু নেতৃগণ তাঁহাদেরকে ডেকে ডেকে হয়রান হ'য়ে, অগত্যা ভিন্নপথ অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন। যেখানে সরল পথে চলিয়া কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তথায় কুটিলতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কাজেই হিন্দু নেতৃবর্গ হতাশ হইয়া যদি কুটিল পথে গমন করিয়া থাকেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তাই'ত, দেশের সমস্যা জটিলতর হ'য়ে উঠেছে। এখনও যে মুসলমান নেতৃবৃন্দের চৈতন্য হইতেছে না, এ সম্বন্ধে আপনারা কি বলেন? হিন্দু যেমন প্যান ইসলামিজমের ভয়ে জড়সড়, মুসলমানও তদ্রূপ হিন্দু স্বরাজের আশঙ্কায় ভীতিগ্রস্ত। এখনও যদি উভয় সম্প্রদায় সকল প্রকার দূষিত মনোভাব পরি-ত্যাগপূর্ব্বক এক স্বার্থে মিলিত হ'য়ে, দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তা হ'লে সকল কঠিন সমস্যাই কি সহজ হইয়া আসিবে না?

বিনীত—
শ্রীপ্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী,
"স্বরাজ" আফিস, পাবনা।

কানপুরের পত্র

মজদুর সভা, কানপুর,
৫ই অক্টোবর, ১৯২৬।

মাননীয় "গণ-বাণী" সম্পাদক মহাশয়,
সমীপেষু—

মহাশয়!

ভারতবর্ষে "ন্যাশন্যাল কম্যুনিজম"এর আবিষ্কর্ত্তা মিঃ সত্যভক্ত এখন হিন্দু সভা ও সংগঠন আন্দোলনের একজন মহা পাণ্ডা। কানপুরে যাঁরা স্বরাজ্য পার্টীর বিরোধী দল মিঃ সত্যভক্ত ও রাধা-মোহন গোকুলজী বর্ত্তমানে তাঁদের হাতের ক্রীড়ণক মাত্র। তাঁরা এখানকার বিখ্যাত ধনী চুনিলালের পৃষ্ঠাবলম্বন করে "ভারত" নামক একখানা কাগজ বের করেছেন। শ্রীযুত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী কানপুর হতে কাউন্সিলের পদপ্রার্থী হয়েছেন। মিঃ সত্যভক্ত তার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। এই ধুরন্ধরটিকে চিনে রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইনিই গত বৎসর কানপুরে কম্যুনিষ্ট কন্-ফারেন্স আহ্বান করেছিলেন। ভারতে কম্যুনিজমের কপাল খুবই খারাব বলতে হবে, যে এদেশে সত্যভক্ত ও রাধামোহন গোকুলজীর ন্যায় লোকও কম্যুনিষ্ট বলে আপনাদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। আপনি এঁদের সম্বন্ধে এসব কথাগুলো আপনার কাগজে ছাপালে বড় বাধিত হব। কানপুর মজদুর সভার বিরুদ্ধেও "ভারত" নামক কাগজখানা লিখ্ছে। মজদুর সভা যাতে সকলের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয় তারি চেষ্টা করছে এই "ভারত"।

বিনীত—
রমজান আলী,
সেক্রেটারী, মজদুর সভা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল

অধ্যাপক জিতেন্দ্র লাল বন্দোপাধ্যায় বীরভূম জেলার অ-মুসল-মান কেন্দ্রহতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ প্রার্থী হয়েছেন। এ উপলক্ষে তিনি সংবাদ পত্রে সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছেন। এ বিজ্ঞাপনে তিনি তাঁর আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন এবং নির্ব্বা-চিত হয়ে কাউন্সিলে যেতে পারলে কি কি করবেন তা-ও বিবৃত করেছেন। তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক, যেহেতু তিনি বহু পূর্ব্ব হতেই দেশে সুপরিচিত ও স্বনাম ধন্য। আমরা তাঁর কাউন্সিলের কর্ম্মতালিকা সম্বন্ধে দু'এক কথা বল্‌ব মাত্র। তিনি বলেছেন যে তিনি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দণ্ডায়মান হয়ে শ্রেণীর সহিত বিরোধ করবেন এবং জাতির সহিত সম্প্রদায়ের বিরোধ যখন বাধবে তখন তিনি দাঁড়াবেন জাতির পক্ষে। অধ্যা-পক বন্দোপাধ্যায় মহাশয় খুব বড় কথাই বলেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু, সত্যই একি তাঁর প্রাণের কথা? বাংলা দেশে যে শুদ্ধি সভা আছে তিনি তার সম্পাদক। আর এই শুদ্ধি সভা যে সর্ব্বসাধারণের সভা নয়,—বিশিষ্ট শ্রেণীর সভা, একথা কে না জানে? তারপরে, এই শুদ্ধি-সভা যে সাম্প্রদায়িকত্বের উপাসক এবং জাতীয়ত্বের ঘোর পরিপন্থী একথা কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন? সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান মাত্রেই, হিন্দুর হোক কিংবা মুসলমানের হোক্, জাতীয়-ত্বের পক্ষে হানিকর। শুদ্ধি-সভা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হানিকর এজন্যে যে এর এমন কতকগুলো খুব সঙ্কীর্ণ নীতি আছে যদ্দ্বারা দল বাড়াবার পক্ষে বিশেষ কিছু সুবিধে না হলেও বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে ঝগড়া বাধানো যায় খুব বেশী। শুদ্ধি ওয়ালারা, অসম্ভব হলেও, ভারতবর্ষ হতে বেদের সভ্যতা ছাড়া অন্যসব সভ্যতাকে তাড়িয়ে দিতে চান। তাঁদের ইত্যাকার সঙ্কীর্ণতার দ্বারাই সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি দেশে হয়ে থাকে। অবশ্য এর দ্বারা একথা আমরা মনে করিনা যে কেবল মাত্র শুদ্ধি ওয়ালারাই সাম্প্রদাদায়িক বিরোধ ঘটাবার মূলীভূত কারণ। আমরা এই মাত্র শুধু বলতে চাই যে বর্ত্তমানে দেশে যতগুলো বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক

অনুষ্ঠান আছে তার মধ্যে শুদ্ধি-সভার আসন খুবই উচ্চে অধিষ্ঠিত। শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় এহেন অনুষ্ঠানের প্রধান পরিচালক হয়েও বল্‌ছেন কিনা যে তিনি সর্ব্বসাধারণের ও জাতীয়ত্বের পক্ষাবলম্বন করে কাউন্সিলে যাচ্ছেন। তিনি শুদ্ধি, সংগঠন বা হিন্দু মহাসভা যা ইচ্ছে তা করুন, তাতে আমাদের এতটুকুও কিছু বলবার নেই। কিন্তু, তিনি সর্ব্বসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করবেন এরূপ বলার কোনো অধিকারও তাঁর আর নেই। শুদ্ধি সভার ন্যায় সভার সম্পাদক যিনি হয়ে থাকেন তিনি আর যা-ই হোন্‌না কেন, গণ-নায়ক কিছুতেই হতে পারেন না। তারপরে, শ্রীযুত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ীতে যখন থাকেন তখনো তাঁর দ্বারে লেখা থাকে যে তিনি বাড়ীতে নেই। লোকের সাথেত তিনি মিশ্‌তেই চাননা, আর, না মেশার জন্যে বড়ীতে থেকেও "বাড়ীতে নেই" লিখে দিয়ে তিনি সকলকে প্রতারিত করেন। এ অবস্থায় তিনি দেশের ও দশের কাজ কি করে করবেন?

ম-আ

কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব

আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব হাওড়া-হুগলী মিউনিসিপ্যালিটির মুসলমান কেন্দ্র হতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ প্রার্থী হয়েছেন। তিনি দেশের প্রকৃত সমস্যা অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্যা বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেছেন। জন-সাধারণের পক্ষ থেকে তাঁর কাউন্সিলে যাবার সত্যকারের অধিকার আছে। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি খুব উন্নত ধারণা পোষণ করে থাকেন। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সব কিছু উৎপাদন করে থাকে, তারা সব কিছু হতেই বঞ্চিত হচ্ছে, আর যারা অলস অশ্রমিক, তারাই ভোগ বিলাসে দিন কাটাচ্ছে। এইযে সামাজিক অত্যাচার ইহার প্রতিকার তিনি করতে চান। হুগলি-হাওড়ার মিউনিসিপালিটির অধীন স্থান সমূহে কারখানার শ্রমিকদের সংখ্যা খুবই বেশী। শ্রমিকদের ভাত-কাপড়ের সুব্যবস্থা করা তাঁর জীবনের ব্রত। তাদের কথা তিনি যতটা জানেন, আর তাদের ভালো কিসে হয় তা তিনি যতটা বোঝেন, তেমন জানা বা বোঝা লোকের সংখ্যা এদেশে খুব বেশী নেই,—নেই বলেই দেশের অবস্থা এত শোচনীয়। স্বরাজের স্বরূপ সম্বন্ধে কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের ধারণা খুব পরিষ্কার। গণ-তান্ত্রিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতা তিনি চান। এ সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির চেয়েও উন্নত। অতীব সুখের বিষয় যে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিও উপরি উক্ত কেন্দ্রের জন্যে কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবকেই মনোনীত করেছেন। হুগলী ও হাওড়ার যুবকদের নিকটে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে তাঁরা কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের নির্ব্বাচনে সাহায্য করুন। তাঁকে নির্ব্বাচন করে দিতে পারলে যে তাঁরা যোগ্যতম লোককেই নির্ব্বাচন করবেন তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই।

ম-আ

অন্তরীণে কম্যুনিষ্ট

পেশোয়ার কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ এ ধারা অনুসারে মোহাম্মদ শফীক্ ১৯২৪ সনে ৩ বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ ই তারিখে কারামুক্ত হয়ে তিনি যখন তাঁর নিজগ্রামে ফিরে যান তখন গবর্ণমেণ্টের আদেশে আবার তাঁকে আপন গ্রামে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছিল, ষড়যন্ত্রের অপরাধে, কিন্তু, জেল হতে বের না হতেই আবার আপন গ্রামে তাঁকে আবদ্ধ রাখা হলো কিসের অপরাধে সেটা একবার দেশবাসী জিজ্ঞাসা করবেন কি?

কি করা চাই?

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের বৈঠক বসতে আর বেশী বিলম্ব নেই। এবার কংগ্রেস যে গৌহাটিতে হবে এ কথা সকলেই জানেন। বাংলাদেশের খুব বেশী সন্নিহিত হওয়া হেতু গৌহাটিকে বাংলা বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই, এবারকার কংগ্রেস "আসাম-কংগ্রেস" হলেও তার জন্যে বাঙালীর দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়। বাঙালীকে কি করতে হবে সে কথাই এখন ভেবে দেখা চাই। বাংলার রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁদের প্রাণ এখনো তরুণ ও সজীব আছে তাঁদের উচিত দলবদ্ধ হয়ে গৌহাটি কংগ্রেসে যাওয়া, এবং সেখে কংগ্রেসের সুর ও কর্ম্ম ধারার আমূল পরিবর্ত্তন করে দেওয়া। কংগ্রেস স্বরাজ লাভ করতে চায়, কিন্তু, স্বরাজটা যে কি বস্তু তার কোনো ব্যাখ্যাই আজো দেওয়া হয়নি। যখনি স্বরাজের ব্যাখ্যার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখনি ওকালতি বুদ্ধির একটা না একটা চাপ পড়েছে। ফলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অদ্যাবধি স্বরাজের কোনো একটা সংজ্ঞাই দিতে পারেনি। এটাকে ধামা চাপা দিয়ে রাখার কারণ এই যে আন্দোলন করে করে যখনি মনের বল কমে যাবে তখনি আন্দোলনের অগ্রণীগণ যা কিছু একটা হাতের কাছে পেলেই বলবেন যে তাঁরা স্বরাজ পেয়েছেন। এই যে মানসিক দুর্ব্বলতা—এরি জন্যে শুধু স্বরাজের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু, অনিশ্চিতের পেছনে মানুষ কতকাল দৌড়াতে পারে? এই জন্যেই কংগ্রেস এতবেশী নিস্তেজ হয়ে গেছে। এবার গৌহাটির বৈঠকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যাতে সকলের চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হয় সেই ভাবে তাকে পরিবর্ত্তিত করে নিতে হবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হবে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। গৌহাটিতে যাঁরা যাবেন তাঁদের উচিত কংগ্রেসকে দিয়ে এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়ে নেওয়া। এরি জন্যে তরুণ প্রাণ বঙালীকে আমরা দলবদ্ধ হয়ে গৌহাটিতে যাবার জন্যে অনুরোধ করছি। আজো যে ভারতের জাতীয় মহা সমিতির উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যাত হয়নি তার জন্যে আমাদের জাতীয় চরিত্রে একটা কলঙ্কের ছাপ লেগে আছে। তরুণ প্রাণ ভারতবাসীর উচিত এই ছাপ মুছে ফেলা। ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ও সংহত গণতন্ত্র (The Federated Republican Form of

Government প্রতিষ্ঠার মন্ত্র যখনি গ্রহণ করবে তখনি কংগ্রেস নব ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। কারণ, যাদের বিন্যস্ত স্বার্থ আছে সেই ধনিক-বণিক শ্রেণীর লোকেরা এ উদ্দেশ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবে। তখন কেবল মাত্র ভদ্র সঙ্ঘ না হয়ে কংগ্রেস স্বত্বাকারের জাতীয় সঙ্ঘ হবে।

হিন্দু-সভা মার্কা কম্যুনিষ্ট

অন্যত্র কানপুর মজদুর সভার সেক্রেটারী রমজান আলী সাহেবের পত্র প্রকাশিত হলো। তা পড়লে পাঠকগণ জানতে পারবেন যে আমাদের তথা-কথিত কম্যুনিষ্ট মিষ্টার সত্যভক্ত ও রাধামোহন গোকুলজী আজকাল হিন্দু মহাসভা ও সংগঠনের পাণ্ডাগিরি করছেন। এ খবর আমাদের নিকট কিছু নূতন আসেনি। মিঃ সত্যভক্ত কিসের দ্বারা প্রাণোদিত হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেছিলেন তা আমরা গত বৎসর কানপুর যেয়েই বুঝে নিয়েছিলুম। শ্রীযুত রাধামোহনজীর সহিত পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বোঝার বাকী ছিলনা যে তিনি কোন্ শ্রেণীর কম্যুনিষ্ট। হিন্দু-মহাসভা ও সংগঠনের সভ্যগণ যাতে কম্যুনিষ্ট পার্টিরও সভ্য হতে পারেন তার জন্যে গোকুলজী যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি তাই যদি করা হয় তা হলে কম্যুনিষ্ট পার্টি অনেক অর্থিক সাহায্য পাবে এরূপ লোভও তিনি দেখিয়েছিলেন। তার পরে, কলকাতায় এসে তাঁরি মুখে শুনলুম যে তিনি আর্য্যসমাজেরও সভ্য। এমন কি আর্য্যসমাজ তাঁর নাম কেটে দিতে চাইলেও তিনি উহার গঠন প্রণালী দেখিয়ে তাঁর নাম যে কাটা যেতে পারেনা তা নিরূপণ করে নিয়েছেন। মৌলানা হসরৎ মোহানী সাহেব কম্যুনিষ্ট হয়েও খিলাফৎ কমিটির সভ্য গত বৎসর পর্য্যন্ত ছিলেন, অবশ্য এবারে তা আছেন কিনা জানিনে। কম্যুনিষ্ট যাঁরা হবেন তাঁরা ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের সহিত কোনো যোগ রাখতে পারেন না। কিন্তু, মিঃ সত্যভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেছিলেন যত সব অ-কম্যুনিষ্টদের নিয়ে। যাক্, মিষ্টার সত্যভক্ত ও গোকুলজী যখন নিজে থেকেই কম্যুনিষ্টপার্টি হতে সরে পড়েছেন তখন তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলবার নেই। তাঁরা যে ন্যাশন্যাল কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেছেন (বোধ হয় কাগজে পত্রে) সেটা আর যা হোক; কম্যুনিষ্টপার্টি মোটেই নয়। "কম্যুনিজম্ জিনিসটা একান্তই আন্তর্জাতিক ব্যাপার, "ন্যাশন্যালিজম্" এর সহিত কখনো তার কোনো প্রকার সখ্য স্থাপিত হতে পারেনা।

রমজান আলী সাহেব তাঁর পত্রে বলেছেন যে মিঃ সত্যভক্ত একজন বিখ্যাত ধনীর কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য নিয়ে স্বরাজ্যদলের সহিত বিরোধ করছেন। স্বরাজ্যদলের সহিত তাঁর যে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এটা তাঁর পত্র পড়লেই বোঝা যায়। সেজন্যে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে স্বরাজ্যদল কি ধনিকদের নিকট হতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি? স্বরাজ্যদলের প্রোগ্রামে যে শ্রমিক আন্দোলন চালাবার কথা ছিল তা কোনো দিনও কার্য্যে পরিণত হলোনা কেন? রমজান আলী সাহেবের বন্ধু গণেশ শঙ্করজী স্বরাজ্য দলের প্রতি আরোপিত এ অভিযোগের কোনো জওয়াব দিতে পারেন কি?

দেশ-বিদেশের খবর

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি

মুখপত্র প্রচারের আয়োজন

গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর রবিবার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্য্যকরী সংসদের এক সভায় আগামী অগ্রহায়ণ হইতে সমিতির মুখপত্র স্বরূপে "সাহিত্যিক" নামদিয়া একখানি মাসিকপত্র প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এ পত্রিকাখানি পরিচালনের জন্য খ্যাত-নামা সাহিত্যিকদের লইয়া একটী সম্পাদক সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। চাঁচলের রাজা বাহাদুর সমিতিতে ৫০০্ পাঁচ শত টাকা দান করায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আর একটী প্রস্তাবও এই সভায় গৃহীত হয়।

ঐদিন সমিতির উদ্যোগে একটী সাধারণ সাহিত্য-সভারও অধিবেশন হয়। সাহিত্য-সভায় মোঃ গোলাম মোস্তফা বি, এ, সাহেব "সম্রাট এনোফেলীসের সমরাভিযান" শীর্ষক একটী উপভোগ্য ক্ষুদ্র নাটিকাও পাঠ করেন।

"দেশের বাণী"র মোকদ্দমা

নোয়াখালীর "দেশের বাণী" নামক কাগজের সম্পাদক শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ও ১৫৩এ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়েছেন' এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। ৬ই অক্টোবর তারিখে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আদালতে এ মোকদ্দমা উঠেছিল। সে দিন ছুটীর দিন সত্ত্বেও আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। সরকার পক্ষে মোকদ্দমা চালাচ্ছিলেন উকীল শ্রীযুত শুভময় দত্ত, আর ক্ষিতিশ বাবুর পক্ষাবলম্বন করার জন্যে ব্যারিষ্টার মিঃ শরচ্চন্দ্র বসু নোয়াখালী গিয়েছিলেন। বহুসংখ্যক স্থানীয় উকিল ও মোক্তারও মিঃ বসুকে সাহায্য করছিলেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী অনুবাদক শ্রীযুত প্রকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য সর্ব্ব প্রথমে গৃহীত হয়। অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধের মূল ধারণা যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ব্যঞ্জক নয় একথা তিনি মেনে নিয়েছেন। অনেক জায়গায় তরজমা যে আরো ভালো হতে পারত একথাও তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। সব চেয়ে মজার কথা এই হয়েছে এই সহকারী অনুবাদক মহাশয় চীফ্ সেক্রেটারীর নাম পর্য্যন্ত জানেন না, যদিও তাঁর আফিস চীফ্ সেক্রেটরীরই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

তারপরে, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি বলেছেন যে "দেশের বাণী"র সম্পাদক কখনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করেছেন, এমন কথা তিনি অভিযোগের বিষয়ীভূত প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে জানতে পারেন নি।

৬ই নবেম্বর তারিখে মোকদ্দমার দিন পড়েছে।

ম্যান্সফিল্ড কোম্পানীতে ধর্ম্মঘট

মেসর্স ম্যান্সফিল্ড এণ্ড কোম্পানীর ট্যাংরা (ইটালী) স্থিত কারখানার প্রায় ৬০০ শত শ্রমিক গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছিল। গতকল্য সোমবার প্রাতঃ-কাল হইতে তাহারা পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

ধর্ম্মঘটের কারণ এই ছিল যে, বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মুসলমানদের পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটি ছিল। সেইদিন হিন্দু শ্রমিকগণ অর্দ্ধেক দিন কাজ করিয়া অর্দ্ধেক দিন ছুটি প্রার্থনা করে। প্রকাশ যে, ম্যানেজার ঐ ছুটি না-মঞ্জুর করেন। মজুরগণ তখন এই বলিয়া চলিয়া যায় যে, তাহারা আর বাকী সময়ের জন্য কাজ করিবে না এবং সেই দিনের জন্য অর্দ্ধেকটা মজুরী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। ম্যানেজার তখন স্থির করেন যে শাস্তি স্বরূপে সেই অর্দ্ধেক মজুরীও তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না। মজুরদের নিকট জানা গেল যে, ইতিপূর্ব্বে মুসলমান পর্ব্বের দিন হিন্দু মজুরগণ ছুটি উপভোগ করিয়াছে। ম্যানেজার এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে চেষ্টা করায় ব্যপার সঙ্গীন হইয়া উঠে এবং হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকেরা একযোগে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে।

অতঃপর ধর্ম্মঘটকারীদের পক্ষ হইতে মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী এম, এ, বি, এল ঐ কলের ম্যানেজার ও মিঃ জে, ম্যান্সফিল্ডের নিকট গমন করেন। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষ কথা দেন যে, তাঁহারা মজুরদের অভিযোগের বিষয় বিবেচনা করিবেন। মিঃ মুখার্জ্জী তখন ফিরিয়া আসিয়া মজুরদিগকে কার্য্যে যোগদান করিতে স্বীকৃত করিয়াছেন।

বাংলার নূতন গবর্ণর—বাংলার গবর্ণর লর্ড লিটনের কার্য্যকাল শেষ হলে তাঁর জায়গায় কর্ণেল জাক্সন বাংলার গবর্ণর হয়ে আসবেন। তিনি বিলাতের রক্ষণশীল দলের চেয়ারম্যান। সেই দলের ইস্তফা তিনি শীঘ্রই দিবেন।

নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে কবি—বাংলার বরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইস্লাম ঢাকা বিভাগের মুসলমান কেন্দ্র হতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ প্রার্থী হয়েছেন।

নূতন বাস কোম্পানী—পত্রান্তরে প্রকাশ যে কলকাতায় শীঘ্রই বড় মূলধন লইয়া একটী বাস্ কোম্পানী গঠিত হবে। ২০০ শত মোটর বাস নিয়ে কোম্পানী প্রথমে ব্যবসায় আরম্ভ করবেন স্থির করেছেন। কোম্পানীর বাসগুলি কলকাতার সন্নিহিত শহর গুলোতেও চলাচল করবে।

আসাম কংগ্রেস—আসামে গৌহাটিতে এবার ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্‌ন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। কংগ্রেসের সকল কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। চার হাজার ডেলিগেটের বাসোপযোগী পাঁচশত কুটির নির্ম্মিত হবে।

ফরওয়ার্ডের নামে মান হানি—গৌহাটি হতে হতে খবর পাওয়া গেছে যে পুলিশের দারোগা প্রদীপ চন্দ্র সেন বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্পেশাল সব জজের আদালতে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা এবং ওর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে ৩০০০ টাকার দাবীতে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। "ফরওয়ার্ড" নাকি প্রকাশ করেছিলেন উপরি উক্ত দারোগা কয়েকজন কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বড়পেটার নিকট একগ্রামে লোকজনের উপরে অত্যাচার করেছিলেন। এ ব্যাপারের অনুসন্ধান করার জন্যে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি একটা কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। সে কমিটি নাকি রিপোর্ট দিয়েছেন যে ব্যাপার মিথ্যা।

পাবনার মোকদ্দমা—পাবনার শোভাযাত্রার মোকদ্দমার বিচার কার্য্য শেষ করে বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ হলো রায় প্রকাশ করেছেন। দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারামতে শীতলাইএর জমীদার শ্রীযুত যোগেন্দ্র মৈত্র ও পাবনার উকিল শ্রীযুত রণজিৎ লাহিড়ী ও অপর ১৪ হিন্দু ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তাঁহারা পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট এ হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেছেন। জজ মিঃ ইরাদতুল্লা আপীল মঞ্জুর করে প্রত্যেক আসামীকে দু'শ টাকার জামীনে মুক্ত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

এ দণ্ডাদেশের প্রতিবাদ স্বরূপ পাবনা শহরের হিন্দুগণ হরতাল করেছিলেন।

দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফরর্ম—লণ্ডনের রেলওয়ে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে যে ভারতের শোনপুর নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মটি জগতের মধ্যে দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম্ম। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৪৫০ ফিট। ম্যানচেষ্টার ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্ম ২১৭৫ ফিট, গোরখপুর ২১১২ ফিট, মেলবোর্ণ ২০০৬ ফিট, এবং ব্যারৌনি ও গোণ্ডা ২০০০ ফিট লম্বা।

মস্কো স্কুল—গত বৎসর মস্কো নগরের স্কুল সমূহে স্কুল যাওয়ার বয়স হয়েছে এমন ছাত্র সমূহের শতকরা ৯৯ জন এবং মস্কো প্রদেশের শতকরা ৯৪ জন স্কুলে যোগদান করেছিল। আগামী বছরে আরো ২০০০০ হাজার বেশী ছাত্র যোগদান করবে এরূপ আশা যায়। মস্কোতে ১৯টি নূতন স্কুল ও ৫০৯টি সঙ্ঘবদ্ধ স্কুল খোলা হবে। বর্ত্তমান সময়ে স্কুলের জন্যে ৭টি নূতন বাড়ী তৈয়ার হচ্ছে। ৭০ হতে ১০০ রুবল যেখানে মাতাপিতার মাসিক আয় সেখানে মাসে ১টি রুবল ছেলেদের পড়ার খরচ দিতে হয়। আর ১০১ হতে ১৫০ রুবল পর্য্যন্ত ৩ রুবল মাসে এ কারণে দিতে হয়। ১৫১ হতে ২০০ রুবল মাসে আয় হলে সন্তানদের পড়াবার জন্যে মাসে ৮ রুবল এবং ২০০ রুবলের বেশী আয় মাসে হলে ১২ রুবল দিতে হয়। মাতা পিতার আয় যদি মাসে ৭০ রুবলের কম হয় তা হলে সন্তানদের পড়ার খরচের জন্যে কিছুই দিতে হয় না। প্রত্যেকে স্কুলে একটা করে কাউন্সিল আছে। এ কাউ-ন্সিল ইচ্ছে করলে বিশিষ্ট কারণে সন্তানদের পড়ার খরচের দায় হতে মাতাপিতাকে একেবারেই অব্যাহতি দিতে পারেন।

শোক-সংবাদ—গত শুক্রবার দিবাগত রাত্রে কলিকাতার সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডি, এন, রায় এম-ডি হৃদ্‌রোগে হঠাৎ পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স ৭২ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল।

ছুটী নামঞ্জুর—ষ্টেট প্রিজনার শ্রীযুত জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় আজকাল ঢাকা জেলে আবদ্ধ আছেন। তাঁর মা'র অবস্থা খুবই খারাপ, হয়তো না ও বাঁচতে পারেন। তিনি বন্দী পুত্রকে একটি বার দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দয়ার অসীম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছুটী নামঞ্জুর করেছেন। জীবন বাবুর বাড়ী ঢাকা জেলারই মুন্সীগঞ্জে। দু'চার দিনের জন্যে তাঁকে মা'র কাছে যেতে দিলে বোধ হয় শোষণ-বাদের গবর্ণমেণ্ট উল্‌টে যেত না।

স্বগৃহে বন্দী—১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনের বন্দী শ্রীযুত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য কিছুকাল ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়াতে আবদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি হুকুম হয়েছে যে তাঁকে মাদারীপুরে তাঁর আপন গৃহে আবদ্ধ থাকতে হবে। শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য ১৯২৩ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সর্ব্বপ্রথম গেরেফ্‌তার হয়েছেন।

বিলাতী কয়লা ধর্ম্মঘটের জের

ইংলণ্ডের ভীষণ দুর্দ্দশা।

৩৫০ কোটী পাউণ্ড ক্ষতি।

গত মে মাসে কয়লার ধর্ম্মঘট শুরু হয়; ধর্ম্মঘটের পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছিলাম ১৯২৩ সালের মে মাসে বিলাতে ধর্ম্মঘট হইতে উক্ত ধর্ম্মঘট বহুদিন থাকিবে। তাহাতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবল ও অর্থবল উভয়ই নষ্ট হইবে। ধর্ম্মঘট সহজে মিটিবে না। এই ধর্ম্মঘটের নামান্তর ঘরোয়া যুদ্ধ "সিভিলওয়ার"। যে কারণে ইংলণ্ডে কয়লার ধর্ম্মঘট হইয়াছে' সেই কারণ সামান্য নহে। কেন না দেশের ধনিগণ একদিকে, অন্যদিকে দেশের কোটী কোটী নরনারী। দেশের সাধারণ লোকের ইচ্ছা ঐ সকল ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি না হইয়া দেশের লোকের বা জাতির সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা উচিত, এবং যে সকল লোক খনিতে কাজ করিবে তাহাদের বেতন বাড়াইয়া দেওয়া হউক।

বিলাতী গভর্ণমেণ্ট কয়লার গোলমাল মিটাইতে চেষ্টা করিয়াও মিটাইতে পারিতেছেন না অথচ এ পর্য্যন্ত যে ভাবে কয়লার ধর্ম্মঘটের জন্য দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যদি এ অবস্থা বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে অচিরাৎ বিলাতের গভর্ণমেণ্টের লোকসান হইবে চারিশত কোটী পাউণ্ড।

ইংলণ্ড এই ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে না। অর্থনৈতিক সমস্যা দুর না হইলে দেশে অশান্তি বাড়িয়া যাইবে। তখন সিভিল ওয়ার ছাড়া জাতির আর অন্য কোন উপায় থাকিবে না।

গত মে মাসে ৩৫০ কোটী পাউণ্ড লোকসানের সীমা ছিল।

স্যার হিউবেল হিসাব করিয়া বলিয়াছেন ধর্ম্মঘটের দরুণ রোজ ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডের লোকসান হইতেছে। সপ্তাহের হিসাবে রোজ সাড়ে পাঁচদিনের কাগজের হিসাবে ঐ অর্থটা লোকসান হইবে। আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত হিসাবে মোট ক্ষতি ২৯ কোটী পাউণ্ড হইবে। ধর্ম্মঘটে মনিব ভৃত্য উভয়েরই লোকসান হইতেছে। এই ভীষণ ধর্ম্মঘট যদি আরও চলে, তাহা হইলে করদাতাদের উপরে আরও বেশী কর ধার্য্য হইবে।

ব্যবসায়ের লোকসানের জন্য আগামী বৎসরের বজেটেও ঘাটতি হইবে।

রেলওয়েই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী মাস পর্যান্ত যাত্রী এবং ভাড়া বাবতে ২ কোটী পাউণ্ড রেলের ক্ষতি হইয়াছে।

ধনী ও দরিদ্রের অর্থ নৈতিক সমরে আজ ইংলণ্ড যে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে বসিয়াছে সেই ক্ষতির পরিমাণ আশঙ্কাপ্রদ।

নেপোলিয়নের সময়ে ইংলণ্ড যুদ্ধে জিতিলেও তাহার ঋণের ভার এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে ইংলণ্ডকে সে জের অনেক দিন টানিতে হয়। কিন্তু এবারের ধর্ম্মঘটের জন্য ইংলণ্ডের সকল বিভাগের দুরবস্থা ঘটিবে। এমন কি ধর্ম্মঘটের পরিণাম ইংলণ্ড "সিভিল ওয়ার"।

রেলের ক্ষতি

জি, ডবলিউ, আর—৩১৯৫০০০ পাউণ্ড।

এল, এম, এস— ৯০২০০০০ পাউণ্ড।

এল, এন, ই, আর—৬৮০৪০০০ পাউণ্ড।

এস আর,— ১৫০১০০০ পাউণ্ড।

লৌহ ও ইস্পাত ব্যাবসায় এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। এখন আর লৌহ ও ইস্পাতের কোন জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে না। এপ্রিল মাসে ৫৩৯১০০ টন লৌহ দ্রব্য তৈয়ারী হইয়াছিল কিন্তু গত মাসে মাত্র ১৩৬০০ টন মাল উৎপন্ন হইয়াছে। ৬৬১০০০ টন ইস্পাতের দ্রব্যের স্থানে ৩২১০০ টন মাত্র তৈয়ারী হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটের দরুণ জাহাজে চালানি ব্যবসা এবং বস্ত্র শিল্পের ও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ৯০০০০০০০ টন কয়লা রপ্তানি হওয়ায় কথা ছিল এবং সেই স্থানে ৬০০০০০০০ টন কয়লা রপ্তানি হইয়াছে। এই রপ্তানি হ্রাসের জন্য ৫৪০০০০০০ পাউণ্ড অধিক ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রিটিশ শিল্প জগতেও ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। দূরদেশে যে সকল মাল রপ্তানী হইত তাহা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। মাসে ৫০০০০০০০ পাউণ্ড যুদ্ধের মাল ইংলণ্ডে রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে অথচ ১৯২৫ সালে এই সময়ে যে মাল উৎপন্ন হইত তাহা হইতে ১১০০০০০০ পাউণ্ড যুদ্ধের কম মাল উৎপন্ন হইয়াছে।

নিবেদন

এই নিয়ে নয় সংখ্যা "গণ-বাণী" সাধারণ্যে প্রকাশিত হলো। যাঁরা নিয়মিতরূপে কাগজখানা পড়ে এসেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ ধারণাটা করে নিতে পেরেছেন যে "গণ-বাণী" কি বল্‌তে চায়। অনেক অসুবিধের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে চল্‌তে হচ্ছে, অনেক বাধ-বিঘ্ন আমাদের সম্মুখে রয়েছে। এই জন্যে কাগজ খানাকে আমরা ঠিক্ যেমনটি করতে চাই তেমনটি করে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে। যেসকল মতবাদ আমরা প্রচার করতে চাই সে গুলি আরো বিশদ

রূপে ব্যাপ্যাত হওয়া আবশ্যক জেনেও আমরা তা' আজো পর্য্যন্ত করে উঠ্‌তে পারিনি। ধীরও স্থিরভাবে একদিনও কাজ করবার সুযোগ আমাদের ঘটেনি। "গণ-বাণী"র প্রবন্ধ লিখা ও সম্পাদন করা নিয়ে শুধু আমাদিগকে মাথা ঘামাতে হয় না, আমাদের শরীরের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে অর্থের ভাবনায়। কোনো সম্বল নিয়ে আমরা কাগজখানা বের করতে পারিনি। "গণ-বাণী"র মত কাগজ প্রকাশ করার একান্তই আবশ্যক ছিল বলে আমরা তা করেছি, ভাবতে পারিনি কোথা হতে অর্থ আসবে। আর যদি সে বিষয়ে আগে হতে ভাবতেও পারতেম, তা' হলেও কোথাও হতে সে অর্থ আমাদের হাতে আসতে পারত এমন কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। ধনিক-বণিক ও শোষক শ্রেণীর অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতির দ্বারা ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় মুক্তির এতটুকুও সম্ভাবনা নেই। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জীবনের বাণী প্রচার করা ও তাদেরকে তাদের সত্যকারের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই ভারতের মুক্তি-সাধনার একমাত্র কাজ। এই কাজের জন্যে লোক তৈরী করাই হচ্ছে "গণ-বাণী"র ব্রত। আমাদের এই কাজ ফেলে রাখবার কাজ নয়। তাই, আর কেউ নিলেনা বলে আমরাই এটাকে বহুরোগী হওয়া সত্ত্বেও মাথায় তুলে নিয়েছি। কিন্তু, সাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে। আমাদের কাজে যাঁদের এতটুকুও আস্থা আছে তাঁরা এখন থেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য আমাদের করুন। যিনি যা দেবেন তা-ই আমরা মাথায় তুলে নেব। সাহায্যের অর্থের প্রাপ্তি আমরা কাগজে স্বীকার করব, অবশ্য দাতার যদি তাতে কোনো প্রকার আপত্তি না থাকে।

বিনীত নিবেদক—
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

গণ-বাণী

(এর সাথে "লাঙল" একীভূত হয়েছে)

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৭, ১লা বৈশাখ ১৩৩৪ | ১০ম সংখ্যা

বর্ত্তমান ভারত

গ্রেট্ বৃটেনের গণ-আন্দোলনের এতটুকু খবরও যাঁরা রাখেন আর, পাম দত্তের নাম তাঁরা নিশ্চয়ই শুনেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি মডার্ণ ইণ্ডিয়া নাম দিয়ে ইংরেজীতে একখানা বই লিখেছেন। এ বইএতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ভারতের রাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করেছেন এবং ভারতে জনগণের গবর্ণমেন্ট স্থাপন করার জন্যে অতি সুন্দর এক প্রোগ্রামও দিয়েছেন। এ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ধারা বাহিক রূপে গণবাণীতে বের করা হবে। বলা বাহুল্য, আর, পাম দত্ত একজন ইংল্যাণ্ডবাসী বাঙালী।

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহমদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ১৷৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে ৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস্ এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯২৭, ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪ | ১০ম সংখ্যা

আমাদের কৈফিয়ৎ

শোষিত, লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত করার ব্রত গ্রহণ করে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছি। নূতন পথে যারা চলে, তা সে পথ যতই সত্যকারের পথ হোক্ না কেন, তাদেরকে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তার ওপরে স্বাস্থ্য আর সম্পদের যদি একাধারে অভাব হয়ে পড়ে তা-হলে বাধা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আমাদের না আছে স্বাস্থ্য, না আছে সম্পদ, আর অযোগ্যতার কথা এখানে না হয় না-ই বা বল্লেম।

গত অক্টোবর মাসে ৯ম সংখ্যক **গণবাণী** বের করে আমরা দু' হপ্তার জন্যে শরতের ছুটী নিয়েছিলুম। তার পরে এ পর্য্যন্ত কাগজ আর বের হয় নি। ছুটী নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যে দু'জনাতে সব সময় কাগজের জন্যে কাজ করতেম সে দু'জনা পড়লেম বিছানায় শুয়ে, আর একজনা যিনি সময়ে অসময়ে সাহায্য করতেন তিনি গেলেন মারা। কাজেই, কাগজের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আপনা হতে। ইচ্ছাকৃত হোক্ বা অনিচ্ছাকৃতই হোক্, ত্রুটী যা আমাদের দিক্ থেকে হয়েছে তার জন্যে আমরা আমাদের পাঠক আর গ্রাহকদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

গণবাণী বের হয়েছিল এমন সময়ে যখন দেশের লোক, অবশ্য অধিকাংশেরই বেলায় স্বার্থের প্রণোদনে, সাম্প্রদায়িকতার নেশায় ভয়ানক মশ্‌গুল হয়ে উঠেছিল। নিতান্ত অন্ধভাবে যাঁরা এক বা অপর সম্প্রদায়ের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করছিলেন তাঁদেরই কাগজের ছিল বাজারে জয় জয়কার, এখনো যে নেই তা নয়। অধিকাংশ দেশীয় কাগজ বিশেষ করে দেশীয় ভাষায় লেখা কাগজ "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে" নীতি অবলম্বন করে এত বেশী সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গারণ করছিল যে দেশের এক ক্লাস পাঠকের মাথা সত্যই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিল,—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা ছাড়া আর কিছুই তাঁদের ভাল লাগেনি পড়্‌তে। কাজেই, এই সাম্প্রদায়িকতার বাজারে "**গণবাণী**"র ন্যায় অসাম্প্রদায়িক কাগজ আশানুরূপ সমাদৃত হয়নি। আর হয়নি বলে আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতাও কোনোদিন ঘোচেনি। অথচ, এই অসচ্ছলতাও কাগজ বন্ধ রাখার অন্যতম কারণ।

গত এক বছর থেকে আমাদের দেশে খবরের কাগজের বাজারের আব-হাওয়া খুব বেশীরূপ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এ যেন সত্যকার বস্তুটিকে বিষাক্ত গ্যাস্ দিয়ে ঢেকে রাখার বিরাট প্রচেষ্টা। দেশের জনগণের পক্ষে সত্য সত্যই এটা বড় দুর্দ্দিন। এ দুর্দ্দিনে একখানা "গণবাণী" কিছুই করে উঠ্‌তে পারবে না। যে কোন ব্যাপারের, বিশেষ করে ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক দ্বেষা-দ্বেষীর প্রকৃত স্বরূপ জনগণের চোখের সামনে ধরে দিতে পারে এমন অনেকগুলি কাগজের প্রচার জনগণের মঙ্গলের জন্যে হওয়া একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তা না হলে দেশের জনগণ স্বার্থপর শ্রেণীর লোক ও তাদের এজেন্টগণের দ্বারা প্রতারিত হতেই থাকবে। কোনো ব্যাপারকে ধামাচাপা দিয়ে রাখবার সময় আর নেই। সব কথা সাদা কথায় খোলাখুলি বলে দেওয়া এখন একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

নূতন দল

[মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ]

পুরাতন দল যখন কেবলমাত্র দেশের শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের খাতিরে পরিচালিত হয় তখন জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য নূতন দল গড়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে লিবারেল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি

দল বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণতন্ত্রের সহিত সকল প্রকার বন্ধুত্ব বজায় রেখে আপনাদের কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। সমাজের উচ্চ স্তরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই এ সকল দল গঠিত হয়েছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস শ্রীযুক্ত মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে একবার মাত্র জনগণের সংস্পর্শে এসে পড়েছিল এবং আবার এই গান্ধীরই নেতৃত্বে জনগণ হতে বহুদূরে সরেও পড়েছে।

বিগত যুদ্ধের পর হতে পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। রুষের বিপ্লবের ফলে সমগ্র জগতে একটা গণ-চৈতন্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের যে শক্তি ছিল সে শক্তি আর এখন নেই। ভারতবর্ষের ধনিক-বণিকের সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি না করে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম কিছুতেই এ দেশকে আর শোষণ করতে পারবে না। তারি জন্যে তুলোর শুল্ক উঠে গেছে, লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যের আমদানীর উপরে শুল্ক বসেছে এবং আরও কত কি পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের এই আপোষের ফলে দেশীয় ধনিক-বণিকের নিকট হতে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে সাহায্য পাবার আর কোনো আশা নেই। ন্যাশনাল কংগ্রেসের বেদী হতে ওর কয়েকজন সভাপতিই পরে পরে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সংস্রব কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজী নন। তাঁরা আর খানিককটা রাজনৈতিক অধিকার বাড়িয়ে চান মাত্র। উপনিবেশ সমূহের সমাধিকার ভারতবর্ষ পেতে পারে না, কারণ,ভারতবর্ষ গ্রেটবৃটেনের উপনিবেশত নয়ই, পরন্তু ইউরোপের অন্য কোনো স্বাধীন শক্তিরও উপনিবেশ নয়। ঔপনিবেশিক অধিকার পেয়েও ভারতবর্ষের অবস্থার এতটুকুও উন্নতি হতে পারে না। কেননা, সে অবস্থাতেও ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের হাত এড়াতে পারবে না। অষ্ট্রেলিয়া আজো পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়েলিজমের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণতন্ত্রের বর্ত্তমান থাকা সত্বেও কোনো দেশ যে মুক্তিলাভ করেছে এমন কথা মেনে নেওয়ার ন্যায় বাতুলতা আর কিছুই হতে পারে না। ধনিকবৃত্তির শেষ সোপান হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজম। ধনিকরা প্রথমে নিজেদের দেশের শ্রমিক ও উৎপাদক-দিগকে শোষণ আরম্ভ করে থাকে। এইরূপে তাদের কারবার যখন খুব বিস্তৃতি লাভ করে, তাদের নিজেদের দেশে যখন কাঁচা মালের অভাব হয়, তখন তাদেরকে বের হতে হয় নূতন বাজারের সন্ধানে,—তাদের উদ্দেশ্য তৈরী মাল চালনো ও কাঁচা মাল সংগ্রহ করা। এইরূপে যে ধনিকের শোষণ হয়ে থাকে, এ শোষণেরই নাম হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজম। ইহারই জন্যে দেশের পর দেশকে ইম্পিরিয়েলিষ্ট বা শোষণবাদীগণ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে পদানত করে রেখেছে।

ভারতবর্ষ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পদানত হয়ে আছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দেশীয় ধনিক-বণিককে হাত করে দেশের জন-সাধারণকে নির্দ্দয়ভাবে শোষণ করছে। এই শোষণের হাত এড়াবার জন্যে আমাদের সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন হবে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কিন্তু, ভারতের জাতীয় রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস তা চায় না। কংগ্রেস্ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। তার কারণ এই যে কংগ্রেসের মাথার ওপরে যারা বসে আছেন তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক যে শ্রেণীর লোকের সহিত বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কংগ্রেসের গত গৌহাটী অধিবেশনের কার্য্যাবলীর খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝে থাকবেন যে বর্ত্তমান কংগ্রেস ভারতের জনগণের জন্যে নয়।

কংগ্রেসের সবজেক্ট কমিটিতে প্রস্তাব উঠেছিল, জমীদার ও ধনিকের সহিত যখন কৃষক ও শ্রমিকের ঝগড়া বাধবে তখন কংগ্রেসকে দাঁড়াতে হবে কৃষক ও শ্রমিকের পক্ষাবলম্বন করে। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের মাথার মণি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তার উত্তরে বলেছেন—'কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট দল নয়।' একথা বলার মতলব এই হচ্ছে যে যারা পরিশ্রম করে সব কিছু উৎপাদন করে থাকে তাদের হয়ে দাঁড়াতে কংগ্রেস কিছুতেই প্রস্তুত নয়। প্রস্তুত যে নয় তা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এতকাল দেখে এসেছেন। তবুও আরো পরিস্কার ভাষায় বঙ্গের স্বরাজ্য দলপতি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত সে কথাটিই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—তাঁদের দলে অনেক জমীদার আছেন, আর জমীদারের সাহায্য না পেলে তাঁদের এত লোক কিছুতেই ব্যবস্থাপক সভায় যেতে পেতেন না। কাজেই, এ হেন জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা কিছুতেই কৃষকদের সাহায্য করতে পারবেন না। একজন বাঙালী কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন ঐ কমিটিতে। তিনি বললেন—কি সর্ব্বনাশ! এই করলে যে কংগ্রেস একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর হাতে অর্থাৎ কৃষক শ্রমিক প্রভৃতিকে মিলিয়ে ধরলে শতকরা ৯৮ জনের হাতে—এসে পড়বে! এ তিনি কিছুতেই হতে দিতে পারেন না। তাঁর মতে কংগ্রেস জমীদার, ধনিক, কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকগণের সমবেত সংগঠন হবে। কিন্তু, সত্য কি তা কখনো হতে পারে? এ কথা কোনো দিন কোনো পাগলেও বিশ্বাস করতে পারবে না যে কৃষক আর জমীদারের এবং শ্রমিক ও ধনিকের স্বার্থ অভিন্ন। কৃষক আর শ্রমিকের যা স্বার্থ জমিদার ও ধনিকের পক্ষে তা ধ্বংসের কারণ। একটা হলো শোষিতের শ্রেণী, আর একটা হলো শোষকের। এ দু' শ্রেণীতে মিলে মিশে সচেতন হয়ে কিছুতেই কাজ করতে পারে না। খেটে, উৎপন্ন করে যারা খেতে পায়না, আর না খেটে, না উৎপন্ন করে যারা প্রচুর খেতে ও জমা করতে পায় তাদের মধ্যে একটা সংগ্রাম বাধবেই বাধবে। এরূপ সংগ্রাম ভারতবর্ষে নেই বলে, এটা ইউরোপ থেকে আমদানী করা বলে, কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা ধাপ্পাবাজি ও গোজামিলের ভিতর দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু, কতদিন আর তা চলে! তাই, কালের আহ্বানে এবারে যখন দাবী করা হলো কংগ্রেসকে দেশের জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে হবে তখন অগত্যা কংগ্রেসের নেতাদের বলে দিতে হয়েছে যে তাঁরা জনগণের দলে নন্—তাঁরা তাঁদের নিজেদেরই দলে অর্থাৎ ধনিক-বণিক ও জমিদারের দলে।

এইত গেল ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কথা। তারপরে, অল্-ইণ্ডিয়া ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অবস্থা আরো শোচনীয়। এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সঙ্ঘগুলো শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশ স্থলেই আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই অপদেবতার মত শ্রমিকদের ঘাড়ে চেপে বসে আছেন। এঁদের অনেকেই কারখানার শ্রমিকদের সাথে মেলা-মেশা করার চেয়ে মালিকদের সাথেই মেলা-মেশা করতে বেশী ভালো বাসেন। তাঁরা শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯২৭, ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪ | ১০ম সংখ্যা

আমাদের কৈফিয়ৎ

শোষিত, লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত করার ব্রত গ্রহণ করে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছি। নূতন পথে যারা চলে, তা সে পথ যতই সত্যকারের পথ হোক্ না কেন, তাদেরকে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তার ওপরে স্বাস্থ্য আর সম্পদের যদি একাধারে অভাব হয়ে পড়ে তা-হলে বাধা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আমাদের না আছে স্বাস্থ্য, না আছে সম্পদ, আর অযোগ্যতার কথা এখানে না হয় না-ই বা বল্লেম।

গত অক্টোবর মাসে ৯ম সংখ্যক গণবাণী বের করে আমরা দু' হপ্তার জন্যে শরতের ছুটী নিয়েছিলুম। তার পরে এ পর্য্যন্ত কাগজ আর বের হয় নি। ছুটী নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যে দু'জনাতে সব সময় কাগজের জন্যে কাজ করতেম সে দু'জনা পড়লেম বিছানায় শুয়ে, আর একজনা যিনি সময়ে অসময়ে সাহায্য করতেন তিনি গেলেন মারা। কাজেই, কাগজের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আপনা হতে। ইচ্ছাকৃত হোক্ বা অনিচ্ছাকৃতই হোক্, ত্রুটী যা আমাদের দিক্ থেকে হয়েছে তার জন্যে আমরা আমাদের পাঠক আর গ্রাহকদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

গণবাণী বের হয়েছিল এমন সময়ে যখন দেশের লোক, অবশ্য অধিকাংশেরই বেলায় স্বার্থের প্রণোদনে, সাম্প্রদায়িকতার নেশায় ভয়ানক মশ্‌গুল হয়ে উঠেছিল। নিতান্ত অন্ধভাবে যাঁরা এক বা অপর সম্প্রদায়ের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করছিলেন তাঁদেরই কাগজের ছিল বাজারে জয় জয়কার, এখনো যে নেই তা নয়। অধিকাংশ দেশীয় কাগজ বিশেষ করে দেশীয় ভাষায় লেখা কাগজ "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে" নীতি অবলম্বন করে এত বেশী সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গারণ করছিল যে দেশের এক ক্লাস পাঠকের মাথা সত্যই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিল,—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা ছাড়া আর কিছুই তাঁদের ভাল লাগেনি পড়্‌তে। কাজেই, এই সাম্প্রদায়িকতার বাজারে "গণবাণী"র ন্যায় অসাম্প্রদায়িক কাগজ আশানুরূপ সমাদৃত হয়নি। আর হয়নি বলে আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতাও কোনোদিন ঘোচেনি। অথচ, এই অসচ্ছলতাও কাগজ বন্ধ রাখার অন্যতম কারণ।

গত এক বছর থেকে আমাদের দেশে খবরের কাগজের বাজারের আব-হাওয়া খুব বেশীরূপ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এ যেন সত্যকার বস্তুটিকে বিষাক্ত গ্যাস্ দিয়ে ঢেকে রাখার বিরাট প্রচেষ্টা। দেশের জনগণের পক্ষে সত্য সত্যই এটা বড় দুর্দ্দিন। এ দুর্দ্দিনে একখানা "গণবাণী" কিছুই করে উঠ্‌তে পারবে না। যে কোন ব্যাপারের, বিশেষ করে ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক দ্বেষা-দ্বেষীর প্রকৃত স্বরূপ জনগণের চোখের সামনে ধরে দিতে পারে এমন অনেকগুলি কাগজের প্রচার জনগণের মঙ্গলের জন্যে হওয়া একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তা না হলে দেশের জনগণ স্বার্থপর শ্রেণীর লোক ও তাদের এজেন্টগণের দ্বারা প্রতারিত হতেই থাক্‌বে। কোনো ব্যাপারকে ধামাচাপা দিয়ে রাখবার সময় আর নেই। সব কথা শাদা কথায় খোলাখুলি বলে দেওয়া এখন একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

নূতন দল

[মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

পুরাতন দল যখন কেবলমাত্র দেশের শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের খাতিরে পরিচালিত হয় তখন জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য নূতন দল গড়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে লিবারেল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি

দল বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণতন্ত্রের সহিত সকল প্রকার বন্ধুত্ব বজায় রেখে আপনাদের কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। সমাজের উচ্চ স্তরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই এ সকল দল গঠিত হয়েছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস শ্রীযুক্ত মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে একবার মাত্র জনগণের সংস্পর্শে এসে পড়েছিল এবং আবার এই গান্ধীরই নেতৃত্বে জনগণ হতে বহুদূরে সরেও পড়েছে।

বিগত যুদ্ধের পর হতে পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। রুষের বিপ্লবের ফলে সমগ্র জগতে একটা গণ-চৈতন্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের যে শক্তি ছিল সে শক্তি আর এখন নেই। ভারতবর্ষের ধনিক-বণিকের সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি না করে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম কিছুতেই এ দেশকে আর শোষণ করতে পারবে না। তারি জন্যে তূলোর শুল্ক উঠে গেছে, লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যের আমদানীর উপরে শুল্ক বসেছে এবং আরও কত কি পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের এই আপোষের ফলে দেশীয় ধনিক-বণিকের নিকট হতে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে সাহায্য পাবার আর কোনো আশা নেই। ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের বেদী হতে ওর কয়েকজন সভাপতিই পরে পরে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সংস্রব কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজী নন। তাঁরা আর খানিককটা রাজনৈতিক অধিকার বাড়িয়ে চান মাত্র। উপনিবেশ সমূহের সমাধিকার ভারতবর্ষ পেতে পারে না, কারণ,ভারতবর্ষ গ্রেটবৃটেনের উপনিবেশত নয়ই, পরন্তু ইউরোপের অন্য কোনো স্বাধীন শক্তিরও উপনিবেশ নয়। ঔপনিবেশিক অধিকার পেয়েও ভারতবর্ষের অবস্থার এতটুকুও উন্নতি হতে পারে না। কেননা, সে অবস্থাতেও ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের হাত এড়াতে পারবে না। অষ্ট্রেলিয়া আস্তো পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়েলিজমের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণতন্ত্রের বর্ত্তমান থাকা সত্বেও কোনো দেশ যে মুক্তিলাভ করেছে এমন কথা মেনে নেওয়ার ন্যায় বাতুলতা আর কিছুই হতে পারে না। ধনিকবৃত্তির শেষ সোপান হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজম। ধনিকরা প্রথমে নিজেদের দেশের শ্রমিক ও উৎপাদক-দিগকে শোষণ আরম্ভ করে থাকে। এইরূপে তাদের কারবার যখন খুব বিস্তৃতি লাভ করে, তাদের নিজেদের দেশে যখন কাঁচা মালের অভাব হয়, তখন তাদেরকে বের হতে হয় নূতন বাজারের সন্ধানে,—তাদের উদ্দেশ্য তৈরী মাল চালনো ও কাঁচা মাল সংগ্রহ করা। এইরূপে যে ধনিকের শোষণ হয়ে থাকে, এ শোষণেরই নাম হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজম। ইহারই জন্যে দেশের পর দেশকে ইম্পিরিয়েলিষ্ট বা শোষণবাদীগণ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে পদানত করে রেখেছে।

ভারতবর্ষ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পদানত হয়ে আছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম দেশীয় ধনিক-বণিককে হাত করে দেশের জন-সাধারণকে নির্দ্দয়ভাবে শোষণ করছে। এই শোষণের হাত এড়াবার জন্যে আমাদের সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন হবে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কিন্তু, ভারতের জাতীয় রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস তা চায় না। কংগ্রেস্ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। তার কারণ এই যে কংগ্রেসের মাথার ওপরে যারা বসে আছেন তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক যে শ্রেণীর লোকের সহিত বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কংগ্রেসের গত গৌহাটী অধিবেশনের কার্য্যাবলীর খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝে থাকবেন যে বর্ত্তমান কংগ্রেস ভারতের জনগণের জন্যে নয়।

কংগ্রেসের সবজেক্ট কমিটিতে প্রস্তাব উঠেছিল, জমীদার ও ধনিকের সহিত যখন কৃষক ও শ্রমিকের ঝগড়া বাধবে তখন কংগ্রেসকে দাঁড়াতে হবে কৃষক ও শ্রমিকের পক্ষাবলম্বন করে। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের মাথার মণি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তার উত্তরে বলেছেন—'কংগ্রেস সোস্থালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট দল নয়।' একথা বলার মতলব এই হচ্ছে যে যারা পরিশ্রম করে সব কিছু উৎপাদন করে থাকে তাদের হয়ে দাঁড়াতে কংগ্রেস কিছুতেই প্রস্তুত নয়। প্রস্তুত যে নয় তা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এতকাল দেখে এসেছেন। তবুও আরো পরিস্কার ভাষায় বঙ্গের স্বরাজ্য দলপতি শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত সে কথাটিই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—তাঁদের দলে অনেক জমীদার আছেন, আর জমীদারের সাহায্য না পেলে তাঁদের এত লোক কিছুতেই ব্যবস্থাপক সভায় যেতে পেতেন না। কাজেই, এ হেন জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা কিছুতেই কৃষকদের সাহায্য করতে পারবেন না। একজন বাঙালী কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন ঐ কমিটিতে। তিনি বল্লেন—কি সর্ব্বনাশ! এই করলে যে কংগ্রেস একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর হাতে অর্থাৎ কৃষক শ্রমিক প্রভৃতিকে মিলিয়ে ধরলে শতকরা ৯৮ জনের হাতে—এসে পড়বে! এ তিনি কিছুতেই হতে দিতে পারেন না। তাঁর মতে কংগ্রেস জমীদার, ধনিক, কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকগণের সমবেত সংগঠন হবে। কিন্তু, সত্য কি তা কখনো হতে পারে? এ কথা কোনো দিন কোনো পাগলেও বিশ্বাস করতে পারবে না যে কৃষক আর জমীদারের এবং শ্রমিক ও ধনিকের স্বার্থ অভিন্ন। কৃষক আর শ্রমিকের যা স্বার্থ জমিদার ও ধনিকের পক্ষে তা ধ্বংসের কারণ। একটা হলো শোষিতের শ্রেণী, আর একটা হলো শোষকের। এ দু' শ্রেণীতে মিলে মিশে সচেতন হয়ে কিছুতেই কাজ করতে পারে না। খেটে, উৎপন্ন করে যারা খেতে পায়না, আর না খেটে, না উৎপন্ন করে যারা প্রচুর খেতে ও জমা করতে পায় তাদের মধ্যে একটা সংগ্রাম বাধবেই বাধবে। এরূপ সংগ্রাম ভারতবর্ষে নেই বলে, এটা ইউরোপ থেকে আমদানী করা বলে, কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা ধাপ্পাবাজি ও গোজামিলের ভিতর দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু, কতদিন আর তা চলে! তাই, কালের আহ্বানে এবারে যখন দাবী করা হলো কংগ্রেসকে দেশের জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে হবে তখন অগত্যা কংগ্রেসের নেতাদের বলে দিতে হয়েছে যে তাঁরা জনগণের দলে নন্—তাঁরা তাঁদের নিজেদেরই দলে অর্থাৎ ধনিক-বণিক ও জমিদারের দলে।

এইত গেল ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কথা। তারপরে, অল্-ইণ্ডিয়া ট্রেড্স্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অবস্থা আরো শোচনীয়। এর অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সঙ্ঘগুলো শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশ স্থলেই আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই অপদেবতার মত শ্রমিকদের ঘাড়ে চেপে বসে আছেন। এঁদের অনেকেই কারখানার শ্রমিকদের সাথে মেলা-মেশা করার চেয়ে মালিকদের সাথেই মেলা-মেশা করতে বেশী ভালো বাসেন। তাঁরা শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের

প্রতিকারের জন্যে ধর্ম্মঘট করানোর চেয়ে ধর্ম্মঘট ভেঙে দেওয়াটাই বেশী পছন্দ করেন। তাঁরা শ্রমিকদের সাথে যখন মিশতে যান তখন তাদের একজন হয়ে কিছুতেই যেতে পারেন না। তাঁরা বড়, তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর লোক, এ সব মনে রেখেই দয়া করে শ্রমিকদের উপকার করতে যান মাত্র। এদের মধ্যে যাঁরা ভাল লোক তাঁদের কেউ বা লোক-হিতৈষী, কেউ বা শান্তিবাদী—বিপ্লবের ধারণা অল্প লোকেরই আছে, হয় তো তা-ও নেই।

মোটের ওপরে সত্যিকারের শ্রমিক-আন্দোলনের সৃষ্টি এদেশে এখনো হয় নি। একটা আমূল পরিবর্ত্তনের ধারণা নেই বলে বর্ত্তমানের শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের বিশেষ কিছু উপকার হচ্ছে না। তাদের হয়ে যাঁরা কাজ করতে যান, তাঁরা তাদের একজন হতে পারেন না, এবং আজকালকার বৈপ্লবিক শ্রমিক সঙ্ঘবাদের (Revolutionary Trade Unionism এর) সহিত তাঁদের ভালো পরিচয় নেই বলে, আজো পর্য্যন্ত তাঁরা শ্রমিকদের ভিতর থেকে শ্রমিক-নেতা গড়ে তুলতে পারেন নি। যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন আমাদের শ্রমিক আন্দোলন কিছুতেই মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বে না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শোষিত হয় বলে, তাদের কোনো সহায়-সম্পত্তি নেই বলে এবং সর্ব্বোপরি কারখানা প্রথার কল্যাণে তারা খুব সহজে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে বলে, আমাদের শ্রমিকগণই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রণী হতে পারে। যারা অগ্রণী হবে তারাই যদি পেছনে পড়ে থাকে তা হলে আমাদের মুক্তির আন্দোলন যে পণ্ডশ্রম মাত্র হবে তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই।

এই সকল কারণে একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই দল জনগণের দল। আমরা এর নাম দিয়েছি "**কৃষক ও শ্রমিক দল।**" শোষণের কল্যাণে যারা সর্ব্ব সম্পত্তি হারিয়ে আপনাদের পরিশ্রম ধনিকদের নিকটে বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে শুধু যে সেই সর্ব্বহারা (Proletariat) এই দলে থাকবে তা নয়, কৃষকরা ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকেরাও এতে থাকবে। এই নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকেদের যাঁরা জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাঁরা তাতে ধনিকদের যথেচ্ছাচার দেখে অনেকটা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কেবল নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকেদের নিয়ে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন করা চলে না, তাই তাঁদের অনেকেই ঝুঁকে পড়েন ষড়যন্ত্র মূলক ত্রাসনীতির দিকে। কিন্তু, এটা যে সত্যিকারের বিপ্লবের পথ নয় তাঁদের মধ্যে যাঁরা এতটুকু চিন্তাশীল লোক আছেন তাঁরা তা বুঝ্‌তে পেরেছেন এবং এখন তাঁদের অনেকের আকর্ষণ হয়েছে জনগণের প্রতি।

শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকদের নিয়ে আমাদের এই নূতন দল। সর্ব্বহারা শ্রমিকগণ ভারতের এই জাতীয় সংগ্রামে অগ্রণী হবে আর কৃষক সাধারণ তাদের অপরিমিত জনবল নিয়ে তাদের সাথে যোগদান করবে। যেহেতু আমাদের জাতীয় সংগ্রামের একমাত্র শক্তি ও বিরাট শক্তি কৃষক ও শ্রমিকগণ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর, এই জন্যে নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকগণ তাদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণ করবে।

আমাদের কর্ম্ম-তালিকা

১। ভারতে যে শোষণ-তান্ত্রিক (Imperial) গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত রয়েছে তা গ্রেট বৃটেনের জন-সাধারণের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় না। গ্রেট বৃটেনের ধনিক্ শ্রেণীর (Capitalist class এর) হিতের জন্যে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকদিগের শোষণে সহায়তা করাই হচ্ছে এই শোষণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব বজায় রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর উন্নতির অনুকূলে গ্রেট বৃটেনের ধনিক্ শ্রেণীর স্বার্থের জন্যে পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কিছুই হয়ে উঠ্‌ছেনা।

২। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস ও তদন্তর্ভুক্ত দল সমূহ এবং লিবারেল ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি দল সময়ে সময়ে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে দু'এক কথা উচ্চারণ করেন বটে, কিন্তু, কার্য্যতঃ তাঁরা কৃষক ও শ্রমিকগণের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবী এবং অভাবের প্রতি কখনো দৃক্‌পাতও করছেন না। পক্ষান্তরে, তাদের কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে তারা বিদেশী ও দেশীয় ধনিকগণের স্বার্থেরই পরিরক্ষক।

৩। ভারতের অধিবাসিগণের অধিকাংশই কৃষক। এই কৃষকগণ নানা দিক্ থেকে অতিরিক্ত ট্যাক্স ও করের চাপে এবং সুদখোর মহাজনগণের দেনার দায়ে একেবারেই ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে আছে। একেত তাদের ওপরে এ অত্যাচারের বোঝা চাপানো রয়েছে, তার ওপরে তারা আবার নিরক্ষর; কাজেই মুক্তির সংগ্রামে এতটুকুও তারা এগুতে পারছে না।

৪। কারখানার শ্রমিকগণের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কোনো আইন নেই, এবং যা রয়েছে তা'ও কাজে লাগাবার মত কোনো উপায় নেই বলে, তারা অত্যন্ত বেশীরূপে শোষিত হচ্ছে। আজো পর্য্যন্ত তারা কোনো প্রকার সফল সংগ্রামে লিপ্ত হতে ত পারেই নি, অধিকন্তু তারা তাদের ট্রেড্ ইউনিয়ন (শ্রমিক) আন্দোলনকে বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকগণ ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে তাদের রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্ম্মগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে ব্যবহার করে আস্‌ছে।

৫। এদেশের অধিবাসিগণের বেশীর ভাগ লোকের (Masses এর) মধ্যে যদিও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে, যদিও এ বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ ঠিক এক নয়, তথাপি, মূলতঃ (Fundamentally) একে অন্যের প্রতিকূলও নয়—তারা সকলেই আর্থিক হিসেবে শোষিত হচ্ছে—তাদিগকে সমভাবে নিগড়াবদ্ধও করে রাখা হয়েছে। ভারতীয় ধনিকগণ ও বিদেশীয় শাসন তাদিগকে কোনো প্রকার সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতি করতে দেয়নি।

৬। এই সকল কারণেই কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকগণের একটি রাষ্ট্রনৈতিক দল (বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল) গঠন করা অতীব আবশ্যক বলে উপলব্ধ হয়েছে। এ দলের সভ্যরা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ভিতরে প্রবেশ করে শোষিত কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকগণের দাবীদাওয়ার কথাকেই সেখানকার প্রকৃত প্রশ্ন করে তুলবেন, আর

শ্রমিক সঙ্ঘগুলোকে সুসংহত করে বিরোধী লোকদিগের কবল থেকে উদ্ধার করবেন। এই দল কৃষকগণের আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে ভিত্তি করে কৃষক সঙ্ঘ সমূহ গঠন করবে এবং দৃঢ় ও প্রাসঙ্গিক ভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকগণের জন্যে সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির সুব্যবস্থা করবে।

কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকগণের শোষণ ও অধীনতার কোনো চরম প্রতিকার হতে পারেনা, যে পর্য্যন্ত না দেশের সর্ব্ববিধ শাসন-ক্ষমতা তাদেরই হাতে আসে। কৃষক ও শ্রমিক দলের চরম উদ্দেশ্য ভারতে সমস্বত্ত্বাবদ্ধ গণতন্ত্রের (Federated Republic) প্রতিষ্ঠা করা, যাতে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের উপায় সমূহ জন-সাধারণের অধিকারে থাকবে ও সামাজিক ভাবে শাসিত হবে।

(ক) রাষ্ট্রীয় দাবী সমূহ
(Political Demands)

১। আঠার বছর ও তার বেশী বয়সের নারী ও পুরুষ মাত্রকেই ভোটের অধিকার দেওয়া।

২। জাতি ও বর্ণগত বৈষম্য (Racial discrimination and caste distinctions) বিদূরীত করা।

৩। প্রেসের, বক্তৃতার ও সমিতি গঠনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা।

৪। ট্রেড্ ইউনিয়ন (শ্রমিক সঙ্ঘ) সমূহের ওপর হতে সকল প্রকার প্রতিবন্ধক দূর করা এবং আইনের দ্বারা ট্রেড্ ইউনিয়ন সমূহকে উন্নত দেশ সমূহের সমান অধিকার প্রদান করানো।

(খ) অর্থনৈতিক দাবী সমূহ
(Economic Demands)

১। যথা সম্ভব পরোক্ষ ভাবে ট্যাক্স গ্রহণ প্রথা তুলে দেওয়া ও ক্রম-বর্দ্ধিত হারে মাসিক ২০০ টাকা হতে তদধিক আয়ের ওপরে ইন্‌কম ট্যাক্স ধার্য্য করা।

২। সকল প্রকার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৩। চাষের উপযুক্ত ভূমি সমূহ সরকারের দ্বারা কেবল মাত্র চাষীদিগকেই বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান করা।

৪। ভূমির উৎপন্ন ফসলের তারতম্য অনুসারে নিম্নতম হারে ভূমিকর ধার্য্যকরা ও কোনো অবস্থাতেই সে কর উৎপন্ন ফসলের শতকরা দশ ভাগের বেশী হতে না দেওয়া।

৫। কৃষকদিগকে টাকা ধার দেওয়ার জন্য সরকারের দ্বারা ষ্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করানো। এই ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৭ টাকার বেশী হবে না। ব্যক্তিগত ভাবে যারা সুদের ওপরে টাকা খাটিয়ে থাকে তাদেরও সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা আইনের দ্বারা বিধি-বদ্ধ করে দিতে হবে।

৬। ঋণের টাকা শোধ না দিতে পারার জন্যে চাষীর চাষের জমী হস্তান্তর হতে না দেওয়া।

৭। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথাতে চাষীদিগকে কৃষিকর্ম্মে শিক্ষা দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা।

৮। কারখানার শ্রমিকগণের জন্যে আইনের দ্বারা ৮ ঘণ্টার দিন ও সাড়ে পাঁচদিনে সপ্তাহ নির্দ্ধারিত করে দেওয়া। নারী ও বালক শ্রমিকগণের জন্যে আরো কম সময় নির্দ্ধারিত করা।

৯। আইনের দ্বারা কারখানার শ্রমিকগণের জন্যে নিম্নতম বেতনের হার নির্দ্ধারিত করে দেওয়া। এই হার ধার্য্য করার সময় শ্রমিকগণের মানুষের মত খাওয়া পরার জন্যে যা প্রয়োজন হয় তারও ওপরে শতকরা ৩৩ টাকা অধিক ধার্য্য করা।

১০। সকল প্রকার কারবারেই শ্রমিকগণের জন্যে বার্দ্ধক্য, রোগ ও কর্ম্মহীনতার ইন্সিউরেন্স যাতে হয় তার ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করে দেওয়া।

১১। শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও মালিকগণের দায়িত্ব (Liabilities) সম্বন্ধে যে আইন আছে তার প্রসার আরো বৃদ্ধি করা এবং সে আইন যাতে কার্য্যে পরিণত হতে পারে তার যথোচিত ব্যবস্থা করা।

১২। খনি ও কারখানা সমূহে শ্রমিকগণকে বিপদ হতে বাঁচানোর জন্যে বর্ত্তমানে যে সকল উন্নত উপায় সমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে সে সমুদায়ের ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করিয়ে নেওয়া।

১৩। শ্রমিকগণকে সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(গ) সামাজিক দাবী সমূহ
(Social Demands)

১। জন-সাধারণের নিরক্ষরতাকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা। (স্বাক্ষর হওয়ার মানে আপন আপন মাতৃভাষায় পত্র লিখিতে ও পড়িতে পারা।)

২। শ্রমিক ও কৃষকগণের জন্যে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ স্থাপন করা এবং নারীদের গর্ভাবস্থার জন্যে সেবা-সদন স্থাপন করা।

৩। শ্রমিক ও কৃষকগণকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সমূহ শিক্ষা দেওয়া।

৪। কারখানার মালিকগণকে দিয়ে শ্রমিকগণের জন্যে যথোপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করানো এবং এ সকল বাসগৃহের ভাড়া যাতে শ্রমিকদের ক্ষমতার বাইরে ধার্য্য না হয় তার যথোচিত ব্যবস্থা করা।

৫। নারী ও বালক শ্রমিককে যাতে কোনো প্রকার বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত না করা হয় আইনের দ্বারা তার ব্যবস্থা করা।

৬। ১৪ বছরের কম বয়সের বালককে যাতে কোনো কারখানার কাজে নিযুক্ত না করা হয়, আইনের দ্বারা তার ব্যবস্থা করা।

যেহেতু এই কর্ম্ম-তালিকার বিষয়গুলোকে সফল করে তোলার এক মাত্র উপায় হচ্ছে বৃটিশ শোষণ-তন্ত্রের (Imperialismএর) কবল থেকে ভারতের পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা, সেই হেতু অন্যান্য যে সকল দল এই মত পোষণ করে থাকে ও এজন্যে কাজে প্রলিপ্ত হতে প্রস্তুত আছে, **বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল** সে সকল দলের সাথে একযোগে কাজ করতে পরাঙ্মুখ হবেনা। *

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল
The Peasants' and Workers' Party of Bengal.

* [এই কর্ম্ম-তালিকা ১৯২৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দলের দ্বিতীয় সম্মিলনে সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হয়েছে।]

চীনে কৃষক-আন্দোলন ও বিশ্ব-বিপ্লব

[লেখক—শাও-লি-জি (Shao-Li-tzi), ক্যাণ্টন]

———

চীনের বিপ্লব, জগতের বিপ্লবের একটা দিক্ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর সফলতার জন্যে সব কিছুর আগে বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কৃষকদের সংগঠন করা এবং তাদেরি মুক্তির জন্যে তারা যাতে কার্য্যতঃ মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত হয় সে চেষ্টা দেখা। যে হেতু বিশ্বব্যাপী কর্ম্মশীল জনগণ ও শোষণ-বাদী নির্য্যাতকগণের মধ্যে যে সংগ্রাম চলেছে তার সাথে চীনের কৃষকগণের সংগ্রাম বিশিষ্টরূপে সংযুক্ত রয়েছে, এবং আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের কাছ থেকে উপদেশ ও নৈতিক সহায়তা দাবী করার অধিকার আমাদের আছে, এ জন্যে সব দেশের বিপ্লব-নেতৃগণকে চীনের আন্দোলন সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

চীন কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অধিবাসিগণের শতকরা ৮০ জন কৃষক এবং দেশে যা উৎপন্ন হয় তার একশ' ভাগের নব্বই ভাগই কৃষিজাত দ্রব্য। কাজেই চীনের জাতীয় আন্দোলনকে সত্যকার ভাবে ধরতে গেলে কৃষক-আন্দোলন বলা যেতে পারে। চিং ও হান্ বংশের পরের চীনের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, রাজতন্ত্র শাসন বারে বারে কৃষক সাধারণের দ্বারাই বিপর্য্যস্ত হয়েছে। টেইপিং আর বক্সার বিদ্রোহ কৃষকগণের বিপ্লবমূলক কার্য্যেরই বিকাশ মাত্র ছিল। শোষণবাদী (Imperialistic) নির্য্যাতকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিচালনা করে যিনি চল্লিশ বছর চীনের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন সেই ডাক্তার সুন্-য়াৎ-সেনও কৃষক বংশেরই লোক ছিলেন। তাঁর অনুসরণকারিগণও ছিলেন ঠিক তাই। যদি জয়লাভ করাই বাঞ্ছনীয় হয় তা হলে বিপ্লব আন্দোলনে ব্যাপকরূপে কৃষক সাধারণের যোগদান করা যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন এ কথা ডাক্তার সুন্-য়াৎ-সেন আর সব সময়ের চেয়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে বেশী ভাল করে বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে বিপ্লব আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শুধু যে কৃষকগণের কুমিণ্টাঙে যোগদান করা উচিত তা নয়, পরন্তু, এও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবলমাত্র কৃষকদের নিয়ে, কৃষকদের দ্বারা এবং কৃষকদেরই জন্যে বিশুদ্ধ কৃষক সঙ্ঘ সমূহ গঠিত হওয়া উচিত। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে কুমিণ্টাং দলের প্রথম কংগ্রেস বসেছিল। এ কংগ্রেসে কৃষক সাধারণের প্রতি দলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে ডাক্তার সুন্-য়াৎ সেনের ধারণা অনুযায়ী কৃষক সঙ্ঘ সমূহ সংগঠন করার ওপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৬ সনের মে পর্য্যন্ত কোয়াণ্টাং প্রদেশের ৬৬টি জেলাতে এ প্রকারের সঙ্ঘ সমূহ গঠিত হয়েছিল। এ সকল সঙ্ঘের মেম্বরের সমষ্টি ছিল ১০০,০০০। কোয়াণ্টাং প্রদেশের বাহিরেও পার্ল নদীর ধারে ধারে কোয়াংসি প্রদেশে কৃষক সঙ্ঘ সমূহ গঠিত হয়েছে। ইয়াংসি নদীর ধারে হুনান, হুপেয়াই, আন্‌হোয়েই, শেকুওয়ান ও চেকিয়াং প্রদেশ সমূহে এবং লোহিৎ নদের কেনারায় শানটাং, হোনান, চিহ্‌লি ও অন্যান্য প্রদেশ সমূহেও কৃষকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে।

এ কৃষক আন্দোলনের যেমন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। কুমিণ্টাং দলের প্রধান উদ্দেশ্য কেবলমাত্র কৃষকদিগকে এমন বিপ্লবে যোগদান করানো নয় যার স্বার্থ বুর্জোয়া স্বার্থের মত বা বিশেষ করে কৃষক স্বার্থের মত। কুমিণ্টাং চায় কৃষক সাধারণ জাতীয়-মুক্তি-সংগ্রামের তাৎপর্য্য ভালোরূপে বুঝে নেবার পর তাদের মনে তাদের দৈনন্দিন জীবনের শ্রেণীগত স্বার্থ সংরক্ষণের, ফলে, শ্রেণী-সংগ্রাম চালানোর আবশ্যকতার ভাব জন্মিয়ে দিতে।

চীনের কৃষকগণের জীবনের দুঃসহ কষ্ট ও কঠোরতা চরমে উঠেছে। যখন থেকে শোষণবাদীরা (Imperialists) এদেশে চড়াও করেছে তখন থেকে চীন তাদের কৃষিজাত কাঁচামাল পাবার ক্ষেত্রে ও তৈরী মাল চালাবার বাজারে পরিণত হয়েছে। কাপড়ের সুতো প্রভৃতির ন্যায় প্রসিদ্ধ কৃষক হস্তশিল্পগুলোকে বিদেশীয় কলের তৈরী জিনিসের প্রতিযোগিতায় তুলে দিতে হয়েছে। বিদেশীরা কাঁচামালকে কোণঠাসা করে কম মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে খরিদ করছে, আর কৃষকদের যা তৈরী মালের প্রয়োজন তা তাদের নিকটে যথাযথ মূল্যেরও তিনগুণ চড়া দামে বিক্রী করছে। এতে ক্ষুদ্র উৎপাদকগণের ভয়ানক সর্ব্বনাশ হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, সম্পত্তিহীন (Proletariat) লোকের ও দস্যু-তস্করের উদ্ভব হচ্ছে। শোষণ-বাদীদের সামরিক ভাড়াটেরা তাদের লোকক্ষয়কর সংগ্রাম চালাবার জন্যে এসব লোকদের মধ্য থেকেই সেনাদল সংগ্রহ করে থাকে যার দ্বারা ক্ষুদ্র কৃষকদের অবস্থা আরো শোচনীয়তর হয়ে উঠে।

অতএব পরিস্কারই বোঝা যাচ্ছে, শোষণবাদী ও সৈন্যবলাভি-মানীদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলেছে তা যে শুধু জাতীয় বিপ্লবের উদ্দেশ্যেই পর্য্যবসিত তা নয়, পরন্তু, লক্ষ লক্ষ লুণ্ঠিত ও নির্য্যাতিত কৃষকের মুক্তির অপরিহার্য্য পূর্ব্ব সূচনা। এ সম্বন্ধে কৃষকরাও খুব সচেতন। ক্যাণ্টনের বিপ্লব সেনাদলের উত্তরাভিযানে তারা এ কারণেই কোয়াণ্টাং প্রদেশের কৃষক কংগ্রেসের সাহায্য পেয়েছে। (এ কংগ্রেসে আরো অনেক প্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছিল। সত্যকার ভাবে বল্‌তে গেলে এটাকে একটা সমগ্র চীন দেশীয় কৃষক কংগ্রেস বলা যেতে পারে।) যখনি বিপ্লব সেনাদলের আগমন হয় তখনি কৃষকগণ তাদেরকে খুব উৎসাহের সহিত অভিবাদন করে থাকে। পক্ষান্তরে এ সেনাদলের রাষ্ট্রবিভাগের কর্ম্মচারিগণ কৃষক সংগঠনের কাজে সর্ব্ববিধ সাহায্য করাকে তাঁদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য মনে করে থাকেন। দলের কর্ম্মতালিকায় এ কাজটার ওপরে খুব বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তার সুন্-য়াৎ-সেনের যুদ্ধধ্বনি ছিল—"ভূমির সমভাগে বণ্টন।" তিনি ভেবেছিলেন ভূমিকর ও ভূমিতে জীবন-স্বত্বকে কৃষি সম্বন্ধীয় আইন করে সীমাবদ্ধ করলেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে। তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে বরাবরের জন্যে ভূমির মালিকের নিরূপিত মূল্যের অনুপাতে ভূমিকর ধার্য্য হওয়া উচিত, যার জন্যে মালিককে গবর্ণমেণ্টের নিকটে একটা ঘোষণা করতে হবে। দরকার হলে গবর্ণমেণ্টেরও ভূমি খরিদ করবার অধিকার থাকবে, অবশ্য তার জন্যে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত মূল্য অনুসারে মালিককে গবর্ণমেণ্টের একটা ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

অল্প সংখ্যক ভূম্যধিকারীর হাতে ভূমি কেন্দ্রীভূত যাতে না হয়, এ প্রকারের বিধি ব্যবস্থা করে গবর্ণমেণ্টের তা নিবারণ করার ইচ্ছা ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সুন্ এ কথার

পরেও জোর দিয়েছিলেন যে ভূমিতে কেবল সে কৃষকেরই অধিকার থাকবে যে তাতে কাজ করবে। কুমিণ্টাং দলের কংগ্রেসের বিজ্ঞাপনীতে একথা বলা হয়েছে যে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে গবর্ণমেণ্টের ভূমি দেওয়া উচিত। কেবল মাত্র জন কতেক লোকের হাতে ভূমি কেন্দ্রীভূত না হতে পারে, ওপর থেকে দেখলে মনে হয়, কেবল তারি জন্যে এ সকল বিধি-ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে এগুলো প্রায়ই ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করারই মত। বিরুদ্ধ বাদীদের দ্বারা নিহত, অতুলনীয় উদ্যমশীল বিপ্লবনেতা লিয়াও-চাং-কাই সুন্-য়াৎ-সেনের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে কৃষক আন্দোলনকে জাগিয়ে তুলতে তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

জাতীয় বিপ্লব-সেনাদলের প্রধান সেনাপতি চ্যাং কাই শিহ বলেছেন যে "ভূমির প্রশ্নের একটা সুমীমাংসা করাই বিপ্লবের অন্যতম বিশিষ্ট উদ্দেশ্য। বিপ্লবের কোনো বিশেষত্বই থাকছে না যদি ভূমির প্রশ্নের একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া যায়।"

প্রাচীন চীনের জ্ঞানিগণ কৃষকদের মধ্যে ভূমির সমভাবে বণ্টন হওয়ার নীতিকে সমর্থন করতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথার ওপরেও জোর দিতেন যে সমস্ত ভূমি কেবল মাত্র রাজারই সম্পত্তি। সে সময়ে কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিলনা বলে ঋষিদের এ ধারণা কার্য্যে পরিণত হয়নি। চীনের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে কেউ এ মতের খণ্ডন করতে সাহস করেনি, অবশ্য জমিদার ও অভিজাতগণ ছাড়া।

চীনের ভূমি-প্রশ্নের সমাধান করার সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এই হচ্ছে যে চীনে সত্যকারের বড় জমিদার নেই। ছোট ছোট ভূম্যধিকারীর হাতেই সব জমি রয়েছে, আর তারাই কৃষকদের শোষণ করছে। জমি বড় বড় জমিদারের হাতে থাকলে তা জব্দ করার পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে পড়ত। কিন্তু, যারা কৃষকদের কাছ থেকে কর হিসেবে পাওয়া কৃষি জাত দ্রব্যের ওপরে জীবন ধারণ করে থাকে সেই ছোট জমীদারদের সম্মুখীন হবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা একান্তই প্রয়োজন!

বর্ত্তমান সময়ে চীনের কৃষকগণ, বিশেষ করে কোয়াণ্টাং প্রদেশের কৃষকগণ, ভূমির কর কমিয়ে দেবার জন্যে দাবী করছে। ভূমি-প্রশ্ন সমাধানের কাজ আরম্ভ করার বহু উপায়ের মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাও একটা উপায়। কিন্তু, ডাক্তার সুন্-য়াৎ-সেন যে সকল মতের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন তার একটিকে কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত। এইটে হচ্ছে যে ভূমির মালিক কেবল সে কৃষকরাই হবে যারা তা চাষ করে থাকে।

চীনের ভূমি-প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধানের পথে নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকগুলো বিদ্যমান রয়েছে:—

(১) চীন ভাষার জটিলতা হেতু কৃষকদের পক্ষে শিক্ষা লাভ করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তারি জন্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা এত নগণ্য।

(২) রাস্তা-ঘাটের সুবন্দোবস্ত নেই বলে কৃষকদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করাটা বড়ই কষ্টকর। কৃষকদের এই বিক্ষিপ্ততার জন্যে শিক্ষাকে বিশিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ করে রাখতে হয়েছে।

(৩) অদৃষ্টবাদ আর কুসংস্কার কৃষকের মনকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। তার অপকৃষ্ট দুর্ভোগকেও সে অখণ্ডনীয় কপালের লিখা বলে মনে করে থাকে। সে ভূতেআর যাদু বিদ্যাতেও বিশ্বাস করে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি কৃষকদের বিদ্রোহী হতে বাধ্যও করে, তারা সাধারণতঃ প্রকৃত বিপ্লবের পথ হতে সরে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্থলে বক্সার বিদ্রোহ বা বর্ত্তমান রেড্ স্পিয়ার সোসাইটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ সকল অসুবিধা যে অনতিক্রমনীয় এরূপ মনে করা কিছুতেই উচিত নয়। কুমিণ্টাং এ সকল অসুবিধার সহিত যুদ্ধ করতে ও কৃষকদের মধ্যে উদ্যমের সহিত কাজ করতে প্রস্তুত আছে। ১৯২৬ সনে কুমিণ্টাংএর যে দ্বিতীয় কংগ্রেস হয়ে গেছে তাতে কৃষক আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ কর্ম্মী তৈরী করার জন্যে কতকগুলি কৃষক স্কুল ও কুমিণ্টাংএর সমস্ত প্রাদেশিক কমিটিতে একটি করে কৃষক বিভাগ স্থাপন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। কৃষক বিভাগের প্রথম উদ্দেশ্য হবে কৃষকদের নিরক্ষরতা বিদূরীত করা। দ্বিতীয় কংগ্রেস আরো প্রস্তাব পাস করেছে যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে কৃষক সাধারণের যোগদান করার আবশ্যকতা আছে। তাদের সংগঠন গুলোকে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের দিকে আকর্ষণ করতে হবে। এ যাবৎ কৃষকদের সম্বন্ধে চীনে কোনো আইন পাস হয়নি। কোয়াণ্টাং, হুনান্ ও অন্যান্য প্রদেশ সমূহে ডাক্তার সুন্-য়াৎ-সেন যে হুকুম জারী করেছিলেন তারি ফলে সর্ব্বপ্রথমে কৃষক সঙ্ঘ সমূহ গঠিত হয়। কুমিণ্টাং দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসে স্থিরীকৃত হয়েছে যে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম আত্ম রক্ষার ভাব থেকে চালাতে হবে। উত্তর প্রদেশীয় অভিযানের কার্য্য যখন সমাপ্ত হবে তখন কুমিণ্টাং দলের প্রথম কাজ হাব কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের অনুকূলে নানাবিধ ব্যবহারিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং সে গুলো যাতে কার্য্যে পরিণত হয় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

চীনের জাতীয় বিপ্লবের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্যে প্রথম ও প্রধান কাজ হবে কৃষক সাধারণকে মুক্ত করা। সমগ্র নীতিটাই, তা' রাজনৈতিকই হোক আর অর্থনৈতিকই হোক, কৃষক আন্দোলনের ভালোর জন্যেই চালানো উচিত। দলের কর্ম্ম-কুশলতা আর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য, এ সবেরই ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত প্রধানত কৃষকদেরই স্বার্থ সংরক্ষণের অনুকূলে এবং সব কাজই চালিত হবে তাদের মুক্তির জন্যে। কুমিণ্টাং দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কৃষকদের ওপরে যে প্রস্তাব পাস হয়েছে তাতে এরূপ কর্ম্ম-ধারার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

জগতের কৃষকগণের, বিশেষ করে প্রাচ্য দেশ, উপনিবেশ ও অর্দ্ধোপনিবেশে সমূহের কৃষকগণের উচিত চীনের কৃষকগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করা। তারা তাদের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে এবং শোষণবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে তারা একটা ভীষণ নাটকের অভিনয় করছে। সঙ্গে সঙ্গে জগতের কৃষকগণের সংগ্রাম প্রণালী ও অভিজ্ঞতার প্রতি চীনের কৃষকগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হওয়াও উচিত। কাজেই, অন্যান্য দেশের কৃষকদের মুক্তি আন্দোলনের সহিত ও তার পরিচালক সঙ্ঘ—ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফার্ম্মার এণ্ড পিজাণ্ট কাউন্সিলের (ক্রেষ্টিণ্টার্ণ) সহিত—চীনের কৃষকগণের ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত। চীনের কৃষক আন্দোলন চালানোর জন্যে চীনের কৃষকগণের উচিত অন্য দেশের কৃষক

আন্দোলনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা এবং আরও তাদের উচিত ক্রেষ্টিন্টার্ণের নেতৃত্বাধীনে চলা।

চীনের লোক সংখ্যা জগতের লোক সংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ, আর চীনের কৃষকের সংখ্যা চীনের লোক সংখ্যার পাঁচভাগের চার ভাগেরও বেশী। একথা বলা অনাবশ্যক যে, চীনের কৃষক আন্দোলন জগতের বিপ্লব-নেতৃবৃন্দের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার উপযুক্ত।

জগতের মুক্তিদায়ক কৃষক আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক!

(ইংরেজী হতে অনুবাদিত)

ট্রেড্ ইউনিয়নিজম
বা
শ্রমিক সঙ্ঘবাদ

(ভারতের শ্রমিকগণের অবস্থা অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন, এই প্রবন্ধ এমন একজন বৃটিশ শ্রমিক সঙ্ঘবাদীর লিখা। বোম্বের "ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্যাল হেরাল্ড" নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কৃপানুমতি নিয়ে "গণবাণী"তে প্রবন্ধটি ছাপা হলো।)

একশ' বছর আগে কাজের মত ট্রেড্ ইউনিয়নিজম বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদের কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। ইংল্যাণ্ডের বাইরে সুলক্ষণযুক্ত শ্রমিক সঙ্ঘের কোনো আভাস পর্য্যন্তও পাওয়া যেতনা, আর ইংল্যাণ্ডে ধনিকবাদ (Capitalism) তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। তারি জন্যে সংরক্ষক সঙ্ঘের আকারে শ্রমিক সঙ্ঘ সবে শিকড় গজাচ্ছিল মাত্র।

প্রস্তাবনা

সেই প্রাথমিক যুগে শ্রমিক সঙ্ঘগুলোকে অনেক বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়ে কাজ করতে হত। শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করা তখনকার দিনে বে-আইনি কাজ বলেই পরিগণিত ছিল। তাই, সেগুলোর সকল কাজই গোপনে করতে হত। শ্রমিক সঙ্ঘ-বাদীরা যদি শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপারকে কোনো প্রকারে নিয়মিত করতে চাইতেন, তা হলে নিয়োগকারিগণ ও গবর্ণমেণ্ট তাঁদের সে কাজকে ব্যবসায় ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বলে ধরে নিতেন। সংখ্যায় দিক থেকে দেখতে গেলে ইউনিয়নগুলোর সভ্য সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী কিছুতেই ছিল না। একটুকু সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যায় যে এ ইউনিয়নগুলো অত্যন্ত বেশী রক্ষণশীলও ছিল। প্রত্যেক সমাজ আপন আপন বিশিষ্ট শিল্প কৌশলের গৌরব রক্ষা করতে চেষ্টা করত। বিভিন্ন সঙ্ঘের সভ্যগণ আপনাদের অবস্থা ভালো করার জন্যে একত্র হয়ে তাদের নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে লড়বে এমন ধারণা সেই দিনে কেউ কল্পনায়ও আন্‌তে পারত না।

বিশিষ্টতম শক্তি

আজকের দিনে ট্রেড্ ইউনিয়নিজম রাষ্ট্রনীতির একটা বিশিষ্টতম শক্তি। শ্রমিক আন্দোলন আজকের দিনে কোনো একটা দেশের ভৌগলিক সীমার ভিতরে আবদ্ধ নেই। এ হচ্ছে এখন আন্তর্জাতিক অর্থাৎ সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির আন্দোলন। অত্যন্ত অনুন্নত দেশেও কোনো না কোনো আকারে শ্রমিক সঙ্ঘের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। যে দেশে কলকারখানা খুব অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হয়েছে সে দেশের শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে লক্ষ লক্ষ হয়েছে। এ সবের উদ্দেশ্য ও নীতির দিক থেকেও ঠিক এরূপই উন্নতি হয়েছে। বিশেষ শিল্প-কৌশলের জন্যে যে একটা বিশেষ সংস্কার ছিল, যে সংস্কার বছরের পর বছর শ্রমিক সঙ্ঘগুলোর ওপরে কর্ত্তৃত্ব করেছে, তার ক্ষমতা আজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। বড় বড় উন্নত কলকারখানা স্থাপিত, মূলধন কেন্দ্রীভূত ও মূলধনের মালিকগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রমিকগণও তাদের পূর্ব্বসংস্কারের বাঁধ ভেঙে ফেলার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর সভ্যরূপে শ্রমিকসঙ্ঘ মাত্রেরই সহিত যে তাদের সমস্বার্থ রয়েছে তা তারা বুঝতে পেরেছে। এই দিক থেকে ট্রেড্ ইউনিয়ন বা শ্রমিকসঙ্ঘগুলি আর সব আন্দোলনের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর হয়েছে। তাদের জাতীয়ত্বের প্রতিবন্ধক ভেঙে যাওয়ায় তারা ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক ভাবে সংহত হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব

এ কথা অবশ্য মেনে নিতেই হবে যে এখনো শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের আন্তর্জাতিক সংহতির জন্যে অনেক কিছু করা দরকার। এতেও অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে অবস্থা সমূহের পার্থক্য, জাতীয় আচার-বিচার ও পুরুষানুক্রমে পাওয়া উপদেশাদি শ্রমিক সঙ্ঘবাদের আন্তর্জাতিকে শক্তিকে একত্রীভূত করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি আজকের দিনে আমরা লক্ষ করেছি যে শ্রমিক সঙ্ঘগুলির আন্তর্জাতিক ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটুকু পর্য্যবেক্ষণ করলেই দেখতে পাওয়া যায় যে শ্রমিক আন্দোলন, সোজা-সুজি তার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। ওপরে যা বলা হলো তাতে ন্যায়তঃ আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বর্ত্তমান কালে শ্রমিকসঙ্ঘবাদ সমাজের একটা স্থায়ী শক্তি বিশেষ। এর জন্ম হয় সর্ব্বত্র ধনিকবাদের জন্মের সাথে সাথে। ধনিক সমাজের গঠনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহেরও গঠন ও দৃষ্টির প্রসারতার পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন এখনো দুর্ব্বল এবং কার্য্যের দিক থেকে নগণ্য। তবুও ধনিকবাদের প্রসার ও আধুনিক কল-কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শৈল্পিক সেনাদল (Industrial Army) অর্থাৎ শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহও প্রসারিত হবে।

ভারতের সুযোগ

অন্যান্য দেশের অধিকতর পুরাতন আন্দোলনের চেয়ে ভারতের আন্দোলনের একটা মীমাংসিত সুযোগ রয়েছে। শ্রমিক সঙ্ঘ গঠনের কাজে অগ্রণী যাঁরা হয়েছিলেন তাঁদের সম্মুখে না ছিল কোনো সিদ্ধান্ত (Theory), না ছিল কোনো কাজের অভিজ্ঞতা, যার দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হতে পারতেন। ভুল তাঁরা পদে পদে করেছেন। তাঁদের নীতি ও গঠনের দুর্ব্বলতা বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। পুনঃ পুনঃ পতন ও পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হতেই প্রাথমিক যুগের শ্রমিক নেতৃগণ তাঁদের

ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং আন্দোলনের গঠনের কোথায় দুর্ব্বলতা রয়েছে তা ধরতে পেরেছিলেন। সময়ে সময়ে আন্দোলন অত্যাচারের চাপে একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে, কখনো বা ঘরোয়া বিবাদে সংগঠনগুলো প্রায়ই ভেঙে গিয়েছে। এ সকল পরীক্ষাতেই আন্দোলন উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্ত্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের অনেক শক্তি ও প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণ এই যে এ আন্দোলন পতন থেকে অনেক শিক্ষালাভ করেছে, আর এ শিক্ষালাভই তার শক্তিমত্তার মূল।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন আজ সবে মাথা তুলে উঠেছে। এ আন্দোলন অন্য দেশের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক পরিমাণে উপকৃত হতে পারে। প্রাথমিক যুগে অন্যান্য দেশের আন্দোলন যেরূপ ভুল ও গাঠনিক দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করেছে সে সব থেকে দূরে সরে থেকে ভারতীয় আন্দোলন ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠনরূপে বেড়ে উঠ্‌বে।

অতীত ও ভবিষ্যৎ

ট্রেড্ ইউনিয়নিজম্ বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদের ন্যায় জটিল বিষয়ের আলোচনার গোড়ার কথা হচ্ছে এমন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যার দ্বারা বোঝা যাবে ট্রেড্ ইউনিয়নিজম জিনিসটা কি, কি ভাবে তা কাজ করে এবং তার মুখ্য ও গৌণ লক্ষ্যই বা কি? বহু সংখ্যক অনুমাতা (theorists) এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন, অনেক গবর্ণমেণ্ট আইন তৈরী করে ট্রেড্ ইউনিয়নের কাজ ও আদর্শ স্থির করে দিতে চেষ্টা পেয়েছেন এবং সদিচ্ছাপ্রবণ লোকহিতৈষী ও সমাজসেবকগণ তাঁদের শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কল্পনা অনুযায়ী শ্রমিক সঙ্ঘবাদকে তাঁদের নিজেদের মতলব মত গড়ে নিতেও চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। এ শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘবাদ অনেক সময়ে বাধা প্রাপ্ত, এমন কি বিপথে চালিতও হয়েছে, কিন্তু তথাপি সম্মুখ গতির দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘবাদ মিথ্যা অনুমান (theory) খণ্ডন করেছে, বাধাজনক আইনগুলোকে ভুলে দিতে বাধ্য করেছে এবং লোকহিতৈষীদের আওতা হতে আপনাকে মুক্ত করেছে। এর পথ নিরূপিত হয়েছে পূর্ব্বকল্পিত ধারণাবলীর দ্বারা নয়,—শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের অত্যন্ত কঠোর ঘটনাবলীর দ্বারা। দরিদ্রতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যেয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে এর গঠন, কার্য্যপ্রণালী ও বহির্দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে। এর আকর্ষণ হয়েছে বরাবর বৃহত্তর সংগঠনের ভিতর দিয়ে সমস্বার্থ সংযোগের, এবং ব্যাপকভাবে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারসমূহের অংশ গ্রহণের প্রতি।

ট্রেড্ ইউনিয়নিজম্ বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদ সম্বন্ধে যত সব অনুমান (theory) খাড়া করা হয়েছে এ আলোচনার সুবিধার জন্যে তার মধ্যে তিনটে মাত্র আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার উপযোগী। এই তিনটের দু'টোর মূল ইংল্যাণ্ডের, আর একটির মূল ইংল্যাণ্ডের না হলেও তার ভিত্তি গঠিত হয়েছে ইংল্যাণ্ডের সে সময়কার অবস্থা অধ্যয়ন করে যে সময়ে ধনিকবাদের প্রাথমিক অবয়বগুলো বেড়ে উঠেছিল ও দৃঢ়তা লাভ করছিল।

সমবেত ক্রয়-বিক্রয়ের থিওরি

এই তিনটে অনুমান বা থিওরির প্রথমটিকে ক্রয়-বিক্রয়ের থিওরি (Theory of Collective Bargaining) বলা যেতে পারে। শ্রমিক সঙ্ঘবাদের প্রাথমিক যুগে এ অনুমান জন্ম লাভ করেছিল এবং ধনিকদের দ্বরেই করেছিল। এই মতে অনুযায়ী ট্রেড্ ইউনিয়নিজমের সংজ্ঞা হচ্ছে—বণিকদের সাধারণ সমিতি। এর উদ্দেশ্য কতকগুলো বিশিষ্ট শ্রমিক ও তাদের নিয়োগকারীদের মধ্যে নিয়োগের চুক্তিকে নিয়মিত করা। এই ধারণা প্রথমেই অনুমান করেছিল যে ধনিক সমাজ চিরস্থায়ী হবে এবং এর উদ্ভব এ গৃহীত বাক্য হতে হয়েছিল যে ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থ এক। অন্যভাবে বলতে হলে এই বলতে হয় যে ধনিক ও শ্রমিক উভয়েরই স্বার্থের উন্নতি হতে পারে উভয়েরই সমবেত শক্তি প্রয়োগ করে। এই থিওরি ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দিয়ে আধুনিক কলের প্রণালী দেখতে পায়নি, এও দেখতে পায়নি যে কল-কব্জা তখনকার শিল্প কৌশলকে ধ্বংস করে দেবে এবং সুকুশল বণিকদিগকে কেবলমাত্র মেশিন চালকের কাজে অবনমিত করবে। ধনিক প্রথা যখন হস্তশিল্পকে ছাড়িয়ে যায়নি তখন এই থিওরি কতকটা লোকপ্রিয় হয়েছিল তারপরে ধনিকবাদের বিবর্ত্তনে ট্রেড্ ইউনিয়নিজমের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে প্রাথমিক ধনিক মত আপনা হতে খণ্ডিত হয়ে গেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর সংরক্ষণ

দ্বিতীয় থিওরির উদ্ভব হয়েছে তখন যখন ধনিক প্রথার উৎপাদন অনেকটা প্রসারিত ও উন্নত হয়েছে। শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের দ্বারা যে সকল আইন পাস হয়েছিল সে সবের দ্বারা অর্থনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের আন্দোলন বারে বারে প্রতিহত ও পরাজিত হয়েছে। শ্রমিকদের ভোট দেবার অধিকার না থাকায় তারা পার্লামেণ্টের কাজের বিরুদ্ধে কিছুই করে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া, ধনিকবাদ যখন ব্যক্তিগত অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে শক্তিশালী সমিতি ও কোম্পানীর অধিকারে উন্নীত হলো তখন স্থানীয় ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের শ্রমিকগণের সংগঠন গুলোকে বাধ্য হয়ে মাথা নোয়াতে হলো তাদের মালিকগণের শক্তিশালী সংগঠনের সম্মুখে। দ্বিতীয় থিওরীর উদ্ভব দেরীতে হয়েছে বলে তা প্রথম অপেক্ষা অধিকতর প্রসারিত ধারণা গ্রহণ করেছে। এ থিওরীও সমবেত কেনা বেচার মতগুলি (Principles of Collective Bargaining) মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু একটুকু সম্মুখেও অগ্রসর হয়েছে। এর অনুসরণকারীরা ঘোষণা করেছেন যে ট্রেড্ ইউনিয়নিজম বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদের প্রধান কাজ হচ্ছে শ্রমিকদিগকে শ্রেণী হিসেবে রক্ষা করা, কোনো বিশিষ্ট ব্যবসায়ের কর্ম্মী বলে নয়। এই অবস্থায় শ্রমিকসঙ্ঘ গুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে যোগদান করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। এই মত অনুসারে, যদিও ঠিক এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, বৃটিশ শ্রমিকগণ জাতীয় শ্রমিক সঙ্ঘ গুলির ঐক্যের জন্যে প্রথম ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপন করতে চেয়েছিল। এখানেই সর্ব্ব প্রথমে তাদের মুখ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কাজে যোগদান করার দাবীর কথা উত্থিত হয়। এখানেই ট্রেড্ ইউনিয়নগুলো শ্রমিক শ্রেণীর রক্ষক হিসেবে সকল প্রকার সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় কাজে অংশ নিতে আরম্ভ করে। বাহ্য দৃষ্টিতে এটা দেখতে পাওয়া যায় যে প্রথম থিওরীর চেয়ে দ্বিতীয় থিওরীর কর্ম্মক্ষেত্র অধিকতর প্রসারিত। তথাপি এটাও স্বীকার করতে হবে যে দ্বিতীয় থিওরীও প্রথম থিওরীর ন্যায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজগুলোকে

সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এই দ্বিতীয় থিওরী এমন সব অবস্থা গুলোকে বজায় রেখেছে যার দ্বারা শ্রমিকগণ ধনিকবাদের দ্বারা শোষিত হবে।

মৌলিক বিপক্ষতা

এই দিক থেকে প্রথম দু' থিওরীর সহিত তৃতীয় থিওরীর পার্থক্য অনেক বেশী। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্লমার্ক্স তৃতীয় থিওরীর উদ্ভব করেন। তাঁর অনুসরণকারীরা পরে এ থিওরীকে আরো অনেক বিশদাকার প্রদান করেছেন। এ মতে ধনিকবাদ সমাজের একটা গমনশীল পরিবর্ত্তনীয় দিক্ মাত্র। যারা এ মত পোষণ করেন তাঁরা মেনে থাকেন যে ধনিকবাদের (Capitalism এর) জন্মের দ্বারা একটা মৌলিক সামাজিক বিপক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিপক্ষতার একদিকে হচ্ছে ধনিকগণ, আর একদিকে রয়েছে সম্পত্তিহীন শ্রমিকগণ। এ মতবাদীরা বিশ্বাস করেন যে ধনিকবাদ তার ভিতরকার বিরোধগুলির দ্বারাই লয়প্রাপ্ত হবে, আর তার ধ্বংসস্তূপের ওপরে জন্মাবে সমাজের সোশ্যালিষ্ট অবস্থা যার দ্বারা সকল প্রকারের শোষণ তিরোহিত হয়ে যাবে। এই সত্য (Premise) হতে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহ শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিত ও চরম উদ্দেশ্যাবলীর প্রতিনিধিরূপে দারিদ্র্যের সহিত দৈনন্দিন সংগ্রামের দ্বারা ধনিকবাদের অন্যায় অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাবে। এ সংগ্রাম করতে করতে ধনিকবাদের গোটা অস্তিত্বকেই যুদ্ধে আহ্বান করতে তারা বাধ্য হবে। তার পরে ধনিকবাদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকসঙ্ঘেরই ভিত্তির ওপরে নবরূপে নবসমাজ গঠিত হবে।

অবশ্য শ্রমিকসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে আরো অনেক থিওরী কল্পিত হয়েছে। কিন্তু সে সবের অধিকাংশেরই, ওপরে যে সব থিওরীর কথা বলা হলো তার কোনো না কোনো একটার সহিত কাছাকাছি সম্বন্ধ রয়েছে। কাজেই সে সবের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন নেই। যে সব থিওরীর কথা আমরা বলেছি সে সবের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে শ্রমিকের চির শত্রু ব্যতীত আর সকলের নিকটে প্রথম থিওরীর আর কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্য দু'টোর শ্রমিকজগতে অনেক অনুসরণকারী আছে। ট্রেড্ ইউনিয়নিজমের সমালোচনার যেখানে আমরা পৌঁছেছি তাতে লেখক বিশ্বাস করেন যে থিয়োরীগুলোর কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ সে বিচার করবার কোন প্রয়োজন নেই। শত বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বুঝতে পারি যে কোন্ থিওরী সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কোন্ থিওরী মানুষের সত্যকার জীবনের সাথে ও শ্রমিকসঙ্ঘবাদের অভিজ্ঞতার সহিত বেশী করে খাপ খেয়েছে।

এর পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ট্রেড্ ইউনিয়নিজমের প্রাথমিক ইতিহাস সম্বন্ধে এবং সে সময় হতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তার উন্নতির বিষয়ে আলোচনা হবে।

জাত্যভিমান

[রিজাউল করিম]

—*—

(ছোট লোকদের কথা)

জাত্যভিমানী, উচ্চ বংশীয় মানুষ! শির উন্নত করিয়া কোন্ অহঙ্কারে তুমি আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছ? উচ্চবংশের? উচ্চপদমর্য্যাদার? তুমি যে সাধারণ লোক হইতে কয়েক ধাপ উর্দ্ধে উঠিয়াছ তাহারই গর্ব্ব করিতেছ? এই গুলিই যদি তোমার গুণ হয় তোমার নিজস্ব আর যদি কোন গুণ না থাকে তবে তুমি আমাদের নিকট হইতে সরিয়া যাও! তোমাকে আমরা চাইনা, কোটি কোটি নর নারীর মধ্যে তোমাকে বিশেষ ভাবে পরিচিত চিহ্নিত ও অলঙ্কৃত করিবার আর যদি কোন গুণ না থাকে, তবে তোমাকে লইয়া আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই, তুমি সম্মুখ হইতে দূর হও!

আমরা চাই সচ্চরিত্রতা, স্পষ্টবাদিতা, মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা আর চাই নিঃস্বার্থ ভাবে মানব জাতির সেবা। আমরা চাই, মানুষ, সর্ব্ববিধ সাধনা করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন পূর্ব্বক জনসাধারণকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিবে। আমরা চাই, মানুষ, নীচভাব, স্বার্থপরতা ও কলুষিত চিন্তার আবিলস্রোতে ভাসিয়া যাইবে না, বরং মস্তক উন্নত করিয়া প্রবাহমান পাপের স্রোতের মুখে বাধা দিয়া জগৎকে পাপ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে—আমরা চাই, মানুষ, শুধু স্বার্থ সিদ্ধির জন্য লেখা পড়া শিখিবেনা, বরং লেখা পড়া শিখিয়া পশুত্ব ভাব পরিত্যাগ করিয়া, মনের কলুষ কালিমা, সংকীর্ণতা, নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের বিমল আলোকে হৃদয় পূর্ণ করিয়া আপনি বাঁচিবে, জগতের লোককে বাঁচাইবে—জগতের লোককে আপনা হইতে ছোট জানিয়া নহে, তাহাদিগকে আপনার মত সমান পদমর্য্যাদাশীল জানিয়া! জাত্যভিমানী মানুষ! তুমি এমনি মানুষ হইতে পারিবে? এমন করিয়া আপনার মধ্যে সদ্গুণ রাজি আয়ত্ত করিতে পারিবে? যদি পার, তবে আইস, হৃদয়ের মধ্যে পূরিয়া রাখিব! আর যদি না পার, যদি মানুষকে তোমার সমকক্ষতা প্রদান করিতে লজ্জা বোধকর তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই—মানুষের কীট তুমি, তুমি দূর হও।

তুমি পদ মর্য্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাও? আরোহণ করিতে পার ত, কর, তুমি বিলাসিতার স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া গগনলোকে হাত বাড়াইতে চাও—পারত, হাত বাড়াও। যেখানে দরিদ্র নরনারী মৃন্ময় গৃহে পর্ণ শয্যা রচনা করিয়া কোনও রূপে শীত বর্ষার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে, তুমি তাহাদের বুকে বজ্র হানিয়া তাহাদের সামান্য গৃহকে ভূমিসাৎ করিয়া সেইখানে তোমার বিলাস-ভবন রচনা করিতে চাও? কতকাল এরূপ চলিবে? আমার নিকটে সাহায্যের জন্য তোমাকে আসিতে হইবে। তখন তোমার উচ্চ বংশ ও পদমর্য্যাদায় পদাঘাত করিয়া, আমি বলিব, যাও! যাও! সরিয়া যাও! বিশ্বের সভা হইতে সরিয়া যাও—বিধাতার রাজ্য হইতে সরিয়া যাও। তুমি ধর্ম্মের কীট—তুমি মানব সমাজের কীট—তুমি সরিয়া যাও। মানুষ হইয়া তুমি মানুষকে ঘৃণা কর, অবজ্ঞা কর—তুমি সরিয়া যাও! দুখু মোড়ল,

সুধু সেথ অতি নিরীহ, অতি সাধু, অতি সজ্জন, তাহারা, কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে মানুষ নয়! তাহারা ছোট লোক, তাহারা চাষা, তাহারা মুটে মজুর, কুলি। তাহারা দিন আনে দিন খায়,—তাহারা ছলনা চাতুরী জানেনা, তাহারা মামলা মোকদ্দমার ফাঁদে পড়ে না, অপরকে ফেলে না, তাহারা সঞ্চয় জানেনা—তাহারাত মানুষ নয়! তাহারা সৃষ্টির এক অদ্ভুত জীব! কিন্তু ভাই জাত্যভিমানি—না না ভাই নয়—তোমাদিগকে ভাই বলিয়া ডাকিবার আমার ত কোন অধিকার নাই, আমি যে ছোট-লোক! হে উচ্চকুলোদ্ভব! দেবতা বলিয়া ডাকিলে ত সন্তুষ্ট হইবে? তোমরা এ সব ছোটলোকদের রাজ্যে থাকিও না—চলিয়া যাও! দেবতা তোমরা, কোনো দেবলোকে চলিয়া যাও! এখানে, আমাদের ছোটলোক প্লাবিত এরাজ্যে থাকিলে তোমার বংশের কেহই মর্য্যাদা করিবে না! করিতে পারিবে না।

যাহাদেরকে তোমরা অমানুষ বলিয়া ঘৃণা কর, ছোট বলিয়া ডাকিয়া থাক, তাহারা যদি মানুষ নয়, তবে মানুষ কাহারা? দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক যাহাদের সমষ্টি যাহাদের মাথার ঘাম-পায়ে ফেলা পরিশ্রমে দেশের বড় লোকদের পুষ্টি সাধন হইতেছে তাহারা যদি মানুষ নয় তাহা হইলে মানুষ কাহারা? জগতের চারি দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ দেখ হাটে ঘাটে পথে প্রান্তরে কোটি কোটি মানুষ, কেমন নিপুণ ভাবে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে—কেহ চাষ করিতেছে, কেহ বাজারে দ্রব্যাদি বেচিতেছে,—কেহ মুটেগিরির কাজ করিতেছে, কেহ তাঁত বুনিতেছে এইরূপ কত লোক কত ভাবে পরিশ্রম করিয়া স্বাধীন ভাবে দিনপাত করিতেছে,—ইহারা যদি মানুষ নয়, তবে মানুষ কাহারা? তোমরা? যাহারা বিলাস ভোগে দিনপাত করিতেছে, যাহারা অলস হইয়া বসিয়া বসিয়া অপরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাওয়াকেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করে—যাহারা আপন বংশ মর্য্যাদার অহঙ্কারে দরিদ্র মানুষকে সর্ব্বদাই হেয় জ্ঞান করে—তাহারা সেই সব পরান্নজীবী পাষণ্ডেরাই প্রকৃত মানুষ? যাহারা আপনাদের মধ্যে কোনরূপ সদ্গুণ সঞ্চিত করিতে পারে নাই, দাম্ভিকতা, অহঙ্কার কুটিলতা ও শঠতা যাহাদের অঙ্গের ভূষণ সেই সব কুলাঙ্গার কীটগণই কি মানুষের আদর্শ? হে জাত্যভিমানি! ধন্য তোমাকে! ধন্য তোমার মনুষ্যত্বের আদর্শকে।

হে বংশগৌরবে অন্ধ মানুষ। তোমাদের মনুষ্যত্বের, যাহাই আদর্শ হউক না কেন—তোমরা নিজেদেরকে যতই উচ্চ বিবেচনা কর না কেন—তাহাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না—তোমরা আমাদের এই পৃথিবীর কেউ নও। রবি-শশি-গ্রহ-তারকা-হসিত এই যে মনোহর আকাশ—আর তাহারই তলে সবুজ ঘাসের মখমলময় বিছানার উপর এই যে কোটি কোটি লোকের আবাসস্থান—এ জগৎ তোমাদের নয়, প্রকৃতির শিশু যাহারা আমার মত মুটে মজুর চাষী যাহারা তাহাদেরই ইহা! তাহাদেরই বাসগৃহ ইহা। তাহারাই ইহাকে সুন্দর ও মনোহর বেশে সজ্জিত করিয়াছে, ইহার সুখ ঐশ্বর্য্য তাহাদেরই কারণে বর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে—ইহার শোভা ও শ্রী তাহাদের মঙ্গলময় স্পর্শে দিব্য রাগে ফুটিয়া উঠিতেছে—এই পৃথিবীতে তোমাদের কোন অধিকার নাই—ইহা আমাদের—আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি।

সারা জগতের পানে একবার চাহিয়া দেখিবার তোমাদের কখনও অবসর হইয়াছে? জগতের উপর কিসের হাওয়া বহিতেছে, কি বন্যা-প্রবাহ তরতর বেগে ছুটিতেছে—কি ভীষণ ঝটিকা সমগ্র জগতের বক্ষে মহা প্রলয় হানিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার তোমার কি কখনও অবসর হইয়াছে? আজ সমগ্র জগতে সাম্য, মৈত্রী, ও গণতন্ত্রের ভাবধারা প্রবলবেগে বহিতেছে। উহার প্রবল স্রোতের সম্মুখে তোমাদের জাত্যভিমানের বৃথা আস্ফালন টিকিতেছে কি? টিকিবে কি? সব পণ্ড হইয়া যাইতেছে, সব চূর্ণ হইয়া যাইতেছে!

তোমরা আপনাকে বড় বলিয়া জান! তোমরা কিসে বড়? তোমাদের যে হাড়মাসের দেহ আমাদেরও সেই দেহ—তোমাদের অর্থ আছে? কোথায় সেই অর্থ পাইয়াছ? তোমরা ত শ্রম বিমুখ জীব, আমাদের লুণ্ঠন করিয়াইত তোমাদের ধন। আমরা নিজে পরিশ্রম করিয়া খাই—তোমরা অপরের অর্জ্জিত অন্ন ভোগ কর—এই হিসাবে তোমাদের চেয়ে আমরাই বড়।

উচ্চ নীচ, ছোট বড় বলিয়া জগতে কোন ভেদ নাই—কোন ভেদ থাকিতেই পারে না। ক্ষমতা, বাহু বল, ছলনা, চাতুরীবলে কতক ব্যক্তি উর্দ্ধে উঠিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও সরল প্রকৃতির মানুষকে পায়ের তলে চাপিয়া তাহাদের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া আপনাদিগকে 'ভদ্র' ও 'শরীফ' বলিয়া পরিচয় দিতেছে কিন্তু তাহারা মূলতঃ এই 'ছোটলোক'দের মত একই স্থান হইতে একই মূল হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে! কেন তবে তোমরা হে জাত্যভিমানি! দরিদ্র ও ছোটলোকদিগকে, ছোট লোক, ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণা কর? উহারা যে তোমাদেরই বংশধর!

জাতের অভিমান করিও না, জাতি লইয়া আর নাই জাতি রাখিয়া যাইবে না—যাইতে হইবে মনুষ্যত্ব রাখিয়া! সেই মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টা কর! "আবার তোরা মানুষ হ" যদি তোমরা প্রকৃত মানুষ হইতে চাও তাহা হইলে তোমাদেরকে অনেক কাজ করিতে হইবে! পৃথিবীর অনেক অভাব পূরণ করিতে হইবে! তোমরা হৃদয়ের পশু ভাব দূর কর, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হও! তোমরা পরকে আপন করিতে শিখ—যাহাদিগকে ছোট বলিয়া ঘৃণা কর, তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লও! ইহাতে অপমান নাই—বরং সম্মান বাড়ে। তাহাদিগকে 'মানুষ' ভাবিতে শিক্ষা কর—তোমরা দরিদ্রের বন্ধু হও! আর্ত্তের সখা হও—পীড়িতের চিকিৎসক হও। রোরুদ্যমানের অশ্রু মুছাইয়া দাও!

তোমরা কি মনে কর, দরিদ্র ও পতিত মানুষ তোমাদের কাছে আসিয়া পায়ে সাধিয়া তোমার দয়ার দান গ্রহণ করিবে? তোমার নিকট মুক্তির বাণী শ্রবণ করিতে চাহিবে? সেই দিন আর নাই বন্ধু, সেই দিন আর নাই! সময় আসিয়াছে, দরিদ্রেরা, তথাকথিত ছোট লোকেরা আপনাদের দাবী দাওয়া কড়ায় গণ্ডায় এখন বুঝিয়া লইবে। তোমরা দেনা শোধ দিবার জন্য প্রস্তুত হও।

—*—

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের দলাদলি

বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসে খুব দলাদলি আরম্ভ হয়েছে। কোনো অনুষ্ঠানের ভিতরে দলাদলি হওয়াটা জীবনের লক্ষণ, অবশ্য সে দলাদলি যদি কোনো কাজের তালিকা নিয়ে হয়। বড় দলের ভিতরে ছোট ছোট দল হয়েই থাকে, আর এই ছোট দলের কোনোটি হয় নরম, কোনটি হয় গরম। নরমের আর গরমের কর্ম্ম-তালিকায় পরস্পর ঠোকাঠুকি বেধেই থাকে। আর এই ঠোকাঠুকিই হয় দলাদলি। বাংলার কংগ্রেসে যে দলাদলি হচ্ছে তা কিন্তু এই নরমের গরমের কার্য্য-তালিকার ঠোকাঠুকি নয়। এখানে কার্য্য-তালিকার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত কোথাও নেই। তবুও কিন্তু ঠোকাঠুকি আছে অনেক বেশী, এত বেশী যে, একটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দু'টিতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা বাইরের দিক থেকে দেখলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। অনেকে ভাবতেই পারেন না যে কেন এমন হলো। জগতের সর্ব্বত্রই দল যেখানে যেখানে ভেঙেছে, কর্ম্ম-তালিকার বিরোধেই ভেঙেছে। একমাত্র বাংলার কংগ্রেস কমিটিই ভেঙে গেল নিছক ব্যক্তিগত বিরোধের জন্যে। এটা নিতান্তই লজ্জার কথা, কিন্তু, এ লজ্জা সমগ্র জাতির লজ্জা নয়। প্রাদেশিকই হোক, আর সমগ্র ভারতীয়ই হোক, কংগ্রেস আজো পর্য্যন্ত সমগ্র জাতির প্রতিনিধি সভা হতে পারেনি। এটা এখনো একটা শ্রেণীর সভা মাত্র। কোনো একটা শ্রেণীর লজ্জাকর অভিনয়ের জন্যে একটা জাতি কখনো দায়ী হতে পারে না। কংগ্রেস যদি সত্যই দেশের জনগণের সংগঠন হত তা হলে কোনো গান্ধী এসে কংগ্রেসকে এই বলে ধমকাতে পারতেন না যে 'তোমরা যদি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করে নাও, তা হলে আমি কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাব।' কোনো যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত সাহস করে উচ্চারণ করতেই পারতেন না যে জনগণের পরোয়া না করে তিনি কংগ্রেসকে জমীদারের হাতে তুলে দিবেন।

—*—

সাম্প্রদায়িক বিরোধ

গত বছর এমন দিনে কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রকট হয়েছিল তা আজ কাল বাংলার মফস্বলেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। খবরের কাগজ ওয়ালারা ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বেশী রূপ তুমুল করে তুলেছে। আমরা একটি কথা বারে বারে বলেছি এবং আজ আবারও বলছি;—এই যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা প্রতিদিন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তা সত্যই কিছু সাম্প্রদায়িক বিরোধ নয়। কলিকাতা হতে বিরোধ মফস্বলে প্রসারিত হয়ে পড়ায় আমাদের কথার সত্যতা আরো বেশীরূপে প্রমাণিত হচ্ছে। এ বিরোধের মূলে রয়েছে একটা বিরাট অর্থ নৈতিক অসন্তোষ। নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রেণী-সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। বাংলা দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে যারা শোষিত হয় তারা প্রায়ই মুসলমান, তেমনি শোষণ যারা করে তারা প্রায়ই হিন্দু। কাজেই শোষিত মুসলমান কৃষকের মনে এ ভাব জাগিয়ে দেওয়া খুবই সহজ যে তারা হিন্দুদের স্বধর্ম্মাবলম্বী নয় বলেই হিন্দুরা তাদের দু'হাতে লুঠছে, আর মুসলমান কৃষক যখন চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পায় যে তার সবই নির্য্যাতক হিন্দু তখন সে প্ররোচকের কথায় বিশ্বাস করে ধর্ম্মের নামে হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে পড়ে। এমনটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু, যে কোনো জিনিসকে তার সত্যকার রূপে সকলের সম্মুখে হাজির করানো উচিত। মুসলমান কৃষকসাধারণ সত্যই নির্ম্মমভাবে শোষিত ও নির্য্যাতিত হচ্ছে। তবে তারা মুসলমান বলেই যে হিন্দু মহাজন ও হিন্দু জমীদার তাদেরকে শোষণ করছে তা'তো মোটেই সত্য কথা নয়। মহাজন আর জমীদারের ধর্ম্মই শোষণ। তারা সকলকেই শোষণ করবে, তা সে শোষিত ব্যক্তি হিন্দুই হোক্ বা মুসলমানই হোক্। সত্য বটে শোষিতের মধ্যে মুসলমানই হয়তো পনের আনা, কিন্তু এক আনা যে হিন্দুও রয়েছে সে কথা ত অস্বীকার করার উপায় নেই। এই এক আনা হিন্দু, হিন্দু জমীদার ও হিন্দু মহাজনের দ্বারা মুসলমানের চেয়ে কোনো অংশে কম শোষিত হচ্ছে কি? তার পরে সংখ্যায় কম হলেও মুসলমানের মধ্যেও জমীদার ও মহাজন রয়েছে। তারা কিছু জাত ভাই বলে মুসলমানদের কম শোষণ করে না। শিক্ষিত মুসলমানদের উচিত এ সব কথা মুসলমান কৃষকসাধারণকে বোঝানো।

কৃষকদিগকে তাদের শোষক ও নির্য্যাতকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কোনো হিন্দু-মুসলমানের কথা এখানে নয়। কৃষকদের অর্থ নৈতিক সংগ্রামে তাদেরকে সারা বিশ্বের সহানুভূতি অর্জ্জন করতে হবে। সে সহানুভূতি তারা হারাবে যদি হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নকে মিছামিছি তারা তাদের আর্থিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে টেনে আনে। শুধু কি তাই? এ ধর্ম্মের বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে শোষক ও নির্য্যাতকগণ আত্মরক্ষার অনেক সুযোগ পাবে। সত্যই যেখানে ধর্ম্মের কোনো কথা নয় সেখানে ধর্ম্মের কথা তুলে মুসলমান কৃষকগণ আপনাদের পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

—*—

ধনিকবাদের উগ্রমূর্ত্তি

ইংলণ্ডের গত সাধারণ ও কয়লার ধর্ম্মঘটে বৃটিশ ধনিকবাদের মূল যেমন কেঁপে উঠেছিল তেমনটা আর কখনো হয়নি। বিলুণ্ঠিত শ্রমিকের শক্তি যে কত বড় তা বৃটিশ ধনিকগণ ধর্ম্ম-ঘটের সময় বিশেষরূপে টের পেয়েছেন। শ্রমিকেদের সংহতি এমনি ভাবে বেড়ে উঠ্‌লে ধনিকদের অস্তিত্ব নিতান্তই সম্বিহান হয়ে উঠ্‌বে। আপনার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার পূর্ব্বে সূচনা দেখ্‌তে পেয়ে বৃটিশ ধনিকবাদ সম্প্রতি ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছে এবং তাহারি ফলে বৃটিশ হাউস্ অব্ কমন্সে পেশ্ হয়েছে "ট্রেড্‌স ইউনিয়ন এণ্ড ট্রেড্‌স ডিস্‌পিউট বিল"। এই বিল পাস হয়ে আইনে পরিণত হলে বৃটনের শ্রমিকগণের পক্ষে শ্রমিকসঙ্ঘগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাই কষ্টকর ব্যাপার হবে, কোনো আন্দোলন করা ত দূরের কথা। যেমন করে হোক্, শ্রমিক-শক্তিকে দাবিয়ে রাখাই হচ্ছে ধনিকবাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সত্যই কি ধনিকবাদ তা করতে পারবে? কিছুতেই নয়। আমাদের মতে এই আইন পাস করে বৃটিশ ধনিকবাদ শ্রমিক-গণের উপকারই সাধন করবেন। যে শ্রমিক-বিপ্লব গ্রেটবৃটেনে বহু বিলম্বে হাওয়ার কথা ছিল, এ আইন পাস হলে তা অনেক সত্বরই হবে। এ বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে বিপ্লব করা ব্যতীত বৃটিশ শ্রমিকগণের গত্যন্তর নেই। প্রোলেটারিয়েটের (সম্পত্তি হীন হয়ে যারা আপনাদের ভাড়ায় খাটাতে বাধ্য হয় তাদের) সৃষ্টি করে ধনিকবাদ গোড়াতেই আপন হাতে আপন কবর খনন করে রেখেছে। এ কঠোর আইন যদি সে পাস করে তা হলে সে আপনা হতেই আপনার হাতে খোদা কবরে গিয়ে পড়বে।

দেশ বিদেশের খবর

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নূতন ব্রাঞ্চ লাইন তৈরী হচ্ছে:—শিবসাগর কোয়াং রেলওয়ে; করিমগঞ্জ লুঙ্গাই রেলওয়ে এবং ফারকেটিং বাদলিপাড়া জোর হাট রেলওয়ে। এ সকল তৈরীর ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্ট বহন করছেন।

মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ রেলওয়ে এজেন্টের সাথে দেখা করে ইউনিয়নকে কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে মঞ্জুর করে নেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। এজেন্ট উত্তরে বলেছেন যে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বরাবরই কর্ম্মীদের অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন। তবে ইউনিয়নের তরফ থেকে অনেক সময় এমন সব অভিযোগ পেশ করা হয় যা বিবেচনার যোগ্য মোটেই নয়। ইউনিয়ন যদি তার নীতি পরিবর্ত্তন করে তা হলে ইউনিয়নকে মঞ্জুর করে নেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

আসামের সুর্ম্মাভেলি বিভাগের কেরাণীদের সম্মিলন ১৬ই এপ্রিল তারিখে শিলচরে বসবে। রায় বাহাদুর প্রমোদচরণ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।

চট্টগ্রামের সেশন জজ সম্প্রতি বিশেষ জুরির সাহায্যে এক জমিদারের মোকদ্দমার বিচার করেছেন। কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত টেকসিয়ার জমিদার গুড়ামিঞা চৌধুরী ও অপর দুই ব্যক্তি এ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ছিলেন। অভিযোগের বিষয় এই ছিল যে তাঁরা সেখানকার অজিহুল্লা নামক এক ব্যক্তির গৃহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। বিচারে অভিযুক্তগণ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় জমীদার গুড়ামিঞা ৩ মাসের সশ্রম দণ্ডে ও ৫০০ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। অপর দু'ব্যক্তির প্রত্যেকে যথাক্রমে ১৫ ও ১৮ মাসের সশ্রম দণ্ডে এবং ২৫০ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।

বালুর ঘাটের খবরে প্রকাশ হয়েছে যে ওখানকার সাহেব কাচারীর জমিদারের কর্ম্মচারী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর ভাই হরনাথ চক্রবর্ত্তী জমিদারের পুত্র ও অন্য কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে বালুর ঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা তাঁর ভাইএর ওপরে নানারূপ অত্যাচার করেছেন। এ অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যেই বেচারা ত্রৈলোক্যনাথকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। অনুসন্ধান চলেছে।

ইংল্যাণ্ডের ফরেন্ সেক্রেটরী সার অষ্টেন চেম্বার লেন্ ৭ই এপ্রিল তারিখে বার্ম্মিংহামে এক বক্তৃতা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটেনের সম্বন্ধ বজায় রাখা বড় কষ্টকর ব্যাপার হয়ে পড়েছে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে জগতের সর্ব্বত্রই বিপ্লব ঘটাতে চায় একথা তারা আর ঢেকে রাখেনি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ওপরেই তাদের রাগ সব চেয়ে বেশী। তারা কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যালের মধ্যবর্ত্তিতায় ও অন্যান্য উপায়ে বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নানা প্রকার খারাব ভাব জাগিয়ে দিচ্ছে।

হাউস্ অব্ কমন্সে যে ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল পেশ করা হয়েছে লিবারেল দলের সভ্যরা তাঁদের দলের পক্ষ থেকে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করে তার বিপক্ষতা করেছেন। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে ট্রেড্ ইউনিয়ন আইনে অনেক সব অনিশ্চয়তা আছে। নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের দ্বারা সে গুলোকে বিশদরূপে প্রকাশ করে তবে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত ইতোমধ্যে এই বিল্ কল কারখানার শান্তি বিধানে বাধা দেবে, পার্লামেন্টের অনেক আবশ্যক বিষয়েও দেরী পড়ে যাবে।

বর্দ্ধমানের পাব্লিক প্রসেকিউটর নজীর উদ্দীন আহ্মদ সাহেবের সম্পাদকতায় "বর্দ্ধমান বাণী" নামক একখানা বাংলা সাপ্তাহিক গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে।

বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে "অনাগত" নামক একখানা বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা হতে বাহির হবে। শ্রীযুত ক্ষীরোদকুমার রায় ও শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ কাগজের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করবেন। ক্ষীরোদ বাবু এক সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ছিলেন আর বঙ্কিম বাবু ছিলেন যুক্ত প্রদেশের ইটাওয়া কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট সদস্য।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

আগামী ১৮ই এপ্রিল তারিখে অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির এক অধিবেশন দলের কার্য্যালয়ে হবে। সদস্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জেনেরেল সেক্রেটরী

ট্রেড্স ইউনিয়ন বিল

এটর্নি জেনেরেল বৃটিশ হাউস্ অফ কমন্সে "ট্রেড্স্ ইউনিয়ন ও ট্রেড্স ডিস্পিউট্" নামক এক বিল পেশ্ করেছেন।

কোনো বিশিষ্ট ব্যবসায়ের শ্রমিকগণ সে ব্যবসায়েরই ঝগড়ার মীমাংসা করার জন্যে ছাড়া যদি গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করার জন্যে কিংবা কোনো সম্প্রদায়কে বা সে সম্প্রদায়ের কোনো অংশকে ভয় দেখানোর জন্যে ধর্ম্মঘট করে, তা হলে সে ধর্ম্মঘট বে-আইনি বলে পরিগণিত হবে। এরূপ ধর্ম্মঘটের জন্যে আর্থিক সাহায্য করাও বে-আইনি বলে পরিগণিত হবে। এসব অপরাধ করার জন্যে দু' বছরের পর্য্যন্ত সাজা হবে। এটা হল বিলের প্রথম দফা।

বিলের দ্বিতীয় দফা হচ্ছে এই যে সে সকল শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করবে না তাদেরকে ইউনিয়ন হতে বের করে দেওয়ার বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়ে দেবার অধিকার কোনো ইউনিয়নের থাকবে না।

তৃতীয় দফার বিধান এই হচ্ছে যে কোনো বাড়ী বা কারখানার নিকটে ভয় দেখিয়ে, বাধা প্রদান বা শান্তিভঙ্গ করে পিকেটিং করলে তা বে-আইনি বলে পরিগণিত হবে।

চতুর্থ দফা বলছে, এখন যেমন পলিটিক্যাল লেভী প্রদান করে চুক্তি করা হয় তার পরিবর্ত্তে ট্রেড ইউনিয়নের মেম্বর তার ইউনিয়নে নিরূপিত ফর্ম্ম পাঠিয়েই চুক্তি করবে।

পঞ্চম দফার বিধান হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়ন যদি কেবলমাত্র রাজ সরকারের লোকের না হয়, যদি কোনো বাইরের ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের সহিত তার সম্বন্ধ থাকে তা হলে কোনো সিবিল সার্ভেন্ট ট্রেড ইউনিয়নের মেম্বর হতে পাবে না।

এ সব ছাড়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ট্রেড ইউনিয়নের মেম্বর হওয়ার শর্ত্তের ওপরে কোনো নিয়োগ করতে পারেন না।

বিলে যেরূপ বিধান আছে তা ছাড়া অন্য কোনো প্রকারে ট্রেড ইউনিয়নের তহবীলের টাকা খরচ করতে গেলে এটর্নি জেনেরেলের তাতে বারণ করবার অধিকার থাকবে।

———

কাকোরি ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা

লক্ষ্ণৌতে যে কাকোরি ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা চলেছিল এ সংবাদ সকলেই জানেন। এত দীর্ঘকাল পরে এ মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত অভিযুক্তগণ প্রত্যেকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন :—

১। রামপ্রসাদ (শাহ্‌জাহান পুর)।

২। রাজেন্দ্র লাহিড়ী (বেনারস) (ইনি দক্ষিণেশ্বর বোমার মোকদ্দমায় ১২ বৎসরের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্ট এ সাজা কমিয়ে ৮ বছর করেছিল)।

৩। রওশন সিং (শাহ্‌জাহান পুর) বয়স ৩৩ বৎসর।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

মন্মথনাথ গুপ্ত (বেনারস) ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

নিম্নলিখিত অভিযুক্তগণ, প্রত্যেকে ১০ বছরের সশ্রম কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন :—

১। গোবিন্দচন্দ্র কর (ঢাকা)।
২। মুকুন্দীলাল (ইটাওয়া)।
৩। রাজকুমার সিংহ (কানপুর)।
৪। রামকিশন ক্ষত্রী (চাঁদ, মধ্যপ্রদেশ)।
৫। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা)

নিম্নলিখিত অভিযুক্তগণ প্রত্যেকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন :—

১। বিষ্ণুশরণ দুবলিশ (মিরাট)।
২। সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কানপুর)।

নিম্নলিখিত অভিযুক্তগণ প্রত্যেকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন :—

১। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (এলাহাবাদ)।
২। প্রণবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় (জব্বলপুর)।
৩। প্রেমকিশন খান্না (শাহ্‌জাহানপুর)।
৪। রামদুলারে (কানপুর)।
৫। রামনাথ পাঁড়ে (বেনারস)।
৬। বনোয়ারীলাল (ইনি আদালতে সকল কথা বলে দিয়েছেন।)

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (লক্ষ্ণৌ) ও হরগোবিন্দ (শাহ্‌জানপুর) বে-কসুর খালাস পেয়েছেন।

সরকারী সাক্ষী হয়েছিল বলে বেনারসিলাল ও ইন্দুভূষণ মিত্রকে ক্ষমা করা হয়েছে।

আশ্‌ফাকুল্লাহ্‌ ও শচীন্দ্রনাথ বক্সী পরে ধরা পড়েছেন। তাঁদের মোকদ্দমা এখনো বিচারাধীন রয়েছে।

———

পরে সংবাদ এসেছে যে কাকোরি ষড়যন্ত্রের সাজা পাওয়া দেশপ্রেমিকদের অনেকেই অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন। সাজার দিনেই তাঁদেরকে সংযুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে জন্যে তাদের অনশন ব্রত নেওয়ার সকল খবর এখনো পাওয়া যায় নি। জজ তাঁর রায়ের সর্ব্বত্রই বলেছেন যে কাকোরি মোকদ্দমার অভিযুক্তগণের সকলেই রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধী, কিন্তু, এ কথা তিনি কোথাও বলেনি যে কারাগারে তাঁদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে। সে জন্যে জেল কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁদের সাথে মামুলী কয়েদী হিসেবে ব্যবহার করবেন স্থির করেছেন। কিন্তু, অভিযুক্তগণ এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলছেন—সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত যখন তাঁরা হয়েছেন তখন কাজ তাঁরা জেলে করবেন, তবে তাঁদেরকে রাষ্ট্র-নৈতিক কয়েদী বলে ধরে নিতে হবে। তাঁরা আপনাদের পরিহিত পোষাক ত্যাগ করে জেলের পোষাক পরতে রাজী হন নি। সম্ভবতঃ এ কারণেই তাঁরা অনশন ব্রত নিয়েছেন।

———

BOOKS ON SOCIALISM.

1. The Coming of Socialism.
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. Scientific Socialism.
Its Aims and Ideals.
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. The Religion of Capital
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. Manifesto of the Communist Party
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS.
Price—As. 6/- only.

To be had of
The Book Company
4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	॥০
অগ্নিসংস্কার	১॥০
শুভা	২৲
পাপের ছাপ	২।০
বিপর্য্যয়	২॥০
শান্তি	২॥০
কাঁটার ফুল	১॥০
রক্তের ঋণ	॥০
আনন্দ-মন্দির	॥০
রাজগী	২।০
পিতাপুত্র	১॥০
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	১॥০
দূরের আলো	২৲

নাটক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ॥০
২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত, প্রস্থচিত্র। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

উপন্যাস ও গল্প

১। মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। একা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—

১। ভাত কাপড়ের কথা
বাঙ্গালার রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।
২। বাণী বীথি।
বাঙ্গালা সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাত্নিক ব্যবহারের গ্রন্থ
1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.
Published by the Calcutta University.

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Saraswati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta, and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণ-বাণী

(এর সাথে "লাঙল" একীভূত হয়েছে)

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১শে এপ্রিল ১৯২৭, ৮ই বৈশাখ ১৩৩৪ | ১১শ সংখ্যা

বর্ত্তমান ভারত

গ্রেট্-বৃটেনের গণ-আন্দোলনের এতটুকু খবরও যাঁরা রাখেন আর, পাম দত্তের নাম তাঁরা নিশ্চয়ই শুনেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি মডার্ণ ইণ্ডিয়া নাম দিয়ে ইংরেজীতে একখানা বই লিখেছেন। এ বইএতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত ভারতের রাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করেছেন এবং ভারতে জনগণের গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করার জন্যে অতি সুন্দর এক প্রোগ্রামও দিয়েছেন। এ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিক রূপে গণবাণীতে বের করা হবে। বলা বাহুল্য, আর, পাম দত্ত একজন ইংল্যাণ্ডবাসী বাঙালী।

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস }

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ... ৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ... ১৸৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে ... ৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস্ এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

নজরুল ইস্‌লামের পুস্তকাবলী

১। অগ্নিবীণা (৩য় সংস্করণ) মূল্য ১।০
২। ছায়ানট (কবিতার বই) মূল্য ১।০
৩। ঝিঙেফুল (ছেলেদের কবিতা) মূল্য ৸০
৪। চিত্তনামা (শোক কবিতা) মূল্য ১৲
৫। সর্ব্বহারা (নূতন কবিতার বই) মূল্য ১।০
৬। দুর্দ্দিনের যাত্রী (ধূমকেতুর অগ্রলেখ) মূল্য ।৵০
৭। দোলন চাঁপা (কবিতার বই) মূল্য ১।০

প্রাপ্তিস্থান

১। ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২। বর্ম্মণ পাব্‌লিশিং হাউস্
১৯৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

টাকার কথা

আমাদের ১০০০০০ ক্রেতারা কি বলেন জানেন কি?
তাঁদের সবাই বলেন—"এঁদের দোকানের জিনিস অপসন্দ হলে খরচ সুদ্ধ ফেরৎ দেবার সুবিধে থাকলেও আমাদের কোনো দিন জিনিস ফেরৎ দিতে হয়নি।" আর বলেন—"বাজারে সবার সঙ্গে তুলনায় এঁদের জিনিস সুলভ ও সুন্দর।"

আমরা সকলের জন্য ফুটবল, ব্যাটবল, হকি, ব্যাড্‌মিন্টন ও টেনিসের সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকি। বাদ্য-যন্ত্রাদিও আমাদের নিজেদের সুদক্ষ ২৫ বছরের অভিজ্ঞ কারিগর দিয়ে তৈরী করে থাকি।

ক্রেতাগণকে আমরা একবার পরীক্ষা করতে অনুরোধ করছি।

আমাদের চির-পরিচিত

বাসন্তী ফ্লুট

(হারমোনিয়াম) এর দাম এবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।
সিঙ্গল রীড মূল্য ২২৲—২৫৲
ডবল রীড " ৩২৲, ৩৫৲, ৪৫৲, ৫৫৲, ও ৬৫৲

অরগ্যান

মূল্য—৭৫৲, ১২৫৲ ও ১৫০৲

ফুটবল—(ম্যাগ্রেকার) ১৮৲
" প্যানেল্ কম্‌পিটিশন্ মূল্য ১২৷০
" অন্যান্য ৮৷০ ও ৫৷০
" ৪নং ৬৷০ ও ৪৲
" ৩নং ৩৷০ ও ২৷০
" ২নং ২৷০ ও ১নং ১৸০

দি ইউনাইটেড্ স্পোর্টিং এজেন্সী
২৬, কালীকুমার বানার্জ্জি লেন,
টালা, কলিকাতা।

A book to be read by all

Hundred Percent Indian

By C. G. Shah.

This is an excellent book written from the point of view of Historical Materialism. The Gandhism has most scientifically been refuted in this little book. This is perhaps the first Marxian book written in India by an Indian.

Price As 6/- only.

To be had of
THE BOOK COMPANY LTD.
4/4 A, College Square, Calcutta.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১শে এপ্রিল, ১৯২৭, ৮ই বৈশাখ, ১৩৩৪	১১শ সংখ্যা

অন্তর-ন্যাশন্যাল-সঙ্গীত

নজরুল ইসলাম

জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত॥

যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্ব্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি দৈত্য-কারা
আয় সর্ব্বহারা!
কেহ রহিবেনা আর পর-পদ-আনত॥

কোরাস্ :—
নব ভিত্তি পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী!
ছিনু সর্ব্বহারা, হব সর্ব্বজয়ী॥

ওরে সর্ব্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই "অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংহতি" রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত॥

কলিকাতা
১ বৈশাখ, ৩৪

সাহায্য প্রার্থনা

সুদীর্ঘকাল বন্ধ থেকে **গণবাণী** আবার বের হল। পূর্ব্বে যেমন কোনো সম্বল আমাদের ছিল না এবারেও ঠিক তা নেই। তবুও যে কাগজ বের করেছি তার একমাত্র কারণ এই যে সম্বল না থাকার অসুবিধেটা আমাদের যত বেশী তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী প্রয়োজন হয়েছে কাগজ বের করার।

যে যুগে আমরা বাস করছি তা জনের যুগ নয়, গণের যুগ। ব্যষ্টি তার বেঁচে থাকার শেষ সময়ে এসে পৌঁছেচে, এখন তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে সমষ্টির জন্যে। জন-বন্দনার মৃত্যুর স্পষ্ট সূচনা আমরা দেখিছি। তাই, এবারে হবে জনগণের জয় জয়কার।

নিপীড়ন আর বিলুণ্ঠনে আমাদের দেশের উৎপাদকগণ (কৃষক ও শ্রমিকগণ) একেবারে অসাড় হয়ে পড়েছে। তারা ভুলে গেছে কি শক্তি তাদের ভিতরে লুক্কায়িত আছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল্ কংগ্রেসের বাঁধা বুলি শুনে শুনে আমাদের নিম্ন মধ্য-শ্রেণীর লোকগণ যদিও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন, যদিও তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে স্বার্থপর লোকেরা কংগ্রেসকে এর সত্যি-কারের পথে যেতে দিচ্ছে না, তথাপি তাঁরা আজো পর্য্যন্ত প্রাণে মনে এটা অনুভব করতে পারেন নি যে দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণকে নিয়েই তাঁদের সত্যিকারের কাজ হবে। গণ-চৈতন্য সম্পাদন ও গণ-উদ্বোধন সাধন করাই দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিতে অসন্তুষ্ট নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকগণের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—অবশ্য বিদেশীয় শোষণবাদের কবল হতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং দেশীয় ধনিকগণের শোষণ ও অত্যাচার হতে দেশের জনগণের মুক্তিলাভের বাসনা সত্যই যদি তাঁদের থাকে।

দেশের কেবল মধ্যশ্রেণী ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকগণ যে দেশে বিপ্লব আনয়ন করবে সে যুগ বহুকাল পূর্ব্বে অতীত হয়ে গেছে। এখন জনগণের উত্থানের যুগ। এ উত্থানকে অবহেলা করার শক্তি কাহারো নেই। রাষ্ট্রনীতি; অর্থনীতি ও সমাজনীতি এখন সবই কিছু হবে দেশের জনগণেকে নিয়ে।

কিন্তু, এ সকল সত্যকারের জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্যেও বোঝাবার জন্যে কোনো কাগজই আমাদের নেই। যে কাজের জন্যে বহু সংখ্যক কাগজের প্রচার হওয়া আবশ্যক ছিল সে কাজের খাতিরে একখানা মাত্র কাগজ,—**গণবাণী**—বের করা অত্যন্ত বেশী প্রয়োজনের বশে হয় নি কি?

এখন কথা হচ্ছে কি করে **গণবাণী** চলবে? এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সোজা। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির দ্বারা **গণবাণী**কে চালাতে হবে। এ উপায়ই আমাদের একমাত্র উপায়, অন্য কোনো উপায় একেবারেই নেই।

গণবাণী পড়ে ভালো যাঁদের লাগ্‌বে তাঁরা যে কোন উপায়ে হোক্ বাস্তব সাহায্য আমাদের করুন। সাহায্যকারি-গণ যদি ইচ্ছে করেন তবে তাঁদের প্রাপ্তি স্বীকার ও নামধাম প্রকাশ আমরা করব। আর যাঁরা তা চাইবেন না তাঁদের সাহায্যের প্রাপ্তি স্বীকার ও নাম-ধামাদি প্রকাশ করা থেকে আমরা বিরত থাকব। কিন্তু সাহায্য আমরা একান্তই চাই। তা' ছাড়া আমাদের চল্‌তেই পারে না, কিছুতেই না। কালের আহ্বানে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয়েছি। সুবিধে অসুবিধের কথা এতটুকুও খতিয়ে দেখতে পারিনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে জনসাধারণের সাহায্য আমরা পাবই পাব।

বিনীত—

"গণবাণী"র পরিচালকগণ

———

জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ

———

[মুজফ্‌ফর আহমদ]

—•—

পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ভারতে জনগণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পক্ষে আমাদের তিনটি প্রধান বাধা রয়েছে। যথা :— বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদ, (২) দেশীয় ধনিকের শোষণ ও (৩) জমীদারের শোষণ ও অত্যাচার। যতক্ষণ না বৃটিশ শোষণের অবসান হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই বল্‌তে পারা যাবে না যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। শোষণবাদ যেখানে আছে স্বাধীনতা সেখানে কিছুতেই থাকতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা চীনের নাম উল্লেখ করতে পারি। স্বাধীন হওয়া সত্বেও চীন আজ স্বাধীনতারই জন্যে লড়ছে। ইম্পিরিয়ে-লিজম বা শোষণবাদ একবার যেখানে ঢুকতে পারে সেখানকার স্বাধীনতা নামে মাত্র স্বাধীনতাতে পর্য্যবসিত হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক হিসেবে সে দেশ ইম্পিরিয়েলিজমের পদানত হয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবেও সে দেশকে তার পদানত হয়ে পড়তে হয়। তারি জন্যে আজ চীনকে স্বাধীনতার সমরে প্রলিপ্ত হতে হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, অথচ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত তার সম্বন্ধ কাটবে না—এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা আর কিছুই হতে পারে না।

তারপরে দেশীয় ধনিক ও জমীদারগণের শোষণের কথা। জনগণের স্বাধীনতা লাভের জন্যে যেমনি বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের অবসান হওয়া অপরিহার্য্য আবশ্যক, ঠিক তেমনি আবশ্যক দেশীয় শোষকগণেরও শোষণের পরি সমাপ্তি হওয়া।

এ নিবন্ধে আমরা জমীদারী প্রথার কথাই বিশেষ করে বলব। সেই পুরাতন ফিউডালিজমের খানিকটা চিহ্ন আজো পর্য্যন্ত আমাদের জমীদারী প্রথাতে বিদ্যমান রয়েছে। বর্ত্তমান শোষণতন্ত্রই এ প্রথাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদেরকে যদি একথা মেনে নিতে হয় যে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের উদ্দেশ্য ভারতে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, তা হলে এটাও অবধারিত যে জমীদারগণকে তার বিপক্ষে দাঁড়াতেই হবে। উৎপাদনের ক্রমোন্নত শক্তির দ্বারা ফিউডাল অর্থনীতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে থাকে, আর এ ক্রমোন্নত শক্তির অবাধ উন্নতির দাবী হয়ে থাকে গণতান্ত্রিক শাসন। কাজেই গণতান্ত্রিক শাসনের সমর্থন করে জমীদারগণ কিছুতেই আপনাদের ধ্বংস কামনা করতে পারে না। বৃটিশ শোষণতান্ত্রিক শাসন ভারতের জনগণের পক্ষে এ জন্যে ক্ষতিকর যে এ শাসন জনগণের স্বাভাবিক বর্দ্ধনে বাধা দিচ্ছে। সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি

অবাধে হতে থাকলে ভূম্যভিজাত সম্প্রদায়ের তাতে বিপদের সম্ভাবনা যেমন খুবই বেশী, আর বৃটিশ শাসন বজায় থাকলে তেমনি তাদের নিরাপদ হওয়ার সম্ভাবনাও ষোল আনা থাকে। এ কারণে জমিদারগণ আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পথে অন্তরায়। অবশ্য আমাদের জাতীয় সংগ্রাম যদি চরকা আর খদ্দরের প্রচার মাত্র হয়, তাতে ভূম্যভিজাত সম্প্রদায় কখনো আমাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে না।

জমীদার আর জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিরোধী। একারণে জনগণের আন্দোলন ভূম্যধিকারীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারে না, আর পারে না বলেই ভূম্যধিকারীকে বৃটিশ শাসনের ভক্ত অনুরক্ত হতে হয়। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকারী আর ভূম্যধিকারীতে তফাৎ এই যে প্রথমোক্ত যে জিনিসের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করতে চায়, ঠিক সে জিনিসকেই রক্ষা করতে চায় ভূম্যধিকারী। মোট কথা, বিদেশী শোষণবাদ যেরূপ আমাদের পায়ের বেড়ী হয়ে আছে, ঠিক তেমনিই বেড়ী হয়ে আছে জমীদারগণও। কাজেই জাতীয় আন্দোলনে সফলকাম হবার জন্যে আমাদেরকে "জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ" দাবী করতেই হবে।

ভারতবর্ষে ভূম্যভিজাত সম্প্রদায় বৃটিশ শোষণতন্ত্র সংরক্ষণের স্তম্ভ স্বরূপ হয়ে আছে। এদের কাছ থেকে সর্ব্ববিধ সাহায্য পেয়ে থাকে বলেই ভূম্যধিকারিত্বকে শোষণতন্ত্র আজো বাঁচিয়ে রেখেছে। তা না হলে এ প্রথাকে রক্ষা করার কোনো প্রয়োজন বৃটিশ শোষণতন্ত্রের ছিলনা। জমীদারের মধ্যবর্ত্তিতায় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব পেয়ে থাকে জমীদার মাঝে না থাকলে তার চেয়ে অনেক বেশী পেতে পারত। বাংলা দেশে ভূমিকরের পরিমাণ এষ্টিমেট করা হয়েছে এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড, অথচ গবর্ণমেণ্টের এষ্টিমেটের পরিমাণ ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র। এ সত্ত্বেও যে শোষণতান্ত্রিক শাসন ভূম্যধিকারিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার কারণ এই যে ভূম্যধিকারিগণ শোষণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে রাখবার জন্যে সর্ব্ববিধ চেষ্টা করছে। কাজেই আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যদি আমরা জমীদারী প্রথাকে ধ্বংস করার চেষ্টা না করি তা হলে বুঝতে হবে যে ইম্পিরিয়েলিজমের হাত থেকেও আমরা মুক্ত হতে চাইনে। ইম্পিরিয়েলিজমের বিরুদ্ধে বলা আর ভূম্যধিকারিত্বের বিরুদ্ধে কিছু না বলার মত ধাপ্পা বাজী আর কিছুই হতে পারে না। কারণ দুটো প্রথার মধ্যে যখন যোগ রয়েছে তখন একটিকে সমর্থন করতে যাওয়ার মানেই হচ্ছে দুটোকেই সমর্থন করা।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অত্যন্ত বেশী মাত্রায় জমীদার-গণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আছে। কংগ্রেস নেতৃগণের অধিকাংশই জমীদার। গৌহাটি কংগ্রেসে নেতৃগণ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত জমীদারের পক্ষ সমর্থন করেছেন তাতে বোঝা যায় যে কংগ্রেস আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে জমীদারের দ্বারা চালিত না হলেও জমীদারেরই জন্যে চালিত হয়ে থাকে।

জমীদার সম্প্রদায় নিতান্তই পরাশ্রিত সম্প্রদায়। কৃষকদের পরিশ্রমে ভাগ বসাবার কোনো অধিকারই তাদের নেই। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে কৃষক সম্প্রদায়কে অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাতে হচ্ছে, আর বে-রোজগারের কড়ির দ্বারা জমীদার ভোগে-বিলাসে ডুবে আছে। আমাদের সমাজ-দেহের এ পরগাছাগুলোকে একান্তই তুলে ফেলা চাই। তা না হলে সমাজ কখনো মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে না।

দেশের নানা জায়গায় জমীদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আজকাল হচ্ছে বটে, কিন্তু, এ আন্দোলন কৃষক আন্দোলন মোটেই নয়। অধিকাংশ স্থলেই তালুকদার ও জোতদারগণ এ আন্দোলন চালাচ্ছে। তারা জমীদারের অধিকার খর্ব্ব করে নিজেদের অধিকার বাড়াতে চায়। কৃষকদের ভালো হোক, কৃষকরা তাদের শ্রমের মূল্যটা বুঝে নিক, জমীদারের বিরুদ্ধ আন্দোলনকারীরা তা মোটেই চায়না। এ সব আন্দোলন কোথাও কৃষক আন্দোলন নামে পরিচিতও নয়। প্রজা আন্দোলন বা রায়ত আন্দোলন নামেই এ সব পরিচিত। প্রজা বা রায়ত যে হবে তাকে যে কৃষকও হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। জমীদারের নীচে যাদের স্বত্ব রয়েছে তাদেরকে প্রজা, রায়ত, জোতদার ও তালুকদার প্রভৃতি সবই বলা যেতে পারে। সত্যকারের কৃষকের সহিত যে জমীদারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ একেবারেই নেই এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না, কিন্তু, বেশীর ভাগ জায়গায় কৃষকদিগকে বোঝা পাড়া করতে হয় তালুকদার ও জোতদার প্রভৃতির সাথে। এ জোতদার ও তালুকদারগণের নিকট কৃষকের ভূমি কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। তারা নানা ভাবে কৃষকদিগকে শোষণ করে থাকে। অনেক জায়গায় তাদের আয় বড় বড় জমীদারের আয়েরই সমান। জমীদারের বিরুদ্ধ আন্দোলন করতে যেয়ে আমরা যে জোতদার ও তালুকদার প্রভৃতির শোষণকে সমর্থন করব, তা কিছুতেই হতে পারে না। বে-রোজগারের মাল জমীদাররা যেমন ভোগ করে থাকে। ঠিক তেমনি ভোগ করে থাকে এ শ্রেণীর জোতদার ও তালুকদারগণ। জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ বলতে আমরা জমীদারের জমীদারীকে যেমন মনে করেছি, ঠিক তেমন জোতদার ও তালুকদারের ভূমির কেন্দ্রীভূতকরণকেও মনে করেছি।

সরকার ও কৃষকের মধ্যে কোনো মধ্য স্বত্ববান থাকবে না। আমরা চাই ভূমি সোজাসুজি কৃষককেই বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। ভূমির মালিক হবে একমাত্র কৃষক, আর কেউ নয়।

যে সকল প্রথা বহুকাল থেকে চলে এসেছে সে সকল যে চিরকালই চলবে তার কোনো মানে নেই। কৃষকগণ, আমাদের সকলের খাদ্য-দ্রব্যের উৎপাদকগণ, নানাদিক থেকে নানাভাবে শোষিত হয়ে একেবারে সারশূন্য হয়ে পড়েছে। ভূমি যাদের কবলে রয়েছে তারা যে শুধু অতিরিক্ত কর ও নজর ইত্যাদি আদায় করে কৃষকদের শোষণ করে থাকে তা নয়, কৃষকদের নিকটে সুদের ওপরে টাকা লগ্নিও অধিকাংশ জায়গায় তারাই করে থাকে। এ সকল অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্যে দেশের সর্ব্বত্র কৃষকসঙ্ঘ সমূহ স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রজা আন্দোলন ও রায়ত আন্দোলন প্রভৃতি সত্যকারের কৃষক আন্দোলন নয়। সত্যকারের কৃষক আন্দোলন কৃষকরাই চালাবে, যারা কৃষকদের শোষণ করে থাকে তারা নয়।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের তরফ থেকে "গ্রামে ফিরে যাওয়া" ও "গ্রামের পুনর্গঠন করা" প্রভৃতি কথা উঠেছে। কিন্তু, এ সবের দ্বারা কৃষকদের মূল অভিযোগগুলোর কোনো প্রতিকার তাঁরা করতে এতটুকুও চেষ্টা করেন নি। ভূমির বহুধা বিভক্ত করণ ও তাতে কৃষকের সংখ্যাধিক্য, উৎপাদনের সেই পুরাতন প্রথা, ঋণ এবং ট্যাক্স ও করভার এ সবই হচ্ছে কৃষকদের দারিদ্র্যের কারণ। "গ্রামে ফিরে যাওয়া" ও "গ্রামের

পুনর্গঠন"কারীর দল এ সবের প্রতিকার কিসে হতে পারে সে দিকে লক্ষ্যও করে দেখেন নি। কল কব্জার প্রতিষ্ঠা হয়ে যখন হস্ত শিল্প একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন এই হিতৈষীর দল চান হস্তশিল্পির প্রবর্ত্তন করতে। যে পঞ্চায়েতি প্রথা অকেজো হয়ে আপনা হতে লুপ্ত হয়ে গেছে এরা চান সে প্রথাকে ফিরিয়ে আনতে। অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা অতিরিক্ত মাত্রায় শোষিত হয়ে শ্রমের পূর্ণ মূল্য পাওয়া যখন কৃষকদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে তখন এরা তাঁদের দারিদ্র্য দূর করার জন্যে ব্যবস্থা করছেন কিনা চরকা আর খদ্দরের, যার কোনো অর্থনীতিক ভিত্তিই নেই! মোট কথা, যে সময়ে বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের পূর্ণ সুবিধা কৃষকগণ যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন সে সময়ে কৃষকদের এ হিতৈষী বন্ধুগণ চান তাদেরকে আরো পাঁচশ' বছর পেছনে ঠেলে দিতে।

কৃষকদের মধ্যে সমস্বার্থ সংযোগ ও ঐক্য স্থাপনের জন্যে কৃষকসঙ্ঘ সমূহ গড়ে তুলতেই হবে। নিম্ন মধ্যশ্রেণীর দরিদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাঁরা গ্রামে ফিরে যেতে চান তাঁদেরকে এ জন্যই যেতে হবে। কিন্তু দরবার শরীর নিয়ে কৃষক হিতৈষী সেজে গ্রামে কৃষক সংগঠন করার জন্যে তাঁদের গেলে চলবে না। তাঁরা যদি সত্যই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সৈন্য হন তাঁদেরকে সে সংগ্রামেরই প্রয়োজনে কৃষকসঙ্ঘ সমূহ গঠন করতে হবে। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে, স্বাধীনতা লাভের জন্যে কৃষক সংগঠন করে তাদেরকে তাদের দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে সচেতন করা একান্তই প্রয়োজন। গ্রামে যেয়ে কৃষকদের দুটো হিত কথা শুনিয়ে যাঁরা কৃষকদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করবেন মনে করেন তাঁদের গ্রামে না যাওয়াই ভালো।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিক মুক্তির জন্যে অনেক শোষণ প্রথার যেমন উচ্ছেদ সাধন করা উচিত তেমনি উচিত সকল প্রকার জমীদারী প্রথারও উচ্ছেদ সাধন করা। কৃষকসঙ্ঘ সমূহ গঠন করার সময় একথাই সকলের আগে মনে করে নিতে হবে। "ভূমির মালিক কৃষক" একথাই হওয়া উচিত আমাদের সংগ্রামের ধ্বনি।

ভারতের কৃষকগণ তাদের মুক্তি সমরে জয়যুক্ত হোক!

আর যারা বে-রোজগারের কড়ি ভোগ করে থাকে তারা নিপতিত হোক!!

———

বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি

—*—

সমালোচনা: "গণবাণী"র জন্যে লিখিত

———

[লেখক—জনৈক লেবর রিসার্চস্কলার]

—*—

(**মডার্ণ ইণ্ডিয়া**—আর, পাম দত্ত প্রণীত, প্রকাশক সানশাইন পাবলিশিং হাউস্, বোম্বে। **দি ফিউচার অব্ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স্** এম, এন, রায় প্রণীত, প্রকাশক আর, বিশপ, লণ্ডন। দু'টি পুস্তকই এস, গোবিন্দ এণ্ড কোম্পানী, সাণ্ডহার্ষ্ট রোড, বোম্বে, ঠিকানায় প্রাপ্তব্য)

এ দু'টি ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ত্তমান সময়কার ভারতের এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থকারেরই লেখক ও মার্ক্সের অনুসরণকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। বর্ত্তমান সোস্যালিজমের বিচারাস্ত্র প্রয়োগ করে তাঁরা এ অপরিচিত বিষয়ের যেরূপ আলোচনা করেছেন তার ফল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মূল্যবান হয়েছে। সম্পাদ্য বিষয়ের দিক থেকে মিষ্টার দত্তের পুস্তকের আলোচনা অধিকতর ব্যাপক হয়েছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে মৌলিক অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন সমূহ ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে সে সবের কতটা উন্নতি সম্ভবপর হতে পারে তারি বিবৃতি তিনি এ পুস্তকে করেছেন। মিষ্টার রায়ের পুস্তক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও সে বিষয়ের আলোচনা তিনি শৃঙ্খলার সহিত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে করেছেন। তাঁর পুস্তকের প্রথম ভাগে তিনি আধুনিক ঘটনা সমূহের অর্থনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা প্রধানতঃ ভারতীয় ও বৃটিশ ধনিকগণের সম্বন্ধের দিক থেকে করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে স্বরাজ পার্টির রাষ্ট্রনীতি ও উন্নতির দোষগুণের অত্যন্ত সুন্দর এক বিশ্লেষণ। এ বিশ্লেষণও তিনি প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকেই করেছেন। এ সকল অবস্থার বিচার করে সংগ্রামের ভবিষ্যদ্গতি কোন্দিকে অবশ্যই চালিত হওয়া উচিত তাই তিনি বলেছেন তাঁর তৃতীয় ভাগে। একটি হৃদয়গ্রাহী জিনিস দু'টি পুস্তকেই লক্ষ্য করার আছে,—যদিও বিষয়টি কতকটা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে—তথাপি দু'জন গ্রন্থকারেরই উপসংহারে খুব ঘনিষ্ট ঐক্য রয়েছে।

মিষ্টার দত্ত একটা সংক্ষিপ্ত "সমস্যার বিবৃতি" দিয়ে তাঁর বই আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেছেন:—ভারতের জাতীয় আন্দোলন এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যাতে এর অবস্থা, উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালীর একটা নূতন পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। গত ক'বছরে প্রচলিত আন্দোলন একটা পূর্ণ প্রতিরোধের পথে এসে দাঁড়িয়েছে বলে অগ্রসর হওয়ার জন্যে একটা নূতন পথ খুঁজে বের করা দরকার। কর্ম্মভূমির যে নূতন পরিমাপ হওয়া আবশ্যক তা এরি জন্যে।"

তারপরে তার প্রশস্ত উপসংহারের বিবৃতি এইরূপ:—

"স্বাধীনতার জন্যে যে জাতীয় সংগ্রাম,—তাকে এখন নবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করাতে হবে। ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলেছে তা ব্যাপকভাবে জনগণের সংগ্রাম হওয়া উচিত। জনগণকে তাদের আপন স্বার্থ ও বন্ধন-মুক্তি সম্বন্ধে সচেতন করাই আমাদের সম্মুখে এখন একমাত্র কাজ। মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম করা হয় জাতীয় সংগ্রাম তার একটা স্তর মাত্র। আমাদের যুদ্ধ সকল প্রকার শোষণেরই বিরুদ্ধে,—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, বর্ণগত বা ধর্ম্মগত যে প্রকারেরই তা হোক্ না কেন। এ সংগ্রাম যেমনই বাড়তে থাকবে তেমনি ভারতের উৎপন্নকারী প্রোলেটারিয়েট (যারা শোষণের দ্বারা সম্পত্তিহীন হয়ে আপনাদিগের পরিশ্রম বিক্রী করতে বাধ্য হয় তাদের) ও কৃষকগণের নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের চেহেরা আমাদের সম্মুখে ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্কার হয়ে উঠবে। বর্ত্তমানে সংগ্রামের যে স্তরে আমরা পৌঁছিছি তা হচ্ছে শোষণবাদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে। কিন্তু, জাতীয় সংগ্রামের ভিতরে আগে থেকেই বর্দ্ধমান সামাজিক সংগ্রামের জীবাণু রয়েছে। এরি সাথে তুলনা করেই জাতীয় সংগ্রামকে সত্যকার ভাবে বোঝা যেতে পারে। এ সত্যকে বুঝে

নিতে অক্ষমকার্য্য হওয়া, যে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজিগণ (বুর্জ্জোয়াজি শব্দের মানে অন্যত্র দেখুন) ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে তাদেরই ভিত্তির ওপরে জাতীয় আন্দোলনকে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করা ও প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক কার্য্যপ্রণালীর সহিত উন্নত রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকে একীভূত করার চেষ্টা করা—এ সবই হচ্ছে ভারতীয় ন্যাশনালিজমের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা।"

তারপরে ভারতের সহিত বৃটিশ সম্বন্ধের ইতিহাসের অতি দক্ষতার সহিত সমালোচনা করে তিনি তাঁর এই যুক্তিগুলোকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। এ ইতিহাসের তিনটে যুগকে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে ধরে নিচ্ছেন। এর প্রথম যুগ ছিল নিছক লুণ্ঠনের যুগ। এ সময়ে বৃটিশ ভারতের শাসন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল। ভারতে অন্তর্বিভেদ সৃষ্টি করা ও শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করাই ছিল কোম্পানীর স্বার্থ। এর দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে বিনিময়ের যুগ। এ যুগে ভারতবর্ষ ছিল প্রধানতঃ বৃটিশ নির্ম্মাণ-শিল্পের জন্য কাঁচা মাল যোগাবার উপায় ও বাজার। এ যুগেই ভারতবর্ষ সমগ্র বৃটিশ ধনিকবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং ভারতের শাসনভার সরকারী ভাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আপন হাতে নিয়েছিল। এ সকল অবস্থা ভারতে শৃঙ্খলা আনয়ন করেছিল এবং বাণিজ্যের সুবিধের জন্যে চলাচলের বন্দোবস্ত ইত্যাদি করা হয়েছিল। এ যুগের শেষ মোটামুটি ভাবে যুদ্ধের সাথে সাথে হয়েছে। তারপরে তৃতীয় যুগের আরম্ভ। এ যুগের এখন বর্দ্ধনাবস্থা। বৃটেনে শৈল্পিক উন্নতি যা হবার তা প্রায় শেষ হওয়ায় বৃটেনকে বাধ্য হতে হয়েছে তাদের মূলধন অন্যত্র, বিশেষ করে উপনিবেশ সমূহে খাটাবার। মূলধন খাটাবার মানে হচ্ছে ভারতে প্রচুর পরিমাণে কল-কব্জার প্রবর্ত্তন করা, ভারতের নূতন শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করা ও ভারতের ধনিক শ্রেণীর সহিত বন্ধুত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করা। "এ নূতন স্তরের রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশ হচ্ছে দ্বৈতশাসন।"

"ভারতে ইম্পিরিয়েলিজম (শোষণবাদ)—এর পুরাতন ভিত্তি" নামক অধ্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসনের ফল কি দাঁড়িয়েছে তিনি তার একটা মোটামুটি হিসাব দিয়েছেন। বর্ত্তমানে আমরা যে ভয়াবহ উত্তরাধিকার উপভোগ করছি তার মূল কোথায় তিনি তাও এ হিসাবে দেখিয়েছেন। অখণ্ডনীয় সরকারী অঙ্ক ও রিপোর্টের ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন যে কি করে সরকারী নীতির দ্বারা লোকের ওপরে ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য আনয়ন করা হয়েছে। এ নীতি হচ্ছে—অত্যধিক সংখ্যক অধিবাসীকে ক্রমান্বয়ে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করতে বাধ্য করা, ভূমিকে অত্যন্ত হাস্যাস্পদরূপে বিভক্ত করা, পুরাতন শিল্পের ধ্বংস সাধন করা, এবং আধুনিক প্রক্রিয়ায় শিল্পের উন্নতি হওয়াকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং কৃত্রিম উপায়ে বাধা দেওয়া, অথচ এরি দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবপর ছিল। "ভারতে লোক সংখ্যা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়েছে। (বৃটিশ শাসনের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যে) এই যে পুরাতন সরকারী যুক্তি আছে—এ যুক্তিকে তিনি খুব সতর্কতার সহিত খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন,—গত শতাব্দীতে ভারতে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি এক ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপের আর সকল দেশের চেয়ে কম হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে—বৃটিশ শৈল্পিক ধনিকবাদের হিতের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাধা দেওয়া।

"তাই বৃটিশ শাসনে ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ হচ্ছে ভারতকে ধনিকবাদের পদানত করে রাখা। কৃষি উপনিবেশ ভারতবর্ষকে বৃটেনের কারখানা ওয়ালারাই পদানত করেছে। এইটে ছিল শোষণবাদের পুরাতন প্রণালী। যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এ প্রণালীতেই কাজ চলেছিল। বাইরে থেকে দেখলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রনৈতিক একীকরণ—"শান্তি" ও "শৃঙ্খলা" স্থাপন করেছেন, জগতের জাতি সমূহকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ভারতের "অনুন্নত" সভ্যতার অনুপাতে তাঁরা "উন্নতি"র পরিরক্ষক। প্রকৃত পক্ষে এ প্রণালীটি ছিল ক্রমাগত অত্যধিক শোষণের, অর্থ-নৈতিক উন্নতিতে বাধা দেওয়ার ও তার ফলে বর্দ্ধমান অনশন ও ক্লেশের, অতএব কঠোর হতে কঠোরতর অত্যাচারেরও।"

এখন এ চিত্রের পরিবর্ত্তন হয়েছে। ভারতবর্ষ এখন কলকারখানার দেশে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু, এখানেও মিষ্টার দত্তের দেখাতে কোনো অসুবিধা হয় নি যে নীতির এ পরিবর্ত্তন ভারতের কোনো প্রয়োজনে হয়নি। এ পরিবর্ত্তন বৃটিশের উন্নতির অপরিহার্য্য পরিণাম। ভারতের সমস্যার সমাধানে এ পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র সাহায্য করেনি; কেননা, এ শৈল্পিক উন্নতি খুব বেশীর ভাগ বৃটিশ রক্ষণাধীনে ও বৃটিশ মূলধনে হয়েছে, আর, এর লাভের অংশ পাচ্ছে বৃটিশ অংশীদারগণ।

এ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ ভূম্যধিকারিগণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃটেন ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সাহিতও সহযোগ আরম্ভ করেছে এবং যে কোনো প্রকারে অতীব সফলতার সহিত তাদিগকে বৃটিশ শাসন ("সাম্রাজ্যের ভিতরে" "ঔপনিবেশিক স্থিতি") গ্রহণে রাজী করাতে সমর্থ হয়েছে। এরূপ অধিকার ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজিগণ গ্রহণ করতে যেরূপ রাজি হবে ঠিক বৃটিশ তা মঞ্জুর করতেও তেমনি রাজি হবে। কিন্তু, এটা সত্য যে এ অধিকার পেয়ে ভারতের জনগণের বা আর কাহারো কোন উপকার হবে না। আগে থেকে যে ব্যাপার চলে এসেছে তারি একটা আকৃতিগত বিকাশ এর দ্বারা হবে মাত্র। এ বিকাশ হচ্ছে—ভারতের জনগণের শোষণে বৃটিশ ও ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজিগণের পরস্পর ভাগী হওয়া।

এ কারণে গ্রন্থকার যুক্তি প্রদর্শন করছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই হওয়া উচিত—শোষণবাদের কবল হতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা, আর এ পূর্ণ স্বাধীনতা হবে পূর্ণ সামাজিক মুক্তির পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া।

এ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থকার "জাতীয় আন্দোলন এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকগণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ" বিষয়ে যে সুন্দর অধ্যায়গুলি লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে তিনি কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টির নেতৃত্বের মূলতঃ ধনিকপ্রকৃতি নির্ভুত ভাবে দেখিয়েছেন, আরো তিনি বিবৃত করেছেন দু'পক্ষেরই অসাফল্যের কথা। ভারতের ধনিক শ্রেণী স্বরাজের নামে ভয় পেয়ে থাকে—তারা জনগণের নামে ভীত হয়ে ওঠে, অথচ জনগণই কেবল মাত্র স্বরাজ লাভ করতে পারে। কাজেই, জনগণের নেতৃত্ব পেয়ে স্বরাজ অন্দোলনকে বিপথে চালিত করা ছাড়া তারা আর কিছুই করতে পারে না।

তারপরে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকগণ ও সমাজের অন্যান্য শোষিত সম্প্রদায়ের মূল আবশ্যকতা কি তারি প্রকৃতি মিষ্টার দত্ত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এ আবশ্যক দাবীগুলোর স্থান প্রোগ্রামের সম্মুখেই প্রকৃত স্বরাজ আন্দোলনকে অবশ্যই দিতে হবে। কেননা, এ দাবীগুলো যে স্বরাজ পূর্ণ করবে না সে স্বরাজের কোনো প্রয়োজনই নেই। কাজেই, প্রকৃত জনগণের দল গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সমাজের এমন নব সম্প্রদায়ের লোকেরা, যেমন শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকগণ ও পেটিবুর্জ্জোয়াজিগণ—এ দলে যোগদান করবেন যাঁরা স্বরাজের জন্যে সংগ্রাম করতে সমর্থ।

আমাদের সমালোচনার এ-জায়গাতেই আমরা মিঃ রায়ের পুস্তকের আলোচনা করতে পারি। ভারতের প্রতি বৃটিশ শোষণবাদের নবনীতির অধিকতর বিশদ আলোচনা, এবং নেতৃত্ব ও প্রোগ্রামের মূলতঃ ধনিক প্রকৃতি হওয়া বশতঃ স্বরাজপার্টির ক্রমপতনের আলোচনা করার পরে তিনি ভবিষ্য সংগ্রামের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে গিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন শোষণবাদের বিরুদ্ধ সংগ্রাম কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকেরা চালাতে পারে। তারা হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, কারিগর, অল্পশিক্ষিত ও পেটিবুর্জ্জোয়াজিগণ। আর যারা এ সংগ্রাম চালাতে পারে না তারা হচ্ছে—ধনিক, বড় জমীদার ও স্বদেশী আমলাতন্ত্র, প্রভৃতি।

সর্ব্বশ্রেণীর লোক নিয়ে একটী জনগণের দল গঠন করার স্পষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এ দল ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ঐক্যবদ্ধ করবে যারা শোষণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে পারবে। এ দল সোশ্যালিষ্ট দল হবে না। তবে শ্রমিকগণ এ দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করবে। সংগঠন করার জন্যে ও প্রশস্তর মতাবলম্বী জাতীয় আন্দোলনের সহযোগে বিশেষ কাজগুলি চালাবার জন্যে শ্রমিকশ্রেণী আপনাদের সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করে নেবে।

তার পরে, ভারতে লেবর পার্টি গঠনের যে অনেক প্রচেষ্টা চলেছে তিনি তারি আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বর্ত্তমান অবস্থায় লেবর পার্টি গঠন করার কোনো স্থানই নেই, আর তার কোনো কাজও নেই। লেবর পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা বৃটিশ শ্রমিক-শোষণবাদীগণই (Labour Imperialists) করেছে। তাদের ইচ্ছে ভারতীয় শ্রমিকগণকে সত্যকার রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্য হতে বিপথে চালিত করা। পক্ষান্তরে, যেমন মিষ্টার দত্ত বলেছেন, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় আন্দোলনের অবশ্য কর্ত্তব্য বৃটিশ শ্রমিকের নব গঠনশীল গরম দলের (Newly forming "left wing") সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা। এ গরম দল এখন বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধিদল। এজন্যে অবশ্যাম্ভাবীরূপ তারা ভারতের জাতীয় মুক্তির সমর্থক।

মিষ্টার দত্ত কিংবা মিষ্টার রায়ের দু'জনার একজনও বলেন নি যে কিভাবে নূতন জনগণের দল গঠিত হবে, অর্থাৎ এ দল কি বর্ত্তমান কংগ্রেস সংগঠনের সহিত এক হয়ে নূতন প্রোগ্রাম ও নূতন নেতৃত্বে নিয়ে গড়ে উঠ্‌বে, না কংগ্রেসের গঠন বদ্‌লাবার ও কংগ্রেসকে অধিকার করবার জন্যে কংগ্রেসের ভিতরে পূর্ণগঠিত দলরূপে বেড়ে উঠ্‌বে। আমাদের উপস্থিত কাজ এ সমস্যা নিয়ে ঝগড়া করা নয়। পারিপার্শ্বিক ঘনটাবলী আমাদের জন্যে এ সমস্যার সমাধান করে দেবে। আমাদের কাজ হচ্ছে শোষণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্যে শ্রমিক ও কৃষকগণকে সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করা।

আমাদের মতে যে কোন প্রকৃত অভিপ্রায়যুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের এ দু'খানা বই পড়া একান্তই উচিত। এটা দুঃখের বিষয় যে বই দু'খানা কেবল মাত্র ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়েছে। এ ক'বছরে এ দু'খানা বই এর ন্যায় কোন বই প্রকাশিত হয় নি। মিষ্টার দত্ত তাঁর যুক্তির গভীরত্ব ও স্পষ্টত্বর দ্বারা, আর মিষ্টার রায় তাঁর ব্যক্তি ও নীতির স্বরূপ নির্ণয়ের বিশুদ্ধতার দ্বারা যেমনি আমাদের ওদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করেছেন তেমনি আমাদের হর্ষও উৎপাদন করেছেন। এ সকল রচনা প্রণালী ও বলার কায়দার প্রশ্ন বাদ দিয়েও এ সত্য কথাটি মনে রাখতে হবে যে দু'খানা পুস্তকই বিভিন্ন দিক থেকে বর্ত্তমান ভারতীয় অবস্থা সমূহের মূলতঃ বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছে, আর দু'খানা পুস্তকই ভাবিষ্যতের বাস্তবিক অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক। জাতীয় আন্দোলন হয় তো এ পথ-প্রদর্শন মেনে পথ চলবে, নতুবা অকৃতকার্য্য হবে।

(ইংরেজী হতে অনুবাদিত)

—•—

বুর্জ্জোয়াজি (Bourgeoisie)—আধুনিক ধনিকগণ, সামাজিক উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকগণ এবং ভাড়াটে মজুরদের নিয়োগকারীগণ। এ মজুররা উৎপাদনের উপায়ের মালিক না হওয়ায় বেঁচে থাকার জন্যে শ্রমশক্তিকে বিক্রী করতে বাধ্য হয়। এদেরকে প্রোলেটারিয়েট (Proletariat) বলা হয়।

পেটি বুর্জ্জোয়াজি (Petty bourgeoisie)—ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর, কেরাণী, ছাত্র ও অল্প শিক্ষিত সম্প্রদায় ইত্যাদি।

———

শোষণবাদ-বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতাবাদী সঙ্ঘ

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ই হতে ১৫ই পর্য্যন্ত (বেল্‌জিয়মের রাজধানী) ব্রুসেল্‌স শহরে শোষণবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতাবাদী সঙ্ঘের (The League against Imperialism and for National Independence এর) ভিত্তি-স্থাপন কংগ্রেস বসেছিল। ৩৭টি দেশের বিভিন্ন সংগঠন সমূহের ১৭৫ জন প্রতিনিধি এ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। প্রাচ্য দেশ সমূহের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল এক শতেরও বেশী এবং একা চীন থেকেই এসেছিলেন ২১ জন। যে সকল সংগঠন পরিচয় পত্রের দ্বারা কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল সে সবের মধ্যে—চীনের জাতীয় বিপ্লব সেনাদল, চীনের ট্রেড্‌স ইউনিয়ন কংগ্রেস, কুমিণ্টাংএর কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি, অল্-ইণ্ডিয়া ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, ইজিপ্টের জাতীয়দল, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেড্‌স ইউনিয়ন কংগ্রেস, পারস্যের বিপ্লব মূলক গণতান্ত্রিক দল, সিরিয়ার বিপ্লব দল, আফ্রিকার নিগ্রো-জাতির সংরক্ষক কমিটি, ইণ্ডোনেশিয়ার (যাবা প্রভৃতি) জাতীয়

আন্দোলন, আমেরিকার সিবিল লিবার্টিজ্ ইউনিয়ন প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কংগ্রেসের কাজ যখন শুরু হয় তখন অনেকগুলি আবশ্যক ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা তাতে প্রদান করা হয়। এ সকল বক্তৃতা ঔপনিবেশিক ও অর্দ্ধ-ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের নিপীড়িত জনগণের অবস্থা সম্বন্ধে ঐ সকল দেশের প্রতিনিধিগণই প্রদান করেছিলেন, অবশ্য তাঁদের প্রত্যেকে আপন আপন আপন দেশের কথাই বলেছিলেন। শোষণবাদের বিরুদ্ধে ও জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যে জগৎ জোড়া সংগ্রাম চালাতে হবে তারি ব্যবহারিক দিক্ সমূহ এ সকল বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ছিল।

সম্মিলনের কার্য্যক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্থান পেয়েছিল :—

১। প্রারম্ভিক অভিভাষণ।

২। শোষণবাদ (ইম্পিরিয়েলিজম) এবং উপনিবেশ ও অর্দ্ধ-উপনিবেশ সমূহে তার কুফল,

৩। শোষণবাদ ও যুদ্ধের ভয়।

৪। নিপীড়িত দেশ সমূহের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ও শোষণকারী দেশ সমূহের শ্রমিক ও শোষণবাদ বিরোধী আন্দোলনের পরস্পর সহযোগ।

৫। উপনিবেশই হোক বা শোষণকারী দেশই হোক্, সকল দেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও শ্রমিক সংগ্রামকে সমভাবে চালানো।

৬। একটি স্থায়ী বিশ্ব বিস্তৃত সঙ্ঘ স্থাপন করা এবং তার সাথে শোষণবাদ ও ঔপনিবেশিক নিপীড়নের বিরোধী শক্তি সমূহকে গ্রথিত করা।

পৃথিবীর ব্যাপার সম্বন্ধে কংগ্রেস এক সুদীর্ঘ ম্যানিফেষ্টো বা ঘোষণা পত্র প্রচার করেছে এবং তাতে দেখানো হয়েছে যে শোষণবাদের বিরুদ্ধে এক সঙ্ঘ গঠন করা অতীব আবশ্যক। নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা করে এ ম্যানিফেষ্টোর সমাপ্তি করা হয়েছে :—

এই লীগের ভিত্তি স্থাপনের বিষয় আজ আমরা সকল্ নিপীড়িত জাতি ও প্রভুত্বকারী দেশ সমূহের নিপীড়িত শ্রেণী সমূহের নিকটে ঘোষণা করছি। যাঁরা অত্যাচারের দ্বারা জীবন ধারণ করেন না, যাঁরা আধুনিক দাসত্বকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকেন, যাঁরা নিজেদের ও নিজেদের মত আর সকলের মুক্তি কামনা করেন, আমরা তাঁদের নিকটে নিবেদন করছি যে তাঁরা আমাদের অন্তর্ভুক্ত হউন্, আর আমাদের সাহায্য করুন।

ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদ সম্বন্ধে প্রস্তাব

এ কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য প্রস্তাবে ইম্পিরিয়েলিজম সম্বন্ধে সাধারণ নীতির একটা ব্যাখ্যান দেওয়া হয়েছে। আমরা নিয়ে এ প্রস্তাবের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিলুম :—

ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও শোষণবাদের বিরুদ্ধবাদী এই কংগ্রেসের মত এই যে ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের অধিবাসিগণকে দাসত্বে অবনমিত করা, জোর করে তাদেরকে দিয়ে পরিশ্রম করানো এবং তাদের উচ্ছেদ করাই ধনিকবাদের বৈদেশিক নীতির উদ্দেশ্য। ধনিকবাদের প্রকৃতিই এইরূপ।

ইম্পিরিয়েলিজম এমন কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয় যা থেকে ধনিকবাদ ইচ্ছে করলেই মুক্ত হতে পারে। এ হচ্ছে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের যৌক্তিক ফল। কিন্তু, অর্থের দ্বারা সৃষ্ট ধনিকবাদ (Finance Capitalism) যা ধনিকবাদের আপন দেশ সমূহে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে যখনই ক্ষমতাবান হয়, তখন একদিকে দেশীয় শ্রমিকগণকে শোষণ করে সোজাসুজি লাভ করে এবং অন্যদিকে অন্যত্র কাঁচামাল উৎপন্নের উপায় সমূহের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে খুব বেশী লাভবান হচ্ছে।

শোষণকারী দেশ সমূহের Imperialist Countries) এক বিশাল শ্রমিক সঙ্ঘ অতিরিক্ত লাভের ভাগী হয় না,—কেবলমাত্র তার একটা সামান্য অংশ ধনিকগণ শ্রমিকদের অতি অল্প সংখ্যক লোককে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করার জন্যে দিয়ে থাকে ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের সীমাহীন লুণ্ঠনের দ্বারা ধনিকদের মাতৃভূমি সমূহের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ভীষণরূপে প্রতিহত হয়ে থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে দু'টো প্রধান রকমের শোষিত দেশের সম্মুখীন হতে হয় :—

(১) পরিপূর্ণরূপে পদানত দেশ সমূহ যা ধনিকগণের মাতৃদেশের দ্বারা ঔপনিবেশিক আমলা তন্ত্রের মধ্যবর্ত্তিতায় শাসিত হয়ে থাকে।

(২) নামে মাত্র স্বাধীন দেশ সমূহ যা কার্য্যতঃ জোর করে করানো সন্ধির দ্বারা শোষণ বাদীদের অধীন হয়ে পড়েছে এবং যা সমভাবে শোষিত হচ্ছে।

সর্ব্ববিধ প্রকারের ঔপনিবেশিক দমন ও শোষণের প্রতিবাদ করে এ কংগ্রেস দাবী করছে যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জাতীয় অধিকার, যা তথাকথিত লীগ অব নেশন্স সাধুতার (?) সহিত প্রচার করে থাকে, সমস্ত ঔপনিবেশিক জাতির পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে লাভ করা উচিত এবং যে সকল সন্ধি সমাধিকারের ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয় সে গুলোর রহিত হওয়া উচিত।

এ দাবীকে কার্য্যে পরিণত করার জন্যে ইম্পিরিয়েলিষ্ট ষ্টেট্ সমূহের নূতন ঔপনিবেশিক অধিকার বিস্তার করাকে কংগ্রেস না-মঞ্জুর করছে। যে সকল ষ্টেটের কোনো উপনিবেশ নেই বা যারা তাদের উপনিবেশ সমূহ হারিয়েছে তাদেরকে নূতন ঔপনিবেশিক অধিকার দেওয়াও কংগ্রেস বাতিল করেছে। কোনো নাম মাত্র স্বাধীন দেশে বৈদেশিক ষ্টেটের মূলধন খাটানো হচ্ছে বলে তার থেকে সে দেশের ওপরে কোনো বৈদেশিক ষ্টেটের ধনিকের কোনো বিশেষ অধিকার হতে পারে না।

বর্দ্ধমান ইউরোপীয় ও আমেরিকার উপনিবেশ-জগতের বিখ্যাত প্রতিনিধিগণ এ দাবীর সমর্থন করেছেন।

সংগ্রামশীল শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র সম্পত্তির অধিকারী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সমসূত্রে গ্রথিত করার জন্যে ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও শোষণবাদের বিরোধী এ কংগ্রেসকে একদিকে যেমন অনুরোধ করা হচ্ছে, ঠিক অন্যদিক থেকে সমাজের এ সকল শাখার মধ্যে ও সমগ্র জগতের শ্রেণীজ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিকদের মধ্যে আরো অধিকতর ব্যাপক ভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করার অনুরোধও করা হচ্ছে।

শ্রমিক সংগঠন সমূহের যে সকল প্রতিনিধি এ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত উপনিবেশবাসীদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ

কিংবা শোষণবাদীগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাত্র করার ভিতরে আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। তাঁরা বলেছেন জনগণের উত্থানের জন্যে আমাদের শক্তি সমূহকে সংহত অবশ্যই করতে হবে। কোনো শোষক ষ্টেট্ যদি কোনো উপনিবেশ বা অধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে তা হলে যে সকল সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ এ প্রস্তাব সমর্থন করেছেন তাঁদের উচিত প্রথমেই এর বিরুদ্ধাচরণ করা ও ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে ট্রান্সপোর্টের অর্থাৎ জাহাজ আদির শ্রমিকগণের। এতে সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী ঐ সকল দেশে নিয়ে যাওয়াতে বাধা দেওয়া হবে যে সকল দেশকে বাধ্য হতে হয়েছে শোষণবাদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে। এ সকল উপায় যদি উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট না হয় তা হলে অধীন জাতি সমূহকে মুক্ত করার জন্যে শ্রমিকগণের উচিত সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে দেওয়া। উপনিবেশ ও অধীন জাতি সমূহের প্রতিনিধিগণ ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা নিজ নিজ দেশে শোষণবাদের বিরুদ্ধ সংগ্রামকে শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ উত্থানে পরিণত করবেন। তাঁরা আরো ঘোষণা করেছেন যে শোষক-শক্তি যদি অস্ত্রের দ্বারা বাধা দিতে আসে তাহলে তারা তাদেরকে আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এতদুভয় দিক্ থেকেই বয়কট করবেন এবং এই করে তাঁরা যে সকল নির্য্যাতিত ভ্রাতৃজাতি আত্মরক্ষার জন্যে সংগ্রামে প্রলিপ্ত হয়েছেন তাদের হয়ে শোষণ-বাদীদের বাধা দিবেন।

এ প্রস্তাব বর্ত্তমান সময়ে চীন সম্বন্ধে খুবই খাটছে। শোষণ-বাদ ও ধনিকদের শত্রু যাঁরা তাঁদেরকে আমরা আহ্বান করছি—

"আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন, আমাদের দাবীকে মূর্ত্তকরে তুলতে সাহায্য করুন।"

এ ছাড়া নিপীড়িত জাতি সমূহের মুক্তির জন্যে আরো প্রস্তাব পাস হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন জাতীয় ও শ্রমিক আন্দোলন একত্রে শোষণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করবে। আরো বলা হয়েছে যে নাম করার মত যে কোনো জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিশ্চিতই রষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, কার্ষণিক (Cultural) ও সৈন্য সংক্রান্ত পূর্ণ-স্বতন্ত্র্য লাভ করা হবে।

লীগের সংগঠন

নিম্নলিখিত বিধান সমূহ লীগের সংগঠনের জন্যে কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছে :—

(১) শোষণবাদের বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক ক্রুসেলস্ কংগ্রেসে সমবেত প্রতিনিধিগণ স্থিরীকৃত করছেন যে শোষণবাদের বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক এক আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ স্থাপন করা হোক।

(২) এ আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের নাম হবে শোষণবাদের বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক লীগ্।

(৩) সমস্ত সংগঠন, সমুস্তদস, শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহ এবং ব্যক্তি-গণ যাঁরা সকল জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে, সকল জাতির স্বাধীনতার জন্যে, সকল শ্রেণী ও সকল মানুষের সমানাধিকারের জন্যে ধনিক শোষণবাদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে একান্ত মনে সংগ্রাম চালাচ্ছেন তাঁরা এই "শোষণবাদের বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক লীগের" অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

(৪) পরবর্ত্তী কংগ্রেসের বৈঠক না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের পরিচালক সঙ্ঘ (Presidium), যা কংগ্রেসের অস্থায়ী কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি রূপে নির্ব্বাচিত হয়েছে, "শোষণবাদের বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক লীগের" জন্য একটা প্রোগ্রাম ও নিয়মাবলী রচনা করবেন। দু'টি মুসাবিদাই নূতন কংগ্রেসের বৈঠক হওয়ার কম পক্ষে ৩ মাস পূর্ব্বে অন্তর্ভুক্ত সংগঠন সমূহকে বিবেচনার জন্যে পাঠাতে হবে।

(৫) অস্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিরূপে গঠিত কংগ্রেস প্রেসিডিয়ামের হাতে শোষণবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক লীগের কার্য্যপরিচালনার ভার থাকবে।

(৬) কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি ৭ জন সদস্যকে নিয়ে একটি শাখা বিভাগ গঠিত করবেন যার ৩ জন সদস্য সেক্রেটরীরূপে কাজ করবেন। ৩ জন সেক্রেটরী ও শাখা বিভাগটি কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির শাসনাধীনে থাকবেন ও প্রত্যেক কংগ্রেসে নির্ব্বাচিত হবেন। বর্ত্তমান সময়ে চীনের ও ভারতের মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্ব অনেক বেশী বলে এবং সকল আন্দোলনের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্বন্ধের গুরুত্বও অনেক বেশী বলে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি স্থিরীকৃত করছেন যে পরবর্ত্তী কংগ্রেস পর্য্যন্ত ৩ জন সেক্রেটরীর ১ জন চীনবাসী, ১ জন ভারতবাসী ও ১ জন বৃটিশ প্রতিনিধি হবেন। শাখা বিভাগের অন্য চারজন সদস্য অন্য দেশ সমূহের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

(৭) শাখা বিভাগ কোথায় স্থাপিত হবে তা শাখা বিভাগই স্থির করবে। তবে যে সকল দেশে জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সংগ্রাম চলেছে সে সকল দেশের নিকটতম স্থান তা হওয়া চাই এবং যে দেশ শাখা বিভাগকে যথা সম্ভব শান্তির সহিত কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেবে সে দেশ তা হওয়া চাই। প্রস্তাব করা হয়েছে যে পরবর্ত্তী হেড কোয়ার্টার প্যারীতে স্থাপন করা হবে।

(৮) বিভিন্ন নেশন ও মানব জাতির ওপরে যত প্রকারের অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য ও আন্দোলন চালাবার ব্যবস্থা করার ভার কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি ও শাখা বিভাগের ওপরে দিচ্ছে।

(৯) বিভিন্ন দেশের শোষণবাদের অত্যাচার সম্বন্ধে শাখা বিভাগ উপাদান সংগ্রহ করবে এবং বক্তৃতা, দৃশ্য ও প্রদর্শনী আদির দ্বারা যারা গতর ও মাথা খাটিয়ে কাজ করে তাদের ইচ্ছা শক্তিকে জাগিয়ে নিপীড়িত মানব সমূহের জাতীয় ও সামাজিক সংগ্রামকে সফল করবে।

(১০) শাখা বিভাগ শোষণ বাদীগণের আন্দোলনের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র সমূহে, বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষ, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইজিপ্টে শাখা বিভাগ শাখা সমূহ স্থাপন করবে। এ সকল শাখাকে হেড কোয়ার্টারসের সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ রাখতে হবে। সে চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরে "শোষণবাদের বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক লীগের" জন্যে শাখাগুলো আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ চালাবে।

(১১) শুরুতে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি ও শাখা বিভাগ লীগের শাখা সমূহ গঠিত হয়ে কাজের ভার না নেওয়া পর্য্যন্ত কাজের জন্যে ব্যক্তিগত সভ্যদের ওপরেই নির্ভর করবে। কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি ও শাখা বিভাগকে ভার দেওয়া হয়েছে যে "শোষণবাদের বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক লীগের" শাখা সমূহ সকল দেশে স্থাপন করার জন্যে তাঁরা যথাবিহীত

উপায় অবলম্বন করবেন। এর উদ্দেশ্য হবে আগে থেকে এ প্রকারের যে সকল সঙ্ঘ রয়েছে, যেমন—"হ্যাণ্ডস্ অফ্ চায়না" কমিটি, "হ্যাণ্ডস্ অফ্ রাসিয়া" "কমিটি," কমিটি ফর সিরিয়া "কমিটি ফর মরোক্কো, ঔপনিবেশিক শোষণের বিরোধী লীগ, শোষণবাদের বিরোধী লীগ সে সকলকে নবগঠিত শোষণবাদের ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক লীগের" সহিত একীভূত করা।

(১২) শোষণবাদের বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক এই লীগের সহিত যে সকল সংগঠন বা সঙ্ঘ একীভূত হবে তাদের কে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে তারা সকল শক্তি দিয়ে লীগকে সমর্থন করবে এবং তাদের মেম্বরের সংখ্যা ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করে বার্ষিক একটা অর্থ সাহায্যে শাখা বিভাগকে তাদের করতে হবে।

(১৩) কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীকে মেম্বরের সংখ্যা বাড়াবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা লীগের নবগঠিত শাখা সমূহের প্রতিনিধিগণকে অথবা যে সকল শ্রমিক সংগঠন বা সঙ্ঘ নূতন লীগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ও ক্রসেল্স কংগ্রেসের মীমাংসা মেনে নিয়েছে তাদের প্রতিনিধিগণকে কো-অপট করেই এ সংখ্যা বাড়াতে পারেন।

(১৪) মুক্তির জন্যে জাতীয় আন্দোলনের পরিচালনা ব্যপদেশে যদি যুদ্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপার পৌঁছয় কিংবা যদি শোষণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট জোর করে জাতীয় মুক্তি লাভের প্রচেষ্টাকে প্রদমিত করে, তা হলে অবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিবেচনা করে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি স্থির করবেন যে ভয়-প্রদর্শিত সংগঠন সমূহকে কতটা কাজের মত সাহায্য করা যায়, আর সহযোগিতার কোন্ প্রণালীই বা অবলম্বন করা যায়। এরূপে বিপদ আসন্ন হলে কার্য্যানির্ব্বাহক কমিটির ক্ষমতা থাকবে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের সহিত ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদের আন্তর্জাতিক আন্দোলন সমূহের সহিত লেখা-লেখি করার। এ লেখা-লেখির উদ্দেশ্য হবে শ্রমিক ও কৃষকগণের সমবায়ে গণ-উত্থানের বন্দোবস্ত করা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন জর্জ্জ ল্যান্সবারী এম,পি, প্রেসিডেণ্ট (গ্রেট বৃটেন); এইচ লিয়াউ (H.Liau) (চীন); জওয়াহিরলাল নেহেরু (ভারতবর্ষ); মোহাম্মদ হাত্তা (ইণ্ডোনেশিয়া অর্থাৎ যাবা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ); ল্যামাইন সেঙ্গোর (নিগ্রোজাতি) ডব্লিউ, মুন্‌ট্‌সেন বার্গ (W, Munzenberg) (জার্ম্মাণী); মার্‌তোঁ (Marteaux) বেল্‌জিয়ম); ইডো ফিমেন্ (হল্যাণ্ড); ম্যানুয়েল উগার্‌তে (ল্যাটিন আমেরিকা); হেন্‌রি বারবিউসে (Henri Barbusse) (ফ্রান্স)। বল্ডার বালডুইন (আমেরিকা) আর, ব্রিজ্‌ম্যান্ (বৃটেন), এবং গিবার্টি (জার্ম্মানি) অতিরিক্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

বৃটিশ, ভারতীয় ও চীনের প্রতিনিধিগণের সমবেত ঘোষণা

সমগ্র কংগ্রেসের দ্বারা বিশেষ দেশ সমূহের (যেমন ভারতবর্ষ, চীন ও ইণ্ডোনেশিয়া প্রভৃতি) জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের মধ্য হতে বিশিষ্ট দল সমূহের দ্বারা দু'টি উল্লেখ যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এ দু'টি ঘোষণার প্রথমটি হচ্ছে বৃটিশ, ভারতীয় ও চীনের প্রতিনিধিগণের নিম্নলিখিতরূপ সমবেত ঘোষণা :—

আমরা বৃটিশ, ভারতীয় ও চীনের প্রতিনিধিগণ বিবেচনা করতেছি যে শোষিত দেশ সমূহের শ্রমিকশক্তির নির্দ্দিষ্ট কাজ হচ্ছে :—

(১) নিপীড়িত দেশ সমূহের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যে যখন জাতীয় সংগ্রামকারিগণ ইচ্ছা করবে তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করা।

(২) উপনিবেশের অধিবাসিগণের ওপরে সকল প্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা।

(৩) নিপীড়িত জাতি সমূহের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে যে সকল সৈন্য, নৌবহর ও আকাশযানাদি রাখা হয় তার ব্যয় না মঞ্জুর করা।

(৪) সৈনিক ও অ-সৈনিক অধিবাসিগণের মধ্যে শোষণ-বাদের বিভীষিকা সমূহ প্রদর্শন করা।

(৫) শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের দিক্ থেকে শোষণ-নীতির দোষগুলি দেখিয়ে দেওয়া।

চীনের উপস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে ঃ—

(১) আমরা দাবী করছি যে চীনের স্থল ও জলাধিকার হতে এখনি সশস্ত্র সৈন্যদলকে তুলে নেওয়া হোক্।

(২) আমরা খোলাখুলি কাজ করতে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করছি। এ কাজ হবে ধর্ম্মঘট করা এবং চীন ও ভারতে কিংবা ভারত হতে যুদ্ধসামগ্রী সৈন্যাদি প্রেরণে বাধা দেওয়া।

(৩) যুদ্ধের জন্যে বা যুদ্ধের ন্যায় কাজের জন্যে কোনো অর্থের মঞ্জুরী চাইলে তার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া।

(৪) সশস্ত্র বাধা বা খোলাখুলি যুদ্ধের ব্যাপারে শ্রমিক আন্দোলনের ভিতরে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত যে শ্রমিক সংগ্রামের মধ্যে যত প্রকার অস্ত্র আছে যুদ্ধ-বিগ্রহকে বারণ করার জন্যে সে সমুদায়ের যাতে প্রয়োগ করা হয়।

(৫) আমরা দাবী করছি যে কোনো শর্ত্ত ব্যতিরেকেই ন্যাশনালিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে মেনে নেওয়া হোক, অসম সন্ধি সমূহও বাহিরের শক্তির অধিকার রহিত করা হোক্ এবং বৈদেশিক সুবিধাগুলি ত্যাগ করা হোক্।

(৬) সর্ব্বশেষে, বৃটেন, ভারতবর্ষ ও চীনের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকসঙ্ঘের ভালোর জন্যে সেগুলো যাতে খুব ঘনিষ্ট ভাবে ও কার্য্যকরী সহযোগের সহিত কাজ করতে পারে তাই করার জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি।

জি, ল্যান্সবারী এম,পি, — এলেন উইলকিন্‌সন এম,পি,
জন্ বিকেট এম,পি, — ফেনার ব্রক্‌ওয়ে
জন্ ষ্টোক্‌স — হ্যারি, পলিট্
এ, ম্যাক্ ম্যানাস্ — ডব্লিউ, রাষ্ট,
এইচ, লিয়াউ (কুমিণ্টাঙের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী)
লিউ, চুং লিং (ক্যাণ্টন সৈন্যদলের জেনেরল)
জওয়াহিরলাল নেহেরু (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস)
এস, ও, ড্যাভিস্
আর, ব্রিগ্‌ম্যান্
হেলেন, ক্রফোর্ড।

(লেবর মন্থ্‌লি, মার্চ্চ, ১৯২৭)

———

আন্তর্জাতিক কৃষি সংসদ

[লেখক—ভুবরভস্থি]

৮ই মার্চ্চ তারিখে মস্কো শহরে আন্তর্জাতিক কৃষি সংসদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সংসদ কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশের কৃষক-কুলের অবস্থা অনুসন্ধান করিবে। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত জাতীয় গবেষণাগার আছে সেই সমস্ত স্থানে এই বিষয়ের একটা দিকের অর্থাৎ টেকনিক্যাল্ দিকের আলোচনা হয় মাত্র কিন্তু আন্তর্জাতিক কৃষি সংসদ বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে কৃষি সম্বন্ধীয় সমস্ত দিকগুলি অর্থনীতির বিচার পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা করিবে। পৃথিবীর কোনো দেশে চাষীদের বর্ত্তমান অবস্থার ইতিহাস আলোচিত হইবার ব্যবস্থা নাই; এবং যদিও কোনো স্থানে এই রকম প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব জানা যায় তাহা হইলেও সেই সকল স্থানে কেবলমাত্র শাসক সম্প্রদায় অথবা জমীদারদের মতের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কৃষকদিগের, আত্ম-কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত, ১৯২৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক কৃষক সম্মিলন (First International Farmerr Conference) কৃষি-সংসদ স্থাপন করিয়া কৃষকদিগের সংঘশক্তি বাড়াইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংসদ কৃষককুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।

রাজসাহায্যে পরিচালিত অনেক কৃষি সংসদ আছে; কিন্তু এই সংসদ সেইরূপ কোনো গবর্ণমেণ্টের সহিত সংসৃষ্ট নয় বলিয়া স্বাধীনভাবে লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত গৃহস্থ ও কৃষকের স্বার্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে।

অনেক সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং আন্তর্জাতিক কৃষি-আন্দোলনের রাজনৈতিক নায়কেরা ইহার সভ্য হইয়া এই কাজে যোগদান করিয়াছেন। তাহা ছাড়াও অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমষ্টিগত সদস্য হিসাবে ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলির, আন্তরিকতার জন্য এই সংসদ অতি অল্পকালের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজারখানা পুস্তকের একটি লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। অতি শীঘ্রই গ্রন্থের সংখ্যা ৭৫ হাজারে পরিণত হইবে। বিভিন্ন বিভাগের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অর্থনৈতিক কৃষি-বিভাগ—উৎপাদনের বর্ত্তমান অবস্থা, জমির অধিকার স্বত্ব, খাজনা, কৃষকদের দেনা প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

কৃষক-আন্দোলন বিভাগ কৃষকদিগের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করে। এই বিভাগ আন্তর্জাতিক অথবা জাতীয় কৃষক-সঙ্ঘগুলির কাজের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কৃষকেরা কি পরিমানে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারও খবর এই বিভাগ হইয়া থাকে। রাজনৈতিক ও আর্থিক মুক্তিলাভের সংগ্রামের ধরণ কিরূপ, এবং কৃষি সমবায়গুলি কিরূপ প্রণালীতে চলিতেছে তাহাও এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।

কৃষি-রাজনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় বিভাগ কৃষি সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইন ব্যবস্থাগুলির কার্য্যক্ষেত্র, জমীর স্বত্বসম্বন্ধীয় নিয়মকানুন, জমিসম্বন্ধীয় অধিকারের অপব্যবহার, উৎপাদন সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিধান এবং ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া থাকে। কৃষি ও কৃষকের স্বার্থজড়িত সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাধারণ আইন-ব্যবস্থার আলোচনাও এই বিভাগের কাজ। তবে এই বিভাগ বিশেষ করিয়া যুদ্ধের পরে য়ুরোপে কৃষি-সংস্কার সম্বন্ধীয় যে সমস্ত আইন ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, সেই সমস্ত আলোচনা করে।

রুশিয়ার কৃষক-বিপ্লবে পৃথিবীর সমস্ত কৃষকের অত্যন্ত সহানুভূতি আছে বলিয়া এই সংসদের একটি বিশেষ বিভাগ বিপ্লবের পূর্ব্বে এবং পরে কৃষকের অবস্থার যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহার তুলনামূলক আলোচনা করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের কৃষি-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করাও এই বিভাগের অন্যতম কাজ।

কৃষি-মজুরের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য একটা বিশেষ বিভাগ আছে। কৃষক-মজুরকে বেতন দেওয়ার পদ্ধতি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে নানা প্রকারে জটিল হওয়ায় এই বিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হইয়াছে।

সংসদের লাইব্রেরীর একটা তালিকা-বিভাগ আছে। সেখানে এই সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে।

একটা সংবাদ বিভাগও এই সংসদের আছে। ইহা সংবাদ পত্র মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া বিখ্যাত ঘটনা অথবা পরিবর্ত্তনের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে এবং মাঝে মাঝে সংবাদ হিসাবে পুস্তিকা প্রকাশিত করে।

সংসদের এ পুস্তক প্রকাশ বিভাগ হইতে কৃষি ও কৃষক-আন্দোলন সংস্পৃক্ত পুস্তক প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

১৯২৬।২৭ সালের মধ্যে সংসদের কর্ম্ম-তালিকা অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে প্রায় চল্লিশখানা পুস্তক প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। সংসদ অনিতিবিলম্বেই ইহার বিভিন্ন বিভাগের কাজের হিসাব দিয়া শীঘ্রই পুস্তিকা প্রকাশিত করিবে।

এই সংসদ অতি অল্পকাল হইল কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক চিন্তায় অভ্যস্ত কৃষক এবং বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে কাজ করিতে অভ্যস্ত কর্ম্মীদের সহানুভূতি যেই পরিমাণে পাইয়াছে তাহাতে সংসদ আশা করেন যে অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃষক ও গৃহস্থের অধিকার লইয়া যাঁহারা সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সমস্ত চিন্তাশীল কর্ম্মীদের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্ররূপে এই আন্তর্জাতিক কৃষি-সংসদ শীঘ্রই স্বীকৃত হইবে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

এই সংসদের কাজ প্রসার লাভ করিবার একমাত্র উপায় জনসাধারণের সহযোগিতা। যাঁহারা ইহার অস্তিত্ব কামনা করিয়াছেন তাঁহারা যদি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া অথবা নিজেরা ইহার কাজে যোগদান করিয়া সহযোগিতা করেন তাহা হইলেই ইহার ক্রমিক প্রসার লাভের চেষ্টা সফল হইবে।

(মূল প্রবন্ধ ইংরাজিতে লিখিত। শ্রীযুত ভোলানাথ কাপুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাংলায় তর্জ্জমা করেছেন)।

দেশ-বিদেশ

বিগত ১৮ই এপ্রিল তারিখে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টির এক কন্‌ফারেন্স বসেছিল। এ কন্‌ফারেন্সে বৃটিশ যে চীনে সৈন্য পাঠিয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। দাবী করা হয়েছে সশস্ত্র সৈন্যবল এখনি চীন থেকে সরিয়ে আনা হোক, আর নান্‌কিনের ঘটনা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করা হোক। ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদল যে চীনে পাঠানো হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ এ কন্‌ফারেন্স করেছে। যুদ্ধ যদি ঘটে তা হলে ট্রান্সপোর্টের দ্বারা, যুদ্ধ সামগ্রী প্রস্তুতের দ্বারা ও অন্য কোনো উপায়ে তাতে সাহায্য করা হবে না।

১৯শে এপ্রিল তারিখে এসোসিয়েটেড্‌ প্রেস মাদ্রাজ থেকে খবর দিয়েছে যে ওখানকার বর্ম্মা ওয়েল এণ্ড ট্যাঙ্ক ষ্টোরেজ কোম্পানীর ৮০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কোম্পানী ৯৮ জন শ্রমিককে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, আর তারি প্রতিবাদ স্বরূপ এ ধর্ম্মঘট হয়েছে। কোম্পানীর তরফ থেকে বলা হয়েছে যে এ সকল লোক ইচ্ছে করেই কাজ কম করেছিল। তারি জন্যে তাদেরকে অপসারিত করা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের তরফের কথা যে কি তা এসোসিয়েটেড প্রেস জানান নি। শ্রমিকরা কোনো প্রকারের গোলমাল কিছুই করেনি।

—*—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী এক্সেকিউটিভ অফিসার হাজী আবদুর রশীদ খান গুড্‌ ফ্রাইডের সময়ে নোয়াখালী গিয়েছিলেন। নোয়াখালীর উকীল মৌলবী আবদুল গোফ্‌রানের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে তিনি যে দরখাস্ত করেছিলেন তারি উপলক্ষেই তাঁর যাওয়া হয়েছিল। প্রকাশ যে এ মোকদ্দমা আপোসে মিটমাট হয়ে যাবার কথা হয়েছে এই শর্ত্তের ওপরে যে মৌলবী আবদুল গোফরান সার আবদুর রহীমের দলে যোগদান করবেন এবং হাজী সাহেবকে তাঁর খরচের টাকাটাও দিবেন। মৌলবী আবদুর গোফরান সাহেব হাজী সাহেবের ভ্রাতুস্পুত্রীর জামাতা।

—*—

বৃটিশ কম্যুনিষ্ট টম্‌ম্যান, আমেরিকান র‍্যাডিক্যাল্‌ আর্ল ব্রাউডার ও ফ্রেন্স কম্যুনিষ্ট ডেপুটী ডরিয়ট হ্যাঙ্কোতে পৌঁছেছেন। তাঁরা ওখানকার ভালো বিদেশী হোটেলে অবস্থান করছেন। বলা হয়েছে ডরিয়ট তৃতীয় কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি।

—*—

খবরে প্রকাশ যে চীনের ন্যাশনালিষ্টদের নরমে আর গরমে বিরোধ বেধেছে। গরমের জয় হোক্‌।

—*—

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ভূম্যধিকারী সম্মিলনের সভাপতিত্ব করার জন্যে কুর্গের মার্কারাতে গিয়েছেন। কংগ্রেসের সভাপতির গুণের অবধি নেই দেখতে পাচ্ছি। তিনি একদিকে যেমন জমীদার অন্যদিকে আবার সুদখোর মহাজনও নাকি বটেন। শুনেছি তাঁর সুদের আয় মাসে ছ'হাজার টাকা। এমন প্রেসিডেণ্ট যখন মাথার ওপরে রয়েছেন তখন ভারতের জনগণ তাঁদের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারেন।

—*—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স এবারে হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে হয়ে গেছে। কংগ্রেসের মধ্যে এবারে ভাঙাভাঙি হয়ে গেছে। তাই, একদল লোক কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন নি। কন্‌ফারেন্সর খবর সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে বের হয়ে গেছে। তাই, আমরা আর তার কোনো খবর প্রকাশ করলেম না এখানে। কন্‌ফারেন্স যেমন হয়ে থাকে তেমনি হয়েছে। কোনো প্রোগ্রাম নেই, তালিকা নেই—কন্‌ফারেন্স আছে!

—*—

প্রাদেশিক সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে মাজু গ্রামে যুবক সম্মিলনও হয়ে গেছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক লম্বা তালিকা দিয়েছেন। আমরা পরে তাঁর তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

শ্রীযুত শিবশঙ্কর ব্রহ্মচারী বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে বন্দী ছিলেন। পীড়াগ্রস্ত হয়ে তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আনীত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর গায়ে বসন্ত বেরুতে তাঁকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কংগ্রেস কর্ম্মীসঙ্ঘের লোকেরা তাঁর দেহের সৎকার করেছেন।

১৯শে এপ্রিল অপরাহ্ন ৫৷৷০ টার সময় কুষ্টিয়াতে এক প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা উঠেছিল। তাতে অনেক গুলো বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে, অনেক নৌকা ডুবে গেছে, সর্ব্বোপরি কিছু লোকের প্রাণহানিও ঘটেছে। ৪৩ জন যাত্রী নিয়ে একখানা লঞ্চ বোয়ালমারী থেকে আসছিল। তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তবে লঞ্চখানা যে ডুবেছে সে খবরও আসেনি।

নোয়াখালীতেও নানা জায়গায় এ ব্যাপার ঘটেছে। বহু লোক গৃহহীন। দত্ত পাড়ার শ্রীযুত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে ইউরোপে চলে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি তাতে রাজী হননি। বলেছেন স্বেচ্ছায় ইউরোপে নির্ব্বাসিত হওয়ার চেয়ে তিনি কারাগারে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর মনে করেন।

মিঃ গান্ধী মহীশূর রাজ্যের নন্দীপর্ব্বতে হাওয়া বদলাতে গেছেন। সেখানে তিনি মহীশূরের মহারাজার অতিথি হয়েছেন। গান্ধী বুদ্ধিমান ছেলে। তাই, ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছেছেন!

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের অধিনায়কত্বে আগামী বৎসর ময়মনসিংহে সমগ্র বঙ্গীয় কৃষক সম্মিলনের অধিবেশন হবে। ময়মনসিংহের কৃষক ও শ্রমিক দল বন্দোবস্তের ভার নিয়েছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রমিক সংগঠনে অসুবিধা

আমাদের যে সকল বন্ধু শ্রমিক সংগঠনের কাজে নিঃস্বার্থভাবে প্রলিপ্ত আছেন তাঁরাও অনেক সময়ে হতাশ হয়ে বলেন যে ভারতের শ্রমিকগণের কিছুই হবেনা। কেন না, শ্রমিকদের ডেকে ডেকে তাঁদের গলায় ব্যথা ধরে গেছে, তবুও হতভাগা শ্রমিকগুলো কিছুতেই দলে ভিড়তে চাইছে না। যাদের ভালো বন্ধুরা করতে চান তারাই যদি নিজেদের ভালো না করতে চায় তা হলে বন্ধুরা কতকাল আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন? তাঁদের এ অভিযোগের উত্তরে আমাদের বলবার এই আছে যে মন্ত্রশক্তি মুনি ঋষিদের যুগে পুঁথির অক্ষরের সীমার ভিতরেই কাজ করেছে, কিন্তু, এ যুগের বিজ্ঞানের ত্রিসীমাতেও সে শক্তি ঘেষতে পারবে না। এ বৈজ্ঞানিক যুগে বন্ধুদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই কাজ করতে হবে, মন্ত্রশক্তির জোরে নয়। মাঝে মাঝে মহিমান্বিত সাধারণ সভা আহ্বান করলে শ্রমিক সঙ্ঘ সংগঠিত হয় না। তার জন্যে শ্রমিক দিগকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। শ্রমিক আন্দোলনের কোনো বন্ধু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন কি যে সে কাজ তাঁরা একদিনের জন্যেও করেছেন? অমনি ৫০টি সঙ্ঘ গঠন করার চেয়ে ১০টি শ্রমিককে বিশেষ রূপে সচেতন ও সুশিক্ষিত করে তোলাই বড় কাজ। আমরা অনুরোধ করছি, বন্ধুগণ ট্রেনিং ক্লাস খুলে শ্রমিকদের শিক্ষিত করুন। তার পরে তাঁরা দেখে নিবেন শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় কিনা।

বিদ্যার্থীজীর পত্র

কাকোরি ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় যাঁরা সাজা পেয়েছেন তাঁদেরকে সংযুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন জেলে বদলী করে দেওয়া হয়েছে। যতটা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে তাদের সকলেই অনশন ব্রত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। জেল কর্ত্তৃপক্ষ যে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা তাঁদের জন্যে করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি বলেই তাঁরা প্রতিবাদ স্বরূপ উপোশ করছেন। কারা-বন্দীর প্রতিবাদ জানাবার জন্যে এ একটি মাত্র অস্ত্রই তার অধিকারে থাকে। যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কানপুরের "প্রতাপ" নামক হিন্দী সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী মশায় সম্প্রতি এ বিষয়ে একখানা পত্র যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বর নওয়াব মোহাম্মদ আহমদ সইদ খানের নিকটে লিখেছেন। তাতে তিনি নওয়াব সাহেবকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন অচিরে কাকোরির সাজা পাওয়া কয়েদীগণের অভিযোগের একটা সুপ্রতিকার করেন। বিদ্যার্থী মশায় বার কতক জেল খেটেছেন। সেজন্যে তিনি ভালোরূপে জানেন যে যুক্ত প্রদেশের জেলগুলো কি চীজ্। ওখান কার জেলগুলোতে সাধারণ ভারতীয় কয়েদীগণকে যে খাদ্য ও পোষাক দেওয়া হয় তা ব্যবহার করে জীবনে খাওয়া পরার এতটুকু স্বাদও যাঁরা পেয়েছেন তাদের বেঁচে থাকাই মুশ্‌কিল। কাকোরির কয়েদীগণ বলছেন, তাঁরা সাজা যখন পেয়েছেন তখন জেলে কাজ করতে তাঁরা কখনো অপ্রস্তুত নন, তবে খাওয়া পরা সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ অধিকার পেতে চান এই মাত্র। আমরা চাই জেলের সকল কয়েদীর খাওয়া-পরার উন্নতি হোক্। কিন্তু, সে উন্নতি করা কিছু কাকোরির কয়েদীগণের হাতে নয়। তাঁরা তাঁদের নিজেদের দাবী পেশ করতে পারেন, করেছেনও তাই। আমরা যতটা বুঝি তাঁরা অন্যায় দাবী কিছুই করেননি। যুক্ত প্রদেশের জেলে পরিশ্রমী কয়েদীদের খাবারের জন্যে বার্ষিক মাথা পিছু মাত্র ৪২ টাকা মঞ্জুর করা আছে। এ ৪০ টাকারও সবটা কিছু কয়েদীদের ভোগে আসে না। যাদের হাত হয়ে মালপত্র আসে তাঁরাও এর একটা ভাগ পায়। এই থেকে হিসাব খতিয়ে সকলেই বুঝে নিতে পারেন কি খাদ্যটাই কয়েদীদিগকে দেওয়া হয়। কাকোরির মোকদ্দমার লোকেরা জানেন এ খাদ্য খেয়ে তাঁরা কিছুতেই জীবন ধারণ করতে পারবেন না। তাই যে উপায় তাঁদের হাতে আছে সে উপায়ই তাঁরা অবলম্বন করেছেন। ইউরোপীয় কয়েদীগণ যদি যুক্ত প্রদেশের জেলে ভালো খাওয়া-পরা পেতে পারে তা হলে কাকোরি মোকদ্দমার লোকেরা তা পাবে না কেন? যুক্ত প্রদেশের কারাগারের অত্যন্ত ক্লেশকর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সে জন্যেই এত কথা বললেম। জানিনে শ্রীযুত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর পত্র পেয়ে নওয়াব সাহেব কোনো প্রতিকার করবেন কিনা। কিন্তু, দেশের লোকের কি কিছু করণীয় নেই এর জন্যে?

বিক্রমপুর যুবক সম্মিলন

নিবেদন

(বিক্রমপুরের ১৫ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়ে নিম্নলিখিত নিবেদনটি বের হয়েছে। এ সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুত জীবন কানাই পাল।

প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে বিক্রমপুরের বিশিষ্ট স্থান আছে। রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম্ম-শিক্ষা সাহিত্য-ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিক্রমপুরবাসীর দান নগণ্য নহে। ভবিষ্যতের বহু সম্ভাবনা যে মানুষ ও জাতিতে বীজাকারে সুপ্ত থাকে সেই মানুষ ও জাতির কাছেই মানুষ বহু কিছু আশা করে। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী সেবিত উর্ব্বর-ক্ষেত্র বিক্রমপুর বহু বহু সম্ভাবনার সম্পদ বুকে করিয়া আছে, সেই সম্পদের সদ্ব্যয় করাই বিক্রমপুরবাসীর কর্ত্তব্য।

শত সহস্র কৃতবিদ্য, ধনী ব্যবসায়ী বর্ত্তমান থাকা সত্বেও বিক্রমপুরের অভাব অভিযোগের অন্ত নাই। এদিকে বিক্রমপুরে শিক্ষিত যুবজনেরও অভাব নাই। তাহাদের প্রাণে অদম্য উৎসাহ কর্ম্মশক্তিও প্রচুর।

বিচ্ছিন্নভাবে বিক্রমপুরের যুবকগণ নানাস্থানে সেবা-সমিতি ও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন করিয়া বিক্রমপুরের তথা দেশের সেবা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই সকল বিচ্ছিন্ন কর্ম্মশক্তি কেন্দ্রীভূত, সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে না পারায় শক্তিশালী ও কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না। তাই বিক্রমপুরের কতিপয় উৎসাহী যুবক আগামী বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহে হাসারা গ্রামে "বিক্রমপুর যুবক সম্মিলন" নামে একটি সার্ব্বজনীন যুবক সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে। এ যুগে সংহতিই যে শক্তির মূল ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। একটি সুবিবেচিত, সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে বিক্রম পুরের যুবকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন—বিক্রমপুরের রোগে শোকে, আপদ-বিপদ ভয়ে, শিক্ষায় স্বাস্থ্যে সহায় হইতে পারেন, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক দুঃখ দৈন্য দূর করিতে পারেন এবং সর্ব্বগ্রাসী 'কচুরী পানা' ধ্বংস সাম্মিলিত শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করার মহৎ উদ্দেশ্যে এই বিক্রমপুর যুবক-সম্মিলনীর আয়োজন।

আমরা আশা করি, বিক্রমপুরবাসী মাত্রেই "বিক্রমপুর যুবক-সম্মিলনীর" সাফল্যকল্পে যথাসাধ্য আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দান করিবেন। বলা বাহুল্য এই প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতাও যেমনি নাই, কোনও প্রকার দলাদলিও তেমনি নাই।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের

১৯২৭ সনের

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি

প্রেসিডেণ্ট

১। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট

২। ডাক্তার শ্রীযুত নরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, ডি-এল

৩। মিষ্টার কুতুবুদ্দীন আহ্‌মদ

জেনেরেল সেক্রেটরী

৪। শ্রীযুত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ

(ইনি শীঘ্রই ইউরোপে যাচ্ছেন। আপাততঃ এঁর জায়গায় মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক খান কাজ করবেন)।

বিভাগীয় সেক্রেটরী (কৃষক বিভাগ)

৫। শ্রীযুত হেমন্ত কুমার সরকার এম এ।

(নানা কারণে ইনি ছ'মাস অনুপস্থিত থাকবেন। এঁর স্থানে অন্য লোক কাজ চালাবেন)

বিভাগীয় সেক্রেটরী (শ্রমিক বিভাগ)

৬। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক খান

সদস্যগণ

৭। কাজী নজরুল ইস্‌লাম

৮। মিষ্টার ফয়জুদ্দীন হোসেন (ময়মনসিংহ)

৯। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

১০। মিষ্টার আবদুল হালীম

১১। শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য

১২। মিষ্টার আফতাব আলী

১৩। শ্রীযুত প্যারীমোহন দাস

১৪। শ্রীযুত নীরদকান্ত চক্রবর্ত্তী

১৫। শ্রীযুত ব্রজনাথ দাস (বগুড়া)

১৬। মিষ্টার মহীউদ্দীন।

১৭। শ্রীযুত নিশিকান্ত পাত্র (কুষ্টিয়া)

১৮। শ্রীযুত রাসমোহন মুখোপাধ্যায়

১৯। শ্রীযুত মনোরঞ্জন গুহ

২০। শ্রীযুত অনাথনাথ লাহিড়ী

২১। শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র কায়েত

২২। শ্রীযুত স্ফুটবিহারী বন্দোপাধ্যায় বি-এল

২৩। শ্রীযুত অরুণচন্দ্র সেন

২৪। শ্রীযুত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় (রাজবন্দী)

২৫। শ্রীযুত ক্ষীরোদকুমার রায়

২৬। শ্রীযুত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

২৭। শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বিশ্বাস

২৮। শ্রীযুত ধরণীকান্ত গোস্বামী

২৯। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

রাজবন্দী শ্রীযুত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে ফরিদপুর হতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী চর ভদ্রাসন নামক স্থানে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। ক'দিন থেকে তিনি মস্তিষ্ক ও উদরের পীড়ায় ভুগছেন।

রাজবন্দী শ্রীযুত লোকনাথ বল ও শ্রীযুত প্রেমানন্দ দত্তকে তাঁদের স্বগৃহে আবদ্ধ রাখা হয়েছে।

রাজবন্দী শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়কে বহরমপুর জেল হতে কৃষ্ণনগর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

রাজবন্দী শ্রীযুত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এস-সি মুক্তি পেয়েছেন।

এলাহাবাদের "লীডার" পত্রিকা খবর পেয়েছেন যে শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রথম "এজেণ্ট" নিযুক্ত হয়েছেন।

"রেঙ্গুন মেইল" খবর দিয়েছে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ক'দিন থেকে ফুস্‌ফুসের বেদনায় ভুগ্‌ছেন। তাঁকে যে মটরে বেড়াতে দেওয়া হত তা অজ্ঞাত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার তাঁকে ঘরের বের হতে একেবারেই নিষেধ করেছেন।

শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কুতুবদিয়া নামক দ্বীপে আবদ্ধ রেখেছেন।

লাহোর হতে "মেহনৎ কশ্" (পরিশ্রমী) নামক একখানা উর্দ্দূ সাপ্তাহিক আজ বেরুচ্ছে এ কাগজ খানা জনগণের দলের কাগজ হবে।

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণ-বাণী

(এর সাথে "লাঙল" একীভূত হয়েছে)

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে এপ্রিল ১৯২৭, ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৪ | ১২শ সংখ্যা

গণবাণীর এবারের বৈশিষ্ট্য

গণবাণীর এ সংখ্যা থেকে আর, পাম দত্তের বিখ্যাত পুস্তক "মডার্ণ ইণ্ডিয়া"র বাংলা তরজমা "বর্ত্তমান ভারত" নাম দিয়ে শুরু হল। এ তরজমা ধারাবাহিকরূপে গণবাণীতে বেরুতে থাকবে। আমাদের পাঠকগণের নিকটে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে তাঁরা নিজেরা এ তরজমা পড়ুন এবং তাঁদের বন্ধু বান্ধবদের পড়তে অনুরোধ করুন।

"শ্রমিকসঙ্ঘবাদ" এর দ্বিতীয় প্রবন্ধও এ সংখ্যায় ছাপা হল। এ প্রবন্ধটিও সকলে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন, এ প্রার্থনা আমরা জানাচ্ছি।

কাজী নজরুল ইস্‌লামের রক্ত পতাকার গানও এ সংখ্যাতে বের হয়েছে।

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা।
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ১৷৷৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে ৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু, প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে এপ্রিল, ১৯২৭, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৪ | ১২শ সংখ্যা

রক্ত-পতাকার গান

—:০:—

নজরুল ইসলাম

—•—

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান!
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥

শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি ফুটে কুসুম
নব-বসন্ত-সূর্য্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরেরে হান মৃত্যু-বাণ।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥

চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বদ্ধ মন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির্ পতাকা ওড়াও ঊর্দ্ধে,
গাহ রে গান
লাল নিশান! লাল নিশান!

———

কলিকাতা
১ বৈশাখ, ৩৪

অর্থনীতিক অসন্তোষ

[মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ]

বাংলা দেশের নানা স্থানে যে হিন্দু-মুস্‌লিম বিরোধ বেধে উঠেছে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থনীতিক অসন্তোষের ওপরে। আমরা একাধিকবার এ কথা বলেছি এবং এখনো আমাদের মতের পরিবর্ত্তন এতটুকুও হয়নি। কিন্তু, আমাদের ইংরেজী সহযোগী "ফরওয়ার্ড" একথা সোজাসুজি কিছুতেই মান্‌তে রাজী নন। ২৩শে এপ্রিলের "ফরওয়ার্ড" এ "পূর্ব্ব বঙ্গের অবস্থা"র ওপরে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলতে চেষ্টা করা হয়েছে যে যদিও জমীদার ও মহাজনের অধিকাংশই হিন্দু, আর কৃষক অধিকাংশই মুসলমান, তথাপি বিরোধটা সম্পূর্ণরূপে অর্থনীতিক কারণে ঘটেনি। অর্থনীতিক কারণে ঘট্‌লে মুসলমান কৃষকরা মুসলমান জমীদারের বাড়ী ঘরও আক্রমণ করত। কিন্তু, তা করেছে বলে কোনো সংবাদ আজো পর্য্যন্ত "ফরওয়ার্ড" পান নি। এই গৃহীত বাক্য হতে "ফরওয়ার্ড" সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে স্বার্থপর লোকেরা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টির জন্যেই অর্থনীতিক অভিযোগকে উত্তেজিত করছে ও তার সুযোগ নিচ্ছে। মতলববাজ লোকেরা মতলব সিদ্ধির জন্যে যা খুশী করুক না কেন অর্থনীতিক অভিযোগ যে রয়েছে এ কথা সহযোগী একটুকু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

অভিযোগ আছে, অথচ অসন্তোষ নেই, এমন কথা আমরা কখনো শুনিনি। অভিযোগের সাথে সাথে অসন্তোষও ফুটে ওঠে, কিন্তু, কোথায় কি ভাবে যে ওঠে তা কেউ বলতে পারে না।

"ফরওয়ার্ড"এর লেখা পড়ে আমরা যতটা বুঝতে পেরেছি তাতে তার মানে এই হয় যে অর্থনীতিক অভিযোগটা মুসলমান কৃষকদের আছে সত্য, কিন্তু অসন্তোষটা ছিল না। এটা কতকগুলি মতলববাজ লোক উস্কিয়ে তুলেছে মাত্র। এ কথা আমরা মেনে নিতে রাজী আছি যে মতলববাজ লোকেরা মতলবের সিদ্ধির জন্যে বাংলার মুসলমান কৃষকদিগকে তাদের অসন্তোষের (কেবল মাত্র অভিযোগের নয়) সুবিধে নিয়ে বিপথে চালিত করছে। কিন্তু, সে দোষটা কার? "ফরওয়ার্ড" যাঁদের কাগজ তাঁরা ত ত্যাগ, দেশভক্তি, জাতীয়ত্ব (Nationalism) ও সর্ব্বোপরি নেতৃত্বের ঠিকা নিয়ে বসে আছেন। তাঁরা কেন এতকাল কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি? তাই যদি তাঁরা করতেন তা হলে আজ যত সব মতলববাজ লোক এসে কৃষকদের বিপথে চালিত করতে পারত কি?

বাংলা দেশের কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান, আর যারা তাদের সাক্ষাৎ ভাবে শোষণ করে থাকে তাদের অধিকাংশই হিন্দু। শোষিত শ্রেণীর মধ্যে শোষিত হয় বলে স্বভাবতই একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শ্রেণী-সংগ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে যে ব্যাপার ঘটেছে বা ঘট্‌ছে তা-ও শ্রেণী-সংগ্রাম বটে, কিন্তু, বিপথে চালিত শ্রেণী-সংগ্রাম। এটা খুবই সত্য যে নীচমনা মতলব বাজ লোকেরা অসন্তুষ্ট মুসলমান কৃষকদের মধ্যে একথা প্রচার করে থাকবে যে হিন্দুরা হিন্দু বলেই, আরো সোজা কথায় বলতে গেলে কেবল মাত্র ধর্ম্মগত বিদ্বেষেরই বশে মুসলমান কৃষকদের শোষণ করে থাকে। শোষকের সংখ্যা এত বেশী মাত্রায় হিন্দু যে সরলমনা মুসলমান কৃষকদের পক্ষে এমন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কিছু-মাত্র আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নয়।

মোটের ওপরে পাবনা, বরিশাল ও মাদারীপুর যেখানকার কথাই হোক্ না কেন—সর্ব্বত্রই ব্যাপার হচ্ছে কৃষক-উত্থানের। তাদের চালাবার জন্যে সত্যকারের নেতৃত্ব পাচ্ছে না বলেই তারা নিতান্ত ভুলপথে ছুটেছে। অসন্তোষের আগুন জলে জলে বাষ্প তৈরী হয়েছে, জাহাজও চলেছে, কিন্তু প্রকৃত কর্ণধারের অভাবে ঠিক দিকে চলেনি। কৃষকদের এই শ্রেণী-সংগ্রামকে সত্যকারের পথে পরিচালিত করার জন্যে আজ লোকের দরকার। কিন্তু কোথায় সে লোক?

বলেছি বাংলা দেশের কৃষক অধিকাংশই মুসলমান, আর হিন্দু কৃষক যা আছে তারাও সকলে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। জাতীয় আন্দোলনের অংশ যে হিন্দুরা নিয়েছেন, তা কংগ্রেসী দলই হোক, বা বিপ্লবী দলই হোক—তাঁদের শতকরা ৯৯ জনই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। এঁদের মধ্যে যাঁরা অবস্থাপন্ন লোক তাঁদের স্বার্থ কৃষকদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী, কেননা তাঁরা কৃষকদের শোষক। শোষক ও শোষিতের মধ্যে সমস্বার্থ-সংযোগ কখনো স্থাপিত হতে পারে না। আর যাঁরা অবস্থাপন্ন লোক নন অথচ শিক্ষিত, তাঁরা কৃষকদিগকে বুদ্ধি যুগিয়ে, জ্ঞান বিতরণ করে তাদের পরিচালক হতে পারেন। কিন্তু, যদিও তাঁরা সাধারণত অবস্থাবানদের দ্বারা শোষিত হয়ে থেকেন, তথাপি তাঁরা তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর বলে তাঁদের সমবেদনাটা হয়ে থাকে উচ্চশ্রেণীর অবস্থাবান লোকদেরই প্রতি। কৃষকদের প্রতি তাঁদের প্রাণের দরদ নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই, তাঁরাও কৃষক উত্থানের সত্যকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁরা কত যুগের পুরাতন বুর্জ্জুয়া বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্ধকারে ঘুরে মরছেন,—কিছুতেই বোঝেন না যে এটা কৃষক ও শ্রমিক উত্থানের যুগ। তাঁরা মনে করেন বীরের আদর্শটাই সব কিছু, আর গণিতের অঙ্কটা কিছুই নয়। তাই ঐতিহাসিক ভাবে যে জিনিস বাতিল হয়ে গেছে, যা এযুগের ব্যাপার নয়, তা নিয়েই তাঁরা মেতে ওঠেন। বাড়ীর কাছের চীন আজ চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখিয়ে দিচ্ছে তারও কোনো মূল্য নেই তাঁদের কাছে।

নিম্নমধ্যশ্রেণীর বা সাধারণ কথায় ভদ্রলোক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা আজো কৃষক ও শ্রমিকদিগকে ছোট লোক মনে করে থাকেন, অথচ তাঁরা নিজেরা যে সমাজের পরগাছা হয়ে উঠেছেন এ কথাটা কিছুতেই ভেবে দেখ্‌তে চান না।

অর্থনীতিক শোষণে অতিষ্ট হয়ে আজ বাংলার কৃষক উত্থানের সূচনা দেখা দিয়েছে, কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে এ উত্থান ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছেনা। কৃষকরা সব কিছু উৎপন্ন করেও তাদের

শ্রমের ফলে বঞ্চিত হচ্ছে। অত্যাচার আর নির্য্যাতনে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে আছে। তাদের এ অর্থনীতিক অসন্তোষকে যারা আজ মিথ্যা ধর্ম্মের খোলস পরিয়ে দিচ্ছে তারা মানুষ নয়, পশু। গাল আমরা দিচ্ছি বটে, কিন্তু যারা কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রামকে বিপথে চালিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, ঠিক বিপথে চালানোই তাদের কাজ। জমীদার আর মহাজন যেমন কৃষকের, শোষক, ঠিক তেমনি শোষক বটে এই মিথ্যা ধর্ম্মাচারীর দলও। কৃষকের অর্থনীতিক অসন্তোষকে আজ যারা ভিন্নরূপে পরিস্ফুট করতে চাইছে তারা যে কৃষকের পরম শত্রু এ কথাটা তাদেরকে বোঝাতে হবে। শোষক শোষকই বটে, হিন্দু কিংবা মুসলমান সে নয়। জমীদার আর মহাজনের বিচার করতে হবে জমীদার আর মহাজন হিসাবে, হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে নয়। মুসলমান জমীদার কিংবা মহাজন কিছু মুসলমান কৃষকদিগকে কম করে শোষণ করেনা। পক্ষান্তরে হিন্দু জমীদার ও মহাজনও নমঃশূদ্র প্রভৃতি হিন্দু কৃষকদিগকে শোষণ করতে এতটুকুও কসুর করে না। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে একটা মোকদ্দমার বিচার হয়ে গেছে। মুসলমান কৃষকের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বলে মুসলমান জমীদার গুড়ামিঞা তাতে তিন মাসের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এসব ব্যাপার গুলো ভালো করে মুসলমান কৃষকদিগকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। গজনবী মিনিষ্টার হবেন কি আবদুর রহীম হবেন এই নিয়ে মুসলমান শিক্ষিত যুবকগণ মাথা ঘামিয়ে মরছেন, ওদিকে মুসলমান কৃষকগণের স্বার্থের কত যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সে দিকে তাঁরা চেয়েও দেখ্‌ছেন না। মুসলমানদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, বৈশ্যত্ব বা কায়স্থত্ব যখন নেই তখন শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণের মধ্যে কৃষক সন্তানই যে বেশী তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। জমীদার বা মহাজনের সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যে খুবই নগণ্য। এ সত্ত্বেও মুসলমান যুবকদের এদিকে এত টুকুও লক্ষ্য নেই। ভুলপথে চালিত হয়ে বাংলার কৃষক উত্থান যদি পশ্চাদ্‌পদ হয়ে পড়ে তা হলে অনেক ক্ষতি হবে দেশের।

শ্রেণী-সংগ্রাম কিছু আমাদের ঘরের তৈরী জিনিস নয়। শোষক আর শোষিত যেখানে আছে শ্রেণী-সংগ্রামও সেখানে আছে। পাবনা আর বরিশালে এ সংগ্রাম যে আকারে প্রকাশ পেয়েছে, চেষ্টা করলে সে আকারটা পরিবর্ত্তিত হতে পারে কিন্তু শোষণ যতদিন বর্ত্তমান আছে ততদিন মূল শ্রেণী-সংগ্রাম ত নষ্ট হবেনা কিছুতেই। এ সংগ্রামে যদিও নমঃশূদ্র প্রভৃতি শোষিত শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানদের সাথে সমস্বার্থ সংযোগে একীভূত হবে তথাপি হিন্দু শোষক আর মুসলিম শোষিতের সংখ্যা খুব বেশী বলে স্বার্থপর লোকেরা ভবিষ্যতেও চেষ্টা করবে একে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বলে প্রমাণিত করতে। আমাদের দেশের নিম্ন মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণের সম্মুখে একটি কঠোর পরীক্ষা এসে উপস্থিত হয়েছে। জানিনে এ পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারবেন কিনা।

"ফরওয়ার্ড" যদিও স্বীকার করেছেন যে অর্থনীতিক অভিযোগের সুযোগ নিয়ে মতলববাজ লোকেরা কৃষকদিগকে উত্তেজিত করছে, তথাপি আবার একথাও বলেছেন যে অর্থনীতিক কারণে বিরোধ ঘটলে মুসলমান কৃষকগণ মুসলমান জমীদার মহাজনের বাড়ীও লুণ্ঠন করত। আমাদের মনে হয় "ফরওয়ার্ড" নিজেই নিজের কথার খণ্ডন করেছেন। একথা বলার ঠিক পর মুহূর্ত্তেই "ফরওয়ার্ড" যখন অর্থনীতিক অভিযোগের, সুতরাং অসন্তোষেরও কথা মেনে নিচ্ছেন তখন আর এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। তবে এতটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে কৃষকরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যখন উত্থিত হয় তখন হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য তারা করেনা। চৌরিচৌরার হিন্দু-মুসলমান কৃষকগণ যখন থানায় আগুন ধরিয়ে থানার লোকগুলিকে পুড়ে মারতে গিয়েছিল তখন তারা চিন্তা করে দেখেনি যে থানার কর্ম্মচারীরা হিন্দু না মুসলমান। তারা যখন পুলিশকেই দেখেছিল তাদের সম্মুখে। মালাবারের কৃষক বিদ্রোহ যখন ঘটেছিল তখন সেখানে যে সামান্য দু' এক জন মুসলমান জমীদার ছিল তারাও রেহাই পায়নি মোপলা কৃষকদের হাত থেকে।

মানুষ নিপীড়িত হয়ে হয়ে নিপীড়ণ কারীর বিরুদ্ধে যদি উত্থিত হয়, যদি নিপীড়ণকারীর ওপরে সে নিপীড়ণ করতে সমর্থ হয় তা হলে সে নিপীড়ণের ধরণ যে কি হবে সে কথা কেউ বলতে পারে না। এমন কি, যে নির্য্যাতিত মানুষ নির্য্যাতনেরই দ্বারা প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হবে সেও পর্য্যন্ত আগে থেকে বলতে পারবেনা কি ভাবে সে নির্য্যাতন করবে।

কৃষকরা আমাদের সকলেরই অন্নদাতা। জমীর মালীক তাদের করে দেওয়া হোক, মহাজনের অত্যাচার হতে তাদের বাঁচানো হোক্ এবং সর্ব্বোপরি তাদের সুশিক্ষা দেওয়া হোক, তা'হলে সকল গোলমালের অবসান হবে।

—*—

বর্ত্তমান ভারত

[আর, পাম দত্ত]

(১)

সমস্যার বিবৃতি

—*—

ভারতের জাতীয় আন্দোলন এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যাতে ওর অবস্থা, উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালীর নূতন পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বর্ত্তমান আন্দোলন গত ক'বছরে প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সম্মুখ অগ্রসর হওয়ার জন্যে একটা নূতন পথ খুঁজে বের করা আবশ্যক। কর্ম্মভূমির নূতন পরিমাপ করাও ঠিক এরি জন্যে দরকার।

এ বইখানা এরূপ বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর বিশেষ প্রচেষ্টা হচ্ছে ভারতীয় জনগণের সমস্যা

সামাজিক সংগ্রামের সহিত জাতীয় সংগ্রামের সামঞ্জস্য আনয়ন করা।

বর্ত্তমান জগৎ-আন্দোলনের প্রত্যেক দিকের অভিজ্ঞতার ও আধুনিক বিশ্বের চিন্তাধারার পরিণতি সমূহের সহিত ভারতীয় আন্দোলন ও ভারতীয় চিন্তাধারার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া উচিত। ভারতের আন্দোলন ও চিন্তাধারাকে (বেশীর ভাগ শোষণবাদী শাসকগণের নীতির দ্বারা) এতকাল অত্যন্ত বেশী মাত্রায় আলাহিদা করে রাখা হয়েছে। এ পুস্তকের প্রচেষ্টা হচ্ছে চিন্তাধারাকে উপরিউক্ত পথে পরিচালিত করা।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর ব্যাপার মাত্র ছিল। এসকল গণ্ডী ভারতীয় সমাজের সমৃদ্ধশালী স্তরের অল্প-সংখ্যক প্রতিনিধিদের দ্বারাই পরিচালিত হত। কিন্তু, যুদ্ধের সময় হতে এ অন্দোলন জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ১৯২১ হতে ১৯২২ সনের ঘটনাবলীর দ্বারা এটা বেশ বোঝা গিয়েছে। তথাপি এর বাহ্যদৃষ্টি, ধারণাবলী, নীতি ও সংগঠনের অবয়ব সমূহ এখনো ঘনিষ্টভাবে পুরাতন ভিত্তির ওপরেই বিন্যস্ত রয়েছে। জনগণের একটা সত্যকারের প্রোগ্রাম (কর্ম্মতালিকা), তাদের একটা সত্যকারের সংগঠন এখনো তৈরী সাপেক্ষ। এ যখন হয়ে যাবে তখনি ভারতের জাতীয় আন্দোলন আপন শক্তিমত্তা প্রদর্শন করতে সমর্থ হবে।

পক্ষান্তরে, অতীব কৌশল সহকারে নূতন অবস্থা সমূহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যুদ্ধের সময় হতে শোষণবাদ (ইম্পিরিয়েলিজম) অত্যাবশ্যকরূপে আপনার নীতির পরিবর্ত্তন করেছে। শোষণবাদ (ইম্পিরিয়েলিজম) ভারতে ধনিকবাদের প্রসার বাড়াবার কাজে হাত দিয়েছে, অবশ্য ভারতীয় ধনিকবাদকে অধীন অবস্থায় আনয়ন করে। এর দ্বারা, পুরাতন জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি, যা উন্নতিশীল ভারতীয় বুর্জ্জুয়াজিগণের দাবী দাওয়ার ওপরে সংন্যস্ত ছিল, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। বর্ত্তমান শোষণবাদের নীতি হচ্ছে ভারতীয় বুর্জ্জুয়াজিগণকে আপনার ছোটভাগীদাররূপে পাওয়া। এ নীতির চরম বিকাশটা পাওয়া যাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনে। কিন্তু, এর থেকে এই মানে হবে না যে শোষণবাদীগণের শোষণের সত্যকারের বোঝা বহনের দায়িত্ব থেকে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মুক্তিলাভ হবে।

স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় সংগ্রামকে এখন নব নব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে হবে। শোষণবাদের বিরুদ্ধ আন্দোলন ব্যাপক ভাবে জনগণের আন্দোলন এবং এ'কে নিশ্চিতরূপে জনগণেরই আন্দোলন হতে হবে। জনগণকে তাদের নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে ও মুক্তির বিষয়ে সচেতন করাই এখন আমাদের সম্মুখে কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জাতীয় সংগ্রাম মুক্তি-সংগ্রামের একটা স্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে সর্ব্বপ্রকারের শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তা সে শোষণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, বর্ণগত বা ধর্ম্মগত যে প্রকারেরই হোকনা কেন। যতই সংগ্রাম বাড়বে ততই আমাদের চোখের সম্মুখে ভারতের উৎপন্নকারী বিত্তহীন শ্রমিকগণের ও কৃষকগণের নেতৃত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হতে থাকবে।

বর্ত্তমানে সংগ্রামের যে স্তরে আমরা আছি, এ হচ্ছে শোষণতান্ত্রিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কিন্তু, আগে থেকেই জাতীয় সংগ্রামের ভিতরে বর্দ্ধনশীল সামাজিক সংগ্রামের জীবাণু-সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই কেবল মাত্র জাতীয় সংগ্রামকে বোঝা যেতে পারে। এ কথাটি মেনে নিতে না পারা, ভারতীয় বুর্জ্জুয়াজিগণের চির দুর্ব্বলতাশীল ভিত্তির ওপরে জাতীয় অন্দোলনকে খাড়া করার চেষ্টা করা, অগ্রগামী রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সহিত প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক প্রোগ্রাম (কর্ম্মতালিকা) কে একীভূত করার চেষ্টা করা,—এ সবই হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়ত্বের (ন্যাশ্‌নালিজমের) বর্ত্তমান দৌর্ব্বল্যের মূলীভূত কারণ।

জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ যতটুকু ব্যাপক গণ-আন্দোলনে হবে ঠিক ততটুকুই মাত্র তা সফলকাম হতে পারে। জাতীয় আন্দোলন তখনি ব্যাপক গণ-আন্দোলন হতে পারে যখন এর লক্ষ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি জনগণের লক্ষ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি হবে এবং এর সংগঠন জনগণ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। আমাদের এ কর্ত্তব্য অনেকগুলো সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আশা করা যাচ্ছে, এ পুস্তকে এ সকল সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে ও জাতীয় আন্দালনের যথাবশ্যক বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কিছু লেখার চেষ্টা করা হবে।

ভারতে শোষণবাদ—এর পুরাতন ভিত্তি

যুদ্ধের সময় হতে ভারতে শোষণবাদের নীতি এক নূতন ও বিশিষ্ট স্তরে পদার্পন করেছে; ১৯১৬-১৮ সনের শিল্প-কমিশন, মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট ও "সংস্কারাবলী" এবং ফিস্‌ক্যাল্ (রাজস্ব বিষয়ক) কমিশন ও তার আনুষঙ্গিক শাসন-নির্ব্বাহক বন্দোবস্ত সমূহ—এ সবই হচ্ছে নবনীতির ক্রম বিকাশ। নব শৈল্পিক সাহসিকতা ও ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে প্রবেশ করণের জন্যে ভারতে বৃটিশের অজস্র মূলধন ছড়ানো হতেই এ নব নীতির প্রকাশ পেয়েছে।

এ পরিবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক তথাকথিত "নিয়মানুগত সংস্কার সমূহের" (Constitutional Reforms) আপাত মনোরম ও ভ্রমাত্মক ধরণের দ্বারা এর বিস্তৃতি ও গুরুত্ব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তথাপি জাতীয় আন্দোলনের ভবিষ্যতের জন্যে এ পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

বৃটিশ শাসনাধীনে ও বৃটিশের টাকা লগ্নিকারীদের লাভের জন্যে নূতন নীতি ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানময় হওয়ার দিকে চালিয়ে নিচ্ছে। অনুন্নত কৃষি-ভারতের পরিবর্ত্তে (উন্নত শাসকগণের সুবিধের জন্যেই অনুন্নত রাখা হয়েছিল) সম্মুখে রাখা হয়েছে "অগ্রসর" "উন্মুক্ত" ও "শিল্পানুষ্ঠান পূর্ণ" ভারতের দৃশ্য। কিন্তু এও করা হয়েছে বৈদেশিক প্রভুত্বের দ্বারা ও ভারতীয়দের মধ্যে তার পরাশ্রিত এজেণ্টগণের দ্বারা সমভাবে বরঞ্চ আরো অধিকতর যোগ্যতার সহিত লুণ্ঠনেরই জন্যে।

এ নূতন নীতি হচ্ছে শোষণবাদের আধুনিক বিস্ময়মূ উন্নতির একটা অংশ। এর দ্বারা ভারতের সামাজিক অবস্থা সমূহের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে এবং তাতে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের ধরণেরও আকারগত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা সমূহের গতি এত বেশী দ্রুত যে বাহ্য দৃশ্যের পরম্পরাগত আকার সমূহ ও প্রচলিত চিন্তাধারাকে অতিক্রম করার ভয় এর রয়েছে।

নবনীতির গুরুত্বের বিচার করার জন্যে পুরাতনের ধরণ কিরূপ ছিল প্রথমে তা বুঝে নেওয়া আবশ্যক।

১। যুদ্ধের পূর্ব্বের বৃটিশ শাসন

ভারতে শোষণবাদের পুরাতন ভিত্তি কি ছিল ? এটা হচ্ছে প্রথম জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন।

বৃটিশ ভারতবর্ষে দোকানদার ও ব্যাপারী রূপেই এসেছিল। তাদের বিজয়ের ক্রম লাভ করার ক্রমেরই একটা অংশ মাত্র ছিল এবং তা লাভের উদ্দেশ্যের বশীভূতও ছিল। বৃটিশের আপন ঐতিহাসিকগণই বিজয় ব্যাপারটাকে কেবল মাত্র "আকস্মিক ঘটনা" নামে অভিহিত করেছেন। ভারতবর্ষের সহিত বৃটিশ সংস্রবের এই মৌলিক অর্থনীতিক ভিত্তি, আকারের নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে আজকের দিন পর্য্যন্ত বজায় রয়েছে। কিন্তু, অর্থনীতিক শোষণের আকারের নানা পরিবর্ত্তনই হচ্ছে পরবর্ত্তী রাষ্ট্রনীতিক স্তর সমূহের উন্নতির অর্থাৎ ভারতের অধিবাসিগণের পরাধীনতার কারণ।

ভারতের সাথে বৃটিশ সংস্রবের তিনটে যুগকে পৃথক ভাবে দেখানো খুবই সম্ভব পর।

প্রথম যুগে বৃটিশ দুঃসাহসিক বণিকরূপে এসেছিল। এটা ছিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগ। তখন ব্যবসায় ও লুণ্ঠনের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্পই ছিল। সে সময়ে ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে অধিকতম সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। ভারতকে লুণ্ঠন করে লাভের মাত্রা এত বেশী চড়েছিল যে তা গল্পাত্মক বলে মনে হয়। সাধারণ ভাবে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর লভ্যাংশ বছরে শতকরা ১০০, ১৫০ ও ২৫০ পর্য্যন্ত দেওয়া হত। এ ছাড়া কোম্পানীর এজেন্ট ও চাকরগণ ব্যক্তিগত ভাবে যা মেরে নিত তা'তো ধরাই হয়নি। এ রীতি অনুসারেই ভারতের সামাজিক অস্থৈর্য্য ও বিশৃঙ্খলতার সময়ে ভারতীয়দের সাহায্যেই (প্রকৃত পক্ষে উন্নতিশীল ভারতীয় ব্যাপারীগণের সাহায্যে এবং আগে থেকে টলটলায়মান ফিউডাল (জায়গীরদারী) শাসন পদ্ধতির ধ্বংসস্তূপের ওপরে) তাদের ভারত বিজয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এরূপে এই বৃটিশ ব্যবসায়ী কোম্পানী বৃটিশ ধনিকবাদের প্রতিনিধি রূপে ভারতের ক্রমবর্দ্ধিত অংশের প্রভুত্ব সাক্ষাৎ ভাবে লাভ করেছিল।

—*—

বুর্জুয়াজি (Bourgeoisie)—আধুনিক ধনিকগণ, সামাজিক উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকগণ এবং ভাড়াটে মজুরদের নিয়োগ কর্ত্তৃগণ। মজুরগণ উৎপাদনের উপায়ের মালিক হতে না পেরে বেঁচে থাকার জন্যে তাদের শ্রমশক্তিকে বুর্জুয়াজিগণের নিকটে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। এরূপ মজুরগণকে **প্রোলেটারিয়েট** (Proletariat) বলা হয়।

——*——

ট্রেড্ ইউনিয়নিজম
বা
শ্রমিক সঙ্ঘবাদ

—:*:—

(এ প্রবন্ধটি একজন বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদীর লেখা। তিনি ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে এসে এ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। বোম্বের "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড" নামক ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদকের কৃপানুমতি নিয়েই আমরা প্রবন্ধটি "গণবাণী"তে প্রকাশ করলেম। এর প্রথম প্রবন্ধ বিগত ১৪ই এপ্রিল তারিখের ১০ম সংখ্যক "গণবাণী"তে প্রকাশিত হয়েছে।)

প্রাথমিক ইতিহাস

শ্রমিক আন্দোলনের আরম্ভ ও প্রারম্ভিক সংগ্রাম সমূহের বিষয় জানিতে হলে আমাদিগকে সে সময়কার বৃটিশ ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে যে সময়ে বৃটেন ফিউডালিজম বা জায়গীরদারীর বন্ধন হতে আপনাকে মুক্ত করছিল। সমগ্র জগতেই অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের এরূপ উন্নতি হয়েছে কিংবা হচ্ছে এবং প্রত্যেক জায়গার আন্দোলনের এক একটা বিশিষ্ট দিক্‌ও আছে। তা সত্বেও সকল জায়গার আন্দোলনই প্রধানত বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর অভিজ্ঞতারই দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এ কারণে সাধারণত বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনকে প্রাচীন বা মূল বলে ধরে নেওয়া হয়, যদিও তা কোনো প্রকারে নিখুঁত আদর্শ নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের শিল্প প্রধানত অনেক প্রকারের ব্যবসায় বা বণিক সমিতির (গিল্ডের) দ্বারাই রক্ষিত হত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্ত্তনের বিকাশ যেমন যেমন হয়েছে ঠিক তেমনিই এ বণিক সমিতি গুলিরও পরিবর্ত্তন হতে হতে সে গুলি ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সঙ্ঘে বিবর্ত্তিত হয়েছে। এ কথা সত্য হতে পারে যে কোনো কোনো বণিক সমিতি বিবর্ত্তনের প্রক্রিয়ার দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘে পরিণত হয়েছে, কিন্তু মত হিসাবে এ বিবর্ত্তনের যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত পক্ষে বণিক সমিতি (গিল্ড) আর ট্রেড্ ইউনিয়নের মধ্যে গঠন ও কার্য্য প্রণালী উভয় দিক থেকেই মৌলিক পার্থক্য ছিল। তারি আলাচনা আমরা এখন করব।

বিশিষ্ট ব্যবসায় বা শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেই বণিক সমিতি গুলি অস্তিত্বে এসেছিল। বিশিষ্ট শিল্পের সকল ব্যবসাদারই এ সমিতির সভ্য হতে পারত। কারিগর হতে আরম্ভ করে শিক্ষানবিস পর্য্যন্ত কেউই বাদ পড়তনা। এ সমিতিগুলির কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল—উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করা, শিক্ষানবিসের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা, উৎপন্ন দ্রব্য উচ্চতম মূল্যে বিক্রয় করা এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা। সমিতির সমৃদ্ধি তার সভ্যগণ অনুপাত অনুসারে ভোগ করত। এখানকার

সংগ্রাম মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ছিলনা। সাধারণ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমগ্র শিল্পটাকে উচ্চতম আদর্শে প্রতিষ্টিত রাখাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

উৎপাদনের উপায় সমূহের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে অবস্থাগুলিও বদলে গেল। সাধারণ শ্রমিক তখন আর উৎপাদনের উপায়ের মালিক থাকতে পারলেনা, তাকে বাধ্য হতে হলো তার শ্রমশক্তিকে কোনো প্রভুর নিকটে বিক্রী করতে। এর ফলে দু'টো মণ্ডলীর সৃষ্টি হল,—এক দিকে মালিকগণ এবং অন্যদিকে সম্পত্তিহীন শ্রমিকগণ। বণিক সমিতিগুলি ছিল সমগ্র শিল্পটার রক্ষণাবেক্ষণের সংগঠন, পক্ষান্তরে ট্রেড্ ইউনিয়ন বা শ্রমিক সঙ্ঘগুলি ছিল সম্পত্তিহীন শ্রমিকগণের সংগঠন-যার দ্বারা তারা তাদের উৎপন্ন ধনে আরো অধিকতর অংশ পাওয়ার জন্যে তাদের মালিকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত।

প্রাথমিক আকার ও তার বহির্দৃষ্টি

আমরা এখন আমাদের মনোযোগ প্রদান করব প্রাথমিক শ্রমিক সঙ্ঘগুলির আকার ও উদ্দেশ্যের প্রতি। স্বভাবতই যেমন আশা করা যায় সংগঠনের এ প্রাথমিক প্রচেষ্টার সহিত আজকালকার দিনের শ্রমিক সঙ্ঘের তফাৎ অনেক বেশী। তখনকার সঙ্ঘগুলি গঠিত হয়েছিল নূতন শত্রু—ধনিকগণের সহিত যুদ্ধ করার জন্যে। সে সময়ে ধনিকবাদ যে পরিবৃত্তির সৃষ্টি করেছিল স্বভাবতঃ তারি অনুরূপেই সঙ্ঘগুলো গঠিত হয়েছিল। ফলে, সকল দিক্ থেকেই সেগুলো অপরিণত ছিল।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণ রাজনীতিক হিসাবে ধনিকবাদ যে কি তা বুঝতেই পারেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন মেশিনই যত অনিষ্টের মূল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল জনগণের মুক্তি নির্ভর করছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ওপরে নয়, পরন্তু, মেশিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শিল্পের পূর্ব্বাবস্থাতে ফিরে যাওয়ার ওপরে। এদিক থেকে তাঁরা উন্নতির পরিপন্থিই ছিলেন। অবয়বের দিক থেকে সঙ্ঘগুলি বিশিষ্ট ব্যবসায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আর তাদের প্রকৃতিও ছিল নিতান্ত স্থানীয় ধরণের। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের প্রশস্ততর মূর্ত্তি তখনো পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি। ধনিকবাদও তখন সংগঠনের প্রথম স্তর অতিক্রম করতে পেরেছিলনা। তার ফলে স্থানীয় সঙ্ঘগুলো উপস্থিত সংগ্রাম চালানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সঙ্ঘসমূহের প্রধান কাজ ছিল শ্রমিকগণের অবস্থার উন্নতি করা এবং নিয়োগকর্ত্তৃগণের অনধিকার হস্তক্ষেপকে প্রতিরোধ করা। এছাড়া রোগীর ও বেকারের জন্যে বন্দোবস্ত করার স্কীমও তাদের আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বণিক সমিতি সমূহের ন্যায় তারাও বিশিষ্ট ব্যবসায়ের নাম বজায় রাখতে চেষ্টা করত এবং জানা কারিগর ছাড়া কোনো শিক্ষানবিশ যেন নেওয়া না হয় তার জন্যে নিয়োকর্ত্তাকে বাধ্য করত।

সঙ্ঘগুলিকে মানিয়া লওয়ার জন্যে সংগ্রাম

যতই দোষ থাকুক না কেন প্রাথমিক শ্রমিক সঙ্ঘগুলো মালিকগণ ও গবর্ণমেণ্টের মনে অনেকটা ভীতির সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিল। আকারে ছোট হলেও তাদের সংখ্যা অনেক ছিল এবং তারা খুব কর্ম্মপটুও ছিল। তারা তাদের অস্তিত্বকে অনুভব করাতে যেই মাত্র আরম্ভ করেছিল তার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের উচ্চস্তর তাদেরকে ভেঙে দেওয়ার জন্যে দাবীকরাও আরম্ভ করেছিল। নিয়োগকর্ত্তৃগণের দাবীর ফলে গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৯ ও ১৮০০ সনের কম্বিনেশন এক্ট পাস করেন। এ আইনের দ্বারা শ্রমিক সমিতি গুলো বে-আইনি বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু, এর দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের উন্নতিতে কোনো বাধা পড়েনি। পক্ষান্তরে শ্রমিক আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। ধর্ম্মঘট ও বয়কটের দ্বারা এবং অন্য অনেক প্রকার কার্য্য প্রণালীর দ্বারা বে-আইনি হয়েও শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহ তাদের নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে খুব ফলপ্রদ সংগ্রাম চালাতে সমর্থ হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে তাদের অস্তিত্ব এত সুস্পষ্ট ছিল যে তাদের অনুমিত বে-আইনি হওয়াটা একটা প্রহসনে পরিণত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট ১৮২৫ সালে কম্বিনেশন এক্ট তুলে দিয়ে ট্রেড্ ইউনিয়ন সমূহের বৈধ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এ সময়ে ইউনিয়নগুলি প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আরো অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এখন তারা মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অধিকতর সমর্থ হওয়ায় তারা শ্রমিক শ্রেণীর বৃহত্তর সমস্যা সমূহের প্রতি মনোযোগ প্রদান করে। তাদের যাবতীয় অভিযোগ, তা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধেই হোক্ কিংবা সমগ্র প্রণালীর বিরুদ্ধেই হোক্, তারা আবেদনের দ্বারা পার্লামেণ্টের গোচরীভূত করে। এ উপায়ের দ্বারা তাদের লোকপ্রিয়তা বেড়ে যেতে থাকে এবং তারা আরো অধিক সংখ্যক ইউনিয়ন গঠন করতে যেমনি সমর্থ হয় ঠিক্ তেমনি সমর্থ হয় গঠিত ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যা বাড়াতে। এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অসংখ্য আবেদন যে ভাবে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নামঞ্জুর হল তা থেকে তাদের এ শিক্ষা হল যে তাদের মালিকগণের চেয়ে গবর্ণমেণ্ট কোনো অংশে কম বিরোধী নয়। ফলে, আন্দোলনের নেতৃগণ আন্দোলনকে যথাবিহীত রূপে বিন্যস্ত করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। তাতে শ্রমিক আন্দোলন সমাজে স্থায়ী ও তেজপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়। এ সময়ে এমন অবস্থা ঘটল যার ওপরে ইউনিয়নগুলির কোনো হাত ছিলনা এবং যার দ্বারা সেগুলি প্রায় বিলীন হয়ে যায়।

চীনের বিপ্লব

[আবদুল হালীম]

—:০:—

বর্ত্তমান সময়ে সারাদুনিয়ার বিশেষ করে ভারতের অধিবাসীদের নজর পড়েছে মহাচীনের মহাজাগরণের দিকে। হিমালয়ের অপর পারে প্রাচীর বহু পুরাতনতম দেশ চীন অতীতের মোহ-ঘুমঘোর-তন্দ্রালস-সুপ্ত লুপ্তচেতনা, আফিমের কূট তীব্র নেশার ঘোর কাটিয়ে জেগেছে! বীরদর্পে, বীরতেজে প্রবলবিক্রমে, উদ্যমের সাথে জেগেছে। চারিদিকে আজ নব

জাগরণের সাড়া পড়েছে। আজ রণদুন্দুভি বেজে উঠেছে চীনের বন্দরে বন্দরে, শহরে শহরে ও প্রতি পল্লী জনপদে। অদ্যকার এ উত্থান কেবল জয় পরাজয়ের নয়, নূতন নূতন দেশ জয়ের বিজয় উল্লাস উন্মাদনাও নয়। এ জাগরণ, এ যুদ্ধ বিপ্লব জাতির জীবন মরণের যুদ্ধ, একটা জাতির ভাগ্যের আমূল পরিবর্ত্তনের জাগরণ। এর ওপরে নির্ভর করছে ভবিষৎ চীনের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রন। এই উত্থানের সাথে সাথে ভবিষৎ চীনের যে নব শক্তি জন্ম লাভ করবে ইহা তার সূচনা এবং পূর্ব্বাভাষ মাত্র। বর্ত্তমান চীনে যে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে তাহা কেবল স্বার্থপর শোষক, অত্যাচারী রাজশক্তি দ্বারা চালিত যুদ্ধ নয়, শুধু শিক্ষিত বিপ্লববাদীদেরও বিপ্লব প্রচেষ্টা এ নয়, এ জাগরণ অগণিত জনগণের জাগরণ। শ্রমিক কৃষক যারা যুগ যুগ ধরে চীন দেশীয় রাজশক্তিবর্গের অত্যাচারে পঙ্গু, হীন এবং নির্বীর্য্য হয়ে পড়েছে, যারা অত্যাচারিত পর-পদ-লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, যাদের ওপর দিয়ে বহুবর্ষ ধরে একাধিক্রমে সমান ভাবে অত্যাচরের ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে রাজশক্তি যাদের ওপর কঠোর অত্যাচার ও নৃশংস ব্যবহার করেছে সেই ৪০ কোটী চীনের অধিবাসী আজ জেগেছে তাদের অতীতের সব সংস্কার দূরে নিক্ষেপ করে তাদের পুরোপুরি অধিকার বুঝে নেবার জন্যে।

পরধনলোভী, হিংস্রক বৃটিশ শোষণবাদীরা সুদূর ইংলণ্ডের উপকূল থেকে গিয়ে একে একে অতি নিপুণতার সহিত চীনের বন্দরগুলো দখল ক'রে বাণিজ্যের হাটে তাদের এক চেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। চীনের সমুদ্র তীরের শহর গুলিতে কলকারখানা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চীনের অধিবাসীদের জঘন্যভাবে শোষণ করছে। ধীরে ধীরে জোঁকের মত চীন দেশের ধন সম্পদ তারা শোষণ করতঃ চীনেদের দাসত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছে—তাদের দাস-জীবনের কারণ হয়েছে। সমস্ত মিলিত ইম্পিরিয়েলিষ্ট শক্তিবর্গ চীনদেশের ওপর প্রভুত্ব করছে। অতীতের সহজ সরল প্রকৃতির স্বাধীন চীনেরা তাদের পূর্ব্ব জীবন যাত্রা ভুলে গিয়ে শোষণবাদের দাসত্ব নিগড়ে শৃঙ্খলিত হয়েছে। আজ তার হস্তপদ দৃঢ়ভাবে বাঁধা রয়েছে। মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার জন্য তাই সে ছটফট করছে। চীনের যে বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন তাকে একাধারে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিপ্লব দুই ই নামে অভিহিত করা যেতে পারে। বৈদেশিক শোষণবাদীদের সহিত সংগ্রামে চলেছে ; তাই একে যুদ্ধ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া চীনের লোকেরা এক ঘরোয়া যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে—তাহা চীনের অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত। তবে আসল বিপ্লব এখনো বহুদূরে। এখনো প্রকৃত বিপ্লবের বহ্নি-ধূম্র শিখা দেখা দেয়নি। ধীরে ধীরে উক্ত বিপ্লবস্রোত চতুর্দ্দিক প্লাবিত করবে। চীনদেশের শতকরা আশিজন লোক কৃষক, চাষ-আবাদ করে তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেই কৃষক সম্প্রদায় এখনো সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবের স্রোতে নিজেদের আহুতি দেয়নি। তাদের মধ্যে খুব দ্রুত প্রচার কার্য্য চলেছে। চারিদিকে কৃষক আন্দোলন চলেছে কৃষকদের বিপ্লব সেনানীরূপে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা খুব নিপুণভাবে চলেছে। তাদের বিপ্লবে যোগদানের একটা স্বাভাবিক সূত্র বিদ্যমান রয়েছে, কেননা তারাই সব চেয়ে বেশী অত্যাচারিত শোষিত। তারা যে দিন সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিবে—সে দিন বিপ্লবের গতি বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হবে।

চীনের চার পাঁচটী জাতীয়দল বিভিন্ন প্রদেশে বিপ্লবের কার্য্যে ও যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত আছে। ক্যান্টন, পিকিং হুনান, হংকো হুপে প্রভৃতি স্থানগুলি চীনের কুমিণ্টাং বা জাতীয় দলের নেতৃত্বে বা এই দলের বিশিষ্ট কয়েক জন কম্যুনিষ্টের দ্বারা পরিচালিত। ইয়াংসী উপত্যকার দু'ধারে কুমিণ্টাংদল তাদের প্রচার কার্য্য চালাচ্ছে। কুমিণ্টাংদলের ভিতরেও যে বিরোধ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, কেননা সকলে এখনো ডাক্তার সান ইয়াৎসেনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁর পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত মতে চলবার শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হয় নি। ডাক্তার সেন যে পদ্ধতিতে বিপ্লব চালিয়ে এসেছিলেন, তাঁর অনুসৃত নীতি যদি সকলে মেনে নিতেন কিংবা সোভিয়েট নীতিতে বিশ্বাসবান হয়ে যদি চলতেন তা হলে শোষণবাদীরা এতদিনে ঘায়েল হয়ে যেতো। শুধু দেশের জাতীয় জাগরণের ওপরে বিশ্বে বিপ্লবজয়ী হওয়া সম্ভবপর নয়, তাই প্রত্যেক দেশের বিপ্লব আন্দোলনের গতি আন্তর্জাতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—কেননা এই যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন তাহা কৃষকদের ও সর্ব্বহারা শ্রমিকের আন্দোলন।

চীনের যুদ্ধ একটা বড় বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার। একদিকে পুরাতন রাজবংশীয়দের পদচ্যুত করে তাদের স্থলে যারা দেশ শাসন করছে ও আপন আপন প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক এক একটা প্রদেশের মালিকরূপে বিরাজমান তারা বা তাদের অধীন যোদ্ধৃগণ চীনের জাতীয় দলের নেতাদের বিপক্ষে অবিরত সংগ্রাম চালাচ্ছে। ইহাদের কেহ কেহ বৃটিশ শোষণবাদীদের আশ্রিত এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারী। তারা নিজেদের বিক্রয় করে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় দলের সাথে যুদ্ধ করছে। চ্যাং সো লীন, উই-পে-ফু, সান, প্রভৃতি দেশীয় যোদ্ধৃবর্গ আজ প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে, এবং সমবেতভাবে জাতীয়দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। এমন কি চ্যায়াং-কৈ-সেকের মত জাতীয় সেনানীও স্থির মস্তিষ্ক হয়ে কাজ করতে পারছে না। সংবাদ পত্রের খবর যদি বাস্তবিক সত্য হয় তা হলে বলতে হবে কুমিণ্টাংদল এখনো পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়নি। তবে এই সমস্তের ভিতর যে গূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে তাহা আমাদের খুব সতর্কতার সাথে বুঝে নিয়ে তবে চীনের মত একটা বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্রত্যেক মুক্তির সংগ্রামেই যারা নরমপন্থী তারা কিয়ৎদ্দূর অগ্রসর হওয়ার পরই রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন ক'রে থাকে। বিপ্লব পন্থীদের ওপরেই যাবতীয় কাজ ও তার সাফল্য নির্ভর করছে।

চীনদেশ একটা বৃহৎ দেশ। একদিকে রুষিয়ার প্রান্তদেশ হতে ভারতের উত্তরে হিমাচলের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত—অপর দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি পর্য্যন্ত প্রসারিত। সোনা, রূপা কয়লা, হীরা প্রভৃতি নানা খনিজ সম্পদে সম্পদশালিনী চীন এখনো শোষণবাদীদের লুণ্ঠনের একমাত্র বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিরূপে চীনদেশকে কৌশলে হাতের মুঠোর ভিতর এনে তদ্দেশজাত যাবতীয় সম্পদ সম্পূর্ণরূপে যাতে উপভোগ করতে পারা যায়—ইম্পিরিয়েলিজমের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। ধনিকতন্ত্র বিশ্বের পরাধীন ও তথাকথিত স্বাধীন দেশ সমূহের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবার জন্যে কত প্রকারের যে কুহক জালের সৃষ্টি করেছে তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান জগতে যত যুদ্ধবিগ্রহ, অনুষ্ঠিত হচ্ছে—তাহা আর রাজায় রাজায় বা রাজায়প্রজায়

যুদ্ধ নহে—পূর্ব্বের ন্যায় কর আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর সৈন্য বাহিনীর অভিযানও আর হয় না। বর্ত্তমানে পৃথিবীর যে যুদ্ধ বিপ্লব তাহা শোষিত ও শোষকদের যুদ্ধ। পৃথিবীর একশত সত্তর কোটি অধিবাসীর অধিকাংশই শ্রমিক ও কৃষক। তাদের শোষণ করা সমস্ত শোষণবাদী শাসকদের একত্র সমাবেশ এবং বড় বড় ধনিক বণিকের সহায়তা ব্যতীত কোনো দিন সম্ভবপর নয়। তাই চীন দেশের যে যুদ্ধ তার এক দিকে বৃটিশ জাপান ফ্র্যান্স, আমেরিকা প্রভৃতি ইম্পিরিয়েলিষ্ট ও তাদের আশ্রিতগণ—অন্য পক্ষে লক্ষ লক্ষ; মূক, সর্ব্বহারাদল, কৃষক, মুটে মজুর, মেষ-পালক, জিপসী ও অসংখ্য বেকারের দল। তাদের এই যে জাগরণ তাহা তাদের সনাতন শাশ্বত দাবীর জাগরণ—মুক্তির ও খাওয়া-পরার জন্য জাগরণ। অনশন কষ্ট, দুঃখ দারিদ্র্য-তাড়িত জনগণ তাদের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য জাগ্রত হয়েছে। এই যে সনাতন, শাশ্বত জাগরণ—তাকে দমন করার জন্য বৃটিশ শোষণ-বাদীরা কেবল বলশেভিক আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রে পরাধীন দেশ সমূহের অন্তরে একটা ভয়ের সঞ্চার করে দিচ্ছে। বলশেভিকদের নামে মিথ্যা প্রচার কার্য্য চালিয়ে তাদের ওপরে কলঙ্ক কালিমা লেপন করছে। পৃথিবীর লোকের কাছে বলশেভিকদের নরখাদক অত্যাচারী দস্যু এবং রাক্ষসের সহিত তুলনা করা হয়েছে। লেনিন, ট্রট্‌স্কী, চিচারিণ, স্তালীন, বরোদিন, কারাখান প্রভৃতি বিশ্ব প্রেমিক কর্ম্মী তপস্বীদের চরিত্র খুব খারাব ভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। বৃটিশ শোষণবাদীরা তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য উপলব্ধি পূর্ব্বক—যত প্রকারে সম্ভব অন্যায় প্রচার কার্য্যের দ্বারা লোকের অন্তর বিষময় করে তোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের বোঝা একান্ত আবশ্যক যে রুষ বা বর্ত্তমান সোভিয়েট সঙ্ঘ তাদের সাম্রাজ্যিক প্রসারতা বাড়ানোর জন্য বিশ্ব-বিপ্লবে ব্রতী হয়নি। রুষ চায় ইম্পিরিয়েলিজমের সাথে পরাধীন ও তথাকথিত স্বাধীন দেশ সমূহের একটা শেষ বোঝাপাড়া হোক। একটা বিশ্বব্যাপী বিপ্লব ছাড়া ইহার শেষ মীমাংসা হবে না। শুধু চীনদেশ কেন, ভারতবর্ষ, জাপান, যাভা, মিসর, মরক্কো, জগতের আর আর নিপীড়িত পরাধীন দেশ সমূহ—যে সব শোষণবাদীদের দ্বারা শোষিত তাদেরও ভাগ্য এই চীন বিপ্লবের সাথে সাথে নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। চীনের পর ভারতবর্ষ, যাবা ইত্যাদি দেশে একটু একটু চেতনার সাড়া পড়েছে।

বৃটিশ শোষণবাদের শোষণের তিনটী প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত রয়েছে—ভারতবর্ষ, উপনিবেশ সমূহ ও চীন দেশ। ঔপনিবেশিক শোষণনীতির কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব না। তবে ভারতবর্ষ ও চীনের বিষয় একটু আলোচনা করা যাক্—প্রায় দু'শত বৎসর হতে চল্‌লো ভারতকে সহস্র প্রকারে শোষণ-পূর্ব্বক বর্ত্তমান সময়ে আরো পুরোপুরি ভারত বর্ষকে লুণ্ঠন করার মতলবে—তারা নূতন অর্থনীতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ভারতের শ্রমিক ও কাঁচামাল অপরিমিত সস্তা। এই সমস্তকে শোষণের উদ্দেশ্যে এ দেশের ধনিকদের সহায়তায় বড় বড় কারখানা খোলা হচ্ছে। এ দেশের ধনিকদের হাত করে বৃটিশ শোষণবাদ আপনার ভিত্তি সুদৃঢ়তর করে নিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক টাটার বৃহৎ লৌহ কারখানা। টাটা কোম্পানীকে ১৫ কোটী টাকা সাহায্য করা হয়েছে। বাণিজ্যের বাজারে অপর দেশীয় ব্যবসায়ীরা পণ্য আমদানী করে যাতে ভারতের লুণ্ঠনে ভাগ বসাতে না পারে—এবং ভারতের শোষণের ওপর বৃটিশ শোষণবাদের দখলী স্বত্ব কায়েম হয় এবং প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে কেহ দাঁড়াতে না পারে তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় ধনিকদের সাথে একটা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাদেরকে শোষণের বাজারে অংশীদার রূপে স্বীকার করে নিয়েছে। এদেশের ধনী অভিজাত শ্রেণীর চিত্তে একটু অসন্তোষ এবং চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের শোষণের পথে বাধা পড়াতে তারা বৃটিশ শাসনের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারছিল না, কাজেই, সময়ে সময়ে তারা কিছু কিছু আন্দোলন চলাচ্ছিল তাদের অধিকারকে আরো একটু বাড়ানোর জন্যে। যুদ্ধের সময় হতে তারা সে অধিকার অনেকটা পাচ্ছে—স্বদেশী যুগের শুরু থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যত আন্দোলন চলেছে তাদের পুরোহিতদের প্রতি দৃকপাত করলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হবে যে নেতারা কত শীঘ্র শীঘ্র তাদের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করতে পারে। বর্ত্তমান স্বরাজ্য দল ও অন্যান্য দলের কার্য্য প্রণালীর দিকে তাকালে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হবে। এই তো গেল ভারতের কথা।

এখন চীনের কথা :—চীন দেশকে আন্তর্জাতিক ইম্পিরিয়েলিষ্টরা সমগ্র ভাবে শোষণ করছে—চীন দেশে মিসনারী পাঠিয়ে প্রভু যীশুর নামে এবং ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তায় চীনের বাজারে তাদের বাণিজ্যের প্রসারতা বাড়িয়েছে। এক শত বছরের ভিতর চীনদেশকে শতধাবিভক্ত করে তাকে সামাজিক, আর্থিক দিক থেকে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে। বৃটিশ পণ্য চীনের বাজার দখল করে চীনের সমস্ত কুটীর শিল্পকে নষ্ট করেছে—এবং চীনের খনিজ সম্পদ ভোগ করার জন্য মিলিত শোষণবাদীরা চীন দেশে স্থির ভাবে আড্ডা গেড়ে বসে আছে। বক্সার যুদ্ধের পর থেকে চীন দেশকে কায়েমী ভাবে ভোগ দখল করার নিমিত্ত অনেক ফন্দীও করেছে। আজ আবার চীনেরা আফিমের নেশা কাটিয়ে জেগেছে দেখে শোষণবাদীরা প্রমাদ গণেছে। তাই, সাজ সাজ রব পড়েছে। যুদ্ধ জাহাজ, ট্যাঙ্ক, বিমান ও বিবিধ প্রকার মারণ অস্ত্র চীনের বন্দরে প্রেরণ করছে। ভারত থেকেও সৈন্য চালান দেওয়া হচ্ছে। বৃটিশ শোষণবাদীরা নিরীহ চীন শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ চীনে শ্রমিকদের পাশবিকভাবে হত্যা করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র ও নিরস্ত্র শ্রমিকদের গুলি করে মারা হয়েছে। ওয়ানসিনে গুলি চালিয়ে শহরটীকে বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত করা হয়েছে। গানবোট হতে অনর্গল গুলি বর্ষণ করতঃ ইয়াংসী নদীর উভয় তীরের জনপদ সমূহের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। বৃটিশ শোষণবাদী শাসকেরা চীনের বুকের ওপর অত্যাচারের চূড়ান্ত করেছে। বীভৎসভাবে স্ত্রীপুরুষ ছেলেদের হত্যা করেও এতটুকু প্রকৃতিস্থ হতে পারছেনা। ছলে বলে কৌশলে যাতে জাতীয় বা কুমিণ্টাংদলের ভিতর ভাঙন ধরে তজ্জন্য অহরহ বিরুদ্ধ আন্দোলন চালাচ্ছে। ঘুষদিয়ে লোককে বশীভূত করছে। এবং রুষের সোভিয়েট প্রতিনিধিদের ওপর বলশোভিক বা রেডপ্রোপেগেণ্ডার ঝাল ঝাড়া হচ্ছে। এমন কি কুমিণ্টাংদলের জাগরণকে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব নামে আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। চীনের কম্যুনিষ্টরা চীনদেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন চালাতে যাতে অকৃতকার্য্য হয় তার জন্যে তাদের চেষ্টার অবধি নেই। বার্কেনহেড, চার্চ্চিল, চেম্বারলেন প্রভৃতি পার্লামেন্টী কর্ত্তারা 'গেল

রাজ্য গেল মান' বলে চীৎকারে জগৎ কম্পিত করে তুলছে ও চীনে যুদ্ধনীতির সমর্থন করছে। তাদের ঐ একই যুক্তি "বৃটিশের প্রাণ বিপন্ন"। বৃটিশ শোষণবাদী শাসকদের মনে রাখা উচিত চীনে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন রুষিয়া হতে আমদানী জিনিস নয়। চীনের কৃষক ও শ্রমিকরা বহুদিন হতে তাদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত—তারা দুঃসহ কষ্টে দৈনন্দিন জীবন যাপন করছে। ডাক্তার ইয়াৎসেন তাদের বিপ্লব গুরু—তিনি দেশের লোকের দুঃখের, অভাবের কথা হৃদয় হতে বুঝে ছিলেন। তাই তিনি সর্ব্বহিতে আজীবন অশেষ দুঃখ লাঞ্ছনা গঞ্জনা, সহ্য করেছেন—দেশের স্বাধীনতার জন্য বরাবর নির্ব্বাসিত হয়েছেন। বহুবার তাঁর প্রাণ বিপন্ন হয়েছে—তবুও তিনি তাঁর কর্ত্তব্য হতে বিচলিত হননি। তাঁর কার্য্য যেই সফল হয়ে আসছিল, অমনি তিনি ধরাধাম হতে চলে গেলেন। তাঁর শিক্ষা দীক্ষার অনুপ্রাণিত হয়ে যারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তারা বুঝেছেন শুধু শ্রেণী বিশেষকে নিয়ে বিপ্লব আন্দোলন চালানো যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভব পর নয়। তাই কারখানার শ্রমিক, মুটে মজুর, কৃষিক্ষেত্রের চাষী, মেষপালক, প্রভৃতি নিপীড়িত জনগণকে নিয়ে তাদের এই অভিযান। ইহা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। জমীর মালিক হবে চাষী, শ্রমিক তার পরিশ্রমে ন্যায্য মজুরী পাবে। শোষণবাদীদের দূরে তাড়িয়ে দিতে হবে যাতে চিরকাল যেন তারা একটা দেশের বুকের রুধির পান করতে না পারে। কম্যুনিজম, যাহা বিশ্বের সর্ব্বহারাদের মূলমন্ত্র, তাহা থেকে কিরূপে তারা সর্ব্বহারা হয়ে দূরে সরে থাকতে পারে? আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র্য ও সৌহৃদ্যকে কিছুতে চীনের জনগণ পরিত্যাগ করতে পারে না। কেননা সোভিয়েটসঙ্ঘ চায় বিশ্বের ধনী শোষক ও অত্যাচারীদের পতন হোক—আর তার স্থলে বিশ্বসঙ্ঘ গড়ে উঠুক, মানুষের দুঃখ কষ্টের অবসান হোক! মানুষ, মানুষ। তারা মানুষের অধিকারে যেন বঞ্চিত না হয়। আজ আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন চীনা, জাপানী, নিগ্রো ও ভারতীয় নয়। আমরা চাই জগতের যে যে থানে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত তারা মানুষ। যে শোষণবাদী শাসকরা তাদের পদানত করে রেখেছে, তাদের দাস বানিয়েছে, তাদের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়েছে, সে শোষণবাদীদের ধ্বংস হোক।

চীনেরা জেগেছে আরো বেশী করে জাগুক, তাদের অন্তরের কালিমা মুছে যাক! তারা আবার মানুষের অধিকার ফিরে পা'ক। আমরা পরাধীন ভারতবাসী। পরাধীনতার বেদনা আমরা যেরূপ বুঝি—তাতে চীনের আন্দোলনের—বিপ্লবের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে—চীনের শ্রমিক কৃষকরা জয়ী হোক' ইহাই আমাদের কামনা।

নিখিল বঙ্গীয় যুবক সম্মিলন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

১৬ই তারিখে যুবক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন বসিয়াছিল। সভাপতির অভিভাষণ এবং কয়েকজন বক্তিয়ার খিলিজির বক্তৃতা প্রথম অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি প্রায় চারিটার সময় বসিয়াছিল। তীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক বুদ্ধি ও উচ্চাঙ্গের রাজনৈতিক জ্ঞান এই সভার অনিবার্য্য ভূষণ বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম। প্রস্তাবের খসড়া করিতে সভ্যগণ যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমরা আর কোনো আশঙ্কাই পোষণ করিব না।

সুভাষ বাবুকে গভর্ণমেণ্টের শর্ত্ত স্বীকার করিবার প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি হইয়াছিল। আদর্শ-পন্থী যুবকেরা আদর্শকে মারিয়া সুভাষবাবুকে বাঁচাইবার প্রস্তাবে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। আদর্শের জয় হোক, সুভাষ বাবু সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠান করুন—নিজের সমস্ত কর্ম্মশক্তিকে হত্যা করিয়া—এই রকম অভিপ্রায় অধিকাংশ সভ্যের অন্তঃকরণেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। অবশেষে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। প্রথম প্রস্তাবে ভারতবর্ষের বাহিরে, বাঙলার ও ভারতের যে সমস্ত কৃতী যুবক, ভারতবর্ষের খ্যাতিকে প্রচারিত করিয়াছেন তাঁহাদেরকে অভিনন্দিত করা হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, ও প্রোফেসর রাধাকৃষ্ণকে এই জন্য বাঙলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন কলহ বাঙলার যুবকেরা পসন্দ করেন নাই। রাজনৈতিক জীবনের এই গ্লানি অপসারণ করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর এই সংবাদ জানাইয়া একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। অন্তরীনদের মুক্তির প্রস্তাব, পোনাবালিয়ার দুর্ঘটনা এবং বিবাহ-রেগুলেশন আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত এবং গৃহীত হয়। পণপ্রথা নিবারণ অথবা বিবাহ রেগুলেটিং আইন সম্বন্ধে একটী দস্তরমত পার্লামেণ্টারি বিল্ জনৈক সভ্য পেশ করিয়াছিলেন। তাহাও গৃহীত হইয়াছে।

রাত্রে সুনিদ্রা হওয়ার পর কয়েকজন উৎসাহী সভ্য একটি পর্দ্দা সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ভাব বিনিময়ের আব-হাওয়া বহিয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে বাঙলার যুবকদিগের হাসিবার শক্তির কতকগুলি উপকরণ পাইয়া আমি খুসী হইয়া-ছিলাম। জ্ঞান-প্রদায়িণী, বুদ্ধি-উচ্চারিণী, প্রভৃতি গম্ভীরানন্দে মগ্ন না থাকিয়া এই দেশের যুবকেরা যে একটু হাসি-তামাসার চর্চ্চা করিতেছে তাহাতে অত্যন্ত প্রীতি বোধ করিয়াছি। মালদহ জিলা হইতে, কয়েকটী এ রকম সমিতির সংবাদ সম্পাদককে গোচর করান হইয়াছিল। তাহাদের একটির নাম Heart Failure's Association এবং অপরটী Grand Royal Adda, যথার্থভাবে অবসর উপভোগ করার মধ্যে জাতীয় শক্তিমত্তার অনেকখানি পরিচয় মিলিয়া থাকে। আমাদের আশা আছে, যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই সভায় পূরণ করিবে।

পরিশেষে বৃদ্ধ অমূল্য বাবুর যৌবন শক্তির পুনরুদ্গম হওয়ায় আলোচনা গম্ভীর হইতে একেবারে গম্ভীরতায় পরিণত হয়। সম্পাদক নরেশ বাবুর সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য অর্থাৎ গোঁফ ছাটাইয়া

ফেলিবার উদ্দেশ্যে সমিতি প্রচুর টাকা মঞ্জুর করেন। নরেশ বাবু যথেষ্ট আপত্তি জানাইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা টিকে নাই।

যুবক বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্র আর এক দিকে সুপ্রসারিত দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। যে বিপুল আয়োজন আহারাদির হইয়াছিল যুবক বাঙলা তাহার প্রতি অবিচার করেন নাই। এই ক্ষেত্রে তাহাদের সমবেত চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টা বিবিধ প্রকারে ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। সম্পাদক নরেশ বাবু লুচি খাইবার যে অভিনব কৌশলটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা কাজে খাটাইতে না পারিয়া অনেক সভ্যকেই হতাশ হইতে দেখা গিয়াছিল।

মাজুতে বাঙলার যুবকেরা সভা করেন নাই, উৎসব করিয়াছেন। এই লক্ষণ ভাল এবং সেইজন্য তাহাদিগকে আমরা সম্ভাষণ জানাই।

"মে-দিবস"

[পি, স্প্রাট্ বি-এ]

"গণবাণী"র জন্য লিখিত

শ্রমিক জগতের সর্ব্বত্র 'মে দিবস' বর্ত্তমান সময়ে শ্রমজীবী-দিবসরূপে সবিশেষ পরিগৃহীত হয়েছে। সবদেশে যেখানে যেখানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রমিক আন্দোলন চল্‌ছেসেখানে মে মাসের প্রথম দিবস শ্রমিকদের ছুটীর জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। এই তারিখে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বপ্রবৃত্তির সমস্ত সমিতি ও দলের এবং তাদের সহিত অসঙ্ঘবদ্ধ অগঠিত সমিতি এবং দলের স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা এবং অন্যান্য সকলে প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমস্বার্থতা প্রদর্শন করার নিমিত্ত একত্রিত হয়।

"একের ক্ষতি সকলের ক্ষতি" এই প্রাচীন আহবধ্বনি আজো পর্য্যন্ত এই পর্ব্বের প্রকৃত মর্ম্ম সুব্যক্ত করে। "ইন্টার ন্যাশন্যাল সঙ্গীত" এর যত বিপ্লবকর ব্যগ্রতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উৎসাহ-উচ্ছ্বাস সহই হচ্ছে এদের সঙ্গীত।

মে-দিবসের প্রফুল্লপ্রদ সাহচর্য্য, শীতঋতুর বিদায়, সমুজ্জ্বল সূর্য্য, এবং বিকশিত পুষ্প, পল্লবিত তরুর মনোরম শোভা নিয়ে গ্রীষ্ম ঋতুর আগমন সত্ত্বেও কিন্তু ইহা অতীতে প্রায়শঃ তীব্র কলহ এবং ভীষণ দুঃখের ঘটনায় পরিগণিত হয়েছে। ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলনের শৈশব অবস্থায় যখন সর্ব্ব-প্রথম 'মে-দিবস' অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন অগ্রণী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সমূহ হাতে পতাকা ও সাজসজ্জা নিয়ে তাদের স্বজাতীয়দের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অভিসম্পাত সহ্যকরেও পথে যাত্রা করত। শ্রমিক আন্দোলন গঠনের প্রতি হিংসাভাবাপন্ন এবং বিশেষকরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ সংগঠনের বিরুদ্ধাচারী ধনিকতন্ত্র শাসন শ্রমিকদের অভিযান ও জাগরণ দমন ও সমূলে ধ্বংস করার নিমিত্ত তাদের পুলিশ ও সামরিক শক্তি প্রেরণ করতো। ঐ পুরাতন সময়ে অনেকবার যখন শ্রমিক সঙ্ঘবাদ এবং সমূহবাদীদল (সোশ্যালিষ্ট পার্টি : অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে প্রাণপণ চেষ্টায় রতছিল এবং ধনিকবাদ ও ধনিকবাদ অর্থে সে সময়ে যা বুঝাতো তার বিশুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র ছিল, তখনো মে-দিবসেরই সময় যতসব হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার সংগঠিত হয়েছে।

কিন্তু ধনিকবাদ যতই ক্রমশঃ অধিকতর প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠ্‌লো ততই তারা শ্রমিক আন্দোলনকে সহ্য করতে শিখল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একে দূষিত ও বিকৃত করতেও শিখল। এর ভিতরে তাদের বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করল—এমন কি তথায় তাদের স্থান ও ক্ষমতা প্রবল হয়ে উঠলো। অধিকন্তু শ্রমিকদের বেতন এবং অবস্থা একটু স্বচ্ছল করে দিয়ে তাদের বিপথে চালিত করতে আরম্ভ করল। ধনিকবাদ খুব দৃঢ় ছিল—ইহাকে দূরে অপসারিত করার আশা অনেকের চক্ষে হাস্যকর ঘটনা বলে অনুমিত হত। তথাপি শ্রমিক আন্দোলন এই পাপ প্রভাবের কাছেও পূজনীয় হয়ে দাঁড়াল। শ্রমিকরা তাদের ভ্রষ্ট নেতাদের অধীনে 'মে-দিবস' সম্পন্ন করার অনুমোদন গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পেলো। এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পর্ব্বের অনুষ্ঠান একটা মিথ্যা চাতুরীতে পরিণত হলো। যুদ্ধ সুরু হলে সাধারণ ধর্ম্মঘট সম্বন্ধীয় সাধু (?) প্রস্তাব গুলির কথা কপট অবিশ্বাসী বক্তাদের দ্বারা প্রস্তাবিত হতো। কিন্তু ১৯১৪ সনে যেই যুদ্ধ বাধল তখন ধর্ম্মঘটের কোন বন্দোবস্ত করা হলো না। প্রস্তাবগুলো তারা তখন ভুলে গেল। শ্রমিক পল্টন সমূহকে এর বিপক্ষে যুদ্ধ করার পরিবর্ত্তে এবং প্রায় কোনো বাধা না দিয়ে যুদ্ধের কার্য্যে পরিচালিত করা হলো।

যুদ্ধের প্রথম কয়েক বৎসর "মে-দিবস" পালিত হয় নি। ধনী, সামরিক গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনে, শ্রমিকেরা, যুদ্ধের সাজসজ্জা, যুদ্ধোপকরণ, সামরিক দ্রব্যাদি কিংবা গ্যাস ছড়ান, গুলিবর্ষন বা সঙ্গীন সাহায্যে পরস্পর খোঁচা খুঁচির ব্যাপারে তাদের স্ব-স্ব-শোষণবাদী শোষকদের যুদ্ধকার্য্যে বিশেষভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শ্রমিকদের মনোভাব, মূলতত্ত্ব আর বহুকাল অপ্রকাশিত থাকল না। ১৯১৬ সনে গৌরবজনক আইরিশ বিপ্লব এবং ১৯১৭ সনে রুশ-বিপ্লবের পর "ইন্টার ন্যাশন্যাল" আর একবার প্যারিস শহরের পথে শ্রুত হতে আরম্ভ হলো। সেই সময় যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলিতে, কয়লাখনিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা সমূহে ধর্ম্মঘট একমাত্র ঘটনায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। 'মে-দিবস' অর্থে প্রধানতঃ যাহা বোঝা যায়—সেই মূলতত্ত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সমস্বার্থতা এবং আন্তর্জ্জাতীয়তার বিষয় সর্ব্বদেশের শ্রমিকরা আর একবার চিন্তা করতে শুরু করল। এ সব কথা বিগত

চার বৎসরে এবং গবর্ণমেণ্টের ধর্ষণ, প্রসর ও অসৎ নেতাদের প্রভাবের ফলে তারা সব ভুলে গিয়েছিল।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী বৎসরগুলির হাঙ্গামা অর্থনীতিক চাঞ্চল্য, এবং খাওয়া-পরার একটা বাঁধা নিয়মের দ্রুতপরিবর্ত্তনের সাথে সাথে আর একবারে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল ভাবে সাড়াদিল এবং সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। এমনতর অবস্থা এর পূর্ব্বে আর কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯১৯, ১৯২০, ১৯২১ সালে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের ভাব নিয়ে 'মে-দিবস' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বের অত্যাচারিত নিপীড়িত শ্রমিকদের আঘাতে ধনিকবাদ থর থর বিকম্পিত ও টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল। তাদের ভিতর অবশেষে সোশ্যলিষ্টদের আজ্ঞাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ভাব দেখা দিল।

জার্ম্মানী হতে অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষ হতে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স পর্য্যন্ত যত অধীন জাতি এবং অধীন সম্প্রদায় আছে তাদেরকে ক্ষুদ্র শোষণবাদী দলের যেসব প্রভুরা শাসন করত তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ বিদ্রোহ করেছিল। বয়কট, অবরোধ, ধর্ম্মঘট, বিপ্লব ও হরতালের অগ্নি সর্ব্বত্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু, এই বিরাট আশ্চর্য্যজনক আন্দোলন যদিও খুব উৎসাহ-পূর্ণ ও প্রাণবন্তছিল তথাপি আবশ্যক নেতৃত্ব ও গঠনের দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ ছিল। তারি জন্যে ধনের শক্তি, সৈনিক শক্তি, ভ্রষ্টতা ও বোকামীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা তার ছিলনা। তা ছাড়া যতই পুরাতন ও অখ্যাতিকর প্রথা হোক না কেন তার বন্ধন থেকে যে রক্ষণশীলতা মুক্ত হতে দেয়না তারও হাত তারা এড়াতে পেরেছিল না।

কেবল মাত্র রুশিয়ার অবস্থা যথেষ্ট অনুকূল ছিল। বিপ্লবে জয়ী হওয়ার পক্ষে এবং তার ফলকে সংহত করার জন্যে রুষের নেতারা যেমন বিশ্বস্ত ছিলেন তেমনি চতুরও ছিলেন। তথায় বৎসরের পর বৎসর ধীরভাবে নির্দ্দিষ্ট পথে প্রচার কার্য্য চলেছিল এবং তার শিক্ষা পশ্চিম য়ুরোপের অবিশুদ্ধ সংস্কারত্ব মুক্ত ছিল। এ প্রকারে শক্তিবান, ধীশক্তি সম্পন্ন ও সহজ-নম্র বলশেভিক দল গণ-বিপ্লবকে জয়ের পথে চালিত করতে এবং তাকে রক্ষা করতে যে যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তার নির্ম্মান করেছিল।

রুষিয়ার বাহিরে পৃথিবীর ধনিকরা তাদের গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ক্রমশঃ অসঙ্ঘবদ্ধ, বিপথে চালিত জনসঙ্ঘকে বশীভূত ও দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

বহুবর্ষ ধরে মসীময় বিষাদ অবসন্নতা চলেছিল। সারা ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এবং এসিয়া ব্যাপিয়া অতি কঠোর রকমের 'শ্বেত অরাজকতার' রাজত্বের প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল এবং এখনো তা সমর্থিত হচ্ছে। বর্ত্তমান শাসনের বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধককে নির্দ্দয়ভাবে দমন করা হয়। কতিপয় দেশে যেখানে বুর্জ্জোয়া স্বাধীনতা-নীতি খুব প্রবল তথায় শ্রমিক নেতাদের ও প্রচারকদের কচিৎ স্বাধীনতা বিদ্যমান রয়েছে। এমন কি "মুক্তিদাত্রী" বৃটেনেও শ্বেত অরাজকতা এবং ফ্যাসিষ্ট সংগঠনের শক্তি শাসন প্রতিভাত হয়েছে।

স্রোতের গতি কিন্তু আবার ফিরছে। বৃটিশ শ্রমিকগণ সাধারণ ধর্ম্মঘটেও খনির শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও এখন সম্পূর্ণরূপে, গণ-আন্দোলনের পথে সংগ্রাম চালিয়ে দিতে অগ্রসর হচ্ছে। তারা ট্রেড ইউনিয়ন আইন ফ্যাসিষ্ট জুলুম এবং সরকারী দমন নীতি ও তাদের নেতৃবর্গের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হবে! পুনঃপুনঃ পরাজিত হয়েও যতদিন পর্য্যন্ত তারা কৃতকার্য্য না হয় ততদিন তারা অগ্রসর হতেই থাকবে।

চীনদেশের শ্রমিকদের দ্বারা চালিত চীনের জাতীয় অন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। নানা কঠোর প্রতিবন্ধক এর বিরুদ্ধে, এমন কি জগতের সমস্ত মিলিত শোষণবাদীদের শক্তি তাদের এই অগ্রসরে বিরত করতে ও বাধা দিতে অক্ষম। যতদিন তারা বিজয়ী না হচ্ছে ততদিন তারা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতেই থাকবে।

১৯২৬ সালে মে-দিবস বৃটিশ খনির শ্রমিকদের এবং বৃটিশ শ্রমজীবীদের সমর্থন কল্পে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। বৃটেনে এমন শক্তি সম্পন্ন ও অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ মে-দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছিল যা আজ পর্য্যন্ত কখনো পরিলক্ষিত হয় নি। এতে অস্থিরচিত্ত নেতাদের অন্তরে বিভীষিকারও সঞ্চার করে দিয়েছিল। তাঁরা শ্রমিকদের ইচ্ছার দ্বারা বিনম্র হয়ে সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯২৭ সালের "মে দিবস" চীনদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি দেখানর-জন্য ও তাদের সমর্থনার্থ উৎসর্গ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মিলিত শোষণবাদী শাসকদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে চীনেদের আশ্চর্য্য জনক অভিযান সমস্ত পৃথিবীর নিপীড়িত জাতি ও শ্রেণীর চিত্তে অনুপ্রেরণা ও উন্মাদনা জাগিয়েছে।

ভারতের শ্রমিকগণ যেন এবার পশ্চাতে পড়ে না থাকে। "মে-দিবস" আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী দিবস। এই শুভক্ষণে আমাদেরকে প্রকৃত মনোযোগের সহিত অন্য দেশীয় ভ্রাতাদের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা উচিত।

চীনদেশীয় শ্রমিকগণ কেমন করে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হয় সে পথ দেখিয়েছে। তারা আমাদের আরো দেখিয়েছে যে কারখানা ও মিল প্রভৃতির শ্রমিকদের উপর শোষণবাদীদের নিকট হতে স্বাধীনতা পাওয়ার গৌরবময় প্রচেষ্টাও কর্ম্ম নির্ভর করছে। চীনেদের কাছ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে আমাদের এই কার্য্যের নিমিত্ত যেন আমরা প্রস্তুত হতে পারি।

সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিক সমস্যা এক। ভারতীয় শ্রমিক, রুষীয় শ্রমিক, বৃটিশ শ্রমিক, এই দিনে সকলে সাহস, সামর্থ্য উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে একত্র সংহত হোক! আমরা অবশ্য সকল দেশের বিশেষ করে আমাদের চৈনিক ভ্রাতৃগণের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা ও হৃদয়ের অভিবাদন জানাব। কেন না, এই মুহূর্ত্তে তারা সমস্ত পৃথিবীর শোষিতদের জন্য যুদ্ধ চালাচ্ছে।

চীনদেশীয় শ্রমিকগণ সাফল্য লাভ করুক। ভারতের শ্রমিকগণ সত্বর তাদের অনুসৃত পথে অগ্রসর হোক!

দেশাবিদেশ

—:•:—

বুধবার (২০শে এপ্রিল) কালিঘাট মন্দিরের নিকটে প্রেস-কর্ম্মচারী সমিতির এক সভা হয়। ঐ সভায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট প্রেস ও জেল প্রেসের কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং মন্তব্যও গৃহীত হয়। সভাপতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় বলেন যে শ্রমিকদের প্রধান দোষ এই যে তাহারা কোন সঙ্ঘের সভ্য হইতে না হইতেই আশা করে যে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি হইবে। তাহারা ভাবে না যে সঙ্ঘের বল, প্রতিপত্তি ও স্থায়িত্বের উপর তাহাদের ভবিষ্যতের শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। লোকে গাছ পুতিয়াই যেমন ফল আশা করে না, তাহাকে বহু কষ্টে জল সিঞ্চন করিয়া বর্দ্ধিত করিলে যেমন সময়ে ফল পাওয়া যায় তেমনি সঙ্ঘের বলবৃদ্ধির সহিত সঙ্ঘের সভ্যদের হইয়া সঙ্ঘ মনিবদের নিকট যে দাবী করিবে সে দাবী পূরণ হইতে বাধ্য। তখনই আমাদের দাবী আমরা পাইব যখন আমরা জানিব কেমন করিয়া দাবী আদায় করিতে হয়।

———

গত রবিবারে (২৪শে এপ্রিল) হাওড়ার রেলের মোটবাহী শ্রমিকদের একটি সভা হাওড়া হাটে হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ৯টার পর সভা আরম্ভ হয় ও রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত চলে। মেসার্স মৃণালকান্তি বসু, কে, সি, রায়চৌধুরী, কিশোরীলাল ঘোষ, লাতাফত হোসেন ও প্রেস কর্ম্মচারী সমিতির সংগঠনকারী সম্পাদক ইন্দু ভূষণ সরকার উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া ষ্টেশনের মোটবাহী শ্রমিকদের নানা প্রকার অভাব অভিযোগ আছে। তাহাদিগকে ৭৲ করিয়া মাসিক license fee (লাইসেন্স ফি) দিতে হয়। তাহারা দৈনিক যাহা রোজগার করে তাহা হইতে টাকায় চারি আনা করিয়া মেট বা সর্দ্দার দিগকে দিতে হয়। শ্রমিকরা এক এক জন করিয়া তাহাদের দুঃখ কাহিনী বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে তাহারা একযোগে দাবী করিল যে মেটগুলি যদি শীঘ্র অপসারিত না হয় তো কয়েক দিবসের ভিতর বিষম গোলমাল হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাদিগকে বি, এন্, রেল্ কোম্পানীর বেগর খাটিতে হয়। তাহাদের মধ্যে অনেককে রেলের বড় বড় অফিসরের বাড়ী বেগর দিতে হয়। লাতাফৎ হোসেন উর্দ্দুতে ও কিশোরী বাবু হিন্দিতে তাহাদিগকে ইউনিয়নের উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। কিশোরী বাবু তাহাদিগকে তাহাদের ইউনিয়নটি মজবুত করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, "তোমরা যদি সৎপথে থাক তবে তোমাদের ভয় কিসের? তোমাদের অভাব অভিযোগ শুনিতে যখন কোন উপর ওয়ালা আসেন তোমরা বল যে তোমরা ইউনিয়নের মেম্বর নও, তোমাদের কোন অভাব অভিযোগ নাই। এইরূপ মিথ্যা কথা বলা কেবল কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে বিলাত হইতে তোমাদের রেলের এজেণ্ট ও অন্যান্য বড় বড় অফিসার আসিয়াছে সেই বিলাতে এক সময়ে ইউনিয়ন-এর মেম্বর হওয়া বে-আইনি ছিল। অনেকে ইউনিয়নের জন্য ফাঁসি যাইতেও পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। তবে তো আজ বিলাতের শ্রমজীবীরা গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত চালাতে সক্ষম হয়েছে।"

———

দেওয়ান চমনলাল মহাশয় প্রায় দশ দিন হইল কলিকাতা আসিয়াছেন। শ্রমিকসঙ্ঘ সংস্রষ্ট কর্ম্মীরা তাঁহার আগমন বার্ত্তা খবরের কাগজে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তিনি কোথায় অবস্থান করিতেছেন চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারেন নাই। All-India Trades Union Congress এর (অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের) সভাপতি মহাশয়ের প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিবার কারণ কি?

———

গত শুক্রবার কয়েক খানি দৈনিক সংবাদ পত্রে হঠাৎ দেখা গেল যে দেওয়ানজি মহাশয় ট্রেড্ ইউনিয়ান ওলাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ তলে ঐ দিবস বেলা ছয় ঘটিকার সময় এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। কতিপয় সঙ্ঘবাদী, যাঁহাদের দৃষ্টি ঐসংবাদে আকৃষ্ট হইয়াছিল কেবল তাঁহারাই তাঁহাদের অন্যান্য কার্য্য পণ্ড করিয়া নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমতী সন্তোষ কুমারী গুপ্তা ও ইয়াকুব কাসেম আরিফ সাহেব তাঁহাদের দলবল লইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বোধ হয় বহুপূর্ব্ব হইতেই সভাপতি মহাশয়ের গতিবিধি ও তাঁহার কলিকাতার ঠিকানা জানিতেন এবং সভার কথা অন্যান্য লোকেরা জানিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি মহাশয় কি এই বিশাল কলিকাতা সহরে আর জায়গা খুঁজিয়া পাইলেন না যে ধনিকদের প্রধান আড্ডা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সভা আহ্বান করিলেন?

———

তিনি শনিবার আর একটি সভা লেবর এ্যাসোশিয়সনি হলে আহ্বান করেন। এখানে অপেক্ষা কৃত বেশী লোকের সমাগম হয় এবং কিছু তর্ক বিতর্ক ও হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই হয় নাই। তবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম জুন মাসে বাঙ্গলা দেশের এক মহতী শ্রমিক সম্মিলনী হইবে। দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত মুকুন্দ লাল সরকার মহাশয়ের Emyloyees, Association এর Secretary ব্যতীত আর সকল পদ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ঐ একটি মাত্র সঙ্ঘে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবেন—এই রূপ প্রকাশ করেন। তৃতীয়, একটি কমিটি সংগঠিত হয় যাহাতে ঐ সভায় যে যত পারিয়াছেন নাম দিয়াছেন এবং কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে আরও সভ্যমনোনীত করিতে পারিবেন। এই কমিটির সংগঠন করার সেক্রেটরী হইয়াছেন শ্রীকিশোরী লাল ঘোষ, সভা আহ্বান কারিণী সম্পাদক হইয়াছেন শ্রীমতী সন্তোষ-কুমারী গুপ্তা ও সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন মেসার্স দায়ুদ আরিফ ও সুরেন্দ্র নাথ মিত্র। অনেক গুলি পাচক মিলিয়া সম্মিলন রূপ ঝোলিটিকে নষ্ট করিয়া ফেলেন আমাদের এই আশঙ্কাই প্রবল হইতেছে।

———

সাহায্য প্রার্থনা

—•—

সুদীর্ঘকাল বন্ধ থেকে **গণবাণী** আবার বের হল। পূর্ব্বে যেমন কোনো সম্বল আমাদের ছিল না এবারেও ঠিক তা নেই। তবুও যে কাগজ বের করেছি তার একমাত্র কারণ এই যে সম্বল না থাকার অসুবিধাটা আমাদের যত বেশী তার চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন হয়েছে কাগজ বের করার।

যে যুগে আমরা বাস করছি তা জনের যুগ নয়, গণের যুগ। ব্যষ্টি তার বেঁচে থাকার শেষ সময়ে এসে পৌচেছে, এখন তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে সমষ্টির জন্যে। জন-বন্দনার মৃত্যুর স্পষ্ট সূচনা আমরা দেখিছি। তাই, এবারে হবে জনগণের জয় জয়কার।

নিপীড়ন আর বিলুণ্ঠনে আমাদের দেশের উৎপাদকগণ (কৃষক ও শ্রমিকগণ) একেবারে অসাড় হয়ে পড়েছে। তারা ভুলে গেছে কি শক্তি তাদের ভিতরে লুক্কায়িত আছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল্ কংগ্রেসের বাঁধা বুলি শুনে শুনে আমাদের নিম্ন মধ্য-শ্রেণীর লোকগণ যদিও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন, যদিও তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে স্বার্থপর লোকেরা কংগ্রেসকে এর সত্যি-কারের পথে যেতে দিচ্ছে না, তথাপি তাঁরা আজো পর্য্যন্ত প্রাণে মনে এটা অনুভব করতে পারেন নি যে দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণকে নিয়েই তাঁদরে সত্যিকারের কাজ হবে। গণ-চৈতন্য সম্পাদন ও গণ-উদ্বোধন সাধন করাই দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিতে অসন্তুষ্ট নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকগণের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—অবশ্য বিদেশীয় শোষণবাদের কবল হতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং দেশীয় ধনিকগণের শোষণ ও অত্যাচার হতে দেশের জনগণের মুক্তিলাভের বাসনা সত্যই যদি তাঁদের থাকে।

দেশের কেবল মধ্যশ্রেণী ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকগণ যে দেশে বিপ্লব আনয়ন করবে সে যুগ বহুকাল পূর্ব্বে অতীত হয়ে গেছে। এখন জনগণের উত্থানের যুগ। এ উত্থানকে অবহেলা করার শক্তি কাহারো নেই। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি এখন সবই কিছু হবে দেশের জনগণেকে নিয়ে।

কিন্তু, এ সকল সত্যকারের জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্যেও বোঝাবার জন্যে কোনো কাগজই আমাদের নেই। যে কাজের জন্যে বহু সংখ্যক কাগজের প্রচার হওয়া আবশ্যক ছিল সে কাজের খাতিরে একখানা মাত্র কাগজ,—**গণবাণী**—বের করা অত্যন্ত বেশী প্রয়োজনের বশে হয় নি কি?

এখন কথা হচ্ছে কি করে **গণবাণী** চলবে? এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সোজা। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতির দ্বারা **গণবাণী**কে চালাতে হবে। এ উপায়ই আমাদের একমাত্র উপায়, অন্য কোনো উপায় একেবারেই নেই।

গণবাণী পড়ে ভালো যাঁদের লাগ্‌বে তাঁরা যে কোন উপায়ে হোক্ বাস্তব সাহায্য আমাদের করুন। সাহায্যকারি-গণ যদি ইচ্ছে করেন তবে তাঁদের প্রাপ্তি স্বীকার ও নামধাম প্রকাশ আমরা করব। আর যাঁরা তা চাইবেন না তাঁদের সাহায্যের প্রাপ্তি স্বীকার ও নাম-ধামাদি প্রকাশ করা থেকে আমরা বিরত থাক্‌ব। কিন্তু সাহায্য আমরা একান্তই চাই। তা ছাড়া আমাদের চল্‌তেই পারে না, কিছুতেই না। কালের আহ্বানে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। সুবিধে অসুবিধের কথা এতটুকুও খতিয়ে দেখতে পারিনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে জনসাধারণের সাহায্য আমরা পাবই পাব।

বিনীত—

"গণবাণী"র পরিচালকগণ

শাপুরজি শাকলাৎওয়ালা লণ্ডনে পৌচেছেন। ব্যাটার্সির টাউন হলে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছে। ওখানকার মেয়ার এ সভার নিমন্ত্রণ এই বলে গ্রহণ করেন্ নি যে এ প্রকারের মিটিংএ রাজনীতিক গন্ধ থাক্‌বে। সাক্‌লাৎওয়ালা বলেছেন যে তিনি যেমন ভয় করেছিলেন তেমন ভয়ের কোনো কারণ ঘটেন্নি। ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘৃণাভরে মোটের ওপরে তাঁর কাজে কোনো বাধা দেয়নি। ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে শীঘ্রই তিনি সাধারণ ধর্ম্মঘট যাতে হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

—•—

চীনের জাতীয় দলের ভূতপূর্ব্ব সৈন্যাধ্যক্ষ, চ্যাং কৈ সেকের পুত্র চীন দেশীয় বিপ্লববাদীদের শিক্ষার জন্য মস্কোরে যে সুন-য়াৎ সেন বিশ্ব বিদ্যালয় রয়েছে তার ছাত্র। তাঁর পিতা কম্যুনি-ষ্টদের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করছেন তার এবং তাঁর বর্ত্তমান মনো-ভাবের নিন্দাবাদ করে কোনো পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ পাঠিয়ে-ছেন। তাতে তিনি ঘোষণা করেছেন, বিপ্লব ব্যাপারে চ্যাং-কৈ-সেক তাঁর পিতা ও বন্ধু ছিলেন কিন্তু তিনি এক্ষন শত্রু শিবিরে গমন করেছেন। অতএব তিনি তাঁরও শত্রু।

হ্যাংকৌ গবর্ণমেণ্ট স্থির করেছেন যে সৈন্যাধক্ষের পদ উঠিয়ে দিয়ে সামরিক কমিটির দ্বারা আগামীতে যাবতীয় সামরিক বিষয় পরিচালিত করা হবে।

—০—

Reg. No. C 1440

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণ-বাণী

(এর সাথে "লাঙল" একীভূত হয়েছে)

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৫ই মে ১৯২৭, ২২শে বৈশাখ ১৩৩৪	১৩শ সংখ্যা

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহমদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

75
9-6
[illegible]

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ১৷৷৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে ৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৫ই মে, ১৯২৭, ২২শে বৈশাখ, ১৩৩৪	১৩শ সংখ্যা

জাগর তূর্য্য *

—০—

নজরুল ইস্‌লাম

—*—

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী।
অ-লিখিত যত গল্প কাহিনী—তোরা যে নায়ক তারি॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মা'র সন্তাপ-হারী॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মত
উঠ্, ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত!
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী॥

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেল্ সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির-বারি।
উহারা ক'জন? তোরা অগণন, সকল শক্তি-ধারী॥

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ৩৪

* শেলির ভাব অবলম্বনে।

কৃষক-সংগঠন

—•—

[মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ]

—•—

গত পূর্ব্ব সপ্তাহের গণবাণীতে আমরা জমীদারী প্রথার উচ্ছেদের বিষয় আলোচনা করেছি। আমাদের পাঠকগণ নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে জমীদার বলতে আমরা যে কোনো প্রকারের বড় ভূম্যধিকারীকেই মনে করেছি। কেবল মাত্র বড় জমীদারের উচ্ছেদ আমরা চাইনে। বড় তালুকদার, বড় জোতদার, বড় গাঁতিদার, বড় জায়গীরদার, বড় সর্দ্দার, এক কথায় সকল প্রকারের ভূম্যভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনই আমাদের লক্ষ্য। কেন যে এ লক্ষ্য আমরা স্থির করেছি নিতান্ত সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলেই যে কেউ তা অনায়াসে বুঝে নিতে পারবেন। ভূমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় সে ফসল খেয়ে আমরা সকলেই জীবন ধারণ করি একথা সত্য বটে, কিন্তু, একথাও খুব সত্য যে আমাদের সকলের সহিত ভূমির কোনো সম্বন্ধ নেই। পরিশ্রম করে ভূমি থেকে যে ফসল উৎপাদন করে সে-ই প্রকৃত ভূমির মালিক। যে জমীদার কখনো কোনো পরিশ্রম করেনা, ভূমির কোনো খোঁজ খবর রাখে না সে কেন মিছামিছি ভূমির মালিক হতে যাবে, আর কেনই বা সে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নেবে? লক্ষ লক্ষ কৃষকের নিকটে দু'তিন বিঘার বেশী জমী নেই, আর ওদিকে অল্প সংখ্যক জমীদার দেশের অর্দ্ধেকেরও বেশীর ভাগের মালিক হয়ে বসে আছে। কিন্তু, কিসের খাতিরে? এই জমীদাররা পৃথিবীর যত প্রকারের ভোগ-বিলাসের চূড়ান্ত করবে, পাপের স্রোতে ভেসে যাবে, হাজার রকমের ভ্রষ্টতার সৃষ্টি করবে, আর কৃষকরা কিনা বারো মাস খেটে খেটে তাদের এ সব কাজের জন্যে উপকরণ যোগাবে! এতটুকুও বিচার বুদ্ধি যার আছে সে কখনো এমন অদ্ভুত নিয়মের সমর্থন করতে পারে না।

জমীদার বলছে সে নিজে কিংবা তার পূর্ব্ব পুরুষ অর্থ দিয়ে জমীদারী কিনেছে বলেই জমীর ওপরে তার অধিকার জন্মেছে। অর্থোপার্জ্জনের জন্যে পরিশ্রম করা দরকার একথা সকলেই জানেন। কিন্তু জমীদার যখন কখনো কোনো পরিশ্রম করে না তখন অর্থ সে পেলে কোথায়? আর পরিশ্রমও সে নিজে কিংবা তার পূর্ব্ব পুরুষ যদি জমীদারী লাভের পূর্ব্বে করে থাকে তা হলে সেই বা অগাধ ধনের অধিকারী কেন হলো, আর তার মত অপর শত শত পরিশ্রমী লোক হলোনা কেন? শত সহস্র লোকের শ্রমের ফল বিলুণ্ঠন না করে, মুখের গ্রাস কেড়ে না নিয়ে, কেহই কখনো ধনী হতে পারে নি, পারে না। পল্লীগ্রামে যাঁরা বাস করেন তাঁরা নিশ্চিতই দেখেছেন যে গ্রামের এক ঘর লোক যখন বড় হয়ে ওঠে ঠিক সে সঙ্গে সঙ্গে ১০ ঘর লোক নিঃস্ব হয়ে যায়। অর্থাৎ দশটি পরিবারের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেই একটি পরিবার বড় হতে পারে। এ লুণ্ঠন সুদের ওপরে টাকা করজ দিয়ে ও অন্য নানা উপায়ে করে থাকে। সুতরাং যে উপায়েই লাভ করুক না কেন, জমীতে কোনো শ্রেণীর ভূম্যধিকারীরই কোনো অধিকার নেই। কৃষকের পক্ষে বড় জমীদার যা, বড় তালুকদার, বড় জোতদার ও বড় গাঁতিদার প্রভৃতিও ঠিক্ তাই। সকলেই অলস-অকর্ম্মণ্য জীব, সকলেই শোষক।

বড় জমীদারী, বড় তালুকদারী, বড় জোতদারী ও বড় গাঁতিদারী প্রভৃতির অবসান হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ সব তুলে দিয়ে যে সব কৃষকের জমী নেই, কিংবা যাদের নিকটে অতি সামান্য মাত্র জমী আছে তাদেরকেই জমী বেঁটে দিতে হবে। এ সব বণ্টনের ভার দিতে হবে কৃষকদের গ্রাম্য সংগঠনের ওপরে।

জমীদার প্রভৃতির কাছ থেকে জমী বাজেয়াফত করে নিলে তার জন্যে তাদেরকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এই ক্ষতিপূরণ করতে গেলে কৃষকদের অবস্থা যেইকে সেই থেকে যাবে, শোচনীয়তর হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কেননা, ক্ষতিপূরণ যদি করতে হয় সরকারকেই করতে হবে। কিন্তু, সরকার টাকা পাবে কোথায়? এই টাকা কৃষকদের কাছ থেকে নিয়েই তবে জমীদার প্রভৃতিকে সরকারের দিতে হবে। এতে জমীদার প্রভৃতির হবে লাভ, আর কৃষকদের ওপরে হবে জুলুম। কাজেই, ভূমির কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রথাকে উচ্ছেদ করতে হবে, অথচ এই উচ্ছেদ করার জন্যে যারা ভূমি কেন্দ্রীভূত করেছে তাদেরকে কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না।

কেউ কেউ বলবেন, এতকালের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে যদি কোনো ক্ষতিপূরণ করা না হয় তা হলে ত বড় অবিচার করা হবে তাদের ওপরে। কিন্তু, কৃষকদের ওপরে কি সুবিচার করা হচ্ছে এখন? জমীদাররা কৃষকদের শোষণ করছে, অথচ এরূপ শোষণ করার কোনো অধিকারই নেই তাদের। এ অবস্থায় জমীদার প্রভৃতিকে উচ্ছেদ করে কৃষকদের ভূমি বেঁটে দিলে তাদেরকে তাদের বঞ্চিত অধিকার দেওয়া হবে মাত্র। এটা বিশুদ্ধ অর্থনীতিক প্রশ্ন। সকল ফসলের উৎপাদক কৃষক সম্প্রদায়ের ওপরে সুবিচার করতে হলে যারা অনধিকারে ভূমির ওপরে প্রভুত্ব করছে তাদেরকে বঞ্চিত করতেই হবে।

জমীদারদের ছাড়া আরো অনেকেরই অত্যাচার কৃষকদের ওপরে হয়ে থাকে। সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ীর দালাল উকিল ও মোল্লা-পুরোহিত এরা সকলেই কৃষকদের শোষক। এদের সকলের একই উদ্দেশ্য—কৃষকদিগকে তাদের শ্রমের ফল হতে বঞ্চিত করা। এ সকলেরই শোষণ ও অত্যাচার হতে কৃষকদেরকে বাঁচাতে হলে তাদেরকে সংহত ও সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের দ্বারা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়ে সুদখোর মহাজনদের শোষণের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে হবে। সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৭ টাকার বেশী কিছুতেই ধার্য্য হতে দেওয়া হবে না।

কৃষকেরা দরিদ্র একথা সকলেই জানেন। তারা ঋণভারে জর্জ্জরিত একথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। অতিরিক্ত মাত্রায় শোষণই এর একমাত্র কারণ। সেবার দ্বারা, পল্লী সংস্কারের দ্বারা কৃষকের কোনো দুঃখই ঘোচাতে কেউ পারবে না। পল্লীর কোনো সংস্কারই হতে পারে না যে পর্য্যন্ত না পল্লীর পচা অর্থনীতিক প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হবে। কত যুগ যুগান্তের অনাহার, অর্দ্ধাহার ও অনুপযোগী আহারের ফলে কৃষকের জীবনী শক্তি কমে গেছে, তার শরীর সর্ব্ববিধ ব্যাধির মন্দির হয়ে পড়েছে, তুমি আমি সেবার দ্বারা তার কি উপকার করতে পারি।

দু'টো পুকুর খুদে দিয়ে, তিনটে চিকিৎসালয় স্থাপন করে কেউই কৃষকের উপকার করতে পারবে না। কৃষকদিগকে

শ্রেণীগত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। পল্লীতে যত শ্রেণীর লোক বাস করে তাদের সকলের স্বার্থ কিছু এক নয়। যে পল্লীতে কৃষকরা বাস করে সে পল্লীতে তাদের শোষক মহাজন আদিও বাস করে থাকে। কাজেই, পল্লীর সকলকে নিয়ে কোনো সঙ্ঘ গঠিত হতে পারে না। কৃষকসঙ্ঘ সংগঠন করতে হবে কেবল মাত্র কৃষকদের নিয়ে শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তির ওপরে। যতই অশিক্ষিত নিরক্ষর তারা হোক্না কেন, খাওয়া পরার ব্যাপার তারা খুব সহজেই বুঝতে পারবে। শোষিতকে শ্রেণীজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়।

শোষিত কৃষককে জীবনের সন্ধান দিতে হবে। খাওয়া-পরা সম্বন্ধে তাকে পরিপূর্ণরূপে সজাগ করে তোলা একান্তই আবশ্যক। ভালো খেতে, ভালো পরতে এবং ভালো ঘরে বাস করতে কৃষককে শেখানো চাই। এ সব সত্যকারের অভাব কৃষকরা যখন অনুভব করতে শিখবে তখনি তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে যত সব সামাজিক ও অর্থনীতিক নিপীড়ণের বিরুদ্ধে।

সংগঠিত কৃষক যখন ভূমির মালিক হতে চাইবে, যখন সে সুদখোর মহাজনের বিরুদ্ধে মাথা তুলবে, তখন বর্ত্তমান প্রণালীর গবর্ণমেণ্টের সহিতও তাদের সংঘর্ষ বাধবে। কেননা, যারা বে-রোজগারের ধন খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে বৃটিশ শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট তাদেরই সমর্থক। বৃটিশ পার্লামেণ্টে যে দলের সংখ্যাধিক্য হয়, সে দলেরই শোষণের জন্যে বৃটিশের অধীন দেশগুলো শাসিত হয়। শোষণকারী ধনিক-বণিকেরই জোর এখন পার্লামেণ্টে বেশী। তারা এ দেশের শোষণ-কারীদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেই এ দেশকে শোষণ করে থাকে। কাজেই, কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম একদিক থেকে যেমন সামাজিক ও অর্থনীতিক মুক্তির সংগ্রাম হবে, অন্যদিক থেকে রাষ্ট্রনীতিক মুক্তিরও সংগ্রাম তেমনি তা হবে।

যে সকল শিক্ষিত যুবক দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে চাইছেন তাঁদের উচিত গ্রামে গ্রামে কৃষকসঙ্ঘ সমূহ গঠন করা। সঙ্ঘগুলির মূলমন্ত্র হবে—**"ভূমির মালিক কৃষক আর অন্নের মালিক শ্রমিক"**।

মুক্তি সংগ্রামে কৃষকের জয় হোক্!

কৃষকদের যারা শোষণকারী তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হোক!!

—•—

বর্ত্তমান ভারত

[আর, পাম দত্ত]

—:•:—

("বর্ত্তমান ভারত" আর, পাম দত্তের "Modern India" নামক **ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ**। এ অনুবাদ ধারাবাহিক-রূপে **গণবাণী**তে বের হতে থাকবে। এর পূর্ব্বে ২৮শে এপ্রিল তারিখে ১২শ সংখ্যক **গণবাণী**তে এ অনুবাদ বের হয়েছে।)

———

বৃটিশ বুর্জ্জোয়াজিদের প্রধান অর্থনীতিবিদ্ এডাম্ স্মিথ্ তাঁর "ওয়েল্থ অব নেশন্‌স" (Wealth of Nations) নামক গ্রন্থে এই শাসনের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের) সম্বন্ধে বিশদ-রূপে লিখেছেন :—

"যে কোনো দেশের জন্যেই হোক্ না কেন, কোনো গবর্ণ-মেণ্ট কেবলমাত্র একটা বণিক কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট হলে সম্ভবত তা নিকৃষ্টতম গবর্ণমেণ্ট হয়ে থাকে।"

"রাজশক্তিরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ এই যে ভারতে যে সব ইউরোপীয় দ্রব্য নেওয়া হয় যথাসম্ভব সস্তা দামে সে সমুদায়ের বিক্রী করা, আর ভারত থেকে যে সকল দ্রব্য এখানে আনীত হয় সে সকলের বিক্রী করা যথাসম্ভব উচ্চ মূল্যে। কিন্তু বণিক হিসেবে তাদের স্বার্থ ঠিক্ উল্টো। যে দেশ তারা শাসন করে, রাজশক্তিরূপে ঠিক্ সে দেশের স্বার্থই তাদের স্বার্থ। বণিক হিসেবে তাদের স্বার্থ এ স্বার্থের সোজাসুজি বিপরীত।"

"একমাত্র এই গবর্ণমেণ্টেরই শাসন বিভাগের প্রত্যেক সভ্য চায় যে সে দেশ থেকে বের হয়ে যা'ক্। তারি জন্যে যথাসম্ভব সত্বর গবর্ণমেণ্টের সকল কাজ সমাপ্ত করে সে চায় তার সংগৃহীত সমস্ত সৌভাগ্য ও সম্পদ তার সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে। পরের দিনে যার স্বার্থের জন্যে সে ছেড়ে দিয়ে যায় সেও ঠিক এটুকুই চায়। ভূমিকম্পের দ্বারা সমস্ত দেশ ধ্বংস হয়ে গেলেও এ গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে দিব্য উদাসীন থেকে যায়।"

"প্রায়ই বড় সম্পদশালী বা কখনো কখনো মাঝামাঝি রকমের সম্পদশালী লোক ভারতের শেয়ার ষ্টকে ১০ বা ১৪ শত পাউণ্ড (এখনকার বাজারে ১০০০ পাউণ্ড) লগ্নি করতে ইচ্ছে করে। মালিকগণের কোর্টে ভোটের অধিকারী হয়ে সে আশা করে যে সে কিছু প্রতিপত্তি লাভ করবে। শুধু এ কারণেই সে অংশ খরিদ করতে চায়। এর দ্বারা লুণ্ঠনের অংশ না পেলেও লুণ্ঠনকারীর নিয়োগের অংশ সে পায়। বড় সম্পদশালী বা মাঝামাঝি রকমের সম্পদশালী লোক কয়েক বছরের জন্যেও এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করে যদি সে তার কতিপয় বন্ধুকে ভারতে কাজ জুটিয়ে দিতে পারে তা হলে এরূপ অল্প মূলধন থেকে যে লভ্যাংশ সে আশা করতে পারে তা পেল কি পেল না তার জন্যে সে পরোয়াই করে না। তার ভোট তাকে যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসনে অংশ দিয়ে থাকে সে বৃহৎ সাম্রাজ্যের উন্নতি বা ধ্বংস সম্বন্ধে সে কদাচিৎ পরোয়া করে থাকে। তাদের প্রজাদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে, তাদের অধীন দেশের বর্দ্ধন বা ক্ষয় সম্বন্ধে, তাদের শাসনের গৌরব বা অগৌরব সম্বন্ধে কোনো গবর্ণমেণ্ট কখনো এরূপ দিব্য উদাসীন হয়নি, এবং অবস্থা দৃষ্টে হতে পারতও না, যেরূপ অনিবার্য্য নৈতিক কারণের দ্বারা এই বণিক কোম্পানীর অধিকাংশ মালিকগণ হয়েছে এবং আবশ্যক-রূপে তাদের হতেও হয়েছে।"

(এডাম স্মিথ—"ওয়েল্থ অব নেশন্‌স"
৪র্থ খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।)

এই ক্লাসিক উদ্ধৃত অংশ থেকে শুধু যে ভারতের পুরাতন বৃটিশ শাসনের ধরণটা প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, এর দ্বারা অধীন জাতির ওপরে যে কোনো ধনিক-শাসনের অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতি কিরূপ হয় তারও বিকাশ পেয়েছে। কিন্তু, এডাম্ স্মিথ্ কোনো জিনিসকে কেবলমাত্র ধনিকদের চশ্‌মার ভিতর থেকেই

লক্ষ্য করতে পারতেন। সে জন্যে তিনি আরও অধিকতর প্রশস্ত প্রক্রিয়া যা ঘটছিল তার প্রতি ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে অসমর্থ ছিলেন।

ভারতে বৃটিশ শাসনের দ্বিতীয় স্তর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরম্ভ হয়েছিল এবং সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে এ স্তর যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত পৌছেছিল।

এ স্তর প্রথম স্তরের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল। এ স্তরে ইংলণ্ডে যে লুণ্ঠনের ধন স্তূপীকৃত হয়েছিল তা (এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অপর স্তূপীকরণের ধন) ধনিক প্রথাতে ইংল্যাণ্ডে দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করার প্রচেষ্টার জন্যে প্রাথমিক সংগৃহীত মূলধনের ভিত্তি ছিল। এ ভিত্তিরই ওপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ইংল্যাণ্ডে কল-কব্জার সাহায্যে জিনিসপত্র নির্ম্মাণের কাজ খুব বেশীরূপ বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং সস্তা দরের মেশিনের তৈরী জিনিসের দ্বারা জগৎ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। এ সকল জিনিসের প্রথমেই কাপড়, তারপরে ধাতুনির্ম্মিত ও অন্যান্য জিনিস প্রসার লাভ করে।

এ নূতন বিস্তৃতির দ্বারা ইংল্যাণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অত্যন্ত উচ্চ-দরের বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য তৈরী জিনিসের উৎপত্তিস্থল ছিল। ইংল্যাণ্ডের নবীন শিল্পের যাতে ধ্বংস না হতে পারে তার জন্যে ইংল্যাণ্ডে ভারতজাত দ্রব্যের ওপরে খুব চড়া শুল্ক বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন পক্ষান্তরে ইংল্যাণ্ডের মেশিনের তৈরী জিনিস বিস্তৃতি লাভ করায় ভারতের প্রাচীন শিল্প সমাচ্ছন্ন ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে গেল। ভারতের অর্থনীতিক উন্নতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারত হলো বৃটিশ ধনিকবাদের মাল বিক্রয়ের বাজার আর কাঁচামালের বৃহৎ উৎপত্তিস্থান।

এ পরিবর্ত্তনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের গঠনেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হলো। কাজেই সমগ্র বৃটীশ ধনিকবাদের একমাত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সংগঠনই ভারতের সমস্ত ভার এখন নেবার উপযোগী ছিল। ভারতের শাসন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে পরিবর্ত্তিত হয়ে সোজা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে এলো। এর পরিবর্ত্তন তখনি সাধিত হলো যখন (মেশিনের) তৈরী জিনিসের পরিমাণ এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে ফিউডাল (জায়গীরদারী) ও গ্রাম্য পদ্ধতি এত বেশী ভেঙে গিয়েছিল যে বৃটিশ ধনিকবাদের কেন্দ্র সংগঠনকে বাধ্য হতে হলো শাসনভার নিজের হাতে নিতে। সাফল্যের সহিত আরো অধিকতর প্রণালীবদ্ধ শোষণ প্রথা স্থাপন করার জন্যে শাসনের কতকগুলি প্রাথমিক কাজ হাতে নিয়ে ধনিক বাদকে বাধ্য হতে হলো পুরাতন বিশৃঙ্খল লুণ্ঠনের প্রথার দমন করতে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনের প্রবর্ত্তন বণিক প্রথাকে ভেঙে দেবার জন্যে হয়নি, এ হয়েছিল বৃহৎ ও ব্যাপক ধনিকবাদের স্তরে পঁহুছার জন্যে। কেন্দ্রীভূত শাসনের দ্বারা এবং রেলওয়ে জালের বিস্তৃতি ও যাতায়াতের অন্য সুবিধের দ্বারা সমস্ত দেশ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে একীকৃত হলো এবং দেশের এক কোণ হতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত বৃহৎ পরিমাপে তৈরী দ্রব্যের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফলতঃ অধিকতর ফলদায়ক আমলাতন্ত্রের উন্নতি, অনেক ছোট খাটো ভ্রষ্টতার নিরাকরণ এবং সামাজিক শাসনের আরম্ভ—এ সবই ছিল অধিকতর উন্নত ধনিকবাদের অর্থাৎ অধিকতর নিবিড়ভাবে শোষণের প্রকৃতি নির্দ্দেশক আকার সমূহ। এ পরিবর্ত্তনের সঙ্গের সাথী ছিল জনগণের অবস্থার সত্যকারের হীনতা।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত এ স্তর উন্নতির চরমে পৌছেছিল। তাই, অবশ্যম্ভাবীরূপে পরবর্ত্তী স্তরের অবস্থা সমূহ উত্থিত হলো।

তৃতীয় স্তর হচ্ছে সেই স্তর যখন ধনিকবাদ নিজের দেশে নির্ম্মাণশিল্পের পরিপূর্ণরূপে উন্নতি সাধন করে অধীন দেশেই তার বিস্তার করতে গিয়েছে,—ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানময় করে তোলার জন্যে মূলধনের রফতানি করেছে। এইটে হচ্ছে শোষণবাদের উন্নতির উচ্চতম স্তর। এখন বৃটিশ বুর্জ্জোয়াজিগণের লাভের জন্যে ভারতীয় জনগণকে সস্তা শ্রমের যন্ত্রে পরিণত হতে হবে। বৃটিশ বুর্জ্জোয়াজিগণের আবশ্যক হয়েছে শোষণের সুবিধের জন্যে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজিগণকে ভাগীদাররূপে পাওয়া। এই হেতু এ নূতন স্তরের রাষ্ট্রনীতিক বিকাশ হয়েছে দ্বৈত শাসনে।

শোষণবাদ আপনার পতনের জন্যে আপনিই কারণ সমূহের সৃষ্টি করেছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যে যে অর্থনীতিক অবস্থার দরকার সে সব এখন বর্ত্তমান আছে। কাজে কাজেই, ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন অপরিহার্য্যরূপে আসছে।

ভারতে বৃটিশ শাসনের পুরাতন নীতির বিকাশ হয়েছে বৃটিশ শাসনের দ্বিতীয় স্তরে, যে স্তরে ভারত কৃষি-উপনিবেশ ও বৃটিশের বাজার ছিল। আজকের দিনে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় স্তর হতে তৃতীয় স্তরে পরিবর্ত্তন।

কার্ল মার্ক্স ও ভারতে বৃটিশের সামাজিক বিপ্লব

বৃটিশের ভারত বিজয় কার্য্যতঃ সামাজিক বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। এই সামাজিক বিপ্লবকে বুঝতে পারাই হচ্ছে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির প্রবেশিকা।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সোশ্যালিজমের জনয়িতা কার্ল মার্ক্স এ প্রক্রিয়াকে খুব পরিস্কাররূপে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যে শুধু এর সাধারণ প্রকৃতির বিশ্লেষণ করেছেন তা নয়, পরন্তু, ভারতের সহিত তুলনা করেও বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণত লোকে মনে করে থাকেন যে মার্ক্স কেবল মাত্র ইউরোপীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন; এও প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে মার্ক্সের মতবাদ ইউরোপীয় বস্তু বলে এসিয়ার সহিত তার কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল। রুষ ও চীনের বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদিগকে এ ভুল দেখিয়ে দিচ্ছে। মার্ক্সের মতবাদ বৈজ্ঞানিক বহির্দৃষ্টির চরম সীমায় পৌছেচে। আগাগোড়া এ মতবাদ পরিবর্দ্ধনের বিশ্ব প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় প্রশ্নের প্রতিও মার্ক্স বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালে ভারতীয় প্রশ্নের বিশেষ বিশ্লেষণ মার্ক্স গঠন করে গেছেন। তিনি ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যা আজকের দিনে সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

মার্ক্সের ভারতীয় প্রশ্নের বিশ্লেষণ তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধ-গুলিতে পাওয়া যাবে। এ সকল প্রবন্ধ ১৮৫৩ সনে "ভারতে বৃটিশ শাসন", "ভারতে-বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস" এবং "ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ পরিণাম" নাম দিয়ে

তিনি "নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন" নামক কাগজে লিখেছিলেন। *

এ প্রবন্ধগুলিতে মার্ক্স বিশ্লেষণ করেছেন যে বৃটিশের ভারত বিজয়ের ফল প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। এসিয়ার অর্থনীতিক শৃঙ্খলার মধ্যে এটাই প্রথম সামাজিক বিপ্লব। প্রত্যেক সামাজিক বিপ্লবের ন্যায় এ বিপ্লবেরও সাক্ষাৎ ফল ধ্বংসজনক হয়েছে। এর ভবিষ্যফল তখনো আগমন সাপেক্ষ ছিল। "ইংল্যাণ্ড ভারতীয় সামাজিক শৃঙ্খলার বেড়া ভেঙে দিয়েছে। এমন ভাঙা ভেঙেছে যে তার পুনরভ্যুত্থানের কোনো চিহ্ন আর দেখা যায় নি।"

বুর্জুয়াজি শোষণের আক্রমণে পুরাতন ফিউডাল (জায়গীরদারী) প্রথা ও গ্রাম্য পদ্ধতির ধ্বংসেতেই এ সামাজিক বিপ্লব ঘটেছে।

ইউরোপের ন্যায় ভারতেও বৃহৎ ভূম্যভিজাত সম্প্রদায়ের ও তাদের প্রতিনিধিগণের শাসনই ছিল ফিউডাল (জায়গীরদারী) প্রথা। কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করার ভিত্তির ওপরেই এ প্রথা বিন্যস্ত ছিল। এ ভূম্যভিজাত সম্প্রদায় নামে মাত্র কৃষকদের রক্ষণাবেক্ষণ করত। কৃষকদের সামাজিক কাজগুলি (সেচ বিভাগ) ভূম্যভিজাতগণের যত্নাধীন ছিল। বৃটিশ আক্রমণের দ্বারা বাইরে থেকে এর পতন হওয়ার পূর্ব্বেই সামাজিক উন্নতির স্বাভাবিক গতির দ্বারা ও ইউরোপের ন্যায় অন্তর্ধ্বংসকারক সংগ্রামের দ্বারা ফিউডাল (জায়গীরদারী) প্রথা আগে থেকেই ভাঙার মত হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ বিজয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফিউডাল (জায়গীরদার) প্রভুদের শাসনের পরিবর্ত্তে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তিত হলো। বাকী যেগুলি রইল সেগুলো পরগাছা হিসেবেই রইল। পক্ষান্তরে ভূমির স্বত্ব প্রথম স্তরে জমীদার নামক এক নূতন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর হাতে গেল। জেনে শুনেই বৃটিশ-ভূমি-প্রথার অনুকরণে আপনাদের এজেন্টরূপেই বৃটিশ জমীদারদের প্রতিষ্ঠা করল। বিজয়ের দ্বিতীয় স্তরে কৃষকদের ভূমি সাক্ষাৎ ভাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকেই নেওয়া হলো।

গ্রাম্য পদ্ধতি ছিল ফিউডাল (জায়গীরদারী) প্রথার অধঃস্তর। সামান্য কৃষি ও হস্ত শিল্পের আত্ম-সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর সমবায়ের ওপরেই ছিল এর ভিত্তি। বিদেশে তৈরী জিনিসের ধারাবাহিক অভিযানের দ্বারা হস্ত শিল্পের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে গেল। এর ফলে সমস্ত গ্রাম্য পদ্ধতিই ধ্বংস প্রাপ্ত হলো। হস্ত শিল্পের কারিগররা বাধ্য হয়ে চাষের কাজে হাত দিল। এর দ্বারা গ্রাম সমূহে জনতা ও দারিদ্র্য দু-ই বেড়ে গেল।

এইরূপে বুর্জুয়া বিপ্লবের ধ্বংসের দিকটা খুব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হলো। কিন্তু, এর কোনো গঠনের দিক্ ছিল না। বিপ্লবের কাজ বিদেশী এজেন্টরা কেবলমাত্র বিদেশী শিল্পের বর্দ্ধনের জন্যই করেছিল। এ কারণে ধ্বংস সাধিত হয়েছিল "পুনরুত্থানের" ("Rebirth"এর) বন্দোবস্ত ছাড়া। অন্য দিকটারও আবশ্যকানুযায়ী আসতে হয়েছিল।

গ্রাম্য পদ্ধতির পতনের জন্যে মার্ক্স কি অশ্রু বিসর্জ্জন করেছেন? মার্ক্স দেখতে পেয়েছিলেন বুর্জুয়া সামাজিক বিপ্লবের অসীম যন্ত্রনার দিকটা (যেমন প্রত্যেক দেশেই হয়ে থাকে), বিশেষ করে এরূপ অবস্থা সমূহের ভিতর দিয়ে বিপ্লব ব্যাপার সংগঠিত হওয়ার জন্যে। কিন্তু, তিনি মেনে নিয়েছেন যে এ প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং অর্থনীতিক বর্দ্ধনের শক্তি সমূহের সম্মুখীন হয়ে গ্রাম্য পদ্ধতি আর পুনর্গঠিত হতে পারে না। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে গ্রাম্য পদ্ধতি প্রকৃত পক্ষে অনিয়ন্ত্রিত শাসন প্রণালী, দাসত্ব, কুসংস্কার ও নৃশংসয়তার অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি ছিল।

"কি করে এ সকল অগণিত, পরিশ্রমী, গোষ্ঠিবদ্ধ ও শান্তিময় সামাজিক সম্প্রদায়গুলো অগঠিত হয়েছে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙে পড়েছে, দুঃখের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সমাজের ব্যক্তিগত সভ্যদিগকে তাদের পুরাতন সভ্যতা ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অস্তিত্ব রক্ষার উপায় হতে বঞ্চিত করা হয়েছে—এ সব দেখতে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে যতই ব্যথাদায়ক হোক্‌না কেন, তথাপি আমাদের ভুললে চলবেনা যে এ সকল কবিত্বময় গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলি চিরকাল প্রাচ্য যথেচ্ছচারিতার ভিত্তি স্বরূপ হয়েছে, এরা মানুষের সত্তাকে সঙ্কীর্ণতম সীমার মধ্যে চিরকাল বেঁধে রেখেছে, একে কুসংস্কারের অসহায় যন্ত্রে এবং স্বভাব ও সনাতন আচারের দাসত্বে পরিণত করেছে, আর একে এর সকল মহত্ব ও সকল ঐতিহাসিক সৃষ্টি-ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছে। আমাদের ভোলা উচিত নয় যে বর্ব্বরতাময় অধ্যাত্মবাদ যা একখণ্ড ভূমিকে কামড়ে ধরে পড়ে থেকে অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে সমগ্র রাজত্বের ধ্বংস হওয়া, অবর্ণনীয় বিভীষিকার অভিনয়, একটা পুরো শহরের অধিবাসীদের হত্যা দেখতে পারত আর প্রকৃতির একটা ঘটনা ব্যতীত এর ভিতরে আর কিছুই দেখতে পেতনা। এ অধ্যাত্মবাদ নিজেই নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই যে কোনো আক্রমণকারী তার মনোযোগকে ইচ্ছে করলেই সেদিকে ঘুরিতে দিতে পারত। আমরা ভুলতে পারব না যে এ অকেজো, অনড় ও বর্দ্ধনশীল জীবাকৃতি, এ উদাসীন অস্তিত্ব অন্যদিক থেকে অগণিত ভীষণ অশাসনীয় ধ্বংস শক্তি সমূহের সৃষ্টি করেছে যা হত্যাকে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছিল। আমরা কিছুতেই ভুলব না যে এ সকল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির ভিতরে বর্ণগত বৈষম্য ও দাসত্বের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তারা মানুষকে বাইরেকার শক্তির প্রভু না করে তাকে বাইরেকার অবস্থা সমূহের দাস মাত্র করেছিল, যে সামাজিক গঠন আপনার বর্দ্ধনের প্রক্রিয়ার দ্বারা আবির্ভূত হয়েছে তাকে তারা অপরিবর্ত্তনীয় নৈসর্গিক নিয়মে পরিণত করেছে। এভাবে তারা প্রকৃতির এমন অদ্ভুত পূজো পর্য্যন্ত করতে আরম্ভ করেছে যার কোনো মানেই নেই। প্রকৃতির প্রভু মানুষ ভূজানু হয়ে ধ্যান করছে কিনা হনুমান আর গরুর!"

এই সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্স দেখিয়েছেন যে ভারতে বৃটিশের সামাজিক বিপ্লবকে যদিও এখনো পর্য্যন্ত কেবল মাত্র ধ্বংসকর বলে মনে হয় তথাপি এ বিপ্লব অবশ্যম্ভাবীরূপে নব সামাজিক সংগঠনের অবস্থা সমূহের সৃষ্টি করছিল। তিনি দেখিয়েছেন যে যদিও পুরাতন সামাজিক শৃঙ্খলা ভগ্ন হওয়ার পরে এখনো পর্য্যন্ত ভারতের নবজীবন লাভের কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি তবুও বৃটিশ বিপ্লব এসিয়াতে, বিশেষ করে ভারতে ও চীনে নব সামা-

* অধ্যাপক রায়ানানফ্ এ প্রবন্ধগুলি "Unter dem Banner des Marximus" নামক কাগজের ১৯২৫ সনের দ্বিতীয় সংখ্যায় আপনার ভূমিকাসহ পুনর্মুদ্রিত করেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক অধ্যায়নের পক্ষে মূল প্রবন্ধগুলি ও ভূমিকা খুবই মূল্যবান। ১ম ও ৩য় প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ ১৯২৫ সনের ডিসেম্বরের "লেবর মন্থলী"তে ছাপা হয়েছে।

জিক শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে পূর্ব্ব অবস্থা সমূহের সৃষ্টিতে রত ছিল। তিনি আরো বলেছেন যে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যসাধন করা এবং রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রথা স্থাপন করার দ্বারা অপরিহার্য্য-রূপে ভবিষ্য শিল্পোন্নতির পথ খুলে দেওয়া হয়েছে এবং কাজে কাজেই পরিশেষে ভারতের ভবিষ্য স্বাধীনতার পথও প্রশস্ত হয়েছে।

"যে দেশে কয়লা ও লোহা আছে সে দেশের যোগাযোগের পন্থাতে একবার যদি মেশিনের প্রবর্ত্তন হয় তা হলে সে দেশকে আপন উন্নতি থেকে বিরত করা অসম্ভব। ভারতের রেলওয়ে প্রথাই হচ্ছে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।"

১৮৫৩ সালে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ছিল। আজ বিংশ শতাব্দীর দিনে এ ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হচ্ছে।

কিন্তু, এ ভাবি সূচনা থেকে আরো এক অতিরিক্ত সিদ্ধান্তে মার্ক্স উপনীত হয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত আরো বেশী অগ্রসর। সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে ভারতে এ নব শৃঙ্খলার স্থাপন থেকেই অবশ্যম্ভাবীরূপে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন উদ্ভূত হবে এবং এ প্রকারে পরিশেষে বৃটিশ বুর্জ্জুয়াজি ভারতে আপন হাতে আপন শাসনের জন্যে মৃত্যুবাণ তৈরী করবে। তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় শিল্পের নব অর্থনৈতিক উন্নতিতে যতদিন বুর্জ্জুয়া শাসন থাকবে ততদিন পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর অপেক্ষা ভারতীয় জনগণের কোনো উপকার হবে না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়েছেন যে বৃটিশ বুর্জ্জুয়া শাসনের অবসান করার আবশ্যকতা কি এবং তিনি আরো বলেছেন যে বৃটিশ শ্রমিকগণের সহিত ভারতীয় জনগণের ভবিষ্য সম্মিলনই হবে ভারতের উন্নতি ও মুক্তির নির্দ্দিষ্ট পথ :—

"বৃটিশ বুর্জ্জুয়াজি ভারতীয়দের মধ্যে যে নব সমাজের উপাদান সমূহ প্রক্ষিপ্ত করেছে তার কোনো ফল ভারতবাসী ভোগ করতে পারবে না যে পর্য্যন্ত নিজ গ্রেট বৃটেনেই বর্ত্তমান শাসক শ্রেণী সমূহকে শিল্পানুষ্ঠানে নিয়োজিত প্রোলেটারিয়েটরা কোণ-ঠাসা না করবে কিংবা ভারতবাসীরা চিরদিনের জন্যে বৃটিশ শাসনের অবসান করতে যথেষ্টরূপ বলশালী না হবে।"

এখানে মার্ক্স শক্তিমত্তার সহিত এমন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন যা এখনো বর্দ্ধনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই মাত্র নিবদ্ধ রয়েছে। আপাততঃ এ যাবৎ সামাজিক বিপ্লবের সাক্ষাৎ ফল কি কি হয়েছে তাহারি ভিতরে আমরা আমাদের আলোচনাকে আবদ্ধ রাখব।

বুর্জ্জুয়াজি (Bourgeoisie)—আধুনিক ধনিকগণ, সামাজিক উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকগণ এবং ভাড়াটে মজুরদের নিয়োগ-কর্ত্তৃগণ। উৎপাদনের উপায় সমূহে বঞ্চিত হয়ে যারা বেঁচে থাকার জন্যে আপনাদের শ্রমশক্তিকে বুর্জ্জুয়াজিগণের নিকটে বিক্রী করতে বাধ্য হয় তাদেরকে বলা হয় **প্রোলেটারিয়েট** (Proletariat.)

কৃষক ও শ্রমিক

[শ্রীদীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

বঙ্গদেশীয় কৃষক ও শ্রমিকগণের কথা মনে উঠিলেই তাহাদের নিমিত্ত দুঃখ ও ব্যথায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং নির্য্যাতিত কৃষক ও শ্রমিকগণকে আজ পশুত্বের শেষ সীমায় আনিয়া পৌছানো হইয়াছে। বহু শতাব্দীর অত্যাচার ও অনাচার তাহাদের হৃদয়ে পাথর চাপিয়া বসিয়াছে। তাহাদের বাক্ শক্তি রোধ করিয়া দিয়াছে। একদিকে নানাবিধ ব্যাধি, অন্যদিকে ধনিক ও জমীদার আদির শোষণে কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা আজ নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

যাহাদের চেষ্টা ও যত্নের ফলেই এই বিশ্বের সকল প্রকার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতেছে,—যাহাদের অক্লান্ত কর্ম্মের ফলেই দেশবাসীর অন্নের সংস্থান হইতেছে—তাহারাই আজ বিশ্বের নিকট সকলের চেয়ে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহাদের পেটে অন্ন নাই, শরীরে পোষাক নাই এবং মানুষের বাসোপযোগী বাসগৃহও তাহাদের নাই।

সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর যে সামান্য আয় তাহারা অর্জ্জন করিতে সক্ষম তাহার দ্বারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির অন্নের সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সময়ে একবেলা,—আধবেলা আহার করিয়াই তাহাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হয়। ফলতঃ তাহারা নিজের এবং জাতির কল্যাণের নিমিত্ত বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতেও অক্ষম। হয়তো তাহাদের চির বুভুক্ষিত হৃদয়ে স্বাধীনতাও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। দেশের অধিবাসিগণের ভিতর অধিকাংশই কৃষক ও শ্রমিক। তাহারা আজ নানা প্রকার শোষণ ও নিপীড়ণে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দেশে স্বাধীনতা আনয়নের কথা যাঁহারা বলিতেছেন তাঁহারা দেশের প্রাণ শক্তিকে বাদ দিয়াই স্বাধীনতা আনিতে চাহেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিজেদেরই জন্য। তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না যে তাঁহাদের যুগের অবসান হইয়া এখন কৃষক ও শ্রমিকের যুগ আসিয়াছে। হয়ত তাঁহারা কৃষক ও শ্রমিকগণের সহিত সমপ্রাণ সংযোগে একীভূত হইবেন, নতুবা মরিবেন। তৃতীয় কোনো পথ তাঁহাদের জন্য, এযুগে আর খোলা নাই। পল্লী সংস্কারের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভুয়া কথা। কৃষক ও শ্রমিকগণকে সংগঠিত ও সচেতন করিতে না পারিলে তাহাদের দাবী-দাওয়া না মিটাইলে কোনো সংস্কারেরই আশা নাই। বাংলার যুবকগণ, পারিবে কি এই কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে? সাকলাৎ ওয়ালার কথা কি তোমাদের কাহারো হৃদয় স্পর্শ করে নাই? কি গভীর পরিতাপের কথা!

মানব ধর্ম্ম

[শ্রীবিধুভূষণ মজুমদার]

মানুষ যখন ভুলিয়া যায়, জীব-জগতে তার বৈশিষ্ট্য আর স্বাতন্ত্র্য তখনই সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে সাম্প্রদায়গত, ধর্ম্মগত ও জাতিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে। মানুষ যখন মনুষ্যত্বের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায় তখনই তার ভিতর প্রকট হইয়া উঠে যত.পঙ্কিলতা, যত স্বার্থপরতা, যত পাপ। মানুষে মানুষে তখনই বিরোধ বেধে উঠে, যখন মানুষ মানবতাকে পরিত্যাগ করে মানবেতর প্রাণীর ধর্ম্ম অর্থাৎ নিজ নিজ সুখ দুঃখ নিয়া ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

আজ কাল ধর্ম্ম নামে মানব সমাজে যে জিনিসটি প্রচলিত আছে এবং যাকে কেন্দ্র ক'রে সমাজে ও দেশে নানা বীভৎস পাশবিক অনুষ্ঠান চলেছে সে জিনিসটার সঙ্গে প্রকৃত মানব ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নেই। জলের স্বভাবধর্ম্ম যেমন শীতলতা অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তি, মানুষের তেমনি মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন দলগত ও ধর্ম্মগত দাবী লইয়া যখন মানুষ দাঁড়ায়, তখনই তার ভিতরে প্রবল হ'য়ে ওঠে যত বিদ্বেষ বুদ্ধি, যত হীনতা ও দুর্ব্বলতা, এবং তখনই সম্ভব হ'য়ে ওঠে যত নারকীয় বীভৎস অনুষ্ঠান। মানব সাধারণ যখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে স্বরূপ ভুলে যেয়ে জড়বৎ পরের ইঙ্গিতে চলে তখনই তাদের দ্বারা সম্ভব হয়ে পড়ে আত্ম-কলহ তথা আত্ম-নাশ।

আজ কাল বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতর যে বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠেছে তার মূলে আছে, মানবত্ব অর্থাৎ জীব-জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা। আর এই অজ্ঞতাকে আশ্রয় করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরোহিতকুল ধর্ম্মের নামে মানব সমাজকে ক্ষেপিয়ে তু'লে, মানুষে মানুষে অকারণ লড়াই বাধিয়ে দিয়ে স্ব স্ব আর্থিক ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা ক'রছে। মানুষ যখন সচেতন হ'য়ে উঠ্‌বে নিজ নিজ অবস্থার বিষয়ে, যখন সে জান্‌তে পারবে তার সত্য স্বরূপ, তখন আর পুরোহিতকুলের এরূপ স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হয়ে উঠবেনা; এবং তখনই মানুষে মানুষে প্রকৃত মিলন হবে মনুষ্যত্বের বেদীর ওপরে।

মানুষ যখন পশু হ'য়ে পড়ে, তখনই তার প্রয়োজন হ'য়ে ওঠে অপরের আশ্রয়, নইলে সহজ সরল ভাবে দাঁড়ান তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তেমনি মানুষ যখন তার স্বভাব ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে অথবা ঐ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে তখনই তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে অপরের আশ্রয়, তার লুপ্ত অথবা সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিয়া জীবন পথে সহজ গতি লাভ করিবার জন্যে। মানুষের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন বিভিন্ন দলের বুদ্ধিজীবী লোক গুলি, নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে, মানুষকে নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রেখে, মনুষ্যত্বের দিক্ হতে দূরে সরিয়ে রাখে; এবং স্বকপোল কল্পিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান দ্বারা তাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া বংশ পরাম্পরাক্রমে শোষণ করিবার পথ উন্মুক্ত রাখে। এইভাবে আদি কাল থেকে মানব সমাজে নানাবিধ দল ও ধর্ম্মের সৃষ্টি হ'য়ে আস্‌ছে। যতদিন মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের ওপর না দাঁড়িয়ে চেয়ে থাক্‌বে অপরের দিকে ধর্ম্মের আশায়, ততদিন মানুষে মানুষে বিরোধ থাক্‌বেই।

মানব সমাজকে এই শোচনীয় অধোগতির হাত থেকে বাঁচাতে হলে সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন, পৌরহিত্যের উচ্ছেদ। এর সঙ্গে সঙ্গে, ধ্বংস হয়ে যাবে সমাজের উচ্চ নীচ স্তর। তখন মুক্ত গগন তলে, দল ও ধর্ম্ম গত সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে মানুষ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। সুতরাং দেশের ভিতর যাঁরা শান্তি ও শৃঙ্খলা চান, তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য হবে এই পুরোহিত কুলের হাত থেকে মানবকে মুক্ত করা অর্থাৎ মানব সাধারণকে তাদের অবস্থা ও স্বরূপ সম্বন্ধে জাগ্রত করিয়ে তোলা, তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে মানুষের বিচার হবে তার মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে অন্য কিছুতে নহে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

—:•:—

সি-আই-ডি আতঙ্ক

আমাদের ইংরেজী সহযোগী "ফরওয়ার্ড"এর হঠাৎ সি-আই-ডি আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। বিগত ২৪শে এপ্রিল তারিখের "ফরওয়ার্ড"এ "তিনটি 'সি' ও তাদের যোগসূত্র" (The Three "C" s And the Link Between Them) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বের হয়েছে। এটি একটি প্রাপ্ত প্রবন্ধ। কিন্তু তা হলেও "ফরওয়ার্ড"এর সম্পাদকগণের হাত হয়েই নিশ্চয়ই এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কাজে কাজেই এর মুদ্রণের জন্যে প্রবন্ধ লেখক স্বয়ং যতটা দায়ী তার চেয়ে কোনো অংশেই "ফরওয়ার্ড"এর সম্পাদকগণ কম দায়ী নন।

ইংরেজীতে, "কংগ্রেস" "সি-আই-ডি" ও "কম্যুনিষ্ট" শব্দের প্রথম অক্ষর "সি"। তারি জন্যে প্রবন্ধের নাম তিনটি "সি" হয়েছে। এ তিন দলের মধ্যে যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে তাহারি কথা প্রবন্ধ লেখক বলতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রবন্ধের যতটা প্রকাশিত হয়েছে তাতে কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে কোনো কথা নেই। কেবল এতটুকু মাত্র বলা হয়েছে যে কোনো কোনো লোক বর্ম্মাতে গিয়ে আপনাদিগকে কংগ্রেসের লোক বা কম্যুনিষ্ট বলে পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। বোধ হয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে লেখক কম্যুনিষ্ট ও সি-আই-ডি কিংবা কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেস সম্বন্ধে লিখবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু, আজো পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ আর প্রকাশিত হয়নি। ২৪শে এপ্রিলের পরে এতদিন যেতেও যখন হলো না তখন হবে বলেও বড় একটা আশা আর নেই। "গণবাণী"র একজন সম্পাদক ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন সভ্য। কাজেই, আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেম ফরওয়ার্ডের প্রবন্ধ লেখক কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে কি বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তা জানবার জন্যে। যাক্, তিনি যখন লিখলেন না তখন আর কি করা যাবে?

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস গুপ্ত সমিতি নয়। এর প্রতিজ্ঞা পত্রে নাম সই করলে এবং গান্ধীর প্রবর্ত্তিত সর্ব্ববিঘ্নহর খদ্দর পরিধান করলে যে কোনো লোক কংগ্রেসের সভ্য হতে পারেন। সরকারী চাকুরেরা, কাজে কাজেই গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরাও, যদি প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম সই করেন তবে তাঁদেরও

কংগ্রেসের সভ্য হতে বাধা নেই। অন্ততঃ তাঁদের বাধা দেবার কোনো বিধান কংগ্রেসের নিয়ম পত্রে আছে বলে আমাদের জানা নেই। যে সংগঠনের দ্বার এমনি ভাবে সকলেরই জন্যে খোলা রয়েছে সে সংগঠনের সি-আই-ডিকে ভয় করার যে কি আছে তাত আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনে। যে নীতিতে কংগ্রেসের কাজ কর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ে পরিচালিত হচ্ছে তাতে বিপ্লববাদী সঙ্ঘ কংগ্রেসকে কিছুতেই বলা যেতে পারে না। বিপ্লব বা বিদ্রোহ বল্‌তে এ যুগে ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের বিরুদ্ধের উত্থানকে বোঝায়। মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার হতে আরম্ভ করে মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত পর্য্যন্ত যে সকল মহারথি কংগ্রেসের মাথার ওপরে চেপে বসে আছেন তাঁদের কেউইত বিপ্লববাদী নন। কেননা, ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত সম্বন্ধ তাঁরা কিছুতেই কাটাতে চাননা। এমন কি মিঃ সি-আর দাশও বিপ্লববাদী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের প্রখ্যাতনামা নেতা মিঃ টি, সি, গোস্বামী বলেছেন :—

"মিঃ দাশ কখনো বিপ্লববাদী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ ও গ্রেট্ বৃটেন এ উভয় দেশই বিধান ও শৃঙ্খলার একজন সত্যকারের রক্ষককে হারিয়েছে। মিঃ দাশ ভারতবর্ষ ও বিপ্লবের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন।"

"ডেইলি হেরাল্ড"—১৮ই জুন, ১৯২৫।

অবশ্য কংগ্রেসের ভিতরে যে অসন্তুষ্টের দল নেই এমন কথা আমরা কিছুতেই বলতে পারিনে। এ অসন্তুষ্টের দল সম্ভবতঃ ভারতবর্ষকে ইম্পিরিয়েলিজমের হাত থেকে মুক্তও করতে চান, সুতরাং তাঁরা বিপ্লববাদীও বটেন। পুলিসের নজর এঁদের গতি বিধির ওপরে হয়তো আছে, হয়তো পুলিসের এজেন্টরা এঁদের সাথে এক হয়ে মিশেও গেছে, কিন্তু, এ সব সত্বেও "ফরওয়ার্ড"এর এ অদ্ভুত অভিনয় করার কি প্রয়োজন ছিল? গোয়েন্দাকে ভয় করে কেউ কোন দিন কাজ করতে পারেনি, পারবেও না। পদে পদে গোয়েন্দার আতঙ্ক যাঁদের হয়ে থাকে তাঁদের পক্ষে এ সব কাজে না আসাই শ্রেয়স্কর।

"ফরওয়ার্ড"এর অজ্ঞাতনামা প্রবন্ধ লেখক যেমন ভাবে লিখেছেন তাতে মনে হয় যে গোয়েন্দা পুলিসের এজেন্টগণ নিজেরা নিজেদের সম্বন্ধে যতটা জানে তার চেয়ে ঢের বেশী তিনি তাদেরকে জানেন? আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে কি উপায়ে তিনি এ সব জানতে পেরেছেন? আর জানতেই যদি পেরেছেন তবে তাঁর দলিল পত্র দেখিয়ে পাঁচ জনের সম্মুখে এজেন্টগণকে শায়েস্তা করেন নি কেন?

লেখক যে যে শ্রেণীর এজেন্টগণের কথা বলেছেন সেরূপ গোয়েন্দার এজেন্টের অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে তাহলে তারা বাস্তবিক ঘৃণ্যজীব। কিন্তু, খবরের কাগজের সাহায্য নিয়ে এ কথার আলোচনা করে লেখক মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি। কে কি উপায়ে জীবন ধারণ করেন তা জিজ্ঞাসা করাও সব সময়ে নিরাপদ নয়। তারপরে বাংলা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কারণে দলাদলির অভাব নেই। "ফরওয়ার্ড"এর এ প্রবন্ধ পড়ে এখন থেকে শুধু শত্রুতার বশেই এক দলের লোক আর এক দলের লোককে পুলিসের গোয়েন্দা বলে প্রকাশ করতে থাক্‌বে। লেখক কে তা আমরা জানিনে, তবে আমাদের ভয় হচ্ছে তিনি হয়তো একদিন নিজের খোদা গর্ত্তে নিজেই পড়বেন।

এ লেখকের সহিত সহানুভূতি না থাকলে "ফরওয়ার্ড"এর সম্পাদকগণ কখনো এ লেখা আপনাদের কাগজে ছাপাতে পারতেন না। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় "ফরওয়ার্ড"এর অন্যতম সম্পাদক এবং কংগ্রেসেরও তিনি একজন নেতৃস্থানীয় লোক। তিনি যদি কংগ্রেসকে সত্যকারের মুক্তি সংগ্রামের জন্যে পরিচালিত করতে পারতেন, যদি কংগ্রেসকে শ্রেণী বিশেষের সঙ্ঘ না করে দেশের জনগণের সংগঠন করতে পারতেন তা হলে সেটাই হত তাঁর পক্ষে শোভনক কাজ। "সি-আই-ডি"র সহিত ত তাঁর চেনা শুনা যথেষ্ট হয়ে গেছে। এ বৃদ্ধ বয়সে সি-আই-ডি নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কি আর লাভ করবেন তিনি! পুলিশের এজেন্টের চেয়ে ইম্পিরিয়েলিষ্টদের (শোষণ-বাদীদের) এজেন্টরাই অধিকতর মারাত্মক জীব। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথের কাঁটা হয়ে ইম্পিরিয়েলিজমের এজেন্টগণই দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের এজেন্ট কি করতে পারে? কতটুকুই বা তার শক্তি? কংগ্রেসকে জনগণের সংগঠন করে তোলার জন্যে আবশ্যক হয়ে পড়েছে এ'কে ইম্পিরিয়েলিজমের এজেন্টগণের হাত থেকে মুক্ত করা। উপেন্দ্র নাথ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন কি?

—•—

বোম্বের নবগঠিত শ্রমিক ও কৃষক দলের (The Workers' and Peasants' Party of Bombay এর) সভ্য কমরেড কেশব নীলকণ্ঠ জোগ্‌লেকার ও কম্‌রেড্ রঘুনাথ এস, নিম্বকার বোম্বেতে যে অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং বস্‌বে তাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপস্থিত করবেন। এ প্রস্তাবে তাঁরা কংগ্রেসকে আরো প্রশস্ততর পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। কংগ্রেস জনগণের সংগঠন হয়ে জনগণের কর্ম্মতালিকা নিয়ে সংগ্রাম করুক এই তাঁরা চান। তাঁরা আরো চান যে ইম্পিরিয়েলিজমের হাত থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হোক্। এ প্রস্তাবের খসড়া তাঁরা সর্ব্বত্র প্রচার করেছেন। দৈনিক কাগজ সমূহতেও এর চুম্বক প্রকাশিত হয়েছে। আমরাও স্থানান্তরে এ প্রস্তাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলেম। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে বাংলা থেকে যাঁরা অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস কমিটির সভ্য আছেন তাঁরা এ প্রস্তাবের সমর্থন করবেন কিনা। অনেকেই স্বার্থের খাতিরে করবেন না জানি, কিন্তু ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত স্বার্থের বন্ধন যাঁদের নেই তাঁদের উচিত বোম্বের শ্রমিক ও কৃষক দলের এ প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন করা। আমাদের সহযোগী "ফরওয়ার্ড" ভয়ে ভয়ে একটুকু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রস্তাবের সমর্থন করেছেন। কিন্তু জনগণের শোষক ধনিক, বণিক ও জমীদারের দল "ফরওয়ার্ড" এর মালিক। তাই, খাতির রাখতে গিয়ে "ফরওয়ার্ড" লিখেছেন :— The congress as a national institution cannot, of course, identify itself with any particular class or community and it cannot afford to look at the political or economic situation in the country solely from the point of view of agricultural or industrial labourers.

অর্থাৎ "জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে, অবশ্য কংগ্রেস কোনো বিশিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের হয়ে কাজ করতে পারে না এবং

কেবল মাত্র কৃষি বা শৈল্পিক শ্রমিকদের দিক থেকে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনীতিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেও কংগ্রেস সমর্থ নয়।"

এখানে কৃষি-শ্রমিক বলতে যে "ফরওয়ার্ড" কৃষকদিগকেই মনে করেছেন তা এর পরের বাক্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। "ফরওয়ার্ড" লিখছেন :—

"Silll, we cannot lose sight of the fact that the peasants and labourers form by far the vast majority of the population.

অর্থাৎ "তবুও আমরা এ সত্যকে ভুলতে পারিনে যে দেশের অধিবাসিগণের অত্যন্ত বেশীর ভাগই হচ্ছে কৃষক আর শ্রমিক।"

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এ সত্যটা "ফরওয়ার্ড" স্বীকার করেছেন। হায়দরাবাদের নিজাম হতে আরম্ভ করে দরিদ্র কৃষক বা শ্রমিক পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতিষ্ঠান কিছু কংগ্রেস হতে পারে না। কংগ্রেস যাদের প্রতিষ্ঠান তাদের স্বার্থ সংরক্ষণই কংগ্রেসের কাজ। এ ছাড়া কংগ্রেসের অস্তিত্বের অন্য কোনো কারণ আমরা কল্পনা করতে পারিনি। ধনিক, বণিক ও জমীদারের স্বার্থ এবং জনগণের স্বার্থ এক নয়। প্রথমোক্তদের স্বার্থ হচ্ছে শেষোক্তদের শোষণ ও লুণ্ঠন করা, আর শেষোক্তদের স্বার্থ হচ্ছে প্রথমোক্তদের অন্যায় শোষণ ও লুণ্ঠনের অবসান করে আপনাদের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করা। ধনিক-বণিক-জমীদারের সাথে জনগণের অবিরাম সংগ্রাম চলেছে। কাজেই এক পক্ষর সাথে আর এক পক্ষ এক হয়ে কিছুতেই কাজ করতে পারেনা। কেননা, দু'টোই হচ্ছে সংগ্রামশীল পক্ষ। এ অবস্থায় কংগ্রেসকে হয়ত ধনিক-বণিক-জমীদারের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে কিংবা রাখতে হবে জনগণের স্বার্থের প্রতি। "ফরওয়ার্ড"এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে—The congress as landlords and capitalists institution cannot, of course, identify itself with peasants and workers অর্থাৎ কংগ্রেস জমীদার ও ধনিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কৃষক ও শ্রমিকের হয়ে কাজ করতে পারেনা। কিংবা বলতে হবে The congress as workers' and peasants' institution cannot, of course, identify itself with capitalists and landlords. অর্থাৎ কংগ্রেস শ্রমিক ও কৃষকের প্রতিষ্ঠানরূপে ধনিক ও জমীদারের হয়ে কোনো কাজ করতে পারেনা। এ ছাড়া কোনো তৃতীয় পন্থা নেই। পরিস্কার ভাষায় বলে দিতে হবে এস্‌পার কি উস্‌পার। মিছামিছি গোজামিল দিয়ে কিছু কি লাভ আছে?

পুলিশের দায়িত্ব-হীনতা

বিগত জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা **গণবাণী** আফিসে খানা তালাশি করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা পুলিশের লোকেরাই জানেন। তবে তালাশি করে পুলিশ অনেকগুলো বই ও কিছু কাগজ পত্র আমাদের আফিস থেকে নিয়ে গেছেন। বই গুলো যা পুলিস নিয়ে গেছেন তার একখানাও নিষিদ্ধ পুস্তক নয়। আর কাগজ পত্র যা নিয়েছেন তাতেও আপত্তি জনক কিছুই নেই। **গণবাণী** আফিসে একজন বন্ধু তলাশির সময় ছিলেন। তাঁর বাক্স থেকে পুলিশ অবশ্য একখানা "বিষের বাঁশী" নামক পুস্তক নিয়ে গেছেন। এখানা নিষিদ্ধ পুস্তক হলেও আফিস এর জন্যে দায়ী নয়। যাক, আফিসের যে সকল বই ও কাগজ পত্র পুলিশের লোকেরা নিয়ে গেছেন সে সব আজো পর্য্যন্ত ফেরৎ দেওয়া হয়নি। আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কমিশনরকে এ বিষয়ে লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেছি। প্রথম পত্রের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। তাতে বলেছিলেন যে তাঁর অনুসন্ধানের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই তিনি জিনিস গুলো ফেরৎ দিবেন। তার পরে আর যে সব পত্র তাঁকে লিখা হয়েছে সে সবের উত্তর দেওয়ারও যে কোনো প্রয়োজন আছে তা তিনি মনে করেন নি। স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে নগরের লোকের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অথচ এদিকে যে মানুষের জিনিস নিয়ে গেলে ফেরৎ দেবারও প্রয়োজন আছে সে দায়িত্ব-জ্ঞানটুকু তাঁদের একেবারেই নেই। আমরা জানতে পারি কি যে কোন অধিকারে পুলিসের লোকেরা আমাদের বইপত্র নিয়ে যেয়ে এত দীর্ঘ কাল আটকিয়ে রেখেছেন? এ সবের অভাবে আমাদের যে ক্ষতি ও অসুবিধে হয়েছে তার জন্যে দায়ী কে হবে? স্পেশাল ব্রাঞ্চের মহাপ্রভুটি যখন চিঠির উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত প্রয়োজন মনে করেন নি তখন বাংলা গবর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটরী মশায় এর কোনো প্রতিকার করবেন কি? ন্যায়ের অবতার সার চার্লস্ টেগার্ট'ই বা কি বলতে চান?

কে উত্তর দিবেন?

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অলবার্ট হলের মিটিংএ বি, এন রেলওয়ে ধর্ম্ম ঘট কারীদের সাহায্য করার জন্যে এক কমিটি গঠিত হয়। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা ও শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী হন কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ। অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড্‌স ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাংলার সংগঠনকারী শ্রীযুত কিশোরীলাল ঘোষও এ কমিটির একজন সভ্য। এ কমিটি কি কি কাজ করেছেন এবং ক'টা মিটিং করেছেন তা আমরা একবার জানতে পারি কি? লণ্ডনের ইণ্টার ন্যাশন্যাল ওয়ার্কর্স রিলিফ কমিটি (The International Workers' Relief Committee of London) হতে যে কলিকাতার মেয়র মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের নিকটে ১৩১৬৲ এসেছিল সে টাকাটা তিনি কাকে দিয়েছেন—কমিটির কোষাধ্যক্ষ গোস্বামী মশায়কে না সম্পাদিকা শ্রীমতী গুপ্তাকে? যদি শ্রীমতী গুপ্তাকেই মেয়র সাহেব টাকাটা দিয়ে থাকেন তা হলে তিনি কি তাঁর কাছ থেকে কোনো খরচের হিসেব নিয়েছেন? কিংবা শ্রীমতী গুপ্তা কমিটির নিকটে কি কোনো হিসেব দাখিল করেছেন? এ সব টাকা যখন কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয় তখন যথেচ্ছভাবে এর খরচ হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষতঃ টাকাটা যখন বিদেশ থেকে এসেছে তখন এর ঠিক্ খরচের ঠিকানাটা না পাওয়া গেলে যে ভারতের পক্ষে একটা বিষম কলঙ্কের বিষয় হবে। অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মশায়ই বা কি বলতে চান?

নব কর্ম্ম-তালিকা

অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে মিটিং বোম্বেতে হবে তাতে বোম্বের নব গঠিত শ্রমিক ও কৃষক দলের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করা হবে :—

"কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্ম-কুশলতা ও কার্য্য তালিকা জনগণের দৈনন্দিন জীবন হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এর ফলে দেশের অধিবাসিগণের বেশীর ভাগ লোক, অর্থাৎ ভোটের অধিকার বিহীন শতকরা ৯৮ জনের কংগ্রেসে আর কোনো স্বার্থ ও সহানুভূতি নেই। এজন্যে কংগ্রেস একটি দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃগণ ও পরিচালকবর্গ এমন এক কর্ম্মতালিকার মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ রেখেছে যা কেবল মাত্র নগণ্য-সংখ্যক লোকের পক্ষে অর্থাৎ বড় ধনিকগণ ও তাদের বন্ধু শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী উচ্চ শ্রেণীর লোকগণের পক্ষে হিতকর। একদিক থেকে এ কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেস কেন্দ্রগুলো বিভক্ত হয়ে গেছে এবং অপর দিক্ থেকে জনগণকে তাদের দুরদৃষ্ট সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করার জন্যে সুবিধে দেওয়া, এমন কি উৎসাহ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এ বিরক্তি সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের আকারে ফুটে উঠেছে।

দেশের অত্যন্ত অধিক সংখ্যক জনগণের স্বার্থের জন্যে কংগ্রেসকে শ্রেণী-স্বার্থের সঙ্কীর্ণ বন্ধন থেকে মুক্তি করা উচিত এবং শোষণবাদীগণের দাসত্ব থেকে জাতীয় মুক্ত লাভের কার্য্যে কংগ্রেসকে প্রবৃত্ত করানো উচিত। এ কাজ হবে শোষণ ও অত্যাচার হতে জনগণের পূর্ণ-মুক্তি লাভের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া।

এজন্যে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এ মিটিং প্রস্তাব করিতেছে যে

(১) ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল্ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য শোষণ-বাদের কবল থেকে ভারতের পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা এবং সার্ব্বজনীন ভোটের অধিকারের ভিত্তির ওপরে ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

(২) কংগ্রেস সিবিল ডিস্ওবিডিয়েন্স বা সমবেত বিধি লঙ্ঘনের ওপরে পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করতেছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর্ম্মোত্থানই একমাত্র কার্য্যকর যন্ত্র হবে যার দ্বারা ভারতের জনগণ আপনাদের অধীন অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু, কংগ্রেস এটাও বুঝতে পারছে যে প্রত্যক্ষ কর্ম্মোত্থানের এ যন্ত্রকে সাফল্যের সহিত ব্যবহার করার পূর্ব্বে একটা বিরাট সাধারণ জাগরণের ভাব দেশে আনয়ন করতে হবে।

যথা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ জাগরণের ভাব আনার জন্যে সকল শক্তি অবশ্যই নিয়োজিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নিম্নলিখিত কর্ম্ম-তালিকা গ্রহণ করতেছে :—

(ক) দেশের শতকরা যে ৭০জন লোক কৃষিকার্য্যে রত আছে তাদের কৃষকসঙ্ঘ সমূহ সংহত করতে হবে। এ সকল সঙ্ঘ জিলা, তালুক ও গ্রামে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রথার ধরণে সার্ব্বজনীন ভোটের ভিত্তির ওপরে গঠিত হবে। এ সবের উদ্দেশ্য হবে মফস্বলের অর্থনীতিক জীবনের ওপরে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) সরকারের দ্বারা কৃষি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়ে কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়াতে হবে। এর দ্বারা কৃষকগণ মহাজনদের কবল থেকে আপনাদিগকে মুক্ত করতে পারবে এবং আধুনিক কৃষি সম্বন্ধীয় মেশিন আদি খরিদ করতে সমর্থ হবে।

(গ) আইনের দ্বারা সুদের হার শতকরা ৭ টাকা নির্দ্ধারিত করা।

(ঘ) ভূমিকর ফসলের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে আবদ্ধ করা এবং তা মোটামুটি সরকারী খাজনা বাবদ দেওয়ানো।

(ঙ) যে সকল জমী এখন পতিত রয়েছে সরকারের সাহায্য নিয়ে সে সমুদায়কে চাষের জমীতে পরিণত করা।

(চ) কারখানার কাজের ওপরে ক্ষমতা লাভ করার জন্যে কারখানার শ্রমিকগণকে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহে সংহত করা। তাদের মনুষ্যোচিত অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি করতে হবে :

(৴) আট ঘণ্টার দিন। সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা খাটুনি প্রয়োজন। এটা আন্তর্জাতিক দাবী। সম্পাদক, "গণবাণী"।)

(৵০) বেতনের সর্ব্ব নিম্নহার ধার্য্য করা।

(৶০) আঠারো বছরের কম বয়সের বালককে কারখানার কাজে নিযুক্ত না করা।

(।০) বার্দ্ধক্যের জন্যে বিধি-ব্যবস্থা করা। কারখানার শ্রমিক ও আফিসের কেরাণীদের জন্যে রোগের ও কর্ম্ম-হীনতার ইন্সিউরেন্সের (বীমার) বিধান করা। কৃষি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্যেও এসব ব্যবস্থা গ্রাম্য সংগঠন সমূহের দ্বারা করতে হবে।

(।৴০) নিয়োগ-কর্ত্তৃগণের দায়িত্ব ও শ্রমিকগণের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধীয় আইনের প্রসার বৃদ্ধি করা।

(।৵০) শ্রমিক সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় কাজের জন্যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা।

(।৶০) বাস গৃহের সুবন্দোবস্ত করা।

(॥০) প্রত্যেক দশ হাজার লোকের জন্যে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠা করা। জনগণের জন্যে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করানো।

(॥৴০) শিক্ষা। (॥৵০ দেখুন)।

(॥৵০) বালক বালিকাদের জন্যে ফ্রি ও বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা। দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার জন্যেও যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা। ব্যবহারিক ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত শিক্ষার জন্যেও ব্যবস্থা করা উচিত। স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও নাগরিক অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(॥৶০) পুরুষের ন্যায় নারীরও পূর্ণ সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাষ্ট্র-নীতিক অধিকার থাকবে।

(৸০) পরোক্ষভাবে করদান প্রথা রহিত করা হবে। কৃষক দিগকে কোনো ফিউডাল (বা জায়গীর-দারী) স্বত্বের জন্যে কিছুই দিতে হবে না।

(৸৴০) মাসিক ২৫০ টাকা আয়ের ওপর হতে ক্রম-বর্দ্ধিত হারে ইন্‌কম ট্যাক্স ধার্য্য করা।

(৸৵০) ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে সকলকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু, ধর্ম্মের ব্যাপারকে একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হবে।

(৸৶০) এই কথাটা খুব পরিষ্কার ভাবে মেনে নিয়েও যে সংস্কার ও তদধীনে যে সব রাজনীতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে।

সে সব মোটেই সন্তোষজনক নয়, যথেষ্টও নয়—তথাপি এ কংগ্রেসের মত এই যে যা কিছু বর্ত্তমান রাজনীতিক অনুষ্ঠান সমূহ হতে জনগণের স্বার্থের খাতিরে করা যেতে পারে তা করা কংগ্রেসের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এ কংগ্রেসের আরো মত এই যে উপরি উক্ত কর্ম্মতালিকা অনুসারে জনগণের মধ্যে কাজ করলেই তার দ্বারাই কেবল মাত্র জনগণের মুক্তি লাভ হতে পারে। এ জন্যে এ প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করার জন্যে যে সকল অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন সে সবের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত উচিত। উপরি উক্ত কাজের প্রাথমিক অবস্থায় আইনের রক্ষণ ও সাক্ষাৎভাবে সাহায্য পাবার অবস্থা সমূহ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের মধ্যেই সৃষ্টি করা দরকার। কেবলমাত্র এই নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই সকল কংগ্রেস সভ্যের যেখানে যতটা সম্ভব কাউন্সিল ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সমূহকে ব্যবহারে আনা উচিত।

কংগ্রেসের সভ্যরা কাউন্সিল, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও গ্রাম্য সংগঠন সমূহের ভিতরে প্রবেশ করে আপনাদের শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করবেন এবং উপরি উক্ত প্রোগ্রামকে কার্য্যে পরিণত করার জন্যে ও জনগণের হাতে ক্রমশঃ অধিক শক্তি আনয়ন করার জন্যে যথা সম্ভব চেষ্টা তাঁরা করতে থাকবেন। বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে যথা সম্ভব জনগণের উপযোগী করে তোলার জন্যে কংগ্রেসের সভ্যরা তা ব্যবহার করবেন এবং বিল, প্রস্তাব ও সংশোধনী প্রস্তাব আদি পাস করিয়ে কর্ম্মতালিকাকে পরিণতির পথে চালাবেন। জনগণের ক্ষমতা যাতে বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় তারি উদ্দেশ্যে তার ভিতরে কাজ করতে যেয়ে কংগ্রেসের সভ্যগণ যে সকল ব্যবস্থার দ্বারা আমলাতন্ত্র আপনার শক্তিকে সুদৃঢ় করতে চাইবে নিরন্তর দৃঢ়ভাবে সে সকলের জন্যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিরোধ করতে থাকবেন। গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ যদি উপরি উক্ত উদ্দেশ্যের বিরোধী হয় তবে তাকে নিষ্ফল করার জন্যে কংগ্রেসের সভ্যরা যথা সম্ভব উপায় অবলম্বন করবেন।

(১২). যেহেতু উপরি উক্ত প্রোগ্রামকে কার্য্যে পরিণত করার জন্যে সুবিধাজনক অবস্থা সমূহের সৃষ্টি করা এবং শেষ মুক্তি লাভের জন্যে শ্রেণীজ্ঞান সম্পন্ন গণশক্তির উদ্বোধন করা একান্ত আবশ্যক সে কারণে এমন উপায় সমূহের উদ্ভাবন করতে হবে যার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অবনমিত হয়ে আরো অধিকতর সংস্কার সাধন করতে বাধ্য হবে।

গবর্ণমেণ্ট আপনার বৈজ্ঞানিক সম্পদ সমূহের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাই সাফল্যের সহিত তার সম্মুখীন হতে হলে এ কংগ্রেসের মতে রেলওয়ে, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ এবং অপর ট্রান্সপোর্টের উপায় সমূহ যেমন ষ্টীম্ শিপ, ডক্, মোটর সার্ভিস ও যাওয়াআতের আর সব জিনিসের ওপরে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ স্থাপনের দ্বারা যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে। গবর্ণমেণ্টকে সাধারণ ধর্ম্মঘটের ভয় দেখিয়ে আরো রাষ্ট্রনীতিক অধিকার ছেড়ে দেবার জন্যে বাধ্য করা উচিত। একারণে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উপদেশাধীনে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সমূহ যাতে শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহ সংগঠনের কাজে প্রবৃত্ত হয় তার জন্যে ধারাবাহিক চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

অপরাপর ব্যবসায়েও সাধারণ ধর্ম্মঘটের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যান বাহনের সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রচেষ্টাকে শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে। এই হেতু এ কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করার সকল দিকেই কংগ্রেসের শক্তি নিয়োজিত করা একান্ত আবশ্যক।

প্রস্তাবক—কে, এন, জোগলেকার
সমর্থক—আর, এস, নিম্বকার

দেশ বিদেশ

লাহোর হতে জনগণের উর্দ্দু সাপ্তাহিক "মিহনৎ কশ্" এর প্রথম সংখ্যা বের হয়েছে। মিঃ রামচন্দ্র ও জি, আর, দরবেশী এ কাগজের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেছেন। আমরা সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

—*—

রেলওয়ে ও ষ্টীমারে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধের কোনো অবধি নেই। এর প্রতিকারের জন্যে যাতে শক্তিশালী যাত্রীসঙ্ঘ সমূহ গড়ে ওঠে তদুদ্দেশ্যে গতকল্য "যাত্রী-দিবস" পালন করা হয়েছে। অলবার্ট হলে গতকল্য অপরাহ্ণ ৬টার সময় এক সভারও অধিবেশন হয়েছিল।

—*—

শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্প্রতি কুতবদিয়াতে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। সেখানে তাঁর অশেষ প্রকার কষ্ট হচ্ছে। প্রতিকার কি?

—*—

রেলরাস্তা নির্ম্মানের প্রাথমিক ব্যয় হিসেবে পারস্যের মজ্লিস্ ১৯২৭ সনের জন্যে ৫০ লক্ষ তোমান মঞ্জুর করেছেন। (এক তোমান আমাদের দেশের প্রায় ৩ টাকার সমান।)

—*—

নাগপুরের ৩রা মে তারিখের খবরে প্রকাশ যে অস্ত্র আইন অমান্য করার অপরাধে দু'জন স্বেচ্ছাসেবক গেরেফতার হয়েছেন। তাঁদের নাম রামলাল ও অভিমন্যু। গেরেফ্তার হওয়া মাত্রই এবিষয় শহরে প্রচার করা হয়েছে।

—*—

বৃটিশ লেবর পার্টির মিঃ পি, স্প্রাট্ সেদিন বোম্বের এক বিরাট সভায় বক্তৃতা দিতে যেয়ে বলেছেন যে ভারতে বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। বিপ্লব সম্বন্ধে লোকের একটা ভুল ধারণা আছে। তিনি এই বলে সে ধারণার নিরাকরণ করেছেন যে বিপ্লব বলতেই যে রক্তপাত বা বম নিক্ষেপ করা বুঝতে হবে তার কোনো মানে নেই। রাষ্ট্র-নীতিক ও সামাজিক কারণে যে উত্থান হয়ে থাকে তারি নাম বিপ্লব। তার পরে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এ আন্দোলন অকৃত কার্য্য হয়েছে এই জন্যে যে অর্থ-নীতিক বিপ্লবের নামে ভীত ধনিকগণ এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মিঃ স্প্রাট্ বলেন যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে সামাজিক ও রাষ্ট্র নীতিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে নিরুপদ্রবত্বকে যে বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে তা তিনি মোটেই সমর্থন করেন না। তাঁর মতে বিপ্লবের প্রথম স্তরে রক্তপাতকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। ভারতীয় সমাজের গঠনের অভ্যন্তরে গণ-অসন্তোষ লুক্কায়িত রয়েছে। এ অসন্তোষ সামাজিক ও রাষ্ট্র নীতিক বিপ্লবের রূপে ফুটে উঠবে।

কলিকাতা টাউন হলের সম্মুখস্থ ময়দানে প্রেস কর্ম্মচারি সমিতির এক সভা গত ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবারে হইয়া গিয়াছে। নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি দেওয়ান চমনলাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে কত কাজ করিতে পারে—এমন কি যাহা আপনাদের নিকট এখন অসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে সেই সবও কিরূপে সম্ভব হইতে পারে—ইহা বুঝিবার জন্য এক চীন দেশের দিকে তাকাইয়া দেখুন। চীন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন বৃহত্তর মুক্তির আন্দোলনের সহিত একীভূত হওয়াতে আজ চীন জগতের যত প্রবল পরাক্রমশালী শোষণবাদী শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছে। আপনারাও চীন দেশবাসীর ন্যায় হস্তপদ বিশিষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। চীনে যাহা হইতে পারে ভারতে কেন তাহা অসম্ভব হইবে? "সমিতির সম্পাদক শ্রীকিশোরীলাল ঘোষ বলেন আপনাদের অনেকের বিশ্বাস যে শ্রমিক সঙ্ঘের একমাত্র উদ্দেশ্য মনিবদের নিকট দরখাস্ত করিয়া চিঠি লিখিয়া কোনরূপে কিছু মজুরীর হার বৃদ্ধি করা। অনেকে মনে করেন যে সমিতির সম্পাদকের মুখ্য কাজ এই সকল দরখাস্ত ও চিঠি বেশ গুছাইয়া লেখা এবং মনিবদের সহিত দেখা করিয়া কোনরূপে কিছু মজুরি বৃদ্ধিতে তাঁহাদের সম্মত করা। বাস্তবিক পক্ষে সঙ্ঘের সে উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য আপনাদের বেতন বৃদ্ধি, আপনাদের অতিরিক্ত শ্রমে যাহাতে স্বাস্থ্য হানি করে তাহার লাঘব করা ও আপনাদের অন্যান্য সুবিধা আদায় করা সঙ্ঘের এক প্রধান কার্য্য। কিন্তু এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, আপনাদের দাবী আদায় করিতে হইলে আপনাদের সঙ্ঘের শক্তি থাকা প্রয়োজন। শক্তি থাকিলেই সে শক্তির ব্যবহার করিতে হয় এমন কোন কথা নাই। এমন কি এ কথা খুব সত্য যে যাহার যত শক্তি আছে তাহার পক্ষে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন খুব অল্পই হয়। কিন্তু যাহার শক্তি নাই তাহার দাবী লোকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয় এবং গ্রাহ্যের ভিতর আনে না। সমিতির শক্তি সাধন করিতে হইলে আপনাদিগকে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কলিকাতার প্রত্যেক প্রেস কর্ম্মচারীর এই সমিতির সভ্য হওয়া উচিত, মাসিক চাঁদা নিয়ম মত দেওয়া উচিত, এবং প্রত্যেক সভ্যের মনে করা উচিত সমিতির মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাহার নিজের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করিতেছি। "পরে সভাপতি—শ্রীমৃণালকান্তি বসু মহাশয় বিলাতে শ্রমিকেরা কিরূপভাবে নিজেদের সঙ্ঘ গড়িয়া বলশালী হইয়াছে এবং বিলাতের শ্রমিক আন্দোলনের ধারা সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। বি এন রেলওয়ের সঙ্ঘের শ্রীমনি মুখোপাধ্যায় ও অমরনাথবসু তাঁহাদের যে সম্প্রতি বিরাট ধর্ম্মঘট হইয়াছিল সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। পরে Government of India Press ও Caledonian Press এর কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগের সম্বন্ধে আলোচনা হয় ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য গৃহীত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

—০—

২৭শে মে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে Employees Association এর এক সভা হয়। দিওয়ান চমন লাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দেওয়ানজি বলেন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরিজীবিগণ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে না পারিলে তাহাদের ভবিষ্যতে কোন আশা নাই। সকলে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের অভীষ্ট লাভ করিতে হইবে। তেমনি বেকার সমস্যার জন্য গবর্ণমেণ্টই দায়ী। প্রত্যেক সভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বেকার সমস্যার সমাধান করা কর্ত্তব্য। বিলাতে বেকার দিগকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিয়ম আছে। এখানকার বেকারের অতীব নিরীহ ও একযোগে কার্য্য করিতে অসমর্থ বলিয়া সরকারও এই বিষম সমস্যা নিরাকরণের কোনও উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেন না। পরে ঐ সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সম্পাদক শ্রীমুকুন্দলাল সরকার বক্তৃতা করিবার পর নিম্নলিখিত মন্তব্য গৃহীত হয়:

(১) এই কেরাণী সঙ্ঘ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের বিষম বেকার সমস্যার প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে এবং অনুরোধ করিতেছে যে Unemployment Insurancee (বেকার বীমা) প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া সরকার যেন এই সমস্যা সমাধানের যথোচিত চেষ্টা করেন।

(২) এই সভা Employees Association (কর্ম্মচারী সমিতি) কে অনুরোধ করিতেছেন যে ইহা যেন আবশ্যকীয় statistics (তালিকা) সংগ্রহ করিয়া এই সমস্যা সম্বন্ধে, সরকারের সহিত কথাবার্ত্তা চালান।

(৩) এই সভার মতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টে যে Trades Union Bill (শ্রমিক-সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় আইনের খসড়া) উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে শ্রমিক আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং ইহার ফলে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনও অনেক পিছাইয়া পড়িবে।

—০—

বি, এন, রেলওয়ের গর্ডেন রীচ্ শাখা সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা শুনিতে পাইতেছি। আমরা সে সম্বন্ধে শীঘ্রই বিস্তৃত আলোচনা করিব। সম্প্রতি এই ব্রাঞ্চের এক সভা হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং কংগ্রেসের অন্যতম পাণ্ডা শ্রীতুলসী চরণ গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আয়েঙ্গার মহাশয়ের দিল্লীতে শ্রমিক-প্রীতির যাহা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে যে কোন শ্রমিক সঙ্ঘ তাঁহাকে এরূপ অভিনন্দন করিবে আমরা তাহা আশা করি নাই। যাহা হউক সভাপতি মহাশয় যে শ্রমিকের ছাপ মাত্র একটি শাখা সঙ্ঘের নিকট হইতে পাইলেন ইহাতে বুঝা যায় যে আগামী অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিঙে তিনি মিঃ জোগলেকারের প্রস্তাবের উপরে যে মত প্রকাশ করিবেন তাহা নিতান্ত প্রামাণ্য বলিয়া ধরা হইবে। শাখা সঙ্ঘের এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন দেওয়ান চমন লাল। মিলিয়াছে ভাল। বারান্তরে এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—*—

লণ্ডনের ২০শে এপ্রিল তারিখের খবরে প্রকাশ যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক বৈঠকে স্থিরীকৃত হয় যে যাঁরা পূর্ব্ব বৎসর সাধারণ ধর্ম্মঘট চালাতে স্থির করেছিলেন তাঁরা ঠিক এবারও ট্রেড ইউনিয়ন বিলের প্রতিবাদ করে তার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাবেন। বৈঠক সংশোধন প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করতঃ জেনারল কাউন্সিলকে ধর্ম্মঘটকল্পে শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য যত প্রকার সম্ভব উপায়ে হোক প্রস্তুত হতে উপদেশ দিয়েছেন এবং এতৎ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব ও পাস হয়েছে।

———

২৮শে এপ্রিল তারিখে ১১টা ১০ মিনিটের সময় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কএর কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত কারবার বন্ধ করতঃ ব্যাঙ্কের দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়েছেন। এই সংবাদ সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়াতে এক বৃহৎ জনতা ব্যাঙ্কের চতুর্পার্শ্বে জড় হয়েছিল। দরওয়াজায় দু'জন সশস্ত্র পুলিশ সার্জ্জেণ্ট মোতায়েন ছিল। কারো সর্ব্বনাশ কারো পৌষ মাস—এই সংবাদের পর অনেককে বিমর্ষ দেখা গিয়েছে।

—•—

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের জন্য খুব জোর গলায় বক্তৃতা দিয়েছেন। দিল্লীর বক্তৃতার পরে একটুকু গুতো খেয়েছিলেন কিনা।

———

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ধর্ম্মঘট এখনও চলেছে। কর্ত্তৃপক্ষ নোটিশ জারী করেছেন যে যদি ধর্ম্মঘটওয়ালারা তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে তা হলে তাদের অভিযোগের কথা শুনতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন। কেরোসিন অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জেনারল সেক্রেটারী মিঃ বেচী তার জওয়াবে জানিয়েছেন যে ধর্ম্মঘটকারীরা কেবল মাত্র তাদের সমিতির সেক্রেটারী কিংবা প্রেসিডেণ্টের মারফতে তাদের দাবী জানাতে রাজী আছে।

—•—

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং ভূপাল ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ভূতত্ত্ববিৎ ও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ওবায়দুল্লা আফগান গবর্ণমেণ্টের অধীনে আফগানিস্থানের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করার জন্য পনর শত টাকা বেতনের একটী চাকুরী পেয়েছেন। তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে পাসপোর্ট পেয়েছেন এবং শীঘ্রই কাবুল যাত্রা করবেন। তিনি একজন বাঙালী মুসলমান ও নোয়াখালী জেলার অধিবাসী।

—•—

অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ১২ই মে তারিখে না হয়ে ১৫ই মে তারিখে বসবে।

———

রাজবন্দী কালিপ্রসাদ বানার্জ্জি বর্ত্তমানে খুলনা জেলায় রামপাল গ্রামে আটক আছেন। তিনি মস্তিষ্কের রোগে ভুগছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত ভূপেন দত্ত ইনসিন ও ব্যাসিন জেলে রয়েছেন। উভয়েই রোগে কষ্ট পাচ্ছেন।

———

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার রাজবন্দী শ্রীযুক্ত হরি নারায়ণ চন্দ্র মৌলমিন জেলে রয়েছেন। তাঁকে সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হয়। আলিপুরে জেলে তাঁকে যে সুবিধা দেওয়া হত তা আর তাঁকে দেওয়া হয় না।

—•—

সুকিয়া ষ্ট্রীটে বোমার মামলার কয়েদী মিঃ রবীন্দ্র মোহন কর ও অপর একজন আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনালে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনানুসারে সাত বৎসর দ্বীপান্তর ও দু'বৎসর কারাবাসের আদেশ পেয়েছিলেন। এই সাজার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি সি, সি, ঘোষ ও ক্যামিংএর এজলাসে তাঁরা আপীল করেছেন। বিচারপতিদ্বয় তাঁদের আপীল মঞ্জুর করেছেন।

—•—

সিউড়ীর ২৮শে তারিখের খবরে প্রকাশ যে লাভপুরের রাজবন্দী শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বানার্জী সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হয়ে পড়েছেন।

—•—

১৬ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে এবং তার পূর্ব্ববর্ত্তী দু'সপ্তাহে কলিকাতা নগরীতে যথাক্রমে ৮৮৩, ৮২৮ এবং ৯১৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

—•—

রাজস্থান সেবা সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট মিঃ বি, এম পাঠিক উদয়পুরের মহারাজ কুমার কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল কমিশনের বিচারে ৩ বৎসর ৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি ২৭শে তারিখে মুক্তি পেয়েছেন।

—•—

নোয়াখালী, চাঁদপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবল ঘুর্ণিবাত্যা হয়ে প্রভূত ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।

—•—

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত এবারও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

—•—

বোম্বের শ্রমিক ও কৃষক দলের উদ্যোগে এবার বোম্বেতে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সহিত "মে-দিবস" উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। প্রায় ১০ সহস্র শ্রমিক একত্র হয়ে রাস্তায় মিছিল বের করেছিল। ইতোপূর্ব্বে "মে-দিবস" উপলক্ষে শ্রমিকরা কখনো এত বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করেনি। বোম্বের শ্রমিক ও কৃষক দল নূতন হলেও যথেষ্ট কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। বাংলার দেড় বছর পূর্ব্বে সংগঠিত দলের সভ্যরা কি বলতে চান?

—০—

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১২ই মে ১৯২৭, ২৯শে বৈশাখ ১৩৩৪ | ১৪শ সংখ্যা

বিশেষ অনুরোধ

গণবাণী যা প্রচার করছে তা যাঁদের ভালো লাগছে, তাতে যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন, আমারা চাই তাঁরা অর্থ প্রদান করে ও গ্রাহক সংগ্রহ করে দিয়ে গণবাণীর প্রচারে সাহায্য করুন এবং বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে যোগদান করুন।

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহমদ, শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা।
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

৪৫

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১২ই মে, ১৯২৭, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৩৪ | ১৪শ সংখ্যা

"আসল কথাটা কি ?"

[মুজফ্ফর আহ্মদ]

ওপরের লেখা শিরোনাম দিয়ে শ্রীবটুক ভৈরব ৬ই মে তারিখের "আত্মশক্তি"তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ২৮শে এপ্রিল তারিখের "গণবাণী"তে "অর্থনীতিক অসন্তোষ" নাম দিয়ে আমরা যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেম শ্রীবটুক ভৈরবের প্রবন্ধটি তারি সম্বন্ধে লেখা। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-মুস্লিম বিরোধ নিয়ে ২৩শে এপ্রিলের "ফরওয়াড" একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটিকে ভিত্তি করেই আমাদের "অর্থনীতিক অসন্তোষ" শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখা হয়েছিল। শ্রীবটুক ভৈরব আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন "আসল কথাটা কি ?" এ প্রশ্নের জওয়াব দিতে হলে আমাদের প্রথমেই বল্তে হবে, আসল কথা এই হচ্ছে যে শ্রীবটুক ভৈরব মশায় আমাদের প্রবন্ধটি ভাল করে পড়েন নি। এতটুকুও নিরপেক্ষ মন নিয়ে তিনি যদি আমাদের প্রবন্ধটি পড়তেন তা হলে তাঁকে ছদ্মনামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কখনো জিজ্ঞাসা করতে হতনা যে আসল কথাটা কি ?

আমাদিগকে সাম্যবাদী বলে বটুকজি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। হাঁ, আপনাকে সাম্যবাদী বলে পরিচয় দেবার ধৃষ্টতা এ অধম লেখকের আছে। যিনি কোনো লোককে সাম্যবাদী হওয়ার সার্টিফিকেট দিতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই এটুকুও জানেন যে সাম্যবাদীরা কখনো কোনো বিশিষ্ট ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে দাঁড়িয়ে কোনো কিছুর বিচার করেন না। তাঁরা প্রত্যেক বস্তুরই বিচার বৈজ্ঞানিক ভাবে করেন এবং ধর্ম্মের গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়েই করেন। কিন্তু, এখানেই আমাদের সহিত বটুকজীর একটুকু তফাৎ রয়েছে। তিনি দু'টো গণ্ডীর ভিতরে আপনাকে আবদ্ধ করে রেখে তবে ব্যাপারটিকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তিনি যে আপনাকে শুধু হিন্দুত্বর গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রেখেছেন তা নয়, তাঁর ছদ্মনামের আবরণ ভেদ করে ব্রাহ্মণত্বর গন্ধও বেরুচ্ছে। হিন্দু শুধু তিনি নন, ব্রাহ্মণও বটেন। কাজেই আমাদের দেখার সহিত তাঁর দেখার তফাৎ হওয়াটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

তিনি লিখেছেন—"হিন্দু নেতারা নীরব—সরব হবার কোন প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু এদিকে দেব দেবীর মন্দির আর স্ত্রী লোকের উপর অত্যাচার সমান বেগেই চলেছে। একটা নূতন থিওরি খাড়া না করলে আর মুখ রক্ষা হয়না! কাজেই আমাদের সাম্যবাদী সহযোগী গণবাণী একটা নূতন থিওরি নিয়ে আসরে নেমেছেন। তিনি বলেছেন—"বাংলা দেশের নানা স্থানে যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বেধে উঠেছে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থনীতিক অসন্তোষের ওপরে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।" দেব দেবীর মন্দির আর স্ত্রী লোকের ওপরে অত্যাচার চলেছে বলে "গণবাণী"কে নূতন থিওরি কেনই বা খাড়া করতে হবে, আর কেনই বা খাড়া না করলে মুখ রক্ষা হবেনা এ কথাটার কোনো জওয়াব শ্রীবটুক ভৈরব মশায় দিতে পারেন কি ? "গণবাণী" সাম্যবাদীদের কাগজ নয়— "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর কাগজ। এ দল যে প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে তা সাম্যবাদীদের প্রোগ্রাম নয়, একটা উন্নত জাতীয় প্রোগ্রাম মাত্র। অর্থাৎ অন্যান্য জাতীয় দলের প্রোগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল, বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রোগ্রাম তা নয়। যাক্, আগেই বলেছি এ লেখক একজন সাম্যবাদী (কম্যুনিষ্ট) বটে। বটুক ভৈরব কি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সাম্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও এ লেখক মুসলমানদের সকল অপকর্ম্মের সমর্থন করতে সদাই ব্যস্ত থাকে এবং তারি জন্যে তাদের মন্দির আর স্ত্রীলোক নিয়ে উৎপাত করাকে সমর্থন করার জন্যেই অর্থনীতিক অসন্তোষের থিওরিকে খাড়া করেছে ? ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকত্বের ব্যবসায় আমরা কখনো করিনি। আর কিছু দাবী করার আমাদের থাক্ বা না থাক এটুকু দাবী করার

অহঙ্কার আমাদের আছে। বটুক ভৈরব আদতে যে "ফরওয়ার্ড" এর হয়ে ওকালতি করতে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন সে "ফরওয়ার্ড"কে সাম্প্রদায়িকত্ব মাঝে মাঝে অন্ধ করে দিয়ে থাকে। ২৩শে এপ্রিল তারিখের "ফরওয়ার্ড"এর লেখার উল্লেখ আমরা আমাদের "অর্থনীতিক অসন্তোষ" এ করেছি। ২২শে এপ্রিলের "ফরওয়ার্ড" বরিশালে মুসলমানদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবার কথা ছেপেছিলেন, অবশ্য সংবাদ হিসেবে। যদি নিরপেক্ষ বিচার করার ক্ষমতা "ফরওয়ার্ড"এর থাকত তা হলে ২৩শে এপ্রিলের প্রবন্ধে "ফরওয়ার্ড" নিশ্চয়ই সে ব্যাপারটারও আলোচনা করতেন। গত বছরের কলকাতার হিন্দু-মুসলিম-দাঙ্গার কথাও আমাদের মনে আছে। সে সময়ে পরস্পরের প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার করার জন্যে স্বধর্মাবলম্বীকে উপদেশ দিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বদমায়েশরা বিজ্ঞাপনী সব প্রচার করেছিল। মুসলমানদের তরফ থেকে যে সকল বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল সেগুলি হাতে পড়লেই "ফরওয়ার্ড" ছেপে দিতে এতটুকুও কসুর করতেন না। কিন্তু, সেরূপ বিজ্ঞাপন হিন্দুদের তরফ থেকে যে গুলি বণ্টিত হয়েছিল তার একখানিও "ফরওয়ার্ড" কোনো দিনও ছাপেননি। অলবার্ট হলে হিন্দু নাগরিকদের রক্ষার জন্যে যে সভা দাঙ্গার সময় হয়েছিল সে সভায় এক বাংলা বিজ্ঞাপন বণ্টিত হয়েছিল। তাতে আবাল-বৃদ্ধ বণিতা মুসলমান মাত্রেরই ওপরে অত্যাচার করার জন্যে হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করা হয়েছিল। "ফরওয়ার্ড" এর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তা সত্বেও সে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পর্য্যন্ত কোনো উচ্চ বাচ্য "ফরওয়ার্ড" করেননি। বটুক ভৈরব দেখিয়ে দিতে পারেন কি যে সাম্প্রদায়িকত্বর দ্বারা এরূপ অন্ধ আমরা কখনো হয়েছি?

আমাদের বিদ্যে বেশী নেই। যেটুকু আছে সে টুকু যে পুঁথির সাহায্যেই আয়ত্ত করতে হয়েছে সে কথা কিছুতেই অস্বীকারও করতে পারব না। শ্রীবটুক ভৈরব কি পুঁথি না পড়েই বিদ্যাগ্রস্ত করেছেন? হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ভিতর যে অর্থনীতিক অসন্তোষ মোটেই নেই, একথা বটুক ভৈরব গায়ের জোরে অস্বীকার করতে পারেন, আমরা কিন্তু, তা পারব না। আমাদের একটা বদভ্যাস এই যে, যে জিনিসটি যেভাবে থাকে ঠিক সে ভাবেই আমরা তাকে দেখতে পারি, অন্যভাবে পারি নে। দুইএর সাথে দুই যোগ করলে আমাদের শাদা হিসাবে বরাবর চারই হয়ে থাকে, পাঁচ কখনো হয়না। ফ্রি প্রেস্ অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি পাবনা থেকে এসে যে রিপোর্ট সংবাদ পত্রে পাঠিয়েছিলেন তা আর সকল কাগজে যেমন ছাপা হয়েছিল ঠিক তেমনি "ফরওয়ার্ড"এও ছাপা হয়েছিল। সে প্রতিনিধিও বলেছিলেন যে বিরোধের মূলে অর্থনীতিক অসন্তোষ রয়েছে। অর্থনীতিক অসন্তোষ যে শ্রেণী-সংগ্রামে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এটা ঐতিহাসিক সত্য। বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যে শ্রেণী সংগ্রাম একথাও ঠিক তেমনি সত্য। আমরা আমাদের অর্থ-নীতিক অসন্তোষ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছি—"পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে যে ব্যাপার ঘটছে বা বা ঘটেছে তাও শ্রেণী সংগ্রাম বটে, কিন্তু বিপথে চালিত শ্রেণী-সংগ্রাম।" কৃষকগণ অর্থনীতিক, রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মগত ভাবে শোষিত হয়ে থাকে। তাদের সত্যকারের শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যাহত হচ্ছে এ ধর্ম্মগত শোষণকারীদের দ্বারা। ধর্ম্মের ভিতরে কতকগুলি মিথ্যা সংস্কারের সৃষ্টি করে যারা সরল জনসাধারণকে ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে ও পরকালের নামে শোষণ করে থাকে তারা আর আর শোষণকারীদের চেয়ে কোন অংশেই কম ঘৃণ্য জীব নয়। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশের কৃষকগণের শ্রেণী-সংগ্রাম এ শ্রেণীর স্বার্থপর শোষণকারীদের দ্বারা বিপথে চালিত হচ্ছে। আমাদের আগেকার প্রবন্ধে একথা আমরা পরিষ্কাররূপে বলে দিয়েছি। তবুও বটুক ভৈরব মশায় ব্যস্ত হয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন যে এ সব মোটেই শ্রেণী-সংগ্রাম নয়। জগতের সর্ব্বত্রই যদি শ্রেণী-সংগ্রাম চলতে পারে তা হলে বাংলা বা ভারতে চলবেনা কেন? এর চেয়েও অধিকতর শোষিত দেশ জগতের আর কোথাও আছে কি?

আমরা একটা জিনিসের সত্যকারের মূর্ত্তি সকলের চোখের সম্মুখে ধরে দিয়েছিলেম। পরিদৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে বেশী যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনি। বটুক ভৈরব আমাদের কথা এই বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন যে ব্যাপারটা যদি শ্রেণী-সংগ্রাম হত তা হলে ঝগড়া হত মুসলমান প্রজা আর হিন্দু জমীদারের মধ্যে। কিন্তু, তা না হয়ে ঝগড়াটা হচ্ছে মুসলমান প্রজা আর হিন্দু প্রজার মধ্যে। কাজেই শ্রেণী-সংগ্রামের যুক্তিটা মোটেই টিকতে পারে না। যে যুক্তির দ্বারা বটুক ভৈরব আমাদের কথা উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর সে যুক্তি আপনা থেকেই উড়ে যাচ্ছে। প্রজা শব্দটা বাংলা দেশে খুবই ব্যাপক। জমীদারের নীচে যার স্বত্ব আছে সেই প্রজা। এমন প্রজাও আছে যার বার্ষিক আয় অনেক বড় জমীদারের চেয়েও বেশী। দু' একজন প্রজা যে রাজা বা নওয়াব উপাধি পর্য্যন্ত পেয়েছে তা আমরা জানি। প্রজা হলেই যে সে শোষিতও হবে এমন কোনো কথা নেই। বাংলা দেশে অসংখ্য প্রজা আছে যারা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত নয়। অর্থাৎ জমীদার প্রভৃতির ন্যায় বে-রোজগারের কড়ি ভোগ করে তারাও জীবন ধারণ করে। একজন কৃষক প্রজাও হতে পারে, কিন্তু, প্রজা মাত্রই কৃষক নয়। কাজেই, বর্ত্তমান বিরোধটা মুসলমান-প্রজা আর হিন্দু প্রজার মধ্যে নয়। পরন্তু, মুসলমান কৃষক আর হিন্দু প্রজা ও জমীদারের মধ্যে। বটুক ভৈরব শ্রেণী-সংগ্রামটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়েছেন।

তারপরে, বরিশাল জেলায় মুসলমান কৃষক আর মুসলমান জমীদার বা তালুকদারের মধ্যে যে বিরোধ নেই এ খবরটি বটুক ভৈরবকে কে দিলে তা আমরা একবার জানতে পারি কি? বিরোধ যথেষ্টই আছে। মুসলমান জমীদার বা জোতদার আদি যে মুসলমান কৃষকদিগকেও শোষণ করে থাকে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর শোষণ যেখানে আছে বিরোধও সেখানে আছে। এটা নূতন থিওরি নয়, অনেক পুরাতন সত্য কথা। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি-পত্তিতে আপাততঃ মুসলমান জমীদার আর কৃষকের সংগ্রামের কথাটা কেউ লিখবে না। নতুবা আমরাত বরিশাল জিলার এমন মুসলমান জমীদারের কথা জানি যাকে মুসলমান কৃষকদের ভয়ে পৈতৃক বাসভবন ছেড়ে অন্যত্র পালাতে হয়েছে। আমরাত বলেইছি যে পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকদের শ্রেণী-সংগ্রাম সত্যকারের নেতৃত্ব পায়নি। বটুক মশায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে আর্থিক বৈষম্যের ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম উপস্থিত হয়ে থাকে। এখানেও যখন আর্থিক বৈষম্য আছে তখন সংগ্রাম

থাকবে না কেন? তিনি আরো বলেছেন অর্থই জগতে একমাত্র সত্য বস্তু নয়। কিন্তু অর্থ যে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় সত্য একথাটা তিনি কি অস্বীকার করতে পারেন? অর্থের ব্যাপার পেছনে না থাকলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কখনো এরূপ মূর্ত্তি ধারণ করতে পারত না। বটুক ভৈরব নিশ্চয়ই এসব খবর কিছু কিছু রাখেন।

এদেশে শ্রেণী-সংগ্রাম নেই বললেই কিছু শ্রেণী সংগ্রামটা মিটে যাবে না। ধনিক-বণিকের অনুচর ও প্রসাদভোগী যারা তারা এমন কথা প্রচার করতে পারে। কিন্তু, এরূপ প্রচারের ফলে শ্রেণী-সংগ্রামের বিলোপ হবে না। ব্যাপারটিকে সাম্প্রদায়িক পথে পরিচালিত করে কিছুদিনের জন্যে ব্যাহত করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু, মূল সংগ্রামের কারণ যখন অত্যন্ত তীব্রভাবে বর্ত্তমান রয়েছে তখন তা কি কখনো বিলোপ পেতে পারে? যারা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত নয়, যারা ধনিক-বণিক ও জমীদারের কৃপার ভিখারী তারা এখন সাম্প্রদায়িক বিরোধকে বাড়াবার জন্যে নানা দিক থেকে নানা ভাবে চেষ্টা করছে। তারা হয়তো মনে করছে যে হিন্দু-মুসলিমকে উৎকটরূপে হিন্দু-মুসলিম করে দিতে পারলে শ্রেণী সংগ্রামের কথা ধামা চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের কারণ বর্ত্তমান আছে বলেই যে এ সাম্প্রদায়িক বিরোধও তারা বাধাতে সমর্থ হয়েছে এটা তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

বটুক ভৈরব জিজ্ঞাসা করেছেন, শ্রেণী-সংগ্রামের কোন্ নিয়মের ফলে ঝগড়াটা এমন বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করেছে? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বেই আমরা তার উত্তর আমাদের আগেকার প্রবন্ধে দিয়েছি। সংগ্রাম যে বাধবে এটা মানুষ বলে দিতে পারে, কিন্তু, সংগ্রাম কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে এটা কেউ বলে দিতে পারে না। ভাল নেতৃত্ব পেলে সংগ্রাম ঠিক পথে চলে, আর না পেলে বেঠিক পথেও চলে। নারী নিগ্রহের কথা নিয়েই ওপরের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। হিন্দুতে হিন্দুতে ঝগড়া বাধলে নাকি কোথাও নারীদের ওপরে অত্যাচার হওয়ার কথা শোনা যায় না, আর হিন্দুতে মুসলমানে বাধলেই অনেক বেশী শোনা যায়। বটুক ভৈরবের বিশ্বাস নারী-নিগ্রহের কুপ্রবৃত্তিটা মুসলমান সম্প্রদায়ের একচেটিয়া উত্তরাধিকার। তাঁর মতে আরো খোলাসা ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে কাম প্রবৃত্তিটা কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই আছে। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ। আমরা জানি কাম প্রবৃত্তিটা কেবলমাত্র মুসলমানদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এটা সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই আছে এবং যারা বে-রোজগারের কড়ি খেয়ে অলস জীবন যাপন করে তাদের মধ্যে কিছু বিশ্রী মাত্রায় আছে। নারীকে আমরা যে সামাজিক পদ-মর্য্যাদা দিয়ে রেখেছি তাতে তার ওপরে নিগ্রহ না হওয়াটাই আশ্চর্য্যের কথা। কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নারীর ওপরে নিগ্রহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই করে এবং কেউ কারো চেয়ে কম করে না। একই তারিখের কাগজে আমরা হিন্দু-কর্ত্তৃক ও মুসলমান কর্ত্তৃক নারী নিগ্রহের কথা পাঠ করে থাকি। কিন্তু হিন্দু কাগজওয়ালারা মুসলমানদের ব্যাপারে শিরোনাম দিয়ে থাকেন—"মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক হিন্দু নারীর উপরে পাশবিক অত্যাচার"। আর হিন্দুর বেলায় দিয়ে থাকেন—"জমীদার হত্যার মোকদ্দমা" নারীর ওপরে বলাৎকার করতে যেয়েই এ জমীদার বধ হয়েছিল। ক'দিন পূর্ব্বে "বসুমতী"তে এরূপ একটা খবর আমরা পড়েছিলেম। আর একটা ঘটনা "ফরওয়ার্ড" প্রকাশ করেছিলেন। একজন হিন্দু আর একজন মুসলমানেতে মিলে একটি মেয়েকে চুরি করেছিল। রাধারাণী কি এমন কিছু একটা নাম সে মেয়েটির হবে। শিরোনামে কিন্তু "ফরওয়ার্ড" ও দোষটা চাপালে মুসলমানেরই ঘাড়ে। রাজ-কুমারীর ওপরে অত্যাচার কারা করেছিল? নারীলাঞ্ছনার এর চেয়েও ঘৃণিত চিত্র আর কেউ কখনো দেখেছে কি? বটুক ভৈরব যদি অভয় প্রদান করতে পারেন যে আমাদের নামে কোনো মানহানির মোকদ্দমা হবে না তাহলে আমরা হিন্দু-কর্ত্তৃক নারী নিগ্রহের অনেক খবর প্রকাশ করিতে পারি। অবশ্য আদালতে মোকদ্দমা ওঠেনি কিংবা খবরের কাগজে ছাপা হয়নি—এমন খবরের কথাই আমরা বলছি। তা ছাড়া আদালতে মোকদ্দমা উঠেছে কিংবা কাগজে ছাপা হয়েছে হিন্দুর দ্বারা নারী নিগ্রহের এমন অনেক প্রমাণ আমরা বটুক ভৈরবকে যে কোনো সময়ে দেখাতে প্রস্তুত আছি। আমরা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একথা বলছিনে, ন্যায় ও সত্যের পক্ষ থেকেই বলছি। যেখানে যত বটুক ভৈরবের দল আছে তাঁদের সকলকেই আমরা অনুরোধ করছি যে তাঁরা দৃষ্টিকে আরো প্রসারিত করুন। তা হলেই সব বস্তু ঠিক্‌ভাবে দেখতে পাবেন। এখন তারা সব জিনিসেরই একটা দিক দেখ্‌ছেন মাত্র, অনেক জিনিস আবার দেখেও দেখ্‌ছেন না।

হাঁ, আর একটা কথা। পুঁথির চাপে আমাদের বুদ্ধি মারা পড়েনি, সাম্প্রদায়িকতায় চাপে বটুক ভৈরব মশায় অন্ধ হয়েছেন। সত্যকার লোক যদি মোড়লী গ্রহণ না করে তা হলে খান সাহেবের দল করবে না কেন? বটুক ভৈরবরা একবার কৃষক-দের নিকটে যান না কেন—হিন্দুর রূপে নয় মানুষের রূপে। তা করার পরে যদি কৃষকরা তাঁদের নেতৃত্বের অধীনে না চলে তবেই তিনি আমাদের বলতে পারেন যে পুঁথির চাপে আমরা মরেছি। কিন্তু তা তাঁরা করতে যাবেন কেন? তাঁদের সহানুভূতি যে ধনিক-বণিক-জমীদারের প্রতিই বেশী। উৎপাদনের উপায় বেশী হাতে নেই বলে কিংবা মোটেই নেই বলে তাঁরা জনগণকে খুব বেশীরূপ শোষণকরতে পারেন না বটে, কিন্তু, আদতে তাঁরা শোষকশ্রেণীর লোক, অন্ততঃ বর্ত্তমানে পরগাছা ত বটেনই।

ধর্ম্মশিক্ষার মধ্যে গোড়ায় যেখানে গলদ রয়েছে সেটা দূর করতে বটুক ভৈরব আমাদের অনুরোধ করেছেন। আমাদের মতে ধর্ম্মশিক্ষার কেবল মাত্র গোড়ায় গলদ নেই, ওর আগা-গোড়াই গলদ। একথাটা কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মের সম্বন্ধে আমরা বলছিনে। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই এ দুর্দ্দশা হয়েছে। মস্‌জিদের সম্মুখে বাদ্য বন্ধ করে মুসলমানরা যেমন মিথ্যা ধর্ম্ম-ভক্তির পরিচয় দিচ্ছে ঠিক তেমনি পূজো ও সঙ্কীর্ত্তনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে হিন্দুরাও ঠিক অনুরূপ ধর্ম্মভক্তির পরিচয় দিতে ছাড়ছেনা। ধর্ম্মের বিধান সকল দেশে সকল কালেই রাজা বা শাসন কর্ত্তার মুখের দিকে চেয়ে রচিত হয়েছে। প্রথমে যে মূর্ত্তিতে ধর্ম্ম-প্রচারিত হয়েছে সে মূর্ত্তি তার কিছু কাল পরেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে রাজা-বাদশার প্রয়োজনে। শোষণাস্ত্র-রূপে ব্যবহার করে ধর্ম্মকে নিতান্তই অধর্ম্মে পরিণত করা হয়েছে। মোটের ওপরে ধর্ম্মের নামে যত ব্যাপার সংঘটিত হয় তার সমস্তই কিছু ধর্ম্ম নয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি নাস্তিক ছিল। অথচ সেও চীনে মিশনরী পাঠিয়েছিল ধর্ম্মপ্রচার করার জন্যে। তার

প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল চীনে শোষণের সুবিধে হতে পারে কি না তা দেখা। আর্থিক শোষণের পরিসমাপ্তির জন্যে যেরূপ শ্রেণী-সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজন আছে ঠিক সেরূপ প্রয়োজনে ধর্ম্মগত শোষণের বিরুদ্ধেও আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে।

শেষ কথা, "শ্রেণী-সংগ্রামের দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আসবে" নয়, যে দিন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি জগতে হয়েছে সে দিন থেকেই এসেছে। পূর্ব্বদিকে আগুন আমরা দেখিনি, সূর্য্যই দেখিছি। বটুক ভৈরবরা যে টের না পাচ্ছেন তা নয়, তবে হয়কে নয় করতে চাইছেন।

আবির্ভাব

[আবদুল কাদের]

মৃত্যু-ঘন অন্ধকারে অকস্মাৎ জেগে
যে তুঙ্গ নিঃসঙ্গ প্রাণ ছুটিয়াছে বেগে
স্বাধিকার প্রত্যাশায় প্রভাতের পানে
সহস্র সংঘাত ঠেলি' যৌবন-আহ্বানে
অবরুদ্ধ পথে ক্ষণ-শিথিল চরণে
দাঁড়ায়নি ফিরি' কভু একা ভাবি রণে।
পিশাচের ক্রূর হাসি পাত্র ভরা বিষ
আকণ্ঠ সহিয়া সে যে নিছে অহর্নিশ!
ঘূর্ণী-আবর্ত্তের তলে ঝঞ্ঝার আঁধারে
বাড়ায়েছে হাতখানি আসি' দ্বারে দ্বারে
সহাস্য সহায় মাগি, কেহ প্রীতিস্নেহে
তুষেনি তাহারে কভু সভয় সন্দেহে;
বন্ধুরা গিয়াছে ত্যাজি প্রেয়সী আসেনা,
মিত্র আসে কুটচক্রী লয়ে শত্রু-সেনা!
মরুভূ কান্তার তাই লঙ্ঘি' অকাতরে
পালায়েছে সত্য-সেবী স্বজনের করে
স্বদেশে বঞ্চনা লভি, ফেরুরা পশ্চাতে
গেছে তারে বধিবারে। দুর্যোগের রাতে
বিপ্লবের বহ্নি জ্বালি' দেশ দেশান্তরে
আপনার রক্তাহুতি দিয়া বজ্র স্বরে
শুনায়েছে মুক্তি-স্তুতি শুব্ধ মানবেরে;
সারা অঙ্গে দাসত্বের পূতি ক্লেদ হেরে
যদি জীব জাগে দম্ভে আলোর সন্ধানে
ছুটে' চলে মত্ত গাত জীবনের ঘ্রাণে!

না ফুটিতে ধ্বনি তার না জাগিতে তৃষা
লক্ষ কোটি অন্ধ নর না লভিতে দিশা,
সহসা সে বাঁধা পড়ে কৃতঘ্নের ঘা'য়
অন্যায়ের উগ্র দর্পে বীভৎস কারায়।
সান্ত্রীদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জর প্রহারে
ক্রন্দসী সন্ত্রাসে তার জাগে কারাগারে!
মিথ্যার করাল গ্রাসে সত্যের শাবক
নিঃসহায় ক্রোধে সহে অন্যায়-পাবক।
আঁধারে কন্দরে তার রুদ্ধ হাহাকার
চাহে আলো, চাহে বায়ু, চাহে তরবার!
তিল তিল যন্ত্রণায় নিঃশেষি' জীবন
পুন অভিমানে শেষে স্রষ্টার সদন
চলি' পড়ে ক্ষুব্ধ বীর অনন্ত নিদ্রায়;
—এ সৃষ্টি সন্দেশ তার জানিতে না পায়!

যুগে যুগে দ্বীপান্তরে বন্দীর কারায়
মানব-প্রেমিক কত ঝরি' হেন যায়!
বিশ্বের শত্রুরা লয়ে পাশব বাসনা
ফাঁসি-মঞ্চে করে সেই শক্তির লাঞ্ছনা।
দুর্ব্বলেরে পিষ্ট করি' বাজাইয়া কাড়া,
মানুষের অধিকার কাড়ি' নিছে তারা;
তারাই বিজয়ী, যারা ফাটায়ে জিগর্
জন্ম-দাসত্বের দিছে নৃশংস নিগড়
পরায়ে পরার্দ্ধ আর্ত্ত ভগবান-পদে।
দীন-নারায়ণ-কণ্ঠে সহস্র শবদে
বাজিতেছে অহরহ শৃঙ্খল-ঝঞ্ঝনা
তুলি আর্ত্ত অভিযোগ। সৃষ্টির গঞ্জনা
ভাগ্যদীপ শুনি' কভু পরাইয়া চীর
যে তাপসে পাঠাইছে প্রকাশ-অস্থির
মুছাইতে বিশ্ব-শোক মুক্তি দিয়া হাতে,
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যুঝি' ক্রমে শোণিত সম্পাতে
দানবের হাতে সহি' ব্যথা অন্তহীন
দুরন্ত পথিক হয় শেষে অস্তলীন!

মানুষে মানুষে কোনো নাহি ভেদাভেদ,
সম অধিকার সাহি' সমান নিষেধ
মাটীর সমান ভোগে উরিছে সকলে।
বিধাতার অবিজ্ঞেয় স্বেচ্ছাচার ফলে
কে জানে কে জন্মে কোথা,' তাই বলি' হায়
সুদীর্ঘ জীবন ভরি' নিয়তির ঘা'য়
মর্ত্ত্যের সম্পদ ভোগে রহিবে সুদূর
অভিজাত-গর্ব্ব হারা, পতিত বিধুর?
কেবা রাজা, কিসে রাষ্ট্র, এত আস্ফালন?
উৎপাদকে দিবে কেবা বণ্টন বন্ধন?
স্বাধীন আনন্দে সবা সম কর্ম্ম করি'
জীবনের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি নিবে চিত্ত ভরি।
—এই বার্ত্তা বিঘোষিছে বার বার তারা,
শুনেনি তাদেরে কেহ; করিয়াছে তাড়া।

সেই যুগ অবসান, পশুত্বের দেশ
সুদর্শন-চক্র-ঘাতে করিতে নিঃশেষ
জাগিতেছে কৃষ্ণ, কোটী সব্যসাচী শ্যাম,
হাতুড়ি লাঙ্গল কাঁধে জাগে বলরাম!
আজি মানবের সর্ব্ব অধিকার লাগি'
সর্ব্ব মানবের রুদ্র উঠিয়াছে জাগি'।
নগ্ন কায় সর্ব্বহারা কৃষাণের সাজে
ভীষণ-দর্শন কুলি মজুরের মাঝে
নিগৃহীত পতিতের ম্লান রূপ ধরি'
উরিতেছে চণ্ডদেব, উরিছে শঙ্করী;
কে রুধে সে অভিযান? কে শুনাবে মানা?
একা নয়, রুখে সর্ব্ব হিয়া, দেবে হানা!
নিজের গৌরব নিতে, নিতে অবদান
জাগে রুদ্র, হে মানব-শত্রু, সাবধান!!

চীনের কথা

—:•:—

(আবদুল হালীম)

—•—

নির্জ্জন প্রান্তরে কিংবা গহন কাননে ঝড় বৃষ্টিময় দুর্যোগ রাত্রির গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারে ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রভায় পথভ্রান্ত ক্লান্ত পথিক যখন পথের সন্ধান পায় তখন তার মুখমণ্ডল ও কপোল দেশ এক আশার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তেমনি পরাধীন জাতি যখন অপর পরাধীন জাতির অন্তরে চেতনার সাড়া, নবীন উদ্যম ও আশার আলোক দেখ্‌তে পায় তখন তাদেরও বহু বৎসরের মুমূর্ষু প্রাণ পুলকে নেচে উঠে! তাদের অন্তরেও নব জাগরণের স্পন্দন অনুভূত হয়, খুশীতে তাদেরও হিয়া দুলে ওঠে! আবার যখন জাগ্রত বিপ্লব প্রয়াসীদল বিজয়ের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হয়ে পশ্চাদপদ হয় ও তাদের অগ্রসরে বাধার উৎপত্তি হয়, তখনো আবার তাদের অন্তঃকরণ নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, বুক তাদের ভেঙে পড়ে! বিষাদ অবসন্নতা তাদের হৃদয় অধিকার ক'রে নেয়, তাদের চিত্তের পুলকস্পন্দন হঠাৎ থেমে যায়। "চীনের বিপ্লব" প্রসঙ্গে আমি চীনের নব জাগরণ ও দস্যু শোষণবাদীদলের জঘন্য শোষণ ও মনোভাবের সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলেছি। চীনের মত একটি বিরাট দেশের এবং তার চল্লিশ কোটী অধিবাসীদের সম্পূর্ণ ইতিহাস একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করা বাতুলতা মাত্র। আর আমরা ভারতবাসী বহির্জ্জগৎ হতে এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছি যে এই বৈজ্ঞানিক যুগে চীন বা ভারতবর্ষের বাহিরের অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অতি পরিমিত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বাহিরে যে সমস্ত ঘটনাবলী সঙ্ঘটিত হচ্ছে বৃটিশ শোষণবাদীদের সতর্কতার দরুণ আমরা তার সঠিক সংবাদে বঞ্চিত। তথাপি চীনের যে জাগরণ এবং তার সহিত পরাধীন দেশ সমূহের যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে তাহা কোনো মতে অস্বীকার করা যায় না।

চীনের কুমিন্টাং দল বিজয়োল্লাসে সাংহাই বন্দর দখল করার এবং নানকিনের গোলাবর্ষণের পর চীনের রাজনৈতিক গগন যেন কতকটা তমসাচ্ছন্ন হয়েছে। যদিও আমরা এর সত্যতা অবগত হতে পারছিনে, তবুও চীনের কুমিন্টাংদলের নেতৃবর্গের মধ্যে একটা বিরোধ গজিয়ে উঠেছে তাহা বেশ প্রতীয়মান হয়। আর এই বিরোধকে ভিত্তি করে বৃটিশ শোষণবাদীরা আনন্দে নেচে উঠেছে! চীনের জাতীয় দলের সেনাপতি চ্যায়াং-কৈ-সেককে বিপথগামী করতে সক্ষম হয়ে তাদের অন্তরে আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে বৃটিশ শোষণবাদীদের নীচাশয়তার কথা, তাদের হীন জঘন্য মনোবৃত্তির কথা, ধরিত্রীপৃষ্ঠে যেখানেই স্বাধীনতার আন্দোলনের নিমিত্ত বিপ্লব হয়েছে, সেখানেই ওদের হীন বর্ব্বর বিরুদ্ধ প্রচার ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টির কথা।

এই যে কুমিন্টাংদল এবং এর বিপ্লব প্রচার বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার দরকার। কিছুদিন পূর্ব্বে কুমিন্টাংদলের অগ্রগমন, জয়লাভ এবং তারা বৃটিশ শোষণবাদীদের স্বার্থের যে প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে সেই সংবাদ লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও সমস্ত ইউরোপের দেশসমূহে সংবাদপত্র সাহায্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। ধনিক বুর্জ্জোয়াদের চিত্তে এই সংবাদ হতাশার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু শ্রমজীবীরা তাদের পূর্ব্বদেশীয় ভ্রাতাদের বিজয় উপলব্ধি করে পুলকে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। সাংহাইএর পতনের পর তাদের ধমনীতে ধমনীতে আনন্দের ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছিল। তারা উৎসব গীতি গেয়েছিল। সঠিক ও নির্ভুল সংবাদ প্রেরণে কড়ানজর রাখার দরুণ চীনের প্রকৃত ঘটনা কেবল পরাধীন ভারতবাসীদের কর্ণে পৌছয় নি। চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের এই যে অদ্ভুত রকম বিজয়, হ্যাংকৌ হতে বৃটিশ শোষণবাদীদের শিয়াল কুকুরের মত বিতাড়ণ এসব খবর ভারতবাসী শ্রমিকদের অন্তরে বিপ্লবের সঞ্চার করবে তাই এদেশে উক্ত সংবাদ কুত্রাপি প্রকাশিত হয়নি। চীনের কুমিন্টাং আন্দোলনের আলোচনা করতে গেলেই স্বতঃই ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন ও তার নীতির কথা এসে পড়ে। কোনো রকমে এ'কে পরিহার করতে পারা যায় না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ যে কুমিন্টাং আন্দোলনের স্বরূপের মত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই।

চতুর্দ্দিকে কুমিন্টাংদলের বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হচ্ছে, কিন্তু চীনের জাতীয়দলের অগ্রদূত এই কুমিন্টাংদল অর্থে আমরা কি বুঝি? চীন দেশের জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভ এবং দেশীয় ও বিদেশীয় শোষণবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ডাক্তার সুন-য়াৎ সেন প্রতিষ্ঠিত যে জাতীয় বিপ্লবদল যুদ্ধ করছে তাকে কুমিন্টাং দল বলে তার তাৎপর্য্যকে ক্ষুন্ন করা হয়। চীনের বিপ্লবদল বিবিধ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই দল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকদের এবং তাদের পশ্চাতে অগণিত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহায়তায় সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে এবং বৃটিশ শোষণবাদীদের ভিত্তি শিথিল করে তুলেছে। শ্রমিক ও কৃষকের একত্র সঙ্ঘবদ্ধ এবং তাদের দ্বারা বিপ্লব সফল করে তোলা ডাক্তার সুন-য়াৎ সেনের প্রচেষ্টা ও মনোভাবের শেষ অবয়ব। কুমিন্টাংদল চীনদেশের কতিপয় নরমপন্থী ছাড়া সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকদের সমবায়ে গঠিত। যে সমস্ত ধনী, বৃটিশ শোষণবাদীর সাথে সমস্বার্থে গ্রথিত তাদের সাথে কেবল কুমিন্টাং আন্দোলনের কোনো যোগ নেই। এ আন্দোলন শোষণবাদীদের বিরুদ্ধ আন্দোলন। শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারাই এই বিপ্লব পরিচালিত হয়। চীনদেশের শ্রমিকরাই এই বিপ্লব চালনার কার্য্যে অগ্রণী হয়েছে। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ও তাদের পথি প্রদর্শকরূপে সংগ্রাম চালাচ্ছে। যতই কৃষক ও শ্রমিকগণ এই আন্দোলনে সহানুভূতিসম্পন্ন হবে ও এতে যোগদান করবে এর ভিত্তি ততই শক্ত ও দৃঢ় হয়ে উঠবে। কুমিন্টাং আন্দোলন ইম্পিরিয়েলিষ্টদের ধ্বংস করবার জন্য স্থাপিত হয়েছে এবং শ্রমিকগণই ইহার সম্মুখ সেনানী।

উপরোক্ত কুমিন্টাংদলের পতাকাতলে আজ সমগ্র চীনেরা একত্র হয়েছে এবং অবিরত যুদ্ধ চালাচ্ছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ ও চীনদেশের অবস্থার অনেক পার্থক্য সৃষ্টি করে আমাদের তথাকথিত কংগ্রেসী নেতারা কিছুতেই চীনের কুমিন্টাং পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য চালাতে রাজী নন্। তাঁরা কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহের আশঙ্কায় ভয়াকুল হয়ে ওঠেন। কংগ্রেসের ব্যক্তিগত প্রভুত্ব ও দলাদলির জন্য জাতীয় আন্দোলনের গতি এমন স্থানে এসে থেমে গেছে যে এর নীতির পরিবর্ত্তন ছাড়া আর একপদও অগ্রসর অসম্ভব। চীন ও ভারতবর্ষের অবস্থার যে কোনো

পার্থক্য নেই তা বলা যায় না। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র বৃটিশ শোষণবাদীদের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে, চীন কিন্তু শোষিত হয় মিলিত শোষণবাদীদের দ্বারা। তারা প্রত্যেকে স্ব স্ব শোষণ প্রাধান্য রক্ষায় ব্যস্ত। এদিক থেকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে একমাত্র বৃটিশ শোষণবাদী ভারতকে লুণ্ঠন করছে। ভারতবর্ষের ধনিক বণিকদের শক্তিও অতিশয় দৃঢ়। পক্ষান্তরে চীনদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা সেরূপ নয়। ভারতবর্ষের ধনিকরা তাদের শক্তিবলে তাদের অধিকার আয়ত্ত করতে অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছে। তারি জন্যে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিষ্টদের বিরুদ্ধাচারণ কিছুতেই তারা করতে রাজী নয়। কেননা, বৃটিশ শোষণবাদীদের সহিত তাদের একটা আপোস নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় তারা শ্রমিক আন্দোলন কিংবা চীনের কুমিণ্টাং আন্দোলন চালাতে অস্বীকৃত হবেই। তাদের স্বার্থ হচ্ছে বৃটিশ শোষণবাদের অংশীরূপে ভারতকে আরো শোষণ করা এবং শ্রমিক ও কৃষক উত্থানকে দমিত করে রাখা। কংগ্রেসের ভিতর অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবপন্থী আছেন। তাঁরা জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন। চীনের শাসক, জায়গীরদার ও মধ্যবিত্ত ধনাঢ্যদের মত তাঁরাও হয় ত প্রভুত্বলাভ করতে চান। তাঁদের উদ্দেশ্য বৃটিশ শোষণবাদীদের হাত হতে ভারতকে উদ্ধার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে গঠনপ্রয়াসী শ্রমিকদের উত্থানে বাধা দেওয়া। তবে ঠিক পথে যদি ভারতবর্ষে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন চলে, যদি তারা তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়, এবং চীনের পথানুসরণ করতঃ সর্ব্বহারাদের নেতৃত্ব মেনে নেয় তাহা হলে ধনিকবাদের খুব খারাব স্তরগুলি অতিক্রম না করেও তারা সমূহবাদের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবে। ভারতবর্ষে যদি কুমিণ্টাং আন্দোলনের উপকার অনুভূত হয় তাহলে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জিত হয়ে ও শুধুমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের দাবী সম্মুখে রেখে তবে অগ্রসর হতে হবে। বিপ্লবের প্রকৃত মর্ম্মে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং তারই শক্তিবলে তারা বৃটিশ শোষণবাদীদের পরাজিত করতে পারবে।

বৃটিশ শোষণবাদীরা বরাবর চেষ্টা করে এসেছে যদি কোনো প্রকারে কুমিণ্টাংদলের ভিতর বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে তাহা হলে কুমিণ্টাংদলকে ছিন্ন ভিন্ন করতে পারবে। ক্যাণ্টনের কুমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের অধীন সেনাপতি চ্যাং-কৈ-সেক মডারেট মতাবলম্বী। তিনি মডারেট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন—পক্ষান্তরে বিচারমন্ত্রী সান-কো চরম বিপ্লবপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এই দুই শাখার ভিতর যাতে মতান্তর এবং চ্যাং কৈ-সেক ও জেনারল চ্যাং-সো-লিনের সহিত মিলন হয় বৃটিশ শোষণবাদীরা সেই চেষ্টা করছে। হয়তো কতকটা মধ্যপন্থী প্রোগ্রাম সম্মুখে রেখে খানিকটা মিটমাটও হয়েছে। যদি এইরূপ হয় তাহলে কুমিণ্টাং দলে যে সমস্ত কম্যুনিষ্ট রয়েছে তাদের বের করে দেবার সুবিধা হবে। চ্যাং-কৈ-সেক ও চ্যাং-সো-লিন একত্র মিলিত হলে, কুমিণ্টাং দলের ওপর সোভিয়েট প্রভাবও ক্ষুণ্ণ হবে, আর বৃটিশের প্রভাব যাবে বেড়ে। কিন্তু কুমিণ্টাং দলে যতই বিরোধ থাকুক না কেন তাঁরা যে কার্য্য তালিকা নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাতে তাঁদের নীতির হ্রাস বা বৈদেশিক নীতিতে কোনো মত বিরোধ জন্মিতে পারে না। চ্যাং-কৈ-সেক জনগণের মঙ্গলের জন্য সেনাপতি পদে বরিত হয়েছিলেন আর বরাবর তাদের কর্ম্ম তালিকা মত কাজ করতে ও তাদের স্বার্থরক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এখন যদি তিনি চ্যাং-সো-লিনের দলে ভিড়েন তা হলে তাঁরই প্রভূত ক্ষতি সাধিত হবে। বৃটিশ শোষণবাদীরা চীন বিপ্লবের সময়েও প্রভূত অর্থ সাহায্য দিয়ে, গোয়েন্দা নিযুক্ত করে' সৈন্য প্রেরণ করে বিপ্লবকে টুঁটি টিপে মারবার চেষ্টা করেছে। কোলচাক ও র‍্যাঙ্গেলকে দিয়ে অনেক বাধা দিয়েছে। হোয়াইট রুষদের বিরুদ্ধ-বিপ্লবের পথে চালিত করেছে। তেমনি চীনের জাতীয় দলের নেতাদের ভিতরও দেশীয় যোদ্ধৃবর্গকে যদি অর্থ দিয়ে বশীভূত করতে পারে তা হলে কুমিণ্টাং বিপ্লবের গতি প্রশমিত হবে। বৃটিশ প্রেস এবং সংবাদ প্রেরক সঙ্ঘ অনবরত চীন দেশের মিথ্যা সংবাদ পাঠিয়ে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক করে দিচ্ছে। এত বৎসর শোষণ করার পর বৃটিশ শোষণবাদীরা বুঝেছে আজ কুমিণ্টাং আন্দোলন তাদের শোষণে বাধা দিচ্ছে। চীন দেশের মত একটা বৃহৎ দেশ যাকে প্রাচ্য ভূমি খণ্ডের মহাদেশ বলে অত্যুক্তি হয় না, তার জনগণ আজ জেগেছে সমস্ত বন্ধন থেকে, অধীনতা থেকে মুক্ত হবার জন্যে। তারা আজ যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত, তাদের গতিরোধ করতে হলে তাদের নেতৃবর্গের ভিতর ভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। অত বড় একজন সেনানী শত্রু শিবিরে চলে গেলেন, এজন্যে আমাদের মনে একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, এতে দুঃখিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই। কুমিণ্টাং দল যে কার্য্য তালিকা নিয়ে বিপ্লবে ব্রতী হয়েছে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য শোষণবাদীদের বিতাড়িত করে শ্রমিক কৃষক, মুটে মজুর যারা দেশের প্রকৃত প্রাণ তাদের মুক্তি অর্জ্জন করা, তাদের প্রকৃত অধিকার দেওয়া। তাই শ্রমিক কৃষককুলও অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লব বাহিনীতে যোগদান করছে। মুক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। কুমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট বিপ্লববাদী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট। তার ক্ষমতা চীন দেশের জনগণের শক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। দেশের সর্ব্বত্র তাদের শক্তি ছড়িয়ে রয়েছে। দু'চারটী শহরকে গুলি চালিয়ে ধ্বংস করা বা দু'একজন যোদ্ধাকে দমন করা সহজ হতে পারে—কিন্তু অসীম শক্তিময় শ্রমিক ও কৃষকদের সমবায়ে গঠিত কুমিণ্টাং বাহিনীকে বিদেশী শোষণবাদীরা কিরূপে দমন করবে? চ্যাং-কৈ-সেকের কুমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের নীতির ওপর কোনো হাত নেই—তাঁকে জনগণ সেনাপতিরূপে নিযুক্ত করেছিল। জনগণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য। এখন তিনি যদি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন তা হলে তিনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবেন। দক্ষিণ চীনে তিনি কুমিণ্টাং পদ্ধতি স্থাপনে নিজের যোগ্যতার যেরূপ পরিচয় দিয়েছিলেন তার সেই গৌরব প্রচেষ্টাও চিরতরে বিলুপ্ত হবে। কেননা কুমিণ্টাং দলের পরিচালিত কার্য্যপ্রণালী দেশের লোকের অন্তরে বিশ্বাস উৎপাদন করেছে। তদ্ব্যতীত জাতীয় দল অগণিত জনসাধারণের সাহায্যের দ্বারাই কৃতকার্য্য হয়েছে। আর তারা ইহাও বেশ জানে যে কুমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট যখন স্থাপিত হয়েছে তখন তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের আরব্ধ প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করবে। বৃটিশ শোষণবাদীরা চায় বিরোধ দ্বারা মধ্যপন্থী ধনিকতন্ত্রবাদী ন্যাশন্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হলে তাদের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকবে! কিন্তু সমগ্র চীন যখন বিপ্লবের পথে ছুটেছে তখন তাদের কোনো প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না। সোভিয়েট সঙ্ঘের প্রতি চোখ রাঙানীতে কিছু আসে যায় না।

সোভিয়েট সঙ্ঘ কিছুতেই চীন দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে বৃটিশ ও অন্যান্য শোষণবাদীদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। নতুবা চীন দেশ ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হবে। অত্যাচরিত নিষ্পেষিত শ্রমিক ও কৃষকগণের জয় লাভ অবশ্যম্ভাবী।

—০—

ট্রেড্ ইউনিয়নিজম্

বা

শ্রমিক সঙ্ঘবাদ

—•—

[এ প্রবন্ধটি একজন বৃটিশ ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্ট বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদীর লেখা। তিনি ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে এসেই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। বোম্বের "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড" নামক ইংরেজী দৈনিক সম্পাদকের কৃপানুমতি নিয়েই আমরা প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ গণবাণীতে প্রকাশ করলেম। বড় বলে ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধটি বের হবে এবং ১০ম ও ১২শ সংখ্যক "গণবাণী"তে এর কতকাংশ আগেই বের হয়ে গেছে।]

বাণিজ্যিক সঙ্কট

১৮২৭ সনে ধনিকবাদ প্রথম বাণিজ্যিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। বৃটিশের তৈরী জিনিসের জন্যে যা সম্ভাবনীয় দুরাকাঙ্ক্ষ সমুদ্রপারের বাজার ছিল তা হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। চাহিদার চেয়েও জিনিসের উৎপাদন বেশী হয়েছিল। তারি জন্যে সঙ্কট উপস্থিত হয়। এ ব্যাপার যেমনি আশাতীত ছিল ঠিক্ তেমনি অপূর্ব্বও ছিল। কাজেই এর ফলটা খুব মারাত্মকই হলো। কাজ-কারবার প্রায়ই সব বন্ধ হয়ে গেল। নিয়োগকর্ত্তৃগণ তাদের কারখানার দ্বার বন্ধ করে দিল। বেকারের অবস্থা সর্ব্বত্রই সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়্ল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য অত্যন্ত বেশী মাত্রায় বেড়ে গেল। ধনিকবাদ তার কর্ম্মজীবনের শেষ সীমায় এসে পৌছেচে এরূপ মত অনেক জায়গায় প্রচারিত হতে লাগ্ল। তাই অতীতের সরল জীবনে আবার ফিরে যাবার দাবী খুব জোরের সহিত পেশ্ হতে থাক্ল। শ্রমিক সঙ্ঘগুলি খুব সাহসের সহিত তাদের শক্তিকে সংহত রাখ্বার জন্যে যদিও খুব চেষ্টা করলে তথাপি তাদের ক্ষুদ্র আর্থিক শক্তি শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে গেল। সভ্যসংখ্যা কমে কমে শত শত শ্রমিকসঙ্ঘ ভেঙেই গেল। এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা প্রায় দু'বছর ছিল। তার পরে যখন অনেকটা পূর্ব্বাবস্থা ফিরে এল তখন শ্রমিক আন্দোলন প্রায় অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়েছিল। যে ক'টা সঙ্ঘ বেঁচে ছিল তার প্রত্যেকটির তহবিল কপর্দ্দকশূন্য ছিল। যে অল্পসংখ্যক সভ্য একান্ত প্রাণের সহিত জিনিসটিকে বিশ্বাস করেছিল তারা ছাড়া এ সকল সঙ্ঘের সভ্যও কেউ আর ছিল না। যা হোক্, এ ব্যাপারের দ্বারা শ্রমিকদের যথেষ্ট শিক্ষা হলো, আর এ শিক্ষার দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিতও হয়ে গেল।

বিপ্লব যুগ

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস যারা লিখেছেন তাঁরা ১৮৩০ সন থেকে দশ বছর কালকে বিপ্লবযুগ বলে বর্ণনা করেছেন। হঠাৎ শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টির সীমা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। এর এক কারণ ছিল ওপরে বর্ণিত বাণিজ্যসঙ্কট, আর এক কারণ ছিল রবার্ট ওয়েনের প্রতিপত্তি। এই রবার্ট ওয়েন্ ছিলেন তাঁর যুগের আদর্শবাদী। প্রাথমিক যুগের শ্রমিক নেতা বা ভাবুকদের চেয়ে রবার্ট ওয়েনের আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। আমরা নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি :—

তিনি এ বড় সত্যটি উপস্থিত করলেন যে মাথা খাটিয়েই হোক বা গতর খাটিয়েই হোক্, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহে প্রয়োগের দ্বারা শ্রমই সর্ব্বপ্রকার ধনের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। এ কথাটাকে গ্রহণ করে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে পরিশ্রমের ভিত্তির ওপরেই সমস্ত সমাজ টিকে আছে। তিনি কল-কব্জার আবির্ভাবকে অভিনন্দন করলেন এবং বললেন যে এসব সমাজের পক্ষে আশিস্ স্বরূপ। তিনি আরো বল্লেন যে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এসব কলকব্জার মালিক হওয়াটাই যত অনর্থের মূল। তিনি প্রচার করলেন যে তাঁর চরম লক্ষ্য হচ্ছে সোশ্যালিষ্ট কমন্ওয়েল্থ্ (সমূহবাদমূলক গণতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করা যাতে না থাকবে প্রভু, না থাকবে ভৃত্য। একই সমাজের সভ্যরূপে এতে সকলে যথাসাধ্য পরিশ্রম করবে এবং সমভাবে পরিশ্রমের অংশ গ্রহণ করবে। শ্রমিকদের ইতিহাসের এখানেই আমরা দেখতে পাই যে ধনিকবাদের পরিবর্ত্তে সকলে দাবী করছেন সোশ্যালিষ্ট ষ্টেট বা সমূহবাদ মূলক তন্ত্রের।

আদর্শবাদী হলেও ওয়েনের প্রবল মানব হিতৈষণার প্রবৃত্তি ছিল এবং এ প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হয়েই তিনি বারে বারে তাঁর আদর্শে পঁহুছার পন্থাগুলোর বিবর্ত্তন সাধন করেছেন। তিনি আমেরিকা ও স্কট্ল্যাণ্ডে আদর্শ সম্প্রদায় স্থাপন করে উভয় স্থানেই অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন। তার পরে তিনি কো-অপারেটিভ আন্দোলনের গঠনে সাহায্য করেছিলেন। গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল কন্সোলিডেটেড ইউনিয়ন (বৃহৎ জাতীয় সমাবেশ সঙ্ঘ) এর তিনি স্থাপয়িতা। ওয়েনের প্রচার শীঘ্রই শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমিক নেতৃদের নিকটে আদৃত হতে লাগল। বাণিজ্যের অবনমনের অব্যবহিত পর ১৮৩০ সন হতেই শ্রমিক আন্দোলন আবার নবজীবন লাভ করতে থাকে। শ্রমিকসঙ্ঘগুলি শীঘ্রই আবার আগেকার মত শক্তিশালী হয়ে উঠ্ল। কিন্তু, এবারে তাদের দৃষ্টির প্রসারতা অনেক বেড়ে যাওয়াতে তারা আগেকার চেয়ে অনেক বেশী আতঙ্কের কারণও হয়ে পড়ল। এবারে তারা আর কলকব্জার ধ্বংস করতে চাইল না, পক্ষান্তরে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নিলে।

অধিকন্তু, শ্রমিক নেতারা অধিকতর শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত সংগঠন সমূহ তৈয়ার করতে আরম্ভ করল। বিশিষ্ট শিল্পের জন্যে বিশিষ্ট ইউনিয়ন আর থাকল না। এখন থেকে জাতীয় ও সাধারণ (National and general) ভাবে সঙ্ঘসমূহ গঠিত হলো। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে 'জাতীয়সঙ্ঘ' নামটা অনেক জায়গায় ঠিক্ হয়নি। কিন্তু, শক্তিশালী জাতীয় সঙ্ঘ সমূহের অস্তিত্ব যথেষ্ট ছিল, বিশেষ করে বিল্ডিং, বস্ত্র ও অন্যান্য বাণিজ্যের সঙ্ঘগুলো খুবই প্রবল হয়েছিল। এমন কি যে সকল ইনিয়ন জাতীয়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চায়নি তারাও

সমসূত্রাবদ্ধ হয়ে (On federal basis) তাদের শক্তি বাড়াতে চেষ্টা করেছিল।

এরূপ পরিবৃত্তির মধ্যেই ওয়েন তাঁর গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল কন্‌সোলিডেটেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা করেন। এ সঙ্ঘ ওয়েনের মতবাদের উচ্চতম আদর্শ ছিল। প্রকৃত পক্ষে শ্রমিক সঙ্ঘ হলেও গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল কন্‌সোলিডেটেড ইউনিয়ন ভবিষ্য সমাজ সংগঠনের বীজ স্বরূপ ছিল। এর নাম থেকে যেরূপ পরিব্যক্ত হচ্ছে সেরূপই এ সঙ্ঘ ছিল অর্থাৎ কোনো বিশিষ্ট শিল্পের বা স্থানীয় ধরণের সঙ্ঘ এইটে ছিল না। সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বপদের শ্রমিকগণই এ সঙ্ঘের সভ্য হতে পারত। ওয়েনের বিশ্বাস ছিল যে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী একটি মাত্র সঙ্ঘে সংহত হলে ধনিকবাদ হতে অতীব ফলপ্রসূরূপে সমাজ সমূবাদের বা সোশ্যালিজমের স্তরে পরিবর্ত্তিত হবে।

১৮৩৪ সনে গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল কন্‌সোলিডেটেড ইউনিয়ন স্থাপিত হয় এবং যথেষ্ট সফলতাও লাভ করে। সঙ্ঘটি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে এবং দেশময় বিস্তৃতও হয়ে পড়ে। সিডনি ওয়েব শ্রমিক সঙ্ঘের ইতিহাস রচনায় বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে পরিচিত। তিনি বলেছেন যে ওয়েনের সঙ্ঘ যত দ্রুত বর্দ্ধিত হয়েছিল তেমনটা সে সময়ের পূর্ব্বে বা এ সময় পর্য্যন্ত আর কখনো হয়নি।

সঙ্ঘবাদের এরূপ উন্নতি আবারো গবর্ণমেণ্ট ও নিয়োগকর্তৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এমন একটা রীতি প্রচলিত ছিল যে সঙ্ঘের নূতন মেম্বর হতে হলে তাকে সঙ্ঘের কার্য্যে বিশ্বস্ত থাকার জন্যে ও তার নিয়ম কানুন মেনে চলবার জন্যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত। এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পদ্ধতি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অবৈধ বলে ঘোষিত হলো। অন্য পক্ষে নিয়োগকারিগণ এমন একটা দলিলের প্রবর্ত্তন করলে যার দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘবাদ একেবারেই অস্বীকৃত হয়ে গেল। যে সকল শ্রমিক এ দলিলে নাম সই করতে অস্বীকার করলে তারা সবই কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে গেল। এই দু'টো শক্তির চাপে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি আবার ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেই গবর্ণমেণ্ট সে শ্রমিককে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সাজা দিত। এ সাজার স্বরূপ ছিল নির্ব্বাসন কিংবা দীর্ঘকালের জন্যে কারাবাস। এরূপে নিয়োগকর্তৃগণও খুব সাফল্যের সহিত তাদের প্রবর্ত্তিত 'দলিল' এর প্রয়োগ করে শ্রমিকসঙ্ঘবাদকে আরো দুর্ব্বল করে দিলে। এ সকল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে সঙ্ঘ সমূহকে ধর্ম্মঘট চালাতে বাধ্য হতে হলো। প্রায় সর্ব্বত্রই এ সকল ধর্ম্মঘট যে অকৃত কার্য্য হয়ে গেল তা নয়, তার ফলে সঙ্ঘ সমূহের আর্থিক শক্তিও ভীষণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেল। সভ্যগণেরও আর কোনো প্রকার জোর থাকল না। গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল কন্‌সোলিডেটেড্ ইউনিয়ন যা শ্রমিকদের জন্যে কত উচ্চ আশা পোষণ করেছিল, ধরতে গেলে শ্রমিক আন্দোলনের মজ্জাস্বরূপ ছিল, ক্রমশঃ ধ্বংস হয়ে গেল। অন্য সঙ্ঘগুলিরও সে অবস্থা হলো। ১৮৩৭ সালের শেষ দিকে দেখা গেল যে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের ঢেউ এসেছিল গবর্ণমেণ্ট তা সাফল্যের সহিত দমন করতে সমর্থ হয়েছে। এইরূপে রবার্ট ওয়েনের উচ্চতম আদর্শ ভূমিসাৎ হয়ে গেল।

চার্টিষ্ট আন্দোলন

যে বৈপ্লবিক ভাব শ্রমিক আন্দোলনে প্রবেশ করেছিল তা রাষ্ট্রনীতিক পরিবৃত্তির ভিতরেও প্রবেশ করল। শ্রমিক আন্দোলন অকৃতকার্য্য হওয়ার কথা প্রচার হয়ে যেতেই রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠল। পার্লামেণ্ট সংক্রান্ত সংস্কারের দাবী নিয়েই রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছিল। এ দাবিগুলো জনগণের চার্টার বা সনদ নামে অভিহিত হয়েছিল। এগুলি ছিল:—সার্ব্বজনীন ভোটের অধিকার, (২) পার্লামেণ্টের বার্ষিক অধিবেশন, (৩) সদস্যগণকে অর্থ প্রদান, (৪) নির্ব্বাচন ডিষ্ট্রিক্ট গুলির সমবিভাগ, (৫) সদস্যগণকে বিষয়ের মালিক হতে হবে এরূপ নিয়ম তিরোহিত করা, (৬) ভোট দেওয়ার গোপন প্রথা।

এ চার্টার আন্দোলনের পেছনে সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সমর্থন ছিল। শান্তিবাদী, মানব-হিতৈষী এমন কি চরম পন্থী বিপ্লববাদীরা পর্যান্ত সনদের প্রশস্ত ভিত্তির ওপরে সমবেত হয়েছিল।

এটা দেখতে হবে যে ওপরের দাবীগুলোর দ্বারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের কোনো আসন্ন উপকার হতে পারত না। তবুও শ্রমিকগণ চার্টিষ্ট আন্দোলনে যোগদান করেছিল। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পেরেছিল যে গবর্ণমেণ্ট নিয়োগকর্তৃগণের হাতের খেলার পুতুল মাত্র ছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে সনদ প্রাপ্ত হলে তাদের অর্থনীতিক অভিযোগগুলিরও প্রতিকার হবে। আমরা এখানে বিস্তৃতভাবে চার্টিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে চাইনে। এতটা বললেই যথেষ্ট হবে যে ১৮৩৪ সনে চার্টিষ্ট আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, ১৮৪৩ সনে তা পরাভূত হয়েছিল। পরাভূত হওয়ার কারণ হচ্ছে এর আভ্যন্তরীন দুর্ব্বলতা। এ আন্দোলন জনগণের সমর্থন পেয়েছিল। দেশের সর্ব্বত্রই সমাজের নিম্ন স্তরের লোকেরা সনদ আন্দোলনের জন্যে সমবেত হয়েছিল এবং তা প্রাপ্তির জন্যে তারা নেতৃগণের আদেশ মান্য করতে সব সময়ে প্রস্তুত ছিল। নেতৃগণের মধ্যেই গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল। সকলেই সনদ পেতে চাইতেন, কিন্তু কি উপায়ে যে পেতে হবে সেটা নিয়েই ছিল যত গোলমাল। অত্যন্ত নরমপন্থী যাঁরা ছিলেন তাঁরা জাতীয় ভাবে কেবল দরখাস্ত করেই গবর্ণমেণ্টের ওপরে জোর প্রয়োগ করতে চাইতেন। অন্যপক্ষ বিশ্বাস করতেন যে দরখাস্তে কোনো কাজ না হলে ভয় দেখানোর জন্যে ধর্ম্মঘট করা হবে। অত্যন্ত চরম দলের লোকেরা যদিও সকল প্রকার বৈধ উপায় অবলম্বন করতে চাইতেন তথাপি তারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সোজাসুজি বিদ্রোহ করার ইঙ্গিত স্বরূপে সাধারণ ধর্ম্মঘট করাই আবশ্যক মনে করতেন। দরখাস্তে কোনো কাজই হলো না। সাধারণ ধর্ম্মঘটের বন্দোবস্ত এমন খারাব ভাবে করা হলো যে তা একটা হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হলো। প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ করার পূর্ব্বেই অকৃতকার্য্য হয়ে গেল। নেতৃগণের মধ্যে মত বিরোধ হওয়াতেই শেষ প্রচেষ্টা বিফল হলো। এতে আন্দোলনের সুনাম নষ্ট হয়ে গেল এবং আন্দোলনের শেষেরও আরম্ভ হলো। একে পুনর্জীবিত করার জন্যে চেষ্টা করা হয়েছিল। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর বিপ্লব-উত্থানের সময়ই এ চেষ্টা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। অনেক ভালো নেতা জেলে গেলেন,

অনেকে দল ছেড়ে দিলেন। এর ফলে ১৮৪৮ সনে চার্টিষ্ট আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেল।

আপোষের যুগ

চার্টিষ্ট আন্দোলনের পতন হওয়ার পরে শ্রমিক আন্দোলন সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করলে। এ পরিবর্ত্তনের স্বরূপ প্রকাশ করার জন্যে আমরা আগে যে সব কথা বলেছি সংক্ষেপে তার কতকটা পুনরাবৃত্তি করতে হবে। আমরা বলেছি কি করে শ্রমিক সঙ্ঘ গুলি মেশিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে গিল্ড প্রথার পুনঃ প্রচলন করতে চেয়েছিল। তাতে অকৃতকার্য্য হয়ে পরে তারা মেশিনের মূল্য বুঝতে পেরেছিল। এবারে তাদের প্রচেষ্টা ছিল ধনিক শ্রেণীকে ধ্বংস করে উৎপাদনের উপায়গুলি তাদের হস্তগত করা। গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল কনসোলিডেটেড ইউনিয়ন ও চার্টিষ্ট আন্দোলন অকৃতকার্য্য হওয়াতে অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক উভয় আন্দোলনই মিইয়ে গেল। এর পরে শ্রমিক সঙ্ঘগুলির জন্যে একটি মাত্র পথ খোলা থাকল, সমাজে যে প্রথা প্রচলিত ছিল তারি ভিতরে থেকেই যতটা সম্ভব ভালো অবস্থা লাভ করা।

এ নূতন যুগ ১৮৫০ সনে শুরু হয়েছিল। সঙ্ঘগুলি নরম পন্থীদের নেতৃত্বাধীনে তাদের আগেকার বিপ্লবাত্মক প্রবণতা বর্জ্জন করে দিলে। এবারে তারা চাইলে তাদের বিরোধ মেটাতে কেবলমাত্র মধ্যস্থতার দ্বারা। তাদের এ ইঙ্গিতের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ও নিয়োগকর্ত্তৃগণ তাদের প্রতি কঠোরতা কিছু কমিয়ে দিলে। এ যুগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল ঐক্যবোধের ওপরে। সকলে মনে করে নিলে যে সমাজের সব শাখার উন্নতি নির্ভর করছে শ্রমিক ও ধনিকের সহযোগিতার ওপরে। এর পরে সাম্রাজ্য গঠনের যুগ আরম্ভ হলো। ঘরে যখন শান্তি আর সদিচ্ছার প্রতিষ্ঠা হলো তখন ধনিকরা সমর্থ হলো সমস্বার্থ সংযোগ করাতে ও বাইরে বৃটিশ প্রতিপত্তির বিস্তার করতে। প্রত্যেক নববিজয়ের মানেই হলো অধিকতর ব্যবসায়, আর অধিকতর উন্নতি। ঘটনাক্রমে এ সব অবস্থা থেকে শ্রমিক সঙ্ঘগুলিরও অনেকটা লাভ হলো। এগুলির অস্তিত্ব আর আতঙ্ক বলে বিবেচিত হতনা। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে সঙ্ঘগুলিকে ধনিক সমাজের আবশ্যক অংশ বলে বিবেচনা করা হত। এ জন্যে সঙ্ঘগুলির বর্দ্ধনে উৎসাহ দেওয়া হত। পক্ষান্তরে অতিশয় লোভী নিয়োগকর্ত্তৃগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শ্রমিকসঙ্ঘগুলি তাদের অস্তিত্বের সমর্থন করলে। তারা কারখানা আইন বিধিবদ্ধ করতেও চেষ্টা করলে যা শ্রমিকদের পক্ষে হিতকর ছিল এবং সাধারণ ভাবে অভিযোগ ও ভুল বোঝাকে সহজ সরল করে তোলার পক্ষে সাহায্য করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘগুলো গঠনের দিক থেকেও অনেকটা উন্নত হয়ে উঠল। বড় বড় শিল্পানুষ্ঠানগুলিতে জাতীয় সঙ্ঘ সমূহের প্রতিষ্ঠা হলো। ট্রেড কাউন্সিলগুলি স্বপ্রধান কেন্দ্ররূপে ডিষ্ট্রিক্ট সমূহে প্রতিষ্ঠিত হলো। অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হলো ১৮৬৮ সনে বৃটিশ ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস। প্রথমে এ সংগঠন সমস্ত সঙ্ঘগুলির পূর্ণ সমর্থন পায়নি। তবুও কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এ কংগ্রেসকে সাধারণ ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের জাতীয় কেন্দ্ররূপে মেনে নেওয়া হলো। এখানে এসে আমরা শ্রমিক সঙ্ঘগুলোর প্রাথমিক ইতিহাসের উপসংহার করতে পারি। ইতিহাসের এ দিকটা নিয়ে আলোচনা করতে অনেকটা স্থান ব্যয়িত হয়ে গেল। কেন না, এদিকটা দেখিয়েছে যে কি করে সঙ্ঘগুলির উন্নতি হয়েছিল যখন সেগুলি সংগ্রাম করছিল কম প্রকৃতিগত ভাবে। সমগ্র জগতের শ্রমিক আন্দোলন প্রাথমিক ইংলিশ ইতিহাসের জ্ঞান হতে অনেক উপকার পেয়েছে। প্রাথমিক ইংরেজ শ্রমিকগণ যে সকল ভুল ভ্রান্তি করেছে সে সব পরিহার করে তারা দ্রুত অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছে।

আমরা এখন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক দিকটার প্রতি।

আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে শ্রমিক সঙ্ঘবাদ

আন্তর্জাতিক ভাবে, বিভিন্নদেশে ও বিভিন্ন ধরণে গঠিত শ্রমিক আন্দোলনের এখন আমরা সমালোচনা করব। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে গঠনের পার্থক্য আপনা থেকে হয়নি। এ হয়েছে রাষ্ট্রনীতিক দৃষ্টির পার্থক্যের খাতিরে। এ রাষ্ট্রনীতিক দিকটা নিয়ে আমরা এর পরের প্রবন্ধে আলোচনা করব। কাজেই এখানে সে সম্বন্ধে বিশেষ উক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। আর একটা অসুবিধে এই হচ্ছে যে ট্রেড্-ইউনিয়নের সম্পূর্ণ ও প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। কাজেই, নিয়ে আমরা যে সকল অঙ্ক দিতে যাচ্ছি সেগুলিকে খুব নিকটবর্ত্তী হিসেব বলে ধরে নিতে হবে।

ছোট হোক্ বা বড় হোক্ এমন কোনো দেশ এখন ভূপৃষ্ঠে নেই যাতে কোনো না কোনো প্রকারের শ্রমিকসঙ্ঘ না আছে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা বর্ত্তমানে সাড়ে তিন কোটির কম হবে না।

একটা দু'টো ব্যতিক্রম ছাড়া বড় বড় শিল্পানুষ্ঠান পূর্ণ দেশ গুলির সঙ্ঘেরই সভ্যসংখ্যা অনেক বেশী। জর্ম্মানীর ইউনিয়ন সমূহের সভ্য সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ, বৃটিশের প্রায় ৬০ লক্ষ এবং আমেরিকার প্রায় ৫০ লক্ষ। কিন্তু রুস হচ্ছে একটা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ব্যতিক্রম। যদিও রুস উচ্চস্তরের শিল্পানুষ্ঠান পূর্ণ দেশ নয় তথাপি এদেশের সঙ্ঘসমূহের সভ্য সংখ্যা ৭৫ লক্ষ। তারপরে ভারত ও চীনের কথা। এ দু'টো দেশের অনেক বড় শৈল্পিক অনুদ্ভূত শক্তি রয়েছে। ভারতের সঙ্ঘ সমূহের সভ্য-৩ লক্ষ, আর চীনের চার লক্ষ।

এ অঙ্কগুলোর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য তখনি বুঝতে পারা যাবে যখন কত শ্রমিক সভ্য হওয়ার উপযুক্ত তা তুলনা করে নির্দ্ধারণ করা হবে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে রুসের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে শতকরা ৯১ জন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। আর কোনো দেশে অনুপাতে এত অধিক সংখ্যক শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি। গ্রেট্‌বৃটেনে শ্রমিকগণের শতকরা ৪০ জন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। ভারত অন্যদিক থেকে চরমে পৌঁছেছে। এদেশে শ্রমিকের সংখ্যা দুই কোটি, আর সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে শতকরা দেড়জন মাত্র।

আর একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করতে আমরা ভুলে গেছি। ওপরে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা-থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রুশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত। তার কারণ এই যে রুসিয়াতে শ্রমিকগণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশীয় শক্তির দ্বারা যে সকল দেশ শাসিত হয়ে থাকে সে সকল দেশে শ্রমিক আন্দোলন অত্যন্ত বেশীরূপে পশ্চাদ্‌পদ। দৃষ্টান্ত স্থলে ভারতবর্ষ ও চীনের নাম করা যেতে পারে। এ দু' দেশে শ্রমিক আন্দোলন এত বেশী পশ্চাদ্‌পদ যে তা সহ্য করাই মুশকিল।

জাতীয় সংগঠন

এখন জাতীয় শ্রমিক আন্দোলনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যা'ক্। এখানেও অনেক মতানৈক্য দেখতে পাচ্ছি। এ মতানৈক্য হচ্ছে শ্রমিকশক্তির অমিল ও দুর্ব্বলতার কারণ। এদিক থেকে রুস ও গ্রেট্‌বৃটেন খুব ভাগ্যবান। রুসিয়াতে "অল্ রাসিয়ান সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়ন্স"এর নেতৃত্বাধীনে শ্রমিক আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেরূপ গ্রেট্‌বৃটেনেও উল্লেখ যোগ্য ট্রেডইউনিয়ন মাত্রই বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অন্যান্য দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় কেন্দ্র একটি হলেও তা সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বের দাবী করতে পারে না। জার্ম্মাণীতে শতকরা ৬০টি ট্রেড্ ইউনিয়ন মাত্র "এ, ডি, জি, বি"র ("জেনেরেল ফেডারেশন অব ট্রেড্ ইউনিয়ন্স"এর) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমেরিকার ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাত্র ওদেশের শতকরা ৫০টি ইউনিয়ন। কানাডিয়ান ট্রেডস্ এণ্ড লেবর কংগ্রেসে মাত্র শতকরা ৪০টি ইউনিয়ন যোগদান করেছে।

অপর অপর দেশে পার্থক্য এর চেয়েও বেশী রয়েছে। এ সকল দেশে জাতীয় কেন্দ্রই একটার বেশী রয়েছে। ফ্রান্সে দুইটি বিভিন্ন ন্যাশন্যাল ফেডারেশন রয়েছে। দু'টোরই সভ্য সংখ্যা প্রায় সমান। এর একটি "ইন্টার ন্যাশন্যাল ফেডারেশন অব ট্রেড্ ইউনিয়ন্স" (আমষ্টার্ডাম ইন্টার ন্যাশন্যাল) এর আর একটি "রেড্ ইন্টার ন্যাশন্যাল অব ট্রেড্ ইউনিয়ন্স" (মস্কো ইন্টার ন্যাশন্যাল) এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এ দু'টোর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা আছে তা কতকটা প্রকাশ্য শত্রুতারই মত। সেকো-স্লোভাকিয়াতে কম পক্ষে তিনটি জাতীয় কেন্দ্র আছে। এ তিনটির একটি আমষ্টার্ডামের সহিত যোগদান করেছে, দ্বিতীয়টি মস্কোর নীতির অনুসরণ করে থাকে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে খৃষ্টান ট্রেড্ ইউনিয়ন সমূহের ফেডারেশন। খৃষ্টান ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। স্পেন ও পোলাণ্ডে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন ক্ষুদ্র হলেও তার মধ্যে বিভাগ রয়েছে। জাপানের আন্দোলন বয়সে নবীন হলেও সেখানেও বিভাগ আছে।

ওপরে যা বলা হলো তা কোনো প্রকারেই বিভিন্ন জাতীয় কেন্দ্রের পূর্ণ বিশ্লেষণ নয়। গঠনের ও রাষ্ট্রনীতিক পার্থক্যের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলন কি প্রকার বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাহাই মাত্র এর দ্বারা বোঝা যাবে।

দেশ বিদেশ

—:*:—

কালিঘাটে গত শুক্রবার ৬ই মে তারিখে প্রেস্ কর্ম্মচারী সমিতির (Press Employees Association) একটি সভা হইয়া গিয়াছে। প্রতি সপ্তাহেই প্রেস কর্ম্মচারীদিগের সভা হইতেছে। আমাদের মতে ঘন ঘন সভা করা প্রচারকার্য্যের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। আমাদের শ্রমিকগণের এখনও শ্রমিকসঙ্ঘের কার্য্য কি এ সম্বন্ধে বিশেষ সুস্পষ্ট ধারণা নাই। অনেকের ধারণা যে ইউনিয়নের একমাত্র কার্য্য মাহিনা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। ইউনিয়নগুলিও এ যাবৎকাল কার্য্য কি তাহা বুঝাইবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাও করেন নাই। প্রেস কর্ম্মচারী সমিতি যে এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছে ইহা আনন্দের বিষয়।

—•—

কিন্তু আমরা অন্যান্য ইউনিয়নগুলির বিশেষ সাড়া পাই না কেন? ইণ্ডিয়ান সিমেনস্ ইউনিয়ন, কাঁকিনাড়া লেবর ইউনিয়ন, বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন প্রভৃতির আরও কিছু সজাগ হওয়া উচিত। শ্রমজীবীরা যত বেশী একত্র হইবে, দেশ-বিদেশে শ্রমিক আন্দোলনের স্বরূপ কি তাহাদের নেতাদিগের নিকট শুনিবে ও তাহাদের সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করিবে ততই বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের মূল দৃঢ় হইবে। বক্সমেকারস্ ইউনিয়ন, হরি-নারায়নপুর রায়ৎ সভা প্রভৃতি নামমাত্র সঙ্ঘের কথা ধরি না। ইহাদের অস্তিত্বের একমাত্র নিদর্শন যে ইহারা নিখিল ভারতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সকল কাগুজেসঙ্ঘ মাত্র দু'একটি লোকের নামে পরিচিত। এখন সময় আসিয়াছে যে কংগ্রেসের একটু দৃষ্টি রাখা উচিত যেন ইউনিয়নের অস্তিত্ব কোন নেতৃত্ব-অভিলাষী লোকের উপর নির্ভর না করে। এই প্রকার সঙ্ঘ শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্ব্বল করিয়া তোলে।

ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়ার দেওয়া এক সংবাদ পড়িলে মনে হয় দেওয়ান চমনলাল কলিকাতায় তথাকথিত শ্রমিক-নেতাদের আত্মকলহ যাদুমন্ত্র প্রভাবে মিটাইয়া দিয়াছেন। যদি পরস্পর মতবিরোধী কতিপয় লোক লইয়া কমিটি করিলে ঝগড়া মেটে তাহা হইলে জাতীয় কংগ্রেসের আজ এত দুর্দ্দশা হইত না। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা মহাশয়াকে যে কমিটির আহ্বান-কারিণী সেক্রেটারী করা হইল ইহার উদ্দেশ্য কি? শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা কোন্ ইউনিয়নের সহিত সংসৃষ্ট আছেন? সেই ইউনিয়নের বিবরণ সাধারণের জানিবার কি কোন অধিকার নাই? দেওয়ান চমনলাল কলিকাতায় থাকিবার সময় শ্রীমতী গুপ্তার ইউনিয়নটি দেখিয়াছেন কি? শ্রীমতী গুপ্তা বি,এন্ রেলওয়ের ধর্ম্মঘটকারিগণের সাহায্যের জন্য যে কমিটি হয় সেই কমিটির সম্পাদিকা হিসাবে কোন টাকা তুলিয়াছিলেন কিনা এবং যদি তুলিয়া থাকেন তাহার সম্পূর্ণ হিসাব দেন নাই কেন? তিনি কি এই কমিটির কোন সভা আহ্বান করিয়াছেন? সমিতির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে কি তিনি টাকা দিয়াছিলেন? আমরা এ বিষয় যাহা জানি তাহা বলিবার পূর্ব্বে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

—•—

গত শনিবার ৭ই মে তারিখে ৩৪, বহুবাজার ষ্ট্রীটে বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ফেডারেশনের তরফ হইতে কলিকাতার মেয়রকে তাঁহার তৃতীয়বার নির্ব্বাচন উপলক্ষে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অভিনন্দনের ভিতর কলিকাতায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য, আবাস ও শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল অভাব অভিযোগ আছে সেই বিষয়ের প্রতি মেয়র মহাশয়কে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করা হইবে। শুনিতে পাইতেছি কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ স্বরাজলাভ হইয়াছে। গত তিন বৎসর কংগ্রেসীদলের হাতেই কর্পোরেশন ছিল। তাহাতে যে শ্রমিকদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল এমন কথা কংগ্রেসের গোঁড়া

ভক্তও বলিতে পারেন না। এবারও কংগ্রেসীদলের আয়ত্তে কর্পোরেশন তিন বৎসরের জন্য থাকিবে। দেখা যাউক ফেডারেশনের অনুরোধের ফল কি দাঁড়ায়।

ব্রিটিশ ট্রেড্ ইউনিয়ন বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ফেডারেশন এক মন্তব্য পাশ করিয়াছে। যদিও কেহই মনে করিবেন না যে এই মন্তব্যের ফলে বিলাতের মন্ত্রীসভা বিলটি পরিত্যাগ করিবেন। তবুও এই প্রকার মন্তব্যের আবশ্যকতা আছে। বিলাতের শ্রমিকবৃন্দের সহিত ভারতীয় শ্রমিকবৃন্দের সমস্বার্থ সংযোগ অতীব আবশ্যক। বিলাতের শ্রমিক আন্দোলন যদি ধনিকগণের চেষ্টার ফলে কিছুদিনের জন্যও পিছাইয়া পড়ে তাহা হইলে ভারতের পক্ষে বিশেষ শুভ নয়। ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল পাশ হইয়া যাইবেই, কারণ পার্লামেণ্টে ধনিকদের সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীরা যে তাহাদের সাধ্যমত বিলাতের শ্রমজীবীদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এইটা আমাদের বিশেষভাবে তাঁহাদের জানান উচিত।

বি এন্ আর্ ইয়ুনিয়নের গার্ডেন রিচে তাহাদের যে শাখা ইয়ুনিয়ন আছে তাহার সহিত বহুদিবস হইতে মনান্তর চলিতেছে। সম্প্রতি যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল সেই ধর্ম্মঘটে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক যোগদান করেছিল কিন্তু এই শাখা ইয়ুনিয়ন প্রধান ইয়ুনিয়নের আদেশ পালন করে নাই। ধর্ম্মঘটের সময় ও ধর্ম্মঘটের পরে দুঃস্থ ধর্ম্মঘট কারিগণের সাহায্য দান ব্যাপারেও এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা ঘটা উচিত ছিল না। যাহা হউক এই অপ্রীতিকর আলোচনা আমরা এখন করিতে প্রস্তুত নই, যদিও অনেক মাল-মশলা আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। শাখা ও মূল ইউনিয়নের মনান্তর মিটাইবার জন্য। বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশান নিম্নলিখিত ভদ্রলোককে লইয়া একটি সাব কমিটি গঠন করিয়াছেন যথা:—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ ও মিঃ এম, দাউদ। আমরা আশা করি এই চারিজনের চেষ্টায় মনান্তর মিটিয়া যাইবে এবং উভয় পক্ষই একযোগে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন। কলহ, মনান্তর, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বাঙলাকে ছারখার করিয়া দিতেছে। নেতাদের আত্মকলহে নিস্বঃ শ্রমজীবীর সর্ব্বনাশ হইতেছে।

—০—

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে প্রকাশ যে, শ্রমিকেরা লেবার কমিশনারের মারফতে তিনটি নির্দ্দিষ্ট শর্ত্ত দিয়েছে। একটী শর্ত্ত এই যে যাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদেরকে পুনরায় কাজে নিতে হবে। মিঃ সিঙ্গারাভেলু চেটীয়ারের চেষ্টায় শ্রমিকরা স্থির করেছে যে যদি ঐ শর্ত্তগুলি গৃহীত হয় তবে তারা কাজে যোগ দিবে।

—০—

শ্রমিকের মৃত্যু—অপার চিৎপুরে দু'জন মিউনিসিপ্যালিটীর শ্রমিক একটা মেইনহোল সাফ করার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। হাঁসপাতালে যাবার পথে একজন মারা গিয়েছে। অন্য জনের অবস্থাও নাকি খুব খারাব। বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়েই বোধ হয় এই প্রকার হয়েছে। জোড়াবাগান পুলিশ তদন্ত করছে।

—০—

ব্যাটাভিয়ার ৫ই মের সংবাদে প্রকাশ যে চীন জাতীয়দলের পূর্ব্ব বর্ণিয়োর সমরিন্দা নামক স্থানে চীনারা যে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেছে তজ্জন্য পুলিশ চীন পল্লীতে হানা দেয় ও খানাতল্লাসী করে। পুলিশ কতকগুলি দলিলপত্র নিয়ে গিয়েছে ও দু'জন নেতাকে গেরেফতার করেছে। ধৃত নেতাদ্বয়কে উদ্ধার করার জন্যে লোকেরা চেষ্টা করেছিল। পুলিশ গুলি চালিয়েছিল তার ফলে ১০ জন চীনা নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছে।

—০—

জেনেভার অর্থনৈতিক সম্মিলনে রুষ প্রতিনিধিগণের নিরাপদ উপস্থিতির জন্যে পুলিসের বিপুল ব্যবস্থা হয়েছিল। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁদের দেখবার জন্য একদল লোক সমবেত হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের তথায় না নামিয়ে ৩ মাইল দূরে নামবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তথা হতে তাঁরা সম্মিলনের কর্ত্তাদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট একটী হোটেলে যান।

—০—

লাহোরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেছে তাতে আজ পর্য্যন্ত ১৮ জন লোক নিহত ও ১৭৮ জন আহত হয়েছে। গবর্ণমেণ্ট কমিউনিকে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। দাঙ্গার ফলে শহরে অরাজকতা ও বিভীষিকার উৎপত্তি হয়েছে। দাঙ্গার ভাবটা অনেক উপশম হয়েছে বটে, তবে ভয় একেবারে যায়নি।

প্রকাশ যে ভারত ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম শিখ সর্দ্দার গোলাব সিং পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। শিখ বন্দীদের আবদ্ধ রাখার প্রতিবাদ কল্লেই তিনি এই কার্য্য করেছেন।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মিলনে রুষ হতে আগত প্রতিনিধিদের পেছনে গোয়েন্দা পুলিশ লাগান হয়েছে। মস্কো সরকারী মহল হতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আমন্ত্রণের মধ্যে এই অসারল্য ও সন্দেহের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। প্রতিনিধি মণ্ডলীর সভাপতিকে অবিলম্বে এর প্রতীকারের জন্য বলা হয়েছে। যদি প্রতীকার না হয় তাহলে অবিলম্বে প্রতিনিধিদিগকে জেনেভা ত্যাগ করে চলে যেতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

তিব্বতীয় মুদ্রাজালের অভিযোগ:—বিগত শুক্রবার প্রাতে কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশ সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার অন্তর্গত রঘুনাথ চাটার্জ্জীর লেনে এক বাড়ীতে হানা দেয়। খানাতল্লাসীর ফলে ১০০০০ টাকার তিব্বতীয় জালমুদ্রা, অসমাপ্ত অনেক তিব্বতীয় মুদ্রা, হ্যাণ্ড প্রেস, ব্লক ও ক্যামেরা প্রভৃতি নোটজালের আবশ্যকীয় সাজ, সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়েছে। ঐ বাড়ীর ভারাটীয়া ডেকরাজ নেয়া, ধনকাঞ্চন, তীর্থরাজ নেয়া এবং শঙ্খমণি নামক চারজন নেপালী জাল করার অভিযোগে ধৃত হয়েছে।

—০—

মাদ্রাজের শ্রমিক সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠায় আশঙ্কা পুরামাত্রায় দেখা দিয়েছে। ধর্ম্মঘটীরা খুব সভাসমিতি করছে। হাইকোর্টের কাছে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়েছিল। সভায় কমরেড সিঙ্গারা ভেলু ও চাক্কারী চেটী শ্রমিকদিগকে শান্তিপূর্ণ থাকতে উপদেশ দেন। ডিওসোসিন প্রেসের ধর্ম্মঘট কারীদের কনেষ্টবল সাহায্যে ভিড় ভেঙে হটিয়ে দেওয়া হয়। এরা অন্যান্য শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটে যোগদান করতে অ করছিল।

চীনের কম্যুনিষ্ট বাহিনী সোয়াটোর দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। তারা মাত্র শহর হতে ১১ মাইল দূরে রয়েছে। বৃটিশ ক্রুইজার ডানে বৃটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য পাহারা দিচ্ছে। জাহাজে কামান ও ৪৬২ জন অফিসার রয়েছে।

বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে কিয়ায়োতে ৪ জন লোক রাইফেলের গুলিতে জখম হয়েছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজবন্দী সনৎকুমার

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভ্য শ্রীযুত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯২৫ সনের ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে ফরিদপুর হতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী চর ভদ্রাসন নামক স্থানে আটক হয়ে আছেন। এখানে শুধু যে তাঁকে খুব ছোট্ট একখানা ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে তা নয়, বৃষ্টির জল এ ঘরের বাইরে নাকি মোটেই পড়েনা। বৃষ্টি যখন পড়তে থাকে তখন নাকি বেচারা সনৎকুমারকে বসে বসে রাত কাটিয়ে দিতে হয়। বিছানা পত্র সব ভিজে গিয়ে তাঁর আর শোবার উপায় থাকে না। মাঝে তাঁর রান্নাঘর খানা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাতে দিনকতক তাঁর কষ্টের একশেষ হয়েছিল। এসব কথা যদি সত্য হয় তাহলে বড়ই পরিতাপের বিষয়। মানুষ গুলিকে ধরে নেবার বেলা গবর্ণমেণ্টের কোথাও বাধে না। অথচ ধরে নিয়ে গিয়ে থাকবার একটা ভালো জায়গা পর্য্যন্ত তাঁরা দিতে পারেন না। সনৎকুমারকে যে চর ভদ্রাসনে এ কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তার কোনো সংবাদ গবর্ণমেণ্ট রাখেন কি? যদি খবর রাখেন তাহলে কেন তাঁকে এরূপ কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তার কারণ আমরা জানতে চাই। আর গবর্ণমেণ্ট যদি আজো পর্য্যন্ত এ খবর না জেনে থাকেন তাহলে এখনি এর অনুসন্ধান করে একটা প্রতিকার করুন। এ অবস্থায় যে সরকারী কর্ম্মচারীর কর্ম্মশৈথিল্যে সনৎকুমারকে কষ্ট পেতে হচ্ছে সে কর্ম্মচারীর যথোচিত শাস্তি বিধান করা একান্ত উচিত।

আর এক দফা

"ফরওয়ার্ড" এর সেই অজ্ঞাত নামা লেখক তাঁর "তিনটি 'সি' ও তাদের যোগসূত্র" শীর্ষক প্রবন্ধের আর এক দফা গত রবিবারের "ফরওয়ার্ড"এ প্রকাশ করেছেন। এবারে প্রথমে তিনি পুলিশের নিযুক্ত লোকেরা কি করে বিপ্লবের ভাব প্রচার করেছে এবং কি করে তার দ্বারা "অর্ডিন্যান্স" প্রভৃতি আইন পাস করিয়ে নেবার সুবিধে হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। পুলিশ আফিসের সমস্ত গোপন কথা গুলি পর্য্যন্ত তিনি জানেন। তিনি জানেন কোন্ কোন্ অফিসার কি কি কার্য্যে কৃতকার্য্য হয়েছেন এবং কি কি কার্য্যে হননি। আমরা জানিনে এ লেখক পুলিশের ঘরের এত কথা কি করে জানতে পারলেন। তিনি নিজে কি পুলিশের বিশ্বস্ত বন্ধু কোনো সময়ে ছিলেন? এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে ইণ্ডিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টি ও বঙ্গীয় কৃষক ও ও শ্রমিক দলে অতর্কিত ভাবে পুলিশের প্ররোচক এজেণ্টগণ প্রবেশ করেছে। আমরা এ লেখকের ধৃষ্টতা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেছি। আমরা জানতে পারি কি পুলিসের এজেণ্টগণ কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ও বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে কিসের জন্যে প্রবেশ করতে যাবে? পাঁচটি পিস্তল জোগাড় করে আর তিনটি বোমা তৈরী করে উপরি উক্ত দু'টি দলের একটিও দেশে হাস্যকর বিদ্রোহের অভিনয় করতে চায় না। এ দু'টি দল দেশের জনগণের উত্থানের ওপরে বিশ্বাস করে থাকে। উৎপাদনের উপায় সমূহকে জনগণের অধিকারে আনার জন্যে জনগণের যে উত্থান হয় তারি নাম এ দু'দলের মতে বিপ্লব। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল কিংবা কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া গুপ্ত সমিতি নয়। উভয় দলেরই প্রোগ্রাম আছে—সে প্রোগ্রাম হচ্ছে গণচৈতন্য সম্পাদনের প্রোগ্রাম, গোপনে সরকারী কর্ম্মচারীকে হত্যা করে দেশ স্বাধীন করার প্রোগ্রাম নয়। সেরূপ উদ্দেশ নিয়ে যদি কখনো কোনো দল গঠিত হয় তাহলে পুলিশের নিযুক্ত করা এজেণ্টগণ তাদের মধ্যে ঢুকে তাদেরকে খুনখারাবি করবার জন্যে উত্তেজিত করতে পারে। তাতে গবর্ণমেণ্টের আসন হয়তো এতটুকু কেঁপেও উঠ্‌বে না, পক্ষান্তরে পুলিসের আসন খানিকটা দৃঢ়তর হবে। কিন্তু এ জাতীয় এজেণ্টগণ বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে কিংবা কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়াতে প্রবেশ করে কি করতে পারে? জনগণকে আরো বেশী করে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্যেইত উত্তেজিত করবে। কিন্তু, ক্ষতি তাতে কার? পুলিশের তরফ থেকে এজেণ্টরা এসে যদি আমাদেরকে উত্তেজিত ক'রে আমাদের প্রোগ্রামকে আরো খানিকটা এগিয়ে দেয় তা-হলে আমাদের দিক থেকে কি ক্ষতি হতে পারে? অবশ্য আমাদের প্রোগ্রাম সফল হলে শোষণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। তারা কি পাগল যে নিজের হাতে নিজের মাথা কাটবে?

এখন কথা হচ্ছে এই যে "ফরওয়ার্ড"এর লেখক প্রবরের বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার জন্যে হঠাৎ এত মাথা ব্যথা হওয়ার কি কারণ হলো? আমাদের মনে হয় তাঁর উপজীবিকা হয়তো ধনিক-বণিক-জমিদারের দয়ার ওপরেই নির্ভর করে থাকে কিংবা তিনি নিজেই ধনিক-বণিক ও জমীদার শ্রেণীর একজন। আলোচ্য দল দুটি দেশ থেকে শোষণের অবসান করতে চায়। তাই শোষণ করা যাদের পেশা কিংবা শোষণ-কারীর যারা অনুচর তারা নিশ্চিতই দল দু'টিকে প্রতিহত যে করতে চাইবে তা'তো স্বাভাবিক। প্ররোচক এজেণ্টগণ দল দু'টিতে প্রবেশ করেছে এই কথা প্রচার করে দিয়ে খুব সম্ভবতঃ তারা দলের প্রতিপত্তিকে খর্ব্ব করে দিতে চায়। কিন্তু, বন্ধুগণ, এতে কি তোমরা কিছু করতে পারবে? এ চাল তোমাদের কিছুতেই কার্য্যকরী হবে না। আমরা কালের আহ্বানে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। আমরা দেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত। বর্ত্তমানে আমরা দুর্ব্বল যতই হইনা কেন, আতুরে আমাদের গলাটিপে তোমরা কিছুতেই মেরে ফেলতে পারবে না, একথা নিশ্চয়ই জেনো। কেননা, আমাদের পেছনে দেশের চাষী মজুরের শক্তি রয়েছে।

শেষ, একটি কথা আমরা বলে রাখছি। "ফরওয়ার্ড"এর এই অজ্ঞাত নামা লেখক যিনিই হোন না কেন, তাঁর কোনো অধিকার নেই একথা লিখবার যে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে কিংবা কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়াতে প্ররোচক এজেণ্টগণ প্রবেশ করেছে। তিনি অবিলম্বে তাঁর বর্ণনা পরিহার করুন।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	১॥৶০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—

গণবাণী কার্য্যালয়—

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে মে ১৯২৭, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ | ১৫শ সংখ্যা

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভা

বর্ত্তমান মে মাসের ২৯শে তারিখ রবিবার অপরাহ্ণ ঠিক ৪ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির এক সভার অধিবেশন কলিকাতা, ৩৭, হ্যারিসন রোডস্থিত দলের কার্য্যালয়ে হবে। এ সভায় দলের অর্থ সমস্যা, প্রচার ও সংগঠন কার্য্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করা হবে। কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সদস্য মাত্রেরই এ সভায় যোগদান করা একান্ত প্রার্থনীয়। এ সম্বন্ধে সদস্যগণকে অন্য কোনো পৃথক পত্র লিখা হবে না।

মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক খান
অস্থায়ী সম্পাদক,
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল।

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা।
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে মে, ১৯২৭, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ | ১৫শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

হায়! রাজকুমার!

কাকোরি ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় দণ্ডিত দেশপ্রেমিক রাজকুমার সিংহ বেরিলি সেণ্ট্রাল্ জেলে অনশন ব্রত অবলম্বন করে দিনের পর দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। সুন্দর-সুস্থ-বলিষ্ঠ দেহ রাজকুমার এই সবে বিশের কোঠায় পা দিয়েছে। জীবনের এই নবীন প্রভাতে এই নবীন যুবক আজ প্রতিজ্ঞা করেছে যে কিছু না খেয়ে এখনি মরা তার পক্ষে শ্রেয়স্কর হবে যুক্ত প্রদেশের কারাগার সমূহের অপকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে তিল তিল করে দশ বছর মরার চেয়ে। ৮ই মে তারিখে রাজকুমারের ছোট ভাই যখন তাকে বেরিলি জেলে দেখতে যেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন সে এমন ভাবে মরতে বসেছে তখন সে আপনার ছোট ভাইকে এ কথাগুলি বলেছে। সারা যুক্ত প্রদেশের ওপর দিয়ে এখন উষ্ণ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাহ এমনি আগুন ভরা যে গাছের ডাল স্পর্শ করলেও তা শুকিয়ে যায়। এমন সময়ে দেশমাতৃকার এ স্নেহের দুলাল অনশনে বেরিলি জেল হাসপাতালের এক কোনায় পড়ে ধুকে ধুকে মরছে। সাজার দিনে তার শরীরের ওজন ছিল ১৪৯ পাউণ্ড। বাঙালীর ঘরের ২০ বছরের ছেলের ১৪৯ পাউণ্ড ওজন ত কম কথা নয়। ৮ই মে তারিখে এ ওজন কমে ১০৬ পাউণ্ড হয়েছিল। তারপরে এ কয়দিনে আরো কত যে কমেছে তা কে জানে। দিনের পর দিন এমন সব খবর দেশের লোকেরা পাচ্ছে, আর দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে। হায় দেশপ্রেম! হায় স্বাধীনতা!! হায় রাজকুমার!!!

রাজকুমার একা নয়

সংযুক্ত প্রদেশের কারাগারের বিশ্রী খাওয়া-পরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কাকোরি ষড়যন্ত্রের দণ্ডিত দেশপ্রেমিক মাত্রই অনশন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অনেকে সে ব্রত পরিত্যাগ করেছেন। "ফরওয়ার্ড"এর সংবাদ দাতা ৯ই মে তারিখে যে খবর পাঠিয়েছেন তাতে জানা গিয়াছে যে তখনো পর্য্যন্ত ৮।৯ জন দেশ-প্রেমিক অনশন ব্রত অবলম্বন করেই ছিলেন। যাঁরা কারা-যন্ত্রণা কখনো ভোগ করেন নি, বিশেষ করে যুক্ত প্রদেশের কারাগারের অবস্থা যাঁরা দেখেন নি তাঁরা বুঝে উঠ্তে পারেন না এ অনশন ব্রত কেন অবলম্বন করা হয়। তাঁরা জিজ্ঞাসা করে থাকেন প্রাণ দিতে যাঁরা প্রস্তুত হয়ে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা কারাগারের অসুবিধা ভোগ করতে পারেন না কেন? মানুষ কিসের জন্যে আইন ভঙ্গ করতে প্রস্তুত হয় সে আলোচনা আমরা এখানে করব না। আমরা যদি মেনেও নিই যে, যে কোনো অবস্থাতেই আইন ভঙ্গ করা অপরাধ এবং আইন ভাঙার শাস্তি অপরাধীকে ভোগ করতেই হবে, তা হলে সে অবস্থাতেও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে তাকে চার দেওয়ালের ভিতরে আবদ্ধ করে রাখাই কি তার পক্ষে কঠোরতম শাস্তি নয়? কিন্তু, চার দেওয়ালের ভিতরে মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করার কোনো অধিকার আইনের আছে কি? আর যদি এমন অন্যায় অধিকার আইনের থেকেও থাকে সে আইনকে অমান্য করা কি যে কোনো মানুষের কর্ত্তব্য নয়? ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কারাগারের ভিতরের অবস্থা শোচনীয়, কিন্তু যুক্ত প্রদেশের অবস্থা শোচনীয়তম! যেমন বিশ্রী খাদ্য ও পোষাক কয়েদীদিগকে যুক্ত প্রদেশের জেলের ভিতরে দেওয়া হয় তেমনটা বোধ হয় আর কোথাও দেওয়া হয় না। পদে পদে মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা যুক্ত প্রদেশের কারাগারের ভিতরে হয়ে থাকে যে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে এতটুকুও চেতনা যার মধ্যে আছে তার পক্ষে তা সহ্য করা মোটেই সম্ভব পর নয়। সাধারণ কয়েদীদিগকে খেতে যা দেওয়া হয় তা খাদ্য নামে অভিহিত হওয়ারও যোগ্য নয়। কঠোর পরিশ্রম যে সকল কয়েদী করে থাকে তাদের প্রত্যেকের সারা বছরের খাওয়ার জন্যে সবে ৪৫ টাকা সরকার থেকে মঞ্জুর করা হয়। এর বেশী কিছুতেই খরচ করা হবে না, কিন্তু, কম করা

হলে জেলের কর্মচারীরা বাহ্‌বা পেয়ে থাকেন। এই বাহ্‌বার লোভে খরচ কম করতে যথাসাধ্য চেষ্টা জেলের কর্মচারীরা করেও থাকেন। এ ছাড়া বাইরের কণ্ট্রাক্টররা সমস্ত জিনিস সরবরাহ করে থাকে। তারা তাদের লাভ না রেখে সরবরাহ করতে যাবে কেন? অন্য নানা প্রকার চুরিও এর ভিতরে আছে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে কয়েদীরা খেতে যা পায় তা এই ৪৫ টাকার চেয়েও যে কত কম তা সকলেই অনুমান করে নিন, আর এত কম টাকাতে কি খাবার ব্যবস্থা যে হতে পারে সে সম্বন্ধেও সকলে একবার চিন্তা করে দেখুন! সংযুক্ত প্রদেশের সাধারণ লোকেরা জমীদার, মহাজন ও মোল্লা-পুরোহিতগণের দ্বারা নানা দিক্ থেকে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়ে হয়ে তারা যে মানুষ সে কথাটাই ভুলে গেছে। কারাগারে তাদেরকেই বেশীর ভাগ যেতে হয়, আর খাওয়া-পরার সকল প্রকার কষ্ট তারা সহ্য করেও নিয়ে থাকে। কারণ, তাদের অধিকাংশেরই অদৃষ্ট জেলের বাইরেও খুব বেশী সুপ্রসন্ন নয়। কিন্তু, কাকোরি ষড়যন্ত্রের দণ্ডিত দেশ-প্রেমিকগণ জীবনে ভালো খাওয়া-পরার স্বাদ পেয়েছেন। জেলে সাধারণ ভাবে যা খেতে পরতে দেওয়া হয়ে থাকে তার দ্বারা এত সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকাই তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হবে। ভালো খাবার ও ভালো পোষাকের জন্যে যে দাবী তাঁরা করেছেন সে দাবী অন্যায় দাবী কিছুতেই নয়। জেলের ভিতরে খাওয়া-পরার উন্নতি সকল কয়েদীর জন্যেই করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু, আর সব কয়েদীরা যদি তাদের দাবী পরিহার করে বসে থাকে, তার জন্যে ত কাকোরি মোকদ্দমার কয়েদীরা আপনাদের দাবী ছাড়তে পারেন না।

দেশের লোক যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন না করলে এ দাবী কখনো পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু, তেমন সহানুভূতির সাড়াত কোনো দিক থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। উচিত ছিল আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র যুক্ত প্রদেশকে বিকম্পিত করে তোলা। কিন্তু, সে আন্দোলনের চিহ্নত কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একা গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীই যা একটুকু নাড়াচাড়া করছেন, কিন্তু তাতে কি হয়? কর্ণেল ক্লেমেণ্ট যুক্ত প্রদেশের জেল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল। রাষ্ট্র-নীতিক কারণে দণ্ডিত হয়ে যাঁরা কারাগারে যান তাঁদেরকে তিনি মোটেই ভালো চোখে দেখেন না। আমরা যখন রায় বেরিলির জেলে কয়েদী ছিলেম তখন তিনি দয়া করে আমদের এক বছরের 'রিমিশন' অগ্রিম কেটে নিয়েছিলেন। শুধু তা নয়, এক বছরের জন্যে চিঠি লেখা, চিঠি পাওয়া ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করার সুবিধা থেকেও তিনি আমাদের বঞ্চিত করেছিলেন। আমাদের সহ-দণ্ডিত বন্ধু শওকৎ উস্‌মানীর ৪২ দিন 'রিমিশন' তিনি কেটেছেন। আমাদের বিশ্বাস এ মহাপ্রভুর কল্যাণেই কাকোরি মোকদ্দমার দেশপ্রেমিকগণের অভিযোগের কোনো প্রতিকার হচ্ছে না। ছাতারির নওয়াব বাহাদুর হয়তো ক্লেমেণ্ট সাহেবকে খুব 'কেয়ার' করে চলেন। বড় দুঃখ যে যুক্ত প্রদেশের লোকেরা এর জন্যে একটা কাজের মত আন্দোলন চালাল না!

প্রবেশ নিষেধ

ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি হুকুম জারী করেছেন যে চীনের হ্যাংকোতে যে "ন্যাশ্‌নালিষ্ট নিউজ এজেন্সী" আছে তার প্রকাশিত পুস্তকাদি ভারতে প্রবেশ করতে পারে না। শোষণ-বাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা কামী লীগের দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকাদি সম্বন্ধেও এই একই হুকুম জারী করা হয়েছে। ভারতের শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে এমনভাবে চারিদিক্ থেকে আটঘাট বেঁধে রাখলেই ভারতে আর কোনো দিক্ থেকেই স্বাধীনতার আব-হাওয়া প্রবেশ করতে পারে না। আর না যদি পারে তা হলে তাঁরা চিরকাল শোষণের জন্যে ভারতবর্ষকে শাসন করতে পারবেন। এ উদ্দেশ্য নিয়েই ভারত গবর্ণমেণ্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পুস্তকগুলিও দেশে বাজেয়াফ্‌ত করে দিয়েছেন। কিন্তু, সত্যই কি তাঁরা এই করে ভারতের মুক্তিপথের যাত্রা ব্যাহত করতে পারবেন? যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। এ যাত্রাকে প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতা শোষণ-বাদের নেই। ভারত আর একাকী জগতের এক কোণে পড়িয়া নেই, বিশ্বের সাথে ভারতের যোগ সাধিত হয়ে গেছে। যা কিছু উপায় তোমরা অবলম্ব করনা কেন বিশ্বের সর্ব্বহারা-দের আহ্বানে ভারত সাড়া দেবেই দেবে। ভারতের ধনিক-বণিকের সহিত যতই বন্ধুত্ব স্থাপন করুক না কেন বৃটিশ শোষণ-বাদের বন্ধন যে ভারতের জনগণ কাটিবে তাতে একটুকুও সন্দেহ নেই। ক্রমাগত শোষণের ফলে যে সর্ব্বহারার দলের সৃষ্টি বৃটিশ শোষণবাদ করেছে সেই সর্ব্বহারার দলের হাতেই বৃটিশ শোষণবাদের ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌বে। এটা স্বপ্নও নয়, কাহিনীও নয়,—বৈজ্ঞানিক সত্য।

—•—

হীনতার পরিচয়

বরিশালের বঙ্গীয় মুসলিম সম্মিলনে মৌলবী মোহম্মদ মনিরুজ্জমান ইস্‌লাম আবাদী সাহেব এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপিত করেছিলেন যে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন ও ১৯২৫ সনের ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে যাঁদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তাঁদেরকে হয়তো ছেড়ে দেওয়া হোক্, নতুবা প্রকাশ্য আদালতে তাঁদের নামে মোকদ্দমা করা হোক্। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মৌলবী আবুল কাসেম সাহেব এ প্রস্তাবের সমর্থন করেছেন। বেঙ্গল অর্ডিনান্স যখন প্রথম পাস হয়েছিল তখন এই আবুল কাসেম সাহেবই থিয়েটার রোডের কোনো এক বাড়ীতে একটা পর্দ্দা সভা আহ্বান করে বঙ্গীয় মুসলমানদের তরফ থেকে অর্ডিনান্সের সমর্থন করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ চেষ্টা যাতে সাফল্য মণ্ডিত হয় সে জন্যে বরিশাল মুসলিম সম্মিলনের সভাপতি সার আবদুর রহীমও তাঁকে পর্দ্দার আড়াল থেকে সাহায্য করছিলেন। কিন্তু কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের ন্যায় কতিপয় উদারচেতা মুসলমান সময়ে খবর পেয়ে তাতে বাধা দেওয়ায় তখন তাঁদের হীন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারেনি। এটা নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয়ে যে এহেন সার আবদুর রহীমের নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত বরিশাল কনফারেন্সে রাজবন্দীদের মুক্তির জন্যে যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল আবুল কাসেম সাহেব তার সমর্থন করেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তিন জন মুসলমান এ প্রস্তাবকে উপলক্ষ করে অতিশয় হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে মিঃ নূর আহ্‌মদ, মিঃ আজীজুদ্দীন ও মিঃ আবদুল হাকীম। মিঃ নূর আহ্‌মদ এক সময়ে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। মিঃ আজীজুদ্দীন একজন নবীন উকিল আর মিঃ আবদুল হাকীম ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণের "হানিফী" নামক বাংলা সাপ্তাহিকের

সম্পাদক। মিঃ নূর আহ্‌মদ বলেছেন যে অবরুদ্ধ হিন্দুগণ মুক্তির প্রচেষ্টা করেছেন বলে অবরুদ্ধ হননি। তাহি জন্যে যদি হতেন তা হলে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ও অবরুদ্ধ হতেন। হিন্দুরা মুসলমানদের তেরশ' বছরের পুরাতন দুর্গ মসজিদ আক্রমণ করেছে। কাজেই তাদের সাথে কোনো প্রকারের আপোস নিষ্পত্তি হতে পারেনা। তাঁর মতে মুসলমানেরা খুব রাজভক্ত। তারা গুপ্ত হত্যাকারী নয়। কাজেই, এ সব আইনে পড়ার কোনো ভয় তাদের নেই। এ সব কারণে তিনি ও অপর দু'জন মুসলমান অত্যন্ত হীনভাবে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এই করে জগতের চোখে তাঁরা যে কত বেশী হেয় ও অনুদার বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন তা হয়তো তাঁরা ভেবেও দেখেন নি। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন ও ১৯২৫ সনের ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্যেই পাস করা হয়েছে এবং বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমানদের ঘৃণাও করে থাকে, তথাপি কি এমন ঘৃণিত আইনেরও সমর্থন মুসলমানদের করতে হবে? সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান কি এমনি অনুদার? তাই যদি হয় তা হলে ধরণীপৃষ্ঠে মুসলমানের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। যে ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকত্ব দেশময় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে তার জন্যে কোনো একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক দায়ী নয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্বার্থপর লোকগণ এর জন্যে সমানভাবে দায়ী। সাম্প্রদায়িক দুর্নীতি উভয় সম্প্রদায়কেই অত্যন্ত বেশী মাত্রায় পেয়ে বসেছে। হিন্দুরা যদি তেরশ' বছরের পুরাতন দুর্গ মসজিদ আক্রমণ করে থাকে তা হলে মুসলমানরাও তিন হাজার বছরের পুরাতন দুর্গ মন্দির আক্রমণ করতে ছাড়েনি। শঙ্খঘণ্টাধ্বনি মসজিদের পক্ষে যতই অসহনীয় হয়ে উঠবে ততই মন্দিরে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। তারপরে, কোনো আইন কেবলমাত্র সম্প্রদায় বিশেষের জন্যে পাস হয়না। আইনের কবলে সবাইকে পড়তে হয়। ১৮৬৮ সনে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বহুসংখ্যক মুসলমান যে বন্দী হয়েছিলেন তার কোনো খবর নূর আহ্‌মদ এণ্ড কোম্পানী রাখেন কি? ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এক্ট অনুসারে আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কাজী আবদুল গফ্‌ফার ও মৌলানা হাসরত মোহানী প্রভৃতি মুসলমানগণ কি বন্দী হন নি? দু' তিন বছর স্থগিত রাখার পর আবার যখন ১৯২৩ সনে ৩নং রেগুলেশনের অস্ত্র উত্তোলিত করা হয় তখন সে অস্ত্র পতিত হয়েছিল সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের ৩ জন মুসলমানের মস্তকে। গোলাম হোসেন বন্দী হয়েছিলেন লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে, মোহাম্মদ শওকৎ উসমানী হয়েছিলেন পেশাওর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে, আর এ লেখককে আবদ্ধ হতে হয়েছিল আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেদিনও ৩ বছর কারাযন্ত্রণা ভোগ করে জেল থেকে বের হওয়া মাত্রই মোহাম্মদ শফীককে পেশাওরের নিকটবর্ত্তী নওশেরা নামকস্থানে আবদ্ধকরে রাখা হয়েছে, কোনো ভাতা পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না তাঁকে। এছাড়া বিদেশে নির্ব্বাসিত মুসলমানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। অধ্যাপক বরকতুল্লাহ্, গোলাম আম্বিয়া খান ও মোহাম্মদ আলী প্রভৃতির নাম উপরি উক্ত এণ্ড কোম্পানীর দল কখনো কি শুনেছেন? গোলাম আম্বিয়া খান আবার একজন বাঙালী মুসলমান। তাঁর খবরটা অন্ততঃ এই এণ্ড কোম্পানীর দলের জানা উচিত ছিল। নূর আহ্‌মদ বলেছেন হিন্দুরা মুক্তির প্রচেষ্টা করেছেন বলে অবরুদ্ধ হননি। সে জন্যে অবরুদ্ধ তাঁরা হলে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কেও অবরুদ্ধ হতে হত। আজকের দিনে আলী ভ্রাতৃদ্বয় মুক্তির জন্যে কি প্রচেষ্টা করছেন তা আমরা জানতে পারি কি? আমরা তাঁদের কার্য্য-কলাপ থেকে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতেতো তাঁদের মস্তিষ্ক বন্ধু নূর আহ্‌মদের মস্তিষ্ক অপেক্ষা এতটুকুও বেশী প্রকৃতিস্থ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। আমরা উপরি উক্ত এণ্ড কোম্পানীর দলকে, বিশেষ করে বন্ধু নূর আহ্‌মদকে অনুরোধ করছি যে তাঁরা দৃষ্টিকে আরো সম্প্রসারিত করুন। তা হলে তাঁদের মনের ও মাথার সব গ্লানি দূর হয়ে যাবে। আনন্দের বিষয় যে "মোহাম্মদী"র স্বত্বাধিকারী মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খান মিঃ নূর আহ্‌মদের যুক্তির অসারত্ব প্রতিপাদন করে প্রস্তাবের সমর্থন করেছেন।

—*—

শোচনীয় দাসত্ব

আমাদের এক বন্ধু খবর দিয়েছেন যে কলিকাতা ১১৬।১, হ্যারিসন রোডস্থিত কংগ্রেস আফিসের একখানা ঘরে পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেনের চিত্র প্রতিষ্ঠিত করে দু'বেলা তার পূজো করা হচ্ছে। শ্রীযুত সতীন সেন নাকি স্বচক্ষে এ পূজো পাটের ব্যবস্থা দেখেও গেছেন, তবে দেখে-শুনে মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করেছেন কিনা সে খবর অবশ্য আমরা পাইনি। এ ব্যাপার যদি সত্য হয় তা হলে ভারতবর্ষের স্বাধীন হতে এখনো যে অনেক বিলম্ব আছে সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই। চারদিকে এত দাসত্ব যাদের ঘিরে রেখেছে তারা আবার স্বাধীন হবে কি? কেবল মুখে স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করে কোনো জাতি কোনো দিন স্বাধীন হতে পারেনি। স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে জাতীয় চরিত্র থেকে দাসত্বকে সর্ব্ব-প্রথমে পরিহার করা আবশ্যক। কিন্তু, আমাদের চরিত্রে দাসত্বের দিকটা এখনো খুব প্রবল হয়ে আছে। গান্ধীর কথার ভালো মন্দ বিচার করার আগেই আমরা তাঁকে মাহাত্মা বানিয়ে দিয়েছি। চিত্তরঞ্জন দশকে দেবত্বে প্রমোশন দেবার যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলেছে, এখন আবার সতীন সেনের পূজো আরম্ভ হয়েছে। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ একটা নিছক সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। এ সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের নেতৃত্ব যিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর পূজো হচ্ছে কিনা দেশের জাতীয় অনুষ্ঠান কংগ্রেসের কার্য্যালয়ে! দেশে কত প্রকারের শোষণ যে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা ভেবে দেখ্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যেতে হয়। এই যে যুবকদের দিয়ে চিত্রের পূজো করানো, এও একটা শোষণ বই আর কিছুই নয়, যদৃচ্ছাচারও বটে। একটা আমূল সংস্কারক দল তৈরী করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ সব জারি-জুরি ভেঙে না দিলে দেশের মঙ্গল কিছুতেই সাধিত হবে না। যে সমস্ত লোক মুখে বলছেন যে তাঁরা মুক্তি-সংগ্রামের সেনানী সে সকল লোকই কাজে দেশের মাথায় কেবলি শোচনীয় দাসত্বের বোঝা বেশী করে চাপিয়ে দিচ্ছেন!

—•—

বিশেষ অনুরোধ

"ফরওয়ার্ড"এ "তিনটি 'সি' ও তার যোগসূত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক লিখেছেন যে, বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে পুলিসের প্ররোচক এজেণ্টগণ অতর্কিত ভাবে প্রবেশ করেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া সম্বন্ধেও তিনি এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

আমরা চাই দেশের নিম্ন মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণ দেশের অবস্থা বৈজ্ঞানিক ভাবে অধ্যয়ন করে দেশের শোষিত ও লাঞ্ছিত কৃষক-শ্রমিকদিগকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলুন। আমাদের এ প্রচেষ্টার দ্বারা শোষকশ্রেণীর লোকদের ও তাদের বৃত্তিভোগী অনুচরদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাই, শিক্ষিত যুবকগণ পাছে আমাদের প্রোগ্রামের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পড়েন এই ভয়ে তাঁরা কৌশলে প্রচার করে দিলেন যে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে প্ররোচক এজেন্টগণ প্রবেশ করেছে। বিপন্ন হবার ভয়ে যুবকগণ বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে যাতে যোগদান না করেন সে উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা এ চাল চেলেছেন। গত সপ্তাহের "গণবাণী"তে "ফরওয়ার্ড"এর অজ্ঞাতনামা লেখককে আমরা অনুরোধ করেছি যে তিনি তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করুন। এবারো তাঁকে আবার বিশেষ ভাবে আমরা সে অনুরোধই করছি। কাপুরুষ যদি তিনি না হন তা হলে তাঁর প্রমাণ করা উচিত বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কোন্ কোন্ সভ্য প্ররোচক এজেন্ট। আর তা যদি তিনি না পারেন তা হলে তাঁর উচিত তাঁর উক্তির প্রত্যাহার এখনি করা।

—*—

শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ

খড়্গপুরে বি, এন, রেলওয়ে ধর্ম্মঘটকারীদের ওপরে যে গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল তার রক্ত শুষ্ক হতে না হতেই মাদ্রাজে আবার গুলি চলেছে। মাদ্রাজে তেলের ডিপোর ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের ওপরে পুলিস কিংবা সৈন্যেরা গুলি করেনি, এবারে গুলি করেছে ধনিকদের ইউরোপীয় এজেন্টগণ। দেখা যাচ্ছে ধনিকরা কেবল যে শ্রমিকদের শোষণ করতে পারে তা নয়, ইচ্ছে করলে তারা তাদের ওপরে গুলিও চালাতে পারে। এর যে বিশেষ কিছু প্রতিকার হবে, সে আশাও নেই। কেননা, এদেশের শ্রমিকরা আজো পর্য্যন্ত সুসঙ্ঘবদ্ধ হয়নি, সমস্বার্থ সংযোগের ভাব তাদের মধ্যে এখনো আসেনি। শ্রমিক আন্দোলনকে সত্যকার পথে চালাতে না পারলে, শ্রমিকদিগকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে না তুললে এরূপ নির্য্যাতন যে আরো কত হবে কে জানে? শ্রমিকদের ভিতর থেকে শ্রমিকনেতা গড়ে তুলতে না পারলে আন্দোলন কখনো ঠিক্ পথে চলতে পারেনা। আমাদের দেশে যাঁরা শ্রমিক আন্দোলন চালাচ্ছেন তাঁরা কখনো এদিকে দৃষ্টিপাতও করেননি। আমরা যতটা জানি তাতে সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রমিকদিগকে শিক্ষা দেবার জন্যে একটিও ট্রেনিং ক্লাস নেই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনে এসেছেন তাঁদের নিকটে আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁরা সখের আন্দোলন না চালিয়ে এখন থেকে কাজের আন্দোলন চালাবার ব্যবস্থা করুন।

—*—

সুভাষচন্দ্রের মুক্তি

গত সোমবারে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বিনাশর্ত্তে মুক্তি পেয়েছেন। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে মত দিয়েছেন যে তাঁর রোগ খুবই সাংঘাতিক। সুভাষচন্দ্র ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর রোগ যখন যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়েছে তখনি তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। রোগের এতটা বর্দ্ধন হওয়া হয়তো আমাদের ভাগ্যবিধাতাদের পক্ষে আবশ্যক ছিল। আমরা কামনা করছি সুভাষচন্দ্র শীঘ্রই নিরাময় হয়ে দেশের জনগণের কাজে, ধনিক-বণিক-জমীদারের কাজে নয়, আপনাকে নিয়োজিত করুন। রাজবন্দীদের মধ্যে আরো অনেকেই পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রীযুত জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ও ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর অবস্থাও খারাব। তাঁকে কেন যে মুক্তি দেওয়া হচ্ছেনা তা আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে। দেশবাসী সুভাষচন্দ্রকে ত ফিরিয়ে পেলেন, কিন্তু জীবনলালকে ফিরিয়ে পাবার কি ব্যবস্থা হবে?

—

বর্ত্তমান ভারত

—•—

[আর, পাম দত্ত]

—•—

("বর্ত্তমান ভারত" আর, পাম দত্তের "মডার্ণ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। এ অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে গণবাণীতে বের হতে থাকবে। ইতোপূর্ব্বে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক গণবাণীতে এ অনুবাদ বের হয়ে গেছে। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে পাঠকগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত এ অনুবাদ পাঠ করুন।)

—

৩। কৃষির ওপরে অতি চাপ।

বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় সামাজিক অবস্থা সমূহের নিগূঢ়তত্ব মার্ক্সের বিশ্লেষণের দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে, আরো প্রকাশ পাচ্ছে ভারতের দারিদ্র্যের গোড়ার কথা।

এই নিগূঢ়তত্ব হচ্ছে কৃষি-উপনিবেশরূপে ভারতবর্ষকে বৃটিশ ধনিকবাদের পদানত করে রাখা এবং কাজে কাজেই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি রোধ করে দেওয়া। এসব করার জন্যে ভারতের পুরাতন হস্তশিল্পকে এমন সময়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল যখন তার জায়গায় কলের শিল্প প্রবর্তিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এর ফলে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, এত বেড়েছিল যে কৃষির সেই পুরাতন অবস্থার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিলনা অত লোকের ভার সওয়া।

মার্ক্স দেখিয়েছেন যে ১৮১৮ সন ও ১৮৩৭ সনের মধ্যে ভারতে বৃটিশের তুলোর বস্ত্র রফতানি ৫২০০ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। সে সময়ে বস্ত্র নির্ম্মাণের কেন্দ্রস্থল ঢাকার লোক সংখ্যা ১৫০,০০০ হতে কমে ২০,০০০ হাজারে নেমেছিল। সামাজিক ইতিহাসের এটুকুর মধ্যেই ভারতে বৃটিশ শাসনের কার্য্যাবলী খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতিক সমস্যার গোড়ার কথাই হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রের জনাকীর্ণতা, আর এই জনাকীর্ণতা হচ্ছে বৃটিশ শাসনের সাক্ষাৎ ফল। সাধারণত একথা বলা হয়ে থাকে যে কৃষিক্ষেত্রের জনবাহুল্য ভারতীয় জনগণের একটা বৈশিষ্ট্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ ধনিকবাদের সুবিধার জন্যেই বৃটিশ শাসনের অবস্থা সমূহের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে এই অনুপাতের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা হয়েছে। যে সময় থেকে লোকের ব্যবসায়ের গণনা আরম্ভ হয়েছে সে সময়ের আদম

শুমারির হিসাবের প্রতি লক্ষ্য করলেই এর কার্য্যক্রমের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ হিসাব দেখিয়েছে যে এমন কি গত পুরুষেও এ কার্য্যক্রম চলেই ছিল। গত তিরিশ বছরে প্রত্যেক পরবর্ত্তী আদম শুমারিতে দেখা গিয়েছে যে শিল্পের উন্নতি হওয়া সত্বেও কৃষিক্ষেত্রে অনুপাতে লোক সংখ্যা বেড়ে গেছে।

নিম্নে হিসাব দেওয়া হলো :—

আদম শুমারি	কৃষির ওপরে নির্ভর করে এমন লোক সংখ্যার অনুপাত
১৮৯১	শতকরা ৬১ জন
১৯০১	শতকরা ৬৬ জন
১৯১১	শতকরা ৭২ জন
১৯২১	শতকরা ৭৩ জন

এটা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে এ সব হিসাব লিপিবদ্ধ করার কায়দায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু লোক সংখ্যা যে বেড়েছে এতে এতটুকুও সন্দেহ নেই।

কৃষির ওপরে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বাড়ার কারণ কি? ১৯১১ সনের সেন্সাস্ কমিশনার এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তা খুব পরিস্কার।

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হচ্ছে। নানা শ্রেণীর কারিগরগণ যা লাভ করত তা দেশের ও বিদেশের কলের তৈরী জিনিসের প্রতিযোগিতায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এর ফলে এই কারিগরগণের মধ্যে তাদের পরম্পরাগত ব্যবসায় ত্যাগ করে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করার বর্দ্ধিত মনোভাব দেখা যায়।"

(১৯১১ সনের আদম শুমারির রিপোর্ট)

বৃহৎ পরিমাপে মেশিনের তৈরী ইউরোপীয় জিনিসের ভারতে রফতানি ও সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের ওপরে ইউরোপীয়দের ক্ষমতা বিস্তারের সাক্ষাৎ ফল হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে জনবাহুল্যের কারণ। সেই আদম শুমারির রিপোর্টেই বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯১১ সনের আদম শুমারির রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে তার পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ বছরে বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের সংখ্যা ভারতে বস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা বাড়া সত্বেও শতকরা ৬ জন কমে গিয়েছে। এ কমার কারণ হচ্ছে "হাতের দ্বারা সুতো কাটার প্রথা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়া।"

১৯১১ সনের আদম শুমারির রিপোর্ট অনুসারে চামড়া ও ধাতব বস্তুর ব্যবসায়ে শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৬ জন কমে গিয়েছে, যদিও চর্ম্ম ব্যবসায়ীর সংখ্যা দ্বিগুণ ও ধাতু ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৬ গুণ বেড়ে গেছে। এর কারণও আবার পরিস্কাররূপে দেওয়া হয়েছে :—

"ধাতব বস্তুর দ্বারা যারা জিনিস তৈরী করত তাদের সংখ্যা কমে গেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধাতব বস্তুর ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। এর কারণ এই হচ্ছে যে দেশীয় তামা ও পিতলের বাসন কোসনের জায়গায় এখন ইউরোপ হতে আমদানী করা এনামেলের ও এলিউমিনিয়ামের জিনিসাদি লোকে ব্যবহার করছে।"

(১৯১১ সনের সেন্সাস্ রিপোর্ট)

এ সবের দ্বারা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে কৃষিক্ষেত্রের জনাকীর্ণতা সাক্ষাৎ ভাবে বৃটিশ ধনিকবাদের কার্য্যনীতির দ্বারাই হয়েছে। ভারতবর্ষকে বাজার ও কাঁচা মালের উৎপত্তি স্থলরূপে পাওয়াই বৃটিশ ধনিকবাদের আবশ্যক ছিল।

কিন্তু, কৃষিক্ষেত্রের এ জনবাহুল্যই হচ্ছে ভারতের দারিদ্র্যের মূল। প্রাচীন ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগতই এ জন বাহুল্য ঘটেছে এবং বৃটিশ ধনিকবাদই সাক্ষাৎভাবে এ জনবাহুল্য, যা ভারতের জনগণের দারিদ্র্যের মূল কারণ, ঘটিয়েছে। ১৮৮০ সনের দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্টে একথা স্বীকৃত হয়েছে :—

"ভারতের জনগণের অনেকখানি দারিদ্র্যের মূলে, আর অজন্মার সময়ে তারা যে বিপদের সম্মুখীন হয় তার মূলে এ দুরবস্থা রয়েছে যে জনগণের প্রায় স্থলেই কৃষিই একমাত্র উপজীবিকা।"

কৃষির ওপরে এই যে অতি চাপ পড়েছে তার মানে বোম্বের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার এইচ, এইচ, ম্যানের অনুসন্ধানের ফলে বোঝা যাচ্ছে। তিনি অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে পুনার একখানি গ্রামে ১৭৭১ সনে গড়পরতা জমীর পরিমাণ ছিল ৪০ একর, ১৮১৮ সনে তা হয়েছিল ১৭৷৷০ একর, ১৮২০ হতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত ১৪ একর এবং ১৯১৫ সনে হয়েছিল ৭ একর। তিনি এও জেনেছিলেন যে জমীর বিভিন্ন দাগগুলির শতকরা ৮১ ভাগ "খুব অনুকূল অবস্থার মধ্যেও হস্তান্তরিত" হয়েছে। বাংলায় প্রত্যেক কৃষকের মাথা পিছু চাষের জমী পড়েছে ২·২ একর হিসাবে। ১৯২১ সনের আদম শুমারির রিপোর্টে লিখা হয়েছে যে 'কৃষকের দারিদ্র্যের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হলে বলতে হবে, কৃষকের নিকটে ভূমির এ পরিমাণই হচ্ছে তার দারিদ্র্যের কারণ।'

এই ঘটনাগুলি হচ্ছে বিপ্লবমূলক ঘটনা। এগুলি কেবলমাত্র একটি দিকই নির্দ্দেশ করছে, যেমন রুসের কৃষি সম্বন্ধীয় ইতিহাসে এরূপ ঘটনাবলী করেছিল।

৪। শিল্পানুষ্ঠানের প্রতি নিরুৎসাহ প্রদান

দেশের অধিবাসিগণকে বৃটিশ শৈল্পিক ধনিকবাদের সাহায্যকারীরূপে কৃষিক্ষেত্রের দিকে বিতাড়িত করার নীতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের শিল্পানুষ্ঠানে সাক্ষাৎভাবে নিরুৎসাহ প্রদান করার নীতিও বিদ্যমান ছিল। প্রথমোক্ত নীতির কার্য্য বেশীর ভাগই অর্থনৈতিক শক্তির (Economic forces) অজ্ঞানিত ফল ছিল। জেনে শুনে ও ভেবে চিন্তেই শেষোক্ত নীতির কার্য্যের অনুসরণ যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত করা হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে প্রথম যুগে ভারতের হস্তশিল্পের ওপরে বৃটিশ, রক্ষণ শুল্ক বসিয়েছিল। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয় যখন ঘটল এবং বৃটিশের কলে প্রস্তুত জিনিস যখন ভারতবর্ষকে প্লাবিত করতে আরম্ভ করল তখন ভারতের ওপরে প্রয়োগ করা হলো মুক্ত বাণিজ্যের নব নীতি। এই মুক্ত বাণিজ্যের নীতি হচ্ছে বৃটিশ শৈল্পিক একাধিপত্যের বিকাশ। যুদ্ধের সময়াবধি ভারতে যে সমস্ত কাপড় আমদানী করা হত তার ওপরে বসানো শুল্কের সমতা রক্ষা করা হত ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের ওপরে আবকারী শুল্ক বসিয়ে। ভারতের স্বার্থকে যে বৃটিশ ধনিকবাদ পদানত করে রাখতে চেয়েছিল এই আবকারী শুল্ক বসানোর দ্বারা তা অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এ জন্যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র ছিল এই আবকারী শুল্ক। কেন না, এ আন্দোলন

উদীয়মান ভারতীয় বুর্জুয়াজিগণের স্বার্থেরই খাতিরে পরিচালিত হত।

মুক্ত বাণিজ্যের এই নীতির কিন্তু একটা ব্যতিক্রম ছিল। কলকজার আমদানীর ওপরে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় শুল্ক বসানো হত। বৃটিশ নির্মাণ-ধনিকবাদের এই স্তরে মেসিনের দ্বারা ভারতে জিনিস প্রস্তুত করাকে প্রতিহত করা একান্ত আবশ্যক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভারতে মেশিনের দ্বারা প্রস্তুত জিনিসের উন্নতি, কার্য্যতঃ বিকল হয়েই ছিল এবং তারপরে যদিও আরম্ভ হয়েছিল, তা খুব ধীরে ধীরেই হয়েছিল।

সরকারী ভাবে ভারতের শিল্পকে নিরুৎসাহ প্রদান করার নীতি ঠিক যুদ্ধ পর্য্যন্ত চলেছিল। এ নীতির প্রসারের চিহ্ন অনেক দিকেই দেখা যেতে পারে। স্যর ভ্যালেণ্টাইন চিরল ১৯২২ সালে লিখেছেন :—

"ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে আমাদের ইতিহাস অতীতে সর্ব্বদা খুব শ্লাঘনীয় হয় নি। বিশুদ্ধ ভারতীয় প্রচেষ্টার প্রতি হিংসা না হলেও ঔদাসীন্য যে ছিল তা গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহের অভাবের তাড়নায়।"

(অব্জার্বার, ২রা এপ্রিল, ১৯২২)

১৯২১ সনের সরকারী "নৈতিক ও বাস্তব উন্নতি" (Moral and Material Progress) নামক রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় একথাটা আরো বেশীরূপ প্রকটিত হয়েছে :—

"যুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্যে কয়েকটি প্রাথমিক কারখানা স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং এর জন্যে কোনো প্রকার গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দেওয়াটা "হোয়াইট হল" (ইংল্যাণ্ডের ভারতীয় মন্ত্রীর আফিস) কর্ত্তৃক কার্য্যতঃ নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল।"

(মোর‍্যাল এণ্ড ম্যাটেরিয়েল প্রগ্রেস্ ১৯২১, পৃষ্ঠা ১৪৪)

৫। ভারতীয় দারিদ্র্যের গোড়ার কথা

আমরা খুব পরিস্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে ভারতে ১৫০ বছরের বৃটিশ শাসনের ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্যের মূল কারণ ওপরের বিশ্লেষণ থেকে প্রকটিত হয়েছে। এই ক্রম বর্দ্ধমান দারিদ্র্য খুব সাদিচ্ছাপ্রবণ, উন্নতমনা রাজকর্ম্ম-চারীরও প্রচেষ্টা সমূহকে বিফল করে দিয়েছে'।

এই বর্দ্ধমান দারিদ্র্যের প্রমাণ এবং এমন কি আজকের দিন পর্য্যন্ত জীবনের নিরিখকে হীনতর করে দেওয়ার কথা সরকারী ও বেসরকারী নানাবিধ উপকরণের মধ্যে পাওয়া যায়। (ডাক্তার ম্যানের অনুসন্ধানের ফল তুলনা করে দেখুন। গত ক'বছরের মধ্যে এ অনুসন্ধানই খুব বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ ভাবে করা হয়েছে। "এমন কি এখনো মনে হবে যে গ্রামের আর্থিক অবস্থা স্থিরভাবে অবনমিত হয়ে যাচ্ছে"), কিন্তু এটা খুব পরিস্কার ভাবে এমন সব অখণ্ডনীয় ঘটনা থেকে বোঝা যায় যদ্দারা বর্দ্ধিতরূপে আয়ু হ্রাস পাচ্ছে।

উচ্চ সরকারী দফতর থেকে বৃটিশ শাসনাধীনে বিশেষ ভাবে ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্যের কারণ সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দেওয়া হচ্ছে যে লোক সংখ্যা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়েছে। তাঁদের মতে বৃটিশ "শান্তি" ও "শৃঙ্খলার" জন্যেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। পরীক্ষা করলে কিন্তু এই তথাকথিত কৈফিয়ৎ কিছুতেই টিকবেনা।

বৃটিশ শাসনে ভারতে যে লোক সংখ্যা বেড়েছে ততটা সময়ের মধ্যে ইউরোপীয় দেশ সমূহের লোক সংখ্যা বাড়ার চেয়ে তা কম। প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হলো। (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে বৃটিশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে তার কারণ হচ্ছে অত্যন্ত বেশী রূপে কারখানার বিস্তৃতি। কিন্তু, নির্ভুল তুলনামূলক অঙ্ক পাওয়া যায় না।):

১৮৭০ সন হতে ১৯১০ সন পর্য্যন্ত

লোক সংখ্যার বৃদ্ধি

ভারতবর্ষ	শতকরা	১৮'৯
ইংল্যাণ্ড	শতকরা	৫৮'৯
জার্ম্মানী	শতকরা	৫৯'০
রুসিয়া	শতকরা	৭৩'৯
ইউরোপ (গড়ে)	শতকরা	৪৫'৯

(বি, নারায়ন কৃত "পপুলেশন অব ইণ্ডিয়া")

এতদ্ব্যতীত ভারতের লোক সংখ্যার ঘনতা উন্নত ইউরোপীয় দেশ সমূহ হতে অনেক কম।

লোক সংখ্যার ঘনত্ব

ভারতবর্ষ (১৯২১)	প্রতি বর্গ মাইল ১৭৭ জন
ইংল্যাণ্ড	প্রতি বর্গ মাইল ৬৫০ জন
জার্ম্মানী	প্রতি বর্গ মাইল ৩৩২ জন
ফ্রান্স	প্রতি বর্গ মাইল ১৮৪ জন
বেলজিয়ম	প্রতি বর্গ মাইল ৬৩৬ জন
জাপান	প্রতি বর্গ মাইল ৪০০ জন

ফ্রান্স ব্যতীত প্রত্যেক ইউরোপীয় দেশ হতে ভারতের লোক সংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ কম।

এইরূপে সকল প্রকার পরীক্ষার দ্বারাই প্রথাজনিত সরকারী কৈফিয়তের কোনো মূল্য থাকছে না।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় অবস্থা সমূহের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা লোকসংখ্যাগত নয়। আসল ব্যাপার এই হচ্ছে যে অর্থনীতিক উন্নতি ও উৎপাদনের বিস্তৃতি যা ইউরোপীয় দেশ সমূহে হয়েছে তা ভারতে হয়নি। ওপরে যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তা' থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বৃটিশ ধনিকবাদের প্রয়োজনেই সেরূপ হতে দেওয়া হয়নি।

ভারতের লোকসংখ্যার প্রশ্ন অধ্যাপক ব্রিজ নারায়ণ তাঁর নব প্রকাশিত "ভারতের লোক সংখ্যা" (The Population of India) নামক পুস্তকে খুব বিশদরূপে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা ব্যাপদেশে সংগৃহীত প্রমাণের বিশেষ পরীক্ষা করে ভারতের ও ইউরোপের যে তালিকা ওপরে দেওয়া হয়েছে তিনি যে শুধু তা'ই প্রদর্শন করেছেন তা নয়, পরন্তু তিনি আরো দেখিয়েছেন যে গত ৩০ বছরে লোক সংখ্যা বাড়ার চেয়েও অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে খাদ্য শস্যাদি উৎপাদনের উপযোগী ভূমির পরিমাণ বেড়েছে। এর দ্বারা ব্যাপারটা আরো অধিকতর পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে লোক সংখ্যা জীবনোপায়ের স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে গেছে এমন কোনো প্রশ্ন উঠ্তেই পারে না। এ হচ্ছে বিশুদ্ধরূপে বর্ত্তমান সামাজিক প্রথার প্রশ্ন। এ সামাজিক প্রথাই জনগণের উন্নতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু সরকারী কৈফিয়ৎ যদি এরূপে মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তা হলে এও প্রমানিত হয়ে গেছে যে বৃটিশের দ্বারা শোষণের যে ব্যাখ্যা সেকেলে জাতীয় প্রচার পদ্ধতির দ্বারা দেওয়া হয়েছে তা-ও মোটেই যথেষ্ট নয়। কেন না, ধনিকবাদের কার্য্যাবলীর প্রতি এ প্রচার পদ্ধতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেনি।

পুরাতন জাতীয় দলের সমালোচনা হচ্ছে—বৈদেশিক কর-আদির বোঝা, উচ্চ বেতন ভোগী আমলাদের জন্যে অতিব্যয়, বৃটেনে অর্থ প্রেরণ, এবং বিশেষ আলোচিত "নিঃসরণ" ('drain') সম্বন্ধে।

কিন্তু, আমলা তন্ত্রের কল হচ্ছে বৃটিশ ধনিকবাদের কল। বৃটিশ মূলধনের অধীনতার জন্যে যে ব্যয় ভারতীয় জনগণকে বহন করতে হয় আমলাতন্ত্রের জন্যে ব্যয় তার একটা ভগ্নাংশ মাত্র। বৃটিশ ধনিক শাসনের পূর্ণ ব্যয়ের কথা কেবল মাত্র বৃটিশ ধনিকবাদের পূর্ণ ব্যয়ের কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে—সে কার্য্যাবলী সরকারী ও বে সরকারী, সাধারণের ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থসম্বন্ধীয় কিংবা রেলওয়ে সম্বন্ধীয়, এবং লাভ, কমিশন, সুদ, বেতন ও অন্য শতবিধ ব্যাপার সম্বন্ধীয় হতে পারে। এইরূপে "নিঃসরণ" ('drain') এর প্রয়োগ কেবল মাত্র বিরোধী বৈদেশিক পরিমাপকেই উদ্ঘাটন করে দিচ্ছে। আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত ও শ্রেণী-সম্বন্ধের সহিত এর কোনো সম্বন্ধ নেই। (যুদ্ধের পূর্ব্বকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ এর ন্যায় বর্দ্ধন ও উন্নতিশীল "নূতন" দেশেই "নিঃসরণ" এর অস্তিত্ব থাকতে পারে)। এই "নিঃসরণ" এর কথা বলা জনগণের প্রকৃত শোষণাবস্থা দেখানোর পক্ষে মোটেই ফলপ্রসূ নয়। পুরাতন জাতীয় দলের লোকেরা, যাঁরা ধনিক-বাদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারেন নি, ভারতীয় জনগণের বৃটিশ শাসনের দ্বারা সত্যকারের শোষণকে হৃদয়ঙ্গম করতে অকৃতকার্য্য হয়েছেন। (তাঁরা নিজেরাও জমীদার, এজেন্ট ও সুদখোর রূপে এ শোষণের মালের কমের ভাগ পাচ্ছিলেন।)

অতএব ভারতীয় দারিদ্র্যের প্রকৃত ভিত্তি বিন্যস্ত রয়েছে ভারতবর্ষকে যে বৃটিশ নির্ম্মাণ-ধনিকবাদের কৃষি উপনিবেশরূপে পদানত করে রাখা হয়েছে তার ওপরে।

যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ভারতে ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণ-বাদের এটাই ছিল পুরাতন প্রথা। বাহ্যতঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য, 'শান্তি' ও 'শৃঙ্খলা' স্থাপন করেছেন এবং জাতিসমূহকে দেখাবার জন্যে এই বলে ভাগ করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতের "অনুন্নত" সভ্যতার তুলনায় তাঁরা "উন্নতি" বিধায়ক বীর। প্রকৃত পক্ষে প্রথা ছিল ক্রমশঃ অধিকতর শোষণের, অর্থনীতিক উন্নতিকে প্রতিহত করার ও তার ফলে বর্দ্ধমান অনশন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের। অতএব অত্যাচার কঠোর হতে এত কঠোরতর হত যে খুব সদিচ্ছাপ্রবণ কর্ম্মচারীরাও আপনাদিগকে অসহায় বলে মনে করতেন। তাঁরা তাঁদের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হওয়ার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারতেন না। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁদের মনে হত যে জনগণের দুঃখকষ্টের কোনো প্রতিকার হতেই পারে না। কারণ, ধনিকবাদের কাজের ধারা তাঁরা বুঝতে পারতেন না, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ধনিকবাদেরই এজেণ্ট ছিলেন।

—•—

স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ

—०—

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার)

—•—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র একবার শেষ মাথা নাড়া দিয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকামী ইংরেজের সহায়ক দেশীয়গণের চেষ্টায় সে বিদ্রোহ সফল হয় নাই। তারপরে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ইংরেজের বিরুদ্ধে আর এক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় চিৎ-পাবন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ও বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লব সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কেহ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন, কেহ বা শিবাজীর অসমাপ্ত হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লইয়া এই সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। জাপানের কাউণ্ট ওকাকুরা ও মিষ্টার নিবেদিতার প্রেরণাও ইহার মধ্যে খানিকটা ছিল।

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত প্রায় একই সময়ে হয়। এই দুইটি আন্দোলনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ কিছু ছিল না—কিন্তু একটি অপরটিকে ধরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল আন্দোলনে মুসলমান বিপক্ষভাবেই গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহারা ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজ স্বভাবতই বিপক্ষতা করিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা আসে বঙ্গ ভঙ্গ ব্যাপার হইতে। এক ভাষাভাষী বাঙালী দুই ভাগ হইয়া যাইবে—বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হইয়া বাঙালী জাতির কত না সর্ব্বনাশ ঘটিবে—এই কথা বুঝাইয়া একদল লোক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। কিন্তু ভিতরকার কথা ছিল এই যে, বঙ্গভঙ্গের জন্য—"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (Permanent Settlement) নাকচ হইয়া গেলে আমাদের জমিদার প্রভুগণ কি করিবেন! তাই স্বদেশী আন্দোলনের পৃষ্ঠ পোষক হইলেন যত জমিদার, আর বক্তা হইলেন তাঁহাদের যত উকিল। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী—কিন্তু হিন্দুরাই জমিদার মহাজন, উকিল, চাকুরিয়া প্রভৃতি। সেজন্য শোষক শোষিতের বিরুদ্ধ সম্বন্ধ হইতে জামালপুর প্রভৃতি স্থানে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ হইয়া গেল। যেটা মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণ—তাহাই সাম্প্র-দায়িক বিদ্বেষের রূপ লইয়া দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিল।

সাধারণ প্রজার সুখ দুঃখের কথা স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর ছিল না। যে শ্রেণীর লোক এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও চালক স্বভাবতই তাহাদেরই অভাব অভিযোগের প্রতিকার এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

তখনকার কংগ্রেস কনফারেন্স এই শ্রেণীর স্বার্থের কথাই কহিত। দেশের জনসাধারণের উপর নেতাদের কাহারও কাহারও যে দয়া ছিলনা তাহা নয়। শাসনযন্ত্র হাতে আসিলে জনসাধারণকে সুখে রাখিয়া দোহন করিব—এইরূপ একটা ভাব ছিল। আসল কথা কিন্তু এই ছিল যে সাহেবরা কেন আমাদের দেশে আসিয়া "নবাবি" করিবে—আমরা দেশের লোক লইয়া তাহা কেন করিতে পাইব না, অন্ততঃ এই রাজত্বে তাহার কিছু ভাগ পাইব না কেন।

এই দাবির উপরে বিপ্লবমূলক গুপ্ত সমিতি সমূহেরও নজর ছিল। এজন্য কত যুবক প্রাণ দিয়াছে, কত সংসার ধ্বংসের

পথে গিয়াছে—উদ্দেশ্যও যে সিদ্ধ হয় নাই তাহা নহে। বারীন ঘোষ বোমা মারিয়া দ্বীপান্তর গিয়াছেন, সত্যেন্দ্র সিংহ লাট হইয়াছেন! ভদ্র শ্রেণীর এই দাবী ইংরেজও শাসন সংস্কারের (Reforms) ভিতর দিয়া স্বীকার করিয়াছে। দেশের যে সকল লোক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেয়, তাহাদিগকে কাউন্সিলে ভোটের অধিকার দিয়া ইংরেজ মানিয়া লইয়াছে যে এই শতকরা ২॥০ জনকে তাহারা ভারত শাসন ও শোষণের ভাগী করিয়া লইল। অবশিষ্ট ৯৭॥ জনকে দোহন করিবার ব্যাপারে সহযোগিতা করিয়া এই ২॥ জনের প্রতিনিধিগণ সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের সমান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহারা জমিদার, ব্যারিষ্টার, উকিল, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট বেনিয়ান, মালদী, মন্ত্রী প্রভৃতি হইয়া যথেষ্ট স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারেন। এই দাবী গ্রাহ্য হওয়ায় স্বদেশী যুগের নেতাগণ ইংরেজের সহযোগিতাই মুক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। স্বদেশীর হোতা সুরেন বাঁড়ুয্যে মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেন। Indianisation of Services ভারতীয়গণের চাকুরী লাভ আন্দোলন অনেকটা সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এবং এ সম্বন্ধে কত বৎসরে শত করা কতজন ভারতীয় চাকুরী পাইবে—এই একটা গ্যারাণ্টী পাইলেই এই নেতাগণের স্বরাজ হইয়া যাইবে।

আর ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, কাপড়ের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকের স্বদেশ প্রেমিকতার অভিমানে সুড়সুড়ি দিয়া আর কতকগুলি নেতা কাজ গুছাইয়া লইয়াছেন।

অসহযোগ আন্দোলনে দলিত মথিত ৯৭॥ জনের কথা একটু ছিল, তাই এই আন্দোলন দিন কতকের জন্য বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু নেতাগণের শ্রেণীগত স্বার্থ ও মনোভাব এ আন্দোলনকেও সফল হইতে দেয় নাই। বর্ত্তমান স্বরাজ্যদল এই আন্দোলনকে আবার ঐ শতকরা ২॥ জনের মধ্যে ফিরাইয়া লইতে পারিয়াছেন। তবে গোরুর শোকে শকুনি কাঁদার কথা তাঁহাদের প্রোগ্রামে থাকায় এখনও জনসাধারণ মধ্যে মধ্যে মরীচিকা পাশে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আসে, আবার ফিরিয়া যায়!

জাপানে ছাত্রদের বিপ্লব-আন্দোলন

বিগত পাঁচ ছয় বছর ধরে বেশীর ভাগ মার্ক্স ও লেনিনের ভাবরাশির দ্বারা প্রণোদিত হয়েই জাপানের ছাত্রগণ শক্তিশালী বিপ্লব আন্দোলন আরম্ভ করেছেন।

১৯২০ সনে জাপানে "মে-দিবস" উৎসব সর্ব্ব প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। তার অল্পদিন পরেই জাপানী ছাত্রগণের এক ফেডারেশন কেবলমাত্র ছাত্রগণের সাহায্যের দ্বারাই গঠিত হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ অনুষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়। তার পরের বছরে টকিওর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কম্যুনিষ্ট গ্রুপ (মণ্ডলী) গঠিত হয়। এটাকেও গবর্ণমেণ্টের বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতেই থাকে এবং ১৯২৩ সনে ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানের কম্যুনিষ্ট অধ্যাপক মানাবু সানোর (Manabu Sanoa) বিখ্যাত মোকদ্দমা হয়। আন্দোলন আগে থেকেই অন্যান্য কলেজ সমূহে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ১৯২২ সনের ৭ই নবেম্বর তারিখে ছাত্রগণের ফেডারেশন (Students' Federation) আবার স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সনে যখন ফেডারেশনের নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে "জাপানী ছাত্রগণের সমাজ বিজ্ঞান সমবায়" (The Japanese Students' Federation of Social Science) হয় তখন কলেজ সমূহে তাদের ৫০টির বেশী শাখা ছিল এবং সে সবের সভ্য সংখ্যা ২০০০ এর বেশী হয়েছিল। এ ছাত্র সমবায় কম্যুনিষ্ট মত পোষণ করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্ক্সের থিওরি ও অর্থনীতির জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও শ্রমিকদের মধ্যে বিস্তৃত করা।

ছাত্র সমবায় ক্রমাগত গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্য্যাতিত হয়েছে। ১৯২৬ সনে টকিও ও কয়েটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন ছাত্র যখন গেরেফ্‌তার হয়েছিল তখন তার দ্বারা জাপানে অনেক বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

বিপ্লব মূলক ছাত্র আন্দোলনের বর্দ্ধনের দ্বারা চরমপন্থী শ্রমিকসঙ্ঘগুলির শক্তির বর্দ্ধনে অনেক সহায্য হয়েছে। রক্ষণশীল শ্রমিক সঙ্ঘগুলির চেয়ে চরমপন্থী শ্রমিকসঙ্ঘগুলির সভ্য সংখ্যা অধিকতর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯২৫ সনে চরমপন্থীদলের প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভ্য সংখ্যা ১৮৭০০ ছিল। ১৯২৬ সনে এ সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ৩৮০০০ হাজার হয়েছিল। রক্ষণশীলদলের প্রতিষ্ঠান "জেনেরেল কন্‌ফেডারেশন অব লেবর" এর সভ্য সংখ্যা ১৯২৫ সনে ২৩০০০ ছিল। ১৯২৬ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩০০০ হয়েছে। চরমপন্থীদের সঙ্ঘগুলির মধ্যে "কৃষকসঙ্ঘ" খুব উল্লেখ যোগ্য। এর সভ্য সংখ্যা অন্যান্য সঙ্ঘগুলির চেয়ে অধিকতর দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হয়েছে। এ সঙ্ঘের ৯৬১টি শাখা আছে এবং সভ্য সংখ্যা ৭৩০০০।

দেশ বিদেশ

—:*:—

লণ্ডন পুলিস লণ্ডন শহরস্থ সোভিয়েট দূতাবাস ট্রেড-ডেলিগেশনের আরকস-হাউস খানাতল্লাসী করে। তারা কতকগুলি বায়োস্কোপের ফিল্‌ম্ ও রাইফেল হস্তগত করেছে। সারারাত্রি ধরে তলাসীর কাজ চলেছিল তবুও শেষ হয় নি। পরদিন আবারো তল্লাসী করা হয়। কড়া পুলিস পাহারা দিয়ে বাড়ীটাকে ঘেরাও করা হয়। লণ্ডনের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খানাতল্লাসীর পরোয়ানা মঞ্জুর করেন। পূর্ব্ব হতেই পুলিশ কর্ম্মচারীরা এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র সচীব ও হোম সেক্রেটারীর সাথে পরামর্শে রত ছিল। আরকস একটা লিমিটেড কোম্পানী, রুষীয় মূলধনে পরিচালিত। বৃটিশ ও সোভিয়েট সঙ্ঘের সাথে ট্রেড সম্বন্ধ পুনরায় ফিরে আসার পরই এটা স্থাপিত হয়েছিল। এটা মালের আমদানী ও রপ্তানীর উদ্দেশ্যে স্থাপিত ও প্রায় সহস্র কর্ম্মচারী এখানে কাজ করেন। রাসিয়ান ট্রেড্‌ডেলিগেশনের ও আফিসও ঐ অট্টালিকাতে অবস্থিত। লণ্ডনস্থ সোভিয়েট দূত এম, রোজেনগোয়েটস্ স্যার অষ্টেন চেম্বারলেনকে পত্রদ্বারা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। আরকস হাউস এবং ট্রেড ডেলিগেশন অশ্বারোহী পুলিশ দখল করে অতিশয় অন্যায় করেছে। ১৯২১ সালের বাণিজ্য সম্বন্ধ অনুযায়ী

এবং ১৯১৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর ফরেন আফিসের নোটের অনুমোদন মত দূতাবাস সমস্ত অধিকার ভোগ করবে। পুলিসের আক্রমনের সময় ট্রেড-ডেলিগেশনের একজন কর্ম্মচারী এম, খুদিয়ো-কোভ সিন্দুকে ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও অফিসিয়েল ট্রেড এজেন্টের সাঙ্কেতিক নিয়ম পত্র ছিল তার চাবি দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁকে মারধর করেছে। তারা ট্রেড এজেন্টের নিকটে ডাকবাহক সে দিন যে ডাক এনেছিল তাহাও নিয়ে গিয়েছে। পুলিসের এই ব্যবহার দ্বারা বাণিজ্য যুক্তির পঞ্চম আর্টিক্যালের সমস্ত শর্ত্ত ভঙ্গ হয়েছে। ঐ চুক্তিতে রয়েছে সরকারী এজেন্টগণ স্বীয় গবর্ণমেন্টের সাথে ও অন্যান্য গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধির সাথে স্বাধীন ভাবে চিঠি পত্র ব্যবহার করতে পারবেন এবং ডাকবাহক দিয়ে শীল মোহর বন্ধ ব্যাগ পাঠাতে ও গ্রহণ করতে পারবেন। তাহা গবর্ণমেন্ট পরীক্ষা করতে পারবেন না। আর্টিক্যালের এক ধারা অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এটাও স্বীকৃত হয়ে ছিলেন যে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য সন্ধির তুলনা করবেন না। কিন্তু এই খানাতল্লাসীর দ্বারা অ্যাঙ্গলো-সোভিয়েট বাণিজ্য শক্তির নিশ্চয় ক্ষতি করা হয়েছে। পুলিশ খানাতল্লাসীর সময় সাধারণ ভদ্রতাও ভুলে গিয়েছিল। পরোয়ানা না দেখিয়েই খানাতল্লাসী আরম্ভ করা হয় ও পরে আরকস হাউসের সহকারী ডাইরেক্টার এম, সরোটিন হোকরের হাতে পরোয়ানা দেওয়া হয়। আরকস হাউসের সমস্ত পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মচারী-গণকে এবং ট্রেড-ডেলিগেশনের সভ্যদিগকে আটকান হয়। তাঁদের প্রত্যেকের শরীর ও বস্ত্রাদি তল্লাসী করা হয়। রুষ দূতের পত্নীরও তল্লাসী নেওয়া হয়েছিল। এবং মহিলাদের তল্লাসী পুরুষরা নিয়েছিল। আমি আমার গবর্ণমেন্টকে সকল বিষয় জানিয়েছি এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত এবং উপদেশের প্রতীক্ষায় রয়েছি। আমি অতীব দুঃখের সাথে প্রতিবাদ করছি যে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বাণিজ্য শক্তির শর্ত্ত ভঙ্গ করেছেন।

—:•:—

মজুরগণ সমস্ত রাত্রি নানাবিধ যন্ত্র পাতি নিয়ে আরকসের সুদৃঢ় ঘর ভাঙিতে চেষ্টা করেছিল। চাবি না পাওয়াতে তাদের যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয়েছিল। এখন আরকস্ হাউস পুলিশের দখলে।

—•—

জাপানে রেড গ্রেপ্তার ঃ—টোকিও ১৪ই মে খবরে প্রকাশ একদল রুষীয় ও জাপানী কম্যুনিষ্টকে কয়দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়জনকে ছেড়ে দিয়েছে। অনেককে হাজতে রাখা হয়েছে। ইতি মধ্যে সমস্ত বন্দরে কড়া নজর রাখা হয়েছে। চারিদিকেই রক্তময় !!

—•—

মাদ্রাজের খবরে প্রকাশ 'সত্য নারায়ণ' নামক লঞ্চ অকস্মাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে জলমগ্ন হয়েছে এবং ৫০ জন লোকের প্রাণহানি হয়েছে। লঞ্চটী রাজমুন্দ্রী ত্যাগকরে পালাভরম অভিমুখে যাচ্ছিল।

———

মাদ্রাজ বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকরা বহুদিন হতে ধর্ম্মঘট করে আছে। তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে আরো কয়টি কারখানায় শ্রমিকরা তাদের কাজ বন্ধ করেছিল। ধর্ম্মঘটীরা যখন সভা করছিল তখন তাদের ওপর কয়জন ইউরোপীয় গুলি করে, ফলে কয়েকজন মারা গিয়াছে। এই গুলি বর্ষণের কারণ ও প্রকৃত সত্যতা সম্বন্ধে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করছেন। মিঃ চেটি ও কতকগুলি লোকের জবানবন্দী গৃহীত হয়েছে। মিঃ চেটি বলেন গুলি মারা ব্যাপারের পর শ্রমিকরা যখন সভা আহ্বান করে তখনো ৪ জন ফিরিঙ্গী ঐ সভার ওপর গুলি করে। শ্রমিক নেতারা সবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। নিখিল ট্রেড্ ইউনিয়ন বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদের সাধারণ সম্পাদক মিঃ জোশী মাদ্রাজ সরকারের রাষ্ট্রীয় বিভাগের সেক্রেটারীকে এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের বড় কর্ত্তাকে এর প্রতিবাদ করে তার করেছেন।

———

দেওয়ান চমনলাল কলিকাতায় অবস্থান কালীন যে এক অদ্ভুত লেবর কমিটি গঠন করিয়া যান ৮ই মে তারিখ রবিবার বেলা নয়টার সময় এই কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তার আচরণ দেখিয়া প্রথম হইতেই সকলের স্পষ্ট ধারণা হইয়াছিল যে এই কমিটীর কার্য্য ভাল করিয়া কোন মতেই চলিতে পারে না। শ্রীমতী সন্তোষকুমারীর এমন একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে যে, যে কোন কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করেন সেটি পণ্ড না হইয়া যায় না। করপোরেশনের কয়লা সওদার সহিত লেবর এর কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সংবাদ পত্রে শ্রীমতী গুপ্তার হস্তলিখিত যে দু'একখানি চিঠি বাহির হইয়াছিল তাহাতে বেশ বোধ হয় যে তিনি কয়েকজন কয়লা ওয়ালাকে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেন গুপ্তের নাম লইয়া বেশ ভরসা দিয়াছিলেন। মেওর সাহেবের নাম লইবার অধিকার শ্রীমতী গুপ্তার যতটুকু আছে শ্রমিকের নেতৃত্ব গ্রহণ করার অধিকার বোধ হয় তাঁহার ততটুকু নেই।

———

দেওয়ানচমনলালের গঠিত কমিটির কার্য্য বিশেষ কিছুই হয় নাই। ঐ কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন শ্রীমৃণালকান্তি বসু। দেওয়ান চমনলালের আহ্বানে যে লেবর কনফারেন্স হইয়াছিল তাহার কার্য্য বিবরণী নাকি পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই কতক খবরের কাগজের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এবং কতক বা শ্রীমতী গুপ্তার স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া একটা বিবরণ কমিটির সম্মুখে পেশ করা হয় এবং সেই বিবরণী গ্রহণ করা হয় এই শর্ত্তে যে পূর্ব্ব বিবরণী পাওয়া গেলে সেই বিবরণীই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। পরে আহ্বানকারিণী সম্পাদিকা শ্রীমতী গুপ্তা ও সংগঠন কারী সম্পাদক শ্রীযুত কিশোরী লাল ঘোষের ভিতর একটা কার্য্য বিভাগ করা হয়। আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীমতী গুপ্তা বি এন রেলওয়ে শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য তিনি কত টাকা তুলিয়াছেন এবং কি ভাবে খরচ করিয়াছেন এ সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক হিসাব না দেন ততদিন পর্য্যন্ত এই কমিটির উচিত নয় শ্রীমতী গুপ্তার সহযোগে কার্য্য করা। শ্রমিকের নামে আজকাল অনেক প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। এখন সময় আসিয়াছে যে নেতৃত্ব অভিলাষীরা তাহাদের পরিচয় পত্র লইয়া সাধারণের সম্মুখে আসিবে। বড় লোক বন্ধুর ও মুরুব্বির জোরে আর মুরুব্বি আনা করা চলিবে না।

—•—

আমরা জানিতাম যে ষ্টেভিডোর লেবর ইউনিয়ন ও বোট-মেন্স এসোসিয়েশনের আফিস ২৫৭এ বহুবাজার ষ্ট্রীটে (লেবর এশোসিয়েশনের বাড়ীতে) আছে। সেদিন শুনিলাম যে

শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা দাবী করেন যে এই দুই সঙ্ঘের অফিস্ তাঁহার নিজের বাড়ীতে অর্থাৎ ২৮ নং ডক্টরস লেনে রহিয়াছে। শ্রীমতী গুপ্তার দুটি সঙ্ঘ কবে গঠিত হইয়াছে? কে গঠিত করিয়াছেন? ইহার সম্পাদক ও সভাপতি কাহারা? এই দুই সঙ্ঘের কোন কার্য্যকরী সভা আছে কি? যদি থাকে তো সভ্যগণের নাম কি? এই সব প্রশ্নের সন্তোষ জনক জবাব আমরা শ্রীমতী গুপ্তার নিকট হইতে পাইতে পারি কি?

———

মাদ্রাজে বর্ম্মা ওয়েল কোম্পানীর শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘট প্রসঙ্গে মাদ্রাস লেবর ইউনিয়নএর সভাপতি এক সভায় বলেন যে "মাদ্রাজে শ্রমিকদের বড়ই দুঃসময় যাইতেছে। ধনিকেরা চায় না যে সঙ্ঘগুলি কায়েম হয়। আমি বুঝিতে পারি না সরকার নিযুক্ত লেবর কমিশনরদের কার্য্য কি। তাহারা তো ধর্ম্মঘটের সময় বেশ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকে। অতএব শ্রমিকেরা যে যে বিভাগেই কাজ করুক না কেন তাহাদের বোঝা উচিত সকল শ্রমিক এক এবং প্রত্যেক বিভাগের শ্রমিকদের সঙ্ঘ গঠন করা উচিত এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি প্রাদেশিক কেন্দ্র সঙ্ঘ থাকা উচিত।" এ কথাগুলি সারগর্ভ। কিন্তু নেতামহাশয়দের ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য সঙ্ঘগুলি বাড়িতে পারিতেছে না। প্রাদেশিক কেন্দ্র সঙ্ঘের বল বা প্রভাব নির্ভর করে সঙ্ঘগুলির উপর। সঙ্ঘগুলি যদি না বাড়িতে পায় তো প্রাদেশিক কেন্দ্র সঙ্ঘ দুর্ব্বল ও কার্য্যের বাহির হইয়া পড়ে।

———

গত শনিবার ১৪ই মে তারিখে প্রেস কর্ম্মচারী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাৎসরিক বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ গৃহীত হইবার পর ট্রেড্ ইউনিয়ন এ্যাক্ট অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী আলোচিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। গবর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেসের রীডার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমিতির পরিচালকদের ধন্যবাদ ও সমিতির বাড়িবার পক্ষে যে সকল বাধা তাহার উল্লেখ করিয়া এক বক্তৃতা দান করেন। পরে অন্যান্য প্রেস কর্ম্মচারীরাও প্রেসের দুর্দ্দশার কথা সমিতির সভ্য হইবার প্রয়োজনীয়তা ও সভ্যগণের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। পরে কয়েকটি মন্তব্য পেশ করা উপলক্ষে সভাপতি শ্রীযুত মৃনালকান্তি বসু, মেসার্স কে সি রায় চৌধুরি, মহবুবুল হক্ (ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট) কিশোরী লাল ঘোষ (সম্পাদক) এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রেসের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। সভার কার্য্য প্রায় চার ঘণ্টা ধরিয়া চলে ও সভার তিনটি সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া, মেওর সাহেবের অভিনন্দন প্রস্তাব, বৃটিশ ট্রেডইয়ুনিয়ন বিলের তীব্র প্রতিবাদ, বর্ম্মাওয়েল কোম্পানীর ধর্ম্মঘটকারিগণের উপরগুলি চালানর তীব্র প্রতিবাদ ও আহতগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কয়েটি মন্তব্য সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। পরে আগামী বৎসরের জন্য কর্ম্মকর্ত্তৃগণ নির্ব্বাচিত হয়। সম্পূর্ণ তালিকা আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

———

একটি মন্তব্যের সম্বন্ধে আমরা দু একটি কথা বলিব। সম্পাদক শ্রীকিশোরীলাল ঘোষ কয়েকটি যুবক প্রেস কর্ম্মচারীকে লইয়া একটি বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব করেন। তিনি একটি স্কীম (কার্য্যপ্রণালী) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেটি সভায় পেশ করিয়া বলেন যে প্রতি রবিবারে এই বিদ্যালয় বসিবে। প্রথমে পনেরটি উৎসাহী যুবককে লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইবে। তাহাদিগকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে যে তাহারা যেন প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে ও ইউনিয়ন চালাইবার কার্য্যে দক্ষ হইতে পারে। শ্রমিক আন্দোলনের স্বরূপ কি, ইউরোপ ও আমেরিকায় এই আন্দোলন কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এই সকল বিষয় এই তরুণ শ্রমজীবীদের শিক্ষা দেওয়া হইবে। শ্রীযুত কে, সি রায় চৌধুরী তাঁহার বিলাতের অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল বিদ্যালয় কি ভাবে চালান হয় তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। আমরা এই প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি এবং ইহার সাফল্য কামনা করি। শ্রমজীবীদের কার্য্য তাহাদের নিজেদেরই চালাইতে হইবে। এই কার্য্য চালাইতে হইলে যে শিক্ষা পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন যে দিন শ্রমজীবীরা তদনুরূপ উপযুক্ত হইবে সেই দিন ভূঁইফোঁড় নেতাদের সরিয়া পড়িবার সময় আসিবে।

—:•:—

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে আমাদের গত সপ্তাহের পরামর্শ কোন কোন সঙ্ঘকর্ত্তৃপক্ষর নিকট সমীচীন বোধ হইয়াছে। ইহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি দুইটি সঙ্ঘসভার বিবরণে। গত ১৫ই মে রবিবারে জগদ্দলে কাঁকিনাড়া লেবর ইউনিয়নের এক বড় সভা হইয়া গিয়াছে। বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটরী শ্রীযুত কিশোরী লাল ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় এক সহস্র ইউনিয়নের সভ্য ও পাটকলের মজুররা উপস্থিত থাকে। শ্রীযুত কে সি রায় চৌধুরি, লতাফৎ হোসেন, সভাপতি ও অন্যান্য অনেক পাটকলের মজুরেরা সঙ্ঘের উপকারিতা, সঙ্ঘের কার্য্য কি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। Craig Mill এর মজুরদের সহিত সর্দ্দারের বিবাদ মিটাইবার ব্যবস্থা করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

—•—

আর একটি সঙ্ঘেরও বেশ সাড়া পাওয়া যাইতেছে। ন্যাশন্যাল সিমেন্স ইউনিয়নও খিদিরপুরের ময়দানে এক বড় সভা করেন। শ্রীমুকুন্দলাল সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেসার্স আফতাব আলী ও আবদুল হক্ (মেরিনার্স ইউনিয়ন) প্রভৃতির বক্তৃতার পর রিক্রুটমেণ্ট কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয় এবং জানান হয় যে এই রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য করিতে বিলম্ব হওয়াতে নাবিকগণের ভিতর এরূপ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে যে পরে ব্যাপার বিষম হইয়া উঠিতে পারে। সরকারকে আরও অনুরোধ করা হয় যে ইণ্টার ন্যাশন্যাল লেবর কনফারেন্সের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যেন রিক্রুটমেণ্ট বিউরোর সহিত একটি পরামর্শ কমিটিও গঠন করা হয়।

সম্পাদক আফতাব আলী শিক্ষিত ও উৎসাহী যুবক। জাহাজের নাবিকের কাজ তিনি করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার চেষ্টায় ন্যাশন্যাল সি' মেন্স ইউনিয়ন একটি আদর্শ ইউনিয়নরূপে গঠিত হইয়া উঠিবে।

—•—

সাংহাইএর ১৫ই মের খবরে প্রকাশ যে চীনেরা আমেরিকান জাহাজ পিলস্‌বেরীর উপর নানকিন হতে গুলি বর্ষণ করেছিল। 'রেড' ন্যাশন্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট যে সরে পড়েছে—জেনারেল ফেং-য়ু-সিয়াং হোনান্‌ দখল করেছেন।

উমা শঙ্কর সিংহ নামক বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র বিষপান করতঃ আত্মহত্যা করেছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় নাকি সে একার্য্য করেছে। তার ছোট ভাইও পরীক্ষা দিয়েছিল। সে উত্তীর্ণ হয়েছে। উমা শঙ্কর একটী বাল-বিধবা রেখে গেছে। পরীক্ষায় ফেল হওয়ার পর সে তার পত্নীকে একটী আংটী শেষ উপহার স্বরূপ দিয়ে তাকেও আত্মহত্যা করতে বলে। বিষ পানের পরই দেহে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং ডাক্তার এসে পৌছিবার পূর্ব্বেই তার মৃত্যু হয়।

———

লাহোরের দাঙ্গার পর কয়েকদিন শহরে খুব আশঙ্কার ভাব লক্ষিত হয়েছিল। বর্ত্তমানে শহরের অবস্থা শান্ত ভাব ধারণ করেছে। সংবাদ পত্রগুলির সুর অনেকটা নরম হয়েছে। আগামী কল্য হ্যাভেলী কাবলী মল মামলার শুনানী আরম্ভ হবে।

———

কলিকাতার বিখ্যাত গ্রাণ্ড হোটেলের স্বত্বাধিকারী মিঃ এ ষ্টিফেন গত শনিবার সকালে হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন। তাঁর সামান্য অসুখ হয়েছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি মাত্র ৩০০ শত টাকা নিয়ে ভারতে আসেন—তখন তিনি ইংরেজীতে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারতেন না। তিনি কলকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

———

গত ১৭ই মে মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় মালদহ "গান্ধী হিন্দু ধর্ম্মশালা"য় মালদহ তরুণ ও কিশোর সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে। মালদহ জিলা স্কুলের হেড মাষ্টার মৌলবী মোহাম্মদ মোবারক আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন।

—০—

মাদ্রাজের তৈল কারখানার শ্রমিকদের সাহায্যকরার নিমিত্ত মাদ্রাজ সহরবাসীদিগকে নিবেদন জানিয়ে ডাক্তার ভরদ্বাজ নাইডু এক আবেদন প্রকাশ করেছেন—নিঃসহায় শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ করে মাদ্রাজ শহরে একদিন হরতাল করা উচিত। মাদ্রাজ কর্পোরেশনের শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই সভা নিগৃহীত শ্রমিকদের সাহায্য কল্পে ৫ শত টাকা মঞ্জুর করেছেন।

—০—

মাদ্রাজের ১৬ই মে তারিখের খবরে প্রকাশ যে শহরের শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টা সত্বেও কোনো মিটমাট হয়নি। ধর্ম্মঘট এখনো চলেছে। কোম্পানী আবার নূতন আদেশ জারী করেছে তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে পূর্ব্ব নোটিশের শর্ত্ত অনুযায়ী যারা কাজে পুনরায় যোগ দিবার জন্য আবেদন করেছিল তাদের আজ সোমবার, ধর্ম্মঘটের পূর্ব্বে তারা যে অবস্থাতে ছিল সেই রকমে নেওয়া হবে। কাল প্রাতে ৮ আটটার পূর্ব্বে কোনো নূতন মজুর নেওয়া হবেনা।

—০—

পুলিসের কড়া পাহারা:—যদিও ধর্ম্মঘট সম্পর্কে শহরে কোনো গোলমালের সৃষ্টি হয়নি তবুও পুলিস সর্ব্বত্র কড়া পাহারা দিতেছে এবং সহরে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। গবর্ণর উপদ্রুত স্থানটী পরিদর্শন করেছেন। বন্দর পর্য্যন্ত তেলের পাইপের লাইনটী পুলিশ দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে। এখনও মিটমাটের বিষয়টী অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

—০—

সুভাষ চন্দ্রের কারা মুক্তি:—দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় থাকার পর গত সোমবার শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বাংলা গবর্ণমেণ্ট বিনাশর্ত্তে মুক্তি প্রদান করেছেন। সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাব। জেলে অবস্থান কালে তিনি ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়েছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও সার নীলরতন সরকার তাঁকে পরীক্ষা করে দেখে বলেছেন তাঁর শরীর নিতান্ত খারাব। দর্শকদের তাঁর সহিত এখন দেখা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

—০—

রাজবন্দী জীবনলাল চাটার্জ্জী সারেঙ্গা মিশনারী হাসপাতালে ক্ষয় রোগীর ওয়ার্ডে অবরুদ্ধ আছেন। তাঁকে তথায় নানা অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর জন্য মাসিক ৮৭ টাকা ভাতা নির্দ্ধারিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা হতে ঘর ভাড়া ও হাসপাতালের চিকিৎসা বাবত ৬২ টাকা কেটে নেওয়া হয়। বাকী ২৫ টাকাতে তাঁকে তাঁর যাবতীয় আহারাদিও পোষাক-পরিচ্ছদ ওষুধ পত্র, ফলমূল, ডিম, মাংস, শাক সব্জী কিনতে হয়। তাতে আবার উপরোক্ত দ্রব্যাদি সারেঙ্গাতে দুষ্প্রাপ্য। বর্ত্তমান সময়ে জীবন বাবুর দৈহিক ওজন ১০২ পাউণ্ড। সুভাষ বাবুকে গবর্ণমেণ্ট মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু জীবন বাবুর সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন কেন?

—০—

মস্কোর ১৫ই মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট কাউন্সিল অবট্রেড ও ইণ্ডাসট্রী তাদের এক অতিরিক্ত অধিবেশনে আরকস হাউসের খানা তল্লাসীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ পূর্ব্বক একটী প্রস্তাব পাস করিয়াছে। তাতে প্রকাশ যে এতদ্দ্বারা বৃটিশ ও সোভিয়েট বাণিজ্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে। আরও প্রস্তাবিত হয়েছে যে ফরেন ট্রেড কমিসারেট বৈদেশিক বাণিজ্য সচীব অনুমতি দিয়েছেন যে বৃটেনে যে দশ সহস্র মিলিয়নস্ ষ্টার্লিং এর সনন্দের অর্ডার প্রস্তাবিত হয়েছিল তাহা অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত করা হবে। এবং এতদ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় পত্রাদি ব্যবহার শীঘ্র করা হবে।

—০—

মস্কোর ইজভেসতিয়া পত্রিকায় প্রকাশ যে পিকিংএর উদাহরণের দ্বারা আরকস খানাতল্লাসী অনুপ্রাণিত হয়েছে। এতদ্দ্বারা বাস্তবিক সার অষ্টেন চেম্বার লেনের চিঠিতে যে সন্ধি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ছিল তাহা বেশ বোঝা যায়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট আতঙ্কের সৃষ্টি করে ট্রেড ইউনিয়ন বিলটীকে বিধিবদ্ধ করার জন্য জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্য পথে চালিত করছে।

—০—

বরিশাল মুসলিম সম্মিলনের বৈঠকের কাজ যখন চলেছিল তখন সভা মণ্ডপে ব্যারিষ্টার মিঃ লুৎফে আলী চৌধুরীর ইউ-রোপীয় স্ত্রী আগমন করেছিলেন। তাঁকে মণ্ডপে প্রবেশ করতে দেখা মাত্রই কতিপয় মোল্লা নাকি খুব আপত্তি করতে থাকে। মৌলবী আবুল কাসেমের ধমকানোতে মোল্লারা চুপ করতে বাধ্য হয়। সেদিন রাত্রিতে মৌলবী মনিরুজ্জমান সাহেবের নেতৃত্বে কি একটা সভা বসেছিল। সে সভায় নেসার আহমদ নামক একজন মোল্লা বিষম কান্না কেঁদেছিলেন। তবে মোল্লাজির দাড়ি বেয়ে জল পড়েছিল কিনা সে খবর আমরা জানতে পারিনি। তাঁর কান্নার বিষয় ছিল স্ত্রীলোকের পুরুষের সভায় প্রবেশ করা। মোল্লাজি যদি গলায় কলসী বেঁধে খাড়ি-য়াল খাঁ নদীতে ডুবে মরতেন তা হলে খুব ভালো হত।

———

পাবনা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটী হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। সুজানগর সাম্প্রদায়িক লুটের মামলার ৪৬ জন মুসলমান দু'বৎসর করে কঠোর কারা দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। তারা জেলে প্রেরিত হবার জন্য সকলে আদালতে হাজীর হয়। জেলে যাবার পূর্ব্বে জেলা ম্যাজিষ্টেটের কাছে তারা একটী আবেদনে তাদের সাজা চার মাসের জন্য মুলতুবী রাখতে প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্ত করেছিল। তাহা হলে তারা চাষ আবাদ করতে ও ফসল তুলতে সক্ষম হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের বুঝিয়ে বলেছেন তাঁর হাতে এমন কোন ক্ষমতা নেই যে যাতে তাদের সাজা মুলতুবী রাখতে পারেন। বরং তারা হাইকোর্টে জামীনের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। তাদের দরখাস্ত তাদেরকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। এই যে ৪৬ জন কৃষক আজ তাদের ছেলে মেয়ে চাষ আবাদ ফেলে জেলে গেল এখন তাদের পারিবারদের ভরণ পোষণ কে করবে? প্ররোচক ধর্মধ্বজী চালবাজ মোল্লা-মৌলবীদের প্ররোচনায় তারা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য—ধর্ম্মান্ধ হয়ে লুটতরাজে লিপ্ত হয়েছিল। তারা মুহূর্ত্তে ভাবতে পারেনি আজ তাদের এ দুরবস্থা হবে। তারা সাজা শুনে একেবারে কপালে হাত দিয়ে বসেছিল। তারা স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভরণ পোষণের দুর্ভাবনায় বিগলিত চিত্ত হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সাজা মুলতুবীর প্রার্থনা জানিয়ে ছিল। কিন্তু আইন কারো তোয়াক্কা রাখে না। তাদের করুণ প্রার্থনা আইনের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করতে পারেনি। যারা ধর্ম্মের নামে মানুষকে পশুত্বের পথে চালিত করে তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে যে এতগুলি লোকের পরিজন কি অশেষ দুরবস্থা ও দারিদ্র্যের ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হলো। দরিদ্র চাষী জমি চাষ করে শোষিত নিষ্পেষিত হয়ে কোনো রকমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে আসছিল—হঠাৎ মোল্লাদের প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে আইন বিগর্হিত কাজ করেছে। তাদের অন্তরের চিরদিনের যে অর্থনীতিক অসন্তোষ বর্ত্তমান ছিল বিপথে চালিত হয়ে তারা তাদের প্রকৃত শত্রু কে তাহা উপলব্ধি করতে না পেরে সাম্প্রদায়িক ভাবে লুট তরাজে লিপ্ত হয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে, এই যে সমস্ত মোল্লারা ঐ সমস্ত কৃষকদের শোষণ করে বিপথে চালিত করেছে তারা কি তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করবে? তাদের জমী জমা চাষ কে করবে? এখন মোল্লা, মৌলবীরা কোথায়?

———

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের **মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার** ফস বের হয়েছে, অবশ্য গেজেট এখনো হয়নি। প্রথম বিভাগে ৪৬১৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩২৬৬ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৫০৪ জন পাস্ করেছে। পরীক্ষা দেবার জন্যে মোট ১৫৭৫৪ জন ছাত্রের নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়েছিল। পাস করেছে ৮৩৮৮ জন।

শতকরা পাসের হার

১৯২৭ সন	৫৩·৯
১৯২৬ সন	৫৭·২
১৯২৫ সন	৭৩·৮
১৯২৪ সন	৭৭·৫
১৯২৩ সন	৭৪·০৪
১৯২২ সন	৭৯·০৯

বাজারে জনরব যে মুন্‌শীগঞ্জ কেন্দ্রের একটি ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস্ কমিটি বোম্বে অধিবেশন

———

বোম্বেতে অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং হচ্ছে। আজ বুধবারে আমরা যখন এ খবর লিখছি তখনো মিটিংএর কাজ শেষ হওয়ার খবর আসেনি। কংগ্রেসের কার্য্যকরী কমিটি হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তা গ্রহণ করার জন্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন। রিপোর্টের মর্ম্ম এই যে প্রাদেশিক ও ভারতীয় আইন সভায় সংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের জন্যে জায়গা রক্ষিত থাকবে। কিন্তু তাঁদের নির্ব্বাচন সমবেত ভাবে হবে। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানকেও শাসন সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সিন্ধু দেশকে একটি পৃথক প্রদেশ পরিণত করা হবে। এ প্রস্তাব অত্যধিক সংখ্যক ভোটের দ্বারা পাস হয়ে গেছে। আগামী বারে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

———

বেঙ্গল জুট্ ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন

—•—

গত ৮ই মে ১৯২৭ রবিবার দিন বাংলার চটকলের কর্ম্মচারীদের সমিতি "বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স্ এসোসিয়েশনের" কার্য্যকরী সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহিত হইয়াছে।

১। যেহেতু ভাটপাড়ার Reliance Jute Mills company বিনা নোটিশে কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার অন্যায় অজুহাতে বহুতর কর্ম্মচারীর বেতন বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন ও পরে আদালত কর্ত্তৃক তাহাদের এই অধিকার অগ্রাহ্য হইয়াছে, সেই হেতু এই সভা উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছে যে তাহারা যেন অতঃপর ঐ বে-আইনী কাজ হইতে নিরস্ত হইয়া দরিদ্র কর্ম্মচারীদের পরিশ্রম সাধ্য বেতন আদালতের সাহায্য ব্যতীতই পাইবার সুযোগ দেন।

২। এই সভা বাংলার চটকল সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন যে তাহারা যেন তাহাদের কারখানাগুলি হইতে সত্বর "ঘুস" এবং "ডালি" দেওয়ার কুপ্রথা তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের দুর্নাম ও কর্ম্মচারীদের আর্থিক ক্ষতি নিবারণ করেন।

৩। এই সভা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের নিকট বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন যে তাহারা যেন বাংলার কলকারখানা গুলিতে নিযুক্ত শ্রমিক শিশুদের শিক্ষা ও রক্ষার জন্য সত্বর উপযুক্ত সংখ্যক অবৈতনিক স্কুল এবং শিশু পালনাগার (creches) প্রতিষ্ঠার জন্য কারখানার মালিকগণের সাহাযে আবশ্যক উপায় অবলম্বন করেন।

৪। এই সভা ভারত গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছে যে কারখানার আইন অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগকে "কর্ম্মচারীদের ক্ষতি পূরণ আইনের" (Worksmen's Compensation Act) কথা "কারখানা আইনের" (Factoris Act) ন্যায় অবগত করাইবার জন্য সত্বর আবশ্যক উপায় অবলম্বন করেন।

———

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১॥৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 87, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the

PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে মে ১৯২৭, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ | ১৬শ সংখ্যা

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভা

বর্ত্তমান মে মাসের ২৯শে তারিখ রবিবার অপরাহ্ণ ঠিক্ ৪ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির এক সভার অধিবেশন কলিকাতা, ৩৭, হ্যারিসন রোডস্থিত দলের কার্য্যালয়ে হবে। এ সভায় দলের অর্থ সমস্যা, প্রচার ও সংগঠন কার্য্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করা হবে। কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিব সদস্য মাত্রেরই এ সভায় যোগদান করা একান্ত প্রার্থনীয়। এ সম্বন্ধে সদস্য গণকে অন্য কোনো পৃথক পত্র লিখা হবে না।

মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক খান
অস্থায়ী সম্পাদক,
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল।

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ / শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে মে, ১৯২৭, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪	১৬শ সংখ্যা

অভ্যুত্থান

—*—

[আবদুল কাদের]

—*—

আজিকে রক্ত উৎসব হে।
জীবনের মহা আহ্বান বাজে ভীরুরা থামাও কলরব হে॥

রণ-গান গাহে শ্রমিক-জোয়ান,
ঝুলি ফেলি' চলে দীন-ভগবান,
কৃষাণ জাগিচে, শুনিচে বিষাণ,
মৃত লভে প্রাণ
জীবনের নব অনুভব হে॥

মুক্তি-বিধাতা শক্তির বাগে
উৎপাদকের উত্থান মাগে,
জাগে নির্জ্জিত, নির্জ্জীব জাগে,
প্রলয়ের রাগে
জাগে অভিযান অভিনব হে॥

বঞ্চিত হৃত দাঁড়ায়েছে সারে,
আপনার ভাগ নেবে অধিকারে;
আসে যাত্রীরা রাত্রির পারে,—
সঞ্চয়-ভারে
সঞ্চয়ী মানে পরাভব হে॥

—০—

মুক্তি-সংগ্রাম

—•—

[মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ]

—•—

মুক্তিলাভের জন্যে যে আমাদিগকে অপরিহার্য্যরূপে সংগ্রাম চালাতে হবে এ বিষয়ে কোনো প্রকারের মতভেদ থাকতে পারে না। নরম পন্থী, গরম পন্থী ও মধ্য পন্থী সকলেই সংগ্রামের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। কিন্তু, সংগ্রামের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেন, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতে পারলেই মুক্তি লাভ হয়ে যাবে। কেউ কেউ মনে করেন যে কেবল মাত্র বাইরেকার বক্তৃতার দ্বারা কিছুই হবে না, বিভিন্ন ব্যাবস্থাপক সভায় প্রবেশ করে সরকারের কোনো কোনো কাজে বাধা প্রদান করলেই মুক্তি আপনা থেকে আমাদের ঘরের দুয়ারে এসে উপস্থিত হবে। আবার কাহারো কাহারো মতে গুপ্ত ত্রাসনীতি অবলম্বন করাই সত্যকারের মুক্তির পথ।

ওপরের কোনো দলেরই অবলম্বিত নীতি সত্যকারের মুক্তি-সংগ্রাম ত নয়ই, পরন্তু, অনেক দলের প্রচেষ্টা হচ্ছে সত্যকারের মুক্তি-সংগ্রামকে ধামা চাপা দিয়ে রাখা।

বন্ধন-মুক্ত হবার জন্যে হাত পা নাড়ার পূর্ব্বেই আমাদিগকে জেনে নিতে হবে বন্ধনটা কিসের। বন্ধনের স্বরূপ না চিনে তা' থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা আর আঁধারে ঢু মারা একই কথা।

জাতীয় স্বাধীনতা সব সময়ে সত্যকারের স্বাধীনতা নয়। চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাধীন দেশ হলেও অর্থ-নীতিক ও সামাজিক ভাবে চীন বড় বেশী পদানত হয়ে আছে। প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে বন্ধনের যন্ত্রণা অনুভব করে করে চীনের জনগণ ভালো করে বুঝে নিয়েছে কিসের বন্ধনে তারা জর্জ্জরিত হয়ে আছে। তাই, আজ স্বাধীন চীনকেও মুক্তির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রাম ত করতে হবেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনীতিক মুক্তির জন্যেও তাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হবে।

সারা বিশ্বে বন্ধনের একটি মাত্র সূত্র রয়েছে। সে সূত্র হচ্ছে বুর্জ্জোয়াজিগণের বন্ধনের সূত্র। উৎপাদনের উপায় সমূহকে কবলগত করে যারা জনগণকে শোষণ করে থাকে তাদেরকেই বুর্জ্জোয়াজি বলা হয়। এই বুর্জ্জোয়াজিগণ যখন আপন আপন দেশের উৎপাদকগণকে শোষণ করে থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় ধনিক। (আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্যে আমরা ভারতবর্ষের জমীদারও কারখানার মালিক প্রভৃতি শোষকগণকে ধনিক নামেই অভিহিত করব)। ধনিকদের কারবার যখন খুব বিস্তৃতি লাভ করে তখন তারা কাঁচা মাল পাওয়ায় জন্যে ও পাকা মাল চালাবার জন্যে অন্য দেশেও তাদের কারবারকে প্রসারিত করে থাকে। তখন তাদের উদ্দেশ্য হয় সে দেশকে অর্থনীতিক হিসাবে পদানত করে শোষণ করা। বৃহৎ মূলধনকে কেন্দ্রীভূত করে এই যে ভিন্ন দেশকে অর্থনীতিক হিসাবে পদানত করে শোষণ করা হয় এরই নাম হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজম। বাংলায় আমরা শোষণবাদই বলব। এখানে একটি কথা বলে রাখা আমরা আবশ্যক মনে করছি। জগতের শ্রমিক আন্দোলনের খবর রাখেন না বলে আমাদের দেশে অনেকেই "ইম্পিরিয়েলিজম"এর মানে ঠিক মত বুঝে উঠতে পারেন নি। তাঁরা মনে করে থাকেন যে সাম্রাজ্যের বিস্তারকেই ইম্পিরিয়েলিজম বলা হয়। আমাদের অধিকাংশ বাংলা খবরের কাগজ ওয়ালারা "ইম্পিরিয়েলিজম" শব্দের বাংলায় তরজমা করে থাকেন সাম্রাজ্যবাদ।" কানপুরে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা যখন হচ্ছিল তখন অনেক চেষ্টা করেও আমরা বিবাদী পক্ষের দু'জন ব্যবহারজীবকে "ইম্পিরিয়েলিজম"এর মানে বোঝাতে পারিনি। তাঁরাও বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমকে বৃটিশ সাম্রাজ্যই ধরে নিয়েছিলেন। উক্ত মোকদ্দমার অভিযুক্তগণ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু, তাঁদের ব্যবহারজীবরা সেটাকে ধরে নিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্য। ফলে, আসামীগণকে চার বছরের কারাবাসের হুকুম দিতে জজকে এতটুকুও বেগ পেতে হল না। ইম্পিরিয়েলিজম আর এম্পায়ার (সাম্রাজ্য) এক কথা নয়। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর হতে বের হয়ে গেলেও ভারতবর্ষে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম থাকতে পারে। চীন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্তি না হলেও বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম চীনে অত্যন্ত তীব্রভাবে বর্ত্তমান রয়েছে।

ভারতবর্ষে শুধু যে বৃটিশ শোষণবাদ বিদ্যমান রয়েছে তা নয়, এদেশে বৃটিশের শোষণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেন্টও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম আগে একান্ত ভাবে ভারতবর্ষকে শোষণ করার পক্ষপাতী ছিল। ভারতে শিল্পানুষ্ঠান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এটা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম পূর্ব্বে কিছুতেই পসন্দ করেনি। কিন্তু, যুদ্ধের সময় হতে ইম্পিরিয়েলিজম সে নীতির পরিবর্ত্তন করেছে। রুষে শ্রমিকগণের গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকল দেশের ইম্পিরিয়েলিজমই তাদের নীতির পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম শুধু যে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠান পূর্ণ করে তুলছে তা নয়, পরন্তু, ভারতের ধনিকগণকেও আপনাদের দলে টেনে নিয়েছে। ভারতে বৃটিশ "ইম্পিরিয়েলিজম"এর বর্ত্তমান নীতি হচ্ছে ভারতের ধনিকগণের সহিত ভাগাভাগি করে ভারতের জনগণকে শোষণ করা।

কাজে কাজেই, ভারতের জনগণের বন্ধন হচ্ছে বৃটিশ শোষণবাদ ও দেশীয় ধনিকবাদের বন্ধন। ভারতের কৃষকও শ্রমিকগণ ঘরে-বাইরে উভয় দিক থেকেই শোষিত ও লুণ্ঠিত হচ্ছে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্ একদিকে কাঁচামালের ব্যাপারে কৃষকদিগকে শোষণ করছে, আর একদিক থেকে এ দেশে কারখানা স্থাপিত করে ভারতীয় শ্রমিকদিগকে তাদের শ্রমলব্ধ ধন থেকে বঞ্চিত করছে। শুধু কি তাই? ভারতীয় শ্রমিকগণকে পশুত্বে অবনমিত করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের মত জীবন তারা যাপন করতে পারছে না। শ্রমিকদিগের এমন হীনাবস্থা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। যে ঘরে তারা বাস করে সে ঘর মনুষ্যজাতির বাসোপযোগী একেবারেই নয়। যে খাদ্য তারা খায় তা মানুষের খাদ্য নয়, আর যে পোষাক তারা পরতে পায় তা-ও মানুষের পোষাক নয়। দেশীয় ধনিকেরাও কারখানার মালিকরূপে, ভূমির মালিকরূপে ও সুদের ওপরে টাকা লগ্নিকারী মহাজন রূপে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করছে।

মোটামুটি ভাবে ধরতে গেলে সমাজে এখন দু'টি পক্ষ বর্ত্তমান। এক পক্ষ হচ্ছে শোষকের আর এক পক্ষ হচ্ছে শোষিতের। একপক্ষে উৎপাদনের উপায় সমূহের মুষ্টিমেয়

অধিকারিগণ, আর একপক্ষে অগণিত শোষিত উৎপাদকের দল। এই দু'শ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম চলে এসেছে সে সংগ্রামই হচ্ছে সত্যিকারের মুক্তি-সংগ্রাম। শ্রেণী-সংগ্রাম নামে এ সংগ্রাম অভিহিত হয়ে থাকে। সমাজের সর্ব্ববিধ বিপ্লব ও বিবর্ত্তন শ্রেণী-সংগ্রামেরই ভিতর দিয়ে সাধিত হয়ে থাকে।

ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন কোনো দৃঢ়ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃগণ আমলাতন্ত্রকেই যত গালি দিয়ে থাকে, কিন্তু, আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে দায়ী "ইম্পিরিয়েলিজম" এর সম্বন্ধে কোনো কথাই তাঁরা উচ্চারণ করেন না। দেশীয় শোষণকারীদের বিরুদ্ধেও তাঁরা কোনো কথা বলেন না। তার কারণ এই হচ্ছে যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃগণের কেউ কেউ শোষক শ্রেণীর লোক, কেউবা শোষক শ্রেণীর আশ্রিত লোক। কাজেই, তাঁরা কোনো প্রকারেই শ্রেণী-সংগ্রামে জনগণের পক্ষাবলম্বন করতে পারেন না।

গান্ধী স্বয়ং সব সময়ে আহ্‌মদাবাদের কলের মালিক গণের সাহায্যের ভিখারী হয়ে থাকেন। কলওয়ালাদের সাহায্য না পেলে তাঁর প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণ করা চলেনা। কলের মালিকরা যতই শ্রমিকদিগকে শোষণ করুক না কেন, গান্ধীর মতে তারা শ্রমিকগণের মনিব। মানবের সাথে কোনো প্রকারের ঝগড়া না করে সদ্ভাব স্থাপন করাই হচ্ছে তাঁর মতে শ্রমিকের কর্ত্তব্য। পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশও শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষে শ্রেণী-সংগ্রাম নামক কোনো জিনিসের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। শ্রেণী সংগ্রাম ঐতিহাসিক সত্য, এবং সকল দেশের জন্যেই সত্য এ কথা যে চিত্তরঞ্জন দাশের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত লোক বুঝতেন না এমন কথা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নই। তিনি সবই বুঝতেন, তবে তাঁকে তাঁর দলের কাজ চালাবার জন্যে সময়ে অসময়ে টাকার জন্যে ধনিকদের নিকটে হাত পাততে হত বলে তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের নীতি প্রকাশ্যে মেনে নিতে পারতেন না। লাহোরে ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন সে বক্তৃতা একবার সকলকে পড়ে দেখ্‌তে আমরা অনুরোধ করছি। তাঁর সে বক্তৃতা শ্রেণী-সংগ্রামের নীতির ওপরেই তিনি প্রদান করেছিলেন।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাইরে নয়। পৃথিবীর আর সব জায়গায় যেমন জনগণ শোষিত হচ্ছে ভারতবর্ষে কৃষক ও শ্রমিকগণ তার চেয়ে অনেক বেশী শোষিত হচ্ছে। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের কোনো মূল্যই নেই যদি সে সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে চালিত না হয়। শাসন-সংস্কারের দ্বারা আরো অধিক সংখ্যক সরকারী চাকুরী ভারতবাসীরা পেলে, এমন কি ভারতের লোক লাট-বেলাট পর্য্যন্ত হলেও ভারতের মুক্তি সাধিত হতে পারে না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করেও ভারতবর্ষ পরাধীনই থেকে যাবে। এ প্রকারের পরিবর্ত্তনের দ্বারা ভারতের শোষক শ্রেণীর লোকেরই সুবিধা হবে, কিন্তু জনগণের অবস্থা হবে আরো অধিকতর শোচনীয়। এমন কি ভারতবর্ষ যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেও চলে যায়, অথচ ভারতীয় ধনিকগণের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ভারতে বর্ত্তমান থাকে, সে অবস্থাতেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, বলা যেতে পারে না। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ও ভারতীয় ধনিকবাদের শোষণ হতে ভারতের জনগণ সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হলেই ভারতবর্ষ সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ করবে। সমাজের উচ্চস্তরের লোক গণের সুবিধার জন্যে যদি কোনো পরিবর্ত্তন সাধিত হয় সে পরিবর্ত্তনকে স্বাধীনতা কিছুতেই বলা যেতে পারে না।

শ্রেণী-সংগ্রামই সত্যকারের মুক্তি সংগ্রাম। মানব জাতির ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস। এ ইতিহাসকে ধামা চাপা দেওয়ার কোনো শক্তি কাহারো নেই। উৎপাদনের বৃহৎ উপায় গুলিকে হস্তাগত করে দেশের ধনসম্পদকে কতিপয় লোক আপনাদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। এই কারণে দিনের পর দিন যারা আপনাদের পরিশ্রমের কড়ি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেই জনগণের সংগ্রামই সত্যকারের মুক্তি-সংগ্রাম আর তাদের অভ্যুত্থানই সত্যকারের বিপ্লব।

ট্রেড ইউনিয়নিজম

বা

শ্রমিক-সঙ্ঘবাদ

(এ প্রবন্ধটি একজন বৃটিশ ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্ট বা শ্রমিকসঙ্ঘ-বাদীর লেখা। ভারতীয় শ্রমিকগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে এসেই তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। বোম্বের "ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্‌ন্যাল হেরাল্ড" নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কৃপানুমতি নিয়েই আমরা এ প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ গণবাণীতে প্রকাশ করলেম। এ প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে বের হবে। ইতোপূর্ব্বে ১০ম, ১২শ ও ১৪শ সংখ্যক গণবাণীতে প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে।)

—০—

আন্তর্জ্জাতিক সংগঠন

স্বভাবতই যেমন আশা করা যায়, জাতীয় সঙ্ঘ সমূহে যে অনৈক্য বর্ত্তমান আছে তেমন অনৈক্য আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ সমূহেও প্রতিভাত হচ্ছে। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে আমষ্টার্ডাম ও মস্কোতে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের দু'টি আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র আছে। জগতের শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের তিন ভাগের দু'ভাগ এ দু'টি আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশিষ্ট এক ভাগের কোনো আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ নেই।

আমষ্টার্ডাম আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব যুদ্ধের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, যুদ্ধের প্রারম্ভ হতেই তা ভেঙে পড়ে। শ্রমিকগণের আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ সংযোগের কথা ঘোষণা করে এ কেন্দ্র হতে প্রস্তাব সমূহ পাস হয়েছিল। বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্যে দরকার হলে আন্তর্জ্জাতিক গণ-অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করা হবে, এরূপও মীমাংসা করা হয়েছিল। কিন্তু, কাজের সময় যখন আস্‌ল তখন দেখা গেল যে নেতৃগণের আন্তর্জ্জাতিক ভাব-প্রবণতার ওপরে জাতীয়ত্বের প্রতীতিই বিজয় লাভ করেছে। ফলে, আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র ভেঙে গেল এবং আগেকার কতিপয় আন্তর্জ্জাতীয়ত্ববাদী তাদের আপন আপন গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত গোঁড়া সমর্থক হয়ে পড়ল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হতেই ১৯১৯ সনে শ্রমিক আন্দোলনকে আবার আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তির ওপরে সংহত করার জন্যে চেষ্টা করা হলো। এইরূপে আমষ্টার্ডামের আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র আবার পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠল। আশ্চর্য্যের

বিবদ যে যুদ্ধ ব্যাপারে তাদের কর্ত্তব্য হীনতা সত্বেও আমষ্টা-র্ডামের নেতৃগণের তাতে একটুকু ক্ষতি হয়নি। আগেকার সেই রাষ্ট্র নৈতিক ও গাঠনিক ভিত্তির ওপরেই আন্তর্জাতিক কেন্দ্র পুনর্গঠিত হলো।

মস্কো আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

জগতের ইতিহাসের আর একটি সমান উল্লেখ যোগ্য ঘটনা—রুষের বিপ্লব—যুদ্ধের পূর্ব্বকার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের আমূল সংস্কার মতাবলম্বীদের ওপরে সম্পূর্ণ পৃথক ক্রিয়া করেছিল। তাঁদের মতে জাতীয়ত্ব বাদী সোশ্যালিষ্টগণের কর্ত্তৃত্বাধীন পরিচালিত পুরাতন আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের যত সব মিথ্যা 'থিওরি' ও গাঠনিক দোষ নির্দ্দয়ভাবে যুদ্ধের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। অন্য পক্ষে তাঁদের নিজেদের 'থিওরি''র সত্যতা রুষের শ্রমিকগণের বিজয়ের দ্বারা আরো বেশী করে প্রমাণিত হয়েছিল। এর ফলে, ১৯২০ সনে মস্কো ইন্টার ন্যাশন্যাল বা আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপিত হলো। দু'টো ইন্টার ন্যাশন্যালের থিওরি বা মতগত পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে আমরা প্রথমেই গাঠনিক পার্থক্য গুলিকে পরীক্ষা করে দেখ্‌ব।

আমষ্টার্ডামের ইন্টার ন্যাশন্যাল কতকগুলি জাতীয়ভাবে পূর্ণ আত্ম-সম্পূর্ণ কেন্দ্রের একটা ফেডারেশন বা সান্ধি সূত্রে মিলিত সঙ্ঘ। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখানো যেতে পারে যে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বৃটেন্ সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি আপনার হাতেই রেখেছে। কেবল মাত্র আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রশ্নের ওপরেই ইন্টার ন্যাশন্যাল চূড়ান্ত মত প্রকাশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াও আমষ্টার্ডাম ইন্টার ন্যাশন্যালে বিভিন্ন ব্যবসায়ের শ্রমিকগণের অনেক গুলি আন্তর্জাতিক সেক্রেটারিয়েট বা দফতর আছে। এগুলি হচ্ছে এক একটি বিশিষ্ট শিল্পের ইন্টার ন্যাশন্যাল ফেডারেশন; যেমন ধাতুর কারখানার শ্রমিকগণের ইন্টার ন্যাশন্যাল, খনির শ্রমিকগণের ইন্টার ন্যাশন্যাল ইত্যাদি। আমষ্টার্ডাম ইন্টার ন্যাশন্যালের অন্তর্ভুক্ত এ প্রকারের ২৮টি সংগঠন রয়েছে। মূল সংগঠনের ন্যায় এর প্রত্যেকটিই অসংবদ্ধ ফেডারেশন বিশেষ। নিছক আন্তর্জাতিক সমস্যা ব্যতীত অন্য কিছুর ওপরে এ সবের কোনোই ক্ষমতা চলে না।

সংগঠনের এরূপ অসংবদ্ধত্বই হচ্ছে আমষ্টার্ডাম আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য। আর তাদের এ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মস্কোর সহিত তাদের প্রধান গাঠনিক পার্থক্য। মস্কো ইন্টার ন্যাশন্যালের নেতৃগণের মতে অসংবদ্ধ সংগঠনকে কিছুতেই যথেষ্ট বলে মেনে নিতে পারা যায় না। তাঁদের মতে প্রত্যেক জাতীয় প্রশ্নের মধ্যেই একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে। অন্যদেশে বিদ্যমান অবস্থা সমূহের সহিত প্রত্যেকে দেশেরই একটা সাক্ষাৎ সংস্রব রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভারতের কাপড়ের কলের শ্রমিকগণের সম্বন্ধ রয়েছে তাদের জাপানের ভাইদের সহিত। তাঁরা আন্তর্জাতিক উৎকৃষ্ট ধনিক সংগঠনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এ সংগঠন কত যোগাযোগের সহিত এক দেশের সহিত আর এক দেশের বিরোধ বাধিয়ে দিচ্ছে। সকল দেশের শ্রমিক সঙ্ঘগুলি একটি মাত্র আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে সংহত হওয়ার জন্যে তাঁরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছেন। তাঁরা চান এমন নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে যা সমগ্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে কাজ করতে সমর্থ হবে।

মস্কো ইন্টার ন্যাশন্যালের যান্ত্রিক গঠন নিখুঁত না হলেও এরূপ বিশ্বাসের ওপরে গঠিত হয়েছে। জাতীয় অনুষ্ঠানের কার্য্যাবলীকে সঙ্কুচিত না করে কিংবা জাতীয় বিভাগ গুলির অনুপ্রেরণাকে ধ্বংস না করেই কেন্দ্র সংগঠন সদরে একটা প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে চায়।

শ্রমিক সঙ্ঘবাদের আকার

ট্রেড ইউনিয়নিজম বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদের গঠনের চর্চ্চা ত্যাগ করার পূর্ব্বে আমরা শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের বিভিন্ন আকারের প্রতি আমাদের মনোযোগ প্রদান করব।

শ্রমিক সঙ্ঘবাদের তিনটি প্রধান আকার রয়েছে :—

১। বিশিষ্ট ব্যবসায় সংক্রান্ত সঙ্ঘবাদ

২। সাধারণ সঙ্ঘবাদ

৩। বৃহৎ শিল্পানুষ্ঠান সংক্রান্ত সঙ্ঘবাদ

বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের সংগঠনগুলি (Craft Unions) হচ্ছে সঙ্ঘ সমূহের প্রাচীনতম আকার। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক আন্দোলনের অতি প্রাথমিক যুগ হতেই এগুলি গঠিত হয়ে আসছে। নামের দ্বারাই সূচিত হচ্ছে যে এ ইউনিয়ন গুলির কর্ম্মক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। তারা শ্রমিকদিগকে ব্যবসায় গত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়। অর্থাৎ তাদের মতে ইঞ্জিনিয়ার, ছুতার মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী ও ইঞ্জিন চালক এ সকলেরই পৃথক পৃথক সঙ্ঘ হওয়া উচিত।

সাধারণ সঙ্ঘগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে গঠিত হয়েছে। এরূপ সঙ্ঘের উদ্ভব ইংল্যাণ্ডে ১৮৮০ সনে হয়েছে। গোড়ায় এ ইউনিয়নগুলি ঐ সমস্ত শ্রমিকের জন্যে গঠিত হয়েছিল যারা কোনো বিশিষ্ট ব্যবসায়ের সহিত সংসৃষ্ট ছিলনা, যেমন ডকের ও বিল্ডিংএর সাময়িক শ্রমিকগণ ইত্যাদি।

ক্রমশঃ সাধারণ সঙ্ঘগুলিকে আরো সম্প্রসারিত করায় ধারণার উৎকর্ষ সাধিত হলো। এ প্রকারের প্রধান দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের ট্রান্সপোর্ট ও জেনেরেল ওয়ার্কার্স্ ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা ৫ লক্ষ। ডকের শ্রমিক, নাবিক, বাসচালক ও সাময়িক শ্রমিকগণ এ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ শ্রেণীর শ্রমিক সঙ্ঘগুলির উদ্দেশ্য বৃহত্তর স্বার্থ সংযোগ হলেও এর দুর্ব্বলতাও আছে। এর দ্বারা এমন সব ব্যবসায়ের শ্রমিকগণকে একত্র করা হয়েছে যাদের স্বার্থ ঠিক এক নয়। ফলে, যারা দুর্ব্বল তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া একেবারে বন্ধ না হলেও অতি সামান্য মাত্র দেওয়া হয়। সাধারণ সঙ্ঘবাদের আরো মারাত্মক দোষ এই হচ্ছে যে শ্রমিকদিগকে মণ্ডলীতে বিভক্ত করে তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত এর দ্বারা করা হচ্ছে না। অথচ আধুনিক শিল্পানুষ্ঠানের প্রক্রিয়ার দ্বারা এরূপ মণ্ডলী বিভাগ আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

এ দিক থেকে বিচার করে দেখ্‌লে শ্রমিক সঙ্ঘের তৃতীয় আকার অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পানুষ্ঠানের সঙ্ঘবাদই উৎকৃষ্টতম। ব্যবসায় গত সঙ্ঘ গুলি সংহত শ্রমিকদের মধ্যে অনাবশ্যক উপবিভাগের সৃষ্টি করে থাকে। সাধারণ সঙ্ঘগুলি এই ভুল অতিক্রম করতে যেয়ে উল্টোদিকে চরমে পৌঁছেচে। সমস্বার্থ সংযোগের জন্যে ফলপ্রসূ সঙ্ঘের সংগঠনে এরা জলাঞ্জলি দিয়েছে। এ সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্যে একমাত্র উপায় হচ্ছে শিল্পানুষ্ঠান হিসাবে সঙ্ঘ গঠন করা। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এ আকারের সংগঠন বর্দ্ধিত হয়েছে। এ প্রকারের সংগঠন হচ্ছে অত্যন্ত বেশী রূপ কেন্দ্রীভূত উৎপাদন প্রণালীর ফল। শিল্পানুষ্ঠান মূলক সঙ্ঘ গুলি শ্রমিকরা যে যে কারখানায় নিযুক্ত হয় সে কারখানার হিসাবে সাক্ষাৎভাবে তাদেরকে

সঙ্ঘবদ্ধ করে থাকে। তার পরে তাদের বিশিষ্ট কাজ হিসাবে শাখা বিভাগ করা হয়।

ইংল্যাণ্ডের রেলওয়ে শ্রমিকগণের জাতীয় সঙ্ঘ শিল্পানুষ্ঠান মূলক সঙ্ঘের একটা বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। রেলওয়ে সংক্রান্ত যাবতীয় শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই এ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ট্রান্সপোর্টের এই শাখার সঙ্ঘের অনেক উপবিভাগ আছে; যেমন রেলওয়ে ক্লার্ক, সিগ্ন্যাল মেন, মুটে, আগুনওয়ালা, চালক, স্থায়ী ওয়েম্যান প্রভৃতি। এই বিভিন্ন শাখা গুলির প্রতিনিধিগণ ইউনিয়নের উচ্চতম কমিটির সভ্য হয়ে থাকেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ডিষ্ট্রীক্টে বিভাগীয় কমিটি সমূহ গঠিত হয়েছে। এ প্রকার সংগঠনের দ্বারা বিভিন্ন শাখার দাবী ও অভিযোগ গুলির প্রতি কখনো ঔদাসীন্য প্রদর্শন হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শিল্পানুষ্ঠানের তরফ থেকে খুব দৃঢ় ভাবে নিয়োগকারিগণের সম্মুখীন হতে পারা যায়।

সংগঠনের ভিত্তি

শিল্পানুষ্ঠান মূলক সঙ্ঘবাদের আরো নিয়মাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে কারখানার স্থিতিই হচ্ছে সংগঠনের ভিত্তি। রেলওয়ে কারখানার মিকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারও একজন রেলওয়ে শ্রমিক এবং রেওলয়ে সঙ্ঘতেই তার যোগদান করা কর্ত্তব্য। একজন ছুতোর যদি জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানায় নিযুক্ত হয় তা-হলে তাকে জাহাজ নির্ম্মাণ-কারী শ্রমিকদের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হতে হয়। আর একজন শ্রমিক যদি গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে নিয়োজিত হয় তা-হলে সে গৃহ নির্ম্মাণ শিল্পের লোক। তাকে রাজমিস্ত্রী ও ইটওয়ালা প্রভৃতির সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

তিন আকারের সঙ্ঘবাদের মধ্যে মনে হয় যে ব্যবসায়গত সঙ্ঘবাদই বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু, অধুনা তাদের অযোগ্যতা পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। শক্তিশালী ফেডারেশন ও সম্মিলন সমূহের মধ্যবর্ত্তিতায় ব্যবসায় গত সঙ্ঘবাদের ধারণা এখন দ্রুত তিরোহিত হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণীর ফলপ্রসূ ও অর্থনীতিক বন্দোবস্তের দিক থেকে দেখলে সাধারণ সঙ্ঘবাদের ধারণাও আর আদৃত হয় না। শিল্পানুষ্ঠান মূলক সঙ্ঘবাদ এর সমস্ত শাখা উপশাখা সহ জাতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হবে—এটাই হচ্ছে সকল উন্নত দেশের উন্নতিশীল শ্রমিক সংঘবাদীর উদ্দেশ্য।

—•—

স্বরাজ ও গণতন্ত্র

—*—

(ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক)

—•—

স্বরাজ আমাদের সাধনমন্ত্র, কিন্তু কোন বিশিষ্টপথ অনুসরণ করিয়া চলিলে যে আমরা স্বরাজ সাধন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব তাহাই বর্ত্তমানের একটা মহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যে প্রণালীতে এতদিন আমরা স্বরাজের সাধনা করিয়া আসিয়াছি তাহাতে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, কিংবা আদৌ অগ্রসর হইয়াছি কিনা—কিংবা স্থাণুর মত অসাড় নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিংবা পিছাইয়া পড়িয়াছি, তাহা চিন্তা করিবার প্রকৃষ্ট সময় আজ আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাবিতে গিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে দৃশ্যপটের অন্তরাল হইতে একটা কোন অজানা শক্তি আমাদের সাধন পথের মহাবিঘ্নরূপে আড় হইয়া সাধন মন্ত্রে সিদ্ধির ছোঁয়াছ লাগিতে দিতেছে না; এই শক্তি এতদিন প্রচ্ছন্ন ভাবে সাধন সম্পদকে নির্ব্বীর্য্য করিবার প্রয়াস করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কার্য্য কারণের অপরিহার্য্য পরিণতিতে কৃত্রিমতার মুখোস খসিয়া পড়ায় সেই শক্তি আত্ম প্রবঞ্চনার হাত হইতে নিজকে মুক্ত করিতে কোনই পন্থা আর খুঁজিয়া পাইতেছে না। স্বরাজের ইতিহাস, মুক্তির ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইতিহাসের সত্যিকারের ধর্ম্মে এই শক্তিই দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জনপদে জনপদে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে, স্বরাজ সাধনার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেদীপ্যমান ছিল; কিন্তু আয়র্লণ্ডে ও ঈজিপ্টে সেদিন এই প্রতিকূল শক্তি যে ভাবে গণতন্ত্রের অপ্রতিহত শক্তিতে পরাজিত হইয়াছিল আমাদের তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের দেশেও যে কালে কালে গণতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে ও সংহত শক্তিতে এই প্রতিকূল শক্তি আপন অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে না তাহা অবিশ্বাস করিবার ন্যায় সঙ্গত কারণ কিছু থাকিতেই পারে না। সর্পে ভেকে, বিড়াল মার্জ্জারে ব্যাঘ্রে হরিণে যেরূপ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ গণতন্ত্রের সঙ্গেও এই প্রচ্ছন্ন শক্তি বা ধনতন্ত্রের ঠিক সেই একই সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের দোষ কি পরিমাণ তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে আমাদের নিজেদের আত্মকৃত অপরাধ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার কল্পে বদ্ধ পরিকর হইয়া গণশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একের অভ্যুত্থানে অন্যের পতন হইবেই হইবে। স্বরাজ আমাদের সাধনা, স্বরাজ আমাদের ধ্যান, স্বরাজ আমাদের জ্ঞান, স্বরাজ আমাদের কর্ম্ম, স্বরাজ আমাদের মুক্তি, স্বরাজ আমাদের শক্তি, স্বরাজ আমাদের প্রাণের প্রাণ সাধনার অবচেতনা। এস স্বরাজ সাধনার যাত্রী অপ্রতিহত বীর্য্যে ধনতন্ত্রবাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া গণতন্ত্রবাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করি। আমরা যে দিন সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধিরূপে সমস্ত ধনতন্ত্রবাদীদিগকে মনোনয়ন করিয়া ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহে প্রেরণ করিয়াছি সেইদিন স্বহস্তে হলাহল পান করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বরাজ সাধনায় মন্ত্র ধনতন্ত্রবাদের হস্তের ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা চাই মুক্তি, কিন্তু, মুক্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া ধনতন্ত্রবাদীর কুহকজালে পতিত হইয়া আমরা মুক্তির পরিবর্ত্তে আরও অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। মুক্তি যদি প্রাণের কামনা হয়, যদি সত্যকারের কথা হয় যদি বাস্তবিক আমরা অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া স্বরাজের পথের যাত্রী হই তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বরাজ আমাদের অতি নিকট। ধনতন্ত্রবাদীদের এই কুহকজাল ছিন্ন করিয়া মুক্তির মন্ত্রে, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। মুক্তি, স্বাধীনতা, স্বরাজ সহজ কথা নয়, সহজ লভ্য নয়, জাতীয়তাকে প্রবুদ্ধ করিয়া স্বরাজের পথে চলিতে হইবে। যদি স্বরাজ লাভ করিতে হয় তাহা হইলে নগর হইতে পল্লীর মাঠে মুক্তির সন্ধান করিতে হইবে। নগরের পঞ্চতল ইমারত নিবাসীর নিকট মুক্তির মুক্ত হাওয়ার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা শুধু শুষ্ক কণ্ঠ তালু হইব, মরীচিকায় জল অন্বেষণের মত নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিব। আরাম

কেদারায় বসিয়া ঢুলু ঢুলু আঁখিতে যদি মুক্তির বাণী কল্পনা করিতে পারিত তাহা হইলে দুঃখ দৈন্যের অবসান হইয়া শান্তির রাজত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত হইত; তাই বলিতেছি নগরের বিলাস ব্যসনের আবহাওয়ার অন্তরালে যে মাদকতা রহিয়াছে তাহা মুক্তিকামী স্বরাজ সাধকের কাম্য নয়। স্বরাজ সাধকের কাম্য পল্লীর কৃষকের অবস্থার সম্যক উপলব্ধি। যেদিন পল্লীর কৃষক সম্প্রদায় নিজেদের ন্যায্য অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে শিক্ষা করিবে সেই দিন প্রকৃত মুক্তির নিশ্বাস দেশের প্রাণে প্রবাহিত হইবে।

—•—

শ্রীপাদ্ অমৃত ডাঙ্গে

—:•:—

১৯২৪ সনে কানপুরে যে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা হয়েছিল তা বোধ হয় আমাদের পাঠকগণ এখনো ভুলে যাননি। এ মোকদ্দমায় দণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীপাদ্ অমৃত ডাঙ্গে কিঞ্চিদধিক ৩ বৎসর কাল প্রকৃত কারাদণ্ড ভোগ করার পর গত মঙ্গলবার (২৪শে মে) মুক্ত হয়েছেন। কানপুরে সাজা হওয়ার দেড়মাস পরে শ্রীযুত ডাঙ্গেকে যুক্ত প্রদেশের সীতাপুর ডিষ্ট্রীক্ট জেলে বদলী করা হয়েছিল। সেখানেই তিনি এতকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করে আসছিলেন। ছেড়ে দেওয়ার সময় আসন্ন হয়ে আসায় তাঁকে গত শনিবারে বোম্বের আর্থার জেলে পাঠানো হয়েছিল। এ জেল থেকেই তিনি মুক্তি লাভ করেছেন। সুদীর্ঘকাল পরে আজ আমরা বন্ধু ডাঙ্গেকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে পেয়ে অভিনন্দন করছি।



শ্রীপাদ্ অমৃত ডাঙ্গে

১৯২৪ সনের মার্চ্চ মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে সে গবর্ণমেণ্টের ডাইরেক্টর অব সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্স বিউরো লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সি, কে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১এ ধারা অনুসারে কানপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডব্লিউ, খৃষ্টীর আদালতে এক মোকদ্দমা আনয়ন করেন। এ মোকদ্দমায় আসামী ছিলেন আট জন। যথা:—

১। শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় (আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এম, এন, রায়)।
২। শ্রীযুত মালয়পুরম সিঙ্গারা ভেলু চেটিয়ার (মাদ্রাজ)।
৩। রামচরণ লাল শর্ম্মা
৪। অধ্যাপক গোলাম হোসেন
৫। শ্রীযুত নলিনী গুপ্ত
৬। মিঃ মোহাম্মদ শওকৎ উস্মানী
৭। মুজফ্ফর আহ্মদ
৮। শ্রীযুত শ্রীপাদ্ অমৃত ডাঙ্গে

এই আটজন অভিযুক্তের মধ্যে মুজফ্ফর আহমদ ও নলিনী গুপ্ত বাংলা দেশের কারাগারে, অধ্যাপক গোলাম হোসেন লাহোর সেণ্টাল জেলে এবং মোহাম্মদ শওকৎ উস্মানী পেশাওর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে পূর্ব্ব থেকেই বন্দী ছিলেন। মিঃ এম, এন, রায় ইউরোপে অবস্থান করছিলেন। সিঙ্গারা ভেলু চেটিয়ার মাদ্রাজ হাই-কোর্টের একজন উকিল। রামচরণ লাল শর্ম্মা পণ্ডিচেরীতে ফ্রান্স গবর্ণমেণ্টের আশ্রিতরূপে বাস করছিলেন, আর শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে বোম্বের তদানীন্তন "সোশ্যালিষ্ট" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদকতা করছিলেন।

আদালতে উপস্থিত করা হয়েছিল মাত্র ৪ জন অভিযুক্তকে। যথা:—

১। নলিনী গুপ্ত
২। মোহাম্মদ শওকৎ উস্মানী
৩। মুজফ্ফর আহ্মদ
৪। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে

মিঃ এম, এন, রায় ইউরোপে ছিলেন বলে তাঁকে আদালতে উপস্থিত করা সম্ভব পর হয়ে ওঠেনি। রামচরণ লাল শর্ম্মা ফরাসী ভারতে আশ্রিত ছিলেন বলে তাঁকেও আদালতে আনতে পারা যায় নি। অধ্যাপক গোলাম হোসেনের নাম থেকে মোকদ্দমা ভারতগবর্ণমেণ্ট তুলে নিয়েছিলেন। সিঙ্গারা ভেলু চেটিয়ার সে সময়ে জ্বরে ভুগছিলেন বলে ৫০ হাজার টাকার জামিনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ মোকদ্দমার বিচার কলিকাতা হাইকোর্টে, বোম্বে হাইকোর্টে, মাদ্রাজ হাইকোর্টে, লাহোরে কিংবা কানপুরে হতে পারত। কানপুরের বিচার করার অধিকার অনেকটা সন্দেহজনকই ছিল। তথাপি ভারত গবর্ণমেণ্ট কানপুরেই এ মোকদ্দমার বিচার করা স্থির করেছিলেন। মিঃ এইচ, ই, হোম্ নামক একজন সিবিলিয়ান জজ সেশনে মোকদ্দমার বিচার করেছিলেন। ইনি বিখ্যাত চৌরিচৌরার মোকদ্দমার বিচার করে ১৭২ জন কৃষককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। তাঁর এরূপ বিচারের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কোনো কোনো অভিযুক্ত প্রকাশ্যে লেখা লেখি করেছিলেন। সে সব দলিল পত্র মোকদ্দমায় নথির শামিলও হয়েছিল। কাজেই, মিঃ হোমের মন আগে থেকেই অভিযুক্তগণের প্রতি ভালো ছিল না। এ মোকদ্দমায় যে সকল কাগজ পত্র দাখিল করা হয়েছিল সে সমস্তের বিষয় ছিল মার্ক্সের মতবাদের দিক্ থেকে ভারতীয় জনগণের আন্দোলনের আলোচনা। এ বিষয় বোঝার জন্যে যেমন উকিলের প্রয়োজন

ছিল তেমন উকিল কানপুরে পাওয়া অভিযুক্তগণের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতা বোম্বে ও মান্দ্রাজের ন্যায় স্থানের উকিল ব্যারিষ্টারাও সুদীর্ঘকাল সমস্ত দলিল অধ্যয়ন করে তবে এ মোকদ্দমায় অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করতে পারতেন। সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ (এখন সার) রস অলষ্টন্ এ সব কাগজ পড়বার জন্যে এক বছরের সময় নিয়েছিলেন। একথা তিনি প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করেছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট্ জেনেরেল এস, আর, দাশের সহিত পরামর্শ করার জন্যে তাঁকে দু'বার কলিকাতাতেও আসতে হয়েছিল। অভিযুক্তগণ ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলে আবেদন করেছিলেন যে তাঁদের মোকদ্দমা কলিকাতা কিংবা বোম্বে হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করা হোক্। তাতে তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন যে মিঃ হোমের বিচারের তীব্র সমালোচনা যখন অভিযুক্তগণ করেছিলেন, যখন সে সব সমালোচনার কাগজ পত্র তাঁদের মোকদ্দমায় নথীর শামিল হয়েআছে তখন মিঃ হোম কিছুতেই নিরপেক্ষ মন নিয়ে মোকদ্দমার বিচার করতে পারবেন না। এত বড় মোকদ্দমার বিচার জুরির সাহায্যে হওয়া উচিত, কিন্তু, কানপুরে তা হবে না। তারপরে কলিকাতা কিংবা বোম্বেতে যেমন ভালো উকিল ব্যারিষ্টার পাওয়া যাবে তেমনটা যুক্তপ্রদেশে পাওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই কান দিলেন না। যে কোনো প্রকারেই হোক্ অভিযুক্তগণকে সাজা দেওয়াই বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত ছিল। সম্ভবতঃ মিঃ হোম্‌কেও সে উদ্দেশ্যেই কানপুরে পাঠানো হয়েছিল।

১৯২৪ সনের ২০শে মে তারিখে কানপুরের সেশন জজ মিঃ হোম্ বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রায় শুনিয়ে দিলেন যে উপস্থিত ৪ জন অভিযুক্তের প্রত্যেককেই ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। এর পরে সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ারের নাম থেকেও মোকদ্দমা তুলে নেওয়া হয়েছিল।

তারপরে কারাগারে নলিনী গুপ্ত ও মুজফফর আহমদ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে যখন নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন তাঁদেরকে ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে ১৯২৫ সনের জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে পরে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে এতদিন পরে মুক্ত হলেন। মোহাম্মদ শওকৎ উস্‌মানী এখনো দেরাদুন ডিষ্ট্রীক্ট জেলে অবরুদ্ধ আছেন। তাঁর শরীরও ভালো নয়। তিনি "রিমিশন" কম পেয়েছেন বলে আজো মুক্ত হতে পারেন নি। আগামী আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুক্তিলাভ করবেন এরূপ আশা করা যাচ্ছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘ

কলিকাতার ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘ (Indian Seamen's Union) অনেক দিনকার পুরাতন সঙ্ঘ। এ সঙ্ঘটির সভ্যগণের স্বার্থ-সংযোগের গতি উল্টোদিকে চলেছে। তার ফলে শুধু যে পুরাতন একটি সঙ্ঘ ভেঙে তিনটিতে পরিণত হয়েছে তা নয়, আরো একটি নূতন সঙ্ঘও সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে গঠিত হয়েছে। প্রথমে সমুদ্রগামী নাবিক মাত্রই ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘের সভ্য হতে পারত। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে নদীতে যে সকল ষ্টীমার চলাচল করে থাকে সে সমুদায়ের নাবিকগণের ভারতীয় নাবিক সমিতির সভ্য হওয়ার অধিকার ছিল না। তার পরে সুকানীগণ মূল সঙ্ঘ হতে পৃথক হয়ে কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন (Quarter Masters' Union) নাম দিয়ে সম্পূর্ণ নূতন সঙ্ঘ গঠন করে নিয়েছেন। নদী সমূহে চলাচলকারী ষ্টীমার সমূহের নাবিকগণও ম্যারিনার্স ইউনিয়ন (Mariners' Union) নাম দিয়ে আর একটি সঙ্ঘ গঠন করেছেন। এত বিচ্ছিন্ন হয়েও ব্যাপার মেটেনি। মূল সঙ্ঘটি আরো একবার ভেঙেছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সিমেন্স ইউনিয়ন (The Indian National Seamen's Union) নাম দিয়ে আর একটি সঙ্ঘও কিছুকাল পূর্ব্বে গঠিত হয়েছে। ভারতীয় নাবিকগণের সঙ্ঘ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সঙ্ঘরূপে গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কেননা নাবিকগণ দেশ বিদেশে যাওয়া আসা করে বলে উন্নত দেশ সমূহের হাওয়া তাদের গায়ে লেগে থাকে। কিন্তু, কার্য্যতঃ ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘ বা সঙ্ঘগুলি দিন দিনই দুর্ব্বল হতে দুর্ব্বলতর হচ্ছে। এর দুটো কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ এই হচ্ছে যে যাঁরা আপনা হতে নাবিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই ট্রেড্ ইউনিয়নিজম বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদ মোটেই বোঝেন না। দ্বিতীয় কারণ এই হচ্ছে যে নেতৃগণের অধিকাংশই স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে বা নাম করার জন্যে নাবিক সঙ্ঘ সমূহ গঠনে মনোনিবেশ করেছেন। তাই তাঁরা ততটুকুই মাত্র কাজ করে থাকেন যতটুকু তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি বা নামের জন্যে প্রয়োজন হয়ে থাকে। রোগীর মরা বাঁচাতে কিছুই এসে যায় না, মোল্লার প্রয়োজন হালুয়া আর রুটির।

পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহের শ্রমিক সঙ্ঘবাদীরা যখন শিল্পানুষ্ঠান মূলক সঙ্ঘ গঠনে ব্যাপৃত হয়েছেন তখন কলিকাতা নাবিক সঙ্ঘের নেতৃগণ সঙ্ঘটিকে ভেঙে নানা ভাগে বিভক্ত করে ব্যবসায় গত সঙ্ঘ করে তুলেছেন। সত্য বটে মিঃ দাউদের মৌরসী মোকর্‌ররী নেতৃত্বের সহিত ঠোকাঠুকি বেধেছিল বলে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সিমেন্স ইউনিয়ন"টি পৃথক ভাবে গঠিত হয়েছে। কিন্তু, অপর দু'টি সঙ্ঘ কোনো প্রকারের ঝগড়ারফলে পৃথকভাবে গঠিত হয়নি। উচিত ছিল জাহাজের শ্রমিক মাত্রকেই নিয়ে নাবিক সঙ্ঘ গড়ে তোলা—তা সে শ্রমিক সাগরে চলাচলকারী জাহাজেরই হোক্ কিংবা নদীতে চলাচলকারী জাহাজেরই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। বাস্তবিক পক্ষে সঙ্ঘগুলিকে বিচ্ছিন্ন হতে দিয়ে নাবিকদের সংহতি শক্তিকে ক্ষুন্ন করে দেওয়া হয়েছে। নাবিক মাত্রেরই মনে সমস্বার্থের ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়ার পরিবর্ত্তে তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ সৃষ্টি করে দেওয়া হচ্ছে। এত বেশী বুদ্ধি না থাকলে কি কেউ কখনো শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করতে আসে?

ট্রেনিং ক্লাস খুলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নাবিকদিগকে সংঘবাদের নীতি ও মত শিক্ষা দেবার যেমন সুবিধা আছে এমন সুবিধা অন্য কোনো শিল্পের শ্রমিকগণের পক্ষে নেই। বহু সংখ্যক বেকার নাবিক সর্ব্বদাই ঘরে বসে থাকে। তাদেরকে সংঘবাদের নীতিগুলি শিক্ষা দিলে নাবিকরা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারত। কিন্তু, সেদিকে কাহারো লক্ষ্য নেই। শুনেছি "কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন" ও "ম্যারিনার্স ইউনিয়নের" হাতে কিছু টাকা কড়িও আছে। কিন্তু সংঘবাদ প্রচার কার্য্যের কোনো ব্যবস্থা কখনো করেছে বলে আমরা আজো শুনিনি। কেবল

মাত্র মিটিং করে বক্তৃতা দিলে প্রচার কার্য্য করা হয় না। স্থায়ী প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা একান্তই আবশ্যক। ট্রেনিং ক্লাসও অবিলম্বে খুলে দেওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে উচিত সব ক'টি নাবিক সংঘের এক হয়ে যাওয়া। অবশ্য কাজের সুবিধের জন্যে পৃথক, পৃথক গ্রূপ বা মণ্ডলী থাকবে। নাবিক সংঘ সম্বন্ধে আরো বিশদ আলোচনা আমরা এর পরে করব।

———

যুক্ত নির্ব্বাচন

সম্প্রতি বোম্বেতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে সভা বসেছিল তাতে যুক্ত নির্ব্বাচনের প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। এ প্রস্তাবের মর্ম্ম অনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন আপন প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভা সমূহে পৃথক ভাবে প্রেরণ করবে, কিন্তু, এ প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হবেন যুক্তভাবে। অর্থাৎ হিন্দু বা মুসলমান প্রতিনিধিকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যুক্তভাবে নির্ব্বাচন করবে। এ প্রস্তাব যদি কার্য্যে পরিণত হয় তা হলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার চেয়েও যে তা অধিকতর উন্নত ব্যবস্থা হবে তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। আমরা কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী নই। কিন্তু এদেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নানা কারণে এত বেশী প্রবল হয়ে আছে যে হয় তো আরো কিছুকাল সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথাকে পরিত্যাগ করতে পারা যাবে না। সে অবস্থায় যুক্তনির্ব্বাচনই উৎকৃষ্টতম পন্থা হবে। এরূপ নির্ব্বাচন প্রথার দ্বারা শোষক শ্রেণীর ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে অনেক পরিমাণে বাধা দেওয়া যেতে পারবে। কাজেই ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকগণের পক্ষে সেটা মন্দের ভাল হবে। অনেকেই কৃষকগণকে যুক্ত নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে মত দেবার জন্যে প্ররোচিত হয় তো করবে, কিন্তু, কৃষকদের জেনে রাখা উচিত যে এরূপ প্ররোচকগণ তাদের বন্ধু নয়, শত্রু।

—•—

ন্যাশন্যাল কংগ্রেস ও শ্রমিক আন্দোলন

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বোম্বে অধিবেশনে শ্রমিক আন্দোলন চালাবার জন্যেও এক প্রস্তাব পাস করা হয়েছে। কংগ্রেসের ধনিক সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার গত মার্চ্চ মাসে দিল্লীর এক সভায় কম্‌রেড শাপুরজী. সাক্‌লাৎওয়ালার এক বক্তৃতার উত্তরে শ্রমিকদের সম্বন্ধে অতিশয় ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তি করেছিলেন। তাঁর মতে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে শ্রমিকরা কিছুই করতে পারে না। জানিনে, এহেন আয়েঙ্গার মশায়ের শ্রমিক প্রীতি হঠাৎ কেন উথ্‌লে উঠেছে। তিনি আজকাল কথায় কথায় শ্রমিকদের বিষয় উল্লেখ করে থাকেন। বোম্বের প্রস্তাব পাস করানোর জন্যে তাঁর উৎসাহই আর সকলের চেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছিল। তবে এখন ভাববার বিষয় এই হয়েছে যে কংগ্রেস কি প্রকারের শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করবে? বর্ত্তমান কংগ্রেসের নেতৃগণের স্বার্থের দিক থেকে ব্যাপারটিকে বিচার করে দেখ্‌লে আমাদিগকে শুধু যে নিরাশ হতে হয় তা নয়, পরন্তু, আমাদের ভয়ও হচ্ছে যে হয় তো এঁরা সব প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠ্‌বেন। মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মত জনগণের শোষণকারী যখন বলেন যে তিনি জনগণকে সংহত করবেন তখন আমাদের আশার চেয়ে ভয়েরই সঞ্চার বেশী হয়ে পড়ে। দেখা যাক্, কতটা কি হয়।

—•—

পিতা-পুত্রে

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করতে চান্‌না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন পেলেই তিনি বর্ত্তে যাবেন। জমীদারগণ যখন কৃষকগণের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে তখন কংগ্রেসকে কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করতে বলা হলে তিনি 'সোশ্যালিজম' ও 'কম্যুনিজম' এর ভয়ে আঁৎকে ওঠেন। এ হেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পুত্র পণ্ডিত জওয়াহির লাল নেহেরু ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে ব্রুসেল্‌সের শোষণবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা কামী লীগের প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। এ কংগ্রেসে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে প্রস্তাব পাস হয়েছে। পণ্ডিত জওয়াহির লাল নেহেরুও এখন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চান। ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি নিশ্চয়ই এই চেষ্টা করবেন যে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" এর উদ্দেশ্য হোক্ 'বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম' এর কবল থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। পণ্ডিত মতিলাল ত বৃটীশ 'ইম্পিরিয়েলিজম' এর বন্ধন কিছুতেই কাটাতে রাজী নন। তাঁর পরম গুরু গান্ধীও 'ইম্পিরিয়েলিজম' এর বন্ধন কাটাতে চাইলে কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবেন বলে সবাইকে ধমকিয়েছেন। এ অবস্থায় পণ্ডিত জওয়াহিরলাল নেহেরু কতটা কি করবেন বা করতে পারবেন সেটা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার একটা বিষয় হবে। স্বাধীন ও উন্নত দেশের আব হাওয়ায় পণ্ডিত জওয়াহির লালের যে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে তিনি গান্ধীর সকল প্রকার প্রতিপত্তি এখনো কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। ব্রুসেল্‌স্ কংগ্রেসে প্রদর্শন করার জন্যে একটি চরকার জোগাড় করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু হাতে সময় খুব কম ছিল বলে তা করে উঠ্‌তে পারেন নি। সময় কম থাকাটা বাস্তবিক পক্ষে একটা আশিস্ স্বরূপ হয়েছিল। নতুবা চরকার জোগাড় হলে ভারতের প্রতিনিধিকে বিশ্বজন সভায় সত্য সত্যই হাস্যাস্পদ হতে হত। গান্ধীর খাম খেয়াল যে এখনো পণ্ডিত জওয়াহির লালকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাকে এই ভয় হচ্ছে যে পাছে হয়তো তিনি যেই কে সেই হয়ে পড়বেন।

—•—

ভারতের ভবিষ্য ইতিহাস

ভারতগবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ডাইরেক্টর অব্ পাব্লিক ইনফরমেশন্ প্রতি বৎসরই পার্লামেণ্টে দাখিল করার জন্যে একটা বর্ণনা প্রস্তুত করে থাকেন। বছরের পর বছর তিনি যে এ বর্ণনা দাখিল করে যাচ্ছেন তা ভবিষ্যতে ভারতের ইতিহাসের উপকরণ বলে পরিগণিত হবে। আমাদের ভবিষ্য ঐতিহাসিকগণ এ সকল অমূল্য দলীল পাঠ করেই এখনকার ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করবেন। কিন্তু, ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ফরমেশন যে কত মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁর বিরাট বর্ণনা প্রস্তুত করেন তার খানিকটা নমুনা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন:—

"It was finally decided to transfer the head-quarters (of the Communist Party of India) from Cawnpore to Bombay, whence they were more recently transferred to Calcutta." (India in 1925—26),

—•—

অর্থাৎ "শেষ মীমাংসা এই হয়েছিল যে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়ার কার্য্যালয় কানপুর হতে বোম্বেতে স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু, অল্পকাল পূর্ব্বেই এ আফিস বোম্বে হতে আবার কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে।" এ সংবাদের শেষের দিকটা একেবারেই মিথ্যা। কানপুর হতে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার কার্য্যালয় বোম্বেতে পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা সত্য, কিন্তু, কলিকাতায় আফিস কখনো স্থানান্তরিত হয়ে আসেনি। ডাইরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্ফরমেশনের আফিস যে দিল্লীতে অবস্থিত অবশ্য সে দিল্লীতেই কিছুকালের জন্যে পার্টির কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল। দিল্লীর হ্যামিল্টন রোডে পার্টির আফিস দিল্লী পুলিশ তলাশিও করেছিল। তারপরে আফিস আবার বোম্বেতেই চলে গিয়েছে। ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক্ ইনফরমেশন যখন তাঁর ঘরের এত নিকটের খবরই রাখেন না তখন তিনি যে সমগ্র ভারতের কি খবর রাখতে পারেন তা'তো আমরা ভেবেই ঠিক্ করতে পারছিনে। তিনি আরো লিখেছেন :—"The need which the Communists have long felt of a Press of their own in India has, during the recent months, been met by the publication in Bengal of a paper entitled Langal (Plough), which champions the rights of labourer and workmen on the usual lines." অর্থাৎ "কম্যুনিষ্টরা অনেক দিন থেকেই তাঁদের নিজেদের খবরের কাগজের অভাব অনুভব করে আসছিলেন। সে অভাব গত ক'মাসের মধ্যে বাংলায় "লাঙল" নামক কাগজের প্রচারের দ্বারা বিদূরীত হয়েছে। এ কাগজ যথারীতি শ্রমিকদের স্বার্থই সমর্থন করছে।"

এখানেও ডাইরেক্টর অব ইন্ফরমেশন দায়িত্বহীনতারই পরিচয় দিয়েছেন। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ন্যায় তাঁরও দেখছি কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। আমাদের বন্ধু জোগলেকার বোম্বের ওয়ার্কার্স ও পিজ্যাণ্টস্ পার্টির তরফ থেকে যে প্রস্তাব নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভায় উপস্থিত করেছিলেন তাতে "কম্যুনিজম" এর গন্ধ পেয়ে আয়েঙ্গার মশায় তা উত্থাপিতই করতে দেন নি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই হচ্ছে যে "কম্যুনিজম" কি বস্তু সে জ্ঞানটুকু এ সব উচ্চ শিক্ষিত লোকগণের একেবারেই নেই। যদি থাকত তা হলে জোগলেকারের মামুলি প্রস্তাবের মধ্যে কম্যুনিজমের গন্ধ পেতেন না। যাক্, "লাঙল" কোনো দিনও কম্যুনিষ্টদের কাগজ ছিল না। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল (The Peasants' and Workers' Party of Bengal) আর যা হোক, কম্যুনিষ্ট পার্টি নিশ্চয়ই নয়। "লাঙল" এ দলেরই কাগজ ছিল, আর বর্ত্তমানে "গণবাণী" ও এ দলের কাগজ। কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার যে পৃথক সত্তা আছে তা ডাইরেক্টর মশায় নিজেই স্বীকার করেছেন। অথচ তবুও বলছেন "লাঙল" কম্যুনিষ্টদেরই কাগজ। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কোনো সভ্য কম্যুনিষ্ট হতে পারেন কিন্তু, তা বলে "লাঙল" কম্যুনিষ্টদের কাগজ কি করে হলো? কম্যুনিষ্ট সাকলাৎওয়ালা বৃটিশ হাউস অব কমন্সের সভ্য বলে কেউ কি পার্লামেন্টকে কম্যুনিষ্ট পার্লামেন্ট বলতে পারেন? কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার কোনো কাগজ যদি থাকৃত তা হলে তা আনন্দের বিষয় হত। কিন্তু, তা যখন নেই তখন অন্য দলের কাগজকে তিনি কম্যুনিষ্টদের কাগজ বলতে চান কোন্ লজিকের জোরে? ডাইরেক্টর অব ইন্ফরমেশন যদি এ ভাবেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন তা হলে তাঁর জন্যে ভারতের রাজস্বের টাকা নিতান্তই অপব্যয়িত হচ্ছে বলতে হবে।

———

ট্রেনিং ক্লাস

প্রেস্ কর্ম্মচারী সমিতির শ্রীযুত কিশোরীলাল ঘোষ স্থির করেছেন যে তিনি ছাপাখানার কতিপয় যুবক শ্রমিককে নিয়ে একটি ট্রেনিং ক্লাস শীঘ্রই খুলবেন। এ ক্লাসে তিনি শ্রমিক সঙ্ঘবাদের নীতি গুলি বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সাধারণ শিক্ষার জন্যেও কিছু ব্যবস্থা করবেন। তাঁর এ উদ্যম বাস্তবিকই খুব প্রশংসনীয়। শ্রমিক আন্দোলনকে সত্যকারের পথে চালাবার জন্যে ট্রেনিং ক্লাস খোলাটা অপরিহার্য্য রূপে আবশ্যক। অথচ এদিকে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃগণ এতটুকুও মনোযোগ কোনো দিনও প্রদান করেন নি। শ্রীযুত কিশোরী লাল ঘোষ যে এ কাজে অগ্রণী হতে যাচ্ছেন তজ্জন্য আমরা তাঁকে অগ্রিম অভিনন্দন করছি। একান্ত মনে আমরা এ কামনা করছি যে কিশোরী বাবুর প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হোক্। আমরা আর সকল সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষগণকেও অনুরোধ করছি যে তাঁরা শীঘ্রই আপন আপন ক্লাস খোলার ব্যবস্থা করুন। আমাদের নাবিক সঙ্ঘের বন্ধু আফতাব আলীকে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি যে তিনি অবিলম্বে আপন'র সকল শক্তি ট্রেনিং ক্লাসের কাজে নিয়োজিত করুন। এ ছাড়া সাফল্যের অন্য কোনো উপায় নেই। "বেঙ্গল জুট্ ওয়ার্কর্স ইউনিয়ন" কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল অনেক আগেই ট্রেনিং ক্লাস খোলা। ক্ষতি পূরণের মোকদ্দমা করাটা একটা কাজ বটে, কিন্তু, এ কাজের দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘ সুসংবদ্ধ কিছুতেই হবে না। শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রকৃত কাজের প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। শ্রমিকদের ভিতর থেকে শ্রমিক-নেতা গড়ে তুলতে না পারলে কার্য্য সিদ্ধির কোনই আশা নেই।

হাঁ, আর একটি কথা না বলে আমাদের মন্তব্য শেষ করা উচিত হবে না। সেদিন জগদ্দলে শ্রীযুত কিশোরীলাল ঘোষ সর্দ্দারদের সহিত মজুরদের বিরোধ মিটিয়ে এসেছেন বলে আমরা রিপোর্ট পেয়েছি। কিন্তু, এ বিরোধ কি মেটাবার জিনিস? যে সর্দ্দারের দ্বারা কলের মালিকরা শ্রমিকগণকে শোষণ করে থাকে সে সর্দ্দারদের সহিত বিরোধ মেটানো আর শ্রমিক আন্দোলনের গোড়া কেটে দেওয়া একই কথা। আশু অসুবিধার ভয়ে এ সব করতে যাওয়া বাস্তবিকই বড় মারাত্মক ব্যাপার। ঘোষ মশায়ের সহিত মিঃ কে, সি, রায় চোধুরী প্রায়ই বিচরণ করে থাকেন। এ কারণে, তাঁর জন্যে আমাদিগকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কেন না, মিঃ চৌধুরীর বিদ্যা বুদ্ধি যতই বেশী থাকুক না কেন তিনি যে একজন প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক নেতা তাতে কাহারো মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।

—০—

দেশ বিদেশ

—০—

কলকাতার অস্থায়ী চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, ডি, টাইসন ২ হাজার টাকা বেতনে রাইট অনারেবল, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সেক্রেটারী মনোনীত হয়েছেন।

———

গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে দু'খানি দেশীয় নৌকা মেটিয়াবুরুজের সন্নিকট বেঙ্গল-আসাম ষ্টীমার কোম্পানীর ষ্টীমার "ইংলণ্ডের" সহিত সংঘর্ষ লেগে ডুবে যায়। উক্ত নৌকা খানি শ্রমিকদের নিয়ে মেটিয়াবুরুজ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ওয়ার্কসপে যাচ্ছিল। হাওড়া গোলাবাড়ী হতে নৌকা দু'খানি এসেছিল। দু'খানি নৌকা সংঘর্ষের ফলে উল্টে যায় এবং শ্রমিকেরা গঙ্গা গর্ভে নিপতিত হয়। ৪৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। দু'জনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ছয় জন আহত হয়েছে। তাদের হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

——

ডাক্তার আনসারী ঘোষণা করেছেন যে বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরা চীনে চিকিৎসক প্রেরণের সাহায্য কল্পে মোট ৫৭ হাজার টাকা দান করেছেন। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন। অন্যান্য কংগ্রেস কমিটি গুলি তাদের সাধ্যানুসারে ১ হাজার হতে ৫ হাজার টাকা দিয়েছেন।

——

হুগলী চুঁচড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ অনুন্নত শ্রেণীর বালকগণের শিক্ষার জন্য দু'টী অবৈতিক বিদ্যালয় খুলতে মনস্থ করেছেন।

——

নমঃশূদ্র এসোসিয়েশনের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এক মিটিংএ স্থিরীকৃত হয়েছে যে আগামী ১২ই জুন ঢাকা শহরে এক নিখিল বঙ্গীয় নমঃশূদ্র সভার অধিবেশন বসিবে।

——

এ বৎসর পাটের চাষ যেরূপ হয়েছে তাতে আনুমানিক ৯০ লক্ষ গাঁইট পাট জন্মিবে। পূর্ব্ববঙ্গে ৫৫১৪৮৫৮, উত্তর বঙ্গে ২৩৮৪২৫২, আসামে ৪৬০৩৯০ এবং বিহার উড়িষ্যাতে ৬৪০৫০০ মোট ৯০ লক্ষ গাঁইট।

—০—

হ্যাংকৌর চারদিকে চ্যায়ং-কৈ-সেক, ইয়াং সেন প্রভৃতির সৈন্য বাহিনী সমবেত হচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই ন্যাশন্যালিষ্ট দলের সাথে একটা যুদ্ধ বাধবার আশঙ্কা রয়েছে।

——

সৈয়দ এ, এফ্ আসাদ উদ্দৌলা শিরাজী কলকাতা নিউ শ্যাম পার্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ১২৪ক ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি ৫০০ টাকার জামীনে খালাস আছেন।

—০—

চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টাইসন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ এ ধারানুযায়ী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করার অভিযোগে ভোট রঙ্গের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিককে ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

—০—

মিঃ টাইসন হিন্দু সম্পাদক ও মুদ্রাকরকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারামতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করার অপরাধে যথাক্রমে ছয়মাস ও চার মাস কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলেছেন যে আসামী ইতিপূর্ব্বে ও এই অপরাধের জন্য একবার শাস্তি পেয়েছে কিন্তু এখনো উপযুক্ত শিক্ষা পায়নি।

—০—

চেংচোতে জেনারেল ফেঙ্গুসিয়াংএর জয়লাভ:—২৩শে মের খবরে প্রকাশ রেড় সৈন্যবাহিনী তিন দিনের যুদ্ধে তিনটী শহর দখল করেছে। হোপানে চেং চো শহর দখল করতঃ তারা পিকিনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। আরো প্রকাশ রেড্ সৈন্যদল ৮ সহস্র উত্তরীয় সৈন্য বধ করেছে এবং ৫ হাজার তাদের হাতে ধৃত হয়েছে। হং কৌ-মিলিটারী হেড কোয়ার্টাস দাবী করে যে ক্রিশ্চীয়ান জেনারল ফেঙ্গুসিয়াং চেংচো অধিকার করতঃ হংকৌ হতে পলায়নের পর কম্যুনিষ্টদের পথ কতকটা নিরাপদ করেছেন। হোনানে কম্যুনিষ্টগণ জয়লাভ করাতে জনসাধারণের অবস্থা ক্রমেই ভাল হয়ে আসছে। তথাপি পলায়নপর হংকৌবাসিগণ কনশেসন অঞ্চলে দলে দলে পলায়ন করছে। তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে এবং অনেকের গৃহের দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা বড় সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে।

—•—

ইয়াংসির সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করার জন্য সার মাইলস্ ল্যাম্পসন সাংহাই এ পৌছেছেন। ইয়াংসীর নদীর উপর দিয়ে জল পথে ভ্রাম্যমান ভাইস অ্যাডমিরাল সার রেজিনাল্ড টীরউইট গতকল্য ফ্ল্যাগ সিপে চড়ে হকিন্স যাত্রা করেছেন। শীঘ্রই তিনি সাংহাই পৌছেবেন।

—•—

কাপ্টেন লিণ্ডবার্গ গত ২২শে মে তারিখ দশটা বাইশ মিনিটের সময় আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে লা বোরগেট এরোড্রোমে অবতীর্ণ হন। তিনি ৩,৫০০ মাইল বিমানপোতে কোথাও না থেমে ৩৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিটে দুরতিগম্য আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়েছেন। প্যারিসে পৌছিলে তাঁকে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি ২৫০০০ ডলার ওটরলিগ পুরস্কার পাবেন। তাঁর পৌছা সংবাদ নিউইয়র্কে গেলে তথায় বিপুল উৎসব আরম্ভ হয়। জনতা রাজপথে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকে। কাপ্টেন লিণ্ডবার্গ টেলিফোনে নিউইয়র্কে তাঁর মার নিকট কথাবার্ত্তা বলেন, তিনি বিমানমন্ত্রী সার সামুয়েল হোরের নিকট হতে সহানুভূতি সূচক ধন্যবাদ পান! সার আলাম কবহাম তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করায় জন্য লণ্ডন হতে উড়ো কলে প্যারিসে আসেন।

—•—

গত রবিবার দেবেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী নামক একজন বাঙালী যুবক একটী রিভলভার ও ১২টী কার্টিজ সহ কলিকাতা সি, আই, ডি ইনস্পেক্টর সোবহান কর্ত্তৃক জগন্নাথ ঘাটের নিকট ধৃত হয়েছে।

—•—

এবারকার রাজ রাজেশ্বরী শোভাযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে। কোনো গোলমাল হয়নি।

—•—

শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী ওরফে মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী কেরাণী সঙ্ঘের সভাপতি। শ্রমিক আন্দোলনের সহিত তিনি আরও নানা ভাবে জড়িত আছেন। শ্রমিকদের প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত প্রীতি দেখিয়া সরকার বাহাদুর এত মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে বার বার তিন বার তাঁহাকে বেঙ্গল কৌন্সিলে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোয়ন করেন এবং করপোরেশনেও সরকার বাহাদুর

বহু চেষ্টায় তামাম বাংলা দেশে আর উপযুক্ত শ্রমিক বন্ধু না পাওয়াতে মিঃ চৌধুরীকেই বার বার দুইবার কৌন্সিলার করিয়া দেন। এদেশের শ্রমিকেরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বল সঞ্চয় ও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত, হয় তো তাহারা মিঃ রায় চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করিত যে তিনি গত সাত বৎসরে বেঙ্গল কৌন্সিলে শ্রমিকদের জন্য কি কি কায করিয়াছেন, অথবা করপোরেশনে গত সাড়ে তিন বৎসরে শ্রমিকদের কতটুকু উপকার করিয়াছেন। যাহা হউক তিনি কি কার্য্য করিয়াছেন বা না করিয়াছেন তাহা কৌন্সিল বিবরণীর ভিতরেই পাওয়া যাইবে। তাঁহার উপর্য্যুপরি মনোনয়নের দুইটি মাত্র কারণ থাকিতে পারে। ১ম, বাঙ্গলা দেশে একমমাত্র মিঃ রায় চৌধুরী ছাড়া শ্রমিক বন্ধু আর কেহ নাই, অথবা কেহ থাকিলেও সরকার বাহাদুর বহু তল্লাস করিয়াও তাঁহার সংবাদ পান নাই। ২য়, মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরীকে না হইলে বাংলা সরকারের চলে না। ২য় অনুমানটিই বোধ হয় ঠিক হইবে। আর এই অনুমান যে ঠিক তাহা কৌন্সীল বিবরণী খোঁজ করিলেই ধরা পড়িবে। মিঃ রায় চৌধুরীর কৌন্সিলে ও করপোরেশনে মৌরসি স্বত্ব কায়েম হইবার রহস্যও অনেকটা এতদ্দ্বারা উদ্ঘাটিত হইবে।

রায় চৌধুরী মহাশয় ১৮ই মে তারিখে কেরাণী সঙ্ঘের বাৎসরিক সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করেন। মিটিংএর স্থান হয় "সাহেব"দের আড্ডা ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে। ইন্দুরের সভায় সব চাইতে নাদুস্ নুদুস্ মোটা ল্যাজওয়ালা কাবুলি হুলো বিড়ালকে সভাপতি করিলে যেমন সঙ্গত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় এডিস্ সাহেবের সভাপতিত্ব ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কেরাণী-চক্ষেও বোধ হয় সেইরূপই বোধ হইয়াছিল। এইবার আর কেরাণীসংঘের ভাবনা নাই। যত বড় ভুঁড়িওয়ালা চাপকান পড়া সোনার মোটা চেন বুকে বড় বাবুরা সংঘটিতে আকৃষ্ট হইবেন। তাঁহাদের নিকটে আফিসের ছোট সাহেবেরা বাবা—বড় সাহেবরা বাবার বাবা, আর বড় সাহেবদের সংঘের কর্ত্তা—সে ভাবতেও পারা যায় না—একেবারে বাবুদের প্রপিতামহ। রায় চৌধুরী মহাশয় ব্যবসায়ী—তাঁহার ব্যবসায় বুদ্ধি দেখিয়া সকলেই বাহবা দিবে। অন্ততঃ সাহেব সওদাগরেরা, সিভিলিয়ানরা ও ইংলিশম্যান প্রমুখ ভারতমিত্রেরা তাঁহার পিঠ এরূপভাবে চাপড়াইবেন যে রায় চৌধুরী মহাশয় আহ্লাদে গদ্ গদ্ হইয়া আগামী রয়েল কমিশনের সম্মুখে বাঙলায় একমাত্র শ্রমিক বন্ধু হিসাবে সাক্ষ্যদেবার স্বপ্ন দেখিতে থাকিবেন।

কিন্তু কেরাণীসংঘ বলিতে দুর্ভাগ্যবশতঃ শুধু বড়বাবুদের বুঝায়না। যে শিক্ষিত যুবক দেহের রক্ত জল করিয়া দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর অতি অল্প মাহিনায় (যাহার অধিক বড় সাহেবরা তাঁহাদের কুকুরের পেছনে খরচ করেন) কাটাইয়া আসিতেছে সে যুবক বোধ হয় এই প্রকার সাহেব মনিবদের লইয়া ঢলাঢলি পসন্দ করে না। হায় কেরাণী যুবক! মোটর বিহারী, অর্থশালী প্রতাপান্বিত এডিস্ সাহেবের পরামর্শ তোমার জন্য নয়। তুমি পলিটিক্স্ ছাড়িতে পার না। পলিটিকস্ মানে যদি হয় তোমার খাটুনির অনুরূপ পারিশ্রমিক, তোমার সুচিকিৎসা পাইতে অধিকার, তোমার ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর অধিকার ও স্বাস্থ্যজনক বাড়িতে থাকার অধিকার লাভ—তাহা হইলে পলিটিক্স্ তুমি ছাড়িতে পার না। পলিটিক্স ছাড়া তোমার পক্ষে আত্মহত্যা। সাহেব তোমাকে খেলাধুলা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সাহেবকে যদি মাসিক চল্লিশ-টাকায় একমাস সংসার চালাতে হয় তাহ'লে বোঝা যায় সাহেব কতবার গল্ফ খেলেন অথবা বিলিয়ার্ড খেলায় মনোনিবেশ করিতে পারেন।

রায় চৌধুরী মহাশয় যেসব জ্ঞান-মুক্তা উদ্গীরণ করিয়াছেন তাহার ভিতর একটি কথার আমরা আলোচনা করিব। তিনি বলিয়াছেন "কতক জায়গায় কেরাণী সংঘের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা হওয়াতে আমি এই অবসরে সকলকে জানাইয়া দিতেছি যে কেরাণীসংঘ ঠিক শ্রমিকসংঘের (Trade Union) মত কাজ করিতে পারে না। কেন পারে না তা বলিবার প্রয়োজন নাই।" এ সম্বন্ধে আমরা রায় চৌধুরী মহাশয়কে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই।

১। কোন্ সময় হইতে তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে কেরাণীসংঘের কাজ অন্যান্য সংঘের মত হইতে পারে না?

২। কেরাণী সংঘকে যখন তিনি নিখিল ভারতীয় ট্রেড্স্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন্ সেই সময় কি তাঁহার মনের ভাব ঐরূপ ছিল?

৩। তিনি কি নিখিল ভারতীয় ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ জোশীকে তাঁহার মনোভাব জানাইয়া কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক প্রত্যাহার করিয়াছেন?

গত ১৮ই মে তারিখে বি, এন, রেলওয়ের গার্ডেন রিচ শাখা সংঘের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। গত দুই বৎসর ধরিয়া এই শাখা সংঘটির সহিত মূল সংঘের বিশেষ বনিবনাও চলিতেছিল না। বি, এন, রেলওয়ের ধর্ম্মঘটের সময় এই বিবাদ বড় বিশ্রী রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। বাহিরের দু'একটি স্বার্থন্বেষী নেতৃত্বপদাভিলাষী ব্যক্তি গার্ডেন রিচের বিদ্রোহী দলকে বেশ উৎসাহিত করিতেছিলেন। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী যেভাবে রিলিফের নাম লইয়া অথচ রিলিফ কমিটির অজ্ঞাতসারে গার্ডেন রিচের দু'একটি উপনেতার পরামর্শানুসারে সাহায্য বিতরণ করিয়াছিলেন তাহাতে শাখা ও মূল সংঘের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ মূল সংঘের কার্য্যকরী সমিতিতে যে সকল সভ্যেরা ধর্ম্মঘটে যোগদান করেন নাই তাহাদের বাহির করিয়া দিবার এক প্রস্তাব গ্রাহ্য করাতে উপনেতা মহাশয়েরা বড়ই চটিয়া যান। কারণ, তাঁহারাও যে ঐ পর্য্যায়ভুক্ত।

বি, এন, রেলওয়ে মূল সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত রামচন্দ্র রাও বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশনকে এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ফেডারেশন গত ৭ই মে তারিখের এক কমিটিতে এই বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশ্যে একটি সাব কমিটি গঠন করেন। এ সাবকমিটির বিবরণ গণবাণীর পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখন দেখিতেছি যে ১৮ই মে তারিখের গার্ডেন রিচ শাখার বাৎসরিক অধিবেশনে আর একটি মিটমাট করার কমিটি গঠন হইয়াছে। এ কমিটির সভ্য হইয়াছেন শ্রীযুত নিশীথ চন্দ্র সেন (যিনি একসময় বি, এন, আর ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন) আর শ্রীযুত রামলিঙ্গম্ (Ramlingam) (যিনি মিঃ

গিরি জেনিভাতে যাওয়ায় অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে কার্য্য করিতেছেন)। ইঁহাদের দুজনকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে ইঁহারা যেন জেনেরেল সেক্রেটারী ও গার্ডেন রিচ সেক্রেটারীর সাহায্য লইয়া মিটমাটের এক বন্দোবস্ত করিয়া ১৭ই তারিখের ভিতর এক মন্তব্য পেশ করেন। সেন্ট্রাল কৌন্সিলের সহকারী সভাপতি পণ্ডিত কাশীনাথ মাথু নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এই কমিটি সম্বন্ধে খড়্গপুর শ্রমিকগণের তিনি মত করাইবেন। শাখা ইউনিয়নের মন্তব্য কিরূপে মূল ইউনিয়ন মানিয়া লইবেন তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও যদি এই উপায় দ্বারা কলহের শান্তি হয় তাহা হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। আমরা আশা করি যে Bengal Trade Union Federation এর Sub Committee অন্তত: ১৭ই জুন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। যদি মূল সঙ্ঘের সহিত শাখার মিলন তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় হইয়া যায় সেটা নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

—•—

গত রবিবার ২২শে মে তারিখে ৭নং একবালপুর লেনে লেনে ইণ্ডিয়ান সিমেন্স ইউনিয়নের প্রাঙ্গনে ঐ সঙ্ঘের সাধারণ বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বেঙ্গল ট্রেড্-ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় প্রায় ৪০০।৫০০ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ইউনিয়নের জেনেরেল সেক্রেটারী মিঃ এম, দাউদ কার্য্যবিবরণী পাঠ করিবার পর আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় পেশ করেন। দাউদ সাহেব দেখিতেছি একেবারে কলির কুম্ভকর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। কুম্ভকর্ণ যেমন ছয়মাস ঘুমাইবার পর এক দিনের জন্য জাগিয়া ছয় মাসের ভোজন সেই দিনেই সারিয়া লইত দাউদ সাহেবও সেইরূপ ১৯১৮ হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত নয় বৎসরের হিসাব একদিনে দাখিল করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক ইংরাজীতে একটা কথা আছে "না করার চেয়ে দেরীতে করা ভাল।" দাউদ সাহেব যে দেরিতেও হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত একটা হিসাব দাখিল করিয়াছেন ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। আশা করি এখন হইতে সিমেন্স ইউনিয়নে বৎসর বৎসর হিসাব দাখিল করা হইবে।

—*—

সিমেনদের বাৎসরিক অধিবেশনে যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতর সভাপতির অভিভাষণ আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। তিনি সিমেনদের বেশ করে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নয় কেবল মাত্র দরখাস্ত লইয়া মনিবদের নিকট পেশ করা যাহাতে দু চার টাকা মাহিনা বাড়িতে পারে। সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য বল সঞ্চয় করা, একদিল হয়ে কার্য্য করিতে শেখা, মানুষ হওয়া। কলিকাতায় প্রায় এক লক্ষ নাবিক আছে। আজ যদি এই এক লক্ষ নাবিক সঙ্ঘের সভ্য হ'ত তা হ'লে তাহারা কি না করিতে পারিত। তখন তাদের তরফ হ'তে মনিবদের কাছে যে দরখাস্ত যেত সেটা দরখাস্ত বলে কেউ মনে করতো না। সেটাকে দাবী বলে ধরে নিতে হ'তো, আর মনিবরা সেই দাবী মেটাতে বাধ্য হ'তো। কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের ভিতর এক যোগে কাম করবার প্রবৃত্তি এখনও জন্মায় নি এবং সেরূপ শিক্ষাও তাদের হয় নি। অত্যাচার যখন অসহ্য হয় তখন তাহারা একযোগে হু হু করিয়া সঙ্ঘের সভ্য হইয়া পড়ে, এই আশায় যে সঙ্ঘ যদি অত্যাচারের উপশম করিতে পারে। দুএক মাস দেখিয়া আবার যেমন হু হু করে সভ্য হয়েছিল তারা সেইরূপ অকস্মাৎ সরিয়া পড়ে, কেন না সঙ্ঘতো তাহাদের কিছুই উপকার করিতে পারিল না। তাহারা এটা বোঝেন না যে সঙ্ঘের শক্তি তো তারাই। তারা যদি সঙ্ঘকে পালন না করে সঙ্ঘের বল কোথা হইতে আসিবে? নদীতে যেমন জোয়ার ভাঁটা হয় সেইরূপ সঙ্ঘের কখনও অনেক সভ্য কখনও অল্প সভ্য এরূপ হইলে সঙ্ঘের বল কখনও বাড়িতে পারে না। মাতা যখন সন্তানকে স্তন্য দানে মানুষ করিয়া তোলেন তিনি কখনও এই আশা করিয়া মানুষ করেন না যে শিশু বড় হইয়া তাঁহার ভরণ পোষণ করিবে। অবশ্য সন্তান তার কর্ত্তব্য করে। সেইরূপ তোমরাও তোমাদের এই দশবৎসরের শিশুসঙ্ঘটিকে শক্তিবান করিয়া তোল, দেখিবে তোমাদের ইহাতে সর্ব্ববিষয় সুবিধা হইবে।'

কানপুর ষড়যন্ত্রের মামলার অভিযুক্ত

মিঃ ডাঙ্গের মুক্তি

বোম্বাইবাসী কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা

(ফ্রী প্রেস অব ইণ্ডিয়া)

বোম্বাই, ২৪শে মে

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত মিঃ এস, এ, ডাঙ্গের কারামুক্তিতে যাহাতে সাধারণের মধ্যে কোন সমারোহ না হইতে পারে, তজ্জন্য গতকল্য তাঁহাকে মুক্তি না দিয়া অদ্য প্রাতে ৬টার সময় আর্থার জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত রাত্রি হইতে মিঃ ডাঙ্গের বহু বন্ধু জেলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল।

তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গতকল্য যে জনসভা হইবার কথা ছিল সে সভা অদ্য অপরাহ্নে হইবে। সভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, মিঃ হর্ণিম্যান, এবং মৌলানা শওকৎ আলী বক্তৃতা করিবেন।

কমরেড সিঙ্গার ভেলুর তার

মাদ্রাজ, ২৪শে মে

মিঃ ডাঙ্গেকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া কমরেড সিঙ্গারভেলু এক তার করিয়াছেন। —ফ্রী প্রেস

শ্রীযুক্তা নাইডুর অভিনন্দন

বোম্বাই, ২৪শে মে

মিঃ এস, এ, ডাঙ্গে কানপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় ৪ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি আজ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বহু কংগ্রেস কর্ম্মী ও আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে মহানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহাকে তাঁহার মুক্তিতে অভিনন্দিত করিয়া এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

"আমি সাদরে বোম্বাইয়ে আমাদের মধ্যে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। জাতীয় আত্মমর্য্যাদাবোধ ও জাতীয় আত্মোপলব্ধি জাগাইয়া তুলিবার যে মহাকর্ত্তব্যভার আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে আমি আশা করি আপনার অদম্য উৎসাহ উদ্যম ও অসাধারণ ক্ষমতা তাহাতে নিয়োজিত হইবে। আমার বিশ্বাস, জাতীয় আত্মমর্য্যাদা যে কি জিনিস তাহা আজও আমরা বুঝিতে পারি নাই।

আমি জানি, আপনি শ্রমিকদিগের স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগসম্পন্ন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অত্যল্প সংখ্যক কর্ম্মীই দরিদ্রদিগের অনিষ্টসাধন না করিয়া প্রকৃত ইষ্টসাধন করিয়া থাকেন। আপনি তাঁহাদের একজন।"

মিঃ ডাঙ্গে বেশ সুস্থ আছেন। ইনি বলেন—ইঁহার প্রতি ভাল বা মন্দ কোন বিশেষ ব্যবহার করা হয় নাই। ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে মিঃ ডাঙ্গে জানান যে, তিনি শহরের শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিবেন।

এ, পি, আই

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২রা জুন ১৯২৭, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪	১৭শ সংখ্যা

"গণবাণী" প্রচারের আয়োজন

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিয়ালদা, [illegible], সান্তাহার, পার্ব্বতীপুর, [illegible], লালমণির হাট, কাটিহার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাওড়া, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান, আসানসোল, পাটনা, দানাপুর, জামালপুর, গয়া, মোগলসরাই, মিরজাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, দিল্লী, জব্বলপুর, এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর, পুরুলিয়া, গোণ্ডিয়া ও পুরী প্রভৃতি ষ্টেসনের হুইলার কোম্পানীর ষ্টলে গণবাণী পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া দার্জ্জিলিং-এর হুইলার কোম্পানীর ষ্টলেও গণবাণী বিক্রয়ার্থ মজুদ থাকে।

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহমদ শ্রী[illegible]মোহন দাস	প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা। বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে ৩৲ Foreign Subscription Annual 7s.

-৫১

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

| ১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২রা জুন, ১৯২৭, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ | ১৭শ সংখ্যা |

একখানা পত্র

—:০:—

ভাই……,

পত্র তোমার পেয়েছি। তুমি আর তোমার বন্ধুরা সবাই মিলে কী যে হতে চলেছ সে বিষয়ে যতই আমি চিন্তা করছি ততই আমার বুকের ভিতরে বেদনারাশি স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্‌ছে। চিন্তা আর বিচারের রাজ্যে মানুষ কি করে যে এত বেশী দেউলিয়া হতে পারে তা আমার ধারণাতেই আস্‌ছে না। ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে তোমরা সর্ব্বত্যাগী হয়েছ, সকল প্রকার দুঃখ কষ্টকে তোমরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছ। তোমরা না পাচ্ছ ভালো করে খেতে আর পরতে, না আছে তোমাদের কোথাও ভালো বাসের জায়গা। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে যে, যে স্বাধীনতার নামে তোমরা সব কিছু ছেড়ে এসেছ তোমরা সবাই সে স্বাধীনতারই পরিপন্থী হতে চলেছ। হয়তো তোমরা তোমাদের অজ্ঞাতসারেই পরিপন্থী আর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছ। কিন্তু, হয়ে যে উঠেছ তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতা লাভের জন্যে যে বদ্ধপরিকর হবে নিজের চরিত্রকেও সে স্বাধীনতার উপযোগী করে গড়ে তুলবে। যদি আমরা দেখতে পাই যে তা না করে সে নিজের চারিদিকে নিজের হাতে কেবলি দাসত্বের জাল বুনে যাচ্ছে তা-হলে আমরা তাকে পরিপন্থী আর প্রতিক্রিয়াশীল না বলে কি আর বলব? বীর-পূজার মত ঘৃণিত দাসত্ব আর কিছুই নেই। তোমরা স্বাধীনতার সেবকেরা প্রথমেই বীর-পূজার দাসত্ব শৃঙ্খল গলে পরিধান করে নিয়ে তবে প্রলিপ্ত হতে চাও স্বাধীনতার সংগ্রামে,—জাননা এক হাতে দাসত্বকে বরণ করে নিয়ে আর এক হাতে যে তাকে কোনো দিনও এড়ানো যায় না। বীর-পূজার প্রভাবে মানুষের চিন্তা-শক্তির কর্ষণ কিছুতেই হতে পায় না, মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্বের যে সত্তা আছে সে সত্তা চিরদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যায়। যত রাজ্যের মহাত্মা, ধর্ম্মাত্মা, পূণ্যাত্মা আর দাদা কোম্পানীর পাল্লায় পড়ে তোমরা কেবলি শোষিত হচ্ছ, স্বাধীন সত্তা বলে কোনো জিনিস আর তোমাদের ভিতরে নেই। তোমাদের বীরেরা দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার যদি পঞ্চাশ রকমের স্ববিরোধী কথাও বলে ফেলেন তথাপি একটি বারও সাহস করে তোমরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে পারনা কেন তাঁরা এমন করে ডিগ্‌বাজি খাচ্ছেন। কবে কোন্ এক প্রতিক্রিয়াশীল উপদেষ্টা বলে গেছে—"ভক্তিতে মিলয় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" যার ক্রিয়া তোমাদের ভিতরে এত বেশী হয়েছে যে তর্ক করা তোমরা ভুলেই গেছ। মনে করে বসে আছ এক দাসত্বকে বরণ করে নিয়ে আর এক দাসত্বের অপনোদন তোমরা করবে!

স্বাধীনতার নামে তোমরা তোমাদের বীরদের মুখের অনেক বাঁধা বুলিই আওড়াচ্ছ বটে, কিন্তু, কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমাদের অধীনতার গোড়ার কথাটি কি? তোমাদের বীরপুঙ্গবগণ কতটুকু স্বাধীনতার প্রয়াসী তা কি তোমরা কখনো পরীক্ষা করে দেখেছ? যদি এতটুকুও করার সামর্থ্য ও সাহস তোমাদের নেই তা হলে কেনই বা ভূতের বেগার খেটে মরতে আসা?

বন্ধু, স্বাধীনতা লাভ করতে হলে অধীনতাটা কিসের তা ভালো করে বুঝতে হবে। বৃটিশ ভারতবর্ষকে শোষণের জন্যেই শাসন করছে, এ কথা তোমরা সবাই জান। কিন্তু গ্রেট্ বৃটেনের অধিবাসী মাত্রই যে আমাদের শোষক এ কথা মনে করোনা। গ্রেট্ বৃটেনের জনগণের জন্যে ও জনগণের দ্বারা ভারতবর্ষ শোষিত ও শাসিত হয় না। আমাদের শাসক ও শোষক হচ্ছে ওখানকার ধনিক সম্প্রদায়। গ্রেট বৃটেন একটা শিল্প প্রধান দেশ। অনেক কারখানা ওদেশে রয়েছে। এ সব কারখানায় মাল তৈরী করার জন্যে যত কাঁচা মালের

দরকার তত কাঁচা মাল গ্রেট্ বৃটেনে পাওয়া যায় না। সে জন্যে প্রচুর কাঁচা মাল পাওয়া যায় এমন দেশের তাদের প্রয়োজন। আবার বৃটিশের কারখানায় যত মাল তৈরী হয় তত মাল বৃটেনে ব্যবহৃত হতে পারে না। কাজেই পাকা মাল চালাবার জন্যে বাজার চাই। তার পরে ক্রমশঃ কারবার এত বেশী প্রসারিত হয়ে পড়েছে যে দেশের ভিতরে দেশের শ্রমিকগণকে তাদের শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত করে বৃটিশ ধনিকগণের লোভ আর কিছুতেই চরিতার্থ হচ্ছে না। তাই, তাদের প্রয়োজন হয়েছে বিদেশে মূলধন রফ্‌তানী করে, সস্তায় বিদেশী শ্রমিক নিযুক্ত করে অতিরিক্ত পরিমাণে লাভ করার। এই তিন কারণে বৃটিশ বিভিন্ন দেশকে কোনো না কোনো প্রকারে পদানত করেছে। অর্থাৎ কোনো দেশকে কেবলমাত্র অর্থ-নীতিক ভাবে পদানত করেছে, আবার কোনো দেশকে অর্থ-নীতিক ও রাষ্ট্র-নীতিক উভয় ভাবেই পদানত করেছে। আমাদের ভারতবর্ষ দু'দিক থেকেই বৃটিশের পদানত হয়ে আছে। এই যে বৃটিশের পদানত হওয়া তা সবদিক্ থেকেই হোক্, কিংবা একদিক থেকেই হোক্,—একেই বলা হয় বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্। তোমরা মনে করছ ইংরেজ মাত্রই আমাদের শাসন আর শোষণের জন্যে দায়ী। তাই, আমাকে এতগুলি কথা বলতে হলো। আমি আশা করি, তোমরা নিশ্চয়ই চিন্তা করে বুঝে নেবে যে কেবলমাত্র গণিত সংখ্যক বৃটিশ ধনিকের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যেই আমাদিগকে এবং আমাদের মত আরো অনেক দেশকে গ্রেট্ বৃটেনের পদানত হতে হয়েছে।

ভারতে পাকা মাল চালিয়ে ও ভারত থেকে কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন ও শোষণ করাই ছিল বৃটিশ ধনিকগণের পুরাতন নীতি। বিগত যুদ্ধের সময় থেকে কিন্তু, এ নীতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভারতে বৃটিশ ধনিকবাদের এখনকার নীতি হচ্ছে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠান পূর্ণ করে তোলা। এই নীতিতে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্যে ভারতীয় ধনিকগণের সাহায্য পাওয়া তাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই, গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া এক্ট ও ট্যারিফ এক্ট প্রভৃতি পাস করে ভারতীয় ধনিকগণকে (জমীদার প্রভৃতিকেও আমি ধনিক বলে ধরে নিচ্ছি) অনেক সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এখন ভারতের অধীনতার জন্যে বৃটিশ ধনিকগণ যতটুকু দায়ী ভারতের ধনিকগণও ঠিক ততটুকুই দায়ী। পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে আমাদিগকে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের অধীনতা শৃঙ্খল যেমন ছিন্ন করতে হবে ঠিক তেমনি ভারতীয় ধনিকগণের বন্ধনও এড়াতে হবে।

আমি আশাকরি আমাদের অধীনতার গোড়ার কথা তুমি এখন বুঝে নিয়েছ। কংগ্রেসের ধনিক ও ধনিকাশ্রিত নেতৃগণ পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবী কেন যে পেশ্ করতে চান না তা-ও আশাকরি তুমি এখন খুব সহজেই বুঝে নেবে। আমার অনুরোধ, তোমরা কেবলমাত্র নেতৃভক্তিতে অন্ধ হয়ে না থেকে, হিসাব নিকাশ মিলিয়ে, ব্যাপারটাকে একটুখানেক তলিয়ে দেখতে শেখ। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হোক্, এ প্রস্তাব যখন গৌহাটি কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয়েছিল তখন গান্ধী বলেছিলেন কংগ্রেস যদি এ প্রস্তাব পাস করে নেয় তাহলে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবেন। কাজেই গান্ধী যে স্বাধীনতার পরিপন্থী একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এর পরেও যদি তোমরা গান্ধীর নীতির প্রতি ভক্তিমান থাক তাহলে তোমাদিগকেও স্বাধীনতার পরিপন্থী বল্লে কি কিছু অন্যায় বলা হবে?

আমাদের এ যুগটা হচ্ছে জনগণের উত্থানের যুগ। কেননা, আর কাহারও উত্থান হতে এখন আর বাকী নেই। পুরাতন ফিউডালিজম বা জায়গীরদারী প্রথার ধ্বংস হয়ে বুর্জোয়াজিগণই এখন জগতের সর্বত্র প্রবল হয়েছে। বুর্জোয়াজি বলা হয় আধুনিক ধনিকগণকে। উৎপাদনের উপায় সমূহকে করায়ত্ত করে এই ধনিকগণ পরিশ্রমী লোকদিগকে তাদের শ্রমের ধন থেকে বঞ্চিত করছে। বুর্জোয়াজিগণের ক্রমাগত লুণ্ঠনের ফলেই সমাজে প্রোলেটারিয়েট্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। শোষিত ও বিলুণ্ঠিত হয়ে হয়ে যারা উৎপাদনের উপায় সমূহ হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং বেঁচে থাকার জন্যে আপনাদের পরিশ্রমকে ভাড়ায় খাটাতে বাধ্য হচ্ছে তারাই প্রোলেটারিয়েট্। আমাদের দেশে প্রোলেটারিয়েটের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। গ্রামের কৃষক সম্পত্তিহীন হয়ে ক্রমশঃই শহরের কারখানাতে ভর্তি হচ্ছে। কারখানার শ্রমিকেরা অধিকাংশই প্রোলেটারিয়েট, কৃষিক্ষেত্রেও প্রোলেটারিয়েটের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আর যে সকল কৃষক এখনো সম্পত্তিহীন হয় নি তারাও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শোষিত হচ্ছে। উৎপাদনের উপায় তাদের হাতে কিছু আছে বলে উৎপাদন তারা করছে বটে, কিন্তু শোষণের নানা পদ্ধতির ভিতরে থেকে তারা উৎপন্ন দ্রব্য হতেই বঞ্চিত হচ্ছে। এ দেশের কৃষকগণ সাক্ষাৎভাবে প্রোলেটারিয়েট না হলেও তারা পরোক্ষভাবে প্রোলেটারিয়েট হয়ে ভূতের বেগার খেটে মরছে। কৃষক একখানা হাতে যেখানে উৎপন্ন করছে সেখানে ঠিক পাঁচখানা হাত উদ্যত হয়ে আছে তাকে শোষণ করার জন্যে। জমীদার তাকে শোষণ করছে, সুদখোর মহাজন তাকে শোষণ করছে, ব্যবসায়ী মহাজন ও তার দালাল তাকে শোষণ করছে, মোল্লা-পুরোহিত ও ডাক্তার-উকিল সবাই তাকে শোষণ করছে। এমন কি আজকের দিনে খবরের কাগজওয়ালারা পর্য্যন্ত তাকে শোষণ করতে ছাড়ছে না। বর্ত্তমান সময়ে দেশময় যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে এরও মূলে শোষণেরই কারণ বর্ত্তমান রয়েছে। তারপরে ভদ্রলোক শ্রেণী বলে যে একটা অদ্ভুত শ্রেণী আমাদের দেশে আছে এ শ্রেণীর মধ্যেও প্রোলেটারিয়েটের সংখ্যা কম নয়। বিষয় সম্পত্তি যাদের নেই, বাঁচবার জন্যে ভাড়ায় যারা খাটে তারাই ত প্রোলেটারিয়েট্। ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে এমন লোকের বাহুল্য ত তুমি তোমার চারদিকেই দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু, এ শ্রেণীটে যেমন অদ্ভুত, ঠিক এ শ্রেণীর লোকগুলোও তেমনি অদ্ভুত। যারা তাদের শোষণ করে থাকে তাদেরই প্রতি একটা সামাজিক আকর্ষণ এঁদের রয়েছে। সর্ব্বহারা হয়েও এঁদের প্রত্যেকে এখনো মনে করে থাকেন যে তিনি সম্পত্তির মালিক ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক হবেন। জন কয়েকের হাতে কেন্দ্রীভূত সম্পত্তি যে তাঁদের সকলের নিকটে কি করে আসবে সে কথাটাই তাঁরা শিক্ষিত হয়েও তলিয়ে বুঝতে চান না। সর্ব্বহারা হয়েও এঁরা বুর্জোয়াজিগণের আদর্শকে আপনাদের আদর্শ করে রেখেছেন। কিন্তু, এঁদের এ তাসের ঘর ভেঙে যাবার সময় এসেছে। অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রোলেটারিয়েটগণও যে কারখানার শ্রমিক হতে বাধ্য হবেন সেদিন খুব ঘনিয়ে এসেছে। আর কারখানায় ঢোকার পরই এঁরা আপনাদের স্বরূপ ভালো করে চিনতে পারবেন।

দেশীয় ও বিদেশী বুর্জ্জুয়াজিগণ যে দিনের পর দিন দেশের জনগণকে, বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমিকগণকে লুণ্ঠন ও শোষণ করছে এর দ্বারা তারা নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের কারণও সৃষ্টি করছে। তারা জেনে শুনেই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীদলের সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আমি যদি তোমাকে ক্রমাগতই শোষণ করতে থাকি, তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়াই যদি আমার একমাত্র কাজ হয় তা হলে তুমি কখনো আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বুকে চেপে ধরবে না। আমার প্রতি বিরোধের ভাব তোমার মনে আস্‌বেই আসবে। বুর্জ্জুয়াজিগণ জানে যে তাদের বিরুদ্ধে তারা বিরাট বিশাল অসন্তুষ্ট জনগণের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, তা জানা সত্বেও তারা জনগণকে শোষণ করছে। কেননা, শোষণ করাই তাদের পেশা। বুর্জ্জুয়াজি-গণের বিরুদ্ধে যে গণ-উত্থান হবে ঐ উত্থানের মূল নষ্ট করে দেবার কোনো উপায়ই তাদের হাতে নেই। এই উত্থানকে চেপে রাখাই হচ্ছে তাদের একমাত্র কাজ। তারা অনবরত এই চেষ্টাই করতে থাকবে, যাতে কোনো প্রকারে কৃষক ও শ্রমিকগণের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার না হতে পারে। এজন্যে ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক বিরোধের আগুন যদি দেশময় জ্বেলে দেবার প্রয়োজন হয় তা তারা করতে কতটুকুও পেছপাও হবে না। মোল্লা-পুরোহিত ও নেতা প্রভৃতির দ্বারা তারা অনবরত কৃষক ও শ্রমিকগণের সচেতন হওয়াতে বাধা প্রদান করে যাচ্ছে। এর ওপরে আমলাতন্ত্রের অত্যাচারও আছে।

একটা পক্ষ আর একটা পক্ষকে যে পদানত করে রাখে তারি নাম হচ্ছে অধীনতা। পদানতকারীর সহিত পদানতের যে একটা দ্বন্দ্ব বেধে ওঠে তারি নাম হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। আজকের দিনে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ হচ্ছে—এক-পক্ষে গণিত সংখ্যক বুর্জ্জুয়াজিগণ এবং আর একপক্ষে অগণিত শোষিত ও বিলুন্ঠিত জনগণ। একটা নির্ম্মম সত্যকথা আমাকে এখানে বলতে হবে। গুপ্ত ষড়যন্ত্রমূলক ত্রাসনীতি স্বাধীনতার সংগ্রাম মোটেই নয়। ইংরেজ মাত্রেরই প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাবাপন্ন হওয়া যেমন দেশপ্রেম নয়, তেমনি ধনিকতন্ত্রের দু'চার জন আমলাকে হত্যা করাও স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, তা মনের ভিতরে স্বাধীনতার প্রেরণা যতই আসুক না কেন। জ্বরের রোগীকে জ্বরেরই ঔষধ খাওয়াতে হয়। তা না খাইয়ে যদি তাকে কোন কবিরাজ কলেরার ঔষধ খাইয়ে দেয় তা হলে সেটা আর যা হোক্ চিকিৎসা করা ত হলো না কিছুতেই। পৃথিবী হতে রাজার ক্ষমতা এখন চলে গেছে, ফিউডাল লর্ড বা জায়গীরদারগণের প্রভাবও চিরদিনের তরে ক্ষুন্ন হয়ে গেছে। আজকের দিনে সমস্ত অধিকারকে আয়ত্ত করে রেখেছে বুর্জ্জুয়াজি সম্প্রদায়। তাদের কাছ থেকে সে অধিকার কেড়ে নেওয়াই হচ্ছে সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ করা। কৃষক ও শ্রমিকগণের অর্থাৎ জনগণের উত্থানই হবে এ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম। তোমরা যারা সর্ব্বহারা, সর্ব্বত্যাগী হয়ে পথে বসেছ,—তোমাদের উচিত জনগণকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা, তাদের অধিকার বুঝে নেবার সংগ্রামের জন্যে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা।

আমার অপরাধ নিওনা, তোমাদের দুর্ব্বলতা কোথায় তা আমি দেখেছি। বীর-পুজার আওতায় এসে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি তোমাদের একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। চিন্তা করা এবং ঘটনা ও তালিকা মিলিয়ে ব্যাপারগুলিকে অধ্যয়ন করার ভার তোমরা অন্য লোকের মাথায় চাপিয়ে নিজেরা গতানুগতিকতায় গা ঢেলে দিয়েছ! তাই, যে জিনিসটে বোঝার জন্যে একটুকু মাথা খরচ করার প্রয়োজন আছে তার ত্রিসীমার ভিতরে কোথাও তোমাদের পাবার উপায় নেই। তোমার বীরদের কেউ কেউ বলে গেছেন বোমা আর পিস্তলের দ্বারা দেশোদ্ধার হবে। তাই, তোমাদের অনেকে বোমা আর পিস্তলের সন্ধানে ছুটেছে। তারা মনে করেছে দেশোদ্ধারের যে দায়িত্ব তারা আপনাদের স্কন্ধে নিয়েছে সে দায়িত্বের উদ্‌যাপন এরি দ্বারা হবে। গান্ধী বলেছেন চরকা আর খদ্দরের দ্বারা দেশোদ্ধার হবে। তাই, তোমরা অনেকে চরকা আর খদ্দর ধরেই বসে আছ। এতটুকুও চিন্তা করে দেখবার শক্তি তোমাদের নেই যে, সত্যসত্যই বোমা-পিস্তলকে ভিত্তি করে ষড়যন্ত্রমূলক গুপ্ত সমিতি গঠন করলে কিংবা চরকা ও খদ্দরের প্রচলন করলে দেশে স্বাধীনতা আস্‌তে পারে কিনা। রুষিয়ার চেয়ে ভালো গুপ্ত সমিতি আমাদের দেশে কখনও গঠিত হয়নি। রুসিয়ার নিহিলিষ্টগণ ও সোশ্যালরিভোলিউশনারী দলের চেয়েও উৎকৃষ্ট ত্রাসনীতি আমাদের দেশের ত্রাসনীতিবাদীরা কখনো প্রদর্শন করতে পারেনি। তারা রুষিয়ার জারকে পর্য্যন্ত হত্যা করেছিল। কিন্তু, জারের সিংহাসন তাতে খালি পড়ে থাকেনি। রুষিয়ার শ্রমিকগণের বিদ্রোহের ফলেই রুষিয়া বুর্জ্জুয়াজিগণের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। সোশ্যাল রিভিলিউশনারিগণ শ্রমিক-বিদ্রোহে কোনো সহায়তাও করেই নি, পরন্তু, যখন বৈদেশিক ধনিকশক্তি চারিদিক থেকে রুযিয়াকে ঘিরে ফেলেছিল তখন এই সোশ্যালরিভোলিউশনারী দল প্রতি-বিদ্রোহ করেছিল দেশে। তোমরা যদি এখনো ঠিক পথ বেছে না নাও তা হলে আমার ভয় হচ্ছে যে, ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাসে প্রতি-বিপ্লববাদীর অধ্যায়ে তোমাদেরও নাম হয়তো লিখিত হবে। ফ্যাসিষ্ট হওয়ার লক্ষণ ত এখনি তোমাদের অনেকের মধ্যে সূচিত হচ্ছে।

বন্ধু, বিপ্লববাদীরা দরকার হলে গুপ্ত সমিতি হয়তো গঠন করতে পারে, কিন্তু, গুপ্তসমিতির সভ্য না হলে যে, বিপ্লববাদী হওয়া যায়না এমন বিশ্বাস কিছুতেই মনে স্থান দিওনা। আমি দেখেছি অনেকেই নিজেদের বিপ্লববাদী মনে করে না এই কারণে যে তারা কোনো গুপ্ত বিপ্লব সমিতির সভ্য নয়। আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়াসী যে হবে সে-ই বিপ্লববাদী। অধিকাংশ স্থলে গুপ্ত সমিতির সভ্যগণ তথাকথিত বিপ্লববাদী হয়ে পড়ে। আমি কত বার তোমাকে বলেছি এ যুগে বুর্জ্জুয়াজিগণের বিরুদ্ধে জনগণের উত্থানই সত্যকারের বিপ্লব।

বন্ধু, শরীরের স্নায়ুগুলিকে আর একটুকু শক্ত করতে চেষ্টা কর। হিন্দুতে মুসলমানে এতটুকু ঝগড়া বাধলেই যে কোনো দিকে আর কিছু হবে না বলে নিরাশ হয়ে পড়া, এর চেয়ে কাপুরুষতা আর কিছুই নেই। দৃষ্টিকে অনেক বেশী প্রসারিত করা দরকার। তাতে ছোট খাটো সঙ্কীর্ণতা গুলো আর থাকে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ্য দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে না পারছ ততক্ষণ প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজেরই উপযোগী তুমি হতে পারবে না।

পত্র খানা অনেক বড় হয়ে গেল। আমার যত কথা বলবার আছে সবই তোমায় পরে পরে পরে বলব। *

তোমার—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

* পত্রখানা কোনো এক বন্ধুকে লিখিত হয়েছিল।

সম্পাদক, "গণবাণী"

চীন সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ

—০—

কি করিয়া চীনে বৃটিশের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হইল

—•—

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সর্ব্বপ্রথম চীনদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। এই সময়েই বৃটিশ বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে চীনে আফিম আমদানী করিয়াছিল। চীনের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট এই আফিমের বিক্রীতে বাধা দেয়। ইহাই ছিল বৃটিশ আক্রমণের কারণ। বৃটিশ নৌ-বাহিনী চীনের উপকূলের শহর সমূহকে আক্রমণ করিল, গুলি বর্ষণ ও নর-হত্যার দ্বারা বৃটিশ ধনিকগণ অহিফেন সমরে জয়লাভ করিল। এই জয়লাভের ফলে যে সন্ধি হইল তাহাতে হংকং বৃটিশের হাতে আসিল এবং আরো চারিটী চীনের বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হইল। কিন্তু চীনের গবর্ণমেণ্ট আফিমের ব্যবসায়ে অনুমতি দিতে কিছুতেই স্বীকার করিল না। তাহার ফলে হংকং বে-আইনী ভাবে আফিম আমদানীর কেন্দ্র হইয়া পড়িল। এই আমদানী-কারকগণ হংকং এ বৃটিশের আশ্রয় পাইত এবং বৃটিশ পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ব্যবসায় চালাইত। ১৮৫৬ সালে এইরূপ একখানি আফিমের জাহাজ চীনবাসীদের দ্বারা ধৃত হইল। ইহারই ফলে দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এইবারে বৃটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র চীনের উপকূলের শহর গুলির উপরে গুলি বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিল না, তাহারা পিকিংএ সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিল। শান্তির জন্য যে সন্ধি স্থাপিত হইল, তদ্দ্বারা নয়টি বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আফিমের ব্যবসায়ও আইন সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইল। চীনে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের সুযোগও তাহাদিগকে প্রদত্ত হইল। এইরূপে চীনে আফিম প্রচলনের ও মিশনারীদের কার্য্যের পন্থা সুগম হইল। এই মিশনারীগণ তখন হইতেই বৃটিশ ধনিকগণের চীনের সহিত সম্বন্ধের বহু পন্থা নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশ সমূহের চৈনিক কৃষকগণ অতি মাত্রায় সৈন্যকর, যুদ্ধের খরচ ও ক্ষতি পূরণের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়া এবং তাহাদের জমীদার গণের দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া চীনের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ ক্যাণ্টন হইতে ইয়াংসী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৃটিশ অফিসার গর্ডনের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমিত হয়। এই গর্ডন পরে মিসরে জেনেরল গর্ডন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে বৃটিশ ধনিকগণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে চীনের জন গণের উত্থানের প্রদমনে সাহায্য করিতে লাগিল। ১৯০০খৃষ্টাব্দে আরও একটী অভ্যুত্থান হইল। এই অভ্যুত্থানের সময় চীনের কৃষক বাহিনী পিকিং শহরে প্রবেশ করিয়া বৈদেশিক দূতাবাসগুলিকে ঘিরিয়া ফেলিল। ইহার পরিণামে তথাকথিত বক্সার যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইউরোপীয়গণের সম্মিলিত সৈন্য বাহিনী পিকিংএ প্রবেশ করিয়া জোর পূর্ব্বক বিদ্রোহ-দমন করিল, এবং চীন গবর্ণমেণ্টকে ছয় কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি পূরণ দেওয়ার করার করিতে বাধ্য করিল।

চীনে বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থ

যে ধনিক মণ্ডলী প্রধানতঃ এখন বৃটিশ নীতির পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহারা চীনে তাঁহাদের মূলধন খাটাইবার ইচ্ছা করেন। ইতি পূর্ব্বে যে মূলধন খাটান হইয়াছে তাহার পরিরক্ষণ করাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যদিও চীনের অভ্যন্তরীণ জেলা সমূহ এখনও কেবল মাত্র কৃষকগণের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া থাকে, তথাপি বৃটিশ এবং অন্যান্য বৈদেশিক ধনিকগণ, বিশেষ করিয়া জাপান, ফ্রান্স ও আমেরিকার ধনিকগণ দেখিতে পাইয়াছে যে তাহাদের আপন আপন দেশের চেয়ে অল্প পারিশ্রমিক দিয়া তাহারা চীনে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইতে পারে এবং তাহাদের দেশের প্রস্তুত দ্রব্যও চীনে রপ্তানী করিতে পারে। ইহারই ফলে চীনে বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল বস্ত্র পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে আমদানী করা হইত সেই সকল বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য বৃটিশ ধনিকগণ বস্ত্র প্রস্তুতের কলকব্জা চীনে প্রেরণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বৃটিশ ধনিক মণ্ডলী, যাঁহারা প্রধানতঃ হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কের মধ্য বর্ত্তিতায় কার্য্য করিয়া থাকেন (এই ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টার ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডেরও একজন ডিরেক্টর) চীনের গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করাকে তাঁহাদের নীতির অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। এই শর্ত্তে তাঁহারা ঋণ প্রদান করেন যে ঋণের টাকার দ্বারা চীন বৃটিশ লৌহ শিল্পাগার হইতে রেলওয়ে ও অন্যান্য উপকরণ খরিদ করিবে।

অধিকন্তু, তথাকথিত বাণিজ্য বন্দর সমূহে বৃটিশ বিশেষ অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। (কখনও সাংহাইএর মত, কখনও আন্তর্জাতিক উপনিবেশ সমূহের মত অন্য বৈদেশিক শক্তি সমূহের সহিত সম্মিলিত ভাবে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।) এই বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত স্থানগুলি কার্য্যতঃ বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানগুলি বৃটিশের দ্বারা শাসিত ও বৃটিশ পুলিসের দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। এবং এই স্থান গুলি চীনের সাধারণ আইনের অন্তর্ভুক্তও নহে। এই স্থান গুলিতে বৃটিশ ধনিকগণ ডক নির্ম্মাণ করিয়া, ট্রামওয়ে লাইন স্থাপন করিয়া, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি বসাইয়া চীনের শ্রমিকগণের কঠোর পরিশ্রম হইতে প্রচুর লাভবান হইতেছে। কতকগুলি মজুরীর হার নিম্নে দেওয়া হইল:— বস্ত্র শিল্পানুষ্ঠানে শ্রমিকগণ (পুরুষ) দৈনিক ৭৷৹ পেন্স হইতে ১ শিলিং; রেলওয়ে শ্রমিকগণ দৈনিক ১ শিলিং; বিল্ডিং নির্ম্মাণের শ্রমিকগণ (কারিকর) দৈনিক ১ শিলিং ৩ পেন্স (সামুলি) ৮ পেন্স; কয়লা খনির শ্রমিকগণ দৈনিক ৫ পেন্স হইতে ১০ দশ পেন্স পর্য্যন্ত। দেশালাই কারখানার শ্রমিকগণ (নারী) দৈনিক ২৷ পেন্স হইতে ১ শিলিং পর্য্যন্ত (বালকগণ) ২৷৷ হইতে ৫ পেন্স পর্য্যন্ত।

রেশমের কারখানায় (নারী) দৈনিক ১০৷৷ পেন্স, বালকগণ দৈনিক ৫ পেন্স।

পুরুষ, স্ত্রীলোক ও পাঁচ সাত বছরের বালকগণ দৈনিক ১২ ঘণ্টা হিসাবে সপ্তাহের সকল দিনই কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের শ্রমলব্ধ ধন দ্বারা বৃটিশ প্রচুর লাভবান হইয়া চীনেতে আরও অধিক মূলধন ঢালিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ যে একমাত্র সাংহাইতেই ৬ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন ঢালা হইয়াছে। সমগ্র চীনে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ। ৩০ কোটী পাউণ্ড। পুরাতন চীন গবর্ণমেণ্ট যে বৈদেশিকঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে বৃটিশের অংশ ৪ কোটি পাউণ্ড।

চৈনিক শ্রমিকগণের সংগ্রাম

চীনের বন্দর সমূহের শিল্পের বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রাচ্য

বৃটিশ ও অন্যান্য জাহাজে চীনবাসীদের কর্ম্ম প্রাপ্তিতে পরিশ্রমী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিকসঙ্ঘ গঠেনের আন্দোলনের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম হইতেই ক্যান্টন শ্রমিক সঙ্ঘবাদের বিশিষ্ট উদ্যমপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এই আন্দোলনকে বৃটিশের ধ্বংস করার চেষ্টা সত্বেও সমস্ত বন্দর ও অভ্যন্তরীণ শিল্পকেন্দ্র সমূহে শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহ গঠিত হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল যদ্দ্বারা বৈদিক শ্রমিকগণের নিকট ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল যে, তাহাদের কাজের অবস্থা সমূহের উন্নতিকে প্রতিহত করার জন্য বৃটিশ ও অন্যান্য বৈদেশিক ধনিকগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আছে। ১৯২৫ সনের ২০শে মে তারিখে যখন ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণ একত্র সমবেত হইয়াছিল তখন সেই নিরস্ত্র জনতার উপরে সংহাইয়ের বৃটিশ পুলিশ গুলি চালাইয়াছিল। এই ব্যাপারের অনুসন্ধানের রিপোর্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ৪১ জনের মৃত্যু ও ১২০ জনের আহত হওয়া সম্বন্ধে চীন শ্রমিকসঙ্ঘ যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল সেই সম্বন্ধে কেহ কোন প্রতিবাদ করে নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই যে এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছিল। এ ধর্ম্মঘটে ক্যান্টন আর হংকংও যোগদান করিয়াছিল এবং বৃটিশ ব্যবসায়ের বর্জ্জন ঘোষিত হইয়াছিল। ২৩শে জুন তারিখে ক্যান্টনের একটী চীনপল্লীর রাস্তা দিয়া শ্রমিকগণ মিছিল করিয়া যাইতে যাইতে যখন তাহারা বৈদেশিক দূতাবাসের বিপরীত দিকে পৌছিয়াছিল তখন বৃটিশ "লুইসগান্" ওয়ালারা তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। ফরাসীরাও এই গুলি বর্ষণে যোগদান করিয়াছিল। বৃটিশের সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ৩৭ জন চীনা নিহত হইয়াছিল এবং ৮০ জন আহত হইয়াছিল।

অতঃপর ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যখন নৌ-চালনার আইন ভঙ্গ করার অপরাধে দুইখানি বৃটিশ ষ্টীমারকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল, তখন বৃটিশের গানবোটগুলি ওয়ানসিয়েন পর্য্যন্ত যাইয়া পৌছে। ওয়ানসিয়ান ইয়াংসী নদীর উপরের দিকের একটি বন্দর। ষ্টীমার দুইখানাকে পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টায় যখন অকৃতকার্য্য হইল তখন গানবোটগুলি শহরের উপরে গুলিবর্ষণ করিল। বৃটিশ ধনিকগণের কাগজের বর্ণনা অনুসারে চীনাদের হতাহতের সংখ্যা ২০০০ (ডেলি টেলিগ্রাফ) হইতে ৫০০০ হাজার (মনিংপোষ্ট) পর্য্যন্ত। কুমিণ্টাংদলের ম্যানিফেষ্টো অনুসারে মৃত্যুর নিম্নতম সংখ্যা ৫০০ শত এবং আহতের সংখ্যা এক হাজার।

জাতীয় বিপ্লব আন্দোলন

শ্রমিকসঙ্ঘ সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে চীনের জাতীয় আন্দোলনও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ক্যান্টন ইহার বিশিষ্ট কর্ম্মকেন্দ্র। এইখানে সানইয়াৎ সেনের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবর্থমেণ্টকে পরাজিত করার বহুল চেষ্টা শ্রমিক সংগঠনের শক্তিদ্বারা ব্যাহত লইয়াছিল। সান-ইয়াৎসেন বহু বৎসর জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। পিকিং নামে মাত্র রাজধানী ছিল। ১৯১১ সনে সম্রাটের পরিবারকে বিতাড়িত করার সময় পর্য্যন্ত সম্রাট এইখানে বাস করিতেন। সেই সময় হইতে পিকিংএ একটি নামে মাত্র গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত আছে। বৃটিশ ও অন্যান্য বৈদেশিক ধনিক মণ্ডলী এই গবর্ণমেণ্টের উপরে প্রভুত্ব করিতেছে। যুদ্ধবাদী জেনেরলগণ কম বেশী প্রত্যেকেই বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা শ্রমিক ও জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিয়াছে। জোর পূর্ব্বক সৈন্যকর আদায় করিয়া এবং শস্যাদি অধিকার করিয়া লইয়া তাহারা কৃষক সাধারণের উপরে অত্যাচার করিয়াছে। কোনরূপ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিলেই তাহারা গ্রামসমূহকে ভস্মীভূত এবং অধিবাসিগণকে হত্যা করিয়াছে।

যাহা হউক, ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ক্যান্টনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। গত বৎসরের ঘটনাবলীর দ্বারা ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে জাতীয় বিপ্লবমূলক কর্ম্মতালিকা শহরের ও গ্রামের শ্রমিকগণের নিকট হইতে অত্যধিক মাত্রায় সমর্থন পাইয়াছে। ক্যান্টন-বাহিনী যাহাতে উত্তারাভিমুখে অগ্রসর হইতে না পারে তজ্জন্য বৃটিশ ও জাপান চৈনিক জেনেরলগণের দ্বারা যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ভাড়াটে সিপাহীরাও ক্যান্টন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রাজী হয় নাই। তাঁহারা হয়ত ধরা দিয়াছে, কিংবা ক্যান্টন বাহিনীর আগ্রমনের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে। এইরূপে জাতীয়দল ইয়াংসী পর্য্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ চীন অধিকার করিয়া লইয়াছে। তাহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অগ্রগমনের সময়ে তাহারা এমন সকল শহর দখল করিয়াছে যাহাতে বৃটিশের খুব বড় আর্থিক স্বার্থ নিহিত ছিল। বৃটিশ ধনিকগণ এই সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ না করিতে ও শ্রমিকদের শ্রমের দ্বারা লাভবান হওয়া ত্যাগ না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় বর্ত্তমান সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

চীনে বৃটিশ সৈন্য সমাবেশ

যেমন হইয়া থাকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সার অষ্টেন চেম্বার লেনের মুখ দিয়া বারে বারে ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা জাতীয়দলকে কিংবা তাহাদের শত্রুগণকে সাহায্য করিবেন না। চীনের ব্যাপার সমূহে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার জন্য বৃটিশ উৎকণ্ঠিত ছিল। কিন্তু—

(১) ১৯২৬ সনের নভেম্বর মাসে টিয়ানসিনে কুমিণ্টাংদলের কতিপয় মেম্বার বৃটিশ কর্ম্মচারীদের দ্বারা ধৃত হইয়াছিল। ১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে ইহাদের ১৪ জনকে, চ্যাং-চুং-চ্যাংএর দ্বারা নিহত করান হইয়াছে। (২) ডিসেম্বর মাসে ইহা ঘোষিত হইয়াছিল যে মাণ্টা হইতে বৃটিশ সৈন্য চীনে যাইতেছে। (৩) জানুয়ারী মাসে সাংহাই রক্ষক সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল এবং ঐ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই • টী পদাতিকদল, ৭টী কামানবাহী দল এবং দুইটি রয়েল বিমানবিহারী সৈন্যদল চীন অভিমুখে রওনা হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে হং কং হইতে ভারতীয় সৈন্যগণও সাংহাই পৌছিয়াছিল। (৪) হংকংএ মিছিল করা বা সাধারণ ধর্ম্মঘটের বন্দোবস্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। (৫) ফেব্রুয়ারী মাসের ২১শে তারিখে বৈদেশিক রণপোতসমূহ যাহার অধিকাংশই বৃটিশের ছিল সাংহাইএতে পৌছার সংবাদ আসে। (৬) ২৪শে মার্চ্চ তারিখে বৃটিশ ও আমেরিকার রণপোত সমূহ নানকিনে শেল বর্ষণ করিয়াছিল (এইখানে লুটতরাজ হইয়াছিল এবং ৩ জন বৃটিশ ও ১ জন আমেরিকান নিহত হইয়াছিল) চীনের রিপোর্ট অনুসারে চীনাদের মৃত্যুর সংখ্যা শত শত ছিল। (৭) চীনকিয়াং হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী জাতীয়দলের দ্বারা অধিকৃত একটি দুর্গে ৮ই এপ্রিল তারিখে বৃটিশ ডেসট্রয়ার কামান হইতে শেল বর্ষণ করা হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী

দিবসে ইহা ঘোষিত হইয়াছিল যে সান্‌-চুয়াং-ফেং এর অধিনায়কত্বে উত্তরের জাতীয়দল-বিরোধী সৈন্যবাহিনীর দ্বারা চীনকিয়াং অধিকৃত হইয়াছে।

এই সকল উপায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্যের জন্য অবলম্বন করিয়াছিল। সেই উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশের বিন্যস্ত মূলধনের রক্ষা করা এবং বিপ্লব আন্দোলনের বিজয়কে প্রতিরোধ করা। মার্চ্চ মাসে "টাইমস্‌" জাতীয় দলকে শত্রু নামে আখ্যাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং আমেরিকা ও জাপানের সহিত ব্যাপার জটিল হইয়া উঠিতে পারে এই ভয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহ হইতে নিরস্ত করিয়াছিল।

কুমিণ্টাং দলের সাফল্য

চীনের জনগণের জাতীয় দল কুমিণ্টাং বৈদেশিক শোষণবাদ ও তাহার যন্ত্র উত্তর প্রদেশ সমূহের সামরিক নেতৃগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছে। পূর্ব্ব হইতেই ইয়াংসীর দক্ষিণ উপকূলস্থ প্রদেশ ইহাকে সাহায্য করিতেছে। ইহার সাক্ষাৎ শাসনাধীন জাতীয় সৈন্য বাহিনীকেও উহারা সাহায্য করিতেছে। যে সকল নূতন স্থানের উপরে কুমিণ্টাং দলের অধিকার বিস্তৃত হইতেছে সেই সকল স্থানে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহ গঠিত হইতেছে। শ্রমিকদের বেতন বর্দ্ধিত, এবং তাহাদের কাজের সময় কম করা হইতেছে। ট্যাক্স ও ভূমিকরও কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। "টাইমস্‌" স্বীকার করিতেছে যে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহ জাতীয় দলের শাসন অধিকারের সময় হইতে হ্যাংকো ও সাংহাইতে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় উন্নতিলাভ করিয়াছে। ক্যাণ্টন গেজেটএ যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে দক্ষিণ প্রদেশ সমূহে কৃষকদের সংগঠনের কাজ সমান উৎসাহের সহিত চালিত হইতেছে। কুয়ানটং এ জানুয়ারী মাসে কুমিণ্টাং দলের যে সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে একমাত্র কুমিণ্টং প্রদেশেই ৮ লক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক ও ৩ লক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ শহরের শ্রমিক রহিয়াছে।

কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার আলোচনা করিয়া একটি কর্ম্ম-তালিকা গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার বেশী কাজ করা হইবে না। ধর্ম্মঘট করার স্বাধীনতা থাকিবে, ভূমিকরের শতকরা ২৫ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইবে এবং কৃষকদের জন্য সমবায় সমিতি সমূহ স্থাপন করা হইবে।

কুমিণ্টাং দলে বিরোধ

এপ্রিল মাসের মধ্যে কুমিণ্টং দলের নরম ও গরম পন্থীদের মধ্যে বিরোধ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নরমদল বিদেশীয় ধনিকগণের সহিত কোন না কোন আপোস নিষ্পত্তি করিতে চাহে। পক্ষান্তরে গরম দল চীনের শ্রমিকগণের বিপ্লব সংগ্রাম পরিচালিত করিতেছে। হ্যাংকোর জাতীয়দলের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জাতীয় সেনাদলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি চ্যাং কৈ-সেক নান্‌কিনে নরমদলের এক গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছে। সৈন্য পরিচালনা ও আক্রমণের দ্বারা সে শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। সাংহাইএর তথা-কথিত জেনারেল লেবার ফেডারেশনের ন্যায় সংগঠনগুলিও শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। সে চ্যাং-সো-লিনের সহিত যোগদান করিবে কিনা এবং বৃটিশ স্বার্থান্বেষী-দের দ্বারা কতটুকু সাহায্য পাইবে তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইতেছে যে জাতীয়দলের সত্যকারের নেতৃত্ব কুমিণ্টাংদলের চরমপন্থীদের হাতে রহিয়াছে। এই চরম পন্থীদলের শক্তি শ্রমিক ও কৃষকগণের নিকট হইতে সঞ্চয় করা হইয়া থাকে। এই কারণে বৃটিশ শোষণ-বাদীগণ ইহাকে শত্রু নামে আখ্যাত করিয়াছে। এই বৃটিশ শোষণবাদীগণ বৃটিশ শ্রমিকসঙ্ঘবাদীদের সহিত ও চীনের শ্রমিক-গণের সহিত তাহাদের লভ্যাংশ ও ধনিকবাদকে রক্ষাকল্পে যুক্ত করিতেছে।

(The Monthly Circular of the Labour Research Department, May, 1927.)

বর্ত্তমান ভারত

[আর, পাম, দত্ত]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

("বর্ত্তমান ভারত" আর, পাম দত্তের Modern India নামক ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইতোপূর্ব্বে এ অনুবাদ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ সংখ্যক গণবাণীতে বের হয়ে গেছে। **গণবাণীর** পাঠকগণ মনোযোগের সহিত এ অনুবাদ পাঠ করলে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আদর্শের সহিত পরিচিত হতে পারবেন।)

ভারতে আধুনিক শোষণবাদ(ইম্পিরিয়েলিজম

যুদ্ধের সময় থেকে শোষণকারিগণের নীতির পরিবর্ত্তনই হচ্ছে বর্ত্তমান ভারতীয় অবস্থার শাসনমূলক ভিত্তি।

এই পরিবর্ত্তনের ধরণ ও ভিত্তি কি ?

ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের ওপরে এই পরিবর্ত্তন কি কাজ করেছে ?

১। ভারতে শোষণবাদের (ইম্পিরিয়েলিজমের) আধুনিক ভিত্তি

১৯১৬-১৮ সনে ভারতে ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল (শিল্প) কমিশন বসেছিল। এই কমিশন বসার সাথেই শোষণবাদীগণের নীতির (Imperialist policyর) নবগতি প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিষ্কাররূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে যে যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি সাক্ষাৎভাবে ভারতের শিল্পোন্নতির প্রতিকূল ছিল। বৃটিশ ধনিকদের স্বার্থ সমূহ তখন যে স্তরে পৌঁছেছিল তারি প্রতিবিম্ব ছিল এই প্রতিকূল আচরণ।

যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়কার জাতীয় আন্দোলনকারিগণ নব উদীয়মান ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজিগণের স্বার্থেরই প্রতিনিধি ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচরণের বিরুদ্ধে তাঁহারা শিল্পোন্নতির দাবী সমূহ বুঝে পাওয়ার জন্যেই সংগ্রাম করতেন।

আজকের দিনে শিল্পোন্নতিই হচ্ছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতির মূলমন্ত্র।

ভারতের ইন্ডাষ্ট্রিয়েল (শিল্প) কমিশন ১৯১৬ সনে প্রথম নিযুক্ত হয়েছিল। এই কমিশন ভারতের শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা, উপায় ও কার্য্যকরী অবস্থা সমূহের এবং নানাদিক থেকে তার আবশ্যকতার বিষয় অতীব বিশদরূপে পরীক্ষা করে ১৯১৮ সনে তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। এই রিপোর্টই বর্ত্তমান নীতির ভিত্তি। এতে সুপারিশ করা হয়েছিল :—

(১) শিল্পোন্নতির জন্যে সরকারী সাহায্য

(২) আধুনিক কৃষি প্রণালীর প্রবর্ত্তন

(২) বিশ্বজনীনরূপে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা

যখন নবনীতির আর্থিক ভিত্তি শিল্পকমিশনের দ্বারা স্থাপিত হলো, তখনি ১৯১৭ সনের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের দ্বারা তার রাষ্ট্রনীতিক দিকটাও প্রকাশ পেলো। সাধারণভাবে কম বা বেশী ভ্রমাত্মক "স্বায়ত্ত শাসন" এর কেবলমাত্র রাষ্ট্রনীতিক পরীক্ষারূপেই স্বতন্ত্রভাবে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট বিবেচিত হয়ে থাকে। আসলে কিন্তু সোজা ও খোলাখুলি ভাবে এ রিপোর্ট শিল্পকমিশনের নীতির একটা পরিপূরক বস্তু মাত্র ছিল।

ব্যবস্থাপক সভা সমূহ দেওয়ার ও শাসন কার্য্যে গৌণ অংশ প্রদান করার প্রস্তাব করে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট ভারতে উদীয়মান বুর্জ্জোয়াজিগণের সহযোগিতা লাভ করার উদ্দেশ্যকে প্রশস্ত করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধে উন্নত নীতিরও প্রচার করেছিল।

"শিল্পানুষ্ঠান পূর্ণ ভারতবর্ষ যে সাম্রাজ্যের পক্ষে কত বেশী শক্তি সম্পন্ন দেশ হবে তার পরিমাপ করা যায়না।"

পরবর্ত্তী বর্ষ সমূহে এ নীতির নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ভারতের জন্যে ক্রমবর্দ্ধিতরূপে রক্ষণনীতি অবলম্বন করা। এ সম্বন্ধে ১৯২২ সনের ফিস্‌ক্যাল (রাজস্ব সম্বন্ধীয়) কমিশনের সুপারিশগুলির বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। ফিস্‌ক্যাল কমিশন নিম্নলিখিত ব্যাপার গুলোর অনুকূলে রিপোর্ট প্রদান করেছিল :—

(১) ট্যারিফ (পণ্য শুল্ক সম্বন্ধীয়) বোর্ডের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রভেদ কারক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা।

(২) প্রতিকূল আবকারী শুল্ক তুলে দেওয়া।

(৩) ভারতের আর্থিক ক্ষতির কারণ না থাকলে সাম্রাজ্যিক বস্তুর সমাদর করা।

(৪) বৈদেশিক মূলধন ভারতে নির্ব্বিরোধে আনয়ন করা।

(৫) দ্রুত শৈল্পিক উন্নতি।

(অল্প সংখ্যক ভারতীয় সভ্য সাধারণ উপসংহারের সহিত একমত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা পূর্ণ সংরক্ষণ নীতির দাবী করেছিলেন। সাম্রাজ্যিক বস্তুর সমাদর তাঁরা করতে চাননি।)

এই নূতন নীতির ভিত্তি কি ?

কেউ কেউ বলে থাকেন যে ভারতীয় অভাব ও দাবীর সোজাভাবে অল্প অল্প করে পূরণই এ নীতির ভিত্তি। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে একথা সত্য নয়। নবনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় অবস্থা সমূহের ওপরে বিন্যস্ত হয়নি।

একথা সত্য যে এ নূতন স্তর ভারতীয় উন্নতির একটা অপরিহার্য্য স্তর। এর সাথে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কৌশল সহকারে আপনাদের মিশ খাইয়ে আসছিল। একথাও সত্য যে রাজনীতিক কারণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উদীয়মান ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজিগণকে আপনাদের দিকে লাভ করার জন্যে চেষ্টা করছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভীতি প্রদর্শক জাতীয় আন্দোলনকে বিভক্ত ও নিরস্ত্র করা। কিন্তু, নবনীতির বিস্তৃতি কেবলমাত্র ভারতীয় অবস্থা সমূহের কারণে ঘটেছে এরূপ মনে করাটা খুবই ভুল মনে করা হবে।

ভারতে যে নূতন নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা সারা বিশ্বে যে আধুনিক শোষণবাদের (ইম্পিরিয়েলিজমের) উন্নতি হয়েছে তারি একটা অংশ মাত্র। (সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে) আজকের দিনে প্রত্যেক দেশই এ উন্নতি দ্বারা পদানত হয়েছে।

শোষণবাদ (ইম্পিরিয়েলিজ্‌ম) ধনিকবাদের অধিকতম অগ্রসর ও উন্নত আকার। ধনিকবাদ ধনিকগণের নিজেদের দেশের শ্রমিকগণকে শোষণের দ্বারাই আরম্ভ হয়ে থাকে। কিন্তু, কারবারের বিস্তৃতির দ্বারা নূতন ও প্রশস্ততর বাজার সমূহের এবং কাঁচা মালের উৎপত্তি স্থল সমূহের অত্যন্ত দ্রুত আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রথমে শোষণবাদীদের বিজয়ের যুদ্ধ সমূহ আরম্ভ হয়। এর পরে ধনিকগণের আপনাদের দেশে যখন অত্যধিক শৈল্পিক উন্নতি সাধিত হয়, তখন ধনিকবাদ বৃহৎভাবে এক চেটিয়া অধিকার লাভের দুঃসাহসিক স্তরে পৌঁছয়। বছরের পর বছর যখন লভ্যাংশ স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে তখন ধনিকগণের কারবারকে আরো সম্প্রসারিত করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। এই সম্প্রসারণের কাজ অন্য দেশ সমূহে মূলধনের বিস্তার করে এবং সে সকল দেশকে শৈল্পিক শোষণের বিষয়ীভূত করে সাধিত হয়ে থাকে। রেলওয়ে, কলকব্জা এবং মূলধন নূতন দেশসমূহে রফ্‌তানী করা হয়ে থাকে; নূতন দেশের সুলভ ও অরক্ষিত শ্রমিকগণের ভিত্তির ওপরে শিল্পানুষ্ঠান সমূহ স্থাপিত হয় এবং শোষণমূলক সরকারের (Imperialist State) রাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতা রক্ষিত হয়ে থাকে। শোষণকারী দেশের অংশীদারগণের মধ্যে সুদ ও লভ্যাংশও বণ্টিত করা হয়। এটাই হচ্ছে শোষণবাদের আধুনিক আকার অর্থাৎ অর্থগত মূলধনের (Finance Capital) শোষণবাদ, (আরো খোলসা কথায় আধুনিক বড় শক্তি সমূহের অত্যুচ্চভাবে কেন্দ্রীভূত ও ট্রাষ্টভুক্ত মূলধন)।

এই অধুনিক শোষণবাদই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র। জগতের অধিকার সমূহের জন্যে যুদ্ধ যে বিরুদ্ধবাদী শোষণবাদিগণের সংগ্রাম ছিল একথা এখন সাধারণভাবে সকলেই মেনে নিচ্ছে। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মানীর অধীন দেশ সমূহ বৃটিশ ও ফ্রান্স শোষণবাদগিণের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। (তারা ডায়ের নীতি (Dawes Plan) অনুসারে জার্ম্মান শ্রমিকগণের ওপরে এক প্রকারের ঔপনিবেশিক অধীনতাও বিস্তার করতে চেয়েছিল)। এই প্রকারে বস্তুতঃ প্রায় সমস্ত জগৎই শোষণবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। শোষণবাদীদের ভিতরে খুব তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। এর দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ ক্রমশঃই প্রখর হতে প্রখরতর এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ অপরিহার্য্য হয়ে উঠ্‌ছে। সর্ব্বত্র জনগণেকে শোষণের উদ্দেশ্যে পদানত করে রাখা হয়েছে বলে স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিক সংগ্রামের কারণ সৃষ্টি হয়েছে। পরিণামে শোষণবাদীদের আপন দেশের শ্রমিকগণ সুলভ বিদেশী মজুরীর প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের বোঝার দ্বারা নিষ্যাতিত হয়ে তাদের অবস্থা সমূহের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়ে। এইরূপে ইম্পিরিয়েলিজমের (শোষণবাদের) মধ্যেই ধনিকবাদের চরমস্তর পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। ধনিকবাদ অপরিহার্য্য রূপে আপনার পতনের পথে চলেছে। অন্যপক্ষে শোষণবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ ও পদানত জনগণের সংহতি বিশ্বব্যাপী শান্তিময় সমন্বয় গঠনের পথে, এবং তার পরিণামে শোষণমুক্ত বিশ্বশ্রমিকগণের গণতন্ত্র গঠনের পথে পরিচালিত হচ্ছে।

বৃটেন প্রথম ধনিকদেশ। অনেককাল থেকে এদেশ ধনিকবাদের চরমোন্নতির স্তরে পৌঁছেচে। পূর্ব্বে বৃটেনের কাজ ছিল জিনিস নির্ম্মান করা ও বাণিজ্য করা। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দী থেকে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীময় মূলধনের চালান করা ও পদানত দেশ সমূহের শ্রমিকগণকে শোষণ করার প্রক্রিয়া ও তার ফলে লভ্যাংশ ও সুদ লাভ করাই বৃটেনের প্রধান কাজ হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে বাইরে যে মূলধন বৃটেন চালান করেছে তার পরিমাণ চল্লিশ হাজার লক্ষ পাউণ্ড। এ মূলধন বৃটেনের জাতীয় ধনের প্রায় এক তৃতীয়াংশের সমান এবং ১৯০৩ সনে সার রবার্ট গিফেন্ যে এষ্টিমেট করেছেন সে হিসাবে ভারতের সমস্ত জাতীয়ধনের চেয়েও বেশী।

যুদ্ধের সময় হতে এ প্রক্রিয়া আরো দ্রুত উন্নতিলাভ করেছে। কেননা, বৃটেনের পুরাতন শিল্প সম্বন্ধীয় একচেটিয়া অধিকার শোচনীয়রূপে ও চিরদিনের জন্যে বিচলিত হয়েছে। বৃটিশ শিল্প উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ বুর্জ্জোয়াজিগণের জন্যে এত বেশী লাভ আনয়ন করেছে যে, তা কাহিনীর মত শুনিয়েছে। এখন কিন্তু জগতের প্রতিযোগিতার সম্মুখে তার অবস্থা অবনমিত হচ্ছে। এ জন্যে বৃটিশ বুর্জ্জোয়াজিগণ তাদের লাভের জন্যে সমুদ্রপারে মূলধন খাটাবার প্রতি মনোযোগী হয়েছে। আফ্রিকা, মিসর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষে তারা মূলধন চালান করেছে।

যুদ্ধের পরে বৃটিশ বুর্জ্জোয়াজিগণ যে কার্য্যপ্রণালী স্থির করেছে তার মধ্যে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানময় করে তোলার কথাটা খুব বিশেষ স্থান পেয়েছে।

বৃটিশ যে মূলধন ভারতে চালান করেছে তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নিম্নে তার তালিকা প্রদর্শিত হচ্ছে :—

সন	যত বৃটিশ মূলধন ভারতে রফতানী করা হয়েছে।	সর্ব্বমোট যত বৃটিশ মূলধন রফ্তানী করা হয়েছে।	ভারতে প্রেরিত মূলধনের শতকরা হার।
	দশলক্ষ পাউণ্ড	দশলক্ষ পাউণ্ড	
১৯১৯	১·৪	২৩৭	০·৬%
১৯২০	৩·৫	৩৮৪	০·৯%
১৯২১	২৯·৫	২১৫	১৩·৬%
১৯২২	৩৬·১	২৩৫	১৫·৩%
১৯২৩	২৫·৩	২০৩	১৪·৪%

ভারতের দ্বার "উন্মুক্ত" করতে হবে। বৃটিশ শাসক শ্রেণীর লাভের জন্যে ভারতীয় শ্রমের বিনিয়োগ করে বৃটিশ ধনিকবাদকে উন্নত করতে হবে। (ভারতীয় ধনিকবাদ এ ব্যাপারে বৃটিশ ধনিকবাদের কর্ম্মকারক ও মধ্যস্থ হবে।)

দুরন্ত লোভ



শ্রমিকের পরিশ্রমের ধন শোষণ করে করে ধনিকের দুরন্ত লোভ কিছুতেই চরিতার্থ হচ্ছে না। অতিরিক্ত লাভের ধন ভোগ করে করে তার উদর ভূধরের সমান ফুলে উঠেছে। কিন্তু তবুও তৃপ্তি তার নেই, আরো তাকে চাই—আরো, আরো! যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রমিকের শরীরে শেষ রক্তবিন্দুটুকুও বাকী থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাকে শোষণ করতেই থাকবে। তার পরে সে ফেলে দিবে তার ভাঙা হাড় ক'খানা আস্তাকুড়ের ধারে।

পুস্তক পরিচয়

—:•:—

[পি, স্প্রাট্, বি-এ, (মেম্বার, বৃটিশ লেবর পার্টি)]

—•—

(বিশেষভাবে গণবাণীর জন্যে লিখিত হয়েছে)

"Hundred Percent Indian" (হাণ্ড্রেড্ পারসেণ্ট্ ইণ্ডিয়ান). সি, জি, সাহা প্রণীত, মূল্য ছয় আনা মাত্র। —দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্ ৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, কিংবা গ্রন্থকারের নিকটে "রানছোদ ভবন" গিরগাঁও, বোম্বে ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

মিঃ সাহা একখানা অতি সুন্দর পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় ব্যাপারের সহিত যাঁহাদের যোগ রহিয়াছে তাঁহাদের এ পুস্তিকাখানা পাঠ করা উচিত। ভারতীয় ব্যাপার সমূহ সম্বন্ধে চিন্তার এক সম্পূর্ণ নূতন পথের পরিচয় এ পুস্তিকাখানা প্রদান করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস কর্ম্মক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর হইতে পারার পূর্ব্বেই এ নূতন চিন্তাধারাকে গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দুঃখের বিষয় যে পুস্তিকাখানার রচনাবিন্যাস কিছু কঠিন। যদিও প্রকাশের ভঙ্গিমা ভাল এবং কোথাও অল্পকথায় রচনা

অত্যন্ত রসাত্মক হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস ও কঠিন শব্দ সমূহের প্রয়োগের দ্বারা কোনো কোনো জায়গায় রচনা অস্পষ্টও হইয়া পড়িয়াছে। এ ছাড়া, এ পুস্তিকাতে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ 'থিওরী' বা মতবাদের দিক হইতেই করা হইয়াছে। আলোচনা প্রায়ই 'ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি' (Practical Politics)-কে স্পর্শ করে নাই। এ সব কারণে বইখানা সম্ভবতঃ তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই। কিন্তু, সব সত্বেও এ পুস্তিকাতে একটা আলোকের সন্ধান খুবই পাওয়া যায়।

গান্ধীর দার্শনিক তত্ত্বকে, প্রধানতঃ যে দার্শনিক তত্ত্ব "ইণ্ডিয়ান হোমরুল" (Indian Home Rule) নামক পুস্তকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই দার্শনিক তত্ত্বকে এ পুস্তকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ও প্রণালী সম্বন্ধে অতীব বিস্তৃতরূপে গান্ধীর মত সমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে গান্ধীর বাহ্যদৃষ্টি কত বেশী প্রতিক্রিয়াময়। এইরূপে :—"অন্য কাহারো নিকট হইতে ভারতবর্ষের কিছুই শিখিবার নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আগে হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে সুখ বেশীর ভাগই একটা মানসিক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে লাঙলের দ্বারা ভূমি কর্ষণ করা হইত আজিও সেই লাঙলেরই দ্বারা আমরা কাজ চালাইয়া লইতেছি।" এবং "গান্ধীরাজ একটা আদর্শ রাজ্য হইবে। ইহার পাঁচটি গুহ্যই (Negatives) (রেলওয়ে নয়, হাসপাতাল নয়, যন্ত্রপাতি নয়, সৈন্যদল নয়, নৌ-বাহিনী নয়) একটা প্রকৃত চিত্র সম্মুখে ধরিয়া দিবে।

ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে কিজন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন :—"ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রাম এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার উচ্চস্তরে উন্নয়নের দিক হইতে গান্ধীর মতবাদ চিরন্তন প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে অর্থাৎ মানব সমাজ ও সভ্যতাকে উচ্চস্তরে পৌঁছানর দিক হইতে গান্ধীর প্রভাব যে প্রতিক্রিয়াশীল এ সম্বন্ধে তর্ক করার কিছুই নাই। গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে সভ্যতা একটা ভিত্তির উপরে গঠিত হইয়া থাকে। এই ভিত্তি হইতেছে উৎপাদনের ভিত্তি। প্রশস্ততম ভাব হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে সমাজ ঠিক সেই অনুপাতেই উন্নত বা অবনত হইয়া থাকে যে অনুপাতে উহার উৎপাদনের উপায় সমূহের উন্নতি বা অবনতি হয়। আমরা যে বাস্তব ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অসভ্যতা হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি গান্ধী সেই ভিত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহিয়াছেন। এই ভিত্তিকে ধ্বংস করার মানেই হইতেছে অপরিহার্য্যরূপে আবার আমাদিগকে সেই অসভ্যতার স্তরে অবনমিত করা। অবশ্য আজকাল আমরা যেমন জীবন যাপন করিয়া থাকি ভবিষ্যতে তদপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা আমরা করিব। হয়তো বেশীর ভাগ শহর ও নগরের কোনো অস্তিত্ব আর থাকিবে না, হয়তো লোক তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় গ্রামেই বাস করিবে। কিন্তু, ইহা সম্ভব হইতে পারে কেবলমাত্র আমাদের যান-বাহনের যন্ত্রপাতি যদি অত্যধিক মাত্রায় উন্নতি লাভ করে। আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার ধনিকশ্রেণী সমূহ এরূপ উপায় সমূহ লাভ করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে গ্রাম অপেক্ষা শহর ও নগরেই সভ্যতা অধিকতর উন্নত।

অতি সাধারণ যুক্তির মাপকাঠিতেই গান্ধীর মতবাদের বিশদরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তারপরে গ্রন্থকার সাধারণ ধারণা সমূহের বিচার 'ইতিহাসের বাস্তব ধারণা'র দিক হইতে করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনা "ইতিহাসের বাস্তব ধারণা"র মাপকাঠিতেই করিয়াছেন। পুস্তকের এ অধ্যায়টা যদিও সংক্ষিপ্ত তথাপি ইহাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। মার্ক্সের মতবাদের কোনো ছাত্র (Marxian Scholar) ইতোপূর্ব্বে এই দিকটার আলোচনা করেন নাই। ইহা অধ্যয়ন করার খুবই উপযুক্ত বিষয়।

পুস্তকখানা কোনো মতেই রাষ্ট্র-নীতিক রচনা নহে। ইহা সম্ভবতঃ লেখকের দুর্ব্বলতা। যুক্তিকে কতকটা উচ্চ দার্শনিক গ্রামে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কেবলমাত্র কখনো কখনো বিচারের মত জ্ঞাপন করার সময় লেখক ব্যবহারিক রাষ্ট্র-নীতিক ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছেন। তথাপি কিন্তু ব্যবহারিক ব্যাপার সমূহের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। "ভারতীয় জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম ও তাহাদের উচ্চতর গ্রামে উন্নতির পক্ষে" গান্ধী প্রতিক্রিয়াশীল কেন?

গান্ধীর ধারণা এই যে সামাজিক পূর্ণতালাভ সামাজিক প্রচেষ্টার দ্বারা কিছুতেই হইতে পারেনা যতক্ষণ না সমাজের প্রত্যেকটী সভ্য ব্যক্তিগত ভাবে পূর্ণতা লাভ করে। (ইহা আদর্শ পেটি বুর্জুয়া ধারণা।) গান্ধী মনে করেন যে মানুষ তখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে যখন সে তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা সমূহকে উচ্চতম সুবিধার জন্য ব্যবহার করিতে পারে। কলকব্জা ও যান্ত্রিক উন্নতি সাধারণতঃ মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া থাকে। সে জন্যে এই জিনিষ গুলি নষ্টের মূল।

অধিকন্তু, যান্ত্রিক উন্নতির দ্বারা ব্যক্তিগত কর্ম্ম-কুশলতা প্রকাশ না পাইয়া সামাজিক কর্ম্ম-কুশলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ব্যক্তিত্ব সমাজের ভিতরে হারাইয়া যায় এবং সমাজের উপরে নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এ সবের দ্বারাও আবার গান্ধীর ব্যষ্টির প্রতি অনুরাগ ব্যাহত হইয়া পড়ে।

অতঃপর আমরা গান্ধীর ব্যক্তিগত রাষ্ট্র-নীতিক কার্য্যের ধারা খুব সহজেই বুঝিয়া লইতে পারি। বার-দৌলিতে তিনি এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যে অবস্থায় সামাজিক উন্নতির জন্য জনগণের পক্ষে সমষ্টিগত কার্য্য করা আবশ্যক ছিল। সমষ্টির ভালর জন্য অনেকের, হয়তো তাহাদের অনিচ্ছায়, আত্ম-বলিদান দিতে হইত। যে সকল ব্যক্তির জন্য গান্ধী প্রাথমিক ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন তাহারা তাঁহার নৈতিক পন্থা হইতে সরিয়া পড়িবে, সামাজিক উন্নতির জন্য অন্যায় রাগ দ্বেষ ও বল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইবে—এ সব গান্ধী না পারেন বুঝিতে, না পারেন এ সবের সত্যকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে। এমন অবস্থায় গান্ধী সাধারণত শুধু নিজে যে পেছনে সরিয়া পড়িবেন তাহা নয়, তিনি তাঁহার বিপুল প্রভাব ব্যবহার করিয়া সেই ভাবে ব্যাপারটিকে উন্নতি করিতে বাধা প্রদান করিবেন। তিনি বুঝিতেই পারেন না যে সামাজিক উন্নতি এরূপ পন্থার মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে।

ব্যক্তিগত নৈতিক উন্নতি সামাজিক উন্নতির পরোক্ষ উপফল বিশেষ। কিন্তু, সামাজিক উন্নতির গতি কখনো সাধারণ বাঁধা পথ ধরিয়া চলে না। ইহার গতি কখনো মৃদু,

এমন কি কখনো পশ্চাদপদ, কিন্তু, কখনো কখনো আবার দ্রুত, এত দ্রুত যে ইহা বিপ্লবাত্মক বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার কোনো পথই, তা' যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, আমাদের ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নহে।

কিন্তু, গান্ধী ত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং থাকেন বলিয়াই তিনি পথের "চিরন্তন বাধা"। তাঁহার দুর্ব্বলতা কিংবা তাঁহার অবাস্তব ধারণা সমূহ সমাজের সেই সকল লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে যাহারা আর অধিকতর অগ্রসর হইতে চাহে না। একথা বলিলে অনেক বেশী বলা হইবে না যে জনগণ যখন ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজিগণ ও তাহাদের মিত্র বৃটিশ বুর্জ্জোয়াজিগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উদ্যত হয় তখন গান্ধীকে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজিগণ জানিয়া শুনিয়া গতিরোধক যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহার ব্যক্তিত্বের অনুরাগ (Inividualist out look) তাহাদের অনুরাগের অনুরূপ, উপদ্রবের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তির দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য খুবই সাধিত হইয়া থাকে, আর তাঁহার যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধাচরণ এত বেশী হাস্যাস্পদ ব্যাপার যে তদ্দ্বারা তাহারা এতটুকুও বিচলিত হয় না।

প্রশস্ত দার্শনিক ভাবের দিক হইতেই হউক কিংবা সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রনীতিক দিক হইতেই হউক, গান্ধী একজন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি। এই দুইটি দিকই, যেমন হইয়া থাকে, নিবিড় ভাবে পরস্পর আবদ্ধ রহিয়াছে।

"তাহাদের দার্শনিক মতের দ্বারা তোমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।"

দেশ বিদেশ

আজকাল ইংরাজ ধনিকদের ভিতর সৌহিত্যতন্ত্র দেখা দিয়াছে। ইংলণ্ডে, ভারতে বা চীনদেশে ধনিকদের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হইলেই ধনিকরা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠে "বলশেভিকরা অসন্তোষের বীজ বপন করিয়া পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিতেছে।" কিন্তু একখানা বিলাতি কাগজের নিম্নলিখিত দুইটি বিবরণ পাঠ করিলেই স্পষ্টই বোঝা যায় যে গলদ কোথায়। প্রথম বিবরণটি একটি পুলিশ কোর্টের মামলা, আর দ্বিতীয়টি একটি কুকুর প্রদর্শনী (Dog show)। পুলিশ কোর্টের মামলায় প্রকাশ পায় যে বাদী, তাহার স্ত্রী, তাহার চারিটি বয়স্কা কন্যা ও চারিটি বয়স্ক পুত্র একখানি মাত্র ঘরে বাস করে। প্রতিবাদীর পক্ষের এক সাক্ষী বলে যে সে পল্লীতে ঐ রকম অনেক ঘর আছে যাহাতে আটজন হইতে বাইশ জন ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের স্ত্রীপুরুষকে একত্রে বাস করিতে হয়। হাকিম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কুকুর প্রদর্শনীর বিবরণটি চমৎকার। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলার উদ্যোগে এই প্রদর্শনিটি খোলা হয়। "যত প্রকার বিলাসিতা সম্ভব হয় কুকুরগুলিকে তদ্দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছিল। সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল। ছোট ছোট কুকুর গুলি যাহাতে নরম গদির উপর, রেশমের মশারির ভিতর পরম সুখে নিদ্রা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আহার ও নিদ্রা ব্যতীত আর একটি কার্য্যে তাহাদের দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছিল। কয়েকটি অনুচর মাঝে মাঝে তাহাদের গাত্র আস্তে আস্তে চিরুনি ও ব্রুস দিয়া আঁচড়াইয়া দিতেছিল ও তাহাদের আতর মাখাইতে ছিল। "ভারতের বড় বড় ধনী—কি ইংরাজ বা ভারতবাসী—তাঁহাদের কুকুরের জন্য যাহা খরচ করেন তাহার কিয়দংশ যাহারা তাঁহাদের ধন সম্পত্তির মূল কারণ সেই সব শ্রমিক ও কৃষকের জন্য খরচ করিতে হইলে তাঁহারা পুত্র শোক অনুভব করেন। এই সুন্দর ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন কল্পে যিনিই দণ্ডায়মান হইবেন তাঁহাকে বলশেভিক নামে অভিহিত করা হইবে। 'বলশেভিজম' এর প্রচার বলশেভিকেদের তত করিতে হয় না, ধনিকদের এইরূপ নিষ্ঠুর পরিহাসই তাহাদের প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে।

লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স এর তত্ত্বাবধানে সেদিন এক বিরাট তর্ক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তর্কের বিষয় ছিল—ধনিকেরা কি লাভের অংশ তাহাদের যা ন্যায্য প্রাপ্য তাহার অধিক পায়? (Are Capitalists over paid ?) এক পক্ষে ছিলেন Mr. James Maxton (মিঃ জেম্‌স ম্যাক্সটন) যাঁহাকে "উৎকট বিপ্লববাদী" বলিয়া অভিহিত করা হয়। আর এক পক্ষে ছিলেন Sir. Ernest Bnnnet (সার আরনেষ্ট বেনেট) যিনি ধনিকদের বন্ধু বলিয়া পরিচিত। তর্ক হইবার প্রারম্ভেই ধনিকের সংজ্ঞা (Definition of a Capitalist) ধার্য্য করা হয়। উভয়ের সম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি গৃহীত হয়। ধনিক হচ্ছে সেই লোক যে অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সুবিধার বলে সমাজের বাকি লোকের উপর ডাকাতি করিতে পারে (A Capitalist might be defined as one who, being in a superior economic or political position is able to rob the rest of the Community)।

Mr. Maxton (মিঃ ম্যাক্সটন) বলেন, "ধনিকেরা যে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের অধিক পায় তাহার প্রমাণের প্রয়োজন নাই। যাহারা আমাদের জন্য কায়িক পরিশ্রম করিয়া খাদ্য, পোষাক ও বাসস্থান সরবরাহ করে তাহারা বড় জোর সপ্তাহে ৩০৲ হইতে ৭৫৲ টাকা পায় (ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা ঢের কম পায়)। কিন্তু ধনিকেরা আমাদের সামাজিক জীবনের সুখ, শান্তি বা উন্নতি কল্পে এমন কি করিয়া থাকে যাহার দরুণ তাহারা পারিশ্রমিক বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া থাকে?" Sir Earnest Bennet (সার আরনেষ্ট বেনেট) জবাবে বলেন যে একটি শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইলে ১৫০০০৲ টাকা হইতে ২২০০০ টাকার মূলধনের প্রয়োজন। ধনিকেরা যদি তাহাদের ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত পায় আর শ্রমিকেরা তাহাদের পাওনা অপেক্ষা কম পায় তবে ইহার প্রতিবিধান করিতে আরও মূলধনের প্রয়োজন। Sir Earnest Bennet (সার আরনেষ্ট বেনেট) পণ্ডিত লোক। তাঁহার যুক্তির মর্ম্ম সাধারণ শ্রমিকেরা বুঝিতে পারিবে না। Mr. Maxton (মিঃ ম্যাক্সটন) এর যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে তাহাদের মোটেই বেগ পাইতেহইবে না।

বৃটিশ ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভা ১৯২৭-২৮ এর জন্য ছয়টি স্কলারশিপ দিতে মনস্থ করিয়াছে। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত যে কোন শ্রমিক সঙ্ঘের সভ্য বা সভ্যা এক বৎসরের জন্য যদি Labour College (লেবর কলেজ) কিংবা Oxford

(অক্সফোর্ড) এর Ruskin College (রাসকিন কলেজ) এ পড়িতে চান তাহা হইলে দরখাস্ত করিতে পারেন। আর একটি স্কলারশিপ দেওয়া হইবে যদি কোন সঙ্ঘের সভ্যা জার্ম্মেনিতে ১লা আগষ্ট হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত Socialist People's College এ পড়িতে চান। মোট স্কলারশিপের পরিমাণ প্রায় ১২৫০০৲ টাকা। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাত জন মেয়ে এবং পুরুষ শ্রমিকের শিক্ষার জন্য এক বৎসরে যা খরচ করে আমাদের নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ৪ বৎসরেও তত আয় হয় না। ভারতে কয়টি সঙ্ঘ আছে যাহার বাৎসরিক আয় ১২০০০ ?

—০—

আমরা একটি Railway Men's Federation এর নাম শুনিয়াছি। সেটি নাকি ভারতের যেখানে যত রেলওয়ে শ্রমিক সঙ্ঘ আছে সে সমুদায়কে লইয়া গঠিত। ইহার সভাপতি রায় সাহেব চন্দ্রিকা প্রসাদ, জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সেক্রেটারী শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকার। ১৯২৩ খৃঃ অব্দেও নাকি মুকুন্দবাবুই ইহার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। গত ডিসেম্বর মাসে যে সময় All India Trades Union Congress এর Executive Council এর অধিবেশন হয় সেই সময় নাকি ইহারও একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমরা সেক্রেটারীদের জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে কোন্ কোন্ রেলওয়ে সংঙ্ঘ এই Federation এর অন্তর্ভুক্ত আছে? এই Federation এর বাৎসরিক আয় কত? All India Trades Union Congress এর নিকট হইতে জোশীর মারফৎ এই Fedration কত টাকা পাইয়াছেন? এবং গত B. N. R. ধর্ম্মঘটের সময় এই Federation কি কার্য্য করিয়াছে?

—০—

মাদ্রাজে Diocessan প্রেসের ধর্ম্মঘট প্রায় মাসাধিক ধরিয়া চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোনও সংবাদ পত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাইবার উপায় নাই। ধর্ম্মঘটের কারণ কি, ধর্ম্মঘট কারিগণের দাবী কি, কতগুলি লোক ধর্ম্মঘট করিয়াছে এই সকল তথ্য সাধারণের বিশেষ শ্রমিক সাধারণের গোচরীভূত হওয়া উচিত। কিন্তু এই বিশাল ভারতবর্ষে এমন একখানি দৈনিক কাগজ নাই যাহা শ্রমিকেরা তাহাদের নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে পারে। ফলে Associated Press of India এবং Free Press of India দয়া করিয়া যে টুকু সংবাদ পাঠান সেই টুকুই খবরের কাগজ ওয়ালাদের নিকট আসিয়া পৌঁছে। আবার খবরের কাগজ ওয়ালারাও যে টুকু সংবাদ দয়া করিয়া ছাপেন সেই টুকুই সাধারণ পাঠক জানিতে পারে। শ্রমিকদের যাঁহারা নেতা তাঁহারাও রীতিমত কোনো প্রচার কার্য্য করেন না, করিতে পারিবার সময় বা সামর্থ্য তাঁহাদের নাই, অথবা তাঁহারা করিতে জানেন না। কাজেই শ্রমিকদের ভিতর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করিবার কোন উপায় নাই। ঘুঁটে যখন পোড়ে গোবর জানিতেও পারে না যে ঘুঁটে পুড়িতেছে।

—০—

Diocessan Press এর ধর্ম্মঘট কারিগণ লেবর কমিশনারের নিকট গিয়াছিলেন এই আশায় সে যদি তিনি কিছু মিটমাট করিয়া দিতে পারেন। লেবর কমিশনার মহাশয় তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে এক পক্ষের প্রার্থনাতে সালিসী হইবার নিয়ম নাই। যদি দুই পক্ষ সালিসীতে রাজি হয় তবেই এ ব্যাপার মিটমাটের পক্ষে তিনি চেষ্টা করিতে পারেন। সরকারের নিয়ম বড় চমৎকারই বটে। উভয় পক্ষ মিটমাট করিতে রাজি হয় তখন যখন উভয় পক্ষই তুল্য বলশালী হয়। ধনিকেরা কি দুর্ব্বল সমস্বার্থজ্ঞান শূন্য শ্রমিকের সহিত মিটমাটের জন্য কাহাকেও মধ্যস্থ মানিতে রাজি হয়? বাঙলা সরকারও তো দুই তিন বৎসর ধরিয়া এক সালিসী বোর্ড নিযুক্ত করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই সুন্দর নিয়ম থাকাতে সালিসী বোর্ডের নাম মাত্র অস্তিত্ব আছে। শ্রমিকেরা সব সময়ই মেটামিটির জন্য মধ্যস্থ মানিতে রাজি থাকে, কিন্তু ধনিকেরা রাজি হয় না। কাজেই সরকারের শ্রমিক প্রীতির নিদর্শনও পাওয়া যায়, অথচ ধনিকেরও আপত্তি করিবার কিছু থাকে না।

—০—

করপোরেশনে কংগ্রেস দলের অপ্রতিহত ক্ষমতা। দেশবন্ধু দাশ যখন প্রথম করপোরেশনকে জাতীয় দলের দখলে আনেন তখন তিনি যে প্রোগ্রাম দিয়াছিলেন তাহাতে দরিদ্রদের মঙ্গলের জন্য কি কি কার্য্য করা হইবে তাহার বিস্তারিত তালিকা ছিল। কিন্তু সে প্রোগ্রাম অনুসারে গত চার বৎসরের ভিতর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কার্য্য তো হয়ই নাই পরন্তু বিল সরকার (Bailiff) দের উপর যেরূপ ব্যবহার বর্ত্তমানে কর্ত্তারা করিতেছেন তাহা মোটেই দরিদ্র প্রীতির পরিচায়ক নহে। যে সকল সরকার ৬০৲ মাহিয়ানা পায় তাহাদিগকে ১০০০০৲ টাকার ব্যক্তিগত জামীন দিতে হয়। উপরন্তু এখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিতে হইবে এবং গিল্যারাণ্ডার কোম্পানীতে ৪০০০৲ টাকার Fidelity Bond ও তাহাদের দিতে হইবে। এই Fidelity বণ্ড বাবদ বৎসরে প্রায় ২৫৲ দিতে হইবে। এই সকল শর্ত্ত পূরণ করিতে রাজি না হওয়ায় তাহাদের মাহিনা আটক করা হইয়াছে। অবশ্য এই সকল bailiff প্রত্যেকে প্রায় ২০০০০৲ টাকা আদায় করে। দু'চারবার তহবিল তসরুপও যে না হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু দুচার জন অসৎ লোকের জন্য প্রায় ৫০.৬০ জন বহুদিনের বিশ্বস্ত পরিশ্রমী, অল্প বেতন ভোগী দরিদ্র Bailiff দের সকলকে নির্য্যাতিত করা কি উচিত—? ৬০৲ টাকার উপর কর্পোরেশন তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি দিয়া সেই টাকাটা Fidelity Bond বা কোম্পানীর কাগজ বাবদ কাটিয়া লইলেই তো ল্যাটা চুকিয়া যায়। মেওর মহাশয় ও কংগ্রেসী কৌন্সিলারগণ এ বিষয় একটু দৃষ্টি করুন না কেন।

স-প

—০—

স্বাধীনতার মূল্য

মূল্য দিয়ে কেবল যে, আমাদিগকে সওদা খরিদ করতে হয় তা নয়, স্বাধীনতাকেও মূল্য দিয়ে তবে খরিদ করতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইণ্ডোনেশিয়া অর্থাৎ জাবা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতার জন্যে যে মূল্য প্রদান করছে তা ভারতবর্ষকেও হার মানিয়েছে। ভারতের ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনের অনুরূপ একটা আইন ইণ্ডোনেশিয়াতেও আছে। ইণ্ডোনেশিয়ার গবর্ণর জেনেরেল এই আইন অনুসারে যাকে ইচ্ছা বিনা বিচারে এবং কোনো কারণ প্রদর্শন না করে নির্ব্বাসিত বা কারারুদ্ধ করতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে দুই হাজার বিপ্লববাদী কারাগারে

অবরুদ্ধ হয়ে আছেন—৭ শত পশ্চিম সুমাত্রায় এবং ১৩ শত জাবায়। নিউগিনির একটা ম্যালেরিয়াপূর্ণ ও নরখাদক অধ্যুষিত জায়গায় প্রায় ৮ শত বিপ্লববাদীকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে। এছাড়া বিচারে মৃত্যুদণ্ড যাঁদের হয়নি তাঁরা ১০ থেকে ২০ বছর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। ডচ্ গবর্ণমেণ্টের এত অত্যাচার সত্বেও ইণ্ডোনেশিয়ার জাতীয়দল নবগঠিত শোষণবাদ বিরোধী এবং জাতীয় স্বাধীনতাকামী লীগের (The League Against Imperialism and for National Independencea) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতবাসীর ইণ্ডোনেশিয়ার নিকটেও অনেক শিখ্‌বার আছে।

——

পিতৃশোক

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরীর পিতা গোপালচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ৮৩ বছর বয়সে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা ১২২, বৌবাজার ষ্ট্রীটে পরলোক গমন করেছেন। দীর্ঘ এক যুগের পরে নরেনবাবু কারামুক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু শোকমুক্ত হতে পারছেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর ছোট ভাই অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয়েছেন। সে শোকের বেগ সামলাতে না সামলাতেই তাঁকে আবার পিতৃহারা হতে হলো। অতি বৃদ্ধ হলেও নরেন বাবুর পিতা চলাফেরা করতে পারতেন। বড় দুঃখ যে মৃত্যুর সময়ে নরেন বাবু তাঁর পিতাকে দেখ্‌তে পান নি। বিশেষ জরুরী খবর পেয়ে তিনি যখন নোয়াখালী গিয়েছিলেন তখন তাঁর পিতা অপ্রত্যাশিতরূপে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমরা শ্রীযুত ঘোষ চৌধুরীকে তাঁর এই শোকের পর শোক প্রাপ্তিতে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

ম-আ

——

কমিটির রায়

বাংলার গবর্ণমেণ্ট এক জেল কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। আজ কয়েকদিন হলো সে কমিটি রায় প্রকাশ করেছে। তাতে রাষ্ট্রনীতিক কয়েদীদের জন্যে যে সব ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে গবর্ণমেণ্ট হয়তো মনে করেছেন যে, এ দেশের লোকের রাষ্ট্রনীতিক ব্যাধি চিরদিনের জন্যে সেরে যাবে। কিন্তু, তা কি কখনো সম্ভবপর হবে? শ্রমিকসঙ্ঘ বে-আইনি বলে ইংল্যাণ্ডে এক আইন পাস হয়েছিল। সে আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের গবর্ণণ্টে শ্রমিকসঙ্ঘের গতি কিছুতেই রোধ করতে পারেনি। অবশেষে বাধ্য হয়ে গবর্ণমেণ্টকে আইন তুলে দিতে হয়েছিল। আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাষ্ট্রনীতিক কয়েদীরা রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন পুলিস অফিসারকে হত্যা করেছিল। তারি প্রতিশোধ নেবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট এ সব নূতন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। দেখা যাক্ হোমরা চোমরারা কি বলেন।

——

আর এক ধর্ম্মঘট

এসোসিয়েটেড্ প্রেস খবর দিয়েছেন যে মাদ্রাজের রয়াপুরমে পাব্লিক ওয়ার্কস্ বিভাগের যে কারখানা আছে তার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কেন ধর্ম্মঘট করেছে সে খবর এসোসিয়েটেড্ প্রেসের জানা নেই। তবে তাঁরা দয়া করে এতটুকু জানিয়েছেন যে শ্রমিক প্রতিনিধিগণকে ধর্ম্মঘটের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

—০—

বাঙ্গালী যুবক ধৃত

গত রবিবার অপরাহ্ণে বেঙ্গল পুলিশের লোকেরা ৩৭, হ্যারিসন রোডের একখানা ঘরে কলিকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে তল্লাশ করেছিল। তারা টর্চলাইট ও পকেটল্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে গেছে। শ্রীযুত বদেশভূষণ দাস নামক একজন বাঙালী যুবক সে ঘরে থাকতেন। পুলিস তাঁকেও গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে গেছে। তিনি নাকি হুগলী জিলার কোন্ এক ডকাতির মামলায় সংশ্লিষ্ট আছেন। ভবানীপুর চক্রবেড় রোড হতেও দিবাকর পাত্র নামক আশুতোষ কলেজের একজন ছাত্র ধৃত হয়েছেন। তাঁরো নামে নাকি ডাকাতিরই অভিযোগ রয়েছে। তবে এ দু'জনাই একই ডাকাতির সংস্রবে ধৃত হলেন কিনা তা আমরা জানিনে।

——

রাজবন্দী অভিযুক্ত—

১লা জুন তারিখে ময়মনসিংহ জেলে রাজবন্দী শ্রীযুত যতীন্দ্র দাস ও শ্রীযুত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়ের নামে আনীত মোকদ্দমার বিচার জেলে না হইয়া প্রকাশ্য আদালতে হওয়া উচিত এই মর্ম্মে রাজবন্দীগণ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক তার করেছেন। তার কোনো জওয়াব না আসাতে উকিল শ্রীযুত সুধীকুমার সোম ৭ দিনের অবকাশ প্রার্থনা করে দরখাস্ত করেন। তিনি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫২৬ ধারা অনুসারে আর এক দরখাস্ত করিয়া আরো এক মাসের সময় অবকাশ প্রার্থনা করেন। তাঁর ইচ্ছে হাইকোর্টে আবেদন করে মোকদ্দমা ভিন্ন জেলায় বদলী করা। হাইকোর্টে আবেদন করার জন্যে আদালত ৭ দিনের সময় মঞ্জুর করেছেন।

জেল কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করে রাজবন্দী-গণ তার ১৯ দিন পূর্ব্বে থেকে অনশন ব্রত অবলম্বন করেছেন। শ্রীযুত সোম তাঁদের এ ব্রত ভাঙানোর জন্যে চেষ্টা করেন। কিন্তু যতদিন তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের থাকবে ততদিন তাঁরা অনশন ব্রত ভাঙাবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

——

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এখন থেকে 'গণবাণী'র পাঁচজন গ্রাহক যাঁরা জুটিয়ে দিবেন আমরা তাঁদের এক বছর কাল বিনা মূল্যে গণবাণী সরবরাহ করব।

—*—

মফস্বলে কৃষক হিতৈষী যারা আছেন তাঁরা দয়া করে কোথায় কি প্রকারের কৃষকসঙ্ঘ রয়েছে এবং সে সকল সঙ্ঘ কি কি কাজ করছে তা আমাদের জানালে আমরা বড় বাধিত হব।

সম্পাদক।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১৷৷৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

BOOKS ON SOCIALISM

1. The Coming of Socialism
by
LUCIEN
Price—Ans. 6/- only.

2. Scientific Socialism
Its Aims and Ideals.
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. The Religion of Capital
BY
PAUL LAFARGUE
Price—As. 6/- only.

4. Manifesto of the Communist Party
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS
Price—As. 8/- only.

To be had of
The Book Company Ltd.
4/4A, College Square, Calcutta.

[illegible]	২।০
[illegible]	১॥০
[illegible]	২৲
[illegible]	২॥০
[illegible]	২৲

নাটক

১। [illegible] মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ॥০
২। [illegible] ষ্টারে অভিনীত প্রহসন। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

উপন্যাস ও গল্প

১। [illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—

১। ভাত কাপড়ের কথা
[illegible] কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।
২। [illegible]
[illegible] সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান
[illegible] চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
[illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
[illegible] হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

[illegible]

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	[illegible]
অগ্নিসংস্কার	[illegible]
শুভা	[illegible]
পাপের ছাপ	২।০
বিপর্য্যয়	২।০
শাস্তি	১।০
[illegible]	১।০
রক্তের ঋণ	১।০
আনন্দ-মন্দির	১।০

সামাজিক ও প্রাচীন ব্যবহারের গ্রন্থ
1. Sources of Law and Society in Ancient India
2. [illegible] Law
Published by the Calcutta University.

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Saraswati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৯ই জুন ১৯২৭, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ | ১৮শ সংখ্যা

"গণবাণী" প্রচারের আয়োজন

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিয়ালদা, ব্যারাকপুর, ঢাকা, সান্তাহার, পার্ব্বতীপুর, শিলিগুড়ি, লালমণির হাট, কাটিহার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাওড়া, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান, আসানসোল, পাটনা, দানাপুর, জামালপুর, গয়া, মোগলসরাই, মিরজাপুর, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, দিল্লী, জব্বলপুর, এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর, পুরুলিয়া, গোণ্ডিয়া ও পুরী প্রভৃতি ষ্টেসনের হুইলার কোম্পানীর ষ্টলে গণবাণী পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া দার্জ্জিলিংএর হুইলার কোম্পানীর ষ্টলেও গণবাণী বিক্রয়ার্থ মৌজুদ থাকে।

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৯ই জুন, ১৯২৭, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ | ১৮শ সংখ্যা

ইস্পার কি উস্পার?

—:*:—

[মুজফ্ফর আহ্মদ]

—০—

সময় এসেছে যখন আমাদের স্থির করে নিতে হবে ইস্পার যেতে হবে কি উস্পার? ভারতবর্ষের সকল আন্দোলন এত বিভিন্ন সত্তাতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে আজকের দিনে নিছক গোঁজামিল দিয়ে কোনো কাজই চলতে পারে না। একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ঠিক করে নিয়ে তবেই আমাদিগকে পথ চলা আরম্ভ করতে হবে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্ন্যাল কংগ্রেসের ভিতরে বর্ত্তমান সময়ে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস দল, রেস্পন্সিভিষ্ট দল এবং স্বরাজ্যদল রয়েছে। এই তিন দলের কর্ম্ম-ধারাতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও তিনটি দলই বুর্জ্জুয়াজি সম্প্রদায়ের দল এবং তিনটি দলেরই উদ্দেশ্য ভারতের জন্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (Dominion status) লাভ করা। অবশ্য কংগ্রেসের ভিতরে একটা পেটি বুর্জ্জুয়াজিমণ্ডলীও আছে। (পেটি বুর্জ্জুয়াজি বলতে আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর লোক, ক্ষুদ্র দোকান-দার প্রভৃতিকেই মনে করেছি।) এঁদের কেউ কেউ বা স্বরাজ্য দলের অন্তর্ভুক্ত, আবার কেউ বা গান্ধীর পুরাতন নীতির সমর্থক, যদিও গান্ধী নিজে তাঁর নীতির সমর্থন আর করেন না। এঁরা ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা (বৃটিশ সাম্রাজ্য ও শোষণতন্ত্রের বাহিরে) লাভ করতে চান। মোটের ওপরে কংগ্রেসের আন্দোলন আজকের দিনে নেতৃত্বের আন্দোলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই নেতাগণ বুর্জ্জুয়াজি সম্প্রদায়ের লোক। দেশের জনগণকে শোষণ করে তাঁদের শ্রেণীগত স্বার্থের সংরক্ষণই হচ্ছে তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণেই ঔপনি-বেশিক স্বায়ত্ব শাসন তাঁরা পেতে চান এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

বর্ত্তমানে কংগ্রেস আন্দোলন জনগণের আন্দোলন ত নয়ই, পরন্তু জনগণকে আরো অধিকতর পদানত করে বর্ত্তমান কংগ্রে-সের নেতৃগণ যাতে তাঁদের আপন শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখতে পারেন সেই চেষ্টাতেই ব্রতী হয়েছেন। শ্রেণী হিসাবে তাঁরা বেঁচে থাকতে চান। ভারতে যদি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে তাঁদের পক্ষে সেরূপ ভাবে বেঁচে থাকাটা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। সেই হেতু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করে তাঁরা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত তাঁদের সম্বন্ধটাকে আরো বেশী করে পাকাপাকি করে নিতে চান। এখানে একটা দৃষ্টান্ত প্রদান করলে আমাদের এ কথাটা বোঝার পক্ষে অনেক সুবিধে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে স্বায়ত্বশাসন লাভ করেছেন। ইচ্ছে যদি তাঁরা করেন তা হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেও তাঁরা যেতে পারেন। কিন্তু, এরূপ ইচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা আজো পর্য্যন্ত প্রকাশ করে নি। তার কারণ এই যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিজ আফ্রিকার অধিবাসী লোকেরা ত রয়েইছেন, তা ছাড়া ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণও আছেন। এই ঔপনিবেশিকগণ সংখ্যায় নগণ্য হলেও দেশের প্রভুত্ব তাঁদেরই হাতে রয়েছে। তাঁরা বৃটিশ শোষণবাদীদের সহিত একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিয়ে যুক্তভাবে আফ্রিকার অধিবাসিগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে তা হলে ওদেশের জনগণ আপনাদের হাতে দেশের ক্ষমতা নিবেন, আর যদি সেরূপ ক্ষমতা জনগণ দখল করে বসেন তাহলে শ্বেত ঔপনিবেশিকগণের লুণ্ঠনের সুবিধে আর থাকবে না। ভারতের সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা খাটবে। ভারতের জনগণ যদি দেশের সকল ক্ষমতা নিজেরা অধিকার করে নিতে পারেন তা হলে ভারতীয় ধনিক ও জমীদারগণ নির্ব্বিরোধে দেশের শ্রমিক ও কৃষকগণকে যদৃচ্ছা শোষণ করতে পারবেন না। শোষণ করতে না পারার মানেই হচ্ছে তাঁদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। বৃটিশ শোষণবাদের কবল থেকে পূর্ণ

স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারলে যে ভারতীয় জনগণ ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠ্‌বেন তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্‌ন্যাল কংগ্রেসের ধনিক-বণিক ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের নেতৃগণ কিছুতেই এমন জিনিসের জন্যে দাবী করতে পারেন না যদ্দ্বারা তাঁদের বিত্তস্ত স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যেই তাঁরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে চান। তাঁদের ইচ্ছে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিয়ে আপনাদের ভিত্তিকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

আহ্‌মদাবাদ হতে আরম্ভ করে গৌহাটি পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে নেতৃগণের কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সকলে বুঝে নিতে পারবেন যে কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা আমরা প্রদান করছিনে। গান্ধী বারে বারে আধ্যাত্মিকতার ভিতরে স্বরাজের স্বরূপকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা করেও শেষে বলেছেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করা হলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে বৃটিশ পতাকা উড্ডীয়মান করবেন। চিত্তরঞ্জন দাশ হাজার বার বলেছেন যে 'স্বরাজ' স্বরাজই বটে, তার কোনো সংজ্ঞা নির্ণয় হতে পারে না। কিন্তু ফরিদপুরের প্রাদেশিক সম্মিলনে তিনিই আবার ঘোষণা করে গেছেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই আমাদের স্বরাজের স্বরূপ। বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিরূপে গান্ধী স্বাধীনতার কথা তুলতেই দেন নি। গৌহাটি কংগ্রেসে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে দেওয়া হয়েছিল বলে গান্ধী সভাপতি আয়েঙ্গারকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। বিগত মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটির সভা ঘোষণা করেও তা স্থগিত রাখা হয়েছিল। কারণ ছিল সাকলাৎওয়ালার উপস্থিতি। সাকলাৎওয়ালার প্রতিপত্তির দ্বারা কংগ্রেসে কোনো প্রকারে জনগণের প্রোগ্রাম স্থানলাভ করতে পারে এই ভয় কংগ্রেসের বুর্জ্জোয়া নেতৃগণ করেছিলেন।

এই অবস্থায় দেশের যুবকগণকে স্থির করে নিতে হবে ইস্‌পার কি উস্‌পার? একদিকে রয়েছে স্বার্থপর বুর্জ্জোয়া নেতৃবৃন্দের আন্দোলন এবং আর এক দিকে দেশের অগণিত জনগণের স্বার্থ। একপক্ষ তাঁদের অবলম্বন করতেই হবে। দু'পক্ষে ত তাঁরা থাকতে পারবেনই না, মাঝামাঝিও তাঁদের থাকা চলবে না।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস জনগণের অনুষ্ঠান নয়। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের ওপরে যাঁদের প্রভুত্ব রয়েছে তাঁরা কিছুতেই চান না যে কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান হোক্। তাঁরা যতদিন কংগ্রেসের শীর্ষস্থানে বসে আছেন ততদিন জনগণের কোনো দাবী কংগ্রেসের কার্য্যতালিকায় কিছুতেই স্থান পাবে না। এখন হয়তো কংগ্রেস হতে এই বুর্জ্জোয়াজি নেতৃগণকে বিতাড়িত করে কংগ্রেসকে জনগণের অনুষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, কিংবা জনগণকে আপনাদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান গড়ে নিতে হবে। কংগ্রেসকে জনগণের অনুষ্ঠানে পরিণত করার জন্যেও জনগণের পক্ষে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান সমূহ গড়ে নেওয়া আবশ্যক হবে। কেননা, সংহত হওয়ার জন্যে একটা জায়গা জনগণের জন্যে চাই। বোম্বে ও বাংলার জনগণের দল (The Workers' and Peasants' Party of Bombay and the Peasants' and Workers' Party of Bengal) কিছুকাল পূর্ব্বে গঠিত হয়েও গেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সমূহেও অচিরে জনগণের দল সমূহ গঠিত হবে। এই সকল দল সর্ব্বত্র গঠিত হয়ে সময়ে একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হবে।

দেশের ও দশের কথা ভেবে থাকেন, মুক্তিকে জীবনের আদর্শ করে নিয়েছেন—এমন শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে এখন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে আপনাদিগকে বুর্জ্জোয়াজি সম্প্রদায়ের নেতৃগণের আওতা হতে বিমুক্ত করা। একটুকু চিন্তা করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করা যে সকল নেতার উদ্দেশ্য রয়েছে সে সকল নেতা ভারতবর্ষ বলতে কেবলমাত্র তাঁদের শ্রেণীকেই বুঝে থাকেন। তাঁরা যা কিছু চান তা তাঁদের নিজেদের জন্যেই চেয়ে থাকেন। মুক্তিকামী শিক্ষিত যুবকগণ যদি এ সকল নেতার আওতায় থাকেন তা হলে তাঁদেরকে মুক্তির পরিপন্থী হতেই হবে।

দেশ বলতে দেশের উৎপাদকগণ, এক কথায় দেশের জনগণকেই বোঝায়। জনগণের জন্যে কাজ করাই প্রকৃত দেশের কাজ। দেশের মুক্তি, দেশের জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারাই লাভ হবে। এই জনগণকে, বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের মধ্যে সমস্বার্থজ্ঞান জন্মিয়ে দেওয়াই হচ্ছে মুক্তিকামী যুবকগণের সম্মুখে এখন একমাত্র কাজ। মুক্তি-সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে হলে আপনার তথাকথিত 'ভদ্রতা' নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে চলবে না। কারখানায় মজুরী নিয়ে মজুরদিগকে তাঁদের সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। কৃষকদিগের সহিত তাঁদের মিশতে হবে,—মিশে কৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে কৃষকদিগকে চৈতন্য সম্পন্ন করে তুলতে হবে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত যুবকগণ সত্যিকারের মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে পারেন কি না সে পরীক্ষা ফাঁসির মঞ্চে কিম্বা কারাগারের অন্ধকার গৃহে হয়ে চুকে যায় নি;—তাঁদের প্রকৃত পরীক্ষা হবে ধনিকের কারখানায় ও কৃষকের কৃষি ক্ষেত্রে। ফাঁসির কিম্বা কারাগৃহের পরীক্ষায় যিনি পাস করতে পারবেন তিনি যদি কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষায় পাস করতে না পারেন তা হলে বুঝতে হবে যে মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই। তিনি সে অবস্থায় কেবলমাত্র স্বাধীনতার পরিপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লববাদী মাত্র হতে পারবেন।

শ্রমিক ও কৃষকগণের জীবনের খাওয়া-পরার নিরিখকে উন্নত করতে না পারলে, অন্ততঃ উন্নত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রাণে জাগিয়ে দিতে না পারলে এদেশে কোনো প্রকারের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া সম্ভবপর হবে না। যে সকল মুক্তিকামী যুবক কারখানায় কিংবা কৃষকদিগের মধ্যে কাজ করতে যাবেন তাঁরা আপনাদের জীবনের খাওয়া-পরার নিরিখকে কমাতে যাবেন না, তাঁরা যাবেন কৃষক ও শ্রমিকগণের জীবনের খাওয়া-পরার নিরিখকে বাড়াবার জন্যে। আজ সত্য সত্যই তাঁদের সম্মুখে একটা খুব বড় পরীক্ষা এসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া না হওয়ার দ্বারা আমাদের জাতীয় প্রশ্নের একটা দিকের সমাধান হয়ে যাবে।

চাষী-তাঁতী-জেলের কথা

—•—

[শ্রীসুরেশ বিশ্বাস]

—:•:—

চাষী ভায়া চাষ করে, আর
জেলে ভায়া মাছ ধরে,
তাঁতী ভায়া তাঁত বোনে যে
টানা পোড়েন দিন ভ'রে।
জেলেনী-বৌ জাল বুনে দেয়,
তাঁতী-বৌএর ক্ষিপ্র হাত,
চাষী-বৌ এর ঢেঁকীর 'পারের'
শব্দ শুনি থাকতে রাত।

* * *

এরা দেশের বুকের পাঁজর,
এরা দেশের দখিন হাত,
তবু এরা ঘৃণ্য ও নীচ,
ছুঁলে এদের যায় যে জাত।
কুকুর বেড়াল ঢুকলে ঘরে
নষ্ট কভু হয় না জল,
এরা যদি দাওয়ায় দাঁড়ায়
নষ্ট সকল যজ্ঞ-ফল।

* * *

হাঁড়ির ভিতর ঢোকা জাতের
এমনি নিয়ম কানুন ভাই,
নাপিত এদের চুল কাটে না,
এদের কাপড় কাচ্‌তে নাই।
মানুষ ত' নয় ঘৃণ্য কুকুর,
তাহার চেয়েও জঘণ্য,
হায় রে অধীন পতিত ভারত,
নয় কি শুধু এ জন্য?

* * *

হাস্‌ব কিবা কাঁদ্‌ব ভেবে,
কিচ্ছু আমি পাইনা ঠিক্,
স্বরাজ কি ভাই রাতের খোয়াব্‌
তেমনি ধোঁয়া, তেম্‌নি ফিক্?
রূপকথারি সোনার কাঠির
পরশ সম মুহূর্ত্তে,
পায়ের শিকল বিকল হবে,
কালের চাকা না ঘুরতে?

* * *

চাষী তাঁতী জেলে মালীর
জেনো সবার সমান ভাগ,
এদের ছাড়া বন্ধ রবে,
বিপুল বিরাট বিশ্বযাগ।
এরাও হেথা নিমন্ত্রিত,
এরাও পাবে আলিঙ্গন,
কোল পেতে দাও, উর্দ্ধমাথা!
নম্র কর হৃদয়খান।

———

শ্রমিক শিক্ষা

—•—

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

———

ওয়াসিংটন কনফারেন্সের অভিপ্রায় অনুসারে কারখানা আইন সংশোধিত হয়ে যা' দাঁড়িয়েছে, তাতে বার বছরের বালক-বালিকাকে কারখানার কাজে নিযুক্ত করা যায় না। আর পনের বছর বয়স পর্য্যন্ত তাদেরকে দৈনিক ছ' ঘণ্টার বেশী কাজ করানও নিষিদ্ধ। এর ফল হয়েছে এই যে ১২ বছর বয়স পর্য্যন্ত এই বালক-বালিকাগুলি পিতামাতার অযত্নে এবং অবহেলায়, সুশিক্ষার অভাবে এবং কুশিক্ষার প্রভাবে বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষ হয় না। তাদের শিশু-জীবন কণ্টকাকীর্ণ, অনাবাদী, জলশূন্য জমির মত। ভবিষ্যতেও আর তাতে চাষ চলে না। এই মানব জমি গুলি, যা' আবাদ করলে সোনা ফলত, তা' পতিতই থেকে যায়। তার পর ১২ বছর থেকে ১৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত সময়টা আরও ভয়ানক। এই সময়ে তাদেরকে দৈনিক ছ' ঘণ্টা করে' কাজ করতে নিযুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ এদেরকে বলা হয় half-timers. এই ছ' ঘণ্টা কাজের পর তাদের অনেক সময় থাকে যাতে তাদেরকে সাধারণ শিক্ষা এবং শ্রমশিল্প শিক্ষা অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা' হয় না। তার ফলে এই হয় যে তাদের হাতে কিছু পয়সা হয় এবং কুসংসর্গের আবেষ্টন ত আছেই। এই সকলগুলির সমবায়ে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে সর্ব্ববিধ সামাজিক ও নৈতিক পাপের আধার হয়ে ওঠে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন এই বালক-বালিকাদের শিক্ষার দিকটাও বিশেষ করে' বিবেচনা করেছিলেন। তাঁরা বলেন যে এ দেশের শ্রমিক যে ইউরোপের শ্রমিকদের মত কর্ম্মক্ষম নয়, তার নানা কারণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার অভাব একটা প্রধান কারণ। এই শিক্ষার অভাব যে আমাদের আরও কত রোগের মূল তা' বলাই বাহুল্য। আমরা স্বায়ত্ত-শাসন চাই, কর্ত্তৃপক্ষ বলেন "তোমরা নিরক্ষর মূর্খ; অতএব তোমরা স্বায়ত্ত-শাসন পাবার যোগ্য নও।" আবার আমরা যখন বলি "তবে আমাদের বাধ্যতা মূলক অবৈতনিক শিক্ষা দাও।" তখন কর্ত্তৃপক্ষ বলেন "তোমরা এখনও তার যোগ্য নও। তবে, তোমাদের এই প্রার্থনায় আমাদের হৃদয়ে সহানুভূতি আছে; কিন্তু হাতে টাকা নেই।" এই আন্তরিক সহানুভূতির উপর অব্যভিচারিণী ভক্তি স্থাপন করে' আমরা যদি মনে মনে প্রশ্ন করি (অবশ্য প্রকাশ করে' বলা উচিত নয়) যে কোম্পানীর আমলের কথাটা ছেড়েই দিয়ে কেবল খাস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বের এই ৭০ বৎসরের মধ্যে বাঙলার লোকসংখ্যার মধ্যে যদি শতকরা ৯ জন মাত্র লোকের অক্ষর পরিচয় হয়ে থাকে, তা'হলে এই হারে অক্ষর পরিচয়ের বিস্তার হলে' কত বৎসরে সমস্ত লোকগুলির অক্ষর পরিচয় হবে? ত্রৈরাশিকে ফেলে এর একটা উত্তর বা'র করা তত কঠিন নয়। কিন্তু উত্তরটা দেখলে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। অনন্ত কালের তুলনায় একটা জাতির জীবনে এই প্রায় সাত শ' বছর আর এমন বেশী কি? বিশেষতঃ যদি আমরা স্মরণ করি যে এই ক'টা বছর কাটিয়ে দিতে পারলে স্বায়ত্ত-শাসন পাবার, অন্ততঃ ঐ শিক্ষার অভাবের আপত্তিটা থাকবে না। কিন্তু যাক সে কথা। শিক্ষার অভাব

পূরণ করা সম্বন্ধে যুক্তি তর্কের সময় গিয়েছে। এখন শ্রমিকের শ্রম-শিল্পের এবং মূলধনীর স্বার্থের জন্যও যে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক, সেইটে বোঝা আবশ্যক হয়েছে। সেই জন্য এ সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেছেন, তাঁদের কথাই বলছি। মিস্ জি, এম, ব্রাউটন (G. M. Broughton) এম, এ, ও, বি, ই (যিনি এখন স্যার অতুলচন্দ্র চাটার্জ্জির পত্নী) বোম্বাই এবং বাঙলার অনেকগুলি কারখানা পরিদর্শন করেছেন এবং শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধেও বিশেষ করে' অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বলেন শ্রমিকদের নিরক্ষরতার প্রতীকার করা নিতান্তই আবশ্যক। ১৯২২ সালের কারখানা আইনের দ্বারা এখন বালক-বালিকাদের কারখানার কাজে নিযুক্ত করবার বয়স ৯ বছর থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করে' দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য এখন তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। এখন তাদেরকে কারখানার কাজে নিযুক্ত করবার আগে অনায়াসেই কিছু শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। তার পর কাজে নিযুক্ত হয়েও ১৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত তারা দিনে ছ' ঘণ্টা মাত্র কাজ করে। সুতরাং ১২ বছর পর্য্যন্ত তারা যে শিক্ষা পেয়েছে, তা' ১৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত চলতে পারে। বালক-বালিকাদের শিক্ষার কথা বলেই মিস ব্রাউটন ক্ষান্ত নন। তিনি বলেন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাও অত্যাবশ্যক। যতদিন না কারখানার সকল শ্রমিকেরই শিক্ষার সুযোগ করে' দেওয়া হয়, তত দিন শ্রম-শিল্পের উন্নতির আশা অতি কম। (Labor in Indian Industies. P. 176)

গবর্ণমেণ্টও এখন শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা স্বয়ং কিছু করবেন না। তাঁরা অনুমতি দেবেন আর দেশের লোক একটা টেক্স (Education cess) করে' তার টাকাটা দেবে। এই বন্দোবস্তে কোন কোন স্থানে পাঠশালা স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু দেশের লোকের অর্থাভাব গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাবের চেয়ে কম নয়। সুতরাং এ রকম পাঠশালা বড় বেশী হচ্ছে না। মিস ব্রাউটন বলেন কারখানা-ওয়ালাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি এইরূপ শিক্ষার ব্যয়ের একটা অংশ দেওয়াতে পারা যায়, তা' হলে অনেক সুবিধা হতে পারে। আর এই পাঠশালা গুলিকে যদি আবার সন্ধ্যার সময় বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা যায়, তা' হলে কারখানা-ওয়ালাদের দু'গুণ লাভ হয়। ভবিষ্যতের জন্য এক শ্রেণী শিক্ষিত শ্রমিক ত তৈরী হয়ই, যারা এখন কাজ করছে তারাও শিক্ষিত হয়ে অধিক কর্ম্মক্ষম হয়। এই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শ্রমশিল্প ও কারুকার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থাও খুব সহজেই করা যেতে পারে। (Labor in Indian Industries. P. 176)

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনও ঐ কথাই বলেন। তাঁরা বলেন এই বিষয়টা ১৯১৫ সাল হতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল। তাঁদের আদেশে বা উপদেশে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেছিলেন যে কারখানা আইন অনুসারে বালক-বালিকাদের যে ছ' ঘণ্টা কাজ করতে হয়, সেই ছ' ঘণ্টা সময়টাকে দু' ভাগ করে তিন তিন ঘণ্টা করা হক; প্রথম তিন ঘণ্টা কাজের পর তিন ঘণ্টা ছুটি; মাঝের ছুটির তিন ঘণ্টা তাঁদেরকে শিক্ষা দেওয়া হোক। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন এই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে কারখানাওয়ালাদেরকে বাধ্য করা হোক। কিন্তু প্রস্তাবটা কাজে পরিণত হয় নি। কমিশনের মতে কারখানার শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্তের আবশ্যক নেই। সর্ব্বসাধারণের ছেলে মেয়েদের জন্য যে ব্যবস্থা হবে, শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের জন্যও সেই ব্যবস্থা। এ বিষয়ে প্রথম কর্ত্তব্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন, এবং যেখানে সম্ভব সেইখানেই তার আরম্ভ করা—কেবল কারখানার ছেলে মেয়েদের জন্য নয়, সর্ব্বসাধারণের ছেলে মেয়েদের জন্য।

বাঙলা দেশের পাটের কলের বা অন্য কারখানার বালক বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাবিধানের কথা কখনও ওঠে নি। তবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বাঙলা কৌন্সিলে অনেকবার উঠেছে। তার প্রাচীন ইতিহাসের কথা না তুলে ১৯১৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক আইন থেকেই আরম্ভ করা যাক। এই আইন কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যেই আবদ্ধ। মিউনিসিপ্যালিটির চতুঃসীমার বাইরে এ আইন এখনও অচল। পল্লীতে পল্লীতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার কোন কথাই এখনও ওঠে নাই। আইনটার মর্ম্ম এই যে যদি স্থানীয় লোকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন চায় এবং তার ব্যয়ভারটা বহন করতে প্রস্তুত থাকে ত গবর্ণমেণ্টের তাতে সম্মতি এবং অনুমতি দিতে আপত্তি নাই। গবর্ণমেণ্ট নিজে উদ্যোগ করে, অর্থ ব্যয় করে কিছু করতে প্রস্তুত নন। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিই। যে বছর (১৯১৯) এই আইন পাশ হয়, গবর্ণমেণ্ট বলেছিলেন সেই বছর এর জন্য পাঁচ লাখ টাকা দেবেন। কিন্তু পরে দেখা গেল পাঁচ লাখের জায়গায় একলাখ মাত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, একলাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে যে একলাখ টাকা সত্য সত্যই খরচ হয়েছিল তা নয়। সেই সময় কার্শিওঙে ইউরোপীয়দের জন্য একটা ইস্কুল হচ্ছিল। তার জন্য টাকার আবশ্যক হল। টাকা আর কোথায় পাওয়া যাবে? প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে লাখ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, তারই একটা মোটা অংশ দেওয়া হল!

গত ১৯শে আগষ্ট বাঙলা কৌন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে একটা বাদানুবাদ হয়। তাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে মিঃ ডোনাল্ড (Mr. Donald) বলেন এই বিষয়ক একটা পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন আছে। যদি দেশের লোক সেই কল্পনা অনুসারে কাজ চায়, তা হলে তার জন্য টাকা দিতে হবে। সে কল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করতেই ত এককোটি টাকার আবশ্যক। যদি টাকা প্রতি চার পাই কি পাঁচ পাই হারে একটা টেক্স (cess) আদায় করতে পারা যায়, তা' হলেই এ কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। মিঃ ডোনাল্ড বলেছিলেন এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

সেই মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে এ বিষয়ের আলোচনার জন্য গত পূর্ব্ব জানুয়ারি মাসে বিভাগীয় মন্ত্রীর সমিতি হয়েছিল। সমিতির সদস্যেরা শিক্ষাশুল্কের বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মত, এইরূপ একটা শুল্ক না হলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হতেই পারে না। গবর্ণমেণ্ট বলেন তাঁদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাটাকে একটা উপযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই কঠিন, তাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক করা ত দূরের কথা। তাতে দু' কোটি টাকা লাগবে। রাজস্বের বর্ত্তমান অবস্থায় এত

টাকা দেওয়া অসম্ভব। সেই জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব এই যে একটা নতুন শিক্ষাকর স্থাপন করা হ'ক। শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ব্যয় এইরূপ—

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য	৩৭,২৮০০০
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বতন ইস্কুল শিক্ষার জন্য	২৪,৫৮,০০০
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য	৩০,৯২০০

অর্থাৎ প্রজাপ্রদত্ত রাজস্ব থেকে—

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য দেওয়া হয়

বার্ষিক	১২১৷৶০
ইস্কুলের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য	৬৸৴০
প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য	১৸৶০

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার্থী পেয়ে থাকেন

মাসিক	১০৶২ পাই
ইস্কুলের ছাত্র	৷৵১ "
প্রাথমিক শিক্ষার্থী	৶৩ "

অর্থাৎ উপাধিধারী পুষ্ট-দেহ, হৃষ্টচিত্ত বিদ্যার আভিজাত্যাভিমানী উচ্চ শিক্ষার্থীকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করানই হল প্রথম কর্ত্তব্য। তাতে যা' ব্যয় হয় তার ১৬ ভাগের একভাগ বা টাকায় এক আনার চেয়েও কিছু কম মূল্যের প্রসাদ দেওয়া হয় ইস্কুলের ছেলেদের। তারও চার ভাগের এক ভাগ বা উচ্চ শিক্ষার্থীর প্রাপ্য ব্যয়ের ৬৪ ভাগের এক ভাগ বা টাকায় এক পয়সা প্রাথমিক শিক্ষার্থী বালক বালিকাদের মধ্যে হরির লুটের মত ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হল সরস্বতীর প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা।

—:০:—

কম্যুনিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া

—*—

বার্ষিক অধিবেশন

—০—

বিগত ৩১শে মে তারিখে বোম্বেতে "কম্যুনিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া"র বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির রিপোর্ট ও পার্টির নিয়মপত্র (Constitution) গৃহীত হওয়ার পরে নিম্নলিখিত কর্ম্মকারকগণ নির্ব্বাচিত হয়েছেন :—

প্রেসিডিয়াম্ বা কার্য্যকরী সংসদ

১। মুজফ্ফর আহ্মদ
২। জে, পি, বাগেরহাট্টা
৩। গওহর রহমান দরবেশী
৪। কে, এস, আয়েঙ্গার
৫। শ্রীপাদ্ অমৃত ডাঙ্গে (যদি পার্টির নীতি-পত্র (Creed) সই করতে রাজী হন)

জেনেরেল সেক্রেটরী

১। এস, ভি, ঘাটে

কোষাধ্যক্ষ

১। এস, এইচ, মিস্ত্রী

কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি

১। এম, সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ার
২। ?নূরৎ গোহানী
৩। আর, এস, নিম্বকর
৪। মীর আবদুল মজীদ
৫। কে, এন, জোগলেকর
৬। এস্, এন, ঠাকুর
৭। আবদুল হালীম
৮। এস, ডি, হাসন

প্রস্তাবাবলী

(১) কম্যুনিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া ভারতে যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছে সে সকল কার্য্যের সাফল্যের জন্যে জগতের কম্যুনিষ্ট পার্টি সমূহের ও কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের নেতৃত্ব ও উপদেশ কামনা করছে।

(২) কম্যুনিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া ইচ্ছা করছে যে জে, পি, বাগেরহাট্টা, মুজফ্ফর আহ্মদ ও আর, এস, নিম্বকরের সমবায়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি মণ্ডলীকে শ্রমিকদের অবস্থা অধ্যয়ন করার জন্যে গ্রেট্‌বৃটেন ও কন্টিনেণ্টাল ইউরোপে প্রেরণ করা হোক্। মণ্ডলীকে পার্টির নিকটে তাঁদের কাজের রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৩) চীনে বিদেশী-শোষণবাদিগণ যে অভিসন্ধি করেছে এই দল তার তীব্র ভর্ৎসনা করছে এবং চীনবাসিগণের অর্থনীতিক মুক্তি সংগ্রামে সহানুভূতি জানাচ্ছে।

(৪) কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার এই সভা বৃটেনের রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় সংঘটিত ইংরেজ ও সোভিয়েটের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধনকে খুব ভর্ৎসনা করছে এবং ঘোষণা করছে যে রুষকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্যে শোষণবাদ যে অনেক প্রকার চেষ্টা করে আস্‌ছে বর্ত্তমান কার্য্যও তারি একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

(৫) এই দল বিবেচনা করছে যে গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্টে বর্ত্তমানে যে ট্রেড্ ইউনিয়ন বিল বিচারাধীন আছে তা ধনিকগণের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকগণের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অধিকারকে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং ধনিকগণের এই জবরদস্তী আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রেট বৃটেনের শ্রমিকগণকে যে সংগ্রাম চালাতে হবে তাতে এই দল নিশ্চিতরূপে এর সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে।

প্রোগ্রাম

এই দলের মতে কেবলমাত্র শ্রমরত জনগণের গতিশীল শক্তির দ্বারাই ভারতে স্বরাজ লাভ হতে পারে বলে এবং কংগ্রেসের বর্ত্তমান বুর্জুয়া নেতৃগণ ক্রমশঃ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সাক্ষাৎভাবে জনগণের স্বার্থের বিরোধী হয়ে পড়েছে বলে এদল এর সকল সভাকে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসেরও সভ্য হয়ে তার সকল প্রতিষ্ঠানেই একটা চরমপন্থীদল সৃষ্টি করে কংগ্রেসকে প্রতিকূল পক্ষের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছে।

এই দল আরো অনুরোধ করছে যে কংগ্রেসের ভিতরে যে সকল আমূল সংস্কারকামী লোক আছেন তাঁদের সাহায্য নিয়ে কম্যুনিষ্টগণ নিম্ন লিখিত নিম্নতম দাবীগুলির ভিত্তির ওপরে একটা সাধারণ প্রোগ্রাম রচনা করুণ :—

(ক) পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করে বয়ঃপ্রাপ্ত নারী-পুরুষ মাত্রেরই ভোটের অধিকারের ভিত্তির ওপরে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা; জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা; ভূমিকর ও পরোক্ষ ট্যাক্সের হ্রাস করা; সরকারের (ষ্টেটের) সাহায্যে আধুনিক কৃষি প্রণালীর প্রবর্ত্তন করা; সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুগুলিকে (Public utilities) সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা; দেশকে ষ্টেটের দ্বারা শিল্পানুষ্ঠানময় করে তোলা; শ্রমিকগণের জন্য ৮ ঘণ্টার দিন ও নিম্নতম বেতনের নিরিখ নির্দ্ধারিত করা।

(খ) ওপরের দাবীগুলোকে কার্য্যে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে অল্-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস কমিটিতে যে সকল কম্যুনিষ্ট সভ্য আছেন তাঁরা সে কমিটির চরমপন্থীদের সমবায়ে কমিটির ভিতরে একটা গণতান্ত্রিক মণ্ডলী গঠন করার প্রতি ধ্যান রাখবেন।

(গ) ব্যবস্থাপক সভা, মুনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতির নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী নির্দ্ধারণ করবেন।

(ঘ) অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে যে সকল অত্যাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা হবে সে সকল বিষয় সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টি আলোচনা করে একটা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবেন এবং তদনুসারে কাজ করার জন্যেও কম্যুনিষ্ট সভ্যগণকে উপদেশ প্রদান করবেন।

(ঙ) কম্যুনিষ্ট পার্টির কোনো সদস্য কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের সভ্য হতে পারবেন না। সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণীগত স্বার্থের বিরোধের যদি কিছু পাওয়া যায় তা হলে পার্টি তা সাধারণ্যে প্রকাশ করে দিবে।

ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস

ট্রেড্স ইউনিয়ন কংগ্রেসকে প্রোলেটারিয়েটদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে এর মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বই একমাত্র দায়ী বলে কম্যুনিষ্টগণের ট্রেড্স ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রবেশ করা একান্ত আবশ্যক। ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসকে বুর্জুয়া নেতৃত্ব হতে মুক্ত করার জন্যে কম্যুনিষ্টগণের উচিত শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহ গঠন করে ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা। এ কংগ্রেসে যে কম্যুনিষ্ট গ্রূপ থাক্‌বে সে গ্রূপ শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্যে নিম্নলিখিত উপস্থিত পরিপূরণের নিম্নতম দাবীগুলি পেশ করবে :—

আইনের দ্বারা শ্রমিকের কাজ দৈনিক আধঘণ্টা করে দেওয়া; আইনের দ্বারা বেতনের নিম্নতম হার বিধিবদ্ধ করে দেওয়া; ১৮ বছরের কম বয়সের নারী বা পুরুষের কাজে নিযুক্ত করার প্রথার উচ্ছেদ করা; নারীদিগকে রাত্রে খনির ভিতরের কার্য্যে ও বিপজ্জনক কার্য্যে নিযুক্ত করার প্রথা রহিত করা; মাতৃত্বের বোনফিট দেওয়ার ব্যবস্থা করা; রুগ্নতা, বার্দ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্যতার জন্যে বীমার ব্যবস্থা করা; শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ ও নিয়োগকারিগণের দায়িত্ব আইনের প্রসার বৃদ্ধি করা; শ্রমিক-সঙ্ঘ সংগঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সঙ্ঘের কোনো সভ্যের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে সঙ্ঘকে দায়ী না করা; রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনে যোগদান করার জন্যে সঙ্ঘের সদস্যগণের স্বাধীনতা থাকা; প্রতি সপ্তাহে বেতন প্রদান করা; কারখানা ও খনি-শ্রমিকদিগকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে আইনের দ্বারা উপায় করে দেওয়া;

বোম্বে, বাংলা ও রাজপুতনায় শ্রমিক ও কৃষক দল সমূহ (The Workers' and Peasants' Parties) যে প্রোগ্রাম প্রণয়ন করেছে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া তার পূর্ণ সমর্থন করছে এবং পার্টির সভ্যগণকে এ প্রোগ্রাম কার্য্যে পরিণত করার জন্যে অনুরোধ করছে। অন্যান্য প্রদেশ সমূহেও এরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ার চেষ্টা করা আবশ্যক।

পার্টি মিঃ আবারী ও তাঁর সহযোগিগণকে অত্র রাস্তায় অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে তাঁরা "সত্যাগ্রহ" করেছেন তজ্জন্য অভিনন্দন করছে।

সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্ট যে উন্নত বিষয়ের পুস্তিকাদির ভারতে আমদানি বন্ধ করেছেন পার্টি সে কার্য্যের তীব্র ভর্ৎসনা করছে। পার্টির মতে এরূপ করার মানে হচ্ছে ভারতের মুক্ত-চিন্তাকে প্রতিহত করা।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যে গওহর রহমান দরবেশীর গতিবিধির ওপরে প্রতিবন্ধক স্থাপন করেছেন এ পার্টি তার তীব্র প্রতিবাদ করছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার এই সভা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট মোহাম্মদ শফীককে যে অন্তরীণে রেখেছেন তজ্জন্য সে গবর্ণমেণ্টের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করছে।

মোহাম্মদ আকবর খান ও মোহাম্মদ শওকৎ উস্‌মানী যে আজো কারাযন্ত্রণা ভোগ করছেন তজ্জন্য সভা তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া কমরেড ডাঙ্গের কারামুক্তিতে তাঁকে অভিনন্দিত করছে এবং আশা করছে যে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে পাবার পরেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু যে তাঁর নীতির খাতিরে গবর্ণমেণ্টের শর্ত্ত গ্রহণ করেন নি কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া তজ্জন্য তাঁকে অভিনন্দন করছে।

("ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড", বোম্বে)

কম্যুনিজম ও গণভারত

—:০:—

[শ্রীধরণীকান্ত গোস্বামী]

—০—

ভারতে আজ কম্যুনিজম্-আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা বৃটিশ্ ধনিকতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের ভিতরেই এই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। "নেকড়ে বাঘ! নেকড়ে!!" বলিয়া সকলেই অস্থির। ইহাদের এই ভীষণ আতঙ্ক কোথা হইতে আসিল! "ঐ নেকড়ে বাঘ! ঐ নেকড়ে বাঘ!" চিৎকার শুনিয়াই উহারা ছুটাছুটি করিতেছেন। যদিও আতঙ্কের বস্তু কোথাও কিছুই নাই তথাপি ইহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে চিৎকারকারীর মতবলটা কি?

ধূর্ত্ত বৃটিশ শোষণবাদীরা কম্যুনিজম্‌কে ভারতে লোহিতাতঙ্ক —Red menace in India বলিয়া প্রচার করিতেছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বৃদ্ধেরাত দূরের কথা শিক্ষিত যুবক

সম্প্রদায় পর্য্যন্ত তাহাই মাথা পাতিয়া লইতেছেন। শুধু তাহাই নয়। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সব চমৎকার লোকও আছেন যাঁহারা কম্যুনিজম্ নামটী শুনিবামাত্র নিস্পন্দ হইয়া পড়েন। ইহাদের এইরূপ অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া মনে হয় ভারতে বৃটিশ শোষণতন্ত্রের রাজনীতি অভ্যর্থ সন্ধানেই পরিচালিত হইয়াছে। ধনিকতন্ত্রের এই চালাকী আজ একটু নিবিষ্টচিত্ত হইয়া দেখিতে হইবে এবং আমাদের আতঙ্কের কারণগুলিও ধরিতে হইবে।

কম্যুনিজম, গণভারত এবং ধনিকতন্ত্রের চালাকী এই তিনটি ব্যাপারের সাথে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের স্বাভাবিক ভাবে এক যৌগিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। গণভারতের কথা ভাবিতে গেলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলি খুবই তলাইয়া দেখিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই আমাদের স্বদেশসেবী ও সমাজসেবী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতক বিচারবুদ্ধিহীন কর্ম্মী আছেন যাঁহারা গতানুগতিকভাবে চলিয়াছেন, আর কতক বেশ জাগরুক ও কতক পরিমানে চিন্তাশীল কর্ম্মী আছেন যাঁহারা একটু সতর্কতার সহিত চলিয়াছেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ব্বোক্ত ধারায় এই দুই শ্রেণীর লোকদ্বারাই আবহমানকাল পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের প্রথমোক্ত শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত ও তন্নিম্ন শ্রেণীর লোক—বিশেষভাবে ঐ ঐ সম্প্রদায়ের যুবক শ্রেণীর লোক রহিয়াছেন।

আর শেষোক্তটীতে ধনিক বণিক ও উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক আছেন এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই প্রৌঢ়। শেষোক্ত দলটীতে যেমন বিত্তসম্পন্ন লোক—জমিদার, মহাজন, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, উকিল আছেন, প্রথমোক্ত দলটীতেও তেমন না হইলেও তার একধাপ নীচের লোক আছেন, যেমন তালুকদার, জোতদার, পত্তনীদার দেনাদার ব্যবসাদার ও মধ্যমশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ইত্যাদি।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সর্ব্বপ্রকার অধিবেশনাদিতে এই দুই শ্রেণীর লোকই সর্ব্বদা জমায়েত হয়েন, এবং এই সমস্ত সভাসমিতিতে ইহারাই ভবিষ্যভারতের ভাগ্যলিপির খসড়া প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর স্বদেশসেবীর ভিতরই ভারতের ভাগ্যচক্র ওৎপ্রোত ভাবে ঘুরিতেছে।

ইহাদের ভিতর নানারূপ স্বার্থসঙ্ঘাতে নানা মতবাদেরও সৃষ্টি হইতেছে। দলাদলি হইতেছে, এমন কি লাঠালাঠিও চলিতেছে। ইহারাই আবার বহুধা বিভক্ত হইয়া কেহ নরমপন্থী, কেহ গরমপন্থী, কেহ মধ্যপন্থী, কেহ বিপ্লবপন্থী, কেহ উদারপন্থী, কেহ বা স্বতন্ত্রপন্থী প্রভৃতি খেতাব লইয়া নিজ নিজ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া আছেন। কিন্তু সমস্ত খণ্ড কেন্দ্রগুলিই পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর প্রথমটী এই সমস্ত বিভাগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সাধারণ সম্পত্তি। এই সাধারণ সম্পত্তির সাহায্য ভিন্ন কোন দলই এক পা অগ্রসর হইতে পারেন না। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই সাধারণ সম্পত্তিটি হইতেছে যুবকের দল।

যুবকের দল সাধারণতঃই ভাবপ্রবণ। স্বাধীনতার সকল আহ্বানেই তাহারা বিচারবুদ্ধিহীন হইয়া আত্মোৎসর্গ করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। তাই তাহারা দলে দলে আসিয়া প্রতি আন্দোলনেই যোগদান করিয়া থাকে।

এই খানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে উপরিউক্ত প্রৌঢ়ের দলের সঙ্গে এই শেষোক্ত যুবার দলের একটা স্বাভাবিক বিপরীত স্বার্থ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বিপরীত স্বার্থ কিম্বা বিরুদ্ধ স্বার্থ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও স্বাধীনতার সাধারণ আহ্বানে এই দুই পরস্পর বিরোধী দল আপাততঃ একই ক্ষেত্রেতে কাজ করিতে পারিতেছেন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই ইহাদের স্বার্থসঙ্ঘাত অনিবার্য্য। যেহেতু প্রথমোক্ত দল শেষোক্ত দলের চেয়ে অত্যন্ত বেশী অধৈর্য্য এবং আন্দোলনের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়াইতে চায়—আর শেষোক্ত দল ধীরগতি এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে চায়।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরিক এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিয়াই চতুর শোষণতন্ত্র এই আন্দোলনের জন্ম হইতেই উহার জন্য এক অমোঘ অস্ত্র শাণিত করিয়া রাখিয়াছে। সময়ে ও সুযোগ সুবিধায় মাঝে মাঝে এই অস্ত্রের প্রয়োগে আমাদের এই দ্বন্দ্বকে ঘণীভূত করিয়া দিয়া শোষণতন্ত্র ভারতে তাহার শক্তিকে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কারণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একদল লোককে আমলাতন্ত্র ক্রমশঃ তাহার দলে ভিড়াইয়া নিতে সমর্থ হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের তদানিন্তন ভাবধারা ও দাবী দাওয়ার ব্যাপারগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমরা তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি।

ক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও সঙ্গে সঙ্গে শাসনযন্ত্রেরও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তনাদি ঘটায় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় অন্দোলনও কতকটা প্রসার লাভ করে। কিন্তু ফলে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বোক্ত শোষণতন্ত্রমুখীদল স্বার্থমুগ্ধ হইয়া কর্ম্মী যুবকের দলকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এই শোষণতন্ত্রমুখীদল পূর্ব্বোক্ত স্বদেশসেবীর শেষোক্তদল বা ধনিক বণিক ও উচ্চশিক্ষিতের দল। এদিকে স্বভাবতঃ বিরোধী শেষোক্ত অপরদল স্বাভাবিকগতিকেই স্বতন্ত্র হইয়া আর এক অভিনব অন্দোলনের কল্পনা করিতে থাকে। পরবর্ত্তীকালে বাংলাদেশের স্বদেশী অন্দোলনে এই দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়াছিল দেখিতে পাই।

বঙ্গভঙ্গের অন্দোলনে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শক্তি বাংলাদেশে আসিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া কতদিনের জন্য যে আন্দোলন প্রকট করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাকে বিশেষভাবে ধনিক বণিকের আন্দোলন বা অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্দোলন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ এই আন্দোলনে উক্ত সম্প্রদায় বিশেষেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে—ইঁহাদের স্বার্থরক্ষার বাহিরে একপাও ইঁহারা অগ্রসর হন নাই। পূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা শোষণতন্ত্রমুখী ছিলেন সেই স্বার্থলোলুপ স্বদেশসেবী সম্প্রদায় এই সময়ে এক রকম প্রকাশ্যেই শোষণতন্ত্রের সঙ্গে সন্ধি করিয়া বসিলেন। ধূর্ত্ত শোষণতন্ত্র তাহার প্রথম অস্ত্রপ্রয়োগে সফলকাম হইল। প্রতারিত যুবকদল রাষ্ট্রীয় অন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় অন্দোলনও কিছুকালের জন্য মাথা নোওয়াইতে বাধ্য হইল।

যুবকের দল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হইতে সরিয়া আসিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। যে স্বাধীনতার উন্মাদনায় তাঁহারা সমস্ত কিছু বিসর্জ্জন দিয়া ঝড়ের বেগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন সেইখানে অনবরত প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার ধাক্কা খাইয়া তাঁহারা সেই আকাঙ্খিত বস্তু স্বাধীনতা লাভ করার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা

গুপ্তদলের সৃষ্টি করিলেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবায়োজনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় বিপ্লবান্দোলনও মুষ্টিমেয় একদল মধ্যশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের ভিতরই মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল। উঁহারা যে ধারায় এবং যে গতিতে তখন ভারতে বিপ্লবায়োজনের প্রচেষ্টা করিতেছিলেন তাহাতে কদাপি কোথাও বিপ্লবান্দোলন সার্থক হইতে পারে না। কোনও দেশের বিক্ষিপ্ত বিপ্লবীয়শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একযোগে অগ্রসর হওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দেশে কোন বিপ্লবায়োজন সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। বাংলা তথা ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় তদানিন্তন বিপ্লব প্রচেষ্টায় ভারতের প্রকৃত বিপ্লবীয় শক্তিকে তখন উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা দীর্ঘকালের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও একবারও উত্থান করিতে পারেন নাই। গত যুগের বিপ্লবান্দোলনের প্রকৃত দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা চতুর শোষণতন্ত্র অচিরেই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই অতি অল্প আয়াসেই শোষণতন্ত্র ইহাকে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থও হইয়াছিল। ভারতীয় গুপ্ত বিপ্লবান্দোলনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারেও পূর্ব্বোক্ত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অনুযায়ী অনেক বিরোধসঞ্জাত ও দ্বন্দ্ব-কলহের বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। এসব বিষয়কে ঐ বিপ্লবান্দোলনের নির্ব্বাপনের অন্তর্নিহিত কারণমধ্যে গণ্য করা যায়। আবশ্যক হইলে পরে এই সূক্ষ্ম ও জটিল দ্বন্দ্ব-কলহের বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমানে মোটামুটি এই আলোচনায় ভারতীয় উভয় প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের আশু নির্ব্বাপনের তিন কারণ নির্ণয় হইতেছে। প্রথম, ভারতীয় উভয় প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনেই এক পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি সঙ্ঘাতের উপস্থিতি।

দ্বিতীয়, চতুর শোষণতন্ত্রের সেই সুযোগ গ্রহণে রাজনৈতিক অস্ত্র পরিচালনা।

তৃতীয়, ভারতীয় উভয় প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে গণ-শক্তিকে উপেক্ষা।

জাতীয় জীবনে ও জাতীয় জাগরণে এই তৃতীয় কারণটী অত্যন্ত প্রণিধান যোগ্য এবং এই তৃতীয় শক্তিটাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শক্তি। এই তৃতীয় শক্তির জাগরণই রুষীয় ভাষার বোলশেভিক শক্তির জাগরণ বা রুষিয়ায় অবস্থিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কথায় এবং কার্ল মার্কসের আবিষ্কৃত সামাজিক অভ্যুত্থানের নৈতিক প্রথায় আখ্যায়িত কম্যুনিজম।

জাতির জাগরণ এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে এই কম্যুনিজমকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। উহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে উহার পাদনিক্ষেপ একেবারেই অনিবার্য্য—যদি জাতি জাতিহিসাবে তাহার মুক্তিসংগ্রামে ব্যাপৃত হয়। কেননা, কম্যুনিজম বলিতে গণশক্তির জাগরণকেই বুঝায়, আর গণশক্তিই হইল জাতির প্রকৃত শক্তি। গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া যে দেশে জাতীয় আন্দোলন নামধেয় কোন আন্দোলন চালিত হয় তাহা প্রকৃত জাতীয় আন্দোলন নয়—উহাকে দল বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের আন্দোলন বলিতে হইবে। এ যাবৎকাল ভারতে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃত জাতীয় আন্দোলন বা গণ-আন্দোলন এখন পর্য্যন্ত ভারতে দাঁড়ায় নাই। অথচ জাতির প্রকৃত মুক্তিসংগ্রামে গণ আন্দোলন একান্তই আবশ্যক। যেহেতু সম্প্রদায় বিশেষের আন্দোলনে সম্প্রদায় বিশেষরই সুবিধা হইয়া থাকে এবং জাতির মুক্তির ব্যাপারে উহা ক্রমশঃ পাষাণ চাপাইয়া দিতে থাকে।

প্রকৃত জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তখনই উপলব্ধি করিব যখন দেখিব জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের নিমিত্ত উহার বুকের উপর হইতে সকল প্রকার অত্যাচার সকল প্রকার শোষণকে অপসারিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কারণ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল প্রকার অত্যাচার হইতে রেহাই না পাইলে জাতির মুক্তি লাভ হইয়াছে এই কথা বলিতে পারি না।

বৈদেশিক বৃটিশ শোষণতন্ত্র একমাত্র শোষণের ভিত্তির উপরই ভারতে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে যে সম্প্রদায় উক্ত শোষণতন্ত্রের সঙ্গে সন্ধি করিয়া চলিতে চায় তাহাদিগকে উহাদেরই অংশীদার রূপে গণ্য করিব। কারণ ধনিক বণিক সম্প্রদায় ও শোষণতন্ত্র সমস্বার্থে আবদ্ধ। উভয়েই শোষণনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শোষণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্প্রদায়ও একটী উল্লেখযোগ্য পরিপন্থী শক্তি। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের পরিপন্থী এই সমস্ত শোষক সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ভারতে গণ-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা এবং গণশক্তির জাগরণ। গণশক্তি জাতির বেশীর ভাগশক্তি এবং জাতির প্রাণ। বেশীর ভাগ শক্তির বেশীর ভাগ দাবী আছে এবং প্রাণটিরই বাঁচিয়া থাকার দাবী সকলেরই আগে আছে—নতুবা জাতি বলিয়া কিছু গর্ব্ব করিবার থাকে না। এই গণশক্তি ভারতের সভ্যতার ভাষায় ইতর জনসাধারণ কুলী, মজুর চাষী যাহারা দেশের শতকরা ৯৮ জন লোক, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, শরীরের রক্ত জল করিয়া ধনীর সুরম্য হর্ম্ম, আরাম শয্যা, খাট পালং চেয়ার টেবিল প্রভৃতি তৈয়ার করিয়াছে এবং করিতেছে। যাহারা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাতদিন বাপে বেটাতে মায়েঝিয়েতে মিলিয়া আসুরিক পরিশ্রমে লাঙ্গল চষিয়া কোদাল মারিয়া আমাদের দৈনন্দিন আহার সামগ্রী জোগাইতেছে। যাহারা প্রাণ সংশয় করিয়া ও গাধার মত হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে খনি খুঁড়িয়া ধনীরই পকেটই ভর্ত্তি করিতেছে। রেল তৈয়ার করিতেছে, ষ্টীমার তৈয়ার করিতেছে এবং চালাইতেছে, যাহারা রাতের পর রাত দিনের পর দিন কলকারখানায় যমের খাতায় নাম লিখাইয়া হাত কাটিয়া, পা কাটিয়া এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া ধনীর জন্য বিলাস সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, এবং সকল প্রকারের নিজেরা বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। যাহারা বন কাটিয়া রাস্তা করিয়া দিয়াছে, যাহারা পুকুর খুঁড়িয়া জল আনিয়া দিয়াছে, যাহারা পাহাড় ভাঙ্গিয়া মন্দির তুলিয়া দিয়াছে, অথচ যাহারা সকল বস্তুর উৎপাদক হইয়াও সকল সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিষ্ঠুর সমাজের প্রবঞ্চক নীতির চক্রান্তে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই গণ আন্দোলন যদি কম্যুনিজম হয় তাহা হইলে তাহাতে একমাত্র শোষক সম্প্রদায়েরই ভয়ের কারণ। জন সাধারণের তাহাতে ভয়ের কিছুই নাই। ভারতে গণ আন্দোলন সামান্য একটু দেখা দিয়াছে বলিয়াই শোষণতন্ত্র জন সাধারণের অন্তরে কম্যুনিজমকে নানা উপায়ে সাজাইয়া এবং আতঙ্ক ইত্যাদি

নাম দিয়া এক ভীষণ ভীতির সৃষ্টি করিতেছে। এই স্থানেই চতুর শোষণতন্ত্র তাহার আর এক নূতন অস্ত্রের পরিচালনায় ব্যস্ত হইয়াছে।

গত অসহযোগ আন্দোলনের শেষের দিক হইতেই আমরা ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তখন হইতেই একটু আধটু গণ-আন্দোলনের সাড়া দেখিতে পাওয়া যায়। গণ আন্দোলনে শোষণতন্ত্রের বিনাশ যে অনিবার্য্য চতুর শোষণতন্ত্র তাহা বেশ ভাল রকমেই জানে। তাই পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য আটসাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের গণশক্তি যতদিন সুপ্তির কোলে শায়িত ছিল ততদিন উহার বড় বেশী একটা কিছু ভাবিতে হয় নাই। কারণ ততদিন ভারতীয় মুক্তি সংগ্রাম যে দুই বিরুদ্ধ শক্তির ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল তাহার এক দলকে আমলাতন্ত্র কতকটা মুঠার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে এবং বাদবাকীও সময়ে আসিয়া পড়িবে এই ধ্রুব বিশ্বাস শোষণবাদের আছে।

আর অপর বিরুদ্ধ-অংশ অত্যন্ত অল্পশক্তি এবং অসহায় বলিয়া অন্য বিরুদ্ধ অংশের সাহায্যে দমিত রাখা যাইবে ইহাও তাহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং এ যাবত এক প্রকার নির্ব্বিরোধেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। কিন্তু বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে নানারূপ তীব্র ও অশান্তিরকর যাতনার মধ্য হতে গত অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর দিয়া যখন ভারতে গণশক্তির জাগরণ ফুটিয়া উঠিল তখন হইতেই শোষণতন্ত্রও প্রমাদ গণিল। শোষক আমলা-তন্ত্রের পূর্ব্বের রক্ষিত অস্ত্রে এখন আর কাজ চলিবে না, তদতিরিক্ত একটা অস্ত্রের তার এখন প্রয়োজন। তাই শোষণতন্ত্র বর্ত্তমান ফন্দীতে জাল বিস্তারের চেষ্টায় আছে। শোষণতন্ত্রের সুহৃদ্ আমাদের দেশের ধনিক বণিক সম্প্রদায় ইতি পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। উহারা ঐ সমাজ ভাঙ্গিয়া কখনও বাহির হইয়া আসিবেন না। এখন যদি উহা গণ-শক্তিকে একবার জয় করিতে পারে তাহা হইলে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের যবনিকা চিরকালের জন্যই পড়িয়া যাইবে ইহাই হয়তো তাহাদের বিশ্বাস। তাই নানাদিক দিয়া উহার অদম্য প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। একদিকে গণ-শক্তির সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের কম্যুনিজমের বিভীষিকাত্মক কার্য্যদ্বারা এক বিরোধের চেষ্টা, আর অপর দিকে কৃষিকমিশন ইত্যাদি বসাইয়া গণ-শক্তিকে জয় করিবার চেষ্টা।

শোষণবাদের এই অদম্য চেষ্টাকে আজ ব্যাহত করিতে না পারিলে কোনকালে ভারতের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। আর এই চেষ্টাকে ব্যাহত করার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র গণ-আন্দোলন। ইহা কম্যুনিজম হয় হউক, ইহা বোলশেভিজম হয় হউক, তাহাতে গণ-ভারতের প্রতিষ্ঠাকামী কর্ম্মীর ভয় করিবার কিছুই নাই।

শ্রমিক জগৎ

Employees' Association (কেরাণী-সঙ্ঘের) সভাপতি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গলক্ষ্মী কটন্‌মিলের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। শুনিতে পাই তাঁহার নিজের একখানি বড় কাপড়ের দোকানও আছে। তাঁহার ১২ বি, নন্দরাম সেন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে হরিনারায়ণ পুর রায়ৎ সভার আফিস। হরিনারায়ণপুর রায়ৎ সভা ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সভার কোন অধিবেশনের বিবরণী কোন কাগজে কখনও দেখি নাই। হরিনারায়ণ পুরের রায়তদের সভার কার্য্যালয় কলিকাতায় কি করিয়া হয় তাহাও বুঝিতে পারি না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইচ্ছা করিলে অনেক বিষয় আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। তিনি কটন মিল কোম্পানীর সম্পাদকত্ব করিয়া, কাপড়ের দোকান চালাইয়া, হরিনারায়ণপুর রায়তদের মঙ্গলামঙ্গলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কেরাণী সঙ্ঘের সভাপতিত্ব করিতে কোন প্রকার ক্লেশ বোধ করেন না তো?

—•—

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে অনেকগুলি এমন সঙ্ঘ আছে যে গুলির অস্তিত্ব কাগজের বাহিরে দেখা যায় না। ছাপা চিঠির কাগজ, একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক হইলেই একটি পুরাদস্তর সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়া যায়। এই সকল সঙ্ঘের সভাপতি ও সম্পাদকেরাই নিজেদের শ্রমিক নেতা বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং গালাগালি, নিন্দাবাদ ইঁহাদের মুখে যত শোনা যায় এমন আর কাহারও মুখে শোনা যায় না। কাজেই সঙ্ঘকর্ত্তাদের অবসর যথেষ্ট আছে; কারণ সঙ্ঘের তো আর কিছু কাজ নাই। কাজেই অপরের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়ানর পক্ষে তাঁহাদের কোন প্রতিবন্ধক নাই। পরন্তু, অপর সকলে খারাব এই কথা প্রচার করিবার একটা প্রলোভন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। অপর সকলে খারাব এ কথা যে বলে সে যে খারাব নয়, অন্ততঃ খারাব লোকের সামিল নয় এটা ধরিয়া নেওয়া স্বাভাবিক। আর ইসারায় নিজের সাধুত্ব সম্বন্ধে, লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করাটাত বোধ হয় আত্মপ্রসাদ অনুভব করার পক্ষে সহজ উপায়। অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বক্স-মেকারস্ ইউনিয়নের সভাপতি (?) শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন মিত্রকে কেহ কখনও বক্স মেকারদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শোনে নাই। উক্ত সঙ্ঘের সম্পাদকের পরিচয় কেহ জানে না। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর নানা মুখী প্রতিভা বক্সমেকারদের ছাড়া আর সকল প্রকার শ্রমিকের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত। সুরেশ-সুরেন্দ্র দুইজনই শ্রমিকদের বিশেষ বন্ধু বলিয়া পরিচিত!

—•—

আমরা জানি না যে Provincial Organiser (প্রাদেশিক সংগঠন কারী) এর কর্ত্তব্য কি? গত মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে যে অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেই কংগ্রেসে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য Provincial Organiser (প্রাদেশিক সংগঠনকারী) নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুত কিশোরী লাল ঘোষ বাঙ্গলা দেশের জন্য প্রাদেশিক সংগঠনকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা জানি না তিনি সংগঠনকারী হিসাবে কি কি কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে কিশোরী বাবু কাগজে ইউনিয়নগুলিকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিয়া অন্ততঃ যদি দু'তিনটি আসল ইউনিয়ন সংগঠন করিতে পারেন তাহা হইলেও বঙ্গদেশের বাস্তবিক পক্ষে যে সঙ্ঘগুলি আছে তিনি তাহাদের ধন্যবাদের পাত্র হন। দলাদলি দূর করিতে

হইলে কাগজে ইউনিয়নগুলির ধ্বংস সাধন করা সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন।

—•—

ই, বি, আর রেলওয়ে ইউনিয়ন ঠিক বয়লেকার বা হরিনারায়ণপুর বা ল্যান্সডাউন জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েনের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। ইউনিয়নটি অনেক দিনের এবং সভ্য সংখ্যাও বোধ হয় নেহাৎ কম নয়। কিন্তু দলাদলির ভিতর গিয়া ইউনিয়নটির কার্য্য বিশেষ ভালরূপে চলিতেছে না। কাঁচড়াপাড়ায় ই, বি রেলওয়ের ওয়ার্কসপে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার লোক কার্য্য করে। এখানে বহুদিবস যাবৎ কোন শাখা সঙ্ঘ খুলিবার চেষ্টা হয় নি। এখানকার শ্রমিকেরা নিজেদের একটা সঙ্ঘ গঠন করাতে সঙ্ঘ কর্ত্তাদের চমক ভাঙ্গিয়াছে। সেই জন্য ইউনিয়নের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের স্থান কাঁকিনাড়ায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২৫শে ও ২৬শে জুন তারিখে অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছে। বেঙ্গলির সম্পাদক মিঃ আই, বি, সেন বার-এ্যাট-ল অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভাপতি হইতে স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ সেন তো নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই বুর্জোয়া বলিয়া উপহাস করেন। আশা করি রেলের শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতা আছে। বোধ হয় ই, বি, রেলওয়ের সংঘকর্ত্তারা তাঁহার ন্যায় যোগ্য লোক আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই।

—•—

শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা কোথায়? ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাঁহার উপর তো নিখিল ভারতের শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনি কি পাটকলের শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে ব্যস্ত আছেন? তা যদি থাকেন তো ভাল কথা। তাহা প্রকাশ করিতে দোষ কি? করপোরেশনের কয়লা জোগাড়ের ঠিকাদারদের প্রতি তাঁহার প্রীতি যখন সংবাদপত্রে বাহির হইয়া তাঁহার সহৃদয়তার সাক্ষ্য দিতেছে তখন বোটম্যানদের জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম অথবা পাটকলের শ্রমিকদের প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি লুক্কায়িত থাকে কেন? বি, এন্, আর গার্ডেনরিচ ব্রাঞ্চে তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে কি?

—•—

দিন কয়েক পূর্ব্বে একখানি কাগজে দেখিলাম সম্পাদক মহাশয় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন "সভ্য অপেক্ষা সঙ্ঘ বেশী, আর সঙ্ঘ অপেক্ষা নেতা বেশী—হায়রে গরীব শ্রমিকদল!" সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় শ্রমিক আন্দোলনের ভিতরের কথা বেশী জানেন না। কারণ আমরা তো দেখিতে পাই দু'একটি তথাকথিত নেতা সঙ্ঘগুলিকে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছেন। মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী নিম্নলিখিত সঙ্ঘগুলির সভাপতি:—(১) কেরাণী সঙ্ঘ (Clerks' Union) (২) হাওড়া পোর্টার্স ইউনিয়ন। (৩) ল্যান্স ডাউন জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন (৪) কাঁকিনাড়া লেবর ইউনিয়ন (৫) চাঁপদানী জুট লেবর ইউনিয়ন (৬) ই, বি, আর কাঁচরাপাড়া ইউনিয়ন। মিঃ এম্ দাউদ নিম্নলিখিত ইউনিয়ন গুলির হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। (১) বেঙ্গল মেরিণার্স ইউনিয়ন (সভাপতি)। (২) ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টারস্ ইউনিয়নের সভাপতি (৩) ইণ্ডিয়ান সেমেন্স ইউনিয়ন (জেনারেল সেক্রেটারী) (৪) শান্তিপুর লেবর ইউনিয়ন (সভাপতি)। চৌধুরী সাহেব ব্যবসায়ী, আইনসভার সদস্য, আবার তা ছাড়া করপোরেশনের কাউন্সিলার। দাউদ সাহেব আইন ব্যবসায়ী এবং অলডারম্যান। আমরা যতদূর জানি মিঃ মোজাম্মেল আলী বাস্তবিক পক্ষে ইণ্ডিয়ান সিমেন্সদের ও ইণ্ডিয়ান কোয়াটার্স মাষ্টারদের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন এবং মিঃ আবদুল হকের পরিশ্রমের ফলে বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন চলিতেছে। তবে কর্ত্তাগিরির বেলায়, মোড়লি করবার সময় অবশ্য দাউদ সাহেব। এই সকল ইউনিয়নের কি এই দুইটি নেতা ছাড়া পৃথক সত্ত্বা নেই? মেসার্স দাউদ ও রায় চৌধুরীর মতামতই কি ইহারা গ্রামোফনের মত প্রচার করে? এসব ব্যাপারে সঙ্ঘের চাইতে ব্যক্তিবিশেষ বড় হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য যদি পাঁচটা ছেড়ে পঞ্চাশটা সঙ্ঘ ইহাদের কর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লয়, তবুও কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। তবে সঙ্ঘগুলির জীবনীশক্তির সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়।

———

ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা লর্ড বার্কেনহেডের বলশেভীতি তাঁহার মস্তিষ্ককে কিরূপ বিকৃত করিয়া দিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত বক্তৃতার সারাংশ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

"যে সকল লোক আমাদের উচ্চ, গৌরবমণ্ডিত জাতীয় ইতিহাস ও নীতিকে উপহাস করে সেইরূপ লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব মানিতে চায় না। এরূপ ব্যাপার ইংলণ্ডে ইহার পূর্ব্বে দেখা যায় নি। অতএব যাঁহারা ইংলণ্ডকে ভালবাসেন তাঁহারা সকলে একযোগে ইংলণ্ডের অবাধ্য সন্তানদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। জেনারেল ষ্ট্রাইক্ (সর্ব্বব্যাপী হরতাল) বেশীদিন চলে নাই কিন্তু কয়লার ধর্ম্মঘট অনেকদিন চালিত হইয়াছিল। দুইটি ধর্ম্মঘটই মস্কোর প্ররোচনায় ও নেতৃত্বে চালিত হইয়াছিল। চীনদেশেও যে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ রুষের শত্রুত্ব।" লর্ড বার্কেনহেডের এরূপ রুষাতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে যে কবে হয়তো তিনি ভারতেও রুষের ছায়া দেখিয়া আঁৎকে উঠতে পারেন। ইংলণ্ডে কর্ত্তাদের রুষভীতি হইলেও তত ভয়ের কারণ নাই, কারণ সেখানে বিচারটা সব সময় প্রহসনে দাঁড়ায় না, আর বিনা বিচারে লোককে আটকে রাখবার ক্ষমতাও কোন মন্ত্রির নাই। তবে ভারতে কর্ত্তাদের রুষাতঙ্ক মানে আরও কতকগুলি নির্দ্দোষ যুবকের অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাবাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা প্রার্থনা করি বার্কেনহেড সাহেবের রুষাতঙ্ক যেন শীঘ্রই সারিয়া যায়।

স-প

———

দেশ বিদেশ

মৈমনসিংহ জেলে অনশন ধর্ম্মঘট ভঙ্গ

গত ৩রা জুন রাত্রে মৈমনসিংহ জেলে রাজবন্দী পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ দাস ২১ দিন পরে তাঁহাদের অনশন ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করিয়াছেন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদিগকে কুঠরি হইতে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহাদের নামের ফৌজদারী মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়া এবং তাঁহাদের অন্যান্য অসুবিধা দুরীকরণ করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বকার অবস্থায় রাখিবেন, রাজবন্দীগণ এই শর্ত্তে তাঁহাদের আহার গ্রহণ করিয়াছেন।

—•—

সর্দার খড়ক্ সিং মুক্ত

গত ৪ঠা জুন গুরুদ্বারা সেন্ট্রাল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সর্দার খড়ক সিং ডেরাগাজিখান জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গুরুদ্বারা কমিটির তার হইতে জানা যায় যে মুক্তির পরে তাঁহাকে গুরুদ্বারাতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখান হইতে তিনি মুলতান রওয়ানা হইবেন। সর্দার খড়ক্ সিং পাঞ্জাবের গুরুকাবাগ হাঙ্গামার সময়ে ধৃত হন এবং রাজদ্রোহ এবং বিনা লাইসেন্সে কৃপাণ প্রস্তুত করিবার অভিযোগে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সর্দার খড়ক সিং সকল সম্প্রদায়ের আকালী শিখগণের মধ্যে একজন বিশেষ সম্মানীয় এবং প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি। শিয়ালকোট এবং অমৃতসর মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাকে মানপত্র দিবেন। তাঁহার মুক্তির সংবাদে বহু আকালী গৃহে, গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির কার্য্যালয়ে এবং স্বর্ণ মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

—•—

নাগপুর সত্যাগ্রহ

নাগপুর নগর কংগ্রেস কমিটির একটি মিটিংএ মিঃ আবারীকে তাঁহার ত্যাগের জন্য প্রশংসা করিয়া এবং সি, পি গভর্ণমেন্টকে মিঃ আবারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নিন্দা করিয়া সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে।

বিপক্ষে দুই ভোট এবং স্বপক্ষে চারি ভোটের জোরে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে যে নাগপুর নগর কংগ্রেস কমিটি অস্ত্র আইন অমান্য করিয়া নাগপুর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিবেন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার জন্য একটি সাব কমিটি গঠিত হইবে। তদনুসারে তিন জন সভ্য লইয়া একটি সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে। শেঠ পুনামচাঁদ একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে যতদিন না কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির ডেপুটেশন আসিয়া নাগপুর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তদারক করিয়া না যান ততদিন পর্য্যন্ত নাগপুর নগর কংগ্রেস কমিটি তাহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাব ভোটে হারিয়া যায়। এজন্য শেঠ পুনাম চাঁদ সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়াছেন।

—০—

মিঃ আবারী কারাদণ্ডিত

নাগপুর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং নেতা মিঃ আবারী ১২৪ক ধারা এবং আরও দুইটি অভিযোগে চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা জেলের মধ্যে প্রকাশ করেন। জেলের বাহিরে বহু লোক দণ্ডাদেশ শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। দণ্ডাদেশের পরে মিঃ আবারীকে তাঁহার বন্ধুগণ পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করেন এবং সহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া গণতান্ত্রিক সঙ্গীত গান করিয়া যাওয়া হয়।

—০—

ভারত সরকারের বাজেয়াপ্ত

শিমলার ৩রা জুন তারিখের এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে সি কাষ্টম্ এ্যাক্ট অনুসারে ভারত সরকার "ইম্পিরিয়ালিজম বিরোধী বিশ্বসংঘ" কর্ত্তৃক প্রচারিত কোনও পুস্তিকাদির ভারতে প্রবেশ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

—০—

অস্ত্র আইন মোকদ্দমা

কিছুদিন পূর্ব্বে রাজরাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জনের মিছিলের সহিত মল্লিকঘাটে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি যুবক বিনা পাশে একটী রিভলবার ও কয়েকটী কার্টুজ সমেত সি, আই ডি, পুলিস কর্ত্তৃক ধরা পড়ে।

প্রকাশ যে যুবকটী তাহার পিতা হুগলী জেলার পুলিসের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় এর স্যুটকেস হইতে পিস্তলটী লইয়াছিল। অভিযুক্ত যুবকটী বিচারে আপনার অপরাধ স্বীকার করে। মোকদ্দমাটী কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট রকসবার্গ সাহেবের আদালতে হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে তিন বৎসর ভালভাবে থাকিবার জন্য এক হাজার টাকার মুচ্‌লেকা লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

———

কুমিন্টাংএর সাহায্য প্রার্থনা

নবগঠিত শোষণবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতাকামী লীগকে চীনের হ্যাংকো থেকে কুমিন্টাং দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত রূপ তার পাঠিয়েছে :—

"আমরা আপনাদিগকে ভ্রাতৃত্বের অভিবাদন জ্ঞাপন করছি এবং ব্যবহারিক সাহায্য দানের জন্যে অনুরোধ করছি। যদি সম্ভবপর হয় চীনের যুদ্ধলিপ্ত সৈন্যগণের জন্যে এম্বুলেন্স কোর্ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমরা তা শীঘ্রই পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকব।

———

যুবক সম্মিলন

সাতক্ষীরাতে গত ৪ঠা জুন তারিখে যশোহর খুলনা যুবক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়ে গেছে। অধ্যাপক শ্রীযুত মৃণাল কান্তি বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। মৌলবী আবদুল বারী খান অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। অসুস্থতা বশতঃ তিনি উপস্থিত হতে না পারায় ভাইসচেয়ারম্যান তার বক্তৃতা পড়েছিলেন। প্রায় এক হাজার যুবক সভায় যোগদান করেছিলেন।

———

পারস্যেয় সোশ্যালিষ্ট দল

পারস্যে একটা সোশ্যালিষ্ট দল আছে। পারশ্য ভাষায় এদলের নাম "জমিয়ৎ-ই-ইজ্‌তিমায়ুন-ই-ইরান"। এ দলের নেতা সুলায়মান মির্জা পারস্যের মজলিসেরও মেম্বর। তিনি তাঁর দলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির তরফ থেকে জানিয়েছেন যে তাঁর দল শোষণবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতাকামী লীগের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজী আছে।

—•—

ভারতীয় বিপ্লববাদীর শিক্ষাগার

চীনের বিপ্লব সেনাদলের হেড্ কোয়ার্টারের রাজনীতি বিভাগের প্রেস আফিস হতে লিখিত হয়েছে :—

"চীনের বিপ্লব রুষের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হতে অনেক কিছু শিখেছে। এইরূপ পরিচালনা ও উপদেশ খুবই মূল্যবান। রুষ বিপ্লবের পাঠগুলিকে চীনে খাপ খাওয়ান হচ্ছে। **বিপ্লববাদী চীন ভারতে যে বিপ্লব ঘনিয়ে আসছে তার শিক্ষাগার স্বরূপ**

হবে। গত ক'বছর চীন যে যুদ্ধ করেছে তার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ভারতকে জানানো কুমিণ্টাং দল তাঁদের কর্ত্তব্য বলে মনে করেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা কত যে সচেতন তা শোষণবাদীরা শীঘ্রই টের পাবেন। ইণ্ডো চায়নাতে আমাদিগকে বৈপ্লবিক যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। এ জন্যে প্রতীচ্যের জনগণের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। চীন ও ভারতের সংযুক্ত বিপ্লব শক্তির দ্বারা এসিয়ার বৃটিশ শোষণবাদ চরমভাবে প্রতিহত হবে। তার পরেই কেবল মাত্র এসিয়া ও জগৎ মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে সমর্থ হবে।"

—•—

কাকোরী ষড়যন্ত্রের

আশ্‌ফাক্‌ উল্লা ও শচীন্দ্রনাথ বক্সী কাকোরী মোকদ্দমার সংস্রবে পরে ধৃত হয়েছেন। লক্ষ্ণৌর স্পেশাল জজের নিকটে তাঁদের মোকদ্দমার শুনানি শেষ হয়ে গেছে। রায় এখনো দেওয়া হয়নি।

—•—

চীনের নিউজ্‌ এজেন্সী

রয়টারের ন্যায় সংবাদ সরবরাহকারী এজেন্সী চীন সম্বন্ধে কোনো বিশ্বস্ত খবর দিচ্ছে না। এরূপ এজেন্সীর গায়ে সরকারী গন্ধ আছে বলে সত্য খবর দেবার শক্তিও তাদের নেই। এই জন্যে হ্যাংকোর নিউজ্‌ এজেন্সী বার্লিনে একটা শাখা আফিস খুলেছে। এ আফিসের ঠিকানা হচ্ছে :—

Chinesische National Agentur,
Friedrichstrasse 232 Berlin.

কুমিণ্টাং দলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির একজন সদস্যের তত্ত্বাবধানে এ অফিস পরিচালিত হচ্ছে। ভারতবর্ষ, সিংহল ও বর্ম্মা প্রভৃতি দেশের সংবাদ পত্র সমূহকে এ এজেন্সী সংবাদ পাঠাবে।

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

ধৃষ্টতা আর কাকে বলে?

কংগ্রেসের বুর্জ্জোয়া-নেতৃগণের কতকগুলি চালচলন দেখলে সে সবকে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারা যায় না। ইংল্যাণ্ডে কয়লা খনির ধর্ম্মঘট যখন চলেছিল তখন স্বরাজ্যদলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল তার করে বিলাতের শ্রমিকদের জানিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে শ্রমিকদের জন্যে কেউ কিছু করে থাকেত সে হচ্ছে স্বরাজ্য দল। অথচ প্রকৃত পক্ষে স্বরাজ্য দল শ্রমিকদের জন্যে কখনো ভুলেও কিছু করেন নি। কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলে থাকেন যে কংগ্রেসকে তাঁরা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। তার প্রমাণ তিনি দেখাচ্ছেন যে জওয়াহিরলাল নেহেরু ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্‌ন্যাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে ব্রুসেলে "শোষণবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতাকামী লীগে" যোগদান করেছিলেন। তাঁরা চীনের প্রতিনিধিকে কংগ্রেসে আহ্বান করে ছিলেন। সাকলাৎওয়ালা প্রভৃতি যে বলে থাকেন তাঁরা কংগ্রেসকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করে রেখেছেন তা মোটেই সত্য নয়। কংগ্রেসের কোনো সভ্য যদি কোনো আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে যোগদান করে তাতেই কি কংগ্রেস আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে গেল? মিঃ আয়েঙ্গার আর তাঁর দলের লোকদের যদি বুকের পাটা শক্ত থাকে তা হলে কংগ্রেসকে শোষণবাদ বিরোধী লীগের সভ্য করুন না কেন। তা না করে কথার জমা খরচে কিছু কি লাভ আছে?

—•—

মিঃ দাউদের কৃতিত্ব (?)

মিঃ মোহাম্মদ দাউদ আজকাল বাংলাদেশের একজন বড় শ্রমিক নেতা। ১৯১৮ সনে ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘ গঠিত হয়ে গেছে। সেই থেকে তিনি এই সঙ্ঘের জেনেরেল সেক্রেটারীর কাজ করে আসছেন। এই সঙ্ঘের নাম বিক্রী করে তিনি একবার ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হয়ে গেছেন। আর একবার তিনি জেনিভাতে তথাকথিত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। কিন্তু, তাঁর সঙ্ঘের দুরবস্থার কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। সঙ্ঘের ছাপানো ইতিহাসখানা দেখলেই অনেকেই মনে করে থাকেন যে ভারতীয় নাবিকসঙ্ঘ ভারতের সকল সঙ্ঘের সেরা। ১৯১৮ সন থেকে আরম্ভ করে ১৯২৩ পর্য্যন্ত ৯ বছর সময়ের মধ্যে তিনি সঙ্ঘের কোনো হিসাব পত্র দাখিল করার সময় পান নি। ৯ বছরের হিসাব তিনি একত্রে দাখিল করেছেন। তাও হয়তো তিনি করতেন না যদি মিঃ আফতাব আলীর সহিত তাঁর ঝগড়া না হত। ব্যক্তি বিশেষের ওপরে কোনো সাধারণ কার্য্য নির্ভর করলে যা হয়ে থাকে মিঃ দাউদের বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছে। সঙ্ঘের আমদানীর হিসাব থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

সন	সভ্যচাঁদা	এককালীন দান
১৯১৮-২০	৪৫৬৭	৩১৫
১৯২০-২১	×	×
১৯২২-২৩	১৭৭৮	১২৩৭
১৯২৩-২৪	৩৬	১৩৫
১৯২৪-২৫	১৬৭	৭৯৭
১৯২৫	৪৪৩	৯৮
১৯২৬	৬৯	৮৬

যে সঙ্ঘে ১৯১৮-২০ সনে ৪৫৬৭ টাকা চাঁদা উঠেছিল সে সঙ্ঘে ১৯২৬ সনে আরো অনেক বেশী চাঁদা উঠ্‌তে পারত এবং কাজও অনেক বেশী হতে পারত। এ সত্ত্বেও মিঃ দাউদ নাবিকদের ঘাড়ে চেপে বসে আছেন। মনে হচ্ছে এ পৃথিবীতে তিনি ছাড়া আর কোনো লোক নেই। মিঃ দাউদ আইন সভার সভ্য, জেনিভার প্রতিনিধি ও করপোরেশনের অলডারম্যান প্রভৃতি সবই হয়ে গেছেন। আমাদের মনে হয় এখন নাবিক সঙ্ঘটিকে মুক্তি দেওয়াই তাঁর উচিত।

—০—

পাত্‌তাড়ি

"পাততাড়ি" ছেলে মেয়েদের জন্যে একখানা সচিত্র মাসিক পত্র। বৈশাখ মাসে প্রথম সংখ্যা বেহালা, কলিকাতা হতে বের হয়েছে। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত একটাকা মাত্র। ছেলেমেয়েদের শিখবার ও আমোদ পাবার অনেক বিষয় এ কাগজে আছে। আমরা কাগজখানার দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

—০—

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে　৩৲

ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ　১৷৶৹

বার্ষিক মূল্য বিদেশে　৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেণ্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেণ্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেণ্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—

গণবাণী কার্য্যালয়—

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

BOOKS ON SOCIALISM.

1. **The Coming of Socialism.**
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. **Scientific Socialism.**
Its Aims and Ideals.
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. **The Religion of Capital**
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. **Manifesto of the Communist Party**
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS.
Price—As. 6/- only.

To be had of

The Book Company Ltd.

4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের

উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	॥০
অগ্নিসংস্কার	১॥০
শুভা	২৲
পাপের ছাপ	২।০
বিপর্য্যয়	২॥০
শান্তি	২॥০
কাঁটার ফুল	১॥০
রক্তের ঋণ	॥০
আনন্দ-মন্দির	॥০
রাজগী	২।০
পিতাপুত্র	১॥০
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	১॥০
দূরের আলো	২৲

নাটক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ॥০
২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত প্রহচিত্র। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

উপন্যাস ও গল্প

১ মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। এক্কা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—

১। ভাত কাপড়ের কথা
বাঙ্গালার রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।
২। বাণী বীথি।
বাঙ্গালা সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন ব্যবহারের গ্রন্থ

1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.

Published by the Calcutta University.



Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই জুন ১৯২৭, ১লা আষাঢ় ১৩৩৪ | ১৯শ সংখ্যা

"গণবাণী" প্রচারের আয়োজন

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিয়ালদা, ব্যারাকপুর, ঢাকা, সান্তাহার, পার্ব্বতীপুর, শিলিগুড়ি, লালমণির হাট, কাটিহার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাওড়া, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান, আসানসোল, পাটনা, দানাপুর, জামালপুর, গয়া, মোগলসরাই, মিরজাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, দিল্লী, জব্বলপুর, এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর, পুরুলিয়া, গোণ্ডিয়া ও পুরী প্রভৃতি ষ্টেসনের হুইলার কোম্পানীর ষ্টলে গণবাণী পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া দার্জ্জিলিংএর হুইলার কোম্পানীর ষ্টলেও গণবাণী বিক্রয়ার্থ মৌজুদ থাকে।

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

BOOKS ON SOCIALISM.

1. **The Coming of Socialism.**
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. **Scientific Socialism.**
Its Aims and Ideals.
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. **The Religion of Capital**
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. **Manifesto of the Communist Party**
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS.
Price—As. 6/- only.

To be had of
The Book Company Ltd.
4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্তক

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের

উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	॥৹
অগ্নিসংস্কার	১॥৹
শুভা	২৲
পাপের ছাপ	২।৹
বিপর্য্যয়	২॥৹
শান্তি	২॥৹
কাঁটার ফুল	১॥৹
রক্তের ঋণ	॥৹
আনন্দ-মন্দির	॥৹
রাজগী	২।৹
পিতাপুত্র	১।৹
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	১।৹
দূরের আলো	২৲

নাটক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ৷৹

২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত প্রহসন। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

উপন্যাস ও গল্প

১ মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। একা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—

১। ভাত কাপড়ের কথা।
বাঙ্গালার রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।
২। বাণী বীথি।
বাঙ্গালা সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান

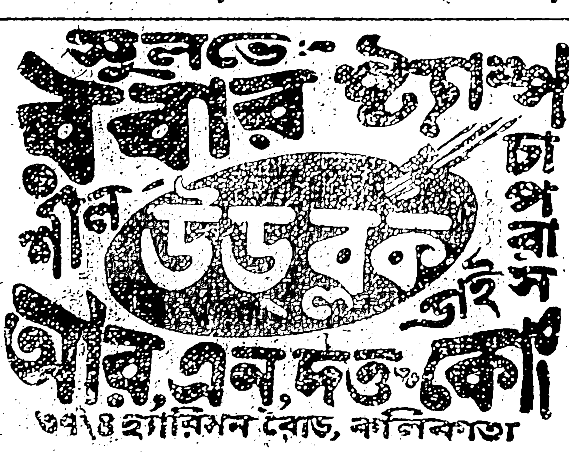
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন ব্যবহারের গ্রন্থ

1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.

Published by the Calcutta University.



Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই জুন ১৯২৭, ১লা আষাঢ় ১৩৩৪	১৯ম সংখ্যা

"গণবাণী" প্রচারের আয়োজন

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিয়ালদা, ব্যারাকপুর, ঢাকা, সান্তাহার, পার্ব্বতীপুর, শিলিগুড়ি, লালমণির হাট, কাটিহার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাওড়া, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান, আসানসোল, পাটনা, দানাপুর, জামালপুর, গয়া, মোগলসরাই, মিরজাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, দিল্লী, জব্বলপুর, এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর, পুরুলিয়া, গোণ্ডিয়া ও পুরী প্রভৃতি ষ্টেসনের হুইলার কোম্পানীর ষ্টলে **গণবাণী** পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া দার্জ্জিলিংএর হুইলার কোম্পানীর ষ্টলেও **গণবাণী** বিক্রয়ার্থ মৌজুদ থাকে।

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহমদ / শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই জুন, ১৯২৭, ১লা আষাঢ়, ১৩৩৪ | ১৯ম সংখ্যা

উত্থান

—:*:—

[আবদুল কাদের]

নব ধরণীর অভিনব সৃষ্টি-মোহে
আজি নিপীড়িত নির্জ্জীত যত জাগো হে ॥

জাগো রে সর্ব্বহারা, ডাকে সর্ব্বনাশী ;
বাজা' দস্যুর মন্দিরে ভাঙার বাঁশী ;
যুগ— বঞ্চিত নে'রে সম অংশ আসি'
তব সঞ্চিত সম্পদে সমদ্রোহে ॥

রাখো সঞ্চয়ী সঞ্চয়-আস্ফালন,
উৎ- পাদকের 'পরে নয় আর শাসন,
উৎ- বৃত্ত যা' শ্রমিকেরা করো গ্রহণ ;
কেবা রাজা প্রজা ? একায়ে বাঁচিবে দোহে ॥

দোলা' রক্ত-পতাকা, নাহি শঙ্কা ভয় ;
হবে অত্যাচারীর যত গর্ব্ব লয় ;
শোন্ স্বয়ং বিধি সে গায় তোদের জয় ;
ঐ সবার মুক্তি আসে যে সমারোহে ॥

ভদ্রশ্রেণীর মানসিকতা

—•—

[মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ]

—○—

পৃথিবীকে মন্থন করে যে ক্ষীর পাওয়া যায় সে ক্ষীর যুগের পর যুগ একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ভোগ করে আসছে। দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মন্থন যারা করছে সেই জনগণ হয়ে আসছে চির বঞ্চিত, আর কোনো পরিশ্রম যারা কখনো করছেনা তারাই ভোগ করছে সব কিছু। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনগণ আজ সমবেত ভাবে যখন উত্থানের জন্যে প্রস্তুত হতে চলেছে তখন জনগণের এই উত্থানকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে তাদের শোষকশ্রেণীর লোকেরাও বদ্ধপরিকর হয়েছে। ইটালীতে শোষক শ্রেণীর এই প্রচেষ্টা ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। সিনোর মুসোলিনী এ আন্দোলনের নেতা। জনগণের আন্দোলনের নেতৃগণকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক ভাবে মুসোলিনী হত্যা করেছে, তাদের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্যে কোনো প্রকারের হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে মুসোলিনী বাকী রাখেনি। আজকের দিনে মুসোলিনীর ন্যায় অত্যাচারী ও যথেচ্ছচারী শাসক জগতের আর কোথাও নেই। ইটালীতে মুসোলিনীর মুখের কথাই আইন। তার কথার ওপরে কথা বলাই হচ্ছে মৃত্যুকে আপনার হাতে বরণ করে নেওয়া। শ্রীযুত তারানাথ রায় চৌধুরী এহেন মুসোলিনীর একখানা জীবন চরিত বাংলায় রচনা করেছেন। বইখানা পড়ার সুযোগ আমরা এখনো পাইনি। কাজেই, বইএর লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করার অধিকার আমাদের নেই। গত রবিবারের (১২ই জুন, ১৯২৭) "অমৃত বাজার পত্রিকা" এ বই এর একটা সমালোচনা বের করেছেন। এ সমালোচনা সম্বন্ধেই দু'চার কথা আমরা এখানে বলব। "অমৃত বাজার" পঞ্চমুখে মুসোলিনীর প্রশংসা করেছেন, আর এই প্রশংসাতে যে কত প্রাণের দরদ মাখানো আছে "অমৃত বাজার" এর মূল সমালোচনা যাঁরা পড়বেন তাঁরা তা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। "অমৃত বাজার" এর মতে মুসোলিনি ইটালির রক্ষক এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থাপয়িতা। তার সম্মুখে কামাল ও ট্রট্স্কি কিছুই নয় ইত্যাদি। মোটের ওপরে হৃদয়ের দ্বার প্রশস্তভাবে উন্মুক্ত করে দিয়ে "অমৃত বাজার" মুসোলিনীর প্রশংসা করেছেন।

আজকের দিনে জগতের মধ্যে মুসোলিনি সম্ভবত ঘৃণ্যতম জীব। 'জন' এর স্বার্থের খাতিরে 'গণ'কে সে শুধু যে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করেছে তা নয়, নির্ম্মম ভাবে কত লোকের হত্যা কর্ম্মও যে সে সাধন করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। "অমৃত বাজার" এর মতে এই মুসোলিনীই নাকি আবার দেশ-প্রাণতার অবতার! তারানাথ বাবুর পুস্তকের বিজ্ঞাপন পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে এর ভূমিকা লেখক শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়েরও নাকি মত ঠিক তাই, অর্থাৎ দেশ-প্রাণতার অবতার বলে তিনিও মুসোলিনিকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। দেশের জনগণের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করা, জনগণের নেতৃগণকে কেবল মাত্র জনগণের নেতা হওয়ার অপরাধেই হত্যা করা ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করাই কি দেশ-প্রাণতার পরিচয়? দেশ-প্রাণতার এই আদর্শ নিয়েই কি উপেন্দ্রনাথ আন্দামানে বারো বছর ঘানি ঘুরিয়ে এসেছেন? দেশ-প্রাণতার এই আদর্শই কি তিনি দেশের যুবকগণের সম্মুখে বরাবর স্থাপন করে আসছেন? কয়েক বছর পূর্ব্বে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগে উপেন্দ্রনাথ "বাংলার কথা" নামক দৈনিক কাগজের সম্পাদন করেছিলেন। সেই সময়ে শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মুসোলিনির যথেচ্ছচার ও অত্যাচার সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ সেই "বাংলার কথা"তেই লিখেছিলেন। নিজের চোখে দেখে এসে দিলীপকুমার মুসোলিনির যে পরিচয় এ প্রবন্ধগুলিতে দিয়েছিলেন তাতে আর যা হোক দেশপ্রাণ তাকে কোনো বিচারশীল ব্যক্তিই বলতে পারেন না। যতই বেশী ক্ষমতা মুসোলিনির থাকুক না কেন, তার নিজের শ্রেণীর লোকদের ছাড়া আর কারো কাছ থেকে সম্মান সে পেতে পারে না। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়াই হচ্ছে যে ব্যক্তির জীবনের ব্রত তার চেয়ে বেশী ঘৃণিত জীব কেউ কি হতে পরে?

শ্রীযুত মৃণাল কান্তি বসু ও শ্রীযুত কিশোরী লাল ঘোষ "অমৃত বাজার পত্রিকার"র সম্পাদন করে থাকেন। তাঁরা এদেশের শ্রমিকনেতাও বটেন। আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে তাঁদের সম্পাদিত কাগজে কি করে মুসোলিনি এত উচ্চ প্রশংসিত হতে পারে? শ্রমিক নেতা হিসেবে একটা কিছু আদর্শত তাঁদের নিশ্চতই আছে। কি সে আদর্শ? তাঁরা তাঁদের সন্তান সন্ততিগণের হাতে মুসোলিনির জীবনী দেবার জন্যে এত ব্যস্তই বা কেন হয়েছেন, আর কি করেই বা মুসোলিনির আদর্শের দ্বারা আমাদের যুবকগণের দৃষ্টির প্রসারতা বাড়বে, এর কোনো সদুত্তর তাঁরা আমাদের দিতে পারেন কি? আমরা সহজ বুদ্ধি দিয়ে যতটা বুঝতে পারি তাতে মুসোলিনীর আদর্শের দ্বারা দৃষ্টির প্রসারতা খুব কমতে পারে বটে, কিন্তু, বাড়তে ত পারে না কিছুতেই।

আমরা আগে আরো অনেকবার বলেছি যে আমাদের দেশের ভদ্রলোক শ্রেণী বাস্তবিকই একটা অদ্ভুত শ্রেণী বিশেষ। ফাঁসির রশিতে হাসতে হাসতে ঝুলে পড়া এই ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকেদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, কিন্তু ভদ্রলোকত্বের সঙ্কীর্ণ সীমা ডিঙানো তাঁদের পক্ষে মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তাঁদের দেশাত্মবোধ. তাঁদের শ্রেণীর সীমা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। এ জন্যেই লেনিনের আদর্শের চেয়ে মুসোলিনির আদর্শই তাঁদের কাছে বড় হয়ে ওঠে, তা সে মুসোলিনি যতই অত্যাচারী আর স্বেচ্ছাচারী হোক্‌না কেন। এক কথায় ভদ্রলোক শ্রেণীর দেশপ্রাণতা যে আছে তা অস্বীকার করার যেমন উপায় নেই ঠিক তেমনি একথাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে তাঁদের দেশপ্রাণতা নিতান্তই এক পেশে, অর্থাৎ তাঁদের দেশ প্রাণতার মধ্যেও ভদ্র অভদ্রের বিচার আছে।

আর সকল দেশে যেমন. হচ্ছে এদেশেও ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক ভাবেই জনগণের অভ্যুত্থান হবে। যতই চেপে রাখার প্রচেষ্টা চলুক না কেন এ অভ্যুত্থানে বাধা দেবার শক্তি কাহারো নেই। এদেশের ধনিক-বণিকেরা কখনো এ অভ্যুত্থানকে ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, এ অভ্যুত্থান দেশী ও বিদেশীয় উভয় শ্রেণীর শোষকগণের বিরুদ্ধেই হবে। তবে ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকেরা, যাঁরা ধনিক বণিক শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত নন—তাঁরা এ অভ্যুত্থানকে কি ভাবে নেবেন সেটাই

হচ্ছে ভাবনার বিষয়। যদি এ যুগেও তাঁরা ভদ্রত্বের মিথ্যা অহঙ্কার ত্যাগ করতে না পারেন তা হলে তাঁরা গণআন্দোলনের পরিপন্থী হয়ে উঠবেন। দেশপ্রাণতার নামে যে আন্দোলন তাঁরা চালাবেন সেটা হবে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন। আর যদি ভদ্রলোক শ্রেণীর যুবকগণ তাঁদের তথাকথিত ভদ্রত্বের মায়া ত্যাগ করে কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে পারেন তা হলে তাঁরাই হবেন ভারতের গণ-অভ্যুত্থানের নেতা।

—*—

হিন্দু-মোসলমান সমস্যা

—:*:—

[শ্রীউল্কা]

—॰—

আজ হিন্দু-মোস্‌লমান-সমস্যা লইয়া হিন্দু ও মোসলমানের আহার ও নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া গেছে। হিন্দু বলিতেছেন, "দোষ মোসলমানের, সে আমাদের ধর্ম্ম-কার্য্যে বাধা দেয়; বাজনা বাজাইতে দেয় না। নারী হরণ করে ইত্যাদি।" মোসলমান বলিতেছেন, "দোষ হিন্দুর, সে বাজনা বাজাইয়া আমাদের নামাজের ব্যাঘাত করে, গরু কোর্ব্বানী করিতে না দিয়া ধর্ম্ম-কার্য্যে বাধা দেয়, ইত্যাদি।"

১৩৩২ সালের পূর্ব্বে বোধ হয় বাজনা হিন্দু-মোসলমানের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই। হিন্দু মোসলমানের মসজিদ দেখিলে বাজনা থামাইত অথবা বাজনা বাজাইয়া যাইত, মোসলমান সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিত না। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। এখন মসজিদ দেখিলে হিন্দু জোর করিয়া বাজনা বাজায় এবং বাজনা লইয়া মসজিদের রাস্তায় আসিতে দেখিলে মোসলমান নামাজ নষ্টের আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। হিন্দু বলেন "ধর্ম্মকার্য্যে প্রাণ যায় সেও স্বীকার তথাপি বাজনা বাজাইব।" মোসলমান বলেন, "বাজনায় বাধা দিয়া শহীদ হইলে বেহেশ্‌ত লাভ হইবে, সুতরাং বাধা দিব।" হিন্দু-মোসলমানের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, এ ধর্ম্মজ্ঞান ১৩৩২ সালের পূর্ব্বে কোথায় ছিল? এখন কি ধর্ম্ম-পুস্তকের দ্বিতীয় এডিশন বাহির হইয়াছে?

হিন্দু বলিতেছেন, "মোসলমান নারী-হরণ করিয়া হিন্দুর জাতি নাশ করিতেছে।" মোসলমান বলিতেছেন, "হিন্দুরা কি ইহার মধ্যে নাই? বিধবা নারীগণ হিন্দুধর্ম্মের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছায় কুলের বাহির হইয়া আসিতেছে।" এ কথা সত্য যে নারী অপহৃতা হইতেছে এবং হিন্দু-মোসলমান উভয় জাতীয় লোকের দ্বারা হইতেছে। এ কথা সত্য যে অপহরণকারীরা সংখ্যায় হিন্দু অপেক্ষা মোসলমান অধিক। কিন্তু হিন্দু কি নাই? হিন্দু কি অপহরণ করিতেছে না? যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজনও হিন্দু অপহরণকারীদের দলে থাকিবে ততক্ষণ হিন্দুসমাজ "হিন্দু নির্দ্দোষ" বলিয়া সাফাই দিবেন কিরূপে? হিন্দু যদি নির্দ্দোষই হয় তবে সে নিজের স্ত্রীকে ভগ্নীকে অপহরণ করিতে সাহায্য করে কেন? "হিন্দু নির্দ্দোষ" বলিয়া হিন্দু কি হিন্দু অপহরণকারীকে প্রশ্রয় দিতেছেন না? হিন্দু অপহরণকারীরা ভাবিতেছে যে, দোষ যখন মোসলমানের ঘাড়েই সম্পূর্ণ পড়িয়াছে তখন আর আমাদের পায় কে?" হিন্দুর উচিত, হিন্দু-অপরাধীর দোষ না ঢাকিয়া যাহাতে অপহরণকারীর দলে একজনও হিন্দু না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।

মোসলমানের কথা সত্য যে, হিন্দুও অপহরণকারীর দলে আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি হিন্দু-নারী হরণ করিতে হইবে? মোসলমান কি জানে না যে, কোরআনে মাতৃজাতিকে কত উচ্চে স্থান দিয়াছে? হাদিসে কি বলে নাই যে, "স্বর্গ মাতার পদতলে।" কোর্‌আন বা হাদিসে ত বিশেষ করিয়া মোসলমান-নারীকে উচ্চ করা হয় নাই, নারীজাতিকে উচ্চ করা হইয়াছে। হিন্দু-নারী কি নারী নহে? সে কি মোসলমানের সম্মানার্হ নহে? তবে মোসলমান "হিন্দু ইহার মধ্যে আছে" বলিয়া সাফাই দিয়া সরিয়া পড়ে কিরূপে?

মানিয়া লইলাম যে হিন্দুধর্ম্মের কঠোরতা অত্যধিক, কিন্তু এ কঠোরতা কি ধর্ম্ম-পুস্তকের নূতন এডিশনে (?) লিখিত হইয়াছে? হিন্দুধর্ম্মত আজ হয় নাই। হিন্দুনারীও নূতন বিধবা হইতেছে না; সুতরাং এতকাল যদি ধর্ম্মের কঠোরতা সহ্য হইয়া থাকে তবে আজ হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল কিরূপে? কুলের বাহির ত পূর্ব্বেও অনেকে হইয়াছে, কিন্তু আজ হঠাৎ দলে দলে বিশেষ করিয়া মোসলমানের সহিত বাহির হইয়া না আসিলে কি চলিতেছে না?

মোসলমান কি মিথ্যা জবাব দিহি করিয়া অপহরণকারীদিগের সাহস বাড়াইয়া দিতেছেন না? প্রতিবেশী হিন্দুর স্ত্রী ভগ্নী কি তাহার মাতা, ভগ্নী নহে?

গোরু কোর্ব্বানী সমস্যাটী অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। হিন্দু বলিতেছেন, "গোরু আমার দেবতা এবং আমার পালিত জন্তুর মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য উপকারী পশু, সুতরাং আমি উহা জবেহ করিতে দিব না।" মোসলমান বলিতেছেন, "গোরু কোর্ব্বানী আমার ধর্ম্মকার্য্য, সুতরাং উহা আমি জবেহ করিবই।"

হিন্দুর বুঝা উচিত যে, গোরু মোসলমানের দেবতা নহে। পাঁঠা বলি যেরূপ কালীপূজার একটি অঙ্গ, গোরু বলিও মোসলমান ধর্ম্মের ঐরূপ একটি অঙ্গ। সত্য বটে আরবে গরু কোর্ব্বানী হয় না কিন্তু বাঙ্গলাদেশে গোরু কোর্ব্বানীই প্রশস্ত, কারণ কোর্ব্বানী দেওয়ার উদ্দেশ্য, ঈশ্বরকে দেখানো যে তাঁহার জন্য কোরবানীদানকারী কতখানি স্বার্থত্যাগ করিতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং প্রিয় যে পশু তাহাকে কোর্ব্বানী দিয়া দেখাইতে হইবে যে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য কিছুই নহে। ঈশ্বরের জন্য আবশ্যক হইলে মোসলমান সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। কোরবানী প্রয়াসী মোসলমানের উচিত, দলের সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী গরুটা কোর্ব্বানী করা।

এ দেশে গরুর মত উপকারী পশু আর নাই। কিন্তু বৎসরের মাত্র একটা দিনে ক'টা গোরু কোর্ব্বানী হয়? কলিকাতা বা বড় বড় শহরে কসাইদিগের হস্তে প্রতিনিয়ত কত গোরুই যে কোর্ব্বানী হইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? গোরু কোর্ব্বানী বন্ধ করিতে হইলে মোসলমানের খৃষ্টানের ও অন্যান্য গো-খাদক জাতির গোরু খাওয়া বন্ধ করিতে হয়। নচেৎ শুধু মোসলমানের কোর্ব্বানী বন্ধ করিয়া লাভ কি?

গোরু কোর্ব্বানী মোসলমানের ধর্ম্মের অঙ্গ এবং গোরুর মাংস মোসলমানের হালাল্, মানিয়া লইলাম। ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন করিতে তাঁহারই সৃষ্ট, নিরীহ, উপকারী, দুর্ব্বল গোরু পাঁঠাকে হত্যা করিয়া কিরূপ পুণ্যার্জ্জন হয় তাহা অবশ্য আমি বুঝি না, কিন্তু কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাৎ প্রভৃতি ইস্‌লাম

ধর্ম্মের বড় বড় কর্ত্তব্য ঠেলিয়া কোর্ব্বানী যে কিরূপে অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মকার্য্য হইয়া দাঁড়াইল তাহাও ভাবিয়া কূল পাই না। বাংলা দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী অনেকই কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্‌ ও জাকাতের ধার ধারে না, অথচ কোর্ব্বানী লইয়া গণ্ডগোল করেন। ধর্ম্ম-গুরু আলেমদিগের উচিত, আগে ঐ সকল লোককে ইস্‌লাম-শরাশরিয়ৎ অনুযায়ী আচার ব্যবহার, বিদ্যা ও নামাজ, রোজা প্রভৃতি শিক্ষা দান করা এবং তৎপরে কোর্ব্বানী লইয়া গণ্ডগোল করা। ধর্ম্মের স্তম্ভ কলেমা-নামাজ-রোজাই যদি না জানিল তবে শুধু কোর্ব্বানীতে বেহেশ্‌তে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।

এ দেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক মোসলমান। গোরুর তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। গোরু হাল বহিয়া তাহাদের সম্বৎসরের খাদ্য যোগাইয়া দেয়। গোরুর দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া তাহাদের হাট্ খরচ চলে। এহেন দরকারী পশুকে ধর্ম্মের ও হালালের দোহাই দিয়া বধ না করিলে কি নয়? নামাজ রোজা না করিয়াও যদি মোসলমানত্ব বজায় থাকে, তবে গোরুর মাংস না খাইলেও ধর্ম্মের কোন হানি হইবে না। গোরু না খাইলে মৃত্যু হইবে, এরূপ আশঙ্কাও ত কিছু নাই!

হিন্দুধর্ম্মে এতকাল বাহিরে আসিবারই পথ ছিল, ভিতরে যাইবার পথ ছিল না। সম্প্রতি "শুদ্ধি" সে পথ খুলিয়া দিয়াছে দেখিয়া মোসলমানের ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। কারণ, এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অধিকার শুধু মোসলমানের একচেটিয়া নহে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পারসী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই উক্ত অধিকার আছে। তবে জোর করিয়া ধর্ম্মান্তরে বাধ্য করিবার অধিকার কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই নাই, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেও নাই। এবং ইচ্ছানুযায়ী কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তাহাকে উৎপীড়ণ করিবার অধিকারও কাহার নাই। আর যদি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া তর্ক উঠে তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, কোন ধর্ম্মই নীচু বা অপ্রয়োজনীয় নহে। তাই যদি হইত তবে ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতে অপ্রয়োজনীয় ধর্ম্ম স্থান পাইত না, লুপ্ত হইয়া যাইত। কোন ধর্ম্মই নীচু নহে, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসী ও ফকিরের সন্ধান পাওয়া যাইত না। বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, হজরৎ মহম্মদ বা মহাবীর কাহারও জন্মগ্রহণ করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্য এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেরই আবশ্যকতা আছে।

হিন্দু আজ এ কথা ভুলিয়া মোসলমানের মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া ভাবিতেছে "ধর্ম্মার্জ্জন করিলাম!" মোসলমান হিন্দুর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ভাবিতেছে, "বেহেশ্‌তের পথ পরিষ্কার করিলাম!"

কিন্তু একথা কি তাহারা একবারও ভাবিতেছে না যে ঈশ্বর এক এবং সকলেই তাঁহার ভজনা করে? যে ঈশ্বর সেই আল্লাহ্! ঈশ্বরের মসজিদ ভাঙ্গিয়া সে ঈশ্বরের অপমান করিতেছে? আল্লাহ্‌র মন্দির ভাঙ্গিয়া সে আল্লাহ্‌র অপমান করিতেছে! শুধু ভাষা ভেদ মাত্র? ধর্ম্মের নামে যে তাহারা ঘোর অধর্ম্ম করিতেছে ইহার শাস্তি কি তাহাদের পাইতে হইবে না? সে শাস্তি কত ভয়ানক, কে জানে!

(১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

মন্তব্য—মসজিদের সম্মুখ দিয়ে কিংবা নিকট দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গেলে যে মসজিদের কিংবা ধর্ম্মের অবমাননা হয় ও ধর্ম্মের এমন কোনো বিধান নেই। ঠিক সেইরূপ গোরুর ন্যায় একটি চতুষ্পদ জন্তুও যে মানুষের দেবতারূপে পূজিত হতে পারে এমন হাস্যজনক বিধি বিধানও কোনো ধর্ম্মের আছে বলে আমাদের বিশ্বাস নেই। সত্যই যদি বাদ্যধ্বনি না শোনা কিংবা গোরুর পূজো করা কোনো ধর্ম্মের বিধান থেকে থাকে, তবে সে বিধানকে বাতিল করে নূতন বিধান প্রণয়ন করার সময় অনেক পূর্ব্বেই এসে গেছে। গোরু খেলে গোরুর সংখ্যা কমে যায় না। যদি তাই হত তা'হলে আজকের দিনে গো-খাদক ইউরোপ মহাদেশে একটিও গোরু খুঁজে পাওয়া যেত না। ইউরোপের লোকেরা যত গোরু খেয়ে থাকে অনুপাতে তার হাজার ভাগের এক ভাগও আমাদের দেশের লোকেরা খায়না। তবুও দুধে ইউরোপ ভেসে যাচ্ছে, আর আমাদের ঔষধের অনুপানের জন্যেও জোটে না। গোরুর চাষ হচ্ছেনা বলেই আমাদের দেশে গোরুর কিছু দুরবস্থা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গো-পালন করলে এ দুরবস্থা ঘুচে যেতে পারে। কিন্তু, গো-পূজকদিগকে এ সত্যকারের ব্যাপারটা নিয়েত মাথা ঘামাতে কখনো দেখতে পাওয়া যায় না। আর একটি কথা—আমাদিগকে চিরকালই কি কৃষির জন্যে গোরুর ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে? কোনো বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে কি আর কখনো হবেনা?

লেখক বুঝে উঠতে পারেন নি ঈশ্বরের সৃষ্ট নিরীহ জীব পাঁঠা আর গোরুকে বলি দিয়ে কি পুণ্যার্জ্জন হতে পারে। সোজা কথাটা তিনি কেন বুঝে উঠতে পারেন নি তা বুঝতে পারছিনে। পুণ্যার্জ্জন করাটা একটা কথার কথা মাত্র। আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে উদরের তৃপ্তি অর্জ্জন করা। সেটা অবহেলা করবার কথা মোটেই নয়।

নারীকে আমরা মানুষের অধিকার কখনো দিইনি। তাদেরকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার যন্ত্ররূপে নিতান্ত অসহায়া করে রেখেছি। এ অবস্থায় তাদের ওপরে নির্য্যাতন না হলেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হব। নারীকে তার সামাজিক অধিকার দিলে অর্থাৎ নারী আপনার অধিকার বুঝে নিতে সমর্থ হলে পুরুষকে নারীর অভিভাবক সেজে বিংশ শতাব্দীতেও লজ্জার মাথা খেয়ে খবরের কাগজে "নারীহরণ" এর কথা লিখতে আর হতনা। হিন্দু হোক কিংবা মুসলমানই হোক,নারীর ওপরে বলাৎকার যে পুরুষ করে থাকে সে নরাকারে পশু। তার ন্যায় ঘৃণিত জীব আর দ্বিতীয়টি থাকতে পারেনা। হিন্দু সমাজে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট সামাজিক কুপ্রথা আছে যার জন্যে নারীকে একটা সম্মানের জায়গা খুঁজে নেবার জন্যে কুলের বাহির হতে হয়। মুসলমানরা যে সম্মানের আসন নারীকে দিয়েছে বলে হিন্দু নারী যে মুসলমানের সহিত বরাবরই বের হয়ে গেছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। হিন্দু সমাজ বৈধব্যের বিধান প্রণয়ন করেছে, কিন্তু পরিবারে বিধবার সহিত ভালো ব্যবহার করতে শেখেনি। হিন্দু বিবাহকে আধ্যাত্মিক বিবাহ বলে মেনে নেওয়াও আর একটি সামাজিক অবিচার। স্বামী-স্ত্রীর অমিলের জন্যে বিবাহিত জীবন যতই বিষময় হোকনা কেন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার কোনো উপায় নেই। এই সকল কারণে বিদ্রোহিনী মেয়েগুলো ঘরের বাহির হয়ে যায়। আর বাহির হলে থাকবার জন্যে আর একখানা ঘর মুসলমান পাড়ায় যত সহজে পাওয়া যায় তত সহজে হিন্দু পাড়াতে পাওয়া যায় না। হিন্দু মেয়ের মুসলমানের সহিত বের হয়ে যাবার এটা একটা খুব বড় কারণ। মুসলমানের

সঙ্গে যে হিন্দু মেয়ে বের হয়েছে মুসলমান তাকে স্ত্রীরূপে নিজের ঘরে রেখেছে,আর হিন্দুর সাথে যে হিন্দু মেয়ে ঘরের বা'র হয়েছে বেশ্যারূপে সে তাকে বাজারে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করবার ক্ষমতা আজকের দিনে কাহারো নেই। সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় মুশ্‌কিল।

মুসলমানের তরফ থেকে সাফাই গাওয়ার কোনো বাসনা আমাদের নেই। শত্রুতা সাধনের জন্যে কিংবা ঘৃণা পরবশ হয়ে যে মুসলমান হিন্দু মেয়ের ওপরে অত্যাচার করে সে মুসলমানকে আমরা মনে প্রাণে ঘৃণা করে থাকি। কিন্তু, সত্যের খাতিরে একথাও আমাদের বলতে হবে যে একদল হিন্দু কাগজওয়ালা নারী নির্য্যাতনের ব্যাপারটাকে যেরূপ অতিরঞ্জিত করে তুলেছেন তাতে তাঁরা নারীদের অপমানই করছেন। তাঁদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে তাঁরা আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

(সম্পাদক—"গণবাণী")

—०—

বর্ত্তমান ভারত

—:०:—

[আর, পাম দত্ত]

—०—

(বর্ত্তমান ভারত আর পাম দত্তের Modern India নামক ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইতোপূর্ব্বে এ অনুবাদ ১২শ, ১৩শ, ১৫শ ও ১৭শ সংখ্যক গণবাণীতে বের হয়ে গেছে। যাঁরা মনোযোগ দিয়ে এ অনুবাদ পাঠ করবেন তাঁরা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ নূতন, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক আদর্শের সহিত পরিচিত হতে পারবেন।)

———

২। ভারতকে শিল্পানুষ্ঠান করা

বর্ত্তমান ঘটনাগুলির পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানময় করে তোলার কাজ ইতোমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। সাধারণ রাজনীতিক আন্দোলনের প্রবণতা আজ পর্য্যন্ত যতটুকু এ ব্যাপারটাকে ধরতে পেরেছে নিশ্চিতই তার চেয়ে অনেক বেশী এ ব্যাপার অগ্রসর হয়েছে।

জগতের মুখ্য শিল্পানুষ্ঠানপূর্ণ দেশ সমূহের যে পরিস্থিতি আছে আগে হতেই ১৯২২ সনে ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতের জন্যেও সে পরিস্থিতির দাবী করেছিল। ১৯২২ সনের অক্টোবর মাসে লর্ড চেম্‌সফোর্ড ভারতগবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে লীগ্ অব নেশন্‌সের কাউন্সিলের বৈঠকে ঘোষণা করে ছিলেন :—

"জগতের ৮টি প্রধান শিল্পানুষ্ঠানময় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষকে গণ্য করবার যে বিশিষ্ট দাবী ভারতের আছে তা প্রমাণিত করা দরকার। ভারতের দাবীর ভিত্তি প্রশস্ত সাধারণ ক্ষেত্রের ওপরেই বিন্যস্ত রয়েছে। এর প্রমাণের জন্যে অনেক বিশদরূপে আঁক কষাকষির কোনো প্রয়োজন নেই। ভারতের কারখানা সমূহে বেতনে লোক মজুরী করে জীবন ধারণ করে থাকে তাদের সংখ্যা মোটামুটি ধরে প্রায় ২ কোটি। এ ছাড়া কৃষি ক্ষেত্রের কাজে নিয়োজিত একটা বিরাট মজুরের দলও রয়েছে।"

এই দাবী গৃহীত হয়েছিল। ভারতবর্ষ এখন সরকারী ভাবে জগতের ৮টি প্রধান শিল্পানুষ্ঠান পূর্ণ দেশের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতি রাষ্ট্রনীতিক পরিণতিতে অর্থাৎ কারখানার শ্রমিকগণ ভবিষ্যতে দেশের কার্য্য পরিচালনায় যে আবশ্যক অংশ নেবে তাতে এখনো উপনীত হতে হবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বের ১০ বছরের মধ্যে শিল্পানুষ্ঠানের প্রক্রিয়া ভারতে পরিস্কাররূপে পরিদৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু, যুদ্ধ থেকে ও যুদ্ধের পরে প্রাপ্ত অবস্থা সমূহের দ্বারাই এর খুব দ্রুত বর্দ্ধন আরম্ভ হয়েছে। তড়িৎ গতিতে ভারতে ও এসিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহে আধুনিক শিল্পের প্রবর্দ্ধন যে হচ্ছে তা যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের একটা খুব বিশিষ্ট অর্থনীতিক ব্যাপার।

এই নীতির সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্কার প্রকাশ বস্ত্র শিল্পেই দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়পড়তায় ৩০০ কোটি গজ বা শতকরা ৭০ ভাগ ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী হয়েছে, আর ১২০ কোটি গজ বা শত করা ২৮ ভাগ ভারতে প্রস্তুত হয়েছে। যুদ্ধের পরে ১০০ কোটি গজ বা শতকরা ৩৫ ভাগ এসেছে ইংল্যাণ্ড থেকে, আর ১৭০ কোটি গজ বা শতকরা ৬১ ভাগ হয়েছে ভারতে প্রস্তুত। (ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ক্লার লিজ প্রদর্শিত হিসাব। ১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসের ১২ই তারিখের "ম্যানচেষ্টার গার্জিয়ান।")

লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনার সার অতুল চাট্‌র্জ্জির হিসাব মতে খনিজ পদার্থের মূল্য ১৯০৮ সনে ছিল ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২০ সনে মূল্য হয়েছিল ৩ কোটি পাউণ্ড।

কোম্পানী সমূহ ও কোম্পানী সমূহের মূলধনের তুলনাও সমান ভাবে বিস্ময়কর। নূতন মূলধনের লাগানের গড়পড়তা যুদ্ধের পূর্ব্বে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। ১৯১৮।১৯ সনে নূতন মূল ধনের লাগান হয়েছিল ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, আর ১৯১৯।২০ সনে হয়েছিল ১০ কোটি পাউণ্ড। অবশ্য হঠাৎ বাজার কৃত্রিমভাবে গরম হয়ে পড়ায় মূলধনের লাগান এরূপ বেড়েছিল। তাই অনেককে দেউলিয়াও হতে হয়েছে। কিন্তু, মূলধনের বৃদ্ধি যে কি প্রকার উত্তেজনার সহিত হয়েছে তা এই থেকে বুঝতে পারা যায়। এই সময়ে লাভও ঠিক এমনি ভীষণ ভাবেই শত করা ১০০, ২০০ এমন কি ৩০০ পর্য্যন্ত হয়েছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ কি বৃহৎ পরিমাপের শিল্পানুষ্ঠানের ওপরে নির্ভর করছে? ঘটনা তালিকার পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ব্যাপার তাই বটে।

শিল্পানুষ্ঠানের উন্নতি হয়ে যে বৃহৎ পরিমাপের সংগঠন হয়েছে তা ২০ জনের অধিক লোক নিযুক্ত করে যে সকল কারবার চলেছে সে সবের সংখ্যা খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে। ২০ জনের অধিক লোক নিযুক্ত ছিল এমন কারবারের সংখ্যা ১৯১১ সনে ৭১১৩টি ছিল, এবং ১৯২১ সনে এমন কারবারের সংখ্যা হয়েছিল ১০,৯৬৯ টি, অর্থাৎ ১০ বছরে শতকরা ৫৪টি বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকগণের শতকরা ৯৪ জন এমন সব কারবারে কাজ করছিল যে সকল কারবারে ৫০ জনের বেশী লোক নিযুক্ত ছিল।

বৃহৎ পরিমাপের শিল্পানুষ্ঠান যে দ্রুত বর্দ্ধিত হয়েছে তা বড় বড় নূতন শহরের সংখ্যার বৃদ্ধি থেকেও বুঝতে পারা যাচ্ছে। প্রথমে এগুলিকে বন্দর বা ডিপো রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরে এ সকল স্থান শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ১৮৯১ সন হতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত ৩০ বছরের মধ্যে

শহরের লোক সংখ্যা মাত্র শতকরা ১ জন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশ হাজারের বেশী অধিবাসী আছে এমন বড় শহরের লোক সংখ্যা ১৯১১ হতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত শতকরা ১৬ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিঃ বি, নারায়ণের পুস্তকের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বৃহৎ পরিমাপের শিল্পানুষ্ঠান সমূহের কথা উল্লেখ করে দেখাতে চান যে বৃহৎ পরিমাপের শিল্পের উন্নতি ভারতে অপরিহার্য্য নয় এবং হিসাবের দ্বারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মধ্যম পরিমাপের শিল্পানুষ্ঠানই এখনো প্রবল রয়েছে। এ হিসাব নিশ্চিতই সত্য। ভারতের পক্ষে এক চোটেই এক চেটিয়া কেন্দ্রীভূত শিল্পানুষ্ঠানের স্তরে উন্নীত হওয়া স্বভাব ও যুক্তি বিরুদ্ধ হবে। কিন্তু এর প্রক্রিয়া যে আরম্ভ হয়েছে তা আগে থেকেই অনুভব করতে পারা যাচ্ছে এবং এ প্রক্রি । একটুকু বিস্ময়োদ্দীপক দ্রুত পাদবিক্ষেপেই অগ্রসর হচ্ছে। মিঃ নারায়ণ স্বীকার করছেন যে ধনিক প্রথাতেই বৃহৎ পরিমাপের উৎপাদনের প্রবণতা সহজাত ভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং একটা বিশিষ্ট স্তরে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীভূত করলেই তা থেকে এক চেটিয়া অধিকার এসে পড়ে। অন্যান্য দেশে ধনিকবাদের যে সকল আইন কাজ করছে সেই সকল আইন থেকে ভারতবর্ষ আর বহির্ভূত হয়ে নেই। পরন্তু, ভাব প্রকার থেকে বোধ হচ্ছে যে ভারতবর্ষই সে অত্যন্ত বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করবে। কেন-না, ষ্টেটের হাতে ক্ষমতা চরম ভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় শিল্পানুষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক অনুষ্ঠান দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ (ট্রাষ্ট পর্য্যায় ভুক্ত) হয়ে যাচ্ছে এবং ষ্টেট ধনিকপ্রথা ছোটো খাটো উৎপাদন প্রণালীগুলিকে আপনার নীচে চেপে রেখেছে।

কিন্তু, ভারতের ভবিষ্যৎ যদি বৃহৎ পরিমাপের শিল্পানুষ্ঠানের ওপরে নির্ভর করে তা হলে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ভবিষ্যৎও নিশ্চিতই ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল প্রোলেটারিয়েট বা কারখানার শ্রমিক-গণের ওপরে নির্ভর করে থাকে। এ জিনিসটিই আমাদেরকে এখনো শিখতে হবে।

ভারতকে শিল্পানুষ্ঠানময় করে তোলার প্রশ্ন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অনেক বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছে। কার্য্যতঃ জাতীয় আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃগণ এবং স্বভাবতঃই সমস্ত বুর্জোয়া নেতা ভারতবর্ষ যে শিল্পানুষ্ঠানময় হওয়া উচিত এর প্রচার করেছে এবং এর জন্যে দাবীও করেছে। পক্ষান্তরে ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধবাদী অনেক লোক ভারতকে শিল্পানুষ্ঠানময় করে তোলার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণও করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে এর দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকার টাউন সমূহে বীভৎসরূপে পাপ মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের নব শিল্পানুষ্ঠানময় শহর সমূহেও এ পাপমূর্ত্তি আরো অধিকতর বীভৎসরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ঘরগুলো অত্যন্ত অসাস্থ্যকর ও অত্যধিক জনতাপূর্ণ, জীবন ধারণের অবস্থা সমূহের ও নৈতিক হীনতা, রোগ, দীর্ঘ সময় খাটুনি, নারী ও বালক-বালিকাদিগকে খাটানো, পানাসক্তি, কার্য্যস্থলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ধ্বংস এ সমস্তের কথা তাঁরা উল্লেখ করে থাকেন।

এ সকল অবস্থা শৈল্পিক উন্নতির কারণে ঘটেনি,—ধনিক প্রথাই এ সবের জন্যে দায়ী। শ্রমিকদিগকে পদানত করে রাখার জন্যে এবং জন কতেক ধনী লোকের সৌভাগ্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে ধনিকেরাই তাদের এরূপ অবস্থায় অবনমিত করে থাকে। শ্রমিকগণ সমবেত ভাবে আপনাদের ভালোর জন্যে উৎপাদন করতে শিখলে তারা এ সকল অন্যায়ের অতিক্রম করে যেতে পারে এবং সমবেত সামাজিক উৎপাদনের দ্বারা তারা শিল্পের শক্তিকে আরাম দায়ক সুখী সমাজের গঠনে ব্যবহার করতে পারে।

গ্রাম্য প্রথার প্রশ্ন সম্বন্ধে যে কথা হচ্ছে শৈল্পিক উন্নতির প্রশ্ন সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথাই হচ্ছে। পরিবর্ত্তন আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে এবং তা অপরিহার্য্যও বটে। এখন বৃথা কান্নাকাটি করা, আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে নবশক্তি সমূহকে করায়ত্ত করা।

পক্ষান্তরে ধনিকগণ যে শৈল্পিক উন্নতির সমর্থন করে থাকে, অর্থাৎ তারা যে লাভ করার ও "তথা কথিত" জাতীয় সম্পদ বাড়ানোর কথা বলে থাকে তা ভারতীয় জনগণের স্বার্থের জন্য মোটেই নয়। এ কথা সত্য যে ভারতের জনগণের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করার জন্যে শৈল্পিক উন্নতি আবশ্যক। কিন্তু, ধনিকগণের পরিচালনাধীনে শৈল্পিক উন্নতি ভারতের জনগণের কোনো কাজে লাগবেনা। এর দ্বারা ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত অংশীদারগণ বিরাট লাভ করে থাকে এবং ভারতের উদীয়মান ক্ষুদ্র ধনিক শ্রেণীও তার ভাগ পায়। পূর্ব্বে ভারতের শৈল্পিক উন্নতির বিরুদ্ধাচরণ করার যে একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বৃটিশের ছিল, বর্ত্তমানে ভারতে যে বৃটিশ শৈল্পিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে তারও ঠিক সেইরূপই একটা উদ্দেশ্য আছে।

ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠান ময় করে তোলাই হচ্ছে একটা আবশ্যক স্তর। কিন্তু, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ যে শিল্পানুষ্ঠানময় হচ্ছে তা ভারতের উপকারের জন্যে হচ্ছে না, ঠিক যেরূপ আগে ভারতবর্ষকে কৃষি-উপনিবেশ করাতেও ভারতের কোনো উপকার হয়নি। এটা হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিষ্ট বা শোষণবাদের নীতির নবগতি। তাদের নীতির এই গতিটা বুঝতে পারা একান্তই আবশ্যক।

৩। শ্রেষ্ঠ অংশীদাররূপে বৃটিশ মূলধন

ভারতের ধনিক উদ্যোগকে প্রধানত বৃটিশ উদ্যোগই বলতে হবে।

গ্রন্থকারগণের সমিতিতে সার মাইকেল্ ওডায়ার একটা বিখ্যাত বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :—"আমাদের সাম্রাজ্যিক অধিকারের প্রতি, ভারতে আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির লোক যারা রয়েছে তাদের প্রতি এবং আমরা যে ভারতে লক্ষ কোটি টাকা বৃটিশ মূলধন ঢেলেছি সে সবের প্রতি আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে।"

১৯২৪ সনের ভারতীয় বর্ষপঞ্জী (Indian Year Book) ভারতের শৈল্পিক উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে বর্ণনা করেছে :—

"বড় বড় শিল্পানুষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই ইউরোপীয় মূলধনে পরিচালিত হয়ে থাকে।"

মোটামুটি ভাবে ধরলে কোম্পানী সমূহের যে মূলধন ভারতে কাজ করছে তার শতকরা ৮৫ ভাগই বৃটিশ মূলধন। সার এম, বিশ্বেশ্বর রায় তাঁর "পুনর্গঠনোন্মুখ ভারত" নামক পুস্তকে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, যে সকল কোম্পানী ভারতে রেজিষ্ট্রী হয়েছে তার মূলধন ৬ কোটি, আর যে সকল কোম্পানী ইংল্যাণ্ডে রেজিষ্ট্রী হয়ে ভারতে কাজ করছে তার মূলধনের পরিমাণ ৪১ কোটি ১০ লক্ষ। এ তুলনা অনুসারে বৃটিশ মূলধন শতকরা ৮৭

ভাগ। প্রকৃত যা ব্যাপার তার চেয়ে এ এষ্টিমেট কম। যদিও ইংলিশ রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানীতে অতি সামান্য ভারতীয় মূলধন নেওয়া যেতে পারে মাত্র, তথাপি এ কথা নিশ্চিত সত্য যে সকল বৃটিশ কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হয়েছে সে সকল কোম্পানীতে প্রচুর বৃটিশ মূলধন ঢালা হয়েছে এবং এ প্রকারের প্রবণতা দিন দিনই বর্দ্ধিত হচ্ছে।

ভারতে ভারতীয় মূলধনের চেয়ে বৃটিশ মূলধন যে শুধু অনেক গুণ বেশী তা নয়, হিসাব খতিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এ প্রাধান্য প্রকৃত প্রস্তাবে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। নীচের হিসাবটা বাস্তবিক শিক্ষাপ্রদ :—

যে সকল কোম্পানী ভারতে কারবার চালাচ্ছে

	ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত সংখ্যা	প্রদত্ত মূলধন টাকা	অন্যত্র রেজিষ্ট্রীকৃত সংখ্যা	প্রদত্ত মূলধন
১৯১২-১৩	২৪৯৯	৭১ কোটী ৬০ লক্ষ	৫৩৫	১৯২,০০০,০০০ পাঃ
১৯২০-২১	৪২৮৩	১৫৮ " ৩০ "	৬৪৩	৪৯৫,০০০,০০০ "

এই হিসাবের দ্বারা বুঝতে পারা যাচ্ছে যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ মূলধন ভারতীয় মূলধনের ৪ গুণ বেশী ছিল, আর যুদ্ধের পরে তা হয়েছে ৬ গুণ বেশী। সুতরাং বৃটিশ মূলধন যে আগে থেকে প্রধান শক্তি হয়ে শুধু আছে তা নয়, কার্য্যতঃ তা ক্রমশঃ অধিকতর প্রধান শক্তি হয়ে পড়েছে। এটা বিশিষ্ট ভাবে দেখ্‌বার বিষয় যে ১৯২১ হতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত যখন ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানী সমূহে বৃটিশ মূলধন সাক্ষাৎভাবে খাটানোর নীতি শক্তি সঞ্চয় করছিল তখনই ভারতে রেজিষ্ট্রিকৃত কোম্পানী-সমূহের মূলধন অনুপাতে বেড়ে গেছে।

ভারতে আধুনিক ধনিক প্রথার উন্নতিকে যে জাতীয় উন্নতি বলে ধারণা করা হয় তা ভয়াবহ রূপে ভ্রম-সঙ্কুল। পক্ষান্তরে ভারতে বর্ত্তমানে যে ধনিক প্রথার উন্নতি হচ্ছে তা বিশিষ্টভাবে ভারতে আধুনিক ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণ-বাদের প্রবেশিকা স্বরূপ। এই ইম্পিরিয়েলিজম্ ভারতীয় ধনিক-বৃত্তিকে ক্রমশঃই আপন পর্য্যায় ভুক্ত করে নিচ্ছে।

বৃটিশ ধনিকবাদ সচেতন ভাবেই ভারতীয় মূলধনের মধ্যে প্রবেশ করার নীতির অনুসরণ করছে। ভবিষ্য জাতীয় সংগ্রামের দিক থেকে এর যে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে তা জোর করে না বললেও চলে।

এই নীতি যে সকল পথে চলেছে তার কয়েকটির প্রতি লক্ষ্য করা খুবই প্রয়োজন। প্রথম পন্থা হচ্ছে যে সকল বৃটিশ কোম্পানী ভারতে মূলধন খাটাচ্ছে তারা তাদের নামে মাত্র কেন্দ্র লণ্ডন ত্যাগ করে ভারতের রেজিষ্ট্রী বইএতে আপনাদের নাম লিখিয়েছে। এর মানে হচ্ছে ভারতের একটা জাতীয় "পোষাক" পরিধান করানো। "ফাইন্যান্‌শিয়েল নিউজ্" নামক পত্রিকার বর্ণনা এ বিষয়ে খুবই সরল :—

"এটা সম্ভব যে সময়ে আর্থিক কারণের চেয়ে রাষ্ট্র-নীতিক কারণেই অনেক ইংল্যাণ্ডে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানী ভারতীয় রেজিষ্টারে আপনাদের নাম লিখিয়ে নেওয়াকে তাদের স্বার্থের বিষয়ীভূত মনে করবে। এর দ্বারা তারা ভারতের অধিবাসী বলে পরিগণিত হবে।"

("ফাইন্যান্‌শিয়েল নিউজ্"
৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩)

এ নীতির আরো একটা ধাপ হচ্ছে আরো বেশী উল্লেখ যোগ্য। এটা ব্যাঙ্কের পরিচালনার ওপরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ব্যাঙ্কের ওপরে কর্ত্তৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করাই হচ্ছে অর্থগত মূলধনের শক্তির মূল মন্ত্র। ১৯২২ সনে যে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক সমূহকে একটি মাত্র "ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া"তে পরিণত করা হয়েছে তা করা নূতন নীতির পক্ষে আবশ্যক ছিল। সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যাপারকে এরূপ ভাবে কেন্দ্রীভূত করার মানে এই হচ্ছে যে এর দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে সকল ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও হৌসগুলি বৃটিশের পরিচালিত ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের অধীন হয়ে পড়েছে। আধুনিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের অনেকগুলি অসংবদ্ধ ঘটনার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা গিয়েছে যে ক্রেডিট, কারেন্সী ও এক্সেঞ্জের পরিচালনার দ্বারা কি করে ভারতীয়দের অধিকৃত অনুষ্ঠান গুলোকে সন্ধির নিয়মে আত্ম সমর্পন করতে বাধ্য করা হয়েছে।

ভারতীয় ধনিকবৃত্তির ওপরে বিদেশীয় শোষণবাদীদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ হচ্ছে ভারতীয়দের অধিকৃত কারবারগুলিকে গ্রাস করে নেওয়া কিংবা সেগুলির সহিত একীভূত হওয়া। এর উল্লেখ যোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুবিখ্যাত ভারতীয় কারবার টাটা কোম্পানী। এই কোম্পানী ক্রমশঃ বৃটিশ ধনিক স্বার্থের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত হয়ে গেছে। "বেঙ্গল আয়রন এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী"র সহিত এর সম্মিলনের দ্বারা ভারতীয় ধনিকগণের অনুষ্ঠান বৃটিশ ইম্পিরিয়ে-লিজমের নিকট সন্ধি সূত্রে আত্ম সমর্পন করা ঘোষিত হয়েছে। রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও এর সমান ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়েছে।

টাটার দৃষ্টান্ত বিশদরূপে দেখিয়ে দিচ্ছে যে নূতন নীতির মানে কি। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা টাটা কোম্পানীকে মোটা সাহায্য দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ষ্টীলের ওপরে আমদানী শুল্ক বসানোর পক্ষেও ভোট দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের ব্যয়ে এই সাহায্য নামে মাত্র জাতীয় স্বার্থোন্নতির জন্যে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকগণের জন্যে একটা নিম্নতম বেতনের হার বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংশোধনী প্রস্তাব যখন উপস্থিত করা হয়েছিল তখন তার কোনো অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এমন কি স্বরাজ্য দলের সদস্যেরাও তা সমর্থন করতে রাজী হয়নি। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে কাকে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছিল? এ সাহায্য প্রকৃতরূপে ভারতের সেই বিদেশী শোষকগণের স্বার্থের খাতিরে দেওয়া হয়েছিল যারা ভারতীয় স্বাধীনতার শত্রু। পরবর্ত্তী ব্যাপার সমূহের দ্বারা এ কথাটা পরিস্কার হয়ে যাবে এরূপে নূতন ইম্পিরিয়েলিষ্ট নীতি, যা কৌশল সহকারে জাতীয় স্বার্থের সহিত সমস্বার্থের ভাব দেখিয়ে ধনিকগণকে নিয়ে গেলছে, জাতীয় দলের প্রতিনিধিগণকে পরিচালিত করছে। এনীতি শুধু যে এ প্রতিনিধিগণকে সহযোগের পথে নিয়ে গেছে তা নয়, কার্য্যতঃ তাঁদেরকে সাক্ষাৎভাবে ইম্পিরিয়েলিষ্ট বা শোষকগণের স্বার্থের জন্যে খেলার পুতুলেও পরিণত করেছে।

এই প্রক্রিয়ার চরম বিকাশ হচ্ছে রাষ্ট্রনীতিক বিকাশ।

—০—

অভিভাষণ *

--০—

[শ্রীমোহিনী মোহন দাশ]

—০—

সমবেত বীরগণ,

কত অতীত মহিমামণ্ডিত, ইতিহাস বিশ্রুত পুণ্যভূমি বিক্রমপুরে এই দীন সেবক আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা নিবেদন করিতেছে। মহারাজ চাঁদ রায়, কেদার রায় ও পুণ্যশ্লোক দেশবন্ধুর জন্মভূমিতে এই অযোগ্য পূজারী নারায়ণের সেবার জন্য যে পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া কম্পিত হস্তে উপস্থিত তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। এই যে আমাদের সম্মুখে যুগ যুগ প্রবাহিত কীর্ত্তিনাশা অসংখ্য কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া কীর্ত্তিনাশা নাম গ্রহণ করিয়াছে সেও এদেশের গৌরবময় ইতিহাস মুছিয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু আজ আমরা যাহারা এখানে সমবেত হইয়াছি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বুকের রক্তদিয়া এদেশে যে বীরত্ব কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন তাহা কালের আবরণ উন্মোচন করিয়া কেহই অধ্যয়ন করিতে কখনও চেষ্টা করি নাই। এ দেশের ধূলিতে কত নমঃশূদ্র সরদার ও বারিকের তপ্ত শোণিত মিশিয়া আছে,—এ দেশের নদীতে কত কৈবর্ত্তের নৌ-যুদ্ধের ইতিহাস লেখা আছে তাহা আমরা অনুসন্ধান করিনাই। কোন জাতি পরাজিত না হইলে পতিত হয় না। আমরা আজ পরাজিত। তাই আমাদের কোন ইতিহাসও নাই।

এদেশে আমরা উপেক্ষিত, নির্য্যাতিত ও বঞ্চিত সমাজ সন্দেহ নাই, কিন্তু যে নির্য্যাতন করে এবং যে নির্য্যাতন সহে উহারা উভয়েই যে কৃপার পাত্র ইহাতেও সন্দেহ নাই। আমরা উপেক্ষিত সমাজ। শতাব্দির পর শতাব্দি নিজের মুক্তির আয়োজন প্রায় কিছুই করি নাই। আমাদের মুক্তির সাধনা জীবনে সত্য হইয়া—জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। আমরা ভাই ভাই মিলিত হইয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্পদের জন্য তপস্যা করি নাই, তাই দিনে দিনে ব্যর্থতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

হিন্দুর শতকরা ৮৭ জন উপেক্ষিত সম্প্রদায়। অন্যে আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করার উপরে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা বর্ত্তমান আছে। মহাপুরুষ কহিয়াছেন "নিজের প্রতি যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর অন্যের প্রতিও সেই ব্যবহার কর।" আমরা জানি ঘৃণা ও উপেক্ষার কি বেদনা। কিন্তু আমরা উপেক্ষিত সমাজ নিজ সমাজ মধ্যে যাহাকে নীচ মনে করি, তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়াছি। যদি করিতাম তবে আমরাই জাতি ভেদের সমস্যা বহু পরিমানে বিদূরিত করিতে পারিতাম। যে অন্যায় হইতে নিজকে মুক্ত করি নাই সেই অন্যায়ের জন্য কেমন করিয়া অন্যকে নিন্দা করিব ?

আমরা কেহ জল চল করার কেহ বা সামাজিক অধিকারের দাবী নিয়া উন্নত সমাজের দুয়ারে উপস্থিত হই। এই প্রার্থনার মধ্যে একটা নির্ম্মম দৈন্য যে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা আমরা [illegible] দেখিনা। কেহ আমার উন্নতি বিধান করিলে—জল-[illegible] [illegible] অধিকার প্রদান করিলে, ঐ দেওয়ার মধ্যেই নূতন পতনের বীজ নিহিত থাকে, কেননা যেখানে একজন দিবার অধিকারী আর একজন প্রার্থী সেখানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে অধিকার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া কাড়িয়া লওয়া হয় নাই সে অধিকার কোন অধিকারই নহে।

আজ যে জাতিভেদ সকল উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে ইহা ব্যাধির অবস্থা—স্বাভাবিক অবস্থা নহে। একদিন জাতির উন্নতির ক্রম রক্ষার জন্য যদি জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে আজ জাতির কল্যাণের জন্য তাহাকে বিদূরিত করিতেও হইবে। যখন বর্ত্তমানে দেখিতেছি জাতির মুক্তি-যাত্রায় প্রতি পদে জাতিভেদ বাধাই প্রদান করিতেছে তখন মুক্তি আমাদের কাম্য হইলে এই বাধা পায়ে দলিয়াই চলিতে হইবে।

যে দিবা রাত্র পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহার পক্ষে সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধির বিকাশ হয়ত সম্ভবপর নহে—কিন্তু বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবীর মিলনেই মাত্র সমাজ দেহ পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করে। শ্রমজীবী শ্রমের কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া তাহাকে নির্য্যাতনের—ঘৃণার ও শোষণের কেন্দ্র করিয়া তোলা সমাজের আত্মহত্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনেকে হয়ত এই জাতিভেদের মধ্যে হিন্দুজাতির বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইহা "সনাতন" বলিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিবেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি "সনাতন" কুসংস্কারের ফলে হিন্দু হাজার বছর পরের লাথিই খাইয়া আসিতেছে এবং মানবতার বিকাশ প্রতিপদে বাধা পাইয়া জাতিকে মুক্তির অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। আজ যখন হিন্দুর সমাজ, ধর্ম্ম, এমন কি মাতৃ-জাতির ইজ্জৎ বিপন্ন তখনও মাপিয়া মাপিয়া ওজন করিয়া কণিকা হিসাবে সহানুভূতির কণা বিতরণের ভিতর যে একটা দাম্ভিকতা ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা যে নিতান্তই অদ্ভুত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ আবার এই সহানুভূতির মধ্য দিয়াই যে বড় আমি ছোট এই আভিজাত্যের দাবী ভিতরে ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে সচেষ্ট। স্বার্থ লোককে অন্ধ করিয়া তোলে, নতুবা আজ দাম্ভিক হয়ত দেখিত জগতের বাতাস কোন দিকে প্রবাহিত হইতেছে। আজ মরণের দুয়ারে আসিয়া হিন্দু যদি ভাইকে ভাই বলিয়া প্রাণের সহিত জড়াইয়া ধরিতে পারিত তবে মিলনের মধ্য দিয়া নূতন মহিমায় হিন্দুর ললাট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এই প্রেমের পথ পরিহার করিলেও উপেক্ষিত তাহার অধিকার একদিন কাড়িয়া লইবে। কেননা, যুগান্তের অমানিশার পরে বিধাতার জাগরণের ডাক আসিয়া পঁহুছিয়াছে। যদি অত্যাচারীর হৃদয় এখনও কাঁপিয়া না উঠে তবে হিংসার ভিতর হইতে যে দৈত্য আবির্ভূত হইবে তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমরা কল্পণাও করিতে পারিনা।

মুক্তি একটা অবস্থা; সাধনা শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা তাহা অর্জ্জন করিতে হয়। আমরা উপেক্ষিত সমাজ শত শত বৎসরের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কার ও চরিত্র দ্বারা নিজকে ঐ জন্য উপযুক্ত করি নাই।

হিন্দু জাতি বলিতে সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে উপেক্ষিত সমাজকে প্রায় বুঝায়। হিন্দুর উন্নতি অবনতি আমাদের উন্নতি ও অবনতির মধ্যেই বহুল পরিমানে নিহিত। আমরা কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর অপূর্ব্ব প্রভাবকেই এতদিন বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি—নিজেদের দৈন্য অনুভব করিয়া উহা

* [illegible] জ্যৈষ্ঠ [illegible] বিক্রমপুর বাবড়া সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ।

দূর করিতে কখনই আপ্রাণ পরিশ্রম করি নাই। যে জাতিভেদ ও অন্ধ হিন্দুত্বের কুসংস্কার আমাদের দুঃখের কারণ তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হই নাই এবং যে জিনিসটা ভাঙ্গারই সমধিক প্রয়োজন তাহাই ধরিয়া রহিয়াছি।

ধর্ম্মের ভিতর দিয়া বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন সাম্যের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা প্রতিবারই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। যখনই এইরূপ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখনি প্রতিঘাতে গোঁড়ামিরও ভীষণ আক্রমণ মাথা জাগাইয়া উঠে। ইহা ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশেই দেখি এইরূপ আন্দোলনের পেছন হইতে যখন প্রবল ব্যক্তিত্বের অবসান হয় তখনই উহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হইয়া উঠে। তখন শিয়া 'সুন্নি, রোমান ক্যাথলিক প্রোটেষ্ট্যান্ট, আর শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবের লড়াই আরম্ভ হইয়া যায় এবং নিজ নিজ গোঁড়ামির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লইয়া লোক ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান হিন্দু সংগঠনের আন্দোলনের মধ্যে পরোক্ষে আবার ঐ "টিকির" আস্ফালন একটু বেশী পরিলক্ষিত হইতেছে। মনে হয় কয়েকজন লোক বিরাট জাতিকে উদ্ধারের নামে সেই "সনাতন" সংস্কারের মধ্যে টানিয়া লইয়া একটা প্রবল সংঘাতের মধ্যে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কৌশল অবলম্বন করিবার চেষ্টায় আছেন। এই পথ অমোদের মুক্তির পথ কিনা ধীর ভাবে বিবেচনার সময় আসিয়াছে। আমাদের মনে হয়, মাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনই আমাদের সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণের মনে যে রাজনীতি অর্থ স্বাধীনতার আন্দোলন, তাহা ফুটিয়া উঠে নাই। এ দেশের অবনত সমাজ চিরদিন যে কেহ রাজা হউক তাহাকে খাজনা দিয়া—সেলাম দিয়া অবসর। আর উন্নত সমাজ যে কোন সরকার হউক তাহার দরবারী হইয়া বা খয়েরখা কর্ম্মচারী হইয়াই চরিতার্থ হন। ইহাই এদেশের প্রাচীন রাজনীতি। উপেক্ষিত সমাজ কখনও চিন্তা করে নাই যে এ দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহার পর্ব্বত প্রমাণ দুঃখের অবসান হইবে না। সে জানে না যে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ যাহারা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহারাই লাট হইতে পেয়াদা রূপে ইংরাজের সিংহাসনকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। এ দেশের স্বরাজের সহিত তাহাদের অস্তিত্বের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজের অসীম শক্তি ইহাদের আজ সহায়। তাই আমাদের বুকের উপর দিয়া ইহাদের নির্য্যাতনের চক্র চালিত লওয়া সম্ভব। ইংরাজ বিদেশী, এ দেশ শাসন তাহার করিতে হইলে, তাহার সাধ্য নাই ইহাদের পরিত্যাগ করিয়া আমাদের গ্রহণ করে, কেননা তা হইলে একদিনেই এই বিরাট ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অতএব আমরা সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক মুক্তি চাহিলে, নির্য্যাতনকারীকে তাহার শক্তিকেন্দ্র হইতে চ্যুত করিতে হইবে! স্বরাজ ব্যতীত তাহা অসম্ভব। কয়েকটি চাকরী সংগ্রহ করিলে অথবা আমরা রাজভক্ত রাজভক্ত বলিয়া গগন পবন বিদীর্ণ করিলেই মাত্র আমাদের দুঃখ দূর হইবে না। যে শিক্ষার অভাবই আমাদের সকল দুঃখের মূল আমরা সেই শিক্ষাকেও আমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তনের জোগাড় করিতে পারিতেছি না।

নগরে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার কেন্দ্র আমাদের জাতিকে বড় বেশী সাহায্য করিতেছেন না। কেননা, উহার সাহায্যে আমাদের দুই চারিজন লোক "বুরজোয়াজি" হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু জাতি-হিসাবে শিক্ষিত হইয়া উঠা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। যতদিন আমরা স্বরাজ লাভ করি ততদিন আমরা শ্রমজীবী ও কৃষক জাতি আমাদের মুক্তির যথার্থ উপায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, চরিত্র, ইহার কিছুরই বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আজ আমরা স্বাধীনতার আন্দোলন হইতে নিজেদেরকে যত্ন সহকারে দূরে রাখিতেছি, অথচ এই বিরাট নিস্পন্দ জাতির জীবনের সোনার কাঠি মাত্র ঐ স্বাধীনতা। আমরা ভুলিয়া যাই যে মানব জীবন স্বাধীনতারই ইতিহাস, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ। একটি শুদ্ধ সত্য বুদ্ধ মুক্ত জিনিস কামনা বাসনা বিজড়িত হইয়া পুনরায় মুক্তির জন্য যে অবিরাম যত্ন ইহাই ত মানবজীবন। অতএব যে মানব, সে স্বাধীনতার উপাসক হইবেই, কেননা স্বাধীনতা তাহার অস্থি মজ্জাগত, কিন্তু যে স্বাধীনতার উপাসনা না করে সে ব্যাভিচার করে, সে আত্মহত্যা করিতেছে। এই মহাপাপ ও ব্যাভিচার হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। আর একটি কথা—পৃথিবীর ইতিহাসে কখন কোথায়ও দেখা যায়না স্বাধীনতার যুদ্ধ একবার আরম্ভ লইলে তাহা লোপ হইয়া গিয়াছে। আজ বহু বৎসর ধরিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে, দ্বীপান্তরের কারাবাসের মধ্য দিয়া জাতির বীরগণ যে মুক্তির তপস্যা করিতেছেন উহা একদিন সফলতা মণ্ডিত হইবে সন্দেহ নাই। সে দিন খয়েরখা গিরির ব্যাখ্যা হয়ত অন্যরূপ হইবে। আর সেই বিজয়ী বীরগণের নিকট সে দিন পুনঃরায় আমরা পতিত ও অস্পৃশ্য বলিয়াই কথিত হইব। আজ আমরা ব্যক্তিগত সুখ ভোগ ও দুই চারিটি চাকরীর জন্য যদি ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যে এমন করিয়া কলঙ্ককালিমা মাখিয়া দেই তবে তাহার চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান কংগ্রেসে হয়ত আমাদের অবাধ গতি না থাকিতে পারে, হয়ত যথার্থ স্বাধীনতার যুদ্ধের দিন আজ যাঁহারা কংগ্রেস পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা বিপক্ষেও গিয়া পড়িতে পারেন। কিন্তু, স্বরাজ ব্যতীত যখন আমাদের মুক্তি অসম্ভব তখন বুকের রক্ত দিয়া উহা সার্থক করিতেই হইবে।

প্রত্যেক জাতির এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করিয়া কোন জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আমরা শিক্ষায় দীক্ষায় সাধনায় সকল দিকে ফুটিয়া উঠিব, কিন্তু, বৈশিষ্ট্য খোয়াইয়া "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইব না। এ দেশে যত চাকরী আছে তাহার সকল কাড়িয়া আনিয়া একদিনে অবনতঃ সমাজকে প্রদান করিলে শতকরা ৬ জন বা ৭ জন লোকের চাকরী হইতে পারে। অতএব ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, কোটী কোটী অবনত নরনারীর মুক্তির পথ বিধাতা ভিক্ষা বা গোলামীর মধ্য দিয়া নির্দ্ধারিত করেন নাই। এ দেশের শিল্প-বাণিজ্য কৃষি সমস্তই প্রায় আমাদের হাতে। অর্থ আমাদের হাতেই উৎপন্ন হয়। আমরা, এই অর্থ নিজ প্রয়োজনে লাগাইতে বা ইহার উচিত মূল্য আদায় করিতে পারি না, কেন না আমরা পরাধীন এবং বঞ্চিত। কিন্তু, তাই বলিয়া সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমে পরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া এই বিরাট জাতিটা মাত্র দরখাস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিবে এই কল্পনা যাঁহারা করেন তাঁহারা দেশ বা জাতির মিত্র নহেন। আমাদের মুক্তি মাত্র স্বাধীনতার মধ্য দিয়াই ভগবান বিধান করিবেন। বিরাট উপেক্ষিত সমাজ! তোমার এই দৈন্য মুছিয়া নিজকে মহিমা-মণ্ডিত করিতে হইলে দলে দলে দেশমাতার চরণতলে কংগ্রেসের বেদীমূলে সমবেত

হইতে হইবে। মায়ের মন্দিরে জাতিভেদের দ্বন্দ্ব নাই, ছোট বড় বিরোধ নাই, সেখানে সকলেই সন্তান সকলেই সমান।

আমরা বিদায়ের পূর্ব্বে পুনরায় আমাদের অক্ষমতা ও আয়োজনের ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। বন্দেমাতরম্।

শ্রমিক-জগৎ

শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয়ের হঠাৎ শ্রমিক প্রীতির উদ্রেক হওয়াতে যে সকল শ্রমিকেরা তাঁহার নাম শুনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। এই আয়েঙ্গার মহাশয়ই প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে দিল্লিতে এক শ্রমিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে শ্রমিকেরা মুক্তির আন্দোলনে যোগ দিতে চায় না, তাদের আন্দোলন কেবল দুচার টাকা মাহিয়ানা-বৃদ্ধির দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, মাসিক ছয় হাজার টাকা আয়সম্পন্ন, মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল মহাশয়ের মুখে এইরূপ শ্রমিক প্রীতির নিদর্শন পাইয়া দিল্লির শ্রমিক সম্প্রদায়ের বোধ হয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল।

কলিকাতার জাতীয় দলের কোন কোন কাগজ যদিও শ্রমিকের প্রতি সর্ব্বদা বিশেষ প্রীতিবান নহেন তথাপি কংগ্রেসের সভাপতির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মনোভাব বেশ স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরেই আয়েঙ্গার মহাশয় যখন কলিকাতায় আসেন তখন "ফরওয়ার্ড"এর মারফৎ এক অভিমত প্রকাশ করেন যে শ্রমিক আন্দোলনে তাঁহার বেশ সহানুভূতি আছে। কারণ, শ্রমিকেরা "এখন" আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন হইতে শিখিয়াছে এবং নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে।" এই "এখন" কথাটার অর্থ বুঝিতে অনেককে বেগ পাইতে হইয়াছিল। দিল্লিতে তিনি শ্রমিকদের সম্বন্ধে যা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন কয়েক দিনের ভিতরই কলিকাতায় আসিয়া সেই মত বদ্‌লাইয়া যাওয়ার কারণ না বুঝিতে পারারই কথা।

সেদিন বোম্বাই সহরে অল্‌-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইয়া গেল সেই অধিবেশনে মিঃ জোগলেকর কংগ্রেসের সম্মুখে এক নূতন কার্য্যতালিকা (programme) পেশ করিয়াছিলেন। সে কার্য্য তালিকাটি গত ১৫ই বৈশাখ তারিখের "গণবাণী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ভিতর এমন কোন ভয়ানক কথা ছিল না, যার দ্বারা আয়েঙ্গার মহাশয়ের মাসিক ৬০০০৲ টাকায় আয় কাড়িয়া লওয়া বুঝা যাইতে পারে, কিংবা শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয়ের বিশাল জমিদারি কাড়িয়া লইয়া পাট কলের মজুরদের বাস করিবার জায়গাগুলি আর একটুকু স্বাস্থ্যকর করা হইবে। কার্য্য তালিকার ভিতর যাহা ছিল, তাহাতে কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আদর্শটিকে পরিস্কার ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আর ছিল যে সকল দীন দরিদ্র চাষী ও শ্রমিক শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামির মত জমিদারের ছেলে হয়ে জন্মায় নাই কিংবা আয়েঙ্গার মহাশয়ের মত আইনের কূট তর্ক ফাঁদিয়া জমিদারী কেনে নাই, সে সকল লোকেরা স্বরাজ বলিলে কি বোঝে সেই সব কথা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রস্তাবটি অধিবেশনে উপস্থাপিত করাই হয় নাই। তাহার বদলে কংগ্রেস কমিটি দয়া করিয়া এক মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন যে কংগ্রেস যতদূর সম্ভব শ্রমিকসঙ্ঘগুলিকে সাহায্য করিবে এবং যেখানে সঙ্ঘ নাই সেখানে সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা করিবে।

কিন্তু আয়েঙ্গার মহাশয় শ্রমিকদের জন্য এত করিয়াও নিশ্চেষ্ট হন নাই। এখন তিনি ফতোয়া জারী করিয়াছেন যে কংগ্রেসের ভিতর একটা শ্রমিক দল গঠন করিতে হইবে। কংগ্রেসে এত দলাদলির ভিতর আবার আর একটা দল না বাড়ালে বোধ হয় কর্ত্তাদের আর চলিতেছে না। কংগ্রেসের নির্ব্বাচন প্রণালীটা যদি ঘরোয়া বন্দোবস্ত না হইয়া বেশ মতামতের উপর হয় তাহা হইলে অনেক শ্রমিক প্রতিনিধিও কংগ্রেসের ভিতর গিয়া আপনাদের মতের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তখন শ্রমিক দল আপনি গড়িয়া উঠিবে, যে পর্য্যন্ত না তাহা হয় আমরা শ্রীযুত সিঙ্গারা ভেলুর ভাষায় আয়েঙ্গার মহাশয়কে পরামর্শ দিতেছি যে তিনি যেন তাঁর নিজের ঘর (কংগ্রেস) সামলান। যে কাজ তাঁহার নয়, সে কাজের জন্য তিনি উপযুক্ত নন্ সে কার্য্যে যেন তিনি হাত না দেন।

যশোহর খুলনা যুবক সম্মিলনীতে সভাপতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসুর অভিভাষণ সম্বন্ধে গতবারে স্থানাভাবে আলোচনা করা হয় নাই। মৃণাল বাবু যুবকদের যে কার্য্যধারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমরা আশা করি যুবকেরা সেই মত চলিবে। ব্যায়ামশালা স্থাপন করা, "নিম্ন শ্রেণীর" দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, দেশী দ্রব্যের ব্যবহার, বিদেশী দ্রব্যের যথাসম্ভব পরিহার, অস্পৃশ্যতা দূর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করা যে খুব ভাল কাজ সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বিশেষ ভাবে সংস্পৃষ্ট থাকিয়া মৃণালবাবু নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় যদি না শ্রমিক আন্দোলনের ভিতর আসিয়া প্রাণপণে সংগঠন কার্য্যে সহায়তা করেন তাহা হইলে এই আন্দোলন কৃতকার্য্য হইতে বেশ বিলম্ব হইতে পারে। অবশ্য সে সকল যুবক মনে করেন যে "চাকরি বাকরী বজায় থাকিবে, সকল স্বার্থ অক্ষুন্ন রহিবে, পুরাদমে সংসার ধর্ম্ম করা চলিবে অথচ এক সুপ্রভাতে উঠিয়া দেখিবেন যে ভারত স্বাধীন হইয়া গিয়াছে" আমরা সে সকল যুবকের কথা বলিতেছি না। আমরা সেই সকল তরুণের কথা বলিতেছি যাহারা অসহযোগ আন্দোলনের সময় মাত্র এক আদর্শের প্রেরণায়—"মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনকে দারিদ্র্যের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া, নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া চির দারিদ্র্য-বরণ করিয়া হৃদয়ে অমিত বল লইয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম নিবেদন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল।"

যে ত্যাগ, যে সংযম, যে বিশ্বাস ও যে বলের পরিচয় তাহারা সে সময় দিয়াছিল তাহার দশ ভাগের এক ভাগও যদি কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনে ব্যয়িত হইত আজ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে মাত্র লর্ডবার্কেনহেড কি করেন না করেন তারি জন্য এই উদ্‌গ্রীব্ প্রতীক্ষায় পর্য্যবসিত করিতে হইত না। একমাত্র বাঙ্গলাদেশে যদি আজ সাড়ে তিন লক্ষ পাটকলের মজুর, এক লক্ষ নাবিক, বিশ হাজার ছাপাখানার লোক, দশ পনেরো হাজার কলকব্জার মজুর আর লক্ষ লক্ষ কৃষককে যদি বোঝান হইত যে, যে স্বরাজের জন্য এত ব্যাকুলতা, এত স্বার্থত্যাগ সে স্বরাজ্যের স্বরূপ কি এবং সেই স্বরাজ্যে তাহাদের স্থান কোথায় তাহা হইলে আজ আমরা শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বড় না শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বড় এই প্রশ্নের সমাধানে ব্যস্ত থাকিতে পারিতাম না। কৃষক ও মজুরের উৎসাহ বহ্নিতে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের আদর্শ ইন্ধন পড়িলে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত তাহাতে সর্ব্বপ্রকার যথেচ্ছাচারিতা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধনীর বিলাসিতা, দরিদ্রের ক্লেশ থাকিতে পাইত না। মুক্তির আব্ হাওয়ায় মানুষ মানুষের অধিকার লাভ করিত। মৃণালবাবু তরুণদের এই দিকটা যদি তাদের দেখাইয়া দিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার "কাজের ধারা" সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত।

তরুণেরা অনেক প্রকার উপায়ে শ্রমিক আন্দোলনে সাহায্যে করিতে পারে। তাহারা প্রচার কার্য্যের দ্বারা সংগঠনের পথ সরল করিয়া দিতে পারে। তাহাদের সামর্থ্যানুযায়ী সামান্য অর্থ সাহায্য পাইলেই অনেক কাজ হইতে পারে যে কার্য্য অর্থাভাবে হইতে পারিতেছে না। চীন দেশের যুবকেরা শ্রমিক আন্দোলনকে তাহাদের জাতীয় আন্দোলন হইতে পৃথক বলিয়া দেখে নাই। সেইজন্য চীনদেশে মুক্তির আন্দোলন যেমন ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করিয়াছে ভারতে তেমন হইতে পারে নাই। আত্মত্যাগী, সরল, নির্ভিক তরুণ-দলের জেলবরণ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে এক জনের জায়গায় দুইজন কি তিনজন তথাকথিত নেতা মোটা মাহিয়ানার মন্ত্রী বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য হইবেন অথবা ১০ জনের জায়গায় ২০ জনকে আই-সি-এস পর্য্যায়ভুক্ত করা হইবে। মুক্তি চাই—যে যে রকমেই নির্য্যাতিত হইতেছে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। জাতীয় আন্দোলন যতদিন পর্য্যন্ত শ্রেণী বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন এই আন্দোলন প্রাণ বিহীন ভাবে চলিবে। দেশের জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ, ঔৎসুক্য বা সহায়তা হইতে এই আন্দোলন বঞ্চিত থাকিবে।

স-প

বিবিধ প্রসঙ্গ

—:০:—

কৃষক সংগঠন

বাংলাদেশের স্থানে স্থানে প্রজাবন্ধু, রায়তবন্ধু ও কৃষকবন্ধুর অভাব নেই, কিন্তু, সমস্ত দেশ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও একটি নাম করার মত কৃষক সংগঠন কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা। ভাষাহীন কৃষকের বন্ধু যাঁরা সেজেছেন তাঁদের অনেকেই আপন আপন স্বার্থের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর যাঁরা সরল মনে কাজে নেমেছেন তাঁরাও প্রায়ই বোঝেন না কি করে কি করতে হবে। কৃষক সমিতি দেশে অনেকই রয়েছে, কিন্তু এ সকলের খাতাপত্রের সহিত কোনো সম্বন্ধ নেই। কে সমিতির মেম্বর এবং কে মেম্বর নয় তা কেউ জানে না, এমন কি সমিতির যিনি সেক্রেটারী তিনিও না। মাঝে মাঝে কৃষক সম্মিলন বা কন্‌ফারেন্স করা ব্যতীত কৃষক সম্মিলন সমূহের যে বিশেষ কিছু কাজ আছে এ কথা কোনো কৃষকবন্ধুই বোঝেন না। যে সমিতি সত্যিকারভাবে কোনো খাতা-পত্র রাখে না, সভ্যগণের নাম তালিকাভুক্ত করে না সে সমিতির অস্তিত্বের কিছুমাত্র মূল্য নেই।

* * * *

ময়মনসিংহের কৃষকদল কি কি কাজ করেছে তা আমরা জানতে পারি কি? এ দলের রেজেষ্ট্রী বই আছে কি না এবং থাকলে সভ্যসংখ্যা কত এ সকল খবর দলের সেক্রেটারী ফয়জুদ্দীন হোসেন সাহেব আমাদের জানালে আমরা বিশেষরূপে বাধিত হব।

—*—

বিষদৃষ্টি

119—125 Charing Cross Road,
London, W. C. 2
23rd May, 1927.

The Editors of
GANAVANI.
Calcutta, India.

Dear Sirs,

On the 15th December, 1926 we submitted an order for one subscription for the first half of 1927, to your esteemed paper to be sent direct to the **Institute of Economics and Statistics P.O. Box 1116 and 1129, Moscow U.S.S.R.** Our Customer complains not having received a single Copy.

Please look into the matter and have forwarded all the back numbers.

Yours truly
W. & G. Foyle Ltd.

বঙ্গানুবাদ—

১১৯—১২৫ চ্যারিং ক্রস রোড্,
লণ্ডন, ডব্লিউ, সি, ২
২৩শে মে, ১৯২৭

সম্পাদকগণ,
গণবাণী
কলিকাতা, ভারতবর্ষ।

প্রিয় মহাশয়গণ,

১৯২৬ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে আমরা আপনাদের সমাদৃত কাগজের ১৯২৭ সনের প্রথমার্দ্ধের জন্যে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করে তা বরাবর মস্কোর ইনষ্টিটিউট্ অব্ ইকোনমিক্স এণ্ড ষ্টেটেস্‌টিক্সের নামে পোষ্ট বক্স নম্বর ১১১৬ ও ১১২৯ ঠিকানায় পাঠাবার জন্যে অর্ডার দিয়েছিলেম। আমাদের গ্রাহক অভিযোগ করছেন যে একখানা কাগজও তাঁদের নিকটে পৌছয় নি।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ ব্যাপারের অনুসন্ধান করুন এবং সমস্ত পুরাতন সংখ্যাগুলি প্রেরণ করুন।

আপনাদের বিশ্বস্ত
ডব্লিউ, এণ্ড জি কয়লে লিমিটেড।

আমরা প্রতি ডাকে কাগজ প্রেরণ করে থাকি, কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট কোন আইনের বলে যে তা যেতে দেন না তা আমরা জানতে পারি কি? আমাদের অধিকাংশ বিদেশী গ্রাহকের ব্যাপারেই এরূপ ঘটছে। কয়েক মাস আগে লণ্ডনের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টির অফিস থেকে কম্রেড তারিণী প্রসাদ সিংহও ঠিক এই একই প্রকারের অভিযোগ করেছিলেন। ডিরেক্টর জেনেরেল অব পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ দয়া করে এ ব্যাপারের একটা প্রতিকার করুন। ভারতীয় পুলিশ প্রভুদের কৃপায় নিশ্চিতই ডাকবিভাগ আমাদের কাগজ বাইরে যেতে দিচ্ছেন না। কিন্তু, আমরা জানতে পারি কি যে কিসের জন্যে এ জুলুম গণবাণীর ওপরে করা হচ্ছে? ডিরেক্টর জেনেরেল অব সেণ্ট্রাল্ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কলিকাতা কিংবা বোম্বের ভক্তবৃন্দ গরীব গণবাণীর ওপরে এত বিমুখ কেন হয়েছেন তা তিনি কি কৃপা করে আমাদের জানাবেন? গণবাণী গোপন বে-আইনি পুস্তিকা নয়। এর প্রকাশের জন্যে কলিকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হতে যথাবিধি সার্টিফিকেট্ আমরা পেয়েছি। পোষ্ট-মাষ্টার জেনেরেলের আফিসে এ কাগজ রেজেষ্ট্রিও আমরা করেছি। তবুও জোর করে যে কাগজের বিদেশে প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে তার কোন মানে আছে কি?

—০—

লণ্ডনে ভারতীয় নাবিক সঙ্ঘ

ভারতীয় নাবিকগণের জন্যে লণ্ডনে একটি নাবিকসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। ৯৮, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডক্ রোড, লণ্ডন, ই, ঠিকানায় সঙ্ঘের আফিস স্থাপিত হয়েছে। এ ইউনিয়নের কমিটিতে কম্রেড শাপুরজি সাক্লাৎওয়ালা সভাপতি এবং এন, জে, উপাধ্যায় সম্পাদক হয়েছেন। ডাক্তার কে, ভাট, ডাক্তার এ, সি বানার্জি মিষ্টার, সি, পি, দত্ত, মিষ্টার জি, হার্ডি মিষ্টার থাই, হিউজ্ ইউনিয়ন কমিটির সভ্য। ভারতীয় নাবিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা ও সচেতন করাই হচ্ছে এ ইউনিয়নের উদ্দেশ্য। "দি ইণ্ডিয়ান সি ম্যান" নাম দিয়ে এ ইউনিয়ন বাংলায় একখানা কাগজও বের করেছে। অবশ্য এ কাগজখানা টাইপে ছাপা হয় না। হাতে লিখে কপিং প্রেসে তার কপি তোলা হয়। বোধ হয় বাংলা টাইপে ছাপাবার সুবন্দোবস্ত লণ্ডনে নেই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি। দেশে গঠিত সঙ্ঘগুলো ত ব্যক্তিত্বের ঝগড়াতেই ব্যতিব্যস্ত থাকে, এখন যদি বিদেশে গঠিত সঙ্ঘটি ভারতীয় নাবিকদের চৈতন্য ও কল্যাণ সাধনে কিছু করে উঠতে পারে তা হলে সেটা খুবই আনন্দের বিষয় হবে।

জনগণের কাজে

জনগণের ভাবে ও কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণবাণী ছাড়া আরো দু'খানা সাপ্তাহিক বের হচ্ছে। "মেহনৎ কশ্" বের হচ্ছে উর্দ্দু ভাষায় লাহোর থেকে, আর "ক্রান্তি" বের হচ্ছে মারাঠী ভাষায় বোম্বে থেকে। আমাদের বন্ধু মত্তহর রহমান দরবেশী "মেহনৎকশ্" যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করছেন। তিনি পেশাওরের কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১এ ধারা অনুসারে দু'বছর কয়েদ খেটেছেন। "ক্রান্তি" বোম্বের নবগঠিত শ্রমিক ও কৃষকদলের কর্ম্মিগণের উদ্যোগে বের হচ্ছে। বন্ধু কেশব নীলকণ্ঠ জোগলেকর ও শান্তারাম, এস, মিরজকর এ কাগজখানা সম্পাদন করছেন। এতবড় ভারতবর্ষে কৃষক ও শ্রমিকগণের মুখপত্ররূপে তিনখানা মাত্র কাগজ সমুদ্রের পক্ষে একবিন্দু জল ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবুও মন্দের ভালো এই যে শোষিতদের পক্ষ থেকে দু'টো কথা বলবার জন্যে তিনখানা কাগজও অন্ততঃ রয়েছে।

—০—

অদ্ভুত খেয়াল

কোনো কোনো বন্ধু আমাদের বলছেন যে "তোমরা চাষী-মজুরের কথা এখন ছেড়ে দাও। আগে ইংরেজের হাত থেকে ভারতবর্ষের উদ্ধার হোক্, তার পরে মাথা ঠিক্ করে চাষী-মজুরের কথা ভাবতে হয় ভাবো।" বন্ধুরা যে চাষীও নন, মজুরও নন—তথাকথিত "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোক, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁদের "ভদ্রত্ব" তাঁদেরকে চাষী-মজুরদের থেকে এতবেশী পৃথক করে রেখেছে যে তাঁরা ভাবতেও পারেন না যে একমাত্র চাষী-মজুরেরাই বৃটিশ শোষণকারীদের কবল থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে পারে। তাঁদের সাড়ে পাঁচজন "ভদ্র" সন্তানের কি শক্তি আছে যে তাঁরা বৃটিশ-শোষণকারীদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করবেন? জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে যাদেরকে তাঁরা বরণ করে নিয়েছেন সেই ভারতীয় "বুরজোয়া" নেতৃগণ আগে-ভাগেই বৃটিশ শোষকগণের সহিত স্বার্থসূত্রে এক হয়ে গেছেন। তাই, তাঁদের অবস্থাকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করে নেবার জন্যে তাঁরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন মাত্র পেতে চাইছেন। কাজেই কেবলমাত্র বৃটিশ শোষণকারিগণের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো সংগ্রামই পরিচালিত হতে পারে না। বৃটিশ শোষকগণের বিরুদ্ধে আমরা যে সংগ্রাম চালাব সে সংগ্রাম আপনা থেকেই ভারতীয় বুর্জোয়াজিগণের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে। কেন না, বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় বুর্জোয়াজিগণ বৃটিশ শোষকগণের সহিত স্বার্থ-সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। যে যুগে আমরা বাস করছি সে যুগ হচ্ছে বুর্জোয়াজিগণের প্রাধান্যের যুগ। এই বুর্জোয়াজিগণ উৎপাদনের বিবিধ উপায়কে করায়ত্ত করে সত্যকারের উৎপাদকগণকে শোষণ করছে। এটা কিছু ইউরোপের বাঁধা বুলি নয়। সকল দেশেই এই শোষণের ব্যাপার প্রতিনিয়ত সকলের চোখের সম্মুখেই ঘটছে। এসব প্রতিদিন দেখে দেখেও যাঁরা সত্য বলে মেনে নিতে চান না তাঁরা হয়তো প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড কিংবা প্রথম শ্রেণীর জন্মমূর্খ। জাতীয় শত্রুদের সাথে সমস্বার্থে সম্মিলিত যাদেরকে হতে হয়েছে তাদেরকে সাথে নিয়ে কোনো জাতীয় সংগ্রামই পরিচালিত হতে পারে না। আমাদের জাতীয় শত্রু বৃটিশ শোষকগণের বিরুদ্ধ সংগ্রাম সমস্বার্থে সম্মিলিত হতে পারে কেবল মাত্র ভারতীয় শোষিত জনগণ। এই জনগণকে সংগ্রামের জন্যে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত বন্ধুগণ গ্রহণ করুন।

অবসর গ্রহণ

কোনো পরবের ছুটি আমরা নিইনি। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বে-পরবের ছুটি এক সপ্তাহ নিলুম। এর পরে ৩০শে জুন তারিখে কাগজ বের হবে।

বিনীত
"গণবাণী"র চালকগণ

দি ইউনাইটেড স্পোর্টিং এজেন্সী

২৬নং কালীকুমার বানার্জ্জী লেন, (টালা) কলিকাতা।

উচ্চদরের খেলার সরঞ্জাম, সাইকেল এবং সাইকেলের অন্যান্য মাল মশলা সরবরাহকারী, কলিকাতার [illegible] নিয়ম [illegible] ফুটের [illegible]।

সিঙ্গেল রিভ ২২৲ ডবলরিভ ৩২৲, ৩৫৲, ৪৫৲, ৫৫৲, ৬৫৲ প্যারিস রিড ৭৫৲ ডবল রিড ৯৫৲

ইংলিশ মেক ফুটবল মেকগ্রিগর

কাউহাইড কম্প নং ৫	২০৲
ওউন মেক ১৮ পেনেলস কম্পিটিসন মেচ কম্প নং ৫	১২॥০
কম্পিটেসন মেচ (মেকগ্রিগর প্যাটার্ণ) কম্প নং ৫	১০॥৵
বুলহেট মেচ ১২ পেনেলস কম্প নং ৫	৮॥০
ভলান্টিয়ার মেচ ১০ পেনেলস কম্প নং ৫	৭॥০
লুনার মেচ ৮ পেনেলস কম্প নং ৫	৬॥০
জুবলী মেচ ৮ পেনেলস কম্প নং ৫	৫॥০
৪ নং বুলহেট মেচ কম্প	৬॥০
৪ নং লুনার মেচ কম্প	৫৲
৪ নং ভলান্টিয়ার মেচ কম্প	৬৲
৪ নং জুবলী মেচ কম্প	৪৲
৩ নং মেচ কম্প ৮ পেনেলস	৩॥০
২ নং ,, ,, ,,	২॥০
১ নং ,, ,, ,,	১৷৹০

ফুটবল ব্লাডার		ইনফ্লাটার
৫ নং	২৲	১॥০, ২৲, ২॥০
৪ নং	১৷৹০	লেস ইং
৩ নং	১৶০	৷৶০, ॥৶০
২ নং	১৶০	রাবার সলিউসন
১ নং	৸৶০	৷০, ৷৶০, ॥০

A book to be read by all

Hundred Percent Indian

By C. G. Shah.

This is an excellent book written from the point of view of Historical Materialism. The Gandhism has most scientifically been refuted in this little book. This is perhaps the first Marxian book written in India by an Indian.

Price As 6/- only.

To be had of

THE BOOK COMPANY LTD.

4/4 A, College Square, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১॥৶০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

নজরুল ইস্‌লামের পুস্তকাবলী

১। অগ্নিবীণা (৩য় সংস্করণ) মূল্য ১৷০
২। ছায়ানট (কবিতার বই) মূল্য ১৷০
৩। ঝিঙেফুল (ছেলেদের কবিতা) মূল্য ৸০
৪। চিত্তনামা (শোক কবিতা) মূল্য ১৲
৫। সর্ব্বহারা (নূতন কবিতার বই) মূল্য ১৶০
৬। দুর্দ্দিনের যাত্রী (ধূমকেতুর অগ্রলেখ) মূল্য ৷৶০
৭। দোলন চাঁপা (কবিতার বই) মূল্য ১॥০
সিন্ধু-হিন্দোল (নূতন তম কবিতা) মূল্য ১৶০

প্রাপ্তিস্থান

১। ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২। বর্ম্মণ পাব্‌লিশিং হাউস্
১৯৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

BOOKS ON SOCIALISM.

1. **The Coming of Socialism.**
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. **Scientific Socialism.**
Its Aims and Ideals.
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. **The Religion of Capital**
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. **Manifesto of the Communist Party**
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS.
Price—As. 6/- only.

To be had of

The Book Company Ltd.

4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের

উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	৷৷০
অগ্নিসংস্কার	১৷৷০
শুভা	১৲
পাপের ছাপ	২৷০
বিপর্য্যয়	২৷৷০
শান্তি	২৷৷০
কাঁটার ফুল	১৷৷০
রক্তের ঋণ	৷৷০
আনন্দ-মন্দির	৷৷০
রাজগী	২৷০
পিতাপুত্র	১৷৷০
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	২৷৷০
দূরের আলো	২৲

নাটক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ৷৷০

২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত প্রহসনচিত্র। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

উপন্যাস ও গল্প

১। মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। একা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—

১। ভাত কাপড়ে কথা

বাঙ্গালার রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।

২। বাণী বীথি।

বাঙ্গালা সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

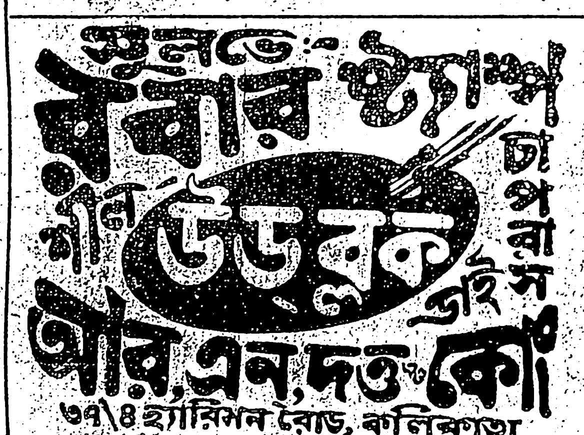
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স

৯২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের গ্রন্থ

1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.

Published by the Calcutta University.



Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta, and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৩০শে জুন ১৯২৭, ১৫ই আষাঢ় ১৩৩৪	২০ম সংখ্যা

"গণবাণী" প্রচারের আয়োজন

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিয়ালদা, ব্যারাকপুর, ঢাকা, সান্তাহার, পার্ব্বতীপুর, শিলিগুড়ি, লালমণির হাট, কাটিহার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাওড়া, ব্যাণ্ডেল, বর্দ্ধমান, আসানসোল, পাটনা, দানাপুর, জামালপুর, গয়া, মোগলসরাই, মিরজাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, দিল্লী, জব্বলপুর, এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর, পুরুলিয়া, গোণ্ডিয়া ও পুরী প্রভৃতি ষ্টেসনের হুইলার কোম্পানীর ষ্টলে **গণবাণী** পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া দার্জ্জিলিংএর হুইলার কোম্পানীর ষ্টলেও গণবাণী বিক্রয়ার্থ মৌজুদ থাকে।

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহ্মদ্
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

-৫৭

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৩০শে জুন, ১৯২৭, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৩৪ | ২০ম সংখ্যা

কি করা চাই ?

—:০*:০—

[মুজফ্ফর আহমদ]

—:•:—

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস বুর্জোয়া কংগ্রেস হয়ে পড়েছে। যে সকল লোক বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত একটা আপোস নিষ্পত্তি করে নিয়ে আপনাদের স্বার্থের খাতিরে ভারতের জনগণের ওপরে প্রভুত্ব জমিয়ে বসতে চান তাঁরাই হয়েছেন আজকের দিনে কংগ্রেসের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করুক, ভারতের জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারা ভারতের সকল কার্য্য পরিচালিত হোক্, এমন আশা গান্ধী হতে আরম্ভ করে মতিলাল নেহেরু পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বিধাতৃ-পুরুষগণ ভুলেও কোনোদিন হৃদয়ে পোষণ করেন নি। তাঁদের সকলেই চান ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন। ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের খোলাসা মানে হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থেকে, বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের সহিত একটা রফা বন্দোবস্ত করে ভারতে ভারতীয় বুর্জোয়াজিগণের, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় সমূহের ওপরে যাঁরা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে বসে আছেন—তাঁদের শাসন প্রবর্ত্তন করা। এরূপ শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনের দ্বারা ভারতের জনগণের এতটুকুও হিত-সাধন হবে না, পক্ষান্তরে কৃষক ও শ্রমিকগণ আরো অধিকতর কঠোরতার সহিত শোষিত ও বিলুণ্ঠিত হতে থাকবে।

ভারত যদি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, আর সেই স্বাধীনতা যদি ভারতের জনগণের অভ্যুত্থানের দ্বারা লাভ হয় তা হলে কংগ্রেসের বর্ত্তমান বুর্জোয়া নেতৃগণের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আজকের দিনে কৃষক ও শ্রমিকগণের বুকের রক্ত পান করে করে এই যে তাঁদের উদরগুলো ভূধরের সমান উঁচু হয়ে উঠেছে—সেইটুকু জনগণের দ্বারা অধিকৃত স্বাধীন ভারতে কিছুতেই চলবে না, আর না চলার মানেই হচ্ছে শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়াজিগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। কাজে কাজেই, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন লাভের জন্যে কংগ্রেসের বর্ত্তমান বুর্জোয়া নেতৃগণ যে সংগ্রাম করছে তা হচ্ছে তাঁদের অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখার সংগ্রাম। এটা কিছু আমাদের মনগড়া কথা নয়। বুর্জোয়া নেতৃগণ ইত্যাকার মনোভাবের পরিচয় বারে বারে দিয়ে এসেছেন।

সত্যকার ভাবে দেশের স্বাধীনতা যাঁরা চান তাঁরা এই বুর্জোয়া নেতৃগণের সহিত এক হয়ে যে কাজ করতে পারবেন না তা স্থির নিশ্চিত। এই তথাকথিত নেতৃগণের সহিত এক হয়ে কাজ করা, আর আপনাদের আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করা একই কথা।

এখন কংগ্রেসকে যদি দেশের জনগণের সত্যকারের প্রতিনিধি সভাতে পরিণত করতে হয় তা হলে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ হবে বুর্জোয়া নেতৃগণের অত্যন্ত দুষ্ট আওতা হতে কংগ্রেসকে বিমুক্ত করা। এই বিমুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন প্রোগ্রাম কংগ্রেসে গ্রহণ করা যা কিছুতেই বুর্জোয়া নেতৃগণ মায় গান্ধী সহ্য করে উঠতে পরেবেন না। মাদ্রাজ কংগ্রেসের দিন ক্রমশঃই নিকটতর হয়ে আসছে। প্রকৃত স্বাধীনতাকামী যাঁরা আছেন তাঁদের এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কংগ্রেসকে নূতন ভাবে, নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন করাই হবে আমাদের প্রথম দাবী। ভুয়ো স্বরাজ্য লাভ করার দাবী আমাদের দাবী নয়। আমাদের দাবী হচ্ছে ভারতের পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করলেও চলবেনা, বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের (লুণ্ঠনের) কবল থেকেও ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে

হবে। কেননা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে স্বাধীনতা লাভ করা আমাদের যেমন উদ্দেশ্য হবে, ঠিক্ তেমনি উদ্দেশ্য হবে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত ভারতের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা। মাদ্রাজ কংগ্রেস যদি কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তা হলে অনেক বুর্জোয়া নেতা তখনি কংগ্রেস ছেড়ে পলায়ন করবেন। এই পলায়নকারীদের অগ্রণী হবেন মিঃ গান্ধী। স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হলে তিনি যে কংগ্রেস ছেড়ে প্রথমেই পালাবেন সে কথা তিনি গৌহাটী কংগ্রেসে নিজেই বলেছেন। গুজরাতের বুর্জোয়া বণিক শ্রেণীর তিনি লোক। তাঁর শ্রেণীর স্বার্থে জলাঞ্জলি দেবার শক্তি তার একেবারেই নেই। তাঁর ব্যবহার থেকে সে পরিচয় অনেকবারই পাওয়া গেছে। গান্ধী যদি কংগ্রেস ছেড়ে যান তা হলে তাঁর ভক্তবৃন্দের অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন। এতে বাস্তবিকই কংগ্রেসে একটা নবজীবনের সঞ্চার হবে। গান্ধীর প্রতিপত্তি এড়ানো সত্য সত্যই আমাদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। "মহাত্মা"গিরির খোলস পড়ে দেশের যে ক্ষতি তিনি করছেন তার পরিপূরণ করতে আমাদেরকে অনেক বেগ পেতে হবে। স্বাধীনতার সংগ্রামে মহাত্মা-পুণ্যাত্মার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা চাই সাহসী ও সচেতন মানুষ।

আমাদের প্রোগ্রাম আমরা ইতোপূর্ব্বেই দেশের সম্মুখে পেশ করেছি। (১৪ই এপ্রিল তারিখের গণবাণী দ্রষ্টব্য।) নিম্নে আবারো আমরা আমাদের দাবীগুলোর পুনরুল্লেখ করছি :—

(ক) রাষ্ট্রীয় দাবী সমূহ
(Political Demands)

১। আঠার বছর ও তার বেশী বয়সের নারী ও পুরুষ মাত্রকেই ভোটের অধিকার দেওয়া।

২। জাতি ও বর্ণগত বৈষম্য (Racial discrimination and caste distinctions) বিদূরীত করা।

৩। প্রেসের, বক্তৃতার ও সমিতি গঠনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা।

৪। ট্রেড্ ইউনিয়ন (শ্রমিক সঙ্ঘ) সমূহের ওপর হতে সকল প্রকার প্রতিবন্ধক দূর করা এবং আইনের দ্বারা ট্রেড্ ইউনিয়ন সমূহকে উন্নত দেশ সমূহের সমান অধিকার প্রদান করানো।

(খ) অর্থনৈতিক দাবী সমূহ
(Economic Demands)

১। যথা সম্ভব পরোক্ষ ভাবে ট্যাক্স গ্রহণ প্রথা তুলে দেওয়া ও ক্রম-বর্দ্ধিত হারে মাসিক, ২০০ টাকা হতে তদধিক আয়ের ওপরে ইন্‌কম ট্যাক্স ধার্য্য করা।

২। সকল প্রকার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৩। চাষের উপযুক্ত ভূমি সমূহ সরকারের দ্বারা কেবল মাত্র চাষীদিগকেই বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান করা।

৪। ভূমির উৎপন্ন ফসলের তারতম্য অনুসারে নিম্নতম হারে ভূমিকর ধার্য্যকরা ও কোনো অবস্থাতেই সে কর উৎপন্ন ফসলের শতকরা দশ ভাগের বেশী হতে না দেওয়া।

৫। কৃষকদিগকে টাকা ধার দেওয়ার জন্য সরকারের দ্বারা ষ্টেট্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করানো। এই ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৭ টাকার বেশী হবে না। ব্যক্তিগত ভাবে যারা সুদের ওপরে টাকা খাটিয়ে থাকে তাদেরও সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা আইনের দ্বারা বিধি-বদ্ধ করে দিতে হবে।

৬। ঋণের টাকা শোধ না দিতে পারার জন্যে চাষীর চাষের জমী হস্তান্তর হতে না দেওয়া।

৭। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথাতে চাষীদিগকে কৃষিকর্ম্মে শিক্ষা দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা।

৮। কারখানার শ্রমিকগণের জন্যে আইনের দ্বারা ৮ ঘণ্টার দিন ও সাড়ে পাঁচদিনে সপ্তাহ নির্দ্ধারিত করে দেওয়া। নারী ও বালক শ্রমিকগণের জন্যে আরো কম সময় নির্দ্ধারিত করা।

৯। আইনের দ্বারা কারখানার শ্রমিকগণের জন্যে নিম্নতম বেতনের হার নির্দ্ধারিত করে দেওয়া। এই হার ধার্য্য করার সময় শ্রমিকগণের মানুষের মত খাওয়া পরার জন্যে যা প্রয়োজন হয় তারও ওপরে শতকরা ৩৩ টাকা অধিক ধার্য্য করা।

১০। সকল প্রকার কারবারেই শ্রমিকগণের জন্যে বার্দ্ধক্য, রোগ ও কর্ম্মহীনতার ইন্সিউরেন্স যাতে হয় তার ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করে দেওয়া।

১১। শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও মালিকগণের দায়িত্ব (Liabilities) সম্বন্ধে যে আইন আছে তার প্রসার আরো বৃদ্ধি করা এবং সে আইন যাতে কার্য্যে পরিণত হতে পারে তার যথোচিত ব্যবস্থা করা।

১২। খনি ও কারখানা সমূহে শ্রমিকগণকে বিপদ হতে বাঁচানোর জন্যে বর্ত্তমানে যে সকল উন্নত উপায় সমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে সে সমুদায়ের ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করিয়ে নেওয়া।

১৩। শ্রমিকগণকে সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা।

—•—

(গ) সামাজিক দাবী সমূহ
(Social Demands)

১। জন-সাধারণের নিরক্ষরতাকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা। (স্বাক্ষর হওয়ার মানে আপন আপন মাতৃভাষায় পত্র লিখিতে ও পড়িতে পারা।)

২। শ্রমিক ও কৃষকগণের জন্যে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ স্থাপন করা এবং নারীদের গর্ভাবস্থার জন্যে সেবা-সদন স্থাপন করা।

৩। শ্রমিক ও কৃষকগণকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সমূহ শিক্ষা দেওয়া।

৪। কারখানার মালিকগণকে দিয়ে শ্রমিকগণের জন্যে যথোপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা করানো এবং এ সকল বাসগৃহের ভাড়া যাতে শ্রমিকদের ক্ষমতার বাইরে ধার্য্য না হয় তার যথোচিত ব্যবস্থা করা।

৫। নারী ও বালক শ্রমিককে যাতে কোনো প্রকার বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত না করা হয় আইনের দ্বারা তার ব্যবস্থা করা।

৬। ১৪ বছরের কম বয়সের বালককে যাতে কোনো কারখানার কাজে নিযুক্ত না করা হয়, আইনের দ্বারা তার ব্যবস্থা করা।

এই দাবী গুলোকে সম্মুখে রেখে ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্‌ন্যাল কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করে নিতে হবে। অবশ্য বর্ত্তমান ধনিক বণিক শ্রেণীর নেতৃগণ এ সকল দাবীর যে সমর্থন করবেন না তা আমরা আগেই বলেছি। তাঁদেরকে বাদ দিয়ে কাজ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। দেশের সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ করার ইচ্ছে যে সকল কংগ্রেস কর্ম্মীর আছে, তাঁদের উচিত অবিলম্বে এ সকল দাবী কার্য্যে পরিণত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগা। শুধু তা নয়, জনগণের হয়ে যাঁরা কাজ করছেন, অথচ আজো কংগ্রেসে যোগদান করেন নি তাঁদের উচিত এ সকল দাবী নিয়ে অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করা। যেমন করে হোক, কংগ্রেসকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতেই হবে। তা যদি আমরা না করতে পারি তা হলে এ কংগ্রেস আমাদের সত্যকারের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

কংগ্রেসকে ধনিক-বণিকগণের আওতা হতে যেমন উদ্ধার করতে হবে ঠিক তেমনি একে ধনিক-বণিকগণের সহায়ক সাম্প্রদায়িকত্বের প্রচারক কর্ম্মী ও নেতৃগণের প্রভাব হতেও বিমুক্ত করতে হবে। শুদ্ধি-তব্‌লীগ, হিন্দু সভা ও হিন্দু সংগঠনের যারা লোক তাদেরকে কিছুতেই কংগ্রেস আসতে দেওয়া সঙ্গত হবে না। খিলাফৎ কমিটি, তন্‌জীম কমিটি, জমিয়ৎ-ই-উলামা এমন কি অল্‌-ইণ্ডিয়া মুস্‌লিম লীগের সভ্যগণকেও কিছুতেই কংগ্রেসে আসতে দেওয়া উচিত নয়। কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হবে এবং জনগণের অনুষ্ঠান হবে।

আড়াই জনের রাজনীতি

—*—

[উচিত বক্তা]

—:০:—

মণ্টেগু শাসন সংস্কারের ফলে শতকরা কম বেশী আড়াই জন লোক ভোট দিবার অধিকারী হইয়াছে। ইহাদেরই প্রতিনিধিগণ কাউন্সিল এসেম্‌ব্লিতে গিয়া দেশের নামে কথা ক'ন। ভারতীয় ধনিক-বণিক সম্প্রদায় ও তাহাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ইহারাই প্রতিনিধি। যুদ্ধের পর দেশীয় ধনিক বণিকগণকে হাতে রাখিয়া ভারতের জনসাধারণের শোষণ নিরাপদে চালাইবার জন্য বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিষ্টগণ শাসন সংস্কাররূপ বিরাট ঘুষ দিয়াছে। ভারতে কলকারখানা খুলিয়া ভারতের সস্তা শ্রমিকের সাহায্যে ভারতের সস্তা কাঁচামাল শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্রয় দ্বারা ধনলাভ করিবার মতলব ইহার পেছনে রহিয়াছে। সেইজন্য ভারতীয় কাপড়ের উপর শুল্ক উঠিয়া গেল, টাটা কোম্পানীকে কোটি কোটি টাকা সাহায্য করা হইতে লাগিল, আমদানি কলকব্জার উপর শুল্ক থাকিল না। এইরূপে দিন দিন ভারতবাসীর উপর কৃপাকণা বর্ষিত হইতেছে। ভারতের জাতীয় দল ইহাতে বড় খুশী। এমন কি স্বরাজ্য দল গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভোট দিয়া টাটা কোম্পানিকে বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাপড়ের শুল্ক উঠাইবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছে। গরীব করদাতার টাকা লইয়া এরূপ বদান্যতা সেই দলেই করিতে পারে, যাহার নেতা জমসেদপুরে বলিয়াছিলেন—A coolie is a coolie !

শাসন সংস্কারের ফলে যতদিন না প্রত্যেক কৃষক ও শ্রমিক ভোটদানের অধিকার লাভ করিতেছে, ততদিন কৃষক শ্রমিক দলের কাউন্সিল, এসেম্‌ব্লিতে বা স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রবেশ করা উচিত নয়। বাহির হইতে ভোটের অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন এবং কৃষক সঙ্ঘ ও শ্রমিক সঙ্ঘগুলি গড়িয়া তুলিয়া কার্য্যকরী ভিত্তির উপর স্থাপন করা—ইহাই প্রধান কাজ হওয়া উচিত। অবশ্য শ্রমিকগণের জন্য কোনও বিশেষ নির্ব্বাচন চক্র রচিত হইলে শ্রমিক প্রতিনিধিগণের আইন সভা সমূহে যাওয়া উচিত। কাজ তাহাতে কিছুই হইবে না—তবে নিজেদের আদর্শ প্রচারের দিক হইতে এবং সাধারণকে শ্রমিক আন্দোলনের মূল তথ্যগুলি সম্বন্ধে পরিচিত করাইবার জন্য আইন সভার শ্রমিক প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিতে পারেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমিক প্রতিনিধি হইয়া যাওয়া মানে গবর্ণমেণ্টের ঢাকের বাঁয়া হইয়া যাওয়া। আর যদি বা সাধারণ নির্ব্বাচন চক্র হইতে আইন সভায় প্রবেশ করিয়া শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ লইয়া যুঝা যায়, তবে সেটা যে কেবল ব্যর্থ হয়, তাহা নয়, যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া যাওয়া তাহাদেরই স্বার্থের বিরোধী হইতে হয়। অথবা শ্রীযুত তুলসী গোঁসাই বা দেওয়ান চমন লালের মত "লেবর লীডার" হওয়া হয়!

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলিয়া ভারতের বর্ত্তমান নেতাগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা চান শতকরা আড়াই জনের তাবেদারী করিয়া নাবালক শ্রমজীবীরা ক্রমশঃ রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে। দেশের জন্য যাহারা অকাতরে জেলে যায়, ফাঁসি কাঠে ঝোলে তাহারাও এই মতাবলম্বী। জনগণের অভ্যুত্থানের দিনে ইহারাই প্রকৃত বিপ্লব পরিপন্থী হইয়া উঠিবে এবং এখন হইতেই সে লক্ষণ বেশ বুঝা যাইতেছে। আর দেশীয় ধনিক বণিক সম্প্রদায় তো ফ্যাসিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। কংগ্রেসের দলে ভর্ত্তি হইয়া নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ পরিরক্ষণের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, আর কংগ্রেসের নীতিও এই স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূলে বেশ নিরাপদ করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহারা ইংরেজের নিকট এখনও ভারতের জনসাধারণের নামে কথা কন এবং শ্রমিক কৃষকরূপী হরিণের মাংস খাইবার যে তাঁহাদেরই একমাত্র অধিকার এই দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়-লড়িতেছেন। যেহেতু ব্যাঘ্ররূপী ধনিক বণিকগণ ভারতের সুন্দরবনে একই স্থানে ঐ হরিণগুলির সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা একই মায়ের সন্তান, সেজন্য বিদেশী ব্রিটিশ সিংহকে খাইবার অধিকার তাঁহারা দিতে রাজি ন'ন। ইহাই ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতি।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত যত নেতার উদ্ভব হইয়াছে সকলেই বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। তাঁহারা যতই ত্যাগ করুন, যতই ক্লেশ স্বীকার করুন, সঙ্কটকালে নিজের শ্রেণীগত স্বার্থের সমর্থন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে করিয়াছেন। বণিক গুরু মহাত্মা গান্ধী বা ধনিকগুরু পণ্ডিত মালব্য বা ইংরেজী শিক্ষিতের গুরু সি, আর, দাশ সকলেই এক আদর্শের ভজনা করিয়াছেন। নিজের জমিদারি বা কল না থাকিলেও

জমিদার ও কলওয়ালার হইয়া মহাত্মা গান্ধী প্রজা ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে গিয়াছেন। পণ্ডিত মালবীয় ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ধনিকতন্ত্রের শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য হিন্দু সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও ধনীর মুখ চাহিয়া শেষ জীবনেও কাজ করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণের মন অধিকার এক সময়ে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কার্য্যতালিকা বিপ্লবমূলক ছিল। ট্যাক্স বন্ধ ও আইন অমান্যে জনসাধারণের দাবী নিহিত ছিল এবং উপাধি, ইস্কুল, কলেজ, আদালত, কাউন্সিল প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় অগ্রসর হইবার ডাকে সত্যিকার একটা ভিত্তি ছিল। এই সংকল্প কাজে পরিণত করাইতে গিয়া যখন উচ্চ শ্রেণী সমূহের অসামর্থ্য প্রমাণিত হইল, তখন দেশের জনসাধারণ অসহযোগ আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। বিক্ষিপ্ত সেনানীগণকে একত্র করিবার চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল গঠন করিলেন। তাহার একটা দূর লক্ষ্যও ছিল যে ভবিষ্যতে জনসাধারণের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন করা। কিন্তু সে লক্ষ্য মরীচিকায় পরিণত হইল। বুর্জোয়া শ্রেণী চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনে নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের পরিপুষ্টির সুযোগ দেখিয়া গান্ধীর আন্দোলন ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্য দলে যোগ দিল। কাউন্সিলে ঢুকিলেই আদালত ইস্কুল কলেজে ঢোকার আর বাধা হইবে না—অনেকে ইহা বেশ বুঝিলেন। ক্রমশঃ মডারেট, ধমা-ধরা প্রভৃতির অনেকেও নূতন মুখোস পরিয়া স্বরাজী হইলেন। যাহারা চিত্তরঞ্জন বাঁচিয়া থাকিতে কংগ্রেসের চারি আনা মেম্বর হয় নাই, তাহারাও চাঁই হইয়া দাঁড়াইল। অসহযোগের বৈশাখী ঝড়ের দিনে যাঁহারা কোন্ গর্ত্তে লেজ গুটাইয়া লুকাইয়া ছিলেন—তাঁহারাও দেশের নেতা হইয়া শরতের আগমনে দেখা দিলেন। তাই, চিত্তরঞ্জন "দেশবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত হইলেন—তাই মরিয়াও তিনি বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের এত প্রিয়!

বিপ্লবের ধারাকে তিনি কাউন্সিলের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া নিরাপদ করিয়া দিয়াছেন, সমগ্র দেশের নামে কথা কহিবার জন্য তিনি পল্লী সংস্কারের ধূয়া তুলিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি আজ এত পূজার সামগ্রী। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার চরম আদর্শকে তিনি কাজে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই—তাঁহার নূতন রংরুটেরাই তাহা করিতে দিত না। চিত্তরঞ্জনের অকাল সমাধির জন্য ইহারাই দায়ী।

শতকরা আড়াই জনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাই তিনি গণ-স্বরাজের কাজে হাত দিতে পারেন নাই। তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত পোলিটিকাল মোহান্তগণ এখন সেই নীতি প্রাণপণে আঁকড়িয়া আছেন। কিন্তু "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো" যে কত বড় সত্যি কথা তাহা নির্য্যাতিত উৎপীড়িত শতকরা ৯৭॥ জনের আন্দোলন শীঘ্রই প্রমাণ করিয়া দিবে।

—

পল্লীর দুরবস্থা

—:০:—

[আবদুল হালীম]

—:০:—

অতীতে পল্লীর স্নিগ্ধ-শ্যামল শোভা দেখিয়া কাহার না চিত্ত পুলকে ভরিয়া উঠিত! তরুশ্রেণীর শীর্ষ-সবুজ পত্র-শোভা অন্তরের অন্তঃস্থলে রঙীন নেশার সৃষ্টি করিয়া প্রাণে হর্ষোৎপাদন করিত! একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিত। ঊষার স্নিগ্ধালোকে গ্রামের চাষীরা প্রভাতী গান গাহিতে গাহিতে মাঠে মাঠে লাঙল চষিত। শাখায় শাখায় দোয়েল, পাপিয়া প্রভাতী কূজন গাহিত। রাখালেরা ধেনু লইয়া মাঠে যাইত—মধ্যাহ্নে নিবিড়-বন-বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া রাখালী গান ধরিত—কেহবা কর্ম্মক্লান্তিতে সবুজ ঘাসের উপরে গামছা পাতিয়া আরামে সুখে নিদ্রা যাইত। বসন্তদূতের কাকলিতানে আম্রকুঞ্জ মুখরিত হইত। জ্যোৎস্নাহসিত রাত্রির মনোরম সৌন্দর্য্যে পল্লীচিত্র শতগুণে ফুটিয়া উঠিত। হৃষ্টপুষ্ট গাভীরা দুগ্ধদানে চাষীদের সবল-হৃষ্ট করিয়া তুলিত। গোলায় গোলায় ধান ধরিত না। কণ্ঠে কণ্ঠে গানের সুর ভাসিয়া বেড়াইত। কিন্তু সেই সমস্ত সুখ-সমৃদ্ধি আজ যেন অতীতের স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমস্ত যেন স্বপ্নকাহিনী বলিয়া মনে হয়। পল্লীর বর্ত্তমান বৈধব্যদশা দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়! পল্লীর বাহ্যশোভা দৃশ্যচিত্র সমস্তই কালের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। এমন কি বৃক্ষ, লতা, পাতা, সব যেন শুষ্ক-মৌন ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই গগনস্পর্শী সবুজ-শোভা পরিলক্ষিত হয় না। গ্রামের ধন সম্পদ লুপ্ত হইয়াছে। চাষীরা স্বাস্থ্য হারাইয়াছে। তাহাদের গাভীতে আর তেমন দুগ্ধ দেয় না। চাষের বলদও হীন-দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পল্লী আজ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। রোগে, শোকে, গুরুকরভারে, জমীদার, মহাজন, সুদখোরের নৃশংস অত্যাচারে, চাষীরা দুরবস্থার শোচনীয়তম সোপানে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহাদের গৃহে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগের ঔষধ নাই, হৃদয়ে আনন্দ নাই, আজ তাহারা নিঃস্ব, সর্ব্বস্বান্ত। কোনো রকমে ভগ্নদেহ যষ্টি লইয়া টিকিয়া আছে, এই মাত্র। পল্লীর এই জঘন্য হীনাবস্থার বিষয় ভাবিতে চক্ষু বাষ্প-সজল হইয়া উঠে। সিক্ত আঁখির করুণ চাহনীতে যে মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়া উঠে, বাস্তবিক তাহা অতি করুণ—বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড় বেদনাব্যঞ্জক। পানীয় জলের অভাবে দারুণ গ্রীষ্মে পল্লীবাসীদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। কর্দ্দমাক্ত ও পঙ্কিলময় জলপানে তাহারা কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি রোগের কবলে পড়িয়া দিন দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। শিশুমৃত্যুর হার রোজ রোজ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহারা আজ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে কেহ তাহাদের অবস্থার প্রতীকারে অগ্রসর হইতে চাহে না। হিংসা, দ্বেষ, ও তাহাদের অন্তর কলুষিত করিয়াছে। একটা নিরাশার ভাব তাহাদের চিত্ত জুড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা তাহাদের প্রতীকারের জন্য বলিলে তাহারা দৈবের উপর সব বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চায়। অন্যায় অধর্ম্মের কুশিক্ষা তাহাদের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে যে কিছুতেই তাহারা তাহাদের কুসংস্কারকে দূরে নিক্ষেপ করিতে রাজী নহে। শিক্ষার অভাবই

তাহাদের এই মনোভাবের একমাত্র হেতু। শিক্ষাকেও তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে চাহে না। নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীদের শিক্ষালব্ধ চাকুরীর মোহ তাহাদেরও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। নিরক্ষরতা দূরীভূত করার জন্য শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানলাভ এখনও হয় নাই। এখনও তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। পল্লীর অবস্থাপন্নদের যাহারা শিক্ষিত হইয়া শহরে বাজারে চাকুরী করিয়া থাকে—তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা-দীক্ষা চাষীদের উন্নতির পথের অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। চাষীর ছেলেও দুই হরফ্ লেখাপড়া শিখিয়া, চাষ, বাস ছাড়িয়া শহরে চাকুরীর উমেদার হইতেছে। জমীতে লোকাধিক্যই ইহার প্রধানতম কারণ। গৃহস্তের ৭/৮ বিঘার অধিক চাষের জমী নাই। ইহাই তাহার সর্ব্বস্ব। মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া পোষ্য সংখ্যা দশের ও উর্দ্ধে। গড়পড়তা প্রত্যেক লোকের দৈনন্দিন আয় ৴১০ পয়সার উর্দ্ধে নহে। জমীদারের খাজনা, গোমস্তার পার্ব্বণী, নায়েবের নজরানা, মহাজনের চক্রবৃদ্ধি-সুদ পরিশোধ করার পর তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই অনাটনে, অনশনে, দিনগুজরান কৃষকের পক্ষে বড় ক্লেশ-দায়ক হইয়া উঠে—তাই তাহারা স্বদেশ ও জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া, শহরে পাটের কলে, ফ্যাক্টরীতে, জাহাজে, ডকে, জেটিতে, এমন কি বহু দূরদেশে চা'বাগানে কাজ করার জন্য ছুটিয়া যায়। গৃহস্থের শিক্ষিত ছেলেদের ঐ একই দুর্দ্দশা, তাহাদেরও বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর অন্বেষণে শহরের অভিমুখে ছুটিতে হয়। শহরের মসীজীবীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহা বেশ উপলব্ধ হইবে।

ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতাও পল্লীবাসী চাষী ও কৃষকদের অন্তরে কম প্রতিক্রিয়ার কাজ করিতেছেনা—বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে—মোল্লা, মৌলবীদের হীন প্ররোচনা তাহাদের অন্তর বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান পরিচালিত সাম্প্রদায়িক সংবাদ পত্রগুলিও নিঃগৃহীত পল্লীবাসীদের মুক্তি-পথে যে সমস্ত পর্ব্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করিতেছে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সময় সাপেক্ষ। প্রতি বৎসরই কৃষক-চাষীরা চাষাবাদ ছাড়িয়া "দিন মজুরে' পরিণত হইতেছে। তজ্জন্য গ্রামে দিন দিন মাঠে খাটা শ্রমিকের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। চাষাবাদের জমী অবস্থাপন্ন রায়তের কিংবা জোতদার ও মহাজনের হাতে চলিয়া যাইতেছে। আর কৃষকরা তাহাদের অধীনে দিন মজুরীতে চাষের যাবতীয় কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের সম্পত্তি দেনার দায়ে নীলামে উঠিয়া জমীদার, মহাজনের করতল গত হইতেছে।

কৃষকদের কেহ বা উদরান্নের সন্ধানে শহরে গিয়া শ্রমিকে পরিণত হইতেছে। আজ পল্লীর প্রত্যেকের মন অশান্তিতে ভরপুর! কেবলমাত্র উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারিতেছে না। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ভাবেরও অভাব তাহাদের ভিতর পরিলক্ষিত হয়—যেমনটি শহরের শ্রমিকদের মধ্যে হয় না। আমার মতে যতই পল্লীর চাষীরা, কৃষকরা আরও অধিকতররূপে শোষিত ও নিষ্পেষিত হইতে থাকিবে—যতই উহাদের ভিতর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শহরের দিকে ছুটিবে, ততই উহাদের ভিতর সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টা দেখা দিবে। পল্লীর এহেন দুরবস্থা—তবুও পল্লীবাসীরা উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে তাহাদের শহরের ভ্রাতাদের প্রতি। তাহাদের ধারণা তাহাদের মুক্তির পথ শহরে তৈয়ারী হইতেছে। শহরের কর্ম্মীদের নেতৃত্বের প্রতীক্ষা তাহারা করিতেছে। তাহারা আজও চৌরীচোরীর ন্যায় এক শুভ মুহূর্ত্তের আশাপথ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। আজ প্রত্যেক স্বদেশসেবীর কর্ত্তব্য চাষী-ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতঃ মুক্তি সেনানীরূপে পরিচালনা করা। চীনের ন্যায় কৃষকবাহিনী যদি জাতীয়তা সংগ্রামে ঝম্প প্রদান করে তাহা হইলে ভারতের ভাগ্য অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইবে।—চাষীদের নিরক্ষরতা দূরীভূত করার উপর অনেকাংশে ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। শিক্ষা বিস্তারকল্পে বৈজ্ঞানিক নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যান্য দেশে, চীন ও রুষিয়াতে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে ভারতবর্ষেও সেই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। গত ৭/৮ বৎসরে সমগ্র রুষিয়াতে শতকরা ৫ হইতে ৮৪ জন লোক নিরক্ষরতা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে। ৪ বৎসর বয়স্ক বালক হইতে ৪০ বৎসরের প্রৌঢ় পর্য্যন্ত সকলকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। ৪০ হইতে অশীতিপর বৃদ্ধের শিক্ষা তাহাদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। তাহাদের উপর কোনো জোর জুলুম করা হয় না। নিম্নে রুষিয়াতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা সম্বন্ধে কলেজ এবং স্কুল সমূহের ও শিক্ষিতদের একটা মোটামুটি হিসাব প্রদত্ত হইল :—

রুষিয়াতে ৭১টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তদ্ব্যতীত তথায় বিশেষ শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা ৫২৪টি। তাহাকে Technical বলা হয়। এই সমস্ত স্কুলগুলি রুষীয় ছাঁচে নির্ম্মিত এবং উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর স্কুল পর্য্যায় ভুক্ত। উপরোক্ত ৭১টি শিক্ষাকেন্দ্র উচ্চ শিক্ষাকল্পে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত। ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় (ইহার ৭টি নূতন নির্ম্মিত) ১৭টি টেকনিক্যাল হাই স্কুল (৫টি নূতন); ৫টি মেডিক্যাল কলেজ (২টি নূতন); ৯টি কৃষি সম্বন্ধীয় উচ্চ বিদ্যালয় (১০টি নূতন); ১০টি Pedagogical Institutions অধ্যাপনা বিদ্যালয় (জারের সময় মাত্র একটি বর্ত্তমান ছিল), ২টি বিশেষ অর্থনীতি শিক্ষালয়, ইহার একটি নূতন, ৭টি আর্ট স্কুল, উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রগুলি নিম্নলিখিত প্রকারেও বিভক্ত করিতে পারা যায়। শিল্প ও টেকনিক্যাল ফ্যাকালটিস্ Industrial and Technical faculties ২১টি, কৃষি-বিদ্যালয় ২৫টি, মেডিক্যাল কলেজ ১৭টি, শোস্যাল ইকনমিক ১৪টি, Pedagogical ১৮টি, আর্টের স্কুল ৪টি. এই সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্র গুলিতে ছাত্র সংখ্যা ১১০,৪১৪।

সমাজের বিভিন্নস্তর হইতে যেরূপ ছাত্র সংগ্রহ করা হয়েছে তাহার হিসাব—শ্রমিক ও শ্রমিকদের সন্তান সন্ততি ২৪·৬% কৃষক ও তাহাদের সন্তান ২৬·২% চাকুরী জীবী ও তাহাদের সন্তান ৩৬·০% ইন্টেলেকচুয়াল ও তাহাদের সন্তান (Intellectual and otheir childern) ১০·৭% অন্যান্য ২·৫%।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাকারী প্রফেসরের সংখ্যা ২৬৪৬ জন
পুরুষছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৬৬,৮%
মহিলা ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩,২%
শিক্ষকদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৮৪,৬
মহিলার সংখ্যা শতকরা ১৫,৪%

কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে ছাত্রদের ঠিক করিতে হয় এবং তাহাদের নিজেদের কর্ম্ম-কুশলতার দ্বারাই শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। রিসার্চ্চ স্কুল গুলিতে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করা হয়। উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, ভূগোল, পাটীগণিত,

জ্যোতিষ বিদ্যা, রসায়ন সম্বন্ধেও গবেষণা হইয়া থাকে। ষ্টেট ক্রমশঃ এত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে যে পশ্চিম দেশীয় লোকের নিকটও ইহা ধারণাতীত। উপরোক্ত শিক্ষাকেন্দ্র গুলি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকরা পল্লীতে পল্লীতে কারখানায় কারখানায় শ্রমিক ও কৃষকদের সহিত একত্র কাজ করিয়া সংগঠনের কাজে সহায়তা করিয়া থাকে।

যতদিন আমাদের দেশে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষার বন্দোবস্ত না হইতেছে ততদিন পল্লীর উন্নতি সুদূর পরাহত। প্রচার কার্য্যের জন্য শিক্ষাকল্পে উন্নত ধরণের ট্রেনিং স্কুলের একান্ত দরকার। আশাকরি আমাদের দেশের নেতৃবর্গ ও যুবকবৃন্দের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইবে।

———

মোষের গাড়ীওয়ালার ওপরে জুলুম

—*—

শ্রীযুক্ত "গণবাণী" সম্পাদক মহাশয়দ্বয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,—

আমি যদিও কোন শ্রমিক সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট নই এবং ভারতে রুশীয়-কম্যুনিজম স্থাপনার সুফলে আমি অবিশ্বাসী, তবুও আমার এ পত্রখানি অনধিকার চর্চ্চার দৃষ্টান্ত বলে আপনারা গ্রহণ করবেন না এ বিশ্বাস আশা করি আমি আপনাদের উপর স্থাপন কর্ত্তে পারি।

বাঙ্গলার তথা ভারতের শ্রমিকদের প্রতি যখন আপনাদের দৃষ্টি আছে তখন এই ক'লকাতা সহরে মোষের গাড়ীর গাড়োয়ানদের সঙ্গে আপনাদের মুখ্য না হোক গৌণ সম্পর্ক থাকতে পারে। বর্ত্তমানে এদের রুজি মারবার জন্য যে দয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে রঙ্গমঞ্চে নামান হয়েছে আশা করি সে সংবাদ আপনারা পেয়েছেন। পশুক্লেশ নিবারণী সভাকে নিমিত্ত করে' বাঙ্গলা সরকার এক আইন জারী করেছেন যে এপ্রিল মাস থেকে বেলা ১২টা হ'তে মোষের গাড়ীর মালটানা ও পথে চলাচল তিন মাসের জন্য নিষেধ। এই আইনের ফলে ক'লকাতার কয়েক হাজার গাড়োয়ানের অর্দ্ধাশনের ব্যবস্থা হয়েছে। পশুক্লেশ নিবারণী সভা বলেন যে মোষ হচ্ছে জলচারী জীব—তীব্র গ্রীষ্মে তার মোট টানা অত্যন্ত ক্লেশকর; তাই তাকে বিশ্রাম দেওয়ার এই চেষ্টা।

আজকে হঠাৎ মোষের ক্লেশে এই আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানটির কুমীরে কান্না কেন সুরু হ'ল দুঃখের বিষয় সেটা কেউ তলিয়ে দেখেছেন ব'লে মনে হয় না। ১০২ ডিগ্রী গরমে মোষের মাল টানতে যে খুবই কষ্ট হয় সে কথা আমরা মোটেই অস্বীকার কচ্ছি না। কিন্তু মোষ ছাড়া আরও ঢের জানোয়ার আছে যাদের ঠিক একই রকম কষ্ট হয়। গাড়ীর ঘোড়াগুলো দুপুরের রৌদ্রে কেমন ধুঁকতে থাকে তা' সবারই চোখে ফি দুপুরেই পড়ে। গরুর গাড়ীর গরুগুলোরও দুর্দ্দশা বড় কম নয়। কিন্তু এদের ব্যথায় আমাদের পশুক্লেশ নিবারণী সভা কোন ক্লেশ বোধ করেন নি—করবারও বিশেষ প্রয়োজন নেই যে তা নীচের কথাটা বিবেচনা করলেই বোঝা যায়।

মোষের গাড়ীগুলি হচ্ছে পৌনে একটন হতে ১½ টন মালটানা মোটর লরীগুলোর শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। মোষের গাড়ী আস্তে চলে বটে কিন্তু তাদের ভাড়াও অনেক অল্প। সকলেরই ত আর সাত তাড়াতাড়ি মাল পাঠাবার বা মাল আনার দরকার নেই; তাই তাদের কাছে মোষের গাড়ীর প্রয়োজন—লরী তারা চায় না। লরীর ভাড়া পোষান দুষ্কর।

মোষের গাড়ীগুলোকে যদি ১২টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত বন্ধ করে'রাখা যায় তাহলে ছোট লরীগুলার মরসুম পড়ে যাবে। তাই আজ গরীব গাড়োয়ানের ভাত মারবার জন্য দয়াদেবীর শুভ আগমন। জেটী থেকে শেষ রাত্রে মাল নিলেও বেলেঘাটা বা হাটখোলায় বেলা ১২টার মাঝে মাল পৌঁছিয়ে দেবার সাধ্য মোষের গাড়ীর নেই। তাই ছোট লরীগুলি বাধ্য হয়েই ব্যবসায়ীদের কিনতে হবে আর কলকাতার বিদেশী লরীর ব্যবসায়ীদের হবে পোয়াবারো।

পশ্চিমের রাজনীতি এমনি সূক্ষ্ম সূত্র ধরেই চলে। আগে মিশনরী, পরে বণিক, তারপরে সৈন্য। এখানেও তেমনি পশুক্লেশ নিবারণী সভারূপী মিশনারীর হাত ধরে লরীওয়ালা বণিক আসছে—বাধা দিলেই আসবে পুলিশ।

সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা এই যে আমাদের রাজনীতির বড় পাণ্ডা ইংরেজী কাগজওয়ালারা এই কথাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও বুঝবেন না—এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি তাঁরা করতে নারাজ; বোধ হয় ফোর্ড ও অ্যালেনব্যারির বিজ্ঞাপন ছুটে' যাবার ভয়ে। এপ্রিল মাসের গোড়াতেই আমি "ফরওয়ার্ড", "বেঙ্গলী", "অমৃতবাজার পত্রিকা"তে এ বিষয়ে লিখি, অথচ তাঁরা আজো পর্য্যন্ত উচ্চবাচ্য করলেন না। "সব শেয়ালের এক রা।"

কয়েক হাজার লোকের রুজি আজ অর্দ্ধেকের চাইতে বেশী কমে গেছে। দিন দিন তাদের আয় কমেই যাবে কারণ যে ব্যবসায়ী একখানা লরী এখন ঠেকে কিনবে সে-ই ত তাদের হাত থেকে ছুটে গেল—এমনি করে' ২।৩ বছরের মাঝে এই হাজার হাজার লোককে নিরন্ন করবার যে ফন্দী বের করা হল তার বিরুদ্ধে প্রতীকার কি?

যে নিয়মে আমাদের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস পেয়েছে, ঠিক সেই নিয়মেই আরেকদল শ্রমিক ও তাদের পোষ্যদের নিরন্ন করে' একটা বিদেশী ব্যবসায়কে এ দেশে অস্বাভাবিক ভাবে উন্নত করা হোল। লাখ লাখ টাকা শোষণের আরেকটি মুখ খোলা হল।

আমাদের দৃষ্টি কবে খুলবে? ইতি

বশম্বদ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়।

———

মন্তব্য—এ পত্র লেখক কলিকাতার মোষের গাড়ীওয়ালাদের ওপরে জুলুমের কথা লিখতে যেয়ে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলেছেন যে তিনি ভারতে রুশীয় কম্যুনিজম্ স্থাপনার সুফলে অবিশ্বাসী। **গণবাণী**র একজন সম্পাদক কম্যুনিষ্ট বলেই বোধ হয় তিনি এ কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বিশ্বাসের ওপরে এতটুকুও বল প্রয়োগ করার ইচ্ছে আমাদের নেই, তবে আমরা জানতে চাই যে তিনি "রুশীয় কম্যুনিজম্" বলতে কি মনে করেছেন? কম্যুনিজম্ কোনো একটা বিশিষ্ট দেশের ব্যাপার নয়। একদল মানুষ যে সমগ্র জগতের জনগণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক ভাবে শোষণ

করে আসছে কম্যুনিজম্ হচ্ছে তারি মূর্ত্ত-প্রতিবাদ। অতএব, এটা যে একটা সমগ্র জাগতিক ব্যাপার সে কথা বলাই বাহুল্য। "রুশীয় কম্যুনিজম্" বলে একটা কোনো জিনিস থাকতেই পারে না। আর যদি থেকে থাকে তা আর কিছু হতে পারে, কিন্তু কম্যুনিজম্ নিশ্চয়ই নয়। বর্ত্তমানে রুশ দেশে যে "ষ্টেট" আছে তাতে কম্যুনিজম্ মতবাদ অবলম্বন কারীদের প্রভাব প্রতিপত্তি কিছু বেশী, আর বেশী বলেই সে ষ্টেটের নামের সহিত কোনো দেশেরই নাম সংযুক্ত নেই। যেমন ফরাসী গণতন্ত্র। জার্ম্মান গণতন্ত্র ও আমেরিকার যুক্ত ষ্টেটস্ প্রভৃতি ষ্টেটের নামের সহিত এক একটা দেশের নাম সংযুক্ত আছে রুশিয়ার বর্ত্তমান ষ্টেটের নামের সহিত তেমন কোনো দেশের নাম সংযুক্ত নেই। সকলেই জানেন, রুশে যে ষ্টেট এখন আছে তার নাম হচ্ছে "ইউনিয়ন অব্ দি সোবিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিক"। এতে রুশের নাম কোথাও নেই। এ অবস্থাতেও যাঁরা "রুশীয় কম্যুনিজম্" প্রভৃতি নামের সৃষ্টি করবেন তাঁদেরকে যে কি বলতে হবে তা জানিনে।

তার পরে, গাড়ী ওয়ালাদের কথা। মোটর লরীর মত জিনিসের আগমনে মোষের ও গোরুর গাড়ীর মত জিনিসের ক্ষতি এবং ক্রমে ক্রমে বিলোপ সাধন নিশ্চিতই হবে। বর্ত্তমান প্রণালীতে এর কোনো প্রতিকার হতে পারে না। তবে এ সকল জিনিসের ওপরে জন সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত যদি হয় তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু, ধনিক-প্রথা যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ তা হতে পারেনা। পত্র লেখক কম্যুনিজমে যখন অবিশ্বাসী, তখন ধনিক প্রথাতে নিশ্চয়ই বিশ্বাসবান। কাজেই, তাঁর লোক-হিতৈষণার ভাব থেকে তিনি যে মোষের গাড়ীর গাড়োয়ানদের জন্যে প্রাণে বেদনা পাচ্ছেন তার এমন কোনো বিশেষ মূল্য নেই।

সম্পাদক—"গণবাণী"

কৃষক সভা

বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ময়মন সিংহ জেলার গড় বাজাইলে এক কৃষক সভার অধিবেশন হয়ে গেছে। ময়মনসিংহ কৃষক ও শ্রমিক দলের সেক্রেটারী ফয়জুদ্দীন হোসেন সাহেব এবং ময়মনসিংহ সদর মহকুমা কৃষক কমিটির সহকারী সভাপতি শ্রীযুত প্রমথ নাথ বসু বক্তৃতা করেছিলেন। প্রায় এক হাজার লোক সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। "গণবাণী"র বহুল প্রচার, স্থানে স্থানে কৃষক সঙ্ঘ সমূহের সংগঠন ও আগামী বৎসর ময়মনসিংহে সমগ্র বঙ্গীয় কৃষক দল গঠন করা সম্বন্ধে সভায় আলোচনা করা হয়। তা ছাড়া নিম্নের লিখিত ৩টি প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

(১) এই সভা বাংলার কৃষকগণকে অনুরোধ করছে যে তাঁরা যেন অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গঠন করেন।

(২) বিগত বৈশাখ মাসে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির দ্বারা আগামী বৎসরে ময়মনসিংহে যে এক সমগ্র বঙ্গীয় কৃষক সম্মিলন আহ্বান করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, এ সভা সর্ব্বান্তঃকরণে তার সমর্থন করছে।

(৩) এ সভা ঘোষণা করছে যে জমীদারগণের ক্রমশঃ খাজনা বৃদ্ধি করার দরুণ কৃষকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উস্মান আলী মৃধা
গড়বাজাইল, ময়মনসিংহ

—০—

প্রেসিডেন্টের কীর্ত্তি

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত বোয়ালখালী থানার ৭নং ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট দেলাওয়ার হোসেন চৌধুরী একজন ক্ষমতাশালী জমিদার ও মহাজন। তিনি ইলেকসানে ভোটের দ্বারা মেম্বার নিযুক্ত হন এবং পরে প্রেসিডেণ্ট পদ লাভ করেন। তাঁহার গ্রামবাসী রশিদ খাঁর পুত্র মহরম খাঁর সহিত তাহার পূর্ব্ব মনোমালিন্য ছিল। মহরম খাঁ একজন কৃষক ও শরবত বিক্রেতা। তাঁহার অবস্থা অবশ্য অন্যান্য কৃষকগণ অপেক্ষা অনেকটা ভাল। তাই, প্রেসিডেণ্ট মহোদয় তাঁহাকে অন্য কোন প্রকারে জব্দ করিতে না পারিয়া এবার তাঁহার উপর ইউনিয়ন কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন পঁয়তাল্লিশ টাকা। ইহাতে গ্রামের সমস্ত কৃষকগণ মিলিয়া প্রেসিডেণ্ট বাহাদুরের বিপক্ষে সরকারের নিকট এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ফল এখনও জানা যায় নাই। উক্ত থানার ৬নং ইউনিয়নের এলেকাধীন জমিদার সারদারূপা লালার চেয়ে বড় ধনী আর নাই। তাঁহার ইউনিয়ন কর হচ্ছে ত্রিশ টাকা মাত্র। এবং প্রেসিডেণ্ট সাহেব নিজে বড় জমিদার হইয়াও নিজের উপরে টেক্স ধার্য্য করিয়াছেন নয় টাকা মাত্র। কৃষকগণকে এইরূপ ভাবে নিষ্পেষিত করিয়াই জমীদার ও মহাজনগণ তাঁহাদিগকে কাবু করিয়া রাখিতে চায়।

ভোট দাতৃগণ আপনাদের নিযুক্ত মেম্বরগণের স্বরূপ জানিয়া রাখুন। আবার ইলেকসান নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। সে সময়ে মানুষ চিনিয়া ভোট দিতে পারিবেন।

জনৈক স্থানীয় লোক

—০—

বিবিধ প্রসঙ্গ

—*—

সাম্প্রদায়িকত্বের নেশা

গত কলিকাতার হাঙ্গামার সময় থেকে আমাদের কতকগুলি খবরের কাগজকে ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকত্বের নেশায় পেয়ে বসেছে। কোনো না কোনো প্রকারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার না করলে এ সকল কাগজের পরিচালকগণের খাবার হজম হয়না। আমাদের দৈনিক সহযোগী "আনন্দ বাজার পত্রিকা" এ বিদ্বেষ প্রচার কার্য্যে আর সকল কাগজ ওয়ালাদের হার মানিয়ে দিয়েছেন। এ কাগজের পরিচালকগণ খুব সম্ভবতঃ আশা করে বসেছিলেন যে মুসলমানদের কোরবাণীর সময়ে একটা না একটা কিছু হাঙ্গামা বাধবে। কিন্তু, তাঁদের দুর্ভাগ্য বশতঃ কোরবাণীর সময়ে এবারে কোনো হাঙ্গামা বাধেনি। অন্য কোনো দিক থেকেও তেমন বড় কোনো হাঙ্গামার খবর

তাঁরা পাননি। তাই, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের একটা ঘটনা তাঁরা ডবল কলমে শিরোনাম দিয়ে গত ৫ই আষাঢ়ের কাগজে প্রকাশ করেছেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভে "আনন্দ বাজার পত্রিকা" একটা মন্তব্য এই বলে লিখেছেন যে হিন্দু মুসলিম বিরোধ কিছু আজ নূতন করে ঘটেনি। এ বিরোধ শতবর্ষ পূর্ব্বেও এ দেশে বর্ত্তমান ছিল। প্রমাণ স্বরূপ ১৭৮৯ সনের ১৫ই অক্টোবরের কলিকাতা গেজেটের বরাত তাঁরা দিয়েছেন। এ প্রকারের মন্তব্য প্রকাশ করার জন্যে একশ' বছরের আগেকার ঘটনার উল্লেখ করা কিছু অন্যায় কাজ নয়। কিন্তু, ডবল কলমে ডবল গ্রেট টাইপের হেডিং দিয়ে ১৩৮ বছর আগেকার ঘটনাকে আজকের ঘটনার মত করে বিবৃত করার মানে কি কিছু আছে? কলিকাতা হাঙ্গামার পূর্ব্বে "আনন্দ বাজার পত্রিকা"র প্রচার খুব কমে গিয়েছিল। লোকসান খেয়ে খেয়ে কাগজের মালিকগণ ভয় খেয়ে গিয়েছিলেন যে হয়তো বা কাগজ বন্ধ করে দিতে হবে। হঠাৎ কলিকাতার হাঙ্গামা বেধে যাওয়াটা "আনন্দ বাজার" এর কর্ত্তৃপক্ষের জন্যে আশিস্ স্বরূপ হয়েছিল। এ উপলক্ষে খুব প্রচণ্ডভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করার ফলে "আনন্দ বাজার" এর প্রচার আশাতীতরূপে বেড়ে গেছে। সেই থেকে "আনন্দ বাজার" পত্রিকার নীতি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করা। দেশের মন্দ হোকে, ভালো হোক্, তাতে কিছুই আসে যায় না,—যে কোনো প্রকারে "আনন্দ বাজার"এর প্রচার বাড়ানোই হচ্ছে কাজ। এ কাগজের সংস্রবে এমন সব লোকও আছেন যাঁরা এক সময়ে সর্ব্বস্ব পণ করে দেশোদ্ধারের কাজে লেগেছিলেন, আর আজকের দিনে তাঁরা লেগেছেন দেশকে পণ করে তাঁদের নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের কাজে। কালের আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তনে এমনি সব ব্যাপার ঘটে থাকে, কিন্তু, দুঃখের বিষয় যে এসব দেখে শুনেও আমাদের কোনো চৈতন্য হচ্ছে না।

—

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা

গণবাণীর অন্যতর সম্পাদক মুজফ্ফর আহমদ একজন কম্যুনিষ্ট। কানপুরের কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় সে কয়েদ খেটেছে,—অতএব সে হ্যারিসন রোডের দোতালায় বাস না করে শহরের জঞ্জালপূর্ণ বস্তিতে খোলার ঘরে বাস করেনা কেন, সে মোট বয়না কেন, রিকশ' টানেনা কেন, জুতো পরে কেন, এ সকল প্রশ্ন এমন সব লোকেরা জিজ্ঞেস করছেন যাঁরা আপনাদের সর্ব্বজান্তা দেশোদ্ধারকারী মনে করে থাকেন। এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্ব্বে আমরা প্রশ্নকারীদের একটা পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি যে তাঁদের কোনো কিছু তলিয়ে বোঝার শক্তি যখন একেবারেই গিয়েছে তখন তাঁরা এতকাল গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবে মরেন নি কেন? "কম্যুনিজম" এর মতবাদ গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ নয়। মানুষের জীবনের খাওয়াপরার নিরিখকে কম্যুনিষ্টরা সকলেরই জন্যে বাড়াতে চায়,—গান্ধীওয়ালাদের মত অধিকাংশের জন্যে কমিয়ে অল্পাংশের জন্যে নয়। কম্যুনিজমের আদর্শ খোলার ঘরে বাস করা, খারাব খাওয়া ও খারাব পরা নয়। তারা চায় সকল মানুষ ভালো খাবে, ভালো পরবে এবং ভালো ঘরে বাস করবে। কম্যুনিষ্টরা সমাজের পরগাছা হয়ে সমাজের উৎপাদক শ্রেণীর লোকদিগকে "ছোট লোক" মনে করে কখনো ঘৃণার চোখে দেখে না। পরন্তু, ভদ্রলোকত্বের দাবীকে ঘৃণিত দাবী বলে তারা সর্ব্বদাই পরিহার করে থাকে। কোন বিষয়ের সমালোচনা করার পূর্ব্বে জানা উচিত সে বিষয়টা কি? কিন্তু, আমাদের এ পণ্ডিত মূর্খের দল বিষয়টা সম্বন্ধে কিছু না জেনেও সে সম্বন্ধে সমালোচনা করতে কখনো পেছ পাও হন না। রিক্শ' টানা, মোট বওয়া খারাব কাজ নয়, খারাব কাজ হচ্ছে রিক্শ' ওয়ালা আর মুটেকে ষড়যন্ত্র করে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এই পণ্ডিত মূর্খের দল সমাজ থেকে পরগাছার মত বেড়ে উঠে আজ প্রকৃত সমাজকেই ঘৃণার চোখে দেখছে। যাদের রক্তপান করে এঁরা বেড়ে উঠেছেন তাদেরকেই ঘৃণার চোখে দেখছেন এঁরা, বুঝতে পারছেন না যে তাঁদেরকেও "অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" আমরা বলে রাখছি যে আর বেশী দিন ভদ্রলোকত্ব করা চলবে না। মেট্রিকুলেশন ও আই-এ পাস করে ট্রামের কণ্ডাক্টরীও তাঁরা করতে আরম্ভ করেছেন, পাটের কলের মজুরীও তাঁদেরকে অচিরে করতে হবে। মিথ্যা অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে মিথ্যা স্বপ্ন দেখে কিছু মাত্র লাভ নেই। ভদ্র লোকদের জন্যে শুধু স্বরাজ আসবেনা, এটা তাঁরা নিশ্চিত জেনে রাখুন। স্বরাজ লাভ হবে জনগণের জন্যে এবং জনগণের দ্বারা। আমাদের হিতৈষী বন্ধুর দল আমাদের ভালবাসেন না, যেহেতু আমরা উচিত কথা বলে থাকি। কিন্তু, একারণে যা তা বলে আপনাদের মূর্খতার পরিচয় যে তাঁরা কেন দিচ্ছেন তাত আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে। তাঁরা আমাদের দেখতে পারেন না (অবশ্য স্বার্থের খাতিরে) বলে আমাদের সব চলনই বাঁকা দেখতে পাচ্ছেন।

—০—

জেগে ঘুমানো

যে লোক সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ে তাকে জাগ্রৎ করা খুবই সহজ। কিন্তু, জেগে যে ঘুমোবে তাকে জাগিয়ে তোলা যে সে কাজ নয়। আমাদের সহযোগী "ফরওয়ার্ড" অনেক সময় জেগেই ঘুমিয়ে থাকেন। কাজেই "ফরওয়ার্ড"এর সহিত বোঝা-পাড়া করতে হলে বেগ মন্দ পেতে হয় না। "ফরওয়ার্ড" নিজে যা বোঝেন তাকে ত ষোলো আনারও কিছু বেশী মনে করেন, আর যা পসন্দ করেন না তাকে মনে করেন "বুদ্ধিবৃত্তির দারিদ্র্য" "অনুকরণ প্রিয়তা" কিংবা "অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা।" এ কারণেই নাকি বিদেশী প্রণালী ও বিদেশী আদর্শ আমাদের সকল আন্দোলনকারীরাই অবলম্বন করে থাকে। "মডারেট"রা পার্লামেণ্টের প্রণালীর নামেই দিব্য করে থাকেন, আর ন্যাশন্যালিষ্টরা সকল পাঠ গ্রহণ করে থাকেন ম্যাটসিনির শিষ্যদের কেতাব থেকে। (গ্লাডষ্টোনের কেতাব থেকে নয় কি?) "ফরওয়ার্ড" বলছেন—এ ছাড়া আরো একটা নবীনতর দলের সৃষ্টি হচ্ছে যারা সর্ব্বহারা শ্রমিকগণের প্রভুত্ব অর্থাৎ Dictatorship of Proletariat এর কথা ব্যতীত আর কিছু ভাবতেই পারে না। এ কথাটি বলাই "ফরওয়ার্ড" এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যারা সর্ব্বহারা শ্রমিকগণের প্রভুত্বের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে কেবল মাত্র তাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির দারিদ্র্য ও অনুকরণ প্রিয়তা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করলে ভালো শোনায় না। তাই "ফরওয়ার্ড" মডারেট ও ন্যাশনালিষ্টদের কথাও খানিকটা টেনে এনেছেন। আমাদের বন্ধু এস,এ, ডাঙ্গে

কানপুরের মজুরদের সভায় এক বক্তৃতা করেছেন। সে বক্তৃতাতে তিনি বলেছেন, কম্যুনিষ্টরা চায় যে যারা খেটে খায় তারাই জাতির ওপরে প্রকৃত প্রভুত্ব করবে। এ কথ্‌টা "ফরওয়ার্ড" মোটেই পছন্দ করতে পারেন নি, আর পারেন নি বলেই এত কথা বলা। নিঃস্ব দিনমজুরের সংখ্যা দিন দিনই দেশে বেড়ে যাচ্ছে, আর তাদেরি শ্রমের ধনে ভাগ বসিয়ে ধনিক-বণিক ও জমিদারের দল ভোগে বিলাসে দিন কাটাচ্ছেন, অথচ কোনো কাজ তাঁদেরকে করতে হর্চ্ছে না। দিন মজুররা এ অত্যাচার চিরকাল সইবে না। তাদের উত্থান অনিবার্য্য। এ উত্থানে কৃষকগণ তাদের অনুসরণ করবে। "ফরওয়ার্ড"এর পরিচালকরা যে এ সব না বোঝেন তা নয়, তবে তাঁরা জেগে ঘুমোচ্ছেন। তার কারণ, মজুরদের অভ্যুত্থানে তাঁদের অনেক অসুবিধে হবে। কিন্তু, সেই জন্যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করাটা কি "ফরওয়ার্ড"এর পরিচালকগণের পক্ষে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক? দিনের আলোককে কেউ কি কখনো ঢেকে রাখতে পারে?

—০—

বোম্বের চিঠি

—০—

২৫শে জুন, ১৯২৭

ট্যারিফ কমিশনের রিপোর্ট যখন থেকে ছাপা হয়েছে তখন থেকে বোম্বের শ্রমিক মহলে এ চর্চ্চাই চলেছে যে কলের মালিকরা কি করবে? কাপড়ের কলের শ্রমিকগণের মজুরী কমিয়ে দেওয়া হবে এরূপ একটা জনরব উঠেছিল, কিন্তু মালিকদের তরফ থেকে অবশ্য তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তবে আসল কথা এই হচ্ছে যে কলের মালিকগণ যে কোনো মুহূর্ত্তে মজুরী কমিয়ে দিতে পারে। এই করে গবর্ণমেণ্টকে ভয় প্রদর্শন করাই তাদের উদ্দেশ্য হবে। শ্রমিকদের মধ্যে যেরূপ চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তাদের বর্ত্তমানের কম মজুরীর ওপরেও যদি হস্তক্ষেপ করা হয় তা হলে তারা তা কিছুতেই নীরবে সহ্য করবেনা। এর হেস্তনেস্ত করার জন্যে তারা সংগ্রাম চালাতে থাকবে। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে শ্রমিকদের আরো ভালো উৎপাদনের ওপরে জোর দিয়েছেন। কিন্তু, ভালো উৎপাদন শ্রমিকরা তখনি করতে পারে যখন তারা ভালো খেতে পরতে পায়। তার জন্যে মজুরীর হার বাড়ানোই দরকার, কমানো নয়। মিঃ এন, এম, জোশী (তিনি কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট) যে বর্ণনা প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি লিখেছেন যে শ্রমিকরা মালিকদের সাথে আপোসে একটা কথাবার্ত্তা চালাতে প্রস্তুত আছে। তাতে তারা আলোচনা করবে কি করে তাদের কাজের ক্ষমতা বাড়াতে পারা যায়, আর কি করেই বা মজুরী সংক্রান্ত গোলমাল মেটানো যেতে পারে। কিন্তু, আমরা জানি এসব ব্যাপারের নিষ্পত্তির জন্যে কেউ কখনো কলের মালিকের ওপরে নির্ভর করতে পারে না।

অল ইণ্ডিয়া ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের আফিসের কাজ কর্ম্ম এখানে অত্যন্ত প্রাণহীন ভাবে চলেছে। এ কংগ্রেসের একজন এডমিনেষ্ট্রেটিভ সেক্রেটারী আছেন, তিনি থাকেন পুনাতে। কাজেই কাজ কর্ম্ম কিছুই দেখা শোনা করতে পারেন না। আশা করা গিয়েছিল যে নবশক্তি কংগ্রেসের ভিতরে প্রবেশ করাতে তার কাজ কর্ম্ম অনেকটা আমূল সংস্কারের দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু, এডমিনেষ্ট্রেটিভ সেক্রেটারীর অলসতার দরুণ তার কিছুই হয়ে ওঠেনি। তিনি যদি এখনো তাঁর অলসতা পরিহার করেন তা হলে হয়তো এখনো কিছু কাজ করা যেতে পারে।

বোম্বের নবগঠিত শ্রমিক ও কৃষক দল (ওয়াকার্স এণ্ড পিজ্যাণ্টস্ পার্টি অব বোম্বে) এখনো বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে ভালো করে মাথা তুলতে পারেনি। তবে সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে এ দলের পক্ষ থেকে যে প্রোগ্রাম (কর্ম্ম-তালিকা) পেশ করা হয়েছিল তার সম্বন্ধে "বোম্বে ক্রনিকল্" খুব অনুকূল মত প্রকাশ করেছিল। এমন কি আপনাদের নগরের "ফরওয়ার্ড" পর্য্যন্ত এর অনুকূলে দু'চার কথা বলেছে। এ সবের দ্বারা এতটুকু অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে যে এ দলের অস্তিত্বটা অন্ততঃ সবাই মেনে নিচ্ছেন। এ দল একটা প্রেস কর্ম্মচারীসঙ্ঘ গঠন করেছে। দলের যে শ্রমিকসঙ্ঘ মণ্ডলী আছে তার নেতাই হচ্ছেন এ প্রেস কর্ম্মচারী সঙ্ঘের সেক্রেটারী। এ দলের মারাঠী ভাষায় "ক্রান্তি" নামক একখানা কাগজ বেরুচ্ছে! এ কাগজখানা শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রচার কার্য্য চালাচ্ছে। তবে এ প্রচার কার্য্য ততক্ষণ খুব বেশী ফলপ্রসূ হবেনা যতক্ষণ না শ্রমিকগণকে "বুর্জ্জোয়া" নেতৃগণের কবল থেকে বিমুক্ত করা হয়। যা হোক ইতোমধ্যে নূতন সঙ্ঘ গঠনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি দোকানের কর্ম্মচারীদের একটি সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে।

গত মাসে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক অধিবেশন এখানে হয়ে গেছে। সেক্রেটারীর রিপোর্ট পঠিত ও গৃহীত হওয়ার পরে নূতন নিয়মাবলী গ্রহণ করা হয়েছে। নূতন কর্ম্মকর্ত্তৃগণও নির্ব্বাচিত হয়েছে। এখন থেকে দলের কেন্দ্র কার্য্যালয় স্থায়ীভাবে বোম্বেতেই থাকবে।

বিখ্যাত কানপুর কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ড প্রাপ্ত শ্রীযুত শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে গত মাসে কারা বিমুক্ত হয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছে, এমন কি বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। "কংগ্রেস হাউস্" এ একটা অভিনন্দন সভায় তিনি বলেছেন যে তিন বছর কারাগারের অভ্যন্তরের যন্ত্রণা ভোগ করা সত্ত্বেও তিনি এখনো কম্যুনিষ্টই আছেন। পুনাতে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন তা থেকে অনেকে অনেক কথা তাঁর সম্বন্ধে বলছেন বটে, তবে তাঁর সাথে আলাপের দ্বারা আমি জানতে পেরেছি যে, যে কোনো অবস্থাতে তিনি "কম্যুনিজম্"এর নীতি ও মত থেকে বিচ্যুত হবেন না। সম্প্রতি তিনি তাঁর বন্ধুদের আহ্বানে কানপুর গিয়েছেন। সেখান থেকে বেনারস হয়ে তিনি জুলাই মাসের শুরুতে বোম্বেতে ফিরে আসবেন।

—০—

শ্রমিক জগৎ

গত বৃহস্পতিবার ২৩শে জুন তারিখে বেঙ্গল ট্রেড্ইয়ুনিয়ন ফেডারেশন (অলইণ্ডিয়া ট্রেড্ইয়ুনিয়ন কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটি) ও প্রেস কর্ম্মচারী সমিতির (প্রেস এমপ্লইস্ এ্যাসোশিয়েশনের) তরফ হইতে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত জে এম্ সেনগুপ্ত মহাশয়কে তাঁহার তৃতীয়বার মেয়র নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন দেওয়া হয়। আমরা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছি যে প্রায় দুইশত নিমন্ত্রণ পত্র দেশের তথাকথিত নেতৃবর্গকে পাঠান হইয়াছিল এবং করপোরেশনের প্রত্যেক অলডার ম্যানকে ও কৌন্সিলারকেও চিঠি পাঠান হইয়াছিল। তথাকথিত কংগ্রেস নেতারা শ্রমিকদের এই অনুষ্ঠানটির সহিত যে ভাবে অসহযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের শ্রমিক প্রীতির নিদর্শন বেশ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ডাক্তার জে, এম, দাসগুপ্ত ভূতপূর্ব্ব শ্রমিক নেতা মিঃ এস, এন্, হালদার, আমাদের স্পষ্ট বক্তা বন্ধু শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার ও ছয় সাত জন করপোরেশনের কাউন্সিলার যাঁহারা এই অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু অল্ডারম্যান দাউদ, যিনি ফেডারেশনেরও একজন চাঁই, উপস্থিত হইতে পারেন নাই কেন ?

———

সত্য কথা বলিতে কি নেতা মহাশয়দিগের অদ্ভুৎ শ্রমিক প্রীতি দেখিয়া মনে হয় যে গরীব শ্রমজীবিরা তাঁহাদের নিকট হইতে যত দূরে থাকেন ততই ভাল। কৃষক ও শ্রমিকদের রাষ্ট্রনৈতিক দাবী যে জমিদার, বড় ব্যারিষ্টার, উকিল, এ্যাটর্ণি বা ডাক্তারের দাবী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং নেতারা যে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীগুলি সহজে তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনভুক্ত করিতে চান না তাহা অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বম্বে অধিবেশনে প্রস্তাবের দুর্দ্দশাই সপ্রমান করিবে। শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশয় অভিনন্দন দুইটির যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে গুটি কয়েক বাঁধা বুলি ছাড়া শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার যা জ্ঞান তাহা চন্দ্রলোকের অধিবাসী অপেক্ষা একটুও বেশী নয়।

———

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বর্ত্তমান কলিকাতা করপোরেশনে যে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের হস্তে অনেকটা ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সে বিষয় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখা যাক কংগ্রেস নেতারা করপোরেশন দখল করিয়া কি ভাবে দরিদ্র শ্রমজীবীগণের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ফেডারেশনের অভিনন্দনে বলা হইয়াছে :—

“স্বর্গগত দেশবন্ধুই সর্ব্বপ্রথম করপোরেশনে দরিদ্রগণের মঙ্গলার্থে এক কার্য্যধারার (Programme) প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু, মহাশয়, কি স্বাস্থ্য, কি শিক্ষা, অথবা বাসস্থানগুলির উন্নতিকল্পে করপোরেশন যে সকল বিধিব্যবস্থা করেন যদিও এই সকল বিষয়গুলির সহিত শ্রমজীবিদের স্বার্থ অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত তথাপি করপোরেশন কদাপি শ্রমিক সঙ্ঘগুলির মতামত এ সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না। একটিমাত্র কৌন্সিলার ... সংরক্ষণ করিবার পক্ষে বা মঙ্গল বিধান করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া সরকারের নিকট বিবেচিত হন। মহাশয়, আমরা অনুযোগ করিতেছি না, কিম্বা (আপনাদের) বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিতেছি না, কিন্তু আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে আমাদের দেশের নেতারা দেশের মুক্তি আন্দোলনে এতই ব্যস্ত যে শ্রমিকদের অভাবগুলি অনুসন্ধান করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শের সম্মুখে শ্রমিকের অভাব অভিযোগগুলি তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ এমন কি কেবলমাত্র অর্থভিক্ষার নামান্তর বলিয়া সম্ভবতঃ প্রতীয়মান হয়।

———

মেয়র মহাশয় করপোরেশনের কর্ত্তা। তাঁহাকে সেই হিসাবেই অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। শ্রমিকের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান করপোরেশনের বিরুদ্ধে অতি সংযত ভাষায় যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহার উত্তরে মোটামোটি করপোরেশন কংগ্রেসদলের আয়ত্তে আসিয়া এযাবৎ শ্রমিকদের জন্য কি করিয়াছে এবং যে সকল বিষয় শ্রমিকদের স্বার্থ বা ইষ্টানিষ্ট জড়িত আছে সেই সব বিষয় শ্রমিকসঙ্ঘগুলির সহিত আলোচনা করা সমীচীন কি না—এই সকল বিষয় মেয়র মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রমিকেরা কিছু শুনিবার আশা করিয়াছিল। এবং মেয়র মহাশয় যদি এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার উত্তর স্থান কাল ও পাত্রোপযোগী হইত।

—•—

কিন্তু মেয়র মশায় যে উত্তর দিলেন তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি মেয়র। তিনি করপোরেশন সম্বন্ধে একটিও কথা না বলিয়া শ্রমিকদিগকে উপদেশ দিলেন, “তোমরা সকলে জাতীয় কংগ্রেসকে সাহায্য কর যাহাতে জাতীয় কংগ্রেস তোমাদের আনুকুল্যে করপোরেশন, কৌন্সিল প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি দখল করিতে পারে। তাহা হইলেই প্রত্যেক প্রতিনিধিই নিজেকে তোমাদের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিবেন এবং তোমাদের ইষ্টানিষ্টের উপর লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইবেন। মেয়র মহাশয় রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শরূপ মেঘের উপর বসিয়া বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে অধিকাংশ শ্রমিকের ভোট নাই। বক্তৃতার সারমর্ম্ম সরল ভাষায় বলিতে গেলে এই বুঝায়, “বাপু হে তোমরা যখন এরূপ ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিবে যে আমাদের তোমাদের সাহায্য না পাইলে চলিবে না তখন আমরা সকলেই তোমাদের জন্য যা করা প্রয়োজন তাহাই করিব। আপাততঃ চেষ্টা কর যেন অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের পোঁ ধরিয়া চলিতে পারে।” উপস্থিত শ্রমিকেরা শতকরা ৯৮ জনের স্বরাজ পাইবার পক্ষপাতী দেশবন্ধুর প্রধান চেলার এইরূপ ধোঁয়াটে আশ্বাসবাণী পাইয়া বোধ হয় পুলকিত চিত্তে স্ব স্ব গৃহে গিয়া সেই রাত্রেই স্বরাজ পাইয়া তাহাদের অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইবে তাহার স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিয়াছিল।

———

যে হেতু ফেডারেশনের অভিনন্দনে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল যে শ্রমিকেরা মনোনয়নের (nomination) খিড়কি দরোজার ভিতর দিয়া প্রতিনিধি প্রেরণের বিরোধী, সেই কারণেই বোধ হয় সেনগুপ্ত মহাশয় তাহাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা

কৌন্সিলে শ্রমিকদের ভাল হইতে পারে না। আজকাল কংগ্রেস নেতাদের মুখে শ্রমিক প্রীতির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজে না। শাসন কার্য্যে নেতাদের কোন ক্ষমতা নাই কাজেই তাঁহাদের হাতে শাসন যন্ত্র আসিয়া পড়িলে তাঁহারা দরিদ্র, অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট, রুগ্ন, নিরক্ষর ও শোষিত দেশবাসীর রক্ষাকল্পে কি করিবেন এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল ভাল ভাল চিত্তাকর্ষক কথা বলেন শ্রমিকেরা তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছে, যদি তাহারা দেখে যে, যে সব অনুষ্ঠান গুলিতে কংগ্রেস আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে অন্ততঃ সেই সকল অনুষ্ঠান গুলিতে নেতাদের প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করিবার আন্তরিক চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু স্বরাজ্য দলের কার্য্য ধারায় শ্রমিক ও কৃষককে দলবদ্ধ করার বিশেষভাবে উল্লেখ, দেশবন্ধুর অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে বক্তৃতা এবং অন্যান্য নেতাগণের বা বাচনিক শ্রমিক প্রীতি, ও ফরওয়ার্ডের সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রমিকের অধিকার সম্বন্ধে ঘোলাটে গবেষণা সত্বেও যেখানে কর্ত্তাদের বাস্তবিক কার্য্য করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে সেখানে তাঁহাদের কার্য্য বিধি দেখিয়া মনে হয় না যে তাঁহারা যা বলেন সেইরূপ কাজ করিতেও পশ্চাদ পদ নন্। হয়তো আমরা ভুল করিয়া তাঁহাদের উপর অন্যায় করিয়াছি। বাস্তবিক যদি আমরা ভুল করিয়া থাকি তবে আমাদের আনন্দ হইবে।

কাঁচড়াপাড়ায় গত শনিবার ও রবিবারে ই, বি, রেলওয়ের শ্রমিকদের কন্ফারেন্স হইয়া গেল। রেস্‌পন্সিব্ দলের মুখপত্র বেঙ্গলি কাগজের সম্পাদক প্রধান শ্রীযুত আই,বি, সেন্ ব্যারিষ্টার এ্যাট্‌ল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি সম্মিলনীতে লোকে আশা করে সে অন্ততঃ সঙ্ঘ কর্ত্তারা সকলেই যাইবেন। আমরা জানি না বাঙলার সব সঙ্ঘদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কিনা। খবরের কাগজে যে সকল ব্যক্তির নাম বাহির হইয়াছিল তাহার ভিতর দেখা গেল রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীযুত মনি-মুখোপাধ্যায় ও বি, এন্, রেলওয়ে য়ুনিয়নের জেনেরেল সেক্রেটারী শ্রীযুত রামচন্দ্র রাও ছাড়া অধিকাংশই শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকার মহাশয়ের দলের লোক। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয় যে ই, বি, রেলওয়ের কর্ত্তারা মুকুন্দবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা হইলে বলিতে হইবে ঐ সঙ্ঘের কর্ত্তারা এই সব ব্যাপারে তুচ্ছ দলাদলির খাতিরে সঙ্ঘের প্রকৃত স্বার্থ, শ্রমিকের প্রকৃত মঙ্গলকে বলি দিয়া ব্যক্তি বিশেষের মনস্তুষ্টি করিয়াছেন। ই, বি, রেলওয়ে সঙ্ঘ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বক্স্ মেকারস ইয়ুনিয়ন বা বঙ্গলক্ষীর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের হরিনারায়ণ পুর রায়ৎ এ্যাশোশিয়েশনের মত কাগুজে সঙ্ঘ নয়। এই সঙ্ঘের কর্ত্তারা নিজেরা রেলে কাজ করেন এবং সঙ্ঘ যাতে দলাদলির বাহিরে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিতে পারে সেই চেষ্টা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সফল হয়—এইরূপ আচরণই তাঁহাদের নিকট লোকে আশা করে। সুরেন্দ্রনাথ ও সুরেশ চন্দ্রের বক্তৃতা অপেক্ষা যাহারা শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে বেশী অধ্যয়ন করিয়াছেন, আসল য়ুনিয়নের সংস্রবে থাকিয়া, নিজের হাতে য়ুনিয়ন চালিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন এরূপ লোকের বক্তৃতা বেশী সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক হইত। শ্রীযুত রামচন্দ্র রাও ও মনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা মুখ খোলেন নাই কেন? বোধ হয় শ্রীযুত সুরেন্দ্র মিত্রের শ্রমিক প্রীতির তুবড়ি ও সুরেশ বাবুর শ্রমিক সংগঠনের অভিজ্ঞতার হাউই দেখিয়া তাঁহাদের মুখ খুলিতে ভরসা বা প্রবৃত্তি হয় নাই।

ইন্দুভূষণ বাবু এক সময় খুব উঁচুদরের নেতা ছিলেন। গরম দলে তাঁহার বেশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিও তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং শ্রমিকের মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করিতেও তিনি বড় ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কি কুক্ষণেই যে তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। কারণ, তিনি এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর প্রতিক্রিয়াশীল দলের সহিত মিশিয়া পড়িলেন। তিনি কোন কোন সঙ্ঘকে মাসিক অর্থ সাহায্য করে থাকেন শুনিছি। কিন্তু দলাদলির মোহ এখনও ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহার সম্পাদিত কাগজে কাঁচড়াপাড়া কন্ফারেন্সের খুব বিশদ বিবরণ বাহির হইল, কিন্তু বেঙ্গল ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন ফেডারেশনের অভিভাষণটি ছাপা দূরে থাকুক এমন কি মেওরের উত্তরটি পর্য্যন্ত ছাপা হইল না। ইন্দুভূষণ বাবু যিনি শ্রমিকদের বুর্জোয়া নেতাদের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা উপদেশ দেন, তাঁহার সম্পাদিত কাগজে এরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যক্তি বিশেষের উপর রাগ বা বিদ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া শ্রমিকদের অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলির পরিচয় সাধারণের সমক্ষে আসিতে দিবার পক্ষে বাধা দেওয়া তাঁহার মত বিজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট আশা করা যায় না।

তাঁহার অভিভাষণটি পাঠ করিলে বেশ বোধ হয় যে শ্রমিক সমস্যার সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করেন এবং আমাদের মাননীয় মেয়র মহাশয় অপেক্ষা তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গভীরতর। "শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বলশালী করিয়া তোল, সঙ্ঘের তহবিলে চাঁদা দাও, শ্রমিকরা যে অবস্থায় কাজ করে তাহাদের নিজেদের বংশধরেদের জন্য সেই অবস্থার উন্নতিকর। অগ্রসর হও, সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শ্রমিকদের সাহায্যকর, তাহাদের দারিদ্র্যের ও রোগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে শিক্ষা দাও যেন তাহারা তাহাদের "অভিশপ্ত অভাব শূন্যতা'র "(Damned wantlessness)" হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। এসো, এগিয়ে এসো, শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ কর আর তাহাদিগকে শিক্ষা দাও যে তাহারা যেন দারিদ্র্যে শান্তভাব আর অত্যাচারে নম্রভাব বর্জ্জন করে।" ই, বি, রেলওয়ের ইয়ুনিয়নের উচিত যে ইন্দুভূষণ বাবুর বক্তৃতার অংশ বিশেষ যেন অনুবাদ করিয়া শ্রমিকদের ভিতর বিতরণ করা হয়। আশা করি সেন মহাশয় যেন না মনে করেন যে বক্তৃতা দিয়াই তাঁহার কার্য্য শেষ হইল। তাঁহার কাগজে ও তাঁহার দলের লোকের মধ্যেও যেন তিনি এই নীতির প্রচার করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কংগ্রেস দল যেমন করপোরেশন দখল করিয়াছেন তাঁহার দল তেমনি মন্ত্রিপদ দখল করিয়াছে। তাঁহার দলের মন্ত্রিদের হাতেই শিক্ষার ভার আছে। শ্রমিকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মন্ত্রির দল কি কার্য্য করেন বা করিতেছেন "বেঙ্গলীর" মারফৎ সে কথা সাধারণ লোকেরা জানিতে ইচ্ছা করে। আশা করি তাহারা নিরাশ হইবে না।

বি, এন, রেলওয়েতে আবার গোলযোগ ঘনাইয়া উঠিতেছে। প্রায় নয়শত লোকের চাকরী যাইবার দাখিল হইয়াছে। রেলওয়ের প্রভুরা বল্‌ছেন যে গত ধর্ম্মঘটে যোগ দেওয়ার দরুণ এই সকল লোককে বরখাস্ত করা হইবে না। তবে রেলওয়ের ব্যয় সঙ্কোচের দরুণ ইহাদের বরখাস্ত করা প্রয়োজন হইয়াছে। ম্যাও সাম্‌লাতে গরীব শ্রমজীবীদের ডাক পড়ে, কিন্তু লি কমিশানের নির্দ্দেশ অনুসারে মাহিয়ানা বাড়ে মোটা মোটা অফিসারদের। আমাদের মনে হয় যে দু'চারজন বড় বড় অফিসার নির্ব্বোধের ন্যায় ভাবিতেছেন যে গত ধর্ম্মঘটের পর এখন ইউনিয়ন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—এই সময় যদি শ্রমিকদের ভিতর যাহারা ইউনিয়নের জন্য খাটে এইরূপ লোকগুলিকে বিতাড়িত করা যায় তাহা হইলে সঙ্ঘটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। যদি এ কথা সত্য হয় এখন হইতে শ্রমিক নেতাদের সমস্ত অধ্যবসায় ও মনোযোগ বি, এন, আর সঙ্ঘে নিয়োজিত করা দরকার। প্রভু সম্প্রদায় যদি বি, এন, আর এর মত বলশালী সঙ্ঘকে ধ্বংস করিতে পারে তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত হীনবল সঙ্ঘগুলি আর বাড়িতে পারিবে না। আশা করি বি, এন, আর সঙ্ঘের বিপদে ভারতের বিশেষতঃ বাঙলার সঙ্ঘগুলি সাহায্য করিতে পশ্চাদপদ হইবে না।

স-প

দেশ-বিদেশ

উস্‌মানীর মুক্তি

কানপুর কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত শওকৎ উস্‌মানী আগামী আগষ্ট মাসের ২৬শে তারিখে কারাগার হতে মুক্তিলাভ করবেন। এখন তিনি দেরাদুন ডিষ্ট্রিক্ট জেলে রয়েছেন। সম্ভবতঃ তিনি সে জেল থেকেই মুক্ত হবেন। তাঁর অবস্থা মোটেই ভালো নয়। খুব সম্ভবতঃ তিনি যক্ষ্মারোগে ভুগ্‌ছেন। মুক্তির পরে চিকিৎসা ও হাওয়া বদলানোর জন্যে তাঁকে আলমোড়া পাহাড়ে রাখার কথা চলছে।

শ্রমিক আইন

কিছুকাল থেকে মাদ্রাজের শ্রমিক মহলে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধর্ম্মঘটের পর ধর্ম্মঘট চলেছে। এ কারণে, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্যদলের সদস্যগণ ও লেবর মেম্বরগণ একটা নিষ্পত্তিকারী মণ্ডলী করার আইন প্রণয়নের জন্যে জোর দিচ্ছে। এ মণ্ডলী যে সর্ব্বদা মালিকগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে থাক্‌বে সে ভবিষ্যদ্বাণী আমরা আগে থাকৃতেই করে রাখ্‌লেম।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ আবার ভ্রমণে বের হচ্ছেন। এবারে ইউরোপে নয়, ইন্দোনেশিয়ার অর্থাৎ জাভা প্রভৃতি ডচ্ অধিকৃত দ্বীপ-পুঞ্জে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে থাকবেন। ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া খবর দিচ্ছেন যে শ্রীযুত নারায়ণ দাস বাজোরিয়া রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দলবলের ভ্রমণের খরচ আংশিক-ভাবে বহন করবেন। আর একখানা হিন্দী কাগজের মতে রবীন্দ্রনাথ বিড়লার কাছ থেকে এ ভ্রমণের জন্যে দশ হাজার টাকা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আর যা হোন্ অর্থকাণা কবি মোটেই নন্। কোথা থেকে কি ভাবে টাকা বের করতে হয় সে সব ফন্দী তাঁর বেশ জানা আছে। জমীদার বিশ্বকবি যাদেরকে গুণ্ডা নামে আখ্যাত করেছেন সেই কম্যুনিষ্টদের কিছু গোলমাল ত জাভাতে আছে বলে শোনা যায়। তাদের হাওয়া গায়ে লেগে কবির স্বাস্থ্যের কোনো হানি হবে না ত?

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি

অনেক দিন থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে গোলমাল চলেছিল। কমিটির দু'টো দল দু'টো কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠন করে দু' জায়গায় আফিস চালাচ্ছিল। সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এ বিরোধ মেটাবার জন্যে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খান ও শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষকে সালিস নিযুক্ত করেছিলেন। সালিসরা দু'টো কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিকেই ভেঙে দিয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মিটিং ডেকে গত রবিবারে আবার কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির নূতন মেম্বর ও কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তৃগণের নির্ব্বাচন করিয়েছেন। শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত সভাপতি এবং ডাক্তার জে, এম দাশগুপ্ত সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

—•—

অনাগত

২নং নেবুতলা লেন, বাগবাজার কলিকাতা হতে অনাগত নামক একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের হয়েছে। শ্রীযুত ক্ষীরোদকুমার রায় এ কাগজের সম্পাদক। এ যাবৎ তিন খানা কাগজ বের হয়েছে। আর আর সব কাগজের ন্যায় নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে এ কাগজ খানা চালানো হচ্ছে না, অর্থাৎ এর ভিতরে বুর্জোয়াজিগণের সুর ধ্বনিত না হয়ে জনগণের সুরই ধ্বনিত হচ্ছে এবং এটা খুবই আশার কথা। ধনিকের অর্থে সাম্প্রদায়িকত্ব প্রচার ও মতের বিকিকিনির দিনে অনাগতকে আমরা সাদরে অভিনন্দন করছি। কাগজ খানা এ ভাবে দীর্ঘ জীবী হলে দেশের অনেক উপকার হবে।

—•—

কাকোরী মামলার আপীল

কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আপীল লক্ষ্ণৌর চীফ কোর্টে দায়ের করা হয়েছে। ১৯শে জুলাই তারিখ হতে আপীলের শুনানি আরম্ভ হবে। এ মোকদ্দমায় যে তিন জনার ফাঁসির হুকুম হয়েছে তাঁরাও আপীলে উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করার ইচ্ছে জ্ঞাপন করেছেন। এ আপীল সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কাগজ পত্র তৈয়ার করা হয়েছে তা মুদ্রিত হয়েও এক হাজার পৃষ্ঠার ওপরে গিয়েছে। এখন উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করলে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা কখনই বা কাগজ পড়বেন, আর কখনই বা মোকদ্দমা বুঝবেন? আপীল আদালতের সুবিচার করার ইচ্ছে যদি থাকে তা হলে আপীলের শুনানির দিন সরিয়ে দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

গণবাণী'র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲

ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ১॥৵০

বার্ষিক মূল্য বিদেশে ৭ শিলিং

এজেন্সী

মফস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা

Printed by Muzaffar Ahmad, at the Sree Sarasati Press, at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 87, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS AND WORKERS PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ... আষাঢ় ১৩৩৪ | ২১শ সংখ্যা

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহমদ
শ্রী ... মোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৭ই জুলাই, ১৯২৭, ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৪ | ২১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাক্লাৎওয়ালার প্রস্তাব

কমরেড্ শাপুরজী সাক্লাৎওয়ালা তাঁর বোম্বের কোনো বন্ধুকে লণ্ডন থেকে একখানা পত্র লিখেছেন। সে পত্রে তিনি লিখেছেন যে আগামী কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার জন্যে তাঁর নাম যেন কিছুতেই প্রস্তাব না করা হয়। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর বন্ধুর মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁর দেশবাসীর নিকটে প্রস্তাব করেছেন যে এবার যেন শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরিত হন। শ্রীযুত বসু সবে মাত্র জেল থেকে বের হয়ে এসেছেন। তাঁর মতামত আমরা আজো জানতে পারিনি। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি কাদের দলে মিশ্‌বেন—বুর্জোয়াজিগণের, না, জনগণের,—তা তিনি এ যাবৎ সাধারণ ভাবে প্রকাশ করেন নি। এ অবস্থায় আর কেউ যদি সুভাষ চন্দ্রের নাম প্রস্তাব করতেন, তাতে আমাদের কিছুই বলার ছিল না, কিন্তু, কমরেড সাক্লাৎওয়ালা কি করে যে তা করলেন তা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারিনি। এ প্রস্তাব করার ব্যাপারে তাঁর আর অপরের দায়িত্ব ঠিক এক নয়। তিনি কম্যুনিষ্ট, কাজেই জনগণের পক্ষ সমর্থনকারী। তিনি কেবল এমন লোকের নাম কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হবার জন্যে প্রস্তাব করতে পারেন, যে লোককে তিনি জনগণের পক্ষাবলম্বনকারী বলে খুব ভালো করেই জানেন। আমরা যতটা জানি, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে কমরেড সাক্লাৎওয়ালা তেমন কিছুই জানেন না। আর, যখন জানেন না তখন তাঁর এরূপ প্রস্তাব করতে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? যেদিন আমরা দেখতে পাব যে শ্রীযুত বসু জনগণের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন সেদিন আমরা তাঁর জন্যে সবই কিছু করব। কিন্তু, আগে থেকে কিছু না জেনে শুনে আমরা কেন শুধু শুধু তাঁকে সমর্থন করতে যাব? বর্ত্তমান অবস্থায় কে সভাপতি হলেন বা না হলেন তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না।

ভারতে ভ্রমণ করতে এসে সাক্লাৎওয়ালা ভারতের সকল শ্রেণীর নেতৃগণের স্বরূপ দেখে গেছেন। দিল্লীতে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃগণ তাঁর সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছেন, আমরা মনে করেছিলেম তাতে তাঁর অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে। এখন দেখতে পাচ্ছি তাঁর এখনো ঢের ঢের শিখবার প্রয়োজন রয়েছে। সাক্লাৎওয়ালা যাঁর নাম সভাপতি হবার জন্যে প্রস্তাব করবেন, তিনি যদি সভাপতি হয়ে কেবলমাত্র বুর্জোয়াদেরই পক্ষ সমর্থন করেন তা হলে তাঁর অবস্থা কি হয়ে দাঁড়াবে?

———

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িকত্ব

মাদ্রাজের ডাক্তার কুলাওাই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে একটি অতি সুন্দর প্রস্তাব উপস্থিত করবেন বলে বিজ্ঞাপিত করেছেন। তাঁর প্রস্তাবের চুম্বক কথাটা এই হচ্ছে যে, যত সরকারী খেতাব ওয়ালা ও সাম্প্রদায়িকত্ববাদী লোক কংগ্রেসের ভিতরে আছেন তাঁদের কে তাড়িয়ে দেওয়া হোক্। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এ প্রস্তাবের সমর্থন করছি, বিশেষ করে এর শেষের দিকটা। দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যারা প্রচার করছে তারা নিতান্তই ঘৃণিত জীব। এ শ্রেণীর লোকগুলোর ন্যায় এমন স্বার্থপর লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। কেবল মাত্র আপন আপন ঘৃণিত স্বার্থ চরিতার্থ করণোদ্দেশ্যেই, ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সমাজের ধনিক শ্রেণীর অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে কতকগুলি লোক দেশময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এমন সব লোককে কংগ্রেস থেকে বহিষ্করণের যে প্রস্তাব হয়েছে তাকে খুবই সাধু প্রস্তাব বলতে হবে। যতই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পূর্ণ তার মন হোকনা কেন, কোনো লোককে সাক্ষাৎ ভাবে সাম্প্রদায়িক বলে অভিযুক্ত করা মোটেই নিরাপদ নয়। এ জন্যে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের সভ্যগণের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপায়। একজন মানুষ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করতে থাকবে, অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে একজন উৎকৃষ্ট জাতীয়ত্ববাদী বা

ন্যাশন্যালিষ্টও হবে, এমনটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কেন না সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার ও জাতীয়ত্ব প্রচার পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। দু'টো পরস্পর বিরোধী কাজ এক সঙ্গে করা কিছুতেই চলতে পারে না। আমাদের মতে হিন্দু মহাসভা, হিন্দু সংগঠন, শুদ্ধি সভা, তন্‌জীম্, তব্‌লীগ্, খিলাফৎ কমিটি, জমিয়ৎ-ই-উলামা, মুস্‌লীম লীগ, শিখলীগ ও হিন্দু মিশনের সভ্যগণ যাতে কংগ্রেসের ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা অবিলম্বেই করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের সহযোগী "ফরওয়ার্ড" কিন্তু প্রস্তাবের এ দিকটা মোটেই সমর্থন করতে পারেন নি। ভারতবর্ষের জন সাধারণের মধ্যে একটা জাতীয় স্বার্থবোধ জন্মাক্, এরূপ ইচ্ছে "ফরওয়ার্ড" বোধ হয় করেনা। তাই, "ফরওয়ার্ড" এর মতে জাতীয়ত্ব ও সাম্প্রদায়িকত্ব সঙ্গে সঙ্গে চলতে পারে। সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগুলো, বিশেষ করে হিন্দু মহাসভা দেশময় কি আগুন দিনের পর দিন জ্বালিয়ে দিচ্ছে তা দেখে শুনেও "ফরওয়ার্ড" এ সকল অনুষ্ঠানের সভ্যগণের কংগ্রেসে থাকা অনুমোদন করছে। আমরা ভেবেই স্থির করতে পারছিনে যে, "ফরওয়ার্ড" এর কোনো বিশিষ্ট নীতি আছে কিনা। হিন্দু মহাসভার নষ্টামীর বিষয়ে আমরা "ফরওয়ার্ড" কে বহুবার লিখতে দেখেছি। ডাক্তার কুলাওাই এর প্রস্তাব পাস হলে যে এ হিন্দু মহাসভার লোকেদেরকেই বেশীর ভাগ কংগ্রেস থেকে বের হতে হবে তা "ফরওয়ার্ড" বেশ ভালো করেই জানে, অথচ জেনেও এর বিরুদ্ধাচরণ করছে। এর ভিতরে যে কি রহস্য আছে তা কে জানে ?

———

ময়মনসিংহবাসীর প্রতি নিবেদন

—:০:—

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সভাপতি মন্ত্রী প্রভৃতি যাবতীয় পদগুলি বাঙ্গালার ভূস্বামীদিগের করতলগত। জিলাবোর্ড মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্বশাসনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিও যাহাতে পুরাদস্তরমত তাহাদিগের প্রভাবাধীন থাকে তাহার বিহীত ভাবে চেষ্টা চরিত চলিতেছে। ভূম্যধিকারীদের কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাদিগের ক্ষেত্রের অভাব নাই; তাহাদিগের প্রজাকুল রোগে, শোকে, অর্দ্ধাহারে জীবন্মৃত প্রায় হইয়া আছে। "জলদে জলদে" বলিয়া তাহারা বাঙ্গালার গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অবস্থায়ও নির্ম্মম নিষ্ঠুরদিগের পাষাণ হৃদয় দ্রব হইতেছে না। একটী পুকুর বা কুপ খননের অধিকার প্রজা পাইতেছে না, কোন কোন জমিদারের এলেকায় আদেশ থাকিলেও কর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে জনসাধারণের একটু জলের সুবিধা করিবার সাধ্য নাই। জমিদার সন্তানেরা ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব এলেকায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের অজ্ঞান ও কুসংস্কার বিদূরীত করিতে পারেন, সমবায় সমিতি স্থাপনে সাহায্য করিয়া উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য প্রচলন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে অনেক সহায়তা করিতে পারেন। পরের টাকায় ছিনিমিনি খেলিবার ইচ্ছা পরিহার করিয়া কর্ম্মের সন্ধান করিলে পোড়া বাঙ্গলা দেশে কর্ম্মের অভাব কর্ম্ম ইচ্ছুকদিগের বাঙ্গালায় টাকারও অভাব হয় না, উপযুক্ত চালক থাকিলে জনসাধারণ অর্থদানেও কুণ্ঠিত নহে। সংকর্ম্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ না হইলেও বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিবার জন্য শোষণ ও পেষণ যে করা না হয় এমন নয়। মধ্যে মধ্যে নামজা ওয়াস্তে যে জমিদারদিগের ২।১টী শিক্ষালয় দৃষ্ট হয় তাহার প্রায়গুলিরই উপর একটা আবওয়াব বসান আছে, কিন্তু তাহার অল্পাংশই জমিদারদিগের তহবিলে আসে। বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীরা প্রায় ২৫।৩০ কোটী টাকা লাভ করিলেও তাহারা কয়জন ঋণশূন্য আছেন? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের অর্থ আছে তাহা হস্তগত করিয়া জনসাধারণের মঙ্গল করিবে এমনি দুরাশা ইহারা পোষণ করে। যাহারা নিজের ঘর সামলাইতে পারেনা তাহারা পরের ঘরে হানা দেয় কোন সাহসে? নামে মাত্র স্বায়ত্বশাসনাধিকারে যে ২।১টী প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিই জনসাধারণের কর্ম্মশক্তি বিকাশের স্থান। সেগুলি যদি দেশের ধনিকেরা আগলাইয়া রাখে তবে সর্ব্বসাধারণের কর্ম্মশক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে কোথায়? এই দোষ শুধু ধনিকদিগের নয়, মধ্যবিত্তদিগের মধ্যেও কতকগুলি ঘরের ঢেকি কর্ম্মীরও আছে। ইহারা স্ব স্ব স্বার্থোদ্ধার এবং জাতি শত্রুবধ সাধনে ধনিকদিগকে প্ররোচিত করে। এই শ্রেণীর বিভীষণ ছাড়া আরেক প্রকার তোষামোদকারী জীব আছে। ইহাদিগের স্বভাব এই যে যদি কোন ধনিক কিছু করিতে চায় বা কোন পদের জন্য প্রার্থী হইবার ইচ্ছা করে তবে এই হাঁ হুজুর কেন চাটার দল সমস্বরে বলিয়া উঠে "হুজুর কর্ত্তা আমরা বর্ত্তে গেলাম, আপনার ন্যায় কর্ম্মবীর ভূভারতে আর কি কেহ আছে? আপনার ন্যায় যোগ্য বীরপুরুষেরই ইহা চাই, ইহা কি নাহু কাহুর কর্ম্ম?" এই প্রকার স্তুতিবাদ করিয়া চাটুকারেরা ধনিকদিগের মাথা বিগড়ায়া দেয়। সে নিজেকেও ধুরন্ধর ও একটা মস্ত বীরপুরুষ বলিয়া মনে করে। তাহার অকর্ম্মণ্যতার কথা সমজাইয়া দিবার জন্য কেহ থাকিলে সে হয়ত সংযত হইতে পারিত।

দেশের এই ভীষণ শত্রু পদলেহনকারী জীবদিগের প্রভাব হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিতে হইবে; সরকারী বেসরকারী প্রতিনিধিমূলক যে প্রতিষ্ঠানই হউক না কেন কোথাও যেন ইহারা নির্ব্বাচিত হইতে না পারে তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধামাধরাগুলির যদি পতন হয় তবে আর ধনিকেরা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাগিরীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে না।

যে পর্য্যন্ত দেশময় ভোটার সঙ্ঘ গড়িয়া না উঠিবে, নিজেদের স্বার্থ বিষয়ে সজাগ না হইবে সে পর্য্যন্ত সরকারী বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানকেই জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারেনা। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখিতে পাই যে জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধীদল নেতৃত্ব করিতেছে। ভোটারেরা ভোট দিয়াই কাজ খতম হইল মনে করা অন্যায়। প্রতিনিধিরা কি করে না করে তাহার খোঁজ খবর রাখা খুব দরকার। জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করিলে তাহার তীব্র প্রতিবাদকরা এবং প্রয়োজন বোধ করিলে ভোট অব্ সেন্সার দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা তাহা করিনা বলিয়াই ডিঃ বোর্ড প্রভৃতির প্রতিনিধিরা পর্য্যন্ত ঘুষ খায়। তারপর, কর্ম্মচারী যাহারা চাকরের চাকর তাহারা জনসাধারণের কান মলিয়া ঘুষ আদায় করে। এই বিসদৃশ্য দেখা বাস্তবিকই বড় অসহ্য

ব্যাপার। দেশবাসী মানুষ হও, তোমার অধিকার তুমি বুঝিয়া লইতে চেষ্টা কর, তবেই তোমার পায়ে ধরণী লুটাইয়া পড়িবে।

ময়মনসিংহের ডিঃ বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন এবং মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচন প্রায় আগত। ময়মনসিংহবাসী সাবধান! কতক ধুরন্ধরেরা জমিদারদিগকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বসাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছে। অনেকেই ডিঃ বোর্ডের পরিবর্ত্তন চাহেন, পরিবর্ত্তন চাওয়া অন্যায় নয়, আমরা পরিবর্ত্তনের বিরোধী নই; আমরা স্বরাজ্য পাইবার যোগ্য কিনা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই প্রমাণ করিতে হইবে; বোর্ডের উৎকর্ষ সাধন মানসে যাঁহারা পরিবর্ত্তন চাহেন তাঁহারা দেশের ধন্যবাদার্হ, কিন্তু পরিবর্ত্তনের নামে একজন জমিদারকে ডাকিয়া আনা দেশবাসী কখনই সহ্য করিবে না। জমিদারকে বসাইয়া যাহারা অভাব পুরণ বা সংস্কার করিতে চাহেন তাঁহারা ভ্রান্ত; জমিদাররাত নিজেদের অভাবই দূর করিতে পারে না, তাহাদের ইষ্টেটগুলি ঘুষের আড্ডা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ অবস্থায় তাহাদিগের দ্বারা কোন সংস্কার চাওয়া আকাশ কুসুম মাত্র। ক্ষমতা প্রিয় দাম্ভিক জমিদারদিগকে না আনিয়া চেষ্টা ও সৎসাহসের দ্বারা নিজেরাই সংস্কারের চেষ্টা কর। তাহাতে কর্ম্ম করিবার শক্তি বিকাশলাভ করিবে ভাল। আর দেশবাসীর কর্ত্তব্য এই সব প্রতিষ্ঠান হইতে যাহাতে ঘুষ বিদূরীত হয় তাহার জন্য তুমুল আন্দোলন করা।

বিনীত
মুজিবর রহমান খাঁ,
ময়মনসিংহ।

মন্তব্য—মুজীবর রহমান খান সাহেবের উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তবে তাঁর মনে এখনো এমন কতকগুলো ধারণা রয়েছে যে সবের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি একেবারেই নেই। তিনি বলেছেন, জমীদাররা ইচ্ছে করলে দেশের অনেক উপকার করতে পারেন। তাঁরা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করতে পারেন, দেশের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করতে পারেন এবং সমবায় সমিতি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন ইত্যাদি। একটুকু তলিয়ে বিচার করলেই বুঝতে পারা যায় যে এর কোনো কাজই করার শক্তি জমীদারের নেই। জমীদার সমাজের পরগাছা স্বরূপ, বে-রোজগারের কড়ি খাওয়াই তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরের রোজগারে ভাগ বসিয়ে যখন তাকে সবই কিছু করতে হয় তখন সেই পরেদের কোনো প্রকারে সচেতন না করাটাই হচ্ছে তার পক্ষে স্বাভাবিক। জমীদারের অর্থাগমের উৎস কৃষকের ঘরেই রয়েছে। তার ভোগ-বিলাস, সৎকর্ম্ম প্রভৃতির জন্যে অর্থ তাকে সেখান থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, পথ ঘাট নির্ম্মাণ ও পুস্করিণী সংস্কার প্রভৃতি কাজ যদি জমীদার করে তা হলে তার জন্যে যে অর্থব্যয় হবে তার দ্বিগুণেরও বেশী কৃষকদের কাছ থেকে সে আদায় করে নেবেই নেবে। জমীদারদের দিয়ে কোনো সৎকর্ম্ম করানোর মানেই হচ্ছে শোষিত কৃষকদিগকে আরো বেশী মাত্রায় শোষণ করতে উৎসাহ প্রদান করা। কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ শোষণ করে জমীদার যদি কোনো সদনুষ্ঠান গড়তে পারে তা হলে কৃষকেরা আপনা থেকে সে সব করতে পারবে না কেন? জমীদারের বাড়ীতে যে গাছে টাকা ফলে না একথা ত সবাই জানেন। টাকাত ফলে কৃষকের ক্ষেতে। কেবল মাত্র কৃষকদের সচেতন করা চাই। তার জন্যে যে কর্ম্মীর প্রয়োজন সে কর্ম্মী সংগ্রহে খান সাহেব মনোনিবেশ করুন।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান জমীদারদের করবার কোনো শক্তিই নেই। জমীদার ত শোষণকারী জীব, শোষণ করাই তার ধর্ম্ম। সে আবার দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে কি? তাকে দিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করানো আর কুমীরের নিকটে ছেলে পড়তে দেওয়া একই কথা। আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কোনো সমস্যারই সমাধান হতে পারে না যতক্ষণ দেশের সকল ক্ষমতা দেশের জনগণের হাতে না আসবে।

কোনো জমীদার যদি খুব ভালো লোক ও খুব লোকহিত-ব্রতও হয়, তবুও তার জমীদার হওয়ার কোনো অধিকার নেই। সে কেন মিছামিছি কৃষকের ঘাড়ে অপদেবতার মত চেপে বসে থাকবে? কৃষক যদি তাকে খাজনা দিতে পারে তা হলে সে বরাবর ষ্টেটকে দিতে পারবে না কেন? জমীদার বল্‌তে আমরা সে সকল লোককেই মনে করেছি যারা কোনো না কোনো প্রকারে ভূমিকে আপনাদের নিকটে কেন্দ্রীভূত করেছে, তা যে কোনো স্বত্বে স্বত্ববান হয়ে হোক্‌না কেন।

মুজীবর রহমান সাহেব যদি সত্যকারের কৃষক-আন্দোলন-কারী হন, তা হলে তিনি সর্ব্বপ্রকার ভূম্যধিকারিত্বের উচ্ছেদ করার জন্যে কৃষকদিগকে প্রবুদ্ধ করুন। "**জমীর মালিক চাষী আর ভাতের মালিক শ্রমিক**" এটাই হওয়া চাই আমাদের যুদ্ধধ্বনি। দেশের শোষক শ্রেণীর লোকেরা চাষী আর মজুরদিগকে নানা দিক থেকে নানা ভাবে মেরে রেখে দিয়েছে। মোল্লা-পুরোহিতের দল দিবা-রাত্র কৃষক আর শ্রমিকের মধ্যে অভাবহীনতা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। কেন না, তাদের অভাব যত কম হবে ততই মোল্লা-পুরোহিতের ও ধনিক-বণিক-জমীদারের তাদেরকে শোষণের সুবিধা হবে। এজন্যে কৃষক আর শ্রমিক আন্দোলনকারীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে অভাবের সৃষ্টি করা। তাদের খাওয়া-পরার নিরিখকে বাড়ানো সব চেয়ে বড় কাজ হওয়া উচিত। অভাবের তাড়ণাতে মানুষ সব কিছু করে থাকে। এদেশে জনগণের উত্থানও হবে এক মাত্র অভাবেরই তাড়ণায়। শরীর-বিজ্ঞানের মূল নীতি অনুসারে মানুষের দৈনিক যা যা খাওয়া অপরিহার্য্য প্রয়োজন তা আমাদের চাষী-মজুররা কখনো কি খেতে পায়?

সম্পাদক, "গণবাণী"

ট্রেড্ ইউনিয়নিজম

বা

শ্রমিক সঙ্ঘবাদ

—০—

(এ প্রবন্ধটি একজন বৃটিশ্ ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্ট বা শ্রমিক সঙ্ঘবাদীর লেখা। ভারতীয় শ্রমিকগণের অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করতে এসে তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। বোম্বের "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড" নামক দৈনিক কাগজের সম্পাদকের নিকট

হতে বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমরা এর বাংলা অনুবাদ বের করছি। ইতোপূর্ব্বে ১০ম, ১২শ, ১৪শ, ও ১৬শ সংখ্যক "গণবাণী"তে এ অনুবাদ বের হয়ে গেছে।)

—০—

বৈধ অবস্থা

আইনের দ্বারা শ্রমিক সঙ্ঘবাদ স্বীকৃত হওয়ার কথাটা খুব বিস্তৃত ব্যাপার। এই দিক থেকে প্রত্যেক জাতীয় শ্রমিক আন্দোলনের আপন আপন বিশিষ্ট ইতিহাস রয়েছে। বিধি-প্রণয়নের ব্যাপার নিয়ে যে সকল সংগ্রাম হয়ে গেছে সে সব নিয়ে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু, এখানে একটি মাত্র প্রবন্ধে যখন আমাদিগকে সে কথা বলতে হচ্ছে তখন বিস্তৃত বর্ণনা সমূহ বাদ দিয়ে কেবল মাত্র এর সাধারণ দিকটাতেই আমরা আমাদিগকে সীমাবদ্ধ রাখব।

শ্রমিক সঙ্ঘবাদের ইতিহাস বেশীর ভাগ এর বিধি-বিধান সঙ্গত সংগ্রামেই পরিচিত্রিত হয়েছে। সেই প্রথম সময় হতে যখন প্রাথমিক উদ্যোক্তাগণকে সংগঠন করার অধিকারের জন্যে যুঝ্‌তে হচ্ছিল আর এই আজকের দিন পর্য্যন্ত আন্দোলনের অগ্রসরের প্রত্যেকটা দিক যে যে দেশের আন্দোলন সেই সেই দেশের আইনের কেতাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একথা সত্য যে এখনো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রীতি রয়েছে। জগতের কোনো কোনো অংশে আজকের দিনেও শ্রমিকসঙ্ঘবাদ বে-আইনি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশে আইন এরূপ ভাবে করা হয়েছে যে শ্রমিকদের দিক থেকে ফলপ্রসূ সংগঠন করা তাতে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক স্থান সমূহে আমরা দেখতে পাই যে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহ এমন আইনের অধিকার ভোগ করছে যার সহিত তাদের ঐতিহাসিক কর্ম্মধারাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারা যায়।

যে সকল অবস্থার ওপরে বিভিন্ন দেশের ট্রেড্ ইউনিয়ন সমূহে পার্থক্য রয়েছে তা হচ্ছে:—

(১) আলোচ্য দেশের অর্থ-নীতিক উন্নতি
(২) সঙ্ঘ আন্দোলনের শক্তি
(৩) গবর্ণমেন্টের রাষ্ট্র-নীতিক স্বরূপ

বৈধ সংগ্রামের সীমা-চিহ্ন

প্রসারিত ভাবে দেখতে গেলে তিনটে এমন নীতি রয়েছে যার, দ্বারা যে কোনো দেশের শ্রমিকসঙ্ঘের বৈধ অধিকারের বিচার করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, নিয়োগ কারিগণের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে কথাবার্ত্তা চালিয়ে অবস্থার খাপ খাওয়ানোর জন্যে শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করার অধিকার। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মঘট করার অধিকারও বাধ্য বাধকতার দ্বারা সালিসী নীতির অস্তিত্ব হীনতা। তৃতীয়তঃ, শ্রেণী হিসেবে সংহত শ্রমিক-গণের তরফ থেকে রাষ্ট্রনীতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে যোগদান করার সুযোগ। কেবল সামান্য ক'টি দেশে আমরা দেখতে পাই যে ট্রেড্‌স ইউনিয়ন এ সকল সুযোগই উপভোগ করছে। শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করার অধিকার প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত হয়ে থাকে; কিন্তু, যুদ্ধের পরে মধ্য ইউরোপের যথেচ্ছচারী শাসন সমূহ সে অধিকার পর্য্যন্ত রহিত করেছিল। কোনো কোনো ব্যাপারে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আবার কোথাও বা অধিকারকে অত্যন্ত বেশীরূপে ক্ষুণ্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি আজকের দিনেও হাঙ্গেরী ও ইটালীতে শ্রমিক আন্দোলন অনেক বৈধ বাধাতে বর্তমান রয়েছে।

কোনো কোনো দেশে ধর্ম্মঘট করার স্বাধীনতা খুব কম। অনেক দেশে এ অধিকার কেবল নির্দিষ্ট শিল্প সমূহে মাত্র সীমাবদ্ধ রয়েছে। বড় বড় শিল্পানুষ্ঠান সমূহে ধর্ম্মঘট করাটা বে-আইনী বলে পরিগণিত হয়। কোনো কোনো ব্যাপারে যুক্ত বোর্ড ও সালিসী আদালতের মিটাইবার প্রচেষ্টা অকৃতকার্য্য হওয়ার পরেই ধর্ম্মঘট করার অনুমতি দেওয়া হয়। এর মানে হচ্ছে নিয়োগকারিগণকে আকস্মিক বিপদ হতে আত্মরক্ষার জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া। তৃতীয় নীতি শ্রমিক সঙ্ঘের কাজ-কর্ম্মকে বিশুদ্ধ অর্থনীতিক ক্ষেত্রের বাইরেও প্রসারিত করে থাকে। অপর দু'টো নীতির যেমন গুরুত্ব আছে ঠিক্ এ নীতিরও তেমনিই গুরুত্ব রয়েছে। তবে এ নীতিটা শ্রমিকের শত্রুদের পক্ষে অধিকতর আতঙ্কজনক। সেজন্যে এর ওপরে বাধ্য-বাধকতা অপেক্ষাকৃত বেশী। শাসক শ্রেণীর স্বার্থ যখন শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত তখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে শ্রমিকদের সম্বন্ধে যে সকল বিধি বিধান প্রণীত হবে সে সবের দ্বারা শ্রমিকদের সুবিধা অস্বীকৃত এবং তাদের গতি সীমাবদ্ধ হবে। ফলে, সমগ্র জগৎময় শ্রমিক আন্দোলনের এই একই প্রধান কর্ত্তব্য হয়েছে যে আপন আপন গবর্ণমেন্টকে দিয়ে সুবিধাজনক আইন করিয়ে নেওয়া। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই তাদেরকে আপন শক্তি-সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। যখন মালিকেরা শ্রমিক আন্দোলনের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে চায় তখন কি করে যে শ্রমিক আন্দোলন মালিকদেরকে এ দুরভিসন্ধির অতিক্রম করতে পারে তার দুটো সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা বৃটেনে পেতে পারি।

ট্যাফ্‌ভেলের মোকদ্দমা

১৯০৩ সনের পূর্ব্বে সাধারণতঃ সকলের এ বিশ্বাস ছিল যে ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের টাকাকড়ির ওপরে কোনো বিপদ মালিকদের তরফ থেকে আসতে পারে না। কিন্তু, সে বছরেই কোনো রেলওয়ে কোম্পানী একটি রেলওয়ে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা আনয়ন করে। এ ইউনিয়ন রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিয়েছিল। কোম্পানীর দাবী লর্ড সভায় পেশ করা হলে উক্ত সভা তা মঞ্জুর করেন। এ মোকদ্দমার এ পরিণাম একেবারেই আশাতীত হয়েছিল। এর সম্মুখে প্রামাণ্য আইনের মতগুলোর কোনো মূল্যই থাক্‌ল না। এই বিচারের ফলে ইউনিয়নগুলিকে জবরদস্তি সালিসী গ্রহণে বাধ্য করা হলো, আর না যদি করে তা হলে মালিকরা ইউনিয়নগুলিকে ভেঙে দিবে এবং ধর্ম্মঘটের দরুণ ক্ষতিটা ইউনিয়নের তহবীল থেকে পুষিয়ে নেবে। সৌভাগ্য বশতঃ এ ব্যাপারের গুরুত্ব কতটুকু তা খুব দ্রুত শ্রমিক আন্দোলন বুঝে নিলে এবং দেশময় দীর্ঘকালব্যাপী এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাক্‌ল। পরিশেষে ১৯০৬ সনে গবর্ণমেন্ট ট্রেড্ ডিস্‌পিউট্ এক্ট পাস করতে বাধ্য হলো। এ আইনের দ্বারা ট্যাফ্ ভেলের মীমাংসার নজীর বাতিল হয়ে গেল, ট্রেডইউনিয়ন সমূহ যে আর্থিক অধিকার দাবী করে ছিল তা মঞ্জুর করা হলো। কিন্তু, শ্রমিকগণের এ বিজয় এর চেয়েও বৃহৎ সংগ্রামের অগ্রদূত স্বরূপ ছিল। মালিকরা ও গবর্ণমেন্ট শ্রমিকআন্দোলনকে রাষ্ট্রনীতিক ধ্বংস করার জন্যে যে ধূর্ত্ত প্রচেষ্টা করেছিল তারি বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এ সংগ্রাম যুঝতে হয়েছিল।

ওসবর্ণ মীমাংসা

ইংল্যাণ্ডের লেবারপার্টি ইউনিয়ন সমূহের একটা সংস্থাবদ্ধ অনুষ্ঠান। এর সভ্য সংখ্যা ও আর্থিক আমদানীর কম পক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে এসে থাকে। তখনকার দিনে যদিও লেবরপার্টি অনেকটা দুর্ব্বল ছিল তথাপি তা ট্যাফভেল্ আন্দোলনে যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের প্রতিনিধিত্ব করার যে এর অধিকার আছে তা প্রমাণিত করেছিল। ফলে যে সকল সঙ্ঘ ইতোপূর্ব্বে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলনা সে সকল সঙ্ঘও স্থির করলে যে এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। অতিশীঘ্রই শ্রমিকগণের রাষ্ট্রনীতিক দিকটার একমাত্র প্রতিনিধি বলে লেবরপার্টি পরিগণিত হলো। লেবরপার্টির এই অভ্যুত্থান কিন্তু মালিকগণের নিকটে আতঙ্কের কারণ হয়ে পড়্‌ল। এ কারণে তারা লেবরপার্টিকে প্রথম সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস করে দিতে চাইলে। কোনো রেলওয়ে ইউনিয়নের সভ্য ওসবর্ণের মধ্যবর্ত্তিতায় তারা এই প্রমাণ করতে চেষ্টা করলে-যে শ্রমিকসঙ্ঘগুলি যে তাদের মেম্বরদের তরফ থেকে লেবরপার্টিকে একটা রাষ্ট্রনীতিক চাঁদা প্রদান করে থাকে তা বে-আইনী। সকল নিম্ন আদালতেই এই মোকদ্দমার হার হলো। তারপরে মোকদ্দমা গেল লর্ড সভায়। এখানে মালিকদের অনুকূলেই মোকদ্দমাটি মীমাংসিত হলো। এতে পুনরায় শ্রমিকআন্দোলন বিপদাপন্ন হয়ে পড়্‌ল। এ বিচার অনুসারে শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের কাজ কেবলমাত্র অর্থনীতিক সমস্যাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। কাজেই শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের সাহায্যের অভাবে শ্রমিক আন্দোলনের রাষ্ট্রনীতিক দিকটা নাম মাত্র অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয়ে পড়ল।

আগেকার মত এবারেও শ্রমিক আন্দোলনের রাষ্ট্রনীতিক ও শৈল্পিক দিকের নেতৃগণ ইত্যাকার ব্যবস্থার গুরুত্ব ভালো করে বুঝে নিলেন এবং খুব জোরের সহিত এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকলেন। চার বছরের আন্দোলনর ফলে ওসবর্ণের বিচার মীমাংসা বাতিল হয়ে গেল পার্লামেণ্টের এক বিশিষ্ট আইনের দ্বারা।

শ্রমিক সঙ্ঘবাদের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে এই দু'টো বিজয় বাস্তবিকই শ্রমিক সঙ্ঘবাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমগ্র জগৎময় ট্রেড্ ইউনিয়ন সমূহ এ সকল সুবিধে পাবার জন্যে চেষ্টা করে আসছে।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের বৈধভিত্তি

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে এখানে এখনো শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কিত বিশেষ কোনো আইন প্রণীত হয় নি। ১৯২৬ সনের ট্রেড্ ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন আইন যদিও পাশ হয়ে গেছে তা' আজো পর্য্যন্ত কাজে লাগানো হয়নি। (এ আইন সম্প্রতি আমলে এসেছে। এ প্রবন্ধ তার আগেকার লেখা)। কিন্তু, এর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না। মোটামুটি ভাবে এর পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যাবে যে যাঁরা এর প্রণয়নের জন্যে দায়ী তাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে ভালো করে জানেন, এবং জানেন বলেই তাঁরা নবীন ভারতীয় আন্দোলনের অনিষ্ট সাধন করার জন্যেই তাঁদের সে জ্ঞান ব্যবহার করেছেন। সঙ্ঘগুলিকে রেজিষ্টী হওয়ার সুযোগ পাবার জন্যে অনেক মূল্য প্রদান করতে বলা হয়েছে। অবশ্য এটা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, যে সকল সঙ্ঘ নাম রেজিষ্টী করবে না সে সকল সঙ্ঘকে মালিকরা কিছুতেই মেনে নেবে না। এ আইন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই। এর দু'টো কথার বিচার করলেই এর সত্যকারের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে। এ আইনের আমলে যে সকল ট্রেড্ ইউনিয়ন আসবে সে সকল ট্রেড ইউনিয়ন কোনো রাষ্ট্রনীতিক বা শিক্ষাসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের জন্যে কোনো অর্থ ব্যয় করাতে পারবে না। অনেকগুলো ছোট ছোট ইউনিয়নকে যদিও একটি বড় ইউনিয়নে পরিণত করতে পারা যাবে, তার জন্যে বেগ পেতে হবে অনেক বেশী। অথচ ভারতীয় আন্দোলনের এ দু'টো দিক্ এর বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত বেশী আবশ্যক। প্রথমতঃ, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনীতিক দাবী অপরিহার্য্যরূপে রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে উন্নীত হয়ে পড়ে এবং তারি জন্যে প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রনীতিক লেবর পার্টি সংগঠন করার। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও ছোট ছোট সঙ্ঘগুলো সে সবের সভ্যগণের সুখ সুবিধে বজায় রাখার জন্যে একটা বড় জাতীয় সংগঠনে একীভূত হতে বাধা হবে।

দু'বছর পূর্ব্বে যে ট্রেড্‌স্ ডিস্‌পিউট্ বিল উপস্থিত করা হয়েছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে, অন্ততঃ অস্থায়ী কালের জন্যে। শ্রমিকসঙ্ঘবাদ বা ট্রেড্‌স্ ইউনিয়নিজমকে হীন প্রতিপন্ন করে তোলার জন্যে এ বিলও গবর্ণমেণ্ট ও মালিকগণের আর এক ধূর্ত্ত প্রচেষ্টা ছিল। এ বিল শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘট করার অধিকার অস্বীকার করেনি বটে, কিন্তু এত সব স্থানীয়, প্রাদেশিক ও জাতীয় সালিসী বোর্ডের ব্যবস্থা করেছিল যে শ্রমিকগণের পক্ষে কোনো প্রকারের ফলপ্রসূ কাজ করা মোটেই তার দ্বারা সম্ভবপর হত না। খুব সম্ভবতঃ এ বিলটা আইন সভায় উপস্থিত করার জন্যে আর একবার প্রচেষ্টা করা হবে।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের নীতি কি তা এ দু'টো বিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বুঝতে পারা যায়। এটা তারা জানে যে শ্রমিক আন্দোলনকে কিছুতেই মেরে ফেলতে পারা যাবে না। তাই তারা একে আপোষ নিষ্পত্তির নিরাপদ জায়গায় টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু, ভারতীয় সঙ্ঘগুলি নিশ্চিতই তাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন আছে। অনেক দৃষ্টান্ত তাদের সম্মুখে রয়েছে। সে সবের দ্বারা তারা পরিচালিত হতে পারে। বৃটেনে ও সম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে শ্রমিকগণের যে সকল অধিকার আছে সে সকল পাবার জন্যে ভারতবর্ষ জোরের সহিত দাবী করতে পারে। অধিকন্তু, অধিকার বুঝে পাবার জন্যে যে সংগ্রাম তাদের করতে হবে তাতে তারা বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন পাবে। এ সমস্যার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখনো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, কেননা ভারতীয় আন্দোলন এখনো ততটা প্রসারিত হয় নি। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত শক্তি যথেষ্টই আছে, অবশ্য যদি এ আন্দোলন আপনাকে ইম্পিরিয়েলিজমের রথচক্রের সহিত আবদ্ধ না করে।

—০—

জোয়ার-ভাটা

—০—

ভারতের জনগণের সমুদ্রে ১৯২০।২১ সনে একবার জোয়ার এসেছিল। ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বারদৌলিতে তার ভাটা আরম্ভ হয়। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলন ভাটার মুখেই চলেছে। আর কখন যে জোয়ার আসবে তা কে জানে? জনগণের উত্থান গান্ধী চেয়েছিলেন। সেই উত্থানের চিহ্ন যখন চৌরি চৌরাতে পরিলক্ষিত হলো তখন গান্ধী তাকে অকালে গলাটিপে মেরে দিলেন। কেন এরূপ করা হলো? যাঁরা নিতান্ত সোজাভাবে কোনো জিনিসকে দেখে থাকেন, তাঁরা হয়তো বলবেন যে জনগণের মধ্যে সত্যকারের নিরুপদ্রবভাবের সঞ্চার হয়নি বলেই সমবেত বিধি লঙ্ঘনের আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু, সত্যই কি তাই? গান্ধী নিজেই কি ষোলআনা নিরুপদ্রব ভাবাপন্ন ছিলেন? গান্ধীর কথার দ্বারাই আমরা তার বিচার করব। তিনি বলেছিলেন :—

"The Non-Co operators are at war with the Government. We want to overthrow the Government and compel its submission to the people's will." অর্থাৎ অসহযোগীরা গবর্ণমেন্টের সহিত যুদ্ধে প্রলিপ্ত হয়েছে। আমরা গবর্ণমেন্টকে বিপর্য্যস্ত করে জনগণের ইচ্ছার নিকটে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করতে চাই।" এই কি নিরুপদ্রবতার ভাষা? "বিপর্য্যয়" ও "বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য" করাটা কখন কি নিরুপদ্রবে হতে পারে? সুতরাং জনগণের মধ্যে উপদ্রবের ভাব বিদ্যমান আছে বলেই যে সমবেত বিধি-লঙ্ঘন বারদৌলিতে স্থগিত রাখা হয়েছিল তা মোটেই সত্য কথা নয়। তার আসল কারণ এই যে গান্ধী ও তাঁর অনুসরণকারিগণ বেরিলি আর চৌরি চৌরাতে জনগণের উত্থানের একটা স্পষ্ট সূচনা দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন যে এরূপ ভাবে যদি গণশক্তি জাগরিত ও সচেতন হয়ে ওঠে তা হলে তাতে তাঁদের শ্রেণীর লোকের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বারদৌলিতে সমবেত বিধিলঙ্ঘন স্থগিত রাখাই যে স্থিরীকৃত করেছিলেন এটাই হচ্ছে তার প্রকৃত কারণ। কৃষকগণ যেন কিছুতেই জমীদারের খাজনা বন্ধ না করে সে কথার ওপরে বারদৌলির প্রস্তাবে অত্যন্ত বেশী করে জোর দেওয়া হয়েছিল। গান্ধী ও তাঁর অনুসরণকারীর চেয়েছিলেন শ্রমিক ও কৃষকগণকে তাঁদের নিজেদের বাঞ্ছিত স্বরাজ লাভের কাজে ব্যবহার করতে। কিন্তু, যখনি তাঁরা দেখতে পেলেন যে তারা সচেতন হয়ে উত্থান করতে চায় তখনি উপরিউক্ত প্রস্তাব পাস করে তাঁরা আপনাদিগকে জনগণ হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। শুধু তা নয়, সেদিন থেকেই তাঁরা কংগ্রেসকে মধ্য শ্রেণীর লোকেদের বাদানুবাদের একটা আড্ডায় পরিণত করলেন! গবর্ণমেণ্ট যখন দেখতে পেলেন যে, যে জাতীয় শক্তি কংগ্রেসে সঞ্চিত হয়েছিল তা আর বিদ্যমান নেই, তখন তাঁরা গান্ধীকে গেরেফ্‌তার করে ছ'বছরের জন্যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করলেন। এর ছ'মাস পূর্ব্বে যদি গান্ধী গেরেফতার হতেন তা হলে দেশময় একটা খুন খারাবি নিশ্চিতই হয়ে যেত, কিন্তু, বারদৌলি মীমাংসার পরে তাঁর গেরেফতার হওয়াতে সেরূপ আর কিছুই হলোনা।

মডারেট ও লিবারেল নেতৃগণ গান্ধীর আন্দোলন থেকে আপনাদিগকে সরিয়ে রেখেছিলেন, কেননা, তাঁরা জনগণকে নিয়ে কোনো খেলা খেলতে প্রস্তুত ছিলেন না। এরূপ খেলাতে কি বিপদ যে ঘটতে পারে (অবশ্য তাঁদের নিজেদের জন্যে) তা তাঁরা ভালো করেই জানতেন। গান্ধীর সহিত যাঁরা নেতৃত্ব করতেন তাঁরা ছিলেন অধিকাংশই মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত লোক। এঁরা একদিকে যেমন জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চাইতেন, অন্যদিকে আবার ধনিক বণিক ও জমীদারের সহিত সম্বন্ধও এড়াতে পারতেন না। এই কারণে সঙ্কটের সময় তাঁদের সম্মুখে আসতেই তাঁরা আর দাঁড়াতে না পেরে একেবারেই ভেঙে পড়লেন। এর পরে এঁদের কার্য্য কলাপ থেকে নপুংসকত্ব আর দেউলিয়াগিরির পরিচয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি।

১৯২২ সনের ঘটনা থেকে নেতৃগণের বিপ্লবেচ্ছাই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, জনগণের নয়। নেতৃগণ ধীরে ধীরে ধনিক-বণিক ও জমীদারের দলে মিশে গেলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের সহিতই তাঁদের সহযোগ আরম্ভ হলো। যে নেতৃত্ব শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে দণ্ডায়মান হয় না, সে নেতৃত্ব কিছুতেই দেশের জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব নামে অভিহিত হতে পারেনা।

গান্ধী-আন্দোলনের শেষ যখন এই ভাবে হলো তখন অভ্যুদয় হলো স্বরাজ দলের। পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ এ দলের প্রবর্ত্তক। এই দল প্রথমেই বলেছিলেন যে জনগণের আন্দোলনের ভিত্তির ওপরেই স্বরাজদলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বরাজদল কৃষক ও শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করবে ইত্যাদি। এ সকল কথা দলের প্রোগ্রাম ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও স্থান পেয়েছিল। দাশ সাহেব নিজেই প্রকাশ করলেন যে তিনি শতকরা ৯৮ জনের জন্যেই স্বরাজ পেতে চান, দু'জনের জন্যে নয়। তিনি আরো বললেন যে তিনি সর্ব্বদা বুর্জোয়াজিগণের বিরুদ্ধাচরণ করবেন, শ্বেত আমলাতন্ত্রের জায়গায় বাদামী (ভারতীয়) আমলাতন্ত্র তিনি কিছুতেই প্রতিষ্টিত করতে রাজী নন। দাশ সাহেব নিজে ও তাঁর শিষ্যরা ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কংগ্রেসেও কাজ কর্ম্ম করতেন। স্বরাজদলের বিশিষ্ট নীতি ছিল বিপ্লবমূলক ধারণা নিয়ে আইন সভাসমূহে প্রবেশ করা এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাতে বাধার সৃষ্টি করে করে আইন সভা সমূহের ভিতর দিয়েই গবর্ণমেণ্টকে বেকার করে দেওয়া।

এ বিপ্লবমূলক ধারণা নিয়ে কাউন্সিল সমূহে কাজ করার জন্যে কোনো দলের পেছনে একটি জিনিস থাকা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন,—সে হচ্ছে সংগ্রামশীল বিরাট গণ-আন্দোলন। তা না হলে বিপ্লবমূলক ধারণা নিয়ে আইন সভাসমূহে কাজ করা একেবারেই সম্ভবপর নহে। এরি জন্যে স্বরাজপার্টির গঠনের মুখে এত জোরে জোরে জনগণের স্বার্থের কথা বলা হয়েছিলো। জনগণের পক্ষ থেকে কোনো আন্দোলন চালাতে হলে বুর্জোয়াজিগণের সহিত সংঘর্ষ ও ছাড়াছাড়ি হওয়া নিতান্তই অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। তার জন্যে স্বরাজ পার্টি কি প্রস্তুত ছিল? পার্টির কগেজ পত্র পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে বুর্জোয়াজিগণকে বাদ দিয়ে পার্টি এক পা অগ্রসর হতেও প্রস্তুত ছিলনা। এর প্রোগ্রামে কৃষক ও শ্রমিকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ

করার কথা স্থান পাওয়ার সাথে সাথেই ব্যক্তিগত "সম্পত্তির মালিক হওয়া" ও "ব্যক্তিগত ভাবে ধন-বৈভব বৃদ্ধি করা" প্রভৃতি নীতিও মেনে নেওয়া হয়েছিল। এর পরে আরো দেখা গেলো ভারতীয় ধনিকগণের স্বার্থের প্রতি স্বরাজ পার্টির কত অপরিসীম টান রয়েছে। ১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় আইন সভায় টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীকে প্রতি টন লৌহজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে ২০ টাকা হিসাবে সাহায্য মঞ্জুর করার জন্যে গবর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। স্বরাজ পার্টির সদস্যগণ পরম উৎসাহ সহকারে গবর্ণমেণ্টের সহিত ভোট প্রদান করেন। শ্রমিক সদস্য মিঃ এন, এম, জোশী এ প্রস্তাবের এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি বল্লেন, সাধারণের এত অর্থ যখন টাটা কোম্পানীকে দেওয়া হচ্ছে তখন শ্রমিক গণের জন্যেও বেতনের একটা নিম্নতম হার বেঁধে দেওয়া হোক। এ সংশোধনী প্রস্তাবের ভোট তিনি গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ত পানইনি, পরন্তু, স্বরাজ পার্টির সদস্যেরাও তাঁকে সমর্থন করেন নি। এরূপে ক্রমশঃ স্বরাজ পার্টির স্বরূপ সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ পার্টি যে জনগণের কেউ নয় এবং বুর্জোয়াজিগণেরই সব, তা ওপরের ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। টাটা কোম্পানীর পক্ষে ভোট দেবার জন্যে তাঁদের উৎসাহের অবধি ছিল না। কিন্তু, জোশী যখন বললেন যে এ উপলক্ষে শ্রমিকদেরও কিছু সুবিধে করে দেওয়া হোক, তখন তাঁরা একেবারে বদ্ধকালা হয়ে পড়লেন, যেন পৃথিবীর কোনো কথা আর শুনতেই পান না।

এরূপে স্বরাজ দলের সকল বিপ্লবাত্মক ধারণার অবসান হয়ে গেল। ১৯২৫ সনের এপ্রিল মাসে দাশ সাহেব নিজেই এক বিজ্ঞাপনী প্রচার করলেন। তাতে তিনি এমন সকল শর্তের উল্লেখ করে ছিলেন, যে সকল পূর্ণ হলে পার্টি আর আইন সভা সমূহে কোনো প্রকারের প্রতিবন্ধক করবে না এবং চাকুরী গ্রহণ করবে। এ দলের নেতারা প্রথমে আপনা-দিগকে জনগণের নেতা বলেই ঘোষণা করে ছিলেন, কিন্তু, তাঁদের জারিজুরির শেষ হলো সমাজের উচ্চস্তরের প্রতিনিধি ও গবর্ণমেণ্টের রক্ষক হিসেবে। এ দলের পেছনে বুর্জোয়া শক্তিই সব চেয়ে বড় শক্তি ছিল, এবং সামান্য যা জনগণের শক্তি এর ভিতরে ছিল এ শক্তি অতি সহজেই তাকে বিপর্য্যস্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। শেষ অবস্থায় স্বরাজ দলের কোনো কোনো সদস্য যেরূপ ভাবগতিক দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁদেরকে খুব ভালো বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। ১৯২৪ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখের ফরওয়ার্ডে সি, আর, দাশ লিখেছিলেন :—

"There is a more serious anarchist movement than the authorities realise. It is growing, and it is increasingly difficult to suppress it. I hope the British and the Indians will get together and presently come to terms on the lines I have mentioned. If the Swarajist movement fails, no repression can possibly cope with the anarchy which is sure to raise its head." অর্থাৎ "কর্তৃপক্ষ যতটা বুঝতে পেরেছেন তার চেয়েও অনেক গুরুতর এনার্কিষ্ট আন্দোলন বিদ্যমান রয়েছে। এ আন্দোলন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর দমন করা ক্রমশঃই কঠোরতর হয়ে পড়ছে। আমি আশা করি বৃটিশ ও ভারতবাসিগণ একত্র সমবেত হবেন এবং অবিলম্বে আমার প্রদর্শিত পথে একটা আপোস নিষ্পত্তি করবেন। স্বরাজ পার্টির আন্দোলন যদি অকৃত কার্য্য হয় তা হলে কোনো প্রকার প্রদমনের দ্বারাই সম্ভবতঃ এনার্কিষ্টদের সাথে পেরে উঠা যাবে না। তারা নিশ্চিতই মাথা তুলে উঠবে।"

এ বর্ণনাতে কোনো জটিলতা নেই। কাজেই এর ওপরে কোনো প্রকারের টিকা-টিপ্পনি করা অনাবশ্যক। আমাদের বিনীত অনুরোধ, পাঠকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মন দিয়ে এর বিচার করবেন।

১৯২৫ সনের জুন মাসে দাশ সাহেবের মৃত্যুর পরে স্বরাজ দলের বিখ্যাত নেতা মিঃ টি, সি, গোস্বামী ঘোষণা করেছিলেন :—

"Mr. Das was never a revolutionary. In his death, both India and Great Britain have lost a true defender of real law and order. Mr. Das stood between India and revolution."

অর্থাৎ—মিঃ দাশ কখনো বিপ্লববাদী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ ও গ্রেট বৃটেন এ উভয় দেশই প্রকৃত বিধান ও শৃঙ্খলার একজন সত্যকারের রক্ষককে হারিয়েছে। মিঃ দাশ ভারতবর্ষ ও বিপ্লবের মধ্যখানেই দণ্ডায়মান হয়ে ছিলেন।"

(ডেইলী হেরাল্ড, ১৮ই জুন ১৯২৫)

দাশ সাহেবের আপন শিষ্য তাঁর সম্বন্ধে যে ঘোষণা করেছেন তার ওপরে আমরা আর কি মন্তব্য প্রকাশ করব? দাশের জীবদ্দশাতেই স্বরাজ পার্টি যে কোথায় গিয়ে নেমেছিল তা দেখাবার জন্যেই শুধু আমরা ওপরের দু'টো অংশ উদ্ধৃত করলেম। তারপরে তাঁর মৃত্যুর পরে অবস্থা যা হয়েছে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলাই প্রয়োজন নেই।

গান্ধীর আন্দোলন, দাশের আন্দোলন উভয়ই মিহিয়ে গেছে। এখন কি উপায় অবলম্বন করলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে সত্যকারের জোয়ার আসবে সেটাই ভাববার বিষয়। ভাটার স্রোতে আমরা চিরকালই কিছু নীচের দিকে যেতে পারব না, তাতে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে।

আমাদের জাতীয় সংগ্রাম হবে জনগণের সংগ্রাম, কৃষক আর শ্রমিকের সংগ্রাম। অল্প সংখ্যক ধনিক-বণিক-জমিদার ও ভদ্রলোকেদের আন্দোলন কখনো জাতীয় আন্দোলন হতে পারে না। আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে নূতন ভাবে মূর্ত্ত করে তুলতে হবে। নূতন প্রোগ্রাম নিয়ে নব ভাবে জনগণের সংগঠনের কাজে আমাদিগকে লেগে যেতে হবে। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি হয় তো ভারতের জনগণের প্রোগ্রাম গ্রহণ করে সত্যকারের জাতীয় মহাসমিতিতে পরিণত হবে, নতুবা এর অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজনই নেই।

আমাদের শেষ কথা এই হচ্ছে যে কর্ত্তার ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এ ভূতের আশ্রয় হতে আমরা যদি আপনাদেরকে মুক্ত করতে না পারি তা হলে আমাদের পক্ষে জাতীয় সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া একেবারেই সম্ভব পর হয়ে উঠবে না।

———

-৬০

যাবার স্বাধীনতা আন্দোলন

—০—

(আবদুল হালীম)

—*—

প্রশান্ত মহা সমুদ্রের ফেনিল জলরাশি ভেদ করিয়া যে অগণিত দ্বীপমালা অনন্ত কাল ধরিয়া বিরাজমান রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা কোনো সংবাদ ভাল করিয়া অবগত হইতে পারিতেছিনা। মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে যাবা বর্নিয়ো প্রভৃতি দ্বীপগুলির জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা পড়িয়া থাকি মাত্র। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া যাবা বর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে জাগরণ যে ভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তদ্বিষয়ে দুই একটি কথা এই স্থলে লিপিবদ্ধ ও বিবৃত করা অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। প্রশান্ত মহা সমুদ্রের ঐ সমুদয় নাতি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমষ্টিকে 'ইণ্ডোনেশিয়া' বলা হয়। যখন সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া স্বাধীনতা সমর সংঘটিত হইতেছে—ইম্পিরিয়েলিজমের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষিত হইয়াছে ও হইতেছে, যখন রুশে শোষণবাদের মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে, চীন যখন ঘোর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শোষণবাদের মূলোৎপাটনে তার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারিত জাতি যখন সংঘবদ্ধ ভাবে সমস্বার্থে, ভ্রাতৃত্ব প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া শোষণবাদীদের ধ্বংসের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছে, ভারতবর্ষও যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে, তখন যাবার পশ্চিম প্রদেশগুলিতে স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত যুদ্ধ-বিপ্লব ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হইতেছে, জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তাহা নিতান্ত সামান্য ঘটনা নহে। বিগত কয়েক বৎসর হইতে যবদ্বীপের মুক্তিকামী বিদ্রোহী দল নানাভাবে বিপ্লবায়োজন করিয়াছে। রেলওয়ে ধর্ম্মঘট, ১৯২৪ সালে ত্রাসনীতিবাদীদের প্রিয়াংগ্রাতে রক্তবাহী বিদ্রোহ, ১৯২৫ সালের প্রারম্ভে এটি দ্বীপে গরিলা যুদ্ধ, ১৯২৫ সালের মধ্য ভাগে 'সণ্ডে' দ্বীপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের ও পুলিশের উপর ভীষণ আক্রমণ এবং ১৯২৬ সালের প্রথম ভাগে 'সুরা' দ্বীপের ধর্ম্মঘট ইত্যাদির দ্বারা বেশ অনুমান হয় যে পশ্চিম যাবাতে বেশ সর্ব্ববাদী সম্মত ভাবে বিপ্লবী দলের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। যাবা প্রভৃতি দ্বীপগুলি 'ডচ্' ইম্পিরিয়েলিজমের করতলগত। এ সকল দেশের অধিবাসীদের শোষণ-কল্পে 'ডচ' ইম্পিরিয়েলিজম বহুতর কঠোর নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছে। পুনঃপুনঃ আইন প্রণয়ন পূর্ব্বক, বিদ্রোহ, ধর্ম্মঘট, এমন কি সাধারণ সভা সমিতির প্রচার ও অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইণ্ডোনেশিয়ার গবর্ণর জেনারেল ফোক এবং তৎপরবর্ত্তী গবর্ণর ডিগ্রাফ্ ১৯২৬ সালে ফোকের স্থলে আসিয়া ফোকের অনুসৃত কঠোর আইনের এতটুকুও পরিবর্ত্তন সাধনত করেই নাই, অধিকন্তু আরও কঠোর নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যাবার কম্যুনিষ্ট আন্দোলনকে টুঁটি টিপিয়া মারিবার জন্য বহু কম্যুনিষ্টকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, কারাকক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছে, এমন কি কতিপয় নেতৃস্থানীয় কম্যুনিষ্টকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পর্য্যন্ত করিয়াছে। ডচ ইম্পিরিয়েলিজমের অধীনতা পাশ ছেদনকল্পে শোষণবাদকে তিরোহিত করিবার জন্য ইণ্ডোনেশিয়ার লোকেরা বেশ সজোরে মাথা নাড়া দিয়াছিল—তবে কিনা প্রচার ও সংগঠনের কাজ খুব দৃঢ় না হওয়ার দরুণ তাহারা বিপ্লব কার্য্যে সফল ও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বিগত বৎসরের ১২ই নভেম্বর তারিখে সজ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা বেটেভিয়ার ডচ-ভারত ঔপনিবেশিক শাসন কর্ত্তাকে মধ্য রাত্রিতে ভোজরত দেখিয়া যেরূপে রাজধানীর সমুদয় রাস্তাগুলি দখল করিয়া লয়, যেরূপে পুলিশের উপর এবং 'মেডোকে' জেল আক্রমণ করে তাহাও নিতান্ত তাচ্ছিল্যকর ঘটনা নহে।

এই সব বিপ্লবের কার্য্য শুধু গুপ্ত বিপ্লববাদীদের দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। বিপ্লববাদীরা টেলিফোনের ষ্টেশন গুলি দখল করিয়া লয়—পুলিশের সহিত খণ্ড যুদ্ধ চালাইতে থাকে। ট্যাংগেরাং শহরে পুলিশের সহিত তাহাদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ বাধে। 'নাগারক শহরে কতিপয় পুলিস কর্ম্মচারীও নিহত হইয়াছিল এবং টিয়ামিসের অবস্থাও তদনুরূপ হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে টেলিফোনের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রেলগাড়ী উল্টাইয়া রেল পথ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ব্যাণ্টামের সমস্ত শহরে একটা অশান্তির উৎপত্তি হইয়াছিল, দলে দলে শত সহস্র লোক উৎকট ভাবে 'মিনিস' 'লাবুয়ানা' টিএনিং প্রভৃতি স্থানগুলির শাসন কর্ত্তাদের ধ্বংস করিয়াছিল এবং শহর ও জেলার গ্রামগুলি দখল করিয়া লইয়াছিল। এমন কি বিদ্রোহের কার্য্যে কতক পুলিস ও সৈনিক বিপ্লবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনও করিয়াছিল, যদিও পুলিস ও সৈন্যদলের মধ্যে প্রচার তত ভালো ভাবে হইয়াছিল না। ট্রামের চালকরা ও মটর প্রভৃতির ড্রাইভারগণও বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের খুব সাহায্য করিয়াছিল। রেলওয়ে কর্ম্মচারী রেল প্রভৃতি সরাইবার ও ধ্বংস করিবার কাজে বিপুল ভাবে সহায়তা করিয়াছিল। টেলিফোন কর্ম্মচারীগণ তার কাটার ব্যাপারেও চুপ থাকে নাই। তাহারাও প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ কৃষক শ্বেত পোষাকে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া মুসলমানদের ধর্ম্মযুদ্ধ বা 'জেহাদ' ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল—এই সমস্তই জাতীয় মুক্তির জন্য বিঘোষিত হইয়াছিল। প্রচার ও সংগঠনের কার্য্য খুব পাকা-পোক্ত না হওয়ায় ও কৃষক এবং শ্রমিকগণ সম্পূর্ণরূপে বিপ্লবে যোগদান না করা হেতু ডাচ ইম্পিরিয়েলিজম শীঘ্র বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। পুলিস ও সৈন্যদলের ভিতর প্রচার কার্য্যের প্রসারের অল্পতা হেতু তাহারাও ভাল ভাবে ইহাতে যোগদান করে নাই। বিপ্লবকারীরা সকলেই বর্ত্তমান আগ্নেয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে নাই। যদি দেশের জনসাধারণ ধর্ম্মঘট ও ডচ্ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অধিকার করিয়া বসিত তাহা হইলে এত সহজে ও এত অল্প সময়ের মধ্যে বিপ্লব দমিত হইতে পারিত না। যদিও এই অবস্থাতে বিপ্লব দমিত হইয়াছে এবং সণ্ডে দ্বীপ পুঞ্জের প্রায় ৫০০ শত কম্যুনিষ্ট এবং অন্যান্য স্থানের ৩০০০ সহস্র লোক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে নিপতিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বা আহত ও নিহত হয়, কাহাকেও বা বিনা বিচারে নির্জ্জন বারিধি পক্ষে অবস্থিত নিউগিনি দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয় ও বর্ব্বর প্রথামত কয়েক জনের বিচার করিয়া জনসাধারণের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়, তবুও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে এই বিপ্লবের দ্বারা অনেক শিক্ষা লাভ হইয়াছে। ভুল ভ্রান্তি, বিপ্লবের কার্য্যের দোষ প্রভৃতি

ভবিষ্যৎ মুক্তিকামী দলের অনেক সহায়তা করিবে। তদ্ব্যতীত ডচ্ গবর্ণমেণ্ট ইহার দ্বারা অনেকটা ধাক্কাও খাইয়াছে। পুলিস ও কর্ম্মচারীরা নিহত হওয়ায় তাহাদের অন্তরেও ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কাজের দ্বারা যখন ইণ্ডোনেশিয়ার অধিবাসীরা জাগরিত হইয়াছে তখন ডচ ইম্পিরিয়েলিজমের ধ্বংস অনিবার্য্য। যে কোন মুহূর্ত্তে বিপ্লবের আশঙ্কা রহিয়াছে, কেননা, জনগণের ভিতরই তাহার আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারাই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ইণ্ডোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে রেল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ডচ গবর্ণমেণ্ট শোষণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। কৃষক ও মজুরদের নির্ম্মমভাবে শোষণ করা হইতেছে। পুরুষ শ্রমিকরা (কারিকর) ১ শিলিং ও মামুলি শ্রমিকরা আরো কম মজুরী পাইয়া থাকে। স্ত্রী-শ্রমিকদের বেতন বহু গুণে কম। তাহা ছাড়া ট্যাক্স, প্রভৃতি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কম শোষণ করে না। তাহাদের অর্থনীতিক দুরবস্থা যখন চরমে উঠিয়াছে তখন তাহারা ক্রমশঃ ডচ শোষণবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারিত দেশ আজ যখন ধীরে ধীরে জাগরণের পথে অগ্রসর হইতেছে—তখন ইম্পিরিয়েলিজমের চিহ্ন ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবেই।

শ্রমিক জগৎ

—০—

প্রেসকর্ম্মচারী সমিতির উদ্যোগে নিখিল ভারতীয় প্রেস-কর্ম্মচারী সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজন হইতেছে। ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে ইতি মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতি, শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলভী মাহ্‌বুবল হক, মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি, শ্রীযুত কিশোরীলাল ঘোষ সম্পাদক, শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সরকার সংগঠনকারী সম্পাদক ও কয়েক জন প্রেস কর্ম্মচারী সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশা করি অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত হইবে এবং প্রেস কর্ম্মচারী সমিতিকে আরও সুগঠিত ও বলবান করিয়া তুলিবে।

—০—

ল্যান্সডাউন জুটমিলের যে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল তাহার আর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না কেন? ল্যান্সডাউন্ জুটমিল এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় কি করিতেছেন? সভাপতি মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী মহাশয়ই বা কি করিতেছেন? ধর্ম্ম ঘটের সময় যে সজ্বের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না সে সজ্ঘ থাকিবার সার্থকতা কি তাহা তো আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বোম্বে কংগ্রেস কমিটি শ্রমিকদিগের উন্নতি কল্পে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন। শ্রমিকদের জন্য যে একটি বিদ্যালয় হইয়াছে তাহাতেও তাঁরা কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। বাঙলার কংগ্রেস কমিটি নিজেদের ভিতর গুঁতাগুঁতি করিয়া যখন নেতাদের ভিতর দলাদলির সৃষ্টি করেন, তখন ভোট বাগাইবার জন্য বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের গাড়ি ভাড়া দিয়ে আনাবার জন্য কখনও খরচ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কৌন্সিল নির্ব্বাচনের সময়ও কংগ্রেস নেতারা জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে পেছপাও হন্ না। কিন্তু শ্রমিকদের উপকারের জন্য কিছু দান করিতে কর্ত্তাদের পুত্রশোক উপস্থিত হয়। অথচ এই সকল নেতারাই ভাবী স্বরাজের প্রধান পাণ্ডা। ইহাঁদের হাতে ক্ষমতা আসিলে শ্রমিকদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা কল্পনা করাও কঠিন!

গতবারে যখন বি, এন, রেলওয়ের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল তখন আমাদের দেশের শ্রমিক সজ্ঘগুলি তাহাতে সাহায্য করাত দূরের কথা, মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেও কার্পণ্য করিয়াছিল। জন সাধারণত কিছুই করে নাই। বি, এন, আরের কর্ত্তারা দেশের লোকের মুরদ বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য ধর্ম্মঘট শেষ হইবার পর এখন সজ্ঘটিকে ভাঙ্গিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এবারও কি সঙ্ঘগুলি নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবে এবং সজ্ঘ নেতারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত থাকিবেন?

কোন এক সজ্ঘ নেতা "গণবাণী" সম্পাদকদের লিখিয়াছেন, আপনাদের কাগজে দেখিতে পাই যে "আপনারা প্রায়ই সজ্ঘ কর্ত্তাদের উপর আক্রমণ করিয়া থাকেন। এরূপ করা আপনাদের পক্ষে বড়ই অন্যায়। এখন এদেশে শ্রমিকদের অবস্থা যেরূপ তাহাতে সজ্ঘ গড়িয়া তোলা যে কি দুরূহ কাজ সেটা যারা হাতে কলমে কাজে করে তারাই জানে। কোথায় আপনারা সজ্ঘ কর্ত্তাদের উৎসাহিত করিবেন, তা না করিয়া কেবল তাহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনাই করিয়া থাকেন। এটা কি ঠিক?" আমাদের মনে হয়, যে সব সজ্ঘ কর্ত্তারা বাস্তবিকই সজ্ঘ সংগঠনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা কাহারও সুখ্যাতি বা উৎসাহের অপেক্ষা করেন না। আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি এবং মনে করিয়া থাকি যে তাঁহাদের কার্য্য ও সাফল্যই তাঁহাদের যথেষ্ট বিজ্ঞাপন। কিন্তু আমাদের মতে দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল। কতকগুলি স্বার্থান্বেষী, দুরভিসন্ধি যুক্ত লোক অধিকাংশ সজ্ঘগুলিকে গিলিয়া রাখিয়াছে। আমাদের উদ্দেশ্য, এই সকল লোক গুলিকে সাধারণের চক্ষের সাম্‌নে তাহাদের স্বরূপ ধরিয়া তুলিলে তাহারা আপনা আপনি সরিয়া পড়িবে। এই সকল লোকের জন্যই সজ্ঘ গুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

শুনিতে পাই ই, আই, আর রেল কর্ম্মচারীদের লইয়া একটি সজ্ঘ বহু দিবস যাবৎ রহিয়াছে। এই সজ্ঘের কর্ত্তা নাকি মিঃ কে, সি, মিত্র। সজ্ঘের অফিস নাকি লক্ষ্ণৌ শহরে। ই, আই রেলে ন্যূন কল্পে প্রায় ৭৫ হাজার ভারতবাসী খাটিতেছে। মিত্র মহাশয়ের সজ্ঘের সভ্য কত? তাঁহার সজ্ঘের শাখা কয়টি? লিলুয়া, জামালপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানাগুলির মজুরেরা কি তাঁহার সজ্ঘের সভ্য? মিত্র মহাশয়ের চালচলন নাকি সন্ন্যাসীর ন্যায়। তিনি কি ই, আই, রেলের কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং এই সকল

অভাব অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করেন? অথবা সুখ দুঃখ কিছুই নয়, সব কিছুই মায়া, এই মত প্রচার করিয়া থাকেন? ইহাই যদি তাঁহার প্রচার কার্য্য হয় তাহা হইলে তাঁহার হিমালয়ে গমন করা উচিত নয় কি?

—০—

কাগজে দেখিয়াছিলাম যে জামসেদপুর লেবর ইযুনিয়নের জন্য একজন সংগঠনকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। সঙ্ঘ উপযুক্ত লোককে ২০০৲ টাকা মাসিক বেতন দিতে প্রস্তুত আছেন। আমাদের দেশে যে কয়টি ইয়ুনিয়ন আছে সেগুলি যদি নিজেদের ক্ষমতা মত মাহিয়ানা দিয়া Organising Secretary (সংগঠন কারী সম্পাদক) নিয়োগ করেন এবং সভ্য পিছু পাওয়া চাঁদার উপর একটা কমিশনের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বোধ হয় শ্রমিকদের ভিতর যাঁহারা একটু লেখাপড়া জানেন, এবং শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা অনেকেই এইরূপ কর্ম্মে আকৃষ্ট হ'ন। সঙ্ঘ গুলিও অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে। এরূপ কার্য্যে প্রকাশ্য ভাবে বেতন লওয়া অপমান বা লজ্জার বিষয় নয়। তবে অনাহারী (?) কার্য্যের সম্মান পাইব, এদিক ওদিক হইতে চোরাকোপ্তা যা কিছু পাই হাতাইব, আর সঙ্ঘের কার্য্যের ভিতর করিবার মধ্যে কেবল নিজের মোড়লত্ব বজায় রাখিব—এটা মোটেই ভাল নয়। আমাদের মনে হয় যে আমাদের দেশের অনুষ্ঠান গুলি যে ভাল রকমে চলে না তাহার কারণ হচ্ছে আমাদের নিজেদের মনোবৃত্তি। আমাদের সাম্নে দিয়ে ছুঁচ্ গলে না, পিছন দিয়ে হাতি গলে চায়।

স-প

———

কানপুরের একটা মিলওয়ালারা দু'জন শ্রমিকের দু'মাসের বেতন বন্ধ করে রেখেছিল। তার কারণ, তারা বিদায় না নিয়ে ক'দিন কাজ থেকে অনুপস্থিত ছিল। কানপুর মজদুর সভার চেষ্টায় কলওয়ালারা এ বেতন আবার দিয়েছে। একজন ঠিকাদার তার কয়েকজন শ্রমিকের ৮০ টাকা মজুরী দাবিয়ে বসেছিল। সভার চেষ্টায় ঠিকাদার সেই ৮০ টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে। দু' মাস আগে সভা একজন সদস্যের বেতন না দেওয়ার জন্যে আর একটা কলওয়ালাদের নামে মোকদ্দমা করেছিল। আদালত মায় খরচ এ মোকদ্দমায় ডিগ্রী দিয়েছে। কানপুরের কল সমূহে শ্রমিকদের ভর্ত্তি মিস্ত্রীদের দ্বারাই হয়ে থাকে। এতে শ্রমিকদের যেমন অসুবিধে হচ্ছে ঠিক মালিকদেরও তেমনি অসুবিধে হচ্ছে। মজদুর সভা চেষ্টা করছে শ্রমিকদের ভর্ত্তির কাজ সভার মধ্যবর্ত্তিতাতেই হোক্। কোনো কোনো মিলত সভার এ প্রস্তাব এখনি মেনে নিয়েছে, আর কয়েকটি মিল এখনো এ প্রস্তাবটাকে বিবেচনাধীন রেখেছে। গত সপ্তাহে সভার তরফ থেকে মিল্ সমূহে ২২ জন লোক ভর্ত্তি হয়েছে। আগামী নবেম্বর মাসে কানপুরে অল্-ইণ্ডিয়া ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। দিওয়ান চমন্লাল হবেন তার সভাপতি। মজদুর সভার ওপরে এর সকল বন্দোবস্তের ভার পড়েছে। গত সপ্তাহে এ অধিবেশনের জন্যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়ে গেছে। কর্ম্মকর্ত্তৃগণ এখনো নির্ব্বাচিত হননি, অধিবেশনের তারিখও এ যাবৎ স্থিরীকৃত হয়নি।

("প্রতাপ", কানপুর, ৩রা জুলাই)

———

কয়েকদিন আগে আমরা শুনেছিলেম যে ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মশায়ের চেষ্টা ও উদ্যোগে কলিকাতায় "ওয়ার্কার্স প্রোটেক্শন্ লীগ্" নামক একটা সঙ্ঘ স্থাপিত হবে এবং এ সঙ্ঘের কাজ হবে বিভিন্ন সঙ্ঘ সমূহের তরফ থেকে শ্রমিকদের জন্যে ক্ষতি পূরণের মোকদ্দমা করা। সম্প্রতি "আনন্দ বাজার পত্রিকা"য় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে এ লীগ স্থাপিত হয়ে গেছে। কলিকাতা, ২৬নং ডিক্সন লেনে এ লীগের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তবে লীগ কি কাজ করবে তা আমরা এখনো সঠিক জান্তে পারিনি। আমরা যা শুনেছি তা-ই সত্য কিংবা লীগ প্রাদেশিক শ্রমিক অনুষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে, তা রিপোর্টের কোথাও লিখিত হয়নি। কাজেই, এ সম্বন্ধে কোনো অভিমত প্রকাশ করা এখন সমীচীন হবে না।

—০—

শ্রমিক

—*—

[গণ-সেবক]

—০—

পৃথিবী তাহার ভোগ-সম্ভার চোখের লইয়া সম্মুখে জাগিয়া আছে অনন্তকাল ধরিয়া! * * *

বিপুল ক্ষুধার তীব্র তাড়নে ছুটে চলি! দুই হাত পাতিয়া আমার ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষা চাই। ধরণী মুখ ফিরাইয়া দূরে সরিয়া যায়।

ধীরে ধীরে আঘাত আসে, বেদনা আসে—দৈন্য, দুঃখ, দারিদ্র্যের তাণ্ডব লীলা চলে জীবনের শ্মশান প্রাঙ্গনে। * *

প্রেম, ভালোবাসা, আত্মীয়তা বান্ধবতার মধ্যে জাগিয়া ওঠে জীবনব্যাপী বঞ্চনার নিষ্ঠুর পরিহাস!

অন্তর জগতে কাঁদিয়া মরে যুগ যুগান্তের মথিত মানুষ!

অত্যাচার, অনশন নিষ্পেষণের মাঝেও প্রাণ চায় জীবনের তৃপ্তি!

* * * *

জ্ঞানী তাহার দানে জগতকে প্রভাবান্বিত করিল। কবির দানে ধরিত্রীর প্রাণ সরস হইয়া উঠিল। ধনী তাহার সমস্ত দান করিয়া প্রতিদানে অমর হইয়া রহিল।

শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমি দান করিয়া আসিলাম—শরীরের রক্ত, দেহের শক্তি এক কথায় সমস্ত জীবনটাকে। প্রতিদানে পাইলাম নিপীড়ন, বন্ধন, বঞ্চনা, অপমান আর বুকভরা বেদনা!

* * * *

অন্ধকার রাত্রি। উর্দ্ধে বহু উর্দ্ধে ম্লান নক্ষত্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম—উঃ কি অকরুণ এই জীবন। সুখ, শান্তি, আনন্দ কিছুই নাই—আছে কেবল রিক্ততার ব্যর্থ হাহাকার! প্রাণের গহন ব্যথার অন্ধকার হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—মিথ্যা কথা!

তোমার ব্যথা, তোমার ব্যর্থতা আজ সার্থকতার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে জেগেছে। প্রতীচির স্বার্থ-মন্দির ভেঙ্গে পড়েছে। মিশরের পীরামিড কেঁপে উঠেছে, চীনের প্রাচীরে ভাঙন লেগেছে—হিমালয় দুলে উঠেছে।

তোমার ব্যথার ভিতর দিয়া সত্যের বাণী এসেছে—মানুষ পাইবে তাহার মানবীয় সর্ব্ব প্রয়োজনে সম অধিকার!

কি আশ্চর্য্য! আমার এই সার্থকতা বেদনার আড়ালে কেমন ক'রে লুকিয়েছিল!

হে মোর জীবনের ব্যথা! তোমায় নমস্কার!

"নওরোজ"

—০—

বাংলা মাসিক "নওরোজ" যে বের হবে তার বিজ্ঞাপন বিভিন্ন কাগজে সকলেই পড়েছেন। সম্প্রতি এ কাগজের প্রথম সংখ্যা বাজারে বেরিয়েছে। এর বার্ষিক মূল্য চার টাকা আট আনা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছয় আনা। কলিকাতা, ৪৫ বি, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট হতে "নওরোজ" প্রকাশিত হয়েছে। এর সম্পাদকীয় ভার মোহাম্মদ আফজাল-উল্-হক সাহেব গ্রহণ করেছেন। সাধারণত মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত মাসিক গুলি যেমন হয়ে থাকে "নওরোজ" তার গণ্ডী এড়িয়ে গেছে দেখে আমরা অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানরা যে দু'এক খানা মাসিক চালাচ্ছেন তার প্রত্যেক খানাই গোঁড়ামীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। এ কাগজ গুলির বিশিষ্ট নীতি হচ্ছে মুসলমান ছাড়া আর কারো লেখা না ছাপানো। তারপরে, প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে যে যোগ্যতার পরিচয় এসব কাগজে পাওয়া যায় তাতে এমন কথা কিছুতেই বলতে পারা যায় না যে কাগজ গুলি সত্যকার ভাবে সম্পাদিত হয়। এটা খুবই আশার কথা যে "নওরোজ" সম্পাদিত হয়েছে এবং সম্ভবতঃ সুসম্পাদিতই হয়েছে। কাগজের ছাপা ও কাগজ ভালো। প্রচ্ছদপট খানা অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত ও মুদ্রিত হয়েছে।

এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র নাথ, কাজী নজরুল ইস্লাম, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এবং আরো অনেকে লিখেছেন। বাঙালী মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত এ মাসিক খানা যদি স্বাধীন চিন্তাধারা প্রবাহিত করার একটা উৎস স্বরূপ হয় তা হলে বাস্তবিকই সেটা খুব আশার বিষয় হবে। "নওরোজ" এর চালকরা তাঁদের পাঠক-পাঠিকাগণের সমীপে এই নিবেদন জানিয়েছেন যে তাঁরা যেন "জাগ্রত ও উন্মুক্ত চিত্ত লইয়া নওরোজের এই প্রয়াসকে প্রীতির চক্ষে দেখেন।" আমরা পাল্টা নিবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁরাও যেন "জাগ্রত ও উন্মুক্ত চিত্ত লইয়া" কাগজ খানার পরিচালনা করেন।

"নওরোজ" এ "মোস্লেম জগৎ" নাম দিয়ে একটা অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। আমাদের মনে হয় এ রকম বিশিষ্ট শিরোনাম দিয়ে একটা গণ্ডীর সৃষ্টি না করলেই ভালো হত। এ অধ্যায়ের কথা গুলো বিভিন্ন শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হত বলেত আমাদের মনে হয় না।

হাঁ, একটা কথা বলিনি বলে যাঁরা আজো 'নওরোজ' পড়েননি তাঁরা বোধ হয় এতক্ষণে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। ছবি "নওরোজ" এ অনেক গুলিই আছে।

চীনের জাতীয় দলের বিজয় দুন্দুভি

—০—

হং কো, চীন

চীনের জাতীয় সৈন্যদল উত্তরাভিমুখে পিকিনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। চীনের জাতীয় দলের নেতৃবর্গ ঘোষণা করিয়াছেন যে বিপ্লব সৈন্য বাহিনী তিন মাসের মধ্যে পিকিন দখল করিতে সক্ষম হইবে। পিকিনের পথে বড় বড় শহরগুলি ইতি পূর্ব্বে তাহাদের করতলগত হইয়াছে। সেই সঙ্গে প্রচুর লোকজন ও যুদ্ধ-সরঞ্জামও তাহাদের অধিকারে আনিয়াছে। চীনের উত্তর ভাগের সামরিক নেতা এবং বৃটিশ আশ্রিত চ্যাং সোলিনের অবস্থা খুব সঙ্কট সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। সে চতুর্দ্দিক হইতে বহুতর বাধা পাইতেছে। চীনের কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদল, এমন কি অনেক ব্যবসাদারেরাও সমবেত ভাবে তাহাকে প্রভূত বাধা প্রদান করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে তাহার পরাজয় ও পতন অবশ্যম্ভাবী।

ভূতপূর্ব্ব জাতীয়তাবাদী ও বর্ত্তমানে চীনের বিপ্লবের বিশ্বাসঘাতক চ্যাং কাইসেকের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সে আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে জনগণকে স্বীয় সাহায্যার্থ পতাকা তলে আনিতে অসমর্থ হইতেছে। সংবাদ হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে চ্যাং কাই সেকের নেতৃত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে ও সে হীনবল ও পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িতেছে। গ্রেটবৃটেন চিং কিয়াং হইতে তাহার প্রতিনিধি সরাইয়া লইয়াছে এবং যে সমস্ত শহরগুলি জাতীদলের অধীনে রহিয়াছে সেখান হইতেও তাহাদের প্রতিনিধি সরাইয়া লইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, কেন না চীনে তাহার প্রভুত্ব ও সম্মানের হ্রাস হইবার ভয় সে করিতেছে। তজ্জন্য সে ক্রমশঃ হংকো জাতীয় দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতেছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসের ধ্বংসপোত 'প্রিবল' ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ তীরস্থ গ্রামসমূহ ও কেল্লাগুলির উপর গুলি বর্ষণ ও গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিল। তদ্দ্বারা অনেক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস।

("দি ইউনাইটেড ফার্ম্মার"
(আমেরিকা) মে, ১৯২৭)

দেশ-বিদেশ

—*—

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস

গত শনিবারে কলিকাতা অলবার্ট হলে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ সম্মিলনে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় বলেছেন—"আজ ইউরোপের নকলে এদেশেও বড় বড় শহরে বড় বড় কেন্দ্রে ধন কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে; যন্ত্র এসে মানুষের হাত থেকে তাদের ধন কেড়ে নিয়ে পুঞ্জীভূত করেছে।" ব্যক্তি বিশেষ কিংবা বিশেষ ব্যক্তি গণের ভাণ্ডারে যে ধন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তাতে যন্ত্রের কিছুই দোষ নেই। যন্ত্রের সৃষ্টি যে মানুষের শ্রমের লাঘব করবার জন্যে হয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হওয়ার প্রথা পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হয়েছে বলেই আজ জগৎময় এত দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্যে কোন একটি বিশেষ দেশের সভ্যতা দায়ী নয়—পৃথিবীর সকল দেশের সভ্যতা সমান ভাবে দায়ী। কবি আর এক জায়গায় বলেছেন :—

"অসাম্যই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার মূল। যেমন এক জায়গায় বায়ু বিরল, অন্যস্থানে তার চাপ বেশী হলে ঝড়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি ধনের অসম বণ্টনই ধন-বৈষম্যের—পৃথিবীব্যাপী দারিদ্র্যের সৃষ্টি করেছে। মানুষের নব আবিষ্কৃত সত্য, সমবায়ের ঐক্যবুদ্ধিই তাকে দূর করতে পারে।" এখানে আমরা কবির সহিত সম্পূর্ণ একমত।

—০—

আফ্‌গানে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা মিঃ ওবায়দুল্লা মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে আফগান রাজ্যের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হয়ে গেছেন। আফ্‌গান সরকার সম্প্রতি তাঁকে তুরস্কে প্রেরণ করেছেন। সেখানে তিনি কয়েক মাস খনি পরীক্ষা করে এসে জালালাবাদে খনির পরীক্ষা আরম্ভ করবেন। মিঃ ওবায়দুল্লা একজন বাঙালী মুসলমান—নোয়াখালী জিলার অধিবাসী।

—০—

বৃটিশ শ্রমিকের শুভেচ্ছা

হ্যাঙ্কোস্থিত কুয়োমিণ্টাং দলের কার্য্যকরী সমিতির চিঠির উত্তরে ব্রিটিশ শ্রমজীবী দল নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন :—

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে আপনাদের প্রেরিত টেলিগ্রামের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে চীনের শ্রমজীবী, কারিগর, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের সহিত আমাদের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

চীনের এই নব জাগরণে আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং ইহাকে জগতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছি। আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্য জগতের উপর চীনের ব্যাপারের প্রভাবের বৈশিষ্ট্য যদি উপলব্ধি করিতেন এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সাম্য এবং সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতালাভে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যদি তাঁহাদের শক্তি প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা রক্ষা করিবার জন্য এবং আপনাদের বিজয়ের পথে বাধা দান করিবার জন্য তাঁহাদের সৈন্য এবং নৌশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন।

ঐরূপ বাধা সত্ত্বেও আপনাদের বিজয়লাভ সুনিশ্চিত, কারণ উন্নতির সমগ্র শক্তি আপনাদের পক্ষে; কিন্তু আমরা আপনাদিগকে এই কথাটা জানাইতে চাই যে, গ্রেটবৃটনে শুধু সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকেরাই যে আপনাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এরূপ নহে, অন্যান্য নরনারীও আপনাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহারাও সকলে চীনের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে বলিতেছেন এবং যে সব শক্তি আপনাদের দেশের জলস্থলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছে, তাহার প্রভাব বিনির্ম্মুক্ত নূতন সান্ধতে আপনাদের সমানাধিকারই স্বীকার করিয়া লইতে বলিতেছে।

(স্বাক্ষর)—জন বেকেট এম-পি; রাটল্যাণ্ড বাউটন; আর্থার বোর চিয়ার; এইচ, এন, ব্রালিস ফোর্ড; ফেনার ব্রকওয়ে; আর, ব্রীজম্যান; এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার; সিমুর কক্স; এ, জে, কুক; এস, সি, ডেভিস, হ্যামিল্টন ফাইফ; টি, গুড; আলেকজেণ্ডার গসিপ, সি, এইচ, হার্ডফোর্ড; জেমস্ হাডসন; দোরোলি থিউসন; জি ল্যান্সবেরী এম-পি; সুসান লরেন্স এম-পি; এষ্ট্রেল ম্যালোন; এল, এল, এষ্ট্রেল ম্যালোন, জেমস্ ম্যাক্সটন এম-পি, কনর‍্যাড নোল, এ, পার্শেল এম-পি, জ্যাক্ পাটরীল, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, সাপুরজী সাকলাতওয়ালা এম-পি, জন স্মিথ, এ, বি, সোয়ালেস, এইচ, এম, সোয়ানিক, জন টার্ণার, আর, সি, ওয়ালহেড, ওয়ালটার ওয়ালস্, জোসিয়া ওয়েজউড, এইচ, জি, ওয়েল্‌স্।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

—০—

দরিদ্রের আত্মহত্যা

নন্দন বাগান লেনের গণেশ সাধুর্খা নামক এক ব্যক্তি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করে করেই লোকটির প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

—০—

যা ছিল তাই হলো

এলাহাবাদের "অভ্যুদয়" নামক হিন্দী দৈনিক এখন থেকে সাপ্তাহিক আকারে বের হবে। পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালবীয় এ কাগজের সম্পাদক। কাগজ খানা পূর্ব্বেও সাপ্তাহিক ছিল। গত নির্ব্বাচনের সময়ে বিরলার অর্থে দৈনিকে পরিণত হয়। প্রকাশ যে এ ক'মাসের মধ্যেই কাগজ খানা ২০ হাজার টাকা লোকসান খেয়েছে।

———

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১৷৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার,
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা বৃহস্পতিবার, ১৪ই জুলাই ১৯২৭, ২৯শে আষাঢ় ১৩৩৪ | ২২শ সংখ্যা

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহ্মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই জুলাই, ১৯২৭, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৪ | ২২ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ কংগ্রেস

বছরের পর বছর ধরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। এক একটা অধিবেশনে লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, এ বার্ষিক অভিনয়ের সারবত্তা যে কি সেটা ভাব্‌লে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। গত ক' বছর ধরে যে ভাবে কংগ্রেসের কাজ কর্ম্ম চলেছে তাতে এই মনে হয় যে কংগ্রেস সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিপন্থি প্রতিষ্ঠান। কোনো প্রকারের বিপ্লবাত্মক আদর্শ কংগ্রেসের সম্মুখে নেই, কংগ্রেসের সভাপতিগণের অভিভাষণে কোনো নূতন কথা থাকে না, কোনো বড় আদর্শ ও নূতন কর্ম্মপদ্ধতি কংগ্রেস কিছুতেই গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। কংগ্রেস ধীরে ধীরে সমাজের স্বার্থপর উচ্চস্তরের লোকেদের হাতে এসে পড়েছে। কংগ্রেস দেশের জনগণের একটা বিপ্লব প্রতিষ্ঠান হোক, এটা তাঁরা মোটেই চান না। তাঁরা চান কংগ্রেসের দ্বারা তাঁদের নিজেদের সুখ সুবিধের বিধান করে নিতে। এজন্যই তাঁরা প্রতিবৎসর কতকগুলি হাস্যাস্পদ প্রস্তাব পাস করে নিয়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের পালা সমাপ্ত করেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। এই অধিবেশনটা যাতে সাফল্য মণ্ডিত হয় তার জন্যে দেশের উন্নতমনা ও স্বাধীনচেতা লোকেদের এখন থেকে চেষ্টা চরিত্র করা একান্তই আবশ্যক। বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের সাফল্য বল্‌তে আমরা এইটুকু বুঝি যে কংগ্রেসকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। কংগ্রেসকে ধনীর অর্থে পরিচালিত ও ধনীর স্বার্থ-সিদ্ধির প্রতিষ্ঠান করে রাখা আর কিছুতেই সঙ্গত হচ্ছে না। ধনীর কাছে হাত পাততে যেয়েই কংগ্রেসকে বর্ত্তমানে ধনিকদের খেয়ালের সামগ্রীতে পরিণত করা হয়েছে। যে পথে চলে লক্ষ্যস্থলে পঁহুছানোর কোনো ভরসা নেই সে পথ ত্যাগ করে সত্যকারের পথ খুঁজে বের করা কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? সম্পূর্ণ নূতন কর্ম্মপদ্ধতি কংগ্রেসকে গ্রহণ করতেই হবে। জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ যে কর্ম্মপদ্ধতির দ্বারা হবে তেমন কর্ম্মপদ্ধতির কথাই আমরা বলছি। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের সম্মুখে কোনো সত্যিকারের কর্ম্মপদ্ধতি নেই। যা আছে তার দ্বারা দেশের জনগণের দাসত্ব মোচন না হয়ে আরো বাড়বে। কংগ্রেস থেকে খদ্দরকে বাদ দিতেই হবে। খদ্দরের আর চরকার দ্বারা স্বরাজ লাভ হবে এমন কথা মেনে নেওয়ার ন্যায় কলঙ্ক জাতির পক্ষে আর কিছুই হতে পারেনা। এমন অযৌক্তিক কথা মেনে নেওয়া থেকে বুঝতে পারা যায় যে বুদ্ধিমত্তার দিক্ থেকে আমরা কত বেশী দেউলিয়া হয়ে গেছি। ভারতবাসীর খদ্দর ব্যবহারের দ্বারা যদি গ্রেট্‌বৃটেন থেকে কাপড়ের আমদানী একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় তা হলেই কি তারা স্বাধীন হয়ে যাবে? আমাদের দেশে কাপড় বিক্রী করে যত টাকা গ্রেট্‌-বৃটেনের লোকেরা পায় তার চেয়েও বেশী টাকা তারা ফি বছরে শ্রমিকদিগকে বেকারির পেন্সন দিয়ে থাকে। কাজেই খদ্দরের দ্বারা স্বরাজ আসবে এমন কথা বলা নিতান্তই বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক। কংগ্রেস গ্রহণ করতে পারে এমন কর্ম্ম-পদ্ধতি আমরা একাধিকবার *গণবাণী*তে প্রকাশ করেছি। ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করবে, বৃটিশ শোষণবাদ বা ইম্পিরিয়েলিজম থেকে সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন করবে, কংগ্রেসের এ উদ্দেশ্য যদি আমরা আজো গ্রহণ করতে না পারি তা হলে বুঝতে হবে যে আমাদের ন্যায় নপুংসক জাত আর জগতের বুকে কোথাও নেই। আঠারো বছর ও তার বেশী বয়সের নারী-পুরুষ মাত্রেরই ভোটের অধিকার লাভ করার জন্যে যদি কংগ্রেস যুঝতে প্রস্তুত না হয়, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্যে যদি কংগ্রেস উঠে পড়ে না লাগে, কৃষক ও শ্রমিকের জীবনের খাওয়া-পরার নিরিখ বাড়ানোকে যদি কংগ্রেস আপনার ব্রত করে না নেয়, তবে তাকে ভারতের জাতীয় মহাসমিতি বলার ন্যায় বিড়ম্বনা আর কিছুই হতে পারে না।

—০—

রয়েল কমিশন

শীঘ্রই রয়েল কমিশন নিযুক্ত হবে। এই কমিশন বিচার-বিবেচনা করে ভারতের শাসন সংস্কারের আর একটা মুসাবিদা তৈয়ার করবে। মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট অনুসারে একবার ভারতের শাসন পদ্ধতির সংস্কার হয়েছে, আর একবার হবে যে রয়েল কমিশন বস্‌বে তারি রিপোর্ট অনুসারে। অনেকে এখন থেকেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। ভারতের একশ্রেণীর লোকের উৎফুল্ল হবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে বটে, তবে ভারতের জনগণের এতে আনন্দ প্রকাশ করার কিছুই নেই। যে নীতি থেকে মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রবর্ত্তন ভারতে হয়েছিল ঠিক্ সেই নীতি থেকেই আগামী রয়েল কমিশনেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। তাই গতবারের ন্যায় এবারেও জনগণের অবস্থা হবে "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" ভারতের জনগণকে শোষণ করার জন্যে বৃটিশ শোষণবাদ বা ইম্পিরিয়েলিজম্ বিগত যুদ্ধের সময় থেকে দু'টি নীতি অবলম্বন করেছে। একটি হচ্ছে তার অর্থনৈতিক নীতি, আর একটি রাষ্ট্রনীতিক। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইম্পিরিয়েলিজমের নীতি ছিল ভারতের কোন শ্রেণীর লোকের সহিত কোনো প্রকারের যোগাযোগ না রেখে যত প্রকারে সম্ভব ভারতবর্ষকে শোষণ করা। নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমকে সেই নীতি যুদ্ধের সময় থেকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। তার পরিবর্ত্তিত অর্থনীতিক নীতি হচ্ছে ভারতের ধনিকগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতের জনগণকে লুণ্ঠন করা। তারপরে, পরিবর্ত্তিত রাষ্ট্রনীতিক নীতির কথা। এরও পরিবর্ত্তন ঠিক সেই একই কারণে হয়েছে। সমাজের উচ্চস্তরের সহিত একটা আপোস-নিষ্পত্তি রাষ্ট্রনীতিক দিক থেকে করে তাকে আপন দলে আকর্ষণ করাই হচ্ছে ইম্পিরিয়েলিজমের মুখ্য উদ্দেশ্য। মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রবর্ত্তন করে একদল লোককে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্ আপন দলে বহু পূর্ব্বেই পেয়েছে। আলোচ্য রয়েল কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে যে সংস্কার হবে তার দ্বারা আরো একটা বড় দলকে আপন দলে পাবে। আমাদের এখনকার বুর্জোয়া রাজনীতিকগণকে আরো কিছু উজিরী-নাজিরী ও ক্ষমতা দেওয়া হবে। তাতেই তাঁরা স্বরাজ পেয়ে যাবেন, যেমন মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পেয়েছিলেন। এক কথায় বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের বর্ত্তমান নীতি হচ্ছে "তোরি শিল তোরি নোড়া, তোরি ভাঙ্‌ব দাঁতের গোড়া।" সব পরিবর্ত্তনের মূলে রয়েছে ভারতের জনগণকে, ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করা। সুতরাং রয়েল কমিশন যে আনবে তাতে ভারতের জনগণের আনন্দিত হবার কিছুই নেই। কেননা, সবই ব্যবস্থা হচ্ছে তাদেরকে শোষণ করারই জন্যে। বিদেশের ধনিকগণ ভারতের ধনিক ও বুর্জুয়া রাষ্ট্রনীতিকগণের যোগাযোগে ভারতের জনগণকে শোষণ করবার জন্যে যে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করেছে ও করতে যাচ্ছে তারি বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। অনধিকার লাভ হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য, আর আমাদের উদ্দেশ্য হবে অধিকার লাভ। জগতের শোষিত, লাঞ্ছিত কৃষক ও শ্রমিকগণের মধ্যে যে একটা আন্তর্জাতিক সমস্বার্থবোধ জন্মেছে তারি বিরুদ্ধে গ্রেট্ বৃটেনের ধনিকগণ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। জগতের কৃষক ও শ্রমিকগণের এবং পরাধীন জাতি সমূহের উত্থানকে সমবেত ভাবে প্রতিহত করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। তাদের এ যুদ্ধের একটা দিক্ হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদল সমূহকে আক্রমণ করা এবং আর একটা দিক্ হচ্ছে চীনে যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করা। এবং তৃতীয় দিক্ হচ্ছে লণ্ডনের আরকস্ হাউসকে বে আইনী ভাবে খানা-তালাসী করা ও সোভিয়েট গণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করার জন্যে ষড়যন্ত্র করা। ফ্যাসিষ্ট ইটালীর সহিত মিত্রতা, বালকানে ষড়যন্ত্র ও তুরস্কের জাতীয় গবর্ণমেন্টের ওপরে চাপ, এ সবও এ যুদ্ধেরই বিভিন্ন দিকের বিকাশ মাত্র। এই সবের দ্বারা বৃটিশ ধনিকগণ আপনাদের ক্ষমতাকে সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ১৯২৯ সনে ভারতে রয়েল কমিশনের আসার কথা ছিল। তার আগে-ভাগে যে আসছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বৃটিশ ধনিকগণের বর্ত্তমান যুদ্ধায়োজনে ভারতের ধনিকগণকে দলে সংগ্রহ করা। বৃটিশ ধনিকগণের তরফ থেকে এ যুদ্ধায়োজন এখন যদি না হত তা-হলে রয়েল কমিশনও ভারতে আসত ১৯২৯ সনে।

—•—

ডক্টর টি, এন, রায়

আমাদের অগ্রজোপম বন্ধু ডক্টর টি, এন, রায় (তেজেন্দ্র নাথ রায়) এম, বি, সি, এইচ, বি (গ্লাসগো) আর ইহ জগতে নেই। ৫ই জুলাই দিবাগত রাত্রি প্রায় ১২টা ৩০ মিনিটের সময় তিনি তাঁর কলিকাতা ৪৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের বাসভবনে ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। সদা প্রফুল্ল, বন্ধু বৎসল তেজেন্দ্র নাথের সেই বিরাট শরীর কলিকাতার রাজপথে আর কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। বিপুল শক্তির আধার সেই দীর্ঘ প্রশস্ত সুন্দর দেহখানা কেওড়া তলার শ্মশান ঘাটে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গত তিন মাস থেকে ডক্টর রায় যকৃত সংক্রান্ত নানা ব্যাধিতে ভুগ্‌ছিলেন। কিন্তু, তার পরিণাম যে এই হবে তা আমরা কেনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। শেষ যে দিন তাঁকে আমরা দেখতে গিয়েছিলেম সেদিন তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তিনি শীঘ্রই সেরে উঠ্‌বেন এবং সেরে উঠে নিত্যরোগী আমাদের ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে দিবেন। ডক্টর রায়ের সহিত আমাদের পরিচয় হয় ১৯২১ সনে যখন ভারতে গান্ধী আন্দোলন তার চরম সীমায় উঠেছিল। গান্ধীর কোনো কাজের সমালোচনা করলে তখনকার দিনে আর রক্ষা ছিলনা, এত অন্ধ সকল মানুষ হয়ে গিয়েছিল। দেশের জনগণ এ আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা চেয়েছিলেন জনগণকে কেবলমাত্র তাঁদেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করতে। জনগণ সচেতন হয়ে আপনাদের জন্যে স্বরাজ লাভ করুক এরূপ ইচ্ছে অসহযোগের নেতৃগণ কখনো মনে স্থান দেন নি। বারদোলির প্রস্তাবের দ্বারা এর সত্যতা প্রামাণিত হয়ে গেছে। যাক্, চরকা আর খদ্দরের যে কোনো অর্থনীতিক ভিত্তি নেই, দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা যে কেবল মাত্র জনগণের দ্বারা এবং জনগণেরই জন্যে লাভ হতে পারে, আমাদের এমন কথায় বিশ্বাস করাত দূরের কথা, শোনার মত প্রকৃতিস্থ মনও খুব কম শিক্ষিত লোকেরই ছিল। আমাদের যখন অবস্থা এইরূপ ছিল ঠিক তখনই ডক্টর রায়ের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। তিনি তখন আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর এ উৎসাহই

তাঁর সহিত আমাদের সৌহৃদ্যকে সুদৃঢ় করেছিল। অসুখে-বিসুখে আমাদের চিকিৎসা তিনি করতেন। তাঁকে যে শুধু আমাদের বাড়ী যেয়ে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিতে হত তা নয়, কখনো কখনো ঔষধ কেনার টাকা ও পথ্যের খরচও তাঁকে যোগাতে হয়েছে। কত রাজ্যের বন্ধুদের তাঁর নিকটে নিয়ে গেছি, কখনো তিনি বিরক্ত হন নি। আমাদের জন্যে পুলিসও তাঁকে কম বিরক্ত করেনি। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে সে জন্যে তাঁর বাড়ীতে খুবই কম যাওয়া-আসা আমরা করতেম। ফিরে আসার পরে প্রথম যে দিন তাঁর সাথে দেখা করতে যাই তার পরের দিনই স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা তাঁকে বলে পাঠালেন, তিনি যে আমাদের মোটরে চাপিয়ে আবারো হাওয়া খাওয়াতে আরম্ভ করেছেন তা তাঁর পক্ষে মোটেই ভালো কাজ হচ্ছে না। অথচ তাঁর মোটরে এ জীবনে আমরা কখনো চাপিনি।

ডক্টর টি, এন, রায়ের অভাব আমাদের বুকে বড় বেশী বাজছে। তাঁর স্ত্রী ও তাঁর বৃদ্ধা মাতাকে আমরা কি বলে যে সান্ত্বনা দেব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে।

বিশ্বভারতী কি সম্প্রদায়িক প্রতিষ্টান ?

হায়দরাবাদের নিজাম রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে লক্ষ টাকা দান করেছেন। এ টাকায় ইস্‌লামীয় সভ্যতা শিক্ষার ব্যবস্থা যেন করা হয় সে ইচ্ছে নিজাম প্রকাশ করেছেন। সহযোগী "আনন্দ বাজার পত্রিকা" এ সংবাদে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। আতঙ্কের কারণ এই হচ্ছে যে "হয়তো" এ টাকা প্রবেশের ছিদ্রপথে বিশ্বভারতীতে মুসলমান ছাত্র ও অধ্যাপকও প্রবেশ করবেন, আর "বিশ্বভারতীতে এ লক্ষ টাকা দান যে, মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারেরই একটা অঙ্গ নহে তাহা কে বলিবে?" "আনন্দ বাজার পত্রিকা" যেমন নিছক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার-কারী দৈনিক কাগজ, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীও কি তেমনি একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান? বিশ্বভারতীতে বিশ্বের সকল দেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্র বা অধ্যাপক অবাধে যোগদান করতে পারেন। সেখানে কাহারো জন্যে "প্রবেশ নিষেধ" লিখা নেই। মুসলমান ছাত্র এখনো সেখানে আছে। সুতরাং "আনন্দবাজার পত্রিকা"র "হয়তো"র কোন মানেই নেই। তারপরে, বিশ্বভারতীতে মুস্‌লিম সভ্যতা অধ্যাপনার ফলেই যদি বিশ্বভারতীর সমস্ত হিন্দু ছাত্র মুসলমান হয়ে যায় তা হলে তেমন ঠুনকো হিন্দু ধর্ম্ম জগতে না থাকাই ভালো। সাম্প্রদায়িকত্ব মানুষকে যে কত সঙ্কীর্ণ করতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "আনন্দ বাজার পত্রিকা"র ন্যায় কাগজগুলি পড়লেই সকলে দেখ্‌তে পাবেন।

ম-আ

সাধারণ স্বত্ববাদীর ইস্তেহার

[কার্ল মার্ক্স্‌ ও ফ্রেড্‌রিশ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌]

অনুবাদক—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্‌ এর বিখ্যাত "ম্যানিফেষ্টো অব্‌ দি কম্যুনিষ্ট পার্টি"র বঙ্গানুবাদ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যক "গণবাণী"তে আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে। তার পরে নানা কারণে শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ অনুবাদ শেষ করতে পারেন নি। সম্প্রতি তিনি অবশিষ্টাংশের অনুবাদ বার্লিন থেকে করে পাঠিয়েছেন। 'কম্যুনিষ্ট' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তিনি "সাধারণ স্বত্ববাদী" ব্যবহার করেছেন। আর প্রোলেটারিয়েট্‌ (Prolcatariat) এর বাংলা তিনি করেছেন "আত্মোৎপন্ন-বঞ্চিতসম্প্রদায়"। শোষণের দ্বারা সম্পত্তিহীন হয়ে যারা আপনাদিগকে ভাড়ায় খাটাতে বাধ্য হয় তাদেরকেই 'প্রোলেটারিয়েট' বলা হয়। বুর্জোয়াজি (Bourgeoisie) শব্দের অনুবাদ তিনি 'পরশ্রম ভোগী' করেছেন। আধুনিক ধনিকগণকে অর্থাৎ যারা সামাজিক উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক হয়ে দিন মজুরগণকে কোনো প্রকারে বেঁচে থাকার মত মজুরী দিয়ে কাজে খাটিয়ে থাকে তাদেরকেই বুর্জোয়াজি বলা হয়। সম্পাদক, "গণবাণী" .)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় ও সাধারণ স্বত্ববাদী

আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাধারণ স্বত্ববাদীর কি সম্বন্ধ সেটা এবারে বিচার করে দেখা যাক। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে অন্য অন্য যে সব দল আছে তাদের বিরুদ্ধতা করবার জন্যে সাধারণ স্বত্ববাদীরা দল গঠন করেনি। তারা তাদের দলের বিশিষ্ট মতবাদ খাড়া করে তার দ্বারা আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত করতে চায় না।

অন্য অন্য শ্রমিক দলের থেকে সাধারণ স্বত্ববাদী সম্প্রদায়ের পার্থক্য হচ্ছে এইখানে যে (১) প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশের আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে থেকে তারা এমন কতকগুলো তথ্যের আবিষ্কার করেছে যার দ্বারা জাতীয়তার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা অপসারিত করে সর্ব্বদেশের আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত স্বার্থের নির্দেশ তারা করতে পেরেছে।

আর (২) দ্বিতীয়তঃ পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের বিরোধ যে সমস্ত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবে তার নির্ণয় করতে গিয়ে সাধারণ স্বত্ববাদীরা সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়েছে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে শ্রমজীবীদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে যে সব দল আছে তাদের মধ্যে সাধারণ স্বত্ববাদী সম্প্রদায়ই হচ্ছে সব চেয়ে অগ্রগামী আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দল। এই দলই অন্য সব দলকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে আন্দোলনের মূল তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি সম্বন্ধেও অন্য অন্য দলের থেকে এদের অনেক বেশী পরিস্কার জ্ঞান আছে। আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন কোন পথ দিয়ে যাবে, কি কি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনকে যেতে হবে, আর এই আন্দোলনের দ্বারা শেষ কালে কি ফল পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে তাদের খুব পরিস্কার জ্ঞান আছে যেটা অন্য দলগুলোর একেবারেই নেই।

অন্য অন্য দলের যে উদ্দেশ্য সাধারণ স্বত্ববাদীদের বর্তমান উদ্দেশ্যও তাই,—আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়কে শ্রেণীবদ্ধ করা, পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিনষ্ট করা এবং আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করা।

সাধারণ স্বত্ববাদীদের মতবাদের সিদ্ধান্তগুলি কোন সংস্কারকের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বাস্তব জগতে আমাদের চোখের সামনে শ্রেণীগত সংঘর্ষের যে ঐতিহাসিক রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তারই উপর সাধারণ স্বত্ববাদীদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত।

সমাজের বর্তমান সম্পত্তি বিভাগ প্রথার ধ্বংস সাধন করবার মতবাদ প্রচারের মধ্যে সাধারণ স্বত্ববাদের বিশিষ্টতার পরিচায়ক কোন কিছু নেই। ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীত কালের সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ প্রথার বারে বারে পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ দেখান যেতে পারে যে ফরাসী বিপ্লব ফিউডাল (জায়গীর-দারী) সম্পত্তি বিভাগ প্রথার ধ্বংস সাধন করে পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বিভাগ প্রথার প্রবর্তন করেছে।

সম্পত্তি বিভাগ প্রথার আমূল ধ্বংস সাধন করা সাধারণ স্বত্ববাদের বিশেষত্ব নয়, পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বিভাগ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করাই হচ্ছে সাধারণ স্বত্ববাদের বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু বর্তমান পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিভাগ প্রথাই হচ্ছে শ্রেণীগত সংঘাতের উপর, কয়েকজন দ্বারা বহুর শোষণবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন করবার ও আত্মসাৎ করবার একটি প্রথার চরম নিদর্শন।

এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে অতি সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সাধারণ স্বত্ববাদীদের মতবাদ হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ সাধন করা। ব্যক্তিগত ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ সাধন করবার অভিলাষ প্রকাশ করবার জন্যে আমরা সাধারণ স্বত্ববাদীরা ভর্ৎসিত হয়েছি, কেননা, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিই নাকি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও কর্মশীলতার ভিত্তি!

অনেক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ স্বোপার্জিত সম্পত্তির কথা বলছো?

পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বিভাগ প্রথার পূর্বে কৃষক ও ক্ষুদ্র শ্রমজীবীদের যে সম্পত্তি বিভাগ প্রথা ছিলো তার কথা বলছো? সে প্রথা তো ধ্বংস করবার কোন দরকারই হবে না। কারণ বর্তমান কালের উৎপাদন প্রণালী এরি মধ্যে তাকে অনেক পরিমাণে ধ্বংস করেছে, আর যেটুকু বাকি আছে সেটুকুও প্রতিদিন ধ্বংস করছে।

পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বর্তমান ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার কথা বলছো? কিন্তু বেতন বিনিময়ে শ্রমপ্রথা কি শ্রমিকের জন্যে কোন সম্পত্তি সৃষ্টি করেছে? না, একেবারেই করেনি। এই বেতন বিনিময়ে শ্রমপ্রথা মূলধনের সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ কিনা সেই ধরণের সম্পত্তির সৃষ্টি করেছে যে সম্পত্তি বেতন দিয়ে শ্রমিকের শ্রম ভাঙিয়ে খায়। যে সম্পত্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় যদি না সে নিয়তই নব নব শ্রমিকদলকে বেতনের পরিবর্তে শোষণ করবার সুযোগ পায়। সম্পত্তি তার বর্তমান অবস্থায় মূলধন আর বেতন-বিনিময়ে শ্রম প্রথার পরস্পর বিরুদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা একবার সেই বিরুদ্ধতার উভয় দিক বিচার করে দেখবো।

মূলধনের অধিকারী হওয়া মানে যে শুধু ব্যক্তিগত ভাবে বর্তমান উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা তা নয়, এর মানে হচ্ছে সমষ্টিগতরূপে সামাজিক ভাবেও উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত থাকা। মূলধন হচ্ছে বহুলোকের সমবেত শ্রমের ফল এবং বহু লোকের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা এমন কি শেষকালে শুধু বহুলোকের নয়, সমাজের সব লোকের মিলিত শক্তি প্রয়োগ করেই এই মূলধনকে চালান যেতে পারে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে মূলধন ব্যক্তিগত শক্তির আধার নয়, সমাজের শক্তির আধার।

তাই বলে মূলধন যখন সমাজের সবলোকের সম্পত্তিতে পরিণত হয় তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে সমাজের সম্পত্তি হয়ে যায় তা নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তখন শুধু তার সামাজিক রূপ বদলায়, তার শ্রেণীগত রূপ হারায়।

এখন আমরা বেতন বিনিময়ে শ্রম প্রথার বিচার করে দেখবো।

বেতন বিনিময়ে শ্রম প্রথায় শ্রমিককে যে বেতন দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে একেবারে নিম্নতম বেতন অর্থাৎ কিনা শ্রমিককে শুধু এতটুকু দেওয়া হয় যতটুকু তার শ্রমিক-জীবন রক্ষা করবার জন্যে না হলেই নয়। সেইজন্যে শ্রমিক তার শ্রমের পরিবর্তে যে বেতন পায় তাতে কোন রকমে বহু কষ্টে নিছক জীবন-ধারণ করা ও সন্তান উৎপাদন করা চলে। শ্রম-উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যক্তিগত অধিকার আর ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমরা নই, কিম্বা তা নষ্ট করতেও চাই না, কারণ, এই ব্যক্তিগত অধিকার জীবন ধারণ ও নবজীবন উৎপাদনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, আর এই ব্যক্তিগত অধিকার এমন কিছুই উদ্বৃত্ত রাখে না যার দ্বারা অন্যের শ্রমকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আমরা যা চাই সেটা হচ্ছে পরশ্রমভোগীদলের এই আত্মসাৎ করবার জঘন্য নিয়মের বিনাশ সাধন করতে, যে নিয়মের অধীনে শ্রমিককে শুধু মূলধন বৃদ্ধি করবার জন্যেই শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করবার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর জন্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

পরশ্রমভোগী প্রভাবান্বিত সমাজে বর্তমান শ্রমিকদল শুধু অতীতের শ্রমলব্ধ ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবার উপায় বিশেষ বলে গণ্য হয়। সাধারণ স্বত্ববাদী প্রভাবান্বিত সমাজে অতীতের ধন সম্পদ বর্তমানে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তাদের সমৃদ্ধ করে তোলবার উপায় স্বরূপ বলে গণ্য হয়।

পরশ্রমভোগীর সমাজে অতীত বর্তমানকে আচ্ছন্ন করে আছে, আর সাধারণ স্বত্ববাদীর সমাজে বর্তমান অতীতকে শাসন

করছে। পরশ্রমভোগীর সমাজে মূলধন হচ্ছে স্বাধীন, মূলধনের ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু ব্যক্তি পরাধীন, ব্যক্তির কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নেই।

এই উপরি উক্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টাকে পরশ্রমভোগীরা ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে বলে থাকে! তারা ঠিকই বলে। পরশ্রমভোগীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও পরশ্রমভোগীর স্বাধীনতার ধ্বংস সাধন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

পরশ্রমভোগীদের বর্ত্তমান উৎপাদন প্রণালীর যুগে স্বাধীনতা বলতে অবাধ বাণিজ্য করবার অধিকার ও অবাধে ক্রয় বিক্রয় করবার অধিকার বোঝায়। কিন্তু যদি ক্রয় বিক্রয় উঠে যায় তা হলে অবাধ ক্রয় বিক্রয় প্রথাও লুপ্ত হয়ে যাবে। যদি মধ্যযুগের অতি সঙ্কীর্ণ ক্রয়বিক্রয় প্রথার সঙ্গে তুলনা করা হোত তা হলে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের অবাধ ক্রয় বিক্রয় করার কথা এবং ঐ ধরণের আরো সব লম্বা চওড়া কথারও কোন তাৎপর্য্য থাকতো; কিন্তু যখন তাদের কথা সাধারণ স্বত্ববাদীদের ক্রয় বিক্রয় প্রথার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন, পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের উৎপাদন প্রণালীর ধ্বংস সাধন, এমন কি পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধনের সঙ্গে তুলনা করা হয় তখন একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংস সাধন করবার ইচ্ছে জানতে পেরে তোমরা শিউরে উঠছো? কিন্তু তোমাদেরই এই বর্ত্তমান সমাজে দশ ভাগের মধ্যে ন'ভাগ লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই। বেশীর ভাগ লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকায় অল্প কয়েকজন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পেরেছে। বেশীর ভাগ লোকের সম্পত্তি না থাকার উপর যে সম্পত্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে আছে সেই সম্পত্তিকে ধ্বংস করবার জন্যে তোমরা আমাদের তিরস্কার করছো? অর্থাৎ কিনা এক কথায় বলতে গেলে তোমরা আমাদের তোমাদের সম্পত্তি ধ্বংস করবার অভিপ্রায় জেনে আমাদের ভৎর্সনা করছো। আমরা কিন্তু ঠিক তাই করতে চাই। যে মুহূর্ত্ত থেকে ব্যক্তির শ্রম মূলধনে, অর্থে কিম্বা যে সামাজিক শক্তি ব্যক্তি বিশেষের একচেটিয়া হতে পারে এমন কোন কিছুতে পরিবর্ত্তিত হতে পারবে না অর্থাৎ কিনা যে মুহূর্ত্ত থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরশ্রমভোগীর সম্পত্তিতে পরিণত হবে না, আর মূলধনে পরিণত হবে না, তোমাদের মতে সেই মুহূর্ত্ত থেকেই ব্যক্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। তা হলে স্বীকার করো যে "ব্যক্তি" বলতে তোমরা পরশ্রমভোগী ও সম্পত্তির অধিকারী মধ্যবিত্ত লোক ছাড়া আর কাউকে ধরো না। তোমাদের এই তথাকথিত "ব্যক্তি"টিকে ধ্বংস করতে হবে। তার অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব করে তুলতে হবে।

সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ গ্রহণের ক্ষমতা থেকে সাধারণ স্বত্ববাদীরা কাউকে বঞ্চিত করে না, তারা যেটুকু করে সেটুকু হচ্ছে এই যে তারা অন্যের শ্রম শক্তিকে অপহরণ করবার ক্ষমতাটুকু নষ্ট করে দিতে চায়।

বলা হয় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করলে সমস্ত কর্ম্মশক্তি লোপ পাবে, একটা জগৎ-জোড়া আলস্যে সকলকে পেয়ে বসবে। এই মতের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকতো তাহলে নিছক আলস্যের দরুণ পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের বহুদিন আগে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া উচিত ছিলো, কেননা, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা কাজ করে তারা কিছুই সঞ্চয় করতে পারে না, আর যারা সঞ্চয় করে তারা কাজ করে না। এই বিরুদ্ধতা এক কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার নামান্তর মাত্র যে যখন মূলধন থাকবে না তখন বেতন বিনিময়ে শ্রম আদায় করে নেবার প্রথাও আর থাকবে না।

বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণ স্বত্ববাদীদের বস্তু উৎপাদন ও বণ্টন করবার নিয়মের বিপক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ স্বত্ববাদীদের জ্ঞানের বস্তু সৃষ্টি করা ও বণ্টন করার বিরুদ্ধে ঠিক সেই একই যুক্তি দেখানো হয়। পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের কাছে শ্রেণীগত সম্পত্তির ধ্বংস সাধনও যা উৎপাদন প্রণালীর আমূল ধ্বংস সাধনও তাই। ঠিক এই একই কারণে পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের কাছে তাদের শ্রেণীগত সভ্যতার ধ্বংস সাধন মানে হচ্ছে সমস্ত সভ্যতার ধ্বংস সাধন। যে সভ্যতার ধ্বংস সাধনের আশঙ্কায় তারা এত কাতর হয়ে পড়েছে সেই সভ্যতা বেশীর ভাগ লোককে শেখায় যে কি করে যন্ত্রের মতন কাজ করে যেতে হবে। আমাদের পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ধ্বংস করবার মতবাদকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়েরই স্বাধীনতা, সভ্যতা ও ন্যায় বিচারের মাপ কাটিতে বিচার করবে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে বৃথা তর্ক করতে এসো না। তোমাদের সমস্ত মতবাদ পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের উৎপাদন প্রথা ও সম্পত্তি প্রথা থেকে উদ্ভূত। যেমন তোমাদের আইন হচ্ছে তোমাদের শ্রেণীর ইচ্ছা বিশেষ যা সকলের জন্যে আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের সেই শ্রেণীগত ইচ্ছার বিশিষ্টতা তোমাদের শ্রেণীর অর্থনীতিক অবস্থার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়েছে। একান্ত স্বার্থপর ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তোমরা তোমাদের বর্ত্তমান উৎপাদন প্রণালী থেকে ও তোমাদের সম্পত্তি প্রথা থেকে যে আধুনিক সামাজিক জীবন উদ্ভূত হয়েছে, যে সামাজিক জীবন বারে বারে গড়ে উঠেছে আর ভেঙ্গে গেছে উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাকে প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম বলে ঘোষণা করে থাকো। তোমাদের আগে যে যে শাসক সম্প্রদায় ছিলো তারাও ঠিক তোমাদেরই মত একই ভুল করেছিলো। অতীতের সম্পত্তি প্রথার ভিতর যে জিনিস তোমরা অত্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাও, ফিউডাল সম্পত্তি প্রথার বিরুদ্ধে যা তোমরা একবাক্যে স্বীকার করো সেই একই বস্তু তোমরা তোমাদের পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি প্রথার বিরুদ্ধে স্বীকার করতে রাজী নও।

পারিবারিক জীবনের ধ্বংস সাধন! এমন কি যারা খুব উদার মতাবলম্বী তারাও সাধারণ স্বত্ববাদীদের এ প্রস্তাবে জ্বলে উঠবে। জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে কিসের উপর নির্ভর করে বর্ত্তমান কালের এই পারিবারিক জীবন, এই পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের প্রভাবান্বিত বর্ত্তমান সমাজের পারিবারিক জীবন দাঁড়িয়ে আছে?

নিঃসন্দেহ ভাবে বলা যেতে পারে যে মূলধন ও ব্যক্তিগত লাভের উপর এই পারিবারিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র এই পর শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই পারিবারিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনের স্বরূপ তখনই যথার্থ ভাবে প্রকটিত হয় যখন দেখি যে আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই

পারিবারিক জীবনের সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে ও প্রকাশ্যভাবে নারীর দেহ-বিক্রয় করবার প্রথাও বর্ত্তমান আছে।

এই ব্যক্তিগত লাভের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পর শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবন ধ্বংস প্রাপ্ত হবে আর মূলধনের ধ্বংস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিগত লাভ উভয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

তোমরা পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা কি পিতার শোষণের হাত থেকে সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের দোষ দিচ্ছ? আমরা সেই অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। তোমরা বলবে যে আমরা পারিবারিক শিক্ষা প্রণালীর স্থানে সমাজের হাতে শিক্ষা প্রণালীর ভার দিয়ে সব সম্বন্ধের মধ্যে যেটা সব চেয়ে পবিত্র সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকে বিনষ্ট করছি। কিন্তু তোমাদের সেই শিক্ষা প্রণালীটির যথার্থ প্রকৃতি কি বলতে পার? সেই শিক্ষা প্রণালীও সামাজিক শিক্ষা প্রণালী নয় কি? সেই শিক্ষা প্রণালী কি সামাজিক জীবনের যে অবস্থার মধ্যে তোমরা শিক্ষা দিয়ে থাকো সেই অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়? সেই শিক্ষা প্রণালী কি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে দিয়ে সমাজের যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কাজ করছে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়?

সাধারণ স্বত্ববাদীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের হস্তক্ষেপ করবার প্রথার সৃষ্টি করে নি, তারা শুধু এই সামাজিক বাধা প্রদান করবার প্রথার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করতে চায়। তারা শাসক সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে চায়। বর্ত্তমান কালের উৎপাদন প্রণালী ও বাণিজ্য প্রথা আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পারিবারিক জীবনের বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ও এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের শিশুদের ব্যবসার দ্রব্য করে তুলেছে, হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটবার যন্ত্র করে তুলেছে। এই সব কারণে পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের পরিবার, শিক্ষাপ্রণালী, সন্তান ও পিতা মাতার মধ্যে পবিত্র সম্বন্ধ সম্বন্ধে সব মিথ্যা চাতুরী নিছক কথার ফাঁদ পাতা, এত জঘন্য, এত নীচ বলে মনে হয়।

পর শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা সমস্বরে চীৎকার করে বলে ওঠে যে তোমরা সাধারণ স্বত্ববাদীরা, নারীকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি করে তুলতে চাও।

এই পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের স্ত্রীকে শুধু উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ বলে দেখে। তারা যখন শোনে যে উৎপাদন প্রণালী ও বাণিজ্য প্রণালী একমাত্র তাদের দ্বারা শোষিত না হয়ে সর্ব্ব সাধারণের দ্বারা শোষিত হবে তখন তারা ধরে নেয় (আর সেটা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক) যে নারীর ভাগ্যেও এই সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলে পরিণত হওয়াও ঘটতে বাধ্য। তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবার কারণ ঘটে না যে সাধারণ স্বত্ববাদীরা সত্যি সত্যি যা চায় সেটি হচ্ছে নারীকে নিছক উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ বলে পরিচিত হবার অপরিসীম লজ্জা থেকে ত্রাণ করতে।

এ ছাড়া সাধারণ স্বত্ববাদীরা প্রকাশ্য ভাবে রাষ্ট্রের দিক থেকে নারীকে সর্ব্বসাধারণের ভোগের সামগ্রী করে তুলবে এই অতি তজ্জন্য মিথ্যার সৃষ্টি করে পর শ্রমভোগী সম্প্রদায় ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে যে কপট রাগের অভিনয় করে তা অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার। সাধারণ স্বত্ববাদীদের নারীকে সাধারণের সম্পত্তি করে তোলবার জন্যে কোন কষ্ট করবার প্রয়োজন নেই, কেননা স্মরণাতীত কাল থেকে নারী সাধারণের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এই পর শ্রমভোগী সম্প্রদায় তাদের আশ্রিত আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের লোকদের স্ত্রী-কন্যার সর্ব্বনাশ করে সন্তুষ্ট নয়, পতিতা নারীদের তো কথাই নেই, তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিতে পারলে পরম আনন্দ উপভোগ করে।

পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের এই বিবাহ প্রথা প্রকৃতপক্ষে নারীকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি করে তোলার নামান্তর মাত্র। সেই জন্যে—এই কারণের জন্যে অর্থাৎ নারীকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি করে তোলবার জন্যে যদি সাধারণ স্বত্ববাদীদের তিরস্কার করা হয় তাহলে বলতেই হবে যে এটা শুধু কপটতার আবরণে লুকানো একটি বস্তুকে প্রকাশ্যভাবে আইন সঙ্গত করবার সৎসাহসের জন্যে তিরস্কার করারই নামান্তর। এটা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে বর্ত্তমান উৎপাদন প্রণালীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এ উৎপাদন প্রণালীর ফলস্বরূপ নারীর সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবার প্রথাও লোপ পাবে অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে নারীর দেহ বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের প্রকাশ্য ও গোপন দুই প্রথাই লুপ্ত হবে।

জাতীয়তা ও ভৌগলিক সীমাবদ্ধ দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করবার জন্যে সাধারণ স্বত্ববাদীরা ভর্ৎসিত হয়েছে।

কিন্তু শ্রমিকদের দেশ বলে কোন কিছু নেই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারি নে। যেহেতু এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রথমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করতে হবে, তাদের জাতির মধ্যে যত শ্রেণী আছে সেই সমস্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রধান হয়ে উঠতে হবে, তাদের নিজেদের একটি জাতি হয়ে উঠতে হবে সেই হেতু তারা ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যতটুকু জাতীয় ভাবাপন্ন হতে হয় ততটুকু জাতীয়তার পরিপোষক কিন্তু পর শ্রমভোগী সম্প্রদায় জাতীয় ভাবাপন্ন বলতে যা বোঝায় সেই রকমের জাতীয় ভাবাপন্ন তারা নয়। বিভিন্ন দেশের লোকদের মধ্যে যে জাতীয় পার্থক্য ও বিরুদ্ধতা আছে সেই বিরুদ্ধতা ক্রমশই পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের অবাধ বাণিজ্যের প্রথা, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময়ের বাজার সৃষ্টি করণ ও তার উপযোগী জীবন যাত্রা প্রবর্ত্তনের দ্বারা লুপ্ত হচ্ছে।

এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এই আন্তর্জাতিক বিরুদ্ধতাকে সত্বর লুপ্ত করে দেবে। সমস্ত সভ্য দেশের সম্মিলিত উদ্যম এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার অন্যতম কারণ।

যে পরিমাণে এক ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির শোষণের প্রথা বিনাশ সাধন হবে সেই পরিমাণেই এক জাতির দ্বারা অন্য এক জাতির শোষণ প্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যে পরিমাণে একটি জাতির মধ্যের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটবে, সেই পরিমাণে একটি জাতির অন্য একটি জাতির প্রতি বিরুদ্ধতা কমে আসবে।

সাধারণ স্বত্ববাদীদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের দিক থেকে, দর্শনের দিক থেকে মতবাদের দিক হতে যে সব আপত্তি উত্থাপন করা হয় সে সব আপত্তি গভীর ভাবে বিচার করে দেখবার উপযুক্ত নয়।

এটা কি বুঝতে সত্যই খুব জ্ঞানের দরকার হয় যে মানুষের সমস্ত চিন্তার ধারা, তার সমস্ত মতবাদ, এক কথায় মানুষের চেতনা তার জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার, তার সামাজিক জীবনের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়।

মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাস কি প্রতিপন্ন করেনা যে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রস ও রূপ সৃষ্টি করবার ক্ষমতার প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটেছে? প্রত্যেক যুগের বিশিষ্ট চিন্তাধরা হচ্ছে সেই যুগের শাসক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা।

যখন আমরা মানুষের সেই সব চিন্তাধারার কথা বলি যে, সব চিন্তাধারা সমাজে বিপ্লব সাধন করে তখন সেই বিপ্লব সাধনকারী চিন্তাধারা বলতে আমরা বুঝি যে সেই পুরাতন সমাজের মধ্যে একটা নতুন সমাজের সূত্রপাত হয়েছে, আর সেই সব পুরাতন চিন্তাধারার পরিবর্তন, পুরাতন জীবন যাত্রা প্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলেছে।

প্রাচীন সমাজ যখন অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে পৌছালো সেই সময়ে সেই যুগের ধর্ম্ম খৃষ্ট ধর্ম্মের দ্বারা পরাভূত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে খৃষ্টান ধর্ম্ম মতবাদ যখন ন্যায় বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়ে পিছিয়ে গেলো ফিউডাল সমাজ তখন সেই যুগের বিপ্লববাদী পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মরণ পণ করে যুদ্ধ করেছিল। ধর্ম্মমত পোষণ করা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, প্রত্যেকের বিবেক অনুসারে মত পোষণের স্বাধীনতা জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার অস্তিত্বের লক্ষণ।

অবিশ্যি বলা হবে যে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নৈতিক দার্শনিক আইন বিষয়ক মতবাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে বটে কিন্তু, শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন ও আইন টিকে থাকতে পেরেছে। তা ছাড়া কতকগুলি শাশ্বত সত্য আছে যেমন স্বাধীনতা ন্যায়বিচার ইত্যাদি যেগুলি সমাজের সব অবস্থাতেই সত্য। অভিযোগ করা হয় যে সাধারণ স্বত্ববাদ এই সব শাশ্বত সত্যের বিলোপ সাধন করতে চায়, সাধারণ স্বত্ববাদ নতুন ভিত্তির উপর ধর্ম্ম ও অর্থনৈতিক জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা না করে সব ধর্ম্মের সব নৈতিক আদর্শের মূলোচ্ছেদ করতে চায়, সেই কারণে সাধারণ স্বত্ববাদ ঐতিহাসিক সমস্ত অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এক কথায় সাধারণ স্বত্ব-বাদীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কিসে পর্য্যবসিত হয়?

পুরাতন সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীগত সংঘর্ষের ক্রমিক বৃদ্ধির ইতিহাস। এই শ্রেণীগত সংঘাত ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। কিন্তু যেরূপই তারা নিক না কেন একটা বস্তু অতীতের সমস্ত সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলো। সেটি হচ্ছে এই যে সমাজের এক অংশের দ্বারা সমাজের অন্য অংশের শোষণ প্রথা। এই সব কারণে অতীতকালে সামাজিক জীবনে সমস্ত বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও প্রাচীন সমাজ বরাবরই কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কতকগুলি বাঁধাধরা সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ ছিল। যতদিন না শ্রেণীগত সংঘাত দূর হচ্ছে ততদিন এই সীমাবদ্ধ প্রাচীন সামাজিক জীবন কিছুতেই একেবারে লোপ পেতে পারে না।

সাধারণ স্বত্ববাদীরা যে বিপ্লব আনবেন সেই বিপ্লব ব্যক্তির সঙ্গে সম্পত্তির যে মামুলী সম্বন্ধ সংস্কারে পরিণত হয়েছে সেই প্রাচীন সংস্কারের বদ্ধ সম্বন্ধ থেকে মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেবে। এই ভাবের বৃদ্ধি হওয়ার মানে যে সমস্ত সংস্কার থেকে যোগ-বিযুক্ত হওয়া এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

যাই হোক এবারে আমরা পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বত্ববাদের বিরুদ্ধে মতবাদের আলোচনায় ক্ষান্ত দিই!

আমরা আগেই দেখেছি যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রমিকদের দিয়ে বিপ্লব করাবার সর্ব্বপ্রথম উপায় হচ্ছে আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়কে শাসক সম্প্রদায় করে তোলা। এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় তার রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে মূলধন ছিনিয়ে নেবার জন্যে ও উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্র রাষ্ট্রের হাতে অর্থাৎ কিনা শাসক সম্প্রদায়ে পরিণত আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত করে যথাসম্ভব শীঘ্রই উৎপাদিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করবার জন্যে ব্যবহার করবে। গোড়াতে এই পরিবর্ত্তন সম্পত্তির উপর ও পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের উৎপাদন প্রণালীর উপর যথেচ্ছাচার প্রভুত্ব না করে সম্ভব হবে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে অবিশ্যি এই সব উপায় মোটেই যথেষ্ট বলে মনে হয় না, কিন্তু আন্দোলনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সেই সব উপায় বদলে যাবে। এই সব উপায় কিন্তু পুরাতন সামাজিক নিয়মকে পরিবর্ত্তন করতে ও বর্ত্তমান কালের পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের উৎপাদন প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

এই বিপ্লব সাধন প্রণালী প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন হবে। তাহলেও সভ্য দেশগুলিতে বিপ্লব সাধনের জন্যে এই নিম্নলিখিত উপায়গুলি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য :—

১। জমীতে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব লোপ ও জমীর খাজনা সাধারণের ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা

২। আয়ের উপর ক্রম বর্দ্ধমান আয় করের ব্যবস্থা করা

৩। উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পত্তি লাভ প্রথার উচ্ছেদ সাধন

৪। যারা দেশ ত্যাগ করে গেছে তাদের ও সব বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা

৫। জাতীয় মূলধন দিয়ে জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে একচেটিয়া অধিকার দিয়ে রাষ্ট্রের হাতে টাকা লেনা দেনা করবার সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা

৬। যাতায়াতের ও বার্ত্তাবিনিময়ের সমস্ত ভার রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করা

৭। রাষ্ট্রের অধিকৃত সমস্ত কারখানা ও উৎপাদন প্রণালীর বৃদ্ধি সাধন করা, সমস্ত ফালতু জমি আবাদ করা ও একটা বিধি অনুযায়ী জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা

৮। প্রত্যেককে শ্রম করে খেতে হবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করা। উৎপাদন করবার জন্যে, বিশেষ করে কৃষি কার্য্যের জন্যে লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করা

৯। সমস্ত উৎপাদনকারী ব্যবসার সঙ্গে কৃষি কার্য্যের যোগাযোগ স্থাপন করা, দেশের মধ্যে লোক সংখ্যা চালিয়ে নিয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য দূর করা

১০। সমস্ত বালকবালিকার জন্যে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। বর্ত্তমান কালে কলকারখানার বালক বালিকাদের যে শ্রম-প্রথা প্রচলিত আছে তার বিনাশ সাধন করা। উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে শিক্ষাদানের যোগাযোগ স্থাপন করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালে যখন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীগত পার্থক্যের অবসান হবে এবং সমস্ত উৎপাদন প্রণালী জাতির একটি বিরাট সঙ্ঘের হাতে ন্যস্ত হবে তখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা তার রাজনৈতিক সত্তা হারাবে। সত্যি করে বলতে গেলে রাজনৈতিক ক্ষমতা এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য এক শ্রেণীকে নিপীড়ন করবার উপায় মাত্র। আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় যদি পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের এই বিরোধের সময় অবস্থা গতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটি শ্রেণীতে পরিণত হতে বাধ্য হয়, যদি বিপ্লব সাধনের দ্বারা এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় শাসক সম্প্রদায়ে পরিণত হয় ও সেই কারণে পুরাতন উৎপাদন প্রণালীকে একেবারে ধ্বংস করে, তাহলে তারা তার সঙ্গে শ্রেণীগত সংঘাতের অস্তিত্ব ও এক কথায় শ্রেণীর অস্তিত্ব লোপ করবে ও তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী হিসেবে তাদের নিজেদের প্রভুত্বের অবসান করবে।

পর-শ্রমভোগী সমাজের শ্রেণী ও শ্রেণীগত সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে আমরা একটা মানব সঙ্ঘ দেখতে পাবো যাতে ব্যক্তির স্বাধীন উন্নতি সমষ্টির পরিপূর্ণ উন্নতির প্রধান সহায় বলে গণ্য হবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

—————

বর্ত্তমান ভারত

—০—

[আর, পাম দত্ত]

—::—

(বর্ত্তমান ভারত আর, পাম দত্তের **Modern India** নামক ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইতোপূর্ব্বে এ অনুবাদ ১৩শ ১৫শ, ১৭শ ও ১৯শ সংখ্যক গণবাণীতে ছাপা হয়ে গেছে। যাঁরা মনোযোগ সহকারে এ অনুবাদ পাঠ করবেন তাঁরা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক আদর্শের সহিত পরিচিত হতে পারবেন।)

৪। নব প্রণালীর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিবিম্ব—দ্বৈতশাসন এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন।

নব ইম্পিরিয়েলিষ্ট নীতির রাষ্ট্রনীতিক প্রতিবিম্ব হচ্ছে দ্বৈতশাসন।

বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধনের যোগাযোগের যে প্রচেষ্টা বর্ত্তমানে চলেছে এবং যে প্রচেষ্টাতে ভারতীয় ধনিককে বৃটিশ ধনিকের অধীন অংশীদার করে নিতে চাওয়া হয়, দ্বৈতশাসন হচ্ছে তারি বিকাশ। জনগণের আন্দোলনের ফলে অনুগ্রহ-দান স্বরূপ তথাকথিত শাসন সংস্কার প্রণীত হয়নি। সাধারণ জনগণের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই—১৯১৭ সনে এ শাসন সংস্কারের বিষয় মূলতঃ ঘোষিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল কেবল মাত্র উচ্চস্তরের অল্পসংখ্যক লোককে আকর্ষণ করা। অর্থনীতিক ক্ষেত্রের ন্যায় রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও নূতন ইম্পিরিয়েলিষ্ট নীতি ভারতীয় বুর্জ্জুয়াজিগণের সহযোগ দাবী করেছিল, উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বুর্জ্জুয়াজিগণকে দিয়ে ভারতীয় জনগণের শোষণ ব্যাপারে ইম্পিরিয়েলিষ্টগণের এজেন্ট বা দালাল রূপে কার্য্য করানো।

"ইকনমিষ্ট" নামক কাগজে দ্বৈতশাসনের প্রকৃত অর্থ অতিশয় খোলা খুলি ভাবে প্রকাশিত হয়েছে:—

"এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় ও বৃটিশ মূলধনের এক উপদেশাধীন পরিচালিত হওয়ার উদ্যম থেকে অনেকটা সুবিধে হবে। দ্বৈতশাসন যেমন পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের অর্দ্ধেক পথের সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে, তেমনি তা এ দেশের শৈল্পিক বিবর্ত্তনের জন্যে অপরিহার্য্য প্রয়োজনও বটে। কিন্তু এর পরিণাম যে সমানে সমান হবে এরূপ অনুমান করা মোটেই নিরাপদ নয়। পাটের কল সমূহে যে মূলধন লাগানো হয়েছে বর্ত্তমান সময়ে তার অর্দ্ধেকেরও বেশীর মালিক ভারতীয়গণ। কিন্তু, তা বলে প্রথমোক্তের (অর্থাৎ কেবলমাত্র বৃটিশের) শাসনে এতটুকুও ব্যত্যয় ঘটেনি। ভারতীয় অংশীদারগণ এর বাইরে থেকেও বেশ্ সন্তুষ্ট আছে।"

(ইকনমিষ্ট, ১৯শে জুলাই, ১৯২৪)

এই বর্ণনার তাৎপর্য্য কি? এর তাৎপর্য্য এই যে ভারতে আজ পর্য্যন্ত যতটা উন্নতি বিধান করা হয়েছে এবং সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করা পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটবে বৃটিশ ধনিকবাদের শ্রেষ্ঠ মুখপত্র শান্ত ও কঠোরভাবে সে সবেরই পরীক্ষা করেছে। এর মতে এ সব পরিবর্ত্তনের দ্বারা ভারতের বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিষ্ট শাসনের কোনো ব্যত্যয় ঘটবেনা, আর ইম্পিরিয়েলিষ্ট শাসনই হচ্ছে ধনিক শাসন।

"স্বরাজ" সম্বন্ধে বৃটিশ শোষণবাদীদের (ইম্পিরিয়েলিষ্টদের) ধারণা কি তা আরো পরিষ্কার রূপে সে কাগজেরই আর এক বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে:—

"মূলতঃ স্বরাজদলের লোকদের দায়িত্বমূলক গবর্ণমেন্টের ধারণা হচ্ছে—পার্লামেন্টের শাসন বিমুক্ত ভারত যা উচ্চ আমদানী শুল্ক বসিয়ে বৃটিশ জাত দ্রব্যের বহিষ্কার করবে; কিন্তু, বহিরাক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্যে নির্ভর করবে বৃটিশ সৈন্য ও বৃটিশ নৌবহরের ওপরে। উপরি উক্ত ধারণার পূর্ণ ভাবার্থ সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখলে ইণ্ডিপেণ্ডেট লেবরপার্টির ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের অনেক উপকার হতে পারে। এর অর্থনীতিক দিক্‌টার ফল এই দাঁড়াবে যে বৃটিশ মূলধন ও ভারতীয় শ্রমিকের সম্বন্ধ আরো পাকা পোক্ত হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধ বর্ত্তমান সময়েও বর্দ্ধিতরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। ভারতীয় আমদানী শুল্কের প্রাচীরের অন্তরালে এ সম্বন্ধের দ্বারা এমন ভারতীয় সমৃদ্ধি বাড়বে যে, যা কখনো কল্পনাও করা যায়নি।"

("ইকনমিষ্ট" ২২শে মার্চ্চ, ১৯২৪)

ভারতের জাতীয়ত্ববাদীরা যদি ওপরের দুটো উদ্ধৃতাংশের অর্থ সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেন এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সহিত এ দুটো উদ্ধৃতাংশের অর্থের কি সম্বন্ধ হতে পারে তা একবার ভাবেন তা হলে তাঁরা অনেক ভালো কাজই করবেন।

৫। ভারতীয় মুক্তির জন্যে কর্ত্তব্য

ওপরকার পরিচ্ছেদগুলির আলোচনা করা থেকে কতকগুলো বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতের জাতীয় স্বার্থের সহিত ভারতের ধনিক স্বার্থের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন একেবারেই মিথ্যা।

পক্ষান্তরে, আজকের দিনে ইম্পিরিয়েলিজম ভারতীয় ধনিক বাদকে আপন কুক্ষিগত করে নিচ্ছে এবং একটা অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক ভাগাভাগির পথ তৈরী করছে। পরিণামে এ পথই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের রূপ গ্রহণ করবে।

এ কারণে মুক্তির জন্যে ভারতের জনগণের সংগ্রাম কেবলমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম হতে পারে। ভারতের ধনিকগণের বৃটিশ ধনিকগণের অংশীদার হওয়ার যে উদ্দেশ্য আছে তারি বিকাশ হচ্ছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। কিন্তু এ উদ্দেশ্য থেকে কিছুতেই জনগণের স্বার্থোদ্ধার হতে পারেনা। জনগণের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের শোষণ হতে পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করা আবশ্যক এবং এ মুক্তি কেবলমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।

সংগ্রামের নেতৃত্বগ্রহণ করার জন্যে ভারতীয় বুর্জোয়াজি অর্থাৎ ধনিকগণকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যেতে পারেনা! প্রতি পাদবিক্ষেপেই এ আশা করা যায় যে তারা ইতস্ততঃ করবে, পেছনে ফিরে যাবে কিংবা সঙ্কটকালে গবর্ণমেণ্টের দলে গিয়ে ভিড়বে। ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত তাদের স্বার্থ আগে থেকেই অত্যন্ত বেশীরূপে বিজড়িত হয়ে আছে এবং তাদের অধীনতা ক্রমশঃই বাড়ছে। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে বিপুল জনগণের সংগ্রাম। এ সংগ্রামের নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদেরকে জনগণের স্বার্থের জন্যেই যুঝতে হবে। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম কেবল মাত্র শ্রমরত জনগণের শক্তির দ্বারাই সাফল্য লাভ করবে। তাদের স্বার্থ ইম্পিরিয়েলিজমের স্বার্থ হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

পরিশেষে, ভারতে অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে। পরিবর্ত্তনের এ প্রক্রিয়া আবশ্যক প্রক্রিয়াই বটে। ভারতের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের জন্যে শৈল্পিক উন্নতি আবশ্যক। কৃষিকার্য্যকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় গঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু, এসকল পরিবর্ত্তন ও লব্ধ-নবশক্তি সমূহ হতে যদি ভারতীয় জনগণ উপকৃত হতে চায় তা হলে এ সব ভারতীয় জনগণের আয়ত্ত করা উচিত। এ জন্যে, ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম পরিণামে অবশ্যই তাদের সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম হবে।

—০—

ভাটপাড়ার পত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "গণবাণী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত ৩০শে জুনের "গণবাণী"তে কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র মহাশয়কে অভিনন্দন ও কাঁচড়াপাড়ায় ই, বি, রেলের ভারতীয় কর্ম্মচারীদের বার্ষিক সম্মিলন উপলক্ষে যে সংবাদ ও সমালোচনা বাহির হইয়াছে তৎসম্পর্কে কয়েকটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আশা করি "গণবাণী"র মারফৎই উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

বিনীত—শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

৫ই জুলাই, ১৯২৭

ভাটপাড়া

১। "বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশন" নামে পরিচিত যে প্রতিষ্ঠানটি সেদিন মেয়র মহাশয়কে অভিনন্দন দিয়াছেন দুইটী ফেডারেশনের বিবাদ মিটাইয়া "অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" কবে ও কোন্ তারিখে সেইটীকেই "বঙ্গীয় প্রাদেশিক শ্রমিক সমিতি" বলিয়া স্বীকার ও গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন?

২। অপরটীকেই বা অগ্রাহ্য এবং নাকচ করিয়াছেন কবে?

৩। মেয়র মহাশয়ের অভিনন্দন উপলক্ষে "প্রায় দুইশত নিমন্ত্রণ পত্র" যাঁহাদের নিকট পাঠান হইয়াছিল তাঁহারা যে "তথাকথিত" নেতা—তাহা সাব্যস্ত হইয়াছে কবে। নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে—না অভিনন্দন সভার পরে?

৪। অভিনন্দনের উত্তরে যিনি আসল কথা ভুলিয়া "রাষ্ট্রনৈতিক মেঘের আদর্শে" শ্রমিকদিগকে মাত্র জাতীয় কংগ্রেসের "পো" ধরিয়া চলিবার পরামর্শ দিয়াই খালাস হইয়াছেন তাঁহার সেই বহুমূল্য উত্তরটী না ছাপাইয়া অথবা ঐ ফেডারেশনের "মানের কান্না" লোক সমাজে প্রচার না করিয়া "বেঙ্গলী" কি অপরাধ করিয়াছেন?

৫। কাঁচড়াপাড়ার কনফারেন্স উপলক্ষে "সং সম্বন্ধের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কি না" তাহা না জানিয়াও কেবল "অনুমান যদি সত্য হয়" সেই আশাতেই আপনার ন্যায় সকল প্রকার দলাদলি ও পক্ষপাত শূন্য নিষ্কলঙ্ক সম্পাদকের পক্ষে মুকুন্দ বাবু ও ই, বি, রেলের ভারতীয় কর্ম্মচারীদের সমিতি সম্বন্ধে ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করা সমীচীন হইয়াছে ত?

৬। পরের মুখে ঝাল খাইয়াই আপনি "শ্রীযুত মণি মোহন মুখোপাধ্যায় মুখ খোলেন নাই" বলিয়া যে হাউই তুবড়ীর বহর দেখাইয়াছেন উহাতে আপনার নিরপেক্ষতার ডিগ্রি ঠিক থাকিবে ত?

—০—

উত্তর

শ্রমিক আন্দোলন এখনো আমাদের দেশে নিতান্তই লাওয়ারিশ ব্যাপার। এ আন্দোলনের না আছে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, না আছে কোনো কর্ম্মের ধারা? আমাদের যে সকল পেটি বুর্জুয়াজি আন্দোলনের স্বকৃত নেতা সেজেছেন আপন আপন ব্যক্তিত্বই তাঁদের নিকটে যথা সর্ব্বস্ব হয়ে উঠেছে। ভাটপাড়ার শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্যকে ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে আমরা যতটা জেনেছিলেম তাতে তাঁর একটা অনুপাত জ্ঞান আছে বলে আমাদের মনে ধারণা জন্মেছিল। কিন্তু, ওপরে তাঁর যে চিঠিখানা ছাপা হয়েছে তা থেকে মনে হচ্ছে যে কালী বাবুও অনুপাত জ্ঞান হারিয়েছেন। তিনি আমাদিগকে ৬টি প্রশ্ন করেছেন এবং সে সবের উত্তর আমাদের কাছ থেকে গণবাণীর মারফতেই তিনি চেয়েছেন। কিন্তু, কেন যে আমাদের কাছ থেকে এ সবের উত্তর চাইলেন তাতো আমরা বুঝে উঠতে পারছিনে। তবে ভারতবর্ষের একজন শ্রমিক নেতা যখন প্রশ্ন করেছেন তখন উত্তর আমাদের দিতেই হবে। নিম্নে আমরা তাঁর প্রশ্নগুলির পৃথক পৃথক উত্তর দিচ্ছি।

১। "অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেস" ও মেয়রের অভিনন্দনকারী "বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন" এ প্রশ্নের উত্তর কালীবাবুকে দিবেন। "গণবাণী" এ দুয়ের কোনো প্রতিষ্ঠানেরই মুখপত্র নয়।

২। অল্-ইণ্ডিয়া ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি (স্বয়ং কালীবাবু যার একজন সদস্য) এ প্রশ্নের উত্তর তাঁকে দিবে।

৩। "শ্রমিক জগৎ" যিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন তিনিই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু, কালীবাবু উত্তর চেয়েছেন আমাদের কাছ থেকে, যা চাওয়ার কোনো অধিকার তাঁর নেই।

৪। "বেঙ্গলী"র অপরাধের বিচার করবার আপাততঃ আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

৫। আমরা কাঁচড়াপাড়া সম্মিলন সম্বন্ধে কোনো "অভিমত" প্রকাশ করিনি। কাজেই সমীচীনতার কথা আসতেই পারে না। তবে "দলাদলি" শূন্য আমরা নই। আমাদের আন্দোলনের প্রধান ভিত্তিই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম এবং সেটা যে দলাদলি নয় এমন মিথ্যে কথা প্রকাশ্য দিবালোকে কি করে বলব? অবশ্য শ্রেণী সংগ্রামটা ব্যক্তিত্বের বা তথাকথিত নেতৃত্বের দলাদলি নয়।

আমরা যদি আপনাদিগকে পক্ষপাত শূন্য বলি তা হলে সে কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। যাঁর দলের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা আমরা করব তিনিই পক্ষপাতিত্ব দোষে আমাদিগকে দুষ্ট দেখ্‌বেন। কোনো মানুষ আপনাকে নিষ্কলঙ্ক বলে দাবী করতে পারে কিনা তাও আমরা জানিনে।

৬। পরের মুখে ঝাল আমরা খাইনি, পরের লেখা ছাপিয়েছি মাত্র। নিরপেক্ষতার সার্টিফিকেট আমরা কখনো কাহারো কাছ থেকে চাইনি।

কালীবাবু বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে কিংবা অন্যত্র শ্রমিকদের জন্যে কি কি কাজ করছেন সে সব বৃত্তান্ত লিখে পাঠালে আমরা খুব আনন্দের সহিতই প্রকাশ করতে থাকব যেমন আগে আগে করতেম। কিন্তু, এ পত্রের বিষয়ের ন্যায় অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখে পাঠালে এর পরে আমরা আর সে সব ছাপাতে পারব না। পত্রের লেখা বিষয়ের সহিত কালী বাবুর কোনো সম্পর্ক যখন নেই তখন তাঁর এ পত্র লেখা অনধিকার চর্চ্চা হয়েছে কিনা পাঠকগণ তার বিচার করুন। আমাদের কাগজে ছাপা কোনো রিপোর্ট যদি ভুল হয় তা যে কোনো প্রত্যক্ষ দর্শী শুধরে দিতে পারেন, তার জন্যে তাঁকে আমরা ধন্যবাদ দেব।

একটা নিবেদন

১৯২৪ সনে কানপুরের কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় যে চারজন যুবক চার চার বছরের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবল মাত্র মোহাম্মদ শওকৎ উস্‌মানীই আজো পর্য্যন্ত রেহাই পান নি। তিনি দেরাদুন ডিষ্ট্রিক্ট জেলে রয়েছেন। আগামী আগষ্ট মাসের ২৬শে তারিখে তিনি রেহাই পাবেন। তাঁর শরীরের অবস্থা খুবই খারাব। ঔদরিক ক্ষয় রোগে তিনি ভুগ্‌ছেন। তাঁর বন্ধুরা স্থির করেছেন যে ছাড়া পাবার পরে তাঁরা তাঁকে আলমোড়া পাহাড়ে বায়ু পরিবর্ত্তন ও চিকিৎসিত হতে পাঠাবেন। উস্‌মানী সাহেব নিজেও সে ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন। এ কাজের জন্যে অন্ততঃ ৫০০ টাকার প্রয়োজন হবে। আমরা সকলের নিকটে, বিশেষ করে ভারতের কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের নিকটে প্রার্থনা করছি যে তাঁদের যাঁর পক্ষে যা সম্ভব এ ফণ্ডটীতে সাহায্য করুন। সংবাদ পত্র সমূহে টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা হবে। সাহায্যের টাকা এস, ভি, ঘাটে ৭২১, গিরগাঁও রোড, বোম্বে নং ৪, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বিনীত নিবেদক

এস, ভি, ঘাটে

জেনারেল সেক্রেটারী, কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, বোম্বে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

সম্পাদক, গণবাণী, কলিকাতা।

দেশ-বিদেশ

শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষদের কর্ম্মিগণ যশোহর জেলার বনগাঁ মহকুমার কয়েকটি গ্রামে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এ প্রচারের ফলে কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আশা নাকি করা যাচ্ছে।

—•—

ডক্টর তেজেন্দ্রনাথ রায় এম, বি, সি, এইচ, বি (গ্লাসগো) বিগত ৬ই জুলাই তারিখে পরলোক গমন করেছেন। কলিকাতা শহরে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের তিনি একজন শিক্ষকও ছিলেন। ছাত্রদের নিকট তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর বৃদ্ধা মাতা এখনো জীবিতা আছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা মনীষা রায় এম-এ স্কুল সমূহের একজন এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্ট্রেস্।

—•—

মোটরে উত্তর মেরু ভ্রমণের সঙ্কল্প করে গত ৮ই জুলাই তারিখে লণ্ডন থেকে মিঃ ও মিসেস্ ভিক্টর ক্রস্ যাত্রা করেছেন। তাঁরা ছ' হাজার মাইল মোটরে ভ্রমণ করবেন।

ডক্টর কর্ণানডেজ বহুকাল থেকে লীড্‌স্ ম্যুনিসিপালিটির সহকারী যক্ষ্মা চিকিৎসক রূপে কাজ করে আস্‌ছেন। তিনি একজন ভারতবাসী বলে ওকাজে বহাল থাকতে পারেন কিনা এই নিয়ে অনেক দিন থেকে বাক্ বিতণ্ডা চলছিল। এরূপে ব্যাপার স্বাস্থ্য মন্ত্রী পর্য্যন্ত পৌঁছায়। ৯ই জুলাই তারিখে লণ্ডন থেকে খবর এসেছে যে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডক্টর কর্ণানডেজকে অপসারিত করার পক্ষেই মত দিয়েছেন। এ কারণে সিটি কাউন্সিল ডক্টরকে কাজে ইস্তিফা দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন। অবশ্য এ প্রস্তাব সিটি কাউন্সিল কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বে উক্ত কাউন্সিলের অনেক সদস্যই প্রতিবাদ করেছিলেন।

—•—

গত ৮ই জুলাই তারিখে সহকারী ভারত সচিব যখন ভারত বিষয়ক আলোচনার শেষ করেন তখন কর্ণেল ওয়েজউড্ গবর্ণমেণ্টকে বলেন যে ভারতবর্ষে কবে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে তার একটা তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা হোক্। এ স্বায়ত্ত শাসনে, কর্ণেল ওয়েজউডের মতে, ভারতবর্ষ নিজের সৈন্য সামন্ত ও

ঘরোয়া ব্যাপার নিজেই দেখা শুনা করবে। কর্ণেল ওয়েজ উড্ অবিলম্বে রয়েল কমিশন নিয়োগের প্রস্তাবও করেন এবং মিঃ গান্ধীকে তাঁর একজন সদস্য নিযুক্ত করতে বলেন।

—০—

ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে শস্য ক্ষেত্রের অবস্থা ভয়ানক খারাব হয়ে পড়েছিল। জলাভাব ও পঙ্গপালের আবির্ভাবই এর কারণ। পঙ্গপালরা অনেক খেত নষ্ট করলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত তাদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে। আজকাল বৃষ্টিও বেশ হচ্ছে। কাজেই অবস্থা যতটা খারাব হবে বলে ধারণা হয়েছিল ততটা খারাব হবে না।

—।—

৯ই জুলাই তারিখে কানপুর থেকে এসোসিয়েটেড্ প্রেস খবর দিয়েছেন যে একটি অল্-ইণ্ডিয়া পিজান্ট্‌স লীগ বা সমগ্র ভারতীয় কৃষক সঙ্ঘ সম্প্রতি সংগঠিত হতে চলেছে। এর কেন্দ্র কার্য্যালয় স্থাপিত হবে এলাহাবাদে। কৃষকগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক ও রাষ্ট্র-নীতিক উন্নতি বিধান করাই হবে এ লীগের উদ্দেশ্য। যিনি রেলপথে কম পক্ষে ৩ হাজার মাইল এবং পদব্রজে ২৫০ মাইল পথ লীগের কাজে ভ্রমণ করবেন. মাসে কম পক্ষে ১০ দিন লীগের জন্য কাজ করবেন, উর্দ্দু ও ইংরেজী লিখতে ও বলতে পারেন, স্বদেশী কাপড় ছাড়া অন্য কিছু পরেন না, যে কোন অবস্থার সহিত আপনাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, কেবল মাত্র তিনিই এ লীগের সভাপতি হতে পারবেন। লীগের নিয়মাবলী ও কর্ম্মতালিকা ছাপা হয়ে গেছে এবং হিন্দু মুসলমান নেতাগণ তা সমর্থন করেছেন। আদৎ কথা কিন্তু এখনো বলা হয় নি,—এ লীগ জমীদার ও কৃষকের সম্বন্ধ ভালো করতে চেষ্টা করবে। কাজেই এটা যে কত বড় কৃষক সঙ্ঘ হবে তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের মনে হয় কৃষকগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রাখবার জন্যে ভারতময় একটা ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা হচ্ছে। তা না হলে কৃষক আর জমীদারের মধ্যে ভালো সম্বন্ধ স্থাপনের কথা এর উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকত না। তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমান নেতৃগণ যখন এ লীগের অনুষ্ঠান পত্র ও কর্ম্মতালিকার সমর্থন করেছেন তখন আমাদের সন্দেহ যে অমূলক নয় তা বেশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে। যা হোক, সভাপতি হবার জন্যে আমরা একজন লোকের নাম প্রস্তাব করে রাখছি। ওপরে গুণাবলীর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সব ক'টিই বোধ হয় অযোধ্যার তালুকদার মিঃ মুশীর হোসেন কিদ্‌ওয়াইর মধ্যে পাওয়া যাবে। অযোধ্যার একজন রাজার চেয়ে কৃষকের বড় বন্ধু আর কে হতে পারে ?

———

সার আবদুর রহীম উত্তর কলিকাতার মুসলমানগণের তরফ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে মৌলবী শেখ আবদুল ওয়াহেদ মোকদ্দমা করেছেন। বাংলার গবর্ণর এ মোকদ্দমার বিচার করার জন্যে মিঃ এইচ, বি, লেথ্‌ব্রিজ আই-সি-এস, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ রায় তারাপদ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ও অবসর প্রাপ্ত সব জজ রায় গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরকে কমিশনর নিযুক্ত করেছেন। আলীপুরে এ মোকদ্দমার বিচার হবে। সার আবদুর রহীম আজকের দিনে বাংলার মুসলমানগণের সর্ব্ববাদী সম্মত গুরু, একেবারে বাংলার 'গাওসুল্ আজম'। তাঁর বিরুদ্ধে এমন কুকার্য্য করে শেখ্ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব 'কাফের' হয়ে যাবেন না ত?

———

"অমৃত বাজার পত্রিকা"র বহরমপুরের সংবাদদাতা এক বড় মজার সংবাদ গত ৫ই জুলাই তারিখে পাঠিয়েছেন। গোরাবাজারের বেণী মিস্ত্রী একজন হিন্দু হলেও আজন্ম তিনি মুসলমানদের সঙ্গেই বেশী মেলামেশা করেছেন। মহরম উপলক্ষে তিনি মুসলমানদের তরবারি ও লাঠি খেলতেন এবং অনেক বছর তিনি একটি আখড়ার নেতাও ছিলেন। এ হেন বেণী মিস্ত্রী যখন সেদিন ৯১ বছর বয়সে মারা যান তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কথা ওঠে যে তাঁর সৎকার করা হবে কোন মতে—হিন্দু না মুসলমান? ব্যাপারটা আপোসে এরূপভাবে নিষ্পত্তি হয় যে বেণী মিস্ত্রীর দেহ প্রথমে শ্মশানে দাহ করা হবে এবং শেষে দেহ-ভস্মের দেওয়া হবে কবর। তারপরে বেণী মিস্ত্রীর শব নিয়ে হিন্দু আর মুসলমানের এক বিরাট মিছিল বের হয়। মুসলমানরা মহরমের পতাকা অর্দ্ধোত্তোলিত করে আর তরবারী পার্শ্বদেশে খুলে রেখে মিছিলের সাথে সাথে চলেছিল, আর তাদের বাদ্যযন্ত্র সমূহে শোকগীতি বাজানো হচ্ছিল। হিন্দুরাও সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল। বাদ্য কোথাও থামেনি,—না মসজিদের সম্মুখে, না মন্দিরের।

———

টাটা আইরণ ও ষ্টীল অয়ার্কস লিঃ

———

১৯২৬-১৯২৭ সালে টাটা আইরণ ও ষ্টীল ওয়ার্কস লিমিটেডের ১৯৪ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে, গত বৎসরের জের ৩ লক্ষ ছাড়া। ডাইরেক্টরগণ নিম্নলিখিত ভাবে লাভের টাকা বণ্টন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ৭৮ লাখ মূল্য হ্রাস (ডিপ্রিসিয়েশন) ফণ্ডে, কোম্পানীর ঋণ পত্র ও অন্যান্য ঋণের সুদ ৪৩ লাখ টাকা, ডিভিডেণ্ড শেয়ারে ৭৩ লাখ টাকা, অফিস খরচ ও এজেণ্ট কমিশন ১০ লাখ টাকা। সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। শেয়ার হোল্ডার ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। জের ৩ লক্ষ টাকা।

———

ভারতীয় জর্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটারী মিঃ বার্ণাড শর নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে তিনি ভারতে আগমন করিবার জন্য ডাক্তার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকট হইতে যে নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন তাহাতে কোনো সত্যতা নাই।

———

কৈফিয়ৎ

প্রেসের কম্পোজিটররা অসুস্থ হয়ে পড়ায় গণবাণী এবার একদিন দেরীতে বের হলো।

———

কাকোরী মামলার রায়

কাকোরী ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমার সংস্রবে আশ্‌ফাকুল্লা ও শচীন্দ্রনাথ বক্সী পরে ধৃত হয়েছিলেন। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ আইনুদ্দীন দু'জনাকেই দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। তার পরে এ মোকদ্দমার বিচার লক্ষ্ণৌর বিশেষ দায়রা জজের আদালতে হয়। জজ আশ্‌ফাকুল্লাকে প্রাণদণ্ডে এবং শচীন্দ্রনাথ বক্সীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। আশ্‌ফাকুল্লার বাড়ী যুক্ত প্রদেশের শাহ্জাহান পুর জেলায় আর শচীন্দ্রনাথ বক্সীর বাড়ী বেনারসে।

কম্যুনিজমের ইতিহাস

(শ্রীধরণীকান্ত গোস্বামী)

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে গণতন্ত্রের সঙ্গে কম্যুনিজমের কতটা কি সম্বন্ধ তাহার আলোচনায় কম্যুনিজমের আভাষ মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কম্যুনিজমের উৎপত্তি, গতি, প্রতিপত্তি ও পরিণতি প্রভৃতি আলোচনা করিব। এই আলোচনায় আমি 'কম্যুনিজম' শব্দটীকে কোনও তরজমায় প্রকাশ করিতে রাজী নই। যেহেতু আমার মনে হয় কোনও ভাষার বিশিষ্ট কোন শব্দ অপর কোনও ভাষায় তরজমা অনেক সময় হইতে পারে না। প্রত্যেক ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দ থাকে যেগুলি কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব ও বিশিষ্ট ঘটনার প্রকাশক। বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশক ও বিশিষ্ট ভাব প্রকাশক শব্দগুলিকে কোনও পৃথক ভাষার তরজমা করিতে চেষ্টা করিলে ঐ সমস্ত শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য সর্ব্বাংশে খর্ব্ব হইয়া যায়। সুতরাং কম্যুনিজমের তরজমার প্রতি মনোযোগী না হইয়া উহার ভাবের প্রতি মনোযোগী হওয়াই আমি বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করি।

এদেশে কম্যুনিজম শব্দকে তরজমা করিতে যাইয়া উহাকে অনেকে অনেক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ উহার নাম দিয়াছেন ধনসাম্যবাদ, কেহ নাম দিয়াছেন সাধারণ স্বত্ববাদ, কেহ সমাজ সাম্যবাদ আর কেহ বা লিখিতেছেন সমানাধিকারবাদ। কিন্তু দেখিতেছি এ যেন নামকরণের প্রতিযোগিতা। ইহাতে বেশ উপলব্ধি হইতেছে যে ইঁহাদের কেহই এখনও কম্যুনিজমের যথার্থ অর্থ ও ভাব প্রকাশক প্রতি শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

কম্যুনিজম শব্দের তরজমা যাহাই কেন হউক না তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছুই লাভ বা ক্ষতি নাই। এখানে আরো একটু উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি যে এদেশে যে সামান্য একটু কম্যুনিজমের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে আমাদের সুধীসমাজের একদল এখনই উহার মৌলিকত্ব নিয়া কাড়াকাড়ি লাগাইয়াছেন। উঁহারা কম্যুনিজমের মূলের সহিত একটা ভারতীয় ছাপ লাগাইয়া দিতে অত্যন্ত ব্যস্ত। ইহাতে যেন আমাদের গৌরব কতই বাড়িয়া গেল! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বস্তুটির মৌলিকত্বে ষোল আনা দাবী করিলেও নিজেদেরকে আসল বস্তুটি হইতে একেবারেই সরাইয়া রাখিতে খুব সতর্ক থাকেন! ইঁহাদের এইরূপ আলোচনায় এবং এইরূপ আচরণে উদারতা বা সঙ্কীর্ণতার কতটা প্রকাশ পাইতেছে তাহা সুধীজনই পরিমাপ করিয়া লইবেন।

যাহা হউক প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে কম্যুনিজমের মূল শিকড়টী কোথা হইতে কোথায় কি ভাবে গজাইল এবং কালের কোন গভীরতম অন্ধকারে কোথায় কি ভাবে উহা কোন আধ্যাত্মিকতার আবর্ত্তে অবস্থান করিতেছিল সে সব জন্ম পত্রিকার জটীল ও রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ববিদের উপর ছাড়িয়া দিয়া আমরা শুধু উহার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থিত আমল হইতে উহাকে অনুসরণ করিয়া চলিব।

সেই হিসাবে আমরা প্রকৃত পক্ষে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিজমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে যে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয় তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডে এক গুপ্ত আন্তর্জাতিক সমিতি অবস্থিত করিতেছিল। এই সমিতির নাম ছিল "কম্যুনিষ্ট ফেডারেশন" (The Communist Federation) এবং ইহার পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত জর্ম্মান পণ্ডিত কাল মার্কস্ ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লণ্ডন সহরে এই দলের এক বৈঠক বসে এবং সেই বৈঠকে উক্ত পণ্ডিতদ্বয়কে সমিতির নামে এক প্রচার পত্র বাহির করিতে অনুরোধ করা হয়। তদনুসারে উঁহারা উভয়ে মিলিয়া সমিতির নামে এক প্রচার পত্র বাহির করেন এবং কম্যুনিষ্টের মতবাদ লইয়া ইঁহারা সেই প্রথম লোক চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। এই প্রচার পত্রে পণ্ডিত কাল মার্কস্ ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ যে সমস্ত নীতি ও মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার উপরই কম্যুনিজমের ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান মানব সমাজ কি ভাবে কতগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থ শক্তির সঙ্ঘাতে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে এবং পৃথিবীর অবস্থিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থাদি কি উপায়ে নিয়মিত ও নিয়োজিত হইলে পর বর্ত্তমান সমাজকে ধ্বংসের পথ হইতে বাঁচাইয়া রাখা যায় ইত্যাদি অত্যন্ত জটীল ও সমস্যা পূর্ণ ব্যাপারের এক অতি প্রকৃষ্ট ধারাবাহিক ও গবেষণা-মূলক সুমীমাংসা-পূর্ণ তথ্য ঐ প্রচার পত্রে আলোচিত হইয়াছে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈঠকের পর কিছু কাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মার্ক্সের নেতৃত্বে একটী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিই প্রথম আন্তর্জাতিক (The First International) নামে অভিহিত হয়।

ক্রমশঃ

গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১॥৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

BOOKS ON SOCIALISM.

1. The Coming of Socialism.
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. Scientific Socialism.
Its Aims and Ideals
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. The Religion of Capital
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. Manifesto of the Communist Party
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS.
Price—As. 6/- only.

To be had of
The Book Company Ltd.
4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	॥০
অগ্নিসংস্কার	১॥০
শুভা	১৲
পাপের ছাপ	২।০
বিপর্য্যয়	২॥০
শান্তি	২॥০
কাঁটায় ফুল	১॥০
রক্তের ঋণ	॥০
আনন্দ-মন্দির	॥০

রাঙ্গণী	২।০
পিতাপুত্র	১॥০
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	২॥০
দূরের আলো	২৲

নাটিক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ॥০
২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত প্রস্থচিত্র। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে
উপন্যাস ও গল্প

১। মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। একা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ ঃ—
১। ভাত কাপড়ের কথা।
বাঙ্গালার রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।
২। বাণী বীথি।
বাঙ্গালা সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯০এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের গ্রন্থ
1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.
Published by the Calcutta University.



Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১শে জুলাই ১৯২৭, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৪ | ২৩ম সংখ্যা

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহমদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১শে জুলাই, ১৯২৭, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৪ | ২৩ম সংখ্যা

সাধারণ স্বত্ববাদীর ইস্তেহার

(কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেড্রিশ্ এঙ্গেল্স্)

অনুবাদক—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। পরিবর্ত্তন বিরোধী সোশ্যালিজম

(ক) ফিউডাল সোশ্যালিজম

তাদের ঐতিহাসিক অবস্থার দরুণ ফ্রান্সের আর ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখা অন্যতম কাজের মধ্যে গণ্য হয়েছিলো। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের সময় আর ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তন আন্দোলনের সময় এই ভুঁইফোড় পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের হাতে অভিজাত সম্প্রদায়কে পরাভব মানতে বাধ্য হতে হয়েছিলো। এই কারণে সত্যিকার রাজনৈতিক বিরোধ ঘটবার কোনই সম্ভাবনা তখন ছিলো না। একমাত্র কাগজে কলমে যুদ্ধ করাই তখন সম্ভব ছিলো। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রাজশক্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠা যুগের মতবাদ চালাবার কোন উপায় ছিলো না।

লোকের সহানুভূতি পাবার জন্যে এই অভিজাত সম্প্রদায় তাদের নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের কথা চেপে রেখে উপদ্রুত শোষিত শ্রমিকদলের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে বাধ্য হয়েছিলো।

সেই কারণে অভিজাত সম্প্রদায় তাদের এই নতুন প্রভুদের সম্বন্ধে বিদ্রূপের গান গেয়ে, আর প্রভুদের কাণে কাণে তাদের আসন্ন বিপদের ভবিষ্যৎবাণী করে নিজেদের পরাজয়ের অবমাননার শোধ নিয়েছিলো।

এই উপায়ে যা গত হয়ে গেছে তার জন্যে হা হুতাশ করে আবার তাকে বিদ্রূপ করে, কিছুটা অতীতের ছায়া নিয়ে আবার কিছুটা বর্ত্তমানের ভয় থেকে ফিউডাল সোশ্যালিজম জন্ম লাভ করেছিলো।

অভিজাত সম্প্রদায় শ্লেষাত্মক নির্ম্মম সমালোচনা করে এই পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়কে বিদ্ধ করত বটে কিন্তু তাদের নিজেদের ইতিহাসের গতির কোন ধারণা না থাকায় তাদের সমালোচনা বেশীর ভাগ জায়গাতেই অত্যন্ত হাস্যজনক হোত। জন সাধারণকে তাদের দলে টেনে আনবার জন্যে অভিজাত সম্প্রদায় তাদের পতাকার অগ্রভাবে আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের ভিক্ষা-পাত্রটি ঝুলিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু যারা তাদের দলভুক্ত হোয়েছে তারা এই পতাকা ও ভিক্ষাপাত্রের পশ্চাতে পুরাতন ফিউডালিজমের প্রতীক লুকোনো আছে দেখতে পেয়ে ঘৃণায় একান্ত অবজ্ঞার হাসি হেসে এই অভিজাত সম্প্রদায়কে ত্যাগ করেছে।

ফরাসী লেজিটিমিষ্ট ও ইয়ং ইংলণ্ডের একদল এই রকম করেছে।

তাদের শোষণ-প্রথা আধুনিক পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের শোষণ-প্রণালী থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই কথা প্রমাণ করতে যাবার সময় পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায় ভুলে যায় যে তারা সমাজের যে অবস্থায় শোষণ করেছে সে অবস্থার এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে ও যে উপায়ে তারা শোষণ করে এসেছে সে উপায়ে এখন শোষণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অভিজাত সম্প্রদায় যখন প্রমাণ করতে যায় যে তাদের সময় বর্ত্তমান কালের এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের কোনই অস্তিত্ব ছিলোনা তখন তারা ভুলে যায় যে বর্ত্তমান পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায় তাদেরই বিশিষ্ট সামাজিক জীবনের ফল।

সমস্ত পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধতা করার যে অতি স্পষ্ট ইঙ্গিত তাদের সমালোচনায় দেখা যায় সেই বিরুদ্ধতাকে গোপন করবার কোন চেষ্টাই তারা করে না। পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এদের প্রধান অভিযোগ হচ্ছে এই যে এই পর-শ্রমভোগী প্রভাবান্বিত সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে ও দিন দিন তার পুষ্টি সাধন হচ্ছে—যে শ্রেণী অতীতের সামাজিক

জীবনকে যে আমূল পরিবর্তিত করবে তাতে কারো সন্দেহ মাত্র নেই।

পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়কে এরা যখন তিরস্কার করে তখন এদের তিরস্কার করবার কারণ এই নয় যে এরা একটা আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে, ভর্ৎসনা করবার কারণ হচ্ছে এই যে এই পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায় একটা বিপ্লববাদী আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে।

এই কারণে রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের নিপীড়ন, নিষ্পেষণ করবার সমস্ত বিধি গুলিকে এরা সমর্থন করে থাকে এবং খুব লম্বা চওড়া নীতির বুলি আওড়ান সত্বেও এরা ব্যবসার সমস্ত স্বর্ণফল ভোগের জন্যে হীনতা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না। এরা আলু থেকে যে মদ তৈরী হয় তার জন্যে, বিটরুটের চিনির ব্যবসার জন্যে, পশমের ব্যবসার জন্যে আত্মসম্মান, ও ন্যায়পরতা সমস্ত বিনিময় করে থাকে।

পুরোহিত যেমন সব সময়েই জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে জমিদারের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে জমিদারকে সব বিষয়ে সমর্থন করে, ধর্ম তান্ত্রিক সোশালিজমও (Clerical Socialism) তেমনি বরাবর ফিউডাল সোশালিজিমের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলে এসেছে।

খৃষ্টান ধর্মের আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহ রীতিকে সোশালিজমের রঙে ছুবিয়ে নেওয়ার মত সহজ আর কিছু নেই। খৃষ্টান ধর্ম কি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিবাহ রীতি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলে নি? এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিবাহ রীতি ও রাষ্ট্রের পরিবর্তে খৃষ্ট ধর্ম কি দান, দারিদ্র্য ব্রত, কৌমার্য্য ব্রত, আত্মনিগ্রহ, সঙ্ঘগত জীবনধারণ ও চার্চের আধিপত্যের কথা প্রচার করে নি? খৃষ্টান সোশালিজম হচ্ছে সেই মন্ত্রপূত জল যার দ্বারা পুরোহিত সম্প্রদায় অভিজাত সম্প্রদায়ের মনের জ্বালাকে পূত করে প্রশমিত করতেন।

—০—

(খ) (ক্ষুদে) পরশ্রমভোগীর সোশালিজম
(Petty Bourgeois Socialism)

বর্ত্তমান যুগের পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের আওতাতে যে শুধু ফিউডাল আভিজাত্যেরই অস্তিত্বের সমস্ত কারণ ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়েছে, আর শুধু ফিউডাল অভিজাত সম্প্রদায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, তা নয়।

মধ্যযুগের স্বাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ভূম্যধিকারীর দল (জোৎদার, তালুকদার প্রভৃতি) বর্ত্তমান পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের অগ্রজাত। ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে বিচার করে দেখলে যে সব দেশ এখনো বিশেষ উন্নতি লাভ করেনি সে সব দেশে এই স্বাধিকার প্রাপ্ত নাগরিক ও কৃষক ভূম্যধিকারীর দল উন্নতিশীল পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা যে সব দেশে পূর্ণ বিকশিত হয়েছে সেই সব দেশে একদল ক্ষুদে পরশ্রমভোগী দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় ও পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে বিরাজ করছে ও প্রতিনিয়তই পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে পুনর্জীবিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতা ও বর্ত্তমান বাণিজ্যের ক্রমবিস্তারের ফলে এই দলের ব্যক্তিগত সভ্যেরা নিয়তই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। এমন কি তারা দেখতে পাচ্ছে যে সেই মুহূর্ত আসন্নপ্রায় হয়ে এসেছে যখন বর্তমান সমাজের স্বাধীন অংশ হিসেবে তাদের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। ব্যবসায়, কৃষিকর্ম ও বস্ত্র উৎপাদনে লোকেরা তাদের স্থান দখল করে বসবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ফ্রান্সের মত দেশগুলোতে যেখানে কৃষকের সংখ্যা দেশের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী সেই সব দেশের যে সব লেখকেরা পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তারা কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক থেকেই পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা করবে, আর এই কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তরফেই শ্রমিকদের হয়ে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করবে। এই সব কারণ থেকে এই রকম করে ক্ষুদে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সোশালিজম জন্মলাভ করেছিলো। ফ্রান্সে আর ইংলণ্ডে সিসমন্ডি এই দলের নেতা ছিলেন। এই সোশালিজমের সমর্থক আধুনিক উৎপাদন প্রণালীর মধ্যে যে সব অসঙ্গতি আছে সেগুলো খুব পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে। অর্থনীতি-বিদদের সমস্ত কপট ছলনা এরা ফাঁস করে দিয়েছে। অকাট্য যুক্তি দিয়ে এরা দেখিয়ে দিয়েছে যে কলকারখানার শ্রম-বিভাগের কয়েকজনের হাতে মূলধন ও জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার, অত্যাধিক দ্রব্য উৎপন্ন হবার ও তার ফল স্বরূপ ব্যবসায়ে যে সঙ্কট ঘটে তার কি বিষময় ফল হতে পারে। এরা পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে যে ক্ষুদে মধ্যবিত্ত পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের ও কৃষকদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এরা দেখিয়ে দিয়েছে যে আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের কষ্টের আর শেষ থাকবে না, উৎপাদন প্রণালীতে বিশেষ অরাজকতা ঘটবে, ধনবণ্টনে বিষম অসমানতা ঘটবে, বাণিজ্য নিয়ে বিভিন্ন জাতগুলির মধ্যে মস্ত প্রাণবিধ্বংসী মহাযুদ্ধ ঘটবে, পুরাতন নৈতিক ও পারিবারিক সম্বন্ধগুলি লুপ্ত হবে, আর প্রাচীন জাতগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

বস্তুতঃ কিন্তু এই মতবাদীরা হয়তো সেই পুরণো উৎপাদন ও বিনিময় প্রণালী ও তার, সঙ্গে সঙ্গে পুরণো সম্পত্তি প্রথার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা যে বর্ত্তমান উৎপাদন ও বিনিময় প্রণালী সেই পুরণো সম্পত্তি প্রথার ধ্বংস সাধন করেছে সেই বর্ত্তমান উৎপাদন ও বিনিময় প্রণালী জোর করে পুরণো সম্পত্তিপ্রথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চায়। উভয় ক্ষেত্রেই এদের মত হচ্ছে পরিবর্ত্তন বিরোধী আর অবাস্তব।

এদের চরম আকাঙ্ক্ষা হোল, উৎপাদনের জন্য "গিল্ড" (Guild) সৃষ্টি করা আর কৃষিকর্মে গোষ্টিপতি-প্রাধান্যমূলক (Patriarchal) প্রাচীন সম্বন্ধের পুন প্রবর্ত্তন করা। কালে যখন ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় তাদের মনের মোহ দূর হল তখন এই ক্ষুদে পরশ্রমভোগীর সোশালিজম পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হোল।

———

(গ) জার্ম্মান অথবা "খাঁটি" সোশালিজম

পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে নিষ্পেষিত হয়ে পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধের ফলে ফ্রান্সে যে সোশালিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট সাহিত্য গড়ে উঠেছিলো সেই সাহিত্য জার্ম্মানীতে ফিউডাল প্রভুত্বের বিরুদ্ধে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায় যে সময়ে উঠে পড়ে লেগেছিলো সেই সময়ে প্রথম আমদানী হয়। জার্ম্মান দার্শনিকেরা, ভাবী দার্শনিকের দল, আর সাহিত্যিকের দল এই সাহিত্যকে আগ্রহের সঙ্গে বরণ

করে নিয়েছিল। শুধু তারা এইটুকু ভুলে গিয়েছিল যে এই সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের সামাজিক প্রথা জার্মানীতে আমদানী হয় নি। জার্মানীর সামাজিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে এই ফরাসী সাহিত্য অর্থহীন হয়ে পড়লো। এইজন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান দার্শনিকের কাছে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের দাবীগুলি নিছক ন্যায়-বুদ্ধি প্রসূত দাবী বলে গণ্য হোল, আর বিপ্লববাদী ফরাসী পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের মতবাদ তাদের কাছে মানুষের ইচ্ছা শক্তির দার্শনিক ব্যাখ্যা বলে প্রতীয়মান হোল। এই নতুন ফরাসী মতবাদটিকে কি করে তাদের পুরোনো দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে অথবা কি করে তাদের নিজেদের দার্শনিক মত ত্যাগ না করে এই নতুন মতবাদটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে তারি নির্দ্ধারণ করা তখনকার জার্মান সাহিত্যিকদের একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছিলো। ভাষান্তরিত করে অনুবাদ করে যে উপায়ে সাধারণতঃ বিদেশী ভাব দখল করা হয় সেই উপায়েই এই কাজটিও সমাধান করা হোল। এটা সকলেরই জানা আছে যে পুরাকালে ক্যাথলিক পুরোহিতরা ভগবানের সত্তায় অনাস্থা সম্পন্ন প্রাচীন জাত গুলোর ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থে তাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষদের জীবন-কথা লিখতো। সম্প্রদায়ের ফরাসী সাহিত্য নিয়ে জার্মান সাহিত্যিকেরা ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা করলো। তারা তাদের বাজে দার্শনিক তত্ত্বগুলো ফরাসী মূল গ্রন্থের তলায় লিখতে সুরু করে দিল। যেমন টাকার অর্থ নৈতিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ফরাসী প্রবন্ধে তলায় তারা এই বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখতো। ফরাসীদের ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে সব দার্শনিক মতবাদ ঢুকিয়ে দেওয়াকে তারা কর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা, খাটী সোশালিজম, জার্মান সোশালিজমের মতবাদ, সোশালিজমের দার্শনিক মূলতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ রকমের নামকরণ করেছিলো। এই উপায়ে ফরাসী সোশালিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট সাহিত্য একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়লো। এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর দ্বন্দ্বের কথা জার্মান দার্শনিকেরা বাদ দিলো। তারা ভাবলে যে এই উপায়ে তারা ফরাসীদের মতবাদের এক পেশে গোঁড়ামিকে নষ্ট করে দিতে পারবে। তারা মনে করলো যে এই উপায়ে তারা বুঝি বাস্তব জগৎএ যা দরকার তার আলোচনা নয়, সত্যের জন্যে যা প্রয়োজন তার আলোচনা করছে; আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য যা দরকার সে কথা নয়, তার পরিবর্ত্তে সমস্ত মানুষের যা ধর্ম্ম হওয়া উচিত তার আলোচনা করছে। এক কথায় কোন শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ নয়, বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই, দার্শনিকের কল্পনার ছায়ালোকে যার বাস সেই অবাস্তব মানুষের সম্বন্ধে আলোচনা করছে। বিদ্যালয়ের ছেলেদের উপযুক্ত যে মতবাদকে তারা এত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলো আর যে মতবাদকে তারা এত আড়ম্বরের সঙ্গে সকলের সামনে জাহির করছিলো সেই জার্মান সোশালিজমের মতবাদ সময়ে তার সরলতার মিথ্যে জলুষ হারালো। কারণ, ক্রমশই জার্মান পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বিশেষ করে প্রুসিয়ান পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ফিউডাল প্রভুত্বও অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের সংঘর্ষ বেড়ে গেলো। এক কথায় বলতে গেলে উদারনৈতিক আন্দোলন ক্রমশই শক্তিমান হয়ে উঠলো। এই উপায়ে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের দাবী খাড়া করবার যে সুযোগ খাঁটি সোশালিজমের মতাবলম্বী এতদিন খুঁজে আসছিল, তাই পেল। উদারনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি-মূলক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে, পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, আইন করণ ও পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সাম্যবাদের বিরুদ্ধে তারা সেই চিরন্তন মামুলী বুলি আওড়াতে লাগলো, আর আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের কাছে প্রচার করতে লাগলো যে পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনের ফলে তাদের কোন লাভ তো হবেই না উল্টে বরঞ্চ ক্ষতি হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। জার্মান সোশালিজম কার্য্যকালে ভুলে গেলো যে, যে ফরাসী মতবাদের অর্থহীন প্রতিধ্বনি হচ্ছে সে, সেই ফরাসী সোশালিজম্ বর্ত্তমান পর-শ্রমভোগী সম্প্রদায়ের ও তার ইকনমিক জীবন ও সেই ইকনমিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে রাষ্ট্রীয় গঠন প্রণালী সৃষ্টি হয়েছে তার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেয়। এই সব বস্তু লাভ করবার জন্যেই কিন্তু জার্মানীতে এই বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিলো। পুরোহিত, শিক্ষক, মোড়ল ও কর্ম্মচারী বহুল এই অপ্রতিহত রাজতন্ত্রের পক্ষে এই সোশালিজমের ফল শাপে বর হয়ে দেখা দিলো, কেননা এই মতবাদ পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা ভীতির সঞ্চার করে দিলো। বেত মেরে আর গুলি করে জার্মান শ্রমিকদের উপর জার্মান গবর্ণমেণ্ট এতদিন যে অত্যাচার করে আসছিলো তার বদলে এই মতবাদের প্রচার খুব সুখকর সম্পত্তি বলে মনে হলো। এই নতুন 'খাঁটি' সোশালিজম যেমন একদিকে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করলো, পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তেমনি অন্যদিকে উন্নতি-বিরোধী রক্ষণশীল জার্মান ক্ষুদে মধ্যবিত্ত পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের স্বার্থের সমর্থন করলো। ষোড়শ শতাব্দীর চিহ্নস্বরূপ এই ক্ষুদে মধ্যবিত্ত পরশ্রমভোগী সম্প্রদায় বারে বারে নানা আকারে গজিয়ে উঠেছে, আর এরাই জার্মানীর বর্ত্তমান অবস্থার সত্যিকার সামাজিক ভিত্তি।

এই দলকে বাঁচিয়ে রাখা মানে হচ্ছে জার্মানীর বর্ত্তমান অবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা। ব্যবসায় আর রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের উন্নতি লাভের ফলে এই দলের অস্তিত্ব দু'কারণে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা ঘটলো। প্রথম কারণ হচ্ছে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের হাতে মূলধন কেন্দ্রীভূত হওয়া। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিপ্লববাদী আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। খাঁটি সোশালিজম এক ঢিলে দুই পাখী মারবার আয়োজন করলো। এই সোশালিজম মহামারীর মত চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।

উপমা ও অলঙ্কারবহুল নির্বীর্য্য কল্পনা দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাষার তন্তুজালে জার্মান সোশালিষ্টরা তাদের 'অনন্ত সত্যের' শুকনো হাড় ক'খানাকে আবৃত করার ফলে তাদের মতবাদ সাধারণের মধ্যে খুব বিকলো। আর জার্মান সোশালিজমও ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিলো যে ক্ষুদে মধ্যবিত্ত পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের হয়ে মোড়লি করাই হচ্ছে তাদের একমাত্র কাজ। এরা জার্মান জাতকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাত বলে ঘোষণা করলে আর জার্মান ক্ষুদে মধ্যবিত্ত পরশ্রমভোগীকে দুনিয়ার আদর্শ মানুষ বলে প্রচার করলো। এই ক্ষুদে পরশ্রমভোগীর সমস্ত হীন নীচ আচরণের মধ্যে এরা একটা দার্শনিক মহৎ সোশালিজমের আদর্শ খুঁজে বের করলো। এরা এমন কি সাধারণ স্বত্ববাদের "পাশবিক ধ্বংসমূলক নীতির" বিরুদ্ধতা পর্য্যন্ত করতে শুরু করে দিল। আর সমস্ত শ্রেণীগত সংঘর্ষের বিরুদ্ধে এদের

ঘৃণা প্রচার করলো। কয়েকটী বই ছাড়া জার্মানীতে আজকাল (১৮৪৭ খৃঃ) যে সব সোশালিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট সাহিত্য চলছে সবই এই ভদ্র প্রাণহীন সাহিত্যের অন্তর্ভূত।

—•—

২। রক্ষণশীল পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সোশালিজম

পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের একদল নিজেদের সম্প্রদায়গত অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে সামাজিক জীবনের অসদ্গতিগুলো দূর করতে চায়। অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, শ্রমিকদের অবস্থার সংস্কার করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, দানশীল ব্যক্তি, পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির সভ্যেরা, পান নিবারণী সভার সভ্যেরা এই রকম হরেক রকমের সংস্কারকদের এই দলে পাওয়া যাবে। এই ধরণের সোশালিজম সম্বন্ধে আবার রীতিমত দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এর উদাহরণ স্বরূপ প্রাউর্দর 'দুঃখের দার্শনিক মতবাদের' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সোশালিষ্ট পরশ্রমভোগী বর্তমান সামাজিক অবস্থার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বিপদ বাদ দিয়ে তার সমস্ত সুখটুকু সমস্ত সুবিধেটুকু উপভোগ করতে চায়। বর্তমান সামাজিক জীবনের বিপ্লবপন্থী ধ্বংসবাদী লোকদের বাদ দিয়ে এরা সমাজের বর্তমান জীবন আকাঙ্ক্ষা করে। তারা আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাদ দিয়ে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আশা করে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই পরশ্রমভোগী সম্প্রদায় তাদের নিজেদের জগৎকে সব চেয়ে ভাল মনে করবে। পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সোশালিজম এই সোয়াস্তিকর মতবাদকে বহু দার্শনিক তত্ত্বে পরিণত করেছে। আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়কে এই রকম একটা মতবাদ কার্য্যে পরিণত করে সামাজিক জীবনে মোক্ষলাভ করতে বলার গূঢ় মানে হচ্ছে তাকে বর্তমান সামাজিক জীবনের মধ্যে থেকে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ মনোভাব বর্জ্জন করতে বলা। এই সোশালিজমের আর একটি মত শ্রমিকদের চক্ষে সমস্ত বিপ্লবমূলক আন্দোলনকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলো। এই মতবাদ প্রমাণ করতে চেষ্টা করলো যে রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই শুধু তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারলেই তারা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে। বাস্তব জীবনের পরিবর্তন সাধন বলতে এই সোশালিজম বর্তমান পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের উৎপাদন প্রণালীর ধ্বংস সাধন ধরে না। একমাত্র বিপ্লবের দ্বারাই এই উৎপাদন প্রণালীর ধ্বংস সাধন সম্ভব। এই মতবাদীরা অবস্থা পরিবর্তন করা বলতে শাসন যন্ত্রের সংস্কারে বোঝে। এই সংস্কার কিন্তু বর্তমান শ্রেণী-গুলির সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্কার সেই কারণে মূলধনের অধিকারী ও শ্রমিকের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমান সেই সম্বন্ধকে কিছুমাত্র নাড়া দিতে চায় না। এরা শুধু পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের শাসনযন্ত্রের ব্যয়ভার লাঘব করতে চায়। পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সোশালিজম অলঙ্কার বহুল বাক্যের মধ্যে দিয়ে তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে। শ্রমিকদের জন্যে অবাধ বাণিজ্য প্রথা, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে শুল্ক প্রথার প্রবর্তন, শ্রমিকদের জন্যে জেলের সংস্কার সাধন, এই হচ্ছে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের সোশালিজমের শেষ কথা। সমস্ত জিনিসটা এক কথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে পরশ্রমভোগী সম্প্রদায় শ্রমিকদের উপর [illegible] করেই পরশ্রমভোগী থাকবে।

—•—

৪। বিচারপন্থী অবাস্তব সোশালিজম ও সাম্যবাদ মতবাদ

বর্তমান যুগের প্রত্যেক বিপ্লবের সময় যে সাহিত্য আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের দাবীগুলি সর্বদা প্রচার করে এসেছে সেই সাহিত্যের কথা আমরা এখানে আলোচনা করবো না। এই সাহিত্যের উদাহরণ স্বরূপ বাবুফ আর অন্যদের [illegible] কথা যেতে পারে। যখন ফিউডাল সমাজের ধ্বংস সাধন করা হোল সেই সময় উত্তেজনার সময়েই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় তার শ্রেণীগত স্বার্থের উন্নতি করতে সাক্ষাৎভাবে চেষ্টা করে। আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণরূপে অপরিণত অবস্থার দরুণ ও আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্যে যে ইকনমিক অবস্থা বর্তমান থাকা উচিৎ ছিলো তার অভাব থাকায় এই মুক্তির চেষ্টা বারে বারে বিফল হয়েছিলো। এই ইকনমিক অবস্থা একমাত্র পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়-শাসিত যুগের মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করতে পারে। আত্মোৎপন্নবঞ্চিত সম্প্রদায়ের আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় যে সব বিপ্লবাত্মক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিলো সেগুলি সবই হচ্ছে উন্নতি-বিরোধী রক্ষণশীল সাহিত্য। এই সাহিত্য বিশ্বব্যাপী বৈরাগ্য-নীতি ও সামাজিক জীবনে সাম্য সাধনের অতি স্থূল মতবাদ প্রচার করলো। সাঁ সিমঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত খাঁটি সোশালিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট মতবাদ পরশ্রমভোগী সম্প্রদায় ও আত্মোৎপন্নবঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের প্রথম অপরিণত অবস্থার কালে জন্মলাভ করেছিলো। এই সব বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টারা শ্রেণীগত সংঘাতের ও বর্তমান সামাজিক জীবনের মধ্যে সামাজিক জীবন নষ্ট হবার যে সব কারণ বিদ্যমান সে গুলির যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই অপরিণত আত্মোৎপন্নবঞ্চিত সম্প্রদায় তাঁদের চোখে ইতিহাসের কোন আন্দোলন শুরু করবার মত কিম্বা কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করবার মত উপযুক্ত শক্তি সম্পন্ন বলে মনে বোধ হয়নি। উৎপাদন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গেই সঙ্গেই শ্রেণীগত সংঘাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু তাঁরা যে ইকনমিক অবস্থা দেখছিলেন সেটা তাঁদের কাছে আত্মোৎপন্নবঞ্চিত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত অবস্থা বলে মনে হয় নি। সেইজন্যে তাঁরা নতুন সমাজনীতির সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা নতুন সামাজিক বিধির অন্বেষণ করতে লাগলেন, যে সামাজিক বিধি দিয়ে তাঁরা আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত ইকনমিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন। তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে ইতিহাসের ঘটনা তাঁদের সৃষ্ট তৈরী করা ঘটনার কাছে হার মানবে। যে সব ঐতিহাসিক কারণের উপর স্বাধীনতা নির্ভর করে সেই সব কারণ তাঁদের স্বাধীনতা লাভের কাল্পনিক কারণের কাছে পরাস্ত হবে, আর আত্মোৎপন্নবঞ্চিত সম্প্রদায়ের স্বতঃ-উৎসরিত শ্রেণীগত জীবন তাঁদের তৈরীকরা সামাজিক জীবন প্রণালীর কাছে পরাভূত হবে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁদের কাছে শুধু তাঁদের সামাজিক মতবাদ প্রচার করবার ও কার্য্যে পরিণত করবার উপায় বিশেষ বলে প্রতীয়মান হয়েছিলো। শ্রমিকরা সব চেয়ে নিগৃহীত সম্প্রদায় বলে কার্য্যপ্রণালী গঠন করবার সময় তাঁরা শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার দিকে সব চেয়ে বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন।

তাঁদের কাছে কেবলমাত্র সবচেয়ে নিগৃহীত নিপীড়িত সম্প্রদায় হিসেবে এই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ মূল্য আছে। শ্রেণীগত সংঘাতের অপরিণত অবস্থা এবং তাদের নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই সোশালিষ্টদের মনে তাদের নিজেদের শ্রেণীগত সংঘাতের অনেক উপরে বলে ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে। তারা সমাজের সমস্ত লোকের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে চায়, এমন কি যে সব চেয়ে সুখে আছে তারও। এই কারণে তারা বারে বারে সমাজের কাছে তাদের নিবেদন জানায় আর বিশেষ করে শাসক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের নিবেদন জানাতে এরা ভালবাসে। কারণ, যারা একবার এদের মতবাদ বুঝতে পেরেছে তারা এই সামাজিক জীবনের চরম উৎকর্ষ অবস্থা আনবার জন্যে যে সার্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে তা কি না বুঝে পারে! এইজন্যে তারা রাজনৈতিক আর প্রধানতঃ সমস্ত বিপ্লবমূলক আন্দোলন বর্জ্জন করে থাকে। তারা অহিংসভাবে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চায়। লোকে যাতে তাদের নতুন সমাজ বিধি গ্রহণ করে তার জন্যে তারা বার বার যে ছোট ছোট প্রচেষ্টা করেছিলো সেগুলি সবই নিষ্ফল হোল। তাদের নতুন সামাজিক মতবাদ যাতে লোকে গ্রহণ করে তার জন্যে তারা অনেক চেষ্টা করলো। আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় যে সময়ে একেবারে অপরিণত অবস্থায় রয়েছে এবং যখন তাদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা নেই সেই সময়ে ভবিষ্যৎ সমাজের এই কাল্পনিক ছবি আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মনে সমাজ সংস্কারের একটা স্বাভাবিক প্রকৃতিগত ব্যাকুলতার আভাষ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই সব সোশালিষ্ট-কম্যুনিষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সামাজিক জীবন খুঁতিয়ে বিচার করে দেখবারও একটা দিক আছে। তারা বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের প্রত্যেক নীতিকে আক্রমণ করে থাকে। এই কারণে শ্রমিকদের শিক্ষালাভের উপযুক্ত অনেক ভালো ভালো জিনিস এই সাহিত্যে আছে। গ্রাম আর শহরের মধ্যে প্রভেদ লোপ করা, পারিবারিক জীবন ধ্বংস করা, ব্যক্তি বিশেষের জন্যে পরিচালিত ব্যবসার ধ্বংস করা, বেতন বিনিময়ে শ্রম প্রথার লোপ করা, সামাজিক জীবনে সাম্যবাদ প্রবর্ত্তন করা, রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্রকে শুধু উৎপাদন-প্রণালীর পরিদর্শকের স্থানে অভিষিক্ত করা প্রভৃতি যে সব পরিবর্ত্তন এরা সামাজিক জীবনে আনতে চায় সেগুলি সবই সবে মাত্র গজিয়ে-ওঠা শ্রেণীগত সংঘাতের ধ্বংস সাধন করবার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। তাদের বইতে এই শ্রেণীগত সংঘাতের অপরিণত রূপের খুব আবছায়া অস্পষ্ট একটা ধারণার আভাষ পাওয়া যায়। সেইজন্যে এই সব দাবী নিছক কাল্পনিক দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিচারশীল কাল্পনিক অবাস্তব সোশালিজম ও সাধারণ স্বত্ববাদ ঐতিহাসিক অবস্থার ক্রমিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই অর্থহীন হয়ে পড়তে থাকে। যে পরিমাণে এই শ্রেণীগত সংঘাত বেড়ে যেতে থাকে আর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে সেই পরিমাণে এই সংঘর্ষ থেকে দূরে সরে থাকবার ও এই শ্রেণীগত সংঘর্ষকে আক্রমণ করবার সব উদ্ভট মতবাদ বাস্তব জীবনের দিক থেকে ও মতবাদের দিক থেকে একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই কারণে এই সব মতবাদের স্রষ্টারা যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিপ্লববাদী ছিলেন তাঁদের শিষ্যরা সব ক্ষেত্রেই বিপ্লব-বিরোধী দল গঠন করেছে। আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের উত্তরোত্তর ঐতিহাসিক অবস্থার উন্নতি লাভ সত্ত্বেও এই শিষ্যের দল তাদের গুরুদের মতবাদকে আঁকড়ে পড়ে থাকে। তারা সব সময়েই এই শ্রেণীগত সংঘাতকে নির্জ্জীব করে দিতে চায়, শ্রেণীগুলির মধ্যে একটা আপোষে রফা করিয়ে দিতে চায়। তারা তাদের কাল্পনিক সমাজ বিধি বাস্তবে পরিণত করবার স্বপ্ন এখনো দেখে। তারা ফ্যালানষ্টেয়র, ছোট ছোট উপনিবেশ, জেরুজলমের নব সংস্করণ, ইকেরিয়ার পত্তন করতে চায়, আর তাদের এই সব অবাস্তব কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে অর্থের জন্যে তারা পরশ্রম-ভোগীর কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। ক্রমে ক্রমে তারা রক্ষণ-শীল পরিবর্ত্তন-বিরোধী সোশালিষ্টদের দলে গিয়ে পড়ে। রক্ষণশীল সোশ্যালিষ্টদের থেকে এদের শুধু এইটুকু পার্থক্য যে এদের নিজেদের মতবাদ সম্বন্ধে একটা অসম্ভব অহঙ্কার আছে আর এদের নিজেদের সমাজতন্ত্রের আশ্চর্য্য ফলের উপর এদের একটা ভয়ানক অন্ধ গোঁড়ামি আছে। এই কারণে এরা শ্রমিকদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঘোরতর বিরুদ্ধতা করে, কারণ, তাদের মতে শ্রমিকদের এই আন্দোলন হচ্ছে তাদের মতবাদের উপর অবিশ্বাস প্রসূত। ইংলণ্ডে ওয়েনের দল আর ফ্রান্সে ফুরিয়ের দল চার্টিষ্ট আর পরিবর্ত্তনবাদী দলের যথাক্রমে বিপক্ষতা করেছিলো।

চার্লস ফুরিয়ের প্ল্যান অনুযায়ী যে সব সোশালিষ্ট উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল তাদের ফ্যালানষ্টারার বলা হোত। ক্যাবট যে উপনিবেশ স্থাপনা করেন তার নাম ছিল ইকেরিয়া।

---

(৪)

বিরুদ্ধবাদী দলগুলির সঙ্গে সাধারণ-স্বত্ববাদের সম্পর্ক

—বর্ত্তমান শ্রমিকদল গুলির সঙ্গে যেমন ইংলণ্ডের চার্টিষ্ট আর এ্যামেরিকার ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তন-কামী দলের সঙ্গে সাধারণ স্বত্ববাদী সম্প্রদায়ের যে কি সম্বন্ধ তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রমিকদের বর্ত্তমান স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে ও শ্রমিকদের বর্ত্তমান দাবী পূরণ করবার জন্যে সাধারণ স্বত্ববাদীরা সংগ্রাম করে থাকে, কিন্তু তবুও আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে তারা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। রক্ষণ-শীল দল আর গোঁড়া পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাধারণ স্বত্ববাদীরা সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের সঙ্গে মিত্রতা করেছিল বটে কিন্তু বিপ্লবের পর থেকে যে সব কথা এতদিন চলে আসছিল সে গুলোকে বিচার করে দেখবার অধিকার তারা নিজেদের হাতে রেখেছিল। সুইজারল্যাণ্ডে তারা র‍্যাডিকাল (আমূল সংস্কারক) দলের সমর্থন করেছিলো বেশ জেনে যে এই দল তাদের বিরোধী সোশাল ডেমোক্রাট আর পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের লোক দিয়ে ভর্ত্তি।

যে দল কৃষকদের দিয়ে বিপ্লব শুরু করা জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রধান উপায় মনে করে, আর যে দল ১৮৪৬ খৃঃ ক্রাকোতে বিপ্লব ঘটায় সাধারণ স্বত্ববাদীরা পোলাণ্ডের সেই দলের সাহায্য করেছিল।

জার্ম্মানীতেও যখনই পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায় একটুও বিপ্লব-মূলক কাজ করে, যেমন কি অপ্রতিহত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধতা করে কিম্বা ফিউডাল তন্ত্রের কিম্বা ক্ষুদে মধ্যবিত্ত পরশ্রম-ভোগী

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে তখনই সাধারণ স্বত্ববাদীরা এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ চালায়। পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায় তার প্রভুত্বের কালে যে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করবে জার্ম্মান শ্রমিকেরা যাতে সেই অবস্থাকে পরশ্রম ভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করতে পারে ও এই পরিবর্ত্তন বিরোধী দলগুলির ধ্বংসের পর যাতে পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ অবিলম্বে শুরু হতে পারে তার জন্যে পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিকদের যে চিরন্তন বিরোধ আছে তার যথার্থ স্বরূপ শ্রমিকদের বুঝিয়ে দিতে সাধারণ স্বত্ববাদীরা মুহূর্ত্তের জন্যে থামে নি।

সাধারণ স্বত্ববাদীরা তাদের সমস্ত দৃষ্টি এখন জার্ম্মানীর উপর ন্যস্ত করেছে। কারণ, শীঘ্রই জার্ম্মান পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায় জার্ম্মানীতে বিপ্লব শুরু করবে। এই বিপ্লব ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নততর অবস্থার মধ্যে ঘটবে আর ইংলণ্ডের সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের শ্রমিক দল আর ফ্রান্সের অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শ্রমিক সম্প্রদায়ের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত শ্রমিকদের মধ্যে এই বিপ্লব ঘটবে। এই পরশ্রম-ভোগী সম্প্রদায়ের বিপ্লব জার্ম্মানীর আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের বিপ্লবের মুখপাত্র হবে। এক কথায় বলতে গেলে বর্ত্তমান সামাজিক আর রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যে সাধারণ স্বত্ববাদীরা সমস্ত বিপ্লব-মূলক আন্দোলনকে সাহায্য করে থাকে। সম্পত্তি প্রথা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন প্রত্যেক আন্দোলনের সময়ে তারা বর্ত্তমান সম্পত্তি প্রথাকে বিপ্লবের সব চেয়ে গুরুতর সমস্যা বলে নির্দ্দেশ করে, আর তারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের গণ-বাদী সম্প্রদায় গুলির মধ্যে ঐক্য সাধনের চেষ্টা করে থাকে। সাধারণ স্বত্ববাদীরা তাদের মত লোকের কাছ থেকে গোপন করাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে যে একমাত্র বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার ধ্বংস সাধনের দ্বারাই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

শাসক সম্প্রদায় সাধারণ স্বত্ববাদীর বিপ্লবের আশঙ্কায় ত্রস্ত হোক। এই বিপ্লবে আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় তার শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবে না। তাদের নতুন জগৎজয় করতে হবে।

পৃথিবীর সর্ব্বদেশের শ্রমিকেরা একত্রে মিলিত হোক

সমাপ্ত।

সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে
ইংলণ্ডের যুদ্ধের ষড়যন্ত্র

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার একটুকরো রক্ত-মেঘ ইউরোপের আকাশে দেখা দিয়েছে। এই মেঘটা ইংলণ্ডের আকাশে ঘনিয়ে উঠে ধীরে ধীরে সমস্ত ইউরোপের আকাশে ছড়িয়ে যাবার লক্ষণ দেখাচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে এই রক্তমেঘের যথার্থ স্বরূপ বুঝে ওঠবার যথেষ্ঠ অসুবিধে আছে। অসুবিধের প্রধান কারণ হচ্ছে যে ইংরেজ শাসনাধীন ভারত সমস্ত পৃথিবী থেকে যোগ-বিযুক্ত অবস্থায় আছে। ইংরেজ তাকে এমন করে রেখেছে যাতে সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সে দিন দিন নিজের জড়তা আর অজ্ঞানতার মধ্যেই ডুবে মরে। ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসে দেখছি যে কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গেই না ইংরেজ ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত সত্য সমাচারকে গোপন করে রাখে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পরাধীন জাতগুলি মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম অবিরত করে আসছে তার কোন সংবাদই ভারতে পৌঁছতে দেওয়া হয় না, আর যখন হয় তখন তার সত্য রূপকে এমন করে বিকৃত করে দেখানো হয় যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্য্য করণের কোন হদিসই তার থেকে পাওয়া যায় না।

গত ১২ই মে তারিখে লণ্ডনে সোভিয়েট রাশিয়ার ট্রেড ডেলিগেশনে, আর আর্কস বিল্ডিংএ ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারের বন্দোবস্ত করার দরুণ সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের যে আফিস ছিলো সেই আফিসে পুলিশ খানাতল্লাসী করেছে। খানাতল্লাসী করবার কারণ দেখানো হয়েছিলো এই যে পুলিশ খবর পেয়েছিলো যে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটাবার জন্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যে চেষ্টা করছে সেই চেষ্টার সঙ্গে এই ট্রেড ডেলিগেশন আর আর্কস আফিস যুক্ত আছে। আর সেই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আয়োজন সংক্রান্ত কতকগুলো গোপন দলীলও সেখানে আছে। সেই গোপন দলিল অনুসন্ধানের জন্যই এই খানাতল্লাসী।

এই খবরটুকু যে ভারতবর্ষে ঠিক যথাসময়ে পৌঁচেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনই কারণ দেখছি না। ইংরেজ তার সমস্ত কাজের মহৎ উদ্দেশ্য ও কারণ নিজের মনের মতন করে সাজিয়ে পৃথিবীর সামনে ধরতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করে না। তবে এদেশে ইংরেজের একটু মুস্কিল আছে। তার কথা এখানে সহজে লোকে বিশ্বাস করে না। লোকে একটু অনুসন্ধিৎসু হয়ে কারণ খুঁজে থাকে। ভারতবর্ষে সে বালাই নেই, তাই, ভারতবর্ষকে তার মনোমত সাজানো ঘটনা বিশ্বাস করানো ইংলণ্ডের পক্ষে এতই সহজসাধ্য হয়েছে। এই যে একটা সামান্য খানাতল্লাসী ঘটে গেলো এর অন্তরালে যে ইংলণ্ডের কি অভিসন্ধি আছে, কি চাল ইংলণ্ডের রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট চালছে সেইটে একটু খুলে দেখবার চেষ্টা করবো।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার মহাবিপ্লবের সময় থেকে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী (ইম্পিরিয়েলিষ্ট) শক্তি আর বিশেষ করে ইংলণ্ড এই সোভিয়েট তন্ত্র ধ্বংস করবার জন্যে যে প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছে তা সকলেরই অল্প বিস্তর জানা আছে। বলশেভিকদের নর-রাক্ষস, পশু বলে জগৎএর সামনে ধরে দেখাবার জন্যে ইংলণ্ড কি অশ্রান্ত চেষ্টাই না করে আসছে। সেই ইংলণ্ড ১৯২১ সালে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যখন বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করলো তখন কি উদ্দেশ্য নিয়ে যে সেটা করলো তা একটু ভেবে দেখলে ক্ষতি নেই। এই বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করবার মূল উদ্দেশ্য ছিলো এই যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সাধারণ স্বত্ববাদের (কম্যুনিজমের) আদর্শে গঠিত রাষ্ট্র ও তার ইকনমিক ভিত্তিকে ইংলণ্ডের শোষণবাদী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাণিজ্য প্রথার সংঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া। স্যর রবার্ট হর্ন যিনি ইংলণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েটের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন তিনি সম্প্রতি তাঁর একটা বক্তৃতায় বলেছেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধস্থাপনের তাঁর অত আগ্রহের অন্যতম কারণ ছিলো এই যে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের ইকনমিক ভিত্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাণিজ্যপ্রথার

সংস্পর্শে এসে কিছুতেই টিকতে পারে না। সার রবার্ট হর্নের এই উক্তি কি উদ্দেশ্য নিয়ে যে ইংলণ্ড রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলো তা পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সার রবার্ট হর্নেরই বক্তৃতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইংলণ্ডের সে আশা সফল হয় নি। সোভিয়েট রাশিয়ার ইকনমিক ভিত্তিকে ইংলণ্ড এই সাত বৎসরের অবিরাম চেষ্টাতেও ধ্বংস করতে পারে নি। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করবার এই উপায় একেবারে ব্যর্থ গেছে। অগত্যা এখন অন্য উপায়ের চেষ্টা করা দরকার সোভিয়েটকে ধ্বংস করবার জন্যে। সোভিয়েটের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করবার মূল উদ্দেশ্যই যে শুধু ব্যর্থ হয়ে গেছে তা নয়, এই বাণিজ্য সম্বন্ধ থেকে একটা বিপদের সৃষ্টি হবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। সেই আশঙ্কাই বর্ত্তমানে ইংলণ্ডকে একটু বিচলিত করেছে। এই আশঙ্কার কারণ কি সেটা ভালো করে বুঝতে গেলে গত কয়েক বৎসর সোভিয়েটের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্বন্ধকে ভালো করে খতিয়ে দেখা দরকার। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের কর্ত্তা মিঃ মিকোয়ান ইংলণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েটের বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ের রিপোর্টে যা বলেছেন তার থেকে কতকগুলি অঙ্ক সঙ্কলন করে দিলুম সেই সম্বন্ধটাকে পরিষ্কার করে দেবার জন্যে।

বৎসর	ইংলণ্ড থেকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আমদানী	সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের গ্রেট বিটেনে রপ্তানী
	রুবল	রুবল
১৯২৩।২৪	৪৯১৭৭০০০	৮০৭২৬০০০
১৯২৪।২৫	১১০৬৯৮০০০	১৮৫৬৩৯০০০
১৯২৫।২৬	১২৯১৬৭০০০	১৯৭৭১৯০০০
১৯২৬।২৭	১৭৬১২৫০০০	২৫১০১০০০০

এই অঙ্কগুলো থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে রাশিয়ার রপ্তানী ইংলণ্ডের রপ্তানী থেকে গোড়া থেকেই বেশী ছিলো, আর ক্রমশঃই খুব দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিলো। এ ছাড়াও গত কয়েকমাসের মধ্যে ইংলণ্ডের ইন্‌জিনীয়ারিং কলকব্জা তৈয়ারীর কারখানা ও ম্যানচেষ্টারের কাপড় তৈরী করবার যন্ত্রের কারখানার সঙ্গে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট বহুলক্ষ রুবলের মালের খরিদ করবার কথাবর্ত্তা চালাচ্ছিল। ইংলণ্ডের ইনজিনীয়ারিং কারখানাগুলোয় যে সব জিনিস তৈরী হয় সে সব জিনিস বিক্রী হয়ে যাবার মত চাহিদা ইংলণ্ডের বাজারে নেই। এই কারণে ইংলণ্ডের ইনজিনীয়ারিং কারখানাগুলোর অবস্থা এখন মোটেই ভালো নয়। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চাহিদাই এই সব কারখানাগুলোকে বাঁচাতে পারতো। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে ব্যবসার এই অবস্থায় ইংলণ্ড সোভিয়েটের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করতে যাবে কেন? তাতে তো তার ক্ষতিই হবে যথেষ্ট, লাভ তো কিছু নেই। কিন্তু, ব্যাপারটা আরো তলিয়ে দেখার দরকার। রাশিয়া ক্রমে ক্রমে ইউরোপের সমস্ত দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করেছে আর তার বাণিজ্য প্রতিবৎসরই বেড়ে চলেছে। গত বৎসর জার্মানী সোভিয়েটকে ১৫০ মিলিয়ন রুবল ক্রেডিট দিয়েছে। এই নিয়ে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী মহলে খুব আন্দোলন চলেছে। তারাও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে ক্রেডিট দিয়ে তার সঙ্গে খুব সজোরে বাণিজ্য চালাতে চায়। এক বৎসর রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই করে তারা গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করেছিল সোভিয়েটকে ১০০ মিলিয়ন রুবল ক্রেডিট দিতে। গত ১১ই মে তারিখে এই ক্রেডিট সংক্রান্ত দলিল-পত্তর উভয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করা হয়েছে, আর ঠিক তার একদিন পরে ১২ই মে তারিখে এই খানাতল্লাসী ঘটেছে। উপর উপর দেখলে এর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে না, মনে হবে যে ইংলণ্ডের কর্ত্তার দল নিশ্চয়ই খেপে গেছে। খেপে তারা গেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু, সেই খ্যাপবার কারণটা কি? কারণ হচ্ছে এই যে এই বাণিজ্যের ফলে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী ও শ্রমিক-দের সঙ্গে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ দিন দিন ঘনিষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল। সেই ঘনিষ্টতাই কর্ত্তাদের কাছে উত্তরোত্তর ভয়ের কারণ হয়ে উঠ্‌ছিল। এই সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হয়ে উঠলে ইংলণ্ডের পক্ষে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যৎএ সোভিয়েটের বিরুদ্ধাচরণ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না, কেননা, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যেই সেটা ঘটতে দেবে না। এই হচ্ছে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করার ও খানা তল্লাসীর যথার্থ কারণ।

তা না হলে আগের দিন ১০০ মিলিয়ন রুবলের ক্রেডিট যে গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তার পরের দিনই তার আফিস খানাতল্লাসী করে তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলার আর কোনই অর্থ থাকতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলবার কারণ হচ্ছে—(এক) যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল, তা সফল হয়নি অর্থাৎ কিনা ইংলণ্ডের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (Individualislic) বাণিজ্য প্রথার দ্বারা কৃষক ও শ্রমিক শাসিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের ইকনমিক ভিত্তি নষ্ট করা সম্ভব হয়নি, আর (দুই) দ্বিতীয়তঃ, উল্টে যে এই বাণিজ্য সম্বন্ধের ফলে সোভিয়ে-টের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্টতর হয়ে উঠছিল যেটা সাম্রাজ্যবাদী, শোষণবাদী রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সত্যিকার ভয়ের কারণ। কিন্তু সম্বন্ধ ছিন্ন করবো মনে করলেই তো করা যায় না। যা হোক, তার একটা কারণ তো দেখাতে হবে। তাই বাইরে যখন মিতালির চিহ্ন-স্বরূপ সোভিয়েটকে শত সহস্র লক্ষ রুবলের ক্রেডিট দেওয়া হল লোককে ভাবের আধিক্য দেখাবার জন্যে,—ভিতরে তখন জয়নসন হিক্‌সের সমস্ত ফন্দী, সমস্ত প্ল্যান তৈরী হয়ে গেছে সম্বন্ধ ছিন্ন করবার জন্যে। কিন্তু অত বড় ধুরন্ধর মতলব বাজ জয়নসন হিক্‌সও বুদ্ধিমানের মত চাল দিয়ে উঠতে পারেন নি। কতকগুলো গোপন দলীলের উড়ো খবরের উপর তাঁর সমস্ত প্ল্যান খাড়া করাটা নেহাৎ শিশু-সুলভ হয়ে গেছে। খানা-তল্লাসী করে এক টুকরোও গোপন দলীল পাওয়া যায় নি। প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন গবর্ণমেণ্টের মুখ রক্ষে করবার জন্যে কোন রকমে একটা কারণ দর্শিয়েছেন বটে, কিন্তু, এই লোক-দেখানো কারণ দেখাবার বিশেষ কোনই প্রয়োজন ছিলো না, কারণ, তাঁদের বহুকালের গোপন অভিলাষ এতদিনে আংশিক-ভাবে পূর্ণ হোল। আংশিকভাবে বলছি, কেন না তাঁদের অভিলাষ তখনই পূর্ণ সফল হবে যখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে তাঁরা একেবারে বিধ্বস্ত করতে পারবেন। সেটা এখনো করে উঠতে পারেন নি, তবে তার তোড়জোড় পুরোদমে শুরু হয়েছে। কোন কোন দিক থেকে সেটা যে শুরু করা হয়েছে তা একে একে দেখাতে চেষ্টা করবো।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটে বের হয়েছে যে সোভিয়েটের সঙ্গে

বাণিজ্য ও রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করবার কয়েক দিন পরেই সাম্রাজ্য রক্ষা সমিতির (The Committee of Imperial Defence) অধিবেশন হয়। অধিবেশনের ফলাফল অবিশ্যি আমাদের জানবার কোন সম্ভাবনাই নেই, কিন্তু, তা সত্বেও ফলাফলটা অনুমান করে নিতে আমাদের বিশেষ বুদ্ধি খরচ করবার কারণ দেখি না। সাম্রাজ্য রক্ষা সমিতির নাম থেকেই স্পষ্ট ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আলোচনাটা কি ধাচের হয়েছিলো। সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, ঘুণ ধরেছে সাম্রাজ্যের মূলে, এখন উপায় কি? কি উপায়ে এই ন্যায় ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে ধ্বংস থেকে রক্ষে করা যেতে পারে? তাঁরা অনেক মাথা ঘামিয়ে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন যে যত দোষ হচ্ছে ঐ সোভিয়েটের। তারা কিনা বলে যে পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বাধীন হোক, কোন দেশের অধিকার নেই অন্য দেশকে পরাধীন করে রাখবার। তারা কিনা বলে যে পৃথিবীর সূত্রপাত থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ধন, সমস্ত কিছু যারা উৎপন্ন করে এসেছে অথচ অনাহারে যারা শুকিয়ে মরেছে সেই শ্রমিক কৃষকদের হাতে, সেই আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের হাতে ইংলণ্ডের শাসন ভার উঠিয়ে দিতে! এমন ভয়ানক কথা যারা বলে তারা শত্রু নয় তো শত্রু কারা? এদের কথা মত কাজ হলে ইংলণ্ডের মান সম্ভ্রম কি একদিনও থাকবে? সাম্রাজ্য যে তাহলে নিমেষে বাষ্প হয়ে উবে যাবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তার চেয়েও ভয়ানক কথা সেটাও যে ঘটবে। তাঁদের অস্তিত্ব; তাঁদের মাতব্বরি করার অনন্ত সুখ ভোগ যে একেবারে অস্ত হয়ে যাবে। তাহলে কি করা যায় এখন? না, চেষ্টা করতে হবে যাতে ইউরোপের সমস্ত দেশগুলো সোভিয়েটের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করে, যাতে সোভিয়েট কোন দেশ থেকে অর্থ সাহায্য না পায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে অর্থাৎ কিনা এক কথায় একটা আন্তর্জাতিক সম্মিলন গঠন করে বাণিজ্য দ্রব্য বিনিময় ও মূলধনের সাহায্য থেকে সোভিয়েটকে বঞ্চিত করতে হবে। এই পেটে মারার ব্যবস্থা সফল হলে একেবারে সোজাসুজি যুদ্ধ ঘোষণা করে সোভিয়েটকে ধ্বংস করতে হবে।

এই উদ্দেশ্য সফল করতে গেলে অন্য অন্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একবার বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে নেওয়ার দরকার। তাই, কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেন ইটালীতে দৌড়েছিলেন। খবরের কাগজে তাঁর আর ম্যুসোলিনীর যে হাসি হাসি মুখের ছবি বের হয়েছিল তার থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে ভাবটা খুবই জমে উঠেছে, আর জমবার তো কথাই! ফ্যাসিষ্ট ইটালীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী (ইম্পিরিয়েলিষ্ট) ইংলণ্ডের মিত্রতা না হলেই আমরা আশ্চর্য্য হতুম। স্বেচ্ছাচারী ম্যুসোলিনিও আবার রোম সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখছেন। ফলে এই দুই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগাভাগির একটা আপোষে রফা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বার্থে স্বার্থে ঘর্ষণ লেগে ভবিষ্যৎএ স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মশিয়ো ড়ুমারগে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। স্বয়ং ইংলণ্ডের যুবরাজ তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ষ্টেশনে এসেছিলেন! স্বয়ং সম্রাট তাঁকে পাশে বসিয়ে গাড়ী করে সারা লণ্ডন ঘুরেছিলেন! ভোজের আর নৃত্যের অফুরন্ত ধারায় ফরাসী প্রেসিডেণ্টকে প্লাবিত করে দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে আমি প্যারিসে ছিলুম। প্যারিসের সমস্ত কাগজে এই অভ্যর্থনার লম্বা লম্বা ফর্দ্দ বের হচ্ছিল। প্রেসিডেণ্ট দেশে দেশে ফিরে এসেই ইংরেজের যে প্রশংসা শুরু করলেন তার বহর দেখে আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে হয়। প্যারিসের লোকরা একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ইংরেজের সঙ্গে এতদিন শুধু আঁতাত (Entente) ছিলো, এবারে আঁতাত কর্ডিয়াল (Fntente Cordiale) হোল। এত গলাগলি এত মাখামাখি যে কেন হোল তার গোপন কারণটা অবিশ্যি বেশী দিন গোপন রইল না। ইউরোপের উপর এখন যে ঝড়ের বাতাস বইছে সেই ক্ষ্যাপা বাতাসে এই খবর দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে দিলো। এই আঁতাত কর্ডিয়ালের কারণটা এখন এখানকার সব লোকই জানে। ভারতবর্ষে খবরটা পৌঁছেচে কিনা জানিনে। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও নব জাগ্রত চীনের বিরুদ্ধে দল পাকানো। কিন্তু কিছু লোভ না দেখালে কি ফরাসী এত সহজে সই পাতায়? সই পাতাবার তলায় তলায় ঘুষ দিতে হয় কতো! এখানে দু'হাতে মালা ধরে গলায় পরিয়ে দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ, এক হাতে করে মালাটা যেমন তেমন গলার উপরে ফেলে দিলেও চলে, কিন্তু অন্য হাতে টাকার তোড়াটা উঁচু করে ধরে থাকতেই হবে।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের এই অন্তরঙ্গতা এই সর্ত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সোভিয়েট ও চীনের বিরুদ্ধে ইংরেজ যা কিছু করুক না কেন ফ্রান্স তা চোখ কাণ বুজে সমর্থন করে যাবে, আর এর পরিবর্ত্তে রুঢ় (Ruhr) প্রভৃতি ফরাসীর অধিকৃত জার্ম্মান প্রদেশগুলি সম্বন্ধে ফ্রান্স যে নীতিই প্রবর্ত্তন করুক না কেন ইংলণ্ড তার পূর্ণ সমর্থন করবে। এই হোল মিতালির গোড়াকার কথা। ফ্রান্সের আপাততঃ মোটেই ইচ্ছে নেই রুঢ় (Ruhr) ছেড়ে দেবার, আর ইংলণ্ডেরও বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ইউরোপের শক্তিগুলিকে দলে টেনে নেবার। তারই ফল ফললো এই ফরাসী ইংরেজের আঁতাত করডিয়ালে।

চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইংরেজ বিশেষ কিছু সুবিধে করে উঠতে পারছে না। হাওয়াটা এবারে বড় এলোমেলো বইতে শুরু করেছে। কিন্তু যত দোষ সে তো হচ্ছে ওই নন্দ ঘোষ সোভিয়েটের। তারাই তো তলায় থেকে চীনকে খুঁচিয়ে তুলেছে। ১৭ মে তারিখে চীনের জাতীয়দলের প্রতিষ্ঠিত হানকাও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ইংরেজ সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছে। কিন্তু, শুধু সম্বন্ধ ছিন্ন করলেই তো হবে না, তাদের উচিত মত শিক্ষাও দিতে হবে। ফ্রান্স গোড়ায় গররাজি ছিলো। এখন আর কোন অমত নেই। এখন ফ্রান্স,ইংলণ্ড, ইটালী ও এ্যামেরিকার নৌবহর চীনসমুদ্র ছেয়ে ফেলেছে। ১৭১ খানা যুদ্ধ জাহাজ চীনকে শাসন করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে। প্রথমে চীনকে সাজা দেওয়া সারা হোক, তারপরে চীনকে খুঁচিয়ে তুলেছে যারা তাদেরও উচিত মত শিক্ষা দিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড, ফরাসী, ইটালী ও এ্যামেরিকার পক্ষে সোভিয়েট একটা মহা সমস্যা হয়ে উঠেছে। তবে ইংরেজের সব চেয়ে বেশী ভয়ের কারণ এতই সুস্পষ্ট যে বলবার ত কোনো দরকার হবে না আশা করি।

রাশিয়ার মহাবিপ্লবের খবর যাঁরা কিছু রাখেন তাঁরাই জানেন যে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী White Russiansরা এই বিপ্লব ব্যর্থ

করে দেবার জন্যে প্রথম থেকেই কি প্রাণপণ চেষ্টাই না করেছিল। সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এরা ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, এ্যামেরিকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সেখান থেকে তারা বরাবর চেষ্টা করে আসছে কি করে সোভিয়েটকে ধ্বংস করতে পারবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এ্যামেরিকা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আওতায় এই নীচাশয় জঘন্য লোকগুলো দিন দিন পুষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি খবরের কাগজে প্রকাশ যে এই White Russiansদের নেতার দল সব লণ্ডনে গিয়ে জমায়েৎ হয়েছে। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে এই সব লোকদের যে বন্ধুতা আছে সেটা অনেকদিনই প্রকাশ হয়ে গেছে। বন্ধুতার কারণ সহজেই অনুমেয়। ৭ই জুন তারিখে পোলাণ্ডে সোভিয়েট দূত ভয়কভকে (Voykov) ওয়ারসয়ে হত্যাকরা হয়েছে। হত্যাকারী হচ্ছে একজন পোল, কিন্তু, তার পিছনে সোভিয়েটকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবার জন্যে বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জারের আমলের একজন রাজনীতি ধুরন্ধর, White Russiansদের নেতা সাবলিন লণ্ডনে ইংলণ্ডের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় এই হত্যা কাণ্ড সমর্থন করেছেন! একটা অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের জাল যে ইংলণ্ড থেকে পোলাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তার করা হয়েছে তা এই উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট একটা ইস্তেহার জারি করেছেন। সেই ইস্তাহারে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি থেকে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েটকে ধ্বংস করবার জন্যে কিরূপ একটার পর একটা চেষ্টা করে আসছেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের ইস্তেহারটা সম্পূর্ণ অনুবাদ করে দিলুম। ৯ই জুন তারিখে এই ইস্তেহার বের হয়েছে।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের ইস্তেহার

"সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের দূত ভয়কভকে ওয়ারসতে হত্যা করা হয়েছে। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের তলায় বর্ত্তমান ইউরোপের শান্তি নষ্ট করবার জন্যে যে সব ঘোরতর অনিষ্টকারী শক্তি উঠে পড়ে লেগেছে তাদের হাত দেখা যাচ্ছে। ভয়কভের হত্যাকাণ্ড ইউরোপের শান্তি ভঙ্গ করবার বিবিধ চেষ্টার একটি চেষ্টা। শান্তিরক্ষা করবার জন্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের শত শত চেষ্টা সত্ত্বেও শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। প্রথম থেকেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত উপায়ে ইংলণ্ড সোভিয়েটকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে আসছে। বর্ত্তমান সোভিয়েটের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করার মানেই হচ্ছে সোভিয়েটকে ধ্বংস করবার চেষ্টা। ভয়কভের হত্যাও ইংলণ্ড কর্ত্তৃক সোভিয়েটের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করবার পরেই ঘটেছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট মনে করে যে, ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় সকলের অবগতির জন্যে ইংলণ্ডের এই সোভিয়েট ধ্বংস করবার চেষ্টার ইতিহাস জগতের সামনে ধরে দেওয়া উচিত।

"১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড আর সোভিয়েটের সীমানা পার হবার চেষ্টা করবার সময়ে ষ্টাইনবার্গ (Steinberg) নামক একজন ব্যবসায়ীকে সোভিয়েট সীমানার রক্ষকদল বন্দী করে। জেরার সময় বন্দী স্বীকার করে যে, তার নাম ষ্টাইনবার্গ নয়, তার যথার্থ নাম হচ্ছে সিডনী জর্জ্জ রীলে (Sidney George Riley)। সে ইংলণ্ডের Secret Service (গোয়েন্দা বিভাগ) এর একজন বিশিষ্ট সভ্য, আর Royal Air Force এর কাপ্তেন। সে আরো স্বীকার করে যে, ১৯১৮ সালের লকহার্ট ষড়যন্ত্রের সে একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলো এবং বর্ত্তমানে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লব, খুনোখুনি সৃষ্টি করবার জন্যেই সে এসেছে। সে আরো স্বীকার করে যে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অর্থসচিব মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলের সঙ্গে সে দেখা করেছিলো, আর উইনষ্টন চার্চ্চিল নিজে তাকে পরামর্শ দিয়েছেন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্যে। রীলের স্বাক্ষরযুক্ত দলিল সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কাছে আছে। রীলের কাছে যে সব কাগজ পত্র পাওয়া গিয়েছিলো তাতে তার উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়।

"১৯২৬ সালের শেষভাগে সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক পেট্রোভস্কি আর উক্রেনের সমিতির সম্পাদক চুবালকে (Tchubal) হত্যা করাবার চেষ্টা হয়। সোভিয়েটের পুলিশের চেষ্টায় দুটোই ব্যর্থ হয়।

"এই সময়েই লেনিনগ্রাডের বিভাগীয় সমিতির সম্পাদককে হত্যা করবার চেষ্টা হয়। ট্রুবা বলে এক ছোকরা এই চেষ্টার মূলে ছিলো। বিলুকভ বলে একজন এই সময়ে উক্রেনের (Ukraine) সোভিয়েট তন্ত্রের নেতাদের হত্যা করবার ষড়যন্ত্রের অপরাধে ধৃত হয়।

"এই বৎসর ১২ই মার্চ্চ তারিখে বুখারিনকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তার বাৎসারক উৎসবে বুখারিনের বক্তৃতা দেবার কথা ছিলো। সেই বক্তৃতার স্থলে বুখারিনকে মারবার আয়োজন হয়। নেহাৎ দৈবক্রমে তাদের অভিসন্ধি সফল হয়নি। গুরেভিচ বলে এক যুবক এর মূলে ছিলো। পরে রিকভ আর ষ্টালিনকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে।

"এই বৎসর ১০ই মে তারিখে কোলচাকের সৈন্যদলের কয়েক জন ভূতপূর্ব্ব অফিসার ক্রেমলিনে মিটিং চলছে সেই সময় মস্কোর প্রসিদ্ধ অভিনয় গৃহ উড়িয়ে দেবার আয়োজন করেছিল; তারা স্বীকার করে যে মস্কোতে ব্রিটিশ বাণিজ্য বিভাগের কর্ত্তা মিঃ হোয়াইটের প্ররোচনায় তারা এই কাজ করছিলো।

"এই বৎসর ৩রা জুন তারিখে সোভিয়েট পুলিশ, মস্কোতে সোভিয়েট পুলিশের প্রধান আড্ডার পার্শ্ববর্ত্তী একটা বাড়ী উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে। ষড়যন্ত্রকারীরা যে বোমা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলো তার থেকে প্রমাণ হয় যে melinite হচ্ছে ফ্রান্সের তৈরী আর বোমার caseটা হচ্ছে ইংলণ্ডের তৈরী। বাইরে থেকে যে এই বোমা আমদানী করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়।

"৭ই জুন তারিখে ওয়ারসতে সোভিয়েট দূত হত হন। হত্যাকারী পোলাণ্ডবাসী হলেও এর তলায় কারা আছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

"৭ই জুন তারিখে লেনিনগ্রাডে কম্যুনিষ্টদলের ক্লাবে একটা মিটিং এর সময় কারা বোমা ছুড়েছিলো। কেউ ধরা পড়ে নি, কিন্তু, এক্ষেত্রেও বোমা পরীক্ষা করে বোমা যে বিদেশ থেকে আমদানী হয়েছে তা প্রমাণিত হয়েছে। এই বোমার ফলে ত্রিশ জন গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে।

"এই সময়েই বিভিন্ন কারখানা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা ধরা পড়ে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কারখানা পুড়িয়ে দেবার একটা বিশেষ চেষ্টা পরিস্ফুট হয়।

"এই বৎসর মে মাসের শেষাশেষি লেনিনগ্রাডে একটি বারুদের গুদামে আগুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। আগুন ধরিয়ে দেবার এই চেষ্টা এই গুদামের ভারপ্রাপ্ত একজন ইসথোনিয়ান কর্ম্মচারী করে। লোকটার নাম হচ্ছে উসিল্ড। পরে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হয়ে যে সব ইসথোনিয়ান লোক কাজ করছে তাদেরই প্ররোচনায় সে এ কাজ করেছিলো।

"এর কিছুদিন আগে লেনিনগ্রাডের কাছে ডুব্রোভকায় একটা কারখানায় আগুন লাগে। একজন ফিনল্যাণ্ডবাসী লোকের এই কাজ। পরে প্রমাণ হয় যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কয়েকজন ফিনের প্ররোচনায় এই লোকটা এই চেষ্টা করেছিলো।

"এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের ক্রমিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা সোভিয়েটকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নি। সোভিয়েট ইউনিয়ানের ইকনমিক অবস্থা দিন দিনই ভালোর দিকে যাচ্ছে এবং কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

"সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকদের দৃষ্টি ইংলণ্ডের এই যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টার দিকে আকর্ষণ করেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের কলকারখানা ও বাণিজ্যের ক্রমিক উন্নতি দেখে দমে গেছে। তাই, তাদের এই অশ্রান্ত চেষ্টা আমাদের ধ্বংস করবার জন্যে।

"সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট, সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত শ্রমিক ও কৃষককে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই আক্রমণ প্রতিহত করতে অনুরোধ করছে। অক্টোবর মাসের বিপ্লব যেন ব্যর্থ না যায়।

"শ্রমিক ও কৃষক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেছে যে শ্রমিক ও কৃষকের অপরিসীম শক্তির সাহায্যে তারা দেশ থেকে শত্রুদের নির্ম্মূল করবে এবং সাধারণ স্বত্ববাদের আদর্শে গঠিত এই রাষ্ট্রকে গড়ে তোলবার কাজ পূর্ব্বের মতই চালিয়ে আসবে।"

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের এই ইস্তেহারের উপর কোন টিপ্পনী করবার দরকার দেখছি না। এই ইস্তেহার ছাড়াও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনগ্রাডে ইংরেজ রাজদূত গুপ্তচরের সাহায্যে কেমন করে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের গুপ্ত খবর বের করবার চেষ্টা করেছিলেন তা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেছেন। এই রাজদূতটির নাম ছিলো প্রেষ্টন (Preston)। এর স্বাক্ষরিত একটা চিঠি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের হাতে পড়ে যায়। সেই চিঠিটার (ফ্যাকসিমিলি) নকল এতদিনে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কাগজে বের করে দিয়েছেন।

প্রবন্ধের আয়তন ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে এরকম একটা বহুকালব্যাপী সোভিয়েটকে ধ্বংস করবার চেষ্টার ইতিহাস অল্পে সারা করা সম্ভব হয় না। যাই হোক আর দু' একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই প্রবন্ধ শেষ করবো।

আমি আগেই দেখিয়েছি যে কি সর্ত্তে ইংলণ্ড সোভিয়েট ও চীনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু এইখানে একটু গোল থেকে গেছে। শীঘ্রই একটা কমিশন বসবে রুঢ়ের (Ruhr) অধিকৃত প্রদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে। জার্ম্মানীর বিশেষ ইচ্ছে যে যাতে সে শীঘ্রই রুঢ় ফিরে পায়। রুঢ়ের কয়লার খনিগুলো ফরাসীর হাতে থাকায় জার্ম্মানীর বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। এদিকে ফরাসীর রুঢ় ছেড়ে দেবার কোনই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। তার উপরে সোভিয়েট আর চীনের বিরুদ্ধে সাহায্যের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড ফ্রান্সের রুঢ় নীতির সমর্থন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর ফলে হয়েছে এই যে ইংলণ্ড সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীকে কিছুতেই দলে টেনে নিতে পারছে না। আর একটা কারণেও জার্ম্মানীর বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে, ইচ্ছে থাকলেও, সোভিয়েটের বিরুদ্ধতা করা সম্ভব হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে জার্ম্মানীর শ্রমিক শক্তি ভয়ানক সঙ্ঘবদ্ধ। এক সোভিয়েট ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে এ রকম সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তি নেই। এই শ্রমিকশক্তি কিছুতেই জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে দেবে না। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে জার্ম্মানীর বিপ্লব অনিবার্য্য। জার্ম্মানীকে দলে টেনে নেবার জন্যে ইংলণ্ড নানা রকম চেষ্টা করছে। কখনো ভয় দেখাচ্ছে, ধমক দিচ্ছে, কখনো বা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। বর্ত্তমান জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট Reactionary (প্রতিক্রিয়াশীল) হলেও উপরি-উক্ত কারণে ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করছে না। ইউরোপের আকাশে ঘনায়মান রক্ত-মেঘের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে প্রবন্ধ সমাপ্ত করলুম।

বার্লিন, জুন, ১৯২৭

বিবিধ প্রসঙ্গ

উপায় কি ?

অত্যন্ত বেশী সুবন্দোবস্তের সহিত দেশময় ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো হচ্ছে। এ বিষের প্রতিক্রিয়া নানা দিক্ থেকে নানা ভাবে আরম্ভ হয়েছে। খুন-খারাবি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সবই কিছু হচ্ছে। কৃষক আর শ্রমিকদিগকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখে দিয়ে তাদেরকে আরো বেশী মাত্রায় শোষণ করবার জন্যে একটা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির ষড়যন্ত্র এ সকল অনর্থের মূলে রয়েছে। সাম্প্রদায়িক সভা-সমিতির সংখ্যা এত দ্রুত গতিতে বাড়ছে যে বাস্তবিকই তা একটা মারাত্মক আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। দেশের ধনিকেরা এ সবের জন্যে দু'হাতে টাকা খরচ করছে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই করে গণ-উত্থানকে প্রদমিত করে রাখা। ধনিক দিগের এই ষড়যন্ত্রের কাজ কেবল যে প্রচ্ছন্ন ভাবে চলেছে তা নয়, অনেক জায়গায় খুব খোলাখুলি ভাবেও তাদের নষ্টামির মূর্ত্তি প্রকট হয়ে উঠেছে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকগণের গত ধর্ম্মঘটের কথা আমরা আজো ভুলতে পারিনি। এ ধর্ম্মঘটকে পণ্ড করে দেবার জন্যে হিন্দু-মহাসভার তরফ থেকে চেষ্টা-চরিত্র কম করা হয়নি। হিন্দু-মহাসভা সত্যকার ভাবে ধনিকগণেরই সভা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের গণ-শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। মিথ্যা প্রচার কার্য্যের দ্বারা দেশে হিন্দুতে আর মুসলমানেতে ঝগড়া বাধানোই হচ্ছে

হিন্দু-মহাসভার প্রধান কাজ। পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহের জন্যেও হিন্দু-মহাসভা খুব একটা মোটা দান দিয়ে আসছে অনেক দিন থেকে। পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃগণ এর যত ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, এ আন্দোলনের দ্বারা দেশময় একটা সঙ্কীর্ণতার আব হাওয়ার সৃষ্টি করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। স্বার্থপর লোকেদের হাতের যন্ত্র হয়ে এ আন্দোলনে যোগদান করে শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ কেবল মাত্র যে নিজেদের শক্তির অপচয় করছেন তা নয়, তাঁরা জনগণের সংহতিকে নষ্ট করে দেশের সহিত অত্যন্ত বেশী রকম শত্রুতাও করছেন। মুসলমানদের দিক্‌ থেকেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ স্বার্থপর লোকেরা প্রচার করছে এবং খুব জোরের সহিতই করছে। বিদ্বেষ-ভাব-প্রবুদ্ধ সভা-সমিতি মুসলমানদেরও অনেক আছে বটে, কিন্তু, হিন্দু-মহাসভার মত অর্থ-সম্পদে সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের একটিও নেই, আর বিবোধ বাধাবার পক্ষে থাকার যে বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে তা-ও নয়। সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানগণের একটা বৈশিষ্ট আছে। এ বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে তাদের সমস্বার্থ-বোধ। এ জিনিসটে যদি জাতীয় ভাবে থাকে তা'হলে জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু হতে পারে কিনা তা জানিনে। তবে, সাম্প্রদায়িক ভাবে এ জিনিসটিরই সকল সুবিধে স্বার্থাপর লোকেরা গ্রহণ করতে ছাড়ছে না। জমীদার থেকে আরম্ভ করে মোল্লা-মৌলবী, খবরের কাগজওয়ালা, আফিসের কেরাণী ও কলেজের ছাত্র—সকলেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করছে, কেউবা ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের খাতিরে, আর কেউবা কেবলমাত্র পরের হাতের যন্ত্র হয়ে। এই দু'দিক্‌কার প্রচারের ফলে ক্ষতি হচ্ছে কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকের। হিন্দুই হোক্‌ কিংবা মুসলমানই হোক্‌, বিরোধ যারা বাধাচ্ছে তারা তো আপনাদের স্বার্থ-হাসিল করে নিচ্ছে, আর তাদের স্বার্থের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে হিন্দু-মুসলমান কৃষক ও শ্রমিক। এখন উপায় কি? উপায় হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক ও কৃষকগণকে এসব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করানো ও তাদের নিজেদের সচেতন হওয়া। হিন্দু-মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকগণের বোঝা উচিত যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারা লাভ লোকসান কাদের হচ্ছে। আজ যারা ধর্ম্মের নামে তাদের উত্তেজিত করছে সে সকল ধর্ম্মধ্বজীদের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগছেনা, অথচ তারা কিনা সেই শয়তান গুলোর স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তাদের বুকের রক্ত ঢাল্‌ছে ও প্রাণ দিচ্ছে! হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক ও কৃষকগণ তোমরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হও এবং তোমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে যারা আপনাদের স্বার্থ উদ্ধার করে নিচ্ছে তাদের নিপাত সাধনের জন্যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য ভুলে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হও। তোমরা হিন্দুই হও কিংবা মুসলমানই হও কিংবা আর কোনো সম্প্রদায়েরই হও তাতে কিছুই আসে যায় না। তোমরা সকলেই মানুষ। পেটের ক্ষুধা তোমাদের আছে, বস্ত্রের তোমাদের প্রয়োজন হয়েই থাকে, আর বাসগৃহ তোমাদের চাই-ই চাই। তোমাদের শ্রমের ধন কেড়ে নিয়ে যারা তোমাদের এসব থেকে বঞ্চিত করেছে, আর আপনাদের উদরকে অসম্ভব রকম স্ফীত করে তুলেছে তারা হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান যাই কিছু হোক্‌ না কেন, তারা যে কখনো তোমাদিগের বন্ধু হতে পারে না, তোমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করতে পারে না, এই সত্য কথাটা তোমরা কখনো ভুলে যেওনা।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জাগরণ

হিন্দুদের যে সকল লোককে ছোট জাত ব'লে, নিম্নশ্রেণীর লোক ব'লে কিংবা অস্পৃশ্য তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ঘৃণা করে থাকেন তাঁদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের লক্ষণ যে সূচিত হচ্ছে এটা খুবই আশার কথা। নানাস্থানে তাদের সভা-সম্মিলন হয়েছে এবং সে সকল সভা-সম্মিলনে তাঁরা স্পষ্টই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বলে দিয়েছেন যে তাঁরা কোনো তোয়াক্কা তাঁদের রাখেন না, তাঁদের কাছ থেকে দয়ার দান স্বরূপ কোনো সামাজিক অধিকার লাভের প্রত্যাশীও তাঁরা নয়। তাঁরা আরো বলেছেন যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শতকরা ৮৭ জন হিন্দু যে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ১৩ জন হিন্দুর নিকটে চিরকালই মাথা নুইয়ে থাকবেন এমন আশা যেন তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা মনের কোণেও স্থান না দেন। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের এ প্রকারের সাহস প্রদর্শন যে খুবই প্রশংসনীয় তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই যে বিদ্রোহ তাঁরা করতে চাইছেন এতে তাঁরা কখনও সফলকাম হতে পারবেন না যদি না তাঁরা রাষ্ট্রীয় শক্তি আপনাদের হাতে সঞ্চয় করেতে বদ্ধপরিকর হন। তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের বিদ্রোহ-আন্দোলনে এখানটাতেই খুব একটা বড় গলৎ রয়ে গেছে। এ আন্দোলনের নেতারা চান যে তাঁরা বৈদেশিক শোষণবাদের সহিত একটা ভাব রেখে দেশীয় অত্যাচারীদের হাত থেকে আপনাদেরকে বিমুক্ত করবেন। কিন্তু, তাঁদের এ ধারণা একেবারেই ভুল। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক এ উভয় ভাবেই তাঁরা শোষিত হচ্ছেন। এ উভয় প্রকারেই শোষণের পরিসমাপ্তি করার জন্যে রাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতার মালিক তাদের পক্ষে হওয়া একান্ত আবশ্যক। বৈদেশিক শোষণবাদীরা শুধু যে আমাদের অর্থনৈতিক শোষণকারী তা নয়, তারা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রভুও বটে। আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধনের দ্বারা সমানভাবে বিজড়িত হয়ে আছি। তিনটি বন্ধনই যদি আমরা খুলে ফেলতে পারি তবেই আমরা সত্যকারেই মুক্তি লাভ করতে পারব। শুধু সামাজিক, শুধু অর্থনৈতিক, কিংবা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিলাভ আমাদের হতে পারে না,—কিছুতেই না। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা যদি জেগেছেন তা হলে এ বিষয়টা তলিয়ে বোঝা তাঁদের পক্ষে একান্তই উচিত।

———

"প্রেসিডেন্টের কীর্ত্তি"

গত ৩০শে জুন তারিখের গণবাণীতে "প্রেসিডেন্টের কীর্ত্তি" শিরোনাম দিয়ে একখানা প্রাপ্ত পত্র আমরা প্রকাশ করে ছিলেম। এ পত্রের মর্ম্ম এই ছিল যে চট্টগ্রাম জিলার বোয়াল খালী থানার ৭নং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট দেলাওয়ার হোসেন চৌধুরী সাহেব একজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক। প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি কৃষকদের কাছ থেকে খুব বেশী বেশী ট্যাক্স আদায় করছেন। একজন কৃষক ও সরবৎ বিক্রেতা মোহর্‌রম খানের ওপরে মনোমালিন্যের জন্যে ৪৫ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করেছেন। এ সব কারণে গাঁয়ের লোকেরা প্রেসিডেন্টের নামে মোকদ্দমা করেছেন। ফল এখনো জানা যায়নি। এ পত্র খানা পাঠ করে উপরিউক্ত প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে

একখানা পত্র লিখেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে যত অভিযোগ করা হয়েছে সবই মিথ্যা। তিনি জনপ্রিয় লোক, দেশের সেবায় জীবনপাত করছেন। মোহম্মদ খানও একখানা পত্র আমাদেরকে লিখেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট তাঁর আত্মীয়। তাঁকে সর্ব্বহ বিক্রেতা বলে তাঁর অবমাননা করা হয়েছে, অধিকন্তু, ৪৫ টাকা ট্যাক্স তাঁর ওপরে কখনো ধার্য্যই করা হয়নি। এঁদের দু'জনার পত্রের কথা যদি সত্য হয়, এবং আমাদের আগেকার মুদ্রিত পত্রের কথা যদি সব মিথ্যা হয় তা হলে তার জন্যে আমরা বাস্তবিকই দুঃখ প্রকাশ করছি। জমীদার ও মহাজনরা প্রেসিডেন্ট যদি হন তা হলে তাঁদের অত্যাচারের মাত্রা প্রায়ই চরমে উঠে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে মনে করেই আমরা পত্রখানা কাগজে ছেপেছিলেম। দেলাওয়ার হোসেন চৌধুরী যদি তাঁর শ্রেণীর আর সব লোকের চেয়ে পৃথক শ্রেণীর ভাবাপন্ন লোক হয়ে থাকেন তা হলে তা খুবই আনন্দের বিষয়ই হবে।

———

স্বরাজ ম্যুনিসিপ্যালিটি

কলিকাতা করপোরেশনের স্বরাজ লাভ হয়ে যে গেছে এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু, এ স্বরাজ ম্যুনিসিপ্যালিটির অধীনে এসেও কলিকাতার শ্রমিকগণের অবস্থার একটুকুও উন্নতি হয়নি। স্বরাজ পাবার পূর্ব্বে যে অবস্থা তাদের ছিল ঠিক সে দুরবস্থা আজো তাদের রয়েছে, কোথাও এতটুকুও পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টা ম্যুনিসিপ্যালিটি করেনি। শ্রমিক পল্লীর উন্নতি সাধন করা ম্যুনিসিপালিটির হাতে ছিল। কিন্তু সে দিকে নজর দেওয়াটা কর্ত্তারা কখনো প্রয়োজনই মনে করেন নি। এই কলিকাতা নগরের ভিতরে যেমন জায়গায় ও যেমন ঘরে শ্রমিকরা বাস করে থাকে তাতে মানুষত দূরের কথা পশুকে রাখাও উচিত হয় না, এখন অপকৃষ্ট হচ্ছে সে সব জায়গা। কলিকাতা কর্পোরেশন হেল্‌থ্ অফিসার ও স্যানিটরী ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতিকে খুব মোটা মোটা মাইনে দিয়ে থাকেন। কিন্তু, তাঁরা ভুলেও কখনো শ্রমিক পল্লী গুলি দেখতে যান না। যদি যেতেন তা হলে কখনো এমন সব ঘরে তাঁরা শ্রমিকদিগকে বাস করতে দিতে পারতেন না। মালিকদেরকে বাধ্য করে কর্পোরেশন শ্রমিকদের জন্যে বাস ভবন তৈরী করাবার চেষ্টা কখনো করেনি, কিন্তু, কখনো যে করবে তারও কোনো সূচনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কর্ত্তারা নিজেদের মধ্যেই 'রুটি আর মৎস্য' ভাগ করার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, কে দেখতে যাবে সেই নোংরা শ্রমিক গুলিকে?

———

দেশ-বিদেশ

———

কমরেড শাপুরজী সাকলাৎ ওয়ালা অসুস্থ

১৫ই তারিখের ওরিয়েন্ট প্রেস সার্ভিসের জরুরী তারের খবর প্রকাশ যে কমরেড শাপুরজী সাকলাৎওয়ালা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহার অসুস্থতা খুব চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে হাসপাতালে (নার্সিং হোমে) স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাঁহার স্কন্ধদেশে অস্ত্রোপচার করা হইবে।

ভিয়েনাতে শ্রমিক বিদ্রোহ

বিগত সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শুক্রবারে অষ্ট্রীয়ার ভিয়েনা শহরে একটি ভীষণ ভীতিজনক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। শ্রমিকেরা দলে দলে উচ্চধ্বনি সহকারে "শ্রমিকদের হত্যাকারীদের পতন হোক", "শ্রেণী-বিচারের অবসান হোক" ইত্যাদি ঘোষণা করিতে করিতে আদালত গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল। আদালত গৃহ দখল করতঃ ও কর্মচারী এবং কেরাণীদের প্রহার করিয়া তাহারা ক্ষতি সাধন করিয়াছে। দুইজন জাতীয়তাপন্থী দুইজন সোস্যালিষ্টকে নিহত করিয়ার বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছে। তজ্জন্য শ্রমিকদের জনতা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। পুলিসও জনতার উপর তরবারি চালাইয়াছিল। জনতা রাস্তায় অবরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। পুলিশ ও জনতার সংঘর্ষের ফলে ৪০ জন নিহত এবং ২০০ দুইশত জন আহত হইয়াছে। অবশেষে পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে গ্রামের দিকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জনতার লোকেরা ইতালীর দূতাবাসের সম্মুখে জড় হইয়া খুব ভিড় করিয়াছিল এবং "মুসোলিনির পতন হোক' বলিয়া খুব চীৎকার করিয়া গগন কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা সংবাদ পত্রিকা আফিস আক্রমণ করিয়াছিল। পুলিশ থানা উড়াইয়া দিয়াছিল। আফিসের সাজসজ্জাও জানালাদি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। প্রভৃত লুটতরাজও হইয়াছে।

—০—

জেরুসালেমে ভূমিকম্প:—জেরুসালেমে যে ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছে তাহার ফলে প্যালেস্টাইনে ১৯২ জন এবং ট্রান্স জর্ডোনিয়াতে ৮৮ জন লোক নিহত হইয়াছে এবং প্রায় দুই সহস্র লোক আহত হইয়াছে। বাড়ীঘর অনেক ধ্বংস হইয়াছে।

—.—

মাদ্রাজ শ্রমিক সমস্যার এতটুকু পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। শ্রমিক নেতাগণ এখনো সাধারণ ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। মিঃ চেটী বর্ম্মা ওয়েল কোম্পানীর এবং এসিয়াটিক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর শ্রমিক ও ঝাড়ুদারদের ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিবার জন্য মিটিং আহ্বান করিতেছেন। ব্রিটিশ শ্রমিক নেতাদেরও তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্যে আবেদন করিয়াছেন।

—•—

আসাদ-উদ্-দৌলা শিরাজী সাহেব ৭ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের সময় নিউ স্কোয়ার পার্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তার ফলে তিনি আলিপুর এডিশ্যানাল ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ১২৪ ধারা অনুযায়ী রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট শিরাজী সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৩ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। মিঃ এস, সি, তালুকদার মিঃ শৈলেশনাথ বিশী এবং মহেন্দ্র কুমার ঘোষ বিচারপতি সুরাওয়ার্দী ও গ্রেগরির নিকট জামীনের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। বিচার পতিদ্বয় জামীন মঞ্জুর করিয়াছেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আপিল দায়ের করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১॥৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেণ্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেণ্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু, প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেণ্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS AND WORKERS PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে জুলাই ১৯২৭, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৪ | ২৪ম সংখ্যা

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে জুলাই, ১৯২৭, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৪ | ২৪শ সংখ্যা

খোলা চিঠির জওয়াব

—০—

শ্রীযুত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

সবিনয় নিবেদন, সমীপেষু

৪ঠা শ্রাবণ তারিখের "বীরভূমবাণী' কাগজে আমাদের নামে লেখা আপনার খোলা চিঠিখানা পড়েছি। আপনি যে "গণবাণী" 'যত্নের সহিত পাঠ করিয়া' থাকেন তার জন্যে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকি ব'লেই তার বিপক্ষে আমাদেরকে দাঁড়াতে হয়েছে। আমরা বেশ পরিষ্কাররূপে দেখতে পাচ্ছি যে দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাসত্বকে সুদৃঢ় করার জন্যেই ধনিকগণ ষড়যন্ত্র ক'রে দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। আমরা জানি, ধনিকদের কাছ থেকে রীতিমত অর্থ সাহায্য পাচ্ছে ব'লেই কয়েকখানা কাগজ অনবরত ধর্ম্মগত বিদ্বেষ প্রচার করছে। এ বিদ্বেষ যখন জমাট বেঁধে উঠেছে তখন অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরেও বিদ্বেষ প্রচারে ব্রতী হয়েছে। এমন অনেক উকীল মোখতার রয়েছে যারা শুধু এই কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে থাকে যে তার দ্বারা তাদের স্বধর্ম্মাবলম্বীদের মোকদ্দমাগুলি তাদের পেতে সুবিধে হয়। এসব কারণে আমরা ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকি। আমরা জানি দেশের জনগণকে অচেতন রেখে মিথ্যা দ্বন্দ্বের ভিতরে ঠেলে দিয়ে তাদেরকে লুণ্ঠন করাই হচ্ছে এ সাম্প্রদায়িকতার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করাই হচ্ছে "গণবাণী"র এবং "গণবাণী" যে দলের কাগজ সেই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। "গণবাণী"র মিশন হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ প্রথাকে তিরোহিত করা। এই কারণেই "গণবাণী"র মধ্যে মতবাদ মূলক সাম্প্রদায়িকতা আছে। সমাজের যে স্তরে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি তাতে অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে লুণ্ঠন করে খাচ্ছে। তাই, এই শোষক ও শোষিতের মধ্যে একটা সংগ্রাম চলে এসেছে এবং এ সংগ্রামে আমরা শোষিতের পক্ষ অবলম্বন করেছি। কাজেই, শোষকদের পক্ষাবলম্বন কারিগণের সম্বন্ধে কোনো তীব্র মন্তব্য যদি আমরা প্রকাশ করে থাকি তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কি আছে? আপনি জমীদার, মহাজন প্রভৃতি হয়ে কিংবা তাদের দালাল হয়ে যদি কাহারো বুকের রক্ত শোষণ করতে থাকেন তা হলে সে আপনাকে বুকে চেপে ধরবে এমন আশা কি আপনি করতে পারেন? নিতান্ত অন্ধভাবে কাহারো "উক্তি" মেনে চলার মত নম্রতা আমাদের একেবারেই নেই, আর থাকাটাকে আমরা নিতান্তই মূর্খতা ও নপুংসকত্বের পরিচায়ক বলে মনে করে থাকি। কাহারো মতবাদ যদি জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল হয় তা হলে আমরা পাঁচ হাজার বার তার সম্বন্ধে কটূক্তি ও বিদ্রূপোক্তি করব, তা সে মতবাদের প্রচারকারী গান্ধীই হউন আর দাশই হউন, তাতে কিছুই যায় আসে না। আমরা যদি জনগণের স্বার্থের সমর্থন করে থাকি, আর মিঃ গান্ধী ও দাশ সাহেব যদি সে স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন, তা হলে আমরা তাঁদের মতের সমালোচনা না করে চুপ করে থাকব, এই কি আপনি আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন?

আপনি লিখেছেন ভদ্রলোক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের ক্রোধ খুব বেশী। আপনি আরো লিখেছেন "যাঁহাদের প্রতি (শিক্ষিত ও ভদ্রলোকগণের প্রতি) ক্রোধ এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তীব্র শ্লেষময় প্রবন্ধ লিখিয়া "গণবাণী" প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেই কি "গণবাণী"র পনের আনা পাঠক নাই? যদি আপনি মনে করিয়া থাকেন শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত যুবকদের দ্বারাই গণের উপকার সাধিত হইবে, তাহা হইলে কি মিত্রভাবে তাহাদিগকে নিজের মতে আনা ঠিক অথবা আঘাত দিয়া দূরে সরাইবার চেষ্টা করা ঠিক?" যে সকল শিক্ষিত ও ভদ্রলোক দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণকে "ছোট লোক" ব'লে অশ্রদ্ধা করে থাকেন তাঁদের প্রতি আমাদের

এতটুকুও শ্রদ্ধা নেই। ভদ্রলোক নামক একটা পৃথক শ্রেণীই এদেশে গঠিত হয়ে গেছে। এমন অদ্ভুত শ্রেণী কিন্তু আর কোনো দেশের সমাজে নেই। একটা মাত্র বিশিষ্ট শ্রেণীকে ভদ্রলোক মেনে নেওয়ার মানেই হচ্ছে তাদের ছাড়া আর সকলকে অভদ্র বলে স্বীকার করা। এ জন্যে আমরা মানুষের এই তথাকথিত ভদ্রত্বর দাবীকে এতটুকুও স্বীকার করিনে। যে সকল শিক্ষিত যুবকের নিকট ভদ্রত্বই সব কিছু, আর মনুষ্যত্ব কিছুই নয়, তাঁদের প্রতি ক্রোধ ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে কিছু কি অন্যায় করা হয়? আমাদের সমাজের নিম্ন মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা খুব দরিদ্র এবং অনেক স্থলে একেবারেই নিঃস্ব। শ্রমিক ও কৃষকগণ যেরূপ শোষিত হয়ে থাকে তাঁরাও ঠিক সেরূপই শোষিত হন। কিন্তু তথাপি তাঁরা কখনো শ্রমিক ও কৃষকগণের সহিত সমবেত হয়ে শোষকগণের বিরুদ্ধে উত্থান করতে রাজি ত হনইনা, পরন্তু শ্রমিক-কৃষকের উত্থানের পরিপন্থীও তাঁরাই হয়ে থাকেন। সমাজের উচ্চ স্তরের লোকগণের দ্বারা শোষিত হওয়া সত্বেও এঁদের মনের টান উচ্চ স্তরের লোকেদের প্রতিই বেশী। কারণ, উচ্চ স্তরের লোকেরা এঁদের মধ্যে একটা ভদ্রত্বর মোহ সৃষ্টি করে রেখেছে। এরূপ মোহাবিষ্ট মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে কিছুমাত্র অন্যায় কাজ আমরা করিনি। এর জন্যে কেউ যদি রাগ করে আমাদের কাগজ না পড়েন তা হলে আমরা নাচার। আমরা কখনো মনে করিনা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণের দ্বারা গণের কোনো উপকার সাধিত হতে পারে। যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক বর্ত্তমান সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণের সহিত সম্মিলিত হবেন তখন তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডী কাটিয়েই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক আপনাকে সেই শ্রেণীর গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রেখে জনগণের উত্থানের জন্যে কখনো কোনো কাজ করতে পারেন না। কেননা, তখন তাঁর স্বার্থ হবে জনগণের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ জনগণকে শোষণ করা। যে শ্রেণীকে আমি শোষণ করব সে শ্রেণীর উত্থানের জন্যে চেষ্টাও আমিই করব এমন পরস্পর বিরোধী ব্যাপার কখনো কি ঘটতে পারে? নিম্ন মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত লোকগণের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটবে। তাঁরা যদি আপনাদিগকে "ভদ্রলোক" মনে করেন এবং চাষী-মজুরদিগকে "ছোটোলোক" ব'লে ভাবেন তাহলে তাঁরাও চাষী-মজুরের উত্থানের জন্যে কোনো কাজই করতে পারবেন না। তাঁদের এই ভদ্রলোকত্বর মানসিকতা চাষী-মজুর ও তাঁদের মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখবে। জনগণের সহিত একটা সমস্বার্থ বোধ না নিয়ে তাদের উত্থানের জন্যে কোনো কাজই করা যেতে পারে না। নিছক লোক-হিতৈষণার প্রবণতা নিয়ে জনগণের "উপকার" করতে যাওয়ার কোনোই মূল্য নেই। শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে একটি পক্ষই আমাদিগকে অবলম্বন করতে হবে। দু'নৌকায় পা'ও রাখব অথচ কোনো অঘটনও ঘটবে না, এমনটা মনে করাটা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ হতে পারে কি? অথচ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ছোটো বড় সকল নেতাই বাহ্যতঃ দেখিয়ে আসছেন যে তাঁরা দু'কূলই রক্ষা করছেন; কার্য্যতঃ কিন্তু তাঁদের একটি কূলই রক্ষা হয়েছে বরাবর অর্থাৎ শোষক সম্প্রদায়ের কূল। এই কারণে, আমরা যদি মিঃ গান্ধী, দাশ সাহেব ও আর আর নেতৃগণের কার্য্যের সমালোচনা করি এবং সে সমালোচনা যদি কাহারো প্রাণে বাজে, তা হ'লে তার বাপের কর্ত্তার ভূত চেপে আছে বললে কিছু কি অন্যায় বলা হয়? বাড়ীর কর্ত্তা মরে যাওয়া সত্বেও বাড়ীর বৌ তাঁর অন্যায় বিধি-নিষেধ গুলি মেনে চলেন এই ভয়ে যে কর্ত্তার ভূতটি হয়তো তার ঘাড়ে চেপে বসে আছে। এটা হচ্ছে বীর-পূজার অত্যন্ত খারাপ পরিণাম, একেবারে দাসত্বের শামিল। চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, পরীক্ষার কষ্টিপাথরের যাচাইতে একটা মতবাদ উত্তীর্ণ হতে পারেনি, অথচ তা সত্বেও বার বার যদি তারই দোহাই দেওয়া হয় তা হলে সেটাকে ভূতাবিষ্টের লক্ষণ না বলে আর কি বলব?

আপনি বলেছেন "গণবাণী" আপনি আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। তাই, যদি হয় তবে ১০ম সংখ্যক "গণবাণী"তে প্রকাশিত আমাদের প্রোগ্রাম আপনি দেখেন নি কেন?

আপনার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কম্যুনিষ্ট নেতা বলে যারা খ্যাত তাঁরা শিক্ষিত ও ভদ্রলোক কিনা। হাঁ, কম্যুনিষ্ট নেতারা শিক্ষিত হতে পারেন বটে, কিন্তু, তার জন্যে তাঁরা সমাজের উৎপাদক শ্রেণীকে 'ছোটোলোক'ও বলেন না; অশ্রদ্ধার চোখেও দেখেন না। আর, ভদ্র-শূদ্রের পার্থক্য ত তাঁরা করতেই পারেন না।

আর বেশী কিছু লিখার দরকার আমরা মনে করিনে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ উত্তরটি আপনার "বীরভূম বাণী"তেও প্রকাশ করবেন।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
"গণবাণী"র অন্যতর সম্পাদক।

কম্যুনিজমের ইতিহাস

[শ্রীধরণীকান্ত গোস্বামী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সমিতিতে পৃথিবীর বহুস্থানের শ্রমিক নেতৃগণ আসিয়া যোগদান করেন। কিন্তু সমিতিতে তখন একতার অত্যন্ত অভাব ছিল বলিয়া এই প্রথম আন্তর্জাতিক সমিতিটী ব্যাপক ভাবে শ্রমিকদিগের সমিতি না থাকিয়া পরবর্ত্তীকালে একটী সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বিপ্লব প্রচারকের সমিতিতে পরিণত হইয়া পড়ে।

এই বিপ্লবীদল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিদ্রোহে যোগদান করে। এই প্যারিস বিদ্রোহ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অতি বিখ্যাত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে পৃথিবীর বিপ্লবের গতানুগতিক ভাবধারার সমূহ পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং এই বিদ্রোহেই প্রকৃত বিপ্লবের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যেহেতু পৃথিবীর ইতিহাসে উহাই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম সফলকাম অর্থনীতিক উত্থান। সর্ব্বস্বাপহারীর বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার এই প্রথম সফলকাম উত্থানে উহারা সম্পূর্ণ দুই মাস কাল ব্যাপিয়া প্যারিস দখল করিয়া সেখানে মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্যে খরিদ দরে বিনালাভে

নাগরিকদিগের খাদ্যদ্রব্যাদির ভাগবণ্টনে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যে বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাই প্যারিস কম্যুন-নামে অভিহিত হইয়াছে। বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের এই প্রচেষ্টাতেই সর্ব্ব প্রথম কম্যুনিজমের মতবাদের কতকটা অনুভূত হয়। বিখ্যাত ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবে যে বীজ প্রথম উপ্ত হইয়াছিল এই বিদ্রোহে তাহা অঙ্কুরিত হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য বিদ্রোহের ন্যায় ফরাসী বিপ্লবেরও অন্যান্য অধ্যায়ে বিদ্রোহীরা কেবল মাত্র শাসন তন্ত্রের দিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, প্যারিস বিদ্রোহে আমরা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই যে প্রকৃত বিদ্রোহিগণ শাসনের জন্য লালায়িত না হইয়া বরং অশনের ব্যবস্থার জন্যই লালায়িত হইয়া বিদ্রোহ সাধন করিয়া ছিলেন। এই অশনের ব্যবস্থাটী মার্জ্জিত ভাষায় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান। মানবেতিহাসে যে সময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে সে সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দেখা যায় যে উহা অনবরত এক শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়াই চলিয়াছে। তাই মানবেতিহাসকে কার্ল মার্ক্স শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাসকে ধারাবাহিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহার মূলে একটী মাত্র কারণ বিদ্যমান। সেইটী হইতেছে এই অর্থনৈতিক শোষণ। ধরা-পৃষ্ঠে যতগুলি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহার প্রত্যেকটী ঐ অর্থনৈতিক শোষণজনিত সমাজের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার এক একটী বহিঃপ্রকাশ। ঐতিহাসিক কালের এইরূপ একটী সামাজিক বিশৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ হইতেছে প্যারিস বিদ্রোহ। এই বিপ্লবে গণশক্তির উত্থানের আকার এবং বিপ্লবের প্রকৃত আভ্যন্তরিক অবস্থা বা আকাঙ্ক্ষা এই দুইটী জিনিষ স্পষ্ট প্রতিভাত দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বিপ্লবী সর্ব্বহারার দল এই সময়েই প্রথম স্পষ্ট ব্যক্ত করে যে অদূর ভবিষ্যতে সর্ব্বহারার দল কি করিবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একদিকে বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণে ও সাহায্যকারী বিপ্লবীদলের ভিতর নানারূপ গোলমালে এবং ইহার গোড়ায় অনেক গলদ থাকায় এই প্যারিস কম্যুন বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে আন্ত-র্জ্জাতিক বিপ্লবীদলেও ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। অবশেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসের মতাবলম্বীদিগের সহিত প্রসিদ্ধ নৈরাষ্ট্রবাদী (Anarchist) বাকুনিনের মতানুবর্ত্তীদিগের মনোমালিন্য হওয়ায় এই প্রথম আন্তর্জ্জাতিক সমিতির অস্তিত্ব একেবারেই লোপ হইয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে ভাঙ্গাগড়া কিছুই নূতন জিনিষ নয়। একদল ভাঙ্গে এবং আর একদলের সৃষ্টি হয়। প্রথম আন্তর্জ্জাতিকের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সোশালিষ্টদলের আবির্ভাব হয়। চতুর্দ্দিকে কলকারখানাদির দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমিতিরও দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হয়। অতঃপর সমিতির চারিদিকের শাখা সমিতিগুলির বেশ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ও সন্তোষজনক কার্য্যাবলীতে পরস্পরের ভিতর সৌহার্দ্য এত ঘনিষ্ট হইয়া উঠে যে অনতিকাল মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত সোশালিষ্ট সমিতিগুলিকে এক আন্তর্জ্জাতিক মহাসভায় আহ্বান করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তদনুসারে ১৮৮৯ সালে এক আন্ত-র্জ্জাতিক সোশালিষ্ট মহাসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় পৃথিবীর বহু স্থান হইতে সোশালিষ্টদলের বহু প্রতিনিধি আসিয়া যোগদান করেন। সোশালিষ্টবর্গের এই বৈঠকেই দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের (The Second International) জন্ম হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের মহা আহবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের আরম্ভ কালের কিছু পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় আন্ত-র্জ্জাতিকের ভিতর দিয়া অনেক ভূতুড়ে কাণ্ড চলিয়াছিল, যাহার ফলে পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীবিখ্যাত বিপ্লববাদী ও সমাজ সংস্কারক, মনীষী নিকোলাই লেনিন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে যখন পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সূত্রপাত হইল ঠিক তখন হইতেই বিভিন্ন দেশের সোশালিষ্ট সমিতিগুলি ও তথা-কথিত সমাজ-সাধারণতন্ত্রী দলগুলি মার্কসের নীতিকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া নানাদিক হইতে নানা রকমে ইম্পিরিয়েলিষ্ট শোষক সম্প্রদায়কে যুদ্ধে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন; মার্কসের নীতি অনুসারে কোথায় ইহারা পরধনোপজীবী অত্যাচারী শোষক সম্প্রদায়ের এই পরস্পর স্বার্থসংগ্রামের সুযোগ গ্রহণে উহাকে ব্যাহত করিয়া সর্ব্বহারাদের কাজ হাসিল করিবার জন্য উহার বিরুদ্ধশক্তির উত্থানের আয়োজন করিবেন, তাহা না করিয়া উহারা সর্ব্বপ্রকারে নিজ নিজ দেশের শোষক শাসনতন্ত্র গুলির সাহায্যকল্পেই ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। উহারা সোশালিজমের নীতিকে একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়া এবং আপন আপন দেশের ইম্পিরিয়েলিষ্ট শোষক শাসনতন্ত্রগুলির স্বার্থসংগ্রামে সাহায্য করিয়া নিজেরাই নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন।

রুশীয়া, সার্ভিয়া ও পরবর্ত্তীকালে একমাত্র ইটালী ব্যতীত আর সমস্ত দেশের সোশালিষ্ট দল স্বার্থান্ধ হইয়া জগতের পরস্বা-পহারীদের এই মহা অনর্থকর সংগ্রামে প্রাণপণ সাহায্য করিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সোশালিষ্ট দলের সাহায্য ব্যতিরেকে এই মহাসংগ্রাম এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

জগতের এই মহা অনর্থকর মহাসংগ্রামে সোশালিষ্ট দলের সাহায্য ব্যাপারে তথাকথিত সোশালিষ্ট নেতৃবর্গ ও সোশালিষ্ট দলের মুখপত্রগুলিই বেশীর ভাগে দায়ী। যেহেতু উহারাই নানা উপায়ে শ্রমিকদিগকে সর্ব্বস্বাপহারীদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যুদ্ধারম্ভের একেবারে অব্যবহিত পূর্ব্বেও যে সমস্ত সোশালিষ্ট দল যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে উত্তেজিত করিতে-ছিলেন যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা হঠাৎ সুর বদলাইয়া ফেলিলেন।

যুদ্ধারম্ভের তিন দিন পূর্ব্বেও ফ্রান্সের সোশালিষ্ট দল যুদ্ধের বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া এক প্রচার পত্র বাহির করেন এবং ফরাসী সিণ্ডিক্যালিষ্টরাও (French Syndicalist) এই মত প্রচার করেন। তদানিন্তন উক্ত সিণ্ডিক্যালিষ্ট দলের মুখপত্রে উল্লিখিত একটী মাত্র ছত্রে হইতেই আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। তাহারা লিখিতেছেন "শ্রমিকগণ যদি তোমরা ভীরু না হইয়া থাক তাহা হইলে প্রতিবাদ কর।" তদনুসারে দেখিতে দেখিতে জার্ম্মানীর তদানিন্তন সমাজ-তান্ত্রিক দলও সংখ্যাতীত প্রতিবাদ-সভার আহ্বান করেন। অধিকন্তু সোশালিষ্টবর্গ বেস্‌লের (Basle) আন্তর্জ্জাতিক সভায় সকলে প্রতিশ্রুতও হইয়াছিলেন যে যুদ্ধের সময়ে গণশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে উহারা ধনিক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে পারে এবং যাহাতে অচিরে ধনিক-তন্ত্রের বিলোপ সাধন হইতে পারে। কিন্তু হইলে

কি হইবে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দল একদিনে এক মুহূর্তে এই সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। যুদ্ধারম্ভের মাত্র একদিন থাকিতে উঁহারা শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে আবার ঘুরাইয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। গুস্তেভ হার্ভি নামক জনৈক সংবাদপত্রসেবী তাঁহার "লাগেয়ার স্যোসিয়ালো" নামক কাগজে তৎকালে শ্রমজীবীদের উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা লিখিতেছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই সোশালিষ্টদের তৎকালীন মতলবের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত সংবাদ পত্র ঘোষণা করিতেছে :—"জাতের সম্মান রক্ষার্থে আমাদের যুদ্ধ সদলের করা একান্ত কর্ত্তব্য.........এমন একটা চমৎকার ব্যাপারে আত্মাহুতি দেওয়া কতই না আনন্দের বিষয়!" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এইরূপে ধীরে ধীরে শোষক ধনিক-তন্ত্রমুখী হইয়া পড়ায় উহার ভিতরে ক্রমে এক ঝগড়ারও সূত্রপাত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে একদল নেতা ঐ সময়ে শোষক সম্প্রদায়ের ঔপনিবেশিক লুন্ঠন ব্যাপারে কতক পরিমাণে অংশীদার হইয়া যাওয়ায় উহাদের ভিতরকার ঝগড়া আরো সঙ্গীন হইয়া পড়ে। ফলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ধ্বংসও একেবারে অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অন্যদিকে এই বিরোধ মঙ্গলজনকই হইয়াছিল। কারণ, এই ঝগড়ার অন্তঃস্থলেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভাবস্রুৎ বীজ উপ্ত ছিল।

যুদ্ধের প্রাক্কালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভিতর যে ঝগড়ার সূত্রপাত দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে উহার ভিতর হইতে তিন দলের সৃষ্টি হয়। প্রথম দল, যাহারা সোশালিজমের নীতি উপেক্ষা করিয়া এবং দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শোষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ধি করিলেন এবং নিজ নিজ দেশের যোদ্ধৃ জাতিকে যুদ্ধার্থে প্রাণপণ সাহায্য করিলেন। এই দল পরিশেষে শোষক সম্প্রদায়েরই পোষ্যরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে জিঙ্গো সোশালিষ্ট (Jingo Socialist) বা সুবিধাবাদীর দল বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দল হইলেন মধ্যস্থ। উঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের মন রাখিয়া কাজ করিতে মতলব করিলেন। উঁহারা পরবর্ত্তীকালে মধ্যপন্থী (Centrist) নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। এই দলের পরিচালক ছিলেন কটস্কী (Kautsky) এই দলকে আমাদের দেশের মডারেট দলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে এই দলও নিজেদের ভিতর কার্য্যের সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিয়া শোষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিতালী করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধাবসানে পূর্ব্বোক্ত প্রথম দল ও এই মধ্যপন্থী দ্বিতীয় দল উভয়ে একত্রে জাতি সঙ্ঘের (The League of Nations) পুষ্টিসাধন করেন।

তৃতীয় দল বা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একমাত্র শেষ দলটিই প্রকৃত প্রস্তাবে সোশালিজমের মতবাদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এই ভীষণ সন্ধিক্ষণেও আপনাদের গন্তব্য পথ ঠিক করিতেছিলেন। বিচ্ছিন্নশক্তি ও নিঃসহায় হইয়াও একমাত্র এই অবশিষ্ট দলটীই অত্যাচারিত সর্ব্বহারাদের দল, যাহারা এইরূপ যুগসন্ধিক্ষণেও সর্ব্বস্বাপহারী শোষক সম্প্রদায়ের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। এই শক্তিই তৎকালে বোলশেভিক শক্তি নামে জগতে পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত সুবিধাবাদীর দল, সেন্ট্রিষ্টদল ও উহাদের সঙ্গে মিলিত মেনশেভিক ইত্যাদি আরো কত দলের সঙ্গে মনীষী লেনিনের মতানৈক্যের ফলেই এই দলের সৃষ্টি হয়। মহাযুদ্ধের রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়গুলির লোমহর্ষণ দেখা দিল। ফলে ইহারা সকলে আপনারা হইতে নিজেদের গন্তব্য পথ সম্বন্ধে একেবারেই অন্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু যুদ্ধের বীভৎস মূর্ত্তি লেনিনকে একটুকুও উদ্‌ভ্রান্ত করে নাই। সর্বিয়ার আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধের নানারূপ বিভীষিকাময় দৃশ্য ইত্যাদি সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও একমাত্র লেনিন ও এই বোলশেভিক দলই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে শোষক শ্রেণীর এই পরস্পর মারামারিতে শোষিতের সমূহ ক্ষতি ছাড়া বিন্দুমাত্র লাভ নাই। সুতরাং শোষকের সঙ্গে শোষিতের কোনই সন্ধি হইতে পারে না। বরং শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের এই সময়ে এক অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ মতানৈক্যের ফলে বোলশেভিক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ভাবেই ও পৃথক পথেই চলিতে আরম্ভ করেন।

ভার্সেলিস সন্ধির সময়ে পূর্ব্বোক্ত দুই জাতি শত্রুর দল জাতিসঙ্ঘের সহিত সুর মিলাইয়া বোলশেভিকদের নামে নানারূপ কুৎসা ও অপবাদ রটাইতেও কসুর করেন নাই। বর্ত্তমানেও যাঁহারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অস্তিত্বের গর্ব্ব করিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ জাতি শত্রুরই দল, যাঁহারা জাতিসঙ্ঘের সহিত এক যোগে এখনও শোষণ নীতির নানারূপ ফন্দি আঁটিতেছেন। বর্ত্তমানে অবস্থিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে ও জাতিসঙ্ঘে কোনই প্রভেদ নাই। জাতি সঙ্ঘটী ধ্বংসোন্মুখ ধনিক তন্ত্রের শেষ প্রদীপ, আর এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক উহার একমাত্র ধামা ধরা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক জাতি সঙ্ঘের প্রসাদেই এখনও যা একটু মাথা তুলিয়া রহিয়াছে।

বোলশেভিক দল যুদ্ধের সময়ে আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ছিল সর্ব্বহারার দলকে সর্ব্বপ্রথম আপন আপন দেশে অবস্থিত বুর্জোয়াজি (Bourgeoisie)র বা পরধনোপজীবী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত করা। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে এইরূপ বোলশেভিক মতের পরিপোষক দল গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। জার্ম্মানীতে অবিলম্বে কার্ল লিবনেকত্‌ (Karl Leibnecht) ও রোজা লাক্সেমবার্গের (Rosa Luxemburg) নেতৃত্বে এক দলের সৃষ্টি হয়। ইঁহাদের মতে প্রলেটারিয়েটদের (Proletariat) বা সর্ব্বহারাদের একটী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ থাকা একান্ত আবশ্যক বলিয়া ইঁহারা ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দলের নাম রাখেন আন্তর্জাতিক। (International) জার্ম্মানীতে জার্ম্মান বোলশেভিক বা স্পার্টাসিষ্ট (Spartacist) দলেরও সৃষ্টি হইল।

সুইডেন ও নরওয়েতেও একদলের সৃষ্টি হইল। উঁহারা দলের নাম রাখেন দি লেফট্‌ সোশালিষ্ট (The Left Socialist)। কিছুদিন পরে ইটালীতেও এই মতের পরিপোষক এক দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপে ধীরে ধীরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় কম্যুনিজমের মতবাদের পরিপোষক বা কম্যুনিজমের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন বোলশেভিক দল পাশ্চাত্যের প্রায় সমস্ত দেশেই এক রকম ছড়াইয়া পড়ে।

অবশেষে দলের এইরূপ ক্রম প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে উহার কার্য্যাবলীর সুশৃঙ্খলতা রক্ষারও গুরুত্ব উপলব্ধি হওয়ায় সুইজারল্যাণ্ডে দলের এক বৈঠক আহ্বান করা হয় এবং শিমারওয়াল্ড (Zimerwald) ও কিনথেলে (Kienthal) পর পর দুই বৈঠকে সমিতি পরিচালনার নিয়ম শৃঙ্খলাদি প্রস্তুত করা হয়।

এই বৈঠকেই প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভিত্তি স্থাপিত হয়। লেনিনকেও এই সময় হইতেই খুব বেশী তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু আন্দোলনের গোড়া পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উহাতেও জাতি শত্রুর আক্রমণ আরম্ভ হয়। মধ্যপন্থী সম্প্রদায়ের লোকজন উহার ভিতর আসিয়া নানারূপে বিঘ্ন জন্মাইতে আরম্ভ করে এবং এমন কি উহারা দলটীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ারও মতলব করে। কিন্তু, শক্তিমান ও বুদ্ধিমান লেনিনের সঙ্গে পারিয়া উঠা শক্ত ব্যাপার ছিল।

মনীষী লেনিন অত্যন্ত চতুরতার সহিত আন্তর্জাতিক জিমারওয়াল্ড সঙ্ঘের মধ্যে আরেকটী বিশিষ্ট দলের সৃষ্টি করিয়া নিজেদের কাজ কর্ম্ম অত্যন্ত দক্ষতার সহিত চালাইতে লাগিলেন। তিনি এই শাখা সমিতিটীর নাম রাখিলেন জিমারওয়াল্ড লেফট (Zimerwald Left)। এইরূপে মনীষী লেনিনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতার প্রভাবে সমিতি ক্রমশঃ বেশ সতর্কতার সহিত ও কৃতকার্য্যতার সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। অতঃপর এই সমিতি রাশিয়ার বিখ্যাত ১৯১৭ সালের বিশ্ব আলোড়নকারী বিপ্লবের পর এবং জার-তন্ত্রের আমূল উৎপাটনের পর রাশিয়ায় সোভিয়েট শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আন্তর্জাতিক আন্দোলনে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের ফলেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভিত্তিতেই কম্যুনিজমের ভিত্তিও জগতে সুদৃঢ় হয়।

পূর্ব্বোক্ত বোলশেভিক দল এই সময় হইতেই তথাকথিত বিশ্বাসঘাতক ও জাতি শত্রু সোশালিষ্টদল হইতে নিজেদের সম্পূর্ণ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণের জন্য নিজেদেরকে কম্যুনিষ্ট নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। ইহার অন্যতম কারণ এই যে লেনিনের মতে প্রকৃত সোশালিজম জিনিসটীর স্বরূপ প্রকাশক শিক্ষা একমাত্র কম্যুনিজমের মতবাদ। অর্থাৎ সত্যিকার সোশালিজম একমাত্র কম্যুনিজমের ভিতর দিয়াই বিকাশ হওয়া সম্ভব। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সর্ব্বহারাদের চমকপ্রদ বিপ্লবের সার্থকতায় ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তড়িৎবেগে পৃথিবীর চারিদিকে কম্যুনিষ্ট দলের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। জার্ম্মানীর স্পার্টাকাস লিগ (Spartacus League) অবিলম্বে তাহাদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'দি কম্যুনিষ্ট পার্টি অব জার্ম্মানী' (The Communist Party of Germany) নাম গ্রহণ করে। বেলাকানের নেতৃত্বে হাঙ্গারিতেও একটি কম্যুনিষ্ট পার্টির সৃষ্টি হয়। দেখিতে দেখিতে অষ্ট্রীয়া, শেকো স্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও পরবর্ত্তীকালে ফরাসী দেশেও সমিতি গঠিত হইয়া যায়। যুক্তরাজ্যেও সমিতি গঠিত হইল। সেখানে মধ্যপন্থীদল একটু খানি প্রবল থাকায় উহার মধ্য হইতে একদল বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া নিজেরা কম্যুনিষ্ট নাম গ্রহণ করেন। দেখিতে পাওয়া যায় ১৯১৯ সালের শেষের দিক দিয়া ইংলণ্ডেও কম্যুনিষ্ট পার্টি মাথা তুলিতে আরম্ভ করে। মোটের উপর রুষ বিপ্লবের কৃতকার্য্যতায় পৃথিবীর যাবতীয় বিপ্লব প্রয়াসী সর্ব্বহারার দলের ভিতর এক অভিনব প্রেরণা আনয়ন করে। ফলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে কম্যুনিষ্ট পার্টি সমূহের সংগঠন আরব্ধ হয় এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই সমিতির যথেষ্ট বিস্তৃতিও হইয়া পড়ায় সমস্ত বিচ্ছিন্ন সমিতিগুলিকে অবিলম্বেই এক সুগঠিত কেন্দ্রীয় সমিতিতে সীমাবদ্ধ করিয়া ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পরিচালিত করার আবশ্যকতা অত্যন্ত উপলব্ধি হইয়া পড়ে। তদনুসারে ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে মস্কোর বিখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদে পৃথিবীর সমস্ত কম্যুনিষ্ট সমিতিগুলিকে আহ্বান করিয়া এক অতি বিরাট বৈঠকের সমাবেশ করা হয়। বৈঠকে সকলে মিলিয়া যে এক কেন্দ্র-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহারই নাম দেওয়া হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক (The Third International) বা কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যাল (Communist International)

কম্যুনিষ্ট মহাসভার উহাই সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন। বিশ্ব-বিশ্রুত অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত কাল মার্কসের প্রতিষ্ঠিত Communist Federation এর নামের অনুকরণে উহার স্মৃতি রক্ষার্থে ও সম্মানার্থে এই তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমিতির নাম কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক রাখা হয়। এই তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক একমাত্র মার্কসের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক ধরাপৃষ্ঠ হইতে ধনিকতন্ত্রের একাধিপত্য অপসারিত করিয়া অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত ধনিকতন্ত্র সমাজ বিধ্বংশকারী। যেহেতু ধনিকতন্ত্র সামাজিক উৎপাদিত বস্তুর শোষণের দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়াছেন, কিন্তু উৎপাদক সম্প্রদায়ের দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখেন নাই। ফলে সমাজের প্রাণ—সামাজিক পদার্থের উৎপাদক সম্প্রদায় ক্রমে হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া মৃত্যুপথযাত্রী হইয়াছে। সমাজও ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। এখন এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে গেলে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত ধনিকতান্ত্রিক সামাজিক প্রথার উচ্ছেদ একেবারে অনিবার্য্য। কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক আজ এই ব্রত উদযাপন করিয়াছেন। এই ব্রত ধ্বংসোন্মুখ হৃতসর্ব্বস্ব, অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিতের ব্রত, আর আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্টদল এই হতভাগ্য সর্ব্বহারার দল। আজ পৃথিবীস্থ হৃতসর্ব্বস্বদের যাবতীয় সঙ্ঘ সমিতিগুলির চরমপন্থী দলগুলি প্রায় সমস্ত এই কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের অভিযান সর্ব্বস্বাপহারীর বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার অদম্য অভিযান। সর্ব্বহারার এই অভিযান জয়যুক্ত হউক।

কম্যুনিষ্ট অভিযান কি কি শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাত্রা করিয়াছে বারান্তরে তাহা আলোচনা করিব।

———

ইংলণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েটের ভবিষ্যৎ সংঘর্ষে

ভারতবর্ষের স্থান

———

(শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

—০—

আমার পূর্ব্বের প্রবন্ধে সোভিয়েট-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্য্যন্ত যে সব উপায়ে ইংলণ্ড সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে আসছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি। ক্রমশই ব্যাপারটা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যৎএ এই দুই শক্তির মধ্যে একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাওয়া অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। এই আসন্ন বিরোধের

কালো মেঘ সমস্ত ইউরোপের উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। ইউরোপের সর্ব্বত্রই একটা অসোয়াস্তির ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ভাবী বিরোধ ঘটিয়ে তোলবার জন্যে ইংলণ্ডই সম্পূর্ণ দায়ী। একটু তলিয়ে দেখলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আজ হোক আর কাল হোক, এই বিরোধ ঘটতে বাধ্য। যে মতবাদের উপর ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত সেই মতবাদের সঙ্গে সোভিয়েটতন্ত্র যে মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মূলগত বিরোধও আছে। একটা মতবাদের পূর্ণ সমর্থক ও চরম নিদর্শন হচ্ছে ইংলণ্ড এবং আর একটা মতবাদের পরিপোষক ও প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক হচ্ছে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট। যেখানে দুটো ভাবের মধ্যে মূলগত বিরোধ আছে সেখানে দুটোই এক জায়গায় থাকতে পারে না। বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার একটা কথা আমাদের দেশে চলতি আছে বটে, কিন্তু আমি চোখে না দেখলেও জোর করে বলতে পারি যে, যে বাঘটা গরুর সঙ্গে একঘাটে জল খেয়েছিলো সেটা নিশ্চয়ই গরু হয়ে গিয়েছিলো, কারণ, যতক্ষণ সে বাঘ ছিলো ততক্ষণ গরুর সঙ্গে তার যে মধুর সম্পর্ক সেটা ভুলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। এক্ষেত্রেও আমার তাই মনে হয়। হয়তো সাম্রাজ্যবাদী, শোষণবাদী ইংলণ্ড থাকবে, নতুবা জনগণ-শাসিত সোভিয়েটতন্ত্র থাকবে। কালের ধর্ম্মে বলে যে গণতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী। শোষণবাদীকে হয়তো তার সমস্ত লুঠের মাল উদ্গার করে দিতে হবে অর্থাৎ আর এক কথায় গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে হবে, নতুবা সমূলে ধ্বংস পেতে হবে। কালের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ যারা একটু নজর করে দেখছে তারাই বুঝতে পারছে যে এটা আজ হোক আর কাল হোক, ঘটবেই ঘটবে। তবে তার লক্ষণ দেখেই যে ইংলণ্ড ভড়কে যাবে আর হঠাৎ বৈষ্ণব হয়ে যাবে এ রকম মনে করবার কোনই হেতু দেখছিনে। সিঁদুরে মেঘ দেখলে শুধু ঘর পোড়া গরু ভয় পায়, যে গরুর ঘর এখনো পর্য্যন্ত পোড়েনি সে ভয় পাবে কেন? আর দ্বিতীয়তঃ এটা ভুললে চলবে না যে ব্যক্তি বিশেষ হোক কিম্বা একদল লোকই হোক, নিজেদের মতবাদকে সহজে ত্যাগ করা কারও পক্ষেই সহজ নয়। বিশেষতঃ, যে মতবাদের ফলে চপলা লক্ষ্মীকে অচলা করে ঘরের দরজায় বসিয়ে রাখা যায় সে মতবাদ ত্যাগ করা প্রায় দুঃসাধ্য বললেও চলে। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে তাতে তাঁদের এটা বুঝতে দেরী হয়নি যে একবার যদি সোভিয়েটতন্ত্র রাশিয়াতে সফল হয়েছে এটা প্রমাণ হয় তাহলে ইংলণ্ডের শ্রমিক আর খুব বেশী দিন তাঁদের সোয়াস্তিতে থাকতে দেবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, একথাটা লাখ কথার এক কথা। জীব ধর্ম্মই হচ্ছে আত্মরক্ষার ধর্ম্ম। তাই, যখন দেখি যে এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায় তাঁদের জাতি কুলমান বাঁচাবার জন্যে হাতের কাছে যা পাচ্ছেন তাই ছুঁড়ে সোভিয়েটকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছেন তখন তাঁদের অবস্থা দেখে মনে যে দুটি রসের সঞ্চার হয় তাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে করুণ রস আর হাস্য রস বলা হয়। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। কাদা ছুঁড়ে আর ঢেলা ছুঁড়ে এই নব-জাত সোভিয়েট শিশুকে মারতে পারবেন তাঁরা অনুমান করেছিলেন। এখন দেখছেন যে মরা দূরে থাক, শিশুটির দৌরাত্ম্যে তাঁদের গোকুলে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে বললেও চলে। তাঁরা এতদিন ধরে যে উপায়ে ননী ভাঁড়ে করে জমিয়ে রেখেছেন তার সব খবর এই শিশু জেনে নিয়েছে, আর ননবন নিয়ে ননী ভাগ করে খাবার চেষ্টায় আছে। এর বিহিত এখন আর ঢিল ছুঁড়ে হবে না, এখন তরবারি ধরতে হবে। সেই চেষ্টাই ইংলণ্ড এখন করছে। কিন্তু এই বিরোধকে তো আগেকার কালের বিরোধের মত করে আমরা দেখতে পারিনে। পুরাকালে এক রাজার সঙ্গে আর এক রাজার যুদ্ধ করে কাটাকাটি করে মরতো, তার ফলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কোন বিপ্লব ঘটতো না। তখনকার যুগের ইকনমিক (অর্থনীতিক) অবস্থায় সে রকম ঘটবার কোন কারণ ছিলো না। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে একটা দেশে ধাক্কা লাগলে অন্য দেশে সেই ধাক্কার ঢেউ পৌছয়। ইংলণ্ডের সঙ্গে যে কোন শক্তিরই যুদ্ধ লাগুক না কেন তার ফলে আমাদের দেশকে কি দণ্ড দিতে হয় তা গত যুদ্ধের ইতিহাস যাঁরা কিছুমাত্র পড়েছেন তাঁরাই জানেন। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের এই রণ সজ্জায় ভারতবর্ষের লোকের যেমন ভয়ের কারণ আছে এমন আর কারো নেই। ইংলণ্ড আর সোভিয়েটের বিরোধের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে কি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে সেটা এই প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করবো। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলির পূর্ব্বতন সম্বন্ধের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, সাউথ আর ইষ্ট আফ্রিকা এখন প্রায় স্বাধীন হয়ে গেছে বললেও চলে। এই সমস্ত দেশেই জাতীয় আন্দোলন যুদ্ধের পর থেকে প্রবল হয়ে উঠেছে। তারা আগের মত আর ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী নয়। লণ্ডনে এই উপনিবেশগুলোর সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে কনফারেন্স হয়ে গেছে তার বিবরণী পাঠ করে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মা-ইংলণ্ড সম্বন্ধে এই উপনিবেশ-ছাগুলি যতই মধুর বচন বলুক না কেন তাঁদের দাবীগুলির মানে হচ্ছে উপনিবেশগুলিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে ইংলণ্ডকে স্বীকার করতে বাধ্য করানো। এরা মাকে বাইরে লোক দেখানো মিষ্টি কথা দু'চারটে বলছিলো বটে কিন্তু ভিতরে এমন জোর চিমটি তারা মাকে কাটছিলো যে মার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাবার দাখিল। এদিকে মুস্কিলও যথেষ্ট. পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায় সেই ভয়ে মা চেঁচাতেও পারে না। এরা সকলেই যাবার সময় মাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে যে মায়ের জমিদারীগুলোতে কেউ হাত দিতে চেষ্টা করলে উপযুক্ত ছেলেরা সব এক জোট হয়ে মাকে সাহায্য করতে আসবে। মায়ের জমীদারীতে এরা কাউকে হাত দিতে দেবে না। কিন্তু তাদের অত করে বলে যাওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যৎএ যে ইংলণ্ড আর কখনো উপনিবেশগুলির কাছ থেকে পূর্ব্বের মত সাহায্য পাবে তাতে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। ভবিষ্যৎএর যুদ্ধে ইংলণ্ডের জন্যে আপন আপন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে কেউ সহজে রাজী হবে না। গত যুদ্ধের মধুর আস্বাদন যারা পেয়েছে, তারা এখন কিছুতেই সহজে লোকবল আর ধনবল ইংলণ্ডের জন্যে নষ্ট করতে সম্মত হবে না। ইংলণ্ড যে তা জানে না তা নয়, কিন্তু, যতক্ষণ ভারতবর্ষ আছে ততক্ষণ তাদের ভাববার বিশেষ কারণ নেই। সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সমস্ত রসদ ভারতবর্ষ থেকেই ইংরেজ সংগ্রহ করে নেবে। সাম্রাজ্যবাদীতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের যে সংঘর্ষ অদূর ভবিষ্যৎএ অবশ্যম্ভাবী সেই সংঘর্ষে ভারতবর্ষের অফুরন্ত লোকবল ও অপরিমিত ধনবল গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্যে ব্যয়িত হবে। ভারতবর্ষই এখন পৃথিবীর সমস্ত দেশের স্বাধীনতা

লাভের প্রধান অন্তরায়। যেখানেই গণ-আন্দোলন মাথা তুলে উঠেছে সেখানেই ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের নিষ্পেষিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার এত বড় শত্রুতা ভারতবর্ষকে তার পরাধীনতার পাপের ফলে বহুকাল থেকে করে আসতে হয়েছে। ইজিপ্ট, আফ্রিকা, মেসোপটেমিয়া চীন, এক কথায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেখানে একটা জাতির মুক্তি লাভের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানেই ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য পাঠানো হয়েছে। চীনের বর্ত্তমান আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে দলকে দল সৈন্য গেছে। ভারতবর্ষের এই কলঙ্ক জগতের ইতিহাসের পাতায় ভারতবর্ষকে চিরকালের মত দাগী করে রাখবে।

সোভিয়েটের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধে ইংলণ্ডের প্রধান ভরসা হচ্ছে ভারতবর্ষ। পৃথিবীর ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কত বড় দায়িত্ব যে ভারতবর্ষের তা যেন আমরা একবার ভেবে দেখি। এতদিন বাদে পৃথিবীর একটিমাত্র দেশে প্রত্যেক মানুষকে তার মনুষ্যত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সত্যিকার মুক্তির আস্বাদ শুধু এই একটিমাত্র দেশের মানুষ আজ সারা পৃথিবীর লোকের মধ্যে পেয়েছে। তারা যে শুধু নিজেদের মুক্তি লাভ করে সন্তুষ্ট তা নয়, তারা যেখানে যারা নির্য্যাতিত আছে তাদের ঘরে ঘরে মুক্তির বাণী পৌছে দিচ্ছে। আজ তাদের ধ্বংস করবার জন্য আমরাই প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবো। আমি জানি যে আমরা কত অসহায়, কত দুর্ব্বল। আমাদের ইচ্ছে থাক না থাক আমাদের গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাই বলে বসে থেকে তো আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। 'দুর্ব্বলের বল ভগবান, তিনি যা করেন তাই হবে' এই চিরন্তন মিথ্যে বুলি না আওড়ে আমরা যদি 'দুর্ব্বলের বল হচ্ছে সেই দুর্ব্বলেরা নিজেই, শুধু তারা কোথায় তাদের বল সেইটুকু জানে না মাত্র' এই বাণী ভারতবর্ষের অগণিত অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতদের মধ্যে পৌছে দিতে পারি তা হলেই আমরা যথার্থ কর্ত্তব্য করবো। ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতের একটা অপরিসীম লজ্জা থেকে ত্রাণ করবো। এ কাজ হচ্ছে আমাদেরই। আমাদের কৃষক-শ্রমিক দলকেই এই কাজের মহৎ ভার মাথায় তুলে নিতে হবে। আমরা এখন থেকে এই বাণী বাঙলার গ্রামে গ্রামে পৌছে দিতে চেষ্টা করবো, প্রত্যেক দেশবাসীকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে চেষ্টা করবো। গভর্ণমেন্টের উদ্যত বজ্র আমাদের মাথার উপর পড়বে আমরা জানি, কিন্তু আমরা তার জন্যে বিন্দুমাত্র ভীত নই। ভারতবর্ষ যেন সোভিয়েটকে ধ্বংস করবার অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত না হয় তার জন্যে জনসাধারণকে ইংলণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েটের বিরোধের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা আমাদের এখন থেকেই করতে হবে। আর মুহূর্ত্তও দেরী করা উচিত নয়। বিশেষ করে দেশী রাজ্যগুলিতে আন্দোলন করা প্রয়োজন। করদ রাজ্যের অপদার্থ মনুষ্য নামের অযোগ্য রাজাগুলো ইংলণ্ডের পায়ের তলায় তাদের মাথা সব সময়ে লুটিয়ে রেখেছে। এ যদি শুধু তাদের ব্যক্তিগত মাথা হোত তা হলে আমার আপত্তি করবার কিছু ছিলো না। তাদের মাথার ওর চেয়ে ভালো সদ্ব্যবহার আর কি হতে পারে? কিন্তু এতো শুধু তাদের মাথা নয়, তাদের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা ইংরেজ শোষণবাদীদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সামনে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য এরা যতটা দায়ী এমন আর কেউ নয়। এরা সৈন্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষুধাকে বরাবর পরিতৃপ্ত করে এসেছে। সেদিন কাগজে পড়ছিলুম যে ভরতপুরের মহারাজা গভর্ণর জেনারালকে একটা টেলিগ্রাম করেছেন যে তিনি আর তাঁর প্রজারা চীনের বিরুদ্ধে সদাশয় ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করবার জন্যে বিশেষ উৎসুক হয়ে আছেন। গভর্ণর জেনারল মহোদয় কি দয়া করে তাঁর আর তাঁর প্রজাদের এই মনস্কাম পূর্ণ করবেন না? হতভাগ্য ভরতপুরবাসীরা রাজার শাসনে বাধ্য হয়ে প্রাণ দিয়ে এই রাজভক্তির পরিচয় দেয়। যখনই ইংরেজের সঙ্গে কারো যুদ্ধ বাধে তখনই এই রাজাগুলির মধ্যে কে কত বেশী রাজভক্ত তাই দেখাবার জন্যে রেষারেষি লেগে যায়। গরীব প্রজার রক্ত শোষণ করে তাঁরা যে ধন সঞ্চয় করে তা তখন ইংরেজকে উজার করে ঢেলে দেওয়া হয়। এই দেশীয় করদরাজ্যগুলো ভারতবর্ষের মুক্তির অন্যতম অন্তরায়। এই রাজ্যগুলির অধিবাসীদের মধ্যে খুব প্রবল আন্দোলন করা উচিত। ভারতবর্ষের একবিন্দু রক্ত, একটি কাণা কড়িও যেন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়। সোভিয়েটের ধ্বংস হওয়া মানে যে ভারতবর্ষের পরাধীনতা আরো কায়েমী করা সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

বাঙলার কৃষক শ্রমিক দল গণ মনে এই চেতনা সঞ্চারের ব্রত সাধনে তৎপর হউক।

বার্লিন

বেঙ্গল মেরিনারস্ ইউনিয়ন

বেতন বৃদ্ধি ও ফিডার সার্ভিস

প্রায় বছর খানেক হইতে উজানিয়া জাহাজের সারেং ও ড্রাইভারগণ তাঁহাদের নিয়োগ কর্ত্তা আই, জি, এন এণ্ড আর কোম্পানী এবং আর, এস, এন, কোম্পানীর নিকট তু'দের বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন নিবেদন করিয়া আসিতেছেন। বেতন বৃদ্ধির দাবী করার কারণ সমূহ সেই সমস্ত আবেদন পত্রে বিবৃত করা হইয়াছে এবং বেতন বৃদ্ধি করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কোম্পানীর জন্য লোক সংগ্রহে সারেং ও ড্রাইভারগণকে কিরূপ বেগ পাইতে হইতেছে তাহা ভাল করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত মে ও জুন মাসে নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ ও বরিশালে ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে ষ্টীমার কর্ম্মচারীদের সাধারণ সভা হইতেও এই মত প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে (অন্ততঃ জয়েন্ট কোম্পানীর স্বার্থের খাতিরেও) ইঁহাদের বেতন শতকরা কম পক্ষে ২৫ পঁচিশ টাকা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে সারেং ও ড্রাইভারদের লোক সংগ্রহের কষ্টের কারণ দূরীভূত হয় এবং কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে চলিতে থাকে। কিন্তু, জয়েন্ট কোম্পানীর হাবভাব দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে কর্ম্মচারিদের আবেদন নিবেদন যেন তাঁহাদের ত্রিসীমানায়ও পৌছিতেছেনা। ফলে লোকেরা দিন দিন ষ্টীমারের চাকুরির প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে ও শ্রদ্ধা হারাইতে চলিয়াছে। কোম্পানী যেরূপ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে

দু'একজনের এক আধটুকু মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছেন তাহাতে লোকদের মধ্যে অধিকতর অসন্তোষের কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া ভয় হইতেছে, পাছে ইহারা ধৈর্য্য হারাইয়া শেষ অবলম্বন ধর্ম্মঘটের (Strike) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসে। কারণ, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। অতএব আশা করি আপনার পত্রিকার সাহায্যে বেঙ্গল মেরিনারদের এই সমস্ত অভাব অভিযোগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট (মেরিন ডিপার্টমেণ্ট), শিপিং-মাষ্টার এবং জয়েণ্ট কোম্পানীদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহায্য করিবেন, যাহাতে পরে নিয়োজিত কিম্বা নিয়োগ কর্ত্তা কাহারো কোন প্রকার ক্ষতির কারণ উদ্ভূত হইতে না পারে। তার পর উপরি উক্ত মিটিং সমূহে ফিডার সার্ভিসে শুধু একজন মাত্র সারেং ও একজন মাত্র ড্রাইভার হওয়ায় যে সাধারণতঃ দুর্ঘটনা ঘটে তাহার উল্লেখ করিয়া দুইজন সারেং ও দুইজন ড্রাইভার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কোম্পানীদ্বয় সেই বিষয়েও নির্ব্বিকার। ফলে ইতি মধ্যেই দু'একটা ফিডার ষ্টীমারের দুর্ঘটনার (Accidents) রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। একজন মাত্র লোক যে কি করিয়া ২৪ ঘণ্টা কাজের জন্য দায়ী হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মেরিন ডিপার্টমেণ্ট কিম্বা শিপিং মাষ্টার ফিডার সার্ভিসের এই সমস্ত ঘন ঘন দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করেন না কেন? তাহাতে কি লোকের অনর্থক প্রাণনাশ এবং যাত্রীদের (Travelling public) এর অসুবিধা হয় না? তারপর সারেংদের নিকট হইতে মোটা মোটা ক্লেইম (Claim) কাটিয়া রাখার অভিযোগেরও কোন প্রকার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতেছে কিনা বুঝা যাইতেছে না।

এম, আবদুল হক বি, এ,
জেনেরেল সেক্রেটরী।

সমগ্র ভারতীয় প্রেস কর্ম্মচারী সম্মিলন

দ্বিতীয় অধিবেশন : কলিকাতা।

সমগ্র ভারতীয় প্রেস কর্ম্মচারিগণের দ্বিতীয় সম্মিলন আগামী ১৩ ও ১৪ই আগষ্ট শনিবার ও রবিবারে কলিকাতায় হবে। কোন সময়ে সম্মিলন প্রথম বসবে এবং কোন্ জায়গায় বসবে তা পরে জানানো হবে। কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য মাদ্রাজের অনারেবল সৈয়দ মোহাম্মদ পাদ্‌শাহ্ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। এ সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে ভারতের প্রায় সকল জায়গারই প্রেস কর্ম্মচারিগণ যোগদান করেছিলেন। সে জন্যে সে অধিবেশন খুবই সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল। তাতে সর্ব্ব শ্রেণীর প্রেস কর্ম্মচারিগণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রস্তাব পাস হয়েছিল। এর ফলে কয়েকটি গবর্ণমেণ্ট ও প্রাইভেট প্রেসের অত্যাচারের উপশম হয়েছে এবং এতদ্দ্বারা প্রেস কর্ম্মচারিগণের আন্দোলনের শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। আমরা প্রেস কর্ম্মচারিগণের সমীপে এই নিবেদন জানাচ্ছি যে তাঁরা অংশ গ্রহণ করে ও প্রতিনিধি প্রেরণ করে এই দ্বিতীয় সম্মিলনকে অধিকতর সাফল্য মণ্ডিত করে তুলুন।

কার্য্যালয় :
৩৪, বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৫ই জুলাই, ১৯২৭

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান, অভ্যর্থনা কমিটি,
শ্রীকিশোরী লাল ঘোষ
সেক্রেটরী, অভ্যর্থনা কমিটি।

দেশ বিদেশ

রয়টার ২৪শে জুলাই তারিখে লণ্ডন থেকে খবর দিয়েছে যে জেনেরেল ডায়ার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই ডায়ারের অভিশপ্ত নাম ভারতবাসী কখনো ভুলতে পারবে না। রওলাট এক্টের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে আন্দোলনের ফলে সেখানে সৈনিক আইন জারী হয়। ১৯১৯ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে যখন রওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হচ্ছিল তখন ডায়ার সেই নিরস্ত্র জনতার ওপরে গুলি চালাতে থাকে। বাগান প্রাচীরের দ্বারা ঘেরা ছিল। দ্বার ছিল মাত্র একটি এবং সেই একটি দ্বারেই ডায়ার তার তোপ বসিয়ে গুলি চালাচ্ছিল। ফলে, চারশত লোক হত ও হাজার হাজার লোক আহত হয়েছিল। যতক্ষণ না তার গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত নিরস্ত্র জনতার ওপরে গুলি চালিয়ে ডায়ার তার হীনতা ও কাপুরুষতার অদ্ভুত পরিচয় দিয়েছিল। ১৯২০ সালে ডায়ার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তার পরে গত তিন বছর যাবত সে পক্ষাঘাত রোগে ভুগছিল। এবার তার মরার খবর এসেছে।

"ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় ১৯২৬ সনের ৭ই জুলাই তারিখে "পাবনায় বিরাট্র" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর জন্যে উক্ত কাগজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা মতে অভিযুক্ত হয়ে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৩০০ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হয়। বিচারপতি সি, সি, ঘোষ ও গ্রেগরীর বিচারে বক্সী মহাশয় ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডের হুকুম হয়েছে। গত সোমবারে তিনি জেলে গিয়েছেন। তাঁর জরিমানার টাকাও দেওয়া হয়েছে।

বাংলার মিনিষ্টার মিঃ গজনভীর কুমিল্লা পরিদর্শন উপলক্ষে কুমিল্লাতে একটা গোলমাল হয়ে গেছে। মিঃ গজনভীকে অভিনন্দনপত্র দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না বলে কয়েকজন কমিশনার ইস্তিফা দিয়েছেন। ১৮ জন কমিশনারের মধ্যে মাত্র ৭ জন কমিশনার অভিনন্দন পত্রে নাম সই দিয়েছিলেন। এ সাত জনের মধ্যে ৫ জন মুসলমান, ২ জন হিন্দু।

বোম্বেতে শিয়া আর সুন্নি মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। শিয়া বোরাদের মসজিদে একটি সুন্নি পাগল ঢু'তে গিয়েছিল বলেই এ অনর্থ ঘটেছে।

—*—

১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনের বন্দী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদারের প্রতি ১৯২৫ সনের বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে মালদা জেলার রিতনাতে আবদ্ধ থাকার হুকুম হয়েছে। রিতনা যাওয়ার পথে তিনি ১৪ দিন হুগলীতে তাঁর বাড়ীতে থাকার অনুমতি পেয়েছেন। ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতে থাকবেন। ভোরে ৬টা হতে বিকেলে ৬টা পর্য্যন্ত তিনি স্কুল মাষ্টার ও ছাত্রদের ছাড়া আর সকলের সহিত নিজ বাড়ীতে দেখা করতে পারবেন।

—.—

লাহোরের "নেশন্" নামক ইংরেজী কাগজ কখনো বের হয়, আবার কখনো বন্ধ থাকে। অবশ্য বন্ধই থাকে বেশী সময়। শুন্‌লুম "নেশন্" নাকি আবার শীঘ্রই বের হবে। বলা বাহুল্য, দিওয়ান চমনলাল "নেশন" এর প্রধান পরিচালক।

———

কতিপয় সন্দ্যের দাবী করার খাতিরে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক হওয়া স্থিরীকৃত হয়েছে তা আগামী ১২ ও ১৩ই আগষ্ট তারিখে অপরাহ্ণ ৩টার সময় কলিকাতা, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, অলবার্ট হলে হবে।

—•—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও কলিকাতা কর্পোরেশনে যিনি একমাত্র প্রতিনিধি বলে সাব্যস্ত হয়েছেন, শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘট ভেঙে দেওয়া যাঁর একমাত্র ধর্ম্ম, সেই মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী কলিকাতা কর্পোরেশনের 'হাউসিং কমিটি'র চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন।

—•—

লাহোরের "জমীদার" নামক দৈনিক কাগজের সম্পাদক সৈয়দ লাল শাহ দণ্ডবিধির ১৫৩এ ধারা অনুসারে ধৃত হয়েছেন। জামিনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

—•—

ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও শ্রমিক বিভাগের হুকুমে শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ আইনের প্রসার খানিকটা বাড়লো। এখন থেকে হার্ব্বারে (পোতাশ্রয়ে) জলে কিংবা পথে জাহাজের মাল বোঝাই করা, মাল নামানো কিংবা কয়লার কাজ করা উপলক্ষে যারা আহত ও নিহত হবে, অবশ্য যাদের বেতন মাসিক ৩০০ টাকার বেশী হবেনা, তারা ১৯২৩ সনের শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে যারা পিয়ার, জেটি, অবতরণ করবার হোয়ার্ফ, কোয়ে, ডক, ওয়ার হাউস ও শেডে কাজ করবে তারা ক্ষতিপূরণ পাবে না।

—•—

রয়টার ২৫শে জুলাই তারিখে প্যারিস থেকে খবর পাঠিয়েছে যে সেখানে যে ৬ জন কম্যুনিষ্ট অভিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের এক জন মুক্তি পেয়েছেন। বাকী ৫ জন যথাক্রমে পাঁচ বছর থেকে ষোলো মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। পাঁচ হাজার থেকে হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানার হুকুমও তাঁদের হয়েছে।

বোম্বের চিঠি

—•:*:•—

বোম্বে, ১৯শে জুলাই, ১৯২৭

বোম্বের শ্রমিক ও কৃষক দল (The Workers' and Peasants' Party of Bombay) এর সেক্রেটারী কমরেড মিরাজকর বোম্বের কেরাণীকুলের প্রতি এক আবেদন পত্র প্রকাশ করেছেন। একটি শক্তিশালী সঙ্ঘ গঠন করার জন্যে তিনি এ আবেদন পত্রে বোম্বের কেরাণীকুলকে অনুরোধ করেছেন। আমি যতটুকু খবর পেয়েছি তাতে জানা গিয়েছে যে এ যাবৎ কমরেড মিরাজকরের নিকটে এক'শ জনেরও অধিক কেরাণী আপনাদের নাম লিখিয়েছেন। তাঁরা সকলে মিলে শীঘ্রই একটা সাধারণ সভা ডাকৃতে যাচ্ছেন, উদ্দেশ্য, কেরাণীকুলকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। বহুকাল পূর্ব্বে কেরাণীদের একটি সঙ্ঘ এখানে ছিল। কিন্তু, গত তিন বছর থেকে তার অস্তিত্বের কোনো সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছেনা। এর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মকর্তৃগণ বর্ত্তমান সময়ে একেবারে অলসাবতার হয়ে পড়েছেন। কাজেই, এ সঙ্ঘ গঠিত যখন হবে তখন একেবারে নূতন রূপেই হবে। কেরাণীদের অভাব-অভিযোগ খুবই বেশী। কাজেই এ সঙ্ঘ খুব শক্তিশালী সঙ্ঘ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

শ্রমিক ও কৃষকদল হিন্দু-মুসলমান জনগণের বরাবরেও এক ইস্তেহার জারী করেছেন। তাতে তাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে যে তারা যেন স্বার্থপর ধর্ম্মোন্মাদগণের প্রচার কার্য্যের দ্বারা বিপথে চালিত না হয়। এ ইস্তেহারের একখানা আপনাদের নামে পাঠানো হয়েছে। আশা করি আপনারা যথাসময়ে তা পেয়ে থাক্‌বেন। বোম্বের পক্ষে এটা খুবই সুখের বিষয় যে এখানকার জনগণ সহজে সাম্প্রদায়িক প্রচারের ফলে বিচলিত হয় না। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে অন্যত্র যখন বিরোধ প্রধূমিত হয়েছে তখনো বোম্বে শান্ত ও সংযত ভাবে কাটিয়েছে। ভারতের অন্যান্য জায়গায় এরূপটা বেশী দেখা যায় না।

গত শুক্রবারে মিঃ গিরি জেনেভা থেকে ফিরে এসেছেন। অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কংগ্রেস তাঁকে অভ্যর্থনা করেছে। জেনেভাতে তিনি কি কাজ করেছেন সে সম্বন্ধে শীঘ্রই তিনি উপরি উক্ত কংগ্রেসের নিকটে আপনার রিপোর্ট পেশ করবেন। ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের হেড কোয়ার্টারে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে নিম্নতম বেতনের হার ও রুগ্নতার বীমা করা সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করতে তিনি কন্‌ফারেন্সকে প্রবৃদ্ধ করতে কৃতকার্য্য হয়েছেন। তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি একেবারেই উদাসীন ভাব অবলম্বন করেছিলেন। আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা তিনি বলেন। শ্রমিকদের ভোটের অনুপাত খুবই কম। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই একজন ক'রে গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকেন। তারপরে নিয়োগ কর্ত্তৃগণের তরফ থেকেও একজন ক'রে প্রতিনিধি পাঠানো হয়। গবর্ণমেণ্ট আর নিয়োগ-কর্ত্তৃগণের স্বার্থ এক হয়ে থাকে বলে শ্রমিকে প্রতিনিধি মাত্র এক তৃতীয়াংশ ভোটের অধিকারী হয়ে থাকে। মিঃ গিরি যা বল্‌লেন তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বছরে বছরে এরূপ কন্‌ফারেন্স ডাকার দ্বারা শ্রমিকদের দিক থেকে বিশেষ কিছু লাভের আশা নেই।

মিঃ গিরি যে বার্লিন, প্যারিস ও আমষ্টার্ডামের শ্রমিক কেন্দ্র সমূহে ঘুরেছেন তারো একটা বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। সে সব দেশের অত্যাশ্চার্য্য সংগঠন সমূহের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আমাদের দেশে যে তাদৃশ সংগঠন নেই তজ্জন্য দুঃখও প্রকাশ করেন। এ দেশের আন্দোলনের জন্যে সব সময়ে কাজ করবে এমন কর্ম্মীর প্রয়োজন। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের আন্দোলনের যতটা উন্নতি হয়েছে তাতে সব সময়ের জন্যে কর্ম্মী নিয়োজিত করতে এখনো বহু বিলম্ব আছে। কানপুরে ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হবে তাতে কংগ্রেস যেন দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত হয়, মিঃ গিরি তাই চান।

এতটুকুও মস্তিষ্কের কারবার যে সংগঠনে আছে সে সংগঠন আমার মতে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত কিছুতেই হতে পারে না। জগৎময় জনগণের মধ্যে যে বিদ্রোহের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সে ভাবের সহিত খাপ খাওয়াতে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক আপনার নপুংসকত্ব প্রকাশ করেছে। আমি যা বুঝি তাতে একটা উদ্গত আন্দোলন কখনো মৃত আন্দোলনের সহিত এক হতে পারে না।

কাপড়ের কলের শ্রমিকগণের সঙ্ঘের তরফ থেকে "মজুর" নামক একখানা কাগজ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ বাখলে হয়েছেন এ কাগজের সম্পাদক। এ কাগজে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহের যাবতীয় খবর প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং এর প্রচার হয় শ্রমিক-গণের ভিতরে।

একটি মারাঠী স্ত্রীলোকের সহিত একজন মুসলমানের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সমগ্র মহারাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। "ক্রান্তি" ও "জ্ঞান প্রকাশ" এ দু'খানা কাগজ এ বিয়ের সমর্থন করতে যেয়ে মারাঠীদের বিষ-নজরে পড়েছে। "ক্রান্তি" অবশ্য মার্ক্সের মত-বাদের দিক থেকেই এ বিয়ের সমর্থন করেছে। একজন গ্রাহক এই ব'লে "ক্রান্তি" ফেরৎ দিয়েছেন যে একজন বিশ্বাসঘাতক হিন্দুনারীর পক্ষাবলম্বন করেছে বলেই তিনি কাগজ ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছেন। এর চেয়ে বেশী গোড়ামী আর কি হতে পারে? পুনার একটা সাধারণ সভায় "জ্ঞানপ্রকাশ" পোড়ানো পর্য্যন্ত হয়েছে।

বোম্বের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি মারাঠী ভাষায় শ্রমিক-সাহিত্য প্রচারের জন্যে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছে।

আজ এই পর্য্যন্ত। জি

বিবিধ প্রসঙ্গ

মেয়রের আবিষ্কার

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত হঠাৎ গত সোমবারে আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনটি ধনিকের কারবার নয়। গত সোমবারে কর্পোরেশনের কর্ম্মীসঙ্ঘের সাধারণ সভার একটি অধিবেশন হয়। মেয়র সাহেব স্বয়ং এ সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। কর্ম্মিগণ তিনটি বিষয়ে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:—(১) ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ছুটি নিয়ে গেলেও কর্ম্মিগণের অনুপস্থিতির দরুণ বেতন কাটিয়া লওয়া হয়, (২) সাময়িক (casual) ছুটিতেও বেতন দেওয়া হয় না। (৩) কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চিফ এক্সেকিউটিভ অফিসার মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসু অতিরিক্ত সময় খাটুনি প্রভৃতির সম্বন্ধে যে অর্ডার পাস করেছিলেন সে অর্ডারটি অন্যায়রূপে রদ করা হয়েছে। সাধারণতঃ যে বিষয়ের প্রতি মেয়র সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় সে বিষয়ের জওয়াব না দিয়ে অন্য কথা বলার অদ্ভুত কৃতিত্ব তাঁর আছে। আলোচ্য সভাতেও তিনি এরূপ কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। ওপরের তিনটি বিষয়ের প্রতিকার সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি বলেন নি। অধিকন্তু কর্ম্মীরা যে আপনাদিগকে পদদলিত ও অবহেলিত বলেছেন তাতে তিনি ঘোরতর আপত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন—"এ সব একে-বারেই অতি রঞ্জিত কথা। তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে যা বলছ সেরূপ তোমাদের মোটেই দেখায় না!" তার পরে তিনি আরো বলেছেন যে কর্পোরেশনে কর্ম্মীদের সঙ্গে কোনো অন্যায় ব্যবহার হতেই পারেনা। তাঁর মতে কর্ম্মীরা মোটেই শোষিত নয়, কেননা, কর্পোরেশন ধনিকদের প্রতিষ্ঠানও নয়, জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীও নয়। তাঁর মতে অল্প বেতন, দীর্ঘ সময় খাটুনি প্রভৃতি কথা উঠতেই পারে না। এমন না হলে কি কেউ বার বার তিনবার মেয়র নির্ব্বাচিত হতে পারেন? ওপর ওয়ালাদের সামান্য আব্দারেই বেতন বেড়ে যায়। আর নীচে ওয়ালাদের বেলায় হয় কিনা যে এমন সব কথা উঠতেই পারে না! অফিসার গণের বিলাসের উপকরণ কর্পোরেশন হরদম জোগাচ্ছে। কেরাণী প্রভৃতির বেলাতেই টাকার যত দুর্ভিক্ষ পড়ে যায়। মেয়র সাহেবের লজিক খুবই অদ্ভুত। যেহেতু কলিকাতা কর্পোরেশনটি ধনিক প্রতিষ্ঠান নয়, সেই হেতু তার কর্ম্মিগণের কোনো অভিযোগ থাকতেই পারেনা, কম বেতন হলেও না, বেতন কেটে নিলেও না। কর্পোরেশন যদি লাভের ব্যবসায় না হয় তা হলে ওর জন্যে এত বিবাদ-বিসংবাদ, কংগ্রেসের ভাঙা-ভাঙ হয় কিসের জন্যে? কর্ম্মচারিগণ দয়ার ভিক্ষা চেয়ে কিছুই লাভ করতে পারবেন না। তাঁদের একান্ত উচিত স্বাধীন ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জোর পূর্ব্বক আপনাদের দাবী কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেওয়া। মেয়র প্রভৃতির মুখ চেয়ে তাঁরা যদি সঙ্ঘ গঠন করেন তা হলে তাঁদের দাবী কখনো পূর্ণ হবে না।

হতভাগ্য আকবর খান্

মোহাম্মদ আকবর খান উত্তর উশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার অধিবাসী। তিনি সুশিক্ষিত যুবক। ১৯২২ সনের মে মাসের ৩১শে তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১এ ধারা অনুসারে অর্থাৎ সম্রাটকে তাঁর ভারতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে পেশাওরের সেশন জজের আদালতে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারতের জনগণের উত্থান প্রচেষ্টার জন্যে মোহাম্মদ আকবর খানই সর্ব্ব প্রথম কারাবরণ করেছেন। সাজা পাওয়ার পরে পেশাওর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে তিনি কয়েদ খাট্‌ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর নামে ওপরের লিখিত ধারা অনুসারে আর এক মোকদ্দমা হয়। এ মোকদ্দমাটা একটা নিছক সন্দেহের বশে করা হয়ে-ছিল। দোষারোপ করা হয়েছিল যে কারাগারে থেকেও মোহাম্মদ আকবর খান কাবুলে অবস্থিত বল্‌শেভিক এজেণ্ট-গণের সহিত ষড়যন্ত্র করছিলেন। এর প্রমাণ ছিল জেলের বাহিরে কোনো এক লোকের নিকটে ধৃত একখানা চিঠি, যা মোহাম্মদ আকবর খানের স্বহস্তে লিখিত ছিল না। যাক্, এ দ্বিতীয় মোকদ্দমায় ১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসের ২৭শে তারিখে

পেশাওরের সেশন জজ তাঁকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সীমান্ত প্রদেশের জুডিশিয়েল কমিশনারের নিকট আপীলেও এই সাজাই বহাল থেকে যায়। এর পরে তাঁকে পেশাওর জেল থেকে বদলী করে দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে তিনি মধ্য প্রদেশের রায়পুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে আছেন। জেলে তাঁর চাল-চলন ভালো বলে এবং তাঁর কয়েদ অর্দ্ধেক কাটা হয়ে গেছে ব'লে রায়পুর জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ রিমিশন বোর্ডের নিয়মানুসারে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্যে তাঁর কাগজ পত্র ১৯২৬ সনের নবেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে হাজারার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পেশাওরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে মতামতের জন্যে প্রেরণ করেন। হাজারার তিনি অধিবাসী। তাঁর সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার সত্যকার অধিকার হাজারার কর্ত্তৃপক্ষেরই আছে। পেশাওরে তাঁর মোকদ্দমা হয়ে সাজা হয়েছিল মাত্র। এ ছাড়া পেশাওরের সহিত তাঁর অন্য কোনো সম্বন্ধ ছিল না। জেলার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে মোহাম্মদ আকবর খানের মুক্তিতে আপত্তি করার কিছুই নেই, কিন্তু, আপত্তি করলেন পেশাওরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। ফলে, তাঁর জেলের সদ্ব্যবহারের জন্যে মুক্তির যে কারণ ঘটেছিল পেশাওরের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধতায় তার আর কিছুই হ'লনা। মোহাম্মদ আকবর খানের এই শেষের সাজাটা যে কত নিষ্মম ভাবে দেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে দু'এক কথা এখন আমরা বলব। দ্বিতীয় মোকদ্দমায় বলশেভিক এজেন্ট গণের সহিত ষড়যন্ত্রের অপরাধ আরোপ করা হয়। এই তথাকথিত এজেন্টগণ ছিলেন ডাক্তার নূর মোহাম্মদ ও রিসালদার রুকহুদ্দীন। এঁরা দু'জনই ভারতবাসী। অনেক দিন হলো এঁরা দু'জনাতেই দেশে ফিরে এসেছেন। কিন্তু এঁদের বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমাই আনা হয়নি। অধিকন্তু, রিসালদার রুকহুদ্দীনের যে পেন্সন বাজেয়াফ্‌ত হয়ে গিয়েছিল তাও গবর্ণমেণ্ট তাঁকে পুনরায় মঞ্জুর করেছেন। এ অবস্থায় গরীব আকবর খান যে কেন আজো কারা যন্ত্রণা ভুগছেন তার সদুত্তর কে দেবে? উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোনো ব্যবস্থাপক সভা নেই। একমাত্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। এ সভার কোনো সদস্য দয়া করে একবার ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বরকে জিজ্ঞাসা করবেন কি যে হতভাগ্য মোহাম্মদ আকবর খান কিসের অপরাধে আজো মধ্য প্রদেশের কারাগারে নিগ্রহ ভোগ করছে? সীমান্ত প্রদেশের কোনো মা বাপ নেই। সেখানে কত লোককে যে কত দুর্ভোগ ভুগতে হয় তার কোনো খবর সে প্রদেশের সীমানার বাইরে মোটেই পৌছয় না।

নীচ ষড়যন্ত্র

সমগ্র জগতে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে প্রকৃতভাবে জনগণের তত্ত্বাবধানে সকল কাজ পরিচালিত হয়। এই রাশিয়াই প্রকৃত পক্ষে জগতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে রেখেছে। রাশিয়া চায় সমগ্র জগতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান হোক্। এই ইচ্ছাকে সফল করার জন্যে যে বিশ্ব বিপ্লববাদী সঙ্ঘ আছে সেই কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের হেড্ কোয়ার্টারও অবস্থিত রয়েছে এই রাশিয়াতেই। এ কারণে জগতের লুণ্ঠনকারী দেশ সমূহ রাশিয়ার সোভিয়েটতন্ত্র ও কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রী, লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বনকারী দেশসমূহের দলে যে ইংল্যাণ্ডও আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এ সকল দেশের ইত্যাকার ষড়যন্ত্রের প্রবৃত্তির সুবিধা গ্রহণ করে কয়েকজন হোয়াইট্ রাশিয়ান, যারা জনগণের শাসন বরদাস্ত করতে না পেরে প্যারিস প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, অনেকগুলি দলিল জাল করে অনেক দেশের গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনেক টাকা মেরেছে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশই এ হোয়াইট রাশিয়ানগণকে টাকা দিয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী অর্থ দিয়েছে স্পেন ও ইটালী—যথাক্রমে আটলক্ষ ও পাঁচলক্ষ ফ্রাঙ্ক। মজা এই যে সোভিয়েটতন্ত্র ও কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালকে ধ্বংস করার জন্যে যে লুণ্ঠনকারী দেশগুলি লুণ্ঠিত হচ্ছিল তা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ন্যায় বড় বড় মহারথীরা ধরতে পারে নি। এটা প্রথমে ধরা পড়েছে দারুণ আমেরিকার কিউবা, বলিভিয়া ও চিলির ন্যায় ছোট ছোট দেশের প্যারিসে অবস্থিত দূতগণের দ্বারা। ফ্রান্স গবর্ণমেণ্ট ইতোমধ্যে সলভস্কি নামক একজন হোয়াইট রাশিয়ানকে গেরেফতার করেছে। পুলিশ জেভাট্স্কি ও মিকাইক্ নামক আর দু'জনাকে অনুসন্ধান করছে। আগামী শরৎকালে এ মোকদ্দমার বিচার প্যারিসে হবে। সোভিয়েটতন্ত্র ও কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যালকে ধ্বংস করার অনেক নীচ ষড়যন্ত্রের কথা এ মোকদ্দমায় বের হয়ে পড়বে। কম্যুনিষ্টদের কথা বললে, কিম্বা জনগণের উত্থানের জন্যে চেষ্টা করলেই বৃটিশ ধনিকতন্ত্র সেখানে রাশিয়ার বোলশেভিক গবর্ণমেণ্টের, অন্ততঃপক্ষে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের ষড়যন্ত্র দেখতে পান। এমন কি যাদের মন আভিজাত্যে ভরপুর হয়ে আছে তাদেরকেও বলশেভিক এজেণ্ট বলতে বৃটিশ ধনিকতন্ত্র ছাড়ে না। এবারে প্রমাণিত হয়ে যাবে ষড়যন্ত্রকারী বলশেভিকরা নয়, পরন্তু সে সকল দেশই ষড়যন্ত্রকারী যে সকল দেশ বলশেভিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধ আরোপ করে থাকে। বিচারকরা এবারে আসবেন বিচারাধীনে, দেখতে বেশ মজাই হবে!

চীনের বিপ্লব ও কৃষক

(শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ব্যক্তির হোক্ কি সমাজের হোক্, কি সম্প্রদায় বিশেষের হোক, অত্যাচার, নিপীড়ন বা শোষণ, ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনীতিক বা অর্থনৈতিক যে কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ তা করুক না কেন, যখন একটা সহনশীলতার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে যায়, তখন সেই অত্যাচারিত, নিপীড়িত এবং শোষিত আপনার অস্তিত্বকে বজায় রাখবার জন্য নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। তখন সে চুপ করে থাকেনা বা থাকতে পারে না। যে গতি ও শক্তির ক্রিয়ার অন্তঃপ্রেরণা প্রতি নিয়ত সে অনুভব করতে থাকে তারি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম রূপে সে অত্যাচারী নিপীড়ক ও শোষকের প্রতিশোধ লইবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এই যে নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মের ক্রিয়া, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সময়ে দেখতে পাওয়া যায় তারই নাম করা হয়েছে বিপ্লব। আত্মচেতনালব্ধ অত্যাচারিতের গতির নাম দেওয়া হয়েছে বিপ্লব। অত্যাচারী এটাকে যতই

বিভীষিকার চক্ষে দেখুক না কেন, অত্যাচারিত জানে এই তার পক্ষে অমোঘ মন্ত্র।

বৈদেশিক ধনিক-বণিকের নির্ম্মম অন্যায় অত্যাচার আর সহ্য কর্ত্তে না পেরে চীনবাসীর মধ্যে যাঁরা দেশ হিতৈষী তাঁরা আজ আত্ম প্রতিষ্ঠ গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের রক্ত পতাকা মূলে দাঁড়িয়েছেন। চীন আজ চায় সর্ব্ব বৈদেশিক ধনিক বণিকের অত্যাচারের মূলে তীব্র কুঠারাঘাত করতে। চীনের আত্ম চেতনার এই যে জয়যাত্রা, এর মূলে আছেন যদিও এক নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়, তবুও এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি রয়েছে একটী সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর। সেটী হচ্ছে এই যে এই বিপ্লবায়োজন চলছে চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের সহিত অন্তরের ও বাহিরের নিগূঢ় যোগ রেখে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর এটা বেশ স্থির ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে কোন প্রদেশেরই বিপ্লব প্রচেষ্টা আজকের দিনে সার্থক হয়না তার সংখ্যাধিক্যের সহানুভূতি না পেলে, আর গণের কোন প্রাণের বা স্বার্থের যোগাযোগ না থাকলে গণসঙ্ঘের সহিত বিচ্ছিন্ন কোন স্বাধীনতা আন্দোলনই এই বিংশ শতাব্দীতে সফল হতে পারে না। যা হ'ক্ ভারত এতদিন ধরে না বুঝলেও চীন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সত্যটীকে অস্বীকার করতে পারেনি। তাই আমরা আজ চীনে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের কথা শুন্‌তে পাই। চীনের জাতীয়দল কুয়োমিন্‌টাং সম্প্রদায় তার কার্য্যবিধিতে শ্রমিক ও কৃষকের দাবীকেই বড় করিয়া দেখিয়েছে। চীন আজ তার বহিঃশত্রু শোষণবাদ এবং অন্তরশত্রু ধনিকবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সত্যই আজ সমস্ত পরনিষ্পেষিত দেশ চীনের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে,—তাদের আন্তরিক কামনা চীন তার মঙ্গলযাত্রায় জয়যুক্ত হউক। শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ লক্ষ্যের বিষয় বলে এই দলের প্রভাব দেশবাসীর মধ্যে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। এই জাতীয়দল চীনের দক্ষিণাংশে ক্যাণ্টনে তাদের বিপ্লব-পতাকা উড়িয়ে দিয়ে ক্রমেই সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। জগৎ একদিন দেখতে পাবে যে মহাচীন এই দলের আয়ত্বে এসেছে। প্রত্যেক দেশের অধিবাসীর মধ্যে গড়ে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগের বেশীই হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষক। তাই যদি কোন দেশে কোন আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে হয়, তবে সেই আন্দোলনের বিশেষতঃ বিপ্লব আন্দোলনের অন্তরধারাকে জুড়ে দিতে হবে সেই দেশের অত্যাচারিত নিষ্পেষিত শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের সহিত। এই আন্দোলনকে বিসর্পিত করতে হবে দেশের যারা বেশীর ভাগ সেই শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে। কেবলমাত্র রাশিয়াই যে এই বিপ্লবের নবমন্ত্রে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে এই সত্যের বিজয়বার্ত্তা দিকে দিকে বিঘোষিত করছে তা নয়—নানা দেশের স্বাধীনতা সমরে পুরাতনপন্থী বিপ্লববাদের অসাফল্যের ভিতর দিয়েও কি ঐ এক সত্যের ইঙ্গিত পাই না? শত শত বৎসর ধরিয়া সহস্র চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারে ও যখন মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের আত্মদানে যখন দাসত্বের শৃঙ্খল মোচিত হচ্ছে না তখন কি এটা প্রমাণিত হয় না যে পুরাতন পন্থায় নিশ্চয়ই কোন দোষ আছে। কিন্তু সে দোষটী কি? সেটী হচ্ছে যে সেই সব আন্দোলনের সহিত শ্রমিক ও কৃষক, এক কথায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ দাবীর কাছে যে কোন শক্তি জয়ী হ'তে পারেনা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রধানতম শত্রু ফ্যাসিষ্ট নেতা মুসোলিনির শ্রমিকের দাবী স্বীকার করবার চেষ্টা করা।

যাই হ'ক এ প্রবন্ধে চীনের শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করব না। চীনের বর্ত্তমান বিপ্লবান্দোলনের সহিত চীনের কৃষকদের যোগাযোগ ও সম্বন্ধ কোন্ প্রকারের সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলব। সাধারণতঃ চীনের শ্রমিক জাগরণের কথা আমরা যা হয় কিছু মাঝে মাঝে শুনতে পাই, কিন্তু কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। এর কারণানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাই যে বৈদেশিক ধনিক বণিকগণ তাদের নীচ স্বার্থ সাধনে ব্যাঘাত শুরু হলেই অমনি নানা প্রকার চীৎকার আরম্ভ করে। তাদের মিথ্যা চীৎকারে তারা জগৎকে জানিয়ে দিতে চায় যে তাদের প্রতি শ্রমিকেরা বিশেষ অন্যায় দাবী করছে। কিন্তু কথা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, চীনে কৃষির জন্য অর্থ ব্যয় করার চেয়ে শিল্পে ব্যয় করাই বিশেষ লাভজনক। তাই বৈদেশিক ধনিকেরা তাদের অর্থ শিল্পেই ব্যয় করেন। কৃষির দিকে তাদের মোটেই দৃষ্টি নেই। কৃষির সহিত সম্বন্ধ নেই বলেই কৃষকের সহিত ও তাদের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। পরোক্ষভাবে তারা অবশ্য কৃষকদের লুঠছে। এ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকার দরুণ আমরা চীনের কৃষকদের কথা বড় একটা শুনতে পাইনা। বৈদেশিক বণিকের শিল্প কার্য্যে শ্রমিকের যথেষ্ট প্রয়োজন। তাই তাহারা চীনের শ্রমিকদের কার্য্যে নিযুক্ত করেন—এবং তাদেরই শ্রমার্জ্জিত ধন আত্মসাৎ করে নিজেদের উদর পুষ্টি করেন। এই যে শ্রম বিমুখ ধনিকদের দ্বারা শ্রম পরায়ণ শ্রমিকেরা শোষিত হয় তার বিরুদ্ধে যখন শোষিত শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শ্রমিক সঙ্ঘের ভিতর দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের বেতন বৃদ্ধি বা অন্য প্রকারের ন্যায় দাবী করে, তখনই ধনিকদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তখন তারা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এই কারণেই চীনের শ্রমিকের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। আর কৃষকের কথা মোটেই শোনা যায় না। তবে মাঝে মাঝে চীনের কৃষক সম্বন্ধে আমরা যে দুই একটী উক্তি শুনিতে পাই তাও সঠিক্ নয়। চীনের কৃষক সম্বন্ধে আমরা হয় শুনি যে তারা সমষ্টি গত ভাবেই ভূমির অধিকারী, না হয় তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মালিক এবং তারা যে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তনকেই এড়িয়ে চল্‌বার বিশেষ পক্ষপাতী। তবে আমরা যদি চীনের জাতীয় দল কুয়োমিন্‌টাং সম্প্রদায়ের বিবরণ পাঠ করি তাহলে চীনের কৃষক সম্বন্ধে অনেক কিছু সত্যই আবিষ্কার করতে পারি। চীনের কৃষকদের অবস্থা জানা যাবে বলেই যে শুধু ইহার মূল্য তা নয়, চীনের বিপ্লবের সহিত কৃষকদের কি সম্বন্ধ এইটীই দেখান হয়েছে বলে ইহার মূল্য-খুবই বেশী। ভারতের ন্যায় অন্যান্য শোষিত দেশেরও এই বিষয়ে অনেক শিখবার আছে। চীনে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণের অনুমতি না পেলেও যদি ভারত তাদের এই শিক্ষা গ্রহণ কর্‌তে পারে, তা হলেও চীনের প্রতি তা'র কম সহানুভূতি প্রদর্শন হবে না।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১॥৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু, প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—

গণবাণী কার্য্যালয়—

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Saraswaty Press at 1, ... Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ৪ঠা আগষ্ট ১৯২৭, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৪ | ২৫ম সংখ্যা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যিনি এক সঙ্গে "গণবাণী"র পাঁচজন গ্রাহক সংগ্রহ ক'রে দিবেন তাঁকে এক বছর বিনা মূল্যে গণবাণী দেওয়া হবে।

ম্যানেজার—"গণবাণী"
৩৭, নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

| ১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৭, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৪ | ২৫ম সংখ্যা |

নিবেদন

—০—

[শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকগণের প্রতি]

———

(মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)

———

বর্ত্তমান সময়ে দেশময় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষের কথাটাই আর সকল কথার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, সত্য কথা বলতে গেলে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থের খাতিরে এ কথাটাকে বড় করে তোলা হয়েছে। যে সকল কথার কোনো মানে নেই সে সকল কথা নিয়ে ঝগড়া-কলহ, এমন কি মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত করা যেন ভারতবর্ষের হিন্দু আর মুসলমানগণের একমাত্র ধর্ম্ম হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে ধর্ম্মের ভাবটা খুবই বেশী। একথাটাকে আরো খোলাসা করে বলতে গেলে এই বলতে হবে যে ধর্ম্মের নাম ক'রে ভারতের লোকদিগকে, বিশেষ করে ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকদিগকে যত বেশী ঠকানো যায় এমনটা জগতের আর কোনো দেশেই পারা যায়না। জগতে এমন সব লোক রয়েছে যারা শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত ভাবে আপন আপন শ্রেণীর বা কেবল আপনার লাভ-লোকসান ছাড়া আর কিছুই বোঝেনা। তাদের ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবীটা রসাতলেও যদি যায় তাতেও তারা মনে করে যে তাদের কিছুই ক্ষতি হবেনা। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেরা কোনো মেহনত করেনা পরের মেহনত লুঠ করে খাওয়াই তাদের রীতি ও অভ্যাস। জমীদার, মহাজন, কারখানার মালিক, মোল্লা-পুরোহিত, সন্ন্যাসী-ফকির প্রভৃতি কি কখনো কোনো পরিশ্রম করে? পৃথিবীর কোনো কাজই বিনা মেহনতে হতে পারে না, একথা সকলেই বোঝে। অথচ যারা কোনো মেহনত করেনা তাদেরই দিন কাটে আরামে আর বিলাসে, আর যারা রাতদিন খেটে খেটে মরে যাচ্ছে তাদের সকল দিকেই অভাব, তাদের দুঃখ কষ্টের কোনো শেষ নেই। একটানা অভাবের ভিতর দিয়ে কেবল মাত্র খেটে মরার জন্যেই যেন তাদের জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধনে ধান্যে ভরা পৃথিবীতে যারা সে সবের উৎপাদক তারাই থাকলো সব কিছু হতে বঞ্চিত হয়ে, আর যারা কখনো কিছু উৎপাদন করলে না সেই সামান্য কজ'ন লোক, শতকরা ৫ জনও নয়, হলো কিনা উৎপন্ন করবার সকল উপায়ের মালিক! পরম বিচারক আল্লা-ভগবানের রাজ্যে এমন অবিচার কেন হয় তা যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তা হলে মোল্লা-পুরোহিত, সন্ন্যাসী-ফকির প্রভৃতি একযোগে বলে উঠে যে এ হচ্ছে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল আর নসীবের লেখা।

ভারতের চাষী মজুর ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকেরা চিরকালই কি এমনি ভাবে পূর্ব্বজন্ম ও নসীবের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে লুণ্ঠিত হতে থাকবে? কৃষকগণ যাবতীয় খাদ্য-শস্য ও কাঁচামাল পয়দা করে থাকে। শ্রমিকগণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুই তৈয়ার করে। সব কিছুর উৎপাদক হওয়া সত্বেও তাদের অবস্থা এত বেশী খারাব কেন হয় সেটা বিচার করে দেখার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কৃষক খাবার জিনিস উৎপন্ন করে বটে, কিন্তু তার ঘরে খাবার থাকে না। ভালো পোষাক সে পরতে পায়না, ভালো ঘরে বাস করা কখনো তার ভাগ্যে ঘটে উঠে না। মজুরদের অবস্থা আরো খারাব। দিনে দশ, এগারো, কোথাও বা ষোলো ঘণ্টা পর্য্যন্ত খেটেও তারা যা খেতে পায় তা মানুষের খাদ্য মোটেই নয়। ঘরের নামে দুর্গন্ধে ভরা যে অন্ধকূপগুলিতে তারা বাস করে থাকে সে গুলি মানুষের ত দূরের কথা, কোনো পশুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপযোগী নয়। আবার এ নরককুণ্ডগুলির ভাড়া শোধ দিতে না পারলে মালিকগণের জুলুমের কোনো সীমা থাকে না। পাথর ভেঙে, মাটি কেটে সুন্দর সুন্দর রাস্তা

যারা তৈরী করেছে, শহরের পর শহর যারা পত্তন করেছে, বড় বড় পাকা ইমারতগুলি যাদের হাতের তৈরী তাদেরকে কিনা বাস করতে হয়, কাদা, পচা জল ও দুর্গন্ধে ভরা পরিত্যক্ত পল্লী-গুলিতে। অসুখ-বিসুখ হলে পথ্যের ও ঔষধের অভাবে তাদের কোলের বাছারা কোলেই মরে যায়। কেউ তাদের প্রতি চেয়েও দেখে না। আর ধনীর বাড়ীতে যদি কারো সামান্য অসুখও হয় তা হলে সেখানে একটা অদ্ভুত কাণ্ড বেধে যায়। এ ডাক্তার সে ডাক্তারের আগমনে, এর ওর তার হায় আফসোসে সমস্ত পাড়া মুখরিত হয়ে উঠে। কৃষকের থালায় যখন ডাল ভাতও পড়েনা তখন জমীদারের ঘরের রকমারি খাদ্যের সুগন্ধে পাড়া ছেয়ে ফেলে। কিন্তু, জমীদার কি কখনো কিছু উৎপন্ন করেছে তার নিজের হাতে?

নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আফিস, আদালত ও দফতর-গুলোকে রাতদিন খেটে খেটে দাঁড় করিয়ে রাখে, আর মজা লুঠে তাদেরই ভাই বেরাদর বড় বড় অফিসাররা। তাদেরই মধ্য থেকে যারা ডাক্তার উকিল প্রভৃতি হয়ে বের হয় তারা তাদের প্রতি চেয়েও দেখে না। তাদেরই লোকেদের দিয়ে তাদের শোষণ করানো হয়। আফিসে-আদালতে মাইনে যখন বাড়ে, তখন বেশী মাইনে ওয়ালাদেরই বাড়ে। কথায় কথায় কাজ থেকে কম মাইনে ওয়ালারাই অপসারিত হয়ে থাকে। এরূপভাবে প্রতিনিয়তই তারা অবহেলিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। তাদেরও ঘরগুলি দুঃখ-কষ্ট ও দৈন্যে ভরা। কিন্তু, চাষী ও মজুরদের চেয়ে অধিকতর সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তারা চাষী ও মজুরের সহযোগে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় না। তার কারণ এই হচ্ছে যে সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা নিম্ন মধ্য-শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে একটা ভদ্রত্বর মোহ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাদেরকে বলা হয়ে থাকে যে "তোমরা চাষী-মজুরদের মত ছোট লোক নও, তোমরা ভদ্রলোক। তোমাদের পেটে অন্ন থাক্ আর না থাক্, আমাদের সাথে মিশবার, ওঠা বসা করবার অধিকার তোমাদের আমরা দিচ্ছি।" এই মিথ্যা ভদ্রত্বর মোহতে আবিষ্ট হয়ে আমাদের নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকেরা কৃষক ও শ্রমিকদিগের থেকে দূরে দূরে সরে থাকে।

কিন্তু, সমাজের এ সব বৈষম্য দূর করতে না পারলে দেশের জনগণের দুঃখ-কষ্টের অবসান কিছুতেই হবে না। অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা বিরাট-বিশাল গণশক্তি যে প্রতিনিয়ত শোষিত, পদ-দলিত হচ্ছে তার শেষ না করলেই নয়। এর জন্যে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকদিগকে একই স্বার্থবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে একই জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে। চারদিক থেকে কি ভাবে তারা শোষিত হচ্ছে সেটা তেদের বিশেষ করে তলিয়ে বোঝা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

জমীদার জমীর জন্যে কিছু করে না। জমীর উন্নতি বিধান করছে কৃষক, জমী থেকে ফসল উৎপন্ন করছে কৃষক, অথচ সেই কৃষকেরই ঘরে অন্নের জন্যে হাহাকার লেগেই আছে। কার-খানাতে খেটে মরছে মজুর আর মজা লুঠছে কারখানার তথাকথিত মালিকরা। মালিক যে মূলধন কারখানায় ঢাল্‌ছে তার পাঁচগুণ তুলে নেবার পরেও সে কারখানার মালিক থেকে যায়। মজুরদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ওপরে দস্যুপনা করেই মালিকেরা মজা করে যাচ্ছে। মজুর যেখানে পাঁচ টাকা রোজগার করছে সেখানে তাকে দেওয়া হয় মাত্র এক টাকা কি দেড় টাকা। মজুরদের অতিরিক্ত পরিশ্রমটা অপহরণ করে বলেই পুঁজির পাঁচগুণ তুলে নেওয়া সত্বেও কারখানা চলে এবং খুব জোরে জোরে চলে।

কিন্তু, সামাজিক ও অর্থনীতিক বৈষম্য এভাবে কতকাল চলতে থাকবে? কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নশ্রেণীর লোকগণ এক জায়গায় জমায়েৎ হয়ে এ সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করুক। সমাজ দেহে পরগাছা স্বরূপ হয়ে যারা সমাজের দেহের রক্ত চুষে খাচ্ছে তাদেরকে নিপাত না করতে পারলে দেশের মঙ্গল কিছুতেই হবে না। আমাদের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার কাণা-কড়ির মূল্যও থাকবে না যদি সে স্বাধীনতার ভিত্তি সামাজিক ও অর্থনীতিক স্বাধীনতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ইংল্যাণ্ডের ধনীদের পরিবর্তে ভারতের ধনীদেরকে আমাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা করলে আমাদের অবস্থার এতটুকুও উন্নতি হবে না। তখনই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হবে যখন দেশের জনসাধারণের হাতে দেশের সকল ক্ষমতা আসবে। কিন্তু, যতক্ষণ সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনীতিক উৎপীড়ন থাকবে ততক্ষণ কিছুতেই দেশের জনসাধারণের হাতে কোনো ক্ষমতাই আসতে পারে না।

আমাদের সমাজের নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকগণ আপনাদিগকে কৃষক ও শ্রমিকগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে আপনাদের পায়ে কুঠারাঘাত করে আসছে। তারা যদি এমনি ভাবে আপনাদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখে তা হলে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা মুশ্‌কিল হয়ে পড়বে। যারা তাদের শোষক তাদের সহিত তাদের স্বার্থ কখনো এক হতে পারে না। শোষিত মাত্রকেই এক পতাকা-তলে দণ্ডায়মান হয়ে শোষকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ভাই, নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর লোকগণ, তোমাদের ভদ্রত্বর অহঙ্কার তোমরা পরিহার কর। একটুকু চিন্তা করে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে এ অহঙ্কার তোমাদের পায়ের বেড়ী হয়ে আছে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামে তোমরা হবে জ্ঞানের যোগাড়ীয়া, শ্রমিকেরা হবে অগ্রগামী সৈন্যদল, আর কৃষকেরা হবে বিশাল রক্ষিত সৈন্য। সমস্বার্থ বোধের দ্বারা তিন দলের সমবেত সংগ্রামের দ্বারা আমরা যা লাভ করব তা যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে তা নয়, সামাজিক ও অর্থনীতিক স্বাধীনতাও তা হবে।

শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্য শ্রেণীর ভাইগণ, দেশে যে একটা ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক কলহের বান ডেকেছে এ বান থেকে তোমরা আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রেখো। ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে এ সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি করা হয় নি, এ হয়েছে তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্যে। এ কলহের পেছনে ধনীদের হাত কাজ করছে। তারা চায় কোন কিছুর দ্বারা তোমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে। তোমরা সকলে এক স্বার্থ বোধের দ্বারা একীভূত হলে ধনিক, বণিক ও জমীদারের সর্ব্বনাশ হবে। তারি জন্যে তারা এ সর্ব্বনেশে বিরোধ দেশে বাধিয়ে দিয়েছে। কেবল মাত্র নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তোমাদের অনেক আপন লোকই এ বিরোধাগ্নিতে কাঠ ও কয়লা যোগাচ্ছে। কেউ সস্তা দামের খবরের কাগজ বা'র করে দিয়েছে। কাগজ বিক্রীর পয়সাতে তার পকেট ভরে উঠেছে। আবার কেউ বা প্রচারক সেজে তোমাদেরকে উত্তেজিত করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছ থেকে আদায় ক'রে দু'পয়সা তার নিজের পকেটেও ফেলছে। এই শেষ বস্তুটিই তার প্রকৃত লক্ষ্য, ধর্ম্মটা উপলক্ষ্য

মাত্র। এ সকল লোকের খর্পরে পড়ে তোমরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করছ।

ভ্রাতৃগণ, ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস তোমাদের প্রতিষ্ঠান না হয়ে বড়লোকদের প্রতিষ্ঠান হয়ে আছে। সে জন্যে কংগ্রেস তোমাদের স্বত্ব স্বামিত্বের জন্যে কোনো চেষ্টাই করেনি। বাংলা ও বোম্বেতে কৃষক ও শ্রমিক দল (The Workers' and Peasants' Parties) গঠিত হয়েছে। শীঘ্রই এ দল সমগ্র ভারতময় গঠিত হবে। এ দলের উদ্দেশ্য ভারতের জনসাধারণের জন্যে জনসাধারণেরই দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। তোমরা সকলে এসে এ দলের পতাকাতলে সমবেত হও। এ দলের ভিতর দিয়ে কংগ্রেসকেও তোমরা অধিকার করে নিতে পারবে।

—•—

চীন বিপ্লবে নূতন পন্থা

—•:•:•—

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়)

—•—

সাম্রাজ্যবাদীর দল চীনের ন্যাশনালিষ্টদের কাছে ক্রমাগতই যখন পরাজয় স্বীকার করছিল ঠিক সে সময়ে খবর এল যে 'কুও-মিন্-টাঙ্গে ভাঙ্গন ধরেছে—জেনারেল চিয়াং-কৈ-শেক দল থেকে ছট্‌কে পড়েছে। জেনারেল চিয়াং এর সামরিক শক্তিই কুও-মিন্-টাঙ্গের জয়যাত্রার প্রধান কারণ। তাই, যখন এ সংবাদ এল তখন যাঁরা চীনের এই অগ্রগমনকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন তাঁরা অনেকে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কুও-মিন্-টাঙ ধীরে ধীরে আবার শক্তি সঞ্চয় করেছে—সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আবার তার জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ডেলিগেশান এই জাতীয় অভ্যুত্থান দেখবার জন্যে চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের একজন সদস্য আল্ ব্রাউডার জুলাই মাসের "লেবার মান্থলি"তে কুও-মিন্-টাঙ্গের এই ভাঙ্গন ও তার নবশক্তি সঞ্চয়ের ইতিহাস নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন। সে প্রবন্ধের সার সঙ্কলন এখানে করে দিলাম।

হাঙ্কোতে গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পুনর্গঠন হয়েছে ও তারি সাথে সাথেই বৈপ্লবিক সৈন্যদল কর্ত্তৃক নান্‌কিং ও সাংহাই দখল হওয়ার ফলে চীন-বিপ্লবের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছে। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা একদিকে তীব্র হয়ে উঠেছে, অপরদিকে এরি ফলে চীনের মধ্যাংশ যে জাতীয় দলের আয়ত্তে কয়েক মাসের ভিতরেই আস্‌বে এ কথাটা সব লোকের মুখে মুখেই ফিরছে।

১১ই মার্চ্চ তারিখে যে নূতন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে তাতে চীনের কম্যুনিষ্ট দলের প্রতিনিধিরা আছেন। কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী হয়েছেন টান-পিঙ-শান্; ইনি সদ্য মস্কো থেকে ফিরেছেন। সেখানে তিনি কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশানালের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটিতে চীনের প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রম বিভাগের মন্ত্রী সৌ-চেঙ-সেন্ হচ্ছেন অল-চায়না লেবার ফেডারেশন ও চৈনিক নাবিক সমিতির সভাপতি, বিখ্যাত হং কং ধর্ম্মঘটের সর্ব্বপ্রধান নেতা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্র সমিতির সভ্য। কম্যুনিষ্ট দলের দুইজন বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দুইটি প্রধান বিভাগের ভার দেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে চীনের বিপ্লব কোন্‌মুখী হয়েছে।

চীন বিপ্লব-ধারার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে অ্যামেরিকান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে যেমন বিস্মিত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি একটা মস্তবড় ধাক্কাও খেয়েছে। কুও-মিন্-টাঙ্গের সাম্রাজ্যবাদীর দল-ঘেঁষা ডাইনের (নরমপন্থী) অংশটাকে যারা একেবারে নিজেদের হাতে আন্‌বার চেষ্টায় কোনরূপ উপায়ই বাদ দেয় নাই, জেনারেল চিয়াংকে হাতে এনে কুও-মিন-টাঙ্গের কেন্দ্র ও বাঁয়ের কম্যুনিষ্ট অংশ দুটোকে ঘায়েল করবার আশায় যারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ হাঙ্কোর এই নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন দেখে তারা যে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে উঠবে এত জানা কথাই। তারা ভেবেছিল জেনারেল চিয়াং কুও-মিন-টাঙ্গের ন্যাশনালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট দলটাকে ধ্বংস করে ফেলবে ও জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হবে, কিন্তু তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এই আশা ভঙ্গের মনস্তাপই যে নানকিং ও ওয়েইচৌর সহস্র সহস্র চীন নরনারী ও অসহায় শিশুর রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করতে আমেরিকান্ ও ব্রিটিশ রণতরীকে প্রবৃত্ত করেছিল, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সাম্রাজ্যবাদীদের আশা পূর্ণ হবার যে অনেকটাই লক্ষণ মাঝখানে দেখা দিয়েছিল তা স্বীকার কর্ত্তে হবে। কুও-মিন-টাঙ্গের সামরিক প্রভাব যখন এক কোয়াংটুঙ্গ প্রদেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, সেখানকার প্রত্যেকটি দুর্গম স্থান ব্রিটিশের কামান শ্রেণী যখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধূলিসাৎ করতে পারত তখন হঠাৎ ২০শে মার্চ্চ (১৯২৬) তারিখে কুও-মিন্-টাঙ্গের ডাইনের দল সৈন্যদলের ও হোয়াম্পো মিলিটারী অ্যাকাডেমীর অধ্যক্ষ জেনারেল চিয়াং-কৈ-শেকের নেতৃত্বে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দখল করে' বসল ও কম্যুনিষ্টদের সকল কর্ত্তৃত্ব হতে একদিকে যেমন বিতাড়িত করল, অপরদিকে সান্-ইয়াৎ-সেনের প্রধান শিষ্য এবং কুও-মিন-টাঙ্গের নির্ব্বাচিত সভাপতি ওয়াং-চিং-ওয়েইকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হল। এ সময় থেকেই জাতীয়দলের ওপর অ্যামেরিকান ও ব্রিটিশ কাগজওয়ালারা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তারপর চিয়াং-কৈ-শেক যখন প্রধান সেনাপতিরূপে উত্তর চীন বিধ্বস্ত করে' ফেলল ও নভেম্বরে উ-হান প্রদেশের সহরগুলি দখল করল তখন সাম্রাজ্যবাদীরা কুও-মিন-টাঙ্গে ডাইনের দলই সর্ব্বে সর্ব্বা হয়েছে মনে করে' অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিল।

কিন্তু তাদের স্বপ্ন হঠাৎ কেমন করে' ভেঙ্গে গেল ; কেমন করে কুও-মিন-টাঙ্গের কেন্দ্র ও বাঁয়ের জাতীয় ও কম্যুনিষ্ট দল এক হয়ে' জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে নিজেদের হাতে নিয়েছে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বুঝতে হবে যে চীনের বিপ্লব ধারা জাতির পরতে পরতে কেমন ছেয়ে গিছ্‌ল।

বৈপ্লবিক সৈন্যদল যখন কোয়াংটুঙ্গ থেকে হোনান কিয়াংসি ও হুপের বুকের ওপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখনই চিয়াং কৈ-শেককে পরাস্ত করতে যে শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তি তৈরী হয়েছিল। বৈপ্লবিক সৈন্যদল যেভাবে উত্তর চীনের সহরের পর সহর দখল করেছে তা জগতের চক্ষে বিস্ময়কর বলে পরিগণিত হয়েছে ; তাদের এই বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছিল, কারণ, জনসাধারণ সামরিক-অভিজাতদের শোষণে

একেবারে 'মরিয়া' হয়েছিল—অনেক স্থলেই এমন হয়েছে যে বৈপ্লবিক সেনাদলের আগমন সংবাদ পেয়ে অত্যাচারিত জনসাধারণ নিজেরাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে' শোষক সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করেছে।

একদিকে বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনী যেমন অগ্রসর হচ্ছিল অপর দিকে তেমনি সমগ্র চীনের শ্রমিক-সংঘগুলিকে একত্রিত ক'রে নিখিল-চীন শ্রমিক ফেডারেশন এবং চাষীদের সংঘবদ্ধ করে' কৃষক-সংঘ গঠন করা হয়। এক বৎসরের কম সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নূতন সদস্যের সংখ্যা হয় প্রায় দশ লক্ষ আর কৃষক-সংঘের হয় ১০ লক্ষেরও বেশী। এই সংঘ গঠনের থেকেই বিপ্লবের প্রকৃত কাজ—সামরিক শক্তি, আভিজাত্যে ও উৎকোচগ্রাহী শাসনকর্ত্তার এবং পরবিত্তোপজীবী গ্রাম্য ভদ্রশ্রেণীর ভিত্তিমূল শিথিল হতে শুরু হয়। এরি ফলে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার কার্য্যক্ষেত্রও বহুদূর প্রসারী হয়ে পড়ে। এ সময় সেণ্ট্রাল কুও-মিন-টাঙ্গ স্থির করলে যে গভর্ণমেণ্টের আস্তানা ক্যাণ্টন থেকে সরিয়ে হাঙ্কোয় (উ-হানএ) নিতে হবে; কারণ, ক্যাণ্টনের নাকের ডগায় সাম্রাজ্যবাদীদের রণতরী ও সৈন্য বাহিনী কামান ও রাইফল্ উঁচিয়ে সব সময়ই থাকে! তাদের যখন খুসী গোলা ছেড়ে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্বকে অতি সহজেই সন্দেহসঙ্কুল করে' তুলতে পারে। কিন্তু হাঙ্কোতে গভর্ণমেণ্ট সরে গেলে সে ভাবনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কারণ মধ্য-চীন প্রায় সমস্তটাই বিপ্লবী আবহাওয়ায় পূর্ণ, আর সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের কামানের গোলাকে পৌছুতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাই একবার হাঙ্কোতে গভর্ণমেণ্টের আস্তানা গাড়তে পারলে সেখান থেকে প্রাদেশিক সামরিক-অভিজাত ও সাম্রাজ্যবাদীদেরও যেমন জব্দ করা যাবে তেমনি কুও-মিন টাঙ্গের আপন ঘরের বিশ্বাসঘাতকদেরও পঙ্গু করা সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে।

চিয়াংএর নেতৃত্বাধীন কুও-মিন-টাঙ্গের ডাইনের দল কেন্দ্র ও বাঁয়ের দলের (চরমপন্থীদের) এই চাল যে বুঝেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু ক্যাণ্টন ত্যাগের যে সব অকাট্য যুক্তি ছিল তা অস্বীকার কর্ত্তে অক্ষম হয়ে' নানা তাল-বাহানায় তারা যাত্রার দিন ক্রমেই পেছিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে চিয়াং বাধ্য হয়ে হাঙ্কোতে গভর্ণমেণ্ট উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আজ্ঞা দেয়, কিন্তু প্রধান প্রধান বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা নান্চাঙ্গে উপস্থিত হলে তিনি আর অগ্রসর হওয়া বন্ধ করেন। এদিকে কুও-মিন-টাঙ্গের কেন্দ্র কমিটি হাঙ্কো যেয়ে পৌছে। কেন্দ্র কমিটি কিছুদিন অপেক্ষা করে যখন দেখলে যে গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই হাঙ্কোতে আসছে না তখন তারা এক জয়েণ্ট কন্ফারেন্স খাড়া করে' তার ওপর গভর্ণমেণ্ট চালাবার ভার ন্যস্ত করে। চিয়াং প্রথমতঃ এই কন্ফারেন্সের কর্ত্তৃত্ব মেনে নিয়ে পরে এ'কে বে-আইনী সভা বলে' ঘোষণা করে। কেন্দ্র কমিটীর সদস্যেরা যখন দেখ্লেন যে চিয়াং কিছুতেই সেণ্ট্রাল কুও-মিন-টাঙ্গের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করছে না তখন তাঁরা স্থির করলেন যে সেণ্ট্রাল কুও-মিন-টাঙ্গ ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আর বিলম্ব না করে' বিপ্লব-চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে। চিয়াং এদিকে ঘোষণা করে' দিল যে হাঙ্কোর সেণ্ট্রাল কুও-মিন-টাঙ্গ বে-আইনী এবং নানচাঙ্গে সে এক সেণ্ট্রাল কমিটি খাড়া করে গভর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করে। এমনি করেই কুও-মিন-টাঙ্গের সঙ্গে চিয়াংএর বিবাদ প্রকাশ্যভাবে বেধে ওঠে। হুপের ট্রেড ইউনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষ'ও হুপে কুও-মিন-টাঙ্গের একসিকিউটিভ কমিটি চিয়াংকে বিপ্লবের শত্রু বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। হাঙ্কোর সেণ্ট্রাল কুও-মিন্-টাঙ্গের মুখপত্র "মিন কুও জিপাও" লিখ্ল:—

The party has lost its power, and all the power has gone to the hands of a dictator and the highest organisation of the party has lost its function.

Help the Central Executive Committee to overthrow the condition of usurpation, to restore the spirit of democracy, to make all party members obey the orders of the party.

Now it is time for us to manifest the power of the party whether our party will even exist depends entirely upon whether we can make the power of the party felt.

জেনেরাল চিয়াং হোয়ামপোর মিলিটারী অ্যাকাডেমিকে ও বৈপ্লবিক সৈন্যদলকে হস্তগত করে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়ায়। তার মতিগতি যে অভিজাত শ্রেণীর দিকেই ছিল তার প্রমাণ সে কর্ত্তৃত্ব পেয়েই গোপনে ক্যাণ্টন মিউনিসিপাল কুও-মিন-টাঙ্গ ও কিয়াংসি প্রাদেশিক কুও-মিন-টাংকে ধ্বংস করে এবং ফেঙ্গটিয়েন ও সাণ্টাঙ্গের সামরিক অভিজাতদের সাথে আপোষ করে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সন্ধি করে হাঙ্কো ও ফিউচিয়াঙ্গের উদ্ধার সাধনে অস্বীকৃত হন। রাশিয়ার সাথে মৈত্রী নষ্ট করে ও জাপানের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে সে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের তথা সান ইয়াৎ সেনের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়; সে নানাস্থানে শ্রমিক সংঘ ও সেণ্ট্রাল কুও-মিন-টাঙ্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত সমিতি ও তাহার কর্ম্মীদের ধ্বংস সাধন করে।

তাহার স্বরূপ ক্রমশঃই যেমন ফুটে উঠতে লাগল তেমনি তার বিরুদ্ধে চারিদিকে বৈরিতাও জেগে উঠল।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক ডেলিগেশান তার অত্যাচারের ও বিশ্বাসঘাতকতার বহু প্রমাণ পেয়েছেন এবং সে সব প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। তাঁরা চিয়াংএর দলের নিকটও গিছলেন এবং চিয়েংএর দলস্থ ব্যক্তিদের কথাও শুনেছেন। এঁদের মতে চীনের আন্দোলন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন; উহা চীনের একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। এই ব্যাপার ভাল ভাবে পরিচালিত করতে শক্ত লোক প্রয়োজন এবং সেই শক্ত লোক হচ্ছে জেনেরাল চিয়াং কৈ শেক।

চিয়াং চীনের নেপোলিয়ন হবার জন্যই যে চেষ্টা করেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু, সেণ্ট্রাল কুও-মিন-টাঙ্গ পরিচালিত বৈপ্লবিক সৈন্যদল একটা বিরাট শ্রমিক-কৃষক সঙ্ঘশক্তি দ্বারা বলীয়ান হয়ে চিয়াংএর আশা নির্ম্মূল করেছে। এই বৈপ্লবিক সৈন্যদল বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তারা যে বর্ত্তমানে কম্যুনিজমেরি পক্ষপাতী তা বোঝা যায় নিম্নের ঘটনাবলী থেকে—

(১) আন্তর্জাতিক শ্রমিক ডেলিগেশান যখন গত বৎসর চিয়াং কৈ-শেকের প্রধান আড্ডা হোয়াম্পো মিলিটারী অ্যাকাডেমী দর্শনে যায় তখন অ্যাকাডেমীর ৫০০০ ক্যাডেট "ইণ্টার ন্যাশানেল" গেয়ে ডেলেগেশানকে অভ্যর্থনা করে ও

তাদের জয়ধ্বনি ছিল "কম্যুনিষ্ট ইন্টার ন্যাশানেলের উপদেশ শোন।"

(২) ক্যানচোতে চিয়াংএর সৈন্যদল ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়; কিন্তু ডেলিগেশান তথায় যাবার দিন কয়েক আগে সামান্য কয়েকজন বৈপ্লবিক সৈন্য ও বিপ্লব নেতা তথায় যেয়ে পুনরায় ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিয়াংএর হাত থেকে সে জায়গা উদ্ধার করে।

(৩) নানচাঙ্গে চিয়াঙ্গের জেনারেল হেড কোয়ার্টারের ঠিক সামনেই স্থানীয় সেনারা ডেলেগেশানকে বিপুল অভ্যর্থনা করে এবং সেখানে একজন সাধারণ সৈনিক চিয়াঙ্গের অনুসৃত নীতির প্রতিবাদ করে। সেখানে মার্শাল ল জারী করে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বন্ধ করা হয়েছিল—কিন্তু স্থানীয় সেনারাই সেই আইন ভেঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপিত করে ও চিয়াংএর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে।

(৪৷ ৮ই এপ্রিল তারিখে উচাঙ্গের পোলিটিক্যাল মিলিটারী অ্যাকাডেমী ডেলিগেশানকে, ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি, নূতন গভর্ণমেন্টের শ্রমবিভাগের কম্যুনিষ্ট মন্ত্রী ও কৃষক সংঘের নেতাকে সম্মিলিত ভাবে অভ্যর্থনা করে। এই সভায় সকলে চিয়াংএর অনুসৃত নীতির প্রতিবাদ করে ও তাকে পার্টি হতে বিতাড়িত করে পার্টি কর্ত্তৃক তাহার বিচারের দাবী করে।

সেণ্ট্রাল কুও-মিন-টাঙ্গ কমিটী এইরূপে চারিদিক হতে সাহায্য পেয়ে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করে। ওয়াং চি-ওয়েইকে পুনরায় এনে তাঁকে নেতৃপদে নির্ব্বাচিত করেছে। ওয়াং নির্ব্বাচনের পরেই চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক চেন টু-শিনের সহিত একযোগে নিম্নলিখিত ইস্তাহার জারী করেন:—

"চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্ব্বদাই অত্যন্ত সরলান্তঃকরণের সহিত একথা মেনে নিয়েছে যে কুও-মিন-টাঙ্গ ও আমাদের প্রস্থিত নেতা সুন-ইয়াৎ-সেনের প্রবর্ত্তিত জনগণের তিনটি নীতিই জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি স্বরূপ। কেবল মাত্র বিপ্লব বিরোধীরাই কুও-মিন-টাঙ্গের সান-মিন-নীতিগুলি ভেঙ্গে দিতে চায় এবং তারাই শুধু জাতীয় দলকে বিভক্তও করে দিতে চায়।

"এ কথা সত্য যে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কুও-মিন-টাঙ্গের কার্য্য তালিকা ঠিক এক নয়। কিন্তু তবুও উভয় দলের সভ্যগণের মূলনীতি এই হচ্ছে যে তারা বিশেষ সংযোগের ভাব নিয়ে যুক্ত ও মুক্ত চীনের জন্যে যে সংগ্রাম চলেছে তারি জন্যে আপনাদিগকে পরিচালিত করবে। যাঁরা কম্যুনিষ্ট পার্টির বিপ্লবের ধারণার কথা জানেন, এবং কুও-মিন-টাঙ্গের প্রতি পার্টির মনোভাবের কথা জানেন তাঁরা উভয় পার্টি একযোগে কাজ করবে সুন্ ইয়াৎ-সেনের একথা বলার জ্ঞানবত্তাতে নিশ্চিতই সন্দিহান হবেন না।"

বর্ত্তমানে জনসাধারণ নূতন গভর্ণমেণ্টেরই চারিদিকে একীভূত হয়েছে। নূতন গভর্ণমেণ্ট এক দিকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধানে যেমন ব্যস্ত অপর দিকে তেমনি তাহাদের বিজয়ী সৈন্যদল পিকিংএর দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে। সব দিকেই শ্রমিক ও কৃষকদের মাঝে সাড়া পড়ে গেছে। বিপ্লবের অগ্নি শিখা চীনের বুকে জ্বলছে এবং এই আগুনের লেখাই চীনে বিপ্লবের বিজয় লেখা অনশ্বর অক্ষরে আঁকছে।

—০—

যুবক-সম্প্রদায়ের প্রতি

—০:০:০—

যুবক ভ্রাতৃগণ,

আজ বাংলার দিকে দিকে নবীন প্রাণের জাগরণ দেখিয়া হৃদয়ে এক নবীন আশার সঞ্চার হইতেছে। বাঙ্গালী যুবকের প্রাণে নবীন যৌবন বান ডাকিয়াছে। বাঙ্গালী যুবক জাগিয়াছে। বাঙ্গালী যুবকের প্রাণে আরো দুই একবার যে জাগরণের সাড়া না আসিয়াছিল তাহা নয়। ১৯০৬ সালের স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে বা বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে বাঙ্গালী যুবক প্রথম সাড়া দিয়াছিল। বাঙ্গালী যুবকের তাজা প্রাণগুলি ছাড়া বোধ হয় সে আন্দোলন কৃতকার্য্যই হইত না। স্বদেশী যুগ বাংলার যুবকের অন্তরে যে দাগ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছিল তাহা স্বদেশী আন্দোলনের অবসানেও অপসারিত হয় নাই। বরং স্বদেশী আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উহা অধিকতর ভীষণাকারই ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল। বাংলার বুকের উপর দিয়া কয়েক বৎসর আগে যে বিপ্লব-বন্যার ঢেউ খেলিয়া গিয়াছিল তাহাই তার একমাত্র প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে। গত যুগের বাংলার বিপ্লবায়োজনের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়াও বাঙ্গালী-যুবক-হৃদয়ের সাড়া যে উপলব্ধি হইয়াছিল তাহা কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালী যুবকের প্রাণে আরো একবার বান ডাকিয়াছিল ১৯২০-২১ সালে,—যখন অসহযোগ-আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে বাঙ্গালী যুবক আর এক নূতন আশায় ও নূতন উৎসাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ১৯০৬ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী যুবকের প্রাণ যে কয়টী আন্দোলনেই আন্দোলিত হইয়াছে তাহার কোনটীতেই সে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। অথচ যুবকশক্তি দেশের অপরাপর উল্লেখযোগ্য শক্তির মধ্যে একটী বিশিষ্টতম শক্তি। কিন্তু আত্ম-প্রতিষ্ঠ না হইলে সকল শক্তিই উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

বাংলার যুবক সম্বন্ধেই শুধু নয়, ভারতের যুবক সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে ভারতের উপেক্ষিত গণশক্তির ন্যায় ভারতের এই উল্লেখযোগ্য যুবকশক্তিও আবহমানকাল উপেক্ষিত হইয়াই আসিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে বাংলা তথা ভারতের যুবকশক্তি চিরকালই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বলিয়াই তাহারা কোনও কালে একটা পৃথক সত্তারূপে ও পৃথক শক্তিরূপে পরিগণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, আর তাই আত্মসম্বিৎও লাভ করিতে পারে নাই।

ভারতীয় জাতীয় জাগরণে বাঙ্গলার যুবকশক্তি একটি প্রধান শক্তি। এ শক্তিকে বিস্মৃত হইলে কিম্বা এ শক্তি উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে জাতীয় শক্তির পঙ্গুত্ব অনিবার্য্য। যেহেতু যুবকশক্তির জাগরণ না হইলে কোনও জাতীয়-শক্তির জাগরণ একেবারেই অসম্ভব। ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের প্রাণহীনতার কারণগুলির মধ্যে যুবকশক্তির অভাবও একটি বিশিষ্ট কারণ। যদিও মুমূর্ষু জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আন্দোলনের গোড়া হইতে যুবকদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এবং এখনও একমাত্র যুবকেরাই সেগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, তবুও ঐ সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং তৎসদৃশ অপরাপর দেশহিতকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে যুবকেরা কোন প্রতিষ্ঠানিক শক্তি হিসাবে যোগদান করে নাই। এখনকার

অবস্থিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যুবকেরা যেভাবে যোগদান করিয়া আসিতেছে তাহাতে যুবকশক্তি হিসাবে উহাদের গণনা করা যাইতে পারে না। তবে বলা যাইতে পারে যে এখনকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অদূর ভবিষ্যতের এক বিরাট যুবক-বাহিনীর এক অপরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র এখন কাজ করিতেছে। এই শক্তি যুবকশক্তির ব্যষ্টিশক্তি মাত্র, সমষ্টিশক্তি নহে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই অংশ-শক্তি বা ব্যষ্টি-শক্তির পশ্চাতে কোন প্রতিষ্ঠিত সমষ্টি-শক্তির প্রতিষ্ঠা না থাকিলে উহা অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হইবে। যুবক বাংলার ইতিহাসে এই অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

একদিকে সমষ্টিগত শক্তির একান্ত অভাব বশতঃ বারবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া এবং অপরদিকে সমষ্টিগত শক্তির অভাব-জনিত অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণে অধুনা প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদির কতিপয় আত্মসর্ব্বস্ব, অভিজাতমণ্ডিত, অল্প-প্রাণ, সন্ধিকামেচ্ছু পরিচালকের দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তিত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বাংলার যুবকসম্প্রদায় আজ তাহার যৌবন সুলভ চঞ্চলতা, যৌবনসুলভ আশাআকাঙ্ক্ষা, উদ্যম-উন্মাদনা ও অদম্য কর্ম্মক্ষমতা একেবারেই হারাইতে বসিয়াছে। অধিকন্তু আভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের মোহে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া বাংলার যুবক সম্প্রদায় আজ আত্মমর্য্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ করিয়া আনিতেছে। কোটি কোটি বাঙ্গালী যুবক কোটি কোটি ভারতের যুবক আপনার বিশ্ববরেণ্য শক্তি বিস্মৃত হইয়া এমন করিয়া কি পৃথিবীর সম্মুখে লজ্জিত হইয়া থাকিবে? বাংলা তথা ভারতের যুবকগণ কি কখনও আপনাদের বিশিষ্ট সম্প্রদায়গত শক্তি লইয়া এক অচ্ছেদ্য বাহিনীরূপে গঠিত হইয়া উঠিবে না? কখনও কি উহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবেনা? অসম্ভব! পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ গুরুতর অসম্পূর্ণতাকে ভ্রমেও কখন স্থান দিতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের ন্যায় বিশাল জনপদের কোটি কোটি যুবকের এইরূপ হাস্যাস্পদ অকর্মতায় কখনও নিজেকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। তাই আজ দিকে দিকে বাংলা তথা ভারতের যুবকগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছে।

দীর্ঘকালের লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত, নিরাশা-নিপীড়িত, ভবিষ্যভারতের আশাস্থল ভারতের যুবকদল বিশেষ বাংলার যুবকদলে আজ এক স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক হইলেও এক অভিনব উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু বলিতে কি সুদীর্ঘকালের ভ্রান্তপথবাহী, আত্মানির্ভরতায় আস্থাহীন, নেতৃত্বমোহগ্রস্ত যুবকদল এখনও সেই পূর্ব্ব দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

যুবক ভ্রাতৃগণ, তোমরা আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইয়াছ বটে, কিন্তু এখনও তন্দ্রালসতাকে কাটাইয়া উঠিতে পার নাই। এখনও সচেতন হইতে পার নাই। তোমাদের কল্পিত ব্রতের উদ্যাপিত বোধনই তোমাদের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত করিয়া দিতেছে। কারণ অনুসন্ধানে বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইবে না। এই গ্রীষ্মবকাশে বাংলা দেশের যে কয়টি স্থানে যে কয়টি যুবক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ পাঠেই তোমাদের অভিযানের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে? ইহাদের একটি মাত্র সম্মিলন ব্যতীত অপরা-পরগুলির কোন কোনটী যুবকগণকে কেবলমাত্র কচুরীপানা ধ্বংস করিতে ও জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম পরিষ্কার করিতে এবং পুকুরের পঙ্কোদ্ধার কার্যে নিযুক্ত হইতে আদেশ করিতেছে। কোন কোনটী যুবকগণকে খদ্দর ব্রত অবলম্বন করিতে ও বাংলা দেশকে নারীলাঞ্ছনাকারী দুশমনের হাত হইতে রক্ষা করিতেই আদেশ করিতেছে, আর কোনটী বা দেশাচার পালনের আদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে। কিন্তু যুবক বাংলা কি এই অমূল্য আদেশগুলিকেই একমাত্র তাহার জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে কর্মতালিকায় সীমাবদ্ধ করিয়া লইবে? দেশকাল কালোপযোগী প্রকৃত দেশহিতৈষণার আর সমস্ত কর্ম কি যুবক বাংলার অকর্মতার বিজ্ঞাপনী প্রচার করিবে? তাহা কখনও হইতে পারে না। যুবক বাংলা এই অকর্মতাকে যেদিন বরণ করিবে পৃথিবীর যুবক শক্তির বিশালত্বকেও যে খর্ব করা হয়। যুবক বাংলাকে অবশ্যই তাহার অকর্মতাপাশ ছিন্ন করিতে হইবে। বাংলা তথা ভারতের যুবক শক্তিকে আজ পৃথিবীর যুবক শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

নরনারায়ণ-সেবা-ধর্ম্মাশ্রিত মহানুভবতার জন্য বাংলার যুবকদল বহুদিন ধরিয়াই করিয়া আসিয়াছে। দামোদরের বন্যায় আর উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ও অবশ্যম্ভাবী সংস্য বিপদ জানিয়াও এই দুর্ভিক্ষ-বন্যা-ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে, উপর্য্যুপরি ক্ষুৎ পিপাসার নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও একমাত্র বাংলার যুবক ছাড়া আর কে বা কাহারা সে কাজে অগ্রসর হইয়াছিল? কিন্তু এই গতানুগতিক ধারার মহানুভবতাপূর্ণ ধর্ম্মযাজ্ঞের কর্ম্মে বাংলার যুবক কতটা লাভবান হইয়াছে? কতটুকু আত্মসম্বিৎ লাভ করিয়াছে? এতটুকুও নয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। "লাভ ক্ষতি আমরা দেখিব না, আমরা শুধু কাজ করিয়া যাইব"—এইরূপ কতকগুলি কুহেলিকাপূর্ণ, অসার, অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী কতক যুবক আমাদের দেশে আছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আজ প্রশ্ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, শুধু প্রশ্ন করাই নয়, তাঁহাদিগকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করাই একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যে কিরূপে তাঁহারা এই অদ্ভুত ও অযৌক্তিক যুক্তির অনুবর্ত্তিতা স্বীকার করিয়া লইতেছেন। "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই পঞ্চসহস্রাধিক বৎসরের অত্যন্ত প্রাচীনতাদুষ্ট আপদকালীন সামাজিক নীতিকে ক্রম-বিবর্ত্তনে সমূহ পরিবর্ত্তিত আমাদের বাস্তব জগতের অধুনাতন সামাজিক সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কুজ্ঝটিকায় নিক্ষেপ করিলে আর চলিবে না। উহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তাই, ব্যর্থতাও উহাতে অনিবার্য্য। যুবক ভ্রাতৃগণ, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে এই আধিভৌতিক জগতের লোক আমরা লাভ ক্ষতির বিচার না করিয়া কোনও কালে এক পদ অগ্রসর হইয়াছি কি না, কিম্বা হইতে পারি কিনা? ভ্রাতাযুবকগণ, আজ আমাদিগকে পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে আমাদের এই মনুষ্য দেহেতে আধ্যাত্মিকতার কোনও মাল মসলা নাই এবং উহা দৃষ্টির বহির্ভূত কোনও বস্তু নয়। উহা পরিষ্কার দৃশ্যমান মনুষ্যদেহ। উহার ক্ষুধা আছে ক্লান্তি আছে, পুষ্টি আছে, বৃদ্ধি আছে, বার্দ্ধক্য আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে। এই দৃশ্যমান মানুষটীকে বাঁচিতে হইবে। আর বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিয়া থাকিবার মত যাবতীয় উপকরণও উহার একান্ত আবশ্যক হইবে। মানুষকে বাঁচিতে হইলে তাহার এই একান্ত

আবশ্যকীয় উপকরণ ও মানুষ স্বয়ং, এই উভয়ের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইবে। তাই সমাজকে বাঁচাইয়া রাখাই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এই সমাজ বা সমাজধর্ম্ম কিম্বা সামাজিকতা অর্থে সঙ্কীর্ণভাবে কোন সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িকতাকে লক্ষ্য করা হইতেছে না। উহা ব্যাপক ও বিরাটভাবে সমগ্র বিশ্বমানব সমাজ কিম্বা তাহার কর্ত্তব্যাবলিকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

মানুষকে মানুষ বাঁচাইয়া না রাখিলে সমাজ অচল হইয়া পড়ে, মানুষও আর বাঁচে না। তাই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখাটাই মানুষের মনুষ্যত্ব ধর্ম্মে পরিগণিত হইয়াছে। বিশ্ব সংসারের সমগ্র মানব সন্তানকে একই যোগসূত্রে গ্রথিত করিয়া তোলা এবং এক সমশক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়াই মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। কিন্তু বর্ত্তমান কাল হইতে সুদূর ভবিষ্যতের মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের শীর্ষস্থানাবধি পৌঁছা সময় পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ ও ব্যাপক সময় অতিবাহিত করিতে হইবে তাহাতে বর্ত্তমান সমাজকে অত্যন্ত দৃঢ় ও সুসংবদ্ধতার ভিত্তির উপরে গ্রথিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। উহাই হইবে বর্ত্তমান মানব সমাজের বর্ত্তমানে প্রধান কর্ত্তব্য। তাই আংশিক কর্ত্তব্য হিসাবে সমগ্র পৃথিবীর মানবতার বৃহত্তম অংশের একাংশ ভারতভূমি এবং তদবৃহত্তমাংশের একাংশ আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাসে বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির উপর আজ এক বিশিষ্ট দায়িত্ব অতি স্বাভাবিক গতিতেই ন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব একমাত্র বাংলার যুবক সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ।

এই ন্যস্ত দায়িত্বটি কি তাহা বোধ হয় বাংলার যুবককে আর অধিক বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাংলার যুবকের উপর এই ন্যস্ত দায়িত্বটী বাংলা তথা ভারতের ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইয়া তোলা। বাংলা তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙ্গালী তথা ভারতীয় যুবকগণ পূর্ব্বাপর গতানুগতিক ধারায় দেশহিতকর কর্ম্মে যে পরিমান শক্তি ক্ষয় করিয়া আসিয়াছে তাহা তো শুধু বুভুক্ষা পীড়িত জঠরকে শান্ত করিতে যাইয়া মনকে আধ্যাত্মিকতার প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ করিতে বৃথা প্রয়াস মাত্র। কিন্তু স্বাভাবিক জঠর জ্বালায় অস্থির মানুষ যে তাহার স্বাভাবিক আহার ব্যতীত আধ্যাত্মিকতার ধোকায় কখনও মুগ্ধ হইতে পারে না এই সাধারণ সত্য হিসাবটা আজ আমাদের বেশ একটু নিবিষ্ট চিত্তেই বুঝিয়া লইতে হইবে।

যুবক বাংলাকে আজ গতানুগতিক ধারার গোঁড়ামিতা পরিপূর্ণ পরহিতব্রতরূপ মহানুভবতা লিপ্সার যাবতীয় দুর্ব্বলতাকে পরিহার করিয়া বিচারবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এক অতি সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক প্রণালীতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতিকর কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। যুবক বাংলাই তাহা বুঝিয়া ও বাছিয়া লইবে। "জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে" এই প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যকে সমূহ পরিবর্দ্ধিত অত্যন্ত পরবর্ত্তীকালেও প্রাচীন ব্যবস্থায় আর পরিপোষণ করিলে চলিবে না—চলিতে পারে না। অধুনাতন অবস্থান্তর প্রাপ্ত জগতের নৈসর্গিক অবস্থান্তরাদির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থান্তরাদিরও অত্যন্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। এইরূপ ক্রমপরিবর্ত্তনশীল ও ক্রমবিকাশমান জগতে প্রাচীনতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠার বৃথা প্রয়াসে বৃথা শক্তিক্ষয় করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া আর কি?

আরও বুঝিতে হইবে যে "ক্ষুধিতেরে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তেরে জল, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান জনম সফল"। এই সমস্ত সাধুবাক্য প্রতি-পালনে বা সংরক্ষণে আত্মোদর-মোহগ্রস্ত হইয়া 'জনম' সফল করিতে যাইয়া কেবলমাত্র ক্ষুধিতকে একদিন চারিটি চাল দান করিলেই, নিবর্স্ত্রকে একখণ্ড বস্ত্র দান করিলেই, তৃষ্ণার্ত্তকে একটু পানীয় দান করিলেই এ দেশের দুর্ভিক্ষ মহামারী ও দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইবে না এবং যাইতে পারে না। অর্থনৈতিক, রাষ্ট্র-নৈতিক ও সামাজিক সচ্ছলতা ও স্বচ্ছন্দতার উপরই একটি দেশের সুখসমৃদ্ধি নির্ভর করিয়া থাকে। আর যখনই সেই অবস্থিত অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা-দির সমূহ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তখনই এক একটি জনপদে এই দুর্ভিক্ষ মহামারী দারিদ্র্য কায়েমী পাট্টা করিয়া বসে। রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলতা জনিত কঠোর দুর্ভিক্ষ-মহামারী-দারিদ্র্য নিপীড়িত এইরূপ কোন কোটি কোটি জনসমাকীর্ণ জনপদে একটীমাত্র কম্বল, একটুখানি পানীয়, দুটী অন্ন, একফোঁটা ঔষধ বিতরণ আর এক আধটা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, মরুভূমির জ্বালাময়ী রৌদ্রে পীড়িত ব্যক্তিকে কণামাত্র নীহার বারিতে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টার মত হাস্যাস্পদ মহানু-ভবতাময় পরহিতব্রত পরায়ণতা উপযুক্ত ব্যবস্থা নয়। ইহা লোকহিতকারিতা (?) হইতে পারে কিন্তু দেশহিতকারিতা নয়। প্রকৃত দেশহিতকারিতা এরূপ সঙ্কীর্ণতা-পঙ্কিল-নিবদ্ধ নয়, যাহাও আবার কতিপয় আত্মোদর সর্ব্বস্বদের প্রসাদেই পরিপোষিত হইয়া আরো বিকৃতত্ব সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত দেশহিতকর কর্ম্ম এবং প্রকৃত জাতীয় উন্নতিকর কর্ম্ম কোনও অবস্থিত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত দেশের শৃঙ্খলা পুনঃ সংস্থাপন ব্যপদেশে নিয়োজিত যাবতীয় চেষ্টা দ্বারাই একমাত্র সম্ভবপর। বাংলা তথা ভারতের বর্ত্তমান দেশগত বা সমাজগত অবস্থা, কতিপয় আত্মসর্ব্বস্ব, স্বার্থলোলুপ সম্প্রদায়ের ক্রমাগত অবাধ, অবিরাম ও প্রবল অর্থনৈতিক শোষণে একেবারেই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের শাসনবিধাতৃ হইতে আরম্ভ করিয়া কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল প্রকার সমস্বার্থ বণিক প্রবৃত্তি ও বণিক-বৃত্তি পরায়ণ সম্প্রদায় আজ একযোগে এই মারাত্মক শোষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ফলে বাংলা তথা ভারতের গাত্র-বলমাত্র-সম্বল দেশের সমষ্টিশক্তি ও দেশের প্রাণ স্বরূপ সামাজিক উৎপাদক শ্রেণী ক্রমশঃ নিঃস্ব হইতে নিঃস্বতর হইয়া কঙ্কালমাত্র সম্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাই বাংলা তথা ভারতের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ মহামারী দারিদ্র্য উলঙ্গ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। জাতি অত্যন্ত দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। এই জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে জাতীয়তার ভিত্তি-কেই বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। জাতীয়তার ভিত্তি জাতির একমাত্র উৎপাদক শ্রেণীর বাঁচিয়া থাকার উপরই নির্ভর করে। তাই আজ জাতিকে বাঁচাইতে হইলে জাতির এই ধ্বংসোন্মুখ সামাজিক উৎপাদক শ্রেণীকে সকল প্রকার শোষণ হইতে রক্ষা করিতেই হইবে। সকল প্রকার শোষণনীতির মূল উচ্ছেদ না করিলে নূতন সামাজিক ব্যবস্থা একেবারেই অসম্ভব। আর শোষণনীতি বিবর্জ্জিত নূতন সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন

ব্যতিরেকে এজাতিরও ধ্বংস একেবারে অনিবার্য্য। পৃথিবীর ইতিহাসে উহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, মুষ্টিমেয় বণিক ধনিক পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত বর্ত্তমান সামাজিক বিধিব্যবস্থা একেবারেই সমাজ বিধ্বংসকারী, যেহেতু উহা কেবলমাত্র শোষণনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রকৃত দেশহিতকারী সমাজহিতকারী যুবকের দলকে আজ শোষিত ও ধ্বংসসর্ব্বস্বদের সঙ্গে মিলিত শক্তিকে হিমাদ্রি-অচল-দৃঢ় ও সুসংযত শক্তি লইয়া, এক অতি দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনী রূপে এই সমাজ বিধ্বংসকারী ঘৃণ্য শোষণনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার শোষকদিগের সঙ্গে ভারতীয় যুবক ও গণশক্তির একতাবদ্ধ বাহিনীর এক অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী। বাংলার যুবককে অগোণে তাহার সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। উহাই যুবক শক্তির একমাত্র বর্ত্তমান কর্ম্ম। এই অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ সমরায়োজনে যুবক বাংলা তথা যুবক ভারতের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে নিজেদের আত্ম-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করা ও সমগ্র বিচ্ছিন্ন যুবক শক্তিকে এক সুসংহত সংহতি শক্তিতে আবদ্ধ করা এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করিয়া এক সর্ব্বজনীন অধিকারের উপর নিজেদের কর্ম্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা যাহাতে সমগ্র যুবক শক্তি দেশের শোষিত গণশক্তির সমবায়ে এক সাধারণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ও এক সাধারণ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও এক সুপরিচালিত বিরাটবাহিনীতে পরিণত হইয়া দেশের ও জগতের মহা অকল্যাণকারী এই শোষণবাদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে পারে। এই অভিযানে যুব ও গণশক্তির মিলিত বিরাট বাহিনীর বিজয় অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বিশেষতঃ প্রাচ্য গৌরব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকামী যুধ্যমান চীন তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য লইয়া এখনও ভারতের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। "অসভ্য চীন" বলিয়া শিঙ্গা ফুঁকিতে পর-পদ-দলিত ভারত কি এখনও সাহস রাখে? যুবক ভারত তাহার জবাব দিবে। যুবক চীন গণ-চীনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যুবক ভারত কি গণ-ভারতের প্রতিষ্ঠায় সচেতন হইবে না, বদ্ধপরিকর হইবে না?

যুবকগণের বিবেচনার্থ যুবক ভারতকে কি ভাবে গঠিত করিয়া এবং সেই গঠিত শক্তি কি ভাবে নিয়মিত করিয়া নিশ্চিত জয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে তাহার একটা পরিকল্পনার সন্নিবেশ করা গেল।

গঠন প্রণালী

১। সমগ্র ভারতে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এক প্রতিনিধি মূলক কেন্দ্রীয় যুবক সমিতির প্রতিষ্ঠা করা।

২। সমগ্র ভারত কেন্দ্রীয় যুবক সমিতির অধীনে সমস্ত প্রাদেশিক যুবক সমিতিগুলিকে আনয়ন করা।

৩। প্রতি জেলায়, মহকুমায় ও গ্রামে এক একটী প্রতিনিধি মূলক ক্ষুদ্র কেন্দ্র সমিতি প্রতিষ্ঠা করা ও তৎ সমুদয়ে ১৫ বৎসর হইতে ৩৬ বৎসর বয়স্ক যুবককে সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা।

যুবক ভিন্ন অন্য কাহাকেও সভ্য শ্রেণীভুক্ত না করা।

৪। যুবকান্দোলনের পক্ষপাতী, সহায়ক এবং শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিকে সমিতির সাধারণ সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যুবক সভার উপরে তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

৫। নিজেদের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত এক একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধীনে সমস্ত কেন্দ্রগুলি পরিচালিত করা।

৬। প্রত্যেক যুবক সভা হইতে যথাসম্ভব কম একটী নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক চাঁদা সংগ্রহ করা।

কার্য্য প্রণালী

১। নিম্ন ও উর্দ্ধ সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে বর্ত্তমান কালোপযোগী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক, পুস্তিকা ও সংবাদ পত্র সম্বলিত এক একটী পাঠাগার স্থাপন করা।

২। নিজেদের জ্ঞান সঞ্চারের নিমিত্ত ঐ সমস্ত পাঠাগারে সাপ্তাহিক একটী ক্লাস করা।

৩। সমগ্র ভারত যুবক সভা হইতে এবং প্রাদেশিক যুবক সভা হইতে একদল উপযুক্ত প্রচারক বাহির করা।

৪। শ্রমিক ও কৃষক বস্তিতে দিবা, নৈশ কিম্বা রবিবারের বিদ্যালয় (Sunday School) স্থাপন করা।

৫। প্রত্যেক কেন্দ্রের অধীন স্থান সমূহের অভাব অভিযোগ সম্বলিত সমূহ বিবরণ (Statistics) সংগ্রহ করা।

৬। শ্রমিক ও কৃষকদিগের মধ্যে সভা সমিতির আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা বুঝাইয়া দেওয়া ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা।

৭। সময়ে সময়ে সমস্ত সম্প্রদায়ের যুবকদিগের দ্বারা একত্রে রাস্তায় শোভাযাত্রা বাহির করা।

৮। কংগ্রেস, কাউন্সিল প্রভৃতিতে ও লোক্যালবোর্ড মিউনিসিপালিটি ইত্যাদিতে যুবক প্রতিনিধি প্রেরণ করা অথবা যুবকদের বিবেচনায় উপযুক্ত নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে প্রেরণ করা। প্রতিনিধিকে যুবক সভার নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করা।

৯। যুবক সমিতির মুখপত্র স্বরূপ একটী সংবাদপত্র বাহির করা।

১০। সময়ে সময়ে মহকুমা জিলা ও প্রাদেশিক সভা আহ্বান করা ও বৎসরে একবার জাতীয় মহাসভার অধিবেশন সময়ে সমগ্র ভারত যুবক মহাসভার অধিবেশন করা।

১১। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশ করা ও তাহাদিগকে প্রকৃত দেশহিতকারী অনুষ্ঠানে গড়িয়া তোলা।

১২। বৈদেশিক যুবক প্রতিষ্ঠানাদির সহিত সখ্য স্থাপনোদ্দেশ্যে তথায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা।

১৩। সর্ব্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকদিগকে বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইতে প্রস্তুত করা।

শ্রীধরণীকান্ত গোস্বামী

পলিটিক্সের দুর্দ্দশা

(কামাল-উদ্-দীন)

—০—

পলিটিক্সের সব দিক আলোচনার উদ্দেশ্য আমার নয়; অতদূর যোগ্যতা যে আমার নেই, তা না বললেও খুব চলে। সুপরিচালনার অভাবে আমাদের দেশের পলিটিক্স যে মারাত্মক পথ অবলম্বন করছে, সে সম্বন্ধে শুধু দুটো কথা আমার বলবার আছে।

আমরা যে যুগে বাস করছি, এ হচ্ছে মানবতার যুগ। ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি, সাম্প্রদায়িক দলাদলি, এ সব পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির দ্বারাই পরিত্যক্ত হতে চলেছে। সমগ্র বিশ্ব আজ এক নূতন অখণ্ড জাতি গঠনে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু ভারত এদিক দিয়া অতি শোচনীয় ভাবে পশ্চাৎপদ! আজ ভারতের পলিটিক্সের ভিত্তি হয়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ!

এর কারণ কি? সমস্যার সমাধানে হয়তো উভয় পক্ষের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ রাজনীতি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু ঘেঁটে একে অপরের বিরুদ্ধে সংখ্যাতীত দলিল নজীর পেশ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধি তবলিগ ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঞ্জীভূত প্রস্তাবও পাশ হবে। তা হয়েও আসছে। কিন্তু, আমাদের রাজনীতিক সমস্যা এতে অধিকতর জটীল হয়ে দাঁড়াচ্ছে বই নয়। তার কারণ এ সব সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের মূলে এক বিন্দু সত্যও নিহিত নেই। যা সত্য নয়, তা কখনো জনগণকে কল্যাণের পথে পরিচালন করতে পারে না, ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের স্বার্থ পূর্ণ হওয়ার যোগাড় যদিও এতে ষোল আনা থাকে।

আমাদের দুর্দ্দশার মূলে রয়েছে আমাদেরই প্রাণের অভাব। ভারতবাসী আজ সত্যিকার দেশাত্মবোধ হারিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা আজ বিরাট জাতীয়তাকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে টুঁটী টিপে ধরেছে, হিন্দু মুসলমান এ ভারতে এক দিনের নয়। এ দেশে উভয় জাতির সমান অধিকার রয়েছে; অনেক দিন থেকে বন্ধুভাবে, প্রতিবেশী সম্প্রদায় রূপে এরা এ দেশে বসবাস করে আসছে। কিন্তু, মসজেদের সামনে বাদ্য বাজানো বা গো-কোরবাণী নিয়ে এত মাথা ব্যাথা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয়নি। এসব নিয়ে ইতি পূর্ব্বে কোনদিন ধর্ম্মহানি বা নাগরিকতার অধিকারের প্রশ্ন খাড়া হয়েছে বলে আমরা জানিনা। পক্ষান্তরে ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, ভারতের সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি, এমন কি, বিপদ আপদ এই দু'টি বিরাট অখণ্ডনীয় জাতি বরাবরই ভাগ করে নিয়েছে।

কিন্তু আজ আর সে দিন নেই। উভয় সম্প্রদায় আজ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পরবশ। হিন্দু আজ মুসলমানকে বিশ্বাস করে না, মুসলমানও হিন্দুকে কুটীল দৃষ্টিতে দেখে। শুধু সাম্প্রদায়িক হীন মনোবৃত্তি নিয়েই উভয়ে আপন আপন ধর্ম্ম গড়ে নিতে তৎপর হয়েছে। তাই দেখতে পাই, একদিকে পূজা-পার্ব্বণ ও মিছিল বা'র করার সংখ্যা যেমন শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে শহীদ (martyr) হওয়ার লোভও দিন দিন উত্তালভাব ধারণ করছে। কাল যাদেরকে গুণ্ডা-গাঁটকাটা ব'লে ঘৃণা করা হয়েছে আজ সুবিধে বুঝে তাদের কে ধর্ম্মধ্বজ বা 'কওমী শের' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে! এমন সব ছিনিমিনি খেলা আমরা আরম্ভ করে দিয়েছি!

কিন্তু এই যে আমরা অন্ধের মত হাতড়িয়ে চলছি এ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত পলিটিক্সের পাছে, এর পরিণাম কি! আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের (আমি যুবকদেরই বলছি কেননা, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ-দের উপদেশ দিতে যাওয়ার মত দুর্লোভ আমার নেই, কেউ তা প্রত্যাশাও করেন না) এ বিষয়ে ভেবে দেখার প্রয়োজন এখনো হয় নি কি? তাদের কি কোন কর্ত্তব্য নেই? জাতির প্রাণ হচ্ছেই এ যুবকগণ। কোন জাতি যদি শক্তির বড়াই করে, তবে এ যুবকদের নিয়েই করবে। কিন্তু আমাদের যুবক শক্তির অবস্থা কি? ধর্ম্মান্ধতার কুট-চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে তাদের অন্তর-দেবতা আজ অবসন্ন, মূর্চ্ছিত!

নামজাদা নেতাদের নিকট আমরা বিশেষ কোন কিছুর প্রত্যাশা বড় একটা করিনে। অট্টালিকাবাসী তাঁরা দেশের শতকরা ৯৮ জন চাষা মজুরের কথা ভাববেন, বা ভাবতে পারেন—এর চেয়ে অশোভন প্রস্তাব কি আর হতে পারে? তাঁরা স্বরাজ আনতে যা'ন বা মন্ত্রিত্ব নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে থাকুন, তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয়, জাতির প্রাণ শক্তি, জাতির সাচ্চা সৈনিক আমাদের যুবকদলের অন্তরের উপরও বড়দের এ কুৎসিত মনোবৃত্তির ছাপ পড়েছে।

মানুষের সব চেয়ে বড় অধঃপতন তখন শুরু হয়, যখন সে অন্তরের সাধারণ গতিকে অবরোধ করে অপরের নিকট মনোবৃত্তি ধার করতে যায়। সে অশুভ দিন আমাদের আজ এসেছে, স্বীকার করতে হবে। আমরা ব্যক্তি বিশেষের কূট প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে স্বাভাবিক সত্যকে অবহেলা করতে, ত্যাগ করতে শিখেছি। আমরা প্রকৃষ্ট সত্য পথ ছেড়ে ধ্বংসের পথে প্রয়াণ করেছি। অন্ধকার আমাদের ঘিরে নিয়েছে; এ কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে দৈন্য লুকিয়ে আজ আমরা হাঁকছি—হিন্দু, আমি, ক্ষাত্রবীর্য্য আমারই ধমনীতে প্রবহমান, অপর পক্ষে আবার জওয়াব দিচ্ছি,—'আমি মুসলিম, বাক্তিয়ারেরই বংশধর! ইত্যাদি'

ধর্ম্ম যদি পর ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতা না শিখায়, বিধাতার সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া স্নেহ ভালবাসার প্রতিবন্ধক হয়, সে ঠুনকো ধর্ম্ম তবে আমরা চাইনে! বিধাতা তাঁর আলো বাতাস কারো জন্যে বিশেষ করে সৃষ্টি করেননি; মনুষ্যত্বের অধিকার হতে তিনি কোন মানুষকে বঞ্চিত করেননি; সেই পরম পিতার সন্তান আমরা ভেদবুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে ভাইকে ঘৃণা করতে শিখেছি। তাই, আমাদের অবনতি! তাই আমাদের অধঃপতন!

কিন্তু এই পূতিগন্ধময় তমসার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি আজ তরুণ ভারতের কর্ণে নব প্রভাতের আনন্দ বার্ত্তা ঘোষণা করছি। এস হে হিন্দু, হে মুসলিম! প্রকৃত মানব হয়ে তোমরা আজ বিশ্বের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও!

যুগ ধর্ম্ম এই আহ্বান বাণী তোমাদের জানাচ্ছে!

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত! উত্থিত হও, জাগ্রত হও! দেখ, বিশ্বের উন্নতির পথে তোমরা কি ভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছ। বিশ্ব আজ তোমাদের ডাক দিয়েছে। মানব জাতির মঙ্গল যজ্ঞে তোমাদের দেওয়া অর্ঘ্যের সাজি এখনও পৌছয়নি! তাই তোমাদের এ আহ্বান!

তোমরা দাঁড়াও, বল আমরা প্রথমে মানুষ, তারপর হিন্দু মুস্‌লিম বৌদ্ধ বা খৃষ্টান! মানুষ মাত্রেরই সুখ-দুঃখের আমরা সমভাগী! বিশ্ব জগৎ জুড়ে আমাদের এক মানুষের প্রাণই রয়েছে!!

দেশমাতা আজ তোমাদের পরিচর্য্যার অভাবে ভিখারিণী বেশ ধারণ করেছেন। বিশ্বপাতার চিত্র-প্রতিফলিত দর্পণ সম তোমাদের সোনার মুখ পানে মা ওই সজল নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন; তাঁকে প্রত্যাখান করা তোমাদের সাজে না, সে শক্তি তোমাদের নেই, তরুণ!

ভয়? মিথ্যা কথা! তরুণের প্রাণে নিরাশার স্থান হতে পারে না।

এসো ভ্রাতঃ! আজ আমরা হিন্দু মুস্‌লিমের সমবেত কণ্ঠে বলি—

আমাদের প্রাণশক্তি উদ্বুদ্ধ হোক!
আমাদের মানবতা জাগ্রত হোক!!
আমাদের জীবন সুন্দর হোক!!!

——

পুলিশের শুভাগমন

—•:•:•—

গত ২৯শে জুলাই অপরাহ্ণ ৫টার সময় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল (The Peasants' and Workers' Party of Bengal) এবং তার মুখপত্র "গণবাণী"র আফিসে একদল পুলিশ হানা দিয়েছিল। এ দলে একজন থানার ও একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার ছিলেন। "গণবাণী"র অন্যতর সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আফিসে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের অফিসাররা তাঁকে জানান যে তাঁরা "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না" (ভারতবর্ষ ও চীন) নামক পুস্তিকাখানা দয়া ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন। তাঁদের কাছ থেকে ওয়ারেণ্ট দেখতে চাইলে তাঁরা জানান যে সমস্ত আফিস তালাশি করার কোনো পরোয়ানা তাঁদের নিকটে নেই। কেবল মাত্র বইখানা নিয়ে যাবার পরোয়ানাই তাঁরা পেয়েছেন। অবশ্য সে পরোয়ানাও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবকে দেখানো হয়নি। তিনি তাঁদের জানিয়ে দেন যে ৫০ খানা বই তিনি পেয়েছিলেন। তার একখানাও তাঁর নিকটে নেই। এ কথার ওপরেই পুলিশের লোকেরা চলে যায়।

কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের "বুক কোম্পানী লিমিটেড" ও ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটের সরস্বতী লাইব্রেরী এ পুস্তিকা খানা আপন আপন দোকানে রেখেছিলেন। পুলিশ এ দু'টো দোকানেও হানা দিয়েছিল। কিন্তু, কোথাও পুস্তিকাখানা তারা পায়নি। বুক কোম্পানীর ক্যাশ মেমোগুলি তারা তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছিল।

"ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না"

"ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না" একখানা ক্ষুদ্র ইংরেজী পুস্তিকা।" বোম্বের "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড" নামক ইংরেজী দৈনিক কাগজের গত ২৪শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৯শে জানুয়ারী এবং ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যাগুলিতে জনৈক "আন্তর্জাতিক" কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ ও চীন সম্বন্ধে ছয়টি প্রবন্ধ লিখিত হয়। বোম্বের শ্রমিক ও কৃষক দলের (The Workers' and Peasants' Party of Bombay) সেক্রেটারী মিঃ শান্তারাম ছাবলদাস মিরাজকর প্রবন্ধগুলিকে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন। এ পুস্তিকা খানার মলাট তিনি রক্তের ন্যায় টকটকে লাল কাগজে দিয়েছিলেন। সেটাই বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল।

বোম্বেতে খানাতালাশি

২৮শে জুলাই তারিখে "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না"র জন্যে বোম্বের কয়েক জায়গায় তালাশি হয়েছিল। কলিকাতার ব্যাপার ঘটে তাহারি ফলে। "এ্যাডভোকেট্ প্রেস", "হেরাল্ড"এর আফিস, বোম্বের শ্রমিক ও কৃষক দলের ও তার মুখপত্র "ক্রান্তি"র আফিস এবং দাদারে মিঃ মিরাজকরের বাসভবনে পুলিশ তালাশি নিয়েছিল। "হেরাল্ড"এর আফিস থেকে উপরি উক্ত সংখ্যাগুলো এবং প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পুলিশ নিয়ে গেছে। এ্যাডভোকেট্ প্রেস থেকেও পুলিশ কয়েক কপি "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না" নিয়ে গেছে।

"ক্রান্তি" আফিস ও মিঃ মিরাজকরের বাড়ী থেকে নিম্ন লিখিত বইগুলো পুলিশ নিয়ে গেছে:—

1. Modern India by R. P. Dutt.
2. Gains of Revolution.
3. Soviet at Work by Lenin
4. Lenin as a Marxist by Stalin
5. Lenin on Co-operatives
6. Hundred Percent Indian
7. Russia's Path to Communism
8. India in Transition by M. N. Ray.
9. 4 issues of Communist International
10. Issue of the "Sunday Worker"
11. Soviet Russia
12. Life of Barindra Kumar Ghose
13. About 25 Copies of the "Masses of India" Published in Paris.
14. Michael Bakunin, the Communist.
15. God and the State by Bakunin
16. Evolution and Revolution
17. Outlawing Socialism
18. 53 copies of "India and China."

ধাড়ওয়ারে হিন্দুস্থানী সেবাদলের আফিস এবং হুবলিতে এ দলের সেক্রেটারী ডাক্তার হার্দ্দিকরের বাড়ীও পুলিশ এ পুস্তিকার জন্যে তালাশি করেছে।

——

বিবিধ প্রসঙ্গ

"ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না"

বন্ধু মিরাজকার বড় ভুল কাজ করেছেন। "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড" এর প্রবন্ধগুলি শুধু যে পুস্তকাকারে ছাপালেন তাতো নয়, তাতে আবার লাগালেন কিনা লাল মলাট,—সে লালও যে সে লাল নয়, একেবারে রক্তের মত টকটকে! ভারতের নামের সহিত চীনের নামের সংযোগ, "আন্তর্জাতিক" এর লেখা, সাক্‌লাৎওয়ালার ভূমিকা এবং তার ওপরে আবার রক্তের মত লাল মলাট,—এত সবও যদি নিভাজ খাঁটি "বলশেভিজম" না হয় তবে আর হবে কি? এতে কি কখনো শোষণবাদী গবর্ণমেণ্টের মাথা ঠিক্ থাকতে পারে? মাদ্রাজ আর বোম্বের গবর্ণমেণ্ট তো তবু গেজেটে বিজ্ঞাপন বা'র করে বইখানা বাজেয়াফ্‌ত করেছেন, কিন্তু, বাংলা গবর্ণমেণ্টের 'আলালের ঘরের দুলাল' পুলিস প্রভুরা তার অপেক্ষা না করেই গত শুক্রবারে কলিকাতায় ছুটোছুটি করেছে বইটের জন্যে। বোম্বের কৃষক ও শ্রমিক দলের সেক্রেটরী এবং সে দলের মুখপত্র "ক্রান্তি"র সম্পাদক যে বইখানা ছাপিয়েছেন তার জন্যে তারা যে বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদল এবং তার মুখপত্র "গণবাণী"র আফিসে হানা দেবে সে তো জানা কথাই ছিল। এ ছাড়া বুক কোম্পানী ও সরস্বতী লাইব্রেরীতেও তারা ছুটেছিল। শুনলুম তারা নাকি নব প্রকাশিত বাংলা মাসিক "নওরোজ" এর আফিস পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিল। কেননা, "নওরোজ" আফিস "মুসলিম পাবলিশিং হাউস" নামক বইএর দোকানের মধ্যবর্ত্তিতায় এর একখানা বই কিনেছিল। একেই বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

•　　*　　*　　•

"ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না"র দ্বিতীয় সংস্করণ বা'র করার আশা তো গেলো, কেন যে গেলো সে বিচার করবার কেউ এদেশে নেই। এদেশের জনগণ শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়ার মত সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ আজো হতে পারেনি। কাজেই, আজকের দিনে "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না" নামক পুস্তিকাখানার অধিকতর প্রচার বন্ধ হল বলে আক্ষেপ করে আর বেশী কিছু লাভ নেই। কাগজ-কলমের অস্তিত্ব বজায় থাকলে আর হাত আর মাথাটা যথাস্থানে থাকতে পেলে ভবিষ্যতে বই আরো অনেক লিখ্‌তে পারা যাবে, কিন্তু, উপস্থিত আমরা ভাবছি বন্ধু মিরাজকরের চাকুরীর কথা। বোম্বের ফরাসী ব্যাঙ্কে কেরানীগিরি করে মিরাজকর মাসে একশ' টাকা মাইনে পান। তাঁর এই কেরানীগিরিটে বজায় থাক্‌বে কি? বোম্বে পুলিশের দয়া মিরাজকরের ওপরে অনেক বেশী। এর আগেই তারা একবার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে গিয়ে বলেছিল যে তিনি তাঁর ব্যাঙ্কে একজন সাংঘাতিক কম্যুনিষ্টকে জায়গা দিয়েছেন। মিরাজকর "কম্যুনিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়ার" সভ্য তো ননই, আপনাকে কম্যুনিষ্ট বলে কখনো ঘোষণাও তিনি করেন নি। তাই, ম্যানেজার তাঁকে সে কথা জিজ্ঞাসা মাত্র করেই চুপ মেরে ছিলেন। কিন্তু, এবারে সেদিন কাগজে দেখলুম যে "এসোসিয়েটেড্ প্রেস" তাঁকে "স্থানীয় কম্যুনিষ্ট" বলে আখ্যাত করেছেন, তার ওপরে আবার তাঁর বাড়ী ও আফিস তালাশি করে লেনিন, বুখারিন, স্তালিন প্রভৃতির বই তো পেয়েইছেন, তা ছাড়া ভারতের সেই প্রনষ্ট সন্তান মানবেন্দ্রনাথ রায়েরও একখানা বই পুলিশ তাঁর ওখান থেকে নিয়ে গেছে। কাজেই এবারে ধরে বেঁধেও কম্যুনিষ্ট, বলশেভিক প্রভৃতি সবই কিছু বোধ হয় তাঁকে হ'তেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্কের চাকুরীটির গতিও হয়তো সুগতি হবেনা। মিরাজকর অবশ্য নিশ্চিতই জানেন যে পথ চলতে হলে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে নিয়েই চলতে হয়। তাই বলছি, আগে চলো বন্ধু, আগে চলো।

———

বাংলার বড়াই কোন্‌খানে?

বাংলা নাকি ভারতের মাথা; জাতীয় সংগ্রামে বাঙালীর ত্যাগই নাকি ভারতের আর সব প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী; কিন্তু, আমরা একটিবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে বাঙালীর আদর্শটি কি? বাংলা যদি আর সব প্রদেশের চাইতে বিদ্বান বুদ্ধিমান হয়, বাঙালীর আদর্শ যদি আর সব প্রদেশের আদর্শের চেয়ে মহত্তম হয় তা হলে বাংলা আজো কংগ্রেস থেকে ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা দাবী করতে পারে নি কেন? অন্ধ্র যা করতে পেরেছে, সংযুক্ত প্রদেশে যা করতে পেরেছে, বাংলা আজো তা করতে পারেনি। তবু বাঙালী বড়াই করছে কিনা যে, সে ভারতের মাথা। স্বরাজের ওকালতি চালের ধামা-চাপা-দেওয়া সংজ্ঞা ফরিদপুরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন বলে ঘোষিত হওয়ার পরেও বাঙালী আপনার শ্রেষ্ঠত্বর বড়াই করতে ছাড়ছেনা। এত নির্লজ্জ, এত বেহায়া হয়ে গেছে এই বাঙালী জাত। বাংলার যুবকেরা হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসির মঞ্চে চড়েছে, কারাবরণ করেছে আর নজরবন্দী হয়ে থেকেছে বলেই তো আজ বাংলার এত নাম, এত মান! কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই যুবকদেরই অবস্থা কত হীনতম হয়ে দাঁড়িয়েছে! তারা অন্ধ ও ঘৃণিত সম্প্রদায়িকত্বের পুতিগন্ধময় কর্দ্দমের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরছে। মহান্ আদর্শ ও স্বাধীনতার উপাসনা ত্যাগ করে আজ তারা উপাসনা করছে সঙ্কীর্ণতার, এবং লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তারি নাম দিচ্ছে আবার জাতীয়ত্ব—ন্যাশন্যালিজম। মরণ আর কাকে বলে? প্রকৃত স্বাধীনতার মহান্ আদর্শকে ধারণ করবার মত শক্তি যদি আজো বাঙালী যুবকদের হৃদয়ে থেকে থাকে তা হলে তারা তা হয়তো কার্য্যক্ষেত্রে দেখা'ক্, নতুবা বলুক যে তাদের বড়াই করবার মত কিছুই নেই। মিছামিছি মনের সহিত চোখ ঠারাঠারি করার হীনতা দেখিয়ে কিছু কি লাভ আছে?

—•—

মেরিনার্স ইউনিয়ন

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নটি হচ্ছে বাংলার নদীপথে চলাচলকারী ষ্টীমার ও ফ্ল্যাটের খালাসী, আগুনওয়ালা, সুকানী সেরাং ও মিস্ত্রী অর্থাৎ ড্রাইভার প্রভৃতির একটি সঙ্ঘ। এ সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ আবদুল হক, বি-এ'র একটি প্রবন্ধ আমরা গত সপ্তাহের "গণবাণী"তে প্রকাশ করেছি। তাতে তিনি শ্রমিকদের জন্য সংধারণভাবে শতকরা ২৫ টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবী করেছেন, ফিডার সার্বিসে যে সকল জাহাজে একজন সারেং ও একজন ড্রাইভার আছে সে সকল জাহাজে দু'জন সারেং ও দু'জন ড্রাইভার নিযুক্ত করার প্রস্তাব তিনি করেছেন। জাহাজের মাল চুরি যাওয়ার জন্যে যে "ক্লেইম" (claim) কাটা হয় তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদও করেছেন। এসব বিষয়ে আলোচনা করার

জন্যে তিনি আগামী ৭ই আগষ্ট তারিখে এক সাধারণ সভাও ডেকেছেন। জেনেরেল সেক্রেটারীর নজর যেন সেরাং ও ড্রাইভারদের প্রতিই কিছু বেশী। অথচ এ সারেং ও ড্রাইভাররা শুধু যে আর সবার চেয়ে বেশী মাইনে পায় তা নয়, তারা খালাসি ও আগুনওয়ালা প্রভৃতিকে তাদের মজুরী থেকে বঞ্চিতও করে। ষ্টীমারের খালাসী ও আগুন-ওয়ালারা সারেং ও ড্রাইভারদের দ্বারা নিযুক্ত হয় এবং তারা তাদের মাইনেও পায় সারেং আর ড্রাইভারদেরই কাছ থেকে। এ অবস্থায় সারেং আর ড্রাইভাররা কখনো খালাসী ও আগুনওয়ালাদের পুরো মাইনে দেয় না। এতে আর, এস, এন কোম্পানী ও আই, জি, এন এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর পক্ষে খালাসী ও আগুনওয়ালাদেরকে লুণ্ঠন করার যথেষ্ট সুবিধে হয়েছে। দুটো কোম্পানীই কাটা দিয়ে কাটা তুলছে। এ প্রথাটির বিরুদ্ধে কোনো কথা মিঃ আবদুল হক বলছেন না। তাঁর লেখা থেকে মনে হচ্ছে যে তিনি যেন সারেং আর ড্রাইভারদের জন্যেই বেশী অনুভব করেছেন খালাসী আর আগুনওয়ালাদের চেয়ে। শতকরা ২৫ টাকা মাইনে যদিও বাড়ে তা সারেং আর ড্রাইভারদের পকেটেই বেশীর ভাগ যাবে যদি না প্রথা পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমেই নিয়ম হওয়া উচিত যে কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মীই, তা সে খালাসীই হোক্‌ কিংবা আগুনওয়ালাই হোক্‌, তার মাইনে বরাবর কোম্পানীর অফিস থেকেই পাবে। এ প্রথা প্রবর্ত্তিত না হলে মাইনে বাড়ানো না বাড়ানো একই কথা হবে। তারপর মিঃ আবদুল হকের বাহ্যদৃষ্টি আরো প্রসারিত হওয়া উচিত। তাঁর লেখা থেকে মনে হচ্ছে যে একশ' বছর পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক নেতাদের যে আদর্শ ছিল তার চেয়ে তাঁর আদর্শ এতটুকুও উন্নত নয়। যখন সমগ্র জগতের শ্রমিকগণ তাদের শোষক নিয়োগকারিগণের সহিত সংগ্রামে প্রলিপ্ত হয়েছে তখন তিনি চাইছেন কিনা নিয়োগকারিদের সহিত একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে! মিঃ আবদুল হকের উচিত সময়ের সহিত পা মিলিয়ে চলা।

দেশ বিদেশ

—০—

গুজরাটে বন্যার প্রকোপে ভীষণ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। প্রায় দুই সহস্র গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং ক্ষতির পরিমান প্রায় দশ লক্ষ টাকা। অসংখ্য গৃহহীন লোক, আহমদাবাদের জল মগ্ন রাস্তার উপর দিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তাতে এক কোমর পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে। দুই শত লোক যাহারা জল স্রোতের ভয়ে অপাওয়াতে রেলের গাড়ীতে আশ্রয় পাইবার জন্য পলায়ন করিয়াছিল তাহারা সকলে অনাহারে দিন অতিবাহিত করিতেছে। ব্যবসা পত্র সমস্ত বন্ধ হইয়াছে। দরিদ্রেরা অনাহারের তীব্র কষাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে।

—০—

শেঠ দামোদর স্বরূপ—কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম শেঠ দামোদর স্বরূপের অবস্থা ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইতেছে। তিনি কিছুকাল রাজপুর (ডেরাহুন সেনাটারিয়ামে) অবস্থান করার পর সম্প্রতি মুসৌরী গিয়াছেন। তিনি সেখানে হাকিম আজমল খানের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ ওমর খানের চিকিৎসাধীনে আছেন। আরো কিছুকাল থাকার পর পুনরায় তিনি দেরাদুনে ফিরিয়া যাইবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। সেখানে হাকিম আজমল খানের চিকিৎসাধীনে তিনি থাকিবেন। বর্ত্তমানে হাকিমজীও তথায় অবস্থান করিতেছেন।

মিঃ নরদেব শাস্ত্রী বেনারসের 'আজ' পত্রিকায় শেঠজীর শারীরিক অবস্থা বিবৃত করিয়া লিখিতেছেন যে যখন শেঠজী এরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় রহিয়াছেন তখনও গোয়েন্দা পুলিশের লোকেরা তাদের 'দরশন' দিয়া তাঁহাকে কম উৎপাত করিতেছেনন।

—০—

পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহী নেতা শ্রীযুত সতীন সেনের ১ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। তিনি উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিলেন। আপীল মঞ্জুর হইয়াছে। এখন তিনি ৪০০ শত টাকার জামীনে মুক্ত আছেন।

—০—

আরামবাগ রাজনৈতিক ডাকাতি মামলার মোকদ্দমা হুগলী স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের আদালতে চলিতেছে। অন্যতম আসামী ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির মাতা এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে যাহাতে বর্ত্তমানে স্বগৃহে আটক ডাক্তার মুখার্জ্জীর ভাই শ্রীঅনন্তকুমার মুখার্জ্জি এই মোকদ্দমার সংক্রান্ত বিষয়ে উকীলকে পরামর্শ দিতে পারেন তজ্জন্য অনুমতি প্রদান করা হউক। ট্রাইবুনালের প্রেসিডেণ্ট জানাইয়াছেন যে তাঁহার দরখাস্ত বাংলা সরকারের স্বার মুন্সীর নিকট প্রেরণ করা হইবে।

—০—

২৯শে জুলাই দিবা ১-৩০ মিনিটের সময় ৩ জন বিচারাধীন কয়েদী ঢাকার একটি সাব জেল হইতে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ও লাফাইয়া পলায়ন করিয়াছে। একজন ধৃত হইয়াছে কিন্তু দুইজন এখনও পলাতক।

—০—

মেরিনার্স ইউনিয়ন

আগামী ৭ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৩।০ টার সময় খিদিরপুর, ৭নং ইকবালপুর লেনে বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হবে। জাহাজের চাকুরিয়াগণের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা তাতে হবে। সভ্য-গণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

সত্যেন্দ্রচন্দ্রের মুক্তি

রাজবন্দী শ্রীযুত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র এম, এ, বি-এল মুক্ত হয়েছেন। আমরা তাঁকে হৃদয়ের প্রীতি ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—০—

মহাযুদ্ধের গৌরব :—বিগত মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ৮০৭,৪৫১ জন লোক নিহত হইয়াছে। ৬৪,৯০৭ জন লোক নিরুদ্দেশ হইয়াছে। ২,০৫৯,১৩৪ জন আহত হইয়াছে। ৩৯,০০০ হস্তপদ হারাইয়াছে। ২০০০ জন অন্ধ হইয়াছে। ৬০০০ হাজারের উপর মস্তিস্ক বিকৃত হইয়াছে। ১৯,০০০ জন আহত লোক এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

যুদ্ধের বিধবা সংখ্যা ১৫৪,০০০ জন। যুদ্ধের মাতৃ পিতৃহীনের সংখ্যা ২৬,৬০০০ জন এবং ৭৫০,০০০ জন সৈনিক বেকার অবস্থায় আছে। ইহাদের ৬০,০০০ জন ক্ষমতাহীন হইয়াছে।

দি ইউনাইটেড স্পোর্টিং এজেন্সী

[illegible] বানাজী লেন (টালা) কলিকাতা।

উন্মুক্ত খেলার সরঞ্জাম, সাইকেল এবং সাইকেলের অন্যান্য মাল মশলা সরবরাহকারী, কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ হারমোনিয়ম "বাসন্তী" ফ্লুটের নির্ম্মেতা।

সিঙ্গেল রিড ২২, ডবলরিড ৩২, ৩৫, ৪৫, ৫৫, ৬৫, প্যারিস রিড ৭৫, ডবলরিড ৯৫,

ইংলিশ মেক ফুটবল মেকগ্রিগর

কাউহাইড কম্প নং ৫	২০
ওউন মেক ১৮ পেনেলস কম্পিটিসন মেচ কম্প নং ৫	১২॥০
কম্পিটেসন মেচ (মেকগ্রিগর প্যাটার্ণ) কম্প নং ৫	১০॥০
বুলহেড মেচ ১২ পেনেলস কম্প নং ৫	৮॥০
ভলান্টিয়ার মেচ ১০ পেনেলস কম্প নং ৫	৭॥০
সুনার মেচ ৮ পেনেলস কম্প নং ৫	৬॥০
জুবলী মেচ ৮ পেনেলস কম্প নং ৫	৫॥০
৪ নং বুলহেট মেচ কম্প	৬॥০
৪ নং সুনার মেচ কম্প	৫
৪ নং ভলান্টিয়ার মেচ কম্প	৬
৪ নং জুবলী মেচ কম্প	৪
৩ নং মেচ কম্প ৮ পেনেলস	৩॥০
[illegible]	২॥০
১ নং [illegible]	১৫০

	ফুটবল ব্লাডার	ইনফ্লাটার
৫ নং	২	১॥০, ২, ২॥০
৪ নং	১৫০	লেস ইং
৩ নং	১৷৵০	৷৵০, ৷৷৵০
২ নং	১৵০	রাবার সলিউসন
১ নং	৫৵০	৷০, ৷৵০, ॥০

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১৷৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১১ই আগষ্ট ১৯২৭, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৪ | ২৬ম সংখ্যা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যিনি এক সঙ্গে "গণবাণী"র পাঁচজন গ্রাহক সংগ্রহ করে দিবেন তাঁকে এক বছর বিনা মূল্যে গণবাণী দেওয়া হবে।

মানেজার—"গণবাণী"
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

[illegible] মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
[illegible] শ্রীদ্যা[illegible]মোহন [illegible]

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১১ই-আগষ্ট, ১৯২৭, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৪	২৬ম সংখ্যা

ফ্যাসিষ্ট ইটালীতে কৃষকদের অবস্থা

(শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সম্প্রতি রোমের আশপাশে কতকগুলো জায়গায় কৃষকেরা ম্যুসোলিনীর শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলো। কর আদায় করবার জন্যে যখন আদায়কারী আসে তখন তারা তাকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। এই অদম সাহসিকতার দণ্ড স্বরূপ ম্যুসোলিনী গ্রামকে গ্রাম কৃষকদের মেয়ে পুরুষ সকলকে ফ্যাসিষ্ট সৈন্য পাঠিয়ে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছেন। অত্যাচার সহ্য করবারও একটা সীমা আছে। (অবিশ্যি ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়ে) ফ্যাসিষ্ট প্রভুত্বের শাসনে ইটালীর কৃষকদের যে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে তা বলে শেষ করা যায় না। ইটালী হচ্ছে কৃষি-প্রধান দেশ। শতকরা ষাটজন হচ্ছে চাষী। ম্যুসোলিনী এই কৃষকদের সাহায্যেই নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। চাষীদের খুব লম্বা চওড়া কথা বলে আশ্বাস দিয়ে ম্যুসোলিনী তাদের সাহায্যে শহরে শহরে তাঁর বিরুদ্ধে যে সব দল ছিল তাদের নির্ম্মূল করেন। কিন্তু যেই কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেল অমনি চাষীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ম্যুসোলিনী বড় বড় ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কের মালিকদের দলে টেনে ফ্যাসিষ্ট দল পুষ্ট করেছেন। ইতালীর কৃষকদের অবস্থা বুঝতে গেলে ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্ট কৃষকদের সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করেছে সেটা বিচার করে দেখা দরকার। প্রত্যেক দেশেই কৃষকদের অস্তিত্ব কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তের উপর নির্ভর করে। সেই সর্ত্তগুলি হচ্ছে (১) কি দাম দিয়ে কৃষককে তৈরী মাল কিনতে হয় (২) কি সর্ত্তে কৃষক টাকা ধার পায় (৩) কি পরিমাণ ট্যাক্স তাকে গভর্ণমেণ্টকে দিতে হয় এবং (৪) জমিদারদের সঙ্গে খাজনা সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করবার স্বাধীন অধিকার কৃষকদের কতদূর আছে।

মোটামুটি ভাবে ধরতে গেলে এই চারটি সর্ত্তের উপর কৃষকের জীবন অনেকখানি নির্ভর করে থাকে। ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্টের শাসনে ইটালীর কৃষকদের কৃষি সমবায় স্থাপন করবার কোন অধিকার নেই। ফলে ব্যবসাদাররা যে দাম দাবী করে সেই দাম দিয়েই তারা তৈরী মাল কিনতে বাধ্য হয়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইটালী জার্ম্মানীর সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্যে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছিলো তখন ইটালীয়ান ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে ইটালীর জমিদারদের ভয়ানক সংঘর্ষ হয়। জার্ম্মানীর সঙ্গে প্রতিযোগতায় ইটালীর ব্যবসায়ীরা প্রতিপদে হটে যাচ্ছিল। জার্ম্মানীর তৈরী মাল ইটালীর বাজার থেকে ইটালীর মালকে একরকম তাড়িয়ে দিচ্ছিল বললেও চলে। ব্যবসায়ীরা জার্ম্মানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে উঠে গভর্ণমেণ্টকে জার্ম্মান মালের উপর রক্ষণ-শুল্ক বসাবার জন্যে চাপ দিতে লাগল। এদিকে জমিদাররা দেখলো যে এই রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তিত হলে তাদের ভয়ানক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, কেন না জার্ম্মানী তাদের কৃষিজাত দ্রব্য কিনতে সম্মত হয়েছিলো এই সর্ত্তে যে ইটালীর বাজারে জার্ম্মানীর তৈরী মাল বেচবার অবাধ অধিকার থাকবে। এই রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তিত হলে জার্ম্মানীর তৈরী মাল বিক্রি করবার অবাধ অধিকার অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হবে। ফলে, জার্ম্মানী তাদের কৃষিজাত মাল কিনতে রাজী হবে না। এই কারণে জমিদাররা রক্ষণ-শুল্ক প্রবর্ত্তনের বিপক্ষে দাঁড়ান। ফলে বহুকাল ধরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জমিদারদের লড়ালড়ি চললো। শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদেরই জয় হোল। গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মান মালের উপর শুল্ক বসালো। এর ফলে জমিদারদের যত ক্ষতি হোক না হোক কৃষকদের ভয়ানক ক্ষতি হোল। এই শুল্ক বসার দরুণ তাদের আগের চেয়ে বেশী দাম দিয়ে জিনিস কিনতে বাধ্য হোতে হোল। শুধু তাই নয় ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে কয়েক বৎসরের মধ্যে ইটালীতে কয়েকটি একচেটিয়া ব্যবসায়ের (Trusts) উৎপত্তি হয়েছে। মণ্টি কাটিনী কোম্পানী বলে একটা

কোম্পানী সারা ইটালীতে জমিতে দেবার জন্যে কেমিক্যাল সার প্রস্তুত করবার একচেটিয়া অধিকার পেয়েছে। এই কোম্পানীর সঙ্গে ইটালীর সমস্ত বড় বড় অলিভ তেল তৈরী করবার ফ্যাক্টরীর বন্দোবস্ত আছে। তারা তৈল বের করে নিয়ে অলিভের ছিবড়েগুলো এই কোম্পানীকে দেয়। এই অলিভের ছিবড়েগুলো গরুর খাবারের জন্যে ইটালীতে বিক্রী হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মণ্টি কাটিনী কোম্পানী ক্যালসিয়াম সায়ানাইড, সুপার ফস্‌ফেট এক কথায় কৃষির জন্যে যা কিছু দরকার হয় সব জিনিস উৎপন্ন করে। এই কোম্পানী যে শুধু উৎপন্ন করবার একচেটিয়া অধিকার দখল করে আছে তা নয় কৃষির পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের জিনিস বিদেশ থেকে আমদানী করবারও একচেটিয়া অধিকার এই কোম্পানীর হাতে। ফলে কৃষকদের এই কোম্পানীর কবল থেকে রক্ষে পাবার কোন উপায় নেই। এই কোম্পানী খুসী মত যে দাম ঠিক করে দেয় সেই দাম দিয়েই কৃষকদের জমিতে দেবার জন্যে সার, গরুকে খাওয়াবার জন্যে অলিভের খোসা কিনতে বাধ্য হতে হয়।

ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্টের দৌলতে কৃষকদের এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী দিয়ে তৈরী মাল কিনতে হয়। শুধু তাই নয় ফ্যাসিষ্ট শাসনের আগে ইটালীতে কৃষকদের সহায্য করবার জন্য বহুসংখ্যক কৃষি ব্যাঙ্ক ছিলো। এই ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদের কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি, জমিতে দেবার জন্যে সার ইত্যাদি কেনবার জন্যে দরকার মত টাকা ধার দিতো। এই ব্যাঙ্কগুলো প্রায় অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিকদের হাতে ছিলো। ফ্যাসিষ্ট কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্যে এই রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠিত কৃষি ব্যাঙ্ক গুলোকে ধ্বংস করেছে। ফলে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কৃষির জন্যে টাকা ধার করা ছাড়া কৃষকের আর অন্য কোন গতি নেই। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকেও তারা এক পয়সা ধার আজ পর্য্যন্ত পায় নি। ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্ট কৃষকদের বার বার আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত তাদের কিছুই দেয় নি। তাই আজ ইটালীর কৃষকদের দুরবস্থার আর শেষ নেই।

এর উপর ইটালীর কৃষকদের গভর্ণমেণ্টকে তিন রকম ট্যাক্স দিতে হয়—(১) ন্যাশন্যাল ট্যাক্স (২) প্রভিন্সিয়াল (প্রাদেশিক) ট্যাক্স (৩) লোকাল (স্থানীয়) ট্যাক্স।

(১) সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ন্যাশন্যাল ট্যাক্স স্বরূপ কৃষকদের সম্পত্তি আর আয়ের উপর ট্যাক্স আদায় করে।

(২) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট supplementary ট্যাক্স আদায় করে।

আর (৩) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট গরুবাছুরের উপর আর মাথাপিছু পরিবারের প্রত্যেক লোকের উপর ট্যাক্স আদায় করে। এ ছাড়াও কৃষকদের Indirect tax নানারকম দিতে হয়। যে কৃষকেরা তাদের ক্ষেতের কাছে বাস করেনা তারা ট্যাক্স না দিয়ে ক্ষেত থেকে শাক সবজী শহরে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেনা। এই শুল্ক প্রথায় কৃষকদের যে কি অবস্থা ঘটেছে তা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের যে স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমান ছিলো ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্ট সেগুলি উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় গ্রামে গ্রামে নিজেদের লোক নিযুক্ত করেছে ট্যাক্স আদায় করবার জন্যে।

কৃষকদের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্টের জমীদারদের খুব সুবিধে করে দিয়েছে। আগে এই প্রতিষ্ঠানগুলোই ব্যক্তিগত কৃষকের হয়ে জমীদারদের সঙ্গে জমী সংক্রান্ত সমস্ত দেনা পাওনার বন্দোবস্ত করতো। এই সঙ্ঘশক্তির জোরে কৃষকেরা জমীদারের কাছ থেকে সুবিধেজনক সর্ত্তে জমি বন্দোবস্ত করে নিতো। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখন প্রত্যেক কৃষককে ব্যক্তিগত ভাবে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। জমিদারেরা সুবিধে বুঝে ইচ্ছানুযায়ী খাজনা ধার্য্য করছে।

ইটালীর কৃষকেরা আজ বুঝতে পেরেছে যে কতবড় ভুল তারা করেছে অতীতে মুসোলিনীকে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। আজ তাই ইটালীতে স্থানে স্থানে কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছে। কৃষক আন্দোলন সমস্ত ইটালীময় ছড়িয়ে পড়েছে। ইটালীর কৃষক তো আর ভারতবর্ষের কৃষক নয় যে জমিদারের অত্যাচার আর গভর্ণমেণ্টের নিষ্পেষণ বরাতের দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সারা জীবন ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দেবে। এরা অত্যাচারকে কি করে দমন করতে হয় তা জানে। সেদিনকার ঘটনা ভবিষ্যৎ এর মহাবিপ্লবের ইঙ্গিত মাত্র। এদেশের মানুষ শুধু "বাত" দিয়ে নয়, হাত দিয়ে অত্যাচারীকে শাসন করে থাকে।

—বার্লিন

বর্ত্তমান ভারত

—০—

(আর, পাম দত্ত)

—০—

[বর্ত্তমান ভারত আর, পাম দত্তের "মডার্ণ ইণ্ডিয়া" (**Modern India**) নামক ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। এ লেখকের আন্তর্জাতিক খ্যাতির বিষয় নূতন করে পরিচয় দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিক গণ-আন্দোলনের খবর এতটুকুও যাঁরা রাখেন, আর, পাম দত্তের নামও তাঁরা জানেন। মনোযোগ সহকারে এ অনুবাদ পাঠ করতে থাকলে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক আদর্শের সহিত পাঠকগণ পরিচিত হতে পারবেন। ইতোপূর্ব্বে ১৩শ, ১৫শ, ১৭শ, ১৯ম ও ২২ম সংখ্যক "গণবাণী"তে এ অনুবাদ বের হয়ে গেছে।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাতীয় আন্দোলন

আধুনিক ইম্পিরিয়েলিজম্ বা শোষণবাদ যে সকল নূতন অবস্থার সৃষ্টি করেছে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সে সবের সম্মুখীন হতে কতটা কৃতকার্য্য হয়েছে তা দেখা দরকার।

যুদ্ধের পূর্ব্বাবধি প্রাথমিক জাতীয় আন্দোলন সমাজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রস্তরে—প্রধানতঃ ব্যবহারজীব শ্রেণীর মধ্যেই

সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চতর শ্রেণী সমূহ, ভূম্যধিকারিগণ ও ধনিক সম্প্রদায় বৃটিশের দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে বিদেশী শাসনের প্রতি ভক্তিমান ছিল। শ্রমিক ও কৃষকগণের মধ্যে কোন জাগরণের ভাব তখনো পরিলক্ষিত হয়নি।

এমন কি যুদ্ধের পূর্ব্বেও এ পরিবৃত্তির বিস্তৃতি অনেকটা পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার আওয়াজ মধ্যশ্রেণীর নিম্নস্তরেও পৌছেছিল। গঠনমূলক পরিবর্ত্তনকামী বা মডারেটগণের ন্যাশনালিজম (জাতীয়ত্ববাদ) চরমপন্থার অনুকূলে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ চরমপন্থার ভিতর দিয়ে ইম্পিরিয়েলিষ্ট বা শোষণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সম্পত্তি বিহীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অদম্য ঘৃণা প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, ব্যবহারিক নীতির দিক থেকে তখনো চরমপন্থা দুর্ব্বল ছিল, কেননা, তা কোনো শক্তিশালী, অবিচ্ছিন্ন গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। চরমপন্থীদের অধিকতম শক্তিশালী অস্ত্র ছিল বয়কট বা বর্জ্জন। কিন্তু, একক ভাবে এ'কে পরীক্ষা করে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে এ'টি ভারতীয় শিল্পানুষ্ঠানের মালিকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা যে চরমপন্থার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ হয়েছিল ত্রাসনীতিকগণের বিপ্লবান্দোলনে। কাজেই এটা নিশ্চিত যে চরমপন্থীদের আন্দোলন মধ্যশ্রেণীর সীমা অতিক্রম করে উৎপন্নকারী শ্রমিকগণের প্রকৃত শক্তির অন্তর্নিহিত কিছুতেই হতে পারেনি।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেও যুদ্ধের পরে জনগণের মধ্যে একটা খুব বড় জাগরণ সূচিত হয়। জাগরণ যে শুধু এক ভারতেই হয়েছিল তা নয়, আসলে একটা বিশ্বজোড়া আন্দোলনেরই একটা অংশ ছিল এ জাগরণ। যে বিশ্ব-বিপ্লব-তরঙ্গ যুদ্ধ ও রাশিয়ার বিপ্লব থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, তা জগতের সকল দেশেই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের শ্রমিকগণ ও এসিয়ার পদানত জাতি-সমূহ যে মুক্তি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল তদ্দ্বারা ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের ভিত্তি বিকম্পিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলন একটা নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল; চাঞ্চল্য বিশ্বজনীন হয়ে পড়েছিল; লক্ষ লক্ষ লোক ধর্ম্মঘট, হরতাল ও সংগ্রামে যোগদান করেছিল। ১৯১৯ হতে ১৯২২ সাল ভারত-সাম্রাজ্য বিপদ-সঙ্কুল হয়ে পড়েছিল।

এই সময় থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। প্রকৃত পক্ষে আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এর সকল অকৃতকার্য্যতা সত্ত্বেও এ আন্দোলন এর পুরাতন স্তরে কিছুতেই ফিরে যেতে পারে না। শত লক্ষ কৃষক ও শ্রমিক, যাদের নামে মধ্যশ্রেণীর জাতীয় আন্দোলনকারীরা কথা বলতেন তারা আজ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু, নিদারুণ প্রশ্ন হচ্ছে—সে নেতৃত্ব কোথায় যে নেতৃত্বের দ্বারা তাদের দাবী সমূহের কথা উত্থিত হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরের ওপরেই জাতীয় সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

১৯১৯ হতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত সময় জাতীয় আন্দোলনের অগ্নি পরীক্ষার সময় ছিল। এ সময়ের অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদিগকে ভবিষ্যতের কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করতে হবে।

জনগণের আন্দোলনের জন্যে সত্যকারের নেতৃত্ব পাওয়া গিয়েছে কি? ১৯১৯ সন হতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত যে নেতৃত্ব প্রদর্শিত হয়েছিল তা'কি যথার্থ নেতৃত্ব ছিল? বর্ত্তমান নীতি ও প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কি? এ সকল প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

এ ক'বছরে যা দেখা গিয়েছে তাতে ভারত সাম্রাজ্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে অত্যন্ত বেশীরূপে বিপর্য্যস্ত করেছে। ভবিষ্য বিজয়ের পথ পরিষ্কার করার জন্যে বর্ত্তমান পরাজয়ের পাঠ গুলোকে খুব ভালোরূপ বিশ্লেষণ করে বুঝে নিতে হবে। পতনের সময়ে কর্ম্মপদ্ধতির প্রণয়ন ও সংশোধন এবং সংগঠনের কাজ, এ সবই অতিশয় আবশ্যক কাজ।

১। গান্ধীর কার্য্যক্রম

জাতীয় আন্দোলনের আধুনিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হলেই ১৯১৯—১৯২২ সনের সঙ্কট কালের কথাই বিবেচনা করতে হবে। আধুনিক আন্দোলনের এটাই ছিল সন্ধিক্ষণ।

এ সময়টা সম্বন্ধে আলোচনা করতে অনেক অসুবিধে আছে। গান্ধীর ব্যক্তিত্ব লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয়েছিল। ব্যক্তিগত অনুরাগ, দার্শনিক ও ধর্ম্মবিষয়ক পূর্ব্বানুরাগ এবং রাষ্ট্রনীতিক পরম্পরা এ সবই একটা আলোচনার পথ খোলসা করে দেয়।

পরোক্ষ ভাবে ব্যতীত বর্ত্তমান উদ্দেশ্যের জন্যে গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও দর্শনের প্রশ্ন ততটা আবশ্যক প্রশ্ন নয়। আমাদের নিকটে বিশিষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে ১৯১৯—১৯২২ সনের গণ-আন্দোলন এবং যে নেতৃত্বের দ্বারা এ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সেই নেতৃত্ব। গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও দর্শন ততটুকু উল্লেখযোগ্য যতটুকু সে সবের দ্বারা নেতৃত্বের সামাজিক শক্তি সমূহ প্রকাশ পায়। প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি মাত্র প্রশ্ন এই হচ্ছে যে এ নেতৃত্বের রাষ্ট্রনীতিক পথ ঠিক ছিল কিনা? এর পরে যে অকৃতকার্য্যতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা'কি অনিবার্য্য ছিল, না তা ভুল নেতৃত্বের ফল ছিল? যদি ভুল করা হয়ে থাকে তা হলে সে সব ভুল কি? ভবিষ্যতের জন্যে এর দ্বারা কি শিক্ষাই বা আমাদের হয়েছে?

এ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ১৯১৯—১৯২২ সনের ঘটনাবলীর ও গান্ধীর কার্য্যক্রমের সমালোচনা করতে পারি।

প্রথমেই এ সময়কার কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ও গান্ধীর সাফল্য কোথায় তা নির্ণয় করতে হবে। এ সময়কার কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য এই হচ্ছে যে জাতীয় আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিগণিত হয়েছিল। আর গান্ধীর সাফল্য এই ছিল যে তিনিই আর আর সব নেতাদের চেয়ে একক হয়ে প্রায় সর্ব্বপ্রথমে জনগণের নিকটে পৌছেছিলেন। এটা ছিল গান্ধীর প্রথম কর্ম্মসাফল্য।

গান্ধীর বিরুদ্ধে যে সব খাস-মেজাজ ও দুর্ব্বলতার অভিযোগ আনা হয় সে সবের চেয়ে তাঁর বাস্তব কর্ম্ম সাফল্য বৃহত্তর এবং এ কর্ম্মসাফল্যই হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়ত্বের জন্যে তাঁর প্রকৃত অবদান। জাতীয় রাজনীতির চর্চ্চাকারিগণের মধ্য থেকে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে কংগ্রেস, কাউন্সিল, এসেম্‌ব্লী ও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির সঙ্কীর্ণতার পরিবৃত্তি অতিক্রম করে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও অপর শ্রমিকগণের মধ্যেই তাঁর বাণী পৌছাতে চেষ্টা করেছিলেন। যখন তাঁর ক্ষমতা ছিল তখন তিনি তাদেরই মধ্য থেকেই সে ক্ষমতা পেয়েছিলেন। আর যে মুহূর্ত্তে তিনি আপনাকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর পতন আরম্ভ হলো।

গান্ধীর দ্বিতীয় কর্ম্মসাফল্য হচ্ছে যে তিনি জনগণের সম্মুখে কর্ম্ম-নীতি উপস্থিত করে ছিলেন, অর্থাৎ গণকর্ম্মের নীতি।

কি নীতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন যার দ্বারা তিনি জনগণের কাছ থেকে সাড়া পেয়েছিলেন? তাঁর নীতি ছিল স্বরাজ লাভ করবার জন্যে অসহযোগ অবলম্বন এবং বিশেষ করে তাঁর আন্দোলনের শেষ সীমানায় জন-গণের সমবেত বিধি-লঙ্ঘন-নীতি।

এখানে আমাদের দেখতে হবে অসহযোগের মানেই বা কি, আর সমবেত বিধি-লঙ্ঘনই বা কাকে বলে?

সাধারণতঃ অসহযোগকে একটা বিশিষ্ট দর্শনের বিকাশ বলা হয়। এ দর্শন হচ্ছে নিষ্প্রতিরোধের দর্শন। কোনো প্রকারের বল প্রয়োগ করাই এর দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। কোনো প্রকারের জোর জবরদস্তী নয়, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির বলেই সব করিয়ে নিতে হবে।

একথা মোটেই ঠিক নয়

অসহযোগের ব্যবহারিক মানে ও রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য এর সম্পূর্ণ বিরোধী। অসহযোগের রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য বেড়েছে তা উপরিউক্ত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে।

জনগণের সমবেত কার্য্যের শক্তির দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে নম্র হতে বাধ্য করার প্রচেষ্টার নামই হচ্ছে অসহযোগ।

শান্ত, প্রবর্ত্তনশীল ও আধ্যাত্মিক যুক্তি-তর্কের কোনো প্রশ্নই এতে উঠতে পারেনা। এ হচ্ছে নিছক শক্তির প্রশ্ন।

এ বিষয়টা এত বিশিষ্ট ভাবের যে এটাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার রূপে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। সন্দেহ দূরীভূত করার জন্যে আন্দোলনের সময়ে গান্ধী যে ভাষার প্রয়োগ করেছেন তারি সমালোচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাঁর সে সময়কার ভাষা অত্যন্ত চরমভাবে যুদ্ধে আহ্বানের ভাষার মতো। তিনি বলেছেন :—

"অসহযোগীরা গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করতে এবং জনগণের ইচ্ছার নিকটে বশীভূত হতে বাধ্য করতে চাই। আমরা মানবতাকে বিলোড়িত করে তুলব, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়র্ল্যাণ্ড যা করেছে তা'ও আমরা করতে ছাড়বোনা, শুধু এইটুকু বাদে যে—আমরা বরং নিজেদের রক্তপাত করব, কিন্তু আমাদের বিরোধীদের নয়। আমাদের এ যুদ্ধ হচ্ছে শেষ যুদ্ধ।"

১৯২১ সনের ডিসেম্বরের বিজ্ঞাপনী থেকে এটুকু নেওয়া হয়েছে।

"আমি শান্তিপ্রিয় লোক, কিন্তু তা বলে যে কোনো প্রকারেই শান্তিকে মেনে চলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা ততটুকু শান্তি অবলম্বন করবো যা আমাদিগকে মুক্তমানব হিসেবে দাঁড়াতে সমর্থ করবে।

"গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করা", "গবর্ণমেণ্টকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা," এসব আধ্যাত্মিক প্ররোচনার ভাষা মোটেই নয়। এ হচ্ছে দস্তুর মত বল প্রয়োগের ভাষা। এ হচ্ছে বিশাল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে শক্তিশালিনী ভাষা। এ ভাষাতে শক্তি এ জন্যে সঞ্চিত হয়েছে যে এটা জনগণের কর্ম্মপ্রেরণার ওপরে বিন্যস্ত হয়েছে।

নন্-কো-অপারেশন ও সমবেত বিধি-লঙ্ঘনের প্রচার কার্য্যে জাতীয় আন্দোলনকে সম্পূর্ণ এক নূতন রূপ দিয়েছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে চরম পন্থীদলের সীমাবদ্ধ বয়কটের পরীক্ষা ব্যতীত আন্দোলনের এমন রূপ আর কখনো পরিস্ফুট হয়নি। গবর্ণমেণ্টকে বশ্যতা মানাবার জন্য জনগণকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করার প্রচেষ্টা এই প্রথমই হয়েছিল। ১৯২০—২২ সনে যে অসহযোগের প্রচার কার্য্যে বিপ্লবের রূপ ধারণ করেছিল এটাই ছিল তার একমাত্র কারণ।

এ সব ছিল গান্ধীর দু'টো খুব বড় কৃতিত্ব। কেমনে যে ভাঙন ধরেছিল তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা এখন আবশ্যক এবং কেন এ ভাঙন ধরেছিল তারও কারণ নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়।

গান্ধীর সংগ্রাম ব্যঞ্জক ভাষা জনগণের ধাতের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছিল। এ ভাষার দ্বারা জনগণের কাছ থেকে ভীষণ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর হুকুমে কাজ করতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রস্তুত ছিল। ইংল্যাণ্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে যে হরতালের হুকুম জারী হয়েছিল তা সমস্ত দেশ জুড়ে জনগণের ধর্ম্মঘটের দ্বারা পালিত হয়েছিল। ১৯২১ সনের আহমদাবাদ কংগ্রেস সমবেত বিধি লঙ্ঘনের কর্ম্মতালিকা কার্য্যে পরিণত করার জন্যে গান্ধীকে একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করেছিল।

তারপরে ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের আকস্মিক বিশৃঙ্খলা এলো। এ বিশৃঙ্খলা গবর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠতর শক্তির দ্বারা গণশক্তির পরাজয় নয়। এ ছিল বিনাযুদ্ধে পশ্চাদ্গমন। সমবেত বিধি-লঙ্ঘনের যে বৃহৎ কামানটি দেখিয়ে প্রায়ই শাসানো হতো তা আর কখনো গোলা উদ্গীরণ করলে না। পশ্চাদ্গমনের সঙ্কেত দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র আন্দোলনটি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। গান্ধী গেরেফ্‌তার হলেন বটে, কিন্তু, জনগণের তরফ থেকে তার কোনো প্রতিবাদ হলোনা। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আসন যেটুকু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সেটুকু তারা আবার ভালো করে ফিরিয়ে নিলে। সেই থেকে যে বিষাদময় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে তা আজো পর্য্যন্ত চলেছে।

—০—

বিবিধ প্রসঙ্গ

সত্যেন্দ্র সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল সরকারের নজরবন্দী হয়ে বর্ম্মার জেলে আবদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি মুক্তি পেয়ে তিনি কলিকাতায় ফিরে এসেছেন। তিনি নোয়াখালী জেলার অধিবাসী। সেজন্যে কলিকাতাস্থ নোয়াখালী বাসিগণের সভা "নোয়াখালী সম্মিলনী" গত রবিবারে তাঁকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ হলে অভিনন্দিত করেছেন। সত্যেন্দ্র বাবু গত যুদ্ধের সময়ে প্রায় ৪ বছর নজরবন্দী ছিলেন, এবারেও তিন বছর থেকে ফিরে এলেন। দেশপ্রাণতার জন্যে এই যে দুঃখ-কষ্ট তিনি ভোগ করেছেন তার জন্যে তাঁর দেশবাসী তাঁকে অভিনন্দিত না করলে বাস্তবিকই অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হতো।

জন্যে নোয়াখালী সম্মিলনীকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সত্যেন্দ্র বাবু বলেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁকে বন্দী করে রেখে তাঁর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। যে অল্প ক'জন রাজবন্দীর সহিত তিনি কারাগারে বাস করেছেন তাঁদের সকলের মধ্যেও কোনো পরিবর্ত্তন, কোনো দুর্ব্বলতার লক্ষণ তিনি দেখতে পাননি। এটা তাঁর পক্ষে একটা মস্ত বড় সান্ত্বনা। তিনি আরো বলেছেন যে আমাদের জাতীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যে কাজের যে পন্থা সকলে তাঁকে নির্দ্দেশ করে দিবেন সে পথ ধরেই তিনি চলবেন। এ সম্বন্ধে দু' একটি কথা আমরা তাঁকে বলব। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস আজকের দিনে সম্পূর্ণরূপে সমাজের উচ্চস্তরের বিন্যস্ত স্বার্থ বিশিষ্ট লোকের করতলগত হয়ে পড়েছে। জনগণের সহিত কংগ্রেসের এতটুকুও যোগ আর নেই। জনগণের অধিকারের কথা কংগ্রেসে তুল্লেই কংগ্রেসের ও দেশের বড় বড় নেতারা সোশ্যালিজম, বলশেভিজম্ ও কম্যুনিজমের গন্ধ তাতে পেয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠেন। কেউ কেউ বা আবার কৃষকের রক্ত-শোষক জমীদার গুলোর জন্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে আরম্ভ করে দেন। ধনিক, বণিক ও জমীদারের অর্থের দ্বারা তাদেরই স্বার্থের জন্যে এঁ দলের লোকেরা জাতীয় সংগ্রাম চান। আমরা জানতে চাই সত্যেন্দ্র বাবু কাদের নির্দ্দেশ মেনে চলবেন? পরান্নভোজী, পরশোষক স্বার্থপর বুর্জোয়া নেতৃগণের, না, শোষিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত জনগণের?

"অধিকার"

বাংলা দেশের হিন্দু সমাজের হয়ে যাঁরা কথা ক'ন, তাঁরা বাস্তবিকই সমগ্র হিন্দু সমাজের হয়ে কোনো কথা ক'ন না। সাধারণত দু' শ্রেণীর হিন্দু রয়েছেন,—ভদ্র ও শূদ্র অর্থাৎ উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর। এই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা শতকরা সাড়ে বারো জন আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা হচ্ছে শতকরা সাড়ে সাতাশি জন। এই শতকরা সাড়ে বারো জনই বাংলার সমগ্র হিন্দু সমাজের নামে কথা ব'লে থাকেন। কিন্তু, কাজের বেলায় তাঁরা সাড়ে সাতাশি জন হিন্দুকে হিন্দু ব'লে মান্য করাতো দূরের কথা মানুষ বলেও গণ্য করেন না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর স্পর্শে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর দেব-দেবীকেও নাকি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর ওপরে এই যে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অত্যাচার যুগের পর যুগ ধ'রে চলছে তারি বিরুদ্ধে আজ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মাথা তুলে উঠেছে, তাদের মধ্যে একটা সামাজিক বিপ্লবের পূর্ণ লক্ষণ সূচিত হচ্ছে। এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের দ্বারা পরিচালিত অধিকার নামক ক্ষুদ্র মাসিক খানা রীতিমত পড়লে বুঝতে পারা যায় যে এ বিপ্লবের ভাবটা কত বেশী প্রবল। শ্রাবণ মাসে অধিকার এর চতুর্থ সংখ্যা বের হয়েছে। ছোট্ট কাগজ, মূল্য মাত্র বছরে একটাকা। ৫।২, মাণিকতলা রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুত রসিকলাল বিশ্বাস বি, এ, কাগজ খানার সম্পাদন করেন। "অধিকার" তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের নিকট থেকে দয়ার দান স্বরূপ কোনো অধিকার পেতে চায় না, সে চায় নিজের শক্তির জোরে নিজের ন্যায়ানুমোদিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। "অধিকার" বলছে, শতকরা ৮৭॥০ জন হিন্দু শতকরা ১২॥০ জনের মন্দির গুলোকে বিধর্ম্মীর অত্যাচার থেকে কিছুতেই রক্ষা করার চেষ্টা করবে না। কেন না, সে মন্দিরে তাদেরকে কখনো প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। "অধিকার" আরো বলছে যে 'আমরা ৮৭॥০ জন ১২॥০ জনের সম্মুখে মাথা নোয়াতে যাবো কিসের দুঃখে? ১২॥০ জনের দরকার থাকে তো বিনম্র হয়ে, ভালো মানুষ সেজে আমাদের সম্মুখে আসুক।' বটেই তো। একেতো সংখ্যায় শতকরা ৮৭॥০ জন, তার ওপরে আবার উৎপন্নকারী শ্রেণী, কেনই বা মাথা তাঁরা নোয়াবেন। তবে "অধিকার" এর পরিচালকগণকে একটি কথা আমরা বলে রাখতে চাই। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এ তিনটি বন্ধনই এক একটা মনুষ্য-শ্রেণীকে এক সঙ্গেই বেঁধে রেখে দিয়ে থাকে। এর একটি মাত্র বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তিনটি বন্ধনই একই সঙ্গেই জড়িত হয়েছে, এক সঙ্গেই খুলতে হবে, তিনটিকেই। "অধিকার" এর পরিচালকগণের তলিয়ে দেখা উচিত যে কিসের জোরে ১২॥০ জন ৮৭॥০ জনকে পদানত করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ ১২॥০ জনের হাতে অর্থনৈতিক ও কথঞ্চিৎ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা আছে বলে নয় কি? "অধিকার" এর দলের দ্বারা পরিচালিত সামাজিক বিদ্রোহের কাজে বর্ত্তমান রাষ্ট্রশক্তি সাহায্য করবে, অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকবে এরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল। বৈদেশিক শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট দেশের কাহারো সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হবে তো আগে থেকে যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদেরই সহিত হবে। আশাকরি অভিনিবেশ সহকারে "অধিকার" এর পরিচালকগণ এ বিষয়টা চিন্তা করে দেখবেন।

আমরা "অধিকার" এর উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

আবার গান্ধী ও সাকলাৎ ওয়ালা

কমরেড্ সাকলাৎ ওয়ালার বুদ্ধির তারিফ আমরা মোটেই করতে পারছিনে। গান্ধী ভারতের শ্রমিকগণকে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করবেন এই আশা করাও যা, আর বন্ধ্যা নারী সন্তান প্রসব করবে এরূপ চিন্তা করাও ঠিক্ তাই। গান্ধী যদি শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে হাত না দেন তা হলেই যে দরিদ্র ও শোষিত শ্রমিকরা বেঁচে-বর্ত্তে যায়। এখনো আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধনিকগণের দালাল ও স্বার্থপর প্রতিক্রিয়া-শীল লোকের অভাব নেই। এর ওপরে যদি স্বয়ং গান্ধী এসে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তা হলে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্দ্দশার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। আরো খোলাসা করে বলতে গেলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন কম পক্ষে আরো পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে পড়বে। শ্রমিকদের সম্বন্ধে গান্ধীর যা মত তা আমরা জানি। তিনি তাদের ধর্ম্মঘট করার অধিকার পর্য্যন্ত স্বীকার করতে রাজী নন। আহ্‌মদাবাদে ধনিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি থাকেন। তাঁর পরম শিষ্য যমুনালাল বজাজ ও শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার প্রভৃতি কলের মালিক অর্থাৎ শ্রমিকগণের শোষক। তাঁর দরদ, তাঁর সহানুভূতি শ্রমিকদের চেয়ে ধনিকদের ওপরেই বেশী। তার পরে, শ্রমিক সঙ্ঘ বলতে তিনি বোঝেন, মালিকগণের নিকটে দরখাস্ত লিখে দয়া ভিক্ষা করার সঙ্ঘ। শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের শোষক মালিকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবে, এটা গান্ধী কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। এ হেন গান্ধী যদি শ্রমিকসঙ্ঘ গঠন করেন তা হলে সে সঙ্ঘ যে কত বড় প্রতিক্রিয়া-শীল সঙ্ঘ হবে

তা ধারণাই করে উঠ্‌তে পারা যায় না। আমরা জানিনে, সাকলাৎ ওয়ালা কেন এ সব কাজের জন্যে মিছামিছি খুঁচিয়ে তুলছেন? এরূপ করে তিনি ভারতে সত্যকারের ট্রেড্ ইউনিয়ন কর্ম্মী যাঁরা আছেন তাঁদের পথে কেবল মাত্র বাধারই সৃষ্টি করবেন। আমরা জানি ভারতবর্ষে এসে তিনি অনেক লোকের স্বরূপই ভালো ক'রে চিন্‌তে না পেরে অনেক ভুল করে গেছেন। অবশ্য অল্পকালের আলাপে সকল লোককে চেনা সহজও নয়। কমরেড সাকলাৎ ওয়ালাকে একটা অনুরোধ আমরা করছি। তিনি যদি কম্যুনিষ্ট হিসেবে মনে প্রাণে শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করে থাকেন তা হলে গান্ধীর মত শ্রেণী-সংগ্রাম বিরোধী প্রতিক্রিয়া-শীল লোকদিগকে যেন কর্ম্মক্ষেত্রে আর আহ্বান না করেন। ভারতের জনগণের সংগ্রাম ধনিক-বণিক ও জমীদারের দ্বারা কিছুতেই পরিচালিত হতে পারে না, ধনিক-গণের পরম হিতৈষী গান্ধীর দ্বারাও নয়। গান্ধী, নান্দী পর্ব্বতে মহীশূরের অতিথি হয়েছেন, সেখানেই তিনি থাকুন, কিংবা সিমলার পাহাড়ে যেয়ে লর্ড আরউইনের আতিথ্য গ্রহণ করুন, তাতেই দেশের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হবে। আমরা তাঁকে দেশের জনগণের আন্দোলনের কাজে কিছুতেই আর ডাকতে পারিনে। একবার যখন জেনে শুনেই জনগণের সহিত প্রতারণা করেছেন তখন তাঁকে দ্বিতীয় বার জনগণের কাজে বিশ্বাস করা কিছুতেই উচিত হবে না।

অন্যায় অত্যাচার

আমরা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারি যে ডাক ঘরে আমাদের চিঠি পত্র পুলিসের লোকেরা খুলে পড়ে তবে আমাদের নিকটে বিলি করতে দেয়, অথচ ডাক বিভাগ সরকারী ভাবে কিছুতেই স্বীকার করে না যে আমাদের চিঠি পত্র পুলিশের লোকেদের দ্বারা খোলা হয়। চিঠিগুলো খুলে অনেক সময় তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত আটা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাতে খামে আর চিঠিতে এত বেশী এঁটে যায় যে আমাদের পক্ষে তা খোলাই দায় হয়ে পড়ে। তার ওপরে অনেক সময়ে খুব বিলম্বেও চিঠিপত্র বিলি করা হয়। তার জন্যে পোষ্টাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অভিযোগ করলে তাঁরা কেবল মাত্র দুঃখ প্রকাশ করেই আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মাথা কিনে নেন। অনিয়ম কিন্তু সমান ভাবেই চলতে থাকে। এ সকল চিঠি পত্র যদি আবার বিদেশী ডাকের হয় তা হলে তো অত্যাচারের মাত্রা আরো চরমে উঠে পড়ে। বিদেশী ডাকের অনেক জিনিস আমাদিগকে ডেলিভারিই দেওয়া হয় না, নিষিদ্ধ না হলেও না। ইংল্যাণ্ডের "ন্যাশন্যাল মাইনরটি মুভমেণ্ট"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র "দি ওয়ার্কার" আমাদিগকে রীতিমত পাঠানো হয়। কিন্তু বিলি তা আমাদিগকে কখনো করা হয় না। অথচ "দি ওয়ার্কার" যে ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ হয়েছে এরূপ বিজ্ঞাপন আমরা কখনো দেখিনি। **বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের** জেনেরেল সেক্রেটারী শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রমিকদের সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার জন্যে ইউরোপে গিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি বার্লিনে আছেন। সেখান থেকে একটা রেজেষ্ট্রী খামে কিছু লেখা তিনি "গণবাণী"র সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহমদের নামে পাঠিয়েছিলেন। খামটা গত ৩১শে জুলাই তারিখে কলিকাতায় পৌঁছেছিল। সেদিনকার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট আফিসের ছাপও সে খামের ওপরে মারা রয়েছে। বিদেশী ডাকও কলিকাতায় সেদিনই বিলি করা হয়েছিল। সেদিন অবশ্য রবিবার ছিল। সে কারণে রেজিষ্টারী খামটা সেদিন বিলি না করা হলে তার পরের দিন সোমবারে সেটা বিলি করা খুবই আবশ্যক ছিল। কিন্তু, আমরা সেটা পেয়েছি ৪ঠা আগষ্ট বৃহস্পতিবারে। এরূপ জুলুম আমাদের ওপরে প্রায়ই হচ্ছে আর ডাক বিভাগ একটুখানিক শুক্‌নো দুঃখ প্রকাশ করেই ছুটি নিচ্ছে। এ সকল অন্যায় অত্যাচার ও অনিয়মের কেউ প্রতিকার করবার আছে কিনা তা আমরা খোলাসা ভাবে জানতে চাই। সরকার নিজেদের তৈরী করা আইন কানুন নিজেরাই যদি না মানে তা হলে অন্যলোক সে সব ভূয়ো আইন কানুন মানতে যাবে কেন?

— •:•:• —

পল্লীবাসীর পত্র

—•—

শহর হইতে পল্লীগ্রামের কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। গ্রামের কৃষক-চাষী মজুরদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাস্তবিক চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা নির্গত হয়। আষাঢ় এবং শ্রাবণ এই দুই মাসই চাষের প্রকৃত সময়। কিন্তু এই দুই মাসই চাষীদের বড় দুঃসময়। কাহারো হালের হেলে নাই। কাহারো ঘরে খাবার নাই। নিশ্চিন্ত মনে চাষে আত্ম নিয়োগ করিবে কি তাহারা স্ত্রী পুত্র পরিবারের উদারন্নের জন্য মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। কেহবা মহাজন, জমীদারের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে। উপবাস করিয়া তো আর হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করা চলেনা, তাই যাহাদের ঘরে ভাত নাই তাহারা "বাড়ি ধানের" অন্বেষণে জমীদার মহাজনদের কৃপাভিক্ষা মাগিতেছে। 'দেড়া বা দুনো' সুদ ব্যতীত মহাজনেরা বাড়িধান দিতে রাজী হয় না—অগত্যা মাথা পাতিয়া তাহাদের তাহাই লইতে হয়। মহাজনের পক্ষে 'বাড়িধান' বিলি করিবার ইহাই প্রশস্ত সময়। সময় বুঝিয়া তাই তাহারা দর হাঁকিয়া বসে। তাহাদের মর্জ্জির উপর কৃষকদের সমস্ত নির্ভর করে কাজেই বাধ্য হইয়া তাহারা এতদরে ধানবাড়ি লয়। কেহবা ধানের পরিবর্ত্তে জমী আবদ্ধ কিংবা বন্ধক দিয়া চড়া সুদে টাকা কর্জ্জ লইতেছে। এই সুদের টাকা বৎসরান্তে চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পাইয়া আসলে পরিগণিত হয়। কৃষক-চাষীদের তাহাদের যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর, লাখারাজও মালের সম্পত্তি—এমন কি বাস্তুভিটাটা পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া দলীল লিখিয়া দিতে হয়। সময় মত ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে তাহার সম্পত্তি নীলামে উঠিয়া পরিশেষে মহাজনের করতল গত হয়। প্রতি বৎসর কত জমী জমা চাষীদের হস্ত হইতে মহাজনদের হস্তে চলিয়া যাইতেছে তাহার সঠিক একটা হিসাব আমার নিকট নাই তাই তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না। বন্ধকী ও আবদ্ধ দিয়া কৃষকগণ প্রতি বৎসর যে কত পরিমান ঋণ গ্রহণ করে—এবং কিরূপ পরিমান জমী জমা হস্তান্তরিত হয়—সাবরেজিষ্ট্রী আফিসে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে একটা মোটামুটি হিসাব মিলিতে পারে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি দিনের পর দিন যে কত শত লোক শুধু ঋণের দলীল রেজেষ্টারী করিবার নিমিত্ত রেজেষ্ট্রী আফিসের সম্মুখে হাজীর হয়। এইরূপ শত অসুবিধার ভিতর দিয়া গ্রামের চাষীদের জীবন সংগ্রাম সাধিত হইতেছে। এক মুহূর্ত্ত তাহাদের নিকট

এক এক যুগ বলিয়া অনুমিত হয়। তাহা ছাড়া, রোগ, শোক অনশন, দুঃখ ক্লেশ, মহাজন জমীদারের দেনার তাগিদ তো নিত্য লাগিয়াই রহিয়াছে। জমীদারের অত্যাচারে তাহারা আর মাথা উঁচু করিতে পারে না। চৈত্র মাসের শেষে আমাদের এখানে রাজস্বের শেষ কিস্তি মিটাইয়া দিতে হয়। প্রথম কিস্তি আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে তখনও ফসল উঠিতে বহু বিলম্ব থাকে —দ্বিতীয় কিস্তি পৌষ মাসে ঠিক যখন ফসল উঠে। উৎপন্ন ফসল বিক্রি করিয়া চাষীরা তাহাদের সাধ্যমত যাবতীয় দেনা পরিশোধ করিতে এতটুকু কসুর করে না ; তথাপি অনেক ক্ষেত্রে জমীদারের গোমস্তারা চৈত্র মাসে খাজনা আদায় করে। তখন চাষীদের ঘরে এক মুষ্টি চাউল অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু তাহা কে বুঝে ? গোমস্তা সুদসহ কড়ায় গণ্ডায় কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করে। তাহা ছাড়া আনুষঙ্গিক আদায়ও কম করে না। তহরী পথকর, জলকর, পার্ব্বণী, জমীদারের ছেলের বিবাহের দরুণ চাঁদা, জমীদারের মাতার শ্রাদ্ধের চাঁদা প্রভৃতিতে কৃষকের উৎপন্ন ফসলের ষোল আনা ফুরাইয়া যায়, উপরন্তু আবার নূতন করিয়া কর্জ্জ করিতে হয়। অন্নাদায়ে বাকী খাজনার দায়ে জমীদার মোকদ্দমা রুজু করিলে আদালতের খরচাসহ জমীদার ডিক্রি পায়—তখন চাষীদের 'বাস্তুভিটাটা পর্য্যন্ত নীলামে উঠে। দেনার দায় হইতে তাহাদের অব্যাহতি পাওয়ার সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে তাহারা সর্ব্বস্বহীন হইয়া সর্ব্বহারা হইয়া পড়ে। জমী-হীন চাষীর সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে, তাহা শহরের কল, মিল, জেটী, চা' বাগান ও বিদেশে যে সমস্ত লোক চলিয়া গিয়াছে সেই সমস্ত শ্রমিকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। চাষীদের প্রাণে না আছে আনন্দ, না আছে স্ফূর্ত্তি তাহারা কেবল ভূতের বেগার খাটিয়া মরিতেছে। সাতে ভূতে তাহাদের লুণ্ঠন করিয়া খাইতেছে। স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর যত না অত্যাচার করে ততোধিক অত্যাচার করে পরশ্রমভোগী, জমীদার, মহাজন সম্প্রদায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষককুল এমন ভাবে শোষিত ও নিস্পেষিত হইতেছে যে তাহারা কেহবা উদ্বাস্তু হইয়া কেহবা গ্রাম ছাড়িয়া, গ্রামের মায়া-পাশ কাটাইয়া দূর দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে।

• • * চাষীদের এই নিদারুণ দুরবস্থার প্রতীকার ততদিন হইতে পারেনা যতদিন না জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধিত না হইতেছে। জমীদারীর প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইলে সমাজ দেহ হইতে পরগাছা বিলুপ্ত হইবে—তাহা হইলে কৃষক ও চাষীদের দুরবস্থা বহুলাংশে লাঘব হইবে।

বারান্তরে এই বিষয়ে আরো লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

আ-হা,

—:o:—

দি প্যান-প্যাসিফিক্ ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স

—*—

বিগত মে মাসের ২০শে তারিখে হ্যাংকৌ পিপল্‌স ক্লাবে প্যান-প্যাসিফিক্ ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সমস্ত প্রতিনিধিরা সদল বলে হাজীর ছিলেন। চীন; জাপান, সোস্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাব্লিক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, যাবা, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহের প্রতিনিধিগণ উক্ত কনফারেন্সের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা পুলিশের বাধা প্রদান নীতি ও পাসপোর্টের গোলমালের জন্য কনফারেন্সে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

"অল চায়না" লেবার ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ সু-চেঙ-জিও বেশ একটা মর্ম্মস্পর্শী বর্ক্তৃতার দ্বারা বিশ্বের পরাধীন জাতি সমূহের ইম্পিরিয়েলিষ্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে একত্রিত হইবার স্বার্থকতা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বিবৃত করেন।

"বন্ধুগণ! যেদিনে আমরা প্যান-প্যাসিফিক কনফারেন্সের দ্বারোদ্ঘাটন করিতেছি তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। অদ্য হইতে এক নব যুগের সূত্রপাত হইয়া প্যাসিফিক দেশ সমূহের এবং আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শ্রমিকগণের অন্তরে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে। প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সের কার্য্যধারা প্যাসিফিক দেশ সমূহের শ্রমিকদের, তাহাদের সাধারণ শত্রু ধনিক সম্প্রদায় ও শোষণবাদী শাসকগণের বিরুদ্ধে খুব ফলপ্রসূ ও তীব্র সংগ্রাম চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করিবে। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬শে তারিখে অল চায়না লেবার ফেডারেশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'বন্দোবস্ত সমিতির' এক অধিবেশনে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(১) ইম্পিরিয়েলিজমের বিরুদ্ধে এবং ট্রেড ইউনিয়নের জন্য সংগ্রাম।

(২) বেতন ও কাজের ঘণ্টা আন্তর্জাতিক কার্য্যের নিয়মানুগত করা।

(৩) প্যাসিফিকে যুদ্ধের বিপদ

(৪) দেশান্তর গমন ও ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা

(৫) প্যাসিফিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নের ভিতর গঠন মূলক সম্বন্ধ স্থাপন

(৬) প্যাসিফিক ও ফার ইষ্টের অন্যান্য সমস্যা

তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন এই কনফারেন্স প্রভূত ও বহুভাব প্রকাশক কনফারেন্স। আমাদের সম্মুখে কার্য্য হইতেছে যে প্যাসিফিক দেশগুলির শ্রমিকদের জাগরিত করিতে হইবে। তাহাদের সম্মুখে আসন্ন বিপদ হইতেছে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এবং আমাদের সমস্ত শক্তিকে এই বিপদকে বাধা দিবার জন্যে সমন্বয়ও একত্রিত করিতে হইবে। প্যাসিফিকের উপর সুদূর বিস্তৃত উপকূলভাগ এবং তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রদেশগুলির সীমানাসহ চীনদেশ শোষণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রভুত্বের জন্য শেষ ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। "অর্থনীতিক মুক্তি" এই বাহানা ধরিয়া এবং বহুবিধ মিষ্ট কথা আওড়াইয়া ইম্পিরিয়ে-লিষ্টরা একমাত্র চীনের উপর তাহাদের বাণিজ্যের বাজারও আয়ের অফুরন্ত সম্পদের জন্য চরম লক্ষ্য রাখিয়াছে। শোষণবাদী শক্তিবর্গের ভিতর প্রতিযোগিতা যুদ্ধে বর্দ্ধমান প্রাবল্য জনিত

অদূর ভবিষ্যতে একটা ভীতিজনক বিশ্ব সমর অত্যন্ত আসন্নবর্ত্তী হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মহাযুদ্ধে আমরা সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছি। সে যুদ্ধে পৃথিবীর সর্ব্বদেশের পরিশ্রমরত জনগণকে বর্ণনাতীত ও অকথিত দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। পুনরায় আবার যদি পৃথিবী ব্যাপিয়া দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়—প্যাসিফিক যুদ্ধ মূর্ত্ত হইয়া উঠে তাহা হইলে প্যাসিফিক দেশের নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী জনপদের শ্রমিকদের নিকট ইহা ভীষণাকার ধারণ করিবে।

এই ক্রমবর্দ্ধমান ভীতিকে দূরীভূত করা হইতেছে এই অধিবেশনের অন্যতম প্রধান কার্য্যাবলীর মধ্যে একটা।

চীনদেশ একটী অর্দ্ধ ঔপনিবেশিক দেশ। চীনের বিপ্লব আন্দোলনকারীরা শোষণবাদীদের পরাজয় ও দমন করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। চীনের জাতীয় বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবের এক অখণ্ড অংশ। যত শীঘ্র চীনের বিপ্লব-বীরেরা বিজয় লাভ করিবে তত শীঘ্র ধরিত্রীপৃষ্ঠ হইতে ইম্পিরিয়েলিজমের চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে। পৃথিবীর পরিশ্রমী সম্প্রদায়ের মুক্তি সংগ্রাম চীন দেশের মুক্তি সংগ্রাম হইতে কখনো স্বতন্ত্র থাকিতে পারেনা। বর্ত্তমান সময়ে চীনের বিপ্লবস্রোত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। চীন বিপ্লবের যুদ্ধের অগ্রভাগ নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। সম্প্রতি যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে চীনের শ্রমিক ও কৃষকগণের এবং গণতন্ত্রের দ্বারাই বিপ্লব কৃত কার্য্য হইয়াছে এবং তাহারাই উহার শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং চীন বিপ্লবের সমস্ত নেতৃত্ব উপরোক্ত দুই সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। এই জন্য শোষণবাদীরা আজ চীন বিপ্লবের ভয়ে জড় সড় হইয়াছে। তাহারা তাহাদের পতাকা উড্ডীন করিতেছে। সর্ব্বত্র ভ্রান্ত, অস্বাভাবিক সংবাদ ছড়াইতেছে, অপরের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করিয়া দিতেছে এবং তজ্জন্য অন্যান্য ইম্পিরিয়েলিষ্টদের চীন দেশে তাহাদের সঙ্গে একযোগে রণপোত, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া চীন বিপ্লবকে ধ্বংস করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে ও দলে টানিতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চীন বিপ্লবকে বিশ্ব বিপ্লবের একটি অংশ রূপে জানিয়া এবং এক জনের নিকট ভয় অপরের নিকট আতঙ্ক ইহা উপলব্ধি করিয়া লইয়া আমরা প্যাসিফিক দেশ সমূহের শ্রমিকদিগকে জাগ্রত করিব এবং তাহাদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করিয়া চীনের বিপ্লব সমরের সাহায্যার্থ নিয়োগ করিব। ইহাই হইতেছে প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সের দ্বিতীয় বড় কার্য্য।

প্যাসিফিক সীমানার অধিকাংশ দেশগুলিই হয় ঔপনিবেশিক আর না হয় অর্দ্ধ-ঔপনিবেশিক। এই সমস্ত দেশের পরিশ্রমকারী সম্প্রদায়গণ দ্বিগুন উৎপীড়নশৃঙ্খলে জর্জ্জরিত! তাহারা তাহাদের সামরিক গবর্ণমেণ্টের অবৈধ অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং ইম্পিরিয়েলিষ্টদের কাছ হইতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎপীড়ন ভোগ করিতেছে। এই ঔপনিবেশিক এবং অর্দ্ধ ঔপনিবেশিক দেশগুলির শ্রমিক কৃষকদের দুর্দ্দশার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্বল্পবেতন, দীর্ঘঘণ্টা ধরিয়া পরিশ্রম, অমানুষিক জীবনযাপন এবং কাজের অবস্থা—কোটি কোটি নিষ্পেষিত, শোষিত লোকের মারাত্মক জীবন যুদ্ধ আমাদের নিকট অজ্ঞানিত নহে। যদিও আমেরিকা কিম্বা জাপানের শ্রমিকরা ইহা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ ভাল জীবন যাপন করে তবুও ইহা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়াছে যে এই [illegible] ও বৈষম্যের দ্বারা শোষণবাদী শাসকরা পৃথিবীর শ্রমিক সম্প্রদায়কে বিভক্ত করিয়া তাহাদেরই বিরুদ্ধে [illegible] ব্যবহার করিতেছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র বংশগত, জাতিগত এবং দলগত এবং আরও বহুবিধ বাধা দ্বারা এমনকি শ্রমিক সম্প্রদায়কে জাতীয়ভাবে ও আন্তর্জাতিক দিক হইতে পৃথক [illegible] বিভক্ত করিয়া দিতেছে। এবং শোষণবাদীরা তাহার সুযোগের গ্রহণ করিতেছে। ইহা বেশ পরিস্ফুট যে ইহা প্যাসিফিক দেশ সমূহের নিকট অসুবিধাজনক তাহা আমেরিকার প্রোলেটারিয়েট-দের স্বার্থের ও আমেরিকার প্রোলেটারিয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা কার্ল মার্কসের শিক্ষার অনুযায়ী। তিনি আমাদের শিখাইয়াছেন যে শ্রমিকদের কোনো মাতৃভূমি নাই। আমরা শ্রমিকদের ভিতর কোনো জাতীয় বিভেদ স্বীকার করিনা। প্রোলেটারিয়েটরা হইতেছে আন্তর্জাতিক। আমরা এই কনফারেন্সে যাহাতে প্যাসিফিক দেশের শ্রমিকদের ভিতরে আদর্শ সামরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তজ্জন্য যাহা সম্ভবপর তাহাই করিব। আমরা যাহাতে শ্রমিকদের কয়ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে তার সময় নির্দ্ধারণ, নিয়মমাফিক বেতন, জীবনের খাওয়া পরার নির্দিষ্ট বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিব এবং তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। এবং যাহাতে বংশগত, জাতিগত কুসংস্কার দূরীভূত হয় সে সম্বন্ধেও একটা মীমাংসায় উপনীত হইব, কেননা এই সমস্ত বিভেদ শোষণ-বাদীরা শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে ও তদ্দ্বারা খুব লাভবান হয়। প্যান-প্যাসিফিক কনফারেন্সে ইহা আমাদের তৃতীয় দরকারী কার্য্য।

প্যাসিফিক দেশ সমূহের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকগণ যদিও অনেক বড় এবং কষ্টকর সংগ্রাম করিয়াছে এবং আদর্শস্বরূপ যুদ্ধ করিয়াছে তাহা সত্ত্বেও কিন্তু প্যাসিফিক দেশগুলির শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভিতর একটা প্রকৃত দৃঢ় মিলন-সংগঠন অতি অল্পই হইয়াছে। এবং সেই সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। আমরা এখনো ইম্পিরিয়েলিজমের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই নাই। আমরা দৃষ্টান্তদ্বারা অনুপ্রাণিত হইব। প্যাসিফিক দেশস্থ শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষে একত্রিত হওয়া ও একটা বিরাট শক্তিরূপে নিজেদের পরিচালিত করার ইহাই উপযুক্ত সময়। এবং তাহাদের একটা বাহিনীতে পরিণত হইয়া উৎকট ভাবে সংগ্রাম চালাইবারও এই-ই প্রশস্ত সময়। এই কার্য্য সাধন করিবার জন্য সংগঠন ও কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে আমাদের চতুর্থ কার্য্য।

সর্ব্বশেষে প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সের কাজ হইবে যাহাতে ঠিকমত প্রচার কার্য্যদ্বারা পরবর্ত্তী অধিবেশনে জয়লাভ করা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। এইরূপ করিলে সমুদয় শ্রমিক সংগঠন কোনো প্রকার বাধা না পাইয়াই প্যাসিফিক দেশগুলিতে কাজ করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের স্লোগান হইতেছে—

সমস্ত প্যাসিফিক দেশ সমূহের শ্রমিকদের সমস্বার্থতা দীর্ঘস্থায়ী হোক!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

চীনের বিপ্লব আন্দোলনকে সাহায্য করা।

চীনে ইম্পিরিয়েলিষ্টদের অস্ত্রদ্বারা বাধা প্রদাননীতির তীব্র প্রতিবাদ করা।

পরিশ্রমের সময় নির্দ্ধারণ এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের বেতন নিয়মানুগত করা।

শোষণবাদীদের প্রোলেটারিয়ান সমস্বার্থতা ভঙ্গ করার চেষ্টায় বাধা দেওয়া।

প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স দীর্ঘজীবী হোক!

সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকদের স্বাধীনতা বাঁচিয়া থাকুক!

লেবার ইউনিয়ন সমূহের রেড ইণ্টার ন্যাশন্যাল দীর্ঘজীবী হোক!

শ্রমিক জগৎ

—:*:—

বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এ্যাসোসিয়েশনের শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিতেছি "গণবাণী"র উপর কিঞ্চিৎ চটিয়া গিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন "নামে পরিচিত যে অনুষ্ঠানটি মেয়র মহাশয়কে অভিনন্দন দিয়াছেন।" সেই অনুষ্ঠানটিকে কবে "বঙ্গীয় প্রাদেশিক শ্রমিক সমিতি" বলিয়া অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস "কবে ও কোন তারিখে" স্বীকার ও গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছেন সেই বিষয় কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। গণবাণীর সম্পাদক মহাশয় কালিদাস বাবুর ন্যায় "ভারতবর্ষের একজন শ্রমিক নেতাকে" ইহার উত্তরের জন্য অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস ও বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশনের নিকট তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য অনুসন্ধানের পরামর্শ দিয়াছেন। "শ্রমিক জগৎ"এর লেখক কালিদাস বাবু ঐ দুই অনুষ্ঠানের নিকট হইতে কি উত্তর পান তাহা জানিবার জন্য নিশ্চয়ই উৎসুক হইয়া থাকিবে, আশা করি কালিদাস বাবু নিজের সংশয় মিটাইতে কালবিলম্ব করিবেন না।

কিন্তু কালিদাস বাবু শুধু হতভাগ্য বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ, অব্যর্থ ও মারাত্মক সংশয়বাণ নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি "বেঙ্গলী" সংবাদপত্রের হইয়া কিঞ্চিৎ ওকালতি করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারেন নাই। ওকালতি কাজটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, কারণ ওকালতি করা মানেই ইংরাজীতে বলে practise করা—যে কথাটার অর্থ অভ্যাস করা। শ্রমিক জগতের কে না জানে কালি বাবু Workmen's Compensation Act এর একজন authority "আত্মশক্তি" পাঠ করিলেই বোঝা যায় কালিবাবু না থাকিলে কত গরীব বেচারা হয় দুর্ঘটনার দরুণ যে সাবৎ পাইত না অথবা পেশাদার উকীলের হাতে পড়িয়া যাহা টাকা পাইত তাহার অনেক অংশ তাহাদের পেটে গিয়া ঢুকিত।

—০—

কিন্তু গরীব শ্রমজীবীদের হয়ে ওকালতি করে করে কালি বাবুর এই পেশাটার উপর বেশ আসক্তি হয়ে উঠেছে। তিনি ই, বি, রেলওয়ে কনফারেন্সের সভাপতি ও কিম্বদন্তি অনুসারে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস এ্যাসোসিয়েশনের মাসিক সাহায্যকারী বন্ধুবিশ্রুত শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ওরফে মিঃ আই, বি, সেন বার-এ্যাট-ল সম্পাদিত "বেঙ্গলী" কাগজের ওকালতি করিয়া "গণবাণী" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে দুইটি বিষয়ের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। "ভারতবর্ষের একজন শ্রমিক নেতা" শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রথম প্রশ্ন।

অভিনন্দনের (অর্থাৎ বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন যে মেয়র মহাশয়কে অভিনন্দন করিয়াছিলেন) উত্তরে যিনি আসল কথা ভুলিয়া "রাষ্ট্রনৈতিক মেয়রের আদর্শে" শ্রমিকদিগকে মাত্র জাতীয় কংগ্রেসের "পো" ধরিয়া চলিবার পরামর্শ দিয়াই খালাস হইয়াছেন তাঁহার সেই বহুমূল্য উত্তরটি না ছাপাইয়া অথবা ফেডারেশনের "মানের কান্না" লোক সমাজে না প্রচার করিয়া "বেঙ্গলী" কি অপরাধ করিয়াছেন?

কালিদাস বাবু বেঙ্গলীর ওকালতি করিতে যাইয়া সম্পাদকের কর্ত্তব্যরূপ গভীর জলে পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে "news paper"এর সহিত "views paper"এর কিছু তফাৎ আছে। অবশ্য কালিদাস বাবু যদি তাঁহার সম্পাদকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা লইয়া কোন কাগজের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতেন লোকে তাঁহার কাগজে কি বাহির হইতেছে বা না হইতেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাইত না। কারণ কালিবাবু "ভারতবর্ষের একজন শ্রমিক নেতা" হইলেও এবং খেসারৎ মামলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইলেও সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতা বোধ হয় তাঁহার নাই অন্ততঃ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের ন্যায় নাই। যদি সম্পাদকের "views"এর সঙ্গে না মিলিলেই "news" ছাপান বন্ধ হইত বা অভিনন্দন ও তাহার জবাব ছাপান রীতিবিরুদ্ধ হইত তাহা হইলে অধিকাংশ দৈনিক সংবাদপত্রকে কলেবর সংক্ষিপ্ত করিতে হইত। সেন মহাশয় বা তাঁহার ভক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়লাট, মেজলাট বা ছোটলাটদের সে সব অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহা বোধ হয় "মানের কান্না" বলিয়া ছোতা কাগজের ঝুড়ির ভিতর ফেলিয়া দেন না। এ ক্ষেত্রে যদি "ফেডারেশন নামক অনুষ্ঠানটি" মেয়র মহাশয়কে অভিনন্দন দিবার সময় কতকগুলি নিত্য ব্যবহৃত কথার দ্বারা স্তুতিবাদ না করিয়া স্বদেশবাসী চালিত ও কংগ্রেস দলের অধিকৃত করপোরেশন শ্রমিকদের শুভাশুভ বিষয় অবহেলা করিতেছেন এই কথা ভদ্রভাবে প্রকাশ করেন এটা যে "মানের কান্না" তা কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট মনে হইলেও বোধ হয় সম্পাদক সেন মহাশয়ের নিকট মনে না হইতেও পারে। কালিদাস বাবুর ওকালতি দেখিয়া একটা গল্প মনে পড়ে। কোন এক অভিযুক্ত ব্যক্তি হাকিমের নিকট সময় প্রার্থনা করে এই অজুহাতে যে তাহার উকীল পীড়িত হয়ে পড়াতে তিনি আসিতে পারেন নাই। হাকিম বলেন "তোমার সম্বন্ধে যা অভিযোগ সে তো চাক্ষুস সাক্ষীর দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে গেছে এক্ষেত্রে তোমার উকিল তোমাকে কি করে নির্দ্দোষ প্রমাণ করবেন?" "হুজুর আমি সেইটাই দেখতে চাই"। সেন মহাশয় বোধ হয় তাঁহার এই স্বয়ং নিযুক্ত উকিলের ওকালতি থেকে পরিত্রাণ পাবার প্রার্থনা কচ্ছেন।

—০—

যাক্ মজুরের প্রতিনিধিদের অভিযোগ বা অভিনন্দন নয় "মানের কান্না" বলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু "মেয়র" সাহেবের জবাবটা তো ফেলবার কথা নয়? লাট সাহেবদের "বহুমূল্য" উত্তর গুলি ছাপাইতে তো "বেঙ্গলীর" দ্বিধা হয় না? দ্বিধা হওয়া উচিত নয়, কারণ, বেঙ্গলীর পাঠকদের অনেকের বুঝিবার ক্ষমতা আছে যে কোন-

গুলি "বহুমূল্য" আর কোনগুলি নয়। কালিবাবুর অপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি জগতে না থাকিতে পারে কিন্তু অন্ততঃ তাঁহার সমান লোক যে বেঙ্গলীর পাঠকের ভিতর পাওয়া যেতে পারে একথা কালিবাবু বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। মেয়রের উত্তরটি পড়িলে এবং অভিনন্দনটি পড়িলে বেঙ্গলীর পাঠকদের ভিতর এমন লোক অনেক আছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের বিচার শক্তির দ্বারা নিজেদের মতামত গঠন করিতে পারেন। সেই জন্যই ৩০শে জুনের গণবাণীতে "শ্রমিক-জগতের" ভিতর আক্ষেপ করা হইয়াছিল যে "তাঁহার (শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেনের) সম্পাদিত কাগজে কাঁচড়াপাড়া কন্‌ফারেন্সের (যাহার তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন) খুব বিশদ বিবরণ বাহির হইল, কিন্তু বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অভিভাষণটি ছাপা দূরে থাকুক এমন কি মেয়রের উত্তরটি পর্য্যন্ত ছাপা হইল না। ইন্দুভূষণ বাবু যিনি শ্রমিকদের বুর্জোয়া নেতাদের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা উপদেশ দেন তাঁহার সম্পাদিত কাগজে এরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় বাঞ্ছনীয় নয়। তখন কে জানিত যে ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের একটি ভয়ানক উকীল আছেন যাঁহার অসীম উৎসাহ ও দক্ষতা শ্রমিকগণের খেসারৎ আদায় করিবার জন্য ব্যয় হইয়াও এত উদ্বৃত্ত থাকে যাহাতে একজন বিখ্যাত সম্পাদকের হইয়া ওকালতি করা চলিতে পারে।

—•—

কালিদাস বাবু নিজের মুখে নিজে দেওয়া "ঝাল" খাইতে অভ্যস্ত, কিন্তু তিনি যে পরের উপর নিজের মনের "ঝাল" মেটান এটা অনেকেই জানিতেন না। ই, বি, রেলওয়ে কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে "গণবাণী"র "শ্রমিক জগতে" যাহা বাহির হইয়াছিল তাহাতে বলা হইয়াছিল।

"শ্রীযুত রামচন্দ্র রাও ও মণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় মুখ খোলেন নাই? বোধ হয় শ্রীযুত সুরেন্দ্র মিত্রের শ্রমিক প্রীতির তুবড়ি ও সুরেশ বাবুর শ্রমিক সংগঠনের হাউই দেখিয়া তাহাদের ভরসা বা প্রবৃত্তি হয় নাই।" ইহাতে কালিদাস বাবুর রুষ্ট হইয়া গণবাণী সম্পাদক মহাশয়ের উপর "ঝাল" ঝাড়িয়াছেন :— "পরের মুখে ঝাল খাইয়াই আপনি "শ্রীযুত মণিমোহন মুখোপাধ্যায় মুখ খোলেন নাই" বলিয়া যে হাউই তুবড়ির বহর দেখাইয়াছেন উহাতে আপনার নিরপেক্ষতার ডিগ্রি ঠিক থাকিবে তো?

—•—

তা' "গণবাণী" সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন, কিন্তু কালিবাবুর "নিরপেক্ষতার" ডিগ্রি যে ক্রমশঃ হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে তাহা "বেঙ্গলীর" ওকালতিতেই অনেকটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। আর মণিমোহন বাবুর কথা প্রসঙ্গে যে "তুবড়ি" ছাড়িয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয়, যে বেঙ্গলীর তিনিও পক্ষপাতী সেই "বেঙ্গলী" কাগজেই এই কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল তাহা তিনি পড়েন নাই। কাঁচড়া পাড়া কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে "বেঙ্গলী" কাগজের বিবরণই প্রামাণ্য, কারণ এরূপ বিশদ বিবরণ অন্য কোন কাগজে বাহির হয় নাই। ২৬শে জুন তারিখের বেঙ্গলী কাগজে দেখা যায় যে "যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন" তাঁহাদের নামের ভিতর শ্রীরামচন্দ্র রাও ও মণিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে "শ্রীমতী কমলা দেবী ও মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের" নামোল্লেখ আছে। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতার সারাংশ বার তের লাইনের ভিতর সারিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাটি সম্পূর্ণ দেওয়াতে বোধ হয় কাগজে আর জায়গা না হওয়াতে শুধু বস্ত্র মেকারের সুরেনবাবুর নাম আর বঙ্গলক্ষ্মীর সুরেশবাবুর (যাঁহারা বেঙ্গলীর সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ) বক্তৃতার সারাংশ দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিলনা। অবশ্য কালিদাসবাবু যদি "গণবাণী" সম্পাদকের নিরপেক্ষতার ডিগ্রি ঠিক করিতে ব্যস্ত না হইয়া নিজের নিজের নিরপেক্ষতার ডিগ্রির দিকে মন দিতেন তাহা হইলে এই কথা বুঝিতে পারিতেন যে আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি রেলওয়ে কনফারেন্সের বিবরণীর ভিতর ঐ কনফারেন্সের সভাপতি সম্পাদিত কাগজে বঙ্গলক্ষ্মীর সুরেশবাবু বা বস্ত্র মেকারের সুরেন বাবুর বক্তৃতা অপেক্ষা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে সঙ্ঘের ন্যায় একটি বড় সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীরামচন্দ্র রাও এবং রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার অন্ততঃ সারাংশও দেখিবার আশা করে। "যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন" তাঁহাদের ভিতর কালিদাস বাবুর নামও দেখা যায় আর পাছে কারুর মনে সন্দেহ হয় যে এ কোন কালিদাসবাবু, আমাদের সেই "নিরপেক্ষ" কালিদাসবাবু কিনা, সেইজন্য ব্রাকেটের ভিতর ছিল "বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস এ্যাসোশিয়েশন"। কালিদাসবাবুর উচিত ছিল বেচারি গণবাণী সম্পাদকের উপর ঝাল না ঝাড়িয়া শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেনকে জিজ্ঞাসা করা যে রেল কর্ম্মচারীদের কন্‌ফারেন্সে রেল ইউনিয়ন বা রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের কর্ম্মকর্ত্তাদের বক্তৃতা দেওয়া না হইয়া বস্ত্র মেকার বা হরিনারায়ণপুর বায়, সভার গোড়লদের বিশেষভাবে উল্লেখ হয় কেন। সেন মহাশয় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এবং বোধহয় "নিরপেক্ষ" লোকদের শ্রদ্ধাও করেন। কালিবাবু যদি বেঙ্গলীর সম্পাদককে এই প্রশ্ন করিতেন শ্রমিকজগতে নিরপেক্ষতার জন্য তাঁহার প্রভাব বাড়িয়া যাইত আর বোধহয় সেন মহাশয় বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস্ এ্যাসোশিয়েশনে যে টাকা এযাবৎকাল দিয়াছেন তাহা কাড়িয়া লইতেন না।

—•—

বাস্তবিক পক্ষে শ্রমিক জগতের উদ্দেশ্য নয় সে যাঁহারা সঙ্ঘের উন্নতি বা সংগঠনে ব্যস্ত আছেন তাঁহাদের প্রতি অযথা আক্রমন করা। তবে যে সকল লোক ভণ্ডামি করে শ্রমিকদের কাছে ধাপ্পাবাজি ও সাধারণের কাছে চালাকি করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বা দিন গুজরানের চেষ্টায় ফিরিতেছে তাহারা যেই হোক না কেন তাহাদের নির্দ্দয়ভাবে চাবুক মারিয়া শ্রমিক আন্দোলনের ভিতর হইতে তাড়ানই গণবাণীর মারফৎ শ্রমিক জগতের কাজ। হয়তো "শ্রমিক জগতের" মতামতের সহিত গণবাণীর মতের ঐক্য সব জায়গায়, নাই, কিন্তু ধাপ্পাবাজি, শঠতা, ভণ্ডামির যম গণবাণীও যেমন শ্রমিক জগতও সেইরূপ। তাহা যদি না হইত শ্রমিক জগত গণবাণীর ভিতর স্থান পাইত না। সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কাজ করিলে যে ভুল হইবে না এ কথা কেহ বলে না। আর ভুল হইলেই যে ফাঁকি দেওয়া হইবে এ কথাও কোন বিবেচক লোক বলিবেন না। কিন্তু সদিচ্ছা নিয়ে যারা এই আন্দোলনে এসেছে, তাদের ভুল দেখালে তারা ক্ষিপ্ত হয় না বরং নিজেদের ভুল আছে কিনা বুঝিবার চেষ্টা করে এবং ভুল বুঝিতে পারিলে তাহার সংশোধনেরও জন্য

চেষ্টা করে। যাহারা এরূপ চেষ্টা করেন তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র কিন্তু যাঁহারা সত্য কথা শুনিলে জ্বলিয়া উঠেন এবং অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিয়া ও বাক্যের "তুবড়ি" ছাড়িয়া আসল কথাটাকে চাপা দিতে যান তাঁহারা দেশের শত্রু ও শ্রমিকের যম। তাঁহারা নিজেরা কয় জন ছাড়া আর সকলেই exploiter এই আখ্যা দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তাঁহারা জানেন না যে ঐ একটি কথার দ্বারা তাদের নিজেদের স্বরূপ বর্ণনা করেন। স-প

—•—

মস্কো ফেরৎ অভিযুক্ত

—•—

লাহোরের ৫ই আগষ্ট তারিখের খবরে প্রকাশ যে পেশাওরের এডিশন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টমশনের আদালতে সম্প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১-এ, ধারা অনুসারে অর্থাৎ সম্রাটকে তাঁর সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করার জন্যে একটি মোকদ্দমার শুনানী শেষ হয়ে গেছে। এ মোকদ্দমার অভিযুক্ত হচ্ছেন মালিক ফজলে ইলাহী কোরবান। অভিযোগ এই হচ্ছে যে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে কাবুলের ভিতর দিয়ে মস্কো গিয়েছিলেন এবং সেখানে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে তিনি যোগদান করেছিলেন। লাহোরের ব্যারিষ্টার দিওয়ান চমনলাল অভিযুক্তর পক্ষ সমর্থন করেছেন। সরকার পক্ষে মোকদ্দমা চালিয়েছেন মিঃ মঙ্গলদাস।

নথী পত্রর দ্বারা আরোপ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত কোরবান প্রথমে তাসকেন্দ গিয়েছেন এবং সেখান থেকে গিয়েছেন মস্কো। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে তিনি পড়া শুনাও করেছেন।

সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। কলিকাতার জনৈক ব্যারিষ্টার মিঃ মুখার্জ্জিও এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে অভিযুক্ত তাঁহারি সহিত "ডি" অরতাগনান্ নামক জাহাজে মার্সাই ও কলম্বো হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। কিন্তু, প্রথমে তিনি অভিযুক্তকে চিন্‌তেই প্যারেন নি। আরো দু'জন লোকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়েছে। তারা দু'জনে এর পূর্ব্বেও এরূপ মোকদ্দমাতেই সাক্ষ্য দিয়েছিল।

সি-আই-ডি পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খান সাহিব শেখ আবদুল আজীজ একখানা দলীল দাখিল করেন। এ দলীল খানা হচ্ছে "ভ্যানগার্ড" নামক পত্রিকার ১৯২৩ সনের একটি সংখ্যা। এ সংখ্যায় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে এবং তার নীচে নাম স্বাক্ষর করা হয়েছে—"কোরবান"। অভিযুক্ত কোরবানই এ প্রবন্ধের লেখক বলে আরোপ করা হয়েছে।

অভিযুক্তের ব্যারিষ্টার এ'তে আপত্তি করেন। তদন্তের সময় সি-আই-ডি'র নিকটে যে সব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সে সবেও তিনি আপত্তি করেন।

অভিযুক্ত বলেছেন যে তিনি তাসকেন্দ ও মস্কো গিয়েছেন বটে; কিন্তু, কোনো অপরাধ করেন নি। তিনি কাবুল হয়েই প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন এবং বাতে ভুগছেন। ডাক্তারের সাক্ষ্যের দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি সত্যই বাতে ভুগছেন।

সওয়াল-জওয়াবের সময় তাঁর ব্যারিষ্টার বলেছেন যে দলীল পত্রের দ্বারা কোনো ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয় নি। অভিযুক্ত কোনো ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণও করেন নি। তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে অনেক গুলি 'রুলিং' তিনি দেখিয়েছেন।

সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত মুহাজ্বিররূপে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি যেরূপ বিরূপ ভাবাপন্ন অবস্থায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন, তা থেকেই তাঁর পরবর্ত্তী ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করতে হবে। অধিকন্তু, পূর্ব্ববর্ত্তী বিচার সমূহে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়কে বিপ্লববাদী বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। মোকদ্দমার রায় এখনো শুনানো হয়নি।

—•—

দেশ-বিদেশ

"মেহনৎ কাশ্" অভিযুক্ত—

লাহোরের 'মেহনৎ কাশ্" নামক উর্দ্দু সাপ্তাহিক যখন সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয় তখন মিঃ রামচন্দ্র ছিলেন তার সম্পাদক। দু'সংখ্যা কাগজ বের হবার পরেই তিনি তার সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু, 'কম্‌লি'কে ছাড়লে কি হবে, 'কম্‌লি' যে কিছুতেই ছাড়তে চাইছেনা। দু' সংখ্যা "মেহনৎ কাশ্" এর সহিত সংসৃষ্ট থাকার জন্যেই মিঃ রামচন্দ্র ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়েছেন। লাহোরে তাঁর মোকদ্দমা চলেছে।

—•—

নূতন উর্দ্দু সাপ্তাহিক—

বোম্বে "মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন" এর তরফ থেকে "মজদুর" নামক একখানা নূতন উর্দ্দু সাপ্তাহিক বের হয়েছে। কাগজ খানা বোম্বের খিলাফৎ প্রেসে মুদ্রিত ও স্যাণ্ডার্ষ্ট রোড ওপরের লিখিত ইউনিয়নের কার্য্যালয় থেকে সৈয়দ মনুওয়ার বি-এ, এম-এল-সি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এরূপ কাগজ যত বেশী বা'র হয় ততই ভালো। এক সংখ্যা মাত্র কাগজ পড়ে এর নীতি সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক হবে না। আরো কিছুদিন পরে "মজদুর" এর অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। ইতোমধ্যে আমরা "মজদুর" এর দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

—•—

কলহের অবসান—

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান সিমেন্স ইউনিয়ন এর মধ্যে একটা নেতৃত্বের বিরোধ অনেক দিন থেকে চলছিল। এ বিরোধের ফলে মিঃ আফতব আলীর প্রচেষ্টায় "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সিমেন্স ইউনিয়ন" নামক একটি পৃথক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। সম্প্রতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় এ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে নূতন ইউনিয়নটি পুনরায় পুরাতনের সহিত এক হয়ে গেছে। মিষ্টার দাউদ জেনেরেল সেক্রেটারী ছিলেন, এবারে চেয়ারম্যান হলেন। আর জেনেরেল সেক্রেটরী হলেন মিঃ আবদুল মতীন চৌধুরী, বি-এল, এম-এল-এ। মিঃ মুজাম্মিল আলী ও মিঃ আফতাব আলী সহকারী জেনেরেল সেক্রেটরী মনোনীত হয়েছেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব ইউনিয়নের মুরব্বি থাকবেন। এবারে যদি ইউনিয়ন কিছু বিপ্লবাত্মক ধারণা নিয়ে কাজ করেন তা হ'লে আমরা বড় সুখী হব।

—•—

যুবক সম্মিলনী—

ঢাকা জিলার যুবকগণের সম্মিলন বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ১৯শে, ২০শে, ও ২১শে তারিখে ঢাকার ন্যাশনাল কলেজের বাড়ীতে বসবে। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ও ডাক্তার মোহিনী মোহন দাশ অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ডাক্তার মোহিনী মোহন দাশ তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু। তাঁকে যে ঢাকার যুবকগণ, অবশ্য অধিকাংশই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যুবকগণ, তাঁদের মুখপাত্র রূপে বরণ করেছেন এটা অবশ্য খুবই আশার কথা।

—০—

প্রেস কর্ম্মচারী সম্মিলন—

সমগ্র ভারতীয় প্রেস্ কর্ম্মচারিগণের দ্বিতীয় সম্মিলন কলিকাতা টাউন হলে ১৩ই আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় ও ১৪ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ২টার সময় বসবে। কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সভ্য, মান্দ্রাজ বেলারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দ মোহম্মদ পাদ্‌শাহ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হয়েছেন শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র পাল।

———

কৃষক বিদ্রোহ—

লণ্ডন থেকে গত ২১শে জুলাই তারিখের যে খবর ডাক যোগে ভারতে পৌছেচে তাতে জানা গিয়েছে যে ইটালীর ফ্যাসিষ্ট গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ওখানকার কৃষকগণের বিদ্রোহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে, আর এ বিদ্রোহের কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অসন্তোষ। "আমরা রুটি চাই, আর কাজ চাই" এই বলে শত শত নারী, পুরুষ ও বালক কৃষক-শ্রমিক রাস্তায় মিছিল করে যাচ্ছিল, তাদের হাতে ছিল বড় বড় অক্ষরে ছাপানো বিজ্ঞাপনী। ফ্যাসিষ্ট সরকারের পুলিস এসে তাদের প্রায় ১০০ জনকে গেরেফ্‌তার করে। তাদের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ৪ জন নারী আহত হয়েছে। অধিকাংশ লোকই পুলিশকে ধরা দেয়নি। শান্তি ভঙ্গ করার অপরাধে পুলিশ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধবাদী প্রায় ২০০০ লোককে গেরেফ্‌তার করেছে। ফ্যাসিষ্টরা কৃষকদের ওপরে অত্যাচার করে থাকে বলেই আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা দিন দিন ফ্যাসিষ্টদের প্রতি ভক্তিমান হয়ে উঠেছেন। কথায় বলে "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই"। আমাদের মধ্যমশ্রেণীর লোকেরাও কৃষকদের রক্ত শোষণ করে জীবন ধারণ করেন কিনা।

—০—

ধর্ম্মঘটের অবসান—

ঢাকা এসোসিয়েটেড্ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেডের কম্পোজিটরগণ অনেকদিন পূর্ব্বে ধর্ম্মঘট করে কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি সে ধর্ম্মঘটের অবসান হয়েছে। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয় লোকেরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁরা যথাসম্ভব সত্বর তদন্ত করে কম্পোজিটরগণের অভিযোগের প্রতিকার করবেন।

—০—

সাহায্য কমিটি—

পাবনার সাম্প্রদায়িক-হাঙ্গামার ফলে যে সব মুসলমান কারারুদ্ধ হয়েছে তাদের বিপন্ন পরিজনকে সাহায্য করার জন্যে পাবনায় একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

—*—

স্যাক্কো ভ্যানজেটির প্রাণদণ্ড—

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্ স্টেটের গভর্ণর ফুলার [illegible] স্যাক্কো ও ভ্যানজেটি নামের দুজন মজুর-নেতার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিয়েছেন, এ কথা পাঠকগণ জানেন। এ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আমেরিকায় তীব্র আন্দোলন চলেছে। এর প্রতিবাদ স্বরূপ সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টগণ একদিনের ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট করা স্থিরীকৃত করেছেন। পুলিশ আগে থেকেই খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছে। এ প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ [illegible] ক্যাথলিক গির্জাতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। গির্জার ছাদ ও জানালাগুলো ভেঙে গেছে। বোমা ফেলবার পূর্বে [illegible] চারিদিকের পল্লীতে অসংখ্য বিজ্ঞাপন বণ্টন করা হয়েছিল। তাতে স্যাক্কো-ভ্যানজেটির মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদ সভায় সবাইকে যোগদান করতে আহ্বান করা হয়েছিল। জজ্ থেয়ার দণ্ডের আদেশ পরিহার করতে কিংবা দণ্ড স্থগিত রাখতে অস্বীকার করেছে। স্যাক্কো-ভেনজিটির কৌঁসিলী আবারো একটা আপীল করেছেন। এ সব ৯ই তারিখের খবর।

১০ই তারিখে বষ্টন থেকে খবর এসেছে যে গবর্ণর মৃত্যুদণ্ড কিছুকাল স্থগিত রাখবার বিষয় বিবেচনা করেছেন। ধর্মঘটের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি ১১ই তারিখে বসবার কথা ছিল। তবে তারিখ এগিয়ে ১০ই তারিখ করা হয়েছে। ধর্মঘটের মধ্যে ২৪ ঘণ্টার হরতাল বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত হয়নি। মাত্র ৪ লক্ষ শ্রমিক তাতে যোগদান করেছিল।

—০—

চীনে মেডিক্যাল মিশন—

চীনে যে ভারতবর্ষ থেকে মেডিক্যাল মিশন পাঠাবার কথা হয়েছিল তা আর কার্য্যে পরিণত হবেনা। এতকাল পরে ভারত সরকার মিঃ টি, সি, গোস্বামীকে জানিয়েছেন যে মেডিক্যাল মিশনের পাসপোর্ট তাঁরা দিতে পারবেন না। ভারত গবর্ণমেণ্ট জানিয়েছেন যে চীনের ব্যাপার নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। কাজেই বাইরের লোকেরা তাতে কোনোরূপ দখল দেবার প্রয়োজন নেই। চীনের ব্যাপারটা চীনের নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার বলেই বোধ হয় বৃটিশ ও ভারত গবর্ণমেণ্ট এত সৈন্য-সামন্ত চীনে পাঠিয়েছেন! বেহায়াপনা আর কাকে বলে?

—০—

পাঁচ বছর!

—০—

মস্কোর প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মালিক ফজলে ইলাহী ওরফে কোরবান যে পেশাওরে দণ্ডবিধি আইনের ১২১-এ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়েছেন সে খবর অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। আজ খবর এসেছে যে ফজলে ইলাহীর প্রতি পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। হে অচেনা বন্ধু, হে শৃঙ্খলিত সুহৃদ, আমাদের হৃদয়ের গভীর প্রদেশের সমবেদনা তোমায় জানাচ্ছি। হে অজানা সখা, তোমার দণ্ড ভারতের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করুক। বিদায়! বন্ধু, বিদায়!! যদি বেঁচে থাকি একদিন তোমার সহিত পরিচয় হবে। সে দিন কবে আসিবে?

—*—

দি ইউনাইটেড স্পোর্টিং এজেন্সী

[illegible] বেনেটোলা লেন (টোলা) কলিকাতা।

ফুটবলের খেলার সরঞ্জাম, সাইকেল এবং স্পোর্টসের অন্যান্য মাল সরবরাহকারী। কলিকাতার [illegible] সুন্দর ও নিয়মিত বাসা ও দ্রব্যের। নিম্নোক্ত।

সিঙ্গেল রিড ২২৲ ডবল রিড ৩২৲ ৩৫৲, ৪৫৲, ৫৫৲ ৬৫৲ প্যারিস রিড ৫৫৲ ডবল রিড [illegible]

ইংলিশ মেক ফুটবল মেকগ্রেগর

কাউহাইড কম্প নং ৫	২০৲
ওউন মেক ১৮ পেনেলস কম্পিটিসন	
মেচ কম্প নং ৫	১৪॥০
কম্পিটেসন মেচ (মেকগ্রেগর প্যাটার্ণ) কম্প	
নং ৫	১০॥০
বুলহেট মেচ ১২ পেনেলস কম্প নং ৫	৮॥০
ভলান্টিয়ার মেচ ১০ পেনেলস কম্প নং ৫	৭॥০
[illegible] মেচ [illegible] পেনেলস কম্প নং ৫	৬॥০
জুবলী মেচ [illegible] পেনেলস কম্প নং ৫	৫॥০
৪ নং বুলহেট মেচ কম্প	৬॥০
৪ নং [illegible] মেচ কম্প	৫॥০
৪ নং ভলান্টিয়ার মেচ কম্প	৬৲
৪ নং জুবলী মেচ কম্প	৪৲
৩ নং মেচ কম্প [illegible] পেনেলস	৩॥০
২ নং [illegible]	[illegible]
১ নং [illegible]	১৸০

ফুটবল ব্লাডার		ইনস্টার	
৫ নং	[illegible]	১॥০, ২৲, ২॥০	
৪ নং	[illegible]	লেস ইং	
৩ নং	[illegible]	[illegible] ১৸০	
২ নং	৸০	রাবার সলিউসন	
১ নং	৸৵০	।০, ।৵০, ॥০	

A book to be read by all

Hundred Percent Indian

By C. G. Shah.

This is an excellent book written from the point of view of Historical Materialism. The Gandhism has most scientifically been refuted in this little book. This is perhaps the first Marxian book written in India by an Indian.

Price As. 8/- only.

To be had of
THE BOOK COMPANY LTD.
4/4 A College Square, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১৸৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫৲ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

BOOKS ON SOCIALISM.

1. The Coming of Socialism.
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. Scientific Socialism.
Its Aims and Ideals.
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. The Religion of Capital
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. Manifesto of the Communist Party
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS
Price—As. 6/- only.

To be had of
The Book Company Ltd.
4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	॥০
অগ্নিসংস্কার	১॥০
শুভা	২॥০
পাপের ছাপ	২।০
বিপর্য্যয়	২।০
শান্তি	২॥০
কাঁটার ফুল	১॥০
রক্তের ঋণ	॥০
আনন্দ-মন্দির	॥০
রাজগী	২।০
পিতাপুত্র	১॥০
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	২॥০
দূরের আলো	২৲

নাটক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ॥০
২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত প্রস্থচিত্র। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

উপন্যাস ও গল্প

১। মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। একা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—

ভাত কাপড়ের কথা।
বাঙ্গালী রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।
[illegible] প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন ব্যবহারের গ্রন্থ

1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.

Published by the Calcutta University.



Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Saraswati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯২৭, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৪	২৭ম সংখ্যা

বিশেষ বিজ্ঞাপন

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ও অন্য অনিবার্য্য কারণে গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে "গণবাণী" প্রকাশিত হয়নি। "গণবাণী"র গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের নিকটে এ জন্যে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যে সকল গ্রাহকগণের মূল্য ফুরিয়ে গেছে তাঁরা দয়া করে জানাবেন যে পরবর্ত্তী বছরেও গ্রাহক তাঁরা থাকতে চান কিনা। এক সপ্তাহের মধ্যে অসম্মতি সূচক কোনো পত্র না পেলে আমরা সকলেরই নামে ভি, পি তে কাগজ পাঠিয়ে দেবো। সে অবস্থায় কেউ যদি ভি, পি ফেরৎ দেন তা হলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

বিনীত—
ম্যানেজার—গণবাণী

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯২৭, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৪	২৭ম সংখ্যা

'রেড ফ্রন্ট'

—:০:—

[শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৩রা জুন তারিখটা বহুকাল মনে থাকবে। বার্লিনের রাজপথ সেদিন আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভার স্রোতের মত লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী প্রাণের তপ্ত স্রোতে প্লাবিত হয়েছিল। গত তিন বৎসর থেকে জার্ম্মাণীর শ্রমিকেরা জুন মাসে তাদের বার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন করে। তারা এই উৎসবের নাম দিয়েছে "রেড ফ্রন্ট" (Red Front) অর্থাৎ কিনা রক্তে রাঙা ভবিষ্যৎ। বার্লিনের যে অঞ্চলে শ্রমিকরা বাস করে সেইখানে আমরা গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। দেখলেম রাস্তায় লক্ষ লক্ষ লোক এই শোভাযাত্রা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। পথের দু'ধারের বাড়ীগুলোতে শত শত লাল নিশান উড়ছিলো। যতদূর চোখ যায় চেয়ে দেখলুম রক্তের রঙে কে যেন সব ছুবিয়ে দিয়েছে বলে মনে হোল। দূর থেকে বাদ্যের ধ্বনি কানে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে তারা দলে দলে এসে পড়লো। ইণ্টারন্যাশনাল বেজে উঠলো, আর তার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চললো এই তিন লক্ষ লোক। জার্ম্মাণীর প্রত্যেক কারখানার শ্রমিকেরা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলো। রুঢ় থেকে, মধ্য জার্ম্মানী থেকে, জার্ম্মানীর শেষ প্রান্ত থেকে দলে দলে শ্রমিকেরা এসেছে এই উৎসবে যোগদান করবার জন্যে। প্রত্যেক শ্রমিকের দক্ষিণ বাহুতে লাল ব্যাজ আর তারা কোথা থেকে এসেছে সেটা নির্দ্দেশ করবার জন্যে প্রত্যেক দলের দলপতির হাতে সংজ্ঞা নির্দ্দেশক নিশান। আমাদের দেশে চৈত্র সংক্রান্তির দিন যেমন বিদ্রূপাত্মক নানা রকমের ছবি বের হয় এদিনও তেমনি নানা ধরণের বিদ্রূপাত্মক মূর্ত্তি তৈরী করে এরা পথে পথে ঘুরেছিল। ক্যাপিটালিষ্ট আর কলের মালিকদের ঠাট্টা করে নানা বিদ্রূপাত্মক ছবি সেদিন দেখলুম। চেম্বারলেনকে শান্তি রক্ষা করবার জন্যে নোবেল পুরস্কার দান এই ছবিগুলির মধ্যে একটি ছবি। লেনিন, রোজা লুক্সমবার্গ, লিবনেক্‌টের ছবি শোভাযাত্রার অগ্রভাগে। লেনিনের ছবির তলায় লেখা "লেনিন পৃথিবীর নির্য্যাতিতদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, সেই পথে অগ্রসর হও।" রোজা লুক্সমবার্গ আর লিবনেকটের ছবির তলায় লেখা "এঁদের রক্তঋণ আমাদের শোধ করতে হবে মনে, রেখো।" এই শোভাযাত্রায় মেয়ে আছে, ছোট ছোট বালক-বালিকারা আছে, বৃদ্ধ আছে, যুবা আছে। সকলেই আজ বের হয়ে পড়েছে, ভবিষ্যৎএর মুক্তির স্বপ্নে অধীর হয়ে দলে দলে এসে মিলেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তারা "রেড ফ্রন্ট" বলে চীৎকার করে উঠছে আর মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। অমনি তাদের সঙ্গে রাস্তার দু'পাশের দর্শকেরা "রেড ফ্রন্ট" বলে চীৎকার করে উঠছে আর মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত শূন্যে তুলছে। এদের সেই লক্ষ হাতের আঘাতে আকাশও যেন চৌচির হয়ে ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। তাই বুঝি হোলও। দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। দর্শকেরা সব চলে যেতে লাগলো। আমরাও বাড়ীর দিকে রওনা দিলুম। দূর থেকে কানে আসতে লাগলো লক্ষ কণ্ঠের গর্জ্জন "রেড ফ্রন্ট" "রেড ফ্রন্ট"।

বার্লিন

—০—

কৃষক ও শ্রমিক
এবং
শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় *

বন্ধুগণ,

কৃষক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিবার জন্য আপনারা আপনাদের লোক ভাবিয়া আমাকে যে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন তাহাতে আমি নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এই কৌলিন্য, আভিজাত্য ও বীর-পূজার ভারতবর্ষে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রশ্ন অধ্যয়নে আগ্রহান্বিত দেখিতে পাইলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাস্তবিকই প্রাণে অনেক আশার সঞ্চার হয়। ভারতের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আমাদের যুবকগণের উপরে কত বেশী দায়িত্ব যে চাপানো রহিয়াছে এবং এ সংগ্রামে দেশের শ্রমিক ও কৃষকগণের স্থান যে কত অধিক উচ্চে অবস্থিত তাহা আমরা যুবকেরা যে দিন সত্যকার ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব সে দিনই আমাদের জাতীয় সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। আজ আমি এখানে দাঁড়াইয়া এই কথাটিকে কেন্দ্র করিয়াই আমার বক্তব্যটুকু প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

কিছুকাল ধরিয়া বাংলা দেশের নানাস্থানে যুবক সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। ভারতের অন্যত্রও এরূপ সম্মিলনের অধিবেশন যে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু, এ প্রকারের সম্মিলনের ফলে যে জিনসটি মূর্ত্ত হইয়া উঠা উচিত ছিল তাহার এতটুকু লক্ষণও কোনো দিকে আজো প্রকাশ পায় নাই। আমি সমগ্র ভারতময় একটা যুবকান্দোলনের কথাই বলিতেছি। একটা আমূল সংস্কারের ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া কেবলমাত্র বাংলা দেশেও আজ পর্য্যন্ত যুবকান্দোলন মাথা তুলিতে পারে নাই। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের দেশে যে সকল যুবক সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে সে সকলের পশ্চাতে কোনো প্রকারের সুসংহত যুবক শক্তি বিদ্যমান নাই। ভারতের যুবক আন্দোলন শুধু যে নিতান্তই বিক্ষিপ্ত ভাবে চলিতেছে তাহা নহে, ইহাতে জীবন ও যৌবন এ উভয় জিনিসেরই একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। পৃথিবীর আর আর দেশে যুবকেরা যখন নূতনকে জয় করার জন্য অভিযান করিতেছে তখন আমরা ভারতের যুবকগণ পুরাতন গতানুগতিকতার ভিতরে কেবলই ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছি। আমরা কোনো বড় আদর্শকে আমাদের সম্মুখে খাড়া করিতে পারি নাই, স্বাধীনভাবে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারেও আমরা ব্রতী হই নাই। বীর পূজার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরাতন পূতিগন্ধময় প্রচলিত প্রথার আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া এবং বর্ত্তমান কালের অনুপযোগী হাজার হাজার বছরের জীর্ণ দর্শনকে অভ্রান্ত সত্য মনে করিয়া আমরা নূতনকে বরণ করিবার প্রবৃত্তি একেবারেই হারাইয়া বসিয়াছি। দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন করিব মনে করিয়া আমরা দাসত্বকেই গলার হার করিয়া লইতেছি।

যুবকেরা দেশের সর্ব্ববিধ কাজের অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহেন এরূপ একটা ধারণা এ দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমরা দেশের ভাব আলোচনায় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে সেবা-ধর্ম্ম পালন করাই যুবক সংগঠনের একমাত্র কাজ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে যুবক সংগঠন সমূহ সেবা-ধর্ম্মের কাজ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু, তাহাই সংগঠন সমূহের প্রধান ও একমাত্র কাজ কিছুতেই হইতে পারে না। তারপরে, ধর্ম্মের নামে এমন অনেকগুলি ক্রিয়া-কর্ম্ম আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে সবের প্রতিপালনে সাহায্য করিয়া সেবা ধর্ম্ম পালন করা উচিৎ নয়, বরঞ্চ সে সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাই যুবক সম্প্রদায়ের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্থলে স্নান পর্ব্ব সমূহের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। পুণ্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার নারী ও পুরুষ নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর নদী, নালা ও পুকুর সমূহে স্নান করিতে যাইয়া থাকে। এ সকল কু-সংস্কারের কাজে কোনো প্রকারের সহায়তা না করিয়া যাহাতে সে সকল কাজ হইতে দেশের লোকগণ বিরত হয় সর্ব্বতোভাবে সে চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এমন আরো অনেক কু-সংস্কার ব্রতের নাম করা যাইতে পারে। আমি এমন যুবক সভা দেখিয়াছি যাহাতে এরূপ সব কাজে সহায়তা করাই বৃহত্তম কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমরা যুবকেরা বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তি লইয়াই সকল কাজ করিব এবং দেশের ছোট-বড় সকল কাজেই শুধু অংশ গ্রহণ করিলে আমাদের চলিবে না, বিশিষ্ট অংশই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের জাতীয় মুক্তি লাভের সংগ্রামে আমাদের দায়িত্ব যে বৃদ্ধদের চেয়ে ঢের ঢের বেশী একথা আমাদিগকে মনে-প্রাণে বুঝিয়া লইতে হইবে।

মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা আমরা বলিতেছি, আর সকলকে বলিতে শুনিতেছি, কিন্তু আমাদের বন্ধন যে কোথায় তাহা আমরা অনুভব করিবার চেষ্টা আদৌ করিতেছি না। আমাদের মুক্তির স্বরূপই বা কি হইবে তাহারও কোনো পরিষ্কার মূর্ত্তি আমাদের চোখের সম্মুখে নাই। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ভারতের যুবকগণ, বিশেষ করিয়া বাংলার যুবকগণ দেশের মুক্তির জন্য জীবন পর্য্যন্ত মূল্য প্রদান করিয়াছেন, আর দুঃখ-কষ্ট যে কত সহিয়াছেন ও আজো সহিতেছেন তাহার তো ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু, তাঁহারা যে ঠিক পথে চলিয়াছিলেন কিংবা আজো চলিতেছেন তাহাতো আমার মনে হয় না। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের আন্দোলনকে বাদ দিয়াও বিদেশী শাসনের হাত হইতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্যে দুইটি চরম আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে মাথা তুলিয়াছিল। কর্ম্ম প্রণালী বিভিন্ন হইলেও দুইটি আন্দোলনের উদ্দেশ্য একই ধরণের ছিল এবং দুইটি আন্দোলনেরই অল্প-বিস্তর জের আজো পর্য্যন্ত চলিতেছে। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ওহাবী আন্দোলন মাথা তুলিয়াছিল, আর এ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাথা তুলিয়াছিল ত্রাসনীতি-মূলক বিপ্লবান্দোলন এবং বাংলা দেশ গ্রহণ করিয়াছিল এ আন্দোলনের নেতৃত্ব। মুসলমানদের মধ্যে একটা শাখাকে ওহাবী বলা হয়। এই ওহাবীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ও পাঞ্জাবের শিখ নরপতি রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিখগণের অত্যাচার হইতে পাঞ্জাবের মুসলমানগণকে বিমুক্ত করা এবং ইংরেজের কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিয়া পুনরায় মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করা। ওহাবীদের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই

* ঢাকা জেলার বিশেষ যুবক সম্মিলনে শ্রমিক ও কৃষক বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ।

এ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীর শুরুতে প্রথমে বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে যে ত্রাসনীতিমূলক বিপ্লব মাথা তুলিয়াছিল তাহাতে শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণই যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দু রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। দুইটি বিপ্লব দলই ধর্ম্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ওহাবী মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রেরণা পাইয়াছিলেন কোর্‌-আন্‌ ও হাদিস্‌ হইতে আর হিন্দু যুবকগণ তাঁহাদের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন গীতা ও উপনিষদ হইতে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দমন নীতির ঝড় উভয় দলেরই মাথার উপর দিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগে বহিয়া গিয়াছে। অবশ্য মুসলমানদিগকেই এ ঝড়ের বেগটা কিছু বেশী মাত্রায় সহিতে হইয়াছে। কেননা, তাঁহারা প্রকাশ্য উত্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। দুইটি বিপ্লবেরই প্রমর্দনে একই চরম ঔষধ কাজ করিয়াছিল, আর সে ঔষধ ছিল বিপ্লব পন্থীদিগকে রাজবন্দী করিয়া রাখিয়া দেওয়া। ১৮৬৮ সন ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বহু মুসলমানকে রাজবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের মতে ইহারই দ্বারা ওহাবী আন্দোলন মিহিয়া গিয়াছিল। ১৯০৯ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৯ সন পর্য্যন্ত ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন ও যুদ্ধের সময়ে প্রবর্ত্তিত ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এক্ট অনুযায়ী শত শত হিন্দু যুবককে বন্দী করিয়া ত্রাসনীতি মূলক আন্দোলনকে গবর্ণমেণ্ট প্রশমিত করিয়াছে। এ কথা বলা বাহুল্য হইবে যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই উপরিউক্ত দুইটী আন্দোলনের সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং সঙ্কীর্ণতারই জন্য দুইটি আন্দোলনই অকৃতকার্য্য হইয়াছে। সত্যকারের বিপ্লবের ভিত্তি কোনো প্রকারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তারপরে, ধর্ম্মের নামে বিপ্লব সাধন করার যুগ বহুকাল পূর্ব্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় পৃথিবীতে অনেকেই রহিয়াছে। কিন্তু, ইহার একটিও আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী লইয়া আজিকার দিনে আর কিছুতেই পরিতুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। বিশিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে সন্তুষ্ট থাকার জন্য ধর্ম্ম বরাবরই উচ্চ প্রাচীর খাড়া করিয়াছে বটে, কিন্তু, অর্থনীতিক শক্তি সে প্রাচীরকে ভাঙিয়া চূরমার করিয়া দিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রভৃতি কোনো সম্প্রদায়ই শুধু আপন আপন সম্প্রদায়কে লইয়াই জীবনযাত্রা কিছুতেই আর নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে না, অপর সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিবার জন্য অর্থনীতিক শক্তি প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই বাধ্য করিতেছে। কাজে কাজেই, কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে লইয়া, কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই জন্য স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার মত বাতুলতা আজিকার দিনে আর কিছুই হইতে পারে না।

ভারতবর্ষকে আজ আমরা স্বাধীন ও মুক্ত করিতে চাই, কিন্তু, কাহার কবল হইতে? এ কথা সকলেই জানেন যে বৃটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গ্রেট্‌ বৃটেনের যিনি রাজা তিনি ভারতের সম্রাটও বটেন এবং এই সম্রাটেরই নামে ভারতবর্ষ শাসিত হইয়া থাকে। সম্রাট নিজে যেমন ভারতবর্ষ শাসন করেন না, ঠিক তেমনি তাঁহার জন্যও ভারতবর্ষ শাসিত হয় না। ভারত শাসনের কলকাঠি যাহারা ঘুরাইয়া থাকে তাহারা হইতেছে গ্রেট্‌ বৃটেনের ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়। ইহারা ইহাদের অর্থনীতিক ও সামাজিক শক্তিকে অপ্রতিহত রাখিবার জন্য গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও আপনাদের সম্পূর্ণ কবলগত করিয়া রাখিয়াছে। এই ত্রিশক্তির জোরে বৃটিশ ধনিক-বণিকগণ বিশ্বজয়ী হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের এই বিশ্বজয়ী শক্তিই বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্‌ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধনিকবাদের উন্নততম আকারকেই ইম্পিরিয়েলিজম্‌ বলা হয়। আপন দেশের শ্রমিকগণের শোষণের ভিতর দিয়াই প্রথমে ধনিকবাদের কার্য্যারম্ভ হয়। কিন্তু, ইহার ব্যবসায়ের প্রসার যতই বিস্তৃত হইতে থাকে ততই ইহাকে নূতন বাজারের ও কাঁচা মালের উৎপত্তিস্থলের সন্ধানে বাহির হইতে হয়। অর্থাৎ ধনিকদের কারখানা যখন বিস্তৃতি লাভ করে এবং নূতন নূতন কল-কব্জা তাহাতে বসানো হয় তখন উহার মাল উৎপন্ন করিবার ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। এই অত্যধিক উৎপন্ন মাল ধনিকদের আপন দেশ ব্যবহার করিয়া কিছুতেই শেষ করিতে পারে না। কাজেই প্রয়োজন হইয়া পড়ে অন্য দেশে নূতন বাজারের। অত্যধিক উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে অত্যধিক কাঁচা মালেরও দরকার হয়। তত বেশী কাঁচা মাল ধনিকগণের নিজেদের দেশে পাওয়া যায় না এবং কোথাও কোথাও মোটেই পাওয়া যায় না। এই কারণে, কাঁচা-মালের উৎপত্তিস্থল সমূহের সন্ধানও ধনিকদিগকে করিতে হয়। অনেক সময় কাঁচামাল উৎপত্তির দেশেই সস্তা কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায় বলিয়া এবং রক্ষণশুল্ক ইত্যাদিকে এড়াইবার সুবিধা হয় বলিয়া ধনিকগণ কারখানাও স্থাপন করিয়া বসে। ধনিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই এ সকল কাজ সম্ভব হইয়া থাকে। অপর দেশ সমূহকে এইরূপে শোষণ করিবার জন্য ধনিকগণ সর্ব্বদাই আপনাদের করতলগত রাষ্ট্রীয় শক্তিকে শুধু যে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা নয়, যদৃচ্ছা ব্যবহারই করিয়া থাকে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা অপর দেশকে রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক ভাবে কিংবা শুধু অর্থনীতিক ভাবে পদানত করিয়া থাকে। এই যে পদানত করণ, ইহারই নাম হইতেছে ইম্পিরিয়েলিজম্‌।

আমরা ভারতবাসিগণ বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের দ্বারা সকল দিক হইতেই পদানত হইয়া আছি। ইম্পিরিয়েলিজমের শাসন শোষণেরই জন্য হইয়া থাকে এবং ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণ যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে শোষিত হইয়া থাকে এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শুধু কৃষক ও শ্রমিকগণ শোষিত হয়, একথা আমি এজন্য বলিয়াছি যে যাবতীয় ধন ও সম্পদ কেবলমাত্র তাহারাই হস্তের ও মস্তিষ্কের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ভারতবর্ষে দুই বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাতন ইম্পিরিয়েলিজম ভারতবর্ষের শৈল্পিক উন্নতির পরিপন্থী ছিল। উন্নত কলকব্জার সংযোগে ভারতে মাল তৈরী হয় এমন নীতির পক্ষপাতী যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম ছিল না। এ কারণে, মেসিনের উপরে খুব চড়া আমদানী শুল্ক বসানো হইয়াছিল। এদেশে মেসিনে প্রস্তুত মালের উপরেও আবকারী শুল্ক বসিয়াছিল। কিন্তু, বিগত যুদ্ধের দ্বারা অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে। ভারতে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের বর্ত্তমান নীতি হইতেছে ভারতবর্ষকে শিল্পানুষ্ঠানময় করিয়া তোলা এবং ভারতের ধনিকগণকে আপনার অধীন অংশীদাররূপে গ্রহণ করা। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমকে উহার বর্ত্তমান নীতি অবলম্বন

করিতে জগতের অবস্থাই বাধ্য করিয়াছে। ভারতের ধনিক-বণিকগণ অত্যন্ত পরিতুষ্টির সহিত বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের অধীনে অংশীদার হইয়াছে। নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলনের প্রাথমিক দিকটা ব্যতীত আর সকল সময়েই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ধনিক-বণিকগণের,—জনগণের নয়,—অবস্থার উন্নতি সাধন করা। নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোনো জাতীয় আন্দোলন জনগণের ভালোর জন্য কোনো দাবী কখনো পেশ করে নাই। নন্‌-কো-অপারেশন আন্দোলনও উহার দাবী পরে তুলিয়া লইয়াছিল। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্ বুঝিয়াছে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করার জন্য ভারতীয় ধনিক-বণিক ও অভিজাত শ্রেণীর সহিত আপোস করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কেননা, রাশিয়ার বিপ্লব জগতের ইম্পিরিয়েলিজম্ সমূহের জন্য অনেক সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। এদিকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কমিশন ও মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের দ্বারা যতটুকু অধিকার ভারতীয় ধনিক-বণিক ও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর লোকেরা পাইয়াছে তাহাতে তাহারা এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে যে তাহাদের এই অধীন অংশীদারত্ব ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের দ্বারা একদিন সমান অংশীদারত্বে পরিণত হইবে। সমগ্র জগতের শ্রমিক ও কৃষকগণ যখন ধনিক ও জমীদারের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের ক্ষমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে তখন ভারতের ধনিক-বণিক ও ভূম্যধিকারিগণও আপনাদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জানে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের দ্বারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া বৃটিশ ধনিকগণের সহিত ভাগাভাগি করিয়া ভারতীয় জনগণকে, বিশেষ করিয়া ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণকে তাহারা মনের সুখে লুণ্ঠন করিতে পারিবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের আন্দোলন হইতেছে ভারতের উৎপাদক শ্রেণীর দাসত্বকে সুদৃঢ় করার আন্দোলন।

আজিকার দিনে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে বিদ্রোহ ঘোষিত হইবে এবং যে বিপ্লব সংঘটিত হইবে তাহা কখনো ইংল্যাণ্ডের ক্রম্‌ওয়েলের বিপ্লব কিংবা ১৭৮৯ সনের ফরাসী বিপ্লবের মত হইবে না। এই দুইটি বিপ্লবে ফিউডাল ও অভিজাত শ্রেণীর সহিত ক্ষমতা প্রয়াসী ধনিকগণের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। জগতের সে অবস্থা এখন আর নাই। জগতে এখন ধনিকগণেরই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শোষিত জনগণ এখন বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে ধনিকগণের প্রভুত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে। পুরাতন প্রথাকে ধ্বংস করিয়া তাহার জায়গায় নূতনের প্রবর্ত্তন করার নামই হইতেছে বিপ্লব বা রিভোলিউশন্। ধনিক-শোষণ প্রণালীকে ধ্বংস করিয়া কৃষক ও শ্রমিকগণের অর্থাৎ শোষিত জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার কার্য্যকরী চেষ্টাই আজিকার দিনে বিপ্লব বা রিভোলিউশন নামে আখ্যাত হইতে পারে। এই হিসাবে ভারতের ত্রাসনীতি মূলক গুপ্ত ষড়যন্ত্র বা আন্দোলনকে বিপ্লব বলা যাইতে পারে কিনা তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা, ত্রাসনীতিবাদিগণ যে কখনো শোষিত জনগণের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাকেই আপনাদের আদর্শে পরিণত করিয়াছিলেন এ সংবাদ তাঁহাদের আত্ম-বিবৃতি হইতে আমরা কখনো জানিতে পারি নাই।

আমাদের রিভোলিউশন বা বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইবে কৃষক ও শ্রমিকগণের অর্থাৎ জনগণের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা আর তাহার কার্য্য হইবে কৃষক ও শ্রমিকগণের উত্থান — এই একটি মাত্র পথ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আমরা এই কাজ না করিয়া যদি আর কিছু করি তবে আমরা বিপ্লব-বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইব।

স্বাধীনতা যদি যুবকগণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ধনাভিজাত্য, জমিদারী-আভিজাত্য, কুলাভিজাত্য ও বর্ণাভিজাত্য প্রভৃতি পরিহার করিয়া কৃষক ও শ্রমিকগণের ভিতরে তাহাদেরই লোক হইয়া কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। কৃষকগণের নিরক্ষরতা বিদূরিত করিবার জন্য চীনে ৮০ হাজার যুবক আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিরক্ষরতাকে বিদূরীত করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণকে তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতেছেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই চীনের ছাত্রগণ ও চীনের যুবকগণ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। গোটা চীনের আবহাওয়াই তাঁহারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন ও ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নূতন বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার দ্বারা তাঁহারা সমস্ত চীনকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বহু সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বহু পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কোনোটিরই উদ্দেশ্য হাজার হাজার বছরের পুরাতন ভাবধারাকে আজিকার জীবনের সহিত খাপ খাওয়ানো নহে—সব কয়টিরই উদ্দেশ্য প্রতিগন্ধময় পুরাতনের বর্জ্জন এবং নূতনের বরণ। চীনের যুবকান্দোলন হইতে ভারতীয় যুবকগণের কিছুই কি শিখিবার নাই? চীনের যুবকগণ যখন নূতন আলোক রশ্মির দ্বারা তাঁহাদের দেশকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন তখন ভারতের যুবকগণ করিতেছেন কিনা পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ। জানিনা, আমাদের শালীনতা বোধ কোথায় গিয়াছে!

হীন-সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকত্বকে ঘৃণাভরে পরিহার করিয়া মনুষ্যত্বকে বরণ করিয়া লইতে না পারিলে আমরা ভারতের যুবকগণ কোনো কাজেই আসিব না।

আমরা চেষ্টা করিলেই অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। আমাদের কাজের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিবন্ধক হইতেছে আমাদের অভিজাত মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তিকে দূর করিতে না পারিলে আমরা কোনো কাজই করিতে পারিব না। কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের একটা বিশিষ্ট শিক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সমূহ আমাদিগকেই গড়িয়া লইতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত মিশিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে, কারখানায় প্রবেশ করিয়া মজুরের জীবনের সহিত আমাদিগকে মিশিয়া যাইতে হইবে। চাষী আর মজুরদিগের হৃদয়ে ভালো খাওয়ার জন্য, ভালো পোষাক পরার জন্য এবং সর্ব্বোপরি ভালো ভাবে ভালো জায়গায় বাস করার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে না পাইয়াও মানুষের জীবনকে অভাবহীন করিয়া গড়ার ন্যায় অভিশাপ পৃথিবীতে আর কিছুই হইতে পারে না।

আমাদের কৃষকগণ, শ্রমিকগণ, এক কথায় জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ না করিলে ভারতবর্ষ কখনো স্বাধীন হইবে না, ইংরেজ চলিয়া গেলেও না। ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের জনগণের দ্বারা এবং জনগণেরই জন্য পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে।

যে মুক্তি-সংগ্রামে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি শ্রেণী-সংগ্রাম তাহার একটা রূপ। সমাজে যে দিন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছে সে দিনই সম্পত্তির অধিকারীর সহিত সম্পত্তি হীনের সংঘাতও বাধিয়াছে। উৎপাদনের যাবতীয় উপায় সমূহের উপর যাহারা প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়া আছে তাহাদের সহিত শোষিত উৎপাদকগণের সংঘাত ও সংগ্রাম অনিবার্য্য রূপেই চলিয়াছে এবং যতদিন না সম্পত্তিশীলের শোষণ প্রথা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ততদিন চলিতেও থাকিবে। আমাদের দেশের অনেক ধনিক নেতা ও ধনিকের প্রসাদ-প্রয়াসী নেতা শ্রেণী-সংগ্রামের নামে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কেননা, তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের কিংবা তাঁহারা যাঁহাদের প্রসাদ-প্রত্যাশী তাঁহাদের স্বার্থের হানি হইবে। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রামের নামে আপত্তির বেলায় তাঁহারা স্বার্থ হানির কথা উচ্চারণও করেন না। তাঁহারা বলেন,—"এসব পাশ্চাত্যের জিনিস, প্রাচ্যের আব হাওয়াতে কিছুতেই সহিবে না।" পাশ্চাতের নিকট হইতে প্রাচ্য কত কিছু গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিনিয়ত করিতেছে—তাহাতে এ সব নেতার আপত্তি কখনো হয় না। তাঁহারা নিজেরা যে রাতদিন পাশ্চাত্যের হীনতম ভাবে মশগুল হইয়া থাকেন তাহাতেও প্রাচ্যের কোনো ক্ষতি হয় না! প্রাচ্যের ক্ষতি হয় শুধু নাকি শ্রেণী-সংগ্রামের বেলায় যাহা কোনো দেশের বিশিষ্ট বস্তু মোটেই নয়। ধন-বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি সকল দেশেই হইয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা সকল দেশেই সমাজের নানাবিধ বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। এক কথায় মানব-সমাজের ইতিহাসই হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামও নিছক শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্ এবং উহার অংশীদার ভারতীয় ধনিকবাদ ও ভূম্যাভিজাত্য আমাদের দাসত্ব ও অধীনতার মূলীভূত কারণ। এই শক্তিগুলি আমাদের দেশের উৎপাদকগণকে অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকগণকে দুই হাতে শোষণ করিতেছে। কৃষক ও শ্রমিকগণ উত্থান করিয়া যদি এই শোষণকারী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে তবেই আমরা সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব, অন্য কোনো উপায়ে নহে। ভারতময় সংহত যুবক শক্তি কৃষক ও শ্রমিক উত্থানের কাজে আপনাদিগকে মনে প্রাণে নিয়োজিত করুক।

১৯শে আগষ্ট, মুজফ্ফর আহ্মদ
১৩২৭ সন

ঢাকা যুবক সম্মিলন

(অভ্যর্থনাকারীর অভিভাষণ)

সমবেত ভদ্র মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

যাঁহার ইচ্ছায় জগতে ভাঙা গড়া উত্থান পতন সংঘটিত হয় সেই নিখিল জাতির ভাগ্য বিধাতার ভৈরব শঙ্খ আমাদিগকে জাগ্রত করুক। নানা দিগ্ দেশ হইতে আজ আপনারা এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীতে শুভাগমন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে সম্বলবিহীন—আমাদের আয়োজন যে অসম্পূর্ণ, তাহা এই অযোগ্য সেবকের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণের ভার অর্পিত হওয়াতেই প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা কি দিয়া কেমন করিয়া আপনাদের সেবা করিব? আমাদের হৃদয় আসনে সজ্জিত সুন্দর প্রীতি শতদলের স্বরভিসিক্ত আনন্দ অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া আমাদের দীন আয়োজন সার্থক করুন—শ্রদ্ধা প্রীতি অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ঢাকার যুবক শক্তি একদিন সুদূর অতীতে মোগল ব্যাঘ্রের দারুণ আক্রমণ হইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিক্রমপুরের বীরসন্তান চাঁদ-কেদার নৌ-শক্তি গড়িয়া ফিরিঙ্গি হারমাদ ও আরাকানি মগের দুর্জ্জয় শক্তি স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। মোগল সেনার লোহিত শোণিতধারায় মেঘনার কালো জল লালে লাল হইয়া গিয়াছিল। আজ যাহারা সমাজে নির্য্যাতিত—সেই নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত, টিয়র, ভূঁইমালী, ঢালি প্রভৃতি জাতির তরুণের দল—নৌ-বহর পরিচালনায়, লাঠি-খেলায়, অসি-চালনায় দক্ষ ছিল,—অত্যাচারিত নরনারীর করুণ ক্রন্দনে তখন আকাশ হাহাকারের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত হইয়া উঠিত না—"তখন একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে, চাঁদ-কেদারের প্রতাপে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।" —আজ সে স্বপ্নের কথা! আজ সেই ঢাকা—গভীর ঘন অন্ধকারে ঢাকা। তারপর রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনে কতদিন চলিয়া গেল।

ঢাকার যুবক শক্তি আজ রাজরোষে বিদ্ধস্ত, অনৈক্য-বিক্ষিপ্ত এবং কারাগারে বন্দী। বিশ বৎসর হইতে যে নির্য্যাতনের প্রবাহ ইহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহাতেও দেশকে জাগ্রত করিয়া তুলে নাই। মুক্তি পাগল জাতির মত একের শূন্য স্থান দশজনে পূর্ণ করিয়া জীবনের স্পন্দন ফুটিয়া উঠে নাই। বরং এক গভীর অবসাদের অন্ধকার আকাশ বাতাস আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। নির্য্যাতনে জাতির প্রাণ ও চরিত্র কঠোর হইয়া "ঝড় বাদলে গভীর রাতে বুকের পাঁজর জ্বালিয়া নিয়া" ছুটিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। এদেশের ধ্রুব প্রহ্লাদের তপস্যা জাতির যুবকগণের জীবনে সার্থক হইয়া উঠে নাই। আমরা আজ বয়সে নবীন হইয়াও যুবকগণের অভ্যর্থনায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের বুকের মধ্যে জীবনের সবুজ রং তামার বরণ হইয়া গিয়াছে। তাই যৌবনের রথচক্রের ঘর্ঘর নিনাদেও হৃদয়-দারিদ্র্যের বিষণ্ণ বিবর্ণ মূর্ত্তি আপনাকে গোপন করিতে পারে নাই—ফুটিয়াই উঠিয়াছে।

যৌবন, হাসি-খেলা, আনন্দ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া জগৎকে সুন্দর ও শোভন করিয়া মরুতে কুসুম ফুটাইয়া পাষাণে নির্ঝর বহাইয়া জোছনা ঢালিয়া মলয় বহাইয়া দেয়। সে চারিদিকের বাঁধন ছিঁড়িয়া কারা ভাঙ্গিয়া নিজকে বিশ্বে বিলাইয়া দেয়—প্রাণের বেগে ভাঙ্গিয়া চলে, গড়িয়া চলে। বিজ্ঞতার আবরণে বিধি নিষেধের বাঁধনে নিজকে পলে পলে মুচরাইয়া মারে না। ভাল করে মন্দ করে, সফলতা নিস্ফলতার ভিতর দিয়া যৌবনের বেগেই ছুটিয়া চলে, তার বাঁশীর ডাক শুনিয়া নরনারী ছুটিয়া আসে, যমুনা উজান বহে। সে কালিয়া নাগের ফণা দমন করে, পুতনার মায়া ছিন্ন করে, বাঁশী হাতেই কংশ বিনাশ করে। কিন্তু আজ দিকে দিকে সুচিভেদ্ধ অন্ধকার অন্ধকারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, চারিদিকে রোগ শোক দুর্ভিক্ষ

মহামারিতে মৃত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শবরাশী ও আর্ত্তের করুণ ক্রন্দন—এই মহাশ্মশানে কে আছ বীর! কে আছ সাধক! তোমার চিরজাগ্রত ভীতিহীন প্রাণ লইয়া সাধন করিবে? ঐ দেখ চরিত্রে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, উদ্যমে, তপস্যায়—সন্তানের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মা "ময় ভূখা হুঁ" বলিয়া আকাশ কম্পিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। কে আছ সাধক! ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া—হৃদপিণ্ড উপাড়িয়া মায়ের পায়ে উপহার দিবে—কে আছ বীর, বুকের রক্ত ঢালিয়া দিয়া মায়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে?

সকলদিকে আজ যে বিরাট একটা দৈন্য ও দুঃখ আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে ইহা কি কেবল অধীনতারই ফল? ইহার মধ্যে কি আমাদের অলসতা চরিত্রহীনতা ভেদবুদ্ধি ও আত্ম-বিস্মৃতি বর্ত্তমান নাই? স্বাধীনতা একটা অবস্থা, আমরা ঐ অবস্থার অযোগ্য হইয়াই পরের পায়ের নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। অযোগ্যতা ইহার কারণ, আর পরাধীনতা কার্য্য। কার্য্যকে লোপ করিতে হইলে কারণ লোপ করিতে হইবে। সে দৈন্য মুছিয়া ফেলিতে যুবক সমাজে কঠোর সংযম ও প্রচেষ্টা ত দেখিতে পাই না।

আজ যাহারা যুবক কালই তাহারা গৃহী। যুবকরাই দেশের ভবিষ্যত গঠন করে। আমাদেরই যুগে রাশিয়ায়, আয়র্ল্যাণ্ডে, নব্য তুরস্কে ও চীনে যুবকশক্তির যে অপূর্ব্ব সাধনা দেখিলাম, তাহা এদেশের যুবকগণের বুকে কি রামধনু সৃজন করিবে না? এদেশে যুবকগণের কি সিনেমা, রেস ও বিলাসিতা নিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিবার দিন এখনও রহিয়াছে? ইহারা কি কেবল ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের জন্য এক কলঙ্কময় উপাদানই মাত্র রাখিয়া যাইবে? যে সকল আত্মা তোমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে তাহাদিগকে কি তৃপ্ত করিবে না? শরীরের দুর্ব্বলতা মন ও চরিত্রের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে। এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে শরীর চর্চ্চা নিন্দনীয়, "সকলেই ভাল ছেলে"।

যুবকগণ! তোমাদের ক্লৈব্যের জন্য আজ এদেশের মুক্তি-সাধনা ব্যর্থ, মাতৃজাতির সম্মান লাঞ্ছিত, ধর্ম্ম বিপন্ন, তোমাদের অবসর কোথায়? নিজ নিজ স্বচ্ছন্দতা ও সন্তোষের মাদকতা তোমাদিগকে আর কোথায় নিয়া যাইবে? তোমাদের সবল বাহু এবং প্রশস্ত বুকের জন্য যে ধর্ম্ম ইজ্জৎ, দেশ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় খেলা এবং জাতীয় অনুষ্ঠান (festivals) পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তা লাভ করা অসম্ভব। আমাদের দেশের ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলোয়াড়গণকে জাতীয় কার্য্যে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যায়ামের সহিত বুদ্ধি আলোড়িত না হয় তাহা মানুষকে শারীরিক শক্তি দিতে পারে কিন্তু বীরত্ব প্রদান করে না। এজন্য লাঠিখেলা এবং অসি পরিচালনা সমধিক কার্য্যকরী।

তোমাদের পিছনে ঐ দেখ বিরাট জাতি পড়িয়া রহিয়াছে। এদেশে বলিতে গেলে তাহাদের দেশ যাহাদের উত্থান ও পতনের মধ্যে এদেশের উত্থান ও পতন নিহিত। তাহারা শিক্ষায় দীক্ষায় সংস্কারে পতিত বলিয়া আজ প্রতিপদে তোমাদের পায় বিরাট শৃঙ্খলরূপে মুক্তি-যাত্রায় বাধা প্রদান করিতেছে। তোমরা অনেকেই সেই বিরাট শক্তি অবহেলা করিয়া মনকে চোখ-ঠার দিতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তাহারা আসিয়া তোমাদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া যাত্রা করিবে সে পর্য্যন্ত দেশের মুক্তি স্বপ্ন—সাধনা ব্যর্থ। তোমরা যদি দুষ্টের মত যত্নে এখন করিয়া তাহাদের প্রতি ব্যবহার কর তবে এমন দিন হয়ত আসিবে যেদিন তোমাদের পাপের জন্য সমস্ত জাতিকে বহু বৎসর ব্যাপিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পরের জুতার তলে যাহার মাথা পড়িয়া আছে তাহার কি শোভা পায় আভিজাত্যের গৌরব করা? কাহারা এ দেশ পরের হাতে সাঁপিয়া দিয়াছে? কে বিদেশীয় শাসন এ দেশে চালাইয়া নিতেছে? কে বিদেশীর সহায়তায় এদেশের নির্য্যাতিত কোটী কোটী নরনারীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া "ছোটলোক" বলিয়া গালি দেয়? যুবকগণ, এ কথা একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় বোধহয় আসিয়াছে, নতুবা একদিন এমন আসিতে পারে যেদিন বুভুক্ষিত সহস্র সহস্র নরনারীর সম্মুখে এর জবাব দেওয়া হয়ত অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আর যদি আজ তোমরা প্রাণ নিয়া, জ্ঞান নিয়া ঐ বঞ্চিতের দুয়ারে ছুটিয়া যাও তবে মিলনের মধ্য দিয়া যে ভাগিরথী ধারা প্রবাহিত হইবে "সে যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে"?

আজ হিন্দু মুসলমান বিরোধ দেখিয়া দেশ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু "এই ব্রতের এই কথা"। এ বিরোধ ধর্ম্মের লড়াই নহে; ইহার পেছনে অর্থনৈতিক সমস্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ বিরোধ অস্থি মজ্জাগত। এ দেশের মুসলমানগণের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক লোক হয়ত বিদেশ হইতে আসিয়াছে, বাকি সকলেই এদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অত্যাচারে মুসলমান হইয়াছে। এই অতীতের নির্য্যাতন জাতির মনে অলক্ষে নিহিত আছে। রাজনৈতিক বাতাসে সেই আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া দেশ ছাই করিয়া দিতেছে। যাহাদের তোমরা দূরে রাখিয়াছ তাহারা এবং অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম্মমতে ভিন্ন হইলেও ইহারা এক জাত, একই কৃষক ও শ্রমজীবী। ইহাদের একইরূপ শিক্ষা এবং জীবিকানির্ব্বাহের প্রণালী। যদি মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া এই উপেক্ষিতের প্রতি তোমাদের ব্যবহার সংশোধন না করিয়া লও এবং এখনও মরণকে বরণ করিয়া সেই শাস্ত্রের পাতাই ঘাটিতে থাক তবে একদিন ঐ দুইটি জাতি মিলিয়া আভিজাত্যের বিরুদ্ধে এক হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব নহে। এই বিপদ হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে যাহারা পেছনের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে তাহাদিগকে বাদ দিয়া যুবকগণকেই অগ্রসর হইতে হইবে। বুদ্ধিমত্তার প্রভাব নিয়া গুমর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কেন না, জগতে উহার বিরুদ্ধেও বিপ্লব সম্ভব হইয়াছে।

চিরদিন মিলনের মধ্য দিয়াই নূতনের সৃষ্টি সম্ভব হইয়া থাকে। আমাদের এই সাগর প্রমাণ দুঃখের পরপারে মিলনের ভিতর হইতে যে মহাশক্তি আবির্ভূত হইবে সেই মাত্র আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু আমাদের তথা কথিত ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কার কিছুতেই আমাদের মিলন সার্থক হইতে দিতেছে না। যাহা ধারণ করিয়া থাকে তাহাইত ধর্ম্ম এবং সমাজ ত মানুষেরই সৃষ্টি। তাহা হইলে জীবনপথে ইহারা প্রতিপদে আমাদিগকে বাধা দিতেছে কেন? মানুষ যখন জীবনের বেগেই না চলিয়া নিয়ম ও সংস্কারের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া যায়, তখনই তাহাকে জড়ত্বে আশ্রয় করে এবং চারিদিকে কেবলি গণ্ডীর পর গণ্ডী টানিয়া ভেদ বিরোধ সৃষ্টি

করিয়া লয়। মুক্তি আমাদের যথার্থ কাম্য হইলে এই বাধা অতিক্রম করিয়াই চলিতে হইবে। স্বাধীন হইতে হইলে তাহার যোগ্যতাও অর্জ্জন করিতে হইবে। এদেশের বিরোধ তিনটি উপায়ে বিদূরিত হইতে পারে। প্রথম একে অন্যের ধর্ম্মগ্রহণ, দ্বিতীয় কোন ধর্ম্মাশ্রয় না মানিয়া মাত্র মানব ধর্ম্ম পালন, আর তৃতীয়তঃ, তৃতীয় একটা ধর্ম্ম গ্রহণ। কোটী কোটী মুসলমান হিন্দু হইবে ইহা কল্পনারও অতীত এবং কোটী কোটী হিন্দু মুসলমান হইবে ইহাও বাতুলের প্রলাপ। কেবল তৃতীয় ধর্ম্মগ্রহণ দ্বারাই এই সমস্যার মীমাংসা সম্ভব হইতে পারে—এই ধর্ম্ম জাগ্রত দেশপ্রীতি। মাতৃ চরণেই হিন্দু-মুসলমানের, উন্নত ও অবনতের মিলিত হওয়া সম্ভব। অযুত প্রকার বৈচিত্র্য মাত্র এই দেশমাতার চরণতলে মিলিত হইয়া মহাজাতি গঠিত হওয়া সম্ভব। যুবকগণ, তোমরা এই মাতৃনাম নিজ জীবনে সার্থক করিয়া গৃহে গৃহে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আজ বিধাতার ডাক আসিয়াছে। বৃদ্ধগণ তাহাদের চুল চেরা রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি লইয়া এই পথে যাত্রা করিতে পারিবেনা। তাই তাহারা নিজেদের দুর্ব্বলতায় জাতির চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। যুবকশক্তিই মাত্র এই দুর্দ্দিনে তাহার প্রেমভরা প্রাণ ও বুকভরা সাহস লইয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সক্ষম।

মানুষের সম্মুখে বড় আদর্শ না থাকিলে সে ভেদ বিরোধ নিয়াই পড়িয়া থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ঢাকায় যে যুবকদের ৩৬টি সঙ্ঘ তাহার কারণ ইহার কতেকের কংগ্রেসে যোগ দিবার সাহস নাই অথচ নিজের একটু প্রতিষ্ঠা চায়, স্বাধীনতা ইহারা কল্পনাও করিতে পারে না। আর কতেকে হয়ত মাত্র সেবা ধর্ম্মকেই বড় জানিয়া উহাই নিয়া থাকিতে চাহে। সেবা ভাল, কিন্তু, স্বাধীনতা মহান। এই অবস্থা দেখিয়া অনেকেই মনে করে হয়ত এই অসীম শক্তিশালী ভবিষ্যৎ জাতির পরিচালক যুবক শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিতে কোন দুষ্ট হস্ত ইহার পিছনে কাজ করিতেছে। আর এক মুহূর্ত্তও নিজেদের বিক্ষিপ্ত না রাখিয়া এক মাতৃনামে কংগ্রেসের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইতেই হইবে। "হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর"—এই দুর্দ্দিনে তোমাদেরই বুকের পাঁজর জালিয়া জাতিকে পথ দেখাইয়া নিয়া যাইতে হইবে। কবি কহিয়াছেন "জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না, কিন্তু, দেশের জন্য প্রাণ সকলেই দিতে পারে।"

পুনরায় আমাদের লক্ষ ত্রুটি এবং সেবার অক্ষমতার জন্য আপনাদের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

১৭শে আগষ্ট বন্দেমাতরম্
১৯২৭

শ্রীমোহিনী মোহন দাশ

যুবক বাঙলার অর্থ-শাস্ত্র *

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

আর্থিক আইন-কানুন ও স্বদেশ-সেবা

সত্য কথা বলিবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা জানি না। কিন্তু অপ্রিয় কথা বলিতে আমি ওস্তাদ।

প্রথমতঃ, বিদেশ হইতে পুঁজি আমদানি করিয়া ভারতের ধন-সৃষ্টিতে আর বেকার-সমস্যায় সাহায্য করা আমি বিচক্ষণ স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া থাকি। তাহার অন্যান্য সুফলের ভিতর আমি দেখিতে পাই যে, চাষীরা অল্পমাত্র জমির উপর নির্ভর করিয়া গণ্ডা গণ্ডা লোকের ভরণ-পোষণ করিতে আর বাধ্য হইবে না, জেলায় জেলায় অসংখ্য আধুনিক প্রণালীর শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে, মজুর আর মধ্যবিত্ত নামক দুই শ্রেণীর লোক-বল, ধন-বল, জ্ঞান-বল আর চরিত্র-বল বাড়িতে পারিবে আর সমাজের সর্ব্বত্র যন্ত্র-নিষ্ঠার জয়জয়কার চলিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের হাতে জনগণকে বেশী পরিমাণে ট্যাক্স দিতে উৎসাহিত করা আমি স্বরাজ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য সমঝিয়া থাকি। কেননা, স্বরাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকর নানাপ্রকার কাজে টাকা খরচ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করানো আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, আঠার পেন্সের রুপেয়ার স্বপক্ষে আমি প্রথম হইতেই আছি। তাহাতে বাঙলার চাষীর ক্ষতি আমি দেখিতে পাই না। চতুর্থতঃ, সরকারী কৃষি-কমিশনের বিপক্ষে যুক্তি দেখানো আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আর পঞ্চমতঃ, আজকাল যে "রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আইনের কথা উঠিয়াছে তাহার পক্ষেই আমার চিন্তা খেলিতেছে।

বোলশেভিক রুশিয়ায় "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক"টা "সরকারী" প্রতিষ্ঠান, ইতালিতেও তাই। অর্থাৎ অংশীদার নামক জীব এই দুইটার শাসনকর্ত্তা নয়। অপরদিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। দেখা যাইতেছে যে, দুনিয়ায় সরকারী এবং বে-সরকারী দুই প্রকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কই চলিতেছে। কাজেই ভারতে যদি বিলাতী-জার্ম্মান আদর্শের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কায়েম হয় তাহা হইলে একটা মারাত্মক কিছু শয়তানি ঘটিবে বলিয়া আমি সন্দেহ করি না।

তবে ইহার শাসনে ও কর্ম্ম-পরিচালনায় ভারত-সন্তানের হাত বেশী থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক কিছুতেই "ইণ্ডিয়ানিজেশ্যন" বা ভারতীকরণ এখনো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। কাজেই একমাত্র ইণ্ডিয়ানিজেশ্যনের ওজরে রিজার্ভ-ব্যাঙ্ককে খাড়া হইতে না দেওয়া আমার মতে অতিমাত্রায় চরম-পন্থিতা। সাধারণতঃ, চরম-পন্থীতার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই চরম-পন্থীতা বাঞ্ছনীয় কিনা সন্দেহ।

* ঢাকা জেলার বিশেষ যুবক সম্মিলনের অর্থনীতি বিভাগের সভাপতির অভিভাষণের বিক্ষিপ্ত অংশ।

কিন্তু ব্যাঙ্কটাকে অন্যান্য তরফ হইতেও শাসন হিসাবে উন্নত করা সম্ভব। প্রস্তাবে আছে যে, মাত্র চারটা "ভারতীয়" ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক কাগজপত্র এই ব্যাঙ্কে স্বীকার করা হইবে। অথচ ২২টা বিদেশী ব্যাঙ্ক এই অধিকার ভোগ করিবে। এই বিধানের বিরুদ্ধে আমি বলিতে চাই যে, অন্ততঃ গোটা চল্লিশেক "ভারতীয়" জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ককে এই অধিকার দেওয়া উচিত। অধিকন্তু ভারতের প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলারও এই অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।

শাসন-সংক্রান্ত এই ধরণের কয়েকটা দফা বাদ দিলে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের প্রস্তাবে যে সকল শর্ত আছে তাহার অধিকাংশই আমার বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণীয়। বিশেষতঃ, ইয়োরামেরিকার চরম অভিজ্ঞতার সুফল এই ব্যাঙ্কের নোট-জারী আর নোটে-সোনায় সম্পর্ক সম্বন্ধে কায়েম করিবার ব্যবস্থা আছে। সংক্ষেপে এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, নোট সম্বন্ধে ফরাসী কায়দা ত বর্জ্জিত হইয়াছেই, এমন কি বিলাতী রীতিও গ্রহণ করা হয় নাই। প্রস্তাবে আছে জার্মান-জাপানী রীতি।

বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তাই হউক অথবা প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিষয়ক বিলই হউক,—কোন বিষয়েই বিপুলায়তন কেতাব লিখিবার সময় বা সুযোগ আমার জুটে নাই। তবে নানা উপলক্ষ্যে সিদ্ধান্তগুলা কয়েক কথায় প্রচার করা গিয়াছে।

মতামতের অনৈক্য

বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের মতন আর্থিক আইন-কানুন বিষয়েও আমার মতামত গুলা লোক-প্রিয় নয়। সর্ব্বত্রই আমি কিছু বে-আড়া রকমের কথা বলিয়া থাকি।

কাজেই আমার নিকট হইতে আজও হয়ত পুরাপুরি অপ্রিয় কথাই বাহির হইবে। অন্যান্য দুনিয়ার মতন আর্থিক দুনিয়ায়ও বহুসংখ্যক মতভেদ আর দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমি অবশ্য দল পুরু করিবার মতলব রাখি না। মতটা জাহির করিবার স্বাধীনতা পাইলেই কৃতার্থ হইয়া থাকি।

আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন কিম্বা স্বরাজশীল থাকিত তাহা হইলেও একাধিক পরস্পর-বিরোধী আর্থিক মত বাজারে চলিত। কাজেই যখন-তখন যেখানে-সেখানে যে-সে মতকে দেশ-হিতকর অথবা দেশের অনিষ্টকারক বলিতে গেলে অবিচার করা হইবে।

আজ ভারতে স্বরাজ বা স্বাধীনতা নাই বলিয়া সর্ব্বদা দেশশুদ্ধ লোককে কোনো এক মতের স্বপক্ষে "দেশের নামে" বিনা বাক্যব্যয়ে রায় দিতে উদ্বুদ্ধ করা স্বদেশ-সেবার লক্ষণ না হইতেও পারে। তাহাতে "দেশের স্বার্থ" রক্ষিত হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বহু সংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণীর উপর অত্যাচার ও জুলুম ঘটিতে বাধ্য। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাধারণতঃ আমরা না ভাবিয়া-চিন্তিয়া চাষী আর মজুর এই দুই শ্রেণীর লোককে এক গোত্রের অন্তর্গত বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই দুই এর স্বার্থ অনেক সময়েই একরূপ নয়। বিদেশী মাল বয়কট সুরু হইলে অথবা তাহার উপর চড়া হারে শুল্ক চাপাইলে খরিদ্দার হিসাবে চাষীদের ক্ষতি। কিন্তু যে সকল স্বদেশী ফ্যাক্টরীতে সেই সব মাল তৈয়ারী হয় বা হইবার সম্ভাবনা তাহার মজুরেরা তাহাতে বিচলিত হইবে কেন?

কাজেই চাষী আর মজুরকে অনেক সময়ে দুই বিভিন্ন স্বার্থের লোক অথবা দুই বিভিন্ন পথের পথিক দেখিতে পাওয়া স্বাভাবিক। আবার কলের মালিকেরা যে আইন বা কর্ম্ম-প্রণালীকে দেশোচিত বিবেচনা করেন তাঁহাদের মতামতকে "দেশের পক্ষে" মঙ্গলজনক বিবেচনা করিবার কোন কথা বলা চলে না।

তারপর, স্বদেশিক মতাবাদের মতি, গতি, স্বার্থ বা নীতি কিরূপ? এই শ্রেণীর লোকেরা আজ যে জমিদারের পক্ষে, কাল হয়ত ফ্যাক্টরি-মালিকের পক্ষে, "দেশের পক্ষ" বিবেচনা করিতে পারে। এমন কি কখনও বা চাষীকে অপেক্ষা কখনও বা মজুরকে তোয়াজ করা তাঁহাদের স্বার্থ-যোগাযোগের বা যুক্তি-তার্কিক দাঁড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং কোনো জবরদস্তি করিয়া কোনো দাগ-দেওয়া বিশিষ্ট মতকে স্বদেশসেবার মত বা স্বরাজের পথরূপে প্রচার করা অন্যায় মাত্র। কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে, শ্রেণী-বিশেষকে বা দল-বিশেষকে দেশের একমাত্র বা প্রধান প্রতিনিধি বিবেচনা করা পুরাপুরি অন্যায়।

আর্থিক জীবনে ভাঙন-গড়ন

যৌবনশক্তির চাষ চালাইয়া বাঙলাদেশের যে কয়টা ক্ষেত্র বাঙালী জাতিকে বর্ত্তমান জগতে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহার ভিতর টাকার ইজ্জৎ খুব বেশী। যুবক বাঙলার ১৯০৫-৭ সন টাকার আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছিল। আর এই বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী জাতি দুনিয়ায় যাহা কিছু করিয়া আসিতেছে তাহার প্রধান ফোয়ারা সেই ১৯০৫-৭ সনের কর্ম্ম ও চিন্তারাশি।

সেই যুগের সাধনাকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইবার জন্য যুবক বাঙলা দেশে বিদেশে নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙালীরা বাংকাণিজ্যে কিছু কিছু নজর দিতেছে। বাঙালীরা শিল্প-কারখানা কায়েম করিতেছে। উন্নত বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদের চেষ্টা বাঙলায় দেখা যাইতেছে। বাঙালীর তাঁবে "যৌথ" ব্যাঙ্ক আর "সমবেত" ব্যাঙ্ক কতকগুলা মাথা খাড়া করিয়াছে।

বাঙলার বাহিরে যুবক বাঙলা বাঙালী যৌবনশক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ গাড়িতেছে। ভারতের বাহিরেও বাঙালী সাঁতার কাটিয়া গিয়া আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জাপানী সমাজে বাঙালীর যৌবনশক্তি ভারত-সুহৃৎ ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। ফ্রান্সে, জার্ম্মানীতে, ইতালিতে, রুশিয়ার সর্ব্বত্রই যুবক বাঙলা নবীন ভারতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে জীবন্ত সাক্ষ্য দান করিতেছে। দুনিয়ার বড় বড় চিন্তাকেন্দ্রে আর কর্ম্মকেন্দ্রে যুবক বাঙলা একটা "বৃহত্তর ভারত" কায়েম করিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের জীবনস্রোত আজ জগতের মজুর, পুঁজিপতি, শিল্পি, বিজ্ঞানসেবী, সাংবাদিক, রাষ্ট্রবীর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নরনারী মহলে গিয়া ঠেকিয়াছে। দুনিয়ার অনেক প্রকার আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের স্বাধীন ও সমানভাবে জীবন-বিনিময় সাধিত হইতেছে।

প্রবীণেরা যাহা কখনো কল্পনা করিতে পারিত না ১৯০৫-৭ সনের নবীনেরা সেই স্বপ্নাতীত খেয়ালগুলাও কার্য্যে পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছে। যুবক বাঙলার এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইল কি করিয়া? যৌবন-শক্তির যুক্তিশাস্ত্রই এই অসাধ্য-সাধনের জন্য দায়ী। ভাঙন আর গড়ন হইতেছে সেই যুক্তি-শাস্ত্রের মোটা কথা।

দুনিয়া সম্বন্ধে যুবারা ভাবিত,—

সূর্য্য ভাঙিয়া গড়েছে পৃথিবী, পৃথিবী ভাঙিয়া গড়েছে চাঁদ,
আগ্নেয়গিরি ভাঙিয়াছে ধরা,—নদী ভাঙিয়াছে গিরির বাঁধ।
ধাতুরে গ্রাসিয়া বাঁচিতেছে গাছ, জীব বাঁচিতেছে গাছেরে খেয়ে,
অতীতে গ্রাসিয়া হল বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমানেরই মেয়ে।
ব্যক্তিমাত্রে রহস্যময়, নীতিধর্ম্ম বদলায় ক্ষণে ক্ষণে;
জীবনের প্রাণ চির-বিপ্লব,—স্থিতি নাহি তাহার পুরাতনে।
ভাঙার দাগ ত চারিধারে দেখি, দুনিয়াতে হেরি নিষ্ফল সব,
সবই অপূর্ণ বিশ্ব ব্যাপিয়া, শেষ পরিণাম শুধু পরাভব।
হিন্দু-গ্রীক ছাড়; ডারুইন্-কেপ্লার,—তারাই কম্বে পায়না হে!
রেডিয়াম এসে বাষ্প-তাড়িতে ভিটেমাটি-ছাড়া করিল যে?
পরাজয়ই বটে উন্নতি, আর হারিল যাহারা তারাই বীর,
পরাজিত বীর কমেনা যাদের, অমরতা ভাগ্যে সেই জাতির।
দুনিয়ার গায়ে লেখা আছে দুই, বিপ্লব,—বিফলতা,
বাড়াও বিশ্বে শত বৈচিত্র্য,—তাহাই সার্থকতা।

যুবক বাঙলা পরাজয় আর বিফলতাকে ডরায় নাই। অসাধ্য সাধনই তাহার একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল। এই অসাধ্য সাধনের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরা অতীতের তোয়াক্কা রাখে নাই, অভিজ্ঞতার ধার ধারে নাই, ফেল-মারার ভয়ে জড় সড় হয় নাই। তাহাদের বিচারে বর্ত্তমানই একমাত্র কাল। ভবিষ্যৎকে গোলাম করিয়া রাখিবার জন্য বর্ত্তমানের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিই ছিল তাহাদের জীবন-দর্শন।

আজ ১৯২৭ সন। অসাধ্য-সাধন আর বর্ত্তমান-নিষ্ঠা ধাপের পর ধাপে এক কথঞ্চিৎ উন্নত ঠাঁইয়ে আসিয়া খাড়া হইয়াছে। বাঙলার যৌবন-শক্তি এই উঁচু ঠাঁইয়ের মাপে বর্ত্তমান-নিষ্ঠ হইতে পারিবে কি? এই ঠাঁইয়ে দাঁড়াইয়া যুবক বাঙলা প্রবীণদের দিকে তাকাইয়া বলিতে সাহসী হইবে কি,—

"দুনিয়ার গায়ে লেখা আছে দুই,—বিপ্লব, বিফলতা,
বাড়াও বিশ্বে শত বৈচিত্র্য, তাহাই সার্থকতা?"

দুনিয়া আজ বাঙলার যৌবনশক্তিকে এই পরীক্ষায় ফেলিয়াছে। ভাঙন-গড়নের ক্ষমতা আছে কিনা তাহারই আবার যাচাই হইতেছে।

আজ অর্থশাস্ত্রের [illegible] এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহাদের অনেকেই কেতাব-পুঁথির ধার ধারেন না। অনেকে আবার কেতাবের পোকা বিশেষ। কেহ বা কাজের লোক, খুবই ব্যস্ত। তাঁহারা যুক্তি-তর্কের ধাক্কায় সময় খরচ করিতে অনভ্যস্ত। আবার অনেকে হয়ত তার্কিক। "কামের কথা পরে হবে" বলিয়া তাঁহারা তর্কের খাতিরে তর্ক চালাইতেই সুপটু।

জীবন আমাদের এইরূপ বিভিন্নতাময়। কিন্তু সকলেই যৌবনের ভাঙন-গড়নে মাতিবার জন্য এইখানে উপস্থিত হইয়াছি। আর্থিক জীবন সম্বন্ধে যে সকল চিন্তা-প্রণালী ও কর্ম্ম-প্রণালী এতদিন সনাতন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভিতর কোন্‌টা গ্রহণীয় আর কোন্‌টাই বা বর্জ্জনীয় তাহার কিছু কিছু খতিয়ান করা আজকার উদ্দেশ্য। বিরাট বিশ্বকোষ ঘাড়ে বহিয়া আনি নাই। সকল কথা আলোচনা করা অসম্ভব। ক্ষমতারও বোধ হয় অভাব। আর যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে সেই সবও নেহাৎ সূত্রাকারে আলোচিত হইবে। মোটা সিদ্ধান্তগুলা দেখানো হইবে মাত্র।

গোটা কয়েক অর্থনৈতিক স্বীকার্য্য

যে ধরণের ধনবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র আমার মেজাজ-মাফিক তাহার কয়েকটা মূলসূত্র প্রথমেই বলিয়া রাখি। এইগুলা আমার নিকট নেহাৎ গোড়ার কথা,—স্বতঃসিদ্ধ বা প্রাথমিক স্বীকার্য্য বিশেষ।

ইতালি ও জাপানের অর্থনীতি

বিদেশের নজির, বিদেশী অভিজ্ঞতা আর বিদেশ-নিষ্ঠা যুবক বাঙলার আর্থিক ভাঙা-গড়ায় এক বিপুল শক্তি। কিন্তু বিদেশ ত এক বিরাট দুনিয়া। এ দুনিয়ার কোন্ কোন্ অঞ্চলের নজির ও অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে আজকালকার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় বিশেষরূপে কার্য্যকরী? আমার বিবেচনায় একদিকে ইতালিয়ান আর অপরদিকে জাপানী কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের খুব বেশী কাজে লাগিবে। ইতালির আর জাপানের আর্থিক কর্ম্মপ্রণালী আর চিন্তাপ্রণালী বাঙলার ব্যবসায়ী মহলে আর ধনবিজ্ঞান-সেবীদের আবহাওয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

কারণগুলা অতি সোজা। ইতালি ইয়োরামেরিকার "সভ্য" বা "উন্নত" বা "যন্ত্রনিষ্ঠ" বা "ধনশালী" দেশগুলার ভিতর নিকৃষ্ট। আর জাপান হইতেছে এই সকল বিষয়ে এশিয়ার সেরা।

ঘটনাচক্রে প্রাচ্য জাপান আর পাশ্চাত্য ইতালি সভ্যতার সিঁড়িতে প্রায় এক ধাপেই অবস্থিত। উভয়ের সমস্যাই একরূপ। উভয়েই আজও কৃষি-প্রধান অবস্থায় রহিয়াছে। উভয়কেই আস্তে আস্তে যন্ত্রনিষ্ঠ, ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠ, শিল্প-নিষ্ঠ সমাজ-জীবনের কোঠায় উঠিতে হইতেছে। এই সিঁড়ির মাথায় অবস্থিত তিন দেশ,—ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানি আর আমেরিকা। এই তিন দেশকে ধ্রুবতারা করিয়া জাপান আর ইতালি জীবন-সাধনায় ব্রতী রহিয়াছে। ফ্রান্সের ঠাঁই এই তিন দেশের কিছু নীচে।

এইখানেই ভারতের সঙ্গে ইতালির আর জাপানের আধ্যাত্মিক সংযোগ অতি নিকট। আজ আমরা ভারতে আর্থিক জীবনের যে ধাপে রহিয়াছি ইতালি আর জাপান ঠিক যেন তার পরের ধাপ। অর্থাৎ ইংলাণ্ড, জার্ম্মানি আর আমেরিকা ও ফ্রান্স পর্য্যন্ত "প্রোমোশান" পাইতে হইলে যুবক ভারতকে আগে ইতালি-জাপান নামক আর্থিক-সামাজিক পুলটা পার হইয়া যাইতে হইবে।

আর্থিক স্বার্থ ও হিন্দু-মুসলমান

"হিন্দুর স্বার্থ" আর "মুসলমানের স্বার্থ" ইত্যাদি বোল আজকালকার বাঙলায় খুব শুনা যায়। কিন্তু খাওয়া-পরা আর টাকা-রোজগারের কর্ম্মক্ষেত্রে এই ধরণের ধর্ম্ম হিসাবে স্বার্থ-ভেদ আমি স্বীকার করিয়া চলিতে অসমর্থ। আমার স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ একদম অন্য ঢঙের।

যে-যে প্রণালী অবলম্বন করিলে বাঙলার চাষী, মজুর, কেরাণী, শিল্পী ও বণিক পরিবারগুলা দুই বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারিবে, শীতকালে গায়ে আলোয়ান জড়াইবে, গরমে-বর্ষায় ছাতা মাথায় দিবে, স্বাস্থ্যকর ঘর-বাড়ীতে শুইতে পারিবে, অসুখ হইলে ডাক্তার-কবিরাজ-হাকিম ডাকিতে পারিবে আর, সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা জমাইয়া রাখিতেও পারিবে,—সেই প্রণালীগুলা বাঙালী-হিন্দুর পক্ষেও যা, বাঙালী-মুসলমানের পক্ষেও তাই।

ধন-বিজ্ঞানে জাতি-ভেদ, রক্ত-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, ভাষা-ভেদ নাই। এ হইতেছে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মামলা। "সূচী-সংখ্যায়" ধরা পড়ে কোন্ লোকটা সুখে আছে আর কোন্ লোকটা দারিদ্র্য-সীমানার তলায় পড়িয়া আছে। দাড়িতে আর টিকিতে তফাৎ করা "ইণ্ডেক্স্ নাম্বারে"র কোষ্ঠীতে লেখা নাই। এই সনাতন, বিশ্বজনীন বিদ্যার পতাকা-তলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ঐক্য-বদ্ধ হইতে বাধ্য।

যদি অনৈক্য দেখা দেয়, সে অনৈক্য দাড়ি আর টিকির অনৈক্য নয়। সে অনৈক্য জীবন-যাত্রার মাপ-কাঠির অনৈক্য। তুমি বেশী খাইতে পাইতেছ, ভাল কাপড় পরিতেছ, তোফা বাড়ীতে বাস করিতেছ আর আমি এই সকল বিষয়ে ঘৃণ্য নগণ্য জঘন্য জীবন যাপন করিতেছি, সেই অনৈক্য। অর্থাৎ ধনী-নির্দ্ধনে, মজুর-মালিকে, চাষী-জমিদারে, কেরাণী-মনিবে অনৈক্য। এ সব অনৈক্য ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনৈক্য নয়,—আর্থিক ও সামাজিক অনৈক্য। আর এই সকল নতুন ধরণের অনৈক্য নিবারণের দাওয়াইও আছে হরেক রকমের। সে কথা সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি না।

ভারতের মজুর-নিষ্ঠা

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতি যত কারণে নবশক্তির আধার হইয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতর আধুনিক শিল্পকর্ম্মের সেবক, দিন মজুর সম্প্রদায় অন্যতম। বাস্তবিক পক্ষে শহর, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ফ্যাক্টরী আর মজুর এই চার বস্তু আধুনিক আধ্যাত্মিকতার সমান প্রতিমূর্ত্তি। ভারতবর্ষ এই কর্ম্মক্ষেত্রে কোনো নতুন সৃষ্টি দাবী করতে অসমর্থ। কিন্তু ইয়োরামেরিকার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া আমরাও জাপানীদের মতনই নবীন অর্থ, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছি।

বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য দেশের মতন ভারতও ক্রমশঃ ফ্যাক্টরী-নিষ্ঠ ও মজুর-নিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও মজুর-শক্তিই স্বরাজ ও স্বাধীনতার প্রধান সহায়রূপে দেখা দিতেছে। কাজেই মজুর-আন্দোলনের ক্রমিক উন্নতিকে আমি ভারতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির এক বড় খুঁটা সমঝিতে অভ্যস্ত।

এই বৎসর দিল্লীতে নিখিল-ভারত-মজুরকংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। আগামী বৎসর কানপুরে অধিবেশন বসিবে। অপরদিকে জেনেভার আন্তর্জাতিক মজুর-সম্মেলনের সঙ্গে ভারতীয় মজুর-আন্দোলনের যোগাযোগে কায়েম হইয়াছে। উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ও অন্যান্য ভারতবাসী এই আন্দোলনে মজুরদের সুহৃৎভাবে দাঁড়াইয়া ভাবুকতার নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া ধরিতেছেন। মজুর-আন্দোলনে ক্রমশঃ নানা দল দেখা দিতে থাকিবে। তাহাতে ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

———

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঢাকা যুবক সম্মিলন

গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে আগষ্ট তারিখে ঢাকার ন্যাশন্যাল কলেজ প্রাঙ্গনে বিরাট পেণ্ডালের ভিতরে ঢাকা জেলার যুবকগণের এক বিশেষ সম্মিলনের অধিবেশন হয়েছিল। অন্যান্য জেলার যুবকগণও সম্মিলনে যোগদান করেছিলেন। মেয়েদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত সভাপতি হলেও তিনি ঢাকা যেতে পারেন নি। তবে তাঁর লিখিত মুদ্রিত অভিভাষণ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেছিলেন। এ সম্মিলনের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে কেবলমাত্র একজন সাধারণ সভাপতি নির্ব্বাচিত করে সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃগণ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, আরো ছয় জন বিভাগীয় সভাপতিও তাঁরা নির্ব্বাচিত করেছিলেন। যথা—(১) আন্তর্জাতিক বিভাগে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি, (২) অর্থনৈতিক বিভাগে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, (৩) স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগে শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী, (৪) ব্যায়াম বিভাগে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস, (৫) শিক্ষা বিভাগে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং (৬) কৃষক ও শ্রমিক বিভাগে "গণবাণী"র অন্যতর সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্‌মদ। সাধারণ সভাপতির ন্যায় শিক্ষাবিভাগের সভাপতিও সম্মিলনে হাজির হন নি। তাঁর অভিভাষণেরও কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের সভানেত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী সাধারণ সভানেত্রীর পদেও বরিতা হয়েছিলেন। যুবকগণ ভবিষ্যতে এরূপ সম্মিলনের ব্যবস্থা যখন করবেন তখন এতসব সভাপতির ছড়াছড়ি না করে একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত করলেই বোধ হয় ভালো কাজ করবেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে রচনা (thesis) তৈরী করে সম্মিলনে পাঠ করবার জন্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে তাঁরা সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করে আনতে পারেন এবং আমাদের মতে এরূপ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিবেচনক হবে। আশা করি যুবকবৃন্দ এ বিষয়টা চিন্তা করে দেখবেন।

* * * *

একটা স্থায়ী সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ যুবকশক্তি পেছনে না থাকলে এখানে সেখানে যুবক সম্মিলনের অধিবেশন করে বিশেষ কিছু লাভ নেই। সমস্বার্থ (solidarity) বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রিভোলিউশন্যারি আইডিয়েল বা বিপ্লবাত্মক ধারণা সম্মুখে রেখে দেশময় পরিব্যাপ্ত যুবকসঙ্ঘ একটিও আমাদের গঠিত হয়নি। স্ব স্ব প্রধান হয়ে ছোট ছোট যুবকসঙ্ঘগুলি বিক্ষিপ্ত হয়েই থাকতে চায়, একটা বড় সংহত যুবকশক্তি গড়ে তোলবার প্রতি তাদের আকর্ষণ একেবারেই নেই, অন্ততঃ ঢাকাতে তো আমরা তা-ই দেখে এলাম। বিপ্লবাত্মক আদর্শ সম্মুখে না থাকলে এবং সংহত হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রাণে না জাগলে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে যুবক সম্মিলনের অধিবেশন করবার কিছু কি সার্থকতা আছে ?

* * * *

যৌবনের ধর্ম্ম হচ্ছে পুতিগন্ধময় পুরাতনকে ভেঙে তার জায়গায় উন্নত নবীনকে অভিষিক্ত করা। গোঁড়ামীতে আর রক্ষণশীলতায় যার আপাদ মস্তক পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, আমূল সংস্কার সাধন করার ভাব (Radical spirits) যার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়নি, বয়সে যতই নবীন হোক্ না কেন, যুবক সে কিছুতেই হতে পারে না। সে যে বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে পৌঁছেচে সেটা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হবে। আমাদের মনে হয় আমাদের অধিকাংশ যুবকেরই প্রাণে বার্দ্ধক্যের সঞ্চার হয়েছে এবং তারি জন্যে আমূল পরিবর্ত্তনকামী যুবকান্দোলন (Radical Youth Movement) আমাদের দেশে আজো গড়ে উঠছে না। ঢাকা যুবক সম্মিলনে একজন যুবতী

এই বলে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে "দায়ভাগ"এর কল্যাণে মেয়েরা বাপের ও স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতা হয়ে থাকেন। এই পচা পুরাতন প্রথাকে ভেঙে এমন নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করা উচিত যাতে মেয়েরা পিতার ও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারেন। অধিকাংশ যুবকদের ভোটে এ প্রস্তাব হেরে গেছে। বদ্ধমূল সংস্কারের চাপে যুক্তি আর বিচার যুবকদের নিকটে কত ছোট বলে যে প্রতিভাত হয়ে থাকে তা এই ছোট্ট ঘটনা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। যুবকেরা এ প্রস্তাবের বিপক্ষাচরণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে গৃহলক্ষ্মী করে রেখে দিয়ে তাঁরা মেয়েদের মাথা কিনে নিয়েছেন। তা ছাড়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার না দিলেও মেয়েদের বেলায় মোটা পণের টাকা দিতে হয়। কাজেই, তাদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করার কথা উঠতেই পারে না। এ যুক্তি যেমন বাজে তেমনি হাস্যকরও বটে। পণপ্রথা সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিদ্যমান নেই। বাংলাদেশে যত হিন্দু আছে তার শতকরা সাড়ে বারো জন তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর ও শতকরা সাড়ে সাতাশি জন তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে পণপ্রথা নাই বললেও চলে, আর উচ্চশ্রেণীরও সকল স্তরে যে আছে তাও নিঃসংশয়ে বলা চলে না। এমন অবস্থায় পণ-প্রথার দোহাই যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা কত সত্যের অপলাপ যে করেছেন তা মনে করতেও আমাদের লজ্জা বোধ হয়। বৃদ্ধদের সভায় এ প্রস্তাব হেরে গেলে আমাদের দুঃখের কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু যুবকদের সভায় এ প্রস্তাবের এরূপ পরিণাম বড় বেশী মর্ম্মান্তিক হয়েছে। উত্তরাধিকার প্রথা একেবারে তুলে দিতে পারলে আমরা আনন্দিত হব, কিন্তু, সে প্রথা বর্ত্তমান যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ মেয়েদের তার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখবার কি অধিকার পুরুষদের আছে? মেয়েরা তো কিছু মানবেতর প্রাণী নয় যে পুরুষেরা যদৃচ্ছা ব্যবহার করবে তাদের সাথে?

০ ০ ০ *

একটা কথার উত্তর আমরা যুবকদের কাছ থেকে চাই। কথাটা এই হচ্ছে যে, আজকের দিনে বিপ্লব বা রিভোলিউশন বলতে তাঁরা কী বুঝে থাকেন? রিভোলিউশনের কি সংজ্ঞা নির্ণয় করতে তাঁরা চান? 'পুরাতন প্রথাকে সমূলে ধ্বংস করে তার জায়গায় নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন' বিপ্লবের এই সংজ্ঞা আমাদের যুবকগণ স্বীকার করেন কিনা? যদি স্বীকার তাঁরা করেন তবে বিপ্লবের কাজে যে তাঁরা এক পা'ও আজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হননি, পরন্তু বিপ্লবের বিপক্ষাচরণই তাঁরা করেছেন এ সত্য কথাটা স্বীকার করবার মতন শক্ত বুকের পাটা যুবকদের আছে কি? সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক যে প্রথার দ্বারা বর্ত্তমানে আমরা শাসিত হচ্ছি, যে প্রথা ভারতবর্ষকে পদানত করে রেখেছে সেই প্রথাকে ধ্বংস করে কোনো নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করার প্রচেষ্টা অতীতে যুবকেরা কখনো করেন নি। তাঁরা মাত্র ইংরেজের রাজত্বের অবসান ভারতবর্ষ থেকে করতে চেয়েছেন, কিন্তু যে প্রথার ওপরে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই প্রথাকে ধ্বংস করার কোনো চেষ্টা তাঁদের তরফ থেকে হয়নি। যে ক্ষমতাটা বৃটিশ ধনিকগণের হাতে আছে সেই ক্ষমতাটাই ভারতীয় ধনিক ও জমীদারগণের হাতেই আনবার চেষ্টা মাত্র তাঁরা করেছেন। কিন্তু মজা এই হয়েছে যে একা একা ক্ষমতা উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় ধনিক ও জমীদারগণের একেবারেই নেই। তারা চায় বৃটিশ ধনিকগণের সহিত ভাগাভাগি করে ক্ষমতা উপভোগ করতে এবং সে জন্য তাদের দাবী হচ্ছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। এই অবস্থায় আমাদের যুবকগণের স্থান যে কোথায় তা আমরা তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাই। "গণবাণী" এ সম্বন্ধীয় আলোচনার স্থান দিতে রাজি আছে।

০ * * *

ঢাকা জেলার যুবক সম্মিলনে মুসলমান যুবকগণ খুব কমই যোগদান করেছেন। তাঁদের এই আলাদা হয়ে থাকার প্রবৃত্তি যে কত বেশী আত্মঘাতী তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না, এটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। কলিকাতার মুসলমান যুবকগণ তো মিঃ গজনবী ও সার আবদুর রহীম ছাড়া আর কিছুই জানেন না, অন্ততঃ তাঁদের কাজ কারবার থেকে তার অতিরিক্ত কোনো কথা যে তাঁরা ভাবেন তার কোনো পরিচয় আজো আমরা পাইনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের প্রকাশিত বার্ষিক সাহিত্য "শিখা"র প্রবন্ধাবলী পড়ে আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে সেখানে মুসলমান যুবকদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার চাষ কিছু হয়ে থাকে, কিন্তু ঢাকা যুবক সম্মিলনে তাঁদেরও অনুপস্থিতি দেখতে পেয়ে আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। 'কানা গোরুর জন্যে পৃথক বাথান' তৈরী করে তাঁরা বিরাট পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে কি যে সাফল্য লাভ করবেন তা তো আমরা মোটেই বুঝে উঠতে পারছিনে।

—০—

প্রতিক্রিয়াশীল "ফরওয়ার্ড"

ভারতের জন্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে যারা ভারতের জনগণের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করতে চায় তাদের ইংরেজী দৈনিক "ফরওয়ার্ড" অত্যন্ত বেশী রকম প্রতিক্রিয়াশীল প্রপাগ্যাণ্ডা আরম্ভ করেছে। এরূপ প্রপাগ্যাণ্ডা চালাবার জন্যে "ফরওয়ার্ড" গত রবিবার থেকে কোনো এক গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এবারে "ফরওয়ার্ড" এর সত্যকার স্বরূপই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ভারতের জনগণের উত্থানকে প্রতিহত করার জন্য স্বার্থপর শোষক শ্রেণীর কাগজ "ফরওয়ার্ড" এবারে যথার্থ লোকের সহিতই বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পরম সুহৃদ "ফরওয়ার্ড" এর ধৃষ্টতা ও বাঁদরামি সম্বন্ধে আমরা বিশেষরূপে আলোচনা করতে থাকবো।

—০—

শ্রমিক জগৎ

—:*:—

সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম কমরেড্ সাকলাৎওয়ালার সহিত মহাত্মা গান্ধীর আর এক প্রস্থ পত্রযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে মহাত্মা বড় সুবিধা করিতে পারেন নাই।

কমরেড সাকলাৎওয়ালা মহাত্মাকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহমদাবাদ টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নটিকে অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ইহাতে ইউনিয়নটিরও উপকার হইবে আর কংগ্রেসেরও শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

—০—

মহাত্মা কলেডে সাকলাৎওয়ালার অভিযোগ [illegible] করিতে অসমর্থ হন এবং অসম্মতির যে [illegible] সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহা এই :—[illegible] স্বার্থপর লোক আসিয়া জুটিয়াছে, [illegible] বা বিদ্বেষের প্রভাব বর্জ্জন [illegible] আন্দোলনের নেতা বা উপদেষ্টাদের [illegible] সঙ্ঘকর্ত্তারা প্রাদেশিক নেতৃবর্গের নির্দ্দেশ [illegible] "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আহমদাবাদ [illegible] কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াতেই শ্রমিক আন্দোলনের [illegible] শুভ কাজ হইয়াছে"।

—০—

এই প্রকার যুক্তি অর্ব্বাচীন বা বাতুলের মুখে [illegible] ভারতের এক সময়কার ডিক্টেটর এবং একচ্ছত্র নেতা, [illegible] মহাত্মার মুখে এইরূপ যুক্তি [illegible] অশোভন হইয়াছে। [illegible] যে সব যুক্তি দেখাইয়া তাঁহার সাধের আহমদাবাদ [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে দূরে [illegible] সেই সব যুক্তিগুলি প্রমাণ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে তাঁহারা [illegible] আর জাতীয় কংগ্রেসে থাকা চলিত না। [illegible] গুলিতে কি কলহ বিসম্বাদ নাই? কংগ্রেস নেতা [illegible] কি সবাই "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির?" অনেক বড় বড় [illegible] কি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক ভাব পোষণ করেন না? [illegible] কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট কি দুই চারিজন নাই যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভাব পোষণ করেন? মহাত্মার ভীষণ বজ্র কেবল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর নিক্ষিপ্ত হয় কেন? জাতীয় কংগ্রেসের পাণ্ডাদেরই বা তিনি কিছু বলেন না কেন?

—•—

আমরা মানিয়া লইতেছি যে শ্রমিক আন্দোলনে [illegible] জন কয়েক স্বার্থান্ধ, বিবেক বুদ্ধি শূন্য, ধাপ্পাবাজ জুয়াচোর আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের তাড়াইবার জন্য মজবুত সঙ্ঘগুলির এবং শ্রদ্ধাস্পদ নেতাদের এই আন্দোলনে আসিয়া আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তোলা উচিত। মহাত্মা অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অথচ তাঁহার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্বন্ধে মতামত দেখিয়া মনে হয় যে তিনি ঐ অনুষ্ঠানটিকে "অস্পৃশ্য" করিয়া রাখিতে চাহেন। তাঁহার ন্যায় লোকের নিকট হইতে কেহ ঐরূপ উত্তর আশা করে না।

—০—

মাদ্রাজের শ্রমিক মহলে বেশ চাঞ্চল্য [illegible]। সেদিন বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর লোকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। আবার ম্যাসী কোম্পানী নামক একটা কল কব্জার কারখানায় ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। ডয়োশেশন ছাপাখানায় এখনও ধর্ম্মঘট চলিতেছে। প্রায় তিন মাস ধরিয়া প্রায় ৩০০ জন কম্পোজিটার প্রেস ও মেসিন ম্যান ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। স্বয়ং Lord Bishop of Madras এই Press Committee র সভাপতি অথচ গরীব বেচারাদের দুঃখ শুনিবার বা মোচন করিবার কেহ নাই।

—•—

[illegible] মুখে [illegible] হইয়া [illegible] পুরুষ [illegible] হইয়াছেন। [illegible] না হইলে [illegible] কেন?

[illegible]

পরলোকে জগলুলপাশা

—•—

[illegible] হইয়াছে [illegible] স্বাধীনতা [illegible] জগলুল পাশার পরিচয় নূতন [illegible] হবেনা। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের [illegible] উদ্ধার করার জন্য তিনি সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৭ বৎসর।

—০—

সাহায্য প্রার্থনা

আমরা আগেও আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে জানিয়েছি যে অতি সামান্য মাত্র সম্বল হাতে নিয়েই আমরা "গণবাণী"র প্রচারে ব্রতী হয়েছি। অর্থাভাব হেতু আজো আমরা কাগজখানাকে মনের মতন ক'রে তুলতে পারিনি। ইতোপূর্ব্বে আমরা যে সাধারণের নিকটে প্রার্থনা করেছিলেম তাতে কিছু আর্থিক সাহায্য আমরা পেয়েছিলেম। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কট জনক হয়ে পড়েছে। বাজারে দেনা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এমন এক জায়গায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যে আর দেনা কিছুতেই বাড়ানো চলছেনা। "গণবাণী"র প্রচার কেন করা হচ্ছে তা যাঁরা কাগজ রীতিমত পড়ছেন তাঁরা নিশ্চিতই বুঝতে পেরেছেন। সাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে এরূপ কাগজ চালানো একেবারেই সম্ভবপর নয়। আমাদের প্রচার কার্য্যের সহিত যাঁদের সহানুভূতি আছে তাঁরা দয়া করে আমাদের কিছু অর্থ সাহায্য করুন। সাহায্যের পরিমাণ সামান্য হলেও তা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হবে।

বিনীত নিবেদক
মুজফ্ফর আহ্মদ
"গণবাণী"র অন্যতর সম্পাদক।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩,
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১॥৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫, টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫, টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে; কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টদিগকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—

গণবাণী কার্য্যালয়—

৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramnath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৪	২৮ম সংখ্যা

বিশেষ বিজ্ঞাপন

[illegible] যাঁদের মূল্য ফুরিয়ে গেছে তাঁদের নিকট হতে অসম্মতি সূচক কোনো পত্র না পেলে আমরা তাঁদের নামে গণবাণী ভি, পি, তে পাঠাতে থাক্‌বো। নূতন গ্রাহক হবার জন্যে যাঁরা পত্র লিখেছেন তাঁদের নিকটে ভি, পি, এই জন্যে আমরা এখনো পাঠাইনি যে শীঘ্রই গণবাণীর কিছু মূল্য কমাবার কথা হচ্ছে। সেটা সুস্থির হয়ে যাবার পরেই আমরা ভি, পি, পাঠাবো।

বিনীত—
ম্যানেজার—গণবাণী

সম্পাদক { মুজফ্ফর আহ্মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৪ | ২৮ম সংখ্যা

"ফরওয়ার্ড" ও আমরা

—০:০:০—

(১)

কলিকাতার ইংরেজী সহযোগী "ফরওয়ার্ড" একেবারে আদা-জল খেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লেগে গেছে। ভারতের জাতীয় মুক্তির জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, যে আদর্শ আমরা দেশের লোকের সম্মুখে ধরে দিতে আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে আসছি সে আদর্শ "ফরওয়াড" ওয়ালাদের নয়। "ফরওয়াড" যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা হচ্ছেন সমাজের উচ্চ মধ্য শ্রেণীর লোক। বিষয়-বৈভবের স্বার্থ তাঁদের আছে। কোথাও বা তাঁরা নিজেরা জমীদার আর কোথাও বা তাঁরা জমীদারের স্বার্থ সংরক্ষণপ্রয়াসী। বড় বড় কলকারখানার মালিক যদি তাঁরা নাও হন, কল-কারখানার মালিকদের সাথে বন্ধুত্ব তাঁরা সর্ব্বদাই বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। তাঁরা তাঁদের শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যেই দেশের লোকের নামে জাতীয় আন্দোলন চালিয়ে থাকেন,—দেশের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ তাঁদের উদ্দেশ্য মোটেই নয়। শ্রমিক ও কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ তাঁরা এই জন্যে করতে চান যে তা না হলে তারা তাঁদের হাতের মুঠো থেকে বের হয়ে যাবে। জমীদারদের আর কলওয়ালাদের নুন খেয়েই "ফরওয়ার্ড" ওয়ালারা তাঁদের তথাকথিত জাতীয় আন্দোলন চালাবার পক্ষপাতী। কিন্তু, কারো নুন খেলে যে গুণও গাওয়ার আবশ্যক হয়, এ কথা কে না জানে? বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের অর্থাৎ শোষণকারী বৃটিশ ধনিকগণের সমান অংশীদার হবার জন্যে তাঁরা ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এক কথায় ভারতের জনগণের দাসত্বকে সুদৃঢ় করে উচ্চশ্রেণীর কতিপয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করারই তাঁরা পক্ষপাতী।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের (Peasants' and Workers' Party of Bengal এর) উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। আমরা যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে যেতে চাই, ঠিক তেমনি বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের অর্থাৎ বৃটিশ ধনিকগণের শোষণের হাতও এড়াতে চাই। "ফরওয়ার্ড"এর দলওয়ালারা তাদেরি সহিত ভাগাভাগি করে ভারতের জনগণকে শোষণ করতে চান। আমরা চাই সত্যকারের কৃষকগণের ভূমির ওপরে সম্পূর্ণ স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে আর "ফরওয়ার্ড" ওয়ালারা চান জমীদারী প্রথাকে রক্ষা করে কৃষকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করতে। কল-কারখানার মালিকগণের সহিত সংগ্রাম করে মজুরগণের সকল প্রকার অবস্থার উন্নতি সাধন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর যাঁরা "ফরওয়ার্ড" কাগজ চালিয়ে থাকেন তাঁরা কল-কারখানার মালিকগণের নুন খান বলে মজুররা যাতে মাথা না তুলতে পারে তারি চেষ্টা করেন। মালিকের নুন খেয়ে মজুরের গুণ কেউ কখনো গাইতে পারেনি, আজো পারবে না। ভারতের ভাবী শাসনের উপরে ভারতের জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে সত্যকারের ডেমোক্রাসি বা গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা আমরা যখন করছি তখন "ফরওয়াড"এর দলের লোকেরা চেষ্টা করছেন ভারতে কিয়জ্জন তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে।

আমাদের সহিত "ফরওয়ার্ড" ওয়ালাদের পার্থক্য কোথায় তা এখন সকলেই বুঝতে পেরেছেন। আমরা বারে বারেই বলেছি যে ভারতে এখন যে শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের শাসন। ওপরে আমরা যা দেখিয়েছি তা থেকে সকলে সহজেই বুঝে নিতে পারবেন যে "ফরওয়ার্ড"এর দল "বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্" এর কত আপনার লোক আর আমরা কত বেশী পর। "ফরওয়ার্ড"এর পৃষ্ঠাগুলি খুললেই সকলে বুঝতে পারবেন যে কাদের বিজ্ঞাপনে সে সব ভর্ত্তি হয়ে আছে। যে ধূর্ত্ত বৃটিশ ধনিকগণ ভারতবর্ষকে চিরদিনের জন্যে গোলাম করে রাখতে চায় তাদেরই বিজ্ঞাপনে "ফরওয়ার্ড"

এর পৃষ্ঠা সমূহ ভরপুর হয়ে আছে। দেশীয় এড্ভারটাইজিং এজেন্সী (Advertising Agency) সমূহের তরফ থেকে কোনো বিজ্ঞাপন পাবার তোয়াক্কাই "ফরওয়ার্ড" করে না, আর যদি বৃটিশ ধনিকগণ তাদের সব বিজ্ঞাপন তুলে নেয় তা হলে কাল যে "ফরওয়ার্ড" বন্ধ হয়ে যাবে, সে কথা জেনেও না। এদিক্ থেকে তুলনা করে দেখতে গেলে তখনকার দিনের "স্বরাজ" নামক বাংলা দৈনিকের সহিত আজকের দিনের ইংরেজী দৈনিক "ফরওয়ার্ড"এর একটুকু তফাৎও নেই।

এমন যে প্রতিক্রিয়াশীল (Re-actionary) "ফরওয়ার্ড"—সেই "ফরওয়ার্ড" কিনা গত ২১শে আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় আমাদের সম্বন্ধে লিখেছে :—

"The Peasants' and Workers' Party of Bengal which has its head quarters in Calcutta and a Bengali Paper of Calcutta are largely manned by some of those agents (of the C, I, D,)"

"অর্থাৎ 'বঙ্গীয় কৃষক' ও শ্রমিক দল, যার হেড্ আফিস কলিকাতায় রয়েছে, আর কলিকাতার একখানা বাংলা কাগজে বেশীর ভাগ সি-আই-ডি দের দালাল ভর্ত্তি হয়ে আছে।"

"নিম্ন জগতের ক্ষণিক দীপ্তি" (Glimpses of the underworld) শিরোনাম দিয়ে যে বৃহৎ প্রবন্ধটি ২১শে আগষ্ট তারিখের "ফরওয়ার্ড"এ বের হয়েছে তা থেকে এ অংশটুকু আমারা উদ্ধৃত করেছি। যিনি এ প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি নিজেকে "সি-আই-ডি" (C. I. D.) বলে পরিচয় দিয়েছেন। এখন কথা এই হচ্ছে যে যদি লেখক সত্যই "C. I. D." হন তা হলে "ফরওয়ার্ড" এর পরিচালকগণ নিঃসন্দেহে "সি-আই-ডি" ওয়ালাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর যদি তিনি "ইলিশিয়াম্ রো"র অর্থাৎ "সি-আই-ডি"র চাকুরে না হন তা হলে তিনি সেখানকার খবর কি ক'রে জেনেছেন? নিতান্ত অন্তরঙ্গ না হলে স্বচও যে "ইলিশিয়াম রো"র দু'খানা বাড়ীতে প্রবেশ করতে পায় না।' যাক্, দেশের লোক নিশ্চিতই হস্তী মূর্খ নন। তাঁরা নিজেরাই এ সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে নিবেন।

'আমাদের দল ছাড়া বাংলা দেশের আর কোনো শ্রমিক কিংবা কৃষক দলের মুখপত্র নেই, সুগঠিত কর্ম্ম তালিকাও আর কোনো দল সাধারণের নিকটে দাখিল করেনি। এ দলের সভ্যরা কিঞ্চিৎ ত্যাগও করেছে, দুঃখ-যন্ত্রণাও কিছু কিছু ভোগ করেছে, বিশেষতঃ খাবার না থাকলে দিনের পর দিন উপবাসও করতে পারে। মোট কথা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একটা নির্ব্বন্ধাতিশয্য (Tenacity of purpose) যে তাদের আছে এ কথা তাদের শত্রুও অস্বীকার করতে পারবে না। কাজেই, এহেন **বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল** যে "ফরওয়ার্ড" এর শোষকগণের বিষদৃষ্টিতে পড়বে তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই। কিন্তু, "ফরওয়ার্ড" এর স্বার্থপর ও নষ্ট বুদ্ধি লোকদের আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে আমাদের দল কিংবা কাগজ যদি সি-আই-ডি'র এজেন্টগণ দ্বারা manned হয় তা হলে "গণবাণী"র নিম্নলিখিত রূপ সমালোচনা "ফরওয়ার্ড" করেছিল কোন্ দায়িত্বের বশে?

"**Ganabani** (Edited by Messrs Muzaffar Ahmad and Pyari Mohon Das and published at 37, Harrison Road, Calcutta, is a Bengali Weekly organ and mouthpiece of the Peasants' and Workers' Party in Bengal) This paper has been upholding from the very beginning, the highest cause of Indian nationalism, and though the riots came and went it never stooped low to identify itself with one community or the other. No Bengali paper, to our knowledge has the quiet and forceful dignity of tone of Ganabani. As one peruses the articles of this paper one is struck by the superior voice of nationalism which it sounds against the immediate and petulent cry of communalism which has unfortunately filled the political air of our country. Mr. Muzaffar Ahmad has suffered three years' (**four years'**) imprisonment in the Cawnpore Bolshevic Case. From the opinions which he represents, it is obvious, that he repesents what is best and noblest in human life, and it is a great gain to our Country that immediatly he became free he came back to his native province to dessiminate the doctrines of Socialism and Neo-Leninism. Most of the Bengali papers show a woeful poverty of intellectuality, but Ganabani contains forceful and thoughtprovoking articles and not floriate nonsense. Such a paper is sure to make a mark in our literature and though belated, we offer our heartiest congratulations to its two editors."

("Forward" oct., 13, 1926)

অর্থাৎ "**গণবাণী**" (মুজফ্ফর আহ্মদ ও প্যারী মোহন দাস সম্পাদিত এবং ৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হতে প্রকাশিত। এখানা **বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের** সাপ্তাহিক বাংলা মুখপত্র।) এ কাগজ খানা গোড়া থেকেই ভারতীয় জাতীয়ত্বর উচ্চতম কারণ গুলোকে সমর্থন করে আসছে। যদিও দাঙ্গা এসেছিল এবং চলেও গিয়েছে তথাপি এ সম্প্রদায় কিংবা সে সম্প্রদায়কে সমর্থন করার মত নীচ **গণবাণী** কখনো হয়নি। আমরা যতটা জানি তাতে আর কোনো বাংলা কাগজেরই সুর **গণবাণী**র সুরের মত এত শান্ত ও জোরালো গাম্ভীর্য্য পূর্ণ নয়। **গণবাণী**র প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে তাতে জাতীয়ত্বের উচ্চ সুর দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আকাশ যে বিশ্রী সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা ছেয়ে গেছে তারি বিরুদ্ধে এই উচ্চ সুরেরই দ্বারা **গণবাণী** যুঝ্তেছে। মিঃ মুজফ্ফর আহ্মদ কানপুরের বলশেভিক মোকদ্দমায় তিন বছর (চার বছর) কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। মানুষের জীবনে যাহা ভালো, যাহা সুন্দর তাহাই তিনি প্রচার করছেন। আমাদের দেশের পক্ষে এটা অনেক লাভের কারণ হয়েছে যে ছাড়া পাওয়া মাত্রই তিনি তাঁর নিজের প্রদেশে চলে এসেছেন সোশ্যালিজমের মত সমূহ ও লেনিনের নব নব মত সমূহের প্রচার করতে। অধিকাংশ বাংলা কাগজই মানসিক শক্তির দিক থেকে শোচনীয় দারিদ্র্য প্রদর্শন করে থাকে। **গণবাণী**তে কিন্তু শক্তিপূর্ণ চিন্তাব্যঞ্জক প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থহীন কিছু

গণবাণী প্রকাশ করে না। আমাদের সাহিত্যে এমন কাগজ নিঃসন্দেহে নাম করবে। বিলম্বে হ'লেও গণবাণীর সম্পাদকদ্বয়কে আমরা আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।"

('ফরওয়ার্ড" ১৩ই অক্টোবর ১৯২৬)

এই প্রশংসা করার পরে কাদের ইঙ্গিতে "ফরওয়ার্ড" সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে পারে তার বিচার পাঠকগণ করুন।

আজ এ পর্য্যন্ত। এর পরে আমরা আবারো "ফরওয়াড" এর খবর গিরি করব।

———

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন

—০—

মাননীয়,

শ্রীযুক্ত "গণবাণী"—সম্পাদক মহাশয়

সমীপে—

মহাশয়,

আপনাদের গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখের 'গণবাণী'তে বাঙালার "মেরিনার"দের উপকারার্থে আমাকে লক্ষ্য ক'রে কয়েকটী কথা বলা হ'য়েছে; তজ্জন্য বিশেষ সুখী হ'লুম। এবং আমার "বাহ্যদৃষ্টি আরো প্রসারিত" ক'রে "সময়ের সহিত পা মিলিয়ে চলার" উপদেশটা দুর্ব্বোধ্য ও অপরিস্ফুট হ'লেও তজ্জন্য হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কচ্ছি। তবে ভবিষ্যতে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমার কাজের যে কয়টী ক্রটির উল্লেখ ক'রেছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে:—'আমার নজর যে সেরাং ও ড্রাইভারদের প্রতিই কিছু বেশী' খালাসী আর আগুনওয়ালাদের চেয়ে'—এই কথা কয়টীর মূলে কোন ভিত্তি নাই। আমার কোন্ কাজ হ'তে যে এই অনুমান করা হ'য়েছে বুঝতে পারা যায় না। কোন কোন সেরাং ও ড্রাইভার যে খালাসী ও আগুনওয়ালাদেরকে সকল সময়ে পূরো মাহিনা দেয় না, এবং তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে, একথা ঠিক এবং তাহার কারণ আপনাদেরই ভাষায় "ষ্টীমারের খালাসী ও আগুনওয়ালারা সেরাং ও ড্রাইভারদের দ্বারা নিযুক্ত হয় এবং তারা তাদের মাহিনাও পায় সেরাং ও ড্রাইভারদেরই কাছ থেকে।" 'এতে আর, এস, এন্ কোম্পানী এবং আই, জি, এন্ এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানীর পক্ষে যে খালাসী ও আগুনওলাদেরকে লুণ্ঠন করার যথেষ্ট সুবিধে হ'য়েছে এবং দুটো কোম্পানীই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছে'—এ অতি সত্য কথা! এখন কথা হ'চ্ছে, আমি এই প্রথাটীর বিরুদ্ধে কোন কথা ব'লে আসছি কিনা এবং সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ভেবে আসছিলুম কিনা। আজকাল সেরাং ড্রাইভার কিম্বা খালাসী আগুনওয়ালারা তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকারার্থে কোন কিছু করার পূর্ব্বে সাধারণতঃ ইউনিয়নের উপদেশ নিতে আসে এবং ইউনিয়নের নির্দ্দেশ মত কাজও ক'রে থাকে। শত করা ২৫৲ পচিশ টাকা মাহিনা বৃদ্ধির আন্দোলনের মূলেও এই কথা খাটে। এই জন্য প্রথমে বাংলাতে মৌলিক (original) যে দরখাস্ত করা হয়, তা'তে দেখবেন—শুধু ক্রুদেরই বেতন বৃদ্ধির কথা সেরাং ড্রাইভারদের মুখ দিয়ে বলা হ'য়েছে। অতঃপর তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয়বারে যে আপীল (Appeal) করা হয়, তার শেষভাগে লিখা রয়েছে:—"That your humble petitioners beg to add that as an experiment, the Joint Companies may take upon themselves the task of the recruitment of the crews which will prove the truth of the statement made by them regarding scarcity of labour available for Inland ships at the rate of pay now allowed by the Companies"—এই যদি হয়, কোম্পানী যদি তাদের নিজের দায়িত্বে লোক-সংগ্রহ করে, তা' হ'লেই "প্রথাটী পরিবর্ত্তিত" হ'য়ে যায় এবং "কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মীই, তা সে খালাসীই হোক কিংবা আগুনওয়ালাই হোক তার মাইনে বরাবর কোম্পানীর অফিস থেকেই পাবে"—যেমন পোর্ট কমিশনারের ঘরে হ'য়ে থাকে। অনেক আগেই আমার এ-খেয়ালটা এসেছিল ব'লেই আমি ওদের মাইনে বৃদ্ধির আপীলের খসড়া তৈয়ের ক'রে দিবার বেলায় ওকথা কয়টী ঢুকে দিয়েছিলুম। নারায়ণগঞ্জ এবং গোয়ালন্দে, ইউনিয়নের গত সাধারণ সভা (২৮শে ও ২৯শে মে, ১৯২৭) হ'তেও সে কথা কোম্পানীকে জানিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে—এই সব আবেদন নিবেদন সেরাং ড্রাইভারদের নামে না হ'য়ে প্রথমেই ইউনিয়নের নামে করা হয়নি কেন? বড়ই দুঃখ হয় যে, আপনারা সব জেনে শুনেও ভুল বুঝছেন! ভারতের তথা ভারতের শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থায় আর পশ্চিম কিংবা তদ্দেশের শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থার আস্মান-জমিন তফাৎ! কাজেই একশ বছর কেন, তার চাইতেও বেশী বছর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের শ্রমিকদের যে অবস্থা ছিল, তার তুলনায় ভারতের শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থা অনেক নিম্নে! এর জন্যে দায়ী শুধু শ্রমিক নেতারা নন; এর জন্যে দায়ী খাস ক'রে এ হতভাগ্য দেশের অপরাপর আন্দোলনের নেতারা এবং বিশেষ ক'রে তার দণ্ডমুণ্ডের মালিক ব্যবসায় বুদ্ধি প্রবুদ্ধ পশ্চিমের গবর্ণমেণ্ট!

কাজেই দেখা যায়, ভারতবর্ষকেও বর্ত্তমানের পশ্চিম মনে ক'রে ভারতের সকল আন্দোলনের মূলে পশ্চিমের আদর্শের আমদানী ক'রে অপপ্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক অদূরদর্শী নেতা ব্যর্থচেষ্ট হ'য়েছেন এবং তাঁদের প্রায় আন্দোলন মাঠে মারা গেছে। তা' বলে যে 'বাহ্য-দৃষ্টি প্রসারিত হওয়া উচিত নয় একথা বল্‌ছিনে। কিন্তু মন্দ ভাগ্য ভারতের যে অবস্থা তাতে এক ধাপে সকল কিছু করা যেতে পারে না, যেমন অন্য দেশে করা যায়! আগে ভারতবর্ষ অন্যান্য দিক দিয়ে জগতের অপরাপর দেশের মত হোক্, তবে ত তার শ্রমিক আন্দোলনের মূলেও তদনুরূপ নীতি বা আদর্শ অবলম্বন করা যেতে পারে। এখনি এক লাফে—আবশ্যক শক্তি সামর্থ্য অর্জ্জন করার পূর্ব্বে আন্দোলনের আদর্শকে পঞ্চমে চড়িয়ে দেওয়া আর সমগ্র আন্দোলনটাকে গলা টিপে মেরে ফেলা একই কথা হবে। যাক্ কথায় কথায় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথারই অবতারণা হয়ে গেল। এখন কথা হচ্ছে, শতকরা ২৫৲ টাকা মাইনে বাড়লে সেটা প্রকৃত পক্ষে খালাসী আগুনওয়ালারা পাবে, না সেরাং আর ড্রাইভারদের পকেটেই বেশীর ভাগ যাবে। অনেক মাস আগে থেকেই ইউনিয়নের কর্ম্মীরা ক্রুদেরকে ব'লে ক'য়ে আস্‌ছে যে, যখন কোন সেরাং কিংবা ড্রাইভার তোমাদেরকে চাকুরীতে নিতে আসে, তখন তার থেকে তোমরা একটা একরার নামায়

সই করে নিয়ো, যে, কোম্পানীর থেকে যত টাকারই বিল্ আসুক, মাসের শেষে খোরাকীর অত টাকা বাদ দিয়ে আমাকে অত টাকা মাইনে দিতে হ'বে। যদি রাজী হও, আমি চাকুরীতে যেতে রাজী আছি, যদি রাজী না হও, অন্য লোকের সন্ধান কর। এই নিয়ে যখনই কোন ক্রু সেরাং ড্রাইভারদের কম মাইনে দেওয়ার অভিযোগ ক'রেছে, ইউনিয়ন হ'তে সে গুলির আপোষ নিষ্পত্তি ক'রে ক্রুদের ন্যায্য পাওনা সেরাং ড্রাইভারদের থেকে আদায় ক'রে দেওয়া হয়েছে। তবে যদি কেউ ইউনিয়নকে না জানিয়ে আপোষে নীরবে সহ্য করে যায়, সে স্বতন্ত্র কথা; এবং যে কয়জন নগণ্য-সংখ্যক সেরাং কিংবা ড্রাইভার এই জঘণ্য লোভটার মোহ এড়াতে পারেনি, শুধু তারাই এখন পর্য্যন্ত ইউনিয়নে যোগদান করতে ইতস্ততঃ করছে। কারণ তারা বুঝতে পাচ্ছে যে, ইউনিয়ন ক্রমে ক্রমে ক্রুদের উপরে তাদের অত্যাচার অবিচার—কোম্পানীর অত্যাচার অবিচারের মত এক-একটী ক'রে তুলে দেবে এবং বাস্তবিক পক্ষে হতেছেও তাই। কাজেই আমার নজর সেরাং ও ড্রাইভারদের প্রতিই যে কিছু বেশী,—আমি যে, সেরাং ও ড্রাইভারদের জন্যই বেশী অনুভব করছি খালাসী ও আগুন ওয়ালাদের চেয়ে,—'শতকরা ২৫৲ টাকা মাইনে বাড়্‌লে তা সেরাং আর ড্রাইভারদের পকেটেই বেশীর ভাগ যাবে'—এই কথা কয়টী নিছক ভিত্তিহীন এবং ইউনিয়নের আইন-কানুন কিংবা অপর কোথাও এইরূপ তারতম্য করা হয়নি। কাজেই বুঝতে পাচ্ছিনে, কিসে ক্রুদের দাবী-দাওয়া উপেক্ষা ক'রে নিয়োগ কর্ত্তাদের সহিত 'একটা আপোষ-নিষ্পত্তির' চেষ্টা চল্‌ছে! এ সম্পর্কে আর দু' একটী কথা বলাও, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—১৯২০ সালে উজানীয়া জাহাজের এই সমস্ত কর্ম্মচারী "ইন্‌ল্যাণ্ড ষ্টীমার এণ্ড ফ্ল্যাট্ এমপ্লয়াজ এসোসিয়েশন" নামে এক সঙ্ঘের গঠন করেন। কিন্তু মৌলবী নুরল হক চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ প্রমুখ তদানীন্তন নেতাগণের বুদ্ধির দোষে হোক্, কিংবা অন্য যে-কোন কারণে হোক্, রাজনৈতিক কারণে ১৯২১ সালে তাঁহারা ধর্ম্মঘট ক'রে যে গলদ ক'রে গেছেন, তা' শোধরে নিতে এখন পর্য্যন্ত বেগ পেতে হ'তেছে; এবং শ্রমিক আদর্শের উপর ভিত্তি না ক'রে শুধু রাজনৈতিক কারণে ধর্ম্মঘট করা হয়েছিল বলেই উক্ত সঙ্ঘটা অকালে ছারখার হ'য়ে গেছিল। যা' হোক্, মিঃ আজিজুর রহমান প্রমুখ কর্ম্মিগণের আপ্রাণ চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের ফলে উহা ১৯২৫ সালের শেষভাগে আবার "বেঙ্গল মেরিনারস্ ইউনিয়ন" নামে পুনরুজ্জীবিত হ'য়েছে। সেই ধর্ম্মঘটের বিষময় ফলের কথা ভুলতে পারা যায়নি ব'লেই 'মেরিনারস ইউনিয়ন' অতি সাবধানতার সহিত ধীরে—সন্তর্পণে পদক্ষেপ ক'রে অগ্রসর হ'চ্ছে। এতে যদি কারো আদর্শের সহিত আমাদের আদর্শের খাপ না খায়, অথবা আমাদের নীতি তাঁহাদের পছন্দ সই না হয় তজ্জন্য আমরা নাচার। এত সব কথা এত সহসা সাধারণে প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল না। তবে যখন একবার কথা তুল্‌ছেন, তখন তার উত্তরে দু'এক কথা না বল্লে চলে না। আশা করি, মনে কিছু নেবেন না।

৭নং একবালপুর লেন। খিদিরপুর, কলিকাতা।

এম্, আবদুল হক্
জেনারেল সেক্রেটারী
বেঙ্গল মেরিনারস্ ইউনিয়ন।

মন্তব্য—আমরা যা বলেছিলেম তার কোনো বিচার লেখক করেন নি। আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করব। লেখক সব জেনেও আসল কথা এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। ১৯২০ সনের ধর্ম্মঘট রাষ্ট্রনৈতিক মোটেই ছিল না। আমাদের শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবার জন্যেই ধর্ম্মঘট হয়। পরে অর্থনৈতিক দাবীর কথাও উঠেছিল। ধর্ম্মঘট অকৃতকার্য্য হয়েছিল সমিতির নেতাদের, অধিকাংশ সারেংদের এবং ঘরওয়ালাদের বিশ্বাসঘাতকতায়। শতকরা ৯৯॥০ জন সারেং ও ড্রাইভার খালাসী ও আগুনওয়ালার পূরো মাইনে দেয় না। কোম্পানীর বাড়ী থেকে নিম্নতম বেতন পাওয়া যায় মাসে ২০৲ টাকা। (সারেং ও ড্রাইভাররা বলে মাসে ১৪৲ টাকা।) খোরাকীর জন্যে খরচ হয় মাসে ? হতে ৬ টাকা। খালাসীদের বেতন দেওয়া হয় ৮।১০ টাকা মাত্র। কেন তা জানতে পারি কি? সারেং আর ড্রাইভার দিয়ে দরখাস্ত দেওয়ানো তো সেখানে সেখানে কোলাকুলীর কথা! তার মানে এই হচ্ছে যে "আমাদের মাইনে আরো কিছু বাড়িয়ে দাও।" খালাসী আর আগুনওয়ালারা সে দরখাস্ত করেনি কেন? এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা আমরা এর পরে করবো। আমাদের নিকটে সঠিক তথ্য সংগৃহীত আছে। তা না হলে শুধু শুধু খোঁচাতে যাবো কেন?

(সম্পাদক, গণবাণী।)

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন

কেন্দ্রে কেন্দ্রে সভা।

উজানিয়া জাহাজের কর্ম্মচারিদের শতকরা ২৫৲ টাকা করিয়া মাহিনা বৃদ্ধি, ফিডার সার্ভিসে দুইজন সেরাং ও দুইজন ড্রাইভার নিয়োগ, সেরাংদের নিকট হইতে মোটা মোটা "ক্লেইম্" কর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে বর্ত্তমানে যে আন্দোলন উঠিয়াছে এবং মেম্বরগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করতঃ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করণোদ্দেশ্যে ইউনিয়নের গত ১৪ই আগষ্ট তারিখের কমিটি মিটিংয়ের প্রস্তাবানুসারে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট—মিঃ এম্ দাউদ এম্,এ, বি,এল; এবং জেনারেল সেক্রেটারী—মিঃ এম্, আবদুল হক বি,এ, সাহেবান কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মীসহ নিম্নলিখিত তারিখে নিম্নলিখিত কেন্দ্রে সভা করিবেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইউনিয়নের লোক থাকিবে।

জাহাজী মাত্রেরই সভায় যোগদান বাঞ্ছনীয়।

গোয়ালন্দ—	২৮শে আগষ্ট,	১৯২৭,	রবিবার,	সন্ধ্যা ৮টা।
খুলনা—	৪ঠা সেপ্টেম্বর,	,,	,,	,, ৭টা।
বরিশাল—	১০ই ,,	,,	শনিবার,	,, ৬টা।
নারায়ণগঞ্জ—	১৭ই ,,	,,	,,	বৈকাল ৩টা।
কলিকাতা—	২৫শে ,,	,,	রবিবার,	,, ২॥টা।

৭নং একবালপুর লেন,
খিদিরপুর, কলিকাতা,
২৪শে আগষ্ট, ১৯২৭।

এম্, আবদুল হক
জেনারেল সেক্রেটারী।
আজিজুর রহমান
জয়েণ্ট সেক্রেটারী।

কম্যুনিষ্ট অভিযান

—০:০:০—

(১)

কর্ম্মতালিকার গঠন সৌকার্য্য

———

(শ্রীধরণীকান্ত গোস্বামী)

—০—

সকল অভিযানই একটি বিশিষ্ট কর্ম্মতালিকা কিম্বা কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে। কম্যুনিষ্ট অভিযানেরও সেইরূপ একটি বিশিষ্ট কর্ম্ম-তালিকা আছে। এই কর্ম্ম-তালিকা মার্কস ও এঙ্গেল্‌স লিখিত কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রচার পত্রের (The Menifetso of the Communist Party) মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কম্যুনিষ্ট অভিযানে কম্যুনিষ্ট দল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ও অনুসৃত কর্ম্মতালিকা বা কর্ম্মপদ্ধতি রাশিয়ার ১৯১৭ সালের বিখ্যাত নবেম্বর বিপ্লবের পর সমিতির অষ্টম অধিবেশনে আরো বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কম্যুনিষ্টদিগের এই কর্ম্মতালিকা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমাদের উহার গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার ও শিখিবার আছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম্মতালিকার গঠন সৌকার্য্যেই উপলব্ধি হয় যে এই সমিতি কিরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কর্ম্মতালিকার গঠনতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের দেশের কর্ম্মিগণ বুঝিতে পারিবেন যে আন্দোলন মাত্রেরই সফলতা নির্ভর করিয়া থাকে একমাত্র সমিতির কর্ম্মপদ্ধতির উপর। কম্যুনিষ্টদলের কর্ম্মপদ্ধতি ও কর্ম্মতালিকা আগাগোড়াই এক অতি সুদৃঢ় যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। চুলচেঁড়া বিচার করিয়া তবে তাঁহারা কর্ম্মতালিকা খাড়া করিয়াছেন। কর্ম্ম-তালিকা গঠন করিতে যাইয়া উহারা সর্ব্বপ্রথম প্রতিপাদ্য অবলম্বন করিয়াছেন একটী অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন যাহার সম্বন্ধে হয়ত আমরা কেহই কোনকালে কিছু ভাবি নাই। এই প্রতিপাদ্য প্রশ্নটী অবলম্বন করিয়া সমিতি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং অবশেষে যে মীমাংসায় পৌছিয়াছেন তাহা এই—প্রতিপাদ্য বিষয় [illegible] কর্ম্মতালিকা বা কর্ম্মপদ্ধতি ব্যাপারটি কি?

সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক দল বা সমিতিই নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া থাকে। এখন এই দল জমিদারদিগেরই হউক আর ধনিকদিগেরই হউক কিম্বা কৃষক অথবা শ্রমিকদিগেরই হউক। বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেক দলের একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা একান্ত আবশ্যক নতুবা উহাকে কোন দল বা সমিতির আখ্যায় ফেলা যাইতে পারে না।

এখন যদি জমিদারদিগের কোন সমিতি থাকে তাহা হইলে উহা ঠিক জমিদারদিগেরই স্বার্থগুলিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবে। উহা জমির উপরে মালিকানী স্বত্ত্ব-স্বামিত্ব দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিবে। কৃষকদিগকে ও শ্রমিক দিগকে নানা রকমে বন্ধনে ফেলিতে চেষ্টা করিবে। জমির উপস্বত্ব হিসাবে উহার মূল্য বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করিবে। সুবিধায় মজুর জোগাড়ের চেষ্টা দেখিবে এবং আপন স্বার্থ বজায় রাখিতে জমিগুলি কাটাছেঁড়া করিবার চেষ্টা করিবে।

একটী ধনিক ও কলের মালিকের দলও ঠিক তেমনি অন্য এক পৃথক ধারায় তাহাদের লক্ষ্যের দিকে চলিয়া থাকে। এই সমিতি বা দল সস্তায় মজুর জোগাড়ের চেষ্টা দেখিবে, কুলি-দিগকে বশে রাখিবার চেষ্টা করিবে এবং অধিকতর মূল্যে কোথায় এবং কাহার কাছে মাল বিক্রয় করা যায় সেরূপ স্থানও ক্রেতা খুঁজিয়া বেড়াইবে এবং বরাবরই যাহাতে বেশ মোটা রকমের লাভ পাওয়া যাইতে পারে তাহার ফন্দি দেখিবে। এই সমিতির লোকেরা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনার্থ শ্রমিকদিগকে অতিরিক্ত মাত্রায় খাটাইয়া থাকে এবং এমন কৌশলেই তাহাদের কাজগুলি গুছাইয়া থাকে যে ফলে এই সমস্ত শ্রমিকেরা কস্মিনকালেও কোন নূতন চিন্তা মাথায় আনিতে পারে না। এই সমিতি তাহার কর্ম্মপদ্ধতির সাহায্যে শ্রমিকদের মনে এক সাঙ্ঘাতিক ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করে যাহার ফলে শ্রমিকেরা মনে করে যে পৃথীবতে চিরকালই একটা প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ থাকিবেই। উহা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। ধনিক শ্রেণী ও কলকারখানার মালিকদিগের হইল এই সমস্ত মতলব।

এখন কৃষক ও শ্রমিকদিগের ব্যাপার আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে উল্লিখিত ব্যাপারগুলির সঙ্গে তাহাদের বিপরীত সম্বন্ধ। বাস্তবিকপক্ষে উহা স্বতঃসিদ্ধ যে কৃষক ও শ্রমিকদিগের পক্ষে ঐ সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে এক বিপরীত উদ্দেশ্য হইবে। যে হেতু তাহাদের স্বার্থ ধনিক ও জমিদারের স্বার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বা বিপরীত। ইউরোপে একটা কথা প্রচলিত আছে যে "একটী রুশীয় লোকের পক্ষে যাহা উপাদেয় একজন জার্ম্মানের পক্ষে তাহা মৃত্যুর কারণ!" কথাটা আরো সুন্দর অর্থ প্রকাশ করিত যদি বলা যাইত যে "যাহা একটী শ্রমিকের পক্ষে উপকারী তাহা একটী ধনী অথবা জমিদারের পক্ষে মৃত্যুর কারণ।" অর্থাৎ কিনা শ্রমিক যাহা তাহার আবশ্যক বিবেচনায় করিতে যাইবে ধনী করিবে তাহার অন্যথা। আর জমিদারের ত কথাই নাই।

অবশ্য প্রত্যেক জমিদারই যে তাহার প্রজার কান-কড়িটি পর্য্যন্ত শোষণ করিয়া আনিবার ফন্দি জানে বা ফন্দি বাহির করিবার চেষ্টা করে তাহা নয়। অনেক জমিদারকেই দেখা যায় যে প্রায় সব সময়ই এক রকম টং হইয়া আছেন। আর এদিকে জমিদারীর কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে তাহার কোন সংবাদের বড় একটা পরোয়া রাখেন না। ঠিক এদিকে কৃষক ও শ্রমিকদিগের মধ্যেও এইরূপ অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কোন একটা নূতন ব্যাপার দেখিলে কিম্বা একটা পরিবর্ত্তনের কথা শুনিলে ইহাদের কেহ কেহ উত্তর করিয়া থাকে "আরে যাও গোলমাল দিয়া কাজ কি বাবা? কোন রকমে না কোন রকমে দিন কাটিবেই, বাপদাদা যেরূপে গিয়াছে আমরাও সেইরূপেই যাইব।" প্রত্যেক সমাজেই এইরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকে। সমাজের এই শ্রেণীর লোকগুলি দুনিয়ার হালচাল কিছুই ঠাহর পায় না, এমন কি উহারা নিজেদের স্বার্থ টুকু পর্য্যন্তও বোঝে না। কিন্তু পক্ষান্তরে যাহাদের এই জ্ঞান টুকু হয় যে কি উপায়ে তাহারা নিজেদের স্বার্থ টুকু রক্ষা করিতে পারিবে তাহারই কিন্তু একটা না একটা দলবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ এক একটী দলে গোটা সম্প্রদায়টা যে আসিয়া

যোগদান করিবে তাহা কখনও আশা করা যায় না এবং তাহা হয় ও না। এই সমস্ত দলে বা সমিতিতে কেবলমাত্র সম্প্রদায়ের বাছাই লোকগুলি এবং বেশ একটু কর্ম্মঠ লোকগুলিই আসিয়া যোগদান করে এবং এই সমিতিবদ্ধ লোকগুলিই পরে গোটা সম্প্রদায়কে পরিচালিত করে। কম্যুনিষ্ট দলেও শ্রমিক এবং দরিদ্র কৃষকদের মধ্য হইতে বাছা বাছা লোকগুলি আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঠিক তেমনি ধনিক-শ্রেণী ও জমিদার শ্রেণীকেও জমিদার এবং ধনিকশ্রেণীর মধ্য হইতে ও উহাদের পোষ্যগ্রহ আইন ব্যবসায়ী, অধ্যাপক ও সৈনিক বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে সুদক্ষ ও কর্ম্মঠ লোকগুলি আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ফলতঃ দেখা যায় প্রত্যেক সমিতিই স্ব স্ব শ্রেণীর বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকগুলি দ্বারাই গঠিত হয়। এই কারণেই একজন জমিদার অথবা একজন ধনী ব্যক্তি যিনিই হয়ত একটা সঙ্ঘ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তিনিই একটী দরিদ্র কৃষক অথবা শ্রমিকের সঙ্গে অধিকতর দক্ষতার সহিত লড়িতে সাহস করিয়া থাকেন, যতটা না তিনি পূর্ব্বে সঙ্ঘের বাহিরে থাকিতে করিতেন। আবার এ দিকেও ঠিক তেমনি সঙ্ঘবদ্ধ একটী শ্রমিক একটী বাহিরের সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে ভাল রকমে এবং বেশ কৌশলেরই সহিত একটী ধনী ব্যক্তি কিম্বা একটী জমিদারের সঙ্গে লড়িতে সাহস করিবে। যেহেতু সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক সঙ্ঘের নিকটে দৈনন্দিন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতেছে এবং এই বিষয়ে সে বেশ একটু চিন্তা করিবারও সুযোগ পাইতেছে। বিশেষতঃ কি উপায়ে অতি সহজে তাহার স্বার্থের সংস্থান করা যাইবে তাহারও সন্ধান সে এখানে জানিতে পারিবে। এখন দেখা যায় যে এইরূপে যে সমিতি বা দল কতকগুলি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়া একটা বিশিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মুখপাত্র-রূপে দাঁড়ায় এবং তাহার উদ্দেশ্য গুলি উক্ত শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রাণপণ নিয়োজিত হয় তাহাই একটি সমিতির বা একটী দলের কর্ম্ম-পদ্ধতি কিম্বা কর্ম্ম-তালিকার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ একটী কর্ম্মতালিকায় স্পষ্টই উল্লেখ থাকে যে একটী বিশিষ্ট শ্রেণী কি নিয়া এবং কি জন্য সংগ্রাম করিবে। কম্যুনিষ্ট দলের কর্ম্মতালিকায়ও উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রমিক এবং দরিদ্র কৃষক কি জন্য সংগ্রাম করিবে। প্রত্যেক দলের নিকট তাহার কর্ম্ম-তালিকার একটা মস্ত মূল্য আছে। কারণ কর্ম্ম-তালিকা হইতেই আমরা শিক্ষা করিয়া থাকি যে প্রত্যেক দল বা সমিতি উহার কি কি স্বার্থ নিয়া অভিযান করিয়াছে।

ক্রমশঃ

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন

ভারতবর্ষে যতই শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গজাইয়া উঠিতেছে ততই একদল প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসওয়ালারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য যত প্রকারে সম্ভব বাধা দিবার প্রচেষ্টা পাইতেছে। তাহারা তাহাদের ইংরাজী কাগজে এই আন্দোলনের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইতেছে। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন যখন বারদোলিতে সমাধিস্থ হইল। গান্ধী যখন গ্রেপ্তার হইয়া ছয় বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন তখন আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের গতি একেবারে থামিয়া গেল। দেশের ভিতর যে প্রকৃত উত্তেজনার ভাব ও বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছিল তাহা অকালে কালগর্ভে পতিত হইল। কংগ্রেসের ভিতরকার 'মধ্য চেয়ার' নেতারা নিজ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব প্রাধান্য লাভ করিতে কম কসুর করেন নাই। দেশবন্ধু দাশ কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া কংগ্রেসকে "ভাঙ্গনীকে" আবার মেরামত পূর্ব্বক ধনী বুর্জোয়াদের দ্বারা স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন। এবার দেশ মাতুক আর না মাতুক "দাদা কোম্পানীর" নেতৃত্বে যুবকের দল কতকটা মাতিল। ভোট ভোট করিয়া ভারতবর্ষের গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া দিন কতক দেশ ১২০ ডিগ্রিরও বেশী গরম হইয়া উঠিল। ইহাতে দেশের জনগণের কিছু হোক আর না হোক তথাকথিত ধনী মালদারীরা বেশ গুছাইয়া বসিলেন। দেশের শ্রমিকদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড স্বায়ত্ত শাসনে ভারতবর্ষের শতকরা ২॥ জন লোক ভোটাধিকার পাইয়াছে। অতএব যাঁহারা কাউন্সিল গৃহে স্বরাজ খুঁজিতে গেলেন তাঁহারা যে কোন শ্রেণীর লোক এবং কাহাদের জন্য কাউন্সিল প্রবেশ করিলেন দেশের শতকরা ৯৭॥ জন লোক তাহার কিছু জানিল না বা আজো জানে না। কংগ্রেস যে কোন শ্রেণীর হাতে পরিচালিত হইতেছে ও কংগ্রেসে কাহাদের প্রাধান্য বেশী তাহা ইহার নেতৃবর্গের প্রতি দৃকপাত করিলে বেশ উপলব্ধ হইবে। এই তথাকথিত ধনী অভিজাত গরিমায় গর্ব্বিত নেতৃবর্গ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের নামে শিহরিয়া উঠেন। আজ যাহারা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের জন্য অগ্রণী তাহারা যাহাতে মাথা উঁচু করিতে না পারে তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ তৎপর। গৌহাটী কংগ্রেসের অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলালজী কম্যুনিজম ও সোস্যালিজমের গন্ধ পাইয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। যখনই কংগ্রেসে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন-মূলক কোনো প্রশ্ন উঠে নেতার দল তাহাকে ধামা চাপা দিতে কম কসুর করেন না। আবার যাহারা স্বাধীনভাবে কংগ্রেসের বাহিরে শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ গঠ করিতে যত্নপর তাহাদিগকে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও তাহাদের মুখপত্রের নিকট কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। কংগ্রেসের ভিতর দলাদলি রেষারেষির পূঁতিগন্ধময় আবর্জ্জনা আজ ভারতের রাজনৈতিক গগনের বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। যাহারা আজ শ্রমিক আন্দোলনের জন্য মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে তাহাদের গ্রাস করিবার জন্য বিপক্ষ দল কম চেষ্টা করিতেছে না। বাংলার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের জন্য যাহারা যাবতীয় দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছে কংগ্রেসী-প্রভুদের কাছে তাহাদের লাঞ্ছনার অবধি নাই। বাংলার যুবকরা আজো সেই পুরাতন পন্থাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। কংগ্রেসের তথাকথিত নেতাদের এবং দাদা কোম্পানী-দের--বিরুদ্ধে তাহাদের এতটুকু কিছু বলিবার সাহস নাই। বাংলার যুবকের তারুণ্য, সাহস, সব লোপ পাইয়াছে। তাঁহারা পরমুখাপেক্ষী হইয়া গতানুগতিকার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। রুষ যখন অতীতের সমস্ত সংস্কার মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে পৃথিবীর বুকের উপর বিচরণ করিতেছে। চীন যখন বিপ্লবের অনল প্রবাহে ঝম্প প্রদান করিয়াছে।

যাবার লোকেরা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল বিমুক্ত হইবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। মরক্কোর কঠিন পাষাণ-ভেদ করিয়া যখন স্বাধীনতার উৎস ধারা প্রবাহিত হইতেছে। তুর্কীরা যখন বিজয়োল্লাসে জরাজীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে নূতনের সৃষ্টি করিতেছে, ভারতবর্ষ তখন বহু শতাব্দীর জীর্ণ পঙ্কিল আবিলতাকে আঁকড়াইয়া অতীতের পানে উন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পৃথিবীর মহাযুদ্ধের পর প্যাসিফিক দেশগুলিতে মানুষের জীবন সমস্যা যেরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে আজ ভারতবাসীদেরও প্যাসিফিক দেশ সমূহের সহিত একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বৃটিশ শোষণ বাদীদের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতে হইবে। আজ আর যুবকদের একা পথ চলিলে চলিবে না। দেশের শতকরা ৯৮ জন শ্রমিক ও কৃষক। তাহাদের আজ স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের সচেতন করিয়া বিপ্লবের পথে চালিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন ব্যতীত আজ আর ভারতবাসীরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। যাহারা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের বিরোধী তাহারা চায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা আপোস মিটমাট করিয়া এই দেশের জনগণের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিতে। আমাদের শত প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়াও কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন গঠন করিতে হইবে। তাহাদের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

আ-হা

বোম্বের চিঠি

বোম্বাই, ২৬।৮।২৭

গতবারে লেখার পর হইতে এখানে কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া টেক্সটাইল শ্রমিকদের ব্যাপারে। সর্ব্বপ্রথমে কারলা মিল ধর্ম্মঘটের কথাই বলি। এই মিলের শ্রমিকেরা তাহাদের বেতন পাওয়ার পরই কয়েকদিন মিলের কাজে অনুপস্থিত থাকার দরুণ তাহাদিগের জরিমানা করা হয়। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বপ্রথম শ্রমিকদের উপরে খুব বেশী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু ধর্ম্মঘট ফলপ্রসূ হওয়ায় তাহারা জরিমানা কমাইয়া দিতে সম্মত হয়েন। কাজে কাজেই কর্ত্তৃপক্ষের সম্মান ও বাঁচিয়া যায়। মিলের শ্রমিকেরা কয়েকদিন ধর্ম্মঘটের পর পুনরায় তাহাদের কাজে যোগদান করে। কয়েকজন লোকের অপরাধে এবং বাস্তবিক যদি কোন অপরাধ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সমস্ত শ্রমিকদের সেই দোষে দোষী করিয়া জরিমানা করাটা একটা ভীষণ শাস্তি এবং বাস্তবিকই ইহা জোরজবরদস্তীর কাজ। ন্যায়তঃ বিভাগীয় সমস্ত শ্রমিকদের এই কঠিন শাস্তি না দিয়া প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিলেই যথেষ্ট হইত। ইহা যেন সামরিক আইনের অনুরূপ ব্যবস্থা। শ্রমিকদের এই ব্যাপারে কিছু শিখিবার আছে। তাহাদের অকৃতকার্য্যতা হইতে বেশ অনুমিত হইতেছে যে এই আংশিক ধর্ম্মঘট কখনো সফলকাম হইতে পারে না যতক্ষণ না ধর্ম্মঘটীদের প্রতি তাহাদের সহ-শ্রমিকদের পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়তঃ এ্যাপোলো ও ম্যাঞ্চেষ্টার মিলের তাঁতীদের ধর্ম্মঘট হয়। এখানে যদিও ধর্ম্মঘট কেবলমাত্র তাঁতীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল তথাপি এই সমস্ত ধর্ম্মঘটীরা এক আদর্শ লইয়া সংগ্রাম করিতেছিল। এই ধর্ম্মঘট যদি অকৃতকার্য্য হয় তাহা হইলে তাহার ফল সমস্ত শ্রমিকদের ভোগ করিতে হইবে।

দুইটির স্থলে তিনটি তাঁত প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মঘট মিটিয়া গিয়াছে। টেক্সটাইল কমিশনার, যদি ভাল মেশিনারী থাকে এবং তাহা হইতে বেশী জিনিষ উৎপন্ন হইবার ভরসা পাওয়া যায় অধিকন্তু ইহাতে যদি তাঁতীদের বেতন হ্রাস না পায় তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে সম্মত আছেন।

বর্ত্তমানের খারাপ মেশিনারীর সঙ্গে মিলের মালিকেরা শ্রমিকদের বেতনের হার আনুপাতিক হিসাবে বর্দ্ধিত না করিয়াই জোর করিয়া উপরোক্ত প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অধিকন্তু পূর্ব্বেকার প্রথায় যেখানে একটি শ্রমিক দুইটি তাঁতে কার্য্য করিয়া ৫৮৲ টাকা মজুরী পাইত সেইস্থলে সেই শ্রমিক তিনটি তাঁতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য উৎপন্ন করিয়াও বর্ত্তমানে মাত্র ৬০৲ টাকা পায়। কিন্তু এই খারাপ মেশিনে এইরূপ অধিক মাল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া কয়েকজন লোকই যে সময়ে সময়ে অসুস্থ হইয়ে পড়ে তাহা নহে—এই সমস্ত ধারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে উৎপন্ন জিনিষের অনুপাতে বেতনও কমিয়া যায়। মালিকেরা "সিকনেস ইনসিউরেন্স" প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন না। ইহা করিলে মজুর ও শ্রমিকদের কিছু আশা থাকে। যাহা হোক আজো পর্য্যন্ত এই সাহসী লোকগুলি তাহাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। তবে বলা যায় না তাহারা সহকর্মীদের সাহায্য ব্যতীত এই সংগ্রামে কতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

এখানে মুশকিলের ব্যাপার এই যে, এখানে যে দুইটি ইউনিয়ন আছে তাহাদের সম্মিলিত শক্তির সাহায্য পাওয়ার আশা খুবই কম। এখন অবশ্য মিলনের লক্ষণ একটু দেখা দিয়াছে এবং আশা করা যায় বোম্বের শ্রমিক ও কৃষকদল অনতিবিলম্বে এই ইউনিয়ন দুইটিকে মিলিত করিতে সমর্থ হইবে।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের আলোচনা

এখানকার কতিপয় কংগ্রেসের গণ্যমান্য লোক যাঁহারা ডাক্তার আনসারীকে এখানে আশা করিয়াছিলেন তাঁহারা ডাক্তার আনসারীর ঘোষণার পরে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রমিক ও কৃষকদলের ধারণা এই যে দেশের এই বর্ত্তমান সঙ্কটে বসু মহাশয়ই বোধ হয় উপযুক্ত লোক। প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা তাহাদের সুর ধরিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রভুদের স্বীকারোক্তির পর তাহারা চুপ মারিয়া গিয়াছে। পণ্ডিত নেহেরুর তর্জ্জন গর্জ্জনও যে অপ্রত্যাশিত তাহা নহে। তরুণ সম্প্রদায় এই ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করে তাহা এক কথায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়—"নেতাদের বস্তাবন্দী করে রাখো।"

দি ক্রান্তি—

তরুণদলের মুখপত্র "ক্রান্তি"র অফিসে বোম্বে গবর্ণমেণ্টের শুভাগমনে "ক্রান্তি" বরং আরো দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। উহার আফিসে খানা তল্লাসীতে চতুর্দ্দিকে উহার যে পরিমাণ প্রচার লাভ হইয়াছে তাহা প্রভূত অর্থ ব্যয়েও বোধ হয় সম্ভব হইত না। এই ত মজা! এখন প্রত্যেকেই জানেন এবং জানিতে উৎসুক যে 'ক্রান্তি' কি এবং কোথায় পাওয়া যায়।

গুজরাটের বন্যা—

বোম্বাইএর সমস্ত দৃষ্টি এখন গুজরাটের উপর ন্যস্ত হইয়াছে—কেননা সম্প্রতি উক্ত প্রদেশ বন্যার ভীষণ প্রকোপে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে দুঃস্থদের সাহায্যার্থে প্রভূত অর্থ আমদানী হইতেছে। প্রপীড়িতদের দুঃখ মোচনের যে সমস্ত চেষ্টা এখানকার লোকেরা অবলম্বন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে 'ক্রান্তি' দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিয়াছেন যে গুজরাটের সাহায্য ব্যাপারে সেবাধর্ম্মের কার্য্যের ভিতরে ভিতরে ও ঐ স্থানের লোকদের শোষণের আর এক ফন্দি চলিতেছে। ব্যাপার ঐখানেই এবং ইহা হইতে পরিত্রাণের ও কোনো উপায় নাই। সকলেই যদি দারিদ্র্য প্রপীড়িত হয় তাহা হইলে ধনিকেরা কাহাদের শোষণ করিবে? এইখানে লক্ষ্য করিবার এই যে, যে টাকা দেওয়া হইতেছে তাহা দান হিসাবে নয় কর্জ্জ হিসাবে। অর্থাৎ দুঃখীদের ঘাড়ে বর্ত্তমানে যে বোঝা রহিয়াছে তাহার উপর আরো বোঝা চাপান হইতেছে।

স্যাকো এবং ভ্যানজিটী হত্যা—

ধনিক সভ্যতার আর এক ঐতিহাসিক অপরাধের বিরুদ্ধে বোম্বের লোকেরা প্রতিবাদ করিতে পশ্চাদপদ থাকে নাই। বোম্বের নাগরিকদের পক্ষ হইতে এই অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূলক এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হইয়াছে। আরো ও প্রকাশ যে বক্তাগণ এই উপলক্ষে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ড প্রাপ্তদের সাজা বাড়ানোর জন্য ও প্রতিবাদ করিবেন।

জি

———

দেশ বিদেশ

বাংলার গবর্ণর মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত ও সার আব্দুর রহিমকে স্বীয় দপ্তর খানায় নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে গবর্ণর সকাশে দর্শন দিয়াছিলেন। মিঃ সেনগুপ্ত গবর্ণর সাহেবের সাথে ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তা চালাইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে কিংবা মন্ত্রিত্ব গঠনে অন্য দলকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সার আবদুর রহিমের সহিত লাট সাহেবের কি বার্ত্তাচিৎ হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। স্বরাজদলের শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার ও লাট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

—০—

আবার বম—

গত শনিবার হাওড়া জেলায় মালিপাঁচঘোরা থানার অন্তর্গত ১৯১ নং বাবুডাঙ্গা রোডে আশুতোষ দাসের বাড়ী হইতে পুলিস ১১টা বোমার খোলা, একটা টোটা ভরা রিভলভার, এক শত টোটা, বোমা তৈরীর সাজ সরঞ্জাম, বোমা প্রস্তুত প্রণালী বিস্ফোটক পদার্থ, এবং বিপ্লব মূলক কেতাবপত্র পুলিস হস্তগত করিয়াছে। গৌরহরি দাস নামক জনৈক যুবককে বিপ্লববাদী সন্দেহে পুলিশ অনেকদিন হইতে নজর রাখিতেছিল। সে নাকি বিপ্লবীদলের সদস্য। হাওড়া, ও স্পেশাল ব্যাঞ্চের লোকেরা ভোর থেকে গিয়ে বাড়ী ঘেরাও করে। তারপর বাড়ীর লোকদের উঠিয়ে ঘর খানা তল্লাসী করে এবং উপরোক্ত জিনিস পত্র আবিষ্কার করে। গৌরচন্দ্র দাসকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে গৌর দাসের বৃদ্ধ পিতা আশুতোষ দাস, ব্রজদাস আদিত্য দাসকে ও পুলিস গ্রেপ্তার করে। গৌরদাস মেসার্স জেসোপ কোম্পানীর বাড়ীতে চাকুরী করিত সে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। গৌরদাস পায়ে ক্ষতরোগে ভুগিতেছিল এবং গত তিন মাস আফিসে যায় নাই। আদিত্য দাসও মেসার্স জেসোপ কোম্পানীর বাড়ীতে কাজ করিত। সেখানে কাজ করিতেছিল তখন পুলিস তথায় তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই সম্পর্কে কলিকাতাতে ও তল্লাশ হইয়াছিল কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ গৌরদাস হাওড়া জেলে পুলিশের বড় কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে গৌরদাসকে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ কাল ডাঙ্গাতে একটি বাড়ী খানা তল্লাসী করে ও সতীশচন্দ্র ডাঙ্গা নামক একজন ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বিস্ফোটক আইনের ৪ ও ৫ ধারা ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে ধৃত ব্যক্তিদের নামে মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে। হাওড়ার উকীল শ্রীযুত সূর্য্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এচ, সি, বোসের নিকট আশুতোষ, ব্রজনাথ, ও আদিত্যের পক্ষ হইতে জামীনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেককে এক শত টাকা জামিনে মুক্ত দিয়াছেন।

—০—

বাঙ্গালোরের ২৯শে তারিখের খবরে প্রকাশ যে মহীশূর স্পিনিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং মিলের প্রায় ৩০০০ হাজার শ্রমিক আবার ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

—০—

বোষ্টনের ২৯শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে স্যাকো ও ভেনজেটিকে যেখানে সমাধিস্থ করা হয় সেই স্থান পরিদর্শন করিতে যে সহস্র সহস্র শ্রমিকদের নীরব শোকযাত্রা বাহির হইয়াছিল প্রায় লক্ষাধিক লোক সেই দৃশ্য দেখিতে বাহির হইয়াছিল।

———

কানপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

কানপুরেও হিন্দু মুসলমানে একটা ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সহরের অবস্থা এখনো ভীতিসঙ্কুল। এখনো চারিদিক হইতে মাঝে মাঝে গুপ্ত আঘাতের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। একজন আহত হিন্দু অদ্য হাঁসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ২৮জন মুসলমান এবং ১২ জন হিন্দুর অবস্থা খুব সঙ্গীন। কয়েক-জন ধৃত ব্যক্তি জামীনে মুক্ত হইয়াছে। অদ্য সন্ধ্যায় আরো কয়েকজন লোক ধৃত হইয়াছে। ৩০।৮।২৭।

—০—

টকিয়োর সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে গবর্ণমেণ্ট সাণ্টাটাং হইতে জাপানী সৈন্যবাহিনী শীঘ্র উঠাইয়া আনিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

———

মিলন বৈঠক

নেতৃবর্গের হিন্দু মুসলমানগণের সমীপে নিবেদন—সিমলা ৩০শে তারিখের সংবাদে জানা যায় যে মিলন বৈঠক তিনঘণ্টা ব্যাপিয়া আলাপ আলোচনার পর বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলিম নেতৃগণ ও এসেম্বলীর সদস্যগণের স্বাক্ষরিত একটি নিবেদন পত্র বাহির করিয়াছেন। ইহাতে উভয় সম্প্রদায়কেই তাহাদিগকে মিলনের জন্য সমর্থন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। যাহাতে সম্প্রদায়দ্বয়ের ভিতর কোন গোলমালের সৃষ্টি হইতে পারে এমনতর কার্য্য করিতে তাঁহারা বিরত হইবেন। তাঁহাদের বিশ্বাস উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগে তাঁহারা এই দুই সম্প্রায়ের ভিতর একটা পাকাপাকি মিলন আনিতে সক্ষম হইবেন। উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যের বিষয়গুলি আগামী ৭ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে আলোচিত হইবে।

———

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১॥৶০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু, প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

BOOKS ON SOCIALISM.

1. The Coming of Socialism.
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. Scientific Socialism.
Its Aims and Ideals.
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. The Religion of Capital
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. Manifesto of the Communist Party
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS.
Price—As. 6/- only.

To be had of
The Book Company Ltd.
4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	॥০
অগ্নিসংস্কার	১॥০
শুভা	২৲
পাপের ছাপ	২।০
বিপর্য্যয়	২॥০
শাস্তি	২॥০
কাঁটার ফুল	১॥০
রক্তের ঋণ	॥০
আনন্দ-মন্দির	॥০
রাজগী	২।০
পিতাপুত্র	১॥০
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	১॥০
দূরের আলো	২৲

নাটক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ॥০
২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত প্রস্থচিত্র। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে
উপন্যাস ও গল্প

১। মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। একা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—

১। ভাত কাপড়ের কথা
বাঙ্গালার রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।
২। বাণী বীথি।
বাঙ্গালা সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন ব্যবহারের গ্রন্থ

1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.

Published by the Calcutta University.



Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭, ২২শে ভাদ্র, ১৩৩৪ | ২৯ম সংখ্যা

বিশেষ বিজ্ঞাপন

যাঁদের মূল্য ফুরিয়ে গেছে তাঁদের নিকট হতে অসম্মতি সূচক কোনো পত্র না পেলে আমরা তাঁদের নামে গণবাণী ভি, পি, তে পাঠাতে থাক্‌বো। নূতন গ্রাহক হবার জন্যে যাঁরা পত্র লিখেছেন তাঁদের নিকটে ভি, পি, এই জন্যে আমরা এখনো পাঠাইনি যে শীঘ্রই গণবাণীর কিছু মূল্য কমাবার কথা হচ্ছে। সেটা সুস্থির হয়ে যাবার পরেই আমরা ভি, পি, পাঠাবো।

বিনীত—

ম্যানেজার—গণবাণী

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, ২২শে ভাদ্র, ১৩৩৪ | ২৯ম সংখ্যা

"ফরওয়ার্ড" ও আমরা

—০:০:০—

(২)

আমরা গত সপ্তাহের "গণবাণী"তে আমাদের ইংরেজী সহযোগী "ফরওয়ার্ড"এর প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এবারে আমরা আমাদের অবশিষ্ট বক্তব্য টুকু আমাদের দেশের জনসাধারণের গোচরীভূত করব। ২১শে আগষ্ট তারিখের "ফরওয়ার্ড"এ প্রকাশিত প্রবন্ধের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে কংগ্রেসকে ভাঙার জন্যেই গবর্ণমেণ্ট ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চটিকে মৌজুদ রেখেছে। এর জন্যে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা-চরিত্রের আর অন্ত নেই। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত এজেণ্টগণ কোথাও বা কংগ্রেসের ভিতরে প্রবেশ করে কংগ্রেসকে ভাঙবার চেষ্টা করছে, আবার কোথাও বা বাইরে প্রতিষ্ঠান সমূহ খাড়া করছে সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। এই যে তথাকথিত বিপ্লববাদিগণকে জেলে কিংবা অন্যত্র আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তারও মূলে রয়েছে কংগ্রেসকে ভাঙার প্রচেষ্টা। এক কথায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের বঙ্গীয় শাখাটিকে বিধ্বস্ত করার জন্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে। এ কথাটা কতদূর সত্য তা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র সে সকল প্রতিষ্ঠানকেই ভাঙবার চেষ্টা করতে পারে যে সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুইটি শক্তির স্বার্থে স্বার্থে যখন সংঘাত বাধে তখন একটি শক্তির পক্ষে আর একটি শক্তিকে ধ্বংস করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু, কংগ্রেস যাঁদের হাতে রয়েছে তাঁদের সহিত যে শক্তির দ্বারা গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হয়ে থাকে সে শক্তির সত্যকারের স্বার্থের কোথাও সংঘাত বেধেছে কিনা তা এখন আমাদের দেখা উচিত। গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ ধনিকগণের হাতে আছে আর কংগ্রেস আছে ভারতীয় ধনিকগণের হাতে। বৃটিশ ধনিকগণের বর্ত্তমান পলিসি হচ্ছে ভারতীয় ধনিকগণের সহিত একটা রফা বন্দোবস্ত করে নিয়ে তবে ভারতবর্ষকে শোষণ করা, আর ভারতীয় ধনিক-গণের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশ ধনিকগণের সহিত সমানে সমান ভাগীদার হওয়া। কংগ্রেস যে জাতীয় আন্দোলনের বড়াই করে আসছে সে জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য কিছুতেই ভারতবর্ষের জন্যে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা নয়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমে তো গান্ধী হতে আরম্ভ করে চিত্তরঞ্জন দাশ পর্য্যন্ত সকলেই লোকের চোখে ধূলো নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছেন, পরে যখন বাধ্য হয়ে উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন তখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ওপরে এক পাও অগ্রসর হতে পারেন নি। এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন মঞ্জুর করতে যে বৃটিশ ধনিকবাদের এতটুকুও আপত্তি নেই তা তাদের বর্ত্তমান নীতি থেকে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। এ অবস্থায় বৃটিশ ধনিকবাদ ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কেবলমাত্র বঙ্গীয় শাখাটাকে ভাঙবার জন্যে যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়িত করবে একথা বললে কোন পাগলেও বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কেউ যদি বলে যে বৃটিশ ধনিকবাদ কংগ্রেসকে তার বর্ত্তমান নেতৃ-গণের হাতে রেখে দেবার জন্যে চেষ্টা করছে, তা হলে সে কথা যে কোনো বুদ্ধিমান লোক নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে। কেননা, কংগ্রেস দেশের জনগণের প্রতিষ্ঠান হলে তাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।

যে উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে "ফরওয়ার্ড"এর লোকেরা তাঁদের বন্ধু "সি-আই-ডি"র সাহায্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের সে উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হবে না। তাঁরা মনে করেছেন, এই ক'রে তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিপ্লবাত্মক ধারণা বিশিষ্ট লোক-দিগকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। জনগণের আন্দোলন মাথা না তুলে শ্রেণী-আন্দোলনই চলতে থাকুক, "ফরোয়ার্ড"এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক তাই।

দেশে যদি কোনো চরম আন্দোলন কখনো মাথা তুলে ওঠে তখন যে শক্তির বিরুদ্ধে সেই আন্দোলন মাথা তুলবে সেই শক্তি যে গোয়েন্দা ও দালাল প্রভৃতি সবই কিছু নিযুক্ত করবে তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের ভিতরে এমন কিছু বিপ্লবাত্মক শক্তি নেই যাতে গোয়েন্দা পুলিশ প্রভৃতি তা ধ্বংস করতে আসবে। এরূপভাবে বিজ্ঞাপন যতই প্রচার করা হোক্ না কেন, তাতে যে কংগ্রেসের মূল্য জনগণের নিকটে এতটুকু বাড়বে না। "ফরওয়ার্ড"এ এর আগেও একবার লেখা হয়েছিল যে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে (The Peasants' and Workers' Party of Bengalতে) পুলিশের এজেন্ট ঢুকেছে। আমরা তখনো "ফরওয়ার্ড"কে বলেছিলেম যে এতই যদি পুলিশের সাথে তার মাখামাখি থেকে থাকে যাতে পুলিশের ঘরের সব কথা সে জানতে পারে তা হলে আমাদের বলে দিলেই তো পারে কে কে সেই পুলিশ এজেন্ট। কিন্তু বুকের পাটায় সে শক্তি "ফরওয়ার্ড"এর নেই।

"ফরওয়ার্ড"এর দল মনে করেন যে সকল শক্তি তাদের শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চাইছে সে সব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু, তাঁরা জেনে রাখুন, তাঁদের সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যা তা বলাতে জনগণের উত্থান প্রতিহত কিছুতেই হবে না। বাংলা দেশে কম্যুনিষ্ট গ্রুপ্‌গুলি যে কোথায় আছে তা আমরা একটি জানতে পারি কি? কানপুরের কোন্ জায়গায় কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে কথাটিও আমরা জানতে চাই। বাংলা দেশে কম্যুনিষ্ট গ্রুপ্ বলতে কিছুই নেই। কানপুরে পুলিশ এজেন্টের হাতে কম্যুনিষ্ট কেন্দ্র থাকাতো দূরের কথা, কোনো প্রকারের কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠানই নেই। "ফরওয়ার্ড"এর পরম সুহৃদ "সি-আই-ডি"টি যে কতবড় মিথ্যাবাদী এ সব কথা থেকেই সকলে তা বুঝে নিবেন।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ধারা যে পথে চলিয়াছে সেই পথে যে ভারতের মুক্তি আসিবেনা সে কথা আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি। কংগ্রেসের বেদী তলে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমানে দেশের নেতারা যে স্বাধীনতার সুখ-স্বপ্ন কল্পনা করিতেছেন সে স্বাধীনতা যে ভারতবর্ষের বিপুল জনগণের পক্ষে কতটা উপভোগ্য হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অসহযোগ আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিরাট বিপ্লবাত্মক আন্দোলন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনো আন্দোলন এত বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই। হিমালয়ের প্রান্তদেশ হইতে ভারত মহাসমুদ্রের উপকূল ভাগের সমস্ত প্রদেশ, জেলা, মহাকুমা, পল্লীজন পদে এই আন্দোলন অগ্নির ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মালাবারের কৃষক বিদ্রোহ, চম্পারণের খাজনা বন্ধের আন্দোলন, জাহাজের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট, রেলওয়ে ধর্ম্মঘট, চা বাগানের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট এই সমস্তই ভারত ব্যাপী জনগণের মনে একটা অসন্তোষ ভাবের মসীময় ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। ইহার মূলে ছিল অর্থনৈতিক অসন্তোষ। বৃটিশ শোষণকারী শাসক, ধনিক, বণিক, মহাজনদের অবাধ শোষণে ভারতের জনগণের অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের ক্ষুধা, অস্বাস্থ্য, অত্যাচার, নির্যাতন, লাঞ্ছনার প্রবল উৎপীড়নে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল—তাই ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে একই বহ্নি আর্ত-ক্রন্দনে উদিত হইয়াছিল। তাই মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তাহারা সাড়া দিয়াছিল। কংগ্রেসের পতাকা তলে তাহারা সমবেত হইয়াছিল। দেশের এই আহ্বানে তরুণের দল যে সাড়া দেয় নাই তাহা নহে—শিক্ষিত লোকেরাও সমান ভাবে এই ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন। স্কুল, কলেজ বয়কট করিয়া বহু ছাত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। উকীলেরা আদালত বর্জ্জন করিয়াছিলেন—কিন্তু দেশের অশিক্ষিত জনগণ যেরূপভাবে এই আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল অন্য কেহ তেমনটি দেয় নাই। অনেকে আবার হুজুগে মাতিয়াও আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু এত বড় বিরাট একটা আন্দোলন অত্যল্পকাল মধ্যে কিরূপে ধূলিসাৎ হইয়া গেল? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব বরাবর যাঁহাদের হস্তে ছিল তাঁহারা বস্তুতঃ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। জনগণের স্বার্থের সহিত তাঁহারা নিজেদের স্বার্থকে কখনো সমান চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাই পৃথিবীর এতবড় একটা বিপ্লবকর আন্দোলন অতি অল্পকাল মধ্যে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। সর্ব্বহারা শ্রমিক, কৃষকরা যদি উপযুক্ত নেতৃত্বের ইঙ্গিতে চলিতে পারিত তাহা হইলে আজ ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত—কিন্তু চৌরিচৌরার শ্মশান ভূমে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। অসহযোগ আন্দোলনের গতি প্রতিহত হইল। কংগ্রেস যদি প্রথম হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম দেশের জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিত তাহা হইলে হয় তো আন্দোলন ভিন্নাকার ধারণ করিত। যাহাহোক কংগ্রেসের বাৎসরিক অনুষ্ঠান প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত হইতেছে কিন্তু স্বাধীনতার পথে দেশ অদ্য কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে? কংগ্রেসকে আভিজাত্য বিমুক্ত করিতে না পারিলে বর্ত্তমান কংগ্রেসের রূপ আর বদলাইবেনা—কিন্তু যাহারা শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের ব্রত গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে চায় বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের বিপক্ষ দলের নিকট কম নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে না। কংগ্রেস যে নীতির উপর স্থাপিত তদ্দ্বারা বুঝা যায় কংগ্রেস চায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। সেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন যে জনগণের কতটুকু উপকারে আসিবে তাহা যাহারা পৃথিবীর অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন। এই তথাকথিত ধনিক বণিকের দালালগণ দেখিতেছে যে দেশের অন্য প্রান্তে শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে, তখন তাহারা তাহাকে অকালে বিনষ্ট করিবার জন্য বিরুদ্ধ প্রচারের পথ অবলম্বন করিতেছে। তাহারা জানে যে যদি কালে বাস্তবিকই শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করে তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব টিকা দায় হইয়া উঠিবে। কাজে কাজেই ধনিক বণিকের দালালগণ পূর্ব্বাহ্নেই তাহাদের তূণীর হইতে চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ করিতে বিশেষ সচেষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলির উপর দিয়া একটা অর্থনীতিক অসন্তোষের ঢেউ

প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। ভারতবাসীদের অন্তরে ইহার ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। তবে উক্ত বিষ-বীজ মহীরুহ রূপে পরিণত হওয়া সময় সাপেক্ষ। কংগ্রেসের বুর্জ্জোয়া নেতৃগণ যত প্রকারেই না শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে দমাইয়া রাখিতে চেষ্টা করুক তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। হিমালয়ের তুষার ধবল প্রদেশের অপর প্রান্তে চীনের জাগরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে যে চ্যাং কৈসেকের ন্যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লববাদী নেতা, যাহার হস্তে সমুদয় সৈন্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল তাহারও পতন হইতে শুরু হইয়াছে। সাংহাই যখন বিপ্লবী সৈন্যরা দখল করিবার জন্য অগ্রসর হয় তখন সুগঠিত শ্রমিক সঙ্ঘই তাহাদের সেই অভিযানে সহায়তা করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রভূত চেষ্টাতেই সাংহাই জাতীয় দলের হস্তে আসে। আজ আমাদের কংগ্রেসের বেদীমূলে বসিয়া যাহারা প্রতিক্রিয়ার উপাসনা করিতেছে কালে তাহাদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। নানকিনে স্বীয় মনোমত স্বেচ্ছাচারতন্ত্র স্থাপন করিয়াও চ্যাংকৈসেক চীনের বিরাট কৃষক ও শ্রমিকদের তাহার বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারে নাই। জাতীয় দলের বিপ্লবী ও কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গের পরিচালনায় সমগ্র চীনে দ্রুত শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ এবং টেউ ইউনিয়ন আন্দোলন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষেও স্থানে স্থানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। অনেক শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, তবে প্রকৃত পক্ষে অনেক নেতাদের দোষে তাহা প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। ভারতের শিক্ষিত যুবকেরা যদি তাঁহাদের নিজহস্তে এই শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘ গঠনের ব্রত গ্রহণ করেন তাহা হইলে অনতি বিলম্বে তাঁহারা শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। আত্মঅহমিকা ও গরিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া পৃথিবীর অপর দেশগুলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। পৃথিবী ক্রমশঃ সম্মুখের দিকে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। সমস্ত জাতি যখন নবীন মন্ত্রে দিক্ষিত হইতেছে, তখন একাকী ভারতবর্ষ তাহার পূর্ব্বের সংস্কার লইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। যাঁহারা ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা কামনা করেন তাঁহাদিগকে হয় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে নতুবা রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে মহাপ্রস্থান করিতে হইবে। যাহারা শ্রমিক ও কৃষক সংঘের বিরোধী তাহারা আজ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে যতই মিথ্যা প্রচার করুক না, তাহারা দেশের জনগণের পরম শত্রু—এবং তাহারাই গবর্ণমেণ্ট এবং ধনিক বণিকদের দালাল।

আ-হা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাক্কো এবং ভানজেটী

নিকোলো সাক্কো এবং বার্টোলোমিয়ো ভানজেটী এই দুই শহীদের নাম সম্প্রতি পৃথিবীর সমস্ত দেশের পত্রিকাতে আলোচিত হইয়াছে। আমেরিকার শোষণবাদী গবর্ণমেণ্ট এই দুই জন কম্যুনিষ্টকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। কয়েকদিন মাত্র আগে তাহাদের শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োগ করিয়া তাহাদের বধ করা হইয়াছে। এই অন্যায় নৃশংস হত্যার জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দুভার্গ্যের বিষয় একমাত্র বোম্বের শ্রমিক ও কৃষকদল ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংবাদ পত্র স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এতটুকুও ক্ষীণ প্রতিবাদ করে নাই। তাহাদের হত্যার পূর্ব্বে আমেরিকার বোষ্টন, নিউইয়োর্ক প্রভৃতি নগরীতে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়াছিল। শহরে নানা গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বত্র একটা অরাজকতার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অনেকস্থলে ধর্ম্মঘট ঘোষিত হইয়াছিল। তাহাদিগকে জেল ভাঙ্গিয়া বাহির করিবার একটা প্রচেষ্টাও চলিয়াছিল। আমেরিকার শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট কিন্তু সহস্র প্রকারে শ্রমিকদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়া ছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের করুণ আর্ত্তনাদ, প্রতিবাদ কিন্তু আমেরিকায় স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিতে পারে নাই। বিচারে জজ উভয়ের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বাহাল রাখিয়াছিল। তাহাদের হত্যা করার পর বার্লিনে, প্যারিসে, ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়া ছিল। শ্রমজীবীরা কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পুলিসের সঙ্গে মারামারি লড়ালড়িও হইয়াছিল। বহু লোক হত ও আহত হইয়াছিল। এই যে দুই জন শহীদের নাম আজ সর্ব্ব দেশের নিপীড়িত শ্রমিকদের মুখে মুখে ফিরিতেছে তাহারা কাহাদের লোক ছিল? স্যাক্কো একটি জুতার কারখানায় জুতা গুছানোর কাজ করিত আর ভানজেটী মাছের ফেরি করিত। তাহারা যে অসাধারণ পুরুষ ছিল বলিয়া সমস্ত জগৎ আজ তাহাদের প্রতি এত শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে। তাহারা অতি সামান্য এবং দরিদ্র শ্রমজিবীই ছিল, তবুও তাহারা একটা মতবাদের উপরে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান ছিল। এবং তজ্জনই তাদের আজ এমন ভাবে ধরিত্রী পৃষ্ঠ হইতে সরাইয়া লওয়া হইল। এই দুই জন শ্রমিক প্রাণ হইতে বুঝিয়াছিল, আজ দুনিয়াতে যত বৈষম্য, যত অত্যাচার, শোষণ নির্য্যাতন তাহার মূলে এই ধনিক শোষণবাদীর দল, তাই তাহারা ধনিকতন্ত্রের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, পত্রিকা, আর্ম্মি, নেভি, এক কথায় যাবতীয় শাসনযন্ত্রের ও ধনিক সংগঠনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। এই ধনিকতন্ত্র পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের দুঃখ-কষ্ট, অনশন, অজ্ঞানতা, অসহায়তা ও মৃত্যুর কারণ। দরিদ্রদের শোষণ করিয়া তাহাদের অজ্ঞানতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াই তাহাদের শোষণ করতঃ যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্য, মনুষ্য জীবনের সমুদয় আবশ্যকীয় সামগ্রী নিজেদের হস্তে রাখিয়াছে। তাহারা শুধু ঘৃণা করিয়া আর কাঁদিয়া ক্ষান্ত ছিল না। তাহারা রীতিমত

—৭৫

শ্রমিক ও কৃষকদের ও আমেরিকার বিপ্লববাদী লোকদের কণ্ঠ বন্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের এই কাজ আমেরিকার ধনিকদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। তবুও তাহারা তাহাদের আদর্শের জন্য আজ মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে!

"কয়েকজন দস্যু একটি মটর গাড়ী আটকাইয়া ১৫০০০ হাজার ডলার ছিনাইয়া লইয়াছিল এবং দুইজন রক্ষীকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল।"

ধনিকতন্ত্রের প্ররোচনায় পুলিশ স্যাকো ও ভানজেটীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করিয়া এই প্রকারে দুইজন শ্রমিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে কৃতকার্য্য হইল। এই ফাঁসীর জন্য পৃথিবীর সমস্ত সর্ব্বহারারদল প্রতিবাদ করিয়াছে কিন্তু তাহা বিচারকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। ভানজেটী কোর্টকে ও বিচারককে সম্বোধন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিল তাহা অতীব মর্ম্মস্পর্শী, তেজপূর্ণ। সাত বৎসর কাল জেলে আবদ্ধ রাখার পর তাহাদের পুনর্বিচার করা হইল। ভানজেটি জজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, "যে তাহাদের উপর জেলে যে অত্যাচার করা হইয়াছিল তাহা কোনো মানুষ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না। "আজ আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি তবুও আমি নির্ব্বিকার স্থির, নিশ্চল, সোজা আপনার দিকে চাহিয়া আছি। আমার রংএর কোনোরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই আমি লজ্জিত নহি, ভীতও নহি"। দৃঢ় ও অটলভাবে, সাহসের সহিত ভানজেটী তাহার নিরপরাধতার কথা বর্ণনা করিয়াছে। ধনিকতন্ত্রের অন্যায় স্বেচ্ছাচার, জুরীদের হৃদয়হীনতা, জজের দোষ, যুদ্ধের অপকারিতা প্রভৃতি বিষয় তাহার জবান বন্দীতে বলিয়াছে। কিন্তু নিষ্ঠুর বিচারকের হৃদয় তাহাতে বিগলিত হয় নাই। তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য, স্বদেশপ্রীতি, কম্যুনিজমের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্যই আমেরিকার শোষণবাদী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে নিহত হইল। তাহারা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাদের নীতিতে আস্থাবান ছিল। তাই এই তরুণ কর্ম্মীদের পৃথিবীর বুক হইতে অন্যায়ভাবে সরাইয়া লওয়া হইল। তাহাদের মৃত্যুতে সকলেই শোক প্রকাশ করিয়াছে। আমাদের প্রার্থনা তাহাদের মৃত্যু জগতের সমস্ত দেশের শ্রমিকদের এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ধনিকতন্ত্রের অবসান করিতে বদ্ধপরিকর করিবে। আমরা আজ শোক বিহ্বল চিত্তে ঐ তরুণ শহীদদ্বয়ের আত্মার মঙ্গল কামনা করিতেছি। তাহাদের মৃত্যু আজ জগতের শ্রমিকদের চিত্তকে আরো দৃঢ়তর করিয়া তুলুক! ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—০—

কানপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

কানপুরে ও একচোট হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গেল। হতাহতও অনেক হইয়াছে। বিগত দুই বৎসর হইতে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের অন্তর এমন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে যে অতি সামান্য কারণে যত্র তত্র দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত হইতেছে। লোকজন নিহত হইতেছে। এতদ্বারা দেশের নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদের বিস্তর ক্ষতি সাধিত হইতেছে। এই বিশ্রী, ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা বাংলার পল্লীজনপদে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি কতক গুলি স্বার্থপর লোক ধনিক্ বুর্জ্জোয়াদের প্ররোচনায় চতুর্দ্দিকে এই সাম্প্রদায়িক বহ্নি ছড়াইতেছে। তাহারা অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছে। বাংলাদেশে, কলিকাতা, পাবনা, ঢাকা, পলাশীপাড়া, এই সেইদিন মাত্র কুমিল্লাতেও ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিহারে বেথিয়া, যুক্তপ্রদেশে এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা অতি সামান্য কারণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দাঙ্গা হাঙ্গামাতে হতাহত যাহাই হউক, এই দাঙ্গার ফলে যাহারা ধৃত হইয়া জেলের লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে—যাহারা ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বলি দিয়াছে তাহাদেরও সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুণ সর্ব্বাপেক্ষা দেশের নিঃস্ব শ্রমিক কৃষকদেরই প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। পাবনার কৃষক যাহারা লুটতরাজ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অপরাধে ধৃত হইয়া দীর্ঘ দিনের জন্য কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, পাবনার আদালত গৃহে তাহাদের করুণ ক্রন্দন কাহারো হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই! জেলে যাওয়ার দরুণ তাহাদের চাষবাস সব পড়িয়া আছে। তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারে, যে কিরূপ জীবন যাপন করিতেছে তাহা লেখনী সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। যে সমস্ত মোল্লা, মৌলবী ও ধর্ম্ম-প্রচারকেরা আজ নিরক্ষর, দরিদ্র, প্রপীড়িত হিন্দু-মুসলমান কৃষককে ধর্ম্মের নামে রক্ত-লোলুপ করিয়া তুলিতেছে যাহারা, কৃষককুলের অজ্ঞানতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বার্থের জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে উত্তেজিত করিতেছে—সেই সমুদয় স্বার্থপর, ধর্ম্মধ্বজী দেশ-শত্রুদের স্বরূপ বিশদভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের বুঝাইতে হইবে। সামান্য গান বাজনার জন্য আজ সহরের রাজপথে অগণিত লোকের শোণিত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। ঘৃণ্য কলহ হিন্দু-মুসলমানের চিত্ত জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ভারতবর্ষের এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায় যদি পরস্পর কাটাকাটি ও মারামরিতে রত থাকে তাহা হইলে ভারতবাসীর মুক্তি সুদূর পরাহত। আমাদের মতে দেশের নিরক্ষর শ্রমিক কৃষকদের তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, এবং তাহারা যদি তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয় তাহা হইলে আর ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মী প্ররোচকদের কর্ম্ম সফল হইবে না। উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ একই। তাহারা যদি মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহা হইলেই এই জঘণ্য সাম্প্রদায়িকতার তিরোধান হইবে।

———

বিগত সপ্তাহে হাওড়াতে পুলিশ, বোমা, রিভলভার, বিস্ফোটক দ্রব্য, বোমা প্রস্তুত প্রণালীর সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছে। ঐ সম্পর্কে কয়েকজন লোকও গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে নীত হইয়াছে। বিচারাধীন মামলা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। তবে আমরা কি "ফরওয়াড"এর সি, আই, ডি, প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি ইহা কোন্ প্ররোচকের কাজ? সবজান্তা 'ফরওয়াড'এর গুপ্তচর প্রভৃতি যদি কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট পার্টি, বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের ভিতর পুলিসের প্ররোচকের সব সন্ধান দিতে পারে তাহা হইলে, পূর্ব্বাহ্ণে ধৃত যুবকের দলকে এই সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলে অনর্থক তাহারা পুলিসের বেড়াজালে চুনোপুঁটির মত ধরা পড়িত না। অধিকন্তু সি, আই, ডি, প্রবরের প্রকৃত 'ফরওয়াড' হিতৈষণার কাজ করা হইত।

অনেক ক্ষেত্রে পুলিস সন্দেহের বশে অনেক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে রাখিয়াছে। তাঁহাদের কারগারের কঠোর নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, অমানুষিক অত্যাচার নির্ব্বিচারে সহ্য করিতে হইতেছে। তাঁহাদের স্বদেশ সেবা সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ করিতে পারে না বা পারিবে না। তবে 'ফরওয়ার্ড' যে বাংলা তথা ভারতের সর্ব্ব অনুষ্ঠানের সঙ্গে সি, আই, ডির যোগ রহিয়াছে এবং তাহাদের প্ররোচকরা প্রায়ই ক্ষেত্রে সেই দলে কাজ করিতেছে এই সম্বন্ধে লম্বা চৌড়া প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের জনগণের ভিতর একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছে, তাহার মূলে যে দুরভিসন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা ধারাবাহিক ভাবে ক্রমশঃ আলোচনা করিব। উপস্থিত জিজ্ঞাস্য এই যে হাওড়ার বোমার ঘটনা সম্বন্ধে 'ফরওয়ার্ড' এর সি, আই, ডি প্রবরের কিছু জানা থাকিলে শীঘ্র সাধারণে প্রকাশ করিলে দেশের প্রভূত উপকার করা হইবে। দেখা যাক সি, আই, ডি, প্রবর কি বলেন!

—•—

ভাস্কর এন, এল, এ্যারোনসনের সোভিয়েট রিপাবলিক সম্বন্ধে অভিমত

সর্ব্বজন বিদিত ভাস্কর এন, এল, এ্যারোনসন সম্প্রতি ফ্রান্স হইতে সোভিয়েট রুষিয়া পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। মস্কোতে ৫ সপ্তাহ অবস্থান করার পর, মে মাসের শেষভাগে তিনি লেনিনগ্রাড পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং লেনিনগ্রাড প্রাব্‌দার জনৈক প্রতিনিধির নিকট রুষদেশের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ অভিমত বর্ণন করিয়াছেন।

"প্রায় বারো বৎসর অতীত হইতে চলিল, যখন আমি শেষবার রুষিয়াতে ছিলাম। ইহা ১৯১৬ সালের প্রান্তের কথা। আমি কোনো বিষয়ের অতিরিক্ত বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিনা, তবে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিতেছি যে আমি রুষিয়াকে ও তাহার অধিবাসীদের মোটেই চিনিতে পারি নাই। যেই মুহূর্ত্ত হইতে রুষিয়ার সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করিয়াছি সেই মুহূর্ত্ত হইতে সমস্ত জিনিস আমার নিকট নূতন, অভিনব, ও অত্যাশ্চর্য্য ঠেকিয়াছে। যখন ইতিপূর্ব্বে জারের শাসনাধীনে, প্রান্ত সীমানা অতিক্রম করিয়াছি তখন সশস্ত্র পুলিস প্রহরী কর্ত্তৃক, মটরগাড়ী সমূহ পরিদর্শিত হইত। উজ্জ্বল দিনকে রাত্রি বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এইবার যখন আমি রাত্রিকালে সীমানা ভূভাগ অতিক্রম করিলাম, এবং সোভিয়েট সীমানা-রক্ষীকে দেখিলাম যে একজন খুব সুশ্রী যুবক অতিশয় বিনয় সহকারে যাত্রীদের দলীলপত্র অনুসন্ধান করিল। এবারে রাত্রিকে পরিস্কার দিন বলিয়া ভ্রম হইল।

"মস্কোতে যে ৫ সপ্তাহ এবং লেনিনগ্রাডে ৭ দিন অতিবাহিত করিয়াছি তাহা বহুদিবস ধরিয়া আমার স্মরণ থাকিবে। যদি আরো ভালরূপে বর্ণনা করি তাহা হইলে বলিতে হয় যে অন্যান্য বৈদেশিকদের চেয়ে আমি রুষিয়ার যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে বিচার করিতে পারি, কেননা, আমি রুষিয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং রুষের সৈন্যবাহিনীতে কার্য্য করিয়াছি। এবং এইভাবে যথেচ্ছাচার শাসনের সমুদয় সুখ সুবিধা অনুভব করিয়াছি।

"আমি শুধু রাস্তার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কোনো বিষয়ের বিচার করিতেছিনা, অধিকন্তু সোভিয়েট জীবনের যাবতীয় মনো-যোগী বিষয়গুলির পাঠ হইতে এই আলোচনা করিতেছি। আমি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শহরের রাস্তা ধরিয়া কারখানায় যাইতাম, কারখানার ক্লাবগুলি পরিদর্শন করিতাম, রেড আর্ম্মির সৈনিকদের সহিত, তরুণ কম্যুনিষ্ট, ও শ্রমিকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতাম। সর্ব্বপ্রথমে যে জিনিস আমার দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল তাহা হইতেছে রাস্তা ঘাটের দৃশ্য ও জনতা। তথায় একটি বিশিষ্ট বৈশাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল মাত্র যে পূর্ব্বেকার রুষিয়ার সহিত তাহা নহে পরন্তু, প্যারিস ও পশ্চিম ইউরোপের যে কোন বৃহৎ শহরের সহিত ও এই বৈশাদৃশ্য রহিয়াছে। তথায় আমরা পাশাপাশি দেখিতে পাই সুস্পষ্ট বিলাসিতা, আবার ভয়াবহ দারিদ্র্য, তাহা অতীব বিষাদজনক। তাহার কারণ প্রবল বৈসাদৃশ্য! সোভিয়েট নাগরিকদের বুর্জোয়া পোষাক পরিচ্ছদের ধরণ ধারণে দেখা যায় নাই। কিন্তু আমি যাহাদের দেখিলাম তাহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকে ভূষিত। আমি দেখিতাম খুব ভোরে শ্রমিকরা কেহ পদব্রজে, কেহ বা গাড়ী চড়িয়া কারখানায় চলিয়াছে এবং সত্য বলিতে কি আমি তাহাদের হাব ভাবে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এমন এক সময় গিয়াছে তাহারা মাতাল অবস্থায় থাকিত ও অত্যাচারিত লোক ছিল। এক্ষণে তাহারা দৃঢ়তা সহকারে ও আনন্দের সহিত পথে চলে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহারা প্রত্যেকে হয় একখানা পুস্তক না হয় একখানা পত্রিকা হাতে চলিয়াছে। ইহাদের প্রতি তাকাইলে তক্ষনি চক্ষে পড়িবে যে এই সমস্ত লোকগুলি চিন্তা করিতে শিখিয়াছে এবং সকলেই শিক্ষিত হইয়াছে।

আমার ন্যায় একজন শিল্পীর পক্ষে মে মাসের প্রথম দিবস মস্কো সহরে অবস্থান করাটা বড় আনন্দদায়ক হইয়াছে। লণ্ডনে সোভিয়েট ট্রেড ডেলিগেশনের খানাতল্লাসীর পর মস্কোর রাস্তায় যে কুচকাওয়াজ ও জনশোভা বাহির হইয়াছিল তাহা আমি দেখিয়াছি। অনেকবার আমি প্যারিসে ১৪ই জুন তারিখে যে ব্যাসিটিল সমারোহ হয় তাহা দর্শন করিয়াছি! কিন্তু মে মাসের ১লা তারিখে সোভিয়েট রুষিয়াতে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার সহিত ইহার কোনো তুলনাই হইতে পারে না। আমার মনে হয় কেবলমাত্র ফরাসী বিপ্লবকালে বৈপ্লবিক ছুটীর দিনে এমনি একটা অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু মস্কোর লক্ষ লক্ষ অধিবাসী যাহারা মে মাসের প্রথম তারিখে শ্রমিক-দিবস অনুষ্ঠান করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের হৃদয় উৎসাহ, সাহস, শক্তি, আনন্দে ভরপুর ছিল। খানাতল্লাসীর বিরুদ্ধে যে জনসমাবেশ হইয়াছিল তাহা আরো ভারী জমকাল হইয়াছিল। আমি একই রাস্তাতে একই লোকদের দেখিয়াছি কিন্তু, স্বতন্ত্র মনোভাব ও বিক্ষোভে তাহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ এবং সকলেই তাহার শেষ শোণিত-বিন্দু দিয়াও রুসিয়ার অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

প্রথম ও শেষের ব্যাপারে এমন সব লোক রহিয়াছে এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করিয়া লইতে পারা যায় যে, ইহা কোনো প্রকারে সম্ভব হইবে না যে তাহারা

কাহারো নিকট কিংবা কোনো জিনিসের জন্য আত্ম সমর্পণ করিবে। কম্যুনিষ্ট যুবকদের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবর্ত্তা কহিয়া আমার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহারা সোভিয়েট রুষিয়াকে একটা নূতন জাতিতে পরিণত করিবে, এবং তদ্দারা প্রাচীন যোদ্ধাদের দূরীভূত করিতে সক্ষম হইবে। এই নব জাতি খুব উৎসাহ পূর্ণ হইবে। এবং সেখানে পূর্ব্বের ন্যায় কোনো দুঃখ কষ্ট, দাসত্ব-নিগড় থাকিবে না। পরন্তু, জ্ঞানলাভ ও স্বাধীন-জগতে বাস করিবার একান্ত লিপ্সা থাকিবে।

আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন সোভিয়েটের নবীন শিল্পীদের সম্বন্ধে আমার ধারণা কিরূপ। আমি একটা কথা বলিতে পারি যে সোভিয়েট রুষিয়াতে শিল্পকৌশল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ দেশের পুনর্গঠনের উপরই ইহার ব্যাখ্যা নির্ভর করিতেছে। অত্যল্পকাল মধ্যে এই স্রোত চলিয়া যাইবে—এবং আপনাদের নূতন শিল্প সুদৃঢ়তর হইবে ও নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে এবং তাহা রুষিয়ার নিকট যোগ্যতাসম্পন্নই হইবে। নব্য শিল্পীদের আরো অধিক শিক্ষার আবশ্যক রহিয়াছে।

উইকলি নিউজ বুলেটিন
৩।৬।১৯২৭।

—০—

বাংলার কৃষক

—০:*:০—

রয়াল কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়া ভারতের কৃষি-বিভাগের মিঃ কিটিংস্ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের কৃষকদের মধ্যে যে ভাবে জমী বিলি হইয়াছে, কৃষির পক্ষে মোটেই তাহা অনুকূল নহে। কৃষকদের প্রত্যেকের ভাগে যে জমী পড়িয়াছে, তাহা একদিকে যেমন পরিমাণে অল্প, তেমনি আবার তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভিন্ন অংশে অবস্থিত।

বাংলার কৃষকদের প্রত্যেকের ভাগে কতখানি জমি পড়িয়াছে এবং তাহার তুলনায় তাহাদের আয়-ব্যয়ের পরিমান কত, নিম্ন-লিখিত হিসাব হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

জিলা	জনপ্রতি একর	জনপ্রতি বার্ষিক আয়	জনপ্রতি বার্ষিক ব্যয়
ময়মনসিংহ	২.৬৭	৭২৲	৫৯৲
ঢাকা	১.৫৮	৫৭	৫৪
ফরিদপুর	১.৬৮	৬০	৫০
বাখরগঞ্জ	২.৫১	২৯	৫০
রাজসাহী	৩,৫০	৫০	৫০
নোয়াখালি	২.৩০	৩০	৫০
যশোহর	১.৪০	৫৪	৫৩৶০
মেদিনীপুর	১.২৯	৪৮	৪৮

উল্লিখিত আটটী জিলার জনপ্রতি আয় ২৯৲ হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত। ভারতের অন্যান্য জিলার তুলনায়ও ইহা নৈরাশ্য-জনক। কারণ বোম্বাইয়ে কৃষকদের জনপ্রতি আয় ৭৫৲ এবং মাদ্রাজে ১০০৲ বলিয়া জানা গিয়াছে।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ উইলিয়াম্‌স্ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "যে সমস্ত গ্রামে রীতিমত বৃষ্টি হয় না, সে সমস্ত গ্রামে কৃষকদের বার্ষিক আয় জনপ্রতি ৩৫৸০ এবং জীবন ধারণের নিতান্ত আবশ্যক ব্যয়ই ৪৪৲।

মেজর জ্যাক তাঁহার "বঙ্গ-পল্লীতে অর্থ-নৈতিক জীবন" গ্রন্থে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন "বাঙ্গালার কৃষকদের আয়ের শতকরা ৫৮ টাকাই ঋণ।"

আমাদের দেশের বাংলার কৃষকদের জনপ্রতি জমির হিসাবের সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনা করিলে বাঙ্গালার দারিদ্র্য স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

যুক্ত প্রদেশ	৭.৮	একর
মাদ্রাজ	৮	"
বোম্বাই	১২.৫০	"
বিহার	১	"
উড়িষ্যা	৮	"
পাঞ্জাব	১০	"
বাঙ্গালা	২	"

ইহার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনা করিলে আমাদের দুর্দ্দশা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ইংলণ্ড	৬২	একর
ফ্রান্স	৯০.২৫	"
জার্ম্মাণী	২১. ৫	"
আমেরিকা	১৪৮	"
জাপান	৩	"
চীন	৩.২৫	"
হল্যাণ্ড	২৬. ০	"
বেলজিয়ম	২৪. ৫	"
ডেনমার্ক	৪০	"
ভারতবর্ষ	৩	"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কৃষির উন্নতি না করিতে পারিলে এবং একই জমিতে বিভিন্ন রকম শস্য উৎপাদন করিতে না পারিলে কৃষকদের অবস্থা কিছুতেই উন্নত হইবে না।

(খাদেম)

—০—

দেশবিদেশ

—০—

গত রবিবার হাওড়র স্থকিয়াতে গোয়েন্দা বিভাগের সি, আই, ডি পুলিশ স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অনেকগুলি বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খানাতল্লাসী। সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে হাওড়াতে বোমা, রিভল-ভার প্রভৃতির জন্য যে তলাশী হইয়াছিল, সেই সম্পর্কেই এই খানাতলাশি হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৯টি বাড়ীতে খানাতলাশি হইয়াছিল। এবং সন্তোষকুমার মুখার্জ্জী নামক জনৈক যুবককে

পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিছু বাজেয়াপ্ত পুস্তক ও কাগজ পত্র পুলিশ হস্তগত করিয়াছে। রবিবার দিন প্রত্যুষে কলিকাতা মধ্যবিভাগের প্রায় সমস্তই গোয়েন্দা পুলিস, হাওড়া, এবং গোলাবাড়ী কেন্দ্রের স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে বাবুডাঙ্গা রোড়ে, এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী সালকিয়ার প্রায় ১৯টি বাড়ীতে খানাতল্লাসি করিয়াছিল। একই সময়ে বাড়ীগুলি তলাশি করা হয় এবং প্রায় মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত তলাশির কাজ চলিয়াছিল। তলাশির পর পুলিশ ১৬ জন লোককে হাওড়া থানাতে আনিয়াছিল। তাহাদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া। কেবলমাত্র সন্তোষকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত সোমবার হাওড়ার উকীল শ্রীযুত সূর্য্য প্রসাদ মুখার্জ্জি এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এচ, সি, বোসের নিকট সন্তোষের ভ্রাতার পক্ষ হইতে জামীনের প্রার্থনা করেন। দরখাস্তে বলা হইয়াছে সন্তোষ ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক, বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল এবং তাহার ভাইএর সহিত ঈশ্বর দত্ত লেনে বাস করিতেছিল। পুলিস কেবলমাত্র তাহার কাছে একখানা 'পথের দাবী' পাইয়াছে। আসামীর পলাইয়া যাইবার কোনো কারণ নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট আজ পর্য্যন্ত আদেশ মূলতবী রাখিয়াছেন।

ষ্টীমার দুর্ঘটনা

—০:*:০—

উজীরথান এবং উজীর দুইজন শ্রমিক অন্যান্য শ্রমিকদের সহিত এস, এস, নারিঙ্গা জাহাজে কাজ করিতেছিল। গতরবিবার উজীর খানকে ২নং ফলকার নীচে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং উজীরকে তাহারই পার্শ্বে সাংঘাতিক জখমী অবস্থায় দেখা যায়। ধারণা করা হইয়াছে যখন তাহারা ফল্কার সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতেছিল যে, তখন পা ফসকাইয়া পড়িয়া যায়। উজীর খান সম্বন্ধে নিয়মিত অনুসন্ধান করা হইবে।

লণ্ডনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, "ডেলি মেলের" সংবাদদাতা প্রকাশ করিয়াছেন রুষিয়া বিস্তৃতভাবে বিমান, বিষাক্ত, গ্যাস প্রভৃতি তৈয়ার করিতেছে। উদ্দেশ্য হইতে বিশ্বব্যাপী বিপ্লব ঘোষণা করা। খুব গুপ্তভাবে এই কার্য্য চলিতেছে। প্রোগ্রামে জানা যায় ৩০০০ হাজার সামরিক বিমানপোত, তাহা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিমান তৈরী হইবে এবং তাহা যুদ্ধের উপযোগী করিয়া তৈয়ার করা হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাকলাৎওয়ালা ভীতি

লণ্ডনের ৩রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কমরেড শাকলাৎওয়ালাকে ভারতে আসবার যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল, পররাষ্ট্র সচীবের দপ্তরখানা উহা না-মঞ্জুর করে দিয়েছেন। রয়টারের প্রতিনিধি কমরেড শাকলাৎওয়ালার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন যে বৃটিশ পার্লামেন্টের তিনি একজন সভ্য, অধিকন্তু তাঁর জন্ম ভারতে এবং তিনি ভারতীয় পিতামাতার সন্তান। লণ্ডনের রাজনৈতিক মহলে এরূপ প্রকাশ পেয়েছে যে ভারতকর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারেই কমরেড সাকলাৎওয়ালার পাসপোর্ট নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

কোয়েম্বেটোর ধর্ম্মঘট

—০:*:০—

কোয়েম্বেটোর ধর্ম্মঘটের মিটমাট হয় নি। শ্রমিকদের ও কলের মালিকদের দ্বারা একটা বৈঠক আহূত হয়েছিল। মালিকেরা কয়েকটা দাবী পূরণ করতে স্বীকৃত হলেও ৮৫ জন লোক যাহারা ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল তাদের বরখাস্ত করতে চেয়ে ছিল। এতে মিঃ শিবরাও তাঁর সহকর্ম্মীগণ রাজী হন নি। মিলের কর্ত্তৃপক্ষদের ঔদ্ধত আচরণ সম্বন্ধে সন্ধ্যাকালে একটা মিটিংএ অনেক বক্তা বক্তৃতা দেন। গবর্ণমেণ্ট যদি বাধা না দেয় তাহা হলে ধর্ম্মঘট ভীষণাকার ধারণ করবে।

প্রেস, কমরেড সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ার এর নিকট হতে অবগত হয়েছে যে মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কমরেড সিঙ্গারাভেলু একটা মিটমাটের চেষ্টায় আছেন তাহা যদি ব্যর্থ হয় তাহা হলে কয়েক মাস ধরে ধর্ম্মঘট চলতে থাকবে। সোস্যাল ওয়ার্কস ইউনিয়নের সেক্রেটারী গবর্ণরকে তার করেছিলেন যাতে তিনি উটির পথে একটা ডেপুটেশন গ্রহণ করেন, তদুত্তরে গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী জানিয়েছেন, তিনি কোয়েম্বটোর অতিক্রম করে চলেগেছেন। তার পক্ষে অনুরোধ রক্ষা করা অসম্ভব।

—•—

শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

রাজবন্দী শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের উপর কালিমপোং অন্তরীন করিবার পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে তদনুযায়ী তিনি গত রবিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় দার্জ্জিলিং মেলে কালিমপোং রওনা হইয়াছেন। শ্রীযুত দত্ত ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়া কারাকক্ষে আবদ্ধ হন। তৎপূর্ব্বে ১৯১৫ সালেও ষ্টেট প্রিজনার ছিলেন, এবং ১৯২০ সালের শেষভাগে মুক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি ১৯২৩ সালে তাঁহার গ্রেপ্তারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বরাজ্য পার্টির একজন কর্ম্মী ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর আলিপুর জেলে নীত হয়েন, এবং সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁহাকে মেদনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯২৪ সালের মধ্যভাগে তাঁহাকে বর্ম্মাতে স্থানান্তরিত করা হয় ও ইনসীন জেলে জীবনলাল চাটার্জ্জীর সহিত আটক রাখা হয়। ইনসীন জেল হইতেই পার্লামেণ্টে ভারত সেক্রেটারীর নিকট তাঁহাদের সুদীর্ঘ আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বর্ম্মা হইতে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আনা হয়।

—০—

জাল পাসপোর্ট

এস, এস, ল্যাংগা গত রবিবার রেঙ্গুন হইতে আসিয়া পৌঁছিলে কলিকাতা পোর্ট পুলিশের সার্জ্জেন্ট ফক্স, চারণ সিং নামক একজন লোককে গ্রেপ্তার করে। করাচী পুলিশকে ঠকানার জন্য পুলিশ তার খোঁজ করিতে ছিল। প্রকাশ যে কর্ত্তৃপক্ষ শ্যাম সিং নামক একজন লোকের নামে পাসপোর্ট দিয়াছিল। আসামী নিজকে শ্যাম সিং পরিচয় দিয়া উক্ত পাসপোর্ট সাহায্যে ভ্রমণ করিয়াছে। তাহাকে বিচারার্থ করাচী পাঠান হইবে।

নাগপুরে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

নাগপুর ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের খবরে প্রকাশ যে গত রাত্রিতে সেখানে হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এবং তাহার ফলে অনেক লোক জখম হইয়াছে। ব্যক্তিগত কারণে দাঙ্গার সৃষ্টি হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ৫ জন লোক নিহত হইয়াছে ও ২০০ জন লোক আহত হইয়াছে। শহরের অবস্থা খুব সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল বন্ধ হইয়াছে, হাট বাজার পরিত্যক্ত হইয়াছে, শহর জনশূন্য বোধ হইতেছে।

পটুয়াখালীতে পিটুনীকর

পটুয়াখালী হইতে ৩রা তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক সংবাদদাতা লিখেছেন গবর্ণমেণ্ট পিটুনী পুলিসের ব্যয় ২২০০০ হাজার টাকা তুলবার জন্য প্রজাদিগের উপর কর বসাবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করার ফলে এখানকার অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় বৎসর খানেক সত্যাগ্রহ চলছে। সত্যাগ্রহের জন্য পুলিস বসাইতে হয়েছিল। অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে ওঠায় গবর্ণমেণ্টকে পিটুনী পুলিস বসাতে হয়েছিল। একেত দুঃস্থ কৃষকদের এই সময়ে কর দিতে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয় তার ওপর আবার পিটুনী করের দরুন তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে এই ট্যাক্সের দায়ে ঘরদোর ছেড়ে পলাবে মনে করেছে।

—*—

অনাস্থার প্রস্তাব টিকিল না

রাঁচি ৩রা সেপ্টেম্বর। আজ বিহার উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় তিল ধরণের স্থান ছিল না। স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী গণেশ দত্ত সিংহের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব ভোটে উঠিলে ৪৫—৩৭ ভোটে উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

—•—

কোয়েম্বাটুর শ্রমিক সঙ্ঘ

কোয়েম্বাটুর শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ এন, এস, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে কোয়েম্বাটুর আসবার জন্যে তার যোগে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন, এণ্ড্রুজ সাহেবের শরীর খারাপ বলে তিনি তার যোগে জানিয়েছেন যে তিনি যেতে অসমর্থ; তিনি রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যেন শ্রীযুত আয়েঙ্গার ১৪৪ ধারা অমান্য না করেন। শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মঘটের অবসান হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

—•—

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের নব নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী বিগত রবিবার দিন যথারীতি দলিলপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এখন মিলটী তাঁদের পরিচালনাধীন হোলো।

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি

৪ঠা সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ, ডাক্তার আনসারী বহু ভোটাধিক্যে আগামী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাত্র দু'জন সদস্য প্রতিবাদ করেছিল। পরে অভ্যর্থনা সমিতি তাদের প্রতিবাদ প্রত্যাহার করতে অনুমতি দেন। তারা প্রত্যাহার করায় ডাঃ আনসারী বিনা প্রতিবাদে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১॥৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু, প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

BOOKS ON SOCIALISM.

1. **The Coming of Socialism.**
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. **Scientific Socialism.**
Its Aims and Ideals.
BY
Wm. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. **The Religion of Capital**
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. **Manifesto of the Communist Party**
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS.
Price—As. 6/- only.

To be had of

The Book Company Ltd.
4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের

উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	॥০
অগ্নিসংস্কার	১॥০
শুভা	১৲
পাপের ছাপ	২।০
বিপর্য্যয়	২॥০
শান্তি	২॥০
কাঁটার ফুল	১॥০
রক্তের ঋণ	॥০
আনন্দ-মন্দির	॥০

রাঙ্গা	২।০
পিতাপুত্র	১॥০
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	২॥০
দূরের আলো	২৲

নাটক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ॥০
২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত প্রহসনচিত্র। ১৲

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে

উপন্যাস ও গল্প

১ মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। একা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—

১। ভাত কাপড়ের কথা

বাঙ্গালার রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নজলের কথা।

২। বাণী বীথি।

বাঙ্গালা সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন ব্যবহারের গ্রন্থ

1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.

Published by the Calcutta University.



Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Behalf of the
PEASANTS AND WORKERS PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪	৩০ম সংখ্যা

বিশেষ বিজ্ঞাপন

আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা 'গণবাণী' আমাদের গ্রাহকগণকে ভি, পি, তে পাঠাতে থাকব। যারা ভি. পি. গ্রহণে অসম্মতি আগে থেকে জানিয়েছেন তাঁদের নিকটে ভি. পি. অবশ্য পাঠানো হবে না। যাঁদের মূল্য ফুরিয়ে গেছে এবং মূল্য ফুরিয়ে যাবার পরেও যারা কাগজ গ্রহণ করে আসছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁরা যেন ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। আগামী নবেম্বর মাস থেকে গণবাণীর প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু' পয়সা করা হবে।

বিনীত—

ম্যানেজার—গণবাণী

সম্পাদক: মুজফ্‌ফর আহমদ, শ্রী... মোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা

বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৩৲

Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪	৩০ম সংখ্যা

মুক্তি-মন্ত্র

—০—

[আবদুল কাদের]

—০—

ছোট'দের বুকে গুরু হ'য়ে বাজে হীন অপমান ধ্বংস মার ;—
ডাকে বিভু, লহ' তাহাদেরে কোলে, মুছে' ফেলো সব অত্যাচার।

তৃষ্ণাতুরের জ্বালা ক্রন্দন
ভুবনে শ্বসিছে, স'বে কতকাল অদৃষ্টের এই বন্ধন ?
দরিদ্র-প্রাণ ফানা হয়ে গেছে, কেঁদে কেঁদে আজ মূক নিসাড় ;—
হে স্রষ্টি, তব আসে আহ্বান, খুলে' দাও রাজ হৃদয়-দ্বার !

মহাজন যত ক্ষিপ্ত মানস,
জনের শোণিতে হর্ম্ম্য রাঙায়ে—পূরে' নাই তবু মত্ত লালস।
সৃষ্টি মথিয়া বিলাস ব্যসনে যোগায় নগ্ন ভোগের ভার ;—
কোথায় দলিত, দল বেঁধে' আজি ভাঙো তাহাদের মিথ্যাগার !

কুলী মেথরেরর কিবা লাজ মান ?
অর্দ্ধ আহারে যাবে দিন, দারা পুত্রের ভবে নাহি কোনো স্থান।
চরণ চাটিয়া বাঁচিবে যাহারা, তাদের শ্রান্তি ক্লেশ আবার ?
জাগো শূদ্রের সুপ্ত শক্তি মুছাতে মথিত মর্ম্ম ভার !

ঘৃণা শ্লেষ শিরে ফিরিয়া ভুবন
বিশ্ব জনায় সেবিছে যাহারা, তাহাদের নাহি অঙ্গ-শোভন,
জীর্ণ কুটীরও পেলনা ধরায় করিতে বোশেখী রাত্রি পার।
জাগো দরিদ্র, জাগো তাই, লহ রাষ্ট্র শাসন এই ধরার !

দুর্ব্বহ দেহ অধীন জীবন ;
কলের চাকায় মরে কাঁচা প্রাণ, না পায় করিতে অশ্রু স্বেদন।
কারখানা ঘোরে মানুষ-মেষেতে, নাহি অবসর আসান তার ;—
এ জাগর-যুগে জাগোরে শ্রমিক টুটি' যন্ত্রীর অহম্‌কার !

বঞ্চিত ক্ষত দীনের আত্মা,
লক্ষ পতির সঞ্চয়-নেশা দৈত্যের মতো তুলিছে বাত্যা।
জমিদার হোল ভূমির মালিক, কৃষাণের শুধু আবাদ সার ;—
আদম-জনক-হল-ধর কা'রা, দলে' দে'রে এই ভণ্ডাচার !

ক্ষুধিত পরাণ কর্ম্ম বিমুখ,
অন্ন খুঁটিয়া চাহেনা বাঁচিতে, ঘৃণিত জীবনে রয়েছে কী সুখ !
উরিবে রে কবে মহাকাল ভোলা, সর্ব্ব জনারে করিবে পার ;—
আনো হে চারণ, আনো সেদিনের মঙ্গল-গীতি অমিয়াসার !!

—০—

কৃষক ও শ্রমিক দল

—:•:—

(মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)

—:•:—

কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্য তালিকা সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকে বুঝে উঠতে পারছেন না যে এ দলটা কি জিনিস। গবর্ণমেণ্টের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের অনেক লোক, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত লোকও এ দলকে কম্যুনিষ্ট দল ব'লে মনে ক'রে থাকেন। তাঁদের এরূপ মনে করার পক্ষে কি যে যুক্তি রয়েছে তা অবশ্য আমরা জানিনে, তবে আমাদের মনে হয় যে, দু' একজন কম্যুনিষ্ট এ দলের ভিতরে রয়েছেন বলেই হয়তো অনেকে এ'কে কম্যুনিষ্ট দল বলে মনে করে থাকেন। 'কম্যুনিজম' কি জিনিস আর কম্যুনিষ্ট দলই বা কেমন ভাবে গঠিত হওয়া উচিত তা অনেকের জানা না থাকাই হচ্ছে এরূপ ভুল ধারণার আর এক কারণ। মানবতার চরমোৎকর্ষ সাধন করার পক্ষে 'কম্যুনিজম্' এর চেয়ে সেরা মতবাদ আর কিছুই হ'তে পারে না। কৃষক ও শ্রমিক দল যদি সত্য সত্যই কম্যুনিষ্ট দল হ'তো তা হলে এর পক্ষে তা অগৌরবের বিষয় কিছুই হতো না। কিন্তু, প্রকৃতই যখন কৃষক ও শ্রমিক দল কম্যুনিষ্ট দল নয় তখন এ'কে মিছামিছি কম্যুনিষ্ট দল নামে আখ্যাত করে সত্যকারের কম্যুনিষ্ট দলের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

কৃষক ও শ্রমিক দল কি ?

ভারতবর্ষে যতগুলি রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক দল ছিল সে গুলোর অকৃতকার্য্যতার ধ্বংস স্তূপের মধ্য থেকেই কৃষক ও শ্রমিক দলের উদ্ভব হয়েছে। এ দল আপনা হতে সৃষ্ট হয়নি, সমাজের বাস্তব অবস্থা সমূহ (Material Conditions of the Society) এ দলকে সৃজন করেছে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে একবার মাত্র জনগণের সংস্পর্শে এসেছিল। জনগণ যখন কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঠেছিল তখনই কংগ্রেস জনগণের কার্য্য-তালিকা পরিহার করে বসলো। ১৯২২ সনে বারদৌলিতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে যতগুলো শর্ত্ত কংগ্রেসের কর্ম্ম তালিকায় স্থান পেয়েছিলো সে সবই বাতিল করে দেওয়া হলো। মিষ্টার গান্ধী যখন কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকায় জনগণের, বিশেষ ক'রে কৃষকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের শর্ত্ত গুলির স্থান প্রদান করেছিলেন তখন বোধ হয় তিনি ভেবে দেখবার অবসর পেয়েছিলেন না যে এর পরিণতি কি হতে পারে। গুজরাতের বেণেদের শ্রেণীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। বেণেদের, ধনীদের প্রতি যে তাঁর একটা স্বাভাবিক মমত্ব-বোধ আছে সেটা ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে কিনা তা'ও সে সময়ে তিনি ভেবে দেখেন নি। কিন্তু, মালাবার, চৌরিচৌরা, রায় বেরিলি ও আর আর জায়গায় যখন তিনি কৃষকদের মধ্যে অভূত পূর্ব্ব চৈতন্যের সঞ্চার দেখতে পেলেন তখনি তিনি এক মুহূর্ত্তে বুঝে নিলেন যে দেশের জন সাধারণের যা হ'বার তা হো'ক্, ধনিকদের ও জমীদারদের সম্বন্ধ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এইটে বুঝে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বারদৌলিতে তিনি আপন মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। কংগ্রেসের কর্ম্ম-তালিকা থেকে জনগণের স্বার্থ-সংরক্ষণ মূলক শর্ত্ত গুলোকে বাদ দিতে যেয়ে যেরূপ কঠোর যথেচ্ছাচারীর মূর্ত্তি তিনি পরিগ্রহ করেছিলেন তার সহিত পৃথিবীর যে কোনো যথেচ্ছাচারীর তুলনা করলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হবে না। তার পর থেকে কংগ্রেস জনগণ হ'তে সম্পূর্ণরূপে সরে পড়েছে। এই সরে পড়ার দরুণ জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকেই এই কৃষক ও শ্রমিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। এই দল উন্নত জাতীয়ত্বের (Advanced Nationalism এর) অনুসরণ করে থাকে। জাতীয়ত্ব বা ন্যাশন্যালিজম্ বলতে আর সকল দল একটা বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর স্বার্থকেই বুঝে থাকে, আরো খোলাসা কথায় আর সকল দল কেবল মাত্র সমাজের উচ্চ শ্রেণীকেই জাতি বা নেশন্ ব'লে গণ্য করে থাকে। কিন্তু, এই দিক্ থেকে কৃষক ও শ্রমিক দলের আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। এ দলের জাতি বা নেশন্ হচ্ছে সমাজের জনগণ। উন্নত জাতীয় দল হিসেবে কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের দ্বারা, জনগণেরই জন্যে ভারতের পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কেন না, দেশের শোষিত জনগণ যদি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভ না করে তা হলে তারা কিছুতেই শোষণের হাত এড়াতে পারবে না। কিন্তু, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলের উদ্দেশ্য তা নয়। সে সব দল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করে বৃটেনের শোষক শ্রেণীর শাসকগণের সমকক্ষ হতে চায়। সমাজের উচ্চশ্রেণীর কবলগত দলগুলি যে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর সুখ-সুবিধের জন্যেই সব কিছু করতে চাইবে তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করার চেয়ে, ভিতরে থেকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করাতেই সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকগণের পক্ষে অধিকতর লাভ জনক। তাতে তারা বৃটিশ শোষকগণের সমকক্ষতা লাভ ক'রে তাদেরি সহযোগে ভারতের জনগণকে শোষণ করার অধিকতর সুবিধে পাবে। জনগণকে শোষণ করাই সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকগণের একমাত্র ব্যবসায়। তাদের সবই যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে ব্যাহত শোষক জীবনকে অব্যাহত করার জন্যে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এখন সমাজের উচ্চস্তরের লোকগণের ক্ষমতার ভিতরে এসে পড়েছে। কাজে কাজেই সমাজের উচ্চস্তরের নীতিই বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসেরও নীতি।

জনগণ কাহারা ?

কৃষক ও শ্রমিক দল ভারতের জনগণের দল। সম্পত্তিবান ও সম্পত্তি-হীন কৃষক, কৃষিক্ষেত্রের মজুর, গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত মজুর। কারখানার মজুর, ষ্টীমার, নৌকা ও গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের কর্ম্মী, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কেরাণী, ছাত্র, স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতির সমবায়কেই আমরা জনগণ (The Masses) নামে আখ্যাত করে থাকি। ভারতবর্ষে এই জনগণের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৯৮ জন। আর বাকী দু'জন হচ্ছে কারখানার মালিক, জমীদার, বড় ব্যবসায়ী, টাকা লগ্নীকারী ও দালাল প্রভৃতি। কৃষক ও শ্রমিকদল যেমন বৃটেনের শোষণকারী শাসন হতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চায়, ঠিক তেমনি ভারতের এই শতকরা দু'জনের শোষণেরও পরিসমাপ্তি করতে চায়। বর্ত্তমান সময়ে যতগুলি

দল আছে তার সবগুলিই এই শতকরা দু'জনের স্বার্থ সংরক্ষণেরই প্রয়াসী। তবে লিবারেল প্রভৃতি দল খোলাখুলি ভাবে তা স্বীকার করে থাকে, আর 'স্বরাজ্যদল' স্বীকার না করার ভাণ করে মাত্র। বৃটিশ ইম্পিলিয়েলিজম্ অর্থাৎ শোষণ-কারীদের সহিত এই সকল দলেরও বিরোধ রয়েছে বটে, কিন্তু, সে বিরোধ ইম্পিরিয়েলিজম্‌কে ধ্বংস করার বিরোধ নয়, সত্য কথা বলতে গেলে ভাগে পুষিয়ে নেবার বিরোধ মাত্র। তারপরে, কাউন্সিল প্রভৃতিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার দ্বারা ভোটের অধিকার বিহীন জনগণের সংগ্রাম ও আন্দোলন কিছুতেই চল্‌তে পারে না। উচ্চ শ্রেণীর সদস্যগণ যতই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করুন না কেন, তাঁদের নিজেদের হানি হবে অথচ জনগণের উপকার হতে পারে এমন কোন ব্যাপারে তাঁরা গবর্ণমেণ্টের বিরোধ কিছুতেই করবেন না। বাধা দেওয়ার ও ধ্বংস করার যতই পলিসি তাঁদের থা'ক না কেন, আপন আপন স্বার্থের বেলায় গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হয়ে ভোট দিতে এতটুকুও পেছ পাও তাঁরা হন না। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে 'স্বরাজ্যদল' যে ব্যবহার করেছে তা-থেকে আমাদের কথা যে মিথ্যে নয় সকলেই তা বুঝে নিতে পারবেন। এই সকল কারণে জনগণের দল গঠিত হবার আবশ্যক ছিল বলেই তা গঠিত হয়েছে।

দলের নাম "কৃষক ও শ্রমিকদল হলো কেন?

আমাদের দেশে অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে কেবলমাত্র গতর খাটিয়ে যারা কাজ করে থাকে তারাই শ্রমিক। আমাদের মতে এরূপ মনে করা খুবই ভুল। মাথা ও গতর দুই খাটিয়ে মানুষ পরিশ্রম করে থাকে। তা ছাড়া পরিশ্রম ক'রে কারখানার মজুরেরা যেমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না ঠিক তেমনি আফিসের কেরাণী প্রভৃতিও পায় না। কাজেই, অবস্থা দু'এরই সমান, শোষিত দুই হচ্ছে। 'শ্রমিক' পদটাকে অমরা খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছি এবং আমাদের বিশ্বাস এরূপ করে আমরা কিছুমাত্র ভুল করিনি। একজন কৃষক যদি মাথা খাটিয়ে কোনো কাজ করতে আরম্ভ করে দেয় তা হলে সে আর নিজকে কৃষক বলে স্বীকার করতে চায় না, এমন কি তখনো যদি তার প্রধান উপজীবিকা কৃষিই হয় তখনো না। কোনো কৃষকের যদি তালুকি স্বত্বের জমী থাকে তা হলে সে আপনাকে কৃষক বলে পরিচয় না দিয়ে তালুকদার ব'লে পরিচয় দিতেই গৌরব বোধ করে। শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত শ্রমিকগণ আপনাদিগকে 'ভদ্রলোক' বলে পরিচয় দিতেই বেশী ভালোবাসে। সহায় সম্পত্তিহীন শিক্ষিত শ্রমিক, যারা তাকে পথে খাড়া করে দিয়ে ছেড়েছে তাদেরই দলে ভিড়তে চায়। তার মত নিষ্পেষিত, নির্য্যাতিতদের সঙ্গে মিশ্‌তে তার বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু, সত্য সত্যই সে যে শ্রমিক,—ধনিক নয়, শোষিত—শোষক নয়, এ কথা সে মানবে না কেন? যারা ধনিক নয়, বড় বণিকও নয়, জমিদারও নয়—তারা কৃষক কিংবা শ্রমিক ছাড়া আর কি হতে পারে?

ন্যাশন্যাল কংগ্রেস সম্বন্ধে কৃষক ও শ্রমিকদলের নীতি কি হবে?

ইণ্ডিয়ান ন্যাশ্‌ন্যাল কংগ্রেস কিম্বা অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্য কৃষক ও শ্রমিক দলের নেই। পরন্তু, কৃষক ও শ্রমিকদল চায় দু'টো প্রতিষ্ঠানকেই শক্তিশালী সঙ্ঘরূপে গড়ে তুলতে। তবে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস বর্ত্তমান সময়ে সমাজের শোষক শ্রেণীর কবলগত হয়ে পড়েছে। তাই, তাদেরি প্রোগ্রাম কংগ্রেসে স্থান পেয়েছে। কৃষক ও শ্রমিক দলের উদ্দেশ্য ন্যাশন্যাল কংগ্রেসকে সত্যকারের জনগণের অনুষ্ঠানে পরিণত করা। ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্বন্ধেও কৃষক ও শ্রমিকদলের উদ্দেশ ঠিক তাই। স্বার্থপর লোকগণের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপত্তি শ্রমিক কংগ্রেস হতে দূর করে দিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদল তা'কে সংগ্রামশীল অনুষ্ঠানে পরিণত করতে চায়।

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রতিক্রিয়াশীল "ফরওয়ার্ড"

ন্যাশন্যালিজম বা জাতীয়ত্বের পর্দ্দার আড়ালে থেকে কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক "ফরওয়ার্ড" কত বড় প্রতিক্রিয়া-শীল যে হয়ে পড়েছে তা হয়তো যুবক বঙ্গ আজো ভালোরূপে চিন্তা করে দেখেন নি। এই গণ-চৈতন্যের যুগে সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যেও যে আরো অধিকতর চৈতন্যের বিকাশ লাভ করবে, তাতো খুবই স্বাভাবিক। "ফরওয়ার্ড" হচ্ছে এই উচ্চস্তরের লোকেদের কাগজ। সমস্ত ক্ষমতার কল কব্জা যাতে অব্যাহত ভাবে তাদেরি হাতে থাকে সেই চেষ্টা, তা' যত নীচ ভাবেই হোক্‌না কেন, করাই হচ্ছে "ফরওয়ার্ড" এর কাজ। যে ক'জন বিশিষ্ট লোকের দ্বারা "ফরওয়ার্ড" পরিচালিত হয় এবং যে ক'জন বিশিষ্ট লোক টাকার জোরে কংগ্রেসের ওপরে প্রভুত্ব জমিয়ে কংগ্রেসকে একটা প্রতিক্রিয়া-শীল অনুষ্ঠানে পরিণত করেছেন তাঁদের মতের বিরুদ্ধে কোনো মত গড়ে ওঠে এটা তাঁরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। বিরুদ্ধ মতকে যে কোনো প্রকারে ধ্বংস ক'রে দেওয়াই হচ্ছে তাঁদের কাজ। যে জনগণকে নানা দিক্ থেকে নানা ভাবে বিলুণ্ঠন করে তাঁরা মোড়ল হয়েছেন সেই জনগণের ভাব প্রবণতাকে তাঁদের নিজেদের দিকে আকর্ষণ ক'রে তাঁরা জনগণেরই চৈতন্য লাভে বাধা দিতে চান। কিন্তু, তাঁরা একথা বোঝেন না যে জগৎ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সে অবস্থায় যতই নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁরা দিন না কেন, তাঁদের কার্দ্দানি আর বেশী দিন টিকবেনা। * * * "ফরওয়ার্ড" এর দলের নূতন পলিসি হচ্ছে যাঁরা তাঁদের মতের অনুসরণ করেন না তাঁদের পুলিসের এজেণ্ট বলে প্রতিপন্ন করা। এই হীনতার পরিচয় দিতে যেয়ে "ফরওয়ার্ড" এর দলের লোকেরা নিজেরাই যে পুলিশের দালাল হয়ে পড়েছেন তা আর তাঁরা তলিয়ে দেখেন নি। আমরা বারে বারে "ফরওয়ার্ড"কে জিজ্ঞাসা করেছি যে তোমরা যদি নিজেরা সি-আই-ডি ওয়ালাদের আপনার লোক না হও তা হলে তাদের ঘরের কথা জানলে কি করে? আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর কখনো "ফরওয়ার্ড" দিতে পারেনি।

"ফরওয়ার্ড" এর লেখার প্রতিবাদ করে কেউ কিছু ছাপাতে পাঠালেও তা ছাপাবার মত উদারতাও "ফরওয়ার্ড" হারিয়েছে। আমরা জানি ২১শে আগষ্ট তারিখে "ফরওয়ার্ড" এ প্রকাশিত Glimpses of the Underworld শীর্ষক প্রবন্ধের কতকগুলি

বিষয়ের প্রতিবাদ করে "কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া"র জেনেরেল সেক্রেটরী বোম্বে থেকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। সে পত্র "ফরওয়ার্ড" প্রকাশ করেনি। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে "গণবাণী"র অন্যতর সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যে একখানা পত্র "ফরওয়ার্ড"কে পাঠিয়েছিলেন, সে পত্রখানাও "ফরওয়ার্ড" প্রকাশ করেনি। "ফরওয়ার্ড" এর দল আপনাদের কাগজে অপরের সম্বন্ধে যা খুশী বলবেন, কিন্তু অপরকে কিছুই বলতে দিবেন না। কিন্তু একটা কথা আমরা বলে রাখছি, যতই কিছু প্রচার তোমরা করনা কেন তোমাদের প্রচারের দ্বারা দেশের জন সাধারণ, বিশেষ করে কৃষক ও শ্রমিকগণ এতটুকুও তোমাদের মুখো হবেনা। সে দিন তোমাদের অনেক পূর্ব্বে কেটে গিয়েছে। তোমাদেরি ভক্ত অনুরক্তদের মধ্যে দু' একজন তথা কথিত শ্রমিক নেতা কখনো কখনো তোমাদের শ্রমিকদের মধ্যে ডেকে নেয় বলে স্বপ্নেও মনে স্থান দিওনা যে তোমাদের শ্রমিকরা চেনে বা তোমাদের কথা তারা শোনে।

* * * *

বিপ্লবাত্মক ধারণা নিয়ে কোনো দল গঠিত হলে তাতে সি-আই-ডি প্রবেশ করবার চেষ্টা যে করবে তাতো জানা কথা। কিন্তু, সেই নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? তোমরা তো বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পাকা বন্ধুতে পরিণত হয়েছ, সি-আই-ডি'র ভাবনা আবার তোমাদের কেন? যে সকল দল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরে গঠিত হয়েছে সে সকল দলে হাজার সি-আই-ডি প্রবেশ করেও কিছু করতে পারবে না, কোনো দেশে পারেনি। কিন্তু তোমাদের সত্যকার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে সতর্ক করা নয়, তোমরা চাচ্ছ প্রোপাগ্যাণ্ডা ক'রে জনগণের উত্থান প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু এ প্রচেষ্টাতে তোমরা যে সফলকাম হবেনা, কিছুতেই না, তা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখলুম।

* * * *

নলিনী গুপ্তের বড় ভাই শ্রীযুত শশী গুপ্ত স্থায়ী ভাবে বাম্মার মান্দালয় শহরে বাস করেন। সেখানে তাঁর বাড়ী ঘর আছে, তিনি অবস্থাপন্ন লোকও বটেন। সেই ভাই এর বাড়ীতে নলিনী গুপ্তের যাওয়ার মানে হলো "ফরওয়ার্ড" ওয়ালাদের মতে পুলিসের ডেপুটেশনে যাওয়া। কেননা, বাম্মার জেলে তখন বঙ্গীয় রাজবন্দীরা ছিলেন। "ফরওয়ার্ড" এর সাথে যাদের মতের মিল নেই তারা যদি যে জায়গায় রাজবন্দী রয়েছে সে জায়গায় যায় তা হলে পুলিশের তরফ থেকেই যাবে! এই ফতোয়া অনুসারে "ফরওয়ার্ড" এর সহিত যাঁদের মতের ঐক্য নেই তাঁদের আলমোড়াতে হাওয়া পরিবর্ত্তন করতে যাবার উপায় নেই, কেননা রাজবন্দী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় সেখানে রয়েছেন। কালিম্পংএ রাজবন্দী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত রয়েছেন। কাজেই দার্জিলিংএ যেতেও ভয়ের কারণ আছে। সম্প্রতি রাজবন্দী কিরণ মুখোপাধ্যায়কে ওয়াল্টেয়ারে পাঠানো হয়েছে। অতএব, "ফরওয়ার্ড" এর দলের মত বিরোধীদের ওদিকে যাবার উপায়ও আর থাকলনা। সব চেয়ে মুশ্‌কিল হবে "গণবাণী"র অন্যতর সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের। তাঁর বাড়ী হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ নামক দ্বীপে। সেখানে রাজবন্দী মনোরঞ্জন গুপ্তকে রাখা হয়েছে। কাজেই তিনি যদি বাড়ী যান তা হ'লে বেচারা নলিনীর ন্যায় তাঁকেও "ফরওয়ার্ড" এর আদালতে অভিযুক্ত হতে হবে। এ কাগজ ওয়ালাদের সহিত যাঁদের মতবিরোধ আছে তাঁদের শারীরিক অবস্থা যতই শোচনীয় হোক্না কেন, আলমোড়া, ওয়াল্টেয়ার, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে তাঁরা কিছুতেই যেন না যান। হাঁ, কালিম্পংএ তাঁরা যেতে পারবেন না, কেননা শ্রীযুত ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সেখানে থাকেন।

—০—

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার কি?

চার দিক থেকে দুর্ভিক্ষের খবর আসছে। বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের বালুরঘাট মহকুমায়, বর্দ্ধমানের কালনা মহকুমায়, বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করে উঠেছে। এ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি? অনেকে মনে করেন যে সরকার দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে এ সকল দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির যাতে উপশম হয় তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু, এরূপটা কি কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে উঠবে? ভিক্ষার দ্বারা দুর্ভিক্ষের প্রতিকার কখনো হতে পারে না। সমাজে বর্ত্তমান সময়ে যে অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ত্তমান রয়েছে তার আমূল পরিবর্ত্তন না করলে এ সব জিনিসের কোনো প্রতীকার ত হবেই না, বরঞ্চ ব্যাপার আরো দিন দিন সঙ্গীন হয়ে উঠবে। এমনিই তো আমাদের কৃষক আর শ্রমিকের ঘরে বারো দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে, তার ওপরে যদি কোথাও বন্যা কিংবা অজন্মা হয় তবে আর দুঃখ কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকে না। গ্রামের মহাজন ও অবস্থাপন্ন লোকেদের এ দুর্ভিক্ষের সময়টাই পোয়াবারো। এ সময়েই তারা কৃষকের যথা সর্ব্বস্ব হস্তগত করার সুবিধে পায়। যাঁরা এ সময়ে কিছু কাজ করতে চান, তাঁরা কেবলমাত্র উপশমের কাজ করে যেন ক্ষান্ত না থাকেন। এখনই কৃষকগণকে ও শ্রমিকগণকে সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রকৃষ্ট সময়। হাজার হাজার বছরের পুরাতন চাষের প্রথা তুলে দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রবর্ত্তন করতে হবে। কৃষককে ভূমির মালিক করে দিতে হবে, মহাজনের সুদের রেট আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে, আর করে দিতে হবে চাষীদিগকে চাষের জমীর সম্পূর্ণ মালিক। কৃষক আর ষ্টেটের মধ্যে আর কোনো ভূস্বত্ব থাকতে পাবেনা। ষ্টেট অর্থাৎ সরকারের সহিত কৃষকের যে সম্বন্ধ থাকবে সে সম্বন্ধ হবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। এ সবের জন্যে বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করতে হবে এবং কৃষকদিগকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাও হস্তগত করতে হবে।

———

ভারতবর্ষ ও ভবিষ্য সমর

—০:*:০—

[জনৈক লণ্ডন-লেখক]

———

জুলাই মাসের কাগজ থেকে জানতে পারা যাচ্ছে যে "পিপল্" তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। দাবী করা হয়েছে যে সকল দিক থেকে কাগজখানাকে প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিকে পরিণত করার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটী করা হয় নি। আমরা মেনে নিচ্ছি যে উন্নতি "পিপল" করেছে, কিন্তু পেছনেরই দিকে,—সম্মুখের

দিকে নয়। বর্ত্তমান সময়ের বিশিষ্ট সমস্যাগুলিকে "পিপল" গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল কাগজগুলিরই মত বরাবর ব্যাখ্যা করে এসেছে।

আজকের দিনে ধনিকবাদের অবনতি হচ্ছে একটা মূল প্রশ্ন। এর ওপরে মানব জাতির শান্তি কিংবা ধ্বংস নির্ভর করছে। কিন্তু, জগতের প্রতিক্রিয়ার প্রধান শক্তি সমূহ সমগ্র জগৎকে একটা ভয়ানক যুদ্ধের ব্যাপারে টেনে আনবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। লালাজী ও তাঁর কাগজ এই শক্তি সমূহের সহিত যোগদান করে বিপ্লবাত্মক শক্তিকে, বিশেষ করে সোভিয়েট গণতন্ত্রকে প্রদমিত করার জন্যে চেষ্টা করেছেন। এ সম্বন্ধে তর্ক করার পূর্ব্বে আমরা মিঃ বল্ড্‌ইনের হালের একটা বক্তৃতা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলব। তিনি বলছেন :—"কেউ যদি তোমায় বলে থাকে কিংবা তুমি যদি কোথাও পড়ে থাক যে গ্রেট্ বৃটেন যে কোনো প্রকারে ক্ষয়ের দিকে চলেছে, তা হলে তা পৃথিবীর সব ভুলের চেয়ে একটা বড় ভুল হবে।" ভিতরে কিছু গলদ না থাকলে কেউ কখনো বাইরে সাফাই গাইতে যায় না, তার ওপরে যে সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনো অস্তমিত হয় না সে সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী যখন ওরূপ করতে যান তখন তো অসন্দেহের আর কোন কারণই থাকে না। মিঃ বল্ড্‌ইনের কথার দ্বারা ভিতরের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেছেন যে বৃটিশ ধনিকবাদের অবস্থা কিছু পতনের দিকে যাচ্ছে না। কিন্তু, বে-বন্দোবস্তের দরুণ বৃটেনের একটা বড় ইণ্ডাষ্ট্রী সঙ্কটের অবস্থায় পতিত হয়েছে। যদিও ডারহামের কয়লা খনির কারবারগুলো শতকরা ৬৪ ভাগ কয়লা উত্তোলন করে টন প্রতি ১ শিলিং এর কম থেকে আরম্ভ করে ৭ শিলিং পর্য্যন্ত লোকসান খেয়েছে, তথাপি আবার সেখানকারই শতকরা ৩৬টি কারবার টন প্রতি ১ শিলিং এর কম থেকে আরম্ভ করে ৫ শিলিং পর্য্যন্ত লাভও করেছে। অন্যান্য ডিষ্ট্রিক্টের অবস্থাও এইরূপই বটে। এই থেকে আমরা দেখতে পাই যে সত্য সত্য কি অবস্থার ভিতর দিয়ে বৃটিশ ধনিকবাদ যাচ্ছে। গ্রেট বৃটেন হচ্ছে সব চেয়ে বড় ধনিক ষ্টেট। তার পতনের প্রতিক্রিয়া অপরের ওপরেও হচ্ছে। ইটালী, পোল্যাণ্ড, জাপান ও অন্যান্য দেশেও সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। এ সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে গ্রেট বৃটেনের "মাইনার্স ফেডারেশন"এ যা স্থিরীকৃত করেছে তাই, অর্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্রিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা। কিন্তু, এ' যদি কার্য্যে পরিণত হয় তা হলে তাতে বৃটিশ ধনিকগণের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। কাজেই এ'কে ব্যর্থ করার জন্যে বৃটিশ ধনিকগণ তাদের নিজেদের ও অন্যান্য জাতির শ্রমিকগণের বিরুদ্ধে সকল প্রকার অত্যাচারের বিধান প্রণয়ন করবার চেষ্টা করবে, এমন কি বিষাক্ত গ্যাসেরও পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করবে। "পিপল"এর সম্পাদকও তাঁর নিজের দিক থেকে এ সকল যুদ্ধ সংঘটনকারীদের দলে যোগদান করেছেন। তাই তিনি তাঁর কাগজে "আবার রুশীয় বিপদ" শীর্ষক মন্তব্য লিখেছেন। আজকের দিনের সর্ব্বহারাদের (Proletarians) দ্বারা চালিত সোভিয়েট তন্ত্র ও জার শাসিত পুরাতন যথেচ্ছচার তন্ত্রের সহিত কোনোরূপ পার্থক্য করতে না পারাটা, বিশেষ করে তথাকথিত আদর্শ কাগজের পক্ষে, যেমনি হাস্যকর ঠিক তেমনি মূর্খতার পরিচায়কও বটে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সৈনিক শক্তি সংবদ্ধ করা সম্বন্ধে ও বড় লাটের কাশ্মীর ও বেলুচিস্থান ভ্রমন সম্বন্ধে লিখতে যেয়ে সম্পাদক তাঁর কৃতদাসের মালিক প্রভুদের এই বলে সতর্ক করেছেন যে—"বৃটিশ সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ জানেন যে এ সকল সীমান্তের সম্প্রদায়গুলি, এমন কি আফগানিস্থানও একা একা ভারতের বৃটিশ শক্তির সহিত কিছুই করে উঠতে পারবে না। কিন্তু, আফগানিস্থান রাশিয়া কিংবা অন্য শক্তি সমূহের সাহায্য পেলে বিপদ বাধাতে পারে। আমাদের পক্ষে "উৎকট স্বাদেশিক"এর, যিনি আবার নিজকে "সোশ্যালিষ্ট" বলে পরিচয় দেন, মতলব বোঝা বড় কষ্টকর। তাঁর সোশ্যালিজমের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ, এ কথা বলে তাঁকে ন্যাশন্যালিষ্টও বলা যেতে পারে না। রক্তপিপাসু বৃটিশ রাজের শেষ করার জন্য ইম্পি-রিয়েলিজমের যে বিরুদ্ধ শক্তি সংহত হবে তার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করার চেয়ে তিনি সকল স্বাধীনতার আশা পরিহারই করবেন। যে কোনো প্রকারে তিনি তার পরম্পরাগত সাম্প্রদায়িকতা ও রাশিয়ার বিরুদ্ধতার নীতি প্রমাণ করারই চেষ্টা করছেন। তাঁর এই উভয় মতই ভ্রমাত্মক। একবার যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারে তা হলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে দমাতে পারবে না। শ্রমিক ও কৃষকগণ যদি তাদের নিজেদের দলের দ্বারা সুপথে পরিচালিত হয় এবং লালাজীর ধরণের লোকেদের দ্বারা পরিচালিত না হয়, তা হলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।

সম্পাদক সত্যই কি ভাবেন তা উপসংহারে বেশ ভালোরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলছেন :—"বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কি তাঁদের ভারতের সৈনিক ও শাসন নীতির এমন পরিবর্ত্তন করবেন যাতে জনগণ সাধারণ ভাবে ভাবতে পারবে যে ভারতের সীমান্তে রুশ-বৃটিশ সংঘর্ষ বাধলে গ্রেট বৃটেনের স্বার্থই তাদের স্বার্থ হবে?" এখানে তিনি একটুকু কষ্ট করে চিন্তা করতে চান নি যে ভারতের শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকগণ যুদ্ধ থেকে কি লাভ করবে? গত যুদ্ধের দুঃসহ বোঝা যে তারা আজো তাদের ঘাড় থেকে নামাতে পারে নি। তাদের যদি আরো এক নূতন যুদ্ধে যোগদান করতে হয় তবে তারা যে শুধু কামানের খাদ্য হবে তা তো নয়, সমস্ত ট্যাক্সের বোঝাও যে তাদের বইতে হবে। অর্থনীতির দিক্ থেকে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। ভারতের মুক্তির তারিখ আরো অনেক দিন পেছিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কৃষক ও শ্রমিক-গণ এবং জাতীয়স্বর ভাবাপন্ন বুর্জোয়াজিগণ যদি বৃটিশের সম্বন্ধ ত্যাগ করে এবং বিপ্লবাত্মক শক্তির সহিত যোগদান করে তা হলে তারা সকল বন্ধন তা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক যে কোনো প্রকারেরই হোক না কেন, এড়াতে পারবেন। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম (শোষণবাদ) এর হাত হতে তারা কেবলমাত্র এই পথেই মুক্তি লাভ করতে পারবেন।

(ইংরেজী হইতে অনূবাদিত)

শ্রমিক জগৎ

[এ লেখাটা আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে পেয়েছিলেম। নানা কারণে যথা সময়ে প্রকাশ করতে পারিনি। (সম্পাদক, "গণবাণী"।)]

গত ১৩ই ও ১৪ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে নিখিল ভারতীয় প্রেস কর্ম্মচারী সম্মিলনার দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডেলিগেটের সংখ্যা প্রায় ৭০০.৮০০ হইয়াছিল। দর্শক হিসাবেও অনেক প্রেসের লোক উপস্থিত ছিলেন।

ডেলিগেট (প্রতিনিধি) ও দর্শক লইয়া প্রায় ১২০০ শতেরও উপর লোক সমাগম হইয়াছিল। সকলের মুখেই বেশ একটা উত্তেজনা ও উৎসাহের ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। আশা করা যায় এই সম্মিলনীটি প্রতি বৎসরেই হইবে এবং ক্রমে অন্যান্য স্থানের প্রেস কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও ইহার অধিবেশন হইবে। আচ্ছা, পাটকলের শ্রমিকদের নিয়ে একটা বাৎসরিক কনফারেন্স করা যায়না কি?

———

প্রেস কর্ম্মচারী সম্মিলনীর সভাপতির ও অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের অভিভাষণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। কনফারেন্সের কর্ত্তারা এবং প্রেস কর্ম্মচারী সমিতির কার্য্যকরী সভা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে কি ভাবিয়া অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান করিয়াছিলেন তাহা জানি না। অবশ্য বিপিন বাবুর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য সর্ব্বজন বিদিত। এ কথাও সত্য যে ধনিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র সংবাদ পত্রের অফিস গুলিতে তিনি যখন কার্য্য করিতেন তখন তাঁহাকে লাঞ্ছনাও বড় কম ভুগিতে হয় নাই। বাড়ী নাই, ঘর নাই, সঞ্চিত টাকাও ব্যাঙ্কে নাই—এরূপ অবস্থায় বিপিনবাবু যে intellectual proletariat এর একজন বিশিষ্ট সভ্য তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্তাদের একটি কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল। গত কুড়ি বাইশ বৎসরের ভিতর বিপিনবাবুর ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতের এতবার এবং বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে তিনি নিজেই বোধ হয় জানেন না, তাঁহার আদর্শ কি। তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহার অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মতের পরিবর্ত্তনের কথা এ উপলক্ষে কিছু বলাটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমার মনে হয় সে কথা না বলিলে তাঁহার প্রেস কর্ম্মচারী সম্মিলনের অভিভাষণের সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

———

যাঁহারা ১৯০৫ কি ১৯০৬ খৃঃ অব্দে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তাঁহারা বোধহয় বিপিনবাবুর স্বদেশী যুগের অগ্নিময়ী বক্তৃতার কথা এখনও ভোলেন নাই। বড় হইয়াও বোধ হয় Sir Valentine Chirol এর Indian Unrest নামক পুস্তকে বিশেষভাবে বিপিনবাবুর নামোল্লেখ দেখিয়া থাকিবেন। সে সময়কার বিপিনবাবু একজন অতীব উগ্র "গরমদলের" নেতা ছিলেন। তখন তিনি একেবারেই মানিতেন না যে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন (Dominion Status) লাভ করা। তিনি বলিতেন যে এইরূপ প্রার্থনা করা নিছক বাতুলতা মাত্র। কারণ, ইংরাজ কখনও ভারতবাসীকে ক্যানেডা বা অষ্ট্রেলিয়ার সমান অধিকার দিবে না। যে দিন হইতে এই বিশাল ভারতবর্ষ Self Government পাইবে সেই দিন হইতে ২৫ বৎসরের ভিতর কলিকাতাই সাম্রাজ্যের প্রধান সহর হইবে, লণ্ডনের প্রাধান্য আর থাকিবে না। তাঁহার এই মত পোষণ করার পক্ষে যুক্তি ছিল এই:—ইংরাজ আমাদের এই বিরাট জাতিটিকে এরূপভাবে পিষিয়া রাখিয়াছে যে আমরা উন্নতির পথে মোটেই অগ্রসর হইতে পারিতেছিনা। কিন্তু, একবার পেষণের চাপ যদি বাস্তবিক পক্ষে কমে তাহা হইলে আমাদের যা লোকবল, বুদ্ধিবল ও অর্থসমৃদ্ধির possibilities আছে তাহাতে আমাদের সকলের [illegible] আমাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। ইংরাজ [illegible] আমাদের শাসনের [illegible] [illegible] ছেড়েও আমাদের কিছুমাত্র [illegible] না। তবে কেন আমরা মিছামিছি Dominion Status [illegible] চেঁচাইয়া মরিব? [illegible] আমাদের আন্দোলনের [illegible] আমাদের [illegible] করিতে হইবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করাই সমীচীন। এই ছিলেন স্বদেশীযুগের বিপিনবাবু।

———

পরে বিপিনবাবুর এই মতের আমূল পরিবর্ত্তন হয়। [illegible] যাঁহারা তাঁহার Nationality and Empire পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। এই পুস্তকে বিপিনবাবু পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে Dominion Statusএ নামিয়াছেন। [illegible] তাঁহাকে স্বদেশীযুগের বিপিনবাবু বলিয়া চেনা যায় [illegible]। পরে তাঁহার পুস্তক New Economic Menace to India বাহির হয় এবং তাহাতে তিনি facts and figuresএর দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে ইংরাজ কি ভাবে ভারত হইতে [illegible] ক্ষতি পূরণ করিয়া নিবে। তারপর অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহার যোগদান, (সে সময়ে তিনি College ও University বয়কট করিবার জন্য ছেলেদের বলিয়াছিলেন—Education may wait but Swaraj cannot wait. তারপর বরিশাল সম্মিলনের (Barisal Conferenceএর) পর তাঁহার কংগ্রেস সংস্রব ত্যাগ, এ সকল কথাও বোধ হয় অনেকের মনে আছে।

———

এই কংগ্রেস পরিত্যাগ করিবার পর বিপিনবাবুর reactionary বা প্রতিক্রিয়াশীল মতের ক্রমশঃ বিকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার মনের গতি উল্টা দিকে যাওয়ার দরুনই তিনি Englishman কাগজে গিয়াছিলেন কিংবা ইংলিশম্যান কাগজে গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এ বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তবে যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি করিতেন তাঁহারা বিস্মিত নেত্রে ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ে এই বিরাট প্রখর বুদ্ধি ও উর্ব্বর মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তিটির দ্রুত অধঃপতন দেখিতে লাগিলেন।

———

প্রেস কর্ম্মচারী সমিতির তরফ হইতে যখন তিনি Chairman নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন সে সময়টা ছিল বড় খারাব। সে সময়টা বিপিনবাবু moderateদের ঝুলি ঝাড়িয়া কতকগুলি পুরাতন বুলিকে তাঁহার বুদ্ধি প্রাখর্য্যের দ্বারা মাজিয়া ঘষিয়া Englishman এর কলেবর শোভিত করিতেছিলেন এবং Englishmanএর সম্পাদকের সম্পাদকীয় বাহবা এবং পিঠ থাবড়ানিতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছিলেন। তিনি Englishmanএর Indian eyes হইয়া তাঁহার দেশবাসীকে তখন বুঝাইতেছিলেন যে ইংরাজের সহিত দ্বন্দ্ব করা বাতুলতা মাত্র। তবে ইংরেজকে যদি বুঝাইয়া শুঝাইয়া বলা যায় "ওগো তোমাদের স্বার্থ আমরা ঠিক বজায় রাখব,—স্বায়ত্ত শাসন পেলেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না," তাহা হইলে ইংরাজ আমাদের Dominion Status দিলেও দিতে পারে। ১৯০৬ সালে বিপিনবাবু বলিয়াছিলেন যে স্বায়ত্ত শাসন ইংরেজ কখনও ভারতবাসীকে দিবে না, কারণ, তাহাতে ভারত

ইংল্যাণ্ডকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিবে। আর ১৯২৭ সালে সেই ইংরেজ বিপিনবাবুর কথা শুনিয়া আমাদের Dominion Status দিবে। ভারতের আর England এর স্বার্থ যে পরস্পর বিরোধী—এ কথাটা আজ Indian eyesএ না পড়িতে পারে—কিন্তু ইংরাজের ১৯০৬ সালে দৃষ্টিশক্তি যাহা ছিল ১৯২৭ সালেও ঠিক তাহাই আছে—কেবল বিপিনবাবুরই বয়সের প্রভাবে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস পাইয়াছে।

———

কাজেই এ হেন বিপিনবাবু যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অধিকার অপেক্ষা কর্ত্তব্যকেই বড় করিয়া দেখিবেন এবং "hunger-driven," "greed inspired" ও "envy-incited" ব্রিটিশ ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকিতে পরামর্শ দিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যিনি এ কথা মনে করেন যে ইংরাজকে বুঝাইয়া বলিলেই সে তাহার স্বার্থ আমাদের উপর রক্ষা করিবার ভার দিয়া এদেশ হইতে চলিয়া যাইবে তাঁহার পক্ষে এ কথা বলা মোটেই আশ্চর্য্য জনক নয় যে capital যা করে করুক কিন্তু labour ক্ষুধার্ত্তই হোক, রুগ্নই হউক বা নিরক্ষরই হউক সে যদি ধনিকদের কাছ থেকে তার ন্যায্য দাবী বা অধিকার আদায় করতে যায় তাহা হইলেই সেটা "envy incited বা greed inspired" ব্যাপার হইয়া পড়িবে।

———

বিপিন বাবু বলিয়াছেন "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কিছু মনে করিবেন না, (কিন্তু) আমার মতে উচ্চহারে মজুরি, কম খাটুনি এবং কার্য্যের শর্ত্তগুলির উন্নতির ভিতর কোন নৈতিক মূল্য নাই "Gentlemen, excuse me for saying it, that higher wages, higher hours and pleasanter conditions of work have in themselves no superior ethical value." বিপিনবাবু এ কথাও বলিতে পারিতেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কিছু মনে করিবেন না কিন্তু আমার মতে ছেলেপুলের দরুণ মোটা ভাত কাপড়ের বন্দোবস্ত করা, নিজের স্বাস্থ্য অটুট রাখার বা নিজের ও ছেলেদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করার ভিতর কোন নৈতিক মূল্য নাই। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিতেছেন "If higher wages means greater opportunities for indulgence in vulgar carnalities, if lighter hours means greater leisure for indolence or employment in the Devil's workshop, if easier conditions of work means increased listlessness and inefficiency, then I must frankly confess to you that I would be much better without these." (যদি মজুরির হার বৃদ্ধি মানে হয় লালসা তৃপ্তি করার সুবিধা, যদি অল্প পরিশ্রম মানে হয় শয়তানের কর্ম্মশালের কর্ম্মবৃদ্ধি, যদি কর্ম্ম শর্ত্তের উন্নতি মানে হয় অমনোযোগ বা অযোগ্যতা তা'হ'লে আমি খোলাখুলিই বল্‌ছি যে এগুলি আমাদের না হওয়াই ভাল)। অবশ্য তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে এ সবের দরকার মনকে উন্নত করিবার জন্য। কিন্তু একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার সুস্থ দেহের পক্ষে যতটুকু পরিশ্রম সয় ততটুকু পরিশ্রম মাত্র করিবার, এবং সেই পরিশ্রমের পরও যাহাতে তাহার মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিবার সময় সে পায় এইরূপ অনুপাতে পরিশ্রমের সময় নির্দ্দেশ করার, নিজেদের ছেলেদের শিক্ষা দান করার ও তাহাদিগকে সুস্থ দেহে রাখিতে পারার—অধিকার সকলেরই আছে।

জন কয়েক শ্রমিক তাহাদের মানবোচিত অধিকার লাভ করিয়া পাছে সে সব অধিকারের অপব্যবহার করে এই আশঙ্কায় আঁৎকিয়া না উঠিয়া বিপিন বাবু যদি তাহাদের গোটাকতক পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাঁহার মত লোকের যোগ্য কাজই করিতেন। তাহা না করিয়া গুটি কয়েক ছেঁদো উপদেশের দ্বারা শ্রমিকেরা "কি করিবে না" সেই বিষয় সাবধান করিয়া দিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই সম্বন্ধেই গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একথা কোথাও বলেন নাই যে ধনিকেরা অনেক সময়ই ঘটনা চক্রে জন্মাধিকার সূত্রে যে রাশি রাশি প্রাপ্ত অর্থের নানা প্রকার হীন কার্য্যে অপব্যয় করিয়া থাকেন এবং শ্রমিক দিগকে তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত রাখেন তাহা মন্দ কাজ এবং এ টাকা ধনিকদের পাওয়া উচিত নয়। তাহা বলিলে বোধ হয় তাঁহার ন্যায়ের আদর্শ ছোট হইয়া পড়িত। বিপিন বাবু বৃদ্ধ বয়সে এখন শান্তি-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ইংরাজগণকে তর্কের দ্বারা বুঝাইবেন যে আমাদের দ্বারা তাঁহাদের কোন স্বার্থের হানি হইবে না। আর শ্রমিকদের বলিবেন, যেমন তিনি ইংরাজ প্রভুদের নিকট এ যাবৎ কাল শুনিয়া আসিয়াছেন, যে First deserve then desire" কিন্তু deserve করিতে গেলেই যে আগে desire করিতে হয় এবং desire করিলেই যে desire টাকে সফল করিবার চেষ্টাও করিতে হয়। কিন্তু সেই চেষ্টা করিতে গেলেই বিপিন বাবু "greed inspired or envy incited" বলিয়া গালাগালি দিবেন; ব্যাপার মন্দ নয়।

—০—

সভাপতি Hon'ble Sayed Muhammad Padsha saheb Bahadur মহাশয় একজন Liberal. শ্রমিকের প্রতি শুনিয়াছি তাঁহার কিঞ্চিৎ সহানুভূতিও আছে। তাঁহার বক্তৃতায় নূতন কিছুই ছিল না, তবে উল্লেখ যোগ্য বিষয়ের ভিতর ছিল বিপিন বাবুর সহিত মতান্তর। বিপিন বাবু বিদেশীয় শ্রমিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু পাদশা সাহেব বিলাতি শ্রমিক আন্দোলনের আদর্শের অনুসরণ (অনুকরণ নহে) করিতে বলিয়াছেন। আর একটা স্থানেও বিপিন বাবুর সহিত তাঁহার অনৈক্য হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় বিপিন বাবুর ন্যায় "নৈতিক মূল্যের" অনুসন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া মোটা সাদা কথায় শ্রমিক আন্দোলনের একটা মূল উদ্দেশ্য বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। "The chief object of the labour movement is to ensure to the worker a fair day's pay for a fair day's work. In determining this, regard should be had not only to the question of demand and supply but also to the requirements of the worker to the requirements not only of an efficient worker, but as one filling a place in the social order and if these requiremts are not supplied the worker fails to make his due contribution to the society and "not only does he suffer himself but the social order suffers through him. Therefore it is not his interest

and in the interests of society "that the worker should be able, as the reward of his work, to secure his material conditions, not only of a healthy life but of what we may call succintly a civil life." শ্রমিক আন্দোলনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য যে ন্যায্য কাজের ন্যায্য মজুরি আদায় করা। এই মজুরি যে কেবল চাহিদা ও আমদানীর উপর নির্ভর করে তাহা নয়। মজুরির হার স্থির করিবার সময় দেখিতে হইবে যে একজন দক্ষ শ্রমিকের কি কি প্রয়োজন—শুধু তা দেখিলেও চলিবেনা, দেখিতে হইবে যে সেও সমাজের এক অংশ এবং তাহার ভাল বা মন্দ হওয়ার উপর সমাজের ভাল মন্দ নির্ভর করে।

সত্যপ্রিয়

—

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সহিত সংস্পৃষ্ট শ্রমিক সংঘ সমূহের সভাপতি এবং সেক্রেটারী মহোদয়গণ সমীপেষু

—০:*:০—

আপনারা সংবাদপত্রে নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বি, এন, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ব্যয় লাঘব করিবার প্রণালীর প্রস্তাবের দরুণ খড়্গপুরে একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাঁহাতেই এই নিবেদন লেখার সময় পর্য্যন্ত ১,৭২০ জন শ্রমিকের প্রতি কর্ম্মচ্যুতির নোটীশ জারী করা হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা অনুধাবন করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সময়ে ২,২০০ জন শ্রমিককে বাদ দেওয়া হইবে। তাহাদের মধ্যে ২০০০ হাজার শ্রমিক খড়্গপুর কারখানার অন্তর্ভুক্ত, বাকী নাগপুরের। কর্ত্তৃপক্ষ ব্যয় সংক্ষেপের অজুহাতে এই ভীষণ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। বি, এন, রেলওয়ের ভারতীয় শ্রমিক সঙ্ঘ প্রকাশ করিতেছেন যে, এই ব্যবস্থাটীর দ্বারা প্রকৃততঃ ব্যয় সংক্ষেপের পরিবর্ত্তে নিছক জুলুম ও প্রতারণার ভাবই দেখা যাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ তদন্তচ্ছলেও দেখে নাই যে ব্যয় সংক্ষেপের আর কোনো উপায় উপরে রহিয়াছে কিনা। যে সমস্ত শ্রমিকদের উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে তাহারা ইউনিয়নের কর্ম্মঠ সভ্য ও ইউনিয়নের পরিচালক কর্ম্মী। তাহারাই গত ধর্ম্মঘটের সময় শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাই সকল কথা নয়। একাধারে যেমন একদিকে ষ্টাফকে বাদ দেওয়া হইতেছে, তেমনই অপর দিকে নূতন লোক ভর্ত্তি করা হইতেছে। গত কয়েক মাস ধরিয়া যখন ব্যয় হ্রাসের নাম গন্ধও শোনা যাইত না তখনও ৩১৮ জন লোককে ভর্ত্তি করা হইয়াছে এবং বড় মাহিনার চাকুরীতে ইউরোপীয়ানদের গ্রহণ করারও কথা চলিতেছে। আমি আপনাদের কাছেই উপরিউক্ত ঘটনা গুলির বিচারের ভার ছাড়িয়া দিতেছি যে প্রস্তাবিত ব্যয় সংক্ষেপ ব্যবস্থাটী, যে ইউনিয়ন কলের মালিকদের উদ্ধত ব্যবহারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার দাবী প্রতিপন্ন করে আসছে সেই ইউনিয়নের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিবার একটা ফন্দি কিনা! গত জানুয়ারী মাসে শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য দাবীর জন্য যেরূপ ভাবে লড়িয়াছিল তাহাতে তাহাদের নাজেহাল করিবার জন্যই যে এইরূপ প্রতিশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা তাহা আপনারা বিচার করিয়া দেখিবেন।

সত্য কথা বলিতে গেলে, দেখা গিয়াছে যে গত বার বি, এন, আর, ভারতীয় শ্রমিক সংঘ যখন আপনাদের ন্যায্য দাবীর জন্য প্রাণপণে লড়িয়াছিল তখন, কি জন সাধারণ, কি বিভিন্ন শ্রমিক সংঘ কাহারও নিকট যথোপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যায় নাই। যখন শ্রমিক সংঘের কর্ম্মীদের উপর গুলি চালানর ফলে, মহিলাদের খোঁচার ঘায়ে এবং অবশেষে পক্ষপাতিত্ব দুর্ব্যবহারের ফলে, জন সাধারণ উত্যক্ত ও ক্রোধোদ্দীপিত হইয়াছিল তখনো কিন্তু যে ২০০০০ হাজার লোক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাতে যাইয়া গত শীতের সময় কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহাদের উদ্ধারের কোনো চেষ্টা সংহত ভাবে করা হয় নাই।

ইহার জন্য শ্রমিক সংঘ বাদিগণ যতখানি দায়ী ততখানি কিন্তু জন সাধারণগণ দায়ী নহেন। আমরা কি সভার পর সভা আহ্বান করিয়া দেশ বাসী গণকে এই সকল অবৈধ অত্যাচারের কথা কখনো জ্ঞাপন করিয়াছি? মাত্র কয়েকটা সংঘ ছাড়া সকলেই এই দুঃখের দিনে সাহায্য করিতে অক্ষম হইয়াছিল। শ্রমিক সংঘবাদিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রমিকগণকে এই সংগ্রামের অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষিত করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রমিকগণকে এইরূপ শিক্ষার অধিকারী কর্ম্মিগণ করেন নাই যাহাতে তাহারা মনে করিতে পারে যে বি, এন, আর (ভারতীয়) শ্রমিক সংঘের মত সংঘ যদি মালিকদের চাপে ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই প্রকার অব্যবস্থার জন্য একদিকে যদ্রূপ ভারতীয় জন সাধারণের পক্ষে গৌরব করিবার কিছুই নাই, অন্যদিকে তদ্রূপ ভারতীয় শ্রমিকসংঘবাদীদের পক্ষেও ইহা গৌরবের কথা নহে যে, শ্রমিকগণের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির সংগ্রামের সাহায্য কল্পে অধিক অর্থ বৃটিশ শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

হে বন্ধুগণ, যে সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে শ্রমিকগণ পীড়িত হইতেছে তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করে, আপনারা কি আপনাদের নিজ নিজ সংঘ গুলির মধ্যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সদস্যগণকে লইয়া, ইহার প্রতিকার কল্পে সভা আহ্বান করিয়া, শ্রমিকগণকে বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে সম্যক অবহিত করাইয়া, আপনাদের সামর্থ অনুযায়ী সাহায্য করিবেন না?

শ্রীকিশোরীলাল ঘোষ

অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাদেশিক সংগঠনকারী।

—

উসমানী অভিনন্দিত

14.7.27

—০:*:০—

কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় দণ্ডিত কম্যুনিষ্ট মোহাম্মদ শওকৎ উসমানী গত পূর্ব্ব বুধবারে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়ার দ্বারা আহূত বোম্বের মাড়োয়ারী বিদ্যালয় হলে এক সাধারণ সভায় অভিনন্দিত হয়েছেন। বৃটিশ লেবর রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টের প্রতিনিধি মিঃ পি, স্প্রাট সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথমেই কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে কে, এন, জোগলেকার তাঁকে অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন যে কম্যুনিষ্টগণকে নির্য্যাতিত করে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে কম্যুনিজমের প্রবাহকে মোটেই থামাতে পারে নি। কম্যুনিজমের জন্যে যে তিনি

উস্‌মানীকে হৃদয়ের প্রীতি ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তার পরে এ মোকদ্দমার অন্যতম অভিযুক্ত (যিনি উস্‌মানীর পূর্ব্বে মুক্তি পেয়েছেন) এস, এ, ডাঙ্গে বক্তৃতা দিতে উঠে কানপুরের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে তার সঙ্গে সঙ্গে কমরেড্ উস্‌মানীও বলশেভিক চর বলে নির্য্যাতিত হয়েছেন অবশ্য এ কথা সত্য যে বন্ধু উস্‌মানী কম্যুনিজমের শিক্ষার জন্যে মস্কো গিয়াছেন এবং ১৯২১ সনে মস্কোতেই কাটিয়েছেন। তার পরে তিনি বলেন যে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী ছিলেন ব'লে তাঁরা সাজা পান নি। তাঁদের সাজা হয়েছিল এই কারণে যে তাঁরা ধনিকবাদ ও ইম্পিরিয়েলিজমকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কম্যুনিষ্টদের কারাগারে নিক্ষেপ করে গবর্ণমেণ্ট এ আন্দোলনকে দমাতে চেয়েছেন। কিন্তু, যতদিন দেশে দারিদ্র্য থাকবে, যতদিন জনগণ শোষিত হতে থাকবে ততদিন এ'তে অনুসরণকারীর অভাব হবে না।

ভারতের জাতীয় দলের কাগজগুলির কথা বলতে যেয়ে কমরেড ডাঙ্গে দুঃখের সাহত বলেছেন যে সব কাগজ গুলিই ধনিকদের স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ, জনগণের স্বার্থের প্রতি এতটুকুও দৃষ্টি তাদের নেই।

তার পরে আর, এস, নিম্বকর ও এস, এস, মিরাজকর প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে কমরেড শওকত উস্‌মানী বলেন যে যদিও কারাযন্ত্রণা ভুগে ভুগে তাঁর শরীর অস্থিচর্ম্ম সার হয়েছে, যদিও তিনি ক্ষয় রোগে ভুগছেন, তথাপি তিনি কম্যুনিষ্টরূপেই জীবন ধারণ করবেন, কাজ করবেন এবং মরবেন।

কমরেড সাকলাৎ ওয়ালার পাসপোর্ট ভারতের জন্যে বাতিল করা হয়েছে বলে তার তীব্র প্রতিবাদ করেও এ সভায় এক মন্তব্য গৃহীত হয়েছে।

("ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড")

শ্রমিক প্রতিনিধি গেরেফ্‌তার

—০—

মিঃ পি, স্প্রাট ইংল্যাণ্ডের লেবর রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টের তরফ থেকে ভারতের শ্রমিক অবস্থা অধ্যয়ন করার জন্যে ভারতে এসেছিলেন। গত ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করছেন। তাঁর বেশীর ভাগ দিন বোম্বেতেই কেটেছে। জুন মাসের শেষ ভাগে তিনি লাহোরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি আবার বোম্বেতে ফিরে এসে সেখানকার সেণ্ট্র্যাল ওয়াই, এম, সি, এ তে থাকছিলেন। ৭ই তারিখে সেখানে তাঁর ঘর পুলিস খানা তালাশি ক'রে কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায়। এ তালাশিটা হয়েছিল "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না" নামক পুস্তকের জন্যে। তার পরে ওয়াই, এম, সি, এ, ওয়ালারা মিঃ স্প্রাটকে সেখানে থাকতে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি বোম্বের ওয়াট্‌সন হোটেলে চলে যান। লাহোরে তিনি দিওয়ান চেমনলালের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। সে জন্যে দেওয়ান সাহেবের অনুপস্থিতে বোম্বের তালাশির পরে তাঁরো বাড়ীতে তালাশি করা হয়েছিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে অপরাহ্ণ ৪টার সময় তিনি বোম্বের ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজ্যাণ্ট্‌স পার্টির আফিসে ট্রেড্ ইউনিয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করতে যান। তখন সেখানে মিঃ শওকৎ উস্‌মানী, মিঃ এস, এস, মিরাজকর, মিঃ এস, ভি, ঘাটে ও মিঃ সি, জি, সাহ্ন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ৫৷০ সময় সি-আই-ডি ইন্‌স্পেক্টর মিঃ দেশাই ও মিঃ কোঠারে ম্যাজিষ্ট্রেটর পরওয়ানা নিয়ে সেখানে এসে তাঁকে গেরেফ্‌তার করেন। সেদিন রাত্রেই পেশোয়ার মেলে মিঃ স্প্রাট্ এর লাহোর যাবার কথা ছিল। গেরেফ্‌তারের পরে তাঁকে ওয়াটসন হোটেলে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরে তাঁকে সেদিন রাত্রে এস্‌প্লেনেড্ থানায় রাখা হয়।

১৬ই তারিখে বোম্বের চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের চেম্বারে মিঃ স্প্রাটকে পুলিশ হাজতে থাকতে দেওয়ার জন্যে দরখাস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে মিঃ স্প্রাটের তরফ থেকে মিঃ জে, বি, পাটেল ও মিঃ এফ্, জে, জিনওয়ালা তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেবার জন্যে দরখাস্ত করেন। এ দরখাস্তের বিরুদ্ধাচরণ করে বোম্বে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জানান যে মিঃ স্প্রাটকে জামিনে ছেড়ে দিলে তা সাধারণের আশঙ্কার কারণ হবে।

তাঁর কৌঁসিলিগণ জানান যে তিনি কেবল শ্রমিক আন্দোলনে আপনাকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সাধারণ বিচারে তাঁর পক্ষে ভয়ের কোনো কারণ নেই, আর তাঁর পালাবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। অতঃপর, পুলিশের পক্ষ থেকে এক দলীল পেশ করা হয় এবং বলা হয় যে এটা মিঃ স্প্রাটের নিজের হাতের লেখা। তাতে যে অংশটা রাজ-দ্রোহ মূলক ছিল তৎপ্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্প্রাটের কৌঁসিলিদ্বয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সেখানকার আলোচনা থেকে এ'ও জানা গিয়েছে যে পুলিশের লোকেরা মিঃ স্প্রাটকেই "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না" নামক পুস্তকের গ্রন্থকার বলে ঠাওরিয়েছেন

ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন মঞ্জুর করতে অস্বীকার করলে মিঃ স্প্রাটের কৌঁসিলিগণ তাঁকে জেলের হাজতে রাখবার কথা বলেন। পুলিশ পক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মিঃ স্প্রাটকে জেলের হাজতে রাখবার জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিয়েছেন।

মিঃ স্প্রাট কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট তাঁর বয়স তেইশ কি চব্বিশ বছর হবে।

গণ-আন্দোলন ও শিক্ষিত সম্প্রদায়

—০:*:০—

(আফতাব আলী)

—০—

সেদিন আমার জনৈক সদ্যপ্রসূত গ্রেজুয়েট বন্ধু আমায় ইউনিভারসিটির পুরোপুরি কায়দা ও গাম্ভীর্য্যকে বজায় রেখে প্রশ্ন করে বসলেন,—"তুমি যে গণ-আন্দোলন, গণশক্তি (Democracy) সোশ্যালিজম (সাম্যবাদ) ইত্যাদি বলে বলে মাথা ঘামাচ্ছ,—ও গুলো কি Practicable ?—আমার স্মরণ-শক্তির আরও একটু বেশী তীক্ষ্ণতা থাকলে হয়ত বন্ধুর

ইংরাজিটি অবিকল বসিয়ে দিতে পারবেন!"—ঐ যে ছেলে মেয়েদের দেখতে পাচ্ছ, বল দেখি ওরা প্রত্যেকেই কি প্রত্যেকের সমান হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে? না, তাদের মধ্যে কোন 'তফাৎ' বা বৈষম্য আছে?—"আমি ইঙ্গিতে বন্ধুর বৈষম্যের theory কে মেনে নিতেই বন্ধুর মুখ খানি বেশ উজ্জল হয়ে উঠলো। তিনি বলতে লাগলেন,—"শুধু মানুষে নয়, শ্রীভগবানের প্রত্যেক সৃষ্টিতেই কিছু না কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হ'বে; আর ও' ত বৈষম্য নয়—ও' হচ্ছে সৃষ্টির বৈচিত্র্য, সৃষ্টির চিরপ্রচলিত ধারা; ও গুলোর ভিতর দিয়ে 'তোমাদের' সোশ্যালিজম কতটুকু কার্য্যকরী হ'বে? কি দিয়ে ক্ষুদ্র মানব সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির এই বড় বৈচিত্র্যটুকুকে ফাঁকি দিবে?—"অর্থাৎ জগতে চিরদিনই ধনিক ও শ্রমিক থাকবে, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত থাকবে, আরও সহজ কথায় জগতে ন্যায় অন্যায় কিছুই নহে, সবই হচ্ছে "বিধির বিধান"।

বন্ধু, বাস্তবিকই জগতে এ সব যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, তার সবটাই কি ঐ 'বিধির বিধান'? এই যে জগতে মানুষ, মানুষের উপর অহর্নিশ অত্যাচার ও অবিচার করে আসছে, সবল দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতাকে আরও চেপে ধরে তার যথা সর্ব্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে, এসবও কি 'বিধির বিধান'? এই যে তুমি আর আমি গোলাম হয়ে জন্মেছি, হয়তো গোলাম থেকেই মরবো,—তা'ও কি তোমার 'বিধির বিধান'? এই যে তুমি ব্যথিত স্বরে বলছো "অভাব মানুষকে আত্ম সম্মান যে কি তা' ভেবে দেখবার অবসরটুকুও দেয় না,—" আর এই যে আমি এই নিঝুম রাতে তোমার মত নিকট বন্ধুর সরলতা মাখা তর্ক গুলোকে নির্দ্দয় সমালোচকের মত তীব্র ও বিষাক্ত তুলিতে অঙ্কিত করে বরাবর খবরের বাজারে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বুকের উপর হাত রেখে বল দেখি এ'ও কি ঐ 'বিধির বিধান'?

হাঁ বন্ধু, মানুষ জগতে সমান হয়ে জন্মায় না তা' সত্যি কথা। কিন্তু বল, তবুও এই দেশশুদ্ধ মানুষ গুলোকে শুধু একটী মাত্র গবর্ণমেন্টের কাছে জবাব দিহি করা হয়েছে কেন? এই একই আইন বা দণ্ডের আঘাতে এই এতগুলো অ-সমান মানুষকে জাঁকপেষা করা হচ্ছে কেন? তুমি হয়তঃ বলবে, "Law and order অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খলার জন্য, জগতে 'শান্তির' জন্য। কিন্তু তোমার এই—আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উপকরণ গুলি কি কি? কামান, বন্দুক ও সঙ্গীন ব্যতীত আর কিছু আছে কি? জগতে যখন কোন মানুষ তোমার এই আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তির সত্যাসত্য ও ন্যায় অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন করেছে তখন কোন মানবিক যুক্তি তার উত্তর দেয়নি,—তার উত্তর দিয়েছে তোমার কামান, তার উত্তর দিয়েছে তোমার মেশিনগান্!

আর মানুষ—সমান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে বা করে না, তা'তে সোশ্যালিজমের কি হ'লো? তুমি বলতে চাও নাকি যে মানুষ Equality সমতা নিয়ে আসে না বলে, এ সংসারে আর Equalityর সমতার নাম গন্ধও পাবে না? আমার ভয় হয় বন্ধু, তোমার লজিক তোমায় একটা মস্ত বড় ফাঁকি দিয়েছে। আমরা ত মানুষের গঠন মূলক, শারীরিক বা দৈহিক বা আকৃতিক সমন্বয় চাই না। আমরা চাই রাম, হরি ও যদুর ব্যক্তিগত ও গঠন মূলক বৈষম্যকে সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে তা'দের অবস্থা ও সাংসারিক জীবন-যাপনের উপকরণ ও উপাদানের মধ্যে এক সম বিভাগ বা সমন্বয় নিয়ে আসতে। মোট কথা—আমরা বলতে চাই যে, "—Socialism is not at all concerned with the creation of an anatomical, physiological and sychical equality, but endeavours only to ensure people similar material conditions of existence—Trotsky."

তুমি বৈষম্যকে 'বৈচিত্র্য' বলেছ, হাঁ, তা' অনেকটা বৈচিত্র্যই বটে! ক্ষুদ্র মানব শ্রীভগবানকে ফাঁকি দেয়, না শ্রীভগবান 'ক্ষুদ্র' মানবকে ফাঁকি দেয় সেটা জগতের প্রত্যেক মানুষ জানতে পারলে যে আরো একটা বড় বৈচিত্র্যের উদয় হ'তো-না তা কে বলতে পারে? যা'ক, আমি এ ক'দিন থেকে ভাবছিলুম যে, তুমি এ পুরাণো সুরের 'গৎ' গুলো কোত্থেকে আবিষ্কার করলে! সোশ্যালিজমের ইতিহাসের সঙ্গে তোমার যৎসামান্য পরিচয় থাকলেও, আজকে তুমি স্বীকার করতে বাধ্য হ'তে যে, ঐ সমস্ত বাঁধা 'গৎ' গুলো সোশ্যালিজমের শত্রুরা দাদার—দাদাম'শায়ের কাল থেকেই গেয়ে আসছে। এবং গাৎগুলোও যে নেহাৎ বেসুরা তা' নয়, আর তা'তে যে শুধু তুমিই ধরা পড়েছ তা'ও নয়, জগতের বহু সরল ও স্বার্থশূন্য মণিষীরও এ দুর্দ্দশা (বা সৌভাগ্য, তা'ই যদি তুমি মনে কর) ঘটে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তুমি হয়তো অবগত নও যে, জগতের যে কোন স্থানে যখন লুণ্ঠিত ও শোষিত মানুষ তার লুণ্ঠিত প্রাপ্যের কথা উত্থাপন ক'রে সমাধিকারের দাবী করেছে, সেই দিনই তা'কে এ সমস্ত বাঁধা তর্ক অর্থাৎ "মানুষ সম হয়ে জন্মায় না", "সৃষ্টির চির বৈষম্য" "বিধির বিধান" ইত্যাদির কথাগুলো শুনতে হয়েছে এবং তা'তে এক জন সোশ্যালিষ্ট বা সাম্যবাদীর আশ্চর্য্য হ'বার মত কিছু আছে বলেও মনে হয় না। তবে তর্কগুলো সাধারণতঃ ধূর্ত্ত ইম্পিরিয়েলিষ্ট (শোষণবাদী) ও শোষণকারী ধনিক বা তাদের পোষা জীবদের মুখ থেকেই শোনাটাই হচ্ছে আমাদের বেশী অভ্যাস। তোমার মত ভুক্তভোগীর মুখে শুনতে পেলে আশ্চর্য্য না হ'লেও একটা সন্দেহের উদয় হয় বটে। সন্দেহটা হ'চ্ছে এই যে ভারতের মত দুর্ভাগা দেশে যেখানে এখনও সোশ্যালিজমের মতবাদ তার শিশুকালও ডিঙ্গিয়ে যায়নি সে-দেশেও সোশ্যালিজমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সর্ব্বদা হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করতে ওর শত্রুগণ সচেষ্ট রয়েছে। তারা বেছে বেছে বিরুদ্ধ-মত-পোষিত প্রবন্ধ ও সমালোচনার আমদানীও করছে। বন্ধু, আমি তোমার সোশ্যালিজমের অধ্যয়নের একমাত্র উপাদান অর্থাৎ Modern Thought এর Education and Socialist Movement এর কথাই বলছি। হাঁ, লেখক এ কার্য্যের জন্য যে একজন পাকা ওস্তাদ লোক, তা আমি তোমার কথার আভাসেই অনেকটা বুঝে নিয়েছিলেম।

প্রবন্ধটী না পড়লেও বোধ হয় আমার চলতো। কিন্তু তোমার ইউনিভারসিটির ঘ্রাণশক্তির বিশেষ তারিফ করতে হয় বটে। বাস্তবিকই ইউনিভারসিটি যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের Atlantic Monthlyর গর্ভ থেকে এ হেন মহারত্নের পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন, তা' অতীব প্রশংসার্হ এবং আমার পক্ষে এটা অনধিকার চর্চ্চা না হ'লে আজই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পত্র লিখতুম!

এই প্রবন্ধটী শুধু তোমার স্বাধীন ও সৎ চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু ও বিষাক্ত করে দিয়েছে বলে জানতে পারলে হয়তঃ আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেম; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে,

তোমার মত আরো অনেক শিক্ষিত ও সাধু যুবকেরও অবস্থাই তাই হবে। আর কেবল এই প্রবন্ধও তো নয়। আর-ও অনেক কিছুর সৃষ্টি করছে গণ-আন্দোলনের শত্রুরা। বড় দুঃখের সহিত আজকে আমাদিগকে বলতে হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের দেশের Masses বা জনগণকে বড় তুচ্ছ করে আসছেন। ঐ সাধারণ সম্প্রদায় বা দেশের জনগণের প্রতি যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একেবারেই সহানুভূতি নেই তা আমরা বলছি না। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তাদের প্রতি যতদূর সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া দরকার ততদূর হ'তে এমনও প্রস্তুত হন নি। আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ও যে জনগণের অন্তর্ভুক্ত তাও তাঁরা মানেন না বা জানেন না।

এই শিক্ষিত দলের উপরেই ত দেশের অনেকটা শুভাশুভ নির্ভর করছে আর এই শিক্ষিত দলকেই যে ভারতের ঘুমন্ত গণশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হ'বে তা'ও একাধিকবার বলা হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্তও শিক্ষিত ভ্রাতাদের এদিকে বিশেষ কিছু অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে না। অধিকন্তু শিক্ষিত দলের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা' মোটেই আশাপ্রদ নহে। কথাটা যে মাত্র দু' একটা ব্যক্তিগত ঘটনা আর অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, তা' আশা করি কেহ ভ্রমেও মনে স্থান দেবেন না। এ আমাদের নিয়মিত অনুসন্ধানের ফল। সত্যের খাতিরে আজকে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত ভ্রাতারাই গণ-আন্দোলন, গণশক্তি ও সাম্যবাদের কোনই ধার ধারেন না। তাঁহারা মনে করেন যে কৃষক শ্রমিক বা সাধারণ লোকের সঙ্গে মিলামিশা বিশেষ ঘৃণা ও ছোট লোকের কাজ! তা'দের এ মিশতে না চাওয়ার দু'টি কারণ সর্ব্বাগ্রে ও সহজে দৃষ্ট হয়। প্রথমটা হচ্ছে Social distinction বা সামাজিক বৈষম্য এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে খুবই মারাত্মক—Lack of faith in humanity বা মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাসের অভাব।

এখন প্রথম কারণটার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে তা খুঁজে দেখা যাক। আমাদের শিক্ষিত দলের কোন সামাজিক উচ্চতা মেনে নিতে আমরা মোটেই প্রস্তুত নহি। যেহেতু প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর নন। বর্ত্তমান সমাজের প্রথানুসারে শুধু Landed Aristocracy বা ভৌম-আভিজাত্যের কিংবা ধনিকগণেরই সামাজিক ও রাজনৈতিক উচ্চতা ও সুবিধা (Sacio-politico advantage) আছে। কিন্তু শিক্ষিত দলের অধিকাংশেরই উপরি উক্ত সুবিধা আছে বলে মনে হয় না। কারণ, তাহারা প্রায় সকলেই চাকুরী জীবী বা Wage earners. তা' হলে প্রশ্ন হচ্ছে যে শিক্ষিত দল কোন শ্রেণীভুক্ত? শিক্ষিত দলের শ্রেণী নির্দ্দেশ করতে হলে প্রথমে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিমান নিরূপণ করাই হচ্ছে একান্ত আবশ্যক। কারণ, এযুগে মানুষের শ্রেণী বিভাগ হয় তাদের আর্থিক অবস্থার পরিমাণ নিয়ে। আমাদের শিক্ষিত দলের আর্থিক অবস্থা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করলে ইহা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে তাহারা হচ্ছেন আমাদের দেশের মধ্যবর্ত্তী ও নিম্ন মধ্যবর্ত্তী (Middle and lower middle) শ্রেণীভুক্ত।

শিক্ষিত দলের আর একটি অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক আখ্যা হচ্ছে এই যে তারা Aristocrats না হ'লেও "ভদ্রলোক"। "ভদ্রলোক" সংজ্ঞার বিশেষ কোন নিয়ম নেই। সাধারণত দৈহিক শ্রম থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারলেই 'ভদ্রত্বের' পূরাপূরি না হলেও অন্তত: বার আনা দাবীও করা যায়। এই ঘৃণ্য 'ভদ্রত্বের' মোহই আজ বাংলার তথা ভারতের মানবতাকে এমনি করে' হেয় করে তুলেছে। এমন কি নিরক্ষর বা সাক্ষর কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যেও "ভদ্রলোকের" সংখ্যা কম নহে। এবং আমাদের শিক্ষিত দল যে বহুল পরিমানেই উপরি উক্ত নিরক্ষর বা সল্পাক্ষর পরিবার হতে এসেছেন তাহাতেও কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষিত ভ্রাতারা আশা করি এ সত্যটাকে স্বীকার করবেন। সুতরাং আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতাদের অনর্থক সামাজিক বৈষম্য হেতু কৃষক শ্রমিকদের সঙ্গে মিশতে না চাওয়ার মূলে কোন প্রকার যুক্তিপূর্ণ বা ন্যায় সঙ্গত কারণ আছে কি? আশ্চর্য্যের বিষয়, তবুও কেন যে ভ্রাতাদের উচ্চ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'আভিজাত্যের' লিপ্সা বেড়ে যায় তা' আমরা মোটেই বুঝতে পারছি না। আমরা অনেক সময় দেখেছি আমাদের শিক্ষার্থী যুবকেরা প্রায়ই তাদের আত্মীয় স্বজনের প্রকৃত পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন; আর যাঁদের আত্মীয় স্বজন জমিদার, খাঁ বাহাদুর, রায় বাহাদুর, হাকিম হোকমা, তাঁরা খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। কেন এসব হয়? অনেকে হয়ত: বলবেন শিক্ষাই একটা আভিজাত্য বা স্বাতন্ত্রতার সৃষ্টি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার তা' নয়: এ সব হচ্ছে আমরা যে সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করি তারি জন্যে "– due to the atmospheric condition of the society under which we live"—.

দ্বিতীয়টা "মনুষ্যত্বের উপর অবিশ্বাস—" তা' ও যে এই বিষাক্ত আব-হাওয়ার দরুণ সৃষ্ট হয়েছে তা' বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শিক্ষিত দল তাদের নিজেদেরই স্বার্থে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অজ্ঞাত না থাকলে উপরি উক্ত মতটা কখনও পোষণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহের বিষয়। ভারতের গণ-শক্তিকে অবিশ্বাস করে যে শিক্ষিত ভ্রাতারা প্রকারান্তরে নিজেদেরেই অবিশ্বাস করছেন, তা'—হয়ত: তাঁহারা এখনও অবগত নহেন। কিন্তু আমরা তাহা বেশ অবগত আছি। কারণ শিক্ষিত ভ্রাতারা যে দেশোন্নতি ও দেশ মুক্তির পথ কতটা পরিষ্কার করতে সমর্থ হয়েন তা' আমরা ভাল করেই জানি। Resolutions এর জোরে বা নরম গরম বক্তৃতার তোড়ে যদি দেশোদ্ধার হতো, তা' হলে আমাদের ঐ শিক্ষিত ফৌজ, কেরানী রেজিমেণ্ট, বাবু পল্টন এবং খদ্দরী নেতাজীরাই যে রাতারাতি ভারত উদ্ধার নাটকের যবনিকা টেনে দিতেন, তাতে আমাদের কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু তা'ত হয় না। একটা নায়ক ত দশটা নায়কের প্লে করতে পারে না; ভারত উদ্ধার নাটকের প্লে করবে ভারতের জনগণ—একজন বা দু'জনে নয়। মানসিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতা যে মানুষের Faith বা বিশ্বাসের পরিমাণ নিরূপণ করে, আশা করি তাতে কোনই ভিন্ন মত হবেন না। তাই যদি হয়, তা হলে ঐ যে নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিক সাধারণের উপর শিক্ষিত ভ্রাতাদের এতাদৃশ বিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা' তাদেরই মানসিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতার যথেষ্ট পরিচয় নহে কি?

ক্রমশঃ

———

দেশ বিদেশ

হাওড়া বোমার মামলা—

আলীপুরে হাওড়ার বোমার মোকদ্দমার বিচার করার জন্যে যে ট্রাইবিউন্যাল বসেছিল তার জজগণ মোকদ্দমার রায় শুনিয়েছেন। শ্রীযুত গৌরচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাস প্রত্যেকেই ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

নূতন মিনিষ্টার—

স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও নওয়াব মোশাররফ হোসেন খান বাহাদুর বাংলা দেশের মিনিষ্টারের খালি পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। কাজের ভার নেবার সুযোগ যখন তাঁরা করতে পারবেন তখনি তাঁ-দিগকে গবর্ণর নিয়োগ পত্র দিবেন।

"নিউ লীডার" অভিযুক্ত—

"নিউ লীডার" ইংল্যাণ্ডের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্যর ওয়াইণ্ড হ্যাম চাইল্ডিস্ এর কর্ম সম্বন্ধে একটা প্যারা লিখিত হয়েছিল বলে তিনি "নিউ লীডার" এর বিরুদ্ধে দিওয়ানীতে মান হানির মোকদ্দমা করবার অনুমতি পেয়েছেন। মেজর জেনারেল ওয়াইণ্ড হ্যাম ১৯২১ সন হইতে মেট্রোপলিটান পুলিশে এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের কাজ করছেন।

কাকোরি ষড়যন্ত্র—

কাকোরি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় যে চার জনের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল তাঁদের ফাঁসি স্থগিত রয়েছে। যুক্ত প্রদেশের কাউন্সিলের ও এসেম্ব্লীর কতিপয় সভ্য যে বড় লাটের নিকটে ফাঁসি না দেওয়ার জন্যে আবেদন করেছিলেন তারি ফলে ফাঁসি স্থগিত হয়েছে। জানা গিয়েছে যে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর সহানুভূতির সহিত এ ব্যাপার সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

পনের শত শ্রমিকের ধর্ম্মঘট—

প্রায় এক সপ্তাহ হলো বোম্বের সিম্প্লেক্স মিলের ১৫০০ শত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করেছে। তাদের অভিযোগ এই যে আগষ্ট মাসে তারা পুরো মাইনে পায়নি। মিল কর্ত্তৃপক্ষ এই বলে নোটিশ জারী করেছে যে শ্রমিকরা কাজে যোগদান না করিলে মিলের দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

খড়্গপুরে অসন্তোষ—

খড়্গপুরে কারখানা তেমনি বন্ধ রয়েছে। যে সকল শ্রমিক কাজ হতে অপসারিত হয়েছে তারা ২৮শে পর্য্যন্ত বেতন পায়নি। খড়্গপুর শাখা সঙ্ঘের এক সভায় বলা হয়েছে যে সকল বৈধ উপায় অকৃত কার্য্য হয়েছে। কাজেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে শ্রমিকরা তাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করুক। ১০০০ কার্য্যহীন শ্রমিক চিফ্ মিক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সহিত দেখা করেছিল। কিন্তু, তাতে কোনো ফল হয়নি।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ—

আজ থেকে কলকাতা আর মাদ্রাজে [illegible] পার্টির [illegible] আরম্ভ হবে। [illegible] প্রথম পার্টি যাত্রা করবে।

—০—

পুত্র বিয়োগ—

মিঃ শওকত আলীর দ্বিতীয় পুত্র শফীক আলি দিল্লীতে মিঃ মোহাম্মদ আলীর বাড়ীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

—০—

আয়র্ল্যাণ্ডে নির্ব্বাচন—

আইরিশ ফ্রি ষ্টেটে এখন নির্ব্বাচন চলেছে। এখনো [illegible] সিট ভর্ত্তি হতে বাকী আছে। এ যাবৎ নিম্নলিখিত দল সমূহ-গণ নির্ব্বাচিত হয়েছেন—গবর্ণমেণ্ট পার্টি ৫২ জন, রিপাবলিক্যান ৫৫ জন, শ্রমিক পার্টি ১২ জন, কৃষক পার্টি ১ জন, ন্যাশনালিষ্ট ২ জন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্স্ ২ জন, কম্যুনিষ্ট ১ জন।

—০—

স্প্রাট ফণ্ড

—০—

ইংল্যাণ্ডের লেবর রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টের প্রতিনিধি মিঃ পি, স্প্রাট বোম্বেতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়েছেন। ভালো উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করে এ মোকদ্দমার পক্ষ সমর্থন করানো একান্ত আবশ্যক। সে জন্যে যথেষ্ট অর্থেরও প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহ করার জন্যে বোম্বেতে "স্প্রাট ডিফেন্স কমিটি" গঠিত হয়েছে। মিঃ এস, এ, ডাঙ্গে, মিঃ এস, এইচ ঝাবওয়ালা এই কমিটিতে থাকিবেন। বোম্বে ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজ্যাণ্টস্ পার্টির সেক্রেটারী মিঃ এস, এস, মিরাজকর এই কমিটির সেক্রেটারী হয়েছেন। সাহায্যের টাকা কড়ি মিঃ মিরাজকরের নামে ১৭, দ্বারকা দাস ম্যানশনস্, স্যাণ্ডার্ষ্ট রোড, বোম্বে নং ৪ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। বড়ই আনন্দের বিষয় যে বোম্বের বিখ্যাত ব্যবহার জীব মিঃ কে, এফ, নরিমান্ এ মোকদ্দমার পক্ষ সমর্থন করতে সম্মত হয়েছেন।

"মেহনৎ কশ" সম্পাদক দণ্ডিত

—০—

লাহোরের "মেহনৎ কশ" নামক উর্দ্দু সাপ্তাহিকের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক লালা রামচন্দ্র কাপুর যে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, এ সংবাদ পাঠকগণ জানেন। বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০০ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। জরিমানার টাকা দিতে না পারলে তাঁকে আরো ৬ মাস কাল সশ্রম কারাদণ্ড ভুগতে হবে।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	৩৲
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১৸৹
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন্ পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে, কিন্তু, প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL

37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, ১২ই আশ্বিন, ১৩৩৪ | ৩১ম সংখ্যা

অবকাশ গ্রহণ

আমরা তিন সপ্তাহের ছুটি নিলুম। প্রেস প্রায় দু' সপ্তাহ বন্ধ থাক্‌বে। আর এক সপ্তাহ ছুটি আমাদের বাধ্য হয়ে নিতে হ'লো। ৩২ম সংখ্যক গণবাণী আগামী ২৭শে অক্টোবর তারিখে বের হবে। এবারে কাগজ খানাকে আরো ভালো করে বের করতে চেষ্টা করব। ছুটির পর থেকে প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য হবে দু'পয়সা।

বিনীত—

ম্যানেজার—গণবাণী

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—এক আনা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৸০
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, ১২ই আশ্বিন, ১৩৩৪ | ৩১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

—:*:—

স্প্রাট্ ডিফেন্স ফণ্ড

কমরেড পি, স্প্রাট তেইশ কি চব্বিশ বছর বয়সের যুবক, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেজুয়েটও বটেন। লণ্ডনের লেবর রিচার্স ইনষ্টিটিউটের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বেতে এসেছিলেন। তাঁর ওপরে কাজের ভার ছিল ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা ও রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা অধ্যয়ন করা এবং সে কাজের সুবিধের জন্যে উপরিউক্ত ইনষ্টিটিউটের একটা শাখা ভারতে স্থাপন করা। কিন্তু, স্থায়ী ভাবে শাখা স্থাপন করার পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক ছিল। সেই জন্যে এ দেশে এসে অবধি তিনি আপনাকে সেই কাজেই ব্যাপৃত করে রেখেছিলেন। তাঁর এদেশে অবস্থানের বেশীর ভাগ সময় তিনি বোম্বেতেই কাটিয়েছেন। বিগত মার্চ্চ মাসে তিনি অল্-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান করার জন্যে দিল্লীতেও গিয়েছিলেন। আহ্মদাবাদ ও পুণা প্রভৃতি স্থানেও তিনি শ্রমিকদের অবস্থা জানবার জন্যে গিয়েছিলেন। তার পরে তিনি লাহোরে যান। লাহোরের কাজ সমাপ্ত হবার পূর্ব্বেই তাঁকে বিশেষ কারণে বোম্বেতে চলে যেতে হয়। তাঁর ইচ্ছে ছিল আবার লাহোরে ফিরে যেয়ে সেখান থেকে কলিকাতা আসবেন এবং এখানে থেকে চারিদিকের অবস্থা অধ্যয়ন করে তাঁর শেষ রিপোর্ট দাখিল করবেন। এই রিপোর্ট দাখিল করার পরেই শাখা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু এ সকল কাজ শেষ হবার পূর্ব্বেই তিনি বোম্বে গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুকম্পাতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহ অপরাধে বোম্বেতে ধৃত হয়েছেন। কিছু কাল পূর্ব্বে বোম্বের "ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজান্টস্ পার্টির সেক্রেটরী কমরেড মিরাজকরের দ্বারা প্রকাশিত ও জনৈক আন্তর্জাতিকের লিখিত "ভারতবর্ষ ও চীন" (India and China) নামক একখানা ইংরেজী পুস্তিকা বাজেয়াফত হয়েছিল এবং তার জন্যে বোম্বে ও কলিকাতার নানা স্থানে পুলিশের তালাশিও হয়েছিল। বোম্বে গবর্ণমেন্টের মতে এ পুস্তিকাতে অনেক রাজদ্রোহ মূলক কথা আছে এবং তাঁরা অবধারিত করে নিয়েছেন যে কমরেড স্প্রাটই হচ্ছেন এর লেখক। এই নিয়েই উল্লিখিত মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়েছে।

কমরেড্ স্প্রাট আমাদের দেশে এসেছিলেন আমাদেরই অবস্থা অধ্যয়ন করার জন্যে এবং এ অধ্যয়নের দ্বারা যে কাজ হতো তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক দাসত্ব হতে মুক্তির জন্যে বৃটিশ শ্রমিকগণ ও ভারতীয় জনগণের সহিত একটা সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপন করা। তাঁর মিশন পরিপূর্ণ হবার পূর্ব্বেই আজ তিনি বৃটিশ শোষকগণের দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেন্টের আদালতে ইংল্যাণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাটের নামে অভিযুক্ত হয়েছেন। তিনি আমাদের অতিথি রূপে বিপন্ন হয়েছেন বলে নয়, আমাদেরই জন্যে কাজ করতে যেয়ে বিপদে পড়েছেন বলেই, আমাদের সকলেরই উচিত তাঁর মোকদ্দমায় যথাসাধ্য সাহায্য করা। আদালতে তাঁর মোকদ্দমা ভালোরূপে চালাবার জন্যে ভালো উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা একান্তই আবশ্যক এবং তা করতে হলে যথেষ্ট অর্থেরও যে প্রয়োজন হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। ইতোমধ্যেই বোম্বেতে স্প্রাট ডিফেন্স কমিটি স্থাপিত হয়ে গেছে। বোম্বের সলিসিটর মিঃ এফ, জে, গিনওয়ালা কমরেড স্প্রাটের পক্ষে মোকদ্দমার তদবীর করছেন। মোকদ্দমা হাইকোর্টের দায়রাতে সোপর্দ্দ হয়েছে। ডিফেন্স কমিটি মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছেন। মিঃ জিন্নার মত ব্যারিষ্টারকে দিয়ে মোকদ্দমা চালাতে হলে কত বেশী টাকার যে প্রয়োজন হবে তা সহজেই ধারণা করা যেতে পারে। কাজেই, জনগণের মুক্তি সংগ্রামে যাঁদের বিশ্বাস আছে তাঁদের যার দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকু আর্থিক সাহায্য এ মোকদ্দমায় করুন। সাহায্যের

টাকা কড়ি—সেক্রেটরী, স্প্রাট ডিফেন্স কমিটি, ১৭ নং দ্বারকাদাস ম্যানশনস, স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোড, বোম্বে নং ৪ (The Secretary, The Spratt Defence Committee, 17, Dwarkadas Mansions, Sandhurst Road, Bombay no. 4) ঠিকানায় পাঠাতে হবে। কেউ যদি ইচ্ছে করেন তা হলে ৩৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় আমাদের নিকটেও সাহায্যের টাকা দিয়ে যেতে পারেন। আমরা তা বোম্বেতে পাঠিয়ে দেব।

আজ একজন ভারতবাসী যদি বৃটিশ শ্রমিকদের জন্যে কাজ করতে যেয়ে ইংল্যাণ্ডে ধৃত হয়ে অভিযুক্ত হতেন তা হলে তিনি কিরূপ ব্যবহার ও সাহায্য সেখানে পেতেন সে কথাটা সকলে একটি বার ভেবে দেখুন। বৃটিশ শ্রমিকগণ যতটা সম্ভব ভালোরূপে মোকদ্দমা চালাবার ব্যবস্থা করতেন এবং তার জন্যে একটি পয়সাও ভারতবর্ষের কাছ থেকে তাঁরা চাইতেন না। কমরেড সাকলাৎওয়ালা ও কমরেড তারিণী প্রসাদ সিংহের মোকদ্দমার কথা আশা করি সকলেরই মনে আছে। যদি বৃটিশ শ্রমিকগণের কাছ থেকে টাকা এনে ভারতবর্ষে কমরেড স্প্রাটের মোকদ্দমা চালাতে হয় তা হলে আমাদের লজ্জা রাখবার স্থানই পাওয়া যাবে না।

———

যুবক প্রতিষ্ঠান

বাংলা দেশের স্থানে স্থানে যুবক সম্মিলন অনেক হয়ে গেছে এবং আজো হচ্ছে। এমন কি যে মুসলমান যুবকগণ 'কত রবি জ্বলে রে, কেবা আঁখি মেলে রে' ভাবেই সময় কাটিয়ে দিতে অভ্যস্ত, তাঁরাও সে দিন বর্দ্ধমানে এক যুবক সম্মিলনের অধিবেশন করেছিলেন। যুবক মহলে এই যে চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এটা অনেক খানি আশা জনক হলেও সত্যকার ভাবে যুবজনোচিত প্রতিষ্ঠান একটিও এ যাবৎ গড়ে ওঠেনি। যুবক প্রতিষ্ঠান কা'কে বলা যেতে পারে, যুবক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যও আদর্শ কি হতে পারে তা যুবকরা ভালো ক'রে ভাবেন কিনা তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা, পূতি গন্ধময় পুরাতনকে ভেঙে নূতনকে বরণ করে নেবার জন্যে যে বিদ্রোহ ভাবের প্রয়োজন হয়, তার তো কোনো সূচনা যুবকদের মধ্যে আজো পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। পরম্পরাগত কু-সংস্কারের মায়া যাঁরা কাটাতে পারেন নি, আজকের দিনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হাজার হাজার বছরের জীর্ণ পুরাতন জিনিসের প্রতি যাঁদের অনুরাগ আজো ষোলো আনা বজায় আছে, আর ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামির নিকটে যাঁরা দাসখৎ লিখে দিয়েছেন, তাঁরা অনেক কিছু হতে পারেন বটে, কিন্তু, যুবক যে কি করে হ'ন তা'তো আমরা ভেবেই স্থির করতে পারছিনে। এমন সব লোক যদি যুবক হবেন তবে বৃদ্ধ হবেন কারা? আমরা যতটা পর্য্যবেক্ষণ করতে পেরেছি তাতে দেখেছি যে যুবকরা কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক আদর্শের ভিত্তির ওপরে না দাঁড়িয়েই কেবল হুজুগে মেতে উঠেন, এবং সাম্প্রদায়িক হুজুগে মাতেন সব চেয়ে বেশী। বর্ত্তমান সময়ে যুবক সমাজে সাম্প্রদায়িকত্বের ভাব এত বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে যে তাতে বাস্তবিকই লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধে অংশ গ্রহণ করা ত যৌবনের ধর্ম্ম মোটেই নয়। যুবকদের কাজ হচ্ছে সমাজ থেকে হীন সাম্প্রদায়িকত্বের মূলোৎপাটন করা। যত প্রকারের মিথ্যা কু-সংস্কার সমাজে বর্তমান রয়েছে [illegible] যাঁরা ঘোষণা করবেন, [illegible] করে দিবেন, কেবল মাত্র [illegible] পারেন। যুবক সম্প্রদায় [illegible] অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের [illegible] চাই। কিন্তু, [illegible] লাঠিখেলা ইত্যাদির জন্যে [illegible] কিছু মূল্য নেই। লাঠিখেলার দ্বারা [illegible] উদ্ধারক হবেনা, রক্ষক হবেনা। [illegible] আরো কত কি করা যেতে পারে। [illegible] সময় শক্তি ব্যয় করার মত সৌখীন অবসর আর কিছু [illegible] পারেনা। আমাদের দেশে স্থানে মনে হচ্ছে যে [illegible] তাই করছেন।

পূর্ব্ব পুরুষগণের পুরাতন ধারণা নিয়ে এ যুগে আমরা আর কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারব না। নূতনের সন্ধানে আমাদিগকে ছুটতে হবে। সেই জন্যে কেবলমাত্র ভারতের ভিতর আমাদের বসে থাকলেও চলবেনা। সংঘবদ্ধ যুবকদলের তরফ থেকে বছরে বছরে পৃথিবীর নানা দেশে প্রতিনিধি সমূহ পাঠাতে হবে। তাঁরা দেখে আসবেন পৃথিবীর আর আর দেশে যুবকরা কি করছেন। আপাততঃ চীন আর ইন্দোনেশিয়াতে যাওয়া আমাদের যুবকগণের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা অত্যন্ত বেশী। এই সঙ্কীর্ণতা দূর করতে না পারলে কোনো বড় কাজই আমরা করতে পারব না।

———

সি-আই-ডি আতঙ্ক

বাংলায় যেটুকু বিদ্রোহের ভাব মাথা তুলতে চেয়েছিল সেটুকুকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবার জন্যে এদেশের শোষণ তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট যে প্রচেষ্টা করেছে তাতে তারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়েছে, অন্ততঃ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে তো তা-ই মনে হয়। বাঙালীরা অতিরিক্ত মাত্রায় সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। পুলিশের চর পেছনে লাগতে পারে এমন কাজ যাঁরা করেছেন তাঁদের তো পুলিশের চরের নামে খানিকটা আতঙ্কিত হবারই কথা, আর যাঁরা কখনো কিছু করেন নি তাঁরাও সর্ব্বদা আতঙ্কিত থাকেন। এর দ্বারা স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান সময়ে বাঙালীরা অতিরিক্ত মাত্রায় কাপুরুষ হয়ে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে পুলিশের চর বলে সন্দেহ করছেন। শিক্ষিত বাঙালী, বিশেষ করে যাঁরা এক আধবার কারাগারে ঘুরে এসেছেন তাঁরা, মানসিক শক্তি একেবারেই খুইয়ে বসেছেন। আত্ম বিশ্বাস তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন বলে পরকেও আর বিশ্বাস করতে পারেন না। এত সন্দেহের ভিতরে সত্যকারের পুলিশের চরদের কাজের সুবিধে অনেকটা বেড়ে গেছে। কেননা, কেউ আর ঠিকই করতে পারছেন না যে কে সত্য সত্যই পুলিশের চর, আর কে নয়। সত্যকারের বিপ্লবের আদর্শ তো খুব কম বাঙালী যুবকেরই ছিল, আর যে টুকুই বা ছিল সে টুকুরও পরিণতি হয়েছে আজ অবিশ্বাস আর কাপুরুষতা। নির্ব্বন্ধত্ব (tenacity) আমাদের এত কম যে একবার

জেলে যাবার পরেই আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সে অবস্থায় কাজ না ক'রে আমরা অকাজের মাত্রাই বাড়িয়ে তুলি। অযোধ্যা প্রদেশে 'পাসি' নামক একটা সম্প্রদায় আছে। শূকর পোষাই 'পাসি'দের জাতীয় ব্যবসায়। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তো এদের স্পর্শ করেনই না, মুসলমানরা পর্য্যন্ত এঁদের ছোঁওয়া খান না। এত বেশীরূপে অবহেলিত হয়েও এই 'পাসি'রা নিজেরাই আবার ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ও বিধি নিষেধের ব্যাপারটা মানে অত্যন্ত বেশী। তারা মনে করে যে এই করেই তারা ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের এক এক ধাপ উপড়ে উঠে যাবে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের অনেকেরও এই পাসিদের অবস্থাই হয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে যিনি একবার পুলিশের চর বলে অভিহিত হয়েছেন তিনি আবার অত্যন্ত আরো পাঁচজনকে সেই অপবাদই দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস এই ক'রে তাঁর নিজের অপবাদ ঘুচে যাবে। এরূপ হীনতা আর দুর্ব্বলতার আওতায় যাঁরা এসে পড়েছেন তাঁরা আর কখনো আপনাদিগকে যে তা থেকে বাঁচাতে পারবেন সে আশা খুবই কম। তবে যাঁরা এখনো এ সবের বাইরে আছেন তাঁরা যদি এ সকল কাপুরুষতার ভাবগুলিকে এড়িয়ে চলতে পারেন তাতে দেশের পক্ষে অনেক মঙ্গলই সাধিত হবে।

———

স্বাধীনতার সদুপায়

(ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল)

জগতে যুগে যুগে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সব সফল বা নিস্ফল সংগ্রাম হইয়াছে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী যারা তারা সেগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে স্মৃতি মন্দিরে লিখিয়া রাখিয়াছেন। থারমপলিতে লিওনিদাসের যুদ্ধ হইতে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব পর্য্যন্ত সকল সংগ্রামের বিবরণ সুপরিচিত; আজও যেখানে যেখানে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন হইতেছে সবখানেই এই সব সংগ্রামের দৃষ্টান্তই প্রায় লোকের মুখে মুখে ঘুড়িয়া বেড়ায়। অতীত যুগে সকল দেশে যে সব প্রণালীতে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে সেই সব প্রণালী অনুসরণ করিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিবার ভরসা অনেক করিয়া থাকেন।

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে অতীতের সে দিন আর নাই,—জগতের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। লিওনিদাসের মত মুষ্টিমেয় সৈনিক লইয়া যুদ্ধ জিতিয়া স্বাধীনতা লাভ বা রক্ষা করিবার স্বপ্ন আজ কেউ দেখেন না বটে, কিন্তু ক্রমওয়েল বা ওয়াশিংটন, কি বিপ্লবের যুগে ফরাসী জাতি যে উপায়ে যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, অনেকে সেই উপায়ে সেই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য চঞ্চল। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব এবং সম্ভব হইলেও অনেকটা নিরর্থক একথা অন্ততঃ আমাদের দেশে খুব কম লোকেই ভাবিয়া থাকে।

আজ এয়ারোপ্লেন সব মেরিন ও বেতারের যুগে, ট্যাঙ্ক ও নব নব বিস্ফোরকের যুগে, ওয়াশিংটন বা ক্রমওয়েল কেন, নেপোলিয়নের যুগের ফরাসীরা পর্য্যন্ত তাদের বিপ্লব সার্থক করিতে পারিত না। বিগত মহাযুদ্ধের ইতিহাস হইতে আমাদের এটুকু জ্ঞান অন্ততঃ হওয়া উচিত যে আজ যদি স্বাধীনতার জন্য কোনও দেশে কোনও সংগ্রাম করিতে হয় তবে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম চালাইতে হইবে, কোটি কোটি অর্থ জলের মত ঢালিতে হইবে, অসীম সংখ্যক লোকের প্রাণ বলি দিতে হইবে। ইহার জন্য যে লোকবল, অর্থবল, বিদ্যাবল ও আয়োজনের পরিপূর্ণতার প্রয়োজন তাহা ওয়াসিংটন, ক্রমওয়েল বা নেপোলিয়ন কোনও দিন কল্পনা করেন নাই।

তা ছাড়া, ফরাসী বিপ্লবে বা আমেরিকার যুদ্ধে যে স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে তাহাতে শুধু কিয়জ্জনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমগ্র জাতি স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই। ধনী অধিকতর ধনী হইয়াছে, তার ক্ষমতা আজ অপ্রতিহত! গরীব আরও গরীব হইয়াছে, আর তার দুরবস্থা উপায় হীনতা ও দাসত্ব আজ তুলনারহিত। আজকার দিনে যদি ওয়াশিংটন ফিরিয়া আসেন তাঁর স্বাধীনতার একান্ত কামনা লইয়া তবে আমেরিকায় তাঁর আবার এক নূতন স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে ধনের আধিপত্য দূর করিয়া মানুষকে স্বাধীনতার পীঠে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য।

আজ স্বাধীনতার আদর্শ বদলাইয়া গিয়াছে,—স্বাধীনতা লাভের প্রণালীও বদলাইয়া গিয়াছে। এ তথ্যটা যদি আমরা সম্যক রূপে আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের স্বাধীনতার প্রয়াস কেবল মাত্র মিথ্যা বাগাড়ম্বর ও অযথা ত্যাগে পর্য্যবসিত হইবে। অতীতের দৃষ্টান্ত অন্ধ ভাবে অনুসরণ না করিয়া বর্ত্তমানের অবস্থা ও আবেষ্টনের সঙ্গে তার সমন্বয় করিয়া সত্য পথ অনুসরণ করিতে হইবে। আর আমাদের অনুশীলন করিতে হইবে বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতা লাভের নূতন দৃষ্টান্ত।

অতি অল্পকাল মধ্যে কয়েকটি অল্প বিস্তর দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—রুশিয়া, আয়লর্লণ্ড, তুর্কী ও ইজিপ্ট—আর চীন স্বাধীনতা লাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

রুশিয়ার টুসারের সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি যে কোনও দিন টলিতে পারে, বিগত যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন হঠাৎ বিনা যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া টুসারকে পদত্যাগ করিয়া আপনাকে নিঃশেষ রূপে রুশ বাসীর হাতে আত্ম সমর্পণ করিতে হইয়াছিল। সেই পরিণতির ইতিহাস বড় শিক্ষা প্রদ। ইহার সূত্রপাত সেই দিন হইয়াছিল যে দিন টুসার Zemstvo গুলিকে স্বাধীনতা দিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই Zemstvo গুলি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শক্তি কর্ম্মকুশলতা ও গঠন চেষ্টায় কি অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ Vinogradoff এর Self Government in Russia পুস্তকে আছে। তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে এই Zemstvo বা স্থানীয় সমিতি গুলি শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য রক্ষা, শান্তি রক্ষা ও স্থানীয় সমুদয় শক্তি সংগঠন কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়া এত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল যে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইহাদের সহায়তায় অনায়াসে এক বিরাট বাহিনী সংগৃহীত হইয়াছিল এবং ইহাদেরই চেষ্টায় সে বাহিনীর রসদ সরবরাহ ও সুযোগ সুবিধার আয়োজন ইত্যাদির এমন সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল যে পূর্ব্বে রুশিয়ায় কখনও সেরূপ হয় নাই। আগে যে সব যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছিল তাহা হইয়াছিল আমলা-তন্ত্রের চেষ্টায়, এবার যে আয়োজন হইল তার বেশীর ভাগ হইল সমগ্র জাতির সংঘবদ্ধ চেষ্টায়।

কতকটা সেই জন্যই এই সেনাদল এক মত হইয়া টুশাকের পদত্যাগের দাবী করিতে পারিয়াছিল, এবং সে দাবী অগ্রাহ্য করিবার কোনও চেষ্টা করিতে পারেন নাই সমগ্র জার্মানীর মহাসম্রাট পর্য্যন্ত। যে শক্তি এই রক্তপাত হীন সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিল সে সেনাবল নয়, জাতির শিক্ষা ও সংগঠন (organisation)। নিতান্ত নির্ব্বিবাদে রুষের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয় নাই। ইহার পর বহু রক্তপাত হইয়াছে, ক্ষমতা লুব্ধ ব্যক্তিদের পরস্পর সংঘাতের ফলে বহু প্রাণ নাশ হইয়াছে, কিন্তু সে পরের কথা—রুশের রাষ্ট্রশক্তি ধ্বংস হইয়াছিল বিনা রক্তপাতে—সমগ্র প্রজাশক্তির সংঘ বন্ধন ও স্বাধীনতা লিপ্সায়।

আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস বহু বিস্তৃত। সেখানে বহুযুগ ধরিয়া বহুবিধ চেষ্টা ও আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে আয়োজন সার্থক হইয়াছিল তাহা সমগ্র আয়র্লণ্ড বাসীর সংঘবন্ধন—সিন ফিন। সিন ফিন আন্দোলনের ফলে আয়র্লণ্ডবাসী ক্রমে ক্রমে ইংরেজ শাসন যন্ত্রের সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের একটা স্বতন্ত্র শাসন যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিল। তার ফলে ইংরাজ শাসন-যন্ত্রের অস্তিত্ব সত্বেও সমগ্র জাতি তাহার সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সংঘবদ্ধ সমবেত জাতির শক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইজিপ্টের স্বাধীনতা সর্ব্বাঙ্গীন নয়। অনেক গুলি বাধ দ্বারা তার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। তবু ইজিপ্ট আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে জগলুল পাশার নেতৃত্বাধীনে ইজিপ্টের সমগ্র জাতি সংঘ বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। যখন ইজিপ্টবাসী তাদের সমবেত আকাঙ্ক্ষা একটা শক্তিমান সমবায় বন্ধনের মুখে প্রকাশিত করিল তখন তার শক্তি প্রতিরোধ করিবার শক্তি হয় নাই ইংলণ্ডের। স্বাধীনতা লাভের জন্য তখন যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই।

তুর্কী যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহা অসিবলে সত্য, কিন্তু কামাল পাশার অসির পশ্চাতে যদি সমগ্র তুর্কী জাতির সমবেত ও সংঘবদ্ধ শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা না থাকিত তবে এ স্বাধীনতা কেবল কামালের বাহুবলে অর্জ্জিত হইত না। দীর্ঘকাল হইতে Young Turk দিগের চেষ্টায় দেশে শিক্ষা ও স্বাধীনতার বীজ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কামাল পাশার অদম্য উৎসাহ ও অশেষ সংগঠন শক্তির ফলে সেই শক্তি সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ হইয়া সমগ্র ইউরোপের বড় বড় শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে সেভার্সের সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধে যে সমরায়োজন হইছিল তাহা তুর্কির রাজশক্তি করে নাই, মুস্তাফা কামাল পাশার অধীনে সমবেত তুর্ক জাতি করিয়াছিল। সুতরাং এই স্বাধীনতা লাভের জন্য কৃতিত্বে অধিকার প্রথমে এই সংঘ বন্ধনের, এবং তারপর, ইয়ং টার্কদের প্রবর্ত্তিত জাতীয় শিক্ষার।

চীনদেশে আজ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিয়াছে তাহার একদিকে আছে সংঘবদ্ধ জনসাধারণ, অপর দিকে আমলা ও সেনা পরিবৃত উত্তর চীনের শাসন কর্ত্তৃগণ। আর তার চার পাশ ঘিরিয়া রহিয়াছে ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র শক্তি যারা চীনের বুকের উপর বহু অধিকারের দাবী লইয়া চাপিয়া বসিয়া আছে। চীনের লোক শক্তি এতগুলি শক্তি সমবায়ের সঙ্গে আজ সংগ্রাম করিতেছে—এ পর্য্যন্ত তাহারা জয়ী-ই হইয়াছে, পরিশেষে কি হইবে এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কিন্তু উপস্থিত ফল যাহাই হউক চীনের লোক শক্তির যে পরিমাণ সংগঠন হইয়াছে তাহাই জগতের এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যে শক্তির বলে চীনের জনসাধারণ বিরাট রাষ্ট্রশক্তি ও প্রবলতর সকল বিদেশীয় শক্তিকে এ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, তাহা অতি অল্প দিনে সংগঠিত হইয়াছে—কিন্তু কোনও ইন্দ্রজাল বলে হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই। ইহার জন্য বহুবর্ষ ধরিয়া বহুসংখ্যক যুবক নিঃশেষে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন চীনে শিক্ষা বিস্তারে। চল্লিশ সহস্র যুবক এমনি করিয়া সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ সহকারে লোকশিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল এই যে চীনের জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করিয়া তাদেরকে সমস্ত জগতের জীবন স্রোতের সঙ্গে মিশ খাওয়াইতে হইবে। আজ যে চীনে একটা মহাজাগরণ হইয়াছে, লোকশক্তি যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে জোর করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, সেই লোকশক্তির সংগঠন, যে সম্ভব পর হইয়াছে ইহা এই ত্যাগী যুবকদের অক্লান্ত চেষ্টার ফল, তাদের শিক্ষাদানের ফল।

আমাদের দেশের সম্মুখে আজ এই সমস্যা—কি উপায়ে আমরা পরাধীনতার দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিয়া পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিব? তার উপায় যা কিছু উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একমাত্র গান্ধী প্রচারিত নন-কো-অপারেশন ছাড়া আর সবই মধ্য যুগের আদর্শে রচিত—সে পথে মুক্তি নাই।

আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি বহু হইয়াছে এই লইয়া যে আমরা কো-অপারেশন করিব, না নন-কো-অপারেশন করিব, কলোনীর স্বরাজ চাহিব, না পূর্ণ স্বরাজ চাহিব। অনেক কর্ম্ম-চেষ্টা হইয়াছে, বহু ত্যাগী দেশ সেবক কেহ প্রাণ, কেহ জীবনের সকল অভ্যুদয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া মহত্বের আদর্শ রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন আমরা এখনও হই নাই।

সমস্যাটা সমগ্র জাতির শিক্ষা বিধান, তাদের শক্তি সংগঠন।

একটা প্রকাণ্ড কুস্তিগীরের উপর যদি আমার রাগ হয় তবে অমনি চট করিয়া তাল ঠুকিয়া তার সামনে দাঁড়াইয়া পড়া সাহসের কাজ হইতে পারে, তাহা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়, তাতে জয়লাভ অসম্ভব। যে বুদ্ধিমান সে সেই কুস্তীগীরের দিকে চাহিয়া ফিরিয়া যাইবে আপন ঘরে—তাড়াতাড়ি তাকে বিধ্বস্ত করিবার অসম্ভব আশায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে না। দীর্ঘকালের শিক্ষা ও সাধনায় আপনাকে শক্তিমান করিয়া, কুস্তীর সব পেচ রীতিমত আয়ত্ত করিয়া তবে সে ফিরিয়া আসিবে তার বহুদিনের অভীপ্সিত ব্রত উদযাপন করিতে—কৃতার্থতার একটা দৃঢ় সম্ভাবনা লইয়া।

স্বাধীনতা লাভ যদি আমাদের ব্রত হয় তবে স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহা লাভ হইবে না। আমাদের চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইবে ঠিক কোথায় আমাদের জাতটা পড়িয়া আছে, কোথায় ইহাকে টানিয়া তুলিতে হইবে। তারপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত অটল নির্ভরের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে সমস্ত জাতিকে টানিয়া তুলিবার জন্য।

লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে হইবে, উপায় সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ প্রোগ্রাম করিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সে প্রোগ্রাম দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসরণ করিতে হইবে।

রুষ শক্তি সংগঠন করিয়াছিল Zemstvo গুলির সহায়তায়। আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ড—আমাদের হাতে আছে কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এই গুলির ভিতর দিয়া আমরা সংগঠন কার্য্য অনেক দূর ঠেলিয়া লইতে পারি। চীন দেশের বর্ত্তমান অভ্যুদয়ের মূলে আছে লোক শিক্ষা। ঠিক তেমনি দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে লোক শিক্ষার বিস্তারে, আমাদের দেশে কি মিলিবে না চল্লিশ হাজার যুবক যারা লোক শিক্ষার জন্য জীবন সমর্পণ করিতে পারে?

হিন্দু মুসলমান সমস্যা, জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ সমস্যা আমাদের জাতি সংগঠনের একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়। সে অন্তরায় দূর করিবার প্রণালী দেখাইয়াছে তুর্কি। মুস্তাফা কামাল পাশা সেখানে বজ্রনির্ঘোষে লোককে শুনাইয়াছেন এই বার্ত্তা "Be modern." জাপান বহুবৎসর পূর্ব্বে একদিন ঠিক এই মন্ত্র জপিয়াছিল। সে যে আপনার দেশে জাতি ভেদ ও শ্রেণী ভেদের নিদারুণ অন্তরায় দূর করিয়া অসম্ভব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া বিশ্বের সব চেয়ে শক্তিমান দেশগুলির সঙ্গে এক পংক্তিতে উঠিয়া বসিয়াছে, তার মূলে এই মহামন্ত্র—যে অতীত ও মধ্য যুগের আবহাওয়া একেবারে টানিয়া ফেলিয়া আজকের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ও আবেষ্টনের ভিতর আপনাকে বসাইয়াছে।

আমাদেরও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাইমারী স্কুল পর্য্যন্ত, বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাহিরে সকল শিক্ষার আয়োজনের মূল সূত্র করিতে হইবে এই—"Be modern." এই শিক্ষার ফলে যদি দশ বৎসরে কি বিশ বৎসরে আমরা পরিপূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিতে পারি, তখন এই সব মধ্যযুগের সমস্যা, ধর্ম্মের খুঁটি নাটি লইয়া সর্ব্বপণ, ধর্ম্মের ভড়ং লইয়া মারামারি আমাদিগকে দাঁড়া দিবে না।

মিথ্যা মোহে আপনাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া কোনও বিদেশী বা সর্ব্বদেশাতিক্রান্ত শক্তির দয়া বা অনুগ্রহের ফলে অচির-স্বরাজ লাভের মরীচিকার অনুসরণ না করিয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে এই পথ—শক্তি সংগঠনের পথ। দু'দিনে স্বরাজ আমরা কাহাকেও দিতে পারিব না। প্রকৃত স্বরাজ যদি চাই—যাহা কোনও ক্ষুদ্র শ্রেণীর অধিকার না হইয়া সমগ্র জাতির স্বাধীনতা হইবে—সেই স্বরাজ যদি চাই, তবে তাহা কি বিলাতী কমিশনের অনুগ্রহে, কি দুটা বোমা পটকা ফুটাইয়া দুই দিনে লাভ হইবার নয়।

অনেকে ছোট ছেলের সখ হয় বড়দের মত চাল চলন, তাদের মত চাকরী বাকরী ইত্যাদি করিবে। এই জন্য খোকাবাবু যদি বড় ভাইয়ের অফিসের চেয়ার জুড়িয়া বসিয়া তাঁর সব কাগজপত্র সই করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাকে কাণে ধরিয়া স্কুলে পাঠানটাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আমাদের জাতিটাকে এখন স্কুলে পাঠানই আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ।

আত্মসম্মান ও আত্মশক্তিতে আস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু নিজের শক্তি সাধ্য সম্বন্ধে একটা মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করিয়া যে মূর্খ শিক্ষালাভকে তুচ্ছ করে তার উন্নতি কোনও দিনই হয় না। দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার জন্য আমরা আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন একটা অসম্ভব মোহ সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের দেশকে তারা ইতিহাসের চশমা পড়িয়া অসম্ভব রকম বড় করিয়া দেখিতেছে। যদি কেহ বলে যে এ দেশ তত বড় নয়, কিন্তু বড় হইতে হইবে তবে তাকে তাঁরা অবিশ্বাসী দেশদ্রোহী বলিয়া তর্জ্জন করিতে থাকেন।

এ অন্ধতা দূর করিতে হইবে। এখন চক্ষু মেলিয়া দেখিতে হইবে সমস্ত জগতের তুলনায় আমরা কোথায় পড়িয়া আছি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতের ন্যায্য স্থান লাইবেরিয়া বা হেটীর সঙ্গে এক পংক্তিতে নয়,—সে স্থান সবার উপরে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে এক আসনে বা পুরোভাগে। সেই স্থানের যোগ্যতার মানদণ্ডে আমাদের বর্ত্তমানকে তৌল করিয়া দেখিতে হইবে—ভাবিতে হইবে কত পিছনে আমরা পড়িয়া আছি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে পিছনে পড়িয়া আমরা থাকিব না—আমাদের বিধি নির্দ্দিষ্ট গৌরবের আসন আমরা দখল করিব—স্বাধীনতা ও শক্তির চরম আদর্শ আমরা আয়ত্ত করিব।

তাহা লাভ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা ও শক্তি সংগঠন।

আধুনিক জাতিগণের স্বাধীনতার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে রাজ-শক্তির সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষাই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় নয়। বিনা যুদ্ধে, কেবল আন্দোলন ও দাবীর উত্তরে স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে—আর যুদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র রাজ-শক্তির সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াও স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু সকল জাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইহাই দেখিতে পাই যে এ তিন উপায়ের কোনও উপায়েই কোনও দেশ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই যেখানে সমগ্র দেশ তার শক্তি সংগঠন করে নাই।

আমাদের দেশে ঠিক কোন পথে মুক্তি লাভ হইবে তাহা এখন কেহ বলিতে পারে না। হয়তো যুদ্ধ করিতে হইবে—হয়তো বা সমগ্র দেশব্যাপী এক বিরাট নন-কো-অপারেশনের দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা লাভ হইবে—কিংবা হয়তো তারও দরকার হইবে না। কিন্তু শেষ পথ যাহাই হউক তার পূর্ব্বে চাই বিরাট জাতি সংগঠন কার্য্য। শিক্ষার দ্বারা সমবায় দ্বারা জাতির শক্তি ও বুদ্ধি জাগ্রত ও সংহত করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের আন্দোলন হইবে অরণ্যে-রোদন। নন-কো-অপরেশন ঠিক যে অসার্থকতায় পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহাই চিরদিন লাভ করিবে—আর যুদ্ধ—তার স্বপ্ন মাত্রও সুদূর পরাহত হইবে।

সুতরাং যে পথেই শেষে স্বাধীনতা লাভ আমরা করি না কেন, আমাদের সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে সমগ্র জাতির সংগঠন। শিক্ষা ও সংগঠন কার্য্য সম্যকরূপে করিতে হইলে, রুশিয়ার মত আমাদের প্রথম দৃষ্টি দিতে হইবে আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রভৃতির দিকে। যাহাতে এই সব প্রতিষ্ঠান রুশের Zemstvo গুলির মত কার্য্যকারী ও শক্তি-মান হয় সে চেষ্টা করিতে হইবে। আরও নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে, জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য। একটা বিরাট লোক শিক্ষার প্রচেষ্টা করিতে হইবে যার ভিতর প্রতিজ্ঞা হইবে দশ বৎসরের মধ্যে দেশের অজ্ঞতা দূরীকরণ।

যদি এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হই সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করিতে, যদি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে আমরা এই লোক-শিক্ষা

ও সংগঠনের জন্য নিঃশেষে রূপে নিয়োজিত করিতে পারি, যদি গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ সমবায় সমিতি গঠন করিয়া লোকের ভিতর একদিকে আত্ম নির্ভর, অপর দিকে সমৃদ্ধি লাভের আয়োজন করি এবং সেই দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ সমিতি সংঘবদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি এক দেশব্যাপী সমবায় সম্মিলন, যাহা দেশের অর্থ সৃষ্টি ও বিভাগের সমস্ত আয়োজন একটা বিরাট শৃঙ্খলা বন্ধনের মধ্যে আনিয়া ফেলিবে তবে আমরা যে প্রকাণ্ড শক্তির সৃষ্টি করিয়া ফেলিব, তার সম্মুখে জগতের কোনও শক্তি দাঁড়াইতে পারিবে না। ত্রিশ কোটী মানুষের সমবেত সংঘবদ্ধ শক্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে জগতে অলভ্য কিছুই নাই। তখন সম্মিলিত ভারতবাসী যদি একটা দাবী করে তবে তাহা অগ্রাহ্য করিবার সাহস কাহারও হইবে না। তারা যদি জগতের কোনও জাতিকে বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গে কোনও লেনদেনের সম্পর্ক রাখিব না, তবে জগতের কোনও জাতি তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া পারিবে না। আর যদি এত বড় প্রকাণ্ড সমৃদ্ধ একটা শক্তি সমরের আয়োজন করে, তবে জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত শঙ্কিত কম্পিত হইয়া উঠিবে। সুতরাং এই আদর্শের দিকে অভ্রান্ত লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী একটা বিরাট প্রচেষ্টা করিতে হইবে এইরূপ সংগঠন করিবার।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমরা সহকারিতা করিয়া বিধিসঙ্গত আন্দোলন দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিব, না অসহযোগ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিব, না তার সঙ্গে যুদ্ধ করিব—এ সব আলোচনার সময় এখন নহে। এখনকার কাজ জাতি সংগঠন। তার জন্য আমাদের দেশে যেখানে যে উপায় বর্ত্তমান আছে সব গুলির সহায়তা লইতে হইবে, এখন সে সব উপায়ের জাত বিচার করিয়া সংগ্রহণ বা বর্জ্জন করিলে চলিবে না। গভর্ণমেণ্টের যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, নিজেদের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিতে হইবে—কেবল লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে হইবে—লক্ষ্য জাতি সংগঠন। জাতি সংগঠন কার্য্যে আমরা বহুদূর অগ্রসর হইলে তখন বিচারের সময় আসিবে যে আমরা সহযোগ করিব না অসহযোগ করিব; অহিংসায় কার্য্যোদ্ধার করিব না হিংসার আয়োজন করিব—সে কথা তুলিবার সময় এখন নহে।

আমাদের জাতির আজকার প্রথম মন্ত্র—আধুনিক হও, অতীতের জীর্ণ সংস্কারের বন্ধন মুক্ত হইয়া জগতের বর্ত্তমান আদর্শে ভাব চিন্তা ও জীবন নিয়মিত কর। দ্বিতীয় মন্ত্র, শিক্ষার প্রচার কর—আদর্শের প্রচার কর, চরিত্র গড়িয়া তোল। তৃতীয় মন্ত্র, জাতি সংগঠন কর।

দেশের হিতকামীর পক্ষে আজ ইহা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। আর যত সব সমস্যার আন্দোলনে আজ ভারতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে সব তুচ্ছ অসার—সেগুলি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আমাদের এক লক্ষ্য করিতে হইবে এই কার্য্য।

আজ যারা কিশোর ও যুবক—ভবিষ্যৎ জাতি যারা—তাদেরকে আমি আহ্বান করিতেছি নিঃশেষে আপনাদিগকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে। এই মন্ত্রে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—ইহা উপেক্ষা করিলে অন্য কোনও উপায়ে ভারতের চরম মঙ্গল বা স্বাধীনতা আয়ত্ত হইবে না। এ বিষয়ে [illegible] [illegible] ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া [illegible] আমাদের [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] বিচার [illegible]

—

গণ-আন্দোলন ও শিক্ষিত সম্প্রদায়

—•:০:•—

([illegible])

—•—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে বর্ত্তমান সমাজ দুটী শ্রেণী বা Class এ বিভক্ত। সমাজেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দু'টী শ্রেণীই সমান ভাবে সমাজের মধ্যে [illegible] বিরাজমান রয়েছে। (ক) Bourgeois class, অর্থাৎ [illegible] ধনিক দল, (খ) Proletarian class অর্থাৎ [illegible] শ্রমজীবী দল। 'ক' শ্রেণীতে ধনিক, বণিক, জমিদার ও [illegible]-কারীর (যে সমস্ত মোল্লা-পুরোহিত কোন প্রকার শ্রম না করেই শুধু তাদের ধর্মাধিকারের জোরে বেপরোয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে থাকে) স্থান হবে। 'খ' শ্রেণীতে কর্মীরা অর্থাৎ যারা তাদের দৈবাহিক বা-মানসিক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জ্জন করে। ইউরোপের বর্ত্তমান Term বা কথানুসারে উপরোক্ত 'ক' ও 'খ' শ্রেণীদ্বয়কে ক্রমান্বয়ে Capital (ধনিক) ও Labour (শ্রমিক) বলা হয়ে থাকে।

আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতারা হচ্ছেন 'লেবর'দল ভুক্ত। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে শিক্ষিত দলের অধিকাংশই চাকুরীজীবী বা Wage earners. কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতারা তাদের এ অবস্থা সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নহেন। তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও ভেবে দেখেছেন যা—যে, আজকে এ 'ভদ্রত্বের' মোহ তাহাদের শুধু মানবতা থেকে নয়, দুনিয়ার সর্ব্বপ্রকার ভোগ বিলাস ও ন্যায্য পাওনা থেকেও চিরবঞ্চিত করে রেখেছে। অনবরত কলম চালিয়েও বহু শিক্ষিত ব্যক্তির অন্ন সংস্থান হচ্ছে না। কেন? শিক্ষিত হয়ে, 'ভদ্রত্বের' অধিকারী হয়েও অন্নের সংস্থান হয় না কেন? আজ ত্রিশটী মুদ্রায় একটি চাকুরীর জন্য অন্ততঃ তিন শ' শিক্ষিত 'ভদ্রলোক দরখাস্তকারীর সমাগম হয় কেন? কই মানুষের এই যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত ভদ্রত্ব'ত একদিনের জন্যও মানুষের অন্নাভাবের পূরণ করতে তো পারলে না! হায়রে ভদ্রত্ব! তোমায় নমস্কার।

যাক্, এখন আমাদের শিক্ষিত ও 'ভদ্রলোক' আখ্যাধারী ভ্রাতাদের কিছু জ্ঞান লাভ হবে কি? ভ্রাতাদের জানা উচিত যে জগতে 'ভদ্রলোক' হওয়ার চেয়ে আরও একটী বড় ও মহত্তর কার্য্য আছে, সেটা হচ্ছে 'মানুষ' হওয়া।

মানুষের 'মানুষ' পদবীর চেয়ে গৌরবের ও মহত্ত্বের আর কিছু আছে কি? শিক্ষিত 'ভদ্রলোকেরা' কি এখনও বুঝতে পারছেন যে—তারাও কৃষক-শ্রমিক সাধারণের মত লুণ্ঠিত হচ্ছেন? এটা নির্দ্দিষ্ট বেতন বা মূল্য নিয়ে কর্ম্মশক্তি বিক্রি

করার লাভ ও ফলাফল কি তাহারা এখনও দেখতে পান নি? এই অত্যাচার, অবিচার আর লুণ্ঠনের বেদীতে গঠিত সমাজ যে শিক্ষিত দলকে ও সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকের মত পদে পদে লুণ্ঠন করছে, ফাঁকি দিচ্ছে ও ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রেখেছে তা'ও কি ভ্রাতারা এত দিনে বুঝতে পারেন নি?

শিক্ষিতদল! তোমরা 'ভদ্রলোক' হও আর যেই হও না কেন, কিন্তু এ কথাটি প্রমাণিত হচ্ছে যে তোমরাও কৃষক ও শ্রমিকের মতই শ্রমজীবী, নিজের 'শ্রম' বা কর্ম্মশক্তিকে বিক্রী করে জীবিকা ধারণ কর অর্থাৎ তোমরা শ্রমের খরিদ্দার নও। মানুষের শ্রমের খরিদ্দার বা ধনিক চোররা তোমাদিগকেও যথাসম্ভব কম মূল্যে খাটাইতে চায়। ধনিকদের এই পরশ্রম পিপাসার বিরুদ্ধেই আমাদের এই অভিযান। তাই শিক্ষিতের দল, তোমরা আমাদের ভিন্ন নও। আমরা উভয়ই আমাদের পরিশ্রমের উচিত মূল্য হ'তে বঞ্চিত হয়ে আসছি। আমরা কৃষক আর শ্রমিক, ধনিক চোরদের জন্য খেটে খেটে মরি, এক-দিনের জন্যও আমাদের হাড় ভাঙ্গা খাটুনীর ন্যায্য মূল্য পাইনা। তাহারা তাদের সুবিধা মত—আচার পদ্ধতি ও আইন কানুনের উপর—বর্ত্তমান সমাজটাকে গড়ে তুলেছে আমাদের দৈহিক শ্রম-শক্তিটাকে লুটে নিতে। ঠিক তেমনি ভাবে ঐ বুড়োদের দল তোমাদের মানসিক-শ্রম শক্তিটাকেও (mental labour power) লুটে নিচ্ছে। স্থির জেনো ভাই, ঐ অত্যাচারীদের পাষাণ বেদী বা সমাজটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে না পারলে আমাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন হতে নিষ্কৃতি পাওয়া সদূর পরাহত। এস, এস, স্বাধীনতার সেবক, মুক্তির অগ্রদূত, এস, আজকে এই মিথ্যা সমাজের ভাঙ্গার সমরে আমাদের সহগামী হও। এস আজকে এই অশান্তি আর অত্যাচার ভরা সমাজকে ভেঙ্গে ফেলে একটা নূতন শান্তিময় শ্রেণীশূন্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করি, যে সমাজে মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার ও সমান দাবী থাকবে। ঐ শোন দিগ দিগন্ত কম্পিত করে জগতের মহাসত্য ঘোষিত হচ্ছে "—মানুষ মানুষের লুণ্ঠনের বা ভোগের সামগ্রী নহে, আর মানুষ মানুষের ন্যায্য দাবীকে পদদলিত করে তা'কে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারবে না; জগতে সকল মানুষেরই সমান দাবী ও অধিকার আছে।" সাড়া দাও ভাই শিক্ষিত, সর্ব্বহারা মানুষের মুক্তি সংগ্রামে তোমাকেই যে অগ্রদূত হতে হবে, ইতিহাস আর—ভবিষ্যৎ বিস্ময় নেত্রে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করছে। তাই বলি আর ঘুমিও না, তোমরা শিক্ষার নামে কলঙ্ক রেখো না ভাই।

কুমারপাড়া শ্রীহট্ট
২৯শে আগষ্ট, ১৯২৬।

—:—

খোলা চিঠি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
মহাশয়ের সমীপেষু—

বিনিত নিবেদন এই—

মহাশয়, আপনি যখন আমাদের জন্য সুদূর ব্রহ্মের কারাকক্ষে পলে পলে নিজকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিয়াও আমাদিগকে জাগ্রত করিতে পারেন নাই আমরা তখন দেশবাসী আপনাদের কারাকক্ষের দ্বার নিজেরা খুলিয়া দিবার কথা দূরের কথা—বরং পরস্পর দলাদলি ও বিরোধের ফলে এ দেশের স্বরাজ সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া আপনাদের শৃঙ্খল আরও দৃঢ় করিয়া দিয়া-ছিলাম। আজ আপনি ইংরাজের কৃপায় মুক্ত, দেশবাসী তাহাদের প্রাণের নেতা দেশবন্ধুকে অকালে হারাইয়া মাত্র আপনার দিকেই আশান্বিত নয়নে চাহিয়াছিল। এ দেশে প্রতিভায়, কর্ম্মক্ষমতায় প্রাণের স্পন্দনে দেশপ্রীতিতে আপনি সকলেরই আন্তরিক বিশ্বাসের পাত্র এবং দেশবন্ধুর পতাকা আপনিই মাত্র ধারণ করিয়া দেশবাসীকে আজ উহার তলে মিলিত হইতে আহ্বান করিবার যথার্থ অধিকারী। আপনি ছোট বড় সকলকে মাতৃচরণ তলে মিলিত হইতে ডাক দিয়াছেন। তাই, আমাদের হৃদয়ের দুই একটা কথা আপনাকে নিবেদন করিতেছি।

এ দেশে আজ ধর্ম্ম, সমাজ, সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে পরস্পর প্রেম ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় তাহার অযুত প্রকারের বৈশিষ্ট্য লইয়াও মাত্র এক কংগ্রেসের পতাকা তলেই মিলিত হইতে পারে। এ দেশবাসীর দেশপ্রীতিই একমাত্র মিলন ভূমি। কিন্তু আজ কংগ্রেসের দরজা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে। কায়স্থ বৈদ্য, ব্রাহ্মণের মধ্যেও মাত্র কয়েকজন লোকের হাতে আজ কংগ্রেস আবদ্ধ। জাতীয় কংগ্রেসের উপর আমাদের অচলা বিশ্বাস থাকা সত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে এই কংগ্রেসের সহিত দেশের বর্ত্তমানে প্রাণের যোগ নাই। মুসলমান গণ বহু পরিমাণে কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুর শতকরা ৮০ জন অবনত সমাজ। তাহারা চিরদিন উচ্চশ্রেণীর হাতে নির্য্যাতিত হইয়া এমন ভাবেই তাহাদের বিশ্বাস হারাইয়াছে যে, কংগ্রেস উচ্চ-শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত, মাত্র এই জন্যই কংগ্রেস হইতে তাহারা দূরে রহিয়াছে। কংগ্রেসকে কোন দিনই আপন জিনিস বলিয়া ইহারা গ্রহণ করে নাই। যে ২।৫ জন লোক এই সমাজের মধ্যে কংগ্রেসে বিশ্বাসী আছে, তাহারাও এই সমাজ দ্বারা কখন কখন নিঃপীড়িতও হইয়াছে। কিন্তু পুণ্য শ্লোক দেশবন্ধুর স্নেহে ও আহ্বানে ক্রমে যাহারা আসিয়া কংগ্রেসে যোগ দিতেছিল তাহারাও আজ অনেকটা যেন বিতাড়িতই হইয়াছে। ইহাদের আজ কংগ্রেসের প্রতিনিধি হওয়াও আর সহজ সাধ্য নহে। ইহাদের নিকট ভাল করিয়া কেহ যায় নাই, স্বর্গীয় দেশবন্ধুর নিকট একথা বলিলে তিনি একাধিকবার আমাদিগকে বলিয়া-ছেন "একটু আমাকে অবসর হইতে দাও, ঐ কাজই করিব।" আপনি কি এই চির বঞ্চিত ও উপেক্ষিতদের দুয়ারে মায়ের নাম নিয়া যাইবেন? ইহাদের নিকট যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে এবং তাহাতে খুব গুরুতর ক্ষতিও হইয়াছে। ইহা-দিগকে উপেক্ষা করিয়া উচ্চশ্রেণীর স্বরাজ হইতে পারে কিন্তু পূজনীয় দেশবন্ধু স্বরাজ অর্থে ইহাদের স্বরাজই বুঝিতেন।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশের কংগ্রেস কয়েকজন ধনী এবং চতুর লোকের হাতের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। জন সাধারণের সম্পত্তি আর ইহাকে বলিতে পারা যায় না। কলিকাতায় কয়েকজন অসম্ভব বড় লোক এবং কয়েকজন বুদ্ধিমত্তার মহাজন নিজেদের টাকায় এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রভাবে ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত করিতেছেন। নিজ নিজ দল পুষ্টির জন্য এক দল লোককে টাকা দ্বারা খরিদ করিয়া বা কর্পোরেশনে চাকরীর

লোভ দেখাইয়া নিজেদের কার্য্যে লাগাইতেছেন। তাহাদিগকে মফঃস্বলের নির্ব্বাচনে ইচ্ছানুরূপ লোক দিগকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে মফঃস্বলে রিটার্ণিং অফিসার বা অন্যরূপে পাঠাইয়া মফঃস্বলেও কলিকাতার দলাদলি ছড়াইয়া দেশের অবস্থা সমধিক জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে। নতুবা B. P. C. C.র সভাপতি, মেম্বর বা একজিকিউটিভ অফিসারের গোল মফঃস্বলে ছড়াইতে পারিত না। দেশের দুর্ভাগ্য যে এক দল লোক আছে যাহারা এই ধনীদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য কিছু টাকার বিনিময়ে তাহাদের নিজেদের বিবেক বুদ্ধি নাশ করিতে চিন্তাও করে না। B. P. C. C.র (বি, পি, সি, সি,র) নির্ব্বাচনে কলিকাতা হইতে অনেক স্থলে নামের ফর্দ্দ নিয়া মফঃস্বল আসা হয় এবং ঐ ফর্দ্দ অনুসারে নির্ব্বাচন হয়। নির্ব্বাচিত মেম্বর যাহাতে কলিকাতা প্রবাসী বেশী হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়া থাকে। আজ কংগ্রেসে যোগ দিতে হইলেই একজন ধনীর আশ্রয় নিতে হইবে এবং তাঁহার মতানুযায়ী ভোট দিতে হইবে। কোন স্বাধীন প্রকৃতির লোকের কংগ্রেস কাউন্সিল বা B. P. C. C. তে (বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিতে) প্রবেশ অসম্ভব। এই টাকা ওয়ালাদের প্রভাব হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিতে হইবে। টাকার বিনিময়ে বিবেক ও স্বাধীন বুদ্ধি বিক্রী করিলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং ধনিকের পূজার মধ্য দিয়া গণ-তন্ত্রের বিকাশও অসম্ভব। ইহাদের স্বার্থ এবং জন সাধারণের স্বার্থ এক নহে। ইহাদের চিন্তা ও জীবিকা নির্ব্বাহের প্রণালীও ভিন্ন রূপ। B. P. C. C. (বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি) টাকার জোরে ইহাদের হাতে বলিয়া কাউন্সিল নির্ব্বাচনেও জনসাধারণের প্রতিনিধি মনোনীত না হইয়া বুরজোয়া শ্রেণীই বেশী মনোনীত হইয়াছে, ফলে প্রজা পক্ষের লোক প্রায় বাদই পড়িয়াছে। এক কংগ্রেসই ছিল যেখানে আমরা ভাবিতে পারিতাম, আমরা প্রত্যেকে সমান কিন্তু টাকার চাপে সে অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন হয় ত ইহাদের তাবেদারী করিতে হইবে নতুবা কংগ্রেসে প্রতিনিধি হওয়ার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। আর একটী কথা, এই বড় লোকদের সম্বন্ধে দেশবাসীর মধ্যে অনেক মিথ্যা জনরব আছে। তাহা দূর করা আবশ্যক। আমরা অনেকে মনে করি ইহারা অনবরত কেবল আমাদের জন্য টাকা ছড়াইতেছেন, ইহাতে মানুষের মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। শেষে মনে করে কংগ্রেসে ইহাদের এরূপ অন্যায় বুঝি ইহাদের অনুগ্রহেরই ফল। আমরা জানি ইহারা কেহ কেহ একই টাকা একাধিক বার দান করিয়া পরে সমস্ত টাকাই দেওয়া হয় নাই বলিয়াছেন। ইহাদের কার্য্য এবং ইহাদের দান প্রকাশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আমরা একজনের টাকার নিকট কংগ্রেস বাঁধা না দিয়া দশ জনের নিকট ভিক্ষারই বেশী পক্ষপাতী। দেশে সুযোগ প্রাপ্ত সমাজের সহিত বঞ্চিতের এবং জমিদার ও মহাজনের সহিত জন সাধারণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এখন ধনী ও জমিদারদিগকেই মাত্র ধরিয়া থাকিলে কংগ্রেস টিকিয়া থাকিতে পারিবেনা। অনেকে মনে করে যথার্থ স্বাধীনতার যুদ্ধের দিনে এই ধনিকগণ বিপক্ষেই গমন করিবেন, কেননা, ইহারা ইংরাজের সৃষ্টি এবং ইংরাজের প্রতিষ্ঠার উপরই ইহাদের প্রতিষ্ঠা।

আর একটী কথা এখন প্রকাশ্যে বলার সময় আসিয়াছে। মহাত্মার প্রবর্ত্তিত পন্থায় আমাদের যথার্থ বিশ্বাস আছে কি না? এবং ইহা যে কার্য্যকরী হইবে তাহা প্রাণের সহিত আমরা বিশ্বাস করি কিনা। যাহা করিতে যাইব সে সম্বন্ধে আমার প্রাণের সম্পূর্ণ সাড়া না পাইলে প্রতি পদে যে পদস্খলনই হইবে। জাতির মনের অবস্থা বীরের মত প্রকাশ করার আবশ্যকতা আছে। নতুবা বিশ্বাস একরূপ এবং কাষ্য অন্যরূপ, ইহাতে জাতিকে চরিত্রহীন করিয়া তুলিবে। এ দেশের জাতিভেদ ও অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাস আমাদের সমাজের জীবনের স্রোত প্রায় নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তবুও কুসংস্কারের জন্য উহাকে ভাঙ্গিবার সামর্থ্য জাতির নাই। মহাত্মার কর্ম্মপন্থা জাতিকে সেইরূপ নূতন স্পন্দন দিতেছেনা, ইহা জানিয়াও শুধু প্রেষ্টিজের জন্য মাত্র জাতির জয় যাত্রায় বাধা না পায় তাহাও ধীর ভাবে বিবেচনার সময় বোধহয় আসিয়াছে।

এই পরাধীন দেশে গৃহ বিবাদের মধ্যে বুকের রক্ত দান করিয়া যাঁহারা জাতির সম্মুখে আত্মত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা অমর, তাঁহাদের স্মৃতি জাতি হৃদয় সিংহাসনে অনন্তকাল পূজা করিবে। কিন্তু তাঁহাদের নাম করিয়া আজ যাঁহারা করতালি নিয়া ফিরেন তাঁহারা দেশের বর্ত্তমান সমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখন ত্যাগের পুরস্কার দেওয়ার সময় কোথায়? মৃতের সৎকারের সময় নাই, এখন জীবিতের শুশ্রূষা করিতে হইবে। অনাথ আশ্রমের কাজ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ এক নহে।

আপনার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া এই বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নিবেদক—
শ্রীমোহিনীমোহন দাশ।

—•—

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভা

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের (The Peasants' and Workers' Party of Bengal এর) কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির এক অধিবেশন কলিকাতা, ৩৭, হ্যারিসন রোডে দলের কার্য্যালয়ে হয়েছিল। দলের সভাপতি হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। দলের ব্যক্তিগত সভ্য সংখ্যা বাড়ানো, নূতন শ্রমিক বা কৃষক সঙ্ঘ সমূহ সংগঠন ও অন্যান্য উপায়ে প্রচার কার্য্য চালানো সম্বন্ধে এ সভায় বিশেষরূপে আলোচনা হয়।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল, এর উন্নত কর্ম্মতালিকা নিয়ে শক্তিশালী জনগণের প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ভিতরে বর্ত্তমান সময়ে যে একটা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থপর লোকেদের দল গঠিত হয়েছে তার অস্তিত্ব আর থকবেনা। কেননা, সে অবস্থায় কংগ্রেসকে জনগণের কর্ম্মতালিকাই গ্রহণ করতে হবে। এই জন্যে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ভিতরকার স্বার্থপর দলের দ্বারা ও ইঙ্গিতে পরিচালিত এবং ইউরোপীয় ধনিকগণের বিজ্ঞাপনানুগ্রহে পরিপুষ্ট ইংরেজী দৈনিক "ফরওয়ার্ড"এর ভিতর দিয়ে একটা হীন প্রচার কার্য্য

চলেছে। তাদের এই ঘৃণিত কার্য্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে :—

This meeting of the Executive Committee of THE PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL strongly condemns the attack made in "The Forward" news paper in a series of articles entitled "Glimpses of the Underworled" by a "C. I. D." against the party as being "largely manned by some of agents" (of the C.I.D.) which imputation is totally false and has been made in the interest of a bourgeois clique in the Indian National Congress for the purpose of alienation of public sympathy from a party which is working for the real freedom of the masses.

অর্থাৎ

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির এই সভা "ফরওয়াড" নামক সংবাদপত্রে জনৈক গোয়েন্দা (সি, আই, ডি) শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে এই দলে অধিক সংখ্যকরূপে সি, আই, ডি'র চর রয়েছে বলে প্রকাশ ক'রে দলকে যে আক্রমণ করেছে তার তীব্র ভৎসর্না করছে। এ দোষারোপ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ভিতরে বুর্জ্জোয়াজিগণের উৎপাদনের উপায় সমূহকে আয়ত্তকারিগণের বা তাদের অনুগতগণের যে একটা দল গঠিত হয়েছে তারি স্বার্থের খাতিরে যে দল জনগণের প্রকৃত মুক্তির জন্যে কাজ করছে তাকে কার্য্যক্ষেত্র হতে অপসারিত করার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়েছে।

—•—

বি, এন, রেলে শ্রমিকগণের কর্ম্মচ্যুতি

—:*:—

নারী ও পুরুষ শ্রমিক উপবাসে দিন কাটাচ্ছে

—•—

অল-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স্ ফেডারেশনের সেক্রেটারী মিঃ মুকুন্দলাল সরকার ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ব্যয় সংক্ষেপ ব্যবস্থার দ্বারা নির্য্যাতিত শ্রমিকগণের সাহায্যের জন্যে নিম্নলিখিতরূপ আবেদন পত্র প্রকাশ করেছেন :—

খড়্গাপুরের রেলওয়ে কারখানা এখনো বন্ধই রয়েছে। অন্যায় ভাবে যে সব লোক কমানো হয়েছে তাদের সংখ্যা খড়্গাপুরে ২০০০, নাগপুরে ৫০ জন, বিলাসপুরে ৬০ জন এবং ডোঙ্গরগড়ে ১৯ জন। এ সকল শ্রমিকগণের উপরে নির্ভরশীল প্রায় ১০০০০ লোক এতদ্দ্বারা নিরন্ন হয়ে পড়েছে। শ্রমিকগণ নিজেরা ও তাদের ইউনিয়ন সমূহ এ ব্যাপারে যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু আজো পর্য্যন্ত কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ ব্যাপারের গোড়া থেকেই আমি খড়্গাপুরে ছিলুম। কাজেই ব্যাপারটাকে অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। এটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে শ্রমিকরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ভারতীয় শ্রমিক সঙ্ঘ যে তালিকা সংগ্রহ করেছে তাতে জানা গিয়েছে যে কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের শতকরা ৫২ জন মাসে ১৫ টাকার কম বেতন পাচ্ছিল। এই ৫২ জনের অধিকাংশই দৈনিক মজুরী পেত ।৶০ আনা থেকে ৸০ আনা পর্য্যন্ত। তারপরে শেষ যে খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে যে কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের শতকরা ৯২॥০ জন গত ধর্ম্মঘটে যোগদান করেছিল। তাদের শতকরা ৮৫ জনের বয়স চল্লিশ বছরের কম। যে সকল নারী শ্রমিকের কাজ গিয়েছে তাদের অধিকাংশই বিধবা, বয়সেও প্রবীণা। এদের পরিবারে প্রত্যেকের উপরে গড়পড়তা নির্ভরকারীর সংখ্যা ৫ জন। এ অবস্থায় সহজেই প্রতীয়মান হবে যে খড়্গাপুরের শ্রমিকরা কত কষ্ট ভোগ করছে। লোক কমানোর প্রশ্ন এখনো মীমাংসিত হয়নি বলে শ্রমিকরা "সেটলমেণ্ট"এর টাকা গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। কিন্তু, আগষ্ট মাসের বেতন তারা চেয়েছিল সাধারণত প্রত্যেক মাসের ১৮ই তারিখে শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হয়। কিন্তু, কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাদের বিরোধের গতিকে আজো পর্য্যন্ত তারা বেতন পায়নি। এ কারণে তাদের উপবাস করতে হচ্ছে। বস্ত্রাভাবে তারা এখন উলঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয়েছে। ২০শে তারিখ থেকে শ্রমিক সঙ্ঘ রিলিফ কেন্দ্র সমূহ স্থাপন করেছে। যাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় তাদের কোনো প্রকারে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এ সকল কেন্দ্র হতে অর্থ ও অন্ন বিতরিত হচ্ছে। এ যাবৎ ইউনিয়ন স্থানীয় সাহায্য থেকেই এ কাজ করেছে। কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করছেন এবং রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যেমন দুর্বিনীত ভাব ধারণ করেছেন তাতে ইউনিয়নকে এ আন্দোলন আরো অনেক দিন চালাতে হবে এবং দরকার হলে ধর্ম্মঘটও ঘোষণা করতে হবে। অবশ্য এ সবেরই উদ্দেশ্য হবে লোক কমানোর হুকুমকে বাতিল করে সুবিচার পাওয়া। কাজেই, যতদিন না এ প্রশ্নের সুমীমাংসা হচ্ছে ততদিন শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাদের খাওয়া পরার বন্দোবস্ত করতে হবে। জনসাধারণের, শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের, বিশেষ করে দেশবিদেশের রেলওয়ে সঙ্ঘ সমূহের নিকটে আমি প্রার্থনা করছি যে তাঁরা খড়্গাপুরের বিপন্ন শ্রমিকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করুন। টাকা-কড়ি অল্-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন, ১২নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এ সকল টাকার যথারীতি প্রাপ্তি স্বীকার করা হবে। টাকা আমরা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান লেবর ইউনিয়নের নিকটে পাঠিয়ে দেবো।

বোম্বে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা

—০—

স্প্রাট ও মিরাজকর অভিযুক্ত—

--০—

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ক ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অপরাধে বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধি কমরেড ফি, স্প্রাট যে বোম্বেতে ধৃত হয়েছেন সে খবর পাঠকগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর মোকদ্দমা বোম্বের চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উঠেছিল। তাঁর ওপরে আরোপিত অভিযোগ এই যে তিনি "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না" (ভারতবর্ষ ও চীন) নামক ইংরেজী পুস্তিকার লেখক।

পরদিন প্রসেকিউটর মিঃ ওয়াকার মোকদ্দমা আরম্ভ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] যে:—"চীনের লোকের হাতে [illegible] [illegible]

নিবেদন

"গণবাণী" যাঁরা পড়েন তাঁদিগকে বলবার কোনো প্রয়োজন নেই যে "গণবাণী" কি জিনিস, আর কেমনই বা তা' বের করা হয়। এ রকমের কাগজ যে ব্যবসায় হিসাবে চালানো যেতে পারে না এ কথাও নিশ্চিত সকলেই বোঝেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে ভারতের জনগণের সংগঠন ও উত্থানের যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন এ কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদেরি আর্থিক সাহায্যের ওপরে "গণবাণী"র প্রচার নির্ভর করছে। আমাদের আরব্ধ কাজের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বন্ধুদের সাহায্যে অতীতে "গণবাণী" চলেছে এবং ভবিষ্যতের জন্যও আমরা তাঁদেরি দ্বারস্থ হচ্ছি। যাঁকে দিয়ে যতটা সম্ভব আর্থিক সাহায্য আমাদের করুন। "গণবাণী"র গ্রাহক সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা তো আমাদের সকল পাঠকেরই আছে। সাহায্যের প্রাপ্তি আমরা যথারীতি স্বীকার করব। যাঁরা অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন তাঁদের নাম আমরা প্রকাশ করব না। ছুটির পরে "গণবাণী"কে আরো অধিকতর সৌষ্ঠব সম্পন্ন করে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমরা করেছি। সবই অবশ্য নির্ভর করছে আর্থিক সাহায্যের ওপরে। আমরা শরীরের রক্ত খরচ করছি, কিন্তু, আমাদের বন্ধুগণ কি সামান্য কিছু অর্থও সাহায্য করতে পারবেন না?

নিবেদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
সম্পাদক—"গণবাণী"।

করবার সময় বলেন যে আসামীকে তাঁর ভারতের পাসপোর্টে "পুস্তক বিক্রেতা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশ্যতঃ যা দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাতে তিনি পুস্তক বিক্রয়ের জন্যে তেমন কিছুই করেন নি। আসামী যে উল্লিখিত পুস্তিকার লেখক তা ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাস যোগ্য দলিল আদির দ্বারা ফরিয়াদীর তরফ থেকে প্রমাণ করা হবে। সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে পুলিশ যখন আসামীর ঘরে খানা তালাসি করেছিল তখন তারা "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল হেরাল্ড" এর সম্পাদক মিঃ বি, জি, হর্নিম্যানের নামে লিখিত একখানা পত্রের প্রতিলিপি পেয়েছিল। এ কাগজেই "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না"র প্রথম কয় অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রখানা ১৯২৭ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত হয়েছিল এবং প্রতিলিপিতে আসামীর নিকটে মাথা নত করার পক্ষপাতী।" আর এক জায়গায় বলা হয়েছে:—

"আমাদিগকে শুধু বৃটেনেরই সম্মুখীন হতে হবে। চীনের ও মিসরের সংগ্রামে, বৃটেনের আপন শ্রমিকগণের সংগ্রামের কথা না হয় এখানে নেই বা বললেম, হীনবল বৃটেন ভারতবর্ষকে কবলগত করে কিছুতেই রাখতে পারেনা, অবশ্য ভারত যদি আপনাকে প্রকৃতরূপে মুক্ত করার জন্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়।" অপর এক অংশ পড়ে সরকার উকিল বলেন যে আসামী ভারতীয় কৃষকগণের সৈনিক-সজ্ঞ সমূহ গঠনের জন্যে অনুরোধ করেছিল। তারপরে সরকার পক্ষ থেকে আরো কতকগুলো দলিলপত্র পাঠ করা হয়।

মিঃ স্প্রাটের ঘর তালাশির সময় একটা নোট বুক, তার

ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র, একটা ঘোষণা পত্র, একটা টাইপ রাইটার ও "বিপ্লবের পাঠ্য সম্বন্ধে একটা প্রস্তাবিত সিলেবাস্" পাওয়া গিয়েছিল।

মিঃ ওয়াকারের বক্তৃতা শেষ হলে পরে মিঃ ফিলিপ স্প্রাটের ব্যারিষ্টার মিঃ জে, ডি, পাটেল বলেন যে তাঁর মক্কেল হাইকোর্টের দায়রাতেই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান। ম্যাজিষ্ট্রেট তদনুসারে মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ করেছেন।

মিরাজকর গেরেফতার

বোম্বে শ্রমিক ও কৃষক দলের সেক্রেটারী এস, এস, মিরাজকর ২৫শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা গেরেফতার হয়েছেন। তিনি "ইণ্ডিয়া এণ্ড চায়না"র প্রকাশক। বইখানা "এডভোকেট অফ ইণ্ডিয়া" প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল। তাই, সেই প্রেসের মুদ্রাকর মিঃ কে, কে, চিটালেও গেরেফতার হয়েছেন। পরওয়ানাতে জামীনে ছেড়ে দেবার হুকুমও ছিল। তাই, তাঁদের প্রত্যেকেই তিন হাজার টাকার জামীনে মুক্ত হয়েছেন।

মোকদ্দমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে গঠিত কমিটি টাকা আদায়ের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করছে।

লণ্ডনের লেবর রিচার্স ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর কমরেড পেজ আর্নটের নামে বোম্বের শ্রমিক ও কৃষকদল থেকে কমরেড স্প্রাটের ধৃত হওয়া সম্বন্ধে তার পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু, প্রাপ্তি স্বীকার না পাওয়াতে দলের লোকেরা মনে করেছেন যে ভারতবর্ষ কিংবা লণ্ডনে টেলিগ্রাফ টা আটক করে রাখা হয়েছে। মিরাজকর ও চিটালেও দায়রাতে সোপর্দ্দ হয়েছেন।

—০—

দেশ বিদেশ

—:০:০:—

কম্যুনিষ্ট গ্রেপ্তার

আমষ্টার্ডাম ২৩শে সেপ্টেম্বর। আমষ্টার্ডাম লেডেন এবং হেগের পুলিশ কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, এই সন্দেহের বশে কতিপয় ডাচ্ ইণ্ডিয়ান ছাত্রের কক্ষে খানাতালাশি করিয়াছে। অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কে পুলিশ শোষণবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা বাদী সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য, মোহাম্মদ হাত্তাকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—০—

দীনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহাকুমায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বহুলোক অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের খবরে জানা গিয়াছে যে সাবডিভিশানাল ম্যাজিষ্ট্রেট পঞ্চায়েৎদের নিকট আদেশ জারী করিয়াছেন যে, যে সমস্ত লোক দুই তিন দিন যাবৎ অনাহারে আছে তাহাদের খাওয়াইয়া সার্কেল অফিসারের কাছে তাহার বিল উপস্থাপিত করিবে। সার্কুলারে ইহাও প্রকাশ যে অনাহার জনিত মৃত্যুর জন্য পঞ্চায়েৎদের দায়ী করা হইবে।

—০—

বি, এন, রেলের শ্রমিকদের জন্য সাহায্য সমিতি

খাদিরা খড়্গপুরের স্থানীয় লেবর ইউনিয়নের কার্য্যালয়ে একটি সাহায্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। যে সমুদয় স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিক অতিশয় কষ্টে দিনাতি পাত করিতেছে ও যাহারা মীমাংসার শর্ত্ত গ্রহণ করে নাই তাহারা তথায় প্রত্যহ ডাল ভাত খাইতে পাইতেছে।

—০—

আরামবাগ রাজনৈতিক ডাকাইতীর মামলা

হুগলী, ২৩শে সেপ্টেম্বর।

হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স জজ্ মিঃ সি, বে, বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ মিঃ এস, আহমদ, এবং অবসর প্রাপ্ত সাব্ অর্ডিনেট জজ মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জীর দ্বারা গঠিত হুগলী স্পেশাল ট্রাইবিউনাল আরামবাগ রাজনৈতিক ডাকাইতি সম্পর্কে অভিযুক্ত স্বদেশভূষণ দাস, ডাক্তার যতীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, ও হরিসাধন পাইনের মোকদ্দমার রায় ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রকাশ করিয়াছেন। ষড়যন্ত্র ও ডাকাইতির অভিযোগ তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আরামবাগ, শিল গ্রামের বিপিনবিহারী পালের গৃহে, তাঁহারা রিভলবার প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ডাকাইতি করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার সরকারী সাক্ষী দিবাকর ইহার সহিত সংসৃষ্ট ছিল ও ইতিপূর্ব্বে অপরাধ স্বীকার করার পর তাহার সাজা হইয়াছে। যথেষ্ট সাক্ষ্যের অভাবে হরিসাধন পাইনকে স্পেশাল ট্রাইবিউনাল অব্যাহতি দিয়াছেন। ডাক্তার মুখার্জ্জী ও স্বদেশভূষণ দাসের উপর যথাক্রমে ছয় ও পাঁচ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

—০—

ধীবর ধর্ম্মঘট

এলাহাবাদ ২৭শে সেপ্টেম্বর সেণ্ট্রাল বোর্ডের নির্দ্দেশ মত কাজ করা হইবে জানিয়া এলাহাবাদের ধীবরগণ ধর্ম্মঘট বন্ধ করিয়াছে।

—০—

সাময়িক রেল ষ্টেশন

মাদ্রাজ ২৩শে সেপ্টেম্বর। 'মাদ্রাজ মেল' অবগত হইয়াছেন, কংগ্রেসের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ স্পারট্যাঙ্কে একটা সাময়িক রেল ষ্টেশন খুলিতে সম্মত হইয়াছেন। কংগ্রেসের সুবিধার জন্য বহু সংখ্যক স্পেশাল গাড়ী যাতায়াত করিবে।

—।—

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার জের

সিমলা, ২৪শে সেপ্টেম্বর।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামী চতুষ্টয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যভাগে বহুলোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন বড়লাটের নিকট পেশ হইয়াছে। এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত আবেদন সম্পর্কে পণ্ডিত মালব্য, নবাব জুলফিকার আলী এবং আরও কয়েক ব্যক্তি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

—০—

মাদ্রাজ মেথর ধর্ম্মঘট

সিমলা, ২৪শে সেপ্টেম্বর।

মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটীর ঝাড়ুদার ও মেথরগণ তাহাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

—০—

আসাম চা বাগানের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট

আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের উপর যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, চা বাগানের শ্বেতাঙ্গ মুনিবদের অপকৃষ্ট ব্যবহারে শ্রমিকদের যে কিরূপ কষ্টের ভিতর দিয়া দৈনন্দিন জীবন যাপিত হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গ প্রভু ও তাহাদের ম্যানেজারগণ, দাসদাসী পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় বাস করে, মটরগাড়ীতে পরিভ্রমণ করে আর শ্রমিকগণ তাহাদের দেহের শোণিত জল করিয়া প্রভুদের যাবতীয় বিলাস সামগ্রী সরবরাহ করে। শ্রমিকদের অনশনে, অর্দ্ধাশনে অন্ধকার দুর্গন্ধময় কুড়েঘরে বাস করিতে হয়। আমাদের [illegible] দের স্থানেও কোনো কালে এরূপ পায় না। [illegible] তাহাদের প্রকৃতির সহিত একটানা সংগ্রাম করিতে হয়। তাহারা মাসিক যে বেতন পায় তাহা নিতান্ত কম। পুরুষ শ্রমিকরা মাসে ৭ টাকা পায় আর স্ত্রী শ্রমিকরা ৬ টাকা পায়। এই টাকাতে কোনো প্রকারে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তারা গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত কর্ত্তৃক চা বাগানের মালিকদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত ভাটীখানাতে গিয়া মদ্য পান করে। এইরূপে তাহাদের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত শোষণ করে। মদ্যপান করিয়া সমস্ত পয়সা খরচ করিয়া মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি তাহারা অনাহারে কাটায়। সম্প্রতি ডিব্রুগড় ও তেজপুরের চা বাগান গুলির মধ্যে কয়েকটি স্থানে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কিন্তু তথায় কোনো সঙ্ঘবদ্ধ ইউনিয়ন নাই। কোনো ফাণ্ড নাই যে তদ্দ্বারা তাহারা সংগ্রাম চালাইতে পারে। তেজপুর ও ডিব্রুগড়ের শ্রমিকগণ অনাহার ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া তথাকার ডেপুটি কমিশনারের কাছে তাহাদের দুঃখের কাহিনী জানাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কোনো প্রতীকার হয় নাই। ডিব্রুগড়ের কমিশনার সাহায্য দেওয়া, দূরের কথা তাহাদের অভিযোগই শুনে নাই। তেজপুরে শ্রমিকরা পুলিশ কর্ত্তৃক কাজে ফিরিয়া যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। প্রায়ই দেখা যায় শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিলে, পুলিশের কনেষ্টবলের লাঠি, গুর্খার বেটনের ঘা প্রভৃতি কাজে লাগান হয়। বর্ত্তমানে তাহাদের অবস্থা সাংঘাতিক দাঁড়াইয়াছে।

—০—

রাশিয়ার নিমন্ত্রণ

সোভিয়েট গণতন্ত্রের দশম বার্ষিক উৎসবে যোগদান করার জন্যে রাশিয়ার সঙ্গে অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপনের যে সোসাইটি আছে তাঁর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ভারতীয়গণ নিমন্ত্রিত হয়েছেন :-

১। মিষ্টার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ"
২। " কে, এম, সেনগুপ্ত, ব্যারিষ্টার,
মেয়র, কলিকাতা।
৩। " সুভাষচন্দ্র বসু,
৪। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
৫। মওলানা আবুল কালাম আজাদ,
৬। মিষ্টার মোহাম্মদ আলী,
৭। " শওকত আলী,
৮। " হসরৎ মোহানী
৯। " সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী,
সম্পাদক, বোম্বে ক্রনিকল,
১০। অধ্যাপক কে, টি, শাহ, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়।

নিমন্ত্রিতগণকে ৩০শে অক্টোবর তারিখে মস্কো পৌঁছার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। রাহাখরচ সোসাইটি বহন করতে প্রস্তুত আছেন। সি, সি, এফ, এণ্ড্রুজও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

—০—

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন

—:০:—

শ্রীযুক্ত "গণবাণী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

"বেঙ্গল মেরিনারস্ ইউনিয়ন" ফ্লাট ও ষ্টীমারের সারেং, সুখানী, ইঞ্জিন ড্রাইভার ও ক্রুদের বেতন বাড়াইবার আন্দোলন করিয়া এই পূজার ভিড়ে ষ্টীমার কোম্পানীদের উপর চাপ দিয়াছেন ও অনেকটা সফলকাম হইয়াছেন। কিন্তু, এই বেতন বৃদ্ধিতে সাধারণ খালাসীদের কি কোনরূপ উপকার হইবে? চিরকালই ত সারেঙ্গ ও ড্রাইভারেরা খালাসীদের উপর বেতন সম্পর্কে ও অন্যান্য উপায়ে অত্যন্ত জবরদস্তি করিয়া আসিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক অপেক্ষা কম লোক রাখিয়া, ১২ বৎসরের অল্প বয়স্ক লোকদের বে-আইনী মত নিযুক্ত করিয়া ও নূতন অ্যাপ্রেন্টিসদের কম বেতন দিয়া এবং খোরাকী বাবদ সব কাটিয়া রাখিয়া এই সারেঙ্গ ও ড্রাইভারেরা কম লাভ করে না। মেরিনারস্ ইউনিয়ন এ সব জানেন কি, আর জানিলে ইহার প্রতীকারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? না, তাঁহারাও কেবল সারেং ও ইঞ্জিন ড্রাইভারদের সুবিধাই দেখিবেন?

ইতি—
খাতির-নদারৎ।

—০—

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

মূল্য

বার্ষিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে	২৸০
ষাণ্মাসিক মূল্য ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ	১৵০
বার্ষিক মূল্য বিদেশে	৭ শিলিং

এজেন্সী

মফঃস্বলের এজেন্টগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্য ৫৲ টাকা করিয়া আফিসে জমা রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সে মাসের কাগজের মূল্য আফিসে পাঠাইতে হইবে। মনিঅর্ডার ফিস এজেন্টগণকে দিতে হইবে। অবিক্রীত কাগজের শতকরা ১০ খানা আফিস ফেরত লইবে; কিন্তু, প্রতি সপ্তাহে তাহার আগেকার সপ্তাহের কাগজ ফেরৎ আসা চাই। কাগজ ফেরৎ পাঠানোর ব্যয় ভার এজেন্টগণকে বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

"গণবাণী"র বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে আফিসের সহিত লেখালেখি করিয়া বা লোক পাঠাইয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজার—
গণবাণী কার্য্যালয়—
৩৭ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

BOOKS ON SOCIALISM.

1. **The Coming of Socialism.**
by
LUCIEN.
Price—Ans. 6/- only.

2. **Scientific Socialism.**
Its Aims and Ideals.
BY
WM. PAUL
Price—As. 4/- only.

3. **The Religion of Capital**
BY
PAUL LAFARGUE.
Price—As. 6/- only.

4. **Manifesto of the Communist Party**
BY
KARL MARX & FREDERICK ENGELS.
Price—As. 6/- only.

To be had of
The Book Company Ltd.
4/4A, College Square, Calcutta.

কথা সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
উপন্যাস ও গল্প

দ্বিতীয় পক্ষ	৷০
অগ্নিসংস্কার	১৷০
শুভা	২৲
পাপের ছাপ	২।০
বিপর্য্যয়	২৷০
শান্তি	২৷০
কাঁটার ফুল	১৷০
রক্তের ঋণ	৷০
আনন্দ-মন্দির	৷০
রাজগী	২।০
পিতাপুত্র	১৷০
গ্রামের কথা	২৲
ব্যবধান	১৲০
দূরের আলো	২৲

নাটক

১। ঠকের মেলা, মিনার্ভায় অভিনীত প্রহসন। ৷০
২। ঋষির মেয়ে, ষ্টারে অভিনীত প্রহসন। ১৲

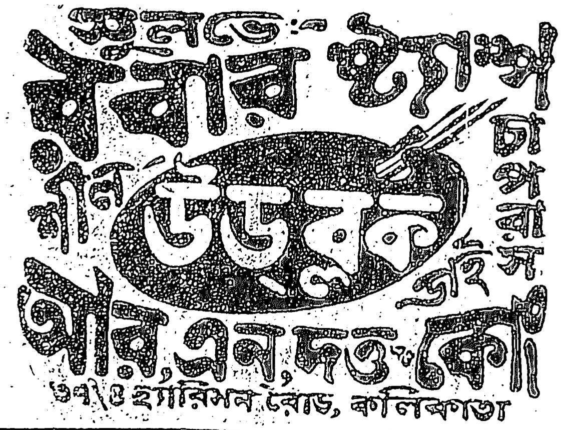
শীঘ্র প্রকাশিত হইবে
উপন্যাস ও গল্প

১। মিলন পূর্ণিমা।
২। তৃপ্তি।
৩। একা।

প্রবন্ধ সংগ্রহ :—
১। ভাত কাপড়ের কথা
বাঙ্গালার রায়তের কথা—বাঙ্গালীর অন্নকষ্টের কথা।
২। বাণী বীথি।
বাঙ্গালা সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কথা।

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমাজতত্ত্ব ও প্রাজ্ঞিক ব্যবহারের গ্রন্থ
1. Sources of Law and Society in Ancient India.
2. Evolution of Law.
Published by the Calcutta University.



Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

GANAVANI

Weekly Organ in Bengali of the
PEASANTS' AND WORKERS' PARTY OF BENGAL
37, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

১ম খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে অক্টোবর ১৯২৭, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪	৩২ম সংখ্যা

সম্পাদক { মুজফ্‌ফর আহমদ
শ্রীপ্যারীমোহন দাস

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু' পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৷৹
Foreign Subscription Annual 7s.

গণ-বাণী

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

—চণ্ডীদাস—

১ম খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে অক্টোবর, ১৯২৭, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৪ | ৫ম সংখ্যা

ভিয়েনার শ্রমিক-সংগ্রাম থেকে ভারতবর্ষ কি শিখতে পারে ?

—০—

(শ্রীসৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর)

—০—

১৫ই, ১৬ই জুলাই দু'টি দিন ভিয়েনার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, আর থাকবে অমর হয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের নির্য্যাতিতদের ইতিহাসের পাতায়। আমাদের বড় গর্ব্বের 'সভ্যতার' যে নমুনা আমরা এই দুটি দিনে পেয়েছি তাতে এর পরেও আমাদের সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে যদি কারো কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে তাকে আমরা অনুরোধ করি একটু মন দিয়ে এই ঘটনাটির বিষয় ভেবে দেখতে। এই বৎসরে জানুয়ারী মাসের ত্রিশ তারিখে স্যাটেন ডর্ফের পথ দিয়ে শ্রমিক সঙ্ঘের একদল শ্রমিক সৈন্য মার্চ্চ করে যাচ্ছিল। এমন সময় স্যারমান আর পিণ্টার নামে দুজন ফ্যাসিষ্ট এদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তার ফলে একটি শিশু আর একটি বৃদ্ধ হত হয়, আর কতকগুলি শ্রমিক অল্প বিস্তর আহত হয়। এই দুটি হত্যাকারী এতদিন বিচারাধীন ছিলো, ১৪ই জুলাই তারিখে তাদের নির্দ্দোষ বলে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৪ই সন্ধ্যা বেলা এই সংবাদ দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে একটা মহা উত্তেজনার সঞ্চার হয়। ১৫ই জুলাই শুক্রবার সকালে প্রায় সব কারখানার শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দলে দলে সহরের মধ্যিখানে জড় হতে থাকে। পুলিশও প্রতি পদে এদের বাধা দেবার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু চারদিক থেকে দলে দলে শ্রমিকরা আসতে থাকায় শত চেষ্টায়ও পুলিশ কিছু করে উঠতে পারে নি। এই রকম করে দেখতে দেখতে অসংখ্য শ্রমিকেতে রিঙষ্ট্রাসে বলে ভিয়েনার প্রকাণ্ড রাস্তাটা ছেয়ে গেল। পুলিশ একটা গণ্ড গোল বাধাবার চেষ্টায় বারবার শ্রমিকদের উত্তেজিত করতে থাকে, কিন্তু, তাদের এ কৌশল বিশেষ কার্য্যকরী হয় নি। তখন আর মিথ্যে কোন ছুতো না করে পুলিশ শ্রমিকদের উপর সোজাসুজি গুলি বৃষ্টি করতে থাকে। নিরস্ত্র শ্রমিকেরা তখন আর কোন উপায় না দেখে হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। একটা পুলিশের ব্যারাকের মধ্যে থেকে শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালাচ্ছিল। শ্রমিকেরা দলে দলে মৃত্যু স্বীকার করেও সেই ব্যারাকটা দখল করে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপরে তারা পার্লামেণ্ট বিল্ডিং এর পিছনে কোর্ট অফ জাষ্টিসের সামনে জড় হতে থাকে। কোর্টের মধ্যে একদল পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছিল। শ্রমিকেরা কোর্টের সামনে ময়দানে জড় হয়ে এই ব'লে চীৎকার করতে থাকে যে "শ্রমিকদের হত্যাকারীদের দণ্ড দেওয়া হউক, বিচারের নামে যে শোষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয় সেই মেকী বিচারের অবসান হউক, সিপেল গভর্ণমেণ্টের ধ্বংস হউক।" তারা কিন্তু একবারও কোর্টের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেনি। এত উত্তেজনার মধ্যেও তারা আশ্চর্য্য সংযম দেখিয়ে আসছিল। কিন্তু যা সব দেশে হয়ে থাকে এদেশেও তাই হোল। আইন আর শান্তির রক্ষকেরাই সর্ব্ব প্রথমে শান্তি ভঙ্গ করে থাকেন। অবশ্য শুনতে পাই যে সে শান্তি ভঙ্গ করবার কারণও নাকি শান্তি রক্ষা। যাই হোক এক্ষেত্রেও তাই হোল। পুলিশ; কোর্টের ভিতর থেকে শ্রমিকদের উপর গুলি ছুড়তে শুরু করলো। দেখতে দেখতে কোর্টের সামনের প্রাঙ্গন মৃত দেহেতে ছেয়ে গেল। শ্রমিকেরা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো। মৃত্যু তুচ্ছ করে তারা দলে দলে কোর্ট দখল করবার জন্যে সেই অভ্রান্ত গুলি বর্ষণের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হোতে লাগলো।

একটু একটু করে এগোতে এগোতে তারা শেষে কোর্টের সিংহ দরজা ভেঙ্গে তার মধ্যে প্রবেশ করলো। কাইসারের ছবি, সোনায় ঢালাই করা ঈগলের প্রতিমূর্ত্তি, পুরাণো দলীল ইত্যাদি তারা যা কিছু হাতের কাছে পেল সব ভেঙ্গে চুরমার করে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপরে তারা কোর্টের প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিতে লাগলো। তখন তাদের

সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। নকল বিচারের যা কিছু নিদর্শন তারা দেখল তাই তারা ধ্বংস করে দিতে লাগলো। একদল শ্রমিক ফ্যাসিষ্ট দলের আড্ডা হানা দিয়ে তাদের আফিস পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। লাঞ্ছিতের বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলে তারই স্পর্শে সমস্ত ভিয়েনা ধূ ধূ করে জ্বলে উঠলো। এই ধ্বংসলীলা যখন সহরের চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন একে একে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতারা দেখা দিতে লাগলেন। এই শ্রমিক নেতারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েই শ্রমিকদের সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করে আগুন নেবাবার জন্যে পুলিশকে সাহায্য করতে লাগলেন। এমন কি সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের শ্রমিক নেতাদের কথায় শ্রমিক সঙ্ঘের সৈনিকদলও আগুন নেবাতে আর শান্তি রক্ষা করবার জন্যে পুলিশকে সাহায্য করতে লাগলো। তারা শ্রমিকদের হাত থেকে পুলিশদের রক্ষে করে নির্ব্বিঘ্নে তাদের ব্যারাকে পৌছে দিতে লাগলো। পুলিশদের দুঃখ দেখে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতাদের বুক ফেটে যাবার দাখিল। যে পশুগুলো এতক্ষণ নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর গুলি ছুড়ে আসছিলো তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে শ্রমিক নেতাদের এই আত্যন্তিক আগ্রহকে কি ভাষায় বর্ণনা করবো ভেবে পাচ্ছি নে। যাই হোক তাঁরা শত চেষ্টা করেও শ্রমিকদের অনেক অনুনয় বিনয় করে, অনেক ধমক দিয়েও বিচার ভবন রক্ষা করতে পারলেন না। শ্রমিকেরা কোর্ট ঘিরে পাহারা দিতে লাগলো, দমকলকে কোন মতেই আগুন নিবাতে দিলো না। শুক্রবার বিকেল থেকে সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল মেশিন গান নিয়ে শ্রমিকদের আক্রমণ করলো। সমস্ত সন্ধ্যা, সমস্ত রাত ধরে সহরের যে অংশে শ্রমিকরা থাকে সেই অংশে সৈন্যদল সকাল বেলার প্রতিশোধ নিল। এক হাজারের বেশী শ্রমিক আহত হোল, একশ'র বেশী শ্রমিক মৃত্যু মুখে পতিত হলো। বাড়ী বাড়ী ঢুকে সৈনিকেরা যাকে পেল তাকেই গুলি করে মারতে লাগলো। ১৬ই জুলাই শনিবার সকাল বেলা ভিয়েনাতে একজন শ্রমিকও কাজে গেল না, আর রেলের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে সমস্ত অষ্ট্রিয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিলো। শনিবার রাত্তিরেও পুলিশ আর সৈন্যদল মিলে শ্রমিকদের বাসস্থল আক্রমণ করে নিরস্ত্র শ্রমিকদের গুলি করে মারতে লাগলো। ১৭ই জুলাই রবিবার সকাল বেলা সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হরতাল ভেঙ্গে দিলেন। ট্রামের কর্ম্মচারীরা আবার কাজে যোগ দিল। ১৮ই জুলাই সোমবার ট্রেড ইউনিয়নের দলপতিদের বিধি অনুযায়ী সমস্ত শ্রমিকেরা আবার কাজে যোগদান করলো বটে, কিন্তু হরতাল ভেঙ্গে দেবার জন্যে শ্রমিক নেতাদের উপর শ্রমিকদের বিশেষ অসন্তোষ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক নেতাদের সাহায্য পেয়ে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত মনে শ্রমিকদের সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য করতে সাহস করেছে। এমন কি পার্লামেণ্টের অধিবেশন পর্য্যন্ত ডাকতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত নয়, যতক্ষণ না শ্রমিকেরা একেবারে বশ্যতা স্বীকার করছে। এবারকার মত এই ভিয়েনার শ্রমিকদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এ পরাজয় তাদের মহত্বকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করে নি। সহস্র প্রাণের আহুতি দিয়ে এরা পৃথিবীর সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সামনে ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। এবারে তাদের যে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে সে পরাজয়ের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক নেতার দল। এই নেতার দল প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের মত অনুযায়ী চলে থাকে। আসল কথা হচ্ছে যে বিপ্লবপন্থী শ্রমিক সঙ্ঘের নেতৃত্ব যারা করবে তারা হয়তো নিজেরা শ্রমিক হবে, নতুবা শ্রেণীগত সত্তাকে সম্পূর্ণ রকমে হারিয়েছে এমন de-classed bourgeois intellectual হবে। প্রথমোক্ত নেতৃত্বের অভাব ঘটলেই দ্বিতীয় নেতৃত্বের স্থান হয়, নইলে নয়। সোশাল ডেমোক্রাটরা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল একদল পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের লোক, অথবা পরশ্রমভোগী সম্প্রদায়ের মতবাদে আস্থাসম্পন্ন লোক, যারা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবার অছিলায় নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থকে শ্রমিকদের আক্রমণ থেকে অতি সুনিপুণ ভাবে রক্ষা করে আসছে। আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে বললেও চলে। আজ যাঁরা এই শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন তাঁরা প্রায় সকলেই হচ্ছেন প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কারবাদী (Reformist)। এরা বর্ত্তমান ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের কাঠামোর মধ্যে থেকে শ্রমিকদের যতটুকু সুবিধে করে দেওয়া যায় তার জন্যে চেষ্টা করতে সম্মত আছেন। এরা যে শ্রেণীতে ভুক্ত সেই শ্রেণীর স্বার্থের বাধা ঠেলে এদের কেউ বের হয়ে আসেন নি ব'লে দেখতে পাই যে ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন Constitutional reformist line এ চলেছে। এই পথে চলার দরুণ শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবের যে সহজ শক্তি আছে তা বৃথা নষ্ট হচ্ছে। ভিয়েনার শ্রমিক আন্দোলন আমাদের কাছে এই reformist নেতৃত্বের সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটা প্রকটিত করে দিয়েছে। আমাদের আন্দোলনের এই উন্মেষ কালে আমরা যাতে অন্য দেশের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হতে পারি সেটা আমাদের দেখা দরকার। নতুন ট্রেড ইউনিয়ান বিলের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ট্রেড ইউনিয়ান গুলিকে একেবারে নিবীর্য্য করে দেবার জন্যে মস্ত এক চাল চেলেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে গভর্ণমেণ্ট শ্রমিক আন্দোলনকে খুব সুস্থ মনে দেখতে পারেন নি। শ্রমিক শক্তির সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের কিঞ্চিৎ পরিচয় গভর্ণমেণ্ট অসহযোগ আন্দোলনের সময় পেয়েছেন। ভবিষ্যৎ এ যাতে সেই পরিচয়ের আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্যে গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে এই ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ট্রেড ইউনিয়ান আইনকে অস্বীকার করা, যতদূর সম্ভব ট্রেড ইউনিয়ানগুলিকে আইন অনুযায়ী registered হতে বাধা দেওয়া, আর ট্রেড ইউনিয়ানগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের হাত থেকে উদ্ধার করা।

ভিয়েনার শ্রমিক আন্দোলন থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

বার্লিন
৩০শে আগষ্ট

—০—

বিবিধ প্রসঙ্গ

খড়্গপুরে শ্রমিক নির্য্যাতন

খড়্গপুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কারখানার শ্রমিকদের ওপরে কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপভাবে নির্য্যাতন করছে তার বিবরণ সকলেই দৈনিক কাগজে পড়েছেন। শ্রমিকসঙ্ঘগুলো যখন হয়ে উঠ্বে, এটা কোনো ধনিকই চাইতে পারেনা। শ্রমিকরা সত্যকার ভাবে সংহত হয়ে উঠলেই যে ধনিকদের লুণ্ঠনের দিন ফুরিয়ে আসবে এটা তারা জানে, আর জানে বলেই তারা খড়্গপুরে শ্রমিকদের ওপরে প্রচণ্ড খড়্গ উত্তোলন ক'রে ধরেছে। বাজে কারণের অজুহাত দেখিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ দু'হাজার শ্রমিককে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা মনে করেছে যে এতে শ্রমিকরা খুবই ভয় খেয়ে যাবে, আর ভয় খেলেই শ্রমিক আন্দোলনও মিইয়ে যাবে। কিন্তু ফলটা উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিক মাত্রেরই স্বার্থ যে অভিন্ন তা খড়্গপুরের শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছে। তাই বিতাড়িত বন্ধুদের কাজে ফিরিয়ে নিতে যাতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হয় সে জন্যে তারা কোনো কাজই করছেনা, অবশ্য ধর্ম্মঘট তারা আজো ঘোষণা করেনি। কোম্পানির তরফ থেকে কারখানার দুয়ার বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আজ খড়্গপুরের দশ হাজার নারী ও পুরুষ শ্রমিক অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কোম্পানীর অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হলেই শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতেই হবে। সংস্কারবাদী শ্রমিক নেতারা ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে যে মত দিবেন তা জানি, কিন্তু, ধর্ম্মঘটই শ্রমিক-সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্র। দেশময় শ্রমিকদের মধ্যে একটা সমস্বার্থ বোধ জন্মালেই ধর্ম্মঘট সফল হতে পারে। আমাদের দেশের শ্রমিক নেতৃগণের প্রতিক্রিয়াশীলতার খাতিরে সে বোধটা শ্রমিকদের ভিতরে আজো প্রকৃষ্টরূপে জন্মায়নি। তবে, এরূপ সংগ্রামের ভিতর দিয়েই তা জন্মাতে পারে। যে কোনো মতেই ধর্ম্মঘট করা ব্যতীত আর কোনো পথ নেই। ধর্ম্মঘটের অসাফল্যের ভিতরেও যে একটা সাফল্য লুক্কায়িত থাকে সেটা অনেক শ্রমিক নেতাই তলিয়ে দেখতে চান না। সংগ্রামের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজের দাবী-দাওয়া বুঝে পাওয়া। প্রতিপক্ষকে দুর্ব্বল না করতে পারলে এ দাবী-দাওয়া বুঝে পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। যে দাবিটিকে উপলক্ষ ক'রে শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে থাকে সেটা প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো ধর্ম্মঘটের দ্বারা পূর্ণ না হলেও ধর্ম্মঘটের দ্বারা ধনিকরা যে যথেষ্ট পরিমাণে পর্য্যুদস্ত হয় তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই, আর ধনিকদের এই পর্য্যুদস্ত হওয়াটাই হচ্ছে শ্রমিকদের পক্ষে প্রত্যক্ষ না হলেও, পরোক্ষ সফলতা। ২৯শে অক্টোবর তারিখে খড়্গপুরে সমগ্রভারতীয় রেলওয়ে শ্রমিকগণের ফেডারেশনের এক সম্মিলন বসবে। তাতেই ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে মীমাংসা হবে। আমরা সম্মিলনের ফলাফল জানবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে রইলুম। খড়্গপুরের শ্রমিকদের মধ্যে যে একটা শ্রেণীজ্ঞান ও চৈতন্যের সঞ্চার হয়েছে [illegible] সংস্কারবাদী নেতাদের [illegible] নষ্ট হয়ে যায় [illegible] আমাদের [illegible] বিস্মৃত হবে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে শ্রমিকসঙ্ঘের একটি খুব [illegible] প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। [illegible] ধর্ম্মঘটের সময়ে [illegible] পার্টিসানের শাখা ধর্ম্মঘটে যোগদান করেনি। [illegible] শাখা মূল সঙ্ঘ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। [illegible] বাড়ছে। [illegible] আমরা জানতে পেরেছি [illegible] বর্ত্তমান সময়ে [illegible] কোম্পানীর হয়ে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিচ্ছে। শ্রীযুত [illegible] চন্দ্র, শ্রীযুত [illegible] ও শ্রীযুত [illegible] গোস্বামী মহাশয় [illegible] প্রতিক্রিয়াশীল সঙ্ঘটির কোনো না কোনো বড় পদে [illegible] রয়েছেন। [illegible] গোস্বামী মহাশয় স্বরাজ্য [illegible] "ফরওয়ার্ড" এর ডিরেক্টর। আমাদের [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] নয়। কাজেই এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

—o—

কাজটি কি?

বাংলার রাজবন্দী শ্রীযুত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু কারামুক্ত হয়েছেন। সংবাদ পত্রের মারফতে আমরা জানতে পারছি যে তাঁদের দু'জনাতেই ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কাজে আত্ম নিয়োগ করবেন। কিন্তু, আমরা জানতে পারি কি যে কাজটি কি? আপাততঃ কংগ্রেসের সম্মুখে কোনো প্রোগ্রামই নেই। আমরা আজো জানতে পারিনি শ্রীযুত মিত্র ও বসু কোনো প্রোগ্রাম খাড়া করা সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করছেন কিনা। দাশ সাহেব যে প্রোগ্রাম উপস্থিত করেছিলেন তাতো অনেক দিন পূর্ব্বেই অকৃতকার্য্য হয়ে গেছে এবং তারি ফলে কংগ্রেস দেশের জনগণ হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সত্য কথা বলতে গেলে বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেস সমাজের উচ্চ স্তরের শ্রেণী বিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেছে। প্রথমেই আমাদের জানা উচিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের "ন্যাশন" বলতে কা'দের বোঝানো হয়। এই ন্যাশন্" বলতে যদি কেবল মাত্র দেশের ধনিগণ ও তাদের প্রসাদজীবিগণকেই বোঝানো হয় তবে তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু, এর মানে যদি হয় দেশের জনগণ (masses) তা হলে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও মুক্তির জন্যে তো কোনো প্রোগ্রামই কংগ্রেস গ্রহণ করেনি। ১৯২০ সনে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণোদ্দেশ্যে দু' একটি বিষয় কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকায় স্থান পেয়েছিল এবং তাতে জনগণ আশাতীতরূপে সাড়াও দিয়েছিল। কিন্তু, ১৯২২ সনের আরম্ভে যে প্রোগ্রাম বারদোলিতে কংগ্রেস প্রত্যাহার করেছে। তারপরে দাশ সাহেবের প্রবর্ত্তিত প্রোগ্রামে জনগণের স্বার্থ সম্বন্ধে যে যে কথা উল্লিখিত হয়েছিল সে তো ছিল একেবারেই মনকে চোখ ঠারা। সমাজের class (শ্রেণী) ও mass (জনগণ) এর মধ্যে যে কোনো প্রকার স্বার্থ বিরোধ আছে একথা দাশ সাহেব কিছুতেই মানতে

চাইতেন না। তাই তিনি সমাজের শোষক শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় প্রদান ক'রেই শোষিতের স্বার্থের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর ফলে কংগ্রেস যাদের হাতে যাবার ঠিক তাদেরি হাতে গিয়ে পড়েছে। মিত্র ও বসু মহাশয়দ্বয় যে কংগ্রেসের কাজে আত্ম-বিনিয়োগ করবেন তাতে কোনো ভুল নেই। কেননা, তা না হ'লে তাঁরা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণের প্রতিবাদ নিশ্চিতই করতেন। এ অবস্থায় তাঁরা য'দ তাঁদের কাজের স্বরূপ কি হবে তা সাধারণকে জানাতেন তবেই বোধ হয় খুব ভালো কাজ করতেন। কংগ্রেসের কাজ যাঁরা করবেন তাঁরা কেবলমাত্র দু'টো কাজই করতে পারেন। প্রথম কাজ হচ্ছে কংগ্রেসকে সমাজের শোষক শ্রেণী ও তাদের প্রসাদ জীবিগণের জন্যে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা, আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে কংগ্রেসকে জনগণের জন্যে একটা মুক্তি সংগঠনরূপে উন্নত করা। প্রথম প্রকারের কাজের উদ্দেশ্য হবে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের সহিত ভারতীয় ধনিকগণকে সম-মর্য্যাদা বিশিষ্ট ক'রে তোলা অর্থাৎ যাতে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বৃটিশ ও ভারতীয় ধনিকগণ সমভাবে যাতে ভারতের জনগণকে লুণ্ঠন করতে পারে তারি ব্যবস্থা করা। এই 'মর্য্যাদা' টুকুর নাম হচ্ছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন, যা পাওয়ার দাবী স্বয়ং দাশ সাহেবও ফরিদপুরে করেছিলেন। আর অপর পক্ষের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের বা শোষণবাদিগণের কবল থেকে ভারতের জনগণের দ্বারা ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধনিকগণ যে ভারতীয় জনগণকে শোষণ করে থাকে তারো ধ্বংস সাধন করা। শ্রীযুত মিত্র ও শ্রীযুত বসু কোন্ পথ অবলম্বন করবেন?

—০—

বন্দী-দিবস

২৫শে অক্টোবর তারিখে বাংলা দেশে বন্দী-দিবস প্রতিপালিত হয়েছে। বাংলার নানাস্থানে বহু সভার অধিবেশন হয়ে গেছে। বাংলার অনেক সুসন্তান বছরের পর বছর ধরে কারাগারে ও কারাগারের বাইরে বন্দী-জীবন কাটিয়ে আসছেন। কোনো আদালতে তাঁদের বিচার হয়ে তাঁদের প্রতি কোনো প্রকার সাজার হুকুম কখনো হয়নি। ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন ও ১৯২৫ সনের ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে তাঁদের সকলেই অনিশ্চিত কালের জন্যে আটক হয়ে আছেন। ভারতে এ প্রকারের নিগ্রহ কিছু নূতন নয়। যুদ্ধের সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষই এ নিগ্রহ অনেক ভোগ করেছে, কিন্তু, ১৯২৩ সন থেকে নিগ্রহটা বাংলার ভাগ্যে এক চেটিয়া হয়ে পড়েছে। আজো পর্য্যন্ত যে আটকের জের মেটেনি তার আরম্ভ হয়েছে ১৯২৩ সনের জুন মাসে। ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে এ সময়ে বাংলায় প্রথম অবরুদ্ধ হন মুজফ্ফর আহমদ। সেই সঙ্গে সঙ্গেই শওকৎ উসমানী পেশাওরে ও গোলাম হোসেন লাহোরে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। তারপরে সাড়ে তিন মাস কেটে যেতে একদিন একই সঙ্গে ভূপতি মজুমদার, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বারোজন ধৃত হলেন। তারপর থেকে ক্রমশই বন্দীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯২৪ সনের শেষ ভাগে গবর্ণমেণ্ট কেবল মাত্র ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশন নিয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না, তাই পাশ করলেন এক অর্ডিন্যান্স। এই নূতন আসন্ন আইন অনুসারে এবং পরে ১৯২৫ সনের ক্রিমিন্যাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে বাংলার বহু যুবকেরই ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটেছে। ধরার কাজ বিগত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত চলেছে, আর ছাড়ার কাজো চলেছে বটে, কিন্তু খুবই ধীর ও মন্থর গতিতে। ১৯২৩ সনে দ্বিতীয় দফায় যাঁরা ধরা পড়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আজো পর্য্যন্ত মুক্ত হননি। অনেকেরই স্বাস্থ্য একবারেই ভেঙে গেছে, অনেকে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন। তবুও কিন্তু, তাঁদের বন্দী-জীবনের অবসান কিছুতেই হচ্ছেনা। ২৫শে অক্টোবর তারিখে যে সকল সভা হ'য়ে গেল সে সব ছিল গবর্ণমেণ্টের এ অন্যায় অবরুদ্ধ ক'রে রাখার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। যাঁরা এ সব ব্যাপারের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন সত্য সত্যই হতভাগ্য বন্দীদের বেদনা যদি তাঁদের প্রাণে বেজে থাকে তা হ'লে তাঁরা দেশের জনগণের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করুন। আজকের দিনে ভদ্র শ্রেণীর আন্দোলনের বিশেষ কিছু মূল্য নেই। বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমের পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট জনগণের আন্দোলনে যতটা বিচলিত হবে ততটা আর কিছুতেই হবেনা। একমাত্র জনগণের দাবীর দ্বারাই রাজবন্দিগণ অবিলম্বে মুক্তিলাভ করতে পারেন। বন্দিগণের নাম, ধাম সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ মুদ্রিত ক'রে দেশের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেওয়া উচিত। বন্দীদের যে সব পরিচয় কাগজে মুদ্রিত হয়েছে তার অনেকই দেখলুম প্রমাদ পরিপূর্ণ। একশ'—দেড়শ' লোকের পরিচয় সংগ্রহে প্রমাদ থাকা বাস্তবিকই বড় ক্ষোভের বিষয়। রাজবন্দিগণ তাঁদের দেশের লোকের দ্বারা সংগৃহীত তাঁদের ভুল পরিচয় যখন কাগজে পড়বেন তখন বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হবেন।

—০—

খড়গ্পুর

—০—

(মুজফ্ফর আহ্মদ)

—০—

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের একটা খুব কঠোর পরীক্ষা এবারে খড়্গপুরে হয়ে যাবে। যাঁরা আপনাদিগকে শ্রমিক নেতা ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁদের পরীক্ষা হবে আরো কঠোরতর। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকগণের মধ্যে শুধু যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে তা নয়, একটা সত্যকারের শ্রেণী জ্ঞানও জন্মেছে তাদের ভিতরে। এই জিনিসটি ভারতের শ্রমিকগণের মধ্যে খুবই দুর্লভ বস্তু। শ্রমিকগণ প্রায়ই নিরক্ষর ব'লে এদেশে শ্রমিক আন্দোলন অধিকাংশ স্থলেই মধ্য শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এই মধ্য শ্রেণীর শ্রমিক নেতৃগণ শ্রমিকদের মতানুসারে কাজ না ক'রে তাঁদের নিজেদের ইচ্ছানুসারেই শ্রমিক সঙ্ঘ

সমূহের কাজ চালিয়ে থাকেন। শ্রমিকদিগকে শিক্ষিত ও শ্রেণী-জ্ঞান সম্পন্ন ক'রে তোলার কোনো প্রচেষ্টাই এই নেতৃগণ করেন না। তাঁদের কর্মশক্তির পরিচয় সঙ্ঘের কাজে কখনো পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্যক্তিত্বের কলহে যথেষ্টই পাওয়া যায়। যে সকল ইউনিয়নের টাকা-কড়ি নেই সে সবের কথা আমরা বলছিনে,—যে সব ইউনিয়নের আর্থিক অবস্থা অনেকটা ভালো সে সব ইউনিয়নও কখনো শ্রমিক আন্দোলনের মত ও নীতি গুলিকে শ্রমিকদিগের মধ্যে প্রচারের কোনো ব্যবস্থাই করেন না। আমরা যতটা জানি "ট্রেণিং ক্লাস" ব'লে একটা জিনিস এদেশের কোনো শ্রমিক সঙ্ঘেরই নেই। যে যে স্থলে ইউনিয়নের বয়স ছয়, সাত এমন কি আট বছর পর্য্যন্ত হয়েছে, দু'দশ জন লেখা পড়া জানা লোকও ইউনিয়নে পাওয়া যায়, সে সব জায়গায়ও শ্রমিকদিগের ভিতর থেকে আজো পর্য্যন্ত শ্রমিক নেতা বা'র হয়নি। এদিক থেকে শ্রমিক আন্দোলনের যাঁরা সদিচ্ছা প্রবণ নেতা তাঁরাও কিছু করবার চেষ্টা যে করেন নি তা অনায়াসেই বোঝা যায়। কলিকাতার একটি খুব নাম করা ইউনিয়নের কয়েকজন সভ্য সেদিন আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল, গবর্ণমেণ্ট তাদের জন্যে যে ইউনিয়ন ক'রে দিয়েছে তাতে মেম্বরদের সহিত কোনো একটা বিশিষ্ট ব্যবহার করার অধিকারও গবর্ণমেণ্ট ইউনিয়নের কর্মচারিগণের হাতে দিয়েছে কিনা। ব্যাপারটা এই হয়েছে যে গবর্ণমেণ্টের নামে ভয় দেখিয়ে কিংবা ভক্তি আকর্ষণ ক'রে শ্রমিকদিগকে ইউনিয়নে আনা হয়েছে। শ্রমিকদিগকে সচেতন করা তো দূরের কথা, একেবারে আঁধারে ঠেলে দিয়েই ইউনিয়নের কর্মকর্তৃগণ কাজ চালিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। আর, এই আঁধারে ঠেলে দেওয়াটা যে তাঁদের ইচ্ছাকৃত তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। যে দেশে শ্রমিক আন্দোলন এতদূর অবনমিত অবস্থায় পড়ে আছে সে দেশেও কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উৎপীড়নের দ্বারাই খড়্গপুরের শ্রমিকগণ শ্রেণীজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। মিঃ গিরির ন্যায় সংস্কারবাদী ও নরমপন্থী (reformist and moderate) নেতা খড়্গপুর লেবর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হওয়া সত্বেও খড়্গপুরের শ্রমিকগণের দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করার মনোবৃত্তি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকগণের একবার ধর্ম্মঘট যে হয়ে গেছে সে খবর সকলে জানেন। ইউনিয়নের নেতৃগণের বার বার নিষেধ করা সত্বেও সেবারে শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করেছিল। নিতান্ত অমানুষিক ভাবে তাদের ওপরে গুলিও চালানো হয়েছিল, বেয়োনেটের খোঁচাও তারা খেয়েছিল। তবুও কিন্তু তাদের সংগ্রামের প্রবৃত্তি এতটুকুও কমেনি. সত্য কথা বলতে গেলে অনেক বেশী বেড়েছে। খড়্গপুরের শ্রমিকগণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে (direct action এ) নিয়োজিত হওয়ার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। তারা সত্যই শ্রমিক-ভারতের গৌরব।

যে কোনো মুহূর্ত্তেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যে যারা প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের ধর্ম্মঘট যে আজো ঘোষণা করা হয়নি এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার এই যে প্রবল প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তিকে মিহিয়ে যেতে দিলে যে ভুল করা হবে সে ভুলের সংশোধনের কোনো উপায় হয়তো কোনো দিন পাওয়া যাবেনা। শ্রমিকগণের মনোবৃত্তিকে সংহত করার কোনো অধিকার কোনো শ্রমিক নেতারই নেই। খড়্গপুর আজ শুধু বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকগণের নয়, সমগ্র ভারতের শ্রমিকগণেরই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। খড়্গপুরের সংগ্রামের বিজয়ের দ্বারা সমগ্র ভারতের শ্রমিকগণই বিজয় লাভ করবে, আর খড়্গপুরের পরাজয়ে যে ক্ষতি হবে তা শুধু বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকগণের হবে না, পরন্তু সমগ্র ভারতের শ্রমিকগণকে অবনত মস্তকে সে ক্ষতির ভার বহন করতে হবে। শ্রমিকগণ যত বিভিন্ন ব্যবসায় ক্ষেত্রে কর্ম্মরত থাকুক না কেন তারা সমভাবেই শোষিত ও উৎপীড়িত হয়ে থাকে। কাজেই, তাদের পরস্পরের স্বার্থ অভিন্ন। যে কোনো শিল্পক্ষেত্রে সংগ্রাম আরম্ভ হোক না কেন, তার প্রভাব সমগ্র দেশময় বিস্তৃত হয়ে প'ড়ে থাকে। এক জায়গার সংগ্রামের বিজয়ের দ্বারা সকল জায়গার শ্রমিকগণের মস্তক উন্নত হয়ে থাকে, আবার এক জায়গার অসাফল্যের সুযোগ নিয়ে ধনিকগণ সকল জায়গার আন্দোলনকেই অসফল করে দিতে চায়। কিন্তু, ধর্ম্মঘটের অসাফল্য যে পরাজয় নয় এটা সকলেরই বোঝা উচিত। ধর্ম্মঘটের অসাফল্যের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের রক্তপতাকা কখনো অবনমিত হয় না। এ কথাটী যে আমাদের কাল্পত নয় খড়্গপুরই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এক ধর্ম্মঘটের অবসান হওয়ার ছয় মাস পার হতে না হতেই খড়্গপুরের শ্রমিকগণ আর এক ধর্ম্মঘটের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কোনো অত্যাচার, কোনো অবিচার তারা নীরবে সইতে আর একেবারেই প্রস্তুত নয়। ধর্ম্মঘটের অসাফল্যের দ্বারা শ্রমিকগণ যতটা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী বেড়ে যায় তাদের সংগ্রামের স্পৃহা। অবশ্য সচেতন শ্রমিকগণের কথাই আমরা বলছি। আর ধর্ম্মঘটের দ্বারা ধনিকগণ অল্প-বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই থাকে, তা ধর্ম্মঘট সফলই হোক্ বা অসফলই হোক্। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকগণের সংগ্রামে সর্ব্ব শ্রেণীর শ্রমিকগণেরই সর্ব্বপ্রকার, বিশেষ করে আর্থিক সাহায্য করা একান্তই উচিত। আর সকল রেলওয়ে শ্রমিকগণের তো উচিত সাধারণভাবে ধর্ম্মঘটে যোগদান করা।

সর্ব্বহারা শ্রমিকগণের এ সংগ্রাম যে কেবল মাত্র তাদের সংগ্রাম, এর সহিত যে কৃষকগণের ও জাতীয় দলের লোকগণের কোনো সম্বন্ধ নেই এটা যেন কেউ মনে না করে বসেন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে শ্রমিক সম্প্রদায়ই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। কেননা, একমাত্র শ্রমিক সম্প্রদায়ই সামাজিক মুক্তির শেষ মীমাংসা হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাতে থাকবে। সামাজিক বৈষম্য ধ্বংস করার জন্যে যে সংগ্রাম শ্রমিক সম্প্রদায় চালিয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত সংগ্রাম। জাতীয় সংগ্রাম (National struggle)এ সামাজিক সংগ্রামেরই একটা দিক ও অংশ মাত্র। ভারতবর্ষ এখন শিল্পানুষ্ঠান পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একে আরো অধিকতর শিল্পানুষ্ঠানময় করে তোলাই হচ্ছে এখনকার অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পলিসি। ধনিকবাদের শক্তি যতই অধিক পরিমাণে ভারতে কাজ করছে ততই বেশী ভারতের কৃষকগণ সর্ব্বহারা হয়ে পড়ছে। বিক্ষিপ্ত কৃষক শক্তির নেতৃত্বও উন্নতিশীল কারখানার শ্রমিকগণই গ্রহণ করবে। শ্রমিক সম্প্রদায়ই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী শোষিত সম্প্রদায় এবং তারা সম্পত্তি হীনও বটে। কাজেই, তারাই হচ্ছে ভবিষ্যতের সব

চেয়ে বড় বিপ্লব শক্তি। বিরাট ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্যে যে সকল অবস্থার প্রয়োজন সে সকল অবস্থা শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্যে ধনিক সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করে দিয়েছে। কাজেই, শ্রমিক শক্তিই হবে বৃহত্তম শক্তি যা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। শ্রমিকগণ যে সামাজিক সংগ্রামে (Social struggle) প্রবৃত্ত হয়েছে তার সাফল্যে পঁহুছার জন্যে রাষ্ট্র-নীতিক ক্ষমতাও তারা হস্তগত করবে, না করলে তাদের সংগ্রামের শেষ মীমাংসা হবে না। এই কারণে, যাঁরা রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা কামনা ক'রে থাকেন সেই জাতীয় দলেরও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হচ্ছে শ্রমিকদলের সংগ্রামে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করা।

আমরা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিক বন্ধুগণকে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা একান্ত মনে কামনা করছি যে তারা তাদের ন্যায় সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হোক্। "পিজান্ট্‌স্ এণ্ড ওয়ার্কার্স্ পার্টি" (বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল) শ্রমিক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতা হস্তগত করার কাজে সাহায্য করার জন্যই গঠিত হয়েছে। কাজেই, শ্রমিক সম্প্রদায়ের সংগ্রামে এ পার্টি এর সকল শক্তি বিনিয়োগ করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে।

—০—

দেশ-বিদেশ

গত কল্য "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার ৪র্থ সাম্বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের প্রীতির জন্যে জলযোগ ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

—০—

আফ্‌গানিস্থানের বাদশাহ আমান উল্লা খান ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হবেন। তিনি ভারতের করাচী বন্দরে জহাজে চড়বেন। তাঁর ভারত অতিক্রম করার সময় তিনি ভারত সরকারের প্রীতি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তিনি ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কাবুল হতে রওয়ানা হয়ে কান্দাহারের পথে ভারতে আসবেন। তিনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইতালী ও আঙ্গোরা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করবেন। খুব সম্ভবতঃ ফিরবার সময় তিনি রাশিয়া হয়ে আফ্‌গানিস্থানে আসবেন। ওপরের লিখিত শক্তি সমূহ তাঁকে সরকারী ভাবে নিমন্ত্রণ করেছেন।

—০—

২৯শে অক্টোবর তারিখে খড়্গপুরে অল্-ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের কন্‌ফারেন্স বসবে। রেলওয়ে শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করবে কিনা তা এ কন্‌ফারেন্সে ঘোষিত হবে।

—০—

দেওঘরের একটা বাড়ীতে খানা তালাশি ক'রে পুলিশ দু'টো পিস্তল ও কিছু কার্ত্তুজ পেয়েছে। এ সংস্রবে ৩জন বাঙালী যুবক—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও তেজেশ চন্দ্র ঘোষ গেরেফ্‌তার হয়েছেন।

—০—

আগামী কল্য কলিকাতার অলবার্ট হলে অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভা বসবে।

—০—

খালাসীর পত্র

—০—

হাজার হাজার সালাম পঁহুছে। পরে খেদমতে আরজ এই যে আপনাদের "গণবাণী" নামক খবরের কাগজে যে আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা অল্প-সল্প লেখা হয় সেই জন্য আমরা বড় খুশী হইয়াছি। আমরা বড় গরীব দুঃখী মানুষ, আমাদের দুঃখ কেউ বুঝেনা। আমাদের একটা ইউনিয়ন হইয়াছে, সেই ইউনিয়নের হুজুরেরাও আমাদের দিকে ভাল মতে চায় না। সেরাং আর মিস্ত্রীদের সাথেই তাঁদের ভাব বেশী। বাহির জাহাজের সকল লোকই নামে নামে আলাদা মাশহারা পায়। কিন্তু, উজানীয়া জাহাজে আমরা যে খাটিয়া মরি, আমাদের মাশহারা সেরাঙের দয়ার উপরে পাই। কোম্পানীর ঘরে আমাদের নাম লেখা থাকেনা। আমাদের নামে নামে তলবের জন্য বিলও হয় না। সেরাং আর মিস্ত্রী আগুন আলা আর খালাসীর তলব পূরা কোনও দিন দেয় না। আমাদের হকের পয়সা খাইয়া খাইয়া সেরাং আর মিস্ত্রীরা মোটা হইয়া গেল। একটা পয়লা নম্বর সেরাং ১০০ টাকাও তলব পায় না আর বাড়ীতে পাঠায় মাসে গড়ে দুইশ টাকা। হুজুর, এই টাকা আমাদের শরীরের খুন্। চার দিক হইতে লুঠিয়া লুঠিয়া আমাদের নাজেহাল করিয়া দিয়াছে। দেশে জমীদারের নায়েব ও মহাজনের জুলুম আছে। বেটা মহাজনেরা আমাদিগকে ধরবার জন্য জাল বসাইয়া রাখিয়াছে। সুদে সুদে আর নায়েবের, দারোগার ঘুষে হুজুর সব গেল। চাকরী করতে যখন আসি তখন সেরাং সব টাকা খাইয়া ফেলে। আপনিই বিচার করিয়া দেখুন আমরা কেমন করিয়া বাঁচি। কোম্পানীও আমাদের কম তলব দেয়। আমাদের কষ্ট কি আপনি দেখিয়াছেন? শীতকালের রাত্রিতেও জাহাজ ঘাটে ভিড়াইবার জন্য আমরা পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়ি। আমরা তলব বলাইয়া (বাড়াইয়া) চাই, আর চাই আমাদের নাম কোম্পানীর ঘরে লেখা হয়। আর চাই আমরা যেন কোম্পানীর ঘর হইতে হাতে হাতে তলব পাই। জাহাজে হুজুর, কেউ পূরা তলব পায় না। আমরাত খালাসী মানুষ, সুকানীরাও পূরা তলব পায় না, হুজুর। ১৫ দিন কাম করার পর বরখাস্ত হইলে সে আর তলব পায় না। সেরাং বিল করিয়া সেই টাকা নিজে আনিয়া লয়। ক্লেইমের জন্য আমাদের পূরা তলব কাটিয়া লয়। আমরা ভূতের বেগার খাটিয়া মরি। জাহাজে আমরা যা খাই তাহা মানুষের খোরাক নয়। আপনারা আমাদের দুঃখ দূর করিতে পারিলে আমরা বহুত বহুত দোয়া করিব। আমরা গরীব মানুষ, আর কি করিতে পারি?

হাবিবুল্লা

(উজানীয়া জাহাজের খালাসী)

—০—

[এ পত্রখানার ভাষা আমাদিগকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ক'রে দিতে হয়েছে। বানানও শুদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু, পত্রের মূল কথার পরিবর্ত্তন আমরা কোথাও করিনি। এ পত্রের প্রতি আমরা "বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন" এর কর্ম্মকর্ত্তৃগণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্পাদক, "গণবাণী"।]

—০—

সোভিয়েট রাশিয়ার খবর

মস্কো, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭। সোভিয়েট গণতন্ত্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে আমেরিকার শ্রমিক প্রতিনিধিগণের অভিমত :—"সোভিয়েট গণতন্ত্র সঙ্ঘে শ্রমিকগণ ঠিক সে জিনিসটিই তৈয়ার করছে যে সম্বন্ধে মানব জাতির শ্রমিক বিভাগ যুগের পর যুগ কেবল স্বপ্নই দেখে আসছে। সোভিয়েট শ্রমিকগণকে সাহায্য করাই হচ্ছে জগতের সর্বহারা শ্রমিকগণের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। সোভিয়েট গণতন্ত্র সঙ্ঘের কাজ আমাদের নিজেদেরই কাজ। সোভিয়েট গণতন্ত্র সঙ্ঘে শ্রমিকগণ সর্ব্ব ক্ষমতার অধিকারী,—প্রভু।"

—

সোভিয়েট গণতন্ত্র সঙ্ঘে শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের নারীগণ কি ক'রে ষ্টেটের (সরকারের) কাজ চালাতে হয় তা-ই শিখছে। নারী ডেলিগেটের সংখ্যা ৬২০,০০০ জন।

—

এক কোটি বয়ঃপ্রাপ্ত নিরক্ষর লোক লিখতে ও পড়তে শিখেছে।

—

সোভিয়েট বিমানপোত

"হিন্দু কুশ" অতিক্রম

বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েট রাশিয়ায় নির্ম্মিত একটা জাঙ্কার্স (Junkers) মেশিনে এই উড্ডয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডবরোফট (Dobroftot) বিমান পোত বিভাগের কমরেড সেমেনোফ এই মেশিনের পাইলট্ ও কমরেড সোবেট্স্কি এর মিকানিক ছিলেন। মধ্য এসিয়ার তাসকেন্দ ও কাবুলের দূরত্ব হচ্ছে ৯১০ কিলোমিটার, (এক কিলোমিটার ১০৯৩·৬ গজের সমান)। এই দূরত্ব ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে অতিক্রম করা হয়েছিল। মেশিনটার সাইজ ছিল "১০—১৩"। এই সাইজের মেশিন সাধারণতঃ ১৩৮৬ পাউণ্ড (৮২ পাউণ্ডে এক মণ হয়) ভার নিয়ে উড়তে পারে। কিন্তু, এ মেশিনটা ভার নিয়েছিল ১৫৮৪ পাউণ্ড। চার ঘণ্টা সময় মেশিনটা অনবরত ১৩১৫০ ফিট উচ্চতার মধ্য দিয়ে চলেছিল এবং সব চেয়ে বেশী যে উচ্চতা দিয়ে বিমান পোতটি অতিক্রম করেছিল তার পরিমাণ ছিল ১৫৪০০ ফিট্। এরূপ পোতের পক্ষে এত বেশী ওজন নিয়ে, এমন জায়গায় ওপর দিয়ে এতবেশী উচ্চতা অতিক্রম করে যাওয়া বিমান পোতের ইতিহাসে এটাই সর্ব্ব প্রথম সফল উদ্যম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"গণবাণী" এবার আকারে ছোট হয়ে বের হলো। এই ছোট হয়ে বের হবার একমাত্র কারণই হচ্ছে আর্থিক অসচ্ছলতা। ঠিক্ এ আকারই বরাবর থাকবে না। আর্থিক অবস্থা একটুকু সচ্ছল হলেই আবার আমরা কাগজ খানাকে আকারে বাড়িয়ে দেবো। তবে নগদ মূল্য এখন কমিয়ে যা করা হয়েছে ঠিক্ তা'ই থাকবে। বার্ষিক মূল্যও তিন টাকা থেকে কমিয়ে দু' টাকা বারো আনা করা হয়েছে।

ম্যানেজার, "গণবাণী"

Printed by Muzaffar Ahmad at the Sree Sarasati Press at 1, Ramanath Mazumdar Street, Calcutta and published by the same at 37, Harrison Road, Calcutta.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the

WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL

2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই জুন ১৯২৮, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ | ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক
মুজফ্ফর আহ্মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscridtion Annual 6s.

৩৮১

জাহাজীদের কথা

কলিকাতায় জাহাজীদের দুইটি ইউনিয়ন আছে। একটি নদীতে গমনাগমনকারী ষ্টীমার ও ফ্ল্যাট সমূহের কর্ম্মচারীদের ইউনিয়ন, নাম "বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন।" দ্বিতীয় ইউনিয়নটি হইতেছে সমুদ্রগামী জাহাজের ভারতীয় নাবিকগণের। ইহার নাম "ইণ্ডিয়ান সি-ম্যান্স ইউনিয়ন"। সমুদ্রগামী জাহাজের তিনটি বিভাগ আছে—ডেক, ইঞ্জিন ও সালুন। সালুনের লোকেরাই প্রথমে ইউনিয়ন করিয়াছিল। কিন্তু, তাহারা এখন আর ইউনিয়নে নাই। ইঞ্জিন বিভাগের লোকেরাও বড় একটা ইউনিয়নের ধার ধারে না। বাকী থাকিল ডেক্: এই ডেকেরও আবার সব লোক ইউনিয়নের মেম্বর নয়। কেবলমাত্র সুকানীগণই মেম্বর ছিল, তাহাও আবার সোজাসুজি নয়। সুকানীরা নিজেরাই একটা ইউনিয়ন করিয়া পৃথক হইয়া যায়। এই ইউনিয়নের নাম হয় "ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন"। ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত ইহার পৃথক সংযোগও হইয়া যায়। কাজেই "ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন" টিকে স্বাধীন ইউনিয়ন বলিয়া ধরিয়া লইলে "ইণ্ডিয়ান সি-ম্যান্স ইউনিয়ন" যে কি জিনিস তাহা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময় আবার সুকানীদের ইউনিয়নেও ভাঙন ধরিয়াছে। এক কথায়, আজ কাল জাহাজীদের খুবই দুঃসময় যাইতেছে। সি-ম্যানদিগকে শোষণ করাই যাহাদের ব্যবসায় তাহারা ইউনিয়নের ভিতরকার দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়া এখন বেশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ দিকে সে দিকে নূতন ইউনিয়নও গজাইয়া উঠিয়াছে, অবশ্য শোষণকারীদেরই চেষ্টায়। কাজেই, এরূপ ইউনিয়নের উদ্দেশ্য যাহা তাহাত সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। বাহিরের লোকেরা জানিত "ইণ্ডিয়ান সি-ম্যান্স ইউনিয়ন" একটা বড় ব্যাপার। কিন্তু, এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে মিঃ দাউদ এতকাল বালির উপরেই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বসিয়াছিলেন। নাবিক আন্দোলন মোটেই অবহেলার বস্তু নয়। জাহাজের শ্রমিকেরা শুধু যে জাতীয় জীবনে খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহা নয়, দেশ-বিদেশের সহিত সাক্ষাৎ যোগও তাহাদেরই দ্বারা স্থাপিত হয়। কিন্তু, আশ্চর্য্য এই যে এতকাল জাহাজী শ্রমিকদিগকে কোনো প্রকারে সচেতন করিয়া তোলার চেষ্টা করা হয় নাই। বিদেশের শ্রমিক-আন্দোলন ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। জাহাজীরা সেই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেক কিছু প্রেরণা লাভ করিতে পারিত। এ দেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব জাহাজী শ্রমিকদিগেরই গ্রহণ করার ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, কিছুই হইয়া উঠে নাই। আর না হওয়ার একমাত্র কারণ এই বলিব যে যাঁহারা নাবিকদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্মুখে কোনো বড় আদর্শই ছিল না। বড় আদর্শের উপরে ভিত্তি স্থাপিত না হইলে কোনো আন্দোলনেরই বনিয়াদ শক্ত হয় না, কাজে কাজেই আন্দোলন বেশী দিন স্থায়ী হইতেও পারে না।

নাবিকদিগকে এমনি ভাবে দুরবস্থার ভিতরে ফেলিয়া রাখিয়া দিলে কিছুতেই কাজ চলিবে না। এত বড় দারিদ্র সম্পন্ন শ্রমিকগণকে ভাল ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিতে না পারিলে শ্রমিক আন্দোলনের ভীষণ ক্ষতি হইবে। ইউনিয়নের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তৃগণ কি করিতে চাহেন তাহা আমরা জানিতে চাই। ব্যাপার যদি উঁহাদের সাধ্যের অতীত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই সরিয়া দাঁড়াইতে পারেন। আর তাহা না হইলে তাঁহারা ইউনিয়নকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলুন। বর্ত্তমান অবস্থা কেহই সহিতে পারিবে না, জাহাজীরা ত নহেই, যাঁহারা জাহাজীদিগের সংগ্রামের অনুমোদন করেন তাঁহারাও নয়।

দেশীয় ষ্টীমারের লোকেদের কথা আমরা আগামী বারে আলোচনা করিব।

যশোহরে কৃষক জাগরণ

(শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়)

যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমাতে এবং নাড়াবল, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন হইতে কৃষকদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে আত্ম-স্বার্থচেতনা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে। গত দুই বৎসর কালের মধ্যে তাহারা আত্মস্বার্থরক্ষা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিপুল শক্তির সহিত জমীদার মহাজন উকিল মোক্তার প্রভৃতি সমাজের সকল প্রকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। যশোহর জেলার লোক সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ মুসলমান ও ৬ লক্ষ হিন্দু। ছয় লক্ষ হিন্দুর মধ্যে তিন লক্ষেরও বেশী নমশূদ্র এবং প্রায় তিন লক্ষ অপরাপর জাতি। বার লক্ষ মুসলমানের মধ্যে এগার লক্ষেরও অধিক কৃষক, তিন লক্ষ নমশূদ্রের সকলেই কৃষক এবং অপর প্রায় তিন লক্ষ হিন্দুর মধ্যেও অনেকে কৃষক। একণে মুসলমান ও নমশূদ্রগণ, অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হইয়া কৃষক আন্দোলন চালাইতেছে। কৃষকদিগের এই একতা নষ্ট করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর জমীদার মহাজন ও উকিল মোক্তারগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সফল হয় নাই। ইহারা কৃষকদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও জাতি বিদ্বেষ প্রচার করিয়া এবং আরও নানা প্রকারে তাহাদিগের মধ্যে আত্ম-কলহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের একতা ও সঙ্ঘশক্তিকে নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে পারে নাই।

কৃষকগণ সর্ব্বপ্রথম দাবী করিয়াছে ভাগের জমীর ফসলের অর্দ্ধেক ভাগের পরিবর্ত্তে তিন ভাগের দুই ভাগ। জমীর মালিকেরা অবশ্য সহজে কৃষকদের এ দাবী স্বীকার করিয়া লইতেছেনা, কিন্তু কৃষকেরা ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এজন্য বহুস্থানে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভাগের জমী বয়কট করিয়াছে। বেগার খাটা, আবওয়াব ও সেলামী, পেয়াদাআনা প্রভৃতি নানাপ্রকার জমীদারি জুলুমের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও তাহারা উদ্যমের সহিত চেষ্টা করিতেছে।

নড়াইল মহকুমার কৃষকগণ সালিশী আদালত স্থাপন করিয়া আদালতে মামলা মোকদ্দমা করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং ফলে উকিল মোক্তারদের অবস্থা অতিশয় কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। এবার যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলির নির্ব্বাচনেও বিরাট ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। আগে যাঁহারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলির উপরে আধিপত্য করিতেন, এবারকার নির্ব্বাচনে তাঁহাদের আধিপত্য একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

এই গণ-উত্থানকে দলিত ও প্রহত করিবার জন্য শোষক শ্রেণীর পাণ্ডারা কৃষকদিগের উপরে নানাপ্রকার নিষ্পেষণ ও অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু কৃষকগণ অবিচলিত চিত্তে ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের সংগ্রাম চালাইতেছে। যশোহরের কৃষক সম্প্রদায়ের এই সংগ্রামশীলতা আজ সমগ্র বাঙ্গলার কৃষকের গৌরবের বিষয় হইয়াছে।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর
সাপ্তাহিক মুখপত্র

"শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

—চণ্ডীদাস—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৪ই জুন, ১৯২৮, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ | ১৫ সংখ্যা

অবকাশের পরে

সুদীর্ঘ অবকাশের পরে আজ আমরা আবার আমাদের দেশের জনগণের দুয়ারে হাজিরী দিতে এসেছি। আমরা যে অবকাশ গ্রহণ করেছিলেম, তা মোটেই ইচ্ছা ক'রে নয়, আমাদিগকে ছুটী নিতে হয়েছিল নিতান্ত অপারগ হয়ে। ২৭শে অক্টোবর ([illegible]) তারিখে "গণবাণী" শেষ বের হয়েছিল। তার পরে আজকের দিন পর্য্যন্ত যে কাগজখানা আর প্রকাশিত হ'ল না তার একমাত্র কারণ, টাকা-কড়ির অভাব। "গণবাণী" নগদ বিক্রী ক'রে কিংবা এর বার্ষিক বা ছয় মাসের মূল্য উসুল ক'রে যে টাকা আমাদের হাতে আসে তাতে কিছুতেই কাগজ চালানো যেতে পারে না। অনেক লোকসান দিয়েই এ কাগজখানাকে আমাদের চালাতে হয়। "গণবাণী" বাজারের আর দশখানা কাগজের মতও নয়, অর্থাৎ ব্যবসায়ের হিসাবে এ কাগজখানাকে চালানো হয় না। যাঁরা আগে রীতিমত "গণবাণী" পড়েছেন তাঁরা জেনেছেন, লোকসান দিয়েও কেন কাগজ চালানো হয়, আর এখন থেকে যাঁরা পড়বেন তাঁরাও জানতে পারবেন আমাদের লোকসান খাওয়ার কারণ কি?

লোকসান খেয়ে কোনো কাজ করতে হলে তার একটা সংস্থান থাকাও দরকার। কিন্তু, একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে আর সব জিনিসের চেয়ে আমাদের আর্থিক সংস্থানের অভাবটাই বেশী। নবেম্বর মাসের গোড়ায় যখন আর কিছুতেই পারা গেল না তখন অতি অনিচ্ছার সহিতই, আমাদিগকে কাগজ বন্ধ ক'রে দিতে হলো। অবস্থার সহিত একটানা যুদ্ধ ক'রেই আমাদিগকে পথ চলতে হচ্ছে। আজো যে আমরা বেশী কিছু পুঁজি হাতে নিয়ে কাজে নেমেছি তা নয়, আমাদের সম্বল খুবই সামান্য। তবে এবারে চেষ্টা করতে হবে, যাতে কাগজখানা আর না কিছুতেই বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র জনগণের অভ্যুত্থানের দ্বারাই যে আমাদের মুক্তিলাভ হ'তে পারে এ কথায় যাঁরা প্রত্যয় করেন তাঁদের সাহায্য আর সহানুভূতিই, আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদিগকে ভালো চোখে যাঁরা দেখে থাকেন তাঁরা যদি কাজেও কিছু সহায়তা আমাদের করেন তা হ'লে আমাদের কাজ আরো অনেক বেশী অগ্রসর হবে। নবেম্বর মাস থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ ক'রে কৃষক ও শ্রমিকগণের মধ্যে একটা চৈতন্যের ভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাজেই, আমরা যদি আশা করি যে এবারে "গণবাণী" জনগণের সহানুভূতি বেশী পরিমাণে আকর্ষণ করবে এবং এর প্রচারও অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে, তা হ'লে আমাদের সে আশা মোটেই দুরাশা হবে না।

যে সকল বন্ধু টাকা দিয়ে "গণবাণী"র গ্রাহক হয়েছেন তাঁদের ঠকাবার চেষ্টা আমরা কখনো করিনি। যাঁদের দেওয়া মূল্য ফুরিয়ে যায় নি তাঁরা এবারেও কাগজ পাবেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, যে সকল এজেন্ট মফঃস্বলে কাগজ বিক্রী করেছেন তাঁদের অধিকাংশই আমাদের ঠকিয়েছেন। সামান্য ক'জন বিজ্ঞাপনদাতার অনেকেই টাকা দেন নি। এবার যাতে ঠকিয়ে আমাদের অচল ক'রে না তোলা হয় তার জন্যে আগে থেকেই আমাদের ভাবী এজেন্টগণের নিকটে সবিনয় নিবেদন আমরা জানিয়ে রাখছি।

———

মহাবিপ্লব

—:০:—

আবদুল কাদের

রক্ত পতাকা উড়াও আজিকে, জ্বালা' রে প্রলয়-মশাল জ্বালা'!
উড়ারে পাগল, ভাঙ্গরে আগল, ভাঙ্ অসুরের বন্দী-শালা!
নির্য্যাতনের পাষাণ-পীড়ায় হাঁপায়ে উঠেছে বিশ্ব-প্রাণ,
দানবের পুরে দেবতা বন্দী, বন্দী মোদের শ্রীভগবান!
ঝড়ের ঝাপ্টা হেলায় সহিয়া সঙ্গী-বিহীন যাপি' আঁধার
চল্ রে সমরে মুক্তির তরে পীড়িত বিশ্ব-মানবতার,
নিঙ্কিত জন-মন-আঙ্গনে বিদ্রোহ-রণে চল্ রে চল্—
জ্বালা' বিপ্লব-বাড়বানল!

শাসন-বিলাসী শাসকদলের বেড়েছে শক্তি আস্ফালন,
শাসিতের দেহ স্তূপাকার করি'—তার 'পরে রচে সিংহাসন।
মানুষের রক্তে রাঙাইছে হাড় দিয়া গড়ি' রাজ প্রসাদ,
প্রমোদ-গানের সনে কানে লাগে কাতর প্রাণের আর্ত্তনাদ।
দুঃখের রক্ত শোষণ করিছে, ধন সম্পদ করিছে লুট,
লক্ষ দুখের প্রাণের অন্নে গড়িয়া উঠেছে রাজমুকুট।
নিপীড়িতের ক্রন্দন-শ্বাসে মাখিয়া গিয়াছে গগন তল;
—জ্বালা' বিপ্লব-বাড়বানল!

সম্ভ্রম-মোহে উন্মাদ আজি বিশ্বের সব সরুশীরা
ইন্দ্রিয়-ভোগ-বিলাস লাগিয়া শ্রমিকের মনে হানিছে পীড়া।
কারখানা-যূপে শিশু জননীরা অন্ন মাগিয়া যেতেছে বলি;
কলের চক্র ঘন ঘন ঘোরে কাঁচা বুক কত নিমেষে দলি'।

ধনিকের দয়া-লেশ নাহি মনে—শুধু আক্রোশ, মিথ্যা ছল,
দুখী মজুরের ব্যথায় বিধির [illegible] স্রষ্টা [illegible]!
ওরে যুগ-যুগ-বঞ্চিত দল! আজি [illegible]
জ্বালা' বিপ্লব বাড়বানল।

"ভূস্বামিকারী" ভূমির মালিক কবে থেকে হ'লো কেমন করি'?
কৃষাণ-বধূরা অঝোর নয়নে কাঁদে সে ব্যথার কাহিনী স্মরি'।
চাষীরা দেশের পরগাছা হ'লো—আবাদ করিয়া পরের তরে,
গ্রাসাচ্ছাদন জুটে না ক' তারা উপবাসে রোগে ভুগিয়া মরে।
ফসলের ভোগ তাহাদের নয়—যারা ক'রে ভবে উৎপাদন,
করের উপর উপকর দিয়া বাধে [illegible] তা'রা বরে মরণ।
মাটীতে সমান ভাগ ক'রে নিতে জাগ মড়া, তোলা ওঠা [illegible]—
জ্বালা' বিপ্লব-বাড়বানল।

বিভেদ আনিয়া মানব-সমাজে হিংসা সৃজিল শাস্ত্রকার—
ছোটদের পীঠে পা রাখিয়া আজ বড়'রা উড়ায় সুখ দেদার।
ধর্ম্ম-[illegible]-প্রবরা নৃত বুলি' তুলি' [illegible] হিংসা বেশে
চা[illegible]ইছে দুখীর রক্ত বুকে লয়ে স্নেহ ধর্ম্মাবেশে।
[illegible] গারদে বন্দী রাখিছে মানুষেরে দিয়া বিধি নিষেধ
যা[illegible] পুড়াইয়া ফ্যাল্ তা'রে তোরা মনে না মানি' খেদ!
[illegible] চলারে নন্দিত করি' নভোপ্রাঙ্গনে বাজে মাদল—
জ্বালা' বিপ্লব-বাড়বানল!!

জাগরণ

—:০:—

ভারতের সর্ব্বত্রই জনগণের জাগরণের একটা অপূর্ব্ব সূচনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শোষিত, নির্য্যাতিত মানবগণ আজ অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে এমন সব জায়গাতেই এই সংগ্রাম বেশীভাবে প্রকটিত হয়ে পড়েছে। বোম্বের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণ আর কিছুতেই কলওয়ালাদের খামখেয়াল বরদাশ্ত করতে রাজী নয়। ধর্ম্মঘট ক'রে তারা কাপড়ের কলগুলিকে অচল ক'রে দিয়েছে। কানপুরে ধর্ম্মঘট চলেছে। জমশেদপুরে টাটার কারখানায়ও শ্রমিকরা তাদের শক্তির পরিচয় দিতে ছাড়ছে না। সাড়ে তিন মাস হ'তে চল্‌লো ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লিলুয়া কারখানায় আর কোনো কাজই হচ্ছে না,—কল-কব্জাগুলিতে মরিচা ধরেই যাচ্ছে। বার্ণ, জেসোপ ও মার্টিন কোম্পানীর কারখানাগুলির অবস্থাও তাই। চেঙ্গাইল লাড্‌লো জুট মিলে এখনো ধর্ম্মঘট চলেছে, আর রিষড়া ওয়েলিংটন জুট মিলের ও মাহেশ বুরুজ কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘটের অবসান সবেমাত্র হয়েছে। হাওড়ার মেথর আর ঝাড়ুদারদের ধর্ম্মঘটের শেষ কিছুকাল পূর্ব্বে হয়ে গেছে। কিন্তু, কলিকাতার মেথর ঝাড়ুদার প্রভৃতির ধর্ম্মঘট যদিও মিটেছিল তথাপি কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ আবার খুব শীঘ্রই হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ময়মনসিংহের মেথর ও ঝাড়ুওয়ালারা হয়তো দু'একদিনের মধ্যেই ধর্ম্মঘট ক'রে বসবে।

এই ত গেল শিল্পজগতের কথা। কৃষকগণের ভিতরেও আজ চাঞ্চল্যের লক্ষণ যথেষ্টই দেখতে পাচ্ছি। ময়মনসিংহ জিলার নানা স্থানের কৃষকগণ আর মাথা নত ক'রে সব অত্যাচার সহ্য করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। বিশেষ ক'রে আটিয়া পরগণার ১০৪খানা গ্রামের লক্ষাধিক কৃষক জমীদার আর সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার স্থানে স্থানে কৃষকদিগের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব সংগ্রামশীলতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

কৃষক আর শ্রমিকের এই সংগ্রাম প্রতিহত যে না হচ্ছে তা

নয়। একদিকে ধনিক, জমীদার আর গবর্ণমেণ্টে এ সংগ্রামকে বাধা দেবার জন্যে যত প্রকারের উপায় অবলম্বন করা উচিত তার কোনোটাই বাকী রাখছে না। অন্যপক্ষে কৃষক ও শ্রমিকের সংগ্রামের নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের অনেকেরই মিথ্যা চাতুরী, ভণ্ডতা ও বুদ্ধির দৈন্যের দ্বারাও সংগ্রামের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু, এসব সত্বেও এ কথা আমাদিগকে মেনেই নিতে হবে যে দিন দিনই কৃষক ও শ্রমিকগণ অধিকতর সচেতন হয়ে উঠ্‌ছে।

নিম্ন মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শ্রমিকদের অবস্থার চেয়ে এতটুকুও ভালো নয়। কৃষকদের ন্যায় তাঁরাও শোষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় এই যে আজকের এই কৃষক ও শ্রমিক জাগরণের সময়ে তাঁদের জাগরণের কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না। যতই শোষিত, নির্য্যাতিত ও সর্ব্বস্বহারা তাঁরা হোন্ না কেন, সমাজের উচ্চতর অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর সহিত তাঁদের অচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধন রয়েছে। শোষকদের দ্বারা পদ-দলিত হয়েও তাঁরা আপনাদিগকে শোষকদেরই নিকট আত্মীয় ব'লে মনে ক'রে থাকেন। তাঁদের মানসিকতা কিছুতেই তাঁ'দিগকে কৃষক ও শ্রমিকদিগের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হ'তে দিচ্ছে না। তাঁরা অনেক সময় জনগণের সংগ্রামের অন্তরায় হ'তেও ছাড়েন না। কলিকাতা ও হাওড়ায় মেথর-ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘটের সময় এ ব্যাপার আমরা ভালোরূপে লক্ষ্য ক'রে করে দেখিছি। ইস্পাতেই নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর যুবকগণ ধর্ম্মঘট ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন।

যা কিছু হোক না কেন, অর্থনীতিক আর সামাজিক অত্যাচার আজ কৃষক ও শ্রমিকগণকে ক্রমশঃই সংগ্রামশীল ক'রে তুলছে। 'শ্রেণী-সংগ্রাম বিদেশের আমদানী জিনিস, ভারতের পুণ্য-ভূমিতে তা কিছুতেই সইবে না' ব'লে যাঁরা ধনিকগণের হয়ে প্রচার কার্য্য চালিয়েছেন বা চালাচ্ছেন আজ তাঁদেরি বুকের ওপরে শ্রেণী-সংগ্রামের নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেছে। সব ধর্ম্মঘটই যে কৃতকার্য্য হয়েছে বা হবে তা কেউই বলতে পারে না, কিন্তু, গণ-চৈতন্য ও সংগ্রামশীলতা যে কিছুতেই অকৃতকার্য্য হবে না এটা ধ্রুব সত্য। যুগের পর যুগ যারা শোষিত ও পদ-দলিত হয়েছে তাদেরি দিন এখন আস্‌ছে। নির্য্যাতনকারী আর শোষকের দল বুঝতে পেরেছে যে তাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই, তারাও আজ "কাণ্ট্রি লীগ" আদি গঠন করে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু, যারা সমাজের পরগাছা স্বরূপ, কোনো কিছু উৎপন্ন করার ক্ষমতা যাদের এতটুকুও নেই, কেবলমাত্র শোষণের ওপরেই যাদের সব কিছু নির্ভর ক'রে থাকে তারা ভাড়াটে লোকের সাহায্য গ্রহণ ক'রে অগণিত জনগণের আক্রমণ আর কতকাল সইতে পারবে?

আজ এই গণজাগরণের মূহুর্ত্তে যাঁরা জাতীয় আন্দোলনকারী ব'লে আপনাদের পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁদেরও সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা এতকাল ভাব্‌তেই পারেন নি যে তাঁদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরেও পৃথিবী আছে। তাঁরা কখনো চা'ন নি যে জনগণের উদ্বোধন হোক, সংগ্রামের দ্বারা জনগণ সব ক্ষমতা করতলগত করুক। কংগ্রেসের বেদী থেকে তাঁরা বারে বারে জনগণের দাবী-দাওয়াকে উপেক্ষা ক'রেছেন। কিন্তু, তাঁদেরও আজ গোঁজামিল দিতে হচ্ছে—এখানে-ওখানে জনগণের নামে দু'একটা কথা তাঁরাও আজ না ব'লে থাকতে পারছেন না, যদিও সে সব কথা মোটেই প্রাণের কথা নয় এবং অনেক সময়ে জনগণের অহিত করার জন্যেও সে সব কথার উচ্চারণ তাঁরা করেন। বোম্বের কাপড়ের কলের শ্রমিক-ধর্ম্মঘট, কলিকাতার মেথর ও ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘট এবং সম্প্রতি কেশোরাম কটন মিলের ধর্ম্মঘট ব্যাপারে আমরা এই শ্রেণীর লোকের স্বরূপ অনেকটা চিনে নিয়েছি। এঁরা জনগণের উদ্বোধনকে ভালো চোখে ত দেখ্‌ছেনই না, অধিকন্তু এটাকে একটা বিপদ ব'লেও মনে করছেন। কাজেই, এ উদ্বোধনের বিরুদ্ধাচরণ এঁরা করবেন, ধরতে গেলে বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভইত করে দিয়াছেন। এ সব বিষয় এর পরে আমরা আরো বিশদভাবে আলোচনা করব। তবে নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর লোকেদের বিশেষ ক'রে যুবক-যুবতীদের জন্যে একটা ভাব্‌বার সময় উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা যদি তাঁদের অভিজাত মানসিকতা পরিহার না করেন এবং জনগণের সংগ্রাম থেকে আপনাদিগকে দূরে সরিয়ে রাখেন তা-হ'লে তাঁদের অবস্থা কত যে শোচনীয় হয়ে পড়বে তা আমরা ভাব্‌তেই পারছি নে। এই ক'রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্থী যে শুধু তাঁরা হবেন তা নয়, তাঁদের অস্তিত্ব পৃথিবীর বুকে অভিশাপ হয়ে বাজতে থাকবে।

কৃষক ও শ্রমিক দলের করণীয় কার্য্য *

—:*:—

[ফিলিপ স্প্রাট্ বি, এ, (ক্যাম্বিজ)]

কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্যের প্রসার দিন দিনই বাড়ছে, এর ক্ষমতা ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করছে। দলের মুখপত্রও পুনরায় প্রকাশিত হতে চলেছে। বিশেষ ক'রে ঠিক্ এই সময়েই সাধারণ ভাবে এবং বিশিষ্ট ব্যাপারেরও নামোল্লেখ ক'রে একটা বর্ণনা প্রচার করা দরকার যাতে বুঝতে পারা যাবে এই দল কেন গঠিত হয়েছে এবং কি কি ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য সম্পাদন এই দল করার ভার নিয়েছে। এ প্রবন্ধটি হচ্ছে ঠিক্ এইরূপ একটা বর্ণনা প্রদান করার প্রচেষ্টা মাত্র।

প্রথমে আমাদের এটা দেখা দরকার কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে দলটির উদ্ভব হয়েছে এবং তা বর্দ্ধিত হয়ে উঠেছে। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে ক'রে বলতে গেলে বলতে হয় যে বর্ত্তমান যুগ হচ্ছে শোষণবাদের (ইম্পিরিয়েলিজমের) যুগ। কিন্তু, শুধু যে এ শোষণবাদের অস্তিত্বই বিদ্যমান রয়েছে তা নয়, শোষণবাদ তার চরম সীমায় পৌঁছেছে এবং কাজে কাজেই তার অবনতি ও পতনেরও সূত্রপাত হয়েছে। বিশ্বজোড়া ধ্বংস আর বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়েই এই অবনতি ও পতন

* এই প্রবন্ধটি লেখকের "The Role of the" Workers' and Peasants' Party" শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

(সম্পাদক, "গণবাণী"।)

আরম্ভ হয়েছে। বর্তমান যুগে জগতের সকল দেশের শ্রমিকগণ ধ্বংসশীল ধনিকবাদের অসহনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই যুগে ঔপনিবেশিক দেশ সমূহ যেমি বর্দ্ধনশীল নিষ্পেষণ ও শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চাইছে তখনি তারা নির্য্যাতক ও শোষকদের হাতেই মার খাচ্ছে। তার পরে, এই যুগ যুদ্ধ বিগ্রহেরও যুগ বটে, যাতে বড় নির্য্যাতকের লাভের খাতিরে নির্য্যাতিতগণ পরস্পরের মধ্যে হত্যার উৎসব পালন করছে।

এই ঐতিহাসিক যুগ ভারতে চরম রূপে পরিস্ফুটমান হচ্ছে। অধীন দেশের নিকটে এ যুগের দাবী হচ্ছে বৈদেশিক শাসনের হাত হ'তে সমগ্রভাবে মুক্তি লাভের জন্যে এবং দেশের ভিতরে জনগণকে শোষণ ও অজ্ঞতার হাত থেকে পরিত্রাণ করার জন্যে অবিচলিত ভাবে সংগ্রাম। এই শোষণ ও অজ্ঞতার জন্যেই বৈদেশিক শাসন সম্ভবপর হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সব সময়ের চেয়ে এখনি বেশী প্রয়োজন হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জনগণের একটা আন্দোলন।

কিন্তু এখনি যখন জাতীয় স্বাধীনতা একান্ত চাই-ই চাই তখন রাষ্ট্রনীতিক জাতীয় আন্দোলন—কংগ্রেস প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এই কথাটি বিশেষ ভাবে আলোচনা করা দরকার। সকলেই স্বীকার করবেন যে বারদৌলির মীমাংসার দ্বারা জাতীয় আন্দোলন বিশেষ ভাবে প্রতিহত হয়েছিল। তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এ আন্দোলন আর প্রকৃতিস্থ হ'তে পারে নি। কিন্তু, গত বছর ধরে সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে ও সর্ব্বদল সম্মিলনের দ্বারা যে ভাবের পুনরুদয় হচ্ছে, অনেকে তাতেই একটা আন্দোলনের সূচনা দেখতে পাচ্ছেন, যা তাঁদের মতে শোষণ বাদকে শুধু যে সমস্ত ক'রে তুলবে তা নয়, পরিণামে শোষণবাদকে বিধ্বস্ত করেও ছাড়বে। এরূপ মত আংশিক ভাবে সত্য হ'লেও এর ভিতরে সাংঘাতিক ভুলও রয়েছে। একথা সত্য যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যে জনগণের আন্দোলন আবারো দৃঢ়ীভূত হচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্টের পরড়া-শুদ্ধ-কংগ্রেসই যে সেই জনগণের আন্দোলনের বিকাশ এরূপ ভাবা মস্ত বড় ভুল। জনগণের তরফ থেকে যে জোর দেওয়া হচ্ছে তারি খাতিরে বুর্জোয়া দল সমূহ কার্য্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা জনগণকে ঠাণ্ডা ক'রে রাখতে চায়। কিন্তু, এ সব দলের কার্য্যাবলী কোনো প্রকারেই জনগণকে সন্তোষ জনক ভাবে পরিচালনা করতে পারে কিংবা তাদের জন্যে কোনো প্রকারের সম্ভবপর কার্য্য প্রণালী স্থির করতে পারে একথাটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না।

সর্ব্বদল সম্মিলনের মীমাংসা ও সুপারিশ সমূহ সম্বন্ধে এখানে বিশদরূপে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু, কথাটা অবশ্যই পরিষ্কার করে বলা দরকার যে লিবারেল কিংবা অপর প্রতিক্রিয়াশীল দল সমূহের সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করে কংগ্রেস বড় বুর্জোয়াদের (বড় ধনিকগণের) স্বার্থের নিকটে আত্ম সমর্পণ করেছে যে স্বার্থ জনগণের অভ্যুত্থান ও দেশের স্বাধীনতার সমূহ বিরোধী।

বৃটিশ পণ্যের বর্জ্জননীতি আপাতদৃষ্টিতে খুবই কার্য্যকরী বলে মনে হয়। কিন্তু, সবাই জানেন যে ভারতে পণ্য বর্জ্জন আন্দোলনের কোনো বিশেষ মূল্য নেই এবং আজকাল তা' সমস্ত গতিশক্তি হারিয়ে বসেছে। অবশ্য মধ্যশ্রেণীর লোকেদের মনকে কিছু আন্দোলিত [illegible] জাতীয় সংগ্রামে কতকটা চেতনা [illegible] এর দ্বারা সাধিত হয়। [illegible] যে এটা কখনো সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবাত্মক অস্ত্র হ'তে পারে না [illegible] না সংগ্রামশীল জনগণের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমন ১৯২০ ২১ সনে দক্ষিণ চীনে হয়েছিল। [illegible] ভেবে দেখবার বিষয়। বর্জন আন্দোলন মাত্রই [illegible] মূলক আন্দোলন বলে বিবেচিত হ'তে না পারে, [illegible] তা কিন্তু সংস্কার মূলক ভাবেই (বিপ্লব মূলক ভাবে নয়) পরিচালিত হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে [illegible] দিয়ে গবর্ণমেণ্টের হাত থেকে কিছু সুবিধা আদায় করা।

কংগ্রেসের তৃতীয় নীতি হচ্ছে অহিংসা [illegible] সম্বন্ধে কোনো ভুল ধারণা হ'তেই পারে না। [illegible] বোম্বায়ের শ্রমিক-যুবক ধর্মঘটের কথা কেউ কখনো শুনেছে কি? মাদ্রাজ কংগ্রেসে নিবাদেনদের মনে আঘাত লাগবে এই ভয়ে ধর্মঘট আর হরতালের কথাকে স্থানই দেওয়া হয়নি। ধনিক-গণের স্বার্থের খাতিরে গণ আন্দোলনকে বলিদান করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে বেনারসে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ চাঞ্চল্যের আভাস পেয়েই তবে হরতালের হুকুম দেওয়া হয়েছিল। এই সব ব্যাপারকে কংগ্রেস-নেতৃগণের বিপ্লবাত্মক দৃঢ়তা বলে মনে করাটা অজ্ঞতার শক্ত কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে বিশদ রূপে আলোচনা করা দরকার। কেন না, এটা খুব পরিষ্কার রূপে বোঝা আবশ্যক যে সাধারণ ভাবে ধনিক শ্রেণী এবং এমন কি এর চরম পন্থীদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসও এখন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস এখন আর বিশেষ ভাবে জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে না। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যথা সম্ভব সুবিধা জনক ভাবে গবর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করা। (স্বাধীনতা প্রস্তাবের দমবাজির কথা এখানে প্রকাশ করার কোনো আবশ্যক নেই।)

এই কারণেই নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ার আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছে। এটা অপরিহার্য্য যে পুরাতনের জায়গায় একটা নূতন জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হবে যার বেদী থেকে জনগণের অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক মুক্তির কথা প্রচারিত হ'তে থাকবে। পুরাতন আন্দোলনের অনুসরণকারীগণ যদিও বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছেন তথাপি এর ওপরে রাষ্ট্রনীতিক ভাবে শাসন ছিল ধনিক ও ভূম্যধিকারিগণের। শোষণবাদ সম্বন্ধে এদের ক্রম পরিবর্তন শীল অবস্থা আন্দোলনকে ধ্বংসের মুখে টেনে এনেছে। নূতন আন্দোলন এ অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন ক'রে দিচ্ছে। যদিও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগত সভ্যদের সহায়তা এ আন্দোলন চাইছে তথাপি এর নীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শ্রমিক ও কৃষকগণের ওপরে। নূতন আন্দোলন শুধু যে কৃষক ও শ্রমিকগণের মধ্যে লোক সংখ্যার অধিকাংশকেই দেখতে পাচ্ছে তা নয়, পরন্তু এও বুঝতে পারছে যে তারাই শোষণবাদীদের শোষণের আধার। তাদের মুক্তির মানেই হচ্ছে শোষণবাদের ধ্বংস হওয়া। তারাই একমাত্র শক্তি যাদের সংগ্রামশীল অভ্যুত্থানের দ্বারা শোষণবাদ বিপর্য্যস্ত হয়ে যাবে। এ টুকুই হচ্ছে নূতন জাতীয় আন্দোলনের নীতির সার, আরো পরিষ্কার কথায় **কৃষক ও শ্রমিক দলের** নীতি।

ওপরে যত সব কথা বলা হয়েছে সে সব সত্ত্বেও একথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এবং হবে যে নূতন দল গঠন করার কি

প্রয়োজন? যার অস্তিত্বের কারণই হচ্ছে শোষণবাদের সহিত সংগ্রাম করা সেই ঐতিহাসিক কংগ্রেসই কি যথেষ্ট নয়? যদি কংগ্রেসের পলিসি আশানুরূপ উন্নত না হয় তা হলে তা পরিবর্ত্তন করতে পারা যায় না কি? **কৃষক ও শ্রমিক দলের** বয়স এখনো তত বেশী হয়নি এবং দল ততটা সুগঠিতও হয়ে ওঠেনি যে এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো কৈফিয়ৎ না দিলেও চলতে পারে। উল্লিখিত প্রশ্নগুলির জওয়াব এই যে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনাটা কল্পনাত্মক ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর যদি সম্ভবও হয় তা হলেও তাতে অতি দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হবে। সে দিনের প্রতীক্ষা ক'রে জনগণ কিছুতেই ব'সে থাকতে পারে না। ইতোমধ্যেই তাদের বিদ্রোহ বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তা দ্রুতগতিতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু, এই বিস্তৃতি ও বৃদ্ধির তুলনায় তাদের সঙ্ঘ সমূহ এখনো রাষ্ট্রনীতিক দিক্ থেকে পেছনে পড়ে রয়েছে। নামে নয় কাজে কবে কংগ্রেস তার সম্পূর্ণ নীতির পরিবর্ত্তন করবে, কবে কংগ্রেস জনগণের সংগঠনের কাজ হাতে নেবে, কিন্তু লোকহিতৈষণার ভাব থেকে নয় যেমন এখন কখনো কখনো করে থাকে, ধনিকগণের স্বার্থের খাতিরে গণ-আন্দোলনকে শোষণ করার উদ্দেশ্যেও নয়, পরন্তু, প্রকৃত জনগণের সংঘঠনেরই উদ্দেশ্যে— সেদিনের অপেক্ষায় বসে থাকা একেবারেই সম্ভবপর নয়।

পক্ষান্তরে, কৃষক ও শ্রমিক দল চায় যে কংগ্রেস তার নীতির পরিবর্ত্তন করুক। দলের সভ্যগণ ক'বছর ধ'রে কংগ্রেসের ভিতরেই কংগ্রেসের নীতির ও নেতৃত্বের পরিবর্ত্তনের জন্যে সংগ্রাম ক'রে আসছে। কিন্তু, সকলেই জানেন যে মৌখিক অনেকে কিছু বললেও কংগ্রেস এখনো তার পুরাতন নীতিই মূলতঃ ধ'রে আছে। অল্প ক'জন ছাড়া বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃগণের সকলেই এদিক থেকে নীতির পরিবর্ত্তন করার ঘোর বিরোধী। এই জন্যেই কৃষক ও শ্রমিক দল সত্য দৃষ্টি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কিছুতেই পরিহার করতে পারে না।

কৃষক ও শ্রমিক দলের ঐতিহাসিক দায়িত্ব হচ্ছে শোষণবাদকে বিধ্বস্ত করার জন্যে অর্থাৎ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে যত কিছু সামাজিক উপকরণ থাকতে পারে সে সমুদায়কে একত্র সমাবিষ্ট করা। দলের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে শ্রমিক ও কৃষকগণই এর প্রধান শক্তি সমূহের আধার হবে, কিন্তু, তা হ'লেও যে আর কেউ এতে স্থান পাবে না এমনই নয়। মধ্য শ্রেণীর লোকেদের একটা খুব বড় ভাগ শোষণবাদীদের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে। তাঁরাও দৃঢ়তার সহিত শোষণবাদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও শোষণবাদকে বিধ্বস্ত করার নীতির অনুমোদন করতে ইচ্ছুক হবেন।

কৃষক ও শ্রমিক দল ভারতে অনেকটা সে কর্ত্তব্যই সম্পাদন করতে যা ১৯২৪-২৬ সনে চীনের কুওমিন্টাং দল্ করেছিল; অর্থাৎ তা এমন একটা জনগণের দল হবে যা অনেক বিভিন্ন শ্রেণীকে শোষণবাদের বিরুদ্ধতা করার এবং পূর্ণ স্বাধীনতা স্থাপিত করার ভিত্তির ওপরে একত্র করবে। কিন্তু, কুওমিন্টাংকে যে সকল বাধা-বিপত্তির সন্মুখীন হতে হয়েছে ভারতীয় পার্টিকে সে সকল বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। অর্থাৎ দলের ভিতরে স্বার্থের বিরোধ কুওমিন্টাঙ্গের ন্যায় ভারতীয় দলের থাকবে না। ভারতীয় ধনিকগণ এই ক্ষেত্রে পহুঁছার পূর্ব্বেই রঙ্গভূমি হতে সরে পড়েছে। কিন্তু, চীনে কিছু কাল ধনিকগণ জনগণের আন্দোলনে যোগদান করেছিল। পরে তারা শোষণবাদেরই পক্ষে চলে যায়। এর দ্বারা যে আন্দোলনকে তারা গ্রহণ করেছিল সে আন্দোলনের মধ্যে বিভাগ হয়ে পড়ে। (ঐতিহাসিক হিসাবে অবশ্য ঘটনীয় এই ভাঙনের চরম মুহূর্ত্ত ভারতে এসেছিল ১৯২২ সনে। কার্য্যতঃ এখন, যেরূপ আমরা ওপরে দেখাতে চেষ্টা করেছি, এ ভাঙনের কাজ শেষ হয়েছে।)

এটা ভারতীয় আন্দোলনের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। কুওমিন্টাং দল অনেক দিনই বুর্জোয়া বা ধনিক দিগের স্বার্থের খাতিরে জনগণকে শোষণ করেছে। যদিও এই দল জনগণকে সাহায্যও করেছে তথাপি তা জনগণকে ভীষণ পরাজয়ের মুখে টেনেও এনেছে। এদেশে কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক দল গোড়া থেকেই জনগণের প্রকৃত স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিক্ থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। এ দল শ্রমিক শ্রেণীর কিংবা কৃষকগণের যে কোনো সংগ্রামশীল বিভাগের সংগ্রামে সব শক্তি দিয়ে সাহায্য করতে পারে এবং করেও থাকে। কোনো এক দলকে তাদের উপস্থিত দাবী-দাওয়া পূরণের জন্যে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই সে দলের সকল লোককেই সমগ্র গণশক্তি নিয়েও সাহায্য করে থাকে—যে গণশক্তি ভারতবাসীর মূল শত্রু শোষণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। এ সকল গণশক্তির অভ্যুত্থান বর্ত্তমান ভারত-ইতিহাসের খুব হৃদয়াকর্ষক ও উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। বর্ত্তমান সময়ে জনগণের সংগ্রাম খুব বেশী রূপ বিস্তৃত হলেও তা বিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে এবং সে জন্যে সহজে পরাজিতও হচ্ছে। বিশেষ ক'রে দু'টো বৃহৎ শ্রেণীর, শ্রমিক ও কৃষকের এখনো পর্য্যন্ত প্রায় কোনো সংগ্রাম-শীল সংযোগ নেই। তাদের মুক্তি নির্ভর করছে সম উদ্দেশ্য নিয়ে একই সূত্রে গ্রথিত হওয়ার ওপরে। সেই সম উদ্দেশ্য হবে শোষণবাদকে বিপর্য্যস্ত করা। এই উভয় শ্রেণীর জন্যে একটা সাধারণ পরিচালনারও প্রয়োজন, আর সেটা পাওয়া যাবে **কৃষক ও শ্রমিক দলের** তরফ থেকে।

পরিশেষে, এই দল জনগণের সম্মুখে একটা চরম লক্ষ্য স্থাপিত করবে যার একটা অত্যাবশ্যক স্তর হবে **স্বাধীনতা**। এ দল এটা অনুভব করতে পারছে যে বৈদেশিক শোষণের যে প্রণালী এখন বিদ্যমান আছে তা ধ্বংস করার পরে ভারতের দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের একমাত্র সম্ভবপর সমাধান হবে সোশ্যালিজম বা সমূহ বাদ। এই দল বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সাধারণের নিত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান সমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে এবং শ্রমিকগণের শাসন সে সমুদায়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দল জমীদারী প্রথাকেও উচ্ছেদ করতে চায়। এ সব পরিবর্ত্তনই হবে ভারতীয় অর্থনীতিক জীবন পুনর্গঠনের ভিত্তি। বর্ত্তমান যুগ হচ্ছে শোষণবাদ বা ইম্পিরিয়েলিজমের যুগ—ধনিকবাদের অবনতি ও ধ্বংসের যুগ। যাঁরা ভবিষ্যতের জন্যে কিছু মাত্র তোয়াক্কা রাখেন তাঁদের খুব বিশেষ ভাবে সেই প্রণালীর জন্যে ভাবা ও তৈয়ার হওয়া উচিত যা ধনিকবাদের জায়গায় স্থাপিত হবে।

দলের সাধারণ নীতি ও কর্ত্তব্য কি তা বলা হলো। বর্ত্তমান অবস্থায় দলের ওপরে যে কার্য্য ভার বিন্যস্ত হয়েছে তা ক্রমশঃই অধিকতর বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে। এখন আমরা একই সঙ্গে বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিক ও শিল্প সংক্রান্ত (ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল) সঙ্কটের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। সাধারণ নীতি অনুসারে এই দল দু'টো ব্যাপারকেই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করে তুলবে; কেননা, সব অর্থনীতিক দ্বন্দ্বই রাষ্ট্রনীতিক দ্বন্দ্বও বটে, আবার সব রাষ্ট্র-

নৈতিক সংগ্রামও অর্থনৈতিক সংগ্রামেরই রূপান্তর মাত্র। যে কোনো ধর্মঘট, জমীদার কিংবা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নির্য্যাতিত কৃষকগণের যে কোনো সংগ্রাম এই দলের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবে। এই সকল সংগ্রাম ভবিষ্যতে যে শোষক ও শোষিতের মধ্যে ক্রমাগত লাভের জন্যে একটা বিরাট সংগ্রামে পরিণত হবে তারি সূচনা মাত্র। এ সবের পূর্ণ অর্থ জনগণের চোখের সামনে ধরে দেওয়া উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও যাঁরা প্রকৃত পক্ষে শোষণ-বাদের বিরোধী রয়েছেন, সাইমন কমিশন ও যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে এই দলের উচিত তাঁদেরও এক জায়গায় সমবেত করা। সাইমন-কমিশন-বয়কটের নামে ভারতবর্ষকে শোষণবাদের সহিত বেঁধে দেবার যে প্রচেষ্টা এখন চলেছে তা এ দল অবশ্যই নির্ম্মমরূপে সকলের চোখের সম্মুখে প্রকটিত ক'রে দেবে। বোম্বেতে যে সর্ব্বদল সম্মিলনের বৈঠক বসেছিল তাতে কমরেড্ ডাঙ্গে দলের মতই পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন:—এ সম্মিলনের একমাত্র ফলদায়ক নীতি হতে পারত শোষণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে একটা সমবেত শক্তি কেন্দ্রীভূত করা। কিন্তু তা' না করে সম্মিলনকে একটা দরদস্তুর যুদ্ধবিদ্যা করার জন্যে ব্যবহার করার মানেই হচ্ছে শোষণবাদের হাতের পুতুল হওয়া।' এর দ্বারা সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে অবনমিত করে পার্লামেণ্টের নীতিতে পরিণত করা হয়েছে। **কৃষক ও শ্রমিক দল** কিছুতেই এরূপ প্রবঞ্চনার কাজে যোগদান করতে পারে না। এ দলের সভ্যরা সকলকে শোষণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার জন্যে এবং বুর্জোয়া দল সমূহের প্রতিক্রিয়াশীল ও আপোষ করার প্রকৃতিকে সাধারণে প্রকাশ করে দেবার খাতিরেই সর্ব্বদল সম্মিলনে যোগদান করবে। ভারতীয় ও বৃটিশ ধনিকগণের মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ নিয়ে মীমাংসার জন্যে খসড়া প্রণয়নে এ দল কিছুতেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তার চেয়েও বড় কাজ দলের করবার রয়েছে—সে **হচ্ছে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম।**

পল্টন

—:*:—

এ, ম্যারোসেভ

[বোলশেভিক রাশিয়ার লেখা-চিত্র]

ম্যান্দ্রোনিকভ পার্টি-কমিটির সদস্য। কখনো কোন কালে কোন সভা-সমিতিতেই গরহাজির থাকতে তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। আর বারতেনিভও বিরুদ্ধবাদীদের কোণ ঠেসা করবার জন্যে একান্তভাবে লেগে গিয়েছিলেন। মস্কোর সোভিয়েট প্রাসাদ থেকে ম্যান্দ্রোনিকভ বংডেস্ট্ভেনস্কি বুলভারে উঠে গেলেন—সে বাড়ীটা ছিল শহরের যত শ্রমিকের আড্ডা, আর তাদের বেশীর ভাগই ছিল ছাপাখানার কর্ম্মচারী। বারতেনিভ উঠে গেলেন লিউবিয়াঙ্কায়—সেখানে তিনি ভিতর মহলের এক নিরালা ঘরে আস্তানা নিলেন। ও বাড়ীটাই আবার বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান কেন্দ্র। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীটা যেন গোলা-গুলি-বিভলভার-রাইফেলে সরগরম হয়ে উঠল।

ওঁরা দুজনায় পরম বন্ধু। কারুর সঙ্গে কারুর দেখা নেই, কথা বলার ফুরসৎ নেই, তবু ওঁদের বন্ধুত্ব ভাটা পড়বার মত নয়—মনের সঙ্গে মনের বন্ধুত্ব।

তখন চেকো শ্লোভাকিয়া সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে। একদিন সোভিয়েট সভায় 'হোয়াইট হাউস' কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্যে বৈঠক বসে। দুই বন্ধুতে দেখা হল। বৈঠকে বড় বড় কর্ম্মীরা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন।

পার্টি কমিটির সভ্য হিসেবে ম্যান্দ্রোনিকভকে 'এন' সৈন্য-বাহিনীর প্রতিনিধিরূপে আহ্বান করা হয়েছিল। সেই সৈন্য বাহিনীতে কি একটা গোলোযোগ শুরু হয়েছে।

বারতেনিভ বললেন, 'চল, এক সঙ্গেই যাই, আমার সঙ্গে গাড়ী আছে।'

কাজেই দুজনে এক সঙ্গেই গেলেন।

বৈঠকের অতি প্রশস্ত ঘরটায় নানা রকম গোলমাল হৈ চৈ চলছে, কেউ চেঁচাচ্ছে, হাঁকডাকের আর সীমা নেই। কোথাও বা চীৎকার করে কান্না তর্কবিতর্ক আরম্ভ করে দিয়েছে। কারুর কথাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। সৈন্য বাহিনীর অধ্যক্ষ রেজনিক-ভের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর এই সুবিপুল গোলমালে একেবারে তলিয়ে গেল।

ওই অর্দ্ধনগ্ন, অর্দ্ধভুক্ত উত্তেজিত সৈনিকদের শান্ত করবার প্রয়াস হল। কিন্তু তারা তাঁর সদাহাস্যময় ঠাণ্ডা মেজাজের ক্ষীণ কণ্ঠে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'আমাদের আগে পায়ে দেবার জুতা দাও, তারপর যত পার মিষ্টি বুলি আউড়িয়ো'।

'ওসব আমরা ঢের শুনেছি। আমাদের রুটি কোথায়? খালি গায় শীতের রাতে একদিন ডিউটি দিয়ে দেখো, তা হলেই মজাটা টের পাবে'।

'দূর থেকে 'কমরেড্' 'কমরেড্' করতে কর্ত্তারা কতই না তৎপর!

চারিদিক থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

চীৎকার করতে গিয়ে অনেক আগেই বেচারা রেজনিকভের গলা ভেঙে গিয়েছিল। তিনি তখনো তাঁর সেই চিঁ চিঁ স্বরে কথা কইবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন।

ম্যান্দ্রোনিকভ সেনাদলের মধ্যে দিয়ে রেজনিকভের দিকে আসতে আসতে শুনতে পেলেন তিনি সৈন্যদের বোঝাতে শেষ চেষ্টা করছেন।

'কমরেড, ভাই, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সত্যিই খুব শোচনীয়। বিপক্ষদল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বুর্জ্জোয়া সরকারের কাছ থেকে উৎকোচ পেয়ে আমাদের অমনি করেই পিষে মারতে উদ্যত হয়েছে—ভলগার তীরবর্ত্তী সমগ্র উর্ব্বর ভূমি তারা দখল করতে চেষ্টা করছে। এখন যদি আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে না দিই ত সব পণ্ড হবে। কিন্তু ওদের একবার দাবিয়ে দিতে পারলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। দেশের সমস্ত উৎপন্ন শস্য যদি কৃষাণদের, বিশেষ করে লাল-পল্টনের মধ্যে আবশ্যক অনুযায়ী বণ্টন করা হয়, তা হলে যে বিরাট শক্তি গড়ে উঠবে তা সমগ্র জগতের ইতিহাসে কোন কালে কেউ কখনো দেখে নি।'

তোমার বাজে বক্তৃতা শুনতে চাই নে। আগে আমাদের পায়ে দেবার জুতো জোগাও!'

'ওসব ঢের জানি, ঢের শুনেচি!'

'বেশ বুঝলাম তোমার কথা, কিন্তু আমাদের খাবার কোথায়?'

সেই উন্মত্ত বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘের চীৎকার আবার বেড়ে গেল।

রেজ্‌নিকভ অদূরে ম্যান্দ্রোনিকভকে দেখতে পেয়ে খুশীও হলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে একটু কুন্ঠিতও হয়ে পড়লেন। তাঁর অন্তর্দাহ বাইরে ফুটে বেরুল, দুরন্ত রসনাগ্রভাগ ক্রমাগত ওঠা-নামা করতে শুরু করে দিল। তিনি বলে চললেন

'কাজেই এখন আমাদের ধৈর্য্য ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলতে হবে।......'

'হাঁ তাই বই কি, ধৈর্য্য ধরব বই কি!.....তাই না তুমি আলুগুলি জমা করে রেখে পচিয়ে ফেলে দিচ্ছ, তবু আমাদের দিচ্ছ না!'

'খেতে না পেলে শৃঙ্খলা কি করে থাকবে?'

রেজ্‌নিকভের আর কিছু বলবার মত শক্তি ছিল না।

তিনি যথেষ্ট উত্তেজিত ও শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তা ছাড়া তাঁর কথাগুলি বিফল হওয়ায় তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন। তবু তাঁর মুখ অপূর্ব দীপ্তিতে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল, মুখে তাঁর হাসি, চোখ দুটো জল্ জল্ করচে, কানদুটো লাল টক্‌টকে, যেন সদ্য মুষ্টিযুদ্ধ করে এসেছেন। সেই মুহূর্ত্তে ম্যান্দ্রোনিকভ ও বারতেনিভ যে তাঁর সে দুর্দ্দশা দেখবার জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন এ কারণে তিনি ভারি দুঃখিত হলেন।...... এককালে যিনি একজন প্রচণ্ড দুঃসাহসী জোয়ান—বিপ্লবপন্থী ও টেররিষ্ট ছিলেন, সেই তিনিই আজ নিজের ব্যর্থতায় লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে মাটীতে নুয়ে পড়লেন। সব চাইতে তাঁর লজ্জার বিষয় এতদিন যাদের তিনি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করেছেন, যাদের জন্যে কত না দুঃখকষ্ট সয়েছেন আজ তারাই কৃতঘ্নতা করলে।..... অদূরে সেই অগণিত জনতা ক্রুদ্ধ পশুরাজের মত গর্জ্জন করতে লাগল।

সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কোন দলেরই নন। চেহারাটি তাঁর দেখলেই হাসি আসে। গালে একটি প্রকাণ্ড জরুল, তাতে রেঁায়া রকমের তিনটি চুল গজিয়েচে।

তিনি বললেন,

'কম্‌রেড্‌গণ, শোন তোমরা। মস্কোর বোলশেভিক কমিটির প্রতিনিধিকে এবার বক্তৃতা দেবার সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুগণ, তোমাদের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তোমরা সকলে একটু শান্ত হয়ে তাঁর কথা সব শোন। যদি তোমাদের কারুর কিছু বলবার থাকে,—প্রতিবাদই হোক আর অভিযোগই হোক—এসো, বল সে সব কথা, আমরা সাগ্রহে তা শুনব এবং প্রতিকারের চেষ্টা করব। কিন্তু চীৎকার করার ত কোন অর্থ নেই। হেই কম্‌রেডগণ, যারা ওই জানালার নীচে দাঁড়িয়েচো, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? গোলমাল থামাও। ইনি এখন আমাদের খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে কিছু বলবেন। তোমরা সকলে মন দিয়ে শোন।'

ম্যান্দ্রোনিকভ বেশী জোরে নয় কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে শুরু করলেন:—

'বন্ধুগণ, স্পষ্ট করেই তোমাদের বলচি যে, পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্য সম্বন্ধে তোমরা যে অভিযোগ করচো, তা খুব খাঁটি। আমাদের খাদ্য বা অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে। নিজেদেরই নেই; তা তোমাদের দেব কোথা থেকে? কিন্তু তার জন্যে কি করতে চাও? ধর, তোমাদের সকলকেই যদি বাড়ী পাঠিয়ে দিই, কিন্তু তোমরা কি বলতে চাও যে বাড়ী গেলেই তোমরা পেট ভরে খেতে পাবে, না সেখানে গেলেই শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে? তোমরা নিজেরা সকলেই চাষী; আচ্ছা, তোমরা প্রত্যেকেই আপনার মনে ভেবে দেখ যে, তোমরা কিছু নিজেরা এসে প্রধান কেন্দ্রে শস্যাদি জমা দাও না; অথচ তোমাদেরই তা দেবার কথা।......আচ্ছা, তারপর কারা সে সব জমা দেয়, সদরে শস্যাদি আমদানি করবার মত যথেষ্ট গাড়ী ঘোড়া কোথায়?'.....

ম্যান্দ্রোনিকভ গোড়া থেকেই প্রশ্ন করে এবং নিজেই তার জবাব দিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদের কোণ ঠেসা করে ভর্ৎসনার সুরে কর্ম্মপ্রেরণায় উৎসাহিত করে তুললেন। নিজে তিনি প্রায় দুদিন কিছুই খেতে পান নি। তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট—সিধা গিয়ে শ্রোতার মনকে অভিভূত করে।

ওদিকে বারতেনিভ ও রেজনিকভ পিছনে বসে ছিলেন। মানুষের বোকামি দেখতে বারতেনিভের পরম আনন্দ, বিশেষত সেই বোকামির প্রকাশ যখন এমন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে তখন তাঁর পুলকের আর সীমা থাকে না। এ ক্ষেত্রে কেবল বোকামি নয়, অপদার্থতাও ধরা পড়ে গেছে। কাজেই তিনি রেজনিকভের দিকে বেশ লোভীর মতই নজর রেখেছিলেন, সুযোগ পেলেই প্রশ্নের বা অভিমতের বাণে তাঁকে একেবার বিদ্ধ করে দিবেন।

হঠাৎ এক সময় তিনি রেজনিকভকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'আচ্ছা, এ ব্যাপারের ফল কি হবে, তোমার কি মনে হয়?' বিক্ষুব্ধ সৈন্যদের দিকে আঙুলি নির্দ্দেশ করলেন।

'কে জানে কি হবে। কিন্তু যাই হোক, আমাদের খুব সাবধানের সঙ্গে চলতে হবে।'

'আমার মনে হয় এর মধ্যে কোন কারসাজি আছে।'

'হয় ত আছে। কে বলতে পারে। হয়ত সত্যিই এ কার সাজি।'

বারতেনিভ আস্তে আস্তে তাঁর জিভ কামড়াতে আরম্ভ করে দিলেন এবং চোরা হাসিতে তাঁর বাঁ গালে টোল খেয়ে গেল।

ক্ষুব্ধ জনতা ইতিমধ্যেই ম্যান্দ্রোনিকভের বক্তৃতায় শান্ত হয়ে আসছিল। তিনি তখন তাদের বর্ত্তমান আর্থিক অসহায় অবস্থার কথা বোঝাতে লাগলেন। এবং যদি সমগ্র লাল পল্টন সোভিয়েট রাশিয়াকে, সকল রকমে সমর্থন না করে কেবলি দাবী দাওয়া নিয়ে অসন্তোষ জানায় তাহলে সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

'আমরা বোলশেভিক, আমরা কম্যুনিষ্ট। আমরা সব সময়ই সকল কাজে গণশক্তির উপর নির্ভর করি, সুতরাং গণশক্তিই আজ তাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুক। যদি অন্য কোন স্বতন্ত্র সরকারের প্রতিষ্ঠা তাদের সকলকার কাম্য হয়, তাহলে স্পষ্ট করে এসে বলুক; 'আমরা সোভিয়েট শাসন চাই নে, দূর করে দাও সাম্যবাদ।'

বলতে বলতে তিনি সহসা চুপ করলেন। বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে যেন একটা তুমুল আলোড়ন আরম্ভ হয়ে গেল। তাদের সেই শ্মশ্রুবহুল মুখগুলি মেঘের চাইতে কালো হয়ে উঠল।...

জনতার মধ্যে থেকে একজন কি জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল,

'আমরা গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কোন তথ্য বলতে চাই নে। আমরা চাই খাদ্য, পোষাক।'

আর একজন বললে, 'আমরা সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধবাদী নই।'

আর একজন চীৎকার করে উঠল, নিশ্চই আমরা সোভিয়েট রাষ্ট্রশক্তিকে চাই---আমরা বুর্জোয়া শাসন চাইনে কেন? তার স্বাদ ত বেশ পেয়েছি, আর কেন

তখন য্যাস্ক্রোনিকভ সুযোগ পেয়ে বলতে শুরু করলেন, যদি সত্যি সত্যিই তোমরা সোভিয়েট শাসন চাও, তাহলে সর্ব্ব প্রযত্নে তাকে সমর্থন কর সাহায্য কর। তার জন্যে প্রয়োজন হয় ত তোমাদের প্রাণ দিতে হবে। দাবীর ফর্দ্দ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের এ সময় নয়।'

এমনি করে তিনি তার ভর্ৎসনার ধারা বর্ষণ করতে লাগলেন।

য্যাস্ক্রোনিকভ সৈনিকদের অসন্তোষের কথাগুলি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় স্পষ্ট করে আলোচনা করলেন। তাদের অসন্তোষের কারণগুলি তাদের সামনে খুলে ধরলেন। সকলকে বুঝিয়ে দিলেন এবং সেইটে করে সবার তাদের সকলকে এক নিমেষে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুললেন---যেমন পাকা মাঝি ঝড়ের মুখে হাল ধরে নৌকা ঠিক রাখে। তাদের সে অসন্তোষের গতির মুখ ফিরিয়ে বিপ্লব বিরোধীর দিকে পরিচালনা করলেন। এ কথাটা তিনি স্পষ্ট করেই তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে গৃহকলহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সকল সমস্যার সমাধান হবে।

রেজনিকভ যুক্তিতর্ক দেখিয়াছেন, আর য্যাস্ক্রোনিকভ দিলেন পথ নির্দ্দেশ করে। বারতেনিভ কনুই দিয়ে রেজনিকভকে একটু ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, শীগগির কর, একটা প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করে ফেল।' সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিজের পকেট থেকে সিগারেট বার করে রেজনিকভের সম্মুখে ধরে দিলেন।

হাঁ, তুমিই ঠিক।

রেজনিকভ তাঁর নোটবুক বার করে পড়লে ;

"বিবেচনা করে দেখা গেল'

"আবার তিনি ভাবতে লাগলেন।

"এরকমটা নয়---একেবারে পুরোনো।' বারতেনিভ মৃদুস্বরে বলে উঠলেন। তাঁর মুখে একটা শয়তানি হাসি ফুটে উঠল। এবং বাঁ গালে টোল খেয়ে গেল। "অন্যরকম করে লেখ:---সামরিক নেতার বিবরণ শুনে কম্‌রেড্ রেজনিকভ---এটুকু থাকা চাইই, এ না হলে কাল খবরের কাগজে তোমার নামটা উঠবে না।

"বেশ, কিন্তু তাহলে বলতে হবে: সামরিক নেতা কম্‌রেড রেজনিকভের বিবরণ ও কম্‌রেড্ য্যাস্ক্রোনিকভের অতিরিক্ত বিবরণ শুনে আমরা' ....

বারতেনিভ মন্তব্য প্রকাশ করলেন তোমার হাতের লেখা বড় খারাপ। দাও আমায়, আমি লিখি, আর তুমি বলে যাও।'

বারতেনিভ শব্দের পর শব্দ বসিয়ে গেল---যেন মুক্তার পর মুক্তা দিয়ে একটি সুন্দর হার গড়িয়ে তুললেন। বারতেনিভ ও রেজনিকভ প্রস্তাবটি লিখে শেষ করতে না করতেই য্যাস্ক্রোনিকভ তাঁর সুকণ্ঠ বক্তৃতা শেষ করলেন। এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলে। সোভিয়েট শাসন দীর্ঘজীবী হোক! কোলচাক ও সামাজিক বিপ্লবীদের ধ্বংস হোক---সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকও তাদের দলের যারা সম্পর্ক রেখে যাবে তাদেরও জাহান্নমে যাক!'

সম্মিলিত সৈনিকদের মধ্যে একটা তীব্র উৎসাহ ও আস্থা বদ্ধমূল হয়ে গেল।

এক দীর্ঘাকৃতি, কালো উস্কো খুস্কো, সৈনিক লাফ দিয়ে বক্তৃতা মঞ্চে এসে উঠল, তার দীর্ঘ বাহুদুটি লোমশ থাবার মত দুলছিল। সে চীৎকার করে বলে উঠল :---

"বিরুদ্ধবাদী দল ও সেনানায়কদের ধ্বংস কর!"

এই বলে সে তার ডান হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ করে শূন্যে তুলে ধরলে।

'তাদের সব ধ্বংস কর! হুররা!' লালপল্টনের দল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। তাদের সে মিলিত চীৎকারে মনে হল যে পাহাড়ে যেন একসঙ্গে কে পাথর ভাঙছে।

"কম্‌রেডগণ'---সভাপতি তাঁর মেয়েলি মুখে সেই লোমশ ... নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলেন' "কম্‌রেডগণ সামরিক ... কম্‌রেড রেজনিকভ এখন সভার পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি ... পাঠ করবেন।

রেজনিকভ পড়লেন।

"প্রস্তাবের স্বপক্ষে যারা আছ হাত তোল---সকলেই হাত তুললে, যেন সেখানেটায় এক নিঃশ্বাসে মাথা নলে এক শান বাগান রচিত হল।

'প্রস্তাবের বিপক্ষে?' কেউ না।

"ভোট দাও নি এমন কেউ আছ?

পিছনের দিক থেকে কে একজন হাত তুলল কিন্তু সে একা বলে তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে দিলে।

উপসংহারে সভাপতি বললেন, "সর্ব্ববাদী সম্মতি ক্রমে গৃহীত হল!"

সেদিন হোয়াইট হলের কনফারেন্সে আসতে য্যাস্ক্রোনিকভের বেশ দেরী হল।

অনুবাদক---

শ্রীনিরুপরঞ্জ।

শ্রেণী-সংগ্রাম

—:০:—

জমীদারী জুলুমের নূতন ধারা

—০—

সমাজের পরগাছা স্বরূপ জমীদারগণ চিরদিনই কৃষকগণের ওপরে নানাদিক থেকে নানাভাবে জুলুম করে থাকে। কিন্তু, ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার ১০৪ খানা গ্রামে তারা জুলুমের যে নূতন উপায় অবলম্বন করেছে সেটাকে বাস্তবিকই অদ্ভুত বলতে হবে। এই ১০৪ খানা গ্রাম সাবেক মধুপুর জঙ্গলের আবাদী জায়গা। এ সবের পরিমাণ ফল ১০৪ বর্গমাইল হবে, আর লোক সংখ্যা হবে এক লক্ষেরও ওপরে। আসল জুলুমের কথাটা বলার পূর্ব্বে এ সব গ্রামের আবাদের একটা অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করা খুবই আবশ্যক।

প্রাচীন সময়ে মধুপুরে মানুষের বসতি ছিল। বেশ বৰ্দ্ধিষ্ণুও যে মধুপুর ছিল তারও যথেষ্ট পরিচয় এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু, হঠাৎ এক সময়ে এখানে ধ্বংস তার করাল মূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়ে পড়ে। মহামারী, ম্যালেরিয়া কিংবা অপর কোনো সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা সমস্ত মধুপুর মানুষের বসতি শূন্য হয়ে যায়। ফলে, স্থানটা ক্রমে ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হয়ে পড়ে। গজারী নামক এক প্রকার নিকৃষ্ট শাল বৃক্ষ এই স্থানে বেশী সংখ্যায় জন্মায় ব'লে এ'কে গরগজারীও বলা হয়। "গর" শব্দের মানে বোধ হয় স্থানীয় ভাষায় জঙ্গল। এ জঙ্গলে ঢুকলেই মানুষ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ত। নানা প্রকার পশুতে, বিশেষ ক'রে হিংস্র পশুতে জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। কাজেই, জমীদারদের কোনো আয় এই জঙ্গল থেকে হত না।

বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষা-শেষিতে জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে মানুষের খুব ঘন বসতি হয়ে পড়েছিল। জমীদাররা সুযোগ বুঝে ইস্তেহার জারী করে সবাইকে আহ্বান করলে জঙ্গল আবাদ করার জন্যে। যে যতটুকু জায়গা আবাদ করতে পারবে তত টুকুরই মালিক সে হবে এবং বার্ষিক আট আনা মাত্র কর দিলে জঙ্গলের যে কোনো গাছ বা ঘাস কেটে ব্যবহার বা যেখানে ইচ্ছা স্থানান্তরিত করতে পারবে এরূপ ব্যবস্থাও করা হলো। ফলে, দলে দলে লোক এসে জঙ্গল আবাদ করলে, অবশ্য তার জন্যে তাদের জীবনের মূল্য দিতে হলো অনেক। এর পরে জরিপ জমাবন্দী হলো। নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যে সব প্রথা ছিল সে সব প্রথাও এখানে জারী করা হলো। স্থির হলো প্রজাদের কিছুতেই জমীদার তাড়াতে পারবে না। লোকেরা কেবল মাত্র প্রজা-স্বত্বের মালিক যে হলো তা নয়, ওখানকার প্রথা মত পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমীর জমীদারী স্বত্বও তারা পেয়ে গেল। জঙ্গল থেকে কোনো আয় ছিল না বলেই গরজে পড়ে জমীদারগণকে অনেক কিছু অধিকারই দিতে হয়েছে। কাজেই, কোথাও বা চার ভাগের তিন ভাগ, আর কোথাও বা পাঁচ ভাগের চার ভাগ জায়গা আবাদ করে লোকে চাষ-বাস করছে এবং তাতে বসতিও তারা স্থাপন করেছে।

সময়ের এখন অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। এখন প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করে যা পাওয়া যায় তার থেকে ঢের ঢের বেশী পাওয়া যায় জঙ্গলের বাহাদুরী কাষ্ঠ ও জীব-জন্তু বিক্রী করে। তাই, জমীদারগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করে অত্যাচারের এক নূতন উপায় আবিষ্কার করেছে। যে কৃষকগণ শত শত জীবনের বিনিময়ে জঙ্গলটাকে মানুষের বাস ও চাষের উপযোগী করে তুলেছে তাদেরই উচ্ছেদের জন্যে হচ্ছে জমীদার গণের এই উপায় অবলম্বন করা। বাংলার গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করে উপরিক্ত ১০৪ খানা গ্রামের কৃষকদিগকে জানিয়েছে যে এ গ্রাম গুলোর জঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত জঙ্গল ব'লে স্বীকৃত হলো। এরূপ করার অজুহাতও গবর্ণমেণ্ট জানিয়েছেন। সে হচ্ছে এই যে জমীদারগণের তিন ভাগের দু'ভাগ এ স্থান গুলোকে রক্ষিত জঙ্গলে পরিণত করার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন এবং এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁদের চুক্তি পত্রও হয়ে গেছে।

তার পরে গবর্ণমেণ্ট নোটিসের পর নোটিস জারী করে গেছে। প্রথমে বলা হয়েছে, ১০ প্রকারের গাছ কাটতে পারা যাবে না। তার পরের এক নোটিসে আগেকার নোটিসকে উল্টে দিয়ে হুকুম জারী হয়েছে যে ৬৩ প্রকারের গাছ কেউ স্পর্শও করতে পাবে না। শুধু তা' নয়। বন্য জীব-জন্তুও, তা সে সব হিংস্রই হোক, আর অহিংস্রই হোক, কেউ কখনো মারতে পাবে না। এ সমস্ত হুকুমের মানেই হচ্ছে কৃষকদিগকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব'লে দেওয়া যে তোমরা সব বাড়ী-ঘর-দোর চাষ-বাস ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। ৬৩ প্রকারের গাছ যখন কেউ কাটতে পাবে না তখন সমস্ত গ্রামই ক্রমশঃ জঙ্গলে পরিণত হয়ে যাবে। আর গ্রামগুলি যখন জঙ্গলে পরিণত হবে তখন আব-হাওয়াও খুব অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়বে। এ ছাড়া হিংস্র জন্তুতে জঙ্গল পরিপূর্ণ হয়ে যাবে ব'লে কাজে কাজেই মানুষের বসতি এ ১০৪ খানা গ্রামে আর কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

এ গ্রামগুলো এখন বন-বিভাগের কর্ম্মচারীতে ভরে গেছে। তারা নানা ভাবে কৃষকগণের জীবন বিষময় করে তুলেছে। পদে পদে কৃষকেরা তাদের হাতে বাধা পাচ্ছে। যে সকল গাছ কৃষকদের ক্ষেতের ওপরে ঝুঁকে পড়ে ফসল নষ্ট করে দেয় সে গাছের ডাল আদি কৃষকদিগকে কাটতে দেওয়া হয় না। এমন কি ক্ষেতের ও বাড়ীর আশে পাশের আগাছার ঝোপগুলি পর্য্যন্তও কৃষকদিগকে পরিষ্কার করতে দেওয়া হচ্ছে না। গো-মহিষাদি চরান ও গ্রামের রাস্তা দিয়ে কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়া আসা করা কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পদে পদে তাদের নির্য্যাতিত করা হচ্ছে। তা-দিগকে গেরেফতার ক'রে তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। ঘুষ আদায় করার কথাও কৃষকদের আরজিতে উল্লিখিত হয়েছে। পুলিস এবং ম্যাজিষ্ট্রেটও বন-বিভাগের সাহায্য করেছে। যে ম্যাজিষ্ট্রেট্ এক্সেকিউটিভ অফিসার হিসাবে মোকদ্দমা পরিচালনা করেছেন সেই ম্যাজিষ্ট্রেটই আবার কোর্টে বসে লোকেদের সাজা দিচ্ছেন। বন-বিভাগের অত্যাচারে এরূপ ভাবে অনেক কৃষক কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হয়েছিল। হাইকোর্টের বিচারে তাদের সকলেই মুক্তি লাভ করেছে। হাইকোর্টের জজেরা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে প্রজাদের গেরেফতার করার কোনো অধিকারই বন-বিভাগের নেই। প্রজাদিগকে গাছ কাটা ও অন্যান্য বিধি সঙ্গত কাজে বাধা দেওয়া কোনো মতেই বন-বিভাগের পক্ষে সঙ্গত নয়।

অত্যাচার কৃষকদের ওপরে এখনো সমান ভাবেই চলেছে। যেমন বরাবর করে থাকে ঠিক্ তেমনি গবর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারেও জমীদারদের সাহায্য করছে। কৃষকদিগের অধিকারের কথা এতটুকু ভেবে দেখাও গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন মনে করেনি। আটিয়া পরগণার এই ব্যাপার থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের অনেক কিছু শিখ্‌বার আছে। তারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধণের জন্যে বদ্ধপরিকর না হয় তা হলে তাদের দুর্গতি দিন দিনই বাড়তে থাকবে।

বোম্বে ধর্ম্মঘটের অবস্থা

বোম্বের বস্ত্র-কল সমূহের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। শ্রমিকরা খুবই দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মঘট চালাচ্ছে। কোনো প্রকার দুর্ব্বলতার লক্ষণ তাদের মধ্যে কখনো প্রকাশ পায় নি। পক্ষান্তরে কলের মালিকরা দিন দিনই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। বর্ষাকাল আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজেই মালিকেরা যন্ত্রপাতিগুলিকে আর অব্যবহারে বেশী দিন ফেলে রাখতে

পারবে না। রাখলে মরিচা ধরে যন্ত্রগুলি খারাব হয়ে যাবে। আহ্‌মদাবাদ ও শোলাপুরের কলওয়ালারা এ ধর্ম্মঘটের সুযোগে বোম্বের বাজার দখল করে নেবে, সে ভয়ও বোম্বের কলওয়ালাদের রয়েছে। তা ছাড়া মাল সরবরাহ করবার অনেকগুলি বড় বড় কণ্ট্রাক্ট তাদের আছে, অথচ ষ্টকে মাল মৌজুদ নেই। এই অবস্থা সমূহ শ্রমিকদের অনেকটা সাহায্য করছে। বোম্বে ধর্ম্মঘটের নেতৃগণ শ্রমিকদিগকে রিলিফ দেওয়া সম্বন্ধে হাওড়ার 'জটাধারী বাবা'র মত অবিবেচকের কাজ করেন নাই। এতকাল শ্রমিকরা নিজেদের পায়েই নিজেরা দাঁড়িয়েছিল। তাদের রিলিফ সবে এখনি দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। ধর্ম্মঘট কমিটির হাতে যা কিছু আছে তাতে আরো ৭।৮ সপ্তাহ খুবই তারা দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু, ততদিন কলওয়ালারা বসে থাকতে পারবে কিনা তাতে খুবই সন্দেহ আছে। দু'জন শ্রমিক কাজে যেতে চেয়েছিল বলে তাদের মুখে চুন কালি লেপে দেওয়া হয়েছিল, ও তাদের আটকে রাখা হয়েছিল, এই অপরাধে বোম্বের কৃষক ও শ্রমিকদলের এস, এ, ডাঙ্গে ধৃত হয়ে জামিনে মুক্ত আছেন। আদালতে সেই দু'জন শ্রমিক বলেছে যে ডাঙ্গের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাদের নেই। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার কথা তারা কখনো পুলিশকে বলেনি।

লিলুয়ার ধর্ম্মঘট

লিলুয়ার ধর্ম্মঘট তেমনি চলেছে। শ্রমিকরা কাজে যায় নি যদিও তার জন্যে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে অনেক চেষ্টা হচ্ছে। বর্ষা নেমে গেছে। কাজ না হলে মেসিনগুলিতে মরিচা ধরে যাবে। কাজেই, শ্রমিকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। তা ছাড়া ধর্ম্মঘট ক্রমশই অন্যত্র বিস্তৃত হচ্ছে। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল"এর সভ্যগণ ও শ্রীযুত রাধারমণ মিত্র এ জন্যে বিশেষ খাটছেন।

চেঙ্গাইল পাটের কল

চেঙ্গাইল লাডলো জুট্ মিলে আবারো ধর্ম্মঘট চলেছে। এবারে ৬০০ শত নারী শ্রমিক ধর্ম্মঘট করাতেই সমস্ত মিলের কাজ অচল হয়ে গেছে। মেয়েদের মাইনে বাড়িয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করে মিলওয়ালারা সে প্রতিজ্ঞা রাখে নি। এ কারণেই মেয়েরা ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ওপরে পুলিশ জুলুম হওয়া সত্বেও তারা এতটুকুও দমে নি। **পাটের কলের শ্রমিকদের সম্বন্ধে এর পরে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।**

কেশোরাম মিলের ধর্ম্মঘট

মাটিয়াবুরুজ কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করেছিল। আগে শ্রমিকরা ওজন হিসেবে মজুরী পাচ্ছিল, কিন্তু, সে জায়গায় কোম্পানী গজের হিসাব প্রবর্ত্তন করেন। শ্রমিকদের ক্ষতি হচ্ছিল বলে তারা আপত্তি করে কাজ ছেড়ে দেয়। ই, আই, রেলওয়েইউনিয়নের শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মিত্র ও "বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিকদল"এর সভ্যগণ ধর্ম্মঘট পরিচালনা করেন। ম্যানেজিং এজেণ্ট বিরলা ব্রাদার্স শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুর মধ্যবর্ত্তিতায় শ্রীযুত মিত্রকে ডেকে অনুরোধ করেন যে তিনি নূতন রেটে কা[illegible] করতে শ্রমিকদের যেন প্রবৃত্ত করেন। অবশ্য পুরাতন রেটের চেয়ে মজুরী যাতে কম না পড়ে সে ব্যবস্থা করবেন বলে, বিরলারা প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজে যাবার জন্যে শ্রীযুত বসু ও মিত্র শ্রমিকদের বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ করেন। কিন্তু, তারা কিছুতেই কাজে যেতে রাজি হয়নি। শ্রমিকরা বলে যে পূর্ব্বের রেট থেকে কম মজুরী দেবার ইচ্ছেই যদি কোম্পানীর না থাকে তা হলে তাদের সে রেটে মজুরী দেওয়া হচ্ছেনা কেন? এর পরে ভয় দেখিয়ে লোকেদের কাজে নেবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু, কিছুতেই তারা কৃতকার্য্য হয় নি। অবশেষে ৭ই জুন তারিখে শ্রমিকদের কয়েকজন প্রতিনিধি ও তাদের নবগঠিত ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীযুত মনীন্দ্র সিংহকে আফিসে ডেকে নিয়ে বিরলা ভ্রাতাগণ পুরাতন হারে মজুরী দিতে রাজী হন এবং অন্যান্য অভিযোগের প্রতিকারের প্রতিশ্রুতিও দেন। ২২শে মে তারিখে শ্রমিকরা প্রথম ধর্ম্মঘট করেছিল। মাটিয়াবুরুজের পুলিশ কোনো প্রকারে শ্রমিকদের উত্যক্ত করেনি। তবে কলিকাতা হতে আগত একটি সার্জ্জেণ্ট শ্রীযুত মনীন্দ্র সিংহকে পিকেটিংএর জন্য গেরেফতার করেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কৃষক ও শ্রমিক দল

ঢাকায় "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর একটি শাখা সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। আগামী বারে বিস্তৃত বিবরণ ছাপানো হবে।

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভ্য কমরেড আবদুল হালীম ১২ই জুন তারিখে বোম্বে গিয়েছেন। সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল গঠনের জন্যে যে প্রভিশন্যাল্ কমিটি গঠিত হয়েছে তার সভা এবং কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রথম ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে বোম্বের দলের সহিত আলোচনা করাই তাঁর বোম্বে যাওয়ার উদ্দেশ্য।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২।০ এবং যান্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেণ্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেণ্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখতে হবে।

এজেণ্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

Reg. No. C. 1440.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta.

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১শে জুন ১৯২৮, ৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫ | ২য় সংখ্যা

"ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান !
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

"শীতের শ্বাসের বিদ্রূপ করি ফুটে কুসুম
নব-বসন্ত-সূর্য্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরের হান মৃত্যুবাণ।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

"চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বদ্ধ মন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও ঊর্দ্ধে,
গাহরে গান
লাল নিশান ! লাল নিশান !"

সম্পাদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription Annual 6s.

লিলুয়া ধর্ম্মঘট

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ইউনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ কিরণচন্দ্র মিত্র ওরফে "জটাধারী বাবা"র বিরুদ্ধে অনেক কথা বলবার থাকলেও আমরা এতদিন কিছুই বলিনি। শুরু থেকেই তিনি যথেষ্ট যথেচ্ছচারিতা প্রদর্শন ক'রে আসছেন। এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হবে এবং তাতে হয়তো মজুরদের সংগ্রামের ক্ষতি হবে, এই ভয় থেকে আমরা সাধারণ ভাবে তাঁর অন্যায় ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু, এখন যখন মিঃ মিত্র আপন খামখেয়ালের বশে মজুরদের সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছেন তখন কোনো কথা না বললে নিতান্তই অন্যায় করা হবে। সেদিন তিনি ই, আই, রেলওয়ের এজেন্টের নিকটে যে সকল শর্ত্ত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তাতে তিনি এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের অপরিসীম ক্ষতি করেছেন। তিনি যে ভাবে আত্ম-সমর্পণ করতে গিয়েছিলেন তাতে যে কেবল মাত্র লিলুয়া ও হাওড়ার শ্রমিকগণের সর্ব্বনাশ হত তা নয়, এদেশের শ্রমিক আন্দোলনও সমগ্রভাবে প্রতিহত হয়ে যেত। এখন বর্ষা নেমেছে। এই বর্ষার দিনে খোলা দেশের ন্যায় ভিজা জায়গায় মেশিনগুলো না চাললে সমস্তকেই মরিচা ধরে যাবে। কাজেই ধর্ম্মঘটের বর্ত্তমান অবস্থাকে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক অবস্থা বলতে হবে। তা ছাড়া ধর্ম্মঘট ই, আই, রেলওয়ের অণ্ডাল ও আসানসোলেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অন্যান্য জায়গাতেও বিস্তৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আসানসোলের কারখানা আবার "লকো"র কারখানা। সকলেই জানেন "লকো"র কারখানা হচ্ছে রেলওয়ের প্রাণ। ইতোমধ্যেই মালগাড়ীর চলাচল বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়েছে। কাজেই এ সময়টা হচ্ছে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করার সময়। অথচ মিঃ মিত্র কিনা এমন সময়ে উপযাচক হয়ে এজেন্টের বাড়ীতে নিজের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করতে গেলেন।

মিথ্যা বলতে মিঃ মিত্রের এতটুকুও বাধে না। এই যে তিনি কথা-বার্ত্তা চালাতে গেলেন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে এ সব কথা তিনি নিজের সহকর্ম্মীদের নিকটেও গোপন রেখেছিলেন। তাঁদের বলেছিলেন যে এজেন্ট নিজেই কুমার অরুণচন্দ্র সিংহের মধ্যবর্ত্তিতায় কথা-বার্ত্তা চালাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছেন। এরূপ মিথ্যা বলার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি এখন বলেছেন যে তাঁর হাতে টাকা নেই। শ্রমিকরা সাহায্য চাইলে তিনি দিতে পারেন না। সেজন্যে তাঁর মনে দুর্ব্বলতা এসে গিয়েছিল। আমরা ভেবেই ঠিক করতে পারছিনে যে দুর্ব্বলতা নিয়ে তিনি একটা সংগ্রামের নেতা হতে আসেন কেন?

যেখানে সেখানে আর্থিক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া মিঃ মিত্রের একটা ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত হয়ে গেছে। কাশীপুর চিৎপুরে জুটপ্রেসের লোকদের যখন ধর্ম্মঘট হয়েছিল তখন তিনি একদিন সেখানে যেয়ে শ্রমিকদের অর্থ সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন। তার পরে ওপথে আর কখনো যাননি। হাওড়ায় মেথর ধর্ম্মঘটের সময় মেথরদিগকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি মেথর ইউনিয়নের কাজের অনেক অসুবিধা করে তুলেছিলেন। সেদিন মাটিয়া বুরুজে যখন কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘট হয়েছিল তখনো মিঃ মিত্র প্রথমে খুব গরম গরম বক্তৃতা দেন এবং বলেন যে তিনি ধর্ম্মঘট চালাবার জন্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করবেন। এরপরে মিঃ বিড়লার সহিত দেখা করে হঠাৎ তাঁর মত বদলে যায়। তখন তিনি মিঃ বিড়লার প্রদত্ত শর্ত্তেই শ্রমিকদিগকে কাজে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন, কিন্তু, তাঁর কথায় শ্রমিকরা কান দেয়নি। মোটকথা শ্রমিক মহলে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে যে মিঃ মিত্রের নিকটে অপরিমিত অর্থ রয়েছে। তা ছাড়া, তিনি শ্রমিকদের ধর্ম্মভাবের সুযোগও যথেষ্ট নিচ্ছেন। তাঁর সন্ন্যাসী নাম হচ্ছে "জটাধারী বাবা", কয়েক মাস পূর্ব্বেও তাঁর মাথায় জটা ছিল। কাজেই তাঁর অতি-প্রাকৃত ক্ষমতাতেও শ্রমিকদের কিছু কিছু বিশ্বাস আছে। "জটাধারী বাবা"র জয় জয়কার মানেই হচ্ছে তাই।

মিঃ মিত্রের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আমরা এ সব কথা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হলেম। প্রত্যেক শ্রমিক-বন্ধুরই উচিত আন্দোলনের মঙ্গলের জন্যে শ্রমিকদের ওপর থেকে "জটাধারী বাবা"র প্রভাব কমানো। শ্রমিক আন্দোলনে কিরণচন্দ্র মিত্রের স্থান হতে পারে। কিন্তু কোনো "জটাধারী বাবা"র স্থান তাতে হওয়া উচিত নয়।

মিঃ মিত্রের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও লিলুয়ার শ্রমিকগণ তাদের নিজেদের ও শ্রমিক আন্দোলনের মুখ রক্ষা করেছে। তারা কাজে যেতে রাজি হয় নি। শুধু তা'ও নয়, কোনো প্রকার আর্থিক সাহায্য না নিয়েও তারা আরো অন্ততঃ একমাস ধর্ম্মঘট চালাতে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

—০—

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেন্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেন্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখতে হবে।

এজেন্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

—চণ্ডীদাস—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২১শে জুন, ১৯২৮, ৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

"অমৃত বাজার"এর বিরলা-প্রীতি

বিরলা ব্রাদার্স লিমিটেডের দ্বারা পরিচালিত মাটিয়া বুরুজের "কেশোরাম কটন মিল"এর শ্রমিকেরা যখন ধর্ম্মঘট করেছিল তখন আমাদের ইংরেজী সহযোগী "অমৃত বাজার পত্রিকা" একেবারেই চুপ-চাপ ছিলেন। "ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়া"র মারফতে পাঠানো ধর্ম্মঘটের কোনো রিপোর্টই সহযোগী কোনো দিন প্রকাশ করেন নি। কিন্তু, ধর্ম্মঘট মিটে যেতে না যেতেই "অমৃত বাজার পত্রিকা" বিরলার প্রসংসায় মুখর হয়ে উঠেছে। ২৩শে মে থেকে শুরু করে ২ই জুন পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চলেছিল। "পত্রিকা"র সম্পাদকগণের মধ্যে বাংলা দেশের দু'জন শ্রমিক নেতা থাকা সত্ত্বেও এ সময়ের মধ্যে 'পত্রিকা'র কোনো রিপোর্টার মাটিয়া বুরুজের রাস্তা ভুলেও কোনো দিন মাড়িয়ে আসেন নি। অথচ ধর্ম্মঘট মিটে যাবার পরে 'পত্রিকা'য় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে যে ধনিক হলেও বিরলারা দয়ার অবতার। শ্রমিকদের একটা ডেপুটেশন মিঃ জি, ডি, বিরলার নিকটে যেতেই সদয়চিত্তে তিনি পুরাতন প্রথামত মজুরী দেওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য মজুরী দেওয়ার নূতন প্রথার প্রবর্ত্তনই ছিল শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘটের কারণ। কেননা, নূতন প্রথায় মজুরী নিয়ে শ্রমিকদের যথেষ্টই ক্ষতি হচ্ছিল। বিরলারা যতই দয়ার্দ্র ও দাতা হোন্ না কেন তাঁদের পরিচালিত কারখানায় শ্রমিকদের ওপরে জুলুম যথেষ্টই হয়ে থাকে। তাঁদের হয়ে মেটাতে যেয়ে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুও স্বকর্ণে এসব অত্যাচারের কথা কিছু কিছু শুনে এসেছেন। যাতে কোনোদিন ধর্ম্মঘট না হতে পারে তার জন্যে চোখা চোখা লোকগুলোর কাছ থেকে বে-আইনি দলিল সই করিয়ে নেওয়া ও টাকা জমা নেওয়া কেবলমাত্র বিরলাদের চালিত কলেই হয়েছিল। ধর্ম্মঘট ভেঙে দেবার চেষ্টার কোন ত্রুটীই তাঁরা করেন নি। শ্রমিকরা ভাড়া দিয়ে যে সব ঘরে থাকে সে সব ঘর থেকে বা'র করে দেবার নোটিসও তাঁরা জারী করেছিলেন। শ্রমিকদিগের প্রার্থনা মতে পুলিশের আগমন না হলে এই ব্যাপার নিয়েই মাটিয়াবুরুজে সেদিন রক্তের নদী বয়ে যেত। কল-ওয়ালাদের ইঙ্গিতেই ইউনিয়নের সেক্রেটরী শ্রীযুত মনীন্দ্র সিংহকে ইউরোপিয়ান পুলিশ সার্জেণ্ট গেরেফতার করেছিল। মোট কথা, বিচারশীল বিরলারা ধর্ম্মঘট মেটান নি, অপারগ বিরলারাই মিটিয়েছেন। আর কেউ জানুন আর নাই জানুন, "অমৃত বাজার পত্রিকা"র শ্রমিক নেতাদের অন্ততঃ জানা উচিত ছিল যে শ্রমিকদিগের দাবী দাওয়ার প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ করার জন্যে যে কারখানায় বে-আইনি বণ্ড সই করিয়ে নেওয়া হতে পারে সে কারখানার পরিচালকদের নিকটে শ্রমিকদের ডেপুটেশন গেলে কোনো বিরোধ কখনো মেটেনা। আলীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যবর্ত্তিতায় ইউনিয়নের সেক্রেটরী ও কয়েকজন শ্রমিককে ডেকে গাড়ী ভাড়া দিয়ে বিরলাদের আফিসে নিয়ে যাওয়ার মানে যে ডেপুটেশন পাঠান নয় এ জ্ঞানটুকু আমাদের প্রাচীন সহযোগীর থাকা খুবই উচিত ছিল। বিরলাদের বিচারশীলতার আরো একটুকু আভাস সহযোগী জেনে রাখুন। ধর্ম্মঘট করার খাতিরে কোনো লোকের চাকুরী যাবে না এ প্রতিশ্রুতি যদিও স্বয়ং মিঃ জি, ডি, বিরলা দিয়েছিলেন তথাপি চণ্ডী সর্দ্দার নামক একটি লোকের চাকুরী ইতোমধ্যেই গিয়েছে। বিচারশীলতার চরম নয় কি?

মেথর ও ঝাড়ুদার

যে সকল শর্ত্তের ওপরে নির্ভর করে মেথর ও ঝাড়ুদার প্রভৃতির ইউনিয়ন (দি স্কাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল)

বিগত ৯ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার মেথর ও ঝাড়ুদার প্রভৃতির ধর্ম্মঘট তুলে নিয়েছিল তার কোনোটিই পূর্ণ হয় নি। যদিও চিফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের সহিত পরামর্শ করেই ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত এ সকল শর্ত্তে সই করেছিলেন তথাপি চিফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারই স্বয়ং এ সব শর্ত্ত পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মিঃ সেন গুপ্ত নিজেও এ সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চ বাচ্য করছেন না। কর্পোরেশনের মেয়র তিনি আর হন নি বটে, কিন্তু, তা ব'লে কর্পোরেশনের সহিত তাঁর সম্বন্ধ কিছুতেই চু'কে যায় নি। অলডারম্যান তিনি আজো রয়েছেন। কাজেই তাঁর প্রতিজ্ঞার দায়িত্ব থেকে তিনি কিছুতেই অব্যাহতি পান নি। কর্পোরেশনের তরফ থেকে নানা ভাবে চেষ্টা হচ্ছে যাতে স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়নটি ভেঙে যায়। কারণ, তা হ'লে তাঁরা ১২০০০ মেথর ও ঝাড়ুদার প্রভৃতিকে নির্ব্বিঘ্নে শোষণ করতে পারবেন। কিন্তু, এই চেষ্টাকারীর দল একটা সোজা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে ইউনিয়নের শক্তিই হচ্ছে বারো হাজার লোকের অনন্ত ক্ষুধা। যতই তাঁরা চেষ্টা আর অর্থ ব্যয় করুন না কেন স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন বেঁচেই থাকবে এবং ক্ষুধা'র জোরেই থাকবে। কেবলমাত্র কলিকাতা শহরের অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই আজো পর্য্যন্ত পুনরায় ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হয় নি। কিন্তু, অধিবাসীরা যখন এর কোনো প্রতিকারের চেষ্টা কিছুতেই করলেন না তখন ইউনিয়নকে বাধ্য হয়েই আবার ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতে হবে। এবারে ধর্ম্মঘট হ'লে মেথর ও ঝাড়ুদাররা দু'টাকা মাইনে বাড়ানোতে আর কিছুতেই রাজী হবে না, তারা আরো বেশীর দাবী করবে। কলিকাতার নাগরিকগণ একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দেখবেন যে লোক গুলো আর কাজে যায় নি।

হাওড়ায় ধর্ম্মঘট

সাড়ে তিন মাস হ'তে চললো লিলুয়া কারখানার ব্যাপার তেমনি অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। শ্রমিকদের অভিযোগের কোনো প্রতিকার হয় নি ব'লে কারখানার দুয়ার খুলে দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাতে প্রবেশ করে নি। বার্ণ আর জেসোপের কারখানার ধর্ম্মঘটও ঠিক আগেরই মত চলছে। শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামশীলতার এতটুকুও কসুর নেই। বাহাদুর সিপাহীর মত দুঃখকষ্ট সয়েও তারা আজো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রমিকদের যারা নিযুক্ত ক'রে থাকে তারা অপারগ না হয়ে পড়লে কখনো কোনো শর্ত্তে রাজী হয় না। প্রথমে ক্ষতি স্বীকার করাই তাদের অভ্যাস। ই, আই, রেলওয়ের ব্যাপারেও ঠিক তাই হচ্ছে। আরো কয়েকটি কারখানা আছে বলেই কর্ত্তৃপক্ষ আজো মাথা নোয়াতে চাইছে না। বি, এন, আর এবং ই, আই, আর'এর ব্যাপার ঠিক এক নয়। খড়্গপুরের মত বড় কারখানা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের আর নেই। কাজেই, সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ খড়্গপুরেতেই কাবু হয়ে পড়ে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বড় কারখানা কয়েকটিই রয়েছে। সে জন্যে গোড়া থেকেই উচিত ছিল ষ্ট্রাইক্ রেলওয়ে লাইনের সর্ব্বত্র না হ'লেও অপর কারখানাগুলিতে অন্ততঃ বিস্তৃত করার চেষ্টা করা। কিন্তু, সেদিকে শ্রমিকদের নেতা শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মিত্র এতটুকুও খেয়াল করেন নি। যে ব্যাপারটাতে সব চেয়ে বেশী শক্তি ব্যয় করা উচিত ছিল সেটার প্রতিই তিনি অত্যন্ত বেশী ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। অণ্ডাল আর আসানসোলে ধর্ম্মঘটের বিকৃতি বিশেষ ক'রে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সভাগণ এবং চেঙ্গাইল জুট ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের কমরেড রাধারমণ মিত্রের প্রচেষ্টাতেই হয়েছে। খুবই আশা করতে পারা যায় যে এতে রেলওয়ে শাসনের মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে। তাছাড়া বর্ষা যখন নেমে পড়েছে তখন মেশিন না চালালে তাদের যা দুরবস্থা হবে মজুর ভাইগণ ভালোরূপেই তা জানে। এ অবস্থায় আরো কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলে তাদের জয় হবেই হবে।

সংগ্রামশীলা নারী শ্রমিক

চেঙ্গাইল লাডলো চটকলের ৬০০ মেয়ে মজুর ধর্ম্মঘট ক'রে কাজ বন্ধ ক'রে দিতেই অত বড় লাডলো মিলটা বেকার হয়ে গেছে। মেয়েদের মাইনে বাড়াবার কথা দিয়ে কলওয়ালারা সে কথা রাখে নি। তার জওয়াবে মেয়েরাও তাদের শক্তি কলওয়ালাদের দেখিয়ে দিয়েছে। পুলিশের হাতে মার খেয়ে ও জখম হয়েও তারা এতটুকু দমে যায় নি। এই যুদ্ধ লিপ্ত নারী শ্রমিকগণ শুধু যে ভারতের নারীদের গৌরব তা নয়, তারা নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আমাদের সকলেরই গৌরব। নারী শ্রমিকগণ তাদের এ সংগ্রামে জয়যুক্তা হোক!

নব স্রষ্টা

আবদুল কাদের

বন্দী ধরার আর্ত্ত হাহাকারে—
একলা আসি' দাঁড়ালো সে সমর-সিন্ধু পারে।
নতুন উষার আসার লাগি'
রইলো সে যে নিশীথ জাগি',
আপন বুকের রক্তে আকাশ
রাঙ্‌লো বারে বারে।
বন্দী ধরার আর্ত্ত হাহাকারে॥

অনাগত আস্‌বে যারা—
ভাঙ্‌তে তাদের পথের কারা
গেলো সে হৃদ-অগ্নি জ্বালি,
অগ্রে অন্ধকারে।
বন্দী ধরার আর্ত্ত হাহাকারে॥

নবীন ভুবন গড়্‌বে বলি'
দিলো নিজের জীবন বলি'
চাইলো নব সৃষ্টি সে যে
আকুল অশ্রুধারে।
বন্দী ধরার আর্ত্ত হাহাকারে॥

কৃষক শ্রমিকের স্থান

কৃষক আর শ্রমিকেরা জানে না যে সমাজে তাদের স্থান কোথায়। তারা যদি তা ভালো করে বুঝতে পারত তা-হলে আমদের দেশে সমাজের এখনকার যে গঠন আছে তা অনেক দিন পূর্ব্বেই বদলে অন্য রকম হয়ে যেত। আমাদের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হচ্ছে চাষী আর মজুর ভাইগণকে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দেওয়া। খাওয়া আর ব্যবহারের সব জিনিসই চাষী আর মজুর ভাইগণ উৎপন্ন ক'রে থাকে। ক্ষেতের কথা যদি ধারা যায় তা-হলে ধান, ডাল, গম, যব আন্যান্য শস্য ও পাট ইত্যাদি সবই কৃষক ভাইগণই পয়দা করে। তার পরে, মানুষের ব্যবহারের আর সব জিনিস, যেমন কাপড়, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, কারখানায় তৈয়ার হয় মজুর ভাইগণের দ্বারা। এই যে জাহাজ, রেলগাড়ী চলাচল করছে এসবও মজুরগণের দ্বারাই তৈয়ার হয়েছে এবং মজুর ভাইদের মেহনতের দ্বারাই এ সবের চলাচলও সম্ভব হচ্ছে। বড় বড় কোঠা বালাখানা মজুরেরাই গড়ে তুলেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজের নিয়মানুসারে মজুরগণ এসব কিছুরই মালিক হয় না। উৎপাদনের উপায় গুলির ওপরে মজুরগণের কোনো হাত নেই। কারখানায় জিনিসাদি কেবল তারা তৈয়ারই করে থাকে, কিন্তু কারখানার পরিচালনার ওপরে কোনো কথাই তারা কইতে পারে না। ধনিকগণ তা-দিগকে বোঝা-টানা জানওয়ার ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। কৃষকদিগের অবস্থাও ঠিক তাই। জমীদার, জমীদারের কর্ম্মচারী মহাজন, উকীল, মোক্তার, মোল্লা পুরোহিতাদি সকলেই তাদের রক্ত শোষণ করে থাকে। কৃষককে যদি আমরা গাছ ব'লে ধরে নি-ই তা-হলে এসব শ্রেণীর লোক দিগকে পরগাছা বলেই মেনে নিতে হবে। সমাজের আগাছা স্বরূপ এই জীব গুলো প্রতি বৎসরই হাজার হাজার কৃষককে ভূমিহীন ও গৃহহীন ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে। নিছক শোষণেরই ফলে কি মজুর, কি চাষী, কারো দুর্গতির সীমা নেই।

কৃষক আর শ্রমিকগণ জানে না তাদের ভিতরে কত শক্তি লুক্কায়িত রয়েছে; "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" তা-দিগকে তাদের শক্তি সম্বন্ধে শুধু যে সন্ধান দেবে তা নয়, তাদের মিলিত শক্তির জোরে তারা যাতে তাদের দাবী-দাওয়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে পারে সে উপায়ও দেখিয়ে দেবে। চাষী আর মজুরকে যারা চাষী-মজুর নয় তারা 'ছোটলোক' ব'লে ঘৃণা ক'রে থাকে। চারদিক থেকে তাদের এমন ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 'ছোট লোক' কিছুতেই অভিজাত ও ভদ্র শ্রেণীর সমান নয়। এসব শুনে শুনে কৃষক ও শ্রমিকগণের মনেও বিশ্বাস জন্মে গেছে যে হয় তো তারা সত্য সত্যই" "ছোট লোক"। কিন্তু, আমরা একথা বুঝিয়ে দিতে চাই যে "ছোট লোক" ত তারা নয়ই, তবে কেউ যদি প্রকৃত "ছোট লোক" থেকে থাকে সে, হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা চাষী-মজুরকে "ছোট লোক" অখ্যায় আখ্যাত করে।

সব কিছুর উৎপন্নকারী হিসাবে কৃষক ও শ্রমিকগণই সমাজে বিশেষ স্থান লাভ করার অধিকারী। সে অধিকায় বুঝে নেবার জন্যে তা-দিগকে আজ উঠে পড়ে লাগ্‌তে হবে। তারা চিরকালই অভাবের তাড়নার ভিতর দিয়ে জীবন যাপন করছে। এখন হতে ভালো খাওয়া, ভালো পরা ও ভালো ঘরে বাস করার জন্যে তা-দিগকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে হবে। মানুষের জীবন নিয়ে তারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। কাজেই মানুষেরই মত তা-দিগকে জীবন যাপন করতে হবে। কৃষক ও শ্রমিকগণকে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের শোষকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। দল বেঁধে কোনো কাজ না করলে এই শোষণ আর অত্যাচারের দিনে তারা কিছুতেই পৃথিবীতে টিকে থাক্‌তে পারবে না। যারা কৃষক ও শ্রমিকগণের মেহনত লুটে লুটে পেট মোটা করছে তাদের কাছ থেকে মেহনতের ধন উসুল করে নিতেই হবে। এ জন্যেই স্থানে স্থানে কৃষক ও শ্রমিকগণকে সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে। এক জোট বেঁধে কাজ করলেই তারা তাদের দাবী দাওয়া সবই বুঝে পাবে। পৃথিবীতে শরীর খাটিয়ে ও মাথা খাটিয়ে পরিশ্রম যারা করে তারাই কেবল মাত্র রুটি ও ভাতের মালিক হতে পারে, আর ভূমির মালিক হতে পারে একমাত্র কৃষক।

ধর্ম্মঘট

—:*:—

আবদুল হালীম

অত্যাচারের কঠোর নিষ্পেষণে আজ শ্রমিকজগতে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চারিদিকে শ্রমিক-বিপ্লব অগ্নি বিস্তর মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ধনীর সঙ্গে লড়াইয়ের মাত্র একটি অস্ত্র বিদ্যমান শ্রমিকদের রয়েছে, আর তা হচ্ছে 'ধর্ম্মঘট'। নিরস্ত্র যুদ্ধে ধর্ম্মঘট চালিয়ে, শ্রমিকদের, ধনিক, বণিক, কারখানার মালিক, কলের মনিব প্রভৃতির নিকট হতে পূরাপূরি দাবী আদায় করতে হবে। কারখানার মালিক কে হবে তার মীমাংসা ও বিচার ভার দেশের জনগণের জন্য যে "দল" বিপ্লব-মূলক কার্য্য-তালিকা হাতে নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়েছে তার হাতে আপাততঃ ছেড়ে দিতে হবে। সেই দলই শ্রমিকদের তাদের সম্পূর্ণ নীতির উপর যুদ্ধ করতে শিক্ষা দিবে। ধনিক বণিক সর্ব্বদা নজর রাখে কিসে তার বেশী লাভ হবে। তা ছাড়া তার নজর রয়েছে, নূতন নূতন কলকব্জা আমদানী করার দিকে। ধনিকের পুঁজি আসে কোথা থেকে? শ্রমিকদের শোষণ করে তার যে অর্থ লাভ দাঁড়ায় তাকে পুঁজি করেই, ধনিক তার কারখানার অঙ্গস্বরূপ কলকব্জার প্রসারতা বাড়িয়ে থাকে। ধনীর তীব্র শোষণ-লিপ্সা তাকে দিন দিন নূতন নূতন প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করছে যে কিরূপে সে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। তাই অতি সামান্য কারণে ধনিক মজুরদের উপর খড়্গহস্ত উত্তোলন করে থাকে। শ্রমিকদের তাদের দাবী আদায় করার জন্য ধর্ম্মঘট যুদ্ধ চালাতে হবে। এ যুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠনের ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। শ্রমিকদের সমস্বার্থতার উপরই ইহার সাফল্য বেশীর ভাগ নির্ভর করে। তা ছাড়া, আজকাল সামান্য কিছু গোলমালের সৃষ্টি হইলেই কারখানাওয়ালারা "লক্ আউট" (বহিষ্করণ) ঘোষণা করে দিয়ে সমস্ত শ্রমিদের শক্তিহীন করতে চেষ্টা করে। কারণ, লাভের টাকা খেয়ে খেয়ে

তাদের হাতে প্রচুর অর্থ জমে গিয়েছে। কাজেই সহজে শ্রমিকদের দাবীর উপর তারা তত দৃষ্টি প্রদান করে না। বর্ত্তমানে, শ্রমিকদের লক্ষ্য হবে—মালিকদের এই খামখেয়ালের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করা। বিপ্লবাত্মক নীতির উপর সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করে তবে সংগ্রামে অগ্রসর হতে হবে। শুধু ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে দিলেই কিছু কাজ ফুরিয়ে যায় না, কেমন করে ধর্ম্মঘট চালাতে হবে সেটা জানা এবং অবস্থা দৃষ্টে স্থির করা দরকার। তা না হলে সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভবপর হবে না। আমাদের চোখের সামনের ঘটনা গুলো সে সম্বন্ধে আমাদের বেশ ভালো করেই জানিয়ে দিচ্ছে। ধর্ম্মঘটের আসল ভিত্তি, মূলনীতি ও উদ্দেশ্য এবং বৈজ্ঞানিক কার্য্য প্রণালীর ধারাগুলি শ্রমিকগণের কাছে লুক্কায়িত রাখলে চলবে না। পুরা দস্তর লড়াই ব্যতীত যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। আজ কাল কোথাও কোথাও ধর্ম্মঘট করতে যেয়ে গান্ধী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। হাওড়ার সত্যাগ্রহ তার প্রমাণ। এরূপ নীতি খুবই মারাত্মক। অসহায় মনে করে, পুলিশ, সরকারের বন্দুক ধারী ফৌজ, প্রভৃতি 'শান্তিরক্ষী' দানবগুলো, কাজে অকাজে, নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়' দাঙা বাজী করে, সঙ্গীনের খোঁচায় শ্রমিকদের দেহ ক্ষত বিক্ষত করে তুলে। যেখানে কোনো ধর্ম্মঘট হলো, অমনি কলওলার স্বার্থ রক্ষার্থে পুলিশ ছুটলো। সম্প্রতি আবার সি-আই-ডি গুলো ষ্ট্রাইক হবার আগে আগেই ছুটতে থাকে। এতদিন সি-আই-ডির কাজ ছিলো, কোথায় বোমা, রিভলবার বন্দুক, এক্সপ্লসিভ প্রভৃতি রয়েছে তার সন্ধান করা। এক্ষণে তাদের কাজ হয়েছে 'পোষ্ট আফিসের' চিঠি খোলা, আর যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সংসৃষ্ট রয়েছে তাদের পশ্চাদধাবন করা, শ্রমিক সভার নোট নেওয়া। হাওড়া থেকে শুরু করে আসানসোল পর্য্যন্ত তারা ছুটোছুটি লাগিয়েছে। পুলিশ যে ধনীর স্বার্থ রক্ষার্থ নিরস্ত্র দরিদ্র শ্রমিকদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করতে পারে, তার দৃষ্টান্তের অভাব বাংলা দেশে অথচ ভারতবর্ষে হবে না। বামুনগাছি আর হাওড়ার কথা সকলেই জানেন। চেঙ্গাইলেও জুলুম শুরু হয়েছে, তাও নারী শ্রমিকদের উপরে। তাঁতী, চাষী, ধাঙ্গড়, মেথর ও অন্যান্য যাবতীয় কল কারখানার শ্রমিক যখন একটু একটু করে মাথা তুলে উঠছে তখন সর্ব্ব প্রথমে তাঁদের কর্ত্তব্য হবে তাদেরও এক সুসংবদ্ধ 'বাহিনী' গঠন করা। তার উদ্দেশ্য হবে অত্যাচারীর জুলুম হতে নিজেদের আত্মরক্ষা করা। ধর্ম্মঘট আরম্ভ হলেই মালিকগণ পুলিশের সাহায্য চেয়ে পাঠায়। তার পর একে একে তাদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হলেই—শ্রমিকদের উপর 'নোটিশ'জারী করে, "মকান ছোড়কে' যাও'। কিছু দিন থেকে ধর্ম্মঘট ভেঙে দিবার জন্যে মালিকেরা এই সব অন্যায় ও গর্হিত নীতির আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেছে। তারা মনে করেছে এই ফন্দীর দ্বারা তারা শ্রমিকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সমর্থ হবে।

আজ শ্রমিকদের সম্মুখে মহা সমস্যা, তারা কোন্ পথে চলবে? দুর্ব্বলচেতা, ভীরু ব্যক্তির নেতৃত্বের হাত হতে তাদের অব্যাহতি পেতে হবে। একমাত্র সংগ্রাম শীল মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধ না করলে তাদের মুক্তি সুদূর পরাহত। তাই চাই উন্নত, সুসংবদ্ধ, সংঘের সংগঠন!

কোন্ পথে

—:•:—

"স্বাধীনতা আমরা একান্তই চাই, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই আমাদের জীবনের একমাত্র কামনা" এই কথাটা আমরা বারে বারেই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শুনে আসছি। কোন্ পথে আমরা স্বাধীনতা লাভ করব আর আমাদের গণতন্ত্রের স্বরূপই বা কি হবে সে সম্বন্ধে কোনো কথা কিন্তু তাঁদের বড় একটা বল্‌তে প্রায়ই শোনা যায় না। আমাদের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় সে সব বিষয়ের চিন্তার ভার তাঁদের নেতৃগণের হাতে ছেড়ে দিয়ে দিব্য আরামে আছেন, যেন স্বাধীন চিন্তা তাঁদের একেবারেই করতে নেই। যখনি যে ধুয়ো উঠে সে ধুয়ো ধরেই তরুণরা সব হৈ হৈ ক'রে উঠেন, কিন্তু, এটা তাঁরা কিছুতেই পরখ করে দেখ্‌তে চান না যে, যে ধুয়োটা উঠ্‌লো সেটার বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি আছে আর যাঁরা ধুয়োটা তুল্লেন তাতে তাঁদের ঐকান্তিকতাই বা কতটুকু রয়েছে।

গণতন্ত্র ত আমরা সত্যই চাই। কিন্তু, প্রকৃত গণতন্ত্রের উপযুক্ত ক'রে আমাদের তরুণ শিক্ষিত বন্ধুগণ তাঁদের মনোবৃত্তি গুলিকে কতটা গঠন ক'রে নিতে পেরেছেন, সেটাই ভাববার বিষয়। "গণ" বল্‌তে ত জমীদার, ধনিক কিংবা 'ভদ্রলোক'দের বোঝায় না,—"গণ" ত হচ্ছে চাষী, মজুর ও দরিদ্র সর্ব্বহারার দল। তাদেরি তন্ত্রের যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা হ'লে তার জন্য শিক্ষিত তরুণের দল কতটা প্রস্তুত হ'তে পেরেছেন? সত্যকারের গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, অভিজাত ও ভদ্র মানসিকতা। এই প্রকারের মানসিকতা পরিবর্জ্জিত (De-Classed) মনোবৃত্তি আমাদের তরুণ শিক্ষিত ভাইদের ক' জনাতে অবলম্বন করতে পেরেছেন? যদি না পেরে থাকেন তা-হলে তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের কারা যন্ত্রনা ভোগ কর। তাঁদের ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলার কিছুই ত সার্থকতা থাকে না, অবশ্য সে সব যদি তাঁরা গণতন্ত্রের নামেই ক'রে থাকেন।

বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম-পদ্ধতি ও বিশিষ্ট নীতি তাঁরা অবলম্বন করেছেন কি? দেশ তার কোনো পরিচয় আজো পায় নি। যখনি যে সুর উঠ্‌ল সে সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেওয়াই যেন তাঁদের একমাত্র নীতি হয়ে পড়েছে। তা না হ'লে যে যুবকগণ ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখ্‌তে চান, সেই যুবকগণই আবার রঞ্জিৎ পাল চৌধুরীর কাউন্সিল নির্ব্বাচনের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে গেলেন কোন্ নীতি থেকে? কৃষকগণের বুকের রক্ত শোষণকারী, চা-বাগানের শ্রমিকগণের নিগ্রাহক পাল চৌধুরীকে কংগ্রেস মনোনয়ন করতে পারে বটে, কিন্তু গণতন্ত্রকামী যুবকগণ তাতে সাহায্য করতে যান কোন্ মুখে? শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মহারাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রচার করার পরেও বাংলায় এসে ধনিক ও জমীদার পাল-চৌধুরীর নির্ব্বাচনের সাহায্য করতে পারেন, কেননা, তিনি "বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি"র সভাপতি। কংগ্রেসের নেতৃগণের শতকরা পৌনে একশ জন মুখে যা বলে থাকেন মনে তা যে কখনো মানেন না, এ কথা কে না জানে? মাদ্রাজ কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব

ও সর্ব্বদল সম্মিলনের কার্য্যাবলী মিলিয়ে দেখলেই একথার সত্যতা হাতে হাতে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

সকল কাজেই অগ্রসর হবার বিপ্লব মূলক ও সংস্কার মূলক দু'টো পন্থা রয়েছে। কংগ্রেস চলেছে সংস্কার মূলক পন্থায়। সংস্কারবাদীরা সাধারণত অভিজাত ও ধনিক সম্প্রদায়ের লোক কিংবা তাদের হিতকামী লোকই হয়ে থাকে। কাজে কাজেই তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লব বিরোধীই হতে হয়। কিন্তু, গণের পন্থা সংস্কার মূলক পন্থা কখনো হতে পারে না,—গণকে অগ্রসর হতে হয় বিপ্লব মূলক পথে। সমাজে যে শ্রেণী-সংগ্রাম বিদ্যমান রয়েছে, এ হচ্ছে বিপ্লব মূলক সংগ্রাম, অর্থাৎ যে শ্রেণী শোষণের দ্বারা ভোগ বিলাসে জীবন যাপন ক'রে থাকে সেই শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে গণের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের দ্বারা শোষক শ্রেণীকে হীনবল ও বিধ্বস্ত করতে পারলেই তবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হবে, নতুবা নয়।

একজন সংস্কারবাদী যদি কংগ্রেসের সদস্য হয় তা হলে তাকে কংগ্রেসের সব কিছু মেনেই চলতে হবে। আর যদি একজন গণতন্ত্রবাদী কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন তা হলে তাঁকেও যে কংগ্রেসের সংস্কার মূলক পথে অগ্রসর হতে হবে তার কোনো মানে নেই। সংস্কারবাদীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনিক ও জমীদার প্রভৃতির ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করা, আর গণতন্ত্রকামীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ক্ষমতাকে ভেঙে তার জায়গায় গণের তন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কাজেই কংগ্রেসের ভিতরেও সংস্কারবাদী আর গণতন্ত্রবাদীর একনীতি কিছুতেই হতে পারে না।

জনগণের নেতা

(এ, ভি, লুনাচার্স্কি)

অনুবাদক—আবদুল কাদের

পৃথিবীর বৃহত্তম বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব সমাগত। এই উৎসব ব্লাডিমীর লেনিনের নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সুনিবিড় বন্ধনে বদ্ধ। পৃথিবীর আর কোনো বিপ্লবই এমন একজন বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যশীল নায়কের জন্মদান করিতে সক্ষম হয় নাই। ক্রমওয়েল একজন মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একটা দেশের একটা সামান্য অর্থগৃধ্নু বুর্জ্জোয়াজি সম্প্রদায়ের বীর্য্যবান আত্ম-প্রত্যয়ী নেতা। ওয়াশিংটন একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি, তিনি তদীয় যুগে স্বাধীনতার একটা নূতন ধারার প্রবর্ত্তনা করেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল ইংলণ্ডের কবল হইতে আন্তর্জ্জাতিক ধরণের স্বাধীনতা লাভের জন্য কঠোর সংগ্রামের ধারায়। স্বাধীনতার একটা নূতন জগৎ জোড়া ভীষণ আন্দোলন সত্ত্বেও ফরাসী বিপ্লব তার অন্তর্গত উৎকৃষ্ট নীতি সমূহের পরাজয়েই পর্য্যবসিত হইয়াছিল—সে সকল নীতি অতীতের উজ্জ্বল সংস্কারই রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সক্ষম হয় নাই। উক্ত বিপ্লবের চরিত্রবান বিচক্ষন পাণ্ডাগণ তখনকার ঐতিহাসিক আকাশে এক একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতন প্রতিভাত হইতেন, কিন্তু তাঁহারা মাত্র একটা ভবিষ্যৎ হীন হতভাগ্য বুর্জ্জোয়াজি সম্প্রদায়েরই নেতা ছিলেন—যে সম্প্রদায়ের মহান চিন্তা-ধারা নিছক স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

একটা সত্যকার জয়-মণ্ডিত সম্প্রদায় কর্তৃক চালিত হইয়াছিলেন বলিয়া লেনিন সমস্ত উন্নতিশীল মানব সমাজের নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি এমন সময় লেনিন আবির্ভূত হইতেন, যখন সমস্ত কিছুই সমাজতন্ত্রবাদের সফলতার সহায়ক ছিল, তাহা হইলে তিনি আরো সহজে পথ চলিতে পারিতেন, কিন্তু আজ যেই সমুজ্জ্বল গৌরব তাঁহার নামের সহিত বিজড়িত হইয়া আছে, তাহার অধিকারী তিনি কখনো হইতে পারিতেন না। লেনিন এমন এক যুগে সর্ব্বহারা দলের নেতৃরূপে গণ্য হইয়াছিলেন—যে যুগ একটা জীবন্ত বিজয়ী বিপ্লবের প্রারম্ভ, বিশেষতঃ যখন শত্রু অগণ্য, বাধা বিঘ্ন অনন্ত, বিবিধ সমস্যা সমাধান প্রাপ্তির জন্য মানুষের সম্মুখে প্রথম সম্মুখীন!

লেনিন সর্ব্বহারা দিগকে প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের চরম কার্য্য ধারার নির্দ্দেশক।

তিনি নিজে তদীয় বিরাট সম্প্রদায়ের সঙ্গে অগ্রে অগ্রে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি সর্ব্বহারা দলের সম্মুখে সেই ঐতিহাসিক প্রদেশের একটা মানচিত্রের স্থাপনা করিতে পারিয়াছিলেন—যার উপর লক্ষ্য দিয়া তাহাদিগকে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে হইতেছিল।

নেতার দৃষ্টি অপ্রচ্ছন্ন হওয়া উচিত। মানব সমাজের যে অংশকে তিনি পরিচালিত করিতেছেন, তাহাকে অন্ধকারে রাখিবার অধিকার তাঁর নাই। তিনি নিজে পথ পরিষ্কার দেখিলে শুধু চলিবে না, তাঁহাকে চলার পথ উজ্জ্বল করিয়া দিতে হইবে।

লেনিনের মতো নেতা শিক্ষক পদে বরিত হইবার যোগ্য বটেন। তিনি জনসাধারণকে বিশ্বব্যাপক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকও ছিলেন। ছোট বড় এমন কম্যুনিষ্ট নাই, যিনি তাঁর ছাত্র বলিয়া দাবী করিতে গৌরব বোধ করিতেন না। কম্যুনিষ্ট ব্যতিরেকেও হাজার হাজার লোক তাঁর আত্মীয়তার দাবী করিত। সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রণালীতে শিক্ষাদানই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; প্রকৃত কার্য্য তাঁর শিক্ষা হইতে ফলিত।

আমাদের শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগ লেনিনের কার্য্যের অংশ মাত্র, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লেনিনের নীতি সঞ্চারিত করিতে হইত। স্বতন্ত্র ভাবে ইহার কোনো সার্থকতা ছিল না। পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রকারের কার্য্যকারিতায় ইহা যে পর্য্যন্ত চালিত করে, সে পর্য্যন্তই ইহার সার্থকতা। তিনি আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক এবং অর্থনীতিক; কিন্তু তিনি কৃষ্টির (culture) দিকে জনগণের উত্থানকেই প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। এই কারণে আমরা শিক্ষিতেরা তাঁহাকে আমাদের পৃষ্ঠপোষক জ্ঞান করি এবং বলি যে—সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আমরা জানি—ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের সৃষ্টি। আমরা জানি—সর্ব্বহারা সম্প্রদায় ও তার বিকাশ ব্যতিরেকে লেনিনের কোনো ভাবনা আসিত না। কিন্তু সর্ব্বহারা দল যে অফুরন্ত সংগ্রামের সাধনায় তাহাদের নায়ক নির্ব্বাচন করিয়া ছিল—

উক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি তারই ফল ও প্রকাশ। আমরা লেনিনকে শ্রদ্ধা করি, আমরা তার কারণে গৌরবান্বিত, আমরা তাঁকে আমাদের বিপ্লবের প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান করি।

এই নববর্ষের অক্টোবরে যখন সেই মহা বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে, আমরা তখন সকলে লেনিন-বাদের পতাকা-তলে সমবেত হইব, এবং তাহার প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া একই অভিন্ন উদ্দেশ্যে হাজার হাজার বন্ধু ও সহযোগীগণের মতো সশ্রদ্ধ ভাবে আমাদের মহানায়কের নাম উচ্চারণ করিব। *

—০—

কৃষক ও শ্রমিক দল

—০—

ঢাকায় নূতন শাখা

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর একটি নূতন শাখা ঢাকায় স্থাপিত হয়েছে। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে নিয়ে একটি শাখা কমিটিও গঠিত হয়েছে :—

সভাপতি

১। নয়েম উদ্দীন আহ্‌মদ

সহকারী সভাপতি (অস্থায়ী)

২। আবদুল কাদের

জেনেরেল সেক্রেটরী

৩। গোপাল চন্দ্র বসাক

শ্রমিক বিভাগীয় সেক্রেটরী

৪। আবদুল মজীদ

কৃষক বিভাগীয় সেক্রেটরী

৫। জাহিদুল হক চৌধুরী

প্রচারক মণ্ডলী

আবদুল কাদের

৬। নলিন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত

সভ্যগণ

৭। সুরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার

৮। মোহাম্মদ নূরুল ইস্‌লাম

৯। হরিনাথ গুহ

১০। গণেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১। দেবেন্দ্র বিজয় গুহ (কোষাধ্যক্ষ)

দলের কার্য্যালয় সম্প্রতি ৬১ নং নবাবপুর রোডে স্থাপিত হয়েছে।

এ শাখার সভ্যগণ ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকদিগকে ও ঢাকার মেথর-ঝাড়ুদারদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। শাখার সভাপতি নয়েম উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের [illegible] আন্দোলনের [illegible] বিশেষ উৎসাহ [illegible] একটি [illegible] ([illegible]) [illegible]

—০—

আটিয়া-টাঙ্গাইল শাখা

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর আটিয়া (টাঙ্গাইল) শাখা শীঘ্রই সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট [illegible] জমিদারদের নামে ময়মনসিংহে মোকদ্দমা দায়ের করতে যাচ্ছে। জমিদারগণের অনুরোধে গবর্ণমেন্ট যে আটিয়া পরগণার [illegible] গ্রামকে "খাস মহল" বলে ঘোষণা করেছেন তারই বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা হবে। এই মোকদ্দমার ফলাফলের উপরে এই ১০৪ খানা গ্রামের কৃষকগণের ভাগ্য নির্ভর করবে। [illegible] জয়ী হলে কৃষকগণ তাদের ভিটে-বাড়ী [illegible] ভোগ দখল করতে পারবে। আর যদি পরাজয় হয় তা হলে তাদেরকে এ সকল গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। এই অবস্থায় এ সকল গ্রামের প্রত্যেক কৃষকেরই "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর সভ্য হওয়া উচিত। সকলে মিলে দলের তহবিলে চাঁদা জমা করবেন এবং এই চাঁদার টাকা থেকেই মোকদ্দমার খরচা চালানো হবে। কেবল মাত্র মোকদ্দমা করলেও চলবেনা, সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনও চালাতে হবে। সমস্ত কৃষক দলবদ্ধ হলে জমীদার ও গবর্ণমেন্টকে অন্যায় বিধান তুলে নেবার জন্যে বাধ্য হতে হবে। কাজেই মোকদ্দমা ও আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে চালানো আবশ্যক। আন্দোলনের দ্বারা দেশের অন্যান্য স্থানের কৃষকগণের সহানুভূতিও আটিয়ার কৃষকগণ পাবেন।

—০—

ময়মনসিংহ শাখা

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর ময়মনসিংহ শাখা সম্প্রতি ময়মনসিংহ শহরের মেথর-ঝাড়ুদারগণের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্যে চেষ্টা করছে। এ শাখা মেথর ও ঝাড়ুদারগণের ইউনিয়নও ময়মনসিংহে গঠন করেছে। তা ছাড়া কৃষকগণের মধ্যেও এ শাখা আন্দোলন চালাচ্ছে। দলের তরফ থেকে ল্যান্টার্ণ ও স্লাইডের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

—০—

সভ্যগণ অভিযুক্ত

ধরণীকান্ত গোস্বামী ও গোপেন্দ্র কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভ্য। এঁদের দু'জনার নামেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত ব্যাপারে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলেছে। গোস্বামীর নামে মোকদ্দমা হচ্ছে আসানসোলে। তাঁর নামে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ আনা হয়েছে। চক্রবর্ত্তীর নামে অভিযোগ-আইনি জনতার। তাঁর মোকদ্দমা হচ্ছে হাওড়া কোর্টে।

ফিলিপ স্প্রাট, কালীকুমার সেন গুপ্ত ও ধরণীকান্ত গোস্বামী আসানসোল ও অণ্ডালে ধর্ম্মঘট পরিচালনা করছেন।

---

* সোভিয়েট রাশিয়ার Cultural Societyর প্রকাশিত "Weekly News Bulletin" হইতে। ইহা গত বছরের লেখা।

শ্রেণী-সংগ্রাম

— : — : —

কম্যুনিষ্টের প্রতি প্রাণ-দণ্ডাদেশ

সিঙ্গাপুর কম্যুনিষ্ট পার্টির সুবিখ্যাত নেতা কমরেড ওঙ্গ-টেক্-চাই যিনি ক্যান্টন হতে পালিয়ে এসেছিলেন, কম্যুনিষ্ট নীতি বিষয়ক পুস্তিকা, কাগজ পত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ রাখার অপরাধে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। কেবলমাত্র প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিয়েও শোষণ তান্ত্রিক আদালতের বিচারক ক্ষান্ত হতে পারেন নি, সঙ্গে সঙ্গে ২০টী বেত্রাঘাতের আদেশও তিনি দিয়ে ছেড়েছেন। প্রকাশ যে পুলিশের গুপ্তচর নাকি তাঁর বাড়ীতে বিস্ফোরক পদার্থাদি আগে থেকেই রেখে এসেছিল। পূর্ব্ব দেশীয় শ্রমিক মহলে কমরেড ওঙ্গ একজন সুপরিচিত নেতা। তিনি নাগরিক চিন্তাশীলতা ও দুর্জ্জয় সাহসিকতার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। সিঙ্গাপুরের চীন শ্রমিকগণ ও মালয় দেশীয় শ্রমিকগণ তাদের নেতার প্রতি এরূপ বর্ব্বরোচিত দণ্ডাদেশে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এই আদেশের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হবে। ভারতবর্ষের এত নিকটে সিঙ্গাপুর হওয়া সত্ত্বেও ভারতের সংবাদ পত্র সমূহে এ বিবরণ প্রকাশিত হয় নি। বিগত ২০শে মে তারিখের বিলাতের একখানা কাগজ থেকে আমাদের এ সংবাদ নকল করতে হয়েছে।

———

বিরাট শ্রমিক সভা

১৭ই জুন রবিবার কলিকাতার উপকণ্ঠে রাজাবাগান বড় সাহেবের হাটে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এবং নবগঠিত "বেঙ্গল টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন"এর উদ্যোগে শ্রমিকগণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়েছিল। এ সভায় গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপ, কেশোরাম কটন মিল, স্থানীয় দু'টি চটকল ও আই, জি, এন কোম্পানীর ডকের দু' হাজারের কিছু বেশী শ্রমিক সমবেত হয়েছিল। বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর জেনেরেল সেক্রেটরী মুজফ্ফর আহ্মদ, "বেঙ্গল টেক্সটাইল ওয়ার্কস ইউনিয়ন"এর মাটিয়াবুরুজ শাখার সেক্রেটরী মুনীন্দ্রকুমার সিংহ ও সভাপতি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "ইউনিয়ন" গঠন। গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপে শ্রমিকদিগের ওপরে নানাভাবে জুলুম হয়ে থাকে। এই সব জুলুমের প্রতিকারের জন্যে গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপের শ্রমিক, আই, জি, এন, কোম্পানীর ডকের শ্রমিক এবং কিং জর্জ ডকের শ্রমিকগণের একত্রে একটা ইউনিয়ন গঠন করার আবশ্যকতা বক্তাগণ বিশেষরূপে বুঝিয়ে দেন। বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের একটা শাখা গঠন করার কথাও সভায় স্থিরীকৃত হয়।

———

কেশোরাম মিলে অসন্তোষ

কেশোরাম কটন মিলের ধর্ম্মঘট যদিও মিটে গেছে তথাপি শ্রমিকদিগের ভিতরের অসন্তোষ এতটুকুও কমে নি। মিঃ জি, ডি, বিড়লা কথা দিয়েছিলেন যে কোনো শ্রমিককে কাজ থেকে তাড়ানো হবে না। কিন্তু লোকেরা কাজে যেতে না যেতেই চণ্ডী নামক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একটি শ্রমিককে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ম্যানেজিং এজেন্টস্ বিরলা ব্রাদার্স ও ব্যক্তিগত ভাবে মিঃ জি, ডি, বিরলাকে ইউনিয়নের তরফ থেকে পত্র লিখেও কোনো প্রতিকার হয় নি। শীঘ্রই এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা না করলে শ্রমিকরা হয়তো আবারো ধর্ম্মঘট ক'রে বসবে। বিরলা মশায়ের প্রশংসা মুখর "অমৃত বাজার পত্রিকা" কি বলেন?

———

ষ্টীমারের সারেংগণের অভিযোগ

বরিশাল থেকে একখানা পত্র আমরা পেয়েছি। তাতে দেশের ভিতরে নদীতে চলাচলকারী ষ্টীমার সমূহের সারেংগণের অভিযোগের বিষয় লিখিত হয়েছে। আমরা মূল পত্রখানা না ছেপে তার সার মর্ম্ম এখানে প্রকাশ করছি। প্রথমেই লেখা হয়েছে যে "ম্যারিনার্স ইউনিয়ন"এর আন্দোলনের দ্বারা লোকেদের অভাব-অভিযোগের কতক প্রতিকার যে হয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। লোকেদের আশা দেওয়া হয়েছিল যে ক্রমশঃ তাদের সমস্ত অভিযোগের প্রতিকার করা হবে। কিন্তু, এই নিষ্পত্তির পর থেকে অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। কর্ম্মচারীদিগকে কথায় কথায় সামান্য কারণে বা অকারণে জরিমানা, সস্পেণ্ড ও বরখাস্ত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জয়েন্ট কোম্পানীদ্বয়ের ম্যানেজিং এজেন্টগণের নিকটে দরখাস্ত করেও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় নি। গত ক' দিনের মধ্যেই ৪০।৫০ জন সারেং ও মিস্ত্রী কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছেন। অনেকগুলি সারেং নাকি গভীর রাত্রে আর, এস, এন কোম্পানীর ম্যারিন্ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাড়ীতে যাতায়াত করে থাকে, কিন্তু কেন যে যাতায়াত করছে সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। "হাতিয়া" নামক ষ্টীমারের দ্বিতীয় সারেং শরাফত আলী স্ত্রীর অসুখের অজুহাতে ছুটীতে গিয়েছিল। কলিকাতায় ফিরে এসেই সে ভারপ্রাপ্ত সেরাং হয়েছে। অথচ তার উপরকার অনেক সারেং এখনো ভারপ্রাপ্ত সারেং হতে পারেন নি। এ ব্যাপারের ভিতরেই বা কি রহস্য রয়েছে?

তারপরে আই, জি, এন কোম্পানীর সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন তাঁর অফিসের বড় বাবু মহিমচন্দ্র দে'র ওপরে। কাজেই দে মশায় মিস্ত্রীদের ভাগ্য বিধাতা হয়ে পড়েছেন। তিনি যখন যা খুশী তা-ই করে থাকেন। মিস্ত্রীদের ভাগ্য নির্ণীত হয় বড় বাবুর নিজের বাড়ীতে এবং গভীর রাত্রেও বটে। দুষ্ট লোকেরা রটিয়ে থাকে যে বাবু মশায়ের নাকি ঘুষ খাওয়ার অভ্যাস খুবই আছে। এ সংবাদ সত্য হলে এখনি তার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। আব্দুল হাকিম নামক একজন মিস্ত্রী বড় জাহাজে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে 'ডিগ্রেড' করে "কংস" নামক ছোট ষ্টীমারে বদলী করা হয়। বদলীর কারণ এই হচ্ছে যে তিনি নাকি বড় বাবুকে খুশী করতে পেরেছিলেন না। তবে লোকেরা এও রটাচ্ছে যে বরিশালে ৩০ টাকা মাইনের রিজার্ভ মিস্ত্রী হওয়া থেকে তিনি কোন প্রকারে বেঁচে গেছেন। কেননা, তাঁর মাথায় বুদ্ধি তখন খেলেছিল ব'লে তিনি বড় বাবুর বাড়ীতে উপহার পাঠিয়েছিলেন।

আই, জি, এন কোম্পানীর এসিষ্টাণ্ট ম্যারিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বিগ্ বাই, এর সম্বন্ধেও পত্রে অনেক কথা লিখিত হয়েছে। তিনি নাকি বড় বড় সারেংদের হাত করে রাখেন এবং তাঁর

বাড়ীতে নাকি এমন জিনিসের ডালি আসে যা হয়তো ম্যানেজিং এজেন্ট মিঃ প্যারোটের ভাগ্যেও ঘটে উঠে কিনা সন্দেহ।

এরপরে পত্রলেখক জানতে চেয়েছেন যে কোম্পানীদ্বয়ের ম্যানেজিং এজেন্টগণ এবং ম্যারিনার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী এ সব ব্যাপারের প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করেছেন? বলাবাহুল্য পত্রলেখক নিজেও ষ্টীমারের একজন কর্ম্মচারী।

উপরে লিখিত বিবরণগুলি সত্য হলে এ সবের আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। সারেং ও মিস্ত্রীদের ওপরে সত্যই জুলুম হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। "গণবাণী" এ সব জুলুমের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করতে রাজি আছে। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"ও সারেং আর মিস্ত্রীদের হয়ে সংগ্রাম চালাতে কখনো পেছপাও হবে না। কিন্তু, তার আগে সারেং আর মিস্ত্রীদিগকে খালাসী ও আগুনওয়ালাদের দাবী-দাওয়া স্বীকার ক'রে নিতে হবে। তাঁদের যেরূপ বেদনা আছে ঠিক সেইরূপ বেদনা খালাসী ও আগুনওয়ালাদেরও আছে। আমরা জানতে চাই যে, মিস্ত্রী ও সারেংগণ এতে রাজী আছেন কিনা?

সমুদ্রগামী নাবিকগণের বেতন

ভারতীয় সমুদ্রগামী নাবিকগণ যত কম মাইনে পেয়ে থাকে তত কম মাইনে পৃথিবীর আর কোন দেশেই দেওয়া হয় না। সম্প্রতি বিলাতের পার্লামেণ্টে একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে সমুদ্রগামী জাহাজে কাজ ক'রে থাকে এমন যে সকল নাবিকের নাম ইংল্যাণ্ডে রেজেষ্ট্রীভুক্ত হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল দু' লক্ষ। এই দু' লক্ষের মধ্যে লস্করের সংখ্যা ছিল ৫২০৭৯ জন। বলা বাহুল্য লস্কর সাধারণতঃ এসিয়াবাসী নাবিকদিগকেই বলা হয়। কাজে কাজেই ভারতীয় নাবিকগণও এদের মধ্যে শামিল রয়েছে। এসকল নাবিকগণের বেতনের কোন বাঁধা রেট নেই। তবে ইউরোপীয় চুক্তি অনুসারে এসিয়াবাসী যত নাবিক নিযুক্ত হয়ে থাকে তাদের সকলকেই ইউরোপীয় হারে বেতন দেওয়া হয়।

ইউরোপে নাবিকগণের বেতনের বাঁধা রেট হচ্ছে সাধারণতঃ মাসে ৯ পাউণ্ড। ৯ পাউণ্ড বর্ত্তমান বাজারে আমাদের দেশের ১১৯৷০ আনার সমান। পার্লামেণ্টে দেওয়া হিসাব অনুসারে এসিয়ার পোর্টে সই করলে কলিকাতার লস্কর মাসে পায় ২৪ টাকা আর চীনের লস্কররা পায় ৪২৷৪৩ টাকা।

ইউরোপীয় নাবিকগণ যে কাজ করে থাকে ঠিক সে কাজই ভারতীয় নাবিকেরাও করে। তথাপি তাদের মাইনে আর ভারতীয় নাবিকগণের মাইনেতে কত বেশী প্রভেদ। আবার এই ভারতীয় নাবিকই যখন ইউরোপীয় পোর্টে নাম সই করে তখন মাইনে পায় ১১৯৷০ আনা। বেতনের এই পার্থক্য নাবিকদের কিছুতেই সহ্য করা উচিত নয়। ভারতীয় নাবিক ব'লে তাদের কর্ম্মশক্তি যদি কম হত তা হলে ইউরোপীয় পোর্টে নাম সই করলে ইউরোপীয় হারে বেতন তাদের কিছুতেই দেওয়া হতনা। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে কলিকাতায় নাবিক আন্দোলন কোনো প্রকার রূপই ধারণ করেনি। নাবিকগণের 'ইউনিয়ন' বর্ত্তমান সময় শোচনীয় দশাগ্রস্থ হয়ে আছে। নাবিকদিগের মধ্যে একটা শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা ইউনিয়ন কখনো করেনি। শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত ইউনিয়নের লক্ষ্য ছিল সরকারের নিকটে আবেদন আর নিবেদন করা। ডেক্, ইঞ্জিন ও স্যালুন প্রভৃতি সকল বিভাগের লোকদের একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। যে সকল শক্তি তাদের ইউনিয়নে যোগদান করার পথের বাধা হয়েছে সে সকল শক্তিকে পদ-দলিত ক'রে তাদের সকলেরই উচিত দলে দলে ইউনিয়ন গঠন করা। বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন তাদিগকে এখনি আরম্ভ করা উচিত। জীবনটাকে প্রকৃত মানুষের মত ক'রে উপভোগ করার অদম্য বাসনা প্রত্যেক নাবিকেরই মনে জাগরুক হওয়া আবশ্যক। তাদের জীবনে অভাবের সৃষ্টি না করতে পারলে তারা কিছুতেই জোরের সহিত আন্দোলন চালাতে পারবে না। 'ভালো খাব, ভালো পরব এবং ভাল ঘরে বাস করব' এই ভাবটা যতক্ষণ না প্রত্যেক নাবিকের মনে প্রবল হয়ে উঠবে ততক্ষণ নাবিকদের কিছুতেই কিছু হবে না।

ওয়েলিংটন মিলে শ্রমিক বহিষ্করণ

কিছু কাল পূর্ব্বে রিষড়ার ওয়েলিংটন জুট মিলের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করেছিল। মাসাধিক কাল ধর্ম্মঘট চলার পর তা মিটে যায়। শ্রমিকদিগের মজুরী বাড়িয়ে দেওয়াতেই এ ধর্ম্মঘট মিটেছিল। কিন্তু, শ্রমিকরা যখন কাজে ফিরে যায় তখন তাদের মুখপাত্রকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারি বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে তারা কাজ করতে অস্বীকার করে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে ৮০০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে ১৫ই জুন থেকে কলের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সভার কাজে কলওয়ালাদের বাধা

১৫ই জুন তারিখে বাউড়িয়ার তিনটি চটকলের শ্রমিকগণের একটা সভা হওয়ার কথা ছিল। চেঙ্গাইল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি কালিদাস ভট্টাচার্য্য যখন ওখানকার কারখানার ময়দানে সভা করতে যাওয়ার জন্যে উপস্থিত হন তখন তাঁদের নামে ফোর্ট গ্লষ্টার জুট ম্যানুফাকচারিং কোম্পানীর ইষ্টেট ম্যানেজার এই ব'লে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে তাঁরা যেন কোম্পানীর জায়গায় কোনো সভা না করেন। কাজেই, তাঁ-দিগকে সরকারী রাস্তার পাশে সভা করতে বাধ্য হতে হয়। হাজার হাজার শ্রমিক সারি বেঁধে রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেলে একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থান হতে বঙ্কিমবাবু, কালীবাবু ও বেঙ্গল টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মাটিয়া বুরুজ শাখার সেক্রেটারী মনীন্দ্রকুমার সিংহ বক্তৃতা প্রদান করেন। কোম্পানীর ব্যবহারে শ্রমিকরা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তাদিগকে দলবদ্ধ হওয়ার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার আবশ্যকতা বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

আসানসোল

আসানসোলের ১৮৩ জন ধর্ম্মঘট কারীকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইতোপূর্ব্বে তাদিগের ওপরে ১৪ই জুন তারিখে কাজে ফিরে যাবার জন্যে নোটিশ জারী করা হয়েছিল। ১১ জন অধর্ম্মঘটকারী কয়েক জন ধর্ম্মঘট কারীর নামে ভীতি প্রদর্শনের মোকদ্দমাও দায়ের করেছে। অনধিকার প্রবেশের জন্যেও দু'জন অভিযুক্ত হয়েছেন।

১৫ই জুন তারিখে ইউনিয়ন আফিসের নিকটবর্ত্তী ঝুমরি মহল্লা হতে ধর্ম্মঘটকারিগণের একটা মিছিল বা'র হয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে সহরের মধ্য দিয়ে বার্ণপুরে গমন করেছিল। বার্ণপুরে ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানা আছে। ফিলিপ স্প্রাট ও অন্যান্য শ্রমিক নেতা মিছিলটি পরিচালনা করেছিলেন।

বারদৌলি সত্যাগ্রহ

বারদৌলির কৃষকগণের সত্যাগ্রহ তেমনি চলেছে। মিটমাটের এখনো কোনো বিশেষ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

ময়মনসিংহে মেথর ধর্ম্মঘট

১৮ই জুনের প্রাতঃকাল থেকে ময়মনসিংহ সহরের মেথর ও ঝাড়ুদারগণ ধর্ম্মঘট করেছে। বঙ্গীয় মেথর ও ঝাড়ুদার ইউনিয়নের ("দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ্ বেঙ্গল" এর) ময়মনসিংহ শাখা বহুদিন থেকে চেষ্টা করে আসছিল, যাতে বিনা ধর্ম্মঘটে মেথর প্রভৃতির অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হতে পারে। কেননা মেথরদের সহিত সহরের অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু, যখন ম্যুনিসিপ্যালিটি কিছুতেই সন্তোষ জনক প্রতিকার করতে রাজি হলোনা তখন ইউনিয়নকে বাধ্য হয়ে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতে হয়েছে।

বোম্বের পত্র

বোম্বে টেক্সটাইল মিল সমূহের ধর্ম্মঘট পূর্ব্বেরই মত পূরোদমে চলছে। মিটমাটের কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। মিলের স্বত্বাধিকারিগণ কিছুতেই একটা রফা করতে রাজী হচ্ছে না। জয়েন্ট ষ্ট্রাইক কমিটির (অর্থাৎ গরম ও নরম দলের শ্রমিক প্রতিনিধিদের) ও মিলের স্বত্বাধিকারীদের একটা মিলন-বৈঠক বসেছিল কিন্তু বৈঠক ফল-প্রসূ হয়নি। অদ্য প্রাতঃকাল হতে জয়েন্ট ষ্ট্রাইক কমিটির বৈঠক বসেছে। গরম ও নরম দলের অর্থাৎ মিঃ জোশীর দল এবং বোম্বাই শ্রমিক ও কৃষক দলের মিঃ ডাঙ্গে, ঘাটে, নিম্বকার প্রভৃতি সদস্যদের একটা পরামর্শ সভা বসেছে। সে সভায় স্থিরীকৃত হবে কি উপায়ে ধর্ম্মঘট চালানো যাবে।

প্রায় দেড় লক্ষাধিক শ্রমিকদের মধ্যে বর্ত্তমানে ৩০।৪০ হাজার শ্রমিক শহরে উপস্থিত আছে। অপর সকলে উদরান্নের সংস্থানে এখানে ওখানে চলে গিয়েছে। কেহ বা দেশে ফিরে গেছে। শ্রমিকদের মধ্যে মাদ্রাজী, ভাটিয়া, গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী প্রভৃতি নানা প্রদেশের লোক রয়েছে। স্ত্রী মজুরের সংখ্যাও বিস্তর।

আমি বোম্বে আসার দিন থেকেই বন্ধুবর ঘাটে ও ডাঙ্গের সাথে সমস্ত শ্রমিক কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করছি। শ্রমিকদের সুসংঘবদ্ধ করবার জন্য সহরে ও সহরতলিতে বিভিন্ন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। প্রত্যহ সভা করা হয়। প্যারেল ও দাদারেই মিলের সংখ্যা বেশী এবং উক্ত স্থানেই শ্রমিক সংঘের আফিস খোলা হয়েছে। পারেল, দাদার, ট্রাম্ব বন্দর প্রভৃতি স্থানে রিলিফ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে একদিন শ্রমিকদের চাল ডাল বিতরণ করা হয়েছে। গত কল্য আবার প্রায় ১৩ হাজার শ্রমিককে চাল-ডাল বিতরণ করা হয়। যাহাতে অকুস্থলে কোনো গোলমাল হতে না পারে তজ্জন্য পূর্ব্ব হতেই সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। আগের দিন সমস্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন কেন্দ্রে টিকিট বিতরণ করা হয়। কাজেই রিলিফ দেবার দিনে কর্ম্মীদের কোনো প্রকার বেগ পেতে হয় নি।

রিলিফ দেওয়া দেখার জন্য আমি সকালেই এলফিনিষ্টনে 'স্যোশ্যাল সার্ভিস লিগের' আফিসে গিয়েছিলুম। দামোদর ঠাকুরজী বিল্ডিং ও "সমাজ-সংঘ" হলে সমস্ত শ্রমিকগণ সমবেত হয়েছিল। উক্ত বিল্ডিং এর উপর তলায় অনেক গুলি শ্রমিক সংঘের আফিস আছে। ট্রামওয়ে শ্রমিকগণের ও জি, আই, পি রেলওয়ে শ্রমিকদের ইউনিয়নও এই বাড়ীতেই রয়েছে। বন্ধুবর ডাঙ্গে হচ্ছেন 'ট্রামওয়ে মেন্স ইউনিয়নের' জেনেরেল সেক্রেটারী। যদিও রিলিফ কেন্দ্রগুলিতে ভীষণ ভিড় হয়েছিল, তথাপি খুব তৎপরতার সহিত সব কাজ সম্পন্ন করা হয়। কোনো গোলমাল হয় নি। ভলান্টিয়ারগণ খুব পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যে তাঁদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। যদিও ষ্ট্রাইক কমিটির হাতে প্রচুর অর্থ নেই তবুও তাঁরা অতীব যত্ন সহকারে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করছেন। বোম্বে কর্পোরেশন দৈনিক হাজার টাকা শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের দুগ্ধের জন্য খরচ করবে বলে শুনা যাচ্ছে। মিল ওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা কর্পোরেশনের মেম্বর আছেন তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আরো কিছুকাল ধর্ম্মঘট চালাতে পারলে শ্রমিকগণ অবশ্য জয়ী হবে। বন্ধু ডাঙ্গে, ঘাটে, ঝাবওয়ালা, নিম্বকার, মিরাজকর ও ব্রাডলে প্রভৃতি বোম্বাই শ্রমিক ও কৃষকদলের সদস্যগণ এই ধর্ম্মঘট পরিচালনার কার্য্যে লিপ্ত আছেন। তাঁরা খুব আন্তরিকতার সাথে ও সাবতীয় ক্লেশ সহ্য করে তাঁদের কর্ত্তব্য পালন করছেন।

আমি সমস্ত কেন্দ্র স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম যে শ্রমিকগণ বেশ দৃঢ়চিত্ত সুসংঘবদ্ধ হয়ে আছে। শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তারা এই যুদ্ধ চালাবে। এত কাল ক্লেশ ও পুলিশের নির্য্যাতন ইত্যাদি সহ্য করেও তারা দমে যায় নি। তারা বেশ প্রফুল্ল এবং মুখে চোখে তাদের এখনও উৎসাহ এবং সংগ্রাম-শীল ভাব ফুটে রয়েছে। তারা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতে দৃঢ়সংকল্প এবং বদ্ধ-পরিকর হয়েছে। শ্রমিকদের চিত্তে একটা বিপ্লব ভাব প্রকটিত হয়েছে- যদিও তারা খুব শান্তির সহিত এই ধর্ম্মঘট সংগ্রাম চালাচ্ছে। তবে বলা যায় না কতকাল তাদের এই শান্তিবাণী প্রচার করে ঠাণ্ডা রাখা যাবে। বুভুক্ষু আত্মা তাদের ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বোম্বের মত শিল্প প্রধান স্থানে শ্রমিকগণ খুব দ্রুত সংঘবদ্ধ হবে—এবং তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার উপরই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতাগণ অনেক কার্য্য প্রণালীর জন্য দায়ী। মিঃ জোশী একজন বড় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হলেও তিনি লিবারেল দলের লোক এবং সর্ব্বদাই মিলন প্রয়াসী। এই সমস্ত বিফরমিষ্ট নেতা বিলাতের ম্যাকডোনাল্ড ল্যান্সবেরী, পার্সেল, চাস ওয়াং টাইপের। বিপ্লবী নেতৃগণ যদি এই ষ্ট্রাইকের ভার নিজেদের

হাতে তুলে না নিতেন তাহা হলে এদিন ধর্ম্মঘট চালানো দায় হতো। এবং সহজে মিলওয়ালারা বৈঠক ইত্যাদি করতেও রাজী হতো না। তবুও ভরসা মিলওয়ালারা আর বেশী দিন মিল বন্ধ করে রাখতে পারে না। মিল গুলির অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে উঠেছে। পরেলে ও দাদারে দেখলুম পথের দু'ধারে সারি সারি মিল। কোহিনূর মিল, করিম ভাই মিল (এদের ১৩ টা মিল আছে) সাসুন মিল দিন শা পেটিট মিল আরো কত মিল। একটা জনপ্রাণী নেই মিলের আশে পাশে, সব যেন খাঁ খাঁ করছে। স্থানে স্থানে ২।১টি লোক জটলা পাকাচ্ছে। গেটের কাছে দারোয়ান উদাস মনে পায়চারি করছে। অত বড় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মিল সব জনশূন্য, শ্মশান ব'লে মনে হচ্ছে। আরো কিছু কাল এই করে সকল মিলের দশা কি দাঁড়াবে তাহা দু'দিন বাদে মিলওয়ালারা উপলব্ধি করতে পারবে। এখন খুব বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাদলা হাওয়া লেগে মিলের কল কব্জার দফারফা হবে। শ্রমিকগণ আরো ৬।৭ সপ্তাহ ধর্ম্মঘট চালাতে পারবে—মিল ওয়ালারা যে কতকাল মিল বন্ধ রাখতে পারবে তাহা ভাববার বিষয়। বড় জোর ২।১ সপ্তাহের বেশী তারা মিল বন্ধ রাখতে পারবে না। মিলের দুয়ারে দুয়ারে এখনও ২।১ জন করে ভলানটিয়ার মতায়েন আছে দেখলুম। পুলিশও মিলের দরজা গুলোতে চৌকী দিচ্ছে।

বোম্বাই বাণিজ্যের দিক দিয়ে খুব বড় কেন্দ্র। যত সূতা ও কাপড় কল এই বোম্বাই শহরের আশেপাশে রয়েছে। শ্রমিক সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এই সব শিল্প কেন্দ্রে শ্রমিকদের যত শীঘ্র সংঘবদ্ধ করা সম্ভবপর হবে কৃষকদের তত শীঘ্র সংঘবদ্ধ করা যাবে না। এই সমস্ত শহরের শ্রমিকদের অর্থাৎ প্রলেটারিয়েটদের অনেকের বাড়ী ঘর কিছুই নাই। শহরে তাদের যে বাসস্থান আছে তাহা বাংলা দেশের মজুরদের মতন। তাহা ছাড়া পচা দুর্গন্ধময় অলিতে গলিতে এখানেও তারা বাস করে। এরা একবার সুগঠিত হলে অসাধ্য সাধন করতে পারবে। ভারতের শিল্প বিপ্লবের এই মাত্র শৈশব অবস্থা। এখন থেকে তাদের বৈজ্ঞানিক নীতিতে শিক্ষিত সুসংবদ্ধ করে তুলতে হবে। বিলাতের ও রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি এদের সংঘবদ্ধ করা যায় তাহা হলে সত্বর ফললাভ হবে। তবে আশা এই যে বোম্বের "কৃষক ও শ্রমিক দলের" হাতে শ্রমিক আন্দোলন প্রভূত পরিমাণে এসেছে ও ক্রমশঃ আসবে তাঁদের অনেকেই এই ধর্ম্মঘট করাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের প্রভূত অসুবিধার ভিতর দিয়া কাজ করতে হচ্ছে। প্রথম থেকেই ট্রেড ইউনিয়নের মডারেট নেতা মিঃ জোশীর সাথে তাঁদের প্রভূত লড়াই করতে হয়েছে। মোট কথা, প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে চলতে হচ্ছে। পুলিশ সর্ব্বত্রই সমান! ধনিকের ও জন সাধারণের স্বার্থ ও শান্তি রক্ষা দুই-ই তারা করছে। সি, আই, ডি র গতি বিধি এখানেও বাংলা দেশের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমি ২ দিন এখানে এসেছি। তাতেই তারা আমার পেছনে লেগেছে।

ষ্টেটসম্যান, ইংলিশ ম্যানের মত এখানেও 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' "ইভিনিং নিউজ" ইত্যাদি সংবাদ পত্র গুলি বোম্বাই কৃষক ও শ্রমিক দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে লিখতে এতটুকুও ত্রুটি করে না। মস্কোর বিভীষিকা এখানেও বাংলা দেশের মত। এই সমস্ত আধা সরকারী সংবাদ পত্রগুলো, প্রচার করছে যে এই সমস্ত শ্রমিক ধর্ম্মঘট বলসেভিক প্ররোচকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতবর্ষে একটা গুরুতর বলসেভিক বিপ্লব ঘনিয়ে আসছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ষ্টেটসম্যান, আর ইংলিশম্যান লিলুয়ার ব্যাপারে বলসেভিক, কম্যুনিষ্টদের হাত আছে বলে প্রচার করছে—এখানকার কাগজগুলো একই বুলি আওড়াচ্ছে। তা ছাড়া এখানকার ন্যাশন্যালিষ্ট কাগজ গুলো না কোন ধর্ম্মঘটের খবর ইত্যাদি ছাপে,—বাংলার 'পত্রিকা' ও ফরওয়ার্ডের মত নহে। শ্রমিক নেতাগণ সেদিন কংগ্রেস নেতাদের নিন্দা করে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিল—পত্রিকা গুলো অবিকল তাই ছেপেছে। এদিক দিয়ে তারা একটু উদার! এখন সময় এসেছে—কংগ্রেসের নেতাদের স্বরূপ জনগণের সামনে খুলে প্রকাশ করা। বাংলা দেশের ও বোম্বের কৃষক ও শ্রমিক দলের সদস্যদের এই কর্ম্ম ভার হাতে তুলে নিতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিক আন্দোলনের গুরু ভার এই দলকেই বহন করতে হবে।

ষ্ট্রাইক কমিটির হাতে প্রচুর টাকা নেই যে তারা প্রত্যহ সাহায্য দিতে পারবে। তবে শ্রমিকগণ সমুদয় কষ্ট সহ্য করতে রাজী আছে। একটা সম্মানজনক মীমাংসা না হলে তারা কিছুতেই কাজে ফিরবে না।

১৬ই জুন ১৯২৮

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2/1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the

WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL

2-1, European Asylum Lane, Calcutta.

LOCAL AGENCY.

50, Johnson Road, Dacca.

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে জুন ১৯২৮, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫ | ৩য় সংখ্যা

"ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান !
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

"শীতের শ্বাসের বিদ্রূপ করি ফুটে কুসুম
নব-বসন্ত-সূর্য্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরের হান মৃত্যুবাণ।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

"চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বদ্ধ মন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও ঊর্দ্ধে,
গাহরে গান
লাল নিশান ! লাল নিশান !"

সম্পাদক
মুজফ্ফর আহ্মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৷৷০
Foreign Subscription Annual 6s.

বাঙ্গলার পাটকলের শ্রমিক সমিতির

মেম্বর হওয়ার সাধারণ নিয়ম ও উপকারিতা

১। চটকল ও জুট প্রেসের শ্রমিকগণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই সমিতির মেম্বর হইতে পারেন।

২। যে কোন মাসের যে কোন দিন বা তারিখ হইতেই মেম্বর হওয়া যায়।

৩। প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে সমিতির প্রথম মেম্বর হওয়ার সময় আট আনা ও পরে প্রত্যেক কোয়ার্টারে (তিন মাস অন্তর) ছয় আনা করিয়া চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়।

৪। চাকরী থাকা সত্বেও যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা না দেন তাহা হইলে এসোশিয়েসনের মেম্বর রোল্ হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয় ও পরে পুনরায় তাঁহাকে নূতন মেম্বর হইতে হয়।

৫। কোন সময়ে কেহ চাঁদা দিতে না পারিলে তাহার কারণ এবং কত দিন দিতে পারিবেন না তাহা পূর্ব্বে জানাইয়া সেক্রেটারীর লিখিত সম্মতি লইতে হয়।

৬। সমিতিতে মেম্বর হওয়ার পূর্ব্বে সংঘটিত কোন বিবাদের জন্য সমিতির কোন দায়িত্ব থাকে না।

৭। সমিতিতে মেম্বর হওয়ার প্রথম দিন ও তারিখ হইতে পরবর্ত্তী ৩১ দিনের মধ্যে সমিতি হইতে কোন সাহায্য পাওয়ার অধিকার জন্মে না—তবে বিশেষ ক্ষেত্রে একজিকিউটিভ কমিটি অনুকূল ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৮। সমিতির কোন মেম্বরকে কারখানা হইতে বিনা দোষে ও বিনা নোটিশে জবাব দিলে যে ক্ষতি-পূরণ পাওয়া যায় কোম্পানী স্বেচ্ছায় তাহা না দিলে সেই মেম্বরকে উহা আদায়ের জন্য আইন সংক্রান্ত সকল রকম সাহায্য করা হয়।

৯। কাহারও "হপ্তা", "বাকী-হপ্তা" বা মাহিয়ানা না দিলে উহা আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য আইন সংক্রান্ত সকল রকম সাহায্য করা হয়।

১০। কারখানায় কাজ করিতে করিতে সমিতির কোন মেম্বর হত বা আহত হইলে যে ক্ষতি-পূরণ পাওয়া উচিত কোম্পানী স্বেচ্ছায় তাহা না দিলে উহা আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য আইন সংক্রান্ত সকল রকম সাহায্য করা হয়।

১১। কোন মেম্বরের চাকরীর জবাব হইয়া গেলে অন্যত্র তাঁহার চাকরী করিয়া দেওয়ার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করা হয়।

১২। পূর্ণ এক বৎসর কাল সমিতির মেম্বর হইয়া থাকার পর যাঁহাদের চাকরী নষ্ট হইয়া যায় তাঁহারা আবেদন করিলে সমিতি হইতে সপ্তাহে দুই টাকা হিসাবে ছয় সপ্তাহের জন্য মোট ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত "খোরাকী" দেওয়া হয়।

১৩। পূর্ণ দুই বৎসর মেম্বর হইয়া থাকার পর সমিতির মেম্বররা সমিতির "ক্রেডিট ফণ্ড" হইতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মাসিক শতকরা আট আনা হারে সুদে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত কর্জ গ্রহণ করিতে পান।

১৪। পূর্ণ তিন বৎসর মেম্বর হইয়া থাকার পর সমিতির কোন মেম্বরকেই আর চাঁদা দিতে হয় না ও মেম্বর হওয়ার প্রথম দিন ও তারিখ হইতে সম্পূর্ণ দশ-বৎসর মেম্বর হইয়া থাকার পর কাহারও মৃত্যু ঘটিলে শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সমিতিতে মোট যত টাকা চাঁদা দিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে প্রথম উপযুক্ত ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া হয়।

বলা বাহুল্য যে সমিতিতে যত অধিক লোক মেম্বর হইতে থাকিবেন ও ইহার অর্থ-সঙ্গতি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে মেম্বর দিগকে নানা দিক দিয়া ততই অধিক সাহায্য করা সম্ভব হইবে।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।
সভাপতি—
বাঙ্গলার পাট কলের শ্রমিক সমিতি
পোঃ ভাটপাড়া, জিলা ২৪ পরগণা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

—চণ্ডীদাস—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৮শে জুন, ১৯২৮, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৫ | ৮ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আসল চেহারা

ডাক্তার বিপিন বিহারী সেন ময়মনসিংহ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির তিনি চেয়ারম্যানও বটেন। মদ্য-পান নিবারণ করার জন্যে তিনি কত যে বক্তৃতা করেছেন তার [illegible] নেই। ময়মনসিংহের মেথর ও ঝাড়ুদার দের ভিতর থেকে মদ্যপানের রীতি যাতে একেবারেই উঠে যায় তার জন্যেও তিনি [illegible] চেষ্টা করেছেন। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর ময়মনসিংহ শাখার সেক্রেটারী কয়জুদ্দীন হোসেন ওখানকার মেথর ও ঝাড়ুদারগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করার জন্যে যখন ডাক্তার সেনের নিকটে যান তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে অত সব গোলমাল না ক'রে তিনি (কয়জুদ্দীন হোসেন) যেন মেথরদের মধ্য থেকে মদ [illegible] তুলে দেবারই জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেন। ডাক্তার সেনের মতে [illegible] বেতন বাড়াবার জন্যে আন্দোলন করাটা একটা অনিচ্ছ [illegible] ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এই মেথরগণই যখন সেদিন তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার [illegible] ধর্ম্মঘট ক'রে বস্‌লো তখন ডাক্তার সেনই বিনা মূল্যে মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে তা-দিগকে মদ সরবরাহ করলেন [illegible] হও তাঁবার যেমন তেমন নয়, একেবারে মদের ভাটিওয়ালার সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করে গাড়ী বোঝাই সরবরাহ [illegible] করার উদ্দেশ্য ছিল মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে [illegible] যুদ্ধে লিপ্ত মজুরগণকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া। ডাক্তার সেন শুধু এই করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি নাকি একথাও মেথরদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে কয়জুদ্দীন হোসেন একজন মুসলমান। হিন্দু [illegible] তাঁকে তাদের বড় নেতা বানাতে গেল কেন? [illegible] কথা যদি সত্য হয় তা হলে এটা অবশ্য মেনেই নিতে হবে [illegible] বঞ্চিত করার জন্যে তিনি না করতে পারেন এমন কোনো গর্হিত কাজ নেই। যাক্, এই মেথরদের ধর্ম্মঘট থেকে আমরা আসল ডাক্তার সেনকে চিনে রাখলুম। এতদিন আমরা যাকে [illegible] তিনি ছিলেন নকল ডাক্তার সেন। শুধু ডাক্তার সেনই বা কেন, এ ব্যাপার থেকে বর্ত্তমান নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসের [illegible] সকলের চোখের সম্মুখে ধরা পড়েছে। [illegible] মিউনিসিপ্যালিটি বর্ত্তমান সময় কংগ্রেস দলের [illegible] পরিচালিত হচ্ছে।

তথাকথিত জাতীয় দলের হীনতম বৃত্তি

ধনিক, বণিক ও জমীদারের নেতৃত্বে গঠিত [illegible] জাতীয় দলের হীনতম মনোবৃত্তির পরিচয় আমরা [illegible] পেয়েছি। কাপড়ের কল সমূহের ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত [illegible] প্রচার কার্য্য তারা আজকাল চালাচ্ছে তাতে শুধু যে [illegible] হীনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, মানসিক [illegible] ও তাতে তাদের আছে। কলওয়ালারা যতই শোষণ মজুরদের করুক না কেন তার বিরুদ্ধে কিছুই এই ভণ্ড জাতীয় দলের বলবার থাকে না, কিন্তু যখনি মজুরেরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখনি এই ভণ্ডের দল না [illegible] থাকে। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করে থাকেন তাঁ-দিগকে লোক-চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাই [illegible] প্রধানতম কাজ। তাই, কাপড়ের কলের শ্রমিকদের হয়ে যাঁরা আজ লড়ছেন তাঁরা হচ্ছেন, এই ভণ্ডদের মতে মানবগৌরব

কাপড়ের কলওয়ালাদের দূত। ম্যানচেষ্টার ওয়ালাদের টাকা খেয়ে তাঁরা নাকি ভারতের "ন্যাশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রী" বা জাতীয় শিল্প ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই প্রচার কার্য্যও আবার তাঁরা সংবাদ পত্রের মারফতে চালাচ্ছে না—এখানে সেখানে প্রচার ক'রে ক'রে জনসাধারণের মনে একটা ভুল বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টাতেই তাঁরা রয়েছে। প্রকাশ্য প্রচার করার চেয়ে পরিচিতের নিকটে বিশ্বস্ত ভাবে বলার গুরুত্ব অনেক বেশী, এবং বেশী বলেই এই বিশ্বস্ত প্রচার খুব দ্রুতগতিতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ধনিকগণের প্রসাদ-প্রত্যাশী জীব গুলোর অভিধানে যে নেশন বা জাতির উল্লেখ আছে তার গণ্ডীর ভিতরে কৃষক ও শ্রমিকগণের কোনো স্থানই থাকে না। তাই, তারা জমীদার বা ধনিকগণের লাভকেই জাতীয় লাভ ব'লে মনে ক'রে থাকে।

তর্কস্থলে এদের কথা যদি মেনেও নেওয়া যায় অর্থাৎ ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কলওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা খেয়েই কেউ যদি ভারতের কাপড়ের কল-সমূহের শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে চায় তাতেই বা ক্ষতির কারণ কি আছে? ভারতের শ্রমিকগণ যদি সচেতন হয়ে ওঠে, যদি তারা ভালো খেতে, ভালো পরতে ও ভালো ঘরে বাস করতে চায় সেত লাভেরই কথা। জীবনকে উপভোগ করবার সকল বাসনাই যাদের বিলুপ্ত হয়েছে, শোষণ আর অত্যাচারের দ্বারা যা-দিগকে পশুত্বের সীমায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা যদি আজ তাদের অবস্থার বিপ্লব সাধন করতে চায় তাতে ত ভারতের জাতীয় লাভ ছাড়া ক্ষতির এতটুকুও সম্ভাবনা কোথাও নেই। ন্যাশন্যাল-ইণ্ডাষ্ট্রী বা জাতীয় শিল্প নষ্ট হওয়ার যে কথা বলা হয়ে থাকে তার মত ভূয়ো কথা ত আর কিছুই হতে পারে না। ভারতের কোনো ইণ্ডাষ্ট্রীকে কি আমরা জাতীয় ইণ্ডাষ্ট্রী ব'লে দাবী করতে পারি? জাতীয় রাষ্ট্র যদি স্থাপিত হয়, কল-কারখানা গুলির ওপরে যদি সে রাষ্ট্রের সমূহ শাসন স্থাপিত হয় তা-হলেই শুধু জাতীয় শিল্পের কথা উঠতে পারে। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার পরে তাতে যদি ভারতের জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই শাসন যদি সমস্ত বড় বড় কল-কারখানার পরিচালনা স্বহস্তে গ্রহণ করে তবেই কেবল মাত্র সে কারখানা গুলিকেই আমরা জাতীয় শিল্প ব'লে দাবী করতে পারব। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় শিল্প ব'লে কিছুই নেই। ভারতীয় ধনিকগণের মূলধনের দ্বারা পরিচালিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানই আমাদেরজাতীয় শিল্পাগার প্রতিষ্ঠান নয়। ভারতীয় শ্রমিকগণের রক্ত শোষণ ক'রে ক'রে ভারতীয় ধনিকগণের সম্পদ বাড়ানোকে যারা জাতীয় সম্পদ বাড়ানো বলে মনে করে তাদের মত দয়ার পাত্র বাস্তবিকই কেউ হতে পারে না।

সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল

"কৃষক ও শ্রমিকদল" (The Workers' and Peasants' Party) বাংলা, বোম্বে ও পাঞ্জাবে গঠিত হয়ে গেছে। মাদ্রাজেও চেষ্টা চলেছে এবং খুবই আশা করতে পারা যায় যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশসমূহেও এ দল শীঘ্রই গঠিত হয়ে যাবে। যুক্ত প্রদেশের "গোরক্ষপুর বিভাগীয় কৃষক ও শ্রমিক সভা"ও এই দলের সহযোগে ও কর্ম্মতালিকা অনুসারে কাজ করার ইচ্ছা জানিয়েছে। তাতেই, দলগুলিকে বিভিন্ন অবস্থায় না রেখে দিয়ে একই সূত্রে গ্রথিত করা এখন খুবই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এ উদ্দেশ্যে সকল দলের সভ্যদের নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হয়েছে। বোম্বে ও বাংলায় শ্রমিক দলগুলি মিলে [illegible] এই কমিটি এতদিন বিশেষ কিছু কাজ করতে পারে নি। শীঘ্রই কলিকাতায় এ কমিটির বৈঠক হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে সকল দলের একটা সম্মিলন কলিকাতায় হবে। এই সম্মিলনেই 'সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" (The Workers' and Peasants' Party of India) গঠিত হবে। "কৃষক ও শ্রমিকদল" জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটা বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপদ্ধতি নিয়েই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল"এর তৃতীয় কনফারেন্সে যে সকল প্রস্তাব ও কর্ম্মপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে সে সবই একসঙ্গে পুস্তকাকারে শীঘ্রই মুদ্রিত হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো এ সকল প্রস্তাব ও কর্ম্মপদ্ধতিতে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হয়েছে :—

(১) আমাদের রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা
(২) সংগঠন নীতি
(৩) শ্রমিক আন্দোলন
(৪) কৃষক আন্দোলন
(৫) যুব-আন্দোলন

ইংরেজী শিক্ষিত পাঠকগণ এ পুস্তক পাঠ করলেই "কৃষক ও শ্রমিকদল"এর কর্ম্মধারার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হতে পারবেন। পুস্তকের সারমর্ম্ম "গণবাণী"তেও প্রকাশিত হতে থাকবে।

পাটের কলের মজুরগণের জন্যে কি চাই ?

বাংলার পাটের কলগুলির মজুরের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪০ হাজার। এত বেশী মজুর বাংলার অন্য কোনো জিনিসের কারখানাতেই কাজ করে না। পাটের শিল্পই হচ্ছে বাংলার সব চেয়ে বড় শিল্প। শুধু তা নয়, পাটের কলের শরিকদারগণ যত বেশী লাভের অংশ পায় এত বেশী লাভের অংশ অন্য কোনো কারবারই কখনো দিতে পারে নি। লাভের অংশ অত্যন্ত বেশী মাত্রায় বিতরণ করা থেকে বুঝতে হবে যে পাটের কলের শ্রমিকগণ খুবই বেশীরূপে শোষিত হয়ে থাকে। কাজেই এ পাটকলগুলির মজুরগণকে তাদের শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্যে যে সঙ্ঘবদ্ধ করা উচিত এ বিষয়ে কারো মতভেদ নিশ্চয়ই থাকতে পারে না। এখন ঠিক করা দরকার কি ভাবে তা-দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ থেকে পাটের কলের মজুরগণের ইউনিয়ন গঠিত হচ্ছে। "বঙ্গীয় পাটকল সমিতি" (বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস্ এসোসিয়েশন) ১৯২৫ সনে গঠিত হয়েছে। এ ইউনিয়নটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা বাংলার পাটের কলের মজুরগণকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তোলা। কাঁকনাড়াতে আর একটি ইউনিয়নও আছে। এটি অবশ্য স্থানীয় ইউনিয়ন। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মঘট ভঙ্গকারী কে, সি, রায় চৌধুরীর সম্বন্ধ এ ইউনিয়নের সহিত রয়েছে। বাংলার গবর্ণরকে অভিনন্দন পত্রও এ ইউনিয়নই দিয়েছিল। এ ছাড়া আরো ক'টি 'নামকা ওয়াস্তে' ইউনিয়ন ছিল বটে, কিন্তু, সে সবের কোনটিরই অস্তিত্ব এখন আর নেই। সম্প্রতি চেঙ্গাইলে একটি নূতন ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। এ ইউনিয়নটি অবশ্য ভালো। গঠিত

হতে না হতেই ইউনিয়নটিকে প্রথম একবার ১৭ দিন ব্যাপি' ধর্ম্মঘট চালাতে হয়েছে। চেঙ্গাইলের দ্বিতীয় ধর্ম্মঘটের অবসানও সবে হয়েছে। ইউনিয়নের কয়েকজন সভ্য আগেও অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এখনো এর সেক্রেটারী বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হয়ে রয়েছেন। কাজেই চেঙ্গাইলের ইউনিয়নটি কাঁকনাড়ার মত লাট সাহেবের বন্দনাকারী ইউনিয়ন নয়। চেঙ্গাইল ইউনিয়ন গঠিত হওয়াতে গঙ্গার অপর পারের চটকল সমূহের মজুরদের মধ্যে একটা চেতনা ও চঞ্চলতারও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, এত সব সত্বেও আমাদিগকে বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে চটকলের মজুরগণের সংগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে না চালিয়ে একই জায়গা থেকে চালানো উচিত ছিল। এক একটা কারবারের জন্যে এক একটা বড় ইউনিয়ন করাই হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের মূল নীতি। একটি ইউনিয়নকে ডিঙিয়ে অপর একটি ইউনিয়ন গঠন করার বিরুদ্ধে "অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন্‌স কংগ্রেস"এর দিল্লী বৈঠকে প্রস্তাবও পাশ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সারা বাংলার জন্যে যে ইউনিয়ন পূর্ব্বেই গঠিত হয়েছে তার সহিত এক হয়ে মজুরদের যুদ্ধ চালানো চেঙ্গাইল ইউনিয়নের উচিত। শক্তিকে বিচ্ছিন্ন না করে একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা একান্তই আবশ্যক, বিশেষ ক'রে পাটকলের মজুরগণের পক্ষে। বাংলার যেখানে যত পাটের কল আছে সে সমুদায়ের মজুরগণ যদি একই সঙ্গে, একই [illegible] ধর্ম্মঘট না করে তা হ'লে তাদের ওপরে যত অত্যাচার [illegible] হচ্ছে সে সবের প্রতিকার কিছুতেই হবে না। [illegible] দাবিয়ে রাখার জন্যে কল-ওয়ালারা সকলে মিলে [illegible] সমিতি গঠন করেছে। তাদের সকল জোর, সকল [illegible] একই জায়গায় জমা হয়ে আছে। কাজেই মজুরদেরও উচিত একই জায়গায় তাদের শক্তি জমা করা। তা না করলে তারা কিছুতেই জোরের সহিত সংগ্রাম চালাতে পারবে না।

অবশ্য চেঙ্গাইল [illegible] যদি "বাঙ্গালার পাটকলের শ্রমিক সমিতি"র সহিত [illegible] হয় তা হলে সমিতির বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে কিছু উলট-পালট করতে হবে। আমাদের মতে [illegible] সমিতির কেন্দ্র-আফিস ভাটপাড়া থেকে কলিকাতায় [illegible] সঙ্গত কাজ হবে।

আটিয়ার কৃষকগণ

আটিয়া পরগণার [illegible] গ্রামের কৃষকগণকে পথে বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে এ সংবাদ [illegible] পাঠকগণ জানেন। জমীদারগণ সমাজের গায়ে পরগাছা স্বরূপ। কৃষকের গায়ের রক্ত যতই এই অকর্ম্মণ্য জীবগুলো শোষণ করছে ততই তাদের লোভ আরো বেড়ে যাচ্ছে। [illegible] জন্যে জমীদারী প্রথাকে তুলে দেওয়া একান্তই দরকার হয়ে পড়েছে। জমীদার চিরদিনই জমীদার অর্থাৎ কৃষকগণের [illegible] হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, নিষ্ঠুর হোক আর দয়াবান হোক—জমীদারের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষকগণকে যে কোনো [illegible] শোষণ করে আরামে থাকা। রোগী মরুক আর বাঁচুক [illegible] মোল্লার কিছুই এসে যায় না— সে সর্ব্বদাই চায় হালুয়া আর রুটি। কৃষক জাহান্নামে যা'ক আর যাই হোক, জমীদার চায় তার বিলাসিতা। আটিয়া পরগণার এই ১০৪ খানা গ্রামের লক্ষাধিক লোককে "রক্ষিত জঙ্গল" এর দরুণ যে ভিটে-বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে তার কথা কি গবর্ণমেণ্ট, কি জমীদার কেউই ভাবে নি। সন্তোষের রাজা, ঢাকার নওয়াব, গজনবী আর করটিয়ার চাঁদামিঞা প্রভৃতি হচ্ছেন এ সকল গ্রামের জমীদার। চাঁদামিঞা আবার এক সময়ে জাতীয় আন্দোলনের নেতাও ছিলেন। নন্‌-কো-অপারেশনের সময় কিছুকাল কয়েদও তিনি খেটেছেন। সম্প্রতি করটিয়ায় কলেজ আদি স্থাপিত করে দাতা নামেও তিনি খ্যাত হয়েছেন। এ সব সত্বেও আজ লক্ষ লোকের আবাস স্থল ঘোর জঙ্গলে পরিণত হতে চলেছে। দেশের কৃষকগণের জন্যে এখন ভাব্‌বার সময় এসেছে। তারা সকলে যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, একই স্বার্থের বন্ধনে যদি আপনাদিগকে আবদ্ধ তারা না করে তা হলে তাদের বেঁচে থাকা মুস্কিল হবে। আটিয়ার ১০৪ গ্রামের কৃষকদের ওপরে যে বিপদ এসেছে এ বিপদকে দেশের প্রত্যেক কৃষকেরই উচিত নিজের বিপদ মনে করা। এ [illegible] বিধানের বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করতে হবে। কৃষকদের নীরবে অত্যাচার সহ্য করা কিছুতেই উচিত নয়।

কোন পথে ?

—*—

(শ্রীরণজিৎকুমার বর্ম্মণ)

—*—

চল্লিশ বৎসরের বেশী কাল অতীত হ'ল ভারতে [illegible] আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। উদ্দেশ্য, স্বরাজ লাভ করা, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্বরাজের অর্থ বা তাহার স্বরূপ কি তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নি। কেহ বলছেন "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা," আর গান্ধী [illegible] কেহ কেহ "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন" ই আমাদের লক্ষ্য, এই বলে চীৎকার করছেন। এই সব দেখে মনে হয় আমাদের গোড়াতেই গলদ, এবং এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত জাতীয় সংগ্রাম কোনরূপ সাফল্য লাভ করতে পারছে না। আমাদের মুক্তি-পথ স্থির করবার পূর্ব্বে একটা বিষয়ে বেশ ভালরূপ বিচার প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে বর্ত্তমান জগতে শাসন পদ্ধতিতে কোন্ নীতি প্রধান এবং কোন নীতির বিরুদ্ধে আজ সারা বিশ্বময় আন্দোলন জাগ্রত হয়ে উঠেছে, আর স্বরাজের প্রয়োজনীয়তা আমাদের কোন দিক্ থেকে ?—এবং কি প্রক্রিয়া [illegible] আজ ভারতের জনসাধারণের এই বিজয় অভিযান [illegible] একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়—জনসাধারণ [illegible] সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে যেরূপে শোষিত (Exploited) হচ্ছে, এই জাগরণ সেই অত্যাচারিতের নির্য্যাতিতের, হৃদয় বিদারক শোষণের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লবাত্মক আত্ম-প্রকাশ। তারা চায় এখন মুক্তি এবং নিজের অধিকারে নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে। জন সমাজ গান্ধীজিকে এত উঁচুতে স্থান দিয়েছিল, গান্ধী কি [illegible] ভারতের আকাশ বাতাস কম্পিত করে বৃটিশ শোষণ [illegible] গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্বকে দোলায়মান করে তুলেছিল—[illegible] তিনি জন সাধারণের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, সকল অত্যাচার, দুঃখ, দৈন্যের বিরুদ্ধে বুক পেতে নূতন সাম্যের বাণী নিয়ে। সেই সময় বর্ত্তমান শোষণ নীতি হতে [illegible]

পাওয়ার চেষ্টা বিপুল ভাবে আত্ম প্রকাশ করেছিল। কিন্তু কালচক্রে গান্ধীজিও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অধিক দিন দণ্ডায়মান থাকতে না পেরে শেষে শোষণ নীতিকেই প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আসনও নীচে নেমে গেছে। সে শ্রদ্ধা, সে ভক্তি এখন অতীতের গর্ভে লীন হয়ে গেছে।

আধুনিক সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয়ে জনসাধারণের স্বার্থ, কতিপয় প্রবল, বৈদেশিক ও দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর কৌশলে বিপর্য্যস্ত। বৈদেশিক হো'ক, দেশীয় হোক ধনিক শ্রেণীর উপর সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক, কর্তৃত্ব না থেকে যদি জনসাধারণের হাতে থাকে, তবেই এই অশান্তির কোন কারণ থাকে না। কারণ বেশীর ভাগ লোক দ্বারা যাহা পরিচালিত তাহা গণ-সমাজের স্বার্থই সর্ব্বদা সংরক্ষিত ক'রে চলে।

সর্ব্বগ্রাসী শোষণের কবল হ'তে দেশকে মুক্ত করতে চাইলে, প্রথমই বৈদেশিক ও দেশীয় ধনিক দ্বারা পরিপোষিত, সংরক্ষিত বুরোক্রেটিক গভর্ণমেণ্ট জন সাধারণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। বুর্জোয়াগণ জানে জন সাধারণের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকলে তাদের আর শোষণ করা চলবে না, শোষণ তান্ত্রিক (Imperialist) গভর্ণমেণ্ট দমন নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আন্দোলনকে দাবাইয়া রাখে। শোষণের সহায়ক বলিয়াই বুর্জোয়াগণের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের প্রতি এত অনুরাগ, তারা ধন দিয়ে, জন দিয়ে, বাঁচিয়ে রাখে। এই নীতি শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এরূপে শোষণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের সহায়তায়, অল্প সংখ্যক এক শ্রেণীর লোক দ্বারা যুগে যুগে শোষিত হচ্ছে। সুতরাং যে গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় বুর্জোয়াগণ জন সমাজের সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকল সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে, সেই শাসননীতিকেই আমাদের সর্ব্ব প্রথম আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে। শোষণ তান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট দ্বারা দেশ পরিচালনা করা প্রয়োজন। এর জন্যই আজ সাধারণ সমাজ স্বরাজ স্বরাজ বলে আকুল হয়েছে, নিজেদের সকল বন্ধন দূর হয়ে যাবে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে ভেবে, অন্য কোন ভাবের কথায় তারা সাড়া দেয় না। কিন্তু এই ব'লে কেহ মনে করবেন না যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য শুধু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিদূরিত করা। বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের সাহায্যকারী বুর্জোয়াগণকেও সেই সঙ্গে বিনাশ করে দেশে সমহবাদ প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রকৃত সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠাই আন্দোলনের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য। পৃথিবীর অনেক দেশই স্বাধীন বটে, কিন্তু তাহাতে জন সাধারণের সুবিধা হয়নি মোটেই; পূর্ব্ববৎ এক শ্রেণীর লোক দ্বারা তারা শোষিতই হচ্ছে। এজন্য সর্ব্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নূতন সংগ্রাম চলেছে।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পাণ্ডাদের কারো কারো ভাব দেখে মনে হয়, তাঁরা চান বৈদেশিক বুর্জোয়াদের হাত থেকে নিজেদের হাতে শাসন ক্ষমতা এনে, খুব সুশৃঙ্খলায় ও নির্ব্বিবাদে আপন আপন ইচ্ছানুসারে জনসাধারণকে সম্যক্ ভাবে স্বাধীনতার নামে শোষণ করতে। অবশ্য তাদের পক্ষে ইহা খুব স্বাভাবিক। এ চাল বাজিতে জনসাধারণ হয়ত, ভাবপ্রবণ কথায় আকৃষ্ট হয়ে দুদিন হুজুকে মেতে যাবে, কিন্তু যখন তাদের স্বার্থে পদে পদে পূর্ব্ববৎ আঘাত লাগবে, তখন আবার তাদেরি মনে বিদ্রোহ বহ্নি জলে উঠবে। এ আন্দোলন দমন করা সম্ভবপর নয়। কেননা, তাদেরই যে সব শক্তি, সম্বল বলতে যা কিছু।

অনেকের মত, ধনিকদের প্রতি দরিদ্রের অসন্তোষ চিরকালই চলে আসছে এবং থাকবেই। এ যুগের সঙ্গে ইহার তাহলে স্বীকার্য যে শোষক ও শোষিতের মধ্যে এ শোষণের দ্বারা অনিবার্য্য সংগ্রাম অবশ্য হয়েছে। কারণ যে কোন প্রাণীকে দাবিয়ে রাখতে যতই না কেন চেষ্টা করুন, কৌশল করুন, সে মাথা উত্তোলন একদিন করবেই, ইহা মানবের স্বাভাবিক স্বভাব-জাত ধর্ম। শোষিত সমাজ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে যুগ যুগান্তর ধরে এরূপ যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছে, তা-ই ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রাম (Class struggle) নামে অভিহিত। এই শ্রেণী সংগ্রাম (শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম) কেহ আনয়ন করেনি, এটা স্বতঃ স্ফূর্ত। যেদিন থেকে ধনিক শ্রেণী দ্বারা নিঃস্ব, সর্ব্বহারা, আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকারে শোষিত হতে চলেছে, সেইদিন থেকেই ইহার সৃষ্টি। যে হেতু এটা ব্যক্তি বিশেষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন আন্দোলন নয়, সেই হেতু কোন বিশিষ্ট সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষ ইহার গতি হ্রাসও করতে সক্ষম হবেন না। আপনার গতিতে ইহা পরিস্ফুট হয়ে, সকল শ্রেণীর নিপ্যাতিতের মনেই প্রভাব বিস্তার ক'রে নূতন আশায়, উদ্দীপনায় সর্ব্বহারাদের জীবনকে কর্ম্মশীল ক'রে তুলবে। যুক্তির দিক দিয়ে বিচার করলেও এই নীতি বেশ বুঝা যায়।

সকলকে উপযুক্ত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে কেহ একত্র সংগৃহীত ক'রেই বড় লোক। শ্রমিক নিজের শ্রম-শক্তির বিনিময়ে যে জিনিস উৎপাদন করে সেই সমুদায় হ'তে লভ্যাংশ দ্বারাই বণিকের মূলধন বৃদ্ধি পায়। কৃষক রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শস্য উৎপন্ন করে থাকে। জমিদার, যে কখনও মাঠেই হয়তঃ আসে নাই, প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বসে সেই শস্য ভোগ ক'রছে। সোজা কথায় বলতে হলে যারা সকল জিনিস উৎপন্ন করে নিজের শ্রম-শক্তি দ্বারা তাহা যদি ভোগ না করতে পারে, পরন্তু তাহার শ্রমশক্তি ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে, তবে যে সম্প্রদায়, নিজের কৌশল, বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগে তাহাদিগকে বঞ্চিত ক'রছে তাদের প্রতি মানসিক 'অসন্তুষ্টি' অত্যন্ত স্বাভাবিক। এটাই ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে সংগ্রামে পরিণত হয়। এই শ্রেণী-সংগ্রাম রাশিয়ায় নূতন জীবন সৃষ্টি করেছে। এই মনোভাব থেকেই পৃথিবীর সকল দেশে সর্ব্বহারাদের জাগরণের আন্দোলন খুব জোরে চলেছে।

দেশে ও সমাজে শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা আনয়ন করতে হলে, জনসাধারণকে অর্থাৎ শতকরা ৯৮ জনের উপর শাসন ক্ষমতা দিতে হবে। তা হ'লেই উৎপাদক শক্তি, তার নিজ নিজ স্বার্থ অর্থাৎ শ্রম বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য পাবে। আর যারা পরিশ্রম অথবা উৎপন্ন করে না, অথচ ভোগ করে,—তাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে। আমাদের নেতৃবৃন্দ অনেকেই এই গণ-উত্থানকে মোটেই আমল দেন না। কারণ, তাহলে নিজের ধনিক মনোবৃত্তি ও সংস্কারে আঘাত পড়ে এবং স্বার্থ রক্ষা হয় না। আমাদের দুঃখের যাহা মূল কারণ তাহা নষ্ট না করে (সমাজ হতে সকল প্রকার শোষণ-নীতি দূর না করে) কতিপয় বৈদেশিক বুর্জোয়ার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে দেশীয়দের হাতে

দিলে প্রকৃত লাভ আমাদের কিছুই হ'বে না। জনসাধারণের পক্ষে যা ক্ষতিকর, তাই জাতির পক্ষে অনিষ্টকারী বলে বিবেচিত হয়। কারণ জনসাধারণকে নিয়েই জাতির অস্তিত্ব; জাতি বলতে অন্য কোন পৃথক সত্তা নাই। কংগ্রেস আন্দোলনে জনসাধারণ প্রকৃত রূপে আজও সাড়া দেয় নি; কারণ নেতৃবৃন্দের সেই দিকে চেষ্টা মোটেই নেই এবং যাতে জনগণের বাস্তব জগতে প্রকৃত শান্তি আসে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান রাজনীতি, সেই অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং তথাকথিত নেতৃবৃন্দের অবলম্বিত নীতির অনেকগুলিই গণ-স্বার্থের 'প্রতিক্রিয়া শীল'। তবে ইহা ঠিক যে গণ-শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে শনৈঃ শনৈঃ জাগ্রত হ'য়ে উঠছে। তারই কিঞ্চিৎ আভায অধুনা যে সব ধর্ম্মঘট সংগঠিত হচ্ছে, তাতে পাওয়া যায়। শ্রমিক ও কৃষকের আত্মস্বার্থ-চেতনার লক্ষণ টাঙ্গাইল ও যশোহর জেলায়ও কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাচ্ছে। যা হউক, নেতৃবৃন্দের সব দিকে চিন্তা করে দেখা উচিত, যে স্বাধীনতা গণ-স্বার্থ-রক্ষা করে চলবে না, তা কিসের উপর ভিত্তি স্থাপন ক'রে অধিক দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে?

কাজেই একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যই জন সমাজকে আত্ম-স্বার্থ বিষয়ে সচেতন করে তোলা, তাদের 'সর্ব্বহারা' হওয়ার কারণ বুঝিয়ে দিয়ে; ধ্বংস নীতির বিরুদ্ধে [illegible] চিত্ত 'বিদ্রোহাত্মক' করে দেওয়া। 'Mass Conciousness' যখন এসে যাবে তখন আমাদের 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা' [illegible] হবে না। তারাই নিজের পথ পরিষ্কার করে [illegible] যাতে সমাজে তাদের আপন আপন অধিকার ন্যায় [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন শুধু চাই সকল দিকে সকল [illegible] ও নিম্নমধ্য শ্রেণীর লোক দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলা। [illegible] তাদেরে ছেড়ে 'জনসাধারণের' স্বরাজ আসবে না। [illegible] বুর্জোয়াদের নূতন শোষণ-নীতিই 'স্বাধীনতার' নামে গরীবের রক্ত পান করবে।

কতকগুলি যুক্তি [illegible] বাণী 'খদ্দর' 'চরকা' ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করলে [illegible] কাজ হয় না। নিজের ধনিক মনোবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে জন-সমাজের সহিত মিশতে হবে, সাম্যের বাণী শুনাতে হবে, অধিকার তাদের দিতে হবে। [illegible] সমাজের দ্বারা স্বাধীনতা আনয়ন করাটা [illegible] ভাবেন না—শুধু অধিকার ছেড়ে দিতেই রাজী নন। [illegible] এই ভাব দূর করতে হবে। গণ-সমাজ যখন আপন সঙ্ঘ-শক্তিতে আস্থাবান হয়ে, 'আত্ম-স্বার্থ জ্ঞানে' আন্দোলনকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবে তখনই গণ-তান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। এই গণ-তান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য কোন [illegible] গণ-স্বার্থ রক্ষা করবে না। সুতরাং জাতির স্বার্থও রক্ষা হবে না।

[illegible] শ্রেণীতান্ত্রিক [illegible] সাহায্যে বর্ত্তমানে যে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক নিয়মে শোষণ চলেছে, তাহা দূর করে নূতন সমাজনীতি, যা উৎপাদক শক্তি অর্থাৎ সর্ব্বহারাদের স্বার্থ বিশেষ ভাবে রক্ষা করবে, তাহা প্রবর্ত্তিত হয়ে সমগ্র জাতির সহিত সকল [illegible] সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং উৎপাদক শক্তি সকল জাতির কেন্দ্রশক্তি স্বরূপ পরিচালনা ভার গ্রহণ করবে। যাঁরা রাজনীতিকে সমাজনীতি থেকে ভিন্ন ভেবে অগ্রসর হতে চান, তাঁরা ভাবপ্রবণ কথায় দেশকে ক্ষণিকভাবে মাতাতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী কখনও হবে না, 'রাজনীতিকে' 'অর্থ ও সমাজনীতি'র উপরই ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। যাঁরা আধুনিক জগতের রাজনীতি বিষয়ে চিন্তা করেন, তাঁরা এই গণ-আন্দোলনকে গ্রহণ করতে বাধ্য। গণশক্তিই দেশের প্রাণশক্তি! যাঁরা প্রকৃত দেশের ও সমাজের হিত চান, ধনিকদের শোষণ হতে গণ সমাজকে রক্ষা করতে চান—তাঁরা প্রাণপণে এই গণ-আন্দোলনকে আঁকড়ে ধরুন। এটাই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়ার একমাত্র পথ। বিপ্লবের অগ্রদূত হলে জনগণ, সুতরাং এদের সঙ্ঘশক্তিই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

স্বদেশ জননীর চরণে উৎসর্গীকৃত বন্ধুগণ! একবার ধনিক মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে নির্য্যাতিত ভাইদেরে বুকে ধরে নিতে এস, তাদের পাশে দাঁড়াও! তবেই তোমাদের সাধনা জয়যুক্ত হবে!!

জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য *

—০:*:০—

(আর, পাল, দত্ত)

—*—

"স্বরাজ" কি?

ইহা খুবই সত্য কথা যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তার দায়িত্বশীল নেতাদের দ্বারা "স্বরাজের" কোন সহজ বা সাধারণ সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নি। "স্বরাজের" ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না, "স্বরাজ" এক ব্যাখ্যাতীত রহস্য (indefinable mystery)। ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে মিঃ সি, আর, দাশ এই ভাবটাই ব্যক্ত করেছেন:—

"স্বরাজ" কি, এই প্রশ্নটী অনেক বারই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। স্বরাজের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, ইহা কোনো বিশেষ শাসন-প্রণালী নয়। "স্বরাজ"—জাতীয় মনের স্বাভাবিক প্রকাশ, এবং আবশ্যকতই ইহা জাতীয় সমগ্র ইতিহাসকে ব্যাপ্ত করে আছে।"

কিন্তু "স্বরাজ" যদি এক অব্যাখ্যাত রহস্য হয়, তবে কেন নিজেদের অগ্রণী হ'য়ে আসা, এবং ইহার জন্য লাখো জনকে সংগ্রাম করতে আহ্বান করা? যা তাদের কাছে একেবারে অর্থশূন্য, এমন অপ্রকট রহস্যের জন্য জন-সাধারণ কোনদিনই সংগ্রামে লিপ্ত হ'বে না। ভারতের লোক-সাধারণ প্রকৃত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে,—যদিও আজো তারা পথের সন্ধান করছে। সম্মুখের চলা-পথ স্পষ্ট দেখিয়ে দেওয়াই নেতৃত্বের কাজ—অস্পষ্ট রহস্যের কথা বলা নয়।

জাতীয় সংগ্রাম ভারতময় এক শক্তিশালী আন্দোলন হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলন আজ পর্য্যন্ত তার কার্য্যতালিকা, লক্ষ্য ও পরিচালনা বিষয়ে অনেকটা গোলমেলে হ'য়ে আছে। কাজেই, সিদ্ধিতে পৌছতে তাকে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে। এই সকল বাধা বিঘ্ন দূরীকরণ,

* এ নিবন্ধ মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব পাসের যে প্রহসন হয়েছিল তার অনেক আগেকার লেখা।

(সম্পাদক, 'গণবাণী')।

আর সম্মুখের পথ নিশ্মুক্ত ক'রে দেওয়াই বর্ত্তমানে এই সমবেত জনগণের আন্দোলনের জন্ম কর্ত্তব্য কাজ, আর এই কাজের জন্ম প্রথম প্রয়োজন—লক্ষ্য বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া।"

শোষণবাদ মূলক আধিপত্য থেকে মুক্তি

এই পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ও স্বীকৃত যে, জাতীয় সংগ্রাম শোষণ-বাদ মূলক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম।

কিন্তু, কেন? কি জন্ম? শোষণ তান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে কেন?—ইহার উত্তরের ওপরই নির্ভর করে উদ্দেশ্য বিষয়ের অপ্রচ্ছন্নতা।

শোষণ বাদ মূলক কর্তৃত্ব ভারতীয় অধিবাসীদের শত্রু। কেননা ইহা বিদেশীয় শোষক শ্রেণীর শাসন বটে। ভারতীয়দের বিকাশ পথে ইহা এক অন্তরায়, ইহা তা দিগকে সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক বিষয়ে অধীন করে রাখে এবং নিজের লাভের কাজে লাগায়।

কৃষকের পক্ষে এই শোষণ তান্ত্রিক শাসন কেবল মাত্র শুল্ক করই নয়, সেই শক্তিও বটে, যা তাদেরে শাসনাধীন ক'রে রাখছে, যা তাদের শোষণকারীদের দাসত্বে বজায় রাখতে গিয়ে আইন-শাসন ব্যবস্থা আর সশস্ত্র শক্তির ব্যবহার ক'রে থাকে, যা তাদের ভূমি অধিকারের সময় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে। নগরের শ্রমিকদের শোষণ তান্ত্রিক প্রভুত্ব বন্দুক ও জল কুণ্ডাকৃতি যুক্ত শত্রু রূপে দেখা দেয়, সে যখন ধর্ম্মঘট ক'রে তখন এ সকলকে তার পথে আপতিত হ'তে দেওয়া হয়; এবং রাষ্ট্রের সকল সংহতি তার নিয়োগ কর্তার সাহায্যার্থে থাকে। কেরানী এবং ছোট খাটো ব্যবসায়ীর সামনে শোষণবাদ মূলক শাসন দেখা দেয় বর্ণ ভেদ আর অসমতা রূপে যা তাকে দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে নামে যেতে পারে, তার, জীবনের প্রয়োজনীয় ক্রীত জিনিসাদির ওপর ধার্য্য শুল্ক কর রূপে, এবং শাসক শ্রেণীর চাকুরী ও পদ মর্য্যাদা রক্ষা রূপে। এমন কি, ভারতের ধনিকদের কাছেও শোষণ তান্ত্রিক শাসনের অর্থ—নিম্ন পদে ভুক্ত করা, শিল্প প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রনাতীত বিধি নিষেধ দ্বারা প্রতিহত করা এবং রাজস্ব ও শাসন বিভাগীয় শক্তি সাহায্যে শোষণ বাদী পুঁজিবাদিদের দ্বারা লাভের সবটুকু মন্থন করে নেওয়া। এই প্রকার সাম্রাজ্য বাদ মূলক শাসন এই সকল বিভিন্ন স্তরের মানুষের সামনে শত্রু রূপে উপস্থাপিত রয়েছে। এ'কে শত্রু আখ্যাত করা হচ্ছে এই কারণে যে ইহাই শোষণের প্রধান অস্ত্র ও সহায়। সাম্রাজ্যবাদ শোষণ বাদেরই অন্যরূপ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শোষণবাদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম বটে।

যখন ভারতের জন সংঘ সামাজিক মুক্তি লাভের দিকে অগ্রসর হ'বার সন্ধান দেখে, তখন তা'রা দেখে যে বৃটীশের শাসন-তন্ত্র তাদের সে-পথ রোধ ক'রে আছে। কাজেই তা'রা মনে ভাবতে বাধ্য হয় যে বৃটীশ সরকার তা'দের সাক্ষাৎ শত্রু এবং সামাজিক স্বাধীনতার দিকে যাতে করে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে, তার জন্য সর্ব্বাগ্রে শত্রুকে পরাভূত করা কর্ত্তব্য।

ভারতের জন মণ্ডলীর পক্ষে সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম সহজ ভাবে সামাজিক মুক্তির দিকে ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামেরই অংশ বিশেষ। এই ক'রে জাতীয় সংগ্রাম হ'য়েছে সামাজিক সংগ্রামেরই অংশ স্বরূপ।

এ হেন জাতীয় সংগ্রামের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে হ'লে ভারতীয় জনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য সাম্রাজ্যবাদ মূলক শাসনের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। এর চাইতে স্বল্প কোনো কিছুই সাম্রাজ্যবাদ মূলক প্রভুত্বকে অপসারিত করতে সক্ষম হ'বে না।

সুতরাং জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য—সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসন বা সম্পর্ক থেকে অখণ্ড মুক্তি লাভ।

(২) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ভ্রান্ত যুক্তি

সাম্রাজ্যবাদ মূলক আধিপত্য থেকে এই মুক্তি কি শান্ত ভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সন্ধি বা আপোষ ক'রে অর্জ্জন করা যেতে পারে—যেমন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অনেক পরি কল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছে?

না। ইহা যখন একবার প্রকট হ'য়েছে যে প্রকৃত সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ মূলক শোষণের বিরুদ্ধে, তখন ইহা সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্কই মুক্তি এনে দিতে পারবে না। ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের একরূপ অংশভাগী হ'তে মত দেবেন, এবং তা'কেই "স্বাধীনতা" ব'লে আখ্যাত করবেন কিন্তু ভারতীয় জাতির পক্ষে তা' আদৌ "স্বাধীনতা" ব'লে গণ্য হ'বে না। শাসন সংস্কারের কোনো পরিবর্ত্তন হয়ত হ'তে পারে—যা সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে নাম মাত্র স্বায়ত্ত শাসন সম্ভব করবে, কিন্তু ইহা সাম্রাজ্যবাদ মূলক শোষণ প্রক্রিয়াকে আগের চাইতে অধিকতর দৃঢ়ীভূত ক'রে তুলবে। এ ধারণা একেবারে অলীক। বস্তুতঃ আজকাল ভারতের নীতি ও অবস্থাসমূহের প্রকৃষ্ট বিশ্লেষণের পূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহাই প্রতিপন্ন করা যে এ ধরণের অবস্থা প্রাপ্তি হ'চ্ছে বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদ মূলক নীতির লক্ষ্য।

ভারতীয় জাতির উদ্দেশ্য হ'বে—পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। এমন অনেক (শুধু বৃটীশ নহে, ভারতীয়ও) আছেন, যাঁরা ব'লে থাকেন যে ভারতবর্ষীয়েরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের অনুপযোগী। নিজেদেরে শাসন করবার মতন কোনো অভিজ্ঞতা তা'দের নেই, তা'দের জন্য আরো কিছুদিন বৃটীশ শাসক-বৃন্দের অভিভাবকত্ব আবশ্যক। কিন্তু ইহার অর্থ শোষণকেই গ্রহণ এবং দীর্ঘস্থায়ী করা। একবার ইহা উপলব্ধ হ'য়েছে যে সাম্রাজ্যবাদ অভিভাবকত্ব নয়, পরন্তু শোষণ-বাদ বটে; তা হ'লে শোষকদের দ্বারা সংস্কারিত এই অসত্য যুক্তি তর্ক সমগ্র ভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যায়, এবং ইহা সুস্পষ্ট যে যে দিনই ভারতবর্ষীয়েরা নিজেদিগকে শাসন করতে শুধু শিখতে আরম্ভ করবে—যেদিন তা'রা শোষক বর্গের কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে।

এই গোছের আর একটা তর্ক এই যে, বৃটীশ সাম্রাজ্য-বাদের নাগ পাস ছিন্ন করার প্রস্তাব নিরর্থক, কেননা যখনই ইহা অপ-সারিত হ'য়ে যাবে, তখনই আর কোনো না কোনো সাম্রাজ্য বাদী শক্তি এসে সে স্থান অধিকার করবে। এইটা একজন গৃহ-স্বামীর তর্কেরই মতন যখন সে এই ব'লে তর্ক ক'রে যে, একজন ধন লুণ্ঠনকারী দস্যুর বিরুদ্ধে একটা আঙ্গুল হেলানও বৃথা। কেননা, যদি বা আজ উপস্থিত দস্যুকে তাড়ানো হয়, তথাপি কল্য আর একজন দস্যু আসবে এবং ধন লুটে নিয়ে যাবে। ইহা এই ধরণের তর্ক যে—অদ্য আহার নিরর্থক কেননা কল্য আবার ক্ষুধা পাবে। এই সকল যুক্তি সত্যই বিসদৃশ। যদি আমরা অদ্য আহার করি, তবে কল্য আহার গ্রহণে অধিক সমর্থ হ'বো। যদি গৃহস্বামী অদ্য দস্যুকে তাড়িয়ে দেয়, তবে অন্যান্য দস্যুরা

তার বাটীতে পুনরায় আসবার পূর্ব্বে খুবই ইতস্ততঃ করবে। এবং যদি ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান বৃটীশের সাম্রাজ্য-বাদ মূলক আধিপত্যকে অপহৃত করবার মতন শক্তি-ধর হয়, তবে সেই বিজয়ের পরে ইহা খুব অস্বাভাবিক যে—আর কোনো সাম্রাজ্য-বাদী তাদের শাসনাধীন করবার মতন উপযুক্ত শক্তিশালী হ'বে।

বুর্জ্জুয়াদের একদল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন অর্থাৎ তথাকথিত সাম্রাজ্যাধীন স্বরাজ সমর্থন করছে। এই সমর্থন ব্যাপার সোজা কথায় শ্রেণী-স্বার্থ, মুক্ত ভারতে সুখ সুবিধা হারায় এই ভয়, আর বৃটীশ বুর্জ্জুয়াজির ভাগী হবার লোভ, এই সবের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সাম্রাজ্য-তান্ত্রিক কুটুম্বিতার সমর্থনকারী নেতাদের বিবরণ সমূহ বিচার করে দেখলে এ কথাই প্রমাণিত হ'বে; এবং দেখা যাবে যে ভারতীয় জাতির পক্ষে যা অকাট্য তাকে বিসর্জ্জন দেবার মতো কোনো যুক্তি তাদের নেই। এখানে দু'জন লব্ধ প্রতিষ্ঠ নেতা—গন্ধী ও দাশের বিবৃত মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বেলগাম কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে মিঃ গন্ধীর অভিমত এমন তর বিবৃত হ'য়েছে :—

"উপরি-উক্ত পাণ্ডুলিপি, সসম্মানে ও সমান শর্ত্তে বৃটীশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার কথা কল্পনা করছে। কিন্তু আমি খুব জানি যে কংগ্রেসের ভিতরে এমন একদল লোক রয়েছেন, যারা যে কোনো অবস্থাতেই পূর্ণ স্বাধীনতা চাচ্ছেন। তারা শাসন ব্যাপারে এমনকি সমান সমান ভাগও নিতে চাহেন না। আমার মতে, বৃটীশ সরকার যদি কথা মতো খাটী কাজ করে, এবং আমাদের সমানাধিকারের পথে বাস্তবিক সহায়তা করে তবে বৃটীশের সম্পর্ক একেবারে ত্যাগের চাইতে পূর্ব্বোক্ত মত বজায় রাখাই হ'বে বড় গৌরবের কাজ। সুতরাং আমি বৃটীশের সাম্রাজ্যাধীনের স্বরাজ লাভেরই প্রচেষ্টা দেখ্‌বো।"

এই উক্তিতে কোনো যুক্তি স্থান পায় নি। আগেকার গণ-আন্দোলনের দিনের অভিভাষণ-সমূহে গান্ধী বৃটীশ রাজ্যকে "শয়তানের রাজ্য" অভিহিত করেছেন। তিনি আজকের দিনে সেই শয়তানের সাথে শুধু সসম্মান সহযোগ চান না, সেই শয়তান আমাদেরে সাম্যের পথে তুলে নেবে এমন প্রত্যাশা ও তিনি করেন। তার এই দারুণ সঙ্কীর্ণতা, বিরুদ্ধ প্রবল "শক্তির" কাছে আত্ম-সমর্পণের বহিঃপ্রকাশ। আমাদের সেই সমূহ শক্তির প্রকৃতি বুঝবার জন্যে আর কোথাও দেখ্‌তে হ'বে।

যখন মিঃ দাশের ফরিদপুরের ১৯২৫ সালের মে মাসের অভিভাষণ খুলি, তখন এ বিষয়ে আমাদের এই বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হ'য়ে ওঠে। এইখানে শুধু ভারতের নয়, নিখিল জগতের সাম্রাজ্য-বাদের বেদ বাক্য সহজ ভাষায় বিবৃত রয়েছে :—

"অনেক সুখ সুবিধার স্পষ্ট চৈতন্য লাভ সাম্রাজ্যে ঘটে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আজ আর কোনো মতেই পরাধীনতা নয়। সোজা কথা, যারা লৌকিক সুবিধা লাভের খাতিরে সাম্রাজ্যের এক অংশ ভুক্ত হয়ে আছেন, তাঁদের স্বীকৃতি মতে আজকাল কার দিনে সহযোগের সত্যতার ব্যাখ্যা মতে এ হচ্ছে সন্ধি-স্থাপন। বর্ত্তমান অবস্থায় কোনো জাতিই স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিক্‌তে পারে না। এবং যেহেতু বৃটীশ সাম্রাজ্য-স্বরূপ জাতি-সমূহের সুবৃহৎ Commonwealth গঠন দ্বারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রত্যেক দেশখণ্ডকে পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে, প্রত্যেক দেশ-খণ্ডই নিজেদেরে উপলব্ধি করবার, প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণাবয়ব ক'রে গড়ে' তুল্‌বার ক্ষমতা রাখে, এবং কাজেই আমার বিবরণানুযায়ী সব কিছু অংশ কার্য্যতঃ অঙ্গীভূত ও প্রকাশ ক'রে থাকে। আমার কাছে এই ধারণা এর গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয়। আমি বিশ্ব-শান্তিতে, বিশ্বের চরম মৈত্রী-তন্ত্রে (ultimate federation of the world) আস্থাবান; এবং আমি বিশ্বাস করি যে, বৃটীশ সাম্রাজ্য নামীয় সমূহ-জাতির বিরাট federation যদি রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞ নেতাদের দ্বারা ঠিক পথে পরিচালিত হয়, তবে মানুষের ধারণাতীত সেই বৃহত্তম federation এ তাকে রূপান্তরিত করা যেতে পারে—যা হ'বে বিশ্ব মানবের মৈত্রীবাদ মূলক রাষ্ট্র; এবং তা' দ্বারা জগতের সেই মহা সমস্যার সমাধান হ'তে পারে।"

(—Bombay Chronicle. 4th April. 1925.)

এই উক্তি সাম্রাজ্য-তন্ত্রের জীবন্ত উক্তি আর কিছু নয়। *বক্তা হ'তে চান সাম্রাজ্যের অংশগ্রাহী. যা এনে দেবে বৈষয়িক আনুকূল্য। (কিন্তু কাকে? যাদের দারিদ্র্য ও শোষণ থেকে সাম্রাজ্যের বস্তুগত সুযোগ (material advantage) লাভ ঘটে' সেই হাজার হাজার শ্রমজীবি ভারতবাসীকে নয়, কিন্তু তা মাত্র মুষ্টিমেয় ধনিকদেরে—যারা বৃটীশ সাম্রাজ্য-বাদের লাভের ভাগ নিতে চাইবে।)* জগৎ—জোড়া দাস জাতিদের ওপর ভিত্তি পত্তন ক'রে বৃটীশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার দিকে মোটেই দৃষ্টি না দিয়ে তিনি সে সাম্রাজ্যের সকল জাতির Commonwealth এই সাধারণ ও সমুদার আখ্যা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তিনি সাম্রাজ্যের মাঝে আবিষ্কার করেছেন এক "গভীর আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত" তিনি বৃটীশ সাম্রাজ্যে দেখ্‌তে আশা করে "বিশ্ব মানবের মৈত্রী-তন্ত্রের পথ"।

এই সকল তর্কের অর্থ কি? বক্তা সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক বিকাশের সমর্থন করেন, কারণ—

(১) ইহা "বস্তুগত সুবিধা" এনে দেয়

(২) ইহা "পূর্ণ স্বাধীনতা" প্রদান করে

(৩) ইহা বক্তার ঈপ্সিত "স্বরাজের" সত্বর লাভের আয়োজন করে; এই তিনটী যুক্তি সোজা কথায় দাঁড়ায়—

(১) শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জ্জুয়ার সঙ্গে দুর্ব্বল ভারতীয় বুর্জ্জুয়ার সন্ধির অর্থ—শেষোক্তের বৈষয়িক সুবিধা।

(২) সাম্রাজ্যের সৈন্য-বাহিনী ও নৌ-বিভাগ তাদিগকে ভারতের সংঘ হ'তে ক্রমাগত রক্ষা দ্বারা এই সন্ধিই ভিতরের ও বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ আশ্রয় দান করবে।

(৩) ফলতঃ, বক্তা যে সীমা নির্দ্দেশ করেছেন, স্বরাজের তা ডিঙিয়ে যাওয়ার অর্থাৎ জনসংঘের সামাজিক মুক্তির দিকে এগোবার আশঙ্কা মোটেই থাক্‌বে না।

এ কয়টী, সাম্রাজ্য বাদ মূলক সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে ভারতীয় বুর্জ্জুয়াদের মোটামুটি যুক্তি। কিন্তু ভারতীয় জনগণের পক্ষে, এই সকল যুক্তি বিরুদ্ধ ফল প্রসূই হ'বে। সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সম্বন্ধ থেকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী যে লাভ ও নির্ভিরতা পেতে চান, তার অর্থ ভারতের জনগণের দাসত্বের দীর্ঘস্থায়ীতা।

পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই কেন ভারতীয় জাতির লক্ষ্য হ'বে, তা'র পক্ষের কারণগুলোকে বুর্জ্জুয়াদের এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যেতে পারে :—

(১) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—যাতে তখন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর চরম কর্ত্তৃত্ব থেকে' যায়, তা কোনো কালেই জাতীয় মুক্তি দান করতে পারে না। সব সময়েই তথা কথিত স্বায়ত্তশাসন-যন্ত্রের অন্তরালে বৃটীশ শক্তির বাস্তবতা গ'ড়ে তুল্‌তে ও অনধিকারে চেপে' দিতে পারবে ভেবে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় বুর্জ্জুয়াদের হাতে আস্তে আস্তে (যত আস্তে হোক্) শাসন-যন্ত্র ছেড়ে' দিতে প্রস্তুত। স্বায়ত্ত-শাসন-যন্ত্রের আড়ালে থেকে' সাম্রাজ্যবাদ শক্তির যে বাস্তব সত্তা গড়ে' তোলে তা' তার পেছনস্থিত সৈন্যশক্তির অনুমোদন মতে বাণিজ্য-বিষয়ক ও অর্থ-বিষয়ক বটে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সোজা কথায় সাম্রাজ্যবাদেরই অত্যন্ত অগ্রসর রূপের প্রকাশ।

(২) সাম্রাজ্যতন্ত্র শান্তি রক্ষা যন্ত্র নয়, হ'তে পারে না। লেনীন তাঁর পুস্তকে এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে সাম্রাজ্য-বাদকে আর্থিক মূল-ধনের প্রসার-নীতি বলা হ'য়েছে, এবং এই নীতি পরাধীন দাস জাতিদের বিরুদ্ধে ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে চরম ও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ-শীল হিংসা ও সংগ্রাম ব্যতিরেকে প্রতিপালিত হ'তে পারে না। সার্ব্বভৌমিক শাসনকে বিশ্ব-মৈত্রীবাদ শান্তির হেতু বল্‌তে গেলে ১৯১৪—১৯১৮ সালের সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতি-মূলক যুদ্ধের প্রতি পূর্ণ অন্ধতা দেখাতে হয়, সাম্রাজ্যবাদ অবিনশ্বর হ'য়ে থাকলে সে যুদ্ধ বিরাটতর চেহারা নিয়ে পুনর্ব্বার দেখা দিতে বাধ্য হ'বে। শান্তি ও আশ্রয়ের গ্যারান্টি দিয়ে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ক'রে রাখার মানে—ভারতকে ভবিষ্যতের ভীষণতর যুদ্ধে জড়িত থাকতে গ্যারান্টি দিয়ে রাখা।

(৩) ভারতের বাইরের অনেক পরাধীন জাতি জগৎ জুড়ে' সাম্রাজ্য-শাসনের অধীন হ'য়ে আছে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের সুবিধামূলক অবস্থায় উন্নীত হ'বার জন্যে ভারতের আকাঙ্ক্ষা মানে—দাস জাতিদেরে অধীন ক'রে রাখার কাজে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের সাথে ভাগী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বই আর কিছু নয়। সাম্রাজ্য-প্রসার-নীতিকে যেমন ধনিক-বাদ মূলক অভিব্যক্তির একটা বিশেষ স্তরের বহিরাস্তব ব'লে মনে হয়, তেমনি একটা বিশেষ অবস্থায় এসে' মনে হ'বে—ভারতীয় বুর্জ্জুয়াদের এমনতর উদ্দেশ্য খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ইহা হ'বে জাতি-ভারতের জন-সাধারণের এক অভাবনীয় অবস্থা।

পূর্ণ স্বাধীনতা যা জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য, তার আবশ্যকতা সুস্পষ্ট ক'রে দেখাবার জন্যে প্রদত্ত কারণগুলো নিশ্চয় পর্য্যাপ্ত হ'য়েছে।

বাস্তবতার দিক দিয়ে ভারতের লোকমতের পূর্ণঝোঁক ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হ'য়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সম্বন্ধ সমর্থনকারী ভারতীয় বুর্জ্জুয়াদের শঙ্কিত হওয়া থেকেই এ কথার সত্যতা স্বীকৃত হচ্ছে। ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটী প্রেসিডেন্ট মিঃ আচারিয়ারের ১৯২৪ সালের অভিভাষণ থেকে একটা সুন্দর উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :—

"ভারতে এমন একটা প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় আছে, যাঁরা সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বন্ধনকে অক্ষয় ক'রে রাখবার চেষ্টা দেখ্‌ছে। কিন্তু খুলে' বল্‌তে কি, বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যাওয়ার আন্দোলনই ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। এবং যদি শাসন-সংস্কার স্বরূপ সারবলে কোনো কিছু না করা হয়, তবে দু তিন বৎসরের মধ্যেই এ আন্দোলন আমাদের অথবা যে কোনো জনের আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাবে।"

বৃটীশ বুর্জ্জুয়াদের সাথে কাজ করা যাঁরা সমর্থন ক'রে থাকেন, এমন মুষ্টিমেয় সম্ভ্রান্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টার পাশ স্বাধীনতার দিকে ভারতীয়দের অনিবার্য্য আন্দোলন কখনই প্রতিহত হ'য়ে থাকবে না।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক—আবদুল কাদের

লিলুয়া ধর্ম্মঘট

আজ প্রায় চার মাস হইতে চলিল লিলুয়া রেল কারখানার শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট ক'রে বেকার ব'সে আছে। গরীব শ্রমজীবীরা বড় লোকের কারখানায় দিন রাত মেহনত ক'রে নিজের ও স্ত্রীপুত্রের অন্ন সংস্থান করে। ধর্ম্মঘট ক'রে উপোস করার সখ কি তাদের সহজে কারও হয়? মেহনতের তুলনায় অবশ্য যে বেতন পাওয়া যায় তা কতটা ন্যায্য—এবং অন্নসংস্থানই বা তা'তে কেমনতর হয় তা বোধ হয় এ দেশের শ্রমিকদের বুঝিয়ে বলার আবশ্যক নেই। সেই দুরবস্থার সামান্য প্রতীকার ক'রতে অনুরোধ ক'রেই লিলুয়ার চৌদ্দ হাজার শ্রমিক সপরিবারে আজ মরণ পথের যাত্রী। ধনী ও নিষ্ঠুর মালিক আজ এই হাজার হাজার গরীবের আসন্ন মৃত্যু দেখে আরও যেন বাড়িয়ে তুলেছে। শ্রমিকরা কিন্তু অটল। এক বেলা খাচ্ছে—উপোস ক'রছে, ভিক্ষা ক'রছে তবুও ঐ সর্ব্বনেশে শোষকদের কাছে মাথা নীচু ক'রতে চাইছে না। এত সাহস এত আত্ম সম্মান বোধ ভবিষ্যৎ মঙ্গলাভে এমন অপূর্ব্ব বিশ্বাস বাঙ্গলার কেউ কখন পূর্ব্বে দেখেছে কি? লিলুয়ার শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য অণ্ডাল, আসানসোলেরও কাজ বন্ধ। আসানসোল ও অণ্ডালের সহযোগীরা লিলুয়ার সহযোগীদের একদিনের আবেদনে যে উত্তর দেন তা'র ফলে সেই দিনই অণ্ডাল ও আসানসোল বন্ধ হ'য়ে যায়। কাঁচরা পাড়ার সহযোগীরা লিলুয়ার এমন কি ই, আই, রেলের কোন কারখানার কোন কাজই ক'রতে অস্বীকার ক'রে সাফ জবাব দিয়েছেন। বাকী এবার অ্যাঙ্গাস্ এবং জামালপুর! লিলুয়ার সৈন্যদল জামালপুর আক্রমণে এগিয়েছেন। সেদিন শোনা গেল অ্যাঙ্গাসের সহযোগীরাও নাকি ব'লেছেন যে লিলুয়ার ধর্ম্মঘটের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ ই, আই, রেলের কোন কাজই তাঁরা ক'রবেন না। বাঙ্গলার শ্রমিক সমাজ আজ জামালপুর ও অ্যাঙ্গাসের দিকে সোৎসুক নয়নে চেয়ে আছে। দেখা যাক্ কি হয়।

শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণ আইন

এদেশের কল কারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস থেকে সরকার তাঁদের জন্য আইন বহাল ক'রেছেন। কারখানায় কাজ করার সময় কাহারও হাত পা কাটিয়া গেলে বা কেহ মারা গেলে তিনি বা তাঁহার আত্মীয়গণ যা'তে কারখানার মালিকদের কাছ থেকে ক্ষতি পূরণ পান সেই জন্যই এই আইনের সৃষ্টি। এই আইনে শ্রমিকদের যে সত্যই বিশেষ উপকার হ'য়েছে—তা নয়। তবুও আমাদের মনে হয় যে-বা হ'য়েছে তা কিছু না হওয়ার চেয়ে ভাল। দুঃখের বিষয় যাদের জন্য এই আইনের সৃষ্টি দেশের সেই শ্রমিক ভাইদের অনেকেই আজ পর্য্যন্ত তা'র কথা বিশেষ ক'রে জানতে পান নি। এই জন্য কল কারখানার সকল শ্রমিক যা'তে অন্ততঃ এই আইনের মোটামুটি কথা গুলি সহজে জানতে পান সে জন্য আগামী সপ্তাহ থেকে "গণবাণী"র প্রত্যেক সংখ্যাতে এই আইনের কথা প্রকাশ করা হ'বে।

শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গলার পাটকলের শ্রমিক সমিতির উদ্দেশ্য

১। কারখানার কোন কর্ম্মচারীর মাসিক উপার্জ্জন যাহাতে অন্যূন ৩০৲ টাকার কম না হয়

২। কোন কারখানায় কাহাকেও যাহাতে একদিনে ৮ ঘণ্টার বা এক সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টার অধিক খাটিতে না হয়

৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহাতে সকলের বেতন বৃদ্ধি পায়

৪। উপযুক্ত বয়সে [illegible] শ্রেণীর শ্রমিককে যাহাতে "পেন্সন" দেওয়া হয়

৫। সাধারণ [illegible] অন্ততঃ একমাস পূর্ণ বেতনের ও অসুখ বিসুখের সময় দুই মাস অর্দ্ধ বেতনের সহিত ছুটি দেওয়া হয়

৬। অধিক পরিমাণে জরিমানা করা না হয় ও জরিমানা বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত টাকা যাহাতে শ্রমিকদেরই হিত সাধনের জন্য ব্যয়িত হয়

৭। কারখানায় কোন কর্ম্মচারীকে যাহাতে "ঘুস," "ডালি," "দস্তরী" বা "জলপানি" দিতে না হয়

৮। পূর্ব্বে নোটিশ না দিয়া কোন কর্ম্মচারীকে যাহাতে জবাব না দেওয়া হয়

৯। কারখানায় কাজ করিতে যাইয়া কেহ হত বা আহত হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়

১০। নারী শ্রমিকগণকে যাহাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও পরে কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত করা না হয়

১১। নারী শ্রমিকগণ অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রসবের দুই মাস পূর্ব্ব হইতে প্রসবের দুই মাস পর পর্য্যন্ত পূর্ণ বেতনের সহিত যাহাতে ছুটি পায়

১২। শ্রমিক শিশুদের জন্য কারখানার নিকটে যাহাতে কোম্পানীর ব্যয়ে উপযুক্ত বিদ্যালয় খোলা হয় ও শিশুদিগকে তথায় বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়

১৩। শ্রমিক শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারখানায় যাহাতে উপযুক্ত "ক্রেশ" বা "পালনাগার" স্থাপিত হয়

১৪। কারখানার শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া সকলকে যাহাতে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেওয়া হয়।

তাহার ব্যবস্থা করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। বাঙ্গলার পাটকলের প্রত্যেক মজুরের উচিত এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সত্বর সমিতিতে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করা।

মেথর ও ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘট

২৪শে জুন তারিখে কলিকাতার মেথর ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি আবারো ধর্ম্মঘট করেছে। গত ধর্ম্মঘটের সময় যে সকল প্রতিশ্রুতি কর্পোরেশন দিয়েছিল তার একটিও রক্ষিত হয় নি বলেই তারা ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য হয়েছে। দু'মাস পূর্ব্বে কর্পোরেশনের নামে নোটীশও জারী করা হয়েছিল। কর্পোরেশন সে দিকে দৃষ্টিপাত করাও দরকার মনে করে নি। ধর্ম্মঘটকারী-দের ওপরে নানা ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। পুলিশ কর্পোরেশনকে সব দিক থেকে সাহায্য করছে। কর্তৃপক্ষ জোর করেই ধর্ম্মঘট ভেঙে দিতে চাইছে। নির্য্যাতন সত্ত্বেও ধর্ম্মঘট-কারিগণ এখনো অবিচলিত রয়েছে।

মেথর ও ঝাড়ুদার ইউনিয়নের সভানেত্রী ডাক্তার মিস্ প্রভাবতী দাস গুপ্তা এম-এ, পি, এইচ, ডি এবং সহকারী সভাপতি মুজফ্ফর আহ্মদ গত সোমবারে গেরেফ্তার হয়ে মঙ্গলবারে ১১৷০টার সময় জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। মিঃ আই, বি, সেনের মত লোক জামিন চাওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে সোমবার রাত্রিতে মুক্তি দেওয়া হয় নি। তাঁদের নামে ম্যুনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদিগকে মার ধোর করার অভিযোগ আনা হয়েছে। মোকদ্দমা'র সংখ্যা ৭টি। আপাততঃ তিনটি মোকদ্দমা বিচারার্থ প্রেরিত হয়েছে।

বস্তু-তান্ত্রিক ভারত

[illegible]

[গোপালচন্দ্র বসাক]

— ০ —

[illegible] — সহজ সত্যের [illegible] ...

একদিন এই পৃথিবীর [illegible] আর্তনাদের [illegible] হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে নি [illegible] প্রভুত্ব [illegible] যে সন্তান উৎপাদন করেছে [illegible] সব ভারতের পুরাণ-কথা। সেই হতেই আর্য্য ভারতের [illegible] প্রভুত্ব ও অত্যাচার, অন্য ধর্ম এখানে নাই।

সনাতন [illegible] কোনো অর্থ নাই [illegible] হিন্দু শব্দটাই হচ্ছে [illegible], তার আসল রূপ সনাতন প্রভুত্ব ধর্ম বা ব্রাহ্মণ-ধর্ম [illegible] অপরের উপর প্রভুত্ব করবার জন্য সনাতন প্রচেষ্টা [illegible] দুই ভিন্ন ভিন্ন [illegible] ভগবান আর ভক্ত, [illegible], প্রভু আর দাস, অত্যাচারী আর অত্যাচারিত, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী [illegible] ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রচারে ব্রাহ্মণের [illegible] শূদ্রের উপর, আবার শূদ্র [illegible] উপর।

[illegible] শ্রেণী [illegible] প্রতিষ্ঠিত করে ব্রাহ্মণ-ধর্মের ভিত্তি অক্ষয় করেছে। [illegible] মাঝে প্রয়োজন অনুসারে ব্রাহ্মণ সেনাপতি [illegible] বৌদ্ধরাজ বৃহদ্রথকে হত্যা করেছে ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী [illegible] যুবরাজ [illegible] হত্যা করেছে, এমনি অনেক হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মণের নিজের রাজদণ্ড পরিচালনার খাতিরে। ব্রাহ্মণেরা মরে গেলেও তার প্রতিনিধিবর্গ ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা প্রভুত্ব ধর্মের আদর্শ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বজায় রেখেছে।

ভারতের বাহিরের পৃথিবী ব্রাহ্মণ-ধর্ম গ্রহণ ও বিবর্তনবাদ অনুসারে স্বাধীন লাভ দ্বারা ভারতের ঘাড়ে চেপে বসে স্বভাবতঃ যখন মধুর সম্বন্ধ পাতাতে চেষ্টা করলো, ব্রাহ্মণ নন্দকুমার প্রভৃতিরা তখন তার সাথে মিতা-সম্বন্ধ পাতাতে বাড়িয়েছিল, কিন্তু [illegible] বদলে যখন [illegible] দুর্গো বলে [illegible] হলো, তখন তারা [illegible] [illegible] গলাবাজি [illegible]

তাদের [illegible] ব্রাহ্মণ কাছা খুলে জোড় বসলে, [illegible], আমার [illegible] আদর্শের অমর্যাদা [illegible] স্বধর্মাবলম্বী [illegible]

[illegible] বৌদ্ধ যুগের পর, [illegible] সাধিকতা [illegible] ইউরোপে [illegible]

ব্রাহ্মণ চটে বল্লে, "যাও, ম্লেচ্ছ, বস্তুতান্ত্রিক (materialistic) ইউরোপ।" ইউরোপ মুচকি হেসে বল্লে, "বটে [illegible] বৈদিক সাধক, তোমার [illegible] তোমার [illegible] বটে, নৈবেদ্য চৌকাহিন [illegible] নানা রকমের প্রতিমা পূজায় [illegible] তোমারই [illegible]"

ব্রাহ্মণ [illegible] হয়ে তার পুঁথি খুঁজে [illegible] কান [illegible] সে তখন ইউরোপের পানে চাইলে।

ইউরোপ বল্লে, "কি দেখ, ঠাকুর—আমি তান্ত্রিক বটে, কিন্তু তার মধ্য দিয়েও আমি [illegible] পথ খুঁজছি।

আর তুমি—ভণ্ড, পাষণ্ড, [illegible] পণ্ড করে রেখেছ এবং নিজে তন্ত্রেরই বিকৃত পথ অনুসরণ করে তান্ত্রিকেরও অধম হয়েছ ও হচ্ছ।

ব্রাহ্মণ তা' শুনে ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় দৌড়ে এসে তারদের সকল গৃহদ্বার রুদ্ধ করতে লেগে গেল সত্য, কিন্তু ইউরোপের কথাগুলি বজ্রমূর্ত্তি ধরে, তার ঘরের সব জীর্ণ দুয়ার জানালা চতুর্দ্দিক হতে ভাঙ্গতে সুরু করেছে—তার গোপন সহজ-সত্যকে উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে।

—*—

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2/1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the

WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL

2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৫ই জুলাই ১৯২৮, ২১শে আষাঢ়, ১৩৩৫ | ৪র্থ সংখ্যা।

তোমাদের চলা পথ রুদ্ধ হ'বে, এই আশঙ্কায়
যাহাদেরে জীবনের রাজপথে চলিতে দিলেনা কভু মানুষের প্রায় ;
তিলে তিলে ক্ষয়করি' জীবন যৌবন দেহ শক্তির সম্পদ
আজন্ম রচিল যারা তোমাদের চলিবার পথ ;
বিলাসের ফেন-স্রোতে কেবলি ভাসিয়া যেতে, ভোগেরে রাখিতে অফুরাণ
হিংস্র পশু সম নিত্য কাড়ি' নিলে যাদের ক্ষুধার অন্ন পান ;
উদর পূরণ করি' যাদের দিলেনা খেতে, যারা চির গৃহ-হারা বুভুক্ষ হৃদয়
তোমাদের ভোগ-তরে পাংশু মুখে রাখি' যায় দিবসের শ্রমের সঞ্চয় ;
যাহাদের দেহ-রক্তে-রচা' সিংহাসনে, আছ তোমরা আসীন,
আপনারা ছোট হ'য়ে যারা করে তোমাদের মহান কুলীন,
ঘৃণিত জীবন যাপে, মহা জীবনের সাথে লভিতে পায়না পরিচয়,
তোমাদের জীবনেরে সুন্দর করিতে গিয়া যারা চির অসুন্দর রয় ;
আজি তাহাদের জয়-শঙ্খ বাজে, দাস তারা রহিবেনা, বঞ্চিত রবেনা তারা আর,
তোমাদের হ'তে বলে নিশ্চিত কাড়িয়া ল'বে নিজেদের সর্ব্ব অধিকার ॥

আবদুল কাদের

সম্পাদক
মুজফ্ফর আহমদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ১॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন

এই আইনের বলে যে সকল শ্রমিক রেলে, ট্রাম গাড়ীতে, কল কারখানায়, কয়লার খাদে, ডকে, জাহাজে, ঘরবাড়ী [illegible] নির্মাণ কার্য্যে, টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন অথবা [illegible] তার খাটান, রাস্তার নীচে নর্দ্দমা পরীক্ষা বা পরিষ্কার করায় বা [illegible]-ব্রিগেডের কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহারা ও অন্যান্য আরও কয়েকটী স্থানের শ্রমিকরা ক্ষতি পূরণের দাবী করিতে পারিবে।

আইনের নাম শুনিয়াই অনেক কারখানার শ্রমিকদের মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে ধনী ব্যবসায়ীদের কারখানায় কাজ করিতে যাইয়া কেহ হত বা আহত হইলেই সেই কারখানার মালিকদের নিকট হইতে ক্ষতি পূরণের টাকা পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে এই ধারণা নিতান্ত ভুল এবং অনিষ্টজনক। বর্ত্তমান আইন এমন কৌশলে রচনা করা হইয়াছে যে নামে ইহা "শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন" হইলেও কাজে কতকগুলি ধনী বীমা কোম্পানী, উকিল, ডাক্তার এবং দালাল ব্যতীত গরীব শ্রমিকদের উপকার ইহাতে অতি সামান্যই হইয়াছে বা হওয়া সম্ভব. কোন কারখানায় কেহ হত বা আহত হওয়ার পর মালিকরা যেখানে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করিয়াছে সেখানে উহা আদায়ের জন্য যাহারা এই আইনের আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই উপকার হওয়া ত দূরের কথা বরং বিপদ আরও বাড়িয়াছে। এই আইন তাঁহাদিগকে হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, রীতিমত দলবদ্ধ এবং শক্তি সম্পন্ন হইয়া ধনী কারখানা ওয়ালাদের উপর চাপ দিতে না পারিলে পৃথকভাবে দুই একজন শ্রমিকের সাধ্য নাই যে তাহাদের কবল হইতে একটী কড়িও আদায় করিতে পারে। শ্রমিকদের অর্থ, সামর্থ্য যাহা কিছু সবই দেহের বল। দেহ যদি সুস্থ থাকে হাত পা যদি সবল থাকে কারখানায় বা আর কোথাও তবেই তাহাদের অন্নসংস্থান হয়। নচেৎ এমন কোন উপায়ই আর নাই যাহাতে তাহারা নিজের ও পরিবার বর্গের ভরণ পোষণ করিতে পারে। এই যে অবস্থা এই অবস্থায় যদি কোন শ্রমিকের একটি হাত একটি পা কিংবা একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় তবে তাহার অবস্থা যে কি ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়- লক্ষ্মীর বর পুত্রেরা তাহা না বুঝিলেও গরীব শ্রমিকদের বুঝিতে বিলম্ব হয় কি? এদেশের শত শত কারখানায় সহস্র সহস্র শ্রমিক কাজ করে। প্রতিদিন কোন্ কারখানায় কত লোকের হাত পা জখম হইতেছে কত লোকের অপঘাত মৃত্যু ঘটিতেছে কে তাহার সংখ্যার নির্ণয় করে? গত তিন বৎসর যাঁহারা ছিন্নভিন্ন অঙ্গ লইয়া এই আইনের ধাপ্পাবাজীতে ঠকিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছে ও শেষে একেবারে পথে বসিয়াছে। তাহাদের সকলকে একত্র করিতে পারিলে যে ভয়ানক দুঃখের উৎপত্তি হয় যাহারা এই আইনের সৃষ্টি করিয়াছে ইচ্ছাহয় সেই দুঃখের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সেই আইন কর্ত্তাদের জিজ্ঞাসা করি, যে "হতাহত শ্রমিকদের [illegible] সাহায্য করাই এই আইনের উদ্দেশ্য" বলিয়া তাহারা যে প্রচার করিয়া আসিয়াছে তাহা [illegible]

যাহা হউক বিপদের তরঙ্গ দেখিয়া [illegible] চলিবে না। যাহা কিছু আমরা পাইয়াছি শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা তাহাকেই যতটুকু সম্ভব আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। [illegible] শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া [illegible] এই পরম উপকারী আইনটিকে সকল দোষ মুক্ত করিয়া [illegible] সহজ আমাদের উপযোগী এবং অধিক উপকারী করিয়া লইতে হইবে। শ্রমিকগণ ভাবিবেন না কেহ দয়া করিয়া তাঁহাদের সেই কাজ করিয়া দিবে বা দিতে পারে। দলের একতা, শক্তি এবং উদ্যোগের উপরই তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বর্ত্তমান আইনে যে-যে অবস্থায় ক্ষতি পূরণ পাওয়া যায়

১। কোন কারখানায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিজের কাজ করিতে যাইয়া হত বা আহত হইলে।

২। আহত স্থান চিকিৎসা সত্ত্বেও যদি ১০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সারিয়া না উঠে

৩। আঘাত লাগার ফলে শরীরের কোন অঙ্গ কাটিয়া বাদ গেলে যদি প্রমাণ করা যায় যে সেই জন্য পূর্ব্বেরমত কাজ করার ক্ষমতা আর তাহার নাই

৪। আঘাত লাগার পরে শরীরের কোন অঙ্গ কাটিয়া বাদ না গেলেও যদি প্রমাণ করা যায় যে আহত স্থান অকর্ম্মন্য হইয়া গিয়াছে ও পূর্ব্বের মত কাজ করার ক্ষমতা আর তাহার নাই

৫। লোম, পশম, সীসা কিংবা অন্য কোন বিষাক্ত গ্যাসের কারখানায় কাজ করিতে যাইয়া যদি কেহ স্থায়ী ভাবে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে ও প্রমাণ করা যায় যে সেই জন্যই তাহার রোগ হইয়াছে

৬। কারখানা ওয়ালাদের দেওয়া গাড়ীতে, ষ্টীমারে কিংবা নৌকায় করিয়া কাজে আসিবার সময় বা কাজ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে——ও তাহার ফলে কেহ হত বা আহত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৫ই জুলাই, ১৯২৮, ২১শে আষাঢ়, ১৩৩৫ | ৪র্থ সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের সভাপতি

আজকাল বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি থেকে আগামী কংগ্রেসের সভাপতির নাম প্রস্তাবিত হচ্ছে। মিঃ গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর নাম এ সম্পর্কে প্রস্তাবিত হয়েছে। বেশী জায়গা থেকে পণ্ডিত মতিলালের কথাই উঠেছে। বাংলার কংগ্রেস কমিটিও তাঁরি নাম করেছেন। যারা তাঁকে নির্বাচন করতে চান তাঁরা নির্বাচনের আবশ্যকতাও প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের মতে এবারকার কংগ্রেস একটা বিশিষ্ট কংগ্রেস হবে, আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণ হচ্ছে সাইমন কমিশন। কাজেই এমন একজন লোককে সভাপতি করা আবশ্যক যিনি সব দিক বজায় রেখে অর্থাৎ শ্যাম আর কুল রক্ষা করে কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুই হচ্ছেন তাঁদের মতে এ কাজের জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তি। সব দিক বজায় রাখার মানেই হচ্ছে এ দেশের ধনিক ও জমীদারের [illegible] থেকে বৃটিশ শোষণতন্ত্রের সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করা। কংগ্রেসের নেতৃগণের এই আপোষ করাটাই যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তা সর্ব্বদল সম্মিলনের কাজের ধারা থেকে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থাৎ বৃটিশ শোষণতন্ত্র থেকে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্বেও সর্ব্বদল সম্মিলনে দায়িত্ব মূলক শাসন অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের জন্যে খসড়া প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাবটি ঝকমারি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। মতিলাল নেহেরু একজন প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কারবাদী নেতা। ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা তিনি চান না। তাঁর দ্বারা ধনিক ও জমীদার [illegible] স্বার্থ সংরক্ষিত হবে বলেই তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি করার প্রচেষ্টা চলেছে। তাঁর নির্বাচনের পক্ষে বাংলার কংগ্রেস কমিটিও যে সায় দিয়েছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে [illegible] কংগ্রেসের ওপরে সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতিপত্তি [illegible]। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব যদি অর্থহীন না হ'ত তাহলে [illegible] পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মিঃ গান্ধীর নাম কিছুতেই প্রস্তাবিত হ'ত না। যে ক'জন লোকের নাম প্রস্তাবিত হয়েছে তাদের মধ্যে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুই যোগ্যতম ব্যক্তি। [illegible] জনগণের পক্ষ সমর্থন করেন;—গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তিনি চান। তাঁর গান্ধীপ্রীতি আমরা সমর্থন না করলেও তাঁর [illegible] প্রবণতার আমরা সমর্থন করে থাকি। দেশ এখন [illegible] নেতৃত্ব চায়—সংস্কার মূলক নয়। এ হিসাবে পণ্ডিত জওহর লালকেই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

মেথর ও ঝাড়ুদার

কলিকাতার মেথর ও ঝাড়ুদার প্রভৃতির ধর্মঘট [illegible] অপরিহার্য্য হোক না কেন, অনেকেই [illegible] কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছেন না। তাঁরা বলেন [illegible] যে কর্পোরেশনের কংগ্রেস সদস্যগণের প্রচেষ্টার ফলেই এ [illegible] ঘটেছে। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি [illegible] করা। এই প্রচারের ফলে তারা যে শুধু কংগ্রেস[illegible] হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে তা নয়, মেথর-ঝাড়ুদারদের ন্যায্য দাবী নষ্ট করাও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মেথর-ঝাড়ুদারদের ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের সহিত কংগ্রেসের কোনো সম্বন্ধই নেই। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল"ই মেথর-ঝাড়ুদারদিগকে

কে আমাদের ঘর থেকে বা'র ক'রে দেয়, আর কেই বা বিনা নোটিসে আমাদের ইউনিয়ন সমূহের আফিস-ঘর থেকে বা'র ক'রে দেবার জন্যে বাড়ীওয়ালাদের প্ররোচিত করে? কে মালিকদের সামান্য মুখের কথাতেই আমাদের বহু লোককে গেরেফ্‌তার করে, আর কেই বা মালিকদের বিরুদ্ধে আমাদের সাবাগুক রকম অভিযোগও শুনতে চায় না?—শাসনতন্ত্রের এবং এর পুলিসের, ম্যাজিষ্ট্রেটের ও গোয়েন্দাদের "পক্ষপাত শূন্যতা"র কথা লিখ্‌তে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভর্ত্তি হয়ে যাবে।

আসল কথা হচ্ছে, আমরা সকলেই এখন বুঝতে পারছি যে একটা বিশিষ্ট প্রকারের পরিবর্ত্তন আনয়ন করা একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বৈদেশিক শোষণের শেষ হওয়া ত চাই-ই চাই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে শাসনতান্ত্রিক প্রথার দ্বারা এ বৈদেশিক শোষণ বজায় রয়েছে তারও শেষ হওয়া দরকার। পরিষ্কার কথায় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ আমরা করতে চাই। আমরা বেশ অনুভব করতে পারছি যে শুধু একটা পরিবর্ত্তন আনলেই চলবে না, সে পরিবর্ত্তন অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা শীঘ্রই আনয়ন করা চাই। চারদিকের শোষণ আমাদের আর একেবারেই সইছে না।

এ যাবত আমরা সাইমন কমিশন'এর বয়কট করা সম্বন্ধে বুর্জ্জোয়া অর্থাৎ ধনিক ও জমীদার শ্রেণীর রাজনীতিকগণের নীতি মেনেই চলেছি। এ বয়কটের সমর্থন করার খাতিরে আমরা হরতাল মানিয়েছি এবং ধর্ম্মঘট চালিয়েছি। অক্টোবর মাসে সাইমন কমিশন যখন আবারো ভারতে আসবে তখনো আমরা হরতাল ও ধর্ম্মঘট করব এবং খুব জোরের সহিতই করব। কিন্তু সেটা হবে শুধু আমাদের শক্তি প্রদর্শনের খাতিরে। এ'তে একটা শক্তি দেখানো ছাড়া আমাদের আর কিছুই লাভ হবে না। কিন্তু, একটা বৃহত্তর কার্য্যকরী নীতিও আমাদের অবলম্বন করতে হবে। এ কাজ আমাদের করতেই হবে এবং সাইমন কমিশনের আগমনকে লক্ষ্য করে আমরা কাজ করার একটা অত্যন্ত সুন্দর সুযোগ পাচ্ছি।

দেশে আর একবার যখন এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল তখন আমরা কংগ্রেস ও মিঃ গান্ধীর ওপরে নির্ভর করেছিলেম। কিন্তু, গান্ধী ও কংগ্রেস অকৃতকার্য্য হয়েছে অর্থাৎ আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেনি। এবারে আমাদের সে সবও নেই। কে আজ একথা গম্ভীর ভাবে ভাব্‌তে পারে যে কংগ্রেস (ডাক্তার আনসারী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীনে) জনসাধারণকে স্বাধীনতার পথে দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির পথে চালাতে পারবে? জনসাধারণকে তাদের নিজেদের নেতৃত্ব খাড়া করতে হবে।

গত মার্চ্চ মাসে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল"এর (The Workers and Peasants Party of Bengal এর) বার্ষিক সম্মিলনে এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে:—

"এই যে সংগ্রাম চালানো হবে এ'কে পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবী অবশ্যই করতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত একটা **কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি**র বা সুসংবদ্ধ সম্মিলন আহ্বান করতে হবে। এ সম্মিলনের দ্বারা জনগণের বিভিন্ন দাবী ও বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হবে এবং তাদের কথা প্রামাণ্যভাবে প্রকাশিত হবে। সার্ব্বজনীন ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত এ সম্মিলন জনগণকে **সম্মিলিত ও সংগ্রামশীল** ভাবে পরিচালিত করবে যা সর্ব্বদল সম্মিলন করতে পারে নি। এই সুসংবদ্ধ সম্মিলনই হবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও সাইমন কমিশনের প্রকৃত পাল্টা জওয়াব। এরি দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে জনগণের সংগ্রামের প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশিত হবে এবং তাদের কষ্টদায়ক অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগের প্রতিকারও হবে এরি দ্বারা।"

যে উপায় দেখানো হলো তাই কিংবা তারি মত কিছুর যে নিশ্চিত প্রয়োজন রয়েছে এটা বোঝার জন্যে বিশিষ্ট কোনো পাণ্ডিত্যের দরকার নেই। প্রথমে দেশের সর্ব্বত্র সম্মিলন-সমূহ আহ্বান করার চেষ্টা আমাদিগকে দেখাতে হবে। কম পক্ষে প্রত্যেক প্রদেশে একটি ক'রে সম্মিলন হওয়া উচিত। এরূপ সম্মিলনের দ্বারা শহর ও জেলার প্রতিনিধিরা, শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহ ও সে সবের শাখা সমূহের প্রতিনিধিগণ, কৃষক সমিতি সমূহ, স্থানীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সমূহ (অবশ্য যদি যোগদান করতে চায়) কৃষক ও শ্রমিকদল সমূহ, যুবসমিতি সমূহ, হিন্দুস্থানী সেবাদল এবং এরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ সুসংবদ্ধ সম্মিলন আহ্বান করবার পথ পরিষ্কার করবে।

এ সকল সম্মিলন স্থায়ী কমিটি সমূহ গঠন করবে। সমিতি-গুলিতে সুগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির সভারা থাকবে এবং সে সবের উদ্দেশ্য হবে:—

(১) সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে জনগণের শক্তির প্রদর্শন।

(২) প্রচারকার্য্য চালানো এবং জনগণকে সুসংবদ্ধ সম্মিলন (Constituent Assembly) এর জন্যে তৈয়ার করা।

(৩) যে সকল শ্রমিক কিংবা কৃষক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে, কিংবা নিয়োগকর্ত্তা, জমীদার বা গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয় তাদের জন্যে (ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, এর প্রাদেশিক কমিটি ও যথাযোগ্য ইউনিয়নের সহযোগে) সাহায্য সঞ্চয় করা।

(৪) শ্রমিকসঙ্ঘ ও কৃষকসঙ্ঘ সমূহ গঠন করা।

(৫) শ্রমিকগণকে সাধারণ ধর্ম্মঘটের জন্যে ও কৃষকগণকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করার জন্যে তৈয়ার করা এবং তা স্বাধীনতার জন্যে রাষ্ট্রনীতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা।

এ সবই হচ্ছে বর্ত্তমান সময়ে জনগণের সম্মুখে বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সম্প্রতি যে সকল শ্রমিক ধর্ম্মঘট করেছে তারা এবং আরো অনেকে জানে যে একা একা ধর্ম্মঘট ক'রে বিশেষ লাভ নেই। ধর্ম্মঘটের জন্যে জনসাধারণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পথে যতই বাধা থাকুনা কেন, ধর্ম্মঘট আমাদের করতেই হবে। জনগণের সমস্বার্থ বোধই শ্রমিকগণের একমাত্র অস্ত্র। যতটা সম্ভব এ অস্ত্রের ব্যবহার আমাদিগকে অবশ্যই করতে হবে। আমাদের নিয়োগকারিগণের অন্যান্য নিয়োগকারিগণের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষভাবে কলওয়ালাদের সমিতি, চেম্বার অফ্ কমার্স ও আরো কত কিসের মধ্যবর্ত্তিতায় যোগাযোগ রয়েছে। শ্রমিকদের যারা খাটায় তাদের পেছনে গবর্ণমেণ্ট রয়েছে। কাজেই আমাদের সমস্বার্থ বোধ ও সংগঠন অবশ্যই থাকা দরকার।

জনগণের শক্তিকে সাক্ষাৎভাবে কাজে লাগাতে পারলেই আমরা নিয়োগকারিগণের ও তাদের গবর্ণমেণ্টের শাসন [illegible]

চির দিনের জন্যে মুক্তিলাভ করতে পারব। কংগ্রেসের জন্যে কিংবা সর্বদল সম্মিলনের জন্যে অপেক্ষা করে কিছু মাত্র লাভ নেই। এ সবের দ্বারা কিছুই হবার নয়। আমাদের এখন থেকে কাজে লেগে যেতে হবে এবং "সাইমন ও বার্কেন হেড"কে প্রকৃত উত্তর দিতে হবে।

জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য

—:০:—

আর, পাম দত্ত

—:০:—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩) স্বরাজের রূপ কি হ'বে?

স্বাধীনতাকে অনেক সময় নাস্তি-গর্ভ (Negative) আদর্শ ব'লে সমালোচনা করা হ'য়েছে। এই সমালোচনা ভুল নয়, কিন্তু এই সমালোচনার প্রকৃত বেগ (যা কার্য্যতঃ বহুবার সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শোষণের পক্ষে যুক্তি স্বরূপ ব্যবহৃত হ'য়েছে) সব সময় উপলব্ধ হয় নি। স্বাধীনতা নাস্তি-গর্ভ (Negative) বটে, কারণ স্বয়ং স্বাধীনতা কখনই চিরন্তনী আদর্শ বা লক্ষ্য নয়, বরং ইহা মাত্র বাধা অপসারণের, আর কোনো কিছু দেবার জন্য একটা উপায় মাত্র। সামাজিক মুক্তিই সত্য লক্ষ্য, এবং একমাত্র লক্ষ্য হ'তে সমর্থ।

জাতীয় বুর্জোয়া প্রভুত্বের দ্বারা সাম্রাজ্য-তান্ত্রিক প্রভুত্বের অপসারণ মাত্রের অর্থ যদি "স্বরাজ" হয়, বৃটীশ ব্যাঙ্ক পরিচালক, বণিক ও সৈন্য সামন্ত ইত্যাদির আধিপত্যকে অপসারিত ক'রে দেশী রাজ-রাজড়া, ধনবান শ্রেণী, শ্রমিক-নিয়োগকারী, ভূম্যধিকারী ও ভারতীয় সওদাগর প্রভৃতির রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তা'হলে ভারতবাসীর কোনো সত্যকার লাভ হ'বে না,— বল-বিজ্ঞান কৌশল হিসাবে শুধু তাদের শত্রুকে দুর্ব্বল করা হ'বে। তাদের সত্যিকার সংগ্রাম সম্মুখীন হ'য়েই থাকবে; তা'দের দুঃখ ভোগ আর নিগ্রহ তখনো পর্য্যন্ত স্থায়ী হ'য়েই থাকবে।

জাতীয় যে মুক্তি সামাজিক মুক্তি এনে দেয় না, অর্জ্জন হিসাবে তা অকিঞ্চিৎকর। বিগত শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাস তা বার বার চিত্রিত ক'রে দেখিয়েছে। জাতীয় বিরাট আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি, এসব পরিণতি লাভ ক'রেছে— শোচনীয় দাসত্ব, ভীষণ প্রতিযোগিতা আর বৈষম্য, ইউরোপীয় ধনিকদের প্রকৃত দাসত্ব ইত্যাদিতে,—কারণ, যুদ্ধ ক'রে সামাজিক-সংগ্রামের মীমাংসা হয় নি, সামাজিক মুক্তিলাভ করা হয়নি। সামাজিক মুক্তি লাভের পথে জাতীয় মুক্তি পথ পরিষ্কারক একটা পর্য্যায় ব্যতীত আর কিছু নয়।

সত্যিকার মুক্তি সামাজিক,—অর্থাৎ দেশের (পরিণামে বিশ্ব-ব্যাপ্ত আয়তনে) ভোগ দখল, জীবন ধারণের যোগ্য সম্পদ সম্ভার, কাজের দ্বারা অর্জ্জিত ধনের সাধারণ অংশ গ্রহণ, এ সমাজের মধ্যে সমগ্র মানব জাতির সহজ অধিকার লাভ দ্বারা শোষণ ও শ্রেণী বিভাগের চরম অবসান।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক অভিব্যক্তির বহু পর্য্যায়যুক্ত এক দীর্ঘ কার্য্য প্রণালীর সমাধানের দ্বারা হ'বে এ অর্জ্জন। সাম্রাজ্যবাদের অপসারণের প্রশ্ন [illegible] স্বাধীনতা [illegible] একটা স্তর রূপে যা দাম আছে।

সুতরাং স্বরাজের লক্ষ্য [illegible] সামাজিক মুক্তি লাভের জন্যে, জাতীয় বিপ্লবকে [illegible] নতুন সামাজিক বিপ্লবে পরিণত করার জন্য [illegible] করা কর্তব্য। [illegible] নিজেদের হাতে, কৃষক ও শ্রমিকদের হাতে, অর্জ্জিত ক্ষমতার [illegible] মুক্তি অর্জ্জন করবে।

তদনুসারে ইহা "স্বরাজ" আন্দোলনের, [illegible] মুহূর্তে উদ্ভূত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমূহ রূপের [illegible] নিয়ামককারী সিদ্ধান্ত।

কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রাথমিক প্রয়োজন—[illegible] অবসরের সাম্ভাব্য লাভ করা; অর্থাৎ সংহতি, আন্দোলন, [illegible], প্রকাশ্য সভা, ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকার (Universal Suffrage), বংশানুক্রমিক সুযোগ [illegible] সাধন, এ সবের অধিকার লাভ করা। জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব হবে।

কিন্তু জাতীয় গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ সামাজিক বিকাশ, কৃষক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং বুর্জোয়াদের আপেক্ষিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে।

প্রাচ্য ইউরোপের বিভিন্ন স্তর সমূহের পুনঃ পুনঃ আসার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আবশ্যকতঃ যাবে না; কিন্তু তার থেকে দ্রুততর বেগে অভিব্যক্ত হ'তে পারে। প্রতীচ্যের পার্লামেন্ট সম্পর্কীয় গণ-তন্ত্রের (Parliamentary Democracy) কলঙ্কাবহ রূপ—যা লৌকিক প্রতিনিধিত্বের (Popular repre-sentation) ব্যঙ্গাভিনয় ক'রেছে, যার তথাকথিত মুক্তি ছলনা বই আর কিছু নয়,—তার পূর্ণরূপে স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের সামাজিক সম্প্রদায় সমূহের সঙ্গে নিবিড়তর সাদৃশ্য রেখে, এবং কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলন ও অগ্রগমন জন্য ঐরূপে ব্যাপকতর প্রসর প্রদান করে, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের স্বাধীনতর রূপের প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে। ইহা এমনও হ'তে পারে যে, সামাজিক রূপান্তরের দ্রবকারী পাত্রে কৃষক ও শ্রমিকেরা একটা দৃঢ়তর স্থান জিতে নিতে এবং এমন কিছু বাগে পেয়ে নিতে পারে যাতে তারা ক্ষমতা লাভের ও প্রকৃত সামাজিক পরিবর্ত্তনের দিকে অবিলম্বে অগ্রসর হ'তে পারে।

অল্পকথায়, সামাজিক পরিণতির সমূহ পর্য্যায় ও অবস্থান্তরের সমূহ অবস্থার ওপর স্বরাজের সমূহ রূপ নির্ভর করবে। কৃষকদের সহযোগে যখন শ্রমিকরা ক্ষমতা অর্জ্জন করবে এবং সামাজিক রূপান্তরের কাজে হাত দেবে, তখনই কিন্তু সামাজিক মুক্তির দিকে সত্যিকার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'বে। ফলতঃ, কৃষক ও শ্রমিক, এবং সেই মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও মনীষীরা—যাদের স্বার্থ তাদের অর্থাৎ জাতির সংখ্যাধিকতম অংশের সঙ্গে জড়িত, তাদের কাছে স্বরাজের মূল্য সমগ্র ভাবে নির্ভর করবে তত টুকুর ওপর, যতটুকু সুবিধা ইহা তাদের উদ্দেশ্য,—সামাজিক মুক্তির উদ্দেশ্য উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হ'বার জন্যে দেবে।

অনুবাদক—আব্দুল ক্বাদের

পুলিশ জুলুম

—:*:—

পুলিশের জুলুমের বিষয় বাঙ্গালী মাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে অবগত আছেন। চাঁদপুরে পুলিশের নিরস্ত্র শ্রমিকের উপর গুলি বর্ষণ, সালাদা হাটে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ, মুক্তাকান্দিতে দরিদ্র কৃষকের উপর নৃশংস অত্যাচার, চরমানাইরএ পুলিশের নিরীহ স্ত্রীলোকদের উপর অমানুষিক ও নির্লজ্জ নির্য্যাতন—বঙ্গবাসী মাত্রেরই চিত্ত হইতে অদ্যাপি মুছিয়া যায় নাই। এই সেদিন লিলুয়ার ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালাইয়াছে। আজকাল চারিদিকে যতই শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—আর ততই ধনীর স্বার্থ-রক্ষার্থে পুলিশ নিরপরাধ দরিদ্র শ্রমিকদের উপর বিনাকারণে গুলি চালাইতেছে। বেয়োনেটের আঘাতে শ্রমিক সংঘবাদকে পঙ্গু করিয়া দিতে পুলিশ বদ্ধপরিকর হইয়াছে। লিলুয়া, চেঙ্গাইল, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে পুলিশের নির্ম্মম অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে। কলিকাতাতেও অদ্য সপ্তাহ খানেক হইল পুলিশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেথর-ধাঙ্গড়রা তাহাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে—আর পুলিশ, কর্পোরেশনের বিধাতাপুরুষ '[illegible]চীফের' পরামর্শ অনুসারে এই কয়েক দিবস দরিদ্র [illegible] মজুর ধাঙ্গড়-মেথর-ঝাড়ুদারদের উপর অসহনীয় [illegible] জুলুম, মারপিট, নির্য্যাতন শুরু করিয়া দিয়াছে। আমরা [illegible] যেখানে, যে বস্তিতে, যে পল্লীতে গিয়াছি সর্ব্বত্রই একই অনুযোগ যে পুলিশের অত্যাচারে তাহারা জর্জ্জরিত—[illegible] ক্ষত-বিক্ষত! শুধু ইহাতেই তাহাদের পরিত্রাণ নাই—[illegible] অশেষ নির্য্যাতনও তাদের উপর চলিতেছে। পুলিশের এই অন্যায় পাশবিক অত্যাচারে শহরবাসীর [illegible] বিস্ময় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পুলিশের দুর্ব্ব্যবহারের [illegible] এতটুকু হ্রাস পায় নাই। অকারণে, পুলিশ ধাঙ্গড় মেথর [illegible] বাহির করিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে তাহাদের উপর [illegible] হীন ব্যবহার করিয়াছে। চিৎপুর-কাশীপুরে গভীর রাত্রে [illegible] কর্পোরেশনের লোকের সহায়তায় পুলিশ [illegible] চূড়ান্ত করিয়াছে। আমরা পুলিশের এই [illegible] কদর্য্য ব্যবহারের কথা যখন উচ্চ পুলিস কর্ম্মচারীদের গোচরীভূত করিয়াছি তখন তাহারা মৌনব্রত থাকিয়া পক্ষান্তরে এই হীন নীতির প্রশ্রয় দিয়াছে। কয়েকটি থানায় আমরা স্বয়ং পুলিশের [illegible] কর্ম্মচারীদের নিকট জানিতে পারিয়াছি—তারা বলিয়াছে যে উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাদের উপর এই আদেশ জারী করিয়াছে যে তারা নির্ব্বিবাদে কুলি মজুর ধাঙ্গড়দের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে পারে। এমন কি ধাঙ্গড়দের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রমিক-নেতৃবর্গের উপরও তাদের শক্তি প্রয়োগ [illegible] ক্ষমতা আছে।

চারিদিকে পুলিশের অত্যাচার যেরূপ উৎকট মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে এবং প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন যে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহা আজ ভাবিবার বিষয়। আমাদের সম্মুখে চীন যে পথে চলিয়াছে ও চলিতেছে ভারতে যে তার পুনরভিনয় না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? শোষণবাদী শাসনের কঠোর নির্য্যাতন, আজ শ্রমিক জগতের সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থাপিত করিতেছে তাহাতে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে ভারতবর্ষেও অনতিবিলম্বে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে! আজ শ্রমিকরা পড়িয়া পড়িয়া মার হজম করিতেছে। কিন্তু বেশী দিন হয়তো তাহারা এই 'পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়া' হজম করিতে রাজী হইবে না। এই সমস্ত অত্যাচার, জুলুম, নির্য্যাতন তাহাদের বিপ্লবের পথে শীঘ্র শীঘ্র চালিত করিবে! আজ সংগঠন ও সংঘবদ্ধের দ্বারা শ্রমিক আন্দোলন যে পথে চলিতেছিল—পুলিশ ও ধনীর দমননীতি কিন্তু তাহাদের [illegible] বিঘ্নসঙ্কুল পথে টানিয়া আনিতেছে। এই বিঘ্ন-বহুল [illegible] বাধা তাহাদের বিপ্লবের পথে অনুপ্রাণিত করিবেই। [illegible] পরাধের রক্ত স্রোতে ধরণীবক্ষ প্লাবিত হইবে। [illegible] ও শৃঙ্খলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহা [illegible] পরিচালিত হইবে। ধনিক বণিক অভিজাত শ্রেণীর [illegible] স্বয়ং তাহাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে। শ্রমিকগণ [illegible] শক্তির দ্বারা তাহাদের স্বাধিকার ফিরাইবার জন্য [illegible] অনুসৃত নীতিতে বিশ্বাসবান ছিল—ধনীর প্ররোচনায় [illegible] সে পথ পরিহার করিতে বাধ্য হইবে।

বর্ত্তমানে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণ [illegible] এই অশেষ অত্যাচার সহ্য করিতে সক্ষম হইতেছে [illegible] প্রধানতমঃ কারণ যে তাহারা এখনও দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ নহে [illegible] বাণী এখনও তাহাদের অন্তরকে নবীন উদ্যম আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। তাহাদের সংহতি শক্তির [illegible] তাহাদের যাবতীয় সাফল্য নির্ভর করিতেছে। [illegible] অবিচলিত চিত্তে পথের সমস্ত বাধা ব্যতিক্রম [illegible] সেদিন মস্তকে ধারণ করিয়া লইতে সমর্থ হইবে [illegible] শোষণবাদীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার তাহাদের [illegible] প্রতিহত করিয়া দিতে সক্ষম হইবে না। যুগ যুগ [illegible] কঠোর কশাঘাতে তাহাদের অন্তর মুষড়াইয়া গিয়াছে [illegible] চেতন, অবনমিত, অনুন্নত, পরপদ লেহিত শ্রমিককুল [illegible] সমাজের উচ্চপদস্থ লোকের দ্বারা নির্য্যাতিত, নিষ্পীড়িত [illegible] সম্পূর্ণরূপে বিবর্জ্জিত। শ্রমিক জাগরণের বিভীষিকা [illegible] মানসিকতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। [illegible] বুর্জোয়ার দল তাই শ্রমিক অভিযানকে প্রতিহত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কিন্তু আশার কথা এই যে ভারতের মেঘ-মেদুর আকাশও শ্রমিক-বিপ্লবের ঘনঘোর ঘটায় আচ্ছাদিত হইতেছে। আর আমাদের শোষণবাদী শাসকগণই সেই বিপ্লবের ইন্ধন যুগাইতেছে। জাগো শ্রমিক জাগো [illegible]! অত্যাচারের মায়া স্পর্শে তোমরা পৃথিবীর সমস্ত [illegible] লতাকে জলধি গর্ভে ডুবাইয়া দাও—তোমরাই ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর—সে দিন ঐ আগত প্রায়!

তাহাদের বেতনের দরুণ প্রত্যেক কলে সপ্তাহে প্রায় আরও দুই হাজার টাকা বাঁচিতেছে। আর শ্রমিকদের দৈনিক দুই হইতে তিন ঘটা হিসাবে পাঁচদিনে দশ হইতে পনর ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রমের সময় বাড়িয়াছে। "ডেলি" লোক অভাব দেওয়ান তাহাদের মেহনতও বাড়ে চাপিয়াছে। আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই রন্ধন এবং স্নান আহার শেষ করিতে হওয়ায় মোটেই বিশ্রাম পাওয়া যাইতেছে না।

ফলে সকলের শরীর নষ্ট হইতেছে। এইরূপ পাঁচদিনের [illegible] বাড়ীতে সপ্তাহে "[illegible]রোকী" বন্ধ হইয়াছে। ওয়েলিংটন জুট মিলের কর্ত্তাদের ইহাতেও তৃপ্তি নাই। শ্রমিকরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে [illegible] টাকা প্রতি চারিআনা হিসাবে একটা "বোনাস" পাইয়া আসিতেছিল এই তিনিকে তাহাও বন্ধ করা হইয়াছিল। শ্রমিকরা কর্ত্তাদের এই শোষণের প্রতিবাদ করিয়া বহুবার আবেদন করিয়াছে। ফল কিন্তু কিছুই হয়নাই। তখন অগত্যা তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। ধর্ম্মঘট তিন সপ্তাহ অতীত হইলেও কর্ত্তাদের চৈতন্য উদয় হইলনা। এমন সময় শ্রীযুক্ত শিবনাথ [illegible] মিত্রের তত্ত্বাবধানে পাটকলের শ্রমিক সমিতি ধর্ম্মঘটকারীদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চাউল প্রভৃতি আমদানী করিবার ব্যাপার শুনিয়া নয় বুঝিয়া কর্ত্তারা "বোনাসের" কিয়দংশ বৃদ্ধি করিয়া দিতে স্বীকৃত হন। ফলে প্রথম ধর্ম্মঘট নিষ্পত্তি হয়। দ্বিতীয় ধর্ম্মঘটের কথা আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গীত জীবন

—:০:০:—

(প্রফেসর সাজ্জি বাগোনারস্কী)

অনুবাদক—আবদুল কাদের

October Revolutionএর প্রারম্ভ হইতে আমাদের সঙ্গীত-জীবন এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—এবং অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়াছে। অতি উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞগণ, লাল-পল্টন, কর্ম্মী ও তরুণ শ্রমজীবী সমাজকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে; কর্ম্মীদের কেন্দ্র স্থানে, সৈনিকের ব্যারাকে এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে সাধারণতঃ সঙ্গীতের ব্যাখ্যাকারী একজন বক্তার সহযোগে বিনি পয়সার কনসার্টের বন্দোবস্ত করা হয়। কেবল মাত্র প্রধান প্রধান নগরে নহে, এমনকি প্রাদেশিক সহরেও ইহা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল। নতুবা শ্রোতারা অতীতের সেই নূতন ও প্রায়শঃ অবোধ্য সঙ্গীত খুব আগ্রহ ও মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিত। সেই শ্রোতারা কিন্তু সঙ্গীতকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ জ্ঞান করিয়া তাহাতে অতি দ্রুত অভ্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং সেই একতান সমন্বিত জলে সঙ্গীতের বিশ্লেষণের জন্য আগ্রহ জানাইত। সঙ্গীতজ্ঞগণ সেই দাবী পূরণ করিত; তাহাতেই যান্ত্রিক ও শাব্দিক পল্লী-সঙ্গীতের নানা প্রকার জ্ঞান বিকাশের সূচনা হয়। [illegible] ভিন্ন ভিন্ন নিয়মিত হয়, [illegible] কর্ম্মীদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গীতের [illegible] উপর সাধারণতঃ শ্রোতৃবর্গ নিজেদের [illegible] কর্ম্মীদের সঙ্গীত সম্বন্ধে [illegible] পরিবেশন যোগ্য কনসার্টে রচনায় [illegible] সাধারণের জীবন ও স্বাদের সঙ্গে [illegible] শেষে, বহুকাল যাবৎ [illegible] সমস্যাটির সম্মুখীন [illegible] শিক্ষকগণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক জনগণের মধ্যে [illegible] নিম্নলিখিত পন্থা অনুসৃত হয়:—(১) [illegible] বক্তৃতা ও জটিলতা মূলক গীতি-বাদ্যের সুব্যবস্থা করা হয়, এবং শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে [illegible] বিবর্ত্তনের [illegible] ব্যাখ্যা করা হয়। (২) সুর-তান সমন্বিত [illegible] লোক সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট সংগ্রহ, বিপ্লবমূলক ও সামাজিক বিষয় নিয়া নূতন সঙ্গীত প্রকাশ করা হয়। (৩) [illegible] (orchestra)র [illegible] উৎসাহী [illegible] হয়। (৪) বাদকদের উন্নতিসাধন ও তাহার [illegible] ব্যবহার করা হয়;—ইত্যাদি। সম্প্রতি [illegible] গীত-বাদ্যের একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, [illegible] বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। ৮০ শ্রমিক ও [illegible] প্রতিযোগী হইয়াছিল। সঙ্গীতশালা-(Conservatory) ও কর্ম্মীদের ক্লাবের মধ্যে খুব নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান, এই সব বিদ্যালয় সঙ্গীত শিক্ষকগণকে সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী করে, এবং তথা হইতেই বাদকরা ও সঙ্গীত-শিক্ষকগণ ক্লাবের সঙ্গীতশালা সমূহে আসেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্গীত-বিদ্যালয় সমূহের কার্য্য পদ্ধতিকে অবস্থার উপযোগী এবং অধিকতর জীবনী-শক্তি সম্পন্ন ও কার্য্যকরী করা হইয়াছে।……

দুর্ঘটনা

গত ২৮শে জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় নৈহাটী জুট মিলের একখানি নৌকা ডুবি হওয়ায় ঐ মিলেরই কয়েকজন শ্রমিক নরনারীর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের আত্মীয়গণের উচিত মৃত ব্যক্তিদের পক্ষে ঐ মিল কোম্পানীর নিকট হইতে ক্ষতি পূরণের দাবী করা। কেহ ইচ্ছা করিলে আমাদের নিকট আসিয়া এই বিষয়ে আবশ্যক পরামর্শ ও অন্যান্য সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। সাহায্য প্রার্থী চট কলের শ্রমিক হইলে তাঁহাকে এজন্য কোনরূপ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না। অধিকন্তু যথার্থ অভাবগ্রস্ত হইলে আমরাই তাঁহাকে এজন্য আর্থিক সাহায্যও করিব। ইতি—

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
ভাটপাড়া
বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন
৩রা জুলাই - ১৯২৮

---

* সোভিয়েট রাশিয়ার Cultural Societyর ২০।৫।১৯২৭ তারিখের "Weekly News Bulletin" হইতে অনূদিত।

সি-মেন্স ইউনিয়ন

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়নের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। এ ইউনিয়নের একটি শাখা স্থকাণীদের ইউনিয়ন (ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার্স ইউনিয়ন) যাতে ভেঙে যায় তার চেষ্টা ইউনিয়ন বিরোধী লোকেরা করছে। এ চেষ্টায় তারা অনেকটা সফলকামও হয়েছে ক'বছর থেকে জাহাজের কাপ্তানগণ নিজেরা শিপিং অফিসে যেয়ে স্থকানী বেছে নিচ্ছিলেন। স্থকানীদের ইউনিয়ন এ সকল লোক সরবরাহ করছিল। এতে স্থকানীর নিয়োগ ব্যাপারে যে ঘুষ দেওয়া—নওয়া হত তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে দালালগণ ইউনিয়নটি ভেঙে দেবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। তারা চারিদিকে এতটা তাল সামলিয়ে নিয়েছে যে জাহাজের কাপ্তানেরা ইউনিয়নের স্থকানী আর কিছুতেই নিচ্ছেনা। সারেং আর লজিং হাউস কিপারগণ (ঘরওয়ালাগণ) কাপ্তানদের জানিয়েছে যে তাঁরা যদি ইউনিয়নের স্থকানী কাজে ভর্ত্তি করেন তারা (সারেং আর ঘরওয়ালাগণ) খালাসী সরবরাহ করবেনা। ফলে, স্থকানীদের ইউনিয়নটিও ভাঙতে বসেছে। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজ সমূহের সকল বিভাগের লোকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। আমরা জানি, এখন এ কাজে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নাবিকদের দল গড়ে তুলতেই হবে; যেখানে হাজার হাজার লোক কাজ ক'রে থাকে সেখানে কেবলমাত্র ১২।১৪ শত লোক পৃথক দল গড়লে সে দল কিছুতেই বাঁচতে পারেনা। স্থকানীদের ইউনিয়নের ব্যাপার থেকে আমরা আশা করি যে নাবিক ভাইগণ নিশ্চয়ই তলিয়ে বুঝতে পেরেছেন।

ইউনিয়ন গঠন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকদের কাছ থেকে দাবী দাওয়া উসুল করে নেবার জন্যে শ্রমিকদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যে একটা উচ্চধ্বনি উত্থিত করতে হয় অর্থাৎ 'আওয়াজ বুলন্দ' করতে হয়। জাহাজের নাবিকগণের এই লড়াইয়ের আওয়াজটা হবে বেতন বৃদ্ধি। বেতন বৃদ্ধি করবার জন্যেই নাবিকদিগকে দলবদ্ধ করতে হবে। তাদের প্রাণে ভাল খাওয়া, ভাল পরা ও ভাল ঘরে বাস করার জন্যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগাতে হবে। কেবল মাত্র সরকারের নিকটে আবেদন-নিবেদনের থালা নিয়ে উপস্থিত হলে কোন কাজ হয় না। শক্তির দ্বারা সব কিছু উসুল করতে হবে।

—

A CALL TO ACTION

Being the Resolutions and Theses passed at the Third Annual Conference of the WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL.

After years of agitation and organisation, India is still a dependency, is farther from freedom than ever. Why is this?

Why is the once mighty National Congress a laughing stock before the world?

Why do our leaders invariably say one thing and do another?

For a clear, consistent Marxist analysis and explanation of these disturbing phenomena,

For a clear practical lead as to what to do to remedy this state of things,

See, "A CALL TO ACTION."

The book will be shortly out and sold at a cost price only.

To be had of

THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL

2/1, European Asylum Lane, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেণ্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেণ্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেণ্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2/1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১২ই জুলাই ১৯২৮, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৫ | ৫ম সংখ্যা

"বিপ্লবের আদর্শবাদ ব্যতীত কোনো বিপ্লব-আন্দোলনই সম্ভবপর নয়।"

—লেনিন—

* * *

"বিপ্লব হচ্ছে ইতিহাসের গমনশীল যন্ত্র।"

—মার্ক্স—

* * *

"শ্রমিকগণ যে বিপ্লব আনয়ন করবে তার প্রথম ধাপ হচ্ছে সর্ব্বহারাগণকে শাসক শ্রেণীতে উন্নীত করা—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয় লাভ করা। ধনিকগণের (বুর্জ্জোয়াজিদের) হাত থেকে ক্রমশঃ সমস্ত ধন ছিনিয়ে নেবার জন্যে, উৎপাদনের উপায় গুলিকে ষ্টেট্ বা তন্ত্রের হাতে অর্থাৎ শাসক শ্রেণীতে সংগঠিত সর্ব্বহারাগণের হাতে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে এবং যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে উৎপাদনের শক্তি সমূহের সমষ্টিকে বাড়াবার জন্যে—সর্ব্বহারাগণ তাদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের ব্যবহার করবে।"

—মার্ক্স—

সম্পাদক
মুজফ্ফর আহ্মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৷৷০
Foreign Subscription : Annual 6s.

A CALL TO ACTION

Being the Resolutions and [illegible] passed at the [illegible] of the WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL.

After years of agitation and [illegible] farther from freedom than [illegible]

Why is the once mighty Nat[illegible]

Why do our leaders invariably [illegible]

For a clear, consistent [illegible] explanation [illegible] phenomena.

For a clear practical lead as to what [illegible]

See, "A CALL TO ACTION."

The book will be shortly out and [illegible]

To be had of:

THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL

2/1, European Asylum Lane, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণী"র বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ১৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেন্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেন্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখতে হবে।

এজেন্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২/১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

কৃষকের কথা

আফতাব আলী প্রণীত

মূল্য—পাঁচ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

দি ভ্যাঙ্গার্ড লিটারেচর কোম্পানী

২/১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,

কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড } কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১২ই জুলাই, ১৯২৮, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৫ { ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাসপোর্ট না মঞ্জুর

বৃটিশ শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে তবেই ভারতবর্ষকে শাসন করতে চায়। ভারতবাসী [illegible] ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকুক, বাইরের আলো, বাইরের [illegible] কিছুতেই তাদের গায়ে না লাগুক, এটাই হচ্ছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতি। এই হীনতম নীতি মেনেই গবর্ণমেণ্ট কথায় কথায় যাকে তাকে পাসপোর্ট না মঞ্জুর ক'রে [illegible] বৃটিশ শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আমাদের [illegible] স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত নেই। "কৃষক ও শ্রমিক দল" (Workers' and Peasants' Party) এর সভ্যদের প্রতি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আবার খুব কড়া নজর রেখেছেন। ঠাকুর [illegible] লোক ব'লেই সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই যা গত [illegible] কোনো প্রকারে পাসপোর্ট পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বোম্বে "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর ডি. আর. ঠেংদে এবং এস. [illegible] পান নি। তারাও ঠিক একই সময়ে পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব্ব হোম মেম্বার স্যার হিউ ষ্টেফেন্‌শনকে চিঠি লিখে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জানতে চেয়েছিলেন যে তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হবে কিনা। স্যার হিউ সে চিঠি খানা পুলিসের নিকটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পুলিস এই চিঠির ছুতো ধরে (একটা কিছু ছুতো পেলেই তারা বর্তে যায়) দিন [illegible] কতক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নিকটে খুবই আনাগোনা করেছিল। তার পরে ব্যাপারটা অমনিই ধামা চাপা পড়ে গেছে। [illegible] কি স্যার হিউ কেউই তাঁকে চিঠির জওয়াব দেওয়া পর্য্যন্ত আবশ্যক মনে করেন নি। কয়েক মাস পূর্ব্বে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের" আর একজন সভ্য বন্ধু আফ্‌তাব আলীও পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। তাঁর অপরাধ বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সভ্য হওয়া কিনা তা অবশ্য জানিনে। বন্ধু আফ্‌তাব আলী বৃটিশ ধনিকদের দেশে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডেই যেতে চেয়েছিলেন। ওখানকার কোনো শ্রমিক কলেজে পড়া শুনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ সত্ত্বেও তাঁকে পাসপোর্ট দেওয়া হয় নি। ইংল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট কি এতই দুর্ব্বল হয়ে গেছে যে আফ্‌তাব আলীর ন্যায় একজন লোক সেখানে গেলেই সব উলট্ পালট্ হয়ে যাবে? পুলিসের "হাঁ"র সহিত গবর্ণমেণ্ট "হাঁ" মিলাবেন আর আমরা নির্ব্বিবাদে তা সহ্য করতে থাকব, এরূপ কিছুতেই হতে পারে না। গবর্ণমেণ্টকে এর জন্যে একটা কৈফিয়ৎ অবশ্যই দিতে হবে।

মেথর-ঝাড়ুদার ও ঘুষ প্রথা

কলিকাতার মেথর-ঝাড়ুদারগণ আপনাদের জীবন বিপন্ন ক'রে সহরবাসীর জীবন রক্ষা ক'রে থাকে। মজুরী তারা অতি সামান্যই পায় এবং সেই মজুরী থেকেই তাদের আবার ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ দেওয়ার জন্যে তারা যে কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে মাসিক টাকা প্রতি দু আনা সুদে কর্জ নিয়ে থাকে সে কর্জ্জ জীবনে শোধ দেওয়া তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব পর হয়ে উঠে না। [illegible] হাত থেকে এ শ্রেণীর মজুরগণকে বাঁচানো অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তার জন্যে কর্পোরেশনের বর্ত্তমান প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে। ব্লক সরকার প্রথা এখনি তুলে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ব্লক সরকারের নিজেরাও ঘুষ পেয়েই থাকে, [illegible]

[illegible] বিভাগের মারফত কিছু কিছু [illegible]
ব্রুক সরকারদের নিকটেই গান্ধীবাদীদিগকে [illegible] নিযুক্ত করা ও কাজ থেকে বরখাস্ত [illegible] রয়েছে। কাজেই, তাদের দুর্নীতি [illegible] বাধা দিতে পারে না। যেমন এই যুদ্ধের [illegible] তুলে দিতে [illegible] সরকারদেরই বিদায় [illegible] হয়। ব্রুক সরকারেরা [illegible] চলন [illegible] কিছুতেই [illegible] কথা বলতে গেলে [illegible] ব্রুক সরকার নামক ফার্মকে [illegible] দেবার কোনো আবশ্যকতাই নেই। [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] ইঞ্জিনিয়ারদের ওপরে দিলে [illegible] দুর্নীতি না হলেও, বেশী [illegible] রেলওয়ের ভিতরে গলদের কিছু শেষ নেই। [illegible] ব্যাপার না করে [illegible] হয়েছে [illegible] প্রদান করা খুবই আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

ধনিকগণের চালবাজী

[illegible] ধনিকগণ নানাবিধ ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু, ভারতের ধনিকগণ যে উপায় অবলম্বন করছে তার মত [illegible] উপায় [illegible] আর কিছুই হতে পারে না। এ দেশের লোকেরা একটু বেশী মানে ব'লেই ধনিকগণ মজুরদের মধ্যে ধর্মগত ঝগড়া সৃষ্টি করে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নিতে চায়। কয়েকদিন আগে খড়্গপুরে হিন্দু-মুসলমান মজুরদের মধ্যে যে ব্যাপার ঘটেছে তা আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ খড়্গপুরের মজুরগণের সর্বনাশ করেছে। কিন্তু, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের হাতে অনেক সুবিধা হয়েছে। সম্প্রতি মাটিয়াবুরুজেও এইরূপ একটা চেষ্টা চলেছে। ওখানকার "কেশোরাম কটন মিলস্" এর শ্রমিকগণ কিছুদিন আগে ধর্মঘট করেছিল। সেই সময় থেকে শ্রমিকগণের একটা শক্তিশালী ইউনিয়নও গঠিত হয়েছে। এ ইউনিয়নটি কলওয়ালাদের পক্ষে একটা ভয়ের কারণ হয়ে পড়েছে। তারা অন্য কোনো প্রকারে ইউনিয়নের ক্ষতি না করতে পেরে সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক কলহ বাড়িয়ে তোলার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করছে। হিন্দু শ্রমিকদের লাইনে আজকাল রোজই ল্যান্টার্নের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। কোথায় কবে মুসলমানগণ হিন্দুদের মেরেছে তারি সব "স্লাইড" তৈরী করে শ্রমিকদের দেখানো হয়। মিলের একটা সর্দারের সহিত হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকগণের যে সমবেত বিরোধ ঘটেছিল সে বিরোধটিকেও কলওয়ালারা হিন্দু-মুসলমান বিরোধ রূপে পাকিয়ে তুলেছে। এরূপ হীন উপায় অবলম্বন করেই কেশোরাম কটন মিলের ম্যানেজিং এজেন্টগণ শ্রমিকদিগের ইউনিয়নটিকে ভেঙে দিতে চাইছে। শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করলে মালিকদের পক্ষে মুস্কিলের কারণ হবে বলেই তারা শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু, এই হীন উপায় অবলম্বন ক'রে চিরকালই শ্রমিকদিগকে কিছু বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারা যাবে না। ল্যান্টার্ন লেকচারের [illegible] চিরকালই শ্রমিকদিগকে [illegible]

—০—

[illegible]শনের প্রতি দুর্ব্যবহার

[illegible] মুক্ত হয়ে [illegible] সংবাদ [illegible] করা [illegible] সরকার [illegible] সমস্ত [illegible] অনুমতি [illegible] ছিলেন, [illegible] সাথে [illegible] মানুষের [illegible] মানুষকে [illegible] করতে হয়। [illegible] এলিশনের উপরে [illegible] ব্যবহার করা হয় নি। তাঁর কোনো বন্ধুকেই তাঁর সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় নি। কবে তিনি জেল থেকে মুক্ত হবেন সে সংবাদও কাউকে জানানো হয় নি। [illegible] রাত্রির [illegible] পুনা থেকে বোম্বে নিয়ে আস। হয় এবং কোনো বন্ধুর সহিতই তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয় না। দুটো মাত্র শার্ট আর দুই পাউণ্ড তাঁর পকেটে দিয়ে তাঁকে জাহাজে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বোম্বেতে কুক কোম্পানীর বাড়ীতে তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ পড়ে ছিল। সে সুরও তাঁকে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় নি। মোটের ওপরে গবর্নমেন্ট এলিশনের প্রতি যে ব্যবহার করেছে তা যে খুবই বর্বরতা ব্যঞ্জক তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। কারামুক্ত হওয়ার পরেও কারো সঙ্গে কয়েদীর মত ব্যবহার করা যে আইনী কাজ। কিন্তু, এ দেশের গবর্নমেন্ট আপনাদের বেলায় আইন মেনে চলার কোনো আবশ্যকতাই অনুভব করে না। বৃটিশ শোষণ-তন্ত্র যে আইনের নামে গবর্নমেন্ট চালানোর কথা বলে থাকে সেটা নিছক ভণ্ডতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এলিশনের প্রতি যে ব্যবহার করা হলো তা থেকেই এর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

—০—

সাকলাৎ ওয়ালা এবং জশী এণ্ড কোং

১৯২৭ সনের গোড়ায় সাকলাৎ ওয়ালা যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য ঘটেছিল। তিনি যাঁদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশা-মেশি করেছিলেন তাঁরা যে এ দেশের সংগ্রামশীল শ্রমিক আন্দোলনের পরিপন্থী এ কথাই আমরা তাঁকে বলেছিলেম এবং এ কথা নিয়েই তাঁর সহিত আমাদের মত-বিরোধ ঘটেছিল। জোশী, চমনলাল এণ্ড কোম্পানীর সম্বন্ধেই আমরা সাকলাৎ ওয়ালাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেম। কিন্তু, তখন তিনি আমাদের কথা একেবারেই শোনেন নি। এ দেশে যাঁরা সংগ্রাম শীল শ্রমিক-আন্দোলনের অগ্রণী তাঁরা সংখ্যায় কম এবং সহায় সম্বল হীন ব'লে সাকলাৎওয়ালা জোশী, চমনলাল এণ্ড কোম্পানীকেই অধিকতর প্রীতির চোখে দেখেছিলেন। এত

দিনে যে তাঁর ভুল ভেঙেছে, তিনি যে জোশী, চমনলাল প্রভৃতির স্বরূপ চিনতে পেরেছেন, তাতে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। "লণ্ডনের ওয়ার্কস ওয়েলফেয়ার লীগ্ অফ্ ইণ্ডিয়া" ভারতীয় শ্রমিকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই গঠিত হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকগণের প্রকৃত অবস্থা কি তা এই লীগের কাছ থেকে বৃটিশ শ্রমিকগণ জানতে পারে। দিল্লীতে অল্-ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল তাতে ওয়ার্কর্স ওয়েলফেয়ার লীগকে অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের লণ্ডন এজেণ্টস্ নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু, গত মার্চ মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির সভায় জোশী ঠিক্ মিঃ শাপুর সহিত ষড়যন্ত্র ক'রে বৃটিশ ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসকেই সর্ব্বময় এজেণ্ট নিযুক্ত করেছে। বৃটিশ লেবর পার্টি ভারতীয় শ্রমিকগণের সহিত প্রবঞ্চনা করেছে। বৃটিশ লেবর পার্টিই কানপুর কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা ও ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের অনুমোদন করেছিল। বৃটিশ লেবর পার্টির সভ্য সাইমন কমিশনের সভ্যও হয়েছেন। জোশী কোম্পানী এহেন লেবর পার্টির সহিত ষড়যন্ত্র ক'রে ওয়ার্কর্স ওয়েলফেয়ার লীগের সহিত সম্পর্ক কেটে দিয়েছে। সংগ্রাম-শীল শ্রমিক আন্দোলনের এই শত্রুর দলকে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে না তাড়াতে পারলে শ্রমিক আন্দোলনের মঙ্গল কিছুতেই হবে না।

আটিয়ার নিপীড়িত কৃষক

ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার ১০৪ খানা গ্রামের কৃষকদের কথা আমরা বারে বারে "গণবাণী"তে লিখেছি। এ সম্বন্ধে কারো দৃষ্টি আজো পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে আকর্ষিত হয় নি। সেই ব্যাপারে ... কৃষকদের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, তথাকথিত রায়ত বা কৃষক আন্দোলনকারীর দল সেদিকে মনোযোগ দেওয়া একেবারেই আবশ্যক মনে করেন নি। অবশ্য কোনো কোনো তথাকথিত প্রজা বন্ধু এ উপলক্ষে এই ১০৪ খানা গ্রামের দুস্থ, নিপীড়িত কৃষকগণের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ আমাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন যে আটিয়ার ব্যাপার নিয়ে আমরা জমীদারদের আক্রমণ করছি কেন, ... মতে জমীদারের কোনো অপরাধ নেই। গবর্ণমেণ্ট জায়গাটাকে বন-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। আমাদের উচিত গবর্ণমেণ্টকেই গালাগালি দেওয়া। এই প্রশ্নকারীরাও নাকি কৃষকদের ব্যথার ব্যথী! কিন্তু, আমাদের মনে হয় তাঁদের প্রাণের টান জমীদারদের ওপরেই বেশী। এই ১০৪ খানা গ্রামের লক্ষাধিক কৃষককে পথে বসাবার বন্দোবস্ত জমীদারই করেছে। গবর্ণমেণ্ট ত শুধু জমীদারদের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। লক্ষাধিক লোকের বসতি যেখানে রয়েছে, লক্ষাধিক লোকের চাষের জমি যেখানে অবস্থিত সেই জায়গাটাকে জঙ্গলে পরিণত করার বুদ্ধি জমীদারদের মাথাতেই প্রথমে এসেছে। তারাই গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন-নিবেদন ক'রে জায়গাটাকে রক্ষিত জঙ্গল বলে ঘোষণা করিয়ে নিয়েছে। এই ১০৪ খানা গ্রামের ওপর থেকে জমীদারগণের মালিকানা স্বত্ব নষ্ট হয় নি, পরন্তু তাদেরই খাতিরে গবর্ণমেণ্ট সব কিছু করেছে ও করছে। অরণ্য লাভের অংশ সমস্ত জমীদারদের পকেটে না যেয়ে কিছু কিছু সরকারী তহবিলেও যাবে এবং মেহনতানা হিসাবেই যাবে। কাজেই, এ অবস্থায় কৃষকদের বিরোধ কি জমীদারদের সহিত নয়? বাংলা দেশে কৃষক আন্দোলনের মানেই হচ্ছে জমীদারদের বিরুদ্ধ-আন্দোলন। এখানে কৃষক আন্দোলনের উদ্দেশ্যই জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা এবং কৃষকদিগকে জমির প্রকৃত মালিক করে দেওয়া। জমীদার আর কৃষকের এই সংগ্রামে গবর্ণমেণ্ট বরাবরই জমীদারদের পক্ষাবলম্বন করবে। তা সত্ত্বেও কৃষকদিগকে সংগ্রাম চালাতে হবে। কৃষকদের মধ্যে একটা সমস্বার্থ বোধ জন্মানো একান্তই আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে আটিয়া পরগণার ১০৪ খানা গ্রামের কৃষকগণের ওপরে যে বিপদ এসেছে সে বিপদকে দেশের প্রত্যেক কৃষকেরই উচিত আপনার বিপদ বলে মনে করা। বর্ত্তমান সময়ে তাদের পক্ষে গ্রামে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বনবিভাগের লোকেরা তাদের ওপরে নানা প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করে দিয়েছে। কথায় কথায় তাদের জরিমানা হচ্ছে। সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক-শক্তি এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা না তুললে তার প্রতিকার কিছুতেই হবে না।

আসে অনাগত

—:*:—

আবদুল কাদের

—:*:—

আলোকের শিশু আসে ঊষা-পথে,
আঁধার ওই মিলালো;
জননী বোনেরা হুলু রব দাও
বধূরা প্রদীপ জ্বালো!

ভাঙ্গনের রণ-তূর্য্যের পিছে
নব-সৃষ্টির সূর্য্য উঠিছে,
বিশ্ব-শোভন সুন্দর আসে
পন্থ করিয়া আলো।
জননী বোনেরা হুলু রব দাও
বধূরা প্রদীপ জ্বালো।

আসে অনাগত নব সন্তান
পূর্ণ বীর্য্য, মুক্ত পরাণ;
সাম্যতন্ত্রী তরুণ আসিছে
মানুষেরে বাসি ভালো।
জননী বোনেরা হুলু রব দাও
বধূরা প্রদীপ জ্বালো।

নতুন পাতার পতাকা ওড়ায়ে,
আসে বসন্ত শীতেরে সরায়ে;
সর্ব্বহারার বিজয় আসিছে
ঘুচায়ে পথের কালো।
জননী বোনেরা হুলু রব দাও
বধূরা প্রদীপ জ্বালো।

লিলুয়া ধর্ম্মঘট

[illegible]

[illegible]

[illegible] লিলুয়ার শ্রমিকগণ [illegible] সংগ্রাম [illegible] দায়নি। [illegible] পেটের জ্বালা [illegible] কাজে ফিরে [illegible] করেছে বটে, কিন্তু, তাদের সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি যেমন ছিল ঠিক তেমনই [illegible] রয়েছে। তাদের এই সংগ্রামশীলতা এক দিন না একদিন তাদের কপালে জয়ের টিকা [illegible] দেবেই দেবে। তারা বিনা শর্ত্তে কাজে ফিরে [illegible] বটে, কিন্তু, তা ব'লে শোষণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের [illegible] কিছুতেই ঠিক [illegible] না যে শ্রমিকদের দাবী [illegible] পূর্ণ করতে হবে না। লিলুয়ার শ্রমিকগণ সংগ্রাম চালাতে শিখেছে। তাদের দাবী তারা আদায় করে ছাড়বেই ছাড়বে।

লিলুয়ার ধর্ম্মঘট থেকে আমাদিগের অনেক কিছু শিখবার আছে। এই ধর্ম্মঘটের ব্যাপারটাকে আমারা যদি আজকের দিন থেকে ধামা চাপা দিয়ে রেখে দিই তা হলে তাতে আমাদের ভবিষ্যত শ্রেণী-সংগ্রামের অনেক ক্ষতি হবে। কাজেই, এ ধর্ম্মঘট পরিচালনার ব্যাপারে যাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাজের সমালোচনা করা খুবই আবশ্যক। সত্য কথা, বলতে গেলে সব ব্যাপারটা একটি মাত্র লোকের ক্রিয়া-কাণ্ড হয়ে পড়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের শ্রমিক সঙ্ঘকে, অন্ততঃ লক্ষৌর এদিকের অংশটাকে মিঃ কে, সি, মিত্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না। মিঃ মিত্র যখন যা খুশী তা-ই করেছেন। তাঁর যথেচ্ছচারিতার দ্বারাই কাজের বহু ক্ষতি হয়েছে, ধরতে গেলে সবই কাজ পণ্ড হয়েছে। লিলুয়াতে যখন তিনি ইউনিয়নের শাখা গঠন করলেন তখন একটা শাখা কমিটি পর্য্যন্ত তিনি গঠিত হতে দিলেন না। বাঙালী শ্রমিকেরা শাখা কমিটি গঠনের চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু, তিনি অ-বাঙালী শ্রমিকদের হাত ক'রে বাঙালীদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করেছিলেন। মিত্র মশায় পরিশ্রম খুবই করেন। সে বিষয়ে আমরা তাঁকে কোনো দোষ দিতে পারিনে। তিনি [illegible]

[illegible] সাধারণ মজুর [illegible] করে [illegible] আমাদের [illegible]

[illegible] কিছু ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের [illegible] কারখানা ই, আই, রেলওয়ের আরো [illegible] রয়েছে। তা ছাড়া নিকটেই বি, এন, রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়া কারখানাও আছে। এমন অবস্থায় কেবল মাত্র লিলুয়ায় ধর্ম্মঘট ঘটিয়ে তা সফল করে তোলা একেবারেই অসম্ভব [illegible]। এ কথাটা আমরা বারে বারে মিঃ মিত্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আমরা তাঁকে বুঝিয়েছি যে ধর্ম্মঘট অন্যত্র বিস্তৃত না করতে পারলে সফলতার কোনো আশাই নেই। তিনি [illegible] আমাদের কথা বোঝেন নি, তা নয়। কিন্তু, তাঁর মনে এই ভয় জেগেছিল যে তিনি যদি বেশী জায়গায় কাজে হাত দেন তা হলে তাঁর ক্ষমতা হয়তো কোনো কোনো জায়গায় আর থাকবে না। এই ভয়েই তিনি একটি জায়গা ধ'রে বসেছিলেন। লিলুয়া ছেড়ে তিনি আর কোথাও যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর ভয় ছিল যে তাঁর লিলুয়ার রাজত্ব হয়তো তাঁর অনুপস্থিতিতে আর কেউ কেড়ে নেবে।

অণ্ডাল আর আসানসোলের ধর্ম্মঘট অনেক বিলম্বে করা হয়েছিল। সেই ধর্ম্মঘটের ক্রিয়াও মিঃ মিত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ নষ্ট হয়ে গেছে। আসানসোল ধর্ম্মঘটের পরে তিনি যে ভাবে এজেণ্টের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন তাতে তাঁর একটুও সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় নি।

সব কাজ একা করতে গেলে সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, এ ব্যাপারেও তাই হয়েছে। শ্রমিক মহলে লিলুয়ার ধর্ম্মঘটের ব্যাপারটা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। এই ধর্ম্মঘটের ভালো-মন্দর বিচারের দ্বারা আমাদের শ্রমিক-আন্দোলন বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে।

শ্রমিকরা কাজে ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও ব্যাপার এখনো মিটে যায় নি। ধর্ম্মঘটের সাহায্যকারী ও ধর্ম্মঘট-কারীদের নামে মোকদ্দমা এখনো দায়ের রয়েছে। আমরা এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা পরে করব।

চিঠি

—:০:—

(শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী, সম্পাদক, বীরভূম-বাণী)

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

কিছুদিন পূর্ব্বে আপনাদের গণবাণীর একজন হিতৈষী শ্রীযুক্ত সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, গণবাণীতে মাঝে মাঝে লেখা পাঠাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি সামান্য শক্তি নিয়ে বীরভূমে তথাকথিত ডিপ্রেস্‌ড ক্লাশে শিক্ষা বিস্তার জন্য চেষ্টা করছি বলেই হয় ত সৌম্য বাবু আমাকে গণবাণীতে লিখতে বলেছিলেন। আমি তাঁকে লেখা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রে উঠতে পারি নি। কেন পারি নি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে, সে বিষয় আজ কিছু বলব।

যে কারণেই হোক এদেশে যাঁরা গণনায়কের পদ গ্রহণ করেছেন, তাদের সামাজিক অবস্থা আর সাধারণ কুলি-মজুরগণের সামাজিক অবস্থা এক রকমের নয়। সামাজিক অবস্থার সাম্য নীতির উপরেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মুখে গণহিতৈষী হলেও, ঐ সমগ্র দলের সাড়ে পনের আনা লোক মজ্জাগত কৌলিন্য শিকার জন্য, মনে তথাকথিত ধনিক সম্প্রদায়ের [illegible] সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য লালায়িত। সুযোগ পেলেই অর্থাৎ [illegible] আশীর্ব্বাদ পেলেই আমরা সবাই একমেই "বড়লোক [illegible] যাই"। ঐরূপে বড়লোক হবার পূর্ব্বে গণের সঙ্গে যে [illegible] প্রীতি আমরা প্রদর্শন করি সে প্রীতি হচ্ছে বড় লোকের [illegible] ভাব— গরীবের প্রতি আত্মীয়তা পাতাবার [illegible] আমারি ভৃত্য যখন আমাকে একটু সোজা [illegible] রকমের উচিত কথা বলতে চায় অমনি আমি [illegible] বিরক্ত হই। এ স্বভাবটী আমাদের খুব মজ্জাগত [illegible] আমার নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করেই বলছি [illegible] অনেক সময় ডিপ্রেস্‌ড ক্লাসের লোকেরা তাদের মজ্জাগত [illegible] এবং কুশিক্ষার ফলে আমার উপদেশকে [illegible] এবং আমার গুরুগিরির প্রতি ভক্তি দেখায় না। [illegible] আমার মজ্জাগত কৌলিন্য মুখে না হোক, মনে মনে [illegible] দের জন্য আমাদের কিছু করতে আসাই বিড়ম্বনা [illegible] ভদ্রলোকের মান সম্ভ্রম রেখে কথা কইতে পারে না [illegible] এবং "আমাদের" সম্বন্ধ ভেদজ্ঞান আমাদের [illegible] মধ্যে গিয়ে কাজ করবার বিশেষ একটা অন্তরায়। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই ভেদজ্ঞানকে আমরা [illegible] উত্তেজনাময় আন্দোলন দিয়ে অস্বীকার করবার চেষ্টা করছি। বস্তুতঃপক্ষে ঐ ভেদটা অন্তরের গভীরতম জায়গার, ভেদ [illegible] বাইরের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ খুব কম। মনে পড়ে কয়েক বৎসর [illegible] আমাদের বাড়ীতে দুর্গা পূজার সময় অঞ্জলি দেবার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছিল। যাঁরা ডেকে ছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন এ ছোকরা নিশ্চয়ই অঞ্জলি দেবে না, তবু ওকে একটু জব্দ করা যাক। আমি অঞ্জলি দিতে রাজী হলুম, কিন্তু নিম্নলিখিত শর্ত্তে। দুর্গাকে যখন আমরা জগজ্জননী বলি তখন তিনি নিশ্চয়ই হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলের না হোক—অন্ততঃ পক্ষে, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকল শ্রেণীর হিন্দুরই জননী, কাজেই পূজা দেখবার জন্য সেখানে উপস্থিত যত শ্রেণীর হিন্দু ছিলেন সকলকেই অঞ্জলি দেবার অধিকার দিতে হবে"। এই শর্ত্তের কথা বল্‌তেই গুরুজনেরা বল্‌লেন "তোমার যদি হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞান থাকত তা হলে এ রকম কথা বলতে না"। গুরুজনকে উচিত কথা বলা কেউ কেউ অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করেন। কাজেই, আমাকে বল্‌তে হল "কথাটা ঠিক। হিন্দু-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ- বলেই অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়াটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক হয়েছে, বিজ্ঞ হলে অবশ্য আপনাদের কথাকে মেনে নিতুম। দুর্গা মা ঠাকুরুণ যদি রায় চৌধুরী বংশেরই এক চেটিয়া সম্পত্তি হন ক্ষতি নাই, কিন্তু এ অবস্থায় তাঁকে জগজ্জননী বলে জগজ্জননীর প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক ভাবকে হেয় করতে পারব না। প্রশ্ন হল আমি প্রতিমা পূজা মানি কিনা মানি না। উত্তর দিলাম; ধর্ম্মের ক্ষুধা আমার জাগ্রত হয় নি, কাজেই "আকার পূজা" এবং "নিরাকার পূজা" সম্বন্ধে "হাঁ" কিম্বা "না" যাই বলব সেটাই ভণ্ড উত্তর হবে। সামাজিক দিক দিয়ে এবং কবি কল্পনার শিল্পকলার দিক দিয়ে দুর্গাপূজা সরস্বতী পূজা ইত্যাদির একটি মূল্য অনুভব করি। সেজন্য সরস্বতী পূজা সম্বন্ধে কয়েকবার কবিতাও লিখেছি এবং ছেলেদের চাঁদাও দিয়েছি। কিন্তু সেই সামাজিক দিক দিয়েও এই সব পূজার দরুণ অসাম্যের ভাব পূরা মাত্রায় থাকে বলে মনে দুঃখ হয়"।

এই শ্রেণীর একটা সামাজিক অসাম্যতা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জাতির মধ্যে থাকার জন্যই গণ-আন্দোলনে সাফল্য আনা অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমার মনে হয়, যে সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা (অবশ্য সাধু ইচ্ছা নিয়েই) গণ-আন্দোলনকে সফল করতে যাচ্ছেন, তাদের নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে গণতন্ত্রের ভাবকে না জাগাবার চেষ্টা করলে, এক জায়গা থেকে টপ্‌কে অন্য জায়গায় গিয়ে সাম্য প্রচার করলে সে সাম্যনীতি মৌখিকতায় ব্যর্থ হবে।

আমরা আন্তরিক ভাবে গরীব কুলি মজুরদের এবং তথাকথিত অস্পৃশ্যদের উন্নতি করতে অক্ষম বলেই, বাহিরের দিকে যতটুকু পারি সেটা করা কি অন্যায়? নিশ্চয়ই তা অন্যায় নয়, বরং সেটা ভাল। কিন্তু যাঁরা সামাজিক দিকে কুলীন হয়েও অধঃপতিত তাঁরা অস্পৃশ্যদের এবং গরীব কুলি-মজুরদের বাহিরের দিক দিয়ে সাহায্য করলে সেটা কতকটা প্রচলিত ধারায় খিলাফৎ থুফির কাজ করা হবে (যেটা অবশ্য কিছু না করার চেয়ে ঢের ভাল) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উন্নতি বিধান করা হবে বলে আমার বিশ্বাস নয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের উচিত আধুনিক প্রয়োজনানুযায়ী সমাজে সাম্যভাব আনয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, গণ-আন্দোলনের গতিকে সার্থক করবার চেষ্টা করা।

এইজন্য মধ্যবিত্ত সমাজে সব দিক দিয়ে সোশ্যাল রিফরমের * বিশেষ আবশ্যকতা আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের যুবকগণ আজকাল কোন রকমের রিফরমের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার চেষ্টা না করে, কেবল সামাজিক ধর্ম্মাচরণের সাবেকি প্রথাকে, সর্ব্বত্র কায়েম করবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে ঘরে ঘরে এবং ঘরে বাহিরে দারুণ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবল করে তুল্‌ছেন এবং যুবকদের মধ্যে নেতৃত্বের খোঁটাকে কায়েমী করবার জন্য, খ্যাত এবং অখ্যাত অনেক ব্যক্তি হঠাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ধুরন্ধর হয়ে উঠেছেন। "আত্ম-প্রতিষ্ঠা" করতে হবে বলে সাম্প্রদায়িক নেতারা যে রকম এ্যাগ্রেসিভ হতে সুরু করেছেন, তাতে ক'রে কল্পিত ভারত-জাতির, প্রোগ্রেসিভ গতি পদে পদে বাধা গ্রস্ত হচ্ছে না কি?

---

* বিপ্লবের কেন নয়? — সম্পাদক, "গণবাণী"।

"গণবাণী"র প্রচার

—০:০:০—

[illegible] আমাদের বিষয় যে [illegible] দলের [illegible] মুখপত্র "গণবাণী" আবার বার হয়েছে। [illegible] তুলবার জন্যে এবং দলের [illegible] জন্যে "গণবাণী"র সদ্ব্যবহার করা [illegible] আবশ্যক। [illegible] খানা যাতে স্থায়ী হতে পারে, [illegible] তার চেষ্টা দলের প্রত্যেক [illegible] উচিত। [illegible] "গণবাণী" আর না বন্ধ হয়ে যায় [illegible] দৃষ্টি রাখতে হবে।

আগে যতটা হয়েছিল তার চেয়ে [illegible] প্রচার [illegible] বেশী বাড়াতে হবে। [illegible] রাজনৈতিক ও আর্থিক, এ উভয় কারণেই [illegible] প্রচার ও এক হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে [illegible] নেই। এর প্রচারের সুবিধার জন্যে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ [illegible] কিংবা অর্থ ব্যয় করাও সম্ভবপর নয়। কাজেই প্রচার [illegible] ভার দলের সভ্যদিগকেই নিতে হবে।

আমাদের দলের [illegible] ও চীনে [illegible] সকল দলের বহু সংখ্যক সভ্য প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা দলের কাগজ বিক্রয়ের কাজে ব্যয় করে থাকে। এ দেশেও আমরা সে উপায় অনায়াসেই অবলম্বন করতে পারি। আমাদের দলটা আদর্শবাদীর দল না হলে সংবাদপত্র বিক্রেতার দল হলে অনেক কিছু কাজ হত। এতে শুধু যে কাগজের প্রচার বেড়ে যেত তা নয়, এর দ্বারা দলের প্রতিপত্তি, সংগঠন ও কাজ করবার ক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেত।

আমাদের দলের যে সকল সভ্যের শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের সহিত যোগ রয়েছে তাঁদের উচিত আপন আপন ইউনিয়নের সভ্যগণের নিকটে কাগজ বিক্রয় করা। এ ছাড়া, কলেজ সমূহে ও কলেজ স্কোয়ার প্রভৃতি ছাত্রদের সাধারণ সমবেত হওয়ার স্থান সমূহেও কাগজ বিক্রয়ের জন্যে আমাদের সভ্যগণের যাওয়া উচিত। রাজনৈতিক ও ট্রেড্ ইউনিয়ন বিষয়ক যে কোনো সাধারণ সভায় কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে দলের কোনো না কোনো সভ্যের হাজির হওয়া একান্তই আবশ্যক। কারখানা সমূহের দুয়ারে দাঁড়িয়ে কাগজ বিক্রীরও ব্যবস্থা করতে হবে। মফস্বলেও কোনো সাধারণ স্থানে কাগজ বিক্রীর ব্যবস্থা করা চাই-ই চাই।

দলের যে সকল সভ্য, বিশেষ ক'রে ছাত্র সভ্য সময়াভাবে সাধারণ প্রচার কার্য্যে ও সংগঠনের কার্য্যে যোগদান করতে পারেন না, তাঁরাও কাগজ বিক্রয় করতে পারেন। দলের নিয়মপত্রে লেখা আছে যে মেম্বর মাত্রকেই দলের প্রচার কার্য্য করতে হবে। "গণবাণী" বিক্রয়ের কাজ করে সকল সভ্যই দলের প্রচার কার্য্যে সাহায্য করতে পারেন।

কাগজ বিক্রয়ের কাজকে ছোট কাজ মনে করা কিছুতেই উচিত নয়। কাগজ বিক্রয় করা আবশ্যক। কাজেই আমাদের তা করতে হবেই হবে। একবার রীতিমত আরম্ভ করতে পারলেই কাজটা পরে আমাদের নিকটে নিশ্চয়ই আমোদজনক হয়ে উঠবে। কারখানার দুয়ারে কাগজ বিক্রয় করে আমরা শ্রমিকদের সহিত পরিচিত ও হতে পারব। ফলে, কারখানা কমিটি কিংবা ইউনিয়ন গঠন করা ইত্যাদি কাজ খুবই সহজ হয়ে উঠবে।

[illegible] মনে রাখতে হবে যে [illegible] কাগজ [illegible] করার [illegible] [illegible]

[illegible] প্রত্যেক সপ্তাহে [illegible] সেই হিসাবেই পরের সপ্তাহের [illegible] হবে। বিক্রী [illegible] যে পয়সা পাওয়া যাবে [illegible] ঠিক সময়ে আফিসে জমা করে দিতে হবে।

শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ

ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী ও রাশিয়া এই তিন দেশের [illegible] ভাবে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তার একটা বিবরণ আমরা নিম্নে দিচ্ছি :—

সাময়িক ভাবে কাজের অযোগ্যতার জন্যে

রাশিয়াতে শ্রমিকরা পূর্ণ বেতন পেয়ে থাকে।

জার্ম্মানীতে শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ১০ থেকে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে এই ক্ষতিপূরণ চাকুরীর [illegible] উপরে নির্ভর করে থাকে। দীর্ঘকাল কাজ করলে বেশী এবং কম সময় কাজ করলে কম বেতন দেওয়া হয়। নারী শ্রমিকগণ কম ক্ষতিপূরণ পান।

অকর্ম্মণ্যতার পেন্সন

রাশিয়াতে পূরা মজুরী পেন্সন হিসাবে দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণীতে শতকরা ৬৫ টাকা দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৫০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়ে থাকে।

অক্ষমতার পেন্সন

রাশিয়াতে বেতনের শতকরা ৬৬ ভাগ।

জার্ম্মাণীতে বেতনের শতকরা ১০ থেকে ২৫ ভাগ।

ইংল্যাণ্ডে বেতনের শতকরা ৭ থেকে ১৩ ভাগ।

বেকার থাকার পেন্সন.

রাশিয়াতে শতকরা ১৩ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত।

জর্ম্মাণীতে শতকরা ৪৬ টাকা।

ইংল্যাণ্ডে শতকরা ২০ টাকা থেকে ৬০ টাকা।

গর্ভাবস্থার পেন্সন

রাশিয়াতে পূর্ণ বেতন দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণীতে বেতনের শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ।

ইংল্যাণ্ডে এক কালীন দুই থেকে চার পাউণ্ড।

বেকারীর পেন্সন ব্যাপারে রাশিয়া এখনো পশ্চাদ্‌পদ। তবে নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন হলে রাশিয়ার হার বৃটীশ হারের চেয়েও বেশী হবে।

শ্রেণী-সংগ্রাম

—০—

লিলুয়া ধর্ম্মঘট

ইউনিয়নের হাতে টাকা নেই বলে জেনারেল সেক্রেটরী মিঃ কিরণ চন্দ্র মিত্র ধর্ম্মঘট তুলে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে শ্রমিকদের কাজে ফিরে যাওয়ার মানে আত্ম-সমর্পন নয়। এটা একটা অস্থায়ী বিরতি মাত্র। আবার যখন ধর্ম্মঘট করার সুযোগ হবে শ্রমিকরা তখনই ধর্ম্মঘট করবে।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

আটিয়া-টাঙ্গাইল শাখা

আটিয়া পরগনার কৃষকদের দুর্গতির কথা আমরা অন্যত্র দিয়েছি। কিন্তু, তাই শুধু দুর্গতির শেষ নয়। ব্যক্তি গত অভিযোগের বিবরণী আমাদের নিকট এত বেশী এসেছে যে তা দু'চার সপ্তাহে প্রকাশ করেও শেষ হবে না। বন-বিভাগ নানা প্রকার ছুতো ধরে লোকেদের নির্য্যাতিত করছে। সরকারী রাস্তা দিয়ে তাদের গাড়ী চালাতে দিচ্ছে না। গাড়ী তাদের আবদ্ধ ক'রে রেখে দিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে তবে ছেড়ে দিচ্ছে। বন বিভাগের অত্যাচার দেখে মনে হচ্ছে যে আটিয়া পরগনার ১০৪ খানা গ্রামে কোনো প্রকারের আইন কানুন আর নেই। আমরা নিম্নে এক খানা মোকদ্দমার আরজী অবিকল উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। বাসাইল থানার অধীন মুচারিয়া পাড়া গ্রামের আতন আলী এই মোকদ্দমা দায়ের করেছে।

"বাদীর নিবেদন, এই আমাদের গ্রাম হইতে কালমেঘা ও আটিয়া এবং অন্যান্য স্থান দিয়া বহুকালাবধি একটা প্রকাশ্য গাড়ীর রাস্তা ফুলবাড়িয়া বাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আমরা বহুকাল যাবৎ উক্ত রাস্তা দিয়া কাঠ বোঝাই গরু ও মহিষের গাড়ী চালাইয়া ফুলবাড়িয়া বাজারে কাঠ বিক্রয় করিয়া আসিতেছি। ১নং বিবাদী আটিয়াগরের ফরেষ্টার ও অন্যান্য বিবাদিগণ তাহার অধীনস্থ উক্ত গরের গার্ড ঘটনার দিন, আমরা গাড়ী বোঝাই করিয়া কাঠ বিক্রয় করিতে গেলে আটিয়া ফুলবাড়িয়ার মধ্য দিয়া গাড়ী চালাইবার জন্য আমাদিগকে কিছু টাকা দিতে বলে। আমরা প্রতিবাদ করিলে ১নং বিবাদীর হুকুমে ২নং বিবাদী আমাদের গাড়ী হইতে মহিষ ও গরু ছাড়াইয়া নিয়া ফুলবাড়িয়া খোয়াড়ে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এবং অন্যান্য গার্ড গাড়ী হইতে চাকা খুলিয়া আমাদের গাড়ী ও কাঠ বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। আমরা প্রতিবাদ করিলে বিবাদিগণ আমাদিগকে অশ্লীল গালাগালি করিয়া মারপিট করিতে আক্রমণ করিয়াছিল। আমরা স্থানীয় নায়েব ও দারোগাকে ঘটনার বিষয় জানাইয়াছি। মোকদ্দমা করিবার জন্য আমরা ভুলে প্রথম টাঙ্গাইল গিয়াছিলাম। তজ্জন্য নালিশ করিতে বিলম্ব হইল। বিবাদিগণ আমাদের অনুমান ৫০।৬০ টাকা মূল্যের কাঠ ও গাড়ী বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। প্রার্থনা সাক্ষী ও আসামী তলব দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ২।৪।২৮

"প্রকাশ থাকে যে ১নং সাক্ষী ও আমি কাঠ কিনিয়া আনিয়াছিলাম। ২নং সাক্ষী তাহার নিজের ঘরের পুরাণ কাঠ বিক্রী করিতে আনিয়াছিল।"

কেশোরাম কটন মিলে চাঞ্চল্য

১ই জুলাই শনিবার হতে মাটিয়াবুরুজ কেশোরাম কটন মিলে আবার শ্রমিক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ইতোপূর্ব্বে যে ধর্ম্মঘট হয়েছিল তার মীমাংসার সময় শ্রমিকদিগের ইউনিয়ন নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থিত করেছিলেন:—

(১) পুরাতন বন্দোবস্ত অনুসারেই শ্রমিকদিগকে বেতন দিতে হবে।

(২) ধর্ম্মঘট করার জন্য কাজ হতে কাউকে বরখাস্ত করা হবে না।

(৩) ধর্ম্মঘট সময়ের বেতন দিতে হবে।

কলের ম্যানেজিং এজেন্টগণের পক্ষ থেকে মিঃ বিরলা প্রথম দু'টি সর্ত্তে রাজী হন, কিন্তু, তৃতীয় সর্ত্তটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, বলেন। এ কথার উপরেই ধর্ম্মঘট মিটে যায়। দুঃখের বিষয় ধর্ম্মঘট মিটে যেতে না যেতেই [illegible] বিভাগের একটি সর্দ্দারকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে শ্রমিকদের মধ্যে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ইউনিয়নের তরফ থেকে এ বিষয়ে লেখা-লেখি করেও কোনো ফল হয় নি। এদিকে ধর্ম্মঘটের সময়ের বেতন কাউকে দেওয়া হয় নি ব'লে অসন্তোষের মাত্রা আরও বেড়েছে। শ্রমিকদিগের মধ্যে যখন এরূপ একটা আপত্তি ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হচ্ছিল তখন দু'জন তাঁতীর সহিত অন্য একজন সর্দ্দারের বিবাদ হয়। এ কারণে সে দু'জন তাঁতীকে বরখাস্ত করা হয়। গত শনিবার দিন এই ঘটনা ঘটে। অন্যান্য শ্রমিকরা এরূপ বরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে গেলে ম্যানেজার তাদের কথা [illegible] করেন। ফলে, সঙ্গে সঙ্গেই কল বন্ধ হয়ে যায়। প্রকাশ যে কাজ বন্ধ করে শ্রমিকগণ বের হয়ে যাচ্ছিল তখন জমাদার [illegible] সিংহের আদেশে কয়েকজন গুর্খা দরোয়ান কুকরি হাতে নিয়ে শ্রমিকদিগকে কলের ভিতরের দিকে তাড়া করে নিয়ে যায় এবং বলতে থাকে যে যে কেউ বাইরে যাবার চেষ্টা করবে তাকেই কেটে ফেলা হবে। শ্রমিকরা ভয় পেয়ে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এ সময় কলের ফটকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিস এসে গুর্খাদের নিরস্ত করলে গোলযোগ কেটে যায় এবং বহু শ্রমিক বাইরে চলে আসে।

রবিবার সকাল বেলা বেঙ্গল টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফ থেকে ডাক্তার প্রভাবতী দাশগুপ্তা, কালিদাস ভট্টাচার্য্য, মুজফ্ফর আহ্মদ, ধরণীকান্ত গোস্বামী ও মনীন্দ্রকুমার সিংহ কেশোরাম কটন মিলের ম্যানেজার ও সেক্রেটরীর সহিত দেখা করেছিলেন। কোনো মিটমাট হয় নি। কলওয়ালারা ব্যাপারটাকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধে পরিণত করার চেষ্টায় রয়েছে। ইউনিয়নের তরফ থেকে ৭ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। এই ৭ দিনের ভিতর একটা সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে ব্যাপার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখন ঠিক বলা যায় না।

দেশীয় মিলে ধর্ম্মঘট হলে "জাতীয় শিল্প ধ্বংস হলো" রব যাঁরা তোলেন তাঁরা এখন কোথায়? এই যে মাটিয়াবুরুজে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাধাবার চেষ্টা চলেছে সে সম্বন্ধে তাঁরা কি বলতে চান?

নিম্বকর গেরেফ্তার

বোম্বে "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর আর, এ, নিম্বকর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ ধারা অনুসারে গেরেফ্তার হয়ে জামিনে মুক্ত হয়েছেন। তাঁর অপরাধ এই যে তিনি বি, বি, এণ্ড সি, আই, রেলওয়ের শ্রমিকদের এক সভায় সি-আই-ডি'র একটি হেড কনেষ্টবলকে থাকতে দেন নি, [illegible] নাকি খুব অপরাধ হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, সভা [illegible] হতে বসেছিল,—কোনো খোলা জায়গাতে নয়।

———

শ্রমিক আন্দোলনে অন্তরায়

—:০:—

[illegible] গোস্বামী

শ্রমিক আন্দোলনে অন্তরায়ের [illegible] আন্দোলন [illegible] ধনিক ও মনিবদের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] ধনিক আর মনিবদের [illegible] তাহারা [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible] তাহাতে [illegible] বাবা [illegible] একটা [illegible] বিদেশী ধনিক যদি স্বদেশী [illegible] হইলে [illegible] শ্রমিকের পক্ষে উহার [illegible] তাহার [illegible] হইয়া উঠিয়াছে [illegible] দিতেছে [illegible] বাড়াইতে পারিতেছে [illegible] দেশের [illegible] না করিয়া স্বদেশী [illegible] পার্থক্য স্থির করিতে পারিতেছে [illegible] যাহার সঙ্গে যে মালিক স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক সে যদি তাহার শ্রমের দাম কাড়িয়া নেয়, সে যদি তাহাকে [illegible] পাওয়াতে [illegible] তাহা হইলে উক্ত মালিক স্বদেশী ধনিকই হউক আর বিদেশী ধনিকই হউক শ্রমিকের চক্ষে একই শ্রেণীর অন্তরায় [illegible] ধনিক বা মালিকের কোন জাতিত্ব, [illegible] বা দেশের [illegible] নাই। শ্রমিকের পক্ষে তাহার যে পার্থক্য বা ব্যবধান [illegible] শ্রেণীগত। ধনিক তাহার এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য চিরকাল বজায় রাখিতে সচেষ্ট। উহা ধনিক প্রবৃত্তি। যাহারা [illegible] করিয়া বেড়ান দেশী ধনিকে আর বিদেশী ধনিকে [illegible] পার্থক্য আছে, হয় তাহারা নির্বোধ নতুবা তাহারা অন্য দেশের ন্যায় এ দেশেরও ধনিক শ্রেণীর গলগ্রহ। যেখানে [illegible] ধনিকশ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানেই এই প্রকার [illegible] ধনিক গলগ্রহজীব সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার এক শ্রেণীর গলগ্রহ সম্প্রদায় সৃষ্টি করাও দুনিয়ার ধনিক শ্রেণীর একটা প্রধান কাজ। কারণ এই জীব-সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনিক ও মালিক কৌশলে আপনাদের কাজ হাসিল করিয়া থাকে। শ্রমিকের কাজে ইহারা ভীষণ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া থাকে। ধনিক সোজাসুজি শ্রমিকের মাথায় বাড়ি দেয় কিন্তু এই সম্প্রদায় অপরোক্ষ ভাবে শ্রমিকের মজ্জা নষ্ট করিয়া দেয়। এই ধনিক-পুষ্ট সম্প্রদায় [illegible] দোহাই দিয়া, সমাজের অনিষ্ট দেখাইয়া, আইনের ভয় দেখাইয়া, সাহিত্য কিম্বা ধর্মকে অমূলক মতবাদের প্রচার করিয়াও নানা অপবাদের সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকের সংগ্রামকে ব্যর্থ করিয়া দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। ধনিক শ্রেণীর অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া উহাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না, রাখিতেও পারে না। কারণ অন্নের বিনিময়ে উহারা নিজেদের সবকিছুই বিলাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ধনিকের শিখান বুলি কবচান ছাড়া উহারা দুনিয়াতে আর কিছুই করিতে পারে না। দুনিয়ার ধনিক সম্প্রদায় এই প্রকার এক গলগ্রহ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ও এই সম্প্রদায়কে আপনাদের অস্ত্রস্বরূপ চালনা করিয়াই প্রচুর [illegible] সক্ষম হইয়াছে। এই মহাশক্র ধরাপৃষ্ঠে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন শ্রমিককে যে কত লাঞ্ছনা [illegible]

[illegible] সমষ্টি [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] বাড়িতেছে [illegible] বাড়িতেছে। [illegible] দেখা যায় [illegible] ধনিকগণ [illegible] পাইয়া দেশী ধনিক [illegible] একটুকুও [illegible] ধনিকবৃত্তি [illegible] ধনিক [illegible] এই প্রকার। ধনিক চায় তাহার লাভ, [illegible] তাহার [illegible] যে স্বাদেশিকতার কোন দাম [illegible] না। ধনিকের নিকট আজ যাহারা স্বাদেশিকতার শিক্ষা লাভ করিতে মনোনিবেশ করিতেছেন তাঁহারা সমাজের মহা অকল্যাণে ব্রতী হইতেছেন। কারণ তাঁহারা শ্রেণী-স্বার্থ সংগ্রামে ধনিকদের সাহায্য করিতে যাইয়া সাক্ষাৎ ভাবে সমাজের উৎপাদক শ্রেণীর সর্বনাশ সাধনই করিবেন।

বরিশাল কারখানায় অসন্তোষ

—:০:—

আর, এস, এন, কোম্পানীর বরিশালস্থ কারখানার শ্রমিকগণের মধ্যে একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক দিন পূর্বে শ্রমিক গণ কর্তৃপক্ষের নিকটে তাদের নিম্ন লিখিত দাবীগুলি পেশ করেছে :—

(১) কারখানায় পানীয় জলের কোনো বন্দোবস্ত নেই। অবিলম্বে অবিরাম কলের জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হউক।

(২) কারখানার যে সকল শ্রমিক অসুস্থ হয়ে [illegible] কারখানার কোনো দুর্ঘটনার দরুণ বাড়ীতে পড়ে থাকে তা[illegible] দিগকে ডাক্তার কখনো দেখতে যান না। এখন থেকে ডাক্তার

যাতে তাদের দেখা-শোনা করে তার বন্দোবস্ত করা হউক।

(৩) পীড়াগ্রস্ত হয়ে শ্রমিকরা যখন কাজে যেতে পারে না তখন তাদের কোনো বেতন দেওয়া হয় না। কেবল মাত্র যারা কারখানায় আহত হয় তাদিগকে চার ভাগের এক ভাগ বেতন দেওয়া হয়। যারা অসুস্থ হয়ে কাজে যেতে পারেনা কিংবা কাজ করতে করতে আহত হয় তা-দিগকে পূর্ণ বেতনে ছুটী দেওয়া হউক।

(৪) যে সকল শ্রমিক ছুটীতে বাড়ী চলে যায় দৈব-দুর্ঘটনা বশতঃ তাদের ফিরতে দেরী হলে তাদের পাশ বাতিল হয়ে যায় এবং ফিরে এসে তাদের কারখানায় প্রবেশ করাও এসিষ্টান্ট ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ারদের দয়ার উপর নির্ভর করে। অনেক সময়ে তাহাকে বিনা নোটীসে কাজ থেকে বরখাস্ত করেও দেওয়া হয় এবং তার জন্যে কোনো ক্ষতি পূরণও করা হয় না। এ সবের প্রতিকার হওয়া উচিত। যুক্তি সঙ্গত কারণে অনুপস্থিত থাকতে হলে পাসের সময়ও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এরূপ অনুপস্থিতির জন্য কাজ থেকে বরখাস্ত করাও উচিত নয়।

(৫) কারখানার ভিতরে দুর্ঘটনার দরুণ কেউ একেবারেই যদি কাজের অক্ষম হয়ে যায় কিংবা মরে যায় তা হলে অক্ষম ব্যক্তিকে ও মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে এক সঙ্গে ২৪ মাসের বেতন দেওয়া হউক। মৃত ব্যক্তির কেউ কাজের উপযুক্ত থাকলে কোম্পানীর উচিত তাকে কাজে ভর্ত্তি করে নেওয়া।

(৬) শ্রমিকদের বেতন অন্যান্য জায়গার তুলনায় কম। তাদের বেতন শতকরা ৩০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং শতকরা ১০ টাকা বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হউক।

(৭) কোনো শ্রমিকের বেতন যেন মাসিক ২৫ টাকার কম না হয়।

(৮) শ্রমিক দিগকে দৈনিক মজুর ব'লে গণ্য না ক'রে কোম্পানীর স্থায়ী কর্ম্মচারী বলে গণ্য করা হউক।

(৯) যে শ্রমিক কারখানায় ২০ বছর কাজ করবে কাজ থেকে চলে যাবার সময় তাঁকে হয়তো ১৮ মাসের বেতন দেওয়া হউক কিংবা তাকে সমস্ত জীবনের জন্যে পেন্সন দেওয়া হউক।

শ্রমিক গণের এ সকল অভিযোগের প্রতিকার না করলে যাতে প্রতিকার হবে সেই পথ অবলম্বন করবে বলে জানিয়েছে।

পাটকলে ধর্ম্মঘট

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:*:—

[শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য]

—০—

ওয়েলিংটন জুট মিলের মালিকরা ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের দাবীর উত্তরে টাকায় এক আনা হিসাবে "বোনাস" বৃদ্ধি করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলে প্রথম বারের ধর্ম্মঘট শেষ হয়। সেই সঙ্গে কর্ত্তারা কিন্তু ব্যবস্থা করেন, যে ধর্ম্মঘটের ফলে কল যতদিন বন্ধ ছিল তাহা পূরণ করিয়া লওয়ার জন্য সপ্তাহে পাঁচ দিনের পরিবর্ত্তে সাড়ে পাঁচ দিন করিয়া চালান হইবে। তাঁতিরা কিন্তু সেই অধিক আধ রোজ কাজ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট "রেট" ব্যতীত "বোনাস" পাইবে না। সকল মিলের ন্যায় এই মিলের তাঁতিদেরও থান বেশী হইলে নির্দ্দিষ্ট রেটের উপর একটা "বোনাস" দেওয়া হয়। যেমন ১১ পোর্টার ১২ শট্স ৪০ ইঞ্চি (১১×১২—৪০") কাপড় এক থান বুনিলে এক টাকা ও পাঁচ টাকা দেওয়া হয়। যদি পাঁচ থানের উপর সপ্তাহে কেহ ছয় থান বুনিতে পারে তাহাকে ছয় টাকার স্থলে সাত টাকা এবং সাত থান বুনিলে নয় টাকা দেওয়া হয় ইত্যাদি। এই অধিক দেওয়াকে "প্রোডাকশন্ বোনাস্" বা "বক্শিস্" বলা হয়। ইহার উদ্দেশ্য লোকে নিজের গরজেই অধিক মেহনত করিবে। ম্যানেজার সাহেব হুকুম করিলেন যে, পাঁচদিন কাজ করিয়া তাঁতিরা যে কয় থান বুনতে পারিবে তাহার উপর আবশ্যক মত বোনাস্ দেওয়া হইবে বটে কিন্তু সাড়ে পাঁচ দিনের দরুণ যে আধ রোজ, সেই আধ রোজে যে অধিক থান তাহারা বুনিবে তাহার জন্য সাধারণ রেট ব্যতীত বোনাস্ দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ কর্ত্তাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহারা তাহা পূরণ করিয়া লইতে থাকিবেন। আর কল বন্ধ থাকার ফলে শ্রমিকদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ করা হইবে না। বলা বাহুল্য যে ম্যানেজার সাহেবের এই অদ্ভুত আব্দারে ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের যুক্তির (?) খাতিরে তাঁতিরা কেহই সাড়ে পাঁচ দিন চালাইতে রাজী হইল না। অগত্যা যাহা হইবার তাহা হইল। অর্থাৎ একটু কড়া রকমের চাপ দিতে পারিলেই যাহা সকল জায়গায় হয় এখানেও তাহাই হইল। সকলকেই বোনাস্ দিতে হইল। তাহার পর আসিল জবাব। টাকায় এক আনা হিসাবে বৃদ্ধি করিয়া দিতে ও বোনাস্ দিতে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া দেওয়া হয় যে ধর্ম্মঘটকারীদের কাহাকেও জবাব দেওয়া হইবে না। স্বার্থে আঘাত লাগিলে কারখানার মালিকরা যে কতদূর নীচে নামিতে পারে ওয়েলিংটন জুট মিলের ম্যানেজারের কথা ও কাজের তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। ধর্ম্মঘটের সময় যাহারাই একটু সাহস করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছে ও প্রধানতঃ যাহাদের চেষ্টায় ম্যানেজার সাহেবকে 'ধনুক-ভাঙ্গা পণ' নষ্ট করিয়া শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে, কল চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক সেই সব লোক গুলিকেই কল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দেশের চটকলের শ্রমিকরা এই সব ম্যানেজারের মুখের কথায় যে সহজে বিশ্বাস করে না শ্রমিকদের সহিত তাহাদের ব্যবহারই এজন্য দায়ী। সেদিন লাড্লো জুট মিলের ধর্ম্মঘটের সময়ও শ্রমিকরা আমাদিগকে বার বার বলিয়াছিল, "বাবু! সাহেব যাহা দিতে চাহে তাহা কাগজে লিখিয়া কলের দরজায় লাগাইয়া কিংবা ইউনিয়নের অফিসে পাঠাইয়া দিতে বলুন; নচেৎ মুখের কথায় কদাচ বিশ্বাস করিবেন না, কল চলিয়া গেলে আর কিছুই দিবে না ইত্যাদি।" যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। মালিকদের সহিত ব্যবহারে শ্রমিকরা যদি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করে তাহা হইলে দুর্ব্বল শ্রমিকদিগকেই পদে পদে ঠকিতে হইবে। রিষড়ার ওয়েলিংটন জুট মিলই বাঙ্গলা দেশে প্রথম চটের কল। এই মিলের ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে যাহাদিগকে জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঐ কলে প্রায় ৩০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছে। জীবনের অধিকাংশ দিন যাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া

মালিকদের লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ যোগাইয়া আসিয়াছে আজ বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় তাহাদিগকে বিদায় লইতে হইয়াছে। একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর খাম খেয়ালে তাহাদিগকে পথের ভিখারী সাজিতে হইয়াছে!! ইহার প্রতিকার কি? এই ধর্ম্মঘটের ব্যপারে পুলিশ ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যবহার আরও অধিক মনোরম। ধর্ম্মঘট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব "শান্তি" রক্ষার অজুহাতে ১৪৪ ধারা নোটীশ জারী করিয়া শ্রমিকদের সভা সমিতি বন্ধ করিয়া দেন। সর্ব্বত্র পুলিশের কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়। পাছে ধর্ম্মঘটকারীরা "শান্তি" ভঙ্গ করে সেই আশঙ্কায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল কি না আমরা জানি না। ধর্ম্মঘটের পরে কোথাও কোন হাঙ্গামা হয় নাই, কোন গোলযোগ ঘটে নাই। তথাপি শান্তি ভঙ্গের এত আশঙ্কা! শান্তি ভঙ্গের এই বিচিত্র আশঙ্কা ও উদ্বেগের পিছনে ধনীদের স্বার্থ রক্ষার অভিসন্ধিই অধিক ছিল কি না শ্রমিক সমাজই তার বিচার করিবেন। সে দিন আসিতেছে যে দিন ধনী কারখানাওয়ালাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের সকল গুপ্ত অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া বাংলার শ্রমিক সমাজ সগৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া দাড়াইবে ও জন সাধারণের ভৃত্যদের আজিকার এই পক্ষপাত দুষ্ট দুর্ব্ব্যবহারের কৈফিয়ৎ তলব করিবে। এখানে বলা আবশ্যক যে ওয়েলিংটন জুট মিলের ধর্ম্মঘটে শ্রমিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য ডাণ্ডীর পাটকলের শ্রমিক সমিতি উহার সেক্রেটারী মিঃ জে, এফ সাইমের মারফত পঁচিশ পাউণ্ড বা ৩২৯॥৶০ পাঠাইয়া ছিলেন। ডাণ্ডী হইতে এই টাকা আসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র মিত্র মহাশয় বিষড়ার সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়া শ্রমিকগণকে সাহায্য করিতেছিলেন। বাঙ্গলার পাট কলের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য ডাণ্ডীর পাটকলের শ্রমিক সমিতি পূর্ব্বেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি মিঃ সাইম তাঁহার কমিটির পক্ষ হইতে জানাইয়াছেন যে বাঙ্গলার শ্রমিকদের জন্য তিনি সর্ব্বদাই সংগ্রামে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। আমরা আশা করি বাঙ্গলার শ্রমিকগণ এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

অ্যাঙ্গাস্ ইন্‌জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়ন

—:•—

এতদ্দ্বারা "অ্যাঙ্গাস্ ইন্‌জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের" মেম্বর দিগকে জানান যাইতেছে যে এখন হইতে প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার দিন ইউনিয়নের অফিসে "গণবাণী" রাখা হইবে। যাঁহারা ইউনিয়নের মেম্বর তাঁহারা ইউনিয়নের অফিসে আসিয়া "গণবাণী" লইলে দুই পয়সার পরিবর্ত্তে মাত্র এক পয়সায় পাইবেন। কেবল মাত্র মেম্বরদের জন্য এই নিয়ম আগামী ১৫ই জুলাই হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে। ইতি—

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
সেক্রেটারী।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2/1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta.

২য় খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে জুলাই ১৯২৮, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৫	৬ষ্ঠ সংখ্যা

"বিপ্লবের আদর্শবাদ ব্যতীত কোনো বিপ্লব-আন্দোলনই সম্ভবপর নয়।"

—লেনিন—

* * * *

"বিপ্লব হচ্ছে ইতিহাসের গমনশীল যন্ত্র।"

—মার্ক্স—

* * * *

"শ্রমিকগণ যে বিপ্লব আনয়ন করবে তার প্রথম ধাপ হচ্ছে সর্ব্বহারাগণকে শাসক শ্রেণীতে উন্নীত করা—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয় লাভ করা।

"ধনিকগণের (বুর্জ্জোয়াজিদের) হাত থেকে ক্রমশঃ সমস্ত ধন ছিনিয়ে নেবার জন্যে, উৎপাদনের উপায় গুলিকে ষ্টেট্ বা তন্ত্রের হাতে অর্থাৎ শাসক শ্রেণীতে সংগঠিত সর্ব্বহারাগণের হাতে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে এবং যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে উৎপাদন ক্ষম শক্তি সমূহের সমষ্টিকে বাড়াবার জন্যে—সর্ব্বহারাগণ তাদের রাষ্ট্রনীতিক প্রভুত্বের ব্যবহার করবে।"

—মার্ক্স—

সম্পাদক
মুজফ্ফর আহ্মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

শোচনীয় বিশ্বাস ঘাতকতা

—:•:—

কলিকাতা কর্পোরেশনের একদল কাউন্সিলারগণ [illegible] অত্যন্ত গর্হিত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন। গত মার্চ্চ মাসে যখন কলিকাতার মেথর ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি ধর্ম্মঘট করেছিল তখন মেয়র মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত বেতন বৃদ্ধি ক'রে দেবার অঙ্গীকার করলে নিজের কাজে ধর্ম্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই সব ব্যাপার [illegible] যায়। [illegible] ও স্বরাজ্য দলের [illegible] শ্রমিকদের ব্যাপারের কোনো মীমাংসাই যখন [illegible] গত ২৪শে জুন তারিখে তারা আবারো ধর্ম্মঘট করতে বাধ্য হয়। এ ধর্ম্মঘট ভেঙে দেবার জন্যে কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার চেষ্টার এতটুকুও ত্রুটী করেন নি। পুলিস পল্টনের সাহায্য নিয়ে মজুরদের তাদের নেতৃগণের উপর অশেষ অত্যাচার করা সত্ত্বেও যখন ধর্ম্মঘট ভেঙে গেল না তখন একটা মিটমাট করার জন্য চিফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার ও কোয়ালিশন পার্টির নেতৃগণ বাধ্য হয়ে পড়েন। গত মার্চ্চের কর্পোরেশনের মিটিংএ যে "স্ট্যাণ্ডিং কন্‌ফারেন্স" নির্ব্বাচিত হয়েছিল এবং নূতন মেয়র মিঃ বিজয়কুমার বসু যে কন্‌ফারেন্সকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, সেই কন্‌ফারেন্স আবার ডাকা হলো। মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তও নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন এবং আরো এলেন এমন অনেক কাউন্সিলার যাঁরা কন্‌ফারেন্সের সদস্য নন। মেথর ও ঝাড়ুদারদের তরফ থেকে ডাক্তার মিস্ প্রভাবতী দাশগুপ্তা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও ধরণী কান্ত গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ও শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ ও উপস্থিত হয়েছিলেন। এরা বাঙলা দেশ থেকে শ্রমিক প্রতিনিধি কন্‌ফারেন্সের নির্ব্বাচিত সভ্যও বটেন।

আলোচনার পরে স্থির হয় যে—

(১) মাসিক এক টাকা হিসাবে ঐ সকল মজুরের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে যারা কর্পোরেশনের অধীনে একটি মাত্র চাকুরী করে থাকে।

(২) গাড়ীখানার লোকের যারা মাসে ১৮ টাকার বেশী রোজগার করতে পারে না তারাও মাসে এক টাকা বেশী পাবে।

(৩) খোদ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কেউ মজুরদের কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের বরখাস্ত করার পরেও বিতাড়িত মজুর চিফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের নিকটে আপিল করতে পারবে।

(৪) (ক), ধর্ম্মঘট করেছে ব'লে কোনো মজুরকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হবে না।

(খ) ধর্ম্মঘটের সময়ের পূর্ণ বেতন মজুরগণকে দেওয়া হবে।

(গ) ধর্ম্মঘট কারিগণ ও তাদের নেতৃগণের নামে যে সকল মোকদ্দমা করা হয়েছে সে সকল মোকদ্দমা তুলে নেওয়া হবে।

ডাক্তার মিস্ প্রভাবতী দাশগুপ্তা ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জানান যে তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা তুলে নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছেন না। তাঁরা আদালতে মোকদ্দমা লড়তে চান।

শ্রমিক প্রতিনিধিগণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে সকল মজুর ধর্ম্মঘট করেনি তাদের দু'টাকা হিসাবে বখ্‌শিশ দেওয়া স্থিরীকৃত হয়।

সকলেই একথার [illegible] মেথর ও [illegible] অনুরোধ [illegible] শহরবাসীর জীবন এ ধর্ম্মঘটের ফলে বিপন্ন হয়ে [illegible] নেতৃগণ এগুলি মেনে [illegible] কিন্তু, [illegible] কর্পোরেশনের [illegible] তাদের [illegible] এই [illegible] মেয়র মিঃ [illegible] মাত্র [illegible] স্বাক্ষর [illegible] কর্পোরেশনের [illegible] বিজয়কুমার বসু [illegible] কোনো প্রস্তাব [illegible] বলেন যে সব দলের সভ্যই উপস্থিত আছেন। [illegible] পারেন না। এমন কি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ও শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ পর্য্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। যে মেয়রের কথায় বিশ্বাস করা হোক্। কথা হয় যে মেয়র নিজেই প্রস্তাবটি কর্পোরেশনের সভায় উপস্থিত করবেন। চারদিক থেকে এত সব প্রতিশ্রুতি পেয়ে মেথর ও ঝাড়ুদার [illegible] ইউনিয়ন সে দিনই ধর্ম্মঘট তুলে নেন।

এর পরে ধর্ম্মঘটের সময়ের মাইনে সম্বন্ধে ইউরোপীয় মহলে আপত্তি ওঠে। "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে লেখা হয়। ফলে কোয়ালিশন পার্টির সভ্যগণ ধর্ম্মঘটের সময়ের বেতন দেওয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেন। কংগ্রেসদলেরও অনেক সভ্য উপস্থিত ছিলেন না। আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যেও দু'জন—রামকুমার গোয়েঙ্কা ও নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। ধর্ম্মঘটের সময়ের বেতন দেওয়া না মঞ্জুর হয়ে গেছে। মিঃ দাউদ অবশ্য দেওয়ার পক্ষেই ভোট দিয়ে ছিলেন যদিও তাঁর ভ্রাতা মিঃ আবদুর রজ্জাক অনেক কারসাজি করেছিলেন। সেই বিখ্যাত ধর্ম্মঘট ভঙ্গকারী, গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র ও তথাকথিত শ্রমিক প্রতিনিধি কে, সি, রায় চৌধুরী ভোট না দিয়েই পালিয়ে ছিলেন। মেয়র মিঃ বিজয়কুমার বসু কোনো পক্ষেই ভোট দেন নি।

কর্পোরেশনের কোয়ালিশন পার্টির কাউন্সিলারগণ অত্যন্ত শোচনীয় বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা ক'জন ইউরোপীয় সভ্যের ভয়ে ধর্ম্মঘটের সময়ের বেতন না-মঞ্জুর করেছেন। তাঁদের কথার কোনো কাণা কড়িরও মূল্য নেই। মেয়র মিঃ বসু তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারেন নি। মেথরও ঝাড়ুদার প্রভৃতির সহিত যে সহরবাসীর জীবন-মরণ সম্বন্ধ রয়েছে সে কথাটা ভুলে যেয়ে আজ কয়েক জন ইউরোপীয় ধনিকের ভয়ে মানুষের জীবন নিয়ে তিনি ছিনি মিনি খেলতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু, মেথর ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি এ অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না। তাদের সংহত শক্তির নিকটে "ষ্টেটস্‌ম্যান" ও বিশ্বাসঘাতক কাউন্সিলারগণ যে কত তুচ্ছ তা তারা দেখিয়ে দেবে।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর
সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড } কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে জুলাই, ১৯২৮, ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গণ-আন্দোলন ও কংগ্রেস

—:*:—

মিষ্টার সুভাষচন্দ্র বসুর মহারাষ্ট্র অভিভাষণ সম্বন্ধে ডাক্তার তারকনাথ দাস ১১ই জুলাই তারিখের "ফরওয়ার্ড" এ "ভারতে শ্রমিক আন্দোলন" নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধে ডাক্তার দাস নিজের কথা বিশেষ কিছুই বলেন নি, এর শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি সুভাষ চন্দ্রের বক্তব্যের সমর্থনই শুধু ক'রে গেছেন। ডাক্তার দাসের এই সমর্থন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পরিণত হয়েছে বল্‌লেও বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। প্রথমেই তিনি মিঃ বসুর অভিভাষণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে দিয়ে তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেছেন। ভারতীয় ন্যাশনালিজম্—সাদা কথায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল্ কংগ্রেসকে যে নানা দিক্ থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে তারি কথা বলতে যেয়ে মিঃ বসু বলেছেন :—

"আর একটা আক্রমণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন কিংবা আন্তর্জাতিক "কম্যুনিজম" এর দিক থেকে হচ্ছে। এ আক্রমণে কেবল যে সুবিবেচনার পরিচয়ের অভাব আছে তা নয়, এর দ্বারা অজ্ঞাতসারে বিদেশী শাসকদের স্বার্থও সিদ্ধ হচ্ছে। অতি সাধারণ লোকও একথা খুব সহজে বুঝতে পারবে যে সমাজকে নব ভিত্তির ওপরে, তা' সে ভিত্তি সাম্যবাদ মূলকই হোক্ বা অন্য কিছুই হোক্—গঠিত করার চেষ্টা করতে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের হাতে সে অধিকারটুকু আসা দরকার যার দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের অদৃষ্টকে গ'ড়ে তুল্‌তে পারব। যতদিন ভারতবর্ষ বৃটেনের পদানত হয়ে থাক্‌বে ততদিন সে অধিকার আমরা কিছুতেই পাব না। কাজেই, শুধু ন্যাশন্যালিষ্ট বা জাতীয়ত্ববাদীদের নয়—ন্যাশন্যালিজমের বিরোধী কম্যুনিষ্টদেরও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে যতটা সম্ভব সত্বর ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি আনয়ন করা। রাষ্ট্রীয় মুক্তি লাভ করার পরেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যার বিষয় গভীর ভাবে আলোচনা করবার সময় আসবে। আমি যতটা জানি অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট কম্যুনিষ্টগণেরও এই মত। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যে এ সময় যাঁরা প্রকাশ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেন কিংবা তার জন্যে কাজ করেন তাঁরা আমার মতানুযায়ী ন্যাশন্যালিজমের দরবারে গুরুতর অপরাধ ক'রে থাকেন।"

ডাক্তার দাস বলেছেন যে মিঃ বসুর কথা খুবই নির্ভুল। এ সম্বন্ধে কি ন্যাশন্যালিষ্ট, কি শ্রমিক নেতা প্রত্যেকেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া আবশ্যক। তার পরে তিনি বলেছেন—এশিয়ার ন্যাশন্যালিজম বা জনগণের জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতৃগণের কোনো দরদ নেই। তাঁরা যা কিছু ক'রে থাকেন সবই রাশিয়ার সুবিধার জন্যেই করেন। পারস্য, আফ্‌গানিস্থান, তুরস্ক ও চীনের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পথ সোভিয়েট রাশিয়া পরিষ্কার ক'রে দিলেও তার মূলে সোভিয়েট রাশিয়ার ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সমূহকে দুর্ব্বল করার উদ্দেশ্য বিদ্যমান রয়েছে। এ সব কথা বলার পরে ডাক্তার দাস বলেছেন—"যাঁরা ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানেন তাঁরা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারবেন যে ভারতে শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচারের ফলে গৃহ-বিরোধ উপস্থিত হবে এবং তার দ্বারা বিদেশী প্রভুগণ ও বৃটিশ লেবর ইম্পিরিয়েলিষ্টগণ ছাড়া আর কেউই উপকৃত হবে না। এর দ্বারা ভারতীয় ন্যাশন্যালিজমও প্রতিহত হবে।"

এখন দু'টো কথার সংজ্ঞা সর্ব্ব প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক। "ন্যাশন্যালিজম" বলতে মিঃ বসু ও ডাক্তার দাস কি বোঝেন এবং "শ্রেণী-সংগ্রাম" বলতেই বা তাঁরা কি মনে করেন? মিঃ বসু বলেছেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়ত্ববাদকে আক্রমণ করেছে এবং শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচারের দ্বারা বিদেশী শাসকগণেরই উপকার হচ্ছে। ডাক্তার দাসও তাঁর পোঁ ধরেছেন। কিন্তু, বর্ত্তমান সময় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন অর্থাৎ ভারতীয় কংগ্রেস আন্দোলনকে ভারতীয় জনগণের আন্দোলন নামে অভিহিত করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। জাতীয় সংগ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি

স্বেচ্ছাচারিতা দুর্গম পথের বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া রুশের জনগণকে সমাজতন্ত্রবাদের নীতিতে, সংগ্রামশীল মনোবৃত্তিতে এবং সামরিক শক্তি সঞ্চয়ে শক্তিমান করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই রুশ জারতন্ত্রের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। রুশ বিপ্লবের চিত্র যুগপৎ বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ। ত্যাগের মহিমা স্পর্শে যাহা মেকি, যাহা ভণ্ডামি ও অজ্ঞানতার অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল তাহা কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। রুশ বিপ্লবের কাহিনী বর্ণনা করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কেশাগ্র খাড়া হইয়া উঠে। জারতন্ত্রের কঠোর নিষ্পেষণে, নির্মম ব্যবহারে, সাইবেরিয়ার তুহিনসিক্ত প্রান্তর বীথির পাদদেশে কত স্বদেশ প্রাণ তরুণ বিপ্লব বীরের সমাধি রচিত হইয়াছে। কত তরুণ প্রাণের গলিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছে। তুষারাচ্ছন্ন বনানীর অভ্যন্তরে কত বীর মৃত্যু শয্যায় চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছে—কে তাহার সন্ধান রাখে? শত শত বীর বিপ্লব পূজারী, মনীষী, তপস্বী, কর্মী, অনাহারের দারুণ-তৃষ্ণায় মৃত্যুকে হাসিতে হাসিতে বরণ করিয়া লইয়াছে। কত নারী বিদ্রোহের লাল নিশান হস্তে গর্বভরে তরুণ বিপ্লব পূজারীদের পূজায় অর্ঘ্য ডালি দান করিয়াছে। তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া সহাস্যে সমুদয় নির্যাতন সহ্য করিয়াছে। কিন্তু কোনো অত্যাচারের ফলেই বিপ্লবের গতি প্রতিহত হয় নাই। আজ যারা বন্ধু ছিল কাল তারা শত্রু সাজিয়াছে। কত বিপ্লব সহচর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। মহাত্মা লেনিনকে পর্যন্ত জার্মানদের গুপ্তচর আখ্যায় ভূষিত হইতে হইয়াছে—কিন্তু জনগণের বিপ্লব গতি অপ্রতিহত থাকিয়াছে। বাধার পর বাধা—পথের বিঘ্ন, প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত হইয়াছে। যে সমুদয় বীর সাইবেরিয়ার নির্যাতন ভোগ করিয়া দেশ-হিতার্থে নিজেদের আত্মাহুতি দিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন, সংকটের বিপদ কালে তাঁহাদেরই অনেকে গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধ-চারিতা করিয়াছেন, কিন্তু বিপ্লব তবুও সংঘটিত হইয়াছে। কত বীর জার-তন্ত্রের ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বলি দিয়াছে, তাঁহাদের মৃত্যু স্পর্শে ফাঁসির মঞ্চ আন্দোলিত হইয়াছে। মর্মান্তুদ যন্ত্রণায় তাঁহাদের চিত্ত বিদীর্ণ হইয়াছে। জারের নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ পুলিশের নির্মম অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। সুদূর সাইবেরিয়ার নদীতীরে, অরণ্যেতে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়াছে। মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, অনশনে উপবাসে হিমানী সিক্ত শীতের কর কম্পনে তাহাদের হস্ত পদ শিথিল, জড়সড় ও নিশ্চল হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই বিপ্লবের গতিরোধ হয় নাই।

রাশিয়ার ভাগ্য বিবর্তনের মূলে ছিলেন অক্লান্ত কর্মী ক্ষণজন্মা পুরুষ লেনিন এবং তাঁহার সহকর্মী-বৃন্দ, যাঁহারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিপ্লবের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিয়াছেন। এই সমস্ত বীরদের জীবন কাহিনী বড় চমকপ্রদ। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া একাধারে জারতন্ত্রের অন্যায় স্বেচ্ছাচারিতা, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির বিরুদ্ধচারিতাও বৃটিশ শোষণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের জঘন্য হীন বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। আজো পর্যন্ত বৃটিশ শোষণবাদীদের সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচারের ত্রুটি কম হইতেছে না। জিনোভিয়েভের চিঠি হইতে শুরু করিয়া পিকিনের সোভিয়েট কনস্যুলেটে খানাতল্লাশি পর্য্যন্ত, বিলাতে আর্কস্ হাউসে খানাতল্লাসী, বাণিজ্য-বন্ধি রদ প্রভৃতি দৃষ্টান্তগুলি তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। সম্প্রতি সোভিয়েট তন্ত্রের বিরুদ্ধে বৃটিশ শোষণবাদিক গবর্ণমেণ্ট যে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিতেছে তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, ভবিষ্যতে আবার এক বিরাট পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। এই রণাঙ্গনের শেষ সিদ্ধান্ত আজো নির্ণীত হয় নাই। তবে যুদ্ধ যে অনিবার্য তাহা আজ সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকূল ভাগ সমূহের দেশগুলিতেই এই [illegible] বাধিয়া উঠিবে, কেহ বলিতেছেন আফগান সীমান্ত প্রান্ত সীমানায় এই বিপ্লবের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে। যুদ্ধ যে হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যুদ্ধ কিরূপ ভাবে, পরিচালিত হইবে তাহাই প্রণিধান করিবার বিষয়। পরাধীন দেশগুলি এবং চীন দেশের ভাগ্য এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে নির্ণীত হইবে। পরাধীন ভারতবর্ষের ভাগ্য কি হইবে তাহাও ভাবিবার বিষয়।

রাশিয়ার বিপ্লব একদিনে সম্পন্ন হয় নাই। উপর্যুপরি অনেক বার বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯১৭ সালের বিপ্লব ফলকার্য্য হইয়াছে। ১৯০৫ সালে যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাহা কেবল শিক্ষিত বিপ্লবাদীদের অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল। সোশ্যাল রেভোলিউশনারী দলের পাণ্ডারা তাহার পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর লেনিন ও তাঁহার সহকর্মীরা পূর্বোক্ত পথ পরিহার করিয়া প্রকৃত বিপ্লবদল গঠন করেন এবং শহরের শ্রমজীবী ও পল্লীর কৃষকদের বিশিষ্ট ভাবে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করিয়া তুলেন। তাঁহাদেরই সহায়তায় বিপ্লব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে যে বিপ্লব হয় তাহার ফলে রাশিয়ার শাসনতন্ত্র সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টির হাতে চলিয়া যায়। কেরেনস্কী ছিলেন এই দলের দলপতি। পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সমগ্র রাশিয়ার শ্রমজীবী ও জাহাজের নাবিকদের অশ্রান্ত পরিশ্রমে নভেম্বরের বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়। পূর্বে রাশিয়ায় বিভিন্ন মতবাদ লইয়া যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে বলশেভিকদল ও মেনশেভিকদল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেজরিটি অর্থাৎ বেশী সংখ্যক লোকের দল বলিয়া বলশেভিকদলের নেতৃত্বে বিপ্লব পরিচালিত হয়। মেনশেভিকদল অল্প সংখ্যক লোকের দল। তাঁহারা বলশেভিক দলের কর্মকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন না, এবং বহু ক্ষেত্রে বলশেভিকদের বিরুদ্ধ চারিতা করিয়াছেন। ট্রট্‌স্কি ও ষ্ট্যালিনের ঝগড়ার ভিত্তিও অনেকটা বলশেভিক মেনশেভিক মতের উপরই স্থাপিত। তদ্ব্যতীত ছিল সোশ্যাল বিপ্লববাদীদল। তাঁহাদের আবার, দুই শাখা—নরম দল ও গরম দল এই গরম দল পরবর্তীকালে সোশ্যালিষ্ট রিভোলিউশনারীদল নামে পরিগণিত হয়। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে আসল বিপ্লব-বাদীদল এবং পরে তাঁহারাই বলশেভিকদের সহিত এক হইয়া বিপ্লবে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। এই দলের সভ্যেরাই বলশেভিক বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

রুশিয়ার এই বিপ্লবের দরুণ লক্ষ লক্ষ মানুষের শোণিত ধারায় পৃথিবীবক্ষ সিক্ত হইয়াছে—রক্তের নদী প্রবাহিত হইয়াছে। যাঁহারা ১৯১৭ সালের বিপ্লব কাহিনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য জানেন মস্কো ও পেট্রোগ্রাডে (বর্ত্তমানে লেনিনগ্রাড) কিরূপ কাণ্ড সংগঠিত হইয়াছিল—Jhon Reed তাঁর "Ten Days That Shook The World" নামক পুস্তকে তাহার জ্বলন্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। য়ুরোপে এই পুস্তকের বায়োস্কোপ দেখান

হইতেছে। William Ryss তাঁহার "Through the Russian Revolution" নামক পুস্তকেও এই সম্বন্ধে প্রকৃত রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্‌সম্পর্কে আর একটি পুস্তকও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাহা হইতেছে Philips Priceএর "My Reminiscences of the Russian Revolution." তাঁহাদের প্রত্যেকেই ১৯১৭ সালের বিপ্লবকালে রাশিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছেন—যথাযথ তাহার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। বিপ্লব সময়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক, অজন্মা, মন্বন্তর, বিরুদ্ধ-বিদ্রোহ, অন্তর্বিদ্রোহ, বৃটিশ শোষণ-বাদীদের ঘৃণিত আচরণ প্রভৃতির দ্বারা রুশদেশ যে বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহা তাঁহারা প্রত্যেকেই সচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন এবং নিজেরা বহু কষ্টও স্বীকার করিয়াছেন। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস জানিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির উক্ত তিনখানি পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। তবে রুশ যে মন্ত্র জগতের সম্মুখে প্রচার করিতেছে—বিপ্লবের পর রুশের শাসন তন্ত্র গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগের, কার্লমার্ক্স, এঙ্গেল্‌স, লেনিন, ট্রট্‌স্কী, বুখারিন স্তালিন প্রমুখ মনীষীদের রচনাবলী পাঠ করা একান্ত দরকার। বর্ত্তমানে রুশ সম্বন্ধে রাশি রাশি পুস্তক রচিত হইয়াছে। রুশ সাহিত্য দিন দিন প্রভূত উন্নতির পথে চলিয়াছে। থিয়োরীও মতবাদ ছাড়া, বর্ত্তমানে সোভিয়েট তন্ত্রের শাসন সম্বন্ধে গণতন্ত্রের বিবিধ গঠন দিক লইয়া (Vanguard Publication) ১৩ খানি মূল্যবান পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই তের খানি পুস্তকে বিভিন্ন দিক দিয়া রুশ গণতন্ত্রের শাসনের বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস দর্শন, বিবাহ, শিক্ষা, নারীপুরুষের সম্বন্ধ, কম্যুনিজম শ্রমিক মজুর, সোভিয়েটবাদ, ধনবাদ প্রভৃতি বিষয়ের সুচারু ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রুশের ধ্বংস স্তূপের ও শ্মশান ভূমির উপর যে নব ইমারত তৈয়ার হইয়াছে তাহাতে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর পূর্ব্বে যাহা কল্পনার অতীত ছিল, তাহা আজ জল জল রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে: আজ রুশ বিশ্বে যে নবীন মন্ত্র, যে নূতন বার্ত্তা, নবদীক্ষা, শিক্ষা বহন করিয়া আনিয়াছে—তাহা চিন্তাজগতে বিপ্লব আনায়ন করিয়াছে। তরুণ হৃদয় আলোড়িত হইয়াছে। চিন্তারাজ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। ঘুমন্ত চীন, উক্ত পথ অনুসরণ করিয়া জাগিয়াছে। জড়নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উৎক্ষিপ্ত চিত্তে মুক্তি সমরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। আজ প্রাচীর দুয়ারে দুয়ারে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তরুণ আর পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায় না। তাই মিসর, তুরস্ক, রীফ, সিরিয়া, জাপান, আফগানিস্থান, জাভাতে নব চেতনার ভাব লক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষও পশ্চাদপদ থাকিবে না। রুশের জন-গণের যে ভাবে মুক্তিলাভ হইয়াছে—ভারতের মুক্তির আদর্শও সেইরূপ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকের শ্রমিক চাঞ্চল্য ও গণ-উত্থান ভারতের মুক্তির এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

যাহা রুশের স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের অধীনে সম্ভবপর হইয়াছে, যে জারের সিংহাসন গণবিপ্লবের দাপটে বিধ্বস্ত হইয়াছে ধনিক-বাদের মূলচ্ছেদ কল্পে তাহা ভারতবর্ষেও সম্ভবপর হইবেই। বর্ত্তমানে শোষণবাদী শাসনতন্ত্র জগতের সমস্ত পরাধীন দেশের লোকদিগকে শোষণ করিতেছে—তাহাদের শোষণ লিপ্সা চরমে উঠিয়াছে। কলকব্জার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শোষণ নীতিও পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই শোষণ-তান্ত্রিক শাসনের বিলোপের জন্য জনগণকে মস্তক উত্তোলন করিতে হইবেই। তাহা আজ হোক—আর কাল হোক!

দেশ-বিদেশ

বোম্বাই ১৪ই জুলাই

জনরব যে সোমবারে কতক কল খুলিবে এবং মিল কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের পূর্ব্বের হারে বেতন দিতে সম্মত হয়েছে। করিমভাই মিল, মাধবজী মিল ও ওয়াডিয়া মিলএর অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহাও প্রকাশ যে জয়েন্ট ষ্ট্রাইক কমিটি যাতে সমস্ত ধর্ম্মঘট মীমাংসা হয় তার জন্য সমুদয় ক্ষমতা নিয়োগ করবেন। কমিটি সিদ্ধান্ত করেছে যে-তারা আগামী কল্য সমস্ত মিলের সীমানায় ৫টা সভা করবেন ও শ্রমিকদের যতক্ষণ সাধারণ ধর্ম্মঘটের একটা মীমাংসা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের কাজে ফিরে যেতে নিষেধ করবেন। মিলওনারস্ এসোসিয়েশন ও একটি সভা আহ্বান করেছিল এবং অবস্থা সম্বন্ধে বাদানুবাদও আলোচনা করেছিল এবং কয়েকটি নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধেও আলোচনা করেছিল।

১৩ই জুলাই

আরো কিছু সাক্ষ্য সাবুদ গ্রহণকরার পর বোম্বের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বোম্বে কৃষকও শ্রমিকদলের সদস্য ও জয়েন্ট ষ্ট্রাইক কমিটির সেক্রেটারী কমরেড নিম্বকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি সরকারী কর্ম্মচারীকে তার কর্ম্মে বাধা দিয়াছেন। মিঃ নিম্বকার নিজেকে নির্দ্দোষ বলেছেন ও পরে তাঁর জবানবন্দী দিবেন বলেছেন।

জেমসেদপুর ১৪ই জুলাই

জমসেদপুর 'এল' টাউনে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। প্রকাশ ধর্ম্মঘটকারীও পিকেটিংকারীরা সাধারণের রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়ে তাদের ও ট্রাফিকের প্রভূত ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। তদ্ব্যতীত ঘরে চড়াও করে লোকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং রাস্তায় লোকেদের উপর ময়লা আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করছে ইত্যাদি। ইহাও প্রকাশ যে স্ত্রীলোক মজুরগণ ঝাঁটা হস্তে কারখানার দুয়ারে পিকেটিং করছে। এবং কাককে কারখানার কাছে আসতে দিচ্ছে না। ধর্ম্মঘট কারীদের এক সাধারণ সভাও হয়েছিল।

আসানসোলের ১৪ই জুলাইর খবরে প্রকাশ যে মেসার্স কালী কুমার সেন, সত্যকুমার মিশ্র এবং অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবর্গ এখানে আজোও অবস্থান করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ১১৭ বিধি অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই জামীনে মুক্ত আছেন। তাঁদের মোকদ্দমার আত্মপক্ষ সমর্থনের বন্দোবস্ত হচ্ছে।

১৩ই জুলাই মাদ্রাজ হতে এসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে প্রকাশ যে সাউথ ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিঃ কৃষ্ণস্বামী পিল্লেই তার করেছেন যে যদি এজেন্ট লোকদের দাবি মানিয়া না লন তাহা হইলে ১০শে জুলাই থেকে সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হবে।

আফগান রাজমহিষীর পর্দ্দা মোচন

ইউরোপ হতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর আফগান রাজমহিষী ও রাজ পরিবারের অন্যান্য মহিলাগণ তাঁদের পর্দ্দা ত্যাগ করেছেন এবং রাজপরিবারের লোক ছাড়াও অন্যান্য লোকের সম্মুখে ভোজন করেছেন। পারস্যদেশে থাকা কালীন তথাকার মোল্লাদের কড়া আইন অনুযায়ী তাঁকে মুখে আবরণ দিয়া পর্দ্দা করিতে হয়েছিল। ইউরোপ ভ্রমণকালে তিনি সর্ব্বত্র পর্দ্দা না দিয়া পরিভ্রমণ করে-ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে একদল মোল্লা একটি ডেপুটেশন নিয়ে আমীরের নিকট এসেছিল এবং রাণীর পর্দ্দা মোচনের জন্য বিলাপ করেছিল। আমীর তাতে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁদের স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দা করে কিনা। উত্তরে তাঁরা জানায় যে তাঁদের স্ত্রীলোকেরা গরীব এবং জীবিকার্জ্জনের জন্য তাদের পর্দ্দা না দিয়ে বাইরে যেতে হয়। তখন আমীর বলেন তোমরা আগে তার পর্দ্দার ব্যবস্থা কর পরে আমার নিকট [illegible] আফগান রাজমহিষী ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য মহিলার পর্দ্দা মোচন

করেছেন তাহা নহে—তাঁরা আধুনিক ইউরোপিয় পোষাকে বিভূষিতা এবং নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করেন ও ভোজ সভায় যান।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

বিগত ৮ই জুলাই বেলুড়ের নিকট কলিকাতা গয়া প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানা মধ্যরাত্রে লাইনচ্যুত হয় ও তার ফলে বহু হতাহত হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত হতাহতের সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়নি। চারিদিক হতে সংবাদ পত্রে এই ট্রেন ধ্বংসের যে সব হৃদয় বিদারক কাহিনী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তদ্দ্বারা অনুমিত হচ্ছে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী। রেল কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে তদন্ত সুরু করেছেন। তাদের রিপোর্টে জানা যায় ২০ জনের বেশী লোক প্রাণে মারা পড়ে নাই। কিন্তু প্রত্যহ "ফরওয়ার্ড" "পত্রিকা" প্রভৃতি সংবাদ পত্রে উক্ত ট্রেনের যাত্রীদের নিকট হতে অনেক চিঠিপত্র আসছে ও তাহাতে জানা যায় যে কয়েকখানা গাড়ী একেবারে চুরমার হয়েছিল ও অস যাত্রীদের অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। রেল কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু সে সমস্ত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন। প্রকাশ যে রেলের পাটির সংযোগস্থলের ফিসপ্লেট fish plato খোলা ছিল, তার ফলেই এই নিদারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আরও জানা যায় "ফরওয়ার্ড" পত্রিকায় যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাহা অতিরঞ্জিত ও আপত্তিজনক, তজ্জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট ১৩৫ ধারা অনুযায়ী "ফরওয়ার্ড"এর নামে মোকদ্দমা দায়ের করবেন।

আলিপুর পুলিশের ম্যাজিষ্ট্রেট মোহম্মদ আলি আবদুল গফুর নামক একটি বৃদ্ধ লোককে দু'বৎসরের কঠোর সাজা দিয়াছেন। আবদুল গফুর স্পেশাল ব্রেকের সি, আই, ডি, রায় সাহেব কালিপদ ঘোষালের একটি গরু চুরি করেছিল।

নব্য চীনের দাবী

সাংহাইএর সংবাদে প্রকাশ যে বিশ্বস্তসূত্রে এরূপ জানা গিয়েছে যে নানকিংস্থিত চীন পররাষ্ট্র সচীব ২৪টি বিদেশীয় প্রতিনিধির নিকট এই মর্ম্মে চিঠি দিবেন যে চীন সরকারের সাথে যে সমস্ত সন্ধি রয়েছে তৎ সমুদয় পরিবর্ত্তন করতে হবে।

বৃটেন, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, ও ইতালির নিকট চীন সরকার এইরূপ দাবী করছেন যে ইয়াংসি নদী হতে সমস্ত রণপোত সরিয়ে নিতে হবে। কারণ রণপোতগুলির অবস্থিতি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিরোধী।

জি, আই, পি, রেলে শ্রমিক বিক্ষোভ

চাকুরীর স্থায়িত্ব, ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থারদ, জীবিকার্জ্জনের উপযোগী বেতন, আট ঘণ্টা করে দৈনিক পরিশ্রম ও জরিমানা তুলে দেওয়া সম্বন্ধে জি, আই, পি, রেল কর্ম্মচারীদের ভুসাভল সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, গত রাত্রে কল্যাণে জি, আই, পি, রেলওয়ে শ্রমিক সঙ্ঘের এক সভায় তাহা সমর্থিত হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে ঐ সমস্ত দাবী যদি ২২শে জুলাইর পূর্ব্বে মঞ্জুর না করা হয় তাহা হলে শ্রমিক সঙ্ঘ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।

প্রেসে দুর্ঘটনা

বিগত বৃহস্পতিবার হিতবাদী প্রেসের কর্ম্মচারী পটলচন্দ্র দাস (বয়স ২০ কুড়ি) সাংঘাতিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। জানা গিয়েছে যে যখন পটল দাস প্রেস ঘরে কাজে লিপ্ত ছিল, অকস্মাৎ কতক মেশিনে তার কাপড় আটকে যায় এবং তার দেহ নিকটবর্ত্তী একটা পাথরের উপর জোরে নিক্ষিপ্ত হয়। গুরুতর আঘাতে তার মাথার খুলি ভেঙে যায় ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর মারা পড়ে।

ছাত্রের আত্মহত্যা

ট্রাঙ্গ রোডের শশীরাম আড্ডা নামক জনৈক ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে তার জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। তিরস্কারের কয়েক ঘণ্টা পরে সে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে। কিছু আফিম ও একখানা চিঠি তার পকেটে পাওয়া গিয়েছে তাতে সে লিখেছে যে সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে।

'ইতালিয়া'

'ইতালিয়া' বিমান পোতের উদ্ধার কল্পে রাশিয়া হতে 'ক্রাসিন' নামক বরফ ভাঙা বিমানপোত খানি প্রেরিত হয়েছিল। বহু চেষ্টার পর মালমগ্রেন তাঁর পার্টির নিকট পৌঁছে। মালমগ্রেনকে মৃত্যু দশায় পাওয়া গিয়েছে। ইতালিয়া ওয়ার্কিং পার্টি তের দিন অনাহারে ছিলেন। একমাস পূর্ব্বে মালমগ্রেন মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মিঃ মেরিয়ানো জর্গী বেশ প্রফুল্ল চিত্ত ছিলেন। ইটালিয়ার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই তবে অন্যান্য পার্টির নিকট হতে বিনা তারের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ভিজালিয়ারীর দল বিনা তারে তাদের গন্তব্য স্থানের সংবাদ জ্ঞাপন করাতে তাদের উড়োকল থেকে খাদ্য দ্রব্য ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে প্রকাশ যে 'ক্রাসিন' ভিজালীয়ারের সন্ধান পেয়েছে। বিজন দ্বীপে পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের কোন খোঁজ খবর এখনো পাওয়া যায়নি।

পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গিয়েছে ইতালীয়ার আরো দুইজন সমুদ্র পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের 'ক্রাসিন' উদ্ধার করেছে। ইটালিয়াকে উদ্ধারকল্পে বৈমানিক মিঃ আমণ্ডসন যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছেনা। কাপ্তেন রভাজোনী সি-প্লেনে নরওয়ের তীরবর্ত্তী স্থানগুলি খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। 'ক্রাসিন' এক্ষনে আমণ্ডসনের সন্ধানে যাত্রা করেছে। 'ক্রাসিন' বিপন্ন ভিজলিয়েরীর দলের ৬ জন লোককে তুলে নিয়েছে। তাঁরা পূর্ব্বে জেনেরল নবাইলএর অধীনে ছিলেন। এ সম্পর্কে বিবিধ চেষ্টা চলেছে।

সাংহাই ১৩ই জুলাই

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে যে নানকিনের পররাষ্ট্র সচীব ২৪টি দেশের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের এই মর্ম্মে চিঠি দিবেন। যাতে অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের সাথে সমস্ত সন্ধির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বৃটেন, আমেরিকা, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের জন্য খসড়া প্রস্তুত করছেন। যাতে আছে ইয়াংসীর তীরে যুদ্ধ জাহাজ থাকতে পারবে না। এবং ইহা আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী।

মিঃ মণ্ডল সেসন সোপর্দ্দ

ই, আই, রেলওয়ে ইউনিয়নের মিঃ মণ্ডল সেসন সোপর্দ্দ হয়েছেন; ৫০০ টাকা জামীনে তিনি মুক্ত আছেন।

প্রকাশ্য দিবালোকে বন্ বিভাগের কর্ম্মচারীদের অদ্ভুদ ডাকাতি

—০—

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ বিগত ১৮ই আষাঢ় মোতাবেক ইংরাজী ২রা জুলাই সোমবার ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার আটীয়া পরগণাস্থিত বাসাইল থানার অন্তর্গত সালগ্রামপুর হাট হইতে ৫ গোট গুলি গজারী কাষ্ঠ (লম্বা ৫ হাত বেড় ১ হাত) খরিদ করিয়া নৌকা যোগে বাড়ী অভিমুখে যাওয়ার কালে সুবিখ্যাত নকীল বিলের পূর্ব্ব দিকে উক্ত হাটের নৌকা চলাচলের রাস্তায় ঠিক সূর্য্যাস্তের ঘণ্টা খানিক পূর্ব্বে বহেরাতলী রেঞ্জের ফরেষ্ট বিভাগের কর্ম্মচারী ১। রেঞ্জার, বাবু ইন্দুভূষণ সরকার ২। মাখনলাল দাস ফরেষ্টার, বহেরাতৈল ৩। এ, কে, মিত্র ফরেষ্টার, কালীদাস ক্যাম্প ৪। ভোমরালী সেখ গার্ড বহেরাতৈল ৫। নায়েবালী সেখ গার্ড বহেরাততৈল, ৬। কালীচরণ কোচ গার্ড কচুয়া ৭। শ্রীধর মাঝি গার্ড বহেরাতৈল ও তাহাদের ষ্ট্যাফের অন্যান্য মাঝি মাল্লাসহ প্রায় ২০।২২টী বন্দুক ধারী লোক একটি পান্সে নৌকায় ঠিক দস্যুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের নিকট উক্ত কাষ্ঠের চেক তলব করিল। পরমুহূর্ত্তেই আমরা চেকটী ২নং ফরেষ্টার বাবুর নিকট দিলাম। চেকটী প্রাইভেট রক্ষিত ইজারা সখীপুর গড়ের ছিল। চেকটী ২নং ফরেষ্টার বাবু আমাদের নিকট হইতে লইয়া এবং উহা দেখিয়াই দ্বিখণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ১নং রেঞ্জার বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন "সখিপুর গড়ের কাঠ কাটা বন্ধ আছে, এ নূতন কাটাকাষ্ঠ। তোমরা এ কাষ্ঠ চুরি করিয়া আনিয়াছ। এ কাঠগুলি ঢালিয়া রাখিয়া তোমাদিগকে বাধিয়া চালান দিব"। এই কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া রহিলাম, ক্ষণকাল পরে আমাদের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি সাকেলউদ্দিন অহ্মদ্ উত্তর করিল "আপনারা কি প্রকারে আমাদিগকে চোর সাব্যস্ত করিলেন, আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ হাটে কাষ্ঠ খরিদ করিয়াছি, আমরা চোর হ'লেম কি প্রকারে? আত্মসম্মান সকলেরই আছে। আপনাদিগকে শিক্ষিত ভদ্র লোকের মত দেখায় কিন্তু এরূপ অশ্লীল বাক্য ভদ্র লোকের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না"। এই কথা শুনিয়া রেঞ্জার বাবু অগ্নিমূর্ত্তী ধারণ করিয়া বলিলেন "আমার সম্মুখে আমার কর্ম্মচারীর প্রতি অবমাননা? বেটারা চিনে না আমরা কে? এখনি ইহার প্রতিফল দিয়া দেই, এই বলিয়া আমাদের প্রতি কায়িক ও দশ টাকা অর্থ দণ্ডাদেশ দিয়া ফেলিলেন"। ইহা শুনিবা মাত্র সিপাহী গার্ডগণ আমাদের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, আমরা সকলেই আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাহাদের সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের ছোট নৌকা খানাও প্রায় ডুবু ডুবু হইয়াছিল। একজন অনবরত জল সেচন করিতেছিল। ওদিকে রেঞ্জার বাবু বলিতেছেন, "তোদের মত লোকে আমাদের সম্মুখে অত কথা বলিতে পারে? তোদের মত লোককে এই গভীর নকীল বিলে নৌকা ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিলে কি হইবে? আমরা যে গবর্ণমেণ্টের লোক তা তোরা শুনিতে পাস্ নাই? আমরা ৪০৲ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ছয় মাসের জেল দিয়া মাইর পিট করিতে করিতে চালান দিতে পারি। আমাদের সব ক্ষমতাই আছে"। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা হাতে হাতেই পাইলাম। আমাদের ভাগ্যে মাইর-পিট যাহা ছিল তাহা ঘটিল।

তাহার পর আমরা রেঞ্জার ও ফরেষ্টার বাবুদের নিকট জরিমানার টাকা মাপ চাই এবং সরকারী রেটানুযায়ী ঘাটের খাজানা দিতে চাহিলাম। উহা শুনিয়া রেঞ্জার বাবু উত্তর করিলেন, "আমরা স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট, আমরা যাহা আদায় করি তাহাই রেট। ওরে! বেটারা অন্ততঃ দুইটী টাকা দিতে পারিলে তো'দিগকে ছাড়িয়া দিব; নচেৎ কাষ্ঠগুলি ঢালিয়া রাখিয়া তোমাদিগকে বাধিয়া চালান দিব"।

আমাদের সঙ্গে মাত্র ১৲ একটী টাকা ছিল। সেই সময়ে আমাদের পরিচিত কালিহাতী থানার অন্তর্গত কালিহাটী নিবাসী ইয়ারউদ্দিন শেখ ও তাহার ভ্রাতা সদরউদ্দিন ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের নিকট হইতে ১৲ টাকা করজ করিয়া এই দুইটী টাকা এ. কে, মিত্র ফরেষ্টারের হাতে দিলাম। পরে তিনি আমাদিগকে ঘাটের পাশ দিলেন। পাশে ২৲ টাকা স্থলে ১৲ টাকা ৫ গোট কাষ্ঠের স্থলে ৫০ গোট লিখা হইয়াছে।

আমরা অনুমান দুই ঘণ্টা সময় তাহাদের নিকট আটক ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে তাহারা (ফরেষ্ট কর্ম্মচারী) স্বেচ্ছাচার ভাবে ঘাটের খাজনা আদায় করিয়াছেন। এক নিয়মে কাহারও নিকট হইতে ঘাটের খাজানা আদায় করেন নাই। জোরে বলে যাহার নিকট যাহা আদায় করিতে পারিতেন, তাঁহারা তাহাই আদায় করিতেন। তাহারা সকলেই বন্দুকসহ কাটা পোষাক ধারী। তাহাদিগকে দেখিলেই সকলেরই ভয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহারা যাহা চায় তাহারা তাহা দিয়াই তাহাদিগের নিকট হইতে অব্যাহতি পায়। সুতরাং তাহাদের কত দেয় খাজনা তাহা বলিবার অবসর তাহারা পায় না। কেহ কোন কথা বলিলে সে আমাদের মত অপমান ও অপদস্থ হয়। এই অপমানের ভয়ে ঘাটের খাজনা সম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন না।

আমাদের বাড়ী কাউলজানী বলা স্বত্বেও "কাইলান, Kailan" লিখিয়াছেন ইহার মধ্যে কি গূঢ় রহস্য আছে, তাহা তাহারাই জানেন।

অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বিশ্বস্ত কোন কর্ম্মচারীদ্বারা ঘটনা তদন্ত করতঃ ফরেষ্ট বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের পাশবিক অত্যাচার হইতে এ অঞ্চলের সর্ব্ব সাধারণ প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—১৩৩৫ ৩০শে আষাঢ় ১৯২৮ ১৪ই জুলাই।

নিবেদক—

সাকেলউদ্দিন আহ্মদ্
কাজিমউদ্দিন আহ্মদ্
আক্কেলআলী আহ্মদ্
সাঃ কাউলজানী, থানা বাসাইল।

বনবিভাগের কর্ম্মচারীদের অদ্ভুদ চালান

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমাস্থিত বাসাইল থানার অন্তর্গত কালমেঘা নিবাসী রহেজ শেখ ও তাহার পুত্র রহিজউদ্দিন শেখদ্বয় বিগত ২৩শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে তাহাদের বহুকালের দখলীয় স্বত্ব বিশিষ্ট জমিতে হাল বাইছ করিতেছিল। সেই সময়ে কারিখাটা ফরেষ্ট অফিসের ফরেষ্টার ও

তাহা'দ গ্রামের ...গণ উক্ত জমিতে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে বাধা ... দেয়। তাহাদের ক্ষেতে হালে গরু জোড়াই ছিল তাহাদের সংসারে বাপ বেটা ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ লোক নাই। উক্ত গ্রামের অনেকেই তাহাদের জন্য ... হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু কলেক্টার বাবু তাহাদের কিছু মানেন নাই। তাহাদের হালের গরুর অবস্থা কি হইল তাহা খোদাতায়ালা জানেন। তাহাদিগকে ... জমি ... বাহির করা হইয়াছে। প্রকাশ তাহাদের ... সব ... জমি ও নাকি গবর্ণমেন্টের ... অন্তর্ভুক্ত হই

বিপোর্টার

সাবেরউদ্দিন আহ্মদ্

সাং কাউলজানী

পোঃ ধুলবরী

টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ

শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণ আইন।

—০—

(শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।)

যে যে অবস্থায় ক্ষতি পূরণ পাওয়া যায় না

এই আইনের ব্যবস্থানুসারে হত বা আহত শ্রমিকদের জন্য যে যে অবস্থায় ক্ষতি পূরণ পাওয়া যায় গত সংখ্যার "গণবাণী"তে আমরা তাহা প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে যে যে অবস্থায় ক্ষতি পূরণ পাওয়া যায় না তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কাজ করিতে যাইয়া।

২। নিজের কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজ করিতে যাইয়া।

৩। কলকব্জা পরিষ্কার করা বা মেসিনে কাজ করা সম্বন্ধে মিল কোম্পানীর যে সব নিয়ম প্রণালী লিখিয়া কারখানার ভিতর দেওয়ালের গায়ে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা শ্রমিকদিগকে কাজে ভর্ত্তি করিবার সময়ে মুখে বলিয়া এবং বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহা অমান্য করার ফলে।

৪। নেশা করিয়া কারখানায় কাজ করিতে যাইয়া যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে ও প্রমাণ হয় যে লোকটী মাতাল হইয়া অসাবধান না হইলে সেই দুর্ঘটনা হইত না।

৫। আঘাত যদি গুরুতর না হয় এবং চিকিৎসায় ১০ দিনের মধ্যেই সারিয়া উঠে।

৬। আঘাত লাগার ফলে শরীরের কোন অংশ জখম হইলে পর চিকিৎসা সত্বেও যদি বাঁকিয়া চুরিয়া বা আড়ষ্ট হইয়া থাকে অথচ প্রমাণ করা যায় যে চিকিৎসায় ভাঙ্গা হাড় ঠিক মত জোড়া লাগিয়াছে কেবল ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রীতিমত মালিশ কিংবা সময় মত অল্প অল্প কাজ না করায় বা আহত স্থান ক্রমে ক্রমে খেলাইবার চেষ্টা না করাতেই ঐরূপ হইয়াছে তাহা হইলে উহা "আঘাত" লাগার জন্য "স্থায়ী ক্ষতি" বলিয়া ধরা হইবে না বা সেজন্য অধিক টাকাও পাওয়া যাইবে না।

৭। নিজের জন্য কোন জিনিস প্রস্তুত করিতে গিয়া, চালু মেশিনের কল মুছিতে গিয়া, যে সকল চাকার এবং চাকার চারিদিকে লোহার বেড়া কিম্বা ঢাকা দিয়া ঘেরা থাকে ... চালু অবস্থায় সেই সব বেড়া বা ঢাকা সরাইয়া ... চাকা পরিষ্কার করিতে বা চামড়ার ... অথবা অন্য কিছু করিতে গিয়া কোন দুর্ঘটনা হইলে।

৮। আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার ডাক্তার কিম্বা ... কোন ইন্সপেক্টার অথবা ... চিকিৎসা না করাইলে।

৯। পাশ করা এবং রেজিষ্টার্ড ডাক্তার ভিন্ন অন্য কোন হাতুড়ের ... কিম্বা ... অথবা কোন ... গাছ গাছড়ার ... ব্যবহার করিয়া ... ঠিক ... হাড় জোড়া না লাগে।

১০। ... করিতে বা ... হাত পা কাটিয়া যায় কী ...

১১। আঘাত লাগার পর চিকিৎসা ... কারখানার ম্যানেজারকে না জানাইয়া ও ডাক্তারের অনুমতি না লইয়া হঠাৎ কোথাও চলিয়া যাইয়া ... চিকিৎসা ... হইলে।

১২। ক্ষতি পূরণের টাকা দিতে অস্বীকার করিবার ... আঘাত লাগার দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে "ক্ষতি পূরণ আদালতে" নালিশ না করিলে।

ক্রমশঃ

—০—

বাউড়িয়ায় শ্রমিক-অভ্যুত্থান

কলিকাতার কয়েক মাইলের ভিতরে বাউড়িয়া নামক স্থানে ফোর্টগ্লষ্টার কোম্পানীর চারটি মিল ও জমীদারী আছে। এসকল মিলের শ্রমিকদের ও জমীদারীর প্রজাদের উপরে অশেষ অত্যাচার হয়ে থাকে। শ্রমিকরা আর কিছুতেই অত্যাচার সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এ সকলের প্রতিকার করবে স্থির করে। ৩।৪ দিন আগে মাত্র তাদের ইউনিয়ন গঠিত হয়। তাতেই কলওয়ালারা শ্রমিকদের ওপরে অত্যাচার আরম্ভ করে দেয়। ১৬ই জুলাই সোমবার গুলি পর্য্যন্ত চলেছে। মঙ্গলবার সকালে আমরা এ খবর পাই। নব গঠিত ইউনিয়নের অস্থায়ী সেক্রেটরী শ্রীযুত রাধারমণ মিত্র ও তখন আমাদের আফিসে উপস্থিত ছিলেন। খবর পেয়েই তিনি বাউড়িয়ায় চলে যান। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর পক্ষ থেকে আবদুল হালীম ও ফিলিপস্প্রাট ও গিয়েছিলেন। কমরেড প্রাট ও অঞ্চলের শ্রমিকদের নিকটে "আঞ্জুমন সাহিব" নামে পরিচিত। চেঙ্গাইল ও চক্কাশির শ্রমিকরা গুজব শুনতে পায় যে তাদের প্রিয় "আঞ্জুমন সাহিব" কে গ্রেফ্তার করা হয়েছে। ইউনিয়নের আর সব কর্ম্মকারকদের গ্রেফ্তার করার গুজবও তাদের মধ্যে রটেছিল। এ খবর শুনে চেঙ্গাইল ও চক্কাশি থেকে প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক বাউড়িয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল। ৫০।৬০ জন রেলওয়ে গাড়ীতে আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিল। যখন তারা জানতে পারলে যে ইউনিয়নের বাবুরা ও প্রাট সাহেব গেরেফ্তার হন নি তখন তারা শান্ত হয়ে ফিরে যায়।

সোমবারের ঘটনা

সোমবার প্রাতঃকালে ৫টার সময় ফোর্টগ্লষ্টার মিলস্ এর ম্যানেজার ১। আবদুল জামাদার ২। জমিন সেখ (তাঁতঘরের) ৩। আতিয়ার রহমান ৪। কাজেম সারেঙ্গ (স্পিনিং ঘরের) এরফান সেখ এই পাচজন মেটকে আফিসে ডাকিয়ে নিয়ে যায় ও তাদের হপ্তা মিটিয়ে দিয়ে মিলের ভিতর থেকে বের করে দেয়। প্রকাশ যে হপ্তা আবার পুরোপুরি দেওয়া হয়নি; অনেক কম দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ম্যানেজার এই অভিযোগ আনয়ন করে যে, তারা বদমায়েস লোক, তারা মিলের ভিতর নানারকম গোলমালের সৃষ্টি করছে ও ইউনিয়ন সংগঠনে তারাই অগ্রণী, কাজেই তাদের জওয়াব দেওয়া হলো। তারা ৫ জনে এসে মিলের অন্যান্য শ্রমিকদের বলে যে সাহেব আমাদের জওয়াব দিয়েছে। এই কথা শুনে ২০।২১ জন লোক সাহেবের কাছে যায় ও তাকে জিজ্ঞাসা করে কি অজুহাতে তাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে? তাতে সাহেব কোনো উত্তর না দিয়ে ইঞ্জিন ঘর বন্ধ করে দেয় ও বলেন যে তিনি কাউকেও চান না। ইঞ্জিন বন্ধই থাকে। বেলা ৮॥ টার সময় সকল শ্রমিক মিলের কাছে উপস্থিত হয়। এবং সকল লোক মিলের সাহেবকে অনুরোধ করে যে আমাদের 'হপ্তা' মিটিয়ে দাও সাহেব, আমরা যে যার ঘরে চলে যাবো। সাহেব বলে যে আজ টাকা নেই কাল 'হপ্তা' দেব। কলের স্ত্রী মজুরগণ বলে আমাদের ঘরে কোনো খাবার নেই ছোট ছেলে মেয়েরা আমাদের কি খাবে? আমাদের 'হপ্তা' আজই মিটিয়ে দেওয়া হোক। সেই অবস্থায় মিলের বড়বাবু 'যতীন বাবু' ও চামর সাহেব (ওল্ড মিলের বড় সাহেব) মিলের নৌকার মাঝিদের, দারোয়ানদের ও মিলের অভ্যন্তরস্থ প্রহরী পুলিশদের, (পুলিশ প্রহরী আগে থেকেই আনিয়ে রাখা হয়েছিল) হুকুম দেয় যে এই লোকদের মারো। পুলিশ, মাঝি, ও দারোয়ানদের সংখ্যা ২০০ শতেরও অধিক ছিল। তাদের কয়েক জন শ্রমিকদের কয়েক জন লোককে লাঠির দ্বারা মারে। তার ফলে তারা জখম হয়। এই আহতদের নাম তহির মোল্লা, পূর্ণ প্রামাণিক, বরুণ প্রভৃতি। পূর্ণ গুরুতর জখম হয়েছে। মার খেয়ে পালিয়ে আসবার কালীন তারা দেখে যে মিলের গেট বন্ধ। গেটে তালা দেওয়া এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপার নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে ঘটেছিল। তাড়া ও মার খেয়ে তারা পালিয়ে আসতে থাকে, পিছনের দিক থেকে তখন গুলি চলতে থাকে, গেটের নিকটও গুলি করা হয়। ভিতরে তখন ১০০ শতেক অনেক লোক ছিল। প্রাণরক্ষার্থ কেউ মিলের ভিতর ঢুকে, কেউ পলায়ন করতে থাকে। 'ওল্ডমিল' পূর্ব্ব হতেই বন্ধ ছিল, কাজেই উক্ত মিলের শ্রমিকরা সমবেত ছিল না। ওল্ডমিল ও নিউমিল একই প্রাঙ্গনে। কটন মিলে কাজ চলছিল। গুলির শব্দ শুনে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে—কটন মিল থেকে ওল্ড মিলের ব্যাপার লোকেরা সমস্ত দেখতে পাচ্ছিল। আরো তারা শুনে যে নিউমিলের সমস্ত লোকদের গুলি করে মারা হচ্ছে। তখন তারা ব্যাপার কি দেখবার জন্য সেই দিকে দৌড়ে আসে। নিউমিলের গেট তালা দিয়ে বন্ধ ছিল। ভিতরে ঢুকবার ও বের হয়ে আসবার কোনো উপায় ছিল না। বাইরে যে সমস্ত শ্রমিক সমবেত হয়েছিল তারা ভিতরের প্রকৃত ঘটনা অবগত হতে পারছিল না। অথচ তাদের উপর অজস্র গুলি বর্ষন হতে থাকে, লাঠি, ইট, পাটকেল পড়ে থাকে। উপায়ন্তর নেই দেখে প্রাণ ভয়ে তখন শ্রমিকরা ওল্ড মিলের গেট দিয়ে নিউমিলের কমপাউণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে। তখনো তাদের উপর অবিরত গুলি চলতে থাকে, তখন তারা নিরুপায় হয়ে যে যাহা হাতে পায়, ববিন, মাকু, লোহা-লক্কর-লাঠি, সোটা নিয়ে মাত্র আত্মরক্ষা করে। শ্রমিকরা বলে যে যতীন বাবু, গুলি করার হুকুম দেয় এবং সে নিজেই গুলি করে। ভুবনেশ্বর, যতীন্দ্র ঘোষ, দারোগা বাবু তখন সেইখানে উপস্থিত ছিল। মিলের সাহেবরা ও উপস্থিত ছিল। পরে তারা মিলের ভিতর ঢুকে পড়ে। তখন সেখান হতে তাদের দিকে অবিশ্রান্ত গুলি চলতে থাকে। পুলিশ অনবরত গুলি চালাতে থাকে, নিউমিলের গেট এই অবস্থায় খুলে দেওয়া হয় তার ফলে লোক জখম হয়ে ধরাশায়ী হতে থাকে। অনেক শ্রমিক তখন আহতদের তুলে নিয়ে প্রমথ বাবু ডাক্তারের নিকট হাজীর করে তিনি তাদের হাওড়ায় হাসপাতালে পাঠাইবার উপদেশ দেন। জনতার সংখ্যা প্রায় ৪।৫ হাজার ছিল। ১০টা থেকে ১১ টার ভিতর অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। আর এই এক ঘণ্টা ব্যাপী অনবরত গুলি বর্ষিত হয়। গুলির আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে ও পুলিশের লাঠির গুঁতা সহ্য করতে না পেরে সকলে পলায়ন করে- কিন্তু পুলিশের গুলি চলতেই থাকে। মিলের দিকে যে কেউ গিয়েছে তার উপর গুলি নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই কাণ্ড বিকাল ৫ পাচটা পর্য্যন্ত চলেছে। গুলির ঘায়ে ২৪।২৫ জন গুরুতর জখম হয়েছে, ৪।৫ জন নিমখুন হয়েছে। আরো প্রকাশ মিলের কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব থেকেই এই অভাবনীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল। মিলের ভিতর পূর্ব্বে থেকে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী, দারোয়ান মজুত রাখা হয়েছিল। পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বীকার করেছেন যে পুলিশ ও দারোয়ান মিলে শত অনেক লোক আগে থেকে মিলের শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। মিলের এক ধারে নদীর তীর। মাঝিরা সেখানেই থাকে। তারা সকলে মিল কর্তৃপক্ষের আদেশে শ্রমিকদের দমনে নিযুক্ত হয়। মিলের বোট জেটিতেই বাঁধা থাকে। বোট থেকে নেমে এসে তারা মিলের ম্যানেজার, পুলিশ, দারোয়ান ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়। বাউড়িয়া থানার দারোগা পুলিসকে জনতার উপর গুলি ছুড়িবার হুকুম দেন; ভুবনেশ্বর বাবু, সার্জ্জন, ইনেস্পেক্টর প্রভৃতি ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, ভুবনেশ্বর বাবু স্বীকার করেছেন যে তিনি গুলি করতে বলেন নাই, যতীন বাবু গুলি করতে বলেছে। প্রথম গুলি যতীন বাবু নিজেই নাকি করেছে। ঘটনার পর হাওড়া থেকে পুলিশ ফোর্স এসে পৌছায়। তখন সমস্ত বাউড়িয়া পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট, এস, ডি, ও, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সকলেই ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় ৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। একজন চক্কাসির লোক, নাম শহর আলি। আর বাকী ৩ জন মিল লাইনের লোক। তাদের নাম ধাম জানা যায় নি। টেলিফোনের তার কাটার ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য এই ঘটনা প্রচার করা হয়েছে। শ্রমিকদের বোটের লোকদের আক্রমণ করার কথা বলা হয়েছিল। তাহা একেবারে মিথ্যা কথা। সকালে গুলি চালানোর ফলে যারা জখম হয় তাদেরে ঐ দিনই ২॥০টার গাড়ীতে হাওড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর অবশিষ্ট আহতদের ৫টার গাড়ীতে পাঠানো হয় ঘটনার পর যে যার ঘরে চলে যায়। সারাদিন কোনো গোলমাল হয় নি। তদন্ত ও খোঁজ খবর নিয়ে যতদূর জানা গিয়েছে তাতে জানা

গেল যে সমুদয় দুর্ঘটনা নিউ মিলের প্রাঙ্গনে ও গেটে হয়েছে। লোক জনদের নদীর ধার থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়। আহতের মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, বিলাস পুরী উড়িয়া সব শ্রেণীর লোক রয়েছে। বাঙ্গালী ছাড়া সকলে লাইনে থাকে। কয়েকজনকে দেখলাম, তাদের কারো মাথায়, হাতে, ও নাভির নীচে গুলি লেগেছে। কয়েকজন অল্প বয়স্ক শ্রমিক বালকেরও গায়ে টোটা বিদ্ধ হয়েছে।

মঙ্গলবারের ঘটনা

কটন মিল ছাড়া সব মিলের 'হপ্তা' মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিউ মিলের সকল শ্রমিকদের অদ্য ৮॥ টার সময় থেকে হপ্তা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ কোনো গোলমাল নাই। সব চুপ-চাপ, নিস্তব্ধ। মেয়ে মজুরদেরও 'হপ্তা' দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্ব্ব শুদ্ধ চারটি মিল আছে। যথা:—'কটন মিল' নিউ মিল, ওল্ডমিল, ও নর্থ মিল। চারটি মিলই এখন বন্ধ। অদ্য দু'জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। থানায় গিয়েও তাদের বিরুদ্ধে [illegible] অভিযোগ [illegible]না গেল না। তাদের উলুবেড়িয়ায় চালান করা হয়েছে। এদের এক জনের নাম আতিয়র রহমান। শোনা গেল তার উপর ভীষণ জুলুম করা হচ্ছে। আর এক জনের নাম নুর আলি[illegible] বাকী ধৃত লোকদের নাম জানা যায় নি।

আমরা বেলা ৪॥ টার সময় মিঃ মৃণালকান্তি বসু, মিঃ স্প্রাট প্রভৃতির সহিত বাউড়িয়া থানায় যাই। দারোগা বাবু মিল এরিয়াতে চৌকী দিতে বেরিয়ে ছিলেন কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা ফিরে আসি, পথে দারোগা বাবু ও ডি, এস, পির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি দু' ঘণ্টা ধরে সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে বিবৃত করেন। তার সার মর্ম্ম এই যে সব কাণ্ড প্ররোচকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিল কর্ত্তৃপক্ষের দুরব্যবহারের কথার বিষয় অবগত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন প্রকৃত ঘটনা তিনি জানেন না জানলেও বলবেন না। তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য সেখানে এসেছেন ও ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন। দারোগা বাবু বল্লেন শ্রমিকদের পুলিসের উপর কোনো আক্রোশ ছিলনা। যতীন বাবুর উপর তারা সকলেই অসন্তুষ্ট। এতদ্বারা বেশ বোঝা গেল যে 'যতীন বাবু' সব কিছুর মূলে আছেন। ডি, এস, পি বল্লেন লোক সংখ্যার অনুপাতে শ'খানেক লোক তিনি গ্রেপ্তার করবেন। কে দোষী নির্দ্দোষ তাহা তিনি দেখছেন না। কাঁচা ও পাকা আমপাড়ার মধুর উপমা তিনি দিলেন। বিকালে আমাদের সামনে ১০।১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো। জন ৩০ ত্রিশেক সশস্ত্র পুলিশ দারোয়ান ও যতীন বাবু দারোগাগণ মিলের ঝুঁপড়িতে ঝুঁপড়িতে ঘুরে ঘুরে ধর পাকড় করছে। প্রকাশ যে রাত্রে কতকগুলি বস্তিতে চড়াও করা হবে গ্রেপ্তারের জন্যে। ডি, এস, পি, খুব বিজ্ঞের মত তাঁর পুলিশ লাইনের কার্য্য কুশলতা, জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদি সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাতে থেকে বোঝা গেল তিনি শান্তি শৃঙ্খলার অবতার। ধর পাকড় ছাড়া আর কোনো গোলমাল কাল হয় নাই। সন্ধ্যায় কারবালা ট্যাঙ্কের ওখানে একটা বিরাট সভা হয়। তাতে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মিঃ স্প্রাট্ ধারারমণ মিত্র ও বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সভ্য প্রভৃতি শ্রমিকদের সাহস সঞ্চয় করবার জন্য উপদেশ দেন। মিঃ স্প্রাট তাদের ইউনিয়নকে খুব সুগঠিত করবার জন্য উপদেশ দেন। ধৃত লোকদের জামীনে মুক্ত করার চেষ্টা চলেছে।

যারা আমাদের এই ঘটনা বলেছে তাদের নাম আমরা প্রকাশ করলামনা যদি দরকার হয় তবে তাহা পরে করা যাবে। ৫।৬ জন লোক এই ঘটনার বর্ণনা প্রদান করেছে। আহতদের কাছ থেকে একটা জবানবন্দী লওয়া হবে।

শ্রীযুত ধারারমণ মিত্র ও চিরঞ্জীলাল স্রফ বাউড়িয়ায় রয়েছেন।

—০—

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2/1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে জুলাই ১৯২৮, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৫	৭ম সংখ্যা

"বিপ্লবের আদর্শবাদ ব্যতীত কোনো বিপ্লব-আন্দোলনই সম্ভবপর নয়।"

—লেনিন—

* * * *

"বিপ্লব হচ্ছে ইতিহাসের গমনশীল যন্ত্র।"

—মার্ক্স—

* * * *

"শ্রমিকগণ যে বিপ্লব আনয়ন করবে তার প্রথম ধাপ হচ্ছে সর্ব্বহারাগণকে শাসক শ্রেণীতে উন্নীত করা—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিজয় লাভ করা।

"ধনিকগণের (বুর্জুয়াজিদের) হাত থেকে ক্রমশঃ সমস্ত ধন ছিনিয়ে নেবার জন্যে, উৎপাদনের উপায় গুলিকে ষ্টেট্ বা তন্ত্রের হাতে অর্থাৎ শাসক শ্রেণীতে সংগঠিত সর্ব্বহারাগণের হাতে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে এবং যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে উৎপাদন ক্ষম শক্তি সমূহের সমষ্টিকে বাড়াবার জন্যে—সর্ব্বহারাগণ তাদের রাষ্ট্রনীতিক প্রভুত্বের ব্যবহার করবে।"

—মার্ক্স—

সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ	প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০ Foreign Subscription : Annual 6s.

ফোর্টগ্লষ্টারে ধর্ম্মঘট

— • —

গত ১৬ই জুলাই সোমবার বাউড়িয়ার ফোর্টগ্লষ্টার জুট মিলের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস তাহাদের উপর গুলি চালাইয়া অনেককে জখম করিয়াছে। শ্রমিকদের পক্ষে আহতের সংখ্যা ২৮ জন, তন্মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। ফোর্টগ্লষ্টার জুট মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট মেসার্স কেটল্‌ওয়েল্ বুলেন এণ্ড কোম্পানী। বাউড়িয়ায় ইহাদের পাশাপাশি চারিটী কল ব্যতীত বিস্তৃত জমিদারীও আছে। ফোর্টগ্লষ্টার কোম্পানীর চারিটী কলের শ্রমিক সংখ্যা অনুমান ১২০০০ হাজার হইবে। এইবার হাজার শ্রমিক নরনারী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যে সামান্য বেতন পায় তাহাতে তাহাদের ভরণ পোষণের সংস্থানও হয় না। সুতরাং সেজন্য একটা গুরুতর অসন্তোষ ইহাদের মধ্যে লাগিয়াই থাকে। তাহার উপর ডিপার্টমেণ্টের ওভারসিয়র, বড় বাবু প্রভৃতিকে "ঘুষ" "ডালি" এবং সময় সময় আরও অনেক কিছু যোগাইতে হয়। যে "ঘুষ" এবং "ডালি" দিতে না পারে তাহার চাকরী হওয়া দায়। যাহার চাকরী হয় "হপ্তার" দিন তাহাকেও "জল পানি" দিতে হয়। ইহা ভিন্ন "শনিবারের বাজারে" কোন কোন সাহেব ওভারসীয়রের জন্য আরও যে সব ব্যাপার করিতে হয় সে সব কথা লোক সমাজে প্রচার না হওয়াই ভাল। এ দেশের চটকলের শ্রমিকদের প্রতি কুঠীয়াল সাহেবরা অধিকাংশ সময়ে যে ইতর জনোচিত ব্যবহার করিয়া থাকে, সকল কল হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া যদি একটা তালিকা করা যায়, তাহাতে যে ভয়াবহ ও বীভৎস চিত্রের সৃষ্টি হয় সে কালের নীলকুঠীর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারও বোধ হয় তত ভয়ানক ছিল না। এ দেশের অসহায় শ্রমজীবীদের প্রতি বিদেশী বেনিয়াদের দুর্ব্ব্যবহার করার এই যে অন্যায় স্পর্দ্ধা—ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী এ দেশের পুলিস। শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যেখানে এবং যখনই কোন বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে সেইখানেই দেখা গিয়াছে যে মালিকদের নিযুক্ত ভাড়াটিয়া গুণ্ডার ন্যায় পুলিস সেখানে এমন ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে, যাহার ফলে শ্রমিকগণ পুলিসকে যমদূতের অধিক ভয় করিতে শিখিয়াছে। অপর পক্ষে স্বভাবতঃ নির্ম্মম বিদেশী বেনিয়াদের স্পর্দ্ধা অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিক ও মালিকদের প্রত্যেক বিবাদ ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা বুঝিতে বাধ্য হইয়াছে যে মালিকরা তাহাদিগকে শোষণ করিবার জন্য যতই অত্যাচার করিতে থাকুক না কেন উহা বন্ধ করিবার কোন প্রকার চেষ্টা তাহারা করিলেই পুলিস তাহাদিগকে গুলিদ্বারা হত্যা করিয়াও নিরস্ত করিতে থাকিবে। সেরূপ ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা, আইন আদালত সবই একটা প্রহসনে পরিণত হয়। যদিও এদেশের পুলিস এদেশের অর্থেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে তথাপি কুঠীয়ালদের, বিশেষতঃ ইংরাজ কারখানাওয়ালাদের স্বার্থ অপেক্ষা এদেশের লোকের জীবনকে তাহারা অধিক মূল্যবান্ মনে করে না। এদেশে শ্রমিক সংগঠনের প্রধান অন্তরায় এই পুলিসের ক্ষমতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা; ইহা সত্বর সংযত করিতে না পারিলে সাফল্যের আশা সুদূর পরাহত হইয়াই রহিবে। ফোর্টগ্লষ্টার জুট মিলে ধর্ম্মঘট হইল কেন? উত্তরে কারখানার মালিক ও তাহাদের অনুগৃহীতেরা হয়ত বলিবে যে কয়েকজন বদমায়েস এবং স্বার্থপর লোক শ্রমিকদিগকে ভুল বুঝাইয়া মালিকদের বিরুদ্ধে অকারণ উত্তেজিত করার ফলেই এই গোল যোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বাউড়িয়া অঞ্চলে যে সব চটের কল আছে সেই সব চটের কলে সত্যই সেদিন কোন গোলযোগ ছিল না। কলওয়ালারা যে ভাবে ইচ্ছা করিয়াছে সেই ভাবেই শ্রমিকদিগকে চালাইয়াছে; কাজ দিয়ে "ঘুষ" আদায় করিয়াছে, অন্যায় ভাবে প্রতিদিন বহু শত লোককে জবাব দিয়াছে, গালাগালি দিয়াছে, মারিয়াছে, কলের বাহিরে জমিদারীতে শ্রমিক প্রজাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, অসহায় শ্রমিকরা মুখ বুজিয়া সমস্তই সহ্য করিয়াছে, সাহস করিয়া কথাটী পর্য্যন্ত বলে নাই। আজ তাহারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া তিল তিল করিয়া যে অসন্তোষের আগুন হাজার হাজার শ্রমিকের অন্তরে ধূমায়িত হইতেছিল আজ হঠাৎ তাহা ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফলে শ্রমিকদের উপর গুলি চলিয়াছে। অনেককে বন্দী করা হইয়াছে, প্রাণের ভয়ে লোক ঘর দুয়ার ছাড়িয়া দূরান্তরে পলায়ন করিয়াছে। অথচ যাহারা এই বিদ্রোহ সৃষ্টির হেতু, বহু দিনের শোষণ ও উৎপীড়নের দ্বারা যাহারা এই হাজার হাজার শ্রমিককে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছে, পুলিশের বন্দুকের আড়ালে তাহারা বেশ আরামেই নিদ্রা যাইতেছে! আইন তাহাদের আরামে বাধা দিতে পারে না—সে ব্যবস্থা আইনে নাই! ধনিক ও বণিক প্রভাবান্বিত সকল দেশের "আইনই" এই রূপ। দেশের রাজ শক্তি বা আইন আদালত পরিচালনার ক্ষমতা যতদিন পর্য্যন্ত উহাদের হাতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত শোষকেরা সাড়ে সাতানব্বই জন লোকের জীবন লইয়া এই ছিনি মিনি খেলা চলিবেই। এই জন্যই "বাঙ্গলার কৃষক ও শ্রমিকদল" শ্রমিক এবং কৃষকদের ইউনিয়ন গুলিকে সত্বর শক্তিশালী করিয়া তুলিতে ও শোষক এবং উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চান। সুখের বিষয় "কৃষক ও শ্রমিক দলের" চেষ্টায় কারখানার শ্রমিকগণ ক্রমেই তাহা বুঝিতেছে ও শোষকদের শয়তানী চক্র ভেদ করিয়া ক্রমেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতেছে। ফোর্টগ্লষ্টার জুট মিলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে গত সপ্তাহের "গণবাণী"তে তাহার বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী বারে তাহার কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে আরও সংবাদ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ধর্ম্মঘট

গত ১৯শে জুলাই দিবা গতে রাত্রি থেকে মাদ্রাজের সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মজুরগণ ব্যাপক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেছে। শ্রমিকগণের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া থেকেই এ ষ্ট্রাইকের কারণ উদ্ভব হয়েছে। তা ছাড়া নিম্ন স্তরের মজুরেরা বেতন বৃদ্ধির দাবীও করেছে। যাক, তারা মরিয়া হয়েই ধর্ম্মঘট করেছে। ফলে, তারা গাড়ীর চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছে। পুলিশের গুলি খেয়েও তারা দমে যাচ্ছে না। মোট কথা, তারা প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছে না। মা'রের জওয়াব তারা মা'রের দ্বারাই দিচ্ছে। যেখানে পল্টন সঙ্গীন ও রাইফল নিয়ে শ্রমিকদিগের গতি প্রতিহত করছে সেখানে ইট-পাট-কেলের দ্বারাই তারা তার জওয়াব দিচ্ছে। গ্যাং মজুরগণ ও পয়ণ্টস্-ম্যান সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মঘট করেছে। প্রকাশ যে শ্রমিকরা একটা ষ্টেশন ভূমিসাৎ করে দিয়েছে। নানা প্রকারে তারা ট্রেণের গতিতে বাধা দিচ্ছে। তুতিকোরিণে রেলের লাইন তুলে ফেলা হয়েছে। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়েছে। ওখানকার ইঞ্জিনের কারখানার বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। ২৮শে জুলাই তারিখে কোদাই কানাল রোডে মাদুরা হতে আগত ট্রেণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে একজন লোক হত ও ১১ জন মারাত্মক রূপে আহত হয়েছে। আরো ২০ জন লোকের সামান্য রূপ জখম হয়েছে। শ্রমিকদিগের নেতা সিঙ্গারা ভেলু চেটিয়ার ও মুকুন্দলাল সরকার গেরেফতার হয়েছেন।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে জুলাই, ১৯২৮, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৫ | ৭ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

—:০:—

চট্‌কলের মজুর

বাউড়িয়ায় চটকলের মজুরগণের ওপরে গুলি চলেছে। তার পরে এখন ধর পাকড় আরম্ভ হয়েছে এবং মজুরগণের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমাও উঠেছে। বাউড়িয়ার ঘটনা ঘটার অল্প দিন আগেই চেঙ্গাইল লাড্‌লো জুটমিলে ও রিষড়ার ওয়েলিংটন জুট মিলে দু'বার ক'রে ধর্ম্মঘট হয়ে গেছে! ভারতবর্ষে যত কল কারখানা আছে সে সবের মধ্যে চট্‌কলগুলি যত লাভ ক'রে থাকে তত লাভ আর কোনো কল-কারখানাই করতে পারেনা। একশ' টাকা পুঁজির ওপরে চটকলের অংশীদারগণ বছরে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ পেয়েছে। যে কল লাভ যত বেশী করে তত বেশী লুণ্ঠনও করে মজুরদিগকে। অর্থাৎ মজুরগণকে তাদের ন্যায্য মেহনতানা হতে বঞ্চিত ক'রেই, কারখানার মালিকেরা এত বেশী লাভ করতে পারে। কলের যারা ভাগীদার হয়, তারা তাদের পুঁজির টাকাত দু'এক বছরের মধ্যেই তুলে নিয়ে যায়। নিজেরাও কোনো কাজ কর্ম্ম করে না। তবুও যে তারা বছর বছর এত অধিক পরিমাণে লাভ ক'রে নেয় এ লাভের টাকা অশিং কোথা থেকে? চটকলের মজুর ভাইগণ এ বিষয়টি ভাব্‌তে আরম্ভ করেছে। তারা তাদের পেটের জ্বালা থেকে বুঝ্‌তে শুরু ক'রেছে যে তাদের মেহনত কারা লুটে খাচ্ছে। চেঙ্গাইল, বাউড়িয়া ও রিষড়ার ঘটনাগুলি হচ্ছে চটকলের মজুরগণের চেতনার লক্ষণ। বাউড়িয়াতে মজুরদের এই চেতনার জওয়াব গুলির দ্বারাই দেওয়া হয়েছে। যখনি দরকার হবে তখনি অন্য জায়গাতেও চটকলের মালিকেরা ও তাদের সাহায্যকারী পুলিশগণ এরূপ জওয়াবই দেবে। সেই জন্যে মজুর ভাইগণকে এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হবে। কেবল মাত্র দু' চারটা কলে ধর্ম্মঘট চালালে মজুর ভাইগণের কাজ কিছুতেই হাসিল হবে না। তাদের ওপরে জুলুম সমস্ত চট্‌কলেই হয়ে থাকে, তাদের বুকের রক্ত সমস্ত চটকলের মালিকেরাই শোষণ ক'রে খায়। কাজেই সমস্ত চটকলের মজুরগণকে এক হয়ে একই সঙ্গে সব জায়গায় মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। তা না হ'লে তারা কিছুতেই জয়লাভ করতে পারবে না। বাংলা দেশের চটকল গুলিতে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মজুর কাজ ক'রে থাকে। এই ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মজুর যখন একই সঙ্গে দল বাঁধ্‌বে এবং একই সঙ্গে মালিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তখনি শুধু তারা কিছু আদায় ক'রে নিতে পারবে। আজ এ জায়গায়, কাল সে জায়গায় ধর্ম্মঘট চালিয়ে বিশেষ কিছু লাভ নেই। যে দিন সকলে মিলে বাংলার চটকলগুলিকে অচল ক'রে দিতে পারবে সে দিনই তাদের জয় জয় কার প'ড়ে যাবে। সেই শুভ দিনের জন্যে বাংলার চটকলের মজুর ভাইগণকে প্রস্তুত হতে হবে। তাদের যত শক্তি আছে সে সব শক্তিকে একই জায়গায় জমা করতে হবে। তারা যদি ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়ন গ'ড়ে নিয়ে একে অন্যে থেকে আলাদা হয়ে লড়াই চালাতে থাকে তা হলে কলের মালিকেরা পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাদের ধ্বংস ক'রে দিবে। তাদেরকে এমন ভাবে দল বাঁধ্‌তে হবে যে কোনো জায়গায় যদি একটি মাত্র মজুরের ওপরে মালিকেরা জুলুম করে তা হলে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মজুর একই সঙ্গে একই কথায় তার প্রতিকারের জন্যে উঠে প'ড়ে লাগবে। ধর্ম্মঘটও তাদিগকে একই সঙ্গে সব জায়গায় চালাতে হবে। কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভবপর হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত চটকল সমূহের মজুরগণের ইউনিয়ন একটি মাত্র না হয়। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তার ভিন্ন ভিন্ন শাখা স্থাপিত হবে।

ইউনিয়নের আদর্শ

আমরা বলেছি যে প্রত্যেক কারবারের জন্যে একটা বড় ইউনিয়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা যদি আমরা না করি, তা হলে যুদ্ধ জয়লাভ আমরা কিছুতেই করতে পারব না। কিন্তু,

দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে এখনো ছোট ছোট ইউনিয়ন গড়ার দিকেই শ্রমিক-নেতাদের ঝোঁক খুব বেশী। চটকলের মজুরদের ব্যাপারে এ ঝোঁক আবার খুব বেশী মাত্রায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভাটপাড়ায় বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন ও বঙ্গীয় পাটকল সমিতির হেড্ আফিস রয়েছে। এ সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত বাংলার চটকলগুলির মজুরগণকে একই নিশানের নীচে সমবেত করা, অর্থাৎ তাদের জন্যে একটা বড় ইউনিয়ন গ'ড়ে তোলা। এ ইউনিয়ন থাকা সত্বেও চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়ায় আলাদা আলাদা ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটারী মিঃ কিশোরী লাল ঘোষ এই দু'টি ইউনিয়ন গড়ার কাজে বিশেষ রূপে যত্নবান হয়েছেন। বেঙ্গল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনটি অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটি। কাজেই, এ কমিটির উচিত যাতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি কাজে লাগানো যেতে পারা যায় তার জন্যে যথা সাধ্য চেষ্টা করা। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব এই মর্ম্মে পাশ হয়েছিল যে একটা ইউনিয়নকে ডিঙিয়ে কেহ অন্য ইউনিয়ন গড়তে পারবে না। এই কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারীরূপে মিঃ কিশোরী লাল ঘোষের পক্ষে ছোট ছোট ইউনিয়ন গড়া কিছুতেই উচিত কাজ হয় নি। বঙ্গীয় পাটকল সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি যে কোনোরূপ উন্নত ব্যবস্থার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রয়েছে। সমিতির হেড আফিস ভাটপাড়া থেকে কলিকাতায় তুলে আনতে কমিটির কোনোরূপ আপত্তি নেই। নূতন সংগঠন-কারীদের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেবার জন্যে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিকে ভেঙে গড়তেও বঙ্গীয় পাটকল সমিতি সব সময়ে প্রস্তুত আছে। এত সব সত্বেও মিঃ ঘোষ কেন আলাদা আলাদা ইউনিয়ন গঠন ক'রে ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তা আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। তাঁর এরূপ কাজের দ্বারা চটকলের মজুরগণের বিশেষ ক্ষতি হবে। সমস্ত চটকলের মজুরগণকে এক করতে না পারলে তাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করা, জুলুমের হাত থেকে তাহাদিগকে বাঁচানো একেবারেই সম্ভবপর হবে না।

শিক্ষিত মুসলমান ও মুসলমান সাধারণ

শিক্ষিত মুসলমানগণ ক্রমশই একটা বিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের নিকটে তাঁদের শ্রেণীগত স্বার্থ ব্যতীত এ পৃথিবীতে আর কোনো সত্য বস্তুই নেই। এই শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় সর্ব্বদা মুসলমান সাধারণের নামেই কথা-বার্ত্তা ব'লে থাকেন। কিন্তু, তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমান জন সাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া। সরকারী চাকুরীই তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পঁহুছার জন্যে অর্থাৎ চাকুরী লাভ করার জন্যে মুসলমান জন সাধারণের স্বার্থে যে কোনো মুহূর্ত্তে তাঁরা পদাঘাত করতে পারেন। আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে যে কোন রূপ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিতেও তাঁদের বাধেনা। সম্প্রতি তাঁরা সাইমন কমিশনের সহিত মাখা মাখি করার জন্যে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মুসলমান জনসাধারণের নামেই তাঁরা কমিশনের সহিত সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছেন। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের স্বার্থের সহিত তাঁদের স্বার্থের এতটুকুও যোগ নেই। যে কোনো সম্প্রদায়ের হোক না কেন সাইমন কমিশনের দ্বারা জনসাধারণের কোনো উপকারই সাধিত হবেনা। ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে কোনোরূপ পরিবর্ত্তন করা যায় কিনা তার বিচার করার জন্যে বিলাতের ধনিক সমাজ সাইমন কমিশন নিযুক্ত করেছে। বলা বাহুল্য, বিলাতের ধনিক সমাজই আমাদের শাসন কার্য্য চালায়। জনসাধারণের স্বার্থ এবং যারা জনসাধারণকে শোষণ ক'রে থাকে তাদের স্বার্থ কিছুতেই এক হ'তে পারেনা। ইংলণ্ডের ধনিকগণ আমাদের দেশের জনসাধারণকে শোষণ করার জন্যেই আমাদের দেশ শাসন ক'রে থাকে। এর জন্যে তারা আমাদের দেশের ধনী ও জমীদারগণের সহিত একটা তাল রেখে কাজ চালাচ্ছে। সাইমন কমিশন কিছু শাসনাধিকার যদি দিতে পারে তা আমাদের দেশের ধনী ও জমীদারগণকেই দিতে পারবে। আমাদের জনসাধারণ সাইমন কমিশনের নিকট হ'তে কোনো অধিকারই পাবেনা। তাদিগকে আপনাদের জোরেই অধিকার বুঝে নিতে হবে। এই অবস্থায় মুসলমান জন সাধারণের নামে সাইমন কমিশনকে সমর্থন করার কোনো অধিকারই মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেই। তাদের একমাত্র আশা হচ্ছে তাঁদের শ্রেণীর লোকেদের চাকুরী লাভ। এরি খাতিরে তারা সাইমন কমিশনের সহযোগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। কিন্তু, এই স্বার্থপর মুসলমান শিক্ষিত সমাজ হ'তে মুসলমান কৃষক ও মুসলমান শ্রমিকের খুবই সতর্ক থাকা আবশ্যক।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ

বাংলার স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার মানেই হচ্ছে কৃষক ও মজুরের ঘরে অন্নের অভাব হওয়া। যারা সকল প্রকার ফসলের উৎপন্নকারী তাদেরই ঘরে সকলের আগে ভাতের অভাব হয়, এর চেয়ে বেশী পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? শোষণের পর শোষণের দ্বারা দেশের কৃষকগণের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয়তর হচ্ছে। এই অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন না হলে তাদের দুঃখ-কষ্ট কিছুতেই দূর হবেনা, —দুর্ভিক্ষ আর মহামারী সর্ব্বদাই তাদের সঙ্গের সাথী হয়ে থাকবে। ভূমিতে ফসল কৃষকগণই উৎপন্ন ক'রে থাকে, কিন্তু ভূমির মালিক হচ্ছে জমীদার, যার সহিত ভূমির কোনো সম্বন্ধই নেই। চাষের এখনো সেই হাজার বছরের পুরাতন প্রথা বর্ত্তমান রয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আবাদ না করলে কিছুতেই কৃষক আর টিকে থাকতে পারবেনা। আধুনিক উন্নত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কৃষকদিগকে চাষের জন্যে ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের সমবেত হয়ে চাষের কাজ চালাতে হবে। কিন্তু, তার জন্যে চাষীদের শুধু যে ভূমির মালিক হওয়া আবশ্যক তা নয়, মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের সহযোগে দেশের শাসন ক্ষমতাও তাদের অধিকার করতে হবে। তা না হলে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে তারা কোনো কালেও উদ্ধার পাবেনা। এখান-ওখান থেকে সাহায্য নিয়ে এবারকার দুর্ভিক্ষ হয় তো কোনো প্রকারে কেটে যাবে। কিন্তু ভবিষ্যতের দুর্ভিক্ষের কারণ তেমনি বর্ত্তমান থাকবে। "কৃষক ও শ্রমিক দল" কৃষক, মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে একই পতাকার নীচে সমবেত ক'রে অধিকার লাভের সংগ্রামে পরিচালিত করবে। দেশের শাসন ক্ষমতা যখন তারা অধিকার করবে তখনি শুধু তারা নিজেদের

অদৃষ্ট নিজেদের হাতে গ'ড়ে তুল্‌তে পারবে, এবং তখনি শুধু তারা দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মূল কারণ গুলিকে সমূলে নষ্ট করতে সমর্থ হবে।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে শ্রমিকগণের ব্যাপক ধর্ম্মঘটের বিবরণ সকলেই দৈনিক কাগজে পড়েছেন। মরিয়া হয়ে সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করেছে। অত্যাচার, শোষণ আর নির্য্যাতন তাদের বিদ্রোহী ক'রে তুলেছে—লিলুয়া ধর্ম্মঘটের শোচনীয় পরিণতি দেখে তারা এতটুকুও দমে যায় নি। ধ'রতে গেলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ষ্ট্রাইক শেষ হতে না হতেই এস, আই, রেলওয়ের ষ্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। ষ্ট্রাইকের দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের অসুবিধার কথা, জীবন হানির কথা ব'লে বিদেশী ধনিক সমাজের মুখপত্র "ষ্টেট্‌সম্যান" মজুরদের ওপরে সর্ব্ব-সাধারণকে বিদ্বিষ্ট ক'রে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে ব্যাপক ধর্ম্মঘট ঘোষণার পরেও এস, আই, রেলওয়েতে লোকেরা ভ্রমণ করতে যাচ্ছে কেন? যথারীতি নোটিস জারী ক'রে মজুররা ধর্ম্মঘট করেছে। তা সত্ত্বেও জনসাধারণ যে ভ্রমণ ক'রে নিজেদের জীবন বিপন্ন করছে তার জন্য দায়ী কি মজুরগণ? জুলুম সয়ে সয়ে ভারতীয় মজুরগণ অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা এখন চায় অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন। যেমন ক'রে হোক্ সে পরিবর্ত্তন তারা করবেই করবে। মাদ্রাজের প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী শ্রমিক নেতা কার্ক ও শিবরাও ব'লে বেড়াচ্ছেন যে বলশেভিক্ আর কম্যুনিষ্টরা এ সব গোলমাল বাধাচ্ছে। তাঁদের কথা থেকে মনে হয় যে মজুরদের যেন কোন অভাব অভিযোগই নেই! কার্ক আর শিবরাও যে শ্রেণীর লোক তাতে তাঁদের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কথা আশাই করতে পারা যায় না। মজুরদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অন্ধ হয়েই এই সকল লোক-গুলি মজুরদের নেতা সেজেছে। আসলে এদের প্রাণের যোগ ধনিকদিগের সহিতই বেশী।

কংগ্রেস ও শ্রেণী-সংগ্রাম

(শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার)

বিপদ দেখিলে খরগোস চক্ষু বুজিয়া থাকে—ভাবে, তাহা-হইলে ব্যাধ আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। বাংলার বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতাদের ও মনোভাব হইয়াছে এইরূপ। শ্রমিকগণের মাথা তোলা দেখিয়া তাঁহারা বলিতেছেন ভেদাভেদ নাই—যাহারা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলে তাহারা জাতীয় আন্দোলনের সম্মুখে পাপী। বাংলার ফ্যাসিষ্ট কংগ্রেসের মুসোলিনি সুভাষচন্দ্র এই ধুয়া তুলিয়াছেন এবং ফরোয়ার্ড ঢাকের বাঁয়ার মত সেই সুরে সুর দিয়াছেন। আমেরিকা হইতে তারকদাস সায় দিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র কম্যুনিষ্টদিগকে ন্যাশনালিষ্ট কম্যুনিষ্ট হইতে আদেশ দিয়াছেন—এ সোনার পাথরের বাটী হইবার যে উপায় নাই।

"To introduce fresh cleavage within our ranks by talking openly of class war and working for it—appears to me at the present moment to be a crime against nationalism" (Maharastra P. C. speech) সুভাষচন্দ্র "Our" বলিতে কাহাদের বুঝেন আমরা জানিনা এবং তাঁহার "nationalism" বলিতে কোন্ নেশন বুঝায় তাহাও আমরা বুঝি না। সাপ এবং ব্যাং এক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া একজাতি নয়। সুভাষচন্দ্রের "আমরা" যাঁহারা, তাঁহারাই জাতির সবটা ন'ন—এমন কি লক্ষাংশের এক অংশ ও নয়। এই মুষ্টিমেয়ের দল স্বরাজ আনিবেন এবং জনসাধারণ তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহাদিগকে স্বরাজ আনিতে সাহায্য করিবে এবং স্বরাজ হইলে কর্ত্তারা তখন দয়া করিয়া জনসাধারণের অধিকার দিয়া দিবেন! এই যুক্তির অব-তারণা করিবার পূর্ব্বে একটু ভাবা উচিত কংগ্রেসের কর্ত্তা যাঁহারা তাঁহাদের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক কি? কংগ্রেসে এখন আর ১৯২১ অব্দের প্রোগ্রাম নাই—পাঁচী মরিয়া গেছে, তবুও বুড়িকে লোকে "পাঁচীর মা" বলিয়া ডাকে—কংগ্রেসের ও সেই অবস্থা। জনসাধারণ কংগ্রেস হইতে সরিয়া গিয়াছে, কংগ্রেস এখন কাউন্সিলের দাবাখেলার মধ্যে নিজের দুষ্ক চালা-ইতেছে। উহাকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া তাহারাই মনে করিতে পারে যাহাদের একদণ্ড ইংরেজের রাজ্য না থাকিলে জীবিকা উপার্জ্জন হয় না এবং রাজনীতিকে যাহারা জীবনের অবসর সময়ের একটা খেলা মাত্র মনে করিয়া থাকে। ফরোয়ার্ডের amusement এর পৃষ্ঠায় কংগ্রেসের সংবাদ বাহির হয় ইহার ভিতর কতখানি unconscious humour যে রহিয়া গিয়াছে, তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রেণী-সংগ্রাম নাই বলিলেই উড়িয়া যাইবে না। কংগ্রেস নিজেই একটা শ্রেণীর হইয়া লড়িতেছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যশোর কনফারেন্সে যখন কৃষকের ভূমিতে স্বত্ব হওয়ার জন্য একটা প্রস্তাব উপস্থিত করি, তখন প্রতিনিধিগণের অনেকে আমায় বলিয়া ছিলেন—"আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, চাষাদের জন্য আপনার এত মাথা ব্যথা কেন?" এই তথা-কথিত ভদ্র-মনোভাবের মধ্যদিয়া কংগ্রেসের শ্রেণীস্বার্থমূলক গঠনের কথা বুঝা যায়। ১৯২১ অব্দে গুজরাটে জমিদার ও প্রজার বিরোধ বাধিলে মহাত্মা ফতোয়া দিয়াছিলেন যে খাজনা না দেওয়া কংগ্রেস আন্দোলনের নীতি বিরুদ্ধ অথচ non-payment of tax তখনও কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকার অঙ্গ ছিল। সকলে ভাবিয়া ছিলেন ওটা শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইবে। আমেদাবাদে কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট হইলে মহাত্মা কলওয়ালাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গৌহাটি কংগ্রেসে প্রজার ও জমিদারের মধ্যে বিরোধ হইলে কংগ্রেস প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিবেন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয় এবং এই লইয়া পণ্ডিত মতিলাল জমিদারদের হইয়া কত সদ্‌যুক্তির অবতারণা করেন, যেন তাহাদের দেখিবার এ দুনিয়ায় কেহ নাই। বাংলার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত মহাশয়তো জমিদারদের জোরে কাউন্সিল ইলেকসনে জিতিয়াছেন বলিয়া কত কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বাংলার কাউন্সিলে যখন প্রজাস্বত্ব আইন উপস্থাপিত হয়, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তখন সিলেক্ট কমিটি হইতে বর্ত্তমান লেখককে বাদ দিবার জন্য স্বরাজ্যদল গবর্ণমেন্টের সহিত একযোগে ভোট

দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখকের অপরাধ তিনি জমিদার নহেন এবং কাউন্সিলের প্রজাদলের সম্পাদক ছিলেন। স্বরাজ টিকিট লইয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া একদিনও স্বরাজ দলের বিরুদ্ধে না যাওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের ছাপ দিলেও জমিদার ভবেন রায়কে তাঁহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অনেক নেতা এবং কাউন্সিল ক্যাণ্ডিডেট সাহায্য করিয়া ছিলেন। নদীয়ার গত উপনির্ব্বাচনেও তাঁহাকে বাদ দিয়া একজন জমিদারকে কংগ্রেস মনোনীত করেন। প্রজাস্বত্ব আইনের সিলেক্ট কমিটিতে অধিকাংশ স্বরাজী প্রবেশ করিয়া প্রস্তাবটিকে জমিদারগণের এমন সুবিধাজনক করিয়া লইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট "খোল-নলচে" বদলাইয়া আবার আইনটিকে উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সিলেক্ট কমিটির সভ্য হইয়াও স্বরাজী কাউন্সিল দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন কয়দিন উপস্থিত হইয়াছিলেন? প্রজার জন্য কংগ্রেসের এইতো দরদ। আর স্বরাজী জমিদারদের প্রজার উপর কত ভালবাসা তা উত্তর পাড়ার তারক বাবুর জমিদারির প্রজাগণের সভার মন্তব্য হইতেই বুঝা যায়।

শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে বলিতেছেন কে? না যিনি এই শ্রেণীস্বার্থান্ধ কৃষকের নির্য্যাতনকারী দলের প্রধান পুরোহিত! এই সেদিনও বোম্বে করপোরেশনে কাপড়ের কলের ধর্ম্মঘটী মজুরদের ছোট ছোট ছেলেদের দুধের জন্য কিছু টাকা মঞ্জুরী চাওয়া হয়—সে প্রস্তাব পাশ হয় নাই। কলিকাতার কর্পোরেশনের ঝাড়ুদারগণের ধর্ম্মঘট মীমাংসা প্রস্তাব বাতিল করার পক্ষে গান্ধী-ভক্ত-নারী, দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের চাঁই, কংগ্রেস কাউন্সিলের মিঃ বি, এন্ বানার্জি বলিয়াছেন—"I object to the pampering the scavengers by giving them this increase in salary at the expense of the impoverished middle classes of the community, who could not properly feed or educate their children, and who felt the increased assessments greatly."

রামকুমার গোয়েঙ্কা নামক আর একজন কংগ্রেস কাউন্সিলর এই রায়ে রায় দেন। যখন চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের বেতন ৫০০৲ টাকা বাড়ানো হয়, বা দ্বিতীয় ডেপুটি শৈলপতি বাবুর মাহিনা ১২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত করা হয়, তখন এই সকল মহাত্মার একটি ও কথা ক'ন নাই। গরীব ঝাড়ুদারেরা মাত্র ১৪৲ টাকা মাহিনা পায়। একটাকা বাড়ানোর প্রস্তাবেই কর্ত্তারা চটিয়া গেলেন। ১৯২৫ অব্দে কাশীপুরের মেথরদের ধর্ম্মঘট ভাঙিতে সুভাষ চন্দ্র নিজে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন—তাহার ইতিহাস দিবেন কি? সে পন্থা কি বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের পন্থা হইতে বিভিন্ন ছিল? Strike-period এর মাহিনা খড়্গপুরের ধর্ম্মঘটীরাও "শয়তানী" বৃটিশগবর্মেণ্টের মধ্যস্থতায় পাইয়াছিল। আর কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিশ্রুতি দিয়া ঝাড়ুদারদিগকে কাজে লাগাইয়া এখন ধর্ম্মঘটের কয়েক দিনের মাহিনা দিলেন না। এই সামান্য বেতন বৃদ্ধির জন্য যদিও কর বৃদ্ধি হইবে না সকলেই জানিতেন।

তবুও বলিতে হইবে শ্রেণী সংগ্রাম নাই! কথায় বলে এক হাতে তালি বাজে না। একপক্ষে যেখানে এত বড় শ্রেণী স্বার্থান্ধতা—অপর পক্ষে সেখানে কেন সংঘাত বাধিবে না? যিনি জাতির প্রকৃত সেবক, তিনি ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর স্বার্থ-সমর্থন করিতে পারেন না—অধিকাংশের ইষ্ট যাহাতে হয় সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলি—অতীতের কঙ্কালচয়, তোমরা শূন্যে বিলীন হও, তোমরা বিলীন হইলেই ভবিষ্যৎ ভারত জন্ম গ্রহণ করিবে। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর এখন একমাত্র কর্ত্তব্য জাপানের সামুরাইগণের মত নিজের স্বার্থ স্বেচ্ছায় বলিদান করা—আজ স্বেচ্ছায় না করিলে, কাল জোর পূর্ব্বক সে স্বার্থ ছিন্ন হইবে—শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ইহাই বাণী।

জামশেদপুর শ্রমিকের আত্মবেদন

আমি একজন কারখানার সত্যকার শ্রমিক। সত্যকার কথাটা বলতে হচ্ছে এই জন্য যে কারখানার মালিকদিগের ভুঁড় মোটা করবার জন্য আমাকে সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোর যথোচিত ব্যবহারই করতে হয়। বৈদ্যুতিক ব্যজনীর শীতল আবহাওয়ায় চেয়ারে বসা বাবু ভায়াদের মত অক্লান্ত পরিশ্রম (?) ক'রতে হয় না বটে, তবে ভরা আটটা ঘণ্টা সামান্য মজুরীর জন্য এমি কঠোর পরিশ্রম করতে হয় যে শীতকালেও ঘামের মন্দাকিনী মাথা হ'তে বয়ে যেতে থাকে। আমাদের এই যে হাড় ভাঙ্গা খাটুনি, এর বিরাম নাই। যদিও বা একটী কিসেরও অজুহাতে গত ধর্ম্মঘটের পর হতে মাসে দুটা দিন অবসর মিলিল; কিন্তু সে বিশ্রামের মর্য্যাদা আমাদের মত ভাত কাপড়ের কাঙ্গাল কুলী মজুররা কোন মতেই নিতে পারল না। মালিকরা বলে দিলে "কাম নেই দাম নেই" (No Work No Pay) বাস্! পোড়া কপাল যাদের তাদের সুখ নাই। তবে যে সুবিধা কারু হ'ল না এরূপ নিছক মিথ্যে কথা বললে খোদার—যিনি রাত দিন পয়দা করছেন তাঁর—অভিশাপে পড়তে হয়। সুবিধা হ'ল তাদের যারা পাখার নীচে বসে সোডা বরফের শ্রাদ্ধ করে বেড়াচ্চে; আর যারা শুধু ঘুরপাক খেয়ে কর্ম্মরত মজুরদের উপর বৃথাই নানারকম তুম্বি তাম্বা লাগিয়ে তাদিকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের ভুঁড়ি মোটা করছে সেই সব ফোরম্যানদের। মাসিক ওয়ালাদের কল্যাণার্থে রোজ বেতন ওয়ালাদিকেই মাসে দুদিনের বেতন উৎসর্গ ক'রতে হল। জানিনা, এটা বিধাতার অভিশাপ! কি কারু চক্রান্ত! কি কারু বিশ্বাসঘাতকতা!

কতকগুলো মজুর নিজেদের গতরের উপর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়ে মিল ওয়ালাদের কাছে যা মজুরী পায়, তাতে নিজেদেরই পেট চলা দায়, তার পর আবার কাচ্চা বাচ্চার উপদ্রব আছে। (যেহেতু তারা সব্বাই বিবেকানন্দের মত সাধু সন্ন্যাসী নয়) এ ক্ষেত্রে পেটের দায়ে মাগ ছেলে গুলো চোখের সামনে উপোস্ যাচ্ছে দেখতে না পেরে ন্যায় সঙ্গত ভাবে যৎ কিঞ্চিৎ মজুরী বাড়াবার জন্য বড় সাহেবকে বলে এবং তিনি ইহাতে কর্ণপাত না করায় শান্তিপূর্ণ ভাবে আপন আপন কর্ম্ম ত্যাগ করে বাইরে আসে। কতকগুলো স্বার্থান্ধ লোক যাই বলুক না কেন, তাদের কাজ ছাড়া অন্যায় যে কোন মতেই হয় না একথা প্রাণবান মাত্রেই স্বীকার করবে। আর সত্যিই ত—কাজ ক'রে যদি পেট না ভরে—সত্যের কান্না—প্রাণের কান্না না মেটে তবে সে কাজ করে লাভ?

ফলে মালিকদিগের দয়ায় অপরাপর জায়গা বিশেষতঃ পণ্যোৎপাদক বিভাগগুলির অচল অবস্থা হেতু আবশ্যক লোক ব্যতীত সকলকেই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বসে থাকতে হ'ল। এই হতভাগাদের মাঝে আমি একজন। তাই আমার দুঃখের কথাটী সবার কাছে জানাবার জন্য একটু ব্যস্ত হয়েছি। এতে আপনারা স্বার্থ পরই বলুন আর যাই বলুন। আমার নিয়েই জগৎ ব্যস্ত। আর এই আমিত্বই বোধ হয় স্রষ্টার সৃষ্টি চাতুরী এবং জগৎ রক্ষার একটি মস্তবড় ভিত্তি। যা কিছু মানুষ করে তা বোধ হয় এই "আমারই" জন্যে। আমার অভাব মোচন হলেই হ'ল ব্যস্। অপরের জন্য কে ভাবে! "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" বলে একটী কথা আছে; চার্ব্বাক মুনির খুরে খুরে নমস্কার। তিনি তাহার "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" * * সূত্রে এই কথাটীরই সমর্থন করে গেছেন।

বসন্তের কোকিল নিজের অভাব মোচনের জন্য (কিসের অভাব তা দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয়দের গবেষণার বিষয়) গাছে গাছে গলাবাজি আরম্ভ করে বেড়ায় এবং অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত পক্ষীকুলের উপকারের দোহাই দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মী পক্ষীকুলের উচ্ছবৃত্তি অবলম্বনে আহৃত তণ্ডুল কণার কিয়দংশ লইয়া ভারতের অন্যপুষ্ট (অন্নপুষ্ট?) সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত গলাবাজি করিতে ছুটে। তারপর যখন সাধনার সিদ্ধিরূপে পর্য্যাপ্ত অর্থের রস আপন উদর গহ্বরে প্রবেশ করাইতে সমর্থ হয় দীপালোকে সজ্জিত আনন্দ নিকেতন রূপ আম্রকুঞ্জে আশ্রয় লাভ করে তখন বসন্তের গীতি মুখর সুকণ্ঠ কোকিলের বাক শক্তি রহিত প্রাবৃটের পরভৃৎ সাজিতে আর কাল বিলম্ব হয় না। তাই বলি, ভাই সব, যদি জগতের মধ্যে গণ্যমান্য হইবার বাসনা হৃদয়ে বলবতী হয়, তবে আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাক। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

হাঁ, এখন আমার কথাটী একটু সংক্ষেপে বলি শুন :—

আমার পোষ্য—(১) বুড়ো অন্ধ বাপ, (২) মা ষষ্ঠীদেবীর কৃপালাভে কৃতকৃতার্থা তিনটী জীবিত ছেলের জননী আমার স্ত্রীরত্ন (৩) আর আমি। নিজস্ব মজুরীর উপর যে কি প্রকারে দিনপাত হয় তা অন্তর্য্যামীই জানেন।

আজ মাসাবধি বেকার বসে। বড় সাহেবের কাছে সব কথা খুলে বললেম। তিনি সাহেব মানুষ, তিনি যা উপায় করেন তা তাঁর খরচের ৫ গুণ। কাজেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ন্যায় সঙ্গত উত্তরই প্রদান করলেন।

শেষে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে যা উপায় করি তা' হ'তে পেটে না খেয়ে মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়ে শ্রমিক সঙ্ঘ (লোকে বলে মহান্ প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানটী যে মহান্ তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি) তৈরি করেছি। তাদের কাছে ধন্না দিয়ে পড়লাম। তারা দেশের লোক দুঃখ বুঝবে তাই। কিন্তু "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র"। তারা জবাবের সহিত এমন সব কথা বলতে লাগল যে সে সময়ের মনের অবস্থায় তার সব কথার তাৎপর্য্য বেশ ভালকরে বুঝতে পারলাম না। তবে এই মাত্র বুঝলুম যে ধর্ম্মঘটীগণের উপর তাদের সহানুভূতি নাই বরং ইহা যাহাতে নষ্ট হয় সেরূপ চক্রান্তে লিপ্ত আছেন—As it was taken as unauthorised Strike)।

যাহা বেতন পাইয়াছিলাম তাহা পাওনাদারকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব বুঝাইয়া দিতে নিঃশেষ প্রায় হইয়াছে। দোকানদারগণ "কাম নেই ধার নেই" এই নৈতিক উপদেশ প্রদান করিয়া ধারের পথ রুদ্ধ করিয়াছে। অন্ধ পিতা অপোগণ্ড শিশুর কি প্রকারে জীবন রক্ষা করিব, সেই চিন্তায় আধমরা হইয়া পড়িয়াছি।

এখন পেটের জ্বালায় "ইহাসনে শুষ্যতু যে হৃদয়ম্" বলে বুদ্ধদেবের মত নির্ব্বাণ মুক্তি কামনা করাই একমাত্র পথ। কিন্তু বোধি বৃক্ষেরই অভাব, এই টুকুই অসামঞ্জস্য। তবে যদি বোধি অভাবে কেন্দূস্যাৎ" বলে শাস্ত্রকারেরা মত দেন; তাহা হলে হতভাগাদের একটী গতি হবার আশা হয়। কারণ শ্রমিক সঙ্ঘের অফিসের সামনে একটী কেন্দুবৃক্ষ আছে, শ্রমিক সঙ্ঘের পাণ্ডারা কিছু বলিবেন না ত?

যাই হোক সমস্যা বড়ই দারুণ। লম্বা চৌড়া বক্তৃতা দানকারী শ্রমিকদরদীরা আমাদের করুণ দৃশ্যটী দেখবার অবসর পাবেন কি?

জনৈক ভুক্তভোগী

বাঙ্গলার পাটকলের শ্রমিক সমিতি।

(বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন।)

মেম্বরদের প্রতি

১। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিজে আসিয়া কিংবা লোক পাঠাইয়া এসোসিয়েসনের হেড অফিসে কিংবা আপনি যেখানে কাজ করেন তাহার নিকটে যে ব্রাঞ্চ আফিস আছে সেখানে যাইয়া চাঁদা দিতে অবহেলা করিবেন না।

২। কারখানায় কাজ করিবার সময় মালিকদের সহিত যদি আইন ঘটিত কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে আপনার ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন ন্যায়তঃ আপনাকে সকল প্রকার সাহায্য করিতে বাধ্য। জানিয়া রাখিবেন যে আপনার ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন তখন আপনার নিকট হইতে কোন কারণেই আর অধিক অর্থ লইতে পারেন না।

৩। পূর্ব্বে ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশনের পরিচালকদের না জানাইয়া সহসা ধর্ম্মঘটে যোগ দিবেন না।

৪। যত অধিক সংখ্যক লোক ইউনিয়নের মেম্বর হইবে ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে ইহা বুঝিয়া আপনি আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। মনে রাখিবেন যে ইউনিয়নের একশত জন মেম্বর যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রত্যেকেই মাসে অন্ততঃ একজন করিয়াও নূতন মেম্বর করিতে পারেন এবং তাহা হইলেই প্রতিমাসে ১০০ শত জন করিয়া মেম্বর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

৫। আপনাদেরই সুখ সুবিধা বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য মিটিং করা আবশ্যক হয়। এইজন্য আপনার ইউনিয়ন হইতে যখন কোন মিটিং করা হয় তখন আপনার উচিত নিজে মিটিংএ যাবার সময় সহকর্ম্মী আরও সকলকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া। কারণ মিটিংএ যত অধিক লোক জমা হয় ততই ভাল। উহাতে এক সময়ে অনেকের সহিত দেখা শুনা ও অনেক বিষয়ের পরামর্শ করার সুবিধা হয়। অন্য দিকে—মিটিংএ অধিক লোক একমত হইয়া কোনও বিষয় যদি কারখানার মালিককে বা গভর্ণমেণ্টকে জানান হয় তাহা হইলে মালিক বা গভর্ণমেণ্ট ঐ

বিষয়ে বিশেষ ভাবিয়া কাজ করিতে বাধ্য হন। নচেৎ দুই পাচ জনের কথা কেহই গ্রহ্য করে না।

৬ দেশের কিংবা বিদেশের সকল কর্ম্মচারীকে বিশেষতঃ ইউনিয়নের সকল মেম্বরকে নিজের সহকর্ম্মী বন্ধু বলিয়া ভাবিতে শেখা ও তাঁহাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে চেষ্টা করা উচিত।

অ-মেম্বরদের প্রতি

১। একতা ভিন্ন শক্তি বা শক্তি ভিন্ন মুক্তি লাভ করা যায় না। একতার বলে সকলের শক্তি বৃদ্ধি করা যায় বলিয়াই ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন গড়া আবশ্যক। আপনি কি ইহা ভাল বলেন না?

২। ইউনিয়নের মেম্বর হইলে উহার শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, না হইলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। —কোনটী আপনার অভিপ্রেত?

৩। মেম্বর হইলে সকল বিপদাপদেই ইউনিয়নের সাহায্য পাওয়া যায়; না হইলে কোনও দাবী দাওয়া থাকে না। কোনটীতে আপনার সুবিধা?

৪। মালিকদের শোষণ এবং উৎপীড়নের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে দল বাঁধিয়া প্রতিবাদ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন সেই দল। ঐ দলে যোগ দেওয়া কি আপনার উচিত নয়?

৫। শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিলে বে-আইনী করার জন্য গভর্ণমেণ্ট বা পুলিশের ভয় নাই। অথচ সকলের সাহায্য পাইয়া যদি ইউনিয়ন প্রবল হইয়া উঠে তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিক ইউনিয়নের ন্যায় আপনার ইউনিয়নও—আপনার অসময়ে চাকুরী জোগাড় করিয়া দিতে, উচিত মত ছুটি দেওয়াইতে, বেতন বৃদ্ধি করিতে, "পেন্সন" লাভের উপায় করিতে, আপনার ছেলে মেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে, রোগ ভোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে, বেতন অনাদায়ে বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া দিতে এবং আবশ্যকমত আরও অনেক উপকার করিতে পারে। দেশের বা বিদেশের শক্তিশালী ইউনিয়ন গুলির সংবাদ লইয়া জানুন যে ইহা কোন গল্প বা গুজব কথা নহে, প্রকৃত সত্য। এই ইউনিয়নের মেম্বর হওয়া কি আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য নহে?

৬। যতক্ষণ আপনার ক্ষমতা ততক্ষণই আপনি মনিবের ও মনিব আপনার। যে মুহূর্ত্তে আপনার ক্ষমতা হ্রাস পাইবে সেই মুহূর্ত্তেই মনিব আর আপনার কেহ নয়! মনিব দেবতা হইলেও ব্যবসায়ী। লাভ ব্যতীত সে আপনার সহিত কথাটী পর্য্যন্ত কহিবে না। স্মরণ রাখিবেন সেই অবস্থায় কারখানার বাহিরে আপনার একমাত্র বন্ধু ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন। সময় থাকিতে ইহার আশ্রয় লওয়াই কি আপনার উচিত নহে?

———

সওয়াল-জওয়াব

—*—

প্রশ্ন—আজকাল এমন অনেক সভা সমিতি গঠিত হয়েছে যে সবের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের বিশেষ ক'রে কৃষক ও মজুরগণের ভালো করা। এ সকল সভা সমিতিগুলির মধ্যে কোনটি জনসাধারণের সব চেয়ে বেশী ভালো করতে চায়?

উত্তর—বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল। ইংরেজীতে এই দলের নাম "ওয়ার্কর্স এণ্ড পিজান্টস্ পার্টি অফ বেঙ্গল"।

প্রশ্ন—"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর উদ্দেশ্য কি?

উত্তর—এই দলের উদ্দেশ্য খুব ব্যাপক। মোটামুটি এই দল কৃষক, মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের দল। যারা মাথা ও শরীর খাটিয়ে সব কিছু উৎপন্ন ক'রে থাকে, অথচ উৎপাদনের ফল হ'তে বঞ্চিত হয় তাদিগকে এক ক'রে তাদেরই হাতে সব অধিকার আনয়ন করাই "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর বিশেষ উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন—তাদের হাতে সব অধিকার আনয়ন করার মানে কি?

উত্তর—তার মানে এই হচ্ছে যে দেশের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে দেশের জনসাধারণের হাতে অর্থাৎ মজুর, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের হাতে আসবে। উৎপাদনের যত প্রকার উপায় আছে—যেমন কলকারখানা ও ফসল পয়দা করার ভূমি, এ সবেরই ওপরে তাদের ষোল আনা অধিকার জন্মাবে।

প্রশ্ন—কি প্রকারে এ অধিকার আসবে?

উত্তর—জনসাধারণ নিজেদের শক্তির বলে সকল অধিকার হাত ক'রে নেবে। তার জন্যে এক জোট বেঁধে তাদিগকে কাজ করতে হবে। জায়গায় জায়গায় দল বা ইউনিয়ন সমূহ গঠন ক'রে সমবেত শক্তির দ্বারা তাদিগকে আপন আপন ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্যে লড়তে হবে।

প্রশ্ন—নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোক কাহারা?

উত্তর—আমাদের দেশের গরীব ভদ্রলোকগণ।

প্রশ্ন—গরীব ভদ্রলোকগণ কি কৃষক ও মজুরগণের সহিত এক হয়ে কাজ করতে পারবে? তারা ত মজুর আর কৃষকদিগকে 'ছোটলোক' ব'লে ঘৃণা ক'রে থাকে।

উত্তর—দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে হলে গরীব ভদ্রলোকদিগকে মজুর আর কৃষকদিগের সহিত এক হয়ে কাজ করতেই হবে। মজুর ও কৃষকগণ যেমন বিদেশী ও স্বদেশী শোষকগণের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে ঠিক তেমনি এই গরীব ভদ্রলোকেরাও শোষিত হয়ে থাকে। এই শোষণই তাদিগকে মজুর আর কৃষকের সহিত এক ক'রে দেবে।

প্রশ্ন—আমাদের দেশ ত বিদেশী শাসকদেরই শাসনাধীন রয়েছে—জনসাধারণের হাতে শাসন ক্ষমতা আনতে হলে ত প্রথমেই দেশকে বিদেশী শাসকদের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করতে হবে। আপনি কি তাই মনে করেন?

উত্তর—নিশ্চয়। বিদেশী শাসকদের হাত হ'তে দেশকে স্বাধীন না করতে পারলে জনসাধারণের হাতে শাসন ক্ষমতা আসবে কি প্রকারে?

প্রশ্ন—মজুর, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কি দেশের কার্য্যের পরিচালনা করতে পারবে? এরূপ কি সম্ভবপর?

উত্তর—রাশিয়ায় এখন মজুর আর কৃষকগণের শাসন স্থাপিত হয়েছে। চীনের কয়েকটি প্রদেশেও মজুর ও কৃষকগণই শাসন কার্য্য চালাচ্ছে। কাজেই, রাশিয়া আর চীনের মজুর যা করতে পেরেছে হিন্দুস্থানের মজুর ও কৃষক তা পারবে না কেন?

প্রশ্ন—উপস্থিত কাজ আমাদিগকে কি ভাবে আরম্ভ করতে হবে?

উত্তর—"ভালো" খাব, ভালো পরব এবং ভালো ঘরে বাস করব" এই আকাঙ্ক্ষাটা প্রত্যেক মজুর, কৃষক ও গরীব ভদ্রলোক নর-নারীর মনে খুব বেশী ভাবে জাগিয়ে দিতে হবে। মানুষ যখন অভাব অনুভব করে তখন সেই অভাব পূরণের চেষ্টাও সে করতে থাকে। ভালো খাওয়া, পরা ও থাকার দাবী সামনে রেখেই উপস্থিত আমাদিগকে মজুর ও কৃষকগণের ইউনিয়ন সমূহ গঠন করতে হবে। ইউনিয়ন গঠন করার মানেই হচ্ছে অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করা।

প্রশ্ন—"বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল" এই সকল ইউনিয়ন গুলিকে কি ভাবে সাহায্য করবে?

উত্তর—"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এই সকল ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে মজুর আর কৃষকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা লড়াই করার ভাবটা জাগিয়ে রাখবে। তা ছাড়া তাদিগকে সকল ব্যাপার খুব ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিতে থাকবে এবং তাদিগকে সামনের দিকে চালিয়ে নেবে। এক কথায় আমাদের দেশের জন-সাধারণের মুক্তি সংগ্রামের মাথা হবে এই "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল।"

প্রশ্ন—"কৃষক ও শ্রমিক দল" কি শুধু বাংলা দেশেই আছে?

উত্তর—"কৃষক ও শ্রমিক দল" বোম্বে আর পাঞ্জাবেও গঠিত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে এই দল সমগ্র ভারতীয় দলরূপে পরিগণিত হবে।

প্রশ্ন—যে কোনো মজুর, কৃষক ও গরীব ভদ্রলোক কি এই দলের মেম্বর হতে পারে?

উত্তর—হাঁ, পারে?

প্রশ্ন—চাঁদা কিছু কি দিতে হয়?

উত্তর—মজুর আর কৃষক মেম্বরকে বছরে মাত্র চার আনা পয়সা চাঁদা দিতে হয়

প্রশ্ন—আপন আপন ইউনিয়নের মেম্বর থেকেও কি "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সভ্য হতে পারা যায়?

উত্তর—ঠিক সেরূপই ত করতে হয়।

প্রশ্ন—"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর আফিস কোথায়?

উত্তর—এ দলের হেড আফিস কলিকাতা ২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে রয়েছে।

প্রশ্ন—হিন্দী ও উর্দ্দু 'বোল্‌নেওয়ালা' মজুরেরা এই দলকে কি নামে ডাকবে?

উত্তর—"মজদুর ও কিসান্ পার্টি, বেঙ্গল" নামে তারা এই দলকে ডাকতে পারে।

--*--

ঘুষখোরদের কাণ্ড

—*—

গৌরীপুরে

শেখ জয়নদ্দীন নামে একজন শ্রমিক গৌরীপুর জুট মিলের জমাদার ব্রহ্মসিং ও সর্দ্দার দলীপ সিং এবং আরও তিন জনের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরের ফৌজদারী আদালতে এই ব'লে নালিশ ক'রেছে যে ওরা সকলে ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁত ঘরে লাইন সর্দ্দারের কাজ দেওয়ার নাম ক'রে তার কাছ থেকে নগদ ৫০৲ টাকা নেয়। তারপর দু'তিন মাস ঘুরিয়ে এবং হয়রাণ ক'রে শেষে জমাদার একদিন তাকে বল্লে যে "সাহেব তোমাকে কাজ দিচ্ছে না, আমি কি ক'রব।" উত্তরে জয়নদ্দীন টাকা ফেরত চাইলে, জমাদার তাকে সন্ধ্যার সময় তার বাসায় যেতে বলে। জয়নদ্দীন যথা সময়ে জমাদারের বাসায় হাজির হ'লে, জমাদার তাকে বেশ খাতির ক'রে বসিয়ে বলে যে "টাকা দিচ্ছি রসিদ সহি ক'রে দাও।" জয়নদ্দীন রসিদ সহি ক'রে দিলে জমাদার সেখানা ঘরে রেখে এসে তাকে বল্লে যে "আজ সব টাকা হবে না. কাল সন্ধ্যার সময় এসে নিয়ে যেও।" জয়নদ্দীন তার পরদিন সন্ধ্যার সময় গেলে জমাদার তাকে সটান হাঁকিয়ে দেয়। তারপর নালিশ হ'য়েছে—ব্যারাকপুরে মোকদ্দমা চল্‌ছে। কলের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য সাহেবরা জমাদারকে খুব সাহায্য ক'রছে। সাহেব মহাশয়রা বোধ হয় মনে করেন যে তাঁদের কলের জমাদারের গুণের কথা বাহিরে কোথাও প্রকাশ পায় না। "গণবাণী" যে এদিকে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গছে সে খোঁজ কর্ত্তাদের নেই!

বজবজে

শশী সর্দ্দার কেলিডোনিয়ান্ জুট মিলের তাঁত ঘরে বড় সর্দ্দারী ক'রত। কা'কেও একখানি তাঁত দিতে হ'লে সর্দ্দার মশাই বিশ পঁচিশের কম আর কথা কইতেন না। গরীব তাঁতিদের উপর এই জুলুম অনেক দিন থেকেই চ'লে আসছিল। ভয়ে লোক কথা বলত না। তারপর এল ইউনিয়ন। বাঙলা দেশের পাটকলের শ্রমিক সমিতির একটি ব্রাঞ্চ অফিস বজবজে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দার মশাইকে ঘরে যেতে হল। ইউনিয়নের একজন সাহসী ও জোয়ান মেম্বর একদিন সর্দ্দার মশায়ের হাত ধরে কল থেকে সটান বের ক'রে দিলে। সাহেব ও বাবুরা হাঁ ক'রে রইল। লোকজন সব তাজ্জব মানলে। বুড়ো শ্রমিকদের মুখে কথা বেরুল না। পরদিন সাহেবের সঙ্গে ইউনিয়নের এই মেম্বরটির সঙ্গে নরম গরম বেশ একটু হ'য়ে গেল। সাহেব চেষ্টা করলে তাকে জবাব দেওয়ার জন্য; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধাক্কা সামলান যাবে না বুঝে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। শশী সর্দ্দার গেল—শত শত লোকের হাজার হাজার টাকা রক্ষা পেলে। আমরা আশা করি শশী সর্দ্দারের সঙ্গে কেলিডোনিয়ান্ জুট মিলের তাঁত ঘরে "ঘুষ"ও চিরদিনের জন্য বিদায় হ'ল শশী আবার কোন্ গগনে উদয় হবে কে জানে!

জগদ্দলে

ক্রেগ্ জুট মিলের সেলাই ঘরের বড় সর্দ্দার কেরামৎ খুব জবরদস্ত লোক। রঘুনন্দন নামে একজন ছোক্‌রা তার বিরুদ্ধে বারাসত দেওয়ানী আদালতে এই ব'লে নালিশ ক'রেছে যে গত পৌষ মাসে তাকে কাজ দেওয়ার জন্য সর্দ্দার মশায় তার কাছ থেকে নগদ ২০৲ টাকা আদায় করেন। টাকা লওয়ার পর সর্দ্দার মশায় তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী যান। তারপর বাড়ী থেকে এসেই আবার তাগাদা। বল্লেন আরও ৫৲ টাকা দিতে হবে। গরীব রঘুনন্দন কিন্তু আর দিতে পারলে না। তা বল্লে কি হয়! তুমি খাও আর না খাও, তোমার ছেলে পুলে উপোস ক'রে মরুক—সর্দ্দারের তাতে কি? রঘুনন্দন টাকা দিলে না ব'লে দু একদিনের মধ্যেই তার কাজকর্ম্ম ভয়ানক খারাব হ'তে লাগলো। শুধু তাই নয় সাধু সাহেব বাবাজীও দেখলেন যে রঘুনন্দন বেজায় রকমের কুড়ে হ'য়ে পড়েছে, কাজকর্ম্ম ভাল ক'রতে পারছে না। তা ছাড়া সে সর্দ্দারের কথা শোনে না, লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া করে, এই

রকম কত কি। এমন লোককে কি কাজে রাখা যায়! কাজেই তার জবাব হ'ল। সেও আদালতে নালিশ করলে। মোকদ্দমা চল্‌ছে। দেখা যাক্ কি হয়।

হালি সহরে

হুকুম চাঁদ জুট মিলের তাঁতের সুপার মজুরদের বুদ্ধি দেবার 'ফাং' হন! "ঘুষ" নেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বারাকপুর কোর্টে মোকদ্দমা চলছে। তাঁহারা বাড়াবাড়িকে এখন যে রকম করে ফিরেছে তাতে খাজা সাহেবের নাম!

নৈহাটীতে

নদীর জুট মিলের সেলাই ঘরের "ঠোকাদার" অনেক কাটি ছাঁকার ক'রে তবে বাবু, মজুরদের 'ঘুষ', 'প্রণামী' বন্ধ করেছে। এই ঘুষ বন্ধ করার জন্য যারা একটু সাহস ক'রে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ডিপার্টমেন্টের সাহেব তাদের অনেককেই জবাব দিয়েছে। সাহেব বলে ঠোকদাররা সবাই বড় পাজী। ঠোকদাররা বলে ঘুষ বন্ধ হওয়াতে সাহেব মহাশয়েরও বেজায় অসুবিধা হয়েছে। শনিবার হলেই 'টেইলর' টাকাটা প্রভৃতির পকেট থেকে নগদ বের কর্‌তে হচ্ছে। তাই এত গোসা! যাই হোক—ঘুষ কিম্বা জলপানি কেউ আর কিছু দিতে চাইছে না। যাদের জবাব হ'য়ে গেছে ইউনিয়ন থেকে অন্য জায়গায় তাদের চারজনের কাজ যোগাড় ক'রে দেওয়া হয়েছে। দু পাঁচ জন দেশে চলে গেছে। বাকী লোককে ইউনিয়ন থেকে "খোরাকী" দেওয়া হচ্ছে। তাদের কাজও শীঘ্রই হবার আশা করা যায়।

হুগলীতে

ভদ্রেশ্বরে অ্যাঙ্গাস জুট মিলের মাদ্রাজী শ্রমিকদের কাছ থেকে মিলের কোন বাবু অত্যন্ত বেশী রকম ঘুষ আদায় করছে ব'লে, শ্রমিকরা গোলযোগ ক'রছে। এই দুষ্টামির জন্য ঐ বাবু নাকি আগে ধর্ম্মঘটের সময় শ্রমিকদের কাছে একবার বেদম্ প্রহার খেয়েছিল। ইউনিয়ন থেকে অনুসন্ধান চলেছে।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

দেশ বিদেশ

—:*:—

ভারতীয় ফেরিওয়ালা

লণ্ডনের ২০শে জুলাই তারিখের খবরে প্রকাশ যে 'বুদু ফৈয়জবাজ' নামক একজন নাবিক পি, ও, কোম্পানীর জাহাজ হতে পলায়ন করার অভিযোগে 'ইষ্টহ্যামে' অভিযুক্ত হয়েছিল। প্রকাশ যে 'বুদু' ইংল্যাণ্ডে পঁহুছিয়ে জাল নামে একটি ফেরিওয়ালার লাইসেন্স সংগ্রহ করে। সে ফেরি ক'রে ১৫৫ পাউণ্ড ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিল। এই ব্যাপারটির উপর কোম্পানীর খুব কড়া নজর পড়ে ছিল। তারা রাগান্বিত হয়েছিল এই জন্যে যে যদি এই সমস্ত মোকদ্দমার কঠোর ভাবেই সাজা দেওয়া না হয় তাহা হলে ভারতীয় ফেরিওয়ালেতে এ দেশ ছেয়ে যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেট বুকে সেই দিনই একটা পি, ও, জাহাজে চলে আসতে আদেশ দেন ও তার ৫ গিনি জরিমানা করেন।

চাঁদপুর ও মুজফ্‌ফরপুরে বন্যা

চাঁদপুরের [illegible]

[illegible] হয় নি।

মজঃফরপুরে [illegible]

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিলের খসড়া

বাংলা গবর্ণমেণ্ট আগামী [illegible] আগষ্ট তারিখে [illegible] কাউন্সিলের অধিবেশনে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিলের সংশোধক প্রস্তাব পাস করবে ঠিক করেছেন। একটা প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে গত মার্চ্চের অধিবেশনে বিল পাস করতে বিলম্ব করার জন্যে অনেকে অসহিষ্ণুতার ভাব দেখিয়েছিলেন, সেই জন্য স্থিরীকৃত হয়েছে যে এবার কাউন্সিল বসার সঙ্গে সঙ্গেই বিলটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। বঙ্গীয় কাউন্সিলের ৬০ (১) ধারা অনুযায়ী ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্ডার অনুযায়ী ২৮শে জুলাই সংশোধক প্রস্তাব আনার দিন ধার্য্য হয়েছে। কিন্তু নির্দ্দেশ করা হয়েছে যে এত অল্প সময়ের ভিতর এত বড় একটা দরকারী ও বিরাট জটিল বিলের সংশোধক প্রস্তাব প্রস্তুত করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য সময় ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেবার জন্যে খুব আবেদন পত্র আসছে। কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট বিলের ক্লজ মত ৩১শে জুলাই বেলা ৩টা পর্য্যন্ত সংশোধক প্রস্তাব গ্রহণ করবেন স্থির করেছেন। আর বেশী সময় মঞ্জুর করা সম্ভবপর নয়। কেননা, কাউন্সিলের আলোচনা হবার পূর্ব্বে সংশোধন প্রস্তাব ছাপতে ও পরীক্ষা করতে সময়ের আবশ্যক হবে।

পর্ত্তুগালে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা

লিসবন ২১শে জুলাই। গত কল্য সন্ধ্যার সময় বিদ্রোহী দল গোলযোগ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেছিল। গবর্ণমেণ্ট তাহা সম্পূর্ণ রূপে দমন করতে সমর্থ হয়েছেন। এক্ষণে পুলিশ ও সাধারণ-তন্ত্রী রক্ষীদল শান্তিরক্ষা করছে। শহরের সব নীরব।

দেশলাইএর কলে ধর্ম্মঘট

বোম্বাই ২২শে জুলাই। পশ্চিম ভারতে দেশলাই প্রস্তুতের কারখানার শ্রমিকেরা শনিবার হতে ধর্ম্মঘট করেছে। গত মাসের ধর্ম্মঘটে যারা নেতৃত্ব করেছিল, কর্ত্তৃপক্ষ তাদের শাস্তি দিয়েছিল বলেই তাহারা কাজ বন্ধ করেছে।

Reg. No. C. 1440.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the

WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL

2-1, European Asylum Lane, Calcutta.

২য় খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২রা আগষ্ট ১৯২৮, ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৫	৮ম সংখ্যা

সাহায্য প্রার্থনা

"কৃষক ও শ্রমিক দল"এর (Workers' and Peasants' Partyর) মত ও প্রচার কার্য্যের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি ও বিশ্বাস আছে তাঁদেরি অর্থ সাহায্যে "গণবাণী" বরাবর প্রকাশিত হয়েছে। এবারেও তাঁদেরি সাহায্যের আশাতেই আমরা কাগজের পুনঃ প্রচারে ব্রতী হয়েছি। এই শ্রেণীর কাগজের প্রচারের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোনো আশাত করাই যেতে পারেনা, পক্ষান্তরে কোনো প্রকারে খরচ পুষিয়ে নেওয়াটাও অধিকাংশ স্থলেই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। কাজে কাজেই লোকসান দিয়েই কাগজ চালাত হয়। তা সত্ত্বেও কাগজ খানাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তেই হবে। জনসাধারণের জন্যে আমরাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক, বিপ্লবাত্মক ও কার্য্যকরী কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছি। "গণবাণী" এই কাজের তালিকা সকলের চোখের সামনে ধ'রে দিচ্ছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে, কেমন ক'রে আমরা সফলতা লাভ করতে পারব। এ অবস্থায় "গণবাণীর"র বেঁচে থাকার ওপরে আমাদের দেশের গণ-আন্দোলনের অনেকখানি নির্ভর করছে। কেবল মাত্র গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারাই যে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারব, এ কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন আজ আমরা তাঁদেরি নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছি। দেশের প্রত্যেক শ্রমিক, কৃষক ও যুবসঙ্ঘের সাহায্যও আমরা একান্তই চাই। সকলে তিন প্রকারে সাহায্য করতে পারেনঃ—

(১) অর্থ দ্বারা (২) গ্রাহক সংগ্রহ ও নগদ বিক্রী ক'রে দিয়ে এবং (৩) বিজ্ঞাপণ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে।

যে ভাবে যাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় সে ভাবেই তাঁরা আমাদের সাহায্য করুন।

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি,
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

সম্পাদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

A CALL TO ACTION

Being the Resolutions and Theses passed at the Third Annual Conference of the WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL.

After years of agitation and organisation, India is still a slave nation, is farther from freedom than ever. Why is this?

Why is the once mighty National Congress a laughing stock before the world?

Why do our leaders invariably say one thing and do another?

For a clear, consistent Marxist analysis and explanation of these disturbing phenomena,

For a clear practical lead as to what to do to remedy this state of things,

See, "A CALL TO ACTION." Price As. 8/- only.

To be had of

1, THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2/1, European Asylum Lane, Calcutta.

2. THE BOOK COMPANY LTD.
4/4A., College Square, Calcutta.

HELL FOUND

Or

A COMMUNIST'S THREE YEARS IN AN INDIAN PRISON.

By

S.A.DANGE

You will see here how helpless human beings are laid prostrate and beaten with shoes and sticks till they bleed, how patients in high fever are put in irons, how in the height of a Himalayan winter men are left to freeze and die.

Full of sensations and revealations.

Price Re. 1/- only.

To be had of

THE VANGUARD LITERATURE Co.
2/1 European Asylum Lane, Calcutta.

Or

THE BOOK COMPANY Ltd.
4/4A College Square, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেণ্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেণ্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেণ্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেণ্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২রা আগষ্ট, ১৯২৮, ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৫ | ৮ম সংখ্যা

আবির্ভাব

—:*:—

— আবদুল কাদের —

—:*:—

ধরণীর অঙ্কে বসি যে উলঙ্গ পশুত্বের কলঙ্কাভিনয়
তোমরা করিছ নিত্য, কুজ্ঝটীর ধূম্র সম ছেয়ে' নভঃ দূর দিগ্বলয়
মর্ত্তের অন্তর ভেদি' শান্তিহারা যে-ক্রন্দন ওঠে অন্তহীন,
পুঞ্জে পুঞ্জে যেই ব্যথা-বিষ-কালি মানবের শুভ্র মন করিছে মলিন,
সৃষ্টির প্রভাত হ'তে গণ-দেবতার হৃদে ঘনায় যে তীব্র অভিমান,
প্রবলের পদ-পিষ্ট দুর্ব্বলেরা লভে যে দুর্ব্বহ অপমান,
যে-বন্ধন রুদ্ধ করি' রাখিয়াছে নিখিলের মানুষের অনন্ত প্রকাশ,
শাসনের শোষণের যে-নিগ্রহ নিরন্নে দিল না অবকাশ,
একের লাগিয়া অন্যে যে-জ্বালায় খুলিয়াছে আত্মঘাতী হীন ব্যবসায়,
অদৃষ্টে ধিক্কার দিয়া বুভুক্ষার যেই দাহে সর্ব্বহারা কাঁদে অসহায়—
সেই জ্বালা বজ্র-বিষ, সে-বঞ্চনা, বুভুক্ষিত হৃদয়ের সেই অভিমান
পীড়নের অন্ত লাগি' মুক্তি মাগি' বিশ্ব জুড়ি' ঘোষে অভিযান।
নিশ্চয় হইবে শেষ বৈষম্যের ইতিহাস,—ঘুমন্ত সত্যের হ'বে নব জন্মলাভ;
ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পশ্চাতে আসিবে নব মানবের অনিন্দ্য-সুন্দর আবির্ভাব॥

পরিপূর্ণ স্বাধীনতা

—•—

"কৃষক ও শ্রমিক দলের (Workers' and Peasants' Party)" উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা। কিন্তু কেন? এটা বোঝান আবশ্যক যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ন্যায় কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতারই খাতিরে "কৃষক ও শ্রমিক দল" এ উদ্দেশ্য গ্রহণ করেনি। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারা কি বোঝায় তা উপলব্ধি না করেই কংগ্রেস নিতান্ত তুচ্ছতার সহিতই সে সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পাস করেছে।* যুক্তি-তর্কের দিক থেকে এই প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের (creedএর) পরিবর্ত্তন হওয়া এবং যারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে কাজ করতে চায় না তাদের কংগ্রেস থেকে বাদ দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু, তা করা হয়নি। পক্ষান্তরে "কৃষক ও শ্রমিক দল" যখন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে কাজ করার কথা ব'লে থাকে তখন এ দল সত্যিকার ভাবে ঠিক তা ই করতে চায়। এই নীতির কোথায় কি মারপ্যাঁচ আছে সবই এই দল পুরোপুরি উপলব্ধি করতে চায়। কংগ্রেসের পথ এই দলের পথ নয়।

অনেকে, বিশেষ ক'রে কংগ্রেসের এই প্রস্তাব পাস করার পর থেকে, যুক্তি প্রদর্শন ক'রেছেন যে, লিবারেল পার্টি, স্বরাজ-পার্টি ও অপর আরো অনেক দলের দিব্য করা লক্ষ্য "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" এর ভিতরে অন্যান্য অনেক জিনিসের ন্যায় পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিকারও যখন রয়েছে তখন তা পরিপূর্ণ স্বাধীনতারই মত উত্তম বস্তু। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ভিতরে পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিকার আছে কি নেই তা খুবই সন্দেহ জনক—'ষ্টেটস্‌ম্যান' তা অস্বীকার করছে। কিন্তু, যে কোনো প্রকারে এটা তেমন কিছু উল্লেখ যোগ্য ব্যাপার নয়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই হচ্ছে যে যাঁরা এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তাঁদের বুদ্ধি হয়তো গুলিয়ে গেছে, কিংবা তাঁরা জেনে-শুনে ও ইচ্ছে করেই প্রতারণা করেছেন। "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" ও "স্বরাজ" প্রভৃতিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার খুব নিকটবর্ত্তী ব'লে তাঁরা মনে ক'রে থাকেন। "অমৃত বাজার পত্রিকা" অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রভৃতির মধ্যে বড় বেশী পার্থক্য নেই। কাজেই, যাঁরা এ সবে বিশ্বাস করেন তাঁরা অনায়াসে একত্র হয়ে কাজ করতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সত্যের অপলাপ এর চেয়ে বেশী কিছু হতেই পারেনা। "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" হচ্ছে সেই এক মাত্র লক্ষ্য যাতে গমনের পথে ও নিরুপদ্রব ভাবে পৌছানো যেতে পারে। এমন কি স্বরাজীরা পর্য্যন্ত "গোল টেবিলের বৈঠক"এর অর্থাৎ ইম্পিরিয়লিজম বা শোষণবাদের সহিত চুক্তিপত্র করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে এই পথেই "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" প্রতিষ্ঠিত হবে। (অবশ্য এর সঙ্গে যোগ করতে হবে জনগণের তরফ থেকে খানিকটা চাপ যা আবার খুব বিপজ্জনক যেন-না হয়। (দৃষ্টান্ত স্থলে বারদৌলির ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে।) এখন আমাদিগকে সরকারী ভাবে এটাই কি মনে করে নিতে হবে যে বৃটিশ শোষণবাদ ইচ্ছা করেই ভারতবর্ষকে এমন একটা স্থিতি মঞ্জুর করবে যা স্বাধীনতার "সমান" কিংবা স্বাধীনতা থেকে মাত্র "এক ধাপ কম"? যদি তা করা হয় তা হলেই সেই বাকী "ধাপ"টার কি ভারতবর্ষকে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে? (মিসরের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখা যেতে পারে।) এই যে অবস্থাটা, তা কত বড় মিথ্যা সেটা মাত্র এই একটা প্রশ্ন থেকেই যে কেউ ভালো করে বুঝে নিতে পারবেন।

"ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" তা হলে কি? কথাটা আজ কাল সকলেরই মুখে শোনা যাচ্ছে। লিবারেল, স্বরাজী, হোমরুলবাদী ও পারস্পরিক সহযোগবাদী সকলেই এই "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" চান। এমন কি অনেক ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞও এর সমর্থন করেছেন। বৃটিশ লেবর পার্টি (শ্রমিক দল) ত অনেকটা প্রাতজ্ঞতার সঙ্গেই এটাকে গ্রহণ করেছে। কাজেই, বিলম্বে হোক কিংবা অবিলম্বে হোক ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করবার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হবে এবং আমাদের মতে তার কোন প্রয়োজন নেই। ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ রাজনীতিকগণের ও সংবাদপত্রসমূহের কথা খুবই পরিষ্কার। যদিও তাঁদের সকলে "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" কথাটা ব্যবহার করেন নি তথাপি বৃটিশ ধনিকগণের যে শাখাটার হাতে শাসনভার রয়েছে তাঁদের সকলেই এ প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রায় একমত। বৃটিশ শ্রমিক নেতৃগণেরও সরকারীভাবে এতে কোনো মতভেদ নেই। তাঁদের সকলেই এ সম্বন্ধে একমত যে ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকতেই হবে। এটা হচ্ছে একটা খুব বড় প্রশ্ন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকার মানেই হচ্ছে ভারতবর্ষকে বৃটিশ ধনিকগণের শোষণাধীন রাখা। অপরাপর ব্যাপারগুলো এর তুলনায় তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। বর্ত্তমানের সামান্য আরম্ভ থেকে অনেকে "ক্রমশঃ দায়িত্বপূর্ণ শাসন" লাভ করার কথা ব'লে থাকেন। কেউ কেউ ব'লে থাকেন "গণতন্ত্রের ক্রম প্রসার" এর কথা। এমন আরো কত কি বলা হয়। এমন কি যাঁরা "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন" লাভের কথা বলেন তাঁরাও তা এখন দিতে চান না। এটা তাঁদের মতে চরম লক্ষ্য, ক্রমান্বয়ে সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে। বৃটিশ রাজনীতিক ও শ্রমিক নেতৃগণের সহিত স্বরাজ পার্টি ও অন্যান্য ভারতীয় দলগুলির ঝগড়ার এটাই হচ্ছে মূল কারণ। বৃটিশ নেতৃগণ "ক্রমশঃ"র ওপরে এত জোরই বা দেন কেন? তাঁদের মতে ভারতবাসী "রাষ্ট্রনীতিক হিসাবে এখনো অপরিণত", "পার্লামেন্টের ধারা"য় তাদের এখনো শিক্ষা পাওয়ার প্রয়োজন আছে এবং অতি অবশ্য তাদের "দায়িত্বজ্ঞান" অর্জ্জন করতে হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আপাত দৃষ্টিতে এটা একটা রাষ্ট্রনীতিক দমবাজী ব'লে মনে হলেও খুব সহজেই এর বাস্তব অর্থ বোঝা যেতে পারে। এসব কথা বলার মানে এই হচ্ছে যে ভারতীয় ধনিকগণ যতই বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থ-সংরক্ষণ করতে থাকবেন ততই তাঁদের

---

* সম্ভবতঃ তুচ্ছতার সহিত নাও হতে পারে। "ফরওয়ার্ড" পত্রিকার লণ্ডন-লেখক গত ১লা জুলাই তারিখে লিখেছেন :— "এমন কি যাঁরা ভেবে থাকেন যে ভারতের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন তাঁদেরও পক্ষে এটা ধরে নেওয়া মোটেই কষ্টকর হবেনা যে, যদি ভারতবর্ষ আপনার চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করতে চায় তাহলে বৃটেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে।"

ওপরে শাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকতর ভার দেওয়া হবে। এইরূপ কায়দায় ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার উন্নত স্তরই হচ্ছে "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন"। এই অবস্থায় সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্যদলের রক্ষণাধীনে থেকে বৃটিশ ধনিকগণের লাভের জন্যে ভারতবর্ষ (বেশীর ভাগই) ভারতবাসীর দ্বারা শাসিত হবে।

যুদ্ধের সময় থেকে এটাই যে বৃটিশ শোষণবাদের নীতি হয়েছে তা বোঝাবার জন্যে এখানে আলোচনা করার তেমন কোনো আবশ্যক নেই। খুব দ্রুতবেগে কল-কারখানা এ দেশে স্থাপিত হয়েছে, বৃটিশ মূলধন খুব বেশী রূপে ঢালা হয়েছে এবং ভারতীয় ধনিকগণকে সর্ব্ব প্রথমে "ছোট অংশীদার" রূপে "মেনে নেওয়া"ও হয়েছে। বৃটিশ ও ভারতীয় স্বার্থ ইতোমধ্যেই অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতের প্রধান কারবার টাটার কারখানার নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বৃটিশ ও ভারতীয় উভয় মূলধনই খাটছে এবং গবর্ণমেণ্টের সহিতও এ কারখানার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। এর সাথে বন্দোবস্ত আছে যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহ করার। ভারতীয় ধনিকগণ ও তাঁদের অনুচরগণ বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে খুব দ্রুত শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে।

এখনি কিছু ভারতীয় ধনিকগণকে "ঔপনিবেশিক" স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে না। এটা এখনো একটা টোপ গেলানো ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এটা ফেলা হয়েছে তাঁদিগকে গঠন-মূলক পথে টেনে নেবার জন্যে। এখানে বিশেষ ভাবে দেখ্‌বার বিষয় এই হচ্ছে যে সকলে, এমন কি স্বরাজীরা পর্য্যন্ত, ধীরে হলেও নিশ্চিত রূপে সেই পথে চালিত হচ্ছেন। ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে বৃটিশ ধনিকগণের লড়াই লড়ার সুযোগ দানের পক্ষে কতক লোক এখনো খুব "দুর্ব্বিনীত" রয়ে গেছেন। তাঁদেরই অনেকে বারদৌলি সত্যাগ্রহের * ন্যায় অগঠন মূলক কাজের সমর্থন করেছেন!

* এটা এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে স্বরাজীরা এ ব্যাপারে ভেদের পরিচয় দিয়েছেন। বারদৌলি সত্যাগ্রহ একটা গভীর ও বাস্তব গণ-আন্দোলন। নেতৃগণ এ আন্দোলনকে খুবই নির্দ্দোষ পথে চালিয়েছেন। ধনিক নেতৃগণ যে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ আন্দোলনের সুযোগ নিচ্ছেন এটা হচ্ছে তারি একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বল্লভ ভাই পাটেল ও অন্যান্য নেতৃগণ সমভাবে ও ভুল ক্রমে আন্দোলনকে যথাসম্ভব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রেখেছেন। স্বরাজীরা ও আরো অনেকে মিঃ পাটেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাপারটাকে "সমগ্র ভারতীয়" প্রশ্ন ক'রে তুলেছেন। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে এ আন্দোলনকে অপর কৃষকদের মধ্যে বিস্তৃত করার ইচ্ছা তাঁদের নেই। আন্দোলনকে যথেষ্ট অর্থের দ্বারা সাহায্য করার ইচ্ছাও তাঁদের নেই। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্যে হচ্ছে এর দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার কার্য্য। তা না হলে আটিয়ার কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁরা কোনো কিছুই করেছেন না কেন? আটিয়ার কৃষকগণ বারদৌলি থেকে সংখ্যায় বেশী, তাদের অভিযোগও খুব গুরুতর। এর কারণ এই যে আটিয়া আন্দোলন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে হলেও এ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারতীয় জমীদারগণের যোগাযোগ রয়েছে। কাজেই, স্বরাজীরা তাঁদের সুবিধার খাতিরে বাজে জাতীয়ত্বের নামে এ আন্দোলনকে ব্যবহার করতে পারছেন না।

তাঁদের আরো ভালো শিক্ষা হওয়া দরকার; তাই কথা ওঠে ক্রমশঃস্তর, তাই কথা ওঠে "ক্রমোন্নত ভাবে দায়িত্ব মূলক শাসন লাভের।"

"ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন" এর অধীনে ভারতবর্ষ কল্পনায় যতই "মুক্ত" হোক্‌না কেন; এ মুক্তি কিন্তু এমন কিছু হতে পারে না যার সহিত ভারতের জনগণের কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকতে পারে। আমরা চাই বৃটিশ ধনিকগণের শোষণ হতে মুক্তি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অন্য কোনো প্রকার শাসন আমাদিগকে তা দিতে পারবে না। এ কারণে আমরা কিছুতেই সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকতে পারি না। আমাদিগকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতেই হবে যার মানে হবে বৃটিশ ধনিকগণের শোষণ হতে আমাদের স্বাধীনতা।

এ যে নীতি—এটা হচ্ছে এখন গভীর ভাবে চিন্তা করবার বিষয়। এটা খুব সহজেই প্রতীয়মান হবে যে স্বাধীনতা শান্তির সহিত লাভ করা কিংবা বৃটিশের সহিত চুক্তির দ্বারা লাভ করার কোনো প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না। বৃটিশ ধনিকগণ কিছুতেই কোটী কোটী টাকা নির্ব্বিরোধে ছেড়ে চলে যাবে না। তাদের আরো যে কত ক্ষতি স্বীকার করতে হবে তার কথা এখানে না হয় নাই বা বল্‌লেম। এ কথা প্রত্যেক ভারতবাসীরই জানা উচিত যে বৃটিশ ধনিকগণ খুব দৃঢ়তার সহিত এবং কঠোর ভাবেই তাদের স্বার্থের জন্যে যুঝ্‌বে

কংগ্রেস "পরিপূর্ণ স্বাধীনতা"র দাবী যখন করে তখন এ সবই কি ভাবে? এ প্রশ্ন কেবল জিজ্ঞাসা করাই সার হবে; অবশ্য কংগ্রেসের ভিতরে এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা নিশ্চিন্ত ভাবে স্বাধীনতা লাভ করতে চান এবং এই চাওয়ার খাতিরে সব কিছুর সম্মুখীন হতেও তাঁরা রাজী আছেন। এই শ্রেণীর লোকেরাই বেশীর ভাগ জায়গায় কংগ্রেসের নেতৃগণকে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্যে ভোট দিতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু, এটা খুবই জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে কত কাল এ প্রতারণা, এ গোজামিল চল্‌তে থাক্‌বে। যাঁরা সত্য সত্যই স্বাধীনতা চান এবং তার জন্যে সংগ্রাম করতেও প্রস্তুত আছেন তাঁদের আর যাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে আপোষ-নিষ্পত্তি করতেই চান, অথচ গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাবার জন্যে কিংবা "ভক্তদের" অসন্তোষ এড়াবার জন্যে স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন এই দু-পক্ষের মধ্যে কোনো সম্মিলন হতে পারে কি?

এরূপ কোন সম্মিলন হতেই পারে না। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার মানেই হচ্ছে বিপ্লব, আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মানে শান্তিপূর্ণ বিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীনতার মানে বৃটিশ ধনিকগণের সহিত বিচ্ছেদ, আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মানে হচ্ছে তাদের ক্ষমতার নিকটে আত্ম সমর্পন। স্বাধীনতার মানে "শতকরা আটানব্বই জনের জন্যে স্বরাজ লাভ করা", আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মানে "শতকরা দু' জনের জন্যে স্বরাজ (?) লাভ।" এইরূপ পরস্পর বিরোধী নীতি ও স্বার্থের সহিত সম্মিলন হতে পারে না। কাজেই বর্ত্তমানের অত্যন্ত বাজে সম্মিলনের জায়গায় * অচিরেই বিচ্ছেদ ঘটিত হবে।

* এখানে প্রকৃত অবস্থার একটা প্রকৃত চিত্র দেওয়া হলো। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ তারকনাথ দাস ও "ফরওয়ার্ড"এর দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে অনেকেই জাতির এই 'বিভেদ" ও ভারতে

কংগ্রেস আধা আধি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিচ্ছে, অপর দিকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারীদের সহিত সম্বন্ধও কাটাতে পারছে না, কাজে কাজেই কেবল হাস্যাস্পদই হচ্ছে।

আসল কথাটা এখানে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার জন্যে কাজ করার নীতি গভীর ভাবে চিন্তা করার বিষয়। কেবল মাত্র বক্তৃতা বা ভয় প্রদর্শন করা স্বাধীনতার খাতিরে কাজ করা নয়। স্বাধীনতা লাভের জন্য কাজ করার মানে হচ্ছে সমগ্র দেশের জনগণের দৃঢ়, কঠোর ও নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম। যতক্ষণ না স্বাধীনতা লাভ হবে ততক্ষণ এ সংগ্রাম চালাতেই হবে। এই লাভের পথে আমাদিগকে অনেক কিছু ঝড় ঝাপ্‌টার সম্মুখীন হতে হবে—কেবল মাত্র শান্তিপূর্ণভাবে আদায় করে নেবার চেষ্টা করলে চলবে না। বিপদ-আপদের ভিতর দিয়ে হলেও আমাদিগকে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন কিংবা এরূপ কিছু একটার জন্য ধনিকগণের সহিত আপোষ নিষ্পত্তির জন্যে একটী জীবন বলিদান করাও সঙ্গত নয়। কে বলতে পারে যে, স্বাধীনতা আর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন একই জিনিস? আর কিসের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে তাতেই বা কার সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে?

—০—

বিবিধ প্রসঙ্গ

—*—

ই, আই, রেলওয়ে ও "ফরওয়ার্ড"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে একথা সকলেই জানেন। আহত যাত্রীকে মেরে ফেলা হয়েছে ব'লে একটা সংবাদ প্রকাশ করায় "ফরওয়ার্ড"এর নামে দশ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করা হয়েছে। যাঁরা চোখে দেখেছেন তাঁরাই শুধু বলতে পারেন যে প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছে। তবে এরূপ ঘটনা যে ঘ'টে থাকে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা চিলির একটা ঘটনার উল্লেখ করছি :—

"...........In order to extract the saltpetre, mines are dug and charged with tons of dynamite connected to an electric station and then blown up by a charge of electric current. It once happened that an electrician pulled the wrong switch and sent the current to the mine thinking it was an electric light. The mine blew up while 300 people were working there; there were 100 victims including children. The laws of Chile forbid the employment of children under the fourteen years, but in this mine children of ten and twelve years of age were working. In order not to be caught red-handed infringing the law, the mine owners killed off the wounded children. In reply to the indignant protests which arose throughout the whole country they said: "We killed them out of humanitarian feelings, in order to minimise their sufferings."

অর্থাৎ "সোরা বা'র করার জন্যে খনি খোদাই ক'রে তাতে বহুল পরিমাণে ডিনামাইট্ চাপান হয় এবং এর সহিত বৈদ্যুতিক শক্তির যোগ থাকে। তার পরে এর ভিতরে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ ক'রে খনি উড়িয়ে দেওয়া হয়। এক দিন এক জন ইলেক্‌ট্রিকের মিস্ত্রি আলোর সুইচ ভেবে ভুলে অন্য সুইচ টিপে দিতেই তার দ্বারা খনির ভিতরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে যায়। ফলে ভিতরে যখন ৩০০ লোক কাজ করছিল তখনি খনি উড়ে যায়। শিশু সহ ১০০ লোক আহত ও নিহত হয়। চিলির আইন অনুসারে ১৪ বছরের কম বয়সের ছেলেদের কাজে নিযুক্ত করা নিষেধ, কিন্তু, এই খনিতে ১০ ও ১২ বছরের ছেলেরা কাজ করছিল। আইন অবমাননার কাজে হাতে হাতে ধরা পড়ার ভয়ে খনির মালিকেরা আহত বালকদিগকে মেরে ফেলে দিলে। ব্যাপার জানাজানি হয়ে প্রতিবাদে সমস্ত দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে যখন উঠল তখন মালিকেরা ব'লে দিলে :

"আমরা বালকদিগকে মানবতার ভাব থেকে, তাদের যন্ত্রনার অবসান করার জন্যেই হত্যা করেছি।"

কডোবিলা (Codovilla) লিখিত Imperialist Oppression in Latin America" (ল্যাটিন আমেরিকাতে শোষণ-বাদের অত্যাচার) শীর্ষক প্রবন্ধ হতেই আমরা ওপরের বিষয়ট উদ্ধৃত করেছি। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

"কর্ম্মে আহ্বান"

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর তৃতীয় সম্মিলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সে সমুদয়কে একত্রে গ্রথিত করে "A Call to Action নাম দিয়ে ইংরেজিতে প্রকাশ করা হয়েছে। কেবল মাত্র ছাপার খরচটা তুলে নেবার জন্যেই বই খানার আট আনা দাম রাখা হয়েছে। বই খানা মুদ্রিত হয়েছে কলিকাতার বিখ্যাত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে। কাজেই, ছাপা যে খুবই সুন্দর হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে কয়েকটি মুদ্রিত প্রস্তাব কিনে আবার কে পড়তে যাবে? কিন্তু, তাঁদের জানা উচিত যে, প্রস্তাবগুলি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস কিংবা অন্য কোনো সঙ্ঘের নয়। "কৃষক ও শ্রমিক দল"এর যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, ঠিক এর প্রস্তাবেরও তেমনি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই প্রস্তাব সমূহে

শ্রেণী-সংগ্রামের "প্রবর্ত্তন" এর বিরুদ্ধাচরণ করবেন এবং বলবেন যে—"প্রথমেই আমারা স্বরাজ চাই, তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে স্থির করা যাবে কোন প্রকারের স্বরাজ সেটা হবে।" ওপরে যা বলা হয়েছে তাতেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে খাঁটি স্বরাজ নামক কোন বস্তু নেই। স্বরাজ হয়তো জনগণের দ্বারা লাভ হবে কিংবা লাভ হবে ধনিকগণের নেতৃত্বাধীনে। ধনিকগণ (bourgeisie) যে "স্বরাজ" চায় তা মোটেই স্বরাজ নয়। তারা চায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন কিংবা বৃটিশ শোষণবাদের সহিত এমনি একটা কিছু অপমান জনক আপোষ নিষ্পত্তি। একমাত্র সম্ভবপর স্বরাজ "শতকরা আটানব্বই জনের" দ্বারা ও 'শতকরা আটানব্বই জনের" জন্যই লাভ হবে।

(১) দেশের সাধারণ রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা
(২) যুব-আন্দোলন
(৩) শ্রমিক আন্দোলন
(৪) কৃষক আন্দোলন ও
(৫) সঙ্ঘ গঠন

প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতরূপে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করা হয়েছে। দেশের সম্মুখে একটা সুন্দর কর্ম্মপদ্ধতি ধরে দেওয়াই এ প্রস্তাবগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা প্রত্যেক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিকেই এ প্রস্তাবগুলি একটিবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

যুব আন্দোলন

আমাদের দেশে একটা যুব-আন্দোলনের সৃষ্টি যে হয়েছে তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু, একটা আমূল পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য নিয়ে কোনো তরুণ আন্দোলনই দেশে অদ্যাবধি সৃষ্টি হয় নি। ছাত্র, আফিসের কেরাণী, কিংবা বেকার যা-ই কিছু হোন না কেন, তরুণদেরও যে বিশেষ কিছু কাজ করবার আছে তার পরিচয় কোনো তরুণ সঙ্ঘের কর্ম্মপদ্ধতি থেকে আজো পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। সত্য কথা বল্‌তে গেলে তরুণরাও সেই গতানুগতিক পথেই চলেছেন। কোনো বিপ্লবাত্মক পন্থা তাঁরা আজো বেছে নিতে পারেন নি। সামাজিক কুসংস্কার সমূহের মূলে কুঠারাঘাত করাও তরুণদের একটা বড় কাজ। কিন্তু, কাজের বেলায় আমরা তার উল্টোই দেখতে পাচ্ছি। কুসংস্কারগুলি যাতে জীবিত থেকে যায় তারি জন্যে আমাদের তরুণগণকে শক্তির অপব্যয় করতে প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই শোচনীয় দুর্গতির হাত থেকে তরুণগণ যদি আপনাদের বাঁচাতে চান তা হলে তাঁদের উচিত অচিরেই একটা "তরুণ বন্ধুদের দল" গঠন করা। সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক আমূল পরিবর্ত্তনই হবে এই তরুণ বন্ধুর দলের বিশেষ উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশের জনগণের মঙ্গলের খাতিরে তরুণদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে আপনাদিগকে পুরাতন, ভাকেজো জাতীয়ত্বর (ন্যাশন্যালিজমের) কবল হতে মুক্ত করা। কেননা, তাঁদিগকে নূতন জনগণের জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তরুণের কাজ হচ্ছে পুরাতনকে পরিহার করে নূতনকে বরণ করা। তরুণের হাত হবে লোহার মত শক্ত। এই শক্ত-কঠোর হাত দিয়ে তরুণ সকল প্রতিবন্ধককে নির্ম্মমভাবে ভেঙে নূতনকে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

—০—

বিচারক বিচারাধীনে

গত সপ্তাহে আমরা পাটের কলের মজুরগনের ইউনিয়ন সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করেছি। আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে ছোট ছোট স্বাধীন ইউনিয়ন গঠন না ক'রে সমস্ত পাটকলের মজুরদের একটিমাত্র বড় ইউনিয়ন গঠন করা আবশ্যক। আমরা বলেছি যে সকল পাটকলের মজুরগণ এক হয়ে, এক জোট বেঁধে যখন আপনাদের দাবী-দাওয়া বুঝে নেবার জন্যে লড়াই শুরু ক'রে দেবে তখনি শুধু তারা তাদের দাবীর বস্তু লাভ করতে পারবে। চটকলগুলির মালিকগণের কারবার আলাদা আলাদা হলেও তারা সকলে জোট বেঁধে আছে। এই মালিকদের একটা সভা আছে। এই সভা থেকেই তারা স্থির ক'রে থাকে যে কি ভাবে মজুরদের বুকের রক্ত পান করতে হবে। এই অবস্থায় সবক'টি পাটকলের মজুরগণেরও একটা মাত্র সভা বা ইউনিয়ন হওয়া আবশ্যক। এই একটা মাত্র ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হবে মিলিত মালিকগণের সহিত মিলিত মজুরগণের যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে শ্রেণী-সংগ্রাম বলা হয়। অর্থাৎ যে শ্রেণী শোষণ ক'রে থাকে সেই শ্রেণীর সহিত যে শ্রেণী শোষিত হয় সেই শ্রেণীর সংগ্রাম বা লড়াই। আরো পরিষ্কার করে বল্‌তে গেলে বলতে হয় যে, যারা মজুরদের মেহনত লুটে খায় তাদের কাছ থেকে মেহতানা উসুল করে নেবার লড়াই বা সংগ্রামকেই শ্রেণী-সংগ্রাম বলা হয়। সমস্ত ভারতবর্ষের ওপরে যে মজুর সঙ্ঘ বা বড় ইউনিয়ন আছে তাকে অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস বলা হয়। এই কংগ্রেসেরও মত যে এক একটা কারবারের জন্যে এক একটা বড় ইউনিয়ন গঠন করা। শ্রীযুত কিশোরীলাল ঘোষের সহিত অল্-ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বাংলা দেশে এই কংগ্রেসের যে কমিটি আছে তিনি হচ্ছেন তারি সেক্রেটরী। আশ্চর্য্য এই যে শ্রীযুত ঘোষ নিজেই ছোট ছোট ইউনিয়ন গড়ার কাজে হাত দিয়েছেন! বাউরিয়া আর চেঙ্গাইলে আলাদা আলাদা ইউনিয়ন তাঁরি চেষ্টায় গঠিত হয়েছে। গত সপ্তাহে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করার পরে আমরা শ্রীযুত ঘোষের সহিত দেখা ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে ছোট ছোট ইউনিয়ন তিনি কেন গঠন করেছেন এবং "বঙ্গীয় পাটকল সমিতি"র সহিত এক হয়ে তিনি কাজ করছেন না কেন? উত্তরে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের হুকুম অনুসারেই তিনি এ কাজে লিপ্ত হয়েছেন। আমরা জানিনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কখন তাঁকে এরূপ কাজ করতে বলেছে! দিল্লীর কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির বৈঠকে ত অন্ততঃ এরূপ কিছু বলা হয় নি। এই সেদিন যখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের মজুরদের একটা নূতন ইউনিয়ন বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে দরখাস্ত করেছিল তখন শ্রীযুত ঘোষ বিচারকের আসনে ব'সে সে দরখাস্ত না মঞ্জুর করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর ফেডারেশনের বন্ধুগণ বলেছিলেন যে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে মজুরদের মূল ইউনিয়নকে ডিঙিয়ে আর একটা স্বাধীন ইউনিয়ন কিছুতেই গঠিত হওয়া উচিত নয়। আজ কিন্তু শ্রীযুত ঘোষ বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস্ এসোসিয়েশন (বঙ্গীয় পাটকল সমিতি) কে ডিঙিয়ে ছোট ছোট ইউনিয়ন নিজের হাতেই গড়তে যাচ্ছেন। বিচারক আজ বিচারাধীন হয়েছেন। মজুরভাইগণই বিচার ক'রে রায় শুনিয়ে দেবে।

———

শ্রেণী সংগ্রাম

ঢাকেশ্বরী কটন মিল

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকেরা এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাস করেছে।—

(১) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ ওয়ার্কস্ ইউনিয়ন এখন থেকে "বেঙ্গল টেক্স্‌টাইল ওয়ার্কস্ ইউনিয়ন—ঢাকেশ্বরী মিল শাখা" নামে অভিহিত হোক্।

(২) ইউনিয়নের সেক্রেটরীকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, যে দু'জন তাঁতির হাত কেটে গেছে তাঁদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য তিনি যেন অবিলম্বে যথাবিহীত ব্যবস্থা করেন।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকদের ওপরে নানা ভাবে জুলুম করা হয় ব'লে আমরা খবর পেয়েছি। এই মিলের মালিকেরা খুব চালাক লোক। তাঁরা শহর হ'তে বহুদূরে এক গ্রামে মিল বসিয়েছেন। ষ্টীমার কিংবা রেল সেখানে যতায়াত করে না। কাজে কাজেই মিলের মজুরগণের কোনো মা-বাপ নেই। তাদের ওপরে যদৃচ্ছা অত্যাচার করলেও সেখানে কেউ দেখবার শুনবার নেই। আমরা এর পরে ঢাকেশ্বরী মিলের মজুরদের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করব।

—০—

ঢাকার মেথর ঝাড়ুদার

"দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ বেঙ্গল" অর্থাৎ বঙ্গীয় মেথর-ঝাড়ুদার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে লাহোর হ'তে আরম্ভ করে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত মেথর-ঝাড়ুদার মহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সর্ব্বত্রই তারা নিজেদের অবস্থাকে ভালো ক'রে নিতে চাইছে। ঢাকার মেথর ঝাড়ুদারগণও উচ্চ বেতনের ও অন্যান্য আরো অনেক সুবিধার দাবী করেছে। কিন্তু, ঢাকা ম্যুনিসিপ্যালিটি আপত্তিজনকভাবে তাদের দাবী দাওয়াকে চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। প্রকাশ যে ম্যুনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ মেথর ঝাড়ুদারগণের কাছ থেকে টিপসই নিয়ে বলেছে যে তাদের দরখাস্ত ছোটলাট, বড়লাট প্রভৃতির হাত হয়ে রাজার নিকটে পাঠানো হবে এবং সেখান থেকে আবার সকলের হাত ঘুরে ঢাকায় ফিরে এলেই তারা বর্দ্ধিত হারে বেতন পাবে। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে এর চেয়ে হীন আচরণ আর কি হ'তে পারে?

খালাসীগণের অভাব অভিযোগ

—*—

সম্পাদক মহাশয়, আমরা দুনিয়ার ঘৃণিত ও গরীব খালাসী বলিয়া আমাদের নিম্নলিখিত অভাব অভিযোগগুলি আপনার কাগজে প্রকাশে ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ না করিলে বড়ই কৃতার্থ হইব ও আজীবন খোদার দরবারে আপনার মঙ্গল কামনা করিব।

কলিকাতা করপোরেশানের অধীনে থিউ, লালারোখ, চার্লস পাইন নামে কয়েকখানা ষ্টীমার ও ১নং এবং ২নং নামে দুইখানা বাষ্পে বোট আছে; এই ষ্টীমারগুলি জাহাজী কর্ম্মচারীদের পানীয় জল সরবরাহ করে। টাউন হলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অফিস, মনোমোহন মিত্র মশায় বড় বাবু।

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের বিগত আন্দোলনের ফলে আমাদের অভাব অভিযোগের যে যৎ সামান্য প্রতিকার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিতে পারিনা,—কিন্তু এখন প্রতিকারের দশগুণ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি কথায় কথায় সামান্য কারণে বা অকারণে জাহাজের সারাং ও মিস্ত্রী হইতে ক্রু পর্য্যন্ত প্রত্যেককে সমভাবে নানা রকম মন্দ ও কটু কথা শুনিতে হইতেছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রত্যেক কাজই বড বাবুর উপর ন্যস্ত করেন। বড বাবু যাহাই বলেন, তাহাই সাহেব সত্য সনাতন রূপে গ্রহণ করেন। কাজেই বড বাবুই লোকদের ভাগ্য নির্ণয়কারী। বড বাবুর কলমের উপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কলম ধরিবার কোন অধিকার নাই।

গার্ডেন রীচে দুইজনা (Extra) এক্সট্রা খালাসী কাজ করে। ষ্টীমারে যখন কোন খালাসীর কাজ খালি হয়, তখন সিনিয়রিটি ও সারাংদের সুপারিস অনুসারে গার্ডেন রীচ হইতে খালাসী লইয়া ঐ স্থান পুরণ করা হয়। অনেক দিন হইতে এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু গত কয়েক মাসের ভিতর ষ্টীমারের উপর যে কয়েকটী খালাসীর চাকরী খালি হইয়া গিয়াছে,—আমাদের প্রকৃত দাবীর সারাংদের সুপারিস সত্বেও বডবাবু মিত্র মশায় বাহিরের সম্পূর্ণ নূতন লোক কেন ভর্ত্তি করিলেন, তাহার গুপ্ত রহস্য করপোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে জানিতে দিবেন কি?

বিগত ৯ই তারিখে সৈয়দর রহমান নামে একজন খালাসী ২ মাসের ছুটী নেয়। ননা মিঞা নামে একজন পুরানা খালাসী উক্ত জায়গায় কাজ করে, অবশ্য সারাং তাহার জন্য সুপারিশও করিয়াছিলেন, কিন্তু বাবু মশায় ননা মিঞাকে একা দুইমাসের না দিয়া এক মাসের জন্য নিযুক্ত করিয়া সারাংএর অনুরোধ রক্ষা করেন এবং গার্ডেনরীচ হইতে একজন খালাসী আনিয়া আর একমাসের জন্য নিযুক্ত করেন। অতঃপর থিউ জাহাজের একজনা খালাসী ছুটীতে বাড়ী যায়। গার্ডেন রীচের একজনা খালাসী ঐ জায়গায় ভর্ত্তি হওয়ার ন্যায্য অধিকার, কিন্তু বড়বাবু মিত্র মশায়কে খুশী করিতে না পারার দরুণ—তাহাদের কাহারো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না। পুলিশ বিভাগ হইতে একজন ডিসমিস করা লোক (কনেষ্টবল) বাবু মশায়কে খুশী করেন বলিয়া বাবু মশায় তাহাকেই নিযুক্ত করে। ফলে সারাং তাহাকে "খাবড়া" ধরিতে বলিলে সে "বাদলী" নিয়া টানাটানি করে। নূতন লোক, খালাসীর কাজ কিছুই জানেনা, তাহার দোষ কি? চার্লস পাইনেও একজন খালাসী ও একজন কয়লাওলার চাকরী খালী হয়। কিন্তু বড়বাবু মিত্র মশায় গার্ডেন রীচের কোন লোককে না নিয়া খালাসীর স্থলে একজন বোটের ভাণ্ডারী এবং কয়লাওয়ালার স্থলে একজন মুটেকে নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত ব্যাপারের কারণ উদ্ঘাটিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বড়বাবু লোকদের ভাগ্য বিধান করেন এবং ঘুষ খাওয়ার ইচ্ছাও বড় বাবুর খুব প্রবল বলিয়া দুষ্ট লোকেরা রটাইয়া থাকে। এ সমস্ত কারণ যদি সত্য হয় তাহার প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আশা করি করপোরেশানের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমাদের উল্লিখিত অভাব অভিযোগের প্রতি আকর্ষিত হইবে। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

জনৈক ভুক্তভোগী

—•—

আটিয়ার পত্র

"গণবাণী" সম্পাদক সাহেব সমীপেষু—

নিবেদন এই,—আমি বিগত ২৯শে আষাঢ় আপনার নিকট যে ঘটনা কাগজে উঠাইবার জন্য পাঠাইয়াছি ঐ ঘটনার প্রকাশ্য তদন্তের জন্য স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম। সেই দরখাস্ত করার পরই বন বিভাগের বহেরাতৈল রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত ও অধীন কর্ম্মচারিগণ আমাদের প্রতি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। বিগত ৩রা শ্রাবণ আমাদের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি, কাজেম উদ্দীন বহেরাতৈল হাটে গিয়াছিল। উক্ত রেঞ্জের অধীন জনৈক গার্ড তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রেঞ্জার ইন্দুভূষণ সরকার মহাশয়ের নিকট ফরেষ্ট আফিসে উপস্থিত করিল। তাহাকে দেখিয়াই উক্ত রেঞ্জার বাবু উক্ত গার্ডকে হুকুম দিলেন "এ বেটাকে বাঁধিয়া মাইর পিট করিয়া মামলা করিবার স্বাদ মিটাইয়া দাও।" এই অবস্থায় তাহাকে প্রায় তিন ঘণ্টা বাঁধিয়া আটকাইয়া রাখিয়া নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া উক্ত রেঞ্জার বাবু সাদা কাগজে জোর করিয়া তাহার (কাজিম-উদ্দীন) টিপসহি রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট পূর্ব্ব ঘটনা ও অত্র ঘটনার প্রকাশ্য তদন্তের জন্য দরখাস্ত করিলাম।

আপনি আমাদের ঘটনাগুলি কাগজে উঠাইবেন কি না বিস্তারিত পত্রোত্তরে জানাইলে সুখী হইব।

নিবেদক
সাকেন উদ্দীন আহ্মদ
কাজিম উদ্দীন
গ্রাম কাউলজানি, থানা বাসাইল
পরগনা আটিয়া

ফোর্ট গ্লষ্টারে ধর্ম্মঘট

—*—

গতবারে আমরা বলিয়াছি যে বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লষ্টার জুট মিলের শ্রমিকদের উপর নানাভাবে যত অত্যাচার করা হয়, অন্য কোন পাটের কলে আজ পর্য্যন্ত তাহার তুলনা মিলে নাই। বর্ত্তমান ধর্ম্মঘটের হেতু কি? শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনে বাধা দেওয়াতেই এই ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি হয়। লাড্‌লো জুট মিলের ধর্ম্মঘট মিটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বজবজ, বাউড়িয়া, শ্যামগঞ্জ প্রভৃতি সকল কলের ও শ্রমিকদের মধ্যে একটা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। ইউনিয়ন গঠন করিয়া নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে ও কারখানা ওয়ালাদের অত্যাচার বন্ধ করিতে সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। ফোর্ট গ্লষ্টার জুট মিলের শ্রমিকরা এই উদ্দেশ্যে ১৫ই জুন ১৯২৮ শুক্রবার বাউড়িয়ার কারবালা ময়দানে এক সভায় যোগদান করিতে যায়। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কুমার সিংহ এবং আমিও সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বাউড়িয়ায় যাইয়া উপস্থিত হই। আমাদের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য প্রায় দশ হাজার শ্রমিক রেল ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। রেল ষ্টেশন হইতে আমরা সকলে মিলিয়া কারবালা ময়দানের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদিগকে জানান যে ষ্টেশনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একবার আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্য ডাকিয়াছেন। আমরা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের মধ্যে যাইয়া দেখি উলুবেড়িয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, একজন সত্যিকারের সাহেব, কয়েকজন পুলিশ ও খানসামা প্রভৃতি—কেহ বসিয়া এবং কেহ দাড়াইয়া আছেন। আমরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদিগকে সমঝাইয়া দিলেন যে কারবালার ময়দানে যেন আমরা মিটিং করিতে না যাই কারণ উহা ফোর্ট গ্লষ্টার কোম্পানীর জমিদারী। ঐখানে আমাদের মিটিং করার পক্ষে কোম্পানীর আপত্তি আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই ভূমিকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—কাচ সোনা সত্যকারের সাহেবটা পকেটে হাত পুরিয়া দুই খানি নোটিশ বাহির করিয়া আমাকে ও বঙ্কিমবাবুকে দিলেন। নোটিশের মর্ম্ম এই যে আমরা যদি এই নোটিশ পাইয়াও কোম্পানীর জমিতে অনধিকার প্রবেশ করি তাহা হইলে কোম্পানী আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইবে ইত্যাদি। মনিবাবুর নামটি বোধ হয় গোঁসাইরা জানিতে পান নাই। নচেৎ তাঁহাকেও যে একখানি নোটিশ দেওয়া হইত সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। আমাকে যে নোটিশখানি দেওয়া হয় সেখানির মাথায় প্রথমে অন্য একজনের নাম লেখা হয় পরে সংশোধন করিয়া আমার নাম বসান হয়। অতঃপর কারবালা ময়দানে সাধারণের সভা না হইয়া জমিদারী স্বত্ব হইল কিরূপে এই কথা লইয়া ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে কিছু বাদানুবাদ হওয়ার পর সেই দশহাজার শ্রমিকদের সঙ্গে আমরা কারবালার দিকে অগ্রসর হই। সঙ্গে পুলিশ ও কয়েকজন গুর্খা লাঠি ঘাড়ে করিয়া আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। ভয়ানক বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমরা কারবালা ময়দানের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, সদর রাস্তা হইতে ময়দানে উঠিবার পথেই ফোর্ট গ্লষ্টার কোম্পানীর নোটিশ দেওয়া রহিয়াছে। কয়েকজন গুর্খা সেখানেও উপস্থিত ছিল। আমরা দেখিলাম যে এখন যদি জোর করিয়া ময়দানে উঠা যায়, ও এই কয়েকজন গুর্খা ও পুলিশ কনেষ্টেবল আসিয়া আমাদের বাধা দেয়, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই কারবালা লালে লাল হইয়া উঠিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জমিদার সাহেবের সঙ্গে যে কয়েকজন পুলিশ কনেষ্টেবল ও গুর্খা আছে সকলেরই বিপদ ঘনাইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানের রক্তে ইউনিয়নের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিবে। অগত্যা আমরা নিরস্ত হইয়া রাস্তার উপরেই মিটিং করিলাম। কারণ, নিকটে এক মাইলের মধ্যে যত মাঠ ময়দান বা পতিত জমী আছে শুনিলাম যে সমস্তই ঐ ফোর্টগ্লষ্টার কোম্পানীর জমিদারী। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় চিরদিন ঐ কারবালা ময়দানে খেলাধূলা ও সভাসমিতি করিয়া আসিতেছে। কোন দিন কেহ আপত্তি করে নাই বা কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই। এখনও সেইরূপ হইতেছে। মধ্যে কেবল শ্রমিকদের নাম শুনিয়াই এইরূপ করার উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে কি? অতঃপর ২৬শে জুন মঙ্গলবার রথের এবং ২৯শে জুন মহরমের জন্য যে দুইদিন ছুটি দেওয়া হয়, পরবর্ত্তী দুই সপ্তাহে সেই দুইদিন অধিক চালাইবার আয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে ৭ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হয় সেই সপ্তাহে ফোর্ট গ্লষ্টার কোম্পানীর তিনটি চটের কলই পূরা পাঁচদিন করিয়া চালান হয়। পরবর্ত্তী সপ্তাহে পুরান মিলের গোলযোগ হওয়ার আশঙ্কায় উহা চারদিন এবং নর্থ মিল ও নিউ মিল পাঁচ দিনই চালান হয়। ১৬ই জুন সোমবার সকালে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শ্রমিককে জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্ত শ্রমিকরাও কাজ ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর

যে বাধা জন্মায়। হয় ও শ্রমিকদিগের প্রতি গুলি চালান হয় পূর্ব্বে "গণবাণী"তে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সকল ঘটনা একত্র করিলে এক্ষণে বোধ হয় ইহা বুঝা যাইবে যে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টাতে বাধা দেওয়ার জন্য কল-ওয়ালাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও শোচনীয় দৌর্ব্বল্য হেতু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পক্ষে তাল সামলাইয়া চলিতে না পারাই বাউরিয়া ধর্ম্মঘটের এবং তাহার পরবর্ত্তী গোলযোগের হেতু। কারখানা আইনানুসারে সাধারণতঃ কলে কাহাকেও কোন একদিনে ১১ ঘণ্টা বা এক সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার অধিক খাটান যায় না। এ দেশের চটকলের সাহেবরা অনেক সময় এই আইনকে ফাঁকি দিয়া যে কল চালায় ইহার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। আমরা কয়েকবার কয়েকজনকে ধরাইয়া দিয়া জরিমানা করাইয়া দিয়াছি। কোট ম্রটারের ব্যাপারটা কিরূপ হইয়াছে জানিবার জন্য "বাঙ্গালার পাট কলের শ্রমিক সমিতি"র হেড অফিস হইতে গত ২৯শে জুলাই মাসে ফ্যাক্টরী ইনসপেক্টরের নিকট চিঠি লেখা হইয়াছে। সংবাদ পাওয়া মাত্রই আমরা উহা "গণবাণী"তে প্রকাশ করিব। কারণ বন্দ ও মহরমের জন্য যে দুইদিন কল বন্ধ ছিল তাহা পূরণ করিয়া লইবার জন্য কোট ম্রটার কোম্পানী ইচ্ছা করিলে চারি সপ্তাহে আর রোজ করিয়া চালাইতে পারিতেন। দুই সপ্তাহে করিতে পারেন না। এ জন্য পূর্ব্বে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়াছিলেন কিনা এবং যদি না লইয়া থাকেন তবে ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর সে জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন জানিবার জন্য ভাট-পাড়ার অফিস হইতে তাঁহাকে চিঠি দেওয়া হইয়াছে। সে যাহা হউক কোট ম্রটার জুট মিলের বর্ত্তমান ধর্ম্মঘটের ফলাফল কিরূপ হইতে পারে আগামী বারে আমরা তাহার আলোচনা করিব। ইতি—

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

আমার জীবন *

[জ্যাক্ লণ্ডন]

শ্রমিক দলে আমার জন্ম হইয়াছিল। আমি শৈশবেই উৎসাহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ ধারণাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম এবং সেই গুলিকে সন্তুষ্ট করাই আমার বাল্য-জীবনের একমাত্র চিন্তা ছিল। আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment) ছিল অসভ্যতা ও অপূর্ণতার ভরা। আমার কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু ছিল শুধু উপরে উঠিবার খেয়াল। সমাজে আমার স্থান ছিল নিম্নতম স্তরে। এখানে জীবন আমার দেহ ও প্রাণ উভয়কেই নীচতা ও দুরবস্থা ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারে নাই; যেহেতু এইরূপ জীবনে দেহ ও প্রাণকে সমান ভাবেই ক্ষুধার তাড়না ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

আমার উপরে সমাজের উচ্চ প্রাসাদ দাঁড়াইয়া ছিল এবং আমার মনে মুক্তির একমাত্র পথই ছিল উপরে উঠা। শৈশবেই আমি এই উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। ঐ উপরে—পুরুষেরা ইস্ত্রিকরা শার্ট মূল্যবান পোষাক ও স্ত্রীলোকেরা অতি সুন্দর গাউন পরিধারণ করিত। আরও, সেইখানে নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ছিল ও প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাওয়া যাইত। দেহের জন্য হইল এই পর্য্যন্ত। তাহার পরে প্রাণের জন্যও ছিল অনেক কিছু। আমার উপরে, আমি জানিয়াছিলাম, ছিল নিঃস্বার্থ প্রাণ, পবিত্র ও মহৎ চিন্তা এবং উচ্চ জীবন। 'সি সাইড' লাইব্রেরীর উপন্যাস হইতেই আমি এই সমস্ত জানিয়াছিলাম—যাহাতে নষ্ট চরিত্র স্ত্রী পুরুষ ব্যতীত সকলেই উচ্চ ধারণা পোষণ করিত, মোলায়েম ভাষায় কথা বলিত এবং গৌরব জনক কার্য্য করিত। সংক্ষেপে, আমি যেমন সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়কে (সত্য বলিয়া) গ্রহণ করিয়াছিলাম—তেমনই ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম যে আমার উপরের সব কিছুই ভাল, মহৎ ও উচ্চ,—যাহা জীবনে গৌরব ও উচ্চতা আনয়ন করিয়াছে,—যাহাতে বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা আছে এবং একজন তাহার পরিশ্রম ও কষ্টের মূল্য পাইয়াছে।

কিন্তু শ্রমিক সম্প্রদায় হইতে উপরে উঠা একজনের পক্ষে সোজা ব্যাপার নয়, বিশেষতঃ সে যদি উচ্চ ধারণা এবং সন্দিগ্ধতায় জড়িত থাকে। আমি ক্যালিফোরনিয়ার (California, U. S. A.) এক কৃষি ক্ষেত্রে (Ranch) বাস করিতাম এবং উপরে উঠিবার সোপান পাইতে আমার বিশেষ কষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমি প্রথমেই লগ্নীকৃত (invested) টাকার সুদের হার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমার বাল-মস্তিষ্ককে মানুষের চমৎকার আবিষ্কার—চক্রবৃদ্ধি সুদের (Compound interest) মাহাত্ম্য ও গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলাম। আরও আমি সকল বয়সেরই মজুরদের প্রচলিত (Current) বেতনের হার এবং তাহাদের জীবন ধারণের খরচের পরিমাণ জানিয়া লইলাম। এই সব হিসাব করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে আমি যদি তৎক্ষণাৎই আরম্ভ করি এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত শ্রম করিয়া (অর্থ) সঞ্চয় করি,—তাহা হইলে তখন কার্য্য ছাড়িয়া আমি সমাজের উপরের স্তরের সুখ ভোগের কিয়ৎ পরিমাণ ভাগের অংশীদার হইতে পারিব। অবশ্য আমি বিবাহ করিব না বলিয়া স্থির করিলাম, কিন্তু হায় শ্রমিক জগতের সেই প্রকৃত রূপ অভিসম্পাত—রোগের কথা চিন্তা করিতে ভুলিয়া গেলাম।

কিন্তু জীবন আমার 'কোন রকমে বাঁচিয়া থাকার' কিছু বেশী দাবী করিল। দশ বৎসর বয়সেই আমি একটি সহরের রাস্তায় 'নিউজ পেপার বয়' হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম এবং ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে আমার 'উপরে চাওয়া' বাসনা ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। আমার সব কিছু এখনও পূর্ব্বের মতন আছে,—সেই একই নীচ ও বিড়ম্বিত অবস্থা এবং উপরে আমার সেই একই স্বর্গ অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু উপরে উঠার সিঁড়ি এইবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বারের সিঁড়ি হইতেছে ব্যবসা বা কারবার। যখন আমি পাঁচ সেণ্ট দিয়া দুইখানি খবরের কাগজ কিনিয়া আমার হাতের একটি মাত্র চালের দ্বারা দশ সেণ্ট বা আমার মূলধনকে দ্বিগুণ করিতে সক্ষম,—তখন কেন আমি (নিজের) উপার্জ্জনকে সরকারী কাগজে খাটাইতে যাইব? এবং ব্যবসার সিঁড়িই ছিল আমার প্রার্থিত জিনিস এবং আমি মাথায় টাক আর ক্রোড় টাকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

তখন হইতে আমি অন্যান্য ধনীদের দ্বারা নির্দ্দয় ভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছি। আমার বাহুবল ছিল,—এবং তাহা হইতে ধনিকরা টাকা তৈরী করিল, আমি কিন্তু সেই অভিন্ন (কোন রকমে বাঁচিয়া থাকা) জীবন বহিয়া চলিলাম। আমি মাস্তুলের

* এই প্রবন্ধটি লেখকের "What Life Means to Me." শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ—অনুবাদক।

উপরের খালাসী (১) জাহাজের মাল সরবরাহের কুলি, ও ছোট জাহাজের মজুর ছিলাম; আমি টিন কল (Canneries), কার-খানা ও বস্ত্র-ধৌতালয়ে (Laundries) মজুরি করিয়াছি। আমি লনসের (Lawns) ঘাস কর্ত্তন, কার্পেট ও জানালা পরিষ্কারকের কার্য্যও করিয়াছি। কিন্তু কোন দিনই আমি আমার মজুরির পূরা দাম পাই নাই। আমি টিন কলের মালিকের মেয়েকে গাড়ী চড়িয়া যাইতে চাহিয়া থাকিতাম এবং বুঝিতে পারিতাম যে সেই গাড়ীর রবার-যুক্ত চাকা ঘুরিতে—আমার বহু আংশিক ভাবে সাহায্য করিতেছে। আমি কারখানার মালিকের ছেলের পানে কলেজে যাইতে চাহিয়া থাকিতাম এবং জানিতাম যে আমার বাহুই আংশিক ভাবে তাহার মদ ও ভাল চলা-ফেরার খরচ যোগাইতেছে।

কিন্তু ইহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই। ইহাই যে ছিল সব কিছু সেই খেলার। তাহারা যে বলবান ছিল। বেশ, আমিও বলবান হইব। আমিও তাহাদের একজন হইব এবং অন্যান্য লোকের (শ্রমিকদের) 'রক্ত' হইতে টাকা তৈরী করিব। আমি শ্রম করিতে ভীত ছিলাম না। আমি কঠিন শ্রমকে পসন্দ করিতাম। আমি আরও কঠিন শ্রম করিব এবং পরিশেষে সমাজের একটা স্তম্ভ হইয়া উঠিব।

ঠিক সেই সময়ে ভাগ্যক্রমে আমি একজন সেই রকমের মুনিবের (employer) দেখা পাইলাম। আমি শ্রম করিতে ইচ্ছুক ছিলাম এবং মুনিবেরও ইহা ইচ্ছার বেশী ছিল যে আমি শ্রম করিব। আমি ভাবিয়াছিলাম যে আমি কারবার শিখিতেছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি দুইজন মজুরকে অপ-সারিত করিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে মুনিব আমাকে ইলেকট্রিসিয়ান (Electrician) তৈরী করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে আমা হইতে প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার তৈরী করিতে ছিল। আমি যে দুইজন মজুরকে অপসারিত করিয়াছিলাম, তাহারা প্রত্যেকে মাসিক চল্লিশ ডলার করিয়া পাইত এবং আমি উভয়ের কার্য্যই মাসিক ত্রিশ ডলার মাত্র লইয়া করিতে ছিলাম।

এই মুনিব আমাকে খাটাইয়া কবরের প্রায় কাছা কাছিই লইয়া গিয়াছিল। একজন মানুষ হয়তঃ পোলাও খাইতে ভাল বাসিবে, কিন্তু অতিরিক্ত পোলাও তাহাকে সেই খাদ্যের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিবে। আমারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। অতিরিক্ত শ্রমে আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আমি আর খাটিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। আমি কার্য্য ছাড়িয়া পলাইয়া আসিলাম। আমি পথের ভিখারী হইয়া যুক্ত রাজ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি এবং কুঁড়ে ঘর ও আশ্রমে থাকিয়া জীবনের অনেক খানি রক্ত ব্যয় করিয়াছি।

আমি মজুরকুলে জন্মিয়াছিলাম, এবং এখনও এই আঠার বৎসর বয়সেও আমি যে অবস্থা হইতে (জীবন সংগ্রাম) আরম্ভ করিয়াছিলাম—তাহার নীচেই আছি। আমি সমাজের নিম্নতম স্তরে (cellar) নিমজ্জিত ছিলাম,—দুর্দ্দশার সেই অতল গহ্বরে—যাহার বর্ণনা দেওয়া শোভনীয় বা সঙ্গত নয়। আমি সেই গহ্বরে ছিলাম,—সেই ময়লাম খাদ,—সেই কসাই খানা আমাদের সভ্যতার সেই মৃত সৎকার করিবার স্থান (charnel house)! সমাজ প্রাসাদের এই অংশটিকে সমাজ অবহেলা করিতে চায়! স্থানাভাব আমাকে এখানে আসিতে বাধ্য করিয়াছিল, এবং আমি এইটুকু মাত্র বলিব যে—এখানে যাহা আমি দেখিয়াছি—তাহা ভয়ঙ্কর ভয়োৎপাদনকারী।

তখন আমি জ্ঞান লাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, আমি কালিফোর্ণিয়ায় ফিরিয়া আসিলাম এবং পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইলাম। এই ভাবে আমাকে মস্তিষ্কের ব্যবসায়ী তৈরী করিতে করিতে আমি অবশ্যই সমাজতত্ববাদের (Sociologyর) প্রতি মনোযোগী হইয়া উঠিলাম। সেখানে আমি দেখিতে পাইলাম যে এতদিন ধরিয়া আমি যে সমস্ত সোজা সামাজিক মতবাদ (sociological concepts) গ্রহণ করিয়া আসিতেছি,—তাহাই এক শ্রেণীর পুস্তকাবলীতে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত ও বিন্যস্ত রহিয়াছে। আমি সমাজতত্ববাদ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাবিয়াছি সেই সমস্ত মহৎ লোকেরা আমার জন্মের বহু পূর্ব্বেই তার চেয়ে ঢের বেশী ভাবিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমি একজন সোশ্যালিষ্ট বা সাম্যবাদী।

সোশ্যালিষ্টরা বিপ্লবপন্থী ছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা বর্ত্তমানের সমাজকে চুরমার করিয়া তৎস্থলে ভবিষ্যতের সমাজকে গড়িয়া তুলিতে লড়াই করিতেছিলেন। আমি ত একজন সোশ্যালিষ্ট বিপ্লববাদী। আমি শ্রমজীবী শ্রেণীর চৈতন্য প্রাপ্ত বিপ্লব পন্থীদলের সংস্রবে আসিয়া জীবনে এই প্রথমবার চৈতন্য লাভ করিলাম। এইখানে আমি চমৎকার ধী-শক্তি ও সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং বলিষ্ঠ মস্তিষ্ক ও শক্ত বাহুধারী শ্রমিকদের পরিচয় পাইলাম, যাঁহারা লম্বা জামাধারী প্রচারক নয়,—কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মে যে কোন মাম্মোন উপাসক (১) ইস্রাইলের দল বা ইউনিভার্সিটির শাসকদের দাসত্ব চাকায় বাঁধা অধ্যক্ষদের অনেক উপরে; তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়া অমনি ছুটিয়া আসিয়াছে মানুষের কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিতে।

এইখানে আমি আরও দেখিতে পাইলাম—মানবতায় অগাধ বিশ্বাস, আলোকময় মতবাদ, নিস্বার্থপরতার মাধুর্য্য, ত্যাগ ও Martyrdom—যাহা কিছু সুন্দর এবং যাহা জীবনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। প্রাণ এখানে সরল, পবিত্র ও জীবন্ত। প্রাণ এখানে সুন্দর, মহিমাময় ও নিজকে ফিরিয়া পাইয়াছে এবং আমি বাঁচিয়া থাকিতে সন্তুষ্ট ছিলাম। আমি এখানে মহা হৃদয়বান লোকদের সংস্রবে ছিলাম—যাহাদের কাছে কুঁড়ে ঘরের ক্ষীণ ক্ষুধাতুর শিশুর ক্রন্দন, - জাকজমক ভরা ব্যবসার অভিযান বা দুনিয়ার রাজত্বের চেয়েও বেশী বুঝায়। আমার চারিদিকে ছিল উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্য ও চেষ্টার অনুরাগ; রাত দিনে ছিল চন্দ্রালোক ও সূর্য্যালোকে ভরা এবং আমার চোখের সামনে ছিল আগুন এবং শিশির,—চির জলন্ত, ধক্‌ধকে Holy Grail (২) খৃষ্টের নিজের Grail—সেই চির জর্জ্জরিত নিষ্পেষিত জীবন্ত মানুষ। কিন্তু, এইবার উদ্ধার হইবে, মুক্তি আসিবে।

মগজ বিক্রেতা হিসাবে আমি সফলকাম হইলাম। সমাজের প্রসস্ত দরজা এইবারে আমার জন্য উন্মুক্ত হইল। আমি সমাজের

(১) জাহাজে যে খালাসীকে (Sailor) মস্তুলের (mast) উপরে উঠিতে হয়, তাহাকে মস্তুলের উপরের খালাসী বলে।

(১) মাম্মোন (Mammon) সিরিয়াবাসীদের Money God বা অর্থেশ্বর। এই স্থলে অর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে——অনুবাদক।

(২) Holy Grail—যিশু খৃষ্টের ব্যবহৃত পেয়ালা। এস্থলে মানুষের আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—অনুবাদক

-৯২

উক্ত ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং আমার স্বপ্নঘোরও দ্রুত কাটিয়া গেল। আমি সমাজের মুনিবদের ও তাহাদের স্ত্রী ও মেয়েদের সঙ্গে পানাহারাদি ও মিলা-মিশা করিতে লাগিলাম। আমি স্বীকার করি, তাহাদের (স্ত্রীলোকদের) বেশভূষার যথেষ্ট পারিপাট্য ছিল কিন্তু আমি অতিশয় আশ্চর্য্যের সহিত আবিষ্কার করিলাম যে আমি যে সমস্ত স্ত্রীলোকদের সেই গহ্বরে (cellar) দেখিয়াছি ইহারাও তাহাদেরই মত—এক ছাঁচে গঠিত। "The colonel's lady and Judy O'Grady were sisters under their skins and gowns." (গাউন ও "চামড়ার ভিতরে কর্ণেলের লেডী এবং জুডি-ও-গ্রেডি দুজনই বোন বোন।")

কিন্তু ইহা ব্যতীত তাহাদের জড়-বাদিতাও আমাকে কম আঘাত করিল না। সত্য বটে, এই সুন্দর গাউনওয়ালী সুন্দরীরা অলস-ঘোরে মিঠা মিঠা ও ছোট খাট আদর্শ ও সাধুতার কথা আওড়াইতেন. কিন্তু ইহা সত্বেও তাহাদের প্রধান জীবনসত্ত্ব জড় ও প্রাণহীন ছিল। তাহারা ভাবের দিক দিয়ে কত স্বার্থপর। তাহারা ছোট খাট সব রকমেই দানকার্য্যে সহায়তা করিতেন এবং এই সত্যটীও অবগত ছিলেন যে তাঁহাদের সুন্দর পোষাক লুন্ঠিত শ্রম এবং শিশু শ্রমের রক্ষিত লভ্যাংশেই ক্রীত হইত—যাহা বেশ্যাবৃত্তি হইতে অভিন্ন নয়। তাই আমি এই সমস্ত সত্যের উল্লেখ করিয়া ব্যগ্র আশা করিলাম যে জুডি-ও-গ্রেডির বোনেরাও তৎক্ষণাৎ বাড়া সিল্ক ও মণিমালা পরিত্যাগ করিবেন. কিন্তু তাঁহারা উঠিলেন তেলে বেগুনে জ্বলিয়া। আমাকে প্রচার বাক্য শুনাইয়া দিলেন যে বুদ্ধি ও চেষ্টার অভাব, মদ ও জন্মগত অসাধুতাই সমাজের নিম্নস্তরের এই সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশার হেতু। কি করিয়া যে বুদ্ধি ও চেষ্টার আগে, মদাভ্যাস ও জন্মগত অসাধুতা ছয় বৎসরের শিশুকে দক্ষিণের (১) সূতার কলে প্রত্যেক রাত্রে ১২ ঘণ্টা করিয়া কাজ করাইতে পারে, তাহা বুঝিতে আমার অক্ষমতা জানাইলে জুডি-ও-গ্রেডির এই সব বোনেরা আমার ব্যক্তিত্বকে আক্রমণ করিলেন—আমাকে „এজিটেটর" (আন্দোলনকারী) বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং তাহাতেই তর্কের অবসান হইল।

মুনিবদের সাথেও আমার ইহার চেয়ে ভাল মাখামাখি হইল না। আমি আশা করিয়াছিলাম যে তাহাদের মধ্যে সরল, মহৎ ও জীবন্ত মানুষের পরিচয় পাইব, - যাহাদের আদর্শও হইবে জীবন্ত, নির্মূত এবং উচ্চ। আমি (সমাজে) উচ্চাসীন ধর্ম্মপ্রচারক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, প্রফেসর ও সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। তাহাদের সঙ্গে মাংসাহার, মদ্যপান ইত্যাদি মিলা-মিশা করিলাম এবং তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ (Study) করিলাম। সত্য বটে অনেকের দেখা পাইয়াছি যাঁহারা মহৎ ও সবল, কিন্তু খুব কম সংখ্যক ব্যতীত সকলেই প্রাণহীন বা মৃত, এবং আমার জোর বিশ্বাস যে, আমি জীবন্তদের আমার দুই হাতের আঙ্গুলেই গুণিতে পারিতাম।

সেখানে তাঁহাদের জীবন পচা বা অপরিচ্ছন্ন ছিল না, সেখানেও তাহারা শুধু অ-কবরস্থ মৃত বা উত্তমরূপে রক্ষিত মৃত শরীরের মতই আছেন। এই সংস্রবে,—আমি যে সমস্ত প্রফেসরদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম তাঁহাদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহারা ইউনিভার্সিটির সেই অধঃপতিত আদর্শ "passionless persuit of passionless intelligence" লইয়াই বাঁচিয়া আসিতেছেন।

আমি এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় অভিযান করিয়া মহাশান্তির নামে দোহাই দেন,—তাঁহারাই আবার কল কারখানায় ধর্ম্মঘটী মজুরদিগকে গুলি করিয়া মারিতে (Pinkertonsদের) (১) হাতে বন্দুক তুলিয়া দেন। এবং এমনও লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা পুরস্কার যুদ্ধ (Prize fighting) এর পশুত্বকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন। কিন্তু সেই তাঁহারাই আবার খাদ্যদ্রব্যে বাস্তে মাল মিশ্রণকারীদের দলভুক্ত—যদ্দ্বারা প্রতি বৎসর রক্তপিপাসু হিরোডের (Herod) দ্বারা নিহতদের চেয়ে ঢের বেশী সংখ্যক ছেলেমেয়ের হত্যা সাধিত হইতেছে।

আমি বুঝিতে পারিলাম যে সমাজের উচ্চস্তরে থাকা আমার বাঞ্ছিত নয়। আমার প্রাণ ক্লান্ত হইয়া উঠিল। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া আমি নিজেকে অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। আবার আমার সেই পবিত্রমনা, সত্য উপাসক, বস্ত্রহীন প্রচারক, অশিক্ষিত অধ্যাপক ও শ্রেণী-চৈতন্য প্রাপ্ত শ্রমিকদিগকে মনে পড়িল। আমার চোখের সামনে সেই নিঃস্বার্থপরতার ছবি,—সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাব রচিত স্বর্গ - সেই সূর্য্যদীপ্ত দিন, চন্দ্রদীপ্ত রাত্রি—সেই অনন্ত প্রজ্বালিত ধক্‌ধকে Holy Gail (হোলি গ্রেল্) আবার ভাসিয়া উঠিল।

সেই জন্যই আমি আবার যেখানে আমার জন্ম ও স্থান—সেই শ্রমিকদলে ফিরিয়া আসিয়াছি। উপরে উঠিবার সখ আমার আর নাই। আমার মাথার উপরে,—সমাজের সেই ছল-প্রাসাদের সৌন্দর্য্যেও আর আমার কোন লোভ নাই। এখন আমি সেই প্রাসাদের গাঠনিক কার্য্যেই অনুরক্ত। এখন আমি আনন্দের সহিত লৌহ মুদ্গর লইয়া শ্রেণী-চৈতন্য প্রাপ্ত, বুদ্ধিমান ও সত্য উপাসক শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াইব এবং (আমরা) সমাজের এই সমগ্র প্রাসাদটাকে আঘাত করিব। সময় সময় (লৌহ মুদ্গরকে) পরীক্ষা করিয়া দেখিব (যাহাতে আমাদের ভুল না হয়)। এবং একদিন—যেদিন আরও কর্ম্মী ও লৌহ মুদ্গর আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, - সেইদিন সমাজ তার এই পচা জীবন, ভীষণ স্বার্থপরতা ও অসাড়-প্রাণহীনতা ইত্যাদি সব কিছু সহই ধূলিসাৎ হইবে। তখন সমাজ-প্রাসাদের গহ্বর বা নিম্নতম স্তরকে (Cellar) পরিষ্কার করিব এবং মানুষ জাতির জন্য একটি নূতন উপযুক্ত বাসস্থান তৈরী করিব,—যাহাতে উপরের স্তর থাকিবে না,—যেখানে সব কামরাগুলিই সুন্দর এবং সব গুলিই বাতাসময় হইবে—এবং সেই বাতাস হইবে—নির্ম্মল, জীবন্ত ও মুক্ত।

অনুবাদক—আফ্‌তাব আলী

(১) আমেরিকার যুক্ত রাজ্যগুলি সাধারণতঃ উত্তর এবং দক্ষিণ এই দুই অংশে বিভক্ত। এই স্থলে আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের States গুলিকে বুঝাইতেছে…অনুবাদক।

(১) Prinkerton—Allan Pinkerton (1819-1884) বিখ্যাত মার্কিন ডিটেকটিভ, ধর্ম্মঘটী মজুরদের অত্যাচার ও হত্যার জন্য খ্যাত।—অনুবাদক।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

GANAVANI

Official Organ of the

WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL

2-1, European Asylum Lane, Calcutta.

২য় খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৯ই আগষ্ট ১৯২৮, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩৫	৯ম সংখ্যা

সাহায্য প্রার্থনা·

"কৃষক ও শ্রমিক দল"এর (Workers' and Peasants' Partyর) মত ও প্রচার কার্য্যের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি ও বিশ্বাস আছে তাঁদেরি অর্থ সাহায্যে "গণবাণী" বরাবর প্রকাশিত হয়েছে। এবারেও তাঁদেরি সাহায্যের আশাতেই আমরা কাগজের পুনঃ প্রচারে ব্রতী হয়েছি। এই শ্রেণীর কাগজের প্রচারের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোনো আশাত করাই যেতে পারেনা, পক্ষান্তরে কোনো প্রকারে খরচ পুষিয়ে নেওয়াটাও অধিকাংশ স্থলেই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। কাজে কাজেই লোকসান দিয়েই কাগজ চালাতে হয়। তা সত্ত্বেও কাগজ খানাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তেই হবে। জনসাধারণের জন্যে আমরাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক, বিপ্লবাত্মক ও কার্য্যকরী কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছি। "গণবাণী" এই কাজের তালিকা সকলের চোখের সামনে ধ'রে দিচ্ছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে, কেমন ক'রে আমরা সফলতা লাভ করতে পারব। এ অবস্থায় "গণবাণীর"র বেঁচে থাকার ওপরে আমাদের দেশের গণ-আন্দোলনের অনেকখানি নির্ভর করছে। কেবল মাত্র গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারাই যে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারব, এ কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন আজ আমরা তাঁদেরি নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছি। দেশের প্রত্যেক শ্রমিক, কৃষক ও যুবসঙ্ঘের সাহায্যও আমরা একান্তই চাই। সকলে তিন প্রকারে সাহায্য করতে পারেনঃ—

(১) অর্থ দ্বারা (২) গ্রাহক সংগ্রহ ও নগদ বিক্রী ক'রে দিয়ে এবং (৩) বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ক'রে দিয়ে।

যে ভাবে যাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় সে ভাবেই তাঁরা আমাদের সাহায্য করুন।

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি,
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

সম্পাদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা ।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেন্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেন্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেন্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেন্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২/১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৯ই আগষ্ট, ১৯২৮, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৫ | ৯ম সংখ্যা

বৃটিশ লেবর পার্টির অধঃপতন

বৃটিশ লেবর পার্টি বা শ্রমিক দল ক্রমশঃই চরম অধঃপতনের পথে চলেছে। শ্রমিক দলের সভ্যগণ আজকাল শ্রমিকগণের স্বার্থের প্রতি ততটা লক্ষ্য আর রাখছেন না, ধনিকগণের স্বার্থ সম্বন্ধেই তাঁরা এখন বেশী মাত্রায় সচেতন হয়ে পড়েছেন। পার্লামেণ্টে শ্রমিক সদস্যগণ যে ধনিকদলের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে থাকেন তার উদ্দেশ্য সরল বিশ্বাসী শ্রমিকগণের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মিঃ এ, এ, পার্সেল বৃটিশ শ্রমিকদলের একজন নাম করা সদস্য। গত বছর তিনি বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর ভারত আগমনের একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে সেকণ্ড ইণ্টার ন্যাশন্যালের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া। সম্প্রতি তিনি পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন তা থেকে তাঁর, শুধু তাঁর কেন, সমগ্র বৃটিশ লেবর পার্টির প্রচ্ছন্ন মনোভাব ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। মিঃ পার্সেল বলেছেন, ভারতের গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের সমগ্র শ্রমিক-শ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজে উৎসাহ প্রদান করেন তা হলে সেটা খুব ভালো কাজ হবে। তিনি আরো বলেছেন যে ভারতবর্ষ শোষণবাদ থেকে ততটা কষ্ট পাচ্ছে না যতটা দুঃখ ভারতকে পোয়াতে হচ্ছে খাদ্যের অভাবে। শ্রমিকদিগের সংগঠিত হওয়ার কাজে গবর্ণমেণ্ট কি ক'রে উৎসাহ প্রদান করতে পারে সেটাই আমাদের এখন বিচার ক'রে দেখ্‌তে হবে। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের জনসাধারণের মতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বৃটিশ জন সাধারণের মতের দ্বারাও ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় না। বৃটিশ ধনিক সম্প্রদায়ই ভারতবর্ষের ...ণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাদেরি স্বার্থের ও শোষণের খাতিরেই ভারতবর্ষ শাসিত হয়ে থাকে। অবশ্য এ শোষণের ব্যাপারে ভারতীয় ধনিকগণের স্বার্থও ক্রমশঃ বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থের সহিত বিজড়িত হয়ে পড়ছে। ধনিক-শাসনের অর্থই হচ্ছে শ্রমিকদিগকে শোষণ করা। কাজে কাজেই ধনিক আর শ্রমিকের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। এ অবস্থায় কোন ধনিক চালিত গবর্ণমেণ্টই শ্রমিকদিগকে সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারে না। যখনি কোনো শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট তা করবে তখনি বুঝতে হবে যে মতলব ভালো নয়। ধনিক-শাসিত গবর্ণমেণ্ট যদি শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্যে উৎসাহিত করে তা হলে তার উদ্দেশ্য শ্রমিকদিগের উত্থানকে প্রতিহত করা ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। অথচ বৃটিশ শ্রমিক-দলের নেতা সমস্ত জেনে-শুনেও গবর্ণমেণ্টকে উৎসাহ (?) প্রদান করার জন্যে অনুরোধ করছেন!

আর্থিক নিষ্পেষণে ভারতের জনসাধারণ আজ জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছে। আজ খাদ্যাভাবে যে ভারতে হাহাকার পড়ে গেছে তার একমাত্র কারণই হচ্ছে দেশীয় ও বিদেশীয় (ইম্পিরিয়েলিষ্ট) শোষণ। ভারতে সবই জন্মায়, অথচ ভারতের কৃষক ও শ্রমিকের ঘরে খাদ্যাভাব লেগেই থাকে! অতি মাত্রায় শোষণ আজ ভারতের কৃষক ও শ্রমিককে দুর্দ্দশার চরম সীমায় নিয়ে এসেছে। বৃটিশ শ্রমিক নেতা মিঃ পার্সেল তবুও বলছেন কিনা যে ভারত ইম্পিরিয়েলিজম (বিদেশীয় শোষণ-মূলক গবর্ণমেণ্ট) থেকে তত বেশী যন্ত্রণা পাচ্ছে না যত পাচ্ছে খাদ্যাভাব থেকে। এর চেয়ে হাস্যাস্পদ যুক্তি বোধ হয় আর কিছুই হতে পারে না। প্রহার যন্ত্রণার কারণ প্রহার-কারী না হয়ে কেবল মাত্র 'প্রহার'ই হতে পারে কিনা সে বিচার পাঠকগণই করুন। খাদ্যাভাব যন্ত্রণার কারণ, অথচ যারা খাদ্যাভাব ঘটালো তারা কারণ নয়,—এ যুক্তি ধনিক স্বার্থান্বেষী তথাকথিত বৃটিশ লেবর পার্টির সদস্য ছাড়া আর কেউ প্রদর্শন করতে পারে না। ভারতের সকল দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণই হচ্ছে বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্ বা শোষণবাদ। এই শোষণ-বাদের হাত থেকে ভারতের জনগণ ভারতবর্ষকে মুক্ত করবে এবং আপনাদের শক্তি বলেই

করবে। মিঃ পার্সেল জেনে রাখুন, এ জন্যে ভারতের জনগণ মিঃ পার্সেলের ধনিক পার্লামেন্টের মুখা-পেক্ষী হতে যাবে না।

ভারতের কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে মিঃ পার্সেল বলেছেন—"I do not doubt that they are good Communists and good students but from the workers' point of view they are incapable of organising." অর্থাৎ "তাঁরা যে ভালো কম্যুনিষ্ট ও ভালো ছাত্র সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্রমিকদিগের দিক্ থেকে বলতে গেলে বলতে হয় যে তাঁরা সংগঠন করতে অপারগ।" এই "অপারগ" হওয়ার মূলে একটা রহস্য লুক্কায়িত আছে। আমরা ওপরে বলেছি মিঃ পার্সেলের ভারত ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসকে সেকেণ্ড ইণ্টার ন্যাশন্যালের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া। এই কাজে মিঃ এন. এম. জোশী ও তাঁর দলের লোকেরা মিঃ পার্সেলের সহায়ক ছিলেন কিন্তু তবুও ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে তিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করতে সাহস পান নি, কেননা, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীর দল সংখ্যায় বেশী না হলেও শক্তিশালী ছিল। কাজেই, এরপরে দিল্লীতে যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভা হয় তখন সুযোগ বুঝে মিঃ পার্সেল এই "অন্তর্ভুক্ত" করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধি এস. এ. ডাঙ্গে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র কঠোর প্রতিবাদ করেন। তিনি দলীল প্রমাণের দ্বারা, বিশেষ করে স্বয়ং মিঃ পার্সেলের উক্তির দ্বারা দেখিয়ে দেন যে সেকেণ্ড ইণ্টার ন্যাশন্যাল বা দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক সংহতি শ্রমিকদিগের সহিত প্রতারণা করেছে। এখানে এ কথাটা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে মিঃ পার্সেল এক সময়ে খুব চরমপন্থী ছিলেন। গ্রেটবৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যও তিনি হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ব্যাপক ধর্ম্মঘটের সময় থেকেই মিঃ পার্সেলের পতন আরম্ভ হয়েছে। যখন তিনি চরমপন্থী ছিলেন তখন সেকেণ্ড ইণ্টার ন্যাশন্যালের বিরুদ্ধে তিনি অনেক কিছু বলেছেন ও লিখেছেন। তাঁর এ সকল উক্তিও তাঁর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ উপস্থাপিত করা হয়েছিল। ফলে, সেকেণ্ড ইণ্টার ন্যাশন্যালের সহিত ভারতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংযোগ সাধনের প্রস্তাব দিল্লীতেও কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধির তীব্র প্রতিবাদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়। মিঃ পার্সেলের মতে কম্যুনিষ্টরা যে শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে সমর্থ নয় এ ব্যাপারই হচ্ছে তার মূল কারণ।

মিঃ পার্সেলের মত লোকেরা ভারতে এসে ও ভারত সম্বন্ধে না তা ব'লে বৃটিশ ও ভারতীয় শ্রমিকদিগের সম্মিলনের পথে বাধার সৃষ্টি করছেন। বৃটিশ শ্রমিকদের নামে এই যে শোষণ-কারীর দলের সৃষ্টি হয়েছে এই দলের কার্য্য-কলাপের দ্বারা ভারতের শ্রমিকগণ ক্রমশঃই সন্দিহান হয়ে পড়বে এবং এর পরে হয়তো তারা সত্যিকারের বৃটিশ শ্রমিক প্রতিনিধিদেরও প্রতি আর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না। বৃটিশ "কম্যুনিষ্ট পার্টি" ও "ন্যাশ্ন্যাল মাইনরিটি মুভ্মেণ্ট" প্রভৃতি দল যে প্রকৃতই ভারতের মঙ্গল ও মুক্তি কামনা করে, এ কথাই বিশ্বাস করতে হয়তো ভারতের জনগণ দ্বিধা বোধ করবে। কাজেই, আমাদের দেশের জনগণকে বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থা বোঝান একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

তরুণ-আন্দোলন

গত সপ্তাহের "গণবাণী"তে আমরা তরুণ-আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করেছি। আমরা ব'লেছি একটা **"তরুণ বন্ধু-দল"** গঠন করা খুবই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কেন আবশ্যক হয়েছে সে কথাটাই আরো পরিষ্কার করে বোঝানো দরকার। দেশে একটা তরুণ আন্দোলন যে সৃষ্টি হয় নি তা নয়, কিন্তু, তার ভিতরে তারুণ্যের লক্ষণ একেবারে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। কংগ্রেস প্রভৃতি আন্দোলনে যেমন অ-তরুণরা কর্তৃত্ব ক'রে থাকেন আমাদের দেশের বর্তমান তরুণ-সঙ্ঘ বা সমিতি গুলিতেও তেমনি অ-তরুণদেরই কর্তৃত্ব বেশী। কাজেই প্রকৃত তরুণ-আন্দোলনের পথের দিশা আমাদের তরুণ সঙ্ঘ বা সমিতি গুলি একেবারেই পায় নি। আর বৃদ্ধদের আওতায় থেকে কখনো যে পাবে সে আশাও বড় একটা নেই। এ জন্যেই আমরা চাই যে দেশে একটা "তরুণ বন্ধু-দল" গঠিত হোক্। এ দলে ঢোকার জন্যে প্রথমেই দরকার হবে, বয়সের একটা সীমা রেখা নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া, তা না হ'লে বৃদ্ধদের উৎপাতে দলের বৈশিষ্ট্য একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান তরুণ-সঙ্ঘগুলি দেশের জনগণের সহিত কোনো সম্পর্কই স্থাপন করতে পারে নি। কেবল মাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরেই বর্ত্তমান সঙ্ঘগুলি সীমাবদ্ধ রয়েছে। প্রস্তাবিত "তরুণ বন্ধু-দল"এর আর একটা বৈশিষ্ট্য হবে দেশের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর তরুণ তরুণী দিগকেও এর সভ্য শ্রেণীভুক্ত ক'রে নেওয়া। এইরূপ নীতির দ্বারা দেশের জনগণের সহিত শিক্ষিত তরুণ-দলের অভাব-অভিযোগ ও কর্ম্মহীনতা সম্বন্ধেও "তরুণ বন্ধু-দল" বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করতে থাকবে। সর্ব্বোপরি "তরুণ বন্ধু-দল" সর্ব্বদাই নূতনকে বরণ ক'রে নেবার জন্যে সজাগ হয়ে থাকবে। বর্ত্তমান আন্দোলন এ বিষয়ে মোটেই কৃতকার্য্য হতে পারে নি। কুসংস্কার গুলিকে ভাঙার চেয়ে আমাদের দেশের তরুণ সঙ্ঘগুলি সে গুলির রক্ষার জন্যেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে। সব দিক্ থেকেই আমূল পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য নিয়েই "তরুণ বন্ধু-দল"কে কাজে অবতীর্ণ হতে হবে। এ দলের সভ্যদের কোনো প্রকার কু-সংস্কারের বালাই থাকবে না। এই তরুণের দল থেকেই ভবিষ্যতের নেতৃদল গঠিত হবে। রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক যে ভাবেরই হোক্ না কেন—**আমূল পরিবর্ত্তন**ই হবে "তরুণ বন্ধু-দল" এর যুদ্ধ ধ্বনি।

বিপ্লব সাধনের উপায়

বিপ্লবের কথা, পরিবর্ত্তনের কথা মুখে অনেকেই উচ্চারণ করে থাকেন, কিন্তু, তার জন্যে কি উপায় অবলম্বন করতে হবে সে সম্বন্ধে খুব কম লোকেই ভাবেন। একদল লোক রাষ্ট্র-নীতিকে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সম্মুখে কোনো বড় আদর্শ নেই এবং থাকার কোনো প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করেন না। যেমন অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ক'রে থাকে ঠিক্ তেমনি গোজামিল দেওয়া ও ধাপ্পা-বাজি করাই তাঁদের কাজ। রাষ্ট্রনীতিক পরিবর্ত্তনের জন্যে যে সামাজিক ও অর্থ-নীতিক পরিবর্ত্তনেরও আবশ্যক আছে এ কথাটাকে ধামা-চাপা

দেওয়াই ব্যবসায়ী রাষ্ট্রনীতিক গণের একটা বড় উদ্দেশ্য। কেননা, সামাজিক ও অর্থনীতিক বিপ্লবের দ্বারা তাঁদের নিয়োগ-কারিগণের ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই ব্যবসায়ী রাষ্ট্রনীতিকগণ একটা রাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতার পরিবর্ত্তন মাত্র চান, রাষ্ট্রনীতিক বিপ্লব কিছুতেই আনয়ন করতে চান না। শ্রেণী-সংগ্রামের গতি তাঁরা প্রতিরোধ করতে চান, কেন না, তাতে তাঁদের প্রভুদের উৎপাদনের উপায় সমূহের ওপরে যারা ক্ষমতা ছড়িয়ে রেখেছে সেই প্রভুদের ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ব্যবসায়ার রাষ্ট্রনীতিক গণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমাদের কিছুতেই চলবে না। আমাদিগকে স্থির করতে হবে কি উপায়ে আমরা সত্যকারের বিপ্লব-পথে অগ্রসর হতে পারব। প্রথমেই আমাদের শোষিত ও নির্য্যাতিত জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে যে, যে ভাবে তারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করছে সে ভাবে আর কিছুতেই দিন গুজরান করা চল্‌বে না—পরিবর্ত্তন তাদের চাই-ই চাই। কিন্তু, শুধু এটুকু করলেই চলবে না। শোষকের জীবনকেও ঠিক এরূপ ক'রে তুলতে হবে যে পুরাতন প্রথাতে জীবন ধারণ করা ও শাসন করা আর কিছুতেই চলবে না, এটা যেন সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। মোট কথা যখন সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা অনুভব করতে পারবে যে, যে ভাবে তাদের জীবন যাত্রা চলেছিল সে ভাবে কিছুতেই চালানো সম্ভব নয়, এবং উচ্চস্তরের লোকেরাও বুঝে নিতে পারবে যে পুরাতন প্রথায় শোষণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনি শুধু বিপ্লব সংগ্রামে আমারা কৃতকার্য্য হতে পারব। এ কথাটাকে আরো পরিষ্কার ক'রে বলতে পারা যায়। যে পর্য্যন্ত শোষক আর শোষিত উভয়ের জন্যে একটা জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত না হবে সে পর্য্যন্ত কিছুতেই বিপ্লব সম্ভবপর হবে না। প্রথমেই অধিকাংশ শ্রমিকের, অন্ততঃ শ্রেণী-জ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতিক প্রবণতা সম্পন্ন শ্রমিকদিগকে মনে-প্রাণে বুঝতে হবে যে বিপ্লব সংঘটন করা অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক এবং তার জন্যে সে জীবন পর্য্যন্ত বলিদান করতে প্রস্তুত আছে। শাসক-শ্রেণীরও তখন শাসন-সঙ্কট উপস্থিত হবে। তাতে রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে খুব পশ্চাদপদ লোকেরাও ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠবে। এর ফলেই শাসন ক্ষমতা দুর্ব্বল হয়ে পড়বে এবং বিপ্লবীরা তার জায়গায় উন্নত তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে।

নলকূপ বা টিউব ওয়েল

নলকূপ বা টিউব ওয়েলের সাহায্যে যে জল পাওয়া যায় তা উৎকৃষ্ট পানীয় জল ব'লে সর্ব্বত্র প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু, নল-কূপ বসানো খুব ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। কলিকাতা থেকে লোক নিয়ে গিয়ে নল-কূপ বসাতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার সঙ্গতি সাধারণ গৃহস্থ লোকের নেই। শ্রীযুত শ্রীনাথ দত্ত রায় কিন্তু, খুব কম খরচে নল-কূপ বসাবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। শুধু উদ্ভাবনও নয়, তিনি এরূপ কূপ অনেক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এর কার্য্যকারিতা দেখিয়েও দিয়েছেন। এরূপ কূপ বসাতে ৫০।৬০ টাকার বেশী খরচ পড়ে না। এই কূপ বসানোর কাজ হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে একটি স্কুল স্থাপন করাও তিনি স্থির করেছেন। তাঁর মতে মাত্র একটি মাস শিক্ষার পরে যে কেউ এ কূপ বসাতে পারবেন। এক মাসের জন্যে মাত্র দশ টাকা বেতন নেওয়া হবে। প্রস্তাবিত স্কুলের জন্যে কলিকাতা, ৮৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে আফিস খোলা হয়েছে। এক আনার ষ্টাম্প সহ এ ঠিকানায় পত্র লিখলে যে কেউ বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারবেন। স্কুলের নাম হবে "নল-কূপ শিক্ষালয়"। শ্রীযুত দত্ত রায় কলিকাতার বিখ্যাত রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত কারক "রায় ব্রাদার্স" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রদর্শিত প্রণালীর খুব ভালো রূপে পরীক্ষা হওয়া উচিত। এ প্রণালী কৃতকার্য্য হলে দেশের অনেক উপকার হবে।

বাংলার কৃষক

—:*:—

শ্রীপ্যারীমোহন দাস

—:*:—

অবস্থা ভেদে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর কৃষকই বাঙ্গালা দেশে চাষ-আবাদের কাজে নিযুক্ত আছে। যাহাদের নিজেদের খাস খামারে যথেষ্ট জায়গা জমি আছে এবং নিজেরাই তাহা চাষ আবাদ করিয়া থাকে তাহাদিগকে এ দেশের প্রথম শ্রেণীর কৃষক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষকদের নিজেদের কোন জমি নাই। তারা সাধারণতঃ অন্যের জমি ভাগে—বর্গায় চাষ আবাদ করিয়া কায়-ক্লেশে দিন গুজরান করে। আর এক শ্রেণীর কৃষক আছে যাদের জায়গা জমি থাকা ত দূরের কথা, তারা হাল গরুর অভাবে অন্যের জমি ভাগে চাষ করিতেও অসমর্থ। ইহারা সাধারণতঃ দিন-মজুর খাটিয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে। অন্যের চাষ আবাদের কাজে খাটিয়া খায় বলিয়া ইহারাও কৃষক নামেই পরিচিত হইয়া থাকে। এই প্রকারের সর্ব্বহারার দলকে তৃতীয় শ্রেণীর কৃষক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। মোটের উপর আমাদের দেশের কৃষককুল জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে অধিকাংশই নিঃস্ব। অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের অহরহঃ অত্যাচারের ফলে কৃষকদের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কট-জনক হইয়া উঠিতেছে। সকল প্রকার অত্যাচারের আশু প্রতিকার এবং চাষীদের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে না পারিলে অচির ভবিষ্যতে বঙ্গীয় কৃষক সম্প্রদায় একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক এই হতভাগ্যদের গায়ের রক্ত কি কি উপায়ে চুষিয়া খায় তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমতঃ বা প্রধানতঃ ইহারা জমীদারের অত্যাচারের বেগ সামলাইতে গিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে। জমীদারেরা সাধারণতঃ তাহাদের প্রাপ্য খাজনার বিশ গুণ ত্রিশ গুণ এবং কোন কোন অবস্থায় ইহা অপেক্ষাও বেশী খাজনা দরিদ্র কৃষকদের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জমিতে কৃষকদের কোনও অবিভক্ত স্বত্ব থাকে না। এই খাজনা ব্যতিরেকে নৃশংস জমীদার দল নিরন্ন চাষীর নিকট হইতে আরও যাহা যাহা যে ভাবে আদায় করে তার বহর দেখিলে মানুষের দেহের জমাট রক্ত স্বতঃই চঞ্চল হইয়া উঠে। "তহুরি" নামে এক প্রকার আদায় সমগ্র জমীদার শ্রেণীর এক চেটিয়া। ইহার পরিমাণ দেয় খাজানার প্রতি টাকায় ন্যূন পক্ষে এক আনা। কোন কোন তৃতীয় শ্রেণীর মালিক প্রতি টাকায় ছয় আনা পর্য্যন্তও

আদায় করিয়া থাকে। এই লুন্ঠিত অর্থ অধিকাংশ স্থলেই জমিদারের অল্প বেতন ভোগী কর্ম্মচারীদের প্রাপ্য। দুর্দ্দশা-গ্রস্ত প্রজার গায়ের রক্ত জল করা পয়সা দ্বারা জমীদারেরা যে সব কর্ম্মচারী পোষণ করে তারাই আবার জমিদারের ইঙ্গিতে হতভাগা প্রজাদের লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।

প্রজারা জমীদারকে খাজানাও দিবে এবং এই বর্দ্ধিত হারে খাজানা আদায় করিবার জন্য জমীদারের কর্ম্মচারীর বেতনও যোগাবে। ইহা অপেক্ষা রাহাজানির প্রকৃষ্ট নিদর্শন আর কোথায় আছে। আবার কোন কোন স্থানে এই "তহবিল" অর্থের কিয়দংশ জমীদারদের বিলাস ব্যসন চরিতার্থ করিবার জন্য সরকারে জমাও হইয়া থাকে।

শোষণের এই প্রশস্ত দিক্‌টা ব্যতীত ইহার যে সকল শাখা প্রশাখা আছে তাহাও নিতান্ত তুচ্ছ করিবার জিনিষ নহে। জমিদারদের মা, বাপের শ্রাদ্ধ, ছেলের বিবাহ, মেয়ের অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারে নিঃস্ব প্রজার নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় করিবার রেওয়াজ প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। প্রজারা খাজানা দিবার সময় জমীদারদের নিকট হইতে যে রসিদ পায় তার নাম দাখিলা. এই দাখিলা ছাপাইতে যে খরচ আবশ্যক হয় জমিদার মহাশয়েরা অনেক স্থলে সেই খরচটা প্রজার নিকট হইতে তাহাদের দেয় খাজানার প্রতি টাকায় স্থল বিশেষে দুই পয়সা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের ছাপা খরচের প্রায় বিশ গুণ পয়সা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় হইয়া থাকে। মালিক স্বয়ং মফঃস্বলে পদার্পণ করিলে অথবা তার কোনও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ডিহিতে গেলে তাহাদের দর্শনী ও প্যাদারা খাজানার টাকা আদায় করিতে প্রজার বাড়ীতে গেলে তার দক্ষিণা, যথা সময়ে খাজানার টাকা প্যাদার হাতে দিতে না পারিলে প্রজার কাচারীতে উপস্থিত হওয়া মাত্র নায়েব বা গোমস্তার নজর (দৃষ্টিমাত্র) ইত্যাদি বাবদ হতভাগ্য প্রজাকে অহরহ যে সব বাজে পয়সা দিতে হয় তার কোন হিসাব নিকাশ নাই। এই সব বাজে পয়সা দিতে কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অস্বীকার করিলে অচিরে তাহার ভিটা-মাটী উচ্ছন্ন যাইবে, ইহা অব-ধারিত।

তার পরে ব্যবসায়ীদের নীরব অত্যাচার কাহিনী বর্ণনার বাহিরে। তিল, লঙ্কা, ধান, পাট প্রভৃতি যে সকল উৎপন্ন শস্য কৃষকেরা বাজারে বিক্রী করিয়া থাকে তাহার ওজন এবং বাজার দরের উপরে ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীরা খানিকটা ভাগ না বসাইয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। চোখের আড়ালে ফাঁকি ত ওজনে দিবেই, তার উপরে প্রচলিত প্রথানুসারে চল্‌তা (Excess weight) কয়ালী ('weighter's remuneration) প্রভৃতি জুয়াচুরির ধরা-বাঁধা ফন্দি গুলি প্রয়োগ করিয়া মন করা স্থান কাল পাত্র বিশেষে এক সের হইতে পাঁচ সের পর্য্যন্ত আদায় করিয়া থাকে। লুণ্ঠনের এই অর্থের সম্পূর্ণ আবার দরিদ্র কয়াল বা ওজনদার প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের অল্প বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীদের বরাতে জোটে না। বেশীর ভাগই ব্যবসায়ীদের আদিম তহবিলে (original account) জমা হইয়া থাকে। জমীদারদের তহবির অনুরূপ ব্যবসায়ীদের চল্‌তা বা কয়ালী আদায় প্রথম শ্রেণীর অত্যাচারের অন্তর্গত। ইহা ব্যতীত ঈশ্বর-বৃত্তি নামে মনকরা স্থান বিশেষে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীরা বিক্রেতার নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকে। স্থানীয় বাজারে অথবা তার আশে পাশে কোনও পূজা অর্চনা মন্দির মসজিদ নির্ম্মাণ, জলাশয়াদি খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের জন্য এই ঈশ্বর-বৃত্তি আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কিয়দংশ ব্যবসায়ীদের জমার খাতায় খরচ হয় বাকী পয়সা দ্বারা ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা বাজারে সংবৎসরে দুই একবার যাত্রা থিয়েটার বাই, খেমটা ইত্যাদি আমদানী করিয়া ঈশ্বর বৃত্তির নামে জনহিতকর কার্য্যের চরম সার্থকতা দেখাইয়া থাকে। স্থানীয় স্কুল, মাদ্রাসা, হরিসভা প্রভৃতির জন্য মণকরা দুই এক পয়সা সর্ব্বত্রই বিক্রেতারা দিয়া থাকে। এই ত গেল যারা গৃহস্থ চাষী তাদের কথা। তা ছাড়া একেবারে নিঃস্ব চাষীরা বাজারে সর্ব্বদাই দুই চারি আনার কলা, মূলা, কুমড়া, ফল ইত্যাদি বিক্রী করিয়া থাকে। বাজারের মালিকরা এবং মালিকদের চতুর্গে বাজার ঝাট্‌-দেনে-ওয়ালা, বাজারের পাহারাওয়ালা, মালিকদের একাধিক প্যাদা প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহাদের স্ব স্ব আমদানী তরিতরকারী ফল মূলের কিয়দংশ নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া থাকে। ইহার নাম তোলা। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই এই জঘন্য প্রথা প্রচলিত আছে। কোনও নিঃস্ব চাষা বাজারে দুই আনার কলা আমদানী করিলে পরক্ষণে তার অর্দ্ধেক 'তোলা' হিসাবে তুলিয়া নেয়। তখন তার বাকী থাকে কি? অতএব দেখা যায় যারা যত বেশী হীনাবস্থাপন্ন তারা তত বেশী অত্যাচারিত এবং শোষিত বা লুণ্ঠিত।

উল্লিখিত দুই শ্রেণীর লোকের দোহনের পরে হতভাগা কৃষকদের যা কিছু বাকী থাকে সুদখোর মহাজন এক নিশ্বাসে তাহা সমস্ত নিঃশেষ করিয়া কৃষক কুলকে পথের ভিখারী করিয়া ছাড়িয়া দেয়। বঙ্গদেশে কর্জ্জ দেওয়ার প্রথা অসংখ্য প্রকার। তার ভিতরে দুই প্রকার প্রথাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অসময়ে একমণ ধান বা চাউল কর্জ্জ দিয়া খন্দের সময়ে চাষাদের নিকট হইতে সময়ের পার্থক্য হিসাবে ন্যূনপক্ষে দুইমণ তার সুদ আদায় করিয়া থাকে। এই প্রকার কর্জ্জ দেওয়ার হেয় প্রথা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে জায়গা জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়ার রীতি সর্ব্বত্রই প্রায় একপ্রকার। কোন প্রকার স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়ার প্রথা আজকাল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে দেনদারের সম্পত্তি পরিমাণ হিসাবে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত পাওনাদার উপভোগ করিবার সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দিয়া উক্ত ম্যাদ অন্তে জমি ছাড়িয়া দিত। উক্ত ম্যাদ মধ্যে পাওনাদারের সুদ আসল সমস্ত টাকা পরিশোধ হইয়া যাইত। এই প্রকার কর্জ্জ দেওয়ার সাধারণ নাম ক্ষয়-খালাসী প্রথা। মহাজন যখন দেখিল যে ইহাতে তাহাদের প্রদত্ত গোটা টাকাটা একেবারে তাহাদের হাতে আসিতেছে না এবং ম্যাদ অন্তে দেনাদারকে তার জমি আপনা হইতেই ছাড়িয়া দিতে হইতেছে তখন মহাজনরা আস্তে আস্তে এই ক্ষয়-খালাসী প্রথা তুলিয়া দিয়া অন্য পথা অবলম্বন করিল। দেনাদারের সম্পত্তি পরিমাণ হিসাবে মাত্র সুদের তরে পাওনাদার উপভোগ করিবার সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার রেওয়াজ আরম্ভ হইল। যতদিন না দেনাদার আসল টাকা পরিশোধ করিতে পারে ততদিন পাওনাদার তার সম্পত্তি উপভোগ করিতে থাকিবে। মাত্র সুদের তরে জমি ভোগ করিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়ার জন্য এই প্রথার নাম জায়-সুদী প্রথা। ক্ষয়-খালাসী অপেক্ষা জায়-সুদী প্রথা অত্যন্ত কঠোর।

দরিদ্র কৃষকের জমী জায়গার উপরে অর্থ পিশাচ সুদ-খোরদের লোভ দমন আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন আস্তে আস্তে জায়-সুদী

প্রথাও উঠিয়া গিয়া রেহানী প্রথার প্রবর্ত্তন হইল। পাড়াগাঁয়ের চলতি কথায় এই প্রথাকে চাষাদের মৃত্যুবান্ প্রথা বলে। এই প্রথানুসারে কৃষকের সম্পত্তি কৃষকের হাতেই থাকিবে, মহাজনকে রীতিমত বছর বছর সুদ যোগাইতে হইবে। সুদের টাকা কোনও ক্রমে বাকী পড়িলে তাহা আসলে গন্য হইয়া চক্রবৃদ্ধি হারে আবার সুদের সুদ চলিবে। মহাজন ইচ্ছা করিয়া কোনও দিন সুদ আদায় করিবার চেষ্টা করিবে না। কারণ সুদে আসলে যখন উক্ত রেহান বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যের সমান হইয়া যাইবে তখনই দেনাদার উক্ত সম্পত্তি মহাজনকে চিরতরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। আইন অনুসারে তখন মহাজনই এই সম্পত্তির মালিক হইবে। এই মৃত্যুবান্ প্রথাই বাঙ্গালার সর্ব্বত্র আজ কৃষকদের উপরে পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে।

অল্প কয়েক বৎসর যাবত মাত্র পাড়াগাঁয়ে এই প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার মধ্যেই কত কৃষককে জায়গা জমি মহাজনকে ছাড়িয়া দিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আরও কিছুকাল এই প্রথানুসারে দেনা-পাওনা চলিলে চাষাদের অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা অনুমান সাপেক্ষ। যে দেশে যন্ত্রপাতি প্রয়োগে গো-মহিষাদি উপকারী জন্তু দোহনের জন্য ফুকা বিল আইনে পরিণত হইতে পারে সেখানে বিনা যন্ত্রে মানবজাতির এই সম্প্রদায়কে একেবারে নিশ্চেষ্ট করিয়া দোহন করিবার অপরাধের কোনও আইনের খসড়া এ পর্য্যন্ত কোন সহৃদয় ব্যক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন কি? সরকার বাহাদুরের পশুক্লেশ নিবারণী সভা আছে জানি, কিন্তু মনুষ্যক্লেশ নিবারণী সভার কি কোনও আবশ্যকতা নাই?

———

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন

—০—

কল-কারখানায় কাজ করিতে যাইয়া কেহ হত বা আহত হইলেই যে তাঁহার আত্মীয়স্বজন বা তিনি নিজে ক্ষতিপূরণ পাইবেন এমন নহে। যে যে অবস্থায় উহা পাওয়া যায় এবং যে যে অবস্থায় উহা পাওয়া যায় না তাহাও প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে উদাহরণ দ্বারা আরও সহজ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

১। কোন কারখানায় "নির্দ্দিষ্ট সময়ে" ও "নির্দ্দিষ্ট" "নিজের কাজ" করিতে যাইয়া হত বা আহত হইলে ক্ষতি-পূরণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ:—শ্রীযুক্ত কালী কুমার দে "বাঙ্গলার পাটকলের শ্রমিক সমিতির" মেম্বর। তিনি পূর্ব্বে জগদ্দলের এলায়েন্স্ জুট মিলে টরন্ ম্যানের কাজ করিতেন। একদিন তিনি যখন টরন্ মেসিনে একটি লোহা কাটিতেছিলেন সেই সময় হঠাৎ তাঁহার ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলটী মেসিনে ধরিয়া যায় ও ফলে তাঁহার আঙ্গুলটী কাটিয়া জখম হয়। এখানে কালীকুমার বাবুর হাত জখম হওয়ার জন্য তাঁহার নিজের কোন দোষ ছিল না। কারণ (১) যখন তাঁহার হাতে লাগে, কলে সে সময় তাঁহাকে কাজ করিতে হইত (২) মেসিনে লোহা কাটাও তাঁহার কাজ। (৩) টরন ম্যানদের চালু মেসিনেই লোহা কাটিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে "নির্দ্দিষ্ট সময়ে", "নির্দ্দিষ্ট নিয়মে" ও "নিজের কাজ" করিতে গিয়াই তিনি আহত হইয়াছিলেন। কাজেই মিল কোম্পানী তাঁহার ক্ষতি-পূরণের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। তবে আইন মত তাঁহার যাহা পাওয়া উচিত মিল কোম্পানী তাহা অপেক্ষা অনেক কম দিতে চাহিয়াছিল। পরে এসোশিয়েসন্ হইতে তাঁহাকে পূরা টাকা আদায় করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মাধাই কেওট নামে যে যুবকটি ভাট পাড়ার "রিলায়েন্স জুট মিলে" "গোড়াকাটার" কাজ করিত—তাহার এক হাতের দুইটী আঙ্গুল কাটিয়া গেলে সে ক্ষতি-পূরণের টাকা পায় নাই। কারণ সে "হাতী কলে" তেল লইতে গেলে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া যায়। কোন কোন সময়ে লোকে চালু কলের ভিতর হইতে তেল মুছিতে গিয়া বিপদ ঘটাইয়া বসে। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। মাধাই আরও অধিক অন্যায় করিয়াছিল। কলে সে "গোড়াকাটার" কাজ করিত। "হাতী কলে" যাইয়া তেল মুছিবার কোন আবশ্যকই তাহার ছিল না। কারণ সেটা তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ নহে। কোম্পানী যে কাজ করার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করে নাই বা যে কাজের জন্য সে কোম্পানীর নিকট হইতে মাহিয়ানা পায় না, তেমন কাজের ভাল মন্দের জন্য কোম্পানীকে দায়ী করাও যাইতে পারে না। কোটী কোটী টাকার মালিকরা অবশ্য এই সব বাজে অজুহাতে গরীবদের বঞ্চিত করিতে পারে। ইহা আমরা মোটেই পসন্দ করি না। কিন্তু এখনকার আইনই যখন এই রকম তখন উহা না মানিয়াই বা উপায় কি? শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে এই আইনকে আরও উপযোগী করিয়া লওয়া যাইবে। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাই মানিতে হইবে। শ্রমিকদের উচিত ইহা বুঝিয়া বে-আইনী কোন কাজ কারখানার ভিতর না করা। তাহাতে যদি কোম্পানীর সর্ব্বনাশও হইয়া যায় তাহাতে বড় বহিয়াই গেল। ব্যস্ত হইয়া নিজের বিপদ ডাকিয়া আনা উচিত নহে। কারণ বড় লোকের ক্ষতি-পূরণ সহজেই হইতে পারে; গরীবের সে উপায় নাই। এখানে দেখা যাইতেছে যে মাধাইয়ের ক্ষতি-পূরণ না পাওয়ার কারণ তিনটী; ১ম যে কাজ করিতে যাইয়া তাহার আঙ্গুল কাটিয়া যায়, সে কাজ তাহার "নির্দ্দিষ্ট" কাজ নহে। ২য়—যে সময়ে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া যায় সে সময়ে তাহার "হাতী কলে" কোন কাজ ছিল না। ৩য়—কোন কল পরিষ্কার করার সময় একেবারে উহা বন্ধ না করিয়া উহাতে হাত দেওয়ার "নিয়ম"ও নাই। মাধাই চালু কলে তেল মুছিতে গিয়া সে "নিয়ম" ভঙ্গ করিয়া বে-আইনী করিয়াছিল। কাজেই ক্ষতি-পূরণ পায় নাই। এখানে গোড়ার কথাতেই গলদ হওয়ায় তাহার মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যায় অর্থাৎ সে নিজের "নির্দ্দিষ্ট" কাজ ছাড়িয়া ইচ্ছামত অন্য কাজ করিতে যাইয়া দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়াই তাহার ক্ষতি-পূরণের দাবী অগ্রাহ্য হইয়া যায়। "সময়" এবং "নিয়ম" বা অ-নিয়মের কোন বিচারই আবশ্যক হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোশিয়েসন।
ভাটপাড়া।

—০—

বঙ্গীয় টেক্সটাইল ইউনিয়নের ঢাকেশ্বরী শাখার শ্রমিকদলের সভা

—:•:—

গত ৩রা আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকদের সভা হবে—এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন বিলি করতে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলীয় শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বর্দ্ধণ ও আবদুল কাদের মিলের দুয়ারে গেলে মিল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিশ চৌধুরীর আদেশে দারোয়ান তাঁহাদিগকে মিল কম্পাউণ্ডের বাইরে চলে যেতে বলে।

অতঃপর অপরাহ্ণ ৬টার সময় শ্রীগোপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগোপালচন্দ্র বসাক, উপরি উক্ত দুজনকে কেন মিল কম্পাউণ্ড হতে বিতাড়িত করে দেওয়া হয় জিজ্ঞাসা করার জন্য মিল ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কারণ, ইনি পূর্ব্বে ঢাকা ম্যানেজার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদকের নিকট বলেছিলেন যে ইউনিয়নের সভা প্রভৃতি করার পক্ষে তাঁর কোন প্রকার আপত্তি নাই এবং শ্রমিকদের শিক্ষিত করার জন্য ইউনিয়নকে তাঁরা সাহায্য করতে রাজী আছেন। প্রত্যুত্তরে ম্যানেজার তাঁর কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অস্বীকার করতে প্রয়াস পান এবং যাতে সেদিন সভা না হয় তার চেষ্টা করেন।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় মিলের সংলগ্ন লক্ষণখলা গ্রামের মাননীয় পাণ্ডব শাউধের বাড়ীতে মিল শ্রমিকদের এক বিরাট সভা হয়। তথায় প্রায় ২ শত শ্রমিকের সমাগম হয়। ঢাকার ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ শাউধ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ঢাকার ইউনিয়নের সম্পাদক রিপোর্ট পড়তে উঠে পূর্ব্বাপর সমস্ত মিল ও ম্যানেজিং ডিরেক্টারদের ব্যবহারের কথা বিস্তারিত ভাবে বলেন। মিলের দু'জন শ্রমিকের হাত কাটা গেছে। তাদিগকে কি সব কথা ব'লে ক্ষতি পূরণের টাকা না দেবার ফন্দী করেছেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি পূর্ব্বাপর বিবৃত করেন। সভায় লক্ষণখলা গ্রামের কুলি মিঞা ও আবদুল কাদের মিঞা, দিন দুই পূর্ব্বে কি ভাবে সামান্য বেতন বৃদ্ধির আবেদন করে চাকরী হারিয়েছে তাও জানান্। মিলের শ্রমিকদের ওপর কি কি অত্যাচার কি ভাবে হয় ভুক্ত ভোগী অনেকেই সে সম্বন্ধে বলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতির অনুরোধে বঙ্গীয় "কৃষক ও শ্রমিকদলে"র সভ্য যিনি লিলুয়ার ধর্ম্মঘট ব্যাপারে ১৸০ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে জামিনে মুক্ত আছেন এবং যাহাকে দলের পক্ষ থেকে এই ইউনিয়ন দেখতে পাঠানো হয়েছে তাঁকে ইউনিয়নের বর্ত্তমান অবস্থায় উহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বল্তে অনুরোধ করেন।

তৎপর বাগ্মী শ্রীযুত গোপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রমিকদের শক্তি ও অধিকার, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবস্থা, সংঘবদ্ধ হবার কার্য্যকারিতা, এবং তাদের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের কথা বিস্তৃত আলোচনা করে বুঝিয়ে দেন্। রাত্রি ১২ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

———

বাংলার কাগজ কলের শ্রমিক সঙ্ঘ

—•—

শ্রীগোপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সেক্রেটারী

—•—

জরিমানা।

এ দেশের কল কারখানায় শ্রমিকদের কাজ করবার সময় কোন রকম ত্রুটি হ'লে, যন্ত্রপাতি হারিয়ে গেলে বা কোন জিনিষ নষ্ট হলে, কলওয়ালাদের কথা বুঝতে না পারায় কোন ভুল হ'লে বা প্রস্রাব করতে ফিরতে গিয়ে দেরী হলে, মালিকরা আইনের মধ্যে যে মোটা জরিমানা করে যে গরীবের পক্ষে তা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠে। জরিমানা করার এই অধিকার কারখানা আইনের আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য ইউনিয়ন থেকে আমরা একটি মোকদ্দমা করেছিলুম।

ঘটনাটি এই :—

লাল চাঁদ নামে ইউনিয়নের একজন মেম্বর হালি সহরে কাগজ কলে কাজ ক'রতেন ও চৌদ্দ আনা "রোজ" হিসাবে মাস মাইনে পেতেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে সামান্য একটু ভুল করার জন্য কলের ইঞ্জিনিয়র সাহেব তাঁর পাঁচ টাকা জরিমানা করেন। লালমিয়া বড় সাহেবকে বল্‌তে গেলে তিনিও বলেন ঠিক হয়েছে। সাহেবদের ব্যাপার দেখে লাল মিয়া ইউনিয়নে এসে খবর দিলেন। তিনি জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার ক'রে ইউনিয়নকে মোকদ্দমা ক'রতে পরামর্শ দিলেন। তখন বারাসত দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করা হয়। তারিখের দিন হাজির হ'য়ে বড় সাহেবের বাবু কিন্তু আদালতে এই ব'লে জবাব দিলেন যে "লালচাঁদের জরিমানা করা হয়নি।" লালমিয়ার কাছে কিন্তু বড় সাহেবের ও ইঞ্জিনীয়র সাহেবের নাম সহি করা কাগজ ছিল। হাকিম তখন সাহেবদের সহি করা জরিমানার কাগজ দেখে মোকদ্দমার খরচ শুদ্ধ সব টাকার ডিগ্রী দেন। সেই থেকেও কলে লোকজনদের আর বেশী জরিমানা করা হয় না।

—:—

ইণ্ডোনেশিয়ায় কৃষক আন্দোলন

—•—

আবদুল হালীম

—•—

ইণ্ডোনেশিয়া (জাভা, সুমাত্রা, বর্নিয়ো সাণ্ডে প্রভৃতি দ্বীপ সমষ্টি) একটি ডাচ্ উপনিবেশ। এই দ্বীপগুলি এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এমন ভাবে অবস্থিত যে ঠিক যেন একটি বিরাট সেতু দুই মহাদেশের মধ্যে বিরাজিত। ইহার মধ্য দিয়া প্রশান্ত মহাসমুদ্র হইতে ভারত মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ নীল জল পথ চলিয়া গিয়াছে। বহু পণ্যবাহী জাহাজ দিবারাত্রি এই পথ দিয়া চলাচল করে। এই দেশের বাহ্য শোভা অতি মনোহর। এই দেশজাত প্রচুর মূল্যবান দ্রব্য পৃথিবীর

ব্যবসার বাজারে বৎসর বৎসর রপ্তানি হয়। পেট্রোলিয়ম, চিনি, রবার, তামাক, কুইনাইন প্রভৃতি দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আমরা হয়তো অনেকে জানি না যে প্রকৃতির এই শস্য শ্যামল উর্ব্বর দেশ ৫ কোটি মানবের বাসভূমি এবং এই দেশের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। তাহাদেরই কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য পৃথিবীর বাজারে সরবরাহ হইয়া থাকে।"

এই দেশে পৃথিবীর দেশ-বিদেশের বনিকগণ ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু বিশেষভাবে একদিকে বৃটিশ ও ডাচ শোষণ-বাদীদল অপরদিকে আমেরিকা—এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্বের খাতিরে অর্থনীতিক সংগ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের যাবতীয় ঝুঁকি গিয়া পড়িতেছে ইণ্ডোনেশিয়ার দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের ঘাড়ে। বিগত কয়েক বৎসর হইতে সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় অত্যাচারের কঠিন ফাঁস হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য পূর্ণ বিক্রমে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের জাগরন লক্ষ্য করিয়া এবং তাহাতে বিপদ আশঙ্কা করিয়া ধনিকদের বৃত্তিভোগী প্রেসগুলি হৈ-চৈ শুরু করিয়া দিয়াছে। তাহারা আজ প্রমাদ গণিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে ইণ্ডোনেশিয়ার পরিশ্রমরত জনগণের দৃঢ় সংগ্রাম প্রচেষ্টা বর্ত্তমানকালীন বিশ্বের অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমরা যদি একটুকু অভিনিবেশ সহকারেও অন্তর্দৃষ্টি সাহায্যে প্রণিধান করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে শোষণবাদী শক্তিবর্গের প্রতিযোগিতার কেন্দ্র ফারইষ্টে' অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকূলভাগের দেশ সমূহে স্থানান্তরিত হইতেছে। বর্ত্তমান চীনের ঘটনাবলী ও সিঙ্গাপুরে বৃটিশ নৌবহর সৃষ্টি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহার ফলে ইণ্ডোনেশিয়ার শোষিত-নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত গণশক্তির অভ্যন্তরে যে অগ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তথায় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে জোরে প্রচারকার্য্য চলিয়াছে। আজ সুস্পষ্ট অনুভূত হইতেছে এবং নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে যে এইহত্যা, খুনোখুনির ব্যাপারে নিঃস্ব দরিদ্র কৃষকগণকেও টানিয়া আনা হইবে। আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণী তজ্জন্য তোর জোরে প্রস্তুত হইতেছে।

ইণ্ডোনেশিয়ার কৃষকগণ তাহাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ দ্বিবিধ অত্যাচারের দুর্ব্বহ বোঝা বহন করিয়া আসিতেছে—দেশীয় ও বিদেশীয় ধনিকগণ তাহাদের শোষণ করিতেছে। দেশের অধিকাংশ লোক ক্ষুদ্র জমিদার, ইজারাদার, পাট্টা প্রাপ্ত প্রজা, ও কৃষি ভৃত্য। তাহাদের মাথা পিছু এক বাহুর (এক একর পরিমাণ) অধিক জমি নাই। তাহা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে দিন মজুরের সংখ্যা অনেক। তাহারা সকলেই চাষে খাটে। অনেকে ইক্ষু ক্ষেত্রে, চিনি প্রস্তুতের কারখানায়, তামাক, রবার, চা, প্রভৃতির কৃষিক্ষেত্রে দিন মজুরী করে। এই সমস্ত ফার্মের মালিক বিদেশীয় ধনিক এবং তাহাদের দ্বারাই সব রক্ষিত।

ইণ্ডোনেশিয়ার কৃষকদের বহু রকম শুল্ক, খাজনা ও ট্যাক্স প্রদান করিতে হয়। আয়কর, ভূমিকর, জিনিসের ডিউটি, জমিদারদের জন্য বাধ্যতা মূলক খাটুনি, ষ্টেটের রাস্তা নির্মাণের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে খাটুনী, গ্রামট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হয়। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের কিছু সুবিধা প্রদান করিয়াছিল। তাহাদের মূল উদ্দেশ্য যাহাতে বিপ্লব প্রয়াসী কৃষক ও শ্রমিকদের প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে না পারে। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু খাজনা ইত্যাদির মাত্রা অত্যধিক এবং কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইণ্ডোনেশিয়ায় কতকাংশে এবং বিশেষ ভাবে মধ্য জাভায় কৃষকদের আয়ের অর্দ্ধেক জমিদার, কফার এবং খাস গবর্ণমেণ্টের পকেটে চলিয়া যায়। জাভার আয়তনের তুলনায় লোক সংখ্যা অনেক বেশী। এই দেশের আয়তন ১৩১৪৪০ স্কোয়ার কিলোমিটার। হল্যাণ্ডের আয়তন অপেক্ষা চার গুণ বেশী। লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। শিল্প কেন্দ্র গুলিতে লোক সংখ্যা ঢের বেশী। গবর্ণমেণ্ট এই ঘন বসতি কমাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। বৎসরে ৪ লক্ষ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানের বড় বড় কৃষিক্ষেত্র গুলি বিশেষ করিয়া চা, রবার, তামাক প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্র গুলির কলেবর বৃদ্ধি করা হইতেছে, এবং গরীব চাষীদের জমি দখল করিয়া লওয়া হইতেছে। তাহার ফলে তাহারা আরো দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর অর্থনীতিক সঙ্কটের পূর্ণ প্রভাব ইণ্ডোনেশিয়ার উপরও পতিত হইয়াছিল। যদিও ইণ্ডোনেশিয়া বিগত পৃথিবী ব্যাপী শোষণবাদী শকুনদের সমরে যোগদান করে নাই। তথাপি দেশের আভ্যন্তরিক ঘটনা ও নানা পরিপার্শ্বিক ঘটনাবলী একত্র সন্নিবেশিত হইয়া যুদ্ধের প্রারম্ভকাল হইতে এখানে একটা বিরাট বিপ্লব-মূলক গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। এবং বর্ত্তমান কালে তাহা অত্যন্ত প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া অথবা খাজনা ইত্যাদি কিছু লাঘব করিয়াও তাহাদের উক্ত মনোভাব দমন করিতে সমর্থ হয় নাই।

ইণ্ডোনেশিয়ার গণ-আন্দোলন প্রথমে ধর্ম্মের পক্ষপুটে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম যখন আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন তাহা ধর্ম্ম-জাতীয় আন্দোলন রূপে গঠিত হয় এবং তখন তাহার নাম ছিল সারেকত-ইসলাম (Sarekat-Islam. Union of Islamist) এই আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় ১৯১৬-১৮ সালে সভ্য সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ইহার ৬০% কিম্বা ৭০% পারসেণ্ট ছিল কৃষক। কিন্তু নীচমনা নেতৃবর্গের বিশ্বাস-ঘাতকতায় এবং অনেকের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের জন্য আন্দোলনের গতি থামিয়া যায়। পুনরায় ১৯২৩ সাল হইতে কৃষকদের সংঘবদ্ধ ও সুগঠিত করা হইয়াছে; এইবার এই আন্দোলনের নাম প্রদত্ত হইয়াছে সারেকত-রায়ত (Sarekat-Rayat (Or. Peoples Union) এই আন্দোলন খাটি জাতীয় বৈপ্লবিক ও গণ-তান্ত্রিক দলের আন্দোলন এবং ইণ্ডোনেশিয়ার কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত। কম্যুনিষ্ট দমনের অজুহাতেই গবর্ণমেণ্ট ইহার সভ্যদেরও উপর অত্যাচার চালাইতেছে। 'সারেকত রায়তের' সভ্য সংখ্যা ১৯২৫ সালে দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ, ইহার শতকরা ৫০।৬০ জন কৃষক ও শতকরা ২৫ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রম-শিল্পী ও কারিকর। তাহা ছাড়া অনেক সহানুভূতি সম্পন্ন লোকও আছেন যাঁহারা গুপ্তভাবে সংগঠনের কাজে সহায়তা করেন। "সারেকত ইসলামের" মধ্যে যাঁহারা গরম পন্থী ছিলেন তাঁহারাই 'সারেকত রায়ত' গড়িয়া তুলেন এবং ১৯২৩ সালের অবস্থাটা খুব প্রকটিত হইয়া উঠে। এই সময়ে বিপ্লবী নেতৃবর্গ বিপ্লবাত্মক অবস্থাটিকে জনগণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করিয়া প্রকৃত কল্যাণের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময় তাহারা তীব্র ভাবে শুরু করভারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিয়া দেন, গ্রাম্য নেতৃবর্গের গোঁয়ার্তুমি ও সুদ-খোরদের বিরুদ্ধেও অবিরত সংগ্রাম চলিতে থাকে। কৃষকদের জমি হইতে বে-দখল করিয়া ধনিকদের ইক্ষু প্রভৃতি ক্ষেত্রের

[illegible] সারেকত রায়ত [illegible]
[illegible] মধ্যে [illegible]
[illegible]
[illegible] প্রচার করিতে থাকে [illegible] প্রভৃতি [illegible] সারেকত রায়তের [illegible] বিদ্রোহ প্রকাশ করিবার জন্য [illegible] গ্রামে প্রান্তরে, সভা আহ্বান করা হয়। পুলিশের সহিত সংঘর্ষে অনেকে অনেক মামলা, জরিমানা প্রভৃতি স্থানে ১০ জন লোক নিহত হয় [illegible] জন লোক আহত হয় এবং ৬০০ শত লোক গ্রেপ্তার হয় [illegible] তাহাদের প্রত্যেকের [illegible] হইতে ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯২৭ সালেই গবর্ণমেণ্ট [illegible] ৫৬ জনকে [illegible] (নিউগিনিতে) নির্বাসিত করে। ১৯২৩ সালের প্রারম্ভে তিনি নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯২৫ সালের প্রথমভাগে সারেকত রায়তের আরো ৬৫ জন কর্মী [illegible] বিপ্লববাদীদের [illegible] নির্বাসিত হন। গবর্ণমেণ্ট এত ধর্ষণনীতি প্রয়োগ করিয়া ও কিন্তু সারেকত রায়তের আন্দোলন দমন করিতে ও আন্দোলনের গতি সংযত করিতে সক্ষম হয় নাই। পক্ষান্তরে আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছে। এই বিপ্লব আন্দোলন দমন কল্পে পুলিশ গবর্ণমেণ্ট ও বুর্জোয়াদের নিকট অধিক সাহায্য পাইয়া ১৯২৫ সালের প্রারম্ভে একটি ফ্যাসিষ্ট বাহিনী গঠন করে এবং ইহার নাম দেওয়া হয় সারেকত হিদজু (Sarekat Hidju বা Green Union) এই দলের দশ বিশজন একত্র হয়ে গ্রাম লুণ্ঠন করিতে থাকে ইট-পাটকেল ছুড়িয়া বিপ্লববাদী কৃষকদের জখম করে, অনেক গ্রামে গিয়া বিপ্লববাদী-দের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং কম্যুনিষ্টদের সহিত সংস্পৃষ্ট এই সন্দেহে কৃষকদের বেত্রাঘাত মারপিট এবং হত্যা পর্য্যন্ত করে। এই কাজের জন্য তাহারা ১ হইতে ২ ফ্লোরিণ (১ শিলিং ১০ পেন্সের মত) পারিশ্রমিক পাইত। কিন্তু ইহার উচিত শাস্তি দিবার জন্য বিপ্লবীদল একটি বিরাট অ্যান্টি-বিবুত বণ্ড (anti Ribut Bond anti bandit union) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এমন কি তাদের এই অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য সারেকত হিদজুর ভিতর ঢুকিয়া এক কেন্দ্র গড়িয়া তুলেন এবং শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে সারেকত হিদজুকে ভিতর বাহির দুই দিক হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হয়। উক্ত দুইদলে গ্রামে গ্রামে খুব সংঘর্ষ বাধিতে থাকে এমন কি এই ফ্যাসিষ্ট দলের লোক তাহাদের দল পরিত্যাগ করিয়া অ্যান্টি বিবুত-বণ্ড দলে যোগদান করে। কতিপয় জেলার ফ্যাসিষ্ট দল অল্পবেতনে অসন্তুষ্ট হইয়া অধিক বেতন দাবী করিতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট এই চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া উক্ত দল বর্জ্জন করে। কয়েকমাস পরে এই দল ভাঙ্গিয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে অনেক ষ্ট্রাইক, খণ্ডযুদ্ধ, বিদ্রোহ হইয়াছিল এবং তাহা সারেকত রায়তের নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল।

[illegible]
[illegible] উহাদের জমি [illegible] তাদের কাছ [illegible] হইতেছে। অবশেষে উত্তর সুমাত্রায় বিপ্লবী কৃষকগণ [illegible] তাহাতে সক্ষম হয়। [illegible] কৃষকগণ [illegible] বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। [illegible] গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্রোহ দমন করিতে অসমর্থ হয়। ১৯২২ সালে এবং ১৯২৩ সালের শুরুতে বিদ্রোহী কৃষকগণ গবর্ণমেণ্টের [illegible] অনেক [illegible] দখল [illegible] করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের আন্দোলন দমনের নানাপ্রকার চেষ্টা চালিত করিতেছে। [illegible] সংখ্যা [illegible] বাড়িতেছে। মেটাল ওয়ার্কার্স, পোষকর্মচারী, ষ্টেট রেলওয়ে কম্পানী, ইক্ষু ক্ষেতের মজুরদের ধর্মঘট মিটমাট হইয়া [illegible] পর গবর্ণমেণ্ট ১৯২২ সালে কমরেড আলী আরচম, ডারসোনো, মরদাহনকে একাবাতে (নিউগিনি) দ্বীপান্তরিত করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি, সারেকত-রায়ত, সারেকত-তানি (Peasant Union) এবং রেড ট্রেড ইউনিয়নিজম বা শ্রমিক সংঘবাদ প্রভৃতির সভা সমিতি বন্ধ করিবার নিমিত্ত আইন পাস করিয়াছে। ১৯২২ সালে আইনের কড়াকড়ি জন্য প্রকাশ্য প্রচার কার্য্য চালান অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন বাধ্য হইয়া কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে গুপ্ত পথে চালিত করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের ফ্যাসিষ্ট দল কিন্তু কোন প্রকারেই বিপ্লব দমন করিতে সমর্থ হয় নাই, পক্ষান্তরে অনেক জেলাতে ছোট-খাটো খণ্ডযুদ্ধ, বিদ্রোহ, গবর্ণমেণ্টের অফিসারদের হত্যা প্রভৃতি পুরো দমে চলিতে থাকে। আন্দোলন খুব মূর্ত্ত হইয়া উঠে। পিষ্ট কৃষককুল অত্যাচারের কঠোরঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মরিয়া হইয়া উঠে। তাহারা তাহাদের সমষ্টিগত শক্তি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

ইণ্ডোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রথমেই এই বিপ্লবী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে ঠিক নীতিতে চালনা করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহা ছাড়া কম্যুনিষ্ট পার্টির ভুল সত্ত্বেও কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি অনেক কিছু করিয়াছে। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন সিঙ্গাপুরের নৌবহর নির্ম্মাণ করিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছিল এবং অন্যদিকে ডাচ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নৌ-শক্তি বাড়াইবার জন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির ও সারেকত-রায়তের একটি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই দুই দল একত্রিত হইয়া কাজ করিয়াছিল। এই কংগ্রেসে খুব জনসমাগম হইয়াছিল। এই সম্মিলন ইণ্ডোনেশিয়ার কৃষক ও শ্রমিকগণকে ইম্পিরিয়ে-লিষ্টদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেয়। সাধারণ কৃষক ও মজুরগণ এই কংগ্রেসে যোগদান করতঃ শোষণবাদীদের জঘন্য যুদ্ধ মনোবৃত্তির নিন্দাবাদ করিয়াছিল। ১৯২৪ সালে সেণ্ট্রাল জাভাতে সারেকত রায়ত ও কম্যুনিষ্ট পার্টির এক মিলিত বৈঠক

হয়। তাহাতে ভাবী যুদ্ধের সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব পাস হয় এবং দস্তুর মত প্রচার কার্য্যও চলিতে থাকে। কৃষক ও শ্রমিকগণ খুব সুসংঘবদ্ধ। জাভার রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের সময় কৃষকগণ আর্থিক ও নৈতিক উভয়বিধ সাহায্য করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, হংকং, সাংহাই, বিলাতের সাধারণ ধর্ম্মঘটের প্রতি তাহারা খুব সহানুভূতি দেখাইয়াছে ও আর্থিক সাহায্য করিয়াছে। ইণ্ডোনেশিয়ার কৃষক আন্দোলন সমস্ত বিপ্লবী নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ যোগ্য, কেননা পৃথিবীর এই অঞ্চলেই শোষণবাদী শক্তিবর্গের যুদ্ধের নাকাড়া বাজিয়া উঠিবে।

যদিও সারেকত রায়ত আন্দোলন বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও আন্দোলন পুরোদমে চলিতেছে। ইণ্ডোনেশিয়ার যে সমস্ত তরুণ বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহাদের উপর কম নির্য্যাতন হইতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে জাভার কতিপয় যুবক বিপ্লবমূলক কাগজ পত্র প্রচারের অজুহাতে হল্যাণ্ডে গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁহারা মস্কোর কম্যুনিষ্টদের সহিত সংসৃষ্ট এবং হল্যাণ্ড হইতে বিপ্লব মূলক পুস্তিকা ইত্যাদি ইণ্ডোনেশিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন। হেগের কোর্টে তাঁহাদের বিচার হয়। বিচারে তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কমরেড মোহাম্মদ হাত্তা উক্ত ছাত্র দলের অগ্রনায়ক। তিনি শোষণবাদ. বিরোধী দলের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভ্যও বটেন। কোর্টে কমরেড হাত্তা ওজস্বিনী ভাষায় ইণ্ডোনেশিয়ার ডাচ গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকও কৃষকদের উপর কিরূপ অত্যাচার করে তাহার জলন্ত বর্ণনা প্রদান করিয়াছিলেন।

বিগত এক বৎসরে জাভা প্রভৃতি স্থানের আন্দোলনের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে অত্যাচারও চরমে উঠিয়াছে। অনেক নেতাকে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে। পুরাতন হইলেও এক্ষেত্রে এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে আমাদের দেশেও "শ্রমিকও কৃষক" আন্দোলন দমন করে গবর্ণমেণ্টও পুলিশ কম নির্য্যাতন করিতেছে না। কথায় কথায় গুলি চলে। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। কম্যুনিষ্ট ভীতিও বিভীষিকা তাহাদের সম্পূর্ণরূপে পাইয়া বসিয়াছে। যেখানে যেখানে মজুররা ধর্ম্মঘট করিতেছে- গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী সংবাদপত্রগুলি প্রচার করিতেছে যে এই সমস্ত কম্যুনিষ্টদের কর্ম্ম। হাওড়া, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মঘটীদের উপর পুলিশের দুর্ব্যবহারের কথা বলিবার নয়। বারদৌলিতে সম্প্রতি কৃষকগণ খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু করিয়া দিয়াছে। আমাদের এই বাংলাদেশেই ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় ১০৪খানি গ্রামে জমিদারও গবর্ণমেণ্টের মিলিত অত্যাচারে দরিদ্র কৃষকগণ একেবারে পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছে। জেল, জরিমানা, অত্যাচার এখানেও কোন অংশে কম নহে। জাভার শ্রমিক ও কৃষকগণ সংঘবদ্ধ- আমাদের দেশে তাহা নয়—এই যাহা তফাৎ।

দেশ-বিদেশ

—০—

কাবুলে য়ুরোপীয় পোষাক

লাহোরের ২রা তারিখের খবরে প্রকাশ যে কাবুল হতে প্রত্যাগত কয়েকজন ব্যবসায়ী লাহোরের 'মিলাপ' পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির নিকট বর্ণনা করেছেন যে পূর্ব্বে আফগান গবর্ণমেণ্ট কোট ও প্যাণ্ট এই পোষাক পরিধান করার আদেশ দিয়েছিলেন এক্ষণে হ্যাট ব্যবহার করবার জন্য ও আদেশ প্রদত্ত হয়েছে। ইহাও প্রকাশ যে একজন ব্যবসায়ীকে তাহার সাধারণ পরিচ্ছদে রাজ কর্ম্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি। তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করলে তবে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। ইহাও প্রকাশ যে শিখদেরও হ্যাট ব্যবহার করতে হবে। যদি কেহ প্রথমে এই আদেশ না মানে তাহা হলে তাকে রাজোদ্যানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। রাজা ও রাজ-মহিষী পর্দ্দা-প্রথার বিরুদ্ধে খুব প্রচার চালাচ্ছেন।

—০—

ট্রেন সংঘর্ষ

৪ঠা জুলাই তারিখে মোগলসরাইএর নিকট সাকালডিহা ষ্টেশনে ৩০০ নং মাল গাড়ীর সাথে ১৬৮ নং ডাউন গাড়ীর সংঘর্ষ বাধে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ষ্টক মৃত্যু-মুখে পতিত হন। আরো ৭ জন লোক জখম হয়েছে।

—০—

৯ শত শ্রমিকের পদত্যাগ

৪ঠা জুলাই এর কৈম্বেটোরের খবরে প্রকাশ যে পদানুরের রেলওয়ে কারখানার ১২ শত লোকের মধ্যে ৩০০ শত লোক কাজে যোগদান করেছে। ইউনিয়নের নেতৃবর্গের নির্দ্দেশ মতে ৯০০ শত শ্রমিক পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ গোল্ডেনরক, ত্রিচী, পদানুর প্রভৃতি স্থানের সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের যে সকল শ্রমিকগণ চাকরী করে তাহারা অস্বীকৃতি জানিয়ে পদত্যাগ করেছে। ১৫০০ শত নাগাপট্টম কারখানার মজুর পদত্যাগ করেছে।

—০—

ধর্ম্মঘটীদের সাজা

৪ঠা জুলাই তারিখের সংবাদে জানা গিয়াছে ৯ জন নাগাপট্টম রেলওয়ের শ্রমিক, যারা ষ্ট্রাইক সুরু হবার পরই টাঙ্গারামে পার্সেল এক্সপ্রেস বন্ধ করেছিল; পুলিশ তাহাদের হটিয়ে দেয়। বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের ৬ মাস করে কঠোর শাস্তি হয়েছে।

—০—

পরলোকে আমীর আলি

লণ্ডনের ৩ঠা তারিখের খবরে প্রকাশ যে রাইট অনারেবল আমীর আলি তাঁর সাসেক্স আবাসে দেহত্যাগ করেছেন। ৭ই তারিখে ব্রুক-উড্ সমাধি স্থলে তাঁর শবের সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

—০—

মিসর গবর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতি

কাইরো ৩ঠা আগষ্ট। অদ্য মিসরের পুলিশ ওয়াফিদ (জাতীয়) দলের প্রধান কার্য্যালয়ে হানা দিয়েছিল। প্রকাশ যে বিদ্রোহাত্মক দলিল পত্র আবিষ্কার করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

ছাপাখানায় পুলিশের হানা

লাহোর, ২ই আগষ্ট। [illegible] দলের কার্য্যালয়ে [illegible] দেবার পর পুলিশ আর একটি ছোট ছাপাখানায় হানা [illegible]। [illegible] পুলিশ [illegible] ছাপাখানায় বিদ্রোহমূলক সাহিত্য ছাপা হচ্ছে। [illegible] মালিক ও দুজন ছাত্রকে [illegible] করা হয়েছে। [illegible] পর গবর্ণমেণ্ট আদেশ দেন যে [illegible] দলের প্রধান কার্য্যালয় খানা-তল্লাসী করতে হবে, কেন না এই কার্য্যালয়ে [illegible] ছাত্ররা সমবেত হইয়া থাকে। [illegible] রের মন কোথায় তাহার [illegible] জন্য সরকারী দল উঠে পড়ে লেগেছে! তবে খানা-তল্লাসীর ফলে কিছুই ধরা পড়ে নাই।

নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার

স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ আরকুহার্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। এই আগষ্ট [illegible] হতে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করবেন। [illegible] গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার [illegible] বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক [illegible] বলেন বর্ত্তমানে তাঁর যেরূপ স্বাস্থ্য তাতে এ পদের গুরুতর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়, এই জন্যই ডাঃ আরকুহার্টকে নিয়োগ করা হলো।

কয়লা হতে তেল

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজ এখন কয়লা হতে তেল বের করবার গবেষণায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। জার্ম্মানী এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। তাদের উদ্ভাবিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি দ্বারা যে কোনো কয়লা হতে তেল বের করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। অক্টোবর মাসের গোড়া হতেই তাঁরা বিপুল ভাবে এই তেল বের করবার কারখানা চালাবেন। এই রাসায়নিক পদ্ধতি দ্বারা বছরে ৩০০০০ হাজার টন তেল প্রস্তুত করতে পারবেন বলে তাঁরা আশা করেন।

নানকিং ব্যাপারের আপোষ

লণ্ডন ৩রা আগষ্ট। প্রকাশ যে পার্লামেণ্টে চীন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব লিখিত ভাবে এই মর্ম্মে একটি বর্ণনা দেন যে নানকিং এর ব্যাপার সম্পর্কে চীন ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আপোষের জন্য কথাবার্ত্তা চলছে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সাথে চীন সরকারের ইতিপূর্ব্বেই যে সব শর্ত্তে আপোষ হয়েছে বৃটিশ সরকারও সেই শর্ত্ত গ্রহণ করতে সম্মত আছেন। আরো একটি প্রশ্নোত্তরে সার অষ্টিন চেম্বর লেন বলেছেন যে পিকিংস্থিত বৃটিশ মন্ত্রী জানিয়েছেন যে চীন গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাথে বাণিজ্য সন্ধি করতে প্রস্তুত আছেন। ঐ সন্ধি দ্বারা চীনের বাণিজ্য শুল্কের স্বাধীনতা বৃটিশ সরকারকে স্বীকার করতে হবে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমেরিকা ও চীনের সাথে উক্ত রূপ সন্ধি করেছে।

জাহাজে লস্কর বিদ্রোহ

[illegible] আগষ্ট।

[illegible] লস্কর বিদ্রোহ সম্পর্কে [illegible] এবং [illegible] সম্পর্কে [illegible] মালিকের [illegible] মালিকের [illegible] মালিককে আক্রমণ করে, পরে [illegible]।

প্যারিসে 'রেড' মিছিল ১১ শত কম্যুনিষ্ট গ্রেপ্তার

[illegible] আগষ্ট।

[illegible] একটি কম্যুনিষ্ট মিছিলের [illegible] কম্যুনিষ্ট [illegible] কম্যুনিষ্টদের মধ্যে [illegible] কম্যুনিষ্ট [illegible] কম্যুনিষ্ট [illegible] পুলিশের [illegible] সূচক সংবাদ জানান হয় এবং এই [illegible] যোগদান করতে বাধা দেয়। [illegible] পুলিশ [illegible] কম্যুনিষ্টদের নেতাদের ও মিছিলের জনতা [illegible] গ্রেপ্তার করে। এই ধৃতের সংখ্যা ১১ শত। [illegible] মুক্তি দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ৩৬ জন বিদেশের লোক। তাঁহাদের নির্ব্বাসিত করা হবে, না হয় তাঁদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ধৃত কম্যুনিষ্টদের মধ্যে [illegible] 'হিউম্যানাইট' এর এডিটার ও ছিলেন। পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কৃষকদের গরিলা যুদ্ধ

দার্জ্জিলিংয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, তিব্বতের পো জেলাতে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ তুমুল ভাবে চলিতেছে। উক্ত জেলার উত্তর অঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় সৈন্যদল কৃষকদিগকে পরাস্ত করিয়াছে বটে কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকগণ এখনও নানা স্থান হইতে প্রেরিত সৈন্যগণকে প্রবল ভাবে বাধা দিতেছে। লাসাতে অনেকের বিশ্বাস যে কৃষকগণ যদি পরাজিত হয় তাহা হইলে তাহারা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবে। কিন্তু যদি ভারত গবর্ণমেণ্ট তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে রাজী না হন তাহা হইলে তাঁহারা চীন সরকারের শরণাপন্ন হইবে এবং চীন সরকারও নাকি সানন্দে কৃষকদিগকে সাহায্য করিবেন।

ইতি মধ্যে তিব্বতে একজন ভুটানীকে হত্যা করা হইয়াছে। এজন্য ভুটান সরকারের সঙ্গে তিব্বত সরকারের বর্ত্তমানে খুব মনোমালিন্য চলিতেছে।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র



Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই আগষ্ট ১৯২৮, ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৫	১০ম সংখ্যা

সাহায্য প্রার্থনা

"কৃষক ও শ্রমিক দল"এর (Workers' and Peasants' Partyর) মত ও প্রচার কার্য্যের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি ও বিশ্বাস আছে তাঁদেরি অর্থ সাহায্যে "গণবাণী" বরাবর প্রকাশিত হয়েছে। এবারেও তাঁদেরি সাহায্যের আশাতেই আমরা কাগজের পুনঃ প্রচারে ব্রতী হয়েছি। এই শ্রেণীর কাগজের প্রচারের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোনো আশাত করাই যেতে পারেনা, পক্ষান্তরে কোনো প্রকারে খরচ পুষিয়ে নেওয়াটাও অধিকাংশ স্থলেই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। কাজে কাজেই লোকসান দিয়েই কাগজ চালাতে হয়। তা সত্ত্বেও কাগজ খানাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তেই হবে। জনসাধারণের জন্যে আমরাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক, বিপ্লবাত্মক ও কার্য্যকরী কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছি। "গণবাণী" এই কাজের তালিকা সকলের চোখের সামনে ধ'রে দিচ্ছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে, কেমন ক'রে আমরা সফলতা লাভ করতে পারব। এ অবস্থায় "গণবাণীর"র বেঁচে থাকার ওপরে আমাদের দেশের গণ-আন্দোলনের অনেকখানি নির্ভর করছে। কেবল মাত্র গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারাই যে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারব, এ কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন আজ আমরা তাঁদেরি নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছি। দেশের প্রত্যেক শ্রমিক, কৃষক ও যুবসঙ্ঘের সাহায্যও আমরা একান্তই চাই। সকলে তিন প্রকারে সাহায্য করতে পারেনঃ—

(১) অর্থ দ্বারা (২) গ্রাহক সংগ্রহ ও নগদ বিক্রী ক'রে দিয়ে এবং (৩) বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ক'রে দিয়ে।

যে ভাবে যাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় সে ভাবেই তাঁরা আমাদের সাহায্য করুন।

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি,
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

সম্পাদক
মুজফ্ফর আহ্মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

A CALL TO ACTION

Being the Resolutions and Theses passed at the Third Annual Conference of the WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL.

After years of agitation and organisation, India is still a slave nation, is farther from freedom than ever. Why is this?

Why is the once mighty National Congress a laughing stock before the world?

Why do our leaders invariably say one thing and do another?

For a clear, consistent Marxist analysis and explanation of these disturbing phenomena.

For a clear practical lead as to what to do to remedy this state of things.

See, "A CALL TO ACTION." Price As. 8/- only.

To be had of

1. THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2/1, European Asylum Lane, Calcutta.

2. THE BOOK COMPANY LTD.
4/4A, College Square, Calcutta.

HELL FOUND

Or

A COMMUNIST'S THREE YEARS IN AN INDIAN PRISON

By

S. A. Dange

You will see here how helpless human beings are laid prostrate and beaten with shoes and sticks till they bleed, how patients in high fever are put in irons, how in the height of a Himalayan winter men are left to freeze and die.

Full of sensations and revealations.

Price Re. 1/- only.

To be had of

THE VANGUARD LITERATURE Co.
2/1 European Asylum Lane, Calcutta.

Or

THE BOOK COMPANY Ltd.
4/4A College Square, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং যাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেন্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেন্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেন্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেন্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর
সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই আগষ্ট, ১৯২৮, ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৫ | ১০ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

—:*:—

টেন্যান্সি মাকাল

বাঙ্গাল গভর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব সংশোধক আইনরূপী যে মাকাল ফলটি বাঙ্গাল কাউন্সিলে হাজির করেছেন তা'র অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তা এখন বুঝা যাচ্ছে না। তবে জমীদার বা প্রজা কেহই যে এতে সন্তুষ্ট হয় নি সেটা উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-গণের এই কয়দিনের গলাবাজীতে বেশ উপলব্ধ হয়েছে। ৫০০ সংশোধক প্রস্তাব ইতিমধ্যে কাউন্সিলে উপস্থিত করা হয়েছে সুতরাং কাটছাঁট করে শেষে বিলটির যে কি অপূর্ব্ব আকৃতি দাঁড়াবে তা অনুমান করা শক্ত। বিলের দোষগুণ বিচার ক'রেও এখন বিশেষ লাভ নাই। তবে কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ হ'তে আমরা গুটিকতক কথা বল্‌তে চাই।

প্রথম কথা বিলটি পেশ করা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। সুতরাং এই আইনের দ্বারা প্রজার দুঃখ যে কিরূপ দূর হবে তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝ্‌তে পারবেন। গরীব প্রজার রক্ত চুষে খাওয়া যে বিদেশী ধনতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের একমাত্র কাজ সেই গভর্ণমেণ্ট যে আইন প্রণয়ন করবে তার দ্বারা প্রজার দুঃখ দূর হবে এ কল্পনা যারা করতে পারে তাদের বিশ্বাসবুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা বৃথা।

দ্বিতীয় কথা, যে কাউন্সিলে এই বিলটির সম্বন্ধে আলোচনা হবে এবং যেখান থেকে ইহা পাস হবে সেই কাউন্সিলের সদস্যরা সকলেই জমিদার, বড়লোক বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। কৃষকদের প্রকৃত সুখদুঃখের সঙ্গে তাদের স্বার্থের যে সম্পর্ক তা'তে তারা যে কৃষকদের প্রকৃত স্বার্থের দিকে তাকাইয়া কাজ করবে এ আশা বৃথা।

তৃতীয় কথা কাউন্সিলে তথাকথিত কৃষক প্রতিনিধিরা প্রকৃত কৃষক কেহই নয়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে প্রকৃত কৃষক [illegible] সুতরাং উপাহৃত গলাবাজীর দ্বারা কৃষকদের স্বপক্ষে দু'এক কথা বল্‌লেও কৃষকদের প্রকৃত স্বার্থ যে তারা দেখ্‌বে এ আশা আমরা করি না।

শেষ কথা, কংগ্রেস-স্বরাজী দল। এই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের দল দেশের জনসাধারণের নেতৃত্বের দাবী করে থাকে, কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়ের তরফ থেকে নেতৃত্ব করার দাবী এদের কতকটা আছে তা দলের ঘোষণাপত্র থেকে বুঝা যায়।

ঐ ঘোষণাপত্রে মোটামুটি বলা হয়েছিল যে স্বরাজ্যদল কৃষক ও জমিদার উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে। এক কথায় যাকে বলে বাঘে ও গরুতে একঘাটে জল খাবে। উদ্দেশ্য এইরূপ ধাপ্পাবাজীর দ্বারা দেশের ধনী জমীদার ও গরীব কৃষক উভয়কেই হাতে রাখা। কিন্তু কর্ত্তারা এটা বুঝ্‌তে পারেন নি যে বিংশ শতাব্দীতে এইরূপ মিলন অসম্ভব। খাদ্য ও খাদকের মিলন ততদিন সম্ভব হয় যতদিন নিপীড়িত গণসাধারণ অজ্ঞ ও অসংঘবদ্ধ থাকে এবং অজ্ঞতাবশতঃ প্রতিপদে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হইয়া নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। সুতারং বুঝা যাইতেছে বাংলা দেশের কৃষক কংগ্রেস-স্বরাজীদলের নিকট কিছুই আশা করতে পারে না, কারণ উক্ত দল শিক্ষিত জমিদার সম্প্রদায়কে ঠকাতে পারবে না, নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়কেই ধাপ্পাবাজীতে ভুলাইবার চেষ্টা করবে যাতে তাদের নেতৃত্বের দাবী বজায় থাকে।

এখন, কো পন্থাঃ? আমরা বরাবর বলে আস্‌ছি যে যতদিন না জমিদারী স্বত্বের উচ্ছেদ হবে এবং কৃষক জমির মালিক ব'লে স্বীকৃত হবে ততদিন কৃষকের অবস্থার উন্নতি কিছুতেই হ'তে পারে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বা গভর্ণমেণ্টের জমির মালিকত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য কৃষককে সংঘবদ্ধ হ'তে হবে। যে সংগ্রাম বারদৌলিতে আরম্ভ হয়েছিল এবং যাহা নেতাদের কারচুপিতে কৃষকের পরাজয়ে পর্য্যবসিত হয়েছে, সেই সংগ্রাম গভর্ণমেণ্ট ও জমিদার উভয়ের বিরুদ্ধে

[illegible] হিন্দুস্থানের কৃষককে বিপ্লবের পথ অবলম্বন [illegible] এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদল"।

বারদৌলি

বারদৌলির কৃষকদের সত্যাগ্রহ শেষ হয়েছে। [illegible] হাঁপ ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। জাতীয়দলের সংবাদপত্রগুলি [illegible] ক'রে যুদ্ধ শেষ করলেন।

কিন্তু যুদ্ধে হার হ'ল কি জিত হ'ল সেটা কেউ স্পষ্ট বুঝবার চেষ্টা করল না। সন্ধির সর্ত্তগুলি অনুধাবন করে দেখলেই সেটা প্রতীয়মান হবে।

যে সর্ত্তে সত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হল সেগুলি মোটামুটি এইরূপ :—

(১) সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত একজন জুডিসিয়াল অফিসার ও তাহার সঙ্গে একজন রেভিনিউ অফিসার খাজনার হার সম্বন্ধে যে রায় প্রকাশ করবেন কৃষকরা তাই মেনে নিবে।

(২) সত্যাগ্রহ বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

(৩) বাজেয়াপ্ত জমীগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

(৪) সত্যাগ্রহে যাদের অতিরিক্ত ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

(৫) যে সকল তালাতি ও পাটেল কাজে ইস্তফা দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়েছে।

(৬) পুরাতন হারে খাজনা লওয়া হবে

(৭) সরকারী তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকী টাকাটা (৩০,০০০ টাকা) মিঃ ভাট গভর্ণমেণ্টের কাছে জমা রাখবেন।

(৮) সকল আন্দোলন স্থগিত থাকবে।

আপাত দৃষ্টিতে মীমাংসাটা বেশ সম্মানজনক বোধ হ'লেও একটু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেই বুঝা যাবে কৃষকদের সংগ্রামে জয় হয় নি। কারণ যে জন্য সত্যাগ্রহ ঘোষণা করা হয়েছিল সেটা যেমন তেমনই রইল। বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে হবে কি না তার শেষ মীমাংসা আদৌ হ'ল না। সরকারী কর্ম্মচারীর তদন্তের ফল কি হবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তদন্ত আরম্ভ হবে অক্টোবরে, ততদিনে আন্দোলনও নিভে যাবে এবং যখন সরকারী কর্ম্মচারী তদন্ত শেষ করে রায় প্রকাশ করবেন যে বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে হবে তখন কৃষকরা বাধ্য হয়ে তা মেনে নেবে, ইহাই হ'ল গভর্ণমেণ্টের মতলব।

বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে অর্পিত হয়েছিল তাঁরা যে বিদ্রোহী নন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইজন্য কৃষকদের জয় পরাজয়ের দিকে ততটা দৃষ্টি তাঁরা দেন নাই যতটা দৃষ্টি তাঁদের ছিল নিজেদের মতবাদের দিকে। তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংসনীতির দ্বারা জয়লাভ সম্ভব এবং যখন দেখলেন যে ব্যাপার ক্রমশঃই জটিল হয়ে আসছে এবং অনেকদূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে তখন নিজেদের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা ঢাক্‌বার জন্য পরাজয়কে জয়ের আবরণে ঢেকে কৃষকদের সঙ্গে চাতুরী খেলে যুদ্ধ শেষ করে দিলেন। লাভ হ'ল কি? না সরকারী জুডিসিয়াল অফিসারের তদন্ত। পর্ব্বতের মূষিক প্রসব।

স্বরাজী দলের দুর্ব্বল নেতৃত্বে এর চাইতে বেশী কিছু আশা করা যায় না। যাহার নেতৃত্ব তাঁহারা জোর করে গ্রহণ করতে চাইছেন সেই জনসাধারণের সঙ্গে [illegible] তাঁদের [illegible] [illegible] দ্বারা [illegible] নেতৃত্ব বজায় রাখবার এই বিফল প্রয়াস। স্বরাজী-কংগ্রেস নেতারা যখন দেখলেন যে বারদোলির কৃষক ক্রমশঃ বড় বিদ্রোহী হয়ে উঠছে এবং বারদোলির ব্যাপার শীঘ্রই সারা দেশব্যাপী একটা কৃষক বিপ্লবে পরিণত হ'তে পারে এবং বোম্বাই [illegible] শ্রমিকরাও তাতে যোগ দিতে পারে তখন তাঁরা [illegible] [illegible] [illegible] দেবার জন্য সরকারের সঙ্গে একটা রফা করে ফেললেন ও সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে [illegible] হ'ল। [illegible] কৃষক সম্প্রদায় [illegible] সহজেই বিশ্বাস করল। সরকারের যে [illegible] [illegible] প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং আর কিছুদিন সত্যাগ্রহ চললে সরকার যে [illegible] স্বীকার করতে বাধ্য হ'ত [illegible] কৃষক সম্প্রদায় [illegible] [illegible] হয়ে পড়লেন এবং "সম্মানের" [illegible] করলেন। [illegible] করলেন [illegible] উইলসন

আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মনোবৃত্তি নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে এর বেশী আর কিছু আশা করা যায় না।

বোম্বাইয়ের শ্রমিক ও কৃষক দলের সম্পাদক এইজন্য মিঃ ঘাটে [illegible] প্রতিবাদ করে শ্রীযুত প্যাটেলকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে এমন কথাও বলা হয়েছিল যে যদি স্বেচ্ছাসেবকের অভাব হয় তবে বোম্বাইয়ের ১০০০ শ্রমিক এখনই তাদের কৃষক ভ্রাতাদের সাহায্যের জন্য যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু এ কথায় স্বরাজী নেতারা কর্ণপাত করেন নি। মিঃ ঘাটের কথা যদি শুনা হ'ত তাহ'লে বারদোলির সত্যাগ্রহ সংগ্রাম প্রকৃত বিপ্লবের পথে চালিত হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি বলেছিলেন যে শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত হ'লে কৃষকরা বাজেয়াপ্ত জমীর ফসল জোর ক'রে কেটে আন্‌বে এবং এ বিষয়ে বোম্বাইয়ের শ্রমিকরা তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। এর ফলে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কৃষকদের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ত সন্দেহ নেই এবং সেই সংঘর্ষে কৃষকদের জয় হত কি পরাজয় হ'ত তা বলা যায় না বটে কিন্তু পরাজয় হ'লেও তাদের মধ্যে যে বৈপ্লবিক শক্তির স্ফুরণ হ'ত তাহার মূল্য অনেক। আমরা জোর ক'রে বলে আস্‌ছি যে বিপ্লব ব্যতীত ভারতের মুক্তি অসম্ভব এবং জনসাধারণকে এই বিপ্লবের পথে চালিত করাই আমাদের চরম লক্ষ্য। পৃথিবীর ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করবেন যে বিপ্লব ব্যতীত নিপীড়িত জনসাধারণ তাদের অধিকার ফিরে পেতে পারে না। এখন কি কর্ত্তব্য? আমরা আশা করি বারদোলির কৃষকগণ কংগ্রেস নেতাদের ধাপ্পাবাজীতে না ভুলে বিপ্লববাদী নায়ক গণের নেতৃত্ব স্বীকার ক'রে কঠোর সংগ্রামের জন্য পুনরায় প্রস্তুত হবে এবং সরকারী তদন্ত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধিকার লাভের জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করবে। সারা ভারতের কৃষক ও শ্রমিকদল তাদের পশ্চাতে যোগদান করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রমিক-দলন আইন

—:•:—

এ কথা সত্য যে মজুরগণ পৃথিবীর সকল দেশেই শোষিত ও নির্য্যাতিত হয়ে থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষে শোষণ আর নির্য্যাতনের মাত্রা আর সব দেশ থেকে ঢের ঢের বেশী। এদেশে মজুরদের খাওয়া, পরা ও থাকার বন্দোবস্তটা অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারা যায় যে মানুষ মানুষের কত শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটাতে পারে! বিদেশী ও দেশীয় ধনিকগণ মজুরগণকে ঘর নামক যে জায়গা গুলোতে থাকতে বাধ্য করে সে গুলোতে মানুষ ত দূরের কথা পশুরও স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে না। তার পরে খাওয়া-পরার অবস্থাও শোচনীয়। যা খেয়ে আমাদের মজুরগণকে বাচতে হয় বৈজ্ঞানিক ভাবে বিচার করতে গেলে তা খাদ্য নামেই অভিহিত হতে পারে না। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের অবস্থা আরো বেশী শোচনীয়। এই সকল অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে মজুররা যখন সংগ্রাম চালাতে প্রস্তুত হচ্ছে তখনি ভারতের শোষণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট "ট্রেড ডিস্‌পিউট্ বিল" নাম দিয়া একটা নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এই খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থা সভায় পেশ ক'রে আইনে পরিণত করা হবে। এ আইন পাস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া। আমরা বারে বারেই বলেছি যে বৃটিশ ধনিকগণ শোষণের জন্যেই ভারতবর্ষকে শাসন করছে। ভারতবর্ষে যদি মজুর আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে তা হলে বৃটিশ ধনিকগণকে ভারতের আশা ত্যাগ করতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ শোষণ-বাদের ক্ষমতা একমাত্র ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকগণের নেতৃত্বাধীনেই যে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তা বৃটিশ ধনিকগণ খুব ভালো রূপেই জানে। তারি জন্যে তারা শ্রমিক আন্দোলনকে নষ্ট ক'রে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। শ্রমিকগণকে শোষণ করার ব্যাপারে ভারতীয় ও বৃটিশ ধনিকগণের স্বার্থ একেবারেই অভিন্ন! কাজে কাজেই বর্ত্তমান আইন পাস করিয়ে নেবার কাজে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ধনিকগণের ও পূর্ণ সমর্থন পাবে।

এই আইনের দ্বারা শ্রমিকগণকে চিরদিনের জন্যে দাসখৎ লিখে দিতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনের একমাত্র অস্ত্র ষ্ট্রাইক বা ধর্ম্মঘট শ্রমিকরা আর সহজে করতে পারবে না। এক মাসের নোটিশ নিয়ে তাদিগকে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতে হবে। তা-ও আবার চালাতে হবে অনেক প্রকার আইনের বাধার ভিতর দিয়ে। এতটুকু এদিক ওদিক করলেই হয়তো জেলে যেতে হবে, কিংবা জরিমানা দিতে হবে, নতুবা উভয় প্রকার দণ্ডেই দণ্ডিত হতে হবে। প্রকৃত ধর্ম্মঘট-কারীর সাজা হবে কম, আর বাইরে থেকে যাঁরা মজুরগণকে সাহায্য করতে আসবেন তাঁদের সাজা হবে বেশী। এক জায়গার মজুরগণ অন্য জায়গার মজুর ভাইগণকে ধর্ম্মঘটের সময় কোনো প্রকারে অর্থ সাহায্য করতে পারবে না। আইনটি শুধু এতেই ক্ষান্ত হয় নি, "অনুসন্ধান আদালত" ও "মীমাংসা বোর্ড" নামক আরো দু'টি শানিত অস্ত্রও শ্রমিকগণের মাথার ওপরে ঝুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। এ দু'টি জিনিসেরও মজুরগণকে দলন করার জন্যে অপরিসীম ক্ষমতা থাকবে। মোট কথা, মজুর আন্দোলনকে যেমন করেই হোক, নষ্ট ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই আইনটি পাস হতে যাচ্ছে। ধনিকগণ তাদেরি দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেণ্টকে হাত ক'রে মজুরগণকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহ্বান করেছে। বাস্তবিক ভারতের শ্রমিকগণের পক্ষে একটা শক্তি পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়েছে।

এখন উপায় কি? এর একমাত্র উপায় হচ্ছে, সমগ্র ভারতবর্ষের সকল শ্রমিক কেন্দ্রের শ্রমিকদিগকে এক মত হয়ে একই সময়ে ব্যাপক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা। যতক্ষণ না এই আইন তুলে নেওয়া হবে, যতক্ষণ না শ্রমিকদিগের অন্য সব দাবী-দাওয়া পূরণ করা হবে, ততক্ষণ এই ব্যাপক ধর্ম্মঘট চালাতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ধনিকগণ ভারতীয় শ্রমিকগণকে ভারবাহী পশু বলেই মনে করে থাকে। এবার কিন্তু, তা-দিগকে দেখিয়ে দিতে হবে যে তাদের শক্তি কত বেশী।

"ট্রেড ডিস্‌পিউট্ বিল" তুলে নেবার জন্যে ভারতের সমগ্র শ্রমিকগণকে সমবেত ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হবে। এই সংগ্রাম চালাবার সময় নিম্নলিখিত বিষয় গুলির ওপরে জোর দিতে হবে:—

(১) ইউনিয়নের মেম্বর বাড়াবার জন্যে সমবেত ভাবে প্রচেষ্টা;

(২) যেখানে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি সেখানে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা;

(৩) কারখানার শহর সমূহে ট্রেড কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা;

(৪) যদি এক একটা শিল্পের জন্যে একাধিক ইউনিয়ন থাকে সে সকল ইউনিয়নকে একীভূত করা;

ব্যাপক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করার সময় আরো দাবী করতে হবে:—

(ক) ট্রেড ডিস্‌পিউট্ বিলের প্রত্যাহার;

(খ) সমস্ত ইউনিয়নকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা;

(গ) বেতনের নিম্নতম হার (মাসে অন্ততঃ ৩০ টাকা) আইনের দ্বারা ধার্য্য করিয়ে নেওয়া;

(ঘ) সার্ব্বজনীন ভোটের অধিকার।

আমাদের সম্মুখে বড় সঙ্কটের সময় উপস্থিত হয়েছে। এ সময় আমাদিগকে মরিয়া হয়ে কাজে লাগতে হবে। "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর সভ্যগণের নিকটে আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁরা এ সময়ে উঠে প'ড়ে কাজে অবতীর্ণ হউন। তাঁরা যেন মনে রাখেন যে এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের আর সকল দলের চেয়ে "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর দায়িত্ব অনেক বেশী।

আগামী সপ্তাহে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করব।

ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন

(আবদুল হালীম)

—:•:—

ইটালির ফ্যাসিজম্ ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষার্থে প্রত্যেক দেশের ইম্পিরিয়েলিষ্ট গবর্ণমেণ্টই ফ্যাসিজমের সমর্থন করিতেছে। ফ্যাসিজম ও যুদ্ধ এই দুইটি বিষয় এক্ষণে খুব

[illegible] উঠিয়াছে। ইটালির ধনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পূর্ণ সাহায্য-বলে ফ্যাসিজমের উত্থান হয়। ইহাদের [illegible] যুদ্ধের পর ধনিক, জমীদার ও [illegible] সামরিক কর্ম্মচারীর অভাব এবং ইহাদেরই [illegible] সহায়তা হয়। [illegible] প্রতাপ, [illegible] আন্দোলিত [illegible] মুসোলিনী [illegible] ১৯২০ [illegible] ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন নামে [illegible]। [illegible] মুসোলিনী নিজে তাহার 'ইটালিয়ান সার্ভিস মেন্‌স ইউনিয়ন' (Italian Service Men's Union) প্রতিষ্ঠা করেন। [illegible] সময় [illegible] ফ্যাসিষ্টদের [illegible] কিন্তু ফ্যাসিষ্টরা [illegible] প্রতিক্রিয়াশীল [illegible] তাহারা সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রতি [illegible] ছিল। আমাদের দেশের অনেকে ফ্যাসিজম ও মুসোলিনীর প্রশংসা [illegible]। ইঁহাদের মতে মুসোলিনী ইটালির [illegible] উদ্ধারক ও [illegible]। "মুসোলিনীর শাসনে ইটালিতে সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে"। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি ফ্যাসিজম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও ফ্যাসিজম যে ধনিক ও জমীদারদের দ্বারা পরিচালিত এবং সমর্থিত একটি বিরাট আন্দোলন সে বিষয়ে একটুকু সন্দেহ নাই। যুদ্ধ-প্রপীড়িত, দুর্দ্দশা কাতর, মধ্যশ্রেণী, সামরিক কর্ম্মচারী প্রভৃতি এই আন্দোলনের সেনানী। বিশেষ করিয়া কলকারখানা, শিল্প অনুষ্ঠান প্রভৃতির মালিকদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এই আন্দোলন স্থাপিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের সময়ে জমীদার পুত্র, যুদ্ধ প্রত্যাগত সামরিক কর্ম্মচারী নিম্ন মধ্য শ্রেণীর লোকের দ্বারা ফ্যাসিষ্ট সংঘ গুলি কোলাহল-ময় হইয়া উঠিয়াছিল। এক সময়ে শ্রমিকগণও তৎকালীন সোশ্যালিষ্টগণও এ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই ও অতি সামান্য ঘটনা। ধনিকদের আর্থিক সাহায্যে ফ্যাসিজমের গোড়া পত্তন হয় এবং তাহাদের স্বার্থের খাতিরে ধনিকদলের জন্যই রাজনীতিক ক্ষমতাগুলিও আয়ত্ত করা হয় এবং ইহার পূর্ণ সুবিধা তাহারা উপভোগ করিতেছে। ইটালিতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে দমন করা হইয়াছে। মুসোলিনীর লৌহহস্ত সর্ব্বপ্রথম দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদের উপর পতিত হয়। শ্রমিক-আন্দোলন প্রয়াসী নেতৃবর্গের উপর দীর্ঘ কারাবাস, নির্ব্বাসন, ও নির্ম্মম অত্যাচার, নির্য্যাতন করা হয়। বহু সোশ্যালিষ্টকে ইটালি হইতে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং অনেককে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। মুসোলিনীর শাসনে সোশ্যালিষ্ট ও শ্রমিক আন্দোলন দলন পূর্ণরূপে চলিয়াছে। মুসোলিনী কৃষকদের দমন করে সহস্র প্রকার চণ্ড-নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। জেলের অমানুষিক অত্যাচারে শ্রমিক নেতৃবর্গ জর্জ্জরিত হইয়াছে। অনেকে কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে।

শ্রেণী সংগ্রাম বিরোধী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ধনিক সম্প্রদায় জগতের সর্ব্বহারা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইটালি কৃষি প্রধান দেশ। এখানকার শতকরা ষাট জন অধিবাসী চাষী। তাহাদের সহায়তায় ফ্যাসিষ্ট গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধনীর আওতায় আসিয়া [illegible] উন্নতি হইয়াছে। কৃষকদের সম্বন্ধে [illegible] অনেকেই [illegible] ফ্যাসিষ্ট গবর্ণমেন্ট [illegible] হয়—মুসোলিনীর শাসনে [illegible]দের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নাই। [illegible] কৃষকগণ বহু ঋণ-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের উপর অনেক নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। [illegible] ট্যাক্স, প্রাদেশিক ট্যাক্স, [illegible] (স্থানীয়) ট্যাক্স। [illegible] গবর্ণমেন্ট [illegible] ট্যাক্স স্বরূপ কৃষকদের সম্পত্তি [illegible] উপর ট্যাক্স আদায় করে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট Supplementary ট্যাক্স আদায় করে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট [illegible] উপর ও মাথা পিছু পরিবারের প্রত্যেক লোকের ট্যাক্স আদায় করে। [illegible] ট্যাক্স কৃষকদের দিতে হয়। জমিতে উৎপন্ন শাক-সব্জী পর্য্যন্ত তাহাদের বাজারে লইয়া যাইবার অধিকার নাই। কৃষকদের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান গুলিকে ধ্বংস করিয়া ফ্যাসিষ্ট গবর্ণমেন্ট জমিদারদের প্রভূত সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এইতো গেল ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনীর গণ-প্রীতির পরিচয়।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ফ্যাসিজমের সাফল্যে আনন্দ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। মুসোলিনী তাঁহাদের আদর্শ। আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলন কংগ্রেসের ভিতর এক শ্রেণীর ভদ্র মানসিকতা ফ্যাসিজমের পূর্ণ সমর্থক। তাঁহারা প্রচার করেন যে "আমরা শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করি না।" তাঁহাদের মতে শ্রমিক আন্দোলনের নেতাগণ ধনিকের ও শ্রমিকের মধ্যে খামকা একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহারা বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণীর জন্যই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চাহেন। কংগ্রেস ধনিক ও বুর্জোয়াদের অর্থেই পরিপুষ্ট। তাঁহারা শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধী অথচ ধনিকদের সমর্থন করে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন চালাইতে একটু পশ্চাদপদ নহেন। মুসোলিনীর আদর্শ তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এবং তাঁহারা মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন চালাইতেছেন। শ্রমিকদের ধার তাঁহারা ধারেন না।

আমাদের বৃটিশ শোষণ-বাদী শাসক ও ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা করে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ১৯২৬ সালের বিলাতে জেনারেল ষ্ট্রাইকের সময় বৃটিশ ধনিকদের অর্থে পুষ্ট ফ্যাসিষ্ট দল ধর্ম্মঘট ভাঙিয়া দিতে প্রভূত চেষ্টা করে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বৃটিশ শোষণ বাদিক গবর্ণমেন্ট শ্রমিক আন্দোলনকে টুঁটি টিপিয়া মারিবার জন্য ফ্যাসিষ্ট ধনিক-বণিকদের সাহায্য করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। ফ্যাসিজমের সমর্থন করে গবর্ণমেন্ট বণিক সংঘকে সহায়তা করিতেছে। ফ্যাসিজমের রক্ষা করে, সরকারী পুলিশ, ফৌজ, গোলা-গুলি, অসহায় দরিদ্র শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি ফ্যাসিষ্ট ধনিকদের চেষ্টায় ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বিরোধ-আইন প্রণয়ন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। 'ট্রেড ডিস্‌পিউট্‌ বিল' পাস করিয়া গবর্ণমেন্ট

শ্রমিক আন্দোলনকে পঙ্গু করিয়া দিতে কৃত সংকল্প হইয়াছে। বৃটিশ শোষণ-বাদ সুবিধা মত ফ্যাসিজমের সাহায্যার্থ অর্থ ব্যয় করিতেও কুন্ঠিত হইতেছে না। চীন, জাপান, জাভা, পোলাণ্ড, ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানেও ফ্যাসিজমের সমর্থন কল্পে তাহারা রাশি রাশি মুদ্রা ব্যয় করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে জগতে ফ্যাসিজম ও যুদ্ধ এই দুটি বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পোলাণ্ডে ম্যার্শাল পিলস্থ ডুস্কী ও লিথোনিয়ার ফ্যাসিষ্ট নেতা পুটস্ এর চাল-বাজীতে বাল্টিক ষ্টেট্ গুলিতে ও মেকো-স্লাভিয়াতে ফ্যাসিজমের সৃষ্টি হইতেছে। দুনিয়ার সমস্ত দেশে ফ্যাসিজমের ঢেউ অল্প-বিস্তর প্রবাহিত হইতেছে। য়ুরোপের সমস্ত দেশে ধনিকদের প্ররোচনায় গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে 'ফ্যাসিজম' মাথা তুলিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। এমন কি সুদূর পল্লী অভ্যন্তরেও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। আন্তর্জাতিক ব্যাপার হিসাবে ফ্যাসিজমের একটা সাধারণ মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। ফ্যাসিজম গণ-তান্ত্রিক ও তদভাবাপন্ন শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ফ্যাসিজমের মূল প্রচার নীতি হইতেছে ডিমো-ক্রেসীর বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও নিন্দাবাদ প্রচার করা, তাহা ছাড়া ডিমোক্রেসী যে সর্ব্ব অমঙ্গলের ক্ষেত্র তাহাও পৃথিবীর ধনিক বৃত্তি-ভোগী সংবাদ পত্র গুলি দিবারাত্রি প্রচার করিতেছে। শক্তিমান জাতীয় গবর্ণমেন্টের নামে ফ্যাসিজম শ্রমিকদের স্বার্থ সীমাবদ্ধ ও এমন কি তাহাদের অধিকার অস্বীকার করিতেছে। এবং তাহাদের গবর্ণমেন্টের উপর হস্তক্ষেপ ব্যাপারে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দিতেছে। ফ্যাসিজম ধনিক ও মালদারদের পক্ষ হইতে একাধিপত্যের চূড়ান্ত করিতেছে। পৃথিবীর যেখানে শ্রমিকগণ তাহাদের মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত আছে, ফ্যাসিজম সেখানে তাহাদের ধ্বংস করিয়া দিবার মতলবে নিদারুণ অত্যাচার, নির্য্যাতন করিতেছে। শুধু যে ফ্যাসিজম, বিপ্লব-মূলক গণ-আন্দোলন দমন কল্পে কঠোর নীতির প্রবর্ত্তন করিতেছে তাহা নহে, পক্ষান্তরে যে কোনো গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকূল আচরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে। ফ্যাসিজম ধনিক-বাদকে রক্ষা করিতেছে ও পক্ষান্তরে শ্রমজীবীদের বিপ্লব-আন্দোলনকে পূর্ণ বিক্রমে আক্রমণ করিতেছে। "পৃথিবীর নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত, শোষিত শ্রমিক ও কৃষককুল যখন তাহাদের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানের জন্য একত্রিত হইতেছে, ফ্যাসিজম তখন ধনীদের প্রতিপালন ও রক্ষা-কল্পে তাহাদের যাবতীয় শক্তিকে তাহাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছে। ফ্যাসিষ্টদের আসল মতলব ও উদ্দেশ্য সমাজের পরগাছা, সমাজের ব্যাধি-ক্ষত ধনিক ও জমিদার শ্রেণীদের স্বার্থ ও পূর্ণ ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা এবং যাহাতে তাহাদের অখণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য ও শ্রমিকদের সমবেত আক্রমণ হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহারা রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে।

যুদ্ধের পর ইটালি প্রভৃতি দেশের আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। দেউলিয়া ধনিকদের উদ্ধার কল্পে তখন ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন আরম্ভ হয়। 'ফ্যাসিজম' বুর্জোয়া গবর্ণমেন্টের আর একটা নব আকৃতি। বুর্জোয়াগণ তাহাদের স্বার্থের জন্য দুঃসাহসী পেটি-বুর্জোয়া, অনশন-ক্লিষ্ট শিক্ষিত সর্ব্বহারা ও সমাজচ্যুত শ্রেণী বিশেষকে এই আন্দোলনে মাতাইয়া একটা বিপ্লব ও একাধিপত্যের দ্বারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রামকে জলধিগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া তাহাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দলে টানিয়া সংগ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহে সর্ব্বহারা শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায় যাহাতে একটা আন্ত-র্জাতিক আন্দোলন চালাইতে না পারে তজ্জন্য অনেক বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে। য়ুরোপের পোলাণ্ড, লিথোনিয়া প্রভৃতি দেশের ফ্যাসিষ্টরা যে শুধু জমিদার ও ভূম্যাধিকারীদের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেছে তাহা নহে, বৃটিশ, আমে-রিকা, প্রভৃতি দেশের শোষণবাদী গবর্ণমেন্টের ও ধনিকদের নিকট প্রভুত আর্থিক সাহায্য পাইতেছে। পরাধীন, পরপদানত, অবহেলিত শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ফ্যাসিজম শোষণবাদীদের হাতের একটা ভীষণ অস্ত্র. এবং শোষণবাদীগণ ফ্যাসিজমকে সম্বল করিয়া ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পৃথিবীর ধনিক শোষণবাদী গবর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে নানা অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যবসার বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য তাহারা দল পাকাইতেছে। জাপান, আমেরিকা, বৃটেন, ইটালি, ফ্যান্স ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি যুদ্ধোপকরণ তৈরী করিতেছে। বিমানপোত, ট্যাঙ্ক, কামান সাবমেরিণ, হেভিগান, বিষাক্ত-গ্যাস প্রভৃতি সামরিক উপকরণ হরদম প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধ বাধিলেই হয়! তবে একটি কারণে তাহাদের চিত্তে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে ও বিরত হইতেছে। তাহারা ভাবিতেছে পৃথিবীর নির্য্যাতিত শ্রমিক ও কৃষকগণ যুদ্ধের যাবতীয় সুবিধা গ্রহণ করিয়া, হয়তো এই অস্ত্র শস্ত্র তাহাদেরই উপর আরোপ করিতে ছাড়িবে না। তাহাছাড়া রাশিয়াতে সোভিয়েট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই বিশ্বে একমাত্র শ্রমিক ও কৃষক শাসিত গবর্ণমেণ্ট। আজ তাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার জন্য যুদ্ধের বেড়াজাল তৈরী হইতেছে। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সহিত বাণিজ্য সন্ধি রদ করিয়া দিয়াছে। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চলিতেছে ও ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন দলনের বহুবিধ প্রচেষ্টা উদ্ভাবিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া চীন দেশে বৃটিশ শোষণবাদী গবর্ণ-চীনের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহস্র প্রকার বাধা দিতেছে। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুতে ব্যস্ত রহিয়াছে। আফগানিস্থানকে দলে টানিবারও চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু আশার কথা প্রত্যেক দেশে শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া ফ্যাসিজম ও ইম্পিরিয়েলিষ্টদে বিরুদ্ধে তাহাদের স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইতে বদ্ধপরিকর হইতেছে। যদিও ভবিষ্যতে আর একটা ভারী ইম্পিরিয়েলিষ্ট যুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে তবে একমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের সমূহ শক্তি তাহার পথে অন্তরায় হইয়াছে। ফ্যাসিজমের মূল মন্ত্র হইতেছে শ্রমিক ও কৃষকদের সমূলে বিনষ্ট করিয়া ধনিক অভিজাত দলের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা ও তাহাদের রাজত্বকে অটুট রাখা। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবযুগে তাহা সম্ভবপর নয়। শোষণবাদী শাসকদের স্ব স্ব অস্ত্র তাহাদের ঘাড়ে নিপতিত হইবেই। সংঘবদ্ধ, সংগ্রামশীল, শ্রমিক ও কৃষকসম্প্রদায় মানবের হিতৈষী কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে জগতের গণ-মুক্তির জন্য বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একমাত্র মিলিত কৃষক শ্রমিক শক্তির বিপ্লব সমরে ফ্যাসিজমের চিহ্ন ধরিত্রী পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে।

জাতীয়তাবাদ ও গণ-তন্ত্রবাদ এবং সমাজিকবাদ দুইটি পৃথক জিনিস। একটির উদ্দেশ্য হইতেছে ধনিকের স্বার্থ রক্ষা করা আর একটির লক্ষ্য হইতেছে জগতের শোক দুঃখের অবসান করিয়া গণ-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা।

লিলুয়া

ই. আই. রেলের ধর্ম্মঘটের শোচনীয় পরিণতি শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের কি শিক্ষা প্রদান করেছে তা' আলোচনা করবার সময় এসেছে।

গোড়াতেই স্বীকার করতে হবে যে লিলুয়া কারখানার ধর্ম্মঘট অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কারণ গোড়াতেই বুঝা উচিত ছিল যে সমস্ত লাইনে ধর্ম্মঘট বিস্তৃত না হ'লে একটা কারখানার ধর্ম্মঘটের দ্বারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু আদায় করা সম্ভব নয় এবং ই, আই, আর লাইন যেরূপ অসংবদ্ধ ও অসংগঠিত তাতে লিলুয়াতে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করার আগে এ সব বিষয়ে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে সহযোগী ষ্টেট্‌স্‌ম্যান যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে এই ধর্ম্মঘটের জন্য বাহিরের নেতৃগণ দায়ী তাহা মিথ্যা, কারণ ধর্ম্মঘট বাহিরের নেতারা করতে বলেন নি। কারখানার লোকেরা অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে আপনা থেকেই যখন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দিয়েছিল তখন মিঃ মিত্র ও অন্যান্য নেতৃগণ তাহাদের সাহায্য করিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হবার পরই যে পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল মিঃ মিত্র তাহা করেন নি। লিলুয়ার ধর্ম্মঘট আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ মিত্রের উচিত ছিল লাইনে বেরিয়ে পড়া এবং সমস্ত লাইনে না হ'লেও ই, আই, আরের সমস্ত লোকো ও ক্যারেজ কারখানার লোকদের বাহির করে আনা। তা না ক'রে হাওড়ার বার্ণ, জেসেপ প্রভৃতি প্রাইভেট কোম্পানীগুলির কারখানায় ধর্ম্মঘট করান যুক্তি সঙ্গত হয় নি। আর যদি হাওড়া ও নিকটবর্ত্তী স্থানের সমস্ত শ্রমিকের সহানুভৌতিক ধর্ম্মঘটের দ্বারা কর্তৃপক্ষকে মিটমাটে বাধ্য করা সমীচীন বোধ হয়ে থাকে ত গঙ্গার দু'ধারের সমস্ত চটকল গুলিতে ধর্ম্মঘটের বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত ছিল! তা' করা হয় নি।

কিন্তু এরূপ সহানুভৌতিক ধর্ম্মঘটের চাইতে ঢের বেশী কাজ হ'ত যদি ইউনিয়নের সমস্ত শক্তি প্রযুক্ত হ'ত লাইনে ধর্ম্মঘটের বিস্তারের প্রতি। লিলুয়ার ধর্ম্মঘটের সঙ্গে সঙ্গেই, অন্তত বামুনগাছির ব্যাপারের পরেই নেতাদের উচিত ছিল লাইনে বেরিয়ে পড়া। আর এ কাজের ভার লওয়া উচিত ছিল ই. আই, আর ইউনিয়নের সম্পাদক মিঃ মিত্রের, কারণ তাঁকেই সকলে চিনে এবং তাঁহার প্রতিপত্তির দ্বারা কাজ হ'ত। সে সময় ইউনিয়নের হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল এবং সেই টাকায় লিলুয়ার অন্নসত্র না খুলে যদি হাওড়া থেকে কালকা পর্য্যন্ত লাইনে ধর্ম্মঘট বিস্তারের চেষ্টা হ'ত তাহ'লে কৃতকার্য্য নিশ্চয়ই হওয়া যেত এবং হয়ত ধর্ম্মঘটের এরূপ শোচনীয় পরিণতি হ'ত না।

কিন্তু মিঃ মিত্র লিলুয়া থেকে এক পা-ও নড়লেন না। যখন টাকা ফুরিয়ে এল এবং কারখানার লোকেরা ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে উঠ্‌ল তখন লাইনে ধর্ম্মঘটের বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। অবশ্য এ বিষয়ে "শ্রমিক ও কৃষক"দলের কতকটা দায়িত্ব আছে, কারণ এই দলের পরামর্শ মতই অবশেষে মিঃ মিত্র অনেক কষ্টে লাইনে ধর্ম্মঘটে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু তাহা এত অসময়ে ও এত শেষকালে হয়েছিল যে অণ্ডাল ও আসানসোলে ধর্ম্মঘট হ'লেও অন্যান্য স্থানে তাহার বিস্তারের সুযোগ হ'বার পূর্ব্বেই লিলুয়া আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল।

কিন্তু অণ্ডাল ও আসানসোলের ধর্ম্মঘট থেকে বেশ বুঝা যায় যে এই চেষ্টা যদি ধর্ম্মঘটের গোড়ার দিকে করা হ'ত তা' হ'লে নিশ্চয়ই সমস্ত লাইনে ধর্ম্মঘট বিস্তৃত হ'ত এবং কর্তৃপক্ষকে জব্দ করা কঠিন হ'ত না।

অবশ্যই অণ্ডাল ও আসানসোলের ধর্ম্মঘটের ফলে সেখানকার ধর্ম্মঘটীদের উপর কর্তৃপক্ষ অত্যধিক জুলুম করেছে। দুই জায়গায় শত শত লোককে কর্ম্মচ্যুত করেছে, কিন্তু যেমন এ হবে তা গোড়ার দিকে বুঝা যায় নি এবং তাই ব'লে যে এই দুই জায়গায় ধর্ম্মঘটের বিস্তারের চেষ্টা অন্যায় হয়েছিল একথা কেহ বলতে পারে না। শেষের দিকে লিলুয়ার যেরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে লাইনে ধর্ম্মঘটের চেষ্টা না করলে ইউনিয়নের কতদূর হানি হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন আসানসোল ও অণ্ডালের ধর্ম্মঘটীদের কর্ম্মচ্যুত করা হ'ল তখন তাদের ফেলে লিলুয়ার লোকদের কাজে ফিরে যাওয়া উচিত হয়েছিল কি অন্যায় হয়েছিল এ বিষয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হয়ে থাকলেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে তখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে কাজে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। এই স্থানে একমাত্র প্রশ্ন হতে পারে যে কাজে ফিরে যাবার পূর্ব্বে এজেণ্টের প্রদত্ত সম্মান হানিকর সর্ত্তে রাজী হওয়া উচিত ছিল কিনা। আমাদের মতে সর্ত্ত স্বীকার না ক'রে আত্মসমর্পণ করা ঠিকই হয়েছে।

এ বিষয়ে সমালোচনার কোন মূল্য নাই। একমাত্র এই কথাটা জোর ক'রে বলা যেতে পারে যে গোড়ার দিকে লাইনে ধর্ম্মঘটের বিস্তারের চেষ্টা না করাটা অত্যন্ত অন্যায় ও অসমীচীন হয়েছে। সময় থাকতে এবিষয়ে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ধর্ম্মঘট এরূপ বিফল হ'ত না।

এই সকল ভুল হ'ত না যদি প্রথম থেকেই ই, আই, আর, ধর্ম্মঘটের নেতা মিঃ মিত্র সহযোগীদের পরামর্শ মেনে চলতেন। কিন্তু তিনি যে তা করেন নি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কর্ত্তৃত্বাভিমানে অন্ধ হয়ে তিনি নিজেকে সর্ব্বে-সর্ব্বা মনে করেছিলেন এবং কোনও বিষয়ে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করবার প্রয়োজন আছে এরূপ মনোভাব কখনও প্রকাশ করেন নি। ধর্ম্মঘট পরিচালনা করবার জন্য একটি সুগঠিত কার্য্যকারী কমিটি সংস্থাপিত করার প্রয়োজন ছিল এবং প্রত্যেক কাজে তাহার মতানুবর্ত্তী হয়ে চলা উচিত ছিল। কিন্তু শ্রমিকদলের জয়ধ্বনিতে বিকৃত মস্তিষ্ক জটাধারী বাবা তাহা করেন নি। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজের খেয়াল মত চলেছেন, না ভেবে চিন্তে অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন এবং তাহার ফল যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনে এরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তার স্থান নাই ও যতদিন না শ্রমিকদের মধ্য হ'তে নেতা সংগ্রহ ক'রে তাদের কর্ম্মক্ষম ও শিক্ষিত ক'রে তুলা হবে ততদিন শ্রমিক আন্দোলন ঠিক পথে চালিত হবে না।

নিরক্ষর অজ্ঞ শ্রমিকগণ জটাধারী বাবাকে অবতার মনে ক'রে ভক্তি গদগদ চিত্তে তাঁর হাতে নিজেদের সমর্পণ করেছিল

—তাদের এ ভুল ভাঙ্গবার চেষ্টা তিনি কখনও করেন নি। এরূপ অন্ধ বিশ্বাসে আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এ কথা হয়ত মিঃ মিত্র বুঝতে পারেন নি নয় ত বুঝেও ন্যাকা সেজেছিলেন।

খেয়ালের বশে যে সকল অর্থহীন পন্থা মিঃ মিত্র অবলম্বন করেছিলেন তাহার অন্যতম হাওড়ার সত্যাগ্রহ। শ্রমিক আন্দোলনে সত্যাগ্রহের স্থান নাই। ইহাতে কেবল গভর্ণমেণ্টকে শ্রমিকগণের উপর অত্যাচার করবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং মারপিটের দ্বারা পুলিশ শ্রমিকগণের ধৈর্য্য ও সাহস নষ্ট করে দেয়। হাওড়াতেও তাই হয়েছিল। নিরস্ত্র শ্রমিকগণ পুলিসের লাঠির সামনে দাঁড়াতে পারে নাই। অনেকে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিল এবং ইউনিয়নের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ও তাহাদের মধ্যে ছিলেন।

আর এক কথা। ইউনিয়নের হাতে যে টাকা ছিল ও বাহির হ'তে যে টাকা এসেছিল তাহা অত্যন্ত অবিবেচনার সহিত খরচ করা হয়েছিল এবং এ বিষয়ে অগ্র পশ্চাৎ ভেবে কাজ করা হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তীব্র সমালোচনা ক'রে কোনও লাভ নাই।

ই, আই, আর ধর্ম্মঘটের ব্যর্থতা আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তাহার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে সমস্ত লাইনের লোকদের সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত না করতে পারলে কখনও সফলতার আশা করা যেতে না। ইউনিয়নের কোনও কোনও কর্ম্মী এমন কথাও বলেছিলেন যে কেবল লিলুয়ার কারখানার ধর্ম্মঘটের দ্বারাই সমস্ত লাইনের লোকদের অভাব দূর হবে। এ কথা যে কতদূর ভুল তাহা প্রমাণিত হয়েছে।

শেষ কথা। ই, আই, আর ধর্ম্মঘটের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট ভাঙ্গবার জন্য পুলিশের সাহায্যে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা ভাববার বিষয়। পুলিশের যে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে দেওয়া, শান্তি রক্ষা নয় তা স্পষ্ট বুঝা গেছে। ইচ্ছামত যেখানে সেখানে মারপিট ও ধরপাকড়ের বিরাম ছিল না। পুলিশ জুলুম চরমে উঠেছিল আসানসোলে। পুলিশের এরূপ যথেচ্ছাচার রুশীয় জারের রাজত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সীতারামপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রমিকদের সভায় পর্য্যন্ত আসতে দেওয়া হয় নি। রেলওয়ে কোয়ার্টার ও রেল লাইনের নীচের গেটগুলিকে পুলিশ ঘেরাও ক'রে লোকেদের সভায় আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। ধর্ম্মঘটের নেতারা যখন যেখানে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পল্টন হাজির। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা নিজের হাতে শ্রমিকদের মারপিট করে বেড়িয়েছে। উদ্দেশ্য পিকেটিং বন্ধ ক'রে দেওয়া। এই পুলিশ জুলুমের একমাত্র ঔষধ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে 'Workers' Defence Corps গঠন করা যারা পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারবে।

ই, আই, আর ধর্ম্মঘটের পরিণাম শোচনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শত শত লোক কর্ম্মচ্যুত, সহস্র সহস্র শ্রমিক গত পাচ মাসে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, বহুলোক আহত হয়েছে, দুইজন প্রাণ দিয়েছে, কয়েকজন কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাহাতে আপসোস করবার কিছুই নাই। যারা কষ্টভোগ করেছে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে এবং যাতে তারা হতাশ হয়ে না পড়ে তার চেষ্টা করতে হবে। অপর দিকে এই সংগ্রামে শ্রমিকরা [illegible] বৈপ্লবিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং ইহা দেখে মনে হয় যে শীঘ্রই শ্রমিক আন্দোলন প্রকৃত বিপ্লবের পথে চালিত হবে।

লেনিন এক সময় বলেছিলেন যে শ্রমিক বিপ্লব পরাজয়ের পথেই সাফল্য লাভের অবসর পায়। একথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখতে হবে।

দেশ বিদেশ

—০:*:০—

সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেস

ব্রুসেল্‌স ৯ই আগষ্ট। ব্রুসেল্‌সের আন্তর্জাতিক সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেসে উপনিবেশিক কমিটির পক্ষ হইতে লর্ড অলিভার বলেন যে *'ওয়াকিং ক্লাস সোশ্যালিষ্ট ইণ্টার ন্যাশান্যাল" ভারতের লোকেদের সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার স্বীকার করিতেছে।* তিনি বলেন তিনি ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন। *"সোশ্যালিষ্ট আন্তর্জাতিক"* ভারতবর্ষের কৃষক ও শ্রমিকদের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত তাহাদের একটি দল গঠন করিতে আহ্বান করিতেছে। তাহা অর্জ্জিত হইলেই আর্থিক মুক্তির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারিবে। লর্ড অলিভার বলেন যে "ইণ্টার ন্যাশন্যাল" মিসর ভারতবর্ষ, এবং চীনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী অনুমোদন করিতেছে। এবং সিরিয়া ও ইরাকের এখন হইতেই লিগ অব নেশনে প্রবেশাধিকার ও পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। লর্ড অলিভার আরো ও অনুমোদন করেন যে লিগের নিকট চুক্তি বদ্ধ দেশ সমূহের মূল দায়িত্ব আফ্রিকার ট্রপিকাল ও অর্দ্ধ ট্রপিকাল ও অন্যান্য উপনিবেশের নিকট বিস্তৃত হওয়া উচিত।

—০—

তুরস্কে ভাষা-বিপ্লব

লণ্ডন, ১১ই আগষ্ট

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে তুরস্কের ভাষা-বিপ্লব সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, "ল্যাটিন অক্ষর কমিশন" তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, কমিশন সর্ব্বসম্মতিক্রমে ল্যাটিন অক্ষর প্রবর্ত্তনের পক্ষে মত দিয়াছেন। বর্ণমালা, বানান এবং ব্যাকরণ প্রভৃতি সবই সমর্থিত হইয়াছে। এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, আরবীর পরিবর্ত্তে শিক্ষা যাহাতে ল্যাটিন ভাষায় সম্পন্ন হয়। এরূপ ব্যবস্থা ৭ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে।

এরূপ আশা করা যায় যে, এই বৎসর শেষ না হইতেই ল্যাটিন অক্ষর প্রবর্ত্তনের জন্য একটি নূতন আইন করা হইবে। অস্থায়ীভাবে আরবী অক্ষরের ব্যবহারই চলিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ল্যাটিন অক্ষরের প্রবর্ত্তন হয় এরূপ ব্যবস্থাও করা হইবে।

নূতন আইন অনুসারে সংবাদপত্র সমূহকেও কতক অংশ ল্যাটিন অক্ষরে লিখিতে হইবে। কমিশনের সিদ্ধান্ত সমূহ জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইবে। শরৎকালে পরিষদের অধিবেশন হইবে এবং তৎপূর্ব্বে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য এবং [illegible] জন্য উহা গ্রহণ

করিবার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রতিনিধি গণের একটি সম্মিলন হইবে।

ফেরারী মোপালা বিদ্রোহী

১৯২১ সালে মোপলা বিদ্রোহে অন্যতম ... একজন বিদ্রোহ নেতা ছিল। সে ... পুলিশের চক্ষে ধুলা দিয়া ফেরারী ছিল। সে ... করিয়া বহুদিন পর্যন্ত ফেরারী ছিল।

বোম্বাইএর মোটরের সংখ্যা

বোম্বাইতে বর্ত্তমানে মোটমাট ১০ হাজার মোটর চলিতেছে তন্মধ্যে ৭৮০ খানি লরী। ১৯২৭ সালে ১১৭০ গাড়ী, ২২৮ খানি সাইকেল এবং ৫০ খানি লরী রেজিষ্টার্ড হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৪৩৯টী মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬৬৩টি কম হইয়াছিল।

দক্ষিণভারত রেল-ধর্ম্মঘট

সংবাদ যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ কাউন্সিলের অধিবেশন বসিলে একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা দক্ষিণভারত রেল ধর্ম্মঘটের সময় গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছেন এবং ধর্ম্মঘটী নেতাগণকে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রমিক আন্দোলনকে যেভাবে পদ্দ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য কাউন্সিলের অধিবেশন স্থগিতের এক প্রস্তাব আনিবেন।

সিঙ্গার ভেলু ও সরকার

শ্রমিক নেতা সিঙ্গার ভেলু ও মুকুন্দলাল সরকারের জামীনের জন্য যে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, চিঙ্গেল পেটের ডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট অগ্য সেই দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিয়াছেন।

যুগোশ্লাভিয়ার কৃষক নেতা

এম. ষ্টিফেন রাডিচ যুগোশ্লাভিয়ার কৃষক নেতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে একটা জনতার মধ্যে তাঁহার শরীরে গুলি লাগে। সেই আঘাতের ফলেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর ফলে যুগোশ্লাভিয়াতে সিভিল ওয়ারের খুব সম্ভাবনা হইয়াছে। জার্ম্মান রাজনীতিজ্ঞ গণ বলিতেছেন যে সার্ভ ও ক্রোটদের মধ্যে বিচ্ছেদ গাঢ় হইতেছে। ক্রোটগণ বেলগ্রেড গবর্ণমেণ্টকে তাহারা দোষের জন্য দায়ী তাদের দলে রাখাতে ও তাহাদের শাস্তি না দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতেছে। সম্মিলিত দল বেলগ্রেড গবর্ণমেণ্টকে বয়কট করিতেও তাহাদের বিচার নাকচ করিতে ঘোষণা করিয়াছে।

বোম্বাই শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বোম্বাই ১২ই আগষ্ট, এখানে ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের একটি সভাতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে আইন প্রণয়ন করিতেছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব পাস হয় ও এসেম্বলির মেম্বর দিগকে উহা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রমিক নেতৃবর্গ গবর্ণমেণ্টের এই শ্রমিক আন্দোলন দলন অস্ত্র ও ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংসের প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

সাহেবের গুলিতে কুলির মৃত্যু

মাদ্রাজ ১০ই আগষ্ট মাদ্রাজ হারবারের পোর্টের ইঞ্জিনিয়ার এম মারউ, রোযাইট নামক একজন সাহেব ... হারবার কম্পাউণ্ডে অবস্থিত বাংলা হইতে গুলি বর্ষণ করিয়া মারিবার ফলে একটি হারবারের কুলিকে হত্যা করার অপরাধে মাদ্রাজে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের ... অভিযুক্ত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর নামে ৩০৪ ধারার অভিযোগ খাড়া করিয়াছেন। ১৭ই আগষ্ট মোকদ্দমার পুনরায় শুনানী হইবে।

নৌকা দুর্ঘটনা

মাদ্রাজ ১০ই আগষ্ট, একটি ... সংবাদে প্রকাশ যে একটি নৌকা দুর্ঘটনায় ৫টি লোক জলমগ্ন হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে যখন নৌকাটি ... হইতে নদীর নিম্নাভিমুখে যাইতেছিল তখন একটি ভীষণ বাতা মুখে নৌকাটি পড়িতে হয়, তখন নৌকার মাঝিরা তীরে যাইতে চেষ্টা করে কিন্তু নৌকা সমুদ্রাভিমুখে চালিত হয় আর নৌকাটি লোকজন সহ উল্টাইয়া যায় ও চূর্ণ হয়। তাহাদের শবদেহ তীরে ভাসিয়া আসে।

চব্বিশ পরগণা জেলায় কৃষকদের দারুণ দুর্দ্দশা

২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার ১৫০ খানা গ্রামের কৃষকদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২৪ পরগণায় 'নিউক্যানালের' ধারে খুনি, মধ্যগাছি, কদমপুর, মামুদপুর, বাইহুনি, প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। প্রায় ১৯ বৎসর যাবত জল নিকাশের পথ বন্ধ হওয়ার দরুণ গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশা চরমে উঠেছে। জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট নিউক্যানালের আয় বাড়াতে ব্যস্ত, কিন্তু নিউক্যানালের দরুণ দরিদ্র কৃষককুল যে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারীরও অধম হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে কর্ত্তাদের লক্ষ্য নেই। আজ প্রায় ১৯ বৎসর প্লাবনের দরুণ (অর্থাৎ কিষ্টপুর নিউক্যানাল কাটার পর) প্রতি বৎসর এই দেড় শত গ্রামের কৃষকদের শস্য হানি হচ্ছে। তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য সহস্র গুণে বেড়ে গেছে। আবেদন-নিবেদনে কোনো ফলই হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট কিংবা জমিদার এর সুমীমাংসা করতে রাজী নয়, কেননা এতে তাদের কোনো লোকসান হয় না বরং আয়ের মাত্রা বহু গুণে বেড়েই চলেছে। জোয়াল ভাঙার গেট দিয়ে জল নিকাশের পথ পলিপড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। কুলটি বা বাগবাজার 'লক গেট' খুলে না দিলে এর কোনো প্রতিকার হবে না। গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার এর কোনো প্রতিকার করতে রাজী নহে। দরিদ্র কৃষকগণ রাশি রাশি মুদ্রা রাজস্ব স্বরূপ দিচ্ছে। তারা আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করে জমিদারের বিলাসব্যসনের পয়সা জোগাচ্ছে। অথচ তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অবধি নেই।

বর্ত্তমানে এই ১৫০ খানি গ্রামের সমস্যা খুব জটিল হয়ে পড়েছে। কর্ত্তারা তো দরিদ্র কৃষকদের আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করিতেছে না। এখন এই ১৫০ খানি গ্রামের কৃষকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার উপর তাদের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। অবস্থা যেরূপ গুরুতর দাঁড়িয়েছে তাতে এখানে শীঘ্র আর এক বারদোলির পুনরভিনয় হবে বলে মনে হইতেছে। ১৫০ খানি গ্রামের লোক গুলিও একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে পড়েছে।

আগামী বারে এই সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত বিষয়ে আলোচনা করব।

ঘাটাল মহকুমায় বন্যা

ঘাটাল, ১০ই আগষ্ট। ঘাটালের নিকটবর্তী বন্যা প্রপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশায় কথা বর্ণনা করিয়া শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সংবাদ পত্র সাহায্যে জানাইয়াছেন যে প্রায় দেড় মাসই হইল বন্যায় ঘাটাল মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের কতকগুলি গ্রাম জলমগ্ন হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। পানীয় জল দূষিত হওয়াতে এই অঞ্চলে নানারোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে। কোনো পরিবারই উহার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোক দিন-মজুর, কাজের অভাবে তাহারা অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। চাষ-বাসের কিছু কাজ হইতেছে না।

পিস্তল হস্তে বালক

চট্টগ্রাম ১০ই আগষ্ট। পুলিশ আজ সকালে অন্দর কিল্লা রোডে জালাল আহমদ নামক একটি অষ্টম বর্ষীয় বালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার নিকট একটি অটোমেটিক পিস্তলও ৭টি হাতে তৈরী কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। বালক বলিয়াছে যে ঐ পিস্তল ও কার্ত্তুজ তাহার চাচা তাহাকে দিয়াছে। সে পিছনে আসিতেছে।

সিঙ্গাপুর ডক্

লণ্ডনের ১০ই আগষ্টএর খবরে প্রকাশ যে কেলগ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সিঙ্গাপুরের ডক্ নির্ম্মাণের ঠিকা দেওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিয়াছে।

জাপান ও মাঞ্চুরিয়া

লণ্ডন ১০ই আগষ্ট। রয়টারে টকিয়োর সংবাদ দাতা জানাইতেছেন যে জাপানের গবর্ণমেণ্ট পার্টির প্রধান মন্ত্রী টানাকা জাপান ও চীনের সহিত বন্ধুত্বের ও সমগ্র চীনের মিলন সম্বন্ধে জোর মত প্রকাশ করেন। তবে যাহাতে জাপানের স্বার্থ হানি না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জাপান গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত সালিশী সানন্দে গ্রহণ করেন। সাং হাইএর একটি সংবাদে প্রকাশ যে জাপান জোর পূর্ব্বক মাঞ্চুরিয়ার সহিত চীনের মিলনে কোনো বাধ প্রদান করিবে না।

আফগানিস্থানের রেল নির্ম্মাণ

বার্লিনের ৯ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে আফগান গবর্ণমেণ্ট বার্লিনের নেঙ্গ এণ্ড কোম্পানীকে আফগানিস্থানে রেলী নির্ম্মাণ ও তার রক্ষার ভার প্রদান করিয়াছেন। উক্ত কোম্পান ভাইচেরোফ ও উইড্যান ফার্মের সহিত লাইন নির্ম্মাণের কাজে সহায়তা করিবে। শীঘ্রই কতিপয় জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার প্রাথমিক কাজের ভার লইবার জন্য আফগানিস্থানে যাত্রা করিবেন।

সিঙ্গাপুরে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড

সিঙ্গাপুরের ৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, এখানে এক. ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ফলে. জনৈক চীনা ক্রোড়পতির একটি সুবৃহৎ পণ্য-বিপনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই ধনী বণিকটির নাম টানকাকী। ইহার রবার, জুতা ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় ছিল এবং যে অট্টালিকাটি অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ঐ সমস্ত দ্রব্য মজুত ছিল।

ক্ষতির পরিমাণ অনেক লক্ষ টাকা হইবে। তবে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

অতিকায় হস্তীর কঙ্কাল

বুডাপেষ্টের ৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, টিজা নদীর উপর একটি নূতন সেতু নির্ম্মানের সময় ভূমিখননের কালে একটী অতিকায় হস্তীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এই সুবৃহৎ কঙ্কালটীর মাথার খুলিটি ক্রেন বা মাল উত্তোলনের কল ব্যবহার করিতে হইয়াছে। বুডাপেষ্টের মিউজিয়মে ঐ কঙ্কালটি রক্ষিত হইবে।

নিমজ্জিত সাবমেরিণকে উদ্ধার

রোমের ৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, ৩৪ ঘণ্টা ব্যাপিয়া অবিরত চেষ্টা এবং অদম্য পরিশ্রমের ফলে নিমজ্জিত এফ ১৪ সংখ্যক সাবমেরিণটি উদ্ধার করা হইয়াছে, কিন্তু উহার সমস্ত লস্করগণই শ্বাসরোধ হওয়ার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পোতটিতে ৩৪ জন লস্কর ছিল।

ভাসমান ডকের সমুদ্র যাত্রা

সুয়েজের ৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, গত জুন মাসে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া সিঙ্গাপুরের ভাসমান ডক্ এখানে পৌছিয়াছে। ডকটি ৪ দিনে সুয়েজ খাল অতিক্রম করিয়াছে অন্য একটি পোত ইহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

ইংলণ্ড হইতে সিঙ্গাপুর নিতে এই ডকের জন্য ২০ হাজার পাউণ্ড খরচ পড়িবে এবং সুয়েজখাল অতিক্রমনের জন্যই ইহার অর্দ্ধেক টাকা খরচা পড়িবে।

কর্ড লাইনে গাড়ী চলাচল বন্ধ

ই, আই, আরের হাওড়া ও বর্দ্ধমানের মধ্যে গাঙ্গপুর ষ্টেশনের নিকট গত বুধবার রাত্রে একদল লোককে লাইনের ধারে লাইন নষ্ট করিবার চেষ্টায় রত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রকাশ যে, মেন লাইন ধরিয়া যে আপ বোম্বাই মেল যাইতেছিল, উহার ঠিক আগে আগে যে পাইলট ইঞ্জিনখানি যাইতেছিল, ঐ পাইলট ইঞ্জিনের লোকেরা ঐ লোকগুলিকে দেখিতে পায়। বর্দ্ধমান রেল পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে। ই, আই, আর কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে হাওড়া বর্দ্ধমানের মধ্যে রাত্রিযোগে যে সমস্ত আপ ও ডাউন ট্রেন যাতায়াত করিবে, ঐগুলি কর্ড লাইনে না যাইয়া মেল লাইন ধরিয়া যাইবে।

ধাঙ্গড়দিগের সাহায্য

১৬ হাজার টাকা দানের প্রস্তাব

কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ মেয়রের নিকট একটি রিকুইজিশন পাঠাইয়া অনুরোধ করিয়াছেন যে, ধাঙ্গড়দিগের সাহায্য ভাণ্ডারে ১৬ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি স্পেশাল মিটিং করা হউক।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ধাঙ্গড়দিগের সাহায্যার্থ এবং জুন মাসে যে সমস্ত ধাঙ্গড় ধর্মঘট করিয়াছিল এবং ধর্মঘট সময় পরিবার প্রতিপালনের জন্য যাহাদের ঋণ হইয়াছে, তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য ঐ টাকা ব্যয় করা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রিকুইজিশনে স্বাক্ষর করিয়াছেন :— কে, সি, রায় চৌধুরী, সামসুল হক, সুভাষচন্দ্র বসু, হেমচন্দ্র নস্কর, সন্তোষকুমার বসু, এম, দাউদ, এস, করিমবক্স, বি, সি, ঘোষ, এস, কে, রায় চৌধুরী, এম, এম, বর্মণ, জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং সুকুমাররঞ্জন দাশ।

---

৪০ জন ধর্ম্মঘটীর দণ্ড

কুড্ডালোর, ৮ই আগষ্ট

রেলওয়ে আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধে অদ্য ৪০ জন ধর্ম্মঘটী ২ মাস হইতে ৪ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মোটর ডাকাতি

লাহোর, ৯ই আগষ্ট

অদ্য লাহোর হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী মোগলপুরা রেল ষ্টেসনে একটি ভীষণ মোটর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে; এই ডাকাতিতে রেল কোম্পানীর প্রায় ৯৩০০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, লোকো বিভাগের অডিট অফিসার আফিসের দর দালানে বসিয়া কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দিতেছিলেন, এমন সময় একজন অপরিচিত শ্বেতাঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করে এবং কেরাণীকে হঠাৎ একটা গুঁতা মারিয়া কারেন্সী নোটপূর্ণ থলেটি তুলিয়া লয়। ঐ সময় নিকটে একখানা মোটর আসিয়া থামিয়াছিল, উক্ত শ্বেতাঙ্গ সেই মোটরে লাফাইয়া উঠে এবং পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কেরাণী অবিলম্বে ঐ মোটরের পাদানীর উপর উঠিয়া গাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা করে, তখন একটা ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়, কিন্তু মোটর অনেকটা দূরে চলিয়া যাওয়ার পর ডাকাতেরা তাহাকে গাড়ী হইতে ফেলিয়া দেয়। সে গুরুতর জখম হইয়া এখন অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে আছে। তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক। প্রকাশ যে ঐ গাড়ীতে একজন ভারতীয় মোটরচালকসহ আরও একজন শ্বেতাঙ্গ ছিল। এ পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই।

চুরির দায়ে সাহেব ধৃত

লাহোর, ১০ই আগষ্ট

মোগলপুরাতে গতকল্য যে চুরি হয় তৎসম্পর্কে পুলিস কার্টিস ও এলমণ্ড নামক দুই জন ইউরোপীয়ানকে মধ্য রাত্রিতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বিকাল বেলা যে ট্যাক্সির চালককে গ্রেপ্তার করা হয় সেই ব্যক্তি সাহেবদের সন্ধান দিয়াছিল। কিং কার্নিভালে উহাদের চাল-চলতি দেখিয়া পুলিশের সন্দেহ হয় এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনুসন্ধানে উহাদের নিকট হইতে চোরাই নোট অনেক পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় কার্টিস সেনাবিভাগে কাজ করিত। পরে সে ভারতীয় বিমান সেনা দলের একজন অফিসার হয় কিন্তু দুশ্চরিত্রতার জন্য তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, পরে সে রাওলপিণ্ডিতে একটি কারখানায় চাকুরী লইয়াছিল।

একটি সমগ্র দ্বীপ ধ্বংস

বাটাভিয়ার ৯ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, টাইমোরের জনৈক অধিবাসী খবর দিতেছেন যে, গত ৪ঠা এবং ৫ই আগষ্ট তারিখ আগ্নেয়গিরির ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের পালোয়েয়া নামক সমগ্র দ্বীপটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৬টি গ্রাম অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছে। এক হাজারের অধিক লোক মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আকাশে উৎক্ষিপ্ত দ্রব্যাদির আঘাতেই ৬০০ লোক মারা গিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প হওয়ার ফলে দ্বীপটির সমুদ্রতট ধ্বসিয়া সমুদ্রগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহাতে কত লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। তাহা এখনও স্থির করিতে পারা যায় নাই।

বারুদে বিপত্তি

লেডী হার্ডিঞ্জ রোডে একটি আতসবাজির গুদামে আগুন লাগিয়া লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এক বাক্স 'ক্যাপ' নাড়াচাড়া করিতে গিয়াই এই বিপত্তি হইয়াছে। গুদামে যত বাজি ছিল সব ফাটিয়া ফুটিয়া গিয়াছে, সমস্ত বাড়ীটি ভস্মসাৎ হইয়াছে। সম্পত্তি বীমা করা ছিল না।

বৃটিশ সরকার ও ইবনেসৌদ

বাগদাদের ৯ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি স্যার গিলবার্ট ক্লেটন ও ইবনসৌদের মধ্যে সন্ধির যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সীমান্তে সতর্কতা অবলম্বনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

—০—

ভারতের ভাবী প্রধান সেনাপতি

লণ্ডনের ৯ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড জ্যাকব শীঘ্রই আফিস ত্যাগ করিয়া প্রাচ্য অভিমুখে যাত্রা করিবেন। এরূপ প্রকাশ যে ভারতবর্ষের সেনাদলের ফিল্ড মার্শাল স্যার উইলিয়াম বার্ড উড অবসর গ্রহণ করিলে খুব সম্ভব স্যার ক্লড জ্যাকবই তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

—০—

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র



Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta.

২য় খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৩শে আগষ্ট ১৯২৮, ৭ই ভাদ্র, ১৩৩৫	১১শ সংখ্যা

সাহায্য প্রার্থনা

"কৃষক ও শ্রমিক দল"এর (Workers' and Peasants' Partyর) মত ও প্রচার কার্য্যের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি ও বিশ্বাস আছে তাঁদেরি অর্থ সাহায্যে "গণবাণী" বরাবর প্রকাশিত হয়েছে। এবারেও তাঁদেরি সাহায্যের আশাতেই আমরা কাগজের পুনঃ প্রচারে ব্রতী হয়েছি। এই শ্রেণীর কাগজের প্রচারের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোনো আশাত করাই যেতে পারেনা, পক্ষান্তরে কোনো প্রকারে খরচ পুষিয়ে নেওয়াটাও অধিকাংশ স্থলেই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। কাজে কাজেই লোকসান দিয়েই কাগজ চালাতে হয়। তা সত্ত্বেও কাগজ খানাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তেই হবে। জনসাধারণের জন্যে আমরাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক, বিপ্লবাত্মক ও কার্য্যকরী কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছি। "গণবাণী" এই কাজের তালিকা সকলের চোখের সামনে ধ'রে দিচ্ছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে, কেমন ক'রে আমরা সফলতা লাভ করতে পারব। এ অবস্থায় "গণবাণীর"র বেঁচে থাকার ওপরে আমাদের দেশের গণ-আন্দোলনের অনেকখানি নির্ভর করছে। কেবল মাত্র গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারাই যে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারব, এ কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন আজ আমরা তাঁদেরি নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছি। দেশের প্রত্যেক শ্রমিক, কৃষক ও যুবসঙ্ঘের সাহায্যও আমরা একান্তই চাই। সকলে তিন প্রকারে সাহায্য করতে পারেনঃ—

(১) অর্থ দ্বারা (২) গ্রাহক সংগ্রহ ও নগদ বিক্রী ক'রে দিয়ে এবং (৩) বিজ্ঞাপণ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে।

যে ভাবে যাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় সে ভাবেই তাঁরা আমাদের সাগায্য করুন।

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটী,
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

সম্পাদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

A CALL TO ACTION

Being the Resolutions and Theses passed at the Third Annual Conference of the WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL.

After years of agitation and organisation, India is still a slave-nation, is farther from freedom than ever. Why is this?

Why is the once mighty National Congress a laughing stock before the world?

Why do our leaders invariably say one thing and do another?

For a clear, consistent Marxist analysis and explanation of these disturbing phenomena,

For a clear practical lead as to what to do to remedy this state of things,

See, "A CALL TO ACTION." Price As. 8/- only.

To be had of

1. THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2/1, European Asylum Lane, Calcutta

2. THE BOOK COMPANY LTD.
4/4A, College Square, Calcutta.

HELL FOUND

Or

A COMMUNIST'S THREE YEARS IN AN INDIAN PRISON

By

S. A. DANGE

You will see here how helpless human beings are laid prostrate and beaten with shoes and sticks till they bleed, how patients in high fever are put in irons, how in the height of a Himalayan winter men are left to freeze and die.

Full of sensations and revelations.

Price Re. 1/- only.

To be had of

THE VANGUARD LITERATURE Co.
2/1 European Asylum Lane, Calcutta.

Or

THE BOOK COMPANY Ltd.
4/4A College Square, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেণ্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেণ্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেণ্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেণ্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর
সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৩শে আগষ্ট, ১৯২৮, ৭ই ভাদ্র, ১৩৩৫ | ১১শ সংখ্যা

স্বরাজের স্বরূপ

—০—

আমাদের স্বরাজের স্বরূপ কি হবে সর্ব্বদল সম্মিলনের রিপোর্টে তা প্রকাশিত হয়েছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অধ্যক্ষতায়

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু
সার আলী ইমাম
শ্রীযুত প্রধান
মিঃ শোয়েব কোরায়শী
শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীযুত মাধাওরাও আনি
মিঃ এম, আর, জয়াকর
মিঃ এন, এম, জোশী
ও
সর্দ্দার মঙ্গল সিং

কে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটি স্বরাজের একটা খড়সা প্রস্তুত ক'রে বাজারে বা'র করেছেন। মিঃ এন, এম, জোশী ব্যতীত আর সকলেরই নাম এ খসড়ায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। খসড়াটির সাফল্য সম্বন্ধে আজ ক'দিন থেকে আমাদের ধনিক ন্যাশন্যালিষ্ট সংবাদ পত্র সমূহে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। এই কাগজ গুলির মতে-পণ্ডিত মতিলাল ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ খসড়াটি প্রস্তুতের দ্বারা যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটরী অফ্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়ার দাঁতও ভেঙে দিয়েছেন। কেননা, তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতবাসী কোনো খসড়া প্রস্তুত করতে পারে নি। বিলাতের লোকগুলো এই বার দেখে নেবে যে কত ভালো খসড়া ভারতবাসী প্রস্তুত করতে পারে।

এখন দেখা দরকার, মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হওয়ার পরে এবং সাইমন কমিশন বয়কটের যুগে কি প্রকারের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, আর তার লক্ষ্যই বা কি?

বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের বেশী আর কিছুই স্বরাজের খসড়া প্রণয়নকারীরা দাবী করতে পারেন নি। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরেই তাঁরা থাকতে চান এবং তাঁদের বন্ধুত্বটা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণ-বাদের সহিত খুব পাকা-পাকিও ক'রে নিতে চান। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের এ টুকুই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হয়েছিল এই খসড়া প্রণয়নের পরে তার আর কোনো মূল্যই থাকল না। সত্য কথা বলতে গেলে দিল্লীর সর্ব্বদল সম্মিলনের পরেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের কোনো স্বার্থকতা আর থাকে নি। আসলে ধনিক ন্যাশন্যালিষ্টগণ কোনো লক্ষ্যের দিক থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের সমর্থন করেন নি। এই প্রস্তাব পাস করা এবং এর ওপরে গরম গরম বক্তৃতা করা ছিল তাঁদের একটা চালিয়াতি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দু'টি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই মাদ্রাজে তাঁরা এই প্রহসন করেছিলেন। প্রথমতঃ সাইমন কমিশনকে ভয় প্রদর্শন করা, দ্বিতীয়তঃ তাঁদের অসন্তুষ্ট অনুসরণকারিগণকে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রাখা। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ধনিকগণের যদি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য থাকত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা, তা হ'লে তাঁরা কখনো ভুলেও সর্ব্বদল সম্মিলন আহ্বান করতে যেতেন না। বিরোধী স্বার্থ বিশিষ্ট বিভিন্ন দল কখনো এক হয়ে কাজ করতে পারে না। ভারতের সকল দলের লোকই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করবে, এরূপ যাঁরা ভেবে থাকেন তাঁদের মস্তিষ্কের পরীক্ষা করানো খুবই প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগ হচ্ছে ধনিক শাসনের যুগ। দেশের জনগণ এই যুগে ধনিক

গণের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। কাজে কাজেই এই যুগে কোনো দেশের স্বাধীনতা লাভ করার মানেই হচ্ছে ধনিকগণের হাত হ'তে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। ভারতবর্ষ আবার বিদেশী ধনিকদিগের দ্বারা শোষিত ও শাসিত হচ্ছে। দেশীয় ধনিকগণের স্বার্থ খুব দ্রুতগতিতে এই বিদেশীয় ধনিকগণের স্বার্থের সহিত বিজড়িত হয়ে পড়ছে। মোট কথা, আমাদের অধীনতার বন্ধন কেবল মাত্র বাইরের নয়, ভিতর বাহির উভয় দিকের বন্ধনেই আমরা জর্জরিত হয়ে আছি। আমাদের স্বাধীনতা লাভ করার অর্থ হচ্ছে, এই উভয় প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা। বর্ত্তমান যুগে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার এ আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ স্থাপন করা ন্যায়, যুক্তি ও ঐতিহাসিক গতির দিক্ থেকে একেবারেই অসম্ভব।

কংগ্রেসের নেতৃগণ যদি সত্য সত্যই মনে-প্রাণে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাবে বিশ্বাস করতে পারতেন তবে সর্ব্বদল সম্মিলন আহ্বান করার কোনো প্রয়োজনই তাঁদের ছিলনা। দেশের জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার কাজে জনগণের সহযোগই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। শুধু যথেষ্ট বললে অন্যায় করা হয়, একমাত্র জনগণের অভ্যুত্থানেরই দ্বারা জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ কথাও সত্য যে এই প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আমাদের ঘরে বাইরে উভয় দিকেই সংঘর্ষ বাধবে।

মোট কথা, যখন তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলের কামনা ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করা তখনি কংগ্রেসের ধনিক নেতৃগণ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছিলেন কেবল মাত্র আপনাদের নীতির খাতিরে। কাজেই, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের দ্বারা যাঁরা প্রকৃত লাভবান হবেন তাঁদেরি সহযোগ যাচনা ক'রে কংগ্রেস সর্ব্বদল সম্মিলন আহ্বান করেছিলেন। অবশ্য এই সম্মিলনে তাঁরা ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজাণ্টস্ পার্টি (কৃষক ও শ্রমিক দল) ও কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রভৃতিকেও ডেকেছিলেন। কিন্তু, ধনিকদের দলের সংখ্যা বেশী জেনেই তাঁরা তা করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন কি মুক্তি নামে অভিহিত হতে পারে?

স্বরাজের খসড়া প্রণয়নকারীরা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভই আমাদের জাতীয় মুক্তিরূপে পরিগণিত হবে। তারা এতটা পর্য্যন্ত ব'লে ফেলেছেন যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন আর পরিপূর্ণ স্বাধীনতাতে তেমন কিছু পার্থক্য নেই। কিন্তু, সত্যই কি তাই? আমরা ওপরে বলেছি যে বর্ত্তমান যুগে কোনো দেশ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে বললে বুঝতে হবে যে সেই দেশে জনগণের অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্ব্বময় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়া আর কিছু যে কেন হতে পারে না তা-ও আমরা ওপরে বলেছি। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের দ্বারা কোনো প্রকারেই দেশে জনগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। কেননা, এর দ্বারা বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদ ভারতে অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে। অক্ষুণ্ণ যে থাকবে স্বরাজের খসড়ার একাদশ পৃষ্ঠায় খসড়া প্রণয়নকারীরাই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিদেশীয় ও দেশীয় ধনিক একত্র হয়ে এদেশে কারবার (অবশ্য লুণ্ঠনের কারবার) চালাবেন এবং সমবেত ভাবেই শ্রমিকগণের সহিত সংগ্রাম চালাতে থাকবেন। তাঁদের মতে কোনো দেশই এরূপ সংগ্রামের হাত থেকে রেহাই পায়নি। (এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো। আমরা কেবল মাত্র রিপোর্টের একটা অংশের সার মর্ম্ম মাত্র উদ্ধৃত করেছি। এটাকে কেউ যেন অনুবাদ ব'লে ভুল না করেন।)

এই একটি মাত্র কথার দ্বারাই কংগ্রেস ও অন্যান্য দানকদলের মনোবৃত্তি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাঁরা আবার বলেছেন—"Real problom, to our mind, consists in the transference of political fower and responsibility from the people of England to the people of India" অর্থাৎ "আমাদের মনের সত্যকারের সমস্যা হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের জনগণের হাত থেকে ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা আনয়ন করা"। কিন্তু, এটা একেবারেই মিথ্যা কথা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কোনো দেশেই জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, এদেশেও তা পারবে না। তার পরে, এটা কি সত্য কথা যে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত হয়? বৃটিশ শ্রমিক ও ভারতীয় শ্রমিক সমভাবেই বৃটিশ ধনিকের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে। বৃটিশ ধনিকগণই ভারতবর্ষকে শোষণের জন্যে শাসন ক'রে থাকেন। ভারতের শাসনের ওপরে বৃটিশ জনসাধারণের এতটুকুও হাত নেই। কাজে কাজেই বৃটিশ-জনগণের হাত থেকে ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা আনয়ন করার কথা বলার মত ধাপ্পাবাজী আর কিছুই হ'তে পারে না।

বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজম বা শোষণবাদের লৌহ-শৃঙ্খলে আমরা যে বাঁধা পড়ে আছি তারি বেদনা হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে বড় বেদনা। ঔপনিবেনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের দ্বারা আমাদের সে বেদনা কিছুতেই তিরোহিত হচ্ছে না। এর দ্বারা লাভবান ও ক্ষমতাবান হবে আমাদের সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা। অর্থাৎ আমাদের দেশের ধনিক ও জমিদারগণ। স্বরাজের খসড়ায় বৃটিশ ধনিকগণকে অভয় প্রদান করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে তাদের ব'লে দেওয়া হয়েছে যে তোমাদের শোষণ কিছুতেই ব্যাহত হবেনা। কেবলমাত্র আমরাও তোমাদের সঙ্গে সমভাবে শোষণের অধিকারী হব। এতে তোমাদের ভয়ের (Nervous হওয়ার) কোনো কারণ নেই।

আপাতদৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষণ করবার মত কিছু কিছু কথা খসড়ায় রয়েছে বটে, কিন্তু এই থাকার যে বিশেষ কিছু মূল্য নেই। সে সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করব।

ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজাণ্টস্ পার্টি (কৃষক ও শ্রমিক দল) পরিপূর্ণ স্বাধীনতালাভের পক্ষপাতী। এই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত ভারতের কোনো সমস্যারই সমাধান হতে পারে না। গোলে হরিবোল্ না ক'রে সকলেরই উচিত সকল বিষয় তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করা।

"দুধ ও তামাক"

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার)

স্বর্ণলতা উপন্যাসের গদাধর চন্দ্র বলিয়াছিলেন—"আমি দুধও খাই, টামাকও খাই।" বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনা উপলক্ষে কাউন্সিলে কংগ্রেস দল "গদাধর চন্দ্র"

সাজিয়াছেন। কংগ্রেস দলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, "আমরা প্রজার প্রতি বিচার করিতে চাই, কিন্তু সেই বিচার করিতে গিয়া যদি জমিদারের উপর অবিচার করা হয়, তবে সে বিচার অতি হীন বিচার হইবে!" কি টন্‌টনে ন্যায়জ্ঞান! জমিদারগণের প্রতি অবিচার আশঙ্কায় আশঙ্কিত এই দলের প্রকৃত মনোভাবটা কি? সাদা কথা এই যে, "আমাদের দলে বহু জমিদার আছেন তাঁহারা শ্রেণীগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত নাম যশের খাতিরে এই দলে ঢুকিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা দলের ধন-ভাণ্ডারে প্রজাশোষণের অর্থ হইতে কিছু কিছু দেন, তাহাতেই আমাদের স্বদেশ উদ্ধারের জয়েন্টষ্টক কোম্পানি চলে—তাই আমরা প্রজার ভোটে নির্ব্বাচিত হইলেও, জমিদার-দিগকে চটাইতে পারিব না!"

প্রজার উপর যে অত্যাচার হয়, তাহার জন্য জমিদার দায়ী ন'ন, বা আইন করিয়া সে অত্যাচারের প্রতিকার হইতে পারে না—এটা penalty of ignorance (অজ্ঞতার দণ্ড), এই কথাও নলিনীবাবু বলিয়াছেন। রাজনৈতিক অধিকার চাহিলে ইংরেজও তো আমাদের সেই কথাই বলে! তবে নলিনীবাবু ভরসা দিয়াছেন যে শিক্ষা না হইলে প্রজার এই অজ্ঞান অন্ধকার যাইবে না, অজ্ঞান অন্ধকার না যাইলে তাহার অধিকার পাইয়া লাভ নাই, সেজন্য গভর্ণমেণ্টের কলকব্জা একবার হস্তগত করিয়া লই, তখন লোকের চোখ ফুটাইয়া দিতে আর বিলম্ব করিব না।

অর্থাৎ নলিনীবাবুর দল ভারগ্রহণ করিলেন যে কাউন্সিলে পরের লেখা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবেন এবং তাঁহাদের রাজত্বে প্রজা একেবারে বৈকুণ্ঠবাস করিবে! এই ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে যাহারা প্রজাগণকে ক্ষেপাইয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে আনিতে চায়, তাহারা স্বরাজের শত্রু!

বাবুরা ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের বাক্যবাণ বর্ষণে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়—দেশের জনগণের চেষ্টা না হইলে স্বরাজ কোনদিনই আসিবে না। সে চেষ্টা করাইতে হইলে চালক-গণকে প্রমাণ দিতে হইবে যে তাঁহারা নিজের শ্রেণী বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য লড়িতেছেন না শুধু কথায় নয়, কাজে এই সত্য-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বাংলাদেশের জমিদারগণ ৪৬ হাজার গোমস্তা, নায়েব প্রভৃতি রাখিয়া প্রজার যে রক্তশোষণ করিতেছেন, তাহা নিবারণের কোনও উপায় আছে কি? তথা কথিত ন্যায্য পাওনার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—বৎসরে ২॥০ কোটি টাকা অন্যায় আবওয়াব আদায় কি তাঁহাদের দ্বারা বন্ধ হইবে? বাংলা গভর্ণমেণ্টের আয় ১০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে ৪॥০ কোটি টাকা ভূমি-রাজস্ব গভর্ণমেণ্ট পান, কিন্তু প্রজা দেয় ১৮ কোটি টাকা—জমিদারের লওয়া প্রায় ১০ কোটি টাকার শ্রাদ্ধ সাগরপারেই হয়—ইহাতে প্রজার অবস্থা উন্নত কি প্রকারে হইবে?

তাই যদি আজ জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা দেওয়ার কথা উঠিয়াছে—অমনি সকলে বলেন প্রজা জমি রাখিতে পারিবে না, মহাজনের হাতে সব জমি চলিয়া যাইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১৩৬ বৎসর পরে যদি প্রজার এমন অবস্থা হইয়া থাকে যে, যে-জমিটুকুর উপর তাহার নিজের এবং পরিবারের ভরণপোষণ নির্ভর ও যে-জমির এক হাতের দখল লইয়া সে ঘটিবাটি বেচিয়া মামলা করে বা খুনোখুনি করিয়া ফাঁসিকাঠে ঝোলে, সেই জমি মহাজনকে বেচিয়া ফেলিবে, তবে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই দেশের মঙ্গল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে যে সর্ত্তে অল্প খাজনায় জমিদাররা জমি বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, সে সকল সর্ত্তের একটিও তাঁহারা পালন করেন নাই। জমিতে সেচের বন্দোবস্ত, অভাবের সময় শস্যদান ও অন্যান্যভাবে প্রজা কোনও সাহায্য পায় নাই—কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাঁহারা করিয়া লইয়াছিলেন তাঁহাদের হাত হইতে শতকরা ৮২ ভাগ জমি বাহির হইয়া গিয়াছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ২ কোটি টাকা খাজনা আদায় করিতে গভর্ণমেণ্টকে এখন ১০ কোটি টাকা কমিশন দিতে হইতেছে। অথচ গোড়াতে জমিদার ছিলেন রাজস্ব সংগ্রহের কমিশন এজেণ্ট মাত্র—তাহাতে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র পাইবার কথা। কিন্তু আজ কি দাঁড়াইয়াছে?

পূর্ব্বে জমিদার গ্রামে থাকিতেন—তাঁহার নিকট হইতে প্রজারা নানাপ্রকারে উপকৃত হইত, কিন্তু এখন নায়েব গোমস্তার হাতে প্রজাদিগকে ফেলিয়া দিয়া জমিদার সহরে বসিয়া স্ফূর্ত্তি লুটিতেছেন। প্রজা না খাইয়া মরিতে চলিল, গ্রাম-ছাড়া, ভিটে-ছাড়া হইয়া সহরে মজুরি করিতে চলিয়া গেল—এদিকে জমিদারবাবু বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া লুচির ফুল্কো হজম করিতে সহরে বসিয়া কত ডাক্তার বৈদ্যের সাহায্যই না গ্রহণ করিতেছেন, মোটরে চড়িয়া কত পরিশ্রমই না করিতেছেন!

এই শ্রেণীর লোকের জন্য কংগ্রেসের কেন এত দরদ? কংগ্রেস যদি সত্যকার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া নিজেকে মনে করে, তবে এই শ্রেণীর বিলোপসাধন যাহাতে যথাশীঘ্র সম্ভবপর হয়, সেজন্য তাহার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে শুধু সমাজের উপকার তাহা নয়, জমিদারশ্রেণীরও উপকার যথেষ্ট হইবে—তাঁহারা মানুষ হইয়া, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া সমাজের কল্যাণসাধনে সক্ষম হইবেন।

"তুমিও থাক, আমিও থাকি" এই সব কথা শুনিতে ভাল ইহা দুর্ব্বলতার লক্ষণ। সমাজের অঙ্গবিশেষে "গ্যাংগ্রিণ" হইয়া থাকিলে সমস্ত শরীরটা বাঁচাইবার জন্য যদি ক্ষত অঙ্গ কাটিয়া বাদ দিতে হয়, তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলে চরমে মঙ্গল হয় না।

ম্যালেরিয়ার রোগীকে বাঁচাইতে গেলে, ম্যালেরিয়ার জাবুনের উপর দয়া রাখিলে চলিবে না। অনেকে বলেন, যে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া প্রজা এত সুখে আছে, ভারতের অন্যত্র যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে প্রজার অবস্থা ভাল কি? বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু সেখানকার প্রজার অবস্থা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা ভাল নয়। বাংলার প্রাকৃতিক সুবিধা বাংলার প্রজার অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার জন্য দায়ী। পাটের চাষ তাহার মধ্যে অন্যতম। যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে বারদোলির কৃষকগণের মত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রজা লড়িতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশে এই ভাবে লড়িতে গেলে, কাহার বিরুদ্ধে যাইতে হইবে? কংগ্রেস কি সেই জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে যাইতে পারিবেন? এই ধামা-চাপার পলিসি চলিবে না—দুকূল বজায় রাখিয়া কাজ চালাইতে পারিলে ভাবনা ছিল না কিন্তু এখন প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের নেতা-

গণকে অধিকাংশের স্বার্থের দিকেই চলিতে হইবে—আপোষের পথ নাই।

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

লর্ড অলিভিয়ারের নবমূর্ত্তি

লর্ড অলিভিয়ারকে ভারতবাসীরা ভালো রূপেই চেনেন। লেবর গবর্ণমেণ্টের আমলে তিনি ভারতের মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ২ই আগষ্ট তারিখে ব্রুসেলস্ থেকে প্রেরিত সংবাদে আমরা অবগত হয়েছি যে তিনি ঔপনিবেশিক কমিটির পক্ষ থেকে আন্তর্জ্জাতিক সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেসে এক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দাবী মেনে নিচ্ছে। তিনি আরো বলেছেন যে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে তিনি সাদরে অভিনন্দিত করছেন এবং ভারতে "ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজান্টস্ পার্টি" (কৃষক ও শ্রমিক দল) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আবশ্যকতাও তিনি অনুভব করছেন। বৃটিশ লেবর পার্টির অত্যন্ত বেশী প্রতিপত্তি দ্বিতীয় ইণ্টার-ন্যাশন্যালের ওপরে রয়েছে। এই লেবর পার্টি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ত দূরের কথা, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পর্য্যন্ত মেনে নিতেও রাজী নয়। লর্ড অলিভিয়ার শুধু যে এহেন লেবর পার্টির সভ্য তা নয়, তিনি এর নরম পন্থীদেরই একজন। কাজেই, তাঁর মুখে এ সব কথা ভূতের মুখে রাম নামের মতই শোনাচ্ছে। আজ তিনি ভারতে "ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজান্টস্ পার্টি" প্রতিষ্ঠা করার আবশ্যকতা অনুভব করছেন, কিন্তু, চার বছর পূর্ব্বে কানপুরের তথাকথিত বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার অনুমোদন ভারতের মন্ত্রীরূপে তিনিই করেছিলেন। এই মোকদ্দমায় এস, এ, ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহ্মদ, নলিনী গুপ্ত ও শওকত উস্মানী এই চারিজনের প্রত্যেকেই চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ভারতে প্রকাশ্য ভাবে ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজান্টস্ পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্যে গোপন জল্পনা করাই এই মোকদ্দমা আনয়ন করার অন্যতম কারণ ছিল। দ্বিতীয় ইণ্টার-ন্যাশন্যালের কথার কোনো মূল্য নেই। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে এই ইণ্টার-ন্যাশন্যাল যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনেক প্রচার করেছিল এবং স্থির করা হয়েছিল যে যুদ্ধ আরম্ভ হলেই ইণ্টার ন্যাশন্যাল শ্রমিকদিগকে শুধু যে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করবে তা নয়, পরন্তু, তা-দিগকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করার জন্যেও উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। কিন্তু, সত্যই যুদ্ধ যখন আরম্ভ হলো তখন দেখা গেল যে দ্বিতীয় ইণ্টার ন্যাশন্যালের জল্পনা-কল্পনার কোনো মূল্যই নেই। এর বড় বড় নেতারাই তখন যে যার মতে যুদ্ধের সমর্থক হয়ে পড়েছিল। কাজেই, এহেন ইণ্টার ন্যাশন্যালের বেদী থেকে যা ঘোষণা করা হয় তার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। বৃটিশ লেবর পার্টি আপন প্রতিক্রিয়াশীল নীতির গুণে ভারতবর্ষে সব মান-সম্ভ্রম খুইয়ে বসেছে। আজকের দিনে লেবর পার্টির প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধাও ভারতবাসীর আর নেই। সম্ভবতঃ এই নষ্ট মানের পুনরুদ্ধারের জন্যেই আন্তর্জ্জাতিক সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে উল্লিখিতরূপ ঘোষণার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

—

শ্রমিক-দলন আইন

গত সপ্তাহে আমরা ট্রেড্ ডিস্‌পিউট্ বিল সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করেছি। অন্যান্য অনেক কাগজই এ সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর লেখা-লেখি করেছে। কিন্তু, এ ব্যাপার নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে তেমন কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি আজো হয় নি। আমরা বলেছি যে শ্রমিক আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস ক'রে দেবার জন্যেই ট্রেড্ ডিস্‌পিউট্ বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এক মাত্র শ্রমিকদেরই বিরোধের দ্বারা এই বিল তুলে নিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা যেতে পারে। এখন দরকার হয়ে পড়েছে, প্রত্যেক শ্রমিককে এই বিলের বিষয়ে সচেতন ক'রে তোলা। অফুরন্ত হাণ্ডবিল ও পুস্তিকা মুদ্রিত করে শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা একান্ত আবশ্যক। এ ভাবে খবরটা প্রত্যেক মজুরের কানে গিয়ে পৌছুবে। ঠিক এমন ভাবে আন্দোলন চালাতে হবে যাতে প্রত্যেক মজুরই এই বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে পারে। আমাদের মনে হয় ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃগণ এখনো এ ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেন নি। যদি পারতেন তা হ'লে তাঁরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারতেন না। তাঁদের জানা উচিত যে সংবাদ পত্রে দু'কথা লিখলেই কিছু কর্ত্তব্যের অবসান হয় না।

—

কলিকাতার নিকটে কৃষক-দলন

২৪ পরগণা জেলার বারাসত, ব্যারাকপুর ও আলীপুর মহকুমার প্রায় ১৫০ খানা গ্রামের কৃষকদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার চলেছে। পূর্ব্বে বাগবাজার খাল, কৃষ্ণপুরের খাল, জোয়াল ভাঙ্গার খাল, চিন্তামণির খাল, কোঁচ পুকুরিয়ার খাল, ওকড়ার খাল, কিটা তলার খাল এবং সোনার খাল ইত্যাদির দ্বারা উপরিউক্ত প্রায় ১৫০ খানা গ্রামের জল নিকাশ হয়ে বিদ্যাধরী নদীতে গিয়ে পড়ত। কিন্তু ভাঙ্গর খাল ও কৃষ্ণপুর নিউকাট্ ক্যানালের সৃষ্টি হওয়াতে উল্লিখিত সমস্ত খাল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে, প্লাবনের দ্বারা এ সকল গ্রামের কৃষকদের সমূহ সর্ব্বনাশ হচ্ছে। এ সর্ব্বনাশের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্যে তারা নানা ভাবে নানা দিক থেকে আবেদন নিবেদন ক'রে আসছে, কিন্তু প্রতিকার কিছুতেই হচ্ছে না। ১৯২৬ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে জানানো হয়েছিল যে গবর্ণমেণ্ট গ্র্যাণ্ড ট্যাঙ্ক ক্যানাল খননের চেষ্টা করছেন। সেই ক্যানাল হয়ে গেলেই জল নিকাশের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই গ্র্যাণ্ড ট্যাঙ্ক ক্যানালের কোনো বন্দোবস্তই আর হয় নি। কিন্তু, তার জন্যে কৃষকরা আর কতকাল দুর্ভোগ সইতে পারে? কৃষকদের কথা এই হচ্ছে যে জল নিকাশের বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ার পরেই কেবল মাত্র কোনো খালকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তা না ক'রে কেবল মাত্র ব্যবসা বাণিজ্যটাই দেখছেন। এদিকে কৃষকদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তার প্রতি গবর্ণমেণ্টের ত কোনো নজরই নেই, কৃষকদের

রক্ত-শোষক জমীদারগণও এ সম্বন্ধে কিছু করছেন না। বর্ত্তমান সময় কৃষকরা চাইছে যে ভাঙ্গড় খাল ও নিউকাট্ ক্যানাল জল নিকাশের জন্যে ব্যবহৃত হবে, আর লক্ স্লুইচ রূপে ব্যবহৃত হবে কুলটি ও বাগবাজারের লক। এতে যদি গবর্ণমেণ্ট কান না দেয় তা হলে কৃষকরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করবে।

ঢাকার মেথর ও ম্যুনিসিপ্যালিটি

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের জেনেরেল সেক্রেটরী মুজফ্ফর আহ্মদ ও লেবর সেক্রেটারী ধরণীকান্ত গোস্বামী যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন তখন তাঁরা ওখানকার মেথরদের বস্তীগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে সমগ্র বঙ্গীয় মেথর ও ঝাড়ুদার সঙ্ঘের ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটরীও বটেন। মেথরদের ইচ্ছানুযায়ী ঢাকার করোনেশন পার্কে তাদের এক সভার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ম্যুনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ গুণ্ডা ও পুলিশের সাহায্য নিয়ে মেথরদের সভায় যেতে দেয়নি। ঢাকা ম্যুনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ হয়তো ভেবেছেন যে এ প্রকারে তাঁরা চিরকাল ঢাকার মেথরদের পদ-দলিত ক'রে রাখবেন। তা না হলে মেথরদের সভায় যোগদান করতে বাধা দেবার মানে কি? এ সম্বন্ধে ঢাকার নাগরিকগণের খুবই অবহিত হওয়া উচিত। তাঁরা যদি মেথরদের দাবী দাওয়া পূর্ণ করার জন্যে ম্যুনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য না করেন তা হ'লে ঢাকার মেথরগণকে বাধ্য হয়ে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতে হবে। সে সময়ে দুর্ভোগ ঢাকার নাগরিকগণকেই ভুগতে হবে। মেথরদের সঙ্ঘ গঠনে বাধা দেবার কোনো অধিকার ম্যুনিসিপালিটির নেই। অথচ ম্যুনিসিপ্যালিটি অনবরত বাধা দিয়েই আসছে। ঢাকার নাগরিকগণ যদি এখন থেকে এ সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন তা হলে তাঁদেরি ভোগের সীমা থাকবেনা। মেথররা যে চিরকালই চোখ বুজে অবিচার আর অত্যাচার মাথা পেতে নেবে এরূপ মনে করাই অন্যায়।

"ইয়ং কমরেড্ লীগ"

যুব আন্দোলনের প্রসার দেশে দিন দিনই বাড়ছে। কিন্তু, তাতে একটা বাস্তব জিনিস কিছুতেই মূর্ত্ত হয়ে উঠ্ছে না। তার কারণ এই যে এই আন্দোলনের মধ্যে একটা সত্য দৃষ্টির একান্তই অভাব রয়েছে। জনগণের প্রতি কোনো প্রকারের প্রবণতাই আমাদের তরুণগণ আজো প্রদর্শন করতে পারেন নি। নূতনকে, পরিণতকে বরণ ক'রে নেবার একটা আকাঙ্ক্ষার বিকাশও এ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হয় নি। সর্ব্বোপরি পেছনমুখো বুড়োগুলোর হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেবার যে প্রচেষ্টা এ আন্দোলনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক ছিল তারি অভাব এতকাল সব চেয়ে বেশী অনুভূত হয়ে এসেছে। তরুণের আন্দোলনে বিদ্রোহের কোনো চিহ্নই নেই। অধিকন্ত, তরুণরা চোখ বুঁজে বুড়োদের হুকুমই তামিল ক'রে আসছেন। তরুণদের এই দৈন্য-কলঙ্কের অপসারণ করার জন্যে "ইয়ং কমরেড্স লীগ্" গঠিত হয়েছে। কতিপয় আমূল পরিবর্ত্তনকামী যুবক এই লীগের গঠনকার্য্যে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রথমেই তাঁরা বড় বড় অক্ষরে বুড়োদের জন্যে প্রবেশ নিষেধ লিখে দিয়েছেন—নিয়ম করেছেন যে পনের থেকে তিরিশ বছরের তরুণ তরুণীরাই শুধু লীগে যোগদান করতে পারবেন। কলিকাতা, ৩৭ হ্যারিসন রোডের বাড়ীর দোতালার একখানা ঘরে লীগের আফিস খোলা হয়েছে। আমরা "ইয়ং কমরেড্ লীগ"কে প্রাণের সহিত অভিনন্দিত করছি।

ফোর্ট গ্লষ্টার ধর্ম্মঘট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—০—

ফোর্ট গ্লষ্টার জুট মিলে ধর্ম্মঘট হওয়ার পর কলওয়ালারা অন্যস্থান হইতে লোক আনাইয়া কল চালাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। ফল কিন্তু কিছুই হয় নাই। তবে পুলিসের 'শান্তি' রক্ষার ঠেলায় ও ধৃত ব্যক্তিদিগকে আজ পর্য্যন্ত হাজত হইতে বাহির করিতে না পারায় অনেকে যে একটু ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ফোর্ট গ্লষ্টার কোম্পানী কলগুলিকে চালাইবার জন্য সে দিন শিবপুরের কল হইতে কতকগুলি লোককে নানা অছিলায় বাউড়িয়ায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া আমরা সেখানে যাই ও লোকজনদের বুঝাইয়া বলিলে তাহারা তাহাদের সর্দ্দারদের উপর খুব চটিয়া যায়। শেষে তাহারা আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে হাজার টাকা দিলেও তাহারা বাউড়িয়ায় যাইয়া কল চালাইবে না। অধিকন্তু তাহারা বলে যে যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে তাহারা বাউড়িয়া শ্রমিকদিগকে আর্থিক সাহায্যও করিবে। এই ব্যাপারে কয়েকজন সর্দ্দার এবং দালাল কিন্তু আমাদের উপর খুব চটিয়া যায়। বলা বাহুল্য যে যারা নিজে শ্রমিক তাহারা কখন অন্য শ্রমিকের অনিষ্ট করিবে না, করিতে পারেও না। দালালদের কথা স্বতন্ত্র। ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র দাওয়াই ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। কল কথা বাউড়িয়ার ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি চেঙ্গাইল, চক্কাশী, শ্যামগঞ্জ, বজ্‌বজ্, রাজগঞ্জ, শাকরাইল হাওড়া এবং শিবপুর প্রভৃতি সকল স্থানের চটের কলের শ্রমিকদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। সকল স্থানের শ্রমিকরাই উহাদের সাহায্য করিতেও চায়। বাউড়িয়ার শ্রমিক ভাইদের উচিত এই সাহায্য পাওয়ার জন্য নিজেদের ভিতর হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি বাছিয়া "হপ্তার দিন" ঐ সব অঞ্চলে পাঠাইয়া দেওয়া ও অর্থ সংগ্রহ করা। লাড্‌লো জুট মিলের প্রথম ধর্ম্মঘটের সময় এইরূপেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মঘট পরিচালনা করা হইয়াছিল। তাহার ফলে সেবার কলওয়ালারা শ্রমিকদের সহিত একটা রফা করিতেও বাধ্য হইয়াছিল। বাউরিয়ার শ্রমিকদের প্রতি আজ অন্য সকল কলের শ্রমিকরা চাহিয়া আছে। সকলেই তাহাদের ক্ষমতার প্রশংসা করিতেছে। এই অবস্থায় কাহারও ধাপ্পাবাজীতে ভুলিয়া তাহারা যদি বিনা সর্ত্তে কাজে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে শুধু যে তাহাদেরই বিপদ বাড়িবে বা অন্যান্য স্থানের শ্রমিকরা অপদস্থ হইবে তাহা নহে পক্ষান্তরে বাউড়িয়ার আশে পাশে যে সব কল আছে সেই সব কলের শ্রমিকদের ও গুরুতর ক্ষতি করা হইবে। বাউরিয়ার শ্রমিকগণ অবশ্য শুনিয়াছেন এবং জানিয়াছেন যে কল বন্ধ হওয়য়র পর কলওয়ালারা কারখানার সদর ফটকে এই

[illegible] নোটিশ দিয়াছে যে "অতঃপর কল যখন চালান হইবে তখন চার দিনের পরিবর্ত্তে পাঁচদিন এক টাইম (Single Shift) করিয়া চালান হইবে।" শ্রমিকদের ইহাতে কত অধিক ক্ষতি হইবে [illegible] [illegible] অনেক অংশে [illegible] বুঝিতে পারিবেন। এক টাইম কল চালাইলে শুধু [illegible] [illegible] ক্ষতি হইবে তাহা নহে পরন্তু [illegible] শ্রমিকদের [illegible] সম্ভাবনা বাড়িবে। [illegible] শ্রমিকদের [illegible] ক্ষতি হইবে অন্যদিকে কোম্পানীর [illegible] লাভ হইবে। [illegible] আছে [illegible] যে গুলিতে এক টাইম চালান হইতেছে। [illegible] কলগুলিকে এতদিন পর্য্যন্ত যে এক টাইম চালান হয় নাই তাহার কারণ ওদিকের শ্রমিকরা উত্তরের হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের অপেক্ষা অনেকটা সমঝদার ও একতাবদ্ধ। এই ভয়েই কলওয়ালারা এত দিন তাহা করে নাই। ধর্ম্মঘট হওয়ায় এবার তাহারা প্রথমটায় কিছু অধিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহা করিবে। কারণ তাহারা জানে যে কয়েক মাসের মধ্যেই তাহাদের সে ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম যে বাউড়িয়ার শ্রমিকরা যদি [illegible] কাহারও কথায় ভুলিয়া এক টাইম কল চালাইতে রাজী হয় তাহা হইলে শুধু যে তাহাদেরই ক্ষতি হইবে তাহা নহে, বাউড়িয়ার কল চলিয়া যাওয়ার পর পাশাপাশি অন্য সকল কলেও এক টাইমের ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাতে [illegible] লোকের যে কাজ যাইবে তাহা ভাবিতেও আতঙ্ক হয়। শুধু কাজ যাওয়া নয়—সকলের মেহনতও এত অধিক বাড়িবে যে লোকজন অস্থির হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী শ্রমিকরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে কাজ ছাড়িয়া দিবে ও তাহাদের স্থান ক্রমশঃ হিন্দুস্থানী, বিলাসপুরী ও মাদ্রাজী শ্রমিকে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যে দুই চারি জন বাঙ্গালী থাকিবে তাহাদেরও দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এক টাইম কল চলিলে—

(১ম) কল চালাইবার সময় সপ্তাহে সেই ৫৪ ঘণ্টা থাকাতে কোম্পানীর কাজের কমতি কিছুই হইবে না।

(২য়) শ্রমিকদের "খোরাকী" বন্ধ করিয়াও প্রতি সপ্তাহে অনেক টাকা বাঁচাইতে পারিবে।

(৩য়) যে সব লোকের জবাব হইবে তাহাদের "হপ্তার" দরুনও অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

(৪র্থ) যাহাদের জবাব হইবে তাহারা সকলেই বেকার হইয়া পড়িবে। আবার অধিক লোক বেকার হইলেই সর্দ্দার ও ওভারসীয়রদের "ঘুষ" এবং "ডালির" উপদ্রবও ভয়ানক বাড়িয়া যাইবে।

(৫) আর শ্রমিকদের—কল চলার সময় ঠিক থাকাতে তাঁতঘর, বিমঘর, ফুঁকানলী ও সেলাইঘরে যাহারা ফুরানের কাজ ক'রে **মেহনতের তুলনায়** (বেকার লোকদের খাটুনির চাপ তাহাদের ঘাড়ে চাপায়) তাহাদের যেমন "হপ্তা" বাড়িবে না আর তেমনি পাটঘর, স্পিনিং, রোভিং ও ফিনিসঘরে যাহারা "ডেলিতে" কাজ করে তাহারা এক রোজের দাম বেশী পাইলেও "খোরাকী" না পাওয়ায় ফল সমানই হইবে। লাভের মধ্যে ছুটী কমিয়া যাইবে ও যাহাদের জবাব হইবে তাহাদের মেহনতটাও ইহাদের ঘাড়ে চাপিবে।

[illegible] [illegible] নিজেদের [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] বাউড়িয়ার শ্রমিকরা [illegible] কিছুতেই [illegible] করিবেন না। আবার [illegible] এই রূপ যুদ্ধ চালাইতে হয় [illegible] যতদিন [illegible] থাকিবেন [illegible] [illegible] হইবে যে সময় [illegible] [illegible] না পারিলে [illegible] লোককে কেবল [illegible] যাইবে না। যুদ্ধ চালাইতে হইলে পূর্ব্বেই আমাদের [illegible] সংগ্রহ করিতে হইবে। এমন কিছু অর্থ হইলে [illegible] উত্তম না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু একেবারে না হইলে চালান অসম্ভব। এ কাজ করিবে কে? ইহার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া শ্রমিকদের নিজেদেরই চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাউড়িয়ার আশপাশের কলগুলিতে আমাদের যে সব ভাইরা কাজ করেন তাঁহারা সকলেই বাউড়িয়ার এই ধর্ম্মঘটে সম্পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন। "হপ্তার" দিন তাঁহাদের নিকট যাইয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। চাই কেবল এমন [illegible] উৎসাহী, বিশ্বাসী ও পরিশ্রমশীল যুবক শ্রমিক, [illegible] ঐ সকল স্থানে যাইয়া উহা সংগ্রহ করিবেন। এখন যদি মিটিং বা বক্তৃতা করার আবশ্যকতা থাকে তবে তাহা বাউড়িয়ায় না হইয়া ঐ সকল কলের শ্রমিকদের নিকট হওয়াই আবশ্যক। বাউড়িয়ার শ্রমিক ভাইরা ইহা বুঝিয়া সময় থাকিতেই যদি কাজ আরম্ভ করেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে কদাচ তাঁহাদিগকে বিরোধী পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে না।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

বলশেভিক আতঙ্ক

(মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)

মাঝে মাঝে এদেশের ধনিক সমাজের মুখপত্রগুলির বলশেভিক আতঙ্ক অতি মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। তখন এই কাগজগুলি দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে যে কোনো প্রকার প্রচারকার্য্য চালাতে আরম্ভ করে দেয়। ১৭ই আগষ্ট তারিখে নিউদিল্লী হ'তে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা ও এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়া কমরেড্ এম, এন, রায়ের একখানা পত্রের কিছু কিছু অংশ সর্ব্বত্র প্রচার করেছেন। এই পত্রখানা নাকি বহুমাস পূর্ব্বে কম্যুনিষ্টপার্টি অফ্ ইণ্ডিয়ার সেণ্ট্রাল কমিটি ও ওয়ার্কার্স্ এণ্ড পিজাণ্ট্‌স্ পার্টি (কৃষক ও শ্রমিকদল) এর নামে প্রেরিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এই উভয় পার্টির সহিতই অত্যন্ত ঘনিষ্টরূপে সংস্পৃষ্ট রয়েছি। বাংলার ওয়ার্কর্স এণ্ড পিজাণ্ট্‌স্ পার্টি কিংবা কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া কখনো এরূপ পত্র পায়নি। যদিও সমগ্র ভারতীয় "ওয়ার্কার্স্ এণ্ড পিজাণ্ট্‌স পার্টি" এখনো গঠিত হয়নি তথাপি বিভিন্ন "ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজাণ্ট্‌স্ পার্টি" যথা সম্ভব পরামর্শ ক'রে কাজ

চালিয়ে থাকে। কাজেই এরূপ কোনো পত্র বোম্বে পার্টির নিকটে যদি আসত তা হ'লে সে খবরও বেঙ্গলপার্টিকে অবশ্যই জানানো হ'ত। (পাঞ্জাবের ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজাণ্টস পার্টি এ পত্র লেখার অনেক পরে গঠিত হয়েছে।) এ অবস্থায় "ষ্টেটস্‌ম্যান"এর দিল্লীর সংবাদদাতা এবং এসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার দিল্লী আফিস কমরেড রায়ের পত্রখানা কোথা থেকে পেয়েছে সেটা জানা একান্ত আবশ্যক। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ওয়ার্কস এণ্ড পিজাণ্টস্‌ পার্টির অনুমতি ব্যতিরেকে ষ্টেটস্‌ম্যান ও এসোসিয়েটেড প্রেস'এতে বিভিন্ন অংশ প্রকাশই বা করলে কি প্রকারে? আশা করি "ষ্টেটস্‌ম্যান" ও "এসোসিয়েটেড প্রেস"এর একটা সন্তোষজনক উত্তর দিবেন এবং অচিরেই দিবেন।

পোষ্ট আফিস আপত্তিজনক মনে ক'রে যদি কমরেড এম, এন, রায়ের পত্রখানা যথাস্থানে না পাঠিয়ে পুলিশের নিকটে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, অর্থাৎ পোষ্ট আফিস থেকে বাছাই করে পুলিশ যদি পত্রখানা নিয়ে গিয়ে থাকে তা হ'লে সংবাদপত্রের মধ্যবর্ত্তিতায় তা প্রকাশ করার মানে কি? আর প্রকাশই হ'তে যদি বাধা না থাকে তা হলে পত্রের মালিকদের পত্রখানা দেওয়া হয়নি কেন? আমি জানিনে কে এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবে—পোষ্ট আফিস, পুলিশ না ডাইরেক্টর অফ সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরো? কমরেড এম, এন, রায় যে সত্যই এ পত্রখানা লিখেছিলেন তারি বা কি প্রমাণ রয়েছে?

১৮ই আগষ্ট তারিখের "ষ্টেটস ম্যান" রায়ের আরোপিত পত্রের অংশসমূহ উদ্ধৃত করেছে। ১৯শে তারিখের "ষ্টেটস্‌ম্যান"এ এই পত্রাংশ সমূহের ওপরে "লাল ও সবুজ" শিরোনাম দিয়ে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যাবে যে—ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ও ওয়ার্কাস এণ্ড পিজাণ্টস্‌ পার্টির সভ্যদিগকে, অন্ততঃ বিশিষ্ট সভ্যদিগকে বিপন্ন করার জন্যে কোনো না কোনো জায়গায় একটা হীন প্রচেষ্টা চলেছে। উদ্ধৃত পত্রাংশের এক জায়গায় আছে:—

"An illegal organization is traditionally associated with a terrorist conspiracy, bombs and revolvers. Forced underground, the Communist Party will not make secret of its existence. No, in the least. On the contrary, through literature printed and circulated conspiratively, the existence will be made known to every worker and peasant."

"পরম্পরাগত ভাবে অবৈধ সঙ্ঘকে ত্রাসমূলক ষড়যন্ত্র, বোমা ও রিভলভারের সহিত সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। তলে তলে কাজ চালাতে বাধ্য হয়েও কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এর অস্তিত্ব সঙ্গোপন রাখতে যে হবে তা কিছুতেই নয়। পক্ষান্তরে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুদ্রিত সাহিত্যিক প্রচার কার্য্যের দ্বারা প্রত্যেক শ্রমিক ও কৃষক এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠবে।" এই উদ্ধৃতাংশের ওপরেই "ষ্টেটস্‌ম্যান" সমূহ জোর প্রদান করেছে। এই পত্রের রচয়িতা যিনিই হোন্‌না কেন, তিনি যে ত্রাসমূলক ষড়যন্ত্র, বোমা ও রিভলভার প্রভৃতির কথা বলার পরে আরো কিছু বলেছিলেন তাতে এতটুকুও সন্দেহ নাই। উদ্ধৃতাংশ পড়লে যে কেউ তা সহজেই অনুমান করে নিতে পারবেন। যাঁরা সংবাদপত্রে এ সব ছাপাতে দিয়েছেন তাঁরা দয়া ক'রে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কিছু অংশ বাদ দিয়েই ছেপেছেন। "ষ্টেটস্‌ম্যান" এই নিয়ে খুবই লাফালাফি করেছে। কিন্তু, কম্যুনিষ্টরা বিপ্লববাদী হলেও ত্রাসবাদী (terrorists) যে নয় একথা সমস্ত পৃথিবী জানে। পত্রের রচয়িতা সত্যই যদি কোনো কম্যুনিষ্ট হন তা হলে তিনি কখনো এরূপ ত্রাসনীতির কিছুতেই সমর্থ করেননি।

ওয়ার্কাস এণ্ড পিজাণ্টস পার্টি (কৃষক ও শ্রমিকদল) এই সবে ভারতের জনগণের নিকটে একটা "জনগণের জাতীয় আন্দোলনে" (Mass Nationalist Movement) এর কর্ম্ম-পদ্ধতি নিয়ে ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। এই পার্টিই কৃষক ও শ্রমিকদিগের সম্মুখে একটা বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। তারি জন্যে নানা হীন উপায়ে এই দলকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চলছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল" এর মুদ্রিত রিপোর্ট, প্রস্তাব ও কর্ম্মপদ্ধতি ইত্যাদি আমরা ষ্টেটস্‌ম্যানের নামে পাঠিয়েছিলেম। তখন "ষ্টেটস্‌ম্যান" তার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করেনি। আজ হঠাৎ এই দলের ও কম্যুনিষ্টদের কার্য্যনীতি নিয়ে "ষ্টেটস্‌ম্যান" উতলা হয়ে উঠেছে।

"ষ্টেটস্‌ম্যান" ও ধনিকগণ যতই লাফালাফি করুক না কেন ভারতের গণ-আন্দোলনকে আর যে কেউ চেপে রাখতে পারবে না, এটা যেন তারা নিশ্চিত জেনে রাখে।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল

—:*:—

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের জেনেরেল সেক্রেটরী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, লেবর সেক্রেটরী ধরণীকান্ত গোস্বামী ও লণ্ডনের লেবর রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টের ফিলিপ স্প্রাট ঢাকা ও ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন। গত ১৯শে আগষ্ট তারিখে তাঁরা কলিকাতায় ফিরে এসেছেন।

ঢাকায় তাঁরা দলের নব গঠিত শাখার কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির পুনর্গঠনেই অধিক সময় ব্যয় করেছেন।

ঢাকেশ্বরী কটন মিল

১৪ই আগষ্ট তারিখে গোপালচন্দ্র বসাক ও খগেন্দ্র বর্ম্মণের সহিত তাঁদের তিন জনাই ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকদিগের এক সভায় যোগদান করার জন্যে ধামগর গিয়েছিলেন। হরিনাথ গুহ ও প্রমোদ চন্দ্র ঘোষ আগে হতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় পাণ্ডব সাউধের বাড়ীতে সভার অধিবেশন হয়েছিল। শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও ট্রেড ডিসপিউটবিলই ছিল সভার বিশেষ আলোচ্য বিষয়। ঢাকেশ্বরী কটন মিল শ্রমিক-দিগকে অত্যন্ত কম মজুরী দিয়ে থাকে। এ মজুরী ভারতবর্ষের যে কোনো কটন মিল থেকে কম। জাতীয় শিল্পের নামে শ্রমিকদিগকে লুণ্ঠন করা হয়, কিন্তু, শ্রমিকরাই যে জাতির সত্যকারের মেরুদণ্ড সে দিকে কাহারো লক্ষ্য নেই। শুধু যে মজুরী কম দেওয়া হয় তা নয়, শ্রমিকদিগকে আরো অনেক অসুবিধার ভিতর দিয়েও দিন কাটাতে হয়:—

১। মিলের ঘরে কোনো জানালা নেই।

২ বিজলী পাখারও কোনো বন্দোবস্ত নেই। কাজেই, অসহ্য গরমের মধ্যে বসে শ্রমিকদের কাজ করতে হয়।

৩। একটুখানি বাইরে যেতে চাইলেই দরওয়ানগুলো গোলমাল শুরু করে দেয়।

৪ তুখানা তাঁতে কাজ ক'রে যে শ্রমিক বাম পুরিয়া কটন মিলে মাসে ৪০ টাকা রোজগার করেছে ঢাকেশ্বরীতে সে পাচ্ছে সবে মাসে ২২ টাকা মাত্র।

৫। শ্রমিকদিগকে নামাজ পড়তে দেওয়া হয়না।

৬। শ্রমিকদের জন্যে কোনো শ্মশান বা গোরস্থান নেই, অথচ মিলটি এমন গণ্ডগ্রামে স্থাপন করা হয়েছে যে এ দুটো জিনিস না হলেই নয়। (মিল কর্ত্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সেক্রেটরীকে এ বিষয়ে মৌখিক বলেছেন যে তাঁরা এমন একখণ্ড জমি কেনার চেষ্টায় আছেন যা একাধারে শ্মশান, গোরস্থান ও মলমূত্রের ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড অর্থাৎ মলমূত্র পুঁতে ফেলার জায়গারূপে ব্যবহৃত হবে।)

৭। নিকটে কোনো বাজার নেই। এক আধখানা দোকান ঘর আছে তাতে জিনেসের দাম অত্যন্ত বেশী।

৮। কোম্পানীর ব্যারাকে ভাড়া অত্যন্ত বেশী—উপরের তলায় ৩৲ টাকা, আর নীচের তলায় ১৷৷০ টাকা। ব্যারাকের বাড়ী অত্যন্ত বিশ্রী, দেয়ালে কোনো আস্তর নেই কাজেই দেয়ালটা ছারপোকার চিরস্থায়ী আড্ডায় পরিণত হয়েছে। বর্ষার জল ঘরের ভিতরই বেশীর ভাগ পড়ে থাকে।

৯। শ্রমিকরা কোনো ডাক্তারের সহায়তা পায়না।

এ সকল অভিযোগগুলি শ্রমিকদিগের কাছ টেকে শুনে টুকে নেওয়া হয়েছিল।

ময়মনসিংহে

কমরেড ফিলিপ স্প্রাট, ধরণীকান্ত গোস্বামী ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ১৬ই আগষ্ট তারিখে খুব ভোরে ময়মনসিংহ পৌঁছেছিলেন। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের ময়মনসিংহ শাখার সেক্রেটরী কমরেড ফয়জুদ্দীন হোসেন আগে থেকেই সাধারণ সভার বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় স্থানীয় সূর্য্যকান্ত টাউন হলে শ্রীযুত সূর্য্যকুমার সোমের সভাপতিত্বে এই সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভাপতির নির্দ্দেশ ক্রমে প্রথমে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ "কৃষক ও শ্রমিকদলের" কর্ম্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর কমরেড ফিলিপ স্প্রাট "জনগণের জাতীয় আন্দোলন" এর সহিত সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের তুলনা ক'রে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। পরের দিন তু'টার সময় "সোশ্যালিষ্ট আন্দোলন" সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যে কমরেড স্প্রাট স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। অপরাহ্ণে বিভিন্ন পাট গুদামের শ্রমিকদের নিয়ে এক সভার অধিবেশন হয়েছিল। এই সভায় কমরেড স্প্রাট, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ধরণীকান্ত গোস্বামী ও ফয়জুদ্দীন হোসেন বক্তৃতা করেছিলেন। শ্রমিকগণ স্থির করেছে যে তারা "বঙ্গীয় পাটকল সমিতি"র একটা শাখা ময়মনসিংহে স্থাপন করবে।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ উভয় স্থলেই বহু শিক্ষিত যুবক "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও ধরণীকান্ত গোস্বামীর সহিত আলোচনা করেছিলেন। কমরেড স্প্রাটের সহিতও বহু যুবক দেখা করেছিলেন। একমাত্র "কৃষক ও শ্রমিকদল"ই যে বিপ্লবাত্মক গণ-জাতীয় আন্দোলনের (Revolutionary Mass Nationalist Movement এর) কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে একথা অনেক যুবকই মেনে নিয়েছেন এবং অনেকে দলে যোগদানও করেছেন।

শ্রেণী সংগ্রাম (?)

—:•:—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জামসেদপুর লেবার এসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছেন। তিনি টাটার কারখানার শ্রমিকদিগকে খুব জোরে জোরে ধর্ম্মঘট চালাতে অনুরোধ ক'রেছেন। সংবাদ পত্রের রিপোর্ট পাঠ ক'রে আমরা জানতে পেরেছি যে অনেক শ্রমিক শ্রীযুত বসুর আহ্বানে নূতন ক'রে ধর্ম্মঘটে যোগদানও করেছে। কারামুক্ত হ'তে অবধি তিনি শুধু যে ধনিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের সংগ্রামে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপৃত ছিলেন তা নয়, শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধেও তিনি জোর প্রচার কার্য্য চালিয়ে আসছিলেন। ভারতে যাঁরা শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনার কাজে আপনাদিগকে নিয়োজিত করেছেন শ্রীযুক্ত বসু তাঁর মহারাষ্ট্র অভিভাষণে তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ উদ্গীরণ করেছেন। তাঁর মোসাহেবের দল বোম্বের কাপড়ের কলের মজুরদের ধর্ম্মঘটের নেতৃগণকে দেশদ্রোহী ও গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী ব'লে রটনা করতেও কসুর করেন নি। তাঁদের মতে ডেভিড স্যাস্থন প্রভৃতির কলগুলি জাতীয় শিল্প, আর কলের মজুরগুলি জাতির কেউ নয়! কাজেই, জাতীয় শিল্পের (?) বিত্তস্বার্থের ক্ষতি যাঁরা করতে চান তাঁরা যদি দেশ-দ্রোহী ও সরকারী বৃত্তিভোগী না হন তা হ'লে আর হবেন কে? তবে, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও কি এই দলে ভর্ত্তি হলেন? টাটার কারখানা যে জাতীয় শিল্পের একটা মস্ত বড় আড্ডা তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। শ্রীযুত বসু যে দলের লোক সেই দলই এক বাক্যে টাটার কারখানাকে জাতীয় শিল্প সম্পদ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এ কারণে এ কারখানার জন্যে ভারতের রাজস্ব থেকে পনের কোটী টাকা বৃত্তির মঞ্জুরী শ্রীযুত বসুর দল এতটুকুও আপত্তি করেন নি। তবে শ্রমিকদের জন্যে বেতনের একটা নির্দ্দিষ্ট হার ঠিক্ ক'রে দেবার বিরুদ্ধেই তাঁরা সমস্বরে মত দিয়েছিলেন। কেননা, তাঁদের মতে তাতে জাতীয় শিল্পের পরিরক্ষণ হবে। আমরা অবশ্য কোনো দেশীয় শিল্পানুষ্ঠানকেই জাতীয় শিল্প ব'লে মনে করি না। আমরা জানি, জাতীয় শাসন স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে কোনো প্রকারের জাতীয় শিল্পের কথাই উঠতে পারে না। টাটার কারবার আবার বিশুদ্ধ ভারতীয় মূলধনেও পরিচালিত হয় না। কিন্তু, তাতে কিছু দোষ নেই। ডেভিড স্যাস্থনের কলগুলি জাতীয় সম্পদ হ'তে পারলে টাটার কারখানার ত ডবল জাতীয় সম্পদ হবারই কথা। যাক্, এ সব সত্ত্বেও শ্রীযুত বসু জমশেদপুর লেবর এসোসিয়েশনের সভাপতি মনোনীত বা নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তিনি শ্রমিকদের সদল বলে ধর্ম্মঘটে যোগদান করার জন্যে যে রূপ উৎসাহিত করছেন তাতে ত মনে হয় যে তিনি যেন হঠাৎ শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু, তাঁর বক্তৃতা গুলি মনোযোগ

সহকারে পাঠ করলেই বোঝা যাবে যে তিনি ধনিকদের প্রতি সহানুভূতি হৃদয়ে পোষণ করেই শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি টাটা আয়রণ কোম্পানীর ডিরেক্টরদের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ডিরেক্টররা মন্দ লোক কিছুতেই নন্, মন্দ লোক হচ্ছে কারখানার কর্ম্মচারীরা! কী যুক্তিপূর্ণ কথা! কারখানাটা যেন বড় কর্ম্মচারীদেরই পৈতৃক সম্পত্তি, এর পরিচালনাতে যেন ডিরেক্টরদের কোনো হাতই নেই। শ্রীযুত বসু যে কথা বলেছেন তার চেয়ে মারাত্মক কথা শ্রমিক-সংগ্রামের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। তাঁর কার্য্যাবলীর আমরা যে ভাবে অনুসরণ করেছি তাতে তিনি যে ভুল ক'রে এমন কথা বলেছেন তা-ও ত আমরা মনে করতে পারছিনে। অবশ্য সত্য সত্যই ভুলেই যদি করতেন তা হলে আমাদের পক্ষে তা পরম আনন্দের বিষয় হতো।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ডিরেক্টরদের পরামর্শ না নিয়ে কোনো কাজই করেন না। বিশেষ ক'রে ধর্ম্মঘটের সময় তাঁ-দিগকে অনবরতই ডিরেক্টগণের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। জমশেদপুরের শ্রমিকগণের দুর্দ্দশার মূলে যে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণই রয়েছেন এবং বড় কর্ম্মচারীরা যে তাঁদেরি দ্বারা পরিচালিত যন্ত্র মাত্র। এ কথা রাস্তায় একজন 'ভবঘুরে'ও জানে। তা সত্বেও জমশেদপুর লেবর এসোসিয়েশনের সভাপতি ডিরেক্টরদের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করছেন তাতে শ্রমিকদের মঙ্গল হবে কি?

তারপরে, শ্রীযুত বসুর মোসাহেব দলই বা কি বল্‌তে চান? তাঁরাই বলে দিন, শ্রীযুত বসু কোন পক্ষের লোক।

দেশ-বিদেশ

মালদহের সংবাদ

মালদহের শিকারপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক সাঁওতালের বাস রয়েছে। তাদের সকলেই চাষী। জিতু হচ্ছে তাদের সর্দ্দার। এবার তাদের বড় দুর্দ্দিন যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ হওয়ার দরুণ তাদের আর কিছুই! নেই এখন চাষের সময়, প্রত্যেক গৃহস্থ অন্ততঃ ৪০ টাকা ক'রে না পেলে এবারে চাষই করতে পারবে না। গবর্ণমেণ্ট কিছু কিছু টাকা করজ দিচ্ছিল বটে, কিন্তু সে সবে ২।৪ টাকা হিসাবে। তা ও এখন আর দেওয়া হচ্ছে না। এখন উপায় কি হবে? গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই যদি করজ দেওয়ার ব্যবস্থা না করেন তা হলে সাঁওতালরা কিছুতেই চাষ করতে পারবে না, আর চাষ না করলে অবস্থা যা হবে তা'ত সবাই বোঝেন। কিন্তু, এখন গবর্ণমেণ্টকে সমঝাবে কে?

ইংরেজ বাজার ম্যুনিসিপালিটিতে ৬০।৭০ জন মেথর আছে। সকলে ছ'টা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত খেটেও আবার তাদের বিকেলেও খাটতে হয়। এদের পুরুষরা মাইনে পায় মাসে ৮ টাকা আর মেয়েরা পায় মাসে ৭ টাকা। এ মাইনেটাও আবার যথাসময়ে দেওয়া হয় না। ম্যুনিসিপ্যালিটির একখানা মাত্র ঘর আছে। তাতে সকলের জায়গা হয় না। তাই আপন খরচে তাদের ঝুপ্‌রি তৈয়ার করে নিতে হয়েছে। এদের অভাব-অভিযোগের প্রতি ম্যুনিসিপ্যালিটি কোনো কানই দিচ্ছে না। তবে কি ম্যুনিসিপ্যালিটি চাইছে যে মেথররা ধর্ম্মঘট করুক? ইংরেজবাজারের বাসিন্দাদের মত কি?

মালদহে "সরস্বতী লাইব্রেরী" ও "বিপিন স্মৃতি পাঠাগার" নামে যে দু'টো পাঠাগার আছে তার কোনটাতেই যাতে কোনো স্কুলের ছেলে যেতে না পারে তার জন্যে ওখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে মিটিং করেছেন। এ দু'টো প্রতিষ্ঠান নাকি অবৈধ আড্ডা। কিন্তু, কি ক'রে যে অবৈধ আড্ডা হলো তা কেউ জানান নি। ছেলেরা ব্যায়াম সমিতিতে যায় এ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের চালনা। বলা হচ্ছে যে এ সব জায়গায় ছেলেদের রাষ্ট্রনীতি শেখান হয় এবং তাদের মধ্যে নিষিদ্ধ পুস্তক বিতরণ করা হয়। কিন্তু, রাষ্ট্রনীতি শেখান দোষের কথা কি ক'রে হলো তা'ত আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। রাষ্ট্রনীতি ছাত্ররা আলবৎ শিখবে। এতে কি ম্যাজিষ্ট্রেট, কি শিক্ষক কারো বাধা দেবার অধিকার নেই। তারপরে, নিষিদ্ধ পুস্তকের কথা। নিষিদ্ধ প্রচার করতে যেয়ে যদি কেউ ধরা পড়েন তা হলে তিনি তার জন্যে সাজা ভোগ করবেন। তার আগে মিছামিছি ও সব কথা বলার কি মূল্য আছে। আশা করি ম্যাজিষ্ট্রেট কিছু ভেবে চিন্তে কাজ করবেন।

কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস

লণ্ডনের ১৯শে আগষ্ট তারিখের খবরে প্রকাশ যে মস্কোতে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের সভায় এম কুশিনো বলেছেন যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কম্যুনিষ্টদের কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কেননা, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা তাই চাইছে। তাঁর মতে ভারতের কম্যুনিষ্টগণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন নি। ন্যাশন্যালিষ্টদের রাষ্ট্রনীতিক নেতৃত্ব তাঁদের অধিকার করা উচিত। ন্যাশন্যালিষ্টদের প্রতারণার নিন্দাও তাঁদের করা দরকার। এম, কুশিনোর মতে বারদোলির মিটমাটের ব্যাপার কৃষকদের সহিত প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এম, কুশিনো আরো বলেছেন যে ভারতবর্ষীয়েরা কম্যুনিষ্ট হলেও ইউরোপীয়ানদের বিশ্বাস করতে চায় না। তাঁর মতে ভারতের কৃষক বিপ্লব হওয়া উচিত।

কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি সিকান্দর বলেছেন যে ভারতের বৃটিশ শোষণবাদ (ইম্পিরিয়েলিজম) ই যুদ্ধাশঙ্কার জন্য দায়ী। এই জন্যে ভারতে একটা শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়িয়া তোলা উচিত। এরূপ পার্টি গঠনের জন্যে কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যালের একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পদ্ধতি তৈয়ার করা উচিত।

আটিয়ার কৃষকগণ ময়মনসিংহে গবর্ণমেণ্টের নামে মোকদ্দমা দায়ের করেছে। তারা আদালতে প্রমাণ করতে চায় যে আটিয়ার ১০৪ খানা গ্রামকে বন-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো অধিকার আইনতঃ গবর্ণমেণ্ট কিংবা জমিদারের নেই।

ট্রাম ও বাসে সংঘর্ষ

গত [illegible] আগষ্ট সকাল সময় [illegible] সেতুর উপর একখানি ট্রামের সহিত [illegible] ৬ ব্যক্তি নিহত এবং ১০ জন আহত হইয়াছে। [illegible] মোটরখানি উল্টাইয়া গিয়াছিল, [illegible] চাপা পড়িয়াছিল। [illegible] পড়িয়াছিল।

—

জাপানী দ্রব্য বর্জ্জন

নিউইয়র্কের রাষ্ট্রনৈতিক ইনষ্টিটিউটে [illegible] চীনের জাতীয় দলের [illegible] মন্ত্রী [illegible] বলেন, [illegible] পর হইতে চীনে যে জাপানী পণ্য বর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে, জাপান যতদিন মাঞ্চুরিয়া চীনের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া না লইবেন, তত দিন উক্ত বর্জ্জন কার্য্য ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিবে।

—০—

তরুণ কমিউনিষ্ট সভা

[illegible], ২৬শে আগষ্ট

তরুণ কমিউনিষ্টদের [illegible] সমিতির এক সভা বসিয়াছিল। এমন সময় পুলিশ তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা সভা ভাঙ্গিয়া দেয়। কমিউনিষ্টদের অনেক কাগজপত্র পুলিশের হস্তগত হইয়াছে। সদস্যদের তালিকা, তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালের উপদেশ এবং কমিউনিষ্ট সাহিত্য ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পুলিশ লইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক লোক ধৃত হইয়াছে।

—০—

আলবেনিয়া সাধারণতন্ত্র

এক জনসভার অধিবেশনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট আমেদ বে জগুকে রাজা হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। আলবেনিয়ার অন্যান্য স্থানেও এরূপ সভা সমিতি হইতেছে।

—০—

চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট

কিউবা চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইয়াছেন। অনেকে বলিতেছেন, চীনের বাজারে কিউবার অতিরিক্ত চিনি কাটাইবার উদ্দেশ্যে কিউবা এই খেলা খেলিয়াছেন।

এইরূপ মনে করিবারই একটু কারণ আছে, কিউবার রাষ্ট্রীয় দপ্তর হইতে প্রচারিত হইয়াছে যে, চীনের সহিত একটি বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি করিবার জন্য কিউবা শীঘ্র কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিবেন।

—০—

কাকোরী মামলার শেষ আসামী শেঠ দামোদরের মুক্তি

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শেঠ দামোদর দাস স্বরূপ অসুস্থ থাকার জন্য তাঁহার মামলা এতদিন মুলতুবি ছিল। সম্প্রতি এই মামলা লক্ষ্ণৌ দায়রা আদালতে প্রেরিত হইয়াছিল। সরকারী উকীল মামলা প্রত্যাহার করায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

———

শ্রীযুক্ত পিল্লাই-এর [illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] স্বামী [illegible] তাঁহার [illegible] কিন্তু আর একটি [illegible] মঞ্জুর হয় নাই। আগামী [illegible] হইবে।

—

[illegible] মামলা

[illegible] ১৮ জন শ্রমিক গত [illegible] জুলাই [illegible] আইন [illegible] আটজন দলপতিকে ৮ মাস [illegible] সকলকে ৭ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad

Reg. No. C. 1440.

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র



Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৩০শে আগষ্ট ১৯২৮, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৫ | ১২শ সংখ্যা

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

———০৹৹০———

আমাদের বহু গ্রাহকেরই দেওয়া মূল্য শেষ হ'য়ে গেছে। যাঁদের টাকা ৫।৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে ফুরিয়ে গেছে তাঁদের নামেও আমরা রীতিমত কাগজ পাঠিয়ে আসছি এবং তাঁরা সকলে রীতিমত কাগজ গ্রহণ ক'রেও আস্‌ছেন। কাজেই, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের সকলেই কাগজ এবারেও রাখতে চান। এ সপ্তাহ থেকে আমরা সকলের নামেই ভি, পি, যোগে "গণবাণী" পাঠাতে আরম্ভ করব। দয়া ক'রে সকলেই ভি, পি, গ্রহণ করবেন।

বিনীত

ম্যানেজার, "গণবাণী"

সম্পাদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৷৹
Foreign Subscription : Annual 6s.

CALL TO ACTION

Being the Resolutions and Theses passed at the Third Annual Conference of the WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL.

After years of agitation and organisation, India is still a slave nation, farther from freedom than ever. Why is this?

Why is the once mighty National Congress a laughing stock before the world?

Why do our leaders invariably say one thing and do another?

For a clear, consistent Marxist analysis and explanation of these disturbing phenomena,

For a clear practical lead as to what to do to remedy this state of things,

See. "A CALL TO ACTION" Price As. 8 only

To be had of

1. THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2/1, European Asylum Lane, Calcutta

2. THE BOOK COMPANY LTD.
4/4A, College Square, Calcutta

HALL FOUND

Or

A COMMUNIST'S THREE YEARS IN AN INDIAN PRISON

By

S. A. DANGE

You will see here how helpless human beings are laid prostrate and beaten with shoes and sticks till they bleed, how patients in high fever are put in irons, how in the height of a Himalayan winter men are left to freeze and die.

Full of sensations and revelations.

Price Re. 1/- only.

To be had of

THE VANGUARD LITERATURE Co.
2/1 European Asylum Lane, Calcutta.

Or

THE BOOK COMPANY Ltd.
4/4A. College Square, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৬'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেন্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেন্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেন্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেন্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৩০শে আগষ্ট; ১৯২৮, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৫ | ১২শ সংখ্যা

"শ্রেণী বিরোধ ও কংগ্রেস"

—০—

"শ্রেণী-বিরোধ ও কংগ্রেস" নাম দিয়ে গত ২৪শে আগষ্ট তারিখের "আত্মশক্তি"র "চলতি পথে"র কলমে একটি প্রবন্ধ বা'র হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমাদের প্রতি অর্থাৎ "ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজ্যাণ্টস্ পার্টি" (কৃষক ও শ্রমিক দল) এর প্রতি কোনো ইঙ্গিত কর হয়েছে কিনা, তা 'আত্মশক্তি"র সম্পাদকীয় বিভাগ বলতে পারেন, কিন্তু এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত আমাদের একটা যোগাযোগ রয়েছে এবং এই থাকার দরুণই আমাদিগকে দু'এক কথা বল্‌তে হবে। "আত্মশক্তি" লিখেছেন—"মুক্তিকাম একদল লোক কিছুদিন হইতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে রাজনৈতিক মুক্তির কোন অর্থই থাকে না—যদি না জাতির প্রতি লোক পায় অর্থনৈতিক মুক্তি। আর অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিবন্ধক রূপেই রহিয়াছে দেশের জমীদাররা, ধনিকরা, বিত্তবান সাধারণ সকলে। তাঁহাদের এ কথা যে একেবারেই মিথ্যা এমন কথা আমরাও বলি না। আমরা বলি যে অর্থনৈতিক পরাধীনতার একটা কারণ উহাই সত্য; কিন্তু একমাত্র কারণ কখনই নয়! প্রধান কারণ যাহা তাহা বাড়িয়া উঠিয়াছে বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির প্রভাবে।" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্থনৈতিক শক্তিই (ইকনমিক ফোর্স) সমাজের নানা প্রকার ওলট-পালট সাধন ক'রে থাকে। অর্থনীতিক মুক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনীতিক মুক্তির কোনো মানেই যে শুধু থাকে না তা নয়, অর্থনীতিক মুক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি কখনো সম্ভবপরও নয়। এই মুক্তির প্রতিবন্ধক শুধু যে দেশীয় ধনিক ও জমীদারগণ এমন কথা আমরা কখনো বলিনি। বিদেশী ধনিকগণও আমাদের অর্থনীতিক অধীনতার জন্যে দায়ী। "আত্মশক্তি" আমাদের কথা পূরোপূরি বিশ্বাস করেন না, তবে একেবারে ফেলেও দিতে চান না। আমাদের অধীনতার প্রধান কারণ, "আত্মশক্তি"র মতে, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি। এই শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের জন্যে জাতি তার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করুক, ইহাই "আত্মশক্তি" কামনা করেন।

সাধারণতঃ শাসন-পদ্ধতি কিসের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে সে কথাটা আলোচ্য প্রবন্ধের কোথাও উল্লিখিত হয় নি। এ সম্বন্ধে খোলাসা কথা বল্‌তে চাইলে এই প্রবন্ধ এভাবে লেখাটা কিছুতেই সম্ভবপর হতনা। সমাজের উৎপন্ন করার উপায়গুলোর অর্থাৎ Means of productionএর ওপরে যাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাদেরি দ্বারা শাসন-পদ্ধতি গঠিত হয়ে থাকে। এই উৎপাদনের উপায়গুলোর ওপরে যদি সমাজের কতিপয় লোকের কর্ত্তৃত্ব থাকে তা হ'লে ঠিক তাঁদেরি সুখ সুবিধার অনুরূপ ক'রেই শাসন-প্রণালী স্থির করা হয়। আর এই কর্ত্তৃত্ব যদি দেশের জনসাধারণের হাতে থাকে তা-হ'লে দেশের শাসন পদ্ধতিও দেশের জনসাধারণেরই ইচ্ছানুরূপ গঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক সত্যটাকে ধামা চাপা দিয়ে রাখার প্রচেষ্টা যুগে যুগে চলে এসেছে। এই যুগেও ধনিকগণ এবং ধনিকগণের দ্বারা আচ্ছন্ন জাতীয় আন্দোলনকারিগণ এই প্রচেষ্টার এতটুকুও ত্রুটী করছেন না।

ভারতবর্ষ এখন পরাধীন। বৃটিশ ধনিকগণ আমাদিগকে পদানত ক'রে রেখেছে। তাদের এই পদানত ক'রে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষকে শোষণ করা। এই শোষণের ভাগীদার তারা ভারতবর্ষের ধনিকগণকেও করেছে। তারা বুঝে নিয়েছে যে এই গণচৈতন্যের যুগে ভারতের ধনিকগণের সহিত কোনো না কোনো প্রকার স্বার্থের বন্ধন স্থাপন না ক'রে ভারতবর্ষকে শোষণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। কৃষকদের সহিত যাতে সাক্ষাৎভাবে গবর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ উপস্থিত না হতে পারে এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ ধনিকগণ ভূমিতে বহু মধ্য স্বত্বভোগীও সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। মোটের ওপরে আজকার দিনে বৃটিশ ধনিক শাসকগণ ও দেশীয় শোষকগণ অর্থাৎ ধনিক, জমিদার ও মধ্যবিত্তবান লোক ক্রমশই অধিকতর স্বার্থ বিজড়িত

হয়ে পড়ছে। এই স্বার্থের অনুরূপ ক'রেই আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্র গঠিত হয়েছে, আর এই ভাগাভাগির ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি খাড়া করার প্রচেষ্টাও হবে। নেহেরু কমিটির দ্বারা যে স্বরাজের খসড়া প্রস্তুত হয়েছে তা থেকেই সকলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। সাধারণ দৃষ্টিতে সার্বজনীন ভোটের অধিকার প্রভৃতি দেখে অনেকেই সম্মোহিত হবেন, কিন্তু, অভিনিবেশ সহকারে এই খসড়া পাঠ করলেই সকলেই বুঝতে পারবেন যে ভারতবর্ষে বৃটিশ ধনিকগণের শাসন অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে এতটুকু শুধু পরিবর্তন হবে যে লুণ্ঠনের অংশ ভারতের ধনিক প্রভৃতি আরো অনেক বেশী মাত্রায় পাবে। কাজে কাজেই অধিকারও তাদেরি হাতে বেশী ক'রে আসবে। মোট কথা, শাসন পদ্ধতির উক্তাকার পরিবর্তনের দ্বারা দেশের জনসাধারণের কোনো উপকারই হবে না। সার্বজনীন ভোটের অধিকার থাকা সত্বেও পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রনীতিক পরিবর্তন অর্থনীতিক কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে এ কথা আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আমরা যদি সত্যিকারে ব্যাপারটা সকলের চোখের সামনে ধরতে না পেরে থাকি তা হ'লে আমরা এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতেও প্রস্তুত আছি। "আত্মশক্তি'র প্রবন্ধ যে কংগ্রেসের মুখ রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়েছে তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। প্রবন্ধের আর এক জায়গায় লিখিত হয়েছে যে "কংগ্রেস হইতেছে জাতির ঐক্য স্থাপনের প্রধান প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস তাহার পতাকাতলে ভারতের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোকেদেরই সমবেত হইবার সুযোগ করিয়া দিবে সকলের অধিকার রক্ষার সমান ব্যবস্থা দ্বারা।" আবার বলা হয়েছে---"কংগ্রেস যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তাহা যখন সাধিত হইবে তখন ধনিকে-শ্রমিকে, জমিদারে প্রজায় এমন সম্বন্ধ থাকিবেনা যাহার ফলে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে চাপিয়া দাবাইয়া রাখিয়া বড় হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। সে ব্যবস্থা যে শ্রেণী-বিরোধ ব্যতিরেকে করা যাইবেনা—তাহা অভ্রান্ত সত্য নাও হইতে পারে।" 'আত্মশক্তি'র মন্তব্য পড়ে আমাদের সোনার পাথর বাটীর কথাই বেশী ক'রে মনে পড়ছে। মানুষকে অন্ধ ক'রে রাখার এর চেয়ে বড় চেষ্টা আর কি হতে পারে তা আমরা জানিনে। কংগ্রেসকে জাতির ঐক্য স্থাপনের প্রধান প্রতিষ্ঠান ব'লে লিখতে লেখকের হাত যে কেন কেঁপে গেলনা তা ভেবে আমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি। শুধু মুখের কথা বললে ত চলেনা, দলীল প্রমাণ কিছু আছে কি? জাতির প্রধান অনুষ্ঠান যে কংগ্রেস নয়, সে কথা এর পরের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। সকল শ্রেণীর অধিকার সমানভাবে রক্ষার ব্যবস্থার দ্বারাই কংগ্রেস আপন পতাকার নীচে সকল শ্রেণীকে সমবেত করবে, এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শুনেছে কি? এমন ভণ্ডামী প্রচারের দ্বারা কোনো কালে কোনো অনুষ্ঠান জাতির প্রধান অনুষ্ঠান হতে পেরেছে কি? শোষক আর শোষিত জগতে এক হতে পারে না। কংগ্রেস হয়তো তার পতাকাতলে শোষকদের সমবেত করবে, কিংবা করবে শোষিতদের। বাঘ আর ছাগের মধ্যে সাম্য যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি অসম্ভব শোষক আর শোষিতের সাম্য। যাঁরা এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে চান তাঁরা বাতুল কিংবা ভণ্ড ব্যতীত আর কিছুই হতে পারেন না।

কংগ্রেসের শত শত কার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে তা সমাজের সেই কতিপয় লোকের সমষ্টি যারা উৎপাদনের উপায় সমূহের উপরে আপনাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছে। এই কথা অস্বীকার করার কোনো সাধ্য কংগ্রেসের নেই। এ সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত আমরা ইতোপূর্বে দিয়েছি। এখনো আমরা বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ঘটিত ব্যাপারে কংগ্রেস কাদের পক্ষ অবলম্বন করেছে? এই আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের মনোভাব পরীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে কংগ্রেসের সমর্থন আগাগোড়াই ছিল জমীদারও মধ্য স্বত্বভোগীদের পক্ষে। মাটির বুক চিরে যে কৃষক ফসল উৎপন্ন ক'রে দেয় তার স্বার্থ কংগ্রেস কিছুতেই দেখতে পারলে না। কলিকাতায় বেট অ্যাক্টের পুনঃ প্রবর্তনের পক্ষেও কংগ্রেস ভোট দিতে পারে নি। কেননা, জমীদারের স্বার্থের হানি হবে। জামশেদপুরে শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি হয়েও কংগ্রেসের একজন প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি কারখানার ডিরেক্টরগণের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। এ সব দেখে শুনেও কি আমাদিগকে বলতে হবে কংগ্রেস শ্রেণী অনুষ্ঠান নয়?

জমিদারও থাকবে, কৃষকও থাকবে, আবার ধনিকও থাকবে, শ্রমিকও থাকবে—অথচ কেউ কাউকে দাবাতে পারবে না—এমন ব্যবস্থা নাকি কংগ্রেস করবে। এই ব্যবস্থার জন্যে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজন হবে তাও নাকি আবার অভ্রান্ত সত্য নাও হতে পারে। অথচ কি জগা খিচুড়ী যে কংগ্রেস পাকিয়ে তুলবেন সেটা লেখক কিছুতেই ব্যক্ত করতে পারেন নি। কেননা ব্যক্ত করবার কিছুই নেই। লেখক যা লিখেছেন তা তাঁর মনের সায় নিয়ে যে লিখতে পারেন নি তা তাঁর লেখার অসঙ্গতির দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রবন্ধটি লেখার মূল কারণ হচ্ছে নয় কে হয় ব'লে লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করা। শ্রেণীগত স্বার্থের জন্যে যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাঁরাই প্রচার করছেন শ্রেণী সংগ্রামের অপকারিতা! কিন্তু, এসব জারিজুরি আর বেশীদিন খাটবে না। বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত লোকেরা আজকের দিনে দাবী করতে শিখেছে। সেই দাবীর মুখে এই সব ফন্দীই এক ফুৎকারে উড়ে যাবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভয় কেন?

ভারতের বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিষ্ট শাসকগণ আজ চারিদিকে সর্ষে ফুল দেখ্ছে—রক্তাতঙ্ক, কম্যুনিজম ও বলশেভিজম ইত্যাদিতে তাদের পেয়ে বসেছে। গবর্ণমেণ্ট আজ এসব ভয়ের কারণ অপসারণ করতে চায়, তাই ভারতের জনগণের অভ্যুত্থানকে দলন করবার মতলবে 'ট্রেডস্ ডিস্পিউট' বিলের খসড়া তৈরী করেছে। আগামী ব্যবস্থা পরিষদে এর একটা হেস্ত-নেস্ত হবে। ভারতের ধনিক-বণিক-অভিজাতবর্গও গবর্ণমেণ্টকে কোনো কোনো প্রকারে সাহায্য করবে। গবর্ণমেণ্ট শুধু 'ট্রেডস্ ডিস্পিউট' বিলের মুসাবিদা তৈরী করেই ক্ষান্ত হয়নি, সম্প্রতি

আরো একটি আইনের খসড়াও প্রস্তুত করেছে। ইহার নাম হচ্ছে Public safety (Removal from India) Bill বা জনসাধারণকে নিরাপদ করণ (ভারত হতে বহিষ্করণ) বিল। এই প্রস্তাবিত আইনের বলে গবর্ণমেণ্ট যদি সন্দেহ করে যে কোনো বিদেশী ভারতে এসে বা থেকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা অসন্তোষ প্রচার করছে, অথবা দেশের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সাহায্যে অশান্তি বা বিদ্রোহ সৃষ্টি করছে তবে গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে ঐ ব্যক্তিকে ভারত থেকে বহিষ্কৃত করে দিতে পারবে। এই বহিষ্কারের আদেশ প্রাপ্ত বিদেশী ভারতের কোনো আইন আদালতে তার জন্য আপীল করতেও পারবে না। আইনটি প্রণয়নের হেতু এই দেখানো হয়েছে যে—"ভারতবর্ষে বিদেশ থেকে লোক এসে কম্যুনিজম প্রচার করছে ও ভারতের শ্রমিক ও কৃষকগণকে সমাজ ও রাষ্ট্রধ্বংসকর বিপ্লবের জন্য তৈরী করে তুলছে।" আমরা বরাবর বলে এসেছি যে ভারতের গণের অর্থাৎ ও শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্তি ততদিন আসতে পারবে না যতদিন না ভারতবর্ষ হতে ইম্পিরিয়েলিজমের অর্থাৎ শোষণবাদের চিহ্ন বিলুপ্ত হবে এবং ভারতীয় ধনিক ও জমীদারগণের শোষণেরও সমাপ্তি ঘটবে। বর্ত্তমান শাসন তন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ও জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসন তন্ত্র স্থাপনের দ্বারাই শুধু ইত্যাকার পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া সম্ভব। "কৃষক ও শ্রমিকদল" সমূহ উন্নত বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। দেশের জনগণের বিপ্লবাত্মক জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব "কৃষক ও শ্রমিকদল" সমূহ গ্রহণ করেছে। অচিরে এই দলগুলি কেন্দ্রীভূত হতেও চলেছে। কৃষক ও শ্রমিকগণ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে যে "কৃষক ও শ্রমিক-দল"ই তাদের একান্তই আপনাদের দল। তাই ভারতের শোষণ মূলক শাসনের বিষদৃষ্টি এই দলের ওপরেও পতিত হয়েছে। কিন্তু "কৃষক ও শ্রমিক দল" কোনো কথাই গোপন করে রাখেনি। কোনো অবস্থাতেই এই দল আপনার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে না। আজ ভারতের বৃটিশ শোষণবাদ কেবলি বলশেভিক ভীতির ধূয়া তুলে চারিদিকের বাতাসকে বিষময় করে তুলছে এবং এই অজুহাতে শ্রমিকসঙ্ঘবাদকে বিধ্বস্ত করে দিতে দৃঢ় সংকল্প হয়েছে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে আইন করে দু' একজন লোককে দেশ হতে বিতাড়ন করা যেতে পারে কিংবা তাদের জেলেপুরে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়—কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব যুগে মানুষের মনের অর্গল কিরূপে রুদ্ধ করা যেতে পারে? আজ সমাজে রাজনীতিক্ষেত্রে, ভাবের রাজ্যে সর্ব্বত্র একটা বিপ্লব মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তখন আইনের জগদ্দল পাষাণ দিয়ে কিরূপে সেই চিন্তার দ্বার বন্ধ করা যেতে পারে? অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, অনশনক্লিষ্ট শ্রমিক ও কৃষকগণ যুগযুগের অত্যাচারে প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তাহারা সারাদিন পরিশ্রম করে যে মজুরী পায় তাতে তারা পেট পুরে দু' বেলা দু'মুষ্টি অন্ন পায় না। তাদের পরিধানে বস্ত্র নেই, রোগে শোকে, স্ত্রীপুত্রের হাহাকারে এবং মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে তাদের প্রাণ অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই তারা তাদের বন্ধন মুক্তির জন্য ধনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছে। তারা চায় তারা যে পরিশ্রম করে তার উচিত মজুরী বুঝে পেতে। ধনিকের অত্যাচারে জমিদার মহাজনের শোষণে তারা দুর্দ্দশার শেষ সীমায় এসে পৌচেছে। গবর্ণমেণ্টের গোলাগুলি, কামান বন্দুক, মেশিনগান, উড়োকলের সহিত যুদ্ধ করবার শক্তি তাদের নেই—তাই তারা নিজের পায়ে ভর দিয়ে সংঘবদ্ধ হতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। তাই কি বৃটিশ শোষণবাদ কিনা প্রচার করছে যে এই সমস্ত বলশেভিকদের কাজ! কিন্তু, বলশেভিক হওয়া খারাপ কিসে তা আমরা জানতে পারি কি?

আয়েঙ্গারের মত

শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার জার্ম্মানীতে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন ক'রে মিস্ অ্যাগনেস্ স্মেড্লি আমাদিগকে পাঠিয়েছেন। শ্রীযুত আয়েঙ্গার বৃটিশ লেবর পার্টি সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি যে বৃটিশ লেবর পার্টির এতটুকু সহানুভূতি নেই তা তিনি তাঁর লণ্ডন প্রবাসের সময়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছেন। ভারতে যাঁরা জনগণের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লবাত্মক জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বাস করেন তাঁরা বৃটিশ লেবর পার্টির প্রতি কখনো কোনো বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁরা বারে বারে ভারতবাসীকে সতর্ক করেও দিয়েছেন। তা সত্বেও আমাদের বুর্জোয়া (ধনিক) ন্যাশন্যালিষ্ট-গণ লেবর পার্টির সভ্যদের নিয়ে যথেষ্ট চলাচলি করেছেন। এখন যখন স্বার্থে স্বার্থে সামান্য সংঘাত বেধে উঠেছে তখন তাঁরা লেবর পার্টির প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেছেন —"As for the decision of the Indian National Congress, making national independence the goal of the Indian people—well, he (Mr. Ramsay Mac-Donald) and his Party ignore that." অর্থাৎ "ভারতবাসিগণ যে জাতীয় স্বাধীনতাকে তাঁদের লক্ষ্য করেছেন তৎপ্রতি মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও তাঁর দল কেবল অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই থাকেন।" কিন্তু ভারতের এই জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যের প্রতি শুধু মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও তাঁর দল অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নি, স্বয়ং ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসও অবজ্ঞার চরম ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। মাদ্রাজ কংগ্রেস জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব পাস করার পরেও কংগ্রেস তথাকথিত স্বরাজের খসড়া প্রস্তুত ক'রে স্বাধীনতার লক্ষ্যকে পদ-দলিত করেছে। অবশ্য এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে বুর্জোয়া ন্যাশন্যালিষ্টগণের মধ্যে শ্রীযুত আয়েঙ্গার আজো জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য পরিহার করেন নি, অন্ততঃ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে আমরা তা-ই বুঝতে পেরেছি। বার্লিনে বক্তৃতা প্রদান করার সময় তিনি জনগণের সংগঠনের ওপরেও খুব জোর দিয়েছেন। কিন্তু, ভারতবর্ষে তিনি অনেক সময়ে জনগণের সংগঠন সম্বন্ধে অনেক বিশ্রী কথা বলেছেন। তাঁর সভাপতিত্বাধীনে দিল্লীতে যখন কমরেড শাপুরজী সাক্‌লাৎওয়ালা বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহকে তিনি পোষ্টাল ইউনিয়নের ভাঙ্গা চিঠির বাক্সের বেশী আর কিছুই মনে করেন না। মাদ্রাজে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠকেও তিনি বলেছিলেন যে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও ধর্ম্মঘট প্রভৃতির কিছুই তিনি বোঝেন না। এখন ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী ও রাশিয়ার ভ্রমণের ফলে এ সম্বন্ধে তাঁর মত যদি পরিবর্ত্তিত হয়ে থাকে তা হলে সেটা অবশ্য আনন্দের বিষয় হবে।

জমী ক্রয়ে জমীদারের প্রথম অধিকার

গত সোমবারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হয়েছে যে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা যখন তার স্বত্ব বিক্রী করতে চাইবে তখন তা ক্রয় করবার প্রথম অধিকার জমীদারের থাকবে। অর্থাৎ জমিদার যদি সে সম্পত্তি ক্রয় করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তা হলে আর কারো তা কেনবার অধিকার থাকবে না। শুধু তা নয়, অপরে তা ক্রয় করার পরেও জমীদার ইচ্ছে করলে তা কিনে নিতে পারবে। কংগ্রেসী সদস্যগণ এ ব্যাপারেও জমীদারের সহিত ভোট দিয়েছেন। ফলে জমীদারগণের জয় জয়কার হয়েছে। কংগ্রেস পক্ষের মিঃ আবনচন্দ্র দত্ত জমীদারের স্বার্থ সমর্থন করতে যেয়ে বক্তৃতায় পুঞ্জীভূত যাবিন উদ্গীরণ করেছেন। এই অধিকারের দ্বারা জমীদারগণের অনেক কিছু সুবিধা হবে। প্রথমতঃ তাদের খাসদখলে জমীর পরিমাণ বেড়ে যাবে—তারা ধানিক প্রথায় দিন মজুর খাটিয়ে চাষ ক'রবে অতিমাত্রায় লাভবান হবে এবং সত্যকারের কৃষকরা দিন দিনই তাদের ক্ষেতের কেনা গোলামে পরিণত হ'তে থাকবে। দ্বিতীয়তঃ জমীটা কেনার পরে জমীদার যদি তা আবার বিক্রীত ক'রে দেয় তা হলে সে অন্ততঃ কেনা দামের ৪।৫ গুণ বেশী দাম পেতে পারবে। দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার হাত থেকে জমীটা জমীদারের অধিকারে যাওয়ার পরে তা যে স্বত্বে পরিণত হবে তার দাম ওরকম বেশী না হয়েই পারে না। কিন্তু, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা থেকে এর বেশী কোনো কিছুই আমরা প্রত্যাশা করিনি। এ সভায় জমীদারকে এ অধিকার না দিলেই আমাদিগকে বরক আশ্চর্যান্বিত হতে হতো। তবে, একটা কথা আমরা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তাঁরা কি এখনো কংগ্রেসকে 'জাতীয় মহাসমিতি' বলে মেনে নিবেন? যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ দলবদ্ধ হয়ে জাতির প্রাণশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে পারে সেই কংগ্রেসকে কি করিয়া যে জাতীয় সমিতি নামে আখ্যাত করা যেতে পারে তা আমরা ত কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে।

—০—

আটিয়ার কৃষক

আটিয়ার কৃষকরা গবর্ণমেন্টের নামে মামলা রুজু করেছে। তারা প্রতিপাদন করতে চায় যে তাদের গ্রামগুলিকে বন-বিভাগের শামিল করার অধিকার জমীদার কিংবা গবর্ণমেন্ট, কাহারো নেই। যখন দায়ের করা হয়েছে তখন এই ১০৪ খানা গ্রামের কৃষকদের উচিত মোকদ্দমা ভালো ভাবে লড়ার বন্দোবস্ত করা। অবশ্য তাদের সর্ব্বদাই সাবধান থাকতে হবে যাতে কোনো শঠ-প্রবঞ্চকের হাতে পড়ে তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তাদের প্রতি দরদ দেখাবার ভাণ ক'রে বহু লোকই এখন টাকা কড়ি লুট করার জন্যে আসবে। আমরা শুনেছি ইতোমধ্যেই কোনো কোনো লোক বাইরে থেকে যেয়ে কৃষকদের মধ্যে আপোষে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করেছে। বন বিভাগের প্রজাদের একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে এই মোকদ্দমা করাটাই কিছু তাদের পক্ষে শেষ-সংগ্রাম নয়। মোকদ্দমার চেয়েও বড় যুদ্ধের জন্যেও তাদের সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। দরকার হলে জমীদারের খাজনা তাদের বন্ধ ক'রে দিতে হবে, কিংবা সমবেতভাবে আইন অমান্য করার প্রয়োজনও তাদের হতে পারে। মোকদ্দমায় সুবিচার না পেলে এমন একটা কিছু তাদের করতেই হবে। কিন্তু, আগে ভাগে দল না বাঁধলে দলবদ্ধ হয়ে কোনো কাজই করা সম্ভবপর নয়। সেই জন্যে তাদের উচিত আপনাদের শক্তিশালী দল গ'ড়ে তোলা। কি ভাবে এই দল বা সমিতি গঠন করতে হবে তাহা আমরা আগেই বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে সবাইকে জানিয়েছি। এখনো আবার বলছি যে বন-বিভাগের প্রত্যেক কৃষক ভাইএর উচিত অবিলম্বে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর আটিয়া টাঙ্গাইল শাখার মেম্বর হওয়া। এই শাখা দলে নির্দ্দিষ্ট হারে চাঁদা জমা করাও একান্ত আবশ্যক। টাকা এক জায়গায় জমা না করতে না পারলে আটিয়ার কৃষকদের কথা কেহই শুনতে চাহিবে না। তারা যদি দলবদ্ধ হয়ে দাবী করতে পারে তা হলে সেই দাবী প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা কাহারো নেই। জমীদারী প্রথার যে সমূলে উচ্ছেদ সাধন করতে হবে একথা কৃষকদের ভুললে চলবে না।

তরুণের অভিযান

গত সপ্তাহের "গণবাণী"তে "ইয়ং কম্‌রেড লীগ" নামক তরুণদের একটা সঙ্ঘ গঠিত হওয়ার কথা আমরা বলেছি। বড়ই আনন্দের বিষয় যে এই লীগ ইতোমধ্যেই কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। গত শনিবারে লীগের কার্য্যালয়ে (৩৭, হ্যারিসন রোডে) লীগের একটি সভা বসেছিল। এই সভায় শ্রীযুক্ত রতন হাজরা এম্, এস্, সি ইংরেজীতে "ইম্পিরিয়েলিজম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। এই লীগের নব-প্রচেষ্টার ভিতরে একটা খুব ভালো চিহ্ন আমরা এই দেখ্‌তে পেয়েছি যে এতে বৃদ্ধদের প্রবেশ করার কোনো অধিকার নেই। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণীয় বিষয়ের চর্চ্চা লীগের সভ্যরা এখান আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। অন্ততঃ তরুনরা যে এখানে সূর্য্য গ্রহণ আর চন্দ্র গ্রহণের স্নানের সাহায্যের জন্যে মাথা ঘামাচ্ছেন না, এটা খুবই আশার কথা বলতে হবে।

টেনেন্সি বিল

—০—

[শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত]

—০—

আইন মজলিসে টেনেন্সি বিল পেশ হবার পর থেকে কাউন্সিলের ভিতরে ও বাইরে অনেক বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান জমীদার ও অনেক মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোক যে সব বচন বলেছেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কিন্তু দুঃখিত হবার অনেক কিছু আছে। এই দুই সম্প্রদায়ের সামান্য মাত্র স্বার্থকেও ক্ষুণ্ণ করে বাঙ্গালী চাষীকে কিছু কিঞ্চিৎ স্বত্ব ও সুবিধা দেবার প্রস্তাব মাত্রেরই এরা বিপক্ষতা করেছেন। নিজের ও পরের স্বার্থের সংঘর্ষে নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই মানুষের সাধারণ স্বভাব। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু পতিত জাতির মধ্যে যদি কোনও অগ্রগামী সম্প্রদায় জাতিকে টেনে তুলতে চায় তবে সে সম্প্রদায়কে, অর্থাৎ সে সম্প্রদায়ের অনেক লোককে, মানুষের সাধারণ স্বভাব অতিক্রম করতে হয়। একটু অসাধারণ হয়ে জাতির অন্য সম্প্রদায়ের হিতে নিজের ন্যায্য পাওনাও কতক স্বেচ্ছায় ছাড়তে হয়; অন্ততঃ নিজের

যে স্বার্থ নিজের চোখের সামনে থাকায় আর সব স্বার্থকে ঢেকে রাখে, একটু দূরে সরে' সেই সব স্বার্থের তুলনায় নিজের স্বার্থের যথার্থ পরিমাণ বোঝার শক্তি অর্জ্জন করতে হয়। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত হিন্দু দেশের মধ্যে এমনি ধারা পুরোগামী সম্প্রদায় বলে' নিজেদের জেনে ও জানিয়ে এসেছে। বৃটিশ ভারতবর্ষে যে সব রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এতদিন উপস্থিত হয়েছে তাতে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দুর কাজ ও স্থান তাদের এ দাবীকে সমর্থন করে। আধুনিক ভারতবর্ষে যারা দেশের জন্য পরম দুঃখকে বরণ করেছে এবং চরম দান দিতে কুণ্ঠিত হয় নি, তাদের অধিকাংশই এই সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু বাঙ্গলার চাষের জমীতে চাষীর স্বত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের অতি অকিঞ্চিৎকর আঁকড়ে ধরার যে উগ্র উন্মত্ততা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত হিন্দু প্রকাশ করেছে তাতে সন্দেহের বিশেষ অবসর থাকে না যে সম্প্রদায় হিসাবে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন থেকে তাদের বিদায় নেবার দিন এসেছে। অদূর ভবিষ্যতেই ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে এ সম্প্রদায়কে পাওয়া যাবে বিদেশী ব্যুরোক্রেসীর স্বপক্ষে, – দেশের গণশক্তির বিরুদ্ধে। ইংরেজের ভারতবর্ষ বিজয়ে বাঙ্গালী হিন্দুর সহায়তা কম ছিল না। যদি ভারতবর্ষের পুনর্বিজয় ইংরেজের প্রয়োজন হয় তবে এ সম্প্রদায়ের সাহায্য থেকে সে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবে না!

পৃথিবীতে এমন দিন ছিল, এবং সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের আন্দোলনের নাম ছিল জাতীয় আন্দোলন। সেটা ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, তাতে তখন কাজ চলে' যেত। কারণ স্বল্পবিত্ত শ্রেণী তখনও তাদের দুঃখকে দাবীতে পরিণত করতে শেখে নি। তাদের ফাঁকি দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির আন্দোলনে লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব ও সহজ ছিল। ফরাসী বিপ্লব ও ইংলণ্ডের 'রিফরম্ বিল' এই শ্রেণীর আন্দোলন। কিন্তু যে সব দেশে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর এই রকম আন্দোলনের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাষ্ট্রের নায়কত্ব পেয়েছিল সে সব দেশেও আজ আর স্বল্পবিত্তকে অগ্রাহ্য করা চলছে না। কারণ অভাব ও দুঃখকে তারা আর অবশ্যম্ভাবী বলে' মেনে নিতে রাজী নয়। এবং তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে রাষ্ট্রীয় শক্তি হাতে থাকলে অভাব ও দুঃখ মোচনের চেষ্টায় অনেকটা সাহায্য হয়। এ মনোভাব ও বিশ্বাস ভ্রান্ত হ'তে পারে; কিন্তু যে কাজে গণশক্তির সহায়তা ছাড়া উপায় নেই সে কাজের কাজীকে এ মনোভাব ও বিশ্বাস মেনে নিয়েই কাজে নামতে হবে। নইলে কাজের আরম্ভেই শক্তির অভাবে তার গতি বন্ধ হবে।

আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন যে কিছুদূর গিয়েই আর চলে না, তার কারণ আমরা সকলেই জানি। এ সব আন্দোলন দেশের জনসাধারণের আন্দোলন হ'য়ে ওঠে না, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন মাত্র থেকে যায়। অথচ এর সাফল্যের জন্য গণশক্তির সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। সমস্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন পণও ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনকে সফল করতে পারবে না, যদি না দেশের জনসাধারণ তাদের সহায় হয়। কেননা যে জাতির অধীনতা থেকে মুক্তি পেতে হবে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সে জাতির কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী নয়, স্বল্পবিত্ত শ্রেণীরও স্বার্থের প্রতিকূল। ইংরেজের দেশে মধ্য ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের এই সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ সে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের চোখে রাজনৈতিক দৃষ্টি ও মাথায় রাজনৈতিক বুদ্ধি আছে। সবটা রাখতে হ'লে যে অনেকটা ছাড়তে হয় তা তারা বেশ জানে। এর ফলেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বার্কেনহেড ও র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ভাষা ভিন্ন, কিন্তু মত এক। এ জাতির সঙ্গে লড়তে হ'লে ভারতবর্ষের মধ্য স্বল্পবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থেরও এমনি সমতা ঘটাতে হবে।

কি উপায়ে? এর একমাত্র উপায়, যাদের আছে তাদের, যাদের নেই তাদের অনুকূলে কিছু কিছু ছেড়ে দেওয়া। শুধু মাত্র ফাঁকির জোরে জনসাধারণকে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়ার শুভ বা অশুভ যুগ একেবারে না গেলেও প্রায় যেতে বসেছে। এবং যে দেশে মাথার উপর আর একজন চেপে রয়েছে, এবং ফাঁকির কাজে যার হাত সাফাই কারও চেয়ে কম নয়, সে দেশে এক শ্রেণীর পক্ষে অপর শ্রেণীকে বেশী দিন ফাঁকি দিয়ে নিজের স্বার্থে উপরওয়ালার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

টেনেন্সি বিলের আন্দোলনে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় প্রমাণ করেছে যে 'জনগণ মনের' অধিনায়কত্বে তার রুচি নেই,—যদি তার মূল্য হয় নিজের কিছু স্বার্থ ত্যাগ করা। বর্ত্তমান টেনেন্সি বিলের ভাল মন্দ খুব বড় কথা নয়; কারণ ভোটের জোরে আজ যা স্থির হবে, ভোটের জোরে তা উল্টে যেতে বেশী দিন সময় লাগবে না। নেহেরু কমিটি 'ম্যানহুড সাফ্রেজের' প্রস্তাব করেছেন. এবং আমরা সবাই বাহবা দিচ্ছি। যদি ইংরেজ সে প্রস্তাব গ্রাহ্যই করে, তবে আগামী টেনেন্সি বিলের রূপটা হবে কি রকমের? বাঙ্গালা দেশের 'সেন্সাস রিপোর্ট' বলে যে সে দেশের 'ম্যানহুডের' শতকরা আশী জন মাটি চষে' খায়! আজ মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিরা কাউন্সিলে যে খেলা খেলছেন, চাষীর প্রতিনিধিরাও কাল সেখানে ঠিক সেই খেলাই খেলবে। যা আজকের দিনে ছেড়ে দিলে 'বাবু' ও চাষীর মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন বাঁধা হ'ত, সেইটাই বাধ্য হ'য়ে ছাড়তে হবে, এবং উপরি পাওনা পাওয়া যাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি আক্রোশ। 'স্বরাজ' অবশ্য তাতে অনেকটা এগিয়ে আসবে!

কিন্তু বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত হিন্দু কি ততদিন 'স্বরাজ' চাবে? যে নমুনা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কবির কথায় তারা বলবে,

'স্বরাজ এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে'
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!'

তারা সম্ভব বল্‌বে,—'যে স্বরাজের জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের লোক দুর্গতি সহ্য করেছে, প্রাণ দিয়েছে, তা 'চাষার' স্বরাজ নয়, আমাদের 'বাবুদের' স্বরাজ। ইংরেজ বণিককে সরিয়ে রাজার আসনে দেশের 'চাষাকে' বসাবার পূর্ব্বে একবার ইংরেজের হ'য়ে 'চাষার' সঙ্গে লড়ে' দেখতে হবে'।

(আত্মশক্তি)

—০—

জাহাজীদের প্রতি

—:•:—

বর্ত্তমান সময় জগতের সকল স্থানেই মজুরগণের মধ্যে একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি হইয়াছে। শোষিত, লুণ্ঠিত শ্রমিকগণ আর পড়িয়া পড়িয়া কিছুতেই মার খাইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা এখন দাবী করিতে শিখিয়াছে,—তাহাদের দাবীর জোরে আজ সমস্ত ধনিক-জগৎ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকগণের সঙ্ঘ বা ইউনিয়নের শক্তি সর্ব্বত্রই বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু, বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে শ্রমিকদের এই উত্থান ও জাগরণের যুগে কলিকাতার "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন"টি একেবারেই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। "ন্যাশন্যাল সি-মেন্স ইউনিয়ন" নামক একটি পাল্টা ইউনিয়ন যখন গঠিত হইয়াছিল তখন "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন"ও কিছু না কিছু নড়া-চরা করিতেছিল। কিন্তু, যখন হইতে আপোস নিষ্পত্তির দ্বারা উভয় ইউনিয়ন এক হইয়া গিয়াছে তখন হইতে "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন" উহার সকল প্রকার কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কেন না, তাহার কোনো কারণ আর নাই। গত কয়েক মাসের ভিতরে একটি দিনের জন্যও নাকি ইউনিয়নের আফিসের দরওয়াজা পর্য্যন্ত কেহ খোলে নাই।

দেশের জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনে অর্থাৎ দেশের ভিতরের ও বাহিরের ব্যাপারে ট্রান্সপোর্ট বা যান-বাহনের মজুরগণের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জাহাজীদের বিশিষ্টতা আবার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাহিরের বাণিজ্য জাহাজীদের বাহুর জোরেই পরিচালিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময়ও সওদাগরী জাহাজের নাবিকগণের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যান-বাহনের শ্রমিকগণের শ্রমের দ্বারাই সারা দুনিয়ায় একটা গতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তাহারা কাজ করিতে অস্বীকার করিলে গোটা পৃথিবীটাই অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু, বড় দুঃখ যে আমাদের জাহাজী ভাইগণ নিজেদের মূল্য নিজেরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। তাহাদের শক্তি যে কত বেশী তাহা তাহারা কখনো অনুভব করার চেষ্টাই করে নাই। নিজেদের শক্তির পরিচয় যদি তাহারা পাইত তাহা হইলে আজ তাহাদের ইউনিয়নের এই দুর্গতি কিছুতেই হইতে পারিত না।

সত্য কথা বলিতে গেলে ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়নের সম্মুখে বড় আদর্শ ও সত্যকার কর্ম্মপদ্ধতি কখনো স্থাপন করা হয় নাই। নাবিকদিগকে তাহাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলার অবিরাম চেষ্টাও ইউনিয়নের তরফ হইতে হয় নাই। বস্তুতঃ, দশ বছরের জীবনে "ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়ন" দরখাস্ত লেখার এজেন্সী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে নাই। এই ইউনিয়নের কর্ম্মকারক হইয়া যাঁহারা শ্রমিক নেতা নামে অভিহিত হইয়াছেন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দরখাস্ত লেখকের কাজই করিয়াছেন। আবেদন আর নিবেদনের দ্বারা নাবিকদের ভালো করার উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যই তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে এই আবেদন-নিবেদন করার উৎসাহও তাঁহাদের আর নাই। তাই, আফিসের দুয়ার বন্ধ হইয়াই রহিয়াছে, তাই সাধারণ সভা ডাকার জন্য মেম্বরগণের নোটীশ দেওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ মোহাম্মদ দাউদ সাধারণ সভা ডাকিতে পারিতেছেন না। মিঃ দাউদের বিশ্বাস এই যে নাবিকগণের কিছুতেই কিছু হইবে না। বাস্তবিক তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিলে কিছু যে হইবে না তাহা খুবই সত্য কথা।

সমগ্র জগতের শ্রমিকগণ যখন জাগিয়া উঠিয়াছে তখন ভারতের নাবিকগণ যে কেবল ঘুমাইতেই থাকিবে, এমনটা কিছুতেই হইতে পারে না। আজ অধিকার বুঝিয়া লওয়ার জন্য তাহাদিগকেও জাগিয়া উঠিতে হইবে। মিঃ দাউদ কিংবা মিঃ মুজাম্মিল আলীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে তাহারা কখনো কিছু পাইবে না। তাহাদিগকে নিজেদের সঙ্ঘ-শক্তির বলে সমস্ত দাবী-দাওয়া আদায় করিয়া লইতে হইবে। নাবিকগণ দল বাঁধিয়া আপনাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করার জন্য যদি উঠিয়া-পড়িয়া না লাগে তাহা হইলে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন কোনো কালেও হইতে পারিবে না। দেশের শ্রমিকগণের মধ্যে নাবিকগণের দেখিয়া শিখিবার যে সুবিধা রহিয়াছে সেই সুবিধা অপর শ্রমিকগণের নাই। ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলন কত জোরে চলিয়াছে, সেখানকার শ্রমিকগণের খাওয়া পরা ও থাকার অবস্থা যে ভারতের শ্রমিকদের অপেক্ষা কত বেশী উন্নত—এ সকল চোখ খুলিয়া দেখিয়া আসিলে তাহাদের মনে স্বভাবতই নিজেদের হীনাবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারিত এবং এই আকাঙ্ক্ষাই তাহাদিগকে জয়ের পথে অগ্রসর করিয়া দিত। আমাদের নাবিকগণ সারা জগৎটা ঘুরিয়া আসে সত্য, কিন্তু, চোখ তাহারা রাগে বন্ধ করিয়া! তাই তাহাদের কোনো শিক্ষাই হয় না। নতুবা দেখিয়া শিক্ষার জন্য পুঁথির বিদ্যার কোনো প্রয়োজন হয় না।

ধনিক আর শ্রমিকের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা প্রীতির সম্বন্ধ,—ভালোবাসার সম্বন্ধ কখনো নহে। ধনিক চায় শ্রমিককে যথাসম্ভব কম মাহিনায় দিয়া তাহার নিকট হইতে যথাসম্ভব অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইতে। শ্রমিকের লক্ষ্য থাকে ক্রমশঃ তাহার মজুরী বাড়াইয়া লইয়া পরিণামে তাহার পূরা মজুরী আদায় করিয়া লওয়া। যে দিন শ্রমিক তাহার ষোল আনা মজুরী বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবে সেদিন ধনিকের অস্তিত্ব আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইবে। ধন ধনীর নিকটে জমা হয় বটে, কিন্তু, সে নিজে তাহা উপার্জ্জন করে না। উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কাজ না করিলে কোনো রোজগার যে হয় না এ কথা সকলেই বুঝিতে পারে। ধনীরা নিজেরা কোনো কাজ করে না। তবে চিন্তা তাহারা যথেষ্টই করিয়া থাকে, অবশ্য তাহাও করা হয় অপরকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে। ঠকাইয়া যাহা জমা করা হয় তাহা রোজগার কিছুতেই নয়। অর্থাৎ বিনা রোজগারের ধনের দ্বারাই ধনী পোদ্দারী করিয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই ঠকাইবার প্রণালীটা কি? প্রণালী খুবই সোজা। ধনী মজুরকে কাজে নিযুক্ত করিয়া থাকে। মজুর যখন পাঁচ টাকা মূল্যের কাজ করিয়া দেয় তখন ধনী তাহাকে দেয় দুই টাকা মাত্র। বাকী তিন টাকাই ধনী লুটিয়া নেয়। অভাবের তাড়নায় আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজুরকে কম দামে আপনার মজুরী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়। কেন না, যে যন্ত্রের দ্বারা কোন কিছু উৎপাদিত হইয়া থাকে সেই যন্ত্রই ধনী হস্তগত করিয়া রাখিয়াছে, আর রাখিয়াছে বলিয়াই সে মজুরকে অনায়াসে লুটিতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে জাহাজের কথাই ধরা যাউক। জাহাজ হইতেছে ধন-উৎপাদনের উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই ধনী নাবিকদিগকে লুট করিয়া থাকে। এখন বোধ হয় সকলে

বুঝিতে পারিতেছেন যে মজুর তাহার ষোলো আনা মজুরী বুঝিয়া যখন লইবে তখন কি করিয়া ধনিক আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

মোট কথা, ধনিক আর শ্রমিকদের সম্বন্ধ মধুর সম্বন্ধ মোটেই নহে। তাহাদের সম্বন্ধ হইতেছে বিরোধের ও সংগ্রামের সম্বন্ধ। এইরূপ অবস্থায় আবেদন-নিবেদনের দ্বারা কিছুতেই কিছু হইতে পারে না। নাবিকগণকে দল বাঁধিয়া শক্তি বলে সব কিছু দখল করিয়া লইতে হইবে। ভালো খাইব, ভালো পরিব এবং ভালো ঘরে বাস করিব, এরূপ একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক নাবিকের মনে যখন জাগিবে তখনই শুধু পূর্ণোদ্যমে সংগ্রাম চালাতে সে সমর্থ হইবে।

নাবিকদিগকে শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের সকলের শক্তি যখন ইউনিয়নের ভিতরে সংহত বা জমা হইয়া উঠিবে কেবলমাত্র তখনই তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হওয়াও আরম্ভ হইবে। এ কথা নাবিক ভাইদিগকে সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে ইউনিয়ন গঠন করার উদ্দেশ্য কোম্পানীর নিকটে কিংবা গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করা নহে। যাহারা নাবিকদের বুকের রক্ত চুষিয়া খাইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করাই হইবে ইউনিয়নের উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় আর ভারতীয় নাবিকের অবস্থার মধ্যে বেশী পার্থক্য কিসের জন্য হইয়াছে তাহা ভারতের নাবিকদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ভারতীয় নাবিকেরা দাবী করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা আজ এমন হীনাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। যেখানে একজন ইউরোপীয় নাবিক গড়ে ১২১৲ টাকা মাসে পাইয়া থাকে সেখানে একজন ভারতীয় নাবিক গড়ে মাসে ৩০৲ টাকাও পায় না।

বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়াই নাবিকদিগকে এখন আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে শতকরা একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি তাহাদিগকে চাহিতে হইবে।

———

সভ্যতা না চতুরের ধর্ম্ম ?

—:•:—

(শ্রীসৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর)

—০—

পুরাণেতে আছে যে, যখন মহাসমুদ্র মন্থন করা হয়েছিলো তখন মন্থন করেছিলো দেবতা আর দানবে মিলে। সেই মন্থনের ফলে উঠলো অমৃত, উঠলো রত্ন, উঠলেন লক্ষ্মী, সব গিয়ে জমা হোল চতুর দেবতার ঘরে। উঠলো পাঁক আর বিষ। দেবতারা চাতুরী করে ঠেলে দিলেন দানবের হাতে। হতভাগা দানবেরা মন্থন করবার ফলভোগ করল মথিত হয়ে। এই বহুকালের পুরাণের কথিকাটির মধ্যে মানুষের জীবনের একটা গোড়াকার সম্বন্ধের আভাস পাই। দেখতে পাই যে কেমন করে মানুষের মধ্যে যারা চতুর তারা তাদের চাতুরী দিয়ে বহুকাল থেকে অবশিষ্ট হতভাগা লোকদের বঞ্চিত করে আসছে। তাই দেখি যে মানুষের কল্পনা যখন স্বর্গ সৃষ্টি করলো, দেবতা সৃষ্টি করলো, দানব সৃষ্টি করলো তখন এই পৃথিবীর মানুষদের মধ্যেকার চাতুরীর বাস্তব সম্বন্ধের ছায়া স্বর্গের দেবতা আর অসুরদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হল। তাই হবারই তো কথা। এই কালো-মাটির বাসার বুকের উপর আমরা যে জীবন-প্রণালী তৈরী করেছি তারি বেদীর উপর তো স্বর্গের ইমারৎ তৈরী হতে পারে। এই পৃথিবীর মাটি নিয়ে, তার শস্য নিয়ে, মানুষে মানুষে যে বিরোধ হল, অল্পসংখ্যক চতুর লোক যে উপায়ে অসংখ্য লোককে ঠকিয়ে ধন-সঞ্চয় করলো ঠিক সেই উপায়েই দেখি স্বর্গের দেবতারা দানবদের ঠকিয়ে সব সুধা আপনাদের ভাণ্ডারে জমা করলো। স্বর্গে দেবতা অসুরের বিরোধে দেবতার জয় হোল মর্ত্ত্যের চতুর মানুষ এই ছবি এঁকে এই পৃথিবীতে চতুর, অ-চতুরের সংঘর্ষের ফলে চতুরের (অর্থাৎ মর্ত্ত্যের দেবতাদের) জয় হবে অথবা হওয়া উচিত চাতুর্য্যের এই নৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের লোভকে মহিমামণ্ডিত করতে চেষ্টা করলো। স্বর্গ সৃষ্টি করবার মূলেই রয়েছে চাতুরী, লোভ, লুণ্ঠনকে জীবনের একটা সহজ অভিব্যক্তি বলে স্বীকার করাবার চেষ্টা। স্বর্গ লোভীর আর ভোগীর স্বর্গ ছাড়াতো আর কিছুই নয়। এই চতুর লোকের দল নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থকে ধর্ম্মের নামাবলী দিয়ে ঢেকে এতদিন সাধু সাজিয়ে রেখেছে, এই চতুর লোকেরা নিজেদের লোভের কদর্য্য বুভুক্ষাকে দার্শনিক তত্ত্বের সুনিপুণ তন্তুজালে আবৃত রেখে লোক ঠকিয়ে এসেছে। যুগে যুগে কবি এই চতুরদের জয়গান করে এসেছে, শিল্পী এই চতুরদের কাহিনী অবলম্বনে শিল্প সৃষ্টি করেছে, নারী তার দেহের মাধুর্য্য, অন্তরের সুধা এই চতুরদের কাছে নিবেদন করে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। এই চতুরদের লুণ্ঠনবাদ, অত্যাচার, চাতুরী প্রণালীকে আমরা সভ্যতা বলে থাকি। এই চতুরলোকদের সভ্যতার পরিচয় অতীতেও আমরা পেয়েছি এখনো নানা দিকে পাচ্ছি। তাই ভাবি যে কবে আমরা এই সভ্যতার শিকড় শুদ্ধ উপড়ে একে নিঃশেষ করে দিতে পারবো, কবে চতুরদের তৈরী ধর্ম্ম, কাব্য, দর্শন, শিল্প দগ্ধ করে ছাই করে দিগন্তে ছড়িয়ে দিতে পারবো! এই চতুরদের চাতুরীর ধারা যাকে সভ্যতা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তার অস্তিত্ব যতদিন না সমূলে লোপ করা হচ্ছে ততদিন সত্যিকার মনুষ্যত্বের পথ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে না। এই মনুষ্যত্ব সাধনার ব্রত হল আজকের দিনে মানুষের ব্রত, স্বর্গ সাধনার ব্রত হল অতীতের লোভী মানুষের ব্রত। মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে দেশে দেশে তরুণরা দেখা দিয়েছে। তাদের চোখে জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যতের ধ্যানের জলন্ত শিখা, তাদের ললাটে মহা-ভবিষ্যতের আগমনীর শ্যামল ছায়া। এ-দেশের তরুণদের মধ্যে এই ব্রত উদ্‌যাপনের সংযম দেখে মন শ্রদ্ধায় অবনত হচ্ছে। ভারতবর্ষে কবে এদের মত তরুণ তাপসদের আবির্ভাব হবে, যারা চাতুরীকে সভ্যতা বলে ভুল করবে না, যারা লোভকে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করবে না, যারা দুর্ব্বলতাকে ছন্দে গেঁথে কাব্য করে তুলবে না, যারা লুণ্ঠনকে ধর্ম্ম বলে স্বীকার করবে না! তারাই ভারতবর্ষকে মুক্ত করবে তার সমস্ত বন্ধন থেকে। ঘরে আচারের বন্ধন থেকে, সমাজের বন্ধন থেকে, ধর্ম্মের বিভীষিকার বন্ধন থেকে, সর্ব্বপ্রকার শোষকের বন্ধন থেকে আর বাইরের বিদেশী স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বন্ধন থেকে। আমাদের দেশের কর্ম্মীদের মন যতদিন এই তথাকথিত সভ্যতার ভারে ভারাক্রান্ত থাকবে ততদিন আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মুক্তি নেই। "গণবাণী" এই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ সকলের কাছে সুস্পষ্ট করে

দিক। চতুর লাঞ্ছিত হোক, চতুরের সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। ঐক্যের যথার্থ অনুভূতির রসে সিক্ত হয়ে মানুষের সভ্যতা অঙ্কুরিত হোক। এই নবীন সভ্যতা এ পৃথিবীর বাস্তব অনৈক্যকে অবাস্তব পরলোকের ঐক্যের মিথ্যে আশ্বাস বাক্যে ঢাকতে চেষ্টা করবে না, এ সভ্যতা মানুষের জীবনের দৈহিক তাড়নার অতি সুস্পষ্ট ঐক্যের উপর ভবিষ্যৎ মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা করবে। সেই পরমশুভ মুহূর্ত্ত মানুষকে তার অতীতের অত্যাচারের অপরিসীম লজ্জা থেকে ত্রাণ করবে

ভারতবর্ষে এই মুক্তি-সাধনা সফল হোক। •

বার্লিন

৩০শে আগষ্ট, ১৯২৭।

—০—

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

গত ২৬শে আগষ্ট তারিখে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির এক সভার অধিবেশন হয়েছিল। এই সভায়—

(১) ৩১ জন ...জন ব্যক্তিগত সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন,

(২) হেমন্তকুমার সরকার এম, এ, ও কালীকুমার সেনগুপ্ত ক... নির্ব্বাহক কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন;

(৩) হেমন্তকুমার সরকার এম, এ, দলের কৃষক বিভাগের সেক্রেটারীও নিযুক্ত হয়েছেন।

(৪) দলের তরফ হতে "লাল নিশান" নামক একখানা হিন্দী সাপ্তাহিক প্রচার করাও স্থিরীকৃত হয়েছে।

(৫) সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নিমন্ত্রণে সর্ব্বদল সম্মিলনে পাঠাবার জন্যে যে ষ্টেট্‌মেণ্ট (Statement) তৈয়ার করা হয়েছে তা সভায় পঠিত ও গৃহীত হয়। এই ষ্টেটমেণ্ট বা বর্ণনা পত্র লক্ষ্ণৌর সর্ব্বদল সম্মিলনে দাখিল করার জন্যে সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নিকটে পাঠানো হয়েছে।

অতঃপর কাগজের প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়ার পর সভার কাজ ভঙ্গ করা হয়।

ট্রেড্ ডিস্‌পিউট বিলের প্রতিবাদ

—০—

ঢাকায় সভা *

গত ২২শে আগষ্ট অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় স্থানীয় করোনেশন পার্কে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের ঢাকা শাখার" অধিনায়কত্বে এক সভার অধিবেশন হয়।

বাবু গণেশচন্দ্র চাটার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ট্রেড ডিসপিউট বিল পাস হইলে শ্রমিকদের যে কিরূপ ভয়ানক ক্ষতি হইবে তাহা ই, বি, রেলওয়ের মিঃ আর, জি, দাশ এক বক্তৃতায় ... ভাবে বুঝাইয়া দেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বুর্জ্জোয়া গভর্ণমেণ্ট,—ভবিষ্যতের গভর্ণমেণ্ট কৃষক ও শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হওয়া উচিত—তারই প্রতিষ্ঠার জন্য একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা শ্রমিকদের পক্ষ হইতে হওয়া দরকার।

গোপালচন্দ্র বসাক এরূপ এক রিজলিউশান উত্থাপন করেন যে উক্ত বিলের তীব্র প্রতিবাদ সমগ্র ভারতব্যাপী ষ্ট্রাইক দ্বারা হওয়া দরকার। মিঃ শচীন্দ্র ঘোষ এম, এ, তাহা সমর্থন করেন।

৮॥০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

* লেখাটা হস্তগত হওয়ার পরেই "গণবাণী"র প্রচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ছাপাতে বিলম্ব হলো।

(সম্পাদক)।

প্লাবন পীড়িত কৃষক

—:০:—

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

আজকাল সংবাদ পত্রের পাতা উল্টাইলেই দেখা যায় যে বাঙ্গলার কোন না কোন স্থান বন্যা প্লাবিত হইয়াছে। এক একটি বন্যায় দরিদ্র প্রজা সাধারণের—বিশেষতঃ কৃষক ও শ্রমিকদের যে ভয়ানক দুরবস্থা হয় তাহার কতকটা সামলাইতেই তাহাদের কয়েক বৎসর লাগিয়া যায়। ইতিমধ্যে কোথাও বা আবার বন্যা আসিয়া পড়ে। ইহার উপর দুর্ভিক্ষে দেশ ত শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আহার না পাইয়া লোকে প্রথমটায় ঋণ করিতেছে, শেষে হাল, লাঙল, মহিষ, গরু, বাসন প্রভৃতি বেচিয়া ফেলিতেছে। তাহাতেই বা চলে কয়দিন? অগত্যা আহার কমাইতেছে। ক্রমশঃ দুই বেলার পরিবর্ত্তে একবেলা ও একবেলা হইতে একদিন অন্তর আহার জুটিতেছে। কেহ বা তাহাও পাইতেছে না। শোনা যায় শাক পাতা খাইয়াও নাকি কয়েকদিন চালান যায়। বন্যা-প্লাবিত স্থানের লোকেরা তাহাও জুটাইতে পারে না। অগত্যা "আড়কাটিদের" নিকট স্ত্রী পুত্র বেচিয়া ফেলিতেছে। কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিতেছে। অন্য দেশের লোকে এই অবস্থায় স্ত্রী পুত্র বিক্রয় বা আত্মহত্যা না করিয়া আত্মরক্ষার জন্য যাহা হয় একটা কিছু করিত। অর্থাৎ প্রথমটায় গভর্ণমেণ্ট ও জমিদারের সকল রকম খাজনা বন্ধ করিত। পরে তাহাতেও না হইলে গভর্ণমেণ্ট ও জমিদারকে আবশ্যক সাহায্য করার জন্য বাধ্য করিত। গভর্ণমেণ্ট ও জমিদার উহা না করিলে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। এদেশের কৃষকেরা তাহা যে পারে না তাহা নহে। সেরূপ করার পরিবর্ত্তে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ও আত্মহত্যা করাকে ইহারা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে এবং ইহাদের উৎকট "ধর্ম্ম-বুদ্ধিই" তাহা করিতে দেয় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "মূর্খের কোন ধর্ম্ম নাই"। কথাটার প্রত্যেক অক্ষরটিই সত্য। চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছে যে লোভী জমিদার লাভের আশায় বন্যার জল বাহির হওয়ার খাল-পথ বন্ধ করিয়া দিয়া বা আবশ্যক মত নূতন "হানা"র সৃষ্টি করিয়া মাছ ধরার উপায় উদ্ভাবন করাতেই তাহাদের এই সর্ব্বনাশ হইতেছে! গভর্ণমেণ্টও তাহার তহসীলদারকে চটাইতে নারাজ! তথাপি যে পথে ইহার সত্য প্রতীকার হইতে পারে তাহা না করিয়া "অদৃষ্ট" ও

"কর্ম্মফলের" দোহাই দিয়া সগোষ্ঠী উৎসন্ন যাইতেছে। এ অদ্ভুত ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতিষেধক কি? অনেকে বলেন, বন্যা একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার ইহার উৎপত্তি বা গতি রোধ করা সম্ভবপর নয়। এ দেশের কোন কোন লোভী জমিদার কিন্তু বন্যাপীড়িত প্রজাদের এই বিপদে নিজের কেমন সুবিধা করিয়া লয় নিম্নের ঘটনাতেই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। বজ্‌বজে "বাঙ্গলার পাটকলের শ্রমিক সমিতি"র অফিসের নিকট দাঁড়াইয়া আমি একদিন "গণবাণী" বিক্রয় করিতেছি, এমন সময় একজন শ্রমিক আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" কি আপনাদের? আমি জানাইলাম যে আমিও একজন শ্রমিক এবং এই দল বাঙ্গলার কৃষক ও শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত দল। লোকটী জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কাজ কি?" খুব সংক্ষেপে উত্তর দিবার জন্য আমি জানাইলাম "এই দলের সভ্যেরা অধিকাংশই কৃষক কিংবা শ্রমিক, বাঙ্গলার সকল স্থানের কৃষক ও শ্রমিকদের সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য এই দল যাহা করা উচিত বলিয়া বিবেচনা ও নির্দ্দেশ করেন, দলের সেবক হিসাবে আমাকে ও অন্য সকলকে তাহাই করিতে হয়।" লোকটী তখন বলিল যে বন্যার জলে এবার তাহাদের ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্য অনেক গ্রাম একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। বহু-ক্রোশ-ব্যাপী ধানের আবাদ জলমগ্ন হইয়াছে। লোকের ঘর বাড়ী পড়িয়া যাইতেছে। জমিদার ইচ্ছা করিয়াই কোন প্রতীকার করিতেছে না ইত্যাদি। পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে এ অবস্থায় আপনি আপনার দলের সাহায্যে আমাদের কোন উপকার করিতে পারেন কি না? লোকটী আমাকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যাওয়ার জন্য তখনই অনুরোধ করিল। সেদিন অন্যান্য কার্য্য বশতঃ যাওয়া হয় নাই। পরদিন শুক্রবার তাহাদের গ্রামে যাইতে ও সমস্ত দেখিয়া "দলের" নিকট জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলাম। ১৭ই আগষ্ট শুক্রবার আমরা রওনা হই। উলুবেড়িয়া থানার পার্শ্ববর্ত্তী বাইশ পুটীর খাল অতিক্রম করিয়া রাত্রি আন্দাজ ১০টার সময় আমাদের নৌকা যাইয়া বন্যা প্লাবিত স্থানে উপস্থিত হইল। রাত্রে নৌকা বন্ধ করা হইল না। প্রবল বন্যার স্রোত ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। গ্রামবাসীদের কয়েকজন আমাদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও গভীর অন্ধকারের মধ্যে কয়েকবার আমরা পথ হারাইয়া গেলাম। পরে বহু কষ্টে রাত্রি প্রায় ৪টার সময় আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে একজনের কুটীরে উপস্থিত হইলাম। দুই ঘণ্টা বিশ্রামের পর প্রত্যূষে আবার নৌকা চালাইয়া আমরা শ্যামচক্ ও বৃন্দাবন পুরের মধ্যস্থিত বিস্তৃত বাঁধের উপর উঠিলাম। সংবাদ পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের অন্যূন ৫০ জন লোক আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম। কি অদ্ভুত দৃশ্য! যতদূর দেখা যায় কেবল জল। গ্রামবাসীদের নিকট জানা গেল যে বর্দ্ধমান অঞ্চলের "...নাই" বা "কানা নদীতে" বন্যা হইয়া জল কেদোর মাঠ অতিক্রম করিয়া, পর পর সমস্ত গ্রাম ডুবাইয়া শেষে জঙ্গল বিলাসে আটক খাইয়াছে। পূর্ব্বে আরও কয়েকবার বন্যা হইয়াছে; সে সময় কিন্তু লোকে এরূপ বিপন্ন হয় নাই। কারণ কেদোর মাঠ হইতে আন্দাজ ৪ ক্রোশ দীর্ঘ একটি খাল উন্মুক্ত থাকায় বন্যার জল সেই খাল দিয়া বরাবর আসিয়া বাইশপুটী খালের ভিতর দিয়া একেবারে উলুবেড়িয়ার নিকট গঙ্গায় আসিয়া পড়িত। জমিদারদের স্বাভাবিক উদ্ভাবনী শক্তির বলে ও নায়েব গোমস্তার কৌশলে খাল পথ রুদ্ধ হইয়া এক্ষণে মাছ ধরবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বন্যার জলের স্রোতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যে সব পুষ্করিণী ভাসিয়া মাছ বাহির হইয়া আসে তাহা এই খাল-পথ দিয়াই বাহির হয়। মালা ও বাগ্দীরা এই মাছ ধরার জন্য সুবিধা মত খালের নানা স্থানে জাল এবং "ঘুনি" পাতিয়া রাখে। বলা বাহুল্য ইহাতে তাহারা বেশ কিছু উপার্জ্জন করিতেও পারে। যথা সময়ে নায়েব ও গোমস্তার মারফত জমিদারদের নিকট সংবাদ পৌছিলে সঙ্গে সঙ্গেই একটা "বন্দোবস্ত" হইল। স্থির হইল জমিদারের হুকুম ব্যতীত কেহ মাছ ধরিতে পাইবে না। ক্রমশঃ "ডাক" আরম্ভ হইল। যে বেশী টাকা দিতে পারিল সেই মাছ ধরিবার হুকুম পাইল। জলে জল বাঁধিল। যে জলে প্রজা সাধারণের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল সেই জলেই জমিদারের একটা নূতন আয় বৃদ্ধি হইল। মাছ ধরার জন্য যাহারা খালের অংশ বিশেষ জমা লইল 'ডাকের" টাকা তাহাদিগকে প্রথমেই জমা দিতে হইল। ইহার উপর সমানে নায়েব গোমস্তা ও তাহাদের পেটোয়ালদের "খাওয়ার" মাছ যোগান আছে। মঙ্গল অথচ বন্যায় ভাসা মাছ! কাজেই মাছ ধরার কোনরূপ ত্রুটি যাহাতে না হয় সেজন্য মেছুয়ারা বিশেষ সাবধান হইল। বন্যার স্রোতে সোজা খালের মুখে জাল বা ঘুনি পাতা সম্ভব নয়। কাজেই মাঠের বাঁধের নানা স্থান কাটিয়া মেছুয়ারা স্রোতের স্বাভাবিক গতি মন্দ করিয়া দিয়া মাছ ধরার সুবিধা করিয়া লইল। এদিকে স্রোতের গতি এইরূপে হ্রাস হইতে হইতে অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়াইল যে খালের শেষ পর্য্যন্ত আর আদৌ টান রহিল না। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় বন্যার জল যে পরিমাণ আসিয়া গঙ্গায় পড়িত তাহার দশ ভাগের একভাগ জলও আর গঙ্গায় আসিল না। বিপুল জলরাশি নানা পথে বহিয়া বৃন্দাবনপুর, শ্যামচক্ ও ইস্‌লামপুর প্রভৃতি বড় বড় তালুকের সুবিস্তীর্ণ আবাদী ক্ষেত জলমগ্ন করিয়া অসহায় কৃষকদের কুটীরগুলিকে আক্রমণ করিয়াছে। কতক-গুলি ঘর সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়াছে। কাহারও বা ঘর নষ্ট হওয়ায় দাওয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সর্পভীতিও উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকস্থানে অনেকগুলি সাপকে জলা অতিক্রম করিয়া লোকের গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেও দেখা গেল। গৃহপালিত ছাগল, গরু, মহিষ এবং হাঁস মুরগী প্রভৃতি অনেক ভাসিয়া গিয়াছে। অবশিষ্টগুলিকে লোকে নৌকায় করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বহুক্রোশব্যাপী ধানের ক্ষেত ব্যতীত যে সব গ্রাম আমরা দেখিলাম তন্মধ্যে লতিফপুর, যদুরবেড়ে, বাহিরতলা, ফুলেশ্বর, তাঁতিবেড়ে, পীরপুর, বাঙ্গালপুর, রেজাপুর, বালিপোতা, করাত-বেড়ে, জগদীশপুর, ধর্ম্মতলা, দুলোপুর, বগা, জোয়ারগড়, পানপুর, ভাণ্ডারগাছা, হরিশপুর, মাকালহাটী, কোমরচক, জালালশী, কাঁটাবেড়ে, কটরা, মধ্যেরচক প্রভৃতিই অধিক বিপন্ন। এই সব গ্রামের সন্নিকটে ধানের ক্ষেতে অবস্থিত জলের পরিমাণ অধিকাংশ স্থলেই ৯ হইতে ১৫ ফিট। ৬ ফিটের কম কোথাও পাইলাম না। কেদোর মাঠ হইতে যে খালের কথা পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি তাহা "শিবেরহানা" পর্য্যন্ত আন্দাজ দেড় ক্রোশ রাস্তা মজিয়া যাওয়ায় বন্যার জল সরাসরি ইস্‌লামপুর ও শ্যামচক্ প্লাবিত করিয়া বিস্তৃত বাঁধ ভাঙ্গিয়া বৃন্দাবনপুর ডুবাইয়া দিয়াছে। "শিবেরহানা" হইতে দক্ষিণে "বাইশপুটি" বুড়ীখালি ও কামারখালি প্রভৃতি খাল দিয়া যে

সামান্ত পরিমাণ জল বাহির হওয়ার উপায় ছিল। মাছ ধরার জন্ত ইজারাদারেরা তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। উলুবেড়িয়া হইতে আমরা যখন নৌকা লইয়া খালের মুখে প্রবেশ করি তখন স্রোতের গতি খানিকটা অধিক দেখিতে পাই। মাঠের দিকে যত অগ্রসর হইতে থাকি ততই তাহা কম দেখিতে পাই। খালের সমগ্র পথ মুক্ত থাকিলে নৌকা লইয়া স্রোতের গতি ভেদ করিয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই যে মাঠে যাওয়া সম্ভব হইত না তাহাও বুঝিতে পারা গিয়াছিল। খুড়িখালি ও কানানখালি নামক দুইটী খালের জলে মোটেই স্রোত বহে না। মেছুয়ারা নানাস্থান কাটিয়া দিয়া স্রোতের জল ফিরাইয়া দিয়াছে। ফলে, খালগুলির জল নিকাশের সহজ উপায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা দেখিলাম যে কেদোর মাঠ হইতে যে খাল "শিবেরখানা" হইয়া বরাবর আসিয়া বাইশপুটীতে সংযুক্ত হইয়াছে তাহা যদি ডালজপ কাটাইয়া, দেওয়া বায় ও বাণীবন, জগদীশপুর এবং বটতলা প্রভৃতি স্থানে দুয়ারযুক্ত কয়েকটী পোল বাঁধিয়া গঙ্গার জোয়ার-ভাটার জল আয়ত্তাধীন করা যায়। তাহা হইলে প্রবল বন্যায় বা গঙ্গার জোয়ারে ঐ সকল গ্রামের কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। সে কথা শুনিবে কে? শোনা গেল যে গত বৎসর জমিদারবাবু নাকি বৃন্দাবনপুরের সন্নিকট খালের মাটি কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার জন্ত তাঁহার নায়েব গোমস্তাদের হাতে কিছু টাকা দিয়াছিলেন। গোমস্তা বাবাজীরা উহার সাহায্যে কয়েক ঝুড়ি মাটি কাটাইবার পরিশ্রমও নাকি করিয়াছিলেন! অতঃপর সেই বাঁধের উপর বসিয়াই আমরা গ্রামবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া স্থির করি যে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই অন্যূন দুইশত গ্রামবাসী প্রজা জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া প্রতীকারের প্রার্থনা জানাইবে। তাহার ফলে তাহাদের দুরবস্থা যদি সহজে এবং সত্বর লাঘব হয় ভালই। অন্যথা শত শত গ্রামের সহস্রাধিক বিপন্ন পরিবার যাহাতে দাঁড়াইয়া না মরে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল" অবশ্যই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন। দলের নিকট ইহাই আমার নিবেদন।

দেশ-বিদেশ

—০—

আত্ম নিয়ন্ত্রণ না আত্ম সমর্পন ?

ইউরোপ থেকে ফিরে এসে মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মাদ্রাজের সমুদ্রতটে এক বক্তৃতা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা জাতির পক্ষে আত্ম নিয়ন্ত্রণ কিছুতেই নয়। উহা জাতির আত্ম সমর্পণই বটে। কলিকাতা কংগ্রেস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে—"স্বাধীনতার পতাকাকে অবনমিত করা এই কংগ্রেসের কিছুতেই উচিত নয়। কাজে যদি তা-ই হয়, যদি কলিকাতা কংগ্রেস একটা মদরত কংগ্রেসে পরিণত হয়, তা হ'লে দেশ কিছুতেই পেছনের দিকে ফিরে যেতে পারবে না। ফলে, সংগ্রেসের মধ্যে একটা ভাঙাভাঙি হয়ে যাবে এবং স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম চালাবার জন্যে একটা "স্বাধীনতা সঙ্ঘ" বা League of Independence গঠিত হবে।" এসব কথা শোনায় বেশ ভালো, কিন্তু, মিঃ আয়েঙ্গার যে একজন জমিদারও বটেন। বিন্যস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাকতে পারবেন কি ?

কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক

কর্নেল গিডনি ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে এই বলে প্রশ্ন করেছেন যে সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট এম, এন, রায়ের যে পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কোনো খবর রাখেন কি? যদি খবর পেয়ে থাকেন তা হলে গবর্ণমেণ্ট চিঠিখানা ব্যবস্থা পরিষদের টেবিলের ওপরে রেখে দিবেন কি? কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বারা প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর নাম গবর্ণমেণ্টের জানা আছে কি? কতকগুলো লোক দেখতে পাচ্ছি কম্যুনিষ্টদের ভয়ে একেবারে মরতে বসেছে।

লেনিনের স্মৃতি-ফলক

নির্ব্বাসিত লেনিন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জুরিক শহরের এক অতি পুরাতন নিভৃত সরু গলিতে বাস করতেন। যান-বাহন চলাচলের রাস্তা থেকে গলিটা খুব দূরে ছিল। তা ছাড়া তা এত সরু ছিল যে ওর এক পাশের বাড়ীর লোক অপর পাশের বাড়ীর লোকের সহিত জানালার ভিতর দিয়ে কর-মর্দ্দন পর্য্যন্ত করতে পারত। এমন জায়গায় এক অন্ধকার কুঠরীতে লেনিন একাকী বাস করতেন। কেউ তাঁর খবরও রাখত না। এই গৃহ থেকেই লেনিন রাশিয়াতে ফিরে যান।

সম্প্রতি এই বাড়ীতে লেনিনের স্মৃতিফলক লাগানো হয়েছে। এ উদ্দেশে কোনো উৎসব ইত্যাদি কিছুই হয় নি। একদিন হঠাৎ লোকে দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হলো যে তাতে স্মৃতিফলক লেগে গেছে। প্রথমে কেউ বুঝতেই পারে নি যে কে এই ফলক লাগিয়ে গেল। পরে অবশ্য জানা গিয়েছে যে নগরের কর্ত্তৃপক্ষরাই তা লাগিয়েছে।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র



Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড.	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, ২১শে ভাদ্র, ১৩৩৫.	১৩শ সংখ্যা

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

আমাদের বহু গ্রাহকেরই দেওয়া মূল্য শেষ হ'য়ে গেছে। যাঁদের টাকা ৫।৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে ফুরিয়ে গেছে তাঁদের নামেও আমরা রীতিমত কাগজ পাঠিয়ে আসছি এবং তাঁরা সকলে রীতিমত কাগজ গ্রহণ ক'রেও আস্‌ছেন। কাজেই, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের সকলেই কাগজ এবারেও রাখতে চান। এ সপ্তাহ থেকে আমরা সকলের নামেই ভি, পি, যোগে "গণবাণী" পাঠাতে আরম্ভ করব। দয়া ক'রে সকলেই ভি, পি, গ্রহণ করবেন।

বিনীত

ম্যানেজার, "গণবাণী"

সম্পাদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
শ্রীকালীকুমার সেন

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা।
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৷৹
Foreign Subscription : Annual 6s.

CALL TO ACTION

Being the Resolutions and Theses passed at the Third Annual Conference of the WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL

After years of agitation and organisation, India is still a slave-nation, is farther from freedom than ever. Why is this?

Why is the once mighty National Congress a laughing stock before the world?

Why do our leaders invariably say one thing and do another?

For a clear, consistent Marxist analysis and explanation of these disturbing phenomena,

For a clear practical lead as to what to do to remedy this state of things,

See. "A CALL TO ACTION." Price As. 8/- only.

To be had of

1. THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
   2/1, European Asylum Lane, Calcutta.

2. THE BOOK COMPANY LTD.
   4/4A, College Square, Calcutta.

HELL FOUND

Or

A COMMUNIST'S THREE YEARS IN AN INDIAN PRISON.

By

S. A. Dange

You will see here how helpless human beings are laid prostrate and beaten with shoes and sticks till they bleed, how patients in high fever are put in irons, how in the height of a Himalayan winter men are left to freeze and die.

Full of sensations and revealations.

Price Re. 1/- only.

To be had of

THE VANGUARD LITERATURE Co.
2/1 European Asylum Lane, Calcutta.

Or

THE BOOK COMPANY Ltd.
4/4A College Square, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

''গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছ'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেণ্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেণ্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেণ্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেণ্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, ২১শে ভাদ্র, ১৩৩৫ | ১৩শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

—:*:—

ট্রেড্ ডিস্‌পিউট্ বিল ও "শ্রমিক নেতা"দের কার্য্য

গত রবিবারে কলিকাতার অলবার্ট হলে বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশনের অধিনায়কত্বে এখানকার কয়েকটি ট্রেড্ ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের এক সভা বসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল ট্রেড্ ডিস্‌পিউট্ বিল সম্বন্ধে আলোচনা করা। সভায় লোক সমাগম যত নৈরাশ্য জনক হয়েছিল ততোধিক নৈরাশ্য ব্যঞ্জক হয়েছিল ওর কর্ম্মপদ্ধতি। ট্রেড্ ডিস্‌পিউট বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলে শ্রমিকদের কি সর্ব্বনাশ হবে সেটা শ্রমিকদের জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। এ বিলের বিরুদ্ধে একটা তুমুল আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যে আগে থেকেই সৃষ্টি করা উচিত ছিল। বিলের অনিষ্টকারিত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতন ক'রে দিলেই আন্দোলন আপনা থেকেই সৃষ্টি হ'ত, আর বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশনের ইহাই ছিল কর্ত্তব্য। কিন্তু, ফেডারেশন এতদিন ত সে সম্বন্ধে কিছুই করেনি, রবিবারের মিটিংএ ও সে সম্বন্ধে কোনো কিছু স্থিরীকৃত হয় নি। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের নিকটে উপস্থিত হয়ে বিল যাতে পাস না হ'তে পারে সে দরবারই ফেডারেশন করবে—শ্রমিকদের বস্তীতে বস্তীতে ফেডারেশনের নেতৃগণ কিছুতেই ঘুরে বেড়াতে পারবেন না। কেননা, তাতে শ্রমিকদের সহিত একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ভয় রয়েছে। আর, সাক্ষাৎ সম্বন্ধই যদি শ্রমিকদের সহিত স্থাপিত হলো তা হলে শ্রমিক-নেতৃত্বের আর দাম থাক্‌ল কি? আসল কথা এই হচ্ছে যে শ্রমিক নেতা নামে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই শ্রমিকদের কেউই নন। এই নেতৃগণের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, শ্রমিকদের নেতৃত্ব ও তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোবৃত্তি নিয়েই করছেন। সে জন্যেই কাজের যত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, সে জন্যেই নেতৃগণ মজুরদের বস্তীতে বস্তীতে না ঘু'রে সিমলার দিকেই ছুট্‌তে চাইছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যখন শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে যাবেন তখন প্রথমেই তাঁদের দেখা উচিত যে তাঁরা তাঁদের শ্রেণীগত সত্তা পরিহার করতে পেরেছেন কিনা অর্থাৎ তাঁরা de-classed হতে পেরেছেন কিনা। তা' যদি তাঁরা না হতে পারেন তা হলে শ্রমিক আন্দোলনে তাঁদের যোগদান করা কিছুতেই উচিত নয়। শ্রমিকদের একজন যাঁরা না হতে পারবেন তাঁদের শ্রমিকদের জন্যে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজনই নেই। শ্রমিক-আন্দোলনে শ্রমিকগণ আপন লোকের সাহায্যের ভিখারী হতে পারে, কিন্তু, দয়ার দানের প্রত্যাশী তারা কিছুতেই নয়।

নেতৃত্বের ঝক্‌মারি

কানপুর ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের বৈঠকে সাইমন কমিশনকে বয়কট করার প্রস্তাব পাস হয়েছিল। বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশনের সেক্রেটরী শ্রীযুত কিশোরীলাল ঘোষ এই বয়কটের পক্ষে খুব জোর গলায় বক্তৃতাও প্রদান করেছিলেন। অথচ এই ফেডারেশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী ও অপর একজন বিশিষ্ট সভ্য লাতাফৎ হোসেন সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করার পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। বেঙ্গল ট্রেড্ ইউনিয়ন ফেডারেশন এ সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ করে নি। অধিকন্তু, শ্রীযুত কিশোরীলাল ঘোষ এই ভোট দেওয়ার পরেও লাতাফৎ হোসেনকে বাউড়িয়া জুট্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি মনোনয়ন করেছেন। শ্রমিক-আন্দোলনকে প্রতিহত করাই মিঃ রায় চৌধুরী জীবনের ব্রত যে করেছেন একথা সকলেই জানেন। ট্রেড্ ডিসপিউট বিলের ন্যায় সর্ব্বনেশে ব্যবস্থার সমর্থনও তিনি করেছেন, এমন কি শোনা যাচ্ছে, বিল পাস করার পক্ষে সাহায্য করার জন্যে তিনি শীঘ্রই সিমলা পর্য্যন্ত ধাওয়াও করবেন। এ সব সত্ত্বেও ফেডারেশনের কোনো সভ্য রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন

... রায়-চৌধুরীর আসন ফেডারেশনে আছে। তেমনি অব্যাহত রয়েছে। এসব দেখে শুনে কি মনে হয়না যে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রায় চৌধুরীর কাজের সমর্থন করছে? যদি সত্যই তা হয় তা হলে ফেডারেশনের শ্রমিকদের প্রতিনিধি ব'লে দাবী করার কোনো অধিকারই নেই। কোনো সত্যকারের শ্রমিক অনুষ্ঠানের সহিত রায় চৌধুরীর ন্যায় লোকের সংস্রব কিছুতেই থাকতে পারেনা। আমরা আশাকরি ফেডারেশনের নেতৃগণ শ্রমিক সাধারণের নিকটে তাঁদের কি বলবার আছে তা শীঘ্রই প্রকাশ করবেন।

"স্বাধীনতা সঙ্ঘ"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" (Independence for India League) স্থাপিত হয়েছে। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এ-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। এতটুকু পর্য্যন্ত সঙ্ঘের সহিত আমাদের মতের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে বৈদেশিক শোষণ মূলক শাসন তন্ত্রের হাত থেকে এই যে স্বাধীনতা লাভ করা হবে তা কা'দের জন্যে—ভারতের মধ্যবিত্তবান লোকদের জন্যে, না ভারতের জনগণের জন্যে? যদি মিঃ জওহরলালের উদ্দেশ্য হয় ভারতের জনগণের জন্যে স্বাধীনতা লাভ করা তা হ'লে সেই স্বাধীনতা কংগ্রেসের গণ্ডীর ভিতরে থেকে কি ভাবে লাভ হবে তা'ত আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। অবশ্য মিঃ জওহরলাল নেহেরু যদি "মধ্যবিত্তশালী লোকেদের জন্যে স্বাধীনতা" নামক আকাশ কুসুম লাভ করতে চান তা হলে তিনি বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় তার জন্যে চেষ্টা করতে থাকুন, তাতে আমাদের বিশেষ কিছু বলবার নেই। কত লোক কত অকাজে সময় নষ্ট করছে, কা'কে আমরা বাধা দিতে যাব? কিন্তু মিঃ জওহর লাল জনগণের নামে অনেক বাণীরই ঘোষণা করেছেন। সেদিনও তিনি বলেছেন যে সমূহবাদের অর্থাৎ সোশ্যালিজমের ভিত্তির ওপরে তিনি সমাজকে গঠন করতে চান। বাস্তবিক এই যদি তাঁর মত হয়, তা হলে কংগ্রেসের গণ্ডীর ভিতরে "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গঠন করার কোনো অর্থই থাকেনা। কংগ্রেস শ্রেণী অনুষ্ঠান। কংগ্রেসের হাজার কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে ধনিক, জমীদার ও মধ্যবিত্তবানদের স্বার্থ ব্যতীত কংগ্রেস আর কিছুই সমর্থন করতে পারেনা। দেশের সহিত কংগ্রেসের কোনো সংযোগ নেই, সংযোগ স্থাপিত হওয়াও সম্ভবপর নয়। শোষক আর শোষিতের মধ্যে কোনো প্রকারের ঐক্য যে স্থাপিত হতে পারেনা, এ কথা আর কেউ বুঝুন আর নাই বুঝুন সোশ্যালিজমে আস্থাবান মিঃ জওহর লাল নেহেরুর নিশ্চিতই বোঝা উচিত। চীনের বুর্জোয়া (ধনিক) ন্যাশন্যালিষ্টগণ চীনের জনগণের সহিত যে ভাবে প্রতারণা করেছে তা-ও আমাদের ভোলা উচিত নয়। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভ্রাতৃগণ যতই উল্লম্ফন করুন না কেন, শ্রেণীগত স্বার্থ পরিহার ক'রে নেবার কোনো শক্তিই তাঁদের নেই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে কংগ্রেসী সভ্যগণের কার্য্য থেকেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। জনগণের দাবী দাওয়াকে সম্মুখে স্থাপন ক'রে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালিত হবে তার সহিত কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই তার মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনোবৃত্তি নিয়ে যোগদান করতে পারবে না। অধিকন্তু, সে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধাচারণই করবে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু নেহেরু কমিটীর রিপোর্ট সমর্থন করার পরেও আবার নবগঠিত ভারত-স্বাধীনতা সঙ্ঘে যোগদান করেছেন। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় জমীদারদের হয়ে প্রজাদের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা ক'রে তিনি লক্ষ্ণৌতে যেয়ে বাংলার প্রজার দুঃখে মায়াকান্না কেঁদেছেন। সিটি কলেজের ব্যাপারে দেখা গেছে যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিও তাঁর যথেষ্ট রয়েছে। তারপরে, শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ত তিনি রীতিমত 'জেহাদ'ই ঘোষণা করেছেন। অথচ বর্ত্তমান যুগে স্বাধীনতার সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। এ বিষয় নিয়ে আমরা যে কোনো সুস্থমনা লোকের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেও রাজি আছি। স্বাধীনতা আমরা জনগণের বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুতেই লাভ করতে পারব না। তার জন্যে জনগণের দল যদি গঠন করতে হয় তা হলে তা কংগ্রেসের বাইরেই করতে হবে। "কৃষক ও শ্রমিকদল" (Workers' and Peasants' Party) এ কারণেই স্বাধীনভাবে সৃষ্ট হয়েছে। কংগ্রেসের জনগণের দলে পরিণত হওয়ার এতটুকু সম্ভাবনাও যদি থাকত তা হ'লে "কৃষক ও শ্রমিকদল" কিছুতেই পৃথকভাবে গড়ে উঠ্‌ত না। মিঃ জওহর লাল নেহেরু যদি সত্যই গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী হন, সত্যই যদি সোশ্যালিজমে তাঁর বিশ্বাস থাকে, তা হলে আপন ভুল তিনি অচিরেই বুঝতে পারবেন।

ম্যারিনার্স ইউনিয়ন

সারেং ও ড্রাইভারগণই "বেঙ্গল ম্যারিনার্স ইউনিয়ন"কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, খালাসী ও সুকানীদের ইউনিয়নের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে প্রবেশ করার কোনো উপায় নেই—এরূপ অভিযোগ আমাদের নিকটে এসেছে। অভিযোগ যদি সত্য হয় তা হ'লে তা খুবই দুঃখের বিষয় বলতে হবে। দেশের ভিতরে চলাচলকারী ষ্টীমার সমূহে এই সুকানী, খালাসী ও আগুনওয়ালা প্রভৃতির অভাব-অভিযোগ সারেং ও ড্রাইভারদের চেয়ে ঢের ঢের বেশী। কাজেই, ইউনিয়নের পরিচালনার কাজে তাদের যথেষ্ট হাত থাকা খুবই আবশ্যক। তা ছাড়া সারেং ও ড্রাইভারদের মধ্যে অনেকেই সেকেলে লোক, লেখাপড়া জানেন না বললেই হয়। পক্ষান্তরে নূতন যারা কাজে ঢুকছে তাদের অনেকেই বেশ ভালো লেখাপড়া জানে। এদিক থেকেও ইউনিয়নের পরিচালনায় যথেষ্ট হাত খালাসী ও সুকানী প্রভৃতির থাকা উচিত। আমরা আশা করি ম্যারিনার্স ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তৃপক্ষগণ ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার চেষ্টা করবেন।

হেমন্ত বাবুর পত্র

—:•:—

মাননীয় "গণবাণী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখের "আত্মশক্তি"তে "জমীদারের অধিকার ?" শীর্ষক আমার একখানা পত্র বেরিয়েছে। "আত্মশক্তি" সম্পাদক মহাশয় পত্রখানি প্রকাশ করাতে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। কারণ "আত্মশক্তি" বর্ত্তমানে যে সম্প্রদায়ের সমর্থক, তাহাতে আমার লেখার মত লেখা ঐ কাগজে বার হওয়ার কথা নয়। সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধের সমান লম্বা মন্তব্যে আর মূল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্যান্য যে সকল কথা বলেছেন তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে আমার কথাগুলি তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি—অবশ্য সেটা আমার বলবার দোষে ঘটে থাকতে পারে। সম্পাদক মহাশয়ের সম্বন্ধে সমালোচনা তাঁরই কাগজে না করে গণবাণীতে প্রকাশ করার জন্য আপনার শরণাপন্ন হ'লাম—কারণ আপনি কৃষক আন্দোলনের তাৎপর্য্য সম্যক অবগত আছেন এবং আমার বলার দোষ হ'লেও মর্ম্মটি ঠিক গ্রহণ করতে পারবেন।

কংগ্রেস দল জমিদার ও প্রজার স্বার্থের স্বনিযুক্ত রক্ষক সেজেছেন এবং দেশবন্ধুর মত ইহাই ছিল—ঐ দলের সকলে বলছেন, ও এই স্বার্থ সামঞ্জস্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চোখ বুজে কাউন্সিলে ভোট দিয়ে যাচ্ছেন। দেশ-বন্ধুর অন্যান্য কথার উল্লেখ ক'রে একটি লাইন আমি উদ্ধৃত ক'রে তার জবাব চেয়েছিলাম। সেটি এই :—

"If the middle classes ever win Swaraj and I live to see that day, it will be my lot to stand by the workers and peasants and to lead them on to wrest power from the hands of the selfish classes."

"যদি মধ্যশ্রেণীগণ কখনও স্বরাজলাভ করে এবং ততদিন পর্য্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তা হ'লে আমার ভাগ্য হবে শ্রমিক ও কৃষকগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বার্থান্ধ মধ্যশ্রেণীর হাত হ'তে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য চালিত করা।"

দেশবন্ধুর এই উক্তি সম্বন্ধে ভক্তগণ কিছু বলেন না! দেশবন্ধু-কল্পিত এই প্রকারের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হ'লে তো তাঁদের বড়ই মুস্কিল! জমিদারের সমস্ত অধিকারই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও দেশবন্ধুর স্বরাজে সামঞ্জস্য কিছু তো দেখছি না! চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ও তার অনাচারের সমর্থন কংগ্রেস করেন কি না "আত্মশক্তি" সম্পাদক মহাশয় সে খবর রাখেন না। আমি এই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য ১৯২৪ অব্দে একটি প্রস্তাব কাউন্সিলে দিয়াছিলাম—স্বরাজ্যদল হ'তে এ প্রস্তাব উপস্থিত করতে আমায় দেওয়া হয় নি। প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনা উপলক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা খুবই উঠেছে, তার প্রমাণ রণজিৎ পাল চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতা থেকেই পাই। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে হাত দিলে বাংলায় বারদোলির বৃহদকার অভিনয় হবে ব'লে শাসিয়েছেন। বারদোলিতে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রজার সরাসরি লড়াই, বাংলায় এই লড়াই হ'লে জমিদারের বিরুদ্ধে হবে, রণজিৎ বাবু সেটা তলিয়ে বোঝেন নি। এই তো কংগ্রেস-মার্কা সদস্যের কথা। কংগ্রেসের বাহিরে অন্যান্য সদস্য এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন এবং স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সাগর পারে তার ক'রে জমিদারের অধিকারের কথা জানিয়েছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে আমি নিজে কংগ্রেস, কনফারেন্স, কাউন্সিলে অনেকবার প্রস্তাব তুলতে চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু কর্ত্তাদের চেষ্টায় কোথাও সফলকাম হ'তে পারি নি। আর প্রধানতঃ এই অপরাধেই আজ আমাকে দল হ'তে "ব্লাষ্টকেট" করা হয়েছে ও এত বদনামের বোঝা দেওয়া হয়েছে। নদীয়ায় কাউন্সিলের গত উপনির্ব্বাচনে আমাকে মনোনীত না করার একটি প্রধান কারণ যা কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় বলেছিলেন যে একা জিতেন বাঁড়ুয্যেতে রক্ষে নেই, আবার প্রজাপক্ষে হেমন্ত গিয়ে জুটলে মুস্কিল! কিরণশঙ্কর বাবুরা গোয়ালন্দের জলার মালিক—ঐ জলা সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন ক'রে মৎস্যজীবীগণকে রক্ষা করার চেষ্টাও আমার অন্যতম অপরাধ।

তাই "আত্মশক্তি" সম্পাদক মহাশয় আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন যে আমি প্রজাস্বত্ব প্রসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তুলে প্রতিপক্ষের ভুল ধারণা জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি—এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্বে কি সম্পর্ক 'তা বুঝবার অক্ষমতা।

কংগ্রেস দল হিসাবে প্রজার সামান্য অধিকার দিতে স্বীকার করে নি—তার বহু প্রমাণ আছে। মুসলমান, নমঃশূদ্র প্রভৃতি কৃষিপ্রধান সমাজ কংগ্রেসের বিরোধী বলাতে "আত্মশক্তি" সম্পাদক মহাশয় বলেছেন যে কংগ্রেসের সভাপতি আজও একজন মুসলমান আছেন ও বঙ্গীয় জনসভার সভাপতি বলেছেন কংগ্রেসের মারফৎ ব্যতীত অনুন্নত জাতির মুক্তি নেই। স্বরাজের দাবাইখানায় Show bottleএর মত একটি সামসুদ্দিন আহ্মদ বা মোহিনী দাস থাকিতে পারেন—কিন্তু তাঁদের সমাজ তার পিছনে নাই। প্রমাণ সামসুদ্দিন আহ্মদ তাঁর স্ব-সমাজ কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে নির্ব্বাচিত হ'তে পারেন নি এবং মোহিনী দাসকে তাঁরই স্ব-জাতিরা এই মুক্তিপথ বাতলানো মাত্র চেয়ার ছুড়ে মেরেছিলেন।

কংগ্রেস দল জমিদার ও ধনিক প্রধান কিনা তার প্রমাণ আর নতুন ক'রে দিতে হবে না। মুসলমান, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সমাজ কংগ্রেসে আসছে না কংগ্রেসের কর্ত্তাদের দেখে :—বাংলার সাত লক্ষ মৎস্যজীবী যেমন কিরণশঙ্কর রায় থাকতে কংগ্রেসে আসতে ভয় পায়।

"কংগ্রেস জাতীয় মহাসমিতি, জমিদার সমিতিও নয়, প্রজা সমিতিও নয়" এই কথা ব'লে "আত্মশক্তি" সম্পাদক মশায় একটা মস্ত বড় কথায় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিয়েছেন মনে করেছেন! জাতীয় মহাসমিতির অর্থটা কি? সেখানে অধিকাংশের ভোটেই তো কর্ত্তব্য স্থির হয়! আজ গোটা জাতিটাকে ধরলে কাহাদের পাওয়া যাবে? বাংলায় কৃষকই শতকরা ৭৭ জন, সুতরাং তাদের স্বার্থই জাতির প্রধান স্বার্থ জমিদার সে স্বার্থের বিরোধী, তাই জাতীয় আন্দোলনে শ্রেণী স্বার্থত্যাগী না হ'লে তার স্থান নেই। জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথেরই সেই সমিতিতে স্থান হয়নি কেন সে কথা একবার ভেবে দেখলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

সুভাষবাবু, ও আমাকে এক শ্রেণীভুক্ত ব'লে আত্মশক্তি সম্পাদক মহাশয় খোঁটা দিয়েছেন। বস্তুত তা নয়। সুভাষবাবু বড়লোক, আমরা গরীব ; তিনি বড়লোকের ওকালতি করেন। আমরা গরীব নিজের কথাই ব'লে থাকি মাত্র। আমাদের

অবস্থা ও কৃষক শ্রমিকের অবস্থা খুব দূর নয়। আমরা সুভাষ বাবুর অপেক্ষা তাদের সঙ্গে আত্মীয়তাটা বেশী অনুভব করি। সুভাষবাবু আমাদের গৃহে পদার্পণ করা বা আমাদের সঙ্গে কথা কওয়া অপমান মনে না করলেও, দয়া মনে করেন। কাজেই সুভাষবাবুর "আমাদের" ও আমাদের "আমাদের" অনেকখানি তফাৎ আছে।

কংগ্রেসের প্রেতাত্মা জমিদার ও ধনিক রূপী ছোট্ট একটা শ্যাওড়া গাছে আশ্রয় নিয়েছে। তার ভেতরে আমরা মাত্র মুক্তির সন্ধান আর পাচ্ছিনা। ছেলেবেলায় একটা শোলোক শুনে গা ছম্ ছম্ করতো—"শ্যাওড়া গাছের পেত্নী তার খনা খনা রা সুমুখ দিকে গুড়গুড়ো তার পেছন দিকে পা"—আজ কংগ্রেসের কথাও পথ চলার ভিতরেও এই ভাব দেখছি। পেছন পেয়ে হ'য়ে কংগ্রেস চলেছে।" পূর্ণ স্বাধীনতা" মন্তব্য পাশ ক'রে "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস" (ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র) চাচ্ছে—প্রস্তাব হ'য়ে কাউন্সিলে গিয়ে জমিদারের পক্ষে ভোট দিচ্ছে এবং স্বল্পবিত্ত ও রায়তের সর্বনাশ করছে—"দেশে তৃতীয় দল নেই, গবর্ণমেণ্টের এক দরজা, আমাদের এক দরজা" ব'লে প্রচার ক'রে গবর্মেণ্টের দরজাতেই গিয়ে দল বেঁধে ঢুকছে; প্রজা পক্ষের সমর্থনকারী জিতেন বাড়ুয্যে "দেশদ্রোহী" ব'লে আখ্যাত হচ্ছেন। কলকাতার বড়লোক বাড়ীওয়ালাদের খাতিরে অসহায় ভাড়াটেদের আইনের আশ্রয় দেওয়া হ'ল না—এই ভাবে দেশবন্ধুর "দরিদ্র নারায়ণ"এর সেবা তাঁর ভক্তগণের দ্বারা হচ্ছে। মীরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ, কৃষ্ণচন্দ্রের দল একবার মিলে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলার প্রজাকে বিদেশীর হাতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—আর আজও দেশের প্রধানগণ ইংরেজের সঙ্গে মিলে প্রজার ও গরীবের স্বার্থ অকাতরে ভাসিয়ে দিচ্ছে—তফাতের মধ্যে কেবল এরা খদ্দরের নামাবলী গায়ে দিয়ে গোরা প্রেমে মেতেছে! গবর্ণমেণ্ট, জমিদার ও স্বরাজীর ত্র্যহস্পর্শ ঘটেছে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দিন শীগগির আসছে তখন রাম উল্টা বুঝিলে যেন কেহ দোষ না দেন। ইতি—

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।
১৩-৪-২৮
কৃষ্ণনগর

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সর্বদল সম্মেলনে কৃষকও শ্রমিক-দলের প্রতিবেদন।

—০—

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল নিম্নলিখিত কারণ সমূহের জন্য সর্ব্ব দল সম্মেলনের নিযুক্ত নেহেরু কমিটির প্রস্তাবিত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে রাজি হইতে পারেন না।

(১) সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিকাংশ সভ্যের ঐ সম্মেলনের কার্য্য সম্বন্ধে যে মত বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সে মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ১৯শে মে তারিখের যে মন্তব্য অনুসারে শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়, বিশেষ করিয়া ঐ মন্তব্যের সহিত অনৈক্য হয়।

(২) শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব স্বীকার করিয়াও এই দলের উক্ত খসড়ার অনেক অংশ সম্বন্ধে আপত্তি আছে।

১। ১৯শে মে তারিখের মন্তব্য সম্বন্ধে অনৈক্যের নিম্নলিখিত কারণ সমূহ বোম্বাইয়ের কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(ক) কৃষক ও শ্রমিক দলের মতে—পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় দাবী ও কর্ম্মপন্থার একটি সাধারণ তালিকা করিয়া সর্ব্বপ্রকার জাতীয় শক্তির সমাবেশ করাই সর্ব্বদল সম্মেলনের কার্য্য হওয়া উচিত ছিল। কৃষকও শ্রমিকদল যে কার্য্য পদ্ধতির চিন্তা করিতেছেন দেশবাসীর অধিকাংশের মনঃপূত ঐরূপ বিরোধ মূলক কর্ম্ম-সঙ্কল্প লইয়া গণ আন্দোলনের সাহায্যে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা না করিয়া লিবারেল, ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর খণ্ড স্বার্থের খাতিরে আদর্শকে ছোট করা হইয়াছে এবং Full responsiblo Government (পূর্ণ দায়িত্ব মূলক শাসন পদ্ধতি) এর আদর্শ ও শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদল সম্মেলনের সার্থকতা সম্পূর্ণ নষ্ট করা হইয়াছে।

(খ) কৃষক ও শ্রমিক দলের মতে শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুতের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতার পথ পুনরায় খোলা হইয়াছে। সাইমন কমিশনের বর্জ্জনের দ্বারা এই সহযোগিতার পথ কতকাংশে ত্যাগ করা হইয়াছিল। কমিশন বয়কটের আন্দোলনে জনগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিল—এই সহযোগিতার দ্বার খুলিয়া তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে এবং এই চালটাও দেওয়া ঠিক হয় নাই; নিয়মতন্ত্রের কানাগলিতে (constitutional advance) ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য "ভারতবাসীরা সর্ব্ব সম্মত শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব করিতে পারে না" বলিয়া বার্কেনহেড প্রভৃতি যে "চ্যালেঞ্জ" করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে এই শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হইতেছে—ইহা স্বীকার করাই হইয়াছে।

(গ) এই শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবে ইহা আশা করা হইয়াছে। একথাও বলা হইয়াছে যে ব্রিটেনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে একটা রফা করিবার ভিত্তিস্বরূপ এই শাসনতন্ত্রের খসড়াকে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং এই শেষ মিটমাটের প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে ভারতকে গণ-আন্দোলনের জঙ্গী নীতি অবলম্বন করিয়া লড়িতে হইবে। কিন্তু এই মিটমাটের সর্ত্ত সম্বন্ধে একটা "শেষ" নির্দ্দেশ থাকা উচিত—কারণ সর্ত্তের প্রস্তাবকারীরা কোথায় গিয়া যে নামিবেন তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছে যে ভারতের মনোগত কোনও চুক্তিতেই সে শান্তির পথে রাজি হইবে না। সুতরাং ব্রিটেনের সম্মতি এই শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তনে পাওয়া যাইবে ইহা মনে করাই ভুল। অতএব খসড়া প্রস্তুতের দ্বারা কিছু হইবে না।

এই সমস্ত ও অনুরূপ অন্যান্য কারণে কৃষকও শ্রমিক দল কমিটি নিয়োগ করিয়া শাসতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে মত দেন।

২। তবুও খসড়া যখন প্রস্তুত হইয়াছে তখন ইহা জনগণের দাবী কতটা পূরণ করিবে এবং তাহার জন্য জনগণ লড়িবে কিনা

ইহাই বিচার করিবার বিষয়। প্রথমতঃ জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবী এতখানি যে কোনও শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবেই তাহা পূরণের উপায় নির্দ্দেশ করা যায় না। এই দিক দিয়া সর্ব্বদল সম্মেলন ব্যাপারটিতে হাত দেন নাই। খসড়ার মধ্যেও অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। এইগুলি নিম্নে নির্দ্দেশ করা হইল।

(ক) পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ত্যাগ করাই ইহার সর্ব্বপ্রধান দোষ। এই বিষয়ে ১ হইতে ২১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কমিটি যে যুক্তিতর্ক করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে হয় তাঁহারা জিনিসটি ধরিতে পারেন নাই কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই অবহেলা করিয়াছেন। ২১ পৃষ্ঠায় উঁহারা বলিতেছেন—"ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস (Dominion Status) অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র পূর্ণস্বাধীনতার সহিত তফাৎ করা কঠিন—তফাতের মধ্যে কেবল রাজার সঙ্গে ইহার যে টুকু যোগ আছে। কার্য্য নির্ব্বাহক তন্ত্রের গঠনেই ইহার যা কিছু প্রভেদ।"

এই প্রভেদ নামমাত্র নয়—যত কিছু গণ্ডগোল এই খানেই। ব্রিটিশ ধনিকগণের দ্বারা ভারতীয় জনগণের শোষণ ও শাসন "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসে" চলিতে থাকিবে—কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে তাহা সম্ভবপর হইবে না—এই প্রভেদই আসল প্রভেদ। কমিটি আইনের কূটতর্কের জালে রাজনীতির মূলতত্ত্বগুলি চাপা দিয়াছেন। থিওরিতে প্রভেদ ততটা দেখা যাইবে না—কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার পথে অন্যান্য আমূল পরিবর্ত্তনের মধ্যে—ভারতে ন্যস্ত সমস্ত ব্রিটিশ মূলধন বাজেয়াপ্ত করা আবশ্যক হইবে। এই একমাত্র কারণেই কৃষক ও শ্রমিক দলের মতে স্বাধীনতালাভ সার্থক। ১১ পৃষ্ঠায় সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে যে ইউরোপীয় ধনিকগণের ন্যস্ত মূলধন বিষয়ে কোনও ভয় নাই। এই চুক্তিতে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলেও নামে মাত্র হইবে এবং তাহা পাইয়াও লাভ নাই।

এই কথা লইয়া বেশী যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নাই—কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক দল এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেন। যে গবর্ণমেণ্ট ভারতের জনসাধারণের নিকট দায়ী হইবে (responsible to the people of India), সে গবর্ণমেণ্ট দেশের যাবতীয় শিল্প এবং যাতায়াতের ও সংবাদ প্রদানের উপায় সমূহের উপর এমন করিয়া ব্রিটিশ ধনিকগণের চাপিয়া বসিবার অধিকার স্বীকার করিতে পারে না। এইরূপ গবর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের জন্য কিছু করিতে চায়, কিম্বা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ এই স্বার্থে বাধা দিতে হইবে। বিদেশী শক্তির অর্থনৈতিক অনুষ্ঠান সমূহের ভিতর হাত থাকিলে দেশ নামে মাত্র স্বাধীন থাকে—তাহার উদাহরণ দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্র সমূহ। আর ডোমিনিয়নের তো কথাই নাই—যেমন অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি, ইহারা কমবেশী পরাধীন মাত্র। ইহাদের তুলনায় ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা কত শোচনীয়—কারণ আর্থিক অনুষ্ঠান সমস্তই বিদেশীর হাতে। চীনদেশে যেরূপ বিভিন্ন বিদেশীয় শক্তির হাতে আর্থিক অনুষ্ঠান সমূহ ছিল—ভারতে তাহাও নহে। একটি মাত্র শক্তির হাতে ভারতের আর্থিক কলকাঠি রহিয়াছে।

কৃষক ও শ্রমিকদলের মতে—এত বড় বিষয়টাকে ছোট করিয়া উড়াইয়া দিয়া জনসাধারণের সম্মতি গ্রহণের জন্য কমিটি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অসাধু বলা যাইতে পারে। বাহিরের চটক যতই থাকুক, আসল কথাটাই বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন যে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কমিটি যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা একবারে অবাস্তব।

শান্তভাবে রাজনৈতিক অভিব্যক্তির যে কল্পনা করা হইয়াছে - তাহার অর্থ শোষণ পরাধীনতার অন্য আকারে স্থিতি এবং নামেই স্বায়ত্ত শাসন লাভ। প্রকৃত স্বাধীনতা আনিতে হইলে বিপ্লবমূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা দ্বারাই প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) কৃষকও শ্রমিক দলের মতে রিপোর্টের গোড়াতেই গলদ এবং এই মস্ত বড় গলদের জন্য শাসনতন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরির উপর ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে বিস্তারিত বিবরণে দরকার কি। পরন্তু স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন (Provincial autonomy) কতখানি দেওয়া হইবে, নির্ব্বাচনচক্র (electoral machinery) কিরূপ হইবে ইত্যাদি বিষয় সংগ্রাম শেষে সিদ্ধিলাভ হইলে রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। হয়তো এমন প্রয়োজন হইতে পারে যে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বিশেষ শক্তিশালী রাখিতে হইবে এবং প্রদেশের ক্ষমতা কমাইয়া দিতে হইবে। অবশ্য পরিণামে প্রদেশগুলিকে বেশী স্বাধীনতা দেওয়া বা প্রদেশগুলির প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের বিষয়ে কাহারও আপত্তি হইতে পারেনা।

কৃষক ও শ্রমিক দলের মতে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবিত উপায় সমূহে দলের আপত্তি নাই। কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে জনগণের ভিতর সাম্প্রদায়িক ভাব তেমন কিছু নাই—তবে কোনও ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি বা জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী কোনও বদমায়েস লোক হয়তো কৃত্রিম উপায়ে সাম্প্রদায়িকতার ভাব কোথাও কোথাও ছড়াইয়াছে। এই দুই শ্রেণীর জীব প্যাক্ট, কনষ্টিটিউশন বা চুক্তি পত্রের দ্বারা কোনও কালেই আবদ্ধ হইবে না। সুতরাং যে সব আলোচনায় কেবল সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি জাগিয়া উঠে তাহা করিয়া কোনও লাভ নাই। এই সমস্যার সমাধান জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় ও রাজনীতিক বোধের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

গোড়ায় গলদ থাকাতে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের অন্যান্য ছোট খাটো অনেক বিষয়ে স্বভাবতঃ আপত্তি জনক কথা রহিয়াছে। সমস্ত রিপোর্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভক্তি পরতে পরতে মিশিয়া রহিয়াছে, রাজা, গবর্ণর-জেনারেল, গবর্ণরগণ রহিয়াছেন, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণকে পেন্সন দেওয়া বা কতকগুলি সর্ত্ত অনুসারে রাখা, ইত্যাদি ব্যাপার প্রত্যেক ভারতীয়ের মনই চায় না। এই সকল বিষয় খুব গুরুতর না হলেও প্রমাণ করে যে গোড়ায় গলতি থাকার দরুণ সমস্ত ব্যাপারটা একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রথমে চটক লাগিলেও পরে মন নিঃসন্দেহ হইয়া যায়।

তবে প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারী সকলেরই ভোটাধিকারের প্রস্তাব অবশ্য ভাল হইয়াছে এবং মূল অধিকার (Fundamental rights) সম্বন্ধে ঘোষণা প্রস্তাবও বেশ হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের সাধারণ ভাব হইতে বুঝা যায় এই সকলের মূল্য কিছু থাকিবে না। সর্ব্বদল সম্মেলনের সদস্যগণ এইগুলির জন্য শেষ পর্য্যন্ত লড়িবেন কিনা খুবই সন্দেহ আছে—কারণ ব্রিটিশরা

ইহার বিরোধী হইবেই হইবে। এমন কি এগুলি নূতন শাসন বিধিবদ্ধ হইলেও জনগণের পক্ষে কিছুমাত্র কার্য্যকারী হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে ইংলণ্ডের বা অন্য যে কোনও স্বাধীন দেশের ধনিকশ্রেণী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে কি ভাবে নামে মাত্র পর্য্যবসিত করিয়াছে। রিপোর্টে যেরূপ লেখা হইয়াছে তাহাতে প্রস্তাবিত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নামে কতক বৃটিশ এবং কতক ভারতীয় এইরূপ একশ্রেণী শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিবে এবং সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্ত রাখিবে। এ কারণে কৃষক ও শ্রমিক দল নরনারী মাত্রেরই ভোটাধিকার ও পৌর অধিকার সম্বন্ধে প্রস্তাবকে বড় একটা লাভ বলিয়া মনে করার হেতু নাই বলিয়া সকলকে সাবধান করিতেছেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

—০—

ইয়ং কম্‌রেড্‌স লীগ

—০—

(শ্রীধরণীকান্ত গোস্বামী)

—০—

গণবাণীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে আজ কতকদিন হয় "ইয়ং কমরেডস্ লীগ" নামে একটী নূতন তরুণ সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, এবং উহার আফিস স্থাপিত হইয়াছে কলিকাতা, ৩৭নং হ্যারিসন রোডে। ইতি মধ্যেই ইয়ং কমরেডস্ লীগ'এর পর পর দুই সপ্তাহে দুইটী অধিবেশন ও হইয়া গিয়াছে। এই দুই অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে দুইটী আলোচনা বৈঠকের ভিতর দিয়া 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ' এর সভ্যগণ সমিতির নীতি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। লীগ 'এর প্রথম অধিবেশনের আলোচনা বৈঠকে লীগ' এর সভ্য কমরেড আর, হাজরা এম্ এস্ সি, ইম্পিরিয়েলিজম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পর উপস্থিত সভ্যগণ ইম্পিরিয়েলিজম সম্বন্ধে আপন আপন বক্তব্য প্রদান করেন।

কমরেড হাজরা তাঁহার 'ইম্পিরিয়েলিজম' প্রবন্ধে যদিও কতিপয় মনীষীর মাত্র মতামতের উপর নির্ভর করিয়া ইম্পিরিয়েলিজম' এর প্রকৃত স্বরূপের একটা মানসিক পরিকল্পনা আমাদের মনের ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন তথাপি তরুণ বন্ধুগণের মনে নবযুগের চিন্তাধারার সমাবেশ করিতে উহাই যে পথ প্রদর্শক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লীগ এর দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনা বৈঠকে "লণ্ডন লেবর রিসার্চ্চ ডিপার্টমেণ্ট" এর প্রতিনিধি, কমরেড ফিলিপ স্প্র্যাট বি, এ, (ক্যাম্ব্রিজ) "ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেণ্ট" বা শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ, যুক্তি পূর্ণ ও গবেষণা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কমরেড স্প্র্যাট' এর প্রবন্ধ পাঠের পরে উপস্থিত সভ্যগণ শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। কমরেড্ স্প্র্যাট তাঁহার প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলিয়াছেন যে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের নজর দেওয়া উচিত ইংলণ্ড এর শ্রমিক আন্দোলনের দিকে। কারণ ইংলণ্ডেই সর্ব্বপ্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, শ্রমিক আন্দোলনের উৎপত্তির কাল হইতে উহার বর্ত্তমান পরিব্যাপ্তি পর্য্যন্ত উহাকে কতপ্রোত ভাবে উত্থান ও পতনের ভিতর দিয়া, কত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া এবং কত প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থার ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সেই সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক বিচিত্রময় সাক্ষাও একমাত্র ইংলণ্ডের নিকট হইতেই পাওয়া যাইবে। তাই কমরেড স্প্র্যাট তাঁহার প্রবন্ধে বিশদভাবে ও বিশেষরূপে ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনেরই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন পুঁজিপতিদিগের দ্বারা বৃহদায়তন শিল্পাদির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই এই শ্রমিক আন্দোলনেরও সৃষ্টি হইতে থাকে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে যখন ইংলণ্ডে পুঁজিপতিদিগের বৃহদায়তন শিল্প খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে থাকে ঠিক সেই সময়েই ব্রিটীশ শ্রমিক সঙ্ঘও সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দিতে ব্রিটীশ শ্রমিক সঙ্ঘ প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কমরেড্ স্প্র্যাট দেখাইয়াছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দির গঠিত ব্রিটীশ শ্রমিক সঙ্ঘ উনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগ হইতে যখন বৈপ্লবিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে কেবল মাত্র তখন হইতেই উহা প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলনের ধারা অবলম্বন করে। ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে এক বিপ্লবময় অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়া ঐ শতাব্দরই পরবর্ত্তী কালে সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ঐ আন্দোলনের ভিতর আন্তর্জ্জাতিক ভাব স্পষ্ট হয়। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ হইতে ব্রিটিশ শ্রমিক নেতাগণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। ব্রিটীশ শ্রমিক আন্দোলন হইতে ভারতীয় শ্রমিক নেতাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। কমরেড স্প্র্যাট তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলনের আদর্শানুরূপে গঠিত শ্রমিক সঙ্ঘের এখনও একান্তই অভাব। নবভাবাপন্ন তরুণ বন্ধুগণ অতীতের সকল অভিজ্ঞতা লইয়া এই শ্রমিক আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিবেন উহাও তিনি আশা করেন। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে উহা যদিও শৈশব উত্তীর্ণ হয় নাই তথাপি ইতিমধ্যেই উহা যেরূপ বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে তাহাতে উহার গতি খুবই আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়। কমরেড স্প্র্যাট তাঁহার প্রবন্ধে শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে আরো অনেক সারগর্ভ কথার আলোচনা করিয়াছেন। সমস্ত কথার পুনরালোচনা এখানে সম্ভব নয়। মোটের উপর "ইয়ং কমরেডস লীগ"এর প্রথম উদ্যোগে এই ধরণের আলোচনার ফলে আমরা চারিদিক হইতে নব-ভাবাপন্ন তরুণ বন্ধুগণের বেশ সাড়া পাইতেছি। যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু পরিবর্ত্তনকারী তরুণেরা তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। জরাজীর্ণ পুরাতনকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরস, সতেজ নূতনকে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তিই তরুণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তরুণের এই স্বাভাবিক গতিকে যাহারা মোচড়াইয়া দিতে চায়, তরুণ আজ তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। আমাদের "ইয়ং কমরেডস লীগ"ও সম্পূর্ণ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সর্ব্বপ্রথমেই উহা ঘোষণা

করিয়াছে যে তরুণ ভিন্ন অন্য কাহারও উহাতে প্রবেশাধিকার নাই। যাহাদের বয়স ১৫ হইতে ৩০ এর ভিতর তাহাদেরই শুধু উহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিবে—অন্যের নহে। উহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব উহাতে তরুণ তরুণী উভয়েই স্থান পাইবে। উহার তৃতীয় বিশেষত্ব উহার উদ্দেশ্য। "**ইয়ং কমরেডস** লীগ" ঘোষণা করিতেছে যে দেশের যাবতীয় লাঞ্ছিত ও সর্ব্বপ্রকারে শোষিত জনসাধারণের উপস্থিত সকল প্রকার অভাব অভিযোগ দূরীকরণার্থ এবং ভারতীয় জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ভারত-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার্থ এই 'লীগ' লাঞ্ছিত ও শোষিত তরুণ তরুণী-গণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিবে এবং তাহাদিগকে একটী পরিবর্ত্তন প্রয়াসী ও সংগ্রামশীল আন্দোলনের পথে পরিচালিত করিবে। 'ইয়ং কমরেডস লীগ' পৃথিবীর নূতন চিন্তাধারাকে বরণ করিবে এবং অতীতের সঙ্কীর্ণতাকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে। যাহারা পরিবর্ত্তন প্রয়াসী, যাহারা সংগ্রামশীল, যাহারা রাষ্ট্রে ও সমাজে বিপ্লব আনিবার পক্ষপাতী সেই সমস্ত তরুণ-তরুণীগণ আসিয়া এই নবানুষ্ঠিত ব্রত সাফল্য মণ্ডিত করুন।

—০—

কমিউনিষ্টদের কার্য্যতালিকা

—০—

এম, এন, রায়ের চিঠি
আন্তর্জ্জাতিক কমিউনিষ্ট সভার উদ্দেশ্য।

—০—

নয়াদিল্লী, ১লা সেপ্টেম্বর

পাঠকবর্গ অবগত আছেন ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত হইতে কমিউনিষ্ট বিতাড়ন সম্পর্কে আইনের খসড়া উপস্থিত করিতেছেন। এ সম্বন্ধে "ইংলিশ ম্যান" পত্রের প্রতিনিধি জানাইতেছেন—"মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একখানি চিঠি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিষ্ট দলের আন্তর্জ্জাতিক সমিতির একজন সদস্যমাত্র, কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি তাহা তাঁহাদের কর্ম্মতালিকাতেই প্রকট। ঐ দল তাহাদের কর্ম্মতালিকায় বলিয়াছে যে, বিপ্লব-মূলক কর্ম্মপন্থার সাহায্যে ধনিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজ-বাদীদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। এই রাজনীতিক পরিবর্ত্তন সাধনের যুগে রাষ্ট্রগুলিকে শ্রমিকদলের বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থা প্রয়োগের সর্ব্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন করিতে হইবে। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং কৃষকদলের এইরূপ অধিকার লাভে বর্ত্তমান ব্যবস্থানুরূপ আইন সভার ভোটাধিকার সাহায্যে অশান্তিপূর্ণ পন্থা সম্ভব হইবে না।

বল প্রয়োগের দ্বারা ধনিক শক্তির হাত হইতে অধিকার কাড়িয়া লইতে হইবে, ধনিকদের শাসনযন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে শোষণকারী দলকে দলন করিবার প্রাথমিক উদ্দেশ্য লইয়া শ্রমিকদলের নূতন শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

তৎপরে শ্রমিকদল তাহাদের সেই বিজয়লব্ধ ক্ষমতা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিবে। এই পথে প্রথম কার্য্য হইবে জমিদার এবং ধনিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই সব সম্পত্তি শ্রমিক শাসিত রাষ্ট্রের সম্পত্তির অঙ্গীভূত করা।

উপনিবেশ এবং উপনিবেশের সমাধিকার বিশিষ্ট দেশ সমূহে কৃষক এবং শ্রমিকদলের এই সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রামের প্রয়োজন হইবে। কৃষক এবং শ্রমিক দলের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই যাহাতে ঐ সব দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি হয়, এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্টদিগকে বিশেষভাবে কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক সভার মতে এইগুলি তাঁহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য হইবে:—

জমিদার প্রভাবান্বিত আমলাতন্ত্রের এবং বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীদের শাসনের ধ্বংসসাধন।

কৃষক এবং শ্রমিকদলের গণতন্ত্রমূলক সর্ব্বময় কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।

সাম্রাজ্যবাদীদের বড় বড় কারবারগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

মোহান্ত শ্রেণীর জমিদারদের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি এবং জমিজমা সরকারে বাজেয়াপ্ত করা; সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

দিনে শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা মজুরীর নিয়ম প্রবর্ত্তন।

কৃষক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদিগকে লইয়া রাষ্ট্র সভা প্রতিষ্ঠা।

উপনিবেশসমূহে বিপ্লব এবং পূর্ণ স্বাধীনতালাভের আন্দোলনের মূল্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার দিক হইতে খুব বেশী। উপনিবেশ গুলি এবং উপনিবেশের সমাধিকার প্রাপ্ত দেশসমূহে মূল্য ইহার বেশী আরও এই জন্য যে, বাণিজ্য প্রধান দেশগুলির পক্ষে ঐগুলি বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রাণস্বরূপ; সুতরাং উপনিবেশগুলির জনসাধারণের সঙ্গে জঙ্গী মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা জগতের শ্রমিকদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে।

কমিউনিষ্ট দল রাজনীতিক চাতুর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কমিউনিষ্ট দলের কর্তৃত্ব পরিচালিত রাষ্ট্র শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই দলকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সঙ্ঘগুলি দখল করিবার জন্য দিনরাত কাজ চালাইতে হইবে। ধনিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালনে কৃষক শক্তি একটি প্রয়োজনীয় শক্তি সুতরাং কৃষকদিগকে হাত করিবার জন্য প্রচার কার্য্য বিশেষভাবে আবশ্যক।

এইভাবে বিপ্লব আন্দোলনের গতি আরম্ভ হইলে ধনিক চালিত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষে অবতীর্ণ করানই দলের কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট ও তৎসংশ্লিষ্ট আন্দোলন, ক্রমে দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট এবং সর্ব্বশেষে দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বিদ্রোহ অবলম্বন করাইতে হইবে। সমর চাতুর্য্য সহকারে এই সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

উপনিবেশ সমূহকে মুক্ত করিবার কার্য্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশ-সমূহের কমিউনিষ্ট দলগুলিকে অবিরত সাহায্য করিতে হইবে। ঐ সব দেশের শ্রমিকদের উপরই বিশেষভাবে এই দায়িত্ব

রহিয়াছে এবং নির্য্যাতিত দেশ সমূহের লোকদিগকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে তাহাদেরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। অধিকৃত দেশসমূহ হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের সেনা অপসারণ করিয়া আনিবার জন্য আন্দোলন, মুক্তি প্রয়াসী নির্য্যাতিত দেশসমূহের লোকদের স্বপক্ষে সেনাদলের মধ্যে প্রচারকার্য্য, সেনা এবং সমরোপকরণ চালান দিতে অস্বীকৃত হইয়া ধর্ম্মঘট প্রভৃতি জনসাধারণের সহানুভূতিপূর্ণ আন্দোলনে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিবার এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য অধীন দেশসমূহে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার অধিকার ঐ সব উপনিবেশের আছে এই বোধ জাগ্রত করিবার নিমিত্ত প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে হইবে। বিদেশীদের অধিকৃত দেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদিগকে সাহসের সহিত অবিরত সংগ্রাম চালাইতে হইবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দেশের শ্রমিক-দলের বন্ধুত্ব যাহাতে ঐসব দেশের লোক লাভ করিতে পারে, সেজন্য জোর প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। জমিদার ও মধ্যযুগীয় পুরোহিত বা ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের অধিকার ধ্বংস করিবার নিমিত্ত কৃষকদিগকে জাগ্রত করিতে হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ধনিকদের সম্পর্ক শূন্য হইয়া কৃষক এবং শ্রমিকদিগকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন করিতে হইবে।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক দলের মূলমন্ত্র হইবে এইগুলি—

সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রাম গৃহবিবাদে পরিণত করা।

সাম্রাজ্যবাদীদের খোদ গবর্ণমেণ্টকে পরাজিত করা।

সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্রগুলির এবং অধীন দেশসমূহের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে ঐগুলিকে রক্ষা করা।

কমিউনিষ্টরা তাহাদের উদ্দেশ্য গুপ্ত রাখিতে চাহে না। তাহারা স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করে যে, বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে বিচূর্ণ করিতে পারিলেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব, অন্য কোনভাবে নহে।

———

খড় কুটো

—০—

মানবেন্দ্র রায়ের চিঠি

সরকারী মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত

লক্ষ্ণৌ ১লা সেপ্টেম্বর

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ব্রুসেলস্ ও বার্লিনের "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘ" (League against Imperialism) হইতে এই মর্ম্মে তার পাইয়াছেন যে সিমলা হইতে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের লিখিত বলিয়া যে চিঠি প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা জাল চিঠি।

এই সম্বন্ধে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট পণ্ডিত বলিয়াছেন,—

"যখন এই চিঠি প্রকাশিত হয় তখন আমি জানিতাম না যে চিঠিখানি প্রকৃত কি মিথ্যা। ভারত সম্পর্কে কমিউনিষ্টদের কার্য্য পদ্ধতি বিষয়ে মিঃ রায়ের কি মত আমি জানি না। কিন্তু চিঠিখানি দেখিয়া আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল যে গত ডিসেম্বর মাসের লিখিত পত্র আট মাস পরে কেন বাহির করা হইল।

চিঠিতে এমন সব কথা আছে যাহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যেরূপ সময়ে এবং যেরূপভাবে চিঠিখানি প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। একই সময়ে ট্রেড্স্ ডিসপুট বিল ও তথাকথিত বলশেভিক বিতাড়ন বিল ভারত সভায় পেশ করিবার তাড়া দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কতকগুলি লোককে ভয় পাওয়াইয়া বিল দুইটি পাশ করাইয়া লইবার মতলবেই এই চিঠির উৎপত্তি। বার্লিন হইতে আমি যে তার পাইয়াছি তাহাতে বেশ মনে হয় যে চিঠিখানি জাল এবং ইহাতেই মনে হয় যে চিঠি-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের যে সন্দেহ হয় তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার বিশ্বাস চিঠি সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক ইহাতে কেহ ভুলিবেন না।

গভর্ণমেণ্ট যে দুটি বিল পেশ করিতেছেন তাহা আপত্তিজনক এবং সকলেরই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিত। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন সম্পূর্ণ নবীন এবং ট্রেডস্ ডিসপুট বিলের উদ্দেশ্য আন্দোলনটিকে শৈশবেই নষ্ট করিয়া দেওয়া। বিনা বাধায় গবর্ণমেণ্টকে এরূপ করিতে দেওয়া উচিত নহে। এই দুইটি বিল সম্বন্ধে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি তীব্র প্রতিবাদ করায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

—(০)—

কমিউনিষ্ট দলের মত জিজ্ঞাসা

ভারতীয় কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার এক অধিবেশনে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের পত্রের কথা আলোচিত হয়। এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে যে উপরোক্ত পত্রের মূলে কোনও ভিত্তি আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য কমিউনিষ্ট দলের নিকট পত্র দেওয়া হইবে। কমিউনিষ্টদল যদি বলেন যে এই পত্রের বিবরণ সত্য তাহা হইলে কমিউনিষ্টদলকে অনুরোধ করা হইবে যে এরূপ প্রচার কার্য্য বন্ধ করা কর্ত্তব্য। কারণ ইহাতে ভারতবাসীর অপকার হইবে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দমনমূলক আইন প্রণয়ণের সুযোগ পাইবেন।

—০—

বারদোলী মীমাংসা

অসন্তোষ প্রকাশ

উক্ত সভায় আর একটি দরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বারদোলী সত্যাগ্রহ মীমাংসা করার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। মিঃ সাকলাতওয়ালা এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে এরূপ ব্যাপারের মীমাংসার ভার কতিপয় ব্যক্তির উপর না দিয়া অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উপর দেওয়া কর্ত্তব্য।

সমালোচনা

"লেনিন ও সোভিয়েট"

"বিপ্লব ও ছাত্র সমাজ" প্রণেতা শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী প্রণীত। প্রাপ্তি স্থান সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা। বাংলা ভাষায় লেনিনের জীবনী এবং সোভিয়েটতন্ত্র সম্বন্ধে এরূপ আর একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে রুশ-বিপ্লব এক অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয় ঘটনা। ১৯১৭ সালে ৭ই নভেম্বর রুশ দেশে বিপ্লবানল প্রজ্বলিত হয়—চিরদাসত্ব শৃঙ্খলিত অগণিত মানবের অন্তরের বিপ্লব-বহ্নি, মুক্তি ক্ষুধা জাগিয়া উঠে। একটা বিরাট জাতি জারের স্বেচ্ছাচারিতার পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল—আবার তাহাদের চিত্তে প্রাণের সাড়া জাগে। কোটি কোটি মানব, মুক্তির জন্য দিশাহারা হইয়া তাহাদের প্রিয় নেতা লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব সমরে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদেরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রুশিয়ায় সাম্য-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্য রুশের জনগণ—কৃষক ও শ্রমিকগণ পৃথিবীর বুকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে। রুশ অদ্য হিংসাতুর ধনী বুর্জোয়াদের স্বাধীনতা, সভ্যতা, জ্ঞান গরিমা হইতে অনেক উচ্চে! ইহার মূলে ছিলেন কর্ম্মবীর ত্যাগী, ধ্যানী কারালাঞ্ছিত, চির নির্ব্বাসিত লেনিন। গ্রন্থকার বর্ত্তমান পুস্তকে লেনিনের শৈশব জীবন হইতে জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঘটনাবলী অতি প্রাঞ্জল সরস-মধুর ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। দেশহিতে, নির্ব্বাসিত হইয়া সাইবেরিয়ার তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরের অসহ্য কারাযন্ত্রণা সহ্য করিয়া জার্ম্মানী, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকিয়া ও জীবন ব্যাপী কঠোর সাধন র দ্বারা রুশের শ্রমিক ও কৃষককুলের মুক্তির জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা বলশেভিক নেতা লেনিন সোভেয়েটতন্ত্র, রেডআর্ম্মি, থার্ডইনণ্টারন্যাশন্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কল্পে নিজের জীবনকে যেরূপভাবে নিয়োজিত ও উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিপন্থী, বিরুদ্ধবাদী দলের বিরুদ্ধে যেভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

শতাব্দী ব্যাপী হাড়ভাঙা পরিশ্রম, অত্যাচার, নির্য্যাতন, দারুণ দুর্দ্দশা, কঠোর লাঞ্ছনা, অনশন, অর্দ্ধাশন, শীতকষ্ট, অসহ্য দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি সহ্য করিয়া রুশের 'গণ' অর্থাৎ শ্রমিক, নাবিক ও কৃষকগণ, কিরূপে জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের সমবেত শক্তিবলে কিরূপে অত্যাচারী পামর বিলাসব্যসনরত স্বেচ্ছাচারী জারের সিংহাসন ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল—কৃষক ও শ্রমিকদের ভিতর 'রেড আর্ম্মি' বা 'লাল পল্টন বাহিনী' গঠিত হয় এবং তাহারা বিপ্লবযজ্ঞে প্রাণাহুতি দিয়া কিরূপে সোভিয়েটের পত্তন করে তাহা গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা নৈপুণ্যে, সহজ ও সরল ভাষায় লেনিনের জীবনকাহিনী যেরূপ মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে পুস্তকটি খুব সুপাঠ্য হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবযুগে রুশ পৃথিবীর পরাধীন দেশের সম্মুখে যে বাণী প্রচার করিতেছে এবং শোষণবাদী শাসিত দেশে 'বলশেভিক ভীতি' যেরূপ প্রবলাকার ধারণ করিতেছে—তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির এই পুস্তকটি পড়া উচিত। তাহা হইলে বেশ সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে—রুশ, পৃথিবীর মূক, পরাধীন, পরপদলেহিত, লাঞ্ছিত সর্ব্বহারাদের মুক্তির জন্য বিশ্বে কোন্ মহা বাণী প্রচার করিতেছে! কম্যুনিজম বা সমানাধিকারবাদ ও বলশেভিজম অর্থে লেনিন বুঝিয়াছিলেন, বিশ্বমানবের মুক্তি—শ্রমিক ও কৃষকগণের মুক্তি! লেনিনের জীবনী ও সোভিয়েট পদ্ধতি সম্বন্ধে আজো বাংলাভাষায় কোনো ভালো পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম করিয়া সে অভাব খানিকটা পূরণ করিয়াছেন। আমরা শিক্ষিতদের এই পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

আবেদন

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার সাউথ ইণ্ডিয়া রেল ধর্ম্মঘট সম্পর্কে ত্রিচিনপলিতে ধৃত হইয়া হাজতে আবদ্ধ আছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি শ্রমিকদের জন্য বিশেষ করিয়া কলিকাতার কেরাণীগণের জন্য যেরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই বিপদে আমাদের যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আজীবন শ্রমিকদের জন্য তিনি কার্য্য করিয়াছেন। তাহাদের কার্য্যে দরিদ্র মুকুন্দ সরকার আজ নিঃস্ব। সুতরাং তাঁহার জন্য আমরা কি করিতে পারি তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।

আশা করি আমাদের আবেদন বৃথা হইবে না।

টাকা কড়ি সমস্ত "কর্ম্মচারী সমিতির" অস্থায়ী সম্পাদকের নিকট ১২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। শ্রীযুক্ত সরকারের মামলার জন্য বহু অর্থের সদ্য প্রয়োজন, সুতরাং আমরা আশা করি সকলে সত্বর অর্থ প্রেরণ করিয়া তাঁহার বিপদে সাহায্য করিবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সভাপতি
কর্ম্মচারী সমিতি

শ্রমিক-জগৎ

জামসেদপুর।

কলিকাতা ২রা সেপ্টেম্বর

ফ্রী প্রেস জানিতে পারিয়াছেন, অদ্য রাত্রে জামসেদপুরে যে যে আলোচনা হইবে তাহাতে আপোষের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হইবে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুত আনন্দজী হরিদাস, শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ ও মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ গতকল্য অপরাহ্নে বি, এন,আর, বোম্বাই মেলে জামসেদ-পুর যাত্রা করিয়াছেন। সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লাও ঐ ট্রেণে জামসেদপুর গিয়াছেন। ধর্ম্মঘট নেতা মিঃ হোমী মাত্র গতকল্য প্রাতে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও গতকল্য অপরাহ্নেই শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির সহিত জামসেদপুর গিয়াছেন। এই সব ব্যাপার হইতে সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

হাওড়া ষ্টেশনে ফ্রী প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি মিঃ হোমীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিঃ হোমী বলেন, বাহিরের লোক গোলযোগ বাধাইতেছে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস কারখানার

কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়া লইতে হইবে। শ্রমিকগণ নানা কষ্টের মধ্যে নিজেদের ভাগ্যোন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, তাহা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিলেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান এবং শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতঃপর মিঃ যোশী বলেন, শ্রমিকগণ এই ধর্ম্মঘটে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, শ্রমিকদের ও দেশের মঙ্গলের জন্য স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত।

কয়েকজন ধর্ম্মঘটকারীর প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদিগকে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের পরেই অবিলম্বে তাহাদের বাসস্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তাহারা এই আদেশ মানিবে না, তাহাদিগকে আইনানুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। প্রকাশ, ধর্ম্মঘটকারীগণকে তাহাদের সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ও বাসা ছাড়িতে বারণ করা হইয়াছে। ধর্ম্মঘটকারিগণ ধর্ম্মঘট রীতিমত পিকেটিং চালাইতেছে।

—ফ্রী প্রেস

মাদ্রাজ এস, আই, রেল ধর্ম্মঘট

এস, আই, রেল ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন।—ধর্ম্মঘটের সময় ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মিয়াছে। শান্তি রক্ষার জন্য যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার তাঁহারা তাহাই করিয়াছেন—তাহার বেশী কিছু করেন নাই। ধর্ম্মঘট সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মত এই যে, ঘটনার এখন যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে মধ্যস্থতার আর কোন দরকার দেখা যায় না। যখন সালিসার দরকার হইবে তখন অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট সালিসী করিবেন। অপরাধীগণের বিরুদ্ধে আদালতে যে সকল মোকদ্দমা চলিতেছে তাহা উঠাইয়া লইবার বা অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিবার গবর্ণমেণ্টের কোন অভিপ্রায় নাই।

শ্রমিক নেতাগণের বিচার

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার ও সিঙ্গারাভেলুর মামলা এক সপ্তাহের জন্য মুলতুবি রহিল।

বোম্বাই মিল শ্রমিকদের বেতন নির্দ্দেশ

বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘট কমিটি শ্রমিকদের বেতন সম্বন্ধে একটি স্কীম করিয়াছেন, শীঘ্রই তাহা মিলের মালিকদের নিকট পেশ করা হইবে। শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলেন, এই ধর্ম্মঘটের সুযোগে তাঁহারা শ্রমিকদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে চান। বেতন কমাইলে চলিবে না। টারিফ বোর্ডও বেতন কমাইতে চান নাই, তাঁহারা শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা জুটপ্রেসে কুলীদের বিদ্রোহ

চিৎপুরের হাইড্রলিক জুট প্রেসের কুলীরা গত শনিবার দিন ম্যানেজারের উপর বিরক্ত হইয়া প্রেসের কাজে বাধা দিতে উদ্যত হয়। ম্যানেজার ইহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পাছে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায় এই ভয়ে ম্যানেজার লালবাজারে খবর দেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে দুই লরী সশস্ত্র করিয়া পুলিশ ও সার্জেণ্ট প্রেরণ করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত পুলিসের সাহায্য লইতে হয় নাই। কুলীরা আপনা আপনি শান্ত হইয়া চলিয়া যায়।

বাউড়িয়া মিল হাঙ্গামার জের

ম্যানেজারের কথা

গত ১৬ই জুলাই তারিখে বাউড়িয়া কটন মিলের হাঙ্গামা সম্পর্কে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও মারপিটের অভিযোগে আবদুর মণ্ডল ও অপর ২৫ জন অভিযুক্ত হয়। উহাদের ১২ জনের বিরুদ্ধে একজন দারোগাকে আটক করিয়া বাঁধিয়া জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একটা মিথ্যা বিবরণপত্র লিখাইয়া লওয়ার অভিযোগ আনীত হইয়াছে—এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। গতকল্য উলুবেড়িয়া। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার শুনানী উঠিলে মিলের ম্যানেজার মিঃ ডাওসন বলেন,—আক্কর, সাত্তির, এরফান, আবদুল ও জামাল নামক ৫ জন আসামীকে বরখাস্ত করিতে চাই. ঘটনার দিন কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী আমাকে বরখাস্ত করা স্থগিত রাখিতে বলেন, আমি উহাতে সম্মত হই না। অতঃপর উক্ত ৫ জন শ্রমিককে ডাকিয়া আনিয়া বেতন দিয়া দেওয়া হয় ও তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হয়। ইহার পর দলে দলে শ্রমিকগণ আসিয়া তাহাদের বেতন দাবী করে। এইরূপে প্রায় ২০০০ লোক এককালে বেতন দাবী করে। আমি বলি যে, পরদিন দেওয়া হইবে। অতিবর লিখিত প্রতিশ্রুতি চাহে. আমি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়া ১০।১৫ পদ অগ্রসর হইলে পর আমাকে আক্রমণ করা হয়। পুলিশ আমাকে বাংলার মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। তারপর দাঙ্গা সুরু হয়। সাক্ষী কয়েকজন আসামীকে সনাক্ত করেন। শুনানী মুলতুবী আছে।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad

Reg. No. C. 1440.

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র



Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৫ | ১৪শ সংখ্যা

সম্পাদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
কালীকুমার সেন

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

CALL TO ACTION

Being the Resolutions and Theses passed at the Third Annual Conference of the WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL.

After years of agitation and organisation, India is still a slave-nation, is farther from freedom than ever. Why is this?

Why is the once mighty National Congress a laughing stock before the world?

Why do our leaders invariably say one thing and do another?

For a clear, consistent Marxist analysis and explanation of these disturbing phenomena,

For a clear practical lead as to what to do to remedy this state of things,

See, "A CALL TO ACTION." Price As. 8/- only.

To be had of

1. THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2/1, European Asylum Lane, Calcutta.

2. THE BOOK COMPANY LTD.
4/4A, College Square, Calcutta.

দন্তরোগের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পরীক্ষিত মহৌষধ

দাঁতকিওর

বাজার প্রচলিত দন্তমঞ্জন, দাঁতমাজন প্রভৃতির ন্যায় আমার এই মহৌষধ সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইবে না। কেবলমাত্র একবার ব্যবহার করিলেই চিরজীবনের জন্য দাঁত বেদনা, দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পূঁয পড়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ চিরদিনের জন্য দূর হইয়া দন্ত দৃঢ় হইবে। জীবনের মধ্যে দাঁতে আর কোন রোগ জন্মিবে না। আজীবন দাঁতগুলি অক্ষত অটুট থাকিবে। উপকার না হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দিব।

মূল্য প্রতি কৌটা ।৵০ আনা, ৩ কৌটা ১ টাকা ডজন ৪৲ টাকা, ২ ডজন ৭৷০ আনা, ৪ ডজন ১৪৲ টাকা, ৮ ডজন ২৬৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এজেন্টগণকে বাকি মূল্যে (ধারে) ঔষধ দেওয়া হয়। এক আনার ডাক টিকেটসহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়।

ঠিকানা—

মুজফ্‌ফর হুসেন মাষ্টার।
গ্রাম—গিরপুর, পোষ্ট—আথালয়া,
জিলা—শ্রীহট্ট।

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২৷০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেন্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেন্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেন্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেন্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর
সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৫ | ১৪শ সংখ্যা

ইন্‌টার ন্যাশন্যাল

—০—

(বিশ্ব মানবের মুক্তির গান)

ইউজিন পটিয়ের।

—০—

অনুবাদক—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

—০—

ওঠ্‌রে জেগে উপবাসী অন্ন হীনের দল
জাগ্‌রে ধরার লক্ষ্মী-ছাড়া পান্থ হীন-বল।
শোন্ তোরা শোন্ ন্যায়ের রুদ্র গর্জ্জনে
নূতন সৃষ্টি জাগছে প্রলয় মন্থনে।
পুরাতনের জীর্ণ-মোহের বন্ধন শৃঙ্খল
ছিন্ন করে ওঠ্‌রে জেগে চির দাসের দল।
এবার নূতন ভাবে উঠবে ফুটি জগৎ-শতদল
সর্ব্ব-জয়ী হবো মোরা সর্ব্ব-হারার দল॥

ধূয়া

এবার এই বিরোধেই ঠিক হবে ভাই কে হারে, কে জেতে,
যে আছ ভাই, হও হুঁসিয়ার, দাঁড়াও রে বুক পেতে।
ওরে ও ভাই সর্ব্বহারা বিশ্ব মানব দল
অনাগত যুগের পথের তোরাই চির-বল॥

(২)

(মোরা) চাইনে সে সব দয়ার সিন্ধু ত্রাণের অনুচরে,
(যারা) নকল ন্যায়ের মঞ্চে বসে মোদের বিচার করে।
কর্ম্মী মোরা, তুচ্ছ করি তাদের কৃপার দান
এবার সবার হয়ে করবো মোরা মন্ত্রের সন্ধান।
দস্যু থেকে ছিনিয়ে নেবো লুঠ-করা সব ধনে
ভেঙে কারার বাঁধন মুক্তি দেবো শৃঙ্খলিত জনে।
মোরাই এবার করবো মোদের পথের নির্দ্ধারণ
এবার প্রাণ ঢেলে ভাই করতে হবে কর্ম্মের সাধন।

(৩)

আইন মোদের নিত্য ঠকায় বিত্ত মোদের হরে,
এরা বেতন বিনিময়ে মোদের রক্ত শোষণ করে।
ধনিক যারা মুক্ত তারা, নাইকো কোন দায়
গরীব যে জন আইন শুধু ঠকিয়ে তাকেই পায়।
মোদের যুগের পরে যুগ কেটেছে পেষণ-যন্ত্র তলে
এবার সাম্যবাদের মন্ত্র-বাণী অন্য কথা বলে।
বলে "এ জগতে নাই অকেজোর দাবীর অধিকার
শুধু ভাগের বেলায় ভাগ বসাবার নাইকো দাবী তার"।

(৪)

ঐ যে ওরা বসে আছে মহান্ সমারোহে
রেলের, খনির, জমির মালিক বিরাট গর্ব্ব মোহে,
কি পড়েছো, কি দেখেছো ওদের ইতিহাসে
শুধু কেমন ক'রে মানব কুলের শ্রমে ওরা গ্রাসে।
কয়েক জনের ভাণ্ডারে ভাই কঠিন লোহার তলে
বিশ্ব-জোড়া শ্রমিক কুলের শ্রমের মাণিক জ্বলে।
ফিরিয়ে পেতে চায় যারা সেই মাণিক সমুজ্জ্বল
তারা আপন শ্রমই করছে দাবী, আপন হাতের ফল।

(৫)

মাঠের থেকে, কলের থেকে মিল্‌লো শ্রমিক দল
মিলন মোদের কর্ম্ম যোগে, সত্য যোগের ফল।
এই দুনিয়া মোদের রে ভাই মোরা শ্রমিক-কুল
হেথা শোষণ-বাদীর নাইকো স্থান, করব রে নির্ম্মূল।
মোদের শোণিত পান করে ভাই কতই শকুন দল
দিনে দিনে উঠ্‌লো বেড়ে শোষণ-বাদীর বল।
তাদের ধ্বংস হবার পরেও বিশ্ব ভুবন হতে
ধরার বুকে রবির আলো ঝরবে হাজার স্রোতে॥

ধূয়া

এবার এই বিরোধেই ঠিক হবে ভাই কে হারে, কে জেতে.
যে আছ ভাই হও হুঁসিয়ার, দাঁড়াও রে বুক পেতে।
ওরে ও ভাই সর্ব্বহারা বিশ্ব-মানব দল
অনাগত যুগের পথের তোরাই চির-বল॥

-১০০

ক্যাণ্টন বিদ্রোহ

—০—

[illegible] এপ্রিল মাসে কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে [illegible] শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] সম্মিলিত হইয়া [illegible] করিবার জন্য [illegible] ক্যাণ্টনের কমুনিষ্ট [illegible] নির্বাচিত [illegible] সামরিক শক্তি উপস্থিত হইয়াছিল, [illegible] সরকার মহাজন, পদস্থদিগের [illegible] বিরত করিবার [illegible] স্থির মানসিক হইয়াছিল এবং [illegible]।

[illegible]-কাই যখন দেখিলেন যে [illegible] তাহার পশ্চাৎ স্থায়ী [illegible] তিনি কুয়োমিণ্টাং বা জাতীয় দলের দোহাই দিয়া জনসাধারণের সহানুভূতি ও বিশ্বাস অর্জন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রমিকগণের প্রতি তাঁহার প্রকৃত মনোভাব শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি হংকংএর ধর্ম্মঘটীদিগকে বিতাড়িত করিলেন, তাহাদের লঙ্গরখানা গুলি বন্ধ করিয়া দিলেন, ট্রেড ইউনিয়নের অফিস গুলিতে থানা তল্লাসী ও কর্মীগণের ধর-পাকড় আরম্ভ করিলেন, শ্রমিকদের শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ সভার উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন এবং কমুনিষ্টদের ধরিয়া ফাঁসী কাঠে ঝুলাইতে লাগিলেন তখন তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। এ দিকে আবার কোয়াংটুং প্রদেশে জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ আরম্ভ হইয়া গেল। এই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দলের অভ্যন্তরস্থ পরস্পর বিরোধী দলও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল, তাহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল এবং জনসাধারণ মরিয়া হইয়া—স্বাধীন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সেই সময়কার শাসনাধীনে ক্যাণ্টনের "পার্টি কমিটি" (কমুনিষ্ট দল) বে-আইনী ভাবে গঠিত হইয়াছিল এবং গোপনে কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিদের লইয়া সভাসমিতি চালাইতেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে যখন য়্যানচাঙ্গের (Yeh-Ting) সৈন্যদল কোয়াংটুং অভিমুখে যাত্রা করিল তখন ক্যাণ্টনের কমুনিষ্টদল বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল কিন্তু সোয়াটাওতে "ইয়ে টিঙ্গ" পরাজিত হওয়ায় বিদ্রোহের প্রচেষ্টা উপস্থিত সময়ের জন্য স্থগিত রাখা হইল। এই অবসরে ১৪ই অক্টোবরের নাবিক ধর্ম্মঘট, ৭ই নভেম্বরের চীন বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব ও চ্যাং-ফাট-কাইয়ের কার্য্যাবলীর সুযোগ লইয়া ক্যাণ্টনদল জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া ব্যাপকভাবে ধর্ম্মঘটাদির দ্বারা বিপ্লবের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিল।

পার্টি, ইয়েটিঙ্গের সেনাদলের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট সৈন্যদের সাহায্যে হাইফাং প্রদেশের ৬টি কৃষিপ্রধান জেলায় যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিয়াছিল উহার অধীনে লোক সংখ্যা নভেম্বরের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পাঁচাই লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ [illegible] সোভিয়েটের [illegible] শ্রমিক [illegible] ক্যাণ্টনে [illegible]।

[illegible] সময় ক্যাণ্টনের কমুনিষ্ট [illegible] একটি [illegible] এক [illegible] হইল যে [illegible] বিদ্রোহ [illegible] করা হইবে [illegible] মত [illegible] করিবার জন্য পুর্ণ উদ্যম [illegible]।

[illegible] তাহাতে কৃষক ও শ্রমিক গণতন্ত্রের স্থাপন [illegible] কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে বলিয়া প্রচার করা হইল [illegible] বন্দীগণের মুক্তি, কৃষক ও [illegible], মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতা ও ধর্ম্মঘট [illegible] সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, [illegible] শ্রমিক সঙ্ঘের বাড়ীগুলি নিবাইয়া [illegible] মৃত্যু বিধান, হংকংএর ধর্ম্মঘটীদের [illegible] শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যাপারের [illegible] শ্রমিকদের হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, বড় বড় [illegible], ব্যাঙ্ক ও রেল প্রভৃতি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ী বাজেয়াপ্ত করা, কৃষকদের সমস্ত জমির মালিক স্বীকার করিয়া লওয়া, জমীদার ও ধনী সম্প্রদায়ের মৃত্যুবিধান, সৈনিকদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া ১২ ডলার হইতে ২০ ডলার করা, সৈনিক সঙ্ঘের হাতে সেনা বিভাগের ব্যয় ভার প্রদান ও বিরোধী সেনাপতিগণের বিরুদ্ধে লড়িবার ক্ষমতা দান ইত্যাদি। এই কার্য্যপদ্ধতি জনসাধারণ ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল,—(১) বিপ্লবীগণের দ্বারা পরিচালিত একটি যুদ্ধ সমিতি গঠন (২) কমুনিষ্টদলের সকল সদস্যকে একত্র করিয়া একটি সেনাদল গঠন, (৩) ২০,০০০ শ্রমিক লইয়া একটি বে-আইনী লাল পল্টন গঠন, (৪) যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য হংকংএর ধর্ম্মঘটীদের লইয়া দুইটি, নাবিকগণের একটি ও রিকসাওয়ালাদের একটি সৈন্যদল গঠন, (৫) যানবাহন সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও মোটরগাড়ী চালকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, যাহাতে বিদ্রোহের সময় তাহারা মোটর, লরী প্রভৃতি লইয়া সাহায্য করিতে পারে, (৬) রিভলভার, ছোরা প্রভৃতি সংগ্রহ করা ও লোহার বর্শা ও বোমা তৈয়ারী করা, (৭) পল্টনের মধ্যে বিপ্লব প্রচার—ও বিপ্লববাদী সৈনিক ও সেনানায়কগণের সহিত আহ্বান।

বিদ্রোহের দিন স্থির হইবার পর বে-আইনী ভাবে ক্যান্টনে এক সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠা হইল। ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে দশজন (দুই লক্ষ সভ্য) বিদ্রোহী পল্টন হইতে ৩ জন ও পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের কৃষক সসংঘগুলি হইতে ৩ জন সদস্য এক সাধারণ সভায় নির্ব্বাচন করিয়া—এই সোভিয়েট গঠিত হইল। এই সোভিয়েটের সদস্যগণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সহরের বিভিন্ন পল্লীর যাবতীয় অসামরিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি "কৃষক ও শ্রমিক গেজেট" নামে একখানি দৈনিক,"লাল নিশান" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও বহু সংখ্যক অবৈধ পত্রিকা ছাপাইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে ভোর সাড়ে তিনটার সময় বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ট্রেনিং বেটেলিয়নের সৈনিকগণ ক্যান্টন সোভিয়েটের—সামরিক মন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য কমরেড চ্যাং-টা-লাইকে তাহাদের ব্যারাকে লইয়া আসিল এবং সভা করিয়া কুয়োমিন্টাং গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদ ঘোষণা করিল এবং ক্যান্টন সোভিয়েটের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল।

১৫ জন বিরুদ্ধবাদী সেনা নায়ককে তখনই গুলি করিয়া মারা হইল এবং বিদ্রোহী সৈন্যগণ অভিযান করিয়া যুদ্ধের উপযোগী প্রধান প্রধান স্থানগুলি দখল করিয়া লইল। একই সময়ে লাল পল্টন, সাধারণ পুলিস ও জঙ্গী পুলিসের প্রধান আড্ডাগুলি আক্রমণ করিল ও একঘন্টা যুদ্ধের পর সেগুলি দখল করিয়া লইল ও তাহাদের বন্দুক মেসিনগান ও বর্ম্মাবৃত মোটরগাড়ী গুলি কাড়িয়া লইল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিদ্রোহী সৈনিক ও শ্রমিকগণ সমস্ত প্রধান স্থানগুলি অধিকার করিয়া ফেলিল, আটশত বন্দীকে কারা মুক্ত করিয়া দিল, ও অসংখ্য অস্ত্র শস্ত্র গোলাগুলি কাড়িয়া লইল। চ্যাং-ফাট-ক্লাইয়ের কামানগুলির এক তৃতীয়াংশ তাহাদের হস্তগত হইল।

বিদ্রোহের কয়েক দিবস পূর্ব্বে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল (Council of People's Commissaries) তাহা অবিলম্বে পূর্ণোদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিল এবং নিখিলচীনের কৃষক শ্রমিক ও সৈন্যগণের উদ্দেশ্যে একখানি ও আন্তর্জ্জাতিক প্রোলিটেরিয়েটের উদ্দেশ্যে একখানি ঘোষণা পত্র প্রকাশিত করিল। তিনখানি ফরমান জারি করা হইল। প্রথম ফরমানে সোভিয়েটের স্থাপনা ঘোষিত হইলে। দ্বিতীয়টীতে শ্রমিকগণের নেতৃত্বাধীনে লাল পল্টন গঠিত হইল এবং তৃতীয় ফরমানের দ্বারা একটি বিশেষ বৈঠক স্থাপিত হইল। এই বৈঠকের বিচারে—সাত শত গুপ্তচর, পুলিশ কর্ম্মচারী, বিরুদ্ধবাদী ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে গুলি করিয়া মারা হইল।

সোভিয়েটের সভাপতি হইলেন একজন শ্রমিক, সু-চাও-চেন। ইনি নাবিকগণের নেতা, ১৯২৫ সালের হংকং ধর্ম্মঘটেরও পরিচালক ছিলেন এবং পরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মুদ্রাযন্ত্র সমূহ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। ফরমানগুলি প্রত্যেক খানা আড়াই লক্ষ করিয়া মুদ্রাযন্ত্র সমূহে ছাপাইয়া চারিদিকে তখনই বিলি করা হইল।

বিদ্রোহের সময়কার একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা এই যে শ্রমিকগণ বিশেষতঃ যুবক ও নারী শ্রমিকগণ দলে দলে এই বিদ্রোহ ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিল এবং শেষোক্তরা শত্রুদের ধরিয়া ফেলা, লাল পল্টনের রসদ যোগান, আহতদের শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

তরুণের ডাক

—:*:—

স্বাধীনতার আহ্বান যখন আসে, সমাজে, রাষ্ট্রে যখন বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে সে আহ্বানে সাড়া দেয় তরুণের দল। পথের বাধা তরুণেরা মানে না, সম্মুখের অচলায়তন বাধা তাদের গতি রোধ করতে পারে না। পরাধীনতার ব্যথা যখন তীব্র হয়ে তরুণের চিত্তে বাজে, দেশ জননীর ব্যথায় যখন তাদের চিত্ত বিগলিত হয়, তখন আপনা হতেই তাদের হৃদয়ের অর্গল উন্মুক্ত হয়—ভাবাবেগে চিত্ত আপ্লুত হয়—দেশ-সেবার নেশায় বিভোর হয়ে তারা সমস্ত পথের দুর্গমতাকে দূরে ঠেলে দেয়। মুক্তির পথ কুসুমাস্তৃত নহে, তবুও সে দিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। তরুণ তার স্বভাব-সুলভ সহজ মনোভাব নিয়ে মুক্তি পথের পথিক হয়। তার তারুণ্য ধর্ম্মকে দেশের সমাজের মানবের কল্যাণে, পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির জন্য উৎসর্গ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব-সমাজে, রাষ্ট্রে, যুদ্ধ-বিগ্রহে, বিপ্লব-যজ্ঞে, ফাঁসির যূপকাষ্ঠে সর্ব্বপ্রথমে তরুণ তার কচি প্রাণকে উপহার দিয়েছে। তরুণ ধর্ম্ম মানে না, সমাজের গণ্ডী মানে না। সে চায় অকপট স্বাধীনতা, চায় পরিপূর্ণ মুক্তি! বিরাট বিশ্বের উন্মুক্ত বক্ষ তলে স্বাধীন ভাবে—বাধা-বন্ধ হারা হয়ে বিচরণ করবার উদ্দাম প্রবৃত্তি তাকে আকুল করে তুলে—তাই সে ছুটে যেতে চায় মুক্তি-পাগল আবেগে মুক্তির সন্ধানে। তরুণ পুরাতন, জরা-জীর্ণ পূতি গন্ধ ভাব, আচার-বিচার, রীতি-নীতি, পুঁথি-ধর্ম্ম, মিথ্যা-শাস্ত্র পায়ে ঠেলে দিয়ে সম্মুখের নব নতুনকে আনন্দ-উল্লাসে আলিঙ্গন করতে ছুটে। সমাজে, রাষ্ট্রে, শাস্ত্র-ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে যখন বিপ্লব উপস্থিত হয়—তাকে তরুণ হৃদয়ই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করে—তাকে অবলম্বন করে তরুণ তার যাত্রা পথের গতি, কাজের ধারা, তার কর্ত্তব্য স্থির করে নেয়। আর ইহাই হচ্ছে তরুণ হৃদয়ের সহজ সরল স্বভাব-ধর্ম্ম।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের জন্য তরুণ স্বীয় প্রাণ বলি দিয়েছে। বিপ্লব-বহ্নি-শিখায় তার দেহ চিতা-ভস্মে পরিণত হয়েছে। তাদের তাজা রক্তে ধরণী বক্ষ সিক্ত হয়েছে। তরুণ হিসাব-নিকাশ করে দেখেনি এই বিপুল বিশ্বে তার দাবী কতটুক—সে দুনিয়ার কতটুকু অধিকারী! সে তার সুখের পরিমাণ করে কাজে নামে না! কিন্তু আজ প্রতিপদবিক্ষেপে তরুণ অপমানিত, লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত রাজদ্বারে তার দুর্দ্দশা অপরিসীম। কারালাঞ্ছনা, নির্ব্বাসন রাজরোষ, গুপ্তচরের গোপন অনুগমন, ইত্যাদি তার নিত্য সহচর। বর্ত্তমান কালে ধনিকবাদ ও ইম্পিরিয়েলিষ্ট গৃধ্নুদের শোষণ-লিপ্সার আবহাওয়া পৃথিবীর বহুবিধ পরিবর্ত্তন সাধন করেছে। বিশ্বমানবের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ও সহস্র পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। তরুণকেও তার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করার জন্য তার দৈহিক ও মানসিক শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে হয়। ধনিক, বণিক পুঁজি

[illegible] করে অগাধ ধনের মালিক হয়েছে— [illegible] মেরেছেন। ধনীদিগের কঠোর [illegible] জীবনের পূর্ণ [illegible] প্রাণাহুতি দিতে হচ্ছে। [illegible] পৃথিবীর [illegible]

[illegible] অনেকেই জানেন বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে [illegible] শাসক বর্গের ধন লিপ্সা চরিতার্থ করতে কত শত শত [illegible] দিতে হয়েছে। তাদের হিসাব কে রাখে? যুদ্ধে [illegible] অন্ধ হয়ে তাদের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে জীবন্মৃত হয়ে পড়েছে। লড়াই এর দরুণ, গোলা বারুদ আঘাতে, বিষাক্ত গ্যাসের তীব্র দাহনে মাইন, টর্পেডো ইত্যাদির ঘায়ে কত তরুণ বিকলাঙ্গ হয়েছে, কত তরুণের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। শত শত তরুণ তাদের প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ভ্রাতা ভগ্নী পত্নী প্রভৃতিকে দুঃখ পাথারে ভাসিয়ে চির জনমের মত এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। এ সুন্দর, মনোরম পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-সম্ভোগে তারা চিরবঞ্চিত হয়েছে। এই সব মৃত্যু-পথের যাত্রী, বিগত যৌবন তরুণদের হিসাব কে রাখে? যুদ্ধের দরুণ কত নারী পতি-হারা হয়ে সমাজ দেহের ভারী বোঝা রূপে দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। কত লোক ক্ষীণ বীর্য্য, হীন দুর্বল অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। কত বালক পিতৃ-হীন হয়ে অনাথ নিরাশ্রয় হয়েছে।

ধনিক-বাদ আর উদগ্র অর্থ লোলুপতার জন্যে পৃথিবীর ভিতর দুঃখ দারিদ্র্য, অনশন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক, দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করেছে। সমাজের ঘোর অশান্তি, শোষণ, নিপীড়ন মর্মন্তুদ বেদনা এর জন্য দায়ী কে? আমাদের তরুণরা কি কখনো ভেবে দেখেছে তাদের এই যে নিঃস্বার্থ জীবন দান, মৃত্যুবরণ, আমরণ দুর্বিসহ যন্ত্রণা কার কল্যাণের জন্য তারা করছে? যারা জগতের প্রকৃত মানুষ, ধরার যারা অধীশ্বর—শ্রমিক, কৃষক চাষী—যারা অনন্ত কাল ধরে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করে বিশ্বের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অজস্র ধন-দৌলত পয়দা করছে—যারা কিয়জ্জন পরশ্রম-উৎপন্ন-ভোগী ধনিক বণিকের বিলাস ব্যসনের জন্যে, তাদের মনস্তুষ্টির জন্যে নিজেদের সত্তাকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে; সেই সব খাঁটি মানুষ কখনো কি এই পৃথিবীতে, এই মর্ত্ত্যলোকে মানুষের অধিকার পেয়েছে? আজ তাদের ঘরে ঘরে নিত্য হাহাকার। রোগ শোক ব্যাধি কাতর মুমূর্ষু চাষী আজ অন্নাভাবে, বেদনা কাতর, মৃতপ্রায়, ম্রিয়মাণ। কে তাদের মুখে আশার বাণী ফুটিয়ে তুলবে? কে তাদের মুক্তি-পথের সন্ধান দেবে? তরুণ ছাড়া এ দায়িত্ব কে গ্রহণ করতে পারে? আজকাল আমাদের দেশের তরুণগণ কি এতটুকু সুখী? অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, স্ত্রী পুত্র পরিবারের দুঃখ-দুর্দ্দশা দর্শন করে ভব যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কত শত শত তরুণ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেছে প্রত্যহ এ সংবাদ পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টালে পরিলক্ষিত হয়। আমরা তরুণরা একটু তলিয়ে দেখলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো এর মূলে কি নিহিত রয়েছে। এর মূলগত কারণ সমাজের উচ্চস্তরের কতিপয় লোকের প্রভুত্ব প্রতিপত্তি ও স্বেচ্ছাচার। আমরা তরুণরা তাদের দাস হয়ে কেনা গোলাম হয়ে তাদের সেবা করছি। আর তারা বিলাস স্রোতে অবিরাম গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। তাদের পাপাচারে ধরণী দুষ্ট, অপবিত্র ও গ্লানিমায় ঢাকা। তরুণদের এই যে জীবনব্যাপী অবিরত সংগ্রাম, কঠোর অস্থি-চর্ম্ম পরিশ্রম [illegible] বিনিময়ে তারা পেয়েছে, অনাহার, অনশন, ক্লেশ, নির্মম অত্যাচার নিষ্পেষণ। যারা মাটির মানুষ বক্ষের বুক চিরে ফসল উৎপন্ন করলো, ধন সামগ্রী প্রস্তুত করলো, যারা [illegible] হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, অট্টালিকা নির্মাণ করলো, তারা না পেলো [illegible] অন্ন, না পেলো বাসের জন্য একটা কুঁড়ে ঘর। জমিদার, মহাজনের নৃশংস অত্যাচারে আজ তারা সর্বহারা, [illegible] পথের ভিখারী। তাদের স্ব স্ব অধিকার টুকু দাবী করবার হুকুম নাই। আইন তাদের মূক হয়ে থাকবার আজ্ঞা দিচ্ছে। ঐ দেখো তাদের দেহ ধূলি-ধূসরিত—তাদের গায়ের ধূলা ঝেড়ে তোলবার কেউ নেই। যে শ্রমিকগণ ধনীর সেবার [illegible] পরিণত হয়েছে, কল-কারখানার লোহা লক্করের সাথে অবিরত সংগ্রাম করে যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত করছে তারা না পেয়েছে তাদের উচিত পারিশ্রমিক না পেয়েছে [illegible] না পেয়েছে আলো-বাতাস, না পেয়েছে জীবনের সন্ধান! হে আমার তরুণ [illegible] তোমরা কি কখনো অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এর মূল কারণ অনুসন্ধান করেছ? তোমরা কি কখনো এই অন্যায় অত্যাচার নিপীড়ন, লাঞ্ছনা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করে দেখেছ?

আমরা তরুণদল সমাজের কতখানি? বিংশ শতাব্দির বিপ্লব যুগে পৃথিবীর রূপ অতিক্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে, সমাজে, রাষ্ট্রে, মানবের ভাবরাজ্যে সর্ব্বত্রই একটা বিপুল বিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছে। আমরা যারা তরুণ তারা বিপ্লবের ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর জন্ম লাভ করেছি— তাই আমরা ছাড়িয়ে গিয়েছি জীর্ণ পুরাতনকে। আমরা নব উষালোকে পৃথিবীর নবরূপ পর্য্যবেক্ষণ করছি। আমাদের যারা তরুণ তারা বিপ্লবের প্রজ্বলিত হুতাশনের ভিতর দিয়ে তাদের যাহা মেকী তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে নবজন্মলাভ করছে। তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানবিদ্যা, যাহা কিছু অর্জ্জিত হচ্ছে, তাহা বিপ্লবের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে।

রুশের তরুণগণই তাদের 'গণের' মুক্তি আনয়ন করেছে। ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লব তরুণদেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল। লেনিন, ট্রট্স্কী, স্তালিন, রাদেক, বুখারিন প্রভৃতি মনীষীগণ তাঁদের তরুণ বয়সেই দেশহিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সর্ব্বস্থখে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ-জননীর শৃঙ্খল মোচনকল্পে সমুদয় দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁদের তারুণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে সমাজ দেহের ব্যাধিক্ষত পরগাছা পরধন লোভী হিংসাতুর সম্প্রদায় চিরজনমের মত বিলুপ্ত হয়েছে। তাঁদের মহান ত্যাগ পুরাতন পঙ্কিলতাকে বারিধিগর্ভে নিমজ্জিত করতে সমর্থ হয়েছে। আজ রুশের তরুণগণ এক নবযুগের স্রষ্টা। নবসৃষ্টির আনন্দ আতিশর্য্যে তারা বিভোর। তারা আজ মনে প্রাণে সুখী, তারা সবল-সুস্থ। দশবৎসরের ভিতর রুশীয় তরুণগণ তাদের যেরূপ ভাবে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করতে সমর্থ হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা অভাবনীয় ঘটনা। রুশদেশে বর্ত্তমান সময়ে তিনটি সুবৃহৎ যুব অনুষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে। ষোল বৎসর বয়স থেকে কুড়ি বৎসর বয়স্ক তরুণ দলের সঙ্ঘকে বলা হয় 'The Komsomol" অর্থাৎ তরুণ কম্যুনিষ্টদল। এই দলের সভ্য সংখ্যা ২০ কুড়ি লক্ষ। ঠিক অনুরূপ আর একটি সঙ্ঘ রয়েছে তারও সভ্য সংখ্যা ২০ লক্ষ এবং দলের নাম "Pioneers" কিংবা 'অগ্রগামী দল'

এর সভ্যদের বয়স ১১ হ'তে ১৬ বৎসরের ভিতর। তদ্ব্যতীত আর একটি অনুষ্ঠানও রয়েছে তার সভ্য সংখ্যা ৭ লক্ষ এই দল 'Octobers' নামে অভিহিত এবং এই দলের সভ্যদের বয়স ৭ হইতে ১১ বৎসরের উর্দ্ধে নহে। এই দলত্রয়ের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্য রুশীয় তরুণ তরুণীদের সমীপে তাদের আদর্শকে বড় করে ধরা, যাতে তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভবিষ্যতে আরো সুসংবদ্ধ স্বাস্থ্যবান ও বলীয়ান যুবকবাহিনী গঠিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ তারা চায় যেন ভবিষ্যতে তাদের দলের অভ্যন্তর থেকে বুদ্ধিমান ধীশক্তিসম্পন্ন কম্যুনিষ্টএর সৃষ্টি হ'তে পারে। তৃতীয়তঃ তারা কামনা করে এই দল যেন জাতীয়ত্ববাদকে অতিক্রম করতঃ আন্তর্জাতীয়ত্বের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উক্ত স্তরে পঁহুছিতে পারে এবং চতুর্থতঃ তারা চায় প্রত্যেক সভ্য কোন না কোন সমাজ হিতকর কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের দলের নিয়মানুযায়ী কাজ হতে বিরত থাকলে দল থেকে বের করে দেবারও বিধি রয়েছে। "The Komsomol" তাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘগুলিকে অর্থাৎ "পায়োনিয়ার্স" ও অক্টোবার সংঘদ্বয়কে নানাবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য এই দলের সভ্যগণ যাতে সুশ্রী, সবল ও বলিষ্ঠ হয়ে ধনিকবাদ ও শোষণবাদীদের জুলুম থেকে জগতের নিপীড়িত বেদনাতুর শ্রমিক ও কৃষক কুলের মুক্তির জন্য সাহায্য করিতে সক্ষম হয়। আধুনিক Komsomol Youth রুশদেশে ৮৬টি সংবাদ পত্র প্রকাশিত করে এবং ইহার প্রচার হচ্ছে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার। The Komsomol Pravda" নামে একটি সংবাদপত্র মস্কো সহর থেকে প্রকাশিত হয় ইহার কাটতি দেড়লক্ষ এবং ইহাই তরুণদলের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্রিকা। ভারতীয় তরুণদের রুশীয় তরুণদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানবার অনেক কিছু শিখবার রয়েছে।

চীনের জনগণের মুক্তির জন্য চীনের তরুণরাই উদ্যোগী হয়েছিল। তাদের চেষ্টায় চীনের জাতীয় বিপ্লব সম্ভবপর হয়েছে। চীনের গণ মুক্তি তরুণ কম্যুনিষ্ট দলের উপরই নির্ভর করছে। চীনের তরুণ কম্যুনিষ্ট দল অল্প দিন মাত্র স্থাপিত হয়েছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এর সভ্য সংখ্যা ২০১২৫ সহস্র। চীনের বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যিক মিঃ হু-সু সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের জন্যে তরুণ মনকে জনগণের বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন—এই তরুণ বীরের বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। তাহা ছাড়া চীনের তরুণরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান আমেরিকা ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে গিয়ে অধ্যয়ন করতঃ নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে চীন দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেশের ভিতর এক বিরাট তরুণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। চীনের পিকিনস্থ ইউনিভার্সিটি এই তরুণদেরই অবদান। —এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তরুণ আন্দোলনের কেন্দ্র স্বরূপ হয়েছিল। চীনের বর্ত্তমান বিপ্লবের পূর্ব্বে থেকে চীনের তরুণ ছাত্র ছাত্রীগণ মস্কো 'সান-য়াৎ সেন ইউনিভার্সিটী' থেকে, শিক্ষালাভ করে এসে জনগণের সাথে এক হয়ে কাজ করছেন। Jhou Mc cook Roots তাঁর একটি প্রবন্ধে মস্কোস্থ চৈনিক ছাত্রদের এই ইউনিভার্সিটির বিষয় সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই ইউনিভার্সিটীর কর্ণধার হচ্ছেন কার্ল র‍্যাদেক। তিনি অষ্ট্রীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। রুশ বিপ্লব সময়ে ও সোভিয়েটের নিয়ন্ত্রণে তিনি পূরোপূরি অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় চীনের তরুণগণ নব উদ্দীপনা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। চীনের তরুণগণ নবভাবের ভাবুক হয়েছে। বারান্তরে চীনের তরুণ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করবার অভিপ্রায় রহিল।

জার্ম্মানীর তরুণ আন্দোলনও জগতের তরুণ আন্দোলনের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। যদিও সমগ্র পৃথিবীতে তরুণ আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে। তাদের আহ্বানী হচ্ছে পুরাতনের আবেষ্টনীর বেড়া ডিঙ্গিয়ে এক নব পৃথিবী, একটা নূতন জীবন, নূতন চিন্তা উন্মুক্ত ভাব ও আনন্দের সৃষ্টি করা। উপস্থিত সময়ে জার্ম্মানীর তরুণ আন্দোলন কেবলমাত্র শারীর চর্চ্চার দিকে মনোনিবেশ করেছে। খেলা-ধূলা ব্যায়াম কুস্তি, যুযুৎসুর দিকেই তাদের লক্ষ্য অধিক। তবে প্রত্যেক দেশের তরুণগণ একটা নব চেতনার ও নূতন অবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে শিখছে।

আমাদের দেশেও কয়েক বৎসর হ'তে নানা ভাবে তরুণদের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনো সেই পুরাতনকে আঁকড়িয়ে ধরে রয়েছি। আমাদের তরুণ আন্দোলনের নেতৃত্ব, পৌরহিত্য করছেন প্রৌঢ়ের দল। আমরা তাঁদের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে একটা নূতন ভিত্তির উপর এখনো তরুণ আন্দোলন গঠন করতে পারিনি। আজও আমাদের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধতামসিকতায় ঢাকা। মিথ্যা ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িকতা আমাদের মুক্তিপথের, স্বাধীন চিন্তার অন্তরায় হয়ে রয়েছে। প্রত্যেক দেশ যখন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে আমরা তখনো আমাদের পুরাতন, জীর্ণ, শীর্ণ শাস্ত্র-ধর্ম্ম কুল-গরিমা, সভ্যতা ও গৌরবকে ধরে বসে রয়েছি। কিছুতেই সামনের দিকে পা' বাড়িয়ে চলবার সাহস আমাদের নেই।

সুখের বিষয় কতিপয় উদ্যমশীল পরিবর্ত্তনকামী তরুণ সেই অভাব খানিকটা পূরণ করবার সঙ্কল্প নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। আশা করি ইয়ং কমরেডস্ লীগের বন্ধুগণ একটু প্রণিধান করে দেখবেন আমাদের কর্ত্তব্য কি? কোন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কার্য্যে, পা বাড়িয়েছে। মুক্তি অর্থে আমরা কি বুঝি? দেশ বল্‌তে কাদের বুঝায়? যে দেশের শতকরা ৯৮ জন শ্রমিকও কৃষক আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ না হই তাহা হলে আমাদের সাধনা, আত্মত্যাগ, পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। আমার ইয়ং কমরেডস লীগের বন্ধুগণের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন তরুণ আন্দোলনের আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হয়ে কাজ করেন। তরুণ আন্দোলন বৃদ্ধের প্রতিষ্ঠান নয়। যারা সর্ব্বত্রই একটা পরিবর্ত্তন চায় এ তাদেরই আন্দোলন। তরুণই মুক্তির অগ্রদূত—অগ্রপথিক—সেনানায়ক। তরুণই মুক্তি পূজারী, মুক্তির দেউলে তারাই দীপ জ্বালতে পারে। আশা করি আমাদের তরুণগণও তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলবেন।

জনৈক তরুণ বন্ধু

বিবিধ প্রসঙ্গ

:০:

[illegible] কীর্তি

ভারতের বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ [illegible] 'কম্যুনিষ্ট' নামক এক অদ্ভুত [illegible] সৃষ্টি ও [illegible]। এই সব জীবগুলি বিনা কারণে [illegible] নিরপরাধ লোকের পিছনে লেগে তাদের জীবনকে বিষময় করে তোলে। [illegible] এই সব [illegible] ব্যক্তি বিশেষের নামে [illegible] মিথ্যা [illegible] করে তাকে জেলের পথে ঠেলে দেয় তাহা বাংলার অধিবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। [illegible] মিথ্যা চিঠি [illegible] লোকের বিরুদ্ধে [illegible] মোকদ্দমা খাড়া করে। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে ভারত [illegible] গভর্ণমেন্ট [illegible] ও [illegible] সেফটী বিল প্রণয়ন করবার সপক্ষে উঠে পড়ে লেগেছে। [illegible] মিথ্যা চিঠিকে সত্য প্রমাণ করবার জন্য নানারকম উপায় উদ্ভাবনও করছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ [illegible] আমাদের প্রশ্নের উত্তরে হোমমেম্বর ক্রেরার বলেন এম, এন রায়ের উক্ত চিঠি কলিকাতার মুজফ্ফর আহমদকে লিখিত হয়েছিল। গভর্ণমেন্টের এই উক্তি যে একেবারে মিথ্যা সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। আসল ব্যাপার হচ্ছে বাংলার ও বোম্বের 'কৃষক ও শ্রমিকদল' শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটা বিরাট গণমুক্তির আন্দোলন চালাবার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। শোষণবাদী গভর্ণমেন্ট ধনিক ও বণিকদের প্ররোচনায় এই দলের উদ্যমকে সমূলে বিনষ্ট করে দিবার মতলবে মিথ্যা অজুহাতে এই দু'টি বিলের উপর জোর দিয়েছে। কম্যুনিজম বা বলশেভিক ভীতি যতটুকু হোক না হোক শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে টুঁটি টিপে মারবার জন্যই তাদের এই দৃঢ় প্রচেষ্টা। আমরা কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি যে কতিপয় সি, আই, ডি স্পাই 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলে'র আফিসের কাছে ভিড় লাগিয়েছে। প্রত্যহ ৫।৬ জন লোককে এক সঙ্গে জটলা পাকিয়ে রকের উপর বসে নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গী করতে দেখা যায়। এই সব জীবগুলো প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি [illegible] পর্যন্ত আফিসের চারিদিকে ঘোরা ফেরা করে। কখনো পার্টির মেম্বরদের পিছনে পিছনে রওনা হয়। গভর্ণমেন্টের আইনে আছে ৪।৫ জন লোক একসঙ্গে জটলা পাকাইলে অবৈধজনতার অপরাধে দণ্ডনীয় হতে পারে। কিন্তু এদের বেলায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। তাহা ছাড়া প্রত্যহ এতগুলি লোক পরের বাড়ী চড়াও করে বসে থাকে কিন্তু কিছু বলবার নেই। একেই তো বলে আইনও শৃঙ্খলা। আমরা গভর্ণমেন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি এই লোক গুলোর কাজ কি? কোন্ গুপ্ত উদ্দেশ্য নিয়ে এরা এখানে বসে থাকে?

শ্রমিক নেতাদের দৌড়

কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সম্মিলিত হয়ে ট্রেডস্ ডিসপুট বিল ও বলশেভিক বিতাড়ণ বিল সম্বন্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজনে খুব উৎসাহ দেখাচ্ছেন দেখে আমরা আনন্দিত হলাম। কিন্তু এঁদের দৌড় কতদূর সেটা এখন বুঝা যাচ্ছে না। [illegible] প্রতিবাদ সভায় গণবাণী [illegible] খুব অগ্রসর হবেন না [illegible] বোধ হয় না। [illegible] গণবাণীর [illegible] সরকারকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবেন এটুকু [illegible] কংগ্রেস ফেডারেশন মনে করে থাকেন [illegible] তাঁদের [illegible] অবশ্যই আমরা বাহাদুরী দিতে বাধ্য। কিন্তু এই দুইটি [illegible] কেবল প্রতিবাদের দ্বারা রোধ করা যাবে না [illegible] ঘটে কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে তিনিই বুঝতে পারবেন। [illegible] আইন পাশ হবার পূর্বে গণবাণী কি কিছু কম করা হয়েছিল? এই বিল দুইটির একমাত্র [illegible] হচ্ছে [illegible] শ্রমিক দলগুলির সংগঠন এবং [illegible] শ্রমিক নেতার কর্তব্য এই বিষয়ে দেশের সকল শ্রমিককে সচেতন ও সংগঠিত করা। সে বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না, কারণ সে পথে পরিশ্রম, কষ্ট এবং হয়ত আইনের কবলে পড়া [illegible] সহজ নাম কেন নিবে [illegible]?

সর্বদল সম্মিলনে
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের প্রতিবেদন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(গ) নেহেরু কমিটির রিপোর্টের আর দুইটি গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা করিবার আছে: প্রথম কথা—সৈন্য বিভাগের; গোড়ায় গলদ হওয়াতে এই বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত অগভীর ভাবে করা হইয়াছে। ব্যাপারটি বড় কঠিন এবং ভবিষ্যতে ভারতের নেতাগণের এ বিষয় বিশেষ করিয়া চিন্তা করা প্রয়োজন হইবে। ১৩ পৃষ্ঠায় স্যর শিবস্বামী আয়ারের বক্তৃতা হইতে যাহা বলা হইয়াছে, রিপোর্টের সেই মত গ্রাহ্য না করিয়া ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন নিজের অধীনে সৈন্যদল রাখা। ভারত যদি প্রকৃত স্বাধীনতা চায় তাহা হইলে দেশ রক্ষার ভার ব্রিটিশ সৈন্যের উপর দিলে চলিবে না—কেন না ব্রিটিশই ভারতের সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু হইবে। সাম্রাজ্যবাদের খাতিরে ব্রিটেন ভারতের আর্থিক শাসন অপেক্ষা সৈন্যদল হাতে রাখাকে কম প্রয়োজনীয় মনে করে না। ইহা পরস্পর নির্ভর সাপেক্ষ। সে জন্য আস্তে আস্তেই হউক বা হঠাৎ সৈন্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেন কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। কনষ্টিটিউশনের বাগাড়ম্বরে রাজনৈতিক সত্যসমূহের প্রতি রিপোর্ট অন্ধের মত দৃষ্টি দেয় নাই।

ভারতের অস্ত্রহীন অবস্থা হইলে সে সমস্যার সমাধান অতি কঠিন ব্যাপার—ইহা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু বস্তুতঃ তাহা অসাধ্যও নয়। এই প্রশ্নের আলোচনা এখানে নানা কারণে করা যায় না—কিন্তু দু'একটা কথা বলা যাইতে পারে। রিপোর্টে সৈন্য সংগ্রহের অভাব সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে উহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই—আশার কথা ঐখানেই রহিয়াছে।

কোনও বুদ্ধিমান জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসী এমন এক বিদেশীয় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবেন না যাহা যে কোনও মুহূর্ত্তে দেশের সেবকগণকে গুলি করিতে নিযুক্ত হইতে পারে। ভারত স্বাধীন

হইলে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় সৈন্যদল গঠন করার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে—যেমন চীনদেশে হইয়াছে। এই সৈন্যদলের শিক্ষা ও সাজসরঞ্জাম ভাল না হইলেও উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বলে ইহা অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়া উঠে।

(ঘ) দ্বিতীয় কথা—দেশীয় রাজ্য সমূহের ; এই বিষয়ের আলোচনাও রাজনৈতিক দৃষ্টির অভাবে অপ্রাকৃত ভাবে হইয়াছে। এমন কি কনষ্টিটিউশনের দিক হইতেও অত্যন্ত আপত্তিজনক হইয়াছে। দেশীয় রাজ্য সমূহের প্রজাগণের অধিকার সম্বন্ধে যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়া থাক না কেন এ কথা সত্য যে বর্ত্তমান শাসকগণের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখা হইয়াছে। কোনও গণতান্ত্রিক ব্যক্তি এইরূপ ধারণা রাখিতেই পারে না। ব্রিটিশ ভারতের প্রজাগণকে যেমন ভাষা ও শাসন সুবিধা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাগণকেও ঠিক ঐরূপ সুবিধা দিতে হইবে। এ বিষয়ে কোনও মধ্যপথ নাই এবং দেশীয় রাজ্য-সমূহের অত্যাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণকে একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে।

ব্যবহারিক রাজনীতির দিক হইতেও এইরূপ ব্যবস্থাই ভাল। রিপোর্টের ৭২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে দেশীয় রাজ্যসমূহকে ভারতের আল্‌ষ্টার (Ulster)এ পরিণত করার চেষ্টা হইতেছে—এ বিষয়ে কমিটির সন্দেহ নাই। আলষ্টারের সহিত তুলনায় কনষ্টিটিউশনের বাহিরেও আর কিছু হইতে পারে। সকলেই জানে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কমিটির চেয়ে বাস্তব বোধ অধিক আছে এবং সেজন্য দেশীয় রাজ্যসমূহের ভিতরে সৈন্যদল সংগ্রহে ও তাহাদের উন্নতি সাধনে ভারত-গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিতেছে। জাতীয় আন্দোলন দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না—কারণ ইহাদের অধিকাংশই সাকামারা রাজভক্ত। সেজন্য দেশীয় রাজ্য সমূহের বিদ্রোহী কৃষক ও অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীকে লইয়া জাতীয় আন্দোলনকে চলিতে হইবে।

এই সমস্ত প্রধান প্রধান কারণে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সর্ব্বদল সম্মিলনের নেহেরুকমিটির রিপোর্টের প্রস্তাবিত শাসন-তন্ত্রের ধারা সমূহের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন।

বিলাতে রিপোর্টের বিরুদ্ধ সমালোচনায় প্রস্তাবিত শাসন-তন্ত্রের সমর্থকগণের কেহ কেহ গণ-আন্দোলনের ভয় দেখাইয়া-ছেন! জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোনও গণ-আন্দোলনে যোগ দিতে "কৃষক ও শ্রমিক দল" সব সময়েই প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মতালিকার জন্য "কৃষক ও শ্রমিক দল" সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইতে পারেন না। "কৃষক ও শ্রমিক দল" স্পষ্টই ঘোষণা করিতেছেন যে এই শাসনতন্ত্রের খসড়া যাহারা প্রস্তুত করিয়াছে তাহারা ভারতীয় সমাজের ধনী উচ্চশ্রেণী সমূহের স্বার্থ রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া যাহা দেয়, তাহাদের অতিরিক্ত ইহারা চায় না এবং বৃটেনের ব্যবসা ও শিল্প বিষয়ক স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিবার বাসনা ইহাদের নাই। এই শ্রেণীর লোকের মুখে গণ-আন্দোলনের ভয় দেখানো কেবল ফাঁকা কথা মাত্র।

নূতন কর্ম্ম সংকল্পের পিছনে জাতির সমস্ত শক্তি একত্রিত হবার আবেদন সত্ত্বেও "কৃষক ও শ্রমিকদল" নেহেরু কমিটির রিপোর্ট ও প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা করার জন্য কোনও প্রকার ইতস্ততঃ বোধ করেন না। জাতির শতকরা ২ জনের, যাহারা উচ্চস্তরে থাকিয়া জনসাধারণকে শোষণ করে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জাতির শক্তি একত্রিত করা হইবে। এই শতকরা দুইজনের দাবী পূরণ করাইবার ক্ষমতাও নাই, যদি ব্রিটিশ শোষকগণ তাহাতে ভীষণভাবে আপত্তি করে।

অপর পক্ষে "কৃষক ও শ্রমিকদল" জাতির প্রকৃত ঐক্য সাধন করিতে চায়—যে ঐক্য অধিকাংশের দাবীর পিছনে থাকিতে পারে। প্রকৃত ঐক্য কোথায় হইতে পারে? দেশের শোষিত, লাঞ্ছিত, বেকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহিত ততোধিক হতভাগা কৃষক ও শ্রমিক ভ্রাতৃগণের এই ঐক্য সম্ভবপর হইতে পারে। ইহারা কি দাবী করিবে? পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রকৃত গণতন্ত্র, দেশীয় রাজ্য সমূহের বিলোপ সাধন, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং স্বাধীন ভারতের গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই গ্যারাণ্টি যে জনগণের আর্থিক ও সামাজিক হিতের জন্য মনোযোগ এবং সকল শ্রমিকের প্রাপ্য মূল আর্থিক অধিকার সমূহ—ইহাই তাহাদের দাবী।

এইরূপ কর্ম্ম সংকল্পে ভারতের রাজনৈতিক দল সমূহের চাকচিক্য একতা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু কোন্ কোন্ শ্রেণীর হইয়া এই সকল দল কথা কহিতেছে তাহা বিবেচনা করিলে "কৃষক ও শ্রমিক দলের" কর্ম্ম সংকল্পের ভিতর ন্যায়পরতা ও বুদ্ধিমত্তা দৃষ্ট হইবে।

এই সকল মান্য গণ্য দলের সব গুলিই ঐ "শতকরা দুইজনের" এক কিম্বা অপর শ্রেণীর স্বার্থ বহন করে। তাহাদের ঐক্য বা অনৈক্য, সাহচর্য্য বা অসাহচর্য্য, সহযোগিতা বা বয়কট, মূলতঃ কিছুই নয়। "শতকরা ৯৮ জনের" একতা ও চৈতন্য সাধনেরই প্রয়োজন! সর্ব্বদল সম্মিলন এইটুকুই করিবে না, বা করিতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-উত্থানের পরিচালনা সর্ব্বদল সম্মি-লনের দ্বারা সম্ভবপর না হওয়ায় বুঝা যায় যে এই বুর্জোয়া দল জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে একেবারে সরিয়া পড়িবে এবং সাম্রাজ্যবাদীগণের হাতে আত্মসমর্পণ করিবে।

এই খেয়ালের বশে নির্ব্বাচিত এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধিত্বের অযোগ্য সম্মিলন "কৃষক ও শ্রমিক দল" চায় না—সমস্ত ভারতের জন্য একটি প্রতিনিধি সভা (Constituent Assembly) অবিলম্বে গঠিত করিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নরনারীর ভোটাধিকার থাকিবে, কিম্বা এমন কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে সভা সকলের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে। এই সভা শুধু স্বাধীন ভারতের সাধারণতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিবে না, উপরন্তু ঐ খসড়া গৃহীত হওয়ার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে দাবী উপস্থিত করিয়া গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি করিবে। উচ্চ শ্রেণী সমূহের নিয়মতান্ত্রিকতা ও সভয়দাবী ভারতের কোনও উপকার করিতে পারিবে না—এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই দাবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাও যেন স্বীকার না করে। জনগণের দাবী ও গণ-আন্দোলনের দ্বারা তাহার পূরণই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়।

২৪ পরগণা কৃষক সংঘ

—•—

গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ের বাগুইহাটি ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গুণিগ্রামে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মিঃ মুজফ্‌ফর আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার, ধরণীকান্ত গোস্বামী, কালীকুমার সেন ও ইয়ং কমরেড লীগের কয়েকজন সভ্য সভার কার্য্যে যোগদান করেন। সভায় আলিপুর ও বারাসত মহকুমার প্রায় শতাধিক গ্রামের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। বেলা তিনটার সময় সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় ও সন্ধ্যার পর সভা ভঙ্গ করা হয়। জল নিকাশের পথ বন্ধ হওয়ায় চাষের মাঠগুলি সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। আজ ১২ বৎসর ধরিয়া জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া কোনও ফল হয় নাই। জলের জন্য ধান ডুবিয়া নষ্ট হয় কিন্তু প্রজাকে সমানে খাজনা বহন করিতে হয়। গরুর খাবার জলে ডুবিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রামবাসীরা সহরে কলকারখানায় গিয়া মজুরি করিতে বাধ্য হয় এবং এইভাবে উপায়ের টাকা হইতে জমিদারের খাজনা প্রভৃতি দেয়। বছরে ৬ মাস নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের পথ থাকে না। ইহার উপর কয়েকখানি গ্রামের উপরে ইউনিয়ন বোর্ড বসাইয়া অযথা টেক্স বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রকাশ যে গ্রামের চৌকিদারেরা কলিকাতা সহরে বাসকরে ও কেবল মাত্র ট্যাক্স আদায়ের কালে গ্রামে গিয়া ট্যাক্স উশুল করে। কোন আপদ বিপদে চৌকিদারের সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নাই। এই সকল অত্যাচারের ও অন্যান্য নানাবিধ অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবার জন্য উক্ত সভায় "২৪ পরগনা কৃষক সংঘ" গঠিত হয়। সংঘের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মিঃ মুজফ্‌ফর আহমদ ও হেমন্ত কুমার সরকার প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মহাশয় কৃষক সংঘ গঠনে প্রথমে আপত্তি করেন। কিন্তু পরে সংঘের সভাপতিপদ গ্রহণে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে অনুরুদ্ধ হইয়া স্বীকৃত হন। কাউন্সিলে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন উপলক্ষে স্বরাজ্য দল কি ভাবে প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; সে সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হয় ও স্বরাজ্য দলের কার্য্যে সকলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

অতঃপর "২৪ পরগণা কৃষক সংঘের" কার্য্যকরী সমিতি ও কর্ম্মকর্ত্তাগণের অস্থায়ীভাবে নির্ব্বাচন হয় এবং স্থির হয় যে ভবিষ্যতে বারাকপুর, বসিরহাট ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার প্রতিনিধিগণকে লইয়া স্থায়ী কমিটি গঠিত হইবে।

—০—

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল

ঢাকার নরসিংহদি শাখা

—:*:—

গত ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের মোহম্মদ নুরুল ইসলাম ও ঢাকা শাখার সভাপতি মিঃ আবদুল কাদের নরসিংহদি গিয়েছিলেন। সেখানে দলের একটী নূতন শাখা স্থাপিত হ'য়েছে। এটীকে দলের ঢাকা শাখার অধীন ব'লে গণ্য করা হ'বে। এর বর্ত্তমান কার্য্যালয়—পোঃ নরসিংদি, মিঃ সুন্দর আলীর বাড়ী—স্থির করা হ'য়েছে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে তার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হ'য়েছে:

সভাপতি :—

১। মিঃ সুন্দর আলী

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ :—

২। মিঃ বিলায়েৎ হসেন বি-এ

সদস্যগণ :—

৩। শাহাবুদ্দিন মাষ্টার

৪। শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার

৫। আবুল ফজল

৬। মিরত আলী সরকার

৭। ইমাম উদ্দীন।

নরসিংহদি পাটের আফিসে ও আড়তে প্রায় ১১০০।১২০০ শ্রমিক নিয়মিত খেটে থাকে, তা ছাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, ষ্টীমার, বাজারের মুটে মজুর এরাও যথেষ্ট সংখ্যক রয়েছে। মিঃ সুন্দর আলীর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ঐ শ্রমিকরা সংঘবদ্ধতার দিকে অনেকখানি অগ্রসর হচ্ছে। আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা'র সময় দলের শাখার অধিনায়কত্বে নরসিংহদি বাজারে ঐ সমস্ত শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের এক বিরাট সভা হবে, তাতে ট্রেড ডিস্‌পিউট বিল, তথাকার শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ, গণশক্তির প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা হ'বে।

—

ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ধর্ম্মঘট

—:•:—

কিছু দিন পূর্ব্বে ঢাকেশ্বরী কটন-মিলের শ্রমিকরা তাদের অভাব অভিযোগ পূরণের ও মাইনে বাড়ানোর দাবী মিল্ কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে ছিলেন। গত ৬ই সেপ্টেম্বর জনৈক মিল কর্ত্তৃপক্ষ মিলের শ্রমিকদের সম্বোধন ক'রে উচ্চৈঃস্বরে বল্‌তে থাকেন যে—"বাপের ব্যাটা যারা, তারা এক্ষণ আমার সামনে এসে বেতন বৃদ্ধি চাইবে; আর বাঁদীর ব্যাটা যারা, তারা সামনে বেতন চাইতে পারবে না! শূয়রের বাচ্ছারা কা'রা বেতন বাড়াতে চাস্, সামনে আয় যদি বাপের ব্যাটা হোস্।" ইত্যাদি ব'লে তিনি চীৎকার ক'রে যখন মিল্ কাঁপাচ্ছিলেন, তখন তাঁতীদের কয়েকজন তাঁর সামনে এসে জানায় যে—"তারা বেতন বৃদ্ধি প্রার্থনা করে।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের মিল্ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেন, ও দারওয়ান দিয়ে মিল ছাড়তে বাধ্য করেন। তিনি বলেন, কাউকেই তিনি বেতন বাড়িয়ে দেবেন না, আর যারাই বেতন বৃদ্ধি চাইবে, তাদেরই মিলে কাজ করতে দেবেন না। তাতে weavergণ সকলেই তৎক্ষণাৎ মিল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মিলের বাকী সমস্ত শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে বেরিয়ে পড়ে।

বেতন বৃদ্ধি প্রার্থনা করে বলে যাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে তারা কর্ত্তৃপক্ষকে বাকী মাইনে চুকিয়ে দিতে তাঁদের অনুরোধ জানায়। মিল কর্ত্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করেছেন। তাই তারা এক্ষণে আদালতের আশ্রয় নিতে মনস্থ ক'রে দল বেঁধে নারায়ণগঞ্জে এসে আছে। ধর্ম্মঘটীদের অনেকেই তাদের মিল-সংলগ্ন গ্রামের বাটীতে চলে গেছে, কেউ কেউ তাদের ইউনিয়নের অফিস বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। ৬ই

সেপ্টেম্বর থেকে মিলের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। ব্যারাক তালাবন্ধ আছে। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের—ঢাকা শাখার" কয়েকজন সভ্য ধর্ম্মঘট ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণের জন্যে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।

"মিউচুয়াল এড্‌মিরেশন সোসাইটি"

—:*:—

(শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।)

—:*:—

লক্ষ্ণৌ সহরে যে সর্ব্বদল সম্মিলন হ'য়ে গেল তার সভ্যগণের পরস্পরের প্রশংসা শুনে মনে হয় যেন "মিউচুয়াল এড্‌মিরেশন সোসাইটি"র একটি অধিবেশন হ'য়ে গেল। এই সম্মিলনে আগত প্রতিনিধিদের কে নির্ব্বাচিত করেছে জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া মুস্কিল। অথচ "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" সেজে এঁরা ভারতের জনসাধারণের নামে কথা কয়েছেন। স্বরাজের যে খসড়া তৈরী করেছেন তাতে জনগণের লাভ বিশেষ কিছু হবে না—কেবল মাত্র শ্রেণী-সংগ্রাম আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠবে। এখন ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্ বা শোষণ-বাদের সঙ্গে যে সংগ্রাম চলছিল, ভারতের উচ্চতর ধনিক শ্রেণীরা সেই শোষণ-বাদের সহায়ক হওয়ায়, গণশক্তি তাদের বিরুদ্ধে ও লড়তে বাধ্য হবে। অবশ্য ভারতের বর্ত্তমান তথাকথিত জাতীয় আন্দোলনের নেতারা এ কথাটা বোঝেন নি—এটা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বুঝেও তাঁরা নিজের শ্রেণী-স্বার্থের জন্য এত বড় একটা রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী করছেন এবং শ্রেণী-সংগ্রামের পূর্ণ আয়োজনের পৌরহিত্য ক'রেও শ্রেণী-সংগ্রাম নেই ব'লে জোর গলায় চীৎকার করছেন। নিজেদের স্থবিধে মত স্বরাজের একটা খসড়া ক'রে পরস্পরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এই প্রশংসার স্রোত বহার সময় পাইওনিয়রের বেরসিক সম্পাদক এক থাবা তার ক'রে সব রস ভঙ্গ করেছেন। তিনি বলেছেন যখন সর্ব্বদল সম্মিলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন-তন্ত্র গ্রহণে রাজি হ'লেন—তখন "God Save the King" "ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন" ইংরেজের এই জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সম্মিলনের অধিবেশন শেষ করা হোক। সম্মিলনের সভাপতি আনসারি সাহেব কথাটার খোলসা জবাব না দিয়ে কোনও রকমে আত্ম-সম্মান বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐ গানটা গাইলেই ভাল হ'ত—"বন্দে মাতরম্" এর পর গাওয়া আর মানায় না।

সম্মিলনের প্রস্তাবিত স্বরাজ হ'লে কি হবে তার নমুনা লক্ষ্ণৌ যাওয়ার আগেই বাংলার নেতা স্থভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি দেখিয়ে গিয়েছেন। প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন উপলক্ষে ব্রাহ্মস্পর্শ ঘটেছিল—ইংরেজ, জমিদার ও স্বরাজী মিলে মধ্যবিত্ত ও কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধনে একটুও ইতস্তত করে নি। এইখানেও ছোট-খাটো সর্ব্বদল সম্মিলন হয়। প্রেন্টিক সাহেব, "রাওলাট" মিত্র, নবাবালি চৌধুরী, স্থভাষ বোস ও যতীন্দ্র সেনগুপ্ত মিলে একযোগে ভোট দিয়ে তাঁদের প্রস্তাবিত স্বরাজের পূর্ব্বাভাস দিয়েছেন। শুধু তাই নয় কাউন্সিলে প্রজার সর্ব্বনাশ ক'রেই স্থভাষচন্দ্র জমশেদপুরে শ্রমিক সভার সভাপতি হয়েছেন এবং লক্ষ্ণৌ গিয়ে বাংলার কৃষকের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়েছেন! স্বরাজের খসড়া খানি হাতে ধ'রে কেউ বলেছেন—last milestone on the way to Swaraj—bye-lane to the high road of freedom এবং আরও কত কি? অর্থাৎ স্বরাজের পথে এই খসড়া খানি শেষ মাইল চিহ্ন এবং স্বরাজের বড় রাস্তায় পৌছুবার এই খানি ছোট গলি; আমরা বলি mile stone না mill stone বললেই ঠিক হ'ত, আর bye lane না বলে blind lane অর্থাৎ কানা-গলি বল্‌লেই ভাবটা প্রকাশ পেত ভাল।

এই সকল লম্বা কথা বলেও কিন্তু দু'একজন নেতা মনে মনে অ-সোয়াস্তি অনুভব করেছেন। স্থভাষচন্দ্র বলেছেন—"আমি ভিতরে ভিতরে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তবে কিনা দলে প'ড়ে একতার খাতিরে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের পক্ষে সই করেছি।" এঁরা দেশের লোকের চক্ষে ধূলি দিতে চান এবং দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটোতে চান। কিন্তু কাঁঠালের রস দিয়ে যেটা তৈরি তাকে আমস্বত্ব নাম দিয়ে লাভ কি? আজ ছিট্‌কে গিয়ে স্বাধীনতা লীগে যোগ দিলেও, কাল আবার নিজের চেহারা বেরিয়ে যাবে। টিয়া পাখীকে বিড়ালে ধরলেই রাম নাম ভুলে গিয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ ক'রে উঠিবেই। লোকের হাততালির ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে চলার কি কোনও লক্ষ্য আছে? তাতে ভেসে যাওয়া চলে, কিন্তু লক্ষ্য কি তা স্থির ক'রে বলা যায় না। বা লক্ষ্যে পৌছোনোও যায় না। সেইজন্য নিজের হাবভাবে এত বিরোধের সৃষ্টি হয়, কখনও উজোন কখনও ভেটেল এই ভাবে চলতে হয়। শিব গড়তে গিয়ে যাঁরা বানর গড়েছেন, তাঁদের কারিগরির প্রশংসা আমরা করতে পারিনে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগে পড়েছিলাম—"ঐক্য, বাক্য, অনৈক্য"। তিনি কি মনে ক'রে কথা কয়টি ঐভাবে সাজিয়েছিলেন জানি নে, কিন্তু আমরা ওর ভেতর একটা মানে পাচ্ছি। আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ যে ঐক্যের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল ঐ ঐক্য কেবল বাক্য মাত্র এবং উহার পর অনৈক্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঐক্যের খাতিরে যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র গ্রহণে সম্মত হ'তে পারেন, তাঁরা ঐক্যের খাতিরে মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজি ন'ন কেন? তা হ'লেই তো সব একাকার হ'য়ে যায়—স্যর প্রভাস মিত্র, নবাবালি চৌধুরী প্রভৃতিও দলে আসেন এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের জনকতক সাহেবকে দলে টেনে নিলেই তো সব গোলমাল চুকে যায়—সর্ব্বদল সম্মিলন একেবারে চূড়োন্ত হ'য়ে যায়! ইংরেজের "ন্যাশনাল এনথেম্" গাইতেও আর আপত্তি হয় না।

ঘোরতর অসহযোগের যুগেই মহাত্মা গান্ধী যখন বলেছিলেন যে স্বরাজ মঞ্জুর হ'লে তিনি সবরমতী আশ্রমের মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে দেবেন, তখন বর্ত্তমান অবস্থায় আর লজ্জার কারণ কি? কলকাতায় অল পার্টি কনভেন্সনে দুটো প্রস্তাব পাশ হ'লেই স্বরাজের "ফিনিসিং টচ্" দেওয়া হবে!

(১) খদ্দরের নামাবলী গায়ে দিয়ে ইংরেজের "ন্যাশন্যাল এনথেম্" গাওয়া।

(২) কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকার বদলে "ইউনিয়ন জ্যাক" প্রবর্ত্তন করা।

তা হ'লেই কবির স্বপন সফল হবে—

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।"

"কিনিনিষ উচ্" দেওয়ার পর নিজেদের খবরের কাগজে নিজে প্রচার করতে হবে প্রস্তাব দুইটি পাশ হওয়ার পর ১৭।০ মিনিট ধরে মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উঠে সভাস্থল কম্পিত হয়েছিল, পঞ্জাব কেশরী একপর সিংহনাদ ছেড়েছিলেন, মৌলানা আলি হস্তীর মত গর্জ্জন করেছিলেন, মিসেস নাইডু কবিতা আওড়ে ছিলেন, ও চাবচন্দ্রের স্বেদ পুলক কম্প প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতে নবযুগের অরুণোদয় হয়েছে, ভারতবাসী একতার বন্ধনে আজ ইংরেজের হাতে রাখী বেঁধেছে।

আমরা বুর্জ্জোয়া ও ক্যাপিটালিজমের রাজনীতির এই পরিণাম দেখলেই আর সমালোচনা করব না। তখন তাদের প্রশংসায় আমরাও পঞ্চমুখ হয়ে উঠবো।

—o—

মালদহ সংবাদ

—:•:—

সরস্বতী লাইব্রেরীর কথা

মালদহ সরস্বতী লাইব্রেরীর পিছনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিরূপ উঠে পড়ে লেগেছেন সে খবর গণবাণীর পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

সরস্বতী লাইব্রেরীর পিছনে লাগার মস্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এখানে Young Men দের activity আস্তে আস্তে যাতে নষ্ট হয়, তারই প্রথম চেষ্টা। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্রনাথ মিত্র এখানকার স্কাউটদের প্রেসিডেন্ট, ওঁর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এখানে নানাভাবে নানা সন্দেহ লোকে করে, এবং প্রকাশ্যেই বলে যে, ইনি গভর্ণমেন্টের নিয়োজিত বেতন-ভোগী আই, বি, অফিসার। এতে যতীন্দ্রনাথ মিত্র আবিষ্কার করলেন যে—সরস্বতী লাইব্রেরীতে Proscribed এবং সাংঘাতিক সাংঘাতিক বই আছে,—ওখানে সাংঘাতিক ছেলে সব আছে—যারা এখানকার ছেলেদের নষ্ট করছে। একমাত্র যতীন্দ্র মিত্রের প্ররোচনায় ম্যাজিষ্ট্রেট বিরূপ হয়েছেন। 4th August এর মিটিংএ ঠিক হয় যে, কোন ছেলে সরস্বতী লাইব্রেরীতে যাইতে পারবে না, গেলে ভীষণ শাস্তি হবে, এবং এই নোটীশ স্কুলে জারী করা হয়েছে—এ স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে! যে মিটিংটী হয়েছিল, তাহা মাত্র জন ১০।১২ গার্জ্জেন নিয়ে। এই ১০।১২ গার্জ্জেন ২৫০ গার্জ্জেনের মতামত ঠিক করে দিলেন।

পূর্ব্বের একটি মিটিং এ যতীন মিত্র বলেন, যে, বাৎসরিক অধিবেশনে, সরস্বতী লাইব্রেরীর সভ্যরা (১) National Flag উড়াইয়াছিল—ইহা খুবই খারাপ, তিনি আরও বলেন, এখানে যে কতকগুলি ছেলে ক্লাস করে ছেলেদের Politics শিক্ষা দিচ্ছে তাহা আপত্তিকর। তিনি আরও বলেন এখানে যে Young Men's Association হইয়াছে, উহা ভাল নহে, উহাতে ছেলেরা নষ্ট হচ্ছে। এমন কি, যতীন্দ্র মিত্র, হেড মাষ্টার মহোদয় ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সব সময় খোঁজ নিচ্ছেন যে, কোন ছেলে লাইব্রেরীতে যাচ্ছে কি না, বা কি কি করছে। তাঁরা দৃঢ় পণ করেছেন যে, যেমন করে হোক্ মালদহ হইতে সরস্বতী লাইব্রেরী, ও ঐ রকমের Institution গুলি একেবারে লোপ করিয়া দিবেন। এবং সেজন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

—•—

মেথরদের কথা

:•:—

ইংরেজ বাজার মিউনিসিপ্যালিটীর মেথররা যে যৎসামান্য বেতন পায়, তা দিয়ে, অতি সংক্ষেপেও তাদের ভরণ-পোষণ চলেনা। বেতন যথাসময় না পাওয়ার দরুন তাদিগকে অতি চড়া সুদে টাকা কর্জ্জ করতে হয়। এর উপর কাবুলি ওয়ালা, মহাজনরা সুদ পরিশোধের গোলমাল করে, সুদ পরিশোধের কোন নিদর্শন দেয় না। মেথররা বেতন বৃদ্ধির দাবী করলেই কর্ত্তৃপক্ষ বলে থাকেন "তোমরা কিছুৎ সে বেশী তলব মিলতা হায়"। কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিম মুলুক হ'তে মেথর আমদানী করবার চেষ্টা বহুবার করে ব্যর্থ হয়েছেন, এ কথা মেথররা ভালই জানে। তবুও তারা বেতন বৃদ্ধি করবার জন্য উঠে পড়ে লাগতে পারে না। ধর্ম্মঘট করলেই মহাজনদের রক্তচক্ষু আরও ভীষণ লাল হয়ে উঠবে। মিউনিসিপ্যালিটীর আইনানুসারে চাকুরী ছাড়তে হ'লে এক মাসের আগে নোটীশ দিতে হয়, নতুবা এক মাসের বেতন বাজেয়াপ্ত হয়। চাকুরী ছাড়া কিংবা বিনা বেতনে ছুটী নেবার অভিপ্রায় জানালে উত্তমর্ণদিগের জন্য তাহা হয়ে উঠে না। পীড়িত হ'লে বিনা বেতনে ছুটী নিতে হয়, এ জন্য তারা পীড়িত অবস্থায় চাকুরী করে দিনের খোরাক রোজগার করে।

মিউনিসিপ্যালিটীর হাসপাতালের ডাক্তার, সরকারী ডাক্তার। তিনি মেথর পল্লীতে গিয়ে বিনা ভিজিটে রোগী দেখতে বাধ্য নহেন। তাদের প্রচলিত ডাক্তারখানায় এসে চিকিৎসিত হ'তে হয়—কিন্তু ওষুধ ভাল পাওয়া যায় না। মেথরদের অবস্থা কি ভীষণ দাঁড়িয়েছে, তা নিম্নের ঘটনায় বুঝা যেতে পারে।

সিলচুরীয়া মিউনিসিপ্যালিটীর মেথর। তার স্ত্রী ও নিজে কঠিন পরিশ্রম করে খোরাক রোজগার কর্ত্তে না পারার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়। তার স্ত্রী সুতিকাগারে মারা যায়। এরূপ প্রকাশ যে, অত্যধিক ঋণ কি উপায়ে শোধ করিবে, এই ভাবনায় সিলচুরীয়া আফিং খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয় নাই, এখনও তার মোকদ্দমা বিচারাধীন। কর্ত্তৃপক্ষ মেথরদের যে অবস্থায় ফেলেছেন, তাতে তারা কোন কিছু কর্ত্তে পারে না, অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। বেতন বাড়াইবার কথা ভয়ে বলতে পারে না,—কারণ তাদের ভয় হয় পাছে চাকুরী যায়। কিন্তু এমন একদিন আসতে পারে—সেদিন তারা মরিয়া হয়ে পেটের জ্বালায় ধর্ম্মঘট করে বসবে।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র



Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta.

২য় খণ্ড	কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, ১১ই আশ্বিন	১৫শ ও ১৬শ সংখ্যা

কৈফিয়ৎ

নানা অনিবার্য্য কারণে আমরা যথাসময়ে কাগজ বা'র করতে পারিনি। আশা করি আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন। ভবিষ্যতে আমরা নিয়মিত ভাবে কাগজ বা'র করার চেষ্টায় ত্রুটী করব না।

বিনীত
ম্যানেজার, "গণবাণী"

সম্পাদক মুজফ্ফর আহমদ কালীকুমার সেন	প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৷৷০ Foreign Subscription : Annual 6s.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং যাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেন্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেন্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেন্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেন্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম্‌ লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর
সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড { কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, ১১ই আশ্বিন, ১৩৩৫ } ১৫শ সংখ্যা

"আত্মশক্তি" ও আমরা

—:*:—

গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে "ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী"র দ্বারা পরিচালিত "আত্মশক্তি"তে "শ্রেণী-বিরোধ ও কংগ্রেস" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ৩০শে আগষ্ট তারিখের "গণবাণী"তে আমরা তারি উত্তরে ঐ শিরোনাম দিয়েই একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেম। এই প্রবন্ধ প'ড়ে "আত্মশক্তি"র পেছনে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা খুবই উত্তপ্ত হয়েছেন এবং তাঁদের এই উত্তাপের খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের "আত্মশক্তি"র "কংগ্রেস ও গণ-মঙ্গল" শীর্ষক প্রবন্ধে। কোনো পাঠক যদি আমাদের ও "আত্মশক্তি"র লেখা প'ড়ে নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করেন তা হ'লে তাঁকে বলতেই হবে যে শেষ প্রবন্ধে "আত্মশক্তি" আমাদের প্রদর্শিত যুক্তি সম্বন্ধে কিছুই না ব'লে বেশীর ভাগ জায়গাতেই নিতান্ত বাজে কথার অবতারণা করেছেন। আমরা বহুবার বলেছি এবং আজো বলছি যে কংগ্রেস ভারতের জনগণের প্রতিষ্ঠান নয়। সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের অর্থাৎ যাঁরা জনগণকে শোষণ ক'রে থাকেন কংগ্রেস তাঁদেরি প্রতিষ্ঠান মাত্র। আমরা যে মিথ্যাকথা বলেছি "আত্মশক্তি" কোথাও তা প্রমাণিত করতে পারেন নি। তাই, কোনো না কোনো প্রকারে আমাদের ওপরে কেবল ঝালই ঝাড়তে চেয়েছেন। গোড়াতেই "আত্মশক্তি" "গণবাণী"কে 'বাঙ্গলার নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিক দলের মুখপত্র' ব'লে উল্লেখ করেছেন। বাংলার অধিকাংশ কৃষক ও শ্রমিকই যে নিরক্ষর তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই এবং এই নিরক্ষরতার জন্যে বিদেশী শাসন-তন্ত্র যতটা দায়ী, যে শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা "আত্মশক্তি" পরিচালিত হয় সেই শ্রেণীও ঠিক ততটাই দায়ী। তবে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" কেবল মাত্র নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিকের দল নয়—সম্বলহীন অবস্থায় পেটের জ্বালায় বাধ্য হয়ে যে সকল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিক "ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী"র নিকটে আপনাদের পরিশ্রম বিক্রয় করেছেন এটা তাঁদের মত লোকেরও দল বটে। "আত্মশক্তি"র সম্পাদক যে এ কথা জানেন না তা নয়, তবে আমাদের কথার জওয়াব যখন তিনি দিতে পারছেন না তখন তাঁকে বাজে কথা বলতেই হবে।

"আত্মশক্তি" লিখেছেন—"গণবাণী" শুনাইবার ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা যেমন মনে করেন যে মুক্তি লাভ করিতে হইলে জাতিকে ভ্রাতৃরক্ত-পাত করিতেই হইবে—আমরাও তেমনি মনে করি যে কংগ্রেসের সাম্যের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া যদি এক শ্রেণী শক্রতায় মত্ত হয় অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে—তাহা হইলে তাহা সমগ্র জাতির পক্ষেই ক্ষতিজনক হইয়া উঠিবে। সেই জন্যই আমরা কংগ্রেসের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা সমর্থন করি।" শোষক আর শোষিতের মধ্যে সাম্য কখনো স্থাপিত হ'তে পারে না। জমীদার আর কৃষকের মধ্যে এবং ধনিক আর শ্রমিকের মধ্যে কি ভাবে সাম্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব তা' কি "আত্মশক্তি"র সম্পাদক আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন? সমাজের পরগাছা স্বরূপ অকর্ম্মণ্য জমীদার 'গুলো অকারণে অগণিত কৃষকের বুকের রক্ত শোষণ ক'রে খাচ্ছে। সুদখোর মহাজন রাত দিন কেবল কৃষকের সর্ব্বনাশই করছে। এ সব সত্বেও কৃষক, জমীদার আর মহাজনকে তার পরম সুহৃদ ব'লে মনে করবে—এরূপটা কি কখনো সম্ভবপর হ'তে পারে? শ্রমিক যখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যে তার নিঃসম্বল হওয়ার সুযোগ পেয়ে, পেটের জ্বালায় তাকে কাবু হ'তে দেখে—ধনিক তার পরিশ্রমের ধন লুটে খাচ্ছে তখনো কি তাকে মনে করতে হবে যে ধনিক তার অকপট বন্ধু? বৈষম্যের সব কিছু কারণ বাকী থাকবে, অথচ সাম্যও স্থাপিত হবে, এরূপ মত কেবল মাত্র বাতুল আর ধনিক শ্রেণীর লোকেরাই প্রচার ক'রে থাকে। বাতুল যে কেন এরূপ মত প্রকাশ করতে চায় তার কারণ অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। ধনিক এরূপ মত প্রচার ক'রে থাকে তার আত্মরক্ষার জন্যে। প্রচার কার্য্যের দ্বারা

শ্রমিকগণকে আত্মঘাতী এ সম্মোহিত ক'রে দিয়েই শ্রমিকদের তাদের পরিশ্রমের ধন থেকে ধনিকরা বঞ্চিত ক'রে থাকে। কংগ্রেসের সাম্য প্রচার এরূপই একটা ব্যাপার মাত্র। যতীন্দ্র প্রস্তাবিত আইন নিয়ে কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যগণ যে জঘন্য স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছেন তা-ও কি কংগ্রেসের সাম্য-প্রচারের মধ্যে পরিগণিত হবে? মুক্তি লাভের জন্যে রক্ত-রক্তপাত কখনো করতে হয় না,—তবে এক রক্তপাতের যে আবশ্যক হয় ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। দেশের জনগণের মধ্যে যদি কোনো দিন রক্ত পিপাসা জেগে ওঠে, তবে সে পিপাসার দমন হবে কেবল মাত্র শোষকের রক্তে ক'রে,—শোষিতের নয়। শোষক শোষিতের ভাই নয়,—যারা এ কথা যে না মানবে, মনে করতে হবে যে হয়তো সে মানার সব ক্ষমতা হারিয়েছে, নতুবা সে ভণ্ড।

আমরা বলেছি—অর্থনীতিক মুক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি কখনো লাভ হয় না। কেন না, অর্থনীতিক শক্তিই জগতের সব ভাঙা-গড়ার মূল কারণ। রাষ্ট্রের ক্ষমতা দেশের জনগণ কেবলমাত্র তখনি অর্জন করতে পারে যখন অর্থনীতিক শক্তি বহুল পরিমাণে তাদের করায়ত্ত হয়েছে। "আত্মশক্তি" এই ঐতিহাসিক সত্যকে ধামাচাপা দেবার জন্যে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন—"ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মানী প্রভৃতি কি রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিলাভ করে নাই? স্বাধীন রাষ্ট্র বলিতে লোকে ওইসব দেশকেই বোঝে, যদিও তারা জানে যে ওইসব দেশের সকল বা অধিকাংশ লোক অর্থনীতিক মুক্তিলাভ করে নাই—এমন কি "গণবাণী"র ভূ-স্বর্গ রাশিয়ার লোকেরাও নয়। আমাদের অর্থনীতিক অধীনতার প্রধান কারণ হইতেছে রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষ যতদিন অনধীন না হইবে, ততদিন এমন কোনো ব্যবস্থা করা যাইবে না যাহাতে অর্থনীতিক মুক্তিলাভ হইতে পারে।" "আত্মশক্তি"র আদর্শ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা জার্ম্মানী ও জাপান প্রভৃতি দেশ সত্যই কি স্বাধীন রাষ্ট্র? দেশ বল্‌তে দেশের ধনিকগণকে বোঝায় না—বোঝায় দেশের জনগণকে। কিন্তু এই ক'টা দেশের কোনো দেশই আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি লাভ করে নি এবং এই সব ক'টা দেশেই জনগণের সহিত, রাষ্ট্রের ক্ষমতা যারা অন্যায় ভাবে করায়ত্ত ক'রে রেখেছে, তাদের একটা তুমুল সংগ্রাম চলছে। "আত্মশক্তি" এ কথা অস্বীকার করতে পারেন কি? কেবলমাত্র ইংরেজ ধনিকগণের অধিকারচ্যুত হলেই ভারতবর্ষ কিছু স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে না। ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র নামে অভিহিত হওয়ার জন্যে ভারতের জনগণের কর্ত্তৃত্ব রাষ্ট্রের ওপরে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক হবে। অর্থনীতিক শক্তির ওপরে যথেষ্ট অধিকার যতক্ষণ না জন্মাবে ততক্ষণ কিন্তু রাষ্ট্রের ওপরে জন-গণের এই কর্ত্তৃত্ব কিছুতেই স্থাপিত হবে না। অর্থনীতিক শক্তিকে রাশিয়ার জনগণ অনেক পরিমাণে আয়ত্ত করতে পেরেছে বলেই আজ জগতে একমাত্র রাশিয়াতেই জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাঁ, "গণবাণী" কোনো দেশকেই স্বর্গ ব'লে মানে না। যাঁদের হয়ে "আত্মশক্তি" ওকালতি করছেন স্বর্গ আর নরক তাঁদেরি একচেটিয়া সম্পত্তি। এ দু'টো বস্তুর লোভ ও ভয় দেখিয়ে লুট করার যথেষ্ট সুযোগ ধনিকরা ক'রে নিয়ে থাকে।

"আত্মশক্তি"র মতে কংগ্রেস রাজনীতিক মুক্তির পরিকল্পনা ক'রে যে বিষয়ে ঘোষণা প্রকাশ করেছে এবং এই ঘোষণায় "কোথাও একথা নাই যে মুক্ত ভারতে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে অধিকার হ'তে কখনো [illegible] করাইয়া রাখিবে—পক্ষান্তরে এই দেশে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের সকলেরই যে সমান অধিকার রহিয়াছে তাহাই স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।" কংগ্রেস মুক্ত ভারতের পরিকল্পনা কখনো করে নাই। গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ হ'তে আরম্ভ ক'রে নেহেরু কমিটি পর্যন্ত সকলেই ভেতরে ভেতরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করা পর্যাপ্ত। অবশ্য মাদ্রাজ কংগ্রেসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটাও যে অসন্তুষ্ট লোকেদের চোখে ধুলো নিক্ষেপ করার জন্যে হয়েছিল তা পরবর্তী নেহেরু কমিটির রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে। অধিকার সম্বন্ধে যে ঘোষণা নেহেরু কমিটি করেছে সে ঘোষণা কি ইংরেজ করে নি? সার্ব্বজনীন ভোটের অধিকার পাওয়া খুবই বড় কথা বটে, কিন্তু, তা পেলেও দেশের জনসাধারণের হাতে যে ক্ষমতা আসবে এমন কথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রমাণ স্বরূপে আমরা ইংল্যাণ্ডের নামোল্লেখ করতে পারি। সার্বিক ভোটের অধিকার থাকা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে 'সংখ্যায় গরিষ্ঠ' সম্প্রদায় অর্থাৎ জনগণ আজো 'উপেক্ষিত' হয়েই আছে। উৎপাদনের উপায় গুলির ওপরে যারা কব্জা ক'রে রেখেছে, সকল অধিকার তাদের আয়ত্ত হয়ে আছে। জনগণকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার জন্যে ইংল্যাণ্ডের ধনিকগণের হাতে বিপুল শক্তিশালী প্রেস রয়েছে। এই প্রেসের দ্বারা অনবরত ধনিকদের স্বার্থের অনুকূল প্রচার কার্য্য চালানো হচ্ছে। মিথ্যা জাতীয়ত্ব ও দেশাত্মবোধের কথা প্রচার ক'রে ক'রে শ্রমিকদের ভাব প্রবণতার ওপরে ঘা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশেও যে এরূপ কাজের নমুনা নেই তা নয়। আমাদের শিক্ষিত সর্ব্বহারাগণই আমাদের দেশের ধনিক শ্রেণীর দ্বারা প্রচারিত সংবাদ পত্রের প্রচারের ফলে সব সময়েই বিপথে চালিত হয়ে থাকেন। ধনিকদের সংবাদ পত্রের মারফতে পাওয়া তথাকথিত জাতীয়ত্বের মাদকতায় তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে তাঁদের স্থান কোথায়। অন্যান্য দেশেও এরূপ ব্যাপারই ঘটছে। কাজেই, কেবলমাত্র সার্ব্বজনীন ভোটের অধিকারের নামে উৎফুল্ল হয়ে আমরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব কিছুতেই মেনে নিতে পারব না।

"আত্মশক্তি" যে বলেছেন—গণ-নেতৃগণ গণ-চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এটা একেবারেই মিথ্যা কথা। ধনিকগণ ও তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারকগণই গণ-চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার জন্যে চিরকাল চেষ্টা ক'রে আসছে। স্বয়ং "আত্মশক্তি"ও সেই চেষ্টাকারীদের একজন বটেন।

"আত্মশক্তি" লিখেছেন—"গণবাণী" আমাদের রাজনীতির এ, বি, সি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া নিজের না-বোঝা অনেক রাষ্ট্র তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন কিন্তু, কোথাও বুঝাইতে পারেন নাই যে শ্রেণী বিরোধের আগুন জ্বালাইয়া তুলিতে পারিলেই অধীনতার বন্ধন কেমন করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। আমরা "আত্মশক্তি"কে রাজনীতির এ, বি, সি শেখাবার ভার কখনো নিই নি। কেবল মাত্র বিশিষ্ট স্থানে রাজনীতির এ, বি, সি শেখাবার সময়ও আমাদের নেই। তবে তথাকথিত রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকেরই এই এ, বি, সি শেখার প্রয়োজন যে আছে সে কথা খুবই সত্য। শ্রেণী

সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে আর হবে না, জ্বলেই তা' উঠেছে এবং এই আগুনেই অধীনতার বন্ধন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। শ্রেণীর হাতে দমন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তখন এই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে জনগণকে একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামই চালাতে হবে। অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার মানে কি শ্রেণীর হাত থেকে জনগণের ক্ষমতা গ্রহণ নয়? এই গোড়ার কথাই যদি "আত্মশক্তি" না বোঝেন তবে কি "আত্ম-শক্তি"র এ, বি, সি, শেখার কোন আবশ্যকতা নেই? আমরা যদি আমাদের না বোঝা রাষ্ট্রতন্ত্রের অবতারণা ক'রে থাকি তা হলে সব-বোঝা "আত্মশক্তি" তা বুঝিয়ে দিলেন না কেন? আমরা যে সব যুক্তি দেখিয়েছিলেম "আত্মশক্তি"তে তার নিকটও মাড়ান নি। "আত্মশক্তি" যে সব বোঝেন তার একটা নমুনা আমরা নিম্নে দিচ্ছি। "আত্মশক্তি" লিখেছেন—"জমিদার নাই, ধনিক নাই—এমন দেশও দুনিয়ায় পরাধীন রহিয়াছে এবং সে সব দেশের লোকেরা ভারতের জনগণ যে জীবনযাপন করিতেছে তাহার চেয়েও হীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।" আমরা এতদিন জানতেম, বাগবাজারেই শুধু এমন এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা এমন সব অদ্ভুত কথা জাহির করতে পারে। কিন্তু, সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি রাণী মুদির গলিতেও তার আড্ডা বসে গেছে। জমীদার নেই, ধনিকও নেই, অথচ দেশটা পরাধীন—এমন অত্যাশ্চর্য্য দেশের নাম "আত্মশক্তি" দয়া করে আমাদের জানাবেন কি?

ধর্ম্মঘটের স্মৃতি

—০:*:০—

(কালী সেন)

—০—

কাগজে প্রথম যখন পড়লাম যে লিলুয়া কারখানার মজুররা সত্যাগ্রহ করেছে আর কারখানার কর্ত্তারা তাদের বার করে দিয়ে দরজায় তালাবন্ধ ক'রে দিয়েছে তখন এ বিষয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন না দেখে কাগজ বন্ধ করে-ছিলাম। তারপর প্রত্যহই খবরের কাগজে কিছু না কিছু লিলুয়ার খবর থাকত, কোনওদিন প'ড়তাম, কোনওদিন প'ড়তাম না।

হঠাৎ একদিন কলিকাতা যাবার সময় ট্রেণে খবরের কাগজ কিনে খুলেই নজরে পড়ল বড় বড় অক্ষরে লেখা—বামুনগাছির পুলের ওপর শ্রমিকদের ওপর গুলিবৃষ্টি হয়েছে এবং তা'র ফলে বহুলোক হতাহত। প্রাণের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল; চা খাচ্ছিলাম, চা'টা যেন হঠাৎ বিস্বাদ লাগল। সেই পুরাণ কথা? নিরস্ত্র জনতার ওপর অম্লানবদনে গুলী চালান? ইংরাজ-বীরত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!

তারপর আর একদিন কলিকাতায় যাচ্ছি। আমাদের ট্রেণ যখন শ্রীরামপুরে দাঁড়িয়েছে দেখলাম আপ্ লাইনে একখানি সশস্ত্র পুলিশসিপাহী বোঝাই স্পেশ্যাল ট্রেণ এসে দাঁড়াল। শ্রীরামপুরে ২।১ জন প্যাসেঞ্জার উঠেছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে লিলুয়া থেকে কয়েক সহস্র শ্রমিক দল বেঁধে হাঁটা-পথে বর্দ্ধমান অভিমুখে রওনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে প্রচুর পুলিশ প্রহরী আছে, তথাপি যদি তা'তে না কুলায় সেইজন্য এই স্পেশ্যাল ট্রেণের ব্যবস্থা। মনটা কেমন উৎসুক হ'য়ে উঠল এই শ্রমিকদলকে দেখবার জন্য। কা'রা এই বীর, যারা বামুনগাছির গুলিবৃষ্টি হজম ক'রে আবার এই বিরাট অভিযানে বাহির হয়েছে - জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব থেকে সিপাহী পর্য্যন্ত যাদের জন্য আজ সন্ত্রস্ত? ভাবলাম একবার নেমে দেখে আসি—কিন্তু এমন সময়ে আমার গাড়ী ছেড়ে দিল—দেখা আর হ'ল না। তখন ভাবিনি যে এই শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সঙ্গে আমি শেষ পর্য্যন্ত ওতপ্রোত ভাবে লিপ্ত থাক্‌ব।

ইহার কয়েকদিন পরে, "ফরওয়ার্ডে" বড় বড় অক্ষরে এক ইস্তাহার দেখলাম, হালিডে পার্কে লিলুয়া শ্রমিকদের এক বিরাট সভা। উদ্দেশ্য কলিকাতাবাসীদের নিকট সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা।

তখন বৈকাল ৫টা হবে। আমি হালিডে পার্কে উপস্থিত হয়ে দেখলাম মাত্র জন কয়েক ভদ্রলোক পার্কের এক কোণে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। গেটের কাছে কয়েকটি বড় বড় মাটির জালায় জল রয়েছে, শুনলাম সভায় সমবেত লোকদের পিপাসা নিবারণ করবার জন্য খিলাফত কমিটি এই উদ্যোগ করেছেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একটা সোরগোল শুনতে পেলাম। তখন পার্কের ও সামনের রাস্তায় লোকজন বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে দেখা গেল। বুঝতে পারলাম লিলুয়ার শ্রমিক-বাহিনী আসছে। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কাতারে কাতারে লোক সারি বেঁধে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। সম্মুখে বিশাল রক্তপতাকা। মুহুর্মুহু চীৎকার শুনা যাচ্ছে "মজদুর দল কি জয়!" বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। ধমনীতে দ্রুত রক্ত সঞ্চার স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। চারি সহস্র শ্রমিকের কি বীরত্ব ব্যঞ্জক মুখজ্যোতিঃ, কি সেই নির্ভীক পদক্ষেপ। সামনে, পাশে, পেছনে অসংখ্য পুলিস সিপাহী—সন্ত্রস্ত, তটস্থ।

নিমেষের মধ্যে পার্ক ভরে গেল, শ্রমিকদলের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত হ'তে লাগল। বক্তার পর বক্তা উঠে গলাবাজী করতে লাগলেন। কতক কাণে গেল, কতক গেল না। সকলেই যেন মনে হ'তে লাগল বক্তৃতার খাতিরে চীৎকার করছেন। প্রাণের স্পর্শ অনুভব করলাম না। কয়েকজন বক্তার পর এক মুসলমান যুবক বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়াল। শুনলাম তার নাম করিমুল্লা, লিলুয়া কারখানার একজন মিস্ত্রী। তার মুখে সরল উর্দ্দুতে তার ও তার ভায়েদের দুঃখ কাহিনী অন্তর স্পর্শ করেছিল। তাহার পরে বক্তৃতা করল আর একজন যুবক। শুনলাম সে বার্ণ কোম্পানীর একজন মিস্ত্রী—নাম ললিত। সুন্দর হিন্দীতে মেঘমন্দ্র স্বরে সে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিল। তার বক্তৃতাও খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। এই দুই বক্তার বক্তৃতা আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছিল।

আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলাম অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকদের হাতেই অর্পিত হবে এবং আরও মনে হ'ল যে শ্রমিক আন্দোলনের গতি ঠিক পথে চলেছে।

সভা যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তায় গ্যাস জ্বালা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই শ্রমিক বাহিনীর নায়ক

শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী ও [illegible]নাথ বানার্জ্জীর সঙ্গে [illegible] কথাবার্ত্তা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে আমি লিলুয়া [illegible]

সভা ভাঙ্গবার কিছু পূর্ব্বেই আমরা [illegible] বাড়ীর [illegible] দাঁড়ালাম। সেই [illegible] অবস্থায় পার্কের বাইরে রাস্তায় এসে [illegible] চেষ্টায় [illegible] মধ্যেই সেই বিক্ষুব্ধ [illegible] রাস্তার উপর সারি দিয়া দাঁড়াল ও [illegible] সামনে ক'রে হাওড়ার দিকে অগ্রসর হ'ল। [illegible] দিক কাঁপিয়ে শ্রমিকবাহিনী যখন [illegible] রাত্রি নটা বেজে গেছে। এইখানেই তাদের বিদায় দেওয়া হ'ল ও শ্রমিকদল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যে যার ঘরে চলে গেল। আমরাও মোটরবাসে লিলুয়ার আফিসে যাত্রা করলাম।

[ক্রমশঃ]

পাবলিক সেফ্‌টি বিল ও জাতীয়তা

—০—

(বলসেভিক বিতাড়ন আইন)

—০—

ভারত সভায় "পাবলিক সেফটি বিল" সম্বন্ধে আলোচনা দেখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা হতাশ হয়েছি। জাতীয় দলের যে মনোভাব আলোচনাক্ষেত্রে প্রকাশ হয়ে পড়েছে তা থেকে বেশ বুঝা যায় এই দলের কাছ থেকে আমরা বড় কিছু আশা করতে পারি না। শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধীয় অপর আইনটি (ট্রেড্ ডিস্‌পুটবিল) যখন পেশ হ'বে তখন জাতীয় দল সেটাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে তারও কতকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কোন্ মনোবৃত্তি নিয়ে সরকারের প্রতিপক্ষদল সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে? ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের "অমৃতবাজারে" এ সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হয়েছিল তাহা থেকে আমরা একছত্র উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে চাই তথাকথিত জাতীয় দলের মনের কোনে কি ভাব লুকানো আছে।

"তাঁহারা ভারতীয় নেতারা) যদি বিশ্বাস করতে পারতেন যে গবর্ণমেণ্ট এই বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলছেন তা সত্য তা হ'লে তাঁহারা বিলের বিরুদ্ধে একপ তীব্র আপত্তি উত্থাপন করতেন না।"

"গভর্ণমেণ্ট উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি বলছে? মোটামুটি তারা বলতে চায় যে কমুনিজম্ জিনিষটা খারাপ এবং এ দেশে বাইরের কমুনিষ্টরা আসতে আরম্ভ করেছে, তাদের তাড়াতে হ'বে। এখন এ কথা যদি সত্য হয় তা হ'লেই কি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত বিলটা মেনে নিতে হ'বে নাকি? গভর্ণমেণ্টের অন্য উদ্দেশ্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মোটামুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতে কমুনিষ্টবাদের প্রসার বন্ধ করা, বিপ্লবমূলক শ্রমিক আন্দোলনকে নষ্ট ক'রে দেওয়া। ভারতের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় যে গণ আন্দোলন সেটাকে গলাটিপে মারা এবং সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করবে সেই শ্রমিকও কৃষকদলের অস্তিত্ব লোপ করে দেওয়া।"

এ কথা বুঝতে কি কারও বাকী আছে [illegible] কিন্তু [illegible] অনেকে মুখে 'অ্যাণ্টিকম্যুনিষ্ট' [illegible] বলেছেন [illegible] সম্বন্ধে যদি [illegible] হ'তে পারতেন [illegible] বিলের বিরুদ্ধে [illegible]

[illegible] বুঝা যাচ্ছে যে মনে মনে [illegible] উদ্দেশ্যটি [illegible] কিন্তু [illegible] যে [illegible] পোষণ করেন সেটা [illegible] বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আর এইরূপ মনোবৃত্তি রয়েছে ব'লেই [illegible] মধ্যে মিল নেই আর অনেকে [illegible] দাঁড়াচ্ছেন।

এ সম্বন্ধে যদি কারও সন্দেহ থাকে তা'হলে কতিপয় নেতার উক্তি লক্ষ্য করলেই সে সন্দেহ দূর হবে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্পষ্টই বলেছেন, "কমুনিষ্টদেরপ্রতি তাঁহার কোনও সহানুভূতি নেই এবং যাতে ইহা ভারতে প্রসারলাভ না করতে পারে সে বিষয় তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করবেন এবং এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর এক মত।"

মিঃ অমরনাথ দত্ত বলেন "সমাজ বিপ্লবের দ্বারা বর্ত্তমান সমাজের পরিবর্ত্তন কোনও [illegible] এবং যদি গভর্ণমেণ্ট প্রমাণ করতে পারত যে একপ বিপদের সম্ভাবনা আছে তা হ'লে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিলের অনুকূলে মত দিতেন। দু এক জন ছাড়া অধিকাংশ নেতার উক্তিতেই এইরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

জয় গান।

—০—

—আব্‌দুল কাদের—

—০—

জয় নব-উত্থান, জয় হে।
জয় যৌবন দুর্জ্জয় হে।

জয় জয় হে ॥

জয় জাগ্রত মানুষ—মহান,
জয় উদ্ধত ভুখা-ভগবান,
জয় জন-গণ-রণ-অভিযান,
জয় বিধাতার বরাভয়হে।

জয় জয় হে ॥

জয় লাঞ্ছিত মানবতা জয়,
জয় পুঞ্জিত যুগ-ব্যথা জয়,
জয় নব ঊষার উদয় হে।

জয় জয়হে ॥

জয় উত্থিত লোহিত নিশান,
জয় বিঘোষিত সমর বিষান,
জয় লাল সেনা—শ্রমিক কৃষান,
জয় সাম্যের নিশ্চয় হে।

জয় জয় হে ॥

স্বাধীনতার অগ্রদূত

—:০:—

— শ্রীসুধীর রাহা —

—:০:—

১৯১৮ সালে দেশটা একবার নড়ে উঠে ছিল, কতকগুলি যুবক সেই নেড়ে ওঠার মূলে ছিল। সেই যুবকগুলির ছিল না অজস্র অর্থ, ছিল না অগণিত লোক সংখ্যা,—ছিল শুধু বুকভরা সাহস, ছিল ত্যাগ, ছিল মানসিক শক্তি ও নৈতিক বল। ঐ নিয়েই তারা এই গোটা দেশটাকে 'নড়ে' উঠবার সহায়তা করেছিল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ঐ ১৯১৮ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হইল কেন? এর উত্তর দিতে হ'লে প্রথমতঃ ভারতীয় বিপ্লববাদীগণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা দরকার, অর্থাৎ ভবিষ্য ভারত কি ভাবে গঠিত হইবে, সে বিষয়ে তাঁদের কি মনোভাব ছিল—তাহা বলনা আবশ্যক! মূলসূত্র—(১) ভারতকে অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ ভারতের ব্যাপারে জগতের অন্যান্য কোন জাতিই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(২) ভারতের কোনরূপ শাসন প্রণালী ভাল ও মঙ্গল-জনক হইবে, সে বিষয়ে ভারতবাসীই ঠিক করিবেন।

(৩) ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য কিরূপ ভাবে পরিচালনা করিলে ভারতের এবং জগতের মঙ্গল-জনক হইবে, এই সকল বিষয় ভারতবাসী যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন।

মোটামুটি ইহাই ছিল, সেই যুগের বিপ্লববাদীগণের দুরাকাঙ্ক্ষা।

এই ভারতীয় বিপ্লব-বাদীদের সকল চেষ্টার মূলে এই ছিল যে, ভারতকে এমন ভাবে শক্তি সামর্থ্যে ভূষিত করিয়া তোলা, যাহাতে ভারত অন্যান্য জাতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

ঐ আদর্শ লইয়া ভারতীয় যুবকগণ বিপ্লব কর্ম্মে নামিয়া ছিল।

মূল-সূত্রের defect (১) ঐ ভারতীয় বিপ্লববাদীগণের কার্য্য শুধু মুষ্টিমেয় ছাত্র ও যুবকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল,

(২) বিপ্লববাদীগণের সহিত জনসাধারণের অন্তরের যোগ ছিল তো নাই, পরন্তু জনসাধারণ ঐ বিপ্লববাদীগণকে, স্বদেশী ডাকাত প্রভৃতি মনে করিয়া ভয় করিত।

(৩) দূরদর্শী চিন্তাশীল এবং প্রতিভাবান ব্যক্তির অভাব। রুশিয়ার লেনিন, বা ট্রটস্কির মত, জার্ম্মাণীর হেগেলের মত, বা প্রিন্স বিসমার্কের মত, এমন কোন ভাবুক ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ঐ বিপ্লববাদীগণের মাথার উপর ছিলেন না, তাই ভারতীয় বিপ্লববাদীগণ প্রচার কার্য্য বলিতে গেলে কিছুই করিতে পারেন নাই।

(৪) জনসাধারণের সম্মুখে 'নূতন' ও "আশার" কিছু ভাব দিতে তাঁরা পারেন নাই।

(৫) 'বৈজ্ঞানিক মতের' কাগজ ও পুস্তকের অভাব। যাহা ছিল, তাহা উত্তেজনা মূলক ও প্রতিহিংসার উচ্ছ্বাস পূর্ণ, সেই কাগজ জনসাধারণ ও শিক্ষিতকে কোন নূতন কিছু শুনাতে পারে নাই!

জনসাধারণ হইতে পৃথক ভাবে, ঐ দল ছিলেন। তাহার [illegible] প্রচার [illegible] অভাব, এবং নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের [illegible] [illegible] অন্তর্নিহিত কারণে ঐ বিপ্লব সফল হয়

নাই—তা ছাড়া—বিপ্লববাদীগণেরই নিজেদের "স্বাধীনতা" সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না।

এর পর ধরা যাক্ ১৯২২ সালের 'নন্-কো-অপারেশনের' কথা। এই ২২ সালের আন্দোলন, এ'কে বহু নামে অভিহিত করতে পারা যায় (১) 'মহাত্মা প্রবর্ত্তিত' অসহযোগের আন্দোলন।

(২) ব্যক্তি পূজার মহা অর্ঘ্য।

(৩) বিরাট ধাপ্পাঘট!

এ স্থলে প্রথমে 'মহাত্মার' মূল-সূত্র বা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য গুলি বলা দরকার।

মহাত্মার মতে "মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ বর্ত্তমান সভ্যতা, বিশেষ করে আধুনিক শিল্পানুষ্ঠান সমূহ। এবং তদ্দ্বারা অজ্ঞাত মানুষের দুষ্কর্ম্ম সমূহ!

মহাত্মার মতে এর প্রতিকার "আধুনিক সভ্যতার ধ্বংস, ও কল-কব্জার বিনাশ সাধন!"

এই ভাবুকতা বাস্তবে খাটান কঠিন। জগতের সর্ব্বত্র রাজ-নীতি অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশের রাজনীতি শুধু ভাবুকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'কলকব্জার' জন্যই যে বর্ত্তমানে এত দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করি, কলকব্জার সুবিধা কতখানি।

তবে, কলকব্জার ধ্বংস সাধন না করে, তাকে অন্যভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। অর্থাৎ যে অর্থ ঐ কলকব্জার মারফতে উৎপন্ন হয়, তাহা সমস্তই কলওয়ালার সিন্দুকেই উঠে,—আর শ্রমিকরা যা পায় তাহা পরিশ্রম অনুপাতে খুবই কম; এইজন্য দুঃখ কমে না। এখন যে টাকাটা উৎপন্ন হয়, তাহা সমান সমান ভাগে, বা এমন হারে টাকাটা শ্রমিকরা পাবে, যাতে তাদের দুঃখ ও কষ্ট নিবারণ হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের নেতাগণ দেশের গণসাধারণের নাম ক'রে চীৎকার করেছিলেন। তাঁদের সহানুভূতি ছিল সম্পূর্ণ ধনিক-সম্প্রদায়ের দিকে এবং যখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে তাঁদেরই নেতৃত্বাধীনে দেশের শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে বিপ্লব মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে, হয়ত কালে তা'রা তাঁদের নেতৃত্ব অস্বীকার করে বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন ক'রে বর্ত্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ দুইটাই চুরমার ক'রে দেবে তখন তাঁরা সময় থাকতে সাবধান হয়ে গেলেন। চৌরীচৌরার ব্যাপার দেখে মহাত্মাজী আঁতকে উঠেছিলেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি একেবারে হাত গুটিয়ে নিলেন।

তারপরে এলেন স্বরাজ্যদল। তাঁরাও দিনকতক খুব হৈ চৈ করে, লম্বা লম্বা কথা আওড়ে অবশেষে এমন একটা কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করলেন যার সঙ্গে লিবারেল দলের কার্য্যপদ্ধতির বিশেষ পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এবং তাঁদের দৌড় ওই Dominion Status পর্য্যন্ত।

তবে, আজ দেশের মুক্তি কোন্ পথে? আজ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির তবে কি কোন আশাই নাই?—আছে—এবং একমাত্র 'গণমনের' জাগরণ হচ্ছে ঐ আন্দোলনের প্রকৃত ক্ষেত্র, এবং বিপ্লববীজ ঐ উর্ব্বর ক্ষেত্রে ছড়ানো—তা থেকে মাটী ফুড়ে উঠবে—"সর্ব্বহারা শ্রমিকদল"—তারাই হচ্ছে ভারতের মুক্তির একমাত্র মহাস্ত্র।

এই সর্ব্বহারাদের সম্বন্ধে তাঁদের নানা [illegible] [illegible],

[illegible]

[illegible] ধনীর অসম্ভব শোষণে, আজ সমাজ [illegible]। আজ জগৎ হ'তে এই অন্যায় বৈষম্য দূর করবার জন্য চাই—শ্রমিকগণের জাগরণ।

এবং একমাত্র কম্যুনিজম, বা সমানাধিকার হচ্ছে ঐ অন্যায়, অবিচার, শোষণের মহৌষধ।

তবে, এখন দেখতে হবে, কম্যুনিজম কি? [illegible] কথা হচ্ছে—"সমাজের সমষ্টি শক্তির অর্জ্জিত ধন, (অথবা যে ধন কেহ উৎপাদন করে না—যথা জমি) সমাজের সাধারণ সম্পত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামর্থ্যানুযায়ী পরিশ্রম করিয়া এই ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে হইবে। ব্যক্তির শ্রমলব্ধ ধনের উপরেও ব্যক্তির নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনানুযায়ী সমাজের সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে ধন বণ্টন করিয়া দিবে, (from all according to their ability, to each according to his need)। পরিশ্রম না করিয়া কেহ অন্যের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে নিজের সিন্দুক বোঝাই করিতে পারিবে না।" এই হচ্ছে communismএর আদর্শ।

মার্কস আরও বলেন "বর্ত্তমান সমাজ কম্যুনিষ্টদের আদর্শ গ্রহণ করিতেছেনা—বলিয়াই, সমাজের এত দুর্দ্দশা!!

ঐ কম্যুনিজিমের আর একটা মূল সূত্র এই যে "বর্ত্তমানের অর্জ্জিত বস্তুগুলোকে রেখে দেওয়া, এবং সেগুলোকে সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য ব্যবহার করা,—অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় সমূহকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া, যে অতিরিক্ত মূল্য (Surplus value) এখন ধনীর পকেটে যাচ্ছে—তাহা কাজে লাগান!!

উপরোক্ত মূল সূত্র এবং Communismই একমাত্র সমস্ত দুঃখ কষ্টের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ভবিষ্যতে যে যুগ আসছে,—সেটা হচ্ছে কর্ম্মীর সমাজ,—সেটা অলসদের নহে। ঐ সমাজ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে সমষ্টির ভালোর জন্য কাজ করতে থাকবে। আমরা পর পর

[illegible]

[illegible] কম্যুনিজমের আদর্শ [illegible]।

[illegible] বা মিলওয়ালা [illegible] যেখানে [illegible] পূর্ণ সহযোগ [illegible] প্রমাণ [illegible]।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শুধু [illegible] একমাত্র [illegible] করতে পারে না, তবে কিছুটা এগিয়ে দেয়।

[illegible] প্রমাণ চীন। প্রথমে চীনে ছাত্ররাই বিপ্লব আরম্ভ করেছিল,—কিন্তু ধৈর্য্য ধরে [illegible] চালাতে পারে, এমন শক্তি তাদের নাই। কারণ [illegible] সব ক্ষেত্রে বাধা অনেক প্রকার। ঐ বাধা [illegible] নিজ লক্ষ্যের পথে ছুটিবে, সে একমাত্র সর্ব্বহারা শ্রমিকরাই। কারণ তাদের জ্বালা, সেতো নিবিবার নহে।

তাই দেখতে পাওয়া যায় যে একমাত্র শ্রমিকই দেশকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিবে, [illegible] তাহারা 'কম্যুনিজিম' মন্ত্র গ্রহণ করিয়াই।

— —

ক্যাণ্টন বিদ্রোহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:*:—

ক্যাণ্টন সোভিয়েট তিন দিন মাত্র কর্ত্তৃত্ব করিতে পাইয়াছিল এবং এই তিন দিনেই অনেকগুলি আদেশ পত্র সোভিয়েটের নামে জারি করা হইয়াছিল। ঐ আদেশ পত্র গুলি ২৫শে নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত কার্য্য-তালিকার অনুযায়ী হইয়াছিল এবং উহাদের সব গুলিই ক্যাণ্টন সোভিয়েটের দৈনিক পত্র

"লাল-নিশানে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সকল আদেশ পত্রের কতকগুলি নিম্নলিখিত বিষয়ে :—

(১) হাইফাংএর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং উহার নেতা "পাং উই"কে কৃষি-বিভাগের প্রতিনিধি নিযুক্ত করণ

(২) শ্রমিকদিগকে নাগরিক কর হইতে অব্যাহতি দান।

(৩) যে সকল জমিদারী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল সেই সকল হইতে সৈনিকদের মধ্যে জমি বিতরণ।

(৪) ফাসিষ্ট দলের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন গুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি।

তিন দিন ধরিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাহার শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিল। "লি-চাই-স্বনের" সহকারী "লি-ফু-চুনের" সৈন্যদল ক্যাণ্টনের সমুদ্রতীর-বর্ত্তী হোনাম দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া সহরের উত্তর ও দক্ষিণ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ক্যাণ্টন হারবারের রণতরী সমূহ এবং সশস্ত্র "মিন্ টোয়ান" বা বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর সহিত ও সোভিয়েটকে লড়িতে হইয়াছিল। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে শত্রু পক্ষের একটি ডিভিসন পরাজিত ও সহর হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল এবং তাহাদের বহু লোক হতাহত হইয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে পরাজিত শত্রু পক্ষ আরও অধিক সংখ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং নগর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিদেশী সৈন্যদল ইহাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। সমুদ্রকূলবর্ত্তী বাঁধের উপর জাপানী নাবিকগণ অবতরণ করিয়া লাল পল্টনের উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছিল এবং যে হোয়াইট রাশিয়ান সৈন্যগণ উক্ত অঞ্চলে চতুর্দ্দিকে বেড়া তৈয়ারী করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতেছিল তাহাদিগকে বিতাড়িত হইতে দেয় নাই। ইংরেজের বাণিজ্য জাহাজ ও রণতরী সমূহ বিরুদ্ধবাদী সেনাপতিদিগকে ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে (বুর্জ্জোয়া) হোনাম, শামীন ও হংকংএ পৌছাইয়া দিয়াছিল। বৃটিশ, জাপানী ও ফরাসী রণতরী সমূহ ক্যাণ্টনের উপর গোলা বর্ষণকারী গানবোটগুলিকে রক্ষা করিয়াছিল। বৃটীশ সেনা বিপ্লববাদী চীন সৈন্যদলকে অবরুদ্ধ ও বন্দী করিয়াছিল এবং বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজগুলি বৃটীশ পতাকা উড়াইয়া কুয়োমিংটানের (জাতীয় দলের) সৈন্যগণকে বহন করিয়াছিল।

বিদ্রোহীদের পক্ষে প্রধান অসুবিধা হইল যে অধিকাংশ শ্রমিকই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আদৌ জানিত না। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পর তাহারা বন্দুক ছুড়িতে শিখিল কিন্তু মেসিন-গান ব্যবহার করিবার জন্য লোক পাওয়া গেল না। যে সকল মেসিন-গান বিদ্রোহী দলের হস্তগত হইয়াছিল তাহার মধ্যে মাত্র চারটি ব্যবহারে আসিয়াছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও যুদ্ধের সময় ব্যারিকেডের (barricade) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই এবং কি করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহাও জানিতেন না।

পরে আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিদ্রোহী নেতারা এমন অনেকগুলি ভুল করিয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। প্রথমতঃ ক্যাণ্টন বন্দরে শত্রু পক্ষের আড্ডা নষ্ট করিতে তাঁহারা অত্যধিক সময় নষ্ট করিয়াছিলেন; তাহা না করিয়া তাঁহাদের উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গেই সহরের বাহিরের শত্রু কেন্দ্রগুলিকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া একেবারে হাইলাং-ফেনের কৃষকদলের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করা। এই সকল ভুল ও কার্য্যকুশলতার অভাবের জন্য কম্যুনিষ্ট সেনাপতি ইয়েটিং কে পদচ্যুত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ প্রদেশ সমূহে যে সকল হোয়াইট রাশিয়ান সৈন্যদল ছিল তাহাদের মধ্যে খুব কমই লাল পল্টনে যোগ দিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় বিপক্ষের সেনাদলের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতের প্রচার দ্বারা তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা কম্যুনিষ্টপার্টি করে নাই।

তৃতীয়তঃ বিপক্ষ দল ফাসিষ্ট দলের নেতৃত্বে পরিচালিত মেক্যানিক ইউনিয়নের এক সহস্র শ্রমিককে সশস্ত্র করিয়া লইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে উক্ত সংঘের শ্রমিকগণকে ফ্যাসিষ্ট নেতাদের হস্ত হইতে ছিনাইয়া স্বদলে আনয়ন বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।

যদিও বিদ্রোহ আরম্ভ হইবা মাত্র কয়েক সহস্র কৃষক দলবদ্ধ হইয়াছিল এবং উত্তরের রেলষ্টেশন অধিকার করিয়া টাকা কড়ি কাড়িয়া লইয়া ক্যাণ্টনে প্রেরণ করিয়াছিল কিন্তু ক্যাণ্টনের সমীপবর্ত্তী গ্রামগুলিতে কৃষকেরা ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ঐ সকল গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট সংঘ গঠনের চেষ্টা হয় নাই এবং কম্যুনিষ্ট-পার্টি এই সকল গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনেরও চেষ্টা করে নাই।

বিদ্রোহের শেষে যখন বিদ্রোহীদল বিপক্ষের সহিত আর যুদ্ধ চালাইতে পারিল না তখন ট্রেনিং রেজিমেণ্টের সৈন্যগণ সারিবদ্ধভাবে শত্রু অবরোধ বিদীর্ণ করিয়া হাইফাং অভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রায় বিশ সহস্র রেড গার্ড তাহাদের অনুসরণ করিল।

বিদ্রোহের পরে

ক্যাণ্টনের মাত্র তিনদিন স্থায়ী বিদ্রোহের ব্যাপার হইতে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে পূর্ব্ববৎসরের শোচনীয় পরাজয় হইতে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হয় নাই। বিদ্রোহের পূর্ব্বে এবার যেরূপ সতর্কতার সহিত যোগাড় যন্ত্র করা হইয়াছিল, কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের প্রোগ্রাম ক্যাণ্টনের সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যেরূপ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে কম্যুনিষ্টদল যেরূপ কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে ক্যাণ্টন বা অন্য জায়গায় এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে কম্যুনিষ্টপার্টি সফলতার সহিত কাজ করিতে সক্ষম হইবে। ডিসেম্বরের বিদ্রোহের পরে যে ক্যাণ্টন সোভিয়েট স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বিদ্রোহীদলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইল বটে কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের পূর্ব্বে ও পরে অসংখ্য সোভিয়েট গঠিত হইয়াছিল এবং সেগুলির অস্তিত্ব নষ্ট হইল না। দেশের জনসাধারণ সোভিয়েটের রাষ্ট্রনীতি প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। কোয়ান্টাং প্রদেশের পূর্ব্বে ক্যাণ্টন এবং সোয়াটাওয়ের মধ্যস্থিত হাইফাং, লুফাং, পুলিং, হোউয়ান জিলা এবং কোয়ানটাঙ্গের দক্ষিণস্থিত হাইনান দ্বীপ কৃষকেরা দখল করিয়া লইল এবং ওই সকল স্থানে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা ব্যতীত হিউনান প্রদেশের পূর্ব্বদিকের কয়েকটি জিলায়ও সোভিয়েট স্থাপিত হইল। হিউপে প্রদেশেও সোভিয়েটতন্ত্র বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ঐ প্রদেশের হুয়াংমি জেলায় সোভিয়েট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

[illegible] (Nationalist) [illegible]

[illegible]

রাজকুমার সিংহের আত্মীয় ও জেল কর্ত্তৃপক্ষ

—:•:—

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীমান রাজকুমার সিংহ আমার ভাগিনা। আমাদের প্রাণ তুল্য রাজকুমার বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বচতুর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দণ্ডবিধানে দীর্ঘ দশ বৎসরের জন্য বন্দী হইয়াছেন এবং বিগত ১৯২৭ সালের ৮ই এপ্রেল তারিখে সরকারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ৪২ দিন অনশন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত সময় আমার মাতাও ঐ দীর্ঘ কাল সত্যাগ্রহ করার জন্য তাঁহার শারীরিক অবস্থা শোচনীয় হয়। "মাতার জীবন রক্ষা কর", বারম্বার এইরূপ তার করায় রাজকুমার অনশন ত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অস্বাভাবিক দুর্ব্যবহার মানিয়া লইতে স্বীকৃত হন। এ ঘটনা সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

আমরা (আমি, আমার মাতা ও আমার ভগ্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র) বিগত ২৮শে আগষ্ট তারিখে, ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার বেরেলি জেলে রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করি। ১লা সেপ্টেম্বরের প্রথম ডাকে দেখিয়া কোনও উত্তর না আসায় আমরা রিপ্লাই টেলিগ্রাম দ্বারা পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হই। সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত টেলিগ্রামের কোনও উত্তর না পাওয়ায় নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলাম। বেরেলির শেষ ট্রেন ছাড়িবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমাদের পত্রের উত্তরে অনুমতি পাইয়া যথাসাধ্য ব্যস্ততা সহকারে ট্রেন ধরিতে সমর্থ হইলাম। পর দিন ২রা সেপ্টেম্বর নির্দ্দিষ্ট সময় আমরা জেল ফটকে উপস্থিত হইয়া নিয়মানুযায়ী আমাদের আগমন সংবাদ জেলার মহাশয়কে জানাই। সাক্ষাতের পূর্ব্বে জেল কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা সরকারের চক্ষে অন্যায় না হইলেও আমাদের পক্ষে সেটা অসহনীয় দুর্ব্যবহার মনে করি। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্রে প্রায় তিন চার ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিবার পর রাজভক্ত মহোদয়গণের উত্তর আসিল, "হিন্দি ভাষায় কথা কহিতে হইবে, যদি তাহা না পারেন তাহা হইলে আজ ফিরিয়া যাইতে হইবে।" একে তিন [illegible]

[illegible]

আমাদের কথা আরম্ভ হইল, জেলার মহাশয় ও অন্য একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কথা বার্ত্তা শুনিয়া তাহা নোট করিতে লাগিলেন। অন্যান্য কথা বার্ত্তা হইবার পর রাজকুমার বলিলেন, "তোমরা এত উৎকণ্ঠিত কেন? তোমরা কি বোঝনা আমরা পরাধীন জাতি? ধৈর্য্য হারাইওনা, সর্ব্বদা মনে রাখিও ধৈর্য্য বড় শক্তি। আমাদের রাজা যিনি তিনি ভারতের নবযুবকের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলা করিতে বড় ভালবাসেন। শত সহস্র সংসারের আকুল ক্রন্দনে যাঁহাদের চিত্ত বিচলিত হয়না তোমাদের এসকল অসুবিধার কথা তাঁহাদের জানাইতে গেলে প্রেতাত্মার ন্যায় বিকট অট্টহাস্যে তাঁহারা তোমাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন। যাহা হোক, ইহাও নিশ্চয় জানিও এই নশ্বর জগতের কিছুই স্থায়ী নয়। ধৈর্য্য ধরিও, কিন্তু নিশ্চেষ্ট। ভুলিও না, সংসারে একটী পিপীলিকা হইতে প্রত্যেক শিশু ও যুবা হৃদয়ে জলন্ত অক্ষরে লিখিতে চেষ্টা করিও আমাদের রাজা নিষ্ঠুর নির্ম্মম, ও কাণ্ডজ্ঞান হীন।" আমাদের সম্মুখস্থ জেলার মহাশয় ও অন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া বলিলেন এই যে দেখিতেছ দুজন বসিয়া আছেন, ইহারা কেন বসিয়া আছেন? আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য। আমি কিন্তু ইঁহাদের প্রতি কিছু মাত্র বিরক্ত নহি, কারণ গভর্ণমেণ্টরূপ মেশিনের ইঁহারা ইস্ক্রু মাত্র। ইঁহাদের নিজের কিছুমাত্র শক্তি নাই। মেসিন যেরূপ ঘুরিবে ইঁহারাও সেইরূপ ঘুরিতে বাধ্য। আরও বলিলেন, দেশের প্রকৃত কর্ম্মীদের নিকট আমার এইটুকু বক্তব্য আছে যে ভারত সরকার রাজদ্রোহ অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া আমাদের প্রতি দীর্ঘ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা দ্বারা সাধারণ কয়েদির ন্যায় যে অমানুষিক দুর্ব্যবহার করিতেছেন তাহা ভদ্র সন্তানের পক্ষে নীরবে সহ্য করা কত সহজ তাহা যেন দেশের প্রত্যেক নেতারা অনুভব করিতে সমর্থ হন। আমি আশা করি আমার দেশ প্রিয় ভ্রাতারা আমাদের প্রতি বৃটিশের অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিবেন এবং আমাদের ন্যায় সঙ্গত দাবি পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী করিবেন না।"

জীবনে এমনও দুঃখ আসে যাহার ভিতর মহা আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভারত পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা আছে সে ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইলে চাই কি? চাই আদ্যাশক্তি কল্যাণরূপিণী নারীর আত্মত্যাগ, আর চাই, ভারতব্যাপী নারী জাগরণ। ভারতের ভাগ্য লক্ষ্মীর প্রেরণায় এ জাগরণের সূত্রপাত গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই সাধিত হইতেছে। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে তাঁহারা যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছেন তাহা বর্ত্তমানে দুঃখদায়ক হইলেও ভবিষ্যতে আশাপ্রদ, তাহা জোরের সহিত বলা যায়। প্রিয় পুত্র, ভ্রাতা অথবা আত্মীয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের উৎপীড়ন হেতু আজ হিন্দুর অন্তঃপুরে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে সেই উত্তেজনা স্থায়ী হইলে ভারতের শৃঙ্খল অবশ্যই খসিয়া পড়িবে। পুরুষ শক্তির পিছনে তাদের জলন্ত মূর্ত্তি নারী শক্তি বিদ্যমান থাকিলে অসাধ্য সাধন হয়। বার্দ্দোলীর সত্যাগ্রহ এ বিষয় জলন্ত দৃষ্টান্ত নয় কি?

ইতি—শ্রীসুশীলা বালা ঘোষ
কানপুর

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

ইণ্ডিয়ান্ সি-মেন্স ইউনিয়ন

গত ৩০শে আগষ্ট তারিখের "গণবাণী"তে আমরা "জাহাজী-দের প্রতি" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেম যে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সি-মেন্স ইউনিয়নের আফিসের দরওয়াজা পর্য্যন্ত খোলা হয় না। বস্তুতঃ, বহুমাস যাবৎ ইউনিয়ন আফিসের দুয়ারে তালা পড়েই ছিল। আমরা শুনে খুবই আনন্দিত হলেম যে সম্প্রতি কিছুদিন থেকে আফিসের দুয়ার খোলা হচ্ছে এবং ইঞ্জিন ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা আফিসে যাওয়া আসা করছে। ইউ-নিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিঃ দাউদ নাকি খুব অনিচ্ছার সহিতই একটি নব-গঠিত সব-কমিটির হাতে চাবি সোপর্দ্দ ক'রে দিয়েছেন। মিঃ ফজলুর রহমান এই কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছেন। সব-কমিটি ইউনিয়নকে পুনর্গঠন ক'রে নেবার জন্য চেষ্টা করছেন। তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হোক্। তবে সব-কমিটি যদি খুব বিবেচনা ক'রে কাজ না করেন তাহ'লে কিছুতেই কিছু হবে না। সি-মেন্স ইউনিয়ন যে ভালো ক'রে জম্‌লনা, তার একমাত্র কারণ এই হচ্ছে যে ইউনিয়নের নেতাগণ কখনো ইউনিয়নের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ওপরে বিশ্বাসস্থাপন করেন নি। তাঁহাদের সম্মুখে সব চেয়ে বড় আদর্শ ছিল একটা "সি-মেন্স রিক্রুটিং ব্যুরো" অর্থাৎ জাহাজীদিগকে কাজে নিযুক্ত করার একটা আফিস স্থাপন করা। 'রিক্রুটিং ব্যুরো' স্থাপন করা শ্রমিক সঙ্ঘের চরম উদ্দেশ্য ব'লে কিছুতেই পরিগণিত হতে পারে না। শোষকের বিরুদ্ধে ভাত-কাপড়ের জন্য লড়ার উদ্দেশ্যেই শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হয়। সম স্বার্থবোধের দ্বারাই প্রকৃত সঙ্ঘ গঠিত হতে পারে। শ্রমিক মাত্রেরই স্বার্থ এক, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিকই তার নিয়োগকারীর দ্বারা আপন পারিশ্রমিকের কড়ি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এই যে শোষণ—ইহা'র ভিত্তির ওপরেই সব শ্রমিক এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারে। 'রিক্রুটিং ব্যুরো' স্থাপিত হলে ইউনিয়ন একটা লাভের ব্যবসায়ে পরিণত হতে পারে, ইউনিয়নের কতিপয় লীডার বা নেতা তা থেকে মাস মাহিয়ানাও পেতে পারে এবং সর্ব্বোপরি জাহাজীগণ ঘুষের দায় হতেও অনেক পরিমাণে অব্যাহতি পেতে পারে—কিন্তু, তার দ্বারা শোষণের সমাপ্তি আর কিছুতেই হবেনা। শুধু দালালের ঘুষ বন্ধ করাই ত আর ইউনিয়নের একমাত্র কাজ নয়—জাহাজীদের বেতন বৃদ্ধি করা, তাদের চাকুরীর অবস্থা ভালো করা, তাদের কাজের সময় কম করা, সমান ব্যবহার লাভ করা ও স্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করা ইত্যাদি কত দাবী যে নাবিকদের রয়েছে তার কোনো শেষ নেই। সে সবের আশু পূরণ হওয়া চাই। সব-কমিটি যদি সত্যই ইউনিয়নকে পুনর্গঠিত করতে চান তা হ'লে তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত নাবিকদিগকে সব বিষয়ে সচেতন ক'রে তোলা। নাবিকদিগের চৈতন্যের ওপরে ইউনিয়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সে ইউনিয়ন কিছুতেই টিক্‌বেনা।

"ফরওয়ার্ড" ও সুভাষ বসু

দেশে সুভাষচন্দ্রের নাম জাহির হয়নি, এমন কথা তাঁর শত্রুরাও বল্‌তে পারেন না। নিজেদের হাতে তিন তিন খানা খবরের কাগজ আছে, ব্যাঙ্কে টাকা আছে, দেশ-বিদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে এবং সর্ব্বোপরি কারাবাসের সৌভাগ্য আছে, কাজেই, নাম জাহির না হয়েই পারে না। তবে কিনা, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সে সীমা পার হলেই আর কোনো শালীনতা থাকে না। কিন্তু "ফরওয়ার্ড" দেখ্‌তে পাচ্ছি শালীনতার বালাই ত্যাগই ক'রে বসেছে। স্থানে অস্থানে সুভাষচন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত না করলে "ফরওয়ার্ড"এর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। জামশেদপুরে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ভেঙে দেওয়া সত্ত্বেও "ফরওয়ার্ড" সুভাষচন্দ্রের কৃতকার্য্যতার ব্যাখ্যানের দ্বারা কাগজ পরিপূর্ণ করতে ছাড়ে নি। শুধু তা করেও "ফরওয়ার্ড" ক্ষান্ত হতে পারে নি,—সুভাষচন্দ্রের একখানা ফটোও সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত করেছিল। জামশেদপুরের শ্রমিকদের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করার জন্যই কি এই পুরস্কার? এত প্রচার করেও সাধ কিছুতেই মেটেনি। সেদিন আবার ছাত্র-সম্মিলন উপলক্ষে "ফরওয়ার্ড" সুভাষচন্দ্রের ছবি ছেপেছেন। শ্রীযুত জওহরলাল নেহেরু ছাত্রসম্মিলনের সভাপতি ছিলেন। তাঁর ছবি ছাপানোর মানে আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু তাঁর পাশে সুভাষচন্দ্রের ছবি ছাপানোর মানেটা কি তা আমরা জানতে পারি কি? ও ছবিটা না ছাপালেই কি জওহরলালের দ্বারা সুভাষচন্দ্র আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন?

এ'কে কি আফিস বলে?

১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে জয়রাম নামক একটি শ্রমিক কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের নিকটে নর্দ্দমার ভিতরকার বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের সভায় এই হতভাগা শ্রমিকের পরিজনের জন্যে ৫০০ টাকার ক্ষতিপূরণ

নভেম্বর মাসে মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর ক'রেই কর্পোরেশন সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেছেন। জয়রামের পরিবারকে টাকাটা দেওয়ার কোনো বন্দোবস্ত কর্পোরেশনের আফিস আজো পর্য্যন্ত করতে পারে নি। টাকা ওঠাবার তদবীর করতে গিয়ে জয়রামের পরিবার শতাধিক টাকা ব্যয় করেছে। চাষের জমিটুকু বিক্রি করেই গরীব পরিবারকে এই টাকার সংস্থান করতে হয়েছিল। কিন্তু, তাতেও যখন কিছু হলো না তখন এই হতভাগ্য পরিবার মেথর-ঝাড়ুদার ইউনিয়নের শরণাপন্ন হয়। এই ইউনিয়নও আজ ৭।৫ মাস থেকে চেষ্টা ক'রে হার মেনে গেছে। হিন্দু-আইন মতে জয়রামের মা'ই তার উত্তরাধিকারিণী। বেচারী বুড়ি হাজারীবাগ থেকে এসে কলিকাতায় দেড়মাস ধর্ণা দিয়ে ফিরে চলে গেছে। কর্পোরেশন আফিস এ ব্যাপারটার ফাইল এ ঘর থেকে সে ঘরে চালান দিয়েই সব কর্ত্তব্যের সমাধান করেছে। ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন, জয়রাম যার বাড়ীতে থাকত সেই বাড়ীওয়ালাও জামিন হতে প্রস্তুত ছিলেন,—কিন্তু, কর্পোরেশনের ল' অফিসার কিছুতেই এসব মানতে রাজি নন। তিনি যদৃচ্ছা মন্তব্য লিখেই সব দায়িত্ব এড়িয়েছেন। দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে কর্পোরেশন একটা মগের মুলুকে পরিণত হয়েছে। কাউন্সিলারগণ কি বলেন?

ছাত্র-সম্মিলন

[illegible]শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় সমগ্র বঙ্গীয় ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশন হয়ে গেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে অবধি পণ্ডিত জওহরলাল সোখ্যালিষ্ট ভাবের প্রচার করছেন এবং বাংলার ছাত্রগণকেও তিনি সেই ভাবেরই ভাবুক হতে অনুরোধ করেছেন। আমরা জানিনে, তাঁর উপদেশের দ্বারা ছাত্রগণ প্রবুদ্ধ হয়েছেন কি না। তাঁর আগমন ও বক্তৃতার দ্বারা যদি বাংলার অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রও তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল 'ভদ্র-মানসিকতা' পরিহার ক'রে জনগণের অভ্যুত্থানের কাজে আপনাদিগকে নিয়োজিত করেন তা হ'লে আমাদের চেয়ে বেশী আনন্দিত বোধ হয় আর কেউ হবেন না। আর যদি কেবল হুজুগের বশেই বাংলার ছাত্ররা জওহরলালকে কলিকাতায় নিমন্ত্রণ করে এনে থাকে তা' হলেও আমরাই মর্ম্মাহত হব আর সকলের চেয়ে বেশী। কেন না, ভারতবর্ষে জনগণের অভ্যুত্থানের দ্বারা এবং জনগণেরই জন্যে স্বাধীনতা লাভ করার কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে একমাত্র "কৃষক ও শ্রমিকদল" (Workers' and Peasants' Party)ই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। বিদেশীই হোক,কিংবা দেশীয়ই হোক,শ্রেণীর (Classএর) হাত থেকে গণের (Massesএর) হাতে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। বাংলার শোষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকেরা যদি আজ এই আদর্শ বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারেন তা হ'লেই তাঁদের জওহরলালকে ডেকে আনা স্বার্থক হয়েছে বলতে হবে।

স্বরাজের নমুনা

কংগ্রেসে [illegible] যাঁরা [illegible] আছেন তাঁরা কি [illegible] স্বরাজ চান, [illegible] নমুনা [illegible] দেখতে পাওয়া যায় কংগ্রেসের নির্বাচন ব্যাপারে। [illegible] কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের [illegible] প্রকাশিত করেছেন। [illegible] কংগ্রেসকে [illegible] কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাগণ [illegible] এ সম্বন্ধে বিশেষ চিঠি [illegible] তাঁরা কংগ্রেসকে [illegible] এবং বুঝুন যে কংগ্রেসটা কি জিনিস।

রায়ের চিঠি

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায়ের তথাকথিত চিঠি উপলক্ষ ক'রে ভারতময়, বিশেষ সরকারী মহলে, খুব একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। এই পত্র খানাকে মাঝ খানে স্থাপন ক'রেই ভারত গবর্ণমেণ্ট প্যাবলিক সেফটি বা কম্যুনিষ্ট বিতাড়ন বিল ভারতীয় আইন সভায় পেশ করেছেন। এসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া ও "ষ্টেটস্‌ম্যান" ইত্যাদি কাগজের মারফতে প্রথমে যখন রায়ের এই তথা কথিত পত্র খানার অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি ও ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজাণ্টস পার্টির নামেই তা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু, পরে শুরু হয় যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্যাবলিক সেফটি বিলের আলোচনা হয় তখন হোম মেম্বর মিঃ কেরার জানিয়েছেন যে কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায় পত্র খানা আমাকেই লিখেছিলেন। এই পত্র খানা যে উপরি-উক্ত পার্টিগুলির নিকটে কিংবা আমার নিকটে কখনো পৌঁছয়নি তা আমি আগেই প্রচার করেছি। পৌঁছুবেই বা কি ক'রে? স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ রায়ই জানিয়েছেন যে তিনি এ প্রকারের পত্র কখনো লেখেননি। পত্রখানা ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের লেখা। অথচ তার ওপরে পোষ্ট আফিসের ছাপ রয়েছে ১৬ই মে তারিখের। চিঠি লেখার সাড়ে চারি মাস পরে তা পোষ্ট করা কখনো সম্ভবপর ব্যাপার হতে পারেনা। তা ছাড়া চিঠির খামের ওপরে লেখা আছে যে "চিঠি খানা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে হাতে হাতে বিলি করতে হবে।" কিন্তু তা না ক'রে এই কথাটা কেটে দিয়ে চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছে। কমরেড রায়ের মত লোকের পক্ষে এমন কাঁচা কাজ করা কখনো সম্ভবপর কিনা সে বিচারও সকলে করুন। চিঠি খানা যদি কোনো লোকের মারফতে পাঠানো হত তা হ'লেও সেই লোক এমন ছেলে মানুষী কাণ্ড করতে পারতেন না। ডাকে পাঠানো উচিত নয় ব'লেই কারো মারফতে পত্র যদি পাঠানো হয় এবং তার খামের ওপরে যদি লিখে দেওয়া হয় যে হাতে

হাতেই তা পৌছাতে হবে, তা হলে এমন কোনো পাগল কি পৃথিবীতে থাকা সম্ভব, যে সেই খাম খানাই ডাকে ফেলে দেবে?

এদেশের গণ-আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্যে যদি গবর্ণমেণ্টের আইন পাস করার প্রয়োজন থাকে তা হলে এমন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার কি দরকার ছিল? গবর্ণমেণ্ট যখন লোকমতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তখনত কোনো অনুমতি না করেই তাঁরা যেমন ইচ্ছে তেমন আইন পাস করিয়ে নিতে পারতেন।

যাক্, আমি নিজে গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানে মনে প্রাণে বিশ্বাস ক'রে থাকি। কানপুরের মোকদ্দমার পূর্ব্বেও এ বিশ্বাস আমার ছিল, যুক্ত প্রদেশের কারাগারে যখন আমার ওপরে অন্যায় অত্যাচার হচ্ছিল তখনো আমার এ বিশ্বাস টুটেনি, আর আজো স্বাস্থ্যহীন, সম্বলহীন অবস্থায় শুধু আমার বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়েই আমি বেঁচে রয়েছি। গণ-আন্দোলন আর গণ-অভ্যুত্থানের জন্যে যে কোনো মূল্য প্রদান করিতে আমি সব সময়ে প্রস্তুত আছি।

দেশ-বিদেশ

জাহাজীদের সভা

বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে কলিকাতা ৭নং একবালপুর লেনে আই, জি, এন কোম্পানী ও আর, এস, এন, কোম্পানীর শ্রমিকদের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়েছিল। সভায় বহু শ্রমিক উপস্থিত ছিল। ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ মোহাম্মদ দাউদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে মিঃ মুজফফর আহমদ, মিঃ ধরণীকান্ত গোস্বামী ও মিঃ কালীকুমার সেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপরিউক্ত কোম্পানী দ্বয়ের সারেং ড্রাইভার, বাটলার বার্জ্জের মাঝি ও খালাসী, আরকাঠি, কারিক্যাল ষ্টাফ এবং কারখানার শ্রমিকগণের শতকরা ২৫ টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবী পেশ করার জন্যেই এই সভা ডাকা হয়েছিল। সভায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মিঃ আবদুল হক (জেনারেল সেক্রেটরী), মিঃ আজিজুর রহমান, মিঃ আবদুলগণী ও মিঃ মুজ্জাম্মিল আলী এবং বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের মুজফফর আহমদ ও ধরণীকান্ত গোস্বামী বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। বেতন বৃদ্ধির বিষয় ছাড়াও সভায় পাবলিক সেফটি বিল ও ট্রেড ডিস্‌পিউট্ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছিল। ইউনিয়ন কোম্পানীর লাইনের স্থানে স্থানে এইরূপ সভা করছে। আমরা সর্ব্বান্তকরণে শ্রমিকদের সাফল্য কামনা করছি।

বোম্বে ধর্ম্মঘট

এসোসিয়েটেড প্রেস খবর দিয়েছে যে বোম্বে ধর্ম্মঘটের অবসান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কলের মালিকেরা আসল কথাতে এখনো কান দিচ্ছেন না। এই আসল কথা হচ্ছে বেতন বৃদ্ধির কথা। আগে শ্রমিকদিগকে ওজন হিসাবে মজুরী দেওয়া হত। মালিকেরা তার জায়গায় গজের হিসাবে মজুরী দেওয়া স্থির করে। এই নূতন প্রথা প্রবর্ত্তনের সময় তারা শতকরা ৩০ টাকা পর্য্যন্ত মজুরী কমিয়ে দেয়। এই মজুরী কমানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই মজুররা ধর্ম্মঘট করেছে। মোট কথা, বোম্বের মজুররা যা মজুরী পাচ্ছিল তা-ই শুধু পেতে চায়। বোম্বের কৃষক ও শ্রমিকদল গত ৫ পাঁচ মাসেরও বেশী সময় ধরে মজুরগণকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়েছেন। ফলে বোম্বের বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকগণ যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন হয়েছে। এখন তারা নিজেরাই নিজেদের আন্দোলন স্বাধীন ভাবে চালাতে পারবে। ক্ষুধার তাড়নায় বর্ত্তমান ধর্ম্মঘট যদি অকৃত কার্য্যও হয়ে যায় তবুও এই সজাগ শ্রমিকদলের চোখে বহুকাল ধূলি নিক্ষেপ করা কাপড়ের কলের মালিকদের পক্ষে সম্ভব পর হবে না।

জওহরলালের বক্তৃতা

—:০:—

"নিখিল বঙ্গীয় ছাত্র সম্মিলনীর" সভাপতিত্ব করবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কলকাতায় এসেছিলেন। ছাত্র সম্মিলনীর কাজ শেষ করে এলাহাবাদ যাবার পূর্ব্বদিন যুবসঙ্ঘের উদ্যোগে ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে তিনি আলবার্ট হলে এক বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতাতে তিনি বলেছিলেন যে "সোস্যালিজম্ ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব"। তিনি আরও বলেছিলেন যে "ভারতের যাঁরা বণিকশ্রেণী তারা স্বাধীনতার জন্যে কোনও কিছুই করবে না, কারণ তাতে তাদের স্বার্থ হানি হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। বড় বড় জমীদাররাও কিছু করবে না. কারণ, ভারত স্বাধীন হলে যে ফিউডালিজমের অস্তিত্বের ফলে তারা ইন্দ্রত্ব ভোগ করছে তা অচিরাৎ বিলুপ্ত হবে। আর অধিকাংশ শিক্ষিত "ভদ্রলোক"ও বিশেষ কিছুই করতে পারবে না, কারণ, তাদের অনেকেই গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর উপরে নির্ভরশীল এবং চাকুরী পাবার আশায় লুব্ধ। দেশের স্বাধীনতার জন্যে ব্যাপকভাবে লড়াই করতে পারে শুধু শ্রমিক ও সর্ব্বহারার দল, যদি তারা বোঝে যে ভারত স্বাধীন হলে তাদের অর্থনীতিক মুক্তি হতে পারবে। কাজে কাজেই ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সোস্যালিজম্ দরকার।"

যাঁরা গণবাণীর পাঠক তাঁদের নিকটে একথা নূতন নয়, কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল যে প্রতিষ্ঠানের জেনেরেল সেক্রেটারি সেই প্রতিষ্ঠানের ভক্তেরা এই কাহিনী কিরূপভাবে গ্রহণ করবে সেইটেই দেখবার বিষয়।

স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ

সর্ব্বদল সম্মেলনে যাঁরা "ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্" এর পরিবর্ত্তে "পূর্ণ স্বাধীনতার" পক্ষ পাতী ছিলেন তাঁহারা ভারতকে স্বাধীনতার

জন্য প্রস্তত করিবার মানসে "স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ" (Independence for India League) গঠন করিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বি-পি-সি-সির প্রেসিডেন্ট মিষ্টার সুভাষচন্দ্র বসুর [illegible] অদ্ভুত মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ তিনি নেহেরু রিপোর্টের "ডোমিনিয়ন ষ্টেটস"এর সমর্থনকারী, পরক্ষণেই স্বাধীন ভারত সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া গড্ডলিকা মনোবৃত্তির পরিচয় দেখাইয়াছেন; তার পরে বাঙ্গলাদেশে এই সঙ্ঘের শাখা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তিনি আবার [illegible]। তিনি উদ্যোগী হইয়া এই উদ্দেশ্যে জন কয়েক কর্ম্মী সভায় আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহার জন্য ইনভিটেশন কার্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে এই কর্ম্মী সম্মিলনেই বাঙ্গলাদেশের স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠনের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন এবং এই কর্ম্মী সম্মিলনে যাঁহারা ইনভিটেশন কার্ড পাইয়াছেন তাঁহারাই উপস্থিত হইতে পারিবেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় নাবিক ও ডক মজুরের ধর্ম্মঘট

অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটী বন্দরে ডকের কর্ম্মচারী ও নাবিকগণ ধর্ম্মঘট করেছে। ভলান্টিয়ার নিযুক্ত ক'রে ধর্ম্মঘট ভেঙে [illegible] [illegible]

[illegible] ধর্ম্মঘট [illegible]

[illegible] লাঙ্গল [illegible]

[illegible] আজমেরের [illegible] জমশেদপুরের ধর্ম্মঘট [illegible] শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুকে [illegible] শ্রী বসু [illegible] জমশেদপুরে [illegible] এই প্রস্তাব [illegible] জমশেদপুরে [illegible] করেছেন। [illegible] শ্রী [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] হয়েছেন [illegible] শ্রী বসু [illegible] [illegible]

নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন

"কৃষক ও শ্রমিকদল" বাংলা, বোম্বে ও পাঞ্জাব প্রদেশে গঠিত হয়েছে। এই দলগুলিকে একই সূত্রে গ্রথিত ক'রে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা একান্তই আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার জন্যে আগামী ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে "নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন" এর প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় হবে। এই সম্মিলনেই বিভিন্ন "কৃষক ও শ্রমিকদল" একীভূত হয়ে "নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল"এ (Workers' and Peasants' Party of India তে) পরিণত হবে। সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করার জন্যে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর অধিনায়কত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে।

কংগ্রেস সম্পাদকের পত্র

"গণবাণী" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের
বরাবরেষু—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার নিকট এই চিঠীখানা পাঠাইতেছি। ঢাকা জিলা কংগ্রেস যে "জাতীয়তার" অপবাদ (?) মুছাইতে ব্রতী হইয়াছে, ইহাতে তাহার কিছু নিদর্শন মিলিবে। আশাকরি এই চিঠিখানা অবিলম্বে ছাপিয়া এই জিলার কংগ্রেস সভ্যদের অভিযোগ দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহায্য করিবেন। ইতি—

নিবেদক
মোহাম্মদ স্থন্দর আলী মিঞা
সম্পাদক, নরসিংহদী কংগ্রেস কমিটী
২৩।৯।২৮

কংগ্রেস কি জাতীয় প্রতিষ্ঠান

কংগ্রেস আজও দেশের জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে কিনা অথবা বারদৌলির পর জনসাধারণের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিয়াছে কিনা ইত্যাদি লইয়া অনেক লেখালেখিই পত্রিকায় হয় বটে কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নরনারী যাহারা চারি আনা পয়সা দিয়াছেন, তাহাদের ভোটাধিকারের মর্য্যাদা কিরূপে বঞ্চিত হইতেছে সে সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা গেলেও কাহাকেও এযাবৎ লিখিতে দেখিনাই।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য ইলেকশনে যে সকল ব্যাপার হয় বোধহয় শোষণ তান্ত্রিক ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ঐ প্রকার ইলেক্‌শন প্রহসন করিতে সাহস পায় না। এই প্রকার ব্যবস্থা ও প্রহসন যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে কংগ্রেসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দেশের লোক সন্দিহান হইবে না কেন? এই প্রহসনের একটা স্বরূপ আমাদের এস্থানের ভোটদান ব্যাপারে যাহা হইয়াছে সে সম্বন্ধে যে চিঠি আমি রিটার্ণিং অফিসার মহাশয়ের নিকট দিয়াছিলাম, তাহা হইতে কথঞ্চিৎ মিলিবে। সচরাচর যাহা হইয়া থাকে এ ব্যাপারে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমার সন্দেহ কার্য্যে পরিণত হইলেও এবং আমার এই চিঠি পেশকরা সত্ত্বেও রিটার্ণিং অফিসার মহাশয় নির্ব্বিকার চিত্তে সেই চিঠি উপেক্ষা করিয়াছেন। আরও দুইটি শাখা কংগ্রেস হইতেও ঐ প্রকার ব্যাপারের বিবরণ সম্পাদক বা সভ্যগণ লিখিত পত্রে জানাইয়াছেন। আমাদের কংগ্রেসের সভ্যগণ ও ভিন্ন চিঠিতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু, ফল কিছুই হয় নাই।

জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য এই যে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইয়াছিল তাহার গোড়ায় এই প্রকার যে সকল গলদ রহিয়াছে তাহা যদি এখনও সংশোধিত না হয় তাহা হইলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ইহাকে বাজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না। ইহা মুষ্টিমেয় কয়জন ক্ষমতা লোভীরই খেয়াল চরিতার্থ করার সামগ্রীতে পরিণত হইবে, হইতে বাকিও বোধহয় নাই। যাহা হউক সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে আমার চিঠিখানা (যাহা রিটার্ণিং অফিসার মহাশয়ের নিকট দিয়াছিলাম) প্রথমে প্রকাশিত করিলাম—দরকার হইলে অন্যান্য চিঠীও প্রকাশিত করার চেষ্টা করিব। ইতি

———

বি, পি, সি, সির ইলেক্‌শনের ঢাকা জিলার কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সির
রিটার্ণিং অফিসার মহাশয়ের বরাবরেষু—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার নির্দ্দেশমত আমাদের এস্থানে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে বি, পি, সি, সির সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য আমাদের কোনও সভ্যের ভোট রেকর্ড করান হয় নাই। আমি কয়েকজন সভ্যের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম পোলিং অফিসার নাকি তাহার নিজের বাড়ীতে বসিয়া অ-মেম্বার কয়েকজন লোককে দিয়া বেলট সহি করাইয়াছে। এই প্রকার করা যদি সত্য হইয়া থাকে এবং তদনুসারে কোন বেলট পেপার আপনার নিকট পৌছিলে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই বেলট রিজেক্ট করিবেন এবং সমগ্র জিলার বেলট পেপার স্ক্রুটীণীর তারিখ বদলাইয়া দিয়া এ স্থানের চারিশতাধিক মেম্বরের ভোট লইতে পুনরায় অন্য পোলিং অফিসার পাঠাইবেন। এই জিলায় বোধহয় আমাদের কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যাই সমধিক। কাজেই ইহাদের কোন প্রকার ভোট দিবার স্থবিধা ও সময় না দিয়া ঢাকার ইলেক্‌শন করা বোধহয় অন্যায়ই হইবে।

কাজেই নরসিংহদী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি পুনঃ তারিখ নির্ব্বাচিত করিয়া এস্থানের ভোট লইয়া তাহার পর বেলট পেপার স্ক্রুটীনী করিয়া নির্ব্বাচন-কার্য্য সম্পাদন করিবেন, ইতি।

মোহাম্মদ স্থন্দরআলী মিঞা
সম্পাদক, নরসিংহদী কংগ্রেস কমিটী।

———

শ্রমিক জগৎ

—:০:—

গুণ্ডার কবলে শ্রমিক নেতা।

গোরক্ষপুরের ১৭ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যুক্ত প্রদেশের অন্যতম শ্রমিক নেতা ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গোরক্ষপুর জিলার কোনও গ্রামে কৃষকদিগের এক সভায় যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন সেই সময় কতকগুলি সশস্ত্র গুণ্ডা তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং লাঠি, ও কুড়ালী দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে থাকে। ফলে তিনি সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েন এবং তাঁহাকে গোরক্ষপুরের সরকারী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার আঘাত খুব গুরুতর এবং হাঁসপাতালে তিনি শয্যাশায়ী আছেন।

ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। আশা করি পরের খবরে সবিশেষ রহস্য প্রকাশ পাইবে।

সাবাস বাহাদুর!

সেকেন্দ্রাবাদের ১৫ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, 'নিজাম ষ্টেট রেলওয়ে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে সুব্বিয়া ও লিঙ্গায়া নামক যে দুইজন শ্রমিক অভিযুক্ত হইয়াছিল, উক্ত তারিখে যখন আদালতে তাহাদের মামলার শুনানী আরম্ভ হয় তখন তিন সহস্র ধর্ম্মঘটী দল বাঁধিয়া আদালতে উপস্থিত হয়। তাহাদের উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ কিছু বিব্রত হইয়া পড়েন এবং উপস্থিত জনতাকে জানান যে সুব্বিয়ার বিরুদ্ধে মামলা পুলিশ তুলিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ধর্ম্মঘটী ভাইয়েরা সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা বলিল যে ভাই লিঙ্গায়ার বিচারের ফল না জানিয়া তাহারা নড়িবে না।

তখন ইন্স্পেক্টর সাহেব হাকিমকে জানান যে লিঙ্গায়ার বিরুদ্ধে মামলা পুলিশ তুলিয়া লইতে চায়। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন লিঙ্গায়াকে মুক্তি দেন এবং এই সংবাদে জনতা উৎফুল্ল হইয়া বিপুল হর্ষধ্বনির সহিত স্থান ত্যাগ করে। এই ত চাই!

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ ধর্ম্মঘট পুরা উদ্যমে চলিতেছে।

বোম্বাই ধর্ম্মঘট মিটিবে কি?

"ইণ্ডিয়ান ডেলিমেল" খবর পাইয়াছেন যে বোম্বাই কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। আরও প্রকাশ বোম্বাইয়ের মিলওয়ালাদের এসোসিয়েশনের সাব-কমিটি সম্প্রতি কতিপয় শ্রমিকনেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন। সাক্ষাতের ফলে স্থির হইয়াছে যে বোম্বাইয়ের মেয়র শীঘ্রই উভয় দলের এক বৈঠক আহ্বান করিবেন। দেখা যাউক এইবার মিল-ওয়াদের কাঁড়া কাটে কিনা।

জামশেদপুরে সুভাষ বোস

জামশেদপুরের ১৭ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ জি টাউনে শ্রমিকদের এক সভায় শ্রীযুক্ত সুভাষ বোস বক্তৃতা প্রসঙ্গে ধর্ম্মঘটের সর্ত্ত গুলির আলোচনা করেন এবং শ্রমিকগণকে অনুরোধ করেন যে তাহারা যেন কাজ করিতে থাকে। ব্যাপার কি? ধর্ম্মঘট ত কয়েকদিন হইল মিটিয়া গিয়াছে, তবে এখনও সভা-সমিতি করিয়া শ্রমিকদের বুঝানর ধুম চলিতেছে কেন? তাহারা কি তাহাদের "জয় লাভে" সন্তুষ্ট নহে?

লিলুয়া ধর্ম্মঘটের জের

গত ১৭ই তারিখে হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে লিলুয়া কারখানার দেবী সহায়, রামচিজ কইরি ও রামকরণ বরাইকে হাজির করা হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা বামুনগাছি গুলি মারা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। [illegible] মিঃ [illegible] হইতে [illegible] যে, এখন বন্ধু পাইবেন [illegible] আছে, আর ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] মামলার শুনানী [illegible] উপস্থিত [illegible] মুলতবী [illegible] হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] মুলতবী রাখিয়াছেন।

[illegible]

মজুর সভার আতঙ্ক

[illegible] মিঃ গোপাল [illegible] বলিয়াছিলেন যে [illegible]পুরের মজুর সভা নাকি এখন "লাল" অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের করতলগত হইয়া পড়িয়াছে। এই কথায় উক্ত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব "অভ্রুদ্ধ" হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি সভার নিয়মাবলী ও সভ্যগণের নামের লিষ্টি দেখাইয়া প্রমাণ করিতেছেন যে তাঁহার সভার সাথে "লাল" দলের কোনও সম্পর্ক থাকিতেই পারে না।

যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে বোধ হয় অনেক "[illegible]" শীঘ্র পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র



Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৮, ১৮ই আশ্বিন | ১৭শ সংখ্যা

গাও আলোকের জয় গান

[শ্রীসৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর]

গাও আলোকের জয়গান
আঁধার-মলিন আলোক ভিখারী প্রাণ।
মহাপথিকের চরণ ছন্দে আলোকের জাগরণ
আজ যক্ষপুরীতে যক্ষেরা তারে করিয়াছে-বন্ধন।
হে বীর তুমি কি নীরবে-সহিবে আলোকের অপমান
মরণ পাথার সন্তরি তারে মুক্তি করগো দান ॥
গাও আলোকের জয়গান
আলোকের শিশু আলোক-পিয়াসী প্রাণ।
জটায়ু পাখীর আলোকের ডানা ভাঙ্গিয়াছে দশানন
দিকে দিকে আজ ধ্বনিতেছে তাই আলোকের ক্রন্দন।
আঁধারের তলে আলোকের বীজ মরিতেছে অনুখণ,
তুমি না ঘুচালে, কে ঘুচাবে বল আঁধারের আবরণ ॥
গাও আলোকের জয়গান
আলোক পাগল আলোক-ধৌত প্রাণ।
দানবেরা আজি রচিয়াছে বাধা আলোক উৎস তলে,
আলোক সুধায় বঞ্চিত মোরা মরিতেছি পলে পলে
রুদ্ধ ধারায় করহে মুক্ত আলোক মন্ত্রবলে
আঁধার পাষাণ কাঁপিবে টুটিবে বুকের শোণিত ঢলে ॥

সম্পাদক
মুজফ্ফর আহ্মদ
কালীকুমার সেন

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

A CALL TO ACTION

After years of agitation and organisation, India is still a slave-nation, is farther from freedom than ever. Why is this?

Why is the once mighty National Congress a laughing-stock before the world?

Why do our leaders invariably say one thing and do another?

For a clear, consistent Marxist analysis and explanation of these disturbing phenomena;

For a clear practical lead as to what to do to remedy this state of things,

See, "A CALL TO ACTION." Price reduced to As. 4/- only.

To be had of

1, THE WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2/1, European Asylum Lane, Calcutta

2. THE BOOK COMPANY LTD.
4/4A, College Square, Calcutta.

HELL FOUND

Or

A COMMUNIST'S THREE YEARS IN AN INDIAN PRISON.

By

S. A. Dange.

You will see here how helpless human beings are laid prostrate and beaten with shoes and sticks till they bleed, how patients in high fever are put in irons, how in the height of a Himalayan winter men are left to freeze and die.

Full of sensations and revelations.

Price Re. 1/- only.

To be had of

THE VANGUARD LITERATURE Co.
2/1 European Asylum Lane, Calcutta.

Or

THE BOOK COMPANY Ltd.
4/4A. College Square, Calcutta.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২॥০ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছ'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেণ্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেণ্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেণ্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেণ্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর

সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড | কলিকাতা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৮, ১৮ই আশ্বিন, ১৩৩৫ | ১৭শ সংখ্যা

গোড়ায় গলদ।

—:০:—

শ্রমিক আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংস্থষ্ট থাকিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে ইহার গোড়াতেই অনেক গলদ রহিয়াছে। এই সকল গলদ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের শ্রমিক আন্দোলন কিছুতেই বিপ্লবের রূপ ধারণ করিতে পারিবে না। শ্রমিকদের যত ইউনিয়ন রহিয়াছে তাহার শতকরা অন্ততঃ ৯৯টি বাহিরের লোকের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। মজুরদের ইউনিয়ন গড়ার হাজার ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা নিজেরা কিছুতেই ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি হইতে চাহেনা। এই না-চাওয়ার কারণ তাহাদের লেখা-পড়া না জানা নহে। খুব বেশীরভাগ মজুর লিখিতে পড়িতে না জানিলেও অনেক মজুর যে লিখিতে পড়িতে জানে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহারা ইউনিয়নের সেক্রেটারী কিম্বা প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি হইলে কারখানার মালিকেরা তাহাদিগকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিবে এই ভয় তাহারা করিয়া থাকে। বাস্তবিক, এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিয়াও থাকে। কাজে কাজেই ইউনিয়ন গড়ার ব্যাপার বাহিরের লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে মজুরদের আজো পর্য্যন্ত চলে না।

এই বাহিরের লোকেরা নানাপ্রকার মনোভাব লইয়া কাজ করিতে যান। কেহ যান নাম জাহির করার উদ্দেশ্যে, কাহারো উদ্দেশ্য হয় নিছক স্বার্থসিদ্ধি করা, আবার কাহারো কাহারো উদ্দেশ্য হয় লোকহিতৈষণা দেখানো। কোন কোন লোক শ্রমিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য কারখানার মালিকদের দ্বারা গোপনে নিয়োজিতও হইয়া থাকে। অতি অল্পসংখ্যক লোকই আছেন যাহারা মজুরদের লোক হইয়া ইউনিয়ন ইত্যাদি গড়িতে যাইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকগণ ছাড়া আর কেহই মজুরদিগকে তাহাদের অবস্থা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সত্যকার ভাবে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহেন না। তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী মজুরদিগকে শুনাইয়া থাকে। সর্ব্বদাই মজুরগণকে বোঝানো হইয়া থাকে যে তাঁহারা অর্থাৎ নেতৃগণ দয়া করিয়া মজুরদের সংস্রবে আসিয়াছেন বলিয়াই তাহাদের ক্বচিৎ কদাচিৎ কিছু কিছু ভালো হইয়া থাকে। মজুররা কোনো একটা কথা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুক, এরূপটা এই নেতাগণ কিছুতেই চাহেন না। যে সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিবার কোনো ক্ষমতা নেতৃগণের নাই সে সকল প্রতিজ্ঞাও তাঁহারা মজুরদের নিকটে করিয়া থাকেন। এইরূপ ধাপ্পাবাজী দিয়া দল পুরু করার চেষ্টা অনেক ভালো মানুষ নেতাকেও আমরা করিতে দেখিয়াছি। মোট কথা, যেরূপ ভাবে আন্দোলন চালানো হইয়া থাকে তাহাতে বোঝা যায় যে নেতারাই আন্দোলনের সব কিছু, আর শ্রমিকেরা উহার কেহই নয়।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করা এখনই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বার্থপর এবং উদ্দেশ্যহীন ও আদর্শহীন শ্রমিক নেতৃগণকে আন্দোলন হইতে তাড়ানো খুবই আবশ্যক। এই সম্বন্ধে "কৃষক ও শ্রমিকদল"এর সভ্যগণের দায়িত্ব অনেক বেশী। কেননা, এই দল শ্রমিকদিগের নিজস্ব দল,—তাহাদের প্রতি লোক-হিতৈষণা দেখাইয়া তাহাদের মাথা কিনিয়া লইবার জন্য এই দলের সৃষ্টি হয় নাই। অনেক সময় প্রকৃত কথা শ্রমিকেরা শুনিতে চাহেনা। সেই জন্য কোনো কোনো শ্রমিক-নেতা মনে করিয়া থাকেন যে শ্রমিকদিগকে ধাপ্পা দিয়া কাজ হাসিল করিয়া লওয়া উচিত। এরূপ করিবার কোনো অধিকার কাহারো নাই। শ্রমিকদিগের কাজ শ্রমিকেরাই করিবে, তাহাদের সংগ্রাম তাহারাই চালাইবে। বাহিরের লোক যদি তাহাদের সহিত মিশিতে যায় তাহা হইলে সেই লোকের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে প্রকৃত ঘটনা শ্রমিকদিগের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া। ইহার জন্য যদি হিতৈষী কিংবা স্বার্থান্বেষী নেতৃগণের কাজের সমালোচনা করার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাও

করিতে হইবে এবং তাহার জন্যই করিতে হইবে। শ্রমিক নেতৃগণের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। তাঁহারা আপনাদের শ্রেণী ও শ্রমিকদিগের শ্রেণীকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রমিকদিগের নিকটে তাঁহাদের শ্রেণী যাহাতে কিছুতেই খাটো না হয় এই চেষ্টার ত্রুটী তাঁহারা কিছুতেই করেন না। কোনো নেতা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা আপনাদিগের দল পুষ্টিকরে চেষ্টা করে, তখন তাহার সব দোষ [illegible] চেষ্টা করা হয় শুধু এই কারণে যে নেতাদের মধ্যে একজন [illegible] দুষ্ট হইয়াছে একথা শ্রমিকেরা জানিয়া লইবে অর্থাৎ নেতাদের শ্রেণীর উপরে শ্রমিকদিগের একটা খারাপ ধারণা জন্মিয়া যাইবে।

"কৃষক ও শ্রমিকদল" এর সভ্যগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে—এই সকল বিষয়ে শ্রমিকদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। এই জন্য যদি কাহারো অপ্রিয়ভাজন হইতে হয় তাহাতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করা উচিত নয়। অপর লোকে যাহাই কিছু বলুক না কেন, গোঞ্জামিল দেওয়া "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর সভ্যদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে। এই কথাটি আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে গোঞ্জামিল রাখিয়া কোনো কাজেই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না।

কৃষক আন্দোলন।

—:০:—

আমরা বারে বারে "গণবাণী"তে কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে লিখিয়াছি। সব সময়েই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, যে-ভাবে আন্দোলন চালানো উচিত ঠিক সেইভাবে উহা পরিচালিত হইতেছে না। যে সকল কৃষক সঙ্ঘ বা সমিতিগুলির দ্বারা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে সেই গুলির বনিয়াদ মোটেই শক্ত নহে। সঙ্ঘ বা সমিতিগুলির কোনো রীতিমত আফিস থাকে না, সভ্যদের নামও তালিকাভুক্ত করা হয় না। অধিকাংশ স্থলেই সমিতিগুলির উদ্দেশ্য ও নীতি একেবারেই পরিষ্কার নয়। নিতান্ত বাজে, মামুলী দাবী পেশ করিয়া কৃষক আন্দোলন আরম্ভ করা হয়। বেশীর ভাগ জায়গাতে কৃষকদিগকে শোষণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের সঙ্ঘ বা সমিতি আদি গঠিত হইয়া থাকে। হাজার দিক্ হইতে হাজার রকমের লোকের দ্বারা কৃষকেরা লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। মোল্লা-মৌলবীরা কৃষকদিগের ভিতরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া থাকে। কিন্তু, তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে কৃষকদিগকে শোষণ করা। কৃষকেরা সব কথা তলাইয়া ভালো করিয়া বুঝুক, ইহা এই মোল্লা-মৌলবীর দল কিছুতেই চায় না। কেন না, তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সব বিষয়ে কৃষকদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া দিতে পারিলেই তাহাদের লাভ। এই ভাবে জমীদার, জমীদারের গোমস্তা, পুলিসের দারোগা, আদালতের আমলা, উকিল-মোখ্‌তার, খবরের কাগজওয়ালা ও সুদখোর মহাজন প্রভৃতি সকলেই চায় যে কৃষকেরা চিরকাল অবুঝ ও বোকা বনিয়া থাকুক। দেশের বিদেশী গবর্ণমেণ্টও তাহাই চায়।

কৃষকদের উপকার করিবার জন্য যাহারা আজ দেখা দিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য প্রায়ই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করিয়া লওয়া। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল দলের লোকে [illegible] চেষ্টা করিয়া থাকেন [illegible]। তাঁহারা সংগ্রামী কৃষক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে চাহেন [illegible] কৃষকদের স্বার্থের খাতিরে যাঁহারা নিজেদের স্বার্থ এক করিয়া লইতে পারিয়াছেন ইঁহাদের উচিত সর্ব্বপ্রথমেই কৃষকদের সঙ্গে [illegible] করিয়া [illegible] শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া। বর্ত্তমান সময়ে যে কায়দা অনুসারে কাজ হইতেছে সেই কায়দা অনুসারে কাজ করিলে কিছুতেই চলিবে না। যখন কোনো একটা গ্রামে যাইয়া কৃষকদের একটা সভা করা হয় এবং সেই সভায় একটি প্রস্তাব পাস করিয়া বলা হয় যে "আজ এখানে একটি কৃষক সমিতি গঠিত হইল।" কাজে কিন্তু আর কিছুই হইল না। সমিতির যেখানেই সুরু আর সেখানেই শেষ। যিনি ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন তিনি চারদিক হইতে [illegible] ফেলিলেন, আর বাহিরে নিজের [illegible] করিয়া দিলেন। ইহার একটা কিছু প্রতিকার হয় না। প্রকৃত কাজ যাঁহারা করিতে চাহেন তাঁহাদের এরূপ [illegible] সমিতি গঠন করা কিছুতেই উচিত নয়। সমিতি গঠিত হইলে সেই সমিতিতে রীতিমত মেম্বর তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। খাতাপত্র, হিসাবের বহি ও রেজেষ্ট্রী বহি ইত্যাদি সবই রাখিতে হইবে। যাঁহারা মেম্বর হইবেন তাঁহাদিগকে মেম্বর হওয়ার চাঁদা দিতে হইবে। মেম্বরের সংখ্যা কম বা বেশী হওয়ার উপরেই সমিতির শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া সমিতির মেম্বর হওয়ার দায়িত্ব ও গুরুত্ব কৃষকেরা বুঝিতে পারিবে। কাজ উপর হইতে আরম্ভ না করিয়া নীচ হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। গরীব কৃষক, ক্ষেতের মজুর, গ্রামের কামার, কুমার, ধোপা ও সূতার ইত্যাদিগকে লইয়াই আমাদের কাজ,—ধনী কৃষকদের লইয়া নহে।

কৃষক সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করার উদ্দেশ্য হইতেছে যাহারা কৃষকদিগকে লুণ্ঠন করিয়া খাইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সংগ্রাম ঘোষণা করা। দলবদ্ধ কৃষকেরা বলিবে "হে শোষকগণ, এতদিন শোষণ করিয়া তোমরা আমাদিগকে অস্থিচর্ম্মসার করিয়া তুলিয়াছ। আজ আমরা তোমাদের শোষণের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইলাম, তোমাদের শোষণের শেষ করিয়া তবে আমরা ছাড়িব।"

নিম্নলিখিত দাবীগুলির ভিত্তির উপরেই সঙ্ঘগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে :—

(১) সকল প্রকারের জমীদারীর প্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন করা এবং তাহার জন্য জমীদারদিগকে কোনো ক্ষতিপূরণ না দেওয়া।

(২) পরোক্ষভাবে ট্যাক্স লওয়ার প্রথা উঠাইয়া দেওয়া।

(৩) ষ্টেট বা সরকারের তরফ হইতে ভূমি সোজা-সুজি প্রকৃত কৃষককে বন্দোবস্ত দেওয়া।

(৪) চাষের যোগ্য ভূমির একটা নিম্নতম ট্যাক্স ধার্য্য করা। এই ট্যাক্স উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশের বেশী কিছুতেই হইবে না।

(৫) সুদের হার আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া। শতকরা বার্ষিক ৭ টাকার বেশী সুদ কিছুতেই হইতে পারিবে না।

(৬) কৃষক ট্যাক্স দিতে পারিল না বলিয়া তাহার কাছ হইতে জমিন ছিনাইয়া নিতে পারিবে না। ঋণের দায়েও

কৃষকের চাষের জমিন কেহ বিক্রী করাইতে পারিবে না।

(৭) আজ কালকার উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করার প্রণালী কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া।

(৮) আঠার বা তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের নারী পুরুষ মাত্রেরই ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে।

(৯) জাতি বা বর্ণগত বৈষম্য তুলিয়া দিতে হইবে।

(১০) সংবাদপত্র পরিচালনা করার, সঙ্ঘ বা সমিতি গঠন করার এবং বক্তৃতা দেওয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

(১১) অস্ত্র ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা।

(১২) সমাজ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিয়া দেওয়া কেবলমাত্র বালক-বালিকাদিগকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করিলে চলিবে না। কমপক্ষে ৪০ বছর বয়স পর্য্যন্ত সকলেরই নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে।

(১৩) কৃষকদিগের জন্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যনিবাসসমূহ স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের স্ত্রীদের জন্য প্রসবাগারও স্থাপন করিতে হইবে।

(১৪) স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৫) কোনো সরকারী কর্ম্মচারী, তা তিনি যত বড় কর্ম্মচারীই হউন না কেন মাসে ২৫০৲ টাকার বেশী মাহিয়ানা পাইবেন না।

এই সকল দাবীসমূহ পূরণ করার উদ্দেশ্যেই কৃষক সমিতি সমূহ স্থাপন করিতে হইবে। সমিতিগুলির প্রকৃত কাজ হইবে এই সমস্ত অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কৃষকদিগকে সম্পূর্ণরূপে সজাগ করিয়া তোলা। তাহাদিগকে সংগ্রামশীল করিয়া তুলিতে না পারিলে কোনো প্রকারেই সফলতা লাভ করিতে পারা যাইবে না। কৃষকদের দাবী পূরণ হওয়ার জন্য দেশের শাসন ক্ষমতাও তাহাদের ও কারখানার মজুরগণের হাতে আসা আবশ্যক। শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিতে না পারিলে কোনো গভর্ণমেণ্টই এই সকল দাবী পূরণ হইতে দিবে না। যাহারা কৃষক ও মজুরদিগকে শোষণ করিয়া থাকে তাহাদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকিলে তাহারা মজুর আর কৃষকের দাবী কেন পূরণ করিতে যাইবে? এই জন্য দেশের কৃষক ও মজুরগণকে মিলিত হইয়া বিদেশী গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার শাসন ক্ষমতাও আপনাদের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে। অনেকে বুঝাইতে চাহিবেন যে কৃষক আর শ্রমিকের দ্বারা দেশের শাসন কার্য্য চলিতে পারে না। কিন্তু, একথা মোটেই সত্য নয়। রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিকগণ সেই দেশের সর্ব্ববিধ ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছে এবং গত এগারো বছর কাল হইতে অতি নিপুণতা ও শৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। রাশিয়ার কৃষক আর শ্রমিকেরা যাহা করিতে পারিয়াছে ভারতের কৃষক আর শ্রমিকেরাও তাহা করিতে পারিবে। কেননা, রাশিয়ার অবস্থার সহিত ভারতের অবস্থার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে।

"স্বাধীনতা সঙ্ঘ"

—:():—

লক্ষ্ণৌ সহরে যখন সর্ব্বদল সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং আরো কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম স্বাক্ষরিত হইয়া "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" (Independence for India League) কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গঠিত হওয়ার কথা সর্ব্বপ্রথমে ঘোষিত হয়। নেহেরু কমিটি ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের দাবী মাত্র করিয়াছেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এই কমিটির একজন সভ্য এবং কমিটির রিপোর্টে তিনি আপন নাম স্বাক্ষরও করিয়াছেন। ইহার পরে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে "ভারত স্বাধীনতা সঙ্ঘ" গঠিত হওয়ার অনুষ্ঠান পত্রেও তিনি আপন নাম দস্তখৎ করিতে ছাড়েন নাই। একই সময়ে শ্রীযুত বসুকে বহুরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তিনি কি করিয়া যে একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করিবেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিরোধী জিনিস। প্রথম অবস্থাকে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্তির ধাপ মাত্র মনে করার মত অসংলগ্নতা আর কিছুই হইতে পারে না। আজ যে ব্যক্তি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করার জন্য সংগ্রাম করিতেছে সে যদি তাহা পায় তাহা হইলে তাহার রক্ষার জন্যও তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, আর এই সংগ্রাম চলিবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতাকামিগণের সহিত। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুত বসু কেন দু'নৌকায় পা দিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন।

আলোচ্য সঙ্ঘের নীতি ও প্রোগ্রাম ইত্যাদি এখনও তৈয়ার হয় নাই। সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণের নিকটে পণ্ডিত জওহর লাল বলিয়াছেন যে আগামী ডিসেম্বর মাসে নীতি ও প্রোগ্রামের খসড়া প্রস্তুত হইবে। ইতিমধ্যে কোনো কোনো প্রদেশে সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হইতেছে। বাংলা কিন্তু এ বিষয়ে আরো আগাইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এবং বেশীরভাগ কারামুক্ত রাজবন্দীর সমবায়ে এখানে স্বাধীনতা সঙ্ঘের শাখা মাত্র স্থাপিত হয় নাই, শাখার নীতি ও প্রোগ্রাম আদিও তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। বাঁশের চাইতে কঞ্চিই দড় হইয়া পড়িয়াছে আর কি! এই তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম আদি তৈয়ার করিয়া ফেলার পেছনে নাকি মতলবও রহিয়াছে। গর্ব্বিত বংলা নাকি উহার বৈশিষ্ট বজায় রাখিতে চাহে, অর্থাৎ মাড়ুয়াবাদীর (অ-বাঙ্গালী মাত্রই নাকি ইহাদের মতে মাড়ুয়াবাদী) নেতৃত্ব নাকি বাংলা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। দরকার হইলে নাকি বাংলার স্বাধীনতা সঙ্ঘকে পণ্ডিত জহর লালের নেতৃত্বাধীন সঙ্ঘ হইতে স্বাধীন রাখা হইবে এবং তাহারই জন্য নাকি এই রাত তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম আদি তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১১৬, বৌবাজার ষ্ট্রীটে যে সভা হইয়াছিল সেই সভায় আমাদের কোনো লোক উপস্থিত থাকেন নাই। কাজেই, এ সম্বন্ধে শোনা কথাই আমরা লিখিয়াছি।

এখন আমরা বাংলার "স্বাধীনতা সঙ্ঘ" এর প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। নিম্নলিখিত কথারদ্বারা এই প্রোগ্রামের প্রস্তাবনা শেষ করা হইয়াছে :—

"Politics, it has been felt, cannot be divorced from our economic and Social life Political freedom can not be achieved and can not subsist without freedom in other spheres of life, specially social and economic life." অর্থাৎ "ইহা অনুভূত হইয়াছে যে রাষ্ট্রনীতি আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। জীবনের অন্য দিক্‌কার, বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মুক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি লাভও হইতে পারে না এবং স্থায়ীও হইতে পারে না।" এই ঘোষণা খুবই ভালো। কিন্তু, দু'সপ্তাহ পূর্ব্বেও বোধ হয় শ্রীযুত বসু এই মত পোষণ করিতেন না। তখন তিনি শুধু রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিতেই বিশ্বাস করিতেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিরও যে প্রয়োজন আছে তাহা তিনি মানিতেন না। "ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানীর" কাগজগুলি এই মতের বিরুদ্ধে অনেক লেখা-লেখিও করিয়াছেন, যাহা হউক, যদি এখন শ্রীযুত বসুর মত সত্য সত্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা খুবই আনন্দের বিষয় হইবে।

স্বাধীনতা সঙ্ঘ কাজের কোনো ধারা বলিয়া দেন নাই। কি প্রকারে তাঁহারা তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবেন তাহা প্রোগ্রামে কোথাও বলা হয় নাই। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ছিল তাহাই প্রোগ্রাম হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, গণ-অভ্যুত্থান, ধর্ম্মঘট এবং ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধ করা ইত্যাদিই কাজের ধারা হওয়া উচিত। ইহা যদি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে প্রোগ্রামকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য শ্রমিক ও কৃষক প্রভৃতিকে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। কল-কারখানা (Industry) সম্বন্ধে প্রোগ্রাম সুরচিত না হইলেও খুব খারাবও নয়। তবে, উহার পাঁচ ও ছ'এর ধারা দুইটি এক বারেই প্রতিক্রিয়াশীল। শ্রমিকদিগকে কিঞ্চিৎ লাভের অংশ দেওয়াটা ধনিকগণের একটা চাল মাত্র। ইহার দ্বারা তাঁহারা কারখানার প্রতি শ্রমিকদিগকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের সংগ্রাম শীলতার ভাবটা নষ্ট করিয়া দিতে চায় মাত্র। স্বাধীনতা সঙ্ঘ এই দাবী পেশ করিয়া ধনিকদের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তার পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। ছ'এর ধারায় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ শ্রমিক ও ধনিকের বিরোধে সালিসী বোর্ডের দ্বারা ব্যাপার মীমাংসা করার দাবী পেশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সঙ্ঘ ট্রেড্ ডিস্‌পিউট্ বিলকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এই বিলে সালিসী বোর্ডের কথা মোটেই বলা হয় নাই। কন্‌সিলিয়েশন্ বোর্ডের কথা মাত্র ট্রেড্ ডিস্‌পিউট্ বিলে উল্লিখিত হইয়াছে, আর শ্রমিক-তাহারই বিরুদ্ধে লড়িতেছে। স্বাধীনতা সঙ্ঘ যাহারা গঠন করিয়া-ছেন তাঁহারাও এই বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কাজের বেলায় কিন্তু, তাঁহারা নিজেরাই এতদপেক্ষা কঠোর ব্যবস্থার দাবী করিয়াছেন। ট্রেড্ ডিস্‌পিউট বিলের কন্‌সিলিয়েশন্ বোর্ডের মীমাংসা শ্রমিকেরা না-ও মানিতে পারে, কিন্তু, সালিসী বোর্ডের মীমাংসা মানিতে বাধ্য।

মূল শিল্প এবং রেলওয়ে ও ষ্টীমার ইত্যাদি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া উচিত বলাটা মোটেই যথেষ্ট নয়। বিদেশী শিল্প বিশেষ করিয়া সমগ্র বৃটিশ শিল্পও হস্তগত করিয়া লইতে হইবে এবং তাহার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হইবে না। ভারতের বৈদেশিক ঋণও অস্বীকার করিতে হইবে।

তার পরে, ভূমি সংক্রান্ত দাবীগুলিও মোটেই পরিষ্কার নয়। ন্যায়সঙ্গত (Equitable) কর কি? জমীদারী প্রথাকে উচ্ছেদ করিতে যাইয়া ক্ষতিপূরণ করার মানেই না কি? পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়াই যদি ইহার মানে হয় তাহা হইলে জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার কোনো মানেই থাকে না। যদি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার দ্বারা কোনো অল্প পরিমাণ ভূমির মালিককে হঠাৎ বিপদে পড়িয়া যাইতে হয় তাহা হইলে সেই অবস্থায় সামান্য ক্ষতি-পূরণ করিলেও করা যাইতে পারে। সেই ব্যবস্থাও সবদিক খুব ভালরূপে দেখিয়া তবে করিতে হইবে। কৃষকদের ঋণ রদ করিয়া দেওয়া, অথবা ষ্টেট বা সরকারের তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবীও একেবারেই অর্থহীন। সরকারকে ত সেই টাকাটা কৃষকদের নিকট হইতেই আদায় করিতে হইবে! এমন সব ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো কথাই উঠিতে পারে না। প্রকৃত সময় যখন উপস্থিত হইবে তখন কোনো বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা অবশ্য করা যাইতে পারিবে।

রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের দাবীতেও অনেক কথা বাদ পড়িয়াছে। সার্ব্বজনীন ভোটের অধিকারের কথা উল্লেখই করা হয় নাই। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধেই বা নির্ব্বাক কেন? এ গুলির ধ্বংস কি সাধন করিতে হইবে না? অবশ্য এই শ্রেণীর প্রোগ্রামে কোনো কিছুর বিশদভাবে আলোচনা করা চলে না। তবে বিশিষ্ট প্রশ্নগুলি ছাড়িয়া দিলেও প্রোগ্রামের কোনো মূল্য থাকে না।

মোটের উপরে প্রোগ্রাম জোরের হয় নাই। ইহার ভিতর হইতে দুর্ব্বলতার লক্ষণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইহার দ্বারা কাহারো উপর কোনো বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হয় নাই। প্রোগ্রামের দাবীগুলির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে খুব গরম আন্দোলন চালানো যাইবে বটে, কিন্তু, যখন জনগণ প্রতিজ্ঞা-পূরণের জন্য আসিয়া ধরিবে তখন দেখা যাইবে যে তাহাদিগকে কিছুই দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হয় নাই। সমগ্র প্রোগ্রামটা পড়িয়া কেহ যদি নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে তিনি বলিতে বাধ্য হইবেন যে প্রোগ্রাম রচয়িতৃগণের প্রাণের টান দেশের জন-গণের চাইতে ধনিক ও জমীদারগণের উপরেই বেশী।

দেশ বিদেশ

আফ্‌গান ছাত্র-ছাত্রীর বিদেশ যাত্রা

আফ্‌গান ছাত্র-ছাত্রীর আর একটা দল বিদেশে যাত্রা করিয়াছে। এই দলে ছাত্রীর সংখ্যা আটজন। ইহাদের সকলেরই চুল খাটো করিয়া ছাটা এবং সকলেই হাল ফ্যাসনের পোষাক পরিধান করিয়াছে। বোম্বের পথে দিল্লীতে সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ এই ছাত্রদের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ছাত্রেরা বলিয়াছে যে আফ্‌গানিস্থানের তরুণ সম্প্রদায় দেশকে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন করিয়া তোলার পক্ষপাতী। নারী-জাগরণের জন্য রাণী সৌরিয়া অদম্য উৎসাহে কাজ করিতেছেন। মৌলবীরা তাহাদের পচা খেয়াল ল অনেক গোলমাল করিয়াছিল,

তন্ত, কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। আফগানিস্থানের তরুণ তরুণীরা অজ্ঞতা আর কু-সংস্কারের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবে। তাহারা এমন এক ধর্ম্মের বিবর্ত্তন করিতেছেন যাহাতে মানুষই সব চাইতে বড় বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সকল ছাত্রগণ সরকারী বৃত্তি লইয়া কনষ্টান্টিনোপোলে পড়িতে যাইতেছে।

ডাক-বিভাগের ধর্ম্মঘট

চীনের শাংহাই সহরের ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এই কর্ম্মিগণ শতকরা ৩৩ টাকা বেতন বৃদ্ধি চাহিয়াছে। একটা ভাতা পাওয়ার দাবীও তাহারা করিয়াছে। শাংহাইতে তাহাদের ইউনিয়ন গড়া ও রক্ষাকল্পে তাহারা এককালীন ১০হাজার ডলার ও মাসিক ২ শত ডলার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দাবী করিয়াছে।

সাংহাইতে ডাকবিভাগে ধর্ম্মঘট

সাংহাইয়ের ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা শতকরা এক-তৃতীয়াংশ বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়াছে এবং একটি বিশেষ ভাতা ও চাহিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ সাংহাই ইউনিয়ন গঠনের জন্য অবশ্যই ১০ হাজার ডলার দিবেন এবং উহার রক্ষার জন্য মাসিক ২০০ ডলার প্রদান করিবেন। ইউনিয়নের অনুমতি ভিন্ন কোন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা যাইবে না এবং ইউনিয়নের কমিটি সদস্যদিগকে ডাক টিকিট প্রভৃতির ব্যবহার হইতে রেহাই দিতে হইবে। পুলিশ পোষ্ট অফিসের ভার লইয়াছে এবং অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া কার্য্য চালান হইতেছে।

জাপানীদিগের বিরুদ্ধে বয়কট—

জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত চীন সংবাদপত্র সমূহ স্পর্শ করিতে কর্ম্মচারীরা অস্বীকার করায় পুলিশের সাহায্য চাহিয়া পাঠানো হইয়াছিল। ধর্ম্মঘটের ইহাই মূল কারণ। ডাকের ব্যাগগুলি স্তূপীকৃত হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। অতি সামান্য লোক কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু, খুব ভয়ে ভয়ে। বিদেশী বয়স্কাউটগণ ডাকের চিঠি বিলি করিতেছে। শ্রমিকেরা পরে প্রতিশোধ নেয় এইভয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কোনো নূতন লোক নিযুক্ত করিতেছে না।

মুকুন্দলাল সরকার অসুস্থ

সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ধর্ম্মঘট ব্যাপারে মুকুন্দলাল সরকার ও সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ার ধৃত ও অভিযুক্ত হইয়াছেন। খবর আসিয়াছে যে সরকার মহাশয় হাজতে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বাতরোগে ভুগিতেছেন। তাঁহার চেহারা খুব কালো হইয়া গিয়াছে।

গান্ধীর গো-হত্যা।

মিঃ গান্ধীর আশ্রমে একটি বাছুর অত্যন্ত কঠোর পীড়ায় ভুগিতেছিল এবং উহার বাঁচিবার কোনো আশা ছিল না বলিয়া মিঃ গান্ধীর আদেশে উহাকে হত্যা করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাউথ ইণ্ডিয়া রেলে ধর্ম্মঘট
অনেক লোকের শাস্তি

তুতিকোরিণ, ১লা অক্টোবর

দক্ষিণ ভারত রেল ধর্ম্মঘট সম্পর্কিত দুইটি মামলার রায় এখানকার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদান করিয়াছেন। তিনি ১৬ জন লোকের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন এবং ৮ জন অল্প বয়স্ক বালককে চরিত্র সংশোধনাগারে পাঠাইবার হুকুম দিয়াছেন ও ২ জনকে মুক্তি দিয়াছেন। ঈশ্বর বক্তার নামক একজন লোক এখানে প্রচার কার্য্যের জন্য আসিয়া রেল পুলিশের গুলীতে আহত হয়। তাঁহার প্রতি ১ বৎসরের জন্য জামীন দিবার আদেশ হইয়াছে।

ডকে দুর্ঘটনা।

গত বৃহস্পতিবার রামলোচন নামক একজন শ্রমিক যখন খিদিরপুর ডকে কাজ করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার মাথায় প্রকাণ্ড এক চাই কয়লা পড়িয়া গিয়া তাহার মাথায় সাংঘাতিক আঘাত লাগে। তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছিল।

বাতাস খাইয়া ত বাঁচিতে পারি না!

১৪ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের একটী দোকান হইতে ৪০ টাকা মূল্যের কতকগুলি জিনিষ চুরি করিবার অভিযোগে জোসেফ নামক এক পুরাতন পাপী অভিযুক্ত হয় ও চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আসামী ইতঃপূর্ব্বেও ৪ বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সে চুরি কেন করিয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশ্ন করায় সে বলে,—আমি বাতাস ও ধুলা খাইয়া ত বাঁচিতে পারি না!

অমৃতসরে দুর্ঘটনা।

অমৃতসরের একটী কারখানায় একটী বাড়ী চাপা পড়িয়া ৪ জন স্ত্রীলোক ও ১ জন পুরুষ শ্রমিক মারা গিয়াছে, এবং ২ জন শ্রমিক জখম হইয়াছে। এমন খারাপ বাড়ীতে এত লোক কাজ করিতে দেওয়ার মানে কি?

কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন।

বিগত ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে লায়ালপুরে পাঞ্জাব "কৃষক ও শ্রমিকদল" এর (Workers' and Peasants' Partya) দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবের প্রত্যেক

প্রান্ত হইতে কৃষক ও শ্রমিকগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। কমরেড শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বোম্বে বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সংসৃষ্ট থাকায় সম্মিলনে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে লাহোর ন্যাশন্যাল কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল ছবিল দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন লালা রামচন্দ্র কাপুর। সম্মিলনে বিপ্লবাত্মক শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইয়াছে। নানা অপরিহার্য্য কারণে "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর পক্ষ হইতে কোনো প্রতিনিধি সম্মিলনে যোগদান করিতে না পারায় লিখিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

বোম্বে ধর্ম্মঘটের অবসান—

প্রায় ৭ মাস পরে বোম্বের কাপড়ের কলের ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। বোম্বের "কৃষক ও শ্রমিকদল"এর অদম্য পরিশ্রমের ফলে শ্রমিকেরা যেরূপ দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মঘট পরিচালনা করিয়াছিল তাহার তুলনা ভারতবর্ষে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘটের কল্যাণে এবং 'কৃষক ও শ্রমিকদল"এর অবিশ্রান্ত প্রচারের ফলে বোম্বের শ্রমিকগণ আজ সত্যকার ভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কিসে কি হইয়া থাকে এবং কিসে কি হয়না তাহা বোম্বের শ্রমিকেরা খুব ভাল ভাবেই বুঝিয়া লইয়াছে। বোম্বের ধর্ম্মঘট সজাগ, সচেতন শ্রমিক সৃষ্টি করিয়াছে,—হাওড়া আর খড়্গপুরের ন্যায় 'জটাধারী বাবা' আর "মহাত্মা নাইডু" সৃষ্টি করে নাই। ইহাই হইতেছে বোম্বে ধর্ম্মঘটের সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ। কয়দিন হইতে বোম্বে গবর্ণমেণ্টের জেনেরেল মেম্বর সার গোলাম হোসায়ন হিদায়তুল্লার সহিত কলের মালিকগণ আর যুক্ত ধর্ম্মঘট কমিটির বৈঠকের ফলে ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি স্থিরকৃত হইয়াছে :—

(১) গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ৩ জন লোকের একটি কমিটি নিযুক্ত হইবে এবং এই কমিটি স্থির করিবে যে কলের মালিকগণের তৈয়ার করা স্কীম ও যুক্ত ধর্ম্মঘট কমিটির স্কীমের মধ্যে কোনটি সঙ্গত ও গ্রহণ করা উচিত।

(২) এই কমিটির মীমাংসা হওয়া পর্য্যন্ত শ্রমিকেরা ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসের হারে মজুরী পাইবে।

প্রথম নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন।

আগামী ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় "প্রথম নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল সম্মিলন" (The Frist All-India Workers' and Peasants' Party Conference) এর অধিবেশন হইবে। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল" এর অধিনায়কত্বে এই সম্মিলনের কার্য্যনির্ব্বাহ করার জন্য একটী অভ্যর্থনা সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সম্মিলনের উদ্দেশ্য হইবে "নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল" (Workers' and Peasants' Party of India) গঠন করা। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা, বোম্বে ও পাঞ্জাব এই তিনটী প্রদেশে "কৃষক ও শ্রমিকদল" গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য আরো অনেক জায়গায়ও ছোট ছোট সমিতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুদায়কে একই সূত্রে গাঁথিয়া সমগ্র ভারতীয় দল গঠিত হইবে। "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" এর সভ্য মাত্রেরই এই সম্মিলনকে সফল করিবার জন্য এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। ইহার কার্য্য সমাধা করার জন্য কম পক্ষে দুই হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। সেই টাকার যোগাড়ও এখন হইতেই করিতে হইবে।

"কৃষক ও শ্রমিক দল" এর নীতি ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে জন-সাধারণের নিকটে প্রকাশ করা হইয়াছে। দলের মুখপত্র "গণবাণী"ও সর্ব্বদা দলের নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি সাধারণ্যে প্রচার করিতেছে। যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন এবং তদনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদের সকলেই দলের সভ্য হইতে পারেন। কলিকাতা ২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন ঠিকানায় "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর জেনেরেল সেক্রেটারীকে পত্র লিখিলেই মেম্বর হওয়ার ফারম ও নিয়মাবলী ইত্যাদি পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দলের দ্বারা প্রকাশিত "A CALL TO ACTION" নামক পুস্তকখানা পড়িয়া দেখিবেন। দাম মাত্র চারি আনা।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

Reg. No. C. 1440.

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

গণবাণী

GANAVANI

Official Organ of the
WORKERS' AND PEASANTS' PARTY OF BENGAL
2-1, European Asylum Lane, Calcutta.

২য় খণ্ড | কলিকাতা, শনিবার, ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৮, ২৭শে আশ্বিন | ১৮শ সংখ্যা

শারদীয় অবকাশ

পূজার সময় প্রেস বন্ধ থাকিবে। কাজে কাজেই আমাদিগকেও বাধ্য হইয়াই "গণবাণী" দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে। ইহার পর কাগজ ১লা নবেম্বর তারিখে বাহির হইবে।

বিনীত—
ম্যানেজার, "গণবাণী"

সম্পাদক
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
কালীকুমার সেন

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দু'পয়সা
বার্ষিক মূল্য—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২॥০
Foreign Subscription : Annual 6s.

"গণবাণী"র নিয়মাবলী

"গণবাণীর বার্ষিক মূল্য ২৷৷৹ এবং ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৹ আনা মাত্র।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দু'পয়সা।

এক সঙ্গে অন্ততঃ ২৫ খানা কাগজ না নিলে মফস্বলে কাহাকেও এজেণ্ট করা হবে না। প্রতি ২৫ খানা কাগজের জন্যে এজেণ্টগণকে ৪ টাকা আফিসে জমা রাখ্‌তে হবে।

এজেণ্টগণের নিকট হতে শতকরা ৫ খানা অবিক্রীত কাগজ ফেরৎ নেওয়া হবে।

এজেণ্টগণ শতকরা ২৫ টাকা হারে কমিশন পাইবেন।

ম্যানেজার, "গণবাণী"
২।১, ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন,
কলিকাতা।

গণবাণী

"বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল"এর
সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বিপ্লব বিষয়ে লেখা-লেখি করার চেয়ে বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সময় অতিবাহিত করা বেশী আনন্দ দায়ক এবং অধিকতর কার্য্যকরী।"

—লেনিন—

২য় খণ্ড	কলিকাতা, শনিবার, ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৮, ২৭শে আশ্বিন, ১৩৩৫	১৮শ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

"স্বাধীনতা সঙ্ঘ"

স্বাধীনতা সঙ্ঘ সম্বন্ধে আমরা আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির ভিত্তির উপরেই এই সঙ্ঘ উহার পূর্ণ স্বাধীনতা-সৌধ গড়িয়া তুলিতে চায়। যদি এই উদ্দেশ্যই সত্য হয় তাহা হইলে এই সঙ্ঘ জনগণের সঙ্ঘই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, কংগ্রেসের ভিতরে তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? কংগ্রেস একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান হইতে পারে, ৪২ বছর বয়সের একটা অহঙ্কার উহার থাকিতে পারে, কিন্তু জনগণের অনুষ্ঠান ত আর উহা হইতে পারে না! কংগ্রেসের ভিতরে ধনিক-বণিক-জমিদার ও সম্মোহিত এবং শোষিত নিম্ন মধ্যশ্রেণীর লোকেরাও রহিয়াছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা যতই শোষিত ও নির্য্যাতিত হউন না কেন, তাঁহারা সকলেই সম্মোহিত হইয়া আছেন। তাঁহাদের ভিতরকার মিথ্যা ভদ্র মানসিকতা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শোষক শ্রেণীর সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের অনেকের আবার উদ্দেশ্য হইতেছে কোনো না কোনো দিন শোষকের শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়া। কিন্তু, কৃষক ও শ্রমিকগণের সহিত শোষক শ্রেণীর এইরূপ কোনো সম্বন্ধই স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নয়। কেননা, খাদ্য খাদকের মধ্যে কোন প্রকারের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজে কাজেই, কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়াও যে স্বাধীনতা সঙ্ঘ জনগণের প্রতিষ্ঠান হইতে পারিবে, এরূপ কোনো সম্ভাবনা নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এখানে মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন। তিনি মধ্যশ্রেণীর তরুণ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের দ্বারা যতই অভিনন্দিত হউন না কেন, তাঁহার প্রচারকার্য্য বা মিশনের ততক্ষণ কোনো মূল্যই থাকিবেনা যতক্ষণ না তিনি জনগণের সঙ্গে তাহাদের একজন হইয়া মিশিবেন। পণ্ডিত জওহরলালের সমর্থক গণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা কংগ্রেসকে অধিকার করিয়া লইবেন। যদি তাহাই সত্য হয় তাহা হইলে সেজন্যও স্বাধীনতাসঙ্ঘ স্বাধীনভাবে গঠিত হওয়া উচিত ছিল। তাহা না হইলে জনগণের সহিত উহার সংযোগ সাধিত হইবে কি প্রকারে? জনগণের নিজস্ব দল থাকিবে এবং "কৃষক ও শ্রমিকদল" সেই উদ্দেশ্যেই গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল কৃষক ও শ্রমিক দলের চাইতে অধিকতর বিপ্লব-মূলক কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ার চাইতে তাঁহার উচিত ছিল কৃষক ও শ্রমিকদলে যোগদান করা।

———

গ্লাস কারখানার অত্যাচার

দমদমা গোরাবাজারে "বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেডের" কারখানায় শ্রমিকদের উপরে নানাভাবে অত্যাচার হইতেছে। বিশেষ করিয়া শ্রমিকদিগের খাটুনির কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। শ্রমিকদিগকে দৈনিক ১২ হইতে ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নাকি খাটিতে হয়, তাহা ছাড়া ১২ বছরের কম বয়সের বালকদিগকেও নাকি কারখানায় খাটানো হয়। এই সব খুব সাংঘাতিক অভিযোগ। যদি সত্য হয় তাহা হইলে কারখানার পরিদর্শক বিভাগের পক্ষে ইহা খুবই লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। যেখানে এত অনিয়মিত রূপে কারখানা চালানো হয় সেখানে ফ্যাক্টরী ইন্‌স্পেক্টরগণের এতটুকু যোগ্যতা থাকিলেই তাহা ধরা পড়িয়া যায়। সেদিন কলিমুল্লা নামক কারখানার একজন শ্রমিক ব্যারাকপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে কারখানার ম্যানেজার মিঃ অনাদি সেনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে। মিঃ সেন নাকি এই শ্রমিকটিকে লোহার শিকের দ্বারা প্রহার করিয়াছেন। মোকদ্দমা এখনো বিচারাধীন বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা। তবে প্রহারের চিহ্ন কলিমুল্লার গায়ে আমরা দেখিয়াছি। বলা বাহুল্য এই কলিমুল্লা "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক

দল"এর একজন সভ্যও বটে। এই কারখানাগুলিকে জাতীয় সম্পদ বলিয়া এক শ্রেণীর লোক খুবই উল্লম্ফন করিয়া থাকে। এই জাতীয় সম্পদটিতে শ্রমিকদের উপরে যে অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার সামান্যমাত্র বিবরণ আমরা দিয়াছি। ভবিষ্যতে ইহার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আমরা বলিব। সম্প্রতি এইটা মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কারখানাটি অনেকটা সেন পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। বড় ভাই ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ছোট ভাই জেনেরেল ম্যানেজার, ভগ্নিপতি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং অপর একজন আত্মীয় চৌকিদার, বাবাটিও একজন ডিরেক্টর বটেন। এই অবস্থায় অংশীদারগণের এইটুকু হুঁশিয়ার হইয়া চলাই কর্ত্তব্য।

কুমিল্লা শ্রমিকভবন

কুমিল্লার "শ্রমিক ভবনের" (House of Labour) এর সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ আমাদের নিকটে আসিয়াছে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডপ্রাপ্ত শ্রীযুত যোগেশ চট্টোপাধ্যায় এই শ্রমিক ভবনের প্রতিষ্ঠাতা। গোড়ায় ইহা কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলনা। সকল শ্রমিকেরই সমান অধিকার এই কারখানায় ছিল। সম্প্রতি ইহা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং কয়েকজন লোক ইহার মালিকও সাজিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা কিসে যে মালিক হইলেন তাহা নাকি কেহই জানেন না। এখন এই কারখানাতে শ্রমিকদের উপরে অকথ্য অত্যাচার হইতেছে। তাহাদের নাকি মার পিটও করা হইতেছে। শ্রমিকদের থাকা আর খাওয়ার বন্দোবস্তও যার পর নাই খারাব। তাহাদিগকে বারো ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। এই সব-বিষয়ে অভিযোগ করিলেই নাকি শ্রমিকদিগকে কাজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই কারণে কিছুদিন পূর্ব্বে ২২ জন শ্রমিক কাজ হইতে বরখাস্ত হইয়াছিল। এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করিয়া আরো ৪ জন শ্রমিক কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহার পর শ্রমিকদের সমস্ত দাবী মানিয়া লওয়ার পরে তাহারা আবার কাজে ফিরিয়া যায়। কিন্তু এখন এই তথা কথিত মালিকগণ নাকি আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। শীঘ্রই হয়ত ব্যাপার আবার গুরুতর আকার ধারণ করিবে। এই সকল অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহা হইলে খুবই পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে। এই শ্রমিক ভবনের এখন যাঁহারা মালিক হইয়াছেন তাঁহাদের কয়েকজন রাজবন্দীও ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য ইহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রমিকদের সহিত যে ব্যবহার তাঁহারা করিতেছেন স্বাধীনতা লাভ করিলে এইরূপ ব্যবহারই কি তাঁহারা দেশের জনসাধারণের সহিত করিতেন ?

নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন

আগামী ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা সহরে "প্রথম নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল সম্মিলন" এর অধিবেশন হইবে। "সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদল" Workers' and Peasants' Party of India) গঠন করাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য হইবে। "কৃষক ও শ্রমিক দল" বোম্বে, পাঞ্জাব ও বাংলা এই তিনটি প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে গঠিত হইয়াছে। অবশ্য এই সব কয়টি দলই একই কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া কাজ করিতেছে। এই তিনটি প্রদেশ ব্যতীত ভারতের আরো অনেক জায়গায় "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর কর্ম্মপদ্ধতিতে আস্থাবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীও গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই "সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" গঠিত হইবে।

সম্মিলনের মোটামুটী আলোচ্য-বিষয় হইবে :

(১) রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এবং কৃষক ও শ্রমিক দলের কর্ত্তব্য।

(২) কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্য্যতালিকা,

( ) সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের নিয়ম-কানুন,

(৪) সংগঠনের কাজে দলের কর্ত্তব্য,

(৫) কৃষক ও শ্রমিক দলকে কোনো আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা।

কৃষক ও শ্রমিক দল সমগ্র ভারতের শোষিত ও নির্য্যাতিত জন-সাধারণের দল। যে সকল শ্রেণী পরের মেহনত লুণ্ঠন করিয়া ভোগ-বিলাসে জীবন ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেশের জন-সাধারণ নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং এই প্রতিষ্ঠার কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করাই "কৃষক ও শ্রমিক দল" এর প্রধান কাজ। শোষণের কাজে লিপ্ত যাহারা রহিয়াছে তাহাদের সহিত শোষিত জন-সাধারণের কোনো সম্বন্ধই স্থাপিত হইতে পারে না। "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসে" শোষক শ্রেণীর লোকেদেরই প্রভুত্ব বেশী। কংগ্রেসের মান্দ্রাজ অধিবেশনে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব পাশ হওয়া সত্বেও উহা সর্ব্বদল সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনই মাত্র পাইতে চাহিয়াছে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিলে দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যাইবে এবং দেশে বৃটীশ ধনিকগণের শোষণও অব্যাহত থাকিবে,তবে অবশ্য দেশীয় ধনিক ও উচ্চস্তরের লোকদেরও সুবিধা অনেক বাড়িয়া যাইবে,—অর্থাৎ শোষণের অংশে তাহারা বেশীর ভাগ বসাইতে পারিবে। এই জন্যই আমাদের সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই পাইতে চাহে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে পূর্ণ স্বাধীনতার নাম করিয়া থাকে তাহা নিতান্তই মনকে চোখঠার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বিদেশী শাসনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করাকেই অনেকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সত্যকারের স্বাধীনতা তাহা নহে। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের মানে হইতেছে বৃটিশ ও ভারতীয় ধনিকগণের শোষণ হইতে দেশের জনগণকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করা এবং দেশে জনসাধারণের ক্ষমতা ও শাসন স্থাপন করা। ইংরেজ ধনিকগণ কেবলমাত্র শোষণের জন্যই আমাদের দেশ শাসন করিতেছে। তাহাদের শোষণের শেষ হইলে শাসনও আর থাকিবে না।

যে কলটার দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ শাসিত হইয়া থাকে তাহার উপরে যতক্ষণ না কৃষক, শ্রমিক ও শোষিত নিম্নমধ্যশ্রেণীর লোকদের পূর্ণ ক্ষমতা স্থাপিত হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের অভাব অভিযোগের ষোলো আনা প্রতিকার কিছুতেই হইতে পারে না। শোষকগণের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়াই তাহারা যেমন ইচ্ছা জন-সাধারণকে শোষণ করিতে পারে। এই শোষণের জন্যই অর্থাৎ জন-সাধারণের মেহনতের কড়ি অপরে লুটিয়া খায় বলিয়াই আজ আমাদের

দেশের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নমধ্যশ্রেণীর লোকগণ দুর্গতির চরম সীমায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

"কৃষক ও শ্রমিক দল" এই শোষিত ও নির্য্যাতিত জন-সাধারণকে একই পতাকার নীচে সমবেত করিবে এবং তাহাদের অধিকার লাভের জন্য তাহাদিগকে শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিচালনা করিবে। "সমগ্র ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" গঠনের দ্বারা ভারতের জন-সাধারণের শক্তি কেন্দ্রীভূত ও বদ্ধিত হইবে। দেশের জন-সাধারণ অর্থাৎ শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকগণ আপনাদের শক্তিশালী দল গড়িয়া তুলিতে না পারিলে তাহারা সংগ্রামে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিবেনা। এই দল কংগ্রেসের ভিতরে কিছুতেই গঠিত হইতে পারে না, কেন না, কংগ্রেসে শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বই বেশী।

"প্রথম নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল সম্মিলন"এ ভারত বর্ষের সকল জায়গা হইতে জন-সাধারণের প্রতিনিধি যোগদান করিবে। ইহার দ্বারা ভারতের জন-সাধারণের মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও শোষিত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকগণের প্রচুর সংখ্যক প্রতিনিধি এই সম্মিলনে যোগদান করা উচিত। জন-সাধারণের অভাব, অভিযোগ ও অধিকার সম্বন্ধে এই সম্মিলন তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিবে।

কৃষক ও শ্রমিক দলের ব্যক্তিগত সভ্য যাঁহারা হইবেন তাঁহারাই সম্মিলনে যোগদান করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া কৃষক ও শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘ সমূহও সম্মিলনে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে। যে কোনো কৃষক ও শ্রমিক কম পক্ষে চারি আনা পয়সা চাঁদা দিলে এবং দলের উদ্দেশ্য মানিয়া লইলে উহার ব্যক্তিগত সভ্য হইতে পারিবেন। অ-কৃষক বা অ-শ্রমিক যদি ব্যক্তিগত সভ্য হইতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে কম পক্ষে এক টাকা চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য এই শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে দলের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি বিশেষ যাঁচ করিয়া দেখিবে যে যাঁহারা মেম্বর হইতে চাহেন তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চশ্রেণিত্বর মানসিকতা পরিহার করিতে পারিয়াছেন। কারখানার শ্রমিক কিংবা জাহাজের নাবিক ইত্যাদি তাঁহাদের নিজ নিজ ইউনিয়নের মেম্বর হওয়া সত্ত্বেও "কৃষক ও শ্রমিক দলের" সভ্য হইতে পারিবেন। ইউনিয়নের উদ্দেশ্য—শ্রমিকগণের বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় কমানো, ঘুষ বন্ধ করা এবং ভালো ঘরে থাকা, রোগে ছুটী ও মাহিনা পাওয়া, বৃদ্ধাবস্থায় কাজে অপরাগ হইলে পেন্সনের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য সংগ্রাম করা। কৃষক ও শ্রমিক দলের উদ্দেশ্য আমরা উপরে বর্ণনা করিয়াছি। এই দল শ্রমিকগণের শোষণের গোড়াতেই ঘা দিবে, অর্থাৎ দেশের সমস্ত অধিকার শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকদের হাতে আনয়ন করিবে। আজ যেখানে শ্রমিকেরা মাহিয়ানাভোগী গোলাম বলিয়া পরিগণিত হয় সেখানে তাহারাই এই দলের কল্যাণে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবে। কাজে কাজেই শ্রমিকদিগের পক্ষে তাঁহাদের আপন আপন ইউনিয়ন এবং কৃষক ও শ্রমিকদল এই উভয়েরই মেম্বর হওয়া উচিত।

কৃষক ও শ্রমিকদলের আফিস, কলিকাতা ২।১ ইউরোপিয়ন এসাইলাম লেনে রহিয়াছে। নিজে আসিয়া কিংবা দলের জেনেরেল সেক্রেটারীকে পত্র লিখিয়া সকলে মেম্বর হইতে কিংবা অন্যান্য খবর জানিতে পারিবেন।

ধর্ম্মঘটের স্মৃতি

—০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[কালী সেন]

—০—

লিলুয়ায় যখন পঁহুছিলাম তখন রাত্রি অনেক হ'য়ে গেছে। সে রাত্রে আর কোনও কথা বার্ত্তা হ'ল না। যে যেখানে পারলে শুয়ে পড়া গেল। মনে হ'তে লাগল যেন দিনের যুদ্ধের পর সেনানীরা রাত্রির বিশ্রাম লাভ করছে।

পরদিন সকালে উঠে বন্ধুবর গোপেন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে হাওড়ার ইউনিয়ন আফিসে গেলাম। দেখলাম পাশাপাশি দুইখানি ছোট ঘর। সামনে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে "Factory Workers' Union." অনুসন্ধানে জানলাম, Burns, Jessop ও Martin কোম্পানীর কারখানা সমূহের শ্রমিকদের ইউনিয়ন ঐখানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। লিলুয়া কারখানার ধর্ম্মঘটের সঙ্গে Burns, Jessop প্রভৃতির কারখানার কি সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে উক্ত কারখানাগুলির শ্রমিকেরা লিলুয়ার লোকদের সঙ্গে সহানুভূতি সূচক ধর্ম্মঘট করেছে এবং ধর্ম্মঘট ঘোষণা করবার পর তাদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। ধর্ম্মঘটের পূর্ব্বে ইউনিয়নের কোনও অস্তিত্ব ছিল না এবং ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তাও কেহ এর আগে বোধ করেনি।

আমরা সেখানে পঁহুছিবার অনেক আগে থেকেই দেখলাম বহু শ্রমিক জমায়েত হয়েছে। আফিস ছোট, কাজেই অনেকেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে জটলা করছে দেখা গেল। আমরা পঁহুছিবা মাত্রই সকলে আমাদিগকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল মিত্রবাবু কখন আসবেন।

লিলুয়া ধর্ম্মঘটের নেতা কে, সি, মিত্রের নাম পূর্ব্বে কখনও শুনিনি। এই ধর্ম্মঘটের প্রারম্ভ থেকেই তাঁর নাম সাধারণের কাছে সুপরিচিত হয়ে পড়ে। লিলুয়া ও হাওড়ার শ্রমিকেরা তাঁহাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে দেখলাম। মিত্র ইউনিয়নের মোটরে আসিয়া উপস্থিত হবা মাত্রেই বহুলোক তাঁহাকে ঘিরে ফেলল ও ভক্তিভরে অভিবাদন করতে লাগল। সকলেই তাঁর কথা শুনবার জন্য ব্যস্ত। সমবেত শ্রমিকদের মধ্যে বাঙ্গালী খুব কম দেখলাম। প্রায় সকলেই বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লোক। মিঃ মিত্র সকলের সঙ্গেই ২টা ৪টা কথা ক'য়ে ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

লিলুয়া কারখানায় তালা বন্ধ থাকার দরুণ সে অঞ্চলে পিকেটিং এর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বার্ণ, জেসপ প্রভৃতির কারখানা খোলা ছিল, সেইজন্য ঐ সকল জায়গায় পিকেটিং এর রীতিমত বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। তা ছাড়া ই, আই আর এর ট্রাফিক, জেনারেল ষ্টোরস্ প্রভৃতি বিভাগেও ধর্ম্মঘট বিস্তৃত হ'য়েছিল এবং ঐ সব অঞ্চলেও রীতিমত পিকেটিং চালাতে হয়েছিল। পিকেটিংএর কাজ সুচারুরূপে চালাবার জন্য শ্রমিকদের মধ্য থেকে বহুসংখ্যক ভলান্টিয়ার সংগৃহীত হয়েছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাদের কাজ ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এক একটী দলে ১০ থেকে ২০ জন ভলান্টিয়ার এক একজন নায়কের কর্ত্তৃত্বাধীনে কাজ করছিল। এই ভলান্টিয়ার দলের কাপ্তেন বা প্রধান নায়ক ছিলেন শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পিকেটিংএর বন্দোবস্তে যা'তে ত্রুটী না থাকে তাহা দেখবার জন্য তাঁকে

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লিলুয়া থেকে বাঁটরা পর্য্যন্ত ঘুরতে হ'ত। সেই জন্য তাঁকে একখানা সাইকেল দেওয়া হ'য়েছিল। গোপেন্দ্রের উপদেশ মত আমি কয়েক অঞ্চলের পিকেটিং পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করলাম।

পিকেটিংএর বন্দোবস্ত যা দেখলাম তা খুবই সন্তোষজনক বোধ হ'য়েছিল। কারখানাগুলির সামনে পাহারার বন্দোবস্ত ক'রেই শ্রমিকরা ক্ষান্ত ছিল না। প্রতি মহল্লায় যেখানে শ্রমিকরা থাকে সেই সকল জায়গাতেও রীতিমত পাহারা চল্‌ছে দেখলাম। মহল্লা থেকে কোন শ্রমিকই যাতে কাজে যেতে না পারে সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। আমি যে কয়েকটী অঞ্চলে ঘুরলাম সর্ব্বত্রই দেখলাম বেশ সুন্দর ভাবে কাজ হচ্ছে। কোনও গোলমাল নাই। পিকেটারেরা যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে বা বসে পাহারা দিচ্ছে এবং নায়কদের হুকুম ঠিক ঠিক মেনে নিচ্ছে।

এই পিকেটিংএর ব্যাপারে পুলিসের সঙ্গে পিকেটারদের প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ত। রাস্তায় চার পাঁচ জন পিকেটারকে একত্র সমবেত দেখলেই অনেক সময় পুলিশ তা'দের ধ'রে থানায় হাজির করত। তৎক্ষণাৎ আপিসে খবর পৌঁছে যেত এবং তাদের জামিনে ছাড়িয়ে আন্‌বার জন্য ছুটতে হত। এই কাজের ভার ছিল প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত দীনেশ হাজরার ওপর। তাঁকে দিনের মধ্যে অনেক বারই থানায় ছুটে যেতে হত এবং এ বিষয়ে তাঁর ক্লান্তিবোধ ছিল না।

এই সংক্রান্ত যে সব মামলা পুলিশ কোর্টে উপস্থিত হ'ত তাহার পরিচালনার ভার ছিল শ্রীযুক্ত শান্তিরাম মণ্ডলের উপর—সুতরাং তাঁকে সমস্তদিন আদালতেই কাটাতে হ'ত এবং উকীল মোক্তারের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে হ'ত।

বামুনগাছিতে যখন গুলি চলেছিল তখন বন্দুকের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিলেন এই শান্তিরাম মণ্ডল। বামুনগাছির গুলি মারার মামলাতেও ইনি সাধারণের সুপরিচিত হয়েছিলেন। শ্রমিকরা সকলেই দেখলাম তাঁর খুব অনুগত এবং তাঁকে খুবই ভালবাসে।

শ্রীযুক্ত কে, সি, মিত্রের প্রধান কাজ ছিল, প্রত্যহ সকালে বিকালে শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা করা। হাওড়ার ময়দানে প্রত্যহই সকালে বিকালে মিটিং হ'ত এবং প্রথম প্রথম ঢোল সহরত ক'রে শ্রমিকদের সভা ডাকা হ'ত। পরে তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আপনা থেকেই সভায় হাজির হত। এই সকল সভায় আমরা প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকতাম, কিন্তু বক্তৃতার কাজটি একচেটিয়া ক'রে নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জ্জীও মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করতেন কিন্তু তাঁর বক্তৃতা সেরূপ জোরের হত না। মিত্র প্রত্যেক মিটিংএ একঘণ্টা কখনও কখনও দুই ঘণ্টা ধরেও বক্তৃতা ক'রতেন। নির্ভুল না হলেও তাঁর হিন্দি ভাল এবং বলবার কায়দাও বেশ। কিন্তু তাঁর বক্তৃতাতে সারাংশ কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বোল্‌সেভিজম্‌, কমিউনিজম্‌, কংগ্রেস, নন্‌-কো-অপারেশন সকল বিষয়েরই অবতারণা করতেন। 'লড়াই' কথাটা তিনি খুব বেশী ব্যবহার করতেন এবং ঐ কথাটাই শ্রমিকদের হৃদয় স্পর্শ করত। তারা সকলই এইটা বোধ করত যে একটা বিরাট সংগ্রাম তারা চালাচ্ছে কিন্তু ঠিক কিসের বিরুদ্ধে সেটা তারা বুঝতে পারে নি এবং সে বিষয় তাদের বেশ করে বুঝাইয়াও দেওয়া হ'ত না। বোল্‌সেভিক, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি কথা আওড়ানো এবং প্রায় প্রত্যেক বক্তৃতাতেই রুশ যুদ্ধের মজুর রাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও মিঃ মিত্রের এ সকল বিষয়ে জ্ঞান খুব অল্পই ছিল এবং শ্রমিক আন্দোলনকে ঠিক পথে চালিত করবার দিকে তাঁর চেষ্টাও দেখা যেত না। কোনও সভাতেই আমি মিঃ মিত্রকে এ কথা বল্‌তে দেখিনি যে এই সংগ্রাম শ্রমিকদের নিজেদের চালাতে হ'বে, এই জন্য তাদের রীতিমত সংগঠিত হ'তে ও শিক্ষা লাভ করতে হ'বে এবং সংগ্রামের নেতৃত্ব ও তাদের গ্রহণ করতে হ'বে। সুতরাং চাঁদা দেওয়া, পিকেটিং করা সভায় বক্তৃতা শুনা এবং মিত্রের হুকুম যেরূপই হউক না কেন, না ভেবে চিন্তে বর্ণে বর্ণে পালন করা ছাড়া আর যে তাদের কিছু করবার আছে সে কথা তারা আদৌ বুঝত না বা ভেবে দেখত না।

শ্রমিকদের মধ্যে পূর্ব্বেই বলেছি, দুই তিন জন বক্তা ছিল। তাহারা প্রায়ই বক্তৃতা করত কিন্তু আন্দোলনের গঠনমূলক ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল না এবং এ বিষয়ে তাদের গড়ে তুলবার চেষ্টাও হয় নি। ইহার ফলও অনতিবিলম্বে ফ'লিতে আরম্ভ করেছিল। শ্রমিক মাত্রেরই মনে ধারণা জন্মেছিল যে, মিঃ মিত্র ওরফে "জটাধারী" বাবা তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে তাদের জন্য সবই করে দেবেন ও লড়াই জিতে দিবেন। ধর্ম্মঘট কিছু'দিন চলবার পরই Relief (সাহায্য) নেবার জন্যে হুড়াহুড়ি পড়ে গিয়েছিল এবং লিলুয়ার আফিসটি কার্য্যতঃ অন্নসত্রে পরিণত হ'য়েছিল। আমি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছিলাম তখন রিলিফের কাজ খুব জোর চল্‌ছে। প্রত্যহই শত শত লোক সকাল থেকে Relief (সাহায্য) নেবার জন্য হাজির হ'ত এবং লিলুয়া থেকে তাদের চাল, ডাল ও পয়সা বিতরণ করা হ'ত। শুনেছিলাম ধর্ম্মঘটের প্রারম্ভে ইউনিয়নের ফণ্ডে প্রায় বার তের হাজার টাকা সঞ্চিত হয়েছিল। সমস্ত টাকাটাই লিলুয়া কারখানার ও বার্ণ জেসপ ও মার্টিন কোম্পানীর কারখানার শ্রমিকরা দিয়েছিল। কিন্তু মামলা মোকদ্দমা ও বিশেষ ক'রে Relief যেরূপ হারে দেয়া হচ্ছিল তা'তে ঐ টাকা ২ মাসের মধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসছিল। আমি যে সময় লিলুয়াতে উপস্থিত হই সে সময় টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে অথচ Reliefএর তাগাদা শ্রমিক পক্ষ থেকে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। শ্রমিক মহলে অসন্তোষ ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লিলুয়া আফিসে এমন একটা অশান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে যে সেখানে থাকা সকলের পক্ষেই দুর্ঘট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর পক্ষে ই, আই, আর, এর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এজেণ্ট কল্‌ভিন্‌ সাহেব এবং তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ লিলুয়া কারখানার মালিক গোল্ড প্রভৃতি মিত্রের বক্তৃতায় প্রত্যহই "বেইমান", "সফেদ চামরাওয়ালা হারামখোর" প্রভৃতি মিষ্ট ভাষণে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও সে তরফ থেকে কিছুমাত্র নতি স্বীকারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে মিঃ মিত্রের নেতৃত্বে শ্রমিকদলের সঙ্গে এজেণ্টের বার দুই সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে, কিন্তু মিটমাটের কোনও ইচ্ছাই মিঃ কলভিন্‌ প্রকাশ ক'রেন নি। জেসপ্‌, বার্ণস্‌ ও মার্টিন কোম্পানীর কর্ত্তারা ত কোনও কথাবার্ত্তার উত্থাপনই সে পর্য্যন্ত করেন নি, এবং এ বিষয়ে ইউনিয়নের তরফ থেকে কোন চেষ্টা হয় নি। মিঃ মিত্রের ধারণা ছিল যে ঐ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার কিছু ছিল না, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে লিলুয়া কারখানার ধর্ম্মঘটের মিটমাট হ'লে উক্ত কারখানাগুলির

[illegible] একটা সুমীমাংসা হ'য়ে যাবে। এ ধারণা যে তাঁর [illegible] কথা দৃঢ় অসাধ্য এবং এ সকল বিষয়ে [illegible] মতেই চলতেন, আরও পরে এ সম্বন্ধে পরামর্শ [illegible] তিনি [illegible] বলতেন না এবং কেহ কোনও [illegible] পেলে তা কখনও গ্রহণ করতেন না। অপর [illegible] "জটাধারী বাবা" বললে অজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ [illegible] তাঁর অঙ্গুলিনির্দ্দেশে চালিত হচ্ছিল। আমি [illegible] কারখানার শ্রমিকদের নিজেদের ব্যাপার নিয়ে কখনও [illegible] চিন্তা করতে দেখি নি। এমন কি বার্ণ কোম্পানীর [illegible] মিস্ত্রীরও ও বিষয়ে কোনও জ্ঞান আছে ব'লে মনে হয় নি। সকলেই মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং মনে করত যে কোনও উপায়ে তিনি তাদের [illegible] দেবেন।

মিঃ মিত্রের হাতের টাকা যতই ফুরিয়ে আসতে লাগ্‌ল [illegible] শ্রমিক মহলে অসন্তোষের বিস্তার হ'তে লাগল। ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়াল যে Relief (সাহায্য) না দিতে পারলে ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে যায় এবং শ্রমিকরা কাজে যোগদান ক'রে ফেলে। আসন্ন পরাজয়ের আশঙ্কা মিঃ মিত্রকে অস্থির ক'রে তুলল। তখন ঠিক হ'ল যে ই, আই আর, এর অন্যান্য শ্রমিক যারা ধর্ম্মঘটে যোগদান করেনি তাদের কাছে অর্থ সাহায্য চাওয়া হবে এবং এ সম্বন্ধে ইস্তাহার ছাপিয়ে লাইনে বিতরণ করা হ'তে লাগল কিন্তু বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। তখন জনসাধারণের কাছে অর্থের জন্য আবেদন করা হ'ল কিন্তু তাতেও বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। তখন শ্রমিক মহলে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান অসন্তোষের নিবৃত্তির জন্য ঠিক করা হ'ল যে, লিলুয়া ও হাওড়ার শ্রমিকদের এক বিরাট অভিযান কাঁচরাপাড়া অভিমুখে যাত্রা করবে। উদ্দেশ্য এতে তাঁদের মনে উৎসাহের সঞ্চার হবে এবং কাঁচরাপাড়ার রাস্তায় চটকল সমূহের মধ্য দিয়ে ঐ বাহিনী নিয়ে গেলে ঐ সব অঞ্চলের শ্রমিক মহলে একটা সাড়া পড়ে যা'বে, তারা ধর্ম্মঘটের কথা ভাল ক'রে জানতে পারবে এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য ও পাওয়া যেতে পারে।

শ্রমিক বাহিনী যখন হাওড়া থেকে যাত্রা করেছিল সে সময় আমি উপস্থিত ছিলেম না। আমি ট্রেণে কাঁচরাপাড়ায় যখন উপস্থিত ছিলেম তখন শ্রমিকদল সেখানে পৌছে গেছে। ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে এক ময়দানে বিরাট সভার অনুষ্ঠান করা হয়েছিল এবং তথায় কাঁচরাপাড়া কারখানার বহু শ্রমিক উপস্থিত ছিল। আমি যখন সেখানে পৌছিলাম তখন শ্রীযুত শিবনাথ ব্যানার্জ্জী বক্তৃতা করছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হ'লে কাঁচরাপাড়ার দুই একজন শ্রমিক বক্তৃতা করে এবং ঐ সভায় ঠিক হয় যে কাঁচরাপাড়া কারখানার শ্রমিকরা লিলুয়ার ধর্ম্মঘটের জন্য অর্থ সাহায্য করবে এবং লিলুয়া কারখানার যে মেরামতি কাজ হয় সেই সকল কাজ কাঁচরাপাড়া কারখানায় আসলে সেখানকার শ্রমিকরা তা করবে না। সন্ধ্যার কিছু পরে সভা ভঙ্গ হ'ল এবং আমরা শ্রমিক বাহিনী নিয়ে কলিকাতার দিকে রওনা হ'লাম। সঙ্গে চলল ২ খানি মোটর বাস বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ ও বহু লাঠিধারী পুলিস সিপাহী চলল পদব্রজে সঙ্গে সঙ্গে।

মুহু মুহু জয়ধ্বনি করতে করতে সেই বিরাট বাহিনী অগ্রসর হ'ল। [illegible] গঙ্গার ঘাটে রাত্রি যাপন ক'রে তারপর দিন দুপুরে আমরা টিটাগড়ে এসে বিশ্রাম ও আহারাদি করলাম। পর দিন সকালে হাওড়ায় পৌছান গেল।

রাস্তায় যে সকল চটকল ও অন্যান্য কারখানার সম্মুখ দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম সেই সকল স্থানের শ্রমিকরা বাইরে এসে আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেছিল এবং সকলেই অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। লিলুয়ার ধর্ম্মঘটের প্রতি সমস্ত শ্রমিকেরই যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

সর্ব্বহারার দাবী

—:০:—

ভারতের রাজনীতি প্রাঙ্গণে নেতাদের যে মল্লাভিনয় সুরু হয়েছে তার শেষ পরিণতি কোথায় ঠিক বুঝা না গেলেও এটা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে উহা বাকযুদ্ধ ও লেখনী সংগ্রামের বাইরে পৌছুবে না। বৃদ্ধ মতিলালের দল জিত্‌বে কি তরুণ জহরলালের দল জিত্‌বে এবং আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতে "জাতীয় সম্মিলনীর" কর্ণধার কোন দল হ'বে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা না গেলেও আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে "তাল ঠোকাঠুকি" ও "যুদ্ধং দেহি" রবের বেশী কোনও দলই অগ্রসর হবেন না। তাঁরা যা ভাল বুঝেন করুন, আমাদের কোনও আপত্তি নেই কিন্তু এ সকল কথার অবতারণা করা আজ দরকার হয়েছে এইজন্য যে উহাদের কার্য্যপদ্ধতি বা হাতের "বে-হাতিয়ার লড়ায়ের মধ্যে আমাদের নিয়েও ওরা টানাটানি করতে ছাড়েন নি। সকলের মুখেই এই বুলি শুনা যাচ্ছে যে গণসাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। শোষিত, লাঞ্ছিত, সর্ব্বহারা আমরা, ভারতের কোটী কোটী শ্রমিক ও কৃষক—আজ বুঝতে শিখেছি যে আমাদের সহানুভূতি ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। একথা যে আজ আমরা নূতন শুনছি তা নয়। মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথম এই বাণী আমাদের শুনিয়েছিলেন তখন ত আমরা কোটী কণ্ঠে সাড়া দিয়েছিলাম, ভক্তিতে আমাদের মাথা নত হ'য়ে পড়েছিল, আমরা তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছিলেম। কিন্তু আমাদের সে সহানুভূতি আজ কংগ্রেসের নেতারা হারিয়েছেন, কেন সে কথা কি তাঁরা ভেবে দেখেছেন?

আজ আমরা স্পষ্ট করে রাজনৈতিক নেতাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, আমরা কি চাই, আমাদের কাছে "স্বাধীনতার" মূর্ত্তি কিরূপ।

আমরা দিনের পর দিন নেতা খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু নেতা কোথায়? তোমাদের যে কেউ যখন নেতৃত্বের আসনে ব'সে আমাদের ডাক দিচ্ছে আমরা তখনই তোমাদের পেছনে ছুটছি। তোমাদের ছেঁদো কথায় ভুলে আমরা মরণ পণ করে অন্ধের মত যখনই ছুটে যাচ্ছি তখনই তোমরা পেছিয়ে যাচ্ছ, ও আমাদের অগ্রগতিকে রোধ করবার জন্য নূতন নূতন কথার অবতারণা ক'রছ। তোমরা কি মনে কর যে তোমাদের ধাপ্পাবাজীতে ভুলে চিরকালই আমরা তোমাদের অনুসরণ ক'রব? আমাদের আজ চোখ ফুটেছে, আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের এ অবস্থা কে করেছে, আমরা জানতে পেরেছি কারা আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে আজ আমাদের ভিখারী করেছে, কারা আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে।

চিরকালের অন্ধ আমরা, আজ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছি, আজ আমরা চিনতে পেরেছি কারা আমাদের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু শুষে নিয়ে আমাদের কঙ্কালে পরিণত করেছে। আজ আমরা চিনতে শিখেছি কে আমাদের বন্ধু, কে আমাদের দুশমন। মনে রেখো, আজ ঘুমন্ত দৈত্য চোখ মেলে চেয়েছে। দেখতে পাচ্ছ কি তার চোখের দৃষ্টিতে কিসের জ্বালা? দেখতে পাচ্ছ কি তার বিশাল হাত দুটো আজ কোন্ দিকে প্রসারিত হচ্ছে। বুঝতে পাচ্ছ কি সে আজ ছিনিয়ে নিতে চায়?

সাবধান ভীরু, কাপুরুষের দল। জান কি কা'কে খুঁচিয়ে জাগাচ্ছ তোমরা? পারবে কি আমাদের রুদ্রগতির সামনে বক্রবাহু প'সে অগ্রসর হ'তে? আজ আমাদের চোখে আগুনের জ্বালা ঠিকরে পড়ছে। আজ আমাদের জিহ্বায় আমরা রক্তের মিষ্ট আস্বাদ অনুভব করছি। আমাদের কাণে কেবল ভাঙনের গান শুনতে পাচ্ছি। চারদিক থেকে আমাদের কাণে আসছে হাতুড়ির ঘায়ের আওয়াজ। কোটি কণ্ঠের বজ্রকঠোর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, "ভেঙ্গে ফেল্ ভেঙ্গে ফেল্। ভেঙ্গে ফেল্ ওই জগদ্দল পাথর যা তোদের বুকের ওপরে হাজার হাজার বছর ধরে চাপান রয়েছে।"

ওই শোন আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দুনিয়ার শ্রমিকদলের বজ্র নিনাদ। "দুনিয়ার শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ ক'রে আজ তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই ধ্বনি আজ গর্জ্জে উঠছে। দুনিয়ার শোষক সম্প্রদায় আজ ভয়কম্পিত হৃদয়ে উঠে পড়ে লেগেছে এই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ নিবারণের জন্যে।

শুনবে আমরা কি চাই? আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। দুনিয়ার সম্মিলিত শোষকদলের হাত থেকে আমাদের হৃত অধিকার আমরা কেড়ে নিতে চাই। আমাদের সর্ব্বস্ব চুরী করে, আমাদের পেটের ভাত কেড়ে নিয়ে যারা দুনিয়ার সকল আরাম, সকল সুখ আজ ভোগ করছে, আমরা আজ সেই দস্যুদলের হাত থেকে সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে দাঁড়িয়েছি।

এই শোষণ কাজে যারা লিপ্ত আছে, তারা বিদেশীই হ'ক আর স্বদেশীই হ'ক আমাদের চোখে দুই-ই সমান। আমাদের স্বাধীনতার অর্থ দুনিয়ার সর্ব্বহারা-দলের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার কোনও গণ্ডী নেই।

সেইজন্য আজ আমাদের স্পষ্ট ক'রে বলে দেওয়া দরকার হয়েছে যে আমাদের বিদ্রোহ কেবলমাত্র বিদেশী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। দেশের জমীদার, দেশের ব্যবসায়ী ধনী সম্প্রদায়ের শোষণ থেকেও আমরা নিজেদের মুক্ত করতে চাই।

দুনিয়ার ধন উৎপন্ন করি আমরা আর ভোগ করে আর এক দল যারা—কিছুই উৎপন্ন ক'রে না—এ আমরা চাই না। আমরাই দুনিয়ার ধন-সম্পত্তির মালিক হ'তে চাই আর তার জন্যই আজ সারা দুনিয়ার সর্ব্বহারাদলের সংগ্রামের আয়োজন।

পারবে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে? যদি পার আমাদের দাবী মেনে নিতে ত এগিয়ে এসো আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আর তা না'হলে আমাদের নেতৃত্বের দাবী ক'রো না। পথ থেকে স'রে দাঁড়াও।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল

মাটিয়াবুরুজে শ্রমিক সভা

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের "অনুরোধে বেঙ্গল টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স" ইউনিয়ন মাটিয়াবুরুজে গত রবিবার শ্রমিকদের এক সভা ডাকিয়াছিল। এই সভায় ৫০ শ্রমিক সমবেত হইয়াছিল। সভায় "ট্রেড ডিস্পিউট বিল," "পাবলিক সেফ্টি বিল," ও কৃষক ও শ্রমিকদলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং প্রথম নিখিল ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিক দল সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছিল। দলের পক্ষ হইতে ধরণীকান্ত গোস্বামী, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, শামসুলহুদা ও মণীন্দ্রকুমার সিংহ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রমিকগণ অত্যন্ত জোরের সহিত বিল দুইটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে।

অভ্যর্থনা সমিতি

প্রথম নিখিল ভারতীয় "কৃষক ও শ্রমিক দল সম্মিলনের" জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে মিঃ পি. মিত্র ব্যারিষ্টার উহার চেয়ারম্যান ও মিঃ ধরণীকান্ত গোস্বামী উহার সেক্রেটরী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

Printed at Sree Saraswaty Press, 1 Ramanath Majumdar Street, Calcutta and Published at 2-1 European Asylum Lane, Calcutta, by Muzaffar Ahmad.

নজরুলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বুধবার ১লা পৌষ, ১৩৩২, ইং ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫'।

আর নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে 'লাঙল' পত্রিকা-সমগ্র প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ / মে ২০০১ সালে।

মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত 'লাঙল' সমগ্রতে সম্পাদক উল্লেখ করেছেন, 'লাঙল-এর সবগুলো সংখ্যা পাওয়া গেলেও কিছু পৃষ্ঠা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি'। যেহেতু আজ পর্যন্ত তা উদ্ধার করা যায়নি, তাই পূর্ববর্তী মুদ্রণই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

২.

নজরুলের 'গণবাণী' শিরোনামের সঙ্গে বন্ধনীতে (... 'লাঙল' একীভূত হয়েছে) বাক্যটি প্রমাণ করে পত্রিকার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে কোনো ভিন্নতা বা পার্থক্য আনা হয়নি। 'লাঙল' যেমন কৃষক তথা অতি সাধারণ মানুষের কথা বলে, তেমনি 'গণ-বাণী'ও যে জনগণের জয়গাথা পরিবেশন করে তা ধ্রুব সত্য।

ISBN 984555260-9